মাসিক বসুমতী

চতুর্থ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা)

সম্পাদক ঃ—

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী ✻ সাহিত্য ✻ মন্দির

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪র্থ বর্ষ]

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

[১ম সংখ্যা

[বৈশাখ হইতে আশ্বিন, ১৩৩২]

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

ত্রিবর্ণ চিত্র—

একবর্ণ চিত্র—

আষাঢ়

ত্রিবর্ণ চিত্র—

একবর্ণ চিত্র—

শ্রাবণ

ভাদ্র

ত্রিবর্ণ চিত্র—

একবর্ণ চিত্র—

আশ্বিন

চতুর্থ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩২ [১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার চিহ্নিত সেবক

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সময় বলিয়াছিলেন, মথুর, তুমি যত দিন থাকৃবে, আমিও তত দিন দক্ষিণেশ্বরে থাকৃব। মথুর স্থির জানিতেন, 'বাবা'র বাক্য কখন বিফল হয় না। তাঁহার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে বলিলেন, সে কি, বাবা! আমার স্ত্রী, দোয়ারী (মথুরের পুত্র) যে তোমার পরম ভক্ত।

আচ্ছা, বেশ! যত দিন এরা থাকৃবে, আমি তত দিন থাকৃব।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতিলাভে মথুরের অন্তর আশ্বস্ত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও মথুর স্থির জানিতেন, সম্পদে-বিপদে বাবাই একমাত্র ভরসা। যেথানে ধনজন, প্রতাপ-প্রতিপত্তি সব ব্যর্থ, বাবার কৃপাই সেখানে রক্ষার একমাত্র উপায়। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া মথুর বুঝিয়াছিলেন, এই দীন-হীন, নিরভিমান ব্রাহ্মণ-সন্তান নরদেহধারী হইলেও দেবতার দেবতা। ইঁহার ইচ্ছায় এবং আদেশে শমনের অমোঘ সন্ধান ব্যর্থ হয়, রাজ-করে উদ্যত অসি খসিয়া পড়ে; কৃপায় কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচিয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে ইঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াও মথুর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে জানবাজার-বাটীতে লইয়া গিয়া স্ত্রী-পুরুষে বাবাকে সেবা-যত্ন করিতেন।

অসামান্য রূপ-লাবণ্যময়ী রমণী নিয়োগ করিয়া মথুর বাবার অটল মনকে টলাইতে পারেন নাই। যে মহিলা-সমাজে অতি সংযত-চরিত্র পুরুষও ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করেন, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞানহীন বাবার সেখানে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় অসঙ্কোচ ব্যবহার। এ জন্য জানবাজার-বাটীতে অন্দরে-বাহিরে সর্ব্বত্র বাবার অবাধ গতি ছিল। মথুরের অন্তঃপুরিকাগণ বাবাকে বালক বলিয়াই জানিতেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহাদের ব্যবহারও ছিল তেমনি প্রীতিমাখা, সরল ও সর্ব্বতোভাবে সঙ্কোচশূন্য।

পুত্রহীনা রাণী রাসমণির চারিটিমাত্র কন্যা ছিল। ইঁহারাই তাঁহার সকল সম্পত্তির অধিকারী। ভবিষ্যতে পাছে বিষয়ের ভাগ লইয়া কন্যাদিগের ভিতর গোলমাল বাধে, বুদ্ধিমতী রাণী এ জন্য ভদ্রাসন ও জমীদারী সমান ভাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশমত চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া যান। মথুর বাবুর পত্নী বা সেজগিন্নী এক দিন অপরের

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

ভাগের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, পুকুরের পাড়ে বড় সুন্দর শুষণী শাক জন্মিয়াছে। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, মথুরের স্ত্রী কাহারও অনুমতি না লইয়া অপরের অংশের সেই শাক তুলিয়া আনিল। সর্ব্বনাশ! এ ত চুরি। সেজ গিন্নী করিল কি? শ্রীরামকৃষ্ণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এরূপ অন্যায় কার্য্যের না জানি কি কুফল ফলিবে! এমনি মনে মনে নানা তোলাপাড়া করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই যাঁহার ভাগের শাক, তিনি আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আগাগোড়া ঘটনাটা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। এই তুচ্ছ কারণে বাবার এত ভয় ও ভাবনা দেখিয়া পুষ্করিণীর অধিকারিণীর বিষম হাসি পাইল। কিন্তু মুখে গম্ভীর

ভাব ধারণ করিয়া রহস্যের ছলে বলিলেন, তাই ত বাবা, 'সেজ' ত ভারি অন্যায় কায করেছে! বলিতে বলিতে সেজ গিন্নীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ঘটনাটা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে ব'লে দিতে হয়। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দুটি শাক তুলে আনলুম, আর সে কথা ওকে ব'লে দিয়ে তুমি কি না আমাকে অপ্রতিভ করলে!

তার পর দুই ভগ্নীতে মিলিয়া হাস্যরোল তুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, কি জানি বাপু! বিষয় যখন ভাগবাটোয়ারা হয়ে গেছে, তখন না ব'লে নেওয়াটা ভাল হয়নি। এখন তোমরা বোঝা-পড়া কর।

বাবার কথায় আরও হাসির রোল ছুটিল। কিন্তু উভয় ভগ্নীরই মনে হইল, কি অপূর্ব্ব সরলতা আর ন্যায়-অন্যায়ের উপর কি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

রাণী রাসমণি বিপুল বৈভবশালিনী। জানবাজারে তাঁহার বিশাল বাসভবন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত। কিন্তু এই দেব-বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়াও মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিতেন, হৃদু, এই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, ধন, জন, প্রতিষ্ঠা, আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, সবই ভোজবাজী, একমাত্র রামকৃষ্ণই সত্য। বাবা না উপস্থিত থাকিলে মথুরের কোন উৎসব উৎসব বলিয়া মনে হইত না, কোন আমোদে প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারিতেন না। বাটীতে যাত্রা হইতেছে, মথুর বাবাকে সাজগোজ পরাইয়া আসরে বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদেশে খাজাঞ্চি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে প্যালা দিবার জন্য থাকে থাকে শতাধিক টাকা সাজাইয়া দিয়া গেল। বাবা গান শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া হয় ত এককালীন সমস্ত টাকা গায়কের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। ধনী হইলেও মথুর একটু কৃপণস্বভাব ছিলেন। কিন্তু বাবার বেলা মুক্ত-হস্ত। আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, বাবার যেমন উদার মেজাজ, তেমনি প্যালাও দেওয়া হয়েছে। আবার তেমনি করিয়া টাকা সাজাইয়া দিবার জন্য খাজাঞ্চির প্রতি আদেশ হইল।

মথুর বাবু

প্রতি বৎসর রাণী রাসমণির ভবনে শারদীয় মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবার কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অধিষ্ঠানে উৎসবের আনন্দ যেন শতধারে প্রবাহিত হইতেছে। সুদীর্ঘ প্রবাসের পর কন্যা-সমাগমে মাতাপিতার অপার আনন্দ যেমন অশ্রুধারে আত্মপ্রকাশ করে, মথুর এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সেজগিন্নীর আজ সেই ভাব। কি এক স্বর্গীয় প্রভাব যেন উভয়ের প্রীতি-প্রসন্ন বদনে কারণে অকারণে হাসি ফুটাইয়া অশ্রুর প্রবাহে তাহাকে অধিকতর রমণীয় করিয়া তুলিতেছে। ব্যয়কুণ্ঠ মথুর আজ মুক্তহস্ত, সেজগিন্নী আজ অন্নপূর্ণা। মথুরের রাজসিক পূজা, আয়োজনে কোথাও অণুমাত্র ত্রুটি নাই। তার উপর বাবার অধিষ্ঠানে তাঁহার সকল অনুষ্ঠান আজ সাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত। চন্দন যেন আজ অধিকতর গন্ধ বিতরণ করিতেছে, ফুল যেন আজ অপরিমিত আনন্দে হাসিতেছে! মথুরের গৃহে আজ অপূর্ব্ব সমাগম! এক দিকে যেমন প্রাণময়ী প্রতিমা, অন্য দিকে তেমনি সজীব বিগ্রহ—বাবার অধিষ্ঠান! কিন্তু ভাবাবেশে এ চেতন

বিগ্রহও আজ ক্ষণে ক্ষণে মৃন্ময়ীর ন্যায় নিস্পন্দ-কায়!

আনন্দময়ীর আগমনে এই আত্মারাম পুরুষ এ কয় দিন একেবারে আত্মহারা, শ্রীশ্রীজগদম্বার সখী-ভাবে মাতুয়ারা। তাঁহার হাব-ভাব, চলন-বলন, চাহনি, সমস্তই নিখুঁত নারী-সদৃশ। তার উপর শ্রীভবতারিণীর নিপুণ বেশকার হৃদয় আজ তাহার মাতুলকে গরদের চেলী পরাইয়া রমণীর রমণীয় বেশে সাজাইয়া দিয়াছে!

দিবসের পূজা শেষ হইয়া গেল। ভক্ত দম্পতি বাবার পায় ও জগন্মাতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সন্ধ্যারতির আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান করিতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। অনতিপরেই আরতি আরম্ভ হইবে। কিন্তু বাবার ভাব-সমাধি আজ আর কিছুতেই ভাঙ্গিতেছে না। সেজগিন্নী বড় বিপদে পড়িলেন। বাবাকে একা ফেলিয়া যাওয়া যে নিরাপদ নয়, জগদম্বা দাসী তাহা ভাল রকমই জানিতেন। ভাব হইলে বাবার হুঁস থাকে না। একবার একটা জ্বলন্ত গুলের উপর পড়ায় শরীরের ভিতর আধখানা গুল ঢুকিয়া গিয়াছিল। কত যত্নে তবে সে ঘা সারে! আবার একা ফেলে গেলে, কর্ত্তা যে হঠকারী, কি করিতে কি করিয়া বসিবেন। একে ত রাগিলে তাঁহার গুরু-লঘু, স্ত্রী-পুত্র জ্ঞান থাকে না, তাতে যদি আবার বাবাকে লইয়া কোন বিভ্রাট হয়—গৃহিণী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন ভয়, অন্য দিকে তেমনি অসংবরণীয় আকর্ষণ! এই উভয় সঙ্কটে সেজগিন্নীর মস্তিষ্কে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবিত হইল। তাড়াতাড়ি আপনার বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি আনিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে কানের কাছে বলিতে লাগিলেন, বাবা, আরতি হবে যে! মাকে চামর করতে যাবে না?

এমনি কয়েকবার বলিতে বলিতে বাবার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। জগদম্বার সঙ্গে চামর হস্তে মৃদু-মন্দ-গমনে তিনি প্রতিমা-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এ দিকে মথুর দেখিলেন, কে এক অপরিচিতা সুন্দরী তাঁহার পত্নীর পাশে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে প্রতিমাকে চামর করিতেছে! কে এ? ইহাকে ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই! সুবলিত বাহু দোলাইয়া কি কোমল মধুরভাবে ইনি ব্যজন করিতেছেন—যেন খর বীজনে প্রতিমার অঙ্গে ব্যথা লাগিবে! এ যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি! এমন ভক্তিমতী স্ত্রীলোক আমার আত্মীয়াদের মধ্যে আছে! মথুরমোহনের মুগ্ধ চক্ষুর্দ্বয় প্রতিমাকে পরিত্যাগ করিয়া বার বার এই বিস্ময়-রূপিণী অপরিচিতার পানে ধাবিত হইতে লাগিল।

আরতির পর অন্দরে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই মথুর প্রথম প্রশ্ন করিলেন, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কে চামর করছিল?

সেজগিন্নী হাসিয়া বলিলেন, তুমি চিন্‌তে পার নি? বাবা।

বাবা! তা বটে, ধরা না দিলে এ অদ্ভুত পুরুষকে কার সাধ্য ধরে! চব্বিশ ঘণ্টা একত্র থেকেও আজ চিন্‌তে পারলুম না!

ভরপুর আনন্দে এমনি তিনটি দিন কাটিল। আজ বিজয়া—জগজ্জননীর নিরঞ্জন। মথুর-গৃহিণী পুনঃ পুনঃ অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহারই আয়োজন করিতেছেন। আজ যেন এ বাটীতে দিবালোক নিবিয়া গিয়াছে; সুসজ্জিত ভবন বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। আনন্দময়ী মায়ের মুখও যেন আজ বিষণ্ণ। কিন্তু মথুরমোহনের মনে কোন ভাবান্তর নাই। নিজ কক্ষে বসিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে মায়ের কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে পুরোহিত তাঁহার কাছে সংবাদ পাঠাইলেন, দর্পণ-বিসর্জ্জনের সময় উপস্থিত, বাবুকে দালানে একবার আস্‌তে বল।

কথাটা একবারে মথুরের ধারণায় আসিল না। পুনঃ পুনঃ বলাতে বুঝিলেন, আজ বিজয়া দশমী। তিনি কোন কথা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কেন এ নিষ্ঠুর আয়োজন? মায়ের বিসর্জ্জন? কেন? আমার কিসের অভাব যে, মাকে আমি জলে ফেলিয়া দিব? মায়ের এ আনন্দের হাট কি জন্য চূর্ণ করিব? না না, তা কখনই হবে না, হ'তে দিব না।

এ দিকে পুরোহিতের নিকট হইতে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল, বিসর্জ্জনের সময় বহিয়া যায়। যায় যাক্! মথুর সাফ বলিয়া দিলেন, আমি মাকে বিসর্জ্জন দিব না। আমার অমতে যদি কেউ দেয় ত—

মথুরের চাপা দাঁতের ভিতর বাকী কথাগুলা রহিয়া গেল, ভৃত্যও সভয়ে সরিয়া পড়িল। মথুর যাঁহাদিগকে মান্য করিতেন, তাঁহারা বুঝাইতে আসিলেন। মথুরের সেই এক কথা—যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি নিত্য হবে। মান্যমান ব্যক্তিরাও হারি মানিয়া সরিয়া পড়িলেন। এ দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য বদরাগীকে ক্ষেপাইয়া কে খুনো-খুনী ঘটাইবে! কথাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ক্রমে সেজগিন্নীর কাছে পৌঁছিল। সকলের চেয়ে তিনি স্বামীকে বেশী চিনিতেন, ছুটিয়া গিয়া বাবার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

বাবা আসিয়া দেখিলেন, মথুরের চোখ-মুখ লাল, পাগলের মত ঘরের ভিতর দ্রুত পদক্ষেপে সিংহের ন্যায় এধার ওধার করিয়া বেড়াইতেছে। বাবাকে দেখিয়াই মথুর বলিয়া উঠিলেন, যে যা-ই বলুক, বাবা, আমি বিস-র্জ্জন দিতে দিব না। মাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না।

বাবা মথুরের বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলি-লেন, কে বল্‌লে তোমায় মাকে ছেড়ে থাক্‌তে হবে? মা কি ছেলে ছেড়ে থাক্‌তে পারে? এ তিন দিন বাইরে প্রকাশ হয়ে তোমার পূজা নিয়েছেন, এখন থেকে তোমার অন্তরে ব'সে পূজা নেবেন।

এই অদ্ভুত পুরুষের স্পর্শে কি অদ্ভুত শক্তি ছিল, মথুর অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিরঞ্জনাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন।

ভাব-সমাধিতে অপরিসীম আনন্দের কথা শুনিয়া এবং বাবাতে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মথুর এক দিন আব-দার ধরিলেন, বাবা, আমার যাতে ভাব-সমাধি হয়, ক'রে দিতে হবে।

বাবা অনেক বুঝাইলেন, তা হ'লে সংসারে আর মন থাক্‌বে না। বিষয়-আশয় সব যাবে, বারো ভূতে লুটে খাবে। কে সে কথা শুনে! মথুরের সেই এক গোঁ—না, বাবা, তোমায় ক'রে দিতেই হবে।

মথুরকে একান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, মা'র ইচ্ছা হয়, হবে।

ইহার কয়েক দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য মথুর লোক পাঠাইলেন। কাছে গিয়া বাবা দেখি-লেন, মথুরের চোখ-মুখ-বুক সব লাল, ঈশ্বরের নাম করতে করতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছে। মথুর বাবার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ঘাট হয়েছে, বাবা! তিন দিন ধ'রে যেন ভূতে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়ে না। চেষ্টা করেও বিষয়-আশয়ের উপর মন দিতে পারছি নি। সব নয়-ছয় হয়ে গেল! তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, বাবা!'

বাবা বুকে হাত দিতে সে ভাব শান্ত হইল। মথুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এক সময় মথুর কঠিন বিস্ফোটক রোগে আক্রান্ত হন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য মথুর ব্যাকুল হইল, বাবা বলিয়া পাঠাইলেন, আমি গিয়ে কি করব? আমার কি ফোড়া সেরে দেবার শক্তি আছে? কিন্তু মথুরের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে যাইতে হইল। বাবা উপস্থিত হইতে মথুর বলিলেন, বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আমার পায়ের ধূলায় কি ফোড়া আরাম হবে?

মথুর উত্তর দিলেন, আমি কি এমনি, বাবা! ফোড়া আরাম করবার ডাক্তার আছে। আমি ভবরোগ সারা-বার জন্য তোমার পায়ের ধূলা চাচ্ছি!

এই কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইলে মথুর তাঁহার চরণে মস্তক রাখিলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর এমনি একনিষ্ঠ সেবা করিবার পর মথুরের মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আর দেখিতে গেলেন না। কিন্তু এই চিহ্নিত সেবকের চরম সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

ইহার দীর্ঘকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে মথুরের সেবার কথা শুনিতে শুনিতে কোন ভক্ত বলিয়াছিলেন, মথুর বোধ হয় মুক্ত হয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর দিলেন, না, কোথাও রাজা-টাজা হয়ে জন্মেছে। মথুরের ভোগবাসনা ছিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা

৩

যেমন নাটক-রচনা এবং নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তেমনই কথকতা প্রচলনের দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষা, তথা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যথেষ্ট প্রচার এবং প্রসার লাভ হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য ও কথকতা

বাঙ্গালা দেশে মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি কথকতা হইয়া থাকে। কথকরা সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক এবং বর্ণনাদি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা করিয়া এক অভিনব বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিলেন। ভাষাতত্ত্ববিদরা ইহাকে ভাষার সম্প্রসারণ-রীতি বলেন। কথকদিগের সৃষ্ট ভাষা শিথিল-বন্ধন হইলেও গাঁথনি বেশ জমাট ছিল। ইঁহাদের বর্ণনাগুলি শ্রুতিসুখকর এবং মর্ম্মস্পর্শী। এই বর্ণনা-চাতুর্য্যই ইঁহাদের ভাষাকে অনেকটা সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছে। কথকদিগের দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। যথা,—

"এতস্যাং সান্ধ্যি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্॥
শ্মশান-চক্রানিল ধূলি-ধূম্র-বিকীর্ণ-বিদ্যোত-জটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে॥"

ইহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, যথা,—

"ভূতপতি ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া বৃষবাহন ভ্রমণ করেন, শ্মশান-চক্রানিল-তাড়িত ধূলাতে তাঁহার জটা-কলাপ ধূম্রবর্ণ, অথচ দ্যুতিমান এবং বিক্ষিপ্ত, তদীয় অমল রজত-দেহ ভস্মাচ্ছাদিত; তিনি ত্রিলোচন"—ইত্যাদি।

এইরূপ কতক কতক সংস্কৃত শব্দ ছাড়িয়া ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিবার রীতি তাঁহাদের আছে। প্রায় শতাধিক বৎসর হইল, বাঙ্গালার কথকতা প্রচলন হইয়াছে। উহার প্রবর্ত্তক গদাধর ও রামধন শিরোমণি। রাঢ় অঞ্চলের কথকরা গদাধরের শিষ্য-প্রশিষ্য, রামধনেরও অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণী বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালার কথকদিগের নিকট বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যতটুকু ঋণী, বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকটও তদপেক্ষা কম ঋণী নহে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মনীষীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, উপদেশ ও ব্যাখ্যা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রী-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি আশঙ্কায় এই স্থানে তাহার নমুনা দিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য

সাহিত্যক্ষেত্রে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, কে কাহার নিকট কতটুকু ঋণী, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অনেক সমালোচক মাথা ঘামাইয়াছেন। ইহা সাহিত্যালোচনার অঙ্গীভূত হইলেও আমি উহা একান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ, জগতে এমন কোন সাহিত্য দেখা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বাবলম্বী এবং যাহাতে ঋণের সামান্য গন্ধ বিদ্যমান নাই। ন্যূনাধিক প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট ঋণী। বলিতে কি, যে যত বেশী বড়, সে তত বেশী ঋণী। আজ যে ইংরাজী সাহিত্য আপনার সম্পদ্-গৌরবে বিশ্ব-সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাও প্রাচ্য সাহিত্যের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। এক পঞ্চতন্ত্রের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য-সম্রাট নসিবানের আজ্ঞায় 'পঞ্চতন্ত্র' পহ্লবী ভাষায় এবং তাহার পর ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক ও আরবী

সাহিত্যে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ

ভাষায় অনূদিত হয়। উহার সিরিয় নাম 'কলিলগ ও দমনগ' এবং আরবী নাম 'কলিলা ও দিমনা,' ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত 'করটক' ও 'দমনক' নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরবীয়েরা মনে করিতেন যে, এই উপন্যাস 'বিদ্‌পাই' (বিদ্যাপতি) বিরচিত। এই 'বিদ্‌পাই' শব্দই শেষে অপভ্রষ্ট হইয়া 'পিল্‌পাই' ও 'পিল্‌প' হইয়া পড়ে। কালক্রমে যখন য়ুরোপীয়গণ 'কলিলা' ও 'দিমনা' স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানভাগ 'পিল্‌পের গল্প' (Fables of Pilpi) নামে অভিহিত হইল। পুনরপি দেখা যায়, গ্রীক-সাহিত্যে 'শতকের' প্রভাব অধিকতর বিদ্যমান। আলেক্‌জান্দার নগর গ্রীক ও হিন্দুজাতির মিলন-ক্ষেত্র ছিল। সে স্থানেও বৌদ্ধ প্রচারকদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঈশপ্‌-লিখিত 'উপকথার সহিত 'জাতকে'র অনেকগুলি উপাখ্যানের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। যথা,—সুবর্ণ হংসজাতক—স্বর্ণ-ডিম্বপ্রসবিনী হংসী, সিংহ-চর্ম্মজাতক—সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ। ইহা ব্যতীত দশমিক সংখ্যা-লিখনপ্রণালী আরবীয়রা হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া য়ুরোপে প্রচার করেন। প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের এই যে 'দাবি-দাওয়া', 'আদান-প্রদানের' সম্বন্ধ, ইহা কি আত্ম-সম্মানবিরোধী হীনতার পরিচয়? মহাকবি সেক্ষপীয়র —যিনি ইংরাজী-সাহিত্যে নূতন শক্তি ও অমূল্য সম্পদ্‌ দান করিয়া বিশ্ব স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাঁহারই অধিকাংশ নাটক পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সুগঠিত নহে কি? সমগ্র য়ুরোপখণ্ড আজ গ্রীক্‌-সভ্যতা ও গ্রীক্‌-সাহিত্যের নিকট মস্তক নত করিতে হীনতা জ্ঞান করিবে কি? ইংরাজ কবিগুরু চসার (Chaucer) বোকাসিও (Boccacio) ও পেট্রার্কের (Petrarch) নিকট, মিল্‌টন (Milton) দান্তের নিকট, এবং আমাদের মহাকবি শ্রীমধুসূদন মিল্‌টন্‌ ও দান্তের নিকট ঋণ-পাশে আবদ্ধ নহেন কি? বিশ্ব-সাহিত্যে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, একে অন্যের রুধির অম্লানবদনে পান করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধন এবং শ্রীসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন। যে জার্ম্মাণজাতি আজ সাহিত্য-সম্পদে, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মহাবলীয়ান্‌, তাহার মূল মহাকবি সেক্ষপীয়র নহেন কি? Schlegelএর সেক্ষপীয়রের অনুবাদ হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে জার্ম্মাণ-সাহিত্যের উৎপত্তি। ইমার্‌সান্‌ (Emerson) সত্যই বলিয়াছেন, সেক্ষপীয়রই জার্ম্মাণ-সাহিত্যের জনক। কালিদাসের 'শকুন্তলা' মহাভারতেরই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। মূল শকুন্তলার উপাখ্যান 'কাষ্ঠহারী জাতক' হইতে গৃহীত কি না, ইহাও বিচারসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে 'দশরথ জাতক'ও 'রামায়ণে'র একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেই হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা সমীচীন নহে, ইহার বিচারের ভার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর অর্পণ করিয়া আমার মূল বক্তব্যগুলি বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

এ পর্য্যন্ত আমি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যে ধারা-বাহিক আলোচনা করিলাম, ইহা হইতে আমার পাঠক-বর্গ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কত দীন। কতকগুলি কবিতা-পুস্তক, উপন্যাস এবং কয়েকখানিমাত্র নাটক অবলম্বন করিয়াই এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের দীনতা,—(ক) শব্দের অপ্রাচুর্য্য

আদর্শ-সাহিত্য গঠন করিতে হইলে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য (তক্ষণ), রসায়ন, বিজ্ঞান, নৌতত্ত্ব, সমরতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক রচিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হওয়া অসম্ভব। অবশ্য আজ আমরা যতটা দীন হইয়া পড়িয়াছি, চিরদিন এরূপ ছিল না; আমাদের ক্ষুদ্র ঝুলিতে সমস্ত বিদ্যাই ছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে ও পরাধীনতার তীব্র পেষণে আমরা সর্ব্বস্বহারা হইয়া আজ পরমুখাপেক্ষী—পরানুগ্রহপুষ্ট! যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হইবে, তত দিন বাঙ্গালা ভাষার দীনতা কিছুতেই ঘুচিবে না। শব্দসম্পদে বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা দীন। ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জীবাণুবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়, আবশ্যকমত পারিভাষিক শব্দ কোথায় মিলিবে? এ যাবৎ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা যে শব্দগুলি সংগঠিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ অতি অল্প, সামরিক বিদ্যা (জল-স্থল ও বিমানযুদ্ধ) আমরা একরকম ভুলিয়া গিয়াছি—শিখিবার প্রবৃত্তিও

বোধ হয় নাই। অর্ণবপোতে সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। যদিও এখন সে নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেছে না, তথাপি আমরা এমনই কূপমণ্ডুক যে, গণ্ডীর বাহির হইতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রী' (degree) 'বাগাইয়া' বরঞ্চ দশ ঘণ্টা কেরাণীগিরি করিতে রাজী, তথাপি সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের জন্য একটি ঘণ্টা ব্যয়িত হইলে সময়ের অপব্যবহার করা হইল মনে করি। আজ যে ইংরাজী-সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ য়ুরোপীয় স্বাধীন জাতিদিগের সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যে চিত্রকর আছে, সঙ্গীতজ্ঞ আছে, যোদ্ধা আছে, নাবিক আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, সূত্রধর আছে, মিস্ত্রী আছে। এইরূপে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ উত্তরোত্তর গড়িয়া উঠিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে য়ুরোপের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে অভিনব সামরিক শব্দ বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি আমার পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের বহুবর্ষব্যাপী পরাধীনতায় কত অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, নহিলে আজ আমাদিগকে এত শব্দের কাঙ্গাল হইতে হইবে কেন? হিন্দু-রাজত্বের অবসানের পর ভারতে যে একটু কলা-বিদ্যার চর্চ্চা ছিল, তাহাও মুসলমান সম্রাটদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের সময় প্রাচীন স্থপতিকীর্ত্তি সংরক্ষণের জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কারিগরগণ আগ্রার সেই সুপ্রসিদ্ধ 'তাজমহলের' অঙ্গভ্রষ্ট প্রস্তরগুলি যে ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এখন স্থপতিবিদ্যার কি চরম দুর্গতি! এখন তাজমহলের ন্যায় সুন্দর স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হওয়া দূরের কথা, মেরামত কার্য্যও সুসম্পাদিত হয় না। যাউক্ সে কথা। প্রাচীন পুষ্পকরথ, আজ 'এরিওপ্লেন'এ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উহার পরিচালন-যন্ত্র এবং অংশসমূহের (parts machinary) নামও আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, আমি সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলন করি। উহাতে যতগুলি শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, সমস্তই বৈদ্যক ও রাসায়নিক তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি এখানে দেওয়া যাইতেছে, যথা—charcoal prepared by the destructive distillation of wood—অন্তর্ধূমবিপাচিত অঙ্গার, fiberএ (তন্তু) রং আবদ্ধ না হইলে বস্ত্র রঞ্জিত করা যায় না, সেই জন্য প্রথমে ফটকিরির জলে উহা ডুবাইয়া রাখিতে হয়, এই জন্যই ফটকিরি (allum)কে fixture of dyes বলে। 'রসরত্নসমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, 'তুবরী' (ফটকিরি) 'মঞ্জিষ্ঠারাগবন্দিনী'। আবার দেখুন, a man of commanding presence (অর্থাৎ চেহারা দেখিলেই যাহার আদেশ মানিয়া চলিতে হয়) অনুবাদ করিতে হইলে গলদ্ঘর্ম্ম হয়। কিন্তু বৌদ্ধজাতকে 'আজ্ঞাসম্পন্ন' কথা পাওয়া যায়। Highwayman (বাটপাড়)কে 'পান্থঘাতক' বলা যাইতে পারে না কি? অপিচ জাতক পাঠে জানা যায়, পুরাকালে এমন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল, যাহা এখন আমরা হারাইয়াছি, তখন pilot ছিল, তাহারা 'জলনিয়ামক' নামে অভিহিত হইত; foundation stoneকে 'মঙ্গলেষ্টক,' laying the foundation stoneকে 'মঙ্গলেষ্টক স্থাপন', Viceroyকে 'উপরাজ,' Viceroyaltyকে 'ঔপরাজ্য', Crown Princeকে 'পরিনায়ক', Hospitalকে 'বৈদ্যশালা,' Surgeonকে 'শল্যকর্ত্তা', Nosegayকে 'পুষ্পগুচ্ছ,' Sugar millকে 'গুড়যন্ত্র', Benchকে 'ফলকাসন', earnest moneyকে বায়না, 'সত্যঙ্কর' (সচ্চকার) এবং সায়াহ্নভোজনকে 'সায়মাশ' বলা হইত। এই অচল শব্দগুলি গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় কি না, তাহা সাহিত্যসেবীদের বিবেচ্য। (১) অনুসন্ধান করিলে এইরূপ শত শত 'সমাজচ্যুত' শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৃতী সাহিত্যরথিগণ শুধু 'থোড় বড়ি খাড়া' লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া বিস্মৃতির অন্ধকূপ হইতে ইহাদের উদ্ধারসাধন করিয়া হীনবল বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আরও একটি কথা, বড় হইবার জন্য অন্তরে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে এ বিশ্ব-সংসারে কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

(১) শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'জাতক' ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃঃ

আজ যদি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবার জন্য সকলের অন্তরে প্রবল বাসনা জাগরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্র বাড়াইয়া লও, কূপমণ্ডূক হইয়া আর গণ্ডীর ভিতর বসিয়া থাকিও না। পিঞ্জরের পোষা পাখীর মত শুধু শিখানো বুলি না 'কপ-চাইয়া' অনন্ত নীল গগনোদ্দেশে উড়িয়া বাহির হও! দেখিবে, জগৎ কত বিশাল; দেখিবে, তাহাতে কত অভিনব বিষয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ; দেখিবে, তোমাদের আহরণের জন্য কত অমূল্য রত্নরাজি।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দের কাঙ্গাল; এখন পুনর্ব্বায় দেখাইতেছি, শুধু শব্দের কাঙ্গাল নহে, ভাবেরও কাঙ্গাল।

(খ) ভাবের অভাব

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইতে হইলে—তাহার ভিতরে নানা ভাবের সমাবেশ করিতে হইবে। কিন্তু সে ভাব কোথায় পাইব? আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধানতঃ দুই প্রকার ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই, যথা,—(১) গার্হস্থ্য (২) ধর্ম্মসম্বন্ধীয়।

(১) আমাদের বাঙ্গালাদেশ ছিল 'সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা', উদরান্নের জন্য আমাদের বিশেষ লালায়িত হইয়া কোন দিন বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য ঘরেই মিলিত; সেই ঘর ছিল আমাদের একমাত্র কর্ম্মভূমি। ঘরের কথা বলিতে আমরা বিশেষ পটু, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ গার্হস্থ্য চিত্র,—আমাদের বাঙ্গালী ঘরের সুখ-দুঃখের কাহিনী। রামরাম, রাজীবলোচন হইতে শরৎচন্দ্র এবং চণ্ডিদাস, কবিকঙ্কণ হইতে কুমুদরঞ্জন সকলেই গদ্যে-পদ্যে ঐ একই বর্ণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। (১)

(২) আমরা বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ধর্ম্মপ্রবণ। উদরের চিন্তা কোন দিন না থাকায় অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মচিন্তায় বা পরমার্থচিন্তায় মস্তিষ্ক নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্য, তথা বাঙ্গালা সাহিত্য কতকটা ধর্ম্মমূলক। আমরা যাহা কিছু লিখিয়াছি বা লিখিতেছি, তাহাতে ধর্ম্মের প্রভাবও জাজ্বল্যমান, এমন কি, আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। (২)

নানাবিষয়িণী চিন্তার অভাব হেতু আমাদের ভাব এত সংকীর্ণ, ভাষা এত শক্তিহীন। আমরা কেবল মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন লইয়াই ব্যস্ত, জগতের পণ্ডিতগণ প্রকৃতির কত গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন, কত নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতেছেন, উদ্ভাবন করিতেছেন, আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই, সে বিষয়ে চিন্তা নাই, আমরা চিনি ঘর, আর আমাদের চিন্তা—হাঁচি, টিকটিকি, কাকের শব্দের গূঢ়ত্ব বিষয়ে! কি অধঃপতন!

একে আমরা 'কূপ-মণ্ডূক,' শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মপ্রবণ বাঙ্গালী, তাহাতে দীর্ঘ কঠোর পরাধীনতা—এই উভয়-বিধ কারণে আমাদের কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আর্থিক সকল বিষয়ের অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রও উষর মরু-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা যাহা লিখি, যাহা বলি, তাহার মধ্যে কেবল 'কাঁদুনী', কেবল স্তুতি, কেবল উচ্ছ্বাস! আমরা 'শক্তের ভক্ত, নরমের গরম', আমরা রাজভক্তির উৎকট উচ্ছ্বাসে রাজাকে দেবতার অংশ-বিশেষ বা অবতার মনে করিয়া 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো

(১) 'সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলে দিলেক পান,
সকলের মূল সামগ্রী কল্পিলে আমি হই পরিত্রাণ।' (চণ্ডিদাস)
'বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পড়ে কালী' (মাণিকচাঁদের গীত)
'শিউলি নগরে বৈসে, খাজুরের খাটি রসে, গুড় করে বিবিধ বিধানে'
(কবিকঙ্কণ)
'পায়ে দধি দিলেন মাথায় দূর্ব্বাধান, বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ'
(কৃত্তিবাস)
'মাঝি তুমি হোথা বেঁধো নাকো আজকে সাঁঝে' (কুমুদ মল্লিক)

(২) 'ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট,
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।' (কেতক দাস)
'বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে,
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে।' (কৃত্তিবাস)
'দুর্গে কর মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়।' (দাশু রায়)
'তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-গারদে রাখিস্ বল।'
(রামপ্রসাদ)
'তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।'
(রবীন্দ্রনাথ)

যা" বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না; কিন্তু তাহার পুরস্কারস্বরূপ তথাকথিত অবতারগণের মধ্যে কেহ কেহ "ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে, কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।" (বিজয় গুপ্ত—পদ্মপুরাণ) (১) হায়, রাষ্ট্রীয় দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রতি দাস্য-ভাবও (Slave mentality) আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দাসত্বের কি চরম পরিণতি! এই ঘৃণ্য দাস্যভাব আমাদের আত্মাকে কলুষিত করিয়া, চিন্তাকে বিশুষ্ক করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের গদ্য-সাহিত্যে আবেদন-পত্র, বড় জোর দুই একটি সামাজিক বা পারিবারিক বা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ খুব উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেকন (Bacon), মেকলে (Macaulay), ইমারসন্ (Emerson) প্রভৃতি মনীষিগণের রচনার গভীর ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের কবির লেখনী দিয়া 'নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ' কিংবা 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন নন্দন-ফুল-হার' প্রভৃতি লেখা বাহির হইতে পারে; কিন্তু 'Rule Britannia,' 'Life without freedom' 'Independence' প্রভৃতি লেখা পরাধীন বাঙ্গালার কবির লেখনী দিয়া কোন দিন বাহির হইবে কি না সন্দেহ। যদিও প্রাচ্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়া কোন কোন কবি ঐরূপ ভাবের কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহার অঙ্গে প্রকৃত কুসুমের সুষমা পাওয়া যায় না, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত 'এসেন্সেরই' অস্থায়ী উত্তেজক গন্ধ অনুভূত হয়। যথা—

'When Britain first, at Heaven's Command,
Arose from out the azure main,
This was the Charter of the land,
And guardian angels sang the strain!
Rule Britannia, Britannia rules the waves'.

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারত-বর্ষ! উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ, সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি, বন্দিল সবে, 'জয় মা জননি, জগত্তারিণি, জগদ্ধাত্রি!"

'The isles of Greece, The isles of Greece!
Where burning sappho loved and sung'—etc

'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা
প্রতাপ বীর'—ইত্যাদি।

স্বাধীন দেশের জাতীয় কবি Miltonএর ভেরী নিনাদ পরাধীন দেশের কবীন্দ্রগণের করুণ বংশীধ্বনি কানে পৌঁছায় না। আমরা ভাষায় কাঁদিতে পারি, বিরহ-বেদনা জানাইতে পারি, তোষামোদ করিতে পারি সত্য, কিন্তু ধমকাইবার সময় হিন্দীভাষায় বলি 'চোপরও', 'ভাগ যাও', 'নিকালো', 'চুপ কর', 'স'রে পড়', 'তাড়িয়ে দাও' প্রভৃতি বাঙ্গালা বচনে মনের উষ্ণতা প্রকাশ পায় না। সেইরূপ ঠাট্টা-তামাসার সময়ও 'ওড়িয়া' ভাষার শরণাপন্ন হই। বার্ক, ফক্স, শেরিডেন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনা দূরের কথা, পাঠ করিলে যেমন উত্তেজনায় শরীর রোমাঞ্চিত এবং বক্ষঃশোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, বাঙ্গালার বাগ্মিপ্রবরদিগের বক্তৃতায় সেইরূপ হয় কি? কোন্ বাঙ্গালী অপরাধী প্রাণদণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারে,—"Yes, my lords, a man who does not wish to have his epitaph written until his country is liberated, will not bear a weapon in the power of envy, nor a pretence to impeach the probity which he means to preserve even in the grave to which tyranny consigns him.—" (১) হৃদয়ের সে তেজ, বুকের সে বল, মনের সে দৃঢ়তা, চিত্তের সে অনাবিল প্রসন্নতা পরাধীন বাঙ্গালী কোথায় পাইবে? হায়, বাঙ্গালী আজ প্রাণ খুলিয়া হাসিতেও পারে না! সেই জন্য তাহার সাহিত্যও আজ নিস্তেজ, নিস্পন্দ ও অসাড়, জগতের নিকট আজ বাঙ্গালা সাহিত্য 'মেয়েলী সাহিত্য' বলিয়া পরিগণিত। ইংলণ্ড রাজনীতিক স্বাধীনতার আকর। সেই জন্য তাহাদের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যও উন্নতির চরমে সমুপস্থিত। আর সেই তুলনায় আমাদের

(১) 'সাহিত্য-পরিষদ,' পত্রিকা সপ্তবিংশভাগ, ৩য় সংখ্যা ১০৭ পৃঃ।

(১) বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় কোন কোন অপরাধীর মধ্যে এইরূপ মনের বল পরিলক্ষিত হইয়াছিল।—লেখক

কেবল সূচনা মাত্র। আমাদের দেশের এই নব জাগরণে কেবলমাত্র জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইতেছে, জাতীয় কেন্দ্রীভূত শক্তির উদ্বোধন হইতেছে, ইহার সাহিত্য গঠিত হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির বিকাশ

বাঙ্গালার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, অন্তর্বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইলে এবং রাজা রাজকার্য্যে, প্রজা রাজ-সেবায় মনোনিবেশ করিলে দেশবাসী নিঃশঙ্কহৃদয়ে, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে, শান্ত-সুস্থমনে জড়মুস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে প্রতিভার রোশনাই ফুটাইয়া তুলেন। সেই সময় জাতীয় বিনষ্ট লুপ্ত মানসিক শক্তি পুনরায় বিকসিত হইয়া উঠে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম্ম, সভ্যতা সমস্তই নবভাবের অনুপ্রেরণায় গঠিত হইতে থাকে। মুসলমান-শাসন-আমলে এইরূপ মাঝে মাঝে বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির বিকাশ হইত, অরাজকতা এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন যে তাহার মূলকারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে স্মৃতি-দর্শনের পূর্ণবিকাশ—বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব্ব পরিপুষ্টি। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য তখনও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' ছিল। তাহার পর আবার বাঙ্গালার রাজনীতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল, আবার বাঙ্গালায় অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিল। দেশের এই দুরবস্থার দিনে ইংরাজ রাজ-দণ্ড গ্রহণ করিলেন, দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। ইঁহারা দেখাইলেন এক আশ্চর্য্য জগৎ; আনিলেন এক অভিনব আদর্শ; শিখাইলেন এক সার্ব্বজনীন ভাষা; তাঁহারা সেই মহাজগতের নূতন সভ্যতার আলোক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন। আমরা মনে প্রাণে তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গেলাম। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেই মিলনে আমাদের দৈন্য অপসারিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রকার দীনতার মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের দীনতা অন্যতম প্রধান। ইহার গঠনকল্পে কেরী প্রমুখ ইংরাজ মিশনারীগণের বিপুল প্রচেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম অতুলনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরাজ-রাজত্বের শাসনকালে ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

বিভিন্ন মত এবং তজ্জনিত রাজনীতিক উৎপীড়নে ইংলণ্ডেও মাঝে মাঝে এইরূপ মানসিক শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। মধ্যযুগে ইংলণ্ডের অবস্থা আমাদের মতই শোচনীয় ছিল। ধর্ম্মমত অনুদার, সীমাবদ্ধ এবং দেশাচার ও বাহ্য আড়ম্বরে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশবাসী ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ ধর্ম্মযাজক পাদরীদিগের নিয়ম-ব্যবস্থা অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া চলিত। এইরূপে দেশের স্বাধীন চিন্তাশক্তি তিরোহিত হইলে দর্শন-পুস্তকগত কবিতা প্রাণহীন হইল। তাহার পর অষ্টম হেন্‌রী ও তাঁহার দুহিতা রাণী এলিজাবেথের (Queen Elizabeth) রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দেশবাসীর প্রনষ্ট প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে—আমেরিকা আবিষ্কার, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন, শিল্পকলার পুনরুত্থাবন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার এবং গদ্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টি। এক কথায় বলিতে গেলে মানসিক জড়তা বিদূরিত হইল। ইহার ফলে সিডনি (Sidney), উইলসন (Wilson), এসাম্ (Ascham), পিউটেন্‌হাম (Puttenham) সাহিত্য-রচনার ধারা নিরূপণ করিলেন। হাক্‌লুট (Hackluyt), পুর্‌খা (Purchas) প্রত্যেক প্রদেশের বিবরণ সহ এক বৃহৎ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিলেন। হালিনসেড (Halinshed,) স্পিড (Speed), র‍্যালে (Raleigh), ষ্টো (Stowe), নোলস্ (Knolles), ডেনিয়াল্ (Daniel,), টমাসমোর (Thomasmore), লর্ড হারবার্ড (Lord Herbert) ইতিহাস রচনা করিলেন। ক্যামডেন (Camden), স্পেলম্যান্ (Spelman), ইরাসমাস্ (Erasmus) প্রভৃতির প্রযত্নে এক দল অক্লান্তকর্ম্মী বহু প্রাচীনকালে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অসীম জ্ঞানের আকর বেকন (Bacon) সাহিত্যে চিন্তার স্রোত ফিরাইলেন। বেন্ জনসন্ (Ben Jonson), সেক্ষ-পীয়র (Shakespeare) প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যে নূতন ভাবের অবতারণা করিলেন। কত উল্লেখ করিব? সে সময়কার ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত ও

স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সময় ইংলণ্ডের সর্ব্ববিষয়ের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—এই সময় আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে এক নূতন ভাবরাজ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরেও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের কত শত মনীষীর প্রতিভার বৈচিত্র্যে বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়াছে। সাহিত্যে,—এডিসন্ (Addison), সুইফট্ (Swift), ডিফো (Defoe), মেকলে (Macaulay), কারলাইল্ (Carlyle), ইমারসন (Emerson), রাস্কিন্ (Ruskin), লোপ ডি ভেগা (Lope de Vega), তত্ত্ব উদ্ঘাটনে—নিউটন্ (Newton), ফ্রাঙ্কলিন্ (Franklin); বিবিধ বিজ্ঞানে,—বেকন্ (Bacon), গিল্বার্ট (Gilbert), হারভে (Harvey) ইউরোপে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। একমাত্র ভেগার (Vega) জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি পঞ্চদশ বর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কখন যোদ্ধ্‌বেশে শত্রুর সম্মুখীন, কখন প্রেম-বিহ্বল হইয়া প্রেমিকার পাশে, কখন সংসারের সুখ-দুঃখের মাঝে। জীবনের এইরূপ অবস্থাতেও 'ভেগা' সাহিত্য-চর্চ্চায় ত্রুটী করেন নাই। তিনি দেড় হাজারখানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ভাবিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয় না কি? ইংলণ্ডের এই নবীন প্রতিভার বিমল জ্যোতিঃ এক শুভমুহূর্ত্তে আমাদের দেশেও পৌছিয়াছিল, তাই আজ আমরা সেই নবীনালোকে নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে আমাদের দীনা বাঙ্গালার জীর্ণ কুটীরগুলি সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে দৃঢ়প্রচেষ্ট হইয়াছি! এখনও আমাদের অনেক অভাব—অপরিসীম দীনতা আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধপ্রসঙ্গে তাহার সামান্য আভাষমাত্র দিলাম।

CAUSE OF OUR FAILURE.

It is very true that in our country there is no appreciation of learning and not much culture, and we have not yet invented anything fit to be given to the world at large. But is the education in schools and colleges or the University responsible for this? What is the reason of the present education being mismatched with our real life? Our life is narrow, our nature weak, and the ideas, surrounding conditions and family traditions which have influence on our life are not at all fit to create broadmindedness. —"Hindusthan."

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তুমি ও আমি

অসীম সাগর তুমি,
আমি ক্ষুদ্র নদী;
স্নেহময় বক্ষে তব
বহি নিরবধি।

বিশাল পাদপ তুমি,
আমি তুচ্ছ লতা।
জড়ায়ে তোমার অঙ্গে
ভুলি সব ব্যথা।

তেজোময় রবি তুমি,
আমি ক্ষীণ তারা।
তোমারি টানেতে ঘুরি'—
হয়ে আত্মহারা।

অনন্তের মূর্ত্তি তুমি,
আমি তার ছায়া,
তোমা ছাড়া আমি নই—
তোমারি এ মায়া।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভোলাদা'র ঘটকালী

১

"দূর তোর আকাশের মুখে ঝাড়ু!"—ভোলাদা জানালার ভাঙ্গা গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইল। বর্ষার অবিশ্রান্ত ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টির আর বিরাম নাই। মাথাটা ভিজিতেছিল, ভোলাদা'র সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সেই যে শুক্রবার বৃষ্টি নামিয়াছে, আজ রবিবার অপরাহ্ণ, এখনও সে বারিধারাবর্ষণের অবসান হয় নাই।

ভোলাদা বিকৃত মুখে বিরক্তির সুরে বলিল,—"আপিস যাও ভিজে, বাজারে যাও ভিজে—ঝর ঝর ঝর, যেন লক্ষ্মীছাড়া আকাশ ছেঁদা হয়েছে। নাঃ, শনিবার বাড়ী যাওয়া ত হ'লই না, রবিবারটাও মাঠে মারা গেল। দূর তোর!"

জানালাটা বন্ধ করিয়া ভোলাদা কেওড়া-কাঠের তক্তার উপর আসিয়া বসিয়া আপন মনে গুণ গুণ স্বরে গান ধরিল। মেসবাড়ীর বাসাড়ে বাবুদের অনেকেই কাগজে জুতা মুড়িয়া, জানুর উপর বসন তুলিয়া, সহরের রাজপথের খাল-বিল পার হইয়া শনিবারে বাড়ী গিয়াছে—ঝড়বৃষ্টি তাহাদের আগ্রহ উপশমিত করিতে পারে নাই। ভোলাদা'র মত দুই এক জন বাবু এই শনিবারটা সহরেই কোনরকমে কাটাইয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রবার বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই বাসার উৎকলবাসী বামুনঠাকুর নামধেয় জীবটি ঝির সহিত অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কাযেই বাবুদের অদৃষ্টে এই দুই দিন 'হরিমটর' জুটিয়াছে। কেহ সাঁতার কাটিয়া দ্বারিকানাথের দোকানে পাঁউরুটী ও জগৎলক্ষ্মী মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের দুধ মিষ্টি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, কাহারও বা উড়িয়ার দোকানের মুড়িমুড়কিই ভরসা।

দুই দিনে ভোলাদা'র পিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর বাড়ী যাওয়া হইল না—বাসাটা যেন সত্য সত্যই ভোলাদা'র কাছে নরকের আগুন জ্বালিয়া বসিয়াছিল। পার্শ্বে পিয়ারী ও যামিনীদের ঘরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে নাকি সুরে "এসে হেসে কাছে ব'সে" গানের মহলা চলিতেছিল। ভোলাদা'র নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানো মাদুরে মতিবাবু প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ফুলাইয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতেছিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র-যুগল পিতার নিকট অঙ্ক কষিবার টাস্ক পাইয়া শ্লেটে বাপের ভুঁড়ি আঁকিতেছিল।

ভোলাদা বিরক্ত হইয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "এক কাপ চা খাবারও যো নাই। নলে হতভাগাটা ঘরে তালা দিয়ে এই দুর্য্যোগেও বেরিয়েছে; আজ কদিন যেন তার কি হয়েছে! না হ'লে তার ঘরেই সব যোগাড় রয়েছে—ষ্টোভ, চা, চিনি সব! হর্ত্তুকিবাগানে যে কি গুড় মাখানো আছে—"

এই সময়ে ভোলাদা'র চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া এক বিকট চীৎকার আকাশের গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন এবং ঘরের ভীষণ নাসিকাগর্জ্জনকেও ছাপাইয়া ঘরে দুয়ারে ছড়াইয়া পড়িল—"বাবা, বষ্ঠে আমার নাকে কামড়ে দিয়েছে, এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা!" সে চীৎকারে মতিবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কাসিতে কাসিতে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। ভোলাদা তাঁহার যুগল রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কি হয়েছে?"

"এঁ্যা, এঁ্যা, আমার নাকে কামড়ে দিয়েছে।"

মতিবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষম ধমক দিয় বলিলেন, "তোর মাথা কামড়ে দিয়েছে, রাস্কেল কোথাকার! অঙ্ক হয়েছে?"

ভোলাদা'র জলান পিত্ত আরও জ্বলিয়া উঠিল। কোনও কথা না বলিয়া তখনই সে ছাতাটি বগলে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

পথে কুকুর-বিড়াল নাই। রবিবার—স্কুল, আফিস, আদালত সব বন্ধ, কাযেই পথে লোক-চলাচল নাই বলিলেও হয়। তবে খোট্টা ফেরিওয়ালা এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া "চাউল ভাজা, মটর ভাজা, চানা ভাজা, গরমা-গরম" হাঁকিতে কসুর করিতেছে না। মেসবাড়ীর সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড ত্রিতল গৃহের অন্দরে একটা গ্রামোফোন বাজিতে-ছিল, "যমুনে এই কি তুমি"; আর বাড়ীর বারান্দায় বৃষ্টির জন্য গৃহে আবদ্ধ বালক-বালিকা হুড়াহুড়ি করিতেছিল। ভোলাদা কোন দিকে না চাহিয়া পথে কিছু দূর জল ভাঙ্গিয়া চলিতেই আর এক জন পথিক তাহার পাশ কাটাইয়া মেসবাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, ভোলাদা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল না।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট জলে থৈ থৈ করিতেছে, নেড়াগির্জ্জার মোড়ও তথৈবচ—একটাও চায়ের দোকান খোলে নাই। ভোলাদা'র জলে ভিজিয়া ভিজা বিড়ালটি সাজাই সার হইল। কিছুক্ষণ এধার ওধার করিয়া বিষণ্ণ মনে ভোলাদা বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখনও বাসায় হারমোনিয়ামের সঙ্গে যামিনীদের 'এসে হেসে' গানের মহলা চলিতেছিল।

২

দ্বিতলে উঠিয়া ভোলাদা থমকিয়া দাঁড়াইল—ললিত-মোহনের ঘরের তালা খোলা, দুয়ার ভেজান। ভোলাদা বিস্মিত হইল। এই কতক্ষণ পূর্ব্বে ঘর বন্ধ ছিল, ইহার মধ্যে নলে কি ফিরিয়া আসিল? চায়ের তৃষ্ণা তখনও প্রবল, কাযেই ভোলাদা নিজের ঘরে না গিয়া ললিতের ঘরেই প্রবেশ করিল।

ঘরের দ্বারগবাক্ষ রুদ্ধ—অন্ধকারে টেবলের পার্শ্বে চৌকীর উপর ললিত বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি উদাস, বসন আর্দ্র, তখনও মাথা দিয়া সর্ব্বাঙ্গে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

ভোলাদা বিস্মিত হইয়া বলিল, "এ কি রে নলে, ব্যাপার কি? অন্ধকারে ভিজে কাপড়েই ব'সে রয়েছিস যে?"

ললিত কোন জবাব দিল না। ভোলাদা উত্তরোত্তর বিস্মিত হইল, চিন্তিত ব্যগ্রস্বরে বলিল, "ব্যাপার কি? বাড়ী থেকে কোন খারাপ খবর ত আসেনি?"

ললিত ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না।"

ভোলাদা বলিল, "তবে?"

ললিত বিরক্তির সুরে বলিল, "কিছু হয় নি, যাও।"

ভোলাদা ছাড়িবার পাত্র নহে, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বলিল, "নে, কাপড় ছাড় আগে, তার পর কথা। ট্রাঙ্কের চাবীটা দে দিকি, চা তৈরী করি।"

ললিত কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "খাব না।"

ভোলাদা বলিল, "তুই না খাস, আমি ত খাব। দে, চাবী দে।" চায়ের কৌটা, জমাট দুগ্ধ ও চিনি বাহির করিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ভোলাদা বলিল, "মাথাটা মুছলি নে? গাধা কোথাকার, কি হয়েছে তোর?" ভোলাদা নিজেই তোয়ালে দিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিল। এই মেসে ভোলাদা সব ছেলেদেরই অভিভাবক, সকলেরই রোগের নার্স, সকলেরই friend, philosopher and guide, কাযেই ললিত বিনা আপত্তিতে ভোলাদা'র অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

চায়ের জল গরম করিতে করিতে ভোলাদা বলিল, "এখন বল্ দিকি এই জলে ভিজতে ভিজতে কোথা থেকে এলি? সেই সকালে না খেয়ে বেরিয়েছিস, সন্ধ্যে হয়ে এল, গেছলি কোথায়? হত্যাকিবাগানে বুঝি?"

ললিত একটি ছোট্ট "হুঁ" দিয়া নীরব হইল। ভোলাদা এক পেয়ালা গরম চা নিজে খাইয়া ললিতকেও এক পেয়ালা খাইতে বাধ্য করিল। তাহার পর ললিতের বিছানার উপর বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, "এইবার ত ধাতে এইছিস, কি হয়েছে বল। জানিস ত ভোলাদা অগতির গতি।"

ললিতের অভিমানাহত নয়ন বাহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, ভোলাদা উঠিয়া তাহার হাত দুখানা ধরিবামাত্র তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভোলাদা'র হাতে মুখ গুঁজিয়া বালকের মত ঝর ঝর কাঁদিয়া ফেলিল।

ভোলাদা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "ছিঃ, জোয়ান মদ্দ, খোকার মত কাঁদতে লাগলি? কি হয়েছে, ওদের-সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?"

ললিত বলিল, "ওরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"তাড়িয়ে দিয়েছে? কেন, ছেলেরা আর পড়বে না? এই গিন্নী তোকে এত ভালবাসে, ছেলের আদরে রাখে—"

"না, মা'র দোষ নেই।"

"তবে?"

"কর্ত্তা কাল আমায় জবাব দিয়েছেন।"

"তবে যে তুই বলেছিলি, গিন্নী তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার সব ঠিক করেছেন?"

"সে অনেক কথা।"

"তা হোক, তোকে সব বলতেই হবে।"

ইহার পর ভোলাদা'র সহিত ললিতের অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। মোট কথা, ভোলাদা এইটুকু সংগ্রহ করিল যে, আজ বৎসরাধিক কাল হইতে ললিতমোহন হরিতকীবাগানে নীলকণ্ঠ সরকারের বাটীতে প্রাইভেট টিউটারী করিতেছে। নীলকণ্ঠ বাবুর দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে, ছেলে দুইটিকে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পড়াইতে হয়। নীলকণ্ঠবাবু কলিকাতায় থাকেন না, দানাপুরের ওদিকে তাঁহার কি কারবার আছে, সেই-খানেই বারো মাস তাঁহাকে থাকিতে হয়, তবে মাঝে মাঝে মরশুমের সময় না হইলে দিন কয়েকের জন্য তিনি কলিকাতার বাড়ীতে থাকিতে আসেন। এবার লম্বা ২ মাসের জন্য তিনি লোকজনের উপর কাযের ভার দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, কন্যাকে পাত্রস্থ করা। এই আষাঢ়মাসে তিনি নিশ্চিত কন্যার বিবাহ দিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি পত্নীর মুখে যে কথা শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গিয়াছে। কি স্পর্দ্ধা—এই প্রাইভেট টিউটারটার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ আর সেই সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতে-ছেন কে, না তাঁহারই পত্নী! একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত, না আছে কলিকাতায় ছটাক খানেক জমী, না আছে দেশে জমীদারী, কলিকাতার বাসাড়ে! ছিঃ ছিঃ, না হয় বি, এস-সিই পাশ করিয়া এম,এস-সি পড়িতেছে, কিন্তু বাসার ও পড়ার খরচা যুটাইবার জন্যত তাহাকে মাষ্টারী করিতে হয়। পাড়াগাঁয়ে দুকাঠা ভুঁই আছে,—তাহাতে [illegible] কি আইসে যায়? ছেলে দেখিতে সুন্দর, তা মাকালে কি লাভ? তাঁহার কন্যা সুন্দরী, তিনি যে মেয়েকে যৌতুকও দিতে পারিবেন না, এমন নহে। সুখে বিলাসে লালিতপালিত তাঁহার মনোরমাকে এই বাসাড়ে ছোকরা খাওয়াইবে কি, রাখিবে কোথায়? ঝেঁটা মার! তাঁহার পত্নী ইতঃপূর্ব্বে দুই একখানা চিঠিতে আভাস ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছিলেন, মোনোর একটি কার্ত্তিকের মত বর ঠিক করা হইয়াছে, সে বর শুধু রূপে কার্ত্তিক নয়, গুণেও মস্ত বিদ্বান্, তিন তিনটে পাশ। তখন নীলকণ্ঠ বাবু বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার মাহিনা-করা 'চাকর' এই প্রাইভেট টিউটারটাই তাঁহার পত্নীর মনোনীত কার্ত্তিক! দূর! দূর! তিনি কলিকাতায় আসিয়াই পত্নীর মুখে সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে তদ্দণ্ডেই জবাব দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, সে যেন তাঁহার গৃহের ত্রিসীমায় কখনও না আইসে। ললিতমোহনের নবীন আশামুকুলিত জীবনের দুঃস্বপ্ন সহসা অসময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভোলাদা সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এই কথা? এর জন্যে একেবারে হা-হুতাশ? নে, নে, ও সব নভেলিয়ানা ছাড়। বাঙ্গালীর ঘরে অমন কত সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কত লোক সাধবে তোকে।"

"না, ভোলাদা, সত্যি বলছি, আমি মোনোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।"

"ও রে বাপ রে, এত দূর? 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর'!"

"আঃ, কি ঠাট্টা কর, ভাল লাগে না।"

ভোলাদা মনে মনে বলিল, মনস্তত্ত্বের নভেলগুলো দেশের ছোঁড়াগুলোর কি মাথাই বিগড়ে দিয়েছে! প্রকাশ্যে বলিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। যা হয় ক'রে রোমিওর জুলিয়েট যুগিয়ে দেওয়া যাবে। এখন আজ রাতে কি খাবার ব্যবস্থা করা যায়, বল দিকি?"

ললিত বিমর্ষভাবে বলিল, "আমার ক্ষিদে নেই—"

"নে, নেকামো রাখ। এই ষ্টোভেই দুমুঠো খিচুড়ী চড়িয়ে দেওয়া যাক, কি বলিস? হাঁ, দেখ, তোর এই হবো শ্বশুর—কি বলে ঐ নীলকণ্ঠ সরকারটা লোক [illegible] সরকার না? বাহাত্তুরে?"

"হাঁ। পশ্চিমে খোট্টা বেণের মত কাঠখোট্টা—বড় দুর্ম্মুখো ; কিন্তু মা তার ঠিক বিপরীত।"

"হুঁ। তা বাহাত্তুরে কায়েত, তোর মত মুখ্যি কুলীনের ছেলে পেয়েও খুসী নয়? কি চায়, রাজপুত্তুর?"

"ওঃ, তা বল কেন? এ দিকে জাতে উঠবার খুব আগ্রহ আছে, বলে মুখ্যি কুলীন নইলে মেয়ে দেবে না। তবে আমি যে বাসাড়ে! কলকেতায় বাড়ী নেই!"

তাহার পর দুই জনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। ভোলাদা কিন্তু সে জন্য খিচুড়ীর হাঁড়ি চড়াইয়া দিতে কোনও ভুল করে নাই।

২

কর্ত্তা নীলকণ্ঠ বাবু সবেমাত্র গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ ফোঁটা-ছিটায় অঙ্কিত করিয়া আট হাতি ধুতি পরিয়া একখানি বাতাসা মুখে পুরিয়া জল খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে বাহিরে তাঁহার ডাক পড়িল। আঃ, একটু 'ধর্ম্মকর্ম্মরও' অবসর পাইবার যো নাই! বিদেশে ব্যবসায়ে জীবনপাত ত আছেই, মাত্র কয়টা দিন অবসর লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াও স্বস্তি নাই।

প্রকাণ্ড দেহখানা নাড়া দিয়া দাঁড় করাইতেই হাতের ডজনখানেক মাদুলী ও কবচ খন-খন বাজিয়া উঠিল, গলদেশের রুদ্রাক্ষমালাও ঠক-ঠক করিয়া দুলিয়া উঠিল। কর্ত্তা বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, "গিন্নি, খুকীর বর ঠিক ক'রে ফেলেছি। শ্যামবাজারে ভূষি মালের কারবার করে এরা—বিস্তর পয়সা ; গাড়ী, মোটর, লোক্-লস্কর—ছেলে একটু শ্যামবর্ণ, তা হোক, লক্ষীমন্ত, রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবো?"

গিন্নী এ সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এমন ভাব দেখা গেল না—একটু শ্যামবর্ণের অর্থ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। অপ্রসন্নভাবে তিনি বলিলেন, "তোমার মনের মত হয়েছে ত, তা হলেই হ'ল।"

কর্ত্তা যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"হাঁ, তা মন্দ কি? তবে মুখ্যি কুলীনটা হ'ল না, এই যা।"

গিন্নী বলিলেন, "ছেলে কি করে? কিছু পাশ দিয়েছে?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "ঐ যে তোমাদের আজ কালের কি ঝোঁক! আরে পাশ ক'রে কি করবে—মাষ্টারী না হয় কেরাণীগিরি। তুমি নাও, এই মাসের শেষেই শুভ কাযটা সেরে যেতে হবে। তবে মুখ্যিটা হ'ল না!"

কর্ত্তা খড়ম ঠক ঠক করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ মনোরমা মহা ফাঁপরে পড়িয়াছিল। সে ঘরের মধ্যে আটক পড়িয়া অনিচ্ছায় তাহারই বিবাহের কথা শুনিতেছিল—তাহার মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, সে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলেই সে এক দৌড়ে ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

এ দিকে কর্ত্তা বৈঠকখানায় হাজির হইয়া দেখেন, এক অপরিচিত আগন্তুক তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটিকে দেখিয়াই তাঁহার পাড়া-গেঁয়ে বলিয়া মনে হইল। শীতকাল নহে, তথাপি গলায় কম্ফর্টার, পায়ে রঙ্গিন মোজা, ক্যাম্বিসের জুতা ধূলায় ভরা, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতাও ধূলায় সমাচ্ছন্ন ; দেখিলেই মনে হয়, লোকটি এইমাত্র দূর হইতে সহরে আসিতেছে।

কর্ত্তা তাহার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কোথা হ'তে আসা হচ্ছে—কি প্রয়োজন?"

লোকটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে, সে হাসিয়া বলিল, "বহু দূর হ'তে আসছি। তা বসতেও বললেন না? আমরা পাড়াগাঁর লোক, অতিথ এলে—"

কর্ত্তার মেজাজ অমনই রুক্ষ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পাড়াগেঁয়ে অসভ্য লোক এক হাঁটু ধূলো নিয়ে বিছানা ময়লা করতে এসেছে, আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছে বাড়ীর কর্ত্তাকে? কর্ত্তা হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "এ সহর কলকাতা, এখানে অচেনা অজানা লোককে ঘরে ঠাঁই দেওয়া হয় না। অমন কত ঠক, কত গাঁটকাটা কত সন্ধানে ফিরছে, কে জানে!"

ততক্ষণ আগন্তুক ফরাসের উপর দিব্য আরামে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়াছে। মৃদু হাসিয়া আগন্তুক বলিল, "ভুল করছেন মশাই, আমি নিতান্ত অপরিচিত নই। আমি ললিতের জ্যেষ্ঠ।"

নীলকণ্ঠ বাবু রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "ললিত? ললিত কে? সেই মাষ্টারটা বুঝি? তা, তার আবার পরিচিত অপরিচিত কি? মাইনের চাকর, ছাড়িয়ে দিয়েছি—পরিচয়ও শেষ হয়েছে। তা আপনি কি জন্য এয়েছেন? তার জন্যে সুপারিশ-টুপারিশ চলবে না—"

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিল, "সুপারিশ করতে আসি নি আমি, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে এসেছি।"

"ধন্যবাদ? সে কি রকম?"

"জানেন ত আজকালকার ছেলে কিরূপ একগুঁয়ে হয়। জেদ ক'রে বসেছিল, আপনার কন্যাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। আমরা বুঝিয়েছি, কত সাধ্য-সাধনা করেছি, কোনও কথা শুনতে চায় নি। এখন আপনিই আমাদের উৎকণ্ঠা আশঙ্কা সব দূর করেছেন—বিয়ে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে। খবর পেয়েই মশাই রেলে বিশ কোশ ভেঙ্গে ছুটে আস্‌ছি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে: মশাই, কি ব'লে যে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো! আঃ, মা আপনাকে যে কত আশীর্ব্বাদ করেছেন, কি বলবো! বলেন কি মশাই, মুখ্যি কুলীনের ছেলে কি না শেষে মেয়ে দেখে ভুলে গিয়ে এক হাঘরে ছোট ঘরে বিয়ে করতে নেচে উঠলো! রাম বল, ঘাড়ের ভূত নেমেছে।"

নীলকণ্ঠ বাবুর এতক্ষণ ক্রোধে বাক্‌রোধ হইয়াছিল, না হইলে এতটা কথা তিনি নীরবে কখনই শুনিয়া যাইতেন না। কিন্তু শেষে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি বল্‌লি ছোটলোক—হাঘরে ছোট ঘর? আমি নীলকণ্ঠ সরকার—"

"হ'তে পারেন আপনি জেঙ্গিস খাঁর কুটুম্ব, কিন্তু তা হলেও আমার ভায়ের—বাসুদেবপুরের ঘোষেদের ছেলের ত কলুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না।"

কর্ত্তা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কলু?"

"কলু না ত কি? মশাই দানাপুরে তেল-ঘির মহাজনী করেন, তার কি খবর নিই নি মনে করেন? তা ছাড়া মশায়ের ছাগল-ভেড়ার চালানী কারবারও আছে জানি।"

কর্ত্তার তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মুখচক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। আগন্তুক তাঁহাকে জবাব দিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, "যা হোক মশাই, আপনাকে শত ধন্যবাদ। ওঃ কি বাঁচনটাই বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি! যা হোক আমাদের একটা কুলগৌরব আছে ত। তার উপর আমার ভাই কলকেতায় মেসে থাকলেও দেশে তার বিষয়ের ফেলে ঝেলে বছর শালিয়ানা হাজার দুয়েক টাকা আছে ত—বিশেষ সে মুখ্যু-সুখ্যুও নয়। তার বিয়ের ভাবনা? যাক মশাই, এখন আসি। আবার আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে আমার মায়ের আশীর্ব্বাদটাও জানিয়ে গেলুম।"

আগন্তুক এই কথা বলিয়া ঘরের বাহির হইতে না হইতেই নীলকণ্ঠ বাবু প্রকাণ্ড দেহ দুলাইয়া এক লম্ফে দ্বারসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ঘুষি তুলিয়া বলিলেন, "পাড়াগেঁয়ে চাষা, বাড়ী বয়ে অপমান করতে এইছিস্? আচ্ছা, আমিও যদি নীলকণ্ঠ সরকার হই ত এর শোধ তুলবো, তুলবো, তুলবো, জেনে রাখিস্।"

ততক্ষণ আগন্তুক সদর রাস্তায় হাজির হইয়াছিল। তাহার মনে ভয়ের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার মুখে চোখে হাসির তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল। সে অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলিতেছিল, "তাই ত চাই, পাঁঠীবেচা মহাজন!"

বলা বাহুল্য, আগন্তুক আর কেহ নহে, আমাদের মেসের ভোলাদা!

৩

ললিতমোহন কয়দিন হইতে মন-মরা হইয়া রহিয়াছে। যে দিন সকালে ভোলাদা যথার্থই তাহার দাদা সাজিয়া নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যার পর ললিতমোহন একা অন্ধকারে আপনার ঘরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। তাহার চারিদিকেই নৈরাশ্যের অন্ধকার; কেবল এক ভরসা জোনাকীর আলোকের মত মাঝে মাঝে মনের মধ্যে জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছিল—

ভোলাদা বলিয়াছে, কোন একটা উপায় করিয়া দিবে। কিন্তু কি উপায়? ভোলাদা নীলকণ্ঠ বাবুকে জানে না, চিনে না—সে কি উপায় করিবে?

মাঝে মাঝে তাহার মানস-সরোবরে যতই মনোরমার সুন্দর মুখখানি প্রস্ফুটিত শতদলের মত ভাসিয়া উঠিতেছিল, সে ততই নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন হইতেছিল। মনোরমার মাতা এত দিন আশা দিয়া শেষে কি তাহাকে সত্য সত্যই নিরাশ করিবেন? কিছু দিন হইতে মনোরমাও তাহার সহিত বিবাহ হইবে নিশ্চিত জানিয়া পারতপক্ষে কিছুতেই তাহার সম্মুখে বাহির হইত না। এতটা অগ্রসর হইয়া কূলের কাছে আশা-তরী ভিড়াইয়া শেষে কি ভরাডুবি হইবে?

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, একটা লোক বারান্দা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এটা কি ললিত বাবুর ঘর? ললিত বাবু আছেন ঘরে?"

ললিত চমকিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল, বলিল, "কে? কাকে খুঁজছ তুমি?"

লোকটা বারান্দার আলোকে তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে মাষ্টার বাবু, বাবু এই চিঠি দিয়েছেন, লুকিয়ে পড়বেন, কাউকে দেখাবেন না। আমি চল্লুম।"

ললিত চিনিল, সে নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীর চাকর নিধে। ঘরে প্রবেশ করিয়া আলোক জ্বালিয়া ললিত কম্পিত-হৃদয়ে পত্র পাঠ করিল—সে সময়ে তাহার হাতও কাঁপিতেছিল। পত্র পড়িয়া তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল, সে তৎক্ষণাৎ জামা-কাপড় পরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

হরিতকীবাগানের সেই অতিপরিচিত বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, বাহিরের ঘরে কর্ত্তা ব্যগ্রভাবে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই কর্ত্তা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, "বস।" ললিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত ফরাসের উপর বসিয়া পড়িল।

কর্ত্তাও শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, "তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে আবার ডেকেছি, এতে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ। কিন্তু এর কারণ আছে। না হ'লে ডাকিনি।"

ললিত স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল, "কি, বলুন।"

কর্ত্তা বলিলেন, "বলছি, বোলবো বলেই ডেকেছি। দেখ, সংসার করতে গেলে অনেক তাল সামলে চলতে হয়। তোমাকে আমি খুকীর যোগ্য বর ব'লে মনে করি নি। কিন্তু বাড়ীতেও আমি একটা অশান্তি ঘটাতে চাই নি। আমি সত্যি কথা বোলবো। আমার গৃহিণীর তোমাকেই পছন্দ। এই জন্যে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছি, তোমার হাতেই কন্যা দান কোরবো।"

ললিত আনন্দের আতিশয্যে গদগদকণ্ঠে বলিল, "সে আমার সৌভাগ্য—"

বাধা দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "কিন্তু এক সর্ত্তে। এ বিবাহের কথা তোমার বাড়ীর কাউকে—এমন কি, তোমার গর্ভধারিণীকেও জানাতে পারবে না। ঘুণাক্ষরে যদি বিবাহের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধের কথা কোথাও প্রকাশ পায়, তা হ'লে সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাবে। আমি তোমার বাড়ীর ও বংশের সব খবর নিয়েছি—সব ভাল, তবে আমাদের খুঁটের ঘর নয়। তা হোক, আমি পুষিয়ে দেবো। আমার মেয়েকে আমি কলকেতায় একখানা বাড়ী আর গহনা ও নগদে হাজার দশেক টাকা দোবো। কেমন, এতে সম্মত আছ?"

ললিত অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কেবল মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

কর্ত্তা তখন সাফল্যের গর্ব্বে ভরপূর হইয়া আনন্দে বলিলেন, "তা হ'লে কালই শুভদিন আছে, বিলম্ব কর্‌বো না। আজ আমার এখানেই থাক, কা'ল গায়ে হলুদ ও বিয়ে। কি বল?"

ললিত কোনরূপে গলা সাফ করিয়া বলিল, "আপনি যা আজ্ঞা করেন!"

কর্ত্তা কিন্তু তখনও বলিলেন, "কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, বিবাহের পূর্ব্বে কাউকে এ সংবাদ জানাতে পারবে না। মেয়ে দিব বটে, কিন্তু ছোট ঘরে দিচ্ছি জেনে শুনে তাদের সংবাদ দিয়ে এখানে আনিয়ে ঘটা করতে পারবো না। তার পর চার হাত এক হয়ে গেলে যা হয় কোরো। এখন এস, তোমার এ বাড়ীর মা'র কাছে চল। এখন ত তুমি ঘরের ছেলে হ'লে বাবাজী, কি বল? হেঃ হেঃ!"

৪

ইহার চারি দিন পরে যখন ললিতমোহন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, ভোলাদা ও অন্যান্য বাবুরা এক-খানা চিঠি লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। ভোলাদা তাহাকে দেখিয়াই মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "আরে, নলে যে! কোথায় ছিলি ক'দিন? জিনি-পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল না কি? হাঁ, এইছিস্, ভালই হয়েছে। তোর দাদা মুরারি বাবুর এই পত্র এয়েছে, লিখছে আমাকে—আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছি নি। পড় দিকি।"

ললিত পত্রখানি পড়িয়া একবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পত্রে যাহা লিখা ছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"আজ সিমলা পোষ্টের ছাপ দেওয়া একখানা পত্র এসেছে। পত্র লিখছেন হরিতকীবাগানের কে বাবু নীলকণ্ঠ সরকার। তিনি লিখছেন, 'গত কল্য আপনার ভ্রাতা শ্রীমান্ ললিতমোহন ঘোষের সহিত আমার কন্যা কল্যাণীয়া মনোরমার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাতা বাবাজী আপাততঃ আমার এখানেই আছেন। এখন কবে 'কলু-কুটুম্বের' দীনভবনে মহামুখ্যি কুলীন শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন ঘোষ মহাশয় শুভ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন, সেই আশায় অধমাধম দীন কুটুম্ব নীলকণ্ঠ সরকার উৎসুক হইয়া রহিল।' আমি ত এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারছি না। সত্যই কি ললিত তোমাদের ওখানে নেই? কি হয়েছে ভোলা-বাবু, তুমি আমায় খুলে লিখো। এ পাগল নীলকণ্ঠ কে? ললিত হরিতকীবাগানে যে নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ী মাষ্টারী করে, তার সঙ্গে এ লোকটার কোনও সম্বন্ধ নেই ত?"

জীবন-সন্ধ্যার অতিথি

এলো বল্লভ অঙ্গনে তব
মঙ্গলাচারে বরিয়া লও।
মুখ ঝাঁপি লাজে যেন গৃহ-কাযে
আজি মধু সাঁঝে সরিয়া রও।

যতেক অশ্রু গড়াল কপোলে,
হের আঁখি তুলে যায়নি বিফলে,
মুকুতার মালা হয়ে করে দোলে
এস গো কণ্ঠে পরিয়া লও।

তেয়াগেছ যত উষ্ণ নিশাস
উপজেছ ঠিক ঠাঁয়েতে গিয়ে,
শীতল মলয় হইয়া ফিরেছে
প্রিয় অতিথির উত্তরীয়ে।

বঁধুর লাগিয়া মাটীতে লুটায়ে
যত ধূলিরাশি মেখেছিলে গায়ে,
সঞ্চিত সবি বঁধুর দু' পায়ে
আজিকে দু' হাতে হরিয়া লও।

কত মধু-রাতি বিফল হয়েছে
কত পূর্ণিমা গিয়াছে বৃথা,
বঁধুর হাসিতে ফিরেছে সবাই
ত্যজ গো শোচনা, শুচিস্মিতা।

জীবনে করিয়া বিস্বাদ তিত,
সব মধু তব হলো তিরোহিত,
প্রিয়ের চুমায় সকলি ঘুমায়
অধর-শুক্তি ভরিয়া লও।

শ্রীকালিদাস রায়

বুদ্ধগয়া

গয়া জিলার প্রধান নগর গয়ার ৭ মাইল দক্ষিণে একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম আছে, তাহার আধুনিক নাম বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া। এ নামটা ইংরাজের দেওয়া, স্থানটির প্রাচীন নাম মহাবোধি। এখনও অশিক্ষিত মাগধ কৃষক গ্রামটিকে মহাবোধ বা মহাবোধিই বলিয়া থাকে। মহাবোধি বা বুদ্ধগয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান, আর হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। বুদ্ধগয়া যে হিন্দুর তীর্থ, এ কথা এখনকার দিনের হিন্দুরা অনেকেই জানেন না, কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান এখন সময়াভাবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া এক দিনে বা তিন দিনে গয়াকৃত্য সারিতে শিখিয়াছে। মাগধ হিন্দু কিন্তু এখনও দলে দলে মহাবোধিমূলে পিতৃপিণ্ড দিতে আসিয়া থাকে।

এখন হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গয়া ও মহাবোধি অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশ ছিল, এখনকার মত এখানে মানুষের ঘন বসতি ছিল না। তখন সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন অপর লোক এই দুই স্থানে আসিত না, কেবল মধ্যে মধ্যে আভীর গোয়ালারা গরু ও মহিষ চরাইতে আসিত। আন্দাজ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নগরাজ হিমালয়ের পাদভূমিতে অবস্থিত শাক্যরাজ্যের রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ যখন মানবজাতির অশেষ দুঃখ নিবারণের উপায় অনুসন্ধানের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন হইতে মহাবোধির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল।

শাক্যজাতির রাজধানী কপিলবাস্তু নগর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজগৃহের বর্ত্তমান নাম রাজগির, ইহা এখন পাটনা জিলার বিহার মহকুমায় অবস্থিত এবং রাজগির হইতে গয়া যাইতে হইলে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাইতে হয়। রাজগৃহ নগরে গৌতম সিদ্ধার্থ রুদ্রক নামক এক আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রুদ্রকের শিক্ষায় তাঁহার কোন উপকার হইবে না, তখন তিনি রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপথে চলিতে চলিতে নৈরঞ্জনা নামক নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। এই নৈরঞ্জনা নদীর বর্ত্তমান নাম নীলাজন। নৈরঞ্জনা শব্দ মাগধি প্রাকৃতে নীলাজন আকার ধারণ করিয়াছে। নৈরঞ্জনা ফল্গু নদীর একটি উপনদী এবং এখনও ইহা মহাবোধি বা বুদ্ধগয়ার নিম্নে প্রবাহিতা। এই নৈরঞ্জনা নদীতীরে আসিয়া গৌতম সিদ্ধার্থ উরুবিল্ব গ্রামের সীমান্তে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। এই উরুবিল্ব গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে, মাগধ কৃষকের কাছে ইহার নাম এখনও 'উরবেল।' এই স্থানে নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া গৌতম সিদ্ধার্থ ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ক্রমে আহারের মাত্রা কমাইয়া প্রতিদিন একটি মাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেন। আহারের অভাবে ক্রমে তাঁহার দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল, তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বলচিত্ত মানব কখনও নিজের অভীষ্টসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে

অনশনক্লিষ্ট গৌতম সিদ্ধার্থ (গান্ধারের ক্ষোদিত ফলক)

পারে না। তিনি অনশন পরিত্যাগ করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি নৈরঞ্জনা নদীতীরে এক অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে গেলেন।

বৌদ্ধরা বলেন যে, গৌতম সিদ্ধার্থ এই অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ কথা অনেক দিন হইতেই জানা ছিল। তিনি যখন অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসিলেন, তখন বৃক্ষদেবতা মানুষের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। গৌতম সিদ্ধার্থের জন্মের ৫।৬ শত বৎসর পরে গান্ধারদেশের গ্রীকজাতীয় শিল্পীরা গৌতমের জন্মের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি পাথরে ক্ষোদিয়া বাহির করিয়াছিলেন। গৌতম নৈরঞ্জনাতীর ত্যাগ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে আসিয়াছেন, এই ঘটনার একখানি চিত্র প্রাচীন গান্ধারদেশে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। চিত্রখানি একখানি বড় পাথরের ফলক, ইহার মাঝখানে অশ্বত্থবৃক্ষটি ক্ষোদা আছে। বৃক্ষের নিম্নে একটি বড় বেদী। এই বেদীর গায়ে বৃক্ষদেবতার মূর্ত্তির উপরিভাগ দেখা দিয়াছে। বৃক্ষের বামদিকে চারি জন ও আকাশে দুই পাশে দুই জন লোক। বৃক্ষের দক্ষিণদিকে গৌতম সিদ্ধার্থ দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার পশ্চাতে আরও দুই জন লোক দেখা যাইতেছে।

গান্ধারদেশের গ্রীক্-শিল্পীরা গৌতম সিদ্ধার্থের উপবাসের চিত্রও পাথরে ক্ষোদিয়া গিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে সিক্রী নামক স্থানে অনশনক্লিষ্ট গৌতম সিদ্ধার্থের কঙ্কালসার একটি বড় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি এখন লাহোর মিউজিয়মে আছে এবং ইহার মত বড় মূর্ত্তি খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। পাথরের ফলকেও গান্ধারদেশের গ্রীক্-শিল্পীরা তপস্যারত অনশনক্লিষ্ট গৌতম সিদ্ধার্থের কথা ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় একখানি পাথরের ফলক কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। এই চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৃক্ষতলে বসিয়া কঙ্কালসার গৌতম সিদ্ধার্থ তপস্যা করিতেছেন এবং তাঁহার চারি পার্শ্বে অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

অশ্বত্থবৃক্ষতলে গিয়া গৌতম মানবের দুঃখনিবারণের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌতম সিদ্ধার্থের দুইখানি বড় জীবন-চরিত আছে, একখানির নাম 'বুদ্ধচরিত' আর একখানির নাম 'ললিতবিস্তর।' এই দুইখানি গ্রন্থে বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বের অনেকগুলি অলৌকিক ও অসম্ভব কথা বর্ণিত আছে। আমরা যেমন রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কথা বিশ্বাস করি এবং শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণের কথা সত্য বলিয়া মানি, বৌদ্ধরাও সেই রকম এই সমস্ত অসম্ভব কাহিনী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

বুদ্ধচরিতে ও ললিতবিস্তরে গৌতমের অশ্বত্থবৃক্ষমূলে আগমন হইতে বারাণসীতে তাঁহার প্রথম ধর্ম্মপ্রচার পর্য্যন্ত যে সমস্ত অলৌকিক ও অসম্ভব কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে "মার-বিজয়" সর্ব্বপ্রধান। মার বৌদ্ধধর্ম্মের সয়তান (Satan), হিন্দুর কামদেবের সহিত তাহার বর্ণনা অনেকটা মিলিয়া যায়। গৌতম সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যখন অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে আসিলেন, তখন মারের সিংহাসন টলিল। বুদ্ধচরিতকার অশ্বঘোষ বলেন যে, বুদ্ধদেব অশ্বত্থবৃক্ষমূলে আসিলে পৃথিবীর সমস্ত লোক আনন্দ প্রকাশ করিল, কেবল মার ভীত হইল। অশ্বঘোষ তাঁহার কাব্যের
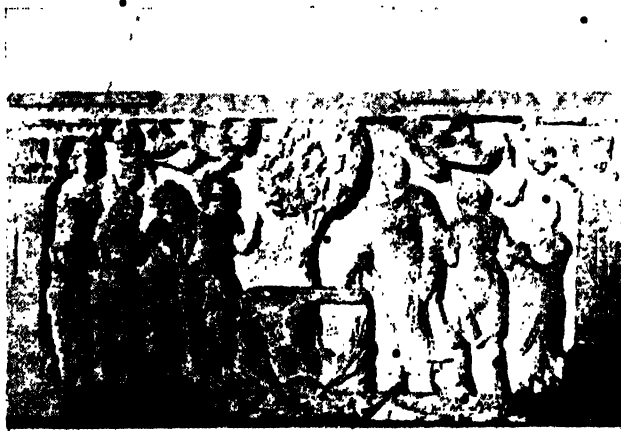
অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গৌতম সিদ্ধার্থের আগমন (গান্ধারের ক্ষোদিত ফলক)

শিববাটীর বুদ্ধমূর্ত্তি (ইহাতে বুদ্ধের জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনা আছে)

ত্রয়োদশ সর্গে স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, লোক যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন। মারকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মারের তিন পুত্রের নাম বিলাস, দর্প ও হর্ষ এবং তিন কন্যার নাম রতি, আরতি ও তৃষ্ণা। পিতার উদ্বেগের কারণ জানিতে পারিয়া মারের পুত্র-কন্যারা তাহাকে আশ্বাস দিল এবং অনেক সৈন্য লইয়া গৌতমের নিকটে গেল। মার প্রথমে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট গৌতম সিদ্ধার্থের সহিত অনেক তর্ক করিল। তর্কে ফল হইল না দেখিয়া মারের সমস্ত সৈন্যসামন্ত গৌতমকে আক্রমণ করিল।

ললিতবিস্তরেও এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মতে মারের পুত্রদের নাম অন্যরূপ। মারপুত্রদের মধ্যে যাহারা গৌতমের প্রতি প্রসন্ন ছিল, তাহারা অশ্বত্থবৃক্ষমূলে গৌতমের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইয়াছিল এবং যাহারা গৌতমের প্রতি বিমুখ ও পিতার পক্ষপাতী ছিল, তাহারা বামদিকে দাঁড়াইয়াছিল। গৌতমের প্রতি প্রসন্ন মার-পুত্রগণের নাম সার্থবাহ, মধুরনির্ঘোষ ও সুবুদ্ধি। গৌতমের প্রতি বিমুখ মার-পুত্রগণের নাম দুর্ম্মতি, শতবাহু, উগ্রতেজা। মারের সৈন্যদের মধ্যেও দুই চারি জন গৌতমের পক্ষপাতী ছিল, তাহাদের নাম প্রসাদপ্রতিলব্ধ। গৌতমের প্রতি বিমুখ সৈন্যদের নাম ভয়ঙ্কর, অবতারদ্বেষী, অনুপশান্ত, বৃত্তিলোল, বাতজব, ব্রহ্মমতি, সর্ব্বচণ্ডাল ইত্যাদি। উভয় গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাদানুবাদের পরে মার ও তাহার সৈন্যরা নানা রকম অস্ত্র লইয়া গৌতমকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন অস্ত্রই গৌতম সিদ্ধার্থকে স্পর্শ করে নাই।

গান্ধারদেশের গ্রীক্-শিল্পীরা মার-সৈন্যের গৌতমকে আক্রমণের ঘটনাটি মূর্ত্তিতে ও পাথরের ফলকে নানা স্থানে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌতম সিদ্ধার্থ নির্ব্বিকারচিত্তে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে বসিয়া আছেন, আর দুই দিক্ হইতে মারের সৈন্যরা নানাবিধ অস্ত্র লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। কলিকাতা মিউজিয়মে এই জাতীয় একটি

মারসৈন্যের আক্রমণ (গান্ধারের ক্ষোদিত ফলক)

পাথরের ফলকের একটি অংশ আছে, তাহাতে গৌতমের মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মাথার উপরের অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মারের সৈন্তরা কেহ রথে, কেহ সিংহের পৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা আকাশে উড়িয়া গৌতমকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগের কাহারও সিংহের মুখ, কাহারও বা রাক্ষসের মুখ, কেহ কেহ দেখিতে দেবতার মত।

ভারতবর্ষে যত দিন বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল,তত দিন পর্য্যন্ত শিল্পীরা মার-বিজয়ের চিত্র অঙ্কিত করিতেন। অজন্তার গুহা-গাত্রে মার-বিজয়ের একখানি প্রকাণ্ড সুন্দর চিত্র আছে। তাহাতে মারের সৈন্যদের আকার ও পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই জাতীয় একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। পাটনা জিলায় বিহার মহকুমায় অবস্থিত বড়গাঁও নামক স্থানের অনতিদূরে জগদীশপুর গ্রামে এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটি এখনও পড়িয়া আছে। এই মূর্ত্তিটিতে বুদ্ধের জীবনের আটটি প্রধান ঘটনার চিত্র পাওয়া যায়। বড় মূর্ত্তিটি গৌতম সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভের চিত্র এবং বাকী সাতটি চিত্রচালির উপর ক্ষোদিত আছে। এই বড় মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট মানুষের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলিই মার-সৈন্ত।

বিহার নগরের বুদ্ধমূর্ত্তি (ইহা ঠিক শিববাটীর বুদ্ধমূর্ত্তির মত)

গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাসংবলিত নালন্দার শিলা-ফলক

মারের সৈন্তরা হারিয়া গেলে মার যখন বিষণ্নবদনে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তখন রতি, তৃষ্ণা ও আরতি নাম্নী তাঁহার তিন কন্যা মারকে প্রবোধ দিয়া গৌতমকে রূপের মোহে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা রূপসী যুবতীর আকার ধারণ করিয়া নানা উপায়ে গৌতম সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গৌতম কিছু-তেই বিচলিত হইলেন না। মার সকল চেষ্টাতেই বিমুখ হইল। তখন গৌতম নিশ্চিন্ত হইয়া ধ্যান-মগ্ন হইলেন। এক রাত্রির প্রথম যামে গৌতম সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভ করিলেন। মারের কন্যাগণের গৌতমকে বিচলিত করিবার চেষ্টা শিল্পীরা আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়া চিত্রিত করিয়া আসিতেছেন। গান্ধারের গ্রীক-শিল্পীরা ও অজন্তার চিত্রকররা এই ঘটনাটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। মথুরার জগৎপ্রসিদ্ধ ভাস্কররাও এই ঘটনাটি বহুবার ক্ষোদিত করিয়াছেন। মথুরা হইতে আবার একখানি বড় লাল পাথরের ফলক এখন লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রাখা
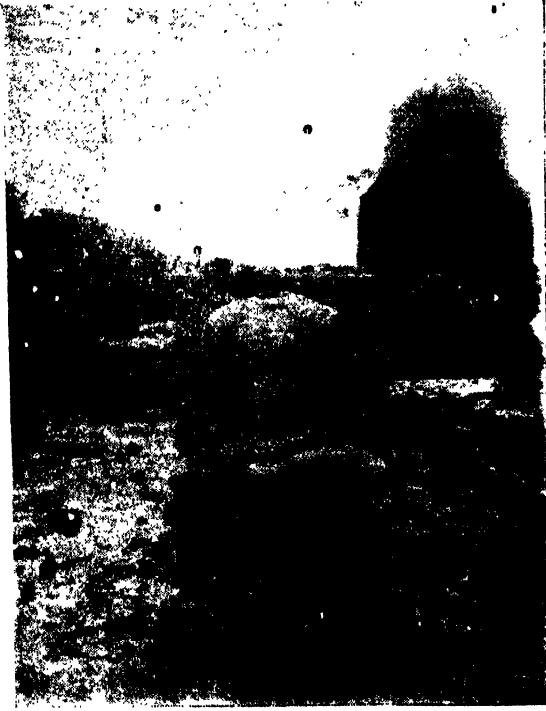
সারনাথে আবিষ্কৃত বজ্রাসন বুদ্ধ-ভট্টারক (বন্ধুগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত)

আছে। এই ফলকখানিতে দুই সারি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সারিতে দক্ষিণদিক হইতে (১) চতুরশ্ববাহিত রথে সূর্য্যদেব, (২) মারবিজয়, (৩) গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, (৪) ইন্দ্রশিলা গুহা ক্ষোদিত আছে। মারবিজয় চিত্রে গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তির দক্ষিণদিকে দুইটি অর্দ্ধনগ্ন নির্লজ্জ নারীমূর্ত্তি ও বামদিকে তিনটি নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদিকের নারীমূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা মারের কন্যা এবং কুৎসিত ভাব প্রকাশ করিয়া রূপের মোহে গৌতমকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের দেশের শিল্পীরাও মূর্ত্তিতে মারবিজয়ের ঘটনা ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় দুইটি মূর্ত্তি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম মূর্ত্তিটি পাটনা জিলার বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এখন ইহা কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি খুলনা জিলায় শিববাটী গ্রামে মহাদেবরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই দুইটি মূর্ত্তিতেই মন্দিরমধ্যস্থ গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তির সিংহাসনের নিম্নে এক সারিতে মার কর্ত্তৃক গৌতমকে আক্রমণ, মারকন্যা কর্ত্তৃক গৌতমকে প্রলোভনের চেষ্টা, তাহাদের পরাজয় ও গৌতমের শরণগ্রহণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌতম যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখনও মার তাঁহাকে ছাড়িল না। মার গৌতমের বুদ্ধত্ব বা সিদ্ধিলাভের মুহূর্ত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, তাহার সাক্ষী কে?" গৌতম তখন দক্ষিণ হস্ত দিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে আহ্বান করিলেন। পৃথিবী মেদিনী ভেদ করিয়া উঠিয়া আসিলেন। পৃথিবীকে সাক্ষী রাখিয়া গৌতম সিদ্ধিলাভ করিলেন। যে সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তিতে বুদ্ধদেব দক্ষিণ হাত দিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত মূর্ত্তি গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের সময়ের চিত্র। গান্ধারের গ্রীক-শিল্পীরা পাথরের ফলকে ক্ষোদিত চিত্রে দেখান যে, গৌতম অশ্বত্থবৃক্ষতলে বজ্রাসনের উপরে দেব, নর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরে পরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। এই সমস্ত চিত্রে বুদ্ধদেবের মৃত্তিকাস্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী সমস্ত যুগের সমস্ত মূর্ত্তিতেই কিন্তু বুদ্ধকে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের মৃত্তিকা

জগদীশপুরের বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি

বজ্রাসনবুদ্ধ-ভট্টারক (প্রাপ্তিস্থান—কুরকিহার, গয়া জিলা)

মুদ্রায় উপবিষ্ট দেখাইয়াছেন। এই জাতীয় মূর্ত্তি দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারে কেবল গৌতম বুদ্ধকে অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের ধ্যান অনুসারে এই প্রকারের মূর্ত্তির নাম "বজ্রাসনবুদ্ধ-ভট্টারক"। এই প্রকারের অনেক মূর্ত্তিই পাথরের, তবে পাচ বৎসর পূর্ব্বে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ-খননকালে অনেকগুলি অষ্টধাতুর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছিল। বজ্রাসন-বুদ্ধ-ভট্টারকের এক পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও অপর পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি থাকে। গৌতম বুদ্ধের সম্বোধি বা বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় প্রকারের মূর্ত্তি অন্য রকমের। এই প্রকারের মূর্ত্তিতে গৌতম বুদ্ধের জীবনের আটটি প্রধান ঘটনার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কেন্দ্রস্থিত চিত্রটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত গৌতম বুদ্ধের। নালন্দার নিকটে জগদীশ-পুরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তিটি এই প্রকারের। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ খননকালে এই জাতীয় একটি সুন্দর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে গৌতম সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব ছিলেন, এখন তিনি বুদ্ধ হইলেন। তিনি যে জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহার নাম সম্যক্ সম্বোধি, যে

নালন্দার বুদ্ধমূর্ত্তি (ইহাতে বুদ্ধের জীবনের ৮টি প্রধান ঘটনা আছে)

স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী রাখার নাম ভূমিস্পর্শ বা সাক্ষীমুদ্রা। বৌদ্ধ-বারাণসী বা সারনাথে আবিষ্কৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত স্থবির বন্ধুগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একখানি বুদ্ধমূর্ত্তিতে এই ঘটনার চিত্র অতি সুন্দররূপে ক্ষোদিত আছে। মূর্ত্তিটিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশ্বত্থবৃক্ষতলে এক খণ্ড শিলার উপরে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া আছে এবং তাঁহার আহ্বানে পৃথিবী ভূগর্ভ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতেছেন। বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত একখানি বুদ্ধমূর্ত্তির সিংহাসনে মেদিনীর ভূগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ অতি সুন্দর-রূপে চিত্রিত আছে।

আমাদের দেশের শিল্পীরা পালবংশের রাজত্বকালে শিল্পের যে নূতন রীতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদনুসারে ক্ষোদিত মূর্ত্তিতেও গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের সময় কল্পনা করিতে গিয়া গৌতম বুদ্ধকে ভূমিস্পর্শ বা সাক্ষী

গৌতম সিদ্ধার্থের সমাক্ সম্বোধি (গান্ধারের ক্ষোদিত ফলক)

অশ্বত্থবৃক্ষতলে বসিয়া তিনি সিদ্ধ হইলেন, তাহার নাম হইল বোধিবৃক্ষ বা বোধিদ্রুম এবং যে ভূমিতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, তাহার নাম হইল মহাবোধি। অশ্বত্থমূলের যে শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন, তাহার নাম হইল বজ্রাসন। এই বজ্রাসন ও বোধিবৃক্ষের জন্য মহাবোধি জগতের সমস্ত বৌদ্ধগণের নিকটে অন্যতম তীর্থ। শাক্যবংশের রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ এই মহাবোধি ক্ষেত্রে যে নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার এত বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, তাঁহার সম্যক্ সম্বোধি তাঁহার নূতন জন্মরূপে পরিগণিত হইল। বুদ্ধের মৃত্যুর হাজার বৎসর পরে হিন্দুরা যখন তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমাদের পুরাণকারেরা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, গয়ার নিকটে ব্রাহ্মণকুলে বিষ্ণু নবম অবতারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চ ধারা

উচ্ছল-জল-কল্লোলময়ী চঞ্চলা গিরি-নন্দিনী,—
অলকনন্দা রম্যা রূপসী মর্ম্মর-কারা-বন্দিনী।
দুস্তর গিরি-গহন-বর্ত্মে
চূর্ণিয়া মহা সলিলাবর্ত্তে,
আয় ছুটে আয় পঞ্চ ধারায় স্বর্গের সুধাস্যন্দিনী!

আকুলি চিত্ত হোত্র-আহুতি-যজ্ঞ-ধূমের গন্ধে গো,
আয় কল্ কল্ উর্ম্মি পাগল নৃত্য-দোদুল ছন্দে গো,
রত্ন হীরক মণি সুবর্ণে
কুণ্ডল দুল পরিয়া কর্ণে,
চুনী পান্নার অঞ্জলিরাশি বিলাইয়া মহানন্দে গো।

উষ্ণ-উষর তৃষ্ণার দেশে উত্তাল লীলা-ভঙ্গীতে,
শীতলি' বক্ষ শান্তি-সলিল-কল্লোল-কল-সঙ্গীতে,

অমর-বৃন্দ-আশিস-সিক্তা,
মন্দাকিনীর পীযূষ-পৃক্তা,
আয় অতীতের মত্ত গরিমা বিকাশি নেত্র-ইঙ্গিতে।
আয় মা আর্য্য হিন্দু-মনীষি-তাপসবৃন্দ-বন্দিতা,
সত্য-ত্রেতার বার্ত্তাবাহিনী সাম-ঝঙ্কার-নন্দিতা;
গান্ধারী-আঁখি-সলিল-বন্যা,
গুরুগোবিন্দ-সাধন ধন্যা,
লক্ষ লক্ষ মত্ত শিখের তপ্ত-রক্ত-রঞ্জিতা।
আয় চারিদিক দীপ্ত করিয়া আর্য্য সুযশঃ সৌরভে,
অঙ্কিত করি চিত্তপটে সে কুরুপাণ্ডব-গৌরবে,
পঞ্চ ধারায় আয় রে সিন্ধু,
পঞ্চ পরাণে জাগুক হিন্দু,
চতুর্যুগের তীর্থে নাহিয়া চিত্ত ভাসুক গৌরবে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।
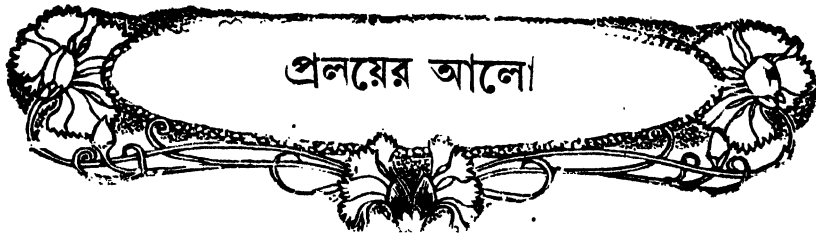
মুখবন্ধ

বিপ্লববাদের প্রধান কেন্দ্র

সুইটজার্লণ্ডের জেনিভা নগরী বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপীয় বিপ্লববাদিগণের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। বল্‌শেভিকগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রুস রাজতন্ত্রের প্রধান শত্রু নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লববাদিগণের অগ্রগণ্য ছিল। তাহারা স্বদেশে নিরাপদ নহে বুঝিয়া বহুকাল হইতে জেনিভা নগরেই প্রধান আড্ড সংস্থাপিত করিয়াছিল। জেনিভা হইতেই তাহারা ভীষণ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সুবিশাল রুস সাম্রাজ্যের বিরাট ভিত্তি পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিল। এই জন্যই কোন সুরসিক ফরাসী বিচারপতি জেনিভা নগরীকে 'য়ুরোপের দুষ্টব্রণ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব রুস সম্রাটের পূর্ব্ববর্ত্তী জারের হত্যার ষড়যন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে জেনিভা নগরেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা এই ভীষণ পৈশাচিক কার্য্যসংসাধনের উদ্দেশ্যে এই নগর হইতেই রুসিয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এমন কি, এই ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয়া একটি চতুরা রমণী কার্য্যসিদ্ধির পর রুসীয় পুলিসের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অদ্ভুত চাতুর্য্যবলে জেনিভায় প্রত্যাগমনে সমর্থা হইয়াছিল, এবং সুইস্ সাধারণতন্ত্র সেই ভীষণপ্রকৃতি নারীকে স্বদেশে আশ্রয়প্রদানে কুণ্ঠিত হয় নাই!

পাঠকপাঠিকাগণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, পৃথিবীর এত স্থান থাকিতে ক্ষুদ্র জেনিভা নগরই বিপ্লববাদিগণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি সহজ। জেনিভার ভৌগোলিক অবস্থানই ইহার একমাত্র কারণ। জেনিভা হইতে ফরাসী রাজ্যে পলায়ন করিতে কোন কষ্ট নাই; বিশেষতঃ বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে যে কোন ব্যক্তি জেনিভা হইতে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ইটালী বা জর্ম্মাণ-সীমায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। য়ুরোপীয় রাজনীতিক অপরাধিগণকে য়ুরোপের অধিকাংশ গবর্মেণ্ট ক্ষমার পাত্র মনে করেন, ভিন্ন গবর্মেণ্টের প্রেরিত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহারা সহজে মঞ্জুর করেন না। য়ুরোপের মধ্যে সুইটজার্লণ্ড এবং ইংলণ্ডই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদার। এই জন্যই জেনিভা ও লণ্ডন মহানগরীতে য়ুরোপের সকল দেশের বিপ্লববাদিগণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

জেনিভা নগর আয়তনে তেমন বৃহৎ নহে, এই নগরের অধিবাসিসংখ্যা এক লক্ষের কিছু বেশী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে এই নগরের বহু উন্নতি সাধিত হইতেছে; তবে বিগত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর সেই উন্নতি-স্রোতে কিঞ্চিৎ বাধা পড়িয়াছিল বটে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই নগরের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। জেনিভার প্রাকৃতিক দৃশ্য য়ুরোপের অধিকাংশ নগর অপেক্ষা মনোহর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যদি ফরাসী বা ইটালীয়ান জাতি এই সুন্দরী নগরীর অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সুবিস্তীর্ণ হ্রদ-মেখলা-শোভিনী গিরিরাণী জেনিভাকে অধিকতর সুষমামণ্ডিতা ও গৌরবশালিনী করিতে সমর্থ হইতেন। সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে অন্য কোন নগরের এরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য লক্ষিত হয় না। যে হ্রদের ক্রোড়ে এই সুন্দরী নগরী অবস্থিতা, তাহা ১৮ ক্রোশ দীর্ঘ। তাহার দক্ষিণে চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন সমুন্নত শুভ্রশৃঙ্গশোভিত গিরিশ্রেণী, পূর্ব্বে চিরশ্যামল সুবিশাল অরণ্যানী। আরও দূরে য়ুরোপের হিমাচল নগরাজ আল্পসের অভ্রভেদী তুষারশুভ্রকিরীট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'মণ্টব্লাঙ্ক' যোগমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বিশ্বনিয়ন্তার ধ্যানে আত্মসমাহিত। জেনিভা সকল ঋতুতেই অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাকুঞ্জ, বিশেষতঃ শীতাগমে সমগ্র পার্ব্বত্য

প্রকৃতি শুভ্র তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে ইহার যে বিরাট সৌন্দর্য্য নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয়, লিপিকুশল ভাবুক কবির লেখনী তাহার বর্ণনায় অসমর্থ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকায় সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব। নানাবর্ণের সুগন্ধি কুসুমের সুমধুর মিশ্রগন্ধ দিবারাত্রি এই নয়নমনোমোহিনী গিরিনগরীকে সৌরভাকুল করিয়া রাখিয়াছে। যেন বিশ্বশিল্পী যথাসাধ্য চেষ্টায় ইহাকে প্রাণমনোলোভী শান্তিরসাস্পদ তপোবনে পরিণত করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রূর প্রকৃতি দর্পান্ধ মানবের উচ্ছৃঙ্খলতায় এমন শান্তির আগার য়ুরোপের 'দুষ্টব্রণে' পরিণত হইয়াছে!

অর্দ্ধশতাব্দীরও কিছু পূর্ব্বে জেনিভার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল, এবং সুদৃঢ় দুর্গসমূহ দ্বারা এই নগর সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেই সকল প্রাচীন দুর্গের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। শত শত বর্ষের অনেক প্রাচীন অট্টালিকা ও সৌধরাজি এখনও বর্ত্তমান আছে। এই নগরে দুর্গম, সঙ্কীর্ণ, অসমতল পথের সংখ্যা অল্প নহে; বিশেষতঃ জেনিভার দরিদ্র পল্লী অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধপূর্ণ ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দরিদ্রের জীবন অভিশপ্ত! স্বর্গের পার্শ্বেই নরক বর্ত্তমান।

এখন প্রাচীন নগরের অনেক অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে; সেই সকল স্থানে নব নব সৌধ ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত হইয়াছে; অসমতল সঙ্কীর্ণ পথগুলি সমতল ও প্রশস্ত করা হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন রোণ নদের উপর ছয়টি প্রশস্ত সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় নগরের সুগমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জেনিভা নগরের অধিবাসিগণ বৈদেশিক সংস্রব ভালবাসে না। তাহারা স্বভাবতঃ অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ। নাগরিকগণ প্রধানতঃ ইটালিয়ান, ফরাসী ও জর্ম্মাণদিগের বংশসম্ভূত। তাহারা ফরাসীদেশ-প্রচলিত রীতি-নীতির পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে আন্তরিক সদাশয়তার একান্ত অভাব হইলেও মৌখিক সৌজন্যে তাহারা পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। সুইটজার্লণ্ডের যে অংশে জর্ম্মাণীর প্রভাব অধিক, সেই অংশের অধিবাসিগণকে জেনিভাবাসীরা 'বৈদেশিক' বলিয়া অবজ্ঞা করে।

জেনিভা নগরে যে সকল বৈদেশিকের বাস, তাহাদের মধ্যে প্রবাসী রুসিয়ানের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ এই নগরে বাস করিতেন, তাঁহারা নানা কারণে রাজধানী ত্যাগ করিয়া হ্রদের অন্য প্রান্তে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা এই উপন্যাসে যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময় জেনিভা নগরে যে সকল রুসিয়ান বাস করিত, তাহাদের অধিকাংশই বিপ্লববাদী অর্থাৎ নিহিলিষ্ট-মতাবলম্বী ছিল। রুসিয়ার জারের সর্ব্বনাশসাধনই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই সকল নিহিলিষ্টের 'চক্র' অতি ভয়াবহ বলিয়াই সকলে মনে করিত। তাহাদের নিজেদের স্বতন্ত্র হোটেল, মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র ছিল। তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাহারা মিতভাষী, অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি ও কর্ম্মঠ ছিল এবং রাজনীতিক সঙ্কল্পসাধনের জন্য প্রাণপণে পরস্পরের সহায়তা করিত। রুস সাম্রাজ্য-প্রচলিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের জন্য তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। এই সঙ্কল্পসাধনের জন্য তাহারা কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইত না।

এই সকল নিহিলিষ্টের অনেকেই রুসিয়ার অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিপ্লববাদী সন্দেহে তাহারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় জেনিভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্কল্প ছিল, যথেচ্ছাচারী রুস সম্রাটের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে সাম্রাজ্যের উদ্ধারসাধন করিবে;—সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন সুবিশাল রাজ্যে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া রুস জাতিকে সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও সঙ্ঘবদ্ধ পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত করিবে; সেই সুবিস্তীর্ণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সন্তোষ, শান্তি, সচ্ছলতা ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবে। বলশেভিক মতবাদ তখন নিহিলিজমের আবরণমধ্যে বীজাণুরূপে সংগুপ্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই দুশ্চেষ্টা কত দিনে সফল হইবে, কখনও সফল হইবে কি না, তাহা তাহারা জানিত না। তথাপি কোন দিন তাহাদের চেষ্টার বিরাম ছিল না; তাহারা হতাশ হইতে জানিত না। এক পুরুষের অন্তর্দ্ধানের পর তাহাদের

বংশধররা পিতৃপুরুষের সমাধিগহ্বর হইতে অসাধ্য-সাধন মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া নবোৎসাহে তাহাদের আরব্ধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিত এবং দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্কল্প-পথে অগ্রসর হইত। পিতৃপিতামহের ন্যায় তাহারাও অম্লানবদনে অবলীলাক্রমে জীবন উৎসর্গ করিত। এই সকল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক নিহিলিষ্টের সাম্প্রদায়িক গুপ্ত-কথা বাহিরের কোন লোক কোন দিন জানিতে পারিত না। সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোক কোন কারণে কোনও গুপ্তকথা প্রকাশ করিলে তাহাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইত; সে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পলায়ন করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও নিহিলিষ্ট ঘাতকের হস্তে তাহাঁকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুদণ্ড যে যমদণ্ডের ন্যায় অমোঘ, ইহা সে বিশ্বাস করিত।

জেনিভা-প্রবাসী নিহিলিষ্টরা 'ফেনিয়ান', 'সোসিয়ালিষ্ট' প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লববাদীদের ন্যায় রাজনীতিক মতামত লইয়া উচ্চ কলরব বা পরস্পরের সহিত কলহ করিত না। তাহারা কোন প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে যোগদান করিত না বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বহির্ভূত কোন কার্য্যের সংস্রবে থাকিত না। যে সকল কার্য্য তাহারা সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত, তাহা সংসাধনের জন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইত না। দয়া, মায়া, হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি বিসর্জ্জন দিয়া কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণে পরাঙ্মুখ হইত না।

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত; যে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিত, সে যতই ধনী, মানী, জ্ঞানী বা উচ্চবংশীয় হউক, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য; বিপুল অর্থ-বল বা পদ-গৌরব তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না। এমন কি, অন্যায় সন্দেহেও অনেককে হত্যা করা হইত! নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা সমগ্র য়ুরোপে কত লোক প্রকাশ্য-ভাবে বা গোপনে নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহারা যাহাদিগকে গোপনে হত্যা করিত, তাহাদের মুখমণ্ডল এ ভাবে বিকৃত করিত যে, নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া উঠিত। কিন্তু এইরূপ প্রাণের আশঙ্কা থাকিলেও কত সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী যুবতী, কত বুদ্ধিমান্, সাহসী, কর্ম্মঠ ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবক কি মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিনিয়ত এই বিপ্লববাদিগণের দলপুষ্টি করিত—তাহাও স্থির করা অসম্ভব। এই সকল সাংসারিক-জ্ঞানবর্জ্জিত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতী কোন-রূপে একবার তাহাদের দলভুক্ত হইলে আর তাহাদের উদ্ধারের আশা থাকিত না। তাহাদের সুখ, শান্তি, সন্তোষ, প্রফুল্লতা চিরজীবনের জন্য অন্তর্হিত হইত। রাজ-পুরুষগণের কঠোর শাসনে নিগৃহীত হইবার ভয়ে সন্দেহের ছায়াপাতমাত্র তাহারা সুখ-শান্তিপূর্ণ গৃহ, ধন-জন, আত্মীয়-পরিবার সকলই পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিত; এবং যে কষ্টে ও অসুবিধায় তাহাদের দুঃখময় জীবন অজ্ঞাতবাসে অতিবাহিত হইত, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও গলিয়া যাইত! রুসীয় সমাজের সকল স্তরেই নিহিলিষ্টগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। রুসিয়ার উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেও নিহিলিষ্টের সংখ্যা অল্প ছিল না। সমর-বিভাগে, নৌ-বিভাগে, ধর্ম্মপ্রচারক-গণের মধ্যে, সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সম্প্রদায়ে অসংখ্য নিহিলিষ্ট প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিত। কিন্তু রুসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তবংশীয় নিহিলিষ্টও অজ্ঞাত হীনবংশোদ্ভূত, ইতর, মূর্খ নিহিলিষ্টকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইত। লক্ষপতির সন্তান ও দরিদ্র কৃষকের পুত্র—উভয়েই ইহাদের নিকট সমান। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের এই সমদর্শিতার আদর্শ বর্ত্তমান কালে বল্‌শেভিকরাও গ্রহণ করিয়াছে।

রুস-গভর্মেণ্ট এই ক্রমবর্দ্ধিত অজেয় শক্তি সমূলে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাজকোষের বিপুল অর্থ মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিতেছিল। রুসিয়ার অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী নিহিলিষ্টদলনে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণদণ্ড এবং তদপেক্ষাও কঠোর চিরনির্ব্বাসনদণ্ড দ্বারা এই শক্তির বিলোপসাধন সম্ভবপর হয় নাই। প্রতি বৎসর দলে দলে নিহিলিষ্ট ধৃত হইয়া বিনা বিচারে বহু গিরি, নদী, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী দুস্তর সাইবিরিয়ার চিরতুষারসমাচ্ছন্ন ভীষণ প্রান্তরে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে; আবার নূতন দল

নবোৎসাহে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া রাজশক্তি বিধ্বস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কোন্ গুপ্তশক্তি কোন্ অলক্ষিত কেন্দ্রে বসিয়া এই অপরাজেয়, অসাধ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্প বিপ্লববাদিগণকে অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছিল—তাহা রুস-সম্রাট সহস্র চেষ্টাতেও জানিতে পারিতেন না, কোন কৌশলেই তাহাদের গুপ্তরহস্য ভেদ করিতে পারিতেন না। তিনি ব্যর্থরোষে বিচলিত হইয়া প্রতিনিয়ত শুনিতেন—সহস্র সহস্র নরনারী এক ভীষণ গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রুস-সাম্রাজ্য হইতে রাজশক্তির অস্তিত্ব-বিলোপের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে জীবন উৎসর্গ করিতেছে; তাহারা ভীষণ কষ্ট ও পৈশাচিক উৎপীড়ন ধীরভাবে সহ্য করিয়া অবশেষে চিরবিস্মৃতিসমাচ্ছন্ন সাইবিরিয়ার মহাশ্মশানে অন্তিম-শয্যা রচনা করিতেছে; তথাপি তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে না, নূতন নূতন লোক তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে! এক দল যাইতেছে, আর এক দল প্রস্তুত হইতেছে!—ইহার পরিণাম কি, তাঁহার বিপুল রাজশক্তি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে, কি নিহিলিষ্টের নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে—তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তিনি আপনাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হতভাগ্য এবং সহস্র সশস্ত্র রক্ষি পরিবৃত হইয়াও সম্পূর্ণ অরক্ষিত মনে করিতেন। মৃত্যুভয় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত, তাঁহার রাজমুকুট কণ্টকাকীর্ণ ও রাজদণ্ড শক্তিহীন প্রতীয়মান হইত!

পূর্ব্বকথা

অঙ্কুর

১

জেনিভা হ্রদের তটে জেনিভা নগর অবস্থিত। হ্রদের পার্শ্ব দিয়া প্রশস্ত রাজপথ প্রসারিত; পথিপ্রান্তে শাখা-বহুল বৃক্ষশ্রেণী পথটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। পথের ধারে দুই চারিখানি সুদৃশ্য উদ্যানভবন দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত। পাহাড়ের পাদদেশে বহুসংখ্যক অট্টালিকা বিরাজিত; সেই সকল অট্টালিকা হইতে শুভ্র তুষারকিরীটী নগরাজ আল্পসের দৃশ্য অতি মনোরম।

গিরিপাদমূলে যে সকল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাদের অধিকাংশই প্রবাসী রুসীয়গণের বাস-ভবন। তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ধনাঢ্য রুসিয়ানদের এই সকল অট্টালিকা হইতে জেনিভা হ্রদের সুনীল শোভা নয়নগোচর হইত, এবং তাহা দর্শকগণের মন মোহিত করিত।

এই অট্টালিকাশ্রেণীর একটির নাম ছিল 'লা গেরেন্স।' 'লা গেরেন্স' অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে নির্ম্মিত। ইহা একটি সুবৃহৎ উদ্যানে পরিবেষ্টিত। সেই উদ্যানে পাইন, সিডার প্রভৃতি নানা জাতীয় পার্ব্বত্য বৃক্ষ বর্ত্তমান ছিল। অট্টালিকার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ নানাপ্রকার সুগন্ধি কুসুমের তরুরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। অট্টালিকাটি পুরাতন হইলেও শ্রীহীন হয় নাই। অট্টালিকার প্রাচীরগুলি চিরশ্যামল 'আইভি'লতায় আবৃত। সম্মুখস্থ বাতায়নগুলি কুসুম-কুন্তলা বনলতায় পরিবেষ্টিত। উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী বলিয়া এই অট্টালিকাটি রাজপথ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইত না; কিন্তু দূরবর্ত্তী প্রান্তর হইতে তাহা বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন কুঞ্জভবনবৎ প্রতীয়মান হইত।

এই অট্টালিকাটি বহুদিন খালি পড়িয়া ছিল; ইহার ভাড়া অত্যন্ত অধিক বলিয়া কোন সাধারণ লোক এ বাড়ী ভাড়া লইতে সাহস করিত না। দীর্ঘকাল পরে একটি ভদ্রলোক এই বাড়ী ভাড়া লইলেন। তিনি জেনিভা নগরের জনসাধারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র ভিন্ন তাঁহার পরিবারে অন্য কোন আত্মীয় ছিল না। কেহ কেহ বলিত, ভদ্রলোকটি হাঙ্গেরিয়ার এক জন বড় জমীদার; রাজরোষে পড়িয়া প্রাণভয়ে তিনি জেনিভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইয়াছিল; তাহারা জানিতে পারিয়াছিল—তাঁহার নাম কাউণ্ট মাট্স্কি। কাউণ্টের সঙ্গে দুই জন পরিচারিকা ও একটি পরিচারক ছিল। পরিচারিকাদ্বয়ের এক জন কাউণ্টের দুই বৎসরবয়স্ক পুত্রটির ধাত্রীর কায করিত; এই ধাত্রীর নাম ক্যাট্রিণা। সে রুসিয়ার কোন কৃষকের কন্যা।

কাউণ্ট মহাশয় এই বাড়ী ভাড়া লইবার পর তাঁহার কথা লইয়া নগরমধ্যে নানাপ্রকার আলোচনা আরম্ভ

হইল। তাঁহার চাল চলন রহস্যপূর্ণ বলিয়াই অনেকের ধারণা হইয়াছিল। তিনি বড়ই নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন; জনসাধারণের সঙ্গে মিশিতেন না, স্থানীয় কোন আমোদ-প্রমোদেও যোগ দিতেন না। জেনিভাপ্রবাসী কোন কোন সম্ভ্রান্ত রুসিয়ান তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কখন কখন তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন, কিন্তু তিনি কোন দিন তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন না। কাউণ্ট ও কাউণ্ট-পত্নী কখন পথেও বাহির হইতেন না; জেনিভার অনেক লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। কাউণ্ট যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার সংবাদ লইয়া তাহারা বুঝিয়াছিল, তিনি মহা ধনাঢ্য ব্যক্তি।

এই বাড়ীতে কয়েক মাস বাস করিবার পর কাউণ্ট মহাশয় একটি নূতন ভৃত্য এবং আর একটি পরিচারিকা নিযুক্ত করিলেন। তাহারা উভয়েই রুসিয়ান। কিন্তু তাহারা পূর্ব্ব হইতেই জেনিভায় বাস করিতেছিল। এই নবাগত পরিচারকটির নাম পলফিস্‌কে। পরিচারিকাটি তাহারই স্ত্রী। তাহার নাম জুলিয়া। কাউণ্টের দাসদাসীরা কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই বাহিরে যাইত, কিন্তু তাহারা তাহাদের মনিব-পরিবার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না; কাউণ্টের ন্যায় তাহারাও মিতভাষী ও গম্ভীর ছিল, কেহ তাহাদের জেরা করিয়া কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারে নাই।

কাউণ্ট মাট্রিস্কি পরম রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত; যেন কোন দুর্ব্বিষহ বেদনা ও অশান্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। আনন্দ ও প্রফুল্লতা যেন চিরদিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কাউণ্ট-পত্নী অসামান্যা রূপবতী ছিলেন, তখনও তিনি যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। অপরূপ লাবণ্য তাঁহার যৌবন-পুষ্পিত দেহে উছলিয়া উঠিয়াছিল। দুই বৎসরবয়স্ক শিশু পুত্রটি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন পুত্র-কন্যা ছিল না।

কিছু দিন পরে জেনিভার জনসাধারণ সবিস্ময়ে শুনিল, কাউণ্ট মাট্রিস্কি হাঙ্গেরিয়ার জমীদার নহেন, রুসিয়ার কোন মহা সম্ভ্রান্তবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি পূর্ব্বে রুস সাম্রাজ্যের সমরবিভাগে কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী রুসিয়ার রাজবংশসম্ভূতা,— জারের অতি নিকট-আত্মীয়া। এই জনরবের মূল কি, নগরবাসিগণ তাহা জানিতে না পারিলেও কথাটা সত্য বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিল। কাউণ্ট ডাকযোগে কখন কোন পত্র পাইতেন না এবং ডাকে কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। এই জন্য সকলেরই ধারণা হইয়াছিল—তাঁহার চিঠি-পত্রাদি গুপ্তচরই বহন করিয়া আনে এবং তাহারাই গোপনে লইয়া যায়। কাউণ্ট-পরিবারের ব্যবহার রহস্যাবৃত হইলেও কাউণ্ট বা কাউণ্ট-পত্নীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কেহ কোন দিন শুনিতে পায় নাই। কোন দুর্নাম বা কলঙ্ক কোন দিন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কাউণ্টের অট্টালিকার দ্বিতলস্থ একটি কক্ষে তাঁহার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংরক্ষিত ছিল। সেই কক্ষে বসিয়া তিনি প্রত্যহ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কাউণ্ট, তাঁহার পত্নী এবং দুই একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন আর কাহারও এই কক্ষে প্রবেশের অধিকার ছিল না। এই কক্ষে বসিয়া তিনি কি করিতেন, তাহা বাহিরের কোন লোকের জানিবার উপায় ছিল না।

এক দিন সন্ধ্যার পর কাউণ্ট-পত্নী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "ডানিয়ফ্ নীচে দাঁড়াইয়া আছে; সে তোমার কাছে কি আরোক লইতে আসিয়াছে! নিকোলাস্, তোমার জীবনের এই ভীষণ ব্রত শেষ করিতে আর কত বিলম্ব? এই রকম নির্ব্বাসিত জীবন যে আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! কোনও নিরাপদ স্থানে গিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল। আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না; চল, ইংলণ্ডে না হয় ফ্রান্সে চলিয়া যাই; দুর্গম মেরুপ্রদেশও এ স্থান অপেক্ষা নিরাপদ। অন্যত্র আশ্রয় লইবার সুবিধা না থাকিলে চল, আমরা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যাই। সেখানে আমরা কতকটা নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিব। তুমি এই কঠোর ব্রত পরিত্যাগ কর।"

কাউণ্ট ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে ইসোবেল, তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা এখন আমার পক্ষে কত দূর অসম্ভব, তাহা জানিলে এ জন্য নিশ্চয়ই আমাকে অনুরোধ করিতে না। এমন কথা আর কোন দিন তুমি মুখে আনিও না। আমরা মেরুপ্রদেশেই পলায়ন করি, আর আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলেই আশ্রয় গ্রহণ করি—কোথাও গিয়া আমাদের নিস্তার নাই! এই ভীষণ ব্রত সহসা ত্যাগ করিবারও উপায় নাই। এখান হইতে পলায়ন করিলেই আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে; তাহার পর যেখানেই আশ্রয় লই, এক সপ্তাহমধ্যে আমার জীবন শেষ হইবে! কিরূপে আমার মৃত্যু হইল, তাহা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার উপায় থাকিলে বহু দিন পূর্ব্বেই আমি সেই উপায় অবলম্বন করিতাম। এত কষ্টে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতাম না। আমার অন্তর্বেদনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নহে।"

কাউণ্ট-পত্নী স্বামীর কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিলেন, "একবার চেষ্টা করিয়া দেখ না, অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটিবে; কিন্তু ছেলেটার কি গতি হইবে? তাহাকে কিরূপে বাঁচাইব? দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা, শয়নে স্বপনে দুঃসহ আতঙ্ক, প্রতি মুহূর্ত্তে শোচনীয় মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকা আর ত সহ্য হয় না! ক্রীতদাসের জীবনও যে ইহা অপেক্ষা সুখশান্তিপূর্ণ, ইহা অপেক্ষা অধিক লোভনীয়। এই ভাবে জীবনভার বহন করাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে? সকল সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সুখশান্তি আরাম-বিরামে বঞ্চিত হইয়া এই রকম নির্ব্বাসিত জীবন আর কত দিন বহন করিব?"

কাউণ্ট কাতরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন। জীবনের সুখ শেষ হইয়াছে; মৃত্যুর পর যদি শান্তি পাই!"

কাউণ্ট পত্নী বলিলেন, "সুখী না হই,—সে জন্য আক্ষেপ নাই; কিন্তু এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! যৌবন অতীত না হইতেই জরা আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে, আমরা অকালে বৃদ্ধ হইতেছি! জীবনের সকল কামনা অপূর্ণ থাকিতেই—"

কাউণ্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "ইসোবেল, প্রিয়তমে, তুমি আর যাহাই বল, এই বয়সেই বুড়া হইয়াছ, এমন কথা মুখে আনিও না। তোমার মুখে এমন কথা আমার সহ্য হয় না। হাঁ, আমার স্ত্রী হইয়া তোমার যৌবনের সকল কামনাই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; তুমি এ পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছ এবং নিত্য নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ। কিন্তু তুমি আরও কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, আমি সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি; জানি না, কত দিনে তাহা আসিবে; কিন্তু হতাশ হইলে জীবন আরও অধিকতর দুর্ব্বহ হইবে। আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। তুমি ত জান, আমাদের সাম্প্রদায়িক কার্য্যে আমার আন্তরিক সহানুভূতি নাই। এই দলে যোগদান করিয়া আমি কিরূপ অনুতপ্ত হইয়াছি, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। কুসংসর্গে পড়িয়া কি ভ্রমই করিয়াছি! কিন্তু এখন আর অনুতাপ করিয়া কোন ফল নাই। আমি কাপুরুষ নহি, প্রাণভয়েও কাতর হই নাই; কেবল প্রাণাধিক পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই অসহ্য মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছি। যদি তাহার ভবিষ্যৎচিন্তায় আকুল না হইতাম, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই এই সকল নরপিশাচের সকল কুকর্ম্মের কথা সম্রাটের গোচর করিয়া আমার ভ্রমের জন্য অকপটচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু আমি যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছি, এখনও তাহার সময় হয় নাই; এই জন্যই আরও কিছু দিন তোমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া এই কষ্ট সহ্য করিতে বলিতেছি।"

কাউণ্টের কথা শেষ হইবামাত্র সেই কক্ষের দ্বারদেশে এক জন আগন্তুকের আবির্ভাব হইল; তাহাকে দেখিয়াই কাউণ্ট ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। লোকটা আড়ালে থাকিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিয়াছে না কি? কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "এই যে ডানিয়ফ, খবর না দিয়াই আমার অন্দরে আসিয়াছ? তা ভালই করিয়াছ, এখনই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছিলাম।"

ডানিয়ফ বলিল, "আপনার অনুমতি না লইয়াই আপনার অন্দরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গোস্তাকি হইয়াছে; কিন্তু কি করি বলুন, আমার

সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, আমি বাহিরে অনেকক্ষণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আর বিলম্ব করা অসম্ভব ভাবিয়াই অগত্যা আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।”

কাউণ্ট ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “না, না, তুমি কোন অন্যায় কায কর নাই। কেন অনর্থক কুণ্ঠিত হইতেছ? আমার অন্তঃপুরের সকল কক্ষেই তোমার প্রবেশাধিকার আছে; তুমি ঐ চেয়ারখানাতে বসিয়া একটু অপেক্ষা কর। ইসোবেল, আমার প্রিয় বন্ধু ডানিয়ফ্‌কে একটু চা খাওয়াইতে পারিবে কি?”

কাউণ্ট-পত্নী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডানিয়ফের মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। ডানিয়ফ্ কাউণ্টের সম্মুখে উপবেশন করিলে কাউণ্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনও নূতন সংবাদ আছে কি?”

ডানিয়ফ্ চঞ্চলদৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, “না, নূতন খবর কিছুই নাই; চারিদিকের কাযকর্ম্ম ভালই চলিতেছে। আরোকটা প্রস্তুত হইয়াছে কি?”

কাউণ্ট বলিলেন, “হাঁ, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; তাহা কি তুমিই লইয়া যাইবে?”

ডানিয়ফ্ বলিল, “নিশ্চয়ই, এই জন্যই ত আমাকে আসিতে হইয়াছে।”

কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ উঠিয়া একটি আলমারি খুলিলেন, এবং তাহার একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ হইতে এক ফুট লম্বা একটা টিনের কৌটা বাহির করিলেন। কৌটার মাথায় একটা ঢাকনী ছিল; সেই ঢাকনী খুলিয়া তিনি কৌটার ভিতর হইতে কাচনির্ম্মিত একটি লম্বা নল বাহির করিলেন। নলটির মাথায় কাচের ছিপি আঁটা ছিল। একটি ধাতুময় আবরণে সেই ছিপিটি আবৃত। নলটির রঙ্গ গাঢ় নীল। কাউণ্ট নলটি ঝাঁকাইয়া আলোর দিকে উঁচু করিয়া ধরিলেন, তাহা স্বচ্ছ তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল।

কাউণ্ট সেই নলটি পুনর্ব্বার টিনের কৌটায় পূরিয়া, অন্য বাক্স হইতে একটি ছোট শিশি বাহির করিলেন, সেই শিশিতেও ঈষৎ লোহিতাভ তরল পদার্থ ছিল। তিনি সেই দুই প্রকার আরোকের আধার দুইটি ডানিয়ফ্‌কে প্রদান করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, “বহু দিনের চেষ্টায় এই দ্রাবক দুইটি প্রস্তুত করিয়াছি; ইহাদের একত্র সংমিশ্রণের ফল অতি ভীষণ। শত্রুগণের ধ্বংসের জন্যই যেন ইহা ব্যবহৃত হয়; ইহাদের অপপ্রয়োগ কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে।”

ডানিয়ফ্ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “কাউণ্ট, সে জন্য আপনি ভাবিবেন না; দেশের শত্রুনিপাত ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যেই এই সাংঘাতিক দ্রব্য ব্যবহৃত হইবে না। আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের যে উপকার করিলেন, তাহা চিরদিন আমাদের সকলেরই স্মরণ থাকিবে। আমাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যিনি যাহাই করুন, আপনাকে কেহই ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন না। এখন আমি বিদায় লইলাম।”

ডানিয়ফ্ চা না খাইয়াই চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে কাউণ্ট-পত্নী এক পেয়ালা চা লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “ডানিয়ফ্ চা না খাইয়াই চলিয়া গেল?”

কাউণ্ট বলিলেন, “হাঁ, সে বিলম্ব করিতে পারিল না।”

কাউণ্ট-পত্নী টেবলের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিতেছিলে, তাহা কি সে দরজার আড়াল হইতে শুনিয়াছে? যদি সে দুই চারিটা কথাও শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের নিস্তার নাই!”

কাউণ্ট উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, “শুনিতে পাইয়াছে কি না, বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু অতঃপর আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। যদি কোন কারণে উহারা আমাদিগকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে, তাহা হইলে আমরা উভয়েই নিহত হইব। শেষে হয় ত ছেলেটাকেও বাঁচাইতে পারিব না। হা ভগবান্, আমাদিগকে তুমি কি সঙ্কটেই ফেলিয়াছ! সুধাভ্রমে যে গরল পান করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। আগুন লইয়া খেলা করিতেছি, পুড়িয়া মরিবার ভয় করিয়া লাভ নাই। ইসোবেল, যদি কোন দিন শুনিতে পাও, আমার ইহলীলার অবসান হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিও না; এমন কি, পুলিসেও সংবাদ দিও না। স্মরণ রাখিও, তোমার

সতর্কতার উপর তোমার ও আমাদের পুত্রের জীবন নির্ভর করিতেছে। আর আমার জীবনের আশা করিও না।"

স্বামীর কথা শুনিয়া কাউণ্ট-পত্নী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তুমি কি সর্ব্বনাশের কথা বলিতেছ? ভয়ে যে আমার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া গেল! যদি তোমার সন্দেহ হইয়া থাকে, এই দুর্ব্বৃত্তরা যে কোন মুহূর্ত্তে তোমাকে হত্যা করিতে পারে, তাহা হইলে কোন্ ভরসায় আর এখানে থাকিবে? চল, আজই আমরা এ দেশ হইতে দেশান্তরে—বহু দূরে পলায়ন করি, তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও আমরা নিরাপদ হইব।"

কাউণ্ট বলিলেন, "ইসোবেল, এরূপ অধীর হইয়া লাভ নাই। হয় ত আমার এই আশঙ্কা অমূলক। যদি ডানিয়ফ্ আমাদের পরামর্শ শুনিয়াই থাকে—তাহা হইলেও আমি তাহাদের জন্য সুদীর্ঘ কালের পরিশ্রমে যে সাংঘাতিক বিস্ফোরক আবিষ্কার করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়াছি, সে কথা স্মরণ করিয়া কি উহারা আমার নিকট বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ হইবে না? তাহাদের সর্ব্বপ্রধান হিতৈষীকে সামান্য কীট-পতঙ্গের মত বিনষ্ট করিবে? বিশেষতঃ উহারা জানে, আমাকে হত্যা করিলে উহাদের অনেক গুপ্ত সঙ্কল্পই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যও আমাকে হত্যা করা বোধ হয় উহারা সঙ্গত মনে করিবে না। আমার শক্তির উপর উহাদের আশা-ভরসা অনেকটা নির্ভর করিতেছে—ইহা উহাদের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও হঠাৎ উহারা আমাকে হত্যা করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

কাউণ্ট-পত্নী বলিলেন, "উহাদের কৃতজ্ঞতা নাই, উপকারীর জীবনও উহারা মূল্যবান্ মনে করে না; দলের যে কোন লোকের প্রতি উহাদের সন্দেহ হয়—এই নরপিশাচরা তাহাকে হত্যা করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও কুণ্ঠিত হয় না! আমরা ইহার বহু প্রমাণ পাইয়াছি। তুমি উহাদের সকল অপকর্ম্মের সমর্থন কর না, ইহা উহাদের অজ্ঞাত নহে। নানা কারণে উহারা অনেক দিন হইতেই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, তোমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিয়া আসিতেছে। ডানিয়ফ্ তোমার বিরুদ্ধে দলপতিকে কোন কথা বলিলে—সে তোমাকে ক্ষমা করিবে, ইহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। তুমি উহাদের যতই উপকার কর, এই কৃতঘ্ন পিশাচরা তাহা আমোলেই আনিবে না, মনে করিবে, তুমি তোমার কর্ত্তব্যের অধিক কিছুই কর নাই। শোণিতলোলুপ রাক্ষসের ন্যায় উহারা তোমার রক্তপানের জন্য অধীর হইয়া উঠিবে। তোমার ভবিষৎ ভাবিয়া আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি; না, এখানে থাকিতে আমরা নিরাপদ নহি। পলায়ন ভিন্ন প্রাণরক্ষার উপায় নাই।"

পত্নীর কথা শুনিয়া কাউণ্ট ঈষৎ হাসিলেন, সে হাসি যেন তাঁহার হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত! তিনি পত্নীকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে লাগিলেন; কিন্তু ইসোবেলের মনস্থির হইল না, তাঁহার আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা দূর হইল না।

২

এক সপ্তাহ পরে কাউণ্ট মহাশয় একখানি পত্র পাইলেন, পত্রখানি সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত। তিনি পত্রখানি খুলিয়া পত্রবাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তাহা পাঠ করিলেন;—"আজ রাত্রি ১২টার সময় 'মণ্টব্রিলে' কোন বন্ধুর গৃহে আমাদের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইবে। এই সভায় আপনার উপস্থিতি অপরিহার্য্য। যথাসময়ে আপনার বাসার নীচে নৌকা প্রেরিত হইবে; আপনি সেই নৌকায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিবেন, অন্যথা না হয়।—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদক।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া অজ্ঞাত ভয়ে কাউণ্টের মুখ বিবর্ণ হইল; তাঁহার ধারণা হইল, তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড-বিধানের জন্যই পরামর্শ-সভার এই অধিবেশন! কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া পত্রবাহককে বলিলেন, "উত্তম, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইব।"

পত্রবাহক বলিল, "পত্রখানি আপনি নষ্ট করিবেন ত?"

কাউণ্ট বলিলেন, "এ প্রশ্ন বাহুল্যমাত্র, এই দেখ।" তিনি তৎক্ষণাৎ পত্রখানি শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া গৃহকোণে নিক্ষেপ করিলেন।

পত্রবাহক বলিল, "আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, পত্রখানির এক টুকুরাও যাহাতে কাহারও হাতে না পড়ে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিবার আদেশ পাইয়াছি।"

পত্রবাহক গৃহকোণ হইতে পত্রের ছিন্ন টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইয়া, দেশলাই জ্বালিয়া সেগুলি দগ্ধ করিল। পত্রবাহকের এই সতর্কতার পরিচয়ে কাউণ্ট বিস্মিত না হইলেও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসের জন্য দুঃখিত হইলেন। পত্রের উদ্দেশ্য তাঁহার অনুকূল নহে, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

পত্রবাহক প্রস্থান করিলে কাউণ্ট তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন। পত্রখানির কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেও তিনি দুই একবার গুপ্ত মন্ত্রণা-সভায় আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনবার তাঁহাকে নৌকাযোগে খালের অপর পারে যাইতে হয় নাই; এবার তাঁহার জন্য নৌকা পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল কেন? পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্য কি?

কাউণ্ট সন্ধ্যার পর তাঁহার স্ত্রীর সহিত ভোজনে বসিলেন। তিনি সেই গুপ্ত পত্রের কথা তাঁহার স্ত্রীকে বলিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন; কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না; এমন কি, সেই রাত্রিতেই কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে, এ সংবাদও জানাইতে পারিলেন না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কাউণ্ট মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হইলেও সমিতির অন্যান্য সদস্যের নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। কাহার আদেশে সমিতির অধিবেশন হয়—তাহাও তিনি জানিতেন না।

কাউণ্ট ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া দেশোদ্ধারের সঙ্কল্পে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিহিলিষ্টগণের সহিত কাউণ্ট-পত্নীর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। নিহিলিষ্টরা তাঁহার দেবচরিত্র স্বামীকে বিপথগামী করিতেছে, তাঁহার সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিতেছে ভাবিয়া, নিহিলিষ্টদিগকে তিনি শত্রু মনে করিতেন। তথাপি সেই সাধ্বী রমণী নীরবে স্বামীর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। নিহিলিষ্টদের অনেক গুপ্ত কথাই তিনি নানা সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীর অনিষ্টের আশঙ্কায় সে সকল কথা তিনি কোন দিন কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। তিনি সকলই দেখিতেন, শুনিতেন এবং সকল কষ্ট মৌনভাবে সহ্য করিতেন। স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরাগ কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

আহার শেষ করিয়া কাউণ্ট স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তাস খেলিলেন। অবশেষে ইসোবেল শয়নকক্ষে গমনোদ্যতা হইয়া স্বামীকেও উঠিতে বলিলেন।

কাউণ্ট বলিলেন, "আমার শয়নের কিছু বিলম্ব আছে। কতকগুলি জরুরী কাজ শেষ করিতে আমার ঘণ্টা দুই বিলম্ব হইবে, ততক্ষণ তোমার জাগিয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর হইবে। তুমি শুইতে যাও।"

স্বামীর কথা শুনিয়া ইসোবেলের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না; তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাউণ্ট তাঁহার পাঠ-কক্ষে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে দীর্ঘকাল ধূমপান করিলেন, তাহার পর একখানি কাগজ লইয়া তাঁহার স্ত্রীকে যে পত্রখানি লিখিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

"প্রিয়তমে ইসোবেল, আজ রাত্রে গুপ্ত সমিতির অধিবেশনে আমার ডাক পড়িয়াছে। ইহাতে দুশ্চিন্তার কারণ না থাকিলেও, কেন বলিতে পারি না, অজ্ঞাত ভয়ে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সভার কায শেষ করিয়া যদি আজ রাত্রিতে আমি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে বুঝিবে—জীবনে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমার ইহলীলার অবসান হইয়াছে। তাহার পর যদি নিজের এবং প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে চাও—তাহা হইলে আমার অনুসন্ধান করিও না; আমার কি হইল, তাহা জানিবারও চেষ্টা করিও না। সেরূপ চেষ্টা করিলে তোমাদিগকেও আমার অনুসরণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অতঃপর যতদূর সম্ভব সাবধানে থাকিবে; আমার প্রসঙ্গে একটি কথাও মুখে আনিও না, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; এমন কি, আমার অপমৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্র

ক্ষোভও প্রকাশ করিও না। হয় ত আমার সন্দেহ অমূলক; কিন্তু যদি সত্যই আমি নিহত হই, তাহা হইলে ব্যাকুল হইয়া কোন অনুচিত কায করিয়া বসিও না। ভবিষ্যতে আমার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিবে না বুঝিয়াই তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য এই পত্র লিখিয়া রাখিয়া, আমি জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। পরমেশ্বর তোমাদের নিরাপদ রাখুন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। পত্রখানি পড়িয়া জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।"

কাউণ্ট পত্রখানি মুড়িয়া টেবলের উপর রাখিলেন। তাহার পর নিঃশব্দে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কাউণ্ট অতি সন্তর্পণে শয্যাপ্রান্তে গিয়া সস্নেহে নিদ্রিত পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, তাহার পর পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "পরমেশ্বর! এই হতভাগ্য অনাথদিগকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করিয়া চলিলাম, তুমি ভিন্ন ইহাদের আর কোন আশ্রয় নাই। দীনবন্ধু! জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম; কিন্তু আমার অপরাধে যেন আমার নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্রের প্রাণ না যায়।" কাউণ্ট আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, অশ্রু মুছিয়া হলঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি শীতবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া টুপি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। নিস্তব্ধ রাত্রি। ঝিল্লী-ধ্বনিমুখরিতা, ক্ষীণ-চন্দ্রালোকমণ্ডিতা রজনী প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যে সমগ্র প্রকৃতি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছিল, তাহা কাউণ্টের মনের ভাব শতগুণ বর্দ্ধিত করিল। নিদারুণ অন্তর্বেদনা তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে হ্রদের দিকে চলিলেন।

অনেক পূর্ব্বেই পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রকলা ভাসমান মেঘস্তরকে ম্লান চন্দ্রিকাজালে বিমণ্ডিত করিয়া নৈশ প্রকৃতির বিরাট গাম্ভীর্য্যকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। কাউণ্ট কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হ্রদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন নৈশ বায়ুপ্রবাহ হ্রদের সুপ্রশস্ত বক্ষে প্রতিহত হইয়া অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি উৎপাদন করিতেছিল; এই শব্দ ভিন্ন সেই সুপ্ত নগরীতে অন্য কোন শব্দ ছিল না। কাউণ্ট নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া হ্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ম্লান চন্দ্রকিরণে তট হইতে প্রায় দশ গজ দূরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাইলেন। নৌকার দাঁড়ি-মাঝিরা সেখানে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা হ্রদের কিনারায় নৌকাখানি লইয়া আসিল। মাঝি নৌকার মাথায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাউণ্ট মহাশয়, নমস্কার!"

কাউণ্ট প্রত্যভিবাদন করিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে কত সময় লাগিবে?"

মাঝি বলিল, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিব; আপনি নৌকায় উঠুন।"

কাউণ্ট নৌকায় উঠিয়া পাটাতনের উপর বসিলেন, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তীরের দিকে চাহিলেন। নৌকা হ্রদের অপর পারে চলিল। মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়াছিল, দুই জন দাঁড়ি সজোরে দাঁড় টানিতে লাগিল।

সকলেই নির্ব্বাক্; কাউণ্ট অধোমুখে বসিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নৌকা হ্রদের ঠিক মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে দাঁড়ি-মাঝিরা তিন জনেই নৌচালন বন্ধ করিয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। কাউণ্ট অবনতমস্তকে চিন্তা করিতেছিলেন, নৌকা থামাইবার কারণ বুঝিতে না পারিয়া তিনি সবিস্ময়ে মুখ তুলিলেন; সেই মুহূর্ত্তেই মাঝি এক লম্ফে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া, সুদৃঢ় ও সুচিক্কণ রেশমী রজ্জুর ফাঁস চক্ষুর নিমেষে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল! কাউণ্ট সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন; কিন্তু তিনি গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না! দাঁড়ি-মাঝিরা তিন জনেই রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া এরূপ জোরে একটা 'ঝিঁকে' মারিল যে, কাউণ্ট আত্মরক্ষার চেষ্টায় হাত তুলিতে গিয়া চেতনা হারাইয়া নৌকার পাটাতনের উপর চিৎ হইয়া পড়িলেন। মাঝি শুষ্ক হাস্যে বলিল,

"কাউণ্ট, আপনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়াছেন।" দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু শূন্যে বিলীন হইল।

কাউণ্টের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নৌকার মাঝি পকেট হইতে একখানি ক্ষুর বাহির করিয়া তদ্দ্বারা কাউণ্টের দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া দিল, তাহার পর ক্ষুরের আঘাতে তাঁহার মুখ বিকৃত করিল। এই সকল কায শেষ করিয়া সে পকেট হইতে গজদন্ত-নির্ম্মিত এক-খানি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ পদক বাহির করিয়া কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দ্বারা তাহা তাঁহার গলায় ঝুলাইয়া দিল। সেই পদকে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল—'বিশ্বাসঘাতক।' অনন্তর কাউণ্টের উলঙ্গ মৃতদেহ একটা সুবৃহৎ বস্তায় পূরিয়া, তাহার মধ্যে একখানি ভারি পাথর রাখিল, এবং দড়ি দিয়া বস্তার মুখ সেলাই করিয়া তাহারা পদা-ঘাতে বস্তাটি হ্রদের জলে নিক্ষেপ করিল!

এই লোমহর্ষণ পৈশাচিক অনুষ্ঠান শেষ হইলে নৌ-চালকরা নৌকাখানি হ্রদের উত্তর তীরে লইয়া গেল, এবং নিঃশব্দে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তীর-সন্নি-হিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

৩

কাউণ্ট-পত্নী পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর স্বামীকে শয়নকক্ষে দেখিতে পাইলেন না; বিভিন্ন কক্ষে খুঁজি-য়াও তাঁহার সন্ধান না পাওয়ায় আশঙ্কা ও উদ্বেগে ব্যাকুল হইলেন। যদি কাউণ্ট প্রত্যুষে কোনও জরুরী কাযে বাহিরে গিয়া থাকেন, ভাবিয়া এক জন ভৃত্যকে তাঁহার সন্ধান লইতে নগরে পাঠাইলেন। কাউণ্ট যে টেবলের উপর পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ইসোবেল অবশেষে সেই টেবলের নিকট গিয়া দাঁড়াই-তেই পত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে তাঁহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; তিনি সমস্তই ঝাপসা দেখিতে লাগিলেন। পত্রখানি পাঠ শেষ হইলে তিনি টলিতে টলিতে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই কঠোর আঘাতেও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না; তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আর কাঁদিবারও অবসর নাই; ভয়ে বিহ্বল হইলে তাঁহারও বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া স্বামীর উপদেশপালনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইসোবেল দীর্ঘকাল চিন্তার পর তাঁহার ভৃত্য পল ও পরিচারিকা জুলিয়াকে স্বামীর পত্রের কথা বলিলেন। তাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও কাউণ্ট-পত্নীকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া, তাহারা সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না বলিয়া শপথ করিল। নিহিলিষ্ট দলের কার্য্যপদ্ধতি তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না; কাউ-ণ্টের শোচনীয় পরিণামে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহারা প্রভু-পত্নীকে জেনিভা হইতে অবিলম্বে পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। ইসোবেল তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি নিজের জীবন মূল্যবান্ মনে না করিলেও প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ-রক্ষার জন্য শীঘ্রই জেনিভা ত্যাগ করিবেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

কাউণ্ট মাটিস্কির মৃতদেহ বস্তায় পুরিয়া হ্রদের জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। তাঁহার হত্যাকাণ্ডের পর-দিন প্রভাতে এক জন ধীবর নৌকায় চড়িয়া হ্রদে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল, দৈবক্রমে কাউণ্টের মৃতদেহ-পূর্ণ বস্তাটি তাহার জালে বাধিয়া গেল, খুব বড় মাছ জালে পড়িয়াছে ভাবিয়া সে মনের আনন্দে জালখানি গুটাইয়া অতি কষ্টে নৌকায় তুলিল; কিন্তু মাছের পরি-বর্ত্তে বস্তা দেখিয়াই তাহার চক্ষুঃস্থির! হয় ত বস্তায় কোন রকম চোরামাল আছে মনে করিয়া সে তাড়াতাড়ি বস্তা খুলিয়া তাহার মধ্যে মৃতদেহটি দেখিতে পাইল। তখন সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পুলিসে সংবাদ দিল।

পুলিস-কর্ম্মচারীরা নৌকায় আসিয়া বস্তা হইতে কাউণ্টের মৃতদেহ বাহির করিল। কাউণ্টের কণ্ঠে গজদন্ত-নির্ম্মিত পদকখানি ঝুলিতে দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিল—এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা জানিত, নিহিলিষ্টরা যে সকল লোককে গোপনে হত্যা করে, তাহাদের মৃতদেহ সনাক্ত করা অসম্ভব। সুতরাং তাহারা কাউণ্টের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার আশা ত্যাগ করিল। হত্যাকারীরা কাউণ্টের মুখমণ্ডল অস্ত্রাঘাতে বিকৃত

করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার দেহ হইতে পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়াছিল, এই জন্য মৃতদেহ সনাক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি পুলিস মৃতদেহটি নৌকা হইতে তুলিয়া থানায় লইয়া গেল, এবং যদি তাহা কেহ সনাক্ত করিতে পারে—এই আশায় প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিল।

নগরবাসিগণ অবিলম্বে এই গুপ্তহত্যার সংবাদ শুনিতে পাইল। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মৃতদেহটি দেখিতে আসিল, কিন্তু উহা কাহার মৃতদেহ, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। বেওয়ারিশ লাস ৩ দিন পর্য্যন্ত থানায় পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী অন্যান্য দর্শকগণের সহিত মৃতদেহটি দেখিতে আসিলেন। মৃতদেহ দেখিয়াই রমণী শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার পর অবসন্ন-দেহে সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া হতাশ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়! অন্যান্য দর্শকেরা নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সেই স্থান ত্যাগ করিল, তাহাদের কোন কথা যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল না, তিনি স্তব্ধভাবে স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে সকল দর্শকের প্রস্থানের পর তিনি অতি কষ্টে উঠিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর মৃতদেহের শিয়রে জানু নত করিয়া অবনত-মস্তকে মৃতের ক্ষতবিক্ষত স্ফীত ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন, তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু মৃত ব্যক্তির গালের উপর ঝরিয়া পড়িল। তিনি উঠিয়া, উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

যুবতী মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই বিদায়-চুম্বন কেহই দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সত্য নহে, একটি রুসীয় যুবক অদূরবর্ত্তী স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। যুবতী প্রস্থান করিলে সে দূরে থাকিয়া নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে তাঁহার অনুসরণ করিল।

যুবতী নানা পথ ঘুরিয়া হ্রদ-সন্নিহিত একটি সুপ্রশস্ত নির্জ্জন রাজপথে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অনুসরণকারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই! থানা হইতে কেহ যে তাঁহার অনুসরণ করিতে-ছিল—ইহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহার হৃদয়ে তখন তুফান বহিতেছিল। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

যুবতী চলিতে চলিতে একটা মোড় ঘুরিয়া হ্রদের তটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনুসরণকারী একটি অরণ্যের ভিতর দিয়া হ্রদের কিনারায় আসিয়া পড়িল এবং ঘাটের ধারে একটি গুল্মের অন্তরালে যুবতীর প্রতীক্ষায় 'ওৎ পাতিয়া' বসিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। হ্রদের তটসন্নিহিত পথ নির্জ্জন, কোন দিকে জন-মানবের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল হ্রদের জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। শোকার্ত্ত-হৃদয়া, নিদারুণ অবসাদে মন্থরগামিনী, বেপমানা, অসহায়া বিধবার নিকট তাহা মর্ম্মবেদনা-প্রপীড়িত বিশ্বহৃদয়ের ব্যাকুল আর্ত্তনাদবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উদ্দাম নৈশ-সমীরণ-বিকম্পিত 'চেষ্টনট' বৃক্ষের পত্ররাশির শর্ শর্ শব্দ যেন করুণহৃদয়া প্রকৃতি জননীর আকুলতা-পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস! রমণী শ্রান্ত-দেহে ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত ঘাটে আসিয়া, সলিল-সন্নিহিত শিলাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি হ্রদের জলের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগি-লেন। সহস্র চিন্তা প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল; তিনি তখন স্থান কাল, স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

যুবতীকে শিলাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অনু-সরণকারী যুবক পার্শ্বস্থ গুল্মান্তরাল হইতে এক লম্ফে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া যুবতী মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিলেন। তাঁহার একটু ভয় হইল, রূপবতী যুবতীর প্রাণের ভয়ই একমাত্র ভয় নহে। তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল না, কিন্তু অন্য ভয় ছিল; বিশেষতঃ তিনি তখন নিরস্ত্র। তিনি একটি অপরিচিত যুবককে সেই নির্জ্জন স্থানে হঠাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, তীরবেগে উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবক গম্ভীর স্বরে বলিল, "এই রাত্রিকালে এরূপ নির্জ্জন স্থানে কোন ভদ্রমহিলার একাকিনী আগমন অকর্ত্তব্য।"

যুবতী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কোন ভদ্রমহিলাকে এ সময় এরূপ নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসা ভদ্রলোকেরও অকর্ত্তব্য। জানি না, আপনার উদ্দেশ্য কি, কিন্তু দেখিতেছি, আপনি আমার অপরিচিত। আপনি দয়া করিয়া নিজের কাযে যান, আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি বিশেষ কোনও কাযে নগরে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি; পরিশ্রান্ত হইয়া এখানে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি। আপনার সহিত আমার আলাপ করিবার আগ্রহ নাই।"

যুবক তথাপি সরিল না, সে বিকৃত স্বরে বলিল, "আমি আপনার অপরিচিত হইলেও আপনি আমার অপরিচিতা নহেন, আপনাকে এখন যে বাড়ীতে যাইতে হইবে, তাহা বহু দূরে অবস্থিত, কত দূরে—তাহা আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না, আমি আপনাকে পথ দেখাইতে আসিয়াছি।"

"আমি আপনার কথার মর্ম্ম—" যুবতীর মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র যুবক শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। যুবতী বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার আততায়ীর মুখের দিকে চাহিলেন, তিনি আর্ত্তনাদ করিলেন না, এমন কি, তাঁহার মুখ হইতে একটি অস্ফুট ধ্বনিও নিঃসারিত হইল না। তিনি উভয় হস্তে আহত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ছিন্নমূল তরুর স্থায় সেই শিলাখণ্ডের প্রান্তবর্ত্তী হ্রদের জলে ঢলিয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

যুবক ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, এই পৈশাচিক কায করিয়াও তাহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, মুখের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটিল না! সে পিস্তলটা পকেটে রাখিয়া যুবতীর মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল—দেহে প্রাণ নাই, তখন সে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

খণ্ড-বিখণ্ড লঘু মেঘস্তরের অন্তরাল হইতে ক্ষীয়মাণ শশধর যেন স্তম্ভিতভাবে এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উর্দ্ধাকাশ হইতে নিষ্প্রভ-দৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন—সেই নির্জ্জন হ্রদ-প্রান্তে শ্যামল তৃণ-শয্যায় কাউণ্ট-পত্নীর মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে, এবং হ্রদের স্বচ্ছ সলিলরাশিতে তাঁহার পাদুকা-মণ্ডিত সুগঠিত চরণদ্বয় প্রক্ষালিত হইতেছে। প্রাণ-বিহঙ্গ কাউণ্ট-পত্নীর অনিন্দ্য-সুন্দর দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মুখখানি প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় তখনও ঢল ঢল করিতেছে।

প্রিয়তম পতির পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পরে কাউণ্ট-পত্নী ইসোবেল নরাধম নির্ম্মম নিহিলিষ্ট ঘাতক-হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। সাধ্বী শোক ও দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনাথ শিশু-পুত্রের কি গতি হইল?

পাঠক-পাঠিকাগণ সেই লোমহর্ষণ রহস্য-বিজড়িত কাহিনী ক্রমে শুনিতে পাইবেন। আমরা এই হৃদয়-বিদারক শোচনীয় দৃশ্যের উপর সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী যবনিকা প্রসারিত করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ব্যথা

খেলা সুরু আমি করিনি যখন তোমার সনে,
বাঁধিনি যখন তোমায়-আমার হৃদয় কোণে;
ফুল-মালা শুধু হাতে ছিল যবে দিইনি গলে,
আজিকার মত ভাসিনি তখন নয়ন-জলে।

খেলা সুরু করি আজিকে কোথায় গেলে গো চলি
এ যাতনা যে গো সহন অতীত গেলে কি ভুলি?
মালা দিনু গলে, বাঁধিনু হৃদয়ে, হ'লাম সাথী,
তুমি চ'লে গেলে হ'লে না ত মোর ব্যথী।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।

গর্ভাবস্থায় নিয়মপালন

মহাজনরা বলেন—"যদি সুস্থ ও সবল সন্তান চাও, তাহা হইলে প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল রাখ।"

প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য :—

১। **স্নান** ঃ—অভ্যাসমত ঠাণ্ডা কিংবা গরম জলে প্রত্যহ স্নান করা উচিত। ইহাতে মন প্রফুল্ল ও শরীর সুস্থ থাকে। স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বশরীরে উত্তমরূপে তৈল মালিস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতে শরীরের মাংসপেশী সবল হয় এবং যাঁহারা পুকুরে, নদীতে বা অন্য কোন খোলা যায়গায় স্নান করেন, তাঁহাদের ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। ইহা ভিন্ন খাঁটী সরিষার তৈল নিয়মিতরূপে প্রত্যহ ব্যবহার করিলে চর্ম্মরোগ হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। তৈল মাথার উপকার পূর্ণমাত্রায় পাইতে গেলে, তৈল রীতিমতভাবে শরীরে মালিস করিতে হইবে, কেবলমাত্র লেপনে সেরূপ ফল হইবে না।

"ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ ন তু ভক্ষণাৎ।"

২। **আহার ও পানীয়** ঃ—প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে আহার করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আহার করিলে পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। সহজে হজম হয়, এরূপ যে কোন খাদ্যই প্রসূতি খাইতে পারেন, যথা—ভাত, ডাল, ঝোল, তরকারী, রুটী, লুচি, হালুয়া, দুধ ইত্যাদি। মাছ, মাংস ও ডিম যত কম পরিমাণে খাওয়া হয়, ততই ভাল। দুধ বেশী পরিমাণে খাওয়া দরকার। বেশী মসলা দিয়া রান্না করা জিনিষমাত্রই গুরুপাক; অতএব সে সকল খাওয়া কোনমতেই উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় অধিক পরিমাণে ফল খাওয়া খুবই ভাল। 'ভাইটামিন্' (Vitamines) নামক পদার্থ স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির জন্য যে 'ভাইটামিন্' প্রয়োজন হয়, তাহা প্রসূতির খাদ্য হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এ জন্য প্রসূতিকে যথেষ্ট পরিমাণে 'ভাইটামিন্' খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। নচেৎ শিশু অপরিপুষ্ট বা ক্ষীণজীবী হয়। সুপক্ক ফল, মটর, ছোলা, মুগ, দুগ্ধ, মাখন ও ঘৃতে ঐ দ্রব্য বেশী পরিমাণে আছে। যত রকম 'ভাইটামিন্' আছে, পাকা কলায় তৎসমস্তই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অগ্নির উত্তাপে 'ভাইটামিনে'র তেজ কমিয়া যায়। এই জন্য কাঁচা দুধ, ভিজা ছোলা ও মটর খাইলে শরীরের তেজ যত বাড়ে, আগুনে ফুটান দুধ, ভাজা বা সিদ্ধ করা ছোলা খাইলে শরীরের তেজ তত বাড়ে না। ছোলা ও মটরের অঙ্কুর (কল্) বাহির হইলে তাহাতে যতটা পরিমাণে 'ভাইটামিন্' পাওয়া যায়, কল্ বাহির হইবার পূর্ব্বে ততটুকু 'ভাইটামিন্' পাওয়া যায় না। প্রতিদিন প্রাতে মুখ ধুইবার পর আদা ও লবণ সহ কিছু ভিজা ছোলা নিয়মিতরূপে খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, যকৃতের (লিভারের) কায ভাল হয় এবং কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার থাকে। চা না খাইলে যাঁহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাঁহারা চা ত্যাগ করিয়া ঐরূপ ভাবে প্রত্যহ ছোলা খাইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। বেশী দিন চা খাইলে ক্ষুধামান্দ্য হয়। আদা ও ছোলায় ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। চা মানুষের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করে, ছোলায় 'ভাইটামিন্' থাকায় জীবনীশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এক পেয়ালা চায়ের পরিবর্ত্তে এক পেয়ালা গরম দুধ ও সুজি খাইলে শরীরের প্রকৃত উপকার হয়। যাঁহারা দুধ

সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাঁহারা চায়ের পরিবর্তে প্রত্যহ আদা ও ছোলা খাইবেন। চায়ে "কেফিন্" (caffeine) ও "ট্যানিন্" (tannin) নামক দুইটি পদার্থ আছে। কেফিন্ শরীরের ক্ষণিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; এই জন্য লোকে চা খাওয়া অভ্যাস করে এবং অভ্যাস হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। ট্যানিন্ পরিপাকশক্তি কমাইয়া দেয়, এই জন্য বেশী দিন চা খাইলে ক্ষুধা কমিয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চা খাওয়া বিশেষ অনিষ্টকর।

গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জল পান করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে প্রস্রাব খোলসা হইয়া প্রসূতির ও গর্ভস্থ শিশুর শরীরের বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। নচেৎ ঐ বিষ প্রসূতির দেহে সঞ্চিত হইয়া নানারূপ রোগ জন্মিতে পারে। আহারের সময় জল খাইলে পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। এই জন্য আহারের সঙ্গে জল না খাইয়া আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে জল খাইবেন।

মাদক দ্রব্য-ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। বরং ঐ সকল দ্রব্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যহানিকর। কোন মাদক দ্রব্যেরই কোন পুষ্টিকর গুণ নাই। ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষণিক উত্তেজনা হয়। জর্দ্দা, সুর্ত্তি, দোক্তা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবেন না। এই সকল দ্রব্যে "নিকোটিন্" (nicotine) নামক একটি পদার্থ আছে। এই পদার্থ হৃদ্‌যন্ত্র ও পাকস্থলীর উপর বিষবৎ কার্য্য করে। সেই জন্য যাঁহারা জর্দ্দা, সুর্ত্তি ইত্যাদি ব্যবহার করেন, তাঁহারা কালে ক্ষুধামান্দ্য, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়েন। তদ্ভিন্ন জর্দ্দা, সুর্ত্তির সহিত যাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পান খান, তাঁহাদের দাঁতের গোড়া সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকে। এ জন্য তথায় পূয় হইয়া সেই পূয় পানের রস ও অন্য ভুক্তদ্রব্যের সহিত পেটের ভিতর যায় এবং ধীরে ধীরে সর্ব্বশরীরকে বিষাক্ত করে, ফলে মনের তেজ কমিয়া যায় এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্মায়।

৩। বেশভূষা ঃ—পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেই জন্য উপযুক্ত কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিবেন। পরিধেয় বস্ত্র (শাড়ী ও সায়া ইত্যাদি) কোমরে "টাইট্"ভাবে ব্যবহার করিবেন না। অন্যথা জরায়ুর আয়তনবৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে; গর্ভস্থ শিশু সোজাভাবে থাকিবার স্থান না পাইয়া বাঁকাভাব ধারণ করে এবং কখন কখন শিশু বিকলাঙ্গ হয়। গর্ভে সন্তান বাঁকাভাবে থাকিলে প্রসবের সময় প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হয় এবং সময় সময় ডাক্তার দ্বারা প্রসব করাইতে হয়; নচেৎ সন্তান ও প্রসূতি উভয়েই মারা যাইতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোক লোকলজ্জার ভয়ে বা সভ্যতার খাতিরে গর্ভাবস্থায় টাইট্ভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাঁহারা এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন, প্রসবকালে অত্যধিক কষ্টভোগ করা বা বিকলাঙ্গ পুত্র-কন্যা প্রসব করা অধিকতর লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়।

গর্ভধারণ করা নারী-জীবনের বিশেষ ধর্ম্ম। ইহাতে লজ্জার কারণ নাই, বরং উপযুক্ত সময়ে গর্ভসঞ্চার না হইলে লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ হয়—নারীধর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকে।

যে সকল বহু-প্রসবিনীদের পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় পেট সম্মুখভাগে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, জরায়ু সোজা রাখিবার জন্য তাঁহারা পেটী ব্যবহার করিবেন। কেন না, পেট বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে গর্ভস্থ সন্তান বাঁকাভাব ধারণ করিতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোক মোজা ব্যবহার করেন, তাঁহারা গার্ডার বাঁধিবেন না; কারণ, তাহাতে পায়ের শিরায় অযথা চাপ পড়িয়া শিরা ফুলিয়া উঠিতে পারে (শিতুলি নামে)। যে সকল প্রসূতির পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠে, তাঁহাদের উচিত চলাফেরার সময় পায়ে পটী বাঁধিয়া রাখা ও শয়নকালে বালিসের উপর পা উঁচু করিয়া রাখা, নচেৎ শিরা বেশী ফুলিয়া ফাটিয়া যাইতে পারে এবং তথা হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া প্রসূতি দুর্ব্বল হইতে পারেন।

৪। পরিশ্রম ঃ—গর্ভাবস্থায় পরিমিতভাবে সংসারের নিত্য কাযকর্ম্ম করিলে শরীরের যথেষ্ট উপকার হয়। ধনীর গৃহে বহু দাস-দাসী থাকিলেও গৃহস্থালীর অধিকাংশ কাযই বাড়ীর মেয়েদের করা উচিত। ইহাতে পরিণামে তাঁহাদের ভাল বই মন্দ হয় না। গর্ভাবস্থায় শরীর কর্ম্মঠ রাখিলে প্রসবের

সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না—সুপ্রসব হয়। যে সকল স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় কেবলমাত্র পুস্তকপাঠ ও নিদ্রালস্যে কালযাপন করেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রসবকালে বিশেষ কষ্ট পান। তাঁহাদের প্রসব-বেদনার তেজ থাকে না, বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ঘিন্‌ঘিনে ব্যথায় প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, শেষে হয় ত সুদক্ষ ধাত্রী কিংবা ডাক্তারের সাহায্য লইতে হয়; নচেৎ সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে।

ক্লান্ত হইতে হয়, এমন কোন পরিশ্রমের কায গর্ভাবস্থায় করিবেন না। কোন ভারী জিনিষ তুলিবেন না বা তুলিতে চেষ্টা করিবেন না। ইহাতে জরায়ুর মধ্যে ফুল খুলিয়া গিয়া প্রসূতির রক্তস্রাব ও গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে। পদ দ্বারা সেলাইয়ের কল চালান একেবারে নিষেধ। টুল বা মোড়ার উপর দাঁড়াইয়া ছবি বা মশারি টাঙ্গান বড়ই বিপজ্জনক; কারণ, তথা হইতে পড়িয়া গেলে পেটে আঘাত লাগিতে পারে। এরূপ দুর্ঘটনা অনেক স্থানে অনেকবার ঘটিয়াছে। দুই বেলা পায় হাঁটিয়া খোলা যায়গায় বেড়াইলে বিশেষ উপকার হয়। যে সকল প্রসূতি সহরে বাস করেন, তাঁহারা সকালে সন্ধ্যায় ছাদের উপর বেড়াইতে পারেন।

৫। কোষ্ঠ পরিষ্কার ঃ—অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আছে। এমন কি, কোন কোন স্ত্রীলোক ২।৩ বা ৪ দিন অন্তর মলত্যাগ করেন। এরূপ অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। মল এক দিনের বেশী পেটে আবদ্ধ থাকিলে মলের বিষাক্ত পদার্থগুলি রক্তে প্রবেশ করায় মুখে দুর্গন্ধ হয়, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, সর্ব্বদাই অলসভাব আইসে, কোন কাযই করিতে ভাল লাগে না এবং ক্ষুধা কমিয়া যায়। প্রসূতি অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকা আরও অনিষ্টকর। অতএব যাহাতে প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এমন জিনিষ খাইবেন। অধিক পরিমাণে দুধ ও ফল (যথা—পেঁপে, কলা, আম, বেল, আতা, পেয়ারা, আলুবোখারা ইত্যাদি) খাইলে কোষ্ঠ খোলসা হয়।

নিয়মিতরূপে প্রতিদিন শয়নকালে ও প্রাতে এক গেলাস গরম জল পান করিলেও গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে দেখা যায়। যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, কটুকী, গুলঞ্চ প্রভৃতি সারক দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত "হিমাটোসারসা" (Hœmato-sarsaharilla) নামক ঔষধ যথারীতি ব্যবহার করিলে প্রভূত পিত্তনিঃসরণ হইয়া মলমূত্র পরিষ্কার থাকে ও বেশ ক্ষুধা হয়। ৬০ ফোঁটা (১ ড্রাম) এই ঔষধ আধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ আহারান্তে দুই বেলা খাইতে হয়। যদি উক্ত মাত্রায় এক সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার করার পরও দাস্ত খোলসা না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে দ্বিগুণ মাত্রায় (১২০ ফোঁটা) এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। উপরি-উক্ত উপদেশমত কায করিয়াও যদি কোন উপকার পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ছোট চামচের ২ চামচ (দুই ড্রাম) যষ্টিমধুর আরক বা গুঁড়া (Extr. Glycerrlyza Liq, or Pulv. Glycerrlyzaco,) বা ক্যাসকারা লিঃ (Extr. Cascara Liq.) শয়নকালে খাইলে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে। এই সকল ঔষধ সপ্তাহে ২।৩ দিনের বেশী খাওয়া উচিত নহে। যদি ইহাতেও মনোমত ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবেন। তীব্র জোলাপ ব্যবহার করিবেন না। তাহাতে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে।

প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে নির্দ্ধারিত সময়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দাস্ত হউক বা না-ই হউক, নিয়মিতভাবে কিছু দিন এইরূপ চেষ্টা করিলে বিনা ঔষধেই অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন কোন ঔষধ নাই, যাহা বরাবর ব্যবহার করিলে চিরদিন সমানভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। কোন ঔষধেই বেশী দিন মনোমত ফল পাওয়া যায় না। এই জন্যই বাজারে হাজার রকম জোলাপের ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিদিন প্রাতে ছোলা ভিজা খাইলে অনেকেরই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। প্রসূতির পক্ষে ছোলা ভিজা খুবই উপকারী। ইহাতে আহার ও ঔষধ উভয়েরই কায হয়।

৬। নিদ্রা ঃ—প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে নিদ্রা যাইবেন। রাত্রি ৯টার সময় শুইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিবেন। রাত্রিজাগরণ একান্ত নিষিদ্ধ।

দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়, অতএব দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবেন। খাইবামাত্রই শয়ন করিবেন না। আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাইবেন। শয়ন-গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে না পাইলে শরীর কখন ভাল থাকে না। ঘরে রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিলে যত উপকার হয়, কোন ঔষধের দ্বারা তত উপকার হয় না—হইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকিলে গা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিবেন। কিন্তু ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখিবেন না।

৭। স্তনের বোঁটা—চুচুক :—স্তনের বোঁটা প্রত্যহ সাবান দ্বারা ধুইয়া পরিষ্কার রাখিবেন। নচেৎ বোঁটার ছিদ্র দিয়া নানারূপ বিষাক্ত পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্তন ফুলিয়া উঠিতে (ঠোন্‌কা) পারে। যদি স্তনের বোঁটা লম্বা না হয়, তাহা হইলে সদ্যোজাত শিশু সেই স্তন মুখে ধরিতে পারে না। এ জন্য যে সকল প্রসূতির স্তনের বোঁটা ছোট বা চেপ্টা, তাঁহারা প্রতিদিন স্তন ধোয়ার পর আঙ্গুলে একটু তেল বা ক্রীম (cream) মাখাইয়া বোঁটাতে মালিস করিবেন এবং অল্প অল্প করিয়া বোঁটা টানিয়া তাহা লম্বা করিবার চেষ্টা করিবেন। জলের সহিত ওডিকোলন (Eau-de-Cologne) বা স্পিরিট (spirit) মিশাইয়া সেই জলে প্রত্যহ বোঁটা ধুইলে বোঁটা বেশ শক্ত হয়—শিশু স্তন টানিবার সময় তাহা ফাটিয়া যাইবার ভয় থাকে না।

৮। স্থানান্তরগমন :—গর্ভাবস্থায় স্থানান্তরগমন না করাই উচিত। যদি একান্তই কোন স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে পঞ্চম মাস হইতে সপ্তম মাস—এই সময়ের মধ্যে যাতায়াত করিবেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে গমনাগমন নিষেধ। কেন না, তাহাতে গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে। একবার কোন প্রসূতি ৯ মাস গর্ভাবস্থায় দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। এমন অবস্থায় রেলগাড়ীতে প্রসববেদনা আরম্ভ হয় এবং কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্বেই গাড়ীর পায়খানামধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই অবস্থায় প্রসূতির অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়াছিল এবং প্রসবদ্বার ছিঁড়িয়া মলদ্বারের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। অতি কষ্টে প্রসূতির প্রাণরক্ষা হয়, কিন্তু সন্তান মারা যায়। ভাবুন দেখি, কি ভয়ানক ব্যাপার! কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনী গৃহস্থের পুত্রবধূ ৩ মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সেই অবস্থাতে ২।৩ দিন অল্প রক্তস্রাব দেখা দেয়। তিনি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। স্রাবের তৃতীয় দিবস বৈকালে গাড়ী চড়িয়া পিত্রালয়ে যান এবং তথা হইতে ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে আইসেন। তথায় অবস্থানকালে রক্তস্রাব বৃদ্ধি পায় ও পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। ঐ অবস্থায় গাড়ী করিয়া বাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বেই রাস্তাতে গর্ভস্রাব ঘটে।

পূর্ণ গর্ভাবস্থায় যদি দূর-স্থানান্তরে একান্তই যাইতে হয়, তাহা হইলে ধাত্রী, ডাক্তার ও প্রসবকালীন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে রাখা উচিত।

৯। মানসিক ভাব :—গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। হঠাৎ শোক, দুঃখ বা বিষাদের কারণ উপস্থিত হইলে গর্ভস্রাব ঘটিতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মনোভাব যেরূপ থাকে, গর্ভস্থ সন্তানের মনোভাবও সেইরূপ গঠিত হয়। অতএব সুসন্তান লাভ করিতে হইলে প্রসূতির সর্ব্বদা সৎচিন্তা ও সদালোচনা আবশ্যক।

ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়।

সময়ের বন্ধু

ফলহীন হ'লে তরু—বিহগ না আসে ;
শুষ্ক সরে—সারস রহে না।
পর্য্যুষিত পুষ্প'পরে মধুপ না বসে ;
দগ্ধ বনে মৃগ ত রহে না।

ধনহীন নরে ত্যজে গণিকা সকল ;
ভ্রষ্ট রাজ্যে মন্ত্রী নাহি রয়।
কার্য্যবশে মনস্তুষ্টি করয়ে সকল,
অসময়ে বন্ধু কেহ নয়!

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাল।

ব্যবসায়িক উদ্ভিদ-প্রজনন

গুহা অথবা কাননবাসী আদিম মানব মৃগয়ালব্ধ খাদ্য দ্বারা ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করিত। চতুষ্পার্শ্বে দিগন্তব্যাপী অরণ্যের তরু, লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও প্রকৃতির এই বিশাল সম্পদকে নিজের উপকারে প্রয়োগ করিবার চিন্তা প্রথমে তাহার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে বন্য জীবনের অনিশ্চয়তা ও অহরহঃ আহারান্বেষণের কঠিন প্রয়াস তাহাকে জীবনধারণের জন্য স্বল্পতর আয়াসসাধ্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রণোদিত করে। কোন শুভ মুহূর্ত্তে কোন গৃহলক্ষ্মী কোন বন্য তৃণের শস্যগুচ্ছ অথবা পাদপবিশেষের সুস্বাদু ফল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার বীজ গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত করে। উহাই কৃষির আদি সৃষ্টি। তাহার পর যুগযুগান্তর ধরিয়া মানব যতই সভ্য ও সমাজবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ততই অধিকসংখ্যক উদ্ভিদ নিজ প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে এবং ফসলও যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কোন উদ্ভিদের আদিম বন্য ও বর্ত্তমান কর্ষিত অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধান, আম ও আলুর উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহারা যথাক্রমে শস্য, ফল ও মূলের প্রতিনিধি। ইহাদের আদিম জাতি এখনও অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। কিন্তু স্বভাবজাত ধান, আম ও আলুর সহিত বহু শতাব্দীব্যাপী চাষ দ্বারা উৎপাদিত উক্ত জাতিসমূহের আধুনিক ফসল যদি পাশাপাশি রাখিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কোন সাধারণ ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন না যে, বন্য ও কর্ষিত গাছ একই জাতিভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে সাধারণ আকার-অবয়বের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও আম ও ধানের ফলে এবং আলুর মূলে বন্যের সহিত কর্ষিতের পার্থক্য এত অধিক যে, উহাদিগকে বিভিন্নজাতীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে ইচ্ছা হয়। যে সমুদয় মধ্যবর্ত্তী স্তর দিয়া বন্য কর্ষিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেগুলি চক্ষুর সম্মুখে না দেখিতে পাওয়াই এইরূপ বিবেচনা করিবার প্রধান কারণ।

উদ্ভিদ্-প্রজননের মূল প্রণালী

কিরূপে একই জাতীয় উদ্ভিদের দুইটি বংশের মধ্যে এত বিভিন্নতা সংঘটিত হইল, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জীবনের কয়েকটি মূলসূত্র জানা প্রয়োজন। অবশ্য জীবনমাত্রেরই চরম উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। বীজকে উদ্ভিদের সন্তান বলিয়াই ধরিতে পারা যায়। আমাদিগের গৃহপালিত পশু ও ক্ষেত্র এবং উদ্যানজাত উদ্ভিদের শুধু যথেষ্টসংখ্যক সন্তান হইলেই কিন্তু আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না। বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য বিশেষ প্রকার উদ্ভিদ্‌চাষ হয়; কোনটি ফলের জন্য, কোনটি ফুলের জন্য, কোনটি বা পাতার জন্য ইত্যাদি। সেই বিশেষ অংশগুলি সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট হইলে চাষের উদ্দেশ্য সফল হয়। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একটি গাছের বীজ হইতে যে সমস্ত চারা উৎপন্ন হয়, সেগুলি মূলতঃ দেখিতে এক রকম হইলেও উহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক আছে। কোনটির ফল হয় ত আকারে বড়, আবার কোনটির ফল আকারে ছোট হইলেও সংখ্যায় অধিক, ইত্যাদি নানা রকমের প্রভেদ দেখা যায়। যদি বড় আকারের ফল উৎপাদন করা কাহারও উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদের বংশানুক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ফলপ্রসবী গাছ বাছিয়া চারা উৎপাদন করিতে থাকিলে কালক্রমে খুব বড় ফলই পাওয়া যাইবে। উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা লক্ষণ সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রথা অবলম্বন করিলে ঐরূপ পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হইবে। ফসলের উৎকর্ষসাধনে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রণালী প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে

নির্ব্বাচনপ্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ ও সহজসাধ্য। নির্ব্বাচনপ্রণালীর মূলে উদ্ভিদের যে প্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহাকে Variation অথবা পরিবৃত্তি বলা হয়। নির্ব্বাচন করিবার সময় কৃষক এই প্রবৃত্তিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

সময় সময় এরূপ দেখা যায় যে, একটি গাছের বীজ-সমূহের মধ্যে ২।১টি বীজ হইতে এমন গাছ উৎপন্ন হইল যে, উহাতে জনক-জননীর সাধারণ লক্ষণ-সমূহের স্থলে স্বতন্ত্র লক্ষণ দেখা দিল। সেরূপ স্থলে উদ্ভিদের প্রায় জাতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ইহাকে (mutation) অথবা জাতিপরিবর্ত্তন বলে; অতি সামান্য স্থলে উদ্ভিদের জাতিপরিবর্ত্তনপ্রবণতা দৃষ্ট হইলেও ইহা স্থির যে, অনেক অভিনব জাতি-বিবর্ত্তনের মূলে এই বিশেষ প্রবৃত্তি নিহিত আছে। জাতি-পরিবর্ত্তন-শীলতা অপেক্ষাকৃত অল্প দিনই উদ্ভিদ্‌বিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; এ সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগৃহীত হইলে হয় ত আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সমুদয় উন্নত জাতি আপাততঃ নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, সেগুলি বাস্তবিকই জাতি-পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি-জনিত। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, Mutation-এর উপর মনুষ্যের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; এবং যত দিন পর্য্যন্ত ইহার রহস্য পূর্ণ উদ্ঘাটিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জাতি-পরিবর্ত্তনের জন্য প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হইবে; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষ কিছুই করিতে পারিবে না।

সপুষ্পক উদ্ভিদ-জগতে তিন প্রকারের লিঙ্গবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদ্ একলিঙ্গ (যেমন পটল); অর্থাৎ উহাদের স্ত্রী ও পুং-পুষ্প স্বতন্ত্র গাছে থাকে; কতকগুলির স্ত্রী ও পুং-পুষ্প একই বৃক্ষে থাকে (ভেরেণ্ডা); আবার কতকগুলির পুষ্প উভলিঙ্গ (আম); অর্থাৎ একই ফুলে স্ত্রী ও পুং-লিঙ্গের সমাবেশ। ফলতঃ লিঙ্গবিন্যাস যেরূপই হউক না কেন, বীজ উৎপাদনের জন্য ডিম্বকোষ পরাগ-নিষিক্ত হওয়া আবশ্যক। স্বাভাবিক অবস্থায় এই কার্য্য বায়ু অথবা পতঙ্গ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। যখন তাহা না হয়, অথবা একলিঙ্গ গাছের বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট গাছ নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকে, তখন বীজ উৎপাদিত হয় না। তাল, পেঁপে প্রভৃতি বৃক্ষের এক এক সময় যে ফল ও বীজ হয় না, তাহার কারণই এই। যাহা প্রকৃতির দ্বারা সাধিত হয়, মানুষও তাহা করিতে পারে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিকট-সম্পর্কীয় কিন্তু বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের যৌনসম্বন্ধ কৃত্রিমভাবে স্থাপনা করা যায়; ইহাকেই সঙ্কর উৎপাদন (hybridisation) বলে। ফুলের বাগিচায়, ফলের বাগানে ও ফসলের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রথায় অনেক সঙ্কর উৎপাদিত হইতেছে। সেগুলি সবই যে উন্নত প্রকারের ও মানবের পক্ষে উপকারী, তাহা নহে। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্দ্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত স্ত্রী ও পুং-পুষ্পের যৌন-সম্মিলন ঘটাইয়া উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ্ প্রজননের
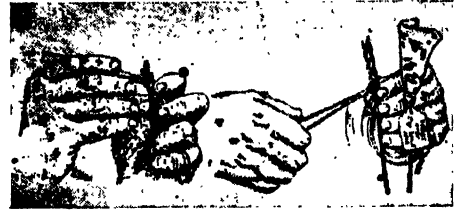
কোমল ব্রস্ দ্বারা পরাগ-সংযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পরে হস্তস্থিত কাগজের ঠোঙ্গা দ্বারা স্ত্রী-পুষ্পগুচ্ছ আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হইবে

উত্তরোত্তর অধিকতর প্রচলন হইতেছে। নানা প্রকারের কলম দ্বারাও উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধিত হয় বটে, কিন্তু এক দিকে সে সমস্ত প্রথার প্রয়োগ উদ্যানজাত গাছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অন্য দিকে তৎসমুদয় দ্বারা নির্দ্দিষ্টরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় না। ফলতঃ ব্যবসায়িক হিসাবে উদ্ভিদ্-প্রজনন দ্বারা নব নব লক্ষণযুক্ত উদ্ভিদ্ লাভ করার প্রকৃষ্ট উপায় দুইটি ;—নির্ব্বাচন ও সঙ্কর-উৎপাদন।

প্রতীচ্যে উদ্ভিদ্-প্রজনন

মেণ্ডেলের সুপ্রসিদ্ধ মটর-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইতেই উদ্ভিদের জন্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণজনিত বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তনের কয়েকটি মূল নিয়মের গবেষণা আরম্ভ হয়। বহুকাল যাবৎ উক্ত তত্ত্বসমূহ মেণ্ডেলের হস্তলিখিত পুঁথিতে-ই আবদ্ধ ছিল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ

হইতে এই সমুদয় তত্ত্ব কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া নানা দেশে কৃষির সমৃদ্ধিসাধনা করা হইতেছে। আমরা এ স্থানে উদার অর্থে কৃষি শব্দ ব্যবহার করিতেছি; অর্থাৎ ফল, ফুল, সব্জী ও ক্ষেত্রজ ফসল চাষ সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। উদ্ভিদ-প্রজননে মার্কিণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অদ্ভুতকর্ম্মা লুথার ব্যরব্যাঙ্কের (Luther Burbank) নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবন-ব্যাপী পরীক্ষা-সমূহের ফলে সাধারণ উদ্ভিদ-সমূহ হইতে অসাধারণ গুণবিশিষ্ট উদ্ভিদ্ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট ভীষণ কণ্টকময় মনসাসীজকে তিনি প্রজননের নানা স্তরের ভিতর দিয়া এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন যে, উহার কাণ্ড কাঁটাশূন্য, মসৃণ ও কোমল শাঁসযুক্ত হইয়াছে; পশ্বাদি ইহা আগ্রহের সহিত খায় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের বলাধানও হয়। আবার ফলেরও এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, উহা শসার ন্যায় কাঁচা অথবা ব্যঞ্জন করিয়া আহার

উদ্ভিদ-প্রজনন-ক্ষেত্র, নবজারসি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

করিতে পারা যায়। ব্যরব্যাঙ্কের বিস্ময়কর কার্য্যসমূহের মধ্যে ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত; ফুল, ফল ও শস্যজগতে তাঁহার এরূপ কীর্ত্তি অনেক আছে। মার্কিণের অনেক বড় বড় কৃষকও ব্যরব্যাঙ্কের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্যান্য ফসলেরও প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। মার্কিণ রাষ্ট্রও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন; তাঁহাদের Bureau of Plant Industry অর্থাৎ উদ্ভিদ্-শিল্প-বিভাগ নানা প্রকারে উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্-জননের সহায়তা করিতেছে। আমাদের দেশের ন্যায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জিলার মধ্যে জল, বায়ু ও মৃত্তিকার অনেক পার্থক্য আছে। বিভিন্ন জিলার উপযোগী শস্য-প্রজনন ও ফলনের হারবৃদ্ধিকরণ, অন্যান্য দেশ হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্ আনাইয়া প্রবর্ত্তন, সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা নব নব উন্নত বংশ সৃজন ইত্যাদি বহু বিষয়ে উদ্ভিদ্-শিল্প-বিভাগে অনুসন্ধান চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়েও উদ্ভিদ্-প্রজনন বিদ্যা উপযুক্ত পরীক্ষাক্ষেত্র-সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিলাতে এ সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু Royal Hrticultural Society, Rothamstead Experimental Station প্রমুখ কয়েকটি সংঘ, সমিতি ও ব্যক্তিগতভাবে উদ্যানপালকগণ উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়াছেন। মধ্য-য়ুরোপে ও ফ্রান্সেও ব্যবসায়িক ফসল উৎপাদনে উদ্ভিদ্-প্রজনন বিদ্যার অভিনব তত্ত্বগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে।

প্রজনন-বিদ্যা ও ভারতীয় কৃষি

ভারতের ন্যায় এত প্রকারের কৃষি ও উদ্যানজাত উদ্ভিদ্ আর কোন দেশেই নাই। বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদয় ফসলের চাষ হয়, তৎসমুদয়ের হিসাব করিলে বিভিন্ন শ্রেণীর নিম্নলিখিতসংখ্যক ফসল দেখা যায়;—

দাইল	ফসল	৯	প্রকার
তৈল	"	১৪	"
রঞ্জক	"	১১	"
পশুখাদ্য	"	৬	"
বিবিধ খাদ্য	"	৬	"
মশলা	"	৩০	"
শস্য	"	১৭	"
শর্করা	"	৩	"
তন্তু	"	১২	"
বিবিধ অখাদ্য	"	১৩	"
ঔষধ ও মাদক	"	২১	"
ফল ও সব্জী	"	১০০	"
	মোট	২৪২	

উদ্ভিদ্-প্রজননের ভারতে যে কি সুবিশাল ক্ষেত্র রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ফসলের তালিকা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্-প্রজননের কথা দূরে থাকুক, দেশে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট জাতীয় শস্য, সজ্জী, ফল প্রভৃতি ছিল, সেগুলি ক্রমশঃই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাটীতে স্বীয় তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট শাক-সজ্জী, ফল-মূল ও শস্য, কলাই প্রভৃতির বীজ সযত্নে রক্ষিত হইত ও তৎসমুদয়ই আবার ফসল বুনিবার সময় ব্যবহৃত হইত। অবহেলায়, আলস্যে ও নাগরিক জীবন অনুকরণের মোহে আজকাল গ্রামবাসিগণ সেরূপ প্রথা প্রায় বর্জ্জন করিয়াছে। বীজ বিক্রয় বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায়ী লোকেই করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত কৃষির সম্বন্ধ নাই। নানা স্থান হইতে সস্তায় বীজ ক্রয় ও একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন একটি চিত্তাকর্ষক নাম দিয়া বিক্রয় করাই তাহাদের কার্য্য। সুতরাং বাজারের সাধারণ বীজে তিন প্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায় ;—(১) ইহাতে যে নামে বীজ বিক্রয় হইতেছে, তদ্ভিন্ন অপর বীজও অল্প-বিস্তর থাকে ; (২) অঙ্কুর উৎপাদনের অনুপাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম ; (৩) বীজ এক নামের হইলেও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নহে ; প্রায়ই ২।৪ প্রকার মিশ্রিত। উত্তম, মধ্যম ও অধম বীজের এইরূপ অবাধ সংমিশ্রণে ও পরে নির্ব্বাচনের অভাবে সমস্ত ফসলই যে উৎকর্ষগুণে হীন হইয়া পড়িবে ও তাহাদের ফলনের হারও কমিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? অথচ এতদ্দেশের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিলে বৈজ্ঞানিকমতে উদ্ভিদ্-প্রজনন দ্বারা কৃষকের যত দূর লাভ হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ আর কোন উপায়ে হইতে পারে না। কারণ, ভারতীয় কৃষকের এমন মূলধন নাই যে, অন্য উপায়ে কৃষির উন্নতি করিতে পারে ; অর্থাৎ অর্থ-ব্যয় করিয়া তেজস্কর সার ও অভিনব কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করা অথবা জলসেচের ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। পক্ষান্তরে, উৎকৃষ্ট জাতীয় উদ্ভিদ্ দ্বারা একই পরিমাণ শ্রম ও ব্যয়ে সে দেড় কিংবা দুই গুণ ফসল লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সরকারী চেষ্টায় উৎপাদিত কয়েকটি বিশেষ প্রকার ফসলের উল্লেখ করিতে পারি।

ধানই বাঙ্গালার প্রধান ফসল। মোট চাষের জমীর শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ ধান দ্বারাই অধিকৃত। জাপান, স্পেন, মার্কিণ প্রভৃতি দেশের তুলনায় বঙ্গে অথবা ভারতে ধানের ফলন অনেক কম। কিন্তু ঢাকা উদ্ভিদ্-তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে উৎপাদিত বিশুদ্ধ 'ইন্দ্রশাল' ধান্য অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গে অন্য শ্রেণীর ধান্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার ফলন অধিক এবং 'আগড়ার' ভাগও কম। ইন্দ্রশাল ধান্য চাষে বিঘা প্রতি অন্যূন দেড় মণ ধান অথবা ১ মণ চাউল অধিক পাওয়া যায়। এখন ইহার চাষ ৫।৬টি জিলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে বাঁশমতি ও দাঁতসার ধান্যের নূতন বংশ-প্রজনন করিয়াও উক্তরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে এবং অন্য একটি নূতন বংশ হইতে আরও অধিক ফলন পাইবার আশা আছে। মাদ্রাজের কইম্বাটুর উদ্ভিদতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বহুলভাবে বপনের বীজ নির্ব্বাচিত হইয়া বিতরিত হওয়ায় কৃষকের অনেক উপকার হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত প্রদেশেও দুইটি উন্নত বংশের ধান্য প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা জমীতে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাচিত বীজের ধান্য শতকরা দশ গুণ অধিক ফসল প্রদান করিয়াছে। ধান্য ব্যতীত গোধূম, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, তামাক, নীল প্রভৃতি ফসলের নূতন বংশ-প্রজনন দ্বারা ফলনের হার ও উৎকর্ষগুণ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্নকষ্ট ও উদ্ভিদ্-প্রজনন

উৎকৃষ্ট ফসল সর্ব্বদেশেরই কৃষির গৌরব ; ভারতও এক সময় সেরূপ গৌরবের অধিকারী ছিল। ইদানীন্তন নানা প্রকার কারণে কৃষি ও উদ্যানজাত ফসল উভয়েরই অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে কৃষিকেই অন্যতম ভিত্তি করিতে হইবে। কারণ, ভারতে এখন প্রত্যেক ৪ জন ব্যক্তির মধ্যে তিন জন কৃষিজীবী। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত জনসাধারণের কৃষির উপর সামান্যই আগ্রহ দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ্-প্রজনন তদ্র

সন্তানগণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত কার্য্য। অনেকেই জানেন যে, কলিকাতার বড় নর্শরীওয়ালাগণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণ বিলাতী বীজ আনাইয়া বিক্রয় করে। ইহার মধ্যে কতকগুলি অবশ্য এতদ্দেশের আদিম সব্জী নহে; কিন্তু তাহা হইলেও সেগুলি যে এতদ্দেশে পরিপক্কতা লাভ না করিতে পারে, তাহা নহে। বস্তুতঃ পাটনায়, সাহরাণপুরে, মুশৌরী পাহাড়ে, নীলগিরি পর্ব্বতে ও অন্যান্য স্থলে নবপ্রবর্ত্তিত বিলাতী সব্জীর যে বীজ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে খাস বিলাতী বীজের সমকক্ষ। উদ্যমশীল ব্যক্তিবর্গ শীতল প্রদেশে জমী লইয়া যদি ব্যবসায়িক হিসাবে ও অভিজ্ঞতার সহিত বীজ-ক্ষেত্র (Seed Farm) পরিচালনা করেন, তাহা হইলে আর্থিক অপচয় হইবার সম্ভাবনা কম। বাঙ্গালার জল-বায়ুতে অবশ্য কপি প্রভৃতির ন্যায় বিলাতী সব্জীর বীজ উৎপাদন অসম্ভব।
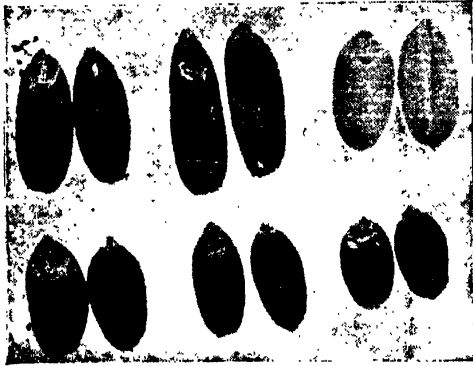
প্রতীচ্যের প্রজনন দ্বারা প্রাপ্ত ছয় প্রকার গোধূম

কিন্তু আলু, বেগুন, লাউ, শসা, কুমড়া, কড়াইশুঁটি, শিম প্রভৃতির উৎকৃষ্ট গাছ প্রজনন করিয়া তৎসমুদয়ের বীজ বিক্রয় করিলেও লাভ আছে। যাঁহারা বলেন যে, এতদ্দেশে উৎকৃষ্ট ফসলের আদর নাই, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সেরূপ আদর কোন দেশেই প্রথমে ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা ও মার্জ্জিত রুচির প্রসারের সহিত ভাল ফসল লোকে চিনিতে ও তাহার গুণ উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। কোন ফসলের নূতন বংশের গুণের প্রচার হইতে অবশ্য সময় লাগে, কিন্তু যখনই বৎসরের পর বৎসর কোন নির্দ্দিষ্ট গুণ ও লক্ষণযুক্ত ফসল সমশ্রেণীর অন্য ফসলের উপর তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে, তখনই তাহার উপর সাধারণের নজর পড়ে এবং কৃষক তাহার নিজের স্বার্থের খাতিরেও সেরূপ ফসলের চাষ আরম্ভ করে। ফলতঃ উৎকৃষ্ট ফসলের কাটতি অবশ্যম্ভাবী। ফলনের পরিমাণাধিক্য; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা রোগ-সহিষ্ণুতা; বিশেষ প্রকার জল, বায়ু ও মৃত্তিকার পক্ষে উপযোগিতা; স্বাদ, গন্ধ, আকার-অবয়বের উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয় উদ্ভিদ্-প্রজননকারীর লক্ষ্যস্থল। এই সমুদয়ের মধ্যে একটি অথবা একাধিক গুণ একাধারে প্রাপ্ত হইবার জন্য তিনি নির্ব্বাচন অথবা সঙ্করোৎপাদনপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২।৩ বংশের মধ্যে অভিপ্রেত গুণ কোন উদ্ভিদে প্রকাশ না পাইতে পারে, অথবা স্থায়ী (Fixed) না হইলেও হইতে পারে; উদ্ভিদ্‌বিশেষে হয় ত আরও অনেক অধিক বংশ ব্যাপিয়া প্রজনন আবশ্যক। কিন্তু উপযুক্ত দক্ষতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে সফলতালাভ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই।

অন্যান্য দেশের ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, কৃষি ও তজ্জনিত আর্থিক উন্নতি প্রধানতঃ জনসাধারণের চেষ্টায়ই সাধিত হইয়াছে। অবশ্য স্বাধীন দেশে দেশীয় শাসনতন্ত্রও এইরূপ চেষ্টার অনুকূল। এতদ্দেশে তাহা নহে সত্য, তথাপি স্বাবলম্বন দ্বারা উদ্ভিদ্ প্রজনন ক্ষেত্রে একাধারে নিজের ও দেশের অনেক মঙ্গলসাধন করিতে পারা যায়। বিলাতে Sutton & Co ফ্রান্সের Vilmorin Andrieux et cie, মার্কিণের Laudreth & Co কোম্পানী প্রভৃতির বীজ অনেক ব্যবসায়ী আনাইয়া থাকেন। এইরূপ কোম্পানী ব্যতীত উক্ত দেশসমূহে উক্ত শ্রেণীর অনেক কোম্পানী ও ব্যক্তি আছে, যাহারা বীজ উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছে। বস্তুতঃ বীজ উৎপাদন (Seed Growing) উক্ত দেশসমূহে একটি ব্যবসায়। এতদ্দেশেও ভদ্রসন্তানগণ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে সরকার আর কোনরূপে না হউক, অন্ততঃ ইন্দ্রশাল ধান, কাকিয়া বোম্বাই পাট প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদের নব-উৎপাদিত উন্নত শস্যের বীজ জন্মাইতে দিয়া উৎসাহিত করিতে পারেন। প্রতি বৎসর এইরূপ

নূতন ফসলের অনেক বীজ আবশ্যক হয়। সেগুলি এখন বিহারের নীলবাগিচা প্রভৃতিতে উৎপাদিত হয় ও সরকার যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করেন। বঙ্গদেশের মধ্যেই শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ দ্বারা বীজক্ষেত্র স্থাপিত ও পরিচালিত হইলে সরকারের এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। ক্ষেত্রজ ফসল ব্যতীত উৎকৃষ্ট উদ্যানজাত ফসলেরও এতদ্দেশে একান্ত অভাব আছে। কোন কোন প্রজননক্ষেত্রে (Breeding Station) সেরূপ ফসল লইয়াও কায চলিতে পারে। এক একটি ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ফসল লইয়াই পরীক্ষা করা ভাল। অনেক রকম ফসল একই ক্ষেত্রে প্রজনন করিবার চেষ্টা ঠিক নহে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলাতেই অন্ততঃ একটি প্রজনন-ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত হইলে সেগুলি লাভজনক কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনাও সমধিক।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

এসো আবার

তেমনি ক'রে এসো ওগো,
এসো আবার, এসো আবার।
প্রাণে তোমার বিরহ যে
সহে না আর—সহে না আর।
ভালবাসি আমি তোমায়
ভালবাসি—ভালবাসি,—
বুক চিরে আজ দেখাইব,
দেখ আসি—দেখ আসি;
আর কেহ নাই জগত-মাঝে
আমার বলে, তুমি আমার—তুমি আমার।
সবার চেয়ে আপন হয়ে
দিয়েছিলে কেন সাড়া?
ধরা দিয়েছিলে কেন
হয়ে আমার নয়ন-তারা?
অন্ধকারে ফেলে রেখে
চ'লে গেলে কেন এবার! কেন এবার!
প্রেমময়ি, আমি যে আর
সইতে নারি - সইতে নারি;
আজকে আমি ম'রে যাব,
মরে যাব সকল ছাড়ি'!
দেখতে পেলে হতেম অমর,
মরার দিনে রূপটি তোমার—রূপটি তোমার!
কেমন ক'রে ডাকৃব তোমায়
ডাক যে ঠেকে ফাঁকা ফাঁকা;
শুন্‌তে তুমি পাওনি কি মোর
লক্ষ ডাকের একটি ডাকা?
ছল করো না, এসো তুমি,
উপায় কর মোর বাঁচিবার—মোর বাঁচিবার।

ডাক না দিতে ছুটে এসে
বস্‌তে আমার হিয়া জুড়ে;
চুপটি ক'রে থাক্‌লে ব'সে
গাওয়াতে গান লক্ষ সুরে;
মন-নয়নে দেখা দিয়ে
ঘুচাতে গো বিশ্ব আঁধার—বিশ্ব আঁধার।
ভালবাসা সেই যে তোমার
ভুল্‌লে তুমি কেমন ক'রে?
মিথ্যা কভু নও যে তুমি,
সত্য তুমি চিরতরে;
দোষী কভু হয় না সে জন
যে হয় তোমার ভালবাসার - ভালবাসার।
ভুল্‌তে তোমায় চাইনি কভু,
এই বটে কি মোর অপরাধ?
সব তোমারে সঁপিয়াছি
যখন যেমন হয়েছে সাধ;
তবে তুমি কোন্ দোষেতে
আমায় ওগো চাও ছলিবার—চাও ছলিবার?
থাক্, আজিকে এসো তুমি,
এসো তুমি, এসো আবার!
শূন্য হয়ে গেছে সকল,
আর বিরহ সয় না প্রাণে!
পূর্ণ দয়া চাহি তোমার,
ধৈর্য্য হিয়া আর না মানে!
উপায় কর--গতি কর
এই জীবনের—এই সাহারার!—এই সাহারার!

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মাধবদেব ঃ—

ইনি নারায়ণপুরের অন্তর্গত বালিগ্রামে ১৪[illegible] শকে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর জিলার অন্তর্গত ধবলা নদীতটস্থ "বাণ্ডুকা" নামক গ্রামে ইঁহার পিতা বরকণা গিরির (১) বাসস্থান ছিল ;—

> "জন্মিলা মাধবদেব কায়স্থ কুলত।
> আছিলন্ত পিত্রি তান বাণ্ডুকা দেশত ॥
> শঙ্করর মাধবর বংশ মত যত।
> একেলগে আছিলন্ত কনৌজ পুরত ॥ [illegible] ।
>
> —রামানন্দ দ্বিজকৃত-শঙ্করচরিত।

বরকণা গিরি ব্যবসায় উপলক্ষে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশস্থ নগাঁও জিলার অন্তর্গত বরদোয়া গ্রামে গমন করেন ও সেখানে তিনি দ্বিতীয় দারগ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি স্বদেশে যাতায়াত করিতেন। বাণ্ডুকা তৎকালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হেতু বিষম অশান্তি ভোগ করায় তিনি নারায়ণপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ;—

* * * * *

> বঞ্চিলন্ত গৈয়া পাছে নারায়ণপুরত।
> বাসা করি রৈলা পাছে বালি জে গ্রামত।
> জন্মিলা মাধবদেব সেহি সময়ত ॥ ৩৪১ ।
> শুক্ল নবমীত জানা বৈশাগ মাহত।
> দিবাভাগে জন্মিলন্ত দুই প্রহরত ॥—গুরু-চরিত্র।

তৎকালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তীর্থ-পর্য্যটনে শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। বরকণা গিরির মৃত্যুর পর মাধবদেব রামদাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ দেন।

মাধবদেব প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। শঙ্করদেবের বেলগুরি বা ধুয়াহাট সত্রে (আখড়ায়) অবস্থানকালে উক্ত রামদাস মাধবদেবকে তাঁহার নিকট লইয়া যায়েন। শঙ্করদেবের সহিত সেখানে মাধবদেবের এই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর এক জন গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া উঠেন। কাশী হইতে প্রেরিত "রত্নাবলি" নামক বৈষ্ণবশাস্ত্র জনসমাজে প্রচার করিবার জন্য শঙ্করদেব তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন ;—

> শঙ্করে বোলন্ত তুমি মাধব শুনিও।
> রত্নাবলি ভক্তিশাস্ত্র পদে নিবন্ধিয়ো ॥
> বৈষ্ণব সকলে শুনি আনন্দ লভিব।
> স্ত্রীবালা মূর্খো ভক্তি রসক বুঝিব ॥
> মাধবে বোলন্ত পাছে করি নমস্কার।
> পদ বান্ধিবাক শক্তি নাহিকে আমার ॥
> কিছু মনে কৃপা যদি হোবয় আমাক।
> তেবেসে পারয়ো তয়ু আজ্ঞা করিবাক ॥
> শঙ্করে বোলন্ত রত্নাবলি শাস্ত্র সার।
> করিওক পদ হুবে লোকত প্রচার ॥
>
> —দ্বিজ রামানন্দ-কৃত গুরু-চরিত।

গুরুর দেহত্যাগের পর মাধবদেব ২৮ বৎসর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি বরপেটা সত্র হইতে ১ মাইল দূরে "সুন্দরীখান," নামক সত্রে অবস্থানকালে গুরুর আজ্ঞা স্মরণ করিয়া "ঘোষা" পুথি রচনা করেন। মাধবদেবের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণদাস বা ঠাকুর-আতা। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।

মাধবদেব গণককুচি, সুন্দরীদিয়া, বরপেটা এবং কুচবিহারে ভেলা নামক সত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যিনি কৃষ্ণের ভক্ত, তিনিই শুদ্ধ। তাঁহার মতে পূজাদি অনাবশ্যক—একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনে সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। তিনি চিরকুমার ও ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, কিন্তু শঙ্করদেবের সহিত মিলিত হইবার পর হইতে তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম-চিন্তা মন হইতে দূরীভূত করেন। তাঁহার আদর্শের অনুকরণেই আসামে "কেবলীয়া ভকতগণের" সৃষ্টি হয়। "কেবলভাব" আশ্রয় হেতু ভক্তদিগকে "কেবলীয়া" বলা হয়।

শঙ্করদেব ও মাধবদেব উভয়েই শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া সাধারণ্যে বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের কীর্ত্তন লিখার যে উদ্দেশ্য, তদীয় শিষ্য মাধবদেবের "নাম-ঘোষা" লিখিবারও সেই উদ্দেশ্য। নাম-ঘোষায় এক হাজার পদ থাকায় উহা "হাজারী" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। নাম-ঘোষা হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

> "দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লভিয়া পশুর যোগ্য
> বিষয়র আশা পরিহরা।
> সন্তর সঙ্গত বসি মুখে হরিগুণ গায়া
> সন্তোষ অমৃত পান করা ॥

(১) বরকণা গিরি—ইঁহার আসল নাম ছিল "গোবিন্দ।" বরকণা, দীঘলকণা, কানলম্বা ইত্যাদি ইঁহার ডাকনাম ছিল। কর্ণ দীর্ঘ ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত। দৈত্যারি ঠাকুরের চরিতে উল্লেখ আছে, "নিজ তান নাম গোবিন্দ জানিবহ, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। কানলম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কানলম্বা নাম।" আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাসে ডাকনাম দ্বারাই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয়।

শুনিওক চিত্ত তের পরম রহস্য বাণী
তুমি শুদ্ধ জ্ঞানর আলয়।
কৃষ্ণ নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ পরম ঈশ্বর দেব
না ছাড়িব তাহান আশ্রয়॥
দিবা সহস্রেক নাম তিনি বার
পঢ়ি পাবে যিটো ফল।
একবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলে
পাঅয় তাবে সকল॥
পরম কৃপাল শ্রীমন্ত শঙ্কর
লোকক করিয়া দয়া।
হরির নির্ম্মল ভকতি প্রকাশ
করিল শাস্ত্রক চায়া॥"

ভেলা ও মধুপুর সত্র ঃ—

উপরি-উক্ত ভেলা সত্র কুচবিহারের ভেলাডুয়ার নামক স্থানে স্থাপিত। কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আইমা (দিদিমা) রাজাকে বলিয়া মাধবদেবের জন্য "দলৈ" নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে জমী লইয়া তদুপরি এইসত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মাধবদেবের তিরোভাবের পর এই সত্র বিদ্যমান ছিল। কোচরাজ বীরনারায়ণের রাজত্বকালে বুড়ীর পো গোবিন্দ এই সত্রের অধিকারী হয়েন। এই সময় টোরোসা নদীর প্রবল প্রবাহে ভেলা সত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ অধিকারী রাজ-অনুমতি লইয়া "মধুপুর" নামক স্থানে এক নূতন সত্র স্থাপন করেন। পূর্ব্বে শঙ্করদেব ও মাধবদেব যখন তীর্থ-পর্যাটনে গমন করেন, পথিমধ্যে এই মধুপুর নামক স্থানে ভোজন করিবার কালে শঙ্করদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পরে এক দিন এই মধুপুর স্থান প্রকাশিত হয়ে উঠবে।" মধুপুরে উক্ত গোবিন্দ কর্ত্তৃক নূতন সত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রাজা ভেলা সত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লোক দ্বারা কোদালযোগে উহার পবিত্র মৃত্তিকা কাটাইয়া সেখানে পাঠাইয়া দেন। তিনি সেখানকার নাম-ঘরের (কীর্ত্তন-গৃহের) ভিত্তি এই মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে ভেলার পবিত্র মৃত্তিকা-চিহ্ন মধুপুরে রক্ষিত হইয়াছিল। টোরোসা-বিধ্বস্ত ভেলা সত্রের এক কোণের অতি সামান্য পরিমাণ মৃত্তিকা ব্যতীত অবশিষ্টাংশ ঐ নদীর বালুকারাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর ঐ বালুকাচ্ছাদিত ভেলা সত্রের অংশ পরিষ্কার করাইয়া পুনরায় "ভেলাথান" নাম দিয়া সেখানে সত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুকাল অবস্থান করেন। কালক্রমে এই ভেলাথান সত্রেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

গোপাল আতা ঃ—

ইনি উজনী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন—রাজ-নিগ্রহে কামরূপে আগমন করেন। জনিয়া সত্রের সংস্থাপক নারায়ণ দাস বা ঠাকুর আতার প্রভাবে ইনি মাধবদেবের নিকট শরণ লইয়াছিলেন। গোপাল আতা জাতিতে "কলিতা" ছিলেন। কলিতারা বঙ্গদেশের কায়স্থ-শ্রেণীস্থ অসমীয়া জাতি। গোপাল বরপেটার নিকট ভবানীপুর নামক স্থানে একটি সত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি "ভবানীপুরীয়া গোপাল আতা" নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

গোপাল আতার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে পুরুষোত্তম 'কাঠপার সত্র', মাধবানন্দ 'আমগুরি সত্র', সনাতন 'নগরীয়া সত্র' স্বরূপানন্দ 'ধোপাবর সত্র', শ্রীরাম আহতগুরি ও করতিপার সত্র', এবং 'অনিরুদ্ধ 'নাহর আটি ও মোয়ামারা সত্র' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই শ্রীরাম আতা প্রসিদ্ধ চরিতলেখক রামানন্দ দ্বিজের পিতা ছিলেন। অনিরুদ্ধ ভাগবতের চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্দের পদ রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল আতার শিষ্যগণ যে সকল সত্র স্থাপন করেন, তাহাদিগকে "ঠাকুরীয়া সত্র" বলা হয়।

মোয়ামারিয়া সম্প্রদায় ঃ—

ইঁহাদিগের ইতিহাস অতীব রহস্যপূর্ণ। ইঁহারা অসমীয়া রাজনীতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় দখল করিয়াছেন। সে সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম "অনিরুদ্ধ।" ইঁহার পিতার নাম "পোগুা।" শঙ্করদেব কোন কারণে অনিরুদ্ধের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। অনিরুদ্ধ তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ না হইয়া নিজেই একখানি সত্র স্থাপন করিয়া কাছাড়ী, ছুটীয়া প্রভৃতি নীচজাতীয় লোককে শিষ্য করেন।

কথিত আছে, আহোমরাজ চুচংফা তাঁহার মাহাত্ম্য পরীক্ষা করিবার জন্য একটি শূন্য কলসীর মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উহাকে উপস্থিত করত 'ভিতরে কি আছে' জিজ্ঞাসা করেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন, "সর্প।" তখন বস্ত্রখণ্ড খুলিবামাত্র উহার মধ্য হইতে একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বহির্গত হয়। রাজার করুণ আদেশে অনিরুদ্ধ তাহার প্রাণসংহার করেন। যেখানে ঐ মায়া-'সর্প' বিনষ্ট হয়, সেইখানে তৎপ্রতিষ্ঠিত সত্রটির নাম হয় "মায় মরাসত্র";—

মায়া-সর্প শুছাইলেক রাজার আগত।
সি কারণে মায়ামরা নাম ভৈলা সত॥
—আদিচরিত।

এক পক্ষ বলেন, "উপরি উক্ত অলৌকিক বৃত্তান্তটি কল্পিত। মায়া-মোরা-শব্দ হইতে "মোয়ামরিয়া" নামের উৎপত্তি হইয়াছে।" অন্য পক্ষের মতে "অনিরুদ্ধ যেখানে সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে প্রচুর মোয়া (১) পাওয়া যাইত। তাঁহার শিষ্যরা উহা ধরিয়া খাইতেন বলিয়া লোকে ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাদিগকে মোয়ামারিয়া বলিত। নামের উৎপত্তি যাহাই হউক, এই সম্প্রদায় অতীব গোঁড়া "মহাপুরুষীয়া।" অন্য দেবদেবীর প্রতি তাঁহারা বীতানুরাগ।

লখীমপুর জিলার অন্তর্গত রোমরিয়া মৌজাস্থ গড়পাড়া গ্রামে এবং চাবুয়ার নিকট দীনজান নদীতীরে মোয়ামারিয়াদিগের সত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। দীনজানস্থ মোয়ামারিয়া সত্রের প্রধান নাম-ঘরে নদীয়ালদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

রাম রায় ঃ—

ইনি শঙ্করদেবের অনেক পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার চরিত-পুথি নীলকণ্ঠ (২) চরিতের অনেক পরে লিখিত হইয়াছিল। বংশী-গোপাল দেবের চরিতে আছে, শঙ্করদেবের তিরোধানের পর বংশীদেব বরপেটা অঞ্চলে আগমন করেন এবং মাধবদেবের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মশিক্ষা করেন। কিন্তু রামরায়-চরিতে আছে যে, শঙ্করের জীবিতকালেই গোপালদেব বরপেটা অঞ্চলে আইসেন এবং শঙ্করদেব তাঁহাকে দামোদরদেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ৺আউনী আটীর দত্তদেব-বিরচিত গোপালচরিতেও আছে যে, শঙ্করের তিরোধানের

(১) মোয়া—এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মৎস্যকে অসমীয়ারা "মোয়া" বলিয়া থাকেন।

(২) নীলকণ্ঠ—নীবকণ্ঠ দাস যি দামোদরদেবর জীবনী লিখিছে, তেঁও দামোদরদেবর শিষ্য আছিল। তেঁও কোচবিহারর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণর পুত্র বীরনারায়ণের সময়র লোক আছিল।—আউনী আটী সত্রের পত্র, তাং; ১৮৪৪।২৫ চৈত্র।

পর তিনি আগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেবের চরিত্রে গোপাল-দেবের বিষয় যাহা উল্লেখ আছে, রামরায়-চরিত্রে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। এ কারণ রামরায় লিখিত বিবরণ কতদূর সত্য বলা যায় না। তদ্ব্যতীত রামরায়ের হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি এখনও আমরা পাই নাই।

আসামে শ্রীচৈতন্য ঃ—

গৌহাটীনিবাসী একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শ্রীযুত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ১৩২২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "এই দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,—দামোদরী, মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্যপন্থী।" আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, হেমবাবু অসমীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে ক্রমাদয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য। তিনি কয়েকখানি অপ্রামাণিক ও কল্পিত পুথি হইতে কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "এতগুলি পুথির এবং জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া যদি আমরা চৈতন্যদেবের কামরূপ আগমনকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে।"

গোস্বামী মহাশয় উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "নীলকণ্ঠ দাস রচিত দামোদরচরিত্রে এই ভাবে উল্লেখ আছে ;—

"দামোদর পাচে কামরূপক আসিলা ॥
রত্নেশ্বরক গ্রামে কতো দিন আছিলন্ত।
তথা হন্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যান্ত ॥ ৮২।
আসিলন্ত চৈতন্য নারদ-বেশ ধরি।
দামোদরে আরাধিলা ভক্তি ভাব করি ॥
সাক্ষাতে সে বিষ্ণুরূপ ঋষিয়ে দেখিলা।
জীব উদ্ধারিতে তাওক তত্ত্বজ্ঞান দিলা ॥ ৮৩।
পরম আনন্দে দুয়ো দুইকো আশ্বাসিলা।
তথা হন্তে চৈতন্য যে ওড়েসাক গৈলা ॥"

হেমবাবু উপরে নীলকণ্ঠের যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নীলকণ্ঠের পুথিতে নাই। হস্তলিখিত তিনখানি প্রাচীন পুথিতে আমরা উহা পাই নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলৈ মহাশয় তদীয় "অসম প্রদীকা" নামক মাসিক পত্রিকায় নীলকণ্ঠের পুথি খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতেও হেমবাবুর ঐ উদ্ধৃত পদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীচৈতন্যের আসাম আগমন সাব্যস্ত করিবার জন্য হেমবাবু "সৎসম্প্রদায়" পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। সৎসম্প্রদায় ভট্টদেবের নামে অনেক পরে কাহার দ্বারা রচিত ও জাল বলিয়া উহার প্রকাশক দণ্ডিত হইয়াছেন। এই পুস্তকখানি নষ্ট করিবার হুকুম আদালত হইতে আইসে। হেমবাবু জানিয়া শুনিয়াও যখন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কি মনে হয় ?

সৎসম্প্রদায় যে কিরূপ মামুলি ধরণের পুস্তক, একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাইবে। তাহাতে আছে, চৈতন্য ও নারদ দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহে। চৈতন্যই হাতে বীণা লইয়া নারদের অভিনয় করিয়াছিলেন ;—

"পাদে হাতে বীণা ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ঠা দেখাইলা।
পাছে চৈতন্যে তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি ওড়েষাক গৈলা ॥"

হেমবাবু কৃষ্ণভারতীর পুথি হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া-৮৮। এ রকমের বই যে আছে, তাহা এখনও অপ্রকাশ। কৃষ্ণ-ভারতী যে কে, তাহাও জানি না, প্রবন্ধ-লেখকের সে বিষয়ে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারক যাঁহারা আসামে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চরিতে তাহার উল্লেখ আছে। সুদূর দক্ষিণাপথ হইতে শঙ্করাচার্য্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার চরিতে তাহা উল্লেখ আছে। শিখ গুরু নানক ও তেগ বাহাদুর আসামে আসিয়াছিলেন, শিখধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার বিবরণ (Vide Macauliffe's Sikh Religion, Vol, IV) আছে। কোথায় পঞ্জাব! কোথায় আসাম! যদি তাহার উল্লেখ থাকে, তবে শ্রীচৈতন্য আসামে আসিয়া থাকিলে তাঁহার চরিতেও তাহা উল্লেখ থাকিত। আমরা প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের authority বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি বলেন, "শ্রীচৈতন্যের কামরূপ গমনের কোন বিবরণ আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাই নাই।"

গোপাল মিশ্র ঃ—

ইনি দামোদরদেবের শিষ্য ছিলেন। শুনা যায়, গোপাল মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। গোপাল মাধবদেবের "নাম-ঘোষা" গ্রন্থের অনুকরণে "ঘোষারত্ন" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব মহাযাত্রা করেন। ইহার ১ বৎসর পরে শঙ্করদেবের ধর্ম্ম-গদী লইয়া মাধবদেব ও দামোদরদেবের মধ্যে যে বিরোধ বাধে, তাহার ফলে মহাপুরুষীয়া ও বামুনীয়া এই দুই দলের সৃষ্টি হয়। গোপাল দামোদরীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও গ্রন্থের প্রারম্ভে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাম শ্রদ্ধার * সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। গোপাল মিশ্রের ঘোষারত্ন পুথিতে আছে ;—

বিষ্ণুর নৈবেদ্যচয় সুরসিদ্ধে সাদরয়
সমস্তকে পবিত্র করয়।
অন্য দেব অবশেষ যদি ভুঞ্জে প্রমাদত
চন্দ্রায়ণ করিতে লাগয় ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য দেবতার অবশেষ (উচ্ছিষ্ট) গ্রহণ করিলে চান্দ্রায়ণ নামক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহাতে শঙ্করদেবের মত ব্যতীত ভিন্ন ভাব কিছুই দেখা যায় না।

ঘোষারত্ন অসমীয়া সাহিত্যে একখানি রত্ন। গোপাল মিশ্র প্রতিষ্ঠিত খুদিয়া সত্র অদ্যাপি কামরূপের নলবাড়ী নামক স্থানে বিদ্যমান আছে। তিনি কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার রামগতি, লক্ষ্মীপতি ও কৃষ্ণপতি নামক তিন পুত্র ছিল।

ভট্টদেব ঃ—

ইনি দামোদরদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। ভট্টদেব-বিরচিত "ভক্তি-বিবেক" দামোদরী সম্প্রদায়ের আদি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি। তাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই উপাসনা করিবার উল্লেখ আছে। রাধা উপাসনার কথাই নাই। ভট্টদেব শ্রীকৃষ্ণে "একশরণ" ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। এমন কি, তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় "পঞ্চযজ্ঞ"ও বাদ দিতে হইবে। কেন না, তাহাতে এক শরণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়। কেবল বিষ্ণুপূজা করিলে দেবদেবী সব পূজিত হয়েন।

"ননু বিধ্যুক্তমার্গেণ ভগবদর্চ্চনে ক্রিয়মাণে নিত্যোক্তপঞ্চযজ্ঞ-পূজা ন স্যাৎ। তত্রাহ—অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চ্চিতঃ সর্ব্বদেবঃ স্যাৎ যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ। তস্মাদন্যদেবারাধনমনাদৃত্য হরিমারাধয়েৎ।"—ভক্তিবিবেক।

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

* প্রাচীন লেখকরা কোন স্থানে শঙ্কর মাধবের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন নাই। সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শঙ্করদেব আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদিগুরু।

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্যের সমালোচনা

শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির এক জন ভক্ত, কিন্তু ভক্তি যখন গোঁড়ামিতে দাঁড়ায়, তখন তাহার উত্তাপ গায় লাগে, সকলে তাহা সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য ধর্ম্মজগতে এত মারামারি।

বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের দেখা-শুনা হইয়াছিল, বৈষ্ণবসমাজে এই প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। নগেন্দ্র বাবু এ কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস এই যে, চণ্ডীদাস এক জন পাড়াগেঁয়ে কবি, আর বিদ্যাপতি ছিলেন—কবি-সম্রাট, তিনি কেন চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা করিতে উৎসুক হইবেন? বিদ্যাপতির পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে নগেন্দ্র বাবু বিশেষরূপ সচেষ্ট, এই জন্য তিনি এই মিলনের কথা উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বিদ্যাপতি "রাজপণ্ডিত, সর্ব্বদা পণ্ডিতদিগের সঙ্গে থাকিতেন," সুতরাং এতাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তি কেন পাড়াগাঁয়ের পয়ার-লেখকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন? নগেন্দ্র বাবু জানেন কি না, বলিতে পারি না, চণ্ডীদাসও এক জন বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জনৈক রাজার এতটা সৌহার্দ্দ্য ছিল যে, কবির জাতিচ্যুত হওয়ার সংবাদে সেই রাজা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া রামীর সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করিয়া একটা মিটমাট করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস একখানি সংস্কৃত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা নকুল তাঁহাকে মহা পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনেকটা বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তদ্রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমরা পাইয়াছি। সুতরাং এখন এটা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, চণ্ডীদাস পাণ্ডিত্যে কম ছিলেন না। এ সকল তথ্য প্রাচীন পুথি হইতে কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু পূর্ব্ব-যুগের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা এ যুগে চালাইতে চাহিয়াছেন, তাহা এখন চলিবে না।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত ও চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন, এই সংস্কার তিনি মন হইতে দূর করুন। তবে এ কথা সত্য যে, কবিত্বের ঊর্দ্ধতম শিখরে দাঁড়াইয়া সত্যের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষায় সারল্য আসিয়াছিল। তিনি বিদ্যাপতির মত অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ দেওয়ার কায়দা দেখাইতে যাইয়া কবিতা লিখেন নাই—প্রেমের আধ্যাত্মিক আনন্দে ভরপুর হইয়া স্বাভাবিক কাব্যের উৎস বহাইয়া দিয়াছিলেন। যে গুণে বাল্মীকির কাব্যে প্রসাদগুণ বেশী, অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের হইতে যে গুণে কবিগুরু শতগুণে শ্রেষ্ঠ, চণ্ডীদাসের ভাষার সারল্যও সেই গুণমণ্ডিত, তাহাতে তিনি মূর্খ প্রতিপন্ন হয়েন না। ফল হইলে যেরূপ ফুল নষ্ট হয়, প্রকৃত সহজ কবিত্বের উদ্রেক হইলে অলঙ্কারশাস্ত্রানুগা কবিতা সেইরূপই লয় পায়।

তাহার পর শিবসিংহের প্রিয় কবি হইতে চণ্ডীদাস খ্যাতিতে ন্যূন ছিলেন না। নরহরি সরকার ১৪৬৫ বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৈষ্ণব প্রাচীন কবিদের অন্যতম। তাঁহার সময়ে চণ্ডীদাসের কবিতা দ্বারা দেশ পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, এ কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ("ব্রহ্মাণ্ড ভরিল যার গীতে")। স্বয়ং গৌড়েশ্বর চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তদীয় বেগম সাহেবা কবির গুণানুরাগিণী হইয়াছিলেন। এ সকল তথ্য শুধু প্রবাদ নহে, প্রাচীন পুথির প্রমাণে ইহা দৃঢ় হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে সময় বঙ্গীয় কবিতা চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তখন এ সকল কথা জানা ছিল না, কিন্তু প্রাচীন সংস্কারগুলিকে এ কালে তিনি কেন আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন, এ সমস্যার কি উত্তর দিবেন? চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বঙ্গীয় কবির শোচনীয় মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে যে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহাও এখন বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকগণ জানেন। সুতরাং নগেন বাবু উল্টা যুগের উল্টা কথাগুলি এখন শুনাইয়া "বাহবা" পাইবেন না।

শিবসিংহের সভার নবীন কবি "নব জয়দেব" যে বাঙ্গালার প্রবীণ কবিকে দেখিতে উৎসুক হইবেন, তাহাতে অবিশ্বাস্য যে কি হইতে পারে, তাহা জানি না। বৈষ্ণব কবিরা লিখিয়াছেন—তাঁহারা উভয়ে উভয়ের গুণমুগ্ধ হইয়া পরস্পরের দর্শনকামী হইয়াছিলেন। ১৭১৫ বা তৎসন্নিহিত কোন খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব দাস "পদকল্পতরু" প্রণয়ন করেন, সুতরাং কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সকল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্ততঃ দুই জন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "পদকল্পতরু" বৈষ্ণবদের অতি শ্রদ্ধেয় সংগ্রহ গ্রন্থ, বৈষ্ণব-সমাজের বহুদিনের সংস্কার ও বিশ্বাসের অনুকূল কিংবদন্তী এই কবিদের রচনায় লিপিবদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব দাস তাহা নিজ গ্রন্থে স্থান দিতেন না। অন্ততঃ ২॥০ শত বৎসর পূর্ব্বের একাধিক কবি যাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ বৈষ্ণব-সমাজ যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন—এই ঐতিহাসিক প্রমাণ যে নগেন্দ্র বাবু কোন্ যুক্তিবলে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ২॥০ শত বৎসর পূর্ব্বের কেহ কি লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মিলন হয় নাই? এরূপ যদি মতদ্বৈধ বা প্রতিকূল প্রমাণ থাকিত, তবে না হয় সন্দেহের কারণ হইতে পারিত। তাঁহার যুক্তি তিনটি। প্রথম বিদ্যাপতি পণ্ডিত ও চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন; সুতরাং বিদ্যাপতি কেন মূর্খের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন? মানিয়া লইলাম, যেন চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে তো মূর্খদের প্রায়ই দেখা-শুনা হয় এবং পণ্ডিতগণও সময়-বিশেষে মূর্খদের সঙ্গে যাচিয়া দেখা করেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু চণ্ডীদাস তো মহা-পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখা হওয়ার বাধা কি? নগেন্দ্র বাবুর প্রধান যুক্তিটি ত ধসিয়া পড়িল। দ্বিতীয় আর একটি অদ্ভুত যুক্তি আছে, তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতি যে বঙ্গদেশে কখনও আসিয়াছিলেন, মিথিলায় এরূপ প্রবাদ নাই। বিদ্যাপতি জোনপুরে গিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার রচিত 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থে লিখিত আছে।" যদিও কালিদাস গঙ্গা ও যমুনার মিলিত প্রবাহ লইয়া বহু শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তথাপি কোথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই যে, তিনি গঙ্গাজল জীবনে কোন দিন পান করিয়াছিলেন, সুতরাং এই অকাট্য যুক্তির বলে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদ্যাপতি কখনও গঙ্গার জল পান করেন নাই।

নগেন্দ্র বাবুর আরও একটা যুক্তি আছে—কবিদের কেহ কেহ লিখিয়াছেন, "যখন চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির দেখা-শুনা হয়, তখন মৈথিল কবির সঙ্গে 'রূপনারায়ণ' নামক এক ব্যক্তি ছিলেন।" এই রূপনারায়ণ কে, নগেন্দ্র বাবু তাহা লইয়া গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যখন এ ব্যক্তি কে, শিবসিংহ অথবা কোন ভিন্ন ব্যক্তি—তাহা নিরূপণ করা মুস্কিল, তখন এ সমস্তই কল্পনা। রূপনারায়ণ শিবসিংহের উপাধি হইলেও বহুসংখ্যক লোকের ঐ নাম থাকিতে পারে। পঞ্চপল্লীর নৃসিংহ রাজার সভাপণ্ডিতের নাম ছিল রূপনারায়ণ, তাহা ৪ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু ৪ শত বৎসরের বহু পূর্ব্বে ও বহু পরে যে লোকের নাম 'রূপনারায়ণ,' থাকিতে পারিত এবং এখনও হয় ত কাহারও ঐ নাম থাকিতে পারে—এটা যে নগেন্দ্র বাবু কেন বুঝিলেন না, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দেখা-শুনার সময় "রূপনারায়ণ" নামক কোন ব্যক্তি সঙ্গে থাকিতে পারেন না, এ কথা কি কোন তাম্রশাসন হইতে নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে পারেন?

অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু চণ্ডীদাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রচনায় বিদ্যাপতির অনেক প্রভাব আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির উপর চণ্ডীদাসের কোন প্রভাবই নাই। এ কথায়ও নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ওকালতীর জোর-জুলুমের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজের বিশ্বাস অন্যরূপ, তাঁহারা বলেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব্বে কেবলই অলঙ্কারশাস্ত্রের বেড়ীর দ্বারা তাঁহার কাব্য-প্রতিভার চরণাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে বঙ্গীয় কবির স্বভাব-সৌষ্ঠব ও গভীর প্রেম তাঁহাকে এক নব জগতে আনয়ন করিয়াছিল—তাহার ফলে তাঁহার "মাথুর"—তাঁহার "ভাব-সম্মিলন"। চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন, "এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর আসিয়া ধরুক তান। গগনে উদয় হউক চন্দ। মলয় পবন বহুক মন্দ।" ইহাই অনুবাদ করিয়া বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন, "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকয়ু, লাখ উদয় কর চন্দ। পাঁচ বাণ অব লাখে বাণ হউ। মলয় পবন বহু মন্দ।"

যদি নগেন্দ্র বাবু বলিতেন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কথাবার্ত্তা যাহা পরবর্ত্তীরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হয় ত ঠিক ঐতিহাসিক সত্য নহে, হয় ত বহুদিন গত হওয়ায় তাহার মধ্যে কোন কোন কথা কল্পিত হইতে পারে, তবে তাঁহার কথায় সায় দিতে আমাদের বাধা থাকিত না।

নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা আছে। "আসক" শব্দট সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "'আসক' শব্দ সংস্কৃত নয়, বাঙ্গালা নয়, ব্রজবুলী নয়, মৈথিল নয়, হিন্দী নয়, একেবারে নিছক পার্শী শব্দ।"

'আসক' শব্দ তাঁহার মতে পার্শী "মাশুক" "ইশক্" প্রভৃতি শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু "আসক্তি" শব্দট যে চিরপরিচিত সংস্কৃত শব্দ এবং "আসক" যে তাহারই কথিত ভাষার রূপান্তর, তাহা কি একবারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই? সেইরূপ "গোহারি" শব্দের তিনি এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বাহির করিয়াছেন, শুধু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলে এ সকল শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। এই "গোহারি" শব্দ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ঘাটে-পথে পাওয়া যাইতেছে। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবি ইহা অজস্র ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার অর্থ "বিলম্ব করা" নহে—"সকাতর প্রার্থনা।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বিপ্লববাদের স্বপ্ন

গরম দেশে টাকার আশে চাকরী নিয়ে আশা,
স্বদেশ হ'তে হেথায় এসে ক'দিন তবে বাসা।
তারই মাঝে আঁতকে উঠি স্বপ্ন দেখে ভয়,
বোমা ছুড়ি রিভলভার—কিছুই বাকি নয়।

বাঙ্গালীর বিবাহ

১

আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন, ভৈরব রাগের বিখ্যাতা তিনটি সহধর্ম্মিণী ;—ভৈরবী, রামকেলী ও বাঙ্গালী। বিশ্বাস না হয়, পুরাতন সঙ্গীত-শাস্ত্রের হনুমন্ত ও ব্রহ্মার মতগুলি পাঠ ক'রে দেখবেন। রামকেলীর সঙ্গে 'ডাইভোর্স' অর্থাৎ বিবাদ হয়ে যাওয়াতে, পরে সে হিন্দোল রাগের সঙ্গে বিবাহ করে। তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত, অতএব সেটার আশ্চর্য্য কিছুই ছিল না। রাগ-রাগিণীর সমূহ বিস্তার হ'লে একালেও সেই রকম দাঁড়াতে পারে। তবুও কি জানেন?

ঘরকন্না ছেড়ে গেলে স্বভাবতঃ প্রিয়ার জন্য মন কেমন করে। অতএব নারদ ঋষি এসে এক দিন সকাল-বেলা ভৈরবকে বল্লেন, 'প্রভু, আজ বীণাযন্ত্রে একটা নতুন রাগিণী আপনাকে আলাপ ক'রে শোনাব।' ভৈরবের মৌনভাবে সম্মতির লক্ষণ দেখে ঋষি আলাপ আরম্ভ কল্লেন—

স রো ম, সরো ম গ রো স, রো রো সা,
ধো রো গ ম গ রো স, মপ ধো প গম,
গ রো স। ধো প ম গ ম প নি—

ভৈরব অমনি বল্লেন, 'বস্—তার কথা (অর্থাৎ রাম-কেলীর কথা) আর তুলো না।'

নারদ। আপনার ভ্রম হয়েছে। আমি শুদ্ধ নিষাদ লাগাচ্ছি।

ভৈরব। দেখি।

নারদ। ম প ধো নি—র্স, র্স র্রো র্গ র্ম,
র্গ র্রো স, র্গ র্রো নি ধো প—

ভৈরব। বাঃ, এ ত সুশ্রাব্য দেখছি। এর নাম কি?

নারদ। বাঙ্গালী।

ভৈরবী। একটা অদ্ভুত নাম দেখছি। তবে, এর হাব-ভাব অনেকটা আমার মত। এর নিবাস কোন্ দেশে?

নারদ। বাঙ্গালা দেশে। আপনার জটানিঃসৃতা জাহ্নবীর শেষ ভাগে, যেখানে সে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

ভৈরব ভেবে দেখলেন যে, মোকামটা মন্দ হবে না। নারদ সাহস পেয়ে আবার বল্লেন, 'বঙ্গোপসাগরের সূর্য্যকরে বাঙ্গালীর জন্ম। ভাগীরথীর শেষ স্মৃতিটুকু সেখানে খানিকটা পাওয়া যায়। সেই স্মৃতিটুকুর জোরেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী।'

গঙ্গার কথা পাড়াতে ভৈরবের চোখের কোণে অশ্রু-বিন্দু গড়িয়ে পড়ল। ভৈরব নারদের কানে কানে বল্লেন, 'বেশী চেঁচিও না, ভৈরবী শুনতে পাবে। আস্তে আস্তে আলাপ কর।'

নারদ। আপনিই একটু আলাপ ক'রে দেখুন না।

ভৈরব তৎক্ষণাৎ তানপূরার চারিটি তার বেঁধে আলাপ আরম্ভ কল্লেন। ঋষি সঙ্গে সঙ্গে বীণা বাজাতে লাগলেন। কোন রাগিণী আলাপ করা ও রাগিণীর সঙ্গে আলাপ করা একই কথা। তাকে আলাপ না করলে, তার সঙ্গে আলাপ হয় না। প্রায় বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত তন্ময় হয়ে সেই আলাপ। অন্য দিন ভৈরবী তা'র আলাপের ধ্বনি শুনত, আজ অন্য একটা আওয়াজ শুনে দ্বারের পার্শ্বে উঁকি মেরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'গাণ্ডার বাণীর চালে আজ ষাঁড়ের মত চীৎকার করছ কেন?'

২

ভৈরবীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখে নারদ ঋষি চট্ ক'রে বীণার ঠাটে পূরো গান্ধার ও নিষাদটা ছেড়ে দিয়ে তাদের কোমল সুর দুটির মিড় দিয়ে বস্‌লেন। রাগিণী বদ্‌লে গিয়েছে দেখে, ভৈরব মধ্যমের সুরে একটু হেসে বল্লেন, 'আমি আমার সঙ্গেই আলাপ কচ্ছিলুম।'

ভৈরবী। ও চালাকিটুকু আমার কাছে চল্‌বে না। আমি জানি, তোমার পর্দাগুলো বাঙ্গালী রাগিণীর মধ্যে আছে। মেড়ুয়াবাদিনী রামকেলীতেও ছিল, কিন্তু ও ভাব বেশী দিন থাক্‌বে না। আমার আপত্তি নাই। তুমি বাঙ্গালীর সঙ্গে বিয়ে ক'রে দেখ। আমি কখনও সতীনকে যন্ত্রণা দিইনি, তা বোধ হয় তোমার অজানা নাই। কিন্তু এবার জ্যাঠামশাইকে ঘটকালী কর্‌তে দেব না। তিনি শেষে একটা ঝগড়া বাধাবেন নিশ্চয়।

নারদ ঋষি দক্ষরাজের কথা মনে ক'রে ক্ষুব্ধ হয়ে বল্লেন, 'মা! তোমার রূপের কাছে কেহই না, তা সকলেই জানে,

তবুও কি জান? গঙ্গা যদি বাঙ্গালী হয়ে ফিরে কৈলাসে আসে, তোমারই সেবা করবে, তার সন্দেহ নাই।'

নারদের 'ডিপ্লোমেসি' দেবলোকে কাহারও অবিদিত ছিল না, সুতরাং ভৈরবী যেন বুঝেও, না বুঝে, শেষে বল্লে, 'আচ্ছা, আপনি যোগাড় করুন। বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে এলে আমার বড় দুঃখ হয়। তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে, ধনদৌলত সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌বেন। আমি তার ধন দিয়ে একটু ফূর্ত্তি করতে চাই। উনি তার রূপ দেখুন সিদ্ধি খেয়ে। কিন্তু আবার যেন তাকে মাথার জটার মধ্যে না রাখেন। আমি ওঁর মাথার উপর কাকেও চড়তে দেব না, সেটা নিশ্চয়!'

৩

বাঙ্গালী খুব বড়লোকের মেয়ে, তার ডাকনাম সুরমা। কলিকাতায় বাস। পাঁচখানা মটরকার, দশখানা চক-মিলানো বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা অগস্তি। এই অতুল সম্পত্তি সেই একলা পাবে। কাযেই তার অহঙ্কার হবারই কথা। কিন্তু আপনাকে ঠিক বলছি, তা নয়। বাঙ্গালী মনে মনে চিরসন্ন্যাসিনী। প্রত্যুষের কন্যা। ভৈরব রাগে তন্ময়ী। তার স্বামীকে সে মনে মনে পূর্ব্বেই চিন্‌তে পেরেছিল, কিন্তু গৌরীর মত তপস্যা করে নাই। সে জানত, যে কোনও দিনে ভৈরব রাগে সে মিশে যাবে। সকালে মধ্যম ও গান্ধারে মিড় দিতে দিতে চা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এসেন্সগুলো ঘরেই প'ড়ে থাকত। ডিনার টেব্‌লে চামচে ভ্রমে কাঁটা মুখে দিয়ে ফেলত এবং পুডিং মনে ক'রে বেগুনপোড়া গ্রাস ক'রে বসত। তবু কি জানেন? এই রকম মেয়ের জন্যই বিশ্বজন পাগল হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যে ভূমণ্ডলে আমরা বাস করি। কাযেই তার পাণিগ্রহণের জন্য বেসুমার সুন্দর ও অসুন্দর, ধনী ও নির্ধন যুবাপুরুষের হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! কিন্তু তা হ'লে কি হয়, বাঙ্গালী সুরমা ঠিক তার স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করত। দীপক, হিন্দোল, মালকোশ, নটনারায়ণ, পঞ্চম, বসন্ত প্রভৃতির মত মানুষগুলোকে তার পছন্দই হ'ত না। হেসে খেলে, দুটো মিষ্টি কথা ব'লে তাদের নমস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিত। সে ভাবত, তার দেশের রাজা হবার উপযুক্ত ভৈরব ছাড়া আর কেহই না।

৪

দেবতার সঙ্গে মানবীর বিবাহ দুরকমে। প্রথম— স্বপ্নে, দ্বিতীয়তঃ—অবতারে। অবতার হয়ে গেলে গল্পটা সোজা হ'ত, কিন্তু এ স্থলে স্বপ্নেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। পরে হয় ত অবতারের মত একটা কিছু হয়ে পড়ত, কিন্তু সেটা ফলে দাঁড়ায় নাই।

বিবাহ-বাসরে স্ত্রীলোক অনেক জুটেছিল। মুলশ্রী, ধানশ্রী, আসাবরী, গুর্জ্জরী, ললিতা, পটমঞ্জরী, কামোদী, মল্লারী ইত্যাদি। রামকেলী আইসে নাই। তার সঙ্গে হিন্দোলের বিবাহ হবার পর হিন্দোলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ললিতা (যে ভৈরবীর ভগ্নী, অর্থাৎ ভৈরবের ছোট শালী) বসন্তরাগের সঙ্গে দেশবিদেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়াত। শালী সম্বন্ধে, সে সপ্তপাকের সময় ভৈরবের মধ্যমের কানটা কড়িমধ্যম পর্য্যন্ত টানাতে বসন্তরাগ একটু মুচ্‌কে হেসে সেটার নকল আলাপে দেখিয়ে দিলেন। সাতপাকের পিঁড়িটা ধরেছিলেন শ্রী, মেঘ, দীপক ও নটনারায়ণ। মেঘ থাকাতে দীপক বাড়াবাড়ি করতে পারেন নি। বাসরঘরে জয়জয়ন্তী ও সাহানা দুজনে রাগমালাতে "দুটি হৃদয়ের নদী, একত্রে বহিল যদি"—গানটি ওলট্‌-পালট্‌ ক'রে গেয়ে মধুযামিনী মাতিয়ে দিয়েছিল আর কি, কিন্তু হঠাৎ বাগেশ্রী চ'টে গিয়ে জয়জয়ন্তীকে বেসুরা ও হার্ম্মনি-বিহীনা বলাতে একটা ফৌজদারি বাধ্‌বার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে সৈন্ধবী (সিন্ধু) এসে সেটা মিটিয়ে দিয়েছিল। আপনারা জান্‌বার জন্য হয় ত উৎসুক হয়েছেন যে, বর ও কনের মুখ দেখাদেখিটা উত্‌রেছিল কি রকম? সে সম্বন্ধে বিশেষ বল্‌বার কিছুই নাই, কারণ, সেটা দিব্য চক্ষুর চাহনি। বাহিরে কিছু জানা যায় নাই।

৫

একটা কথা বুঝেছেন বোধ হয়। বাসরঘরের উৎসবের পূর্ব্বেই ভৈরবী আসর হ'তে স'রে প'ড়ে কৈলাস পর্ব্বতের যে স্থানে সূর্য্যের প্রথম কিরণ প্রত্যুষে উদ্ভাসিত হয়, সেই যায়গাটাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অন্য দিন সেই কিরণের সঙ্গে সঙ্গে সে গৃহকর্ম্মে 'ব্যাপৃত' হয়, কিন্তু আজ সে দিকে না গিয়ে সে অসময়ে পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে আপনার মনে একটা গান করতে ব'সে গেল। গানটা

এত মধুর, এত বৈরাগ্যপূর্ণ, এত দরদের যে, অলকানন্দা উজিয়ে এসে ভৈরবীর পা দুখানি ধৌত ক'রে সার্থক হ'ল। সূর্য্যদেব গিরিচূড়ার আড়ালে লুকিয়ে বেলা আটটা পর্য্যন্ত শুনতে লাগলেন। পৃথ্বী তার মেরুদণ্ডের উপর পরিক্রমণ করতে ভুলে গেল। প্রভাতবায়ু পার্ব্বতীয় বনফুলের সৌরভ বক্ষে ক'রে সেখানে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

খবরটা কেউ জানতে পারে নাই, কেবল নারদ ঋষি ভোরবেলা বীণাযন্ত্রে হরিনাম করতে গিয়ে দেখেন যে, মধ্যমের তারটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। ব্যাপারটা বড় সোজা নয়। মধ্যমের তার গেলে সৃষ্টি থাকে না। গান থাকে না। হৃদয়ে ধর্ম্ম থাকে না। সংসারে কর্ম্ম থাকে না। সুতরাং তিনি ধ্যানে তথ্যটা জানতে পেরে একেবারে সেইখানে ছুটে গিয়ে কেঁদে বল্লেন, 'মা, তুই করছিস্ কি? তুই আত্মহত্যা করলে বিশ্ব যে তমিস্রায় ছেয়ে যাবে।'

ভৈরবী ঋষির দিকে তাকিয়ে বল্লে—'ঋষিপ্রবর, আপনি সঙ্গীতের গুরু। গান গাইলে আত্মহত্যা হয়, না আত্মসমর্পণ হয়? আমার মধ্যে যেটুকু তাঁর, তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, কেবল আমি কোমল গান্ধার ও নিষাদের অস্থি নিয়ে এই কৈলাসে ঘুরে বেড়াব।'

নারদ। তুই চিরটা কাল পাগ্‌লী। এখন ঘরে চল।

৬

সুরমা তার সঙ্গে অনেক ধন-দৌলত ও বিভূতি এনেছিল, সে ভৈরবীকে প্রণাম ক'রে সেগুলি দেখিয়ে বল্লে,—'দিদি, আপনাকে সাজাবার জন্য ওগুলো এনেছি মাত্র। আপনাকে সাজিয়ে দিয়ে আমি দেশে চ'লে যাব। এক সময় তুমি দুর্গারূপে দশপ্রহরণ দিয়ে অসুর বিনাশ করেছ, কখনও জগন্মোহিনীরূপে ভৈরবকে ভুলিয়েছ, কিন্তু এ যুগের সাজে তোমাকে কেমন দেখায়, সেইটুকু আমি দেখতে চাই।'

বলতে বলতে সুরমা জোর ক'রে সতীনের দিব্যদেহে সিল্ক গাউন, সিল্ক-লেসের ঘোমটা, হীরার ব্রাস্‌লেট্, কাঁচা সোনার নেক্‌লেস্, ফিলিগ্রীর জড়াও ভ্রমর, এই রকম কত জিনিষ (আমাদের অত নাম মনে নাই) থরে থরে আর্টের হিসাবে সাজিয়ে দিয়ে একটা ওলসিকারে তাকে বসিয়ে দিল এবং সোফারকে বল্লে,—'মন্দিরে নিয়ে যাও।'

ভৈরবী যে নিতান্ত খুসী হয় নাই, তাও নয়, তবু কি জানেন?—নতুন কিছুতে জড়িয়ে পড়লে এবং তাহার দিকে মন গেলে চৈতন্য একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং সুরগুলো একটু বেসুরো হয়। মন্দিরের দ্বারে কারের নির্ঘোষ শুনে ভৈরব বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, এক জন অপূর্ব্বসুন্দরী বেকুফের মত ব'সে আছে। তিনি সযত্নে তাহাকে নামিয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—'তোমারই নাম কি বাঙ্গালী?'

আপনারা বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন। কিন্তু আসল কথা, ভৈরব নিজেই জ্ঞানহারা চিরকাল। রাত্রিকালে যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে, তার চেহারা পর্য্যন্ত তিনি এখনও দেখেন নাই।

ভৈরবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে স্বামীর চরণে প্রণিপাত করলে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার স্বামী যেমনিকে তেমনিই আছেন। সে মুখ নত ক'রে বল্লে—'হাঁ, আমিই বাঙ্গালী।'

ভৈরব। তবে অমন অদ্ভুত সাজ কেন?

ভৈরবী। (বিনীতভাবে) এই রেশমগুলো রিখব, আপনার ষাঁড়ের জন্য এনেছি। এই গান্ধারটা গাঁজা ও কোমল গান্ধারটা গোলাপজল। এই ব্রাস্‌লেট্‌টা পঞ্চম। এই মোটরকারটা ধৈবত, এতে আপনার জন্য রোজ ধুতুরা চয়ন ক'রে নিয়ে আস্‌ব। এই বেণীর ভ্রমরটা নিষাদ, সে আপনার মাথার সাপের ফণার চারিদিকে গুণ গুণ ক'রে বেড়াবে।

ভৈরব। কিন্তু তা হ'লেও আমার বোধ হচ্ছে, সবগুলোই ছাই-ভস্ম, পুড়িয়ে ফেলে একেবারে তোমার গায় মাখলে কি হয়? আমি সেইটাকেই আসল বিভূতি মনে করি। আর একটা কথা—মধ্যমটা কোথায় গেল?

ভৈরবী তার বিশ্ববিমোহন দৃষ্টি ভৈরবের স্মিত চক্ষুর উপর আরোপ করে মনে মনে ভাব্‌লে, 'সেটা তোমাকে সমর্পণ করেছি।'

ভৈরব হেসে খুন হলেন ও ভৈরবীকে বক্ষে টেনে নিয়ে বল্লেন, 'প্রেমময়ি, তুমি সন্ন্যাসিনী হয়েও প্রেমময়ী। তুমিই বাঙ্গালী, তুমিই ভৈরবী। আমার সঙ্গে ক'দিন লুকোচুরি চলবে?'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রতীচ্যের তরুণ-সম্প্রদায়

একটা কথা উঠিয়াছে যে, এ যুগটি স্বাধীনতার যুগ। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মাণ-যুদ্ধ যে সকল জাতির মুক্তিলাভের সূচনা করিয়াছে, তাহা নহে, জার্ম্মাণ-যুদ্ধ যে কেবল The world safe for democracy করিবার মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা নহে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে, —ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে এ যুগে যেন একটা স্বাধীনতার আবহাওয়া বহিয়াছে। ঘরে-বাহিরে এই স্বাধীনতার প্রভাব প্রতীচ্য জাতিদিগের জীবনে অনুভূত হইতেছে।

প্রতীচ্যের জাতিবর্গের মধ্যে মার্কিণ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা go-ahead দ্রুত উন্নতিশীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। য়ুরোপের ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি এখন 'প্রাচীনপন্থীর' দলে পড়িয়াছে। সুতরাং মার্কিণ জাতির মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহার পরিচয় কিরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে এই স্বাধীনতাযুগের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

বাহিরের অর্থাৎ রাজনীতিক্ষেত্রের স্বাধীনতার সহিত এ প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই। এই যুগে মার্কিণের গৃহস্থের ঘরে স্বাধীনতার স্পৃহা কিরূপভাবে জাগিয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কর্ত্তা, গৃহিণী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পোষ্য লইয়া গৃহস্থের সংসার; এক একটি সংসারের সমষ্টি লইয়া সমাজ; সুতরাং ব্যষ্টিরূপে সংসারে যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগরিত হয়, সমষ্টিরূপে সমাজ-শরীরে তাহাই বিস্তার লাভ করে। এই হেতু মার্কিণ সংসারে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের এবং সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যবর্গের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণীত হইলে এই স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

কোনও মার্কিণ লেখক লিখিয়াছেন, দেশের দৈনিক পত্রসমূহ নিত্য পাঠ করিয়া বুঝা যায়, মার্কিণ-গৃহস্থের ঘরে সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে পাপ ও অপরাধের পরিমাণ যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, মার্কিণ পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গ বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। মার্কিণের তরুণ-সম্প্রদায় সকল প্রকারের শৃঙ্খলা ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহারা যেরূপে আইন অমান্য করিতেছে ও সমাজের সাধারণ চিরাচরিত সংস্কার ও শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সকল অভিভাবকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে। সকল বিষয়ে তরুণ-সম্প্রদায় কোনও Restraint বা বন্ধনের মধ্যে থাকিতে চাহিতেছে না; তাহারা Liberty অর্থে Licenseকে ধরিয়া লইয়াছে। সমাজ-শরীরে এই বিষ বিসর্পিত হইয়া মার্কিণের তরুণ-সম্প্রদায়কে ও তথা তাহাদের অভিভাবক গৃহস্থকে জর্জ্জরিত করিতেছে।

মার্কিণ লেখকের আক্ষেপের কারণ আছে। তিনি সখেদে বলিতেছেন,—যাহারা মার্ব্বলগুলী অথবা পুতুল লইয়া খেলা করিবে, সেই সকল বালক-বালিকা মার্কিণ দেশের জেল পরিপূর্ণ করিতেছে, ইহা কি কম দুঃখের কথা! এই সকল বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীর মধ্যে চোর-ডাকাত, এমন কি, খুনী আসামী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক সহরের ফৌজদারী আদালতসমূহের বহু বিচারক দেশকে দেখাইয়া দিতেছেন যে, আধুনিক কালে ফৌজদারী মামলার আসামী অধিকাংশই বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরী (Children in their early and middle teens). নিউইয়র্ক ষ্টেটের জেল কমিশনার যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে তরুণ অপরাধীর সংখ্যাধিক্যই সপ্রমাণ হয়।

নিউইয়র্কের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকাডু বলিয়াছেন, "আমার বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, অনাচার-অত্যাচার অপরাধে দণ্ডিত আসামীদের মধ্যে ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের নরনারীই অধিক।" নিউইয়র্কের টুমস জেলের কয়েদীদিগের ১ শত ২২ জনের

বয়স ১৬ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে, এইরূপ দেখা গিয়াছে। ব্রুকলিমের রেমণ্ড ষ্ট্রীট জেলের গত ৫ বৎসরের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়সের কয়েদীদিগের মধ্যে ১২ হাজার ৩ শত ৪২ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ৩ শত ৪৬ জন নারী। ইণ্ডিয়ানাপোলিস সহরে ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ প্রকার ভীষণ অপরাধে অপরাধীর বয়স গড়পড়তা ৩১ হইতে ২৪এ নামিয়াছে; অর্থাৎ এই ১০ বৎসরে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নরনারী এই সকল গুরু অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। মার্কিণ লেখক এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে বলিতেছেন,—The hand-writing is on the wall. বর্ত্তমানের স্বাধীনতাকামী তরুণ-সম্প্রদায় এই অবস্থায় আদৌ শঙ্কিত বা বিচলিত নহে; তাহারা বলে, এ সকল অভিযোগ 'বাইবেল-ওয়ালা' সেকেলে লোকদিগের তরুণ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বিপক্ষে অভিযানের পরিচয় দেয়। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চাহে, সেকেলে বুড়ারা ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া তরুণদিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাবৃত্তিতে হিংসান্বিত হইয়া এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, স্থিরমস্তিষ্ক চিন্তাশীল মার্কিণ-বাসীরা সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া—এই going the pace লক্ষ্য করিয়া জাতীয় অবনতির আশঙ্কায় চিন্তান্বিত হইয়াছেন।

মার্কিণ সমাজ-শরীরে এই বিষ বিসর্পিত হইবার কারণ কি? এ বিষয়ে এই প্রকৃতির ফৌজদারী মামলায় বিশেষজ্ঞ ব্যবহারাজীবগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জবাব দিয়াছেন যে, "তরুণ-সম্প্রদায়ের এই অবস্থা আনয়নের কারণ মার্কিণ-গৃহস্থের বর্ত্তমান সংসারের অবস্থা।" ওমাহা সহরের উকীল-সরকার মিঃ ওব্রায়েন বলিয়াছেন, "ঘরে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবই তরুণ-সম্প্রদায়ের অপরাধবৃদ্ধির মূলে নিহিত। অধিকাংশ পিতামাতাই তাহাদের সন্তান-সন্ততির নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাহার কারণ এই যে, পিতামাতারা নিজেদের সুখ ও বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে; সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষা দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না।"

কি ভীষণ কথা! মিঃ ওব্রায়েন আরও খোলসা করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি যে কয় বৎসর ওমাহা সহরে উকীল-সরকারের কার্য্যে ব্রতী আছি, সেই কয় বৎসরে আমি তরুণ অপ-রাধীর বিপক্ষে ৮ হাজারেরও উপর মামলা চালাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অপরাধী বালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজ লইয়াছি, তাহাদের বাল্যজীবনের পরিচয় লইয়াছি। তদ্দ্বারা আমি জানিয়াছি যে, অপরাধী বালিকাগণের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩ জনও গৃহে বা বিদ্যালয়ে বাল্যজীবনে কোনওরূপ ধর্ম্মশিক্ষা পায় নাই।"

কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের লস এঞ্জেলেস সহরের শ্রীমতী এলিস ম্যাকগিলও ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছেন। তিনি ঐ সহরের উকীল-সরকার জে, ফ্রায়েড-ল্যাণ্ডারের আফিসের কর্ম্মচারী; সুতরাং তাঁহারও অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। তিনি বলেন, "দুইটি প্রধান কারণে তরুণদের মধ্যে এই ভাবের পাপের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে;—(১) বদমায়েসী করিবার অধিক অবসরপ্রাপ্তি, (২) গৃহস্থের সংসারে নৈতিক শাসনের অভাব। প্রথম কারণের উচ্ছেদসাধন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে, কারণ, বদমায়েসীর অবসরপ্রদানের সঙ্কোচসাধন করা সম্ভব-পর; অর্থাৎ যে সময়ে বালক-বালিকারা বদমায়েসী করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে তাহাদিগকে এমন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, যাহা তাহাদের পক্ষে বিরক্তি-কর না হয়, অথচ লাভজনক হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই কারণের মূলোচ্ছেদ করা এখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, তরুণদের অভিভাবকদের মধ্যেও উচ্চ আদর্শের অভাব ঘটিয়াছে। যদি ধর্ম্মশিক্ষা অর্থে উচ্চ আদর্শ, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, সাহিত্য, সদালাপ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ, পিতৃমাতৃ-ভক্তি, দেশপ্রেম, শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি আগ্রহ বুঝায়,—তাহা হইলে আমি বলিব, এই ভাবের ধর্ম্মশিক্ষা আমাদের মার্কিণ-গৃহস্থের সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বয়স্করা যদি নিত্য আইন ও নিয়ম ভঙ্গ করে এবং তরুণরা যদি নিত্য তদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে প্রতীকারের উপায় কি?"

ফিলাডেলফিয়া জিলার উকীল-সরকার মিঃ সামুয়েল রোটান বলেন, "১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে পাপকার্য্যের মাত্রা প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহা পেনসিল্‌ভ্যানিয়া প্রদেশের কথা। পরন্তু অন্য সর্ব্বত্র ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়স্কদিগের মধ্যে যত অনাচারী অপরাধী দেখা যায়, উচ্চবয়স্কদের মধ্যে তত দেখা যায় না। এখন বয়স্ক ঝুনা পাপীদের লোমহর্ষণ চুরি-ডাকাতি ও খুন-জালিয়াতির কথা গোয়েন্দার কাহিনীতেই পাওয়া যায়, বাস্তব জগতে পাওয়া যায় না। তরুণদের এই অবনতির অনেকগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য :—

(১) সংসারের জঘন্য অবস্থা।

(২) সংসারের দারিদ্র্যহেতু জননীকে উদরান্নসংস্থানের জন্য বাহিরে চাকুরী করিতে হয় ও অধিক সময় বাহিরে অতিবাহিত করিতে হয়; এ জন্য ছেলেমেয়ের উপর মায়ের নজর রাখিবার সময় হইয়া উঠে না, মায়ের নিকট শিক্ষাই ছেলেমেয়ের বাল্যজীবন গঠন করে।

(৩) পূর্ব্বকালের ধর্ম্মের শাসনের কড়াকড়ির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বর্ত্তমানে একটা বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে।

(৪) অবাধে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(৫) জীবনযাত্রার ব্যয়ের হারবৃদ্ধি।

(৬) অসংযত বিলাসবাসনা।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে তরুণদের বিচারালয়ই একটা কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই সব আদালতে প্রায়ই বয়সের অল্পতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দণ্ডবিধান করা হয়। এ জন্য দণ্ড প্রায় নামমাত্র হয়। এই হেতু তরুণরা লঘুদণ্ডে ভীত না হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করে, পরন্তু আদালতকে খেলার ঘর বলিয়া অবজ্ঞা করে।"

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় কারণ যে সংসারের জঘন্য অবস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসংযত বিলাসবাসনার বৃদ্ধিও আর এক ভয়াবহ কারণ। সুতরাং যে জনক-জননী অথবা অন্য অভিভাবক সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের মনে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষার ভিত্তিপত্তন এবং পাপ ও বিলাসে ঘৃণার উদ্রেকসাধন না করিয়া কেবলমাত্র আপনাদের আমোদপ্রমোদের বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লালায়িত, সেই জনকজননী বা অভিভাবকরাই যে মার্কিণে এই জঘন্য অবস্থা আনয়নের জন্য মূলতঃ দায়ী, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? বালটিমোরের উকীল-সরকার মিঃ হার্বার্ট ওকোনার পিতামাতার দায়িত্বের কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলিয়াছেন :—

"পিতামাতার এলাকাড়ি (অর্থাৎ কর্ত্তব্যে শিথিলতাপ্রদর্শন) যত অনিষ্টের মূল। তাহারা ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়ীটিকে আকর্ষণের স্থলে পরিণত করিতে পারে না। ছেলেমেয়েরা এই জন্য সকল সময়ে বাহিরে অসৎসংসর্গে কাটাইতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা বাড়ীটিকে কেবল খাইবার, শুইবার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার আড্ডা বলিয়া মনে করে। একে মাতার নিকট শিক্ষার অভাব, তাহার উপর পিতাও ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া সময়ে সময়ে ভ্রাতৃভাবে বা বন্ধুভাবে সংসারের সম্বন্ধে কোনও পরামর্শ করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। ইহাতেই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। অবস্থা এত দূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বালটিমোরে সকল প্রকার জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত ৬ হাজার আসামীর মধ্যে শতকরা ৮০ জনই তরুণ-সম্প্রদায়ের বলিয়া জানা গিয়াছে। যে বয়সে তাহারা এই পাপ কায করিয়াছে, পূর্ব্ব-যুগে সেই বয়সের ছেলেমেয়েরা সে সব পাপের কল্পনাও করিতে পারিত না।"

কি ভীষণ অবস্থা! এটালাণ্টার উকীল-সরকার বলিয়াছেন, এখনকার পিতামাতা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব কেবল স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়, মোটর-বিহারে, হোটেলের নাচে, রঙ্গতামাসায়, থিয়েটারে, সিনেমায় বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়, ছেলেমেয়ে শাসন করিবার অবসর পাইবে কোথায়?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 'ওয়াশিংটন ষ্টার' পত্র লিখিয়াছেন, "তরুণদের মধ্যে এই অনাচার ও পাপবৃদ্ধি অতীব ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। ডাকাইতি, দাঙ্গা, খুন প্রভৃতি ভীষণ অপরাধসমূহ আজকাল তরুণদের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে। ওয়াশিংটনের বিশপ (পাদরী) সে দিন ধর্ম্মবক্তৃতাদানকালে বলিয়াছেন, এ জন্য পিতামাতারা দায়ী; কারণ,

তাহারা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে বলিয়াই দেশের ও জাতির এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। তাঁহার এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দিন দিন আমাদের সংসারে পিতামাতার শাসন ও কর্তৃত্ব লোপ পাইতেছে, সংসারে ছেলেমেয়ের সুখ নাই, তাহারা মাতাপিতার ভ্রাতা-ভগিনীর নৈতিক প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। পিতামাতারা স্বয়ং বিলাসলালসাপরায়ণ হইয়া ছেলেমেয়েদের সৎশিক্ষা ও সদ্‌দৃষ্টান্ত দিতে পারে না। তাই বর্ত্তমানে সমাজ পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সাধু নহে, নৈতিক হিসাবে বর্ত্তমানে তরুণরা অবনত হইয়াছে।”

এ অবস্থা কোন দেশেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা ‘ব্যক্তিগত স্বাধীনতা’ ও ‘স্বাতন্ত্র্য’ বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে মার্কিণের স্থিরমস্তিষ্ক চিন্তাশীল সম্প্রদায় ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহারা এ অবস্থার প্রতীকারোপায় অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—এখন হইতে মার্কিণ পিতামাতাকে ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য আবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, এ জন্য তাহাদিগকে কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, নিজেদের বিলাসলালসা ও সুখ-কামনা সংযত করিতে হইবে; অন্যথা সমাজ অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। আটালাণ্টা বিভাগের উকীল সরকার মিঃ পল কার্পেণ্টার বলিয়াছেন, ইহার ঔষধ,—“Home earlier in the evenings, more of the fireside frank discussions and closer companionship with the family is the only salvation for posterity.”

এক দিকে যেমন এইরূপ ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইতেছে, অন্য দিকে আর এক শ্রেণীর মার্কিণ সমাজতত্ত্বজ্ঞ এই শ্রেণীর moralistদিগকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া শাসাইতেছেন যে,—এ সকল ধর্ম্মকথা এ কালে কেহ শুনিবে না; বরং এমন ভাবের বাঁধনকষণের কড়াকড়ি করিতে গেলে গিরো ফস্কা হইয়া যাইবে। কুমারী ডোরোথি ডিক্স এই শ্রেণীর লোক। মার্কিণদেশে নারীর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিশেষ খ্যাতি আছে, তিনি না কি আধুনিক Sex Psychology শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। তিনি ঘরের শাসন সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—“সে দিন নিউইয়র্কের এক গৃহস্থের গৃহিণী তাঁহার ১৬ বৎসরবয়স্কা কন্যার ‘রাত-বেড়ানো’ রোগ সারাইবার জন্য বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফলে এই হইয়াছে যে, কন্যা মাতাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, বজ্র আঁটুনির এমনই ফস্কা গিরো হইয়া থাকে। যে সকল ছেলে-মেয়ে ‘বয়ে’ যাইতেছে (Flappers going the pace), নীতিবিদ্‌রা তাহাদের মন্দ দিকটাই কেবল দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের নিজের দিক হইতে যে একটা কথা বলিবার আছে, তাহা দেখেন না। মেয়েরা বলে, ‘আমাদের বাপ-মা আমাদের পুরুষ-বন্ধুদের সহিত আমোদ-প্রমোদের দিন নির্দ্দিষ্ট করিতে দেন না; কাযেই বাহিরে যাইতে হইলে আমাদিগকে মিথ্যা বলিতে হয়। মিথ্যা বলিলে বালক-বন্ধুরা আমাদিগকে সম্মান করে না। কিন্তু উপায় কি? আমরা মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকিতে পারি না, সুতরাং বাহিরে যাইবার জন্য ছুতা করিতেই হইবে।’ নীতিবিদ্ উপদেশকরা ইহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, ‘ছি! এমন করিতে নাই। তোমরা ভাল মেয়ে হও, বাপ-মাকে মান্য কর, তাঁহাদের বাধ্য হও, তবেই তোমরা সুখী হইবে।’ কিন্তু দুঃখ এই, এই উপদেশ ভস্মে ঘৃতাহুতির মত হইতেছে। ১৬ বৎসরের মেয়ে এত ধর্ম্ম-কথার জন্য লালায়িত নহে; তাহাদের বয়স আর ৫ জন মেয়েদের মত বয়সের আমোদ চাহে। তাহারা তোমার, আমার বা পিতামাতার অথবা ধর্ম্মবক্তার উপদেশ শুনিতে চাহে না। অতএব হে পিতামাতা, গুরুজন ও ধর্ম্মোপদেশকমণ্ডলি! আপনারা অবহিত হউন, আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে বাঁধনকষণের নাগপাশে পিষিয়া ঘরের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। আপনারা জাগ্রত হউন, কালের ধর্ম্ম পালন করুন। মনে করিবেন না যে, আপনাদের ছেলেমেয়ে এ যুগের অন্যান্য ছেলেমেয়ে হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির। আপনাদের বালিকাদিগকে বোতলে ছিপি আঁটিয়া ঘরে আটক করিয়া রাখিবেন, এমন কথা মনে স্থান দিবেন না। ঘরে ছিপি আঁটিয়া রাখিলে তাহারা বাহিরের অন্যান্য বালিকাদের বাসনা, কামনা ও লালসার ত ম

হইতে অব্যাহত থাকিবে, এ কথাও ভুলিয়া যাউন। আপনাদের মেয়েদের নিকট আপনারা পূর্ণ বাধ্যতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাও বিস্মৃত হউন। মেয়েরা বাপ-মা'র হাতে কাদার ডেলা হইবে, এ যুগের তাহা প্রকৃতিই নহে। এ যুগেও মেয়েরা পূর্ব্বের মত ১৬ বৎসরে একবারে সরলা, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা, পুতুল-খেলায় রত থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু Alice in wonderland অথবা পরীর গল্প পাঠে অভিনিবিষ্টা বালিকার সংখ্যা এখন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখনকার বালিকারা Aliceএর পরিবর্ত্তে The Sheik পড়িতে ভালবাসে। এখন ১৬ বৎসরের মেয়ে ৬০ বৎসরের মত চতুরা, সংসারজ্ঞানে পরম অভিজ্ঞা। সুতরাং সকল মেয়ে যে ভাবে জীবনযাপন করিতেছে, সেই ভাবে আপনাদের ঘরের মেয়েকে জীবনযাপন করিতে নিষেধ করিবার আপনাদের কেন,—জগতের কোন শক্তিরই সাধ্য নাই। আপনারা মনে রাখুন,—আপনাদের মেয়েরাও পুরুষ-বন্ধু খুঁজিবে; তাহারা পুরুষ-বন্ধুদের সহিত চড়ুইভাতি বা অন্য আমোদ প্রমোদের দিন স্থির করিবে; তাহারা নাচ-গানের মজলিসে যোগ দিবে; তাহারা থিয়েটার, সিনেমা দেখিতে যাইবে। যদি প্রকাশ্যে সুবিধা হয়, তবে তাহারা প্রকাশ্যে যাইবে; সে সুবিধা না হইলে—বাধা পাইলে তাহারা লুকাইয়া যাইবে। সুতরাং আপনাদের পক্ষে দুই পথ উন্মুক্ত:—(১) যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে বাধা না দিয়া মেয়েকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী পথে পরিচালনা করা, সেই পথেই ভাল হইতে শিক্ষা দেওয়া, অন্যথা (২) মেয়েকে পদে পদে বাধা দিয়া তাহার জাহান্নমের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া।"

ব্যাপার বুঝুন! সৌভাগ্যের কথা, এখনও মার্কিণে ধর্ম্মের শাসন, সমাজের শাসন মানিয়া চলে, এমন লোক আছে। পাদরী পল জোন্স 'স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা' বনাম 'আইন ও বন্ধন' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী রচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

মানুষ বলে, আইন করিয়া মানুষকে দেবতায় পরিণত করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি আমাদের সমাজে এমনভাবে আইন করা যায় যে, সমাজের কতকগুলি সদুদ্দেশ্য তাহাতে সংসাধিত হইতে পারে। পথ-চলাচল, গৃহ-নির্ম্মাণ, খাদ্য-বণ্টন, ব্যবসায়ের লেন-দেন, বিবাহাদি সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ কতকগুলি আইন বা বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, থাকিতে বাধ্য হয়, অন্যথা সমাজ অচল হইত। এইটুকুই সমাজের পরম লাভ। ইহার অধিকন্তু ধর্ম্ম ও নীতি-সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা আইন মানিয়া চলাও মানুষের স্বভাব। সে স্বভাবের অভাব হইলেই সমাজে শৃঙ্খলার অভাব হয়। সমাজবদ্ধ জীবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেমন এক দিকে কতকগুলি অধিকার ও দাবী থাকে, তেমনই অন্য দিকে কর্ত্তব্য ও বাধ্য-বাধকতাও থাকে। আলোক ও অন্ধকারের মত এই দুই দিক পরস্পর interdependent, একের অভাবে অন্যের সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ততক্ষণ অবাধ ও অব্যাহতগতি হইতে পারে, যতক্ষণ উহা সমাজ-শরীরের ব্যথাদায়ক না হয়। তাই মানুষের ব্যষ্টি হিসাবে যেমন rights থাকে, তেমনই মনুষ্যসমাজের সমষ্টি হিসাবেও rights থাকে। আবার অন্য দিকে উভয়ের পরস্পরের প্রতি obligationsও থাকে। যদি যদু এমনভাবে কার্য্য করে যে, তাহাতে শ্যাম ও রামের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে সমাজ যদুর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সামাজিক আইনতঃ সম্পূর্ণ অধিকারী। এখানে যদিও যদুর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সমাজের প্রতি যদুর যে obligation আছে, তাহার হিসাবে তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

এই মূল কথাটা বুঝিতে পারিলে আধুনিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অথবা sex-psychology প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথার সহজ সরল সুমীমাংসা আপনিই হইয়া যায়। এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কেন না, এ সমস্যা আমাদের দেশের নহে, প্রতীচ্যের। তবে বাতাস যে ভাবে বহিতেছে, আমাদের আধুনিক কোনও কোনও রচনায় যেভাবে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ায় ক্ষতি নাই। আশা করি, এ বিষয়ে দেশে আলোচনার অভাব হইবে না।

বাস্তু-শিল্পীর পত্নী

১

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে "ডন্ এনরীক্" তোলেদো নগর অবরোধ করে। কিন্তু রাজার একান্ত বাধ্য ও অনুগত নগরবাসীরা খুব সাহস ও জেদের সহিত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল।

অনেক সময় তোলেদোনগরবাসীরা, সান-মার্টিনের জমকালো সেতু পার হইয়া "সিগারালের" শত্রু-ছাউনীর উপর গিয়া পড়িত। তাহাতে অবরোধকারী সৈন্য ছারখার হইয়া যাইত।

এইরূপ আক্রমণ নিবারণ করিবার মানসে ডন্ এনরীক্ সেতুটা ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

'সিগারালের' উপর সৈন্যদের ছাউনী স্থাপিত হইয়াছিল। এই সুন্দর ভূভাগের চারিদিকে সতেজ-বর্দ্ধিত ফলের বাগান, প্রমোদ-কানন ও গ্রীষ্ম-আবাস সকল অবস্থিত ছিল। এই স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্যের খ্যাতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া "তির্সো" এবং অন্যান্য স্পেনীয় কবি ইহার যশোগান করিয়াছিলেন।

এক দিন রাত্রিকালে ডন্ এনরীকের সৈনিকরা পত্র-পল্লববহুল সতেজ বৃক্ষগুলাকে কাটিয়া, সেতুর উপর জমা করিয়া রাখিল। প্রভাতে দেখা গেল, সেতুর উপর বিশাল অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, অগ্নি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উহার দীপ্তিতে সৈন্য-ছাউনী, টেগস্-নদী, রাজা ডন্-রদ্রিগোর প্রাসাদ এবং ক্ষুদ্র আরব-ধ্বজা-অট্টালক (tower) সমস্তই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ কারুদিগের হাতের সুন্দর কায-করা পিলপাগুলা মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—মনে হইল, যেন উহা বর্ব্বরতার দ্বারা উৎপীড়িতা কলাদেবীর করুণ হাহাকার।

এই ভীষণ দৃশ্যে জাগিয়া উঠিয়া তোলেদোর অধিবাসীরা ছুটিয়া আসিল এবং এই সুন্দর ইমারতের সম্পূর্ণ ধ্বংস নিবারণ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। একটা ভীষণ হড়মুড় শব্দ শুনা গেল; সেই শব্দে টেগস্ নদীর খাড়ী, নালা ও উপত্যকাভূমি—সমস্তই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, সেতুটা আর নাই।

হায় হায়! তাই বটে!

যখন উদীয়মান সূর্য্য 'সাম্রাজ্যিক নগরের' গুম্বজগুলাকে স্বর্ণরাগে রঞ্জিত করিল, তোলেদোর কুমারীরা—যাহারা নদীর স্বচ্ছ-স্ফটিক জল কলসীতে ভরিয়া লইবার জন্য নদীর ধারে আসিয়াছিল, তাহারা খালি কলসী মাথায় করিয়া বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া গেল। নদীর স্বচ্ছ জল ঘোলা ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেন না, নদীর কল্লোলময় তরঙ্গরাজি তখনও সেতুর ধূমায়মান ভগ্নাবশেষ সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

লোকের রোষ উচ্চতম সীমায় উঠিল, কারণ, মনোরম "সিগারাল" ভূমিতে যাইবার উহাই একমাত্র পথ ছিল।

সমস্ত দলবল একত্র করিয়া তোলেদোবাসীরা একটা শেষ চেষ্টা করিল, ভীষণভাবে ছাউনী আক্রমণ করিল, রণস্থলে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া গেল, শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিল।

২

সান্-মার্টিনের সেতু ধ্বংস হইবার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। রাজারা, রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যেরা,—উহার স্থানে ঐ রকম মজবুৎ ও সুন্দর আর একটা সেতু নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া মতলব আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু খুব প্রসিদ্ধ বাস্তু-শিল্পীদিগের প্রতিভা ও অধ্যবসায় তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।

নদীর দ্রুত ও প্রবল স্রোত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলান সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই মিস্ত্রীদের ভারার মাচান্ ও কাঠাম ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

ডন্-পেদ্রো ও তোলেদোর প্রধানাচার্য্য স্পেনের সমস্ত নগরে নকীব পাঠাইয়া, সান্-মার্টিনের সেতু নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্য কি খৃষ্টান, কি মুরজাতীয় সকল বাস্তু-শিল্পীকেই আহ্বান করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। নির্ম্মাণের বাধা-বিঘ্ন দুরতিক্রমণীয় বলিয়া বিবেচিত হইল।

অবশেষে এক দিন এক জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোক—যাহারা ঐ স্থানের সম্পূর্ণ অপরিচিত—কাম্ব্রোন্-ফাটক দিয়া তোলেদো নগরে প্রবেশ করিল। উহারা খুব সাবধানে বিধ্বস্ত সেতুটা পরিদর্শন করিল এবং সেই স্থানে বাসা করিয়া থাকিবে স্থির করিল।

তার পরদিন পুরুষটি প্রধানাচার্য্যের প্রাসাদে যাত্রা করিল। তখন সেই পূজ্যপাদ প্রধান আচার্য্য—পরামর্শ-সভার পুরোহিতবর্গ, বিদ্বজ্জন, প্রখ্যাত নাইটদের লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রধানাচার্য্যের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মজ্ঞান উঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

যখন তাঁহার এক জন পরিচারক আসিয়া জানাইল যে, দূরদেশ হইতে সমাগত এক জন বাস্তু-শিল্পী তাঁহার শ্রীচরণের দর্শনপ্রার্থী, তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

প্রধানাচার্য্য তখনই তাহাকে আদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথম অভিবাদন-ব্যাপার হইয়া গেলে, তিনি উহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি বলিতে আরম্ভ করিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার নাম আপনার জানা নাই—আমার নাম 'জুয়ান-দে-আরেভালো'। বাস্তু-শিল্প আমার পেশা।

"সান্-মার্টিনের সেতু পুনর্নির্ম্মাণের জন্য নিপুণ শিল্পীদের নিকট আমি যে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেম, সেই আমন্ত্রণ অনুসারেই তুমি কি এখানে এসেছ?"

"হাঁ, আমি সেই আমন্ত্রণ পেয়েই এসেছি।"

"ইহার নির্ম্মাণে যে বাধাবিঘ্ন, তা কি তুমি অবগত আছ?"

"আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, কিন্তু ঐ সব বাধাবিঘ্ন আমি অতিক্রম করতে পারব।"

"বাস্তু-শিল্পবিদ্যা তুমি কোথায় শিখেছিলে?"

"সালামাঙ্কায়।"

"তোমার নৈপুণ্যের প্রমাণ কি দেখাতে পার? তোমার হাতের তৈরী কোন ইমারৎ আছে কি?"

"কিছুই না, ধর্ম্মাবতার!"

প্রধানাচার্য্য একটু অধৈর্য্য ও অবিশ্বাসের ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। বাস্তু-শিল্পী তাহা লক্ষ্য করিল।

সে বলিতে লাগিল, "যুবাবয়সে আমি এক জন সৈনিক ছিলেম, কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সৈনিকের কায ছেড়ে দিয়ে আমার জন্মভূমি কাস্টিলে ফিরে আসি। সেইখানে আমি ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক বাস্তু-বিদ্যা শিখতে আরম্ভ করি।"

প্রধানাচার্য্য উত্তর করিলেন, "দুঃখের বিষয়, তোমার নৈপুণ্যে কোন কায হয়েছে—এরূপ প্রমাণ ত তুমি দেখাতে পারলে না।"

"কতকগুলা ইমারৎ আমি তৈরী করেছিলাম, কিন্তু তার প্রশংসার

ভাগী অন্যে ছিল—যে প্রশংসা এ দাসের প্রাপ্য, এ দাস সেই প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হ'ল।"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।"

বাস্তু-শিল্পী উত্তর করিল, "আমি দরিদ্র, সামান্য লোক, আমাকে কেউ জানত না। আমার এক মুঠো অন্ন ও একটু আশ্রয়স্থান পেলেই আমি যথেষ্ট মনে করতেম। যশ-খ্যাতি আমি কখনও চাইনি।"

"বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমার নৈপুণ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, এরূপ কোন প্রমাণ তুমি দিতে পারছ না।"

"ধর্ম্মাবতার, আমি এমন একটা জিনিষ পণ রাখতে পারি, যে পণে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।"

"সেটা কি?"

"আমার প্রাণ!"

"বুঝিয়ে বল।"

"যখন মধ্যস্থলের খিলানটা সরিয়ে লওয়া হবে, তখন আমি তার মধ্য-প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াবো। যদি সেতুটা ভেঙ্গে পড়ে, তা হ'লে আমিও সেই সঙ্গে প্রাণ হারাবো।"

"আচ্ছা, আমি এই পণ গ্রাহ্য করলেম।"

"ধর্ম্মাবতার, আমার কথায় বিশ্বাস করুন—আমি এই কাযটা ক'রে তুলব!"

প্রধানাচার্য্য বাস্তু-শিল্পীর হস্তপীড়ন করিলেন। শিল্পী আশাপূর্ণ হৃদয়ে হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। তাহার পত্নী উৎকণ্ঠার সহিত তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুঃখ-দারিদ্র্যের উপদ্রব সত্ত্বেও সে তখনও তরুণবয়স্কা ও সুন্দরী ছিল।

বাস্তু-শিল্পী পত্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "কাতেরীন্! আমার কাতেরীন্! যে সকল কীর্ত্তি-মন্দিরে তোলেদো বিভূষিত, তার মধ্যে একটা আরেভালোর নাম চিরস্মরণীয় করবে।"

৩

কিয়ৎকাল পরে নূতন সেতুর কার্য্য আরম্ভ হইল। মাচান ও কাঠাম দিয়া সেতুটা পরিবৃত হইলেও, উহার মধ্যবর্ত্তী খিলানটা খাড়া হইয়া উঠিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই নূতন সেতু পূর্ব্ব-সেতুর ধ্বংসাবশেষের উপর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রধানাচার্য্য, ডন্-পেড্রো, তোলেদোর অধিবাসীরা সকলেই বাস্তু-শিল্পীর উপর উপহার ও প্রশংসা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নদীর দুর্জ্জয় স্রোতোবেগ সত্ত্বেও, বাস্তু-শিল্পীর নৈপুণ্য এই মধ্য-খিলান যুড়িয়া দিয়াছে; এই বিরাট ইমারৎ অপরিসীম সাহসের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

তোলেদো নগরের রক্ষাকর্ত্তা সিদ্ধ সাধুপুরুষের উৎসব-পর্ব্ব আসন্ন। আরেভালো প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে বিনীতভাবে জানাইল—এখন কাযের আর কিছুই বাকী নেই—যে ভারা ও কাঠাম ইমারৎকে ধারণ করিয়া ছিল, সেই ভারা ও কাঠামগুলা এখন সরিয়ে ফেললেই হবে। প্রধানাচার্য্য ও পৌরজনদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু এই মাচান ও কাঠামগুলো—যাহা ইমারৎকে ধারণ করিয়াছিল—এইগুলার অপসারণে প্রভূত বিপদ আছে। কিন্তু বাস্তু-শিল্পী খিলানের মধ্য-প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইবে বলিয়া নিজের প্রাণকে পণ রাখিয়াছিল—এই কথা স্মরণ করিয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে তাহার কৃতিত্বে বিশ্বাস করিয়াছিল।

তাহার পরদিন নূতন সেতুর উদ্ঘাটন উপলক্ষে গুরুগম্ভীর আশীর্ব্বচন পঠিত হইবে। এই মহতী ঘটনার ঘোষণাচ্ছলে তোলেদোর সমস্ত গির্জ্জা হইতে ইহারই মধ্যে আনন্দের ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। তোলেদোবাসীরা টেগস্ নদীর উচ্চ তট হইতে আনন্দের সহিত মনোরম 'সিগারাল' ভূখণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছে। যে স্থান এত বৎসর ধরিয়া জনশূন্য ও নিস্তব্ধ ছিল, কাল আবার উহা জীবন-চাঞ্চল্যে পূর্ণ হইবে।

রাত্রি আসন্ন। উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত প্রস্তুত কি না দেখিবার জন্য বাস্তু-শিল্পী মধ্য-খিলানের উপর আরোহণ করিল। আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেতুর সমস্ত কায ও উদ্যোগ-আয়োজন পরিদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহের ভারে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। একটা কথা তাহার মনে হইল—সেই কথা মনে করিয়া তাহার রক্ত জল হইয়া গেল। সেতু হইতে নামিয়া আসিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল।

দ্বারদেশে তাহার স্ত্রী তাহাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল এবং দুই একটা হর্ষসূচক কথা বলিয়া অভিনন্দন করিল। কিন্তু স্বামীর মুখে উৎকণ্ঠার ভাব দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইল। ভীত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ও মা! এ কি! তোমার কি অসুখ করেছে?"

হৃদয়ের আবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বাস্তু-শিল্পী উত্তর করিল, "না, প্রিয়ে!"

"আমার কাছে লুকিও না! তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—তোমার একটা কি কষ্ট হচ্ছে।"

"ওঃ, সন্ধ্যার সময় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে আর খাটুনীটাও একটু বেশী হয়েছে।"

"এসো, উনানের কাছে ব'সে আগুন পোয়াও—আমি ততক্ষণ আহারের আয়োজন করি—পেটে কিছু পড়লে ও একটু বিশ্রাম করলে আরাম বোধ করবে।"

আরেভালো মনের কষ্টে আপন-মনে গুন্ গুন্ স্বরে বলিতেছিল, "আরাম! আরাম!" সেই সময় তাহার স্ত্রী আহারের আয়োজনে ব্যস্ত, উনানের ভিতর কতকগুলা জ্বালানি কাঠ ফেলিয়া দিয়া, উনানের কাছে খাবার টেবল স্থাপন করিল।

শিল্পী মনের বিষণ্ণতাকে জয় করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হইল। স্ত্রীকে ভোগা দিতে পারিল না।

স্ত্রী বলিল, "আমাদের বিবাহিত জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম তোমার একটা কষ্ট আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছ। আমি কি আর তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের যোগ্য নই?"

শিল্পী বলিয়া উঠিল, "কাতেরীন্! ঈশ্বরের দোহাই, আমার ভালবাসায় সন্দেহ ক'রে তুমি আমার কষ্ট আর বাড়িও না।"

স্ত্রী তীব্র বেদনার স্বরে উত্তর করিল, "যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে প্রকৃত ভালবাসা থাকতে পারে না।"

"তোমার ভালর জন্যই একটা কথা তোমার কাছে গোপন করছি!"

"সে নিশ্চয়ই একটা কষ্টের কথা, আমি জানতে পেলে সেই কষ্ট লাঘব করতে পারব।"

"লাঘব করবে? অসম্ভব!"

"আমার যে ভালবাসা, তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।"

"আচ্ছা বেশ! তবে বলি শুন। কাল আমার প্রাণ ও মান—দুই-ই আমি হারাব। সেতুটা ভেঙ্গে নদীতে প'ড়ে যাবে। আর আমি মধ্য-প্রস্তরখণ্ডের 'পর দাঁড়িয়ে থাকায়, এত আশা ক'রে যে ইমারৎ তৈরী করেছিলাম—সেই ইমারতের সঙ্গে আমিও ধ্বংস হব।"

কাতেরীন নিজের মনঃকষ্ট চাপিয়া প্রেমের আবেগভরে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না!"

"হাঁ প্রিয়ে, জয়লাভ করেছি ব'লে যে সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, হঠাৎ সেই সময় দেখতে পেলেম—একটা গণনার ভুলে,

কাল সেতু থেকে কাঠামটা সরিয়ে নিলেই সমস্ত সেতু ভেঙ্গে পড়বে। আর সেই সঙ্গে শিল্পীও প্রাণ হারাবে।"

"না প্রিয়তম, সেতুটা ভেঙ্গে নদীর জলে পড়তে পারে, কিন্তু তুমি কখনই পড়বে না। আমি প্রধান আচার্য্যের পায়ে প'ড়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোমাকে চুক্তি-পণ থেকে মুক্তি দেন।"

"তোমার প্রার্থনা কখনই গ্রাহ্য হবে না। যদি বা প্রধানাচার্য্য তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন, আমি এই মানহীন প্রাণ কখনই রাখব না।"

কাতেরীন্ উত্তর করিল, "আমি বলছি, প্রিয়তম, তোমার প্রাণ ও মান দুই-ই রক্ষা পাবে।"

৪

দ্বিপ্রহর রাত্রি। শিল্পী কষ্ট ও উৎকণ্ঠায় অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এই জ্বালাময়ী নিদ্রায় "প্রকৃতির মধুর আরোগ্যকারী" লক্ষণ অপেক্ষা উৎকট দুঃস্বপ্নের লক্ষণই বেশী ছিল।

ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী কিয়ৎকাল নিদ্রার ভাণ করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। যখন দেখিল, তাহার স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে, তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জানালাটা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

অন্ধকার রাত্রি। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের দীপ্ত প্রভা আকাশকে উদ্ভাসিত করিতেছে। প্রবলবেগে বহমান টেগস্ নদীর গর্জ্জন এবং সেতুর মাচান্ ও জটিল কাঠামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনা যাইতেছে না।

কাতেরীন নিঃশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। উনান হইতে একটা আধ-পোড়া ধূমায়মান জ্বলন্ত কাঠ লইয়া, তাড়াতাড়ি একটা ক্লোক্ পিঠের উপর ফেলিয়া নিস্তব্ধ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

কোথায় সে যাইতেছে? চন্দ্রহীন রাত্রির ঘোর অন্ধকারময় পথ আলোকিত করিবার জন্য মশালের মত কি ঐ জ্বলন্ত চেলা-কাঠটা লইয়া যাইতেছে? রাস্তাটা বাস্তবিকই খুব ভয়াবহ ছিল—বন্ধুর জমী—বড় বড় ভাঙ্গা প্রস্তরখণ্ডে সমাচ্ছন্ন। তথাপি সে ঐ জ্বলন্ত চেলা-কাঠটা তার ক্লোকের ভিতর লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অবশেষে সে সেতুতে আসিয়া পৌঁছিল। তখনও বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছিল এবং পিলপাগুলার গায়ে নদীর স্রোত রোষভরে আছড়াইয়া পড়িতেছিল।

কাতেরীন্ সেতুর পোস্তার কাছে আসিল। একটা অনিচ্ছাকৃত শিহরণ তাহার শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। গর্জ্জনকারী অতল জলরাশির ধারে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া কি এইরূপ হইল? অথবা এতাবৎকাল সে দয়ার কাযে অভ্যস্ত ছিল—এখন তাহাকে ধ্বংসের মশাল জ্বালাইতে হইয়াছে, এই জন্যই কি সে শিহরিয়া উঠিল? অথবা সেই মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ বজ্রধ্বনি হইয়া সমস্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সে কি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল?

ইতস্ততঃ আন্দোলন করিয়া মশালটাকে আবার জ্বালাইয়া তুলিয়া মাচানের ধুনা-পর্ভিত শুষ্ক কাঠে তাহা ধরাইয়া দিল। কাঠগুলা তৎক্ষণাৎ দাউ দাউ ক'রয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং অগ্নিশিখা বাতাসে আরও বর্দ্ধিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল—ক্রমে প্রসারিত হইয়া খিলান, কাঠাম—সমস্ত সেতুকে আচ্ছন্ন করিল।

তখন ঐ স্থান ছাড়িয়া সে চট্ করিয়া চলিয়া গেল। প্রজ্বলিত অগ্নির প্রভা ও বিদ্যুতের আলোর সাহায্যে সমস্ত পথ পার হইয়া সে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। যেমন নিঃশব্দে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তাঁহার স্বামী তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন,—স্ত্রীর অনুপস্থিতি সে জানিতে পারে নাই। কাতেরীন্ আবার নিদ্রার ভাণ করিল, যেন সে কখনই শয্যা ত্যাগ করে নাই।

আর কিয়ৎমুহূর্ত্ত পরে সহরের ভিতর লোকের ছুটাছুটির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগুন লাগিয়াছে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সকল গির্জ্জার ঘড়ী হইতেই বিপৎসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। তার পর একটা হুড়মুড় দুদ্দাড় শব্দ হইল—তার পর একটা যন্ত্রণাসূচক চীৎকারধ্বনি—এরূপ ভীষণ শব্দ বহু বৎসর যাবৎ শুনা যায় নাই।

বাস্তু-শিল্পী আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল, কাতেরীন্ তাহার পাশে শুইয়া ছিল—যেন প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। এই গোলমালের কারণ কি জানিবার জন্য শিল্পী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সেতু আগুনে পুড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে খুসী হইল।

প্রধান আচার্য্য ও নগরের লোকরা ঠিক্ করিল, মধ্য-খিলানে বাজ পড়িয়া সমস্ত জ্বলিয়া গিয়াছে। জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণিত হইল। বিশেষতঃ বাস্তু-শিল্পীর প্রতি সকলেই আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। যে সময় তাহার বিজয়-কীর্ত্তি আসন্ন, সেই সময় কি না তাহার সমস্ত আশা ভস্মীভূত হইয়া সে ঘোর নৈরাশ্যে পতিত হইল। শিল্পী ভাবিল, এ ভগবানেরই কায। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ এই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছেন।

যাহা হউক, তাহার বিজয়-গৌরব এক বৎসরমাত্র পিছাইয়া গেল। পর-বৎসরেই সেই 'সান্-ইল্ডিফন-সোর' পর্ব্ব উপলক্ষে, তাহার নির্ম্মিত নূতন সেতু, গুরু-গম্ভীর অনুষ্ঠান সহকারে শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত হইল। আবার নগরবাসীরা আনন্দে টেগস্ নদী পার হইয়া মনোরম সিগারাল ভূখণ্ডে যাইতে আরম্ভ করিল। সেই শুভদিনে প্রধানাচার্য্য একটা জাঁকালো রকমের ভোজ দিলেন। তাঁহার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিল বাস্তু-শিল্পী ও তাহার পত্নী; একটা খুব স্তুতিবাচক বক্তৃতার পর সমস্ত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করিতে করিতে তুমুল কোলাহল সহকারে দম্পতিকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

তখন হইতে ৫ শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এই সেতু বেগবতী টেগস্ নদীর উপর অকম্পভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বাস্তু-শিল্পীর দ্বিতীয় গণনায় আর কোন ভুল ছিল না। *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* স্পেনীয় লেখক Antonio de Trueba হইতে অনুদিত।

জীবন-প্রদীপ

সাঁজের জ্বালানো মোর মোমের বাতিটি
নিবে গেছে বহ্নিতাপে হয়ে বিগলিত
মিটি মিটি আলো দিয়ে, অতর্কিতে হায়।

না জানি জীবন-দীপ আমারও কখন
সংসার-বহ্নির তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া
মিমিবে পড়িবে লুটে অন্তিম শয্যায়।

লতিকা।

বিশ্বযুদ্ধের নায়ক-নায়িকা

এমন বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের নায়কগণের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছেন, আবার কেহ কেহ বা এখনও জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত লোকলোচনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সে সকল পুরুষপ্রধানের কথার পুনরাবৃত্তি কোনও কালেই অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। তাঁহাদের চিত্র—তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যত্নে সংগৃহীত করিয়া রাখিবার যোগ্য।

·মার্শাল ভন হিণ্ডেনবার্গ

মার্শাল ভন হিণ্ডেনবার্গকে হঠাৎ তাঁহার কৃষিক্ষেত্র হইতে জার্ম্মাণ রাজনীতিক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে, জার্ম্মাণজাতি তাঁহাকে তাহাদের সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করিয়াছে। আজ গভীর অন্ধকার হইতে জগতের রঙ্গস্থলে হিণ্ডেনবার্গের অবতরণে বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী কত কথাই মনে উদয় হইতেছে।

হিণ্ডেনবার্গ মহাযুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণজাতির পরম প্রিয় নেতার পবিত্র পদ অধিকার করিয়াছিলেন—তিনি Idol of the German people বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহার দেশের লোক তাঁহার প্রকাণ্ড দারুমূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল,—এমন কি, বহু জার্ম্মাণ-নরনারী তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে দূর-দূরান্তর হইতে সমুপাগত হইত, প্রতিমূর্ত্তির স্থান তীর্থবিশেষে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে জার্ম্মাণ-পরাজয় ঘটিলে অন্যান্য War Lord অথবা সমর-নেতাদিগের পতন হইলেও হিণ্ডেনবার্গের পতন হয় নাই, তিনি স্বেচ্ছায় রাজনীতির ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রাচীন রোমক যোদ্ধার ন্যায় নির্জ্জনে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোক নেতার অভাবে তাঁহাকেই নেতৃপদে বরণ করিয়া নির্জ্জনাবাস হইতে মাথায় করিয়া বাহিরের জনকোলাহল-মুখরিত রাজনীতিক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে।

এই মহাযুদ্ধের প্রধান নায়ক অষ্ট্রীয়ার আর্কডিউক ফ্রান্‌জ ফার্ডিনাণ্ড। ফার্ডিনাণ্ড যে ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সার্ব এনার্কিষ্টের হস্তে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটা অসম্ভব নহে। তিনি অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফ্রান্‌জ জোসেফের ভ্রাতা আর্কডিউক কারল লাডউইগের পুত্র। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ক্রাউন প্রিন্স রুডলফ আত্মহত্যা করিলে পর আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডকে অজানা স্থান হইতে বাহির করিয়া যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করা হয়। শোকতাপদীর্ণ বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্‌জ জোসেফ তাঁহার উপরেই প্রকৃত রাজকার্য্যের ভার প্রদান করেন। তদবধি কাউণ্ট এরারেন্থল, কাউণ্ট টিজা, কাউণ্ট বার্কটল্ড প্রমুখ অষ্ট্রীয়ান রাজপুরুষগণের নিকটে তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি অত্যন্ত নির্ব্বন্ধপরায়ণ হইয়া উঠেন—যাহা নিজে ভাল বিবেচনা করিতেন, শত বিরুদ্ধযুক্তি তাহা হইতে তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। তাই তিনি হাপসবার্গ রাজবংশের কৌলিক প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া কাউণ্টেস সোফি চোটেকের পাণিগ্রহণ করেন; ইনিই পরে ডাচেস্ অফ হোহেনবার্গ হইয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার উপর স্লাভজাতির ক্রোধের কারণ আছে জানিয়াও কাহারও অনুরোধ না শুনিয়া সেরাজেভো যাত্রা করিয়াছিলেন। স্লাভরা, বোসনিয়া ও হার্জগোভিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে এক হইয়া স্লাভ সার্বজাতির সহিত একযোগে এক বিরাট স্লাভরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে, এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল।

কি সূত্রে কি হয়, কেহ বলিতে পারে না; স্ফুলিঙ্গ হইতে দাবানলের সৃষ্টি হয়। মদোদ্ধত যদুবালকরা পিণ্ডারকতীর্থে দুর্ব্বাসা-প্রমুখ ঋষিগণের অপমান করিয়াছিল—শাম্বের উদরে মুষল লুক্কায়িত করিয়া ঋষিগণকে ছলনা করিয়াছিল,—তাহার ফলে কুলনাশন মুষল প্রসব হইয়াছিল, যদুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। বোসনিয়ার সেরাজেভো সহরে গ্রেভিলো প্রিনসেপ নামক সার্ব যুবকের হস্তনিক্ষিপ্ত গুলীতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের যুবরাজ আর্কডিউক ফান্‌জ ফার্ডিনাণ্ড সস্ত্রীক নিহত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে সারা বিশ্বে কালানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—আজিও তাহার প্রভাব জগতের আর্থিক অবস্থার উপর অনুভূত হইতেছে।

ফ্রান্‌জ ফার্ডিনাণ্ড—অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ

ডাচেস হোহেনবার্গ—অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ-পত্নী

ফার্ডিনাণ্ড ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী, সুতরাং বোসনিয়া ও হার্জগোভিনিয়াকে অষ্ট্রীয়ার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাদমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন,ইহাই তাঁহার শত্রু-সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল। তাঁহার বোসনিয়া যাত্রার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিপক্ষে শ্লাভ এনার্কিষ্টদের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে এবং উহা হইতেই বিশ্বে সমরানল ছড়াইয়া পড়ে।

তাঁহার পত্নী ডাচেস্ হোহেনবার্গ। তাঁহার পূর্ব্বনাম কাউন্টেস সোফি চোটেক। তিনিও সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয়া—বোহিমিয়া দেশের আভিজাত্যগৌরবান্বিত মহৎ বংশের কন্যা। কিন্তু তিনি রাজবংশীয়া ছিলেন না। এই হেতু হাপসবার্গ রাজবংশের কৌলিক প্রথানুসারে তাঁহার সহিত যুবরাজের বিবাহ আইনসঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড প্রেমিকার পাণিগ্রহণার্থে ভীষ্মের ন্যায় অপূর্ব

ফ্রানজ্ জোসেফ—অষ্ট্রীয়ার সম্রাট

প্রথম পিটার—সার্বিয়ার রাজা

যুবরাজ আলেক্জাণ্ডার

মুঁসিয়ে পাসিচ
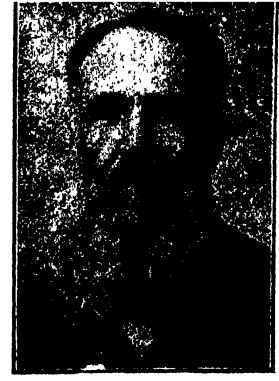
ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। এক অঙ্গীকার-পত্রে তিনি চুক্তিনামা লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী অথবা পুত্র-কন্যা কখনও অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনের দাবী করিবে না, পরন্তু তাঁহার পত্নী কখনও Crown princess বলিয়া সম্বোধিত হইবার দাবী করিবেন না। তাঁহার পত্নীও তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনি অংশভাগিনী ছিলেন, তাঁহার সুখে-দুঃখে পরম সহানুভূতিশালিনী ছিলেন। তাই বোসনিয়া-যাত্রায় বিপদের সম্ভাবনার কথা শুনিয়াও তিনি স্বামীকে সঙ্কল্পচ্যুত করেন নাই। বরং স্বয়ং তাঁহার সহগমন করিয়া স্বামীরই মত আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন।

রাডোমির পুটনিক

২৮শে জুন রবিবার খৃষ্টানের ভজনার দিন। যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী মোটরকারে টাউনহলে অভ্যর্থিত হইতে যাইতেছিলেন। 'আপেল কি' নামক রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইবামাত্র গাড়ীর প্রতি একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। যুবরাজ গাড়ীর পশ্চাৎস্থ ছত্রীর উপর নিক্ষিপ্ত বোমাটাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, উহা ফাটিয়া যাওয়ায় জনগণের কেহ কেহ আহত হয়। বোমানিক্ষেপকারীর নাম নেডজেলিকো কাব্রিনোভিচ, সে বিংশতিবর্ষীয় যুবক, ছাপাখানার কম্পোজিটার এবং এনার্কিষ্ট। পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সে মিলিয়াৎসেকো নদীর চুমুরিয়া সেতু হইতে নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করে, কিন্তু পরে ধৃত হয়।

টাউনহল হইতে প্রত্যাগমনকালে যুবরাজ নগর পরিদর্শন করিয়া কোণাক প্রাসাদে ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করেন এবং পত্নীকে বিপদের আশঙ্কা আছে জানিয়া তদ্দণ্ডেই ভিন্ন যানে প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু সাধ্বী পতি-অনুরাগিণী ডাচেস্ হোহেনবার্গ পতির সঙ্গ ত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন নাই। সুতরাং উভয়ে একত্র সহরপরিদর্শনে যাত্রা করেন। 'আপেল কি' এবং 'ফ্রানজ জোসেফ গসে' ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে তাঁহাদের গাড়ীর নিকটে আবার বোমা পড়ে, সৌভাগ্যক্রমে উহা ফাটে নাই। কিন্তু তদ্দণ্ডেই পিস্তলের গুলীর আওয়াজ হয়। ডাচেস্ সোফি তৎক্ষণাৎ বাহুবেষ্টনে স্বামীকে বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পান, গুলী কিন্তু তাঁহার উদর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। পরমুহূর্ত্তেই আর একটা গুলী ছুটিল, যুবরাজ তাহাতে আহত হইলেন। আততায়ী গ্রেভিলো প্রিনসেফও ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবক, বোসনিয়ার স্কুলের ছাত্র, এনার্কিষ্ট; সে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। এ দিকে আহত রাজ-দম্পতিকে কোণাক্-প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার অবসর হয় নাই; উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিলেন—সাধ্বী পতির সহিত একই সময়ে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজের জ্যেষ্ঠতাত সম্রাট ফ্রানজ জোসেফের দীর্ঘ জীবন নানা বৈচিত্র্যময়, তবে তাহাতে শোক-তাপ ও দুঃখ-কষ্টের অংশই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। তিনি কতকটা অষ্ট্রীয়ার শাসনযন্ত্রের ক্রীড়াপুত্তলি ছিলেন, তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব কিছুই ছিল না বলিলে হয়। এ বিষয়ে তিনি ভারতের মগলেজ্জু কোন কোন ব্যুরোক্র্যাট শাসকের সহিত তুলিত হইতে পারেন। কাউন্টেস্ কেরোলাইনের সহিত ব্যবহারে এই কথাই প্রতিপন্ন হয়। অষ্ট্রীয়ার রাজপুরুষরা বিচারে কাউন্টেসের

কাউণ্ট বার্কটোল্ড

জেনারল আলেকজাণ্ডার ক্রোবাটিন

ব্যারণ ভন জজ্জি
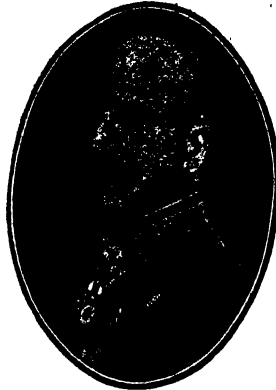
আর্কডিউক ফ্রেডারিক

পুত্রের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। পুত্র তাঁহার নয়নের মণি, রূপে গুণে, বংশ-গৌরবে, মহত্ত্বে, দয়ায়, সৌজন্যে তাঁহার পুত্র যথার্থই যে কোনও বংশের গৌরব বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। কাউণ্টেস এমন পুত্রহারা হইয়া উন্মাদিনী হইয়াছিলেন এবং সম্রাট ফ্রান্জ

মার্শাল কনরাড ভন হটজনডর্ফ

জেনারল ভন বোহেম-আর্জ্জলি

জেনারল পিটার হফম্যান

জেনারল ভন টার্জটন্স্কি

জোসেফকেই উহার মূল মনে করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বংশ হইবেন। কাউণ্টেসের অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। সম্রাটের সুন্দরী কন্যা অল্পবয়সে বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। একমাত্র পুত্র প্রিন্স রুডলফ আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার জননীর এক পরমসুন্দরী সখীর প্রণয়াভিলাষী হইয়া হাপসবার্গ রাজবংশের দারুণ আইন অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া তিনি এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমাভিলাষিণী সুন্দরীও তাঁহার সহিত আত্মহত্যা করেন। ইহার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জেনিভা সহরে সম্রাট পত্নী এক এনার্কিষ্টের হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেক্সিকো-রাজ ম্যাক্সিমিলিয়ান বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়েন। সম্রাটের এক আদরিণী ভ্রাতুষ্পুত্রীর অগ্নিদাহে মৃত্যু হয়। শেষে যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিলেন,

জেনারল ডাহাল

জেনারল হর্সে টজকি

সম্রাট কারল

কাউণ্ট জার্ণিক
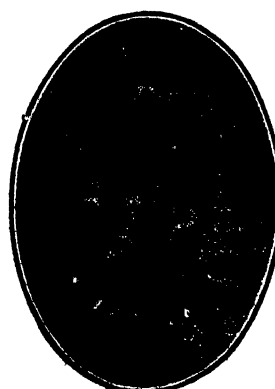
তিনিও আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। তাহার পর মন্ত্রী ও রাজপুরুষরা সার্ব্বিয়ার সহিত বিবাদের সূত্রপাত করিয়া জগতে কালানল প্রজ্বালিত করিলেন। শোকজীর্ণ বৃদ্ধ সম্রাট যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়া যুদ্ধে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে অষ্ট্রীয়া সার্ব্বিয়াকে শেষ চরমপত্র প্রদান করিলেন, সার্ব্বিয়া ২৫শে জুন উহার জবাব দিলেন। কিন্তু ফল হইল না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল,—অষ্ট্রীয়া সার্ব্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করিলেন। ঠিক ইহার ১ দিন পরে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই তারিখে জার্ম্মাণী, রুসিয়া ও ফ্রান্সকে চরম পত্র প্রদান করিলেন এবং ১লা আগষ্ট তারিখে রুসিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সূত্রপাত হইতে এই যুদ্ধের অবসান হইতে ৪ বৎসর লাগিয়াছিল, কেন না, বুলগেরিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার (armistice) জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং মিত্রশক্তিরা ৩০শে আগষ্ট যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্জ জোসেফকে কিন্তু অষ্ট্রীয়ার অবনতি ও অপমান দেখিতে হয় নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার সংসারের সকল জ্বালার অবসান হয়।

কাউণ্ট এয়ারেন্থল

রাজা আলেক্জাণ্ডার ও রাণী ড্রাগার লোমহর্ষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সার্ব্বিয়ার ষড়যন্ত্রকারী রাজপুরুষরা তাঁহাকে ফ্রান্সের এক খেলার আড্ডা হইতে খুঁজিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিল, তিনি সার্ব্বিয়ার রাজবংশের অন্য এক শাখার সন্তান, তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। রাজা হইয়া কিন্তু তিনি রাজারই মত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি সাহসী যোদ্ধাও ছিলেন। দক্ষিণের শ্লাভ জাতিসমূহকে একই জাতীয়তা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক বিরাট সার্ব্ব সাম্রাজ্য (Greater Serbia) প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে তিনি বিভোর থাকিতেন। তাই যখন অষ্ট্রীয়া যুদ্ধঘোষণা করে, তখন তিনি তাহাতে কাতর হয়েন নাই, বীরের মত তরবারিহস্তে স্বয়ং রণস্থলে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ আলেক্জাণ্ডার। ইনিই বর্ত্তমান সার্ব্ব জুগো-শ্লোভিয়ার অথবা বিরাট সার্ব্ব রাজ্যের রাজা। ইনিও পিতার ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষাময়।

মুঁসিয়ে পাসিচ মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক। তিনি মহাযুদ্ধ-সংঘটনকালে সার্ব্বিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় রাজা পিটার পরিচালিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ইঁহার বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকতার সুনাম আছে।

জেনারল ভন কোভোস্সাজা — জেনারল কেলার

মহাযুদ্ধের আর এক নায়ক সার্ব্বিয়ার রাজা প্রথম পিটার। তাঁহাকে সার্ব্বিয়ার রাজহত্যা ধূলি হইতে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল।

রাডোমির পুটনিক—সার্ব্ব রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। ইনি মুষ্টিমেয় সার্ব্ব সেনার সাহায্যে যে ভাবে প্রথমে বিরাট অষ্ট্রীয়ার গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। জার্ম্মাণদের

রাজা নিকোলাস

বিপক্ষে বেলজিয়ানদের ন্যায় তাঁহাকে প্রথম ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছিল।' রাজা এলবার্ট বা জেনারল মেল্যান অথবা রাণা প্রতাপ বা স্পার্টান লিওনিডাসের সহিত তাঁহার নাম ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

কাউণ্ট বার্কটোল্ড মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে অষ্ট্রীয়ার বৈদেশিক সচিব ছিলেন। বলা বাহুল্য, বৈদেশিক সচিবের হস্তেই অনেক সময়ে দেশের যুদ্ধ বা শান্তির সূত্র ধরা থাকে। সুতরাং মহাযুদ্ধের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা সামান্য নহে—উহার উপর ইঁহার প্রভাবও সামান্য নহে।

কাউণ্ট এরারেস্থল—ইনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার বৈদেশিক সচিব ছিলেন। তাঁহার আমলেই রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং শ্লাভ ও টিউটন জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষবৃত্তি জাগিয়া উঠে; কাউণ্ট এরারেস্থল তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য, তাঁহারই অভিপ্রায়মত ঘুরিতেন ফিরিতেন। কাউণ্ট এরারেস্থল যে প্রকারান্তরে তাঁহার অপমৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, তাঁহারই শ্লাভ-বিদ্বেষের ফলে শ্লাভ এনার্কিষ্টরা যুবরাজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল।

রাজকুমারী মেরায়া এডেলেড

জেনারল আলেকজাণ্ডার ক্রোবাটিন। ইনি অষ্ট্রীয়ার সমর-সচিব ছিলেন। কাযেই মহাযুদ্ধের উপর ইঁহারও প্রভাব সামান্য ছিল না।

ব্যারণ ভন জর্জ্জি। অষ্ট্রীয়ার নৌ-সমর-সচিব। ইঁহাকেও ক্রোবাটিনের সমান আসন দেওয়া যাইতে পারে।

আর্কডিউক ফ্রেডারিক। প্রধান সেনাপতি। মহাযুদ্ধের সংঘটনে ইঁহার হাত না থাকিলেও যুদ্ধকালে ইঁহার শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল।

মার্শাল কনরাড ভন হটজেনডর্ফ—চিফ অফ জেনারল ষ্টাফ। সমর-কৌশল ও নীতিনির্দ্ধারণ বিষয়ে ইঁহার খুবই হাত ছিল।

জেনারল ভন বোহেম-আর্ম্মলি—তৃতীয় অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদলের নেতা।

জেনারল পিটার হফমান। ইনি অন্যতম অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি।

জেনারল ডল টার্ঙটিন্স্কি—ইনি অষ্ট্রীয়ান ৪র্থ সৈন্যদলের সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

জেনারল ডাঙ্কাল—ইনি অন্যতম অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি।

জেনারল হর্সেটজস্কি—ইনিও অন্যতম অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি। ইনি পোলাণ্ডপ্রদেশে অষ্ট্রীয়ান অশ্বারোহী সেনার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন।

সম্রাট কারল—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্জ জোসেফের দেহাবসানের পর ইনি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রায় ২ বৎসর রাজত্বের পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে সম্রাট কারল সিংহাসন ত্যাগ করেন। পত্নী জিটা ও পুত্রকন্যাগণকে লইয়া অতঃপর তিনি অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া যায়েন। তিনি পরলোকগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী সাম্রাজ্ঞী জিটা ও তাঁহার ৮টি পুত্রকন্যা অদ্যাপি নির্ব্বাসন জীবন যাপন করিতেছেন।
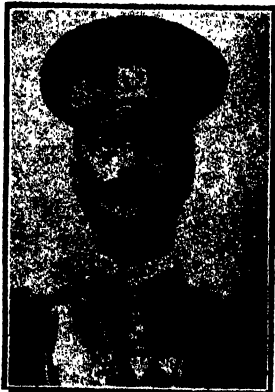
জেনারল মাইটার মার্টিনোভিচ

কাউণ্ট ব্রানিন—ইনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধকালে অষ্ট্রীয়ার বৈদেশিক সচিব ছিলেন। সেই অবস্থায় ইনি অষ্ট্রীয়ার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

জেনারল ভন কোভোস্সাজা—ইনি অন্যতম অষ্ট্রীয়ান সেনাপতি।

জেনারল কেলার। ইনি রুসিয়ার অন্যতম সেনাপতি।

নিকোলাস—ইনি মণ্টিনিগ্রোর রাজা। ইনি শূরবীর ও সাহসী যোদ্ধা। আপনার ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সৈন্য লইয়া ইনি কিছুকাল বিরাট অষ্ট্রীয়ার সহিত শক্তিপরীক্ষায় সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সার্ব্বিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তিনি বুলগেরিয়া ও তুর্কীর বিপক্ষতাচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই।

জেনারল মাইটার মার্টিনোভিচ—ইনি মণ্টিনিগ্রো সৈন্যের সেনাপতিত্ব করিয়া রণস্থলে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রবল শত্রুর বিপক্ষে ইঁহার রণকুশলতা প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল।

রাজকুমারী মেরায়া এডেলেড—ইনি লাক্সেমবার্গের গ্রাণ্ড ডাচেস বা রাণী। ইঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণীর মধ্যে অবস্থিত। এই হেতু জার্ম্মাণরা তাঁহার রাজ্য দিয়া বেলজিয়াম আক্রমণের জন্য সৈন্যচালনার অনুমতি চাহিয়াছিল। রাণী এডেলেড অল্পবয়স্কা—তাঁহার বয়স ২২ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। এত অল্পবয়স্কা হইলেও রাজ্যের গুরুভার এই বিপৎসঙ্কুল সময়ে বহন করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কাতর হয়েন নাই। জার্ম্মাণ-যুবরাজ যখন অগণিত জার্ম্মাণ-সৈন্য লইয়া তাঁহার দ্বারে হানা দিয়াছিলেন, তখনও তিনি স্বেচ্ছায় নিজ রাজ্য দিয়া জার্ম্মাণ-সেনাকে যাইতে দেন নাই। ইহা তাঁহার অল্প দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় নহে।

মুঁসিয়ে আয়েস্কু—ইনি লাক্সেমবার্গের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি লাক্সেমবার্গের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ইঁহাকে জার্ম্মাণদের হস্তে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারও কৃতিত্ব অল্প নহে।

মুঁসিয়ে আয়েস্কু

মুক্তি ও ভক্তি

গীতার উক্ত দুইটি শ্লোকে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি প্রণিধানযোগ্য। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মুক্তাবস্থা ও ভক্তাবস্থা অথবা মুক্তি বা ভক্তি, এই দুইটির মধ্যে এক প্রকার সাধ্যসাধনভাব বা পূর্ব্বাপরভাব বিদ্যমান আছে। কারণ, ব্রহ্মভূত হইয়া শোক ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া সাধক মানব প্রসন্নাত্মা হয়, অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাতেই সাধক সর্ব্বভূতেই সমতাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ভগবদ্গীতারও বহু স্থলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিকে স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন যে, মুক্তাবস্থার পরও ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবার অনুকূল সিদ্ধদেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক মুক্তপুরুষগণ ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন, যথা :—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

আবার সৌপর্ণশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;—

"মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত।"

অর্থাৎ "মুক্তপুরুষগণও এই ভগবানের উপাসনা করেন।" গীতার "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মভূত শব্দের কি অর্থ, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। ব্রহ্মভূত শব্দের যথাশ্রুত অর্থ ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিতে করিতে যে ভাগ্যবান্ মানব দেহাত্মভাব দূর করিয়া স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মভূত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদীর মতে ইহাই তুরীয় বা মোক্ষ অবস্থা, ইহার পরে অন্য কোন প্রকার পুরুষার্থ যে থাকিতে পারে এবং মুক্তপুরুষের পক্ষে তাহাও যে স্পৃহণীয় হইতে পারে, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোন আচার্য্যই অঙ্গীকার করেন না। কিন্তু, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, ব্রহ্মভূত বা মুক্ত হইবার পরে মানব পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মুক্তি জীবের চরম বা পরম অবস্থা নহে, ভক্তিই জীবের চরম বা পরম অবস্থা। এই ভক্তি কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তি নহে, ইহা সাধ্য বা পঞ্চমপুরুষার্থরূপা ভক্তি। ইহাকেই ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ প্রীতি বা প্রেমরূপা ভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কেবল গীতাতেই যে উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও বহু স্থলে এই কথাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে —

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য, "হে অরবিন্দনেত্র! যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন নহে এবং কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের প্রভাবে যাহারা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা বহু ক্লেশে পরমপদ লাভ করিয়াও আবার এই সংসারদুঃখে পতিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের এই প্রকার অধঃপতনের কারণ এই যে, তাহারা তোমার চরণারবিন্দকে আশ্রয় করে না, সুতরাং তাহাদিগের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইতে পারে না; অর্থাৎ ভক্তিহীন জ্ঞান সংসারদুঃখ-নিবৃত্তির আত্যন্তিক কারণ কখনই হইতে পারে না, কিয়ৎকালের জন্য তাহা সাধক-হৃদয়ে আভিমানিক মুক্তি আনয়ন করে; পুনরাবৃত্তিরহিত মুক্তি, ভক্তিসহকৃত বা ভক্তিরূপে পরিণত জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে, ভক্তিহীন জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"হে বিভো! সকল প্রকার

শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির উপায় যে তোমার প্রতি ভক্তি, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা কেবল অদ্বয়বোধ লাভ করিবার জন্য বহুবিধ ক্লেশ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদিগের সেই সকল প্রযত্ন শস্যহীন তুষনিকরের অবঘাতকারী-দিগের প্রযত্নের ন্যায় নিরর্থক ক্লেশকর হইয়া থাকে, অভীপ্সিত ফলদানে সমর্থ হয় না।"

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ ভক্তিকে জ্ঞানের সাধন বলিয়া থাকেন। ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কিন্তু জ্ঞানকে ভক্তির সাধন বলিয়া থাকেন। মোক্ষবাদীর মতে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই মুক্তির সাধন হয়, কেহ সাক্ষাৎ বা কেহ পরম্পরায়।

ভক্তিবাদীর মতে মুক্তি জ্ঞানের সাধ্য হইলেও ভক্তির তাহা পূর্ব্বাবস্থা। চরম সাধ্যরূপ যে প্রেমভক্তি, তাহা বদ্ধাবস্থায় জীবের সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীবের দেহাভিমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভগবৎপ্রেমরূপ ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" এই দুইটি কথার দ্বারা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ভক্তির আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই শোক ও আকাঙ্ক্ষা দুই মিটিয়া যায়। মানবের দেহে আত্মবোধ বা আত্মীয়ত্ব বোধ থাকিতে শোকের বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যখন সম্ভবপর নহে, তখন শোকের বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ উক্তির দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, সেই ব্যক্তির দেহাত্মাভিমান একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে। দেহাত্মা-ভিমান যাহার নিবৃত্ত হইয়াছে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাহাকে মুক্ত বা জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, গীতার নির্দ্দেশানুসারে জীবন্মুক্ত অবস্থার পর প্রেম বা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এ স্থলে গীতাতে আর একটি যে বিশেষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" অর্থাৎ "সর্ব্বভূতে সম।" ভূত শব্দের অর্থ এ স্থলে প্রাণিমাত্র অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান-নিবৃত্তির পর সকল প্রাণীতেই সমতাদৃষ্টি উদিত হয় এবং তাহার পর জীব পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। সমতাদর্শন শব্দের অর্থ কি? ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, দেহাত্মাভিমান-নিবৃত্তির পর সাধকের আত্মস্বরূপ নির্ণয় যেরূপে হয়, সেই রূপেই সকল জীবের যে স্বরূপ-নির্ণয়, তাহাই হইল সর্ব্বভূতে সমতা-জ্ঞান, অর্থাৎ আমার যেমন ভগবান্ হইতে পৃথক্-ভাবে থাকিবার সামর্থ্য নাই, কোন কর্ত্তৃত্ব বা তন্মূলক স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভৃতি নাই, সেইরূপ কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুন্নততম স্তরের যে কোন জীবই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য বা তন্মূলক কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির কিছুই বাস্তব নহে। নিজে কর্ত্তা না হইয়াও, কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত হইলে মানবের যেমন প্রতি পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ আকীট আপতঙ্গ চতুরানন ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল চেতনেই এই কর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক বিড়ম্বনা ও তন্নিবন্ধন নানাবিধ সংসার-দুঃখভোগ সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভূতে সমতাজ্ঞান।

সকল বদ্ধ জীবে এই জাতীয় সমতা-বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেই মুক্ত মানবের হৃদয় স্বতঃই জীবদয়ায় আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন তাহার মনে অভিলাষ হয় যে, এই সকল অবিদ্যাপথপতিত জীবের নিজ ভ্রান্তিকল্পিত দুঃখ-নিবহের নিবর্ত্তন কি প্রকারে করা যাইতে পারে এবং ইহারই জন্য সে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট কাতর-ভাবে এইরূপ নিবেদন করিয়া থাকে,—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঋদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে পরম গতি, তাহা চাহি না; আমি নিজের আন্তরিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি, তাহাও চাহি না; আমি চাহি, সকল জীবের অন্তঃ-করণের নিভৃততম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের মনের মধ্যে যত প্রকার মানসিক পীড়া আছে, তাহা সকলই আমি নিজে অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ-নির্মুক্ত করি।"

সকল জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ-নিবারণের জন্য এই যে অভিলাষ,ইহাই হইল ভগবদ্ভক্তির পূর্ব্বরূপ। ভগবদ্গীতায় জীবন্মুক্তির পরিচয়প্রসঙ্গেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা,মিত্রভাবাপন্ন, কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ ও দুঃখে সমতাজ্ঞান-বিশিষ্ট, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়-নিশ্চয়যুক্ত, আমাতে অর্পিত মনোবুদ্ধি যে মদ্ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।"

এই যে জীবন্মুক্তির অবস্থা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, ইহা জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদজ্ঞানের যে পরিণতি, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, অদ্বৈতজ্ঞান সকল প্রকার দ্বৈতজ্ঞান ও তন্মূলক ব্যবহারের যে একান্ত বিরোধী, তাহা সকল অদ্বৈতাচার্য্যগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। করুণা, মৈত্রী ও ভক্তি প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি দ্বৈতজ্ঞান না থাকিলে উৎপন্ন হয় না; এখানে কিন্তু জীবন্মুক্তির বা স্থিতপ্রজ্ঞের মানসিক অবস্থার বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীভগবান্ এই সকল দ্বৈতজ্ঞানমূলক মনোবৃত্তিনিচয়ের উল্লেখ করিতেছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদসম্মত জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না; ইহা ভগবানের শ্রীমুখের উক্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতিরূপা, সেই প্রীতির আলম্বন শ্রীভগবান্, ইহার আশ্রয়-ভক্ত। এই প্রীতিরূপা ভক্তি মোক্ষের সাধন নহে, প্রত্যুত ইহা মোক্ষের বিরোধিনী। ভগবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিয়া সেবার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার ঐকান্তিক অভিলাষই এই প্রীতিরূপা ভক্তির উপাদান। বিনশ্বর ও অপবিত্র দেহের উপর অহং-মমতাভিমান দূরীভূত না হইলে, সেবার দ্বারা ভগবান্‌কে সুখী করিবার অভিলাষ মানবহৃদয়ে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। দার্শনিকগণ হয় ত বলিবেন, এ আবার কি কথা? ভগবান্‌কে সেবার দ্বারা সুখী করিবার অভিলাষ কিরূপে সম্ভবপর? যিনি স্বয়ং সুখস্বরূপ, শ্রুতি যাঁহাকে সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহার আনন্দের ছিটা-ফোঁটা লইয়া এ সংসারে সকল জীবই আপনাকে আনন্দযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, যিনি আত্মারাম, যিনি আপ্তকাম এবং যিনি সর্ব্বদা আত্মতৃপ্ত, আমরা তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হয়? দার্শনিকগণের এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া ভক্তিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের অনুবর্ত্তী হইয়া যে কয়টি কথা বলিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

তাঁহারা বলেন, শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে ভগবৎতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাঁহাকে কেবল নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিলে চলিবে না। ভাগবতকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা ও ভক্তের নিকট ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানীর নিকট যাহা অদ্বয় অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ, সমাহিত-চেতা যোগীর নিকট আবার তাহাই সর্ব্বভূতগুহাশয় অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে স্ফুরিত হয়; আবার প্রেমিক অনন্যশরণ ভক্তের সেই অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বই ভগবান্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। একই বস্তু সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া নির্গুণ এবং সগুণ, নিরাকার ও সাকার, পরিপূর্ণকাম হইয়াও ভক্তের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। তিনি যে সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। যাঁহা হইতে জল উৎপন্ন হয়, আবার অগ্নিও হইয়া থাকে, অমৃত ও বিষ যাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়, নিজে অবিকৃত থাকিয়া যিনি সকল বিকারের উপাদান হইয়া থাকেন, অনন্ত-শক্তিশালী, সর্ব্ববিরোধের সমন্বয়ভূমি সেই ভগবানের স্বরূপ যাঁহারা কল্পনার দ্বারা নির্ণয় করিতে চাহেন, সেই সকল তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী দার্শনিকগণের নিকট এই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক

ভক্তিসহকারে তাঁহারই শরণ লইয়া তাঁহার জন্ম জীবনের সকল বস্তু ত্যাগ করিতে উদ্যত, তাঁহাদের নিকট ভগবান্ পরিপূর্ণকাম হইলেও ভক্তের সেবা পাইবার জন্ম সর্ব্বদা লালায়িত। তাই ভাগবত বলিতেছে—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনি প্রতিমুখস্য যথা মুখে শ্রীঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য—"এই ভগবান্ কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিখিল সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা নিজলাভে পরিপূর্ণ, অজ্ঞ মানব কোন প্রকার পূজা প্রভৃতি সম্মান করিলে তাহার দ্বারা কিছু লাভ হইবে, এই বিবেচনায় কাহারও নিকট হইতে পূজা, সম্মান প্রভৃতি কামনা করেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি করুণাময়, এই কারণে ভক্তের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি সেই পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। লোকে যে তাঁহাকে পূজা, মান, সৎকার প্রভৃতি করিয়া থাকে, সেই সকল পূজা, মান, সৎকার প্রভৃতির দ্বারা পূজকের আত্মপূজাই হইয়া থাকে, কারণ, ভগবানের সত্তা ব্যতিরেকে যখন জীবের পৃথক্ সত্তাই নাই; এই কারণে আত্মপূজা বা আত্মসম্মান করিতে হইলে ভগবানেরই পূজা বা সম্মান করা একান্ত আবশ্যক। যেমন দর্পণের মধ্যে প্রতিভাত প্রতিবিম্বস্বরূপ যে মুখ, তাহাকে শোভিত করিতে হইলে দর্পণের বাহিরে অবস্থিত যে বিম্বভূত মুখ, তাহাতেই তিলক রচনা প্রভৃতি করিতে হয় এবং তাহা হইলে দর্পণগত প্রতিবিম্বস্বরূপ মুখ আপনা হইতেই শোভিত হয়, সেইরূপ ভগবানের পূজা করিলে সেই পূজায় ভগবৎপ্রতিবিম্বস্বরূপ জীবেরও পূজা হইয়া থাকে।"

এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ আপ্তকাম ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও ভক্তের অভিলাষানুসারে ভক্ত-প্রদত্ত পূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আত্মারামের আত্মতৃপ্তির, পূর্ণেশ্বরের এই ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম যে সর্ব্বদা তৎপরতা, তাহাই হইল ভগবানের ভক্তের প্রতি করুণা। এ করুণা ভগবানের শক্তিবিশেষ। ভক্তগণ ইহাকেই হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে প্রীতিরূপা ভক্তির প্রকৃত তথ্য বুঝা যায় না, এই কারণে এক্ষণে সেই হ্লাদিনীর স্বরূপ আলোচিত হইতেছে।

শ্রীভগবানের শক্তিবিষয়ে বিচারপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই—"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপভূত যে শক্তি, তাহার নাম পরা শক্তি, জীবরূপিণী যে তদীয়া শক্তি, তাহাকে শাস্ত্রে ভোক্তৃশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অপরা শক্তি। তাঁহার আর একটি তৃতীয় শক্তি আছে, যাহার নাম অবিদ্যা শক্তি। যাহাকে কর্ম্মশক্তি বা ভোগ্যশক্তি বলিয়াও পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে পরা যে বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ স্বরূপভূত শক্তি, তাহারই পরিচয় দিতে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইহার অর্থ—'হে ভগবান্, সকলের আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ নামে অপ্রাকৃত স্বরূপভূত ত্রিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। তুমি রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত বলিয়া তোমাতে মায়িক হ্লাদকরী, তাপকরী ও হ্লাদতাপকরী মিশ্র শক্তি বিদ্যমান নাই।" উপনিষদ্ বলিতেছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ "ব্রহ্ম অবিনাশী, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ"।

এই উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্ম সৎ, আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে, এই যে সৎ, আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহাতে ত্রিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপভূত শক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শক্তি শক্তিমানের যে পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নিরূপণ করিতে পারে নাই, কারণ, শক্তি

শক্তিমান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা বলা যায় না বা অত্যন্ত অভিন্ন, তাহাও বলা যায় না, অথচ ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং এতন্মূলক যে ভক্তিবাদ, তাহা লোকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ যে ভগবান্, তাহার স্বরূপভূত যে ত্রিবিধ শক্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই শক্তিত্রয়ের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহা বুঝা যাউক। ভগবান্ স্বয়ং একমাত্র সৎ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা অপর বস্তুনিচয়কে সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী বলা যায়। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়া যে শক্তির দ্বারা অপর বস্তুনিচয়কে অর্থাৎ জীব-সমূহকে জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম ভগবানের সংবিৎ শক্তি। এইরূপ তিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিবশতঃ আত্মস্বরূপ আনন্দের অনুভব করেন এবং অপরকে সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। কার্য্য থাকিলে তাহার কারণ আছে এবং কারণ থাকি-লেই সেই কার্য্যের অনুকূল শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাকে অস্বীকার করিবে? এ সংসারে আমরা দেখিতে পাই, কত কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহারা ছিল না বা সৎ বলিয়া পরিগৃহীত হইত না। তাহারা উৎপত্তির পর যে সৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে এবং সেই সত্তা তাহাদের যখন সর্ব্বদা প্রতীত হয় না, তখন সেই সত্তা তাহাদিগের যে শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাকে কে অস্বীকার করিতে পারে? এই যে অনন্ত প্রাপঞ্চিক কার্য্যনিবহের সত্তা-বিধায়িনী শক্তি, ইহারই নাম শ্রীভগবানের সন্ধিনী শক্তি। এইরূপ জীবনিবহের স্বতঃ চৈতন্যরূপতা থাকিলেও সেই চৈতন্যের দ্বারা সর্ব্বদা সকল বিষয়ের যে প্রকাশ হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কদাচিৎ কোন বিষয়ের প্রকাশ হয়, এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে জীবচৈতন্যের দ্বারা কোন কোন সময়ে কোন কোন বিষয়ের প্রকাশ বা জ্ঞান হইয়া থাকে, এই প্রকাশ বা জ্ঞানের কারণ যে ভগবান্, (কারণ, তিনি সর্ব্বসংশ্রয়, সকল প্রকার কার্য্যের কারণ; এই প্রকাশও একটি কার্য্য, সুতরাং তিনি এই প্রকাশের কারণ) তাঁহাতে এই যে জীবগত আকস্মিক প্রকাশরূপ কার্য্যের অনুকূল শক্তি বিদ্যমান আছে, আপনাকে আপনার নিকট প্রকাশ করা এবং আপনার শক্তি হইতে সমুদ্ভূত প্রাপঞ্চিক সকল বস্তুকে জীবের নিকট প্রকাশ করা-এই শক্তিরই কার্য্য। ভগবানের এই স্বরূপ শক্তিটি সংবিৎ শক্তি নামে বিষ্ণুপুরাণে অভি-হিত হইয়াছে। এইবার হ্লাদিনীর কথা বলিব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

নববর্ষ

আজি বন্দি তোমায় হে নববর্ষ হর্ষ-আকুল চিত্তে।
এস নন্দি ধরার সারাটি অঙ্গ চির-পুরাতন মর্ত্তে॥
মল্লিকা নব, গিরি-মল্লিকা যূথিকা বকুল-গন্ধে।
বিমল কমল মঞ্জুলকম-চম্পকরজোবৃন্দে॥
মধুপ-পুঞ্জ গুঞ্জনভরা কুঞ্জ-কানন-মাঝে।
স্নিগ্ধ সরস মন্দ পবন কম্পিত তরু সাঁঝে॥
শ্যামলবর্ণ প্রান্তরে আজি প্রকৃতির প্রিয়বাসে।
শিখাবলকেকা পরভৃত কুহু ঝঙ্কৃত নীলাকাশে॥
বিলাস-আকর প্রমোদোদ্যানে, নৃপতি-সদনে আজ।
জীর্ণ দীর্ণ ভগ্ন দেউল কুটীরাঙ্গনমাঝ॥
পণ্য-বীথিকা সজ্জিত করি নূতন আম্রপত্রে।
বিদ্যা-আলয়ে, দেব-মন্দিরে, আতুর-পালনশছত্রে॥
বিয়োগ-বিধুর বিরহের মাঝে, বেদনা-ব্যথিত দুঃখে।
মিলনে সোহাগে প্রেমে অনুরাগে পুলক ধরিয়া বক্ষে॥
শিঞ্জিত-সুর সঙ্গীতে করি' দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত।
চিন্ময় চির সত্যের ছবি চিত্তে করিয়া দীপ্ত॥
পুঞ্জিত নব জলধর সাথে, তটিনী ঊর্ম্মিলাস্যে!
কর্ষককুল হর্ষ কারণ ভারত জীবন শস্যে॥
বসুমতী করি বসুমতী তব পুণ্য নূতন স্পর্শে।
সবার আস্যে হাস্য ফুটায়ে নিঃস্ব নিবাস বিশ্বে॥

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

এসিয়াটিক সোসাইটীর উদ্যোগে ৺স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পর প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিজ্ঞান-মন্দিরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। প্রথম বৎসর ছয়টি বিজ্ঞান-শাখা স্থাপিত হইয়াছিল ;—(১) রসায়ন বিভাগ, (২) ভূতত্ত্ব বিভাগ, (৩) প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ, (৪) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব বিভাগ, (৫) নৃতত্ত্ব বিভাগ, (Anthropology) (৬) গণিত ও পদার্থ বিভাগ। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কৃষিতত্ত্বের, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের ও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মনস্তত্ত্ববিদ্যার (Pshychology) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাখা স্থাপিত হয়। এ বৎসর বারাণসী না। ১২ই জানুয়ারী বেলা ১০ ঘটিকার সময় সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণের পূর্ব্বে মহারাজা সার প্রভুনারায়ণ সিংহ উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর নহে, সত্যের আবিষ্কারই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য ; আবহমানকাল হইতে মানবরা বিজ্ঞানের সেবা করিয়া জগতের কল্যাণ করিয়া আসিতেছেন। যে জাতি বিজ্ঞানের যত আদর করে, সে জাতি তত উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাঁহার মতে জগতের সকল প্রকার উন্নতি—কি পার্থিব, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আজ বিজ্ঞানের কৃপায় য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও জগতে সর্ব্বত্র

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ডাঃ এম্, ও, ফষ্টার, এফ, আর, এস্ মহাশয় প্রধান সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন, বিভাগীয় সভাপতিদিগের মধ্যে ৫ জন ভারতবাসী এবং ৪ জন ইংরাজ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পূজনীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃতী ছাত্র অধ্যাপক শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ রসায়ন বিভাগে, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ নৃতত্ত্ব বিভাগে এবং ডাঃ সেনগুপ্ত মনস্তত্ত্ব (Psychology) বিভাগে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক ইনামদার মহাশয় উদ্ভিদ্-তত্ত্বে এবং ডাঃ বেণীপ্রসাদ প্রাণিতত্ত্বে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অপর ৪টি বিভাগের সভাপতি ৪ জন ইংরাজ। বলা বাহুল্য, তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চ রাজকার্য্যে অধিষ্ঠিত। কাশী-নরেশ মহারাজ সার প্রভুনারায়ণ সিংহ এবারকার অধিবেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এই বিজ্ঞানের প্রথম চর্চ্চা ভারত-ভূমিতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু তদানীন্তন কালের ভারতীয়রা আপনাদিগের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আধ্যাত্মিক পথে নিয়োজিত করেন ; তাহার ফলে উপনিষদ্ ও ষড়্দর্শনের সৃষ্টি হয়, এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা নিঃসংশয়রূপে অবগত হইতে পারি যে, আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি এক সময়ে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। পরে মহারাজ তাঁহার বক্তব্যে বলেন যে, ভারতে ঠিক সেই সময়ের পরবর্ত্তী কালে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময়ে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হয় এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। সে সময়কার লোকরা প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত, ভীত ;

ধীর, স্থির চিত্তে বিজ্ঞান-চর্চ্চার অবসর পাইত না। পরে ইংরাজ-শাসনাধীনে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত-ভূমিতে এমন কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয় যে, যে দেশেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সেই দেশই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারে। ঐ সকল বৈজ্ঞানিকরা যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু স্বীয় আবিষ্কৃত পন্থার অনুসরণ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উৎসাহ এবং কার্য্যের সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতবাসী নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে। অধমাদের দেশে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মন্দির নাই বলিয়া মহারাজ দুঃখ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সার দোরাবজী টাটার অর্থে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালোরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দিরের মত বহু শিক্ষা-মন্দির ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেখানে উচ্চ উপাধিধারী ভারতীয় যুবকরা নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন।

ডাঃ এম্, ও, ফষ্টার, এফ, আর, এস

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

মহারাজের বক্তব্যের পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, ভারতীয়রা বহু পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন, কিছুদিনের জন্ত আমাদের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল মাত্র এবং যদিও এখনও পাশ্চাত্যজাতি হইতে আমরা পশ্চাতে আছি, তথাপি আশা করা যায়, শীঘ্রই আমাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করেন বলিয়া যত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি বাঙ্গালোর বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ এম্, ও, ফষ্টার, এফ, আর, এস্ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি বলেন,—গত ১ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্ব্বতন ৩ জন সভাপতি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ৬৬ বৎসর বয়সে এডিনবরোয় মেজর জেনারেল উইলিয়াম বর্ণে বানারম্যান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তিনি এক জন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের সার্জন জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। গত বৎসর এপ্রেল মাসে কলিকাতায় ডাঃ টমাস্ নেলসন্ এ্যানন্ ডেলের ৪৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত তিনি যখন সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, তখন মুহূর্ত্তের তরেও আমরা ভাবিতে পারি নাই যে, শীঘ্রই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে—জীবতত্ত্বের গবেষণাকার্য্যের (Zoology) যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহা বলা যায় না। মৃত্যুর সময়ে তিনি ভারতীয় জীবতত্ত্ব বিভাগের (Zoological Survey of India) অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ৬ সপ্তাহ পরে পাটনায় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে কংগ্রেসের আর একটি উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল; কি আইনে, কি গণিতশাস্ত্রে, কি শিক্ষার ব্যবস্থাপকতায় তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রের দৃঢ়তায় সকলের নিকটই তিনি সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তিনি ভারতের মঙ্গলের জন্য জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার ধারা ভারতে প্রচলন করিতে কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, পরে পুনরায় গত বৎসর বাঙ্গালোরের অধিবেশনে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার অনুপস্থিতে ডাঃ এ্যানন্ ডেলকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

প্রতি বৎসর ভারতের এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়; তাহাদের সংখ্যার নিকট ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু আমরা সংখ্যায় অল্প হইলেও উদ্দেশ্য আমাদিগের অতি মহৎ। প্রাচীন এবং আধুনিক শিক্ষার আজ আশ্চর্য্যরূপ মিলনে আশা হইতেছে। ভারতে এমন এক দিন শীঘ্রই আসিবে, যেদিন প্রকৃতির সকল প্রকার রহস্য আমাদিগের নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে। এই সম্মিলনীর উপযোগিতা অশেষ গুণে বৃদ্ধি পায় এবং এই সম্মিলনী হইতে ভারতের অনেক উপকার হইতে পারে, যদি এ দেশবাসী প্রত্যেক সভ্য দেশ হইতে দেশান্তরে বৈজ্ঞানিক সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রচার নিজ নিজ জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রচারকার্য্যে ব্রতীদিগকে এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে; বৈজ্ঞানিকের চিন্তা, বৈজ্ঞানিকের ধারণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধরা দিতেছে; ইহা হইতে তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, সত্য আবিষ্কারপথে তাঁহারাই একমাত্র যাত্রী এবং অবৈজ্ঞানিকরা ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে বাস করিতেছেন।

কাশীনরেশ মহারাজা সার প্রভুনারায়ণ সিংহ

পরীক্ষামূলক শিক্ষা

(Experimental Training)

বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত অপর শিক্ষার প্রভেদ এই যে, ইহা পরীক্ষামূলক; বৈজ্ঞানিকরা হাতে-কলমে পরীক্ষা না করিয়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। এইরূপ শিক্ষার ফলে আমাদিগের কয়েকটি ক্ষমতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তন্মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও সত্যের উপলব্ধিই প্রধান। সত্যের উপলব্ধিই জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য, সুখ, সমাজ-শৃঙ্খলা প্রভৃতি সকলই সত্যের উপর নির্ভর করে। মনে, বাক্যে ও কর্ম্মে সাধুতার অভাব হইলেই সমাজে বিশৃঙ্খলতা ঘটে। বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি অবহেলা কোন দেশই করিতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী রূপে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য, আবার প্রাণোন্মাদকারী অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উভয়ই বর্ত্তমান আছে, এরূপ দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বিজ্ঞান-চর্চ্চা না করা সমূহ ক্ষতিকর। এমন কি, বিজ্ঞান-চর্চ্চায় উদাসীনতা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেও প্রধান অন্তরায়।

পরীক্ষামূলক শিক্ষার প্রচারে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনিচ্ছার কারণ কি? শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানসিক শক্তির বৃদ্ধি এবং চরিত্রের গঠন, অর্থাৎ যাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং ফলে মানুষ যাহাতে সাহসের সহিত জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত হইতে পারে। জীবনরূপী মহা পরীক্ষা প্রত্যেকের সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই পরীক্ষামূলক শিক্ষার সংস্রবে আসিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হয়েন না; সন্তরণ শিক্ষা না করিয়া গভীর জলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে এবং অনেকে এই উপায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার ফলে কত লোক যে নিমজ্জিত হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করে?

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর আলস্যের অধীন; কাযেই মনে হয়, দৈনন্দিন ঘটনা-পুঞ্জের সংস্রবে না আসার একটি কারণ অলসতা। লিখন অপেক্ষা পাঠ অপেক্ষাকৃত সহজ, পদব্রজে ভ্রমণাপেক্ষা যানারোহণে ভ্রমণে শ্রম অল্প, এ কথা সকলেই জানেন। কাযেই দেখা যায়, বহুজনমান্য এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা যে বাতাসে সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া হয়, সে বাতাসের অথবা যে জল ও খাদ্য সর্ব্বদা পান ও ভোজন করেন, সে জল ও খাদ্যের সঠিক প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অবগত নহেন।

ডাক্তার বেণীপ্রসাদ

তুল্যদৃষ্টি (Balanced view)

প্রাচীন শিক্ষার প্রতি আনুরক্তি কোন দেশবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি নহে। মৃত বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করার জন্য হয় ও

অনেকে পরীক্ষামূলক শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন। সে কারণে কোন বৈজ্ঞানিকই শ্রদ্ধাপ্রদর্শন হইতে বিরত হইবেন না। জীবনব্যাপী সাধনাবলে লক্ষ নূতন নূতন তথ্য দ্বারা যে সকল মহাত্মারা আমাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি না প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ তুল্যদৃষ্টি সাহায্যে আমাদিগের দেখা উচিত। পুরাকালের গৌরব-মহিমা কিছুতেই হ্রাস হইতে পারে না। মৃত মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট থাকা।

মলিনতা ও অসাধুতা

(Dirt and Dishonesty)

সমাজ হইতে মলিনতা ও অসাধুতা দূরীভূত করিতে হইলে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক। এই শিক্ষা অবলম্বনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে সত্য ও মিথ্যা ঘটনার মধ্যে পার্থক্য সত্বর বুঝিতে পারা যায়। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা বিজ্ঞানের কোন অংশ বিশেষভাবে চর্চ্চা করেন, এমন বৈজ্ঞানিকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা সাধারণে যাহাতে পরীক্ষামূলক শিক্ষা পায়, তাহা করিতে পারিলে দেশের অধিকতর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সুচারুরূপে শিক্ষা করিলে নাগরিক গুণের (Civic Virtue) বিকাশ হয়। সাধুতা ও পরিচ্ছন্নতা এই গুণ দুইটি প্রত্যেক বিদ্বান্-ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহারা সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করে; কারণ, ঐ সকল গুণ উপেক্ষা করিয়া কোন পরীক্ষাতেই সফলকাম হইতে পারা যায় না। সমাজের সকল প্রকার পাপ অপেক্ষা অপরিচ্ছন্নতা ও অসাধুতা ভীষণ। অপরিচ্ছন্নতার সকল প্রকার রোগের আক্রমণ হয় এবং অসাধুতার ফলে সমাজ-শরীরে এত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহাদিগের দমনের জন্য অসংখ্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছেন; অন্যথা জগতের হিতের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন।

বিনয় ও ভক্তি

(Humility and Reverence)

পরীক্ষামূলক শিক্ষার কেবলমাত্র প্রচার হইলেই ভারতের বা অন্য কোন দেশেরই উন্নতি হইতে পারে না, যদি না আমাদিগের জীবনের দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনায় এই শিক্ষার প্রয়োগ করিতে পারি। বিজ্ঞানের আমাদিগের মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করা উচিত, যাহাতে আমরা প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃতি অবগত হইতে সচেষ্ট থাকি। এরূপ মানসিক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে বস্তুতন্ত্রের উপাসক বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। শরীর এবং মনের পরিপূর্ণতাই বিজ্ঞান-শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃতির রাজ্যের ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম পদার্থের সঠিক ধারণা যিনি করিতে পারেন, তিনি স্বভাবতই জ্ঞানী পুরুষ। সত্য বটে, গ্রহাদি ও তারকার পরস্পরের দূরত্ব অথবা তড়িৎকণার (Electron) ক্ষুদ্রতার সঠিক ধারণা করা সহজ নহে, তবে নিত্যই গ্রহ-তারকাদির গতিবিধি নভোমণ্ডলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কিংবা অণুর ক্ষুদ্রতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এতটা সঠিক ধারণা করিতে পারা যায়, যাহাতে মন স্বতঃই বিভুপদে নম্র হইয়া যায় এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যিনি লাভ করেন নাই, তিনি তারকাখচিত নভোমণ্ডলের দৃশ্য চমকপ্রদ এবং ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে ক্ষুদ্রতর কোন পদার্থ হয় না বলিয়াই জানেন, কাজেই বাস্তবের যথার্থ রূপের আস্বাদ হইতে তিনি বঞ্চিত থাকেন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা প্রকার রহস্যময় পদার্থের দ্বারা আমরা আচ্ছন্ন রহিয়াছি। যে সকল মহাত্মারা একটির পর আর একটি এই সকল রহস্য ভেদ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহারা মানব-সমাজের গৌরবমণি।

একটি অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা

(A Genuine miracle)

আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, মানব-শরীরের এক ক্ষুদ্র রক্তবিন্দুমধ্যে সমগ্র মহীশূর প্রদেশের অধিবাসি-সংখ্যাপেক্ষাও অধিকতর সংখ্যায় জীবিত প্রাণী বাস করে। জীবিত লোহিত রক্তকণার সংখ্যা অধিক; তাহারা নিজ নিজ শরীর ক্ষয় করিয়া মানব-শরীর রক্ষা করিবার জন্য অক্সিজেন বায়ু সংগ্রহ করে। তাহাদিগের সহিত একত্র অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যায় শ্বেত রক্তকণা বাস করে; শরীরে কোন প্রকার শত্রু প্রবেশ করিলে তাহার ধ্বংসসাধনে শ্বেত রক্তকণাগুলি নিযুক্ত থাকে। এই দুই প্রকার অধিবাসীরা যাহার উপর আপন আপন কার্য্যপ্রভাব বিস্তার করে, তাহার নাম প্লাস্মা (Plasma); ইহার প্রথম কর্ত্তব্য শরীররক্ষার জন্য প্রোটিন্ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী বহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া; এ্যামোনিয়া কারবনেট্, ইউরিয়া ইত্যাদি শরীরের অনাবশ্যক পদার্থ বহন করিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করাও ইহার একটি কর্ত্তব্য। শ্বেত ও লোহিত রক্তকণা-সমষ্টির আকার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেক স্বতন্ত্র কণা, অণুর (molecules) তুল্য ক্ষুদ্র হইলেও মানুষের মত তাহাদেরও প্রত্যেকটির কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষুদ্র রক্তবিন্দু মধ্যে আবার হরমোন্ (Hormone) নামীয় অন্য এক প্রকার অণু বাস করে; তাহাদিগের সংখ্যা কয়েক সহস্র। তবেই দেখা যাইতেছে, এক বিন্দু রক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবিত প্রাণী বাস করে; তাহারা জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকে বলিয়া আবার লক্ষ লক্ষ অণু পরিমাণ জলের আবশ্যক। এক জন সাধারণ লোকের শরীরের মধ্যে অসংখ্য জীবিত প্রাণীর সমাবেশে গঠিত এক বিন্দু রক্তের মত ৫০ লক্ষ রক্তবিন্দু আছে। একটি মানুষের শারীরিক সুস্থতা কোটি কোটি জীবিত প্রাণীর সুখ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

ইন্‌সিউলিন (Insulin)

সম্প্রতি ইন্‌সিউলিনের প্রকৃতি আমরা অবগত হইয়াছি। ইহার সাহায্যে শরীরের ভিতর কিরূপ রাসায়নিক ক্রীড়া হইতেছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ আমরা পাই। রক্তে চিনির পরিমাণ অধিক হইলে মূত্ররোগ (Diabetes Mellitus) হইতে দেখা গিয়াছে। ইন্‌সিউলিনের স্বভাব রক্ত হইতে চিনিকে দূর করা; কাযেই শরীরে ইন্‌সিউলিনের অভাব হইলেই চিনির আধিক্য হয় এবং ফলে মূত্ররোগাক্রান্ত হইতে হয়। সামান্য পরিমাণ ইন্‌সিউলিনে যথেষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত এক বিন্দু ইন্‌সিউলিন ৩০ হাজার বিন্দু চিনিকে দুই ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্তে আনিতে পারে, ইহা দেখা গিয়াছে। কাযেই মূত্ররোগীর শরীরের মধ্যে ইন্‌সিউলিন প্রবেশ করাইয়া দিলে রক্তে গ্লুকোজের হ্রাস হয় এবং রোগীকে সত্বর আরোগ্যলাভ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অপর পক্ষে অধিক মাত্রায় ইন্‌সিউলিন প্রয়োগে মৃত্যু হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইন্‌সিউলিন এবং চিনি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় প্রত্যেক সুস্থ শরীরেই বর্ত্তমান আছে; মাত্রার আধিক্য অথবা অল্পতা হইলেই রোগাক্রান্ত হইতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; এখন ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মূত্ররোগের কারণ হয়, শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ ইন্‌সিউলিন প্রস্তুত হইতেছে না

অথবা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ইন্‌সিউলিন প্রস্তুত হইলেও শরীর-যন্ত্রের অল্প-বিস্তর বিকলতায় জন্য ইন্‌সিউলিন নির্গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইন্‌সিউলিন তথ্যের আবিষ্কারে যে কেবলমাত্র ভীষণ মূত্ররোগের উপশম হয়, তাহা নহে, পরন্তু শরীরের সুস্থতা যে কতকগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়।

ধর্ম্মোপদেশ এবং একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র

(Ten Commandments and Microscope)

আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বহু পদার্থ রহস্যজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এখন সেই রহস্যজাল ভেদ করিতে পারিলে পদার্থের স্বরূপ সহজ মূর্ত্তি আমাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। যাহাতে আমরা রহস্যজাল ভেদ করিতে সমর্থ হই, তদনুযায়ী আমাদিগকে শিক্ষিত করা প্রত্যেক প্রকার শিক্ষারই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে বহু প্রকার রহস্যের সমাধান করা সম্ভবপর। সুতরাং প্রত্যেক বালক কিংবা বালিকাকে অন্ততঃ কতটুকু ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, এ কথা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি, ধর্ম্মের সার কতকগুলি উপদেশ এবং সেই সঙ্গে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আমার মতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় না পাইলে ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণতা লাভ হয় না।

শাসক-সম্প্রদায় ও নীচ প্রকৃতি-বিশিষ্ট নর-পশু (Rulers and Rabble)

বৈজ্ঞানিক সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রচার আমাদের কর্ত্তব্য নহে কি? হে ভারতীয় সন্তাগণ! আপনারা ঐকান্তিক যত্ন সহকারে যদি কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে যে কোন ইংরাজ অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক তর সফলকাম হইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনাদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তান বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিবে, আশা করা যায়। সত্যই আপনারা আপনাদিগের দেশের শ্রেষ্ঠতায় গৌরব করিতে পারেন। আপনারা আত্মার যাহাতে অভিব্যক্তি হয়, তাহার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনাদিগের বিস্তীর্ণ অতুলনীয় দেশের সহিত জ্ঞান-ভাণ্ডার-বৃদ্ধির সামঞ্জস্য করার ভার অন্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। আপনাদিগের জন্মভূমি যেমন বিস্তীর্ণ, জ্ঞান-ভাণ্ডারও সেই পরিমাণে বৃহৎ হওয়া আবশ্যক। সত্য বটে, কয়েক জন ভারতবাসী নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বৈজ্ঞানিক জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতের দান যথেষ্ট নহে এবং বৃটিশ জাতির অত্যাচার যে ইহার কারণ, তাহা আমার মনে হয় না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, যে কোন শাসক-সম্প্রদায় বা সমাজের নীচমনা নর-পশুরা অত্যাচার করিয়া বিজ্ঞানের প্রচার ও উন্নতির পথে কখনও অন্তরায় হয় নাই বা হইবে না। ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। গেলিলিও পোপের সহিত বিদ্রূপ না করিলে তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় কেহই বাধা জন্মাইত না। প্রিষ্টলে (Pristley) এবং ল্যাভইসিয়ার (Lavoisier) তদানীন্তন রাজনীতিচর্চ্চায় মনোযোগী না হইলে নিপীড়িত হইতেন না।

প্রাচীন সময়ের শ্রেষ্ঠতা

("Good old times")

ডাঃ জনসন বলেন, "যখন কেহ বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অতীতের গুণগান প্রচার করে, তখন আমি ক্রুদ্ধ হই। অতীত কালের জ্ঞান-ভাণ্ডারের যথেষ্ট বৃদ্ধি বর্ত্তমানে হইয়াছে। ইহা সত্য বটে, বেণ্টলির মত ল্যাটিন্ ও গ্রীক ভাষায় এ যুগে কাহারও দখল নাই, অথবা নিউটনের মত কেহই গণিতজ্ঞ নাই, কিন্তু সে যুগ অপেক্ষা বহু সংখ্যায় এমন অনেক ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে আছেন, যিনি গ্রীক ও ল্যাটিন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং গণিতশাস্ত্রের আলোচনা করেন।" ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জনসন এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; বর্ত্তমান সময়ে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মন্তব্য আরও সঠিক ভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। ভারত সম্বন্ধে এ কথা প্রযুজ্য হইতে পারে কি না, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে, যাঁহারা সাধুতার সহিত জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষে বর্ত্তমান সময় কিছু মন্দ নহে। অন্য এক জন বিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেন, "পুরাকালের গুণ-গানে লাভ কি? বর্ত্তমান সময়কে ইচ্ছানুরূপ শ্রেষ্ঠ করিতে পারা যায় না কি?"

কিম্ লাভম্? (Cui Bono?)

এখন দেখা যাউক, বিজ্ঞানের কৃপায় ভারতের কি উন্নতি হইয়াছে। রেল লাইন স্থাপিত হওয়ায় এবং জলসেকের বন্দোবস্ত করায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে; নৌ-বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশাস্ত্রের (Engineering) কৃপায় ভারত হইতে এক মাসের মধ্যে সুদূর আমেরিকায় যাওয়া যায় এবং তাহার ফলে বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যে কত দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে ভারত-সন্তানরা আরোগ্য লাভ করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৈদ্যুতিক বিদ্যাবলে জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কার্য্যে লাগাইয়া দেশের প্রভূত আর্থিক উন্নতি হইতেছে। ভারতের কৃষি-কার্য্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ করিয়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজের কৃষকরা প্রায় ৩ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মহীশূর প্রদেশ প্রায় ২০ হাজার ৫ শত টন চন্দন-কাষ্ঠ বিদেশে—বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে রপ্তানী করিত; সেখানে সেই সকল কাষ্ঠ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হইত। পরে এ দেশে কিরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল বাহির করিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হয় এবং পরে মহীশূর সহরে একটি প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করা হয়; বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বাবধানে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুন-মাসের শেষে ৮ হাজার ৬ শত ৫৫ টন কাষ্ঠ হইতে প্রায় ৯ লক্ষ পাউণ্ড তৈল নিষ্কাশিত হয়। ইহাতে মহীশূর রাজ্যের আয় সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাযেই দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের কৃপায় দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইতে পারে।

বহুবিধ জাতি (Variety of Species)

সত্যের আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিকদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত; সাধনার পুরস্কার নিশ্চিতই আছে। জগতের সৃষ্ট জীবের জাতিসংখ্যা এত প্রকার যে, বিস্ময়ে আমরা অভিভূত হইয়া যাই; সার আরথর শিপলে লিখিত "জীবন" পুস্তকের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—"বৃটিশ মিউজিয়মের পরিচালকদিগকে বিভিন্ন প্রকার জীবের কত প্রকার জাতি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে তাঁহারা বলেন :—

স্তন্যপায়ী জীবের জাতি-সংখ্যা	...	১০,০০০
পক্ষীদিগের	...	১৬,০০০
সরীসৃপ এবং উভচর (Amphibia)	...	৯,০০০
মৎস্য	...	২০,০০০
সমুদ্রজ মলস্ক জীবদিগের (Mollusca) জাতি	...	৬০,০০০
" ক্রস্টেসিয়া (Crustacia)	...	১২,০০০
কীটের জাতি	...	৪৭০,১০০

কাযেই দেখা যাইতেছে, জাতি-সংখ্যার কীটরা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক। সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কারণ কোন বৈজ্ঞানিকই অবগত নহেন। বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই। তবে এ কথা সত্য যে, বৈজ্ঞানিকরা যতই অল্প জানুন না কেন, তাঁহারা নিশ্চিতই তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক জানেন, যাঁহারা সৃষ্টি-রহস্য অবগত না হইয়া পরম কারুণিক পরমেশের উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন প্রকার স্তন্যপায়ী জীবের বিভিন্ন প্রকার গুণ বর্ত্তমান; ক্রমবাদের ফলে আমরা বুঝিতে পারি, কোন্ জাতির কোন্ বিশিষ্ট গুণের বিকাশ হইয়াছে এবং অপর কোন্ জাতির সেই গুণ সুপ্ত হইয়া আছে, পরজন্মে বিকাশ লাভ করিবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যে সকল প্রাণী জগতে বাস করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহারা সহজজাত জ্ঞান (instinct) বলে জীবনধারণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের স্বধর্ম্ম সঠিকভাবে জানা সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাহাদিগের বহু প্রকার জাতি কি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার অস্পষ্ট আভাষ আমরা পাই। জীবিত প্রোটোপ্লাজমের (Protoplasm) উৎপত্তি প্রাণহীন প্রোটিন্ (Proten) হইতে। প্রোটিনের রাসায়নিক প্রকৃতি আমরা সম্যক্‌রূপে অবগত আছি এবং ইহা হইতে সঠিক অনুমান করা হয় যে, এ্যামিনো দ্রাবকের (Amino Acid) বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এ্যামিনো দ্রাবকের জটিলতা

(Amino-Acid Complex)

এ্যামিনো দ্রাবকের মিশ্রণের ফলে প্রোটিন্ প্রস্তুত হইতে পারে—ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এখন বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের উৎপত্তির কারণ অবগত হইলে প্রাণিশরীরজাত এবং উদ্ভিদ্ হইতে সৃষ্ট উভয় প্রকার প্রোটিনের রাসায়নিক প্রকৃতি পরীক্ষা করা আবশ্যক; পরীক্ষায় ইহা স্থির হইয়াছে যে, কোন না কোন প্রকার এ্যামিনো দ্রাবক প্রত্যেক প্রকার প্রোটিনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও প্রত্যেক প্রকার প্রোটিনের মধ্যে এমন এক প্রকার দ্রাবক বর্ত্তমান আছে, যাহা অন্য প্রোটিনে বর্ত্তমান নাই এবং দ্রাবকগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন প্রোটিনে বর্ত্তমান আছে। জাতির (spec es) বিভিন্নতার অস্পষ্ট আভাষ ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

এমিল ফিশার (Emil Fischer) মহাশয় একটি ম্যাডাগাস্কর দেশের উর্ণনাভ এবং একটি রেশম কীট, এতদুভয়ের প্রস্তুত সূত্র রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা এ্যামিনো দ্রাবকের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। দুই প্রকার সূত্রের প্রকৃতি প্রায় একরূপ, তবে উভয়ের মধ্যে অল্পমাত্র পার্থক্য এই যে, উর্ণনাভের প্রস্তুত সূত্রে গ্লুটানিক্ দ্রাবক পাওয়া গিয়াছে, যাহা কীটের প্রস্তুত সূত্রে বর্ত্তমান নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, দুই প্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের কীটের প্রস্তুত সূত্রের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, কিন্তু অল্প একটু পার্থক্যের জন্য তাহাদিগের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হইয়া গিয়াছে। এক দিকে শান্ত শিষ্ট গোবেচারা আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম কোন কীট এবং অন্য দিকে রাক্ষস-প্রকৃতিবিশিষ্ট মাংসাশী হিংস্র উর্ণনাভ! প্রকৃতির আশ্চর্য্য খেলা!

রাসায়নিক ক্রিয়ায় চরিত্র-গঠন

(Chemical Basis of Character)

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অবগত নহি। যাহা অনুমান করা যায়, তাহা সঠিক পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয় নাই। তবে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এ বিষয় এতদূর উন্নতি লাভ করিবে যে, প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণ কি কি বিশেষ প্রকার এ্যামিনো দ্রাবকের সংমিশ্রণের ফলে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিবে। মূত্ররোগীর শরীরে যেমন সামান্য পরিমাণ ইন্‌সিউলিন প্রয়োগে তাহাকে সুস্থ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ বাহির হইতে প্রয়োগ করিয়া ভিতরের অভাব যেমন নিবারণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ কোন চরিত্রের কোন বিশেষ গুণের অভাব হইলে, বাহির হইতে সেই অভাব নিবারণ করিতে সমর্থ বিশেষ কোন প্রকার দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া সেই গুণের বিকাশলাভে সহায়তা করিতে পারা যাইবে।

বিবেচনা-শক্তির প্রয়োজনীয়তা

(Empire of Reason)

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্ম্মপদ্ধতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। গত বিশ্ববিদ্যালয়-সম্মিলনীতে ভারতের বড় লাট লর্ড রেডিং বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান কর্ত্তব্য, যাহাতে বিবেচনা-শক্তি সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করে—সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। আমিও সেই কথাই এখানে বলিতে চাই। ভাবপ্রধান জাতির উন্নতি হইতে পারে না, যদি না যুক্তির অধীনে "ভাব" (sentiment) থাকে। যুক্তিবলে মানুষ সত্য ও অসত্যের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং যুক্তিবলে মানুষ মিথ্যাকে খণ্ডন করিয়া দেয়;—অতএব দেখা যাইতেছে, বিবেচনা-শক্তি যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জাতির উন্নতির পথে অত্যাবশ্যক। প্রাচীনকালে প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য শিক্ষা পাইয়া আসিতেছিল; অধুনা প্রতীচ্য প্রাচ্যকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিতেছে। আশা করা যায়, এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যে দিন প্রাচ্য নিজের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতীচ্যকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইবে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিন্দা

(কবীর)

শত্রুরা যদি বা তব নিন্দাবাদ করে —
রটিবে সুখ্যাতি তব অবনী-ভিতরে।

ফুল-গন্ধ চুরি ক'রে কভু কি বাতাস
বাঁধিয়া রাখিতে পারে—অন্তরের পাশ।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ
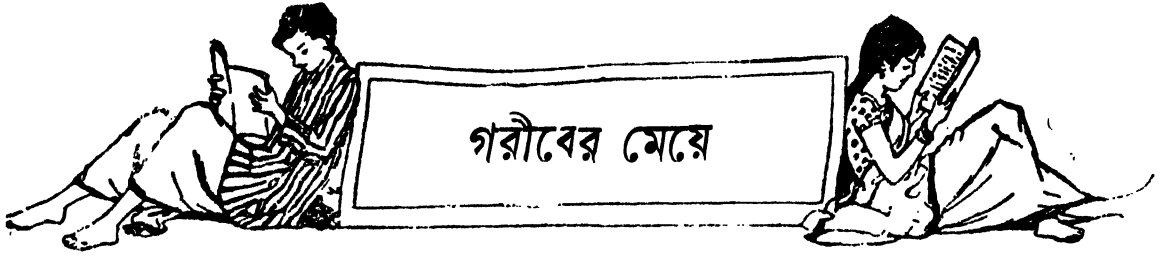
বাড়ী ফিরিয়া সুলেখা তাহার চিরাভ্যস্ত কার্য্যস্রোতে যখন নিজেকে যথাপূর্ব্ব নিমগ্ন করিয়া দিল, তখন বিপ্রদাস বাবু যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন। দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট বন্য পশুকে যেমন কখন কখন তাহার প্রতিপালকের কাছে নিজের চিরহিংস্র প্রকৃতিকে একান্ত বশ্যতায় সংযত ও সংহত করিয়া লইয়া শান্তমূর্ত্তি ধরিতে দেখা যায়, বিপ্রদাসেরও এই প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অপত্যস্নেহ তাঁহাকে তাহার কাছে তেমনই নির্বীর্য্য ও নিরীহ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা তাঁহার শান্ত প্রকৃতি দিয়া যে দুর্দ্দান্ত বাঘকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, এই শান্তমূর্ত্তি ও দীপ্ততেজা বালিকা তাহা অবলীলাক্রমে ঘটাইয়াছিল। বিপ্রদাসের সকল কঠোরতা এইখানেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাই সুশীল-সম্বন্ধীয় ওই দুর্ঘটনাময় দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সুলেখা যখন জিদ করিয়া ভুবনবাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিতে ভরসা না করিলেও মনে মনে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সুলেখার সুকোমল স্নেহময় প্রকৃতি তাঁহার সুপরিচিত হইলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার তীব্র বিরাগও তেমনই যে তাঁহার সুবিদিত। সে যদি সুশীলকে পাপী বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তবে তাহার সে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটান বড় সহজ হইবে না। তাই বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে সহজভাবে নিজের স্থান গ্রহণ করিতে দেখিয়া তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্নের হস্তমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং এ ঘটনাটা সত্যবতীর নিকটে উত্থাপন করারও আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। কারণ, তাঁহার জানা ছিল, এই সকল বাস্তবজগতের পুরুষোচিত দুর্ব্বলতাকে সত্যবতীও মনে মনে ঠিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।

অনুকূলের ব্যাপারটা মিটাইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। মেয়ে নিরুদ্দিষ্টা, শ্মশানঘাটে জলে ডুবিয়া মৃত্যুই প্রমাণ দাঁড়ায়, অগত্যা নগদ দুই শত মাত্র টাকাতেই অনুকূল বিপ্রদাসের ভাবী জামাতার অনুকূলেই পুলিসে এজাহার দিয়া আসিল। মেয়ের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না, সে এক খৃষ্টান যুবাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিল, তাই সুশীলকে সে-ই সে কথা জানাইয়া পলাইতে সাহায্য করে, পরে জাতি যাওয়ার ভয়ে পিতাকে অন্য বরে বিবাহ দিতে উদ্যত দেখিয়া কান্নাকাটি দ্বারা মরণাপন্ন মায়ের মৃত্যু ঘটাইয়া সেই সুযোগে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বে অনুরূপ সন্দেহ ঘটিলেও ইহাই যথার্থ প্রামাণ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। এ দিকের এই গোলমালটা মিটাইয়া ফেলিয়াই বিপ্রদাস ও দিকে ভুবনবাবুকে বিবাহের দিন স্থির করিতে অনুরোধ জানাইয়া সত্যবতীর প্রতিও যথাকার্য্যে মনোযোগী হইবার আদেশ দিলেন।

বেণারসীর কারবারী এক খাণ্ডিলওয়ালা একরাশি সাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল, কয়েকখানা ভাল ভাল সাড়ী বাছাই করিয়া বিপ্রদাস স্ত্রীর কাছে অন্দরে পাঠাইলেন—তাহার মধ্যে দুই চারিখানা পছন্দ করিয়া লইবার জন্য। সত্যবতী আপনি পছন্দ করিয়া তাহার পর মেয়েকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই টকটকে লাল সাড়ীতে বড় বড় জরির ঝাড়ের কায দেওয়া সাড়ীখানা তোর বিয়ের জন্য রাখবোই, তা ছাড়া এর মধ্যে ক'খানা তোর পছন্দ হয়, দেখ্ দেখি।"

সুলেখা কাপড়গুলার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া সে শুষ্ক স্বরে উত্তর করিল, "কাপড় আমার একখানাও পছন্দ নয় মা, কাপড় তুমি সবই ফেরৎ দাও।"

মা বলিলেন, "সে কি রে? এমন চমৎকার কাপড়, তোর কিছু পছন্দ হলো না? সোনার তারের ওই৩

নক্সাকাটা সাড়ীখানা সত্যি চমৎকার! এইটে বাপু, আমি ফুলশয্যায় দোব। আটশো টাকা দাম, তা হোক্ গে। এই রূপার তারে সোনার কাযগুলা, আর নীল রংয়ের বাদলা সাড়ী দুখানা বাক্সয় দিতে লাগবে, ময়ূরকণ্ঠী রংটাও কিন্তু তোকে মানাবে বেশী; ওখানাও নিতে হবে। সবগুলোই ত দেখছি সুন্দর!"

সুলেখা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের আঙ্গুলে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইতেছিল, তেম্নি থাকিয়াই সে ধরা গলায় জবাব দিল, "ও সব কেন বল্‌ছো, মা; তুমি কি জানো না, আমার বিয়ে হওয়া এ জন্মে অসম্ভব! যা হবে না, তার আর মিথ্যা আলোচনায় ফল কি?"

সত্যবতী এবার সাশ্চর্য্যে মুখ তুলিলেন, তাঁহার কণ্ঠে ও নেত্রে সভয় সন্দেহ অতিমাত্রায় ভরিয়া উঠিল, সাশ্চর্য্যে তিনি বিস্ময়বিহ্বলভাবে কহিয়া উঠিলেন, "সে কি লেখা! এ তুই কি বল্‌ছিস্, মা? বিয়ে অসম্ভব! কেন রে? কখন্ কি হলো এর মধ্যে?"

সুলেখা একটু চকিত হইয়া মা'র দিকে চাহিল, তাঁহার বড় বড় চোখে ব্যথিত বিস্ময়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া সে সবই বুঝিল, এবং বুঝিল বলিয়াই পিতার প্রতি মনটা তাহার বিষম বিরক্ত বোধ করিল। তিনি কিছুই তাহা হইলে তাহার মাকে জানান নাই; আশ্চর্য্য!

নীরস শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "বাবুজীকেই আগে তুমি জিজ্ঞেস করো, তিনি যদি এখনও তোমায় না বল্‌তে পারেন, তা হ'লে আমিই না হয় তোমায় সব বলবো, কিন্তু তাঁরই বলা উচিত।"

এই বলিয়াই সে চঞ্চল হইয়া চলিয়া গেল। মায়ের সেই নিশ্চিত আশাভঙ্গের তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া তাহার নিজের দৃঢ়তাও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে মায়ের সঙ্গ আর সহিতে পারিতেছিল না। সে যে মায়ের এক সন্তান।

এ দিকে স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া সত্যবতীও জিদ ধরিয়া বসিলেন যে, এরূপ অবস্থায় ওখানে তিনি কন্যাদান করিতে পারিবেন না। সুলেখাকে এক দিন সেই কথাই বলিলেন, বলিলেন যে, সুলেখার পিতা এখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই বটে, তবে তিনি তাঁহাকে যেমন করিয়াই এ বিষয়ে রাজী করিবেন। কেন, দেশে কি পাত্রের এতই অভাব হইয়াছে যে, সুলেখার মত মেয়েকে অমন অপাত্রের হাতে দিতেই হইবে? সে তিনি থাকিতে ঘটিবে না। মায়ের মুখের আশ্বাস-বাণী শুনিয়া সুলেখার মুখের কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটিল না, সে মায়ের দিকে তাহার স্থির-সিদ্ধান্তে ভরা অবিচল নেত্র দুটি তুলিয়া ধরিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি মনে করছো, আবার আর এক জনের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দেবে, আর তাই আমি করবো?"

সত্যবতী মেয়ের মুখের এই সুস্পষ্ট জেরায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেও মনোভাব গোপন করিয়া সহজভাবেই জবাব দিলেন,—"সে কি? এক জনের সঙ্গে বিয়ের কথা হ'লে কি আর তার অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয় না? একবার ছেড়ে শতবারও এমন বিয়ের সম্বন্ধ সবাইকারই হয়ে থাকে।"

সুলেখা নিজের চোখের দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর তেম্‌নিভাবেই স্থির রাখিয়া কঠিন স্বরে কহিল,—"আর যে যা বলে বলুক, মা, তুমি আমায় ও কথা আর এক-বারও বলো না। সতী-সাধ্বীর মেয়ে আমি, আমায় আট বছর বয়স থেকে এক জনের কাছে উৎসর্গ ক'রে রেখে আজ যদি তোমরা সে দান ফিরিয়ে নিয়ে অপরকে আবার তাকেই দিতে যাও, তোমরা দত্তাপহারী-ই হবেই, আর আমি হবো—অসতী। তা কি ভেবে দেখেছ?"

"লেখা! লেখা!—অমন কথা বলিসনে!" মেয়ের কথায় সত্যবতীর বুকে যেন কে চাবুক মারিল, ঠিক তেমনই আর্ত্তরব করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে গেলেন, —"বিয়ে ত আমরা দিইনি, শুধু মুখের কথা মাত্র দিয়েছিলুম, তার জন্য—"

সুলেখার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই তাহা একান্ত মলিন হইয়া গেল, সে এবার মায়ের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নতনেত্রে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাদের পক্ষে হয় ত সেটা শুধু মুখের কথাই হবে, মা, কিন্তু আমি ত তাকে কেবল মুখের কথাই মনে করতে পারিনি। এত দিন ধ'রে যে বাড়ীকে আমার শ্বশুরবাড়ী ভেবে এসেছি, যাকে আমার—"

সুলেখার ব্যাকুল কাতর কণ্ঠ অস্ফুট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনাকে সন্তর্পণে জাগাইয়া তুলিয়া সে নিজের বক্তব্য সমাধা করিল। কোন বাধাকেই যেন সে মানিয়া উঠিতে পারিল না ;— "যাকে আমার স্বামী ভেবেছি, আমি কেমন ক'রে আবার সে সব বদল ক'রে—আর এক জনকে আবার তারই জায়গায়—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে যেন সেই সম্ভাবনায় একান্ত ভয়ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া সচমকে বলিল, "তা কোন-মতেই হবে না মা, আর কারুকে বিয়ের কথা মনে হ'লে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যায়—সে কিছুতেই আমি পারবো না, তুমি বাবাকে সেই কথা বুঝিয়ে বলো। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, তা হ'তে পারে না ?"

মেয়ের সেই উত্তেজনারক্ত সতীত্বের প্রভাদীপ্ত অনৈসর্গিক মুখের দিকে অনিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া চাহিয়া সত্যবতী মূর্ত্তির মতই শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার প্রত্যেক কথাটি যেন অনির্ব্বচনীয় সত্য, সঙ্কল্পে সুদৃঢ় ও অকাট্য; সে বিষয়ে তাঁহারও আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না এবং সতী নারীর অন্তর দিয়া ইহার যৌক্তিকতাকেও তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

ইহার পর সুলেখার মা-বাপে মিলিয়া কি পরামর্শ হইল, জানা নাই, কিন্তু সুলেখার মায়ের পাত্রান্তরে কন্যা-দানের সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গেল। এক দিন কথায় কথায় তিনি আবার এই কথাটাই তুলিলেন। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "তা হ'লে সুশীলের সঙ্গেই বিয়ে হোক্, তাঁর ত বরাবরই তাই ইচ্ছা। বলেন, বিয়ে হলেই সব শুধরে যাবে। আর তার খবর নিয়েও জেনেছেন, তাতে তার দোষও ত বেশী নয়—"

শুনিয়া সুলেখা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই ছিটকাইয়া উঠিয়া তেমনই জ্বালাভরা ত্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ও কথা আমায় বলো না মা! বিয়ে আমার হওয়া আর সম্ভব নয়। যার মাথায় অত বড় কলঙ্কের বোঝা, তাকে তোমরা কোন্ হিসেবে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও ?"

মা তখন ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "তবে আমরা কি করতে পারি, তাই বল্ মা ? ওকেও বিয়ে করবি না, অন্যকেও না, এর কি উপায় করি লেখা ?"

সুলেখা মৃদু শ্বাস লইয়া উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল, "তাই ত বল্‌ছি মা, এর ত কোন উপায়ই নেই, তাই এমন করেই কাটাতে দাও মা। করবার পথ এর কোন্-খানে আছে যে, কিছু করবে তোমরা ?"

"চিরদিনই আইবুড় হয়ে থাকবি তুই ? লোকে তাতে কি বল্‌বে সুলু ?"

সুলেখা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আর যা বলে বলুক মা! তোমার মেয়েকে দ্বিচারিণী ত আর কেউ বল্‌তে পারবে না। হিঁদুর মেয়ের পক্ষে সেই যে যথেষ্ট। এ যে সীতা-সাবিত্রীর দেশ মা!"

সত্যবতী বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার একমাত্র মেয়ের বিবাহে কত সাধ, কত আশাই যে তিনি মনের মধ্যে করিয়া-ছিলেন। উঃ, পৃথিবীটা কি? যেখানে বেশী আশা, সেইখানেই কি তেমনি ওজনের মাপে মাপিয়া নিরাশার নিরানন্দ পুঞ্জীভূত হইয়া জমিয়া উঠিবে? কে জানিত যে, তাঁহার অত আদরের সুলেখার ভাগ্যেই এমন ধারা বিড়ম্বনা লিখা ছিল!

বিপ্রদাসবাবু নিজেও বিধিমতে মেয়েকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সুলেখার এ যে একেবারেই অস্তিত্বহীন অনাবশ্যক খেয়ালমাত্র, তাহাও তিনি বহুতর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু সুলেখার সেই শান্ত মুখেই বিনীত অথচ সুদৃঢ় বাণী—"আমি মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি বাবা, তিনি আমার হয়ে আপনাকে বুঝাবেন। আর আমি কিছু বলবো না।"

ইহার আর রদ-বদল হইল না। মা মনের দুঃখে অশ্রুপাত সম্বল করিলেন, পিতা ক্রোধকঠিন মুখে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, মেয়ে নীরব দৃঢ়তায় একনিষ্ঠ-ভাবেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া রহিল। শুধু তাহার সারা চিত্ত অসহ ক্রন্দনের আর্ত্ততায় ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া নীরব হাহাকারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, "তোমায় যত দূরেই ঠেলিয়া ফেলি না কেন, তুমি আমারই! তুমি আমারই!"

—

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীতল বর্ষাধারায় চোখের জলের তপ্তধারা মিশাইয়া দিয়া নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি অবসানে ক্লান্তদেহে শ্রান্ত-চিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই দাসী আসিয়া একখানা খামে মোড়া চিঠি সুলেখার হাতে দিয়া বলিল, "ডাকপিয়ন ভোরের বেলা দিয়ে গেছলো, আপনি ওঠেননি ব'লে এতক্ষণ দিইনি।" মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "জামাই বাবুর চিঠি না দিদিমণি?"

সুলেখার চিন্তাম্লান পাণ্ডু মুখ এই ইঙ্গিতে একবারের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সেই আকস্মিক তপ্ত শোণিতোচ্ছ্বাসটা একেবারে নিঃশেষে যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়া তাহার সেই বেদনা-পাণ্ডুর মুখখানাকে কে যেন হল্‌দে রং মাখাইয়া দিল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মাটীর ঠাকুরের সুগঠিত মুখকে যেমন দেখায়—সুলেখার সুন্দর মুখখানাকেও ঠিক তেমনই প্রাণহীন বলিয়াই বোধ হইল। একটু একটু করিয়া তাহার মধ্য হইতে জীবনের তেজ যেন লুপ্ত দৃষ্ট হইল। দাসী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, সে এক পা এক পা করিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-মন্থরগতিতেই নিজের সদ্য পরিত্যক্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বারে খিল লাগাইয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ যেন চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিতেও তাহার ভরসা হইতেছিল না, মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা তাহার জন্য যতই প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল, বাহিরের দিক হইতে হাতের আঙ্গুলগুলা ততই যেন শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহাকে ঐটুকু সহায়তা করিতেও তাহাদের দারুণ অনিচ্ছা খ্যাপন করিতে লাগিল। তাহার কেবলই ভয় করিতে লাগিল, চিঠি খুলিয়া সে হয় ত দেখিবে, সুশীল লিখিয়াছে, নীলিমাকে পাওয়া যায় নাই, আর না হয় ত লিখিয়াছে—তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এখন সে সুশীলের বিবাহিতা স্ত্রী—এই দুটো খবরই যেন সুলেখার পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। একে সুশীলের দ্বারা নারী-হত্যায় তাহার আশা—তাহার চিন্তা—তাহার প্রতীক্ষা ইহ-পরলোকে চিরদিনের মত নিঃশেষ! আর অপরে এ জন্মের মতই তাহার সঙ্গের সকল সম্বন্ধের উচ্ছেদ!

কিন্তু হোক তা, চিরদিনের মত হারানোর চেয়ে বুঝি সেই ভাল! তবু ত সুলেখা নীলিমার স্বামীর চিন্তা করিয়াও জীবনের বাকি দিনগুলা এক রকমে কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এই চিন্তা করিয়াই সহসা সুলেখার সমস্ত জীবনটাই যেন অকস্মাৎ একান্তই অর্থহীন হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, অতঃপর আর কোন কিছুতেই যেন তাহার প্রয়োজন নাই। লোকসমাজে আর সে নিজেকে বাহির করিতে পারিবে না, এমন কি, নিজের মা-বাপের সাক্ষাতেও না। শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য যেটুকু চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক, সেটুকু চেষ্টাও যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! এই পত্র আসার সংবাদে মা আসিয়া যখন ব্যথিত নিঃশব্দ প্রশ্নে দৃষ্টি ভরিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইবেন, তখন তাঁহাকে সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা সে কোনমতেই যেন হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইল না। নিজেকে সে ত শেষ করিয়াই দিয়াছে; কিন্তু বাপ-মায়ের যে কত বড় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার সে কারণ হইয়া জন্ম লইয়াছিল, তাহা ভাবিয়াই তাহার বুক চড়চড় করিতে লাগিল। চিঠিখানা খুলিবার চেষ্টাও এই প্রকার মানসিক অবস্থায় পড়িয়া সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। যেন তাহার ভিতরে একটা করাল কালসর্প লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, খুলিতে গেলেই সেটা তাহাকে বিষদাঁত ফুটাইয়া দিবে, এম্‌নি তাহার ভয় করিতে লাগিল।

বর্ষাদিনের ক্ষণিক সূর্য্যপ্রকাশ ইতোমধ্যেই কজ্জলকৃষ্ণ মেঘব্যাপ্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্যামল জলদের ঘনচ্ছায়ায় বিশাল বিশ্বকে সঙ্কীর্ণতর প্রতীয়মান হইতে-ছিল। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সুলেখা পত্র হস্তে সেইরূপ গুরু স্পন্দিত বক্ষে মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে ফুটন্ত কদম্বগাছের উপর দিয়া প্রমত্ত পবন যেন তাহারই গোপন-সঞ্চিত বেদনা বহিয়া আর্ত্ত হা হা রব তুলিয়াছিল। তাহারই নির্ম্মম পীড়নে ফুটন্ত কদম্ব-কেশর বিরহিণী নারীর অশ্রু-বরিষণের মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া জানালা দিয়া ঝরা পাতা, খসা পাঁপ্‌ড়ি অজস্র পরিমাণে উড়াইয়া আনিল। সুশীলের সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

"সবিনয়-নিবেদন—

তোমার অনুমানই সত্য, নীলিমা মরে নাই, সে বাঁচিয়া আছে।"—সুলেখার হৃৎপিণ্ড সহসা দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল, আঃ, তবে সুশীলের কার্য্য নারী-হত্যার সহায়ক হয় নাই? ভগবান্!—পরক্ষণেই চলন্ত মেঘের কবলে পতিত সূর্য্যালোকের প্রভার মতই তাহার সেই আকস্মিক লোহিত-সমুজ্জ্বলতা একেবারেই যেন ম্লান ও মসীময় হইয়া গেল। বোধ হইল, তাহার চারিদিক বেড়িয়া একটা প্রলয়-রাত্রির বীভৎস দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। প্রমত্ত প্রমথের চরণভঙ্গে তাহার বুকের পাঁজরাগুলা শুদ্ধ যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

তাহার পর সুলেখা আবার পড়িল—"সে এখন * * এর মিশনে বাস করিতেছে। সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, আমার প্রস্তাব সে গ্রহণ করে নাই এবং সে এখন দীক্ষিত খৃশ্চান—"

সুলেখার হাত হইতে পত্রখানা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। সে নিজেও যেন সেই সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। তাহার বুকের মধ্যে একসঙ্গে দুই দিক হইতে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের বন্যা দুকূল প্লাবিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিয়া দেখা দিল। হর্ষ ও শোক, আশা ও নিরাশা, আগ্রহ ও নিরুদ্যমতা এই উভয়ে মিলিয়া তাহাকে যেন একইক্ষণে পীড়িত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলিমার ঐ প্রকার একটা ভুল পরিণামই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিল, সেই জন্য তাহার এ দুঃখ ও নিরাশা,কিন্তু সেটা যে আরও বেশী মন্দ হয় নাই এবং সুশীল যে তাহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টা করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিতে পারিল, সেই আনন্দে তাহার সকল দিনের সকল কষ্টই যেন সে ভুলিয়া যাইতে বসিল। চিঠিখানার শেষ পর্য্যন্ত আর সে মন দিয়া পড়িবার দরকারও মনে করিল না। সে কথা তাহার আর মনেই পড়িল না। কেবল এত দিন ধরিয়া সে সুশীলের প্রতি যে সকল নির্ম্মম ও কঠোর ব্যবহারগুলা করিয়া আসিয়াছে, সেইগুলার কথাই মনে করিয়া এখন তাহার মর্ম্মের বাঁধন যেন চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল এবং সে একটুখানি সুখের সহিত বিগত বিরাট শোকের বিপুল অশ্রু একত্র করিয়া দিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু আবার তাহার স্মরণে আসিল, আজ সে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু তবুও যে তাহার সেই ক্ষণিক মোহের জলন্ত স্মৃতি তাহাদের মাঝখানে পাষাণ-প্রাচীর তুলিয়া রহিয়াছিল, আর কি কখন এ ব্যবধান দূর করিতে পারা যাইবে? না না, সে দুরাশা বৃথা! যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। কখনও না, কিছুতে না, প্রাণ দিলেও না। কিন্তু—কিন্তু তবু—তবু কি কখন সুশীলের সে দিনের সে নিগ্রহ সে ভুলিতে পারিবে? পাপ ত করে অনেকেই, প্রায়শ্চিত্ত তাহার কয় জনে করে? এত মহত্ত্ব কাহার? সুলেখার আদেশের এ সম্মান আর কে রাখিত?

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সে দিন নীলিমার সহিত সাক্ষাতের পর সুশীলের মনে হইল, এ জন্মের মত তাহার সকল কার্য্যই এবার সমাধা হইয়া গিয়াছে, অতঃপর এ পৃথিবীতে তাহার আর কিছুই যখন করিবার নাই, তখন এই অনাবশ্যক জীবনের গুরু ভারটা বহিয়া বেড়াইলেও চলে, অথবা না বহিলেও তাহার আর কিছুমাত্র আসিয়া যায় না! বর্ষার নদী গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে শুকাইয়া গিয়া ক্রমেই যেমন তাহার দুই ধারে বিস্তৃত ধূ ধূ বালুরাশির অভ্যন্তরে মিলাইয়া আসিতে থাকে, সুশীলের শ্রাবণ-গঙ্গার মতই কূলপ্লাবী স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-প্রীতি-পরিপূর্ণ উদার চিত্তও তাহার উপরকার অপ্রত্যাশিত প্রতিঘাতে একেবারে যেন শুষ্কতর হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বসুখের আধারস্থল এই আনন্দময় বিশ্বজগৎ তাহার মনের কাছে একখানা কালো কয়লার চেয়ে এতটুকুও আর বৈচিত্র্য বা আনন্দপ্রদ ছিল না, তাই তাহার সারা চিত্ত যেন নিদারুণ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া এখানের কারবার তুলিয়া দিয়া একটা বিরাম-শয্যা খুঁজিতে চাহিতেছিল; আর সে যেন পারিতেছিল না।

বাড়ী ফেরার তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, কোথাও দূরে দূর হইতে দূরান্তরে দেশ, ভূমি, পরিচিত সব কিছুকেই ছাড়িয়া পৃথিবীর কোন এক নিভৃত প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া, তাহার সুশীল নাম বিস্মৃত হইয়া, জীবনের এই

অন্ধকারময় দিনগুলাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতে তাহার অপমান-পীড়িত আহত অন্তরাত্মা তারস্বরে তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। করাচী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া সাউথ আফ্রিকা বা আরও কোন দূরবর্ত্তী সুদূর অজ্ঞাত-অখ্যাত রাজ্যে অসভ্য বন্যদিগের মধ্যে চিরদিনেরই মত আত্মনির্ব্বাসন দিতে সে মনে মনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার পরিত্যক্ত নিজ গৃহস্থিত একটিমাত্র ক্ষীণ দীপশিখার প্রতি তাহার অশ্রু-অন্ধতায় প্রায়-দৃষ্টিহীন নেত্রের সঙ্কুচিত দৃষ্টি পতিত হইল। যে মাতৃ-প্রতিমা পিসীমা--মাতৃহীন তাহাকে আশৈশব-যৌবন মাতৃস্নেহের অফুরন্ত নির্ঝর-ধারা ঢালিয়া দিয়া বুকে করিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, সেই একমাত্র বিশ্বস্ত স্নেহই যে আজও তাহার জন্য তেমনই অকলুষিতভাবে রক্ষিত আছে। তিনি যে আজও সকলকে সগর্ব্বে মাথা খাড়া করিয়া বলিতেছেন, "কখন না, আমার সুশীল সে ছেলেই নয়! প্রাণ দিবে, তবু সে এতটুকু একটু অন্যায় করবে না—এ আমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলবো!" সেই মহিমময়ী মায়ের কথা কি সুশীল জীবনের শেষ দিনেই কখনও ভুলিবে? এ পৃথিবীতে আজ সে নিঃস্ব নিঃসহায় ফকির! কাহারও কাছে আজ কোন সম্বলই তাহার নাই, তাই এইটুকু পাওনাই তাহার পক্ষে আজ সাত রাজার ধনের মতই অমূল্য বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার পায়ের ধূলাটুকুকে যে যাবার আগে একবার সঞ্চয় করিয়া লইতেই হইবে। সুশীল তাই বাড়ী ফিরিল। মনের অতি-নিভৃত কোণে আরও কাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষাও হয় ত বা অতি সূক্ষ্মভাবেই লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু সে কথাটা সে নিজের মনকে ভাল করিয়া বুঝি জানিতে দিল না, দিলে অভিমানের সহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে হয় ত বা তাহারই জয়পতাকাখানা খাড়া হইয়া উঠিলেও উঠিতে পারে, বুঝি বা মনে মনে সে ভয়ও ছিল।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া বুক আবার সুশীলের যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। পিতার অবস্থা যথাপূর্ব্ব। তিনি জরা-বার্দ্ধক্যে জড়াইয়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। নিজের ঘর হইতে আর বাহিরও হইতে পারেন না, চোখের দৃষ্টি একান্ত ক্ষীণ, কণ্ঠের কচিৎ বিরল ভাষা তদপেক্ষাও ক্ষীণতর। সুশীল গিয়া প্রণাম করিতে তাঁহার ঠোঁট একটুখানি কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও তিনি কহিতে পারিলেন না। অসংবরণীয় ব্যথায় মর্ম্মভেদ হওয়ায় অভিমানী বালক বেত্রাহত, অপরাধীর মত ভগ্নচিত্তে আর্ত্তবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নিজের নির্জ্জন ঘরের আলুথালু বিছানার উপর নিজেকে বিবশভাবে লুটাইয়া দিল। না না, এমন করিয়া আর সে বাঁচিতে পারে না! এ অসহ্য, এ অসহ্য, ইহাঁর অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল! ইহার অপেক্ষা শতবার মৃত্যু ভাল!

চোরের মত পা টিপিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কাছে আসিয়া সে সংশয়-ভীতকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "সুশীল!"

গলা তাহার এতই কাঁপিতেছিল যে, কাহার যে সে স্বর, তাহাও যেন ঠিকভাবে চেনা যায় না। বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া সুশীল ততোধিক বিস্ময়ের সহিত অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিল, "শুভূদা!"

সুশীলের বুকটা নিমেষে ধক্ করিয়া উঠিল। না জানি, আজ আবার কি উদ্দেশ্য মনে লইয়া শুভেন্দুর এখানে আগমন! তথাপি মন কিন্তু সুশীলের তেমনভাবে শঙ্কিত হইল না। কারণ, ভয়-ভাবনা, লজ্জাতঙ্ক আজ সবই যে, তাহার কাছ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাহারও কোন অন্যায় অবিচারে, কোন অমানুষিক অপ্রত্যাশিত অত্যাচারে তাহার আর এখন কিছুমাত্র যায় আসে না, তাহার ক্ষতি-যাহা কিছু হইবার, সে ত সবই হইয়া বহিয়া চুকিয়া গিয়াছে। আর বেশী করিয়া কোথা হইতে কি হইবে?

শুভেন্দু কিন্তু আজ সে ভাব কিছুই দেখাইল না; সে বরং ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার পা দু'খানাকে দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকরুণস্বরে বলিয়া উঠিল, "সুশীল! সুশীল! আমায় বাঁচাও! বাঁচাও ভাই আমাকে!"

শুভেন্দুর এই ব্যবহারে সুশীলের বিস্ময় তখন সীমাতিক্রম করিল। ইহাকে সে তাহার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিয়া গালি দিতে দিতে প্রহার করিতে দেখিলেও ইহার অর্দ্ধেকটুকুও আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু এই যে তাহার

পায়ে ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিতে দেখিল ও শুনিল, ইহাতে সে যেন একেবারে বিস্ময়-সাগরের তলদেশে তলাইয়া গেল! বহুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন ভাষাই যেন সরিল না, পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টার সহিত স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করছো কেন শুভুদা? কি হয়েছে?"

শুভেন্দু ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িয়া রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিল, "পুলিস এসে আমায় ধরেছে, চার্জ্জ গুরুতর, জাল সহিতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বার করা—এখনই আমায় নিয়ে যাবে, তুমি আমায় বাঁচাও ভাই, এ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।" শুভেন্দু গভীর ক্রন্দনে ফুলিতে ও ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল।

সুশীল তখনই অতীতের সব কথা ভুলিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া শুভেন্দুর গায়ে হাত দিয়া সস্নেহে সযত্নে তাহাকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন শুভুদা? জাল ত আর তুমি কর নি, সে অনায়াসে প্রমাণ হয়ে যেতে পারবে। বড় বড় উকীলব্যারিষ্টারের ত আর অভাব হবে না তোমার পক্ষে—"

সহসা ভূতাহতবৎ সুশীল শুভেন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া একটুখানি পিছাইয়া গেল। কি ভীষণ ও অকথ্য লজ্জা-জ্বালাপূর্ণ ইঙ্গিত সে সেই মুহূর্ত্তেই শুভেন্দুর দৃষ্টিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিল! সুশীলের চারিদিকের বিশ্বসংসার বিরাট লজ্জায় যেন কালো হইয়া মিলাইয়া গেল।

শুভেন্দু আবার উর্দ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সুশীলের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। "আমি সাধ ক'রে কিছু করি নি সুশীল! তোমার বোন্‌কে বিয়ে ক'রেই আমি মারা গেলুম। সেই এ বাড়ী থেকে আমায় জোর ক'রে বার ক'রে নিয়ে গেল, তার এখানে থাকতে লজ্জা করে বলে। মোটে তিনটি শো টাকা তোমার বাবা আমাদের দেন, মায় তাতেই বাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত সবই চালাতে হয়, এতে কি কুলোয় সুশীল? তুমিই বল না? এ দিকে রোজগার করি না ব'লে বিনতা চব্বিশ ঘণ্টাই আমায় খোঁটা দিচ্ছে! তাই ত ব্যবসা করবো ব'লেই না আমায় ঐ ২৫ হাজার টাকাটা আপাততঃ নিতে হয়েছিল।" ভেবেছিলুম, লাভ হ'লে ওটা আবার ফিরিয়ে দেব। কিন্তু সংসার-খরচেই যে সব ফুরিয়ে গেল! বিনতাকে খুসী করবো ভেবে তাকে বলেছিলুম যে, ঐ টাকা আমি ব্যবসা ক'রে পাচ্ছি। এমন সময় এই ব্যাপার! এখন কি হবে ভাই? আমি মরুতে তোমাদের বাড়ী এসেই জন্মের মত গেলুম! এর অপেক্ষা গরীব হয়ে থাকাও আমার ভাল ছিল লক্ষগুণে।"

শুভেন্দু হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিনতার উদ্দেশ্যে একটা অকথ্য লঘুভাষা প্রয়োগ করিল। তাহা শুনিয়া সুশীলের সর্ব্বশরীর গভীর ঘৃণা ও বিরক্তিতে যেন ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ইহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেও যেন তাহার অন্তরাত্মা সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। আর ঐ তাহারই ভগ্নীপতি! বোন্ তাহার মরিল না কেন এর চেয়ে!

সুশীলকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া শুভেন্দু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আজ আর ক্রোধ প্রকাশ করিবার ভরসা তাহার মনে নাই। তাই কোনমতে নিজেকে যথাসাধ্য শান্ত করিয়া লইয়া সে শ্লেষ-গম্ভীরস্বরে অনড় অস্পন্দ সুশীলের বুকের উপর সজোরে খড়্গাঘাত করিল, "আমার মরণে তোমাদের আপত্তি নেই, তা আমি খুবই জানি, বরং তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে বোনের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিতে পারবে। এও হয় ত তোমরা মনে ক'রে খুসী হচ্ছ। তাও হ'তে পারে, কিন্তু তোমার অভিমানী বোন্ কি এ অপমানের পর আর বেঁচে থাকবে ভেবেছ? গর্ভে তার সাত মাসের সন্তান, এ অবস্থায় যদি সে আত্মহত্যা ক'রে মরে—"

সুশীলের অবিচল দেহ সঘনে কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল, অতিকষ্টে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এতে কি করতে পারি?"

শুভেন্দু বিজয়ী বীরের মত সদম্ভে বারেক সুশীলের শব-শুভ্র মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "আমার দোষটা তুমি নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নাও। তোমার বাবা কিছুতে আর তোমায় পুলিসে যেতে দেবেন না। তাঁরই ত টাকা—তিনি মোকদ্দমা তুলে নিলে আর কে চালাবে? এইটুকু উপকার কর ভাই, তোমার পায়ে আমি চিরদিনের গোলাম হয়ে থাকবো ব'লে দিলুম, এ তুমি বরাবর

দেখে নিও। আর তোমার বোনের প্রাণটা হয় ত রক্ষা পাবে।”

সুশীলের সেই রক্তশূন্য মুখে তীব্র বেদনার সহিত অকথনীয় ঘৃণার রাশি অসীম হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠে তাহার অতি সহজ শান্তভাবেই উত্তর বাহির হইল, “তাই হবে।”

* * * * *

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া সেলাম দিয়া যখন ভুবন বাবুকে চেক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চেক এবং চেকের উপরকার নামসই তাঁহার কি না?” তখন বিস্ময়মূঢ় ভুবন বাবু কিছুই অর্থবোধ না করিতে পারিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, চেক ঠিক তাঁহারই বটে; তবে নামসইয়ে কিছু গলদ আছে, উহা তাঁহার হাতের সহি নয়। তাহার পর চেক-বহি বাহির করিয়া দুই জনে মিলিয়া তাহা মিলান করা হয় এবং অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কেহ তাঁহারই চেক ছিঁড়িয়া লইয়া জাল-সইয়ে টাকা বাহির করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মনে এই সন্দেহ হওয়াতেই তাহারা পুলিসে খবরটা দিয়াছিল। ভুবন বাবু কিন্তু তখন স্বপ্নেও জানিতেন না যে, সেই অনুসন্ধান-ফলে তাঁহারই সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে!

* * * * *

সুশীল আসিয়া যখন পুলিস-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্থির স্বরে বলিল, “শুভেন্দু নয়, আমিই এ জাল করেছি, আমাকেই আপনারা চালান দিন,” তখন সকলেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাহেব বিস্মিত মৃদু স্বরে আত্মগতভাবেই কহিলেন, “শুভেন্দু বাবু আমাদের এই কথাই বলিয়াছিলেন বটে যে, খুব সম্ভব এ সই সুশীলের। কিন্তু আপনি শিক্ষিত লোক, সে জন্য আমরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করি নাই।”

সুশীল জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উত্তর করিল, “যেটা পৃথিবীতে সব চেয়ে অবিশ্বাস্য থাকে, কোন সময়, সেইটাই হয় ত সব চেয়ে বিশ্বাসের হয়ে দাঁড়ায়—কেমন, এখন ত বিশ্বাস করলেন? এখন চলুন, কোথায় যেতে হবে?”

পুলিসের কাযে যে ব্যক্তি মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার কাছে দোষী-নির্দ্দোষ সহজে ধরা পড়ে। ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলিস সাহেব ধীরকণ্ঠে কহিলেন, “আপনি হয় ত জানেন না, যে চার্জ্জে জড়িত হচ্ছেন, তাহার দণ্ড কত বেশী?”

সুশীল পুনশ্চ সেইরূপ বুকফাটা উচ্চ হাসি হাসিল, “জানি বৈ কি! যাবজ্জীবনও হ’তে পারে, কেমন, না?—চলুন, চলুন।”

ভুবন বাবু দুই হাতে মুখ লুকাইয়া পাথরের মত স্থির বসিয়া আছেন, মুক্ত দ্বারপথে সবই তাঁহার কানে আসিতেছিল, সাহেব ভিতরে আসিয়া পূর্ণ সহানুভূতির সহিত কথা কহিলেন, “আর একবার সইটা ভাল ক’রে দেখবেন কি?”

ভুবন বাবু তাঁহার মুখের ঢাকা না খুলিয়াই জবাব দিলেন, “না।”

“এঁর জামিন কি আপনি হ’তে চান?”

ভুবন বাবু তদবস্থাতেই উত্তর করিলেন, “না।”

সুশীল স্তব্ধ স্থির দাঁড়াইয়া ইহাও শুনিল এবং ইহার পরই বর্দ্ধিতোৎসাহে জোরে জোরে পা ফেলিয়া সকলের অগ্রবর্ত্তী হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

অতীত স্বপন

সে যে মোর অতীত স্বপন।
একটি মধুর নিশীথে, সোহাগে আদরে বরিতে,
এসেছিল মম হৃদয়-রতন।
সে যে মোর অতীত স্বপন।

দিল নন্দন দুয়ার খুলিয়া,
সেথা প্রেম অমিয় ঝরে, শুভ্ররজতধারে, মুগ্ধহৃদয় দেখিয়া;
দেখিতে দেখিতে সে যে, আমারি বুকের মাঝে,
হারায়ে গেল গো তখন।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (শ্রীম)

পঞ্চম ভাগ—প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে। দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে।

[প্রেমানন্দে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

রাত্রি ৮টা ৯টা হইবে। ৺দোলযাত্রা। রাম, মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। সকলেই হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নৃত্যগোপালের ভাবাবস্থায় বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে মাষ্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন—রাখাল শুইয়া আছেন ও ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া 'শান্ত হও' 'শান্ত হও' বলিতেছেন। রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা। তিনি কলিকাতার বাসাতে পিত্রালয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। এই সময়ে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কয়েকদিন পড়িয়াছিলেন।

ঠাকুর মাষ্টারকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, আমি কলিকাতায় বলরামের বাড়ীতে যাব, তুমি আসিও; তাই তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষ, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার, শ্রীযুক্ত বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

এইবার ভক্তেরা বারাণ্ডায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয় না, তিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা।

মাষ্টার এই নূতন আসিতেছেন। এখনও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। কেবল দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

[সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে]

কয়েকদিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শিব-মন্দিরের সিঁড়ির উপর ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৪টা ৫টা হইবে। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ঠাকুর নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতা—তাহাতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখনও ঠাকুরের সেবার জন্য কাছে কেহ থাকেন না। হৃদয় যাওয়ার পর ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। কলিকাতা হইতে মাষ্টার আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সম্মুখস্থ শিব-মন্দিরের সিঁড়িতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দির দৃষ্টে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "মা, সব্বাই বল্‌ছে, আমার ঘড়ী ঠিক চল্‌ছে; খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান সকলেই বলে, আমার ধর্ম্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়ী তো ঠিক চলছে না! তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে! তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হ'লে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌছান যায়। মা, খৃষ্টানরা গির্জ্জাতে তোমাকে কি ক'রে ডাকে, একবার দেখিও! কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে যদি ঢুকতে না দেয়?……তবে গির্জ্জার দোরগোড়া থেকে দেখিও।"

[ভক্তসঙ্গে ভজনানন্দে—রাখালপ্রেম। 'প্রেমের সুরা']

আর এক দিন ঠাকুর নিজের ঘরে ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্ত্তি—হাস্যবদন। শ্রীযুত কালীকৃষ্ণের সঙ্গে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত।

কালীকৃষ্ণ জানিতেন না, তাঁহাকে তাহার বন্ধু কোথায় লইয়া আসিতেছেন। বন্ধু বলিয়াছিলেন, শুঁড়ীর দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক জালা মদ আছে। মাষ্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহ

বলিয়াছিলেন, প্রণামানন্তর ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিলেন, ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এই আনন্দই সুরা, প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞান বিচার ক'রে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতে লাগিলেন—

গান।

কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের বচন,
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন!
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,
ধরবে শশী হয়ে বামন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা—এইটি জীবনের উদ্দেশ্য; যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে কেঁদে বেড়াত। এই বলিয়া ঠাকুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া গান গাহিতেছেন—

গান।

দেখে এলাম এক নবীন রাখাল,
নবীন তরুর ডাল ধ'রে,
নবীন বৎস কোলে ক'রে,
বলে, কোথা রে ভাই কানাই।
আবার, কা বই কান্‌ই বেড়ায় না রে,
বলে কোথা রে ভাই,
আর নয়ন-জলে ভেসে যায়।

ঠাকুরের প্রেমমাখা গান শুনিয়া মাষ্টারের চক্ষুতে জল আসিয়াছে।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মন্দিরে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আজ শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শ্যামপুকুর বাটীর দ্বিতলায় বৈঠকখানা-ঘরে ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। এইমাত্র ভক্তসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। আজ ৯ই এপ্রেল ১৮৮২ খৃঃ ২১শে চৈত্র, ১২৮৮ চৈত্র-শুক্লা-চতুর্দ্দশী; এখন বেলা ১।২টা হইবে। কাপ্তেন ঐ পাড়াতেই থাকেন; ঠাকুরের ইচ্ছা, এ বাটীতে বিশ্রামের পর কাপ্তেনের বাড়ী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কমল-কুটীর নামক বাড়ীতে শ্রীযুত কেশব সেনকে দর্শন করিতে যাইবেন। প্রাণকৃষ্ণের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; রাম, মনোমোহন, কেদার, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, রাখাল, বলরাম প্রভৃতি ভক্তরা উপস্থিত।

পাড়ার বাবুরা ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আছেন, ঠাকুর কি বলেন—শুনিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ঈশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য।" এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য্য।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য্য, তাঁকে খোঁজে না। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ, অশান্তিই বেশী। সংসার যেন বিশালক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুল কাঁটার মত এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরনো মুস্কিল। মানুষ যেন ঝল্‌সাপোড়া হয়ে যায়।

এক জন ভক্ত। এখন উপায়?

[উপায়—সাধুসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। উপায়—সাধুসঙ্গ।

বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ এক দিন করলে হয় না, সর্ব্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

ভক্ত। সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়ীতে কারুর অসুখ হ'লে সর্ব্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারু যদি কর্ম্ম যায়, সে ব্যক্তি যেমন আফিসে আফিসে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয় সেইরূপ। যদি কোন আফিসে বলে কর্ম্ম খালি নেই, আবার তাহার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ কি কোন কর্ম্ম খালি হয়েছে?

"আর একটি উপায় আছে—ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও—দেখা দিতেই হবে—তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন? শিখরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়াময়; আমি তাদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলবো? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তা যদি করেন, সে কি আর আশ্চর্য্য, মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি? সে ত কর্‌তেই হবে, তাই তাঁকে জোর ক'রে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ। ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ মা ৩ বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। আবার যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃ পুনঃ বলে, 'মা, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, আমাকে দুটা পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়।

"সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ-বিচার। সৎ, নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার কর্‌তে হয়। হাতী পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস মারে।"

প্রতিবেশী। মহাশয়, পাপবুদ্ধি কেন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জগতে সব রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন।

[পাপীর দায়িত্ব ও কর্ম্মফল]

প্রতিবেশী। তবে পাপ কর্‌লে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগবে না? সেজো বাবু বয়সকালে অনেক রকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম অসুখ হ'ল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়ীতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হ'লে যত জল পিছনে ঠেলে আসে ও ফঁ্যাচ-ফোঁচ ক'রে উনুন নিবিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব থেকে সাবধান হ'তে হয়। দেখো না, হনুমান ক্রোধ ক'রে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়লো, অশোক-বনে সীতা আছেন। তখন ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, পাছে সীতার ঘর পুড়ে যায়, পাছে সীতার কিছু হয়।

প্রতিবেশী। তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারেরও প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাক্‌লে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিষ বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের কর্‌বেন ব'লে। ইন্দ্রিয় জয় কর্‌লে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে? ঈশ্বরলাভ পর্য্যন্ত তাঁর কৃপায় কর্‌তে পারে। আবার অন্য দিকে দেখো, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে!

"দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি তালুকের প্রজারা বড়ই দুর্দ্দান্ত হয়েছিল, তখন গোলোক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তার নামে প্রজারা কাঁপতে লাগল—এতো কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব অট্টালিকা হতো তো বেশ হতো, অনেক বাড়ী দেখছি ভাঙ্গা, পুরানো। রাম বল্লেন, সীতা, সব বাড়ী সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে? (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর সব রকম করেছেন—ভাল গাছ, বিষ গাছ আবার আগাছাও করেছেন। জানওয়ারদের ভিতর ভাল মন্দ সব আছে—বাঘ, সিংহ, সাপ সব আছে।"

[সংসারে ঈশ্বরলাভ সকলেরই মুক্তি]

প্রতিবেশী। মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য পাওয়া যায়। তবে যা বল্লুম,

সাধুসঙ্গ আর সর্ব্বদা প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুণো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটী-মাখানো লোহার স্থচ্—ঈশ্বর চুমুক পাথর, মাটী না গেলে চুমুক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে স্থচের মাটী ধুয়ে যায়—স্থচের মাটী অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটী ধুয়ে গেলেই, ছুঁচকে চুম্বক পাথর টেনে লবে। অর্থাৎ ঈশ্বর-দর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হ'লে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে দেহেতে, রস অনেক রয়েছে, তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? ঐ সাধুসঙ্গ; কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস; একটু বেড়া না দিলে, ফুটপাথের চারা গাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

প্রতিবেশী। যারা সংসারে আছে, তা হ'লে তাদেরও হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। **সকলেরই মুক্তি হবে**। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আস্তে কষ্ট হবে। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয় তো এ জন্মেও হ'ল না, আবার হয় তো অনেক জন্মের পর হ'লো। জনকাদি সংসারেও কর্ম্ম করে-ছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন ক'রে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাস্তে হাস্তে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে।

প্রতিবেশী। গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন ক'রে পাব?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে সে লোক গুরু হ'তে পারে না। বাহাদুরি কাঠ নিজেও ভেসে চ'লে যায়, অনেক জীব-জন্তুও চ'ড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের উপর চড়লে, কাঠও ডুবে যায়, যে চড়ে, সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।

"জ্ঞান কাকে বলে; আর আমি কে? 'ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা' এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্ত্তা। তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার; যেমন চালাও, তেমনি চলি; যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমন বলি; নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[কমলকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব সেন]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনের বাটী হইয়া শ্রীযুত কেশব সেনের কমল-কুটীর নামক বাটীতে আসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত। সকলে দ্বিতল হলঘরে উপবেশন করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণও উপস্থিত আছেন।

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে বড় ভালবাসেন। যখন বেলঘোরের বাগানে সশিষ্য তিনি সাধন-ভজন করিতে-ছিলেন, অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃঃ মাঘোৎসবের কিছু দিন মধ্যে ঠাকুর এক দিন বাগানে গিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সঙ্গে ভাগিনেয় হৃদয়রাম। পরে দক্ষিণেশ্বরে, কমল-কুটীরে, ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। নানা পথ দিয়া, নানা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া, ঈশ্বরলাভ হ'তে পারে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে সাধন-ভজন ক'রে, ভক্তিলাভ ক'রে সংসারে থাকা যায়। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে তিনি দেখা দেন। এই-রূপ নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। আর এই বাগানে তাঁহাকে বলেছিলেন, তোমারই ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ ক'রে বাহিরেও থাকতে পার, আবার সংসারেও থাকতে পার। যেমন বেঙাচির ল্যাজ খস্‌লে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তোমরা যা করছ, নিরাকার সাধন। সে খুব ভাল। ব্রহ্ম-জ্ঞান হ'লে ঠিক বোধ করবে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে সাকার-নিরাকার দুই মানে। নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোসন-চৌকিওয়ালারা এক জন শুধু পোঁ ধ'রে বাজায়। অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর এক জন

তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগ-রাগিণী বাজায়।

"তোমরা সাকার মান না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই। নিরাকারে নিষ্ঠা থাক্‌লেই হলো। • তবে সাকারবাদীদের টানটুক্ নেবে। মা ব'লে তাঁকে ডাক্‌লে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখনও দাস্য, কখনও সখ্য, কখনও বাৎ-সল্য, কখনও মধুর ভাব। কোন কামনা নাই, তাকে ভালবাসছি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। টাকা-কড়ি, মান সম্ভ্রম কিছুই চাই না: কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুই-ই আছে। সংসারে দাসীর মত থাকবে। দাসী সব কায করে, কিন্তু দেশে মন প'ড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ ক'রে; বলে, 'আমার হরি' 'আমার রাম', কিন্তু জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জ্জনে সাধন কর্‌ছ, এ খুব ভাল। তাঁর কৃপা হবে; জনক রাজা নির্জ্জনে কত সাধন করেছিল। তবে ত সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।

"তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরলাভ ক'রে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বরলাভ না কর্‌লে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর-লাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ। যেমন শুকদেব আদি। চৈতন্য-দেব কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করি-তেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড়-সমাধিতে থাকতেন।"

কেশবচন্দ্র সেন

[শ্রীযুত কেশবের হিন্দুধর্ম্মের উপর উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা]

এইরূপ নানা স্থানে শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেনকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বেলঘোরের বাগানে প্রথম দর্শনের পর শ্রীযুত কেশব ২৮শে মার্চ্চ রবিবারে 'মিরার' সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, * আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেল-ঘোরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভী-রতা অন্তর্দৃষ্টি বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই-য়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমল-প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্ব্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়-ভাবে ভাবিত যোগী পুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে? † কিছু দিন পরে আবার মাঘোৎসব আসিল, তিনি টাউন-হলে বক্তৃতা দিলেন; বিষয়—ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি—('Our Faith and Experiences') তাহা-তেও হিন্দুধর্ম্মের সৌন্দর্য্যের কথা অনেক বলিয়াছিলেন। ‡

* We met not long ago Paramhamsa of Dakshineswar, gentle, tender, contemplative * * His depth, his penetration, his simplicity of spirit all struck us * * Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to insihre such men as these.—Sunday Mirror. 28th March 1875.

† "If the ancient Vedic Aryan is gratefully honored to-day for having taught us the deep truth of the *nirakar* or the bodiless spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious fellings in all their breadth and depth. —*Lecture delivered in January 1876.*

‡ In the days of the Vedas and the Vedanta India

[শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি স্নেহ,
শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশবের পূজা]

আজ কমল-কুটীরে সেই বৈঠকখানা-ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট। বেলা ৫টা হইবে। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি জামা-চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভক্ত-বন্ধু ৺কালীনাথ বসু পীড়িত, তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন, আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছেন—তোমার অনেক কায, আবার খপরের কাগজ লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বল্লুম, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহা হ'লে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব? শ্রীযুত প্রতাপাদি ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত ঠাকুর অনেক কথা কহিতেছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, ইনি কেন যান না, জিজ্ঞাসা কর ত; এতো বলেন মাগ-ছেলেদের উপর মন নাই। মাষ্টার সবে এক মাস ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত করিতেছেন। শেষে যাইতে কয় দিন বিলম্ব হইয়াছে, তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিলেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, দেরী হ'লে পত্র দেবে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা শ্রীযুত সামাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—হাঁ, এঁর চক্ষু দিয়া এঁর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে। যেমন সারসী দরোজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিষ দেখা যায়।

শ্রীযুত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান—আর মা'র নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন।

গান

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান-শুঁড়ীতে চোঁয়ায় ভাঁটী পান করে মোর মন-মাতালে॥
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

শ্রীযুত কেশবকে স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক। আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু, অর্থাৎ সংসারের হয়েন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন।

গান

কথা বল্‌তে ডরাই, না বল্‌লেও ডরাই।
মনের সন্দ হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই॥
আমরা জানি যে মন্তোর, দিলাম তোরে সেই মন তোর,
এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই॥

'আমি জানি যে, মন তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তোর' 'এখন মন তোর।' অর্থাৎ সব ত্যাগ ক'রে ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই সত্য আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ কর্‌লে কিছুই হ'ল না। এই মহামন্ত্র।

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্‌যোগ হইতেছে। হল-ঘরের এক পাশে একটি ব্রাহ্ম ভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও তাঁহাকে কমল-কুটীরে লইয়া আসিতেন। এক দিন তিনি আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশব তাঁহাকে উপাসনা-ঘরে লইয়া গেলেন ও

---

was all communion (joga). In the days of the Purans India was all emotion (Bhakti). The highest and best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities."

চরণে পুষ্প-চন্দন দিয়া অতি ভক্তিভাবে নমস্কার ও পূজা করিলেন। তখন ঘরে অন্য কেহ ছিলেন না। ঠাকুর ৺বিজয় গোস্বামী ও ভক্তদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন।

আর এক দিন, অর্থাৎ উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রাম, মনোমোহন কমল-কুটীরে কেশবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সবে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহাদের ভারি জানিতে ইচ্ছা, কেশব বাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, ইঁহাকে অতি সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না। যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিষ গ্লাসকেশে রাখতে হয়।"

কমল-কুটীর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। কেশবাদি ভক্তেরা সকলেই গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[Circus রঙ্গালয়ে। গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্ম্মীদের কঠিন সমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগরের স্কুলের দ্বারে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে। গাড়ীতে মাষ্টারকে তুলিয়া লইলেন। রাখাল ও আরও ২।১টি ভক্ত গাড়ীতে আছেন। আজ বুধবার, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, কার্ত্তিক শুক্লা পঞ্চমী। গাড়ী ক্রমে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে।

ঠাকুর আনন্দময়। মাতালের ন্যায়—গাড়ীর একবার এধার, একবার ওধার মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দেখিতেছেন। আর উদ্দেশে পথিকদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন, দেখ, সব লোক দেখছি নিম্নদৃষ্টি। পেটের জন্য সব যাচ্ছে। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই।

ঠাকুর আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে যাইতেছেন। মাঠে পৌঁছিয়া টিকিট কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকিট। ভক্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এক বেঞ্চির উপরে বসিলেন। ঠাকুর আনন্দে বলিতেছেন, বাঃ! এখান থেকে বেশ দেখা যায়।

রঙ্গস্থলে নানারূপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার রাস্তায় ঘোড়া দৌড়িতেছে, ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বিবি দাঁড়াইয়া আছে। আবার মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার Ring আছে। রিংএর কাছে আসিয়া ঘোড়া যখন রিংএর নীচে দৌড়িতেছে, বিবি ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া রিংএর মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া। ঘোড়া পুনঃ পুনঃ বন্ বন্ করিয়া ঐ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগিল, বিবিও আবার ঐরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া।

সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাড়ীর কাছে আসিলেন। শীত পড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত দিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, কাছে ভক্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন। এক জন ভক্তের হাতে বেটুয়াটি (মশলার ছোট থলেটি) রহিয়াছে। তাহাতে মশলা, বিশেষতঃ কাবাবচিনি আছে।

[আগে সাধন, তার পর সংসার, অভ্যাসযোগ]

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'দেখলে, বিবি কেমন এক পায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্ বন্ ক'রে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেক দিন ধ'রে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙ্গে যাবে, আবার মৃত্যুও হ'তে পারে। সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়; আরও ডুবে যায়; মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়। কেউ কেউ, যেমন জনকাদি, অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হ'লে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।'

ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বাগবাজারে বসু-পাড়ায় বলরামের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুর সার্কাসের গল্প করিতেছেন। অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরীয় কথা অনেক হইতেছে। মুখে অন্য কথা কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরের কথা।

[Sri Ram Krishna, the Caste system, and the Untouchables.]

জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা পড়িল। ঠাকুর বলিলেন, এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায়—ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই, হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।

ঠাকুর সংসারী বদ্ধজীবের কথা বলিতেছেন। তারা যেন গুটীপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন ক'রে গুটী তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেমন ঘুণির মধ্যে মাছ; যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলে-মেয়ের আধ আধ কথাবার্ত্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ। তবে দু একটা দৌড়ে পলায়, তাদের বলে মুক্ত জীব।

ঠাকুর গান গাহিতেছেন;—

গান।

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল ক'রে ঘুণি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥

ঠাকুর আবার বলিতেছেন, জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটী ধ'রে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে হয়; তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর, তবে মুক্তি। তা না হ'লে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন;—

গান।

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি॥
একে মন-মাঝি আনাড়ী, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল উপায় কি করি;—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গা নামের ভেলা ধরি॥

বিশ্বাস বাবু অনেকক্ষণ বসিয়া ছিলেন, এখন উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অনেক টাকা ছিল, কিন্তু চরিত্র মলিন হওয়াতে সমস্ত উড়িয়া গিয়াছে। এখন পরিবার, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও দেখেন না। বলরাম তাঁহার কথা পাড়াতে ঠাকুর বলিলেন,'ওটা লক্ষীছাড়া দারিদ্দির। গৃহস্থের কর্ত্তব্য আছে, ঋণ আছে; দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, আবার পরিবারদের সম্বন্ধে ঋণ আছে। সতী স্ত্রী হ'লে তাকে প্রতিপালন, সন্তানদিগকে প্রতিপালন যত দিন না লাএক হয়।'

"সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। পঙ্খি আউর দরবেশ

সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সঞ্চয় করে। ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার নিয়ে যায়।"

বলরাম। এখন বিশ্বাসের সাধুসঙ্গ করবার ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সব চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে, গাঁজা খাবার জন্য। (হাস্য)। সাধুরা গাঁজা খায় কি না, তাই তাদের কাছে এসে ব'সে গাঁজা সেজে দেয়, আর প্রসাদ পায়। (সকলের হাস্য)

শ্রীম।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব
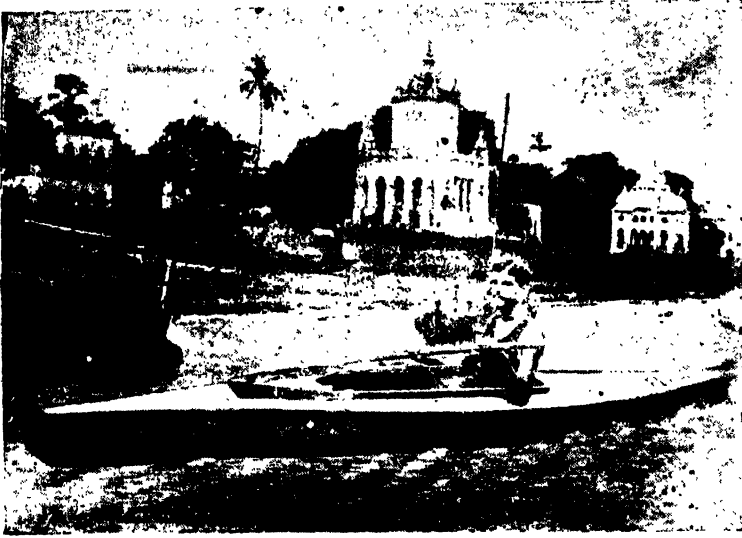
গঙ্গাবক্ষে কাপড়ের নৌকা

বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এক জনের বসিবার উপযুক্ত একখানি ক্ষুদ্র রবারাবৃত ক্যাম্বিসের নৌকা করিয়া গত ১১ই এপ্রিল বেলা ২ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে নদীয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। নৌকাখানি দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উর্দ্ধে ১১ ইঞ্চি মাত্র এবং উহার ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ। জার্ম্মাণী হইতে আনীত নূতন ঐ নৌকাখানি মাত্র দুইটি থলিয়ায় খুলিয়া ভরা যায়, উহার দুইটি পাল ও দুই দিকে টানিবার উপযুক্ত একটি দাঁড় আছে।

সন্ধ্যা ৬টার সময় অমরেন্দ্র বাবু চুঁচুড়ায় পৌঁছান। সেখানে সামরিক পুলিসের কাপ্তেন মিষ্টার বেহেট একখানি ইয়াট চড়িয়া হাওয়া খাইতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে যান ও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মাত্র চারি ঘণ্টায় তিনি অতদূর পথ অতিক্রম করিয়াছেন শুনিয়া তিনি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। পরদিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় তিনি পুনরায় যাত্রা করেন। সেই দিন দক্ষিণা বায়ু প্রবলবেগে বহিতে থাকে এবং গঙ্গাবক্ষ উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার খেলাঘরের নৌকার মত নৌকাখানি ঊর্ম্মিমালার ঘাতপ্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলে। বায়ুর বেগাধিক্যে তিনি কদাচ কখন পাল তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কখন কখন তাঁহার ছাতিটি পালের কায করিয়াছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবেণী অতিক্রম করিবার পর পশ্চিম-গগন হঠাৎ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদের সঙ্গে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল, ক্ষুদ্র নৌকাখানি সেই বিক্ষুব্ধ নদীবক্ষে বিধ্বস্ত হইয়া কিছুক্ষণ পরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে মুনো গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। অমরেন্দ্র বাবু নৌকাখানি জল হইতে টানিয়া তুলিয়া ও বক্ষের উপর ধারণ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণে এ দিক ও দিক করিতে থাকেন। পরে একটি উচ্চভূমিতে একখানি কুটীর দেখিতে পাইয়া অতি কষ্টে সেই ঝটিকাক্লিষ্ট অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেই কুটীরবাসিনী এক বাগ্দীর স্ত্রী ও তাহার দুইটি সন্তান তাঁহাকে সন্তরণ-পরিচ্ছদে নৌকা বহন করিয়া আনিতে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে। তাহাদের চীৎকারে পল্লীর আরও কতিপয় স্ত্রী ও পুরুষ ছুটিয়া আইসে, কিন্তু তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করে। কিছুক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া তাহারা তাঁহাকে স্থানীয় জমীদারবাটীতে পাঠাইয়া দেয়, তথায় শ্রীযুত হরিনারায়ণ ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করেন। তথা হইতে তিনি পরদিন প্রাতে রওয়ানা হন এবং ক্রমান্বয়ে দাঁড় টানিয়া বেলা প্রায় ৯৷৷০ ঘটিকার সময় জিরাটে পৌঁছেন। ঝটিকার সময় হইতে হাওয়ার গতি বিপরীত দিকে হওয়ায় তাঁহাকে অনবরত দাঁড় টানিতে হয়। জিরাটে শ্রীযুত হরিনারায়ণ সিং, শ্রীযুত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। সেই দিন বেলা ৫টার সময় পুনরায় তিনি রওয়ানা হয়েন। এবারে বাতাস বা স্রোত কিছুই নাই, সেই জন্য এবারও তাঁহাকে বরাবর সজোরে দাঁড় টানিতে হয়। সন্ধ্যার সময় চূর্ণীতে প্রবেশ করিয়া তিনি রাত্রি ৮।২০ মিনিটে রাণাঘাটে পৌঁছেন, নদীর উভয় কূলে স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা সকলেই অবাক্ হইয়া ঐ ক্ষুদ্রকায় নৌকাখানির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে এই স্থানের দূরত্ব ৬০ মাইল। এই ৬০ মাইল জলপথ অতিক্রম করিতে অমরেন্দ্র বাবুর ১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

বিজ্ঞানের কীর্ত্তি

রেডিও টেলিফোনের সাহায্যে এত কাল পরে এক জাহাজের যাত্রী অপর জাহাজের আরোহীর সহিত কথার আদান-প্রদান করিতে পারিয়াছেন। স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো হইতে হনোলুলু পর্য্যন্ত যে সকল মার্কিণ কোম্পানীর জাহাজ গতায়াত করিয়া থাকে, তাহাদের কোন এক কোম্পানী তাহাদের জাহাজগুলিতে এক প্রকার রেডিও টেলিফোন যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। এই সকল জাহাজের যাত্রীরা দিনের বেলা ৫ শত মাইল ও রাত্রিকালে ১ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যন্ত্র যোগে পরস্পর কথোপকথন করিতে পারিতেছেন। রেডিও টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে কথোপকথনকালে যাত্রীরা রীতিমত শিরোদেশে কর্ণে শব্দবহ যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। উন্নততর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা-প্রণালীতে পরস্পরের কণ্ঠস্বর পরস্পরের নিকট প্রেরিত হয়।
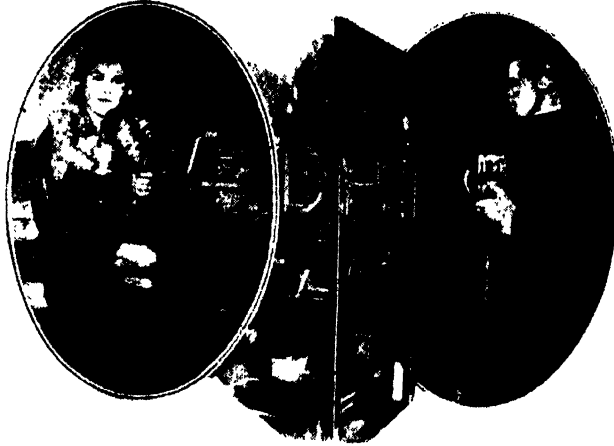
উভয় জাহাজের যাত্রী কথোপকথন করিতেছেন

ঘড়ীযুক্ত টেবল ল্যাম্প

পাঠাগারে টেবলের উপর ঘড়ীসংযুক্ত টেবল ল্যাম্প রাখিলে শোভাবৃদ্ধি হয় এবং কাযেরও সুবিধা হয়, এ জন্য আমেরিকায় এইরূপ অভিনব আলোকাধার নির্ম্মিত হইতেছে। ঘড়ীতে এলার্ম দিবার ব্যবস্থা আছে, আবার শিল্পী উহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। ঘড়ীটি এমনভাবে আলোকাধারে সন্নিবিষ্ট যে, উপর হইতে আলোকধারা ঘড়ীর উপর পতিত হয়। সৌদামিনীর সাহায্যেই অবশ্য আলোক উৎপাদিত হয়।

ঘড়ীসংযুক্ত আলোকাধার

চক্রচালিত চীনের নৌকা

চীনদেশে কোন কোন প্রদেশের নদীতে নৌকা চালাইবার জন্ম চক্র সন্নিবিষ্ট থাকে। এই চাকা চালাইবার জন্ম চীনা কুলীরা নিযুক্ত হয়। ইহাতে নৌকা বেশ দ্রুত চলিয়া থাকে।

চক্রচালিত চীনের নৌকা

ড্রাগন পায়াবিশিষ্ট চৈনিক সুরা-পাত্র

২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে শবাধারের সঙ্গে সুরাপাত্র সমাহিত হইত। এই পাত্রগুলি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত। চীনদেশের চাউ-বংশের কোনও নৃপতির সমাধিক্ষেত্র খনন করিয়া উল্লিখিত ড্রাগন পায়াবিশিষ্ট পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিকিনের যাদুঘরে উহা সংপ্রতি রক্ষিত হইয়াছে। এই আধার-গাত্রে প্রাচীন যুগের বিচিত্র শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন যুগের চৈনিক ঘণ্টা

ড্রাগন পায়াবিশিষ্ট আসবাধার

প্রাচীন যুগের চৈনিক ঘণ্টা

চীনের চাউবংশের কোন নৃপতির সমাধিক্ষেত্র হইতে এই ব্রোঞ্জ ঘণ্টা আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের ১১ শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজা বিদ্যমান ছিলেন।

ব্যাঘ্রাকৃতি পাত্র

ব্রোঞ্জনির্ম্মিত ব্যাঘ্রাকৃতি পাত্র

পিকিনের মিউজিয়ম্ বা যাদুঘরে ব্যাঘ্রাকৃতি এক প্রকার পাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই পাত্রের সাহায্যে অ-

আধারে মদ্য ঢালা হইত। চীনা ভাষায় এই পাত্রের নাম 'সুন্।' উহা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন, এই আধার খৃষ্টজন্মের প্রায় ২ শত ৬০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গীজার চিওপস্ সমাধি-খননে দেশীয়গণ

চিওপস্ পিরামিড-খননে দেশীয়গণ

এডেনে আরবী বর

গীজার প্রসিদ্ধ চিওপস্ পিরামিড খননে দেশীয়গণ নিযুক্ত হইয়াছে। এই পিরামিড খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব-সংক্রান্ত বহু মূল্যবান্ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এডেনে বিবাহপ্রথা

এডেনে আরবদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে একটা চমৎকার প্রথা আছে। বর বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে প্রতিবেশীর নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ তরবারি সংগ্রহ করে। বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ লইয়া উত্তমরূপে সজ্জিত হয়। তাহার পর পল্লীপথে জনৈক পরিচারকসহ অপরাহ্নে এক ঘণ্টা ধরিয়া পরিক্রমণ করিতে থাকে।

গীজায় সীনফেরুর সমাধি

গীজার পিরামিডের মধ্যে সীনফেরুর সমাধি

কায়রোর সন্নিহিত গীজায় পিরামিড খনন করিতে করিতে সংপ্রতি সীনফেরুর সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমাধি ৫ হাজার বৎসরের পুরাতন।

রবারের তোষক ও বালিস

আমেরিকার কোন এক কোম্পানী সংপ্রতি নূতন প্রণালীতে রবারের তোষক ও বালিস তৈয়ার করিয়াছেন।

রবারের তোষক ও বালিস

এই তোষক ও বালিস শেলাই, ধাতব চাকতি প্রভৃতি বর্জ্জিত। কারণ, শেলাই ও ধাতব চাকতি প্রভৃতি থাকিলে কোন না কোন কারণে তোষক ও বালিসের বায়ু বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। উল্লিখিত তোষক ও বালিস অত্যন্ত লঘু-ভার। যখন বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হয়, তখন তোষক ও বালিস ভাঁজ করিয়া রাখিতে পারা যায়। হাঁসপাতালের কাযে অথবা দেশভ্রমণকালে এই প্রকার তোষক প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। রবারকে চাপ দিয়া তোষক, বালিস তৈয়ার করা হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে ঐগুলি নষ্ট হয় না।

বিলাসিনীর দর্পণ

পাশ্চাত্যদেশে বিলাস এমনই বাড়িয়া যাইতেছে যে, বিলাসিনীরা রাজপথে বাহির হইয়াও দর্পণের সাহায্যে বেশভূষার সামান্য বিশৃঙ্খলাও যাহাতে অনায়াসে সারিয়া লইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। হাতের দস্তানার ভিতর ক্ষুদ্র দর্পণ লুক্কায়িত থাকে। তাহার উপর একটা চামড়ার আবরণ আছে। বিলাসিনীরা ইচ্ছামত সেই আবরণ সরাইয়া পথ চলিতে চলিতেও প্রসাধন সমাপন করিতে পারেন। আবরণ টানিয়া দিলে আর দর্পণটি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দস্তানায় দর্পণ

ডাকটিকিটের উপর ৬ শত অক্ষর

জনৈক মার্কিণ যুবক সূক্ষ্ম লেখনীর সাহায্যে একখানি ডাকটিকিটের উপর ৬ শত শব্দ কালিতে লিখিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে অন্য কোনও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে জনৈক ইতালীয় লেখক একখানি পোষ্টকার্ডে ১১ হাজার শব্দ লিখিয়াছিলেন। মার্কিণ লেখক তাঁহাকেও এ বিষয়ে পরাজিত করিয়াছেন। কারণ, পোষ্টকার্ডে তিনি প্রতি বর্গ-ইঞ্চ স্থানে ৫শত ৭৫টি শব্দ বসাইয়াছিলেন। মার্কিণ লিপিবিদ্ প্রতি বর্গ-ইঞ্চ স্থানে ৭ শত ৭৪টি শব্দ হিসাবে বসাইয়াছেন।

মার্কিণ লিপিবিদ্ ও ডাকটিকিট

কৃত্রিম অক্ষিপল্লব

যে সকল বিলাসিনী দীর্ঘ অক্ষিপল্লবের অনুরাগিণী, বিধাতা তাঁহাদের প্রতি বাম হইলেও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা কৃত্রিম পল্লবের অধিকারিণী হইতে পারেন। মার্কিণদেশে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কৃত্রিম পল্লব ধারণ করিলে, তাহার কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলা অসম্ভব। নানা আকারের ও নানা বর্ণের অক্ষিপল্লব বাজারে পাওয়া যায়।

পাশ হইতে কৃত্রিম অক্ষিপল্লবের দৃশ্য

ব্যাঙ্ক-রক্ষায় কলের কামান

আমেরিকার কোনও ব্যাঙ্কে একটি ছোট কলের কামান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দস্যুর আক্রমণ হইতে ব্যাঙ্ক-রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এই নবোদ্ভাবিত কলের কামান আনাইয়াছেন। এক সেকেণ্ডের মধ্যে এই কামান হইতে চল্লিশবার গুলী নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। সাধারণ ইষ্টকের প্রাচীর এই গুলীর আঘাতে বিদীর্ণ করা সহজ। একটি ৪ ফুট উচ্চ ত্রিপাদ আধারের উপর এই ক্ষুদ্র কামান অবস্থিত। যে কেহ অতি সহজে এই কামানকে যে কোনও অবস্থায় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। ইচ্ছামত কামানটিকে উপরে তুলা যায় বা নীচে নামান সম্ভবপর। সামান্য শিক্ষার পর যে ব্যক্তি কখনও কোনও আগ্নেয় যন্ত্র ব্যবহার করে নাই, সেও অনায়াসে ইহা ব্যবহার করিতে পারে।

ব্যাঙ্ক-রক্ষায় ক্ষুদ্রাকার কামান

ব্যাষ্টিয়ার প্রাচীন পথ

ব্যাষ্টিয়া কর্সিকা দ্বীপের রাজধানী। এই কর্সিকা দ্বীপেই জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্ম হইয়াছিল। ব্যাষ্টিয়া অতি প্রাচীন সহর। য়ুরোপে এরূপ প্রাচীন সহর অতি অল্পই পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এই সহরের এই প্রাচীন পথটিতে প্রাচীনতার বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

ব্যাষ্টিয়ার প্রাচীন পথ

দীপ-শলাকা

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে বর্ত্তমান যুগে দীপ-শলাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দীপ-শলাকার প্রয়োজনীয়তা অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রতীচ্যদেশে দীপশলাকা প্রস্তুত করিবার নানা প্রকার উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেরও নানা স্থানে দেশীয় 'দিয়াশলাই' তৈয়ার করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকার এ দেশে দীপ-শলাকা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠ সংগৃহীত হইতে পারে কি না, সে জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার শ্রমশিল্প বিভাগের (Department of Industries, Bengal) কর্ত্তৃপক্ষ এ জন্য দীপ-শলাকার বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত আনন্দপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়কে দীপ-শলাকার উপযোগী কাষ্ঠ পরীক্ষার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।

লঘু, সরল ও সহজদাহ্য কাষ্ঠই দীপ-শলাকা শ্রমশিল্পের উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। যে সকল কাষ্ঠ সূক্ষ্মতম ছিদ্রবহুল (porous) এবং সহজে 'প্যারাফিন্' আকর্ষণে সমর্থ, এইরূপ কাষ্ঠই দীপ-শলাকার উপযোগী। শ্রীযুত আনন্দপ্রকাশ ঘোষ বাঙ্গালাদেশের অরণ্যসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া, যে সকল কাষ্ঠ দীপ-শলাকার উপযোগী, তাহা পরীক্ষা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকার তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি ১শত ৭ প্রকার কাষ্ঠ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৯৪ প্রকার কাষ্ঠ 'কাঠি' ও দীপ-শলাকার বাক্স-নির্ম্মাণের উপযোগী। তবে সকলগুলি হইতে প্রথম শ্রেণীর দীপ-শলাকা উৎপন্ন হইবে না। অধিকাংশই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দীপ-শলাকার পক্ষে উপযুক্ত।
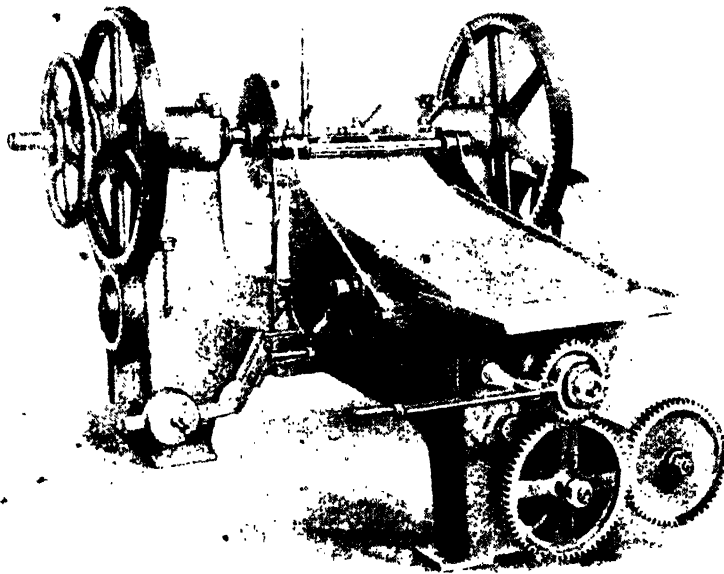
তক্তার চাদর তৈয়ার করিবার যন্ত্র (Peeling machine)

ভারতবর্ষে দীপ-শলাকা শ্রমশিল্পের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সুদূর জার্ম্মাণীতে বসিয়া অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষের অরণ্যে এমন বহু বৃক্ষ আছে, যাহা হইতে প্রথম শ্রেণীর দীপ-শলাকা নির্ম্মিত হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দীপ-শলাকা শ্রমশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়। তক্তার চাদর তৈয়ার করিবার যন্ত্র (Peeling machine), শলাকা কাটিবার যন্ত্র (Splint cutting machine), শলাকা পালিশ ও সমান করিবার কল (Splint polishing & levelling machine), দীপ-শলাকার বাক্স তৈয়ারের কল (Machine for cutting box Veneer).

শলাকা কাটিবার যন্ত্র (Splint cutting machine)

চক্রাকার পেষণ-যন্ত্র
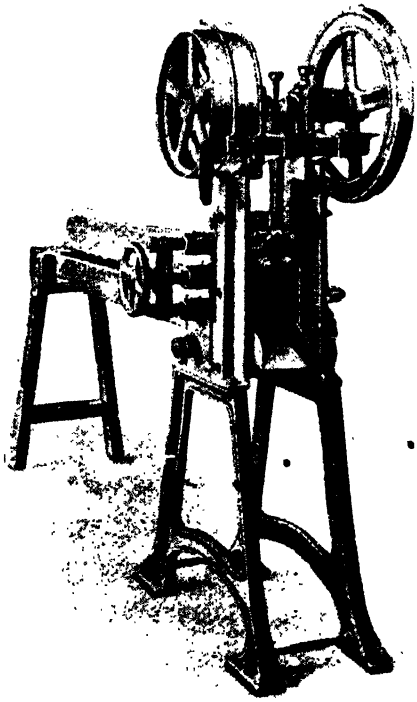
শলাকা তৈয়ার করিতে হইলে, প্রথমতঃ গাছগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে হইবে। ১নং কলের (Peeling machine) দৈর্ঘ্য যত, সেই মাপে কাঠ কাটিয়া লওয়া উচিত। অবশ্য উপরের ত্বক্ বা ছাল পূর্ব্বাহ্নে ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর উহা ১নং কলে (Peeling machine) স্থাপন করিতে হইবে। কল ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, একখানি ছুরী বাহির হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে আঘাত করে। তাহার ফলে দীপ-শলাকার উপযোগী মোটা তক্তার চাদর বাহির হইয়া আইসে। উল্লিখিত যন্ত্রে বহুসংখ্যক ছুরী সন্নিবিষ্ট থাকে। তক্তার চাদরগুলি তৎপরে শলাকার আকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ ছুরীগুলি তক্তার চাদরগুলিকে চিরিয়া শলাকায় পরিণত করে।
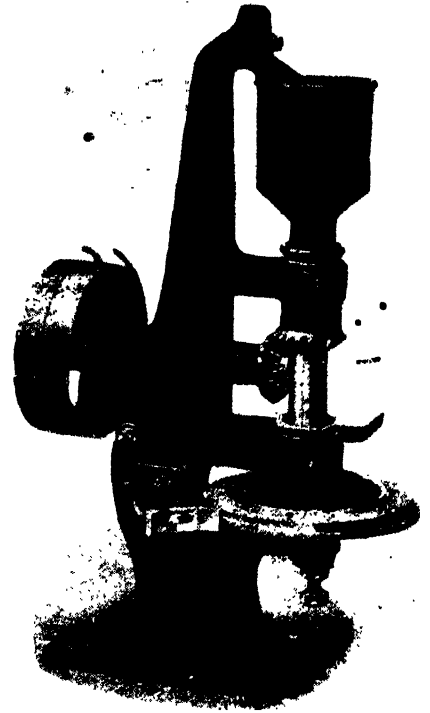
উল্লিখিত চেরা কাঠিগুলি স্তরে স্তরে সাজাইয়া ২নং যন্ত্রের (Splint cutting machine) সাহায্যে দীপ-শলাকার আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। তাহার পর কাঠিগুলি শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন। যাহাতে শলাকা বেশ পরিচ্ছন্ন হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। সুতরাং লৌহ বা কাঠের ড্রামের মধ্যে কাঠিগুলিকে ফেলিয়া ঘষিতে হইবে। উহাতে কাঠির আঁশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাহার পর চালনীর উপর কাঠিগুলি ফেলিয়া নাড়া দিলে, ধূলা ও আঁশগুলি নীচে পড়িয়া যাইবে। তখন শলাকাগুলি সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন দেখাইবে। কোন কোন
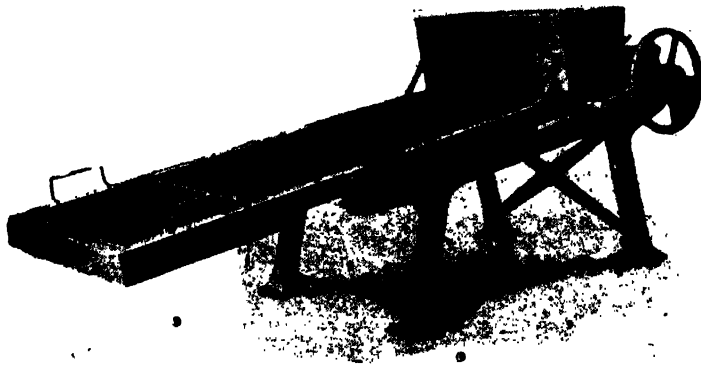
শলাকা পালিশ ও সমান করিবার যন্ত্র (Combined Splint polishing and levelling machine)
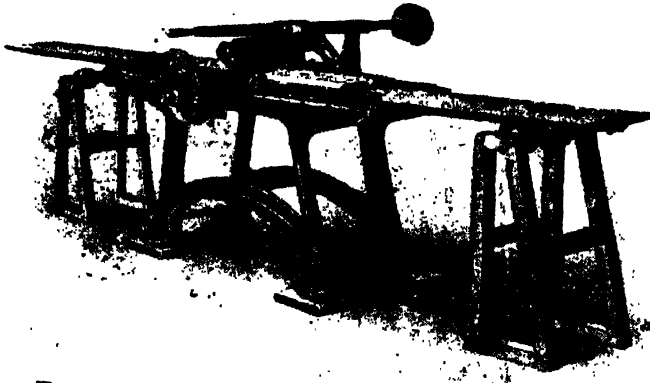
দীপ-শলাকার-মাপের বাক্স তৈয়ার করিবার যন্ত্র (machine for cutting box veneer lengths)

ছোট দীপ-শলাকার কারখানায় কাঠিগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহাতে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে। বৃষ্টি-বাদলের দিনে উহা একেবারেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে আবহাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে চলে না। অতএব কাঠি শুকাইবার জন্য যন্ত্রের সাহায্য লওয়াই কর্ত্তব্য। প্রতীচ্যদেশে এরূপ যন্ত্রাদির অভাব নাই। শুকাইবার যন্ত্র কারখানায় থাকিলে শুধু শলাকা নহে, বাক্সগুলিও শুকাইয়া লওয়া চলে। ইহাতে কাযের বিশেষ সুবিধা হয়।

পরে ড্রম হইতে কাঠিগুলি তুলিয়া লইয়া বাক্সের মধ্যে ভরিয়া ৩নং যন্ত্রে (Splint levelling machine) রাখিতে হইবে।

১নং যন্ত্রে (Peeling machine) তক্তার চাদর কাটা হইলে, শলাকার ন্যায় বাক্সের তক্তাগুলিও স্তরে স্তরে সাজাইয়া ৪নং কলের সাহায্যে কাটিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক কৌটা বা বাক্সের জন্য তিন প্রকার তক্তার প্রয়োজন। এক প্রকার তক্তা বাহিরের কৌটার জন্য, দ্বিতীয় প্রকারের তক্তার ভিতরের কৌটা নির্ম্মিত হয় এবং তৃতীয় প্রকারের তক্তা ভিতরের কৌটার তলদেশের জন্য প্রয়োজন।

জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে রমণী ও বালক শ্রমিকগণ হাতের দ্বারা দীপ-শলাকার বাক্সগুলি জুড়িয়া ফেলিত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কলের সাহায্যে উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে খরচ কম হয় এবং পর্য্যাপ্ত বাক্স প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে ছোট ছোট কারখানার পক্ষে রমণী ও বালক শ্রমিকদিগের দ্বারা বাক্স জোড়ার কায সম্পন্ন করা চলিতে পারে। কিন্তু বড় বড় কারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে বাক্স জোড়ার কার্য্য নিষ্পন্ন করা সঙ্গত।

কৌটা বা বাক্সগুলি জোড়া হইয়া গেলে, শুকাইয়া লইয়া উহাদের উপর লেবেল আঁটিয়া দিতে হইবে। এ কার্য্য রমণী ও বালক শ্রমিকদিগের সাহায্যে অনায়াসে চলিতে পারে। কলের দ্বারাও লেবেল লাগাইবার ব্যবস্থা জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে আছে।

শলাকা বা কাঠি শুকাইয়া কার্য্যোপযোগী হইলে, অপর একটি যন্ত্রে (Frame-filling machine) বাক্সবন্দী করিয়া স্থাপিত করা হয়। যে সকল কারখানায় দৈনিক ৫০ গ্রোস দীপ-শলাকা প্রস্তুত হয়, তথায় এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ, হাতের দ্বারাই সে কার্য্য চলিতে পারিবে। এইরূপ কারখানায় ৩নং যন্ত্র রাখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র কারখানায় frame-filling যন্ত্র না রাখিলেও অনেকগুলি (filling frames
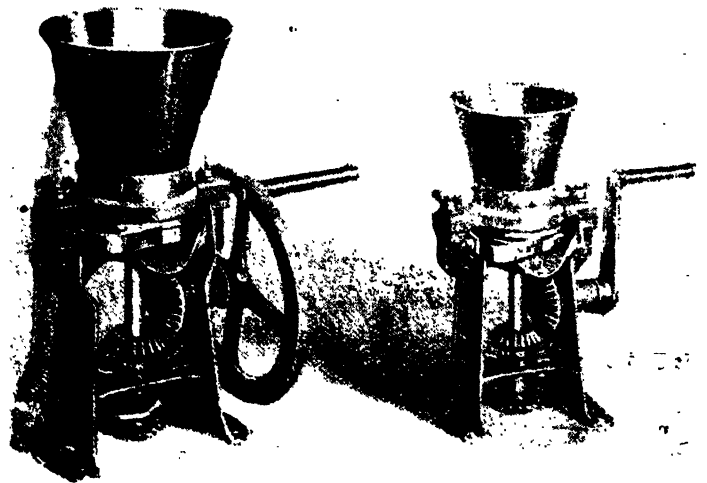
মোচার আকারবিশিষ্ট পেষণ-যন্ত্র।

with grooves) ফাঁপা আধারের প্রয়োজন। তন্মধ্যে শলাকাগুলি হস্তের সাহায্যে সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

ফ্রেমের মধ্যে শলাকাগুলি রাখা হইলে উত্তাপ দিতে হইবে। তাহার পর প্যারাফিন্ ঢালিয়া দাহ্য বা অগ্নি-উৎপাদক দ্রব মশলার (igniting composition) মধ্যে ডুবাইয়া লইতে হইবে। এ জন্য ছোট ছোট কারখানাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয় ;—

(১) একটি লোহার ষ্টোভ—ইহাতে উত্তাপ দিবার কায হইবে। অভাবপক্ষে ইষ্টক-নির্ম্মিত চুল্লীতেও সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। (২) জ্বাল দিবার জন্য একটি কটাহ বা পাত্র। (৩) কাঠিগুলি দাহ্য মশলার পাত্রে ডুবাইবার জন্য একটি যন্ত্র।

উল্লিখিতরূপে কার্য্য করিবার পর ফ্রেম বা আধারগুলি ২।১ ঘণ্টা ধরিয়া শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর ফ্রেমগুলি সরাইয়া লইয়া শলাকাগুলি বাক্সবন্দী করিলেই হইল।

ছোট ছোট কারখানাসমূহে (যদি সে সকল স্থানে শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার কম থাকে) হাতের দ্বারাই শলাকাগুলি বাক্সে ভরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোনও বয়স্কা নারী বা বালিকা প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে ৩ শত বাক্স ভরিয়া ফেলিতে পারে। যে নারী কাযে পাকা হইয়াছে, তাহার পক্ষে ঘণ্টায় ৪ শত বাক্স ভরিয়া ফেলা আদৌ কঠিন নহে।

উল্লিখিতরূপে শলাকাগুলি বাক্সে ভরিয়া, উহার উভয় পার্শ্বে এক প্রকার দ্রব পদার্থ অনুলেপন করিয়া দিতে হয়। তাহাতে শলাকা ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি উৎপাদিত হইবে। এক প্রকার কাঠের ফ্রেমে বাক্সগুলি রাখিয়া বুরুস দিয়া এই অনুলেপন লাগাইতে হয়।

তাহার পর ১২টি করিয়া বাক্স লইয়া এক একটি প্যাকেট বাঁধিয়া তাহার উপর লেবেল লাগাইয়া দিলেই হইল।

দীপ-শলাকা প্রস্তুতের উপকরণ

১০ হাজার বাক্স দীপশলাকার জন্য প্রয়োজন—কাঠ (timber) .৫৫ cubic metres অর্থাৎ প্রায় ২০ ঘন ফুট।

প্যারাফিন্—৬ হইতে ৮ kilos অর্থাৎ প্রায় ৩ পোয়া।

অনুলেপন (painting composition :—

১১৩	গ্রাম্	Gum Cordofan.
৩৮	"	Dextrine.
১২	"	Gum tragacanth.
২৫	"	শিরীষ (glue).
৩৭৬	"	Sulphate of Antimony.
২৫	"	Infusorial earth.
২৫	"	Manganese Ore.
৮৭	"	কাচচূর্ণ
৪০০	"	Phosphorous Amorphous.

দাহ্য (Igniting Composition) :—

৮৪২	গ্রাম্	শিরিস (glue),
৪২৩	"	Gum Co dofan.
২৭৫	"	Bichromate of Potash,
৩৩০	"	Caputmortuum,
৭০৬০	"	Chlorate of potash,
৪১২	"	Infusorial earth,
১২৭৫	"	কাচ চূর্ণ
২২০	গ্রাম্	Oxide of zinc,
৯০৭	"	গন্ধক
১৯১	"	Barium Bichromate,
৪৯৬	"	Barium Sulphate,

কাগজ :—

৪.০	Kilos	straw paper
৭.৫	"	নীল কাগজ

আলুর গুঁড়া (Potato flour) ২.৭ Kilos,

লেবেল ১২৭৫০

যে কারখানায় মানুষের হাতে কায বেশী হইবে এবং ৫ গ্রোস্ বা ৭ শত ২০ বাক্স দীপ-শলাকা (প্রত্যেক বাক্সে ৬০টি শলাকা থাকিবে) প্রতি ঘণ্টায় উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রাদির প্রয়োজন।

শলাকার জন্য : –

(১) হস্ত-করাত—১

(২) Peeling machine বা তক্তার চাদর প্রস্তুতের কল—১

(৩ শলাকা কাটিবার যন্ত্র (Splint cutting machine)—১

(৪) Exhauster—১

(৫) শলাকা পরিষ্কার ও সমান করিবার যন্ত্র (Combined cleaning & splint levelling machine)—১

বাক্স তৈয়ারের জন্য :—

(১) তক্তার চাদর কাটিবার যন্ত্র—৩

(২) তক্তার চাদর কাটিবার মাপের জন্য দাঁতওয়ালা চাকা (Change gear)—১

দাহ্য আরক লাগাইবার জন্য :—

(১) ফাঁপা ফ্রেম—১২৫

(২) শুকাইবার তাক—৫

(৩) লোহার ষ্টোভ—১

অনুলেপন :—

দীপশলাকার বাক্সে অনুলেপন লাগাইবার জন্য ফ্রেম—৬

দাহ্য আরক প্রস্তুতের জন্য :—

(১) মোচার আকারবিশিষ্ট পেষণ-যন্ত্র—১

(২) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপকরণ মাড়িবার যন্ত্র—১

বিবিধ—

(ক) ছুরী শাণ দিবার যন্ত্র—১

(খ) শান-পাথর (Oil-stone)—১

(গ) ত্বক্ ছাড়াইবার ছুরী—১

(ঘ) অতিরিক্ত ছুরী—১

(ঙ) রাসায়নিক জিনিষ ওজন করিবার নিক্তি—১

(চ) শিরীষ মাখাইবার যন্ত্র—১

(ছ) বাহিরে আঠা লাগাইবার যন্ত্র—১

উল্লিখিত শ্রেণীর কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা—

শলাকা-নির্মাণের জন্য	২ জন "	ও ৪ জন রমণী
বাক্স তৈয়ারের জন্য	১ জন পুরুষ	ও ১৫ "
আরক লাগাইবার জন্য	২ জন "	ও ২০ "
অনুলেপন লাগান ও প্যাক করা প্রভৃতির জন্য	০ "	৫ "
আরক প্রস্তুত ও কার্য্য-পরিদর্শকের জন্য	১ "	০ "

মোট ৬ জন পুরুষ ও ৩৯ জন রমণী

পুরুষদিগের মধ্যে ২ জন এবং রমণীদিগের সকলগুলিই অল্পবয়স্ক হইলে ভাল হয়। ১৫ জন রমণী স্ব স্ব গৃহে বসিয়া বাক্সের উপর লেবেল আঁটা ও বাক্স জোড়ার কায করিতে পারে।

জার্ম্মাণ অভিজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, এইরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রাদি বাবদে মোট ৯ হাজার টাকা লাগে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্ত তরঙ্গ

মহাযুদ্ধের পুর্ব্বে ইংরাজ ও জাপানে খুবই মিতালী ছিল। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময়ে জাপান ইংরাজের বন্ধুরূপে প্রাচ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তখন প্রাচীর পুলিসরূপে অভিহিত করা হইত। পরন্তু ইংরাজের মত তাঁহারও রাজ্য সাগর-বেষ্টিত—তাঁহারও প্রভাব সাগরবক্ষে ইংরাজেরই মত বিস্তৃত,—এ জন্য উভয় রাজ্যের মিতালী দেখিতে শুনিতে ভালই হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে উভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছেন। জাপান এখন আবার প্রাচ্য শক্তি—যেন কতকটা প্রতীচ্যের শক্তিপুঞ্জের নিম্নে তাঁহার আসন,—এইরূপ আকারে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যেন অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিদিগের মিলনের যুগ উপস্থিত, এখন ইংরাজ ও মার্কিণ একযোগে জগতের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত, জাপানকে তাই যেন ইঙ্গিতে বলা হইতেছে,—কালা আদমী নীচু যাও। জাপান প্রতীচ্য শক্তিসমূহের দ্বারা 'জাতে' উত্তোলিত হইয়াও হইল না। যেমন মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে প্রাচ্যের কালা আদমীরাও জাতে উঠিয়াও যুদ্ধাবসানে আবার যে যাহার স্থানে নামিতে আদিষ্ট হইয়াছে, জাপানও শক্তিশালী হইয়াও সেইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্যবহারের পরিচয় সিঙ্গাপুরে ইংরাজের নৌ-বহরের আড্ডাস্থাপনের প্রয়াসে এবং মার্কিণের প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ-কুচকাওয়াজের আয়োজনে পাওয়া গিয়াছে। ফলে জাপান বলশেভিক রুসিয়ার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। উভয় জাতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে জাপান রুসিয়ার সাখালিয়ান দ্বীপে পেট্রোল তৈল উত্তোলনে এবং অন্যত্র কয়লা উত্তোলনে শতকরা ৫০ ভাগ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনিময়ে রুসিয়া কেবল একটা প্রাচ্য শক্তির সম্মিলন করিয়াই সন্তুষ্ট। বর্ত্তমানে জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়।

জাপানেরই কোনও অবস্থাভিজ্ঞ রাজনীতিক সে দিন মার্কিণের কোনও সংবাদসংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, মহাযুদ্ধের পরের যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষেই সংঘটিত হইবে। এই যুদ্ধে এক দিকে অ্যাংলো-স্যাক্সন, ইংরাজ ও মার্কিণ জাতি, অপর দিকে চীন, জাপান ও সোভিয়েট রুসিয়ান শক্তি অবতীর্ণ হইবে। সুতরাং সেই ভীষণ সংঘর্ষের ফল কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরাজ মার্কিণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া ভাবিয়াছিলেন, জগতে শক্তিসামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সুতরাং মধ্যে জাতিসংঘকে খাড়া রাখিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া জগতে ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা প্রচলন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইবার নহে। মহাযুদ্ধের দ্বারা সকল যুদ্ধের অবসান হয় নাই। আবার প্রশান্ত মহাসাগরে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে।

এ সম্বন্ধে বিলাতের মনীষীরা যে চিন্তা করিতেছেন না, তাহা নহে। এ, জি, জি'র নাম সংবাদপত্রপাঠক-মহলে অবিদিত নহে। তাঁহার পুরা নাম এ, জি, গার্ডিনার। বহু দিন তিনি লিবারল দলের মুখপত্র 'ডেলি নিউজে' বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার মত যুদ্ধের বিপক্ষবাদীকে Pacifist আখ্যা দিয়া সমরকামীরা খুবই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত,—সে সময়ে তাঁহার সাবধান বাণী কেহ শুনে নাই। এখন মহাযুদ্ধের ফলে জগতে অর্থাভাব, কার্য্যাভাব, ও খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। এখন কেহ কেহ তাঁহার সাবধান বাণীর কথা স্মরণ করিতেছে।

এবারও তিনি জাপানের সহিত বিরোধ ঘটাইতে নিষেধ করিতেছেন। পরন্তু জগতে সকল জাতির মধ্যে সমরায়োজন হ্রাস করিবার কথা পাড়িয়াছেন। ইংরাজ Peace Potrocol হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাতে মিঃ গার্ডিনার বিশেষ চিন্তিত। তিনি ইংরাজজাতিকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—তোমরা জাগ্রত হও, তাহা হইলে জগতের বৈদেশিক নীতি অতঃপর আর সামরিক, নৌ-সামরিক অথবা ফন্দীবাজ রাজনীতিকদিগের হস্তে খেলিবার সামগ্রী থাকিবে না।

কিন্তু জাগে কে? শুনে কে? সাধারণ লোক Pact, Potrocol অথবা বৈদেশিক নীতির খোঁজই রাখে না। তাহাদের নিকট ফুটবল লীগ খেলার খবর চাও, বাজারদরের খবর চাও অথবা ঘোড়দৌড়ের বা মুষ্টিযুদ্ধের খবর চাও,—সঠিক খবর পাইবে। বহু দিন পূর্ব্বে মেকলে বলিয়াছিলেন, ভারত হইতে এক মহাযুদ্ধের খবর আসিলে বিলাতের লোক যত চমকিত হয়, কোলবাথফিল্ডে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইলে তদপেক্ষা অধিক চমকিত হয়। লণ্ডনের এক পাড়ায় আগুন লাগিলে পাশের পাড়ার লোকদিগের যতটা ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, জাপানে ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ লোক মরিলে ততটা ভয়-বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না।

ইহার মূল কারণ এই যে, দূরের ঘটনার সহিত বিশেষ সংস্পর্শ থাকে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে খুবই সম্পর্ক থাকে, এ কথাটা জনসাধারণ বুঝে না। অধুনা জগতের এক প্রান্তে একটা ঘটনা ঘটিলে, ঠিক তাহার বিপরীত প্রান্তেও তাহার সাড়া পৌঁছে।

যখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে সেরাজেভো সহরে আর্ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ড এনার্কিষ্টের গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ লোক তাহাতে বিশেষ ব্যস্ত বা বিচলিত হয় নাই; কে সেই আর্ক ডিউক? কোথায় সেই সেরাজেভো?—এ সব কথায় মাথা ঘামায় কে? তদপেক্ষা সেণ্ট লেজারে কোন্ ঘোড়াটা favourite, সারে কাউণ্টি ইয়র্কসায়ারকে ফুটবলে হারাইতে পারিবে কি না, অথবা শ্রীমতী রবিন্‌সন বা শ্রীমতী ডেনিসটুনের মামলায় রাজা সার হরি সিং বা পরলোকগত বৃটিশ সেনাপতির সম্পর্কে কতটা কলঙ্ক-কথা প্রকাশ পাইল,—তাহার খবর রাখিলে অনেক কায দিবে।

কিন্তু সেই সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের ফলে এখন দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের চাকুরী মিলিতেছে না, বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। এই যে ৬ পেনির স্থলে এক আউন্স তামাকের জন্য ১ শিলিং দিতে হইতেছে, এই যে ১টি সুট কাপড়ের জন্য ৪ পাউণ্ডের স্থলে ৮ পাউণ্ড দিতে হইতেছে, এই যে ডকে বা খনিতে বা কলে

মজুরের কাষ মিলিতেছে না, এই যে এক পাউণ্ডে ১ শিলিংএর স্থলে ৪ শিলিং ৬ পেন্স আয়কর দিতে হইতেছে,—ইহার জন্য দায়ী কি সেই সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড নহে ?

এই হেতু মিঃ গার্ডিনার বলিতেছেন, আধুনিক জগতে কোনও শক্তির বৈদেশিক নীতির সহিত অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। Foreign policy is the most important thing affecting your livelihood, your family and everything affecting you. জগতের লোক ইহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে, কিন্তু ইহার পরিণাম-ফল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। মিঃ গার্ডিনার তাই দেশের লোককে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—হয় তোমরা সময় থাকিতে তোমাদের বৈদেশিক নীতিকে সংযত কর, না হয়, বৈদেশিক নীতিই তোমাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবে, ইহা ছাড়া অন্য পন্থা নাই।

জার্ম্মাণযুদ্ধের ফল এখনও সকলকে ভোগ করিতে হইতেছে; সুতরাং আবার এক নূতন যুদ্ধ সংঘটন করাইবার ইচ্ছা কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যাহারা যুদ্ধ বাধিলে ভাল থাকে,—যাহাদের পেশা যুদ্ধ হইতে অবস্থা ফিরাইয়া লওয়া, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এই সকল 'পাপের' প্রভাব হইতে দেশের সরকারকে মুক্ত করা জনসাধারণের আশু কর্ত্তব্য। তাহারা একবাক্যে বলুক,—We have supped full of the horrors of war and we do not intend to repeat the experience. We want peace and we want disarmaments. We mean to secure peace.

কিন্তু এ কথা ইংরাজজাতি শুনিবে কি ? সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল সরকার এখন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। সে মোহ অবসান হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। যে যুদ্ধে world safe for democracy হইবে, তাহা সংঘটিত না হইলে জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে না।

রুসিয়ান সোভিয়েট

অচেনা অজানা ভয়কে মানুষ খুবই বড় দেখে, ইহা মানুষের প্রকৃতি। রুসিয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনের পর রুসিয়ায় যে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রচলিত হইয়াছে এবং যাহাকে সোভিয়েট, কমুনিষ্ট, থার্ড ইণ্টারনাশ্যানাল প্রভৃতি নানা আখ্যা দেওয়া হয়, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জগতের অন্য দেশবাসীর ধারণা ভাসা ভাসা। যাহারা সোভিয়েট সরকারের বিপক্ষ, তাহারা প্রচারকার্য্যের জন্য উহাকে রাক্ষসের সাজে সাজাইয়া জগতের লোকের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। সোভিয়েট সরকার জগতে সমাজধ্বংসের কল্পনা করিতেছে এবং সকল দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটাইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে, প্রায় সকল জাতিরই এখন সেই ধারণা হইয়াছে। সে দিন থার্ড ইণ্টারনাশ্যানালের বাৎসরিক অধিবেশনে এক মন্তব্য এই মর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে যে, অতঃপর সোভিয়েট সরকার ভারতীয় ন্যাশানালিষ্ট আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে এবং বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ-সাধনার্থ বিপ্লববাদীদিগকে নানারূপে সাহায্য করিবে। অবশ্য ভারতীয় জনসাধারণ এ বিষয়ে কিছুই অবগত নহে, তাহাদের সহিত সোভিয়েট সরকারের সহানুভূতির কোনও সম্পর্কই নাই, তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়াই মুক্তিকামনা করে, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে এই সংবাদের প্রচারকরা সঠিক সংবাদ দিতে পারেন।

তবে সোভিয়েট সরকারের নামে যে সকল সংবাদ রটিত হইতেছে, তাহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, নির্ণয় করা দুরূহ। 'জিনোভিয়েফ পত্র' সম্পর্কে যে আন্দোলন হইয়াছিল এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিলাতের রক্ষণশীল সরকার রুসিয়ান সোভিয়েট সরকারের সহিত সন্ধির কথা-বার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলেন, সে আন্দোলন ভিত্তিহীন বলিয়া বিলাতের এক শ্রেণীর শ্রমিক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিরা রুসিয়ায় গমন করিয়া অবস্থা আলোচনা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সোভিয়েটের সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা এখন বিপজ্জনক।

কোনও অবস্থাভিজ্ঞ ইংরাজ রুসিয়ায় থাকিয়া সোভিয়েট সরকারের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁহার বিবরণ এইরূপ :—

পূর্ব্বে রুসিয়ার সাম্রাজ্য যত দূর বিস্তৃত ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই সোসালিষ্ট সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র যুনিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বতন সাম্রাজ্যের ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, এসথোনিয়া, ল্যাটাইরা ও লিথুনিয়া প্রদেশ এখন সোভিয়েট রিপাবলিক হইতে বিচ্যুত। কয়েকটি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র লইয়া রুসিয়ান সোভিয়েট যুনিয়ান সংগঠিত। এই বিস্তীর্ণ সাধারণতন্ত্রের আয়তন প্রায় ৭৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৩ শত ১৫ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। লোকসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রামে বাস করে, অবশিষ্ট ১৫ ভাগ সহরবাসী। সাধারণতন্ত্র যুনিয়ানের মধ্যে ৫০টি গভর্ণমেণ্ট আছে।

যুনিয়ানের মধ্যে যতগুলি সোভিয়েট আছে, তাহারা এক সাধারণ কংগ্রেসের দ্বারা শাসিত হয়। কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট এক সুপ্রীম একজিকিউটিভ কমিটীর হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত; এই কমিটীর আহ্বানে বৎসরে একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সমস্ত সোভিয়েটের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাছিয়া ৩ শত ৭১ জন সদস্যকে সেন্ট্রাল কাউন্সিল বা কমিটীতে প্রেরণ করা হয়। ইহা ছাড়া কাউন্সিল অফ ন্যাশানালিটিস আছে; কংগ্রেসের অনুমোদন না হইলে ইহার সদস্যসমূহ কাউন্সিলে বসিতে পারেন না।

সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটীর বৎসরে ৩ বার অধিবেশন হয়। কমিটী, কংগ্রেস আদিতে রুসিয়ার অধিবাসী সমূহের সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার আছে। প্রত্যেক ১ লক্ষ ২৫ হাজার অধিবাসী এক জন করিয়া ডেপুটী কংগ্রেসে নির্ব্বাচন করিতে পারে।

কমিটীর ৩টি বিভাগ আছে,—(১) কাউন্সিল অফ পিপলস কমিসারিস, (২) কাউন্সিল অফ লেবার এণ্ড ডিফেন্স, (৩) সুপ্রীম কোর্ট সমূহ। পিপলস কমিসারিসের আবার নিম্নলিখিত কয়টি বিভাগ আছে,—(১) স্থল ও নৌ-সেনা, (২) বৈদেশিক, (৩) বৈদেশিক বাণিজ্য, (৪) যানবাহন, (৫) ডাক ও তার।

প্রত্যেক সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের আবার নিজস্ব কংগ্রেস ও সেন্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটী ও কাউন্সিল অফ যুনিয়ান আছে। কমিটী ও কাউন্সিল প্রদেশের যাবতীয় শাসন ও বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত করেন।

সুতরাং এই বিবরণেই দেখা যায় যে, রুসিয়ান সোভিয়েট সমূহে রীতিমত শাসন ও বিচারের বন্দোবস্ত আছে—সেখানে যে অরাজকতা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে না, তাহার পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না। অন্যান্য সভ্য দেশের অপেক্ষা রুসিয়াতেই গণতন্ত্রবাদ ও নির্ব্বাচন-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সেখানকার শাসনপ্রণালীর কথা শুনিলে মুরের "যুটোপিয়া" বা কার্ল মার্ক্সের "সোসালিজমের" কল্পনারাজ্যের কথা মনে পড়ে। পরলোকগত লেনিন যে শাসনপ্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ছিদ্রান্বেষণ করিবার কিছুই নাই। এমন কি, মার্কিণ স্বাধীনতা-যুদ্ধের

নায়ক জর্জ্জ ওয়াশিংটন মার্কিণ দেশের জন্য যে গণতন্ত্রবাদমূলক শাসন-প্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা তদপেক্ষাও দৃঢ়তর জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইংরাজ লেখক এই পর্য্যন্ত রুসিয়ান শাসনের সুখ্যাতি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরেই বলিতেছেন, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী অনুসারে কার্য্য চলিতেছে না। তাঁহার মৃত্যুর ও ট্রোটস্কির পতনের পর হইতে রুসিয়ার শাসনদণ্ড কামেনেফ, জিনোভিয়েফ ও ষ্টালিনের হস্তে নিপতিত হইয়াছে; এই ৩ জন রুসিয়ার Dictator বা শাসন-নিয়ামকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অত্যাচারে রুসিয়ান জাতি জর্জ্জরিত হইতেছে। জারের বুারোক্রেশীর পরিবর্ত্তে আর এক 'ত্রিমূর্ত্তির বুারোক্রেশী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ ল্যান্সিলট লটন "কন্টেম্পোরারী রিভিউ" পত্রে লিখিয়াছেন,—"কমিউনিষ্ট দল বর্ত্তমানে রুসিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, সোভিয়েটগুলিকে নামমাত্র খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। কমিউনিষ্ট দলের সদস্যরা যদি কমিউনিষ্ট দলের নীতি নিয়ন্ত্রিত করিত, তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু তাহা হইতেছে না, নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে—A clique of bureaucrats কয়েক জন স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্র প্রণালীর শাসক।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, লেনিন ও ট্রোটস্কি যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা অশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু যেমন সকল প্রকারের নূতন মতবাদ প্রচারের অপব্যবহার হইয়াছে, তেমনই লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ শাসন-প্রণালী ক্রমে দোষযুক্ত হইতেছে। ইহার ফল বিষময় হইবেই।

কিন্তু একটা কথা ভাবিবার আছে। লেনিনের জীবদ্দশায় অথবা ট্রোটস্কির কর্ত্তৃত্বের দিনে তাঁহাদের নামেও যথেষ্ট কলঙ্ক রটিয়াছিল,—তাঁহাদিগকেও য়ুরোপীয় লেখকরা নর-রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারণের পর তাঁহারা য়ুরোপীয় প্রচারক ও লেখকগণের দৃষ্টিতে রুসিয়ার শান্তি-স্থাপয়িতা ও জগতে সাম্যবাদপ্রচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কামেনেফ ও জিনোভিয়েফও যে জীবদ্দশায় এই ভাবে হিংসা ও মিথ্যাপ্রচারের লক্ষ্যস্থল হয়েন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

—

রাজনীতির দৈন্য

মিঃ হ্যারল্ড স্পেণ্ডার বিলাতের এক জন বড় লেখক। চিন্তাশীল ও মনীষী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি সম্প্রতি 'কন্টেম্পোরারী রিভিউ' পত্রে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, প্রবন্ধটির নাম, "বৃটিশ সাম্রাজ্য কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে?" এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"সাগরপারে আমরা আমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে মুক্তি দিতেছি। ইহা একটা বড় কথা নহে। কেন না, যে প্রথা অনুসরণ করিয়া আজ আমরা এই বৃটিশ রাজ্য সমূহের অধিবাসীরা রাজভক্ত সন্তুষ্ট প্রজায় পরিণত হইয়াছি, উপনিবেশসমূহকে মুক্তি দিয়া আমরা সেই প্রথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র। যে অধিকার লাভ করিয়া আমরা এত বড় হইয়াছি, যাহাতে আমাদের সর্ব্বস্ব লাভ হইয়াছে, ইহা কি সেই অধিকার নহে? যদি আমরা এই অধিকারদান প্রথাকে ধ্রুবতারারূপে লক্ষ্য রাখিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমাদের বিপথে যাইবার ভয় থাকে না।

"যখনই আমাদের এই বিলাতে এক দফা নির্ব্বাচনাধিকার প্রদান করিবার কথা উঠিয়াছে, তখনই এক দল লোক ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইবে বলিয়া চীৎকার করিয়াছে—দেশের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া হাহাকার রব তুলিয়াছে। যখনই উপনিবেশসমূহকে বৃটিশ প্রথায় স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার কথা উঠিয়াছে, তখনই রব উঠিয়াছে, এইবার পৃথিবী ধ্বংস হইল। অথচ প্রত্যেকবারে অধিকারদানের পর ইংলণ্ড পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, স্থির ও রক্ষণশীল হইয়াছে। এই সে দিন আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দিবার পূর্ব্বে কত আর্ত্তনাদ, কত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলবার্ত্তার রব উঠিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দিবার পর আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, এই দানের পর হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের আমাদের প্রতি মনের ভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে—দ্বেষ-হিংসা ও ঘৃণা-ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রীতি-শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃভাবের উদ্ভব হইয়াছে। যদি আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যান্তর্গত অন্যান্য দেশের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে?"

মিঃ স্পেণ্ডার এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির রাজনীতিক দৈন্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। যাহারা এক হাতের অধিক দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না, তাহাদের নিকট বিচক্ষণ রাজনীতিকতার আশা করা যায় না। এখন ইংলণ্ডে কিপ্‌লিং কবি জাতীয় কবি, সাইডেনহ্যামী দল রাজনীতিক; কাযেই মিঃ স্পেণ্ডার যে অবস্থার কামনা করিতেছেন, তাহা উপস্থিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

মিঃ স্পেণ্ডার সাম্রাজ্যান্তর্গত অন্যান্য দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা কানাডা, আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়াকে বুঝায় না, কেন না, এ সকল দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের বহু পূর্ব্বেই মুক্তি লাভ করিয়াছে; কেবল মুক্তিলাভ নহে, এই সকল 'ঘরের ছেলের' মধ্যে কেহ কেহ বড় হইয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাপের শাসনে ঘরের প্রভাবের মধ্যেও থাকিতে চাহিতেছে না। সুতরাং মিঃ স্পেণ্ডার এ সকল দেশকে উল্লেখ করেন নাই, ভারত, মিশর, প্যালেষ্টাইন, ইরাক প্রভৃতি দেশকে বুঝাইতেছেন। মিশরকে কতকটা মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বলডুইন-সরকার লী-হত্যাকাণ্ডের অছিলায় সেই দোষ সামলাইয়া লইয়াছেন। প্যালেষ্টাইনে লর্ড বালফোর যে zionism বা ইহুদী রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার বিষময় ফল ফলিয়াছে। জাতিসংঘের অনুজ্ঞার দোহাই দিয়া লর্ড ব্যালফোর প্যালেষ্টাইনে ইংরাজের আশ্রিত এক বিরাট ইহুদী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আরবরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি—তাহারা এ অভিসন্ধির কূট তন্তুজাল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই লর্ড বালফোর প্যালেষ্টাইনে পদার্পণ করিয়া ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর বিস্তার করিলে আরবরা সে ফাঁদে পা দেয় নাই—তাহারা তাঁহার পদার্পণে হরতাল করিয়া আপনাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ এমারিকেও তাহারা মনের কথা স্পষ্ট শুনাইয়া দিয়াছিল,—তুর্কীর শাসনে তাহাদের এখনকার অপেক্ষা অধিক নির্ব্বাচনাধিকার ছিল, ইত্যাদি। কথাগুলি শুনিতে শ্রুতিসুখকর নহে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা আরবদের প্রাণের কথা। তাহারা বৃটিশ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না, তাহারা বৃটিশজাতির বন্ধু, কিন্তু তাহারা প্রকৃত মুক্তি চাহে, ইহুদী জাতির মারফতে অধীনতার শৃঙ্খল পরিতে চাহে না। ইহাই প্যালেষ্টাইনের রাজনীতিক সমস্যা। এ সমস্যাসাধনের সহজ উপায় পড়িয়া রহিয়াছে। মিঃ স্পেণ্ডারের পরামর্শমত চলিলে প্যালেষ্টাইনের আরব চিরতরে আইরিশজাতির মত ইংরাজের বন্ধুত্বে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজের রাজনীতিক দৈন্য তাহা হইতে দিবে না।

যাহা প্যালেষ্টাইনের পক্ষে প্রযোজ্য, তাহা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য, সুতরাং সে প্রাচীন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

—

পারস্যের সর্দ্দার সিপা

সম্প্রতি বিশ্ব-দূত রয়টারের তারের সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পারস্তের মোহাম্মেরা অঞ্চলের সেখ পারস্ত-সরকারের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াছেন, সে জন্ত পারস্ত-সরকারের আদেশে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই সংবাদটুকুর ভিতরে অনেক রহস্ত আছে। পারস্তের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা অনেক ভাল, পূর্ব্বে পারস্যের নব-জাগরণের ইতিহাসে এ কথা প্রকাশ পাইয়াছে। পারস্তের যিনি বর্ত্তমান কর্ণধার, সেই সর্দ্দার সিপা বিচক্ষণ, কার্য্যকুশল, কূট-রাজনীতিক, পরন্ত সামরিক ব্যাপারেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার আমলে পারস্তে বহুবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছে, পারসীক সেনা আধুনিক প্রথায় যথারীতি বেতন প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের শান্তি-রক্ষা করিতেছে, রাজকার্য্যে অনাচার, অত্যাচার, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, এক কথায় পারস্ত এখন বর্ত্তমান জগতে অন্ততম মুসলমান-শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সর্দ্দার সিপা কোন কারণে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে পারস্ত মজলিস বা পার্লামেণ্ট তাঁহাকে অনুনয় করিয়া পুনরায় দেশশাসনের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে হঠাৎ এই বিদ্রোহের কারণ কি? ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে আধুনিক পারস্তের কতকটা ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক।

যখন সর্দ্দার সিপার হস্তে পারস্তের শাসনভার অর্পিত হয় নাই, সেই সময়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোহাম্মেরা অঞ্চল ইরাক-সর্দ্দার সেখ জব্বরের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তখন পারস্তের রাজশক্তি দুর্ব্বল, তাহার অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপর নির্ভর করায় তখন কোনও ফলোদয় হইত না। সেখ জব্বর এ জন্য মোহাম্মেরায় একরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। সন্নিহিত ইরাকপ্রদেশেও তাঁহার কতকটা রাজ্য বিস্তৃত ছিল; গোলযোগের সময় তিনি তথায় পলায়ন করিতেন। বৃটিশ-শক্তি তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। এই হেতু পারস্তরাজ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না।

তাঁহার পুত্র সেখ মিজাল বৃটিশ-শক্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাহার কারণ এই যে, কারুণ নদের বাণিজ্য উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সেখ কাজাল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৃটিশ শক্তির সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বৃটিশ শক্তিকে বাণিজ্যাদিব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজের সহিত বন্ধুতার ফলে কাদিশবাদ ও হিন্দিয়াবাদের মধ্যস্থ ভূভাগ তাঁহার রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। বিনিময়ে তিনি ইংরাজের আশ্রিত বলিয়া বিঘোষিত হয়েন। ইংরাজ তাঁহাকে কে, সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন এবং পারস্ত সরকারকে জানাইয়া রাখেন যে, তাঁহার সহিত তাঁহাদের সন্ধি হইয়াছে এবং উহার ফলে তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপ হইলে ইংরাজ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

এই বলে বলীয়ান্ হইয়া সেখ কাজাল বহুদিন পারস্ত-সরকারকে কোনওরূপ খাজানা দেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সর্দ্দার সিপার হস্তে পারস্তের শাসনভার অর্পিত হয়। সর্দ্দার সিপা অন্যে প্রকৃতির লোক নহেন। পারস্তের প্রজা পারস্ত-সরকারকে খাজানা দিবে না, তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে না, ইহা হইতেই পারে না। সর্দ্দার সিপার শিক্ষিত সেনা মোহাম্মেরায় হানা দিয়া সেখ কাজালকে পারস্ত-সরকারের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিল। এইখানেই সেখ কাজালের বিদ্রোহের সূত্রপাত।

সেখ কাজাল মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার অপমান ইংরাজ নীরবে সহ্য করিবেন না। বিশেষতঃ তিনি বক্তিয়ারী সম্প্রদায়ের সাহায্যের ভরসা করিয়াছিলেন। বক্তিয়ারীরাও ইংরাজের নিকট উৎসাহ পাইবার আশা করিতেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার নীরব রহিলেন। সেখ কাজাল মনে করিলেন, ইংরাজ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা অনেকটা মক্কার রাজা আমীর আলীর মত হইল। আমীর আলী যেমন ভাবিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ইংরাজকে তিনি যে সাহায্য দান করিয়াছেন, ইংরাজ তাহার বিনিময়ে ওহাবিদের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু ইংরাজ হজের যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথা সকলেই জানে।

সুতরাং সেখ কাজাল ইংরাজের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের অবসর না পাইয়া পারস্ত-সরকারের উপর মনের আক্রোশ মিটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহের কারণ। কিন্তু সর্দ্দার সিপাও নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি কূট-রাজনীতিক। উত্তরে রুসিয়াকে দক্ষিণে ইংরাজের বিপক্ষে সজাগ রাখিয়া তিনি আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। এখন তিনি পারস্তকে বৈদেশিক শক্তিমাত্রেরই প্রভাব হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই সহজেই কাজালের স্থানীয় বিদ্রোহদমনে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই।

এসিয়ার জাতিসমূহের নবজাগরণের পরিচয় ইহাতে অনুস্থচিত হয়। তুর্কী য়ুরোপীয় শক্তি হইলেও এসিয়াবাসী বলিয়া বিদিত। তুর্কী নব-জাগরণের ফলে নব-বলে বলীয়ান্ হইয়াছে। চীনও জাগিতেছে। পারস্তের ঘুমঘোর কাটিয়াছে। ফলতঃ এসিয়ায় যেন একটা নব-জীবন-স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। এ স্পন্দনের অনুভূতি ভারতেও হইতেছে। ফল কি হইবে, বিধাতাই জানেন।

যুদ্ধ-শান্তি

বিলাতের 'জন বুল' কাগজে প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকাল হইতে জগতে যুদ্ধ ও শান্তির একটা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৯৬ অব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৩ শত ৫৭ বৎসরে জগতে ২শত ২৭ বৎসর শান্তি বিরাজ করিয়াছে এবং ৩ হাজার ১ শত ৩০ বৎসর যুদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতি ১ বৎসরের শান্তির পরিমাণে ১৩ বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছে। সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তি যে কলহ ও যুদ্ধের দিকে সমধিক আকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ৩ শতাব্দীতে মাত্র য়ুরোপেই ২ শত ৮৬টা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ অব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জগতে ৮ হাজারের উপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সেগুলি চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু গড়পড়তায় কোনও সন্ধিই ২ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

ইহার কারণ কি? 'জন বুল' বলেন, "প্রকৃতপক্ষে যত সন্ধিপত্রই স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা এক প্রবল পক্ষের নির্দ্দেশমতই হইয়াছে, উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্যের ফলে হয় নাই।" সুতরাং দুর্ব্বল পক্ষ অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া যাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার কোনও মূল্য থাকে নাই। যখনই দুর্ব্বল পক্ষ সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই সে সন্ধিপত্রকে ছেঁড়া কাগজ বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। উহাতে আবার যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে।

মার্কিণ ফুলের সাজি
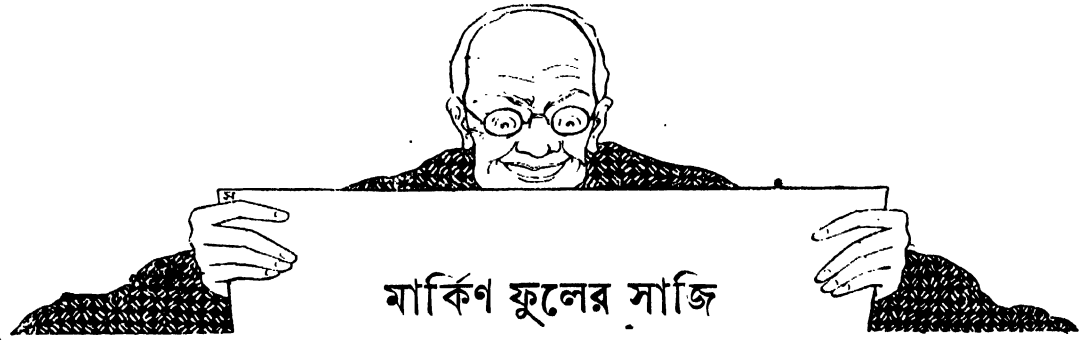
প্রতীচ্যদেশে ফুলের চাষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ ফুলের উন্নতির জন্য কিরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে দেশের যে ফুল সুন্দর, তাহা সংগ্রহ করিয়া য়ুরোপীয় ও মার্কিণ জাতি স্ব স্ব দেশে তাহার পরিপুষ্টি-সাধনে যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, তাহা সকল দেশেরই অনুকরণ-যোগ্য। আমেরিকায় এ বিষয়ের প্রচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মার্কিণের কতিপয় মরশুমী পুষ্পের (Season flowers) বর্ণচিত্র প্রকাশিত হইল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণও সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে। এই ফুলগুলির সহিত আমাদের ভারতবর্ষীয় পুষ্পের সাদৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং মার্কিণ নামই রক্ষিত হইল।

উইলো এম্‌সোনিয়া—

এই পুষ্প গ্রীষ্মকালে ফুটিয়া থাকে। নিউজার্সি হইতে ইলিনয় এবং ফ্লোরিডা হইতে টেক্‌সাস্ পর্য্যন্ত সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায়। বড় হইলে উইলো এম্‌সোনিয়ার পাতা হস্তিদন্তের ন্যায় মসৃণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই মরশুমী ফুল ফুটিয়া থাকে। এই ফুলের অনেকগুলি জাতি আছে। তাহাদের রস অত্যন্ত তিক্ত। এই পুষ্পের কোন কোন জাতি-পুষ্পবৃক্ষ হইতে রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্যাটেল্—

এই পুষ্পের লাটিন নাম 'টাইফা লাটিফোলিয়া'। ইহা আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জমী ভিজা—জলাভূমি, তথায় ইহা দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। 'টাইফা' অর্থে জলাভূমি এবং 'লাটিফোলিয়া' অর্থে চওড়া পাতা। এই ফুলের গাছ ৪ হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে।

ক্যাটেলের অনেকগুলি নাম আছে। ইহার জাতির সংখ্যাও কম নহে। ইহা প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনযুগের প্রসিদ্ধ ইটালীয় চিত্রকরগণ যীশুখৃষ্টের ছবি আঁকিয়া তাঁহার হাতে দণ্ডের স্থলে ক্যাটেল্ পুষ্প দিতেন। ক্যাটেল্ পুষ্পে কাঁটা আছে।

পুসি উইলো—

এই উইলো পুষ্প মার্কিণ উপকথায় যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিবার অধিকার আর কোনও মার্কিণ পুষ্পের নাই। ইহার ফুলগুলি তুলার ন্যায় কোমল এবং গাছের ছাল ঈষৎ সবুজমিশ্রিত পাংশুবর্ণের। উইলো গাছগুলি প্রায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর অথবা জলাশয়ের তীরে অথবা আর্দ্র বনভূমির প্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তের প্রথম সাড়া যখন বনভূমিকে পুষ্পিত করিয়া তুলে, তখনই উইলো গাছে ফুল দেখা দেয়। এই গাছ কোন কোন ক্ষেত্রে ১২ ফুট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। উইলোর ছোট ছোট শাখাগুলির বর্ণ সাধারণতঃ রক্তাভ। শীতকালে যে সকল মুকুল জন্মে, তাহাদের বর্ণও গোলাপী। উইলো গাছের পাতা বাহির হইবার পূর্ব্বেই সাধারণতঃ তুলার মত নরম ফুলগুলি দেখা দিয়া থাকে। উইলো-কুঞ্জের ছোট ছোট গাছগুলি জলের মধ্যে মূল সঞ্চারিত করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

উইলো এম্‌সোনিয়া

ক্যাটেল্

পুসি উইলো

মাকিন ভুঁই চাপা
(Ground Ivy)

উইনডার গ্যামট

পিচার প্লাণ্ট

সাধারণের বিশ্বাস, উইলো গাছ অন্য কোন কোন প্রাচীন পুষ্পবৃক্ষের বংশধর। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের পরাগ বাতাসের সাহায্যে পরস্পরের ফুলে নীত হইয়া পরে উইলো গাছের উৎপত্তি হইয়াছে। অধুনা কীট-পতঙ্গের দৌত্যের উপর উইলো গাছ নির্ভর করিয়া থাকে।

মধুমক্ষিকারাই প্রধানতঃ পুংপুষ্পের পরাগ মাখিয়া স্ত্রী-পুষ্পে মধুপান করিতে যায়। তাহাদের অঙ্গে অতি সূক্ষ্ম রোম বিদ্যমান। পরাগ উহাতে লাগিয়া থাকে এবং পুষ্পান্তরে মধুপানকালে উহা স্খলিত হইয়া পুষ্পমধ্যে নিপতিত হয়।

কবিগণ এই উইলো পুষ্পের কত বর্ণনাই না করিয়াছেন। আমেরিকায় উইলো পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে। নোভাস্কোসিয়া, সাসকাচেওয়ান্, ডিলাওয়ার এবং মিশোরীতে ইহাদের বড় আড্ডা।

গ্রাউণ্ড আইভি—

এই পুষ্প কলসীর আকারের পাপড়ীবিশিষ্ট। আমাদের দেশের "ভুঁই-চাঁপার" সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। য়ুরোপ হইতে মার্কিণগণ উহা আমেরিকায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়েন। এখন নিউফাউণ্ডলাণ্ড এবং ওণ্টারিও হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে জর্জ্জিয়া এবং পশ্চিমে অরিগাঁও পর্য্যন্ত সকল স্থানে এই সাময়িক পুষ্পের আবাদ হইয়া থাকে। মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় এই ফুলের আরও অনেক নাম আছে। য়ুরোপে পূর্ব্বে এই পুষ্পের পাতার সাহায্যে বিয়ার মদ্য পরিষ্কৃত করা হইত।

পিচার প্লাণ্ট—

ইহাও কলসীর আকারের পাপড়ীবিশিষ্ট এবং মক্ষিকাভোজী। লাব্রাডর হইতে ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই পুষ্প প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মে ও জুন মাসে এই ফুল ফুটিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ীগুলি গাঢ় রক্তবর্ণ; কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষৎ সবুজ ও গোলাপী আভাবিশিষ্টও হইয়া থাকে।

গাছের গোড়ার কাছের পাতাগুলি ফাঁপা এবং বাটির আকারবিশিষ্ট। পাতার বাহিরের দিকের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ এবং সবুজ। ভিতরের দিকের বর্ণ ঈষৎ সবুজ এবং তাহার উপর লোহিতাভ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতার মধ্যে জল থাকে। সে জন্য পতঙ্গ দলে দলে তথায় তৃষ্ণানিবারণার্থ সমবেত হইয়া থাকে। পতঙ্গ বা মক্ষিকা পাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর নির্গত হইতে পারে না। পাতার অভ্যন্তরস্থ জলে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়। পাতার উপর সূক্ষ্ম কাঁটার মত পদার্থ থাকে। সেগুলির মুখ নীচের দিকে। সুতরাং তৃষ্ণার্থ মক্ষিকা বা পতঙ্গ ভিতরে প্রবেশ করিলে সহসা নির্গত হইতে পারে না।

মক্ষিকাকুল পাতার মধ্যে বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদের গলিত দেহের নাইট্রোজেন হইতে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপ প্রাণিভোজী বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও লতা পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উইলডার গ্যামট—

এই জাতীয় পুষ্প কানাডা ও টেক্সাসে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থান ভিজা নহে, সেখানেই এই পুষ্প বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার গোলাপীবর্ণের পুষ্প প্রজাপতির পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ।

'চুনি'-কণ্ঠ 'পাপিয়া জাতীয় পক্ষীও এই পুষ্প-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তথায় সমবেত হইয়া থাকে। এই পুষ্পের অনেকগুলি জাতি আছে। তাহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের।

কোন কোন স্থানে বিস্তৃতভাবে এই ফুলের চাষ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে জমীর উর্ব্বরা শক্তি কমিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে চাষ করিয়া এই ফুল রোপিত হয়, তথায় ৫ বৎসরের মধ্যে আর কিছু আবাদ করা যায় না।

মার্কিণ ব্লাডারনট্—

উত্তর-গোলকার্দ্ধে, বিশেষতঃ এসিয়ায় এই ব্লাডার-নট্ পুষ্পের জন্মভূমি। আমেরিকার কুইবেক ও

ওণ্টারিও হইতে দক্ষিণে ক্যারোলিনা ও ক্যান্‌সাস্ পর্য্যন্ত স্থানে আর্দ্রবনভূমিতে ইহাদিগের বাস।

ব্লাডারনট্ ১৫ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে ইহা মুকুলিত হয়। ইহাদের ফুল শ্বেত, তাহাতে একটু সবুজের ছিট আছে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকটা দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত।

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক ব্লাডারনটের মুকুলগুলি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানের লোক উহার বীজগুলিও ভোজন করিয়া থাকে। উদ্যানশোভাবৃদ্ধির জন্য য়ুরোপীয় ব্লাডারনট্ ব্যবহৃত হয়।

ভার্জ্জিনিয়া স্প্রিং বিউটি—

'বসন্তশোভা' ফুল নোভাস্কোসিয়া হইতে জর্জ্জিয়া এবং সাস্‌কাচিউয়ান্ হইতে টেক্‌সাস্ পর্য্যন্ত যাবতীয় আর্দ্রবনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফুলের গাছ সাধারনতঃ ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে।

ফুলগুলি এমনই লজ্জাশীলা যে, মানবহস্তস্পর্শেই লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া ফুলগুলি বসন্ত-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে—শীঘ্র শুকাইয়া যায় না। বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ফুলের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া ইহাকে বসন্তশোভা বলা হইয়া থাকে।

ফুলগুলি দেখিতে নক্ষত্রের মত এবং একই দিকে মুখ রাখিয়া প্রস্ফুটিত হয়। সূর্য্যালোক না পাইলে ইহারা পাপড়ী খুলে না। বসন্তশোভা মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসে তাহার সৌন্দর্য্য বিলাইয়া দেয় না—যে সকল পতঙ্গ তাহার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে না চাহে, তাহাদিগকে বসন্তশোভা কখনই সুধাপানের অবকাশ দেয় না। যে সকল কীট-পতঙ্গ সূর্য্যালোকের ভক্ত, অথচ বসন্তশোভার সঙ্গে আদান-প্রদানের কারবার করিতে অভিলাষী—তাহারা রাত্রিকালে অথবা দুর্য্যোগের সময় বসন্তশোভার কাছে আসিলে, দেখিবে, সে তাহার দোকান রুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপে বসন্তশোভা তাহার মধু ও পরাগ বাজে ব্যয় হইতে দেয় না। যাহারা চোরের মত তাহার কাছে আসে না, বন্ধুভাবে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করে, সে তাহাদিগকেই সুধা বিতরণ করিয়া থাকে।

নানাজাতীয় প্রজাপতি ও মধুমক্ষিকাই তাহার অনুরক্ত অতিথি। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় ৭১ প্রকারের পতঙ্গ তাহার কাছে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ মধু, কেহ বা পরাগের লোভে তাহার সহিত বন্ধুত্ব করে।

সোনালী পারস্‌নিপ্—

এই গাছের ফুল এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুটিয়া থাকে। প্রান্তরে, জলাভূমিতেই এই গাছ জন্মগ্রহণ করে। প্রায় দেড় হাজার রকম পারস্‌নিপ্ আছে, কিন্তু আকার, গুণ ও প্রকৃতির সহিত কাহারও সামঞ্জস্য নাই।

সোনালী পারস্‌নিপ্ ফুলের গাছ ১ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। পথের ধারেই সাধারণতঃ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হয়। নানাপ্রকার মাছি এবং ক্ষুদ্র প্রজাপতি ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু মধুমক্ষিকা ইহার রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হয় না। মধুমক্ষিকা সুধা না পাইলে সে পুষ্পে বিহার করে না, এ জন্য পারস্‌নিপের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব ঘটে না।

ক্যারিয়ন্ পুষ্প—

ইহা কুমুদজাতীয় পুষ্প। কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে, ক্যারিয়ন্ এক প্রকার স্বতন্ত্র মরশুমী ফুল। কিন্তু কুমুদের দল ইহাকে স্বগোত্ররূপে পাইলে খুসী হইত সন্দেহ নাই।

নিউব্রন্‌স্‌উইক্ হইতে ম্যানিটোবা এবং ফ্লোরিডা হইতে নেব্রাস্‌কা পর্য্যন্ত ইহাদের রাজত্ব। এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ক্যারিয়ন্ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, বনে জঙ্গলে থাকিতেই ইহারা ভালবাসে, অর্থাৎ

মার্কিন ব্লাডারনট

বসন্তশোভা—ভার্জিনিয়া

স্বর্ণাভ মেডো—পারস্নিপ্

ক্যারওন্ পুষ্প

সেণ্ট জনসওয়ার্ট

মার্কিন কমুদ (Spatterdock)
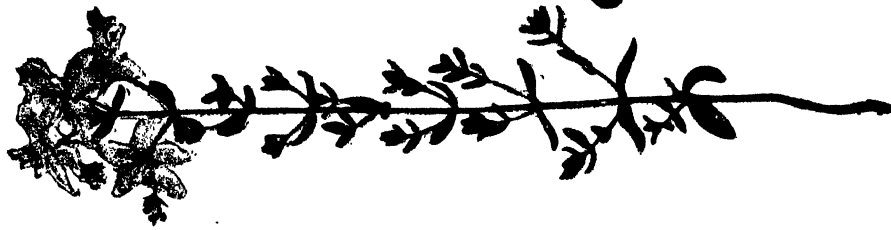
যেখানে ক্যারিয়ন্ পুষ্প বিকসিত হয়, তাহার চারিদিকে প্রধানতঃ বনভূমি ও ঝোপ-ঝাড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নামটি যেমন বিরক্তিকর, প্রচ্ছন্ন গন্ধও তেমনই অসহনীয়।

কিন্তু মধুমক্ষিকা প্রভৃতি উহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া দূতীর কার্য্য করিয়া থাকে। মানুষের কাছে গোলাপের নির্য্যাস বা আতর যেমন লোভনীয়, মক্ষিকাদিগের নিকট ক্যারিয়ন্ পুষ্পের সৌরভ তেমনই প্রীতিপ্রদ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মৃত মুষিকের পূতিগন্ধের সঙ্গে ক্যারিয়ন্ পুষ্পের গন্ধের তুলনা করিয়াছেন।

ক্যারিয়ন্ পুষ্প কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অপ্রীতিকর নহে। সবুজবর্ণের মক্ষিকাগুলিকে পরিতৃপ্ত করা শেষ হইলে—যখন পুষ্পে ফল ধরিতে থাকে, তখন তাহার কদর্য্য গন্ধ অন্তর্হিত হয়। হেমন্তের আগমনে নবীন ভূষণে বিভূষিত হইয়া ক্যারিয়ন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো জামের মত ফলের গুচ্ছ পক্ষীদিগের জন্য ধারণ করে। পক্ষিগণ সেই ফলের বীজ অন্যত্র বহন করিয়া তথায় ক্যারিয়নের বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সাধারণ সেণ্টজন্‌স্‌ওয়ার্ট—

এই পুষ্প এসিয়া হইতে আমেরিকায় নীত হইয়াছে। এখন কিন্তু এই পুষ্প য়ুরোপ ও আমেরিকার নিজস্ব সম্পত্তি। প্রান্তর, পরিত্যক্ত ভূমি ও পথের পার্শ্বেই ইহারা সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ করে। জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহাদের স্থিতিকাল। সেণ্টজন্‌স্‌ওয়ার্ট ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে।

এই ফুলের গাছ একবার যেখানে বসবাস করে, সে স্থান হইতে তাহাকে সমূলে উৎখাত করা সহজসাধ্য নহে। ইহা শীঘ্র পরিপুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া জমীর উর্ব্বরাশক্তি শীঘ্র হ্রাস পাইয়া থাকে, এ জন্য যেখানে এই গাছ উৎপন্ন হয়, তাহার আশে-পাশে অন্য কোন উদ্ভিদ্ তিষ্ঠিতে পারে না।

সেণ্টজন্‌স্‌ওয়ার্ট দেখিতে সুদৃশ্য নহে, কারণ, ইহার কোনও শাখায় তাজা ফুল, আবার কোনও শাখায় শুষ্ক পুষ্প দেখিতে পাওয়া যাইবে, এক দিকে নূতন মুকুল জন্মিতেছে, অন্য শাখায় ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে।

এই পুষ্পে মধু নাই—শুধু পরাগ-ভক্তরা ইহার কাছে আসিয়া থাকে।

এই পুষ্প সম্বন্ধে য়ুরোপের কৃষককুলের বিচিত্র ধারণা আছে। ভূত-প্রেত প্রভৃতি দুষ্ট আত্মার প্রকোপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা সেণ্টজনের উৎসবদিনে স্ব স্ব কুটীরের বাতায়নে উক্ত পুষ্প বা বৃক্ষপল্লব ঝুলাইয়া রাখে। অবিবাহিতা কুমারীদিগের বিশ্বাস যে, গাছের পত্রপল্লব বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের ভাগ্যনিয়ামক। এ জন্য তাহারা স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। যদি বৃক্ষ বেশ সতেজ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে—তাহাদের বিবাহিত-জীবনে সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনা।

পূর্ব্বকালে য়ুরোপের কবি ও ভিষক্‌গণ ইহার গুণবর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সেণ্টজন্‌স্‌ওয়ার্ট হইতে পূর্ব্বকালে এক প্রকার মলম প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বারা যোদ্ধৃবর্গের অস্ত্রক্ষত নিরাময় হইত। যাহারা মানসিক অবসাদ রোগে পীড়িত, এই বৃক্ষের রস তাহাদের পীড়া উপশমে সমর্থ হইত।

ক্ষুদ্র স্প্যাটারডক্—

এই পুষ্পকে বাঙ্গালার কুমুদের সহিত তুলনা করা যায়। মিশরের পদ্ম (lotus) জাতীয় ফুলের সহিতও ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। এই সাময়িক পুষ্প নিউ-ব্রন্‌স্‌উইক্ হইতে পেন্‌সেল্‌ভেনিয়া এবং পশ্চিমে মিনেসোটা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ডোবা, পুষ্করিণী এবং অল্পস্রোতা তটিনী-সলিলেই স্প্যাটারডক্ পুষ্প (কুমুদ) দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিণে এইরূপ কুমুদজাতীয় ৪০ প্রকার পুষ্প আছে। কর্দ্দমে ইহাদের মূল প্রোথিত থাকে। যেখানে জল গভীর—অর্থাৎ তুষারাধিক্যে যে স্থানে কর্দ্দম জমিয়া যায় না, সেই সকল জলাশয়ের কুমুদ শীতকালেও বাঁচিয়া থাকে।

স্নো-অন্-দি মাউণ্টেন—

এই জাতীয় পুষ্প প্রায় ৪ হাজার রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। মিনেসোটা হইতে কলোরাডো পর্য্যন্ত শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আটলাণ্টিক উপকূলবর্ত্তী এবং মধ্যপ্রদেশের অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিবার পর তথায় এই পুষ্পের প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে। মে হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই গাছ জীবিত থাকে। সাধারণতঃ ৩ ফুট পর্য্যন্ত গাছগুলি বাড়িয়া থাকে।

এই জাতীয় গাছের রস বিষাক্ত, তবে উত্তপ্ত করিয়া লইলে বিষের তীব্রতা কমিয়া যায়। এক জাতীয় স্নো-অন্-দি-মাউণ্টেন হইতে প্রথম শ্রেণীর রবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকা এই রবার রপ্তানী করে।

এই বৃক্ষের পাতাগুলি সুদৃশ্য। গিরিশিরস্থ তুষার-স্তূপের সঙ্গে ইহার কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া মার্কিণগণ এই নামকরণ করিয়াছেন কি না বলা যায় না।

ব্লাকবেরী লিলি—

এই পুষ্প খাস মার্কিণের নহে, অন্যদেশ হইতে আমেরিকায় আসিয়াছে। কুসুম-উদ্যানের গণ্ডী ছাড়াইয়া, নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্লাকবেরী-কুমুদ কনেকটিকট্ হইতে জর্জ্জিয়া এবং পশ্চিমে কান্সাস্ পর্য্যন্ত ভূভাগের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং পথের ধারে আসন গ্রহণ করিয়াছে। জুন ও জুলাই মাসে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফল পাকিবার সময়। ফলগুলি কালো জামের মত বলিয়াই উহার নাম 'ব্লাকবেরী লিলি' হইয়াছে।

যাহারা বিশেষজ্ঞ নহে, এই ফুলকে তাহারা কুমুদজাতীয় বলিয়া ভুল করিতে পারে, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্লাকবেরী লিলি আদৌ কুমুদজাতির সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। প্রাচ্যদেশেই ইহার আদি নিবাস—চীনদেশ হইতে উহা আমেরিকায় নীত হয়।

ক্ষুদ্র বাইণ্ড উইড্—

নোভাস্কোসিয়া হইতে নিউজার্সে এবং তথা হইতে যুক্তরাজ্য পার হইয়া কালিফোর্ণিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রান্তর ও অনুর্ব্বর ভূমিতেই বাইণ্ড উইড্ পুষ্প-বৃক্ষের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এসিয়া ইহার মাতৃভূমি; তথা হইতে য়ুরোপের পশ্চিম ভাগে ইহার আমদানী হইয়াছিল। তাহার পর নানাভাবে আটলাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া এই পুষ্প ইদানীং আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। ইহার জাতির সংখ্যাও কম নহে।

যে বংশে উহার উদ্ভব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রায় ১ হাজার প্রকার অনুরূপ পুষ্প-বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বাইণ্ড উইড্ গাছে মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়া থাকে। ফুলগুলি শ্বেত এবং ফিকে গোলাপী—বেশ সুগন্ধ আছে। মক্ষিকাকুল সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইহাদের কাছে ঘুরিতে থাকে।

এই পুষ্প কৃষকদিগের বিরক্তি উৎপাদন করে। অনেক সময় এই গাছের শীষ দেখিয়া কৃষকগণ শস্যের শীষ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, সে জন্য এই ফুলের গাছ দেখিলেই তাহারা উৎখাত করিবার চেষ্টা করে। কৃষকগণকে বাইণ্ড উইড ধ্বংস করিবার জন্য অনেক সময় গুরু পরিশ্রমও করিতে হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় বারবেরী—

য়ুরোপ হইতে এই পুষ্প আমেরিকায় নীত হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহার বংশবৃদ্ধি হইয়া ইদানীং কানাডাতেও বারবেরীর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মে ও জুন মাসে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফল দেখা দেয়। বারবেরী গাছ ৫ হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। কণ্টকবন ও

স্নো অন্ দি মাউন্‌টেন্

মার্কিন কুসুম—ব্ল্যাক্‌বেরী

বাইন্ডউইড

বার্বেরী

ভ উড সরেল

মার্কিন বিটারস্যুইট্

রাজপথের পার্শ্বেই সাধারণতঃ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারবেরী ফুলগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু প্রজনন-ব্যাপারে ইহারা অভ্যাগত পতঙ্গদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যখনই কোন নব-প্রস্ফুটিত বারবেরী পুষ্পে কোনও মধুমক্ষিকা বা পতঙ্গ মধু আহরণ করিতে যায়, অমনই পুরুষ-পুষ্প তাহার পরাগ-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া পরাগ ছড়াইয়া দেয়। পরবর্ত্তী পুষ্পে এই মক্ষিকা বা পতঙ্গ উড়িয়া বসিলে সঙ্গে সঙ্গে পরাগও সেই পুষ্পে স্খলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পীতাভ উডসরেল্—

এই পুষ্প খাস আমেরিকাবাসী। ওণ্টারিও এবং মিচিগান্ হইতে ফ্লোরিডা ও টেক্সাস্ পর্য্যন্ত স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মে মাস হইতে অক্টোবরের শেষভাগ পর্য্যন্ত ফুল ফুটিবার সময়।

৬ ইঞ্চ হইতে এই গাছ ৪ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। অনেক সময় ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী অন্য বৃক্ষে হেলান দিয়া থাকিবার চেষ্টা করে।

এই গাছের পত্রগুলি রাত্রিকালে অথবা মেঘাচ্ছন্ন দিনে যেন নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। এই ফুলের পরাগ অন্য পুষ্পের কোরকে পড়িয়া শীঘ্রই ফল-ধারণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও মক্ষিকা অথবা তদ্রূপ অন্য কোন পতঙ্গের সহায়তায় প্রজনন-ক্রিয়া সংসাধিত হয়।

মার্কিণ বিটারসুইট্—

কুইবেক, উত্তরক্যারোলিনা, ম্যানিটোবা, নিউমেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের উর্ব্বরা ভূমিতে এই পুষ্প পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। পর্ব্বতমূলেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। জুন মাসে ইহাদের ক্ষুদ্রাকারের ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হয়। ফুলে গন্ধ নাই, তথাপি মধুমক্ষিকা অথবা তজ্জাতীয় পতঙ্গ ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সেপ্টেম্বর মাসে এই ফুল হইতে ফল জন্মে। জামের মত ফলগুলির চিত্তাকর্ষক বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং তীব্র গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষুধার্ত্ত পক্ষীরা ফলের উপর আপতিত হইয়া থাকে। বিটার-সুইট ঘন-পল্লববিশিষ্ট এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের মত বর্দ্ধনশীল। বিটারসুইটকুঞ্জ ৬ হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। পাহাড়ের গাত্রে অথবা বৃক্ষ-কাণ্ডে ভর করিয়া ইহারা বাড়িয়া থাকে।

কর্লি ডক্—

এই পুষ্প কোকিলের মত—পরভৃৎ। অর্থাৎ কোকিল যেমন পরের বাসায় ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম অন্য পাখী তা দিয়া ফুটায় ও বড় না হওয়া পর্য্যন্ত আহার-দানে পালন করে, এই কর্লি ডক্ও সেইরূপ।

কর্লি ডক্ ১ ফুট হইতে সাড়ে ৩ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে। জুন মাস হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই ফুল ফুটিবার সময়।

এই গাছের পাতাগুলি অনেকটা তরঙ্গায়িত। অন্য জাতীয় ফুলের পরাগের সহিত এই ফুলের পরাগ মিশিয়া ভিন্ন জাতীয় পুষ্প সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রায় ৮ শত বিভিন্ন প্রকার কর্লি ডক্ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ সুটিংষ্টার—

এই ফুলগাছ ৮ ইঞ্চ হইতে ২ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। এপ্রিল ও মে মাসে বৃক্ষ মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া থাকে। পেন্সিলভেনিয়া হইতে ম্যানিটোবা এবং টেক্সাস্ পর্য্যন্ত সকল স্থানে সুটিংষ্টার দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার ফুলগুলি এমনই ভাবে উৎপন্ন হয় যে, মধু-মক্ষিকা যখন ফুলের মধুপান করিতে থাকে, তখন তাহার উদরে পরাগ লাগিয়া যায়। এই গাছের আরও নানা নাম আছে।

কৃষ্ণবর্ণ সোয়ালো-ওয়াট্—

কালো সোয়ালো-ওয়াট্ য়ুরোপীয় উদ্যানজাত সাময়িক পুষ্প। ইহা উত্তর-আমেরিকায় বসবাস করিতে আইসে। যে সকল জমীতে কখনও চাষ হয় না, সোয়ালো-ওয়াট্ সেইরূপ স্থানে থাকিতেই ভালবাসে। জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ফুটিবার সময়।

সোয়ালো-ওয়াট্ নানা জাতিতে বিভক্ত। প্রায় ২ হাজার বিভিন্ন প্রকার সোয়ালো-ওয়াট্ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকলগুলিরই রস দুগ্ধের মত এবং প্রত্যেকেরই অন্য বৃক্ষে আশ্রয় লইবার মত লতাপ্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রত্যেক সোয়ালো-ওয়াটের গন্ধ সমান নহে। কাহারও কাহারও গন্ধ অত্যন্ত মিষ্ট—কাহারও গন্ধ সহ্য করিতে পারা যায় না। কোন কোন জাতীয় সোয়ালো-ওয়াট্ গাছের রস ভেষজস্বরূপ। ইহাতে নানা রোগের প্রতীকার হইয়া থাকে। এক এক জাতীয় সোয়লো-ওয়াট্ দেখিতে অতি মনোরম।

উড্‌বেটনি—

এই গাছে এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ফুটিয়া থাকে। নোভাস্কোসিয়া হইতে ফ্লোরিডা এবং পশ্চিমে 'রকি' গিরিমালা পর্য্যন্ত ইহার বিহার-ভূমি। শুষ্ক বন-ভূমি এবং ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। ভার্জ্জিনিয়ায় ৩ হাজার ফুট উচ্চ স্থানেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে পরিবারে এই বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ২ হাজার ৭ শত বিভিন্ন প্রকারের উড্‌বেটনি আছে। কাহারও রস তিক্ত, কোনও কোনও জাতীয় বৃক্ষে 'নার্কোটিক্' বিষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুং-পুষ্পে চারিটি পরাগদণ্ড থাকে। বৃষ্টি অথবা অন্যান্য পরাগধ্বংসকারী উৎপাত হইতে পরাগদণ্ডগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রতি পুষ্পে একটি করিয়া অবগুণ্ঠন আছে। ফুলগুলি এমনই ভাবে প্রস্ফুটিত হয় যে, তাহাদের প্রিয় অতিথি—মধুমক্ষিকা অতি সত্বর প্রত্যেক পুষ্পে বিহার করিয়া আসিতে পারে।

সুইট্ ফ্লাগ—

এই পুষ্প জলাভূমি ও তরঙ্গিণীতীরে বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ইহার গন্ধ অত্যন্ত উগ্র, কিন্তু অপ্রীতিকর নহে। এই গাছের রস ফারাওরাজ টুট-আন্‌খ-আমেনের সময়ও শবদেহ অনুলেপনকার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

জুন ও জুলাই মাসে এই গাছে ফুল ফুটিতে থাকে। এই গাছ হইতে একটি দণ্ড নির্গত হয়। তাহার গায়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। শক্তিসম্পন্ন কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক পুষ্পটি কুমুদের মত সুপরিপুষ্ট ফুল।

একই দণ্ডে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া এতগুলি ফুল একত্র থাকিবার উদ্দেশ্য আছে। এই গাছ জলের ধারেই জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মশা ও অন্যান্য পতঙ্গ এই সকল ফুলে বসিয়া প্রজনন-ক্রিয়ার সহায়তা করে।

সুইট ফ্লাগ গাছের মূলগুলিতে নানাবিধ ঔষধ তৈয়ার হইয়া থাকে। মূল শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিলে অজীর্ণ রোগ নিরাময় হয়।

যাহাদের হজমশক্তি কম, ইহা ব্যবহারে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে। এই গাছ হইতে যে তৈল জন্মায়, তদ্দারা অনেক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বযুগের গ্রীক ও ব্যাবিলোনীয়গণ ইহার গুণ জানিত। তাহারা ইহার দ্বারা ঔষধ এবং গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিত।

করলি ডক্
শুটিংষ্টার
সোয়ালোওয়ার্ট

উড্‌বেটনী

সুইট্‌ফ্লাগ্‌

কোবা-ইয়া পেন্‌টস্‌টেমন্‌

কোবিয়া পেণ্টসটেমন—

মিসিসিপি উপত্যকাভূমিতে এই পুষ্প-বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা উর্দ্ধে ১ হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত বড় হয়। এই পুষ্প আমেরিকা হইতে য়ুরোপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। সেখানে এই ফুলের বিশেষ আদর।

এই জাতীয় যত রকম ফুল আছে, সবই প্রায় প্রতীচ্য দেশের, শুধু ৩ প্রকার পুষ্প প্রাচ্যদেশে পাওয়া যায়। বসন্তের শেষভাগে ইহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে এবং গ্রীষ্মের প্রথম আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। শুষ্ক এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশেই এই ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। গাছে যখন ফুল ফোটে, তখন সে স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রধান সেনাপতি

সার উইলিয়াম বার্ডউড

সার উইলিয়াম বার্ডউড পরলোকগত জঙ্গী লাট লর্ড রলিনসনের স্থানে ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গ্যালিপোলির যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিলাণ্ড সেনাদলের অধিনায়কত্ব করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের সীমান্ত যুদ্ধে, বুয়র যুদ্ধে এবং জার্ম্মাণ যুদ্ধে ফ্রান্সের সীমানার বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি ফিল্ড মার্শালের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের আত্মকথা

সার সুরেন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবসরকালে তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের কথা রচনা করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন, গ্রন্থের নাম—"A Nation in making" অথবা 'একটি জাতির গঠন-কালের ইতিহাস।' বিগত পঞ্চাশৎ বর্ষকাল সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার রাজনীতিক জীবনের সহিত কি ভাবে বিজড়িত ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে শেষ বিংশতি বর্ষের কথা ছাড়িয়া তিনি যদি তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত বাঙ্গালার আধুনিক রাজনীতিক ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিত সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার সেই ত্রিংশৎ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্থান কত উচ্চে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজিকার সার সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার সে সুরেন্দ্রনাথ নহেন,—যে সুরেন্দ্রনাথের তূর্য্যনাদে অজয়ের তটপ্রান্ত হইতে আসামের সীমানা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ এক দিন দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, যে সুরেন্দ্রনাথ এক দিন Father of Indian Nationalism নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, যে সুরেন্দ্রনাথ এক সময়ে বাঙ্গালার মুকুটহীন রাজা আখ্যা পাইয়াছিলেন,—সেই সুরেন্দ্রনাথে ও সার সুরেন্দ্রনাথে কত ব্যবধান! সুতরাং সার সুরেন্দ্রনাথের এই রাজনীতিক জীবন-কাহিনী যে একই সুরে বাঁধা নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সে কথাকে স্বতন্ত্র দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিলে অসঙ্গত হয় না।

এত দীর্ঘজীবনব্যাপী কর্ম্ম-কথার আলোচনা সময় ও স্থানসাপেক্ষ; সুতরাং সংক্ষেপে ইহার দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাঁহার প্রথম রাজনীতিক জীবনের সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও এক স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগের কথা ভারতের মুক্তির ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। এ যুগের সুরেন্দ্রনাথ যথার্থই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথ বরিশাল কনফারেন্সের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সে সময়ে রাজশক্তি পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাট সার ব্যামফিল্ড ফুলার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত সামরিক পুলিসের কনষ্টেবল পর্য্যন্ত—বাঙ্গালীর এই আন্দোলনের বিপক্ষে নির্ম্মম নিষ্ঠুর কালের দণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্শন ও জিলা পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প সে সময়ে বরিশালে সমবেত বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের ও অন্যান্য বাঙ্গালীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আজিও প্রত্যেক বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিসের রেগুলেশন

লাঠি দ্বারা কিরূপ প্রহৃত হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ কিরূপে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরা কিরূপ অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সার সুরেন্দ্রনাথ এ সকল কথার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"যে উত্তেজনা ও ঘৃণার ভাব মনে উদয় হইয়াছিল, তাহার তুলনা নাই, কিন্তু প্রতিনিধিরা তথাপি যেরূপ ধীরচিত্তে কনফারেন্সের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গেলেন, তাহা নিশ্চিতই বিস্ময়ের বিষয়।" এ কথা বলিবার কারণ আছে। তাহার কিছু পূর্ব্বে খবর আসিয়াছিল যে, পুলিস, প্রতিনিধিগণকে পথে প্রহার করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্পকে সে বিষয়ে অনুযোগ করিয়া বলেন, "আমাদের লোকজনকে মারিতেছেন কেন? তাহারা দোষী নহে, যদি কেহ দোষী হয় ত তবে আমরাই দোষী। আমাকে ধৃত করুন।" মিঃ কেম্প সুরেন্দ্রনাথকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করেন। সুরেন্দ্রনাথ পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর হস্তে কনফারেন্সের ভার দিয়া পুলিসের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সেরূপ অবস্থায় কনফারেন্সের কার্য্যচালনা করা কি সহজ কথা? তাই সুরেন্দ্রনাথ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "কনফারেন্সের কার্য্য যেমন চলিয়া থাকে, তেমনই চলিল,—যেন কিছু হয় নাই! ক্রোধ ও ঘৃণার উত্তেজনাকালে এরূপ ধৈর্য্য ও আত্মসংযম প্রদর্শন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় নহে; ইহা নিশ্চিতই আমাদের স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির যোগ্যতার পরিচায়ক।"

সেই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এ দেশের আমলাতন্ত্র সরকার কি ব্যবহার করিয়াছেন? ধর্ষণনীতির পর ধর্ষণনীতি—বিধিবজ্রের পর বিধিবজ্র! দেশের শিক্ষিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার—কার্য্যকুশলতা ও যোগ্যতার ইহাই পুরস্কার হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতি-কথায় এই চণ্ডনীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই ধর্ষণনীতির কি ফল হইয়াছিল? সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"Repression failed here, as it has failed wherever it has been tried. It served only to strengthen the popular forces, to deepen the popular determination, যেখানেই ধর্ষণনীতি প্রচলনের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেইখানে ইহা বিফল হইয়াছে। এ দেশেও ধর্ষণনীতি বিফল হইয়াছে। সফল হওয়া দূরে থাকুক, বরং এই নীতি জন-শক্তি বৃদ্ধি করিবার হেতু হইয়াছে—জনগণের সঙ্কল্প দৃঢ় করিবার মূল হইয়াছে।"

তখনও যে অবস্থা, এখনও তাহাই। এখনও বে-আইনী আইন এ দেশের বুকে বজ্রের মত হানা হইতেছে, অথচ তখন আর এখন, এতদুভয়ের মধ্যে একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর যুগপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, এই পরিবর্ত্তন অভাবনীয়। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে না কি বলিয়াছিলেন, "এক পুরুষেই আমরা কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখিলাম!" সুরেন্দ্রনাথ তাঁহারই সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে রমেশচন্দ্রের মত তিনি সরকারের চাকুরী লইয়া সরকারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েন নাই বটে, তবে তিনিও এই পরিবর্ত্তনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

"১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমি জনসাধারণের কাযে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করি, তখন আমাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের স্থান ছিল না। * * * ব্যবস্থাপক সভাগুলিরও সেই অবস্থা ছিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা সকলেই সরকারের দ্বারা মনোনীত হইতেন। শাসকমণ্ডলীই শাসনের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিতেন—সে মণ্ডলীতে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত ভারতবাসীর কোন প্রতিনিধিই ছিলেন না। সিভিল সার্ভিসের চাকুরীয়ারা দেশ শাসন করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। দেশের লোকমত তখনও দুর্ব্বল, আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। জাতীয় জীবনে স্পন্দন যেন অনুভূতই হইত না।

"এই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে কি দেখিতে পাই? অন্যান্য প্রদেশে যেমন—বাঙ্গালাতেও তেমনই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে গণতান্ত্রিক। ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সেগুলিতে জনগণের প্রতিনিধিদিগের প্রাবল্য বিদ্যমান। শাসন-পরিষদে ভারতবাসীর

সংখ্যা নগণ্য নহে—দেশশাসনে তাঁহাদের প্রভাবও তুচ্ছ বলা যায় না। পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন অদূরে লক্ষিত হইতেছে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া প্রদেশসমূহে পার্লামেণ্টের আদর্শে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। চাকুরীতে ভারতীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুত চলিতেছে।"

সুরেন্দ্রনাথ এই পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু দেশের লোক কি এই সামান্য পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইতে পারে বা পারিয়াছে? তাঁহার উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে অনেকগুলি কথা অবাধে স্বীকার করা যায় না;—

(১) শাসন-পরিষদে সরকার যে সব সদস্য মনোনীত করেন, তাঁহাদিগকে জনগণের প্রতিনিধি বলা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জনকে মনোনীত করিয়া সরকার জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? আর তাঁহাদের ক্ষমতা কতটুকু?

(২) সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন অদূরে লক্ষিত হইতেছে।" দেশের লোক এ কথা স্বীকার করে না। ব্যুরোক্রেশী ত চাহিবেনই না, আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া বা সাইডেনহ্যামীর দলের ত কথাই নাই। কলিকাতার 'ষ্টেটশম্যান' ফরিদপুরের প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতি চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণের উত্তরে বলিয়াছেন,—"ভারতের পক্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারপ্রাপ্তির এখনও এক পুরুষের মধ্যে সম্ভব কি না বলা যায় না।" ব্যুরোক্রেশী ও সাইডেনহ্যামী দল ত ইহার উপরে যাইবেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের আশা আগামী ৫০ বৎসরে মুকুলিত হইলেও পারে। কেন না, আধুনিক জগতে এ দেশের এক পুরুষের পরমায়ু গড়পড়তায় ঊর্দ্ধসংখ্যায় পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইবে না। সুরেন্দ্রনাথ মণ্টেগু-সংস্কারেই কিন্তু তাঁহার আশার অনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াছেন—যে দিন রাজ-প্রতিনিধি ডিউক অফ কনট কলিকাতায় কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন, সে দিন সুরেন্দ্রনাথ ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, ভারতে স্বরাজের উদ্বোধন হইল! কিন্তু তাঁহার বুক আশায় ভরা হইলেও—যদিও চণ্ডনীতিপ্রবর্ত্তনকালে লর্ড লিটন মন্ত্রী সার··সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই—মুডিম্যান কমিটীতে সাক্ষ্যদানকালে বহু মন্ত্রী তাঁহাদের ক্ষমতার অভাবের কথা করুণস্বরে নিবেদন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(৩) চাকুরীতে ভারতীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্রুত চলিতেছে,—সুরেন্দ্রনাথের এ কথার সার্থকতাও বুঝিতে পারা যায় না। লী কমিশন ও মুডিম্যান কমিটীর তবে প্রয়োজন কি ছিল? বিলাতে লর্ড বার্কেনহেডের দরবারে বড় লাট লর্ড রেডিংএর তলবই বা পড়িল কেন? লর্ড বার্কেনহেড তবে ডাক দিয়া বিলাতের তরুণদিগকে সরকারী চাকুরীতে দলে দলে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন কেন—তাহাদের recruiting sergeant সাজিবেন কেন?

(৪) যদি এ দেশকে অচিরে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিবার উদ্দেশ্যে মণ্টেগু-সংস্কারের প্রবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ দেশ হইতে যতবার একটা Round Table Conference অথবা উভয় পক্ষে পরামর্শসভা আহ্বানের প্রস্তাব হইয়াছে, ততবারই তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে কেন? অধিক দিনের কথা নহে, চিত্তরঞ্জন যখন অনাচারের ও বিপ্লবের বিপক্ষে তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণা প্রকাশ করেন, তখন লর্ড বার্কেনহেড প্রমুখ বিলাতের কর্ত্তারা এই সাড়া পাইয়া কত কি আশার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরে যখন মহাত্মা গন্ধী ও দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার কথা উঠে, তখন তাঁহারা উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন কেন?

ফল কথা, সুরেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ব্যুরোক্রেশীর সংস্রবে আসিয়া সংস্কার-আইনকে গোলাপী আশার চশমায় যতই সুন্দর দেখুন, দেশের লোক তাঁহার কথার অনুমোদন করিবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইত না। এ কথা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। তাঁহার পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মনোমোহন বসু প্রমুখ বহু বাঙ্গালী এ দেশীয় লোকের মনে জাতীয় জীবনের স্পন্দন আনয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত

জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া স্বীকৃত—উহা ফরাসীর বিখ্যাত 'মার্সেল' সঙ্গীতের মত জাতীয় জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথের অবিদিত নাই। তিনি স্বয়ং স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গের যুগে উহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

তবে এ কথা অবশ্যই বলিব যে, এক দিন সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে সমগ্র বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় এক দিন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই সুরেন্দ্রনাথের সহিত বর্ত্তমানের সার সুরেন্দ্রনাথের তুলনা হইতেই পারে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স

দেশনায়ক শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভানেতৃত্বে ফরিদপুরে এ বৎসরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বাৎসরিক অধিবেশন অপেক্ষা এ বৎসরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল, এই হেতু ইহার ফলাফলের প্রতি লোক বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল। বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, কিছু দিন পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন তাঁহার ও স্বরাজ্য দলের মূলনীতির সম্বন্ধে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, —উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "স্বরাজ আমাদের কাম্য হইলেও ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া ঔপনিবেশিক পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনার্থ অহিংসার পথই আমাদের অবলম্বনীয়, হিংসা দ্বারা দেশের মুক্তিসাধনের সফলতায় আমার বিশ্বাস ছিল না, এখনও নাই।" স্বরাজ্য-দলপতির মুখে এই কথা প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া এ দেশে যত না হউক্, বিলাতে ও এ দেশের প্রবাসী ইংরাজমহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। স্বরাজ্য দলের সহিত অন্যান্য রাজনীতিক দলের যতই মতবিরোধ থাকুক, এক বিষয়ে কেবল বিপ্লবপন্থী ব্যতীত সকলেই একমত। হিংসা দ্বারা দেশের মুক্তি-সাধন হইবে না, এ কথা সকল দলেরই মূলনীতি। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের ঘোষণায় কোনও নূতন কথা ছিল না বলিয়া এ দেশের লোক উহাতে বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ইংরাজের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সে গোপীনাথ সাহা মন্তব্য গৃহীত হইবার পর, তাঁহাদের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, স্বরাজ্য দল বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত একমত—তাহারা হিংসার পথে স্বরাজ কামনা করে। তাই চিত্তরঞ্জনের ঘোষণার পর ইংরাজমহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ফলে এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহে—এমন কি, বিলাতে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের মুখে মিলনের আভাসও পাওয়া গিয়াছিল।

কিন্তু অনেকে সন্দেহ করিতেছিলেন, হয় ত ইহা চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত অভিমত—স্বরাজ্য দল এই অভিমত অনুমোদন করেন কি না, জানিবার উপায় ছিল না। বর্ত্তমানে স্বরাজ্য দলই কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং স্বরাজ্য দলের অভিমত এখন বহুলাংশে কংগ্রেসের অভিমত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স কংগ্রেসেরই অঙ্গ। সুতরাং এই কন্‌ফারেন্সে চিত্তরঞ্জন তাঁহার পূর্ব্ব-ঘোষিত অভিমত পুনরাবৃত্তি করেন কি না এবং সেই অভিমত কন্‌ফারেন্স অনুমোদন করেন কি না, তাহাই জানিবার জন্য সকলের মনে একটা আকুল আগ্রহ জাগিয়াছিল। এই হেতু এ বৎসরের ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এক কারণে ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। নব ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু—অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের প্রচারক—ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী বাঙ্গালার এই প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবেন বলিয়া কথা ছিল। তাঁহার ন্যায় যুগমানবের পুণ্যসংস্পর্শে এই কন্‌ফারেন্সে নব-জীবনীশক্তির সঞ্চার হইবে—বাঙ্গালায় হয় ত এক নূতন ভাবপ্রবাহের বন্যা উপস্থিত হইবে, লোক এই আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। দেশের রাজনীতিক জীবনে যে অবসাদ আসিয়াছিল, হয় ত মহাত্মা তাহাতে উৎসাহ আগ্রহের সঞ্চার করিবেন, এমন আশায় অনেকে আশান্বিত হইয়াছিলেন। এই হেতু এবারের কন্‌ফারেন্সের বৈশিষ্ট্য ছিল।

বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে, কন্‌ফারেন্সে চিত্তরঞ্জন তাঁহার অহিংসা নীতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, পরন্তু কন্‌ফারেন্স তাঁহার নীতি পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধীও কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাণী বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের বাণী—দাসত্ব হইতে মুক্তি, পাপ হইতে মুক্তি,—ইহার পথ অহিংসা, সে সফলতা না দেখা দিলে, জনগত আইন অমান্য করা হইবে, অন্যথা অন্য পথ নাই। মহাত্মার বাণী,—সত্য ও সেবা, অহিংসা ও সহনক্ষমতা;—ইহাই আমাদের মুক্তির উপায়, অন্য পথ নাই।

চিত্তরঞ্জন নূতন কথা বলেন নাই। মহাত্মাই স্বয়ং বলিয়াছেন, "দেশবন্ধু আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।" অর্থাৎ, এ দেশের মুক্তিকামীর অন্য কথা নাই। স্বরাজ তাহাদের জন্মগত অধিকার, স্বরাজ তাহারা চাহিবেই। অহিংসার পথে তাহারা স্বরাজ কামনা করে—এ জন্য তাহারা সাধনা করিবে। যদি ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বরাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাই করিবে, যদি ভিতরে থাকিয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে বাহিরে যাইবার সাধনা করিবে। এ জন্য ইংরাজ সহায়তা করিলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। অন্যথা উভয়েরই অমঙ্গল। তবে এ যুদ্ধে হিংসা বা অস্ত্রঝন্‌ঝনা নাই, ইহা সহনক্ষমতার যুদ্ধ—দেশের লোককে সহনক্ষমতায় অভ্যস্ত করিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন তাই বলিয়াছেন,—

এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাহারই যুদ্ধ। ইহা ধর্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত—কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। এক দিকে বর্ত্তমান যুগের নব-আবিষ্কৃত বিজ্ঞান সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ—অন্য দিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুৎ-পিপাসায় ম্রিয়মাণ অগণন ৩০ কোটি নর-কঙ্কাল। কটিমাত্র বস্ত্র আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ—ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়া আমাদিগকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ

যুগে যুগে ভারতবর্ষের এই প্রশ্ন,—মুক্তি কোন্ পথে? চিত্তরঞ্জন অভিভাষণে বলিয়াছেন, এ যুগেও আমরা মুক্তি চাই এবং সেই মুক্তির পথ সন্ধান করিতেছি। তাঁহার মতে, এ মুক্তি কেবল দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি নহে, পাপ হইতে মুক্তি। এ মুক্তির, এ স্বরাজের আদর্শ Independenceএর আদর্শ অপেক্ষা প্রশস্ত। তাই ইংরাজ চলিয়া গেলে—আমরা Independence পাইলেই এ মুক্তি আসিবে না। ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার উপর মানবজাতির বিভিন্ন শাখাগুলির পরস্পর মিলন নির্ভর করে। এই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা না হইলে League of Nations বিফল। সুতরাং ভারতে এই এক জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইলে ইংরাজের অভাবের প্রয়োজন হইবে না—বরং তাহার সাহচর্য্য ও সহযোগিতা মুক্তির পথ সুগম করিবে। এইখানেই স্বরাজ বা মুক্তি এবং Independenceএর পার্থক্য।

এই জাতীয়তা গঠনের জন্য মহাত্মা গন্ধী গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার দেশবাসীকে মহাত্মানির্দ্দিষ্ট সেই গঠনকার্য্যে ব্রতী হইতে

অনুরোধ করিয়াছেন—কেবল মৌখিক সহানুভূতি-প্রকাশ যথেষ্ট নহে, ইহাও বলিয়া দিয়াছেন।

তাহার পর প্রশ্ন—এই মুক্তিলাভ ইংরাজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া হইবে, না বাহিরে? চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন,—কংগ্রেসই তাহার উত্তর দিয়াছেন,—"আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার, তাহা যদি ইংরাজ-সাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। যদি না স্বীকার করে, তবে বাধ্য হইয়া বাহিরে যাইতে হইবেই, কেন না, জাতীয় মুক্তি আমাদিগকে যেরূপেই হউক্ লাভ করিতে হইবে।" সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিলে আমাদের লাভ অনেক। ইহাতে ভারতের খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে একতা ও শান্তি থাকিবে, বাহিরেও শত্রুভয় থাকিবে না। পরন্তু আর এক লাভ, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মানবজাতি আপনাদের মধ্যে এক সুমহান্ ঐক্য ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

এখন এই মুক্তিলাভের উপায় কি? উপায় আদর্শেরই অংশ। হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না বা এখনও নাই; সুতরাং হিংসামূলক কোনও উপায়ই আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। চিত্তরঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন,—হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয় মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। নিরস্ত্র পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা বিজ্ঞান-বিদ্ সমরকুশল শক্তিশালী ইংরাজ জাতির বিপক্ষে একবারে অসম্ভব। সুতরাং হিংসামূলক রাজদ্রোহিতার দ্বারা মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করা আমাদের নীতি-বিরোধী, আমাদের প্রকৃতি-বিরোধী এবং আমাদের অবস্থার বিরোধী।

তবে মুক্তি কোন্ পথে? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর—গঠনকার্য্যের পথে। এ পথে প্রচুর স্বার্থত্যাগ ও সহনক্ষমতা অভ্যাস করা প্রয়োজন। এ পথে সাফল্যলাভ সম্ভব হয়, যদি উভয় পক্ষে মনের ভাব-পরিবর্ত্তন হয়। সে মনের ভাবপরিবর্ত্তনের জন্য উভয় পক্ষেরই কতকগুলি সর্ত্তে সম্মত হইতে হইবে।

চিত্তরঞ্জন দেশের লোকের পক্ষ হইতে এই কয়টি সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছেন;—

প্রথমতঃ—গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ—রাজনীতিক বন্দীদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ—বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার নড়চড় হইতে পারিবে না।

তৃতীয়তঃ—পূর্ণ স্বরাজলাভের পূর্ব্বে—ইতোমধ্যে এখনই—আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজলাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন পূর্ণ স্বরাজলাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে কোন্ দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিটমাট-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে এবং কথাবার্ত্তা কেবল যে গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজাশক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের য়ুরোপীয় ও Anglo-Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে।

অপরপক্ষে দেশবাসীকেও এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাবভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না এবং সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব।

এই উপায়ে যদি মুক্তি পাওয়া না যায়—যদি গভর্ণমেণ্ট এ সর্ত্তে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে চিত্তরঞ্জনের মতে Civil Disobedience বা জনগত আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। চিত্তরঞ্জন উহাকে 'অহিংসামূলক অবাধ্যতা' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা মুখের কথা নহে। এই অবাধ্যতা করিতে হইলে—

দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় রকমের একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হইবে।

—আত্মোৎসর্গের জন্য অসীম সহিষ্ণুতা ধারণ করিতে হইবে।

—ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থকে সমগ্র জাতির স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জনের আশঙ্কা, মহাত্মা গন্ধীর গঠনমূলক কার্য্য পূর্ণ রকমে সফল না হইলে Civil Disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি আমাদের আদর্শকে সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে, কেন না, যে রকমেই হউক, স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

চিত্তরঞ্জনের এই পথিনির্দ্দেশকে কেহ প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ বা বলিয়াছেন, ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই, মহাত্মা গন্ধী এই পথ বহু পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, পথ একটি, দ্বিতীয় পথ নাই। সুতরাং নূতন পথ প্রদর্শন করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আপোষের কথা স্থির না হইলে, কাউন্সিলের ভিতর দিয়া বাধাপ্রদান দ্বারা গভর্ণমেণ্ট অচল করিবার কথা চিত্তরঞ্জন বলিতে পারিতেন। চিত্তরঞ্জন এ কথা বলেন নাই বলিয়া কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, চিত্তরঞ্জন এ যাবৎ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন—হয় ভূয়া কাউন্সিলের সংশোধন করিতে হইবে, না হয় তাহা ভাঙ্গিতে হইবে, সে কথার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। অথচ তিনি সরকারের সহিত রফার সর্ত্ত দিয়াছেন। কিন্তু দেশে নূতন অবস্থা কিছুই উপস্থিত হয় নাই, সরকারের মনোভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া দিলেও সরকার তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া যথাপূর্ব্ব শাসনকার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন—সরকার চণ্ডনীতি হইতেও সঙ্কল্পচ্যুত হয়েন নাই। তবে এ অবস্থায় চিত্তরঞ্জন রফার কথা পাড়েন কেন? তিনি এই ভাবে রফার কথা পাড়িয়া মডারেট দলভুক্তই হইয়াছেন। অভিযোগ গুরু। কিন্তু উপায় কি? এক উপায় ছিল, কাউন্সিলের পথ ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করা। কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে তাহা না বলিয়া একেবারে Civil Disobedienceএর কথা পাড়িয়াছেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে নূতন কথা। অন্য পথ কি আছে? আবেদন-নিবেদন বা সহযোগ-সহানুভূতির পথ দেখা হইয়াছে। উহাতে যে কোন ফল হয় নাই—হইলেও তাহা যে নগণ্য—তাহা মুডিম্যান কমিটীতে বহু মন্ত্রীই সাক্ষ্যপ্রদানকালে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সে পথ গ্রহণীয় নহে। হিংসার পথে সশস্ত্র রাজদ্রোহ দ্বারা ইংরাজকে বাধ্য করা অসম্ভব, তাহাও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এখন একমাত্র পথ,—আপনার শক্তি দ্বারা আপনি দণ্ডায়মান হওয়া, স্বাবলম্বন বৃত্তির অনুশীলন করা। ইহাতে চাই ত্যাগ, চাই সহনক্ষমতা। তাহার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গন্ধী

এবার বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্সের বাৎসরিক অধিবেশনকালে মহাত্মা গন্ধী বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবেন এবং কনফারেন্সে যোগদান করিবার পর বাঙ্গালার পল্লী-মফঃস্বল পরিদর্শন করিবেন বলিয়া কথা স্থির হইয়াছিল। এ জন্য বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার গঠনকার্য্যে অগ্রণী অক্লান্তকর্ম্মী দেশ-নায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁহাকে বাঙ্গালায় সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ভগ্নস্বাস্থ্য, এ জন্য তাঁহার অভ্যর্থনায় কোনওরূপ আড়ম্বর না হয়, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহাত্মাজী স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সমস্ত আড়ম্বর ভালবাসেন না, বরং তাঁহার দেশবাসী যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর প্রীতি লাভ করিবেন।

সত্যই এবার তাঁহার অভ্যর্থনায় আড়ম্বর হয় নাই। এজন্য ছিদ্রান্বেষীরা অনেক ছল বাহির করিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, জনগণের উপর তাঁহার প্রভাব হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু হাওড়ায় পদার্পণের সময়েই জানা গিয়াছিল, মহাত্মাজীর প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ষ্টেশনের দরিদ্র কুলী ও শ্রমিকদিগকে অনেকে সেই সময়ে মহাত্মাজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে এবং অশ্রুপূত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মহাত্মার জয়ধ্বনি করিতে দেখিয়াছে। মহাত্মাজী স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি জয়ের

সম্মান (dignity of labour) বুঝেন, তিনি দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথী, দরিদ্রের সুখদুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন, এ জন্য দরিদ্র জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব এখনও অক্ষুন্ন।

মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করিবার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, এমন কথাও কেহ কেহ বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালার রাজনীতিক আন্দোলন-নদে ভাঁটা পড়িয়াছিল, লোকের আগ্রহ উপশমিত হইয়া আসিয়াছিল, তাই মহাত্মাকে বাঙ্গালায় আনিয়া ফরিদপুরে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কিছুই বলেন নাই, তাঁহার সে স্বভাব নহে।

কলিকাতাবাসীকে নানা উপদেশ দিবার কালে মহাত্মা গন্ধী মৃজাপুর পার্কে বর্ত্তমান অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বুঝাইয়াছেন। মোটের উপর বুঝা যায়, বর্ত্তমানে যে বিলাতী কর্ত্তাদের সঙ্গে এ দেশের নেতাদের আপোষের কথা চলিতেছে, মহাত্মাজী সে

হাওড়া ষ্টেশনে মহাত্মা গন্ধী

আবার উত্তেজনার সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই এই চাল চালা হইয়াছে। যেন মহাত্মাজী ধূর্ত্ত বাঙ্গালীর হস্তে ক্রীড়নক! এক দিকে বলা হইতেছে, মহাত্মার প্রভাব ক্ষুন্ন হইয়াছে, অপর দিকে বলা হইতেছে, তাঁহার প্রভাবের দ্বারা বাঙ্গালার রাজনীতিক মৃত অশ্বকে চাবুক মারিয়া বাঁচাইয়া তুলা হইতেছে, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

মহাত্মাজী বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া কলিকাতায় ও সম্বন্ধে কিছুই জানেন না; সুতরাং তাঁহাকে ও শ্রীযুত দাশকে বিলাতে আহ্বান করার জনরবের কোনও মূল নাই। মহাত্মা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের রাজনীতির দিকের ভার তিনি স্বরাজ্য দলের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল বা চিত্তরঞ্জনের সুবিচারে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "স্বরাজ্য দলের কার্য্যপদ্ধতি ও নীতি আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত নহে বলিয়া আমি

তাঁহাদের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। স্বরাজ্য দলের অনুসৃত নীতি যে দেশের স্বার্থের বিরোধী, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তবে দেশের রাজনীতিক কার্য্য-পদ্ধতি এবং গঠনাত্মক কার্য্যপদ্ধতি এতদুভয়ের সারবত্তা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবশ্য পার্থক্য আছে। গঠনাত্মক কার্য্য-পদ্ধতির অনুসরণে আমি শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত আছি। ইংরাজের অতুলনীয় রাজনীতিকুশলতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অপেক্ষা না। তাঁহার এই স্পষ্ট কথার পর দেশবাসী আপন আপন কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারেন। মহাত্মা গন্ধী এই জন্য বাঙ্গালার তরুণদিগকে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার আহ্বান বিফল হইবে না।

মহাত্মাজীর মতে হিন্দু-মুসলমান-মিলন, অস্পৃশ্যতা-পরিহার এবং চরকা ও খদ্দর, এই গঠনাত্মক কার্য্যের
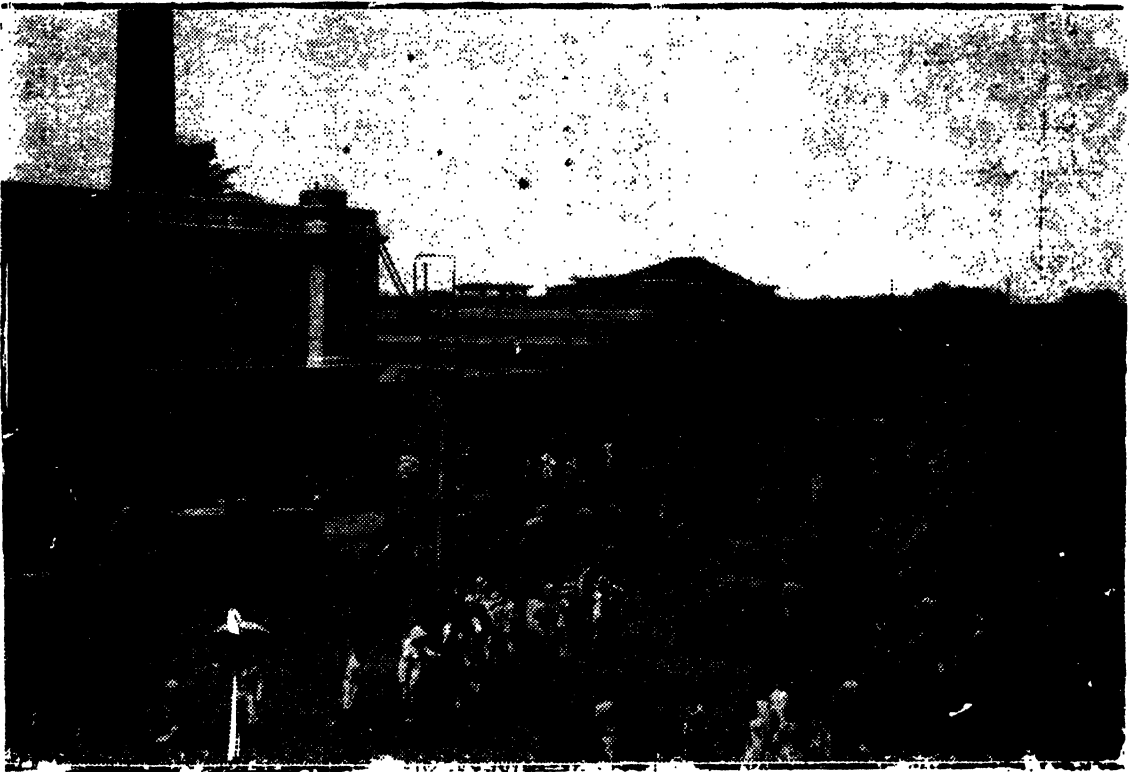
কলিকাতার পথে-মোটরে মহাত্মা গন্ধী

আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গঠনাত্মক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা আমি প্রশস্ততর মনে করি। যত দিন আমাদের আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ না হয়, তত দিন আমলাতন্ত্রের কোনও কর্ম্মচারীর সহিত রাজনীতিক ব্যাপার সম্পর্কে কোনও কথাবার্ত্তা বলা আমি নিতান্ত অস্বস্তিকর মনে করি।" ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে, আমরা জানি

সোপান। হিন্দু-মুসলমানে মিলন সম্পর্কে মহাত্মা বলিয়াছেন যে, "যে দিন হিন্দু-মুসলমান দেশের মুক্তির জন্য একান্তচিত্তে ব্যাকুল হইবে, সেই দিন প্রকৃত মিলন সম্ভব হইবে। তাদৃশ মিলনের পূর্ব্বে যদি উভয় সম্প্রদায় উভয়ের রক্তপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে সে ঘটনা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু বীরের ন্যায় যেন

সেই সংগ্রাম করা হয়, কেহ যেন কাহাকেও ক্ষমা-ঘৃণা না করেন।" সামান্য দুঃখে মহাত্মাজী এ কথা বলেন নাই। তাঁহার মিলনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, এ কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং যাহা হয়, একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কি উপায় আছে? যুদ্ধের পর যখন উভয় সম্প্রদায় বুঝিতে পারিবে যে, বিরোধে কেবল শক্তিক্ষয় হইতেছে, মুক্তি সুদূরপরাহত হইতেছে, তখন উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মিলনেচ্ছা জাগিবে, তাহাদিগকেও মানুষের ন্যায্য অধিকার দিব,—ইহাই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের উদ্দেশ্য।" মহাত্মাজীর এ কথায় সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং মহাত্মাজীর এই উপদেশ সকলেই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারেন। চরকা ও খদ্দর প্রচার সম্পর্কে মহাত্মা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে—বিশেষতঃ কাউন্সিলার ও মডারেটগণকে সানুনয়ে চরকা কাটিতে অনুরোধ করিতেছেন। মরণোন্মুখ জাতির মুখ

মির্জ্জাপুর পার্কের সভায় বক্তৃতামঞ্চে মহাত্মা গন্ধী

অন্যথা নহে। অস্পৃশ্যতা-পরিহার সম্পর্কে মহাত্মা বলিয়াছেন, "বিলাত হইতে আমাদিগকে স্বরাজ দেওয়া হইলেও যতক্ষণ অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ সে স্বরাজের মূল্য কি? অস্পৃশ্যরা স্বাধীনতা না পাইলে দেশের স্বাধীনতা আসিবে না।" অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহাও মহাত্মাজী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মী। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন অর্থে আমি বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানাহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বলিতেছি না। যাহাদিগকে আমরা ক্রীতদাসের ন্যায় রাখিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা মানুষ বলিয়া মনে করি, চাহিয়া অন্ততঃ দিনের অতি সামান্য সময় যদি চরকা কাটা হয়, তাহা হইলেই খদ্দর সস্তা হইবে। সমাজের শীর্ষস্থানীয়রা যদি চরকায় মনোযোগ দান করেন, তবে নিম্নস্তরের গ্রামবাসীরা সেই সদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া চরকা ধরিবে, মহাত্মাজীর ইহাই বিশ্বাস। শিক্ষিত বাঙ্গালী অন্ততঃ মহাত্মাজীর এই উপদেশ পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। মহাত্মা গন্ধী বঙ্গের নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "আপনারা রাজনীতিক বিষয়ে যে দলভুক্ত হউন না, আপনারা যদি দয়া করিয়া গঠনাত্মক কার্য্যকে সম্পূর্ণরূপ সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে আমার

সহায় হয়েন, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, দেশের দাসত্ব আপনা হইতেই ঘুচিয়া যাইবে।" এ কথার কি কোনও সার্থকতা নাই?

মহাত্মাজী কলিকাতায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,—শ্রমের মহত্ত্ব বুঝিতে শিক্ষা করা আমাদের এখন বিশেষ কর্ত্তব্য। ফরিদপুরের স্বদেশী প্রদর্শনীতেও তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি কৃষক, আমি তন্তুবায়, আমি ঝাড়ুদার, আমি সকল কাযই করিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ মহাত্মাজীর মতে কোন শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যই নিন্দাজনক হইব, অপর দিকে আমরা নানারূপে দেশসেবা ও লোকসেবা করিবার সুযোগ লাভ করিব। স্বাবলম্বন ও লোকসেবাই এখন আমাদের ঐহিক জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেন না, এই পথেই আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। মহাত্মাজী স্বয়ং সকল শ্রেণীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে মিলিতে মিশিতে পারিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সকল শ্রেণীরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাত্মা ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতাকালে বলিয়া-

মির্জ্জাপুর পার্কে জনতার দৃশ্য

নহে। আমাদের দেশের লোক এই প্রবল জীবন-সংগ্রামের দিনে যদি মহাত্মাজীর এই কথাটির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের বেকারের সংখ্যা বহুগুণে হ্রাস হইতে পারে। শ্রমবিমুখতা আমাদের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। সুতরাং আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে শ্রমে আমাদিগকে অভ্যস্ত হইতে হইবে। ইহাতে দুই দিকে আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। এক দিকে কেরাণীগিরির মোহ ঘুচিবে—আমরা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের সুখ প্রাপ্ত ছেন, এ দেশে নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম ও নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার মধ্যে একতা স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে সত্য ও অহিংসার পথ গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা আমাদের মুক্তির কোনও উপায় নাই। যদিই বা আমরা স্বরাজ পাই, তাহা হইলে বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী,—সকলেই স্বয়ং সমস্ত ভারত শাসন করিতে চাহিবে, মুসলমানরাও ভারতে এক বিরাট মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিবে। যদি সকল সম্প্রদায় সত্য ও অহিংসার পথ গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই

বিরোধের আগ্নেয়-গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। মহাত্মাজী পুনরপি বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালী তরুণরা দেশমাতাকে প্রাণাধিক ভালবাসে, দেশের মুক্তির জন্য মরিতে তাহারা প্রস্তুত। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা আমারও দেশমাতার প্রতি ভালবাসা কম নহে, আমিও মরণের ভয় করি না। কিন্তু আমরা বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারি না, সেরূপ করিতে আমারও সাধ্য নাই, আমার দেশবাসীরও সাধ্য নাই। দেশের মুক্তির জন্য আমাদের হস্তের শক্তির প্রয়োজন নাই, মনের শক্তিরই প্রয়োজন। কেবল মরিবার বা মারিবার শক্তি সঞ্চয় করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। নিন্দা, গ্লানি, অনাদর ও অবহেলা— সমস্ত সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করা কম সাহসের পরিচয় নহে। আমরা মুক্তি কিরূপে পাইব? মরিয়া বা মারিয়া নহে; হিন্দু মুসলমান একতা, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও চরকা দ্বারাই আমরা মুক্তিধন লাভ করিব।" ইহাই ভারতীয় মুক্তিকামীর মুক্তিমন্ত্র। মহাত্মার এই বাণী সার্থক হউক, ইহাই কামনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

গত ১১ই এপ্রেল ঢাকা মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নাটোরাধিপ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ ষোড়শ বর্ষ ব্যাপিয়া বাঙ্গালায় প্রতি বৎসরই এইভাবে বাণীসেবা হইয়া আসিতেছে—বঙ্গের সারস্বত-কুঞ্জের কোকিলগণ বাণীচরণকমলসেবায় বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে সমবেত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ ও অবনতির সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন কি ভাবে হইতেছে, তাহা ভবিষ্যৎই বলিয়া দিবে। তবে এই ভাবের সাহিত্যের নানা বিভাগের প্রতিনিধিগণের যোগাযোগে যে নিত্য নূতন তথ্যের গবেষণা ও আবিষ্কার হইবার সুযোগ হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ বৎসরের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যোগ্য জনেই নেতৃত্বের ভার অর্পিত হইয়াছিল। এ যাবৎ সভাপতির পদে কোনও রাজা মহারাজা যে বৃত হয়েন নাই, এমন নহে। কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত কমলার বরপুত্রগণের কি বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। মহাকবি কালিদাস বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন, "অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ।" অরসিকের হস্তে রসবিকাশের অথবা রসগ্রাহিতার ভার দেওয়া যেমন বিড়ম্বনা, কেবল কমলার কৃপাদৃষ্টির আশায় মুকুটধারী লক্ষপতির হস্তে বাণীসেবার ভার দেওয়াও তেমনই বিড়ম্বনা।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কমলার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও বাণীর চরণকমলসেবায় বঞ্চিত নহেন। তিনি সাহিত্যের সেবায় কঠোর সাধনা করিয়াছেন—সে পথে একবারে সিদ্ধিলাভও যে করেন নাই, তাহা বলা যায় না। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাচনে গুণেরই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

অধুনা বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে 'নিতান্ত সেকেলে, এ যুগের ধাতুসহ নহে' বলিয়া নির্ব্বাসন দিবার একটা চেষ্টা যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব, বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি,—সবই যেন এ যুগের উপযোগী নহে, এমনই ভাবে বাঙ্গালীকে বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ তাঁহার সুরচিত অভিভাষণে এই চেষ্টার মূলে তীব্র সমালোচনার কুঠারাঘাত করিয়া নিশ্চিতই বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত করিয়া রাখিবার যোগ্য ;—

"বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বলে সমানীত সাহিত্যমন্দাকিনীর সুবিমল রসধারা তৃষাতুর বঙ্গবাসীর চিরতৃষ্ণা নিবারণ করিল। বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিল যে, অন্য পথে নানা দিক্ হইতে শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের সম্মুখ-গতিকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতে পারে, কিন্তু এই সাহিত্যের পথেই তাহাদিগকে নিরাময় মুক্তিলাভ করিতে হইবে, এই সাহিত্যের পথেই অগ্রসর হইয়া এক দিন তাহারা জগতের সভ্য-সমাজে ঈপ্সিত বরণীয় আসন লাভ

করিতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও বোধ করি সে আশা ছিল, সেই জন্ত তাঁহার কথাসাহিত্যের মধ্যে পুরাণেতিহাস, ধর্ম্ম, কর্ম্ম কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বলে, বীর্য্যে, শৌর্য্যে, ভাস্কর্য্যে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের কোথায় কি গৌরব ছিল, তাহা সে দিনে যত দূর জানিবার উপায় ছিল, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করত তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং যে সাহিত্যের তিনি জন্মদাতা, তাহাকে এক দিন জগতের সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে হইবে জানিয়া, তাহাকে তিনি নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যদানে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন এবং জগৎ সভায় বসিবার উপযোগী যে সকল মণিময় আভরণ প্রয়োজন, তাহাও যোগাইয়াছেন,—অঙ্গদ, কুণ্ডল, কেয়ুর, বলয় কিছুরই অভাব রাখিয়া যান নাই।"

কেমন স্বচ্ছ সুন্দর অনাবিল অনায়াসগতি ভাষায় সভাপতি মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন! কথার হেঁয়ালি নাই, ভাবের জড়তা নাই, কথিত ভাষার অন্তরালে শব্দ-আহরণের দৈন্যের পরিচয় নাই,—বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে এমনই ভাষায় বুঝিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র কুত্রাপি কথিত ভাষায় রচনা করিয়া যায়েন নাই। তাঁহার আদর্শ এ দেশে অনুসৃত হইবে, কি আধুনিক যুগের কথিত ভাষায় রচনার আদর্শ অনুসৃত হইবে, এ সমস্যা সম্প্রতি বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সমস্যা সামান্য নহে। কেন না, কথিত ভাষায় রচনাকারীদিগের মধ্যে শক্তিশালী লেখকের অভাব নাই। তাই আমরা সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির মুখে এ বিষয়ের একটা সুমীমাংসার আশা করিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় যেন কতকটা সঙ্কুচিতভাবে আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার অভিমত যে একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতে সাহিত্যসেবিমাত্রেই সন্তোষলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। মহারাজ বলিয়াছেন;—

"বঙ্গ-সাহিত্যে দুইটি পৃথক্ রচনা-নীতি একসঙ্গে চলিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'বীরবল' যে রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে অধুনা যে রীতির কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়, বঙ্গের অনেক যশস্বী সাহিত্যিক সেই রীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেছেন; আবার অন্য এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী লেখক কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে পৃথক্ রাখিয়া প্রতিদিন বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন; ইহার কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সাহিত্য লোক-মনোমোহিনী ও শক্তিশালিনী হইবে, কিসে সাহিত্যের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষিত ও দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমার মনে হয়, তাহার একমাত্র বিচারক কাল, কালই ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ এবং হয় ত কালই তাহা করিবে। তবে এই সমবেত বিদ্বজ্জন-সঙ্ঘের সম্মুখে সভয়ে, সসঙ্কোচে আমি এইমাত্র নিবেদন করিতে চাহি যে, বাঙ্গালার সাহিত্য স্থানবিশেষ বা স্থানবিশেষের কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গের সামগ্রী; কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে থাকিলে সকল স্থানের সকল লোকের পক্ষে তাহা বোধ্য হইবে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা, কলিকাতার কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত বলিয়া এক দাবী উপস্থিত করা যাইতে পারিলেও, উহা বিচারসহ কি না, তাহাও আপনাদের এই সম্মেলনের বিবেচনার অধীনে আনা উচিত কি অনুচিত, সে কথার মীমাংসা আপনারাই করিবেন।

"ধর্ম্ম যেমন জাতিকে এক সূত্রে বন্ধন করে, সাহিত্য দ্বারাও সেই কার্য্য সাধিত হয়। সেই কারণে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষমতা, ধর্ম্মের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে। সাহিত্যই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতির একমাত্র মহামিলন-ক্ষেত্র। এক অখণ্ড, দুশ্ছেদ্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর আছে কি না, আমি জানি না। তাই মনে হয়, লেখ্য ভাষা কথ্য ভাষা হইতে পৃথক্ না হইলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিবে।"

সভাপতি মহাশয় সাহিত্যের আর একটা দিক্ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা এই:—

"আজকাল শুনিতে পাই, বঙ্গ-সাহিত্যে 'আর্টের'

প্রতিপত্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই আর্ট কি বর্ত্তমানের আমদানী, না প্রাচীনকালেও ছিল? যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সময়ে আর্ট ছিল কি না, সে কথার বিচার ও মীমাংসা সম্মেলনের সুধীবর্গ করিবেন, আমি সে কথার কোনরূপ উত্তর দিবার উপযুক্ত নহি; যতটুকু সংস্কৃত বা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত গীতি-কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে যে, আর্ট যেখানে সুন্দর, সেখানে কবির লেখনী অমৃতনিস্যন্দিনী হইয়া অবারিত মুক্ত প্রবাহে ঝর্ ঝর্ করিয়া রসধারা ঢালিয়া দিয়াছে; কারণাধীনে, রামায়ণে, মহাভারতে কিংবা তাদৃশ অপর কোন গ্রন্থে যেখানে অসুন্দর আর্টের ছবি অঙ্কিত করিতে হইয়াছে, সেখানে কবি বহু সন্তর্পণে নানাবিধ কৈফিয়তের অবতারণা করিয়াছেন, ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছেন। এ কালে চিত্রে ও রচনায় আর্ট এরূপভাবে প্রকট হইয়া উঠিতেছে যে, মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয়, মানুষ ও সমাজের জন্ম আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে, না আর্টের জন্ম মানুষ ও সমাজ? আজ আর্টের দাবী এমনভাবে দাঁড়াইয়াছে যে, এখনই উহা বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে এবং বাঙ্গালায় গভীর মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"এখন শুনিতেছি, কবিগণ কেবল রসসঞ্চারই করিবেন, লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিবেন না; গুরুমহাশয়গণের ন্যায় বেত্রপাণি হইয়া লোককে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহাদের উপরে নাই। কথাটা শুনিলে একটু ভীত হইতে হয়।

"উত্তর-চরিতের সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন, চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতিব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না, তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য। * * * কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎকার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে, সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবে।'

"মানুষের জীবন-যাত্রার সহিত কাব্য-নাটকাদির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কবি যে চিরসুন্দরের মন্দির রচনা করিতেছেন, তাহাদের পাদপীঠের শিলা যদি শ্লথবিন্যস্ত হয়, তবে সে মন্দির কতক্ষণ তাহার উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে পারিবে? সে মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, তাহা পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নী সকলকেই একত্রে সমাহিতচিত্তে শুনিতে হইবে; সে মন্ত্রের প্রাণ যদি নীতির ও রুচির হোমবারি স্পর্শে পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উহা সমাজকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যায়, আর্টের সহস্র দোহাই দিলেও তাহার রক্ষা দুষ্কর। কেবলমাত্র আর্ট নহে, সুন্দর নহে, যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিয়াই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ইংরাজ উইলসন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের জয়গান করিয়া বলিয়াছেন যে, পরকীয় প্রেম ভারতবর্ষের হিন্দু-নাটকের প্রাণবস্তু নহে, ক্ষণিক আনন্দপ্রদ অসুন্দর বস্তু, প্রাচীন ভারতের কাব্য-নাটকে প্রধান স্থান কোন দিনই পায় নাই এবং ভারতীয়দিগের নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হইলে, প্রতীচীর বহু ক্ষমতাশালী কবি ও নাট্যকারের উৎসাহ ও উদ্যম মন্দীভূত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।"

সভাপতির কথাগুলি প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর ভাবিবার—বুঝিবার। দেশের সাহিত্যের চিন্তার ধারা—ভাবের ধারা যে ভাবে প্রবাহিত হইবে, সেই ভাবের প্রভাব দেশের লোকের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের উপর অনুভূত হইবেই। এই হেতু বর্ত্তমানে সাহিত্যে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, তাহা সাহিত্যসেবীরাই বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন।

সাধের কাজল

১

রাখাল সর্দ্দারের মেয়ে আদুরী বাপ-মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, পাড়া-পড়শীর বারণ না শুনিয়া, নেশাখোর গোবরা মাঝিকে কেন যে সাঙ্গা করিয়া বসিল, তাহার কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পাড়ার মধ্যে সঙ্গতিপন্ন বলিয়া রাখাল সর্দ্দারের খ্যাতি ছিল। আদুরী তাহার প্রথমা কন্যা। বড় আদরের মেয়ে বলিয়া বাপ-মা নাম রাখিয়াছিল আদরমণি। সাত বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া এগারো বৎসর বয়সে আদুরী বিধবা হইয়াছিল। ডোমের মেয়ে হইলেও আদুরী কুৎসিত-দর্শনা ছিল না, গ্রামের বামুন-কায়েতের মেয়েরাও তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিত। যৌবনোদয়ে সে সৌন্দর্য্য যে আরও একটু বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহাকে সাঙ্গা করিবার জন্য তাহাদের স্বজাতির মধ্যে অনেক অপরিণীত যুবকই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

রাখাল সর্দ্দার জমীদারবাড়ীতে দরোয়ানী করিত বলিয়া একটু ভদ্রভাবে চলিবার চেষ্টা করিত। এ জন্য মেয়ের সাঙ্গা দেওয়া নিতান্ত অভদ্রোচিত কার্য্য বলিয়া ইহাতে মত দেয় নাই। নতুবা তাহার অপেক্ষা ভাল ঘরে সে আদুরীকে দিতে পারিত।

এ হেন আদুরী যখন পাড়ার গোবরা মাঝিকে সাঙ্গা করিতে উদ্যত হইল, তখন শুধু রাখাল নহে, তাহার প্রতিবেশী আত্মীয়-বন্ধুরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল।

পাড়ায় যত হতভাগা বওয়াটে যুবক আছে, গোবরা তাহাদের মধ্যে প্রধান। তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহই ছিল না। সম্বলের মধ্যে একখানি তালপাতার কুঁড়ে, আর তৎসংলগ্ন একটি তালগাছ ও কয়েকটি খেজুরগাছ। চৈত্রমাসে তালের মোচ বাহির হইলে সেই মোচের আগা কাটিয়া সে রস বাহির করিত এবং সেই রস গাঁজাইয়া তাড়ি প্রস্তুত করিয়া নিজে যত দূর পারিত খাইত, সঙ্গীদেরও কিছু কিছু ভাগ দিত। বর্ষার প্রারম্ভে তালের মোচ নিঃশেষ হইলে খেজুরগাছের গলা চাঁচিয়া রস বাহির করিয়া তাড়ির যোগাড় করিয়া লইত। এইরূপে সারা বৎসরের মধ্যে তাহার এক দিনের জন্যও তাড়ির অভাব হইত না। ইহাতে তাহার একটা উপকার হইত, ভাত-তরকারির দরকার ছিল না। সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া তাড়ি খাইত; খাইতে খাইতে নেশার ঘোরে অজ্ঞান হইয়া পড়িত এবং সেই অবস্থায় দিন-রাত্রি কাটিয়া যাইত। সকালে উঠিয়া আবার তাড়ির কলসী লইয়া বসিত।

গোবরা বেতের কায বেশ ভালরূপ জানিত। কাযে পয়সাও বেশ ছিল। কিন্তু কায সে প্রায় করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে সকালে কতকটুকু সময়মাত্র কায লইয়া বসিত। কায করিয়া নগদ পয়সা পাইলে সে দিন আর তাড়িতে পোষাইত না, শুঁড়ীর দোকানে গিয়া উঠিত।

পাড়াপড়শীরা যথেষ্ট উপদেশ দিয়াও যখন গোবরাকে নেশা ছাড়াইতে পারিল না, বরং তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া গোবরা নেশার উপর আর এক মাত্রা

চড়াইয়া দিয়া সোনা বাউরীর বিধবা স্ত্রী রাধাবালা ওরফে রাধীর ঘরে যাতায়াত করিতে লাগিল, তখন সকলেই ঘৃণার সহিত তাহার সংস্রব বর্জ্জন করিল।

আর সকলে ঘৃণা করিলেও এক জন তাহাকে ঘৃণা করিত না। সে আদুরী। গোবরার ছোট বোন ক্ষান্ত আদুরীর খেলুড়ী ছিল। এ জন্য আদুরী প্রায়ই গোবরার ঘরে যাতায়াত করিত। গোবরার মা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করিত, এবং আদুরীর সঙ্গে গোবরার বিবাহ দিবে,এরূপ আশাও মনোমধ্যে পোষণ করিত। বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল, এবং গোবরা কাযে মন দিয়া রাখাল সর্দ্দারের প্রার্থিত সাড়ে চারি গণ্ডা পণের টাকাও সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হইল না। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার মাতা গোপীনাথের রথে চুপড়ী-চাঙ্গারী বেচিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। লোক বলিল, মাগী বুড়া বয়সে কোঁচকাপুরের ধনু সর্দ্দারকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণে রাখাল সর্দ্দার গোবরার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হইল না, অন্যত্র বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল। গোবরা ইহাতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া পড়িল, এবং এই ব্যথার উপশমের জন্য পণের সংগৃহীত টাকায় মদ খাইতে আরম্ভ করিল। টাকাগুলা ফুরাইয়া গেলে নেশার জন্য তাড়ির যোগাড় করিয়া লইল। ছোট বোন ক্ষান্ত ইহার আগেই মারা গিয়াছিল, সুতরাং সংসারে তাহার পাছু ফিরিয়া চাহিবার কিছুই ছিল না।

আদুরী কিন্তু তাহাকে পাছু ফিরাইতে চেষ্টা করিত। গোবরার অন্তরের বেদনা সে নিজের অন্তর দিয়া বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিল, সুতরাং ঘৃণায় পরিবর্ত্তে গোবরার প্রতি তাহার সহানুভূতিই উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সহানুভূতির প্রেরণায় সে সময়ে সময়ে গোবরার কাছে গিয়া বসিত, এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিত। গোবরা তাহার অনুরোধ হাসিয়াই উড়াইয়া দিত।

এক দিন, আদুরী কিন্তু গোবরাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিল, "এমন ক'রে তাড়ি খেয়ে দিন কাটালে চলবে না মাঝি, তোকে বিয়ে কত্তেই হবে। বিয়ে না হয় অন্ততঃ সাঙ্গাও কর্।"

গোবরা হাসিয়া উত্তর করিল, "দূর পাগ্‌লী, আমি কি মানুষ আছি? আমি যে ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমাকে সাঙ্গা করবে কে?"

দৃঢ়স্বরে আদুরী বলিল, "আর কেউ না করে, আমি করবো।"

বিস্ময়ে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া গোবরা বলিল, "তুই আমাকে সাঙ্গা করবি আদুরী?"

আদু। যদিই করি, দোষ কি তাতে?

গোব। দোষগুণের কথা তুই জানিস্, কিন্তু আমাকে সাঙ্গা ক'রে তোর লাভ হবে কি?

আদু। আমি তোকে মানুষ করবো!

গোব। পারবি?

আদু। পারি কি না, তা দেখতেই পাবি।

গোব। কিন্তু তোর বাপ-মা রাজি হবে না।

আদু। তারা রাজি না হ'লেও আমি তো রাজি। এখন তোর কথা কি, তাই বল্।

গোবরা আরক্ত মুখে বসিয়া খানিক ভাবিয়া বলিল, "বেশ ভেবে চিন্তে দেখ্ আদুরী, আমাকে এখন মানুষ করা সোজা কায নয়।"

আদুরী বলিল, "সোজা কায হ'লে আদুরী কখনও সেধে সাঙ্গার কথা বলতো না।"

গোবরা হাঁ করিয়া আদুরীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাপ-মা অনেক নিষেধ করিল, অনেক ভয় দেখাইল, পাড়ার লোক অনেক বুঝাইল, অনেক বাধা দিল। আদুরী কিন্তু কোন বাধা মানিল না, কাহারও কথা শুনিল না। সে পরদিনই গোবরার ঘরে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি তোর ঘরে এসেছি মানিক, এখন তুই কি করবি বল্।"

গোবরা তখন তাড়ির কলসী লইয়া বসিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাড়ির কলসীটাকে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং আদুরীর হাত ধরিয়া হর্ষবিকসিত কণ্ঠে বলিল, "আমি আর কি করবো আদুরী, আমি এখন তোর। আমাকে নিয়ে তুই যা খুসী কত্তে পারিস্।"

আদুরী অঙ্গুলীনির্দ্দেশে তাড়ির ভাঙ্গা কলসীটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "আমাকে ছুঁয়ে বল্, এ সব আর খাবি না?"

আদুরীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে গোবরা বলিল, "তাড়ির কলসী আর ছোঁব না।"

"যদি খাস্?"

"তা হ'লে—তা হ'লে তোর যা খুসী, তাই করবি।"

"করবো আর কি, সেই দিনই কিন্তু তোর মুখে খ্যাংরার বাড়ী মেরে চ'লে যাব।"

মাথা নাড়িয়া গোবরা বলিল, "হু'শো'বার। আমি পেলে তো।"

গোবরার হাত ধরিয়া আদুরী তাহার কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রতিবেশীদিগের সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলিল, "ও আমার সাধের কাজল।"

২

প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিবার জন্য তাড়ি ছাড়িয়া আসিতে গোবরার কষ্ট যে যথেষ্ট হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আদুরীর জন্য এ কষ্ট সহ্য করিতে সে আপনার মনটাকে দৃঢ় করিয়া লইল। প্রথম দিনে তাহার প্রাণ ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। পেট ভরিয়া না হউক, দুই চারি গ্রাস —গাছে ভাঁড়গুলা বাঁধাই ছিল; সারা দিন-রাত্রিতে তাহা পূর্ণ হইয়া উপছাইয়া পড়িতেছিল। গোবরার ইচ্ছা হইতে লাগিল, গাছে উঠিয়া ভাঁড় সমেত সমগ্র রস গলায় ঢালিয়া দেয়। তাহার পর সে ভাঁড়গুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তালের মোচগুলাকে গোড়া সমেত কাটিয়া দিবে। ভাল, আদুরীর অনুমতি লইয়া আজিকার মত তৈরী রসগুলার সদ্ব্যবহার করিলে হয় না? সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে আদুরী কি রক্ষা রাখিবে? গোবরা হতাশ দৃষ্টিতে রসভরা ভাঁড়গুলার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আদুরী ডাকিল, "মাঝি!"

গোবরা চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল, আদুরী তাহার কাছে আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর গাছের রস যে ভাঁড় উপচে মাটীতে প'ড়ে যাচ্ছে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গোবরা উত্তর করিল, "যাক্।"

আদু। এতটা রস খামকা নষ্ট হবে?

গোব। নষ্ট হয় ত কি করবো?

আদু। খেয়ে ফেল না।

সত্যিই না কি আদুরী উহা খাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতেছে! গোবরা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আদুরীর মুখের দিকে চাহিল। আদুরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নষ্ট হওয়ার চেয়ে খাস্ যখন, তখন খেয়েই নে না।"

সর্ব্বনাশ, ইহা আদুরীর অনুরোধ না পরীক্ষা? জোরে মাথা নাড়িয়া গোবরা বলিল, "চুলোয় যাক্ রস, আমি তোকে ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করেছি, আদুরী।"

সহাস্যমুখে আদুরী বলিল, "করলিই বা পিতিজ্ঞে, আমি ত আর তোর গুরু-পুরুত নই।"

গোবরা উত্তর করিল, "গুরু-পুরুতের বাবারো সাধ্যি ছিল না, আদুরী, গোবরা মাঝিকে একেবারে তাড়ি ছাড়ায়।"

আদুরী হাসিয়া বলিল, "আমি তা হ'লে তোর গুরু-পুরুতের চাইতেও বড় বল্।"

গম্ভীর কণ্ঠে গোবরা বলিল, "আমার কাছে তুই সবার চেয়ে বড়। তুই বল্‌লে আমি মত্তে পারি, আদুরী।"

আদুরীর মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গোবরার মুখের উপর হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "বাবা কি বলেছে শুনেছিস্?"

গোব। না।

আদু। রামু সর্দ্দারের বৌ বল্‌ছিল, বাবা বলেছে, আজও যদি আমি ফিরে যাই, বাবা আমাকে ঘরে নেয়।

শঙ্কাবিবর্ণমুখে গোবরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই তা হ'লে কি করবি, আদুরী?"

সহাস্য-মুখে আদুরী বলিল, "তুই-ই বল্ না, কি করবো আমি।"

গোবরা এ প্রশ্নের উত্তর সহসা দিতে পারিল না; ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। আদুরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্, যাব?"

গোবরা সকাতর দৃষ্টিতে আদুরীর মুখের দিকে চাহিল; বলিল, "যদি সুখে থাক্‌তে চাস্, আদুরী, তা

হ'লে তোর যাওয়াই ভাল। আমার কাছে থাকলে তুই কষ্ট ছাড়া সুখ ত পাবি না।"

আদুরী বলিল, "কিন্তু তুই কি তাতে খুসী হবি, মাঝি ?"

গোবরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখকাতর কণ্ঠে বলিল, "আমার কষ্টের বরাত, আমি সুখ কোথায় পাব, আদুরী ? আমার সাথে থাকলে তোকেও কষ্ট পেতে হবে।"

আদুরী ঘাড় দোলাইয়া দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তা বললে চলবে না, মাঝি, যখন এই সাধের কাজল পরেছি আমি, তখন যাচ্ছি না আর কোথাও। তার পর তোর ধর্ম্ম তোর কাছে।"

হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোবরা বলিল, "এ ধর্ম্ম আমি খোয়াব না, আদুরী, আমি জান প্রাণ দিয়ে তোকে সুখে রাখবার চেষ্টা করবো।"

আদুরী প্রশংসাসমুজ্জ্বল দৃষ্টি দ্বারা গোবরাকে অভিনন্দিত করিল।

গোবরা গাছে উঠিয়া রসে ভরা ভাঁড়গুলা গাছের উপর হইতে মাটীতে আছাড়িয়া দিল। ভাঁড়গুলা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, রসগুলা চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। গোবরা তালের মোচগুলার গোড়া কাটিয়া দিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

কিন্তু অভ্যাস বড় সহজে ত্যাগ করা যায় না। আদুরীর ভালবাসা দিয়া গোবরা তাড়ির পিপাসা নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেও মধ্যাহ্ন আসিলেই তাহার মনের ভিতর যেন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। নিজের ঘরে তাড়ি হইবার উপায় সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু পাড়ায় ত তাহার অভাব নাই। তিনু মাঝির ঘরে গেলে যত ইচ্ছা খাইতে পারে। গোকুল সর্দ্দারের ঘরেও রীতিমত আড্ডা আছে। কিন্তু ছিঃ, আবার সেই তাড়ি! আদুরী তাহার জন্য বাপ, মা, বাপের সুখের সংসার ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, আর সে আদুরীর জন্য এই একটা তুচ্ছ নেশা—যাহা না খাইলেও দিন চলিয়া যায়, তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না? গোবরা কি একেবারেই মানুষ নয় ? আদুরীর ত্যাগের মহত্ত্বটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়া গোবরা আপনার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরেই দমন করিয়া রাখিত।

আদুরী বলিল, "হাঁ মাঝি, তুইও ব'সে খাবি, আমিও ব'সে খাব, তা হ'লে দিন চলবে কি ক'রে ?"

গোবরা বলিল, "আমি ব'সে খাব না, আদুরী, কালই গাঁতিপুরে বলাই পালের কাছে গিয়ে কিছু দাদন নিয়ে এসে বেতের কায সুরু করবো।"

আদুরী বলিল, "আজ আমাকেও বাঁশ এনে দে। আমি কুলো, ধুচুনী, চুপড়ী বুনতে পারি।"

গোবরা বলিল, "তুইও খাটবি, আদুরী ?"

ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে আদুরী বলিল, "তা নয় ত ডোমের মেয়ে, ব'সে ব'সে তোর রোজগার খেয়ে গতর-টাকে মাটী কোরবো না কি ?"

পরদিন হইতে গোবরা বেতের কায আরম্ভ করিল, আদুরীও কুলা-ধুচুনী বুনিতে লাগিল। কাযে মন দিয়া গোবরা শুধু যে তাড়ির নেশাটা কাটাইয়া দিল, তাহা নহে, প্রত্যহ প্রায় এক টাকার কায করিতে লাগিল। আদুরী যে কুলা-ধুচুনী বুনিত, তাহাতে নুণ-তেলের খরচ চলিয়া যাইত। তা ছাড়া খরচের সুসারের জন্য আদুরী পুকুরে শাক তুলিত, মাছ ধরিত, গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে দিত। তাহার অকাতর পরিশ্রম দেখিয়া গোবরা বিস্মিত হইত। এক এক সময় বলিত, "আমার যে রোজগার, তাই দুজনে খেয়ে উঠতে পারবো না, আদুরী, তবু তুই এত খাটতে যাস্ কেন ?"

আদুরী উত্তর করিত, "তোর রোজগার সবই যদি খেয়ে ফেলবো, তা হ'লে আর সব কায কি ক'রে হবে ? তোর ঘরে আছে কি ? ভাত খেতে একখানা থালা নাই, জল খেতে ঘটী নাই, তালপাতার কুঁড়ে, একটা ঝড় হ'লেই উড়ে যাবে। কিছু জমিয়ে ঘর একখানা আগে কত্তে হবে, মাঝি।"

গোবরা বলিল, "ঘর হবে পরে, আগে তোকে দু'-খানা গয়না গড়িয়ে দিই। রূপোর চুড়ী আটগাছা, আর পায়ের মল না দিয়ে আমি ত কোন কাযেই হাত দেব না।"

আদুরী বলিল, "মল না হোক, চুড়ী ক'গাছা পারিস্ ত দিস্। কিন্তু পাড়ায় কাঁসারী এলেই থালা একখানা

আর ঘটী একটা আমি কিন্‌বোই কিন্‌বো। একটা লোক এসে জল খেতে চাইলে ঐ ভাঙ্গা ঘটীটায় জল দিতে আমার মাথা যেন কাটা যায়। আচ্ছা মাঝি, এদ্দিন ত তুই কিছু না কিছু রোজগার করেছিস্। সে সব করেছিস্ কি?"

হাসিয়া গোবরা উত্তর করিল, "উড়িয়েছি।"

ঝঙ্কার দিয়া আদুরী বলিল, "ভারী কাযই করেছিস্! কেন, ঘটী-বাটি দুটোও কি কত্তে নাই?"

গোবরা। কার তরে করবো?

আদু। কেন, তোর নিজের তরে। তুই কি জল খেতিস্ না?

গোবরা। তেষ্টা পেলে ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আস্‌তুম।

আদু। ঘাটে বুঝি মানুষে জল খায়?

গোবরা। আমি মানুষ থাক্‌লে ত।

আদু। মানুষ ছিলি না ত কি ছিলি? জানোয়ার?

গোবরা। না, ভূত।

হাসিতে হাসিতে আদুরী বলিল, "ভূতই বটে। নইলে ঘর-সংসার এমন ভূতের বাসা হয়ে থাকে। ধন্যি মানুষ যা হোক তুই মাঝি।"

উচ্চ হাসি হাসিয়া গোবরা বলিল, "আর তুইও ধন্য মেয়ে যা হোক আদুরী, এই দশ দিনে এমন ভূতের বাসাটাকেও মানুষের বাসা ক'রে তুলেছিস্।"

গোবরার মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম তর্জ্জন সহকারে আদুরী বলিল, "ইঃ, ভারী ত খোসামুদে হয়ে পড়েছিস্ দেখছি। এতটা কিন্তু থাক্‌লে হয়!"

গোবরা হাসিয়া উত্তর করিল, "সেটা আমার কপাল, আর তোর হাতযশ।"

৩

আদুরীর কথাই ফলিল, বেশী দিন এতটা রহিল না। নূতনত্বের মোহ যত দিন গোবরাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল, তত দিন সে আদুরীর স্নেহযত্নের মধ্যে অননুভূতপূর্ব্ব সুখের আস্বাদ অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু ক্রমে যখন তাহার নূতনত্বের মোহ কাটিয়া গেল, আদুরীর স্নেহ-যত্ন পুরাতন হইয়া আসিতে লাগিল, গোবরা তখন আবার ধীরে ধীরে পূর্ব্ব-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িল। মাস দুই খাটিয়াই সে যেন সাতিশয় ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিল। এমন গাধার খাটুনী কি মানুষে খাটিতে পারে? না আছে বিশ্রাম, না আমোদ, না স্ফূর্ত্তি; সকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত শুধু শুক্‌না বেতগুলা লইয়া নাড়াচাড়া। এত খাটুনীর মধ্যে একটু নেশা-ভাং করিলেও গায়ের ব্যথা কতকটা সারিয়া যায়, মনেও একটু স্ফূর্ত্তি আইসে। কিন্তু আদুরীর জন্য তাহা করিবার জো নাই। নাঃ, আদুরীকে সাঙ্গা করিয়া গোবরা বিষম সঙ্কটে পড়িল!

ভাল, আদুরীর বা এত কড়াকড়ি কেন? পাড়ায় ত আরও পাঁচ জন আছে, তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সবই আছে। তাহারা খাটিয়া সংসার চালায়, অথচ নেশা-ভাং করে, দুই দণ্ড বসিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাটায়। ইহাতে তাহাদের ঘরের মেয়েরা ত কিছুই আপত্তি করে না? বদন মালিকেরও ত সাঙ্গানী বৌ; সে ছোলা ভাজিয়া, কাঁকড়ার ঝাল রাঁধিয়া বদনকে তাড়ির চাট্ তৈরী করিয়া দেয়। রামু সর্দ্দারের স্ত্রী কুলা-ধুচুনী বেচিয়া রামুর মদের পয়সা জোগায়। শুধু গোবরাই একা চোরের দায়ে ধরা পড়িয়াছে না কি?

এই চোরের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গোবরার প্রাণটা সময়ে সময়ে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত, বন্ধুবান্ধবদিগের আড্ডায় যোগ দিয়া এক আধটু স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ উপস্থিত হইত; কিন্তু আদুরীর ভয়ে পারিয়া উঠিত না। আদুরী যদি রাগ করে? রাগিয়া যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়? আদুরী চলিয়া গেলে গোবরা যে একা থাকিতে পারিবে না, তাহা নহে, কিন্তু এমন স্নেহযত্ন ত আর পাইবে না, সংসারের এমন শৃঙ্খলাও ত থাকিবে না। আদুরীর নৈপুণ্যে তাহার এই তালপাতার কুঁড়েখানিও বেশ বড় বড় অট্টালিকা অপেক্ষা মনোরম হইয়াছে; তাহার শৃঙ্খলাবিহীন সংসারে আদুরী যেন লক্ষ্মীশ্রী জাগাইয়া তুলিয়াছে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনে একটা অনাবিল শান্তি আনিয়া দিয়াছে। তাহার কাযের ব্যস্ততার মধ্যে আদুরী তাত ধরিয়া দিয়া যখন মিষ্ট কোমল স্বরে ডাকে, "বেলা হয়েছে, মাঝি, উঠে আয়!" তখন সে স্বরে

গোবরা কি একটা স্নেহের আহ্বান শুনিতে পায়! আগে সারা দিন না খাইলেও কেহই তাহাকে এমন করিয়া খাইতে ডাকিত না। তাহার জ্বর-জ্বালা হইলে গোবরাকে কি যাতনাই না ভোগ করিতে হইত! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেলেও এক ফোঁটা জল পাইত না, গায়ের জ্বালায় তাহাকে সারা রাত্রি আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে হইত। কিন্তু সে দিন সামান্য একটু জ্বরে আদুরী কি সেবাটাই না করিল! জল চাহিবামাত্র মুখের কাছে জল আনিয়া ধরিয়াছে, মুড়ী-বাতাসা কিনিয়া আনিয়া খাওয়াইয়াছে, সারারাত্রি না ঘুমাইয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়াছে। ছার নেশা! নেশার জন্য আদুরীকে হারাইয়া সে এমন স্বর্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে পারিবে না।

আদুরীর ভালবাসার মধুরতা অনুভব করিয়া গোবরা অন্তরের আগ্রহ অন্তরেই দমন করিয়া রাখিত।

এক এক সময়ে ভাবিত, আদুরী রাগ করিয়া যাইবেই বা কোথায়? বাপের বাড়ীতে ত তাহার ঠাঁই নাই। মেয়েমানুষ আর কোথায় যাইবে? না গেলেও প্রাণের ভিতর সে একটা ভয়ানক বেদনা পাইবে নিশ্চয়। যে তাহার জন্য বাপ-মা ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অশান্ত জীবনে শান্তি আনিয়া দিয়াছে, তাহার প্রাণে ব্যথা দিতে গোবরা যেন কুণ্ঠিত হইত। এ জন্য অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বন্ধুসমাজে তাহাকে উপহাসাস্পদও হইতে হইত। কিন্তু আদুরীর প্রাণে ব্যথা দেওয়া অপেক্ষা সে উপহাস মাথা পাতিয়া লওয়া গোবরা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত।

এক দিন গোবরা আদুরীর কাপড় কিনিবার জন্য টাকা লইয়া শাঁতিপুরের বাজারে গিয়াছিল। রাস্তার ধারেই হৃদয় সাহার মদের দোকান। পূর্ব্বে সে দোকানের সঙ্গে গোবরার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। দূর হইতে দোকানটা দেখিয়াই গোবরার প্রাণটা আনচান্ করিয়া উঠিল। ট্যাঁকে হাত দিয়া দেখিল, দুইটা টাকা রহিয়াছে। কাপড় একখানা কিনিতে দেড় টাকা লাগিবে। বাকী আট আনায় আধ বোতল মাল পাওয়া যাইতে পারে। আগে আধ বোতলে গলা ভিজিত না বটে, এখন কিন্তু উহাতেই যথেষ্ট হইতে পারে। মাতালও হইবে না, অথচ নেশাও একটু হইবে, ইহাই ত ভাল। কিন্তু আদুরী যদি জানিতে পারে? নাঃ, এ ত আর তাড়ি নয় যে, মুখ দিয়া ভর্ ভর্ গন্ধ বাহির হইবে। আর যদিই টের পায়, তাহাতেই বা কি, নিজের রোজগারের পয়সায় মদ খাইতেছে, আদুরীর ত পয়সা নয়। মেয়েমানুষকে এত ভয় করা অপেক্ষা গলায় দড়ী দেওয়া ভাল। ওঃ, কত যুগ সে এই দোকানের দরজা মাড়ায় নাই!

ভাবিতে ভাবিতে গোবরা দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং একবার সতর্ক দৃষ্টিতে এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া কম্পিত-পদে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল।

হৃদয় সাহার সহিত গোবরার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সাহা মহাশয় গোবরাকে দেখিয়াই যেন একটু অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি রে গোবরা, অনেককাল পরে যে? আর যে দেখা-শোনাই নাই।"

যেন কতকটা লজ্জিতভাবে মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে গোবরা উত্তর করিল, "আর মশাই, পয়সা-কড়ি জোটে না।"

ঈষৎ হাসিয়া সাহা মহাশয় বলিলেন, "পয়সা জোটে না বৈ কি, তুই না সাঙ্গা করেছিস্?"

গোবরা বলিল, "করেছি একটা সাঙ্গা। না করলে ঘর চলে না।"

সাহা মহাশয় বলিলেন, "তা ভালই করেছিস্। তবে আমাদের যেন একবারে ভুলে যাস্ না।"

মৃদুহাস্য সহকারে গোবরা বলিল, "আপনকারদের ভুলবার সাধ্যি আছে কি? তা হ'লে আজ আসবো কেন?"

"এসেছিস্, ভালই করেছিস্। ক'টা দেব?"

"ক'টা নয়, আধখানা দেন।"

"দূর ব্যাটা! দু'তিন মাস পরে এসেছিস্, আজ আধখানা দেব তোকে। আচ্ছা, একটাই এখন নে।"

সর্ব্বনাশ, পূরা এক বোতল লইলে সে আদুরীর কাপড় কিনিবে কি দিয়া? আর এক বোতল খাইলে সে কি ঠিক থাকিতে পারিবে? আদুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে যে! গোবরা চিন্তিতভাবে মাথা চুল্কাইতে

ভক্তি-অর্ঘ্য

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—এস, জি, ঠাকুরসিং

লাগিল। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সাহা মহাশয় বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ কি, খাস বিলেতের আমদানী; এমন সরেস মাল অনেক দিন আসে নি। খেলেই বুঝতে পারবি।"

গোবরা লুব্ধ দৃষ্টিতে বোতলটার দিকে চাহিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, বোতলটার ছিপি খুলিয়া আগে খানিকটা গলায় ঢালিয়া দেয়। কিন্তু আতুরীর কাপড়? ব্যস্তকণ্ঠে গোবরা বলিল, "একটু রাখ না সা মশাই, আগে কাপড়ের দোকান থেকে ঘুরে আসি।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গোবরা ছুটিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে আসিতেই সম্মুখে দেখিল, তাহাদের পাড়ার তিনু মাঝি। গোবরাকে দেখিয়া তিনু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি রে গোবরা, মদ খেলে তোর আতুরী রাগ করবে না বুঝি?"

গোবরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই দাঁতে দাঁত চাপিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। সে আর কাপড়ের দোকানে গেল না, ছুটিতে ছুটিতে একেবারে নিজের ঘরে উপস্থিত হইল।

আতুরী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাপড় কৈ, মাঝি?"

গোবরা বলিল, "আজ কাপড়ের দোকান বন্ধ। কাল গিয়ে নিয়ে আসবো।"

৪

সন্ধ্যার একটু আগে গোবরা বেতের বাক্সর ডালাটা ঠিক করিয়া মানাইতে মানাইতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

"বঁধু তোমায় করবো রাজা তরুর তলে।"

কুটীরের সম্মুখে জামগাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল, "বৌ কথা কও।" দক্ষিণা বাতাসে গাছের কচি পাতাগুলা ফুর্ ফুর্ করিয়া নড়িতেছিল; বাতাসের সঙ্গে দূর হইতে আম্রমুকুলের মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। সেই দক্ষিণা বাতাসের স্পর্শে, আম্রমুকুলের গন্ধে, আর পাখীর ডাকে গোবরার প্রাণটা যেন এক সুখের স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিল। সে অস্ফুটস্বরে আপন মনে গাহিতেছিল,—"বঁধু তোমায় করবো রাজা তরুর তলে।"

আতুরী পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া গোবরার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মাঝি!"

তাহার স্বরের রূঢ়তায় গোবরা একটু চমকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। আতুরী তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বাজারে শুধু কাপড়ের দোকানই বন্ধ, আর সব দোকান খোলা ছিল, না মাঝি?"

আতুরীর প্রশ্নের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গোবরা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত উত্তর দিল, "কোন্ দোকানের কথা বলছিস্, আতুরী?"

তীব্র ভ্রূভঙ্গী সহকারে আতুরী বলিল, "মদের দোকানের কথা।"

গোবরা শিহরিয়া উঠিল। আতুরী তাহার শঙ্কামলিন মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতটুকু খেয়েছিস্ আজ?"

শঙ্কিতস্বরে গোবরা বলিল, "কি খেয়েছি, আতুরী?"

"আমার মাথা।"

গোবরা আস্তে আস্তে মাথাটা নীচু করিল। কঠোর কণ্ঠে আতুরী ডাকিল, "মাঝি!"

গোবরা বলিল, "এক ফোঁটাও খাই নি আমি।"

"তবে দোকানে ঢুকেছিলি কি জন্যে?"

"খেতে।"

আতুরী আর সেখানে দাঁড়াইল না; গোবরার মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। গোবরা বলিল, "শোন্, আতুরী!"

আতুরী ফিরিয়া দাঁড়াইল। গোবরা অনুতাপদীর্ণকণ্ঠে বলিল, "খেতে লোভ হয়েছিল, দোকানেও ঢুকেছিলুম, কিন্তু তোর দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, খাই নি আমি।"

"বেশ" বলিয়া আতুরী পুনরায় অগ্রসর হইল। কাতরকণ্ঠে গোবরা বলিল, "আমার কথায় তোর বিশ্বাস হলো না?"

সতেজকণ্ঠে "নাঃ" বলিয়া আতুরী কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গোবরা বাক্সটার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাখীটা তখন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, বাতাস বন্ধ হইয়াছে, সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় দিনের আলো গ্রাস হইয়া

আসিয়াছে। বদন মালিক তাড়ির নেশায় টলিতে টলিতে বিকৃতকণ্ঠে গাহিয়া যাইতেছে,—

"এতো অপোমান তবু প্রাণ তারে চায় রে।"

গোবরা তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৫

"আমাকে খানিক তাড়ি দিবি, তিনে?"

উপহাসের হাসি হাসিয়া তিনু বলিল, "তাড়ি খাবি, তোর আদুরী যদি রাগ করে?"

ভ্রূকুটী-কুঞ্চিতমুখে গোবরা বলিল, "চুলোয় যাক্ আদুরা! তুই দিবি কি না, তাই বল্।"

তাড়ির কলসীটা আগাইয়া দিয়া তিনু জিজ্ঞাসা করিল, "এই আদুরীর সাথে তোর এত ভালবাসা। আবার হ'লো কি?"

এক গ্লাস তাড়ি গলায় ঢালিয়া দিয়া বিকৃতমুখে গোবরা বলিল, "হয় নি কিছু, তবে এত সাধাসাধি আর ভাল লাগে না।"

বদন মালিক হাসিয়া বলিল, "বাছাধন, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি। মেয়েমানুষ বড় শক্ত চীজ,যত নুয়ে চলবে, ততই চেপে ধরবে।"

গোবরা বলিল, "সে কথা ঠিক বদন দাদা, মাগীর মন কিছুতেই পেলুম না।"

বদন বলিল, "মন পাবি, যদি মরদ বাচ্চার মত শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারিস্।"

"এবার তাই শক্ত হয়েই দেখবো" বলিয়া গোবরা আর এক গ্লাস তাড়ি উদরস্থ করিল।

দেখিতে দেখিতে কলসী খালি হইল। তখন গোবরা আজ আদুরীকে দেখিয়া লইবে,- এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরে চলিল। বদন তখন তিনুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গোবরা আজ পুরো মাতাল হয়েছে। আদুরীকে আজ দু'চার ঘা না দিয়ে ছাড়বে না।"

সহর্ষে তিনু বলিল, "ঠিক হবে দাদা, যেমন কাম, তেমন ফল। আমি বছরখানেক ধ'রে মাগীর খোসামোদ করলুম, মাগী কি না, আমাকে ছেড়ে হতভাগা গোবরার ঘরে গেল।"

বদন বলিল, "গোবরার কাছে তাড়া খেলে তোর ঘরে আসতে পারে।"

তিনু বলিল, "আমিও ত সেই চেষ্টাতেই আছি, যাতে দু'জনে ঝগড়া বাধে। কাল আমিই ত আদুরীকে বলেছিলুম, গোবরা মদ খেয়ে এসেছে।"

বদন। সত্যি সত্যি খেয়েছিল না কি?

তিনু। খেতে গিয়েছিল, কিন্তু বোধ হয়, আদুরীর ভয়ে খেতে পারে নি।

বদন। আজ ত একেবারে বেপরোয়া হয়ে খেলে।

তিনু। কাল যে একটু ঝগড়া বেধেছে, আজ তার পাকাপাকি হবে।

বদন। তা হ'লে তোর বরাতটাই খুলে যাবে দেখছি।

তিনু। তা যদি হয় দাদা, তা হ'লে তাড়ির বদলে মদের কলসী নিয়ে বসবো।

বদন। আদুরীর হুকুম পেলে ত?

তিনু। ধ্যেৎ তোর হুকুম! আমি কি গোবরার মত বোকা না কি?

বদন। আচ্ছা, বোকা কি সেয়ানা, দেখা যাবে তখন।

৬

"আদুরী!"

আদুরী রাঁধাবাড়া শেষ করিয়া গোবরার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। কাল সন্ধ্যা হইতে গোবরার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা নাই। রাত্রে উভয়েরই খাওয়া হয় নাই,—গোবরা খায় না বলিয়া আদুরীও কিছু খায় নাই। তাই আদুরী আজ সকাল সকাল রান্নার উদ্যোগ করিয়াছিল। রাত্রিতে আদুরী অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল যে, বাস্তবিক গোবরা মদ খায় নাই; অভ্যাসবশতঃ মদের দোকানে ঢুকিলেও মদ না খাইয়াই চলিয়া আসিয়াছে। আদুরী পরের কাছে মিথ্যা শুনিয়া গোবরার উপর অন্যায় দোষারোপ করিয়াছে। নিজের অন্যায়ের জন্য আদুরী মনে মনে অনুতপ্ত হইল। কিন্তু গোবরার কাছে তাহা স্বীকার করিতে পারিল না।

সকাল হইতে গোবরা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রান্না চাপাইয়া আদুরী তাহাকে সম্বোধন করিয়া ভারীমুখে বলিল, "কাল রাত থেকে খাওয়া নাই, আজও কি নাইতে খেতে হবে না?"

গোবরা উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল।

আদুরীর রান্না শেষ হইল, সূর্য্য মাথার উপর উঠিল, কিন্তু গোবরার দেখা নাই। লোকটা পুকুর কাটিয়া স্নান করিতেছে না কি? আঃ, এই অস্থির-প্রকৃতি মানুষটাকে লইয়া আদুরী কি জ্বালাতেই পড়িয়াছে! লোকটার ব্যবহারে রাগও হয়, আবার উহাকে দেখিলে মমতাও আসে। এই মমতার বশে গোবরার ঘরে আসিয়া আদুরী কি অন্যায় কাযই করিয়াছে। এখন ফিরিয়া এক মুঠা পেটে দিলে যে হয়, আদুরীও এক মুঠা খাইয়া বাঁচে।

সূর্য্য মাথার উপর হইতে গড়াইয়া পড়িল, পাড়ার যাহারা মজুরী খাটিতে গিয়াছিল, তাহারা ঘরে খাইতে আসিল, কিন্তু গোবরা ফিরিল না। আদুরী চিন্তিত হইল এবং রাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গেল না কি, ইহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। রাগের কথা ত আদুরী তেমন কিছুই বলে নাই, সে চুপ করিয়াই রহিয়াছে। সুতরাং রাগ করিবে কি জন্য? রাগ না করিলেও এতক্ষণেও ফিরিল না কেন?

আদুরী উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে পরিশেষে গোবরাকে খুঁজিতে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, এমন সময় গোবরা টলিতে টলিতে আসিয়া জড়িতস্বরে ডাকিল, "আদুরী!"

তাহার অবস্থা দেখিয়া আদুরী ভীত হইল। এ যে পুরো মাতাল! গোবরা তাহা হইলে স্নান করিতে যায় নাই, এতক্ষণ কোথাও বসিয়া তাড়ি খাইতেছিল। কি সর্ব্বনাশ, আবার সেই তাড়ি!

আদুরীকে নিরুত্তর দেখিয়া গোবরা হেলিতে-দুলিতে সগর্ব্বে বলিল, "কি দেখছিস্, আদুরী, কাল আমি এক ফোঁটাও মদ খাই নি, আজ কিন্তু পেট ভরে তাড়ি খেয়েছি।"

"খুব বাহাদুরী করেছিস্, এখন শুয়ে পড়বি আয়।"

গোবরার হাত ধরিয়া আদুরী তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। গোবরা কিন্তু যাইতে চাহিল না; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোর হুকুমে শুয়ে পড়তে হবে না কি? কক্ষনো না। দেখি, কার বাবার সাধ্যি আমাকে শোয়ায়।"

নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইবার জন্য আদুরীকে জোরে একটা ধাক্কা দিতেই আদুরী দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল। হাতের দুই এক যায়গা ছড়িয়া গেল, খোলায় কাটিয়া কপালের এক যায়গা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। গোবরা কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না; সে আপন মনে আদুরীর উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিতে করিতে সদর্প-পদক্ষেপে ঘরের দিকে অগ্রসর হইল এবং দরজা পার হইয়াই মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। আদুরী উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যার খানিক পরে চৈতন্য হইলে গোবরা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, আদুরী বসিয়া তাহার মাথায় পাখার বাতাস দিতেছে। দেখিয়া গোবরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আদুরী জিজ্ঞাসা করিল, "উঠে বস্‌লি যে, নেশা কেটেছে?"

মুখ নীচু করিয়া গোবরা উত্তর দিল, "কেটেছে।"

"মুখে-হাতে জল দে তবে" বলিয়া আদুরী জলের ঘটী আগাইয়া দিল। গোবরা উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বলিল, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আদুরী, ভাত আছে?"

আদুরী বলিল, "ও বেলা থেকে ত হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই প'ড়ে রয়েছে।"

গোবরা। তুই খেয়েছিস্ ত?

আদু। কাল রাত থেকে তুই মুখে একটু জল দিস নিই, আর আমি খেয়ে-দেয়ে ব'সে থাকবো বৈ কি।

তাহা হইলে আদুরী তাহার জন্য একটা রাত একটা দিন উপবাসে কাটাইয়াছে, আর গোবরা তাহার উপর রাগ করিয়া তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল! ওঃ, কি ভয়ানক নিষ্ঠুর সে! লজ্জাজড়িত কণ্ঠে গোবরা বলিল, "ভাত দে তবে শীগ্‌গির।"

আদুরী ভাত বাড়িয়া দিলে গোবরা খাইতে বসিল।

খাইতে খাইতে সহসা আদুরীর কপালের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই, বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কপালে রক্তের দাগ কেন ?"

আদুরী বলিল, "তোর কীর্ত্তি। তোর হাত ধ'রে ঘরে আনতে যেতে তুই যে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলি।"

লজ্জায়, ঘৃণায় গোবরার মুখখানা যেন কালি হইয়া আসিল। সে মাথা নীচু করিয়া পাতের ভাতগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আদুরী জিজ্ঞাসা করিল, "খাচ্ছিস না যে ? আর কিছু তরকারী দেব ?"

গোবরা সে কথার উত্তর না দিয়া অনুতাপদীর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "আদুরী !"

"কি বল্‌ছিস্ ?"

"তবু তুই আমাকে ভাত বেড়ে দিলি ?"

"দেব না ত কি করবো ?"

"তুই ত বলেছিলি—"

"কি বলেছিলাম ?"

"আমাকে নেশা কত্তে দেখলেই চ'লে যাবি তুই।"

আদুরী হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "যখন বলেছিলাম, তখন জানতাম না যে, একবার মায়ায় জড়িয়ে পড়লে ছেড়ে যাওয়া কত শক্ত কথা।"

হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে গোবরা বলিল, "তা হ'লে যাবি না তুই ?"

আদুরী বলিল, "যেতে পারলে অনেকক্ষণ চ'লে যেতাম।"

গোবরা বলিল, "কিন্তু আমি যে তোকে মেরেছি ?"

ঝঙ্কার দিয়া আদুরী বলিল, "তুই মেরেছিস্, আমিও তখন তোকে দু'ঘা মেরে না হয় শোধ নেব। এখন খেয়ে নে ত শীগ্‌গির, আমারও ক্ষিদে-তেষ্টা আছে।"

গোবরা আর কোন কথা না বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল।

সকালে তিনু সবিস্ময়ে দেখিল, আদুরী নিশ্চিন্তমনে বসিয়া চুপড়ী বুনিতেছে ; আর গোবরা তাহার অদূরে বসিয়া বেত চাঁচিতে চাঁচিতে উৎফুল্ল কণ্ঠে গান ধরিয়াছে—

"বঁধু তোমায় করবো রাজা তরুর তলে।"

দেখিয়া তিনু নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

আদুরী সে দিন বাজারে চুপড়ী বেচিতে গেলে তিনুর মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ লা আদুরী, কাল না গোবরা তোকে খুব মেরেছিল ?"

ঈষৎ হাসিয়া আদুরী উত্তর করিল, "কাল যে তাড়ি খেয়ে মরেছিল, দিদি।"

তিনুর মা বলিল, "তা তুই প'ড়ে প'ড়ে ওর মার খাবি ?"

আদুরী উত্তর দিল, "কি করবো দিদি, সাধের কাজল যখন পরেছি, তখন মারুক্-কাটুক, যাব কোথায় ?"

এ উত্তরে তিনুর মা'র মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পুঁজি

চাই না আমি রত্ন-মাণিক, চাই না আমি হীরে,
আমায় দিও একটি চুমা, রইল মাথার কিরে।
সঙ্গহারা দূরপ্রবাসে, তোমায় মনে হ'লে,
সেই চুমাটি, জাগবে আমার, গহন মর্ম্মতলে।

চাই না আমি রাজ্য রাজার, চাই না খ্যাতি প্রিয়ে,
বারেক আমায় বন্দী করো, মৃণাল-বাহু দিয়ে।
স্পর্শহারা সেই বিদেশে, পড়লে তোমায় মনে,
নিবিড় বাহুর ঘেরটি সেথায়, জাগবে শিহরণে।

চাই না আমি অর্ঘ পূজার, চাই না আরাধনা,
আমায় দিও একটু প্রীতি, একটু সোহাগকণা।
শান্তিহারা সেই প্রদেশে, তোমায় যদি খুঁজি,
আমার মনের, গোপন গৃহে, জাগবে সে এই পুঁজি।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

সারা বেলাটা লেবরেটরীতে খেটে দিবাবসানে একটি যুবক মাথাটা শরীরটা ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্যে বাগানে বেড়াচ্ছেন। এই বাগানটি রাজবাড়ীর-ই একটা অংশমাত্র; নানারকম ফল-ফুল ও পাতাবাহারের গাছে বাগানটি দিব্য সাজান। এই বাগানে পুকুর আছে, দীঘি আছে, ফোয়ারা আছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরম পণ্ডিত এই যুবকের মনে অনেক দিন থেকে একটা সন্দেহ জেগেছে যে, পৃথিবীর কায চালাবার জন্যে যতটুকু তাপ ও আলো আবশ্যক হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে সূর্য্যকিরণ অপব্যয় হয়ে যায়, কিন্তু দিনের বেলার এই অতিরিক্ত সূর্য্যরশ্মি যদি কোন রকমে ধ'রে কোথাও আলাদা জমা ক'রে রাখা যেতে পারে, তা হ'লে প্রয়োজন বুঝে অন্য সময় ঐ সঞ্চিত শক্তিকে খাটিয়ে মানুষ আলো ও তাপ আদায় ক'রে নিতে পারে।

প্রকৃতি থেকে-ই মানুষের উৎপত্তি, অর্থাৎ নেচার বা প্রকৃতি-ই হ'ল মানুষের জননী; সুতরাং নেচারকে conquer করা বা মা'কে জব্দ করাই মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও উন্নতির পরিচয়। পরশুরাম থেকে আরম্ভ ক'রে এই নিধিরামের বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত নজর কর্‌লে ছেলের এই বিদ্যার প্রমাণ প্রায় ঘরে ঘরেই পাওয়া যায়।

আমাদের এই পরিচিত যুবকটির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার যে আলাপ ক'রে দেওয়া উচিত, এ কথা মনে ছিল না, এই লৌকিকতা-রক্ষা-ভঙ্গ-অপরাধ জন্য আপনারা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এই যুবকটি নিষধ নগরের রাজা। শেয়ালদহ বা হাবড়া কোন্ ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে চড়লে বা কোন্ লাইন দিয়ে গেলে কবে কত রাত্রে যেয়ে নিষধ নগরে পৌঁছুতে পারবেন, তা আমরা ঠিক বল্‌তে পারি না, বোধ হয়, বিলিতী পাণ্ডা কুক.কোম্পানী বা মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুসন্ধান করলে ঐ নগরটি এখন-ও বর্ত্তমান আছে বা বহুকাল হ'ল তার গঙ্গালাভ হয়েছে তা জান্‌লেও জান্‌তে পারেন। যা' হোক, এই নিষধনগরের রাজার নাম নল। আপনারা ব'ল্লে-ও বল্‌তে পারেন যে, নল কখন-ও মানুষের নাম হয়? এই বিষয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত। বাস্তবিক যুবকটির যথার্থ কি নাম ছিল, তা ইতিহাস কখন-ও অক্ষরে প্রকাশ করেনি, তবে আমাদের বোধ হয়, তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য সর্ব্বদা নানা রকমে পাইপ ও টিউব অর্থাৎ নল নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তেন ব'লে তিনি "নাইট অভ দি পাইপ' কি না "নল-রাজ" ব'লে খ্যাতি লাভ করেন।

নলরাজ বাগানে বেড়াচ্ছেন আর মনে মনে সূর্য্য-রশ্মি পাম্প ক'রে বোতলে পূর্‌বার একটা প্ল্যান ঠিক্ কর্‌চেন। এমন সময়ে অদূরে একটি ফোয়ারার উপর একটি সদ্য রজকাগার-প্রত্যাগত শুভ্রোজ্জ্বল-ধৌত-বসনের ন্যায় হংসকে উপবিষ্ট দেখে রোষ্ট খাবার লোভে রসনার প্রেরণায় তিনি দৌড়ে গিয়ে ধ'রে ফেল্লেন সেই হাঁসটিকে।

বন্দী হংস তখন সহজে প্রত্যাশিত প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্ ক'রে না উঠে ব'লে উঠল,—"I say Nal old fellow!" অর্থাৎ "ওহে নল বুড়ো ইয়ার!" নল ত অবাক্। অবশ্য নলের মতন এক জন বিদ্যোৎসাহী নিশ্চয়-ই জানতেন যে, এই উন্নতির যুগে অধ্যাপকরা আর কেবলমাত্র প্রাসাদ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নয়,

দুর্দ্দশায় আজকাল ঘাটে-মাঠে বাটে হাটে কুটীরে পর্য্যন্ত চ'রে বেড়াচ্ছে; তাঁর বাগানের মালী-ও এখন রাগ করলে খোন্তা কোদাল দূরে ফেলে বলে,—"শালিনে বনমালিনে"; আর কেওরাকুমারী-ও ক্রুচেট-হাতে বিচরণ করে। এর উপর নলরাজ বৈজ্ঞানিক নাইট, সুতরাং নিশ্চয়-ই তিনি জার্ম্মেণী বেড়িয়ে এসেছেন। কে না জানে, বিজ্ঞান কি অন্য কোন বিষয়ে প্রধান পণ্ডিত হ'তে হ'লে জার্ম্মেণীতে গিয়ে পড়তে হয় আর ইংলণ্ডে ফী জমা দিতে হয়! কিন্তু উচ্চশিক্ষা, জনশিক্ষা, হাড়, মাস, চামড়া এডুকেশন পর্য্যন্ত চল্‌বে, এ খবর রাখলে-ও লেখাপড়ার চর্চ্চা যে পশুপক্ষীদের মধ্যে-ও আরম্ভ হয়েছে, এর কল্পনা নলের সূক্ষ্মছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে নি।

হায় নল! তুমি ডিস্ক, রোপাইপ, টেষ্টটিউব, গ্যাস, হক্সলে, টিণ্ডাল, জেগো, গ্যানো ট্যানোকে নিয়েই দিন কাটিয়েছ। পুরাবৃত্তের দিকে-ও যদি তোমার মন থাকত, তা হ'লে বুঝতে পারতে যে, এ দেশে বহুকাল হ'তে ই পশুপক্ষীদের ভেতর বিদ্যাচর্চ্চার বিলক্ষণ আদর ছিল। তখনকার এক জুলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাম ছিল বিষ্ণুশর্ম্মা, এই মিষ্টার বিষ্ণুশর্ম্মা, তাঁর সময়ের পশুপক্ষীরা যে উত্তম সংস্কৃতভাষায় আলাপ করত, এ কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ ক'রে গেছেন। গ্রীক পণ্ডিত ঈশপ এ দেশে হাতী দেখতে এসে একটা বকের সঙ্গে ব্যবহারে বাঘের অতি উচ্চ অঙ্গের ডিপ্লোমেসি দেখে গিয়ে সেটা নিজের দেশের ঘটনা ব'লে প্রচার ক'রে দিয়েছিল। শুনছি, ছাতারে পাখী, কাদাখোঁচা, ফিঙে টিঙে ধ'রে আবার মন্ত্রীর কর্ম্মে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব হচ্ছে, কিন্তু কে না জানে হায়! এই আর্য্যাবর্ত্তে এক দিন কেবল শুক অর্থাৎ টিয়ে পাখী নয়, তার স্ত্রী সারী কি না মিসেস টিয়ে পর্য্যন্ত রাজমন্ত্রীর কার্য্য করতেন;—হায় রে, কোথায় গেল আজ সেই স্ত্রীশিক্ষা!

যাক্, গল্প ধরা যাক। হংস বল্লেন, "হে রাজন্! আমায় বধ করো না। ক্ষিধে পেয়ে থাকে, ঐ গাছে গাছে আম, কাঁটাল, তাল, বেল, আতা, নোনা, নারকল, ড্যাকল, আরো কত ফল ঝুলচে, জিব জুড়িয়ে পেট ভরে খেয়ে ফেল। ভাখ, আমায় বধ করলে তোমায় 'মার্ডার চার্জ্জে' পড়তে হবে। বধ মানে-ই মার্ডার, তা পশুপক্ষী-হত্যা-ই হোক আর নরনারী-হত্যা-ই হোক। তবে তুমি রাজা, তোমার সাত খুন মাপ। আর রাজগুষ্টি ব'লে তোমরা সবা-ই একযোট হয়ে আমাদের কি না এই পৃথিবীর আদিম নিবাসী পশুপক্ষীদের কোন ফিলিং নেই, স্নেহ-মমতা নেই, ব্যথা-বোধ নেই, মানুষের সখ আর পেটের জ্বালা দূর করা ছাড়া আমাদের জীবনের আর কোন প্রয়োজন নেই বলে-ই ক্ষমতা দিয়েছ, কাযেই এখানে তোমরা সাজার হাত এড়িয়ে যাবে, কিন্তু আর এক জন রাজা আছেন—যাঁর তুমি-ও প্রজা, আমি-ও প্রজা, তাঁর সামনে এক দিন তোমাকে খুনী আসামী হয়ে খাড়া হ'তে-ই হবে, তখন তুমি কি জবাব দিবে MAN! বরং ছেড়ে দাও, আমি তোমার একটা উপকার করব।

নল। তুমি আমার কি উপকার করবে?

হংস। আমি তোমার বিবাহ দিয়ে দেব।

নল। বিবাহ!—স্ত্রীলোকের সঙ্গে?

হংস। পুরুষের বিবাহ এখন পর্য্যন্ত ত স্ত্রীলোকের সঙ্গেই চ'লে আস্‌ছে। তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটা মেটামরফোসিস্ ক্লাস খুলেচে, তাতে কেদার যে কালে কামিনী হয়ে দাঁড়াবে, এমন বেশ আশা করা যায়। কিন্তু আমি যে প্রস্তাবটা করব, তাতে বড় একটা চ্যান্স আছে। এ ক'নে বা ডাউয়েরি অর্থাৎ যতুক হাত-ছাড়া হয়ে গেলে শীগ্‌গির আর এমনটি জুটবে না।

নল। কিন্তু, ব্রাদার হংস! স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে আমার বড় ভয় করে।

হংস। কিছুই আশ্চর্য্য নয়; চাক ঘাঁটাতে কে না ভয় পায়? তবে কি না মধু-বুঝেচেন—মধু- under stand মধু!

নল। Dear Duck! তুমি ত বিজ্ঞান জান না, জান্‌লে বুঝতে যে, নারী একটা ভয়ানক 'এক্সপ্লোসিভ্—কম্‌বাষ্টিবল্!'

হংস। তাতে আপনার ভয় কি? দাহ্য পদার্থ নিয়ে-ই ত আপনার কাজ। আপনি রাজা ব'লে-ই পার পেয়ে যাচ্ছেন, নইলে যে সব ভয়ানক 'এক্সপ্লোসিভ্' আপনার লেবরেটরীতে আছে, আর কেউ হ'লে এত দিনে গ্রেপ্তার হ'ত।

নল। তা বটে, তবে কি জান হংসেশ্বর! নারীর

নয়ন দুটি অতি বিষম জিনিষ, ও দুটি cellএর ভিতর যে কি রহস্য আছে, তা পৃথিবীর কোন বৈজ্ঞানিক আজি-ও নির্ণয় করতে পারে নি। ঐ চোখের ভেতর থেকে যে ইলেকটিক কারেণ্ট পাস করে, তার বৈদ্যুতিক শক্তিতে দশটা মাথাওয়ালা রাবণ-ও অচেতন হয়ে পড়েন। আবার আশ্চর্য্য! ঐ এক-ই cell ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে এত বেশী হাইড্রোজেন জেনারেট করে যে, নিশ্বাস টানার সময় সেই অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে একেবারে H_4 O_2 হয়ে দাঁড়ায় আর জলের তোড়ে বড় বড় হাতী পর্য্যন্ত ভেসে যায়।

হংস। কাজটা সীরিয়াস্ বটে, তা না হ'লে আপনার মত লোককে বল্‌ছি কেন। বিশেষ, রূপবতীর নামটি হচ্ছে দময়ন্তী।

নল। দময়ন্তী! গ্রীক 'Damaein' শব্দের অর্থ ত' হ'ল পোষমানান--

হংস। কিন্তু আগে ঐ উপসর্গটি আছে 'Adamas', ঐটে-ই হচ্ছে বিরোধ-বাচক।

নল। যা হোক, বিপজ্জনক পরীক্ষণে সাফল্যলাভ করা-ই বৈজ্ঞানিকদিগের বীরত্ব। তা এই মানবীটি কে?

হংস। ইনি হচ্ছেন বিদর্ভেশ্বরের কন্যা।

নল। বয়স কত?

হংস। ছি!

নল। ঠিক ঠিক, মাপ করবেন; যুবতী যে স্ত্রীলোক, তা আমার মনে ছিল না। দেখতে শুন্‌তে অবশ্য ভাল?

হংস। ভাল! চুলে কেরলী, চোখে বাঙ্গালী, নাকে গ্রীক, ঠোঁটে মারাট্টা, রঙে কাশ্মীরী, কটি অবধি কৌরঙ্গী, তার নীচে উড়েনী, একেবারে 'হল অভ অল্ নেশান্‌স্।' সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। তার উপর সংস্কৃতে ভটচার্য্যি, পালীতে ফুজী, ফ্রেঞ্চে—

নল। অ্যাঁ! ফ্রেঞ্চ-ও জানে না কি?

হংস। বই প'ড়ে শেখা নয়; তবে কুমারী সর্দ্দি-টর্দ্দি হ'লে যখন কথা ক'ন, তখন তাঁর ভাষা মুঁসিয়েরা-ই বুঝতে পারেন। এ ছাড়া গানে প্যাটি, নাচে আল্‌বা, বাজনায় নিতাই চক্রবর্ত্তী, কুস্তীতে—

নল। কুস্তী?

হংস। সখীদের সঙ্গে।

নল। আচ্ছা হংসেশ্বর, তুমি ত কলেজে পড়েছ দেখছি, তবে ঘটকালী বিদ্যে শিখলে কোত্থেকে?

হংস। এবার আমাদের ইউনিভারসিটিতে চীন থেকে 'গ্রীং রীং ভীং ব'লে যে নূতন ভাইস্‌চ্যান্সেলার এসেছেন, তিনি বল্লেন—বিশ্ববিদ্যালয় যখন বরের-ই গুদম, তখন এখানে একটা ঘটকালীর চেয়ার খুললে এই নন্-এম্প্লয়মেণ্টের দিনে অনেক ছাত্রের গতি হ'তে পারে। তবে M. M, M, পাশ করার পরে-ও যাতে আমরা ল' লেকচার শুন্‌তে পারি, তার জন্যে একটা দরখাস্ত করেছি।

নল। হংসরাজ, So fatal was never so sweet! তুমি এই বিবাহ ঘটিয়ে দাও, আমি ঘটোৎকচ-স্বরূপ তোমাকে এক টিন্ গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ খাইয়ে দেব।

হংস রাজার শেষ কথা শুনে 'Thanks' বল্‌তে গিয়ে খালি "প্যাঁক" ক'রে ফেল্‌লে। তার পর রাজাকে উদ্দেশ ক'রে বল্লে,—"আপনি প্রস্তুত হউন, আমি ক'নের বাড়ী চল্লেম। উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি অতি শীঘ্রই ফিরে আসব; আমরা হংসজাতি, একাধারে এয়ারোপ্লেন, সী-প্লেন।"

ইতি নল-নবকলেবর-কাব্যে ঘটকোচ্ছ্বাসো নাম প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

প্রকৃত বীর

চখে ঝরে জল পরের দুঃখে বেদনা-বিভুল প্রাণ,
পরের জন্য জীবন যে দেয় হাসিমুখে বলিদান,
ধন-দৌলত দুঃখীরে দিয়ে আপনি হয় যে নিঃস্ব;
স্তম্ভিত হ'য়ে সজল নয়নে নেহারে যাহারে বিশ্ব।

মুখের অন্ন ক্ষুধাতুরে দিয়ে পায় যে পরম তৃপ্তি,
নাহি থাকে মনে কামনা-কলুষ চখে মুক্তার দীপ্তি,
দীপ্ত বিভায় নির্ম্মলকায় কর্ম্ম সাধনে ধীর;
ভুবন-মাঝারে ধন্য সে জন, সেই যে প্রকৃত বীর।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

৮

এই রায়-পরিবারের জমীদারীটি আয়তনে ছোট, কিন্তু তাহার মুনাফা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। জমীদার চিরদিন প্রবাসে থাকেন, সুতরাং সমস্তই কর্ম্মচারীদের হাতে; এ অবস্থায় কায-কর্ম্ম নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইবারই কথা, কিন্তু প্রজারা ধর্ম্মভীরু বলিয়াই হউক, বা অন্যমনস্ক-প্রকৃতি, উদাসীন রে সাহেবের ভাগ্যফলেই হউক, মোটের উপর ভালভাবেই এত দিন ইহা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল উত্তরোত্তর আয় বাড়ানোর কাযটাই এত কাল স্থগিত ছিল বটে, কিন্তু চুরিটাও তেম্‌নি বন্ধ ছিল। আলেখ্যর হাতে আসিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার চেহারায় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। সুশৃঙ্খলিত করিবার অভিনব উদ্যম এখনও প্রজাদের গৃহ পর্য্যন্ত অত দূরে পৌঁছায় নাই বটে, কিন্তু তাহার আকর্ষণের কঠোরতা কর্ম্মচারিবর্গ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীর আত্ম-হত্যার পরে হঠাৎ মনে হইয়াছিল বটে, হয় ত ইহা এইখানেই থামিবে, কিন্তু হাটের ব্যাপার লইয়া আলেখ্যর কর্ম্মশীলতা পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে আকস্মিক দুর্ঘটনা এই কয় দিন তাহাকে লজ্জিত, বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, কাল অমরনাথের সহিত মুখোমুখি একটা বচসার মত হইয়া যাইবার পরে সে ভাবটাও আজ তাহার কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে আর সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এ সংসারে যাহাদের কোথাও কিছু আছে, তাহা কোনক্রমে নষ্ট করিয়া দেওয়াটাকেই কতকগুলি লোক দেশের সব চেয়ে বড় কায বলিয়া ভাবিতে সুরু করিয়া দিয়াছে এবং অমরনাথ যত বড় অধ্যাপকই হউক, সে-ও এই দলভুক্ত।

স্থির হইয়াছিল, সম্পত্তির কোথায় কি আছে, নিজে একবার পরিদর্শন করিয়া আসিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই আজ সকাল হইতে বৃদ্ধ ম্যানেজার বাবুকে সুমুখে রাখিয়া আলেখ্য কমলকিরণের সাহায্যে একটা ম্যাপ তৈরী করিতেছিল। পথঘাট ভাল করিয়া জানিয়া রাখা প্রয়োজন। উভয়ের উৎসাহের অবধি নাই, দিনের স্নানাহার আজ কোনমতে সারিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহারা সেই কর্ম্মেই নিযুক্ত হইলেন। এম্‌নি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

সঙ্গীর অভাবে ইন্দু মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের টেবলে বসিতেছিল, কিন্তু সেখানে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই অধিকাংশ সময়ই বাটীর চারিপাশে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এম্‌নি সময়ে দেখিতে পাইল, সাহেব পদব্রজে বাহির হইয়া যাইতেছেন। দ্রুতপদে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহেব চকিত হইয়া কহিলেন, তুমি একলা যে ইন্দু?

ইন্দু কহিল, দাদারা ম্যাপ তৈরী করছেন, এখনও শেষ হয়নি।

কিসের ম্যাপ?

ইন্দু কহিল, তাঁরা জমীদারী দেখতে যাবেন, পথ-ঘাট কোথায় আছে-না-আছে, সেই সমস্ত ঠিক ক'রে নিচ্চেন।

সাহেব সহাস্যে বলিলেন, আর সেখানে তোমার কোন কায নেই, না ইন্দু?

ইন্দু হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া কহিল, আপনি কোথায় যাচ্চেন, কাকাবাবু?

এই সম্বোধন আজ নূতন। সাহেব পুলকিত বিস্ময়ে

ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার ছেলেবেলার এক সঙ্গী পীড়িত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছেন, তাঁকেই একবার দেখতে যাচ্ছি, মা।

আপনার সঙ্গে যাবো কাকাবাবু?

সাহেব কহিলেন, সে যে প্রায় মাইলখানেক দূরে, ইন্দু। তুমি ত অতদূর হাঁট্‌তে পারবে না, মা।

আমি আরও ঢের বেশী হাঁট্‌তে পারি, কাকাবাবু। এই বলিয়া সে সাহেবের হাত ধরিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া পড়িল। গাড়ীখানা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইবার প্রস্তাব সাহেব একবার করিলেন বটে, কিন্তু ইন্দু তাহাতে কান দিল না।

গ্রাম্যপথ। সুনির্দ্দিষ্ট চিহ্ন বিশেষ নাই। পুকুরের পাড় দিয়া, গোয়ালের ধার দিয়া, কোথাও বা কাহারও প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া গিয়াছে, ইন্দু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েরা ছুটিয়া আসিল, পুরুষরা জমীদার দেখিয়া কায ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, বধূরা দূর হইতে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া কৌতূহল মিটাইতে লাগিল,—একটুখানি নিরালায় আসিয়া ইন্দু কহিল, এরা আমাদের মত মেয়েদের বোধ হয় আর কখনও দেখেনি, না?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, খুব সম্ভব তাই।

ইন্দু কহিল, এদের চোখে আমরা যেন কি এক রকম অদ্ভুত হয়ে গেছি, না কাকাবাবু? কথাটা বলিতে হঠাৎ যেন তাহার একটুখানি লজ্জা করিয়া উঠিল।

সাহেব জবাব দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন। দুই চারি পা নিঃশব্দে চলিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল, এরা কিন্তু এক হিসেবে বেশ আছে, না কাকাবাবু?

সাহেব পুনরায় হাসিলেন, কহিলেন, এক হিসেবে সংসারে সবাই ত বেশ থাকে, মা।

ইন্দু বলিল, সে নয়, কাকাবাবু। এক হিসেবে আমাদের চেয়ে এরা ভাল আছে, আমি সেই কথাই বল্‌ছি।

বৃদ্ধ ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মা, এদের মত কি তোমরাও এমনিভাবে জীবনযাপন কর্‌তে পারো?

ইন্দু কহিল, তোমরা আপনি কাদের বল্‌ছেন, আমি জানিনে। যদি আলোকে ব'লে থাকেন ত সে পারে না। যদি আমাকে ব'লে থাকেন ত আমি বোধ করি পারি। এই বলিয়া সে মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, বাবা-মা আমার ওপরে বেশ খুসী নন. আমাদের সমাজের মেয়েরা লুকিয়ে আমাকে ঠাট্টা-তামাসা করে. কিন্তু কি জানি কাকাবাবু, আমার ভেতরে কি আছে, আমি কিছুতেই তাঁদের সঙ্গে সমানভাবে মিশ্‌তে পারিনে। অনেক সময়েই আমার যেন মনে হয়, যেভাবে আমরা সবাই থাকি, তার বেশী ভাগই সংসারে নিরর্থক। মা বলেন, সভ্যতার এ সকল অঙ্গ, সভ্য মানুষের এ সব অপরিহার্য্য। কিন্তু আমি বলি, ভালই যখন আমার লাগে না, তখন অত সভ্যতাতেই বা আমার দরকার কিসের?

তাহার কথা শুনিয়া, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সাহেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না। ইন্দু অযাচিত অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া নিজের প্রগল্‌ভতায় লজ্জা পাইল। তাহার চৈতন্য হইল যে, সাহেবের মুখের উপর আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই। এখন কতকটা সাম্‌লাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে কহিল, যাঁদের এ সব ভাল লাগে, তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিনি, কাকাবাবু। কিন্তু যাদের ভাল লাগে না, বরঞ্চ কষ্ট বোধ হয়, তাদের এততে দরকার কি? আপনি কিন্তু আমার ওপর রাগ কর্‌তে পার্‌বেন না, তা ব'লে দিচ্ছি।

সাহেব প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিমুখে কহিলেন, না মা, রাগ করিনি।

ইন্দু বলিতে লাগিল, এই যে সব মেয়েরা সসঙ্কোচে পথের এক ধারে স'রে দাঁড়াচ্ছে, পুরুষরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ আপনাকে প্রণাম কর্‌ছে, কেউ সেলাম কর্‌ছে, এদের সঙ্গে আমাদের কিছুই ত মেলে না, কিন্তু এরা কি সব বর্ব্বর? হলই বা খালি গা, খালি পা,—তাতে লজ্জা কিসের? পরকে সম্মান দিতে ত এরা আমাদের চেয়ে কম জানে না, কাকাবাবু?

বৃদ্ধ এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিলেন না, তেম্‌নি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দু কহিল, আপনি একটা কথারও আমার জবাব দিলেন না, মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন।

এবার বৃদ্ধ কথা কহিলেন; বলিলেন, এটি কিন্তু তোমার আসল কথা নয়, মা। তুমি ঠিক জানো, তোমার বুড়ো কাকাবাবু মনে মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছেন ব'লেই কথা কবার তাঁর ফুরসৎ হচ্ছে না। আচ্ছা, তোমার দাদা কি বলেন, ইন্দু? এই বলিয়া তিনি উৎসুক নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ঔৎসুক্যের হেতু বুঝিতে ইন্দুর বিলম্ব হইল না, কিন্তু ইহার ঠিক কি উত্তর যে সে দিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

কোন কিছুর জন্যই নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করা বৃদ্ধের স্বভাব নয়, ইন্দুর এই অবস্থাসঙ্কট অনুভব করিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কবে যাবার দিন স্থির হ'ল, মা?

কোথায়, কাকাবাবু?

জমীদারী দেখ্‌তে?

ইন্দু কহিল, আমাকে তাঁরা এখনও জানান নি। কিন্তু যদি সম্ভব হয়, সে ক'টা দিন আমি আপনার কাছে থাক্‌তে পার্‌লেই ঢের বেশী খুসী হব, কাকাবাবু।

বৃদ্ধ কহিলেন, মা, এই আমার বন্ধুর বাড়ী। এস, ভেতরে চল।

ইন্দু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ঐ ত সুমুখে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, কাকাবাবু, আমি কেন আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে আসি না? আমার সঙ্গে ত এঁদের কোনরূপ পরিচয় নেই।

বৃদ্ধ কহিলেন, ইন্দু, এ আমাদের পাড়াগাঁ, এখানে পরিচয়ের অভাবে কারও ঘরে যাওয়ায় বাধে না, কিন্তু তোমাকে আমি জোর কর্‌তেও চাইনে। একটু হাসিয়া বলিলেন, তবে রোগীর ঘরের চেয়ে খোলা মাঠ যে ভাল, এ আমি অস্বীকার করিনে। যাও, শুধু এইটুকু দেখো, যেন পথ হারিয়ো না। এই বলিয়া তিনি ইন্দু অগ্রসর হইতেই কহিলেন, আর এই মাঠের পরেই বরাট গ্রাম। যদি খানিকটা এগোতে পারো, সুমুখেই অমরনাথের টোল দেখ্‌তে পাবে। যদি দেখা হয়েই যায় ত বোলো, কাল যেন সে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। এই বলিয়া তিনি সদরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

৯

মাঠের ধার দিয়া চলন-পথ বরাবর বরাট গ্রামে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াও ইন্দু সোজা গিয়া গ্রামের তে-মাথায় উপস্থিত হইল। বিরাট একটা বটবৃক্ষের ছায়ায় অমরনাথের চতুষ্পাঠী, ১০।১২ জন ছাত্র-পরিবৃত হইয়া তিনি ন্যায়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত, এমনি সময়ে ইন্দু গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অতি বিস্ময়ে প্রথমে অমরনাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কিন্তু পরক্ষণে সশিষ্য গাত্রোত্থান করিয়া বহুমানে সংবর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, এ কি আমার পরম ভাগ্য! আর সকলে কোথায়?

এক জন ছাত্র আসন আনিয়া দিল। অনভ্যাস-বশতঃ ইন্দুর প্রথমে মনে পড়ে নাই, সে আর একবার নীচে নামিয়া গিয়া জুতা খুলিয়া রাখিয়া আসনে আসিয়া উপবেশন করিয়া কহিল, আমি একাই এসেছি, আমার সঙ্গে কেউ নেই।

কথাটা বোধ হয় অমরনাথ ঠিক প্রত্যয় করিতে পারিলেন না, স্মিতমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু কহিল, কাকাবাবুর সঙ্গে আমি বেড়াতে বার হয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক পীড়িত বন্ধুকে দেখ্‌তে গেলেন, আমাকে বল্‌লেন, আপনাকে খবর দিতে, যদি পারেন, কাল একবার দেখা করবেন।

অমরনাথ কহিলেন, খবর দেবার জন্যে ত জমীদারের লোকের অভাব নেই। কিন্তু এই যদি যথার্থ হয় ত বল্‌তেই হবে, এ আমার কোন্ অজানা পুণ্যের ফল। কিন্তু কার বাড়ীতে রায়মশায় এসেছেন শুনি?

ইন্দু কহিল, আমি ত তাঁর নাম জানিনে, শুধু বাড়ীটা চিনি। কিন্তু আপনার নিজের বাড়ী এখান থেকে কত দূরে অমরনাথ বাবু?

অমরনাথ কহিলেন, মিনিট দুয়ের পথ।

আমাকে তা হ'লে একটু খাবার জল আনিয়ে দিন।

এক জন ছাত্র ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল

পরেই শাদা পাথরের রেকাবিতে করিয়া খানিকটা ছানা এবং গুড় এবং তেম্‌নি শুভ্র পাথরের পাত্রে শীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রয়োজন নাই বলিয়া ইন্দু প্রত্যাখ্যান করিল না, ছানা ও গুড় নিঃশেষ করিয়া আহার করিল, এবং জল পান করিয়া কহিল, এখন তা হ'লে আমি উঠি?

অমরনাথ এই শিক্ষিতা মেয়েটির নিরভিমান সরলতায় মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, অনাহূত আমার পাঠশালায় এসেই কিন্তু চ'লে যেতে আপনি পাবেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরেও একবার আপনাকে যেতে হবে। সেখানে আমার মা আছেন, দিদি আছেন, ছোট বোন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছেন। তাঁদের দেখা না দিয়ে আপনি যাবেন কি ক'রে? চলুন।

ইন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু সন্ধ্যা হ'তে ত দেরী নেই, কাকাবাবু যে ব্যস্ত হবেন?

অমরনাথ সহাস্যে কহিলেন, ব্যস্ত হবেন না। কারণ, তাঁকে খবর দিতে লোক গেছে।

টোলঘরের পিছন হইতেই বাগান সুরু হইয়াছে। একটা মস্ত বড় পুকুর, তাহার চারিধারে কত যে ফুলগাছ এবং কত যে ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই। অমরনাথের পিছনে সদর-বাটীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দু দেখিল, প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে দিনান্তের শেষ আলোকে বসিয়া জন দুই ছাত্র তখনও পুথি লিখিতেছে, অন্য ধারে পাঁচ সাতটি চিক্কণ পরিপুষ্ট সবৎসা গাভী ভূরি-ভোজনে নিযুক্ত, একটা মস্ত বড় কালো কুকুর একমনে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল, অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিল। সমস্ত পূর্ব্বদিক্‌টা বড় বড় ধানের মরাই গৃহস্থের সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে, একটা জবার গাছ ফুলে ফুলে একেবারে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দু ভাল করিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

মাটির বাড়ী। আট দশটি উচ্চ প্রশস্ত ঘর। প্রাঙ্গণ এমন করিয়াই নিকানো যে, জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে ইন্দুর যেন গায়ে লাগিল। সেই মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, ধূপ-ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে সমস্ত গৃহ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অমরনাথের বিধবা দিদি ঠাকুরঘরে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু খবর পাইয়া তাঁহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট বোন ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, ইন্দু অমরনাথের জননীকে প্রণাম করিল। তিনি হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, এবং যে দুই চারিটি কথা উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে ইন্দুর মনে হইল, এত বড় আদর ইহজীবনে আর কখনও সে পায় নাই। দাওয়ার উপরে বসিতে তিনি স্বহস্তে আসন পাতিয়া দিলেন।

ইন্দু উপবেশন করিলে অমরের জননী কহিলেন, গরীবের ঘরে ঠিক সন্ধ্যার সময় আজ মা কমলা এলেন।

ইন্দু শিক্ষিতা মেয়ে, কিন্তু মুখে তাহার হঠাৎ কথা যোগাইল না। শিক্ষা, সংস্কার ও অভ্যাস বশতঃ জাতির কথা তাহাদের মনেও হয় না, কিন্তু আজ এই শুদ্ধচারিণী বিধবা জননীর সম্মুখে কেমন যেন তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। কহিল, মা, আপনারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি কায়স্থের মেয়ে। আপনি আসন পেতে দিলেন?

গৃহিণী স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, তুমি যে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে লক্ষ্মী এলে। দেবতার কি জাত থাকে, মা? তুমি সকল জাতের বড়।

অমরের ছোট বোন বোধ হয় ইন্দুর সমবয়সী। সে কাছে আসিয়া বসিতেই ইন্দু তাহার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামটি কি, মা?

ইন্দু কহিল, মা, আমার নাম ইন্দু।

মা কহিলেন, তাই ত বলি, মা, নইলে কি কখনও এমন মুখের শ্রী হয়!

ইন্দু অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু আর এক দিন এলে যে তখন কি বল্‌বেন, আমি তাই শুধু ভাবি।

মা-ও হাসিয়া কহিলেন, ভাবতে হবে না, মা, আমি ভেবে রেখেছি, সে দিন তোমাকে কি বল্‌বো। কিন্তু আস্‌তে হবে।

ইন্দু স্বীকার করিল। অমরের দিদি ঠাকুরঘর হইতে ছুটী পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন

ঠাকুরের আরতি হ'তে বেশী দেরী নেই ইন্দু, তোমাকে কিছু একটু মুখে দিয়ে যেতে হবে।

ইন্দু তাঁহার পরিচয় অনুমান করিয়া লইয়া বলিল, খাওয়া আমার আগেই হয়ে গেছে দিদি, আর এক দিন এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবো, আজ আর আমার পেটে যায়গা নেই। এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল যে, এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর এক দিন আসিয়া সে ঠাকুরের প্রসাদ ও মায়ের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া যাইবে।

ইন্দু বাটী হইতে যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। অমরনাথের হাতে একটা হরিকেন লণ্ঠন। ইন্দু কহিল, আলোটা আর কাউকে দিন, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

অমরনাথ কহিলেন, পৌঁছে দেবার লোক আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তার মানে?

তার মানে আপনি অনাহূত আমার ঘরে এসেছিলেন। এখন পৌঁছে দিতে যদি আর কেউ যায় ত আমার অধর্ম্ম হবে।

কিন্তু ফির্‌তে যে আপনার রাত্রি হয়ে যাবে, অমরনাথ বাবু?

তার আর উপায় কি? পাপ অর্জ্জন করার চেয়ে সে বরঞ্চ ঢের ভাল।

ইন্দু কহিল, তবে চলুন। কিন্তু আজ আমার একটা ভুল ভেঙে গেল। আমরা সবাই আপনাকে বড় দরিদ্র ভাবতাম।

অমরনাথ মৌন হইয়া রহিলেন। ইন্দু কহিল, আপনাদের বাড়ী ছেড়ে আমার আস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছিল না। আমার ভারি সাধ হয়, আলোদের বাড়ী ছেড়ে আমি দিনকতক মায়ের কাছে এসে থাকি।

অমরনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, অত বড় সৌভাগ্যের কল্পনা কর্‌তেও আমাদের সাহস হয় না। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
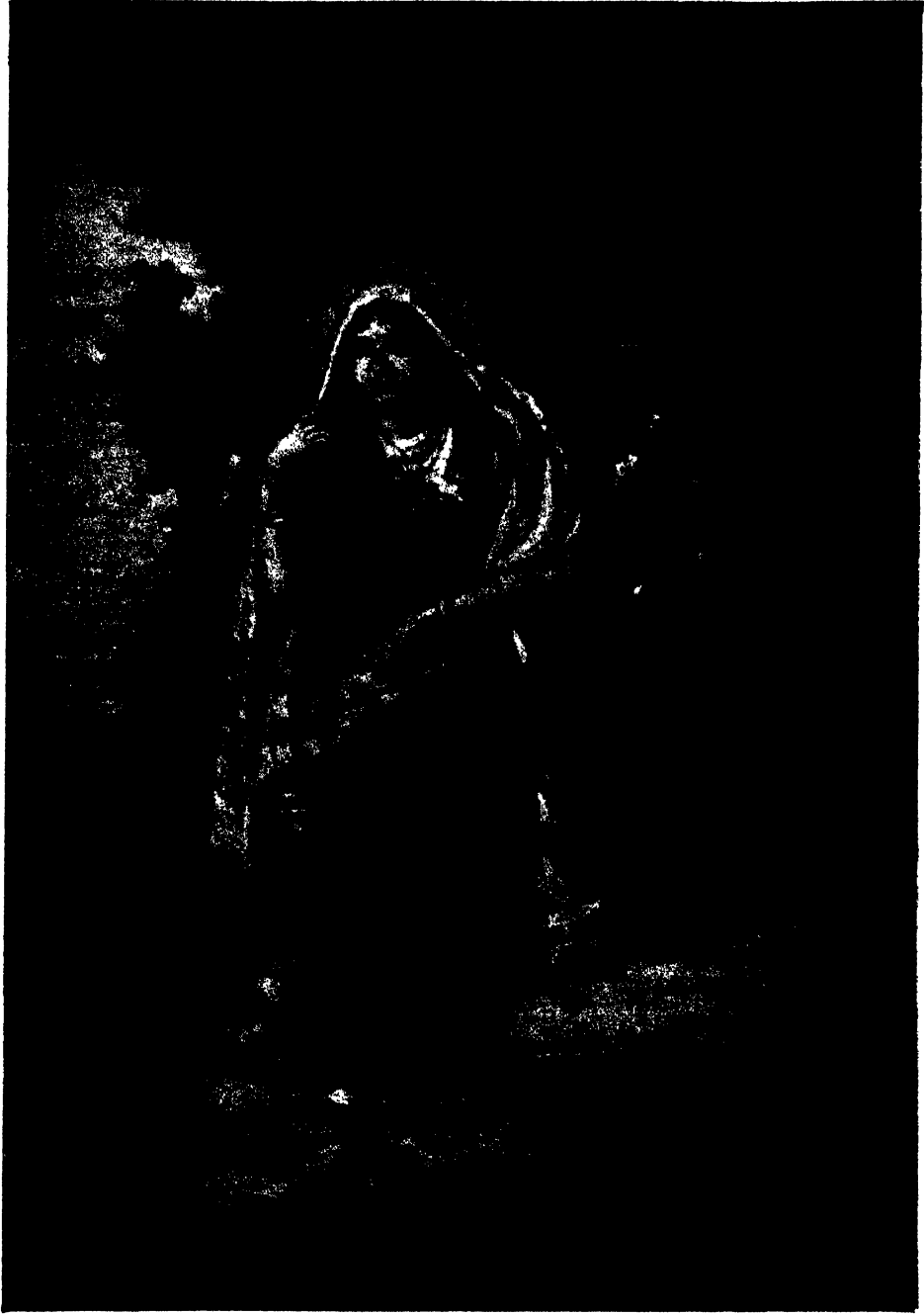
বাঁশীর তানে শ্রীরাধা

কিষণ চূড়াতে, সুনীল আকাশে, আজি কি গো হোলি খেলে !
গোধূলির মুখে, কে দিল আবির, কে ফেলিল হোলি জলে !
লালে লাল পথ, মাধুরিমা কত, সিন্দুরের রেখা কেশে,
চলিছে রাধিকা, যমুনার জলে, অভিসারিকার বেশে।

কাজল বরণ, ময়ূর হেরিয়া, থমকি দাঁড়াল আধা ;
দূর বন হ'তে, সমীরণ স্বনি, বলে রাধা, রাধা, রাধা।
ভুলি গেল রাই, কনক-কলসী, ভুলি গেল রাই আন।
সাপুরা বাঁশীতে, ফণিনী যেমতি, পাতিয়া রহিল কান॥

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

৪র্থ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ [২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম)

শ্রীযুত অধরের বাড়ী রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্ত-সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

[বালকের বিশ্বাস ; অস্পৃশ্য জাতি (the Untouchables) ও শঙ্কর ; সাধুর হৃদয়]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় অধরের বাড়ী শুভাগমন করিয়াছেন। ঠাকুর অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। বৈকালবেলা। রাখাল, অধর, মাষ্টার, ঈশান * প্রভৃতি ও অনেকগুলি পাড়ার লোক উপস্থিত। শ্রীযুত নরেন্দ্রের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। শ্রীযুত ঈশান মুখোপাধ্যায় পেন্সন লইবার পর ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাতায়াত করেন ও ভাটপাড়াতে গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তা করেন। সম্প্রতি ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবার ইচ্ছা ছিল।

আজ শনিবার, ২২এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। তোমার সেই গল্পটি বল ত ; ছেলে চিঠি পাঠিয়েছিল।

ঈশান (সহাস্যে)। একটি ছেলে শুনলে যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই সে প্রার্থনা জানাবার জন্য একখানি চিঠি লিখে ডাক-বাক্সে ফেলে দিছিল। ঠিকানা দিছিল, স্বর্গ। (সকলের হাস্য)

---

* শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসিতেন। তিনি Accountant General's Officeএ এক জন Superintendent ছিলেন। Pension (পেন্‌সন) লইবার পরে তিনি দান-ধ্যান ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন ও ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন করিতেন। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর এক দিন আসিয়া নরেন্দ্রাদি ভক্ত সঙ্গে আহারাদি করিয়াছিলেন ও প্রায় সমস্ত দিন ছিলেন। সেই উপলক্ষে ঈশান অনেকগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

ঈশানের পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপাল,—District Magistrate হইয়াছিলেন। মধ্যম শ্রীশচন্দ্র District Judge হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশ নরেন্দ্রের সহপাঠী, সুন্দর পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। তিনি গাজীপুরে সরকারী কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারই বাসায় নরেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবস্থায় কিছু দিন ছিলেন ও সেইখানে থাকিয়া পাওহারী বাবাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত গিরীশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Asst. Registrarএর কার্য্য অনেক দিন করিয়াছিলেন।

ঈশান এত দান করিতেন যে, শেষে দেনাগ্রস্ত হইয়া অতি কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছিল।

ঈশান ভাটপাড়ায় প্রায় মধ্যে মধ্যে গিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। দেখলে! এই বালকের মত বিশ্বাস। তবে হয়। (ঈশানের প্রতি) আর সেই কর্ম্মত্যাগের কথা?

ঈশান। ভগবান্ লাভ হ'লে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়। গঙ্গা-তীরে সকলে সন্ধ্যা কচ্ছে, এক জন কচ্ছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্‌লে, আমার অশৌচ হয়েছে, সন্ধ্যা * কর্‌তে নাই। মরণা-শৌচ, আর জন্মাশৌচ, দুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মা'র মৃত্যু হয়েছে, আত্মারামের জন্ম হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) আর সেই সমন্বয়ের কথা। সব মত দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। *

ঈশান (সহাস্যে)। হরি-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। যিনিই হরি—তিনিই হর। বিশ্বাস থাক্‌লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আর সেই কথাটি—সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

ঈশান (সহাস্যে)। সকলের চেয়ে বড় পৃথিবী, তার চেয়ে বড় সাগর, তার চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর আত্মজ্ঞান হ'লে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি?

ঈশান। কাশীতে গঙ্গাস্নান ক'রে শঙ্করাচার্য্য সিঁড়িতে উঠছেন, এমন সময় কুক্কুরপালক চণ্ডালকে সাম্‌নে দেখে বল্‌লেন, এই, তুই আমায় ছুঁলি! চণ্ডাল বল্‌লে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই—আমিও তোমায় ছুঁই নাই; আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নির্লিপ্ত। সুরাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আর গঙ্গাজলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব এ দু'য়ে কি ভেদ আছে? †

ভগবান্ বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সেই বিষ্ণুপদ সাধুর হৃদয়ের মধ্যে! তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

এই সকল কথা শুনিয়া ভক্তরা আনন্দ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম-উপাসনা। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

Identity of God the Absolute and God, the Creator, Preserver and Destroyer.

ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবেন। গায়ত্রী ব্রহ্মমন্ত্র। একবারে বিষয়-বুদ্ধি না গেলে

---

* মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥
হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥
—মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ, ২য় অধ্যায়।

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥—গীতা।

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।—গীতা।

ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। * কিন্তু কলিতে অন্নগত প্রাণ—বিষয়-বুদ্ধি যায় না। রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, মন এই সব বিষয় লয়ে সর্ব্বদাই থাকে। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে বেদমত চলে না। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। শক্তির উপাসনা করিলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলে। দু'টা আলাদা জিনিষ নয়—একই জিনিষ।

[The quest of the Absolute and Ishan The Vedantic position, 'I am He' সোঽহং]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। কেন নেতি নেতি ক'রে বেড়াচ্ছো? ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় অস্তি মাত্রম্, † কেবলম্ রামঃ।

"আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি, সবই সেই আদ্যাশক্তির, চিৎশক্তির ঐশ্বর্য্য—সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীব জগৎ; আবার ধ্যান, ধাতা, ভক্তি, প্রেম; সব তাঁর ঐশ্বর্য্য।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ [রাখাল, যৌবনে]

"কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করছেন; বলছেন, হে রাম, তুমিই সেই পরব্রহ্ম, আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা দু'জনে অভেদ। যেমন সর্প ও তার তীর্য্যগ্‌গতি, সাপের মত গতি ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে; আর সাপকে ভাবলেই সাপের গতি ভাবতে হয়। দুগ্ধ ভাবলেই দুধের বর্ণ ভাবতে হয়, ধবলত্ব। দুধের মত সাদা ভাবতে গেলেই দুধকে ভাবতে হয়। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তিকে ভাবতে হয়।

"এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ ক'রে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম, তাই হলুম'। 'আমিই তুমি', 'তুমিই আমি'।

"যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোঽহম্ অর্থাৎ 'আমিই সেই পরব্রহ্ম', এ কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ মা—মা ব'লে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবকভাবই ভাল। এই দাস-ভাব থেকে আবার সব ভাব আসে—শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভাল-বাসে, তা হ'লে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে ব'স্; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বস্‌তে যায়, মনিব রাগ কর্‌বে না?"

[আদ্যাশক্তি ও অবতার-লীলা ও ঈশান। What is Maya? বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের সমন্বয়।]

"অবতার-লীলা এ সব চিৎশক্তির ঐশ্বর্য্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই চিৎশক্তি বা মা, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।"

ঈশান। হরি, হর এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (সকলের হাস্য)

---

* তদ্ বা এতৎ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টম্ দ্রষ্টৃ
অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ;
নান্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতঃ অস্তি শ্রোতৃ
নান্যৎ অতঃ অস্তি, মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ।—বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ,
অক্ষর ব্রহ্মপ্রকরণ।

† নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
*　　*　　*　　*　　*
অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।
—কঠ-উপনিষৎ, ২, ৩।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।—গীতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এক বৈ দুই কিছু নাই। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, আবার তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ।

"সেই চিৎশক্তি, মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, যত ঋষিরা রামকে দর্শন ক'রে কেবল এই কথাই বল্‌ছে, হে রাম, তোমার মায়ায় মুগ্ধ করো না।" *

ঈশান। এ মায়াটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যা কিছু দেখছ, শুন্‌ছ, চিন্তা কর্‌ছ, সবই মায়া। এক কথায় বল্‌তে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

"পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা এ সবতাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ কর্‌লে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ। গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তি লাভ করে, মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ মনে ত্যাগ দুই-ই করবে।"

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[Keshab Chandra Sen and Renunciation. 'নববিধান' ও নিরাকারবাদ; Dogmatism.]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম, যে ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাক্‌লে কেমন ক'রে ভাল হয়?"

এক জন ভক্ত। মহাশয়, নববিধান কি রকম; যেন ডালখিচুড়ীর মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর একটা ঈশ্বর? বলে, নববিধান নূতন বিধান; তা হবে! যেমন ছ'টা দর্শন আছে, ষড়দর্শন, তেমনি আর একটা কিছু হবে।

"তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জান? ভুল এই, তারা বলে, তিনি নিরাকার; আর সব মত ভুল।

"আমি জানি, তিনি সাকার নিরাকার দুই-ই; আরও কত কি হ'তে পারেন। তিনি সবই হ'তে পারেন। *

(ঈশানের প্রতি) "সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব † হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান কর্‌ছিলাম; ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে মন চ'লে গেল রস্‌কের বাড়ী। রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বল্লুম, থাক্ শালা ঐখানেই থাক্। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ীর লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই মা, আর সকলের ভিতর সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র।

"সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ? আমি ও দেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়ীতে কালীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে দিয়েছে। এক জন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, মা'র গলায় পৈতে কেন? যার বাড়ীর ঠাকুর, সে তাকে বল্‌লে, 'ভাই, তুই মা'কে ঠিক চিনেছিস্, কিন্তু আমি কিছু জানি না, মা পুরুষ কি মেয়ে!'

"এই রকম আছে যে, সেই মহামায়া শিবকে টপ

---

* দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥—গীতা।

* 'নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ'—গীতা, ১০ম অঃ।
† মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥—গীতা, ১৩ অঃ।

ক'রে খেয়ে ফেল্‌লেন। মা'র ভিতরে ষট্‌চক্রের জ্ঞান হ'লে শিব মা'র উরু দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তখন শিব তন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।

"সেই চিৎশক্তি মহামায়ার শরণাগত হ'তে হয়।"

ঈশান। আপনি কৃপা করুন।

[ঈশানকে শিক্ষা, 'ডুব দাও'। গুরুর কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শাস্ত্র ও ঈশান। Mere book-learning.]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরলভাবে বল, হে ঈশ্বর, দেখা দাও; আর কাঁদ, আর বল, হে ঈশ্বর, কামিনীকাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর।

"আর ডুব দাও। উপর উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।

"গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। এক জন বাণ-লিঙ্গ শিব খুঁজতেছিল। কেউ আবার ব'লে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে; সেই গাছের কাছে একটি ঘূরণী জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।"

ঈশান। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দই * গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। শূদ্র (একলব্য) মাটীর দ্রোণ তৈয়ার ক'রে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটীর দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে; তাই-তেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হ'ল।

"আর তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি কোরো না। ওদের চিন্তা দু' পয়সা পাবার জন্য।

"আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডী পাঠ কি আর কিছু পাঠ করছে। তা দেখেছি, অর্দ্ধেক পাতা উল্টে যাবে। (সকলের হাস্য।)

"নিজের বধের জন্য একটি নরুণেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল তরয়াল—শাস্ত্র।

"নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। * যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জ্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব ক'রে দেবেন।"

[গোপনে সাধন। শুচিবাই ও ঈশান]

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করিবার জন্য গঙ্গা-কূলে আটচালা বাঁধিতেছিলেন, এই কথা ঠাকুর শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া, ঈশানের প্রতি)। হ্যাঁ গা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? কি জান, ও সব কায লোকের খপরে যত না আসে, ততই ভাল। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে, কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে।

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইয়া যান। হাজরা মহাশয় শুচিবায়ের ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। আর দেখ, বেশী আচার করো না। এক জন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল, সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বল্‌লে, তোমার ডোল † (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার? ভিস্তি বল্‌লে, মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বল্‌ছি, আমার ডোল থেকে জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেট।

"আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা হ'লে আর

---

* "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য।
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌।"—গীতা।

* উত্তমা তত্ত্বচিন্তা এব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্‌।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্তি অধমাধমা।
মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ, ২, ২১।

† নবদ্বারমলস্রাবং সদাকালে স্বভাবজম্‌।
দুর্গন্ধং দুর্ম্মলোপেতং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে॥
—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ।

তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।" এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন।

গান (সিদ্ধাবস্থায় কর্ম্মত্যাগ)।

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী ব'লে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চ মুখে গুণ গায়॥
দয়া ব্রত দানাদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরি যাগ-যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়॥

ঈশান সব শুনিয়া চুপ করিয়া আছেন।

[ঈশানকে শিক্ষা, বালকের ন্যায় বিশ্বাস। আগে জনকের ন্যায় সাধন, তবে সংসারে ঈশ্বরলাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি)। আর কিছু খোঁচ-মোচ (সন্দেহ) থাকে, জিজ্ঞাসা কর।

ঈশান। আজ্ঞা, যা বলেছিলেন, বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব বিশ্বাস কর্‌লে আরও শীঘ্র হয়। গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তা হ লে দুধ কম দেয়; সব রকম গাছ খেলে সে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে দুধ দেয়।

"রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের ছেলে গল্প করেছিল যে, এক জনের প্রতি আদেশ হ'ল, দেখ, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখিস। সে তাই বিশ্বাস কর্‌লে, সর্ব্বভূতে যে তিনিই আছেন।

"গুরু ভক্তকে ব'লে দিছিলেন যে, 'রামই ঘট্ ঘট্‌মে লেটা'। ভক্তের অমনি বিশ্বাস যে, যখন একটা কুকুর রুটী মুখে ক'রে পালাচ্ছে, তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে ক'রে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে, আর বল্‌ছে, রাম একটু দাঁড়াও রুটীতে ঘি মাখান হয়-নাই!

"আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বল্ তো, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ রাম এই মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে কোটী সন্ধ্যার ফল হয়।

"আবার আমাকে কৃষ্ণকিশোর চুপি চুপি বল্‌ত, বোলো না কারুকে, আমার সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না।

"আমারও ঐ রকম হয়। মা দেখিয়ে দেন যে, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আস্‌ছি, পঞ্চবটীর দিকে; দেখি, সঙ্গে একটি কুকুর আস্‌ছে, তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান।

"তাই তুমি যা বল্‌লে, বিশ্বাসেতেই সব মিলে।"

[The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace.]

ঈশান। আমরা কিন্তু গৃহে রয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই বা, তাঁর কৃপা * হ'লে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ গান গেয়েছিল, 'এই সংসার ধোঁকার টাটী।' তাকে এক জন উত্তর দিছিল আর একটি গানের ছলে—

গান

এই সংসার মজার কুটী।
জনক রাজা মহাতেজা
তার কিসে ছিল ত্রুটী।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দু'দিক রেখে,
খেয়েছিল দুধের বাটি॥

"কিন্তু আগে নির্জ্জনে গোপনে সাধন-ভজন ক'রে ঈশ্বর লাভ ক'রে সংসারে থাক্‌লে, জনক রাজা হওয়া যায়। তা না হ'লে কেমন ক'রে হবে!

"দেখ না, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সবই রয়েছে; কিন্তু শিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম ক'রে নৃত্য কর্‌ছেন!"

শ্রীম—

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥—গীতা।

প্রলয়ের আলো

[অষ্টাদশ বৎসরের পরবর্ত্তী আখ্যায়িকা]

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুরিচ নগরের স্মিট্ এণ্ড সন্স

এই উপন্যাসে আমরা যে সময়ের কথার আলোচনা করিতেছি, তাহার বহু বৎসর পরে যুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময় সুবিশাল রুস-সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত। রুসিয়ার জার তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি; প্রাচীন মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধাংশের কোটি কোটি অধিবাসিগণের ভাগ্য-সূত্র তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। সে সময় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিজ্ঞের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই যে, অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত না হইতেই রুস-সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় বিরাট বনিয়াদ রুদ্রের এক ফুৎকারে শতধা বিদীর্ণ হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিবে এবং 'রুসিয়েশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' জারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শোণিতের অক্ষরে যথেচ্ছাচারের স্মৃতি বহন করিবে।

সেই সময় সুইট্জার্লাণ্ডের একাংশে ফরাসীর ও অন্য অংশে জার্ম্মাণীর প্রাধান্য ছিল; জেনিভা ফ্রেঞ্চ সুইট্-জার্লাণ্ডের ও জুরিচ জার্ম্মাণ সুইট্জার্লাণ্ডের রাজধানী। এই উভয় রাজধানীর মধ্যে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, কিন্তু বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনিভার প্রভাব-প্রতিপত্তি যেমন খর্ব্ব হইতেছিল, সেই অনুপাতে জুরিচের উন্নতি হইতেছিল।

জুরিচ নগরী লেমান হ্রদের তটে প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে জুরিচ জেনিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লেমান হ্রদের দৃশ্য-বৈচিত্র্য ভুবন-বিখ্যাত। জুরিচ আকারেও জেনিভা অপেক্ষা বৃহত্তর। জুরিচের অধি-বাসিসংখ্যাও অনেক অধিক। জুরিচের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে উয়েট্লি বার্জ নামক সুপ্রশস্ত মালভূমি অবস্থিত, সমুদ্রতল হইতে ইহা প্রায় ৩ হাজার ফুট উচ্চ। এই স্থান হইতে পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

এই সময় জুরিচে যে সকল লোহার কারখানা ছিল, তন্মধ্যে স্মিট্ এণ্ড সন্সের কারখানাটি সকল বিষয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ফ্রিজ স্মিট্ দরিদ্র কৃষকের সন্তান। তাহার পিতার কয়েক বিঘা জোত ছিল, সে সেই জমী চাষ-আবাদ করিয়া যে শস্য পাইত, তাহাতে সেই দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। ফ্রিজের পিতার সাতটি সন্তান ছিল, তাহাদের মধ্যে ফ্রিজই বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী ও উচ্চাভিলাষী ছিল। সে তাহার পিতার আদর্শে কৃষাণী করিয়া অর্দ্ধাহারে পল্লীপ্রান্তে দেহপাত করিতে সম্মত হইল না। সে দেখিত, কামাররা কৃষক অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, বৎসরের মধ্যে ৬ মাস এক বেলা উপবাস করিতে হয় না।

ফ্রিজ কামারের কায শিখিবার জন্য এক দিন প্রভাতে একাকী একবস্ত্রে রিক্ত-হস্তে জুরিচে উপস্থিত হইল এবং এক জন কামারের কারখানায় গিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কামার তাহাকে সুশীল, বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী দেখিয়া কারখানার কায-কর্ম্ম শিখাইতে লাগিল। ফ্রিজ এই সুযোগ নষ্ট করিল না। সে অল্প-দিনেই ভাল মিস্ত্রী হইল, সকলেই তাহার কাযের আদর করিতে লাগিল।

কিন্তু ফ্রিজ সেই ক্ষুদ্র কারখানায় সামান্য সামান্য কায লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে চাকরীর উমেদারীতে একটা বড় কারখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করিল। সেই কারখানার মালিক পূর্ব্বেই ফ্রিজের সুনাম শুনিয়াছিল, সে সাদরে ফ্রিজকে নিজের কারখানায় চাকরী দিল। ফ্রিজ সেই কারখানায় ৫ বৎসর চাকরী

করিল, তাহার কার্য্যদক্ষতায় কারখানার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে কারখানার মালিক তাহার একমাত্র কন্যা ক্রলিন আনা গট্‌সকের সহিত ফ্রিজের বিবাহ দিয়া কারবারের বখরাদার করিয়া লইল।

কয়েক বৎসর পরে শ্বশুরের মৃত্যু হওয়ায় ফ্রিজই সেই কারখানার ষোল আনা মালিক হইল, কিন্তু তাহার স্ত্রী আনা তাহাকে কৃপার পাত্র বলিয়াই মনে করিত। সে ভাবিত, সে ফ্রিজ স্মিট্‌কে বিবাহ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছে, তাহার ও তাহার পিতার অনুগ্রহ-ভাজন হইতে না পারিলে ফ্রিজকে চিরজীবন লোহা ঠেঙ্গাইয়াই উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত, কিন্তু পত্নী কর্ত্তৃক নিত্য উপেক্ষিত হইলেও ফ্রিজ কোন দিন তাহার গর্ব্বিতা স্ত্রীর মনোরঞ্জনে অবহেলা প্রকাশ করে নাই। ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতায় কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার কারখানা জুরিচের সকল কারখানাকে ছাড়াইয়া উঠিল। কারবারে প্রতি বৎসর তাহার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হইতে লাগিল।

আনার গর্ভে ফ্রিজের তিনটি পুত্র-সন্তান ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি পুত্র অল্পবয়সেই কোন দুর্ঘটনায় মারা যায়। অন্য ছেলে দু'টি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের পিতার কারবারের অংশীদার হইল। তখন এই কারখানার নাম হইল 'স্মিট্ এণ্ড সন্স।' ছেলে দুটি কায-কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে ফ্রিজ কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিল। কিন্তু সে দীর্ঘকাল বিরামসুখ উপভোগ করিতে পারিল না, বিশ্রামগ্রহণের কয়েক মাস পরেই তাহার মৃত্যু হইল। জুরিচের বণিকসমাজ তাহার মৃত্যুতে শোক-সভার অনুষ্ঠান করিলেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহার জীবন-কথার আলোচনা হইল এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, জুরিচের সম্ভ্রান্ত বণিকসমাজে এক জন প্রকৃত কর্ম্মবীরের অভাব হইল, তাহার স্থান সহজে পূর্ণ হইবে না।

স্বামীর মৃত্যুর পর আনা শোকাভিভূতা হইয়া কয়েক মাস কারখানার কায-কর্ম্ম কিছুই দেখিল না। কিছু দিন পরে সে নূতন উৎসাহে পুত্রদ্বয়ের সহিত যোগ দিয়া কারবারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় জুরিচের সম্ভ্রান্তসমাজে মিশিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ হইল এবং সে জন্য আনা মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। বড় বড় মজলিসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার জন্য সে একখানি উৎকৃষ্ট 'ব্রুহাম' গাড়ী কিনিল, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ও বিস্তর বাড়িয়া গেল। তাহার বসিবার ঘরটি নানা মূল্যবান্ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত হইল।

যৌবনকালে আনা স্মিট্ সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিণত বয়সে সে স্থূলাঙ্গী হইয়াছিল; এত মোটা হইয়াছিল যে, চলিতে-ফিরিতে তাহার কষ্ট হইত এবং অল্প পরিশ্রমেই হাঁপাইয়া উঠিত। মাথায় দুই চারিটি পাকা চুল দেখিয়া তাহার মনে যে ক্ষোভ ও দুঃখ হইল, বৈধব্য-যন্ত্রণা তাহার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ!

আনার ছেলে দুইটির বৈষয়িক বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, তাহার উপর তাহারা বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মায়ের কঠোর শাসনে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইবার সুযোগ পায় নাই। আনা তাহাদের কারবারের পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে কারবারটি নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা সামলাইয়া লইয়া মায়ের উপদেশে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর ন্যায় কায-কর্ম্ম চালাইতে লাগিল। মায়ের কোন আদেশ তাহারা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত না।

আনার ছেলে দুইটির মধ্যে বড়টির নাম ফ্রিজ ও ছোটটির নাম পিটার। এই সময় ফ্রিজের বয়স ২৮ বৎসর, পিটার তাহার ৪ বৎসরের ছোট। ফ্রিজ তাহার মাতার ন্যায় দাম্ভিক ছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, জুরিচের অন্য সকল ব্যবসায়ীকেই সে ব্যবসায়-কার্য্য শিখাইতে পারে, এমন কি, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার পিতা জীবিত থাকিলে সে তাহার নিকট ব্যবসায়ের অনেক ফন্দী-ফিকির শিখিতে পারিত। জুরিচের সম্ভ্রান্তসমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল এবং সেই সমাজের নেতৃত্বলাভের জন্য সে লালায়িত ছিল। কিন্তু পিটার তাহার ন্যায় উচ্চাভিলাষী বা বুদ্ধিমান্ ছিল না, তাহার জীবনযাত্রার প্রণালীও সাধাসিধা রকমের ছিল। তবে কায-কর্ম্ম সে ভালই

বুঝিত এবং সঞ্চয়ের দিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রথম যৌবনে বিলাসিতায় অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া সে অনেক সময় আপশোষ করিত।

ফ্রিজ ও পিটার অপেক্ষা তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী বার্থার সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। যখন তাহার বয়স ১৮ বৎসর, সেই সময় সে পিতৃহীনা হয়। বার্থা অসাধারণ সুন্দরী ছিল, এমন কি, জুরিচের আভিজাত্য-গর্ব্বিত অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেও বার্থার স্থায় সুন্দরী দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাহার মুখখানি যেমন সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠবও সেইরূপ নিখুঁত ছিল। তাহার রূপ-লাবণ্য সকলকেই মুগ্ধ করিত।

বার্থার জন্মের পর হইতেই তাহার মাতার সঙ্কল্প হইয়াছিল—মেয়েটিকে সে জমীদারের মেয়ের আদর্শে মানুষ করিয়া তুলিবে। তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে কোন ডিউক, মার্কুইস বা কাউণ্টের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবে। এইরূপ কোন মহাকুলীনের ঘরে বার্থার বিবাহ দিতে পারিলে সমাজে তাহারও বংশ-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; ডিউক বা মার্কুইসের বেয়ানকে কেহই 'কামারণী' বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তিনী হইয়া আনা বার্থার শৈশবকাল হইতেই তাহাকে রাজনন্দিনীর মত প্রতিপালন করিতে লাগিল। আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদে সর্ব্বদা তাহাকে সজ্জিত রাখিত। সে বার্থার জন্ম দুইটি পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিল।

বার্থার ৫ বৎসর বয়সের সময় আনা অনেক টাকা বেতন দিয়া এক জন শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া, তাহার হস্তে বার্থার শিক্ষার ভার অর্পণ করিল, এই শিক্ষয়িত্রীর চেষ্টা-যত্নে বার্থা অল্পদিনেই সুন্দর লেখা-পড়া শিখিল; এমন কি, ১২ বৎসর বয়সে সে যাহা শিখিল, জুরিচের কোন বালকবালিকা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বয়সেও সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে নাই। সকলেই বলিতে লাগিল—এ মেয়ে কালে রাজরাণী হইবে। এই ভবিষ্য-বাণী শুনিয়া আনার হৃদয় আনন্দে ও আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া উঠিত।

বার্থার বয়স দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকাদের স্থায় তাহাকেও সুইস্ রাজধানী বার্ণি নগরের একটি প্রথম শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইল। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বার্থা অল্পদিনেই সঙ্গীত ও চিত্র-বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিল। তাহার মা সেই সময় হইতেই তাহার জন্ম বর খুঁজিতে আরম্ভ করিল, য়ুরোপের কোথায় কোন্ কোন্ উপাধিমাত্রসম্বল নিঃস্ব কুলীন-নন্দন যৌতুকের লোভে সাধারণ লোকের কন্যা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে উৎসুক—তাহাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করিবার জন্ম আনা স্মিট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। লর্ড, ডিউক, কাউণ্ট, মার্কুইস্ প্রভৃতি উপাধিধারী ভিক্ষুক-(Titled beggars) গণের দল হইতে জামাতা সংগ্রহ করিতে হইলে বিস্তর টাকার যৌতুক দিতে হইবে, ইহা আনা স্মিটের অজ্ঞাত ছিল না। অল্প টাকায় কুলীন জামাই কিনিতে পাওয়া যায় না বুঝিয়া কন্যা-জামাতাকে ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক যৌতুক দিবে—এ কথা সে সামাজিক বৈঠক ও মজলিসে সদম্ভে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আনা স্মিটের আশা হইল, জার্ম্মাণীর যোত্রহীন রাজকুমারদের (German pauper princes) দলের কেহ না কেহ তাহার চারে আসিয়া টোপ গিলিবে, তাহার দীর্ঘকালের স্বপ্ন সফল হইবে।

কিছু দিন পরে আনা স্মিট্ জুরিচের কয়েক মাইল দূরে হর্জেন নামক সৌখীন পল্লীতে একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত অট্টালিকা ভাড়া লইয়া, সেই বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এই পল্লী হ্রদের ধারে অবস্থিত। হর্জেনে বাস করা সে সময় জুরিচের ধনাঢ্য জমীদার ও বণিক্‌গণের একটা 'ফ্যাসান' হইয়া উঠিয়াছিল। হর্জেনে বাস না করিলে সম্ভ্রান্ত সমাজে উপেক্ষিত হইতে হইত; বড়লোকের সহিত সংস্রব রাখাও কঠিন হইত। এই জন্যই আনা স্মিট্‌কে হর্জেনে হ্রদের ধারে আসিয়া চার ফেলিতে হইল। সে যে বাড়ীখানি ভাড়া লইয়াছিল—তাহার নাম 'বো-সিজোর।' এই বাড়ীখানি সেই অঞ্চলের সকল বাড়ীর সেরা ছিল। আনা স্মিট্ সপ্তাহে এক দিন এই বাড়ীতে জুরিচের সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য অধিবাসিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিত; বিশিষ্ট ধনবান্ ও উচ্চবংশীয় লোক ভিন্ন অন্য কাহারও সেখানে

প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু যাহারা সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত, তাহাদের মধ্যে কোনও রাজপুত্র, লর্ড, ডিউক, মার্কুইস্ ছিল না; সুতরাং সে শীঘ্র আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিল না। আনা স্মিট্ হতাশ না হইয়া সঙ্কল্প করিল—শীঘ্রই তাহার পুত্রদ্বয়কে দেশভ্রমণ উপলক্ষে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিবে এবং তাহাদের সাহায্যে মনের মত শীকার সংগ্রহ করিবে। ইহা অত্যন্ত সাহসের কায বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালিনী কর্ম্মকার-নন্দিনীর সাহসের অভাব ছিল না। সে অনেক পুরুষের কান কাটিতে পারিত।

বার্থা তাহার উচ্চাভিলাষিণী, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা জননীর সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিল না; সে বার্নির বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণের সহবাসে যুবতীজনসুলভ আমোদ-প্রমোদে, নৃত্যগীত ও চিত্রকলার অনুশীলনে তাহার দিনগুলি সুখেই কাটিতেছিল।

বার্থা নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইলেও বয়োধর্ম্মে গোপনে এমন একটি কায করিতেছিল—যে কথা জানিতে পারিলে তাহার মা ক্রোধান্ধ হইয়া কেবল তাহাকে তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহাকে অবিলম্বে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের কাছে নজরবন্দী করিয়া রাখিত।—বার্থা প্রতি সপ্তাহেই তাহার অভিভাবিকার অজ্ঞাতসারে এক একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইত এবং গোপনে সেই সকল পত্রের দীর্ঘতর উত্তর লিখিয়া পাঠাইত। কি উপায়ে এইরূপ পত্রব্যবহার অন্যের অগোচরে সুসম্পন্ন হইত, তাহা আমাদের অজ্ঞাত হইলেও 'বোর্ডিং স্কুলে'র যুবতী ছাত্রীগণের অবিদিত না থাকাই সম্ভব। একটি তরুণ যুবকের নিকট হইতে বার্থা এই সকল পত্র পাইত; বলা বাহুল্য, পত্রগুলির আগাগোড়া প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিত; তাহার ভিতর কত প্রেমের কবিতা, বিরহের কত হাহুতাশ, মিলনের জন্য কত আকুলি-বিকুলি; কত মান-অভিমানের তরঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকিত, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। বার্থা গোপনে বসিয়া সেই পত্রগুলি যেন গ্রাস করিত! এক একখানি পত্র কতবার করিয়া পড়িত—সে-ও তাহা বলিতে পারিত না। পাঠ শেষ হইলে পত্রগুলি শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া করিয়া অগ্নিমুখে সমর্পণ করিত। পত্র পাইবার পরদিন সে রাত্রি জাগিয়া সেইরূপ আবেগময়ী ভাষায় উত্তর লিখিত।

বার্থার গর্ব্বিতা জননী সারা য়ুরোপ খুঁজিয়া লর্ড, ডিউক, মার্কুইসের ঘর হইতে তাহার জন্য বর সংগ্রহ করিবার আশায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছিল; আর সে গোপনে এক অজ্ঞাতকুলশীল, কোন্ একটা নগণ্য যুবককে তাহার হৃদয় বিলাইয়া দিয়া তাহারই স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল। অদৃষ্টের পরিহাস!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুম-চয়ন

স্মিট্ এণ্ড সন্সের সুবিস্তীর্ণ কারখানায় শত শত কর্ম্মচারী নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। প্রতি শুক্রবার যাহাদিগকে সাপ্তাহিক বেতন দেওয়া হইত, তাহাদের সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক। আনা স্মিট তাহার লোহার কারখানায় এঞ্জিন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছিল, এ জন্য তাহাকে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছিল।

আনা স্মিটের কারখানায় একটি যুবক চাকরী করিত; তাহার নাম জোসেফ কুরেট। জোসেফ দরিদ্র কৃষিজীবীর সন্তান। তাহার পিতামাতা সুইটজার্লাণ্ডের লোক না হইলেও তাহারা বহুকাল হইতে জুরিচে বাস করিতেছিল; এই কুরেট-পরিবারের পূর্ব্ব-ইতিহাস—অর্থাৎ তাহারা কোন্ দেশ হইতে আসিয়া জুরিচে বাস করিতেছিল, কত দিন পূর্ব্বে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, এ সকল কথা কেহই জানিত না। তাহারা জর্ম্মাণ ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় অনর্গল কথা বলিতে পারিলেও সকলেই তাহাদিগকে বিদেশী মনে করিত। তাহারা নিজেদের কাযকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, কোন রকম অনধিকার-চর্চ্চা করিত না; প্রতিবেশিগণের প্রতি তাহাদের হিংসা-দ্বেষও ছিল না। এই সকল কারণে সকলেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত। জুরিচের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা বাস করিত, কুটীর-সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমী তাহাদের দখলে ছিল; তাহাই চাষ-আবাদ করিয়া তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইত।

জোসেফ কুরেটের বয়স ২১৷২২ বৎসরের অধিক নহে; জুরিচের কোন বিদ্যালয়ে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাহার যথেষ্ট অনুরাগ থাকিলেও আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ তাহাকে লেখা-পড়া ছাড়িয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। সে স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানায় শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়া আনা স্মিটের অনুকম্পায় একটি চাকরী পাইয়াছিল। জোসেফ সরল, বিনয়ী ও পরিশ্রমী বলিয়া কর্ত্রীর নেকনজরে পড়িয়াছিল। তাহার রুচি, প্রকৃতি ও চেহারা দেখিয়া দরিদ্র কৃষকের পুত্র বলিয়া মনে হইত না। তেমন রূপবান্ যুবক সম্ভ্রান্ত পরিবারেও সর্ব্বদা দেখা যাইত না। অন্যান্য সুপারিসের মধ্যে চেহারাও একটা বড় সুপারিস। অনেকে বলিত, এই সুপারিসের জোরেই জোসেফ কর্ত্রীর অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিল। জোসেফের পাঠানুরাগ প্রবল ছিল, সে রাশি রাশি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অবসর-কালে পাঠ করিত; অন্যান্য যুবকের ন্যায় আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করিত না। বিজ্ঞানের অনুশীলনে সে বড়ই আনন্দলাভ করিত।

জোসেফ স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানায় প্রবেশ করিবার পর হইতেই কর্ত্রীর স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে এমন একটি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল যে, তাহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ও উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীরাও তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সমাজের যে স্তরের লোক, সেই স্তরের বহু ঊর্দ্ধে তাহার স্থান ছিল; কোন প্রকার ইতরতা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। যেন সে শাপভ্রষ্ট হইয়াই সাধারণ কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আনা স্মিট মানুষ চিনিত, সে জোসেফকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত, এ জন্য তাহার অনেক গোপনীয় কাযের ভার জোসেফের উপর পড়িত। এই সকল কার্য্য উপলক্ষে জোসেফকে সর্ব্বদাই 'বো-সিজোরে' যাইতে হইত। বাড়ীর দাসদাসী-দের প্রতি কর্ত্রীর আদেশ ছিল—জোসেফ সেখানে যাইলে তাহারা তাহার সহিত সাধারণ কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার না করিয়া, বাড়ীর ছেলের মত ব্যবহার করিবে, তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিবে না। দাস-দাসীরা বলাবলি করিত, "ছোঁড়ার রাজপুত্রের মত চেহারার জন্যই উহার উপর বুড়ীর এত দরদ! চাকরের এত খাতির!"

আনা স্মিটের একটি যুবতী পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম সারা ষ্ট্রভোল্জ। সারার রূপের খ্যাতি ছিল। সারা শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া আনা স্মিটের সংসারে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল; এই অনাথা যুবতীকে আনা বড়ই স্নেহ করিত। সারার মা আনার জননীর পরি-চারিকা ছিল; সে মৃত্যুকালে তাহার অনাথা কন্যাকে আনার হস্তে সমর্পণ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, "সারাকে প্রতিপালন করিয়া সৎপাত্রের সহিত উহার বিবাহ দিও, যেন মেয়েটা সুখী হইতে পারে।" আনা তাহার অন্তিমপ্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। আনা স্থির করিল—আর কিছু দিন পরে সে জোসেফকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিয়া সারাকে তাহারই হস্তে অর্পণ করিবে। জোসেফের ন্যায় রূপবান্, গুণবান্ স্বামী লাভ করিলে সারার চিরজীবন সুখে কাটিবে, এ বিষয়ে আনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জোসেফ কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদা 'বো-সিজোরে' আসিত। ক্রমে তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায় সারা তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল; শেষে তাহার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল! সে ভাবিল, জোসেফকে না পাইলে তাহার জীবন-যৌবন বিফল হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু জোসেফকে সে কোন দিন মনের কথা বলিতে সাহস করে নাই; কারণ, জোসেফ কোন দিন তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, তাহার সঙ্গে রসিকতা করা ত দূরের কথা! বোধ হয়, সারার মনে হইত,—এমন রূপ-বান্ তরুণ যুবক—এখনও প্রেমের স্বাদ পাইল না?

রমণীর মনের ভাব বুঝিতে রমণীর বিলম্ব হয় না। আনা স্মিট সারার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—সে জোসেফকে ভয়ঙ্কর ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। আনা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল না। এক দিন সে সারাকে বলিল, "তুই জোসেফকে ভালবাসিয়াছিস্? সত্য কি না ঠিক বল্।"

সারা কি করিয়া সে কথা বলে? সে চোখমুখ লাল করিয়া অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; শেষে বলিল, "আপনার পাকাচুল তুলিয়া দিব কি?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, "মর্ ছুঁড়ী! আমি যেন ওকে পাকাচুল তুলিয়া দিতেই ডাকিয়াছি! তা তোর লজ্জা কি?—ভয় নাই, আমি রাগ করিব না। কেউ তোর পছন্দের নিন্দা করিতে পারিবে না। আমি জোসেফের সঙ্গেই তোর বিবাহ দিব। তোর বিবাহে আমি ৪ হাজার ফ্রাঙ্ক যৌতুক দিব, আর যে সকল কাপড়-চোপড় লাগিবে, তাহাও দিব। তোকে সংসারী হইতে দেখিলে আমার খুব আনন্দ হইবে।"

কর্ত্রীর কথায় সাহস পাইয়া সারা মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চক্ষু নামাইয়া বলিল, "আপনার ত আনন্দ হইবে, কিন্তু জোসেফ আমাকে লইতে রাজী হইবে—এ বিশ্বাস আমার নাই।"

আনা স্মিট সবিস্ময়ে বলিল, "বলিস্ কি লো! সে তোকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে না? আমার হুকুম আলবৎ সে তামিল করিবে। আমি তাহাকে রাজী করিতে পারিব; তবে তাহার মন ভুলাইবার জন্য তোকেও চেষ্টা করিতে হইবে। জোসেফ গরীবের ছেলে, তোকে বিবাহ করিলে ৪ হাজার ফ্রাঙ্ক যৌতুক মিলিবে,—এ লোভ কি সে ছাড়িতে পারিবে মনে করিয়াছিস্? জোসেফের সঙ্গে আমি তোর বিবাহ দিবই।"

কর্ত্রীর জিদের পরিচয় পাইয়া সারার হৃদয় আশা ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল। জোসেফকে কোন কাযে 'বো-সিজোর' আসিতে দেখিলেই সারা তাহার মন চুরি করিবার জন্য নির্ভয়ে সিঁদকাঠী চালাইতে লাগিল। জোসেফ মিষ্ট কথায় ও শিষ্টব্যবহারে কোন দিন কৃপণতা প্রকাশ না করিলেও অন্যান্য প্রগল্‌ভ যুবকের ন্যায় তাহার সহিত রসিকতা করিত না, মাখামাখিও করিত না, সম্ভ্রমের সহিত আলাপ করিত। ইহাতে সারা বড়ই ক্ষুব্ধ হইত। তাহার ধারণা হইল—জোসেফ তাহাকে ভালবাসে না, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য জোসেফের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই; তাহার চেষ্টা-যত্ন সকলই বৃথা! অবশেষে সে এক দিন হতাশভাবে কর্ত্রীকে বলিল, "আমার প্রতি জোসেফের এক বিন্দুও ভালবাসা নাই; সে যে কখন আমাকে ভালবাসিবে, সে আশাও নাই। আপনি যাহাই বলুন, সে আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না।"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "তুই ছুঁড়ী ভারি বোকা! জোসেফ ফক্কড় ছোঁড়াদের মত তোর সঙ্গে ছেবলামী করে না দেখিয়া মনে করিয়াছিস্ সে তোকে ভালবাসে না! জোসেফের প্রকৃতি একটু গম্ভীর, আর সে ভারি লাজুক; সে ফাজিল নয় বলিয়াই ত তাহাকে আমার এত ভাল লাগে। এ কালের ছোঁড়াগুলা এমন ঠেঁটা আর বে-তমিবৎ যে, রূপসীর দল তাহাদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে আসিলে তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রেমের কত রকম অভিনয় করে, রসের ফোয়ারা ছুটায়! জোসেফের রুচি তেমন জঘন্য নয়। তোর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই; আমার প্রতিশ্রুত ৪ হাজার ফ্রাঙ্কের লোভে সে নিশ্চয়ই তোকে বিবাহ করিবে। তোকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে আমি তাহাকে একটা ভাল চাকরী দিব; তাহার বেতনবৃদ্ধি হইলে বিবাহের পর তোদের দুজনকে অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না; বেশ সুখেই তোদের সংসার চলিবে।"

এই সকল কথায় সারার নিরাশ হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ, কয়েক দিন পরে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যে, সারার বিশ্বাস হইল, জোসেফ বাহ্য ব্যবহারে তাহার প্রতি যতই ঔদাসীন্য প্রকাশ করুক, তাহার হৃদয়-ভরা প্রেম সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

তখন জুলাই মাস। স্কুল বন্ধ হওয়ায় বার্থা তাহার মায়ের কাছে আসিয়াছিল। এক দিন বিকালে সে সারাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অট্টালিকা-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিল। তখন অপরাহ্নের অস্তোন্মুখ তপনের হিরণ-কিরণে সমগ্র প্রকৃতি সুরঞ্জিত হইয়াছিল। উদ্যানপ্রান্তবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ হ্রদের স্বচ্ছ সলিলরাশি গলিত সুবর্ণবৎ প্রতিভাত হইতেছিল এবং বহু দূরবর্ত্তী আল্পস্ গিরিমালার শুভ্র তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে শৃঙ্গে লোহিত তপন-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিচিত্র বর্ণ-গৌরব বিকাশ করিতেছিল—তাহার তুলনা নাই!

বার্থা একটি সুদৃশ্য সাজি লইয়া পুষ্প চয়ন করিতেছিল, নানা প্রকার প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুমে সাজিটি প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারাও তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোলাপ তুলিতেছিল। সে বার্থার সমবয়স্কা।

জোসেফ সেই দিন অপরাহ্ণে কি একটা জরুরী কাযে আনা স্মিটের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সারা তখন বার্থার সঙ্গে ফুলবাগানে ছিল জানিয়া আনার ইচ্ছা হইল, এই সুযোগে জোসেফ সারার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়া আসে। কিন্তু চাকরকে ত সে রকম অনুরোধ করা যায় না, কাযেই আনাকে ছলনার সাহায্য লইতে হইল। সে জোসেফের হাতে একখানি শাল দিয়া বলিল, "বার্থা ফুলবাগানে গিয়াছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িতেছে, অথচ তাহার গায়ে গরম কাপড় নাই, এই শালখানি তাহাকে দিয়া এস।"

জোসেফ শাল লইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। কিছু দূর গিয়া সে যুবতীদ্বয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই জোসেফ টুপী তুলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিয়া বার্থা ও সারা উভয়েরই মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, তাহাদের চক্ষু যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল।

জোসেফ বার্থাকে তাহার মাতার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া, শালখানি দিয়া চলিয়া আসিবে, এমন সময় বার্থা আব্দারের সুরে বলিল, "জোসেফ, এই গাছ হইতে আমাকে আর কয়েকটা গোলাপ তুলিয়া দিবে? এই দেখ, কাঁটায় আমার হাত দু'খানি ছড়িয়া গিয়াছে, বড়ই ব্যথা পাইয়াছি। এমন সুন্দর ফুল, এ রকম ভয়ঙ্কর কাঁটায় ঢাকা কেন—কে বলিবে?"

জোসেফ হাসিয়া বলিল, "দেখ মিস্, মনুষ্য-জীবনে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু বরণীয়, তাহা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কণ্টকাঘাতের বেদনা সহ্য করিতেই হইবে। বিনা কষ্টে কাহার কোন্ চেষ্টা সফল হইয়াছে? সংসারের পথই যে কণ্টকাবৃত।"

জোসেফ বার্থার হাত হইতে ক্ষুদ্র কাঁচিখানি লইয়া কয়েকটি প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ শাখা হইতে বৃন্তচ্যুত করিল এবং তাহা গুচ্ছাকারে বার্থার হাতে দিয়া বলিল, "এমন প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা তোমার রূপের প্রভায় ম্লান হইয়া গিয়াছে!"

এই প্রশংসা শুনিয়া বার্থার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল, "মাষ্টার জোসেফ, স্তুতিবাদে তোমার ত বেশ দক্ষতা জন্মিয়াছে!"

সারা বার্থার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে জোসেফকে আর কোন দিন এরূপ রসিকতা করিতে দেখে নাই। জোসেফের কথা শুনিয়া সে একটু বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার মুখে বার্থার রূপের প্রশংসা শুনিয়া তাহার একটু ঈর্ষাও হইয়াছিল। সে মাথা নাড়িয়া, জোসেফের মুখের উপর একটি তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া বলিল, "জোসেফ, আজকাল তোমার মুখ দিয়া মধু ঝরিতেছে! বোধ হয়, অনেক বেহায়া রূপসী তোমার মুখের মধুতে মৌমাছির মত আটকাইয়া গিয়াছে, ডানা মেলিয়া উড়িয়া পলাইবে, সে শক্তি নাই!"

জোসেফ হাসিয়া বলিল, "রূপসী হইলেও তুমি যখন বেহায়া নও—তখন নিশ্চয়ই তোমার সে ভয় নাই, ইচ্ছা করিলেই তুমি ডানা মেলিয়া উড়িয়া পলাইতে পার।"

জোসেফ যে এমন করিয়া মুখের মত জবাব দিবে, ইহা সারার ধারণার অতীত ছিল, জোসেফের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাহার বুঝিতেও বিলম্ব হইল না। সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল।

জোসেফ বুঝিল, তাহার অসংযত কথায় সারা মনে বড় বেদনা পাইয়াছে, সে তাহার ক্ষোভ দূর করিবার জন্য অদূরবর্ত্তী গোলাপগাছ হইতে একটি অর্দ্ধস্ফুট বৃহৎ গোলাপ তুলিয়া সহাস্যে তাহার হাতে দিয়া বলিল, "সারা, এই গোলাপটি তোমাকে উপহার দিলাম, তোমার মুখখানিও ঠিক এই রকম সুন্দর কি না?"

বার্থা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "সত্যই তুমি ভারি খোসামুদে! তোমার মুখে মধু ঝরে—সারার এ কথা মিথ্যা নয়। পুরুষগুলা ভারি মিথ্যাবাদী, ছিঃ!"

জোসেফের নিকট গোলাপটি উপহার পাইয়া সারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! আনন্দে উৎসাহে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস হইল, গোলাপটি তাহার প্রতি জোসেফের প্রণয়েরই নিদর্শন। সারা কম্পিত হস্তে গোলাপটি বুকে রাখিয়া পোষাকের সঙ্গে আঁটিয়া লইল। তাহার পর তৃষিত নেত্রে দুই একবার জোসেফের মুখের দিকে চাহিল। এত সুখ সে জীবনে কখন পায় নাই; তাহার নিরাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল।

অস্তোন্মুখ তপন অনেক পূর্ব্বেই গিরি-অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিল; সন্ধ্যার ছায়ায় সমগ্র প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন হইল। হ্রদের স্বচ্ছ জলরাশি গাঢ় নীলবর্ণ ধারণ করিল। বহু দূরে শুভ্র তুষার-মুকুটিত গিরিশৃঙ্গ সুলোহিত তপন-রাগে রঞ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে অপরূপ বর্ণচ্ছটার বিকাশ করিতেছিল, সন্ধ্যার ধূসর অবগুণ্ঠনের ছায়াস্পর্শে সেই বর্ণ-বৈচিত্র্য কোথায় অদৃশ্য হইল; সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ হ্রদের মুক্ত বক্ষে হিল্লোলিত হইয়া, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুমিষ্ট সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তখনও সেই যুবতীদ্বয় এবং জোসেফ পুষ্পোদ্যান ত্যাগ করিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন ফুলগাছগুলির ফুল দেখা যাইতেছিল না, বিশেষতঃ পুষ্পচয়নেরও প্রয়োজন ছিল না; কারণ, বার্থার সাজি ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা তিন জনে কাষ্ঠাসনে বসিয়া হাস্য-পরিহাস ও গল্পে সন্ধ্যাযাপন করিতেছিল। সারা জোসেফের গল্প শুনিতে শুনিতে স্থানকাল, এমন কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল! বুদ্ধিমতী বার্থা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিল।

হঠাৎ বার্থা মায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিতভাবে ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। ফুলবাগানের সম্মুখেই অট্টালিকার বারান্দা। আনা স্মিট ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে মেয়েকে ঘরে যাইতে আদেশ করিল। কর্ত্রীর আদেশ শুনিয়া সারার বড়ই দুঃখ হইল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; জোসেফকে তত শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না।

জোসেফ বার্থার হাত হইতে ফুলের সাজিটি নিজের হাতে লইল; তাহাকে মধ্যে লইয়া বার্থা ও সারা তাহার দুই পাশে চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে সারা বলিল, "জোসেফ, আজ রাত্রিতে তুমি আমাদের সঙ্গে বসিয়া খাইবে?"

জোসেফ বলিল, "না সারা, আজ আর খাইব না। আমাদের বাড়ীতে আজ আমার মায়ের একটি বান্ধবী আসিয়াছেন, এই রাত্রেই তিনি চলিয়া যাইবেন; আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে; এ জন্য এখানে অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

সারা সেই অন্ধকারেই জোসেফের মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "তোমার মায়ের সেই বান্ধবীটি নিশ্চয়ই রূপবতী তরুণী; এই জন্যই তোমার মাতৃভক্তিটা হঠাৎ এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে!"

জোসেফ হাসিয়া বলিল, "তোমার অনুমানে একটু ভুল হইয়াছে সারা! আমার মায়ের সেই বান্ধবীর বয়স সতের নহে, সত্তর।"

জোসেফের কথা শুনিয়া বার্থা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "তাহা হইলে সারার বোধ হয় দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।"

বাগানের দরজার কাছে আসিয়া বার্থা বলিল, "এখনই ঘরে ঢুকিয়া কি হইবে?—চল, ঐ দিক্ দিয়া আর এক পাক ঘুরিয়া আসি।"

বার্থার এই প্রস্তাবে সারা এত সুখী হইল যে, তাহার ইচ্ছা হইল, সে বার্থাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করে!

তাহারা তিন জনে বাগানটা আর একবার ঘুরিয়া আসিল; আনা স্মিট তখনও বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাঁকা-হাঁকি করিতেছিল। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছিল, এবং আকাশে অনেক তারা উঠিয়াছিল।

বার্থা সাজিটা জোসেফের হাত হইতে লইয়া কয়েকটি উৎকৃষ্ট গোলাপ তাহাকে উপহার দিল; হাসিয়া বলিল, "এই তোমার পরিশ্রমের মজুরী।"

জোসেফ বলিল, "অর্থাৎ কুলীভাড়া! ধন্যবাদ কুমারী বার্থা, আমার পরিশ্রমের অতিরিক্ত পুরস্কার পাইলাম।"—সে বার্থা ও সারার নিকট বিদায় লইয়া উদ্যানদ্বার হইতেই বাড়ী চলিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে আনা স্মিটের সহিত সারার দেখা হইল না। পরদিন সকালে আনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, পূর্ব্বদিন সায়ংকালে জোসেফ তাহার প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিল, সে কথা সে আনাকে না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

সারার কথা শুনিয়া আনা খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, এ আশার কথা বটে; আমি কি বলি নাই, জোসেফ তোর প্রতি যতই ঔদাসীন্য প্রকাশ করুক, তাহাকে টোপ গিলিতেই হইবে? সে তোকে বিবাহ করিবে, এ বিষয়ে

আমার এক বিন্দু সন্দেহ নাই; তবে ছোঁড়াটা লাজুক, আর ভারি চাপা; এই জন্যই তুই এত দিন তার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিয়া মরিয়াছিস্। তোর বরাত ভাল—তাই জোসেফের মত স্বামী জুটিতেছে! তোর জীবন বেশ সুখেই কাটিবে। তোর মায়ের কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা পালন করিতে পারিব ভাবিয়াই আমার এত আনন্দ। আমি কথায় কথায় এক দিন জোসেফকে জানাইব, বিবাহের সময় তোকে চার হাজার ফ্রাঙ্ক নগদ ও ঘর-বসতের জন্য অনেক কাপড়-চোপড় উপহার দিব; আর তাহাকেও একটা ভাল চাকরীতে নিযুক্ত করিব। এ কথা শুনিলে তোকে শীঘ্র বিবাহ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে। তাহার সাধ্য কি এই লোভ সে সংবরণ করে?"—কর্ত্রীর কথা শুনিয়া সারা অধীরভাবে দিন গণিতে লাগিল।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্কল্প ব্যর্থ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হওয়ায় আনা স্মিট এতই অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে মানুষকে মানুষ মনে করিত না। যাহাদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন, তাহারা তাহার মুরুব্বীয়ানায় অস্থির হইয়া উঠিত। সামাজিক সকল কাযেই সে নেতৃত্ব করিতে ভালবাসিত, এবং যাহারা তোষামোদে তাহার মনোরঞ্জন করিত, তাহাদিগকে সে নানাভাবে সাহায্য করিত; সুতরাং তাহার দয়ামায়া ছিল না, এ কথা বলা যায় না। সে যাহা করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিত না; কোন কারণে সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। কেহ তাহার অবাধ্য হইলে, তাহাকে সে চূর্ণ না করিয়া ছাড়িত না; জিদে পড়িয়া সে সকল অপকর্ম্মই করিতে পারিত।

জোসেফের সহিত পরিচারিকা সারার বিবাহ দেওয়ার জন্য আনা স্মিট কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সে জানিত, কোন কারণেই তাহার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই মাস পরে সারার জন্মতিথি উপলক্ষে এক দিন সায়ংকালে আনা স্মিট দাসদাসীগণকে তাহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; বলা বাহুল্য, জোসেফও সে দিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বার্থার ছুটী তখন পর্য্যন্ত শেষ না হওয়ায় সে বাড়ীতেই ছিল, এবং সেই রাত্রিতে নৃত্য-গীতের আয়োজন করিয়াছিল।

জোসেফ সে দিন সারার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, আনা স্মিট অত্যন্ত ঔৎসুক্যভরে তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল; তাহার আশা ছিল, জোসেফ সারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবে ও তাহার মনো-রঞ্জনের চেষ্টা করিবে; কিন্তু জোসেফ সারাকে তেমন আমোল দিল না। সে নাচের মজলিসে গিয়া কর্ত্রীর অনুমতি লইয়া একবার বার্থার সঙ্গে নৃত্য করিল; নাচের পর বার্থা মায়ের আদেশে বিশ্রাম করিতে চলিল; তখন আনা স্মিট জোসেফকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ জোসেফ, আজ সারার জন্মতিথি, এই জন্যই এই উৎসবের আয়োজন; উৎসবের মজলিসে আজ তাহারই আদর সকলের অপেক্ষা অধিক। তাহাকে যথাযোগ্য আদর-যত্ন করা তোমারও কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাতে তোমার ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি একটু দুঃখিত হইয়াছি।"

জোসেফ হাসিয়া বলিল, "না, না, আপনি দুঃখিত হইবেন না; আমি নিশ্চয়ই আপনার আদেশ পালন করিব। আপনি আমার মনিব—এ কথা কি আমি ভুলিতে পারি?"

আনা বলিল, "তুমি মনে করিও না—আমি মনিব বলিয়া তোমাকে হুকুম করিতেছি। আজ সারার মনো-রঞ্জন করা তোমারও কি কর্ত্তব্য নয়?—সাজ-পোষাকে আজ সারাকে কেমন মানাইয়াছে, বল ত শুনি; আজ কি তাহাকে খুব সুন্দরী দেখাইতেছে না?"

জোসেফ বলিল, "চমৎকার! ঠিক পরীটির মত দেখাইতেছে।"

জোসেফের কথা শুনিয়া আনা সুখী হইল; জোসেফও তাহার পর যতক্ষণ সেখানে ছিল—স্তবস্তুতিতে সারাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জোসেফের উপেক্ষায় সারার মনে বড়ই অভিমান হইয়াছিল; তাহার অভিমান

দূর হইল, মুখে হাসি ফুটিল। উৎসবটা তাহার সার্থক মনে হইল।

কর্ত্রীর অনুরোধে জোসেফ সেই রাত্রি 'বো-সিজোরে' থাকিল। পরদিন রবিবার বলিয়া কারখানা বন্ধ ছিল; রবিবারেও সেখানে থাকিবার জন্ত আনা স্মিট তাহাকে অনুরোধ করিলে, পরদিনও তাহাকে সেখানে থাকিতে হইল। রবিবার সকালে আনা স্মিট জোসেফকে তাহার খাস-কামরায় ডাকিয়া পাঠাইল।

আনা স্মিট তাহার খাস-কামরায় বসিয়াই আফিসের অনেক কায করিত। তাহার আফিসের হিসাবের খাতা, চিঠিপত্রাদিও সেই কামরায় থাকিত।

জোসেফ কুণ্ঠিতভাবে সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া আনা স্মিটকে দেখিতে পাইল না; তাহার পরিবর্ত্তে বার্থা সেখানে বসিয়া ছিল। বার্থা জানিত, তাহার মায়ের খাস-কামরায় কোন বাহিরের লোকের প্রবেশাধিকার নাই; এই জন্ত সে জোসেফকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে তুমি কেন আসিলে, জোসেফ?"

জোসেফও তখন তাহাকে সেখানে দেখিবার আশা করে নাই; সে বলিল, "আমি নিজের ইচ্ছায় আসি নাই; তোমার মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কেন ডাকিয়াছেন—তাহা জানিতে পারি নাই।"

বার্থা বলিল, "তিনি তোমাকে কেন ডাকিয়াছেন, আমিও বুঝিতে পারিতেছি না।"

জোসেফ বলিল, "বোধ হয়, আমার উপর কোন কাযের ভার দিবেন; তা ছাড়া আমাকে আর কি জন্ত ডাকিবেন?"

তাহাদের আর অধিক আলাপ করিবার সুযোগ হইল না, আনা স্মিট সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বার্থাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি করিতেছ, মা?"

বার্থা বলিল, "কয়েকখান চিঠি লিখিতে আসিয়াছিলাম।"

আনা স্মিট বলিল, "চিঠিগুলা আর এক সময় লিখিও; তুমি এখন তোমার ঘরে যাও। জোসেফের সঙ্গে আমার দুই একটা গোপনীয় কথা আছে।"

বার্থা অভিমানভরে বলিল, "এমন কি গোপনীয় কথা মা! যা তোমার মেয়েরও শুনিবার অধিকার নাই?"

আনা স্মিট বলিল, "হাঁ, সত্যই গোপনীয় কথা। কথাটা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে, আর তাহা শুনিয়া বোধ হয় একটু বিস্মিত হইবে, তবে যে খুব খুসী হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনই তাহা জানিবার জন্ত উৎসুক হইও না।"

আনা স্মিটের কথা শুনিয়া জোসেফ অধিকতর বিস্মিত হইল, বার্থা মুখ ভার করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

জোসেফ টেবলের কাছে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। আনা স্মিট স্বহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল এবং জোসেফকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল।

আনা স্মিট একটা পেন্সিল লইয়া একখানা সাদা কাগজে কতকগুলা দাগ দিল, ইহা তাহার একটা মুদ্রা-দোষ; কাহাকেও কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে ঐরূপ করা তাহার অভ্যাস ছিল। মিনিট দুই পরে সে পেন্সিলটা ফেলিয়া রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "জোসেফ, তুমি যে রকম দক্ষতার সঙ্গে কায-কর্ম্ম করিতেছ, তাহার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমি স্থির করিয়াছি, দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে অধিক মাহিনার একটি চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া তোমার যোগ্যতার পুরস্কার দিব। তুমি অনেক প্রবীণ কর্ম্মচারীকে ডিঙ্গাইয়া যাইবে।"

জোসেফ অবনত মস্তকে বলিল, "সে আপনার অনুগ্রহ। আমি কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি মাত্র; সে জন্ত আমি উচ্চপদের দাবি করিতে পারি না।"

আনা স্মিট বলিল, "যদি তোমাকে ভাল চাকরীতে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে কি করিবে জানিতে চাই।"

জোসেফ বলিল, "কি আর করিব? প্রাণপণে কর্ত্তব্যপালন করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।"

আনা স্মিট বলিল, "আর যদি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পার, তাহা হইলে?"

জোসেফ বলিল, "প্রাণপণে কর্ত্তব্যপালন করিয়াও যদি আপনাকে খুসী করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব; আর কোথাও গিয়া চাকরী লইব। মনিবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহার চাকরী না করাই উচিত।"

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "না জোসেফ, আমার চাকরী তোমাকে ছাড়িতে হইবে না। আমি তোমাকে চাকরের মত দেখি না; তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি এবং সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা করি। আমার ছেলেরাও তোমার কাযে খুব সন্তুষ্ট; তোমার উন্নতি হয়, ইহা তাহাদেরও ইচ্ছা।"

আনা স্মিট কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমি তোমার কল্যাণকামনা করি বলিয়াই সারা ট্রুভোল্জের প্রতি তোমার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, কারণ, তাহাকে আমি মেয়ের মতই স্নেহ করি।"

আনা স্মিটের কথা শুনিয়া জোসেফের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; সে জড়িতস্বরে বলিল, "কর্ত্রি, আমার বোধ হয়, আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন, কারণ—কারণ, আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন,"—অবশিষ্ট কথা তাহার গলার ভিতর বাধিয়া গেল। সে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

আনা স্মিট হাসিয়া বলিল, "না জোসেফ, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ নাই; আমি ত অন্ধ নই যে, সারার প্রতি তোমার অনুরাগ আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে। কে কাহাকে কি চোখে দেখে, তা আমরা স্ত্রীজাতি খুব ভালই বুঝিতে পারি। যাহাই বল জোসেফ, খাসা তোমার পছন্দ। সারা যেমন সুন্দরী, তেমনই চালাক-চতুর, চটপটে আর সুশীলা; তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার জীবন খুব সুখেই কাটিবে। চাকরী করিতেছ, এখন বিবাহ না করিলে সংসারে মন বসিবে কেন? সংসারী হইলে উন্নতি করিবার জন্য আগ্রহ হইবে। সারা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে; এ বিষয়ে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আমার কথা বিশ্বাস কর—সে সত্যই তোমাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। তুমি আর আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিও না। অর্থাভাবেও তোমার কষ্ট হইবে না; আমি সারাকে চারি হাজার ক্রাঙ্ক যৌতুক দিব, কাপড়-চোপড় যাহা দরকার, সমস্তই দিব; আর তোমাকেও আশীর্ব্বাদী বলিয়া নগদ পাঁচ শত ক্রাঙ্ক দিব। বিবাহের পূর্ব্বেই তোমরা এ টাকাগুলি পাইবে।"

বিচারকের মুখে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া ফাঁসীর আসামীর মুখের ভাব যেরূপ হয়, আনা স্মিটের কথা শুনিতে শুনিতে জোসেফের মুখের ভাবও সেইরূপ হইল; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "কত্রি, আমার প্রতি আপনার দয়ার পরিচয় পাইয়া কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। সারা সুন্দরী, সুশীলা এবং গুণবতী, তাহাও আমি জানি; কিন্তু আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার আদেশ পালন করা আমার অসাধ্য। আপনি আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন; আমি সত্যই সারাকে ভালবাসি না। কোন দিনও তাহাকে ভালবাসিতে পারিব না। আমি তাহাকে বিবাহ করিব না; আপনি এ জন্য আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। ইহাতে অনর্থক আমাকে লজ্জা দেওয়া হইবে মাত্র।"

আনা স্মিট সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী, সারাকে তুমি ভালবাস না? যদি সত্যই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাক, তবে প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে ভুল বুঝিতে দিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ করিলে কেন? প্রেম দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকের খেলার সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে নারীর সর্ব্বস্ব, জীবনের চিরসম্বল!"

জোসেফ সবিস্ময়ে বলিল, "আমি? আমি সারার সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়াছি? মিথ্যা কথা!"

এ কথায় আনা স্মিট সংযম হারাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল; বিকৃতস্বরে বলিল, "কি, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার চাকরের এমন কথা বলিবার সাহস হইল! আমি একশবার, হাজারবার বলিব—প্রেমের ছলনায়, মিথ্যা আশা দিয়া তুমি তাহার জীবনের সুখ-শান্তি হরণ করিয়াছ; এখন তাহাকে বিবাহ করিবার দায়িত্বগ্রহণে অসম্মত হইতেছ। ধিক্‌, নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক!"

জোসেফ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি আমার মনিব, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, আপনার অসঙ্গত অভিযোগ ও অন্যায় তিরস্কার আমি ধীরভাবে সহ্য করিতে বাধ্য। আপনার সহিত বাদানুবাদ করাও আমার শোভা পায় না; কিন্তু কোন ভদ্র যুবক শিষ্টাচারের অনুরোধে কোন যুবতীর প্রতি যতটুকু কোমল ব্যবহার করে, আমিও সারার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করি নাই, আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী—কোন দিন ইঙ্গিতেও এ ভাব প্রকাশ করি নাই। আপনি অকারণে দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিলেন।"

আনা স্মিট মিনিট দুই তিন নতমস্তকে কি চিন্তা করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া জোসেফকে সংযতস্বরে বলিল, "সারা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সুশীলা ও কর্ম্মিষ্ঠা, সকল বিষয়েই তোমার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত; তবে তাহার প্রতি তোমার এরূপ বিতৃষ্ণার কারণ কি?"

জোসেফ বলিল, "তাহার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা নাই।"

আনা স্মিট বলিল, "সে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, আমি তাহার বিবাহে চারি হাজার ফ্রাঙ্ক যৌতুক দিব, তোমাকেও পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক উপহার দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমার মত দরিদ্রের পক্ষে এ প্রলোভন সামান্য নহে; এ অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার অসম্মতির কারণ কি?"

জোসেফ বলিল, "তাহাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

আনা স্মিট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "অসম্ভব? অসম্ভব কেন জানিতে পারি কি?"

জোসেফ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কারণ—কারণ, আমি আর এক জনকে ভালবাসি।"

আনা স্মিট সবিস্ময়ে বলিল, "আর এক জনকে ভালবাস! সে সারা অপেক্ষাও বেশী সুন্দরী? কে সে? কোন রাজকন্যা না কি?"

জোসেফ বলিল, "কর্ত্রি, আমার অবাধ্যতা মার্জ্জনা করুন; আপাততঃ আমি আপনার নিকট তাহার নামপ্রকাশে অসমর্থ। কয়েক দিন পরেই আপনি তাহার নাম জানিতে পারিবেন।"

আনা স্মিট উত্তেজিতস্বরে বলিল, "তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই আমার হিতোপদেশ তোমার ভাল লাগিল না; কিন্তু তুমি আমার অপমান করিয়া তোমার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিলে! ইহার পর তোমাকে পস্তাইতে হইবে। যাও—তোমাকে আমার আর কোনও কথা বলিবার নাই, একগুঁয়ে, অবাধ্য, বেকুব!"

জোসেফ আনা স্মিটকে অভিবাদন করিয়া অবনত-মস্তকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কর্ম্ম পূজা

সাজায়েছি হৃদিপাত্র দুঃখ দৈন্য করুণ ক্রন্দনে
এস কর্ম্ম, লও পূজা, সর্ব্বস্ব আমার দিব বলি—
মুহূর্ত্ত দাঁড়াও আসি' প্রতিমার রূপে এ প্রাঙ্গণে
প্রাণ ভ'রে করি ধ্যান পৃথিবীর সুখ-দুঃখ ভুলি'!

সাজ হ'ল ধ্যান পূজা, দাও এবে দাও আশীর্ব্বাদ,
কিবা শুভ কি অশুভ আর নাহি করিব বিচার,
দাও সুধা দাও বিষ—সমভাবে লইব প্রসাদ,
কিবা সুখ কিবা শান্তি—কিবা দুঃখ কি অশান্তি ভার!

হয় তপ্ত হিয়া শান্ত কর সুধা দানি,
কিংবা পুড়াইয়া ফেল ছাই হয়ে ভস্ম হয়ে যাক্,
খেলাও অপূর্ব্ব খেলা কিংবা তুলি লয়ে হৃদিখানি,
আধখানি শান্ত কর, আধখানি দগ্ধ হয়ে যাক্!

নাহি দুঃখ নাহি খেদ হোক্ তব পূজা নিতি নিতি,
জীবন-রহস্য আর শিখিব সংসার-গূঢ়-নীতি।

শ্রীমহেশচন্দ্র নাথ।
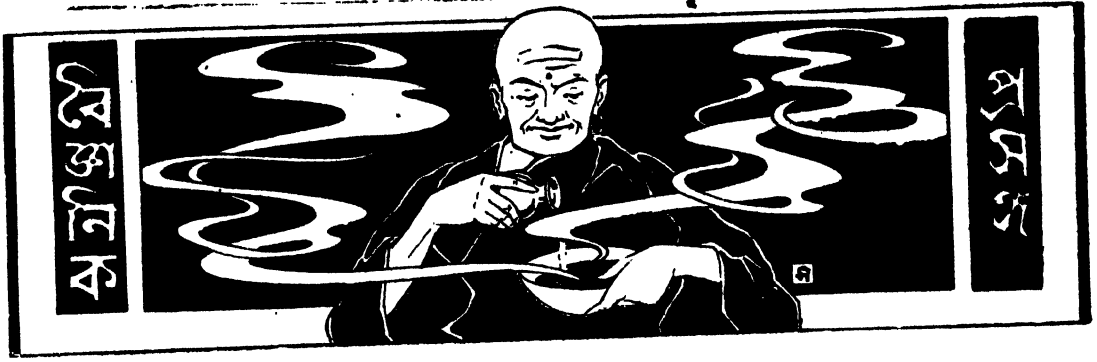
ইন্সুলিন্ (INSULIN.) *

কানাডা (Canada) রাজ্যে টোরোণ্টো † (Toronto) নামক সহরের ডাক্তার ব্যাণ্টিং (Banting) এবং ডাক্তার বেষ্ট্ (Best) ইন্সুলিন্ প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বহুমূত্র রোগের (Diabetes) চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ব্যাণ্টিং গত বৎসর এই মহোপকারী ঔষধের আবিষ্কারের জন্য নোবেল্ প্রাইজ (Nobel Prize) পাইয়াছেন। ইন্সুলিনের ইতিহাস, ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও কার্য্যকারিতা সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ইতিহাস।

প্যান্ক্রিয়াস্ (Pancreas) নামক শরীরের অভ্যন্তরস্থ একটি পরিপাকযন্ত্রের সহিত বহুমূত্র রোগের (ডায়াবিটিস্) অতি নিকট-সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেক দিন হইতেই জানা আছে। প্যান্ক্রিয়াসের আভ্যন্তরিক রসের (Internal secretion) অভাবই যে বহুমূত্র রোগের কারণ, তাহার প্রমাণ কিছু দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভন্ মেরিং (Von Mering) ও মিন্কাউস্কি (Minkowski) নামক স্বনামধন্য ডাক্তারদ্বয় একটি কুকুরের প্যান্ক্রিয়াস্ কাটিয়া বাহির করিয়া দেন। ইহার দুই এক দিনের মধ্যেই ঐ কুকুরের ডায়াবিটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং এই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল।

পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যদি প্যান্ক্রিয়াসের রসবাহী নালী (Pancreatic duct) বাঁধিয়া (Ligature) দেওয়া যায়, তাহা হইলে ডায়াবিটিস্ রোগ হয় না। এই সকল পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্যান্ক্রিয়াসের এমন একটি আভ্যন্তরিক রস আছে, যাহা উহার রসবাহী নালী দ্বারা বাহিরে না আসিয়া একেবারে রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং যাহার অভাব হইলে ডায়াবিটিস্ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রস স্বাভাবিক পরিমাণে শরীরের মধ্যে থাকিলে ডায়াবিটিস্ রোগ হইতে পারে না। আর একটি পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নিরূপিত হইয়াছে। যদি একটি কুকুরের প্যান্ক্রিয়াস্ বাদ দিয়া ডায়াবিটিস্ রোগ উৎপাদন করত অন্য একটি সুস্থ কুকুরের প্যান্ক্রিয়াস্ ডায়াবিটিস্ রোগগ্রস্ত কুকুরটির ত্বকের নিম্নে অস্ত্রচিকিৎসা সাহায্যে লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ডায়াবিটিস্ রোগ সারিয়া যায় এবং কুকুরটি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়।

প্যান্ক্রিয়াসের মধ্যে দুই প্রকারের গঠনোপাদান বা টিসু (Tissue) আছে। একটিকে এসিনস্ (Acinous) ও অপরটিকে আইলেট্ (Islet) টিসু কহে। এই দুই প্রকারের টিসুর ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের। প্যান্ক্রিয়াসের এসিনস্ টিসু (Acinous tissue) হইতে এক প্রকার পাচক রস প্রস্তুত হয়। এই রস প্যান্ক্রিয়াসের রসবাহী নালী (Pancreatic duct) দ্বারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে নীত হইয়া শর্করাজাতীয়, ছানাজাতীয় ও মাখনজাতীয়

---

* বিগত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

† কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক ও শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী স্বর্গগত ডাক্তার রায় বাহাদুর আশুতোষ মিত্র সি, আই, ই মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যামিনী মিত্র মহোদয়া তাঁহার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুলে বহুমূত্র রোগের গবেষণা পরিচালন করিবার জন্য একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। লেখক উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহুমূত্র রোগের গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে। এই রসের সহিত ডায়াবিটিস্ রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন মুখ্য সম্বন্ধ নাই এবং এই কারণেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্যান্‌ক্রিয়াসের রসবাহী নালী বাঁধিয়া দিলেও ডায়াবিটিস্ রোগ উৎপন্ন হয় না। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এই রসবাহী নালী বাঁধিয়া দিলে আইলেট্ টিসুগুলির (যাহা দ্বারা প্যান্‌ক্রিয়াসের আভ্যন্তরিক রস প্রস্তুত হয়) কিছুই অনিষ্ট হয় না, কিন্তু এসিনাস্ টিসুগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে ব্যাণ্টিংয়ের মনে হইল যে, যদি প্যান্‌ক্রিয়াসের আইলেট্ টিসু হইতে একটি রস প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন একটি প্রাণীর প্যান্‌ক্রিয়াসের রসবাহী নালী বাঁধিয়া দিলেন * এবং দশ দিন পরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া উক্ত প্যান্‌ক্রিয়াস্ যন্ত্রটি বাহির করিয়া লইলেন এবং তাহাকে খলে মাড়িয়া তাহার রস অন্য একটি জন্তুর একটি রক্তবাহী শিরার মধ্যে পিচকারীর দ্বারা প্রবেশ (Injection) করাইয়া দিলেন। ইহাতে দেখা গেল যে, পিচকারী প্রয়োগের পর ঐ প্রাণীটির রক্তে স্বাভাবিক শর্করার ভাগ হঠাৎ কমিয়া গেল। বহুমূত্র রোগে এই রস কার্য্যকারী হইবে কি না, ইহা জানিবার জন্য একটি কুকুরের প্যান্‌ক্রিয়াস্ কাটিয়া বাদ দিয়া তাহাকে বহুমূত্র রোগগ্রস্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং অপর একটি জন্তুর প্যান্‌ক্রিয়াস্ হইতে এই রস প্রস্তুত করিয়া উক্ত কুকুরটির শরীরে পিচকারীর দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দেখা গেল যে, উহার রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই রসের নামই "ইন্‌সুলিন্।"

যখন ব্যাণ্টিং দেখিলেন যে, এই রস ডায়াবিটিসের পক্ষে মহোপকারী, তখন এ বিষয়ে আরও গবেষণা করিবার অভিপ্রায়ে এবং এতৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এ সংবাদ কোন প্রকারে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল ও সংবাদপত্রগুলি এই ব্যাপার লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। পাছে অযোগ্য লোকের হাতে পড়িয়া এই অব্যর্থ ঔষধের অপযশ হয়, এই ভয়ে ব্যাণ্টিং এবং তাঁহার সহযোগিগণ ইন্‌সুলিন্ প্রস্তুত-প্রণালীর পেটেণ্ট (Patent) গ্রহণ করিলেন এবং ইণ্ডিয়ানাপোলিস্ (Indianapolis) নামক স্থানে ইলি, লিলি কোম্পানীর (Eli, Lilly & Co) হস্তে ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর ভার অর্পণ করিলেন। এখন অনেক প্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়িগণ ইন্‌সুলিন্ প্রস্তুত করিতেছেন।

ইন্‌সুলিনের মাত্রা ভিন্নসংখ্যক ইউনিট্ (Unit)-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা এইরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে ;—

ইন্‌সুলিনের মাত্রা।

একটি দুই কিলোগ্রাম্ (Kilogram) (প্রায় এক সের) ওজনের একটি খরগোসকে যে মাত্রার ইন্‌সুলিন্ পিচকারীর দ্বারা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে ৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার রক্ত-শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে শতকরা ০.০৪৫ পর্য্যন্ত কমিয়া যায় (অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ), ইন্‌সুলিনের সেই মাত্রা এক ইউনিট্ (Unit) বলিয়া গৃহীত হয়। রোগের গুরুত্বভেদে এই ইউনিট্ সংখ্যার বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

সুস্থ লোকের শরীরে ইন্‌সুলিন্ পিচকারীর দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার রক্ত-শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কমিয়া যায়। ইন্‌সুলিন্ মুখ দিয়া গ্রহণ করিলে এরূপ কোনও ফল পাওয়া যায় না। আমি যখন ইন্‌সুলিন্ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, তখন প্রথমে আমি ৮ ইউনিট্ পরিমাণ ইন্‌সুলিন পিচকারী দ্বারা নিজ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম। আমার দেহস্থিত রক্ত-শর্করার উপর এই ঔষধ প্রয়োগের ফল নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

সুস্থ শরীরে ইন্‌সুলিনের ক্রিয়া।

* এই রসবাহী নালী বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রক্রিয়াতে এসিনস্ টিসুগুলির লোপপ্রাপ্তি হইয়া শুদ্ধ আভ্যন্তরিক রসপ্রস্তুতকারী আইলেট্ টিসুগুলি কার্য্যকারী থাকিবে।

পরীক্ষার সময়	রক্ত-শর্করার পরিমাণ (শতকরা)
ইন্‌জেক্‌শনের পূর্ব্বে	০.১০৬
" ১৫ মিনিট পরে	০.১০০
" ½ ঘণ্টা পরে	০০৮৫
" ১ " "	০.০৮০
" ১½ " "	০.০৬৮
" ২ " "	০.০৭২
" ২½ "	০.০৮৬

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, পিচকারীপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত-শর্করা কমিতে আরম্ভ করে এবং ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টার মধ্যে রক্ত-শর্করার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া যায়। পিচকারী প্রয়োগের ১½ ঘণ্টার মধ্যে আমার সামান্য শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং শরীর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল। ৩ ঘণ্টা পরে রক্ত-শর্করা বাড়িলেও উহার পরিমাণ পিচকারী প্রয়োগের পূর্ব্বাবস্থায় তখনও আসে নাই।

এখন একটি ডায়াবিটিস্ রোগীর শরীরে ৮ ইউনিট্ ইন্‌সুলিন্ পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে কি ফল হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

পরীক্ষার সময়	রক্ত-শর্করার পরিমাণ (শতকরা)
ইন্‌জেক্‌শনের পূর্ব্বে	০.১৬০
" ১৫ মিনিট পরে	০.১৬০
" ½ ঘণ্টা পরে	০.১২২
" ১ " "	০.০৫৭
" ১½ " "	০.০৬৮
" ২ " "	০.০৭০

ইহাতে এই বুঝা গেল যে, পিচকারী দিবার ১৫ মিনিট পর হইতেই রক্ত-শর্করা কমিতে আরম্ভ করে এবং হঠাৎ অনেকটা কমিয়া গিয়া ১ ঘণ্টা পরে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া যায়। এই সময়ে রোগীর মাথার যন্ত্রণা, দৌর্ব্বল্য, গা বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিছু আহার করিবার পর ঐ সমস্ত লক্ষণ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ইন্‌সুলিন্ প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক।

বেশী মাত্রা প্রয়োগের দোষ।

মাত্রা বেশী হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে :—

পিচকারী দিবার ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী অস্থির হয়, কিন্তু কি কারণে এই অস্থিরতা হয়, রোগী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। তৎপরে প্রচুর ঘাম হয় এবং রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা বোধ হয়। তাহার পর হাত-পায়ের পেশীর সঙ্কোচন আরম্ভ হয়। রোগীকে ফ্যাকাশে দেখায় ও তাহার নাড়ী দ্রুত (মিনিটে ১০০ হইতে ১২০) চলে। তাহার চক্ষুর তারকা বড় হইয়া যায় এবং যেন ফিট্ (Fits) হইবে, রোগী এইরূপ অনুভব করে। এই সময়ে কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কার্য্য করিতে রোগীর কষ্ট বোধ হয়। কথা কহিবার ভাষা রোগীর যোগায় না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাক্‌শক্তি লোপপ্রাপ্ত হয় এবং স্মৃতিশক্তিও কমিয়া আইসে। দেহের উত্তাপ কমিয়া যায় (Subnormal temperature) এবং কোন কোন রোগী অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এ স্থলে বলা উচিত যে, এই লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ চিকিৎসা-সাধ্য। রোগীকে অর্দ্ধ হইতে ১ পোয়া পরিমাণ কমলালেবুর রস কিংবা গ্লুকোজ (Glucose) বা মিছরির জল পান করিতে দিলে ১০ মিনিটের মধ্যেই এই লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়। যদি রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এড্রিনালিন্ (Adrenalin) (১০ বা ১৫ ফোঁটা) পিচকারীর দ্বারা ত্বকের নীচে প্রবেশ করাইলে রোগী ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই চৈতন্য লাভ করে এবং তাহার পর পূর্ব্বব্যবস্থামত গ্লুকোজ বা মিছরির জল খাইতে দিলে রোগী সুস্থ হয়।

ডায়াবিটিস্ রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমতঃ

ইন্‌সুলিন্ প্রয়োগ।

দেখিতে হইবে যে, কতটা খাদ্য কমাইয়া দিলে রোগীর প্রস্রাব হইতে শর্করা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যদি দেখা যায় যে, ঐ পরিমাণ আহার গ্রহণ করিলে রোগী নিজেকে এত দুর্ব্বল মনে করে যে, কোন কাজ-কর্ম্ম করিবার শক্তি তাহার থাকে না, তাহা হইলে

সেই স্থলে ইন্‌সুলিনের ব্যবস্থা উপযোগী বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ইন্‌সুলিনের প্রথম মাত্রা ৫ ইউনিট্ দিবসে ২ বারের বেশী দেওয়া উচিত নহে। আহারের পর ২০ মিনিট হইতে ½ ঘণ্টার মধ্যেই ত্বকের নিম্নে পিচকারী দ্বারা এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। আহারের পরিমাণ সমান রাখিয়া ইন্‌সুলিনের মাত্রা, যে পর্য্যন্ত প্রস্রাব হইতে শর্করা অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ ক্রমশঃ বাড়াইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, রোগীর আহারের পরিমাণ ও ইন্‌সুলিনের মাত্রা উভয়ের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে যে, রক্তের শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে, তখন ইন্‌সুলিনের মাত্রা ও আহার এই দুইটিই বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং রোগী আহারের পরিমাণে তৃপ্তি লাভ করিলে দুইয়েরই মাত্রার আর বৃদ্ধি করিতে হইবে না। এই ভাবে রোগীকে কিছুকাল রাখিলে প্যান্‌ক্রিয়াসের আইলেট্‌গুলি আবার সুস্থ অবস্থায় উপনীত হয় এবং তাহারা নিজের কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে শরীরের আভ্যন্তরিক ইন্‌সুলিনই খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে। তখন বাহ্য ইন্‌সুলিন্ প্রয়োগের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইয়া দিতে হয়।

ইন্‌সুলিনের ক্রিয়া।

সুস্থ লোক শর্করা-জাতীয় খাদ্য (শ্বেতসার, চিনি প্রভৃতি) আহার করিলে উহা অন্ত্রমধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া গ্লুকোজে পরিণত হয় এবং এই গ্লুকোজ, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রক্ত দ্বারা ইহা যকৃতে (Liver) উপনীত হইয়া গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামক জৈব শ্বেতসারে পরিণত হয় ও এই আকারে যকৃতে অবস্থিতি করে। শরীরের টিস্যুগুলিতে (Tissue) শর্করার প্রয়োজন হইলে যকৃৎ হইতে ঐ গ্লাইকোজেন্ পুনরায় শর্করায় পরিণত হইয়া টিস্যুর পুষ্টিসাধনের সহায়তা করে। যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করা-জাতীয় খাদ্য আহারের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহার সমুদয় অংশ গ্লাইকোজেনে পরিণত না হইয়া কতকটা চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া থাকে। গ্লুকোজ যকৃতে যাইবার পূর্ব্বে রক্তের সহিত যখন মিশ্রিত থাকে, তখন রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে শর্করার পরিমাণ সহজ অপেক্ষা অনেক বেশী।

রক্তে শর্করার পরিমাণ এইরূপ অধিক থাকিলে, প্যান্‌ক্রিয়াসের আইলেট সেল্ (Islet cells) গুলি ইন্‌সুলিন্ রস প্রস্তুত করিয়া গ্লুকোজ্ পরিপাকের সহায়তা করে।

ডায়াবিটিস্ রোগে আইলেট্ সেল্‌গুলির বিকার উপস্থিত হইয়া ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় এবং সেই জন্য তাহারা প্রয়োজনমত ইন্‌সুলিন্ রস প্রস্তুত করিতে পারে না। সুতরাং এরূপ স্থলে রক্তের মধ্যে শর্করার ভাগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং প্রস্রাবের সহিত শর্করা বহির্গত হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা রোগীর ডায়াবিটিস্ হইয়াছে জানিতে পারি। শর্করা অধিক পরিমাণে রক্তের মধ্যে থাকিবার জন্য রোগীর প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং তৃষ্ণানিবারণার্থ প্রচুর পরিমাণ জলপান করিবার জন্য প্রস্রাবের মাত্রার বৃদ্ধি হয়। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত শর্করার পরিপাক না হইবার জন্য পেশীগুলির পুষ্টিসাধন হয় না, সুতরাং শরীরমধ্যে খাদ্যের অভাব সর্ব্বদাই অনুভূত হয় এবং ঐ কারণে অনেকানেক ডায়াবিটিস্ রোগীর ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবলভাব ধারণ করে। এই অস্বাভাবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রোগীর আহারের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে অসুস্থ আইলেট্ সেল্‌গুলির উপর অধিকতর কার্য্যভার পতিত হইয়া তাহাদের ক্ষীণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিপাক না হওয়ার জন্য রোগী ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ডায়াবিটিস্ রোগে প্যান্‌ক্রিয়াসের ইন্‌সুলিন্ প্রস্তুত করিবার শক্তি কমিয়া যায় এবং আমরা বাহির হইতে ইন্‌সুলিন্ পিচকারী দ্বারা রোগীর দেহে প্রয়োগ করিয়া উক্ত অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করি।

আমরা খাদ্যের সহিত যে মাখন বা চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করি, তাহা শর্করাজাতীয় খাদ্যের সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। যে কোনও ডায়াবিটিস্ রোগীকে অচিকিৎসিত অবস্থায় রাখিলে ক্রমশঃ সেই চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক না হইবার জন্য এসিটোন্ (Acetone) জাতীয়

কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ শরীরে উৎপন্ন হয় এবং উহারা বিষক্রিয়া দ্বারা রোগীকে অচৈতন্য করিয়া ফেলিতে পারে। এই লক্ষণকে ডায়াবিটিক্ কোমা (Diabetic Coma) কহে। অনেকানেক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই অচৈতন্য অবস্থায় ইনসুলিন্ প্রয়োগের ফল অব্যর্থ এবং মনে হয় যেন কোন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে ইন্সুলিন্ রোগীকে মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনে। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় চিকিৎসকের হস্তে আসিলে চিকিৎসক তাহার প্রস্রাব ও রক্তের মধ্যে শর্করা ও অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্যের অস্তিত্ব ও পরিমাণ পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া ৩০ হইতে ৫০ ইউনিট্ ইন্সুলিন্ পিচকারী দ্বারা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন এবং মধ্যে মধ্যে রক্তের শর্করার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখিবেন যে, উহা কতদূর কমিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক কমিয়া গেলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। যাহাতে এই নূতন বিপদ আসিয়া না পড়ে, সেই জন্য এরূপ অবস্থায় ইন্সুলিন্ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ৩০ হইতে ৫০ গ্রাম্ (১½ আউন্স) গ্লুকোজ্ জলের সহিত মিশাইয়া রোগীর শিরার মধ্যে অথবা গুহ্যদ্বারে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। ডায়াবিটিক্ কোমা হইলে ইন্সুলিন্ দিবার ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীকে চৈতন্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতঃপর অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আরোগ্যের পথে আনয়ন করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ইন্সুলিন্ আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে চিকিৎসক এরূপ স্থলে আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় মনে করিতেন; এরূপ সঙ্কটাবস্থাপন্ন রোগীকে আরোগ্য করা তাঁহার ক্ষমতার অতীত ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ডায়াবিটিস্ রোগের চিকিৎসায় ইন্সুলিন্ চিকিৎসকের হস্তে একটি ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। তবে বিশেষ বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিতে না জানিলে এই মহোপকারী ঔষধ রোগীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিদায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু।

প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-চর্চ্চা-জ্ঞান (১)

বেলজিয়মনিবাসী গবলেট্ ডি' আলবিয়ালা (Goblet d' Alviella) নামক এক জন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি ও শিল্প আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত ও মুগ্ধ করে। ভারতের সাহিত্য ও অতুলনীয় নাটকাবলী, উপনিষদ্ ও গীতার গভীর ও মহান্ দার্শনিক তত্ত্বগুলি অনেক দিন পূর্ব্বেই পাশ্চাত্য জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই ভারতবর্ষেই পাটী-গণিত, বীজগণিত প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, সংখ্যা-লিখন প্রণালী আরবদিগের সৃষ্টি; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা হিন্দু-মস্তিষ্ক-প্রসূত। মোক্ষমুলর বলেন, যদি ভারতবর্ষ য়ুরোপকে সংখ্যা-বিজ্ঞান দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তবে ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের ঋণ অপরিশোধনীয় হইত। (২)

প্রাচীন আসিরিয়া, বাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশ-সমূহ তাহাদের স্মৃতিস্তম্ভ এবং পাথর বা অগ্নিদগ্ধ মাটীর ফলকের উপর ক্ষোদাই-করা চিত্র-লিপির ভিতর আজিও অমর হইয়া আছে। সাহিত্য ও দর্শনের ভিতর প্রাচীন রোম ও গ্রীসের প্রাণের স্পন্দন আজও পাওয়া যায়, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ২ হাজার ৫ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির যৎসামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শাক্য মুনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদি কোন প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ-প্রাকার একবার ধ্বংস করিতে পারেন,

(১) Indian Chemical Societyর সভাপতি কর্ত্তৃক কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে প্রদত্ত প্রথমানুষ্ঠানিক অভিভাষণের সারাংশ। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার বসু এম্. এস্-সি কর্ত্তৃক অনূদিত।

(২) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ সংস্কৃতাধ্যাপক বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও ভারতের নিকট য়ুরোপের ঋণ যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ যে সংখ্যা-শাস্ত্র এখন সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভারতীয়েরা আবিষ্কার করেন। এই সংখ্যা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যে দশমিক প্রণালী উদ্ভব হয়, তাহা অঙ্কশাস্ত্র ও মানব-সভ্যতাকে উন্নতির পথে অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতবাসীরা আরবদিগকে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন—পরে আরবগণই এই বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শিক্ষক হয়। সুতরাং যদিও সংখ্যাশাস্ত্রের সহিত আরবদিগের নাম বিজড়িত—প্রকৃতপক্ষে ইহা ভারতবর্ষের দান।"—Macdonnell's History of Sansk Literature, p. 434.

তবে সমগ্র ভারত তাহার নবমতাবলম্বী হইবে। অবশ্য এক সময়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সারনাথের প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণশীলতা এত অদ্ভুত যে, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ পর্য্যটক পিয়ার লোতি (Pierre Loti) পর্য্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। আজকাল কোন পাশ্চাত্য পরিদর্শক আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের গঙ্গাস্নান ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি অবলোকন করিলে সহজেই অনুমান করিবেন যে, পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া হিন্দুদিগের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ২ হাজার ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষরা যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেন, হিন্দুরা আজও ঠিক সেই ভাবেই তাহাদের দিন অতিবাহিত করিতেছে। কবি সত্য সত্যই বলিয়াছেন :—

"The East bowed low before the blast
In patient, deep disdain,
She let the legions thunder past
And plunged in thought again."

হিন্দুরা অতিশয় চিন্তাশীল সত্য—মনোবিজ্ঞানের দুর্ব্বোধ্য সূক্ষ্ম মীমাংসাগুলি লইয়া ব্যস্ত, তথাপি প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব ছিল না। বৈদেশিকদর্শনে পরমাণুবাদ সর্ব্বজনবিদিত গ্রীক দার্শনিক আনাক্সাগোরাস্ (Anaxagoras) ও এম্পেদোক্লীস (Emhedocles) প্রভৃতির বহু পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার মত সময় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও হিন্দুদিগের যে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তি ছিল এবং পরীক্ষামূলক কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা যে তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে আজ কিছু বলিব। রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা ঢুণ্ডকনাথ অথবা রামচন্দ্র বলিয়াছেন ;—

অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎ কর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং
প্রৌঢ়াণাং ... ... ॥

অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূতেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
তেষাং পুনস্তদভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥

অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত আচার্য্য। যে সমস্ত শিষ্য এই সকল পরীক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহা পুনরায় সুসাধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য—ইহা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র অভিনেতা মাত্র।

ঢুণ্ডকনাথ আবার রসার্ণব নামক প্রামাণিক গ্রন্থের নিকট ঋণী। এই পুস্তকে উর্দ্ধপাতন ও তির্য্যক্পাতনপ্রণালী এবং তদুপযুক্ত যন্ত্রাদির বিশদ বিবরণ আছে। সুদক্ষ রাসায়নিক নাগার্জ্জুন এই সমস্ত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিকেরা সকলেই এই জন্য ইঁহাকে বিলক্ষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। (১) নাগার্জ্জুন-সম্পাদিত পারদ বিশুদ্ধ করিবার একটি উপায় বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

মিশ্রিতৌ চেদগে নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষস্তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ ॥

অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসা ও রাং মিশ্রিত করে; ক্রমান্বয়ে তিনবার তির্য্যক্পাতন করিলে এই বিজাতীয় ধাতুগুলি বিদূরিত হয়।

ধাতু দগ্ধ করিবার সময় অগ্নিশিখার বর্ণ দেখিয়া ধাতু সনাক্ত করিবার পদ্ধতি রসার্ণবে বিবৃত আছে। তাম্র নীলবর্ণ, রাং ধূম্রবর্ণ এবং সীসা প্রায় বর্ণহীন অগ্নিশিখা সৃষ্টি করে। এত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ধাতু পরীক্ষা করিবার এইরূপ সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি অন্যদেশে জানা ছিল না। (২)

ধাতুনিষ্কাশন বিদ্যায় হিন্দুদিগের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বেশী ছিল। দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট লৌহস্তম্ভই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (৩)

---

(১) তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ ॥
ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণিঃ।

(২) কার্দা (খৃঃ অঃ ১৫০১-১৫৭৬) সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করেন যে, ধাতুভেদে আলোক-শিখার বর্ণ বিভিন্ন হয়। Hoeferi Histoire de Chimie. Ed. 1869. Vol. II. p. 95.

(৩) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপ
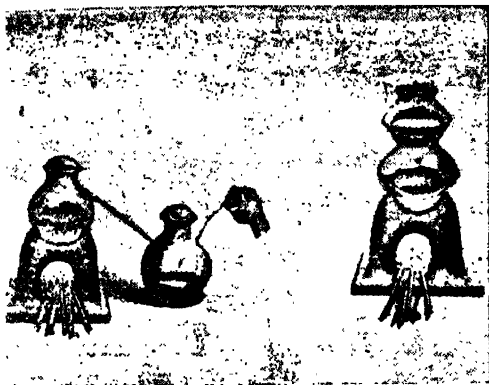
পাতন যন্ত্র   হিঙ্গুল হইতে পারদ নির্গমন

ধূপ যন্ত্র   রসক হইতে যশদ (দস্তা) নিষ্কাষণ

দিল্লীর সন্নিকটস্থ কুতুব মিনার
ও লৌহস্তম্ভ

ঊর্দ্ধপাতন ও তির্য্যক্ পাতন যন্ত্র
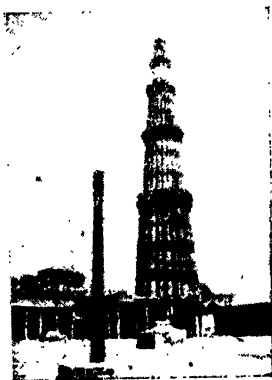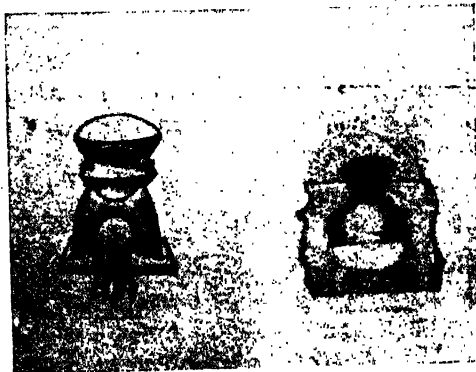
প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক ও রাং (tin) এই ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখা যায়। য়ুরোপের ইতিহাসে পারাসেল্‌সাসের গ্রন্থে (১৪ অঃ— ১৫৪১ খৃঃ অঃ) একটি সপ্ত ধাতুর সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইহাকে তিনি "Zincken" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং উহাকে অবিশুদ্ধ বা কৃত্রিম ধাতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আর বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই।

লাইবেভিয়স্ সর্ব্বপ্রথমে দস্তার স্বাভাবিক ধর্ম্মের অনেক নির্ভুল বর্ণনা করেন। ইহা যে রসক (Calamine) নামক খনিজ পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে, Calaim নামে এক প্রকার রাং (tin) ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফৎ হলণ্ডে যায় এবং তাঁহার হস্তগত হয়।

রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশন করিবার বিবরণগুলি রসার্ণব এবং রসরত্নসমুচ্চয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত আছে। রসকের সহিত হরিদ্রা, লবণ, রজন, ভূষা ও সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মুচির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। একটি সচ্ছিদ্র শরা দ্বারা মুচির মুখ আবৃত করিবে। একটি হাঁড়ি মাটীর ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্দ্ধেক জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ মুচিটি উল্টাভাবে হাঁড়ির উপর সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে জোরে পোড়াইবে। দস্তা (জগদ) বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া শীতল জলের সংস্পর্শে আসিলে রঙ্গের (রাং) ন্যায় আভাযুক্ত হইয়া জমিয়া যাইবে। যখন জ্বালার (অগ্নিশিখা) বর্ণ নীল হইতে সাদা হইবে, তখন উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে। (১)

দস্তা-নিষ্কাশন করিবার এই বিশদ বিবরণটি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের যে কোন পাঠ্য পুস্তকের ভিতর অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহা অন্তর্ধূম-বিপাচন-প্রণালীবিশেষ। ধাতু-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় প্রায়ই এক প্রকার নীলাভ অগ্নিশিখা দেখা যায়। কার্‌বন্ মনকসাইড পুড়িলে এইরূপ হইয়া থাকে। অবশ্য প্রাচীন হিন্দুরা জানিতেন না যে, কার্‌বন্ মনকসাইডের জন্যই এই নীল অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কত বেশী ছিল, ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রাচীন হিন্দুরা যবক্ষার (২) (potassium carbonate) ও সর্জ্জিকাক্ষারের (sodium carbonate) মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা জানিতেন। হিন্দুদিগের প্রাচীনগ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতায় ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় দুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। চরক-সংহিতায় প্রধানতঃ কায়চিকিৎসা এবং সুশ্রুত-সংহিতায় অস্ত্রচিকিৎসার কথা বিবৃত আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় দুই প্রকার ক্ষারের উল্লেখ দেখা যায়, তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষার। বাল্যকালে দেখিয়াছি, কলাগাছের

অনুমান করিলে (এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়) আমরা এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার উপলব্ধি করি, হিন্দুরা এই যুগে এত বড় লৌহখণ্ড ঢালাই করিয়াছেন, যাহা য়ুরোপে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সম্ভব হয় নাই। কয়েক শতাব্দী পরেও কনারকের মন্দির নির্ম্মাণে বড় বড় লৌহদণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, হিন্দুরা লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কাল অপেক্ষা এই সময়েই অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৪ শত বৎসর ধরিয়া বাতাস ও জল লাগিয়াও ঐ স্তম্ভের উপর মরিচা পড়ে নাই, স্তম্ভগাত্রের লিপিগুলি আজও নূতন ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয়।

এই স্তম্ভটি যে বিশুদ্ধ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। Genl Cunnigham ডাঃ মারে দ্বারা এক টুক্‌রা বিশ্লেষণ করাইয়াছিলেন এবং অন্য এক টুক্‌রা স্থানীয় School of Minesএ ডাঃ পারসি পরীক্ষা করিয়াছেন। উভয়েরই মতে ইহা বিশুদ্ধ ও নমনীয় লৌহ-গঠিত।—Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture Ed. 1899, p. 508.

(১) হরিদ্রাত্রিফলারালসিন্ধুভূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ।
সারুষ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সম্মর্দ্য খর্পরন্॥
লিপ্তং বৃন্তাকমূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ।
মূষাং মূষোপরি ন্যস্তখর্পরং প্রধমেত্ততঃ॥
খর্পরে প্রহৃতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি।
তদা সন্দংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা হ্যধোমুখীন্।
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে।
বঙ্গাভং পতিতং সত্ত্বং সমাদায় নিয়োজয়েৎ॥
—ইতি রসরত্নসমুচ্চয়।

(২) বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত ভুলক্রমে সোরাকে যবক্ষার অভিহিত করিয়াছেন এবং তদনুসারে নাইট্রোজেন নামক গ্যাস যবক্ষারজান নামে তখনও বাঙ্গালা-সাহিত্যে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে যবক্ষার=যব+ক্ষার অর্থাৎ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে যবের পাকা শীষ দগ্ধ করিয়া ঐ ক্ষার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে।

ছাই দ্বারা ধোপারা কাপড় পরিষ্কার করিত। ইহার কারণ এই যে, উহাতে যথেষ্ট যবক্ষার বিদ্যমান। সুশ্রুত-সংহিতায় অনেক স্থলজ উদ্ভিদের উল্লেখ আছে, উদয়চন্দ্র দত্তের ভৈষজ্যতত্ত্বে (Materia Medica of the Hindus) এই সব উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন, "শুভদিনে কলাগাছ প্রভৃতি কাটিয়া পোড়াইবে, পরে ঐ ছাই লৌহপাত্রে জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং তৎপরে বহু ভাঁজযুক্ত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।"

এইরূপে মৃদুক্ষার পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই জানেন, কি কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন এই প্রক্রিয়াতে সংঘটিত হয়। ইহার পর তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আছে। ইহা খাঁটী বিজ্ঞানসম্মত। "নানা প্রকার ঘুটিং পাথর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে পোড়াইবে এবং পরে তাহাতে জল দিবে। পরে এই চূণের সহিত মৃদুক্ষারের জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং লৌহ-হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে।"

ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপের ইতিহাসে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় না। এই তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী যে কোন আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের ভিতর আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, লৌহপাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া এই ক্ষার রাখিতে হইবে।

আয়সে কুম্ভে সংবৃতমুখং নিদধ্যাৎ।

সুশ্রুত অবশ্য জানিতেন না যে, কার্ব্বন্ ডাই-অক্সাইড যাহাতে তীক্ষ্ণক্ষারের সংস্পর্শে না আইসে, তাহা লক্ষ্য রাখা দরকার, কিন্তু সেই যুগের বৈদ্যরা ভূয়োদর্শন দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ক্ষারের তীক্ষ্ণতা বিনষ্ট হয়। আজকাল আমরা রজত-পাত্রে বা লৌহপাত্রে তীক্ষ্ণক্ষার রাখিয়া থাকি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সুশ্রুত শুধু ক্ষারের প্রস্তুত ও রক্ষাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু তীক্ষ্ণক্ষার ও মৃদুক্ষারের পার্থক্য স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

ডেভি সর্ব্বপ্রথমে পোটাশিয়ম্ ধাতু এই তীক্ষ্ণক্ষার হইতে আবিষ্কার করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন রাসায়নিকরা যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষারের প্রভেদ জানিতেন না। কিন্তু ইহা ভুল; আয়ুর্ব্বেদে এই উভয় বস্তুর পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে বিবৃত আছে।

সুশ্রুত ও জোসেফ ব্ল্যাকের মধ্যে ২ হাজার বৎসর ব্যবধান। ব্ল্যাক্ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. ডি ছিলেন। তাঁহার Doctorateএর প্রবন্ধে (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে) তিনি সর্ব্বপ্রথমে তীক্ষ্ণ ও মৃদু ক্ষারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি দেখাইলেন, ম্যাগ্নেশিয়ম্ কার্ব্বনেট অগ্নিতে অধিক উত্তপ্ত করিলে উহার ওজন কমিয়া যায় এবং উহা হইতে এক প্রকার বায়ু নির্গত হয়। এই বায়ুকে তিনি "fixed air" বা আবদ্ধ বায়ু (১) নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্ল্যাক তাঁহার পরীক্ষায় তুলাদণ্ড ব্যবহার করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম রামসে তাঁহার কৃত 'Life of Black'নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"ঘুটিং পাথরকে অগ্নিতে পোড়াইলে চূণ হয় এবং সেই জন্য চূণ তীক্ষ্ণতা বা দাহিকাশক্তি লাভ করে। ব্ল্যাকের প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে।

মঁসিয়ে বারথেলো'র অনুপ্রেরণায় আমি হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস (History of Hindu Chemistry) রচনায় প্রবৃত্ত হই। ইনি আমার গ্রন্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "হিন্দুরা সম্ভবতঃ এই রাসায়নিক প্রণালীটি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছে" (Journal des Savants, Jan, 1903, p, 34)। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আছে। চক্রপাণি গৌড়ের রাজা নরপালের (১০৫০ খৃঃ অঃ) রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থে তিনি এই প্রক্রিয়াটি অবিকল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাগভটকৃত একখানি আরও পুরাতন পুস্তকেও (অষ্টাঙ্গ-হৃদয়) ঐরূপ লিখিত আছে।

"মিলন্দা পাঞ্হো" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে আমি একটি সুন্দর অংশ লক্ষ্য করিয়াছি। এই গ্রন্থ অনুমান খৃঃ পূঃ ১৪০ সালে রচিত। অধ্যাপক রিস্ ডেভিস্ নিম্নলিখিত-ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, "যখন প্রদাহ কমিয়াছে এবং

---

(১) লেখক-কৃত "নব রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি" (সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী নং ১৯) ৪২-৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষতস্থান শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, তখন যদি কেহ ছুরিকা দ্বারা ঐ স্থান বিদ্ধ করে এবং তীক্ষ্ণক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর ক্ষার-জল দ্বারা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করে······হে রাজন্, আপনি বলুন, বৈদ্য যদি এইরূপে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার দ্বারা পোড়াইয়া দেয়,তবে তাহা কি নির্দ্দয়তার পরিচায়ক হইবে না ?" (১)

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্ল্যাক স্বাধীনভাবেই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মৃত্‌ক্ষারের মধ্যে কার্‌বন্ ডাই-অক্সাইড আছে, সুশ্রুত এ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

হিন্দু ভৈষজ্যতন্ত্রে পুরাকাল হইতে ধাতব পদার্থাদির ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপে পারাসেল্‌সাস সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ধাতব ঔষধাদির ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বৃন্দ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কি তাহারও পূর্ব্বে ঔষধরূপে কজ্জলীর ব্যবস্থা করেন। কজ্জলী তৈয়ারী করিবার বিস্তৃত বিবরণ চক্রপাণি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) য়ুরোপে কজ্জলী প্রস্তুতপ্রণালী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না।

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আরবরা য়ুরোপে যে চিকিৎসা-বিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত। Ex Oriente Lux অর্থাৎ প্রাচী হইতে প্রতীচীতে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিকের সুসঙ্গত ভাষাতেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি,—য়ুরোপে আবার নবজাগরণের যুগ আগত! ভারতের গভীর জ্ঞান ও গ্রীসের অসাধারণ ধীশক্তির প্রভাবে য়ুরোপের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল—২ হাজার বৎসর পরে য়ুরোপ আবার সেই অবস্থাতেই আসিয়াছে।" (২)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(১) Sacred Books of the East, Vol. 35. p. 168.

(১) শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ
সম্মর্দ্দ্য কজ্জলাভস্তু কুর্য্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে।
* * * * * *
রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা॥

(২) First Faraday Lecture, Chemical Society of London, June 17, 1869.

ক্ষুদ্র ও মহৎ

হৃদয়ের প্রেমাস্পদ নহেক যাহার
ক্ষুদ্র বাস্তুভিটাটুকু পৈতৃক বিভব,
কেমনে স্বদেশ প্রেমে বিশাল আকার
ধরারে সে ভালবাসি' লভিবে গৌরব ?

গার্হস্থ্য প্রণয়ে দুটি প্রিয়জন প্রতি
আসক্তি নাহিক যার,
কেমনে সে জন
বিশ্ব-প্রেমে জীবে করিবে আরতি—
নিরখিবে পৃথিবীরে
প্রেম-বৃন্দাবন ?

মানবের ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যের মাঝে
আছে গুপ্ত জীবনের
কর্ত্তব্য মহান্ ;
জীবনের ক্ষুদ্রতম লক্ষ্য' পরে রাজে
চরম লক্ষ্যের সেই
মহোচ্চ সোপান।

শ্রীপ্রসাদকুমার রায় বি, এ।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জগতের কর্ম্মপ্রবাহ অনন্ত বলিয়া মানুষ তাহার শরীর-মনের কোন অবস্থাতেই কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না। যত বড় অনিচ্ছা ও অনাগ্রহই তাহার মধ্যে থাকুক, কাষ করিতেই হইবে, তা বাহিরটা তাহার যদি বা নিশ্চেষ্ট থাকে, মানস-জগৎ একটু ক্ষণের জন্যও দৃষ্টিহীন থাকিবে না। নিজের বেদনা-বিধুর চিত্তকে কোন উপায়েই যখন আর সান্ত্বনা দিতে পারা গেল না, তখন নিজের সঙ্গে একান্তই বিরক্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুলেখা মাকে আসিয়া বলিল, "অনেক দিন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন দেওয়া হয় নি, পাঁচ জনে শুন্‌তে চায়, দিলে হয় না?"

মেয়ের মুখে বহুকাল পরে পূর্ব্বের মতই একটুখানি আবদারের কথা শুনিয়া সত্যবতী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কীর্ত্তন ও পূজা-আচ্চা কালই আমি বন্দোবস্ত করিয়ে দিব।"

কীর্ত্তনের পালা নির্ব্বাচন লইয়া অনেকখানি গোল বাধিল, মেয়ের ইচ্ছা মাথুর, কিন্তু ঐ পালাটায় না কি বড়ই কাঁদিতে হয়, তাই সত্যবতী কোনমতেই উহাতে রাজী হইলেন না। তখন নৌকাখণ্ডই স্থির হইল।

যথাকালে প্রশস্ত অঙ্গনে আসর সাজাইয়া কীর্ত্তন-গান আরম্ভ হইল। পাড়াপ্রতিবাসী পুরুষ-নারী দলে দলে আসিয়া আসর ভর্ত্তি করিয়া বসিল। তাহা-দের সঙ্গে ছোট-বড়, মেজ-সেজ বহু আকারের বহু বয়সের ছেলে-মেয়ে আসাতে ক্রন্দনে, চীৎকারে, কলহে দেখিতে দেখিতে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। কাহার কোলের তিন মাসের খোকার ঘাড়ের উপর দিয়া কাহারও সঙ্গের এক বৎসর বয়সের মেয়ের জুতা-পরা পা চলিয়া গেল, ফলে আঘাত পাইয়া কচিটা ও মার খাইয়া এক বৎসরেরটি চেঁচাইতে লাগিল, এবং দুই মায়েতে এতদুপলক্ষে ঠিক রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়া গেল। কোথাও বসিবার স্থান লইয়া পরস্পরে বাগ্‌-যুদ্ধ ও ঠেলাঠেলি চলিতেছিল। এক জন বলিলেন, "এ যায়গা আমার, তুমি এসে দখল করলে কেন গা?" অপরা কহিলেন, "কেন, যায়গা কি তুমি ইজারা নিয়েছ না কি যে, তোমারই হয়ে গেছে?"

ইহার পর এ বিবাদ চরমে গিয়া পৌছিল। সুলেখা এই সকল বিবাদ-বিসংবাদ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, স্থির হইয়া বসিয়া গান শুনা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াই উঠিতেছিল না, তথাপি সে জন্য সে বিশেষ দুঃখিতও হয় নাই। যেমন করিয়াই হউক, তাহার মনটাকে সে একটুখানি ব্যাপৃত রাখিতে চায় বৈ ত নয়। তা সেটা যে দিক দিয়াই ঘটে ঘটুক না কেন?

সে দিন জ্যোৎস্না-রাত্রি, আকাশে দুই এক খণ্ড পাতলা মেঘ মন্থরগতি করিশিশুর মতই স্বাচ্ছন্দ্য-বিহারে ইচ্ছাসুখে শুণ্ড দুলাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া ফিরি-লেও বিশালকায় গজযূথ দেখা দেয় নাই। চাঁদের আলো সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘপথে নানারূপে নানা বিচিত্র আকারে ধরণীর বুকের উপর আলিপনা কাটিয়া রাখিয়াছিল। কীর্ত্তন-সভার চন্দ্রাতপতল স্ফটিক-ঝাড়ের উজ্জ্বল বর্ত্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল আলোকিত। কীর্ত্তনীয়াগণের কণ্ঠমাল্য হইতে বেল-যুঁইয়ের ঘন সৌরভ সঘনে উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সুকৌশল কথনভঙ্গী ও মিষ্ট স্বর এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির অপূর্ব্ব রস-রচনা শ্রোতৃবর্গের অনে-কেরই মনে ভাবাবেশ আনয়ন করিয়া দিয়াছিল। আবার কেহ কেহ তখনও ছুতায়-লতায় কলহের কাকলী তুলিয়া নিজের সঙ্গে অপরেরও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সঙ্গীত-সুধাপানের পরিবর্ত্তে কর্কশ চীৎকারে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সুলেখা যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের ভিড়ে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই, সে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তখন শ্রীরাধিকা গভীর মানের দায়ে শ্যাম হারাইয়া অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া মরিতেছেন—

"ধনীকে জিউ ধসই ক্ষীণ ধরণীপর গিরত প্রাণ বঁধুয়ারে মনে পড়ে টুটল মানিনীকো মানে—আর মান নাই, এখন মান গিয়ে বিরহ এল, ধনীর কৃষ্ণবদন মনে হল।"

সুলেখার বড় ভাল লাগিল। বাস্তবিকই তাই নয় কি? অভিমান যতই মনকে অধিকার করিয়া রাখুক না কেন, গভীর প্রেম তাহাকে যে নিয়তই ধিক্কার দিতে ছাড়িতেছে না, সে নিজে আহত হইয়াছে বলিয়াই কি আজ প্রতিশোধ-স্পৃহায় উহাকেও অনবরত আঘাত দিয়া দিয়া পাগল করিতে বসিয়াছে?

গায়কেরা আবার গাহিতে লাগিল,—

"যেমন কায করেছিলাম, তাহার প্রতিফল পেলাম, এখন জ্ব'লে জ্ব'লে জ্বলে মলাম, এখন বিরহদাব-দহনে জ্ব'লে জ্ব'লে জ্ব'লে মলাম।"

সুলেখা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল।

এক জনের কচিছেলে চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ছেলে লইয়া ছেলের মা বাহির হইয়া আসিয়া সুলেখাকে চিনিতে পারিয়া অনুরোধের স্বরে কহিলেন, "ছেলের বড্ড জ্বর এসেছে মা, কোনমতে আর কোলে থাকতে চায় না, যদি সঙ্গে একটি লোক দাও মা ত ছেলে নিয়ে বাড়ী যাই।"

সুলেখার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না, সে একটা দাসীর সন্ধানে চলিল।

"দিদিমণি! আপনাকে বাবু একবার শীগ্‌গির ক'রে ডাকছেন গো।"

সুলেখা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুই এঁকে একটু আগবাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আয় তো বাছা! আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।"

দাসীর নির্দ্দেশমত সুলেখা তাহার পিতার শয়নকক্ষে পৌঁছিয়া দেখিল, সেখানে শুধু তাহার বাপই নয়, মাও রহিয়াছেন। এরূপ অসময়ের আহ্বানে, তাহার উপর যাকে কীর্ত্তন শুনা বন্ধ করিয়া এমন স্তব্ধ ও নতমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বাপের মুখের স্তব্ধ গম্ভীর ভাব দেখিয়া সে মনে মনে ভয়ও পাইয়াছিল।

"বাবা আমাকে ডেকেছ?"—সুলেখা থামিয়া থামিয়া ভয়ে ভয়ে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিল। পিতার এরূপ মেঘমণ্ডিত পর্ব্বতের মত স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি সে অনেক দিন দেখে নাই। হয় ত এরূপ জলদজালমণ্ডিত ভীমকান্ত মূর্ত্তি কখনই দেখে নাই। কি একটা অজ্ঞাত মহাভয়ে তাহার বালিকা-চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। না জানি আবার কি অমঙ্গলের এ সূচনা!

বিপ্রদাস কথা কহিলেন, তাঁহার কণ্ঠশব্দে সুলেখা সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া উঠিল। যেন বর্ষার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশে অকস্মাৎ গুরু গুরু শব্দে মেঘগর্জ্জন হইল!

"সুলেখা! ভুবন বাবুর পুত্র জাল সই দ্বারা ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গা চার্জ্জে অভিযুক্ত, তুমি ভালই করেছিলে যে, তাকে বিয়ে করনি, আজ থেকে আমি তোমার জন্য পাত্রান্তরের চেষ্টা করবো, তার সমস্ত স্মৃতি আজ থেকে মন হ'তে নিঃশেষে মুছে ফেলে দাও; মহাপাপীর স্মৃতিপূজায় পূজার অবমাননা কোরো না।"

স্তম্ভিত সুলেখার চক্ষুতে সহসা সমস্ত বিশ্ব যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। বিমুক্ত জগৎ যেন ভূমিকম্পে নাড়া পাইয়া সজোরে এদিক ওদিক দুলিতে লাগিল। জলস্থল, অন্তরীক্ষ সমুদয় যেন তাহার স্তিমিত নেত্রসমক্ষে ঘন-ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত নিঝুমভাবে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই গর্জ্জিত মেঘের মধ্য হইতে নির্ম্মুক্ত অশনি ভাঙ্গিয়া যেন তাহার মাথায় পড়িয়াছিল।

ঘর গভীর নিস্তব্ধ, গৃহবাসী তিন জনেরই অন্তররাজ্যে তখন প্রবল বিপ্লবস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহারা ঐ আকস্মিক ভয়ভীত মূক জড়প্রকৃতির মতই নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। এই তিনটি প্রাণীর মনের কথা পরস্পরে বিনিময় করিবার মত ভাষা আজ তাহারা যেন একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বলিবার রহিয়াছে বলিয়াই যেন বলিবার ভাষা তাহাদের নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে।

বাহিরের এই ছিন্নভিন্ন মেঘগুলা এতক্ষণে একসঙ্গে জমা হইয়াছিল,এতক্ষণে যেন কোন অদৃশ্য হস্তধৃত বিদ্যুৎ-বরষার মুহুর্মুহুঃ প্রহার-ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া তাহারা একান্ত অসহায়ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঝড়ের বেগে পৃথিবীর উপর আছাড়ি-পাছাড়ি লাগাইয়া দিল। চারিদিক দিয়া একটা উদ্দাম শোকের আর্ত্তনাদ যেন ক্ষণে ক্ষণেই গুমরিয়া ফুটিয়া উঠিল। অন্তর্বাহিরের সেই অফুরন্ত ভয়াবহ শোক ও হতাশা লইয়া এই তিনটি প্রাণী নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া কাছাকাছি বসিয়া নীরবে অসহ্য ব্যথা উপভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু একটি কথার আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরের কাছে কোনরূপ শান্তি বা সান্ত্বনা লাভ করিবার শক্তি বা সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন কাহারই রহিল না।

* * * * *

পরদিন অনেকখানি সুস্থ ও সংযত হইয়া সুলেখার সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, এ সংবাদ হয় ত মিথ্যা। সুশীল জাল সই দিয়া টাকা ভাঙ্গিয়াছে, এ কথায় কোনমতেই যেন তাহার চিত্ত সায় দিতে পারিতেছিল না। সুশীল এত বড় পাপিষ্ঠ! এও কি সম্ভব? যতই ঘৃণার সহিত সে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে যায়, ততই যেন তাহার সঙ্গে সেই বিদায়-দৃশ্য চোখের উপর সদ্য দেখা দৃশ্যের মতই জল-জল করিয়া জাগিয়া উঠে, দুই কান ভরিয়া বাজ যেন সঘনে বাজিয়া উঠে,—"সুলেখা! অবিচারে দণ্ড দিয়ে চ'লে যেয়ো না।" কি সে আর্ত্তস্বর! ওঃ! সুলেখার কান যেন তাহার ঝাঁজে পুড়িয়া গেল!

কতবারই সে নিজের মধ্যে জোর করিয়া বল আনিতে চাহিল, বিচার-বিতর্ক আত্মপ্রবোধার্থ অনেকই করিল, কিন্তু কিছুতেই আজ আর সে নিজের মনকে বুঝাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অন্যায় অবিচার, ইহার আগাগোড়াই যেন একটা অসম্ভব ভুল! আর সেই দণ্ডিতের জন্য তৈরি করা দণ্ডটা যেন তাহার নিজেরই মাথার উপর পড়িয়া তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ অস্থির করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

অবশেষে কোনমতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া, সুলেখা এক সময় সকল দ্বিধাকে পরাস্ত করিয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস তখন অন্যমনস্ক-ভাবে ফুরসীর নলে টান দিতে দিতে কি একটা কথা ভাবিতেছিলেন। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে সুলেখা ডাকিল, "বাবা!"

বিপ্রদাস মুখ তুলিলেন, মুখখানা বড় ম্লান দেখাইল। সুলেখা সহসা কিছু বলিতে পারিল না, সে যাহা বলিতে চায়, বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিপ্রদাস নিজেই কথা কহিলেন, "কি রে লেখা?"

সুলেখা একবার মুখ তুলিয়া আবার তাহা নত করিল, সঙ্কোচ ও লজ্জায় তাহার কণ্ঠ হইতে ভাষা বাহির হইতেছিল না, অথচ এ সব বিষয়ে মায়ের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নহে জানিয়া এই একমাত্র উপায়কেই তাহার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

"কি বলবে বল মা! এসো, আমার কাছে এসে বসো।" মেয়ে আসিয়া হেঁটমুখে পায়ের কাছে বসিতেই পিতা তাহার হাত ধরিয়া কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইলেন; স্নেহভরে কহিলেন, "কোথাও যাবি?"

এই কথার সুযোগ পাইয়া সুলেখা তখন ঘাড় না তুলিয়াই অধোদৃষ্টিতে অস্পষ্টভাষায় একনিশ্বাসে কহিয়া ফেলিল, "আমাদের একবার কল্‌কাতায় গেলে হয় না বাবা?"

"কলকাতায়? কোথায়? কেন?" বিপ্রদাসের কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

সুলেখা তাহা বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই তাহার মনের সঙ্কোচ আরও অনেকটা বর্দ্ধিত হইল, তথাপি সে কোনমতে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। "তাঁদের এমন বিপদের সময় একবারটি যাওয়া কি উচিত নয়?"

বিপ্রদাস মেয়ের কথার অর্থ বুঝিয়া দুঃখগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "তাদের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি লেখা?"

সুলেখার মুখ আরও খানিকটা নামিয়া আসিলেও তাহার সেই নত মুখের নতদৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল ও কঠিন হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, যেন অনেক-খানিই সঙ্কোচ কাটাইয়া ফেলিয়া, নিজেকে দৃঢ় করিয়া

লইয়া একটুখানি স্পষ্টস্বরে কহিয়া উঠিল, "কিন্তু এ ত মিথ্যাও হ'তে পারে ?"

"কি মিথ্যা হ'তে পারে, মা ?"

"এই জাল করার কথা ?"

"কেমন ক'রে তা হবে মা ? সে যে নিজমুখেই দোষ স্বীকার করেছে। খবরের কাগজে এ সব কথা যে বেরিয়েছে, তুমি দেখনি ? —দেখতে চাও ?"

সুলেখা দুই হাতে তাহার সেই নত মুখ ঢাকা দিল, তাহার সেই হাত দুখানা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল—সে অসহায়ভাবে শুধু সবেগে মাথা নাড়িল। ওমনি করিয়াই শুধু তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, না না, সে দেখিতে চাহে না।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুঃখের দিন মানুষের বড় সহজে কাটিতে চাহে না, কিন্তু সুলেখার সে দিন-রাত্রিও অবশেষে কাটিয়া গেল। কাটিল বটে, কিন্তু কি করিয়া যে কাটিল, তাহা শুধু সে-ই জানে। এত দিন অত্যাচারিতা নীলিমার প্রতি করুণায় সে যে নিজের কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও অবসর পায় নাই, বরং তাহার সূচনা দেখিলেই সযত্নে তাহাকে পরিহারচেষ্টা করিয়া গিয়াছে; কিন্তু যে দিন হইতে জানা গিয়াছে যে, নীলিমার ক্ষতি আজ প্রতীকারের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে এত দিনের সযত্ন-রুদ্ধ আত্মচিন্তাটাই যেন তাহার কাছে বড় বেশী প্রবলমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, নিজেরও যে তাহার কত বড় ক্ষতি হইয়া গিয়াছিল, সেই কথাটা এত দিন পরে এখনই তাহার কাছে ভাল করিয়া ধরা পড়িল। আর তাহার অসহ্য বিয়োগ-দুঃখে প্রাণ তাহার যেন ফাটিয়া পড়ে পড়ে বোধ হইল। তাহার উপর আবার এই সংবাদটা যেন তাহার সহ্যের মাত্রাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দিয়াছিল। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত অতি কঠোরতায় তাহার মনে প্রাণে আর সহিবার শক্তি ছিল না। সুশীলের প্রতি এক দিকে যত বড় প্রচণ্ড বিরাগ আর এক দিকে কি না তেমনই প্রবল করুণা! ইহার মাঝে পড়িয়া সে যেন পাগল হইয়া যাইতে বসিল। সেই বিপন্ন, অপমানিত, ঘৃণিত লোকটাকেই একবারটি দেখিবার জন্য তাহার সারা চিত্ত কি বুভুক্ষিতভাবে তীব্র হাহাকারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে! সে আর্ত্তনাদকে—সে আকাঙ্ক্ষাকে সে যে কোনমতেই দমন করিতে পারিতেছে না, সে যেন মুগুর দিয়া তাহাকে মারিতেছে, অথচ এ কি ভীষণ লজ্জা! ইহা যে লুকাইবারও স্থান কোথাও নাই!

কিন্তু এক দিন ইহারও কতকটা সমাধান ঘটিয়া গেল। হঠাৎ সে দিন ভোরে চিঠিখানা পাইল। চিঠিখানা অপরিচিত হাতের অক্ষরে লেখা, কিন্তু লেখিকা তাহার আদৌ অপরিচিতা নহে। সে সাগ্রহে পড়িল;—

"স্নেহের ভগিনী সুলেখা!

হতভাগিনী নীলিমাকে তুমি ত জান, আমি সেই নীলিমা। আমার জন্য তুমি যা করিতে চাহিয়াছ, জগতে দ্বিতীয় কেহ তাহা কখন করে নাই, তাই সে তোমার সেই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতায় একমাত্র তোমারই নিকট চিরবিক্রীত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমার অবস্থা আমি নিজের বুদ্ধির দোষে অথবা শিক্ষার দোষে বা ভাগ্যের দোষে যারই দোষে হোক, এমনই অপ্রতিবিধেয় ও জটিল করিয়া তুলিয়াছি যে, সে জটিলতার পাক ছাড়াইয়া ইহাকে বাহিরে আনা আজ কাহারও পক্ষে আর সম্ভব নহে। যাক্ সে কথা, স্বকর্ম্মের ফলভোগ—যাহার কর্ম্ম, তাহারই করা অনিবার্য্য; সে জন্য আমার কাহারও সম্বন্ধে আজ আর কোনই অনুযোগ করিবার নাই। বড় বিশ্বাসেই এই জ্ঞানটুকু আমি লাভ করিয়াছি যে, মানুষ স্বকর্ম্মফলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে, এবং অদৃষ্ট যাহার জন্মক্ষণেই বাম হইয়াছে, তাহার পরিণাম কখনই শুভ হইতে পারে না। এখন আমার বলিবার কথা এই যে, আমি যে দুঃখ পাইতেছি, তাহা না হয় আমারই থাক; আমার সঙ্গে নিরপরাধে তোমরা শুদ্ধ কেনই যে এত বড় দুঃখ ভোগ করিতেছ, ইহাও কি আমার ভাগ্যলিপি, তাহাও ত জানি না। আমি যেন তোমাদের জীবনের দুষ্টগ্রহ, তাই আমার সংস্পর্শে তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের অনেকগুলা দিন ঘোর দুর্ব্বিপাকের মধ্যে জড়াইয়া বিপ্লবময় হইয়া গেল! কিন্তু আমি যদি ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম, তবে হয় ত এত কষ্ট তোমাদের পাইতে দিতাম না। আমার পোড়া অদৃষ্টের লেখা লইয়া আমিই তাহার যাহা কিছু বিড়ম্বনা

ভোগ করিব, আমার জন্ম জগতের আর কোথাও অপর আর কাহাকেও তাহার অংশভাগী করিতে আমার কোন অধিকারও নাই এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি সরিয়া গেলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

"সুশীল বাবুকে আমি কদিন মাত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তুমি না কি তাঁহার চিরপরিচিতা? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে যে, তাঁহার দ্বারা অমন ঘৃণিত কার্য্যও ঘটিতে পারে? তুমি না হয় ছেলেমানুষ, মানুষ চিনিবার শক্তি তোমাতে আজও না হয় দৃঢ় হয় নাই, কিন্তু তোমার অভিভাবকরাই তাঁহার নিজের বাপ? তিনিও এই হেয় চক্রান্তে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছেন না কি? হায় হায়! সেই বাপের ও তোমার মনোভঙ্গের ভয়েই যে তিনি আমার বাপের কবলে পড়িয়া সব চেয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন! পিতৃবৎসলতার যে তাঁহার সীমা দেখি নাই। আমার মত দুর্ভাগ্য জীব তাঁহার এ ভক্তিভালবাসার কোন অর্থ বোধ করিতেই যে পারে নাই। বিস্ময়ে, ঈর্ষায়, অভিমানে স্তব্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, না জানি সে কেমনই বাপ, যার পরে সন্তানের এত বড় নির্ভর শ্রদ্ধা! কিন্তু ক্ষমা করিও, এই কি তাহার পরিচয়? নিজের সন্তানকে না চিনিয়া তাহার পরে এত বড় কঠিন আঘাত তিনি দিতেও ত পারিলেন? তবে কি তোমাদের বিশ্বাসে দেবতাও পিশাচে পরিণত হইতে পারেন? অথবা অত বড়কে ধারণা করা স্বাভাবিক নয়। আমিও ত এ বয়সে অনেক দেখিলাম, কিন্তু এমন দেখিলাম কই?

"আরও কি স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, এ রটনা—আমার বাপের এই ঘৃণ্য রটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা? বিনা খরচায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্ম তিনিই তাঁহাকে এই কলঙ্করটনার ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া বিবাহে বাধ্য করেন, অসম্মত হইলে আদালতে মিথ্যা নালিশ করার ভয়ও দেখান। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে গোপনে পলাইবার সহায়তা করি। কেন করি? তাঁকে তোমা-ময় জানিয়া। যদি তিনি আমারই ক্ষতিকারক হইতেন, আমিই কি নিজের সেই তত বড় সর্ব্বনাশের সমর্থন করিতে পারিতাম? নারী তুমি, তুমিই ইহার বিচার করিও, আর করিতে দিও তোমার যদি মা থাকেন, তবে তাঁহাকেই।

"আর কি বলিব? বড় নির্ব্বোধের কায তোমরা করিয়াছ! সোনায় খাদ থাকিলে তাহাকে পোড়াইতে হয়, তোমাদের খাঁটি সোনা তোমরা কিসের দুঃখে পোড়াইলে জানি না। বেশী পাইলে হয় ত সে পাওয়া বুঝিতে পারা যায় না। যাক্, যার যা ভাগ্যে ছিল, তা ঘটিয়াছে, এখন তোমার হারানিধি তুমি অকুণ্ঠিতচিত্তে ফিরাইয়া লও। আমার আর তাহাতে লোভ নাই। আমার করতলায়ত্ত রত্ন আমি যে বহুদিন পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সে শুধু তোমারই জন্ম, তোমাহীন জীবনে তাঁহার সুখ হইবে না বুঝিয়াই সে কায করিয়াছি, নতুবা ভিখারী কি রত্ন ত্যাগ করে?

"আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ লইও। আমার স্নেহ-প্রতিমা ছোট বোনটি! ঈশ্বর তোমার সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া লউন। ইতি

তোমার অভাগিনী দিদি
নীলিমা।"

পত্রপাঠশেষে এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধীর হইয়া উঠিয়া সুলেখা প্রাণপণে ছুটিয়া সুপ্তিমগ্ন মা-বাপের শয়নগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। জোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা! মা! বাবা! বাবা!"

একসঙ্গে দুজনেরই ঘুম ভাঙ্গিল। সত্যবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি লেখা? কি হয়েছে, মা? অমন করচো কেন? কি রে?"

"দেখ কি চিঠি পেলুম,—মা! মা! আমি আজই এক্ষনি আমার শ্বশুরের কাছে যাবো, বাবা তুমি দুজনেই আমার সঙ্গে চল।"

নীরবে পত্রপাঠ সমাধা করিয়া একসঙ্গেই দুজনে হর্ষ-বিষাদে মুখ তুলিলেন। পিতা কহিলেন, "এ ত বুঝলুম, তবে এর জন্তে আমার আপত্তিও ত খুব বেশী ছিল না; কিন্তু এবারকার এটা যে এর চেয়েও ঢের বেশী শক্ত, জালিয়াতের হাতে ত আর মেয়ে দেওয়া যায় না।"

সুলেখা তাহার স্বভাবের বহির্ভূত একান্ত অসহিষ্ণু ও অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "মেয়ে দাও না দাও,

সে সব পরের কথা, এখন আজই সেখানে গিয়ে ক্ষমা ত আমার চাইতেই হবে, আমিই যে সকল দুর্দ্দশার মূল! এসো মা, শীগ্‌গির ক'রে তৈরি হয়ে নাও। আমি বলছি, দেখো, এটাও মিথ্যা কলঙ্ক, এ কথনই সত্য হ'তে পারে না, কখনও না, আমার উপর রাগ করেই হয় ত— মা, মা, তুমি কিছু বলো না মা! বাবা, তুমিও সবটা বুঝে দেখ।"

—

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত উত্তেজনার পরই একটা সুগভীর অবসাদ বড় অতর্কিতে আসিয়া দেখা দেয়। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে সারাদিন অগ্নিতপ্ত ধূলি-বালির রাশি উড়াইয়া ঝড়ের বাতাস তাহার যথাসাধ্য দাপাদাপি করিয়া নিজেও জ্বলে, পরকেও জ্বালায়; কিন্তু তাহার পর সন্ধ্যার ম্লান স্নিগ্ধ বিষণ্নতার মধ্যে সে একেবারে যখন স্তব্ধ হইয়া থামিয়া যায়, তখন শ্বাস টানিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত যেন তাহার বাকি থাকে না। সুশীল এত দিন তাহার মনের ঝোঁকে এবং সুলেখার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য-সাধন করিয়া বেড়াইয়াছে; কিন্তু সে কর্ত্তব্য যেই তাহার সমাধা হইয়া গেল, অমনই তাহার বোধ হইল, যেন তাহার এ জীবনের কর্ম্মসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইবার তাহার এই নষ্টশ্রী ও কর্ম্মভ্রষ্ট জীবনটাকেও শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই চুকিয়া যাইবে। তাই হাজতে বসিয়াও সে যেন এত দিনে অনেকখানি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিল। সংগ্রাম-বিধ্বস্ত ক্লান্ত সৈনিক যুদ্ধশেষে শান্তি উপভোগে যেমন নিজের অসহ ক্ষত-জ্বালাকেও বিস্মৃত হয়, তেমনই একটা সর্ব্বনাশের শান্তি যেন সে নিজের সর্ব্বশরীর-মনের উপর বড় স্বস্তির মতই এত বড় সর্ব্বনাশের মধ্যে অনুভব করিল। সে ত খুঁজিতেছিল মরণকেই, তা তাহার অপেক্ষাও তাহার ভাগ্যে এ বড় বেশী পুরস্কার মিলিয়া গিয়াছে; হয় ত বা ইহা ভালই হইল। মরিলেই ত সব চুকিয়া যায়, জীবনের শাস্তিটা ত আর ভোগ হয় না।

লোহার শিকল দিয়া আঁটা ছোট্ট একটুখানি জানালার দিকে মুখ করিয়া সুশীল মাটীর উপর স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, একবার নিজের দীর্ঘব্যাপী ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিল সে নিজের অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়া; আজ সে গৃহহীন, স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা-সুনামহারা, হীনচরিত্র অপরাধী! সুশীলের ওষ্ঠপ্রান্ত একটা অতি তীব্র জ্বালাময় মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার শীর্ণমুখে কালিমালিপ্ত দুই চোখের তারা একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে এক মুহূর্ত্ত দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। কঠোর ব্যঙ্গে আপনাকে আপনিই অভিনন্দিত করিয়া সে মনে মনে নিজেকেই নিজে বলিল, "জগতে বেশ পরিচয়টা রেখে যাচ্চিস্ সুশীল! খুব একটা নাম পেলি! এমন ক'জনের কপালে জোটে!"

সুশীলের মনে পড়িল সুদূর অতীতের একটা সুবিস্তৃত ইতিহাস। সুলেখাদের চাকর গোপাল আগুন দেওয়ার মিথ্যা অপরাধে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া সে এক দিন ভয়ে লজ্জায় যেন মরিতে বসিয়াছিল! তাহার মনের মধ্যে বিস্ময় যেন উথলিয়া উঠিল। সেই মানুষই কি সে?

বদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল। কারা-প্রহরীর যথারীতি নিত্য কার্য্যে আগমন মনে করিয়া সুশীল মুখ ফিরাইল না, নিজের সেই সহসাচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে সংযুক্ত করিয়া লইয়া পুনশ্চ আত্মচিন্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু সে ধারা সে আর অব্যাহত রাখিতে পারিল না। সহসা এই অর্দ্ধ-অন্ধকারে কারাকক্ষে একটি দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার মতই এক রূপসী তরুণী ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

"এ কি, সুলেখা!"

স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বিস্মিত মৃদুস্বরে কোনমতে কথা কয়টা বলিয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহার পা দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং শুধু পা-ও নয়, দেখিতে দেখিতে সেই কম্পনটা তাহার সমস্ত শরীরেই ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না, প্রাণপণ বলে তাহার পা দুখানা তখন সুলেখার দুহাত দিয়া বাঁধা এবং সেই পায়ের উপরেই তাহার মুখখানা সবলে লুকানো। সুশীলের সর্ব্বশরীর সেই স্পর্শে শিথিল হইয়া আসিলেও সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিল যে, সেই মুখখানাতে উষ্ণ অশ্রুস্রোত

ছিটকাইয়া আসিয়া তাহার সেই ধূলি-মলিন শুষ্ক রুক্ষ পা-দুখানাকে ধৌত করিয়া দিতেছে! সুশীল কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পর নিজের এই অবস্থায় যেন ফাঁপরে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া বলিল, "ওঠো সুলেখা!"

সুলেখা দ্বিগুণ বলে পা-দুখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর নিজের মুখ ঘষিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা করতে পারবে না?"

সুশীল তখন একান্ত অধীর হইয়া কহিল, "তুমি আগে উঠে বসো সুলেখা!"

সুলেখা উঠিয়া বসিল, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যে শ্রাবণ-ধারা বহিতেছিল, তাহা সে রোধ করিল না, নত-মস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সুশীল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "তুমি এখানে কেন এলে, সুলেখা?"

সুশীলের কণ্ঠে প্রচুরতর বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

সুলেখা এবার আঁচল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া নিজের চোখ মুছিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে অশ্রু-স্তম্ভিত ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল, "তোমায় আমার যা বলবার আছে, সেই কথা কটা শুধু ব'লে যেতে এসেছি। তুমি দয়া ক'রে শুনবে কি?"

"তোমার বাবা যে তোমায় এখানে আসতে দিলেন?"

সুশীলের কণ্ঠ তখনও তাহার সেই অকথ্য বিস্ময়ের ভাব বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

"সহজে কি আর দিয়েছেন? দুদিন উপোস ক'রে ক'রে প'ড়ে থেকে তবে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি।"—সুলেখার কণ্ঠ সহসা অস্পষ্ট হইয়া থামিয়া পড়িল।

"কেন এলে, সুলেখা?"

সুলেখা উত্তর দিল না, নীরবে তাহার গণ্ড বহিয়া জলধারা বহিয়া আসিয়া ঘরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুশীলের বিস্ফারিত সাশ্চর্য্য নেত্র সেই দৃশ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিল, সেও আর কোন কথা কহিল না।

ছোট জানালাটার বাহিরে তখন পত্রবহুল একটা প্রকাণ্ড নিমগাছকে অসংখ্যজাতীয় পাখীর দল বহুবিধ কলতানে শব্দমুখর করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতার অপর শব্দসমূহকে এখানের দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিলেও ঐ আনন্দ-কলরবটুকুকে ইহার মধ্যে চাপিয়া রাখা যায় নাই। গাছটির মাথার উপর দিয়া যেটুকু নীল আকাশ দেখা যায়, সেটুকু আজ গভীর নীলিমায় নিবিড় দেখাইতেছিল, ক্ষুদ্র এক খণ্ড পীতাভ সূর্য্যালোক মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া অনাবৃত ভূমিতলে এ গৃহের আগত অতিথিকে বুঝি স্বাগত জানাইবার জন্যই আসনের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘর গভীর নিস্তব্ধ, সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা কাহারও সফল হইতেছিল না;—যদিও দুজনেই বুঝিতেছিল যে, বলিবার সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই নির্ম্মমভাবে গত হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দুই জনেই জানে যে, তাহাদের বলিবার শুনিবার দুই-ই এখনও বাকি রহিয়াছে. আর হয় ত এ জীবনে এ সুযোগ কখনও দ্বিতীয়বারের জন্য তাহার মধ্যে আসিবে না।

অবশেষে সেই অন্তর্গূঢ় অসহ্য নীরবতা সুলেখাই ভঙ্গ করিল।

"আমার এই বলবার আছে যে, তোমার আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, তুমি ইহার পর যেখানেই থাক বা যাও, শুধু জেনে রেখো যে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ব'সে রইলুম। এক দিন আমাদের মিলন হবেই;—তা হোক সে এই জন্মে, আর হোক বা জন্মান্তরে। আমি তোমায় যে অন্যায় সংশয় ক'রে অনর্থক দুঃখ দিয়েছি, সে দোষ তুমি আমার যদি ক্ষমা করতে পার, করো; যদি না পার, তাতেও আমার মনে এতটুকু দুঃখ নেই; এ জন্মটা না হয় তার প্রায়শ্চিত্তেই যাবে। কিন্তু তোমায় আমি পাবোই পাবো, তোমায় হারালে আমার চলবেই না। যদি এ জন্মে আর দেখা না হয়, জেনো, মরবার সময় তোমায় পাবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও একান্ত কামনা নিয়েই আমি মরেছি। এর আর কোনমতে কখনই কাল-পরিবর্ত্তন হবে না। আর আমার কিছুই বলবার নেই।"

"সুলেখা! কেমন ক'রে জানলে আমি—"

"নির্দ্দোষ? সে আমি জেনেছি। নীলিমার চিঠি পেয়ে জেনেছি—"

"কিন্তু এই জাল করা, টাকা ভাঙ্গা, এর ত তুমি কোন—"

"না, পত্র পাই নি, জানি না, হয় ত তা কোন দিনই পাবোও না, কিন্তু এ যে তুমি করোনি," এ আমি প্রথম শুনেই বুঝেছিলুম, এ শুধু আমার উপর তোমার বাপের উপর অভিমানে তুমি নিজের ঘাড়ে নিয়েছ, কেমন? নিশ্চয় তাই! নয়? তুমি নাই বলো,—এ আমি সমস্ত পৃথিবী এক দিকে হ'লেও বিশ্বাস করবো না, কেউ করাতে পারবে না। কিন্তু কেন তুমি আমার কাছে সে দিন সব কথা খুলে বল্লে না? কেন বিনা দোষে শুভেন্দুর দেওয়া দণ্ড মাথায় তুলে নিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্লে?"

সুলেখার কণ্ঠ শেষের দিকে যতই লজ্জা, ততই বেদনায় অস্ফুট ও করুণতর হইয়া আসিল। সে একখানা হাত সুশীলের পায়ের উপর রাখিয়া ব্যগ্র দুই চক্ষু তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল—"কেন আমায় ভুল বুঝতে দিলে? কেন বুঝিয়ে দিলে না? এত শাস্তিও কি দিতে আছে?"

সুশীল ব্যস্তে সুলেখার হাতখানা নিজের পায়ের উপর হইতে তুলিয়া হাতের উপর লইল, একটু ক্ষীণ হাস্য-রেখা তাহার শুষ্ক অধরপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল—"বল্লেই কি তোমরা বিশ্বাস করতে? সে যা হবার হয়েছে, সুলেখা! যদি আমি যাই, তুমি—"

যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা সে কথা সুশীল সংবরণ করিয়া লইল। তাহার পিতাকে দেখিতে ইহাকে অনুরোধ করা হয় ত অসঙ্গত এবং—এবং হ্যাঁ—নিশ্চয়ই তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

"আমি কি করবো, বল্লে না? না, বল্‌তেই হবে। বল্‌বে বল?"

দ্বারের নিকট হইতে সুলেখাদের পুরাতন সরকার ও ঝি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "জমাদার সাহেব বল্‌ছেন, আর সময় নেই, চ'লে আসুন দিদি, হয় ত ওরা রাগ করবে।"

সুলেখা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "চল্‌লেম; আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই, তোমার স্মৃতি নিয়ে যদি দরকার হয়—এ জন্মটা আমি খুব কাটিয়ে দিতে পারবো, আজ যে গ্লানির মধ্যে তোমায় আমরা নামিয়ে দিয়েছি, তার প্রায়শ্চিত্তও ত আমাদের একটু আধটু হওয়া চাই! হোক্, তাই ক্ষমার কথা তোমায় যে ব'লে ফেলেছিলুম—সে আমার ছেলেমানুষী—ক্ষমা পেলে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না।"

"দিদিমণি! জমাদার বলছেন—"

"এই যে যাচ্চি—"

সুলেখা নত হইয়া সুশীলের পায়ের ধুলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল—"আবার দেখা হবে—হয় এখানে, না হয়—না হয়—ঐ ওখানে—"

ঝন্ ঝন্ শব্দে লোহার শিকল যথাস্থানে আঁটিয়া বসিল। নির্জ্জন স্তব্ধ গৃহে অশরীরিরূপে প্রতিধ্বনি ধ্বনিত করিল, "না হয়—ঐ—ওখানে—"

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

দুর্ব্বোধ

বুঝি না কেমন প্রেম, কি সে ইন্দ্রজাল,
জীবনে মরণে নিত্য—মধুর মধুর,
যাহার পরশবশে সর্ব্ব-তৃষ্ণা দূর,
সুধায় ভরিয়া উঠে ইহ পরকাল।

কি কহিলে নব মন্ত্র কহ মোর কানে;
প্রেম-তৃপ্তি, প্রেম-দীপ্তি—আনন্দ অশেষ,
দুর্লভ সে থাকে দূরে,—আবির্ভাব লেশ
নাহি কামদগ্ধ চিতে—আত্মার শ্মশানে।

হৃদয়-কমলবনে—তাহার গুঞ্জন,
নিবে যায় দুর্নিবার সম্ভোগ-পিপাসা।
তবে কেন বক্ষোভরা এ লালসা আশা?
ভ্রান্তি ভ্রমণের শেষ কোথায় কখন?

প্রেম সত্য সুবিমল—তপোবহ্নি-শিখা
তৃষ্ণাতুর ভোগী দেখে কাম-মরীচিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঘোষ।

হাঙ্গরের সদ্ব্যবহার

গত ভাদ্র মাসে "বাঙ্গালায় মৎস্যাভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা হাঙ্গর, সঙ্কর প্রভৃতি সমুদ্রচারী মাছের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ উক্ত শ্রেণীর মাছের বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই। এই প্রকার মৎস্য লইয়া আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক দ্বীপে একটি সমৃদ্ধিশালী শিল্প গঠিত হইয়া উঠিতেছে। ভারত মহাসাগরে হাঙ্গরজাতীয় মাছের অভাব নাই এবং এতদ্দেশের সুদীর্ঘ উপকূলের নানা স্থানে অল্পবিস্তর সংখ্যায় হাঙ্গরও ধৃত হয়, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার হয় না। অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টাতেই হাঙ্গর-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা প্রচুর ধনাগম হওয়াও সম্ভবপর। উদ্যমশীল ধনশালী ব্যক্তিবর্গের যাহাতে এই দিকে দৃষ্টি পড়ে, তজ্জন্য অন্যান্য দেশে হাঙ্গরজাতীয় মৎস্যকে যে সমুদয় কার্য্যে প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

গঙ্গার দুই জাতীয় হাঙ্গর

সঙ্কর মাছ

হাঙ্গরের পরিচয়

সাধারণ মাছের সহিত হাঙ্গরজাতীয় মাছের অন্যতম পার্থক্য এই যে, ইহাদের সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়ীভূত অস্থি ও প্রকৃত শল্ক নাই; অস্থির স্থান শক্ত পেশী এবং শল্কের স্থান অনেক স্থানে অস্থির কণ্টক দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু ইহাও জানা দরকার যে, ইহাদের শরীরে যে একবারে অস্থি নাই, তাহা নহে; তবে উচ্চ স্তরের মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের (Vertebrata) দেহে যেরূপ কঙ্কাল পাওয়া যায়, ইহাদের দেহে তাদৃশ পাওয়া যায় না। হাঙ্গরের দুইটি প্রধান উপবর্গ;—হাঙ্গর (Selachoidei) এবং সঙ্কর (Batoidei) উভয়েরই প্রধানতঃ ছয়টি করিয়া গণ (Genus) ভারত মহাসাগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সঙ্করজাতীয় মাছের পুচ্ছ আগে যে চাবুকের জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, তাহা অনেকেই জানেন; এখনও সেরূপ ব্যবহার উঠিয়া যায় নাই। কোন কোন জাতীয় সঙ্কর মাছের চামড়া ঢাকে লাগান হয়; এতদ্ভিন্ন বাজারের হাঙ্গরের পাখনার (Shark-fin) সহিত সঙ্কর মাছের পাখনাও থাকে; কিন্তু মোটের উপর ব্যবসায়ক্ষেত্রে সঙ্করমাছ অপেক্ষা হাঙ্গরের প্রয়োজন অধিক। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির আকৃতি অতি অদ্ভুত এবং আত্মরক্ষা ও শত্রু-আক্রমণের যন্ত্রাদি তদপেক্ষা আরও বিস্ময়জনক। হাঙ্গর-উপবর্গের মধ্যে প্রকৃত হাঙ্গর ভিন্ন আরও কয়েক শ্রেণীর মাছ আছে, তন্মধ্যে কুকুরমুখ (Dog-fish), করাতমুখ (Saw-fish) এবং তরওয়ালমুখ (Sword-fish) মাছই প্রধান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহাদিগকে সাধারণ হাঙ্গর নামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হাঙ্গরের নামে অনেকেই ভয় পাইয়া
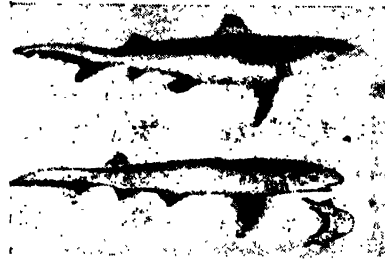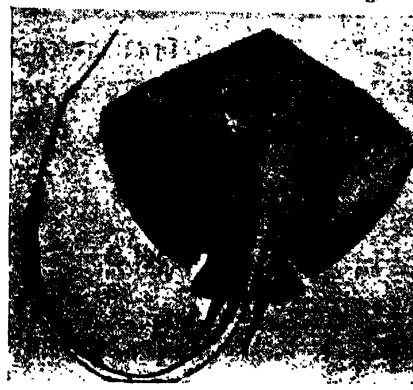
থাকেন। বাস্তবিকই বৃহদাকারে, দ্রুত-গতিতে, অতিমাত্রায় খাদ্যলোলুপতায় এবং ভীষণ ক্রূরস্বভাবে কতিপয় জাতীয় হাঙ্গরের সমতুল্য জীব কমই আছে।

নিরামিষাহারী হাঙ্গরের চোয়াল

সকল জাতীয় হাঙ্গরই যে হিংস্র ও মাংসাশী, তাহা নহে; অনেকগুলি জাতি মানুষের আদৌ অনিষ্ট করে না। বড় অপেক্ষা ছোট জাতীয় হাঙ্গর অধিক বিপজ্জনক। হাঙ্গরের আকারের অনেক প্রভেদ আছে। সামান্য ১৫।২০ ইঞ্চি পরিমিত হাঙ্গর হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় হাঙ্গরও ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায়। সমস্ত মৎস্যরাজ্যমধ্যে আয়তনের হিসাবে কয়েকটি হাঙ্গর ও সঙ্করজাতীয় মৎস্য বৃহৎ। কিছু দিবস পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ গভীর-সমুদ্র-মৎস্যবিদ্ Mr. Mitchell-Hedges যে একটি করাতমুখ মাছ ধরেন, তাহার ওজন প্রায় ৭০ মণ ছিল। সে যাহা হউক, গঙ্গায় সচরাচর যে দুই জাতীয় হাঙ্গর উঠিয়া আইসে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর Carcharins Gangeticusই স্নানার্থিগণের বিশেষ ভয়ের কারণ। গ্রীষ্মকালে এই জাতীয় হাঙ্গর কখন কখন কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গায় আসিতে দেখা গিয়াছে। আকৃতি, অবয়ব ও বর্ণভেদে সাধারণতঃ দশ প্রকারের হাঙ্গর ভারত-সমুদ্রে দৃষ্ট হয়, যথা:—(১) কৃষ্ণ, (২) ইষ্টক-বর্ণ, (৩) রক্তাভ মেটেবর্ণ, (৪) ধূসর, (৫) শ্বেত, (৬) রক্ত, (৭) পীত, (৮) রেখাঙ্কিত, (৯) মালাবার এবং (১০) মুদ্গর-মস্তক হাঙ্গর। ইহার মধ্যে মালাবার উপকূলের হাঙ্গর ১৮।২০ ইঞ্চির বড় হয় না; অন্যগুলি ২৮।৩০ ফুট পর্য্যন্তও লম্বা হইয়া থাকে। অধিকাংশ-জাতীয় হাঙ্গর একাকী বিচরণ করে, দল বাঁধিয়া থাকে না। নিরামিষাহারী হাঙ্গরের দন্ত ভোঁতা, কিন্তু হিংস্র হাঙ্গরের সুতীক্ষ্ণ দন্তপাঁতি পরে পরে সজ্জিত থাকে; একটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পরবর্ত্তী পংক্তি তাহার স্থান অধিকার করে। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে এবং কোন কোন জাতীয় হাঙ্গরের জরায়ু সদৃশ স্থলীতে সন্তান পরিবর্দ্ধিত হয়।

হিংস্র হাঙ্গরের চোয়াল

আহার্য্যরূপে হাঙ্গর

সুন্দরবনে এবং উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বর ও পুরীতে ধীবরগণের জালে সময় সময় হাঙ্গর পড়ে। ইহাদের পাখনা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ছোট আকারের হাঙ্গর কিন্তু কোন কোন স্থানে ইতর শ্রেণীর লোকরা খাইয়া থাকে। প্রকৃত হাঙ্গর না হইলেও কুকুরমুখো মাছ আমরা দুই একবার কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। অবশ্য এখানেও ভদ্রলোকের মধ্যে উক্ত প্রকার মাছ বিক্রয় হয় না, কিন্তু ধাঙ্গড়, মেথর প্রভৃতি ইহা আগ্রহের সহিত ক্রয় করে। প্রতীদ (Protid) এবং ফস্‌ফরিক অম্ল যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় হাঙ্গরের মাংস বিশেষ পুষ্টিকর। অন্যান্য বড় মাছের তুলনায় ইহার স্বাদও খারাপ নহে; কেবল পূর্ব্বে কখন ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া ইহার উপর লোকের অভক্তি আছে। আমেরিকায় হাঙ্গরমাংস-প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যাণ্টা-মণিকা নামক স্থান হাঙ্গর-শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। সংরক্ষণ করিবার জন্য ছাল ছাড়াইয়া লইবার পর হাঙ্গরের মাংসকে পাতলা টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হয়; পরে উহা রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করা হইয়া থাকে অথবা সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট তারের জালে চিনির স্তরের ভিতর দিয়া টুকরাগুলি শুষ্ক করা হয়। এই প্রকার শুষ্কীকৃত মাংস টিনে বন্ধ করিয়া নানারূপ মনরঞ্জক নাম দিয়া মার্কিণের বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। চীনারা হাঙ্গরের মাংস খাইতে আপত্তি করে না, কিন্তু তাহাদের দেশে হাঙ্গরের পাখনা ও পুচ্ছের চলন অধিক। অনেক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর তরকারিতে এই সমুদয় ব্যবহৃত হয় এবং নানা দেশ হইতে বহু পরিমাণ পাখনা চীন প্রতি বৎসর আমদানী করিয়া থাকে। যত্নের সহিত প্রস্তুত পাখনার দরও খুব বেশী। যে সমস্ত শ্রেণীর লোক শুঁটকি মাছ
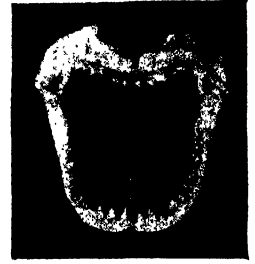
আহার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে হাঙ্গর-মাংসের চলন হওয়া সম্ভব। ব্রহ্ম, মালয়, পিনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে এরূপ অধিবাসীর সংখ্যা কম নহে। ভারত উপকূলে আধুনিক প্রথায় হাঙ্গরমাংস প্রস্তুত হইলে এই সমস্ত দেশে ও ভারতমধ্যেও কতক পরিমাণে উহার কাটতি হইতে পারে।

হাঙ্গরের সার ও তৈল

নরওয়ের উপকূলে হাঙ্গরের তৈল বাহির করিয়া লইয়া সমস্ত দেহটিই পচাইয়া সার প্রস্তুত হয়। তৈল জ্বালাইবার জন্য গ্রাম্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে মাংস কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পশুখাদ্য ও সারে পরিণত করা হয়। হাঙ্গরের অস্থি-চূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া বিক্রয় করিবার প্রথাও আছে। হাঙ্গর-সার প্রয়োগে সাধারণ মৎস্যসার অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া গিয়াছে। হাঙ্গরের যকৃতে তৈলের পরিমাণ সমধিক—প্রায় ৬০ ভাগ। উক্ত তৈল নিষ্কাশন করা স্বতন্ত্র শিল্পরূপে কতিপয় দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের মাদ্রাজ উপকূলেও অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল উক্তরূপ তৈলের কারখানা ছিল। হাঙ্গরের তৈল সাবান ও বাতি প্রস্তুত, চামড়া কসান ও অন্যান্য কার্য্যের উপযোগী। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর তৈল কডলিভার তৈলের সমতুল্য এবং তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। যখন বিলাতী কডলিভার তৈল এতটা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য ছিল না, তখন পূর্ব্বোক্ত মাদ্রাজ কারখানার তৈল রোগিগণকে খাইতে দেওয়া হইত এবং তদ্দ্বারা সুফলও পাওয়া যাইত বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হাঙ্গরের চামড়া

হাঙ্গরের চর্ম্ম বন্ধুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কণ্টকবহুল। প্রত্যেক কণ্টকের গঠন অনেকটা দন্তের ন্যায়। কণ্টকগুলি চর্ম্মের সহিত এরূপ দৃঢ় সংযুক্ত যে, উহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না এবং এত কঠিন যে, পাথরের ন্যায় পালিশ করা চলে। এই কারণে পূর্ব্বে মূল্যবান্ কাষ্ঠ ও হস্তিদন্ত পালিশ করিবার জন্য হাঙ্গরের চামড়া (Shagreen) প্রয়োগ করা হইত এবং এখনও উৎকৃষ্ট রকমের শিরীষ কাগজের (Emery and sand paper) প্রচলন সত্ত্বেও কাঠের আসবাব পালিশে হাঙ্গরের চামড়ার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু ইদানীন্তন এই চামড়ার অধিক ব্যবহার হইতেছে তরবারির হাতল মুড়িতে ও খাপ প্রস্তুত করিতে এবং গয়নার বাক্স, সৌখীন ব্যাগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সৌখীন দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে। অধিকন্তু বিগত ৫।৬ বৎসরমধ্যে অভিনব প্রণালী দ্বারা চামড়ার কণ্টকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া হাঙ্গরের চামড়া রং করা হইতেছে। তাহাতে ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করিতেছে। হাঙ্গরের চামড়া অচ্ছিদ্র (Nonporous) বলিয়া ইহা জল ও বায়ু উভয়ই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। শেষোক্ত গুণ ইহার জুতা প্রস্তুত ব্যাপারে প্রয়োগের প্রতিকূল; কিন্তু অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহারের অনুকূল। হাঙ্গরের অপরাপর ব্যবহারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শুষ্কীকৃত পাখনা হইতে শিরীষ ও জিলাটিন পাওয়া যায়। নাড়ীভুঁড়ি হইতে যে তাঁত প্রস্তুত হয়, তাহা বাদ্যযন্ত্রাদি প্রস্তুত করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুচ্ছ চীনে যে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহা হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ বার্ণিশ প্রস্তুত হয়।

হাঙ্গরের ব্যবসায়

হাঙ্গর এবং মকর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে শ্বেতজাতিগণের মধ্যে হাঙ্গর-মাংসের উপর অশ্রদ্ধা থাকিলেও এখন তাহা ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ হাঙ্গরমাংস যে অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্যের ন্যায় সাধারণ আহার্য্যের মধ্যে স্থান পাইবে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আটলান্টিক উপকূলে আমেরিকায় ফাঁদ-কল দ্বারা যে সমুদয় হাঙ্গর ধরা হয়, সেগুলি গভীর সমুদ্রের তরওয়ালমুখো মাছ নামে বিক্রীত হয়; এইরূপ কৌশলে ক্রেতাদিগের প্রথম ব্যবহারে অনিচ্ছা দমন করিয়া হাঙ্গরমাংসের কাটতি বাড়ান হইয়া থাকে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বাজারে কয়েক প্রকারের হাঙ্গর ও

হাঙ্গর সচরাচর বিক্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত দ্বীপ-পুঞ্জের আবার অনেক স্থানে কেবল পাখনাগুলি কাটিয়া লইয়া হাঙ্গর ফেলিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে ফিলিপাইনে হাঙ্গর-শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে।

ব্যবসায়ের হিসাবে হাঙ্গর সংগ্রহ করিতে হইলে ধীবরগণের জালে কচিৎ লব্ধ ২।৪টি হাঙ্গর দ্বারা কায চলিবে না। হাঙ্গর ধরিবার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে, অধিকাংশ হাঙ্গরের স্বভাব একাকী বাস করা; কিন্তু কয়েকজাতি বৃহৎ বৃহৎ ঝাঁক বাঁধিয়াও বিচরণ করে। অন্যান্যরূপে ব্যবহারের উপযোগী হইলে এই প্রকার হাঙ্গর সংগ্রহ করাই সহজসাধ্য ও বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ ঝাঁক সচরাচর দৃষ্ট হয় এবং বৎসরের কোন্ কোন্ সময় উহারা আইসে, তাহা প্রথমে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। Golden Crown জাহাজ দ্বারা নির্ব্বাহিত অনুসন্ধানে এইরূপ তথ্য কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্যবসায়িক হাঙ্গর-ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিতে হইলে তদপেক্ষা আরও অধিক অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ ছিপ ও বঁড়শী দিয়া হাঙ্গর ধরা হয়; বর্শা অথবা সুতলী-সংযুক্ত টেঁঠা (Harpoon) দিয়াও হাঙ্গর মারার প্রথা আছে। আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উপকূলের ধারে যে সমস্ত মাছ ধরার ফাঁদ-কল বসান হয়, তাহাতেও অনেক হাঙ্গর পড়ে। কিন্তু হাঙ্গর ধরিবার অভিনব ও প্রকৃষ্ট উপায়—এক প্রকার বিশেষভাবে প্রস্তুত Gilnet অর্থাৎ সুতলীযুক্ত জাল। সাধারণ জালে হাঙ্গর পড়িলে জালের অনেক ক্ষতি করিয়া দেয়। নূতন প্রকারের জালে সেরূপ ক্ষতি করা অসম্ভব এবং একবার জালে প্রবেশ করিলে হাঙ্গর উহা হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারে না।

ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে অনেক স্থানেই হাঙ্গর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কোন স্থানে পরীক্ষার জন্য আপাততঃ একটি ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিলে হাঙ্গর-জাত নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ২।৪ বৎসরের মধ্যেই যে জানা যাইতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবসর নাই। আপাততঃ মোটে ১৮৷২০ লক্ষ টাকার হাঙ্গরের পাখনা বোম্বাই ও করাচী বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। চট্টগ্রাম হইতেও সামান্য পরিমাণে হাঙ্গরের পাখনা ব্রহ্মদেশে চালান যায়। ভারতের সামুদ্রিক সম্পদের হিসাবে এই সমুদয় কিন্তু সামান্যমাত্র। উত্তমরূপে প্রস্তুতীকৃত হাঙ্গরের পাখনার জগতের বাজারে প্রচুর কাটতি আছে। বড় আকারের পাখনা হইতে জিলাটিন্ ও ছোট হইতে শিরীষ প্রস্তুত হয়। বাজারে বিক্রয়ের জন্য এতদ্দেশে আপাততঃ যেরূপ পাখনা প্রস্তুত করা হয়, তাহা নিতান্ত সেকেলে ধরণের। পুচ্ছের পাখনা ব্যতীত অন্য সকল স্থানের পাখনা যতদূর সম্ভব, মাংস বাদ দিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। পরে গোড়ায় চুণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই উহা বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়। মূল্যের তারতম্য হিসাবে দুই প্রকার পাখনা আছে—শ্বেত ও কৃষ্ণ। পিঠের পাখনাই শ্বেত শ্রেণীভুক্ত। পার্শ্বের, সম্মুখের ও মলদ্বারের নিকটস্থ পাখনা কৃষ্ণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু শ্রেণীর নাম কৃষ্ণ হইলেও পাখনাগুলির রং ধূসর অথবা পাটকিলে এবং এক দিক হইতে আর এক দিকের চর্ম্ম কতকটা ফিকে। কেবল পৃষ্ঠের পাখনার রং উভয় দিকে প্রায় সমান। অবশ্য ব্যবসায়ে কৃষ্ণ পাখনাই সংখ্যায় অধিক। প্রস্তুতের প্রথার উন্নতি-বিধান করিলে এতদ্দেশীয় পাখনা সমূহের বাজারে অধিক কাটতি এবং উচ্চতর মূল্য হইবার সম্ভাবনা।

শুধু পাখনার জন্য হাঙ্গর মারা কিন্তু নিতান্ত অপচয়ের কায। আহার্য্য, তৈল, সার, চামড়া ও অন্যবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলেই হাঙ্গরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়। হাঙ্গর-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য এক স্থানেই উক্ত কয়েক শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে বিভিন্ন কেন্দ্রে হইলেও হাঙ্গরজাত দ্রব্যগুলি সমস্তই প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এক দিকে যেরূপ শিল্পের পরিসর বৃদ্ধি পাইবে, অন্য দিকে তেমনই হাঙ্গরের যাবতীয় অংশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্যও সস্তা হইবে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মালাবার উপকূলে সংরক্ষিত মৎস্য, মৎস্য-তৈল ও মৎস্যসার শিল্পের প্রবর্ত্তন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দেশীয় জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে শীঘ্র ফললাভের সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের মৎস্যবিভাগ ত উঠিয়া গিয়াছে। যখন ছিল, তখনও উহার কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমান বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। আবার সরকারী ভাণ্ডারে অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইলে উক্ত বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে চেষ্টাও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণের উদ্যম ও আগ্রহ না থাকিলে শুধু সরকারী চেষ্টায় বাঙ্গালার উপকূলে হাঙ্গর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর নহে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

দুগ্ধ-শর্করা ও কেসিন্

দুগ্ধ হইতে শর্করা (milk sugar) ও 'কেসিন্' নামক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'কেসিন্' ঠিক মাখন বা নবনী নহে। মাখন ও নবনী হইতে জলীয়ভাগ ও চর্ব্বি বাদ দিলে যে পদার্থ থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ কেসিন্ বলা যায়। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র য়ুরোপে কেসি-নের বিশেষ অনাটন হইয়াছে। য়ুরোপে ইদানীং দুগ্ধের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষেও দুগ্ধের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অবশ্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে দুগ্ধের প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে; কিন্তু প্রায় সকল সহরেই দুগ্ধের অভাব ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণীর কোন কোন বিশিষ্ট পত্রের মার-ফতে প্রকাশ যে, য়ুরোপের দুগ্ধসমস্যা না কি আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, য়ুরোপীয় রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীতে এখন আর পূর্ব্বের মত পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ জন্মিতেছে না। পূর্ব্বে সাইবিরিয়া হইতে রেলযোগে পশ্চিম য়ুরোপে দুগ্ধজাত নানা প্রকার দ্রব্য (মাখন পর্য্যন্ত) প্রেরিত হইত। এখন আর সে ব্যবস্থা নাই। দুগ্ধজাত 'কেসিন্' পূর্ব্বে য়ুরোপীয় রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীতে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত। মানুষের আহার ছাড়া নানা প্রকার শ্রম-শিল্পের জন্যও উহা ব্যবহৃত হইত। কেসিনের এখন এমনই অভাব যে, মানুষ উহা খাইতেই পায় না—শ্রমশিল্পের জন্য ব্যবহার করিবে কিরূপে?

লণ্ডনে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১ টন (প্রায় সাড়ে ২৭ মণ) কেসিনের দাম ছিল ৩ শত টাকা। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, কেসিনের দাম ক্রমে আরও বাড়িতে থাকিবে। কারণ, কেসিন্-উৎপাদক স্থান থাকিলেও উহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানে না। যে সকল দেশে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ প্রভৃতির প্রাচুর্য্য আছে, সেই সকল স্থান ব্যতীত কেসিন্ অধিক পরিমাণে অন্যত্র উৎপন্ন হইতে পারে না। উত্তর-ভারত এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলভাগে সামান্য পরিমাণ কেসিন্ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু উল্লিখিত অঞ্চলে যাহারা কেসিন উৎপাদন করে, তাহাদের এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান ও অভি-জ্ঞতা নাই এবং যে উপায়ে তথায় উহা উৎপন্ন হয়, তাহাতেও অনেক প্রকার ত্রুটি আছে। এ জন্য যে কেসিন্ জন্মে, তাহা উচ্চশ্রেণীর নহে।

জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ জন্মে এবং তত্রত্য মানুষের ব্যব-হারের পরও উদ্‌বৃত্ত থাকে, সেই সকল অঞ্চলের লোক যদি কেসিন্ উৎপাদনে মনোনিবেশ করে, তবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধিই প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ গুণ। বিশুদ্ধ জিনিষ না হইলে মূল্য অধিক পাওয়া যায় না।

কেসিন্ উৎপাদন করিতে হইলে, প্রথমতঃ দুগ্ধের মধ্যে কি কি জিনিষ আছে, তাহা জানা দরকার। গো, মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ, ছাগল প্রভৃতি জীবের দুগ্ধে শতকরা কি পরিমাণ কেসিন্ আছে, তাহাই প্রথমতঃ জানিতে হইবে। নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া হইল।

নারীদুগ্ধ		...	০'৮
গাভী	"	...	২'০ হইতে ৪'৫
গর্দ্দভ	"	...	০'৭৯
মেষ	"	...	৪'১৭
ছাগ	"	...	২'৮৭
ঘোটকী	"	...	১'৩০

উল্লিখিত প্রকারের দুগ্ধের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য খুব বেশী নহে। প্রত্যেক প্রকার দুগ্ধের মধ্যে একই প্রকার উপকরণ আছে। সুতরাং একই প্রণালীতে সকল শ্রেণীর দুগ্ধ হইতে কেসিন্ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে, যে কোনও প্রকার দুগ্ধ হইতে শত-করা ৩ হইতে ৩'২ ভাগ কেসিন্ পাওয়া যায়।

দুগ্ধের প্রধান উপাদান চর্ব্বি (নবনী), কেসিন্, ল্যাকটিন্ ও জল। বক্রী উপাদান সম্বন্ধে এখানে আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই।

চর্ব্বি জল অপেক্ষা লঘুতর এবং জমাট চর্ব্বি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। দুগ্ধমন্থন করিয়া চর্ব্বি বাহির করিয়া লইলে, দুগ্ধের অবশিষ্ট অংশ ঈষৎ নীলবর্ণ দেখায়।

দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিতে গেলে 'ডেরি' কারখানায় 'সেণ্ট্রিফিউগাল্' মন্থনযন্ত্রের সাহায্যে চর্ব্বিকে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয়। এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার পর মন্থিত দুগ্ধে তখনও শতকরা ০'২ হইতে ০'৩ ভাগ চর্ব্বি অবশিষ্ট থাকে। কেসিন্ স্বতন্ত্র করিয়া লইবার সময় উহাতে শতকরা ৬ হইতে ৮ ভাগ চর্ব্বি থাকে। এইরূপ শ্রেণীর কেসিন্ অবিশুদ্ধ এবং সহজেই নষ্ট হইয়া যায়—ইহাকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেসিন্ বলে। সুতরাং সেণ্ট্রিফিউগাল্ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম দুগ্ধমন্থন করিবার পরে শতকরা ০'২ হইতে ০'৪ ভাগ কষ্টিক্‌সোডাকে (সোডিয়ম্ হাইড্রেট) ৪০ হইতে ৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া মন্থিত দুগ্ধে মিশাইয়া লওয়া দরকার। তাহার পর সেই দুগ্ধকে পুনরায় সেণ্ট্রিফিউগাল্ যন্ত্রের সাহায্যে মন্থিত করিতে হইবে। এই উপায়ে চর্ব্বির ভাগ শতকরা ০'০০৫ কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলে সেণ্ট্রিফিউগাল্ যন্ত্র বসাইবার সুবিধা হইবে না; সুতরাং প্রচলিত দেশীয় মন্থন-যন্ত্রের সাহায্যে কায চলিতে পারে।

দুগ্ধ হইতে সমগ্র চর্ব্বি তুলিয়া লওয়া হইলে অবশিষ্ট থাকে কেসিন্, ল্যাকটিন্ ও জল। তখন উহা হইতে কেসিন্‌কে স্বতন্ত্র করা সহজ। এসিডের সাহায্যে কেসিন্ থিতাইয়া নীচে জমা করা হয়। তখন উহা আর জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে না।

বিশুদ্ধ এসিড—এসেটিক্, সল্‌ফিউরিক্ এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড, কেসিন্ জমাইবার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু কেসিন্ হইতে উল্লিখিত এসিডের ক্রিয়া নষ্ট করিবার জন্য সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ফলে কেসিন্ ও ল্যাকটিন্ ঠিক বিশুদ্ধ থাকে না। কারণ, উহাতে তখন সোডা, লবণ (Sodium salt) মিশ্রিত থাকে। এ জন্য কার্ব্বনিক এসিড ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উহা সহজেই কেসিন্ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—বিশুদ্ধতার হানি করে না। কিন্তু কার্ব্বনিক এসিডের একটা দোষ আছে, উহার ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এ জন্য উহাকে ৩০ ডিগ্রী তাপ দিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য একটি পুরু লোহার আধারের প্রয়োজন। তাপের প্রভাবে আধারটি হঠাৎ ফাটিয়া না যাইতে পারে, এ জন্য এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলে সহসা এরূপ আধার সংগ্রহ করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য নহে। যাহাতে পল্লীর অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকও সহজে কায চালাইতে পারে, এমন অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে।

সলফিউরস্ এসিডের সাহায্যে সহজেই কেসিন্ জমান যায়। গন্ধক পুড়াইয়া তাহার গ্যাস অথবা মিশ্র (solution) আরকের দ্বারা অনায়াসেই যে কেহ কেসিন্ জমাইতে পারে। পল্লী অঞ্চলে সে কার্য্য বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

ভারতবর্ষে বড় বড় দুগ্ধের কেন্দ্র স্থাপন করা তত সহজ নহে। কারণ, সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রস্থলে সঞ্চিত করিবার মত ব্যবস্থা ও যানবাহনাদির সুবিধা নাই। দুগ্ধ বেশীক্ষণ অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় না। কাযেই যে যে স্থানে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, সেইখানেই কেসিন্ তৈয়ার করাই যুক্তিসঙ্গত। কেসিন্ ও ল্যাকটিন্ দীর্ঘকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে। সুতরাং শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অবস্থায় উহা বহুদূরবর্ত্তী স্থানে রপ্তানী করা সম্ভবপর। ভারতবর্ষের পল্লীবাসীরা সুদূর পল্লীতে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দুগ্ধ হইতে কেসিন্ ও ল্যাকটিন্ প্রস্তুত করিয়া প্রতীচ্যদেশের সঙ্গে ব্যবসায় করিতে পারে। যদি কয়েকটি পল্লী সমবেত চেষ্টায় এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে, তবে তাহা আরও 'ফলাও' হয় এবং ব্যবসায়ের সুবিধা আরও বেশী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ক্রমে লাভ হইতে থাকিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যন্ত্রাদির সাহায্যে কারবারকে আরও বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ কলকারখানার সাহায্য না লইয়া হস্তপ্রস্তুত মন্থন-যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে

পল্লীবাসীরা এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন। ব্যবসাটি অত্যন্ত লাভজনক।

সলফিউরস্ এসিডের সাহায্যে কেসিন্ জমাইয়া লওয়াই সহজসাধ্য। ইহাতে আর একটু উপকার দর্শে। কেসিন্ ও ল্যাকটিনে যে সকল জীবাণু থাকে, উক্ত গ্যাসের সাহায্যে সেগুলি ধ্বংস হইয়া যায় এবং কেসিন্ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সময় দুগ্ধে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ মিশিতে পারে না। সলফিউরস্ এসিড মিশাইবার সময় যাহাতে লৌহের কোনও সংস্রব না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, উহা এক প্রকার ক্ষার এবং উহাতে মরিচা ধরিবার বিশেষ সম্ভাবনা। লৌহ-মিশ্রিত হইলে কেসিনের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে।

অতএব উক্ত প্রক্রিয়ার সময় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করাই সুসঙ্গত; বাঁশও মন্দ নহে। ১ শত লিটার (litre) দুগ্ধে ১ শত ২০ গ্রাম গন্ধক পর্য্যন্ত (৪½ লিটারে ইংরাজী ১ গ্যালন) মিশাইতে হইবে। গন্ধক পুড়াইয়া গ্যাস বাহির হইলে, একটা সূক্ষ্ম নলের ভিতর দিয়া সেই গ্যাস দুগ্ধের ভিতর প্রবিষ্ট করান হয়; সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধকে নাড়িতে হয়। সলফিউরস্ গ্যাস জলের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়াও খুব সহজ। তাহার পর সেই মিশ্রিত পদার্থ দুগ্ধের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। অবিশ্রান্তভাবে দুগ্ধকে নাড়িয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেসিন্ জমাইতে গেলে দুগ্ধের উত্তাপ ৫০ হইতে ৭০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত 'থিতান'টা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। সলফিউরস্ এসিডকে উত্তমরূপে কাযে লাগাইতে গেলে, দুগ্ধপূর্ণ প্রথম পাত্রটিকে পুরু আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং দুগ্ধ নাড়িবার জন্ত একটা যন্ত্র তাহাতে থাকা প্রয়োজন। প্রথম পাত্রে সলফিউরস্ এসিড প্রবিষ্ট করাইবার পর অতিরিক্ত গ্যাসের সাহায্যে দ্বিতীয় পাত্রে কেসিন্ জমাইবার সুবিধা ঘটে। সে পাত্রটিকে না ঢাকিয়া রাখিলেও চলে। এইরূপে অল্প গন্ধকের সাহায্যে অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত উপায়ে কেসিন্ জমাইলে উহা তৈলাক্তবৎ দেখিতে হয় না—শ্বেতবালুকণার মত দেখিতে পাওয়া যায়। পরে উহাকে হস্তের সাহায্যে ধৌত করিবার সুবিধা হয়। গন্ধকের সাহায্যে কেসিন্ জমাইলে উহা পরিষ্কার করিবার জন্ত জটিল উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। কেসিন্ পাত্রের নিম্নে থিতাইয়া পড়িলে, উপরের মিশ্রিত দুগ্ধভাগ (milk solution) ঢালিয়া ল্যাকটিন্ বাহির করা হয়। তৎপরে সঞ্চিত কেসিন্ জলে ধুইয়া লইতে হয়। যতক্ষণ এতটুকু ল্যাকটিন্ তাহাতে অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ এই ধৌতকার্য্য চালাইতে হইবে। সাধারণ জলে কেসিন্ ধুইবার ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় কেসিনের সঙ্গে চূণ অথবা অন্ত কোন দূষিত জিনিষ মিশিয়া যাইতে পারে, এ জন্য বৃষ্টির জলে কেসিন্ পরিষ্কার করা সঙ্গত।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেসিনে শতকরা ৪ ভাগের বেশী ভস্ম থাকিবে না। এ জন্য কেসিন্‌কে বিশেষরূপে ধৌত করিবার পর উহা সম্পূর্ণভাবে শুকাইয়া লইতে হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারের উপর কেসিন রাখিয়া তাহার উপর পাট বিছাইয়া লইতে হইবে। সেই পাট ৪৫ হইতে ৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহকে উহার উপর ছাড়িয়া দিলেই সে কার্য্য সংসাধিত হয়। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের উষ্ণতা উহার অধিক হইলে, কেসিনের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কেসিনের রং শ্বেতবর্ণ থাকাই দরকার। নহিলে মূল্য কমিয়া যাইবে।

উপরে কেসিন্ শুষ্ক করিবার যে প্রণালী বিবৃত হইল, ১০ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যকাল, কারণ, কেসিনের মধ্যে শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত জলীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে। উত্তপ্ত বাতাস অধিক পরিমাণে কেসিনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে, আর একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু কেসিনের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। কিন্তু উত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সলফিউরস গ্যাস মিশাইয়া দিলে সে আশঙ্কা আর থাকে না।

সলফিউরস্ গ্যাসের সাহায্যে কেসিন্ সর্ব্বপ্রকার বীজাণুর সংস্রব হইতে রক্ষা পায়। ইহাতে আর একটা উপকার ঘটে—ইহার বর্ণ শ্বেতবর্ণই থাকে। কেসিন্ শুকাইয়া লইলেও তাহাতে শতকরা ১০ ভাগেরও কম

জলকণা থাকা প্রয়োজন, তাহা না হইলে দীর্ঘকাল তাহা ভাল থাকিতে পারে না। কেসিন্ বালুকার মত দানা-বিশিষ্ট না দেখাইলে কখনই প্রথম শ্রেণীর দুগ্ধ-শর্করা বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। ইদানীং কেসিন্ প্রস্তুত করিবার সময় যে যন্ত্রযোগে দুগ্ধকে নাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে ছুরি সন্নিবিষ্ট থাকে। জল দিয়া ধুইবার সময় ছুরিকার সাহায্যে কেসিন্‌কে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে উহা বালুকার মত আকার ধারণ করিয়া থাকে।

কেসিন্ সহযোগে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় বলিয়া কেসিন্‌কে বিশুদ্ধ রাখিতে হয়। উহাতে কোনও প্রকার গন্ধ যাহাতে না থাকে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফ্রান্স এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় প্রথম শ্রেণীর কেসিন্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমেরিকা এ বিষয়ে ফ্রান্সের কাছে হটিয়া গিয়াছে।

কেসিনের প্রয়োজনের অন্ত নাই। প্রথমতঃ উহা পুষ্টিকর খাদ্য। ঔষধবিক্রেতারা কেসিন্‌জাত নানাবিধ পুষ্টিকর পথ্য তৈয়ার করিয়া থাকে। প্লাস্মন্, স্যানাটোজেন প্রভৃতি প্রধানতঃ কেসিন্ হইতেই প্রস্তুত হইয়াছে। সেলুলয়েড ভীষণ দাহ্য পদার্থ, এ জন্য তৎপরিবর্ত্তে কেসিন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুবিধ শ্রমশিল্পজাত পদার্থে কেসিনের সমাবেশ আছে। আলোকচিত্র-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে কেসিনের প্রয়োজন। কেসিন্ হইতে চিরুণীও প্রস্তুত হয়। অনেক প্রকার আলোকচিত্র-সংক্রান্ত কাগজ কেসিনের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। সাবানে কেসিন্ মিশাইলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও কোমল হয়। কেসিন্‌জাত সাবানে ফেনা বেশী হয় এবং অল্পপরিমাণ সাবান ব্যবহারে অনেক কায হইয়া থাকে। চূণের সহিত কেসিন্ মিশাইয়া যে শিরীষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর্দ্রতা নিবারিত হয়, এ জন্য জাহাজে এইরূপ শিরীষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেসিন্‌জাত রং চিত্রকরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, কারণ, তাহাতে কায ভাল হয়। সুরা পরিষ্কারের জন্যও কেসিনের প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেসিন্ উৎপাদনে ভারতবর্ষ মনোনিবেশ করিলে অচিরে ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবে।

কেসিনের পরই ল্যাকটিন্। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ল্যাকটিনের মূল্য য়ুরোপের বাজারে কেসিনের দশ গুণ। কারণ, দুগ্ধে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ল্যাকটিন্ থাকে। ল্যাকটিন্ বা দুগ্ধ-শর্করা সহজ-পাচ্য বলিয়া উহা শিশুদিগের একটি প্রধান খাদ্য। বহুমূত্র রোগী এবং অম্লপীড়ায় যাহারা কাতর, চিকিৎসকগণ তাহাদিগকে দুগ্ধ-শর্করা ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধারণ ল্যাকটিন্ বা দুগ্ধ-শর্করাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ঔষধ-বিক্রেতারা রোগীদিগকে ব্যবহার করিতে দেন। বাজারে যে ল্যাকটিন্ বা দুগ্ধ-শর্করা পাওয়া যায়, তাহা রাসায়নিক হিসাবে বিশুদ্ধ নহে, হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যাঁহারা ঔষধার্থ ল্যাকটিন্ ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা উহা বিশুদ্ধ করিয়া লইবেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করিবার নানা প্রণালী আছে। পল্লীগ্রামে যাহারা ল্যাকটিন্ উৎপাদন করিবে, তাহাদের পক্ষে ঔষধার্থ বিশুদ্ধতর ল্যাকটিন্ তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই। কেসিনের মত ল্যাকটিন্ জমাইয়া বাজারে চালান করিতে পারিলেই হইল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার মণ ল্যাকটিন্ উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক জার্ম্মাণীতেই সে বৎসর উক্ত সংখ্যার একপঞ্চমাংশ ল্যাকটিন্ জন্মিয়াছিল। জার্ম্মাণীর বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীতে দুগ্ধের পরিমাণ কম হইয়া যাওয়ায়, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী ৩ হাজার ৮ শত ১১ মণ বিশুদ্ধ ল্যাকটিন্ রপ্তানী করিয়াছিল। উহার বিনিময়ে ৫০ লক্ষ মার্ক মুদ্রা তাহারা পাইয়াছিল।

ব্যবসায়ের হিসাবে কেসিন্ ও ল্যাকটিন্ কিরূপ লাভজনক হইতে পারে, জার্ম্মাণীর উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে ছানা ও মাখন যাহারা প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার করে, তাহারা দুগ্ধের অবশিষ্টাংশ শুধু ঘোলরূপে জীব-জন্তুকে খাওয়ায় অথবা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তাহা হইতে কেসিন্ ও ল্যাকটিন্ (দুগ্ধ-শর্করা) উৎপাদন করে, তাহা হইলে যে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সপ্তগ্রাম

রাজা তোডরমল্ল বঙ্গদেশের জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজ-স্বের সুবন্দোবস্ত ও তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং আশ্‌লি জমা তুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮৯টি মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্‌লি জমা তুমার হইতে খৃঃ ১৫৮২ অব্দে আবুল ফজল্ রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্য আইন আকবরীতে লিপিবদ্ধ করেন। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিষয়ক ব্যবস্থা প্রায় ৭৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টীয় অব্দে সম্রাট সাহজাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গদেশের সুবাদার সুলতান সুজার আমলে আশ্‌লি জমা তুমারের কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কিন্তু মূলতঃ তাহা একরূপ ঠিকই ছিল। কয়েকটি নবার্জ্জিত প্রদেশ বঙ্গদেশভুক্ত হওয়ায়, বঙ্গদেশ ৩৪টি সরকারে ও ১৩১০টি মহলে বিভক্ত করা হয়। জাফর খাঁ বা মুরশীদকুলী খাঁর জমাই কামিল তুমারে রাজা তোডরমল্লের আশ্‌লি জমা তুমারের আমূল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ইংরাজ অধিকারের ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে মুরশীদকুলী খাঁর নূতন বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টি চাক্‌লা ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করা হয়। তোডরমল্লের আশ্‌লি জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭ আকবরশাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। সুলতান সুজার আমলে রাজস্ব দাঁড়াইয়াছিল ১৩,১১৫,৯০৭ টাকা। আর মুরশীদকুলী খাঁর আমলে ২৪,২৮৮,১৮৬ টাকা। নদীর সংস্থান অনুসারে পূর্ব্বে প্রদেশ বিভক্ত করা হইত। (১) রাজা তোডরমল্লের ১৯টি সরকারের মধ্যে ১১টি গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ৪টি ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং অবশিষ্ট ৪টি গঙ্গার পশ্চিম ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট। তন্মধ্যে সপ্তগ্রাম একটি। ভাগীরথীর

রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়, জন্ম ১৭৪০ খৃঃ, মৃত্যু ১৮০২ খৃঃ

(১) হিন্দু রাজত্বকালেও নদীর গতি অনুসারে বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিভাগ করা হয়। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিমে ও গঙ্গার দক্ষিণে—বাগড়ী, গঙ্গার সঙ্গমস্থানে—বারেন্দ্র, পদ্মার উত্তরে এবং করতোয়া মহানন্দের মধ্য ভূভাগে বঙ্গ, সঙ্গমস্থানের পূর্ব্বে এবং মিথিলা মহানন্দের পশ্চিম-প্রদেশে অবস্থিত ছিল।
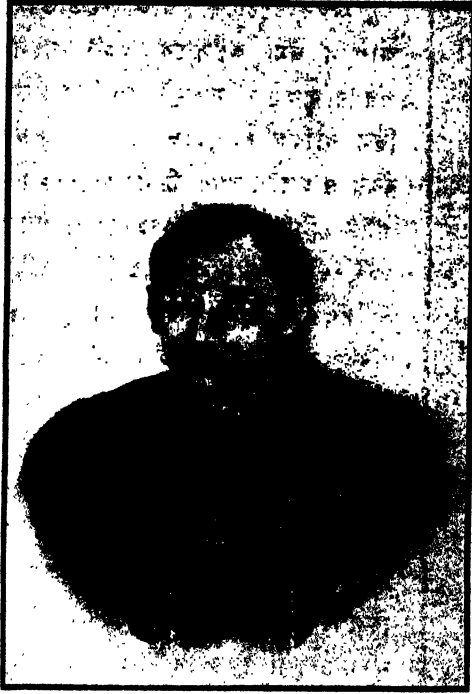
রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয় জন্ম ১৮৪৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৮৯৬ খৃঃ

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহোদয়।

পশ্চিমে কতকগুলি পরগণা সপ্তগ্রাম সরকারভুক্ত ছিল।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অনেকাংশ পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন ছিল। বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে হাওড়া ও হুগলী জিলার অধিকাংশ এবং বর্দ্ধমান জিলার কতকাংশ এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগে নদীয়া জিলার কতকাংশ ও ২৪ পরগণা ও কলিকাতা সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তখন সরস্বতী নদী দিয়া ভাগীরথীর প্রধান স্রোত প্রবাহিত হইত। আইন আকবরীতে লিখিত আছে, (১)
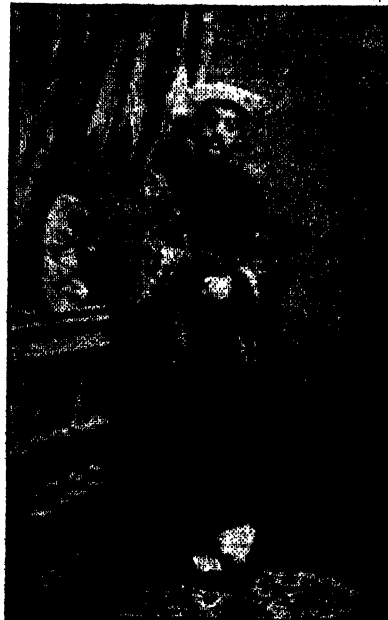
"সরকার বারবাকাবাদভুক্ত কাজিহাটা নামক স্থানে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে—এই পূর্ব্বমুখী স্রোতস্বতী পদ্মাবতী নামে খ্যাত। অপরটি দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সরস্বতী, যন (যমুনা) ও গঙ্গা—বর্ত্তমান হুগলী বা ভাগীরথী নদী। এই তিনটি নদীর সম্মিলনস্থান পুণ্যভূমি ত্রিবেণী। গঙ্গা সপ্তগ্রামের নিকট সহস্রমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। সরস্বতী ও যমুনাও সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে। ডি ব্যারোর (১)

ত্রিবেণীর মুলতাব বাগী রামগোপাল ঘোষ

(১) Mr. Blochman's Edition of the Aini-i-Akbari p. 388.

(১) Joao de Barros—*Da Asia*. Vol. IV pt. 2.
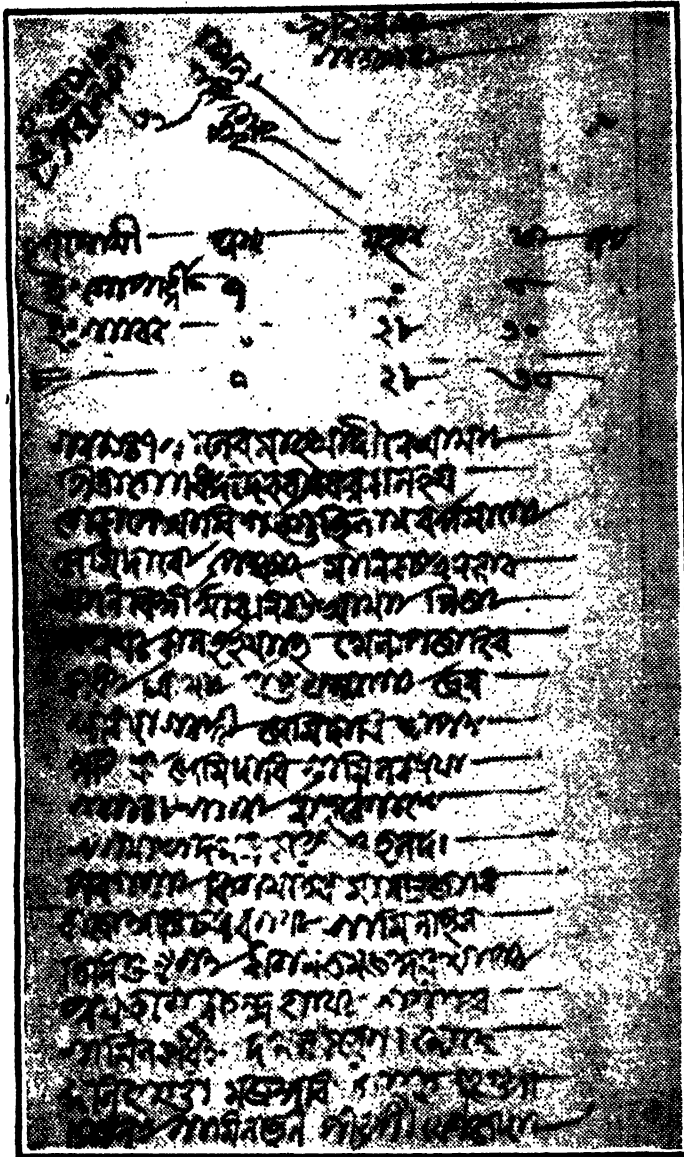
রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত ইরাদপত্র (১নং)

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের মানচিত্রে সরস্বতী ও যমুনা গঙ্গার শাখা-নদীরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে যমুনা একটি সামান্য খালরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু সরস্বতী সুপ্রশস্ত নদীরূপে অঙ্কিত করা আছে। বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতী ক্ষীণকায়া খাল মাত্র। পুরাতন তীরভূমি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সরস্বতী কত বৃহৎ নদী ছিল, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা তোডরমল্লের আশ্‌লি জমা অনুসারে ৫৩টি মহল বা পরগণা সপ্তগ্রাম সরকারভুক্ত ছিল। রাজস্ব ছিল বার্ষিক ৪১৮,১১৮ টাকা। সপ্তগ্রাম বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,০০০। মিঃ গ্রাণ্ট লিখিয়াছেন, ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে আয় ২৯৭,৭৪১ টাকা ছিল। (১)

সপ্তগ্রাম সরকার বহু দূর বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে সাগরদ্বীপপুঞ্জের নিকট হাতিয়াগড়, উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কবাতক হইতে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ ভূভাগ লইয়া অবস্থিত ছিল। সপ্তগ্রামের অধিকাংশ মহল ভাগীরথীর পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণাভুক্ত ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুরশীদকুলী খাঁর নূতন চাক্‌লা বিভাগে রাজা তোডরমল্লের সরকার বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তদনুযায়ী সপ্তগ্রামের অধিকাংশ বর্দ্ধমান ও কতক হুগলী চাক্‌লাভুক্ত করা হয়।

রাজা তোডরমল্লের আশ্‌লি জমা অনুসারে সপ্তগ্রাম সরকারভুক্ত ৫৩টি মহলের মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশটি মহলের বর্ত্তমান স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই—ফরাশেতগড়, আকবরপুর, বীরমাহিরা, মাণিকহাটী, তুরতেরিয়া, হাজীপুর, বারবাকপুর, সাকোতা, শিরণরাজপুর, সাঘাট, কাতশাল, ফতেপুর, খড়ে (খরার), খুল্লনা ও মেকুমা (বেকুয়া)। বক্রী ৩টি মহল বা পরগণার মধ্যে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা ছিল—আর্শা বা এরশাদ তোয়ালী। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, নবাব মুরশীদকুলীর সময় আর্শা পরগণার (২) মালিক বা জমীদার

(১) Grants' Analysis of the Bengal Finances.

(২) Blochman's Notes appended to Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I p. 363.

ছিলেন রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার পর্য্যালোচনার জন্য বিলাতের পার্লামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক নিয়োজিত সিলেক্ট কমিটী যে মন্তব্য ১৮১২ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভায় দাখিল করেন, তাহা সুবিখ্যাত পঞ্চম রিপোর্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত রিপোর্টে লিখিত আছে যে, এই আর্শা পরগণা হইতে বঙ্গাব্দ ১১৩৫ সাল হইতে ১১৪৭ সালমধ্যে আর একটি নূতন পরগণা সৃষ্টি করা হয়। তাহার নাম দেওয়া হয় মহম্মদ আমিনপুর (১) (মামদানীপুর)। এই নবসৃজিত পরগণাটি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বক্সবন্দর হুগলী হইতে কলিকাতার পরপার পর্য্যন্ত ৭ শত বর্গ-মাইল ভূমি অধিকার

রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত ইয়াদ্দস্ত (২নং)

করিয়াছিল। বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের এই জমীদারীমধ্যে য়ুরোপীয়গণের অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যকুঠী সকল অবস্থিত ছিল। নবাব সরকারে ইহার রাজস্ব আবওয়াবসমেত ৩,৩৮,৫৬০ ও হুগলী বক্সবন্দরের শুল্ক ১,৪২,৮৮৩ মোট ৪,৮১,৪৪৩৲ সিক্কা টাকা ধার্য্য করা হয়। অপর পরগণাগুলির মধ্যে বর্ত্তমান ২৪ পরগণাস্থিত কলিকাতা (রাজস্ব ১৪৮২৲), আনোয়ারপুর

(১) Zemindary Kismateah of Mahomedameenpore.—This district comprehending about 700 square miles, with all the European settlements in Bengal, on the western margin of the river Hooghly, from the Foujedarry capital of that name, or port custom house called Buckshbunder, down to the opposite shore of Calcutta was dismembered from the Painam permanent holding of Arseh then the *Eathiman* entire of Ramisser, a Koyt, father of Ragoodeb, and grand father of Govindeb, who succeeded to one-third of the whole trust, first erected into a seperate Zemindary. between the years 1138 and 1147 A. B. It was at the same time partitioned among the former's two younger sons and two nephews. with a Brahmin dependent of the family, each of whom gave his own name, (still retained on the Khalsa record) to the subdivision or portion so acquired; but all were assessed of revenue to Government under the single head of Mahomedameenpore. and in like manner paid alone, through the channel of the most considerable or responsible of the participants.—The Fifth Report from the Select Committee on the affairs of the East India Company Vol. I, p. 45.

রাজা-নৃসিংহদেব রায় মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত ইয়াদ্দস্ত (৩অং)

(রাজস্ব ৭৬৫৫৲) বালিন্দা (রাজস্ব ১৮৫৬৲), বালিয়া (রাজস্ব ৩৲) হাব্‌লি সহর (রাজস্ব ৩৯৪৫৲) মাকোয়ারা (মাগুরা রাজস্ব ৪১৭) এবং বর্ত্তমান হাওড়া জিলাস্থিত মোজাকারপুর (রাজস্ব ২,১৪২) ও বর্ত্তমান হুগলী জিলাস্থ বেগুয়ান (পাওনান রাজস্ব ২৩,৬৩৭), সেলিমপুর (রাজস্ব ১,২৬০) ও হাতিকান্দা (রাজস্ব ২,৫৬৭)। উক্ত পঞ্চম রিপোর্টে রাজা রামেশ্বরের জমীদারী বলিয়া লিখিত আছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা আইন-আকবরীতে প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। আনোয়ারপুর বারাসতের নিকট একটি পরগণা;—বালিন্দা মাদুরের জন্ত প্রসিদ্ধ। বালিন্দার অন্তর্গত হারুয়া পল্লীতে সাধু গোরাচাঁদের সমাধি আছে। বালিয়া যমুনার পশ্চিমে। হাব্‌লী সহর হুগলী ও চন্দননগরের অপর পারে অবস্থিত। এই পরগণার অন্তর্গত হালিসহর সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান। মাগুরা কলিকাতার দক্ষিণে এবং মোজাকারপুর শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানের নিকটে ভাগীরথীতীরে ছিল। পাওনান আর্শা পরগণার পশ্চিমে ও সেলিমপুর উত্তরে এবং হাতিকান্দা সুখসাগরের অপর পারে ছিল। ২৪ পরগণাস্থিত বীরমুক্তি (বরিদহাটী), হাসনপুর, হাতিয়াগড়, মেদিনীমল ও হুগলীস্থিত রায়পুর কোতওয়ালী বাঁশবেড়িয়া রাজষ্টেটভুক্ত বলিয়া লিখিত আছে।(১) মিঃ গ্রাণ্ট রায়পুর কোতওয়ালীর নাম "রায়পুর কোতওয়ালী সাতগাম" লিখিয়াছেন, অর্থাৎ এই পরগণার আয় হইতে সপ্তগ্রামের শাসনবিভাগের (কোতওয়ালী) ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। আকরা বা উকরা একটি বৃহৎ পরগণা। এক্ষণে কতক ২৪ পরগণা ও কতক নদীয়া জিলাভুক্ত। শেষোক্ত অংশ নগর উখরা নামে খ্যাত। সপ্তগ্রাম সরকারের কানুনগু ভবানন্দ মজুমদারের জমীদারীভুক্ত ছিল। বৌধেন (বুড়ান) ও সেলকী (হিলকী) সাতক্ষীরার উত্তর-পশ্চিমে ও পেনগা (ভালুকা) দক্ষিণ সাতক্ষীরার কতকাংশ সরকার খালিকাতাবাদভুক্ত ছিল। পুঁড়া এখন পরগণা নহে, উত্তর বসীরহাটে একটি ক্ষুদ্র পল্লী। বীলগা (বেলগা) পলাশীর দক্ষিণে, বাগোয়ান এখন নদীয়ার ও বজবাড়ী (পাটকাবাড়ী) মুর্শিদাবাদ

(১) The Bansberia Raj by Shumbhoo Chunder Dey, B.L. 2nd Edition (1908) pp. 17 and 21.

জিলাভুক্ত—সপ্তগ্রাম সরকারের উত্তরের শেষ সীমা। ধুলিয়াপুর এখন ২৪ পরগণার দক্ষিণ-পূর্ব্ব যমুনা ও কালিন্দীর মধ্যস্থলে—ইহারই নিকট ঈশ্বরপুর - সুন্দরবনের বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবাসস্থান। রাণীহাট শান্তিপুরের অপর পারে একটি বৃহৎ পরগণা। সাদঘাটি সম্ভবতঃ পলাশীর উত্তরে সাদখালি। গিলারা (কালারোয়া) এখন কতক ২৪ পরগণা ও কতক নদীয়া জিলাভুক্ত। মিতারী (মতিয়ারী) এখন নদীয়া জিলায়। মুদাগাছা (মুনরাগাছা) ডায়মণ্ডহারবার ও হুগলী পইণ্টের নিকট। মাইহাটী (মইহাট) ২৪ পরগণায় কতক সীতারাম নামক এক জমীদারের এবং কতক বাঁশবেড়িয়া রাজষ্টেটভুক্ত। (১) নদীয়া, সাতেনপুর (শান্তিপুর), সাতগাঁ বন্দর ও হাট। বেনোয়া (আম্বয়া) কালনার দক্ষিণে। মিঃ রেনেল বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে আম্বোয়া বলিয়া অঙ্কিত আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সপ্তগ্রাম অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে—

"এইমত সপ্তগ্রাম অম্বুয়া মুল্লুকে।
বিহারেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে ॥"

উপরি-উক্ত পঞ্চম রিপোর্টে সুপ্রসিদ্ধ জয়ানন্দ মজুমদারের (২) পৌত্র রাজা রামেশ্বরের জমীদারীর অন্তর্গত ৩২টি পরগণার তালিকা দেওয়া আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এককালে রাজা রামেশ্বর সপ্তগ্রাম সরকারের মধ্যে ধনে, মানে ও পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে দুইখানি সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। একখানি ১০৯০ হিজরা ২২শে জলুস তারিখের, অপরখানি ১০ই শফর তারিখের। দুইখানিই পারস্য ভাষায় লিখিত, প্রথমোক্তখানিতে তাঁহাকে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে
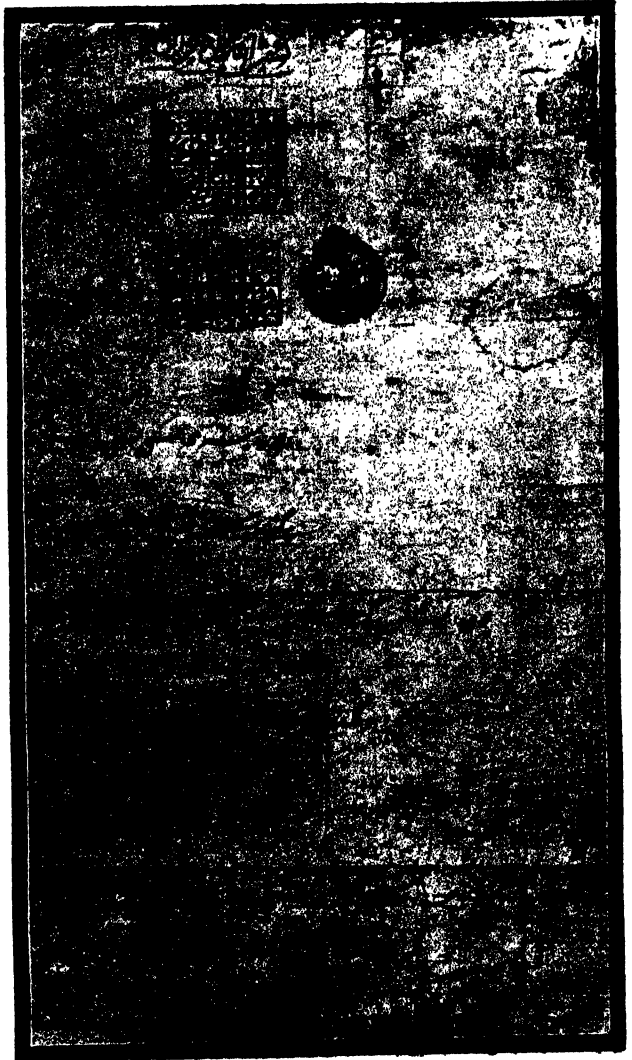
১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়কে সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত বংশানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" উপাধির সনন্দ

(১) A Short Account of the Sudramani Rajas by S. C. Mukherjee, B. L. 2nd Edition (1902) p. 6.

(২) And during this period (1580-82) three tantric Hindus came into prominence. They were Bhabananda, who founded the Nadia Raj, Lakshmikanto, the ancestor of the Savarna Chaudhuris; Jayanando, founder of the Bansberia Raj. - - - For their valuable services Jaigirs and titles were conferred by the Emperor on the three men concerned Bhabananda, Lakshmikanto and Jaiyahanda, all of whom were taken into the service of the State as Majumaders (Collectors)—*Vide* Census of India 1901 Vol. VII pp. 9-10, Bengal Secretariat Press.

বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা জমী নিষ্কর জায়গীরস্বরূপ দেওয়া হয়, অপরখানিতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে "রাজামহাশয়" উপাধি দেওয়া হয়। এই সনন্দের সঙ্গে বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্চপার্চা (পঞ্চরাজ পরিচ্ছদ) খিলাত দেন। সনন্দ দুইখানির অনুবাদ (১) এখানে দেওয়া গেল—
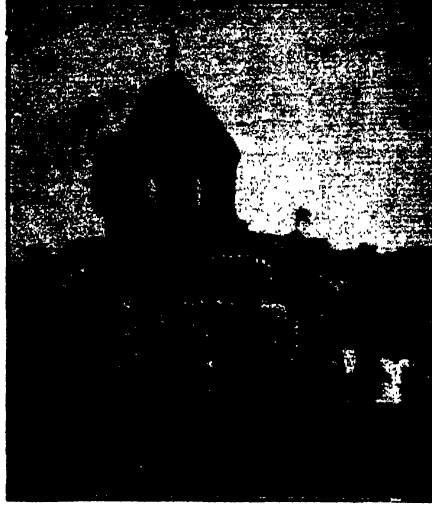
"এই শুভ সময়ে সর্ব্বজন-শিরোধার্য্য মহাপ্রতাপান্বিত এই আদেশ প্রচার হইল যে, যে হেতু সপ্তগ্রাম সরকার ও কোট এক্তিয়ারপুর পরগণার কানুনগো ও চৌধুরী এবং বক্সবন্দরপুর পরগণার, রায়পুর কোতওয়ালী পরগণার, উপরি-উক্ত সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য পরগণার ও সলিমাবাদ সরকারের চৌধুরী রামেশ্বর হিতকারী ও রাজ্যোন্নতি-প্রার্থী; অতএব তাহাকে সরকার সপ্তগ্রাম পরগণা আর্শা মৌজে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪ শত ১ বিঘা জমী, বসতবাটী ও জীবিকার জন্য নিষ্কর পারিতোষিকস্বরূপ দেওয়া হইল। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রধান কর্ম্মচারিগণ যেন উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত জমীর চিরন্তন লাখেরাজদার জানিয়া উক্ত জমী উহার দখলে ছাড়িয়া দেয়, মাল বা অন্য কোন কারণে আপত্তি না করে ও প্রতি বৎসর নূতন সনন্দ তলব না করে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া ইহার কদাচ অন্যথা না করে। ইতি ১০৯০ হিজরী ২২শে জলুস।

বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণু বা বাসুদেব মন্দির

"পুনরায় স্পষ্ট করিয়া লেখা হইতেছে যে, সপ্তগ্রাম সরকার ও কোট-এক্তিয়ারপুর পরগণার কানুনগো ও চৌধুরী—বক্সবন্দরপুর পরগণার উপরি-উক্ত সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য পরগণার কোতওয়ালী রায়পুর পরগণার ও সরকার সলিমাবাদের চৌধুরী রামেশ্বরকে সরকার সপ্তগ্রাম পরগণা আর্শা মৌজে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জীবিকা ও বসতবাটীর জন্য ৪ শত ১ বিঘা পতিত খারিজ জমা-জমীর সনন্দ মহামান্য মহামহিম হুজুরের তরফ হইতে প্রদত্ত হইল। উপরি-উক্ত জমী উক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হয়। বিশেষতঃ সরকারের হাকিম ও আমলাগণ যেন মালের জন্য বা অপর কোন কারণে কস্মিন্-কালেও উক্ত জমীতে হস্তক্ষেপ না করে।" ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও এই জায়গীর বাহালী লাখ-রাজ গণ্য করিয়া লইয়াছেন। (১)

বাঁশবেড়িয়া দুর্গের পথ

(১) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্-এর লিখিত—"পুণ্যবণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়" হইতে অনুবাদ দুইটি গৃহীত হইল।

(১) The Family History of Bansberia Raj by A. G. Bower, B.A. (oxon) (W. Newman & Co., 1896) p. 11. Footnote.

অপর সনন্দখানি—

"রাজা রামেশ্বর রায়
মহাশয় বরাবরেষু
মোকাম বাঁশবেড়িয়া,
পরগণে আর্শা,
সরকার সাতগাঁ।

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরীপ জমাবন্দী করিয়া যে হেতু তুমি রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, যে হেতু তুমি যথেষ্ট যত্নের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, এ জন্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চপার্চ্চা খিলাত ও রাজা মহাশয় উপাধি তোমাকে দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০৯০ হিজরী।

রাজা রামেশ্বর উপরি-উক্ত ৪ শত ১ বিঘা ভূমি এক সুপ্রশস্ত ও সুগভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করেন। একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্থানে স্থানে কামান সন্নিবেশ করেন। গড়বেষ্টিত বলিয়া স্থানটি 'গড়বাটী"নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম ও তৎসংলগ্ন স্থান সকল কয়েকবার বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। অধিবাসীরা ধনরত্ন-সহ "গড়বাটী"তে আশ্রয় লইয়া ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামেশ্বর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত ইষ্টক দ্বারা একটি বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বোক্ত গড়ের বহির্ভাগের অনতিদূরে রাজা রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রঘুদেব আর একটি পরিখা খনন করান—সেটি তত প্রশস্ত বা গভীর নহে, তাহা "বাহিরগড়" নামে
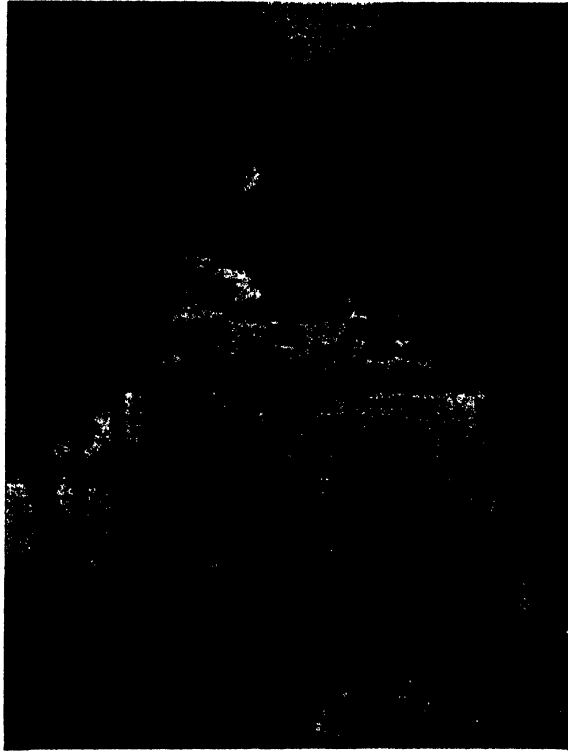
বাঁশবেড়িয়া—দুর্গদ্বার

খ্যাত। এই রাজা রঘুদেবই ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামকে নবাব মুরশীদকুলী খাঁর প্রতিষ্ঠিত "বৈকুণ্ঠ" নামক পূতিগন্ধময় মলমূত্র ও গলিত শবাদিতে পূর্ণ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন। গুণগ্রাহী নবাব রঘুদেবের এই অপূর্ব্ব বদান্যতায় মোহিত হইয়া যান—মোহিত হইবার দুইটি কারণ ছিল, প্রথমতঃ রঘুদেব নিজের রাজস্ব বাকী ফেলিলে স্বয়ং সেই নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা জানিয়াও পরোপকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার জন্য এই বিপদ বরণ করিতে উদ্যত, সেই রঘুরাম অন্যায় পূর্ব্বক নবাব সরকারে তাঁহার সুচতুর 'কর্ম্মচারীর কৌশলে (১) রঘুদেবের অগ্রদ্বীপের জমীদারী দখল করেন। রঘুদেব যখন শুনিলেন, নবাবের আদেশে লক্ষ টাকার জন্য রঘুরামকে সেই নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, তখন তিনি বিচলিত হইলেন। তাঁহার মহান্ চিত্তে তখন অগ্রদ্বীপের কথা স্থান পাইল না। তখন তাঁহার মনে হইল, হিন্দু সন্তান হইয়া কোন্ প্রাণে এই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-তনয়ের নিদারুণ নির্য্যাতন-কাহিনী শুনিবেন? তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে উক্ত টাকা দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতির উপায় করিয়া দিলেন। এই মহাপ্রাণতার সংবাদ নবাবের

(১) শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সঙ্কলিত "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত" ১৪২—৪৩ পৃঃ।

কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে "শূদ্রমণি" উপাধিতে বিভূষিত করেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজা রঘুদেবের নাবালক পৌত্র নৃসিংহ দেবের হল্দা পরগণা তাঁহার নাবালকী অবস্থার সুযোগে দখল করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করেন। রাজা রঘুদেব রায় লক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্র দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উক্ত প্রদেশের যে ব্রাহ্মণ রঘুদেবের ব্রহ্মত্রভোগী নহেন, তিনি ব্রাহ্মণই নহেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছিল—ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। সপ্তগ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া যে বেগবতী সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইত, তাহা ক্ষীণকায়া হইয়া আসিতেছিল, সে জন্য বৃহৎ বাণিজ্যপোত সকল সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসা দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে বাটোরে (বর্ত্তমান হাওড়া শিবপুরে) বাণিজ্যপোত হইতে পণ্যদ্রব্য নামাইয়া নৌকাযোগে সপ্তগ্রামে প্রেরিত হইতে লাগিল। (১) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পর্ত্তুগীজ বণিকেরা ইতঃপূর্ব্বে হুগলীতে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা হুগলীকেই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র করিবার সঙ্কল্প করিল। লক্ষ্মী বরাবরই চঞ্চলা। দৈবের প্রতিকূলতায় সরস্বতী দিয়া বৃহৎ নৌকা যাতায়াতেরও অসুবিধা হইতে লাগিল—এই সুযোগে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করিয়া লইল—সপ্তগ্রাম হীনশ্রী হইয়া পড়িল। বাণিজ্যপ্রধান স্থানের বাণিজ্যের হ্রাসে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। দিন দিন হুগলীর উন্নতি ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন ঘটিতে লাগিল। (১) ক্রমে সপ্তগ্রাম মহানগরী হইতে পল্লীগ্রামে পরিণত হইল। মোগল-রাজপুরুষগণ ও বিচারালয়াদি সপ্তগ্রামে থাকিলেও বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। সপ্তগ্রাম শ্রীহীন হইবার আরও অনেক কারণ ছিল। সপ্তগ্রাম অনেকবার শত্রু-হস্তে নিপতিত হইয়া বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন ও নগরটির নানা স্থান ধ্বংস করে। (২) আরও কয়েকবার সপ্তগ্রাম বিপর্য্যস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনা কর্ত্তৃক হুগলী অবরুদ্ধ হয়। সার্দ্ধ ৩ মাস অবরোধের পর ১০ সহস্র পর্ত্তুগীজের শোণিতে ভাগীরথী-সলিল অনুরঞ্জিত করিয়া মোগলগণ হুগলী অধিকার করেন। অতঃপর মোগলগণ সপ্তগ্রামের রাজকীয় বন্দর হুগলীতে স্থানান্তরিত করিলেন। যে সপ্তগ্রাম রোমকদিগের সৌভাগ্য-রবির মধ্যাহ্নকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত জগদ্বিখ্যাত বন্দর ছিল, আজ তাহা চির-কালের জন্য পরিত্যক্ত হইল। অবশেষে বিচারালয় ও রাজকার্য্যালয়গুলিও হুগলীতে আনয়ন করা হইল। সপ্তগ্রাম সেই সময় হইতে নগণ্য হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়।

(১) A good tide's rowing before you came to Satgaw. a reasonable fair citie abounding in all things and in it the merchants gather together for their trade, from whence upwards, the ships do not go to Satgaw.

* * * * * *

Buttor has an infinite number of ships and bazars, while the ships stay in the seasons, they erect a village of straw houses, which they burn when the ships leave and build again the next season; in the port of Satgaw every year they lade 30 or 35 ships great and small with rice cloth of bombast of diverse sorts, lacca, great abundance of sugar, paper, oil of Zerzeline and other sorts of merchandize."—Caesor Frederick (Hakluyt I, 230, quoted by Wilson).

(১) Satgong—There are two emporiums, a mile distant from each other, one called Satgong and the other Hooghly with its dependencies.—Ayeen Akbary Gladwin's Translation Vol. I, Part I. pp. 305.

(২) "In the meantime some exactions having been made from the Afghans who by the treaty of peace, had been allowed to retain their jaigirs, they again rebelled and having advanced into Bengal plundered the royal port of Satgong in the vicinity of the town now called Hooghly—Stewart's History of Bengal—p. 186.

"And in 1592, the Afghans from Orissa plundered Satgaon—A brief History of the Hughli District by Lieut. Col. D. G. Crawford, I.M.S., p, 3.

ভাদুড়ী মশাই

১

মেদিনীশঙ্কর ভাদুড়ী বত্রিশ বছর বয়সেই খুব নামী এটর্নী দাঁড়িয়ে গেলেন। কেবল যে তাঁর খ্যাতি, অর্থ, অট্টালিকা, মক্কেল, মোটর প্রবলবেগে বাড়তে লাগলো, তাই-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও হু হু ক'রে বাড়তে লাগলো। ছাতা আর রুমালখানি ছাড়া এ বছরের পোষাক-পরিচ্ছদ, আসছে বছর কায দেয় না,- চেয়ারখানাও না। শীতকালেও ইলেক্‌ট্রিক্‌-ফ্যান্‌ ছুটী পায় না।

নন্দ এ বাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য, কর্ত্তাদের আমলের চাকর। সে ভয় পেয়ে ভাদুড়ী মশাইকে এক দিন বল্‌লে,—"বাবু, ঘি-দুধ খাওয়াটা বছরখানেক বন্ধ রাখুন, কালী কবরেজের একটা ওষুধ খান, ওনার বড়ী কথা শোনে, গিরিশ নন্দীর অমন ভীমের মতো শরীল দেড়-মাসে পাত ক'রে দিছলো। শুনতে পাই, তোমার এটা ব্যায়রাম, ওকে আর বাড়তে দিয়ে কায নেই।"

এই ঘি-দুধের সংসারে, গৃহিণী মাতঙ্গিনীও মন্দ বাড়ছিলেন না। নন্দর কথা শুনতে পেয়ে, ঝড়ের বেগে এসে বল্‌লেন—"তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়, যার খাস, তার রোগ মানছিস! কিসের অভাব হয়েছে যে, ঘি-দুধ ছাড়তে হবে? আ—ম—র্‌,—ডাঁটাখেগো দোত্তি কি না, নিজেদের মতো সকলে বেরষো কাট হয়—এই চান।"

নন্দ একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—"বাবুর কষ্ট হয় দেখেই বলেছি মা, কোলে পিটে ক'রে মানুষ করেছি। পায়ের কাছে চটি জোড়াটা রয়েছে, দেখে নিতে পারেন না। সে দিন টেরী কুকুরটাকে পায়ে দিতে গিয়ে চোটকে ফেলেছিলেন।"

মাতঙ্গিনী জ্বলে উঠে মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন—"খুব করেছিলেন,—দূর হ। চাকর থাকতে বাবুর ত জুতো খুঁজে পরবার কথা নয়! বাবুকেই যদি সব করতে হয় ত পোড়ারমুখোদের কেবল নজর দেবার জন্যে মাইনে দিয়ে রাখা কেন?"

সেই পর্য্যন্ত নন্দ আর কোন কথা কইত না। বাবুর কিন্তু কতক প্রকাশ্যে, কতক অপ্রকাশ্যে, দিন দিন অস্বস্তি বেড়েই চলতে লাগলো। টাকার লোভে আর কাযের ঝোঁকে সেটা সয়ে যেতো।

এক দিন আপিস থেকে ফিরে, একতাড়া নোট মাতঙ্গিনীর হাতে দিয়ে, মুখে হাসির একটু রেখাপাত ক'রে ভাদুড়ী মশাই বল্লেন—"মোটা হয়েছি বই কি মাতু, কোন দোকানেই ত গলার কলার মিল্‌ল না! এক জন সাহেব হেসে বল্লে—'বাবু, তোমার কলার পরবার অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন মফলার, না হয় রুমালেই চালাতে হবে।' তা হ'লে কি ঘাড়ে গরদানে—"

মাতঙ্গিনী বাধা দিয়ে বল্লেন—"তুমি চুপ কর ত; পোড়ারমুখোদের দোকানে ভাল জিনিষ নেই, তাই বলুক না কেন! যাদের নিজের দেশে বারো মাসের খোরাক নেই, তাদের রক্ত-মাংসের শরীরের অবস্থা-জ্ঞান কতটুকু, এটা বুঝলে না?"

ভাদুড়ী মশাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন-"তাও ত বটে"—

মাতঙ্গিনী বল্লেন—"তোমাদের কোর্ট বন্ধ হচ্ছে কবে? মনে অমন খটকা রেখে কায কি, চলো, এই দু'তিন মাস একটা ভাল যায়গায় হাওয়া খেয়ে আসবে। মনের মধ্যে মিছে একটা ধোঁকা পুষে রাখা ভাল নয়।"

ভাদুড়ী বল্লেন—"সেই কথাই ভাল। শরীরটে আমার যাই হোক্, মনটা বেজায় হাল্কা কি না। সায়েব লোকে বল্লে,—ওরা তো মিছে কথা কয় না। এই সময় মিছরিলাল মাড়োয়ারীও হাতে আছে, মধুপুরে তার দু-দুখানা বাড়ী। কালই ঠিক করতে হবে; অমনি পাবার তরে অনেক বেটা ঝুঁকবে।"

মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"তোমার যে রকম ভোলা মন, যেন ভুলে ব'সে থেকো না! হা-ঘরেরা হাঁ ক'রে আছে, তা জেনো।"

ভাদুড়ী ব'লে উঠলেন—"ওঃ, ভাগ্যিস কথাটা পাড়লে, আমি ভুলেই গেছলুম। মধুপুরের কাছেই ত বটে! আজ দু'দিন হ'ল বিষ্ণুপুরের তারিণী সামন্ত বলছিল—মধুপুরের মধ্যেই সাঁওতালদের এক ভারী জাগ্রত দেবতা আছেন, তাঁর কাছে যে যা কামনা ক'রে পূজো দেয়, তার তাই সফল হয়। খরচ কিছুই নয়—জোড়া পাঁটা আর দু'চার বোতল মদ। লোকটা মিছে বলবে না, আমার হাতে তার সর্ব্বস্ব ঝুলছে। আমার সন্তান নেই শুনে তার জিদ্ পড়েছে, সেখানে আমাদের নিয়ে যাবেই; খরচ সব তার। এমন সুযোগ"—

এই সময় নন্দ এসে বাবুর জুতো খুলতে বসলো! মাতঙ্গিনী সজোরে চোখ টিপে ভাদুড়ীকে চুপ করতে ইসারা ক'রে মনে মনে নন্দর মাথা খেতে খেতে চ'লে গেলেন। নন্দ আড়াল থেকে সবই শুনে এসেছিল। সে জুতো খুলতে খুলতে আরম্ভ করলে—"দেখুন বাবু! ওই সাঁওতালী দেবতা ধরতে যাওয়া আমি ভাল বুঝি না, যাদের মানুষকেই চিনি না, তাদের দেবতাকে ঘাঁটানো কেন? নিজেদের কি দেবতা নেই, দেবার হয়, তাঁরাই দেবে।"

বাবু বল্লেন—"তোর ও সব কথায় থাকবার দরকার নেই। আমার এক পয়সা খরচ নেই, লাভ নিয়ে কথা! ফাঁকতালে হয়ে যায়, ক্ষতি কি?"

নন্দ উত্তেজিতভাবে বল্লে—"ওই ফাঁকতালটা আমি বুঝি না বাবু। কলকেতা সহরে বুড়ো হয়ে গেলুম, অনেকের অনেক ফাঁকতাল দেখলুম, কিন্তু শেষ তাল কারুরি সামলাতে নি, সবারই ফাঁকে পড়েছে। যাট বছর বাজার করছি, একটা ত বাজারির কাছে আধ' পয়সার ফাঁকতাল চলতে দেখিনি, আর দেবতার কাছে ফাঁকতাল! বিশ্বাস না থাকে ত ও সব কায নেই বাবু।"

মাতঙ্গিনীকে আসতে দেখে ভাদুড়ী মশাই তাড়াতাড়ি বল্লেন,—"আচ্ছা, তুই এখন যা।"

মাতঙ্গিনী সব কথাই শুনিয়াছিলেন। নন্দকে তিনি এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

২

মানুষ ত কেবল দেহ নিয়েই ঘর করে না, দেহের মধ্যে মন ব'লে আর একটা জিনিষও তার আছে, আর সেইটার শক্তিই বেশী। দেহ যত বড়ই হোক্, মন তাকে নিয়ে পুতুলের মত ঘোরায় ফেরায়।

ভাদুড়ী মশাই তাঁর বিপুল দেহভারটা টাকার টানে টেনে বেড়াতেন। টাকার চিন্তা, টাকার আমদানী, টাকার হিসাব, আর টাকার মোহেই তাঁর দেহের চিন্তা ঢাকা প'ড়ে থাকতো। মাতঙ্গিনীও সে চিন্তাকে মাথা তুলতে দিতেন না, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠার সহিত বলতেন, "কণ্ঠা বেরুলো যে, একটু ভাল ক'রে খাও দাও, শরীর থাক্‌লে তবে না সব।" তিনি ফাঁকা কথা কখনও কইতেন না, সঙ্গে সঙ্গে রাবড়ী, রসগোল্লা, ছানার জিলিপি, মালায়ের কুলপি এগিয়ে দিতেন।

কিন্তু এই প্রচুর অর্থ আর বিপুল শরীর সত্ত্বেও ভাদুড়ীদম্পতির মনে সুখ ছিল না। এত লাভের মধ্যে সন্তানলাভ না ঘটায় তাঁরা বড়ই চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন; বয়স বাড়ছে দেখে চিন্তাও বাড়তে লাগলো। দায়ে প'ড়ে লোক যা যা করে,—মাতঙ্গিনী তার কিছুই বাদ দিলেন না। পাড়ায় হরিমতি চক্রসিদ্ধ ওস্তাদ, তার সাহায্যে অনেকেই না কি পুত্রবতী হয়েছে, সে সাতশ টাকা রাস্তাখরচমাত্র নিয়ে বীরভূম থেকে এক জন পাকা তান্ত্রিক কর্ম্মী জুটিয়ে দিলে। লোকটি ৩৫ বছরেই আধ-সিদ্ধ বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ হয়েছেন। বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু, রং কাল, বেশ তেলা চেহারা, গরদ পরেন আর অবজবে ক'রে জবাকুসুম মাখেন, ঘাঁচড়ানো কোসা কোসা কুচকুচে চুল কাঁধে পিঠে পড়েছে, কপালে সিঁদুর, গলায় স্ফটিকের মালা।

হরিমতির আশ্রম পবিত্র ক'রে তান্ত্রিক ক্রিয়াদি এগুতে লাগলো। সেখানে অন্নাহার চলে না, তাই দুই বেলাই লুচি, পাঁটা, কখনও গলদা চিংড়ী আর হাঁসের ডিম এবং স্বদেশী খাঁটি খান। এত বড় সাধক লোক, কিন্তু ধরা দেন না, সর্ব্বদাই বেশ সরস-ভাষী। কণ্ঠ বেশ সুমিষ্ট,—সন্ধ্যার সময় যখন মা'র নাম করেন, তখন থিয়েটারের চামেলী পর্য্যন্ত গ'লে যায়, হরিমতি হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। মাতঙ্গিনী এক দিনমাত্র লুকিয়ে শুনেছিলেন, আর মনে মনে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে সন্তানলাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

এই সময় বিষ্ণুপুরের তারিণী সামন্ত পূর্ব্বোক্ত সংবাদটি দিলে। সংবাদটি যেমন শুভ, তেমনই সহজসাধ্য, আবার ততোধিক সস্তা। তান্ত্রিক-কর্ম্মী শুনেই মা মা ব'লে লাফিয়ে উঠলেন। বল্‌লেন, "ও আমাদের জানা দেবতা, আপনাদের বিশ্বাস হবে কি না, তাই বলিনি, কারণ, অবিশ্বাসে অপরাধ আছে। আমার গুরুদেব (উদ্দেশে প্রণামান্তে) বল্‌তেন, ঐ সাঁওতাল দেবতার মত অভীষ্ট দানে, বিশেষ পুত্রদানে পটু দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। ওটি আমাদের চক্রসিদ্ধ স্থান, ওঁর প্রকাশ নিষিদ্ধ। ঘটনাচক্রে যখন আপনাদের কানে এসে গেছে, ভাগ্য প্রসন্ন জান্‌বেন। মহাষ্টমীও সামনে, অমন প্রশস্ত দিনও আর নেই। শুভ হবার না হ'লে এমন জোট বেঁধে সব ঘুনিয়ে আসে না। শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি। সব কায ফেলে তয়ের হয়ে পড়ুন। আমরা বীরভূমের বীরাচারী কৌল, মায়ের আদুরে ছেলে; তিনি কিসে তুষ্ট, তা আমরাই জানি; অভীষ্টলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মাতঙ্গিনী ভাদুড়ী মশাইকে বল্‌লেন, "তা হ'লে আর পাঁচটি দিন মাত্র হাতে আছে, এর ভিতর সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। কিন্তু ঐ ভান্দা মঙ্গলচণ্ডী না সঙ্গে যায়; শুভকাযে নন্দা অনামুখোর মুখ দেখলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—তা বল্‌ছি।"

ভাদুড়ী মশাই বল্‌লেন,—"না—ও গেলে বাড়ী আগলাবে কে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; ব্যবস্থা আমার করাই আছে। ভাগ্যিস তুমি রুমালে গেরো বেঁধে দিছলে, বাড়ীটা গিছলো আর কি। পাঁচটা মিনিট দেরী হ'লে উকীলগুলোর গ্রাসে গিয়ে পড়তো। এখন নির্ভাবনায় গিয়ে ওঠা যাবে. যাদের বাড়ী, তাদেরি চাকর, বাকী সব ভারই তারিণীর। আমাদের কেবল উপস্থিত হওয়া। অবশ্য তান্ত্রিক আচার্য্য ঠাকুর সঙ্গে যাবেন।"

মাতঙ্গিনী বল্‌লেন, "তিনি ত যাবেনই। বাড়ী কি পাওয়া যেত, রুমালের গেরোটা খুলে দেখো, তার ভিতর কি আছে। পরশু সারা রাত তিনি রূপোর পদকে আকর্ষণী বীজ লিখে, ১০৮ অপরাজিতার বেড়া দিয়ে বসেছিলেন! তা না ত উনুনমুখো উকীলদের গর্ব্বেই যেতো। যাক্—সবই ত দেখছি, লোকটিও পাওয়া গেছে—আসল।"

পরে মনে মনে ভাবতে ভাবতে গেলেন, এই সুযোগে নন্দার মুণ্ডপাতের একটা কিছু করাবোই করাবো!

নন্দার উপর মাতঙ্গিনীর বিষদৃষ্টির কারণটা খুব মক্ষমই ছিল। কর্ত্তাদের আমলের চাকর ব'লে সে নিজেকে সংসারের এক জন ভাবত, আর যা ভাল বুঝত না, অসঙ্কোচে ভাদুড়ীকে বল্‌ত। এক দিন ভাদুড়ীকে বল্লে—"দেখছি, বৌমার ত সন্তান হবার দিন চলেই গেল—এতটা বিষয়, এতটা রোজগার কার জন্যে? ছেলে না থাকলে সবই মিথ্যে। এ অবস্থায় আর একটা বিয়ে করা উচিত বাবু; কর্ত্তা থাকলে পাঁচ বছর আগে এ কায করাতেন",—ইত্যাদি।

আয়ন্দা আমদানীওলা স্বামীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অন্তরে ভবিষ্যতের একটা সশঙ্ক বিভীষিকা স্বভাবতই যখন তখন উদয় হয়ে থাকে। তার উপর নন্দ বেচারার মন্দ ভাগ্যে—ভাদুড়ী মশায়ের ওই সঙ্গীন প্রস্তাব মাতঙ্গিনীকে যে কতটা অশান্ত ও ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌তে পারে, সেটা অনুমান ক'রে দেখলে, নন্দর উপর তাঁর বিষ-দৃষ্টির জন্যে আমরা তাঁকে এতটুকুও দোষ দিতে পারি না।

নন্দ-বিদায়ের অভিনয়টা বহু পূর্ব্বেই শেষ হয়ে যেত, কেবল একটা কারণ থাকায় সেটা ঘটে উঠছিল না। নন্দ আজ ৭ বছর মাইনে পায়নি—চায়ওনি। টাকাটা হাজারের ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একবারে এতটা টাকা বে-কায়দা বা'র ক'রে দেওয়ার মত জান্ বা মন কর্ত্তা কি গৃহিণী কারও ছিল না।

* * * * *

ইতোমধ্যে ভাদুড়ী মশাই শ্যালক নবনীমাধবকে যশোর থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে ছোকরা এই বছর এঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষা দিয়ে এসে বাড়ীতেই ছিল। সংসারজ্ঞান তার নেই বল্লেই হয়, সেকেলে পৈতৃক বাড়ীর দোর, জানালা আর থিলেনের কাট্-ছাটের ভুল বার করছিল, আর অত বড় বাড়ীখানা ওই সামান্য ভিতের ওপর তিতলটা কাঁধে ক'রে কি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তা ঠিক্ করতে না পেরে, একটু হাওয়া দিলেই ছুটে রাস্তায় গিয়ে সারারাত পায়চারি ক'রে কাটাচ্ছিল। কেবল দিনের বেলাটা নির্ভাবনায় তাস খেলে আর মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছিল।

সে এসে শুন্‌লে, ভাদুড়ী মশাই বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুর যাচ্ছেন, তাকে সঙ্গে যেতে হবে। শুনে নবনী খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে ভাদুড়ী মশাইয়ের দিকে চেয়ে থেকে শেষে বল্‌লে, "কল্‌কেতার বায়ু ত দেখছি একদম নিঃশেষ করেছেন, এর ওপর আবার মধুপুরের বায়ু চড়ানো কি ভাল হবে? তার চেয়ে আসাম অঞ্চলে চলুন না, ভীমরুলের মত মশায় চট্ রোগটা শুষে নেবে!"

শুনে ভাদুড়ী মশাই হাসতে লাগলেন। মাতঙ্গিনী চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন, "তুই চুপ কর, তোকে বিধান দিতে কেউ ডাকেনি। এই বুঝি লেখাপড়া শিখে এলি! পোড়ারমুখোরা ওঁর মনে রোগের খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছে—তাই একবার যাওয়া। টাকার শ্রাদ্ধ ত কম হবে না। উনি ওই দেখতেই একটু দোহারা—মনটা যে তেমনই হাল্‌কা।"

নবনী বুঝিল, কথাগুলো বলা ভাল হয়নি, সে সামনে গিয়ে বল্‌লে, "শালা-ভগ্নীপোতের কথায় তুমি কেন কান দাও দিদি। আমি কি ওঁর ধাত বুঝি না, এমন দুর্ব্বল লোক দুটি নেই।" এইতেই সব মিটে গেল।

পরদিন স-আচার্য্য সব মধুপুর যাত্রা করলেন, নন্দ বাড়ী আগলে রইলো। যাত্রার পূর্ব্বে সে কেবল বলেছিল—"পাঁজিটে একবার দেখলেন না—একে ত শনিবার, দোকানে আবার শুনছিলুম আজ না কি তেরো—"

আচার্য্য এক কথায় থামিয়ে দিলেন—"দেবোদ্দেশে কোনও বাধা নেই। তন্ত্রমতে শনিবার, অমাবস্যা, মঘা, তেরস্পর্শ এই সবই ত প্রশস্ত দিন। আশ্চর্য্য! মা'র কৃপায় আপনা আপনি সব জোট বাঁধছে!"

মাতঙ্গিনী ভ্রূ কুঁচকে চোখ পাকিয়ে চাপা গলায় বল্‌লেন, "অনামুখো কেবল মন্দই গাইবে—আসি আগে ফিরে!"

নবনী নন্দর কোন দোষই খুঁজে পেলে না, সে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলো, "শুধু পাঁজি দেখা কেন, এ ফটিকস্তম্ভ নিয়ে নড়তে-চড়তে হ'লে ঠিকুজী-কুষ্ঠী পর্য্যন্ত দেখে বেরুনোই উচিত। এর ওপর মধুপুরের হাওয়া শুষলে 'ট্রকে' ফির্‌তে হবে দেখছি!"

নবনী আমুদে স্বভাবের লোক, দিদির ভয়ে তার মুখ বন্ধ হওয়ায় সে মুস্কিলে পড়েছিল।

৩

মধুপুরে এসে প্রথম দিন দুই বেশ আনন্দে কাটলো। মাতঙ্গিনী বল্‌লেন, "আহা, কি হাওয়া—প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, কি খোলা যায়গা, কি সুন্দর মহুয়া গাছ, কি সব আরাম-কুঞ্জ! স্ফূর্ত্তি যেন শিরায় শিরায় ফর্ ফর্ ক'রে ঘোরে। দারিদ্দিরদের মুখ দেখতে হয় না।"

আচার্য্য বল্‌লেন, "বাঃ, সব ছাঁটা ছাঁটা ভদ্রলোক, বাছা বাছা বড়লোক—রায় বাহাদুর, রায় সায়েব, জমীদার তস্য সম্বন্ধী, বাঃ, যায়গা বটে!"

নবনী বল্‌লে, "রাস্তা কি পরিষ্কার, দোয়ানি খোয়াবার ভয় নেই, না কুমড়োর খোসা, না চিংড়ী মাছের খোসা! মহিলারা কেমন মোজা এঁটে সোজা হয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও গ্রামোফোনে গোবিন্দলালের অভিনয় চলেছে, কোথাও হারমোনিয়মের সঙ্গে নারী-কণ্ঠে—'বাঁধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে'—কি মধুর মিনতি! চড়্ চড় ক'রে লাইফ (life) বেড়ে যায়! আবার ভোর না হতেই ফেরিওয়ালারা ঘর ঘর রুটী, বিস্কুট, আণ্ডা, আণ্ডার মা, ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে; চায়ের টেবলে যেন বসন্তোৎসব লেগে যায়! সকাল হতেই 'Englishman', 'Statesman' হাজির,—স্বর্গ—স্বর্গ!"

আচার্য্য বল্‌লেন, "স্থান-মাহাত্ম্য একেই বলে, সেটা জল-হাওয়ার সঙ্গে—কেউটের বিষের মত চট

গায়ে চ'ড়ে যায়। তা না ত লোক আসবে কেন, মানুষ ত আর মূর্খ নয়, আর টাকাগুলোও খোলামকুচি নয়।"

* * * *

মাতঙ্গিনী দেবী মিছরিলালের বাংলায় গুন্ গুন্ রবে পাক দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অমন যে ভাদুড়ী মশাই—তাঁর মধ্যেও স্ফূর্তি পৌঁছে গিছলো; তিনি ড্রয়িং-রুমের সোফায় শুয়ে হঠাৎ গেয়ে উঠলেন—"আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!" নবনী একটা পাশের ঘরে, বাগানের দিকের জানালা খুলে চিঠি লিখতে বসেছিল, অকস্মাৎ চটকলের ভোঁর মত আওয়াজ পেয়ে চম্‌কে মুখ তুললে। দেখে—সাঁওতালদের এক পাল ছাগল সবংশে এসে বাগানে ঢুকেছিল—তারা ওই আওয়াজের ঘায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট মারছে! নবনীর চিঠি লেখা আর হ'ল না, সে আপনা-আপনি হেসে পেটে খিল ধরিয়ে ফেললে।

আচার্য্য এসে সংবাদ দিলেন, "দেবস্থান দেখে এলুম, এই ত—১০ মিনিটের পথ। হ্যাঁ,—দেবতা বটে, আর স্থান-মাহাত্ম্যই বা কি, গেলেই ঘন ঘন রোমাঞ্চ! পূজারী খুব যোগ্য পুরুষ—আসল তান্ত্রিক,—আমরা চোখ দেখলেই বুঝতে পারি।"

শুনে সকলে খুবই খুসী হলেন, বিশেষ ক'রে মাতঙ্গিনী দেবী। বৈকালে বেড়াতে বেড়াতে সকলে একবার দেবস্থান দর্শন ক'রে আস্‌বেন স্থির হ'ল।

মাতঙ্গিনী নবনীমাধবকে ডেকে বল্লেন, "উনি এখন সোফায় শুয়ে "Statesman" পড়ছেন, একটু পরেই নাইতে উঠবেন। তার আগে সোফার ধার ঘেঁসে সামনে দুগাছি লাক্‌লাইন কড়িকাঠে যে আংটা আছে, তাতে বেঁধে ঝুলিয়ে দে দিকি, তাই ধ'রে উঠবেন বস্‌বেন—কষ্ট হবে না। ছেলেবেলা থেকে এমন সহবৎ অভ্যাস ক'রে রেখেছেন! নন্দা অনামুখোই করিয়ে দিয়েছে।"

নবনী অতি কষ্টে হাসি চাপবার চেষ্টা ক'রে, একটু জোর দিয়ে বল্লে, "বেটা ভারী পাজি ত, এমন ক'রে লোকের অভ্যেস নষ্ট ক'রে দেয়! আর কি কি করেছে, বল ত দিদি, যত দূর পারি, সে সব সাম্‌লাবার চেষ্টা পাই।"

মাতঙ্গিনী বল্লেন, "তার আর ক'টা বোলব ভাই —চেয়ারে ব'সে নাওয়া, চেয়ারে ব'সে খাওয়া— এমন কত আছে।"

নবনী চক্ষু দুটি স্থির ক'রে বল্লে, "উঃ, বেটা বিষম শত্রু দেখছি, ও পাপ রেখেছ কেন? যাক, সে কথা পরে ভাববো, এখন আগে দড়ির জোগাড় দেখি।" এই বল্‌তে বল্‌তে নবনী বাইরে বেরিয়ে পড়েই বেদম হাসি। বলে—'ওরে বাবা, আবার Ropedance! ছেঁড়ে ত থেবড়ে এক দম চাকা! এ সব বিগ্রহকে স্থানভ্রষ্ট কর্‌লেই এরা গ্রহে দাঁড়িয়ে যায় দেখছি। কি ফ্যাঁশাদ রে বাবা, আদত 'ম্যানিলা' চাই।" বল্‌তে বল্‌তে নবনী দড়ি খুঁজতে বেরুলো।

৫

বৈকালে প্রোগ্রামমত সকলে খুব উৎসাহে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন। মাতঙ্গিনীর তাড়ায় ভাদুড়ীমশাইকেও যেতে হয়েছিল।

সেই নিবিড় শাল আর মহুয়াবনের মধ্যে দুখানি ছপ্পর;—তার বড়খানিতে পূজারী থাকেন, আর যেখানির চার কোণে ছোট ছোট লাল নিশেন গোঁজা— তারি মধ্যে দেবতা থাকেন। দেবতাকে দেখলে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও হাতযোড় করতে হয়। সম্মুখে প্রাঙ্গণ।

প্রাঙ্গণটি বেশ নিকোনো আর ছায়াশীতল, বনপুষ্প-গন্ধামোদিত। মৃদু-মধুর হাওয়াও দিচ্ছিল, পাখীও ডাকছিল, অথচ নির্জ্জন, শান্ত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। উপস্থিত হয়ে সকলেই "আহা, কি সুন্দর স্থান!" ব'লে উঠলেন। ভাদুড়ী কেবল একটা হুঁ দিলেন। তাঁর কোন কিছু উপভোগের মত অবস্থা তখন নয়।

মাতঙ্গিনী দেবী ক্রমে ভাদুড়ীমশায়ের রোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা না ক'রে পথ চল্‌তেন না। তাই একটা চাকরকে এক কুঁজো জল আর এক-খানা পাখা নিয়ে সঙ্গে আস্‌তে হুকুম করেছিলেন; আর এক জন জোয়ানের মাথায় একখানা আরাম-চেয়ারও সঙ্গে এসেছিল।

ভাদুড়ীমশাই এইটুকু আসতেই খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আগে আগে জলের কুঁজো আর ইজি-চেয়ার চলেছে দেখে চল্‌তে একটু বল পেয়েছিলেন, আর

আশ্বস্ত হয়ে ভেবেছিলেন, পৌঁছেই আধ কুঁজো টানবেন।

সত্যটা কারে পড়লে প্রকাশ পায়; সুখের দিনে তার খোঁজখবর থাকে না। নগেন্দ্রনাথ বড় অভাবে পড়েই ব'লে ফেলেছিলেন—সূর্য্যমুখী কি কেবল তাঁর স্ত্রী ছিলেন, ইত্যাদি। ভাদুড়ীমশাই আর মাতঙ্গিনীর প্রণয়ও ক্রমে পাক খেয়ে খেয়ে এক নাড়ীতে দাঁড়িয়েছিল। কোন কোন জীবকে যেমন বাঁশপাতা দেখিয়ে পশ্চাদনুসরণ করাতে হয়, তেমনি জল দেখিয়ে এই অচল বিগ্রহটিকে সচল করবার উপায়টি মাতঙ্গিনীরই জানা ছিল। ভাদুড়ীমশাই কিন্তু ঐ কুঁজোর মধ্যে পানীয় ছাড়া আরও পরম উপভোগ্য কিছু উপলব্ধি করতে করতে নিজের পায়ে এতটা দূর আস্‌তে পেরেছিলেন।

মাতঙ্গিনী যখন বল্‌লেন, "আগে দেবতাকে প্রণাম কর—জল দিচ্ছি"—ভাদুড়ীমশাই কোনও দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার করেই ইজিচেয়ারে ব'সে প'ড়ে জলের জন্যে হাত বাড়ালেন। পরে নিমেষে আধ কুঁজো খালি ক'রে—"বাতাস" ব'লেই চোখ বুজলেন।

নবনী হাসিটা হজম ক'রে বল্‌লে, "দেবতার মন্দির দক্ষিণদিকে না,—নমস্কারটা পশ্চিমদিকে হ'ল যে!"

ভাদুড়ী চোখ বুজে বল্‌লেন, "ঐ হয়েছে, তিনি নিয়ে নেবেন অখন, দেবতা আর কোন্ দিকে নেই;—বাখরগঞ্জের বালাম, বিলেত পৌঁছয় কি ক'রে হে!"

আচার্য্য সজোরে মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন, "ইয়াঃ, ভক্তের কথাই ত এই। আর আমাদের ত পশ্চিমও যা, দক্ষিণও তাই; আমি বড় বড় সাধকদের দেখেছি, পশ্চিমমুখ হয়ে পিতৃতর্পণ করতে। আর তা যদি বল, পৃথিবীটাই গোল,—শুধু কি তাই, আবার দিন-রাতই ঘুরছে! এমন জিনিষের দিগ্‌বিদিক্ আছে কি? এই দেখ না—লোক উঁচুতে হাত তুলে গুডমর্ণিং বা নমস্কার করে, কিন্তু নীচুই তার লক্ষ্য। ওগুলো বিড়ালের জাত,—তাদের যেমন দোতালার উপর থেকে উল্টে-পাল্টে, ঘুরিয়েফিরিয়ে যে ভাবেই ফেল, তার পা চারটে এসে ঠিক মাটীতে ঠেকে। কত বলবো বাবাজী, তন্ত্রে অধিকার হ'লে বুঝতে পারবে!"

মাতঙ্গিনী এতক্ষণ পূজারীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন;—পূজারী হিন্দী কইতে পারেন, মাতঙ্গিনীরও ওটা বেশ সড়গড় ছিল। তাঁরা এসে পড়ায় আচার্য্যের বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেল।

মাতঙ্গিনী দেবী পূজারী ঠাকুরকে বল্‌লেন, "কেয়া কেয়া কোরতে হবে, আর কেয়া কেয়া চাই, একবার এ দিকে আস্‌কে বাবুদের বোলকে দিন।"

পূজারী শুনিয়ে দিলেন, "দুখানা বকরা, দু'গাছা কাপড়া, দু' বোতল সরাব, আর পাঁচঠো টাকা চড়ালেই হোবে। সব আখণ্ড দেওয়া চাই। দেবতা বড় দয়াল আছে, ছিটে-ফোঁটা কি টুক্‌রা-টাকরার হাঙ্গামা নেই। আর কর্ত্তাবাবুর চাই কেবল মনমে মনমে অভীষ্টের প্রার্থনা, আউর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আর সাথ সাথ তিন পাক উল্‌টি-পাল্‌টি (গড়াগড়ি);—বস্ সিদ্ধি।"

পূজারী ও আর আর সকলে যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই অভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী হিন্দী করেই বল্‌লেন, "এইমাত্র মে হয়ে যায়গা? এর চেয়ে সহজ আর কেয়া হ'তে পারতা হায়! তোম্‌লোক সকলে কি বল গো? কথা কয়তা নেই কেনো?"

ভাদুড়ীমশাই চোখ বুজেই রইলেন।

আচার্য্যই কথা কইলেন, "আমি হেঁকে বল্‌ছি—এমন আর কোন দেবতাই নেই, যাঁর কাছে এত অল্পে এত বড় অভীষ্টলাভ হয়,—আর এত সহজেও। গেরোবাজদের এক একটা ফরমাজ শুন্‌লে রক্ত শুকিয়ে যায়; এখানে এক প্রণাম, আর তিন গড়াগড়িতেই ফতে! তুমি কি বল বাবাজি!"

নবনী কি ভাবছিল, সেই জানে, যেন চটকা ভাঙ্গার মত অবস্থায় ব'লে ফেল্‌লে—"তা ঠিক।"

কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাক্ থাক্‌লে পাছে পূজারীর উৎসাহভঙ্গ হয়, তাই মাতঙ্গিনী ভাদুড়ীমশাইকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন—"তুমি কি ঘুমিয়ে গিয়া গা?"

ভাদুড়ী চোখ না খুলেই বল্‌লেন—"ঘুমিয়ে কেন যায় গা,—তুমি ত বোলতা হায়, আমি কি ভিন্ন হায়।"

পূজারী উৎসাহের সহিত সোজা হয়ে বল্‌লেন, "বাবু বহুৎ ঠিক বাত কহা, লছমীকী পুৎ হায় কি না।" তার পরই বল্‌লেন—"আউর দেরী মত্ করো—সন্ধ্যা

হোগা, তোমাদের পাস আলো নেই—অন্তরও নেহি আছে।”

নবনী চোম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করলে—“অন্তর কেনো?”

পূজারী বল্‌লেন—“সন্ধ্যার পর কভি কভি ভালু বাহার হয়;—সাবধান থাকা ভালো আছে।”

এই কথা শুনেই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভাদুড়ী-মশায়ের চোখ খুলে গেল—“অ্যাঁ—এ কোথায় আন্‌লে,—ধরো” বলেই হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—“বেরুবার আর কত দেরী?”

পূজারী বল্‌লেন—“এখনও ঘণ্টাভর দেরী আছে, বাসায় পৌঁছতে আপনাদের কতক্ষণ লাগে জানি না ত, আর বাবুও ত স্ফূর্ত্তিতে চল্‌তে পার্‌বেন না।”

মাতঙ্গিনী শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, পূজারীকে বল্‌লেন—“বাবা, আপনি দয়া কোরকে আমাদের সঙ্গে আও, বড়ো ডর লাগছে।”

পূজারী হেসে বল্‌লেন—“কুছ ডর নেই, ও সব ত আমাদের শ্যাল-কুকুর আছে।” এই ব’লে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে এসে বল্‌লেন, “চলো।”

ভাদুড়ীমশাই খুবই ভড়কে গিছলেন; বাকী আধ কুঁজো টেনে—মত্ত হস্তীর মত চল্‌লেন। আচার্য্য সুবিধা বুঝে বল্‌লেন—“ভয় কি, আমি ‘মহানির্ব্বাণের’ বাণগুলি আবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছি,—কার সাধ্য একশো গজের মধ্যে মাথা গলায়।”

সকলে নির্ব্বাক্ চল্‌লেন। আচার্য্য দু’হাতে দু’মুঠো ধুলো নিলেন; নবনী ভাবলে—বিনা যুদ্ধে জান দেবো না, সেও একখানা পোখানেক পাথর কুড়িয়ে নিলে। মাতঙ্গিনীর একমাত্র ভরসা—বাঘই আসুক, আর ভাল্লুকই আসুক, একলা কেউই ভাদুড়ীকে চাগাতে পারবে না।

ঠিক সন্ধ্যার সময় সকলে বাসায় পৌঁছে হাঁপ ছাড়্‌লেন। আচার্য্য ধূলোপড়ার শক্তি সম্বন্ধে মালসাঁট আরম্ভ কর্‌লেন,—এই ধূলোপড়ার জোরে আসামের জঙ্গল থেকে নবাবদের কত হাতী ধ’রে দিয়েছেন, ইত্যাদি। ভাদুড়ী সটান্ সোফা নিলেন। বারান্দায় ব’সে সান্ধ্যশোভা উপভোগ কর্‌তে কারুর আর সাহস হ’ল না;—দেউড়ী বন্ধ হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চঞ্চলা শ্রী

ওগো চঞ্চলা শ্রী—
বিশ্বমরুর মায়া-মরীচিকা মৃগ-মনোহরণী।
অনেক আয়াসে তোমা বাহুপাশে ধরিতে চেয়েছি আমি;
গিরি-মরু-বনে শুধু একমনে ঘুরিয়াছি দিবা-যামী।
বলাকা-মালায় গগনের গায় দেখা দিয়ে গেছ উড়ে,
শরতের নদী—মেঘের তরণী বেয়ে চ’লে গেছ দূরে।
আঁখি পালটিতে, ইন্দ্রধনুতে জাগিয়াই লীয়মান,
খদ্যোতকুলে দেখা দিয়ে ভুলে পাইয়াছ নির্ব্বাণ।
শিরীষ-বোঁটায় অলিপদ হায় যদি বা সহিতে পারো,
ময়ূরের পাখার অতি সুকুমার পরশ সহিতে নারো।
কাঞ্চী-শাখায়, শিশির-মালায়, বুদ্‌বুদ-উদ্‌গমে,
চপলা-ছটায়, সন্ধ্যাঘটায় রক্তিম বিভ্রমে,
বিধু-পরিবেশে, ছায়াপথে হেসে, মুগ্ধ মানস হরো,
নভোনীল পথে উল্কার রথে কত আসা-যাওয়া করো।
সব হ’তে মোরে মায়া-মোহঘোরে নব নব প্রলোভনে,
ঘুরাতেছ হায় মৃগতৃষ্ণায় রমণীর যৌবনে।
ওগো চঞ্চলা শ্রী—
সংসার-বনে হেম-মায়ামৃগী মোহিছ সঞ্চরি’।

শ্রীকালিদাস রায়।

মুদ্রার স্বরূপ

অর্থ লইয়া মানুষের চিন্তা যত অধিক হয়, বোধ হয়, আর কোন বিষয়েই তত হয় না। এই অর্থের জন্যই মানুষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, এমন কি, অভাবে পড়িলে অর্থের জন্য আপনার স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে মানবসমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অর্থ না হইলে উদরান্নের সংস্থান করাই অসম্ভব। অগত্যা লোক অর্থ সংগ্রহের জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে। মুদ্রা এই অর্থের প্রধান নিদর্শন। যাহার টাকা-পয়সা আছে, সেই সভ্য সমাজে ধনবান্। সে সেই টাকার বিনিময়ে অনেক প্রকার সুখের এবং সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। সেই হেতু মানুষ টাকার জন্য ভাল মন্দ সকল কাযই করে। যাহারা টাকার জন্য ভাল কায করে, মন্দ কার্য্য করে না, লোক তাহাদিগকে প্রশংসা এবং যাহারা মন্দ কায করে, লোক তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও অনেক লোক টাকার জন্য মন্দ কায করিতে কুণ্ঠিত হয় না। টাকার এমনই মোহিনী শক্তি যে, লোক উহার জন্য চুরি-ডাকাতী, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, শিশুহত্যা, মিথ্যা, বঞ্চনা, নির্ম্মমভাবে বর-পণ বা কন্যা-পণ আদায় প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিতে প্রলুব্ধ হয়। এক কথায় টাকার জন্য সংসারে অধিকাংশ কুকর্ম্ম ও পাপাচরণ ঘটে। পক্ষান্তরে, টাকা মানুষের কর্ম্মশক্তির প্রবর্ত্তক বা প্রবৃত্তিদায়ক। টাকার জন্যই বা টাকার লোভেই যে মানুষ সকল কায করে এবং করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই, টাকার বা মুদ্রার স্বরূপ কি? ইহার দ্বারা মানুষের কিরূপ প্রয়োজন সাধিত হয়? আমাদের দেশের লোক এই কথাগুলি স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখেন না। এই জিনিষটার সহিত আমাদের যতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকুক না কেন, ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও সংজ্ঞা না বুঝিলে এ সম্বন্ধে কোন জটিল তত্ত্ব বুঝা সম্ভব হইবে না। অবশ্য আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেশে সরকারের টাকশালে রৌপ্যনির্ম্মিত, সরকারের ছাপযুক্ত, চক্রাকার, ১ ভরি ওজনের যে বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাই টাকা। বাজারে যে সকল জিনিষের বিকিকিনি হয়, টাকার বিনিময়ে তাহাই পাওয়া যায়। পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের অথবা উপকারের বা সেবার বিনিময়ে অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে টাকা পাওয়া যায়, অন্যথা উহা পাওয়া যায় না। টাকা বা মুদ্রা সম্বন্ধে এই কথাগুলি সকলেই জানেন। কিন্তু এইটুকু জানিলেই টাকার স্বরূপ বুঝা যায় না। উহা বুঝিতে হইলে আরও একটু সূক্ষ্মভাবে ঐ বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পর অর্থ সম্বন্ধে লোকের ধারণা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ফলে সমস্যাটি বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। টাকার ক্রয়শক্তির অনেক ওলট-পালট ঘটিয়াছে। আমার বাক্সে ১ শত টাকা আছে, কিন্তু সেই টাকার বিনিময়ে আমি আজ যে জিনিষ কিনিতে পারি, কা'ল তাহা কিনিতে পারিব কি না, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ আমি ১০ টাকার বিনিময়ে ৪ জোড়া কাপড় কিনিতে পাইতেছি, কা'ল তাহা পাইব কি না, তাহা বলিতে পারি না। হয় ত বা ১ সপ্তাহ পরে আমাকে ১৫ টাকা দিয়া ঐরূপ ৪ জোড়া কাপড় কিনিতে হইবে। আজ আমি ৫ টাকা দিয়া ১ মণ গুড় কিনিতে পাইতেছি, পরশ্ব আমি ১০ টাকা দিয়া ১ মণ গুড় কিনিতে পারিব কি না, জানি না। আজ আমি ১ টাকা দিয়া ৮ সের চাউল খরিদ করিতে পারি, কিন্তু আগামী সপ্তাহে আমি ঐ টাকাটি দিয়া ৫ সের চাউল পাইব কি না সন্দেহ। টাকার ক্রয়-শক্তির এরূপ দ্রুত বিপর্যয়, এমন ঘন ঘন পরিবর্ত্তন কেন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। দেশে পণ্য বা খরিদ করিবার জিনিষ পূর্ব্ববৎই আছে, টাকাও ঠিক আছে, অথচ টাকার বদলে জিনিষ পাইতে বিষম গোল ঘটিতেছে। ফাটকাবাজীর বাজারের মত জিনিষের দর অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ বিদেশ হইতে বিদেশী মুদ্রার মূল্য দিয়া যে সকল পণ্য খরিদ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মূল্যের অতি দ্রুত এবং প্রবল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিদেশী মুদ্রার সহিত আমাদের টাকার বিনিময়ের হার সকালে যেরূপ থাকিতেছে, বৈকালে সেরূপ থাকিতেছে না। ফলে বাণিজ্যের বাজারে টাকার টান কখনও নরম, কখনও বা গরম হইয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। টাকার মূল্য অর্থাৎ ক্রয়শক্তি ঠিক রাখিবার জন্য সরকার বিশেষজ্ঞ লোক দ্বারা কমিশন বসাইলেন, কমিশন অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, অনেক চিন্তা ও গবেষণা করিয়া, একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন, সরকারও অনেকটা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কায করিতে থাকিলেন,—কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সে সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, তাহা কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই বুঝা গেল। সার ম্যালকম হেলী রাজস্ব-সচিবের আসনে আসীন থাকিয়া কত খেলাই খেলিলেন, তাহাতে ফল বিপরীতই হইল। সার বেসিল ব্লাকেটের মত ১ জন যুনা বার্ত্তাশাস্ত্র-বিশারদ রাজস্ব-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হইতেছে না। অথচ যে যে কারণে সাধারণতঃ মূল্যের বা মুদ্রার ক্রয়-শক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় বলিয়া জানা ছিল, সে কারণগুলি যে অতি প্রবলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নহে। তাহা হইলে পরিবর্ত্তন এত দ্রুত ও আকস্মিক হইত না। কারণ, কারণের পরি-বর্ত্তন ঘটিতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। সাধারণ লোক এই ব্যাপারে অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়াছে। এখনও তাহার জের মিটে নাই। কিন্তু আসল ব্যাপারখানা কি, তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি, বিলাতের, য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের এবং মার্কিণের বড় বড় মেধাবী ও প্রতিভাশালী অর্থনীতি-বিশারদও এই ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য বিশেষভাবে মস্তিষ্ক-সঞ্চালন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং মুদ্রার ব্যাপারটা উপর উপর বুঝাটা যত সহজ, সূক্ষ্মভাবে বুঝাটা তত সহজ নহে। উহা অত্যন্ত জটিল। সেই জন্য মুদ্রার স্বরূপ কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মুদ্রার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইলে মুদ্রার প্রয়োজন কি, কি ভাবে জনসমাজে মুদ্রার প্রচলন হইল, ইহাতে কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই হেতু মুদ্রার ইতিহাস-কথা আমরা প্রথমেই আলোচনা করিব।

মানুষের যখন আদিম অবস্থা, যখন সভ্যতার উন্মেষ হয় নাই, তখন মানুষের মুদ্রার কোন প্রয়োজনই অনুভূত হইত না। তখন মানুষ তৃণাচ্ছাদিত জঙ্গল-ভূমিতে ও পর্ব্বতে বাস করিত। মনুষ্য-জীবন পশু-জীবনের মতই ছিল। তাহারা পশু হনন ও জঙ্গল-বন-জাত ফল-মূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। সুতরাং পশুর যেমন টাকা-পয়সার কোন প্রয়োজনই হয় না, মানুষেরও সেইরূপ টাকা-পয়সার কোন আবশ্যকতা ছিল না। তাহার পর, যখন সেই বন্য মানুষ সভ্যতার অতি ক্ষীণ আলোক পাইয়া এক স্থানে বসবাস করিতে থাকিল, বাসস্থানের সান্নিধ্যে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহার

ফল ভোগ করিতে শিখিল, তখনও সমাজ গঠিত হয় নাই। তখনও মানুষ সপরিবারে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। তখন মানুষের অবস্থা বানর বা গরিলার অবস্থার অনুরূপ ছিল। তাহার পর সেই বন্য-মানব সভ্যতার পথে আর একটু অগ্রসর হইলে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইল এবং কৃষি-কৌশল উদ্ভাবিত করিল। এই সংহতিই সমাজ-সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা। এই অবস্থাতে মানুষ পশু হনন করিলেও কৃষিকার্য্য করিত এবং কৃষিজ দ্রব্য খাইয়া জীবনধারণ করিত। যাহার যাহা উৎপন্ন হইত, সে তাহাই খাইত। তখনও বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না। তাহার পর মনুষ্য-সমাজ সভ্যতার পথে আরও একটু অধিক অগ্রসর হইলে সেই সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের বহু দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। কৃষি-ব্যাপারে নানা জন নানা প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করিতে থাকিল। কেহ কেহ সামান্য রকমের প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে থাকিল। এই সময়ে সমাজে পরস্পরের মধ্যে উৎপন্ন বা আহৃত দ্রব্যের বিনিময় হইতে লাগিল। যাহার কয়েক খণ্ড অতিরিক্ত মৃগ-চর্ম্ম আছে, যব বা গম নাই, কিন্তু উহার প্রয়োজন আছে, সে যাহার মৃগ-চর্ম্মের প্রয়োজন এবং অতিরিক্ত যব বা গম আছে, এমন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মৃগ-চর্ম্মের বিনিময়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ গম বা যব লইত। তখন এইরূপ জিনিষের সহিত জিনিষই বদল করা হইত। কিন্তু ইহাতে লোকের ঘোর অসুবিধা ঘটিত। মনে করুন, গোপীনাথপুরনিবাসী রামের ছোলা অধিক আছে। গোলোকপুরের রহিমের ধান যথেষ্ট আছে। রামের ধানের প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় রামকে নানা স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া রহিমকে বাহির করিতে হইবে। তাহার পর রহিম যদি বলিত যে, সে ধানের বদলে ছোলা লইবে না, তাহার মুগের প্রয়োজন, সুতরাং সে মুগ লইয়া ধান দিতে পারে। এরূপ স্থলে রামকে বাধ্য হইয়া যে ধানের বদলে ছোলা চাহে, এমন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। ইহাতে লোকের দারুণ কষ্ট এবং অসুবিধা ঘটিত। প্রয়োজনের সময় লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইত না। এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া ক্রমে লোক এক কৌশল উদ্ভাবিত করিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রামের লোক তাহাদের গ্রামগুলির কেন্দ্রস্থলে সুবিধামত স্থানে, আপন আপন বদল দিবার মত জিনিষ বা পণ্য লইয়া উপস্থিত হইবে এবং সেইখানেই একত্র হইয়া তাহারা জিনিষের সহিত জিনিষ বিনিময় করিবে। যে স্থানে বিস্তৃত-শাখ বৃক্ষতলে তাহারা পরস্পরের সহিত জিনিষের বিনিময় করিত, সেই স্থানকে হাট বা গঞ্জ বলা হইত। এই প্রকারে হাটের উৎপত্তি হয়। তখন হাট-বার সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় দিন বলিয়া গণ্য হইত। ফলে এই প্রকারে হাটের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়ের বীজ উপ্ত হয়। বিনিময়ই সেই ব্যবসায়ের বীজ বা বনিয়াদ।

কিন্তু লোক তখনও দেখিল যে, প্রয়োজনীয় পণ্যের সহিত প্রয়োজনীয় পণ্যের বিনিময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে। গোবিন্দ ১ জোড়া গোরু কিনিতে চাহে। তাহার মূল্য পাঁচমণ ধান। তাহাকে গোরু কিনিতে হইলে হাটে পাঁচ মণ ধান বহিয়া আনিতে হইবে। তাহার পর সে হাটে আসিয়া দেখিল যে, যে দুই এক জন গোরু বেচিতে আসিয়াছে, তাহারা ধান চাহে না, তাহারা চাহে ভেড়া। অগত্যা গোবিন্দ মেষ-বিক্রেতার নিকট গমন করিল। মেষ-বিক্রেতার যদি ধানের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে এইখানেই হাঙ্গামা চুকিল। আবার সে যদি বলে যে, আমার কাপড়ের দরকার, তাহা হইলে আবার খোঁজ পড়িয়া গেল যে, কে ধান বা মেষের বদলে কাপড় দিতে চাহে। ইহাতেও লোকের বড় অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তখন লোক বিনিময়-সাধনের জন্য একটা সুবিধা-জনক পণ্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিনিময় কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিল। কোন দেশে সৈন্ধব লবণ, কোন দেশে ধান্য, কোন দেশে গম বিনিময়-সাধনের মধ্যবর্ত্তী পণ্যরূপে গৃহীত হইল। সভ্যতার উষা-প্রকাশকালে সমুদ্রতীর-সন্নিহিত স্থানের অধিবাসীরা কড়ি ভূষণ-স্বরূপ ব্যবহার করিত। সেই জন্য সেই অঞ্চলের সকলেরই কড়ির প্রয়োজন হইত। লোক ধান-চাউল দিয়া কড়ি কিনিত। সেই জন্য বহু দেশে কড়িই প্রথমে মুদ্রারূপে চলিতে থাকে। তখন সকলেরই ঘর সাজাইবার জন্য কড়ির দরকার পড়িত। দূর সমুদ্র-কূল হইতে কড়ি কুড়াইয়া উহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। সুতরাং কড়ির একটা মূল্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। উহা যখন প্রধান পণ্য হইয়া দাঁড়ায়, যখন সকলেই উহার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করে, তখন কড়িই মধ্যবর্ত্তী পণ্যরূপে অন্য দুইটি বিভিন্ন পণ্যের বিনিময় সাধিত করিতে থাকে। মনে করুন, গোবিন্দ গোরু কিনিতে চাহে। সে হাটে ২ মণ চাউল বিক্রয় করিয়া দুই কার্ষাপণ কপর্দ্দক পাইল। পর হাটের দিন সে আবার হাটে যাইয়া পুনরায় ২ মণ ধানের বিনিময়ে ২ কার্ষাপণ কড়ি পাইল। তখন সে ৪ কাহন কড়ি দিয়া এক জোড়া বলদ কিনিল। যে বলদ বেচিতে আসিয়াছিল, তাহার যদি মেষের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে সে সেই কড়ি দিয়া তাহার আবশ্যক মেষ কিনিল। সুতরাং এই ব্যবস্থাই অধিকতর সুবিধা বোধে লোক উহাই বিনিময়-সাধক দ্রব্য বলিয়া মানিয়া লয়। আমাদের দেশে প্রাচীন দ্রাবিড়ী জাতিরাই প্রথমে কড়ির চলন করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই কড়িই এ দেশের মুদ্রার বনিয়াদ।

ইহার পর লোক যখন সভ্যতার পথে আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া ধাতুদ্রব্য আবিষ্কৃত করিল, তখন ধাতুই বিনিময়-সাধনের মধ্যবর্ত্তী পণ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিল। আমাদের এই ভারতবর্ষে আর্য্যগণ নিষ্ক নামক স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করেন। প্রথম অবস্থায় এই নিষ্ক কিরূপ ছিল, তাহা বলা বড় কঠিন। অধ্যাপক আর্ণেষ্ট মাইল্ বলেন, এসিয়াবাসীরা প্রথম অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য অঙ্গুরীয়াকারে প্রস্তুত করিয়া তাহাই মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতেন। "সাষ্টং শতং সুবর্ণানাং নিষ্কমাহুর্বনং তথা।" এই শ্লোকাংশ হইতে মনে হয় যে, ১ শত ৮ পল পরিমিত স্বর্ণই নিষ্ক নামে অভিহিত হইত। "হরিকেশ কেনাত কণ্ঠে নিষ্কগ্রীবার্পিকম্" এই উক্তি হইতে

সার বেসিল ব্লাকেট

উহা কণ্ঠ-ভূষণ বা হার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই দিক দ্বারাই প্রাচীন হিন্দুদিগের ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য সাধিত হইত। ইহাই ভারতের প্রাচীন মুদ্রা। মিশরের পল্লী-অঞ্চলে তাম্রই মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল। লোক তাম্রের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সাধিত করিত। ব্যাবিলোনীয়াতেও ধাতু-মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম নোট চলিত হয়। সে নোট ধাতুরই প্রতিভূস্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় একটু গোল বাধিতে আরম্ভ হইল। যে পণ্যকে মধ্যস্থরূপে ব্যবহার করিয়া দ্রব্যাদির বেচাকেনা হইতে থাকিল, তাহার সকল পণ্যের মূল্য সমান নহে। মনে করুন, সুবর্ণকে মধ্যস্থ করিয়া জিনিষের বেচাকেনা হইতেছে। কিন্তু সকল সুবর্ণের মূল্য ত সমান নহে। কোন সুবর্ণে খাদ অধিক, কোন সুবর্ণে খাদ অল্প, আবার কোন সুবর্ণে খাদ নাই। কাযেই কাহার পরিবর্ত্তে কিরূপ পণ্য দেওয়া হইবে, ঐ সুবর্ণ বাচাই না করিলে তাহা বুঝা যাইত না। এই জন্য ইহাতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা অনুভূত হইতে থাকিল। তামা, রূপা, লোহা, এমন কি, ধান, চাউল, লবণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ গোল ঘটিতে আরম্ভ করিল। এই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সকলে স্থির করিলেন যে, রাজা এক নির্দ্দিষ্ট গুণ ও পরিমাণবিশিষ্ট ধাতুকে আপনার নামাঙ্কিত করিয়া তাহাই মুদ্রারূপে প্রচলিত করিবেন। উহাতে রাজার নাম ও চিহ্ন মুদ্রিত থাকিবে বলিয়া উহা মুদ্রা নামে অভিহিত হইবে। য়ুরোপীয়রা মুদ্রার যে ইতিহাস সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য খণ্ডে এসিয়াস্থিত গ্রীসেই প্রথমে মৌদ্রিক ধাতুর বিশুদ্ধতা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রথম মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। লিডিয়ার রাজগণ প্রথমে কোসিয়া নামক স্থানে প্রথমে সুবর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করেন। এই লিডিয়া এসিয়া-মাইনরে অবস্থিত। ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক আর্গসের রাজা ফেইডন (Pheidon) এজিনা নামক স্থানে প্রথমে রজত-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ফ্রান্সের লেনর্মাণ্ট বলেন যে, "খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকগণ কর্তৃক অধ্যুষিত এমন কোন রাজ্য ছিল না, যেখানে তাহাদের নিজ মুদ্রা প্রচলিত ছিল না।" খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬৩ খৃষ্টাব্দে রোমকরা রজত-মুদ্রা এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৭ অব্দে উহারা সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। তথা হইতে য়ুরোপের সকল দেশেই ক্রমশঃ মুদ্রার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়।

এখন বুঝা গেল যে, পণ্যের সহিতই প্রকৃতপক্ষে কেবল পণ্যের বিনিময় হইয়া থাকে। কেবল আদান-প্রদানের সৌকর্য্যার্থ একটা নির্দ্দিষ্ট পণ্যকে সকল পণ্যের বিনিময়-সাধক বা মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। সেই বিনিময়-সাধক বা মধ্যবর্ত্তী পণ্যের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক।

(১) উহা সকলেরই প্রয়োজনসাধক বা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়া চাই।

(২) উহার মূল্য অধিক এবং লইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া আবশ্যক।

(৩) উহার মূল্য স্থির বা অটল থাকা আবশ্যক।

(৪) উহার স্থায়িত্ব অধিক অর্থাৎ উহা দীর্ঘকাল সঞ্চিত রাখিবার উপযুক্ত হওয়া চাই।

অনেক পণ্যই মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। চাউল, গম, ভুট্টা, মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য মানুষের খুবই প্রয়োজন-সাধক। এমন কি, উহা না হইলে মানুষের চলে না। কিন্তু তাহা হইলেও উহা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ, উহার আর তিনটি গুণের কোন গুণই নাই। বাজারে ৫ টাকার জিনিষ কিনিতে হইলে লোকের পক্ষে ১ মণ চাউল বা গম বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ৫টি কি ৬টি টাকা ট্যাঁকে করিয়া লইয়া যাওয়া অনেক সুবিধাজনক। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির থাকে না। অজন্মার বৎসর ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পায়, হয় ত বা অমিল হইতে পারে। সেই জন্য উহাকে বিনিময়-সাধক পণ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতেও পারে না। তাহা ভিন্ন উহার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। সকল ধান, সকল যব, সকল গম সমান দরে বিকাইতে পারে না। উহার মধ্যে ভালমন্দ ভেদ আছে। ইহা ভিন্ন উহা দীর্ঘকাল সঞ্চিত রাখা যায় না,—উহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য উহা মুদ্রারূপে গৃহীত হইবার অযোগ্য। তাহা হইলেও উহার উপস্থিত প্রয়োজনসাধকত্ব আছে বলিয়া উহা এখনও অনেক পল্লীগ্রামে সামান্ত সামান্ত বিকিকিনির কার্য্যে "মধ্যবর্ত্তী পণ্য" বলিয়া গৃহীত হয়। লোক চাউল দিয়া মাছ, তরকারী প্রভৃতি খরিদ করে। অনেক দেশে তামাক, গৃহপালিত পশু, মাংসের টিন এখনও সামান্ত সামান্ত খরিদ-বিক্রয়ের ব্যাপারে বিনিময়-সাধকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিলাতের ষ্টাফোর্ডশায়ারের কয়লার খনির মজুরদিগকে মজুরীর কিয়দংশ মুদ্রায় না দিয়া বিয়ার নামক মদ্য দেওয়া হইত। সেই জন্য উহাকে অনেক ঐতিহাসিক চলিত মুদ্রা (currency) বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হীরা, জহরৎ, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতির মূল্য অধিক, তবে উহা মুদ্রারূপে চলিত হয় নাই কেন? উহার মূল্য এত অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে উহা বিকিকিনির কার্য্যসাধক বা মধ্যবর্ত্তী পণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উহার মূল্যও নির্ণয় করা কঠিন। উহা মূল্যের পরিমাপক হইতে পারে না। অন্যান্য গুণগুলির আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ।

মুদ্রার ইতিহাস আলোচনা করিয়া বুঝা গেল যে, মুদ্রাও একটা পণ্য, যে দেশে যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সাধনের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছে, সেই দেশেই সেই পণ্য মুদ্রারূপে গৃহীত হইয়াছে। ধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পণ্য, উহাতে উল্লিখিত চারিটি লক্ষণই বিদ্যমান। সেই জন্যই উহা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে মুদ্রার এক দিকে রাজার চিহ্ন মুদ্রিত থাকিত, কিন্তু দুষ্ট লোকরা উহার অপর দিক ঘষিয়া উহা হইতে কিছু সোনা ও রূপা বাহির করিয়া লইত বলিয়া পরে উহার দুই দিকেই রাজ-চিহ্ন মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রার সংজ্ঞা নির্দ্দেশে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, উহা বিকিকিনির সুবিধাসাধক রাজ-চিহ্নাঙ্কিত মধ্যবর্ত্তী পণ্যবিশেষ। আজকাল এক শ্রেণীর অর্থনীতি-বিশারদ এই সংজ্ঞাটি বদলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কথা পরে আলোচ্য।

এখন মুদ্রার স্বরূপ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা যাইতে পারে;—

(১) মুদ্রা বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী বস্তু বা পণ্য। (medium of Exchange).

(২) উহা মূল্যের পরিমাণ-নির্দ্দেশক (measure of value).

(৩) উহা মূল্য নির্দ্ধারণের মান (standard of value).

(৪) উহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের উপায় (store of value).

মোটামুটি মুদ্রার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই কয়টি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
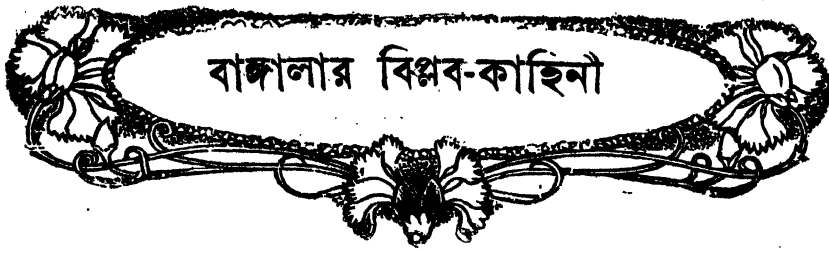
প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈপ্লবিক ডাকাতীর প্রথম চেষ্টা।

প্রথম স্বদেশী ডাকাতীর চেষ্টা হয়েছিল রংপুরে। অন্য স্থানে ডাকাতী কর্‌বার মতলব, এর আগেও আঁটা হয়েছিল ; কিন্তু তা সে যাবৎ চেষ্টায় পরিণত হয়নি। রাওলাট কমিশন রিপোর্টেও এইটেকেই স্বদেশী ডাকাতীর প্রথম চেষ্টা ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে।

বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের সুরুতে আর্থিক সমস্যা সমাধান জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল, তার মধ্যে ডাকাতীই ছিল প্রধান। বিপ্লবচেষ্টার অন্যান্য ব্যাপারের মত এটাও বঙ্কিম বাবুর নভেল থেকে নেওয়া হয়েছিল। আর একটা বড় সমর্থন এই ছিল যে, রাসিয়ার বিপ্লববাদীরাও না কি ডাকাতী করত, কাযেই এ দেশে ডাকাতী করা উচিত কি অনুচিত, অথবা কি রকম ডাকাতী করা উচিত, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা আমাদের মনে ত আসেইনি, নেতাদের মনেও এসেছিল ব'লে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ, নেতাদের মধ্যে ডাকাতীর বিরুদ্ধে একটুও প্রতিবাদ কর্‌তে কাউকে কখনও শুনিনি।

রাসিয়ার বিপ্লববাদীদের ডাকাতীতে কোন বিশেষত্ব ছিল কি না, অর্থাৎ তারা "বিধবার ঘটী চুরি" কর্‌ত কি না, সে খোঁজ কারুরই ছিল না। আর বঙ্কিম বাবুর নভেলি ডাকাতুর যে একটু বিশেষত্ব (মহত্ব ?) ছিল, তা আমরাও জানতুম, নেতারাও জানতেন। তাতে দেশের মধ্যে যে অর্থশালী ব্যক্তি খয়েরখাই বা মুখবীরের (informerএর) কায করত, অথবা যে সাধারণের অপ্রিয়, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, সুদখোর,— তাদেরই অর্থ ডাকাতী ক'রে শিষ্ট, দরিদ্র, দুঃস্থ, অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য কর্‌বার ব্যবস্থা ছিল। গুপ্ত সমিতির সুরুতে আমাদেরও এই ধারণা ছিল যে, সরকারী কোন অফিসের, রেলওয়ে কোম্পানীর, বিদেশী বণিকের টাকাই ডাকাতী কর্‌তে হবে। এখন সরকারী কোন অফিসের টাকা যে দেশের লোকেরই টাকা, অর্থাৎ তা যে দেশেরই আয়-ব্যয়ের তহবিলের টাকা, আর তা'র ক্ষতি-বৃদ্ধির জন্য যে দেশের লোকেই দায়ী, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। টাকা নোটজালের কল্পনাও অনেকের মাথায় এসেছিল, কিন্তু তা কাযে পরিণত হয়েছিল ব'লে শুনিনি।

যাই হোক্, এ যাবৎ চাঁদা, দান আদির দ্বারাই গুপ্ত সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ চল্‌ছিল। এখন তাতে আর চলে না দেখে, বিশেষতঃ হঠাৎ টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ায়, অন্য উপায় অভাবে ক-বাবু ডাকাতীর হুকুম দিলেন। ডাকাতী যে তথাকথিত actionএর একটা অঙ্গ, তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু কা'দের টাকা ডাকাতী কর্‌তে হবে, তা'র কোন বিধি-ব্যবস্থা ক-বাবু দেননি।

কার টাকা ডাকাতী করা যেতে পারে, এই সমস্যা মীমাংসার জন্য রংপুরের নেতাদের সঙ্গে কয়েক দিন ধ'রে পরামর্শ চল্‌তে লাগল, সে সময় পাটের মহাজনরা দাদন দেওয়ার জন্য তোড়া তোড়া টাকা নিয়ে আনাগোনা কচ্ছিল। তাদের ওপরেই নজরটা গিয়ে পড়ল প্রথমে। কিন্তু দেখতে তারা ছিল ভারী 'তাকড়া'। তা'র পর রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস আর স্থানীয় অনেক বড়-লোকের কথা উঠেছিল। কোথাও কিন্তু বড় সুবিধা হ'ল না, অর্থাৎ নিরাপদ বা অহিংস ডাকাতীর সুযোগ খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে এক জন সন্ধান দিলেন, রংপুর সহর থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে, তাঁর বাড়ীর নিকট গাঁয়ে এক বিধবার না কি হাজার-খানেক নগদ টাকা আছে। তার বাড়ীর আশে-পাশে

এমন পুরুষমানুষ না কি কেউ ছিল না যে, ডাকাতদের একটুও বাধা দিতে অর্থাৎ হিংসা করতে পারে। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই বিধবার বাড়ীতেই স্বদেশী ডাকাতীর বউনি করা স্থির হ'ল।

স্যাকো এই রকমের নিরাপদ বা আজকালকার ভাষায় অহিংস স্বদেশী ডাকাতীর নামকরণ করেছিল "বিধবার ঘটী চুরি।"

সেই ঘটী চুরির জন্য আয়োজন হ'তে লাগল। জামিয়া, কুর্ত্তা আদি তয়ের করতে দেওয়া হ'ল কিন্তু স্থানীয় এক দর্জ্জিকে। যুক্তি স্থির হ'ল যে, বিধবার সন্ধান দিয়েছিলেন সেই যে সন্ধানী, তিনি সত্যিকার এক জন ডাকাতকে, সাহায্য করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের স্বদেশী বাবু ডাকাতদের হাতে খড়ি দেওয়াবার জন্য যথাসময় পাঠিয়ে দেবেন। রংপুর থেকে রাত ৯টার সময় দু'দলে পরে পরে বেরিয়ে গিয়ে ঐ বিধবার বাড়ীর একটু দূরে, একটা নির্দ্দিষ্ট গাছতলায় তারা উক্ত ডাকাতের সঙ্গে জুটে রাত ১২টার সময় বিধবার ঘরচড়াও করবে। স্থানীয় ৮।৯ জন যুবককে এই কাযের জন্য মনোনীত করা হ'ল।

এই ঘটনার ৪ বছর পূর্ব্বে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার সময় স্যাকো যদিও শপথ ক'রে বলেছিল যে, দেশের জন্য অসঙ্কোচে সব করবে, তথাপি এ হেন ডাকাতী অর্থাৎ বিধবার ঘটী চুরি করতে তার দ্বিধা বোধ হ'তে লাগল। যখন সে বুঝতে পেরেছিল, তাকেও ডাকাতীতে যোগ দিতে হবে, তখন প্রথমেই তার মনে এই দুর্ভাবনা এসেছিল যে, ধরা যদি পড়ে, তবে আদালতে দাঁড়িয়ে, কেন ডাকাতী করতে গেছল, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কি উত্তর সে দেবে? জবাবই যদি দিতে হয়, তবে কি তাকে বলতে হবে যে, দেশের কাযের জন্য টাকার দরকার, তাই সে ডাকাতী করেছে? তাতে ক'রে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সমিতিকে betray করা হবে। আর জবাব না দেয় যদি, তবে আদালত যা-ই মনে করুক না কেন, দেশের লোক কি মনে করবে? সামান্য হ'লেও তার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল; তার অনেক সম্রান্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবও ত ছিলেন। তাদের মুখে কালি দিয়ে সামান্য টাকার জন্য এমন নীচ ঘৃণিত কায করতে গেছল কেন? তার ছেলেপিলেরাই বা সমাজে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে?

তার পর এও তার মনে হয়েছিল যে, যদি সে ধ'রেই নেয় যে, লোকে অনুমান ক'রে নিতে পারবে, দেশের কাযের জন্যই সে বিধবার ঘটী চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল; তা হ'লে কিন্তু তার উচিত ছিল আগে নিজের স্ত্রীপুত্র, পরিজনকে পথে দাঁড় করিয়ে নিজের সর্ব্বস্ব দেশের কাযে দেওয়া; পরে আত্মীয়-বন্ধুদের সর্ব্বস্ব, তার পরও দরকার হ'লে, বঙ্কিম বাবুর নভেলি ডাকাতীর অনুযায়ী অন্যায়কারীদের ডাকাতী করা। তা না ক'রে নিঃসহায় বিধবার সম্বল চুরি করতে গেল কেন, তার জবাব কি দেবে?

তার মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছিল এই যে, দেশের লোকের সম্পত্তি ডাকাতী করা আদৌ উচিত কি না? সে কেবল জানত, বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ স্বাধীন করা; সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চাই শক্তি; সেই শক্তির ভিত্তি হচ্ছে লোকমতের সহানুভূতির ওপর স্থাপিত। নিরপরাধ দেশবাসীর উপর এমন ডাকাতী অর্থাৎ বিধবার ঘটী চুরিরূপ অমানুষিক দুষ্কর্ম্ম ক'রে বিপ্লববাদীরা লোকমতের পূর্ণ সহানুভূতি কখনও পেতে ত পারে না; অধিকন্তু অতিমাত্রায় কূটনীতিপরায়ণ প্রতিপক্ষ, বিপ্লববাদের প্রতি লোকমতকে বিরূপ করবার এমন একটা মহান্ সুযোগ কখনও ছেড়ে দিতে পারে না। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের জনসাধারণেরই কেবল মঙ্গল-সাধন করাই যে বিপ্লববাদীদের মূলমন্ত্র বা একমাত্র ব্রত ব'লে প্রচার করা হয়, তারাই যদি সুরুতেই বেচারা দেশবাসীর উপর এমন অত্যাচার অক্লেশে ক'রে সেই মঙ্গল-সাধনের এই রকম প্রথম নমুনা দেখায়, তা হ'লে হাজার দার্শনিক ব্যাখ্যা-সমন্বিত ওজর সত্ত্বেও কখনও সাধারণ লোক এ হেন বিপ্লব অন্তরের সহিত কামনা করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—তার মনে হ'ল, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, যেন তেন ক'রে দেশটা একবার স্বাধীন ক'রে নিয়ে, তখন বিপ্লবে যারা অত্যাচারগ্রস্ত হবে, সুদসমেত [illegible] ক্ষতিপূরণ ক'রে দিলেই চলবে। কিন্তু কোন [illegible]

যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য পরিমিত মাত্রায় আফিম খেতে সুরু ক'রে রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের পর ঐ রোগ হ'তে অধিক অনিষ্টকর আফিমের নেশা রোগী যেমন ছাড়তে পারে না, আর সেই নেশার মাত্রা যেমন ক্রমে বেড়ে গিয়ে তার মনুষ্যত্ব নাশ ক'রে ফেলে, এই ডাকাতীও যে দেশের লোকের পক্ষে সে রকম হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? বিশেষ ক'রে বাঙ্গালাদেশের পক্ষে। কারণ, প্রায় ৬০।৭০ বছর আগে পর্য্যন্তও এই বাঙ্গালা-দেশে ডাকাতী বড় একটা ঘৃণিত কর্ম্ম ব'লে বিবেচিত হ'ত না; বরং খুব বাহাদুরীর কায ব'লেই অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও মনে করতেন। এই "স্বদেশী ডাকাতীর" নাম ক'রে যে ভদ্রলোকের ছেলেরা আবার ডাকাতীর নেশায় অভ্যস্ত হবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

স্যাঙ্কো তখন যা আশঙ্কা করেছিল, পরে কাযেও তা ঘটেছিল। স্বদেশী ডাকাতীর নামে বিস্তর মামুলী ডাকাতী লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলেদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর খাঁটি বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে সকল ডাকাতী হয়েছিল, তারও অধিকাংশ টাকার অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে অপব্যবহার হয়েছে ব'লে আমরা জানি।

বলতে কি, যে সকল কারণে এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা সুরুতে বিফল হয়েছে, তার একটা কারণ হচ্ছে, এই রকম "বিধবার ঘটী চুরি" অর্থাৎ স্বদেশী ডাকাতী।

সে যাই হোক, স্যাঙ্কো অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছিল, সে ডাকাতী করতে কখনও যাবে না। তাই আমাদের কুইক্‌জোটকে বলেছিল, সে লাট-বধের জন্য এসেছে, ডাকাতী করতে আসেনি, কাযেই ডাকাতী করতে যাবে না। বারীন এতে ভারী বিরক্ত হয়েছিল। অবশেষে স্যাঙ্কোকে এই ব'লে ডাকাতীতে যেতে বাধ্য করেছিল যে, ক-বাবুর আদেশ তাকে পালন করতেই হবে, আর সে আদেশ পালন করাবার ভার বারীনের হাতে। সুতরাং বারীনের হুকুম অমান্য করলেই বারীন তাকে বিদ্রোহী ব'লে অভিযুক্ত করবে।

তখন স্যাঙ্কোর পক্ষে ভারী মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। দীক্ষা নেওয়ার সময় নিজের মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছিল যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কৃত কোন কাযই বিবেক-বিরুদ্ধ হ'তে পারে না; বিশেষতঃ ক-বাবুর মত এত বড় বিজ্ঞলোকের দ্বারা কোন অন্যায় কায অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। মানুষ যত বড় বিজ্ঞই হোক, অথবা অবতারই হোক, সে সব সময় সকল বিষয়ে অভ্রান্ত হতেই পারে না; এ কথা বেচারা স্যাঙ্কো তখন ভেবে দেখেনি। তার পর আমাদের দেশের নেতাদের বিপ্লববাদ বা রাজনীতিসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বহর কতটুকু, তাও তার জানা ছিল না। বিশেষ বিশেষ বড়লোকদের বড়ত্বের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞানের (commonsense) অভাব। এ বিষয় ক-বাবু শুধু নয়, আমাদের কুইক্‌জোটও যে এই রকম বড়ত্বের অধিকারী, স্যাঙ্কো তাও তখন বুঝতে পারেনি। আর বৈপ্লবিক কাণ্ডটা একটা সামরিক ব্যাপার ব'লেই সে ধ'রে নিয়েছিল; কাযেই সামরিক বিধি অনুসারেই কাপ্তেনের হুকুম কাঁটায় কাঁটায় তামিল ক'রে চলতে সে বাধ্য। তাই কুইকজোটের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি না ক'রে তার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু এই একটা সমস্যা তার মনে তখন এসেছিল যে, যদি কোন কর্ম্মী, নেতার আদেশ যথারীতি পালন করতে গিয়ে দেখে যে, আদেশ পালন করলে বিপ্লববাদের বা দেশের যে মঙ্গল হ'তে পারে, তার চেয়ে আদেশ পালন না করলেই অধিকতর মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে, তা হ'লে সেখানে তার কর্ত্তব্য কি?

নেতাদের মধ্যে মতভেদ হ'লে সাধারণতঃ তাঁরা নিজ নিজ মতানুযায়ী দুই দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু ক'রে দেন। কিন্তু চেলা বা সামান্য কর্ম্মীর পক্ষে তা ত হ'তে পারে না। বিশেষতঃ সে যে মতটাকে উচিত ব'লে মনে করে, সেই মতাবলম্বী কোন নেতা যদি দেশে থাকেন, তবেই না সে তাঁর দলভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু যদি না থাকেন, তা হ'লে তার বিবেক-সম্মত মতটাকে আমল না দিয়ে, অন্ধভাবে নেতার অন্যায় মতের অনুগমন করবে, না এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ভেরাণ্ডা ভাজবে?

এই রকম অবস্থাচক্রে প'ড়ে পরে দেশের কাযে সমর্পিতপ্রাণ অনেক যুবক সত্য সত্যই ঘরে গিয়ে ভেরাণ্ডা ভাজতে বাধ্য হয়েছিল, এখনও হচ্ছে। কারণ, তাদের

মতের ন্যায্যতা দেখাতে গিয়ে নেতাদের কাছে গুণ-গ্রাহিতার বদলে ঘৃণা, বিদ্বেষ, এমন কি, নির্য্যাতন ভোগ করতে তারা বাধ্য হয়েছে। শুধু নেতা নয়, আমাদের দেশের লোকের স্বভাবই এই যে,যে যত লোকমান্য, সে তত অন্যের যুক্তিসঙ্গত মতামত সহ্য করতে অপারগ।

যাই হোক্, আমাদের স্যাঙ্কো নিজের বিবেকবুদ্ধি ধামাচাপা দিয়ে সেইবারকার মত বিধবার ঘটী চুরি করতে অগত্যা রাজী হয়েছিল।

তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে ডাকাতীর জন্য যাত্রা করবার পূর্ব্বে আমাদের কুইকজোট প্রকাশ ক'রে বল্ল, সে যখন দলপতি অর্থাৎ "কমাণ্ডার", তখন যথারীতি লড়ায়ের সময় ক্যাম্পেই থাকবে অর্থাৎ "ঘর সামলাবে" (ঘর সামলান কথাটি বারীনের নিজস্ব)।

যাই হোক্, এক জনকে ওস্তাদ্ ডাকাত ডাকতে উক্ত সন্ধানীর বাড়ী আগেই পাঠান হয়েছিল। বাকী দশ কিংবা বারো জনকে দুদলে ভাগ ক'রে, এক দলের স্যাঙ্কো, অন্য দলের নরেন হয়েছিল সর্দ্দার। প্রত্যেক দল দুটি ক'রে রিভলভার নিয়েছিল।

তখন বোধ হয় আষাঢ় মাস; আকাশ মেঘে ঢাকা। রাত্রি ৯টার সময় নরেনের দল আগে যাত্রা করল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্যাঙ্কোর দল বেরুল। অন্ধকার, কাঁচা রাস্তা, বারো মাইলেরও বেশী; অধিকাংশ পথটায় বিশ্রী কাদা; কোথাও কোথাও একটু শুক্‌নো ছিল বটে, কিন্তু পথটা যেন দাঁত বের ক'রেই ছিল। পায়ে কারও জুতো ছিল না; কারো বগলে ছিল হাতকাটা কুর্ত্তা আর জাঙ্গিয়ার পুঁটলি; আর কারও বা ছিল জাঙ্গিয়ার উপর কাপড় পরা।

ডাক হরকরার অনুকরণে চ'লে রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, স্যাঙ্কোর দল নির্দ্দিষ্ট গাছতলায় পৌঁছে দেখল, নরেনের দল কিংবা সত্যিকার ডাকাত যে ডাকতে গেছল, সে তখনও আসে নি। তাই তাদের দলের দুজন গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে নরেনের দলকে খুঁজে নিয়ে এল। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর সন্ধানী মহাশয়ের কাছ থেকে খবর এল যে, সেই গ্রামে কি একটা তদন্তের জন্য দারগা বাবু সদলবলে সশরীরে উপস্থিত। কাযেই ফিরে যেতে হবে।

তখন জোনাকীর আলোতে ঘড়ী দেখা হ'ল, ২টা। অগত্যা ৫টার আগে রংপুরে ফিরে আস্‌বার জন্য হাঁটুনির বেগ আরও বাড়াতে হয়েছিল। এই ডাকাতীটা ফস্‌কে যেতে স্যাঙ্কো ভারী সোয়াস্তি অনুভব করেছিল। কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ না ক'রে অন্যের মনের কথা জান্‌তে চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রায় সকলেরই মন ঐ রকম একটা কিছু প্রতিবন্ধকের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাবই যে নরেনের পথ ভুলে যাওয়ার অনেকটা কারণ, তাও সে প্রকাশ করেছিল। ধরা পড়লে কি জবাব দেবে, এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দেওয়া বড়ই মুস্কিল দেখে কেউ কেউ বলেছিল, বারীনের ডাকাতীতে যোগ না দেওয়ার এইটেই ছিল কারণ।

যাই হোক, তারা ভোরবেলায় রংপুরে ফিরে এসেছিল। বারীন সমস্ত শুনে বলেছিল, ডাকাতী না হলেও "honest attempt" (সৎ চেষ্টা) ত হয়েছে।

এর পর থেকে দু'বছর যাবৎ কত যে এ হেন honest attempt হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নাই। এ রকম প্রত্যেক অকারণ কষ্টের পর মন থেকে অকৃতকার্য্যতার অপমান মুছে ফেলবার জন্য এই বুলীটি আউড়ে গীতার মর্য্যাদা রক্ষা করা হ'ত; অথচ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার কারণ কখনও খুঁজে দেখা হ'ত না। অর্থাৎ কর্ম্মেই অধিকার আছে, ফলে ত নাই। কর্ম্মের-সৎ চেষ্টা ক'রে যদি ফল না ফলে, তাতে দুঃখ কিছুই নাই। হয় ত গীতার এই নীতির প্রভাবে দেশহিতের প্রায় সকল কাযই ব্যর্থ হয়ে আস্‌ছে। এ ক্ষেত্রে ডাকাতীর দ্বারা লব্ধ অর্থটাই ছিল ফল। এই ফললাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ডাকাতীর চেষ্টাটা আর যাই হউক, ঐকান্তিক যে হ'তে পারে না, ভুক্তভোগিমাত্রেই (অবশ্য দার্শনিক তর্কের কথা পৃথক্) অস্বীকার করতে পারবেন না। অধিকন্তু এই রকম তথাকথিত বৈপ্লবিক action সার্থক করবার চেষ্টা ঐকান্তিক না হওয়ার যে আদর্শের সংকীর্ণতা এবং অস্পষ্টতা প্রকাশ পায়, সে কথা আমরা আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। দেশের যে স্বাধীনতার জন্য লোকে সর্ব্বস্ব পণ করবে, সে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপটা কি, তা স্পষ্ট ক'রে কখনও কেউ ধারণা করতেও পারেন নি, কাযেই অন্যকে করিয়ে দিতেও পারেন নি। স্বাধীনতার

স্বরূপ বিশদরূপে হৃদয়ে অনুভূত না হ'লে আর তা লাভের জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বা কামনা না জাগলে, তার জন্য চেষ্টা ঐকান্তিক হবে কেমন ক'রে?

যাই হোক্, পায়ের ব্যথা সারতে তাদের প্রায় ৪।৫ দিন লেগেছিল। ইতোমধ্যে আবার ডাকাতীর মতলব আঁট্‌তে শুনে স্যাঙ্কো কুইকজোটের সঙ্গত্যাগের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। আর সেই সময় ধুবড়ী থেকে খবর এল, লাট সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেণ গৌহাটী থেকে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু লাট সাহেব এসেই ট্রেণে না উঠে, "ব্রহ্মকুণ্ডে" চ'ড়ে গোয়ালন্দ রওয়ানা হয়েছেন। সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের তরফ থেকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হবে। তার পর সেই পথে বম্বে হয়ে বিলাত রওয়ানা হবেন।

বারীনও বোধ হয় চাচ্ছিল স্যাঙ্কোকে তাড়াতে, তাই হয় ত নিজে না গিয়ে স্যাঙ্কোকে গোয়ালন্দ গিয়ে লাট-বধের চেষ্টা কর্‌তে দিয়েছিল। স্যাঙ্কো প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়েছিল। প্রফুল্লকে খাঁটি লোক ব'লেই বোধ হয় তার ধারণা হয়েছিল। সেও ইচ্ছুক ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ গোয়ালন্দ অভিমুখে রওয়ানা হ'ল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

পুনরাগমন
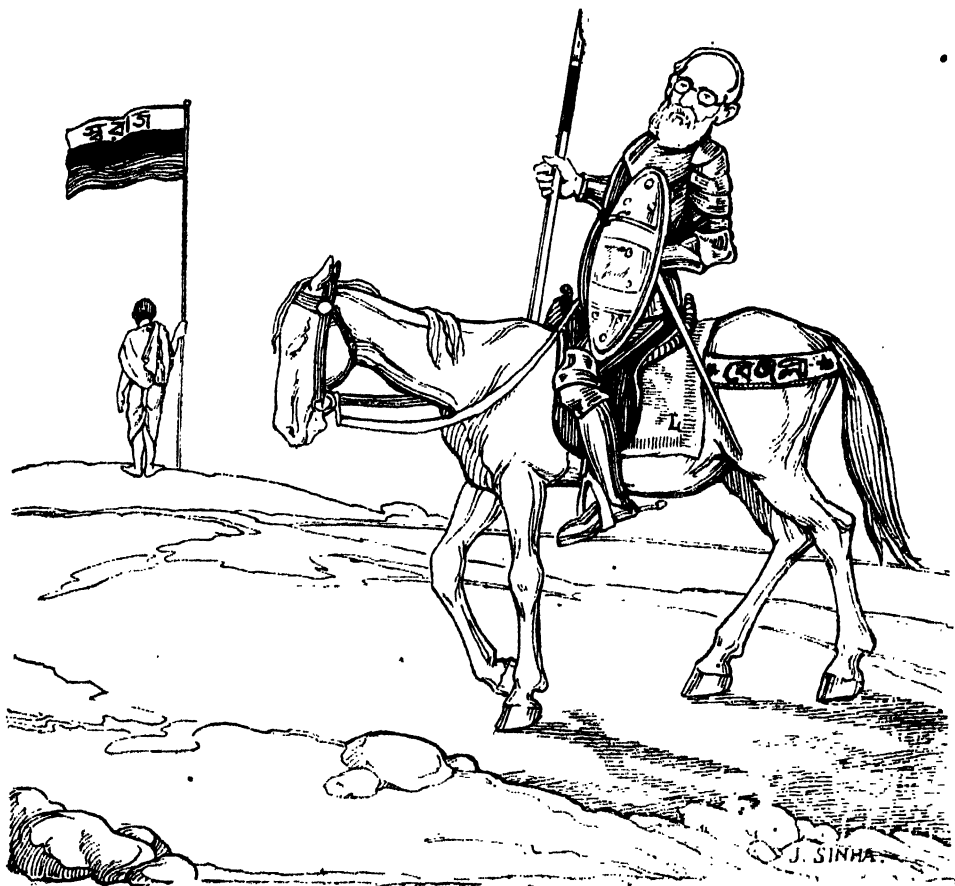
অবসান

আমার পিতা সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। তখনকার এফ-এ পাশ—মাইনে ছিল কম, আর এ ক্ষেত্রে যা থাকে না, তাঁর সেটি ছিল; অর্থাৎ সংসারটি ছিল ছোট।

দেশের অল্প যে কয় বিঘা জমী ছিল, সমস্ত বেচিয়া ও ভদ্রাসনটি বন্ধক রাখিয়া যখন তিনি কোনও মতে আমার ভগিনীর বিবাহ দিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহার পোষ্য রহিলাম কেবল আমি ও আমার মা। তাঁহার চাকরীর টাকাই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইল। কিছুই জমিত না; যাহা আসিত, তাহাতে কোন রকমে সংসার-খরচ চলিয়া যাইত। ভিটাটুকু রক্ষা করিবার আর কিছু উপায় হইল না। এমন সময় এক দিন তিনি দারিদ্র্যের ও দুশ্চিন্তার হাত এড়াইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

আমি সেইবার গ্রামের স্কুল হইতে 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষা দিয়াছি—তখনও ফল বাহির হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এইবার একটা চাকরী করিয়া মায়ের দুঃখ মোচন করিব। কপালে থাকিলে পরে লিখাপড়া হইবে।

আমার 'জ্যেঠা, খুড়া' কেহ ছিলেন না। এক দিন আমার হাত ধরিয়া মা বলিলেন, "চল্ বাবা, তোর মামার বাড়ী যাই।"—জ্ঞান হওয়া অবধি মামার বাড়ী দেখি নাই, আর নিজেদের সেই জনহীন, হতশ্রী বাড়ীটাও যেন একটা আতঙ্কের জিনিষ হইয়াছিল, তাই মামার বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় বরং আনন্দই হইল।

এমন সময় আমার পিতার এক বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন:—

"বাবা বিমল, তোমার পিতা আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। আমি তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বড়ই কাতর হইয়াছি। তাঁর কাছে আমি অশেষ প্রকারে ঋণী; তিনি এক সময় আমার বড় উপকার করিয়াছিলেন। সে জন্য না হইলেও, তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধুর পুত্র, এই হিসাবেও তোমার উপর আমার দাবী আছে। তুমি আমাদের পর নও। পরীক্ষার খবর বাহির হইলেই তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। তোমার পড়ার যে সামান্য খরচ হইবে, তাহা আমিই দিব। কোন দ্বিধা করিও না—আমায় তোমার পিতার সহোদর মনে করিবে।"

আমি মাঝে মাঝে বাবার কাছে তাঁহার এই পাটনার উকীল বন্ধুটির কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি এক সময় ইঁহার উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতাম। কিন্তু মা এই নিঃসম্পর্কীয় ভদ্রলোকের দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না।

আমি তখন তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদসহ জানাইলাম যে, আপাততঃ মা ও আমি আমার মাতুলালয়ে যাইতেছি; সেখানে আমার মামাই আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন।

*　　*　　*　　*

সাত ক্রোশ রাস্তার ধূলা মাখিয়া আমাদের গরুর গাড়ী যখন ক্যাঁচ-কোঁচ করিতে করিতে 'মাট-কোঠা' ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন—"কে এসেছে গো" বলিয়া মামীমা মায়ের হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। 'কি রে অনি এলি?' বলিয়া মামা বাহিরে আসিলেন। মা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া মামা বলিলেন—"থাক্ ও সব কথা; আয়, উঠে আয়। এক মায়ের পেটে যখন ঠাঁই হয়েছে, তখন এক ঘরেও খুব হবে।"—এইরূপে আমরা মাতুলালয়ে স্থানলাভ করিলাম।

আমার পরীক্ষার খবর বাহির হইল। কয়েক দিন পরে একদা সন্ধ্যাবেলায় মামা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিমল, তুই ১০ টাকা জলপানি পেয়েছিস্! কি করবি ইচ্ছে আছে?"

আমি বলিলাম, "আমার ত ইচ্ছে যে, কোনও রকম ছোটখাট চাকরী করি!"

ফুল্ল-কমল
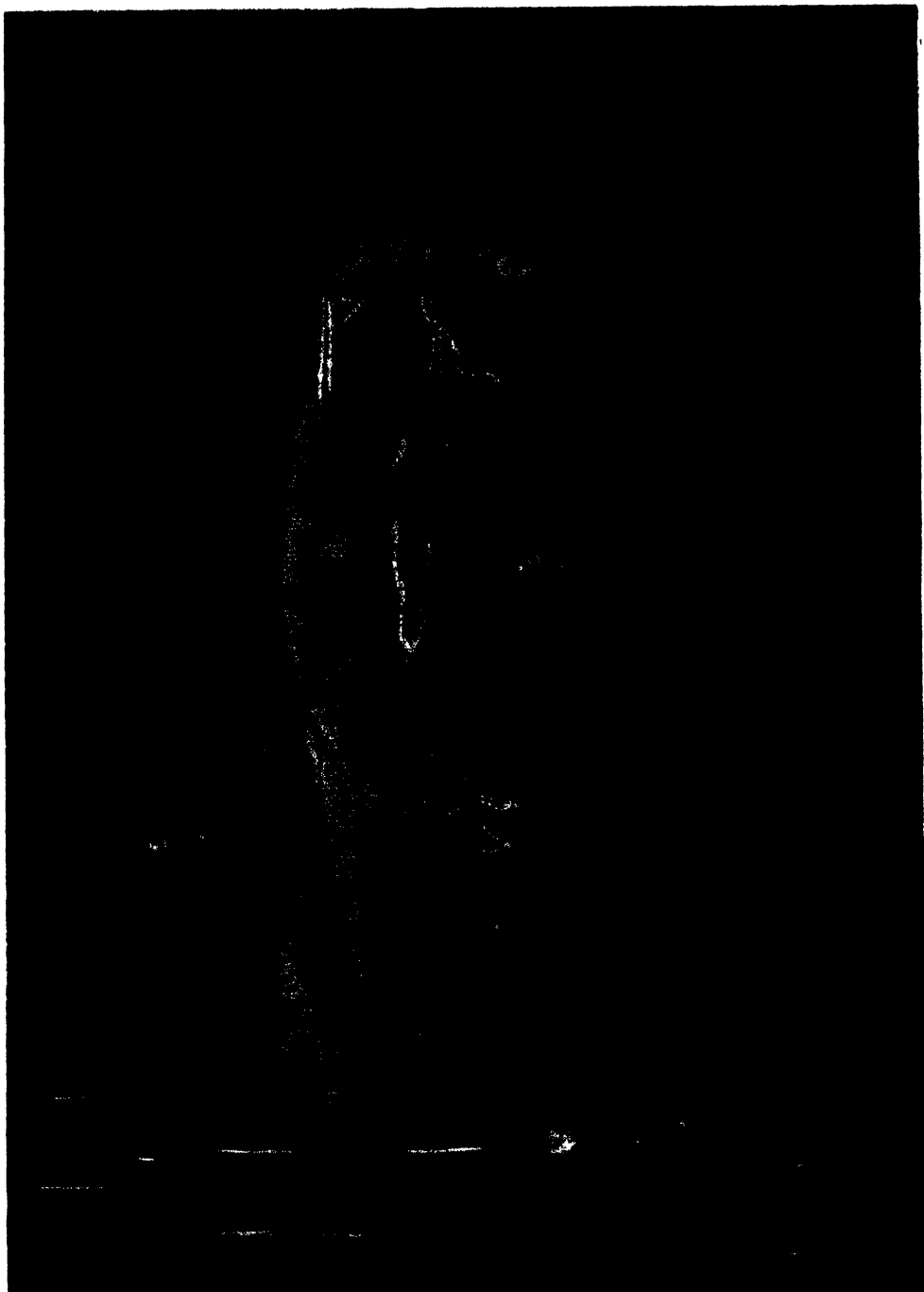
বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী—শ্রীচারু সেন গুপ্ত

"কেন, তোর কি আর পড়তে ভাল লাগে না না কি ?"

আমি উত্তর দিলাম, "না, পড়তে ত খুবই ইচ্ছে যায়। কিন্তু মা রয়েছেন, চাকরী করলে যদি তাঁকে কিছু সুখে রাখতে পারি।"

তিনি হাসিতে লাগিলেন—"কেন রে, আমার কাছে তোর মা বুঝি বড় কষ্ট পাচ্ছে, না ?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না, তা কি আমি বল্‌ছি ? তবে আমার ত তাঁকে পালন করা কর্ত্তব্য।"

তিনি বলিলেন, "তার ঢের সময় আছে এখন। তোকে এর মধ্যে সে জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন 'স্কলারশিপ'টা ছাড়িস্ না ; আমার সঙ্গে চল্, ভাগলপুরেই পড়বি আর আমার কাছে থাক্‌বি। তোর মাকে বলিস্, বুঝলি ?"

মামার সন্তানাদি কিছুই ছিল না। তিনি ভাগলপুরে কায করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গেই সেখানে আসিলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া দেখি, সরোজও সেখানে পড়িতে আসিয়াছে। সরোজের পিতা আমাদের গ্রামের মধ্যে বেশ বড়লোক। ভাগলপুরে গালার ব্যবসা করিয়া তিনি লক্ষপতি হইয়া সপরিবারে গ্রামেই বসবাস করিতেছিলেন। সরোজ আমার সঙ্গেই গ্রামের স্কুল হইতে 'ম্যাট্রিকুলেশন' দিয়াছিল। তাহার পিতার ভাগলপুরের বাড়ী এত দিন মালীর জিম্মায় ছিল। পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে লইয়া ভাগলপুরে থাকিবেন ও কলেজে পড়াইবেন, এই উদ্দেশ্যেই সেই বাড়ী তিনি বিক্রয় করেন নাই। ছোটবেলা হইতেই সরোজ পিতার বড় প্রিয়পাত্র ছিল ও সংসারে তাহার অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় সে সুবিধা পাইয়া একটু বেশী রকম বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন দোষ ছিল না। আমরা দুই জনে একসঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছিলাম, আবার একসঙ্গে কলেজেও পড়িতে পাইব বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমাদের পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ্য আরও গভীর হইয়া চলিল।

ভাগলপুরে মামা একটি ছোট বাসা করিয়া ছিলেন ; এক জন ঠাকুর ও চাকরও ছিল। মামা দিনের অধিকাংশ সময় অফিসে ও বাকীটুকু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজবে কাটাইতেন। আমিও কলেজের পর অধিকাংশ সময়ই সরোজের বাড়ীতে কাটাইতাম। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। তাহাদের অর্গানের সহিত নিজের মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া সে যখন গৃহটি সুরের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিত, তখন আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কোন দিন বা আমরা দুই জনে কলেজের পর গঙ্গার ধারে বেড়াইতাম—কত গল্প হইত। কোন কোন দিন যখন সন্ধ্যার রঙ্গীন ছায়া গঙ্গার বুকে স্বর্ণ-সম্পদে নামিয়া আসিত, তখন তাহার আকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইত :—

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর···' কতই আনন্দে আমাদের সে দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে ! আজ সে কথা যখন মনে পড়ে, মনে হয় যেন একটি অখণ্ড সুখ-স্বপ্নেরই মত একটানা আনন্দে গত হইয়াছে ! সে সুখের তুলনা ছিল না। আমরা দুই জনে পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়াছিলাম ও উভয়েই মনে করিতাম, আমাদের মত বন্ধুত্ব বুঝি বিশ্বে সুদুর্ল্লভ ! আমাদের এ প্রীতির নিকট যে কোন সাধারণ নিয়ম খাটিবে না, এই অসাধারণ ধারণাতেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ ছিল।

ভাগলপুরে আসিয়া আমার সেই পিতৃ-বন্ধু পাটনার ভবেশ বাবুকে জানাইলাম যে, আমি বৃত্তি পাইয়া সেখানে পড়িতেছি, মামার নিকট আছি। তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া আমাকে অনেক স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ-পূর্ণ একখানি পত্র দিলেন। তাহার পর তিনি আমায় প্রায়ই চিঠি লিখিতেন। প্রায় প্রত্যেক ছুটীর প্রথমেই তিনি আমায় লিখিতেন—'বাবা বিমল, তোমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছি ; এখন তুমি বড় হয়ে লিখাপড়া করছ, তোমায় একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করে। তুমি এই ছুটীর প্রথম ক'টি দিন এখানে এসে কাটাও।'···

যখন আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিলাম, তখন মামা ভবেশ বাবুর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লিখা ছিল, "বিমলের পিতা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর দ্বারা আমি এক সময় বড় উপকৃত হই। বিমল আমাদের পর নয়। অনুগ্রহ ক'রে দিনকতকের জন্যে এবারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

মায়ের কাছে যখন গ্রামে গেলাম, তখন তিনি

অনুমতি দিয়া বলিলেন,"ভদ্রলোক যখন এত ক'রে লিখেছেন, না হয় দিনকতক পাটনা গিয়ে বেড়িয়ে আয়। পড়ার মাঝে মাঝে একটু একটু বেড়ানো ভাল।"

নূতনত্বে আমার চিরকালই আনন্দ। চিঠি দিয়া পাটনা রওনা হইলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, এক জন গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ষ্টেশনের নিকটেই তাঁহার সাদা একতলা বাড়ীখানি। লাল নীচু প্রাচীরে ঘেরা। উঠানে দুই একটি কলমকরা আম ও লিচুর গাছে মুকুল ভরা। বাড়ীখানি নূতন তৈয়ারী ও একটি ছোট পরিবারের সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। বিশেষত্বের মধ্যে প্রশংসনীয় —পরিচ্ছন্নতায় চতুর্দ্দিক্ মনোরম।

তিনি আমায় সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট আমায় বসাইয়া আমার জিনিষপত্রগুলি দেখিতে বাহিরে আসিলেন। এই ভদ্রপরিবার এত অল্প সময়ের মধ্যে আমায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন যে, আমি তাঁহাদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ভবেশ বাবুর স্ত্রী আমায় নিজের পুত্রের মত যত্ন করিতেন। তাঁহার ৯ বছরের ছেলে অনিলের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। সে আমায় 'দাদা' 'দাদা' বলিয়া সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে ঘুরিত। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও পাটনায় আসি নাই। সে-ই আমায় নানা যায়গা দেখাইয়া আনিতে লাগিল; সকালে ও বিকালে সে-ই আমার বেড়ানর সাথী হইয়া উঠিল।

যতক্ষণ ঘরে থাকিতাম, অনিল বড় একটা আমার কাছে আসিত না; ঘুড়ি, লাটু বা ঐরূপ একটা কিছু লইয়া সেই সময়টা সম্মুখের রাস্তায় কাটাইতেই সে বেশী আমোদ পাইত।

ভবেশ বাবু যে খুব বেশী টাকা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হইল না। বাড়ীটি করিয়া ও দুইটি মেয়ের বিবাহ দিয়াই বোধ হয় সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার একটি মেয়ে অবিবাহিত।

লীলাকে আমি দেখিয়াছিলাম—সে বাস্তবিকই সুন্দরী। ঘরের ছোট-বড় প্রায় সমস্ত কাযই, আমি দেখিতাম, সে হাসিমুখে করিতেছে। আমাকেও সে স্নানের সময় তেল, গামছা ইত্যাদি আনিয়া দিত। সেই সময় আমার দৃষ্টিতে সে বড় সুন্দর ঠেকিত। তাহার সেই ছোট ছোট কাযগুলি আমার বড় ভাল লাগিত। এখন বুড়া হইয়াছি, বলিতে লজ্জা নাই—তখনকার সেই কিশোর-বয়সের প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে অশেষ সুষমা-মাধুরীময়ী বলিয়া মনে হইত। অল্পে অল্পে সে আমার তরুণ-হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। যদি ইহাকে ভালবাসা বলা যায়, তাহাকে ভালবাসিলাম।

* * * *

কি জানি কেন আমার মনে হইত, ভবেশ বাবু আমাকে যে এত স্নেহ করেন, বাড়ীর মধ্যে বাড়ীর এক জনেরই মত করিয়া রাখিতে চাহেন, লীলাকে অবাধে আমার ছোটখাট কাযগুলি করিতে দেন, ইহার নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। আমার সন্দেহ হইল, হয় ত তিনি আমার সহিত লীলার বিবাহ দিতে চাহেন। যাক্, সে সময় আমি মনের কথা মনেই রাখিলাম।...

কিছু দিন থাকিয়া যখন আবার মায়ের নিকট ফিরিয়া গেলাম, তিনি আমায় অনেক প্রশ্ন করিলেন, "কেমন লোক, কি রকম যত্ন করলে"—ইত্যাদি।

আমি মাকে বুঝাইয়া দিলাম—চমৎকার লোক, অমন সুন্দর মানুষ আমি আর দেখি নাই। লীলার কথা অবশ্য গোপন রাখিলাম।

২

দিন কাটিয়া যায়, মানুষকে সে জন্য চিন্তা করিতে হয় না। আরও ১ বৎসর কাটিয়া গেল, আমি সেইবার আই-এ পরীক্ষা দিলাম।

সরোজ আমায় কিছু দিন ভাগলপুরে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমিও রহিয়া গেলাম। দিনকতক গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়া যখন আমরা দুই জনেই বেশ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সময় এক দিন সরোজ বলিল, "চল না হে একবার পাটনায় গিয়ে তোমার মানসীকে দর্শন ক'রে আসা যাক্।" বলা বাহুল্য, আমার একমাত্র সহচর ও প্রিয় বন্ধু সরোজকে আমি লীলার কথা সমস্তই বলিয়াছিলাম।

মামার অনুমতি পাইতে দেরী হইল না। ভবেশ বাবু আমায় নিয়মিতভাবে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিতেন। তিনি আগেই আমায় তাঁহার কাছে যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আমার এক বন্ধুর সহিত আমি পাটনা যাইতেছি।

প্রথমবারের মত এবারও দেখিলাম, তিনি নিজেই আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন। দুই এক দিনের মধ্যে সরোজও আমারই মত পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িল। পরকে ইঁহারা বড় শীঘ্র আপনার করিয়া লইতে পারিতেন।

লীলাকে প্রথম দেখিয়া সরোজ আমায় চুপি-চুপি বলিল, "সত্যিই ত ভারী সুন্দর!" বলার ভঙ্গীটা আমার ভাল লাগিল না। তবু ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় ?"

সে যেন একটু অনুৎসাহের সুরেই উত্তর দিল, "তার আগে ত তোমার সঙ্গে 'ডুয়েল্' লড়তে হবে ?"…যাক্, কিছু দিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া আমরা ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

*　　*　　*　　*

সরোজ ও আমি দুই জনেই প্রথম বিভাগে পাশ হইলাম। আমি অধিকন্তু একটা ২০ টাকার বৃত্তি পাইলাম। মামা বলিলেন, "বি-এটাও প'ড়ে নে, এত সুবিধে ছাড়িস্ না।" আমিও মায়ের আদেশ পাইয়া বি-এ পড়িতে লাগিলাম। এই সময় আমার সহিত সরোজের ছাড়াছাড়ি হইল। হঠাৎ তাহার খেয়াল চাপিল, সে পাটনায় পড়িবে। আমার কেমন যেন তাহার উপর একটু রাগ হইল। কিন্তু তবুও সে পাটনায় পড়িতে গেল।

*　　*　　*　　*

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিয়া আমি একবার পাটনায় ভবেশ বাবুর নিকট গেলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমায় পূর্ব্বেরই মত যত্ন করিলেন। কিন্তু সেবার লীলার দর্শন তত সুলভ হইল না। ভাবিলাম, বয়স হইয়াছে বলিয়া হয় ত আর তাহাকে পূর্ব্বের মত সব সময় সকলের সামনে বাহির হইতে দেওয়া হয় না।—কিন্তু আমিও কি এত বাহিরের লোক—যাহা হউক্, এ চিন্তা আর ভাল লাগিল না।

এক দিন সরোজ আমায় দেখিতে আসিল। সে আসিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করিল। শেষে বলিল, "এবার ত উঠ্‌তে হবে, একবার বাড়ীর ভেতরটা ঘুরে আসি। আমিও প্রায় সপ্তাহখানেক এখানে আসি নাই।" সে বাড়ীর মধ্যে খাইতে গেল। আমি দেখিলাম, সে খাবার খাইতে বসিয়াছে; লীলাকে লইয়া তাহার মা সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন। আমি ভাবিলাম—লীলাকে ত কোন দিন আমার কাছে তাহার মায়ের সঙ্গেও বসিয়া থাকিতে দেখি নাই! তাহার পর মনে হইল, আমি ত অনেক দিন পরে একবার আসিলাম, সরোজ কতবার আসে; তাহার সহিত ত ঘনিষ্ঠতা হইবারই কথা! কিন্তু তবু যেন মন প্রবোধ মানিল না। যাহা হউক্, যে চিন্তায় অশান্তি আনে, তাহা পরিত্যাগ করাই ভাল, এই বিবেচনায় সে বিষয়ে আর মন দিলাম না।

*　　*　　*　　*

তাহার পর আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল; আমি বি-এ দিয়া আবার পাটনায় আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, যদি আমার সহিত লীলার বিবাহ দেওয়াই ভবেশ বাবু ঠিক করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এবার তিনি নিশ্চয়ই সে কথা পাড়িবেন।

এক দিন সরোজকে নিমন্ত্রণ করা হইল। আমরা দুই জনে খাওয়া-দাওয়া করিলাম। সমস্ত দুপুর গল্প করার পর লীলার মা বলিলেন, "সরোজ, একটু গান-টান কর না, বাবা ?"

আমিও শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সরোজ সম্মত হইল। সে দুই একটা গান গাহিবার পর লীলার মাতা লীলাকে ডাকিলেন। সলজ্জ কিশোরী ধীরে ধীরে মায়ের পাশে দাঁড়াইল। এই কয় বৎসরে লীলার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। তাহার মা তাহাকে বলিলেন, "সরোজ-দা'র কাছে যে গান শিখেছ, তার দু' একটা বিমলকে শুনিয়ে দাও ত, মা।"

নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে লীলা অর্গানের পাশে দাঁড়াইল। সরোজ বাজাইতে লাগিল, সে ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া অতি সুন্দরভাবে একটি গান শেষ করিল। তখন সরোজ নিজের কণ্ঠ লীলার সহিত মিলাইয়া আর একটি গান

গাহিল। এবার সঙ্কোচ দূর করিয়া লীলা যেন একটু সহজভাব ধারণ করিল। আরও দুই একটি গানের পর তখনকার মত সভা-ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার সময় সরোজ যখন বিদায় লইতেছে, তখন লীলার মা তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন আর গান না শেখাও, বিমলের সঙ্গে গল্পও ত কর্‌বে, রোজ যেমন আস্‌তে, তেম্‌নি এসো, বুঝলে বাবা?"

'হ্যাঁ, আস্‌বো বই কি'—বলিয়া সরোজ চলিয়া গেল।

তখন আমি ধীরে ধীরে ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলাম। সরোজ বড়লোকের ছেলে, সে যে আমার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পাত্র, তখন আমার সে কথা মনে হইল। সে লীলাকে নিয়মিত গান শেখায়। আমার কি দাবী আছে ইহাদের উপর? আর সরোজের মত বড়লোক জামাতা পাইলে, কেন ইহারা আমার মত নির্ধন গরীবকে জামাই করিবে? তবু এ সন্দেহের শেষ করিবার জন্য সঙ্কল্প স্থির করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে ভবেশ বাবুর বৈঠকখানায় গেলাম।

ভবেশ বাবু একলাই বসিয়া ছিলেন। কি বলিয়া কথা পাড়িব স্থির করিতে না পারায় চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, "কি বাবা, কেমন লাগছে এখানে?"

আমি বলিলাম, "বেশ আনন্দেই সময় কাটছে ত।"

তখন দুই একটি কথায় সরোজের কথা আসিয়া পড়ায় তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ছেলেটি বেশ। বড়লোকের ছেলে, তার ওপর লেখাপড়াও শিখেছে। আমি ত মনে কর্‌ছি, তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দেবো। তোমার কি মনে হয়, মন্দ হবে না, কি বল?"

আমি আর কি বলিব—তখন বুঝিলাম, আমার সন্দেহই ঠিক। টাকাকড়ি-চালচুলাহীন আমার মত গরীব কি সাহসে লীলার স্বামী হইবার ভরসা করে?—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত বেশ-ই হবে" বলিয়া আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উঠিয়া পড়িলাম। সমস্ত আনন্দ যেন একসঙ্গে যুক্তি করিয়া আমার কাছ হইতে পলাইল। আমি এক রকম টলিতে টলিতে শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম—আলো, দেয়াল, ফুলের টব যেন আমার চারিধারে নাচিতে লাগিল। বাতি নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। শেষে ইহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলাম? ইঁহারা আমার কে? আমি ত ইঁহাদের চিনিতাম না। আমায় অত করিয়া না টানিলে আমিও ত আসিতাম না। যদি কাঙ্গালকে রত্নের লোভ দেখাইলে—তবে কেন তাহা দিলে না? এই কি পিতার উপকারের প্রত্যুপকার? আর ভাবিতে পারিলাম না। ভোরের মৃদু-বাতাস আমার তপ্ত ললাটে তাহার শীতল স্পর্শ বুলাইয়া গেল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, আমার নামে একটি 'টেলিগ্রাম' আছে। তাহাতে এইটুকুমাত্র লেখা ছিল;—

"তোমার মামার অসুখ, শীঘ্র চলিয়া আসিবে।"

আমার চেহারা দেখিয়া ভবেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "বাবা, তোমার কি রাত্রে অসুখ করেছিল?"

ভবেশ বাবুও বলিলেন, "তাই ত, কালকের চেয়ে তোমার যে মুখখানা শুক্‌নো ঠেক্‌ছে।"

আমি বলিলাম, "কই না, অসুখ ত করেনি; তবে কাল ঘুমুতে একটু রাত হয়েছিল ব'লে যদি শুক্‌নো দেখায়। সে যাক্‌, আমাকে ত আজই যেতে হবে—এই দুপুরের ট্রেণে; একখানা গাড়ী ব'লে রাখ্‌লে হয়।"

ভবেশ বাবু আমায় আর বাধা দিলেন না। আমিও শূন্য হৃদয় লইয়া অনিশ্চিত বিপদের দিকে অগ্রসর হইলাম।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। মামার হৃদ্‌রোগ ছিল; তিনি আমার আসিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় মারা গিয়াছেন। মা ও মামীমা'র ক্রন্দন শুনিয়া আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না। এত দিনে আমরা একমাত্র অভিভাবককে হারাইলাম।

তখন আর অন্য উপায় রহিল না। এই দুই জন স্ত্রীলোক ও নিজের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বহু কষ্টে মজঃফরপুর হাই-স্কুলে একটি মাষ্টারী জুটিল। বেতন চল্লিশ—দুইটি ছেলে পড়াইতাম। সহরেই মা ও মামীমাকে আনিয়া আমার ছোট সংসার পাতিলাম। এই অল্প বেতনে কায করিয়াও, মা ও মামীর ম্লানমুখে আনন্দের আভাস দেখিয়া আমি নিজেকে সার্থক মনে করিতাম। এই ভাবে একটানা রকমে আমার বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিয়া চলিল।

৩

মজঃফরপুরে আসিয়া কর্ত্তব্যবোধে একবার ভবেশ বাবুকে মামার মৃত্যুসংবাদ দিয়াছিলাম, তিনিও তাহার উত্তর দিয়াছিলেন ; তাহার পর ৩ মাস আর কোন পত্র-ব্যবহার হয় নাই।

হঠাৎ এক দিন অন্যান্য পত্রের সহিত পাটনার ছাপ-সংযুক্ত একখানি লাল খাম আসিল। ত্রস্তভাবে সেখানি খুলিয়া দেখিলাম, উহা লীলার বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ-পত্র। সরোজের সহিতই বিবাহ হইতেছে। মাকে আমি কিছুই বলি নাই, তিনিও কিছুই জানিতেন না—তিনি আমায় পাটনা যাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা, তোকে তাঁরা কত ভালবাসেন, তাঁদের মেয়ের বিয়েতে একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে আসা তোর উচিত ; তার ওপর তোরই বন্ধুর সঙ্গে যখন বিয়ে !"

কিন্তু আমি জানিতাম, কেন আমার যাওয়া উচিত নয়। আমোদ-আহ্লাদও যে কতখানি হইবে, তাহাও বেশ বুঝিয়াছিলাম। তবু একবার যাইব ভাবিলাম। ৫।৬ দিন পূর্ব্বেই যাত্রা করিলাম।

ভবেশ বাবু বোধ হয় আমার আগমন প্রত্যাশা করেন নাই। কেন না, তিনি যেন বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন, এই ভাব দেখাইলেন ও কি যেন অজানা কারণে লজ্জিত, এই ভাবে আমার সহিত বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তাও কহিতে পারিলেন না। যাহা হউক, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যথেষ্টই হইল।

বিবাহের তখনও পাঁচ দিন দেরী আছে। আমি সেই দিন সন্ধ্যার সময় সরোজের বাসায় তাহার খোঁজ লইতে গিয়া শুনিলাম—"ছোটা বাবু টহলনে গিয়া।"

দরোয়ান রাম সিং বুড়া লোক। সরোজের পিতামহের আমলের চাকর। সে ভাগলপুরেও সরোজের কাছে থাকিত। আমি তখন তাহাদের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ সময় থাকিতাম ও সরোজের যে খুবই নিকট-বন্ধু ছিলাম, তাহাও এই বৃদ্ধ জানিত ; সে আমাকে সরোজেরই মত খাতির করিত। আজও বুড়া রাম সিং এই বাড়ীতে 'ছোটা বাবুর' সঙ্গে আসিয়াছে। আমি আর কাহাকেও পরিচিত না পাইয়া ও সরোজের সহিত একটু অপেক্ষা করিয়া দেখা করিব ঠিক করিয়া দরোয়ানজীর খাটিয়ার এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। রাম সিং ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বাবু, ইস্‌পর্ কাহে, কুর্‌শী লে আন দেজে ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেন রাম সিং, আমি কি এতটাই বাবু বনে গেছি দেখছ ? ভাগলপুরে যে এই খাটে শুয়েই কত দুপুর তোমার দেশের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নাই ?"

রাম সিং বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "আ—বাবু, উসব দিন চলা গিয়া। আপ ত ঞৈসাহি রহ্ গিয়া, লেকিন হামারা ছোটা বাবু"—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। তাহার প্রভাহীন চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।—"বড়ি আফশোষ কী বাৎ বাবু!" বলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সরোজেরই বা কি এমন পরিবর্ত্তন হইল, যাহাতে এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধ এমন বিচলিত হইয়াছে ! আমি কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। তবে কি এ তাহার বিলাসিতার-ই কথা ? আমি সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রাম সিং তোমার ছোট বাবুর ? তাঁর ত আর পাঁচ দিন পরে সাদি হবে—এর মধ্যে দুঃখের কথা কি আছে ? তুমি আমায় সমস্ত খুলে বল। পর ব'লে সঙ্কোচ কোরো না ; জান ত, আমা হ'তে তোমার বাবুর উপকার ছাড়া কখন অপকার হবে না ?" সে তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় চোখের জল মিশাইয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই :—

গত দুই মাস হইতে সরোজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন মদ ধরিয়াছে। এক জনের বাড়ীতে কিছু দিন হইতে সে কাহাকে গান শিখাইতেছে। এই ঘটনার পর হইতেই সরোজ বেশী করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধ দ্বারবান্ সরোজকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরায় সে বলিয়াছিল যে, সে টাকার জন্য গান শিখাইতেছে না—সে মাহিনা লয় না। প্রভুভক্ত দ্বারবান্ সরোজকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সে শুধু কঠোরস্বরে বলিয়াছিল যে, বৃদ্ধ যেন

উপদেশ দিতে না আইসে! সে যে ধারবান্, তাহা যেন ভুলিয়া না যায়!

প্রসঙ্গশেষে বৃদ্ধ বলিল, "বাবু, যাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ কর্লাম, তার এই কথা! কিন্তু বুড়ো মানুষ আমি কি কর্তে পারি? বড় বাবুকে জানালে যদি ছোট বাবুর কিছু মন্দ হয়—তাই চুপ ক'রে আছি। আপনি ছোট বাবুর বন্ধু, আপনি যদি তাঁকে দয়া ক'রে ও পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাই আপনাকে সমস্ত বল্লাম।"

বৃদ্ধ চুপ করিল।

আমি তখন রাম সিংকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্বো, তুমি ভেবো না।"—

"ভগবান্ আপকা ভালা করে"—বলিয়া বৃদ্ধ সজল-নয়নে কৃতজ্ঞতাভরে আমার দিকে তাকাইল।

সে দিন একটু রাত হইয়া যাওয়ায় আর সরোজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভবেশ বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার ঘুম হইল না। তখন আমি এক মহাসমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

লীলাকে আমি ভালবাসি। আমার সহিত তাহার বিবাহ না হইয়া সরোজের সহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লীলা যদি সুরাসক্ত সরোজের হাতে পড়ে, তবে তাহার সুখ-শান্তি যে জন্মের মত শেষ হইবে, বুঝিলাম। ভালবাসার পাত্রকে আজীবন কষ্টের মুখে তুলিয়া দিতে কাহারও প্রাণ চাহে না। কিন্তু উপায় কি?

প্রথমতঃ সরোজ যদি নিজেকে আমূল সংশোধন করে, তাহা হইলে লীলা সুখী হইলেও হইতে পারে। আর এক উপায় আছে, সরোজের প্রকৃত চরিত্র যদি ভবেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলেও তিনি লীলাকে বাঁচাইতে পারেন এবং—এবং লীলা আমার হইতে পারে! আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। এ উপায়ই ত বেশ!

কিন্তু একটু পরেই আমার লোভের আবেগ কাটিয়া গেলে, আমি এই দুর্ব্বলতা জয় করিলাম। ভাবিলাম, আমি যদি লীলাকে ভালই বাসিয়া থাকি, তবে তাহার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করিব। তাহার পক্ষে সরোজও যে, আমিও সে; সে গৃহস্থের মেয়ে, আমাদের ভালবাসিয়া ফেলে নাই নিশ্চয়। বরং সরোজ তাহাকে এত দিন গান শিখাইয়াছে, তাহার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উপরেই লীলার আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সরোজের হাতে পড়িলে সে কখনও অর্থকষ্ট ভোগ করিবে না; বরং আমার মত নির্ধনের গৃহে তাহাকে লইয়া গেলে, তাহার হয় ত অনেক সাধ মিটিবে না। আর, সরোজ আমার বন্ধু; সে যদি লীলাকে পাইলেই সুখী হয়, কেন তাহাতে বাদ সাধিব?

সে যাহা হউক্, আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম, প্রথমে খোঁজ লইব, সরোজ কেন মদ খায়; তাহার পর যে উপায়ে পারি, তাহার ঐ বদ্ অভ্যাস ছাড়াইব। ইহার জন্য 'তাহার পিতাকে জানাইব ও ভবেশ বাবুকে বলিয়া এই বিবাহ বন্ধ করিয়া দিব'—এমন ভয় দেখানও প্রয়োজন বুঝিলে করিতে হইবে স্থির করিলাম।

পরদিন সকালে গিয়া সরোজকে বাহিরের ঘরেই পাইলাম। তাহাকে বলিলাম, "ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, চল, একটু বাগানের মধ্যে বেড়াই গে।"

একটুক্ষণ বেড়াইবার পর আমি হঠাৎ সরোজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কেন মদ ধরিয়াছে। যেন এ প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল, এই ভাবেই উত্তর করিল, "কেন যে মদ ধরেছি, শুন্বে—তোমারই জন্যে।"

আমি ত অবাক্। আমারই জন্যে? কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলাম, "তোমার কথা বুঝতে পার্ছি না—খুলে বল।"

"এ সামান্য কথাটা আর বুঝতে পার্লে না?"—

তখন সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি বল্ছি ভাই, লীলাকে আমিও ভালবেসেছি। যখন মনের মধ্যে সে খবর পৌঁছিল, তখন দেখলাম, বন্ধুর প্রতি একটা মস্ত অন্যায় কর্তে বসেছি। কিন্তু তবুও অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পার্লাম না। বরং এই বিরোধের ফলে লীলার সঙ্গ আরও বেশী দরকার হয়ে পড়ল—তখন মদ ধর্লাম।

"কেন, জান?—কখনও আমার অবস্থায় পড়লে

জান্‌তে। বেশ বুঝলাম, আমি বিশ্বাসঘাতক, বন্ধু নামের অপমান,—আমি মহা দুর্ব্বল। কিন্তু এও বুঝলাম, লীলাকে আমার চাই-ই; লীলাকে পেতে হ'লে চক্ষু-লজ্জা, বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব সমস্ত ডুবিয়ে দিতে হয়। হয় হোক্—তবু তাকে চাই। আমার সে অবস্থায় পড়লে বুঝতে। যখন তোমার একান্ত ভালবাসার পাত্র, তোমার আকাঙ্ক্ষিত একমাত্র বস্তু পরের হ'তে যায়, তখন কি ক'রে সয়তান মনের মধ্যে নৃত্য করে, তা কি জান? সে সময় শত্রু-মিত্র, উচিত-অনুচিত দেখবার সময় কোথায়?

"সে অবস্থায় পড়লে বুঝবে, তখন যদি কোথাও তোমার মনুষ্যত্ব একটু সজাগ হয়ে ওঠে, তাকে সুরার বিষাক্তপ্রবাহে ডুবিয়ে মারতে ইচ্ছে করে—কি না। তখন যদি তোমার মনের মধ্যে বিবেক ব'লে একটা কিছু তোমায় দংশন করতে আরম্ভ ক'রে দেয়, এই অমৃত ঢেলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—কি না!"

সরোজ চুপ করিল। আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলাম; সে চুপ করার পর তাহাকে বলিলাম, 'সে কথা যাক্, তোমার মদ খাওয়ার এইটিই কি একমাত্র কারণ? আমার কিছু লুকিও না।'

সে বলিল, "এ ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই।"

তখন তাহাকে বলিলাম,—"ভাই সরোজ, যদি তোমাকে আমি বলি যে, লীলাকে আমি চাই না—কখনও চাই নাই—তুমিই তাকে বিয়ে কর, তা হ'লে কি মদ ছাড়তে পারবে?"

তাহার মুখে-চোখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—"পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো!"

কিন্তু তাহার পর সে সংযত হইয়া বলিল, "বিমল, কিন্তু তুমি ভাই কেন এতটা করবে? দেখ, আমার এখন মন হচ্ছে, আমি যে রাস্তা পাকড়েছি, তাতে সময়ে হয় ত সমস্ত ভুলতে পারবো; কিন্তু তুমি লীলাকে ভালবাসো, তোমার জীবন কেন দুঃখময় করব? তুমি-ই তার চাইতে লীলাকে বিয়ে কর—যাও, সুখী হও গিয়ে। আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাবো।"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে কথা চলিলে ফল কিছুই হইবে না। খুব দৃঢ়তার ভাণ করিয়া বলিলাম, "সরোজ, আমার কথা শোনো; তুমি আমার বন্ধু; শুধু বন্ধু নও,—ভাই। তোমায় মাতাল হ'তে দেখলে কি কষ্ট হয় জান? যদি জান্‌তে, তা হ'লে বোধ হয় হ'তে না। আর লীলা? বল্‌লাম ত বহু দিন ভুলে গেছি তাকে। তুমি বোধ হয় জান না, আমার শীঘ্র বিয়ে হবার কথা হচ্ছে। এ কথা বোধ হয় তোমায় লুকিয়েছিলাম—ঠিক লুকিয়েছিলাম-ই বা বলি কি ক'রে; ইদানীং ত তোমায় আমায় দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। আমাদের গ্রামেরই এক মেয়েকে আমি বালিকা অবস্থা থেকে দেখে আস্‌ছি, সে এখন বিবাহযোগ্যা কিশোরী ও আমার স্বজাতীয়; তাকেই আমি বিয়ে করব, আর কিছু দিনের মধ্যে।

"লীলার কথা যে তোমাকে বলেছিলাম, সে কেবল রূপের মোহে। এখন সে মোহ কেটে গেছে, আমার মনে এখন লীলার চিন্তা কোথাও নাই।"

এই নিষ্ঠুর মিথ্যাকে ভাষা দিতে আমার বুকের মধ্যে যে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তাহার শক্তির ভয়ে আমি নিজেই ভীত হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, আমার এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সরোজের মুখ উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতেছে। কথা শেষ হইবামাত্র সে আমার হাত দুইটি আবেগভরে চাপিয়া ধরিল:—

"সত্যি বল্‌ছো, বিমল?"

"হাঁ ভাই। এও কি ঠাট্টা করবার কথা?"

সে কিছু বলিতে পারিল না; শুধু কৃতজ্ঞতা যেন জমিয়া দুইটি অশ্রুবিন্দু হইয়া তাহার চোখের কোলে টল্‌টল্ করিতে লাগিল।

ধীর, সস্নেহ কণ্ঠে আমি তাহাকে বলিলাম, "কিন্তু ভাই, এই এম্‌নি আমার গা ছুঁয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তুমি একবারে মদ ছেড়ে দেবে। ছিঃ ভাই, ভদ্রলোকের ছেলের লেখাপড়া শিখে কি মাতাল হওয়া সাজে?"

তখন সে গাঢ়স্বরে আমায় বলিল, "বিমল, ভাই, তুমি আমায় ঘৃণা কোরো না। আমায় তোমার বন্ধুত্বের সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত কোরো না। আমার সাহায্য কর, সান্ত্বনা দাও, সাহস দাও; এ নেশা আমি দু'দিনেই ছেড়ে দিতে পারবো। এখনও আমি এর বশীভূত হইনি।"

তাহার ভাবভঙ্গীর দৃঢ়তায় বুঝিলাম, এ মিথ্যা প্রবঞ্চনার চেষ্টা নয়। তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলাম। তাহার বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইবার পর আমার পদদ্বয় যেন আর আমাকে বহন করিতে চাহিল না।

ক্ষণিক ভালবাসার বশে ছোট ছেলে তাহার নূতন বন্ধুকে প্রিয়তম খেলনাটি দিয়া যেমন সেই পরিতুষ্ট বালকটির সানন্দ গতির দিকে নিরানন্দে চাহিয়া থাকে, তাহার পর সেই ক্ষণিক উত্তেজনা হ্রাস হইলে ঐ বালক তাহার প্রিয় খেলনাটির জন্য লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদে, কিন্তু আর তাহা ফিরিয়া পায় না। তাহার বন্ধু হয় ত তখন খেলনাটি পাইয়া উহার দাতার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়!—ইহাই জগতের নিয়ম। আমিও একবার সেই বালকের মত শূন্য বিষণ্নদৃষ্টিতে সরোজের বাড়ীর দিকে চাহিলাম।

৪

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। আমি একবার ভাগলপুরে সরোজের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার বাড়ী যাই। কোন সংবাদ দিয়া যাই নাই।

আমি 'সরোজ' 'সরোজ' বলিয়া ডাকিতেই একটি ৭।৮ বছরের সুন্দর ছেলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বলিল, "বাবা বাইরে গেছেন, একটু বসুন—এখুনি আস্‌বেন।" বলিয়া বালক আমায় লইয়া বাহিরের ঘরে আসিল। সে দেখিতে কি সুন্দর! মুখখানি ঠিক লীলার-ই মত। আমার স্মৃতি আরও ৮ বৎসর পিছাইয়া গেল; আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার মুখখানি সুন্দর বটে, কিন্তু যেন কিছু নিরানন্দ; তাহার সরল ব্যবহারে, হাসিতে, চাহনিতে যেন বিষাদ ফুটিয়া উঠিতেছে।

তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া দুই একটি কথা কহিতে লাগিলাম। হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—'তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন, খোকা?'

সে একটু ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, সবাই আছে। বাবা, মটু, লিলি, আমি!"

আমি বলিলাম, "তোমার মা?"

বুঝি আমার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়াছিল; ছেলেটি আমার দিকে তাহার বিষাদ-মাখান চক্ষু দুইটি তুলিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "মা, মা? মা ত অনেক দিন নেই! তিনি লিলির জন্মের সময় মারা গেছেন।" বলিয়া বালক উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে আমার কোলে মুখ ঢাকিল। আমি তাহাকে বুকে চাপিয়া চুমা খাইলাম। সে যখন শান্ত হইল, তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলাম, "বাবা, তোমার বাবার সঙ্গে আমি আজ আর দেখা করব না,—আর এক দিন আস্‌ব। এখন আমায় যেতে হ'ল, একটা কায আছে।"

আমি ফটকের বাহিরে আসিয়া চক্ষুর জল মুছিলাম। শেষবারের মত বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তখনও বালকের বিষণ্ন সজল চক্ষু দুইটি আমার দিকে নিবদ্ধ। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

অন্বেষণ

দিবা-নিশি কোথা খুঁজিস্ আমারে
আমি যে রে তোর পাশে.
নহি মন্দিরে নহি মস্‌জিদে
নহিক সে কৈলাসে।

যোগে বৈরাগে ক্রিয়া বা করমে
মিলিবি না মোর সনে,
খুঁজিতে জানিলে পাবি রে আমারে
নিমেষ অন্বেষণে।

কবীর কহিছে শুন ভাই সাধু
অন্তরে মোর স্বামী,
আমারি নিশাসে নিশাস তাঁহার
পড়িতেছে দিবা-যামী।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।

২
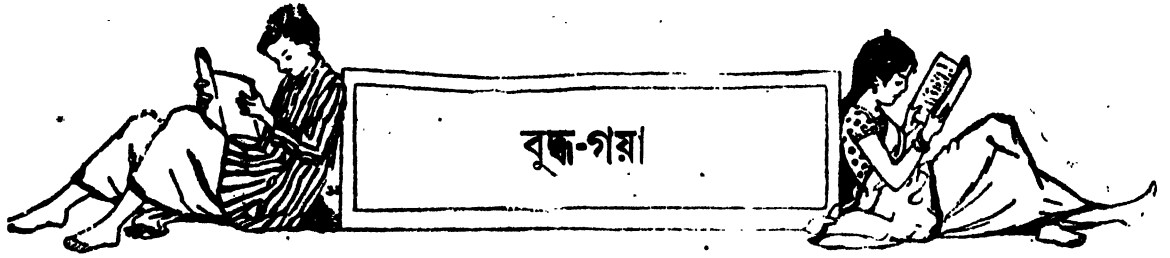
দ্রষ্টব্য স্থান

বুদ্ধ-গয়ায় অনেকেই গিয়া থাকেন, কারণ, এই স্থানে যাইবার জন্য গয়া হইতে একটি সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। ঘোড়ার গাড়ী ও মটর একেবারে মহাবোধি মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত যায়। বুদ্ধ-গয়ায় থাকিবার জন্য একটি সরকারী ডাকবাংলা আছে এবং বৌদ্ধ-তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে। তাহা ছাড়া বুদ্ধ-গয়ার হিন্দুমঠের মোহান্ত নিজের মঠের মধ্যে একটি বড় ধর্ম্মশালা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সকলেই থাকিতে পায়। মোহান্ত মহারাজ সকলেরই আহার্য্য যোগাইয়া থাকেন। গয়া হইতে যে পাকা রাস্তা বুদ্ধ-গয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা গয়া ছাড়াইয়া বরাবর ফল্গু নদীর ধারে ধারে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে গয়া সহরের বাহিরে অনেক খালি জমী ছিল, এখন কিন্তু গয়ার সহরতলীতে গয়া সহরের ধনী অধিবাসীরা অনেকগুলি বাগানবাগিচা তৈয়ারী করাইয়াছেন। এই সহরতলী ছাড়াইয়া এক দিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর বিস্তৃত বক্ষোদেশ, তাহার অন্য দিকে দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে আম্রকানন। পথটি এত সুন্দর যে, সকালে উঠিয়া অনায়াসে দেড় ঘণ্টায় গয়া বিষ্ণুপাদের মন্দির হইতে মহাবোধি মন্দিরে পৌঁছান যায়।

বোধগয়া বা মহাবোধি এখনও একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গয়ার পথ যেখানে বোধ-গয়ার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানে প্রথমে দক্ষিণে থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে পাওয়া যায়। বামে দুর্গের মত সুরক্ষিত দালানটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত গিরিশাখার সন্ন্যাসীদের মঠ। মঠটি প্রকাণ্ড এবং ইহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীরবেষ্টিত জমীর মধ্যে মোহান্ত মহারাজের অশ্বশালা, গোশালা, হস্তিশালা ও আস্তাবল; মধ্যে মধ্যে অতিথিশালা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির। এই জমীর মধ্যভাগে প্রকাণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত ত্রিতল মঠ। এই মঠে মোহান্ত ও তাঁহার শিষ্যরা বাস করিয়া থাকেন। মঠ ছাড়াইয়া গয়ার পথটি দক্ষিণদিকে একটি উচ্চ জমীর উপর উঠিয়াছে। এই উচ্চ জমীটি বুদ্ধ-গয়া বা মহাবোধির ধ্বংসাবশেষ।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষে লোপ পাইল, তখন যত্নের ও সংস্কারের অভাবে ফল্গু বা নৈরঞ্জনা নদীর বালি আসিয়া ছোটখাট মন্দির ভরিয়া গেল, বাকী রহিল কেবল মহাবোধির প্রধান মন্দিরের উচ্চ চূড়া। ছোটখাট মন্দিরগুলি পড়িয়া গেলেও এই বড় মন্দিরটি হাজার বৎসরের অধিক কাল দাঁড়াইয়া ছিল। সময়ে সময়ে এই উচ্চ স্তূপের স্থানে স্থানে খনন করা হইত এবং মন্দির বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও দেবমূর্ত্তি বাহির হইত। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Jonathan Duncan নামক এক জন ইংরাজের প্রবন্ধে বুদ্ধ-গয়ার নাম প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের প্রথমেই ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বৌদ্ধগণের এই প্রধান তীর্থে প্রধান মন্দিরের সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা ইহার প্রথম সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বুদ্ধ-গয়া ভ্রমণ করিয়া মন্দির সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার "Englishman" পত্রে বুদ্ধ-গয়ার ধ্বংসাবশেষের তখনকার অবস্থার একটি বিবরণ বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন মহাবোধি মন্দিরের ভিত্তি পর্য্যন্ত বালুকা ও ধ্বংসাবশেষে প্রোথিত ছিল। তখন গর্ভ-গৃহের মেঝে চারি পাশের জমীর অনেক নিম্নে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মদেশের লোক চারি পাশের এই উচ্চ জমী পাথর দিয়া ছাইয়া দিয়াছিল। তখন মন্দিরের শিখরে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত ছিল এবং সম্মুখের মণ্ডপ ও অর্দ্ধ-মণ্ডপের ছাদ পড়িয়া

গিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director General) মহাবোধির খনন ও সংস্কারের পরে "মহাবোধি" নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মহাবোধি মন্দিরের সংস্কারের পূর্ব্বের একখানি ফটোগ্রাফ ছাপা হইয়াছে (Mahabodhi, Pt, XXI)।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা Sir Ashley Edenএর আদেশে Sir Alexander Cunningham ও তাঁহার সহকারী J. D. N. Beglar মহাবোধিমন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সংস্কার-কার্য্য ১২ বৎসর পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। সংস্কারকালে Cunningham ও তাঁহার সহকারী Beglar মন্দিরের চারিদিকে যতদূর সম্ভব ততদূর খনন করিয়া অনেক বৌদ্ধ-মন্দির, মূর্ত্তি ও স্তূপ বা চৈত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা অবলম্বন করিয়া এখন মহাবোধির প্রাচীন ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে।

মহাবোধি মন্দির

খননকালে যে সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ;—

১। মহাবোধি মন্দির। এই মন্দিরটি ত্রিতল। প্রথম তলে একটিমাত্র কক্ষ আছে এবং এই কক্ষ বা গর্ভ-গৃহের মধ্যে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের একটি প্রকাণ্ড পাষাণময়ী প্রতিমা আছে। এই প্রতিমাটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ছিন্দবংশীয় এক জন রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমার পাদপীঠে তিন ছত্রে এই রাজার একটি শিলালিপি আছে। এই গর্ভগৃহের বাহিরে একটি ছোট মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই মণ্ডপের দুই পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিবার দুইটি সোপান বিদ্যমান। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে গর্ভ-গৃহের উপর আর একটি মন্দির বা কক্ষ ও তাহার সম্মুখে একটি মণ্ডপ আছে। দ্বিতীয় তলের কক্ষে বেদীর উপরে আর একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি বিদ্যমান। এই কক্ষের চারিদিকে খোলা ছাদ এবং তাহার চারিকোণে চারিটি ছোট মন্দির। এই চারিটি মন্দিরের পশ্চাতে দুইটিতে দুইটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। ত্রিতলের কক্ষটিতে এখন আর যাওয়া যায় না এবং প্রাচীনকালে ত্রিতলে উঠিবার সিঁড়ি ছিল কি না, তাহাও জানিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় তলের কক্ষের উপরে মহাবোধি মন্দিরের অতি উচ্চ চূড়া বা শিখর। মহাবোধি গ্রামের চারিদিক হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি নালন্দার ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত মন্দিরের মত। অনেকে মনে করেন যে, মহাবোধি মন্দির গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু নালন্দার নবাবিষ্কৃত মন্দিরের আদর্শের সহিত তুলনা করিলে এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মন্দিরটি বাঙ্গালার পালরাজবংশের রাজত্বকালে নির্ম্মিত।

২। মহাবোধি মন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুদীর্ঘ ইষ্টকের বেদী আছে। ইহা প্রায় ৫৫ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট চওড়া। এই বেদীর দুই দিকে অনেকগুলি পাথরের ছোট ছোট থাম আছে এবং এই সকল থামের বেদীতে (base) এক একটি অতি প্রাচীন অক্ষর

বুদ্ধের সংক্রমণ পথ—মহাবোধি মন্দিরের উত্তরদিক

আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইয়ানচুয়াংএর বিবরণ অনুসারে এই স্থানে গৌতম সিদ্ধার্থ সম্বোধি লাভ করিয়া পাদচারণা করিয়াছিলেন। এই জন্য বৌদ্ধগণের নিকটে এই স্থানটি অতি পবিত্র এবং ভগবান্ বুদ্ধের পাদনিক্ষেপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বেদীর উপরে অনেকগুলি পাথরের পদ্ম বসান আছে।

৩। মহাবোধি মন্দিরের পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চাতে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ ও তাহার নিম্নে এক খণ্ড পাষাণনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বেদী আছে। এই অশ্বত্থবৃক্ষই বোধি বৃক্ষের বংশধর। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া গৌতম বুদ্ধ সম্যক্ সম্বোধি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই বৌদ্ধ জগতে বোধিবৃক্ষ বলিয়া পরিচিত। আদি বোধিবৃক্ষ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়দেশের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। তখন মৌর্য্য সম্রাট অশোকের বংশধর মগধের রাজা পূর্ণ্যবর্ম্মন্ বা পূর্ণবর্ম্মা অনেক চেষ্টা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষের একটি শাখা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে কতবার বোধিবৃক্ষের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ের বোধিবৃক্ষটি ১ শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বৌদ্ধদিগের নিকটে এই বৃক্ষতল অতি পবিত্র স্থান। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণ বুদ্ধ-গয়ায় আসিয়া এই বৃক্ষমূলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণরা যেমন উপনয়নের পরে তিন দিন দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন এবং চতুর্থ দিবসে দণ্ড ত্যাগ করিয়া গৃহী হয়েন, বৌদ্ধরা সেইরূপ বোধিবৃক্ষ-মূলে তিনবার "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়েন এবং পরে গৃহে ফিরিয়া আবার গৃহী হয়েন। অশ্বত্থবৃক্ষের তিন দিকে অতি পুরাতন পাথরের রেলিং আছে।

৪। অশ্বত্থবৃক্ষের তলে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরের আসন আছে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে, এই প্রস্তরখানি বজ্রাসন অর্থাৎ এই পাথরের উপরে বসিয়া গৌতম

মহাবোধি মন্দিরের পাথরের রেলিং

সিদ্ধার্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পাথরখানির কারুকার্য্য ও ইহার উপরের এক ছত্রের প্রাচীন লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা উত্তর-ভারতের কুশানবংশীয় সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালে ক্ষোদিত হইয়াছিল। কুশানবংশের রাজারা যীশুখৃষ্টের জন্মের পরে আন্দাজ ২ শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সম্ভব যে, কুশানবংশের রাজারা প্রাচীন বজ্রাসনের পাথরখানি কারুকার্য্যে শোভিত করিয়া তাহার উপরে নিজেদের লেখা ক্ষোদাই করাইয়াছিলেন।

মহাবোধি মন্দিরের পূর্ব্বদিকের তোরণ

মহাবোধি মন্দিরের গর্ভ-গৃহ, বুদ্ধের সংক্রমণস্থান, বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন বুদ্ধ-গয়ার প্রধান তীর্থ। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের চত্বরের মধ্যে আরও অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান ও পদার্থ আছে ;—
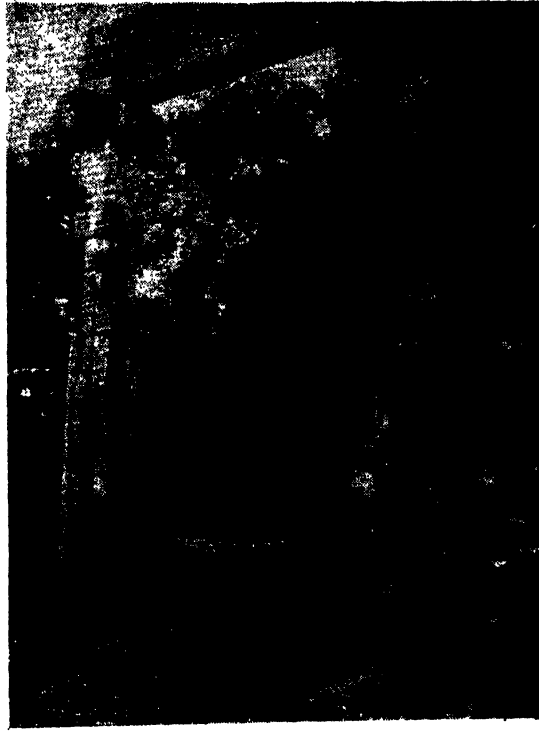
৫। মহাবোধি মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরের তোরণ। ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, কনিংহাম ও বেগলার ইহা মেরামত করিয়া আবার খাড়া করিয়া দিয়াছেন। দুইটি পাথরের থামের উপরে একটি পাথরের চৌকাঠ স্থাপিত। একটি পাথরের থামের অর্দ্ধেক পাওয়া যায় নাই, সেই জন্য নিম্নের অংশে ক্ষোদাইএর কায নাই। এমন সুন্দর ক্ষোদাইয়ের কায ভারতবর্ষে অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। এই তোরণের স্তম্ভগুলি ১৪ ফুট উচ্চ এবং চৌকাঠ সমেত ইহার খাড়াই ১৭ ফুট। চৌকাঠটি ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ইহার মধ্যের পথ ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া। এই সুন্দর ক্ষোদাইয়ের কায দেখিয়া কনিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে ক্ষোদিত হইয়াছিল। নালন্দার ধ্বংসাবশেষমধ্যে পাল রাজবংশের, বিশেষতঃ উত্তরাপথের সম্রাট দেবপালদেবের রাজত্বকালের যে সমস্ত ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বুদ্ধ-গয়ার এই তোরণটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর।

বোধিবৃক্ষ ও মহাবোধি মন্দিরের দক্ষিণদিকের রেলিং

৬। মন্দিরের তোরণের উত্তরদিকে এবং মহাবোধি মন্দিরের দুয়ারের উত্তর-পূর্ব্বে একটি উচ্চ ঢিবির উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই মন্দিরটি 'তারাদেবীর মন্দির' নামে পরিচিত।

তারাদেবীর মন্দিরের শিখর বা চূড়া দেখিতে ঠিক মহাবোধি মন্দিরের শিখর বা চূড়ার মত অথচ ইহা মহাবোধি মন্দিরের অন্ততঃ ৩ শত বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৭। যে পাথরের রেলিংএর ভিতরে মূল মহাবোধি মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহার বাহিরে মন্দিরের প্রাঙ্গণ বা উঠানের চারিদিকে একটি বহুদূর-বিস্তৃত ইষ্টকের প্রাচীর আছে, ইহা লম্বায় প্রায় ৪ শত ৮০ ফুট এবং চওড়ায় ৩ শত ৩০ ফুট। মহাবোধি মন্দিরের পুরাতন উঠান বা অঙ্গন এখনও সমস্ত খুঁড়িয়া বাহির করা হয় নাই। এখন যে উঠানটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কনিংহাম ও বেগলারের খোঁড়া হইতে বাহির হইয়াছিল। এই উঠানের চারিদিকে এখনও উচ্চ ধ্বংসের স্তূপ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার উপরে পুরাতন নূতন অনেক বাড়ীঘর হওয়ায় আর খুঁড়িবার উপায় নাই। উঠানের যেটুকু খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহার চারিদিকে চারিটি বড় সিঁড়ি আছে। উত্তরদিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ডাকবাংলা, মিউজিয়ম, মহাবোধি মন্দির-রক্ষকের বাড়ী ও বুদ্ধগয়ার শৈব মহান্তগণের একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ভূতপূর্ব্ব মহান্তদের সমাধি, শৈব মঠের প্রধান তোরণ পার হইয়া নৈরঞ্জনা বা ফল্গু নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া যায়। দক্ষিণদিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বুদ্ধ-পোখর পুষ্করিণী ও উরেল বা উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। পশ্চিমদিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে আধুনিক বৌদ্ধদের একটি মন্দির ও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণের জন্য নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হওয়া যায়। আধুনিক বৌদ্ধগণের মন্দিরের আগে একটি জাপানী ও অনেকগুলি আধুনিক বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল। মন্দিরের উঠানের যতটুকু খোঁড়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক ছোট-খাট মন্দির, স্তূপ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। তাহার নিদর্শন পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দেওয়া যাইবে।
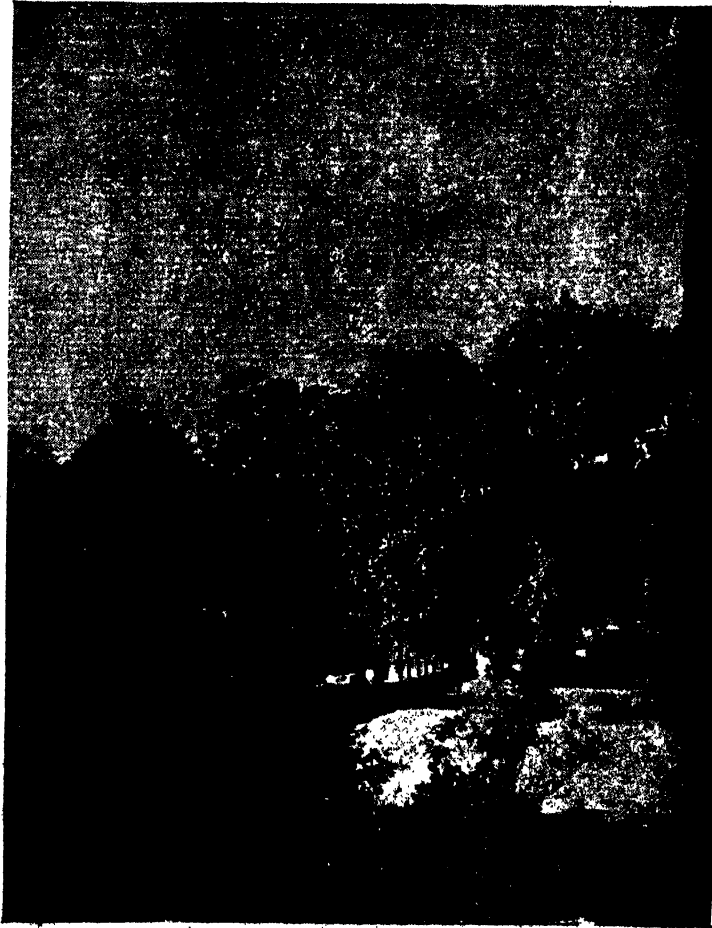
বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন

এই উঠানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের যে ছবিটি ছাপা হইল, তাহাতে উঠানের যে অংশ খোঁড়া হয় নাই, তাহার উপরের খোলার ঘর এবং যে অংশটি খোঁড়া হইয়াছে, তাহাতে ছোট ছোট মন্দিরের ভিত্তি ও স্তূপ বা চৈত্য নামক বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উঠানের মধ্যভাগে, মহাবোধি

মন্দিরের উত্তরদিকে একটি প্রকাণ্ড গোল চাতাল আছে। ইহার আকার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ইহা একটি বড় রকমের চৈত্য বা স্তূপের ভিত্তি। গোল চাতাল-টির উপরে যে সকল হিন্দু এখনও সম্পূর্ণরূপে গয়া-পরিক্রমা করিয়া থাকেন, তাঁহারা পিতৃপিণ্ড দেন। আমি যতবার বুদ্ধগয়ায় গিয়াছি, ততবারই এই স্থানে মগধবাসী বা বিহারীদের পিণ্ড দিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালীদের বড় একটা দেখিতে পাই নাই। বিহারীরা—গয়া-শীর্ষে যে রকমভাবে পিণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ শালপাতার ঠোঙায় যবের ছাতুর সহিত মধু মিশাইয়া—সেই ভাবে পিণ্ড দেন। বিহারীরা আমাদের বাঙ্গালীর মত ভাতের পিণ্ড দেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব অনুসারে গয়াপরিক্রমায় মহাবোধি-মূলে পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী বাবুরা এখন সচরাচর গয়ার পাণ্ডাকে কন্‌ট্রাক্ট দিয়া গয়াকৃত্য সারিয়া থাকেন, সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহাদের মহাবোধিমূলে বড় একটা দেখা যায় না।

তারাদেবীর মন্দির

বৌদ্ধের প্রধান তীর্থ বুদ্ধ-গয়ার মহাবোধিমূলে স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন হিন্দুর পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মৌলিক গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা কিছু সস্তা হওয়ায়, এ বিষয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা এখনও মনঃসংযোগ করিবার অবসর পায়েন নাই। পরে বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের প্রবেশ উপলক্ষে গয়ার শ্রাদ্ধের কথা বলিব। এখন খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধগয়ায় হিন্দু মহান্তের অত্যাচারে বৌদ্ধরা তাঁহাদের প্রধান তীর্থ বৌদ্ধগয়ায় নিজেদের ধর্ম্মমত অনুসারে উপাসনা করিতে পায়েন না, কিন্তু গত ২০ বৎসর যাবৎ আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, কদাচারী বৌদ্ধের অনাচারের জন্য অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ যথারীতি মহাবোধি শ্রাদ্ধ এবং জনার্দ্দনের নবম অবতারের পূজা করিতে পায়েন না। যে সকল আধুনিক হিন্দু, বৌদ্ধ, ভিক্ষু, অনাগারিক শ্রীযুত ধর্ম্মপালের বক্তৃতাপ্রবন্ধে মোহিত হইয়া বুদ্ধগয়ার মন্দির ও প্রাঙ্গণ একেবারে বৌদ্ধদিগের হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ

(ক) আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের মতে শূকরের বা মেষের চর্ব্বি অপবিত্র। সিংহল ও

মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তরদিক—দরিদ্র হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পিণ্ড দিবার স্থান

অনায়াসে প্রদান করিলে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং হিন্দুগণ বিগ্রহ দর্শন ও মহাবোধি-শ্রাদ্ধ করিতে পাইবে না।

(খ) মহাবোধিমূলে পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃপিণ্ডপ্রদান হিন্দুধর্মের একটি প্রাচীন প্রথা; কিন্তু অনেক সময়ে সিংহল ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অত্যাচারে হিন্দুরা মহাবোধিমূলে পিণ্ড দিতে পারেন না। এই সকল দেশের বৌদ্ধভিক্ষুরা সময়ে সময়ে দলে দলে অনার্য্য উপাসক ও উপাসিকাদের সঙ্গে আসিয়া এ রকম ভাবে মহাবোধি বৃক্ষের মূল অধিকার করিয়া বসেন যে, দরিদ্র হিন্দু তীর্থযাত্রীরা মহাবোধিমূলে পিণ্ড দিতে আসিতে পায় না। যে সকল হিন্দু মহাবোধিমূলে পিণ্ড দিতে আইসে, তাহারা অনেকেই দরিদ্র নিরক্ষর বিহারী কৃষক। তাহারা বৌদ্ধভিক্ষুদের এবং ধনী ব্রহ্ম ও সিংহল দেশবাসীদের তাড়া খাইয়া দূরে পূর্ব্ববর্ণিত গোলাকার চাতালের উপর পিণ্ড দিতে বসে। আর্য্যাবর্ত্তের কেন্দ্রে এই সকল অনার্য্যবংশোদ্ভূত বৌদ্ধাচার্য্যগণের দম্ভ ও বিনয়ের

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা শূকরের চর্ব্বিমিশ্রিত বাতি মহাবোধি মন্দিরের গর্ভগৃহে জ্বালাইয়া থাকেন এবং তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ লামারা বসামিশ্রিত অন্ন ভোগ দিতে লইয়া আইসেন, এই জন্য বহু হিন্দুনরনারী শাস্ত্রোক্ত ষোড়শ বা দশোপচারে মহাবোধি মন্দিরের বিগ্রহকে পূজা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কারণ, আনুষ্ঠানিক হিন্দুর নিকটে অশুচি দ্রব্যের অবস্থানের জন্য পবিত্র পূজার উপচারও অপবিত্র হইয়া যায়। অনার্য্য ব্রহ্মদেশবাসী ও সিংহলবাসী আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া আর্য্যধর্ম্মের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার পাইবে কেন, তাহা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-সভা ও হিন্দু মহাসভা কোনও দিন বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কি?

বৌদ্ধগণ আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অনার্য্য এবং দেশভেদে ব্রহ্ম, সিংহল ও তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল কুলাচার ও দেশাচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহার অনেকগুলি অনার্য্য। অনার্য্য বৌদ্ধগণকে হিন্দুর এই পবিত্রতীর্থে সম্পূর্ণরূপে অধিকার

বুদ্ধগোবর্দ্ধ—দূরে মহাবোধি মন্দির

অভাব দেখিয়া আমি নিজে অনেকবার বিস্মিত হইয়া গিয়াছি। এই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মনে করেন যে, বুদ্ধগয়া তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং হিন্দুর তাহাতে কোনই অধিকার নাই। তাঁহারা এবং যে সকল হিন্দু তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, বজ্রযান ও মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্ব তন্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্মের মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তন্ত্রোক্ত হিন্দুধর্ম্ম যে এক দিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শিলালিপি ও তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। ইংরাজের রাজ্যে এবং হিন্দু মহান্তের অধিকারে বুদ্ধগয়ায় হিন্দু তীর্থযাত্রীর যখন এইরূপ ঘোর দুর্দ্দশা, তখন অনাগারিক ধর্ম্মপাল প্রমুখ অধিকারপ্রয়াসী বৌদ্ধাচার্য্যগণের করকবলে মহাবোধি মন্দিরের অধিকার ন্যস্ত হইলে হিন্দুরা বোধ হয় মন্দিরে বা মহাবোধিমূলে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৮। বুদ্ধপুষ্করিণী বা বুদ্ধপোখর এখনকার মন্দির-প্রাঙ্গণের বাহিরে অবস্থিত একটি বড় দীঘি। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া এই পুষ্করিণীর উত্তরধারে উপস্থিত হওয়া যায়। পুষ্করিণীর উত্তরতীরটি গোঁসাই বেলপৎ গিরি নামক এক জন শৈব সন্ন্যাসী বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই ধারের মধ্যস্থলে ঘাট ও ঘাটের উপরে চাতালে একটি ঘর আছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বেলপৎ গিরি বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীযুত কৃষ্ণদয়াল গিরির গুরুভাই ছিলেন। বুদ্ধপোখর গ্রামের চারিদিকে এইরূপ অনেকগুলি দীঘি আছে। বুদ্ধপোখরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘোষালচক উবেলদীঘি ও তেস্কাতাল এবং পশ্চিমদিকে জোখরতাল দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্তি-সাধনার অগ্নি-পরীক্ষা

বটকৃষ্ণ পাল

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত বটকৃষ্ণ পাল স্মৃতিসৌধ (অস্ত্র-চিকিৎসাগার)
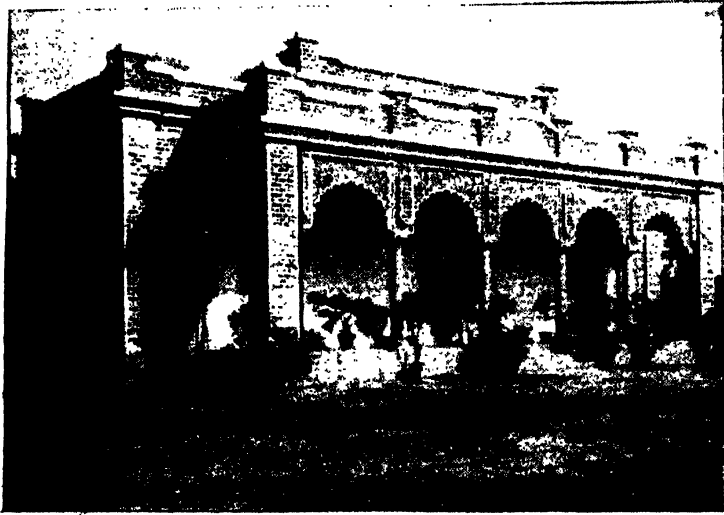
সেবাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা *

শারীরিক "রক্ষাকবচ" বা শরীররক্ষার মূলমন্ত্র সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে হইবে—শারীরিক অমঙ্গলের অর্থাৎ রোগের মূল কারণ কি ?

জ্বরবিকারই বলুন, নিউমোনিয়াই বলুন, আর কলেরা বসন্তই বলুন—প্রত্যেক রোগেরই মূল কারণ এক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-কীটাণু। আধুনিক বিজ্ঞানমতে ইহাই স্থির হইয়াছে। এই সকল কীটাণু এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন চক্ষুতে দেখা যায় না। এই ক্ষুদ্র কীটগুলি জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বদা বাস করে। আমরা যে বাতাস শ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, যে জল পান করি, যে ভক্ষ্য ভোজন করি—তৎসমস্তই কীটাণুপূর্ণ। এমন কি, আমাদের দেহ, আমাদের বেশভূষা, বাসগৃহ, শয্যা—সমস্তই কীটাণু দ্বারা আচ্ছাদিত। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই, এমন কোন বস্তু নাই, এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহা একবারে কীটাণুশূন্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জল, স্থল, আকাশ সর্ব্বস্থান সর্ব্বসময়েই কীটাণু-পরিব্যাপ্ত, তাহা হইলে আমরা নিত্য রোগাক্রান্ত হই না কেন ? আমরা বাঁচিয়া আছি কিরূপে ?

যিনি রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি রোগ আরোগ্যের উপায়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি রোগের কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কীটাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়ও সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় মানুষ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে দোষ কাহার ? সৃষ্টিকর্ত্তার, না মানুষের ?

শাসনের—শাস্তির ভয় না থাকিলে এ জগতে কেহই সোজা পথে চলে না, এমনই মানব-প্রকৃতি।

রোগ সৃষ্টিকর্ত্তার শাসনবিশেষ। এই শাসনভার প্রকৃতি মাতার হস্তে অর্পিত। প্রকৃতি মাতার হৃদয় করুণায় পূর্ণ অথচ বড়ই দৃঢ়। আজ্ঞাবাহী সন্তানকে তিনি সর্ব্বদাই কোলে তুলিয়া রাখেন, কোন শত্রুকে, কোন রোগকে সন্তানের কাছে আসিতে দেন না।

কিন্তু যদি কোন সন্তান অবাধ্য হয়—জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, যদি কোন সন্তান তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে কায করে, তিনি খড়্গহস্ত হইয়া সেই সন্তানকে শাসন করেন। তিনি এতই দৃঢ়।

মায়ামুগ্ধা গর্ভধারিণী মায়ের ন্যায় তিনি অন্ধ নহেন। প্রকৃতি জননী দিব্যদৃষ্টিতে সন্তানের ভাবী অকল্যাণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে সংযত করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। দুষ্ট সন্তানকেও শোধন করিয়া, সন্তানের সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান মাতৃক্রোড়ে তাহাকে সর্ব্বদা রাখিবার জন্য তিনি সদা লালায়িতা। কীটাণুর আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষের রক্তে এক প্রকার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শক্তির নাম জীবনীশক্তি বা Vitality.

রক্তে দুই প্রকার চাক্তি আছে ;—সাদা ও লাল। এই সকল চাক্তি যে তরল পদার্থে ভাসমান থাকে, তাহাকে সিরাম বা plasma বলে। এই plasma ও সাদা চাক্তিতেই মানুষের জীবনীশক্তি নিহিত। নিশ্বাসবায়ু, পানীয় ও ভক্ষ্য দ্বারা যে সকল কীটাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, জীবনীশক্তির প্রভাবে রক্তের সাদা চাক্তি ও plasma তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া নষ্ট করে অর্থাৎ এই জীবনীশক্তিই আমাদের শারীরিক রক্ষাকবচ।

এই জীবনীশক্তি বাড়ে বা কমে কিসে ?

১। সদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ জল পান ও বিশুদ্ধ ভক্ষ্য ভোজন করিলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এই সকলের যে-কোনটির অভাব বা অল্পতা ঘটিলে জীবনীশক্তি কমিয়া যায়।

"আজকাল" দেশের হাওয়া দিন দিন খারাপ

* ৭ই নবেম্বর ১৯২৪ কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে বটকৃষ্ণ-পাল স্মৃতিসৌধের (অস্ত্রচিকিৎসাগার) দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে ডাঃ শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়প্রদত্ত বক্তৃতা।

হইতেছে। সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। বিশুদ্ধ পানীয় জল অনেক স্থানেই পাওয়া যায় না। এ বৎসর গ্রীষ্মকালে দেখিয়াছি, অনেক পল্লীগ্রামে পানীয় জলের কথা দূরে থাক্—শৌচাদির জলেরও অভাব ঘটিয়াছিল। তথায় গ্রামান্তর হইতে জল আনিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে হইত। বিশুদ্ধ খাদ্য এতই দুর্ম্মূল্য যে, সাধারণ গৃহস্থের ভাগ্যে তাহা মিলিয়া উঠা অসম্ভব। অধিকাংশ স্থানেই খাঁটি দুগ্ধ ১৲ টাকায় ৩ সেরের বেশী পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ ঘৃত ১৲ টাকায় দেড় পোয়ার বেশী নয়; খাঁটি সরিষার তৈল ৸৹ বার আনা সের। বর্ত্তমান অর্থাভাবের দিনে কয় জন গৃহস্থ এই বিশুদ্ধ ঘৃত স্বয়ং নিত্য খাইতে বা সন্তান-সন্ততিগণকে খাওয়াইতে পারেন? এমন স্থানও আছে, (যথা কলিকাতা) যেখানে উপযুক্ত মূল্যেও খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল ও বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবে আমাদের জীবনীশক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এই ত এক কথা। তাহার পর—

২। প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বদা পালন করিলে, সর্ব্বদা রৌদ্র, বায়ু, শীত-উষ্ণ সহ্য করিলে, সর্ব্বথা প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলে, আহার-বিহার, শয়ন ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বদা মিতাচার অবলম্বন করিলে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার কথায় কথায় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রৌদ্র বায়ু অঙ্গে লাগিতে না দিয়া সর্ব্বদা অঙ্গাবরণে গাত্র আবৃত করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলে এবং আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে যথেচ্ছ আচরণ করিলে জীবনীশক্তি কমিয়া যায়।

প্রাণধারণ করিতে হইলে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ-যন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে; নচেৎ প্রাণ থাকে না—থাকিতে পারে না; সেইরূপ শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে প্রকৃতি মাতার অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ স্বাস্থ্য থাকে না—থাকিতে পারে না। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না। ধর্ম্মোপার্জ্জন না হইলে প্রকৃত সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। তাই, ফলমূলাশী ঋষি অনাহারক্লিষ্টা ব্রতপরায়ণা অপর্ণা কুমারী গৌরীকে গুরুগম্ভীর স্বরে এক দিন বলিয়াছিলেন,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

স্বাধীনতার হিড়িকে পড়িয়া, অহঙ্কারবশে আজকাল আমরা প্রকৃতি মাতার অধীনতা মানিতে চাহি না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘনের ফলে আজ আমাদের ঘরে ঘরে রোগ, অকাল-মৃত্যু, শোক, আর্ত্তনাদ। দেশ এত দরিদ্র যে, সুপথ্য ও সুচিকিৎসার উপায়বিধান করিতে পারে না। দেশে রোগের প্রাবল্য হেতু অন্ধ-আতুর দীন-দরিদ্রের সংখ্যা নিত্য পুষ্টি লাভ করিতেছে।

আমাদের শাস্ত্রেই আছে, দরিদ্রনারায়ণের সেবাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এ যুগে এই সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আজ ভারতের দিকে দিকে নানা রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কত অনাথ-আতুর সুখ ও শান্তি লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছে। সেবাশ্রমের কর্ম্মীরা বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আতুরসেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছেন।

পুণ্যতীর্থ বারাণসীর রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে পরলোকগত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ এক অস্ত্রচিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর উহার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাই যথার্থ দরিদ্র-আতুর-সেবা। এই ভাবে যদি দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ অর্থের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দেশের অনেক দুঃখ-শোকের নিবৃত্তি হয়। স্বর্গীয় মহাপ্রাণ বটকৃষ্ণ পালের নাম অক্ষয় হইয়া রহিবে।

ঐশ্বর্য্যের অন্ধত্বে অনেকেই দীন-দরিদ্রকে হেয় জ্ঞান করেন। তাই অন্ধ-আতুর দীন-দরিদ্রের কোথাও আশ্রয় মিলে না। কিন্তু এই দীন-দরিদ্রের সেবা করিলে ভগবানের সেবা করা হয়।

সেবা-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, ভগবৎপ্রাপ্তির ইহাপেক্ষা সহজ উপায় নাই। আর্ত্ত, পীড়িত, নিরন্ন ও অভাবগ্রস্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ নানাভাবে দিয়া গিয়াছেন।

সেবা-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক, কিন্তু কাল-ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালায় এই সেবা-ধর্ম্ম ক্রমশঃ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী ভোগ ও বিলাসে অভ্যস্ত হইয়া তাহার জাতীয় জীবনধারা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। যুগাবতার পরমহংস রামকৃষ্ণদেব আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালীর কানে সেবা-ধর্ম্মের মহামন্ত্র প্রদান করিলেন—হৃদয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবার ভাব আবার জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গালী আত্মস্থ হইয়া এই পবিত্র মন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল। পরমহংসদেবের যোগ্য শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত স্বামীজী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদেশে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, 'যত জীব, তত শিব,' দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় সকল ধর্ম্ম সার্থক হয়। যাঁহার চরণ-তলে বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই পবিত্র শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার সেই মন্ত্র প্রচার করিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীরা সেই মহৎ ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে দেশে দরিদ্র-নারায়ণ,—আর্ত্ত-পীড়িতদিগের সেবার জন্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন, দলে দলে শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায় সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিল। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠিত কোনও সেবাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্তব্ধ-বিস্ময়ে তত্রত্য সেবা-পরায়ণ যুবকদিগের অক্লান্ত পরিচর্য্যা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাস্তবিক, শুধু বাঙ্গালী কেন, যে প্রদেশের যে কোনও যুবক যে কোনও রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে দরিদ্র, পীড়িত ও আর্ত্তের পরিচর্য্যার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপে ত্যাগ ও সেবার অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

পরলোকগত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে রামকৃষ্ণসেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সেবাশ্রমে অস্ত্রচিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অস্ত্রচিকিৎসাগারে পীড়িত দরিদ্র-নারায়ণ চিকিৎসিত হইতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে ইহাকেই দরিদ্র-নারায়ণের সেবা বলে। দেশের ধনকুবেরগণ যদি এমনই ভাবে আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার জন্য তাঁহাদের ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করেন, তাহা হইলে অভাবগ্রস্ত দেশের নানা দুর্দ্দশার মোচন হয়। পরলোকগত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রচিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। ইহা দেশ ও দেশবাসীর কম গৌরবের বিষয় নহে।

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়।
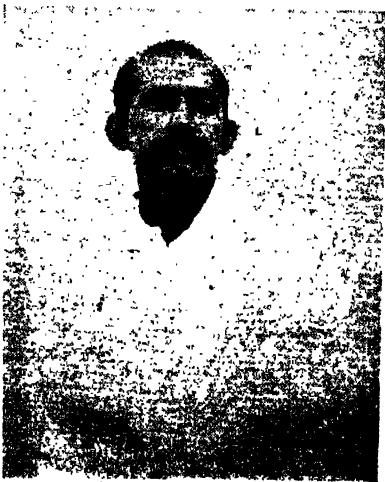
শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মাদারীপুরের শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম ফরিদপুর জিলায় সুপরিচিত। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে তিনি "রায় সাহেব" উপাধি ও বহু টাকা আয়ের ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেসের কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরবাসীরা তাঁহাকে এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর ফরিদপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া যোগ্যপাত্রেই সম্মান অর্পণ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরে যাইয়া মহাত্মা গন্ধী সুরেন্দ্রবাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসরের কথা *

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আপনারা আমাকে মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ-বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত করায় আমি প্রথমেই আপনাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। আমার এই কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন যে নিতান্তই নিয়মানুগ এবং অকারণবিনয়বাহুল্য-সঞ্জাত, অনুগ্রহ করিয়া তাহা মনে করিবেন না। কারণ, জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ সংবাদপত্রের কার্য্যে—রাজনীতি-চর্চ্চায় ব্যয় করিয়া আমি আপনিই ভুলিতে বসিয়াছি যে, আমি সাহিত্য-সেবী। যাঁহার বাদশাহী পাঞ্জার ছাড় লইয়া তরুণ যৌবনে আমি বঙ্গ-ভারতীর দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলাম, সেই নবীনচন্দ্র যাহাকে "রাজনীতি-মরু" নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলুব্ধ হইয়া যাহারা পরিভ্রমণ করে, তাহাদের সাহিত্যসেবা সরসতাশূন্য হয়।

মেদিনীপুরের সহিত আমার প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় রাজনীতিসূত্রে। যাঁহার পুণ্য আজ বিশুদ্ধ পানীয়জলরূপে মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইতেছে, আমার সেই পরলোকগত সুহৃদ, উদারহৃদয়, দেশ-সেবক রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয়ের পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে মেদিনীপুরে আসিয়াছিলাম। কিন্তু পরাধীন বিজিত জাতির রাজনীতি চর্চ্চায় যদি বা উত্তেজনা থাকে—আনন্দ থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শরশয্যায় থাকিয়া মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে হয়—সে জন্য কি কঠোর সাধনার ও তীব্র ত্যাগের প্রয়োজন, তাহা আজ এ দেশে কাহারও অবিদিত নাই। মেদিনীপুরও সে সংগ্রামে সৈনিক যোগাইতে ত্রুটি করে নাই এবং বাঙ্গালার মুক্তির ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রাজনীতিচর্চ্চায় যেমন আনন্দের একান্ত অভাব—সাহিত্যসেবায় তেমনই অনাবিল আনন্দ। সেই জন্যই আপনাদের—সাহিত্য-পরিষদের আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই; পরন্তু অবকাশের অভাবজনিত ত্রুটি অনিবার্য্য জানিয়াও তাহাতে সম্মত হইয়া আসিয়াছি। আশা এই যে, আপনারা আমার উপর যে ভার অর্পিত করিয়াছেন, আপনারাই সাহায্য করিয়া সে ভার আমার পক্ষে লঘু করিয়া দিবেন এবং অতিথির কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি ঘটিলেও সে ত্রুটিতে বিরক্তি বোধ করিবেন না।

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের আহ্বানে আমার আনন্দিত হইবার বিশেষ কারণও আছে। এই পরিষদ বিনয়বশে আপনাকে কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদের শাখা বলিয়া অভিহিত করিলেও ইহা ত স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করিতেছে। খিতশতশাখ বটবৃক্ষের শাখা যেমন আপনার অঙ্গ হইতে ভূমিতে মূল প্রেরিত করিয়া মূল বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও আপনি আপনার পুষ্টির উপায় করিতে পারে, এই শাখাও আজ তেমনই মূল পরিষদ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। এ বিষয়ে মেদিনীপুর বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। সাহিত্যবিষয়ে বাঙ্গালা কখন রাজধানীর প্রাধান্য স্বীকার করে নাই—পরন্তু যে রাজধানীতে আবর্ত্তিত রাজনীতি প্রবাহে শান্তি ও সাহিত্যের বিপদ হয়, সেই রাজধানী হইতে দূরে বাঙ্গালার কলধৌতপ্রবাহবৎ তটিনীর তীরে, বাঙ্গালার ছায়াঢাকা পাখীডাকা গ্রামে বসিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ঘনরাম, কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর, জ্ঞানদাস—রাজধানীর সঙ্গে ইঁহাদের সাহিত্যগত কোন সম্বন্ধই ছিল না। যখন মুসলমানের প্রাধান্য পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে নিদাঘ-দিনান্তের প্রলয়-মূর্ত্তি মেঘের মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছে এবং বিদেশী বণিক ইংরাজের সৌভাগ্যরবি পূর্ব্বদিকে অরুণকিরণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তখনও মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হইলেও ভারতচন্দ্র নবদ্বীপকে "ভারতীর রাজধানী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সাহিত্যিকগণ বাঙ্গালার সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালের মেদিনীপুরের সাহিত্য-সম্পদ যে সামান্য নহে, তাহা গত বৎসর এই আসন হইতে আমার পরম স্নেহভাজন কোবিদ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ লাহা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুরের সহিত আমার প্রত্যক্ষভাবে পরিচয়ের পূর্ব্বেই রামেশ্বরের কাব্যে পরোক্ষভাবে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যসুধারস তাঁহার সময়েও যেমন, আজও তেমনই বাঙ্গালী কাব্যামোদীকে আকৃষ্ট করিয়া আনিতেছে—তাহারা যেন "মুরারি-মুরলীধ্বনিমুগ্ধ গোপাঙ্গনা।" মেদিনীপুরে আজও যে সাহিত্যানুরাগ আমার মত বিস্মৃত সাহিত্যিককে সন্ধান করিয়া আনিয়াছে, তাহা যে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আজ আপনাদের আহ্বানে আমার অনতিদীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনের কত স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; কত কথা—কত ব্যথা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া উঠিতেছে! এ যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর কথা—এই অর্দ্ধশতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সাহিত্যক্ষেত্রে কত দিক্‌পালের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে; কত ঘটনা সাহিত্যে আপনাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—কত ঘটনায় সাহিত্যিক প্রতিভা প্রোজ্জ্বল হইয়াছে, সাহিত্য-মন্দাকিনী দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ'—সাহিত্যের বন্দরে কত পণ্য আনিয়া দিয়াছে!

যে মধুসূদন য়ুরোপে প্রবাসে থাকিয়া কপোতাক্ষীকে "দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে" বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে;
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে"

সেই মধুসূদনের সেই কপোতাক্ষীতীর আমার জন্মভূমি বলিয়া আমি গর্ব্বানুভব করিলেও তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; তবে আমি দূর হইতে আমার সেই পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিককে পূজা করিবার অধিকারমাত্র লাভ করিয়াছি।

যখন মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙ্গালার দুই জন দিক্‌পাল দুই দিক্ অন্ধকার করিয়া লোকান্তরিত হয়েন, তখন সমগ্র বঙ্গদেশে যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সংযুক্ত করিবার কথা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। নানা কারণ বিদ্যাসাগরের নাম তখন বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত—তাঁহার 'বর্ণপরিচয়' তখন শিশু-বোধককে বিস্মৃতির প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছে—তাঁহার 'বেতালে' অনেকের বোধের উন্মেষ হইয়াছে। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য তখন আমাদের ছিল না। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের

---

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনে (৯ই ফাল্গুন) সভাপতির অভিভাষণ।

সহিত সীমাহীন সাহসের সমন্বয় করিয়া তিনি কিরূপে একক য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের যুক্তিকে পরাস্ত করিয়া ভারতীয় সভ্যতার, সাহিত্যের ও শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি প্রস্তরের ভাষা বুঝিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তখনও বুঝিবার যোগ্যতা আমরা অর্জ্জন করি নাই। তবুও ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলাল উভয়কে হারাইয়া বাঙ্গালী যেরূপ কাতর হইয়াছিল, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম :—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে ;
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত ১২৯৩ সালে যখন পরলোকগত হয়েন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার জন্য বাঙ্গালার শোকোচ্ছ্বাস তত প্রবল হয় নাই।

ইঁহাদিগের পরই বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করিতে হয়, যিনি "বাঙ্গালা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গালা পাঠকদিগের সুহৃদ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তান"—যিনি "জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই নূতন অবকাশে, নূতন উদ্যমে, নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত" হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে শোকের অন্ধকার ব্যাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল এবং তিনি যে আমার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা পরীক্ষা করিয়া আমাকে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া আজ যদি আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তবে, আশা করি, সাহিত্যিক সমাজ আমার এই ভাবের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের কোন বিভাগের দ্বার রুদ্ধ রাখেন নাই। তাই তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালার ভাবকেন্দ্র হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীকে "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন ; আনন্দমঠে মা'র মূর্ত্তি—প্রভাতালোক-প্রফুল্ল মন্দিরে মা'র ধ্যান-রূপ বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন—"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত ; দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" তিনি বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছেন, সে যে মা'র সন্তান, তাহাতে দুঃখদৈন্যজাড্য তাহার পক্ষে লজ্জার ও কলঙ্কের কারণ। তিনি এ সবই বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা করিয়া গিয়াছেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যকে তাঁহার ভাবের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা যখন তাঁহার রচিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করি—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ;
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্"

তখন মা'কে প্রণাম করিবার পরই মা'র সেই ভক্ত সন্তানের উদ্দেশে আমরা প্রণাম করি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বৎসর লোকান্তরিত হয়েন, তাহার পরবৎসর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেন।

বিহারীলাল সাহিত্যসাধনায়—ভারতীর সেবায় এমনই তন্ময় ছিলেন যে, বাহিরের লোকের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ তত অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে যে, 'সারদা-মঙ্গলের' কবি এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গুরু। তিনি সারদার ধ্যান করিয়াছিলেন :—

"কে তুমি ত্রিদিব-দেবী বিরাজ হৃদি-কমলে !
মুখখানি ঢল ঢল,
আলুথালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে।"

কিন্তু 'সারদা-মঙ্গল' বিহারীলালের একমাত্র বৃহৎ রচনা নহে। বাঙ্গালী কবির 'বঙ্গসুন্দরী' বাঙ্গালীর মনের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তিনি নারীর বন্দনা-গীত গাহিয়াছেন—

"প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণা-নিঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর এক জন কবি ব্যতীত কেহ এমন ভাবে নারীর বন্দনা করিতে পারেন নাই। সেই দ্বিতীয় কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি তাঁহার 'মহিলা'র অবতরণিকায় লিখিয়াছিলেন—

"বর্ণিতে না চাই হ্রদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্ম্মল নির্ঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ণন ;
হৃদয়ে জেগেছে জ্ঞান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে আত্মস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালী বিদেশী ভাবের প্লাবনে আপনার সঞ্চিত সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিল, মনে করিতেছিল, অন্ধ অনুকরণে জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সেই সময় ভূদেব তাহাকে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রচনায় এ দেশের আচারব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালীকে কেন্দ্রস্থ করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

যে দিন মধুসূদন—

"জিগুগ্রহ প্রায় ধরাতে আসিয়া
জলিয়া হইলা শেষ"

সে দিন বঙ্গদেশে যে সব কবি কবির জন্য রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সর্ব্বপ্রধান। হেমচন্দ্র ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"হায়, মা ভারতী চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল
সেই যে দরিদ্র হবে !"

কিন্তু তিনিও ভারতীর সেবায় বিরত থাকিতে পারেন নাই। লাজ্জনক ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া তিনি কাব্য

রচনা করিয়াছিলেন। তাই শেষ জীবনে তাঁহাকে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া দেশের লোকের দয়ার নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। তখন তিনি অন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যখন চারিদিক সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে দেশাত্মবোধের বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। সে সময়ের বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রকট। হেমচন্দ্রের তূর্য্যনিনাদ বাঙ্গালী কখন বিস্মৃত হইতে পারে না—"আর ঘুমা'ও না"—

"আরব মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি—
চীন, ব্রহ্মদেশ,অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান;
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!"

দেশবাসীকে তাঁহার উপদেশ!—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু,উল্কাপাত, বজ্র-শিখা ধ'রে—
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে একণে পাদুকা বও।"

সভাপতি—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনচন্দ্র ৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যখন-প্রথম যৌবনে সাহিত্যসেবার আগ্রহ হৃদয়ে লইয়াও আমি সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলাম না, তখন পূজারী যেমন সস্নেহে মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মান বালকের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দেবীপ্রতিমার বেদীর উপর স্থাপিত করিয়া তাহাকে ধন্য করেন, তিনি তেমনই স্নেহে আমার কবিতা-পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্তি ম্লান হয় নাই—বার্দ্ধক্য তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তখন 'পলাশীর যুদ্ধের' কবি কৃষ্ণকথা কহিতেছেন—তবে তখনও সে কথার শেষভাগ রচিত হয় নাই। তিনি তখনও সেই কথায় তন্ময় হইয়া আছেন। যে গ্রন্থ-শেষে তিনি লিখিয়াছেন,—

"গীত শেষ; অপরাহ্ণ,
সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে;
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অনন্তসিন্ধু ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী
এই কূলে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য কূলে মুগ্ধকরী।"

হেমচন্দ্রকে যখন আমি দেখিয়াছি, তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, হৃতদৃষ্টি, দুর্দশাগ্রস্ত—প্রতিভার দীপশিখা তখন তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ। আচার্য্য ম্যাক্সমুলার তাঁহার পিতার বন্ধু জার্ম্মাণ কবি হায়েনকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, সে দর্শন সম্বন্ধে আমিও তাহাই বলিতে পারি—"I have seen him, that is all I can say * * However, we travel far to see the ruins of Pompeii and Herculanium, of Nineveh and Memphis, and the ruins of a mind such as Heine's are certainly as sad and as grand as the crumbling pillars and ruined temples shrouded under the lava of Vesuvius."

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মাইতি

সে গ্রন্থকথা তখনও কল্পনালোক হইতে আসিয়া তাঁহার ভাষার বন্ধনে ধরা দেয় নাই। তিনি দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ এই কাব্য-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন; তাহার মধ্যে—

"পাইয়াছি শোকে শান্তি,
পাইয়াছি দুখে সুখ;
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র,
প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

এই সময়ের মধ্যে "নির্গুণ নবীন-তৃণে" দুইটি ফুলের একটি অকালে ঝরিয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের রচনাও দেশাত্মবোধে সমুজ্জ্বল।

সে ভাব তাঁহারা তাঁহাদিগেরও পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ?"

এক সময় বাঙ্গালায় সুপরিচিত ছিল। অনুবাদেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি 'কুমারসম্ভবের' বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার পরে সমগ্র 'রঘুবংশে'র কবিতায় অনুবাদক নবীনচন্দ্র দাস বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

যিনি উপনিষদের বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে পুনরায় বঙ্গদেশে প্রচারে প্রধান সহায় ছিলেন—বাঙ্গালা সাহিত্য যাঁহার কাছে অশেষ প্রকারে ঋণী, ভক্তগণ যাঁহাকে "মহর্ষি" বলিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন, সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দেশে জাতীয় আচার-ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন—এমন কি, তাঁহার রক্ষণশীলতা তখন কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইয়াছিল—তাঁহারা তখনও গুরুর সে ভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য রাজনারায়ণ বসুর রচনায় এই জাতীয় ভাব বিশেষরূপে বিকাশ পাইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার জাতীয় ভাবের যে সকল পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে সকলের স্মৃতি আমি হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি—"রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।" তাহার একটি নিদর্শনের কথা আজ বলিব। সে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। আমি ও আমার অগ্রজ ১লা জানুয়ারীতে তাঁহাকে নববর্ষের উপহার—শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলাম। সে উপহার পাইয়া "স্নেহশীল" রাজনারায়ণ লিখিয়াছিলেন ;—

"তোমাদিগের উদ্দিষ্ট উপহার পাইয়া বাধিত হইলাম। কিন্তু নববর্ষের অভিবাদন এখন করিব না, ১লা বৈশাখে (যদি তত দিন বাঁচিয়া থাকি) করিব। ঐ দিনের জন্য Art Studio দ্বারা বাঙ্গালা ক্ষুদ্র কবিতাযুক্ত উল্লিখিত উপহারের ন্যায় উৎকৃষ্ট উপহার কি প্রস্তুত করাইতে পার না ? কত কাল আর আমরা ইংরাজ থাকিব ?"

মেদিনীপুরবাসীর নিকট রাজনারায়ণ বাবুর সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলিবার আশা দুরাশা মাত্র। আমি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-জাতি সম্বন্ধে তাঁহার জয়োচ্চারণের পুনরাবৃত্তি করিয়া নিরস্ত হইব—

"আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু-জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে উজ্জ্বল করিয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দু-জাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

রাজনারায়ণ বাবুর যে বক্তৃতা হইতে আমি এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল ;—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান !
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান !

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয় !
গাও ভারতের জয় !"—ইত্যাদি।

'বঙ্গদর্শনে' এই সঙ্গীত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছিল—"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক ; হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক ; গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্ম্মদা-গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক ; পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও রবীন্দ্রনাথেরই মত সাহিত্যসেবক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতও সুপরিচিত ;—

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।"

জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে এই সুযোগে আর দুই জনের নাম করিব। এক জন—'যমুনা লহরীর' কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়। তাঁহার—

"কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুখসাগর সাঁতারি' পার হ'বে।"

এত দিন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গীত হইত। তিনি যে মর্ম্মবেদনায় গাহিয়াছিলেন—ভারতবাসী তুমি—

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পর-দাসখতে সমুদায় দিলে।"

সে বেদনার অবসান ত হয় নাই !

আর এক জন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাঙ্গালায় তিনিই প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ-পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন।

আর জাতীয় ভাবপ্রচারপ্রসঙ্গে আমি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নামোল্লেখ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। বিদেশে যে সকল মহা-পুরুষ দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালীকে তাঁহাদের জীবন-কথা—মুক্তির ইতিহাস শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা' এককালে বহু বালকের হৃদয়ে দেশসেবার বাসনা সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই বিভাগে বিদ্যাভূষণের সহিত তুলনা দিবার লোক আর কেহই নাই।

'প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা বা আত্মোৎসর্গ' যে শ্রেণীর পুস্তক—সেই শ্রেণীর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—'আর্য্য-কীর্ত্তি' গ্রন্থকার—রজনীকান্ত গুপ্ত। গুপ্ত মহাশয় যখন বাঙ্গালায় ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন সে বিভাগে কর্ম্মীর সংখ্যা অধিক ছিল না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া 'বঙ্গদর্শন' লিখিয়াছিলেন, "রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে রাজা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" আজ এই ক্ষেত্রে বহু কর্ম্মীর আবির্ভাব সাহিত্যিকদিগকে আনন্দ দান করিতেছে। সুহৃদ্বর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রিয়সুহৃৎ কুমার শরৎকুমার রায়, [illegible] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাক্তার সুরেন্দ্র-নাথ সেন, ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি বহু কর্ম্মী এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আর সর্ব্বপ্রধান

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এখনও ইতিহাসের বিভাগে বিরাজিত।

এই বিভাগে পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধেশচন্দ্র শেঠ ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বটব্যাল মহাশয়ের বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির তুলনা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে সংযোগসেতু হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যের এই বিভাগে এখনও বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। কেন না, ইতিহাসের এত উপাদান এ দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, সে সকলের সংগ্রহ, শ্রেণীবিভাগ, পাঠোদ্ধার প্রভৃতি সম্পন্ন না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। সুখের বিষয়, এই বিভাগের কার্য্যে বর্ত্তমানে অনেককে আকৃষ্ট দেখিতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে আমি কেশবচন্দ্র সেনের উল্লেখ করিয়াছি। আজ অনেকে তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তিনি এ দেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই ভারতের বাণী প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শেষোক্ত কার্য্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বগামী। তবে উভয়ের কার্য্যপদ্ধতিতে প্রভেদ ছিল—সে প্রভেদ উভয়ের ভাবের প্রভেদসঞ্জাত। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুদত্ত দীক্ষার ফলে ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মনীষার আধ্যাত্মিক দানে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই দান দেখাইয়া তিনি বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রতীচীর। তিনি বিদেশী জ্ঞানের গহন অতিক্রম করিয়া যখন ভারতীয় ভাবরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—তখন 'নববৃন্দাবনের' ভাবে বিভোর হইয়া তিনি ভারতীয় সাধনপদ্ধতিতে মুক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে মৃত্যু তাঁহাকে তাহার অজ্ঞাতরাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। তাই বিবেকানন্দের কায যেমন শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কেশবচন্দ্রের কায তেমন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার মত প্রতিভাশালী বাঙ্গালী বঙ্গদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে তাঁহার 'নববিধানের' সঙ্গী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। উভয়েই সুপণ্ডিত—বিশেষ প্রতীচ্য সাহিত্যে ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যে উভয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল। উভয়েই বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের পর প্রতাপচন্দ্রই বন্ধুর মতের পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি বাঙ্গালার যুবকদিগের সৎশিক্ষার জন্য এক সভা (Society for the Higher Training of Youngmen) স্থাপিত করিয়াছিলেন; বাঙ্গালার মহিলাদিগের জন্য 'স্ত্রীচরিত্র-সংগঠন' পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রেরই মত প্রতাপচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই উভয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতাপচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতির ও সাহিত্যরসিকতার বহু পরিচয় লাভের সুযোগ আমার হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গেই কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেনের নামের উল্লেখ করিব। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাদি বিষয়ে যে কয়টি প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য বুঝিবার কোন উপায় নাই। তবে তিনি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে বিবেচনা করিতে হয়, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছেন বটে—কিন্তু সে স্বর্ণমুষ্টি।

বঙ্কিম-যুগের যে সকল সাহিত্যিকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকের কথাই বলিয়াছি। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সময়াভাবে তাহা করিতে পারিলাম না। সে যুগের আর কয় জন সাহিত্যিকের কথা না বলিলে, এ কথা একান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। কবি হেমচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র 'যোগেশে' যে প্রেমমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি অক্ষয়কুমার বড়াল স্থায়ী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি যে সময় বাঙ্গালা ভাষায় দার্শনিক কথার আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন, বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত আর কেহই সে চেষ্টা—তেমন ভাবে করেন নাই।' পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত-বাগীশের নাম এই বিভাগে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি বহু জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও এই সময় তাঁহার মাতুল 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' ও পরবর্ত্তী রচনা 'মেজবৌ' যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার পর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। সে বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। এই নগেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত রচনা করিয়া বাঙ্গালায় বিস্তৃত জীবনচরিত রচনার যে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, পরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগর-চরিতে ও যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের জীবনচরিতে তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও পূর্ণচন্দ্র বসু সেই সময় যথাক্রমে 'বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'কাব্যসুন্দরী' রচনা করিয়া বাঙ্গালায় কাব্যোপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ ও সমালোচনা আরম্ভ করেন। দামোদর মুখোপাধ্যায় এই সময়ের লোক।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বল মণি কালীপ্রসন্ন ঘোষ সাহিত্যিক হিসাবে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা সচরাচর পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাঁহার 'বান্ধব' যেমন বহুদিন সাহিত্যিকদিগের বান্ধবের স্থান অধিকার করিয়া ছিল—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' তেমনই অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্যপ্রতিভার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল।

বঙ্কিম-যুগের আর এক জন দিক্পাল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ক্ষমতা—তাঁহার বাস্তবানুগতা—তাঁহার প্রথম রচনাতেই ফুটিয়া উঠিয়া 'বঙ্গদর্শনের' প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। 'ভারত উদ্ধার' কাব্যে তিনি আমাদের ঝুঠা রাজনীতিকদিগকে যে কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য বটে। ভারত সভাগৃহের সেই বর্ণনা—পাখার "দড়ী আগে ছিঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে" অতুলনীয়। তিনি 'পঞ্চানন্দ'রূপে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। 'কল্পতরু' লইয়া তিনি যখন প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাদর লাভ করেন, তখন হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক দিকে দিক্পালরূপে বিরাজিত ছিলেন। 'বঙ্গবাসীর' স্তম্ভে তাঁহার রস-রচনা অনেক সময় আলোকসম্পাতে সমুজ্জ্বল হীরকের মত শোভা পাইয়াছে। যখন স্বদেশী আন্দোলনের পর মাণিকতলার বোমার ব্যাপার সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই জেলখানার মধ্যেই নিহত হয়, তখন ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"দ্বাপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন;
কলিতে তাঁতির কুলে দিল দরশন।
তাহারে ছলিয়াছিল অক্রূর গোঁসাই—
গোঁসাইকে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই;

গোঁসাই হ'ল গুলীখোর, কানাই নিল ফাঁসি।
কোন্ চোখে বা কাঁদি, বল, কোন্ চোখে বা হাসি ?"

এমন ভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছলে তীব্র বেদনার বিকাশ আর কে করিতে পারিয়াছে ? এ যে সেই "ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।" ইন্দ্রনাথের আলাপও তাঁহার রচনার মত সরস ছিল। তিনিও জাতীয়ভাবে ওতঃপ্রোত ছিলেন এবং মেকির উপর তাঁহার রাগ কেবল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মেকির উপর রাগের সহিত তুলিত হইতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে ভাবে বলিয়াছিলেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ;
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

ইন্দ্রনাথ সেই ভাবের ভাবুক ছিলেন। 'সন্ধ্যা'র উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি উপাধ্যায়কে তেমনই স্নেহ করিতেন। এই যুগেই কবি মনোমোহন বসুর আবির্ভাব। তিনি 'সতী নাটক' ও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে কালে কবির গান, হাফ আকড়াই প্রভৃতিতে ছড়া ও গান বান্ধা হইত। সে বিষয়ে মনোমোহনের অসাধারণ পটুত্ব ছিল। তিনি হিন্দু মেলায় জাতীয় ভাবের উদ্বোধক বক্তৃতা দিতেন। আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দেখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—দেশের

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

আর ও দিকে আমাদের "দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে।" কাযেই—

"খেতে শুতে বসতে
দেশলাই জ্বালিতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের প্রধান লেখকদিগের কথা বলিয়াছি ; ইঁহাদিগের মধ্যে কয় জন আবার বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সবিশেষ পরিচিত।

চন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা' 'তত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ-পুস্তক রচনা করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং গভীর রচনায় তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সর্ব্ববিধ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনা বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার 'নবজীবন' 'বঙ্গদর্শনের' বিলোপের পর বাঙ্গালার বহু মনীষীর রচনায় সমৃদ্ধ হইত—তাহা 'প্রচারের' পূর্ব্বগামী। সংবাদপত্র-সেবাতেও অক্ষয়চন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এমনই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থ সমালোচনার ভারও দিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াই অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' পাঠ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের সতীর্থ শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে চন্দ্রশেখরের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই তরুণ লেখকের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বহরমপুর তখন বহু সাহিত্যরসিকের কেন্দ্র। 'ঐতিহাসিক রহস্যের' উদ্ঘাটক রামদাস সেন বহরমপুরবাসী ; পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিত লোহারাম শিরোমণি তথায় অধ্যাপক ; ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও ইংরাজী লেখক লালবিহারী দে তখন তথায় কলেজে অধ্যাপনা করেন ; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় উকীল ; অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার তথায় রাজকর্ম্মচারী। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-প্রবর্ত্তন পরিকল্পিত হয়। চন্দ্রশেখরও তখন বহরমপুরে। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহবাক্য যে তরুণ লেখককে সাহিত্য-সাধনায় সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; চন্দ্রশেখর বাবুও আমাদিগকে সে কথা বলিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের রচনায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি যে বিষয়েই রচনা করিতেন, তাহাই সরস করিয়া তুলিতে পারিতেন। চন্দ্রশেখর বাবু অক্ষয়চন্দ্রেরই মত ব্যবহারাজীবের ব্যবসার জন্য শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যসেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের উভয়ের ধাতুতে ছিল না। তাই তাঁহারা উভয়েই সাহিত্যিক ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না।

'মালঞ্চের' প্রবর্ত্তক ও কিছুকাল 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী। অনুপ্রাসের অলঙ্কারে ও ভাষার ঝঙ্কারে ঠাকুরদাসের রচনা বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট ছিল। তাঁহার ভাষা যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত বোধ হইত—তাই তাঁহার আক্রমণও অতি তীব্র ছিল। "শেলীর ছেঁড়া মোজার মুকুট মাথায় দিয়া কবিসম্মানপ্রার্থী"—"শূন্য কুম্ভের মধ্যে দমকা বাতাসের গর্জ্জন"—এ সব কথা বাঙ্গালায় স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

চণ্ডীচরণ সেন বাঙ্গালায় কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন এবং 'টম কাকার কুটীর' অনূদিত উপন্যাস তাঁহারই রচনা। চণ্ডীচরণ ইতিহাসের সত্য এমন সরলভাবে অনুসরণ করিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে কল্পনা শাখা-বিস্তারের সুযোগ প্রায় নাই। তাই উপন্যাস হিসাবে তাঁহার পুস্তকগুলি আদৃত হয় নাই—আবার উপন্যাস ইতিহাস নহে বলিয়া ইতিহাসের কথা জানিবার জন্য কেহ সে সব উপন্যাস পাঠ করা প্রয়োজন মনে করে না। নহিলে 'নন্দকুমারের ফাঁসী' 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি পাঠ করিলে অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারা যায়। 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় তাঁহার সাহিত্যানুরাগ, বোধ হয়, পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের প্রভাবের ফল। রমেশচন্দ্র এ দেশে নানা কার্য্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিবার সাহিত্য-রসিক ; তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বে বহু সাহিত্যিকের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রও প্রথমে ইংরাজী ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত বিলাতযাত্রা করেন, তখন তাঁহার পত্রগুলি 'য়ুরোপে তিন বৎসর' নামে প্রকাশিত হয়। সেই ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনাকালে 'বঙ্গদর্শন' তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে বলেন এবং পরে সেই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র চাকরীতে যেমন, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনই যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন এবং রাজকার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে ইংরাজীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। শেষে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসচতুষ্টয়—'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা'—শত বর্ষের ভারতের ইতিহাসের কয়টি প্রধান ঘটনা কেন্দ্র করিয়া রচিত। তাঁহার 'সমাজ' ও 'সংসার'—সামাজিক উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস রচনা করিয়াই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-সে।

শেষ করেন নাই; পরন্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ও প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-প্রচার তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কয়খানি অতি উপাদেয় উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ছোট ছোট বিষয় শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিবার ও অঙ্কিত করিবার ক্ষমতায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবান্ অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের তুল্য ছিলেন। তাঁহার রচনা-মাধুরী পাঠককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিত। তিনি কিছু দিন 'বঙ্গদর্শন' পরিচালনের ভারও পাইয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যেমন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচনা করিয়া অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তেমনই 'স্বর্ণলতা' রচনা করিয়া বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকের সহানুভূতির অশ্রুতে কৃতাভিষেক স্বর্ণলতা ও সরলা বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে আসন লাভ করে। 'স্বর্ণলতার' গ্রন্থকার বাঙ্গালার গার্হস্থ্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—আমাদের সংসার-সংগ্রামের বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার পুস্তক বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। আজ বাঙ্গালার অনেক উপন্যাসে চা-পার্টির, অবৈধ প্রেমের, অসাধারণ ব্যাপারের বাহুল্য দেখিয়া মনে হয়, শত বৎসর পরে যাহারা এই সব পুস্তক পাঠ করিবে, তাহারা কি এই সকল পুস্তকে বর্ত্তমান বাঙ্গালার সমাজের ও পরিবারের যথাযথ চিত্র পাইবে? এই সব উপন্যাসে বর্ণিত চিত্র ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালী পরিবারের সাধারণ ও স্বাভাবিক চিত্র নহে! বিজ্ঞবর টেন বলেন—যাহারা সাহিত্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে, সাহিত্য তাহাদেরই রুচির অনুসরণ করে। যে কৃষ্ণচন্দ্র সভায় বসিয়া সভা-কবির কবিতায় আপনার পূর্ব্বপুরুষ বংশপতির দুই স্ত্রী লইয়া বিব্রত অবস্থার বর্ণনা শুনিয়া আনন্দানুভব করিতেন, তাঁহার সময় 'বিদ্যাসুন্দরের' রচনা স্বাভাবিক; সেক্সপীয়রের সময় যে শ্রেণীর লোক রঙ্গালয়ের প্রধান দর্শক ছিল, তাহাদের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেক্সপীয়রকে নাটক-রচনা করিতে হইয়াছিল—তাই তাঁহাকে অশ্লীলতাপরিত্যাগসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আজকাল যে শ্রেণীর উপন্যাসের কথা বলিলাম, সে সকল পাঠ করিয়া মনে হয়, তবে কি বাঙ্গালার পাঠক-সমাজ—শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলারা এইরূপ পুস্তকেরই আদর করেন? কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' বাঙ্গালী পরিবারের চিত্র।

উপন্যাস-বিভাগে আর কয় জন লেখকের নামোল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইব। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'গুপ্তকথা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'লণ্ডন-রহস্যের' অনুবাদ পর্য্যন্ত, বোধ হয়, অর্দ্ধশত উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পরেই ধীরেন্দ্রনাথ পালের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 'নব্য-ভারতের' সম্পাদক ছিলেন এবং অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর করের 'অনাথবালক' প্রতিভার পবিত্র দান। আর এই প্রসঙ্গে আমরা যেন 'রায় মহাশয়' লেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিস্মৃত না হই।

যে সকল ধনী সমাজে অন্য কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও সাহিত্য-সেবায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন,তাঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ও রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহুগ্রন্থলেখকদিগের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় অন্যতম। তিনি বাঙ্গালা পদ্যে মূল মহাভারত ও রামায়ণ অনূদিত করিয়াছিলেন এবং নাটক হইতে শিশুপাঠ্য কবিতা পুস্তক, 'ঘোড়ার ডিম' পর্য্যন্ত কত পুস্তক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি অল্পবয়সেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—প্রতিভার পদ্ম বিকসিত হইয়া লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে না করিতে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিল—

"অকাল জলদ যথা উদিয়া অম্বরে
নিবায়ে কমলদলে নব রবিকর।"

কিন্তু তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তাঁহার রচনা কোথাও জলচর-সঞ্চার-চঞ্চলিত স্নিগ্ধনীল-পরিসর হ্রদের মত, কোথাও তাহা বাত্যাতাড়িত সিন্ধুর শোভায় শোভাময়। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিবারেই হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। অকালমৃত্যুতে যাঁহাদিগের সাহিত্যিক সাধনা সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যে নিত্যকৃষ্ণ বসুর, দেবদাস করণের, ব্যোমকেশ মুস্তফীর, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের, বরদাচরণ মিত্রের, দ্বিজেন্দ্রলাল বসুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাষার ও ভাবের জন্য তাঁহার কবিতা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা—যে দিন 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলাম, সে দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে শিশিরকুমার ঘোষের স্থান বহু উচ্চে। তিনি সমস্ত জীবন রাজনীতি-চর্চ্চা করিয়াও 'অমিয়নিমাই-চরিত' রচনা করিয়া নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করাইয়াছিলেন—ভগীরথের মত সাধনা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উদার মত বাঙ্গালায় পুনরায় আনিয়াছিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তিনি অল্প কৃতিত্ব দেখান নাই।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, বীরেশ্বর পাঁড়ে, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, লালমোহন বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ ও 'ভক্তিযোগের' অশ্বিনীকুমার দত্তের নাম আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই।

মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মীর মশারফ হোসেনের নাম সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিতে হয়।

সারদাচরণ মিত্র প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের সফল চেষ্টার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবেন।

যাঁহারা নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে যাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়াছে—দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের, রাজকৃষ্ণ রায়ের ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ স্মরণীয়। রাজকৃষ্ণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার 'প্রহ্লাদচরিত্র', গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', অতুলকৃষ্ণের 'নন্দবিদায়' এক দিন রঙ্গালয়ের সাহায্যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এ দেশের পুরাণ-কথা ছড়াইয়া দিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা নানা-বিষয়ক নাটক রচনায় আপনার শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছিল এবং সে কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ সাফল্যও হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রসিদ্ধ নাটকপ্রণেতা মাত্র ছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতিভার অপমান করা হয়। তিনি একাধারে নাট্যকার, কবি, সমালোচক—সাহিত্যিক ছিলেন। সেই জন্যই তিনি যখন অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাঁহার বন্ধুজনের ও

বাঙ্গালী পাঠকগণের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বেদনাদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যক্তিগত নহে—পরিবারগত এবং বহুকালাগত। তাঁহার পিতার সাহিত্যানুরাগ 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' অমর হইয়া আছে এবং তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল উভয়েই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। সেই সাহিত্যিক পরিবারের সাধনা যেন দ্বিজেন্দ্রলাল-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, "ধনধান্যপুষ্পভরা" বঙ্গজননীর এই যশস্বী সন্তান যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, যদি তিনি কেবল তাহারই একটি রচনা করিয়াই লোকান্তরিত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যে সঙ্গীতে বঙ্গবাণীর চরণে "ভক্তিঅশ্রুসলিলসিক্ত" অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, তাহার রচনার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত-রচনার ক্ষিপ্রতায় বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার সন্তান। বাঙ্গালী যেন তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশকে বলিতে পারে—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।" বাঙ্গালী যেন সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া মনে করিতে পারে ;—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'।"

বাঙ্গালার কবিকুঞ্জে কলকণ্ঠের কূজন স্তব্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেন, এই তিন জনের শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে কি ? 'এষার' কবি অক্ষয়কুমার প্রতিভার গবাক্ষে 'প্রদীপ' জ্বালাইয়া বঙ্গবাণীর মন্দির আলোকিত করিয়াছিলেন, 'কনকাঞ্জলি' দিয়া মা'র পূজা করিয়াছিলেন। তিনি অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার বন্ধু, অনুরক্ত পাঠকগণ তাঁহারই কথায় বলি—

"—অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে—
রাজহংস সম চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটি প্রসারিয়া,
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া।"

গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবন সংগ্রামের জীবন—তিনি প্রতিকূল অবস্থার শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের শরাঘাতে ধরণীর বিদীর্ণ বক্ষ হইতে যেমন স্নিগ্ধ সলিলধারা উদ্গত হইয়াছিল, তাঁহার সেই ক্ষতবিক্ষত হৃদয় হইতে তেমনই কবিতার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন—তাই উলঙ্গ সৌন্দর্য্যেরও উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতারই সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা কয় জন উপলব্ধি করিয়াছেন ? তাঁহার উলঙ্গ-সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার স্বরূপ কি ?—

"আরো ভালবাসিতাম, তোমারে গোপিনী—
সামান্য লজ্জার লাগি' যদি না লইতে মাগি'
যে বসন চুরি করি নিল নীলমণি।
যে যাহারে ভালবাসে সে ত বুঝে যায় আসে
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তা'র ওরে গোয়ালিনী !
অন্তরে বাহিরে তা'র কোথা থাকে অন্ধকার ?
আপনি সাধিয়া সে সে সাজে উলঙ্গিনী !"

রজনীকান্তের শ্রান্ত কণ্ঠে গীত শান্ত হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র বঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

পরমুখাপেক্ষিতায় বড় দুঃখ—

"ভিক্ষায় চেলে কাজ নেই
সে বড় অপমান ;
মোটা হক' সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান।"

তিনি বলিয়াছেন, আমরা যে দেশের লোক, সে যে—

"শ্যামল শস্যভরা !
(চির) শান্তি বিরাজিত পুণ্যময়ী ;
ফলফুলপুরিত নিত্যসুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জ্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রিমণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্যবিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজরঞ্জিত।"

বিজ্ঞান বিভাগে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সদানন্দ রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধুগণের পক্ষে অশ্রুসংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। যিনি বিজ্ঞানের নীরস বিষয় উপন্যাসের মত সরস করিয়া তুলিতে পারিতেন, যাঁহার বিদ্যানুরাগ সাগরেরই মত সীমাহীন এবং বাঙ্গালা-সাহিত্য-প্রীতি সেই সাগরেরই মত গভীর ছিল, সেই সদাপ্রফুল্ল—সরস, সরল, সুন্দর—রামেন্দ্রসুন্দরকে হারাইয়া আমরা যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব ? ভাষা যে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। বিশেষ অন্তর যখন বেদনায় কাতর হয়, তখন মুখে কথা ফুটিতে চাহে না—অশ্রুর উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া মনকেই পীড়িত করে।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক বিভাগে যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রতীচ্য চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে বহুগ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা দুর্গাদাস কর যখন বাঙ্গালায় এলোপ্যাথিক 'ভৈষজ্যরত্নাবলী' রচনা করেন, তখন তিনি সে ক্ষেত্রে অগ্রণী। পুত্র পিতার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন ও স্বয়ং কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় প্রথম বে-সরকারী মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিস্থাপন করিয়া তিনিই সেই ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সে জন্য দেশের লোক তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে আমরা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ রামব্রহ্ম সান্যালের নামেরও উল্লেখ করিব।

বাঙ্গালার শিশুপাঠ্য সাহিত্যে যিনি যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালার বালকবালিকার 'সখা' প্রতিষ্ঠাতা ও তাহার সম্পাদক পূতচরিত্র প্রমদাচরণ সেনকে যেন আমরা আজিকার দিনের বিপুল শিশুসাহিত্যের আলোচনাকালে ভুলিয়া না যাই। এই সাহিত্যের তিনিই প্রবর্ত্তক। এই সঙ্গে আমরা যেন চিরঞ্জীব শর্ম্মার ও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কথা স্মরণ করি।

সাহিত্যের সংবাদপত্র বিভাগেও এই সময়ের মধ্যে বহু শক্তিশালী লেখকের ও কর্ম্মীর তিরোভাব হইয়াছে। এ দেশে আমাদের সংবাদপত্রের অবস্থাবৈশিষ্ট্য অনেকে বিবেচনা করেন না। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ষ্টিভেন্স বলিয়াছিলেন—

"এ দেশে দেশীয়চালিত সংবাদপত্রের অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকারের। সে সব পত্রের পক্ষে সর্ব্বদা সরকারের বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বন করাই স্বাভাবিক। যদি কোন দেশীয় পত্র ক্রমাগত ইংরাজ-শাসনের প্রশংসা কীর্ত্তন করে, প্রতীচ্য সভ্যতার গুণগান করে, ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারীদিগের শাসন ও ব্যক্তিগত গুণের বিবরণ বিবৃত করে, তাহা হইলে আমরা (ইংরাজ শাসকরা) সে পত্রের সম্পাদককে সে জন্য শ্রদ্ধা

করিব না। আমরা বুঝিব, সে সম্পাদক ভণ্ড—ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেরূপ করিতেছেন ; * * * * দেশীয় সংবাদপত্রে সরকারের কার্য্যের ও সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সমালোচনাই হইবে।"

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বাঙ্গালার সংবাদপত্রের অধিকারী ও সম্পাদকদিগকে কায করিতে হয়। ইহাতে যে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে বিদ্যমান, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কখনও সেবকের অভাব হয় নাই। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পর বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতিও পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের সহিত লিপ্ত ছিলেন। আর প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা সংবাদপত্রসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গত কয় বৎসরের মধ্যে তিরোহিত হইয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসু শাস্ত্রপ্রচারে, উপন্যাস-রচনায় ও 'বঙ্গবাসী' পরিচালনে অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সুলেখক, সুরসিক ও সাহিত্যানন্দ ছিলেন ; এবং বিলাতে লর্ড নর্থক্লিফ যেমন সংবাদপত্রকে ব্যবসার স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রও ব্যবসাবুদ্ধিবশে তাহা করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'ই এ দেশে ঘরে ঘরে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস প্রবিষ্ট করাইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ও বিহারীলাল সরকার বহুদিন 'বঙ্গবাসী'র কর্ণধার ও অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে এই 'বঙ্গবাসীতে'ই সংবাদপত্রসেবায় নিযুক্ত হইয়া শেষে বাঙ্গালার সম্পাদকদিগের মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং দীর্ঘকাল প্রবলপ্রতাপে সম্পাদকের কায করিয়া গিয়াছেন।

'হিতবাদী'র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন জাপান হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন-পথে সিন্ধুবক্ষে তরীতে দেহরক্ষা করেন, তখন সাগরের মত শক্তিতে চঞ্চল হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। 'হিতবাদী'র ইতিহাস আলোচনার উপযুক্ত। 'বঙ্গবাসী' যখন কংগ্রেসের বিরোধী হইয়া উঠেন ও রক্ষণশীলদলের মুখপত্র হয়েন, তখন 'হিতবাদী' প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাহার সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার নিয়মিত লেখক। ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহাতে অর্থনীতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধলেখক। কিন্তু ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিদানের অভাবে 'হিতবাদী' আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আইসে। ক্রমে কাব্যবিশারদ তাহার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে এককালে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করেন। কাব্যবিশারদ রাজনীতিক, বক্তা, লেখক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার কতকগুলি গান বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র গীত হইত। সে সকলের মধ্যে—"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস, চণ্ডী, যুগান্তরে"—ও

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,'
আমি কি মা'র সেই ছেলে?"

প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—তিলকের উপযুক্ত শিষ্য সখারাম দেউস্কর বাঙ্গালাকেই মাতৃভূমি করিয়া বাঙ্গালায় 'দেশের কথা' লিপিবদ্ধ করিয়া—ইংরাজ শাসনের স্বরূপ অর্থনীতির দিক্ হইতে প্রকট করিয়াছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল এই 'হিতবাদী'র সেবক ছিলেন এবং 'হিতবাদী' তাঁহার রচনায় শক্তিলাভ করিয়াছিল।

যে 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠার দিন হইতে জাতীয়ভাবের প্রচার-বেদী হইয়া আছে, তাহার প্রবর্ত্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দারিদ্র্য হইতে আপনার উদ্যমে ও কর্ম্মক্ষমতায় বিরাট সাহিত্য-মন্দির গঠিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে সাহিত্য-প্রচারব্রত উদ্‌-যাপিত হইয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি নামমাত্র মূল্যে বাঙ্গালীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যাঁহার সহিত সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সদ্ভাবে বিবাদে আমি দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি, সেই আমার প্রিয় সুহৃদ—'সাহিত্যের' সম্পাদক ও সাহিত্য-সমাজপতি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দীর্ঘকাল এই 'বসুমতীর' সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রকে শক্তিশালী করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যিনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নূতন শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন—যাঁহার পত্রে বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ প্রচারে বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল, সেই আমার সুহৃদ্ ও সহকর্ম্মী 'সন্ধ্যার' উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের নামোল্লেখ করিয়া এই বিভাগের কথা শেষ করিলাম। আশা করি, তাঁহার দেশ-সেবার আদর্শ এ দেশে অনুকৃত হইবে।

গত কয় মাসের মধ্যে কয় জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধু পরলোকগত হইয়াছেন। 'অশ্রুকণার' কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। তাঁহার সেই অশ্রু বাঙ্গালা সাহিত্যে মুক্তার মত শোভা পাইতেছে ;—

"এ নয় সে অশ্রুরেখা
মানান্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না
দেখা হ'লে কুলবনে।"
"সে অশ্রু এ নয়, সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল-থরে।"

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহিলাকবিদিগের মধ্যে প্রমীলা নাগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের তিরোভাবে এক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের অভাব অনুভূত হইতেছে।

সার আশুতোষ চৌধুরী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের উভয়ের অনুরাগের অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছি। ভূপেন্দ্রনাথ প্রবাসে বাসকালে বহুবার আমাকে তাঁহার জন্য বাঙ্গালা পুস্তক পাঠাইতে হইয়াছে। আমি সেই দূরদেশে তাঁহাকে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে দেখিয়াছি। তিনি যে আমার সম্পাদিত সংবাদপত্র সেই বিদেশেও পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ সে আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও তাহাতে আমি বিশেষ গর্ব্বানুভব করিতে পারি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা আজ আর কি বলিব? তাঁহার জন্য বাঙ্গালার শোকাশ্রুপাত এখনও বন্ধ হয় নাই। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের আলোচনা করিবার ও মৌলিক গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চাশ বৎসরের কূলে দাঁড়াইয়া আজ কত কথা মনে পড়িতেছে। যাঁহাদের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহাদেরও সকল কথা বলা হইল না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে—আপনাদের ধৈর্য্যেরও সীমা আছে—আত্মপীড়া করাও শিষ্টাচারসঙ্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান যুগের বক্তা ও লেখক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের নাম উল্লেখ না করিলে এই অসম্পূর্ণ বিবরণ আরও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তন্ত্রে শিবচন্দ্রের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বহুগ্রন্থপ্রণেতা—তাঁহার বক্তৃতা ও গান এক সময় বাঙ্গালীকে সমভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। আজও তাঁহার গান—

"যমুনে এই কি তুমি
সেই যমুনা-প্রবাহিণী ;"

বাঙ্গালার পল্লীপ্রান্তরে শুনিতে পাওয়া যায়।

আজ আপনাদের কাছে এই অতীত কথা স্মরণ করিয়া মনের মধ্যে কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সেই কবিতা গুঞ্জরণ করিতেছে ;—

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকাবনে, খেলিতে নব কলিকাসনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ।
কাননে ঢালি জোছনারাশি, ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি,
নাহি সে হাসি প্রমোদরাশি নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশিমাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন।
অমিয় স্বর-লহরে মাখি' স্তবধ করি পশুপাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ননীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীল জলে সন্তরণ।
নিবিড় বনে তমাল ছায়, কোকিলবধূ গীত না গায়,
সারিকা শুক বিরসমুখ বিগত-প্রেম-সম্ভাষণ।
অধীর ব্রজ-বালক দল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল-আঁখি উরধমুখে করিছে কি যে অন্বেষণ।
প্রেমিক কে সে মধুরভাষী, বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তা'র গা'বে না গীত সঞ্জীবন?
অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ কেমনে করি এ দুখ শেষ,—
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়নবারি সংবরণ?

এ যেন শ্মশানে ভ্রমণ করিতেছি। এ অবস্থায়ও মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন মনে হয়—ইঁহারা গিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদিগের কীর্ত্তি ত কালজয়ী! তিনি সাধনা করিয়া সগরসন্তানদিগের মুক্তির জন্য সুরতরঙ্গিণীকে ধরায় প্রবাহিতা করিয়াছিলেন, তিনি নাই, কিন্তু "চন্দ্রশেখরশিরমৌলিবিলাসিনী কেলিকুতুহলা"—গঙ্গা আজও তেমনই "শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনী"-রূপে ভারতের ভূমি পূত করিয়া প্রবাহিতা। শোকের মধ্যে এই যে সান্ত্বনা—ইহা কি সত্য সত্যই শ্মশানবৈরাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে? এ কথা কি সত্য নহে যে, ব্যক্তির তিরোভাব হয়, সাহিত্যের প্রবাহ দিন দিন পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়? বঙ্গভারতী যে দিন—

"আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বা'ম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।"

সে দিনের মত আজও কি তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মানব-মন মুগ্ধ হইতেছে না?

অতীত হইতে বর্ত্তমানের দিকে—শ্মশান হইতে গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—পুরাতনের স্থান শূন্য নাই। সে দিকে প্রথমেই উদয়াস্তঅরুণরাগরঞ্জিত অভ্রভেদি-শৃঙ্গ হিমাচলের মত দণ্ডায়মান—রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই এবং প্রভাতালোকোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিয়া মন যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়—হৃদয় তেমনই প্রফুল্ল হয়। রবীন্দ্রনাথ একক নহেন—পর্ব্বত-মালার একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে না। তাই তাঁহার পার্শ্বে বহু শিখর লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীমান্ কালিদাস রায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? জীবিত লেখকদিগের কথার আলোচনা যে আগ্নেয়-গিরির মুখের পার্শ্বে বিচরণ করারই মত বিপজ্জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই জন্য এ আলোচনায় বিরত হইলাম। সাহিত্যের সকল বিভাগেই আজ কর্ম্মোদ্যম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ে ও মান্দ্রাজে যেরূপ ইংরাজী মাসিক পত্রের বাহুল্য, বাঙ্গালায় সেরূপ নহে। তাহার কারণ, বাঙ্গালী লেখকগণ বাঙ্গালাতেই তাঁহাদের বক্তব্য বিবৃত করেন এবং বাঙ্গালার মাসিক পত্রাদিতে সে সকল প্রকাশিত হয়। আমরা লক্ষ্য করিতেছি—বাঙ্গালায় বক্তব্য ব্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বর্দ্ধিতই হইতেছে। ইহা যে সুলক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালীর এই স্পৃহা যতই বর্দ্ধিত হইবে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ততই সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইবে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইয়াছে, আর বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্ববিধ ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়াছে। আজ আর সে ভাষা অবজ্ঞাত নহে, সে সাহিত্য অবহেলার অপমান সহ্য করিবার মত দীন নহে। আমেরিকার ধর্ম্মমহামণ্ডলে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন গর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন—দেখিয়া বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ বাঙ্গালী সাহিত্যিকও তেমনই বিশ্বের সাহিত্য-সভায় দাঁড়াইয়া তাঁহার সাহিত্য-সম্পদের কথা বলিতে পারেন। আজ বাঙ্গালার বহু গ্রন্থকারের রচনা য়ুরোপের নানা দেশে নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে আদর পাইয়াছে। যত দিন যাইবে, তত যে বাঙ্গালার এই সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইবে, অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা আজ সে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। তখন আমরা অনেকেই জীবিত থাকিব না। কিন্তু যত দিন আমরা জীবিত থাকিব, তত দিন সেই দিনের আশায় উৎসাহ লাভ করিয়া ভারতীর সেবার দ্বারা সেই দিনের আগমন-বিলম্ব হ্রাস করিয়া ধন্য হইব। আমাদের এই যে সব সভা-সমিতি—এ সকল তাহারই আয়োজন—সেই কার্য্যে সাফল্যের উপকরণ।

অদূরভবিষ্যতে বাঙ্গালী তাহার ভক্তিরচিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠার বেদীর উপর বঙ্গভারতীর যে তেজোনিঃসারিণী, শক্তিশালিনী, ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি পূজা করিয়া ধন্য হইবে, আজ কল্পনায় মা'র সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার নিকট আমরা বরাভয় প্রার্থনা করিতেছি। তিনি আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, দৈন্য, জাড্য দূর করিয়া, দুর্ব্বলকে সবল ও সংশয়াকুলকে দৃঢ়সঙ্কল্প করুন—তিনি আমাদের সাধনার সিদ্ধি দান করুন।—

বন্দে মাতরম্!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আশা ও নিরাশা

বাসন্তী সিরাজগঞ্জে চলিয়া আসিয়াছে। এবার তাহার নিজেকে বড়ই একা একা বোধ হইতেছে। কারণ, পিসীমার অসুখের জন্য চামেলী এবার তাহার সঙ্গে আসিতে পারে নাই। জ্যেঠাইমাও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। বাসন্তী মনে মনে স্থির করিল, দুই এক দিনের মধ্যেই সে একবার সুষমার কাছে যাইবে।

যাহাদিগের জগৎ কখনও শূন্য হয় নাই, তাহারা বিশাল জগতের শূন্যতা বুঝিবে কি করিয়া? সেই শূন্যতার মধ্যে প্রবল সঙ্গলিপ্সা মানুষকে কেমন করিয়া পাগল করিয়া তুলে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। বাসন্তীর এই নিঃসঙ্গ জীবন ও ততোধিক সুদীর্ঘ দিন রাত্রিগুলা যেন আর ফুরাইতে চাহিতেছিল না। তাই সুষমার জন্য তাহার ব্যাকুল মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

অন্তরের মধ্যে যাহার কোনরূপ অবলম্বন বা আশ্রয় না থাকে, তাহার দিন-রাত্রি যে কি করিয়া অতিবাহিত হয়, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। দিনের আলো নিভিয়া গিয়া যখন রাত্রির অন্ধকারে জগৎ ঢাকিয়া যায়, তখন নিশাযাপন বাসন্তীর কাছে একটা যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়। আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢাকিয়া সন্ধ্যারাণী যখন দেখা দেন, তখন তাহার অন্তরের অন্তরেও এক বিরাট অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। অন্তরের গভীরতম স্থলেও যেটুকু আলোক-রশ্মি লুকাইয়া থাকা সম্ভব, সে সমস্ত স্থানটাও যেন তখন গভীর অমানিশার অন্ধকারে ভরিয়া উঠে। বুকের মধ্যে তখন যে কি আকুলতার ঝড় উঠে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না।

অসহ্য দুঃখের আতিশয্যে অন্তরাত্মা যখন বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, বিনিদ্র রজনীটা যখন অবিরল অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া তুলে, তখন তাহার মনে হয়, এই প্রিয়জনরহিত পাষাণ অট্টালিকার মধ্যে তাহার এমন আপন জন কেহই নাই যে, তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করে। অতীত না থাকিলে মানুষ বর্ত্তমানের দুঃখ সহিতে পারিত না। বাসন্তী মনে মনে ভাবিত, মামার ক্ষুদ্র কুটীরে মামীমা'র নিষ্ঠুর শাসনেও তাহার দেহ-মন এত জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। অবিরত পরিচর্য্যাতেও সে সেখানে কখনও মনে ক্লান্তি বা কষ্ট বোধ করে নাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে যখন মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া বাল্য-সঙ্গিনীগণের সহিত লুকাচুরী খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কতই না আনন্দে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আজ ঐশ্বর্য্যের উচ্চাসনে বসিয়াও চতুর্দ্দিকের মুক্ত বায়ু তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে কেন? সংসারে অশন-বসনই কি নারী-জীবনের সার্থকতা? এই বিশাল শান্ত স্তব্ধ নির্ম্মম নিষ্ঠুর অট্টালিকাই কি স্বর্গ? অলক্ষিতে তাহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল, তখন স্বর্গগত শ্বশুরের উদ্দেশে মনে মনে সে বলিল, 'তুমি কেন এই দুর্ভাগিনীকে তাহার দুর্ভাগ্যের আবরণ হইতে বাঁচাইয়া তুলিতে সুবর্ণ-পিঞ্জরের মধ্যে আনিয়াছিলে? ইহাতে কি তাহার অদৃষ্টের গতি ফিরাইতে পারিয়াছিলে?'

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাহার চিন্তায় সারা বুক ভরিয়া উঠে, সারা দিন-রাত্রি কর্ম্মের মধ্যেও যাহার মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে অচল অটলভাবে বিরাজিত থাকে, সেই জন যদি স্বেচ্ছায় দূরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে জগৎ যে কি অহিবিষে ভরিয়া যায়, তাহা বুঝাইবার নহে।

জীবনের যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, একান্ত কাম্য, সেই প্রিয়জনের প্রীতিলাভ—তাহা কি সকল নারীর ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠে? কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি সেই প্রিয়তম জীবন-ভরা নিরাশার ব্যথা তাহার অবিরাম প্রেমস্রোতে তৃষিত হৃদয়কে তৃপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে নারী দেবদীপ্ত শুভ্র স্বর্গবাস দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পায়। যাহার দগ্ধভাগ্যে সে দিন উদয় হইয়াও অমানিশার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার সে দুঃখ জগতে কোথাও রাখিবার স্থান হয় কি? বাসন্তীরও সে শুভদিন—বহুদিনের সাধনা পরে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু মধ্যে কি একটা প্রলয়ের ঝড় তাহাকে অনন্তের পথে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহা সে কোনমতেই বুঝিতে পারিল না।

আশা আছে বলিয়াই বিশাল ধরণীর সমগ্র নরনারী কোনমতে জীবন ধরিয়া থাকে, নচেৎ বর্ত্তমানের অসহ্য অসহনীয় দুঃখময় দিনগুলাকে কি কেহ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিত? দুঃখের পর সুখ আসিতে পারে, এই আশ্বাসেই আমরা বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্ট-যাতনাকে সহনীয় করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকি। মহাসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে মানুষ যেমন আশ্রয়ের জন্য তৃণমুষ্টি জড়াইয়া ধরে, নিরাশ হৃদয়ে তেমনই মানবের একমাত্র সান্ত্বনা থাকে আশা। কিন্তু যাঁহার চরণসেবা নারীর একমাত্র কাম্য, যাঁহার স্বর্গীয় প্রীতি নারীর একমাত্র তপশ্চরণ, যাঁহার ধ্যান নারী-জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই একমাত্র আরাধ্য দেবতাকে যদি পাওয়া না যায়, তখন কি অপরিসীম যন্ত্রণায় নারীর অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা কে ব্যক্ত করিতে পারে?

নিরাশার ঘনঘোরে যখন বাসন্তীর দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল, তখন এক দিন হঠাৎ একটা দুঃসংবাদে সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সুষমার পত্রে তাহার মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বাসন্তীর মন বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। সুষমা লিখিয়াছে, "মা যে আমার কি ছিল, তা তুই-ই জানিস্। আজ আমি তাকে হারিয়ে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছি, তা আমি তোকে লিখে জানাতে পাচ্ছি না। একবার তুই আমার কাছে আয়, এ যে কি কষ্ট—" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই চিঠিখানি শেষ করা হইয়াছে। সেই রকম অসমাপ্ত অবস্থাতেই চিঠিখানা তাহার নিকট পাঠান হইয়াছিল।

সুষমার চিঠিখানা হাতে করিয়াই বাসন্তী জ্যেঠাইমার নিকট গিয়া সমস্ত বলিল এবং জ্যেঠাইমার সহিত পরামর্শ করিয়া সে সুষমার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। জ্যেঠাইমা একটুখানি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার দেখছি, মা, পথে পথেই জীবনটা কেটে যাবে, দু-দিন যে ঘরে থাকবে, সে বরাতও ক'রে আসনি। এই ছমাস হেথা হোথা কাটিয়ে এলে, আবার দু মাস না যেতেই এক বিপদ্ এলো। তবে এও বলি মা, তাতে না যাওয়াটাও তোমার ভাল হবে না। মেয়েটা তোমার অসময়ে বড্ড করেছে। আহা, অমন কপাল নিয়েও জগতে এসেছিল, মা ছিল—ভগবান্ তাকেও--" জ্যেঠাইমার চক্ষুপল্লব ভিজিয়া উঠিল, তিনি নিজ অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন।

বাসন্তী তখন ভাবিতেছিল, তাহার মত দুর্ভাগিনী কি কেহ আছে? কত কালই ত কাটিয়া গেল, আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ জীবনটাকে টানিয়া লইয়া কোথায় না ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু এ যাত্রার শেষ কি কিছু—যাহা একটু শান্তি কিংবা তৃপ্তি—এ রকম কিছু কি সে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে? কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতই বিশাল জগতের মধ্যে সে গৃহহীন নষ্টাশ্রয় হইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না কি? এ গতির বেগ হইতে কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে কি? গতির পথে গ্রহ চলে বটে, কিন্তু তাহারও একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট পথ থাকে, তাহার সে পথ আছে কি? আছে কেবল লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন শূন্য জীবনটাকে কোনমতে চালিত করা।

যাত্রার দিন সকালে বাসন্তী চামেলীর একখানি চিঠি পাইল, তাহাতে জানিতে পারিল, পিসীমা এখনও সম্পূর্ণরূপে সারিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছে, হজমশক্তি নাই ইত্যাদি। সেই জন্য তাঁহাকে লইয়া ডেরাডুন যাইবার ইচ্ছা সকলেই করিয়াছেন। কিন্তু বাবার কাছে তাহাকে থাকিতে হইবে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে যদি মায়ের সঙ্গে যায়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়, বাবারও তাই ইচ্ছা। অতএব সে যদি রাজী হয়, তাহা হইলে যাইবার বন্দোবস্ত করিবে। সুতরাং তাহার পত্র পাইলেই যাত্রার দিন স্থির করা যাইবে।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুষমার ব্রহ্মচর্য্য

কলিকাতায় গিয়া বাসন্তী প্রথমেই সুষমার বাড়ীতে উঠিয়াছিল। কিন্তু সে সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজের মামাকে মালীকে ডাকিতে বলিল। বাসন্তী মালীর নিকট শুনিল, সুষমা প্রায় মাসাবধি কাল আশ্রমেই বাস করিতেছে। সে তখন মামার সহিত আশ্রমে চলিল।

আশ্রমের মধ্যে যখন গাড়ীখানি প্রবেশ করিল, তখন বাসন্তী দেখিল, কেমন একটি শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র ভাব চারিদিক সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। কোনখানেই অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্র নাই। সে মনে মনে সুষমার স্থাননির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই কোলাহলপূর্ণ নগরীর মধ্যে এমন নীরব নির্জ্জন স্থান সে কি করিয়া আবিষ্কার করিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। গাড়ী দাঁড়াইল, বাসন্তী মামার আহ্বানে নামিয়া অট্টালিকার পথে চলিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে দেখিল, একটি প্রশস্ত গৃহের মধ্যস্থলে পবিত্র গৈরিক বসনে সজ্জিতা সুষমা অজিনাসনে বসিয়া সম্মুখস্থ ছাত্রীদিগকে গীতার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছে। তখন দূর হইতে তাহাকে ঠিক দেবকন্যার ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার দীর্ঘ আজানুলম্বিত রুক্ষ কৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নীলেন্দীবর-তুল্য আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল কি এক পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সুষমার সেই অগ্নিশিখার ন্যায় তপস্বিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া বাসন্তীর মনে হইল, সে যেন আর এক নূতন সৌন্দর্য্যের জগতে আসিয়াছে তাহার মনে হইল, বহুমূল্য বেশভূষাতেও সে ত সুষমার এমন সৌন্দর্য্য দেখে নাই। যাহাকে দেখিয়া সে আত্মহারা হইয়া যাইতেছিল, সে তখন প্রচ্ছন্নহাস্তে একাগ্রচিত্তে ছাত্রীগণের দিকে চাহিয়া গীতার সারাংশ বুঝাইয়া দিতেছিল—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

"মানুষ যেমন কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে নূতন কাপড় পরে, তেমনি প্রাণ একটা দেহ পুরাতন হইলে নূতন দেহ ধারণ করে, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়।"

সুষমার মুখনিঃসৃত গীতার ঐ কথাগুলি বাসন্তীর কর্ণে যেন অমৃত-সিঞ্চন করিতেছিল। সে ভাবিল, হায়! সকলেই যদি জ্ঞানী জনের পথানুসরণ করিত, তাহা হইলে জগতে দুঃখ বলিয়া আর কোন জিনিষই থাকিত না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাসন্তী দ্বারসন্নিধানে উপস্থিত হইতেই সুষমার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। সুষমা ছুটিয়া আসিয়া অশ্রু-অন্ধ নয়নে কহিল, "এসেছিস্—" সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য, তাহার পর সে ছিন্ন ব্রততীর মত বাসন্তীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। বিনা বাধায় কাঁদিতে পাইয়া তাহার অন্তরের গ্লানি কতকটা কমিয়া আসিলে সে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় কহিল, "বাসি—দিদি—আমার কি গেছে—জানি—" অশ্রুর উৎস আবার উছলিয়া উঠিল, সে যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলিতে পারিল না, তখন দুই জনেই নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

প্রায় অন্ধকার কক্ষে বসিয়া বাসন্তী কহিল, "দিদি, আপনি এ রকম ক'রে আর কত দিন বাঁচবেন?"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সুষমা কহিল, "কেন বাসি, আমি কি করেছি?"

কাতরকণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "কি না করেছেন দিদি, শরীরের উপর কোন্ অত্যাচার বাকী রেখেছেন? এ রকম কর্‌লে শরীর আর ক'দিন টিকবে?"

ব্যথিতকণ্ঠে সুষমা কহিল, "আর বেঁচে কি হবে বাসি, যাঁদের জন্য শরীরটাকে যত্ন কর্‌তুম, তাঁরাই যখন ফেলে গেলেন, তখন শীগ্‌গির ক'রে যাতে মা'র কাছে যেতে পারি, তারই চেষ্টা করা উচিত নয় কি? আর সত্যি কথা বলতে কোন দোষ নেই, মাকে হারিয়ে আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই। মা যে আমার কি ছিল, তা এখন বেশ ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি। মা'র অভাবে বাবাও দাদার কাছে চ'লে গেলেন, ভেবে দেখ দেখি বাসি, আর কত কষ্ট সহ্য করতে পারি?"

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আপনি কি তবে এই পথেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন? বিয়ে করুন না, দিদি?"

সুষমা কহিল, "বিয়ে ক'রে আর কি হবে, বাসি? মা'রই ইচ্ছে ছিল, তিনিই যখন—আর আমি যে বনের পাখী, আমি কি পিঞ্জরের মধ্যে থাক্‌তে পারবো?"

"তবুও, দিদি, একটা অবলম্বন ভিন্ন মানুষ কি থাক্‌তে পারে?"

হাসিমুখে সুষমা কহিল, "কেন, তুই-ই ত আমায় অবলম্বনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিস্। এই অনাথারা এখন আমার সব। দিন কেটে যায়, তা জান্‌তেই পারি না। জগতের সমস্ত অনাথ অনাথাই যে আমার সন্তান। আমি যে এখন জগতের মা, আমি ত আর আমার নই। বাবা যখন আমায় ছেড়ে চ'লে যান, তখন আমি বড্ড কেঁদেছিলুম, বাসি। তাইতে বাবা আমায় বল্লেন, 'তুই যে নূতন ক'রে তোকে গ'ড়ে তুলেছিস্, মা! আমি ত তোকে শুধু আমাদের ভালবাসতে শিক্ষা দিই নি, তোকে যে জগৎকে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়েছি। আজ তবে একটির দিকেই তোর আকর্ষণ আস্‌ছে কেন? তোর ঐ বুভুক্ষু হৃদয়ের ভালবাসাটা জগতের অনাথ শিশুদের উপর ছড়িয়ে দে, দেখবি, সেইখানেই তোর হারান বাবা-মাকে আবার ফিরে পাবি।' বাসন্তি, বাবার আদেশ আমার দেবাদেশের মতই মনে হয়।"

সুষমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "দিদি—"

বাসন্তীর শুষ্ক বিষণ্ণ মুখখানি নিজের বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সুষমা কহিল, "কি বলছিস্, বাসি?"

'আমি যাব না।"

সুষমা তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া কহিল, "ছিঃ বোন্? এটা কি তোর উচিত? চামেলী দিদির চিঠিখানা দেখ্‌লি ত? আমি যাতে তোকে বুঝিয়ে ব'লেকয়ে পাঠাই, তারই জন্যে তিনি বিশেষ ক'রে বলেছেন। এখন যদি তুই না যাস্, তা হ'লে তাঁরা বলবেন, আমিই হয় ত তোকে ধ'রে রেখেছি। তুই ত বুদ্ধিমতী, তবে এ সব পাগ্‌লামী কচ্ছিস্ কেন? পিসীমার অসুখ, এ সময় তাঁকে দেখা তোর উচিত। তোর জন্যে তাঁরও কত অশান্তি, তা ত তুই জানিস্। এখন না যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? তোকে ছেড়ে দিতে আমারও যে কি কষ্ট হয়, তা আমি তোকে কি ক'রে জানাব, বাসি!"

বাসন্তী কহিল, "যেতে যে আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগলেও ভাল লাগাতে হবে। তুই আজ এত অবুঝ হ'চ্ছিস কেন? জগৎটাও মাঝে মাঝে ভূমিকম্পে বিচলিত হয়ে উঠে, কিন্তু তোকে ত কখনও বিচলিত দেখিনি, বাসি। তুই যে মনটাকে পাষাণের মত শক্ত করেছিস্, আজ তবে এ কথা বলছিস্ কেন? একটা কথা আছে জানিস্ ত, 'নেটী-পেটী শো অভিমানী দো।' সেই রকম তুই কাছে থেকে যদি উদাসী মনটাকে ঘরবাসী করতে পারিস্, তার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? বাসি—ছোট বোন্‌টি আমার—তুই ত আমার অবাধ্য হোস্‌নি কোন দিন, তবে আমার এ অনুরোধটা রাখ বোন্, এ মাহেন্দ্রক্ষণ ত্যাগ করিস্‌নি!"

সুষমার মনে হইল, বাসন্তী তাহার কে? এই দুই দিনের পরিচয়ে সে কেন তাহাকে ভালবাসিল? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ভালবাসা যে বাসন্তীর স্বভাব। কি পাষাণী সে? বাসন্তী তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না, সে তাহাকে জোর করিয়া বিদায় করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই যে তাহার কর্ত্তব্য। সে আরও ভাবিতেছিল, সন্তোষদার সেদিনকার সেই ব্যবহার; তার সেই কঠিন, অসহনীয় অভদ্র আচরণগুলা তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল। হায় পুরুষ! তোমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। আবহমানকাল তোমাদের মধ্যে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। চিরদিনই নারী-নির্য্যাতনে তোমরা সিদ্ধহস্ত!

বাসন্তী সুষমার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল, "আর আমি তোমার অবাধ্য হব না দিদি—আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

সুষমা তখন বাসন্তীকে নিজের উচ্ছ্বসিত বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, এই কি শান্তি? এই কি তৃপ্তি? কি এ?

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রবণের অপরাধ

সন্ধ্যাবেলায় কাষ-কর্ম্ম সারিয়া বাসন্তী পিসীমার ঘরে ঢুকিয়া খানকতক চিঠির জবাব দিতে বসিল।

প্রায় ১৫ দিন হইল, তাহারা ডেরাডুনে আসিয়াছে। সুষমার ২।৩খানি চিঠি আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সিরাজগঞ্জেরও কয়েকখানি চিঠি আসিয়াছে। নূতন দেশে আসিয়া নূতন গৃহস্থালী গুছাইতেই বাসন্তী এ কয় দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। সেই জন্য সে কাহারও চিঠির জবাব দিতে পারে নাই। আজ একটু অবসর পাইয়া সে চিঠিগুলি লইয়া বসিল। এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে সুকণ্ঠে কে গাহিয়া উঠিল—

ওহে জীবন-বল্লভ, সাধন-দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন-মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।

গায়কের এই গানখানি যেন তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। অজ্ঞাতে কখন্ যে তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। আবার চারিদিক্ ধ্বনিত করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণ-প্রিয় দিয়ো হে দিয়ো
বেদনা নব নব।"

যে গাহিতেছিল, তাহার কণ্ঠ বড় মধুর। কীর্ত্তনের মধুর স্বর চারিদিক্ যেন মাতাইয়া তুলিতেছিল। সে চিঠি লিখিতে বসিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গীতের মোহমন্ত্র তাহাকে অহল্যার ন্যায় পাষাণে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। আবার বন্ধুর শিলাসঙ্কুল মহাদ্রির নবঘনশ্যামশোভিত চরণপ্রান্ত মাতাইয়া সুধার উৎস উথলিয়া উঠিল—

"তবু কেন না দূরে—দিবস-শেষে
ডেকে নিয়ে চরণে;
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার
মৃত্যু-আঁধার ভবে॥"

বাসন্তীর পশ্চাতে যে শেফালী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। শেফালী ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে চমকিত হইয়া উঠিল। শেফালী কহিল, "এ কি বৌদি, দাদার একটা গান শুনেই কেঁদে ফেল্লেন?"

বাসন্তী লজ্জিত হইয়া কহিল, "দূর।"

শেফালী হাসিয়া কহিল, "কাঁদ্‌ছেন, তবু স্বীকার কর্‌বেন না।"

বাসন্তী কহিল, "কি জানি ভাই, কীর্ত্তন শুন্‌লেই আমার কেমন কান্না পায়।"

বাসন্তীকে শাসাইয়া শেফালী কহিল, "দাঁড়ান, আমি সবাইকে ব'লে দিচ্ছি যে, বৌদি বড়দার গান শুনে ঘরে ব'সে কাঁদ্‌ছেন।"

বাসন্তী অনুনয়ের স্বরে কহিল, "তোর পায়ে পড়ি শিউলি। ছিঃ, ও সব কথা কি বল্‌তে আছে? কি জানি ভাই, আমি যেন কি, বাবার কাষের পর কীর্ত্তন-ওয়ালীগুলোর গান শুনেও আমি কেঁদে কেঁদে মরি।"

"আচ্ছা বৌদি, আমি না আপনার ছোট, আপনি আমার পায়ে পড়বেন কি বল্‌ছেন? আপনি কি ক্ষেপে গেলেন না কি?" এই বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই বাসন্তী পুনরায় তাহাকে কহিল, "শিউলি, তুই যদি আর কারুর কাছে এ কথা বলিস্, তা হ'লে কিন্তু ভাল হবে না। আমি তোর সঙ্গে জন্মেও আর কথা কইব না।"

শেফালী "না" বলিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিশ্রুতি সে কত দূর রক্ষা করিয়াছিল, তাহা সেই রাত্রিতেই বাসন্তী বুঝিতে পারিয়াছিল।

সন্তোষ যে এক জন ভাল গায়ক, তাহা বাসন্তী জানিত না। কারণ, বিবাহিত জীবনের পর এ সৌভাগ্য তাহার কোন দিনই হয় নাই। আজ শেফালীর কাছে সন্তোষ গাহিতেছে শুনিয়া সে প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই। এমন মধুর কণ্ঠ, এমন সকরুণ বেদনার সুর যাহার সঙ্গীতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, সে কেবল মানুষের দুঃখই বোঝে না কেন?

এলাহাবাদে কেবল পিসে মহাশয় ও চামেলী আছে। এখানে পিসীমার সঙ্গে প্রায় সকলেই আসিয়াছে।

শেফালীর স্বামীর শরীর খারাপ হওয়াতে সেও এই সঙ্গে আসিয়াছে। অনিল মা'র সঙ্গে আসিয়াছে; সে কাল চলিয়া যাইবে।

রাত্রিকালে বাসন্তী নন্দাইকে পান দিতে ঘরের ভিতর আসিতেই শিশির বাবু কহিলেন, "ছিঃ, বৌদি, আপনি আজ কেঁদে ফেল্লেন? দাদা ত শুনে গানই বন্ধ ক'রে দিলেন।"

বাসন্তী বড়ই লজ্জিত হইল, সে ভাবিল, তিনিও বাসন্তীর এই দুর্ব্বলতাটা শুনিয়া ফেলিয়াছেন। কেন সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসে নাই? ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে সে কহিল, "শোনেন কেন ও-সব মিছে কথা। শিউলীর যেমন কাণ্ড।"

"আপনি কাঁদ্‌তে পাল্লেন, আর সে বেচারীর বুঝি দোষ হলো?"

মৃদু হাসিয়া বাসন্তী কহিল, "নিজের দিকে ঝোল সবাই টানে মশাই, গিন্নীর দোষ কি কেউ দেখে।"

শিশির বাবু বাসন্তীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কি করি বলুন, আপনাদের আঁখির যে রকম প্রহার। আমরা বেচারীরা বিয়ের পর থেকেই ম'রে আছি। তার পর বাসর-ঘরে কড়িখেলার কথাটা মনে আছে ত? আপনারাই ত জোর ক'রে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন।"

ইতিমধ্যে সুজাতা আসিয়া কহিল, "ইস্ আজ্ঞাধীন ভৃত্য, সকল সময় সকল মত মেনে চলেন কি না।"

"কোনটিই বা অমান্য করি বলুন?"

বাসন্তী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তোমাদের সবই ভাল। আমরাই দোষী। দেখ্ না সুজা, গিন্নীর পেটে আর কথাটি হজম হয়নি, এরই মধ্যে কর্ত্তার কানে উঠিয়ে দিয়েছেন।"

শিশির বাবু হাসিয়া কহিল, "একেবারে জোড়া সরস্বতীর সঙ্গে আমি ছেলেমানুষ কি ক'রে পারবো বলুন, দাদাদের না হয় কাকেও ডেকে আনি।"

সুজাতা রহস্য-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আহা, একেবারে নাবালক। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। সার্জ্জেনটি এ সময় গেলেন কোথায়?"

শিশির বাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "রণে ভঙ্গ দিয়েছেন বোধ হয়। তার জায়গা বেদখল হবার জোগাড় দেখে মায়ের—"

বাসন্তী সুজাতার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ্‌লি সুজাতা, নাবালকটির কথা শুনছিস তো? এর পর স্পষ্টই গালাগাল খেতে হবে। রাতটা যে বেড়েই যাচ্ছে, শেষে কি শাপে পড়ে যাবো?"

"বেশ উল্টা চাপ দিলেন তো, নিজেদের যে সেই সঙ্গে সময় যাচ্ছে, তাই আমার ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিচ্ছেন।"

বাসন্তী বাহিরে যাইতে যাইতে কহিল; "আমার কথা আলাদা 'অন্ধ জাগো, কিবা রাত্র কিবা দিন।' তবে ছোট গিন্নীর—" ঘরের বাহির হইতেই সে দেখিল, সন্তোষ পিসীমাকে ঔষধ খাওয়াইয়া সদরে ফিরিতেছে। বাসন্তী ভাবিতে লাগিল, সে কেন আজ এত বেসামাল হইয়া পড়িতেছে। একেই শেফালী আজ একটা কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, তাহার উপর স্বামী যদি আজ তাহার এই কথা শুনিয়া থাকেন, তাহাকে নির্লজ্জই ভাবিবেন। সে রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়াও নিজের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া নিজে নিজেই লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

সূতা ও ফুল

মালা হ'তে কহে সূতা ফুলদলে ডাকি',—
"এত ভার কেমনেতে স'য়ে বল থাকি?"

কহে হাসি' ফুলরাশি,—'শুন সূতা ভাই!
না রহিলে মোরা, গলে কোথা তব ঠাঁই?'

শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী।

চিত্রে বৈচিত্র্য

কলম ও তুলি দ্বারা চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি বহুযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাই স্বাভাবিক এবং সাধারণ অঙ্কনের জন্য ইহার অপেক্ষা সুবিধার আর কিছু বোধ হয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কলম, তুলি, কালী ও রং, এমন কি, কাগজ ক্যানভাস্ ব্যতিরেকেও ছবির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতক অবস্থাবিশেষে সুবিধার জন্য, কতক শিল্পের উৎকর্ষবিধানের জন্য এবং

বুড়াবুড়ীর রহস্য — যীশুখ্রীষ্ট — জান্ দে আর্ক (রেশমের বোনা ছবি)

কতক শিল্পীর খেয়াল হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। কালী, কলম প্রভৃতির দ্বারাও সময় সময় সাধারণ পদ্ধতির ব্যতিক্রম হইয়া বিচিত্র বা অস্বাভাবিক প্রকারে ছবি তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কতকগুলি চিত্র সহযোগে এই সকলের কথাই বলিব। ছাপা বা আলোক চিত্রের দ্বারা যে সব বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, তাহা এখানে বলিবার বিষয় নহে।

বুনানির দ্বারা ছবি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বহু কাল হইতে এ দেশে ও অন্যান্য দেশে চলিয়া আসিতেছে। গালিচা, আসন, কারপেট, ঢাকাই কাপড়ে ফুল ও পাড় প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। পশম, রেশম, জরি প্রভৃতির দ্বারা আজকাল মহিলাগণ কর্ত্তৃক সূচী-সাহায্যে হস্ত-নির্ম্মিত বহু সূক্ষ্ম চিত্রাদি সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে টিনসেল্ চিত্র নামে এক প্রকার সুন্দর ছবি পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত। তাহা সল্মা-চুমকির কাযের ন্যায়। উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ এই প্রকার ছবিতে অবিকল প্রতিকৃতি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারিতেন। বেণারসে এখনও জরি ও সল্মা-চুমকির সুন্দর নক্সা এবং তাজমহল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ অট্টালিকাদির ছবি পাওয়া যায়। কাঁথাতেও সাধারণ রঙিন সূতা দ্বারা লতাপাতা, ফুল প্রভৃতি দিয়া চিত্রিত করিতে দেখা যায়। ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল্-জামিয়ারে ফুল, লতা ও কল্কা প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গড়ার উপর পশমের বোনা ছবি অনেকেই দেখিয়াছেন। বহু বর্ণের রেশম বা সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা মখমল

জরির তৈয়ারী ছবি

কাগজে কাটা ছবি

উল্কির দ্বারা চিত্রিত

পুষ্পগুচ্ছ—(মানুষের চুলের দ্বারা নির্ম্মিত)
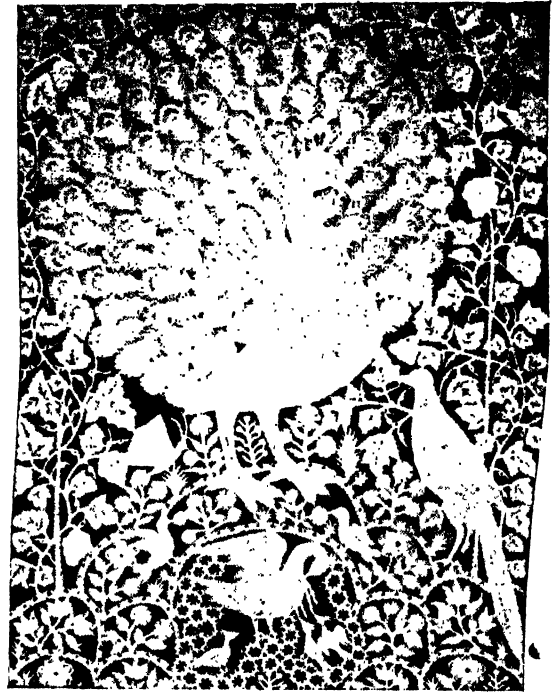
বা অন্য কাপড়ের উপর সূচি-কার্য্যের সুন্দর ছবি, এমন কি, কোন কোন বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতি পর্য্যন্ত এখানকার কোন কোন প্রদর্শনীতে দেখা যাইলেও পাশ্চাত্য দেশে এই শিল্পের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। জামার জন্য শাটিন, সিল্ক বা গর্ণেটের উপর যে সব ফুলের কায দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় নিখুঁত। এই সকল কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহসজ্জার জন্য ফ্রান্সে সিল্কের উপর বোনা এমন সব সুন্দর সুন্দর ছবি পাওয়া যায়, যাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ফ্রেমে বাঁধান অবস্থায় উহা যে সিল্কের উপর বোনা ছবি, তাহা না বলিয়া দিলে প্রায় বুঝিতেই পারা যায় না, একখানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিয়াই মনে হয়।

প্রিন্স এলবার্ট (জরির কায)

মেঝে বা দেওয়ালে পাথরের, কাচের বা ভগ্ন চীনামাটীর বাসনের টুক্‌রা দ্বারা চিত্র-বিচিত্র, কলিকাতার ও মফস্বলের কোন কোন ভাল ভাল অট্টালিকায় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চিত্রের নিদর্শন তাজমহলের ভিতরকার কারুকার্য্য সকলের মধ্যে দেখা যায়। কথিত আছে, তাজমহল এবং আগ্রার দুর্গাভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে পূর্ব্বে বহুমূল্যবান্ প্রস্তরাদির দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ পুষ্পাদির চিত্র ছিল। আগ্রায় নির্ম্মিত এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরাদির ফুল, লতাপাতা অঙ্কিত শ্বেতপ্রস্তরের রেকাবি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। জাপানী আবলুস্ কাঠের ছোট ছোট বাক্স-কৌটার উপর ঝিনুকের ফুল,
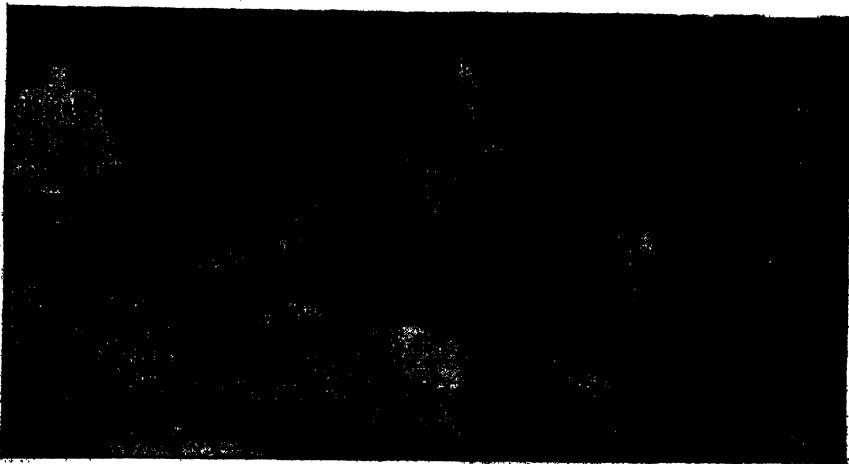
সরল রেখার সাহায্যে চিত্রিত

সিঙ্কের উপর ছবি

সেণ্ট জর্জ্জ এবং ড্রাগন (সল্মা-চুমকির ছবি)

পাখী প্রভৃতির যে ছবি দেখা যায়, তাহাও এই একই শ্রেণীর শিল্প। ছোট ছোট সামুদ্রিক ঝিনুক সিমেণ্টের দেওয়ালে বিন্যস্ত করিয়া চিত্রবিচিত্র করিয়া দেওয়াল সজ্জিত করিতেও দেখা যায়। অলঙ্কারের উপরও বিবিধ উজ্জল বর্ণের যুগলমূর্ত্তি, ময়ূর, পাখী প্রভৃতির চিহ্ন মিনা বা আধুনিক এনামেলের কাযের

বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত ছবি

দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে।

বহু প্রকার বিবিধ আকারের রঙ্গিন কাচখণ্ড দ্বারা অতি সুন্দর মনোরম ছবি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। গির্জ্জার আলোকপথে যীশু খৃষ্টসংক্রান্ত এইরূপ চিত্র দ্বারা সজ্জিত করিতে দেখা যায়। দরজা-জানালায় লাগাইবার জালের মত পর্দ্দা ও কাচের পুঁথির পর্দ্দায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের

বাঘের মুখ (টাইপ রাইটারে অঙ্কিত)

পুঁথি গ্রথিত করিয়া নানা প্রকার চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে গৃহ-সজ্জার জন্য ছবিও করা যাইতে পারে।

বিবিধ বর্ণের দ্রব্য সাজাইয়া বা গ্রথিত পালক দ্বারা কাহারও কাহারও ছবি নির্ম্মাণের খেয়াল দেখা যায়। বিবিধ বর্ণের ছোট ছোট মরসুমি ফুলের গাছ সজ্জিত করিয়াও জীব-জন্তুর আকৃতি

ঘন সন্নিবিষ্ট সমান্তর রেখায় অঙ্কিত মুখ

করিয়া যে যে প্রকারের ছবি হয়, তাহা মোটামুটি বলা হইল। আমাদের দেশে রঞ্জিত চাউলের গুঁড়া বা পঞ্চগুঁড়ির দ্বারা আসন রচনার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। ইহার দ্বারা সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি প্রভৃতি চিত্রিত হইতেও দেখা যায়। ইহা মানুষের খেয়াল হইতে উদ্ভূত কি না, জানি না। প্রজাপতির পাখা সাজাইয়া বা পক্ষীর

কেবলমাত্র সরল রেখার দ্বারা অঙ্কিত ছবি

বা অন্য ছবি ও লেখার সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

সৌখীন বা নিষ্কর্ম্মা লোকের খেয়ালে এইরূপ বহুপ্রকার নূতন ও বৈচিত্র্যময় ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁচির দ্বারা কাগজ কাটিয়াও নানা রকম সুন্দর ছবি প্রস্তুতের খেয়াল দেখা যায়। কেশগুচ্ছ ছাঁটিয়া এমন সুন্দর চিত্র করা যায়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কাচ বা
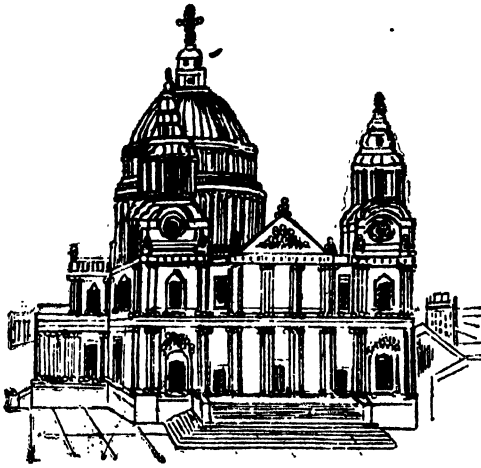
টাইপ রাইটারে চিত্রিত ছবি

চীনামাটীর বাসনে বহু প্রকারে নানাবিধ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে। উহা অধিকাংশ স্থলে তুলিস্পর্শে সাধারণ-ভাবে চিত্রিত নহে। কাচের স্থানে স্থানে অস্বচ্ছ করিয়া সুন্দর ছবি হইয়া থাকে। গজদন্তের পাতের উপর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্র দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। জয়পুর অঞ্চলে পিতলের ও ডালার উপর ক্ষোদাই করিয়া সুন্দর চিত্রাদি অঙ্কিত হয়। সোনা-রূপার উপর এন্‌গ্রেভ করিয়া উৎকৃষ্ট ছবি ও নক্সা করা যায়। সমুদ্রের ঝিনুকে যে চিত্র-বিচিত্র বা নূতন গ্যাল্‌ভানাইজড বাল্‌তি বা করকেট প্রভৃতিতে যে ফুলের মত

সিল্কের ছবি

সোনা ও রূপার পাখী (পশম ও জরির কায)

দেখা যায়, উহা কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া যায়।

বাঁশ হইতে নির্ম্মিত সরু চিকের উপর খুব সুন্দর চিত্র সকল অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। জাপানে এইরূপ চিকের ব্যবহার অধিক হইলেও, এখানেও

বাজনার দল (বাহ্য রেখা ও শেডহীন ছবি)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ (চিকে অঙ্কিত ছবি)
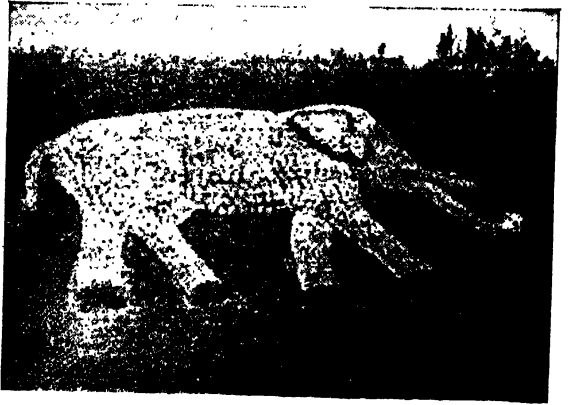
মেঘ (অঙ্গুলীর দ্বারা অঙ্কিত)

দেবদেবীর চিত্র-সংবলিত সুন্দর চিক পাওয়া যায়।

বুরুষ টানিয়া ছবি রং করাই সাধারণ ব্যবস্থা। শিল্পীর খেয়ালে বুরুষ না টানিয়া কেবল উহা দ্বারা ক্যানভাস্‌ স্পর্শ করিয়াও ছবি প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে। আবার তুলি বা বুরুষ না লইয়া কেবল অঙ্গুলীর দ্বারাও কোন কোন ছবি আঁকিতে দেখা গিয়াছে। রমণীরা অঙ্গুলীর দ্বারা আলিপনা দিতে পারেন, এ কথা অনেকে জানেন।

তুলি, বুরুষ ও কলম ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে যে সব চিত্র বা নক্সা প্রস্তুত হইতে সাধারণতঃ

ফুলগাছের দ্বারা হস্তীর মূর্ত্তি

দেখা যায়, সেই সব বিচিত্র চিত্রের কথা বলা হইল। উক্ত সকলের দ্বারাও চিত্রকরের খেয়ালে রকমারি ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে। কেহ কেবল সরল রেখায়, কেহ কেবল বক্ররেখায়, কেহ মাত্র একটি রেখায়, কেহ ঘন সন্নিবিষ্ট সমান্তর রেখায় আঁকিয়া থাকেন। এক কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের বা কেবলমাত্র বিন্দুর দ্বারাও ছবি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। হাফটোন ব্লকের ছবিও কতকটা শেষোক্ত শ্রেণীর। আবার কোন শেড বা বাহ্যরেখা না দিয়া কেবলমাত্র মসীলেপনে চিত্রিত সুন্দর ছবিও দেখা যায়। সেই ছায়া-চিত্রসম ছবিগুলিতেও অঙ্কিত চিত্রের বিষয় বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চিত্রকরের খেয়ালে একখানি ছবির ভিতরে লুক্কায়িতভাবে এমন সব চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

নরদেহে এক প্রকার স্থায়ী চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা

আছে, উহাকে উল্কি বলে। উল্কি পরা এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এমন কি, প্রাচীনাদের মুখে শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বে না কি উল্কি না পরিলে হাতের জল শুদ্ধ হইত না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে অনেকের এই উল্কি পরার যথেষ্ট সখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ পিঠে, বুকে, হাতে, এমন কি, সমস্ত অঙ্গ উল্কির দ্বারা চিত্র-বিচিত্র করিয়া থাকেন। ঘোড়া, গোরু প্রভৃতির গাত্রে উত্তপ্ত লৌহাদি দ্বারা যে প্রণালীতে মার্কা করিয়া থাকে, ইহা সে প্রণালীতে হয় না। ইহা লৌহনির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্র দ্বারা রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে করা হইয়া থাকে।

বক্ররেখার দ্বারা অঙ্কিত মুখ
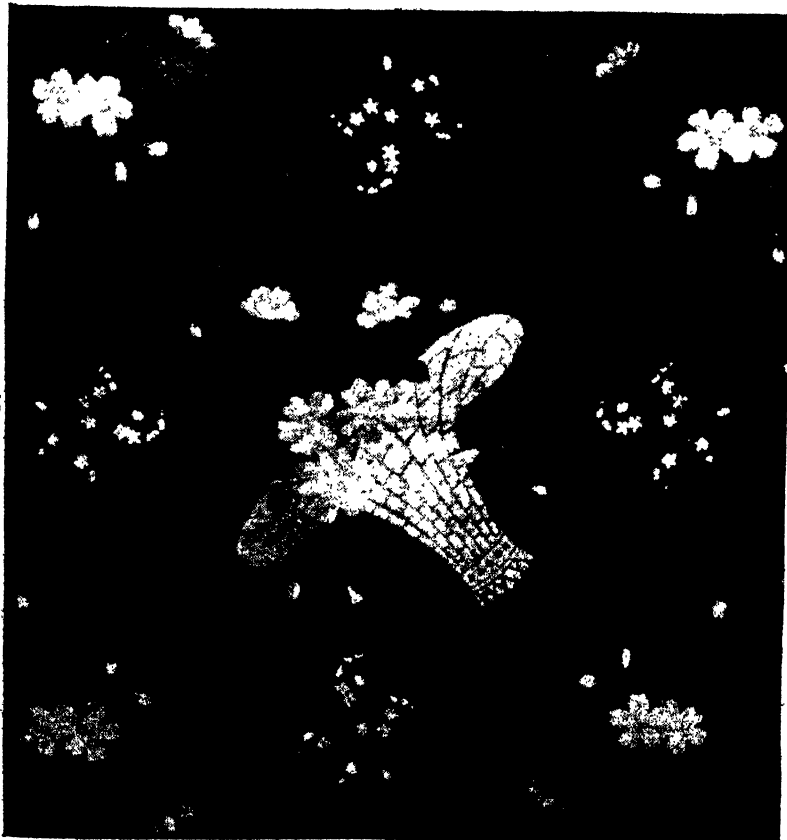
খদ্দরের উপর পশমের ছবি

ছাপা ও ফটোগ্রাফিতেও বিবিধ প্রকারের চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু টাইপ-রাইটারের সাহায্যে শিল্পীর কৌশলে যে পরিষ্কার ছবির সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত নহেন। নখের দ্বারা সরস্বতী, লক্ষ্মী আদি দেব-দেবীর চিত্রও এ দেশে অঙ্কিত হইতে দেখা যায়। শিল্পীর খেয়ালে বা নব উদ্ভাবনার ফলে নিত্যই এইরূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতেছে।

শ্রীহরিহর শেঠ।

রাক্কুসী

১

মোহনপুরের গোবিন্দ পাল অনেক দেখিয়া-শুনিয়া এবং সাধ্যাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া গোবর্দ্ধন দের ছোট ছেলে গিরিধারীর সঙ্গে ৯ বৎসরের মেয়ে রাইকিশোরীর বিবাহ দিয়াছিল।

গোবর্দ্ধনের বাড়ী শ্যামপুর; শ্যামপুর মোহনপুরের ২ ক্রোশ পশ্চিমে—ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। শ্যামপুরে যে ২৫।৩০ ঘর লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে গোবর্দ্ধন বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ; তাহার যথেষ্ট জোত-জমা ও চাষ-আবাদ ছিল; এতদ্ভিন্ন খেজুরে গুড় ও লঙ্কামরিচের ব্যবসায়ে কয়েক বৎসর প্রচুর লাভ হওয়ায় সে বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল।—গোবিন্দের মেয়েটি সুন্দরী এবং গোবিন্দ সজ্জন বলিয়া গোবর্দ্ধন এই বিবাহে আপত্তি করে নাই।

মোহনপুরে গোবিন্দ পালের একখানি ছোট মুদীখানা দোকান ছিল; পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র দোকান, সেই দোকানে তাহার যে যৎসামান্য লাভ হইত, তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসার কোন রকমে চলিয়া যাইত। সে মনে করিয়াছিল, তাহার একটিমাত্র মেয়ে, মেয়ের বিবাহে কিছু দেনা হইল বটে, কিন্তু ক্রমে সে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে; তাহার মেয়ে ত চিরজীবন সুখে থাকিবে। মেয়েটিকে ধনবানের ঘরে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু মানুষ এক ভাবিয়া কায করে, তাহার ফল অনেক সময় অন্য রকম হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল; রাইকিশোরীর সহিত বিবাহের ২ বৎসর পরে গোবিন্দের জামাই গিরিধারী কলেরায় হঠাৎ মারা গেল। স্বামী কি বস্তু, তাহা চিনিবার পূর্ব্বেই ১১ বৎসরের মেয়ে রাইকিশোরী বৈশাখের এক অপরাহ্নে হাতের নোয়া ও সীঁথির সিন্দূরে বঞ্চিত হইল।

গিরিধারীর মৃত্যুতে তাহার পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল; রাইকিশোরীও তাহাদের মত মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু সে কি হারাইয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার ননদ তাহার হাত হইতে বাজু, বালা, শাঁখা ও কাঁঠিপয়লা, পায়ের মল ও নথ-ছুটকী, গলার হার খুলিয়া লইল; এমন কি, তাহার বাঁ-হাতে যে সরু লোহাগাছটি ছিল—সেই এক পয়সা দামের জিনিষটিও তাহাকে হাতে রাখিতে দিল না। তাহার ননদ, বড় জা, এমন কি, শাশুড়ী পর্য্যন্ত গহনা পরে, চুল বাঁধে,—আর তাহাকে সকল সাধে বঞ্চিত হইতে হইল,—এমন দোষ সে কি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত না।—মাছ না হইলে তাহার মুখে ভাত উঠিত না; এক মাস পরে অশৌচান্তে সকলেই আগের মত মাছ-ভাত খাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার পাতে এক দিনও কেহ মাছ দিল না, সে মায়ের নিকট হইতে অনেকগুলি চুলের 'গুছি' আনিয়াছিল, সেই সকল 'গুছি' দিয়া সে চুল বাঁধিতে চাহিলে সকলে মাথা নাড়িয়া মুখ ফিরাইত; তাহার মাথাভরা চুলে কেহ হাত দিতে চাহিত না। তাহার বাক্সে শিশিভরা আলতা ও ২।৩ রকম 'গন্ধ-তেল' ছিল; শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় তাহার মা সেগুলি তাহার বাক্সে সাজাইয়া দিয়াছিলেন; এক দিন তাহার বড় জা তাহাকে বাক্স খুলিতে দেখিয়া বলিল, "ওগুলো ত তোর কোন কাযে লাগ্‌বে না,

শুধু শুধু বাক্সে পুরে রেখে নষ্ট কর্‌বি কেন? আমাকে দে ছোট-বৌ!"

সেগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিতে রাই-কিশোরীর বড় কষ্ট হইতেছিল; চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া তাহার ননদ বলিল, "তুই যেমন রাক্কুসী—আমার ভাইকে খেয়ে এখনও ও সব জিনিষ বাক্সে রাখ্‌তে তোর সাধ হচ্ছে? কি ঘেন্নার কথা! লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে না?"

রাইকিশোরী মাথা গুঁজিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে শিশিগুলি বাহির করিয়া দিল।—তাহার বাক্স-ভরা শাড়ী, সেমিজ, জামা—এক দিন একখানি পেঁয়াজ রঙের শাড়ী পরিবার জন্য তাহার বড় লোভ হইয়াছিল; সে তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে দেখিয়া তাহার বিধবা পিস্‌শাশুড়ী মাথা বাঁকাইয়া, গালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়াছিল, "ও মা, আমি কুতায় যাবো? পোড়াকপালী দেখ্‌চি নোক না হাসিয়ে ছাড়বে না! কোন্ দিন কুলে কালী দিয়ে বস্‌বে! এই বয়সেই এমন 'পিবৃবিত্তি', এর পর ত দিনকাল পড়েই আছে! দেখ্ ছোট-বৌ! তুই যে ঐ নরুণপেড়ে ধুতি পর্‌তে পাচ্ছিস্—এই ঢের। আর দু'দিন পরে আমাদের মত সাদা থান পর্‌তে হবে; নৈলে তোর 'অপো-যশে'র সীমে থাক্‌বে না।"

রাইকিশোরীর বাক্সভরা কত রকম শাড়ী থাকিতে—সে তাহার একখানিও পরিতে পাইবে না; সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে?—সে ঘরে বসিয়া ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে চোখের জল ফেলিত এবং সে সময় কেহ তাহাকে ডাকিলে সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া, চক্ষু দুটি করমচার মত লাল করিয়া, ভয়ে ভয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইত। কেহ তাহার দুঃখ বুঝিত না; একবারও কেহ 'আহা' বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিত না।

সহানুভূতি প্রকাশ দূরের কথা, রাইকিশোরী বিধবা হইবার পর তাহার শাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী, ননদ, বড়জা তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথাও কহিত না। সে সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার শাশুড়ী পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য তাহাকেই অপরাধিনী মনে করিত এবং যখন-তখন ধিক্কার দিয়া বলিত, "কি 'রাক্কুসী'ই ঘরে এনেছিলাম গো! ঐ ত আমার বাছাকে খেলে; নৈলে কি গিরিধারী আমার যাবার ছেলে? ওর মুখ দেখলে আমার মনের আগুন হু হু ক'রে জ্ব'লে ওঠে। পোড়াকপালীর শনির 'দিষ্টি' নেগে আমার সব জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!—জানিনে অদেষ্টে আরও কত খোয়ার আছে; শতেকখোয়ারীর তবু এখনও সাজগোজ করবার সখ! অমন সখের মুখে আগুন! গলায় দড়ি জোটে না?"

রাইকিশোরীর শাশুড়ী ক্ষান্তমণি লোক নিতান্ত মন্দ ছিল না; কিন্তু কুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াতেই তাহার ছেলে মারা গিয়াছে—এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার উপর তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী প্রতিবেশিনীরা—কেহ একটু গুড়, কেহ গাছের একটা নারিকেল, কেহ আধ সের ছোলার জন্য তাহার কাছে আসিয়া নানা মিষ্টকথায় তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত এবং তাহার দুঃসহ পুত্রশোকে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য প্রথমেই তাহার 'অপয়া' পুত্রবধূর নিন্দা আরম্ভ করিত।—কেবল ক্ষান্তমণির নহে, গোবর্দ্ধনেরও ধারণা হইয়াছিল, গোবিন্দ পালের কন্যার সহিত গিরিধারীর বিবাহ না দিলে তাহাকে এই দুঃসহ পুত্রশোক পাইতে হইত না!

বিবাহের পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন গোবিন্দ পালের নিকট রাইকিশোরীর ঠিকুজী লইয়া গিরিধারীর ঠিকুজীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের প্রতিবেশী 'নটবর' আচায্যি উভয় ঠিকুজী পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিল, "দে মশাই, এ যে দেখচি রাজযোটক! আপনি 'অনাসে' এ 'কার্য্যি' কর্‌তে পারেন।"—সুতরাং গোবর্দ্ধনের আপত্তির কোন কারণ ছিল না। কিন্তু গিরিধারীর মৃত্যুর পর গোবর্দ্ধনের সন্দেহ হইল, কোষ্ঠীবিচারে 'নট-বর' ঠাকুরের হয় ত ভুল হইয়াছিল। এই জন্য সে শ্যাম-পুরের প্রধান জ্যোতিষী গণেশ আচার্য্যিকে ডাকাইয়া আনিয়া ১ টাকা প্রণামী দিয়া বলিল, "দেখুন ত আচায্যি মশায়, এ 'প্রেকার' অঘটনটা ঘটবার কারণ কি? আমাদের নটবর ঠাকুর ঠিকুজী মিলিয়ে দেখে বলে-ছিলেন, 'রাজযোটক হয়ে গিয়েছে, আর দেখতে হবে

না। এ কার্য্যি কর্‌তে পারেন।' কিন্তু এ দিকে দু' বছরের মধ্যেই ফরসা! এ আবার কি 'প্রেকার' রাজ-যোটক ?"

গণেশ আচার্য্যি খড়ি পাতিয়া ঘণ্টাখানেক গণনা ও গবেষণার পর কয়েকটা শ্লোক আওড়াইয়া ও ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, "তোমার বৌমাটির হচ্ছে রাক্ষসগণ, আর তোমার ছেলের ছিল নরগণ। রাক্ষসগণে ও নরগণে মিলন হ'লে—রাক্ষসগণ নরগণকে পাকা কলার মত ভক্ষণ করে। এ দুই-এ খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, তা জান ত ?—রাজ-যোটক হয়েছে ভেবে এই বিরুদ্ধ সম্পর্কটা 'উপিক্যে' করা বড়ই অন্যায় হয়েছিল। ঐ ভুলেই তোমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে দে মশায়! বড়ই আপশোষের বিষয় যে, আমি তখন রুইতনপুরের মজুন্দার বাবুদের একখান 'কুষ্টী' তৈরি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, বাড়ী আস্‌তে পারিনি। আমি সে সময় বাড়ী থাক্‌লে কি এ রকম সাংঘাতিক কার্য্যে মত দিই, না এ কর্ম্ম হয়? 'বিধেতা'র 'নির্ব্বন্ধ।' তুমি গেলে কি না 'লটবর'কে দিয়ে 'কুষ্টী' 'বিচের' করাতে! এ কি লটবরের কায? সে শুধু ক্রিয়ে-কর্ম্মের বাড়ীতে গিয়ে কলার পেট্‌কো কাটে, আর বোঁচকা বাঁধে। ঠিকুজী-কুষ্টী বিচেরের সে কি ধার ধারে?"

গণেশ আচার্য্যির এই দৈববাণী বিশ্বাস করিয়া পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য গোবর্দ্ধন তাহার পুত্রবধূকেই দায়ী করিল। গোবর্দ্ধনের অন্তঃপুরে এই কথা লইয়া একটু আন্দোলন আলোচনাও হইয়াছিল; সুতরাং রাইকিশোরীর শাশুড়ী, ননদ, এমন কি, গোবর্দ্ধনের দাসদাসী পর্য্যন্ত তাহাকে 'স্বামীখাকী' বলিয়া গঞ্জনা দিতে লাগিল এবং রাইকিশোরীর নিরীহ পিতামাতা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাইল না!

দুই ক্রোশমাত্র তফাতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। রাই-কিশোরীর কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথা গোবিন্দ ও তাহার স্ত্রী সর্ব্বদা শুনিতে পাইত; অনেক কথা একটু অতিরঞ্জিত হইয়াও তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিত। প্রাণাধিকা কন্যার নির্য্যাতন-সংবাদে তাহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন দে পরম ধার্ম্মিক লোক; দেব-দ্বিজে ভক্তি, বিশেষতঃ গুরুভক্তি তাহার অসাধারণ। তাহার গুরুদেব চিন্তামণি ভাগবতভূষণ আশ্বিনমাসে পূজার পূর্ব্বে শ্রীপাট ইস্‌লামপুর হইতে শিষ্যগৃহে বার্ষিক আদায় করিতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, ছয় মাস পূর্ব্বে গোবর্দ্ধনের যে পুত্রবধূটি বিধবা হইয়াছে, তাহাকে একাদশীতে নিরম্বু উপবাস না করাইয়া রুটী খাইতে দেওয়া হয়!—এই স্বেচ্ছাচারের কথা শুনিয়া ভাগবতভূষণ উভয় কর্ণরন্ধ্রে, উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা 'ছিপি' দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া-ছিলেন, "রাধামাধব! ঘোর কলির অভ্যুদয় হয়েছে; যদিস্যাৎ তাই না হবে, তবে তোমার মত পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর ঘরের বিধবা কৌলিক আচারভ্রষ্ট হয়ে, একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাসের পরিবর্ত্তে দিস্তে দিস্তে রুটী উদরসাৎ করবে কেন?—এ রকম আচারভ্রষ্ট বিপথগামী শিষ্যের গৃহে যে গুরু জলগ্রহণ করেন, তাঁকেও নিরয়গামী হ'তে হয়। গোবর্দ্ধনের বিধবা পুত্রবধূ একাদশীতে রুটী খায়? এঁ্যা! কলির ধর্ম্মনাশিনী শক্তির এর চেয়ে ভাল পরিচয় আর কি আছে?"

সেই দিন হইতে শ্রীগুরুদেবের ব্যবস্থায় একাদশীর দিন রাইকিশোরীকে জলস্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। এই গুরুদেবটির ধর্ম্মানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষে একটি দশমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার বংশরক্ষা হয় না! তিনি অপুত্রক; এই জন্য তিনি তৃতীয় পক্ষের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যখন-তখন শিষ্যদের সম্মুখে শিখা আন্দোলন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিতেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্।"—শিষ্যদের ধর্ম্ম-রক্ষার জন্যই বার্দ্ধক্যে তাঁহার এই কর্ম্মভোগ। তাঁহার এই উৎকট ত্যাগস্বীকার! প্রভুর এই অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গোবর্দ্ধনের ন্যায় পরম ভক্ত শিষ্যরা তাঁহার শ্রীখড়মের রজগ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে কণ্ঠে, ওষ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিত এবং বিহ্বলস্বরে বলিত, "প্রভু, আপনিই ধন্য!"

দুধের মেয়ে একাদশীর দিন পিপাসায় কাতর হইয়া এক বিন্দু জল পায় না শুনিয়া গোবিন্দ পাল দুঃখে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিল। অবশেষে এক দিন সে বৈবাহিকগৃহে গিয়া রাইকিশোরীকে মোহনপুরে লইয়া আসিল। পরম নিষ্ঠাবান্ ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য গোবর্দ্ধন দে

রাইকিশোরীর সমস্ত গহনা, জামা, শাড়ী প্রভৃতি নিজের বাক্সে পূরিয়া রাখিয়া তাহাকে একবস্ত্রে বিদায় করিয়া দিল। রাইকিশোরী তাহার শাশুড়ীর নিকট গহনা ও কাপড় চোপড়গুলি চাহিয়া যে কটূক্তি শুনিল, তাহার পর আর তাহা দ্বিতীয়বার চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। গোবিন্দ তাহার কন্যার প্রতি তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের সংবাদে এতই মর্ম্মাহত হইয়াছিল যে, সে-ও কোন জিনিষের দাবী করিল না; বৈবাহিক-গৃহে জলস্পর্শ না করিয়াই মেয়ের হাত ধরিয়া গরুর গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সংসারের অভিশাপস্বরূপ বিধবা পুত্রবধূকে বিদায় করিয়া গোবর্দ্ধন ও তাহার স্ত্রী কতকটা শান্তিলাভ করিল। তাহারা গোবিন্দকে বলিয়াছিল—এমন অলক্ষণা পুত্রবধূর মুখ যেন আর কখন দেখিতে না হয়।

২

রাইকিশোরীর মা উমাসুন্দরী দুঃখিনী কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইল। রাইকিশোরী মাছ না হইলে ভাত খাইত না; সেই কচি মেয়ে বিধবা হইয়া মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—শুনিয়া সে-ও মৎস্যাহার বর্জ্জন করিল। ভাল কাপড়-গহনা সে ত্যাগ করিল। মেয়ের সকল সুখ ফুরাইয়াছে বলিয়া মায়ের আর কোন রকম সাধ-আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্তি হইত না। বস্তুতঃ বিধবা কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে কিরূপ আঘাত লাগিল, তাহার অবস্থায় না পড়িলে অন্যের তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখে অন্ন রুচিত না; কেহ কোন দিন তাহাকে হাসিতে দেখে নাই। রাইকিশোরী নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া থাকিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে সে তাহাকে সংসারের কায-কর্ম্ম শিখাইতে লাগিল; রাইকিশোরী মায়ের সাহায্যে অল্পদিনেই পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিল, মায়ের সংসারের অধিকাংশ ভার সে স্বহস্তে গ্রহণ করিল। গোবিন্দ রাইকিশোরীকে অল্প লিখাপড়া শিখাইয়াছিল; সে তাহাকে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত কিনিয়া দিয়াছিল, অবসরকালে সে তাহা কোমলকণ্ঠে পাঠ করিয়া তাহার মা ও ছোট ভাই দুটিকে শুনাইত।—সারাদিনের পরিশ্রমের পর—এক এক দিন সে নিঃশব্দে একাকী তাহাদের ক্ষুদ্র অট্টালিকার ছাদের উপর গিয়া বসিত; শুভ্র অপরাহ্ণে সে ছাদের আলিসায় ভর দিয়া শূন্যদৃষ্টিতে পূর্ব্বদিকে চাহিয়া থাকিত। সে দিকে প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিত, সেই মাঠের শেষে পদ্মানদী। অপরাহ্ণের অস্তগত রবিকর-প্রতিফলিত বালুকাপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চরের প্রান্ত দিয়া পদ্মা অশ্রান্ত কল্লোলে বহিয়া যাইত, সাদা সাদা পাল উড়াইয়া পণ্যবাহী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকাগুলি নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইত; দূর হইতে সেগুলি তাহার নিকট নীলাকাশে ভাসমান মুক্তপক্ষ বিহঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইত। লাল মেঘের ছায়া নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত এবং মেঘগুলি ক্রমে পাটল, তাহার পর ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইয়া দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া যাইত; রাইকিশোরী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিত; ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিত এবং জলস্থল একাকার হইয়া যাইত। কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও বিষাদে রাইকিশোরীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের পাতা আর্দ্র হইত।—সেই সময় কোন কোন দিন তাহার ৩ বৎসরের ভাই হরিহর তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ছাদে আসিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সকৌতুকে বলিত, "দিদি টু উক্।"

রাইকিশোরী চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া উঠিত; কিন্তু তখনও তাহার চোখের পাতা ভিজে থাকিত। সে তাড়াতাড়ি ভাইটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিত এবং নীচে আসিয়া দীপ জ্বালিত। সে প্রথমে তুলসীতলায় একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া সেখানে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিত; তাহার পর ঘরে একখানি মাদুর বিছাইয়া দীপালোকে রামায়ণখানি পাঠ করিতে বসিত। জনম-দুঃখিনী সীতার গভীর শোক, কঠোর দুঃখ এবং মর্ম্মান্তিক বিষাদের কাহিনী গুণ গুণ স্বরে পাঠ করিতে করিতে তাহার মনের কষ্ট ও বেদনা যেন ধীরে ধীরে অপসৃত হইত। তাহার পর সে গৃহকার্য্যে মায়ের সহায়তা করিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিত। রাত্রি অধিক হইলে উমাসুন্দরী তাহার ছোট ছেলে হরিহর ও রাইকিশোরীকে কাছে লইয়া ঘরের দাওয়ায় মেঝের উপর শুইয়া পড়িত; মেয়ের দুর্ভাগ্যের

কথা ভাবিতে ভাবিতে গভীর রাত্রেও তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত না।

রাইকিশোরী বিধবা হওয়ায় গোবিন্দ হৃদয়ে কিরূপ গভীর বেদনা পাইয়াছিল—তাহা সে কোন দিন প্রকাশ করে নাই; বোধ হয়, তাহার সেরূপ শক্তি ছিল না। সে দোকানের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া মনের জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিত। সে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গাড়ুটি হাতে লইয়া মাঠে যাইত এবং বেড়া হইতে জামাল-কোটার দাঁতন ভাঙ্গিয়া লইয়া দাঁতন করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া হাত-মুখ ধুইত; তাহার পর তেল মাখিয়া পদ্মায় স্নান করিতে যাইত। স্নানশেষে সে গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, তাহার এক প্রান্ত বক্ষঃস্থলে প্রসারিত করিত এবং তাহার অন্তরালে ডানহাতখানি রাখিয়া অঙ্গুলীসঞ্চালনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিত। কিন্তু বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া এক মুহূর্ত্তও সে ঘরে দাঁড়াইত না; সে একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া দোকানে যাইত এবং দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া 'টাটে' জল দিয়া খদ্দের বিদায় করিতে বসিত।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে গোবিন্দের বড় ছেলে মনোহর দোকানে গিয়া বলিত, "বাবা, মা ভাত বেড়ে নিয়ে ব'সে আছে, খেতে যাও।—আমি তোমার খদ্দের বিদেয় করচি।" গোবিন্দ তাহার ক্ষুদ্র জলচৌকীখানি মনোহরকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে খাইতে যাইত।

মনোহরের বয়স তখন ১২ বৎসর হইয়াছিল, সে রাইকিশোরীর ২।৩ বৎসরের ছোট ছিল। গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল, মনোহর সেখানে কয়েক বৎসর লিখাপড়া করিয়াছিল। তাহার পর গোবিন্দ তাহাকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া দোকানের কায-কর্ম্ম শিখাইতেছিল। গোবিন্দ উচ্চশিক্ষার মর্ম্ম বুঝিত না, ছেলেকে বিদ্বান্ করিবার জন্ম তাহার আগ্রহ ছিল না; সে শক্তিও ছিল না। সে জানিত, কোন রকমে খাতা লিখিতে শিখিলে ও জিনিষপত্রের দাম হিসাব করিয়া লইতে ভুল না করিলে ছেলেটা মানুষ হইতে পারিবে। মনোহর মাড়োয়ারীদের ছেলেগুলির মত সেই বয়সেই 'খদ্দের বিদেয়' করিতে শিখিয়াছিল।

গোবিন্দ দোকান হইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র রাইকিশোরী তাহার পা ধুইবার জন্ম এক ঘটী জল আনিয়া দিত। এক এক দিন গোবিন্দ বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিত, সে দিন রাইকিশোরী অনুযোগ করিয়া বলিত, "বাবা, তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা কিছু নেই? এত বেলা হয়েছে, বাসিমুখে জল দেওনি! তুমি মনোকে দিয়ে দোকান থেকে একটু মিছরী পাঠিয়ে দিও, তোমার জন্যে একটু ক'রে ভিজিয়ে রাখব।"

গোবিন্দ প্রায়ই এ সকল কথার উত্তর দিত না; রাইকিশোরী এক দিন রাগ করিলে গোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "না মা, সত্যিই আমার ক্ষিদে-তেষ্টা পায় না; আমার জন্যে তোকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

সে হাসিতে হাসিতে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহা রোদনেরই নামান্তর! মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। রাইকিশোরী পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা যেন কি! এত বেলা পর্য্যন্ত কেউ কি শুকিয়ে থাকে?" তাহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। পিতা আহারে বসিলে রাইকিশোরী তাহার জন্ম পান সাজিতে যাইত; তাহার পর এক কল্‌কে তামাক সাজিয়া, কয়লার আগুনে তাহা ধরাইয়া রাখিয়া, পিতার বিশ্রামের জন্ম ঘরের মেঝেতে একখানি মাদুর বিছাইয়া একটি ছোট বালিস আনিয়া দিত।

আহারান্তে গোবিন্দ সেই মাদুরে শুইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিত। গোবিন্দের আহার শেষ হইলে তাহার স্ত্রী সেই পাতে খাইতে বসিত। হেঁসেল হইতে মাকে আর কিছু দিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া, রাই-কিশোরী তাহার পিতার মাথার কাছে আসিয়া বসিত এবং তাহার পাকা চুল তুলিতে আরম্ভ করিত। ধূমপান শেষ করিয়া গোবিন্দ উঠিবার চেষ্টা করিলে রাইকিশোরী প্রায়ই বলিত, "বাবা, আর একটু জিরিয়ে নাও; বড্ড গরম, আমি একটু বাতাস করি; তুমি একটু ঘুমোও বাবা! মনো ত দোকানেই আছে।"

"থাক মা, বাতাস কর্‌তে হবে না। ছেলেমানুষের হাতে দোকান ফেলে এসেছি। অনেকক্ষণ জিরিয়েছি, আর নয়। তুমি ব'সে ব'সে রামায়ণখানা পড়, তোমার মাকেও শুনিও।"

গোবিন্দ দোকানে প্রস্থান করিলে রাইকিশোরী

শুভদৃষ্টি

বসুমতী প্রেস] শিল্পী—শ্রীঅলীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
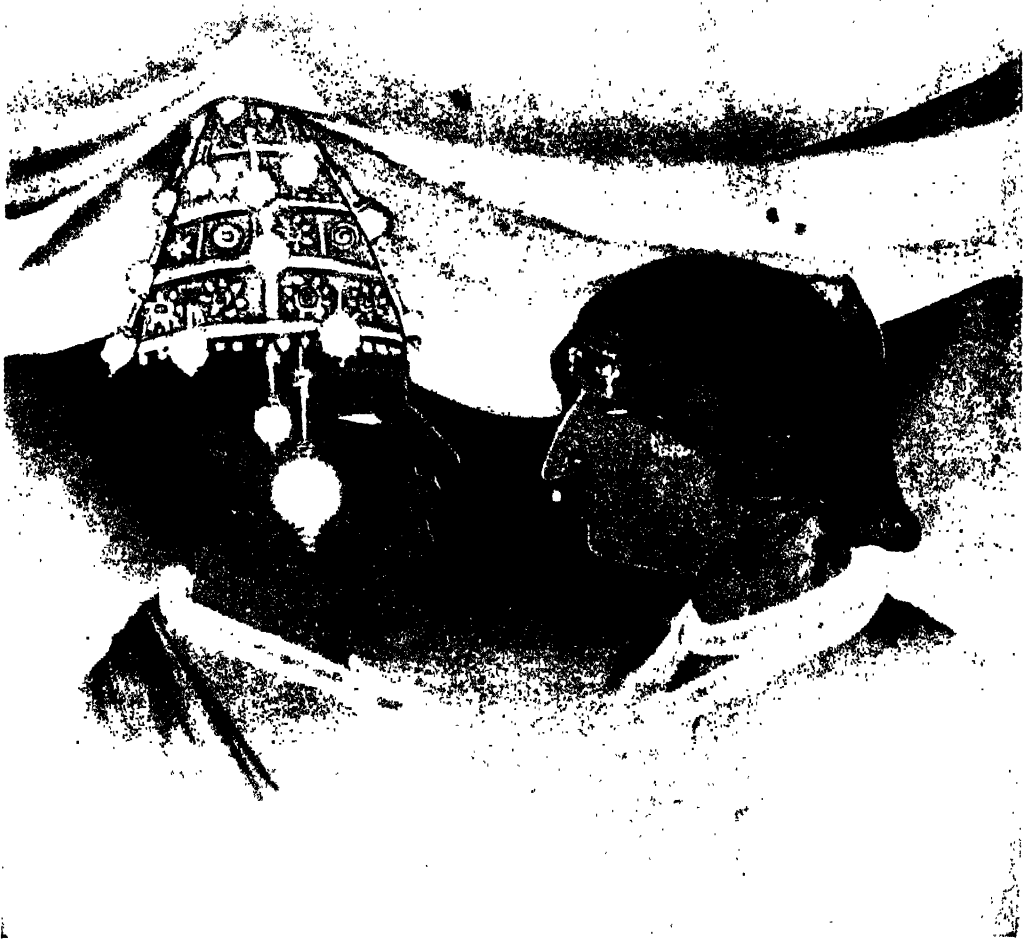
মায়ের কাছে রামায়ণ পড়িতে বসিত। কোন দিন বা মায়ের কাছে বসিয়া সে কাঁথা সিলাই করিত। সে এক মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না। প্রতিবেশিনীদের বাড়ী গিয়া তাহার গল্প করিবারও অভ্যাস ছিল না। মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "আমার এমন লক্ষ্মী মেয়ে! তার অদেষ্টে ভগবান্ একটু সুখ লেখেননি। ওর মুখের দিকে তাকালে আমার বুক চড়চড়িয়ে ওঠে।"

রাইকিশোরী এইভাবে মায়ের কাছে ক্রমে ৫ বৎসর কাটাইয়া দিল; এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার শ্বশুর একটি দিনের জন্যও তাহার সন্ধান লয় নাই; এমন কি, পূজার সময় তাহাকে কখন একখানি কাপড়ও পাঠায় নাই।

মোহনপুর বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীর ন্যায় ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র; প্রতি বৎসর বর্ষাকালে রাইকিশোরী ম্যালেরিয়ায় ভুগিত; জ্বর আসিলে কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়িয়া লেপমুড়ি দিত; জ্বর ছাড়িলে উঠিয়া খানিক কুইনাইন খাইত; স্নানাহার কিছুই বাদ দিত না। বর্ষাকালটা কোন রকমে কাটাইতে পারিলে কতকটা শুধরাইয়া উঠিত। কিন্তু একবার বর্ষাকালে রাইকিশোরীর জ্বর এমন কঠিন হইয়া উঠিল যে, সে আর শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। কিছুতেই জ্বর ছাড়ে না দেখিয়া গোবিন্দ শম্ভু কবিরাজকে ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ মহাশয় রোগ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। গোবিন্দ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখ্‌লেন কবরেজ মশাই! জ্বরটা কি বাঁকা রকমের বোধ হচ্ছে?"

কবিরাজ বলিলেন, "বাঁকা ত বরং ভাল; এ হচ্ছে বাতশ্লেষ্ম বিকার, ডাক্তারগুলো যাকে বলে 'নিমুনিয়া।' তা পুরিয়া তিনেক ওষুধ আর একটু মালিশের তেল এনো। দেখো যদি কোন ফল হয়।"

মা মাথার কাছে বসিয়া দিবারাত্রি কন্যার সেবা করিতে লাগিল; গোবিন্দ দোকান-পাট বন্ধ করিয়া পাগলের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল; মঙ্গলচণ্ডীর ঘরে গিয়া দিনে দশবার করিয়া মাথা কুটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, শেষে কবিরাজ জবাব দিলেন।

"মা, মনোর বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না, এ-ই আমার বড় দুঃখু। তোমরা আমার জন্যে কেঁদ না মা!"

ইহাই রাইকিশোরীর শেষ কথা।—কয়েক মিনিট পরেই অভাগিনী বিধবার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল। বর্ষাকাল, সায়ংকাল, সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষলধারে তখন বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল।—উমাসুন্দরী রাইকিশোরীর মাথা কোলে টানিয়া লইয়া মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দ স্তব্ধভাবে এক পাশে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল; তাহার তখন কাঁদিবারও শক্তি ছিল না। তাহার ছোট ছেলে হরিহর দিদির পায়ের কাছে পড়িয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "দিদি গো দিদি! আমাকে তুই ফেলে যাস্‌নে, আমি কার কাছে থাক্‌ব?"—মনোহর কোন রকমে তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াও আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না, সে তখন নিজেই কাঁদিয়া আকুল।

পরদিন শ্যামপুরে গোবর্দ্ধনের বাড়ীতে এই শোচনীয় সংবাদ পৌঁছিলে রাইকিশোরীর শাশুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সেই ত মলো! যদি ক'বছর আগে বিয়েটা না হ'তেই মর্‌ত, তা হ'লে আমার সোনারচাঁদকে খেয়ে যেতে পার্‌ত না। কি সর্ব্বনাশীকেই ঘরে এনেছিলাম! রাক্কুসী গো রাক্কুসী!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অভিশাপ

চিতাধূম দেখে মোর মৃত্যু ব'লে
ভাবিল যাহারা,
ভ্রান্তি, শুধু ভ্রান্তি এ জীবনে
বহিল তাহারা।

মৃত্যু মোর যথার্থ প্রিয় গো,
সেই দিন জানি,
ফুরাইবে যেই দিন তব
সোহাগের বাণী।

লতিকা।

মুক্তি ও ভক্তি

১৫

হ্লাদিনীর কথা বলিতেছি। শ্রীভগবান্ নিজে সুন্দর, যেমন তেমন সুন্দর নহেন—প্রাকৃতিক সকল সৌন্দর্য্যের যাহা সার, সেই অপ্রাকৃত সারভূত সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার। শ্রীভগবান্ যে শক্তির প্রভাবে আত্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন এবং অপর সকলকে সেই আনন্দের অংশ অনুভব করাইয়া থাকেন, সেই শক্তির নামই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। এ সংসারে আমরা যাহাকে সুন্দর বলিয়া থাকি, তাহা যদি অপরের আনন্দানুভূতির কারণ না হয়, তবে তাহা কি কখনও সুন্দর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে? এ সংসারে সৌন্দর্য্য বলিয়া বাঁধাবাঁধি একটা কোন বস্তুই নাই। যে বস্তু যাহার আনন্দানুভূতির কারণ হয়, সেই বস্তু সেই ব্যক্তির নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুখভোগের সাধনতাই বস্তুসৌন্দর্য্য। ইহাই যদি হইল সৌন্দর্য্যের স্বভাব, তাহা হইলে ভগবৎ-সৌন্দর্য্যেরও এইরূপ স্বভাবই অঙ্গীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া যদি কাহারও সুখ না হয়, তবে তাহা কখনই সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। এই কারণে ভগবানের আনন্দময় সৌন্দর্য্য আছে, তাহা অনুভব করাইবার জন্য যে শক্তি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি।

এই শক্তি তাঁহার স্বরূপশক্তি বলিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরিগণিত হইয়া থাকে। আনন্দ অনুভব করিতে হইলে অন্তঃকরণের যে অবস্থাবিশেষ একান্ত আবশ্যক, তাহা মানব-হৃদয়ে যদি না থাকে, তাহা হইলে আনন্দানুভূতির অন্যান্য কারণ উপস্থিত থাকিলেও মানব আনন্দানুভব করিতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই বিশেষকেই ভক্তিশাস্ত্রে প্রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই প্রীতি দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা এবং অনুকূলতা। কথাটা এই হইতেছে যে, মানব যদি সুখাস্বাদের প্রতি অভিলাষী না হয় এবং সেই সুখের প্রতি তাহার চিত্তের আনুকূল্য বা প্রবণতা না থাকে, তাহা হইলে সে কখনই সুখের সৌন্দর্য্যময় যে স্বরূপ, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই নিয়ম অনুসারে হ্লাদিনী শক্তিও জীব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের প্রতি আনুকূল্য ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার অভিলাষরূপ যে মনোবৃত্তিদ্বয়, তাহা উৎপাদন করিয়াই ভগবৎসৌন্দর্য্য জীবকে অনুভব করাইয়া থাকে, ইহা বাধ্য হইয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ সংসারে এমন কোন জীব নাই যে, সুখের আস্বাদন করে নাই বা সুখের আস্বাদন করিতে বিমুখ হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলিতেছে;—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

অর্থাৎ প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং এই সংসার ছাড়িয়া আবার সেই আনন্দেই মিশিয়া যায়।

এ সংসারে সকল জীবের জীবন এই শ্রুতিনির্দ্দেশ অনুসারে আনন্দময় হইবার কথা। আনন্দময় পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, যখন কোন বস্তুরই সত্তা থাকে না, তখন প্রত্যেক বস্তুতেই যে সেই আনন্দময় পরমাত্মা সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা সংসারী জীব, কৈ, তাহা ত বুঝি না? আমরা দেখি, চারিদিকে দুঃখের—শোকের অপার সমুদ্র, যে সমুদ্রে আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, আবেগ, বিষাদ ও অবসাদের প্রত্যেক তরঙ্গে তরঙ্গে, ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর ভীতির যন্ত্রণাময় ব্যাকুলতা। সচ্চিদানন্দের নিত্য লীলানিকেতন সুখের সংসারে এ অপার অনন্ত দুঃখ-সমুদ্র আসিল কোথা হইতে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য, এই দুঃখ-সমুদ্র শুষ্ক করিবার জন্য, বড় বড় দার্শনিকগণ কত

চেষ্টাই না করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন চেষ্টাই সংসারী জীবের দুঃখ-ব্যাকুল হৃদয়ে সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, জীব নিজের অজ্ঞানের ফলে দুঃখ ভোগ করে। সে যদি নিজে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতির বলে চিত্ত স্থির করিয়া আত্মস্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাহার অজ্ঞান দূর হয় এবং সেই অজ্ঞানমূলক সকল দুঃখও মিটিয়া যায়। কথাগুলি শুনিতে বেশ, কিন্তু তলাইয়া বুঝিতে গেলে ভিতরে কোন সারই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যদি ব্রহ্মস্বরূপ হই, তবে আমাতে সকল দুঃখের মূল অজ্ঞান প্রথমে আসিল কিরূপে? ইচ্ছা করিয়া এই সকল অনর্থের মূল অজ্ঞানকে আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, ইহা ত কখনই সম্ভবপর নহে। আমি ভিন্ন আর কেহ যদি আমার দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে আমি ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি করিয়া এ দুঃখ নাশ করিলেই বা কি হইবে? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার স্কন্ধে দুঃখ চাপাইবার সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনি যদি ঐ সব দুঃখ আবার আমাকে দেন, তখন আমি করিব কি? জ্ঞানী হয় ত বলিবেন, দুঃখ বলিয়া একটা কোন বস্তুই যখন নাই, একমাত্র ব্রহ্মই যখন সৎ এবং আর সকলই অসৎ, তখন অসতের জন্য এত ভাবিয়া আকুল হই কেন? অসৎকে অসৎ ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেই ত সব আপদ্— সব কষ্ট দূর হয়। সাংসারিক জীব ইহার উত্তরে বলিবে, অসৎকে অসৎ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? যে দিন হইতে সংসারে আসিয়াছি, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুগ চলিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই, এই অসদ্বস্তুনিচয়কে আমি সৎ বলিয়াই বুঝিয়া আসিতেছি। শুধু কি আমিই বুঝি? তুমি তত্ত্বোপদেশকারী জ্ঞানী, তুমিও কি ইহা বুঝ না? এ সকল বস্তুকে সত্য সত্য অসৎ বলিয়া যদি তুমি বুঝিতে, তাহা হইলে এ ব্যবহারের রাজ্যে তুমি কেন থাকিবে? তুমিই বলিয়া থাক, ভেদ-জ্ঞানই সকল ব্যবহারের মূল; এই ভেদ-জ্ঞান যাহার নাই, সে সকল প্রকার ব্যবহারের অতীত।

ভেদ-জ্ঞানই ত মিথ্যা জ্ঞান, অর্থাৎ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝা। এ মিথ্যা জ্ঞান না থাকিলে গুরু-শিষ্যভাব থাকে না; তাই যদি না থাকিল, তবে তুমি তত্ত্বোপদেশক হইয়া গুরুর পদে বসিয়াছ কেন? ইহা কি মিথ্যা ব্যবহার নহে? তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, হয় ত ইহার উত্তরে বলিবে যে, মোহ-সমুদ্রের আবর্ত্তে নিপতিত দুঃখ-ভারক্লিষ্ট সাংসারিক জীবনিচয়কে দেখিয়া তোমার হৃদয়ে করুণার উদয় হইয়াছে; সেই করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই দুঃখনিমগ্ন জীবনিবহের উদ্ধারের জন্য তুমি তত্ত্বোপদেশক হইয়াছ। এ উত্তরও কিন্তু অসার, কারণ, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকল বস্তুই যাহার নিকট মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ে করুণা আসিবে কোথা হইতে? ভেদ-জ্ঞান না থাকিলে জীব-হৃদয়ে করুণার উদয় হয় না, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিবে? যেখানে করুণা আছে, তোমার মতে সেখানে ভেদ-জ্ঞান বা তাহার মূলভূত অজ্ঞানও আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবে। সুতরাং তোমার মতে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কখনই করুণাময় হইতে পারে না।

এই সকল তর্কের দ্বারা ব্যাকুলমতি জীব-নিবহের উদ্ধারের জন্য যাহা প্রকৃত সাধন, তাহা অদ্বৈতবাদীর উপদিষ্ট হইতে পারে না। ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুসারে এই সকল তর্ক নিরাসপূর্ব্বক সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবের হৃদয়ে শান্তি দিবার যাহা সাধন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাকেই হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি বা ভগবৎ-প্রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এ সংসারে কোন বস্তুই অসৎ বা মিথ্যা নহে। আনন্দস্বরূপ ভগবান্ আত্মানন্দ স্বয়ং অনুভব করিবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে জীবসমূহকে সেই আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য সর্ব্বদা নিজ স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির প্রেরণা করিয়া থাকেন। এ প্রেরণাও আবার সেই হ্লাদিনীরই পরিণতিবিশেষ। তিনি যখন সর্ব্বাশ্রয়, নিখিল প্রপঞ্চ যখন তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন সৎ ও অসতের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়াই এ সংসারে কোন বস্তুই একেবারে কল্পিত বা অসৎ হইতে পারে না। দুঃখের অনুভব যাহার নাই, সুখ বা শান্তি তাহার প্রিয় হইতে পারে না। যাহার নিকট দুঃখ একেবারে অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুখও তাহার নিকট পরমার্থ সৎ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ এ সংসারে সকল বস্তুরই উৎপাদয়িতা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, ইহা ত সকল শাস্ত্রই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। তিনি গুণনিচয়েরই সৃষ্টি করেন, দোষসমূহ তাঁহার সৃষ্ট নহে, এ প্রকার সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতিসম্মত হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝাইতেছে ;—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

এই শ্রুতিবাক্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সকল বস্তুই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরে অবস্থিত এবং শেষে আবার ঈশ্বরেই প্রলীন হয়, ইহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি আরও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করি-তেছে ;—

"স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা
তস্য লোকঃ স উ লোক এব।"

অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-নির্ম্মাতা, তিনিই সকল বস্তুর কর্ত্তা, এই সকল লোক তাঁহারই, আবার তিনিই এই সকল লোকস্বরূপ।

কৈবল্যোপনিষদ্ বলিতেছে ;—

"স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই সর্ব্বস্বরূপ, যাহা অতীত বা যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা সকলই সেই নিত্য পরমাত্মার স্বরূপ; সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা ছাড়া বিমুক্তির আর কোন পথ নাই।

এই সকল শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এ সংসারে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। সুতরাং এ জগৎ মায়িক, ইহা কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা, পরমাত্মার সহিত ইহার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই। এই প্রকার অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল নহে এবং বেদার্থ-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন পুরাণশাস্ত্রেরও সম্মত নহে। পুরাণ-শাস্ত্র স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে, এ সংসারে সৎ বা অসৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রসিদ্ধ আছে, তাহা সকলই সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিণতি; সুতরাং সেই সকল বস্তুর মধ্যে কোনটিই অজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ শুক্তিতে কল্পিত রজতাদির ন্যায় মিথ্যা নহে। তাই মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলিতেছে ;—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

অর্থাৎ হে সর্ব্বস্বরূপে, এই সংসারে যে কোন স্থানে সৎ বা অসৎ বলিয়া যে কোন বস্তু প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল বস্তুর উৎপত্তি যে শক্তি হইতে হয়, তুমিই সেই শক্তি। এই প্রকার অনন্ত অসীম শক্তি যাহার স্বরূপ, সেই তোমাকে আমি কি বলিয়া স্তুতি করিব?

এই প্রকার বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে, বিস্তার-ভয়ে তাহা করা গেল না। এই সকল শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই সংসারে যাহা কিছু হয়, তাহা সকলই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই হয় এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সেই সকল বস্তুই বিলয়প্রাপ্ত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাও স্থির যে, এ সংসারে ভ্রান্ত জীবগণ যে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাও ভগবদিচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। উপনিষদ্‌ও অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে ;—

এষ এব তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি,যমুত্তমং লোকং নিনীষতি।
এষ এব তং অসাধু কর্ম্ম কারয়তি যং অধো নিনীষতি॥"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তাহাকে সাধু-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন—যাহাকে তিনি উত্তমলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন; আবার তিনি যাহাকে অধোগামী করিতে চাহেন, তাহাকে অসাধু-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্রের সারভূত গ্রন্থ ভগবদ্গীতাও বলিতেছে ;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

অর্থাৎ সকল জীবের হৃদয়প্রদেশে অন্তর্যামিস্বরূপ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছেন; তিনি নিজ

মায়াশক্তিপ্রভাবে কর্তৃত্বাভিমানরূপ যন্ত্রের উপর চড়াইয়া সকল প্রাণীকেই এই সংসার-চক্রে পরিভ্রান্ত করিতেছেন।

ইহাই হইল ঈশ্বরবাদের চরম সিদ্ধান্ত। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডপরিপূরিত অপার অনন্ত সংসারে প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ, নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ডের গতি, স্থিতি ও বিলয়ের প্রত্যেক ব্যাপার তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে একটি পরমাণুকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে, এরূপ শক্তি কোন জড়বস্তু বা চেতনে সম্ভবপর নহে। এ বিশাল কার্য্যকারণভাবরূপ অনাদি শৃঙ্খলে নিয়মিত প্রত্যেক বস্তুই সেই কারণত্রয় হেতু মহেশ্বরের অনাদি ও অনন্ত বিচিত্র মহিমময় লীলার ইচ্ছা-কল্পিত উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনিই জীবের অন্তঃকরণে কর্তৃত্বের অভিমান জাগাইয়া ভোগাভিলাষের চরিতার্থতাবিধান করেন এবং তিনিই ত্রিতাপতাপিত জীব-হৃদয়ে বৈরাগ্যের শান্তিময় প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রেমানন্দময়ী অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কেহ কর্ত্তা, ভোক্তা বা জ্ঞাতা কখনও ছিল না, এখনও নাই, কখনও হইবে না। তাই প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে আত্মলীলার বিচিত্র বৈভব বুঝাইতে উদ্যত হইয়া শ্রীভগবান্ গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষই জীবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সকল বস্তুই দেখিয়া থাকেন, জীবের প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির অনুমতি তিনিই দিয়া থাকেন, তিনিই সকল বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনিই সকলের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। কেবল ঈশ্বর-রূপে রক্ষা বা পোষণ করেন, তাহা নহে। তিনিই আবার জীবরূপে সকল দেহে সুখ-দুঃখ ভোগও করিয়া থাকেন, অথচ তিনিই মহেশ্বর, এই দেহের মধ্যে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই অন্তর্যামি-রূপে সকলের সৎ বা অসৎ কর্ম্মের সাক্ষী হইয়া থাকেন, তাঁহাতেই সকল বস্তু অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই সকলের রক্ষাকারী, কারণ, তিনিই সকলের সুহৃৎ; তিনিই সকল বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন, কারণ, তিনিই এই সংসাররূপ অপরিমেয় বৃক্ষের একমাত্র অবি-নাশী বীজ।

তাঁহার এই বিচিত্র লীলাময় বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে যে শক্তির প্রেরণায় তিনি আনন্দময়, আনন্দঘন ও রসময় পুরুষ হইয়াও, এই সংসারে নিজাংশ জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ইচ্ছা করিয়া দেহাত্মাভিমানের দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, সেই মহামহিম-ময়ী বিশ্ব-কল্যাণকারিণী তাঁহার সেই স্বরূপশক্তিরই নাম হ্লাদিনী শক্তি। ইহাই ত হ্লাদিনী শক্তির স্বভাব যে, তাহা নিজেই বহিরঙ্গ মায়াশক্তির প্রেরণা দ্বারা দুঃখ সৃষ্টি করিয়া, দুঃখের দারুণ সন্তাপজ্বালাময় ভীষণ অগ্নিতে আত্মভূত জীবের দুরভিমানকঠোর নীরস হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া দেয়, আর সেই বিশুদ্ধ হেমসম দ্রুত হৃদয়ে স্বীয় চরম পরিণতিস্বরূপ প্রেম মুদ্রা গাঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া অনাবিল সুখ-শান্তি ও প্রসাদের অবিনাশিভাবে জীবনিবহকে চিরসমাবিষ্ট করিয়া রাখে, ইহাই ত হইল হ্লাদিনীর অসাধারণ স্বভাব। এই হ্লাদিনীর দুরবগাহ গম্ভীর স্বভাব বুঝাইতে যাইয়া ভক্ত-কুলধুরন্ধর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিরূপ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়াছেন, এইবার তাহাই অবতারিত হইতেছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ব্রাহ্মণ ও মেথর

মর্দ্দ খেয়ে নর্দ্দমায় ব্রাহ্মণের ছেলে,
রাস্তায় মেথর তারে সযতনে তুলে।
ব্রাহ্মণ কহিল রেগে—"অশুচি মেথর,
আমারে ছুঁইলে কেন পাপিষ্ঠ পামর ?"

মেথর কহিল হেসে—"ঠাকুর মশাই,—
যাহা ইচ্ছা গালি দাও তাতে দুঃখ নাই।
রাস্তাঘাট পাইখানা করি পরিষ্কার-
অশুচিরে শুচি করা কর্ত্তব্য আমার।"

শ্রীমহেশচন্দ্র নাথ।

জীবন ও শিল্প

চাঁদগলা সেমিজ :—নারীজাতির সাধারণ জামার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ জামা। এই চাঁদগলা সেমিজ সাধারণের মধ্যে প্রচলন বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

সরঞ্জাম :—(Material) কাপড় ২½" গজ অর্থাৎ যত লম্বা হইবে, তার তুই লম্বা কাপড় দিতে হইবে।

মাপ :—মেয়েদের পছন্দানুযায়ী অথবা হাঁটুর ৬" ইঞ্চি নীচে লওয়া উচিত। লম্বা—৪২" ছাতি—৩৪" পুটহাতা—১২" মোহরী—১০"।

সেমিজ কাটিবার নিয়ম :—কাপড়কে লম্বা মাপে ১" ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখিয়া তুই লম্বা কাপড় লইতে হইবে। লম্বা দিক ডবল ভাঁজ করিয়া চওড়া দিকে ডবল ভাঁজ করিতে হইবে। ক খ লম্বা মাপ হইতে ১" ইঞ্চি বেশী ৪২"+১"=৪৩" ইঞ্চি এই চারি ভাঁজ কাপড়ের উপর দাগ কসিতে হইবে। ক, খ লাইন হইতে ৩" ইঞ্চি কাপড় বাদ দিয়া গ, ঘ লাইন টানিতে হইবে। গ, চ ছাতির ¼ অংশ ৮½"—১"=৭½" চ, ছ ১½" ইঞ্চি নীচে ছাড়িয়া মাপের লাইন টানিতে হইবে। গ, ঠ, পুট হাতা ১২"+১"=১৩" ইঞ্চি স্থানে চিহ্ন করিয়া ঠ, ট হাতের মোহরী ১০" ইঞ্চি+৩"=১৩" ইঞ্চি অর্দ্ধেক ৬½" ইঞ্চি স্থানে ট ঠ সংযোগ করিয়া ছ বিন্দু হইতে ছাতির ¼ অংশ ৮½"+২½"=১০" ইঞ্চি স্থানে ঝ চিহ্ন করিয়া খ হইতে ছাতির মাপের অর্দ্ধেক ১৭" ইঞ্চি ড চিহ্ন করিয়া সেমিজের ঘেরের মাপ লইতে হইবে। খ লাইন হইতে ড ১½" উপরে বাঁকা ভাবে সেইপ করিয়া লইবে। এখন ট, ঝ ও ড চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া লইতে হইবে। চাঁদগলা করিবার সময় ছাতির মাপে ⅛ অংশ ৪¼" ইঞ্চি জ চিহ্ন করিয়া ক বিন্দু হইতে ছাতির 1/24 অংশ ঢ বিন্দু চিহ্ন করিয়া জ ঢ চিত্রানুযায়ী দাগিতে হইবে। দাগের কাজ শেষ হইলে ঢ জ গলার অংশ দাগে কাটিয়া ঠ, ট, ঝ, ড ঘ ও খ দাগে কাটিয়া লইলে সেমিজের পিছনকার অংশ কাটা হইল। এখন উপরকার তু'হাত কাপড় লইয়া সম্মুখের অংশ কাটিতে হইবে। ঢ বিন্দুর ১½" ইঞ্চি নীচে ১ বিন্দু চিহ্ন করিয়া জ, ১ চিত্রানুযায়ী দাগিলে সম্মুখের অংশ দাগ দেওয়া হইল।
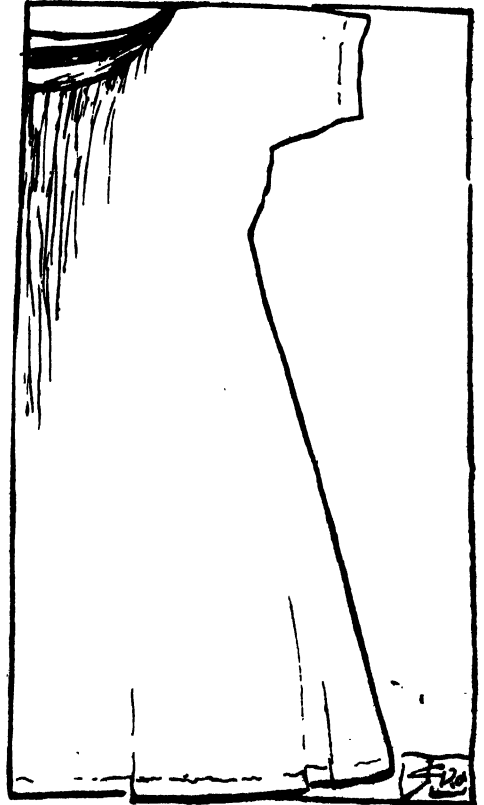
সেমিজ—১নং চিত্র
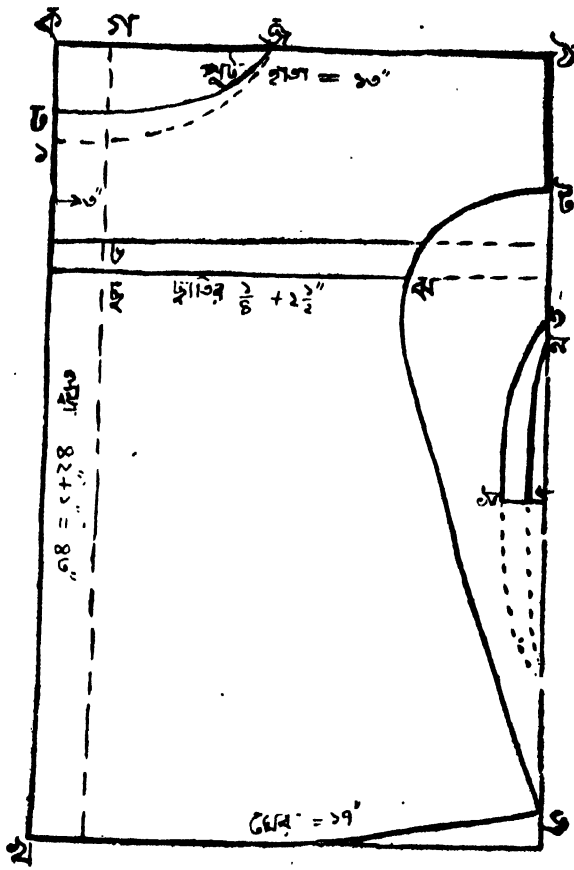
সেমিজ—২নং চিত্র

১, জ দাগে কাটিয়া লইলে সম্মুখের অংশ কাটা হইল।

সম্মুখ ও পিছনের অংশ কাটা হইল বটে, এইটি মনে থাকে যেন চাঁদের অংশ জোড়া অবস্থায় থাকিবে। পাশে যে কাপড়ের ছাট বাহির হইল, তাহা হইতে গলার বেও কাটিতে হইবে। দু'পাত কাপড় লইয়া তাহাকে ডবল ভাঁজ করিলে চারি পাত কাপড় হইল; ধ বিন্দু হইতে ত বিন্দু ৮" ইঞ্চি কাপড়ের উপর ধ, দ ২" ইঞ্চি জোড়া রাখিয়া ৮" ইঞ্চি স্থানে ত, থ ১¼" ইঞ্চি চিত্রানুযায়ী বাঁকা ভাবে সংযোগ করিয়া ধ, ত, থ ও দ দাগে কাটিয়া লইলে গলার বেও কাটা হইল।

সেমিজ সেলাই :—গলার বেও যে কাটা হইয়াছে—ক, গ যে ৩" ইঞ্চি কাপড় রাখা হইয়াছে, তাহাকে কুচি দিয়া ঢ, জ, ১, জ সম কুচি দিয়া লইতে হইবে এবং সম্মুখে দু'পাত ও পিছনকার দু'পাত বেও বসাইয়া লইবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বেওের উপরকার অংশ বকেয়া সেলাই দিয়া উল্টাইয়া লইয়া সেমিজের কুচি দেওয়া অংশ জুড়িতে হইবে। গলায় বেও বসানো হইয়া গেলে মোহরীতে যে ১" ইঞ্চি কাপড় বেশী রাখা হইয়াছে, তাহাকে ভিতর দিক বসাইয়া বকেয়া সেলাই দিয়া দুই দিকের পাশ জুড়িতে হইবে। পাশ জোড়া হইয়া গেলে নীচে ১" ইঞ্চি বা যতদূর সম্ভব ভিতর দিক কাপড়কে মুড়িয়া সেলাই করিয়া লইলে "চাঁদগলা সেমিজ" সেলাই সম্পূর্ণ হইল।

শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

মিলন

অস্ত-রবির করুণ গানে
পরাণ আমার ব্যাকুল করে।
দিনের আলো ঘুমিয়ে এলো
সন্ধ্যা-রাণীর আঁচল 'পরে।
আড়াল থেকে মধুর সুরে
কে গো এমন বাজায় বাঁশী।
সকল খেলা রইল প'ড়ে
বারেক তারে দেখে আসি।
ধূলায় মাখা অঙ্গ আমার
বাহির হয়ে এলাম ছুটি।

খেলার গানটি সাঙ্গ ক'রে
সেই চরণে পড়ব লুটি।
মরণ আমার দূরে দূরে
আঁধার রাতে বেড়ায় ঘুরে।
মিলন লাগি আসবে কবে
বসবে আমার বক্ষ জুড়ে।
সুখের রবি ডুবে যাবে
সন্ধ্যা তখন আসবে নেমে।
নয়ন মুদে দেখবো চেয়ে
রোদন আমার যাবে থেমে।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

২

আবার বাগান ; নেহাৎ বাদ্‌লা-বৃষ্টি না হ'লে ইট-কাঠের বেড়ার ভিতর প্রেম জমে না। অনাঘ্রাত ফুল-গন্ধ, বায়ুর মন্দ আন্দোলন, সরসীর সলিল-হিল্লোল, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান মাধুর্য্য, বর্ষাবারি-ধৌত চন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্য—ঘরের ভিতর আমরা কোথায় পা'ব ? আমরা সহরবাসী গৃহস্থলোক, এই জন্য অন্ততঃ ছাদের ওপর মদন ওরফে প্রণয়-ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক'রে থাকি। তবে রাজারাজড়ার ত আর বাগানের অভাব নেই। তাই আসুন—আমরা খিড়কীদোর দিয়ে একটা রাজ-অন্তঃপুরের পিছনের বাগানে ঢুকে পড়ি।

পরিচ্ছন্নতা ও বস্তু-বিন্যাসে উদ্যানটি মালীর মেহনতের সাক্ষ্য দিলে-ও হরিণাক্ষী ললনার সৌন্দর্য্য-বোধ ও শিল্প-নিপুণতা যে কারুকল্পনাকে রূপের আধারে পরিণত করেছে, তা বেশ বুঝা যায়।

চির-নবীন দূর্ব্বাদলের আঁচল-চাপা সরোবরতীরস্থ প্রশস্ত লন্‌টি অস্তগামী সূর্য্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য পশ্চিমদিকে ঘন বাঁশের ঝাড়। এইখানে বিদর্ভদেশের রাজার একমাত্র কন্যা কনকাস্তি দময়ন্তী সখীগণের সঙ্গে ফুটবল খেল্‌ছেন।

বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেল্‌ছি, না পাঠক মহাশয় বা পাঠিকা টীকাকারিণী ? কিন্তু সাহিত্য-আদালতে এত কাল টাউটারী ক'রে কি নজীর কথাটা-ও শিখিনি ? স্বয়ং কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে কন্দুক-ক্রীড়ার কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন। তবে আমাদের সেই ছোট্ট মা'টি তাঁর খেলার গোলাগুলিকে কোমল কর-পল্লবে ধারণ কর্‌তেন বা শ্রীচরণের পুণ্যস্পর্শে অদৃষ্টের লীলাভূমিতে গড়িয়ে গড়িয়ে অবশেষে গোল পার ক'রে দিতেন, সে কালের রিপোর্টাররা তার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে যাননি। আর অহঙ্কারী পুরুষ আমরা যদি একটু বেশ ভেবে-টেবে ধ্যান ক'রে দেখি, তা হ'লে বুঝতে পারি যে, পুরুষদের নিয়ে ফুটবল খেল্‌বার জন্য-ই এ সংসারে নারীর সৃষ্টি। লুপ্ত-স্থিতি-স্থাপকতা শূন্য-গর্ভ গোলক আমরা ঐ লক্ষ্মীদের শক্তির তাড়নাতে-ই সচেতন হই, লাফিয়ে উঠি, উদ্দেশ্যের নির্দ্দেশ পাই আর কখন কখন বন্ধনীর সীমা অতিক্রম ক'রে ক্রীড়ারতা মমতাময়ীর গৌরব বৃদ্ধি করি।

গলায় দড়ি দিলে-ও এ লজ্জা যায় না যে, আজ বিদেশী বেণে ব্যাসাতি বেচতে এসে এ দেশকে স্ত্রী-শিক্ষা দিতে, স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা সম্মান দিতে শেখাচ্ছে। আর আমরা বেহায়া হয়ে স্বীকার কচ্ছি যে, আমরা আশ্চর্য্য একটা নূতন কথা শুনলুম।

এই ভারতবর্ষের কল্পনা-ই এক দিন নারী-মূর্ত্তিকে চৌষট্টি কলা সমন্বিত সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভারতের উপাসকেরাই দুর্গাদেবীর দশখানি হাতে দশখানি অস্ত্র দিয়ে তাঁর চরণে প্রণত হয়েছিল। এ দেশের সর্ব্বত্যাগী পুরুষের আদর্শ শিব-ই রণ-শ্রমাবসানে গৌরীকে মসীময়ী দেখে আপনার বুক পেতে দিয়ে জায়াকে তার উপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

যে দেশে শক্তিকে সম্মান কর্‌বার জন্য আজ-ও সধবার পূজা কুমারীর পূজা হয়, সে দেশের দময়ন্তী অন্তঃপুরের অন্তরালে সখীদের সঙ্গে যদি একটু ফুটবল খেলেন, তবে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় ? খেলা-টা আপোষে লড়াই ; সুতরাং হারজিত দুয়েতে-ই, সমস্ত গ্রাউণ্ড-টা থেকে-ই একটা হাসির উচ্ছ্বাস মুখরিত হচ্ছে।

অবলা-অধর-স্ফুরিত হাস্যের মধুর কল্লোল অতিক্রম ক'রে একটা আওয়াজ এল—প্যাক্।

কোকিলের কুহরে কিশোরীর কমকায়া কচিৎ চমকিত হয় বটে, পাপিয়ার স্বর-লহরীতে-ও প্রেমিকার বুক-টা চাপিয়া ধরার কথা, ভ্রমরগুঞ্জন-ও রমণীরঞ্জন; কিন্তু হংসের ডাকে এমন কি রাগিণী মাখা আছে যে, তা ঝুমকো-ঝোলানো রাঙা রাঙা কানগুলির ভিতর ঢুকে স্ফুটনোন্মুখ বালিকা কলিকাদলের কন্দুকক্রীড়া বন্ধ ক'রে দিতে পারে? শব্দমাত্রে-ই প্রাণের ভিতর একটা ভাবের ছবি ফুটিয়ে তোলে; হংস কলকণ্ঠ না হলে-ও তাহার আগমনসংবাদ নবীনা যুবতীদের মনে উত্তেজনার পটপরিবর্ত্তনের একটা সঙ্কেত করিয়া দিল। সরোবরসলিলে ভাসমান সেই সিতাঙ্গ বিহঙ্গের রঙ্গ দেখে ক্রীড়াশীলা বালিকারা ফুটবল ফেলে পাখীটিকে ধরবার জন্যে পুকুরের পাড়ে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ ক'রে দিলেন। যে নিজে সুন্দর, সে সকল সামগ্রীকে-ই সুন্দর ক'রে ভোগ করতে পারে, সেই জন্য হংসরাজ ধরা দেওয়ার অভিসন্ধি স্থির ক'রে এলে-ও খানিকক্ষণ সুন্দরীদের চটুল চরণের লাস্যলীলা ও উল্লাসফুল্ল কপোলের অলক্তোজ্জ্বল আভা প্রশংসা-দীপ্ত চক্ষে উপভোগ ক'রে নিয়ে স্বয়ং দময়ন্তীপ্রক্ষিপ্ত পুষ্পাসারবাসিত চেলাঞ্চলের তলে ধরা দিলেন। "বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর হাঁস" এই আনন্দবাণী বালাকণ্ঠে কোরসে ধ্বনিত হ'ল। হাঁসটি বড় হাঁপাচ্ছে দেখে দময়ন্তী সখীদের একটু স'রে যেতে ইঙ্গিত ক'রে বল্লেন, "তোমরা একটু এইখানে থাক, আমি একটু বেড়িয়ে একে ঠাণ্ডা করি—বড় ভয় পেয়েছে।"

একটু এগুতে না এগুতে-ই দময়ন্তী হাঁসের দিকে চেয়ে মনে করলেন, যেন পাখীটা একটু হাসছে। হাঁসের আবার হাসি কি? ঐ লম্বা হাড়ের ঠোঁটে কখনো কি হাসি ফোটে? ফোটে বৈ কি, যেখানে চৈতন্য আছে, জীবন আছে, সেইখানে হাসি-ও আছে, কান্না-ও আছে। হাঁস ত হাসবে; ব্যাঙ-ও হাসে, সাপ-ও হাসে। সেক্সপীয়ার ব'লে গেছেন,—One may smile and smile and yet be a villain; বাঙ্গালার গ্রাম্য কবিরা-ও বলেছেন,—সাপের হাসি বেদের চিনে। আপনারা দেখেননি যে, শুয়োরমুখো, সাপমুখো, ব্যাঙমুখো লোকরা কি মারাত্মক হাসি-ই হাসে? কিন্তু আমাদের পরিচিত সুশিক্ষিত হংসাধরে যে হাস্যরেখা বিকসিত হ'ল, তা মার্জ্জিত-শিষ্টাচারসৃষ্ট, অশ্লীলতাবর্জ্জিত and a bit significant।

"রাজকন্যা ভাল আছেন?" প্যাক্-প্যাক্‌ভাষী হংসস্বরে এই মানবোচিত ভদ্রবাণী শুনে দময়ন্তী ত অবাক্! শুধু অবাক্ নয়, সুশিক্ষিতা হলে-ও দময়ন্তী স্ত্রীলোক, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে যে একটা ভূত-প্রেত ডাইনী গোছের কথা মনে পড়েনি—এটা জোর ক'রে বলা যায় না।

হংস। বোধ হয়, রাজদ্রোহের আশঙ্কায় আপনাদের রাজধানীতে সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ, তা না হ'লে এত দিন জান্‌তে পার্‌তেন যে, যে সভ্যতা বোবাকে কথা কইতে শিখিয়েছে, সেই সভ্যতা পশুপক্ষীদের মধ্যে-ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে।

দময়ন্তী। আশ্চর্য্য!

হংস। আর-ও আশ্চর্য্য হবেন, যখন শুনবেন আপনি যে, পেঁচাদের মাঝ থেকে তিন চার জন বড় বড় গ্রন্থকার হয়েছে, দু'এক জন কাঠঠোকরা এমন সমালোচনা করেন যে, অগষ্টস্ শালা পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না। এক একটি হাঁড়িচাঁচা বক্তৃতায় বার্ককে-ও ছাড়িয়ে উঠেছেন, আর ছাগলদের ভিতর থেকে দু'এক জন এমন উপন্যাস লিখছে যে, বঙ্কিম, জর্জ্জ ইলিয়টদের আদর একেবারে উঠে গেছে।

দময়ন্তী। উঃ, আমরা কি অন্ধকারে! খবরের কাগজের অভাবে ভাবের রাজ্যে যে কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে, আমরা তার কিছুই টের পাই না।

হংস। যাক, এখন ও কথার আলাপ যখন হোল, তখন এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আপনাকে জানাব। এখন একটা Private কথা আছে।

দময়ন্তী। আপনি পক্ষী-ই হোন, আর যা-ই হোন, আপনি পুরুষ, তাতে শিক্ষিত, আপনার সঙ্গে Private কথা কওয়াটা স্ত্রীলোকের পক্ষে—

হংস। চিন্তা করবেন না—চিন্তা করবেন না; দূত যেমন অবধ্য, ঘটক-ও তেমনি অখাদ্য; বিশেষ আপনার কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে বলি—হাড়গিলে শকুনি টকুনির

ভয়ে আমাদের পুরুষত্ব একেবারে লোপ পেয়েছে। লেখাপড়াই শিখি আর ডিগ্রি-ই নিই, রোষ্ট গ্রিল-ট্রিল হওয়া আর আমাদের লেডীদের ডিম্ব উৎপাদন করা ছাড়া জীবনে আর কোন কায নাই।

দময়ন্তী। কি আপশোষ!

হংস। আর আপশোষ নেই, ও সব আমাদের সয়ে গেছে। যখন সামনেই কোন brother হংস বা sister হংসীর পালক-টালকগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গলায় ছুরি বসাচ্ছে দেখি, তখন খাঁচার ভিতর থেকে মনে করি যে, ওদের নিয়ত ছিল, পরমায়ু ফুরিয়েছে, তাই যাচ্ছে, আমাদের এখুনি ধান দেবে, ভুসিগোলা দেবে, মজাসে খাব। যা হোক, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি engaged?

দময়ন্তী। আপনার কত নম্বর?

হংস। মাপ করবেন, আমি আপনাকে টেলিফোন girl মনে করিনি। জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনার মতন অমূল্য রত্ন লাভের আশায় কোন-ও ভাগ্যবান্ যুবক কি—

দময়ন্তী। Oh nonsense—I am only a Child.

হংস। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি যে বালিকা, তা — I may take my Bible oath on it.

দময়ন্তী। আপনি খৃশ্চান না কি?

হংস। না—না, আমি সনাতনী; ওটা কায়দা-দোরস্ত ইংরাজী, তাই ব'লে থাকি। দেখুন, সকলে-ই বলে, আপনি দয়াবতী, ব্যথার ব্যথী হওয়া আপনার প্রকৃতিগত। একটি সম্ভ্রান্ত যুবক —

দময়ন্তী। অন্য কথা বলুন।

হংস। ধন-ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট—

দময়ন্তী। আবার—

হংস। এম্-এস্-সি পাশ ক'রে রিসার্চ্চ ওয়ার্ক করছেন, তা ছাড়া—

দময়ন্তী। তা হ'লে আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

হংস। জার্ম্মাণী ঘুরে এসেছেন।

দময়ন্তী। এঁ্যা—

হংস। কি জানি কোথা হ'তে আপনার অনুপম রূপলাবণ্যের, অলৌকিক গুণাবলীর, বিশ্ব-বিজয়িনী-বিদ্যার, গলাগলি কলাশিক্ষার আর কৌশল—ইউনিয়ন চ্যালেঞ্জ কাপ্ উইন করার খবর শুনে অবধি—

দময়ন্তী। How Strange!

হংস। বাড়ীতে আহার ছেড়ে হোটেলে খাচ্ছেন, নিদ্রা গাছতলাতেই যান, চশমা ত্যাগ করেছেন, দিবা-নিশি শূন্যদৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস ঘোর ভয়ানক! কখন-ও ঝড়ের মত বেগে বাগানে প্রবেশ করেন, কখন-ও চায়ের সরঞ্জাম লয়ে তুলে জুতা বুরুশ করতে ব'সে যান আর কত কবিতা-ই যে লিখছেন—

দময়ন্তী। কবি! তিনি কি কবি?

হংস। একেবারে কবি ক্যায়সার।

দময়ন্তী। হংস, Mr. হংস, তুমি পালকের ভিতরে ক'রে কিছু এনেছ?

হংস। কি আন্‌ব?

দময়ন্তী। কি আনবে? মুকুলিতা প্রেম ধ্বতবানসি বক্ষ অরক্ষণীয়া অবিবাহিতা বালিকাকে কবি যুবকের দীর্ঘশ্বাসের কথা শোনাতে এসেছ আর ঐ কেদার জ্যাকেটের পকেটে ক'রে এক শিশি Salvolatile কি Smelling salt আননি? ওঃ, চেতনার চেষ্টায় তোমার ঠোঁটের ঠোকর আমার সহ্য হবে না, সুতরাং রে মূর্চ্ছা—প্রণয়োচ্ছ্বাস।—প্রকাশ-পটীয়সী মূর্চ্ছা—তুই দূরে থাক, দূরে থাক, অন্য সময় তোর শরণাপন্ন হবো।

হংস। সেই যুবক—

দময়ন্তী। আবার সেই যুবক! তুমি হংস না

বক? মিছে বক্ বক্ করো না।
যাও চলি শীঘ্রগতি; —
পক্ষভরে বাতাসেতে চ'ড়ে,
উড়ে যাও লক্ষ বছরের পথ,
মিনিট পাঁচেকে।
বাঁচাও অবলা-প্রাণ—
ব'লে সেই কবি নটবরে,
নামে মধু ঝরে যাঁর,
হইয়ে বিকলা বালা—

হংস। নল, নল, কোরে।

দময়ন্তী। নল? নল নাম তাঁর?
তরঙ্গে ভরাতে নল এসেছে ধরায়।

নলে ঝরে জল, অনল স্তম্ভিত বাষ্প
বহে নল চালাইতে মিল ;
মধুর অধরে নল, বিরহবিধুর-বাবু
ধড়ফড়ি চিন্তানলে
ভড়র ভড়র টানে গড়গড়া।
সেই নল হৃদয়ের কল মম
চালাবে সোহাগে।
কোথায় সেই—

হংস। নিষধ-ঈশ্বর।

দময়ন্তী। নিষধ কি নিষাদ,
যে কুলে উদয় আমার হৃদয়-চাঁদ,
উড়ে যাও শীঘ্র তথা,—
সেধ'নাক বাদ হয়ে হারামজাদ,
বীররসে হব আমি ভাসমান,
মধুররস ত্যজিয়া তা হ'লে—

হংস। কি বল্‌ব ?

দময়ন্তী। বলো হবে স্বয়ম্বর ;—
প্রথম নম্বর সীট করুন দখল
সকাল সকাল আসি ;
হাসি হাসি ভালবাসি
পরভাতে কল্য বরমাল্য
দিব আমি গলে তাঁর।

তখন হংস প্যাঁক প্যাঁক রবে রাজকন্যাকে ট্যা—ট্যা অভিবাদন করিয়া পক্ষ বিস্তার করিল, দূরে সখীগণ "ঐ যা উড়ে গেল, উড়ে গেল," ব'লে ক্ষণেক পাথরের পরীর ন্যায় স্থির থাকিলে-ও, নানা অভাবজনিত দুঃখে একটি গান ধরিয়া দময়ন্তীকে বেষ্টনপূর্ব্বক নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সখীরা শুনেছিলেন যে, সাধারণ জগতে তাঁদের পৌরাণিক রূপের প্রতিভূস্বরূপিণী রঙ্গিণীরা সমস্বরে গান ধরিলেই নৃত্য করিবেন, এই অনুশাসনটি বিশেষ মান্য করিয়া চলেন, তাই তাঁরাও হর্ষে-বিষাদে ভয়ে-বিস্ময়ে রোদনে-বেদনে গান ধর্‌লে-ই নেচে ওঠেন।

৩

মানব চিরকাল-ই নন্দন-শোভিত অমরাবতী, ঐশ্বর্য্য-ভূষিত ইলিসিয়ম্‌, হুর-মনোহর বেহেস্ত আদি রচনা ক'রে কল্পনার ইউটোপিয়া-স্বপ্নের সাফল্য অনুভব করে। বর্ত্তমান কালের যুগ-সামঞ্জস্যে আমরা অম্‌নি একটা রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার চেষ্টা আজ বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ধ'রে ক'রে আস্‌ছি। পরিবারটি শাড়ী-সিঁদুর পরবে, পায়ের ধূলো নেবে, অথচ সন্ধ্যার পরে একটু ভিড়ের বাইরে গিয়ে ঘোড়াটা আসটা চড়বে, কাছারী থেকে ফিরে এলে হাত থেকে টুপীটা নিয়ে একটু অম্‌নি আড়ালে-আবডালে কাঁধ দু'খানিতে হাত দিয়ে ঠোঁট দু'খানি গালে ঠেকাবে। হরিসভায় গিয়ে কেত্তন-ও করব, চোখ দিয়ে জল-ও গড়াবে, অথচ একটু আধটু ফাউল কারী খেলুম-ই বা। দময়ন্তী ভাল, স্বয়ম্বর ভাল, কিন্তু ওর সঙ্গে দময়ন্তী খেল্‌লে-ই বা একটু হকি, ক্রিকেট, বল্‌লে-ই বা দু' একটা ইংরাজি—সর্ব্বদা ধ'রে রেখে—যে নল-ও একটু ইংরাজী জানেন। স্বয়ম্বরের আমরা খুব পক্ষপাতী ; এই কন্যাদায়ের বাজারে কন্‌ভোকেশনের পর ঐ সিনেট হলে-ই গ্রীভস্‌ সাহেব (in the way of a test case) স্বয়ম্বরের একটা বন্দোবস্ত করেন, তা' হ'লে বোধ হয়, দেশের ও সমাজের অনেক উপকার হ'তে পারে। পুরাণগুলোকে আমাদের ইমিজিয়েট পূর্ব্বগামীরা condemn ক'রে গেছেন বটে, কিন্তু আমাদের ভেতর অনেকটা tolerationএর ভাব এসেছে। এই ধরুন রামচন্দ্র ; পূর্ব্বে অনেকে সীতাকে বনবাস দেওয়ার রামের নিন্দা করতেন ; কিন্তু আমরা বুঝেছি যে, রামচন্দ্র তাঁর রাজ-জন্ম সত্ত্বে-ও Democracyর পক্ষপাতী ছিলেন, কেন না, তিনি সীতা সম্বন্ধে দু' একটা ধোপার মত জান্‌তে পেরে-ই labour-partyর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেন।

কাকে-ও কাকে-ও বল্‌তে শুনেছি যে, রামচন্দ্র সীতাকে ইন্‌টারন্‌ করলেন, তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু এক জন সম্ভ্রান্তা মহিলার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাটা তাঁর ভাল হয়নি ; তিনি বনে ঋষি-কন্যাকে দেখতে যাও ব'লে তাঁর সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করলেন! এদের যদি য়ুরোপের পুরাতন রাজবংশের ইতিহাসের কথা স্মরণ থাকৃত, তা হ'লে বুঝতে পারতেন যে, কত রাজা কত সময় রাণীত্যাগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে অতি গোপনে পোপের কাছ থেকে ছাড়পত্র আনিয়েছেন,

চুপি চুপি পার্লিয়ামেণ্টে ডিভোর্স বিল পাশ করিয়েছেন। পোপ বশিষ্ঠের স্কুলের এট্টেস্‌ম্যান ছিলেন রামচন্দ্র, তিনি বুঝেছিলেন যে, সীতাকে জানিয়ে শুনিয়ে প্রকাশ্যভাবে পরিত্যাগ করতে হ'লে রাজনীতির নিয়মানুযায়ী তাঁর ষ্টেট্ ট্রায়েল হওয়া আবশ্যক, আর তাতে যদি ভার্ডিক্ট সীতার বিপক্ষে দাঁড়ায়, তা হ'লে একেবারে ডিভোর্স ছাড়া উপায় নাই ; কিন্তু যে রামচন্দ্র সীতাকে স্বর্গের দেবী অপেক্ষা সম্মান করতেন, তাঁকে সাধারণ বিচারালয়ে খাড়া ক'রে অপমানিত করবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না এবং স্ত্রীভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করতে-ও তাঁর হৃদয় কখন-ও সম্মত হয়নি ; কেবলমাত্র কতকগুলি প্রজাকে প্রবোধ দেবার জন্যে রাণীর অন্যত্র অবস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন মাত্র, আর অতি বুদ্ধিমতী সীতা নিজে-ও এ কথা বুঝেছিলেন।

এখন আমরা বিলেতী চশমা চোখে দিয়ে পুরাণ পড়ছি, সুতরাং প্রতি শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা আমাদের চক্ষু পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে।

এই যে স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ যাবার পথে মোটর টায়ার ফেটে যাওয়াতে প্রিন্স নলকে পথে প্রায় তিন কোয়ার্টার ডিটেণ্ড হ'তে হয়, আর সেই সময় ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এই চারটি বড় বড় অফিসিয়ালের সঙ্গে তাঁর একটু কথা-বার্ত্তা হয়, এ থেকে আমাদের মত বুদ্ধিমান্ কখন-ও কি বিশ্বাস ক'রে নিতে পারে যে, ইন্দ্র একটা দেবতা যার হাজারটা চোখ ছিল আর অগ্নি একটা হাত-পা-ওলা মানুষ, বরুণ-ও তাই আর যম সেই যমের বাড়ীর যম ? রূপক রূপক, সেকালে কবিরা ইতিহাস লিখতেন, সেই জন্য বেশী অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র ছিলেন গে অল্ ইণ্ডিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, সেকালের চেয়ারম্যানরা খুব বেশী মোটা মাইনে পেতেন আর ভাল ভাল ড্যান্সিং গার্ল-টার্ল মাইনে ক'রে রেখে বাবুয়ানা করতেন। বরুণ হলেন গে জলের কলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার, অগ্নি ফায়ার ব্রিগেডের সুপারিন-টেনডেণ্ট, আর যম হলেন স্বয়ং হেল্‌থ অফিসার, প্লেগ, পক্স, কলেরা এই সবের বাড়াবাড়ি হ'লে কর্ত্তা স্বয়ং-ই এসে গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াতেন।

বিদর্ভনগরে মহাড়ম্বরে স্বয়ম্বর, বিস্তর বিস্তর রাজা-রাজড়া আহূত, এক এক জনের সঙ্গে এক একটা লম্বা রেটেনিউ, তার উপর দর্শক আছে, ভিক্ষুক আছে, রবাহূত। খুব সম্ভাবনা কলেরা প্লেগ টেগ দেখা দেবে ; এই জন্যেই মিউনিসিপ্যালিটীর বড় বড় অফিসিয়ালরা নিজে-ই এসে হাজির হয়েছেন। তার পর যখন কথায় কথায় শুনলেন যে,—young girlটি more than fair আর highly cultured, তখন ভাবলেন—why not take our chance,—it would be quite a fun, তখন এইরূপে ভাগ্যপরীক্ষাই বল আর মজা দেখা-ই বল, একটা মৎলব ঠিক ক'রে ইন্দ্র এণ্ড কোং প্রথমে নলের সঙ্গে একটা কম্পাউণ্ড করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দু' এক কথাতেই বুঝতে পারলেন যে, নলটি একটু বাঁক-নল গোছের অর্থাৎ বেণ্ট পাইপ। যম বললেন,—I shall make a fun of it in earnest ; তোমরা জান যে, Art of make-up অর্থাৎ বহুরূপীবিদ্যে আমার বিলক্ষণ আছে, come, আমরা চার জনেই নলের মত সেজে ফেলি, we'll give a treat to the girl in the way of a pretty puzzle.

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সহ্যের গুণ

কষ্টিপাথর লোহার পরশ
সহ্য করে ত তাই—
মুখ আলো করা তার হাসিভরা
কিরণ দেখিতে পাই।

দুঃখ-প্রহারে ভক্তি জাগিবে
পাপে নাহি রবে মতি—
আঁধার সহ্য হইলে নয়নে
ফুটিবে আলোর জ্যোতি !

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৃষ্টি-তত্ত্ব

এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা পৃথিবী কি সৃষ্টির আদিতেও এইরূপ রমণীয় বেশে বিরাজিত ছিল? আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্করাজি কি অনন্তকাল হইতে এই ভাবে নীল নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে? এই জগৎ কি সৃষ্ট হইয়াছে, না উহা নিত্য? জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকিলে কখন্ হইয়াছে? কিরূপে হইয়াছে? এই সকল প্রশ্ন অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এই সত্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য ঋষিগণ অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যালোচনার ফলস্বরূপ মনীষিগণ জগতের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সত্য ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

বেদ হইতে মনু-সংহিতা পর্য্যন্ত, পুরাণ হইতে তন্ত্রশাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রেই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, ঐ সকল বৃত্তান্ত আমরা অসার কাল্পনিক কাহিনী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি। জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণের যথার্থ জ্ঞান ছিল, এ কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বাস্তবিক একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের শাস্ত্রগুলি কেবল 'গাঁজাখোরী' গল্পে পরিপূর্ণ নহে। ইহাদের মধ্যে অনেক সার সত্য নিহিত রহিয়াছে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় হিন্দু মনীষিগণ যত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, জড়-বিজ্ঞানে তাঁহাদের তত দূর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহা সত্য। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের সহায়তার জন্য জড়-বিজ্ঞানের যতটুকু আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল, তাঁহারা ততটুকুই করিয়াছিলেন। কেবল জড়-বিজ্ঞান হিসাবে হিন্দু ঋষিরা উহার বিশেষ চর্চ্চা করেন নাই। আধ্যাত্মিকতার গুরু চাপে প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞানের বিকাশ পায় নাই। এই প্রতিকূল কারণ সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিদিগের প্রগাঢ় গবেষণার যে সকল ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অমূল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন। প্রাচীন শিক্ষার ধারা সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অধীনে আসিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এ দেশে কোন দিন বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয় নাই। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে বৈজ্ঞানিক সত্য থাকিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। এই ভ্রান্ত সংস্কারের দোষে আর্য্য ঋষি-প্রণীত গ্রন্থনিচয় আমাদের নিকট চির-অজ্ঞাত। শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমানে প্রাচীন শাস্ত্র-নিহিত সত্য সকল উদ্ঘাটন করিতে আমরা অসমর্থ। অজ্ঞানতাবশতঃ কত অমূল্য রত্ন আমরা উপেক্ষা করিয়া হারাইয়া ফেলিয়াছি।

জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রপারদর্শী ব্যক্তিগণ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে তিমিরাচ্ছন্ন সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে অনেক অমূল্য রত্নরাজি উদ্ধার করিতে পারিবেন। আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। অনধিকারী হইয়াও এই প্রবন্ধে আর্য্য-ঋষিদিগের প্রতিভার ক্ষীণ আভাস দিবার প্রয়াস করিতেছি।

বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। অন্যূন খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ-মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। তৎকালে আধুনিক সভ্য জাতি-গণের পূর্ব্বপুরুষগণ অরণ্যে বিচরণ করিত। আমরা বেদপাঠে অবগত হই যে, সরল আর্য্য ঋষিগণ প্রথমে প্রকৃতির রমণীয় ও উপকারী পদার্থসমূহকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। রজনীপ্রভাতের পর যখন পূর্ব্বাকাশ সুবর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তখন তাঁহারা সেই মনোহর দৃশ্যটিকে 'উষা' নামে অভিহিত করিয়া পূজা করিতেন। পৃথিবীর অন্ধকাররাশি দূরীভূত করিয়া যখন "জবাকুসুম-সংকাশম্" সূর্য্য নভোমণ্ডলে উদিত হইতেন, তখন ঋষিগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই 'সবিতার' স্তবস্তুতি আবৃত্তি করিতেন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব, এই জন্য 'বায়ু' মরুৎ নামে অর্চ্চিত হইতেন। এইরূপে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বহু দেবতার সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক দেবতার নামে বহু স্তোত্র রচিত হইল। কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে ঋষিরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে স্রষ্টার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃতির দৃশ্যাবলী সৃষ্ট জড়পদার্থ মাত্র। ইহারা দেবতা হইতে পারে না। ইহাদিগের এক জন স্রষ্টা আছেন। তখন হইতে তাঁহারা প্রাকৃতিক পদার্থের পূজা পরিত্যাগ করিয়া জগতের স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেই ব্যাকুলতা ও সেই কৌতূহলই তাঁহাদিগকে সার সত্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছিল। তাঁহারা অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে জগতের স্রষ্টা ও জগৎ উৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋষিরা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিবৃত হইয়াছে। বেদের দশম মণ্ডলে বৈদিক ঋষিদিগের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে অধিকতর বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম এই প্রশ্নই মনে উদিত হয় যে, জগৎ সৃষ্ট কি নিত্য, অনাদিকাল হইতে জগৎ এইরূপ অবস্থায়ই আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন? ঋষিদিগের মনেও প্রথমেই এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। এই প্রশ্নের সমাধান অতি দুরূহ। সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা কে জানে? কে সেই কথা বলিতে সমর্থ? সন্দেহাকুল চিত্তে ঋষিরা সেই কথাই বলিতেছেন ;—

> কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ,
> কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ঋ।১২৯।১০ম।

তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ব্যাকুল ঋষিগণ জগৎ-উৎপত্তির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়া বলিতেছেন—কে প্রকৃত তথ্য জানে, কেই বা তাহা বলিবে যে, এই জগৎ কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া ইহার সৃষ্টি হইল। আবার সেই কথা ;—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব,
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭।১২৯।১০ম।

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরম ধামে আছেন। অথবা তিনিও না-ও জানিতে পারেন।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা মানুষের পক্ষে ত বলা একেবারে অসাধ্য। জগতের কর্তা ভগবান্ ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে আসিল, এ কথা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। আবার ঋষিদের মনে সন্দেহ হইতেছে, বোধ হয়, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব তিনিও অবগত নহেন। বাস্তবিক এই জগতের আদি কারণ অতিশয় রহস্যময়। কিন্তু তাই বলিয়া ঋষিরা একেবারে হাল ছাড়িয়া নিরাশ হইয়া বসিলেন না। জগৎ-উৎপত্তি-রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও পর্য্যালোচনা চলিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহাদিগের উজ্জ্বল প্রতিভার আলোকে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়, প্রকৃত সত্য তাঁহারা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, এই জগৎ চিরকাল এই অবস্থায় ছিল না। জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা ঋষিরা এরূপ সুন্দর ও এরূপ গভীর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইয়া যায়। ঋষিদিগের চিন্তাশীলতার নিকট স্বতঃই মস্তক অবনত হয়। ঋষিরা বলিতেছেন ;—

নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং,
নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্,
অম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরম্ ॥ ১।১২৯।১০ম ঋক্।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ কোন বস্তু ছিল না, সৎ কোন বস্তুও ছিল না। এই যে উজ্জ্বল গ্রহ, নক্ষত্র সকল, ইহারা কেহই ছিল না। ইহাদের অপেক্ষা উন্নত যে ব্যোম, তাহারও অস্তিত্ব ছিল না। তখন কে সকলকে আবৃত করিয়া ছিল? কোথায় কাহার গৃহ ছিল? আর কাহাকেই বা আবৃত করিবে? কাহাকেই বা আশ্রয় দিবে? তখন কিছুই ছিল না। এমন কি, সেই সময়ে গহন ও গভীর সমুদ্র সকলও বিদ্যমান ছিল না।

তৎপর আবার ঋষিরা বলিতেছেন ;—

ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাৎ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চ নাস ॥ ২।১২৯।১০ম ঋক্।

সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্যুও ছিল না, অমরত্ব (জীবন)ও ছিল না। তখন রাত্রি ও দিনে কোন পার্থক্য ছিল না। তৎকালে সেই এক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বায়ু ও আত্মশক্তিতে জীবিত ছিলেন। এই ঋকটি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন প্রাণীর অস্তিত্বই ছিল না, সুতরাং তখন জন্ম-মৃত্যু দুই-ই ছিল না। সেই কালে চন্দ্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক বর্ত্তমান ছিল না, তাই দিবা ও রাত্রিতে কোন প্রভেদ ছিল না। তখন বায়ুও ছিল না, কোন পদার্থও জন্মিত না। ব্রহ্মের জীবনধারণের জন্য বায়ু ও অন্যের প্রয়োজন হয় না, তাই একমাত্র তিনি বায়ু ও অন্ন ব্যতীত আত্মশক্তিতে জীবিত ছিলেন!

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ মাত্র ছিলেন, আর কোন বস্তুই ছিল না, এই কথাটি কেমন সুন্দরভাবে পরিষ্কার ভাষায় আর্য্য ঋষিগণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে এই জ্যোতিঃপুঞ্জ সূর্য্য ও সুবিমল শশধর এবং নক্ষত্ররাজি-ইহারা যখন কিছুই ছিল না, সুতরাং তখন সর্ব্বত্র কেবল সূচিভেদ্য নিবিড় অন্ধকার বিরাজিত ছিল।

"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" ৩।১২৯।১০ম ঋক্।

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তপোমাহাত্ম্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব হইল। ভগবান্ যখন গভীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইয়া মহাশূন্যে বিরাজমান ছিলেন, তখন তাঁহার জগৎসৃষ্টির কামনা হইল।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি-
মনসো-রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪।১২৯।১০ম ঋক্।

পরমেশ্বরের মনে এই কাম বা ইচ্ছা হইল যে, "আমি জগত সৃষ্টি করিব।" পরমেশ্বরকে কেহ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করিতে দেখে নাই, কিন্তু মনীষীরা স্ব স্ব বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া ইহাই জানিতে পারিয়াছেন যে, সৃষ্টির কোন উপাদান না থাকিলেও সৎ বা বিদ্যমান বস্তু সকল সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে রেতঃ অর্থাৎ জগতের মূল উপাদান সকল (elements) উৎপাদন করিলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মূল উপাদান সকল (elements) কোথা হইতে আসিল, তাহা বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। মূল উপাদানের সৃষ্টির জন্য তাঁহাদিগকেও একটি শক্তিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সেই শক্তিকে ঐশী শক্তি বা Nature or God বলিতেছেন, আর জড়বাদীরা তাহাকে প্রকৃতি বলিতেছেন। ফল দাঁড়াইতেছে একইরূপ। মূল উপাদান হইতে কি প্রণালীতে জগতের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা, তাহাই বিবর্ত্তনবাদীরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মূল উপাদান কোথা হইতে আসিল, তাহা বলিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক মূল উপাদানের সৃষ্টির জন্য একটি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। এক বৃক্ষ অপর বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আদি বীজ কোথা হইতে আসিল? মূল উপাদান সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও ইহার বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই। বেদের ঋষিরা বলিতেছেন, জগতের মূল উপাদান ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীদিগের ন্যায় বলিয়াছেন, প্রকৃতিই জগতের নিদান। প্রকৃতি হইতে মূল উপাদান সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং মূল উপাদান সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে।

এখন কি প্রণালীতে মূল উপাদান হইতে জগতের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঋষিরা বলিতেছেন ;—

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাম্
অধঃস্বিদাসীৎ উপরিস্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫।১২৯।১০ম ঋক্।

অনন্তর 'রেতঃ' বা মূল উপাদান সকল একত্র সম্মিলিত হইয়া জ্যোতিষ্ক সকলের উৎপত্তি হইল। উহারা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মহিমান্বিত হইল। উহাদিগের রশ্মি সকল বক্রভাবে উর্দ্ধে এবং নিম্নে অর্থাৎ সকল দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পৃথিব্যাদি গ্রহে যে সকল শস্য উৎপন্ন হইল, উহারা ভোক্তার অধীন হইয়া নিম্নে স্থান পাইল। অর্থাৎ খাদ্যের উপর খাদকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই স্থানে একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে সূক্ষ্ম মূল উপাদান হইতে জ্যোতিষ্ক সকলের উৎপত্তি এবং উদ্ভিদের ও প্রাণিগণের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে। স্থানান্তরে তাঁহারা জগতের ক্রমবিকাশের আরও পরিস্ফুট আভাস প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ 'রেতঃ' বা মূল উপাদান আদিতে কি অবস্থায় ছিল, উহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ঋষিরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করিব।

ঋগ্‌বেদের এক স্থানে একটু পরিষ্কারভাবে জগতের আদি অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ;—

মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা। ১।৫৯।২য়।

অগ্নিই আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক সকলের আদি কারণ (মূর্দ্ধা,—শিরোবৎ প্রধানভূতো ভবতি—সায়ণ) এবং অগ্নিই পৃথিবীর উৎপত্তিস্থান (নাভিঃ,—উৎপত্তিস্থানম্—সায়ণ) ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রেতঃ বা জগতের মূল উপাদান সকল প্রথমে জ্বলন্ত অবস্থায় বিরাজিত ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলেন, জগৎ উপাদান সকল আদিতে নীহারিকা বা জ্বলন্ত বাষ্পাবস্থায় (gaseous cloud called Nebula) ছিল। সেই জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতে কালক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্করাজি উৎপন্ন হইয়াছে। এই মতই পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলের বিকাশ হইয়াছে, ইহা আর্য্য ঋষিরা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কিরূপে ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, আর্য্য ঋষিগণ সেই তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে অথচ অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন ;—এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী হইতে উদ্ভিদ্ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই চিরপরিচিত পঞ্চভূত হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির 'আকাশ' কথাটি বুঝিতে একটু গোল বাধিতে পারে। আকাশ কথাটি আমরা এখন 'অন্তরীক্ষ' 'নভোমণ্ডল' 'Sky' 'the Oven' এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অর্থে আকাশ ত শূন্য, কিছুই নয় ; তবে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল কিরূপে? 'আকাশ' সংস্কৃত সাহিত্যে sky অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাকে Ether বলেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাকেই 'আকাশ' বা 'ব্যোম' নামে উক্ত হইয়া থাকিবে। 'আকাশ' বলিলে সূক্ষ্মতম অদৃশ্য বাষ্পীয় পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে ক্রমবিকাশের ফলে স্থূলতর বায়ু বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হইল। সেই বাষ্পীয় পদার্থের অণুপরমাণুর সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। কালক্রমে জ্বলন্ত বাষ্পরাশি (Nebula) শীতল হইয়া আপ অর্থাৎ তরল পদার্থে পরিণত হইল। সেই তরল উপাদান সমূহ অধিকতর শীতল হইয়া পৃথিব্যাদি কঠিন গ্রহে পরিণত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহাই সোকাদের

ছি ২ বু। এই সৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টের জন্মের অন্যূন ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ এই সার সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বেদে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা যে তৎকালীন ঋষিদিগের কল্পনা-প্রসূত নহে, এরূপ মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মনীষিগণ সেই এক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা বৈদিক ঋষিদিগের সিদ্ধান্তটিকে কেবল অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে বেদের ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্য সহজে বোধগম্য হইয়াছে। উপনিষদে ও দর্শনে, সংহিতায় ও পুরাণে, জগৎ উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উহার ভিত্তি বৈদিক ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈদিক ঋষিদিগের মত কাল্পনিক মনে না করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন। কল্পনার স্রোত ২ হাজার বৎসর একই পথে প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। কল্পনা ব্যক্তিবিশেষের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। সত্য সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের লোকের উপলব্ধির বিষয়। সত্য নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনশীল।

বেদে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, রামায়ণ এবং মহাভারতেও তাহাই গৃহীত হইয়াছে। বেশী কিছু নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম ;—

নিষ্প্রভেঽস্মিন্নিরালোকে সর্ব্বতস্তমসাবৃতে।
বৃহদণ্ডমভূদেকং প্রজানাং বীজমব্যয়ম্॥ ২৯—আদিপর্ব্ব।

প্রথমে এই জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ইহাতে কোনরূপ জ্যোতিঃ ছিল না। তৎপর সমস্ত পদার্থের বীজভূত এক 'অণ্ড' জন্মিল।

জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রথমেই আমরা বেদের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" সেই গম্ভীর বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ;—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৫।১ম। অঃ।

এখানেও বলা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং কিছুরই চিহ্ন ছিল না, কিছু জানিবারও কোন উপায় ছিল না। সমগ্র বিশ্বের মূল উপাদান সকল প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। অতঃপর ভগবান্ স্বয়ম্ভু আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জগৎসৃষ্টির বাসনা হইলে তিনি সূক্ষ্ম মূল উপাদান সকলের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে আকাশ (Ether) সৃষ্ট হইল। আকাশের একমাত্র গুণ, উহা শব্দ-বহ। উহা দেখাও যায় না, স্পর্শ করাও যায় না। তৎপর—

আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণো মতঃ॥ ৭৬ শ্লোঃ ১ম।

আকাশের বিকারফলে সর্ব্বগন্ধবহ পবিত্র বলবান্ বায়ুর উৎপত্তি হইল। বায়ু স্পর্শগুণবিশিষ্ট। অতঃপর ;—

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাদ্বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥ (৭৭)
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ॥ (৭৮)

বায়ুর বিকারফলে অন্ধকারনাশক দীপ্তিশীল জ্যোতিঃ বা অগ্নির উৎপত্তি হইল। রূপ সেই অগ্নির গুণ অর্থাৎ রূপ আকাশ ও বায়ু দুই

হয় না, কিন্তু অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নির বিকার হইতে রসগুণ-বিশিষ্ট জলের উৎপত্তি হইল, অর্থাৎ জলন্ত বাষ্পীয় পদার্থ সকল কালক্রমে শীতল হইয়া তরল অবস্থায় আসিল। অতঃপর জল হইতে গন্ধগুণবিশিষ্ট ভূমি উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ সর্ব্বশেষে তরল জগৎ উপাদান সকল অধিকতর শীতল হইয়া কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হইল। আদিতে এই ক্রম অনুসারেই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে।

মনু-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, জগতের মূল বীজ বা সূক্ষ্ম উপাদান সকল (elements) সম্মিলিত হইয়া একটি বিরাট অণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। সেই অণ্ড কিরূপ ছিল ?

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্"

সেই অণ্ড স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তিশীল ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে, সমগ্র সৌরজগতের মূল উপাদান সকল এককালে জলন্ত বাষ্পাবস্থায় আকাশে অবস্থিত ছিল। সেই বাষ্পরাশি মাধ্যাকর্ষণের বলে এবং আবর্ত্তনের ফলে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অণ্ডের ন্যায় একটি বিরাট গোলকে পরিণত হইয়াছিল। সেই অণ্ড হইতে সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণবীক্ষণের (spectroscope) পরীক্ষায় জানা যায়, সূর্য্য এখনও প্রজ্বলিত বাষ্পাবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে সৌরজগতের মূল উপাদান সকল 'সহস্রাংশুসমপ্রভম্' ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

য়ুরোপে সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্ট (Kant) প্রচার করেন যে, জলন্ত বাষ্পরাশি হইতে ক্রমবিকাশের ফলে সৌরজগতের সূর্য্য ও গ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। কি প্রণালীতে উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি তাহা বলেন নাই। ক্যাণ্টের এই মত তখন কেহ গ্রাহ্য করে নাই। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ল্যাপ্‌লাস্ (Laplace) ক্যাণ্টের মত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করেন। গণিতের সাহায্যে ক্যাণ্টের মতট তিনি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস করেন। ল্যাপ্‌লাস্ সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকলের অবস্থান পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক গবেষণার পর ক্যাণ্টের মতের সত্যতা উপলব্ধি করেন। ল্যাপলাস্ আকাশস্থ জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা (Nebulas) হইতে সৌরজগতের সূর্য্য ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত সমর্থন করিয়া একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

ল্যাপ্‌লাসের সেই সিদ্ধান্তই জ্যোতিষশাস্ত্রে নীহারিকাবাদ (Nebular Theory) নামে সুপরিচিত। ল্যাপ্‌লাস্ যে ভাবে জলন্ত বাষ্পরাশি হইতে গ্রহ ও উপগ্রহ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে Lord Kelvin প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত আপত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম জলন্ত বাষ্পীয় অবস্থা হইতে যে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিব্যাদি জ্যোতিষ্ক সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। Sir Norman Lockyerএর উল্কাবাদের (meteoric theory) মূলেও ল্যাপ্‌লাস্-উক্ত সেই জলন্ত বাষ্প রহিয়াছে। তাঁহার মতে উল্কাপিণ্ড সকল পরস্পরের সংঘর্ষজাত তাপে দ্রব হইয়া বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। সেই জলন্ত বাষ্প কালক্রমে শীতল হইয়া প্রথমে তরল এবং তৎপর কঠিন গ্রহ ও উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উল্কাবাদ ও নীহারিকাবাদ উভয়ই "আকাশাৎ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" ঋষিদিগের আবিষ্কৃত ক্রমবিকাশের ধারা সমর্থন করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত নীহারিকাবাদ হইতে জানিতে পারি, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ জলন্ত বাষ্পপিণ্ডাকারে শূন্যে অবস্থিত ছিল। অনন্তর সেই বিরাট বাষ্পপিণ্ড হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এবং ইহাদের চন্দ্র বা উপগ্রহ সকল বাষ্পাবস্থা হইতে শীতল হইয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াও কিন্তু বৃহস্পতি, শনি ইয়ুরেনাস ও নেপচুন গ্রহ এখনও সম্পূর্ণ কঠিন অবস্থায় উপনীত হয় নাই। ইহাদের উপরিভাগ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে বাষ্পময় বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য এখনও ভীষণ তেজোময় জলন্ত বাষ্পীয় অবস্থায় রহিয়াছে। যে পদার্থ যত ছোট; সেই পদার্থ তত শীঘ্র তাপক্ষয় হেতু শীতল হইয়া পড়ে। এক কলসী উত্তপ্ত জল যত সময়ে শীতল হয়, তাহার অপেক্ষা অল্পসময়ে এক ঘটী জল শীতল হইয়া যায়। এক ঘটী জলের অপেক্ষা অল্প সময়ে এক বাটি জল শীতল হয়। তাই বুধ, শুক্র, পৃথিব্যাদি সৌরজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সকল একবারে শীতল হইয়া কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি বড় গ্রহগুলি এখন উত্তপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ১৩ লক্ষ পৃথিবীর সমান বৃহৎ। তাই সূর্য্য এখনও জলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে, কালে সূর্য্যও নিবিয়া পৃথিবীর ন্যায় জ্যোতির্হীন হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শূন্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তিশীল এক বিরাট 'অণ্ড' আকাশে বিরাজিত ছিল।

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥ ১২।১ম, মনু।

সেই অণ্ডে ব্রহ্মা ১ বৎসরকাল বাস করিয়া তাহা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সেই অণ্ডের খণ্ডদ্বয় দ্বারা তিনি স্বর্গ, পৃথিবী এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অষ্ট দিক এবং জলাধার সমুদ্র সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, সৌরজগতের যাবতীয় জ্যোতিষ্কাদি পদার্থ এক অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলেরই এক উপাদান। আমাদের পৃথিবীর এইরূপে জন্ম হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অণ্ড ব্রহ্মার ১০ বৎসরকাল শূন্যে অবস্থিতির পর পৃথিবী ও সূর্য্য পৃথক্ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মার ১ বৎসর সহজ কথা নয়। আমাদের ৪ শত ৩২ কোটি বৎসরে না কি ব্রহ্মার ১ দিন। ৪ শত ৩২কে ৩ শত ৬৫ দিয়া গুণ করিলে যত হয়, আমাদের তত বৎসর।

ভারতের ষড় দর্শনে মোটামুটি বেদের উক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে। বৈদিক ঋষিদিগের নির্ম্মিত কাঠামের উপর দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত অভিনব তথ্য সকল সংযোগ করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা কণাদ জড়-বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি জগতে সর্ব্বপ্রথম পরমাণুতত্ত্ব (atomic theory) আবিষ্কার করেন। পরম+অণু অর্থাৎ পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ, ভাগ করিতে করিতে যাহা আর ভাগ করা যায় না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না। পরমাণু চারি প্রকার ;—বায়বীয়, তৈজস, জলীয়, ভৌমিক। প্রথমতঃ অদৃষ্ট কারণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে। সেই ক্রিয়ার ফলে বায়বীয় পরমাণুদিগকে একত্র সংযুক্ত করে। দুইটি অণু সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক, ক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক পরমাণু সকলের সংযোগে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে যাহা 'পরমাণু' নামে উক্ত হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য-দর্শনে "তন্মাত্র" নামে অভিহিত হইয়াছে, মোটামুটি এ কথা বলা যাইতে পারে। সাংখ্যাচার্য্যগণ জগৎ উপাদানভূত (elements) সকলের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ করিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * সে কথায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

---

* পূর্ব্বে বলিয়াছি, "রেতঃ" শব্দ বেদে মূল উপাদান (elements) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুতে তাহাই পঞ্চভূত এবং সাংখ্যে

সাংখ্যপ্রণেতা কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি ঈশ্বরের স্থানে প্রকৃতিকে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীদের (evolutionists) ন্যায় তিনিও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পুরাণ সকল অনেক পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছে। পুরাণে প্রাচীন ঋষিদিগের আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক সার কথা নিহিত আছে। পুরাণ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল। বড় বড় তথ্য সকল সাধারণ লোকদিগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে পুরাণকারদিগকে রূপক ও গল্পের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পৌরাণিক গল্প ও রূপকের অন্তরালে অনেক মণিমুক্তা লুক্কায়িত রহিয়াছে। সকল পুরাণের প্রথম ভাগেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিরূপে মূল উপাদান সকল সৃষ্ট হইল এবং ক্রমবিকাশের ফলে কিরূপে মূল উপাদান হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইল, তাহা সকল পুরাণেই প্রায় একরূপ বিবৃত হইয়াছে। পুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় কিছুই নূতনত্ব নাই, সকলই ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। কেবল মূল উপাদান সকলের বিভাগ এবং বিশ্লেষণে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অনুসরণ করা হইয়াছে। এই জন্য বঙ্কিম বাবু মনে করিয়াছিলেন, সাংখ্য মনু-সংহিতার পরে এবং পুরাণ সকলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার কথা এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীত তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।

অধিকতর সূক্ষ্ম বিভাগ করিয়া তন্মাত্র, সূক্ষ্মভূত এবং স্থূলভূত ইত্যাদিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

আদিতে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক ও অন্য কোন বস্তুই ছিল না। ইহা ঋগ্‌বেদের "ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেত" "নাসীদ্রজো নো ব্যোম" এই মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনিমাত্র। বিষ্ণুপুরাণে আছে, মূল উপাদান সকল একত্র সম্মিলিত হইয়া একটি অণ্ডের আকার ধারণ করিল। এই অণ্ডই আমাদের পৃথিবী। অতঃপর ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীর অবস্থান হইল,—"নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।" (৫৩।১ম) নারিকেলফলের ভিতরে জল; জলের চারিদিকে কঠিন আবরণ। পৃথিবীরও বহিরাবরণ কঠিন মৃত্তিকাস্তরে আবৃত, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ তরল। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পৃথিবী যখন উত্তপ্ত তরল অবস্থায় ছিল, তখন শৈত্যপ্রভাবে উহার উপরিভাগে উত্তপ্ত দুগ্ধ অথবা গলিত ধাতুর উপর যেমন 'সর' পড়ে, তেমন একটি আবরণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই আবরণই কঠিন ভূপৃষ্ঠ (crust)। পৃথিবী যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই নূতন স্তর পড়িতে লাগিল। এই স্থলে পৃথিবীর ক্রমবিকাশের আর একটি অবস্থা জানিতে পারা গেল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,—উত্তপ্ত তরল মূল উপাদান সকলের উপর একটি 'সর' পড়িয়াছিল। কালক্রমে সেই সর কঠিন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, পুরাণকার প্রাচীন ধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট এই তত্ত্বের জন্য ঋণী।

জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে অনেক কথা আছে, এখন আমরা তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ। তাই ঐ সকল তথ্যবচন অর্থশূন্য বোধ হইতেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রকৃতি

এ কথা যে একেলার, অন্তরালে চিন্তা করিবার;
ইহারে ত ব্যক্ত করা, ব্যর্থ করা, ক্ষুন্ন করা তার।
হে প্রকৃতি, অনিন্দিত, ব্রহ্মসম, অনন্ত অপার
তোমার মহিমারাশি; গুণময়ী, রহস্যের দ্বার
চিরকাল বদ্ধ তব। তোমারে জানিতে আশা হায়
পণ্ডশ্রম; নিজেরে করেছ লুপ্ত চির অজানায়।
শুধু তব রূপচ্ছবি, রেখেছ নয়নপথে আঁকি;
আপনার স্বরূপেরে, চিরতরে, দূরে লুপ্ত রাখি'।
অনন্ত রূপের মালা পরি, বাহে সেজেছ সুন্দরী;
মোহযুক্ত জনগণে, রাখিয়াছ মায়ামুগ্ধ করি'।
মেঘপথে হাসির বিজলী, ফুলে তব গন্ধ মাখা,
অন্তকালে আকাশের বুকে হয় তব বর্ণ আঁকা।
ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ নানা রূপ ধর, স্বপ্নময়ী,
বিচিত্র তোমার লীলা, ধরণীতে তুমি সদা জয়ী।
আমি, দেবি, ভক্ত তব, হে আরাধ্যা হে পরা প্রকৃতি,
চিত্ত মোর ছুটে ছুটে, তব দ্বারে অন্বেষিছে গতি।
কিন্তু তুমি কত দূরে, কোথা তুমি খুঁজে নাহি পাই,
এই আছ সন্নিকটে, এই তোমা সুদূরে হারাই।
আমি শুধু ভক্ত তব, হে বিচিত্রা, মুগ্ধ কভু নহি,
পশ্চাতে লুকায়ে রাখ, বিশালতা, তাই চেয়ে রহি,
হে নন্দিতা, আনন্দিত, আধ-ঢাকা তব মুখ পানে,
চেয়ে চেয়ে, যায়, দেবী ছুটি মন, অনন্ত সন্ধানে।
আমি কভু মোহ দিয়া চাহি নাই, শুধু ভক্তি করি,
দেবীশ্রেষ্ঠা ভাবিয়াছি তোমা, তাই তব স্মৃতি ধরি,
সম্ভ্রমে মাথার পরে। মিথ্যা বাণী রচিব বিশাল,
কহি যদি তব স্মৃতি, রচে নাই কোন ইন্দ্রজাল,
আমার হৃদয়-পুরে, তবে আছে ক্ষণকাল তরে,
সহসা টুটেছে স্বপ্ন, তখনি সুদূরে সেই শরে
মাতার মহিমা দিয়া, করিয়াছি যতনে মণ্ডিত,
চারু তব পাদপদ্ম ভাবি ফুলে করেছি সজ্জিত।
ফিরে কভু নাহি আসি, তোমা পরে স্থির রাখি আঁখি,
গোপনে গোপনকাল, আসি কালে রাখে বুকে ঢাকি,
তবু মোর চাহিবার অন্ত নাহি থাকে দেবি আর,
অনন্ত বিস্তার তব পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
নিশ্চিন্তে সে ঘুমায়েছে, সব ভার দিয়া তোমা 'পরে,
দ্বার ঢাকি, বাহিরে দাঁড়ায়ে আছ বিস্ময়ের ঘরে।
দেবী, দেবী, ভক্ত তব, হে গর্ব্বিতা হের চিরদাস।
মোর দ্বার দাও ছাড়ি, খুলে দাও বন্ধনের ফাঁস।
চেয়ে চেয়ে মুখ পানে, আশা করি পেতে গুপ্তধন।
এক দিন কর দয়া, খুলে দাও অনাদি গোপন।
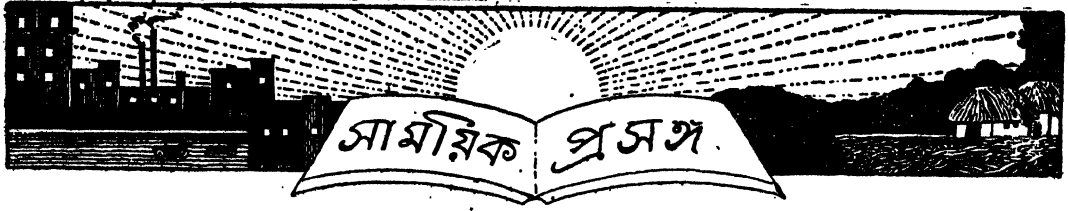
ইংরাজকে ভারতের দান

ইংরাজ তাঁহার বাহুবলের আশ্রয়ে ভারতকে রক্ষা করিতেছেন, বিনিময়ে ভারত ইংরাজকে বেশী কিছু দান করে নাই, এমন অনুযোগ কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজের সেনা, ইংরাজের রণতরী, ইংরাজের উড়োকল, ইংরাজের কৃতবিদ্য তরুণসম্প্রদায় ভারতকে শান্তি ও শৃঙ্খলা দান করিয়াছে ও করিতেছে, বিনিময়ে ভারত ইংরাজের সিঙ্গাপুরে প্রাচ্য নৌবহরের আড্ডা নির্ম্মাণে কাণা কড়িও প্রদান করিতেছে না,—এখন এই ভাবের বিশেষ অনুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সে দিন বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ ষ্ট্যানলি রাইস এই ভাবের অনুযোগ করিবার কালে বলিয়াছেন, ভারত বিলাতে একখানি রেল-নির্ম্মাণে অথবা ইংরাজের রণতরীনির্ম্মাণে একটি স্ক্রুও দান করে নাই। ইহার দ্বারা জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, ইংরাজ মহানুভব জাতি। তাঁহারা শক্তিশালী অভিভাবকের মত নাবালক ভারতের কত মঙ্গলবিধান করিতেছেন—নিজের স্বার্থের মুখ না চাহিয়া ভারতের উপকারসাধন করিতেছেন, অথচ ভারত এতই অকৃতজ্ঞ যে, সে রক্ষাকর্ত্তা ইংরাজের কোনও উপকারে আইসে না।

কথাটা কি সত্য? যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভারতকে ইংরাজই তাঁহার সাম্রাজ্যের 'উজ্জ্বলতম রত্ন' বলিয়া এ যাবৎ অভিহিত করিয়া আসিতেন না, অথবা ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা ভারতকে ইংরাজের 'কামধেনু' বা 'পাগোডা' বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। ২ শত বৎসরের ইংরাজের ভারতশাসনে ভারতের *দোহনকার্য্য* কিরূপ চলিয়াছে এবং উহার ফলে ইংরাজ কিরূপ ধন-সম্পদশালী হইয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। এখনও ভারতের ব্যবসার না থাকিলে—ভারতে মাল চালাইবার সুবিধা না থাকিলে ইংরাজের বেকার-সমস্যা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই বেকার-সমস্যাসমাধানের জন্য বিলাতের কারখানায় ভারতের রেল ও তাহার সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণে কত লোক নিযুক্ত হয়, তাহাও সকলে জানে। ভারতের শাসন, বিচার, বন, আবকারী, পূর্ত্ত, পুলিস, রেল, ষ্টীমার, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগে কত ইংরাজ সন্তান 'করিয়া খাইতেছে', তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

মহাযুদ্ধকালে ভারতের নিকট ইংরাজ কি উপকার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের তৎকালীন বক্তৃতাতে প্রকাশ। ভারতের জনসাধারণ ও রাজন্যগণ অর্থ ও লোকবল দিয়া সে সময়ে কত সাহায্য করিয়াছিল, তাহা মিঃ রাইস প্রমুখ ভারতের লবণে পুষ্ট সিবিলিয়ানশ্রেণী ভুলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু উহা বহু ইংরাজ ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ বিষয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের অভিমত সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় সন্দেহ নাই। মার্কিণ অধ্যাপক ডিমাঞ্জিয়ন লিখিয়াছেন,—

ভারতবর্ষ শোষণের উপনিবেশের আদর্শ (typical colony for exploitation)। এই দেশ প্রচুর ধনশালী এবং লোকের ঘন বসতিতে পূর্ণ। এই হেতু ভারতবর্ষের মনিব ইংরাজের পক্ষে এই দেশ ধনাগমের প্রকৃষ্ট স্থান এবং সাম্রাজ্যরক্ষণের শিকার আড্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের মারফতেই ইংরাজের সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয় হইয়াছে। ভারত ইংরাজের প্রাচ্যের ব্যবসায়ের প্রথম প্রধান গঞ্জ—ঐ স্থানের মারফতে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও ইংরাজের কারকারবার চলিয়া থাকে। পরন্তু ভারত ইংরাজের প্রাচ্য নৌবহরের খোরাক সংগ্রহের ও বিশ্রামের স্থান। ইংরাজের বহু যুবক ভারতের সৈন্যশ্রেণীতে

জীবিকার্জ্জনের পথ পায়। ভারতের সেনাকে চীন ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরাজের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। জার্ম্মাণযুদ্ধকালে ১০ লক্ষ ভারতীয় সেনা ভারতের বাহিরে ইংরাজের হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, তন্মধ্যে লক্ষাধিক ভারতীয় ইংরাজের জন্য রণক্ষেত্রে রক্ত দান করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। ভারত ইংরাজের মাল কাটতির প্রধান আড়ত। এখানে ইংরাজের মারফতে যে সকল পণ্য আমদানী হয়, তাহা মূল আমদানীর তিনের দুই অংশ। ভারত ইংরাজ-সাম্রাজ্যের উৎপন্ন গমের শতকরা ৫১ ভাগ, চায়ের শতকরা ৫৮ ভাগ, কাফির শতকরা ৭২ ভাগ এবং প্রায় সমস্ত তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে। উহা সাম্রাজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতের খনিসমূহে, কারখানায়, চা-বাগিচায়, কুঠীতে, রেলে, সেচে ইংরাজের লক্ষ লক্ষ মূলধন খাটিতেছে। ভারতকে ইংরাজের ৩৫ কোটি পাউণ্ড মূলধনের জন্য সুদ গণিতে হয়। ভারত বিস্তর ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর বেতন যোগান দেয়। তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করেন, তাহা কার্য্যাবসানে বিলাতে চলিয়া যায়। জাতীয় দেনা (public debt), প্রাচীন ইংরাজ কর্ম্মচারীর পেন্সন এবং শাসনযন্ত্র পরিচালন বাবদে ভারতকে ইংরাজের তহবিলে কুবেরের অর্থ যোগান দিতে হয়। (লেখক এখানে কর্ম্মচারীদের বাটা, ভাতা, রাহা, পরিবারপালন ইত্যাদি বাবের কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।) বিলাতে ভারতকে দেনা আদি বাবদে যে অর্থ যোগাইতে হয়, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার বাৎসরিক পরিমাণ ৩ কোটি পাউণ্ড। ইহা ছাড়া পণ্যাদি বাবদে ভারত ইংরাজ ব্যবসাদার ও জাহাজওয়ালাদিগকে যাহা দেয়, তাহাও ধরিতে হইবে। Exploitation কথার এমন সদ্ব্যবহার কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ইহা নিরপেক্ষ মার্কিণ সমালোচকের মন্তব্য। এমন-ভাবের আরও অভিমত উদ্ধৃত করা যায়। খাস ইংরাজের আপনার লোক অধ্যাপক সিলি, অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান বার্ণার্ড হটন, পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির রচনাতেও এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের সভাপতিদিগের অভিভাষণসমূহ অনুসন্ধান করিলে তাহাতেও এই অভিমতের পোষক অনেক কথা পাওয়া যাইতে পারে। অধিক কথা কি, যিনি আমাদের বর্ত্তমান ভারত-সচিব, সেই লর্ড বার্কেণহেড ১৯২০ খৃষ্টাব্দে 'সাণ্ডে হেরাল্ড' পত্রের কোনও এক প্রবন্ধের জবাবে বলিয়াছিলেন ;—

বিলাত সর্ব্বদা ভারত হইতে বহুল পরিমাণে খাদ্য-শস্যাদি ও কাঁচা মাল আমদানী করিয়াছে। সে সকল কাঁচা মালে ইংরাজের শ্রমশিল্প ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত হইতে ন্যূনাধিক ১৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যের মাল প্রতি বৎসর গড়-পড়তায় রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ বিলাতে এবং শতকরা ৪০ ভাগেরও উপর মাল সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যে রপ্তানী হইয়াছে। যে সকল মাল রপ্তানী হইয়াছে, তন্মধ্যে চাউল, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, পাট, পশম, তুলা, চা, চামড়া, তৈলবীজ ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্যবসায়ের অন্য দিক দিয়া দেখিলে ইংরাজের নিকট ভারতের মূল্য কিরূপ বুঝা যায়। ভারত বৃটিশ-কলকারখানা-জাত পণ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদদার। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত বিদেশ হইতে যে পণ্য আমদানী করিত, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ বিলাতের পণ্য !

ইহার পরেও কি আরও প্রমাণের আবশ্যক আছে ? ভারত যে ইংরাজের নিকট অনেক পায়, বিনিময়ে যৎ-সামান্য দেয়—সে যে অকৃতজ্ঞ, তাহা যুক্তি বা প্রমাণসহ নহে। ভারত না থাকিলে ইংরাজের সাম্রাজ্য আজ কোথায় কোন্ আসনে থাকিত, তাহা সকলেই জানে।

শিক্ষায় হস্তক্ষেপ

সার আশুতোষ সরস্বতীর তিরোভাবের পর বাঙ্গালা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নানাভাবে হস্ত-ক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে আশুতোষের সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে গিয়া এক দিন বাঙ্গালার লাট লর্ড লিটন জনসমাজে অপদস্থ হইয়াছিলেন, আজ তিনি নাই বলিয়া হয় ত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে অভি-ভাবকহীন মনে করিতেছেন। তাহা না হইলে তাঁহার

তিরোভাবের পর এত অল্প কালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের যথেচ্ছাচার আচরণে সাহস হইবে কেন ? এক দিকে যেমন বাঙ্গালা হইতে দ্বৈতশাসন তুলিয়া দিয়া পূর্ণ স্বেচ্ছাচার শাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই অন্য দিকে বাঙ্গালার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ সরকারী ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সকল দিকে সরকারের কামনা পূর্ণ হইলে বাঙ্গালা যে দুই দিন পরে Non-regulated provinceএর পর্য্যায়ে নীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কতকটা স্বাধীনতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সরকার এখন এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ কাটিয়া ছাঁটিয়া নূতন করিয়া গড়িতে উদ্যত,—আবার অন্য দিকে মাধ্যমিক শিক্ষা (অর্থাৎ ম্যাট্রিক ও ইণ্টার-মিডিয়েট শিক্ষা) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন হইতে মুক্ত করিতে উদ্যত। অর্থাৎ সরকারের বাসনা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল বি, এ, বি, এস্-সি শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন ; বাকি ম্যাট্রিক, ইণ্টার-মিডিয়েট ও কঙ্কালাবশিষ্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট,—এ সকলের কর্ত্তৃত্ব সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। কেমন, সুন্দর ব্যবস্থা নহে কি ?

পরলোকগত সার আশুতোষ এক দিন চ্যান্সেলারকে বলিয়াছিলেন,—আপনাদের ব্যবস্থা অতি চমৎকার, *এক দিকে আপনারা পাটনায় একটি ও ঢাকায় একটি, এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া* কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিকলাঙ্গ করিতেছেন—উহার বিস্তার ও আয় ক্ষুণ্ণ করিতেছেন,—আর এক দিকে তাহার উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন! আজ সেই 'বাঙ্গালার ব্যাঘ্র' আর নাই, নতুবা তিনি সরকারের এই [illegible] চেষ্টায় বাধা দিয়া নিশ্চিতই বলিতেন, যখন তোমরা সর্ব্বস্ব লইতে বসিয়াছ, তখন আর চক্ষুলজ্জা কেন, যেটুকু রাখিতেছ, ওটুকুও লও!

অসহযোগ আন্দোলনকালে যখন ছাত্রচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, যখন দলে দলে শিক্ষার্থী বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-স্কুল ছাড়িতেছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় টলমল করিয়াছিল, তখন সার আশুতোষ বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা যাহা চাও, তাহাই ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইতেছ। ইহা ত তোমাদের জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে তোমাদের দেশবাসীদেরই সর্ব্বেসর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। তাঁহাদের ইচ্ছামতই ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিত্য ভাঙ্গন-গড়ন হইতেছে। তবে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িবে কেন ?" বস্তুতঃ পরোক্ষভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। অন্ততঃ সার আশুতোষের প্রভাব যত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুভূত হইয়াছিল, তত দিন বিশ্ববিদ্যালয়কে 'বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়' বলিয়া লোক জানিত।

দেশবাসীর দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই প্রভাব সরকারের বোধ হয় সহ্য হইতেছিল না। তাই সরকার দুই পথে উহা ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইলেন ;—

(১) এক Reorganisation Committee বসাইয়া Post-Graduate বিভাগের কাট-ছাঁট করা,

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে লইয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা একটি বোর্ডের হস্তে দেওয়া।

প্রথমটির জন্য যে কমিটী বসান হয়, তাঁহাদের সদস্যরা সিদ্ধান্তকালে একমত হইতে পারেন নাই। তাই দুইটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, একটি Majority, অপরটি Minority. বলা বাহুল্য, দেশের লোকের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া অধিকাংশ সদস্য Majority reportএ স্বাক্ষর করেন এবং সরকার পক্ষের মতসমর্থন করিয়া মুষ্টিমেয় সদস্য Minority reportএ স্বাক্ষর করেন। অধিকাংশের মতে স্থির হয় যে, Post-Graduate বিভাগ রাখা হইবে, তবে তাহার ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থা করা হইবে। অল্পের মতে একরূপ Post-Graduate বিভাগের সমাধির ব্যবস্থারই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। সিনেটে উভয় রিপোর্ট সম্বন্ধে দীর্ঘ ৫ দিনব্যাপী তর্ক-বিতর্ক হয়। সুখের কথা, সিনেট Majority Reportই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এ ব্যাপারে যবনিকাপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সরকার সহজে ছাড়িবেন বলিয়া মনে হয় না। হয় ত অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাতে মারিবার চেষ্টা করিবেন—বিশেষতঃ এখন যখন আবার পূর্ণ আমলাতন্ত্র

শাসনই পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল; তখন আয়-ব্যয় সম্পর্কে তাঁহাদের ক্ষমতা অব্যাহত হইল।

মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন ব্যবস্থাবিধান সম্পর্কে গত ১লা এপ্রেল (All Fool's day) নূতন আইন প্রবর্ত্তনকল্পে গভর্ণরের প্রাসাদে এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড লিটন তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সমিতি ব্যবস্থা করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে লইয়া একটি বোর্ডের হস্তে দেওয়া হইবে।

বোর্ডের গঠন এইরূপ হইবে, যথা,—

(১) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সদস্য—১০ বা ১৩ জন,

(২) নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য—৫ জন,

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত সদস্য—২ জন,

(৪) বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্য—১ জন।

অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভা যত সদস্য নিযুক্ত করিবেন, সরকারের নিযুক্ত সদস্য তাহার প্রায় দ্বিগুণ থাকিবে। ইহা দ্বারা কি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের প্রাধান্য অব্যাহত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে না? এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তারের পক্ষে ঘোর অন্তরায় উপস্থিত হইবে। কেন হইবে, তাহা অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন। যে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া উচ্চশিক্ষা অথবা পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা গড়িয়া তুলিবার কথা, সেই মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব না থাকে—সে শিক্ষার ব্যবস্থা যদি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মনের মত নিয়ন্ত্রণ করিতে না পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার সহিত উহার সামঞ্জস্য-বিধান করিবেন কিরূপে? সরকারের খেয়াল অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া দেশের স্বাধীন শিক্ষামণ্ডলের উপর ন্যস্ত হওয়াই উচিত, এ কথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবে। কারণ, সরকার যদি মাধ্যমিক শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করেন যে, শিক্ষার্থীরা সেই ব্যবস্থা অনুসারে শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ হয়—অথবা উচ্চশিক্ষালাভ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে দেশে প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বাধীন শিক্ষা-মণ্ডলের দ্বারা সে ব্যাপার সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার উপর অর্থের কথাও ধরিতে হইবে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়—এতদুভয়ের মধ্যে অর্থ-বণ্টন ব্যাপার দুরূহ হইয়া উঠিতে পারে।

সরকারের এই নূতন উদ্যম দেখিয়া মনে হয়, প্রথমাবধি সরকার যেমন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মানুষ গড়িবার চেষ্টা না করিয়া ভাল ও মন্দ কেরাণী গড়িয়া আসিতেছেন, সার আশুতোষের নূতন ব্যবস্থায় তাহাতে বাধা পড়ায়, সরকার আবার সেই মামুলী প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছেন। স্যাডলার কমিশন বলিয়াছিলেন,—মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারের অধীন করিতে গেলে শিক্ষার স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে এবং লোক বলিবে, সরকার শিক্ষার বিস্তার ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করিতেছেন। কমিশনের অনুমান ঠিক হইয়াছে, লোক তাহাই মনে করিতেছে।

বোর্ড পুষিবার ব্যাপারও সামান্য নহে। স্যাডলার কমিশন বলিয়াছিলেন, পরীক্ষার ফিস হিসাবে যে টাকা আয় হইবে এবং বর্ত্তমানে যে ব্যয় হইতেছে, তাহার উপর বাৎসরিক ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় না করিলে বোর্ডের কায যথারীতি নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এ অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকাই বা কোথা হইতে আসিবে? যদি না আইসে, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ শক্তিহীন বোর্ড রাখিয়াই বা ফল কি?

বাঙ্গালার লোক কথাগুলি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। দেশের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারের অব্যবস্থার দোষে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুণ্ণ হইতে না হয়, তাহা দেখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

—

বর্ত্তমান অবস্থায় সতীশরঞ্জন

লালা লজপৎ রায় গত ৮ই মে তারিখে লাহোরে কোনও সংবাদসংগ্রাহককে বলিয়াছেন যে, এ দেশে নানা শ্রেণীর রাজনীতিকের বিরোধের মধ্যে একতা আনয়ন করিতে পারে কংগ্রেস—কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নাই যে, বর্ত্তমান বিরোধ-হলাহল হইতে একতা-সুধা উত্তোলন করিতে পারে।

অথচ লালাজী অন্য স্থলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেস ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে, ইহার সদস্য ও অর্থ-ভাণ্ডারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে; উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে ইহার কর্ম্মিবৃন্দ ক্রমেই প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন।

যে কংগ্রেস দেশে একতা আনয়নে একমাত্র সমর্থ প্রতিষ্ঠান, তাহার এমন অবস্থা কেন হইল, তাহা দেশবাসীর পক্ষে ভাবিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেশনায়ক চিত্তরঞ্জন দাশ কারামুক্ত হইবার পর দেশে যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু অহিংস অসহযোগীর মনোভঙ্গ হইয়াছিল। চরকায় স্বরাজ আসিবে না,—এই ভাবের কথা সেই সময়ে নেতৃবর্গের মুখে শুনা গিয়াছিল। বরদোলিতে মহাত্মা জনগত আইন অমান্যের প্রোগ্রাম স্থগিত রাখিয়া স্বরাজ-আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন, এ ভাবের কথাও শুনা গিয়াছিল।

তাহার পর দেশে একটা উত্তেজনা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, কাউন্সিল প্রবেশ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন হইল। সেই আন্দোলনের ফল কি হইয়াছে, তাহা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এখন দেশে সম্প্রদায়গত, ধর্ম্মগত, রাজনীতিক অধিকারগত, জাতিগত,—নানা প্রকার বিরোধ উপস্থিত। আমলাতন্ত্র সরকার সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালায় ও মধ্যপ্রদেশে কাউন্সিল-ভঙ্গের অজুহতে পুনরায় স্বেচ্ছাচারমূলক আমলাতন্ত্র শাসন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতেছেন। মধ্যে চিত্তরঞ্জন-বার্কেণহেড পর্ব্বের অভিনয় হইয়া গেল। অবশ্য গোপীনাথ সাহা মন্তব্য হেতু চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদল সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল, চিত্তরঞ্জন সে ধারণা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার মূলনীতির কথা শতবার বুঝাইয়া দিতে পারেন, ইহাতে কেহ কোনও ছল ধরিতে পারেন না। কিন্তু দোষ হইয়াছে এই যে, য়ুরোপীয় সমাজ ইহাকে চিত্তরঞ্জনের পক্ষ হইতে সহযোগের সাড়া—কতকটা climbing down বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেবল য়ুরোপীয় সমাজ নহে, আমাদের দেশেরও এক শ্রেণীর লোক ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। এলাহাবাদের মিঃ পুরুষোত্তম দাস তাণ্ডন ইহাকে exchange of side-glances আখ্যা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা clear sign of Sawrajya decadence. তাঁহার মতে লর্ড বার্কেণহেডের সহিত চিত্তরঞ্জনের এই পরোক্ষ (ইসারায়) রফার চেষ্টা দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালায় মডারেটদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, চিত্তরঞ্জন মডারেট দলে ভিড়িবার জন্য এই জমী প্রস্তুত করিয়াছেন। সার সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেটরা বলিতেছেন, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার চারা নাই, এখন সকল শ্রেণীর মিলনের চেষ্টা করা উচিত। মডারেটদিগের মধ্যে এডভোকেট জেনারল শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ চিন্তাশীল রাজনীতিক। তাঁহার সহিত মতের মিল না থাকিলেও দেশের লোক স্বীকার করিবে যে, তিনিও তাঁহার দিক হইতে দেশের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদপত্রে একখানি পত্র প্রকাশিত করেন। উহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উহা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের দৃষ্টি কেন সম্যক্ আকর্ষণ করে নাই, বুঝিতে পারা যায় না। উহাতে ভাবিবার কথা অনেক আছে। বিশেষতঃ উহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান স্বরাজ্য-মডারেট সমস্যা ও সেই সঙ্গে অহিংস অসহযোগের সমস্যা মীমাংসিত হইয়া যাইতে পারে।

সতীশরঞ্জন মোটের উপর বলিয়াছেন,— নিজের দেশের জন্য স্বরাজ, স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতা পাইতে ন্যাশানালিষ্ট, স্বরাজী বা অহিংস অসহযোগীরা যেমন ব্যাকুল, তাঁহার ন্যায় মডারেটরাও তেমনই ব্যাকুল। মতভেদ কেবল পথ লইয়া।

এ কথা ঠিক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হইলেও পথ প্রত্যেকেরই বিভিন্ন। কেহ বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত দ্বারা মুক্তি কামনা করে। কেহ আন্দোলন ও আবেদন-নিবেদন দ্বারা ইংরাজের মারফতে স্বরাজ লাভ করিতে চাহে। কেহ বা কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ইংরাজের দেওয়া ভুয়া সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দেশের জনমত প্রবুদ্ধ করিয়া মুক্তি কামনা করে। আবার কেহ বা ইংরাজের যথাসম্ভব সংস্রব বর্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বন দ্বারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ইহার মধ্যে কোন্ পথ সমীচীন? সতীশরঞ্জন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মডারেট দ্বারা অবলম্বিত পথই প্রশস্ত। কেন, তাহা তিনি এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা বিপ্লবপন্থীদের অবলম্বিত বোমা-রিভলভারের পথ দিয়া আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। (এ কথা সতীশরঞ্জন যেমন বুঝাইয়াছেন, তেমনই মহাত্মা গন্ধী ও চিত্তরঞ্জন তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। সুতরাং উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন)। তবে সতীশরঞ্জনের একটা কথা এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি বলিয়াছেন, সকল দেশের গুপ্ত সমিতির ভিতর হইতে বিশ্বাসঘাতক বাহির হইয়া নিজেরাই নিজেদের ধরাইয়া দেয়। এ দেশের গুপ্ত সমিতির বিশ্বাসঘাতকরাও সমিতিগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। সুতরাং এ পথে সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর নহে।

সতীশরঞ্জন বলিয়াছেন যে, "এ দেশবাসীর অনেকের বিশ্বাস, মিসেস্ ও মিস্ কেনেডির হত্যার পর ইংরাজ ভয় পাইয়া ভারতবর্ষ হারাইবার আশঙ্কায় মিণ্টোমরলি সংস্কার দান করিয়াছিল। অনেকে ইহাও বিশ্বাস করে যে, অহিংস অসহযোগীরা যে অসন্তোষের বিষ ছড়াইয়াছিল, তাহারই ফলে গভর্ণমেণ্ট মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে স্বরাজীরা বিশ্বাস করিত যে, বাধা দিয়া শাসনযন্ত্র অচল করিতে পারিলে ইংলণ্ড ভয়ে ভয়ে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিতে বাধ্য হইবে।" কিন্তু সতীশরঞ্জন ইংরাজকে জানেন, তাহাদের বুল-ডগ চরিত্রের কথা অবগত আছেন; সুতরাং বলিয়াছেন, এ সকল ধারণা ভ্রান্ত, ইংরাজ আটাশে ছেলে নহে যে, ভয়ে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে।

তবে কি কোনও উপায় নাই? সতীশরঞ্জন বলিতেছেন, আছে। তাঁহার যুক্তি এইরূপ :—আজ বা কাল না হউক, ৫০ বছরেও না হউক, ভবিষ্যতে কোনও না কোনও সময়ে আমরা যোগ্য হইলেই স্বরাজ পাইব। শত শত বৎসর পরাধীন যে জাতি, সে জাতির জীবনে ৫০ বৎসর কয়টা দিন? কিন্তু আমরা যত দিন গৃহবিবাদ মিটাইতে না পারিব এবং এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইতে না পারিব, তত দিন আমাদের স্বাধীনতালাভের আশা নাই। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যখন ইংরাজকে বুঝাইতে পারিব যে, ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ায় তাহাদের লাভ আছে, তখন ইংরাজ আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবে। কোনও জাতি নিঃস্বার্থভাবে নিজের ক্ষতি করিয়া— অপরকে স্বশক্তিলব্ধ প্রভুত্ব স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেয় না। এই হেতু পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, এ কথাটা ইংরাজকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। কেবল মুখের কথায় নহে, কার্য্যের দ্বারা। ইংরাজের শত্রুতা করিয়া,ইংরাজের কার্য্যে বাধা দিয়া বা ইংরাজের সহিত সংস্রব বর্জ্জন করিয়া এ কথা বুঝান যাইবে না। এই অবস্থায় ভারতের সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চৈতন্য উৎপাদন করিতে হইলে আন্দোলন ছাড়া উপায় নাই। সত্য বটে, বোমার দ্বারা ইংরাজের কতক চৈতন্য উদয় হইয়াছে। ইংরাজের নায়েব ও আমলারা ভারতে সুশাসন করিতেছে, এই বদ্ধমূল ধারণা বোমার দ্বারা অপসারণ করা হইয়াছে। কিন্তু আর বোমার প্রয়োজন নাই। তবে ইংলণ্ড আবার যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আমাদের নাছোড়বান্দা হইয়া আইনসঙ্গত আন্দোলন চালাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যে কোনওরূপ আন্দোলন ইংরাজ-বিদ্বেষ বা ইংরাজের প্রতি বৈরিভাব জাগাইয়া তুলিবে, তাহাই স্বায়ত্ত-শাসনের পথে প্রবল বাধা। স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে আমরা সাম্রাজ্যের মধ্যে মিত্রভাবেই থাকিব, ইংরাজ এ কথা বুঝিলেই স্বায়ত্ত-শাসন দিবে। আইনসঙ্গত আন্দোলন দ্বারা ইংরাজকে বুঝাইতে হইবে যে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ায় তাহাদেরই লাভ এবং উহা দ্বারা অরাজকতা দেখা দিবে না, বরং অসন্তোষ দূর হইবে।

সতীশরঞ্জন এই হেতু দেশবাসীকে মডারেটদিগের

মত আইনসঙ্গত আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং ঐ আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজকে আমাদের মিত্রভাবের কথা বুঝাইয়া দিয়া স্বরাজলাভে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন। স্বরাজীরা বিশেষ ক্ষতি করিতেছে, সতীশরঞ্জনের ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু কাউন্সিল-বিরোধী অসহযোগীরাও ইংরাজের সংস্রব রাখিতে না চাহিয়া যে আরও অধিক ক্ষতি করিতেছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে না বলিলেও তাঁহার কথার আভাসে বুঝা যায়। অসহযোগীরা ভবিষ্যৎ ভাবে না, বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত। তাই তাহাদের এই সাময়িক আন্দোলনের ফলে ইংরাজের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, শিক্ষিত ভারতবাসীরা তাহাদের শত্রু; সুতরাং শত্রুর হস্তে তাহারা প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিবে না। এই জন্য মডারেটদিগের পথই প্রশস্ত। আইনসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজকে আমাদের মিত্রভাবের কথা বুঝাইয়া স্বরাজলাভ করাই যুক্তিসঙ্গত।

সতীশরঞ্জন নিজের দিক্ হইতে যাহা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন, আজন্মপোষিত ধারণার দ্বারা তাহা প্রভাবিত হইলেও তাঁহার দেশের আন্তরিক মঙ্গলকামনার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহার যুক্তি আক্রমণসহ কি না সন্দেহ। ইংরাজ যে ভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এমন নহে। আয়ার্ল্যাণ্ড রক্তসমুদ্র সাঁতার দিবার পর ইংরাজ কি তাহাকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করে নাই? ইংরাজ কি নিঃস্বার্থভাবে কেবল দয়াপরবশ হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে? সুতরাং অবস্থাবিশেষে ইংরাজ যে বুলডগ-নীতি পরিহার করিতে পারে, সে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। অবশ্য, ভারতবর্ষ রক্তসিক্ত তপ্ত-পথে মুক্তিকামনা করে না, এ কথা সত্য। যে কয় জন মুষ্টিমেয় বিপ্লবপন্থী রক্তের পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের কার্য্য ভারতের জনমত সমর্থন করে না, এ কথাও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইংরাজ ভয়ে জিদ ছাড়ে না, এই যুক্তিও সমর্থিত হইতে পারে না।

বাধাপ্রদানেও যে কিছু ফল হয় না, এমন নহে। সতীশরঞ্জনই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "স্বরাজ্যদলের আন্দোলনে আমরা আরও কিছু অধিকার লাভ করিতে পারি।" তবে? স্বরাজ্যদল বাধাপ্রদান করিয়া শাসনযন্ত্র বিকল করিয়া দিতে না পারিলেও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সংস্কার-আইন ভুয়া, উহা দেশবাসীর মনঃপূত নহে। ইহাও দেশের পক্ষে কম লাভ নহে। তবে স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষতি করিয়াছেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া উচিত।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজের সহিত সম্পর্কবর্জ্জনের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, এমন কথা সতীশরঞ্জন কেন, কেহই বলিতে পারেন না। অহিংস অসহযোগের ফলে এক দিন ভারতের লাটের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছিল, দেশের নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা রফার কথাও সরকার পক্ষে একাধিকবার উঠিয়াছিল—Round Table Conference এর প্রস্তাবও হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী সে সময়ে উহাতে অসম্মতি প্রকাশ না করিলে, উহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। এই আন্দোলনের প্রভাব এক সময়ে সামান্য কুটীরবাসী হইতে মুকুটধারী রাজার এবং বিশুদ্ধ অন্তঃপুর হইতে সরকারের পুলিসে পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। সে সময়ে ইংরাজ বিষম শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়,—সেই সময়ে এক বিশিষ্ট ইংরাজই অসহযোগের বিবরণ লিখিবার কালে বলিয়াছিলেন,—Gandhi stalks in the Political arena of the Continent of India like a giant. কিন্তু এ দেশবাসী পূর্ণরূপে মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে নাই বলিয়া মহাত্মাজীকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সে জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন দায়ী নহে।

মহাত্মা দেখিয়াছিলেন যে, দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই দেশকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি এক কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। একতা ও স্বাবলম্বন সেই কর্ম্মপদ্ধতির প্রধান উপাদান। সতীশরঞ্জনও স্বীকার করিয়াছেন যে, একতাপ্রতিষ্ঠা স্বরাজলাভের পক্ষে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। তিনি আশা করেন, হিন্দুমুসলমানে আজ না হউক, দুই দিন পরে একতা

প্রতিষ্ঠিত হইবেই। কিন্তু কিসে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। মহাত্মা কিন্তু সে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সতীশরঞ্জন বলিয়াছেন, ইংরাজকে বুঝাইতে পারিলেই (আমরা তাহাদের মিত্র, সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে চাহি না, আমাদিগকে স্বরাজ দিলে তাহাদের লাভ) তাহারা আমাদিগকে স্বরাজ দিবে। কিন্তু ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। মার্কিণ যুক্তপ্রদেশ এ কথা অনেক বুঝাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ইংরাজ উহাদিগকে স্বরাজ দেয় নাই, লর্ড কর্ণওয়ালিস যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মার্কিণ হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার পর স্বরাজ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। অধুনা কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া বৈদেশিক ব্যাপারে ইংরাজের সমকক্ষরূপে মন্ত্রণা ও সিদ্ধান্ত করিবার দাবী করিতেছে। এ অধিকার না দিলে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহকালে ইংরাজের সাহায্য করিবে না বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। বাধ্য হইয়া ইংরাজকে এ অধিকার দিতে হইবে। তবে সার হেনরী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান দক্ষিণ-আফ্রিকাকে স্বেচ্ছায় স্বরাজ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার মূলেও স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়র বিদ্রোহের ভয় ছিল।

সুতরাং স্বেচ্ছায় ইংরাজ স্বরাজ দিবে, এ স্বপ্নের কথা আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে। বর্ত্তমান বলডুইন সরকারের ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড এ কথা আমাদিগকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। কিন্তু সতীশরঞ্জন যে একতাপ্রতিষ্ঠার কথা পাড়িয়াছেন, উহাতেই আমাদের স্বরাজলাভের পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি আমরা আমাদের ঘর সামলাইতে পারি, যদি আমরা আমাদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তাহা হইলে জগতের কোনও শক্তিই আমাদের স্বরাজলাভে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং এই পথই যে প্রশস্ত, তাহা বোধ হয়, বিজ্ঞ দেশপ্রেমিক সতীশরঞ্জনও স্বীকার করিবেন।

মহাত্মাজী এই একতাপ্রতিষ্ঠার সহজ ও সরল পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—উহা চরকা ও খদ্দর হইতেই সমুদ্ভূত হইবে। কেন হইবে, তাহাও তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অক্লান্তকর্ম্মী দেশ-সেবক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বুঝাইয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র মহাত্মাজীকে নারায়ণগঞ্জের খাদিকেন্দ্র সমূহের এবং খাদির কার্য্যানুষ্ঠানের পরিচয়দানকালে বলিয়াছিলেন,—"মহাত্মাজী! এই সমস্ত কর্ম্মী যেমন কায করিয়া যাইতেছে, তেমনই করিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস ও আশা ক্রমে নষ্ট হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে, চরকা আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায় হইতে পারে না। আপনি এই সন্দেহ ঘুচাইয়া দিন।" উত্তরে মহাত্মাজী বলেন,—"প্রথমেই বলিব, আমি কখনও বলি নাই যে, চরকাই আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায়। আমি বলিয়াছি, চরকা ব্যতীত জনসাধারণের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তবে এখন আমি বলিতে প্রস্তুত যে, চরকাই মুক্তির একমাত্র উপায়। আপনারা একবার মানস-নেত্রের সাহায্য গ্রহণ করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যেমন মানসপটে আপনারা হিমালয়ে দেব-দেবীর অবস্থিতি অনুভব করিতে পারেন, তেমনই সুতাকাটার কর্ম্মপদ্ধতি সফল হইলে কি অবস্থা হইবে, তাহাও মানসপটে চিত্রিত করিতে পারিবেন। আমরা যে কায করিতেছি, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কি প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে,তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বিশেষতঃ লক্ষ লক্ষ লোককে সুতাকাটায় প্রবৃত্ত করা কি বিরাট ব্যাপার, ভাবিয়া দেখুন। এ কার্য্যে আমাদের প্রত্যেককে এক এক খুঁটিনাটি ব্যাপারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা হইতে আমরা সকলেই শৃঙ্খলা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইব। দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোক চরকা কাটিতে আরম্ভ করিলে দেশের অন্যান্য অনেক সমস্যার অবসান হইবে। চরকার প্রচারে অস্পৃশ্যতা দূর হইবে। আমরা যদি অস্পৃশ্যগণকে আপনার করিয়া না লই, তাহা হইলে তাহারা কখনও চরকা গ্রহণ করিবে না, এ কথা কি আপনারা বুঝেন নাই? তাহারা যদি আমাদের সহিত সহযোগ না করে, তাহা হইলে আমরা খদ্দরের কর্ম্মপদ্ধতি সফল করিতে পারিব না। উহা করিতে পারিলেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার অবসান হইবে। খদ্দর প্রচারেই হিন্দু-মুসলমান-মিলন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। অতএব আপনারা দেখুন, চরকাতেই স্বরাজ আসিবে। তাহার পর দেখুন, সরকার সকল বিষয়ে আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন, কেবল অহিংসা সম্পর্কে

পারেন না। আপনারা অহিংসার দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে পারেন, হিংসার দ্বারা পারিবেন না। যদি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সুতাকাটার দ্বারা স্বরাজ-লাভ হইবে, এ কথাও আপনারা বিশ্বাস করিবেন। কারণ, একমাত্র চরকার সুতাকাটার দ্বারা কার্য্যে আমরা অহিংসাব্রত সফল করিতে পারিব, অন্য কিছু দ্বারা পারিব না। হিন্দু মুসলমানের জন্য খদ্দর বুনিবে এবং মুসলমান হিন্দুর জন্য খদ্দর বুনিবে, ইহা ছাড়া আর কিসে আপনারা হিন্দু-মুসলমামানে মিলন ঘটাইতে পারেন? যাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও অস্পৃশ্যজাতি একযোগে কায করিতে পারে, তাহার জন্য আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া সকলকে চরকা ও খদ্দর ধরিতে হইবে। প্রথমে সোজা পথে চলিতে হইবে, পরে মহারাজা নবাবগণকে ধরিতে হইবে। এক দিন দেখিবেন, পরস্পরের বিরোধ কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে, সকলেই একমনে চরকা ও সুতাকাটা ধরিয়াছে।"

মহাত্মাজী ভবিষ্যদর্শী যুগপ্রবর্ত্তক। তিনি অনেক চিন্তার পর এই পথই আমাদের স্বরাজলাভের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রদর্শিত পথই কি এখন আমাদের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে?

ভারতের মাল খরিদ

লণ্ডনে একটা Indian Stores Depratment রাখা হইয়াছে। বলা হয়, ভারতের স্বার্থরক্ষার্থই ভারতের অর্থে ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বৃটিশ ব্যবসাদারের সুবিধার জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছে ও ইহাকে পোষণ করা হইতেছে। সম্প্রতি যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভারতের জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বৃটিশ ব্যবসাদারদের নিকট ক্রয় করা হইয়াছে। অজুহৎ দেখান হইয়াছে যে, বৃটিশ কারখানার মাল বিশ্বাসযোগ্য, স্থায়ী ও ঠিক সময়ে পাওয়া যায়। যেন এ সকল গুণ বৃটিশ পণ্যেরই একচেটিয়া! অথচ দেখা যায়, বৃটিশ ক্রেতারাও অনেক স্থলে নিজের দেশের মাল খরিদ না করিয়া য়ুরোপে মালের জন্য অর্ডার দেয়, কেন না, সেখানে মাল সস্তা! সম্প্রতি এক বৃটিশ অয়েল কোম্পানী তৈল-কূপ খননের মালমশলার জন্য সকলের নিকট দর চাহিয়াছিল। হিসাবে দেখা যায়, জার্ম্মাণদের দর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বৃটিশ কারখানাওয়ালা জার্ম্মাণদের অপেক্ষা ৩ গুণ অধিক দাম চাহিয়াছিল। বৃটিশ কারখানাওয়ালাদিগকে তখন দাম কমাইতে বলা হয়। কিন্তু নানা কাট-ছাঁট করিয়াও জার্ম্মাণীর দরে কিছুতেই নামাইতে পারা যায় নাই। এই অবস্থায় "বিশ্বাসযোগ্যতার ও সময়ে পাওয়ার" ছুতায় অধিক দরে বিলাতী কারখানা ও ব্যবসাদারের নিকট ভারতের জন্য মাল খরিদ করা কেমন সমীচীন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।

দুই চিত্র

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্ক সহরে একটি বৃটিশ বণিক-সভা (Chamber of Commerce) আছে। এই সভায় বক্তৃতাকালে মিঃ পল ক্র্যাভাট নামক মার্কিণ ব্যবহারাজীব বলিয়াছেন যে, "ভারতে এখনও ১ শত বৎসর বৃটিশ প্রভুত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। কিরূপে ইহা হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তবে আমার বিশ্বাস, ইংরাজ ঠিক আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিবে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে ভারতবাসীকে তাহাদের যোগ্যতার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। এই সংস্কার দেওয়াই গত ৪ বৎসরের যত অনিষ্টের মূল। ইংরাজ নিজের উদারতায় যাহা দিয়াছিল, ভারতবাসী তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া নিজের অযোগ্যতাই প্রদর্শন করিয়াছে।"

এই মার্কিণ উকীলটি ইংরাজ সরকারের ওকালতীতে পঞ্চমুখ হইয়াছেন। তিনি ইংরাজ-শাসনের গুণমুগ্ধ, তাই সকল বিষয়ে ইংরাজের যোগ্যতা ও উদারতা দর্শন করিয়াছেন, আর সকল বিষয়ে ভারতীয়ের অযোগ্যতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, যদি আরও ১ শত বৎসর ইংরাজের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন থাকে, তাহা হইলে ভারতের অবস্থা কি হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইংরাজের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন থাকুক, তাহাতে ক্ষতি

নাই, কিন্তু ইংরাজের প্রভুত্ব যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে ভাবে exploitation চলিতেছে, সেই ভাবেই চলিবে। উহার ফল এই দরিদ্র ভারতে কি ভাবে অনুভূত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মিঃ ক্র্যাভাট এক চিত্র দিয়াছেন, আবার তাঁহারই স্বদেশীয় মিঃ সাভেল জিমাণ্ড ঠিক ইহার বিপরীত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। মিঃ ক্র্যাভাটের ভারতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কতটুকু জানা নাই, কিন্তু মিঃ জিমাণ্ড ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নাভার জাঠা অভিযানের সময়ে পণ্ডিত জহরলালের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়:—

(১) ভারতের শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিজীবী। আকাশের বারিবর্ষণের মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে থাকিতে হয়। ১ বৎসর জল না হইলে তাহারা উপবাস করে।

(২) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা গিয়াছে, ভারতের লোকের গড়পড়তায় বাৎসরিক আয় ১৫ ডলার (১ ডলার=৩৵০ আনা)।

(৩) ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৬৪·৬ জন সারা বৎসর সর্ব্বদা অপ্রচুর আহার্য্যের উপর জীবনধারণ করে।

(৪) ভারতের বহু প্রদেশে কৃষক বৎসরের ৬ কিংবা ৮ মাস মাত্র কার্য্য করিবার সুবিধা পায়, অবশিষ্ট সময় বসিয়া থাকে। এই হেতু এবং অজন্মা অথবা অতিবর্ষণ হেতু প্রায় সকল সময়ে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। অতিবর্ষণে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয় এবং তাহাদের বহু কষ্টে সঞ্চিত গৃহস্থালীর দ্রব্য এবং গৃহপালিত পশুপক্ষী নষ্ট হয়। তাহার পুনরায় ক্ষতিপূরণ করা হয় ত তাহাদের জীবনে ঘটিয়া উঠে না।

(৫) দরিদ্ররা অতি শোচনীয় জীর্ণকুটীরে বাস করে। সহরে বস্তীর অবস্থা য়ুরোপের ও মার্কিণের বস্তীর অপেক্ষা বহুগুণে অধিক শোচনীয়।

(৬) এইরূপ অস্বাস্থ্যকর গৃহে অতিরিক্ত লোকের বাস এবং প্রচুর খাদ্যের অভাব ভারতে উচ্চ মৃত্যুর হারের কারণ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে হাজারকরা ৩০·৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল; অথচ ঐ খৃষ্টাব্দেই মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে হাজারকরা ১২·৩ এবং গ্রেটবৃটেনে হাজারকরা ১১·৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

(৭) প্রতি বৎসর ভারতে গড়পড়তায় ২০ লক্ষ শিশু-মৃত্যু ঘটে। যে সকল শিশু অবশিষ্ট থাকে, তাহারাও দুর্ব্বল ও রোগাতুর থাকিয়া যায়। ১ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স হয় নাই, এমন শিশুদের ৪টির মধ্যে ১টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(৮) প্রত্যেক সহরেই প্রতি বৎসর মহামারী দেখা দেয়।

(৯) ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৯৪ জন অশিক্ষিত।

(১০) ভারতের কাঁচা মাল বৃটিশ জাহাজে বৃটেনে চালান হয় এবং সেখানে কারখানায় পাকা মাল তৈয়ার হইয়া ভারতেই রপ্তানী হয়। জাতীয়দল বলেন, বৃটিশ সরকার এইরূপে দেশের কুটীর-শিল্প নষ্ট করিবার জন্য দায়ী। ইহার ফলে দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইতেছে।

(১১) ভারতের বনজ ও ভূমিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা বিদেশী বণিক-ব্যবসাদারের সুবিধার জন্য।

(১২) শাসন ও বিচার বিভাগের ব্যয় দেশের দারিদ্র্যের অনুপাতে অতি ভীষণ। ইহার ফলে ক্রমাগত দেশের অর্থ চলিয়া যাওয়াতে দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। বড় লাটের বেতন ৮৩ হাজার ডলার, অথচ মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের বেতন ৭৫ হাজার ডলার। বড় লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যের বেতন ২৭ হাজার ডলার, মার্কিণ মন্ত্রীর বেতন ১২ হাজার ডলার। মাদ্রাজের গভর্ণরের বেতন ৪০ হাজার ডলার, মার্কিণের নিউইয়র্ক ষ্টেটের গভর্ণরের বেতন ১০ হাজার ডলার। বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতির বেতন ২৪ হাজার ডলার, মার্কিণ যুক্তপ্রদেশের প্রধান বিচারপতির বেতন ১৫ হাজার ডলার।

(১৩) ভারতের বৃটিশ কর্ম্মচারীদের বেতনের অধিকাংশ বিলাতেই ব্যয় হয়, এ জন্য ভারতের ধন হ্রাস হইয়া বিলাতের ধন বৃদ্ধি করিতেছে। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার 'Goverment of India' গ্রন্থে

লিখিয়াছেন, প্রতি বৎসর এই বাবদে ভারতকে ইংলণ্ডের জন্য ৩৫ হইতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা যোগান দিতে হয়।

এই ভাবের আরও অভিযোগের কথা আছে। নিরপেক্ষ মার্কিণ দর্শক মিঃ জিমাণ্ডের মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিবার কোনও স্বার্থ নাই। সুতরাং যাঁহারা মার্কিণ উকীল মিঃ ক্র্যাভাটের সার্টিফিকেটে উৎফুল্ল-হৃদয় হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দের বিশেষ কারণ নাই।

সদনুষ্ঠান

জীবে দয়া—লোক-সেবা এ যুগের অন্যতম ধর্ম। বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য এই ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবকমণ্ডলী এই ধর্মের কর্মানুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে এখন দেশের বহু কর্ম্মী আত্মনিয়োগ করিতেছেন। মহাত্মা গন্ধীও এই পথের অন্যতম পথিপ্রদর্শক।

আজ আমরা তুইটি লোক-সেবার সদনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদান করিব, একটি সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় এবং অপরটি বুদ্ধদেব-সেবাশ্রম।

প্রথমটি ৭।২ বিডন রো, কলিকাতায় অবস্থিত। সন্ন্যাসিনী গৌরীপুরী দেবী ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ইচ্ছানুসারে আশ্রয়হীনা ও অনাথা হিন্দুমহিলাদের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের দারুণ অর্থকষ্টের প্রতি এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথার ক্রমশঃ তিরোধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ভাবের আশ্রমপ্রতিষ্ঠার উপযোগিতা উপলব্ধি হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভদ্রগৃহস্থ-পরিবারের অনাথা ও আশ্রয়হীনারা অধুনা উদরান্নসংস্থানের জন্য যে কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছেন, উহা মোচন করাই এই আশ্রমস্থাপনের উদ্দেশ্য। এই আশ্রমে—

(১) হিন্দুমহিলাদিগকে হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়,

(২) ভদ্র অথচ দুঃস্থ হিন্দু-পরিবারের সহায়হীনা অনাথা মহিলাদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া হয়,

(৩) দেশে আবার আদর্শ আর্য্যনারীর সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

এই আশ্রমে একটি বোর্ডিং এবং দিবসে শিক্ষাদানের জন্য বালিকা বিদ্যালয় আছে। এই আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য-প্রথা অনুসারে আড়ম্বরহীন জীবনযাপন এবং উচ্চাঙ্গের চিন্তার অবসর প্রদানের ব্যবস্থা আছে। যোগ্য নারী-শিক্ষয়িত্রীগণের হস্তে বিদ্যাশিক্ষাদানের ভার অর্পিত হইয়াছে। সাধারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদির সাহায্যে শিক্ষাদান এবং গৃহস্থালীর উপদেশদান ব্যতীত উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আছে। পরন্তু সূচিকার্য্য, সীবন, বয়ন, কাট-ছাঁট, রন্ধন ইত্যাদি নানা বিভাগের শিক্ষাও এই আশ্রমে প্রদান করা হয়।

বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিককালের উপযোগী একটি সদনুষ্ঠান। এমন সদনুষ্ঠান সর্ব্বথা সমাজের সমর্থন ও সাহায্য পাইবার উপযুক্ত। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিক্ষার্থিনীদিগকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনয়ন করিবার অথবা গৃহে রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত প্রয়োজনমত যান-বাহন সংগৃহীত হইতেছে না; বিশেষতঃ হিন্দু-বালিকাগণের পূজার্চ্চনা শিক্ষার নিমিত্ত কোনও মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত হইবার সুবিধা হইতেছে না। শুনিয়াছি, ঋণগ্রহণ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য কোনওরূপে সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও উপরি-উক্ত অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে হিন্দু জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

দ্বিতীয়টি বুদ্ধদেব-সেবাশ্রম। আনন্দের কথা, এই সদনুষ্ঠানটি কয়েকটি সেবাধর্ম্মে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ উৎসাহী যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রথমে বহুবাজার নেবুতলায় ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা ৭১।১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উৎসাহী যুবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এখনও ইহাকে জীবিত রাখিয়াছেন। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য—

(১) দুঃস্থ-পীড়িতগণের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যের জন্য সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা।

প্রতি রবিবারে আশ্রমের সদস্যরা পল্লীতে পল্লীতে

ভিক্ষা সাধিয়া চাউল, পয়সা বা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে দরিদ্র আতুরদিগকে সাহায্যদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্ব্যতীত সদস্যদিগের মাসিক চাঁদা ও এককালীন দানেও কতক সাহায্য করা হয়। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য কয়েক জন ভদ্রলোকও এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধ-ধর্ম্মরাজিকা বিহারের অধ্যক্ষ অনাগারিক 'ধম্মপাল' মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন এবং এককালীন কিছু দানও করিয়াছেন।

এই সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যও সাধু। ইহাতেও অর্থের প্রয়োজন, অথচ আশানুরূপ অর্থাগম হইতেছে না। এ অবস্থায় এই সদনুষ্ঠানে সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

পরলোকে যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানের অনুবাদক ও প্রবীণ সাহিত্যিক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার বেলা ১০॥০ ঘটিকার সময় তাঁহার কাশিমবাজার আবাসে ৬৬ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। পুরাতন সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টড্-প্রণীত রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি সমগ্র বঙ্গে যথেষ্ট খ্যাতি ও যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৈশোরকালে রচিত "সমরশেখর" নামক সুবৃহৎ উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় তিন বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত 'বীরমালা' বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। এতদ্ভিন্ন তিনি বৃহন্নারদীয়পুরাণ, বরাহপুরাণ, মহাভারত, ও শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া "চারুবার্ত্তা" পত্রিকার সম্পাদনভার অর্পণ করিয়া মৈমনসিংহে ইঁহাকে প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের ইতিহাস লিখিবার নিমিত্ত উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপরে 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রথমাবস্থায় তিনি কিছুকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত ঐ পত্র সম্পাদন করেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু ৩।৪ ঘণ্টা কাল ধরিয়া অনর্গল বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত সহজ, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষা ইদানীং বঙ্গীয় লেখকসম্প্রদায়-মধ্যে বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে শুধু গদ্য রচনা করিতেন, তাহা নহে, সুন্দর সুন্দর কবিতা-রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে তিনি কাশিমবাজারে অবস্থান করিয়া 'জগতের সভ্যতার ইতিহাস' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয়, দুই বৎসর যাবৎ ভগ্নস্বাস্থ্য হেতু তিনি তাহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। কাশিমবাজারে অবস্থানকালে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদনভারও কিছু দিন তাঁহার উপর ছিল। 'কাশিমবাজার হিন্দুসমিতি'র স্থায়ী সভাপতিরূপে তিনি অনেক দিন কায করিয়াছিলেন। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম্ এ মহোদয়ের গৃহশিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (যথাক্রমে প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার) বঙ্গভাষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও তামিল ভাষাতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সৌজন্য, সরলতা, মিষ্টভাষিতা, উদারতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে তিনি আবালবৃদ্ধ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার ন্যায় প্রবীণ সুলেখকের অভাব আজ বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্তা বিধবা পত্নীর হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন।

শ্রীমান্ শুভ্রেন্দু

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত "মাতৃমঙ্গল" অধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পাঠে উপকৃতা হইয়া বহু মহিলা

আমাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। জনৈকা ভদ্রমহিলা জানাইয়াছেন যে, শিশুপালনসংক্রান্ত উপদেশগুলির অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের এক বৎসরবয়স্ক শিশুকে পালন করিতেছেন। শিশুর একখানি আলোকচিত্রও আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। জন্মাবধি এই শিশু মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য—গোদুগ্ধ প্রভৃতিও পান করে নাই। পুত্রের জননী ইহাও জানাইয়াছেন যে, সূতিকাগার হইতে আরম্ভ করিয়া সাত মাস বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া শিশুকে দেড় ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু তাহাতে তাঁহার পুত্রের বর্ণ মলিন হইয়া যায় নাই। বড় হইয়া পুত্র কবির ভাষায় আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারিবে না—"দিল মোরে কালো ক'রে মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল!" পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা শ্রীমান্ শঙ্করেন্দু গোস্বামীর চিত্র প্রকাশিত করিলাম। শিশুর বয়স বর্ত্তমানে এক বৎসর মাত্র। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—প্রত্যেক মাতার কোলে আমরা এমনই সুস্থ, সবল সন্তান দেখিতে পাইলে সুখী হইব। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ায় আমাদের মতিগতি এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, এখন আমরা কথায় কথায়, মেলিন্স ফুড, হরলিক্‌স্ মিল্ক, বেঞ্জারস্ ফুড প্রভৃতি সেবন করাইয়া শৈশব হইতেই সন্তানদিগকে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখি। অবশ্য নানা কারণে বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার মাতৃজাতির বক্ষে পুণ্য পীযুষধারা শুকাইয়া আসিতেছে সত্য; কিন্তু তথাপি অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করিলে বৈদেশিক প্রথায় সন্তানপালনরীতি বর্জ্জন করা সম্ভবপর, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীমান্ শঙ্করেন্দু গোস্বামী—বয়স এক বৎসর

সিভিল সার্ভ্যান্টের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

লর্ড বার্কেণহেড ও লর্ড রেডিংয়ের মধ্যে সলাপরামর্শ হইয়া যাহাই কেন স্থির হউক না, লর্ড বার্কেণহেড নানা স্থানে বক্তৃতায় যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, এ দেশের সহিত যাবচ্চন্দ্রদিবাকর য়ুরোপীয় সিভিল সার্ভ্যান্টের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকিবে। বিলাতের যে সকল সংবাদপত্র ভারতের প্রতি কতকটা সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহারা উপদেশ দিয়াছে যে, ভারতের জাতীয় দল যখন সহযোগের 'ইঙ্গিত' করিয়াছেন, তখন সেই ইঙ্গিত হেলায় অগ্রাহ্য করা উচিত নহে, বরং উহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সহিত একটা রফা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লর্ড বার্কেণহেড ভারতসচিবরূপে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

(১) ভারতরক্ষার জন্য বৃটিশ সৈন্যের প্রয়োজন আছে,

(২) ভারত যখন ইংলণ্ডের নিকট এই সাহায্য গ্রহণ করিতেছে—পরন্তু এ সাহায্য না পাইলে যখন তাহাদের চলে না, তখন যত দিন ভারতে বৃটিশ সৈন্য থাকিবে, তত দিন ভারতশাসনে বৃটিশ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা চাই এবং সেই জন্য ভারতে উপযুক্ত পরিমাণে য়ুরোপীয় সিভিলিয়ান রাখা চাই,

(৩) সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ অর্থে সেই চাকুরী হইতে য়ুরোপীয় চাকুরীয়াকে বর্জ্জন করা নহে, বরং উপযুক্ত পরিমাণ য়ুরোপীয় চাকুরীয়া রাখা,

(৪) য়ুরোপীয় চাকুরীয়া রাখিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষানুরূপ বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভারতকে যোগাইতে হইবে, নতুবা য়ুরোপীয় যুবকরা ভারতে যাইতে চাহিবে না,

(৫) য়ুরোপীয় চাকুরীয়ার শাসনে যে যোগ্যতা আছে, তাহার অভাব হইলে ভারতের শাসনযন্ত্র বিকল

হইবে, অতএব যোগ্যতা বা efficiency নষ্ট করা যাইতে পারে না,

(৬) ভারতের জাতীয় দল যদি সংস্কার আইন সফল করিবার জন্য সহযোগিতা করিয়া তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় দেয়, তবেই ভারতকে যথাসময়ে আরও কিছু সংস্কার দেওয়া যাইবে কি না বিবেচনা করা যাইবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে, লর্ড বার্কেণহেডের মনের গতি কোন্ দিকে। ইহা যে কেবল তাঁহার নিজের অভিমত নহে, তাঁহাদের রক্ষণশীল সরকারের অভিমত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং ভারত হইতে সহযোগের 'ইঙ্গিতের' উত্তর যে চমৎকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মোট কথা, ভারতীয়রা বিপ্লববাদের বিপক্ষে স্পষ্ট করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিলে অথবা সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বরাজ পাইবার কথা জ্ঞাপন করিলেও তাহাদের পক্ষে যে ঘাসজলের ব্যবস্থা আছে, তাহাই থাকিবে। তাহারা যদি সুবোধ শান্ত ছেলের মত সংস্কার আইন মানিয়া লইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদের অভিভাবক বৃটিশ জাতি ও তাহাদের পার্লামেণ্ট সেই সময়ে আবার এক কিস্তি সংস্কার হয় ত দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাই দিবার সঙ্কল্প করুন, সে সঙ্কল্পের মধ্যে য়ুরোপীয় সিভিলিয়ান ও সেনার কায়েম মোকায়েম অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করা হইবে না। কারণ, উহা ক্ষুন্ন করিলে শাসনকার্য্যে efficiency বা কার্য্যক্ষমতা ও যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই যোগ্যতার স্বরূপ কি, তাহা অন্য কেহ নহে, আসামের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার ব্যামফিল্ড ফুলার বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যুবক বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ যোগ্যতা লইয়া ভারতশাসন করিতে যায়। তাহারা আইন নামমাত্র শিক্ষা করে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের অতি সামান্য জ্ঞানই থাকে এবং দেশীয় ভাষায় দুই চারিটা কথা লিখিতে ও পড়িতে জানে। ইহা হইল সিভিল সার্ভ্যাণ্টদের কথা। তাহার পর অন্যান্য সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া যাহারা ভারতে যায়, তাহাদের বিদ্যা ও যোগ্যতা আরও অধিক অসন্তোষজনক। যে সকল যুবক পুলিসের চাকুরী লইয়া যায়, তাহাদের কোনওরূপ শিক্ষাই হয় না; অথচ তাহাদের যে কায, তাহাতে ভারতীয়ের জীবনযাত্রা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। ভারতের ভাষা সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না লইয়াই তাহারা ভারতে পদার্পণ করে। বনবিভাগের, ডাক্তারী বিভাগের, এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেও এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।"

এমন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী না থাকিলে ভারতের শাসনকল বিকল হয়, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? সার ব্যামফিল্ড স্বয়ং একটা প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন এবং শাসনকালে নানা শ্রেণীর বৃটিশ কর্ম্মচারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে তাহাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা কষ্টকর হয় নাই। অতএব তাঁহার ধারণা যে ভ্রান্ত, এ কথা লর্ড বার্কেণহেড জোর করিয়া বলিতে পারেন না। অথচ এই প্রকৃতির কর্ম্মচারীকে ভারতে মৌরসী মকরারী চাকুরীর পাট্টা দিয়া লর্ড বার্কেণহেড ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার বনিয়াদ গাঁথিতে চাহেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

মহাত্মা গন্ধীর বাণী

মহাত্মা গন্ধী বাঙ্গালার নানা পল্লী মফঃস্বল পরিদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার একমাত্র বাণী,—খদ্দর পর, চরকা ধর, দ্বিতীয় বাণী নাই। এই চরকা ও খদ্দরে হিন্দু-মুসলমানে কিরূপে একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জিত হইবে, পরন্তু স্বরাজ আসিবে,—তাহা অন্যত্র মহাত্মার বাণী হইতেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। মহাত্মা এ দেশের নরনারীকে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার আদর্শ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আদর্শ আর্য্যনারী সীতাদেবী কখনও বিদেশী বস্ত্র পরিধান করেন নাই, তাঁহার সময়ে এ দেশে ঘরেই বস্ত্র প্রস্তুত হইত এবং সেই হেতু লোক নিত্য অভাবগ্রস্ত হইত না। মহাত্মাজী যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই স্থানেই দলে দলে কাতারে কাতারে নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। সুতরাং বুঝা যায়, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব অত্যন্ত

বাঙ্গালা-দেশে বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণ এই শ্রদ্ধা-প্রীতির পরিচয় দিলেও তাঁহার উপদেশমত চলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। তবে মহাত্মা স্বয়ং বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে খদ্দর ও
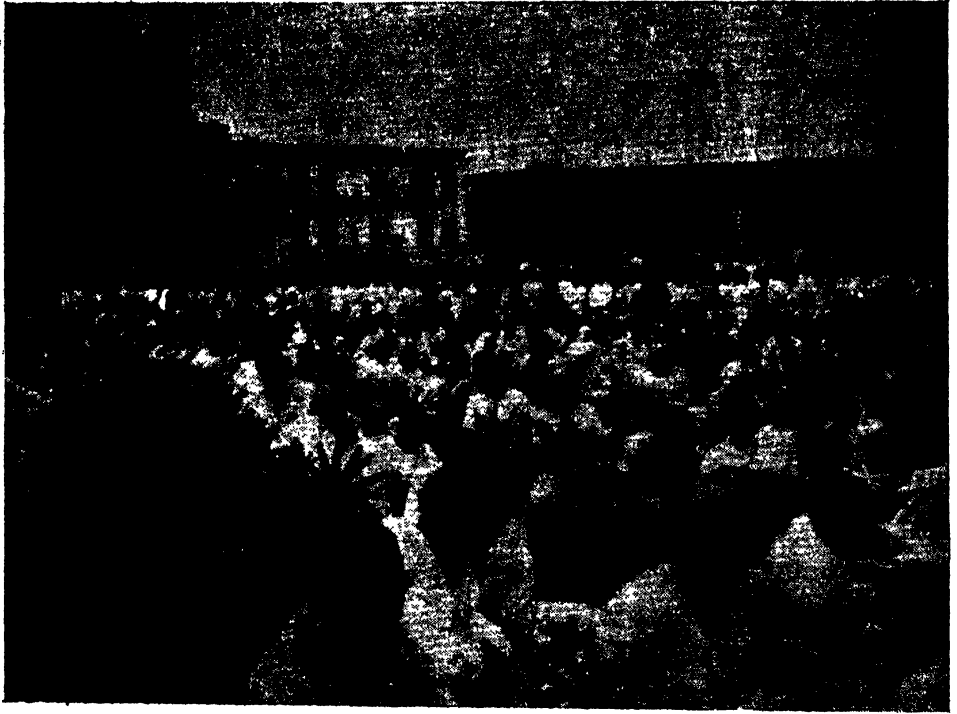
মির্জ্জাপুর পার্কে চরকা-প্রদর্শনী

চরকা-প্রদর্শনীর অপর দৃশ্য

চরকার আশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক শ্রেণীর কর্মীর আন্তরিক গঠনকার্য্যে প্রীতিলাভ করিয়াছেন, বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট খদ্দর প্রস্তুত হয়, এমন কি, অন্ধ্রপ্রদেশও এ বিষয়ে বাঙ্গালার সমকক্ষ নহে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ত্যাগী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বাঙ্গালার ত্যাগেরও পরিচয় পাইয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, বাঙ্গালার মন আছে, হৃদয় আছে, কেবল অভাব—উৎসাহ, ঐকান্তিকতা ও আগ্রহের। এ অভাব পূর্ণ করিতে বাঙ্গালী কি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন না?

অহিংসার পথ

মহাযুদ্ধ সকল যুদ্ধের অবসান করিবে বলিয়া শুনা গিয়াছিল। সে কথা কেমন সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা জেনিভা সহরে জাতি-সঙ্ঘের শান্তিবৈঠকে Peace Protocol ইত্যাদির "সফলতায়" জানিতে বাকী থাকে না। বড় বড় শক্তিপুঞ্জ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্কোচের সর্ত্তে সম্মত হইলেন না, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান গ্রেট বৃটেনই সর্ব্বপ্রথমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সুখের বিষয়, প্রতীচ্যের ক্ষুদ্র জাতিদিগের মধ্যে এখনও কেহ কেহ অহিংসার পথে চলিয়া জগতে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইতেছেন। ডেনমার্ক অতি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ডেনমার্ক য়ুরোপের বৃহৎ দেশসমূহকে যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে-ছেন, তাহা তাহাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। ডেনমার্কের পার্লা-মেণ্ট একখানি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে ডেনমার্ক দেশ হইতে জল ও স্থল সৈন্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এ যাবৎ সমর্থ পুরুষমাত্রকেই একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সমরশিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। এখন হইতে তাহাদের স্থানে স্বেচ্ছাসেনার দল গঠিত হইবে। এই সেনাদল পুলিস-ফৌজের পরিবর্ত্তে গার্ড বা দেশরক্ষীর কার্য্য করিবে। জলে ও সমুদ্রবক্ষে গার্ড-সিপ বা রক্ষিজাহাজসমূহ পুলিসের কার্য্য করিবে অর্থাৎ দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে যাত্রী ও পণ্য রক্ষার উপায়বিধান করিবে। অর্থাৎ পররাজ্য আক্রমণের উপযোগী একটি সেনাও ডেনমার্কে রাখা হইবে না। দেশের লোকের ধনপ্রাণরক্ষার জন্য জলে-স্থলে যেটুকু শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োজন, তাহাই রাখিয়া অবশিষ্ট সেনাদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। এ পথ নূতন হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সকল দেশেই যদি এই ভাবে দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে জগতে শান্তির আশা নিতান্ত সুদূরপরাহত হয় না। অবশ্য জাতিসঙ্ঘের অথবা হেগ বিচারালয়ের মত একটা কোনও প্রতিষ্ঠানকে সকল বিবাদের মধ্যস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আশা করি, তাহাতে ত্রুটি লক্ষিত হইবে না।

মাদকদ্রব্যবর্জ্জন

মার্কিণের মত স্কটলণ্ড দেশেও সুরাপান কোন কোন স্থানে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্কটলণ্ডে যে আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে Local option scheme আইন বলে; অর্থাৎ যে জিলার অধিকাংশ লোক মাদকবর্জ্জনের পক্ষপাতী, সে জিলার কর্ত্তৃপক্ষকে মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা ঐ জিলার কয়েক বৎসরের আবকারীর হিসাবে প্রকাশ। সেটলাণ্ড দ্বীপে লারউইক নামক স্থানে যখন আইনের কড়াকড়ি হয় নাই, তখন শেষ ৩ বৎসরে গড়-পড়তায় বৎসরে ১ শত ৫৩ জন লোক মাতলামীর অপরাধে ধৃত হইয়া-ছিল। কিন্তু যে অবধি আইন করিয়া মাদকদ্রব্যের লাইসেন্স দিবার বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে, সেই অবধি প্রথম ৩ বৎসর ধৃত অপরাধীর সংখ্যা গড়পড়তায় বাৎসরিক মাত্র ২২ জন হইয়াছে। ডাম্বার্টনসায়ার অঞ্চলের কার্কিণটিলক পল্লীতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মাদক-দ্রব্যের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ঐ পল্লীতে প্রথম বৎসরে হাজারকরা ১ শত ৩৬টি এবং পরবৎসরে অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৮৫টি শিশুমৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দুগ্ধ বিক্রীত হইয়াছিল মাত্র ৪৩ হাজার গ্যালন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার গ্যালন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা হইয়া-ছিল ১০ হাজার ২ শত ৮১ পাউণ্ড, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ২২ হাজার ৮ শত ৫৬ পাউণ্ড। পরন্তু ১৯২২-২৩-২৪, ৩ বৎসরে মাতলামীর জন্য দণ্ডিত হইয়াছিল মাত্র ১টি লোক! ইহাতে কি মনে হয়? যদি আইন করিয়া মাদকতাবর্জ্জনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে শুভ ফল ফলে না কি? এ দেশে আবকারীর আয়ের এমনই মোহ যে, সরকার লোকহিতের জন্য তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন না। শেষ বাৎসরিক সরকারী কৃষিবিভাগের হিসাবে দেখা যায়, অহিফেন চাষের ভূমির সঙ্কোচ না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। সরকার যদি প্রজার মঙ্গলকামনা করেন, তাহা হইলে এই ভাবে আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে বিলাতে মাদকদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। উহার ফলে লোকের মাদক সেবনের প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়াছে। বিখ্যাত লেখক গার্ডিনার "নেশান" পত্রে লিখিয়াছিলেন,—বিলাতের মদের শুল্ক আদায়-কারীরা মাদক সেবনের বিপক্ষে লোকের নৈতিক ঘৃণা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের কড়াকাড় আদায়ের ফলে পুসিফুট জনসনের প্রচারকার্য্য অপেক্ষা অনেক অধিক কায হইয়াছে। আমাদের এ দেশে যুক্তপ্রদেশে মাদকদ্রব্যের উপর শুল্কবৃদ্ধি হওয়ায় মাদক সেবনের প্রবৃত্তি কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, মাদকসেবনের মন্দ ফল নিবারণ করা না করা সরকারেরই সাধ্য। কিন্তু সরকারের সেই প্রবৃত্তি হয় কৈ?

চিত্র-শিল্পী সার্জ্জেণ্ট

গত ১৫ই এপ্রেল তারিখে লণ্ডন সহরে চিত্র-শিল্প-জগতের ইন্দ্রপাত হইয়াছে, ঐ দিন জন সিঙ্গার সার্জ্জেণ্ট ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এ দেশের জনসাধারণ সার্জ্জেণ্টের নামের সহিত সবিশেষ পরিচিত না হইলেও, প্রতীচ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তাহার কারণ এই যে, প্রতীচ্যের লোকের বিশ্বাস, র‍্যাফেল, টাইটিয়ান, রেনলড্স্, রিউবেনস্, রেমব্রাঁ, গেনসবরোর পরে এত বড় চিত্রকর আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই।

নরনারীর চিত্র অঙ্কনে সার্জ্জেণ্টের কৃতিত্ব পরিস্ফুট। তিনি যাহা দেখিতেন, তাহাই অঙ্কিত করিতেন—সে অঙ্কনের বিশেষত্ব এই যে, খুঁটিনাটি কিছুই বাদ যাইত না। মুখ-চক্ষুর ভাবব্যঞ্জনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *কিন্তু তিনি মানসভাণ্ডার হইতে কল্পনার সাহায্যে

রঙ্গ আহরণে দক্ষ ছিলেন না। তাহা হইলেও আধুনিক জগতে নরনারীর "সজীব" চিত্র অঙ্কন করিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

সার্জ্জেন্টের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রথমাবধি রিউবেনস ও ভ্যান ডাইকের মত সুপ্রসন্না ছিলেন। ইটালীর ফ্লোরেন্স সহরে তাঁহার জন্ম। এই ফ্লোরেন্স অতি প্রাচীন কাল হইতে কলাশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বোধ হয়, সার্জ্জেন্ট জন্মভূমি হইতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স হইতে প্যারী নগরীতে আসিয়া যুবক সার্জ্জেন্ট ক্যারোলাস ডুরাণের বিখ্যাত চিত্রাগারে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা আরম্ভ করেন। অল্পদিনেই তিনি গুরু ক্যারোলাসকে অতিক্রম করিয়া যায়েন। এই স্থানেই তিনি প্যারী নগরীর বিখ্যাত সুন্দরী ম্যাডাম গত্রুর চিত্র অঙ্কন করিয়া চিত্রশিল্পরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। এই চিত্র হইতেই তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া যায়। Lady with a Rose তাঁহার আর একখানি বিখ্যাত চিত্র। কর্ণেল হিগিনসনের চিত্রও তাঁহার আর এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

নিউইয়র্ক 'সান' পত্রে কোনও চিত্রশিল্প সমালোচক লিখিয়াছেন, "সার্জ্জেন্টের ন্যায় কোনও মহৎ চিত্র-শিল্পী এ যাবৎ শিল্পরাজ্যে অপ্রতিহত শক্তির বিকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ভেরোনিজ টাইটিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, রেমব্রাঁ রুবেনসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, গেনসবরো রেণল্ডসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু সার্জ্জেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী এ যুগে কেহ ছিলেন না। লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে জীবিত শিল্পীদিগের চিত্র এ যাবৎ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল সার্জ্জেন্টের চিত্রের বেলা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশোভাতি ইটালী ও ফ্রান্সে, সেন্টপিটার্সবার্গ ও বার্লিনে,—সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছিল।" ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

জন সিঙ্গার সার্জ্জেন্ট

যাঁহারা সার্জ্জেন্টের নিকট প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া লইতেন, তাঁহাদিগকে এক মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইত। সার্জ্জেন্টের অন্তর্দৃষ্টি অসাধারণ ছিল। তিনি নরনারীর বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরটা দেখিয়া লইতে পারিতেন। এই হেতু তাঁহার চিত্রে নরনারীর মুখমণ্ডলে তাঁহাদের অন্তরের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। কথিত আছে, তাঁহার চিত্র দেখিয়া চিকিৎসকরা নারীর দুর্ব্বোধ্য ব্যাধির বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। ইহা সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। বহু চিত্র অঙ্কন করিবার পর তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আর আমি চিত্র অঙ্কন করিব না। হাতের যে কাযগুলা আছে, তাহা শেষ করিতে পারিলেই এ কার্য্যে আমি ইস্তাফা দিব। নারীরা তোমায় বলিয়া দিবে না যে, তাহাদিগকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত কর, কিন্তু তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, তাহারা সুন্দরীরূপে চিত্রিত হইতে চাহে। ইহাতে অনেক সময়ে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।'

সার্জ্জেন্ট মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজকুমারী মেরী ও তাঁহার স্বামী ভাইকাউণ্ট ল্যাসেলাসের চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় চিত্রশিল্পীর অভাব বহু দিনে পূর্ণ হইবার নহে।

পৃথিবীর তুলার সম্পদ্

অধুনা জগতে তৈল (পেট্রোল) যেমন জাতির প্রধান সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইয়াছে, তুলাও তেমনই অন্যতম সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইতেছে। যে শক্তির তুলার সম্পদ্ যত অধিক, সে সেই পরিমাণে অন্য শক্তির নিকট সম্মান ও প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কেন না, তুলা না হইলে জাতির লজ্জানিবারণের বস্ত্রের অভাব হয়, সে অভাব পূরণের জন্য সেই জাতিকে তুলার সম্পদে সম্পন্ন জাতির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।

জগতে মার্কিণ ও মিশরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুলা উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত চীন, হেরাট, পেরু, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেণ্টাইন, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, উগাণ্ডা, নিগারিয়া, ন্যায়সাল্যাণ্ড, নাটাল, ভারতবর্ষ, বৃটিশ পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, রাসিয়া, ফরাসীর উপনিবেশসমূহ, পোর্টুগালের অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ইটালী, মেক্সিকো ও ইকুয়াডর প্রভৃতি দেশেও অল্পবিস্তর তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মার্কিণ ও মিশর ব্যতীত অন্যান্য দেশ সবেমাত্র তুলার চাষ ও ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের অর্থাৎ বণিকসভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট সার এডুইন ষ্টকটন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢাকার মসলিন রোমরাজ্যেও রপ্তানী হইত। সার এডুইন বলেন, ঐ সমস্ত দেশ নিজের প্রয়োজনানুযায়ী তুলা উৎপাদন করিত, ব্যবসায়ের জন্য করিত না। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভারত যে তুলার চাষ ও ব্যবসায়ে নূতন নহে, তাহা ইতিহাসই বলিয়া দিবে। প্রাচীনকালে ভারতের বস্ত্র ও সূক্ষ্ম মসলিন অনেক দেশের বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করিত।

যাহাই হউক, সার এডুইন উপদেশ দিতেছেন যে, এ সব দেশে যদি ব্যবসায়ের উপযোগী তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মার্কিণ বা মিশরে তুলার ফসল কোন বৎসর ভাল না হইলেও কোনও ক্ষতি হইবে না। ইরাকে ও সিন্ধুপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণ তুলা উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা ফলবতী হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারের ভাবনা থাকিবে না। অর্থাৎ সার এডুইন চাহেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলার চাষের বৃদ্ধি করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ভারতে বা ইরাকে যে তুলা উৎপন্ন হইবে, তাহা ঐ দুই দেশের বস্ত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করাই কি সমীচীন নহে? আজ যদি ঐ দুই দেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকিত, তাহা হইলে কি হইত! কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের সুবিধার জন্যই কি সিন্ধুর সক্কর ব্যারেজে ও ইরাকের তুলার চাষের পরীক্ষায় জলের মত অর্থ ব্যয় করা হইতেছে?

নিরামিষাশীর দৈহিক শক্তি

প্রতীচ্যের বহু ব্যায়াম-বীর নিরামিষ আহার করিয়া জগতে নানা প্রকার ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে যশোলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, মল্ল ও ব্যায়াম-বীরদিগের পক্ষে আমিষ আহার একান্ত প্রয়োজনীয়। এই হেতু বিলাতে, মার্কিণে ও অন্যান্য প্রতীচ্য

দেশে মল্ল ও ব্যায়াম-বীররা অর্দ্ধসিদ্ধ বিফ-ষ্টিক (গোমাংসের শিক-কাবাব) এবং অন্যান্য উত্তেজক আহার্য্যের ভক্ত ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পূর্ব্বে এই ভাবে আহারের তোয়াজ না করিলে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারা যায় না।

অধুনা কিন্তু এ ধারণা লোপ পাইয়াছে। এখন বহু মল্ল ও ব্যায়াম-বীর নিরামিষ আহার করিয়া জগতের নানা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২৫ ও ২৬ মাইলের দৌড়ের বাজীতে, অলিম্পিক প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ৫ মাইল দৌড়ের বাজীতে, ম্যারাথন দৌড়ে, বেলজিয়ামের ৫ হাজার মিটার দৌড়ে, ল্যাণ্ডস এণ্ড হইতে জন-ও-গ্রোটস পর্য্যন্ত পদব্রজে গমনে, সাইকেলে অবিচ্ছিন্ন ২৪ ঘণ্টা কাল চড়িয়া ৪ শত ২ মাইল যাত্রায়, ইংরাজের টেনিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় (১০ বার), মল্ল-যুদ্ধে (১০ বার), গুরুভার দ্রব্য উত্তোলনে, সন্তরণে এবং পর্ব্বতারোহণে নিরামিষাশী ব্যায়ামবীররা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং দৈহিক বলের জন্য আমিষ আহার একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা বলা চলে না। আত্মিক বল যে দৈহিক বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা মহাত্মা গন্ধী নিজের জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে ২১ দিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। নিরামিষাশী মহাত্মা গন্ধী আত্মিক বলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল।

জাপানের ব্যবসায়বুদ্ধি

নবীন জাপান কেবল যে রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আধুনিক জগতে যশস্বী হইয়াছেন, তাহা নহে, জাপান ব্যবসায়বুদ্ধিতেও বহু উন্নতিকামী জাতির আদর্শস্বরূপ হইতে পারেন। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অতি অল্পদিন হইতে প্রতীচ্যের অনুকরণে চেম্বার অফ কমার্স অথবা বণিকসভার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে দেশীয় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের নিজস্ব চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ যাবৎ তাঁহারা এ দেশের য়ুরোপীয় চেম্বার সমূহের অনুকরণ করা ব্যতীত দেশের মঙ্গলকর কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন? তাঁহাদের চেম্বার কতকটা বক্তৃতার সভা মাত্র। দেশে কিসে ব্যবসায়বুদ্ধির বিস্তৃতি ঘটিবে—কিসে শিল্পব্যবসায়ে দেশের লোকের অনুরাগবৃদ্ধি হইবে, কিসে দেশের লোক ব্যবসায়বুদ্ধিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া নিত্য নূতন ধনাগমের উপায় উদ্ভাবন করিবে, কিসে দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইবে,—এ সব বিষয়ে বোম্বাইয়ের চেম্বার বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় চেম্বার এ যাবৎ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

জাপানের ওসাকা চেম্বার ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চেম্বার নিজ ব্যয়ে—

(১) একটি ব্যবসায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Commercial school) স্থাপনা করিয়াছেন,

(২) ওসাকা ও তৎসন্নিহিত স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা রীতিমত স্কুলের শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ যাহাদের ব্যবসায়ে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে, তাহাদিগের জন্য প্রতিবৎসর একটা পরীক্ষার সুব্যবস্থা করেন এবং যাহারা সফল হয়, তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেন।

(৩) জাপান, কোরিয়া বা মাঞ্চুরিয়ার নানা স্থানে বৎসরে এক বা দুইবার বাবাবর মেলার ব্যবস্থা করেন,

(৪) চেম্বার গৃহে প্রতিমাসে এক বা দুইবার শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন।

এই ওসাকা চেম্বার অফ কমার্সের নিজস্ব গৃহ ৫ লক্ষ ইয়েন মুদ্রা-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বনিম্নতলে আধুনিক প্রথার হোটেল ও ভৃত্যদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় তলে চেম্বারের আফিস সমূহ, প্রেসিডেণ্টের কক্ষ, সেক্রেটারীর আফিস, ডাইরেক্টারগণের কক্ষ, সংবাদপত্রের কক্ষ, আগন্তুকের বসিবার কক্ষ, এবং সভাধিবেশনের কক্ষ আছে। তৃতীয় তলে কমিটীর বসিবার কক্ষ ও লাইব্রেরী (Commercial) আছে। চতুর্থ তলে পণ্যদ্রব্য সমূহের নমুনা রক্ষিত হয়, এবং ওসাকায় যত পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার প্রদর্শনী খুলিয়া রাখা হয়।

ভাবুন দেখি, কি বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরাও যদি অসার য়ুরোপীয় চেম্বার সকলের অনুকরণ না করিয়া জাপানের আদর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের কত মঙ্গল সাধিত হয়।

মুর ও চীনদেশ

জগতে অধুনা এই দুই দেশে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। মুরদেশের স্বদেশ-প্রেমিক নেতা মহম্মদ বিন আবদুল করিম রিফের স্বাধীনতা-লাভের জন্য দুইটি য়ুরোপীয় শক্তির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। প্রথমে স্পেনের সহিত সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষে স্পেন পরাজিত হইয়া রিফ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তাহার পর ফরাসী রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রবল শক্তিশালী, সুতরাং মনে করিয়াছিলেন, অতি সহজেই আবদুল করিমের দর্প চূর্ণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চাশা ফলবতী হয় নাই। আবদুল করিম অদ্ভুত বীরত্বের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। এখনই এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী সকল ঘাঁটি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দিন দিন আবদুল করিমের আক্রমণের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এমন কি, ফরাসী মনে করিতেছেন, এ যুদ্ধ কেবল রিফে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, সমগ্র উত্তর-আফ্রিকার মুসলমানের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে, হয় ত অচিরে জেহাদ বলিয়া বিঘোষিত হইবে। ফরাসী ব্যাপার বুঝিয়া স্পেনের সহিত যোগাযোগ করিতেছেন। পরাজিত স্পেনও সুযোগ পাইয়া আবার কোমর বাঁধিয়াছেন। কিন্তু শূরবীর আবদুল করিমও নিদ্রিত নহেন, তিনি তুর্কীর ত্রাণকর্ত্তা গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার মত প্রাচ্য জাতির মুখোজ্জ্বল করুন, ইহাই প্রাচ্য দেশবাসীর আন্তরিক কামনা।

চীনের সাংহাই বন্দর অন্যতম 'ট্রিটি পোর্ট', অর্থাৎ এই স্থানে বৈদেশিকদিগের বাণিজ্যাধিকার সন্ধি অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থানে বহু বৈদেশিক বণিক ব্যবসায়সূত্রে বাস করে এবং সে জন্য বহু বৈদেশিক দূতাবাসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কোন এক কলের ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে এক জাপানী সর্দ্দার মিস্ত্রী এক চীনা শ্রমিককে হত্যা করে। ইহাই সাংহাই হাঙ্গামার মূল। চীনা ছাত্ররা এই হত্যা-ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া বিদেশীদিগের বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করে। পুলিস ছাত্রদিগের শোভাযাত্রায় বাধা দেয়, ফলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা হয় এবং পুলিস গুলী চালাইয়া ৬ জন ছাত্রকে নিহত করে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-চাঞ্চল্য প্রবল আকার ধারণ করে। পিকিং সরকারের পক্ষ হইতে জেনারল ফেঙ্গ এই হত্যাব্যাপারের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। ফলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'টাইমস্' পত্রের সাংহাই সহরস্থ সংবাদদাতা য়ুরোপীয় ও মার্কিণ শক্তিপুঞ্জকে উত্তেজিত করিয়া বলিতেছেন, অবিলম্বে সাংহাইয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। নানা বৈদেশিক শক্তি সাংহাইয়ে স্ব স্ব রণতরী প্রেরণ করিয়াছেন। অবস্থা কতকটা বক্সার বিদ্রোহের কাণ্ডের মত হইয়াছে।

কাপ্তেন এমাণ্ডসন

কাপ্তেন এমাণ্ডসন্

কাপ্তেন এমাণ্ডসন দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের পর উত্তর-মেরু আবিষ্কারে যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কাপ্তেন এমাণ্ডসনের বর্ত্তমান মেরুযাত্রার ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

সেনেটর মার্কণি

তারহীন তাড়িতবার্ত্তার উদ্ভাবনকারী সেনেটর মার্কণি তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সংপ্রতি তিনি চিরকুমারের তালিকা হইতে নাম তুলিয়া লইবার সংকল্প করিয়াছেন। কর্ণওয়ালের লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল ক্যাম্‌বোরণ পেইণ্টারের কন্যা কুমারী এলিজাবেথ নারসিসার সহিত তিনি শীঘ্রই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

সেনেটর মার্কণি

নেপালের মহারাজা

নেপালের বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজা সার চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিতেছেন। বিগত ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে নেপালরাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দাতব্য বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নেপালের বর্ত্তমান মহারাজা দেশ হইতে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ করিয়াছেন। নেপালের অধিবাসীরা এ জন্য দুই হাত তুলিয়া ভগবানের কাছে সার চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুরের কল্যাণকামনা করিতেছে।

নেপালের বর্ত্তমান মহারাজা

প্রাচীনযুগের তাম্রনির্ম্মিত বণ্ড

৫ হাজার ৪ শত বৎসর পূর্ব্বের টেল-এল্ ওবিদ মন্দির সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির-মধ্য হইতে একটি তাম্রনির্ম্মিত বণ্ডমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তির কারুকার্য্য প্রশংসনীয়।

বাঙ্গালীর প্রতিভা

জেমসেদপুরের টাটার লৌহকারখানার জনৈক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষ দুইখানা দ্বিচক্র যানকে একসঙ্গে যুড়িয়া প্রয়োজনকালে আরোহী লইয়া গতায়াত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। জেমসেদ পুরে ভাড়াটিয়া
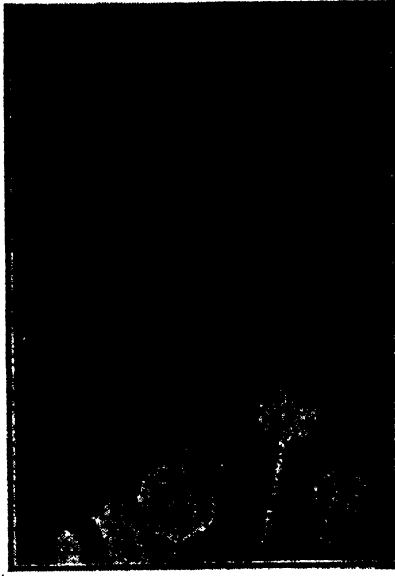
প্রাচীন বাবিলনে দুগ্ধ-দোহনরীতি

টেল্-এল ওবিদ্ মন্দির-গাত্রে যে সকল ক্ষোদিত চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানি চিত্রে প্রাচীন যুগের বাবিলোনীয় দুগ্ধ-দোহন-রীতি প্রকটিত।

প্রাচীন বাবিলনে দুগ্ধদোহনরীতি

তাম্রনির্ম্মিত বণ্ড

নবনির্ম্মিত চক্রযান

যানের অত্যন্ত অভাব। অনেক সময়ই ভদ্রসন্তানদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেই অসুবিধা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত করিবার জন্য উল্লিখিত যুবকযুগল এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সুকৌশলে গ্রথিত যানে চড়িয়া আরোহীরা অনায়াসে গতায়াত করিতে পারেন—কোনও কষ্ট হয় না। দুইখানি দ্বিচক্র যানকে প্রয়োজনমত খুলিয়া ফেলিতে দশ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। একসঙ্গে গ্রথিত করিতেও অনুরূপ সময় লাগে। বাঙ্গালী যুবকদিগের এই প্রচেষ্টা ও প্রতিভার বিকাশ সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য।

পিস্তলের আলোকে ব্যোমরথের গতিবিধি পরিচালন

ব্যোমরথ থামাইবার অভিনব-কৌশল

লণ্ডন সহরে ব্যোমরথগুলির গতিবিধি নিয়মিত করিবার জন্য একটি সু-উচ্চ অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অট্টালিকায় তারহীন তাড়িতবার্ত্তার যন্ত্রাদি সন্নিবিষ্ট আছে। উহার সাহায্যে ব্যোমরথগুলির সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্য হইয়া থাকে। যে সকল ব্যোমরথ ইংলণ্ড হইতে য়ুরোপে গতায়াত করিয়া থাকে, উল্লিখিত উচ্চভবনের শীর্ষ হইতে তারহীন তাড়িত-বার্ত্তা যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে ব্যোমরথশালায় নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিবার বা তথা হইতে বাহির হইবার ইঙ্গিত করিয়া থাকে। ঘন কুজ্ঝটিকা হইলেও কোন বাধা ঘটে না। অন্ধকার রাত্রিতে পিস্তল ছুড়িয়া এই কার্য্য করিতে হয়। পিস্তল হইতে গুলীর পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল আলোকশিখা নির্গত হয়, বহু দূর হইতে তাহা ব্যোমরথ-চালকের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়।

লিভারের সাহায্যে নৌকা পরিচালন

ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক প্রকার জীবনরক্ষক নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে দাঁড়ের পরিবর্ত্তে লিভার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত লিভারগুলি এমনই ভাবে অবস্থিত যে, উহা চাপিয়া ধরিলেই একটা যন্ত্র ঘুরিতে থাকে, তাহাতে নৌকা দ্রুত ধাবিত হয়। এই লিভার চাপিয়া ধরিতে শিক্ষিত নাবিকের প্রয়োজন হয় না। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রমধ্যে এই নৌকা লইয়া যাওয়া সহজ, সমুদ্র-তরঙ্গে সহসা কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও নাই।

লিভারের সাহায্যে নৌকা পরিচালিত হইতেছে

বাহুহীন ব্যক্তির লিখিবার উপায়

বাহুহীন ব্যক্তিদিগের লিখিবার ও চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নির্ণীত হইয়াছে। বক্ষোদেশ বেষ্টন করিয়া একটা 'বেল্ট' বা বন্ধনীবৎ যন্ত্র থাকে, তাহাতে লেখনী বা ব্রুস সংলগ্ন। সামান্য অঙ্গসঞ্চালনে ব্রুস বা
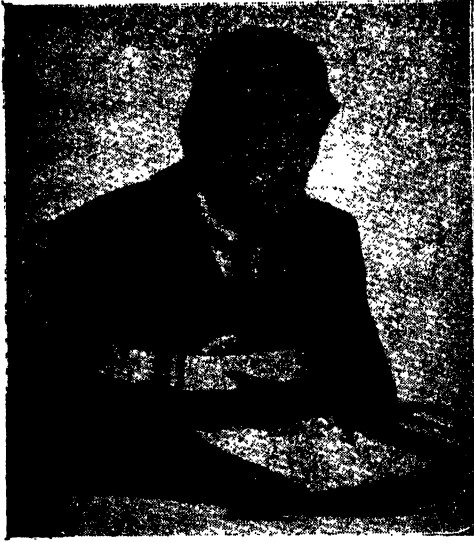
বাহুহীন ব্যক্তি যন্ত্রের সাহায্যে লিখিতেছে

লেখনী কার্য্য করিতে থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থের পাতাও উল্টাইয়া লওয়া যায়। বাহুহীন ব্যক্তি অতি অল্প চেষ্টায় এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে লিখিতে পারে। যুদ্ধে যাহারা বাহুহীন হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই এইরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ ব্যবহার

পাশ্চাত্যদেশের রোগীরা ইদানীং ঔষধ সেবন করিতে নারাজ। ঔষধের তীব্রতা অত্যন্ত অপ্রীতিকর, অনেকটা ঔষধ পান করিতেও বিরক্তি বোধ হয়। এই সকল কারণে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে মুখের পরিবর্ত্তে চর্ম্মের দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করার সুবিধা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, এইরূপ উপায়ে ঔষধ ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র ঔষধের ক্রিয়া হয় এবং ঔষধের বৃথা অপচয় ঘটে না। পাকস্থলীতে ঔষধ পৌছিয়া যতক্ষণে কার্য্য আরম্ভ করিবে, ত্বকের ভিতর দিয়া ঔষধ সঞ্চালিত হইলে তদপেক্ষা সহজে উপকার দর্শিবে। শরীরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের পীড়ার উপশমের জন্যই প্রধানতঃ এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ত্বকের মধ্যে তরল ঔষধ সঞ্চালন

প্রাচীনতম লেখনী

প্রাচীনতম লেখনী

'কিস্' (Kish) খনন করিয়া যে সকল প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় যুগের দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে এক প্রকার লেখনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এত দিন জানিতে পারেন নাই, কি উপায়ে সেই যুগে ব্যাবিলোনীয়গণ সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখিত। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর তাঁহারা এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিয়াছেন।

পুত্তলিকা-সংলগ্ন রেডিওযন্ত্র

পুত্তলিকা-সংলগ্ন রেডিওযন্ত্র

মার্কিণে বড় বড় পুত্তলিকা গড়িয়া, পশ্চাদ্ভাগে রেডিও-যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়। বৈঠকখানাঘরে পুতুল সাজান রহিয়াছে—যন্ত্রের অবস্থান কেহ দেখিতে পায় না। প্রয়োজনকালে পুত্তলিকার মুণ্ড সরাইয়া যন্ত্র মেরামত করাও চলে। সৌখীন মার্কিণগণ এখন ঘরে ঘরে এইরূপ রেডিও-যন্ত্র রাখিতেছে।

আবহবার্ত্তায় বৃক্ষকাণ্ড

আমেরিকার 'ফিল্ড মিউজিয়মের' বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, ওক্ এবং উইলোগাছের কাণ্ড হইতে আবহাওয়ার সন্ধান পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। চিকাগো সহরের সন্নিহিত পুরাতন বৃক্ষকাণ্ডগুলি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ২ শত বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বের আবহাওয়া কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা যায়। নানা জাতীয় বৃক্ষকাণ্ডের ভিতরের আবর্ত্ত রেখার দ্বারা ঋতুর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে যে সকল বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, কাণ্ডের অন্তর্গত বাৎসরিক আবর্ত্ত রেখার দ্বারা তাহারা কোন্ ঋতুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়। এইরূপ উপায়ে সেই সেই সময়ে কি পরিমাণ বৃষ্টি বা রৌদ্রতাপ সেই সকল বৃক্ষ পাইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিসর আরও বাড়াইয়া দিলে অণুবীক্ষণযন্ত্রযোগে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—কোন্ সময়ে বৃক্ষের কোন্ অংশ কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, যে দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার বিপরীত দিকের অংশ অধিকমাত্রায় পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের আবহবিদ্গণ এই প্রণালীতে গবেষণা ও পরীক্ষার কার্য্য চালাইয়া দেখিতে পারেন।
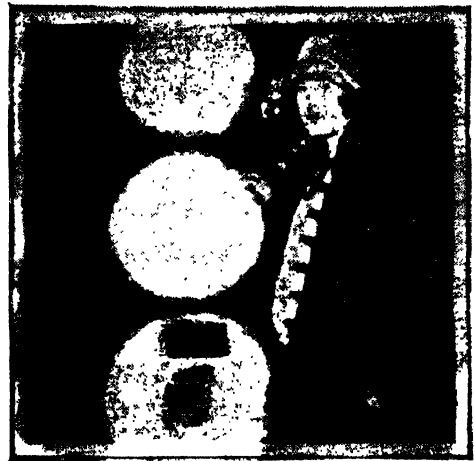
বৃক্ষকাণ্ডের বিভিন্ন অংশাবর্ত্তরেখার দ্বারা আবহ বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব

জীবনরক্ষক তোষক

প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে যে সকল মার্কিণ অর্ণবপোত গতায়াত করিয়া থাকে, তাহারই কোন একখানি পোতের জনৈক নাবিক জীবনরক্ষক তোষক প্রস্তুত করিয়াছে। ঝড়ে বা অন্ত কোনও দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ জাহাজ জলে ডুবিয়া গেলে, আরোহীরা এইরূপ তোষকের সাহায্যে জীবন রক্ষা করিতে পারিবে। বৃক্ষলতাদিসঞ্জাত এক

প্রকার অত্যন্ত লঘু-ভার কার্পাস-তুলার মত পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই তোষকের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহাতে তোষকটি জলে কোনও মতে আর্দ্র হইতে পায় না। জীবনরক্ষক তোষক অঙ্গে ধারণ করিলে বাহুযুগল মুক্ত থাকে, পদযুগলও তোষকের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও উহার নির্ম্মাণ-কৌশলে সঞ্চালন করিতে পারা যায়। জলের উপর সোজাভাবে থাকিয়া জলমগ্ন ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

জীবনরক্ষক তোষক

সুমেরীয় যুগের মণিহার

৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মণিহার

সুমেরীয় যুগের নারীরা ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে মণিমণ্ডিত হার ব্যবহার করিত, 'কিসে'র সমাধি খনন করিয়া তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে যুগে যে সকল মূল্যবান্ মণি পাওয়া যাইত, এই হারে তাহাদের সমাবেশ দেখা যায়।

জলের উপর বসিবার উপায়

সমুদ্রজলে পড়িয়া গেলে যে সকল সাধারণ গোলাকার জীবনরক্ষক (life preserver) বায়ু-পূর্ণ আধার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইদানীং তাহার সঙ্গে রবারের পাজামা, জুতা, পদসংলগ্ন জল কাটাইবার যন্ত্র এবং এক-জোড়া ছোট দাঁড় ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে জলমগ্ন ব্যক্তির নিরাপদে তীরে পৌছিবার অনেক সুবিধা হয়। উল্লিখিত দ্রব্যাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া কোনও ব্যক্তি যদি সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সহসা তাহার জীবন নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পরিচ্ছদ এমনই দীর্ঘ এবং পাজামা এমনই ভাবে নির্ম্মিত যে, জলের উপর বসিবার বিশেষ সুবিধা আছে। হস্তস্থিত দাঁড় দুইটির সাহায্যে বসিয়া
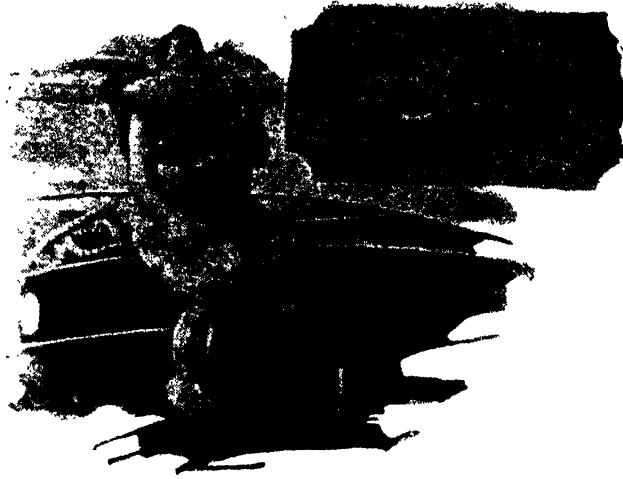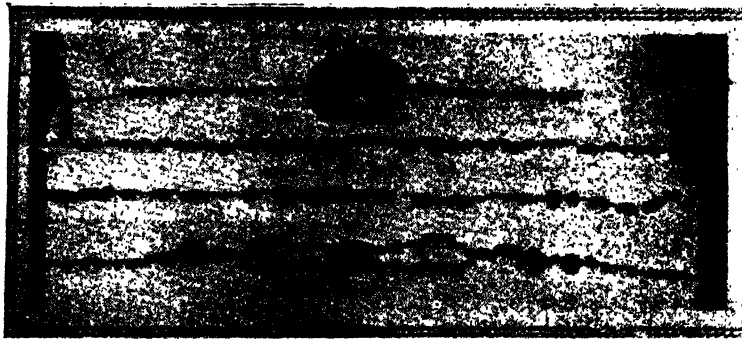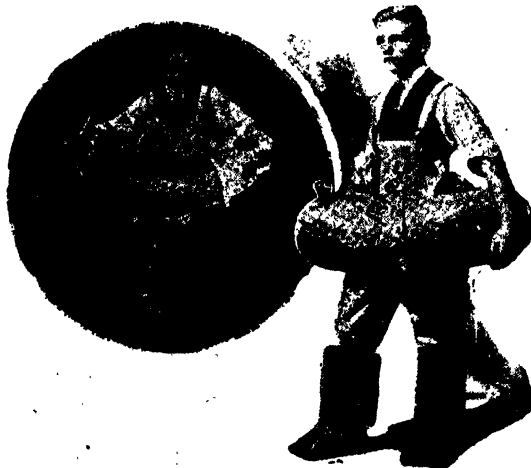
জীবনরক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জলমগ্ন ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া তীরের দিকে চলিয়াছে

বসিয়া তীরের অভিমুখে অগ্রসর হইবারও সুযোগ পাওয়া যায়। পদসংলগ্ন জল কাটাইবার যন্ত্রের সাহায্যেও অনেক সুবিধা ঘটে।
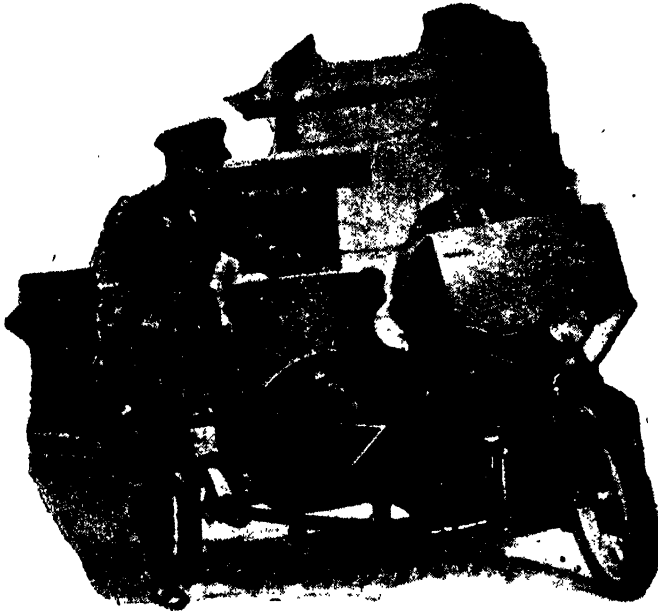
অস্ত্ররক্ষিত মোটর দ্বিচক্রযান

সুরক্ষিত মোটর সাইকেল

আমেরিকায় চিকাগো নগরের ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ দস্যু-তস্করের আক্রমণ হইতে ব্যাঙ্কের তহশীলদারদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অস্ত্রমণ্ডিত মোটর দ্বিচক্রযানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিচক্রযানের পার্শ্বে বসিবার যে আসন আছে, তাহাতে অস্ত্রধারী রক্ষক বসিয়া থাকে। নানাবিধ অস্ত্র সেই পার্শ্বস্থ আসনের চারিদিকে আছে। দ্বিচক্রযানের উভয় হাতলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা সুদৃঢ় ইস্পাতের কামরা আছে, তন্মধ্যে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রক্ষিত থাকে। সম্মুখের দিকে দুর্ভেদ্য একটা যবনিকা থাকে, পিস্তল ও বন্দুকের গুলীতে আরোহীদিগের কোনও অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। চালক ও রক্ষক উভয়েই সশস্ত্র থাকে। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, কোনও দস্যুকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে পারিলে অথবা মারিয়া ফেলিলে মাথা পিছু ৭ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। এই দ্বিচক্রযান মোটর গাড়ী অপেক্ষাও দ্রুতগতিবিশিষ্ট।

তুরস্কের রাজকীয় প্রাচীন বজরা

২ শত ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কের রাজকীয় বজরা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুলতান ও তাঁহার পরিবারবর্গ এই বজরায় আরোহণ করিয়া জলবিহার করিতেন। জনসাধারণ এই বজরা কদাচিৎ দেখিতে পাইত। সম্প্রতি বজরাখানি পোতাশ্রয়ের সংলগ্ন শুষ্ক ভূমির উপর রাখা হইয়াছে। এই বজরা চালাইতে হইলে ১ শত ৪৪ জন দাঁড়ির প্রয়োজন। সূত্রধরগণ অতি যত্নে বজরার অঙ্গে কারুসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছে। বজরার ওজন প্রায় ৩ হাজার মণ হইবে। প্রত্যেক দিকে ৩৬ খানা দাঁড়; প্রত্যেক দাঁড় দুই জন করিয়া টানিবে।
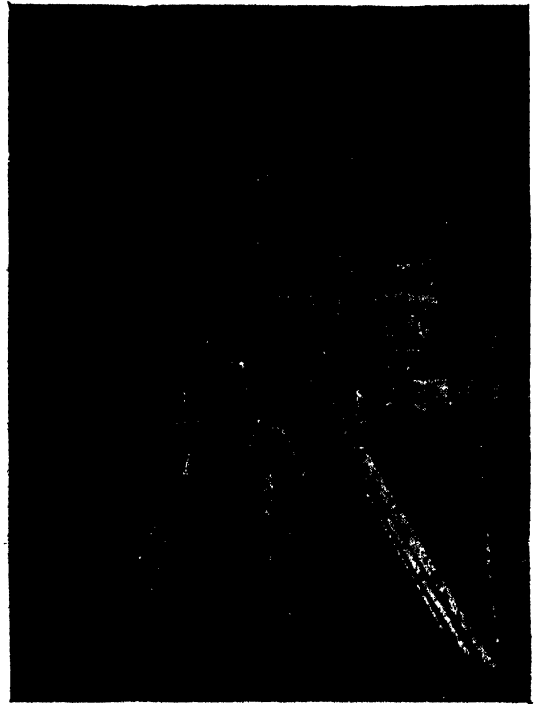
তুরস্কের রাজকীয় প্রাচীন বজরা

রেডিও ঘড়ীতে গান শুনা

রেডিওযন্ত্র, ঘড়ী এবং ফনোগ্রাফ বা শব্দবহ যন্ত্র সকল একত্র মিলাইয়া একটি নূতন যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই যে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে গান শুনিতে পাওয়া যাইবে। ঘড়ীটি এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের হৃদয় হইলেও, তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রে ৪টি নল স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে থাকে। সমগ্র যন্ত্রটির উচ্চতা মাত্র ৬০ ইঞ্চি বা ৫ ফুট, প্রস্থ ১৮ ইঞ্চি এবং গভীরতা ১৪ ইঞ্চি মাত্র। পাঁচ মাসে এই যন্ত্রটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সম্মিলিত যন্ত্রের ঘড়ীর কাঁটা সরাইয়া গানের সময় স্থির করা হইতেছে

প্রাচীন যুগের তাম্র-নির্ম্মিত ছোরা

প্রাচীন সুমেরীয় যুগের সমাধি খনন করিয়া সে যুগের ব্যবহৃত তাম্রনির্ম্মিত ছোরা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছোরার হাতল চামড়ার দ্বারা আবৃত। হাতলে ৬টি করিয়া সোনার বুটি বসান। সুতরাং হাতলটি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন, যোদ্ধার সমাধিতেই এইরূপ ছোরা রাখিবার ব্যবস্থা সে যুগে ছিল।
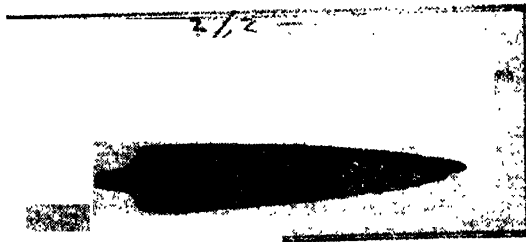
৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের তাম্রনির্ম্মিত ছোরা
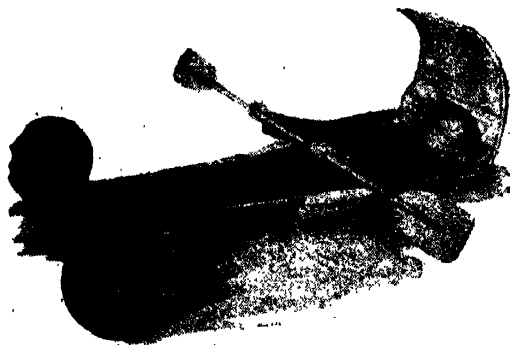
অভিনব ভাসমান ভেলা

আমেরিকায় জলক্রীড়ার জন্য এক প্রকার ভেলা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভেলার সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে বায়ুপূর্ণ বৃহদাকার সুগোল বল সংশ্লিষ্ট থাকে। দুই পার্শ্বে দুইখানি দাঁড়—আরোহী তদ্দ্বারা ভেলা চালাইয়া থাকে। উল্লিখিত ভেলা অত্যন্ত লঘুভার বলিয়া সর্ব্বদা ইহাকে গতি দিতে হয়। সমুদ্রের তরঙ্গে ইহার কোনও অনিষ্ট ঘটে না। সন্তরণকারীদিগের পক্ষে এই ভেলা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মস্তকের দিকে যে আবরণ আছে, তাহা পাইলের কায করিয়া থাকে, তরঙ্গের আঘাতও মাথায় লাগিতে পায় না। ইচ্ছা করিলে এই ভেলাকে সমুদ্রগর্ভে অতি দ্রুতগতিতে চালাইতে পারা যায়, আবার হইলে সে গতি অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই ভেলা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া বা কোথাও পাঠাইয়া দেওয়াও সহজ। অল্প সময়ের মধ্যে অংশগুলি খুলিয়া লইয়া স্বল্পপরিসর স্থানে গুছাইয়া রাখা যায়।

ভাসমান নূতন ভেলা

দাম্পত্য প্রণয়

১

পল্লীগ্রামে পাশার আড্ডা বসিয়াছে। যাঁহারা খেলিতেছেন, তাঁহারা একমনেই খেলিতেছেন। অপর যাঁহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাঁহারা গুড়ুক ফুঁকিতেছেন ও নানাবিধ গল্প করিতেছেন। এমন সময় প্রৌঢ়বয়স্ক সীতানাথ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং সভায় আসন গ্রহণ করিয়া, বেণী বসুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনেছ বোসজা? এবার তারকেশ্বরে যে ভারি ধূম!"

"চড়ক-মেলায় না কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। মোহান্ত এবার কাশী থেকে বাই, কলকাতা থেকে খ্যাম্‌টা নাচ আনাচ্ছে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ত আছেই—আবার কলকাতায় কি এক রকম না কি ছিয়াচার উঠেছে, তাও এক দল আসবে। পশ্চিম থেকে ভুরে খাঁ, চাঁদ খাঁ এসেছে, তারা ভোজবাজি দেখাবে—সে না কি একেবারে আশ্চর্য্য কাণ্ড।"

বসুজ বলিলেন, "বটে! এবার ত তা হ'লে ভারি ধূম দেখতে পাই! যাচ্চ না কি?"

"যাচ্চি ছেড়ে—হুঁ—হুঁ—গিয়েছিই ধ'রে নাও। বলা বাগ্দীর গাড়ীখানা নগদ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে বায়না ক'রে রেখেছি। সংক্রান্তির দিন ভোরে উঠে রওনা।"—বলিয়া সীতানাথ সকলের পানে চাহিয়া গর্ব্বভরে হাস্য করিলেন।

তারকেশ্বরে সংক্রান্তি-মেলায় এবার এই অভূতপূর্ব্ব আয়োজনের সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তারকেশ্বর যাইবার পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল নরহরি বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া, নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। নরহরির বয়স ৩২।৩৩ বৎসর,—সে এ গ্রামের এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ—অর্থেরও অভাব নাই। রাধাচরণ বলিল, "বিশ্বাস ভায়া, তুমি যে কিছু বল্‌ছ না? তুমি কি যাবে না কি?"

নরহরি বিষণ্ণভাবে বলিল, "দেখি!"

গ্রাম সম্পর্কে দত্ত মহাশয় নরহরির ঠাকুরদাদা। তিনি ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে কি, আমি আগেই দেখে রেখেছি। তোমার যাওয়া হবে না। নাতবৌকে ফেলে কি আর তুমি যেতে পার্‌বে?"

নরহরি বলিল, "সেই ত! বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই—একলা কার কাছে থাকে বলুন!"

এ কথা শুনিয়া অনেকেই নরহরির পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। বসুজ মহাশয় থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঢের ঢের স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি ভায়া, কিন্তু তোমার মত আর একটি দেখিনি। এতই যদি বিরহের ভয়, তবে না হয় বোড়েই চল। দু'দিকই বজায় থাকবে।"

এক জন বলিল, "দোহাই বোসজা! ও পরামর্শটি দেবেন না ওকে। ও যদি সত্যিই পরিবারটিকে গলায় বেঁধে তারকেশ্বর যায়, আমাদের কি দশা হবে ভাবুন দেখি একবার! আমাদের 'তিনি'রাও, ধিনি ধিনি ক'রে নেচে উঠবেন; বলবেন, আমরাও যাব? না ভাই নরহরি, ও কার্য্যটি কোর না, কোর না। 'দুঁহু দোঁহা মুখ চেয়ে'—প্রেম-চর্চ্চা তোমরা ঘরে বসেই কর।"

অতঃপর নরহরিকে অব্যাহতি দিয়া, অপর সকলে

যাইবার পরামর্শে বসিয়া গেল। তামাক ছিলিমটা শেষ করিয়া নরহরি উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

২

উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা আজিকালিকার কথা নহে—প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বকার ঘটনা। তখন সবেমাত্র কাশী অবধি রেল খুলিয়াছে। সবেমাত্র সহরের লোকেরা ইংরাজী পড়িতে সুরু করিয়াছে। দূর পল্লী-গ্রামে, অধিকাংশ লোকই তখন নিরক্ষর, কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তাও, পনেরো আনা তিন পাই লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ২।৪ বছরে যতটুকু বিদ্যালাভ সম্ভব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত—অধিক আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ছিল না। এক পাই আন্দাজ লোকেই পাঠশালা পার হইয়া সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিত। সকলেরই কিছু কিছু জোত-জমী ছিল, তাহা-তেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। অবসর-কালে কোনও বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়া নিশ্চিন্তমনে তাস-পাশা খেলিত বা গুড়ুক ফুঁকিত—এবং নানারূপ খোস-গল্পে সময় কাটাইত। ইংরাজী না পড়ায়, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীকে তাহারা যথোচিত মান্য করিয়া চলিত এবং কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রবণ করিলে, এখনকার লোকের মত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া "হাম্বাগ" বলিয়া উড়াইয়া দিত না—বিশ্বাস করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

এই গ্রামখানির নাম মাণিকপুর, তারকেশ্বর এখান হইতে হাঁটাপথে সাত ক্রোশ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপহসিত নরহরি বিশ্বাসের বয়স এ সময় ৩২।৩৩ বৎসর হই-য়াছে। সংসারে স্ত্রী কুসুমকুমারী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। কুসুমের বয়স প্রায় ২৫ হইতে চলিল, কিন্তু অদ্যা-বধি তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। আর যে হইবে, তাহারই বা আশা কৈ? গ্রামের স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই বলিত, কুসুমকুমারী বন্ধ্যা এবং নরহরির পুনরায় বিবাহ করা উচিত, নহিলে পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের লোপ অনিবার্য্য।

এই দুঃখটুকু ভিন্ন এই দম্পতির জীবনে আর কোনও দুঃখের ছায়ামাত্রও ছিল না। স্বাস্থ্য উভয়েরই অটুট—ম্যালেরিয়ার নামও সে দিনে কেহ কখনও কর্ণগোচর করে নাই। মদন ও রতির তুল্য রূপবান্ ও রূপবতী না হইলেও, উভয়েই আকার অবয়বে সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিল। নরহরি ধনশালী ব্যক্তি না হইলেও, তখনকার হিসাবে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই বিবেচিত হইত। তাহার জোত-জমা ছিল, বাগান ছিল, পুকুর ছিল; সে সকলের উপস্বত্বে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। আর একটি অমূল্য সম্পদের তাহারা অধিকারী ছিল—অবিচ্ছিন্ন ও গভীর দাম্পত্য-প্রণয়। বস্তুতঃ, তাহাদের দাম্পত্য-প্রণয় গ্রামের মধ্যে প্রবাদ-বচনের মতই প্রচারিত ছিল। স্বামীরা বলিত, "স্ত্রী যদি হ'তে হয়, তবে ঐ বিশ্বেসদের কুসুমের মতই হওয়া উচিত।" স্ত্রীরা বলিত, "স্বামী যদি হ'তে হয়, তবে ঐ নর-হরি ঠাকুরপোর মতই যেন হয়। আজ প্রায় ১৫।১৬ বচ্ছর হ'ল ওদের বিয়ে হয়েছে—এখনও পর্য্যন্ত দুটিতে যেন জোটের পায়রা!"

কিন্তু এ সকল মন্তব্য তাহারা প্রায় নিজ নিজ দাম্পত্য-কলহের সময়েই প্রকাশ করিত। সুস্থমনে পুরুষরা বলিত, বুড়া হইতে চলিল, এ বয়সেও সেই ২০ বছরের ছোঁড়ার মত, 'পলকে প্রলয়' গণিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ানো, নরহরির নির্লজ্জ ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকরা বলিত, "বুড়ী মাগী,—সময়ে একটা মেয়ে জন্মালে আজ নাতির দিদিমা হ'ত, এ বয়সে চৌদ্দ বছুরী ছুঁড়ীর মত 'প্রাণনাথ' ব'লে স্বামীর গায়ে ঢ'লে ঢ'লে পড়া!—গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এ সকল মন্তব্য যে এই দম্পতির কানে আসিয়া পৌঁছিত না, এমন নহে;—শুনিয়া তাহারা হাসিত মাত্র—এবং পরস্পরকে অধিক আদরে-সোহাগে ডুবাইয়া রাখিত।

৩

মহা ধূমধামের সহিত তারকেশ্বরে চড়ক-মেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চড়ক ত মাত্র এক দিন, কিন্তু মেলাটি সপ্তাহকাল থাকিবে। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষই কেহ গো-শকটে, কেহ পদব্রজে তারকেশ্বরে গিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, পথে নারী-বিবর্জ্জিতা নীতির অনুসরণ করিয়া, নিজ স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীকে কেহই সঙ্গে লয় নাই। ২।৩ দিন পরে গ্রামবাসী কেহ কেহ মেলা দেখিয়া ফিরিয়া

আসিল এবং উৎসবের বর্ণনায়, যাহারা যায় নাই বা যাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে ব্যস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্লকালে পাড়ার ৩।৪ জন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক কুসুমকুমারীর কাছে আসিয়া ধরিয়া বসিল—"এত ধূমধাম, আমরা কিছুই কি তার দেখতে পাব না! সংসারে কি কেবল খেটে মরতেই এসেছি! তোমার স্বামীকে বল, আমাদের সকলকে তারকেশ্বরে নিয়ে চলুন।"

খুড়ীমা, জ্যেঠাইমা—যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিয়া কুসুম বলিল, "কিন্তু শুন্‌লাম, সেখানে যে রকম ভীড় হয়েছে, বাসা পাওয়াই যে শক্ত হবে। পুরুষমানুষরা গাছতলাতেও প'ড়ে থাক্‌তে পারে। কিন্তু আমরা ত তা পার্‌বো না!"

এক বৃদ্ধা বলিলেন, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই। আমার ভাইজির বিয়ে হয়েছে, তারকেশ্বরের খুব কাছেই। এমন কি, গ্রামের বাইরে বেরুলেই বাবার মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়। সেইখানে গিয়ে আমরা থাক্‌বো এখন। আমি যখন বাবাকে দর্শন কর্‌তে যাই, সেইখানেই ত গিয়ে থাকি। জামাইটি বড় ভাল, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমাদের গুরুর আদরে রাখবে, তুমি দেখো।"

অবশেষে কুসুম স্বীকৃত হইল। বলিল, "আচ্ছা, ওঁর কাছে কথাটা পেড়ে দেখি, উনি কি বলেন।"

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "ওলো নাতবৌ, তুই যদি বায়না নিস্ ত নাতির সাধ্যি নেই যে, সে কথা ঠেলে।"

বাস্তবিক, বৃদ্ধার ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হইল। নরহরি সম্মত হইল। পরদিন প্রাতে একখানি গো-শকটে নরহরি ও কুসুম এবং অপর একখানিতে ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমা তারকেশ্বর যাত্রা করিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-জননী

পল্লী সে যে গো প্রকৃতির ছবি
নগ্ন মূরতি তার,
কৃত্রিম বেশ-সম্ভার-হীন
নির্ম্মাণ বিধাতার।
সে যে ঢাকে না আপন দীনতা,
স্পষ্ট তাহার হীনতা,
তোমাদের চোখে হেয় চির সে যে
কুৎসিত ও কদাকার;
সেখানে যে জন কাটায় জীবন
বিফল জনম তার।

আজি ও গো এই জাগরণ-দিনে
তার পানে ফিরে চাও,
পিতা-পিতাম'র ভিটায় আবার
দীপটি জ্বালিয়া দাও।
হয়েছে সে যে গো নীচ ও রিক্ত,
হিংসা ও দ্বেষ-গরল-সিক্ত,
সে ত গো কেবল তোমাদের মত
তনয়-প্রসূন বিহনে—
বিমাতার কোলে এসেছ তোমরা
তেয়াগি জননী-চরণে।

নগরীর ক্রোড়ে লভিতে আলোক
ছুটিয়া গিয়াছ সকলে,
দুখিনী জননী তোমাদের হেথা
যাপিছেন নিশি বিরলে।
এ নিশার ঘোর ঘন তমোরাশি,
তোমরা আলোকে দিবে না কি নাশি'?
পল্লী-জননী চিরদিন কি গো
হারায়ে রহিবে গরিমা,
তোমরা ভিন্ন কে আছে তাঁহার
মুছিতে ললাট-কালিমা?

আমরা যে দীন ভুলে যাই কেন
ময়ূর-পুচ্ছে সাজিয়া,
দৈন্য ঢাকিতে সতত প্রয়াস
দেহটা ঘষিয়া মাজিয়া;
এখনও যে মোহ হয় না ভঙ্গ,
স্বপ্নের ঘোরে অবশ অঙ্গ,
এ শুধু কেবল ভুলেছি বলিয়া
আপন পল্লী-মা'র,
এস ভাই সবে লই গে আশ্রয়
মায়ের অভয় পায়।

শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী।

২৪শে মাঘ—

কলিকাতায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড, হাতিবাগানে ট্যাক্সি-চালক খুন। বিহার-লাট সার হেন্‌রী হুইলার ও আসাম-লাট সার জন কারের ছুটী প্রাপ্তি। মিশরে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জগলুল পাশার পরাজয়।

২৫শে মাঘ—

কলিকাতা ট্যাংরায় মসজিদ-সমস্যা। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরবাসী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যু। নেপালরাজ্য হইতে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। মিশরে নির্ব্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বাঙ্গালায় মন্ত্রিনিয়োগ-সমস্যায় লাটপ্রাসাদে বৈঠক। মালাবার উপকূলে জাহাজডুবি, ১৬ জন যাত্রীর প্রাণহানি।

২৬শে মাঘ—

কলিকাতায় চন্দ্রগ্রহণে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। ফ্রান্সে মানবেন্দ্রনাথ রায় গ্রেপ্তার। কায়রোয় ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধি দল। মৌলানা সামসুদ্দীন আমেদের সভাপতিত্বে বগুড়ায় প্রজা কনফারেন্স। জেড্ডায় গোলাবর্ষণ।

২৭শে মাঘ—

কলিকাতা হাইকোর্টে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের মামলা—ডিরেক্টার-দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ। লাহোরে ষ্টাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার গ্রেপ্তার। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে বিদেশে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা সম্বন্ধে আলোচনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বাজেট পেশ। আমেরিকায় বৃটিশ মদের জাহাজ আটক।

২৮শে মাঘ—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে যোগদানে ব্রহ্মের অসম্মতি। মার্কিণ কর্তৃক অহিফেন সমিতির সংশ্রব ত্যাগ। নবদ্বীপে রামকেলি সংস্কার সম্পর্কে সভা। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেন্টের বেতন-সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে স্বরাজ্য দলের সভা। বোম্বায়ে ছাত্রাভাবে জাতীয় কলেজের আর্ট বিভাগ বন্ধ। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত পটেলের দমননীতি-সম্পর্কিত বিলের আলোচনা।

২৯শে মাঘ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের মন্তব্য—ক্যান্টিলিভার ব্রিজ চাই না। বৌবাজার পোষ্টাফিস হইতে রেজেষ্ট্রী ব্যাগ চুরি। দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। কানপুরে ৫০ হাজার টাকার খর্চচুরি। কায়রোতে সর্দ্দার লী-ষ্টাক হত্যাকাণ্ডের আসামী সনাক্ত। মৈমনসিংহ গাকারগাঁওএ ভীষণ ডাকাইতী। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে মহাত্মা কর্তৃক বিপ্লববাদের নিন্দা। ফতেপুরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা।

৩০শে মাঘ—

দিনাজপুরে মোক্তার বনাম ডেপুটীর মামলা, অবৈধ আটকের অভিযোগ। তাঞ্জোরে দেনার দায়ে স্ত্রী হস্তান্তর। দিল্লীতে ব্যবস্থা-পরিষদে ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত ব্যবস্থা। জোড়াসাঁকোয় হুলস্থূল, বড় ঘরের মেয়ে চুরি। তুর্ক জাতীয় পরিষদে আলোচনাকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা। চরমানাইর মানহানি মামলা—হাইকোর্টে বিচারপতিদ্বয়ে মতভেদ—মামলা প্রধান বিচার-পতির নিকট প্রেরিত।

১লা ফাল্গুন—

১১ মাস ধরিয়া বিচারের পর আজমীরে শ্রীযুত পাঠিকের কারাদণ্ড। বিহার ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্টের বেতন ২ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট। নাভার জঙ্গল হইতে আকালী বীরগণের মৃত্যু-সংবাদ। সর্দ্দার লী-ষ্টাকের হত্যায় ·লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যবস্থা। আয়ারল্যাণ্ডে বিবাহবিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। লিপজিগে বিরাট বলশেভিক ষড়যন্ত্র প্রকাশিত। বিলাতে সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পুনরায় যোগদানে ভারতের অসম্মতি। বিলাতে বিষম খনি দুর্ঘটনা, ১ শত ৩০ জনের জীবন্ত সমাধি। বড়বাজার পোষ্টাফিসে ভীষণ চুরি।

২রা ফাল্গুন—

বোম্বায়ে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন। ঢাকা মুন্সীগঞ্জে ঘূর্ণীবায়ুতে ২ জন হত ও বহু আহত। বিলাতে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। বিহার ও উড়িষ্যায় আবগারী রাজস্ব হ্রাস। আবার রিপণ ষ্ট্রীটে গুলীবর্ষণ, শ্বেতাঙ্গ সি, আই, ডির পুত্র আহত।

৩রা ফাল্গুন—

চট্টগ্রামে দারোগা খুনের জের—হাইকোর্টের বিচারে মুক্তির পর আসামী প্রেমানন্দ দত্ত অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার। বরিশাল কলেজের মুসলমান হোষ্টেলে গো-কোর্ব্বাণীতে হিন্দু ছাত্রবৃন্দের হরতাল। চাকুরিয়া লাইব্রেরীর বিংশবার্ষিক উৎসব। চীনদেশীয় সংবাদপত্র ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। জেকো-শ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট-পুত্রের ভারতে ভ্রমণ। মালদহে রাজবন্দী বিনোদ চক্রবর্ত্তীর প্রায়োপবেশন। বোম্বায়ে স্বরাজ-নেতা জয়াকরের ব্যারিষ্টারীতে পুনরায় যোগদান।

৪ঠা ফাল্গুন—

এলাহাবাদে শ্বেতাঙ্গ-সৈন্য কর্তৃক দেশীয় হত্যার জের—আসামী-দ্বয়ের কারাদণ্ড। রুস, জাপান ও চীনে গুপ্ত সন্ধি। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে হজ সম্বন্ধে প্রশ্নে বাধা। কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র-শোক-সভা। দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে গঙ্গার জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা। মৈমনসিংহে কলেজ-ছাত্র প্রভাত চক্রবর্ত্তী অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার।

৫ই ফাল্গুন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন, ডাক্তার আবদুল্লা সুরাওয়ার্দী ডেপুটী, প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত; শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপস্থিতি;

বাজেট মন্ত্রিবেতন বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত—পক্ষে ৭৫ ও বিপক্ষে ৫১ ভোট—স্বতন্ত্র দলের স্বতন্ত্র ভাব। বোম্বায়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে বিরাট সভায় অ্যানি বেসান্তের বক্তৃতা। এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীতে গণ্ডগোল—চেয়ারম্যান জহরলাল নেহরুর পদত্যাগ। লণ্ডনে হিন্দু-নিবাস ও হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমী গ্রহণ। সম্প্রদায়বিশেষের জন্য রেলগাড়ী রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা বন্ধ—শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর বিল ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত। আসাম শিলাপুকুরী চা-বাগানে ম্যানেজারের ছাতাতত্ত্ব—ভারতীয়ের অপমান। যোধপুর কলেজে বেতনবৃদ্ধিতে ছাত্র-ধর্ম্মঘট।

৬ই ফাল্গুন—

সেকেন্দ্রাবাদে ধনলাভের আশায় দেবতার নিকট নরবলি। মুসলমান-প্রতিনিধিগণের বোম্বায়ে প্রত্যাবর্ত্তন। বোম্বায়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহীশূরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি। বিলাতে কমন্স সভায় ভারত-কথা—মানবেন্দ্রনাথ রায়, বাঙ্গালার অর্ডিনান্স, কানপুর ষড়্যন্ত্র মামলা, সিংহলে স্বরাজ-ম্যানেজার আটক প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা।

৭ই ফাল্গুন—

দিল্লীতে ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার বাজেট পেশ। ভরতপুরের মহারাণীর বিমানপোতে ৮ শত মাইল ভ্রমণ। কিশোরগঞ্জে মুসলমান কর্ত্তৃক কালীপ্রতিমা ভঙ্গে হুলস্থূল। বলভপুরে (হুগলী) বিগ্রহ চুরি। মরক্কোর রিফ নেতা আবদুল করিম খলিফা-পদ প্রার্থী। শ্রীরামপুরে অগ্নিকাণ্ড, ৫ হাজার টাকা ক্ষতি।

৮ই ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অশ্লীল পুস্তক প্রচার সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত। রাষ্ট্রীয়-পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেষ। ব্রহ্ম জেলে বাঙ্গালার রাজবন্দীদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের কথা। সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত। চীনে বলশেভিক ষড়্যন্ত্র। সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ভারত-সরকারের রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত।

৯ই ফাল্গুন—

২৪ পরগণা হাবড়া গ্রামে বীভৎস হত্যাকাণ্ড। বোম্বাই বাজেটে ৪১ লক্ষ টাকা ঘাটতি। এলাহাবাদে প্রাদেশিক মুসলেম লীগের অধিবেশন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসব। ব্রহ্মদেশে ৪০টি রাজনীতিক সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত।

১০ই ফাল্গুন—

মান্দ্রাজে জমীদারে-প্রজায় ভীষণ দাঙ্গা। বিহার-লাট সার হেন্‌রী হুইলার ছুটী লওয়ায় সার হিউ-ম্যাকফারশন অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত। ইচাংএ চীনা সৈন্য কর্ত্তৃক মার্কিণ-জাহাজ আটক।

১১ই ফাল্গুন—

ভারত-সরকারের বাজেট আলোচনায় দিল্লীতে স্বরাজ্য ও স্বতন্ত্র দলের সভা। মহাত্মা গন্ধীর কাথিয়াবাড় ভ্রমণ শেষ। আর্থার কনটের ব্রহ্ম পরিভ্রমণ। হাওড়ার নূতন সেতুনির্ম্মাণ প্রসঙ্গে লাট প্রাসাদে পরামর্শ সভা। ঢাকা মাণিকগঞ্জ নায়চি গ্রামে ভীষণ নারী-নির্য্যাতন। বীরভূমে রাজবন্দী অনন্ত মুখোপাধ্যায় পীড়িত। দিল্লীতে ব্যবস্থাপরিষদে রেলওয়ে বাজেটের কথা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে পাগলা গারদের কথা আলোচনা।

১২ই ফাল্গুন—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আজমীর মাড়োয়ারায় ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের কথা। বোম্বায়ে পার্শীবাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড—লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি। কাবুলে আহমদীয় হত্যায় কলিকাতা হইতে প্রতিবাদ। দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাজেট আলোচনা। লাক্ষ্ণৌয়ে করনির্দ্ধারণ তদন্ত কমিটী। পঞ্জাবে রেলে মোটরে ভীষণ সংঘর্ষ—বহু লোক হতাহত।

১৩ই ফাল্গুন—

মথুরায় দয়ানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব শেষ। বিমানবীর ত্রণের ভারতত্যাগ। মুঙ্গেরে ব্যাঙ্কে সশস্ত্র ডাকাতি, পিস্তলের গুলীতে পাঞ্জাবি খুন। অর্জ্জুনলাল শেঠী কর্ত্তৃক পাওনিয়ারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্বাস্থ্যোন্নতি। বিলাতে কমন্স সভায় বোম্বাইবাসী শিশুদিগকে অহিফেন খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার কথা। ব্যবস্থাপরিষদে পণ্ডিত নেহরুর রেলওয়ে ব্যয়হ্রাসের প্রস্তাব বাতিল—স্বতন্ত্র দলের বিরুদ্ধবাদ। উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র ও রায় বাহাদুর সুদামচন্দ্র নায়েকের মৃত্যু।

১৪ই ফাল্গুন—

কলিকাতায় বিপ্লববাদ সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, মধুসূদন সান্ন্যাল কালীশঙ্কর গাঙ্গুলী ও সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনা—কোরামের অভাবে সভা মুলতুবী। পাটনা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপ্রসাদের পদত্যাগ। খিলাফৎ ডেপুটেশনের উপর কড়া হুকুম—দশ মিনিটের নোটিশে পেশোয়ার ত্যাগ। ত্রিপুরা জেলার যমুনা গ্রামে বোমা সহ ডাকাইতি। মহাত্মাজীর কোহাটগমনে আবার বাধা।

১৫ই ফাল্গুন—

ইন্দোরে ভীষণ মোটরলরী দুর্ঘটনা, ২৩ জনের মৃত্যু। হাওড়া হইতে নাজিমুদ্দী আহম্মদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনা। খদ্দর প্রচারে গুণ্টুর জেলা বোর্ডের বিপদ।

১৬ই ফাল্গুন—

জার্ম্মাণ সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি ইবার্টের মৃত্যু। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য আইন। রাইও-ডি-জেনেরোতে তেলের গুদামে অগ্নিকাণ্ড—১শত মৃত, ৬শত জখম। বাবর আকালী মামলায় ৫ জনের প্রাণদণ্ড, ১১ জনের দ্বীপান্তর। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনা, আবার কোরামের অভাব।

১৭ই ফাল্গুন—

হাওড়া মিউনিসিপালিটীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা। মাণিকগঞ্জে পুলিসের গুলীতে ডাকাইত খুন। মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টায় নাগপুরে হিন্দু মুসলমানে আপোষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যারিষ্টার আর, কে, দাসের দান। বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ উৎসব। দিল্লীতে মিলন বৈঠকের অধিবেশন—হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা আলোচনা।

১৮ই ফাল্গুন—

আসানসোল চরণপুর কয়লার খনিতে অগ্নিকাণ্ডে ১ কোটি টাকা ক্ষতি। লাহোরে দর্জ্জির দোকানে অগ্নিকাণ্ডে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতি। আসামে গভর্ণর কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট আলোচনা। কাশিমবাজার মহারাজার কলিকাতাস্থ রাজবাটীতে শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী। ঘারপুটে লুঠতরাজ, সামরিক ডিপোতে অগ্নিসংযোগে, ১শত বিদ্রোহী ও

৬০ জন সহরবাসীর মৃত্যু। বোম্বায়ে নূতন মেডিকেল কলেজ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বড়লাটের বক্তৃতা। আসাম-ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট পেশ। হিন্দু মুসলমান সমস্যায় মহাত্মাজী ও পণ্ডিত নেহরুর ইস্তাহার। বোম্বায়ে বিরাট ধর্ম্মঘটে বাজারে জিনিষ বিক্রয় বন্ধ।

১৯শে ফাল্গুন—

ভারত সরকার কর্ত্তৃক বোম্বায়ের বার্ষিক হাজত না হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিবাদ। নড়াইল জমীদার কাছারীতে ডাকাইতি। লাহোরে আবার লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট পেশ। মাদ্রাজে জমীদার বাড়ীতে বোমা দ্বারা ডাকাইতি। ব্যবস্থাপরিষদে বাজেট আলোচনা। তুরস্ক গভর্ণমেন্টের পদত্যাগ, মিশরে সংবাদপত্রসম্পাদক নির্ব্বাসিত। হাওড়া কেন্দ্রে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জাল পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার।

২০শে ফাল্গুন—

এক বৎসর পরে মধ্যপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় অহিফেন বিক্রয় বন্ধ ব্যবস্থা। বড়লাটের বিলাতগমনে বাঙ্গালার গভর্ণর সেই পদে নিযুক্ত। মহাত্মার ভাইকম যাত্রা। নোয়াখালিতে লোকাল বোর্ড নির্ব্বাচনে মারামারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমন।

২১শে ফাল্গুন—

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান পণ্ডিত জহরলালের পদত্যাগ। রাষ্ট্রীয় পরিষদে অহিফেন ব্যবহার সঙ্কোচ ব্যবস্থা। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত। মেদিনীপুর বাঁকতলায় গ্রামবাসী ও ডাকাইতে যুদ্ধ। বিপ্লববাদ সম্পর্কে কলিকাতায় শম্ভুনাথ দে গ্রেপ্তার।

২২শে ফাল্গুন—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে গভর্ণরের বক্তৃতা। বাঙ্গালোরে প্রিন্স আর্থার। পার্লিয়ামেন্টে চেম্বারলেনের বক্তৃতায় গণ্ডগোল, শ্রমিক সদস্যের সভাত্যাগ। বোম্বায়ে বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারী ব্যবস্থা। ইডেন হোষ্টেলে এম, এ, ক্লাসের ছাত্রের আত্মহত্যা।

২৩শে ফাল্গুন—

তুরস্কে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত। লর্ড কার্জ্জনের সাংঘাতিক পীড়া। কৃষ্ণনগরে জিলাবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন। মাদ্রাজে মহাত্মা গন্ধী, তিলকঘাটে অভিনন্দন প্রদান। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত।

২৪শে ফাল্গুন—

শাসনসংস্কার তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ। পাটনায় নেতৃসমাগম, দাশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা। কলিকাতা এলবার্ট ইনষ্টিটিউটে সমাজসেবা কনফারেন্স। বোম্বায়ে নূতন মহিলা শান্তিরক্ষক-নিয়োগ। কলিকাতায় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের আদেশে হিন্দু দেবস্থান ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস।

২৫শে ফাল্গুন—

সার হিউ কার বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত নবাব। নবাবালি চৌধুরী ও সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী বাঙ্গালায় মন্ত্রী নিযুক্ত। দিল্লীতে লর্ড লিটনের কার্য্যভার গ্রহণ। মাদ্রাজ ইরোদ ষ্টেশনে রেল-শ্রমিক সভা কর্ত্তৃক মহাত্মার অভিনন্দন। মহাত্মার কোচিন গমন।

২৬শে ফাল্গুন—

এলাহাবাদে ৩ দিন অস্ত্রব্যবহার নিষিদ্ধ। ফৈজাবাদে স্নানঘাটে দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু। বিপ্লববাদ সম্পর্কে কাশীতে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। সার উইলিয়াম রীড বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত। পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে বিহারে আমাওয়রাজের ৫০ হাজার টাকা দান।

২৭শে ফাল্গুন—

ত্রিবাঙ্কুরে রাজমাতা কর্ত্তৃক মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ। বাঙ্গালোরে ৫০ হাজার টাকার জাল নোট ধরা। কলিকাতা বড়বাজার চিনিপটিতে বিরাট বাড়ী ভূমিসাৎ। কুমিল্লা অভয় আশ্রমে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রসিদ্ধ মারাঠী পণ্ডিত রায় বাহাদুর গুপ্তের মৃত্যু।

২৮শে ফাল্গুন—

বোম্বায়ে ভীষণ জালিয়াতি, ব্যাঙ্ক হইতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উধাও। চীনের গণতন্ত্র শাসনের নায়ক সান-ইয়াট সেনের মৃত্যু। ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ। কলিকাতার চীনাপল্লীতে বহু অস্ত্রশস্ত্র ধরা। কাশীপুর ফুলবাগানে ফ্রি হাই স্কুল করিবার জন্য ৺গোপেশ্বর মল্লিকের স্ত্রী কর্ত্তৃক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা দান।

২৯শে ফাল্গুন—

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রি-বেতন না-মঞ্জুর, বার্ষিক ২ টাকা বেতন স্থির। রেঙ্গুনে বন্দুকের গুলীতে য়ুরোপীয় খুন। হোলীতে ঝরিয়ায় ভীষণ গণ্ডগোল। ব্যবস্থাপরিষদে সরকারের অহিফেন-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা। মিশরে প্রাচীন কীর্ত্তির আবিষ্কার। লর্ড কর্জ্জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। হাজিগঞ্জে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

৩০শে ফাল্গুন—

ভারত সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বড়লাটের শাসন-পরিষদের সমস্ত ব্যয় না-মঞ্জুরের প্রস্তাব গৃহীত। জাতিসঙ্ঘের অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত সন্ধি বৃটেন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত। চিত্তরঞ্জন দাশের কলিকাতা আগমন। মিঃ হর্ণিম্যানের ভারতে প্রত্যাগমনে বোম্বাই সরকারের অসম্মতি। তারকেশ্বরে রিসিভার-নিয়োগের জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নিবেদন। যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব।

১লা চৈত্র—

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় মুডীম্যান কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা। নৈহাটী-বালকহত্যায় মামলায় আসামীর ৭ বৎসর কারাদণ্ড। ব্রহ্মদেশে চণ্ডনীতি—৪০টি সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। ত্রিবিন্দ্রমে মহাত্মা গন্ধী।

২রা চৈত্র—

ব্যবস্থা-পরিষদে ফাইনান্স বিলের আলোচনা। কুমারিকা অন্তরীপে মহাত্মা গন্ধী। রাজদ্রোহের অভিযোগে কানপুরে 'বর্ত্তমান' সম্পাদক অভিযুক্ত। রাষ্ট্রীয় পরিষদে সীমান্ত-সমস্যার আলোচনা। খলিফা-সমস্যার সমাধান, রাজনীতিক ভাববর্জ্জিত ধর্ম্মগুরু নিয়োগ। পাণিহাটীতে (২৪ পরগণা) গভর্ণর, নলকূপ প্রতিষ্ঠা। দিল্লীতে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে দাঙ্গা।

৩রা চৈত্র—

সার ইভান কটনের ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবার কথা। ব্যবস্থা পরিষদে লবণ-শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব না-মঞ্জুর। কলিকাতায় আবার ট্যাক্সি ডাকাইতি। বোম্বাই ভবনগরে পুলিস

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খুন। নোয়াখালিতে নির্ব্বাচন বিভ্রাট, ফেণী লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব। ব্যবস্থা-পরিষদে পোষ্টকার্ডের মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব না-মঞ্জুর।

৪ঠা চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবগারী ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব। নাটোরের মহারাজা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত। দিল্লীতে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেবমূর্ত্তি ভঙ্গ। মহাত্মা গন্ধীর ভাইকম ত্যাগ। রেঙ্গুনে অগ্নিকাণ্ডে হোহো সহর ভস্মীভূত। চট্টগ্রামে দেশকর্ম্মী সৈয়দ হোসেনের সম্বর্দ্ধনা। বোম্বাই সহরে গোপনে অস্ত্র আমদানীতে আফগান ছাত্র অভিযুক্ত। ব্রহ্মে অগ্নিকাণ্ডে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

৫ই চৈত্র—

জাপানের দ্বিতীয় বিপদ, টোকিওতে অগ্নিকাণ্ড, ৩ হাজার গৃহ ধ্বংস, ২০ হাজার লোক গৃহহীন। পীড়ার পর সম্রাটের রাজকার্য্যে যোগদান। বোম্বায়ে ট্যাক্সি ডাকাইতি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মুডীম্যান রিপোর্টের নিন্দা। অর্ডিনান্সে ধৃত শম্ভুনাথ দের মুক্তি।

৬ই চৈত্র—

রাষ্ট্রীয় পরিষদে ফাইনান্স বিলের আলোচনা। সার উইলিয়ম বার্ডউড ভারতের জঙ্গীলাট নিযুক্ত। মেষ্টন ব্যবস্থার হাজত না হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বন্ধ। লর্ড কার্জ্জনের মৃত্যু। খাঁ বাহাদুর চৈসুদ্দীনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত। মার্কিণে ভীল সহরে ভীষণ ঘূর্ণা বাত্যা, ১ হাজার লোক নিহত ও ২৭ শত লোক আহত।

৭ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণরের ব্যাণ্ডের খরচ না-মঞ্জুর। চাঁদপুর পুরানবাজারে অগ্নিকাণ্ড। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জেনোয়া গমন। মান্দ্রাজে মহাত্মা গন্ধী। পার্লামেণ্টে বিষম কাণ্ড, সদস্যবৃন্দের মধ্যে হাতাহাতি ও ঘুষাঘুষি, অধিবেশন বন্ধ।

৮ই চৈত্র—

প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েদী কর্ত্তৃক কয়েদী খুন। বিলাতে বাঙ্গালী ডাক্তার মণীন্দ্র বসু সম্মানিত। সার হিউ ম্যাকফারসন বিহারের অস্থায়ী লাট নিযুক্ত। মান্দ্রাজে মহাত্মা গন্ধী কর্ত্তৃক কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের প্রতিকৃতি উন্মোচন। কলিকাতা হইতে আগড়পাড়া—১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা।

৯ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর বেতন নাকচ, নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রস্তাব গৃহীত। হাইকোর্টে চন্দ্রমাসাইর মানহানি মামলার রায়, পুনর্বিচারের আদেশ। বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা বড়লাট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় অর্ডিনান্স সমর্থন। মিশরে মন্ত্রী জগলুল পদত্যাগ।

১০ই চৈত্র

বাঙ্গালার মন্ত্রিদ্বয়ের পদত্যাগ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিচার, কয়েদী ও পুলিস ব্যয় বরাদ্দ। মহাত্মা গন্ধীর দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ শেষ। লালা লজপৎ রায় হিন্দু-মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত। যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভাতে কারাগারে কালা-ধলার ব্যবহার-বৈষম্যের কথা।

১১ই চৈত্র—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গোয়েন্দা পুলিসের কার্য্য সমালোচনায় গোলমাল। কলিকাতা কর্পোরেশনে মাদক বিক্রয় নিষেধের প্রস্তাব গৃহীত। অমৃতসরে ২ জন শিখ নেতা গ্রেপ্তার। ব্যালফোরের গমনে জেরুজালেমে হরতাল। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক বেশ্যা তাড়াইবার চেষ্টা।

১২ই চৈত্র—

জব্বলপুরে কালীর নিকটে নরবলিতে আসামীর ফাঁসির হুকুম। বোম্বায়ে বাওলা হত্যার মামলা আরম্ভ। ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগণের প্রতি সভাপতির ব্যবহারের প্রতিবাদে ব্যোমকেশ ও চিত্তরঞ্জন। কোহাট-সমস্যায় মৌলানা সৌকত আলির সহিত মহাত্মার মতভেদ। বঙ্গীয় ব্যাববস্থাপক সভায় স্বরাজ্য ও স্বতন্ত্র দলের সকল সদস্যের অনুপস্থিতি। তারকেশ্বরে মহাবীর দলের সেবকের উপর ছুরী—আঘাত সাংঘাতিক। বোম্বায়ের মাগদেবীতে অগ্নিকাণ্ডে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতি।

১৩ই চৈত্র—

বোম্বায়ে মহাত্মার সম্বর্দ্ধনা। ঢাকায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে করদাতাদিগের আপত্তি। মৌলবী ফজলল হকের দলের ইস্তাহার, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের কারণ প্রকাশ। কলিকাতায় এক দল গুণ্ডা গ্রেপ্তার। হাইকোর্টের জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকাল বৃদ্ধি। আবার দিল্লী দরবার হইবার প্রস্তাব।

১৪ই চৈত্র—

বাওলা হত্যার মামলায় উদ্ধারকারীদিগের সাক্ষ্য। দিনাজপুরে চলন্ত ট্রেণে য়ুরোপীয় টিকিট পরিদর্শক কর্ত্তৃক ভারতীয় রমণীর ধর্ম্মনাশ। তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে বাঁশবেড়িয়ায় লাইব্রেরী কনফারেন্স। ভারতের জঙ্গীলাট লর্ড রলিনসনের মৃত্যু। হুগলীতে তারকেশ্বর মামলার শুনানী।

১৫ই চৈত্র—

ডাক ও তার বিভাগে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব। অর্ডিনান্সে পাবনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস গ্রেপ্তার। লক্ষ্ণৌ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মামলায় ৮ লক্ষ টাকা জরিমানা। মুক্তাগাছায় মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু-নারী নির্য্যাতন। বোম্বায়ে ওয়াডিয়ার ১৬ লক্ষ টাকা দান। নদীয়ায় ধীবর সম্মিলন।

১৬ই চৈত্র—

হাইকোর্টে ফরিদপুর বোমার মামলার আপীল মঞ্জুর। অযোধ্যার ডেপুটী কমিশনারের শঙ্খকোবিয়া। বাওলা হত্যা মামলায় মমতাজ বেগমের নিবেদন। ওয়াহেদ হোসেন কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত।

১৭ই চৈত্র—

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আলোচনা। প্যারিসে ছাত্র-বিদ্রোহ। বিলাতে কমন্স সভায় বাঙ্গালার রাজবন্দীদের কথা। রঙ্গপুরে নারীনিগ্রহ—ধৃতমণি বৈষ্ণবীর কাহিনী। মেদিনীপুরে অদ্ভুত ছেলেধরা। কলিকাতা, হাওড়া ও আলিপুরের ট্রেজারী হইতে টাকা চুরি। পাতিয়ালার আকালী দল গ্রেপ্তার।

১৮ই চৈত্র—

মান্দালয়ে অগ্নিকাণ্ড, ৬০ হাজার টাকা ক্ষতি। বারতাজার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তহবিল তছরুপের মামলা। তেলিনীপাড়া

স্কুলের মামলা ডিসমিস। প্যারিসে ছাত্র ও পুলিসে ভীষণ দাঙ্গা। চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে পুনর্নির্ব্বাচিত। পাটনায় লালা লজপৎ রায়। এসোসিয়েটেড প্রেসের উষানাথ সেনের বিলাত যাত্রা। তারকেশ্বর মামলার রায়—মিটমাটের সর্ত্ত বে-আইনী।

১৯শে চৈত্র—

বর্দ্ধমান রায়নগরে ভীষণ ডাকাইতি। মাদ্রাজে কৃষ্ণা জিলা দ্বিধা বিভক্ত। বড়লাট কর্ত্তৃক বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা ব্যবস্থা পরিষদের বহু নির্দ্দেশ নাকচ। ত্রিবাঙ্কুরে ইংরাজ দেওয়ান নিয়োগে হিন্দু প্রজাবৃন্দের আপত্তি। লর্ড বার্কেণহেড কর্ত্তৃক চিত্তরঞ্জন দাশের উক্তির উত্তর প্রদান। কলিকাতায় ম্যাডান কোম্পানীর গৃহে অগ্নিকাণ্ডে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি।

২০শে চৈত্র –

কুচবিহার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কর্ত্তৃক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার টাকা দান। বাঙ্গালার নানা স্থানে ডাকাইতি। নিমতলা কাঠের গোলায় অগ্নিকাণ্ড। মাদ্রাজে ডাকঘরের কেরাণীর জাল নোটের কারবার। রেঙ্গুনে জুয়ার আড্ডায় ২৮ জন চীনা গ্রেপ্তার। লর্ড বার্কেণহেডের উত্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ।

২১শে চৈত্র—

অস্ত্রসংগ্রহের ষড়্‌যন্ত্রে কলিকাতায় বাঙ্গালী ও চীনার বিরুদ্ধে মামলা। ভারতে তুর্কী ডেপুটেশনের ভ্রমণ। মৈমনসিংহে ভাটকুরায় ডাকাইতি, ৫০ হাজার টাকা অপহৃত। সার উইলিয়ম করেঙ্গ ব্রহ্মের অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত।

২২শে চৈত্র—

মৈমনসিংহে অর্ডিনান্সে সুধাংশুকুমার অধিকারী গ্রেপ্তার। পাটনা ষ্টেশনে ভারতীয় উচ্চপদস্থ যাত্রীর লাঞ্ছনা। পুনার পোষ্টাফিস হইতে ৩ হাজার টাকার টিকিট চুরী।

২৩শে চৈত্র—

হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্‌সারীর য়ুরোপ যাত্রা। জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে বিডন স্কোয়ারে বিরাট সভা। ভূতপূর্ব্ব পারস্য নৃপতির মৃত্যু। বুলগেরিয়ার কমুনিষ্ট ষড়্‌যন্ত্র। কলিকাতায় ৩ বৎসরে ৮ হাজার ১ শত ৫৭ গো-বৎস হত্যা।

২৪শে চৈত্র—

রেঙ্গুনে কর-কমিটী। জাপানী অধ্যাপকের ভারত আগমনে বাধা। কলিকাতা গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে কাশিমবাজারের মহারাজার আড়াই লক্ষ টাকা দান। য়ুরোপের মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে জাপান-যুবরাজের গ্রন্থ। মিষ্টার ব্যাপটিষ্টা বোম্বাই কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত। চলমচেটী মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত। কনখলে নিখিল ভারত বৈদ্য সম্মিলন।

২৫শে চৈত্র—

আসাম দারাং চা-বাগানে কুলী-বিদ্রোহ—ম্যানেজার খুন। পুলিস সার্জ্জেন্ট কর্ত্তৃক বসুমতী ও ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ডিসমিস। ফরাসীরাজ্য হইতে মানবেন্দ্র রায় নির্ব্বাসিত। ভারতীয় পার্শী জলবেলেম বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত। বসিরহাটে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। মক্কা অবরুদ্ধ, মক্কাবাসীদের চাঞ্চল্য। মরিয়ায় লালা লজপৎ রায়।

২৬শে চৈত্র—

কোহাটে সনাতন ধর্ম্মসভা-সম্পাদকের কারাদণ্ড। স্বরাজ্য ও মডারেট দলের মিলন সম্পর্কে লালা লজপৎ রায়। লক্ষ্ণৌ কাগজের কলে ধর্ম্মঘট। মেদিনীপুর পাঁচেটগড়ে বিগ্রহ চুরী।

২৭শে চৈত্র—

লালা লজপৎ রায়ের কলিকাতা আগমন। পাবনা সাহাজাদপুরে অগ্নিকাণ্ডে দেড় শত গৃহ ভস্মীভূত। নড়াইলে পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা। দামাস্কসে লর্ড ব্যালফোরের লাঞ্ছনা। লর্ড রেডিংএর বিলাতযাত্রা।

২৮শে চৈত্র—

কলিকাতা হ্যালিডে পার্কে লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বর্দ্ধমানে রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ের সভাপতিত্বে অষ্টম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন। মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশন।

২৯শে চৈত্র—

ঢাকায় নর্থব্রুক হলে ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনন্দন। বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের অমর বিশ্বাসের ক্যাম্বিসের নৌকায় গমন। নওগাঁওএ আসাম শিক্ষা সম্মিলন। লণ্ডনে ভারতীয় কর্ত্তৃক নাচওয়ালী খুন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ। বড়া স্কুলগৃহ নির্ম্মাণে চুচুঁড়ার নিবারণ মুখোপাধ্যায়ের ৫০ হাজার টাকা দান। খিদিরপুর ডকে শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা। হ্যালিডে পার্কে হিন্দু মহাসভা।

৩০শে চৈত্র—

জালিয়ানওয়ালা স্মৃতি-দিবসে মির্জ্জাপুর পার্কে বিরাট জনসভা। জাফর আলি লাহোর হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত। যুক্তপ্রদেশে (কানপুর) মডারেট বৈঠক। বিহারে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। পঞ্জাব সেবা সমিতিতে (কলিকাতা) লালাজীর সম্বর্দ্ধনা। কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্য্য শেষ। আর্ল বেলফোরকে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র।

১লা বৈশাখ—

মহাত্মার বাঙ্গালা ভ্রমণের তালিকা প্রকাশ। ব্রহ্মে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় ১ জন মৃত, ১৭ জন আহত। লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতির বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ পরিদর্শন। পঞ্জাবে রেল ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতি। বোম্বায়ে মহাত্মাজীর বক্তৃতা—দেশ সার্ব্বজনীন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত নহে। দিল্লীতে অহিফেনে ৫ জন গ্রেপ্তার। ত্রিপুরার পুলিস কর্ত্তৃক নৌ-ডাকাত দল ধৃত। যুবরাজের আফ্রিকা ভ্রমণ—নাইগেরিয়া যাত্রা। মক্কৌতে নারীনির্য্যাতনে পুরোহিতের কারাদণ্ড।

২রা বৈশাখ—

বিবেকানন্দ-ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নির্ব্বাসন দণ্ড রদ। বহরমপুর পাগ্‌লা গারদ রাঁচীতে স্থানান্তরিত। রঙ্গপুর তিস্তায় ভীষণ নারী-নিগ্রহ। চট্টগ্রামে ৩৩ সের আফিম চুরী। মাদ্রাজে ট্রেণ দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু। রঙ্গপুরে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে লালা লজপৎ রায়। বাওলার উইলের মামলা—আপত্তি অগ্রাহ্য। পঞ্জাব রেল ধর্ম্মঘটে বহু লোক গ্রেপ্তার। দিল্লীতে জুয়াড়ীর আড্ডায় ৩৭ জন গ্রেপ্তার। আঙ্গোরায় সেখ সৈয়দকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা।

৩রা বৈশাখ—

কংগ্রেস, দাশ-ইস্তাহার ও আন্তর্জাতিক মিলন সম্পর্কে মহাত্মার অভিমত প্রকাশ। বসিরহাটে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মিটমাট।

ঢাকায় জাল নোটে ৩ জন গ্রেপ্তার। কাবুলে ইংরাজ দূতাবাস নির্ম্মাণ আরম্ভ। কলিকাতার চাবড়ার বাজারে ধর্ম্মঘট। সিন্ধু হায়দ্রাবাদে ভীষণ হত্যাকাণ্ড। অমৃতসরে স্বতন্ত্র শিখ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা। শ্রীহট্টে জনশক্তি কার্য্যালয়ে পুলিসের হানা। কলিকাতা কর্পোরেশনে লালাজী ও মালবাজীর অভিনন্দন। করাচীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।

৪ঠা বৈশাখ—

যশোহর আউড়িয়া গ্রামে নারীনির্য্যাতন। অর্থ তদন্ত কমিটীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাক্ষ্য প্রদান। মেদিনীপুর লাখি গ্রামে ডাকাইতি—গ্রামবাসীর সহিত ডাকাইত দলের লড়াই। আসাম গোয়ালপাড়ায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র সম্বন্ধে হাই কমিশনারের ঘোষণাপত্র।

৫ই বৈশাখ—

আফ্রিকাবীর রইস্‌লীর মৃত্যু। খুলনা জেলার আটরা গ্রামে অদ্ভুত বালকের আবির্ভাব। মহাত্মার সূতাকাটা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বোম্বায়ের বিঠলভাই পেটেলের বিদ্রোহ ঘোষণা। কুর্দ্দ বিদ্রোহের অবসান—সেখ সৈয়দের প্রাণদণ্ডাদেশ। বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ—সামরিক আইন জারিতে ২ শত মৃত, ২ হাজার আহত। কায়রোতে নির্ব্বাচন হাঙ্গামাকারীদের শাস্তি।

৬ই বৈশাখ—

লিসবনে সৈন্যদলের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা। কলিকাতা রাজাবাজারে মুসলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা। আসাম বগরীবাড়ীতে জমীদারের পাগলা হাতীতে ২২ জন লোক খুন। মান্দালয় জেলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস অর্শরোগে সাংঘাতিক পীড়িত। ফরিদপুরে লোংসিংএ মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ। টাঙ্গাইল বাজাইলে হিন্দুর গৃহে গো-বধ।

৭ই বৈশাখ—

বিপ্লববাদের পুস্তিকাপ্রচারে মোগল সরাইয়ে গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীতে জাহাজ ডুবী। যুবরাজের পূর্ব্ব-আফ্রিকা ভ্রমণ শেষ। হাওড়া জোমজুড়ে খুড়া কর্ত্তৃক ভাইপো খুন। কুর্দ্দ বিদ্রোহের জের—২৩ জনের ফাঁসি। সীমান্তে ইংরাজ সৈন্যদের সহিত দস্যুদলের যুদ্ধ—১৬ জন হত।

৮ই বৈশাখ—

কুচবিহার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় রাণীর জেরা শেষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় দাঙ্গা, জনতার উপর গুলী, ৪ জন হত ও ২১ জন আহত। আমেদাবাদে মহাত্মা গন্ধী—শরীর দুর্ব্বল। শ্রীমতী সরলা দেবীর লক্ষ্ণৌ হইতে লাহোর যাত্রা। বাওলা হত্যা মামলায় আসামী ফাঁসের পক্ষ সমর্থনের জন্য শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বোম্বাই যাত্রা।

৯ই বৈশাখ—

সাইকেলে ভূ-ভ্রমণকারী ইতালীয় যুবকের অমৃতসর গমন। বাওলা হত্যার মামলায় ইন্দোর হইতে ৮৫ জন সাক্ষীর তলব। নাগপুরে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে ম্যাজিষ্ট্রেটের অদ্ভুত আদেশ। কলিকাতায় এতিমখানা নির্ম্মাণে আবদার রহিম ওসমানের বহু অর্থ দান। পারস্যে বিদ্রোহে মহম্মরায় সেখ সার খাজলখান বন্দী। মাদ্রাজে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মাথা ফাটাফাটি। পঞ্জাবে রেল-ধর্ম্মঘটে ২০ হাজার লোকের যোগদান।

১০ই বৈশাখ—

'বসুমতী' আফিসের কেরাণীদের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ। মৈমনসিংহে বিবাহ-বিভ্রাট, ব্রাহ্মণযুবকের বৈদ্যকন্যা বিবাহের চেষ্টা। পাটনা ষ্টেশনে খদ্দর পরিধানে কেলনারের খানসামার হাতে অপমান। পুরীতে লালা লজপৎ রায়। পাটনায় নূতন মেডিকেল কলেজ।

১১ই বৈশাখ—

হুগলী জজ আদালতে তারকেশ্বর মামলার শুনানী. আদালতে মোহান্ত ও প্রভাতগিরি। রাজবন্দী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নোয়াখালি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত। কোচিনে ভীষণ ঝড়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যুবরাজকে বয়কট করিবার কথা। কাণপুরে 'বর্ত্তমান' সম্পাদকের কারাদণ্ড। রেঙ্গুনে হাইকোর্টে ভিক্ষু উত্তমের আপীল না-মঞ্জুর। মসলীপট্টমে স্ত্রীলোকের ফাঁসীর আদেশ।

১২ই বৈশাখ—

শ্রীযুত যোশীর জেনিভা যাত্রা। নাগপুরে ভীষণকাণ্ড, হত্যাকারীর আত্মহত্যা। ই. বি. রেলের নূতন ব্যবস্থার আয়োজন। সম্রাটের লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতায় রমজান উৎসব।

১৩ই বৈশাখ—

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে রামকৃষ্ণ স্মরণোৎসব। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের 'বেঙ্গলীর' সম্পাদক পদত্যাগ। সোফিয়ায় ষড়যন্ত্রকারীদের উপর গুলী।

১৪ই বৈশাখ—

আরা সহরে ডাকাতের দল গ্রেপ্তার। বুলগেরিয়ায় সোভিয়েট ষড়যন্ত্র। ফীল্ড মার্শাল ভন হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত। প্যারিসে কমিউনিষ্ট উপদ্রব।

১৫ই বৈশাখ—

চিত্তরঞ্জন দাশের পাটনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। বালিতে নূতন পুল-নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন। মহাত্মা গন্ধীর বোম্বাই গমন, কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর ব্যবস্থা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাদেশিক হিন্দুসভার ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত। মিশর হইতে বৃটিশ-সৈন্য প্রত্যাহার।

১৬ই বৈশাখ—

নড়াইলে জমীদারপুত্র সারদাপ্রসন্ন রায় খুন। বোম্বায়ে গৃহপতনে ৫ জন কুলী চাপা। কলিকাতায় সার মহম্মদ হবিবুল্লা। বাঙ্গালোরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ। সৈয়দ নাজিম ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেহাবসানের ৩ দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ গৃহীত]

দেশবন্ধুর শেষ চিত্র

Copyright

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

৪র্থ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩২ [৩য় সংখ্যা

Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chittaranjan has left for his countrymen is not any particular political or social programme, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented.

Rabindranath Tagore

১লা জুলাই
১৯২৫

আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা কোনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনের আদর্শমন্ত্র নহে; তাহা সেই সৃষ্টিশক্তি-শালী মহাতপস্যা যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যে অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
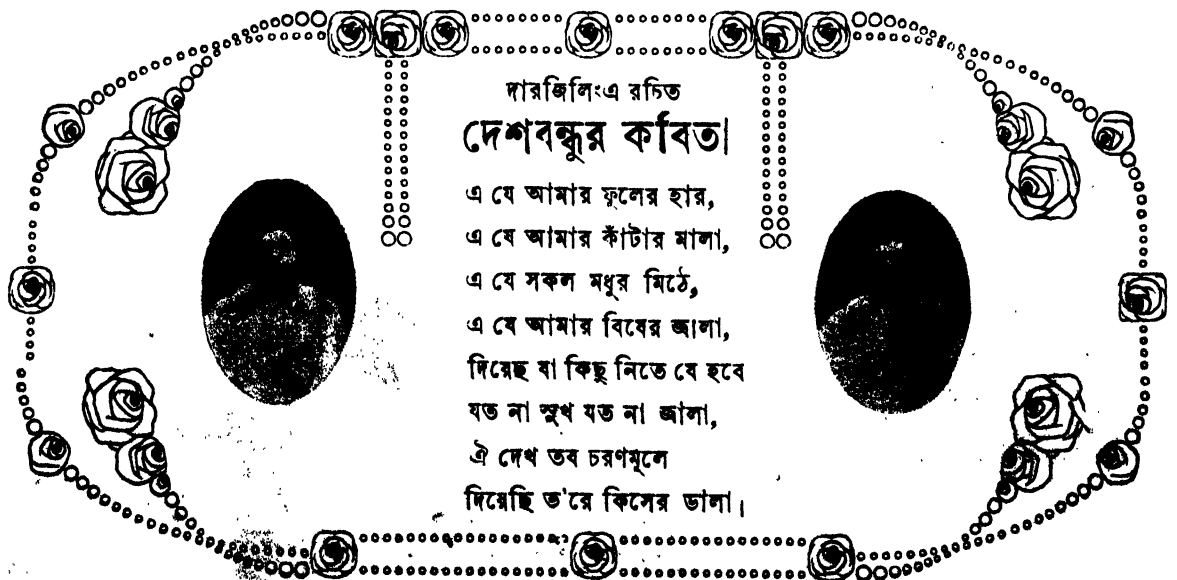
চিত্তরঞ্জনের শেষ কবিতা

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া,
সেই ত হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মূরতি হেরবো ব'লে
পরাণ বড় অভিলাষী ;
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে,
আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার।
এস আমার পরশমাণিক,
বেদবেদান্তে কায কি আর।

কৃতান্তের অত্যাচার
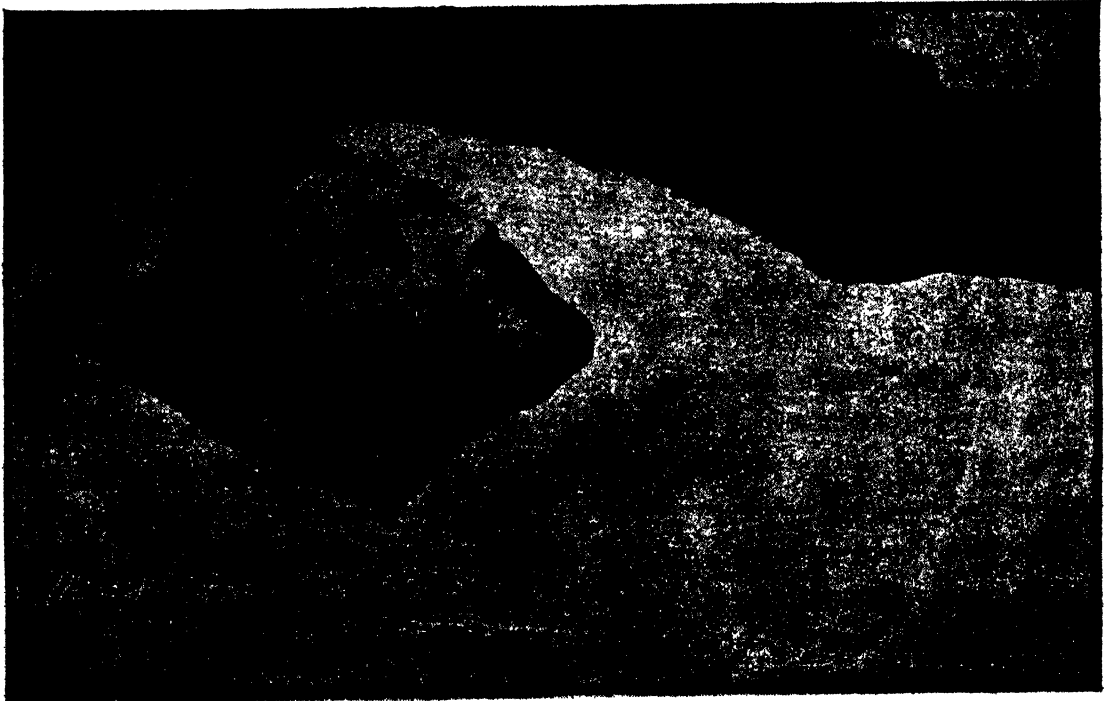
প্রোদ্যৎস্বারাজ্যসূর্য্যোজ্জলকরনিকরৈঃ স্পৃষ্টমাত্রে দিগন্তে
কুঞ্জে কুঞ্জে কবীন্দ্রৈর্ভ্রমরপরভৃতৈর্গীতিভিঃ পূর্য্যমাণে।
ঔৎসুক্যাশাপ্রফুল্লাম্বুজদৃশি নৃগণে বীক্ষমাণে সমস্তা-
স্তৈতদ্যুক্তং বিধাতর্যদয়মপহৃতো দেশবন্ধুর্জনাত্মা॥

উদীয়মান স্বরাজসূর্য্যের সমুজ্জল কিরণসমূহ দিগন্ত স্পর্শ করিয়াছে মাত্র, ভ্রমর ও কোকিল সদৃশ কবীন্দ্রকুলের আবাহনগীতিতে এইমাত্র প্রতি কুঞ্জ মুখরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে আশা ও ঔৎসুক্যের বশে -নয়ন-কমল বিকশিত করিয়া—ঐ নব অভ্যুদয় দেখিবার জন্য বিশ্বের মানবসমূহ চাহিয়া রহিয়াছে—এমন সময় হে বিধাতঃ, জনসমূহের আত্মভূত দেশবন্ধুকে অপহরণ করিয়া তুমি নিতান্ত অনুচিত কার্য্যই করিয়াছ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়া আমাদের দেশ আজ যে বন্ধুসম্পদে হীন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক ত্যাগী মহাপুরুষ যে দেশ হইতে এমন অসময়ে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েন, সে দেশের দুর্ভাগ্যও যে অতুলনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে জননায়কের গৌরব-মণ্ডিত পদে বসিবার শক্তি লইয়া এ পর্য্যন্ত যত লোকাতিগ পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের চিত্তরঞ্জন যে অনন্তসাধারণ ও তুলনাহীন স্বদেশসেবক, তাহা কে না জানে? তাঁহাকে যে একবার দেখিয়াছে ও তাঁহার সহিত ক্ষণিক পরিচয়েরও সৌভাগ্য যে একবার লাভ করিয়াছে, তাহার নিকট তিনি যে সত্য সত্যই চিত্তরঞ্জন ছিলেন ও চিরদিনই চিত্তরঞ্জন থাকিবেন, তাহা ধ্রুব সত্য।

অসময়ে স্বেচ্ছায় অঙ্গীকৃত দারিদ্র্যের তীব্র তাপে দগ্ধ হইতে হইতে নির্ম্মল কাঞ্চনের ন্যায় নয়নরঞ্জন ভাস্বর জ্যোতিতে দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া আমাদের বড় সাধের চিত্তরঞ্জন আজ জীবনসিন্ধুর পরপারে জ্যোতির্ম্ময় দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার সদ্‌ভাবপূত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আজ অমরাবতী নূতন ভাবে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। দেশের জন্য—স্বজাতির জন্য, সর্ব্বস্বত্যাগী তাঁহার ন্যায় সন্ন্যাসীকে পাইয়া ত্রিদিবের জ্যোতির্ম্ময় অধিবাসিগণ আজ যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তাহা যে তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া কেমন করিয়া বুঝিব যে, আজ আমাদের চিত্তরঞ্জন সত্যই জীবিত নাই? তিনি কি সত্যই তাঁহার চিরসাধনার ধন অমরদুর্লভ জন্মভূমি ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছেন? কেমনে বলিব, তিনি আজ তাঁহার বড় আদরের বাঙ্গালায় নাই? ঐ যে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আকুল ক্রন্দনের কোলাহলে মুখরিত হইতেছে, ডাকঘর বা তার-অফিস সমবেদনার করুণ কাহিনী বহিতে বহিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সমবেত বিপুল জনতার শোকোচ্ছ্বাস জড়ীকৃত কণ্ঠে রাশি রাশি শোকপ্রস্তাব তাঁহার বিরহে সমগ্র জাতির অকপট বিরাট ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনি করিতেছে, এই সকল অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশাত্মবোধব্যঞ্জক ব্যাপারনিচয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিবার ও ভাবিবার সামর্থ্য শ্রীভগবান্ যাহাকে দিয়াছেন, কেমন করিয়া সে বলিবে বা

ভাবিবে যে, চিত্তরঞ্জন আজ সত্য সত্যই জীবিত নাই? সে যে মৃন্ময়ী, না, না, চিন্ময়ী দেশমাতৃকার করুণ করস্পর্শে দিব্যনেত্র লাভ করিয়া দেখিতেছে যে, আমাদের সেই এক পরিচ্ছিন্ন চিত্তরঞ্জন কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া আজ কোটি কোটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার বড় সাধের স্বরাজসাধনার বিজয়-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তিনি সিদ্ধির পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন।

তাঁহার অগ্রে, পশ্চাতে পার্শ্বে, অগণিত ভারত-বাসী তাঁহারই স্বরাজ-রথের রজ্জু ধরিয়া তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারই প্রদ-র্শিত পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিক্ষণে সমুপচীয়-মান সেই বিশাল যাত্রিদলের বিরাট জয়ধ্বনিতে ঐ শুন, দিগ্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। নব্যভারতের হৃদয়-রাজ্যে এমন প্রবল-ভাবে প্রবেশ করিয়া এইরূপ অভূতপূর্ব্ব একাধিপত্যের অধি-কার জমাইবার অসাধারণ শক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে কিরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি?

চিত্তরঞ্জন দাশ

আমার মনে হয়, ভারতের পারমার্থিক আত্মার সহিত পরিচয়ই চিত্তরঞ্জনের এই অসাধারণ শক্তিবিকাশের মূল উপাদান। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি যখন সভ্যতার পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া ক, খ পড়িবারও অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারও বহু পূর্ব্বে আমাদের উপনিষদ কিন্তু এই পারমার্থিক আত্মার পরিচয় দিতে যাইয়া গাহিয়াছে—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে" ইতি (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, সুতরাং ভূমাকে জানিতে চাহিবে, তাই ভগবন্, আমি ভূমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"
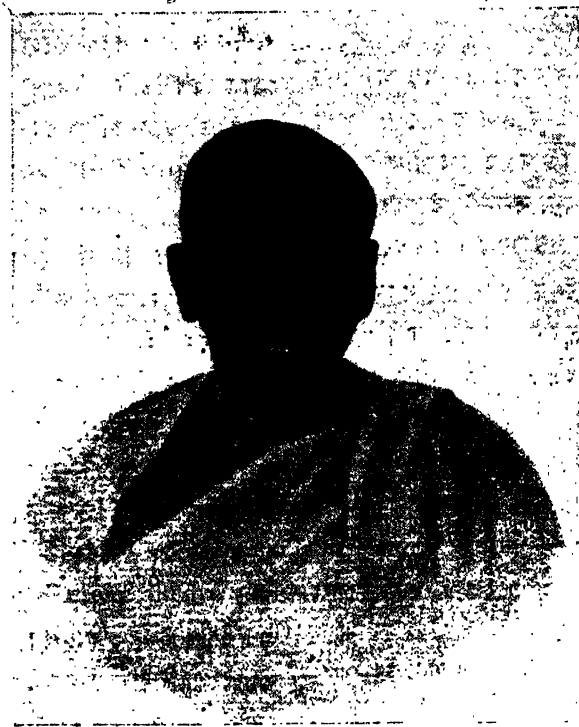
দেবর্ষি নারদের এই ভূমার প্রশ্ন শুনিয়া আচার্য্য সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্‌-বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্‌-বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।"

"যেখানে (মিশিতে পারিলে জীব) অন্য কিছুই দেখে না, অন্য কিছুই শুনে না বা অন্য কোন বস্তু আছে বলিয়া বুঝে না, তাহাই ভূমা; আর যেখানে মিশিয়া যাইলে অন্য বস্তু দেখে, অন্য বস্তু শুনে বা অন্য বস্তু আছে বলিয়া জানে, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত; যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল। নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, সেই ভূমা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? (সনৎকুমার বলিলেন) তাহা নিজ মহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ভারতীয় সভ্যতার মূল অবলম্বন ভারতীয় দার্শনিকতার

সুদৃঢ় ভিত্তি। এই ভূমাত্মাই ভারতের পারমার্থিক আত্মা, ইহাই অমৃত বা মোক্ষ। এই ভূমাত্মার পরিচয় পাইয়াই চিত্তরঞ্জন ব্যবহারিক আত্মার অস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কুক্কুর বা শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহময় ব্যবহারিক আত্মাকে ভূমাত্মদর্শনের বলে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি চিরাভ্যস্ত ভোগসুখ ও তাহার সাধননিচয়কে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগের লীলাক্ষেত্র এই পুণ্য ভারতভূমিতে বহুদিন হইতে বিস্মৃত স্বরাজের সাধনা জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বঙ্গজননীর বড় গৌরবের—বড় সাধের—বড় আদরের সুসন্তান শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষের অভিযোগের সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি ভাবজ্বালাময়ী মর্ম্ম-স্পর্শিনী যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার রাজ-নীতিক্ষেত্রে প্রবেশের প্রথম বিরাট শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। সেই বক্তৃতাই তাঁহাকে নব্যবঙ্গের হৃদয়সিংহাসনে বসিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তখন চিত্তরঞ্জন সে অধিকার আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হয়েন নাই, কারণ, তখনও তাঁহার ভারতের পারমার্থিক আত্মার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই।

ভারতের আদর্শে আবাল্য গঠিত ভূমাত্মদর্শী, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ত্যাগাবতার, মহাত্মা গন্ধীর পূত-সংসর্গেই তাঁহার সেই ভূমাত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল। যেমন সাক্ষাৎকার, অমনি—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

সেই পরাবর আত্মার দর্শন পাইবামাত্র ব্যবহারিক আত্মার বা জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিঁড়িয়া পড়ে, সকল সংশয়ই মিটিয়া যায় এবং বন্ধনহেতু সকল কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আমি পরিচ্ছিন্নশক্তি, দেহসর্ব্বস্ব মানব, এইরূপ হৃদয়ের গ্রন্থি তাঁহার ছিন্ন হইয়াছিল, এত দিন পর্য্যন্ত শিক্ষা, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে আপনার বা আপনার জাতির বিশ্ববিস্ময়করী শক্তির উপর যে সংশয় ছিল, তাহা মিটিয়া গিয়াছিল, আর স্বজাতি-সেবার প্রতিবন্ধক ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি যাহা কিছু কর্ম্ম ছিল, তাহা সকলই খসিয়া পড়িয়াছিল।

সেই মুহূর্ত্তেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নব্যবঙ্গের হৃদয়রাজ্যের বহুকাল হইতে শূন্য সিংহাসন অনন্যসাধারণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের পুত্র হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর তাঁহাকে আর্থিক ক্লেশ যথেষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, পরে স্বীয় বিদ্যা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে দারিদ্র্যের ক্লেশ তিনি নিজ জীবনে দীর্ঘকাল সহিয়া তাহার মর্ম্মন্তুদতা ভাল করিয়া যে বুঝিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তথাপি দেশের জন্য ইচ্ছা করিয়া সেই দারিদ্র্য তিনি আবার গ্রহণ করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ইহার দ্বারা তাঁহার দেশানুরাগ যে কিরূপ তীব্র ও অকৃত্রিম ছিল, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ভাল করিয়া বুঝিবেন। ইহারই নাম দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ। যে দেশে যে জাতির মধ্যে এরূপ অকপট ত্যাগী পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করে, সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য।

তাই বলিতেছি—ভারতের মুক্ত আত্মার সন্ধান এ যুগে তিনি যথার্থই পাইয়াছিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই আত্মতত্ত্বের অনুভূতি করাইয়া অমর করিবার জন্য তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার অধ্যবসায় তাঁহার পরিশ্রম এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার অসাধারণ আত্মবলিদান বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন, সর্ব্বথা অলৌকিক এবং সর্ব্বাংশে অনুকরণীয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে অসীম শক্তিশালী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত নৈতিক মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এই কয়েক বৎসর যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্‌টি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ, এখনও তাহার যথাযথ বিচার করিবার সময় আইসে নাই, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে স্বার্থপরতাশূন্য ও স্বদেশহিতৈষণা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ নাই, তাই তাঁহার কৃত কার্য্য-নিচয়ের সমালোচনা এ ক্ষেত্রে স্পৃহণীয় নহে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি

কথার উল্লেখ নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া করিতে হইল। সে কথাটি এই যে, তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমার বিবেচনায় আস্তিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত নব্যশিক্ষিত উদারপন্থী হিন্দুগণের পরস্পর অবিশ্বাসের ভাব ও তন্মূলক মনোমালিন্য ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং হিন্দুসমাজের অভ্যুদয়ের পক্ষে ইহা কালে যে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় স্বরাজলাভের পথকে প্রত্যবায়সঙ্কুল করিয়া তুলিবে, সে বিষয়ে স্বদেশ-প্রেমিক অভিজ্ঞ ভারতীয়মাত্রেরই প্রণিধান করা একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তিনি অকপটভাবে যে মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট সুবিদিত হইলেও, প্রাচীন রীতিনীতির

রসারোডের আবাসভবন—দেশের সেবায় দেশবন্ধুর দান

একান্ত পক্ষপাতী আস্তিক হিন্দু-সমাজের নেতৃগণের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া একটা বিরাট হিন্দুজাতীয় মহামিলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক চেষ্টা বহু পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মসমাজে অন্তরঙ্গভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও তিনি কন্যার বিবাহকালে সনাতন হিন্দু প্রথানুসারে শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলার সম্মুখে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতসাহায্যে যে সম্প্রদানাদি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, এখনও বাঙ্গালী ভুলে নাই। অবশ্য সে সময়ে তাঁহার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও দেশের আস্তিক-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিবরী ব্যক্তিগণ সেই বিবাহকার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই এবং এই কারণে দেশবন্ধু মহাশয় তৎকালে নিতান্ত দুঃখও প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার এই মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়িনী

চেষ্টা যে সর্ব্বথা বিফল হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

যে দিন হইতে ভারতে স্বরাজলাভের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আস্তিক হিন্দু-সমাজের নেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এই আন্দোলন হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অপর দিকে এই স্বরাজ আন্দোলনের নব্যনায়কগণও তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত, সুতরাং অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া রাজনীতি-ব্যাপারে তাঁহাদের এই ঔদাস্য বা আভিমানিক দূরবর্ত্তিতাকে অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। হিন্দুসমাজের ভিতর এই নব্যতন্ত্র ও প্রাচীনতন্ত্রগণের পরস্পর বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য যে জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা কে দেখিতেছে? ভারতীয় হিন্দুসমাজের উপর প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আধিপত্য অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। নব্যশিক্ষিত যুবকের বা ঐহিকমাত্রসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপেক্ষা বা আপাত মুখরোচক কটু নিন্দাবাদে এই আধিপত্য ফুৎকারে তৃণের ন্যায় উড়িয়া যাইবার নহে, তাহা যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহাদের দূরদর্শিতা কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না; ইহা চিত্তরঞ্জন যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোন জননায়ক এ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট। ভারতকে ভারতীয় আদর্শের উপরই দাঁড়াইতে হইবে, প্রতি জীবে ভগবানের উপাসনাই ভারতীয় আদর্শ, একাত্মবাদ তাহার ভিত্তি ও প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তিই তাহার একমাত্র সাধন; এই সকল কথা তাঁহার প্রাণের কথা ছিল, সুতরাং তিনি যে ধীরে ধীরে প্রতীচীর আদর্শ উপেক্ষা করিয়া প্রাচীর প্রাচীন রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুসমাজের মধ্যেও একটা বিরাট সমন্বয়ের জন্য সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। এই বিরাট সমন্বয়ের সূত্রপাত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকস্মাৎ জীবনসিন্ধুর পরপারে চলিয়া গেলেন, ইহা হিন্দুর জাতীয় জীবনের পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টকর ঘটনা, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝান সম্ভবপর নহে। তিনি চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশের খাঁটি জিনিষ, তাহা এ দেশ হইতে কখনও যায় নাই—যাইতেও পারে না, তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তীব্র আলোকচ্ছটায় তাহা অনেক দিন পরে আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া তিনি আবার নব-জীবন লইয়া এই দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ কালের যবনিকার আবরণে প্রবেশ করিয়াছেন। আবার তিনি নিশ্চয়ই আসিতেছেন, আসিয়া যেন তিনি আমাদিগকে অগ্রসর দেখিতে পায়েন, পশ্চাৎপদ হইতে না দেখেন, এই ভাবেই এখন আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; ইহাই হইল আমাদের বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার শোক ভুলিবার একমাত্র পথ। আশা করি, বাঙ্গালী একাগ্রহৃদয়ে সপ্তকোটি-মিলিত-কণ্ঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়ধ্বনিতে বাঙ্গালার দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এই পথে অগ্রসর হইবে, আর কখনও স্খলিতপদ হইবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বজ্রবাণী

সুদূর ভূধর-শিখর হইতে
ভাসিল বজ্রবাণী!
ভেঙ্গে গেল চূড়া—নিদারুণ শেল
ভারত-বক্ষে হানি’।
উজলি দিক পশ্চিমকূলে
খুলিল তোরণ-দ্বার,
দেববালা আসি বরিল তাঁহারে,
পরায়ে ফুলের হার।

সার্থক নাম রেখেছিল তার—
ধন্য তাহার জননী!
চলে গেছে কোটি চিত্ত ভরিয়া
রঞ্জিত করি ধরণী!
ত্যাগের মহিমা শিখাতে জগতে
সকলি করেছ দান!
প্রেমের বন্যা বহায়ে ভারতে
করিয়াছ এক-প্রাণ!

শ্রীমতী সুধীরবালা বসু।

অশ্রু-তর্পণ

উৎপাটিয়া শোক-শল্যে অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে,
লেখনী করিতে পারি, উৎসারিত রুধিরের স্রোতে,
মসীও মিলিতে পারে, কিন্তু বন্ধু কোথা আজ ভাষা?
সে যে গেছে সেই পথে যেই পথে গেল সব আশা
অনাথ করিয়া দেশ, আজি মহাকালের প্রহরী
শাসন-তর্জ্জনী তুলি সব বাণী নিয়েছে সংহরি',
আছে শুধু "হরি, হরি! হায় হায়! হায় ভগবান্।"
শুধু তাই নিয়ে আর কি লিখিব, কি গাহিব গান?
নিতান্ত শুনিবে যদি, রাখি কান এ বুকের 'পরে
শোন, তথা কোন্ গাথা গুমরিছে ব্যথার অক্ষরে।
পুত্রহারা বাণী যবে নিজে মূক অন্ধ, বাষ্পভারে,
তখন মিলে কি বাণী কবিকণ্ঠে ছন্দ রচিবারে?
ভাষারে ভাসায়ে শুধু অনর্গল মৌন অশ্রুজল
মানসসরসী-বারি, উষ্ণ করি, বাড়ায় কেবল।

যে ব্যথা প্রকাশ মাগে করাঘাতে, ধূলায় লুণ্ঠনে,
ঘন ঘন উষ্ণশ্বাসে, বাষ্পমেঘে, আত্ম-বিস্মরণে,
চৈতন্যের মোহাবেশে,—কোন্ ছন্দে পাবে তা' প্রকাশ?
কোন্ সুরে লভিবে তা' কণ্ঠপথে বাঙ্ময় উচ্ছ্বাস?
শরাহত ক্রৌঞ্চকণ্ঠে কোন্ ছন্দে জাগিবে রোদন?
ধুতুরার বিষে ক্ষিপ্ত অলিমুখে জাগে না গুঞ্জন।
অশ্রু-রুদ্ধ রন্ধ্রপথে কোন্ ছন্দ গাহিবে সানাই?
ছন্ন-ছাড়া ছন্দে আমি বাক্যাতীতে কেমনে জানাই?

মৃত্যু, জন্ম-অনুগামী,—নহে কিছু বিচিত্র নবীন,
দলে দলে জলে স্থলে মানুষ মরিছে প্রতিদিন,
জন্মিয়া মরিছে তারা, বিম্বসম জেগে, লীয়মান,
কালের বারিধি-বক্ষে, কেবা করে সংখ্যা-পরিমাণ?
জীবধর্ম্ম, লোকযাত্রা, কর্ম্মচক্র, জীবন-সংগ্রাম
সমানই চলিতে থাকে যেমনি চলিছে অবিরাম।

কিন্তু যে-মানুষ, যেবা জন্ম লভে শতাব্দী অন্তর,
যারে পেয়ে লভে দেশ শ্রীযৌবনে নব-কলেবর,
যারে চূড়ামণি করি তুলে শির বিশ্বের সমাজে,
যার শক্তি স্পন্দমান তার প্রতি রক্তবিন্দুমাঝে,
প্রাণের বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে যায় যারে ছেড়ে দিতে,
টান পড়ে প্রতি অস্থি মজ্জা স্নায়ু শিরা ধমনীতে;

সে যখন চ'লে যায়, অনন্তের ফণা দশ শত
কেঁপে উঠে থরথর, তার অন্ত, কল্পান্তেরি মত।
যুগসন্ধি জেগে উঠে লয়ে তার দ্বন্দ্ব-বিভীষিকা,
মহাকাল-ভাল-নেত্রে জ্বলে' উঠে মন্বন্তরী শিখা।
সেই অতিমানবের অকস্মাৎ লীলা-সংবরণ
দেশের চৈতন্যবুদ্ধি করে সবি মুহূর্ত্তে হরণ।
জাতীয় জীবনযাত্রা ছত্রভঙ্গ, হারায় সুপথ,
ধরাগর্ভে গ্রস্তচক্র তার মুক্তি-সংগ্রামের রথ।

তার পর? তার পর কৃষ্ণহারা মূঢ় মর্ম্মাহত
ফাল্গুনির করে ফল্গু শক্তিহীন গাণ্ডীবের মত,
রামশৌর্য্যে অবসন্ন যামদগ্ন্য-পরশুর প্রায়
সমস্ত উদ্যম তার সহসা অবশ হয়ে যায়।
পুণ্যক্ষয়ে নহুষের স্বর্গচ্যুতি যেন অকস্মাৎ
ব্যোমচারী বিন্ধ্যবক্ষে মহেন্দ্রের যেন বজ্রাঘাত।
ভার্গব-কুঠারাঘাতে অর্জ্জুনের সহস্র পাণির
স্তম্ভিত সহস্র চেষ্টা মুহুর্মুহুঃ উগারে রুধির।

সত্যের ব্যথিত মূর্ত্তি, শক্তিকণ্ঠহারে মধ্যমণি,
দেশমাতৃ-হৃদয়ের দুগ্ধসিন্ধুমথিত নবনী,
দেশবন্ধু, শেষ বন্ধু, লাঞ্ছিতের হে চিত্তরঞ্জন,
অনাথশরণ, যোগি, জনগুরু পতিতপাবন,
সোমসম নেত্রানন্দ, ব্যোমসম বিরাট উদার,
ধৈর্য্যে ভারতেরি মত, মহাসিন্ধু মাধুর্য্য-সুধার,
ভক্ত রঘুনাথ সম ত্যাগবীর গৌরগতপ্রাণ,
শান্ত দান্ত, ধীরোদাত্ত ভীমকান্ত গুণের নিধান,
ভাবুক রসিক, কবি, প্রত্যেকেরি আত্মার আত্মীয়,
বিশ্বমহামানবের যুগে যুগে চির-বন্দনীয়,
বিপন্নের নিরন্নের মূর্ত্তিমান্ নির্ভর আশ্বাস,
কোথা গেলে, ছিন্ন করি দুঃখীদের শীর্ণ বাহুপাশ?
তুমি আর নাই, জন-হৃদয়ের রাজ-অধিরাজ,
কোটি কোটি মর্ম্মবৃন্তে পদ্মাসন শূন্য শুষ্ক আজ।
বাঙ্গালার শ্যাম গোষ্ঠে অশ্রুজলে আনিয়া প্লাবন
রাখালের রাজা কোন্ মথুরায় পেলে সিংহাসন?
রাজেন্দ্র-দুর্ল্লভ বিত্ত, সুখৈশ্বর্য্য, ভোগের সম্ভার,
রথ, বাজি, হেমচ্ছত্র, দাসদাসী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,

সবি পেয়েছিলে, বন্ধু, কিছুরি ত ছিল না অভাব,
অমৃতের পুত্র তুমি, ভুল' নাই প্রাক্তন-স্বভাব।
মরণ-ভঙ্গুর সুখে বিষসম করি পরিহার
গেলে ব্যথা-সিন্ধু মথি' অমৃতের করিতে উদ্ধার।
এমনি করিল বুদ্ধ, শুনিয়াছি, ভারত-গৌরব,
স্বচক্ষে হেরিনু তোমা, এ যুগেও করিলে সম্ভব।

লক্ষপতি ছিলে তুমি লক্ষ্য ছিল 'কোটির' উপরে
তাই কোটিপতি হ'তে কীট সম ত্যজিলে 'লক্ষ'রে।
দিগ্বিজয় অভিযানে উদ্বোধিল দুর্দ্দম জিগীষা,
কোটি হৃদি জিনে এলো তব প্রেম, তোমার মনীষা।
কোটি গুণমুগ্ধ শির শ্রীচরণে হ'ল অবনত,
নিদেশ পালিতে তব কোটি বাহু আগ্রহে উদ্যত,
ও অভয় ছত্রতলে কোটি প্রাণ লইল শরণ,
উদিলে 'ঈদের চাঁদ' কোটি কোটি নয়নরঞ্জন।
কোটি নর-নারী আজি তোমা লাগি ধূলায় লুটায়
তুমি যদি নহ, তবে কোটিপতি বলিব কাহায়?
সার্ব্বভৌম, প্রেমবলে যে সাম্রাজ্য করেছ বিস্তার
লক্ষ্যবদ্ধ গণ্ডীমাঝে, নিত্য তাহা, মৃত্যু নাই তার।

হর্ম্ম্য ত্যজি, নর্ম্ম ত্যজি ছুটে গেলে কুটীরের পানে
ফুকারিছে মর্ম্মাহতা ভূলুণ্ঠিতা জননী যেখানে,
শিয়রে বসিয়া তার রাত্রি-দিবা ব্যজনের ছলে
আকর্ষিয়া দাহজ্বালা নিজ অঙ্গে বরিলে কৌশলে।
কৌপীন সম্বল রাখি পরিধেয়খানি আপনার,
ছিন্ন করি' সযতনে ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলে তার,
'জল—জল' আর্ত্তনাদ শুনি' গেলে জলেরি সন্ধানে,
হায় প্রেম'সিন্ধু-বধ' কে করিল শব্দভেদী বাণে?

কাঁদ বঙ্গবাসী আজ, দগ্ধ-চিতাকাষ্ঠ বুকে ধরি'
কাঁদ মাতা, তারি ভস্ম মাখি অঙ্গে মুষ্টি মুষ্টি করি'
শব তা'র বক্ষে চাপি' কেঁদে গলে' যাও শৈলরাজ,
ভীষ্মেরে হারায়ে পুন মা জাহ্নবী কাঁদো কাঁদো আজ।
বিদ্যুৎ কঙ্কণ হানি' ঘন ঘন, পাষাণ-ললাটে,
বর্ষার ভারত কাঁদ' হারাইয়া প্রাণের সম্রাটে,
নিসর্গ সুন্দরী কাঁদ' চিতাধূমে আলুলিতকেশে,
আবার গগন কাঁদ', হতভাগ্য দেশ যাক্ ভেসে।

লাঞ্ছিত পতিত কাঁদো নিদ্রাভঙ্গে, দুঃখ এলো ফিরে,
সুখস্বপ্নে হেসেছিলে, স্বপ্ন সবি—মিলাইল ধীরে।
দুঃখীরা পাথারে ডোবো, ভেসে গেছে শেষ ভেলাখানি,
ভিক্ষুক যাচক কাঁদো ভিক্ষাপাত্র বক্ষে শিরে হানি'।
হিন্দু-মুসল্মান কাঁদো, পারসীক, আকালী, খ্রীষ্টান
ভাই—ভাই বাহুপাশে বাঁধি সব ভারতসন্তান।
যে মহামিলনব্রতে যাপিল সে উৎকণ্ঠ জীবন
শ্মশানে ঘটাতে তাই বরিল রে অকাল-মরণ।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বঙ্গবাণী, কাঁদো বঙ্গ ভরি'
চিত্তসরসিজ-হারা মৃণালেরে বক্ষে চাপি' ধরি।
আবার, মৃদঙ্গ, কাঁদো গোরাহারা শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে
গৌরপ্রেম-তরঙ্গিণী কাঁদো বঙ্গে উদ্বেল প্লাবনে।
উচ্ছলি 'সাগর' কাঁদো, শঙ্খে তব কে 'সঙ্গীত' গাবে?
কাব্যের 'মালঞ্চ' কাঁদো কলগুঞ্জ ভৃঙ্গের অভাবে।
ছিন্ন'মালা' বক্ষে ধরি' কাঁদ বঙ্গে 'কিশোর কিশোরী',
রথযাত্রা-লোকারণ্য কাঁদো আজি উৎসব বিসরি'।
কাঁদো বঙ্গগৃহ, তার চিত্রখানি শীর্ণ বুকে ধরি'
কাঁদো ধাত্রী রাজধানী, তার পুণ্য নামাবলী পরি'
বিপ্র কাঁদো, শূদ্র কাঁদো, ক্ষুদ্র কাঁদো, রুদ্র কেঁদে গলো,
অচল পাষাণো তুমি কেঁদে গলে' নদী হয়ে চলো।
যষ্টিহারা পঙ্গু কাঁদ', কণ্ঠহারা কাঁদো সত্যকথা,
শাখিহারা পাখী কাঁদো শাখাহারা কাঁদো ভক্তি-লতা,
বজ্র কাঁদো, বহ্নি কাঁদো, কাঁদো সূর্য্য-গ্রহ শশধর,
শত্রু কাঁদো, মিত্র কাঁদো, কাঁদো আজ দেশ-দেশান্তর।
ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিপথ-চিন্তা-চেষ্টা রাষ্ট্রমত-ধারা,
এক অশ্রু-পারাবারে হারাইয়া যাক্ চিহ্নহারা।

দুয়ারের কবি কাঁদো পদরজে দিয়া গড়াগড়ি,
যাত্রা করেছিলে তুমি যার আশীর্ব্বাদ শিরে ধরি'
যার পুণ্যদৃষ্টিতলে লভিয়াছ অমৃতে সিনান,
যার হাসিটুকু তব মৃতছন্দে দিত নব প্রাণ,
নিত্য যার মূর্ত্তি হেরি' গৃহে বসি' পেলে তীর্থফল
সে ত গেল, কাঁদো কবি, স্নেহস্মৃতি করিয়া সম্বল।

এই পুণ্যবঙ্গভূমি, মাটী যার মাধুরী-নিবিড়,
মাতৃমমতার খনি, তৃণ যার রোমাঞ্চ প্রীতির,

অশ্রুপাতে ঘনশ্যাম—চিরস্নিগ্ধ উশীর-মোদিত,
রসের পাথার যার তলে তলে চির-প্রবাহিত,
যার প্রাণরস ঘন নিমাইয়ের তনু সুকুমার,
নদী যার দধিধারা, পুষ্প যার ত্রিদিব মন্দার,
কারুণ্যমন্থর যার চন্দনাক্ত দক্ষিণ পবন,
শ্যামের মুরলীরবে মুখরিত চির-বৃন্দাবন,
ছায়াময়, মায়াময়, স্বর্ণকুক্ষি, সুফলাঢ্য দেশ,
এই তব মাতৃভূমি, যার অঙ্কে তনু ভস্মশেষ।
ভাবনি দ্যুলোকে কভু যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাম্যতর,
যাহার দাসত্ব হ'তে ইন্দ্রত্বেও গণনিক বড়।
তারি প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনারে নিঃশেষে বিলায়ে
শরতের মেঘসম রিক্ত লঘু গিয়েছ মিলায়ে।
ভালবেসেছিলে তারে প্রতি বক্ষোরক্তকণা দিয়া—
ছত্রপতি, প্রতাপের মন্ত্রদীক্ষা অন্তরে লভিয়া।
ভালবেসেছিলে তার প্রতি রেণু, প্রতি তৃণাঙ্কুর
পতঙ্গ কীটাণুকীট, সবি ছিল পবিত্র মধুর।
প্রতি অশ্রুকণা তার প্রাণস্পন্দ, প্রতি উষ্ণশ্বাস
তোমারি প্রেমের মাঝে অনুক্ষণ পেয়েছে প্রকাশ।
অসীম বেদনা তার একে একে সকলি হরিয়া
হ'লে মূর্ত্ত মাতৃ'চিত্ত', হলাহল স্বেচ্ছায় বরিয়া—
নীলকণ্ঠ, দেশভরা নৃকঙ্কালে গেঁথে নিলে মালা
ভস্ম সনে অঙ্গে মেখে নিলে তার সর্ব্বদাহজ্বালা।
তার পর তিলে তিলে বজ্রকীট-দংশন-বেদনা,
কণ্টকের বীরাসনে রাত্রিদিন কি কৃচ্ছ্র সাধনা!
অনশন অনিদ্রার মরুপথে দুর্ব্বহ বহন,
কূট কটূক্তির কোটি সূচিভেদ,—দুঃসহ সহন,
ভ্রূভঙ্গি শাসন শত, বিদেশের নিত্য অবিরত,
স্বদেশের কৃতঘ্নতা আরো চিত্ত করিল বিক্ষত,
স্বয়ংবৃত তুষানলে ধিকি ধিকি হয়ে দহ্যমান
শিবি-দধীচিরো চেয়ে অপূর্ব্ব এ আত্মবলিদান।
কোটি শোকগাথা, শত শোভাযাত্রা, লক্ষ সভা করি'
এক-গঙ্গা অশ্রুপাতে, বাগ্মিকণ্ঠে, মূর্ত্তিস্তম্ভ গড়ি'
কিছুতে হবে না যোগ্য ও স্বর্গীয় স্মৃতির সম্মান,
আজি শ্রদ্ধা প্রকাশের বৃথা সমারোহের বিধান।
তাঁর ব্রত, তাঁর দীক্ষা, মাতৃসেবা-মন্ত্রের সাধনা,
যদি নাহি অনুসরি' আত্মা তাঁর পাবে কি সান্ত্বনা?

ব্যথাক্লিষ্ট, ব্যাধিপিষ্ট স্থূলদেহ আজি ভস্মীভূত
মুক্তিযজ্ঞে তার শেষ ঐহিকতা আজিকে আহুত,
অশরীরী দুর্নিবার আগ্রহ ত দহিবার নহে
মাতৃমমতার টানে সে যে বঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে রহে।
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘেরি ঘুরি করিছে ইঙ্গিত
ঐ শোন ব্যোমে ব্যোমে প্রতিঘাত আহ্বান-সঙ্গীত!
তাহার অমৃত-মন্ত্রে যদি নাহি করি কর্ণপাত,
মিছে তবে অশ্রুসিন্ধু, ব্যর্থ তবে বক্ষে করাঘাত!

একেশ্বর যুঝিয়াছ, অরাতিমণ্ডল চারি ধারে—
'জয়চন্দ্র'—রাহুগণ গ্রাসিয়াছে জয়-চন্দ্রমারে,
কতবার; তবু তুমি হওনিকো কভু আশা-হারা—
এত আশা কোথা পেলে? কেবা দিল ভগবান্ ছাড়া?
এক হস্তে রুদ্ধ করি রক্তস্রাবি ক্ষত-উৎস-মুখ—
অন্য হস্তে যুঝিয়াছ শর ধরি, তেয়াগি কার্ম্মুক!
আয়ুধ-ক্ষতের মালা পরাইল মুক্তির সংগ্রাম,
যাও রণক্লান্ত বীর, মাতৃ-অঙ্কে লভ' গে বিশ্রাম।

শ্রীবৈকুণ্ঠে হে বৈষ্ণব, এত দিনে মিলিল কি স্থান?
অথবা তোমার আত্মা লভিল কি অনন্ত নির্ব্বাণ?
একাকী লভিয়া মুক্তি পূরিবে কি তোমার অন্তর?
কোটি কোটি ভ্রাতা যদি বহে অঙ্গে দাসত্ব-নিগড়?
কৈবল্য-আনন্দ তব রোচনীয় হবে কি ও পারে,
এ পারে জননী যদি শোচনায় কেবলি ফুকারে!
আবার আনিবে ফিরি বঙ্গে তোমা সবার আহ্বান।
সাধিতে অপূর্ণ ব্রত ফিরিবে না দেশগতপ্রাণ?
মূঢ় মোরা মৃত্যুকেই বড় করে' ভাবি বার বার,
অমৃত লভেছে যেবা হেথা যেন সে-ই নাই আর!
যতটুকু ধ্বংস পায় তারে সত্য করিয়া গণনা—
যতটা অমর, তারে ভাবি মিথ্যা কবির কল্পনা।
কতটুকু গেল তব কতটা যে রহিল হেথায়
এ কথা বুঝিলে আর, মিথ্যা ভয়, নৈরাশ্য কোথায়?
পুনঃ ভাবি যাহা গেল তাহা বুঝি গেল চিরতরে—
নির্ভর করিতে নারি বিধাতারো বিধানের 'পরে।
তবু এই আশা রাখি অপূর্ণ যা রহিল জীবনে—
ও দেহ উৎসর্গ করি, উদ্যাপন করিবে মরণে!

শ্রীকালিদাস রায়।

চিত্তরঞ্জন

গত ৩ হাজার বৎসরের মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে—স্পষ্ট দেখা যায় যে, আমরা যাঁদের মহাজন বলি—তাঁদের প্রথমে আবিষ্কার করে জনসাধারণ। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতিকে লোকোত্তর ব্যক্তি ব'লে প্রথমে চিন্‌তে পেরেছে জনসাধারণ, আর চিন্‌তে পারেনি পণ্ডিতের দল। এমন কি, যে ক্ষেত্রে লোকমতের কোনও মূল্য নেই ব'লে আমরা মনে করি, সেই সাহিত্যক্ষেত্রেও মহাকাব্যকে চেনে ও চিনিয়ে দেয় জনসাধারণ। হোমারের ইলিয়াড যে অপূর্ব্ব কাব্য, সে সত্য গ্রীসদেশে কোনও আলঙ্কারিক আবিষ্কার করেনি, আর মহাভারত যে অপূর্ব্ব কাব্য, সে সত্যও ভারতবর্ষে কোনও আলঙ্কারিক আবিষ্কার করেনি।

মহত্ত্বের আর এক ধাপ নীচে নেমে এলেও আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। রাফেল ও মাইকেল আঞ্জেলো যে অপূর্ব্ব শিল্পী,এ সত্য ইতালীর জনসাধারণই আবিষ্কার করে এবং সেক্সপীয়ার যে অপূর্ব্ব কবি, সে সত্যও ইংলণ্ডের জনগণই প্রথমে আবিষ্কার করে। আমি বিশেষ ক'রে আর্ট ও সাহিত্যের উল্লেখ করছি এই জন্য যে, কর্ম্মজগতে যাঁরা স্বনামধন্য হয়েছেন—তাঁদের কপালে যে রাজটীকা দেশের লোকই পরিয়ে দিয়েছে, এ সত্য ত সর্ব্বলোক-বিদিত।

চিত্তরঞ্জন যে এক জন অ-সাধারণ লোক, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ সে রায় একবাক্যে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের মুখে সে কথা শুধু পুনরুক্তিমাত্র হবে। কি গুণে, অথবা কি কি গুণের সমবায়ে তিনি লোক-হৃদয় অধিকার করেছেন, আমরা অবশ্য তা নির্ণয় করতে পারি। কারণ, আমাদের মত ক্রিটিক নামধারী ব্যক্তিদের কাযই হচ্ছে—সব জিনিষই ছাড়িয়ে দেখা ও দেখান। আমরা রত্ন সম্বন্ধেও তাই করি—মানুষ সম্বন্ধেও তাই করি।

কিন্তু যখন মনে হয় যে, আমরা সমালোচকমাত্রেই আলঙ্কারিক, তা আমরা কাব্য-সমালোচকই হই, আর্ট ক্রিটিকই হই, পলিটিক্যাল পণ্ডিতই হই, তখন লোকমতের ভাষ্য লেখবার উৎসাহ আমাদের ক'মে আসে। কেন না, প্রথমতঃ তা অনাবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ তা হ'বে জটিল।

সুতরাং আজকের দিনে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আমরা যে দেশবাসীদের সঙ্গে একমন ও একমত, সেই কথাটা মন খুলে বলাই আমাদের মুখে শোভা পায়।

বহু লোক একমন হয়ে যে মনোভাব প্রকাশ করে, সে ভাব হচ্ছে এক হিসাবে একটি action, অর্থাৎ সে ভাবপ্রকাশের সঙ্গেই তার ফল পর্য্যবসিত হয় না। কর্ম্মমাত্রেরই একটা না একটা ফল আছে—যা কর্ম্মের সঙ্গেই লোপ পায় না। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে বাঙ্গালী-মন যে আন্তরিক সশ্রদ্ধ বেদনার পরিচয় দিচ্ছে, সে দুঃখ অনুভব করাও একটি বড় মনের পরিচায়ক। কেউ কেউ হয় ত বলবেন যে, এ ব্যাপারটি হচ্ছে বাঙ্গালীজাতির ভাবাতিশয্যের পরিচায়ক। কিন্তু এ শ্রেণীর বুদ্ধিমানদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, যে জাতির প্রকৃতিতে কোনরূপ আতিশয্য নেই, যার অন্তর একেবারে সাংসারিক সীমাবদ্ধ, সে জাতির কাছ থেকে কেউ কখনও বড় জিনিষের প্রত্যাশা করতে পারে না। এই সীমা অতিক্রম করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ব্যক্তিবিশেষের ও জাতিবিশেষের মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই কারণে আশা হয়, বাঙ্গালীজাতি এক দিন না এক দিন মহৎ আনন্দের অধিকারী হবে।—আজকের দিনের এই সার্ব্বজনীন অকপট শোকের মধ্য থেকে এই আশার আলোক আমার চোখের উপর এসে পড়ছে। তাই আমাদের শ্রাদ্ধপদ্ধতির শেষ মন্ত্রটি আমি বাঙ্গালীজাতির হয়ে চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-বাসরে উচ্চারণ করছি :—

ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা-
দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে।
আ মা গন্তাং পিতরামাতরা
চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দেশবন্ধুর জনক ভুবনমোহন দাশ ও জননী নিস্তারিণী দেবী
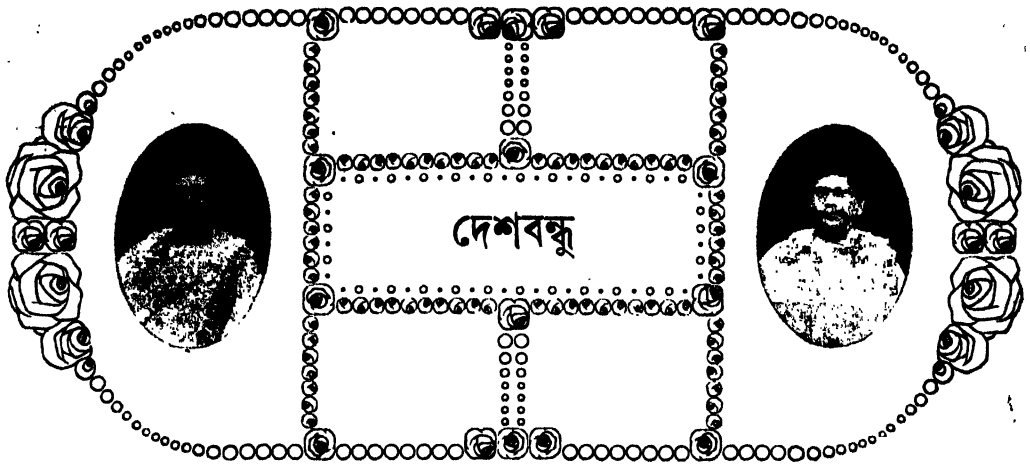
বৈষ্ণবীতন্ত্রে, প্রেমের পথে, ত্যাগের পথে, একতার পথে, অহিংসার পথে, সত্য ও সেবার পথে, বিংশ শতাব্দীর কর্ম্মক্ষেত্রের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া এবং স্বীয় জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালাদেশের বাহ্য-দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন, তাই আমরা কাঁদিয়াছি। হয় ত অনেক দিন কাঁদিব। বাঙ্গালার নব-জীবনের ইহা প্রথম অঙ্ক এবং সেই প্রথম অঙ্কের ইহা প্রথম দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে কি দাঁড়াইবে, তাহা এখনও বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু প্রথম অঙ্কে যে লক্ষাধিক মানবের শোকাশ্রু ক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রচ্ছন্নভাবে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

মনস্বিগণের ভাগবতব্যাখ্যা ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বব্যাখ্যা যত দূর শুনিয়াছি ও পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে মনে পড়ে যে, ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত যে তত্ত্ব হইতে এই সৃষ্টিধারা প্রবাহিত, তাহাই তাঁহার জীবাখ্যা পরমা পরাপ্রকৃতি। জীবই ভগবানের অংশ এবং জীবের মায়িক দেহের কর্ম্মকলাপ দেখিয়া আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করি। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। মায়াশক্তির বলে প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া সম্ভূত হয়েন, অতএব দেহীর মধ্যে তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। দেহীর কর্ম্মকলাপ মনঃপ্রসূত। ভগবান্ মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। "দেবকী জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেবের মন হইতে পাইয়াছিলেন।" ভগবান্ বসুদেবের মনোমধ্যে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। জীব দুঃখে ব্যাকুল হইলে কিংবা উৎপীড়িত হইলে মনঃক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব হয়। ইহা একটা ক্ষেত্রে নয়, বহু ক্ষেত্রে। প্রতি যুগেই ইহা ধর্ম্মসংস্থাপনের বীজস্বরূপ। যুগে যুগে মহাসমরের মধ্যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের ইতিহাসে আমরা তাহা দেখিতে পাই। বিনা দ্বন্দ্বে তাহা কি করিয়া হয়, তাহাই এই যুগের প্রধান সমস্যা।

সেই সমস্যা ভারতে পূরণ হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য দুইটি মহাত্মা রঙ্গস্থলের প্রথম অঙ্কে এই সনাতন দেশের নব রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দেশবন্ধু আর নাই। তিনি অনেক ব্যথা পাইয়াছেন, দলিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, অনেকে তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া দার্জিলিংএর শৈলাশ্রমে তাঁহার বহুমূল্য জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন বলিয়া এ দেশ সার্থক হইয়াছে। অহিংসার মন্ত্র এ দেশ এখনও বুঝিতে পারিবে কি না, তাহা বলা যায় না। ১০ বৎসর পূর্ব্বে হয় ত আমরা কিছু বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু শিক্ষার বহুল বিস্তারে আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতেছি বলিয়া বোধ হয়। দেশবন্ধু অনেক কথা বলিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথার যুগে ভক্তি ভাজিয়া মানবসখ্যতায় পরিণত হয়, কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব কোমলভাব ধারণ করে। তোমার সঙ্গে আমি মিলিত হইব। যে জাতিই হও না কেন, যতই অস্পৃশ্য হও না কেন, তুমি ভগবানের অংশ— মায়িক দেহে, জাতিবিচারে, আচার-ব্যবহারে মিলন
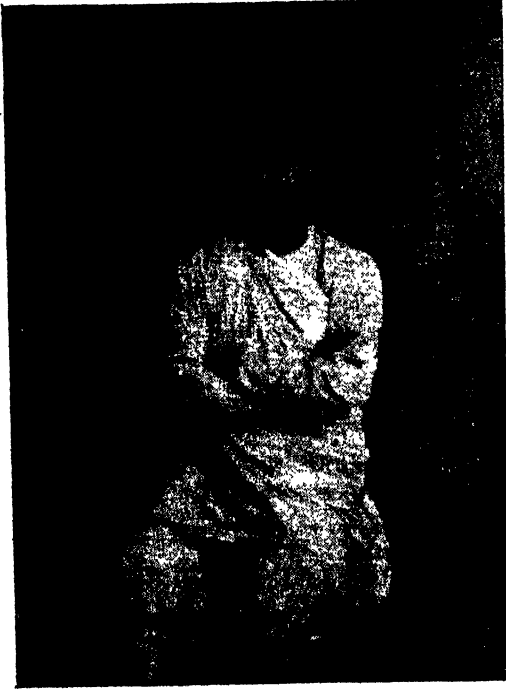
বসন্তকুমার দাশ
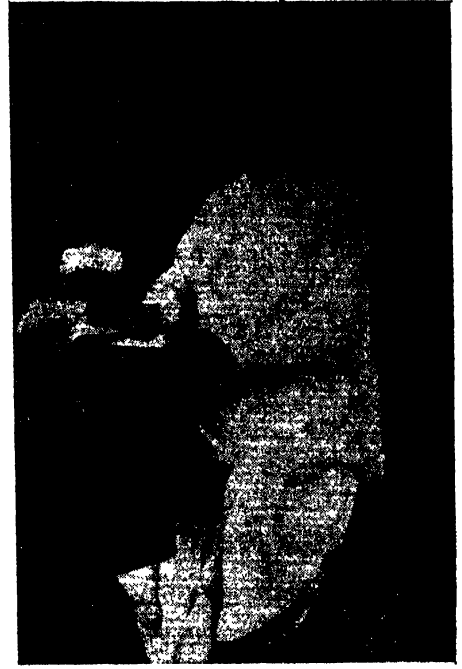
দেশবন্ধুর ভগিনীপতি অনন্তলাল সেন

অসম্ভব হইলেও, মনের কথা তোমাকে বলিব—তাহাতে পরস্পরের সম্পূর্ণ অধিকার। তুমি সেই কথা ভাবিয়া দেখ, একবার ভাই বলিয়া করুণদৃষ্টিতে তাকাও, সৃষ্টির উৎপত্তি দুঃখ হইতে, তাহা একবার জান এবং সেই জ্ঞান অশ্রুধারায় প্রবাহিত কর, বিবাদ মিটিয়া যাইবে। যেখানে সে বিবাদ অতি কঠোর, সেখানে মস্তক নত করিয়া থাক, নিজের কর্ম্মে হিংসাশূন্য হইয়া রত হও। বিলাস চাহি না, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা চাহি না। তুমি যাহা ফেলিয়া দিবে, আমার তাহা অন্ন; তুমি যাহা পরিধান করিবে না, আমার বস্ত্র তাহাই।

ইহাই ভারতের সন্ন্যাসাবস্থা। ইহাই ঈশ্বরপ্রতিভাত জীবের লক্ষণ। ধরিত্রীধারণের ইহাই একমাত্র উপায়। ইহাই ধর্ম্ম। এ দেশের দরিদ্রকুটীরে, অন্নক্লিষ্টদেহে, গৃহস্থাশ্রমে, সতী রমণীর মধ্যে, মাতৃত্বে, আচারে ও ব্যবহারে এবং বর্ণাশ্রমে, এক সময় তাহা সংগঠিত হইয়া বহু বর্ষ বাহিয়া এখনও প্রবহমান। তাহার উন্মেষ বৈষ্ণবধর্ম্মে এবং আংশিক ধর্ম্মবিপ্লবে। অন্য কোনও দেশে এত ফুল ফুটে নাই। ঝরিয়া গিয়াও তাহার বীজ লুপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মের এত কথা কোথায়ও সংকীর্ত্তিত হয় নাই। পরস্পরের মুখ চাহিয়া, পরস্পরের হাত ধরিয়া কোনও দেশে এত গান গীত হয় নাই।

৭ বৎসর পূর্ব্বে একবার দেশবন্ধুকে দেখিয়া সার্থক হইয়াছিলাম। তিনি কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। গান শুনিয়া যে কথাগুলি বলিতেন, তাহাতে বুঝিতে পারিতাম যে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মনোমধ্যে ভগবান্ আবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। তিনি যে পথে গিয়াছেন, বাঙ্গালা দুঃখে আজ অন্ধ হইয়া হয় ত এক সময় সেই পথে তাঁহার অন্বেষণে যাইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন পিতামাতা—চিত্তরঞ্জন। বার বার কেবল এই কথাই মনে হইতেছিল—সে দিন মধ্যাহ্নে, যখন রাজধানীর বুকের ভিতর দিয়া, বাঙ্গালী-হৃদয়ের রাজা—আপন মৃত্যু-অবশ অঙ্গ প্রীতির কুসুম-দাম-স্তূপে আবৃত করিয়া—অগণিত অপলক বাষ্পজড় নেত্র-পাতের ভিতর দিয়া—প্রতিক্ষণে মানবের শেষযাত্রার অবসানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ধ্বংসই হয় ত বিশ্বের পরিণাম—মৃত্যুই হয় ত এ জগতে চরম ও সার সত্য। কিন্তু প্রীতি মানব-সমাজের ভিত্তি ও ভরসা—জীবনের স্থির আকার ও একমাত্র সান্ত্বনা। বঙ্গোপ-সাগরের তট হইতে হিমালয়ের শিখর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রোল—প্রীতির শতমুখ উৎস যখন সেই স্তব্ধ স্পন্দন—সেই পলায়িত নিঃশ্বাসপবনকে ফিরাইতে পারিল না, তখন মৃত্যুর করাল ওষ্ঠে বিদ্রূপের ক্রূর হাসি হয় ত মুহূর্ত্তের জন্ম ফুটিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই শ্রদ্ধা, প্রেম ও সমবেদনার বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর দেখিয়া নির্ম্মম কালও বোধ হয় স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া গিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু, বাঙ্গালীর ঘরে যে বিপৎ-পাত সর্ব্বাপেক্ষা করুণ ও সাংঘাতিক, তাহারই কথা মনে আনিয়া দেয়। গৃহস্থ-পরিবারে যে পুরুষ সমর্থ ও নিপুণ, হৃদয়ে যাহার বল, বাহুতে শক্তি ও অন্তরে যাহার উৎ-সাহ ও স্ফূর্ত্তি—গৃহস্থালীর সেই কেন্দ্র ও অবলম্বন—অসহায় বহু পরিজনের মধ্যে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া—সহসা মধ্যজীবনেই অস্তমিত হইল—এরূপ আকস্মিক বজ্রাঘাত আজকাল কত বাঙ্গালী পরিবারকেই না বিপন্ন করিতেছে! দেশবন্ধুর অসম্ভাবিত মহাপ্রস্থানে দেশ-জননীর অঙ্গনে মনে হইতেছে, সেইরূপ সর্ব্বনাশের হাহাকার উঠিয়াছে। বৈদেশিক শাসন-তন্ত্রের যে বজ্র-মুষ্টি ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া এ দেশের সকল জীবনবেগ নিষ্পিষ্ট করিতে প্রসারিত হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন আপন সমগ্র শক্তিপ্রয়োগে তাহা প্রতিহত করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গমাতার অঞ্চলের নিধি—নয়নের মণি ছিলেন। রাজনীতিক সকল আন্দোলন যখন স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি দেশে পুনরায় আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন—উৎসাহের স্রোত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—সমগ্র বাঙ্গালা—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারত অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া ছিল—ভাবিয়াছিল—এই মুহ্যমান ও অবসন্ন সমাজদেহে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করিতে এই মহাপুরুষই সমর্থ। বাঙ্গালার যাহা কিছু ক্ষীণ, ক্ষাত্র বৃত্তি ও বাসনা—সে সমস্ত পুঞ্জীভূত হইয়া, বোধ হয়, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল—সেই বীরে—সেই অদ্ভুত কর্ম্মীতে—আত্ম-কর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ। আশা ও আশ্বাসের সেই কল্পলোক অকস্মাৎ শূন্যে মিলাইয়া গেল—বাঙ্গালার সকল ভরসা ধূলিসাৎ করিয়া সেই মহাপুরুষ আজ অন্তর্হিত।

হুজুগের তীর্থ, রঙ্গ-তামাসার লীলাক্ষেত্র এই দেশে—স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দৃঢ়কর্ম্মী মানবের যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন এই বীর, মুষ্টিমেয় যোদ্ধৃবৃন্দের নেতৃস্থান শূন্য করিয়া মহাপ্রয়াণে প্রস্থিত হইলেন। অপূর্ব্ব তাঁহার প্রভুশক্তি, অদম্য তাঁহার উৎসাহ—অটল তাঁহার প্রতিজ্ঞা—তাই শেষ পর্য্যন্ত অসীম-প্রতাপ রাজশক্তির সহিত বিরোধে তিনি নিজ সংকল্প জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। যাহারা বলে, তাঁহার রাজনীতিক সংগ্রামের সকল অস্ত্র ব্যয়িত

হইয়াছিল—সকল যুক্তিকৌশল ফুরাইয়া আসিয়াছিল—শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল—তাহারা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃত পরিমাপ করিতে পারে নাই—তাহারা বুঝে না, জলন্ত ধাতবপ্রবাহ মন্দবেগ হইলেই আগ্নেয়গিরি নির্ব্বাপিত হয় না; জানে না, প্রাণের স্পন্দন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কর্ম্মক্ষেত্রে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি নিত্য নূতন লীলায় প্রকটিত হয়।

বিগত ৪ঠা আষাঢ়ের শোকে উদ্বেল, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় নতমস্তক, সমুদ্রবিস্তারের মত বিরাট, সেই অপূর্ব্ব জনতাস্রোত স্মরণে বারংবার এই প্রশ্নই মনে জাগে—কোন্ সংযোগসূত্রে, কি সম্মোহন মন্ত্রে, এ দেশের নানা প্রভেদ ও বিরোধে বিচ্ছিন্ন জনগণকে চিত্তরঞ্জন একতায় বদ্ধ করিয়াছিলেন? মনে হয়, যে সকল বৃত্তি বাঙ্গালী-প্রকৃতির বিশিষ্টতাবিধান করে, যে সকল গুণ বাঙ্গালীর পরম আদরের—জীবনের যে ধারা যুগে যুগে প্রাচ্যদেশে মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে, চিত্তরঞ্জনে সেই সকল বৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। অদৃষ্ট-বাদ এসিয়াবাসীর মজ্জাগত। বিচিত্রকর্ম্মী ঐন্দ্রজালিকের মত দৈবই মানবের ভাগ্য লইয়া অচিন্তনীয় লীলা করিয়া থাকে। এ দেশের জনগণ চিরদিন এই তত্ত্বকেই জীবনরহস্যের স্বরূপ ও সমাধান বলিয়া মানিয়া লয়; উহারই কল্পনায় মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনের জীবনের ঘটনাবলী সেই অঘটনঘটনপটু অদৃষ্ট-মহিমার এক বিস্ময়াবহ নিদর্শন। ভাবাবেশের বশে, চকিতের মধ্যে আমীর ফকির হইল, তার্কিক প্রেমিক হইল, ব্যবহারাজীব নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিল, ভোগী ত্যাগব্রত সার করিল, ঐশ্বর্য্য-বিলাসের পেলব অঙ্ক পরিহার করিয়া কৃচ্ছ্র ও দৈন্যকে বরণ করিয়া লইল। জীবনের এই আকস্মিক ও অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণাম বুদ্ধ-চৈতন্যের অক্ষয়-স্মৃতি-জড়িত ভারতে স্বতঃই সবলে সর্ব্বজনের চিত্ত অধিকার করে। দেশবন্ধুর প্রভাবের এইখানে একটি মূলসূত্র। এ দেশ পাগ্‌লা ভোলার দেশ—আমরা বুঝি মানবের সেই মহত্ত্ব—যাহাতে তাহাকে আত্মহারা করে, তাহার হিসাবনিকাশ ঘুচাইয়া দেয়—উন্মাদনা আনে—আপনা ভুলাইয়া দেয়। উদাত্ত প্রেমের আবেশে এই যে আত্মবিস্মৃতি—এই যে গৃহ-পরিজন বিষয়-বিভবে উপেক্ষা—ইহাই এক দিন "গোরা" নামে বাঙ্গালাদেশকে পাগল করিয়াছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিল—বিংশ শতাব্দীতে চিত্তরঞ্জনও হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খৃষ্টান ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে নিজের এই ঘরছাড়া, আপনহারা দেশ-প্রেমের নেশায় চঞ্চল করিয়া তুলিলেন। ১৩২৬ সনের পৌষসংক্রান্তির সেই ভাব-বন্যা আজ কি শুধু অস্পষ্ট স্মৃতিতেই পর্য্যবসিত হইবে?

দেশবন্ধুর নাম আজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে রটিতেছে—দেশবাসীর চিত্তফলকে ও ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় সুবর্ণাক্ষরে তাঁহার কার্য্যকলাপ অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেই উদার হৃদয়, সেই সস্মিত মধুর বাণী, সেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল—সর্ব্বোপরি সেই প্রাণের আগুন—যাহা প্রতিক্ষণে তাঁহার সঙ্গী ও অনুচরগণকে সজীব করিয়া রাখিত—জীবলোক হইতে চিরতরে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে! যে ধুনি নিরন্তর তাঁহার অন্তরে জ্বলিত—স্থূলদেহের আবরণ ভেদ করিয়া যাহার দীপ্ত আভা—তাঁহার বাগ্মিতায়, তাঁহার হাস্যে ও তাঁহার নয়নভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিত; যাহার উত্তাপস্পর্শে অক্ষমতা ও অবসাদের হিমে অবশ বাঙ্গালীর প্রাণ এই ৫ বৎসর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—সেই ধুনি আজ নির্ব্বাপিত। উৎসুক নয়নে দেশমাতা আজ তাঁহার অগণিত সন্তানের মুখপানে তাকাইয়া আছেন—কোথায় সে সাধক—যে এই ধুনিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সাধনার ধারাকে বজায় রাখিবে?

বুঝি বা সে ধুনির শিখা এখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই—যে ধুনির আগুন ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জনের অন্তরে ভোগৈশ্বর্য্য-বিলাসব্যসনের সকল মলা দগ্ধ করিয়া, পরিশেষে চিতা-বহ্নিরূপে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহও ভস্মসাৎ করিল, তাহার কয়েকটি পাবক-স্পৃষ্ট অঙ্গার কেওড়াতলার পবিত্র শ্মশানে এখনও বোধ হয়, ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। বাঙ্গালীর হৃদয়স্পর্শী নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের নিকেতন এই শ্মশানক্ষেত্র। এখানে ভগীরথ-খাত সংকীর্ণ হইয়া খালের আকার ধারণ করিয়াছে—সেই স্বল্পপরিসর প্রণালীর মধ্য দিয়া আদিগঙ্গা আপন অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র বুকে করিয়া কুলু কুলু নাদে

আজও প্রবাহিতা। ভাঁটার সময় বালকবালিকাও অবলীলাক্রমে ইহা হাঁটিয়া পার হইয়া যায়। ছোট ডিঙ্গী আর ততোধিক ছোট ডোঙ্গা এই ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীর বক্ষে যাত্রী ও পণ্যসম্ভার বহন করিয়া থাকে। বট ও অশ্বত্থের শ্রেণী তীরবর্ত্তী গ্রাম সকলের নরনারীর যুগ-যুগ-ব্যাপ্ত সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদের নীরব সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝের ব্যবধান এত অল্প যে,দুই তীরের পাদপ-শ্রেণী স্থানে স্থানে যেন মনে হয়, মাথায় মাথায় ঠেকিয়াছে। সমগ্র দৃশ্যটিই ক্ষুদ্র আয়তনে খাঁটি বাঙ্গালার গ্রাম্যভাবের পরিচায়ক। এই আদিগঙ্গার তটে - চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের পদাঙ্গুলীচতুষ্টয় ধারণ করিয়া মহাশক্তিপীঠ বিরাজ করিতেছে। তাহারই অদূরে যে মহাশ্মশান —উহা নব্য বাঙ্গালার জাতীয় উন্মাদনা ও প্রেরণার মূল উৎসস্বরূপ। এক দিকে সরস্বতীর বরপুত্র –পৌরুষের আদর্শ—আশুতোষের চিতাস্থল—সম্বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি এখনও শোকক্লিষ্ট কল্পনার চক্ষুতে সেই পুরুষ-শার্দ্দূলের—মনীষার সেই মূর্ত্ত অবতারের ছায়া আনিয়া দেয়। উহারই পার্শ্বে, বঙ্গভঙ্গেরও পূর্ব্বে, জাতীয় জাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, যিনি আত্মনির্ভর মন্ত্রের প্রচার করেন ও পরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেন - সেই অপর আশুতোষের শেষ বিশ্রামস্থান। অন্য দিকে, ভারতে জাতীয় উদ্বোধনের অন্যতম স্রষ্টা—সত্যনিষ্ঠা ও সেবা-ধর্ম্মের আদর্শ—চরিত্র-গৌরবে মহনীয় অশ্বিনীকুমারের অন্তিম-শয্যাভূমি। ইহাদের মাঝে দেশমাতার বড় আদরের ও গৌরবের ধন—চিত্তরঞ্জনের অন্তিম নিকেতন সজ্জিত হইয়া এই মহাশ্মশানকে জাতীয় ভাবসাধনার মহনীয় তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

কে আছ মুমূর্ষু বাঙ্গালায় শক্তিমন্ত্রের সাধক—দেশপ্রেমিক, এই মহাশ্মশানে একবার ভূলুণ্ঠিত হইয়া বিভূতি-রাগে অঙ্গ রঞ্জিত করিয়া ধ্যানস্থ হও। বুঝিবে, এই তীর্থই তোমার অভীপ্সিত মন্ত্রলাভের উপযোগী ; এই তীর্থ-ই তোমার সংশয় ও দৌর্ব্বল্য ঘুচাইয়া, পরাধীনতার কালিমা দূর করিয়া, জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিতে সমর্থ। যে মহিমময়ী বরাভয়দায়িনী সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিতা মূর্ত্তিতে মা আমাদের স্বরাজ-সাধনায় সাক্ষাৎ সিদ্ধিরূপে উদ্ভাসিত হইবেন—সেই মূর্ত্তি আবির্ভাবের ইহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। মনে হইবে, এখানকার আকাশে-বাতাসে যাদু আছে, ইহার সম্মোহন প্রভাবে সংকীর্ণ স্বার্থ-লিপ্সা দূর হয়। ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও দেশদ্রোহকর হীন চাতুরী অপনোদন করিতে—শুষ্ক বৈরাগ্যের মত স্বজন ও স্বদেশের প্রতি বিমুখ না করিয়া, মানুষকে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিতে ইহা আবেশময় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আর মনে হইবে—স্বর্গগত দেশবন্ধুর অন্তরতম বাসনার প্রতিধ্বনি এখনও এখানকার হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে—If I die in this work of winning freedom, I believe, I shall be born in this country again and again, live for it, hope for it, work for it with all the energy of my life, with all the love of my nature till I see the fulfilment of my hope and the realization of this ideal.

ভারতের সকল নরনারী এই বাণী স্মরণে একপ্রাণে ও সমস্বরে আজ শুধু এই প্রার্থনাই করিতেছে,—

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান্!

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিদায়ে

মুক্তি-মাণিক খুঁজিবারে গেলে তুমি ;—
দুখিনী মায়ের আঁধার প্রাণের পুরে,
মাণিকরতন ভারে ভারে হল জমা,
ফেলি তুমি কোথা চলে গেলে দূরে।

তুমি এনেছিলে শোভা-সম্পদ রাশি
জাতির জীবনে দিয়েছিলে তুমি মান,
আজ তুমি নাই, আঁধার সকল দিশি,
অক্ষয় হয়ে আছে শুধু তব দান।

তোমারই দত্ত দান আছে আজ সবি,
বিরহ বেদনে প্রাণ তব কথা কয়,
সঞ্জীবনের মন্ত্র যেতেছি ভুলি
তুমি নাই আজ, কেহ আর কিছু নয়।

শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

যে প্রচণ্ড দুর্ব্বার জীবন-স্রোত সহসা অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম প্রত্যুষে, বর্ষার পদ্মার মত দু'কূল ছাপাইয়া ফুলিয়া দুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল,—গত ৫ বৎসর ধরিয়া যাহার প্রলয়-প্লাবনের ভাবোচ্ছ্বাস বাঙ্গালা ডুবাইয়া, ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, ইংলণ্ডের তটভূমিকে আঘাত করিয়া, প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল—আজ তাহার প্রশান্ত পরিণতি এক মহনীয় আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান! বাঙ্গালীর নবযুগের সাধনা-সঞ্জাত এই প্রচণ্ড বিক্রমের মূর্ত্তিভূত বিগ্রহ এক দিনে সহসা কেমন করিয়া পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল?

কবি চিত্তরঞ্জন এক স্থলে বলিয়াছেন, 'ফুল কখনও এক দিনে ফোটে না।' অতীতের কত লীলাখেলা, কত বিবর্ত্তন-বিকাশ, কত জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া প্রভাতের শিশিরস্নাত পুষ্পটি সূর্য্যের আলোকে চক্ষু মেলিয়া চায়। ফুলের ক্রমবিকাশে কবি যাহা বলিয়াছেন, রাজনীতিক নেতার মানসিক বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব বাহির হইতে দেখিতে গেলে যতটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, মানসিক-বিকাশ ও চরিত্রের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা একটা স্বাভাবিক ও সহজ পরিণতি মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতলব্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে এই শক্তিশালী জীবন অনেকটা লোক-লোচনের অন্তরালেই পরিণতি লাভ করিয়াছে।

আইন-ব্যবসায়

এক জন প্রতিভাশালী তীক্ষ্ণ-মেধা আইন-ব্যবসায়িরূপেই চিত্তরঞ্জন সর্ব্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনের অধ্যায়গুলি একের পর আর যখন যথাযথ ও সুসংবদ্ধরূপে লেখা হইবে, তখন সাহিত্য অধ্যায়ের সঙ্গে জীবিকা-উপার্জ্জনক্ষেত্রে আইন-ব্যবসায়-রূপ যে অধ্যায়, তাহাই অতি বিস্তৃতরূপে তাঁহার জীবনীরূপে ও জাতির ইতিহাসরূপে একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। কোন আইন-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-জীবন জাতির ইতিহাসরূপে যদি পরিগণিত হয়, তবে তাহা চিত্তরঞ্জনেই সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রাজদ্রোহের মামলা লইয়া ভারতবাসী ও ইংরাজ-আদালত বিব্রত হইয়াছে, সেই সব স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাজবিদ্রোহের মামলায় ভারতবাসীর পক্ষসমর্থনের জন্য যদি কেবল এক জন ব্যবহারাজীবের নাম করিতে হয়, তবে চিত্তরঞ্জনের নামই করিতে হইবে। এই শ্রেণীর অনেক মামলায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই সব মামলায় ভারতবাসীর পক্ষসমর্থন করেন নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় আমরা চিত্তরঞ্জনকে প্রথম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখরদীপ্তিতে দেদীপ্যমান দেখি। যে দিন অরবিন্দপ্রমুখ বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের মুণ্ড লইয়া রাজদ্বার ও শ্মশানের বায়ু অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছিল, সেই দিন এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি রাজদ্বার ও শ্মশান এই উভয় স্থানের ভীতি হইতে নির্দ্দোষদের রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা চিত্তরঞ্জনের জীবনের এক অতি গৌরবময় ঘটনা। সেই সঙ্গে ইহা জাতির ইতিহাসের একটা অধ্যায়। রাজদ্বার ও শ্মশানের ভীতি হইতে যিনি রক্ষা করেন, শাস্ত্র তাঁহাকে বান্ধব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত স্বদেশ প্রেমিকদিগকে রক্ষা করা এবং জঘন্য গুরুতর কলঙ্ক হইতে দেশবাসীর সুনাম রক্ষা করার কার্য্য বিচক্ষণ মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন অতি দক্ষতার সহিত, গৌরবের সহিত এবং কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রের নির্দ্দেশমতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই চিত্তরঞ্জন দেশের নিকট "দেশবন্ধু" আখ্যা পাইবার অধিকারী।

ধর্ম্ম, সাহিত্য ও রাজনীতি

'সমগ্র জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ।'

চিত্তরঞ্জন এ কথা বহুবার আমাদিগকে বলিয়াছেন। কি জাতির জীবন, কি ব্যক্তির জীবন খণ্ডিত করিয়া যে বিচার ও বিশ্লেষণ, তাহা সম্যক্ দর্শন নহে, তাহাতে সত্য ধরা যায় না। চিত্তরঞ্জনের জীবনকে তেমনই আমরা কোন বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ কর্ম্মপ্রচেষ্টা দিয়া বিচার করিতে গেলে ভুল করিয়া বুঝিব। চিত্তরঞ্জনের 'স্বভাবধর্ম্ম' বলিয়া একটা বস্তু ছিল। তাঁহার জীবনের সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল ভাব এই প্রাণ-বস্তুটি হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে। অতএব চিত্তরঞ্জনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার 'স্বভাবধর্ম্ম'কে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে।

অনেকেই জানেন, স্কুলের বালকরা পুস্তকে যে সমস্ত প্রচলিত নীতিকথা পাঠ করিয়া থাকে, সেই নীতির ফুটের ফিতা দিয়া চিত্তরঞ্জনের জীবন মাপিতে গেলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হইবে। নীতি-শাস্ত্রের গণ্ডী কাটিয়া এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত জীবনের বিকাশের ধারার পথ নিজেই কাটিয়া চলিয়াছেন। দক্ষিণ ও বামে 'সাধারণ জনের' ভয়ার্ত্ত চীৎকারে দৃক্‌পাত করেন নাই।

জীবনের প্রথম প্রত্যূষেই ব্রাহ্ম-সমাজ-নিরূপিত এক ব্যক্তিবিশেষ স্বেচ্ছাচারী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চিত্তরঞ্জনের 'সহস্র সঙ্কল্পভরা তরুণ জীবন'—'অর্দ্ধ-আলো অর্দ্ধ-অন্ধকারের' মধ্যে সমস্যা-সঙ্কুল সন্দেহের আবর্ত্তে পড়িয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। অজ্ঞেয় তত্ত্বের নিস্তব্ধ নিষেধ কবি চিত্তরঞ্জনকে নাস্তিক না করিয়া তীব্র অভি-মানী করিয়া তুলিল। কঠোর নিয়মের লৌহচক্রতলে মানব-হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া দণ্ডপুরস্কারহস্ত "করুণা-বিহীন" "অনন্ত-নিষ্ঠুর" ঈশ্বরের বিজয়রথখানি জীবনের পথ দলিয়া চলিয়া যাইবে—ইহাকে বিচার করিব না, বিশ্বাস করিব; ভালবাসি বা না বাসি. ইহাকে ভয় করিব; তাহা হইলে পরিণামে স্বর্গসুখভোগ; অন্যথা নরক ও শাস্তি—এই অন্ধ-সংস্কারের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কবি চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন,—

'তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন!
* * তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে
ডুবিয়া হৃদয়তলে, গভীর—গভীর!'

এক মহামৌন তপস্যায় চিত্তরঞ্জন ডুব দিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের একটা নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা অমাবস্যার নিশীথের মত নিঝুম পড়িয়া আছে। এই সময়ের মধ্যেই বোধ হয়, কবি চিত্তরঞ্জন, দয়ালু ও সহৃদাতা চিত্তরঞ্জন—হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অতৃপ্তির উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া, উপধর্ম্মের খণ্ড-সাধনার পথ পরিহার করিয়া—এক রহস্য-ময় দিব্যপ্রেরণার অপেক্ষায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। তাহার পর না জানি কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পুঞ্জীভূত স্তব্ধ অন্ধকার চমকিত করিয়া, সাধনার সাফল্য হিরন্ময়-রশ্মি বিকীর্ণ করিল—নবীন আলোকে চিত্তরঞ্জন পথের সন্ধান পাইলেন। তিনি দেখিলেন,—বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটীর মধ্যে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে।

তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার তুলসীপত্র,বাঙ্গালার গঙ্গাজল,বাঙ্গালার নবদ্বীপ, বাঙ্গালার সেই সাগর-তরঙ্গে চরণ-বিধৌত জগ-ন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গালার সাগর-সঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গালার কাশী, মথুরা,বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গালার ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এ সবই সেই প্রাণের ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

এই বিচিত্র অনুভূতি লইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন আসিয়া বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে 'বাংলার কথা' বাঙ্গালীকে শুনাইলেন। তাঁহার—বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের সিদ্ধসাধকের আবেগময় কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হইল,—"বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি।"—এবং "বুঝিলাম, বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে।"

বাঙ্গালীর প্রকৃত বাঙ্গালী হইবার অন্তরায় শতাব্দী-ব্যাপী সংস্কারের নামে বিজাতীয় পরধর্ম্মানুকরণ। বিংশ

শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই পরানুকরণমোহের উপর অতি তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন। নব্যভারতের সেই মন্ত্রগুরুর ভাবসম্পদ আত্মস্থ করিয়া বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের প্রচারক চিত্তরঞ্জন ফেরঙ্গভাব দাসত্বের প্রতিবাদ-কল্পে বঙ্গবাণীর পূজা-মন্দিরে দেখা দিলেন। 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকার ও কয়েকটি সাহিত্যিক অভিভাষণের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে তাহার স্বভাবধর্ম্মে, তাহার প্রাণধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম বঙ্কিমের পর এই প্রাণধর্ম্মী কবি একটা ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কে জানে, তাঁহার এই অসমাপ্ত কার্য্যভার কে বা কাহারা গ্রহণ করিবে?

যে যাহাই হউক, এই কালে শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয় লইয়া আমরা চিত্তরঞ্জনের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলাম। তাঁহার 'বাংলার কথা'র অপূর্ব্ব বাণী অনেকেরই জীবনে বিচিত্র ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি তখন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; আর নির্ব্বিচারে দুই হাতে বিলাইয়া দিতেছেন। স্নেহময়, উদার, দয়ালু চিত্তরঞ্জন তখন কি গুণে যে মানব-হৃদয়কে অতি প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেন, বুঝিতাম না—কেন যে তাঁহাকে দেখিলেই অতি আপনার জন বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত, অনেকে তাহা বিস্ময়ের সহিত ভাবিতেন। নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, খ্যাতি আরোপিত বসনভূষণের মত খুলিয়া ফেলিয়া আত্মভোলা প্রেমিকরূপে ছোট বড় সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতে ও ভালবাসিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। আর এই অপরূপ গুরু-শিষ্যের প্রেমসম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছিলেন,—তাঁহারাও এই প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসীকে তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, এই মনুষ্য বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে বাহির যে কোথায়, তখন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় নাই। ত্যাগের জন্ম সাধক আপন মনে প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু কিসের জন্ম, কিসের আশায়, তাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই। চিত্তরঞ্জন নিজেও কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বেশান্ত কংগ্রেসে যখন গন্ধীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভাবমুগ্ধ চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "অদূর-ভবিষ্যতে ঐ নগ্নপদ শীর্ণদেহ মনুষ্যটি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, তোমরা দেখিয়া লইও।" তখন চিত্তরঞ্জন কি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনও ঐ কৃশ ক্ষীণ মনুষ্যটির সহিত এক অপ্রত্যক্ষ নিগূঢ় প্রেম সম্বন্ধে আবদ্ধ রহিয়াছে? কে জানে কে বলিবে?

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনকে আমরা কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী নেতৃরূপে দেখিতে পাই। অনেকে অভিযোগ করেন যে, চিত্তরঞ্জন নিয়মিতরূপে কংগ্রেসে বাৎসরিক হাজিরা দেন নাই। ১৯০৬এ লোকমান্য তিলক, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি যখন কলিকাতার নৌরজী-কংগ্রেস হইতে বাহিরে চলিয়া আইসেন, তখন তাহার মধ্যে ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশও ছিলেন। যে কারণে জাতীয় দল কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, সেই কারণে চিত্তরঞ্জনও কংগ্রেসে যায়েন নাই। কংগ্রেস বনাম মডারেট মজলিসে চিত্তরঞ্জনের নিশ্চয়ই স্থান ছিল না। কংগ্রেসে না গেলেও, ঐ কালের মধ্যে তিনি আরও গুরুতর কার্য্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে যাঁহারা নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের এক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্যতীত অন্য তিন প্রধান নেতাই অতি নির্লজ্জ আচমকা আধ্যাত্মিক কারণ ব্যক্ত করিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া রাজশক্তি রক্তনেত্র বিস্ফারিত করিল, দমননীতি সফলতা লাভ করিল। সেই দুর্দ্দিনে, সেই দুর্য্যোগে—সেই রাজদ্রোহিতা ও তাহার দমননীতি এই দুই বিপরীত ঝড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া যে শক্তিশালী মহাপুরুষ একা সব্যসাচীর মত দেশের প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এখনও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। স্বদেশী মন্থনের কালে যে বিষ উত্থিত হইয়াছিল, সেই বিষ পান করিবার জন্ম এই এক নীলকণ্ঠকে রাখিয়া আর যত সব ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ একে একে নিজ নিজ ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই নীলকণ্ঠ সে দিন একলা সমস্ত বিষ অঞ্জলি করিয়া আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণার বিবাহোৎসব

দণ্ডায়মান— (১) চিত্তরঞ্জন (২) বড় জামাতা সুধীরচন্দ্র রায়
সোফায় উপবিষ্ট—(১) বাসন্তী দেবীর জননী (২) চিররঞ্জন (৩) বাসন্তী দেবী
উপবিষ্ট— (১) শ্রীমতী কল্যাণী (২) শ্রীমতী অপর্ণা

তিনি না থাকিলে কত নির্দ্দোষ আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? তিনি না থাকিলে অন্তরীণে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের কত শত বিপন্ন পরিবার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কোথায় বিলুপ্ত হইত, তাই বা কে জানে? ১৯০৬এর পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের হোমরুল আন্দোলন যখন রিফর্ম্মের মোহে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তখন জাতীয় দলের হস্তে কংগ্রেসকে রাখিয়া প্রাচীনপন্থী নেতারা একে একে সরিয়া পড়িলেন। গুপ্ত বিদ্রোহের দ্বারাও সম্ভবপর নয়, প্রকাশ্য বিদ্রোহও অসম্ভব, কংগ্রেসের মামুলী ক্রন্দনও ব্যর্থ—স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই এই ত্রিবিধ উপায় চিন্তা করিয়া চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ জাতীয় দলের নেতারা যখন হতাশ ও ম্রিয়মাণ হইতেছিলেন, তখন ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত মহিমাময় পুত পবিত্র অহিংসামূলক নিরুপদ্রব প্রতিরোধরূপ গাণ্ডীব-ধনু হস্তে ভারতবক্ষে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন - ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা যুগের অবসান এবং এক নবযুগের সূচনা হইল।

সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ

মহাযুদ্ধের সময় বিপাকে পড়িয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, রিফর্ম্মে তাহা ভঙ্গ হওয়ায় ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হইল। তাহার উপর রৌলট আইন ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে অভিনব ঘটনার সমাবেশ করিল। মহাত্মা গন্ধী সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিলেন। পঞ্জাবের সামরিক আইন ও জালিওয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন সত্যাগ্রহী হইয়া, মহাত্মা গন্ধীর বাণীকে জীবনের অর্ঘ্য দিয়া বরণ করিলেন। তাহার পর খিলাফৎ ও পঞ্জাব লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহারে ব্যথিত মহাত্মা গন্ধী অহিংস অসহযোগ ঘোষণা করিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চিত্তরঞ্জন যে আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই আদেশ আসিল। চিত্তরঞ্জন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন, অসহযোগ আন্দোলনকে তুলমূল করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিলেন। গন্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তেমনভাবে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা সে দিন এক চিত্তরঞ্জন ছাড়া আর কাহারও ছিল না। বাঙ্গালার এক ও অদ্বিতীয় তেজস্বী ত্যাগী বরপুত্রকে সম্মুখে করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য অধীর আগ্রহে বাঙ্গালী যখন একান্তভাবে চিত্তরঞ্জনকে আহ্বান করিল —মহাপ্রাণ স্থির থাকিতে পারিলেন না—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জনসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালাদেশ বিরাট মহিমময় অসহযোগ আন্দোলনকে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় বিরাট-পুরুষকে উপঢৌকন দিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ভারতের সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন চিত্তরঞ্জন না থাকিলে গন্ধীর সম্মুখে আমরা কি লইয়া দাঁড়াইতাম? বাঙ্গালীর মান-ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য সে দিন চিত্তরঞ্জন ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালী আমরা আছি বলিতে পারি। চণ্ডিদাসের কাব্য ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লইয়া যে পরদুঃখকাতর, দয়ার সাগর, মহাপ্রাণ বাঙ্গালী প্রাণধর্ম্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণকল্পে সাহিত্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন,—কর্ম্মসন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনকে দেখিয়া বুঝিলাম, তাহা ব্যর্থ হয় নাই, বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্ম মরে নাই। বাঙ্গালী মরে না, প্রাণ দেয়—চিত্তরঞ্জন তাহার প্রমাণ।

শেষ কথা

ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমষ্টি-মুক্তির এক উদার কল্পনা লইয়া নির্ভীক দুঃসাহসী চিত্তরঞ্জন এক উগ্র আবেগে, রুদ্র-তাণ্ডবে জীবনের শেষ কয় বৎসর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই কার্য্যের ফলাফল বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার সময় এখনও আইসে নাই। তাঁহার শক্তি-সবল জীবনের তেজ ও বীর্য্য যে ভাবে উত্তাপ ও আলোক সমভাবে বিতরণ করিয়া জাতিকে আশান্বিত ও বিদেশী আমলাতন্ত্রকে কম্পান্বিত করিয়াছে, তাহা আলোকস্তম্ভের মত বহুদিন অব্যাহত থাকিয়া জাতিকে স্বরাজের পথ নির্দ্দেশ করিবে সন্দেহ নাই। অস্ত্রে ও বর্ম্মে সুসজ্জিত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বীর স্বাধীনতার রণাঙ্গনে দেখা দিয়াছিলেন। গৌরবে উন্নত, ত্যাগে পবিত্র, মহিমায় উজ্জ্বল, সেই সিংহপ্রতিম মূর্ত্তিখানি এখনও আমাদের

অসহযোগ-আন্দোলন সূচনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। সেই বিস্ফারিত চক্ষু, দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর—সেই প্রদীপ্ত ললাটের দিকে চাহিয়া বাঙ্গালী পূর্ণ-বিশ্বাসে তাঁহাকেই স্বরাজ-সংগ্রামের সেনাপতির পদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, কৃতার্থ হইয়াছিল। এই দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জন অকুতোভয়ে অতি কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কঠিন কঠোর বাস্তবের ভূমিতে এই মহাবীর শত্রুর ভীতি উৎপাদন করিয়া জীবন-মরণ সংঘর্ষে ব্রতী ছিলেন—আর আজ বীরোচিত গৌরবে রণক্ষেত্রেই শয়ন করিলেন। ভারতের ইতিহাস আর একবার ভাঙ্গিয়া গড়িবার যে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও দুঃসাধ্য উদ্যম আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—তাহা যে কত বড় আত্মবিসর্জ্জন—আবার বলি—তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আইসে নাই।

তাঁহার সর্ব্বশেষ আদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী এখনও আমাদের কানে সুস্পষ্ট হইয়া বাজিতেছে। ফরিদপুরের অভিভাষণের উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন,—"যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তুমি, তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, একটা সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—তখন সংযত শান্ত পক্ষাপক্ষ সে শান্তিময় মিলন-মন্দিরে সমুন্নতশিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে—এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি।"

তাঁহার পতাকা, তাঁহার বর্ম্ম-চর্ম্ম, তাঁহার বিজয়-মহিমান্বিত তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্রের উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী আমরা—তাঁহার পুণ্যস্মৃতি শ্রদ্ধানতশিরে বহন করিয়া এই বিঘ্নবহুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যত দিন আমরা চিত্তরঞ্জনের ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত মিলনমন্দিরে উপস্থিত হইতে না পারি—তত দিন তাঁহার অমরবাণী, তাঁহার চরিত্র আমাদিগকে উৎসাহ দিবে, বল দিবে, নৈরাশ্যের অন্ধকারে পথ দেখাইবে—ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মজুমদার।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়িবার অনেক দিন পরে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনের কার্য্যসূত্রে আমি তাঁহার সংস্রবে আসি এবং ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হই। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন এসোসিয়েশনের সভাপতি, শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক এবং আমি সহকারী সম্পাদক। হিন্দু-স্কুল থিয়েটার ও পুরাতন এ্যালবার্টহল গৃহে সভার অধিবেশন হইত—সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। হিন্দু-স্কুল থিয়েটারে আলোর ব্যবস্থা ছিল না, অনেক সময় কল্কের উপর মোমবাতী বসাইয়া সভার কায চালাইতে হইত। এ্যালবার্টহলে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু হলের ভাড়া দিবার সঙ্গতি আমাদের ছিল না। তজ্জন্ত হিন্দু-স্কুলের থিয়েটারেই অধিকাংশ মিটিং হইত। শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতেন, সময়ে সময়ে বক্তৃতাও করিতেন।

বোধ হয়, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপূর্ব্বে ও তাহার কিছু দিন পরে পর্য্যন্ত ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনের সহিত তাঁহার পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনের মেধা, উদ্যম ও সহৃদয়তার লক্ষণ তখনই যথেষ্ট প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশনের অনেক বক্তৃতার বাদানুবাদে তিনি যোগদান করিতেন। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার অধিকার ও তর্কশক্তি তখনই যথেষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। বেশভূষার পারিপাট্যের প্রতিও তখন হইতেই বেশ লক্ষ্য ছিল। কালে এই প্রতিভাবান্ যুবক সমাজে বরেণ্য স্থান অধিকার করিবেন, অনেকের তখনই বিশ্বাস হইয়াছিল।

ইহার অল্প পরেই চিত্তরঞ্জন সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্ত বিলাত যায়েন। কোন সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, বিলাতে কোন সভায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার জন্ত তাঁহার সিবিল সার্ভিসে চাকরী হয় নাই। এ কথা সমূলক বোধ হয় না। যে কয় জন লোক লইবার সে-বার কথা ছিল, চিত্তরঞ্জন তাহাদের মধ্যে পরীক্ষায় স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহাই তাঁহার সিবিল সার্ভিসে প্রবেশের বিঘ্নহেতু হইয়াছিল। বিধি যে তাহার সমস্ত কার্য্যাবলী সহসা অনধিগম্য নিয়মে পরিচালিত করিয়া থাকে, মানুষ সহজে তাহা বুঝিতে পারে না।

দেশসেবকদলের মধ্যে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকারলাভ শুধু চিত্তরঞ্জনের ঘটে নাই, তাহা নহে। মনোমোহন ঘোষও সে অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রবিষ্ট হইয়াও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে কর্ম্মে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষও অযথা কারণে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। বিধাতার নির্দ্দিষ্ট গূঢ় কারণেই এই সকল মহাপুরুষের কর্ম্ম-পথ দেশমাতৃকার প্রকৃষ্ট সেবার প্রয়োজনবশতঃ অপর দিকে পরিচালিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন পুরুষানুক্রমে ব্যবহারাজীব বংশজাত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কালীমোহন বাবু ও দুর্গামোহন বাবু উচ্চশ্রেণীর উকীল ছিলেন; তাঁহার পিতা ভুবনমোহন বাবু উকীল ও এটর্ণি ছিলেন। সে কালে এটর্ণি-পুত্রের হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কার্য্যে শীঘ্র প্রতিপত্তিলাভ যত সহজ ছিল, এখন তত নাই। ভুবনমোহন বাবু এটর্ণির কাযে তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন না। তিনি ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন ও বেঙ্গল পাবলিক অপিনিয়ন নামে প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। দেশ ও সমাজহিতকর নানা কার্য্যে তাঁহার সময় যথেষ্ট ব্যয় হইত। কৃতী পুত্রের ব্যবহারাজীব-কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রথম জীবনে ভুবন বাবুর যথেষ্ট সুবিধা ও অবকাশ হয় নাই। বরং শেষ জীবনে ঋণজালে জড়িত হওয়ার জন্ত পিতাপুত্রের কার্য্যক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা হইয়াছিল।

ভবানীপুরের দাশপরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকুতোভয়ে নিজমত অনুসারে কায করিয়া সাধারণে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। দুর্গামোহন বাবুর

পত্নী ব্রহ্মময়ীর ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণা, পতিগতপ্রাণা ও সমাজনির্য্যাতনসত্ত্বেও আশ্চর্য্যরূপ সহিষ্ণু ব্রাহ্ম-মহিলা সে সময়ে অতি অল্পই দেখা যাইত। তাঁহাদের পরিচিত ও আত্মীয় তুল্য প্রিয় এক ব্রাহ্ম-পরিবারের সহিত আমি বাল্যকালে বিশেষভাবে সংবদ্ধ হইয়াছিলাম। রাণাঘাটে আমার তৃতীয় খুল্লতাত আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যখন মুন্সেফ ছিলেন, আমি তাঁহার ও খুল্লতাত-পত্নীর স্নেহে বশীভূত হইয়া অনেক সময় তাঁহাদের নিকট থাকিতাম। পূজার ছুটী, গ্রীষ্মের ছুটী, শীতের ছুটী সকল বড় ছুটীই রাণাঘাটে চূর্ণীর ধারে কাটিত। আমাদের বাড়ীর গায়েই শ্রীযুত নীলকমল দেব নামে এক জন দীক্ষিত ব্রাহ্ম বাস করিতেন; আমার খুল্লতাতের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমার রাণাঘাট অবস্থানের অধিকাংশ সময় তাঁহাদের বাটীতে কাটিত। নীলকমল বাবুর স্ত্রী আমাকে যতদূর সম্ভব স্নেহ করিতেন; তাঁহার পুত্র সুরেশচন্দ্র দেব আমার বাল্যবন্ধু। তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে হিন্দু ও ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে এত দূর প্রগাঢ় স্নেহবন্ধন সম্ভব বলিয়া অনেকে মনে করিতেন না। এই ব্রাহ্ম-পরিবার বিশেষ কঠোরভাবেই যাহা নিজ কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা সাধন করিতেন। সরস্বতীপূজার প্রসাদী ফল জোর করিয়া মুখে দিতে সুরেশচন্দ্রের বলিষ্ঠ বন্ধুগণের পাচ ছয় জনের আয়াস প্রয়োজন হইত। উত্তরকালে সেই সুরেশচন্দ্র পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গুরুর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই পরিবারের সহিত দুর্গামোহন বাবু ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল ও তদুপলক্ষে তাঁহাদের ও তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের রাণাঘাটে যাতায়াত ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবারও আমাদের যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছিল। সে সব দিনের কথা ছোট ছেলেমেয়েদের মনে না থাকিতেও পারে। আমার বিশেষ মনে আছে এই জন্য, আমি তখন অপেক্ষাকৃত বড়। নীলকমল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর প্রতি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা দেখিয়া আমিও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। প্রায় এই সময়েই শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয়। তাহাতে নীলকমল বাবুর পরিবার বিশেষ শোকনিমগ্ন হয়েন, আমাদেরও বড় ব্যথা লাগে। দুর্গামোহন বাবু ও তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ভবানীপুরের দাশ-পরিবারের প্রতি আমি চিরদিন আকৃষ্ট। শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর একখানি সুপাঠ্য জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই পরিবারের কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলিবার এক প্রধান কারণ যে, নীলকমল বাবুর পুত্র সুরেশচন্দ্রের ন্যায় ভুবনমোহন বাবুর পুত্র চিত্তরঞ্জনেরও উত্তরকালে হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা হয় এবং সেই পুনরাস্থাফলে দেশ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। কে জানে, সেই বাল্য-জীবনের কোন কথা, কোন কায, কোন ঘটনার সহিত এই দুই ব্রাহ্ম-বালকের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পুনরাস্থার বীজ ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত হইয়া উত্তরকালে উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছিল কি না।

ব্যারিষ্টার হইয়া দীর্ঘকাল জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত অনেককেই হইতে হইয়াছিল। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী কাহারও পক্ষে প্রথমতঃ এ নিয়মের বিপর্য্যয় হয় নাই, অথচ সকলেই অচিরে প্রতিভাবলে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবহারক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনও এই নিয়মের অধীন। ক্রমশঃ তাঁহার কর্ম্মশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়।

নবীনচন্দ্র বড়াল মহাশয় ও তাঁহার সহযোগিগণ যখন 'হিতবাদী' সংবাদপত্র প্রথম সংস্থাপন করেন, তাহার অব্যহিতকাল পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালই হউন বা শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশই হউন কিংবা তাঁহাদের কোন আত্মীয় কিংবা সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তিই হউন, 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত কোন বিষয়ের কথায় মর্ম্মান্তিক হয়েন এবং তজ্জন্য মানহানির মোকর্দ্দমা কিংবা এইরূপ একটা মোকর্দ্দমার জন্য ব্যস্ত হয়েন। পরামর্শের জন্য আমার ওল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীটের আফিসে আইসেন। সে বাড়ী এখন ভাঙ্গিয়া মাঠ হইয়া পড়িয়া আছে। বহু তর্কবিতর্ক বাদানুবাদ হয়। বিপিন বাবু সকল বাদানুবাদের অগ্রণী। এখন কি করেন, বলিতে পারি না। টেবলের উপর বসিতে পারিলে বিপিন বাবু তখন চেয়ার-কেদারায় বসিতে পারিতেন না। ঘরের বাহিরে কেরাণী-মক্কেল জমায়েৎ হইয়া গেল, দীর্ঘকাল বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। আমি মোকর্দ্দমার

নিরস্ত হইবার পক্ষে যত প্রবল যুক্তির অবতারণা করি, বিপিন বাবুর তত উৎসাহ বাড়ে। আমি বারংবার তাঁহাকে বলি যে, সচরাচর সাধারণ মক্কেলকে আমি তিনবার ফিরাইয়া, তিনবার বুঝাইয়া ও বুঝিবার অবকাশ দিয়া তাহাতেও না থামিলে তবে রণে অগ্রসর হইতে দিই। এ ক্ষেত্রে পাঁচবার এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন হইল। বিপিন বাবু ইহাতেও দমিলেন না, কিন্তু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন ও শান্ত হইলেন। কথা তিনি সে উপলক্ষে অল্পই কহিয়াছিলেন ; উত্তেজনা যথেষ্ট থাকিলেও তিনি অধীর হয়েন নাই, শীঘ্র শান্তভাব ধারণ করিয়া আসল কথা বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন। উত্তরকালে অপরে তাঁহার কারণপরম্পরায় অন্য ভাব দেখিয়া থাকিতে পারে। একাধিকবার আমি এই শান্ত-ভাব দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত মহানুভবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। জীবনে সেই মহানুভবতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এইরূপ আর একবার দারুণ উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও তাঁহাকে শীঘ্র সৌম্য ও শান্তভাব ধারণ করিতে দেখিয়া আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

বারাণসীর এলাকার মধ্যে একটা বড় মোকর্দ্দমায় আমরা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষাবলম্বী ছিলাম। উভয়পক্ষে কলিকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ আদালতের গণ্যমান্য অনেক উকীল-ব্যারিষ্টার ছিলেন। উভয় পক্ষই নিদারুণ রণোন্মুখ ; উকীল ব্যারিষ্টারও তাহাই। শ্রীযুত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুত তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক ব্যবহাররথী সে মোক-র্দ্দমায় নিযুক্ত ছিলেন। অপরপক্ষে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন। তুমুল ব্যাপার। মোকর্দ্দমা চলা উচিত নহে, রফা-নিষ্পত্তি হওয়া কর্ত্তব্য, এই কথা আমার মনে উদয় হয়। বহু কষ্টে আমার পক্ষের লোকের ক্রমশঃ এ কথায় মত হইলেও প্রতিপক্ষের মত সহজে হয় না। প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টার রফা-নিষ্পত্তির বিশেষ বিরোধী। তাঁহার মত করার ভার আমি লইলে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে অধিক বিলম্ব হইল না ; একটা বড় ঘর আপা-ততঃ রক্ষা হইয়া গেল। মূল কথা এই যে, সাময়িক উত্তেজনা সত্ত্বেও ধীর সংযত যুক্তির সাহায্যে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনকে উত্তেজনা পরিত্যাগ করান কঠিন হইত না। যুক্তি ও সত্যের মর্য্যাদার অনুভূতি তাঁহার পূর্ণভাবে ছিল। ব্যবসায়ক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তাঁহার সহিত অনেকবার কায করিবার আমার অবকাশ হইয়াছে। সকল সময়েই এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছি।

'মাসিক বসুমতীর' সম্পাদক মহাশয় আমাকে ভার দিয়াছেন ও অনুরোধ করিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর সম্বন্ধে সচরাচর সমালোচিত কথা বাদ দিয়া আমি সাধারণতঃ অজ্ঞাত কথার অবতারণা করি। সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত সাধারণ কথার বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইবে। সকলের পক্ষে সে সমালোচনার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সে অনুরোধ শিরোধার্য্য।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে পূজার বন্ধের পূর্ব্বেই Congress of Universities of the British Empireএর কায শেষ করিয়া আমি বিলাত হইতে দেশে ফিরিতে বাধ্য হই। বন্ধের পূর্ব্বেই ফিরিতে হয়। সেই সময়ে ভারত-বর্ষ হইতে যে ডাক-জাহাজ যাইতেছে, তাহার মধ্যে একটাকে 'Judges' Boat' বলা হয়। এ অদ্ভুত আখ্যার অর্থ এই যে, পূজার বন্ধে ভারতবর্ষের জজরা যে জাহাজে বিলাত যায়েন বা বন্ধের পর যাহাতে আইসেন, তাহাকেই হাইকোর্টের কথায় 'Judge's Boat' বলে। সে বৎসর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন Judge's Boatএ বিলাত যাইতেছেন। আর আমাদের জাহাজে আছেন, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া Mrs. P. R. Das.

ভুবনমোহন বাবুর সঙ্গে আমার যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পুত্রবধূর কথা বলিতেন। সাক্ষাৎ না হইলেও তাঁহার বিষয় ভুবন বাবুর সহিত এই সকল আলাপসূত্রে বিশেষভাবে জানিতাম। জাহাজে একত্র আসিবার অবকাশ পাইয়া বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। এক টেবলেই পাশাপাশি আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও কথাবার্ত্তা হইত। তিনি তখন অন্তঃ-সত্ত্বা। বিলাত হইতে ফিরিতেছেন। কোন কোন "সাহেবী" ধরণের বাঙ্গালী মহিলা তখন ইংলণ্ড-প্রসূত সন্তানের জননী হইবার আশায় সসত্ত্বাবস্থায় বিলাতে যাইতেন। কিন্তু খাস বিলাতী মেম Mrs P. R. Das,

প্রসব হইবার জন্ত স্বামীর জন্মভূমিতে ব্যগ্র হইয়া ফিরিতেছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহার মধুর স্বভাবে জাহাজশুদ্ধ লোক সুখী হইয়াছিল। তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ইচ্ছা করিয়া স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ীর বিপরীত অনুরোধ সত্ত্বেও খাঁটি বাঙ্গালী মহিলার জীবন যাপন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করেন, তাহার পরিচয় দিতেন। সার রাজেন্দ্র ও লেডী মুখোপাধ্যায়ও সেই জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরিতেছিলেন। মিসেস্ দাশের সে অবস্থায় যেরূপ যত্নসেবার প্রয়োজন, লেডী মুখোপাধ্যায় সেই ভাবে যত্ন করিতেন। বোম্বাইয়ে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে জাহাজেই তাঁহার সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কথাটার অবতারণার উদ্দেশ্য —শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে উদার সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান। মিসেস দাশের পক্ষে সে অবস্থায় বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসা শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ব্যগ্রতা ব্যতীত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার নিকট চিত্তরঞ্জনের অনেক গল্প শুনিতাম; শুনিয়া আপ্যায়িত হইতাম। এক দিন Judge's Boat আমাদের জাহাজের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমরা অপর জাহাজ হইতে এক Wareless পাইলাম। যাহাকে Sea-Law বলে, তখন দুই জাহাজ তাহারই মধ্য দিয়া বিপরীত দিকে যাইতেছিল। সমুদ্রের সকল যায়গা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত নিরাপদ নহে। সেই জন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ পথে বিপরীতদিগ্‌গামী জাহাজকে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ভ্রাতৃবধূর তদানীন্তন অবস্থায় চিত্তরঞ্জন বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন এবং জাহাজ পরস্পর কাছাকাছি হইয়াছে, এই সুযোগে Wareless দ্বারা সংবাদ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তখন Mrs. Das প্রসব হইয়া সুস্থ হইয়াছেন, warelessএর দ্বারা এই প্রত্যুত্তর পাইয়া তাঁহার আনন্দ ধরিল না। পুনরায় Wareless করিয়া উল্লাস প্রকাশ করিলেন। উপলক্ষ সামান্ত হইলেও তাঁহার হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়া জাহাজশুদ্ধ লোক, বিশেষ ইংরাজ রমণী আরোহীরা চমৎকৃত হইলেন। বোম্বাইয়ে Mr. P. R. Das স্ত্রীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই ঘটনার পরিচয় পাইয়া তিনি সুস্থ হইলেন।

এই সময়েই চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-চর্চ্চার প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীত,' বোধ হয়, এই সময়েই প্রকাশিত। সাগর তাঁহাকে কবিভাবে উন্মাদ করে ও সাগরবক্ষে তাঁহার এই সুমধুর আত্মীয়ানুরাগের পরিচয় পাই।

'সাগর-সঙ্গীত' এক খণ্ড উপহার দিয়া চিত্তরঞ্জন আমাকে ধন্ত করিয়াছিলেন। না বলিয়া বই চাহিয়া লওয়া যাহাদের নিত্য কার্য্য, তাঁহাদেরই কাহারও কৃপায় সে বইখানি আমার হারাইয়াছে। তাহা থাকিলে আমার পুস্তকালয়ের আজ গৌরব বাড়িত।

সাহিত্যানুরাগ ও অন্যান্ত কারণে ভাব-প্রেরিত হইয়া চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম নারায়ণ-পূজায় ত্রুটি হয় নাই। পরিশেষে যখন গোলমাল হইয়া পড়ে, তখন পরিবর্ত্তনের জন্ত তাঁহাকে অনেক অনুযোগ ও অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি 'নারায়ণ'-প্রকাশ কার্য্যেই ক্ষান্ত হয়েন। 'নারায়ণের' পূজা অব্যাহত থাকিলে আমাদের সাহিত্য-সম্ভারের প্রকৃষ্ট প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিত সন্দেহ নাই। 'নারায়ণ'-পরিচালন উপলক্ষে অনেক উপযুক্ত অনুপযুক্ত সাহিত্যিক তাঁহার সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যথেষ্ট মনোবাদেরও কারণ হয়। তাঁহার বৈষয়িক ব্যাপারসংক্রান্ত কোন কোন বিষয় লইয়া শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সহিত অনেক সময়ে কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইত। চিত্তরঞ্জনের সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার অনেক পরিচয় এই উপলক্ষে পাইয়াছি।

ত্যাগী, ধীমান্, দাতা, কর্ম্মী, মন্ত্রণাদৃঢ় চিত্তরঞ্জনের অলন্ত উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত দেশমাতৃকার সেবায় সমর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শত্রু মিত্র দারুণ ক্ষুব্ধ হইল; দেশব্যাপী স্মৃতি-সম্মানে দিগন্ত স্তব্ধ হইল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদিনে কলিকাতায় যে অভূতপূর্ব্ব অচিন্ত্যপূর্ব্ব জনসমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য, অর্থ ও ভাবী ফল সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক জল্পনার উদয় হইতেছে। তৎসম্বন্ধে বিচার ও সমস্তাপূরণের সময় অদূর ভবিষ্যতে
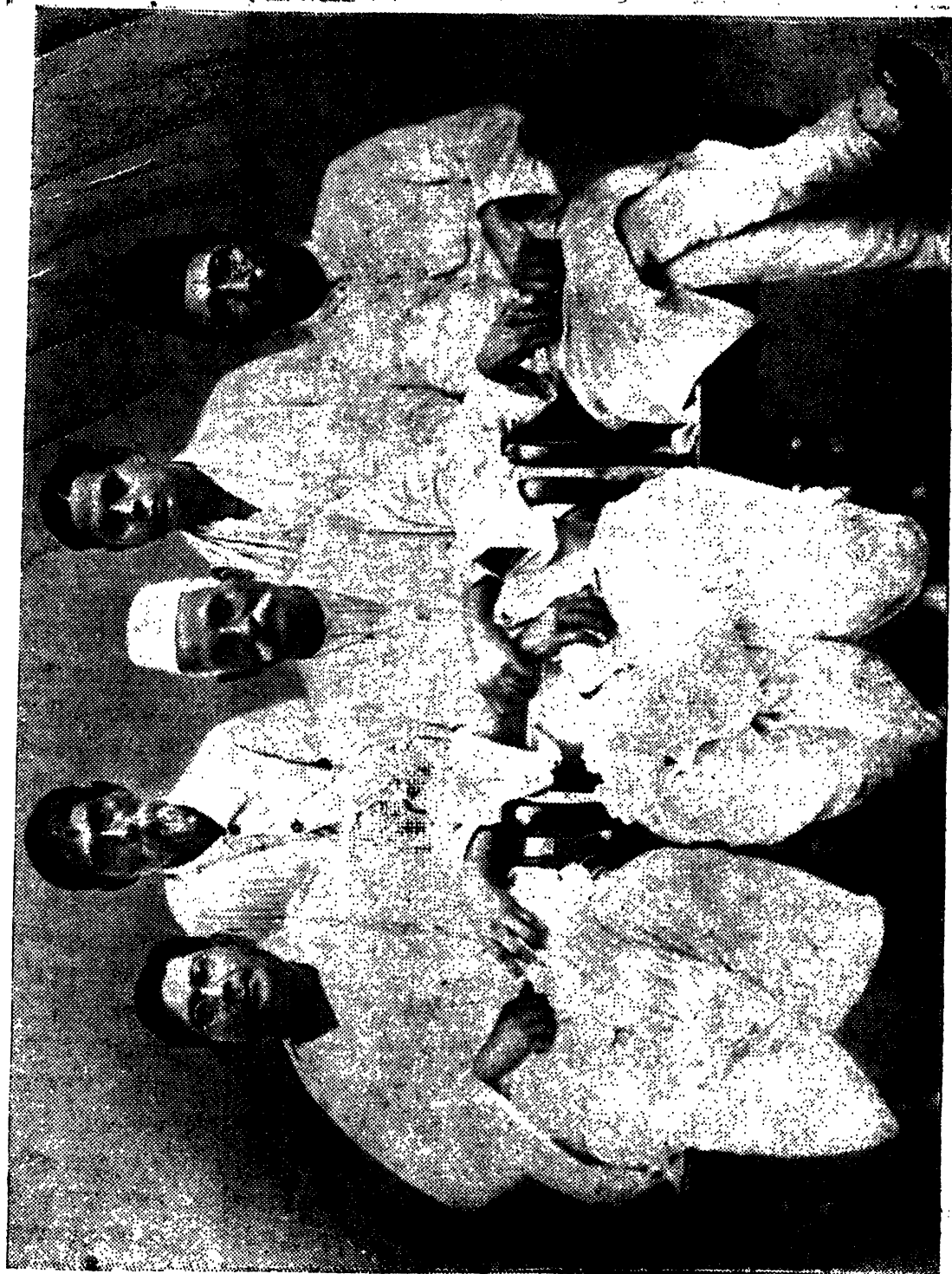
উপবিষ্ট—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ। দণ্ডায়মান—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়

কারামুক্ত চিত্তরঞ্জন

হইয়ে বোধ হয় না। প্রজাপক্ষ রাজপক্ষ উভয়েই এই অদ্ভুত ব্যাপারে স্তব্ধ হইয়াছে ও তাৎপর্য্যগ্রহণ-চেষ্টার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হইতেছে।

দেশসেবা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের শক্তি ও প্রথার ক্রমবিকাশ দেশভক্ত মাত্রেরই ঐকান্তিক অনুধাবনের যোগ্য বিষয়। নূতন পথে মাতৃসেবার তিনি আয়োজন করিতেছিলেন এবং যে জন্য তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অনেকের মনে বিরাগ সৃষ্টি করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হয়েন নাই,সে পথে কতদূর সুফল কত দিনে ফলিত, ভগবান্ জানেন। কিন্তু তাঁহার এ কল্পনা—এ চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইল, দেশের পক্ষে, রাজা-প্রজার পক্ষে তাহা দারুণ ক্ষতি। সহজে সহসা ও শীঘ্র সে ক্ষতিপূরণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

দেশবন্ধুর প্রেরণা

অনেক দিন হইল, একবার শ্রীশ্রী৺পূজার ছুটীতে দেশবন্ধু সপরিবারে মুশৌরী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি সে বার ডেরাডুনে গিয়াছিলাম। মুশৌরীতে একত্র মিলিয়া হরিদ্বার হইয়া সকলে লছমন ঝোলায় উপস্থিত। তথায় পতিতপাবনী জাহ্নবীর তীরে বসিয়া নানা কথা বার্ত্তা হইতেছিল।

সহোদরাস্থানীয়া শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রশ্ন করিলেন, হিন্দুদিগের মধ্যে গঙ্গার এত মাহাত্ম্য কেন? তদুত্তরে দেশবন্ধু যে অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভাবে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা শুনিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। মনে করিতে লাগিলাম যে, এ যুগেও আবার হর-পার্ব্বতীসংবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল।

তিনি বুঝাইলেন যে, হিন্দুর সভ্যতা তাহাদের বিশিষ্ট সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সাধনার ধারা ঐতিহাসিকভাবে জাহ্নবীর মধুর কল্লোলে বহিয়া চলিতেছে। সেই সাধনা ঐ সর্ব্বকলুষনাশিনীর কূলে কূলে ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই জন্যই এই অমৃতধারাবাহিনী গঙ্গা দেবীর এত মাহাত্ম্য। ইহাতে কতকটা বুঝা যায় যে, তিনি ভারতের অতীত সাধনার প্রতি কতটা পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় এত উদার ও মহান্ ছিল যে, এই অপূর্ব্ব সুধাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, তিনি নব ভারতে আবার ভগীরথের ন্যায় এরূপ ভাবগঙ্গা আনিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে কেবল হিন্দু নহে, পরন্তু সকল ধর্ম্মাবলম্বীই—কি মুসলমান, কি খৃষ্টান এবং আপামর সাধারণ পূত হইয়া মনুষ্যত্বের মহাশ্মশানে আবার মনুষ্যত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে।

হে বীর! হে সাধক! তোমার পরম সাধের মনুষ্যত্বের উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন না করিয়াই চলিয়া গেলে? কে আর তাহার উদ্ধারসাধন করিবে?

হে ভাবুক! এই তোমার এক অপূর্ব্ব ভাব। আবার পুরুষ-প্রকৃতির লীলা দেখিতে দেখিতে তুমি আত্মহারা হইয়া যে আনন্দ অনুভূতি করিতে, তাহার স্বাদ নানা ভাবে ও নানা রূপে তোমার দেশবাসীকে দিবার জন্য তুমি প্রয়াস করিয়াছ। পরম বৈষ্ণবের ন্যায় যে নিত্যলীলা তুমি চিরদিন দেখিতে ও দেশবাসীকে দেখাইবার চেষ্টা করিতে, তাহা তোমার দেশবাসীর দেখিবার ও বুঝিবার পূর্ব্বেই দেশবাসীকে দুঃখসাগরে ডুবাইয়া চলিয়া গেলে। কে আর তাহা দেখাইবে, বুঝাইবে?

তুমিই যে এই নিত্য লীলার সেই পুরুষ ছিলে, তুমিই যে "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্", ইহা বোধ হয়, তুমি কতকটা বুঝিতে বলিয়াই এমন করিয়া জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন, ভোগ এবং সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছ। তেমনই আবার এই পুরুষও যে পুরুষোত্তমের লীলারই সহায় মাত্র, ইহা বুঝিতে বলিয়াই সকল কার্য্যই তাঁহারই প্রেরণা জানিয়াই নির্লিপ্তভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে এবং সেই জন্যই যখন তাঁহারই প্রেরণায় ঐ সকল ভোগবিলাস ত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে।

তুমি এইরূপ নির্লিপ্ত পুরুষভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে বলিয়াই প্রকৃতির প্রধান যে মোহিনীশক্তি অর্থাৎ রূপ, অর্থ ও যশ, কখনও তোমায় একেবারে মুগ্ধ, আকৃষ্ট বা বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তুমি প্রকৃতির এই মোহন গুণ সকল ভোগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তাহাও নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায়। স্বরাজলাভের জন্য যখনই তাহা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তুমি বীরের ন্যায় তাহাদের মোহ পরিত্যাগ করিয়া জগতে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছ। এই স্বরাটভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে বলিয়াই যেমন এক পক্ষে প্রকৃতির হৃদয়মোহিনী মূর্ত্তি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, অপর পক্ষে তেমনই মানুষের আত্মপ্রেরণার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির যে সকল সামাজিক ও রাজনীতিক বাধা-বিঘ্ন, ব্যবস্থা-নিয়ম, আইন কানুনকে তাহার অন্তরায় বলিয়া মনে করিতে, তাহার বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় অমিততেজে আজীবন যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছ। ইহাই তোমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" গীতায় এই সূত্রে যে সত্যের আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা

তুমি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলে। তাই সকল নিগ্রহ, সকল বিধিব্যবস্থা মনুষ্যের ব্যক্তিগত বা জাতিগত হিসাবে স্বরাজলাভের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে তাহা দূর করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াছ।

তোমার এই পুরুষত্ব বিকাশের সর্ব্বগ্রাসী চেষ্টায় তুমি একবার স্থির হইয়া বিচার করিবার অবসর পাও নাই যে, লীলাময়ের লীলাবিকাশে বিধি-নিয়মেরও একটা স্থান আছে।

কিন্তু যখনই বিধি-নিয়মের প্রাবল্যে মানুষের হৃদয়-স্থিত ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ চাপা পড়িয়া যায়, তখনই আবার সেই শক্তি রুদ্ররূপ গ্রহণ করিয়া সেই সকল বিধি-নিয়মের উচ্ছেদসাধন করে। তুমিই তাই তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি অবলম্বনে বাহিরের সকল বিধি-নিষেধ দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলে।

তুমি পুরুষত্বের মহাবিকাশ বলিয়াই অন্তর্নিহিত শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে তাহার দোষ-গুণ বিচার করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাও নাই; আত্মপ্রেরণার বলেই বিশ্ব জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। হে বীরবর! তোমার এই বিশ্বজয় সম্পূর্ণ হইতে না হইতে কেবলমাত্র প্রথম রুদ্ধ তোরণ ভগ্ন করার জয়মাল্য শিরে লইয়া চলিয়া গেলে! কে তোমার অসম্পূর্ণ কার্য্য এখন সম্পন্ন করিবে?

তোমার চরিত্রের এই বিকাশ হইতেই দরিদ্র, পীড়িত, ঘৃণিত, নিষ্পীড়িত, লাঞ্ছিতমাত্রেরই প্রতি তোমার অপরিসীম মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কারণ, ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার ধারণা হইয়াছিল যে, কোনও না কোন সামাজিক বা রাজনীতিক ব্যবস্থার দোষবশতঃই ইহারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার ও সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সেই জন্যই তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য করিয়াও এবং তাহা নিজে মাথা পাতিয়া লইয়াও যখন দেখিলে, তাহা দূর করা গেল না এবং যখন বুঝিলে, পরাধীনতাই ইহার মূল কারণ, তখন বীরদর্পে তাহার সংস্কার অথবা দূরীকরণে অগ্রসর হইলে। তোমার এই জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ জগতে বিরল এবং ইহা চিরদিনই এই প্রাণহীন জাতির অন্তরে জাগিবার ও বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হে মহাপুরুষ, তুমি কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া জাতিকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ক্ষান্ত হও নাই। তোমার সেই জলন্ত জীবন্ত আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলে।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এই মহাবচনোক্ত শ্রেষ্ঠরূপেই তুমি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তোমার এই প্রাণস্পর্শী আচরণ কখনই ব্যর্থ হইবে না। তোমা বিহনে তোমার এই মহান্ আদর্শ জাতিকে দ্রুততর বেগে স্বরাজ-সাধনার পথে অগ্রসর করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তুমি নিজের দৃষ্টান্তে যাহা এই জাতির নিকট চাহিয়া-ছিলে—তাহা তুমি তোমার জীবনে দেখিয়া যাইতে পার নাই। তজ্জন্য এই আত্মহারা আত্মবিস্মৃত জাতি প্রাণে প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেছে। যদি জানিত যে, তুমি তাহাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া, তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া এত অল্পকালমধ্যে চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের জড়তা পরিহার পূর্ব্বক একবার প্রাণ-পণে তোমার আদর্শ অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইত। তাহা করিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা আজ মর্ম্মাহত হইয়া তোমার চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একমনে একপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, তোমার জীবনের সাধ পূর্ণ করি-বেই করিবে।

যেমন হৃষীকেশ অর্জ্জুনের নিকট চাহিয়াছিলেন—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ, যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং", তেমনই তুমি সকলের নিকট চাহিয়াছিলে যে, যাহাই কর না কেন, তাহা যেন মাতার উদ্ধারের জন্য—মাতৃপূজার জন্যই হয়।

তোমাকে হারাইয়া আমরা সকলে প্রাণে প্রাণে ইহা উপলব্ধি করিয়াছি।

হে দেব, তুমি যেমন আমাদের মর্ত্তে সাহস, ভরসা, কার্য্যে নিবিষ্ট করিতে, তেমনই তুমি সেই অমরধাম হইতে বল দাও—যেন আমরা অনতিবিলম্বে মাতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তোমার চিরবাঞ্ছিত অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।

শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত।

এস

হে সৌম্য, হে প্রেমময় হৃদয়রঞ্জন,
ব্যথিতের চির-সখা, হে নিত্য-বান্ধব,
অবস্থার বিপর্য্যয়ে দারুণ তাণ্ডব
নয়নে লেপিয়া দিলে বিচিত্র অঞ্জন ;
প্রভাবে তাহার আজি নিঠুর এ ধরা
হেরিতেছি স্নেহরসে, করুণায় ভরা।
সমবেদনার মন্ত্রে হে সিদ্ধপুরুষ,
যে মন্ত্রে উদ্ধার হয় দীন হীন কৃশ,
আজি এ অধম যুগে মহিমা তাহার
মূর্ত্তিমান উপমায় ফিরালে আবার।
কোন এক মহাযুগে তোমায় আমায়,
প্রদোষের অন্ধকারে অশ্বত্থের ছায়,
প্রথম মিলন হ'ল পড়িতেছে মনে ;
বিহঙ্গম-মুখরিত পূত তপোবনে।
তুমি হে তাপসশ্রেষ্ঠ যোগী পুণ্যবান্,
সাধনায় লভি সিদ্ধি দীপ্ত শক্তিমান,
হিতে রত কর্ম্মযোগী বৈষ্ণব-প্রধান,
নৈপুণ্যের অবতার মুক্ত মহাপ্রাণ,
সে শক্তি খসিয়া দিয়া চাহিলে আমায়
তুলিতে তপস্যাগিরি চূড়া যেথা ভায় ;
আমি মূঢ়, স্বার্থপর, আত্মসুখে লীন,
পুণ্য সে ব্রতের কথা ভুলি দিন দিন
তপোভ্রষ্ট কর্ম্মহীন, স্খলিতচরণ,
অসিদ্ধির গুহামাঝে জীবন্ত মরণ
লভিয়া হইনু পঙ্গু ; সর্ব্বশক্তিহীন,
অহঙ্কার দৈন্যে ভরা তবু নহে দীন।
প্রহরীর আঁখি তব নিত্য মোর পানে
চাহিয়া জাগিয়াছিল জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
তার পর কত যুগ, কত জন্মান্তর,
সৃষ্টির রহস্য-লীলা নিত্য নিরন্তর,
তোমার আমার মাঝে দেছে ব্যবধান,
অভ্রভেদী পর্ব্বতের চূড়ার সমান।

তবুও তবুও কভু বিস্মৃতি নিঠুর
একেবারে পারে নাই করিবারে দূর
বিরহের অন্ধকারে যে সূক্ষ্ম মিলন
আলোকের আশাপথ চাহি অনুক্ষণ
নিরালায় ছিল বসি স্মৃতি-সূত্র ধরি'
নিয়তির তাড়নারে অবহেলা করি'।
কবে কা'র পুণ্যার্জ্জিত সুকৃতির ফলে
তোমারে মিলায়ে দিল যেই মন্ত্রবলে
জন্মজন্মান্তর পরে হে চির-বান্ধব
এ যুগের এ মিলন হয়েছে সম্ভব।

তার পর—

দেশমাতৃকার ডাকে দিলে যবে সাড়া
ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত যেন উন্মাদের পারা
জাগিয়া উঠিলে নিজে, নব উদ্বোধনে
সুষুপ্তিরে জাগাইলে রত হ'তে রণে।
স্নিগ্ধ সমীরণ তুমি হলে প্রভঞ্জন
মোহ দূর করি দিলে ; নিজে নিরঞ্জন।
সু-দিব্য সে প্রেরণায় শক্তি সুমহান
অরাতি রোধিতে পারে হয়ে আগুয়ান ?
আরম্ভিলে সে আহব তুমি প্রাণপণে
জীবন সঁপিয়া দিয়া অমর-মরণে।
দেশবন্ধুরূপে দেশ নিল তোমা বাছি
তুমিই সারথি হলে তুমি সব্যসাচী।
তুমি হোতা, তুমি ত্রাতা, অপূর্ব্ব পূজারী ;
সঙ্কটে দানিতে পূত স্নিগ্ধ শান্তিবারি
হৃদয়-শোণিত দিয়ে করিলে তর্পণ।
এ যুগে কোথায় আছে তোমার দর্পণ ?
রক্তহীন ধর্ম্মযুদ্ধ সম্ভব করিলে
তোমার রুধিরদানে রক্ত নিবারিলে।
এ দানের বাড়া দান কোথা আছে আর ?
আতিপাতি ক'রে খুঁজে দেখ ত্রিসংসার।

স্বদেশপ্রেমের উচ্চ হিমাদ্রিশিখরে
স্থাপিলে স্বরাজ-স্তম্ভ তুমি নিজ করে।
বাধা বিঘ্ন বিড়ম্বনা উপেক্ষিত করি,
সাফল্যের ললাটিকা ললাটেতে ধরি,
প্রলয়ের কোলে দিলে নবীন জীবন
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহে সারা ত্রিভুবন!
কে বলে কে বলে তব অসম্পূর্ণ ব্রত
যে বলে সে দৃষ্টিহীন মরণ-আহত
মরণ মেষের হয় মানুষের নয়।
অবতার;—মৃত্যু তার? কোন্ শাস্ত্রে কয়!

"আমার আদর্শে দিতে পূর্ণ পরিণতি
আবার আসিব" ব'লে দেছ প্রতিশ্রুতি।
তাই এস, ফিরে এস, হে নিত্য-সুহৃদ,
এস জাতিস্মর এস জন্মতত্ত্ববিদ্;
প্রেমের বিজ্ঞানে এস বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক,
কর্ম্মের দর্শনে এস শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।
জাতির পরাণে এস পরশমাণিক।
এস, বন্ধু উজলিয়া অন্ধ চারি দিক।
জন্মে জন্মে যুগে যুগে, নর-নারায়ণ,
এমনি করিয়া এস হে চিত্তরঞ্জন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত

স্মৃতি-তর্পণ

ভারতের চির-বিষাদ-চিত্ত রঞ্জন করি' তুমি,
এসেছিলে ওহে স্বরগ দেবতা এ মর মরতে নামি'।
কর্ম্মের মাঝে জন্ম তোমার, কর্ম্ম করিয়া জয়,
কর্ম্ম অন্তে কর্ম্ম-ক্লান্ত ফিরিলে ত্রিদিবালয়।
দেশের বন্ধু—দশের বন্ধু—ভারত-বন্ধু তুমি।
তোমা বিনা আজ কাঁদিছে ভারত দুঃখিনী জন্মভূমি।

প্রবল-পীড়নে দুর্ব্বল যবে বুকে তুষানল জ্বালি',
কোন মতে ছিল নীরবে সভয়ে তপ্ত অশ্রু ঢালি';
সেই দুর্দ্দিনে তুমি, বীরবর, শুনা'লে মাভৈঃ বাণী,
হতাশ হৃদয়ে পেতেছিলে পুন আশার আসনখানি।
দেশের বন্ধু—দশের বন্ধু—ভারত-বন্ধু তুমি,
তোমা বিনা আজ কাঁদিছে ভারত দুঃখিনী জন্মভূমি।

মুক্ত করিতে মুক্তিপ্রদাতা আপনি বদ্ধ হয়ে,
বিলাস বাসনা পরিহরি দূরে ত্যাগের মন্ত্র লয়ে—
উদেছিলে দেব ভাস্করসম ভারত গগন-মাঝে,
মুক্তির যাগে যোগ্য সাধক সেজেছিলে মহা কাযে।
দেশের বন্ধু—দশের বন্ধু—ভারত বন্ধু তুমি,
তোমা বিনা আজ কাঁদিছে ভারত দুঃখিনী জন্মভূমি।

কেন আজ তবে হইয়া নিদয় বিদায় লইলে, প্রভু,
শুনিব না আর কম্বু কণ্ঠে মুক্তি-মন্ত্র কভু।
প্রবলের প্রাণে শঙ্কা জাগায়ে কাহার অভয় বাণী,
ভারতের প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে তুলিবে প্রতিধ্বনি।
দেশের বন্ধু - দশের বন্ধু—ভারত-বন্ধু তুমি,
তোমা বিনা আজ কাঁদিছে ভারত দুঃখিনী জন্মভূমি।

না হইতে তব যজ্ঞের শেষ গেলে, প্রভু, কোন্ পারে;
ভক্ত তোমার দেখ সারা দেশ কাঁদিতেছে হাহাকারে
কাঁদে দেশবাসী—এ সবার তরে বিতরি' দয়ার বিন্দু,
আসিও ভারতে নব কলেবরে ভারত-গগন-ইন্দু।
দেশের বন্ধু—দশের বন্ধু—ভারত-বন্ধু তুমি,
তোমা বিনা আজ কাঁদিছে ভারত দুঃখিনী জন্মভূমি।

শ্রীনলিনীবালা মিত্র।

চিত্তরঞ্জনের বাণী

কোনও সাধু-সজ্জন মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটিলে আমরা বলিয়া থাকি, "তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।"—অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ সাধনা—পরলোকে সেইরূপ উচ্চস্থান তাঁহার প্রাপ্য। চিত্তরঞ্জন এক জন পরম সাধক পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ধাম ত সপ্ত স্বর্গের কোনটিই ছিল না—তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত পরম ধাম ছিল এই ভারত-ভূমি—বিশেষ করিয়া এই বঙ্গভূমি; তবে কেন তাঁহাকে আমরা হারাইলাম? তিনি যে তাঁহার এই জন্মভূমি ভারতভূমিকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞান করিতেন, জীবনে ইহার শত সহস্র প্রমাণ ত তিনি দিয়া গিয়াছেন। দেহত্যাগের পরেও মানবাত্মার অস্তিত্ব থাকে—তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই বর্ত্তমান থাকে—ঋষি-কথিত এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, যদি স্বর্গ থাকে, পুণ্যাত্মার স্বর্গবাস হয়, ইহাও যদি সত্য হয়, তবে স্বর্গের উচ্চতম লোকে অবস্থিত থাকিয়াও, চিত্তরঞ্জনের চিত্ত এই দীনা বঙ্গজননীর জন্যই ব্যাকুল রহিয়াছে সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই তিনি নিজেকে তথায় নির্ব্বাসিত মনে করিতেছেন, অবনতমুখে সাশ্রু-নয়নে এই ভারত-ভূমির দিকেই চাহিয়া আছেন এবং উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার গীতোচ্ছ্বাস তাঁহার কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতেছে মাত্র। কারণ, এ কথা তিনিই বলিয়া গিয়াছেন—
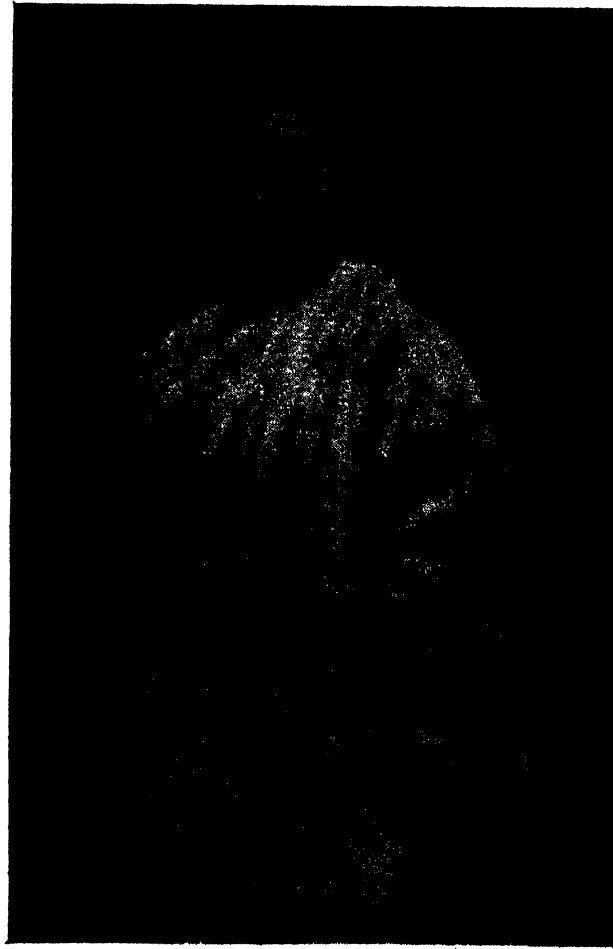
"আমার যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু শ্রেয়:, আমি এই কার্য্যসাধনের জন্য তাহাই প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কায করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে, এই বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিব। আবার আমার দেশের জন্য কায করিব। আবার চলিয়া যাইব, আবার আসিব, এইরূপে যত দিন না আমার

'সাগর-সঙ্গীত' রচনাকালে চিত্তরঞ্জন

মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে—আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, তত দিন এই ভাবেই এখানে কায করিতে আসিব।"

রাজনীতিক্ষেত্রে রীতিমতভাবে নামিবার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া মহাজন-পদাবলীর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চ্চায় এবং পদাবলী-কীর্ত্তনের আনন্দে তিনি অবসরকাল যাপন করিতে ভালবাসিতেন এরূপ শুনিয়াছি। স্বদেশের প্রতি এই যে তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেম বা ঐকান্তিকী ভক্তি, ইহা শ্রীরাধিকার প্রেমভক্তির আদর্শেই গঠিত বলিয়া আমার মনে হয়। রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"জনমে জনমে জীবনে-মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি!"

ঠিক সেইরূপই কি চিত্তরঞ্জন, উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে, জননী বঙ্গভূমিকে বলিতেছেন না—"মা, এ জন্মে আমি তোমার সেবক ত আছিই, কিন্তু জন্মজন্মান্তরেও যেন তোমারই সেবা করিবার অধিকার আমি পাই!"

দেশের প্রতি চিত্তরঞ্জনের প্রেম, রামচন্দ্রের প্রতি সীতাদেবীর প্রেমের অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেমের সহিতই সমধিক তুলনীয়। রামচন্দ্রের প্রতি সীতাদেবীর প্রেমও অগাধ অতলস্পর্শ ছিল বটে এবং তিনিও বলিয়াছিলেন বটে—

'ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥'

কিন্তু তাঁহার এই অসাধারণ প্রেমে, খোসনাম ভিন্ন বদনাম ছিল না। আর শ্রীরাধিকার বেলায় জটিলা কুটিলার নির্য্যাতন, লোক-সমাজে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ত সীমা ছিল না। তথাপি রাধা কৃষ্ণৈকশরণা। এমন দেশ আছে, যেখানে দেশভক্তি দেশসেবার পুরস্কার আছে। আবার এমন দেশও আছে, যেখানে দেশভক্তি দেশসেবার জন্য নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ফাটক পর্য্যন্ত হয়। ফাটক হয় হউক, মৃত্যুও বরণীয়। চিত্তরঞ্জন বলিয়া গিয়াছেন, "আমি আবার আসিব; আসিয়া, মা, আমি তোমারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব।"

মা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিবেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিত্তরঞ্জন স্মরণে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমি ১৯ বৎসর ধরিয়া জানিতাম। তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আমি যখন এটর্ণি ছিলাম,সে সময় তিনি ব্যারিষ্টারী করিতেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা একত্র কায করিয়াছি। তাঁহার একটা মহৎ গুণ দেখিয়াছি, যে কোন কাযই করিতেন, সামাজিক বা রাজনীতিক যে কোন প্রশ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইত, তিনি বিশেষভাবে না বুঝিয়া তাহাতে মত দিতেন না, সকল বিষয়ই তলাইয়া দেখিতেন। তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণই ছিল। তিনি Analytical spiritএর লোক ছিলেন—সব ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন। তাঁহার প্রকৃতি খুব Artistic ছিল, সব কাযই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করিতেন। কিন্তু তিনি নির্ভীক হইয়াও সঙ্ঘবদ্ধতার মূল্য ভালরূপ বুঝিতেন। নিজে কষ্টে পড়িয়া অন্যের উপকার করিতেন। যে কাষ নিজে করিতে প্রস্তুত নহেন, এমন কায অন্যকে করিতে পরামর্শ দিতেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান।

বিক্রমপুরের চিত্তরঞ্জন

ছেলেবেলায় একটি বাউল-সঙ্গীতের একটা পদ শুনিয়া অনেক সময় শিহরিয়া উঠিতাম। পদটি এই—

"আজ ম'লে কাল দু'দিন হবে শুনে যা পাগলের কথা।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের মায়াপাশ ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন,সে আজ এক এক দিন করিয়া এক পক্ষ হইয়া গেল। তবু অনেক সময় মনে সংশয় হয়, চিত্তরঞ্জন কি যথার্থই নাই? জননী জন্মভূমির এত বড় পরাক্রান্ত ভক্তকে কাল অকালে এমন অকস্মাৎ জননীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন কি? আবার চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা স্মরণ করিলে মনে হয়, এমন এক জন লোক যথার্থই আমাদের মধ্যে ছিলেন কি—যিনি একাধারে সুকবি, কৃষ্ণভক্ত, হাইকোর্টের পরিপক ব্যারিষ্টার, কংগ্রেসে নায়ক এবং লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রবল দলের অধিপতি; না চিত্তরঞ্জন কবিকল্পনার সৃষ্টি, স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী—যাঁহার পক্ষে এই বাস্তব লোকরঙ্গমঞ্চ, হাইকোর্ট, কংগ্রেস, কাউন্সিল দৃশ্যপট মাত্র? মানুষ কি এমন স্বার্থশূন্য হইতে পারে? এত গভীর স্বদেশ-প্রেম কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? গত অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ

মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ভারতবর্ষে অবিরাম রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ এমন প্রতাপী রাষ্ট্রনায়কের অভ্যুদয় কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি? চিত্তরঞ্জনের অভ্যুত্থানের এবং তিরোধানের ভঙ্গীও স্বপ্নরাজ্যের প্রভাব মণ্ডিত। গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ মহাশয় চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারিগণের বিশেষ সহায়কারী। আমরা কেহ কেহ সন্দেহ করিতাম, সি, আর,দাশের সাহায্য ব্যতীত বাঙ্গালায় চরমপন্থিগণ মাথা তুলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহাকে রাজনীতিক আসরে প্রকাশ্যে বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাহার পর চন্দ্রমণ্ডলে নক্ষত্রের মত মহাত্মা গন্ধীর মণ্ডলীতে চিত্তরঞ্জন সহসা উজ্জ্বল নক্ষত্রের আকারে সমুদিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নক্ষত্র মার্ত্তণ্ডের আকার ধারণ করিয়া একেবারে মধ্যাহ্ন-গগনে আরূঢ় হইলেন; চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহাদি আর আর জ্যোতিষ্কগণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু হায়, পর-মুহূর্ত্তেই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তেজ কতকটা সংবরণ করিয়া সেই মার্ত্তণ্ড যখন একটু হেলিয়া অপরাহ্নের
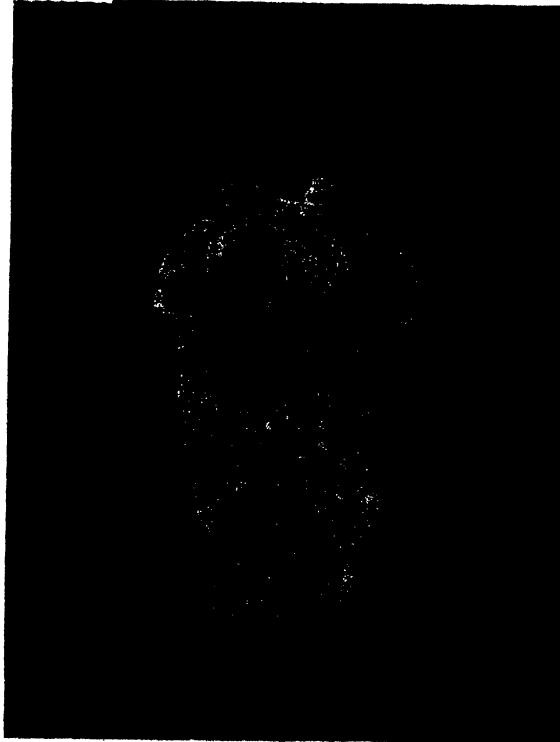
শীতল ছায়াবিস্তারে উদ্যোগী হইলেন, অকস্মাৎ কোথা হইতে কাল রাহু আসিয়া তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া পলায়ন করিল। গত দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাসের ধারা সসম্ভ্রমে যাঁহার ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়াছে, সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে মনে হয়, এ যেন এক জন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষের জীবন-চরিত বা আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায় নহে, চিত্তরঞ্জনের জীবনলীলা বঙ্গরঙ্গভূমিতে কোন মহাকাব্যের এক পর্ব্বের অভিনয়। বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অসাধারণ পুরুষের অভ্যুদয় বিস্ময়কর।

চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ সাধারণ ত্যাগ,—হিসাব-কিতাবের পর যাহা কিছু জমা ছিল তাহা বিলাইয়া দেওয়া—নহে; ইহা আত্মহারা মত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে আপনার যাহা কিছু আছে, সব খসিয়া পড়া। তাঁহার এমন আত্মহারা (abandon) ভাব আসিল কোথা হইতে? রাষ্ট্রসেবা, রাষ্ট্রনায়কতা হিসাব-কিতাবের ব্যাপার। যতই তীব্র হউক না কেন, শুধু রাষ্ট্রসেবার প্রবৃত্তি হইতে এই আত্মহারা (abandon) ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জন প্রৌঢ় অবস্থায় পদার্পণ করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীরাধিকা। চিত্তরঞ্জনের আত্মহারা ত্যাগ, বৈষ্ণবের ভাষায়, "সহজ" ত্যাগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবের ফল।

চিত্তরঞ্জন মাতৃভূমির যে মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন, সে মূর্ত্তি গেজেটিয়রে বর্ণিত, মানচিত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি নহে। সে যেন বাস্তব মাতৃভূমির মাটী দিয়া গড়া স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি তিনি কোথায় পাইলেন? চিত্তরঞ্জন কবিত্ব-শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কল্পনাপ্রবণতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল, সুতরাং যাহা নিরেট বাস্তব, তাহা লইয়া তৃপ্ত থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙ্গালা-সাহিত্য, বিশেষতঃ বঙ্কিম-সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের সহায়তা করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন ভক্ত ছিলেন। যখন তিনি 'নারায়ণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সচিত্র বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পত্রে ১৬ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক নানা দিক্ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসে, আমেদাবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধীর সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান সভাপতিরূপে একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই অভিভাষণে বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক, স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে, যাহা ফরাসীদেশে Voltaire এবং Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। * * * * * আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালায় Voltaire ও Rousseau। যদিও এরূপ তুলনা সমস্ত দিক্ দিয়া সমীচীন নয়।"

এই অভিভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু কমলাকান্তের "আমার দুর্গোৎসব" হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত প্রথম অংশে সুবর্ণময়ী বঙ্গমূর্ত্তির বর্ণনা; দ্বিতীয় অংশে কালস্রোতে নিমজ্জিত মাতৃমূর্ত্তি তুলিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান। দেশবন্ধু যখন এই অভিভাষণ পাঠ করেন, তখন এই লেখক সভাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং তিনি যে সুরে পাঠ করিয়াছেন, সেই সুর এখনও যেন এই লেখকের কানে বাজিতেছে। উপসংহারে দেশবন্ধু যখন গদ্গদকণ্ঠে মহাকবির মহাস্বপ্ন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন মনে হইল, তিনি যেন নিজের স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন। শেষে—

"চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কায কি?"

এই অংশ পাঠ করিবার সময় ভাবাবেশে দেশবন্ধুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। দেশবন্ধু জন্মভূমিকে দেখিতেন, ধ্যানপরায়ণ ভক্ত সাধকের ইষ্টদেবতার মত এবং ইষ্টদেবতার হিসাবেই স্বদেশের সেবা করিতেন।

দেশবন্ধুর শবানুগমনে মহাত্মা গন্ধী

বসুমতী প্রেস] [পি, বসুর ফটো-চিত্র হইতে।

বঙ্কিম-সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের মহান্ হৃদয়ে এইরূপ স্বদেশ-ভক্তিবিকাশের সহায়তা করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল—দুর্জ্জয় সাহস। এই প্রকার সাহস বিক্রমপুর হইতে সংক্রমিত হইয়াছিল। সুবিশাল নদনদীর তরঙ্গের এবং বন্যার সহিত বরাবর সংগ্রামে রত থাকায় বিক্রমপুরবাসীদিগের সাহস অধিকমাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়। চিত্তরঞ্জন এক দিন বৈশাখ মাসে সস্ত্রীক নৌকায় কীর্ত্তিনাশা পার হইয়া চাঁদপুর যাওয়ায় অনেকের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাহসের কায তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে ছিল। রাজস্থানের ইতিহাস-রচয়িতা টডের এবং মারাঠা জাতির ইতিবৃত্তকার গ্র্যাণ্ট ডাফের কৃপায় রাজপুত এবং মারাঠাগণের বীরত্বের কাহিনী সুবিদিত এবং প্রতাপসিংহ ও শিবজী বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পূজিত। যখন প্রতাপসিংহ আকবর বাদশাহের দিগ্বিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার কয়েক বৎসর পরে (১৫৯৬—১৬০২ খৃষ্টাব্দে) বিক্রমপুরের ভৌমিক কেদার রায় মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধে রত হয়েন। প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধে বাদসাহের সেনার নায়ক ছিলেন—নবীন সেনাপতি মানসিংহ। কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে বাদশাহের সেনার নায়ক ছিলেন—প্রবীণ সেনাপতি মানসিংহ। অসমসাহসের হিসাবে মেবারের সেনার এবং বিক্রমপুরের সেনার তুলনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মোগল সুবাদার রাজা মানসিংহের সহিত অসম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার রায় এবং তাঁহার সেনা অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেবারে রাজপুত সেনাকে আশ্রয় দিবার জন্য 'আরাবল্লী' পর্ব্বতমালা ছিল, কিন্তু সমতটের সমতলক্ষেত্রে মৃত্যু ভিন্ন পরাজয় স্বীকার করিতে অসম্মত বিক্রমপুর সেনার আর কোন আশ্রয় ছিল না। রণক্ষেত্রে সাংঘাতিকভাবে আহত এবং মানসিংহের নিকট নীত কেদার রায় মৃত্যুর কৃপারই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত সাহস একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। চিত্তরঞ্জনে সেই সাহস দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল।

বিক্রমপুরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের বরাবরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের অবসানে ষোড়শ সম্মিলন বিক্রমপুরে মুন্সীগঞ্জে আহূত হইয়াছিল। দেশবন্ধু মুন্সীগঞ্জের অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন মুন্সীগঞ্জে যাইতে সাহস করেন নাই। ষোড়শ সম্মিলনের প্রধান সভাপতি নাটোরের মহারাজা শ্রীযুত জগদিন্দ্রনাথ রায়কে তিনি এ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, মহারাজের সৌজন্যে তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"আলি মঞ্জিল, পাটনা
৩রা এপ্রিল, ১৯২৫

মহারাজ,—

যে দিন কল্‌কাতা ছাড়ি, সেই দিনই আপনার চিঠি পাই। মনে করেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব। তা কর্ম্মবিপাকে ঘটে উঠল না। আশা করি, আপনি মুন্সীগঞ্জে যাবেন। আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। শরীরের অবস্থা যেরূপ তাতে মুন্সীগঞ্জ সভা-সমিতিতে গেলে দু' মাসের যায়গায় অন্ততঃ চার মাস ব'সে থাক্‌তে হবে। এবার মনে করেছি, যেমন করেই হউক, দু' মাসের ছুটী নিব। হয় ভাল করেই বাঁচব, না হয় ভাল করেই মরব। * * *"

দেশের দুর্ভাগ্যে, দেশবন্ধুর ভাগ্যে সেই দুই মাসের ছুটীও মিলিল না। তিনি পাটনা হইতে ফরিদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর দার্জ্জিলিংএ গিয়া ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৫টার সময় দুই মাসেরও ছুটী পাইলেন না বলিয়া যেন অভিমানে "না হয় ভাল ক'রে মরব" এই সত্য প্রতি-পালন করিলেন। বঙ্গদেশবাসী তাঁহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাঁসপাতালের বা ধাত্রীবিদ্যালয়ের সাইন বোর্ডের পক্ষে দেশবন্ধুর নাম জীবন্ত রাখা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মহান চরিত্রের উদ্দীপনী শক্তি জীবন্ত জলন্ত রাখিবে কে? পৃথি-বীতে এখন যিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আছেন, তাঁহার দ্বারা চিত্ত-রঞ্জনের চরিত্রদ্যোতক ধাতু-মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিলে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির সম্যক সমাদর করা হইবে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

স্মৃতি-তর্পণ

১৬ই জুন, ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার, রাত্রি তখন বোধ হয় ৯টা, ঘরে বসিয়া ছিলাম, আত্মীয় একটি যুবক আসিয়া বলিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইয়াছে। সহসা যেন বিদ্যুতের আঘাতে দেহ-মন আড়ষ্ট হইয়া গেল!

সকলেরই বোধ হয়, বিনামেঘে আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় এই সংবাদে এমনই একটা অবস্থা হইয়াছিল।

পর দিন সকালে হেদুয়া দীঘির পাড়ে বসিয়া ছিলাম—মেঘলা রোদ, উপরে আকাশ, নীচে জল, চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু দুটি বুজিয়া আসিল। দেশবন্ধুর উজ্জ্বল মূর্ত্তি মুদিত চক্ষু দুটির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, আপনা হইতেই এই কয়েকটি কথা অন্তরের অন্তর হইতে ধ্বনিত হইল,—হে প্রিয়! হে বন্ধু! হে মহান্ তোমাকে নমস্কার! নমস্কার!

বার বার মন্ত্রের ন্যায় কেবল এই কয়েকটি কথাই মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল,—হে প্রিয়! হে বন্ধু! হে মহান্ তোমাকে নমস্কার!

আমি কে? আর দেশবন্ধুই বা কে? 'প্রিয়' বলিয়া 'বন্ধু' বলিয়া এই যে দুইটি সম্বোধন আমার সমস্ত মন ভরিয়া বার বার উঠিল, এ অধিকার কি আমার কিছু ছিল?

নন্-কো-অপারেটর ছিলাম না, স্বরাজীও ছিলাম না। গত কয়েক বৎসর এই দিগ্বিজয়ী মহাবীরের অসিত গৌরবময় কর্ম্মক্ষেত্রে কোনও সংস্পর্শে তাঁহার সঙ্গে আসি নাই, বরং তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির তীব্র সমালোচনাই করিয়াছি। এক দিন—মাত্র একটি দিন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, সে-ও স্বেচ্ছায় নহে, ঘটনাচক্রে আসিতে হইয়াছিল।

তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব কেবল আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর-কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য তিনি ডাক্তার শ্রীযুত শশিভূষণ সেন মহাশয়কে মনোনীত করেন। তাঁহার পক্ষে গোয়াবাগান পল্লীতে একটি সভা হয়। আমারই দীন বাস গৃহের সম্মুখে সেই সভার স্থান, সুতরাং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলাম। বড়বাজার ও বারাকপুরের নির্ব্বাচনের দিন তখনও দূরে ছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী দেশব্যাপী বিজয়ের কোনও সূচনা দেখা যায় নাই। নির্ব্বাচনের ফলাফল কি হইবে, কেহই জানিত না। তাঁহার নিজেরও বড় সংশয় ছিল—এ উদ্যম সফল হইবে কি না। মহাত্মা গন্ধী তখন জেলে; কৌন্সিলে প্রবেশ-চেষ্টা তাঁহার অসহযোগ-নীতিপদ্ধতির বিরোধী বলিয়া দেশবন্ধু অনেকের তীব্র নিন্দার ভাগীও তখন হইয়াছিলেন। এক দিকে এই অসহযোগী দল, অপর দিকে পুরাতন সহযোগী রাষ্ট্রীয় দল, দুই দলই তাঁহার বিপক্ষে তাঁহার এই প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে বদ্ধকটি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিজেরও বড় সংশয় ছিল, প্রবল এই বিরোধকে পরাভূত করিয়া সফলকাম হইতে পারিবেন কি না। কিন্তু বার্দ্দোলীর পরে দেশে অবসাদ আসিয়াছিল, মহাত্মার কারাবরোধের পরে দেশ একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ঠিক স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও দেশবন্ধু অনুভব করিয়াছিলেন, বার্দ্দোলীর কর্ম্মপদ্ধতি এই অবসাদের ভার দূর করিয়া নূতন একটা জীবন্ত ভাবের প্রেরণা দেশের মধ্যে আনিতে পারিবে না। নূতন পথে নূতন কোনও কর্ম্মে নূতন একটা ভাবোন্মাদনা দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দলবলে যদি কৌন্সিলে প্রবেশ করা যায়, আর সেই দলবলে যদি পদে পদে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দেওয়া যায়, বর্ত্তমান এই শাসন-সংস্কার আইন একেবারেই যে একটা বাজে ফাঁকি মাত্র, খুলিয়া যদি ইহা দেখান যায়, একটা রাষ্ট্রীয় সঙ্কট (Political crisis) উপস্থিত হইবে—দেশের মধ্যে নূতন একটা সাড়া তাহাতে উঠিবে। নির্জীব অবসন্ন দেশকে নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার উপায় ইহা ব্যতীত আর কিছু নাই। এই বুঝিয়া, এই ভাবিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে দেশবন্ধুর এই ইচ্ছা হইয়াছিল, যে ভাবেই হউক, স্বরাজী দলকে এই সিদ্ধান্তের জন্য কৌন্সিলে প্রধান করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রতিবাদের তীব্র কণ্ঠ চারিদিক্ হইতে যতই তাঁহাকে ধিক্কার দিতে থাকুক, বাধা সম্মুখে যতই প্রবল হইয়া উঠুক, সিদ্ধির সম্ভাবনা যতই সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হউক, মূর্ত্তিমান্ পুরুষকার দেশবন্ধু কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না, সঙ্কল্প স্থির করিয়া এই সাধনায় তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। যে কোনও কাযেই হউক, এই প্রাণ ঢালিয়া দেওয়াই তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল, সকল কর্ম্মে তাঁহার আশ্চর্য্য সিদ্ধিরও রহস্য ছিল—সঙ্কল্পিত সাধনায় এই ভাবে একেবারে নিঃশেষে সকল শক্তি ঢালিয়া দেওয়া!

দিনের পর দিন উত্তর-কলিকাতা ভরিয়া সভা হইতেছিল, প্রত্যেক সভায় নিজে উপস্থিত হইয়া আপন উদ্দেশ্যের কথা নির্ভীক নিঃকুণ্ঠভাবে সকলকে তিনি বুঝাইতেন। অবিশ্রান্ত এইরূপে নির্ব্বাচন আন্দোলন বাস্তবিক দেশে আর কখনও দেখি নাই। দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়াছি। "ক্রমাগত বাধা দিয়া ডায়ার্কিকে অচল করিব. এই ভুয়া খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তখন খাঁটি শাসন-দায়িত্ব আমাদের হাতে আসিবে," প্রাণভরা জ্বলন্ত আবেগে এই কথাই তিনি বলিতেন। ভাঙ্গিবার পর এই গড়ার সম্ভাবনায় সকলে যে বিশ্বাস করিতেন, তাহা নহে। অনেকেই করিতেন না। সংবাদ-পত্রেও অবিরত ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হইত। কিন্তু দেশ-বন্ধুর অগ্নিময় প্রাণনিঃসৃত অবিশ্রান্ত এই জ্বলন্ত শক্তিস্রোতের বেগ সংবরণ করিতে পারে, এরূপ প্রতি-শক্তি লইয়া কোথাও কেহ দাঁড়াইতে পারে নাই। যুক্তি-তর্কের সকল হিসাব কোথায় ভাসিয়া যাইত। প্রতিবাদের ক্ষীণ ধ্বনি কোথাও কোনও সভায় উঠিলে তাঁহার বজ্র-নির্ঘোষে তাহা ডুবিয়া যাইত।

উত্তর-কলিকাতায় নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে তিনি সফল হয়েন নাই, প্রতিপক্ষের প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে তখন অতি প্রবল ছিল। কিন্তু সেই নির্ব্বাচনে যে আলোড়ন তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে না। ব্যর্থ হইলেও তাঁহার মনোনীত প্রার্থী যে ভোট পাইয়াছিলেন, তখনকার অবস্থায় তাহার মূল্য বড় কম বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন দলের পতাকা-শোভিত মটরগাড়ীর বহরে আর লোকজনের সমারোহে রাজপথগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যেন বড় একটা রাজকীয় উৎসবের ঘটা উত্তর-কলিকাতায় সে দিন হইতেছিল।

যাহা হউক, সেই যে সব সভার কথা বলিতেছিলাম, তেমনই একটি সভা সে দিন গোয়াবাগানে হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেশবন্ধু

আসিলেন, কিন্তু সে দিন একা—আর দেখিলাম বড় ক্লান্ত, এত ক্লান্ত যে, গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, মুখে কথা সরে না, আসিয়াই এক গ্লাস গরম জল তিনি চাহিলেন। সঙ্গে আর কেহ ছিলেন না, আমাকে আগে সভার কয়েকটি কথা বলিতে বলিলেন। ইতোমধ্যে জল আসিল, তাহার পর তিনি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। একটু একটু করিয়া এক এক চুমুক জল মধ্যে মধ্যে খাইতেছিলেন, আর বক্তৃতা করিতেছিলেন। একটু একটু জল খাইতেছিলেন, তাহা ছাড়া তাঁহার বক্তৃতার সেই বজ্রগম্ভীর ধ্বনিতে ক্লান্তির কোন লক্ষণই ছিল না।

সেই একটি দিনমাত্র, স্বেচ্ছায় নহে, ঘটনাচক্রে তাঁহার কর্ম্মে সেই একটুখানি যোগ আমার হইয়াছিল, কর্ম্মক্লান্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া প্রাণে বড় একটা বেদনা চাপিয়া উঠিয়াছিল। একটা সাড়াও প্রাণে আসিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইঁহার সঙ্গে ইঁহারই কর্ম্ম-প্রবাহে এখনই ঝাঁপাইয়া পড়ি; যতটুকু শক্তি আছে, ইঁহার একটু সহায়তা করি।

কিন্তু তাহা করি নাই। যে বুদ্ধিতে, যে হিসাবে করি নাই, আরও দুই চারিবার এই ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে, সেই বুদ্ধি সেই হিসাব মাথায় থাকিত কি না, জানি না।

সেই একটি দিন, একটু সময়ের জন্য জীবনে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধন-ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্পর্শে একটু আসিয়াছিলাম। 'প্রিয়' বলিয়া 'বন্ধু' বলিয়া সেই যে সম্বোধনধ্বনি সে দিন প্রাণ হইতে উঠিয়াছিল, সেই একটি দিনের একটু যোগ সেই অধিকার কি অধম আমাকে দিতে পারে?

টাউনহলের মিটিং-প্রত্যাগত চিত্তরঞ্জন

'দেশবন্ধু' তিনি, দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে বন্ধু বলিতে পারে। আজ সকলেরই 'প্রিয়' অতি 'প্রিয়' তিনি; সকলেই বড় বেদনায় অনুভব করিতেছে, এমন 'প্রিয়জন' বুঝি কেহই আর কখনও ছিল না। কেহ নাই, কেহ হইবেও না।

কিন্তু কেবল সে ভাবে নহে, ব্যক্তিগতভাবেও বড় প্রিয় তিনি ছিলেন, বড় ভাল তাঁহাকে বাসিতাম, বড় আপন-অন্তরঙ্গ এক জন সুহৃদ্ বলিয়া মনে মনে তাঁহাকে অনুভব করিতাম।

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে অনেক সময় তাঁহার কাছে গিয়াছি, সর্ব্বদাই আপনজনের মত যার-পর-নাই সরল ও মধুর ব্যবহার তাঁহার কাছে পাইয়াছি। প্রতিভায়, শক্তিতে, ধনে, মানে, পদগৌরবে অত বড় তিনি, কিন্তু গর্ব্বিত কোনও দূর দূর ভাব একটি দিন তাঁহার আলাপ-ব্যবহারে অনুভব করিতে পারি নাই। বড়লোকের পরিমার্জ্জিত ভদ্রতা কেবল নহে, সমান বয়ুজনের ন্যায় সরল প্রাণখোলা সুমধুর সঙ্গই তাঁহার পাইয়াছি। তিনি যে কত বড়, আর আমি যে কত ছোট, ইহা বুঝিবারই অবসর কখনও পাই নাই। মন খুলিয়াই কথা বলিয়াছি, কোনও সঙ্কোচে বাধ বাধ কিছুতে ঠেকে নাই। তাঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাঁহার কখনও হইয়াছে, সকলেই বোধ হয়, এইরূপ অনুভব করিয়াছেন। নন-কো-অপারেশন যুগের পূর্ব্বে বন্ধু বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, বন্ধুত্বের দাবী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে করিয়াছে, অথচ প্রতিভায় ও পদগৌরবে তাঁহা হইতে অনেক নিম্নে, এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম ছিল না।

সকলের সঙ্গে সকল ব্যবহারে দর্পদম্ভবর্জ্জিত সরল ও অনাড়ম্বর এই প্রাণঢালা মধুরতাই তখন ছিল তাঁহার স্বভাবের বড় একটি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেই সকলকে তিনি এমন করিয়া আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, সকলেরই এমন প্রিয়, আপন জন তিনি হইয়াছিলেন। পরিচিত সকলেরই কাছে তিনি এমন 'চিত্তরঞ্জন' ছিলেন যে, 'চিত্তরঞ্জন' নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, দর্পদম্ভের একটা ভাব কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবহারে শেষে কিছু প্রকাশ পাইত। কোনও প্রতিবাদ কি বাধা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বাধা পাইলে কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্ম-সাধনার অধীর আবেগে তাহা প্রকাশ পাইত। তাহাতে কোনও বাধা কি প্রতিবাদ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে, সামাজিক ব্যবহারে তিনি যে সেই 'চিত্তরঞ্জন'ই ছিলেন না, এ কথা মনেও কখনও করিতে পারি না। সেই মানুষকে যে চিনিয়াছিলাম, তাহা ভুল চিনিয়াছিলাম বলিয়া কল্পনা করাও অসম্ভব।

সেই 'মানুষ'কে চিনিয়াছিলাম; দেখিয়াছিলাম; সেই 'মানুষ'টিকে বড় ভালবাসিতাম। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির প্রশংসা কখনও করি নাই, তীব্র সমালোচনাই সর্ব্বদা করিয়াছি।-কিন্তু তাহার মধ্যেও সেই 'মানুষ'-টিকে বড় ভালবাসিতাম, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির অতি বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে ভালবাসিতেন, এমনই ভালবাসিতেন। আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সকলেই কাঁদিতেছে। এত বড় এক জন দেশনায়ক দেশকে আঁধার করিয়া, অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেও এ কাঁদা কেবল সেই অভাবের দুঃখে নহে। অতি বড় এক জন প্রিয়জন চলিয়া গেলে মর্ম্মভেদী যে ব্যথায় লোক কাঁদে, এ কাঁদা সেই ব্যথারই কাঁদা। আহা, এমন এক জন—কেবল দেশবন্ধু নহে, সকলেরই বড় আপন-এক জন, অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু—আর কি দেশে দেখা দিবেন?

প্রকৃত অর্থ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন আয় করিতেন, রাজার মত

থাকিতেন, রাজার মতই তাহা দান করিতেন। প্রার্থী কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিফল হইয়া ফিরে নাই। রাজার মত এই আয়, আর রাজার মত সেই চালচলন আর সব করিয়া মোটা খদ্দরের বেশে যখন তিনি দেশসেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন, তখন খুব বিস্মিত হই নাই।

চিত্তরঞ্জনের প্রাণের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, কেহই বোধ হয় তেমন একটা অভাবনীয় ঘটনা বলিয়া ইহাকে মনে করিতে পারেন নাই। প্রাণ যার বড়, এমন একটা ডাক যখন আইসে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য অসার ধূলিমুষ্টির ন্যায় অনায়াসে সে ত্যাগ করিতে পারে। দেশ-সেবায় আত্মসমর্পণের যে উন্মাদন আনন্দ, উচ্চতর ক্ষেত্রে কর্ম্মশক্তি প্রয়োগে শক্তিমানের যে সার্থকতায় গৌরব, সমগ্র দেশবাসীর চিত্তের উপরে আধিপত্যের যে দীপ্ত ঐশ্বর্য্য, তাহার কাছে পার্থিব ধনসম্পদের অধিকার কি ছার! ক্ষুদ্রচেতা যে, সে-ই ইহাকে বড় মনে করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। লোকাতীত সেই আনন্দ, সেই গৌরব, সেই ঐশ্বর্য্য হাতে ধরিয়া দিলেও উহা ছাড়িয়া ইহাকে হাতে করিয়া লইতে পারে না। সে ডাক আর তাহার সঙ্গে উন্মাদন আনন্দের উৎস ও অমিত গৌরবের আধার, সেই যে ঐশ্বর্য্যদীপ্তির উষারুণচ্ছটা চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে ভাতিয়া উঠিয়াছিল, চিত্তরঞ্জনের সাধ্য ছিল না, তাহার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আঁধার ও স্থূল পার্থিব ভোগসম্পদের দিকে চাহিতে পারেন।

বৈধ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াও যে প্রাণ পিতৃঋণ শোধের জন্য বহু ক্লেশে অর্জ্জিত বহু সহস্র মুদ্রা অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিল, সেই প্রাণের পক্ষেই এই ত্যাগ সম্ভব হইয়াছিল। তখনকার দিনে এই অবস্থায় এই ভাবে ৭০ হাজারের উপরে টাকা ছাড়িয়া দেওয়া চিত্ত-রঞ্জনের পক্ষে বড় সহজ একটা ত্যাগ হয় নাই। আজকাল খুব কম লোকই এরূপ করিয়া থাকেন। সেই চিত্তরঞ্জনের পক্ষে দেশের বড় ডাকে, আর তাহার আনন্দে ও গৌরবে এই ত্যাগ এমন বড় একটা কিছু নহে। ধন্য ধন্য সকলে করিয়াছে। আমি করি নাই। কারণ, চিত্তরঞ্জনকে চিনিতাম, তাঁহার ভিতরকার সেই 'মানুষ'টির পরিচয় পাইয়াছিলাম। কেবলই মনে হইয়াছে সেই 'মানুষ'টির পক্ষে এ আর বড় কি? তেমন 'মানুষ'টি দেশে আর কোথাও কাহারও মধ্যে বড় এখন নাই, তাই এই ত্যাগ আরও অনেক দেখিতে পাই না। পাই না, তাহা দেশের দুর্ভাগ্য। প্রতিভা আছে, শক্তি আছে, ধন আছে, প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু এমন 'মানুষ'টি যে এই সবের মধ্যে বড় নাই, দেশ তাই আজ এমন দীন, এত বেশী হীন, একেবারে রিক্ত, পথের ধূলিতে অবলুণ্ঠিত!

তাঁহার এই ত্যাগে বিস্মিত হই নাই; বিস্মিত, মুগ্ধ, স্তম্ভিত হইয়াছিলাম অতি আশ্চর্য্য অজেয় এক শক্তির লীলা তাঁহার মধ্যে দেখিয়া। গত পাঁচ ছয় বৎসর এই শক্তির মহিমাতেই নিদাঘের মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় ভারতগগনে তিনি দীপ্তি পাইয়াছেন, আশ্চর্য্য এক দীপ্তি! চক্ষু সকলের ধাঁধিয়া গিয়াছে! এ যুগে পুরুষকারের এমন দীপ্ত দুর্জ্জয় লীলা এ দেশে কোথাও বড় আর দেখা যায় নাই।

মহাত্মা গন্ধী যখন নন্-কো-অপারেশন নীতি কংগ্রেসকে গ্রহণ করাইতে চাহেন, চিত্তরঞ্জন তাঁহার বিরোধী ছিলেন। কলিকাতায় নন্-কো-অপারেশনের প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন ইহাতে হাল ছাড়িলেন না। নাগপুরে আবার ইহা লইয়া মহাত্মার সঙ্গে সংগ্রাম করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া যায়েন। কিন্তু সেখানে মহাত্মার সঙ্গে তাঁহার আপোষ হইল, নন্-কো-অপারেশন নীতি তিনি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেবল মুখে গ্রহণ করিলেই ত হইবে না, কাজেও তাঁহাকে নন্-কো-অপারেটর হইতে হইবে। কলিকাতায় আসিয়াই তিনি আইন-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন; দিয়াই দেশের ছাত্রসমাজকে ডাকিলেন, "তোমরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আইস, দেশ-সেবায় ব্রতী হও; পড়িতে চাও, জাতীয় সব পৃথক্ শিক্ষায়তন তোমাদের জন্য করিব!" ঐশ্বর্য্যবান্ ভোগী ব্যারিষ্টার যখন দেশসেবা-ব্রতে আত্মসমর্পিত ত্যাগী কর্ম্মবীর হইয়া বজ্রনির্ঘোষে এই ডাক তুলিলেন, দলে দলে যুবক ছাত্র স্কুল-কলেজ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল, দেশ ভরিয়া অসহযোগের সাড়া পড়িয়া গেল। ছাত্র হইতে নগরের কুলীমজুর, গ্রামের চাষী, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই এই সাড়ায় নূতন এক রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণ জাগিয়াই থাকে, আগুন যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নিবিয়া না যায়, অক্লান্তভাবে বাঙ্গালাময় ঘুরিয়া চিত্তরঞ্জন নূতন এই অসহযোগের উদ্দীপনার বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন যে অল্পদিনের মধ্যেই এত গম্ভীর ও ব্যাপক-ভাবে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার প্রধান কারণ মহাপ্রাণ, মহাত্যাগী চিত্তরঞ্জন তাঁহার সকল শক্তি লইয়া এমনভাবে ইহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার কারাবরণ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য এক কর্ম্মচক্র রচনা করিয়া অক্লান্ত শ্রমে অবিরামগতিতে ইহাকে চালাইয়াছিলেন।

ক্রমে তাঁহার ও মহাত্মার কারাবরোধের পর অসহযোগ আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়িল। মুক্ত হইয়া যখন তিনি আসিলেন, বুঝিলেন, পূর্ব্বতন পদ্ধতিতে অসহযোগ আন্দোলন আর চলিবে না, দেশেও আর ইহা লইয়া তেমন কোনও সাড়া উঠিবে না। তখন তিনি কৌন্সিলে গিয়া গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ করিবার কল্পনা করেন এবং গয়াকংগ্রেসে ইহার প্রস্তাবও উপস্থিত করেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইল না। অসহযোগ পদ্ধতির অনুবর্ত্তী দল অতি প্রবল ছিল এবং চিত্তরঞ্জন পরাভূত হইলেন। অসহযোগ বর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া বহু লোকের বহু ধিক্কারও তাঁহার উপরে বর্ষিত হইল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দমিলেন না, হাল ছাড়িলেন না। সেই গয়াতেই নূতন এই স্বরাজী দলের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ শক্তিমান্ আরও অনেক দেশনায়ক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। অসহযোগের বিরোধী বলিয়া চারিদিকে স্বরাজী দলের নিন্দা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ হইতেছিল। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিত্তরঞ্জন সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তাঁহার এই নূতন দলের নূতন নীতির কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে স্বরাজী দল সর্ব্বত্রই বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। প্রবল এই স্বরাজী দলের অভিযানের সম্মুখে অসহযোগী কংগ্রেসকেও কিছু নত হইতে হইল, দিল্লী-কংগ্রেস এই দলকে কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে বাঙ্গালায় কৌন্সিলের নির্ব্বাচনের সময় নিকট হইয়া আসিল, চিত্তরঞ্জন আর একবার নানা স্থানে ঘুরিয়া নিজের দলবলকে আরও পাকা করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। ২।৩ মাস মাত্র সময় তখন আছে, প্রতিপক্ষও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-ছিলেন, নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে তিনি যাহাতে সফল হইতে না পারেন। কিন্তু অক্লান্ত ও অদম্য চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার জিলায় জিলায় ঘুরিয়া এমনই ভাবে লোকমতকে নিজের নীতির অনুকূল করিয়া তুলিলেন যে, নবনির্ব্বাচিত বাঙ্গালার কৌন্সিলে তাঁহারই দল বড় একটা স্থান অধিকার করিল।

এমন প্রতিবাদ ও বিরোধের সম্মুখে এত অল্পসময়ের মধ্যে স্বরাজী দলের এই যে প্রাধান্য দেশে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইহা তাঁহার বড় একটি কৃতিত্বের নিদর্শন, কিন্তু ইহার অপেক্ষাও বড় কৃতিত্ব মহাত্মাজীকে তাঁহার এই নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতির সমর্থক করিয়া তুলা। সকলেই জানেন, কঠিন রোগের পর কারামুক্ত হইয়া

গয়া কংগ্রেসে সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন

মহাত্মাজী স্বরাজী দলের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কি ভাবে এই বিরোধ ছাড়িয়া ক্রমে তিনি স্বরাজী দলের বড় এক জন পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান, তাহাও সকলের সুবিদিত।

স্বরাজী দলের কৌন্সিল প্রবেশের নীতি অসহযোগীরা সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের কেবলই বাধাপ্রদানের নীতি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলের কেহও সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু এই দলের অগ্রগতিকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। ত্যাগে মহান্ কর্ম্মে অক্লান্ত, সংকল্পে দুর্জ্জয় চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মহিমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন, এত বড় মহত্ত্বের গৌরব ও কর্ম্মশক্তি লইয়া কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই।

বাঙ্গালার কৌন্সিলে তিনবার তিনি মন্ত্রি-নিয়োগের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টকে পরাভূত করিয়াছেন। ইহাতে রাজনীতিক চালবাজিতে অসাধারণ কুশলতার পরিচয়ও তিনি কিন্তু দিয়াছেন। স্বরাজী দলের এই যে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইল, তাহার তুলনায় ইহা এমন কিছুই নহে।

শক্তিধর কেবল নহেন, যার-পর-নাই ভাগ্যধর পুরুষও তিনি ছিলেন। এত বড় প্রতিভা, এমন মহৎ প্রাণ, আর এমন অসাধারণ কর্ম্মশক্তি লইয়া এরূপ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারা, সেই ত বড় ভাগ্যের কথা, কিন্তু ইহার উপর আবার যার-পর-নাই সার্থককর্ম্মা তিনি ছিলেন। ভাগ্যদেবী যেন অতি আদরে তাঁহার এই প্রিয় পুত্রটিকে নিজের অঙ্কে তুলিয়া লইয়া এই কর্ম্মভূমিতে ও ভোগভূমিতে নামাইয়া সঙ্গে বেড়াইতেছেন। যত কিছু কাম্য ভোগ, সিদ্ধির যাহা কিছু গৌরব, মুক্ত হস্তে তাঁহাকে দান করিয়া নিজেই যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। তাহার পর তাঁহার এই মৃত্যু! ভাগ্যদেবীর চরম আশীর্ব্বাদ চিত্তরঞ্জনের শিরে বর্ষিত হইয়াছে, তাঁহার এই মৃত্যুতে!

এমন এক সঙ্কটে তিনি আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, যাহা সামলাইয়া লইয়া নিজের এই উচ্চতম প্রতিষ্ঠার গৌরব তিনি আর রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, বড় একটা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এমনই সময়ে ভাগ্যদেবী তাঁহাকে সকল সঙ্কট, সকল সংশয় হইতে মুক্ত করিয়া অমরধামে লইয়া গেলেন। তাঁহার রাষ্ট্র-গুরু মহাত্মা গন্ধীর গৌরবকেও ম্লান করিয়া, গুরুকেই একরূপ তাঁহার শিষ্য করিয়া, আজ সেই অমরলোকে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এমন মরা, হায়! কে এ জগতে মরিতে পারে? দেশ আজ তাহার বন্ধুকে হারাইয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু সেই অশ্রুবিন্দু তাঁহার গৌরব-দীপ্তির ভাতিতে মুক্তা হইয়া দেশ ভরিয়া ঝরিতেছে! সমুজ্জ্বল সেই মুক্তার ধারায় দেশ আজ সমলঙ্কৃত হইয়া উঠুক; এ অলঙ্কার তাঁহার অক্ষয় হইয়া থাকুক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনৈতিক মত আমি কখনও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারি নাই। তিনি রাজনৈতিক ঐশ্বর্য্য সাধনের জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই। আর আমার মনে হয় তিনিও শেষ জীবনে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রণালী অনুসারে চলিলে স্বরাজ লাভের আশু সম্ভাবনা নাই। তিনি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যে ঝড় তুলিয়াছিলেন সেই ঝড়ের শেষ জীবনে বেগ দেখিয়া তিনি নিজেই ভয় পাইয়াছিলেন। ঝড়ের পর প্রকৃতি যেরূপ শান্তির মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাঁহার সেই ফরিদপুরের বক্তৃতা হইতে দেখা যায় তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ রাজনৈতিক আকাশে শান্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। যে শান্তি তিনি জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না আজ তাঁহার তিরোধানের পর মহাত্মা গান্ধী সেই শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। আশা করি তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া, ভারতে বিপ্লবের অবসান করিয়া, শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল রাখিবে। আজ লক্ষ লক্ষ নরনারী যে তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে সে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির জন্য নহে, তাঁহার রাজনৈতিক যুদ্ধে নেতৃত্বের জন্য নহে, আমি বলিব যে কেবল তাঁহার উদার হৃদয়ের জন্য, তাঁহার ত্যাগস্বীকারের জন্য। যেদিন তিনি পিতার অতিরিক্ত ঋণভার অযাচিতভাবে আপনার মাথায় তুলিয়া লইলেন সেই দিন প্রথম লোকে বুঝিল তাঁহার প্রাণের কি মাহাত্ম্য! তাহার পর তাহারা সেই মাহাত্ম্যের কত পরিচয় পাইয়াছে। তাহারা দেখিয়াছে তিনি কত দরিদ্র সন্তানের বিদ্যার্জ্জনের সহায়তা করিয়াছেন, কত নিঃস্ব পরিবারের অন্নের সংস্থান করিয়াছেন। যেখানে দুঃখ দেখিয়াছেন সেইখানে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে। অর্থের মায়া, সঞ্চয়ের মমতা তাঁর প্রাণে কোনও দিনই স্থান পায় নাই। তার পর যখন তিনি তাঁহার সেই ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন, যে ব্যবসায়ে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে ব্যবসায়ে তাঁহার

বিপুল অর্থ আসিতেছিল, সেই ব্যবসা যেদিন তিনি মনে একবারও দ্বিধা না করিয়া চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, যেদিন বিলাস বিভব সব বিসর্জ্জন দিলেন, যেদিন স্বেচ্ছায় দারিদ্রতা বরণ করিয়া লইলেন, সেইদিন হইতে লোকে তাঁহাকে হৃদয়ের ভিতর রাখিয়া ভক্তি করিল, পূজা করিল। বুদ্ধদেব আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ অসংখ্য নরনারী তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করে। যীশুখ্রীষ্ট আত্মবলিদান দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক তাঁহার ধর্ম্মপথের পথিক। আর চিত্তরঞ্জন দেশের কল্যাণের জন্য স্বার্থ বলিদান দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ দেশের সকল লোকই তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে ও তাঁহার চিরস্থায়ী স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
৭ নং হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।
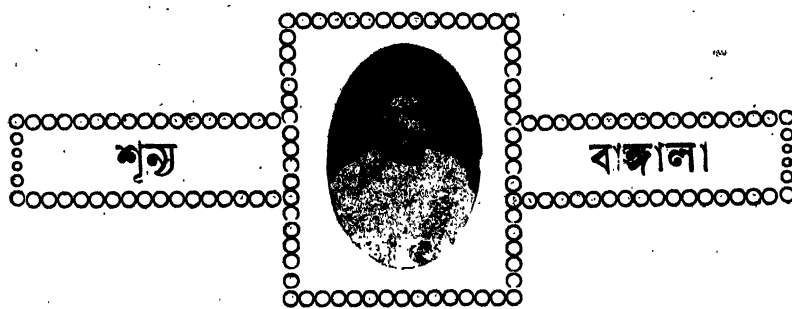
চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে দেশ মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ব্যবহারাজীবরূপে চিত্তরঞ্জন যখন অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময় দেশ-জননীর কল্যাণকল্পে তিনি যে আদর্শকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার জন্য শুধু তিনি তাঁহার ব্যবসায়বৃত্তি ত্যাগ করেন নাই—তাঁহার চিরাভ্যস্ত ভোগবিলাসও বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার জন্য তিনি ৫ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রথমতঃ পাটনায় তিনি কিছু দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার পর দার্জ্জিলিঙ্গে গমন করেন। কিন্তু তথায় অবস্থানকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বিয়োগে এই দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইয়া গেল, তাহা পূর্ণ হইবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। তাঁহার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসী তাঁহার তিরোভাবে শোক করিতে থাকিবে এবং সমগ্র দেশ তাঁহার স্মৃতিকে পূজায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

দেশবন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর বিবাহ-সম্মিলন

দণ্ডায়মান— (১।২) ভাগিনেয়ীদ্বয় (৩) পুত্র চিররঞ্জন (৪) ভ্রাতৃবধূ (৫) চিত্তরঞ্জন (৬) বাসন্তী দেবী (৭) অপর্ণা দেবী (৮।৯) ভাগিনেয়ীদ্বয় (১০) কনিষ্ঠা ভগিনী
চেয়ারে উপবিষ্ট—(১) বড় জামাতা সুধীর (পুত্র ক্রোড়ে) (২।৩) নিকট আত্মীয়া (৪) কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী (৫) কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় (৬) জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া (৭) প্রফুল্লরঞ্জন (পি, আর, দাশ)

সহজাত যজ্ঞ

ভারতের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সুপ্ত নহেন, তিনি জাগ্রত। সুভাষ ও সত্যেন্দ্র সহচরদ্বয়কে বৃটিশসিংহ দেশের বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অধিনায়ক প্রবলপ্রতাপ দেশবন্ধুকে যিনি মৃগাণাং মৃগেন্দ্র, তিনিই নিজের ব্যক্ত আননে গ্রহণ করিলেন।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ—

যিনি লোকসমূহের ক্ষয়কর্ত্তা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত'কাল', তিনিই ভারতের দেশসেবক-সংহারে প্রবৃত্ত। দেশবন্ধুগণ, পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত দীপানলে প্রবেশ করে, তেমনই সমৃদ্ধবেগে তাঁহারই বক্তে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি আজিকার নহেন, তিনি শাশ্বত। তিনি কালও ছিলেন, আজও আছেন, কালও থাকিবেন। তিনি অনন্ত মহাকাল, শান্ত শিব। তাঁহার বক্ষের উপর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড,—আদিত্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও জীবধরিত্রী পৃথিবীর সহিত খণ্ডকালের লীলাবুদ্‌বুদে জাগিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে।

মহাকাল নিত্য, কিন্তু ক্ষণকাল অসত্য নহে। জেলিফিশকে যত টুকরাই কর, প্রত্যেক টুকরাই প্রাণাংশে পূর্ণ ও সত্য। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমবশিষ্যতে। মহাকালের পূর্ণতা হইতে যতই খণ্ডকাল কাটিয়া বাহির হউক, প্রত্যেক কালটুকুই সত্য। ক্ষুদ্র কালে সীমাবদ্ধ জীব নিজ নিজ সীমার মধ্যে চূড়ান্ত আত্মবিকাশের দ্বারা খণ্ডকালকে মহাকালের পূর্ণতাযুক্ত করে।

বিভূতিমান্ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার ক্ষণকালের জাতীয় লীলাময় জীবনকে এই পূর্ণতার দ্বারা সার্থক করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দেবতা আমাদের জাগ্রত। দেবতা আমাদের ভুলেন না। তিনি শান্ত শিব থাকিয়া আমাদের প্ররোচনা করিতেছেন—পূর্ণ হও, ধন্য হও, গ্রাস আমি করিবই; স্বেচ্ছায় গ্রস্ত হও, অনিচ্ছায় নহে, প্রভু হইয়া গ্রাসে আইস, দাস হইয়া নহে; আমার গ্রাসের জন্য শুদ্ধ হও, বদ্ধ হও, আমার প্রসন্নতাজনক হও। পুরুষযজ্ঞে বলিপুরুষ হইয়া, আত্মবলিদান করিয়া, মহৎ হইয়া মহতে লীন হও, যে যে অবস্থায় আছ, সে সেই অবস্থায় সার্থক হও।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ

প্রজার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন স্বরাজ—অর্থাৎ ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে অন্তরে ও বাহিরে স্বাতন্ত্র্যলাভ জীবের জন্মাধিকার, তেমনই যজ্ঞ অর্থাৎ উচ্চ উদ্দেশ্যের জন্য ইষ্টত্যাগ জীবের সহজাত কর্ত্তব্য। মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষে মগ্ন না হইলে, উদ্দেশ্যের পদে ইষ্টত্যাগ না করিলে, ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী হইতে প্রশস্ত পরার্থের দিকে পা না বাড়াইলে, ধন, মান, আরাম ও আপনজন কোন না কোন দিন কোন না কোন দেবতার পদে উৎসর্গ না করিলে, জীবের জন্মদোসর সাধনে বিমুখ হইলে মুক্তি নাই। এ জন্মে জন্মসহজাত কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। বারবার জন্মচক্রে ঘুরিয়া প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যাহা সৃষ্টি হইয়াছে, সেই যজ্ঞ বা আত্মবলিদান এক দিন সম্পন্ন করিতেই হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাণতরী আজ অনন্ত-সাগরে ভাসমান। তরী ভাসিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের ক্ষণিকতাকে পূর্ণতায় ভরিয়া সকলের জন্য তিনি আদর্শ রাখিয়া গেলেন। যুদ্ধ-অশ্ব যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের ঘ্রাণে সে দিকে ছুটিবার জন্য উদ্দাম হয়, তেমনই অনেকেই হয় ত রাজনীতিকক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য স্পৃহাবান্। দেশবন্ধুর সুস্পষ্ট পদাঙ্কের অনুসরণ তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আত্মচরিতার্থতার অভাবে নিজের নিকট নিজের মর্য্যাদায় হেয় হইয়া তাঁহারা কষ্টজীবন অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু রাজনীতি যাঁহাদিগকে নৈসর্গিকভাবে প্রলুব্ধ করে না, তাঁহারা স্ব স্ব প্রকৃতি, রুচি ও অবস্থানুযায়ী যে কোন ক্ষেত্রে লোকহিতজনক যে কোন যজ্ঞ নিজের জন্য বাছিয়া লইয়া আজ হইতে যদি তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার পণগ্রহণ করেন, তবেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্য শোকপ্রকাশ সার্থক হইবে। জীবন ও যৌবনের আরম্ভে সর্ব্বসাধারণের মত চিত্তরঞ্জনও ব্যক্তিগত উন্নতি-সাধনে নিমগ্ন

ছিলেন। কিন্তু কালপুরুষ তথন হইতেই তাঁহাকে শুধু বলিরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। দেউলিয়া পিতার ঋণশোধের দ্বারা পিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে ইষ্টত্যাগ করাইয়া ভবিষ্যতে দেশমাতৃকার বৃহত্তর যজ্ঞের জন্য তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। তাহার পরে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অনেক ভোগবিলাসে ডুবিয়াছেন, কিন্তু বলিদানের পূজার ঘণ্টারব সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইয়াছে। ভয় ও আড়ষ্টতার দিনে তিনি নির্ভয়ে অল্প পারিশ্রমিকে বা বিনা পারিশ্রমিকে বিদেশীয় সরকারের রোষদিগ্ধ স্বদেশী যুবকদের বাঁচাইবার জন্য বাহু বাড়াইয়াছেন। তখনও তিনি শুধু ব্যবহারাজীব, যাজ্ঞিক নহেন। যজ্ঞে নামিলেন অনেক বয়সে। যে দিন নামিলেন, সে দিন ভোগান্তে প্রৌঢ়ের অনাসক্তি ও অকুতোভয়তা,—নির্লোভ ব্রহ্মচর্য্যশীল যুবার তেজকে লজ্জা দিল।

দেশবন্ধু মৃত্যুর দ্বারা দেশের তরুণদিগকে জীবন্ত হইতে শিখাইতেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালী যুবকের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যেখানে যে বাঙ্গালী যুবক আছ, আজ জানো, তোমাদের বন্ধু, তোমাদের সেবক, তোমাদের নায়ক আজ ঐ অনন্ত আকাশ হইতে তোমাদিগকে আকাশবাণীতে বলিতেছেন—"উঠ, জাগো, বন্ধু, ভাই, পুত্র, স্বার্থে নিমগ্ন থেকো না, দেশ মাতৃকার সেবা কর, আত্মোৎসর্গ কর, বলী হও, সার্থক হও, ধন্য হও।"

শ্রীমতী সরলা দেবী।

দেশবন্ধুর অভিনন্দন

সারা জীবনের অর্জ্জিত ধন
স্বদেশের হিতে করিয়া দান,
রত হ'লে মহাব্রতের সাধনে
রাখিতে বিজিত জাতির মান;

স্বরাজের তরে নিলে অকাতরে
বরণ করিয়া চরম ক্লেশ;
তরুণ অরুণ তুমি বঙ্গের,
কারায় দীপ্ত বন্দি-বেশ!

চির-পরাধীন দাস-জাতি-মাঝে
ধন্য মহান্ তুমি হে দাশ,
ত্রাণ হেতু এই পতিত জাতির
প্রাণপাতে তব নাহিক ত্রাস।

লক্ষ কণ্ঠে তব জয় গান
মুখরিত আজি ভারত-ভূমি;
যতনে পুজিতে চরণ তোমার
হৃদয়ের রাজা মোদের তুমি।

সেবক—নারায়ণ ভঞ্জ।

দেশবন্ধু

কর্ম্মী যিনি, পরিচয় তাঁর তাঁহারই কৃত কর্ম্মে। জাতি, নীতি, কুল, গোত্র বা প্রাদেশিক পরিচয় তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট নাই। তিনি তাঁর স্বদেশের সমুদায় নর এবং সমস্ত নারীরই বন্ধু, তাই নাম তাঁর দেশবন্ধু। তাই তাঁর জন্য সকলেরই অশ্রুনির্ঝর স্বতঃই ঝরিয়া পড়ে, সবার চিত্তই বিষাদমেঘে ভরিয়া উঠে, তাই তাঁর স্মৃতির পূজা করিতে সমস্ত জনসাধারণই উদ্‌গ্রীব ও উৎসুক হয় এবং মহতের এই মর্য্যাদাদানে সমস্ত মানবের নিজ নিজ মনুষ্যত্বকেই মর্য্যাদা প্রদান করা হয়, অন্যথায় আত্মাবমাননা। তাই আজ সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশ্যে আমাদের এইটুকু শ্রদ্ধার অঞ্জলি আমরাও ঢালিয়া দিলাম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিয়োগসংবাদ একটা আকস্মিক বজ্রপাতের মতই সমস্ত দেশের মস্তকের উপর আজ পতিত হইয়াছে, আর সেই 'দেশ' বলিতে আজ কোন 'প্রদেশ'-কেই বুঝাইতেছে না, এ দেশ এক সুবিস্তৃত মহাদেশ, ইহার অসংখ্য অসংখ্য কোটি কোটি অধিবাসী নর এবং নারী বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মী এবং এমন কি, বিভিন্ন ভাষাভাষী। তথাপি এই মহা বিপদের আকস্মিক স্খলিত অশনি যেন একই শোকের আঘাতে, একই চিন্তার তাড়নায়, একই আশাচ্যুতিতে একসঙ্গে বিশাল ভারতবর্ষকে স্তব্ধ, আড়ষ্ট ও অভিভূত করিয়া দিয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার প্রেমাস্পদ স্বজন বন্ধু এবং স্বজাতীয়ও আছেন, আবার ইহার মধ্যে তাঁহার বিপক্ষপক্ষীয়, অনাত্মীয় এবং বিজাতীয়েরও অভাব নাই। এতই অভাবনীয় ও ভয়ঙ্কর এ ক্ষতি যে, আজ যাঁহারা স্বদেশে বিদেশে তাঁহার কার্য্যের সহিত তাঁহার মতের সহিত কোন দিনই ঐক্য-মতাবলম্বন করিতে পারেন নাই, এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত তর্ক-বিবাদ ষড়্‌যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষাকল্পে অকুণ্ঠিত সরলতার সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, যাহা গেল, ইহার আর তুলনা নাই! এ ক্ষতির পরিমাপ হয় না। তাই আজ বাঙ্গালার ধন, বঙ্গীয় চিত্তরঞ্জন সমগ্র ভারতের শোকাশ্রু আহরণ পূর্ব্বক সেই কোটি তীর্থসঙ্গমের চিতাশয্যায় অমরত্বলাভ পূর্ব্বক সমস্ত ভারতবর্ষকে জানাইয়া দিলেন যে, বাস্তবিক ভারতবাসীরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বা কেহ কাহারও পর নহে। বিবেকানন্দ, গন্ধী, গোখ্‌লে, তিলক, চিত্তরঞ্জন ইঁহাদের জাতি, গোত্র বা বাসগ্রামে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না, ইঁহাদের স্থান সমস্ত নরনারীর অন্তরকেন্দ্রে, ইঁহাদের বিয়োগ জাতীয় বিয়োগ,

চিত্তরঞ্জনের জননী

ইহাদের তিরোভাব জনিত অসাধারণ ক্ষতি সমুদায় ভারতের ক্ষতি।

মৃত্যু ত আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, তবে ব্যক্তিবিশেষের মরণকেই বা এত বড় করিয়া দেখা হয় কেন? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে মানুষ সবই এক এবং সেই মানব-জীবনের পরিণতিও সর্ব্বত্রই সমান, কিন্তু যথার্থতঃ সেটা স্থূলভাবে হইলেও, সকল মানুষ ঠিক একও নহে এবং সকলের পরিণামও সমান হইতে পারে না। এই যে ক্ষতি আজ আমাদের হইয়া গেল, এ ত তোমার আমার দ্বারা ঘটিত না; কারণ, এই যে জীবন আমাদের মধ্যে জাগিয়াছিল, এই একটিমাত্র জীবনের দ্বারা কতই মহত্তম কার্য্য পরিচালিত, কত ভবিষ্যৎ আশার সূচনা ঘটিয়া উঠিতেছিল. আজ এই অতর্কিত অকালবিয়োগে একান্ত শূন্যময় সেই স্থান পূর্ণ করিবার কে আছে? আর কি সেই হারানো-রত্ন আমরা কোন্ দিনই ফিরিয়া পাই? তাই আমরা বুঝিতে পারি যে, যে বড়, সে জীবনেও বড়,মরণেও তাই। আজ এই যে ভারতীয় পুরুষ-পুঙ্গব অনন্ত-শয্যায় শয়ান রহিয়া তাঁহার স্বদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যথিত, পীড়িত, কাতর চিত্তের হতাশাব্যাকুল হাহাকার এবং দারুণ গ্রীষ্মদিবসের প্রলয়তপ্তসূর্য্যকিরণ উপেক্ষা পূর্ব্বক শোকসংবিগ্নমানসে তাঁহার পরিত্যক্ত শরীরের ক্ষণিক দর্শন,স্পর্শন ও অনুগমনার্থ আগ্রহ দ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি কত বড় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষতিও যেন ইহা দ্বারাই কতকাংশে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল, ইহার অভাব ও নৈরাশ্যে হৃদয় অধিকতর সন্তপ্ত ও পীড়িতও করিল। কিন্তু তথাপি এ দৃশ্য যে আমাদের শুধুই ব্যথিত ও নিরাশ করে, তাহাও নহে, এই মৃত্যুতে শোকের সঙ্গে সঙ্গে বিগতের মহত্ত্ব গৌরব যেন আমরা সমধিকভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃখদীর্ণ বিয়োগতপ্ত অন্তরের অন্তঃস্থলেও একটা গরিমা বোধ করিয়া থাক। তখন আমাদের মনে পড়ে, এই ত জীবন! যেখানে একের জন্য অযুতের শোক, সে শোকও কি মহত্তম? সে শোকেরও কত বড় মর্য্যাদা! সে শোকেও কতখানি মাধুর্য্য! এইরূপ মহৎ প্রাণেরই বিদায় অভিনন্দনোপলক্ষে যেন কবি গাহিয়াছিলেন,

"তুলসি! যব্ জগ্ মে আয়ো, সব হঁসে তোম রোঁও,
এ্যায়সা কাম কর্ যাও যৈসে, তোম্ হঁসো সব্ রোয়ে॥"

এই সেই মৃত্যু, যে মরণকে উদ্দেশ করিয়া কর্ম্মযোগের যুগসাধক কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ তাঁহার ঔদাত্ত গম্ভীরকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন—

"সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল নৃত্য করে উপভোগ মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

এই সেই অমরবাঞ্ছিত মৃত্যু! অথবা মৃত্যু ইহাতে কোথায়? মৃত্যু তাহাকেই বলে—যেখানে বিস্মৃতি। কিন্তু এ মরণের মধ্যে যে অক্ষয় অমর স্মৃতি মধ্যাহ্ন ভাস্কর-দীপ্তিতে ভারতের চিরভবিষ্য গগনকে প্রভাময় করিয়া রাখিল, ইহার মধ্যে সেই অন্ধকারময় বিস্মৃতির স্থান ত নাই। তাই ইহাকে আমরা ত মরণ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, বরং সেই মহৎপ্রাণ অক্লান্ত-কর্ম্মীর কর্ম্ম শরীরাবসানে তাঁহার কর্ম্মময় সূক্ষ্মদেহ—তাঁহার আত্মা সেই কর্ম্মময় মহাশক্তির সহিত একীকৃত হইয়া মহত্তম শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া আরও দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি।

সেই মহাপুরুষের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা কর্ম্ম বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারিলে আমরা তাঁহাকে আবার আমাদের মধ্যেই ফিরিয়া পাইতে সমর্থ। কারণ, দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইলেও দেহীর ত বিনাশ নাই। বিশেষতঃ দেশাত্মবোধ তাঁহার মধ্যে যত বড় পূর্ণরূপে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাঁহার সে বিশাল স্বদেশপ্রেম ত মরণের মধ্যে নাই যে, সে অপহরণ করিয়া লইতে পারে!

সে আছে, বিশ্বাস কর, অন্তরের সহিত ভরসা করিতে থাক যে, সে আছে।

আছে এবং আমাদেরই জন্য আছে। চিত্তরঞ্জনের স্থূলদেহ পঞ্চভূতে মিশিলেও তাঁহার আত্মা সেই বিরাট পুরুষের সম্মিলনে বিরাটরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় এই সমগ্র জাতির ভিতর অনুস্যূত হইয়াছে। ভারতবাসী, আজ গৌরবের সহিত এই মুক্ত হইয়াও একপ্রাণতার প্রেমে যুক্তাত্মার সান্নিধ্যানুভব পূর্ব্বক তাঁহার বাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া তাঁহার আরব্ধ ও পরিচালিত স্বদেশ সেবাকে জীবনের মূলমন্ত্র

করিয়া লও, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, তাঁহার পুণ্য স্মৃতিকে স্মরণে রাখিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথানুসরণ করিতে থাক। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই পথেই এক দিন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজের দেখা আমরা পাইব।

এই বিশ্বাসপ্রণোদিত হইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "আমি এই দেশের উপযোগী করিয়া আমার শাসনবিধিসমূহ গঠন করিবার ক্ষমতা চাহি। সেইগুলি ভবিষ্যতে 'মহৎ ভারত-শাসননীতি রূপে পরিচিত হইবে। উচ্চ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। এক্ষণে আসুন, সেই জন্য যুদ্ধ করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করি, আমাদের সমস্ত শক্তির সহিত যুদ্ধ করি এবং যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সেই অধিকার প্রাপ্ত না হই, তত দিন নিবৃত্ত না হই।"

তিনি আরও বলেন, "আমার বিবাদ ব্যক্তিগতভাবে একেবারেই নহে—আমার দেশের শাসনপদ্ধতির সহিত আমার বিবাদ। এ দেশের কু-শাসনের জন্য এই শাসন-পদ্ধতিই দায়ী। শাসন-পদ্ধতি মন্দ কেন? যেহেতু, ইহার দায়িত্বজ্ঞান নাই। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র কাহার কাছে দায়ী? ভারতের জনসাধারণের কাছে নহে। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের আদেশমত ইহা চালিত হয়। এই দায়িত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় করিবার মত সময় বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নাই। এই অবহেলা ঔদাসীন্যের জন্য নহে, ইহা নিজেদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত। ভারতবর্ষীয় সমস্যা অপেক্ষা ইংলণ্ডের পক্ষে বহুগুণে প্রয়োজনীয় বহু সমস্যার সমাধান পার্লিয়ামেণ্টকে করিতে হয়।" বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে অবস্থার যে বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটে নাই—চিত্তরঞ্জনের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বহু শাখায় বিভক্ত প্রতিনিধিসভা বা ব্যবস্থাপক সভা থাকুক বা না থাকুক, দেশশাসনের নিমিত্ত বিলাতের অনুকরণে তোমাদের আভিজাত সভা ও সাধারণ সভাসমূহ থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে আমার কিছু আইসে যায় না। আমি চাহি সমস্ত ভারতবর্ষের লোক সমস্বরে বলিবে, আমাদের শাসনকার্য্য আমরা চালাইব। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার। কোন শাসনতন্ত্রই আমাদিগকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে তোমরা ইহা বুঝিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমরা স্বরাজ পাইবে।"

দেশবন্ধুর কন্যাদ্বয় ও দৌহিত্রগণ

ইহাই দেশবন্ধুর দেশের প্রতি উপদেশ।

তাহার পর নিজস্বভাবে তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার কথা আমার বেশী কিছু নাই। ব্যক্তিগতভাবে চিত্তরঞ্জন দাশকে আমি কখনও স্বচক্ষুতে দেখি নাই, তাঁহার সহিত আলাপের সৌভাগ্য ত বহু দূরের কথা। তথাপি আজ বহু বহু বর্ষ ব্যাপিয়া আমার চিত্তমন্দিরে তাঁহার জন্য শ্রদ্ধার আসন সুবিস্তৃত রহিয়াছে। যে দিন বোমার মামলায় শ্রীমান্ বারীণ ঘোষ প্রভৃতির সহিত নির্দ্দোষ অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় ধৃত হয়েন ও তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে, সে দিন দেশের অনেকেরই মত আমারও তরুণ চিত্ত তাঁহার মুক্তিকামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দিন এই ধীরচিত্ত পুরুষ-পুঙ্গবকে তাঁহার অসাধারণ শক্তির সম্পদ লইয়া, নির্ভয়ে বিপন্নের রক্ষাকল্পে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, মনে মনে অজস্র শ্রদ্ধার অঞ্জলি সাজাইয়া তাঁহার উদ্দেশে ঢালিয়া দিয়াছি। বিপুল পিতৃঋণ ইন্‌সলভেন্সির

বহুবর্ষ পরে স্বেচ্ছায় পরিশোধ, সে-ও তাঁহার এক মহৎ পরিচয়। ইহা জগতে সুলভ নহে। তাহার পর তাঁহার প্রতি সেই শ্রদ্ধা অসামান্য ভক্তিভরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল সেই দিন—যে দিন কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠতম ব্যারিষ্টার কোটি কোটি লোকের একান্তকাম্য অসাধারণ প্রসারপ্রতিপত্তি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতই অনায়াসে পরিত্যাগপূর্ব্বক চীরধারী সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। রাজা ভিখারী হইলেন, আর সে কিসের জন্য?—এমন কি, নিজের স্বর্গ, মোক্ষ, মুক্তি পর্য্যন্ত তাহার মূল্য ধার্য্য হইল না—সে দৈন্যবরণ, সে বিপদাহ্বান, সেই বিপদাহবে ঝম্পপ্রদান, সে নির্য্যাতন সবই যে মাথার করিয়া লইলেন—শুধু সে পরের জন্য! তাই শ্রদ্ধার তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার মাথা নত হইয়া আসিয়াছে, ভক্তিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কারণ, মানুষ ভাল কায যেটুকু করে, হয় তাহা নিজের জন্য, না হয় ত নিজের বংশের কল্যাণের জন্য। কিন্তু যাঁহারা এই চিরন্তননীতির বাহিরে গিয়াছেন, সকল যুগে এবং সর্ব্বকালেই সকল দেশে তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ইহারই জন্য অবতারবাদ। গুরুপূজা এবং সাকারোপাসনারও মূলকথা এইখানে। ঈশ্বরেরও কৃপামূর্ত্তি, স্রষ্টা ও পাতা রূপকে গৌরব দিয়া আমরা তাঁহার পূজা করি, কারণ, তাঁহার কাছে আমরা যে কৃতজ্ঞ, সেইটা জানাইতে চাহি। তাই যাঁহারা আমাদের জন্য কিছু করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার যাঁহারা আমাদের জন্য অনেকই কিছু করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে পাওয়া সেই ঋণটুকুকে আমাদের অস্বীকার করা চলে না, চলিতে পারে না, এটুকু না করিলে আমাদের মনুষ্যত্ব পঙ্গু হইয়া যায়, মনুষ্যদেহের অধিষ্ঠাতা আহত হয়েন। তাই ক্ষুদ্র হউক, তুচ্ছ হউক, মহতের জন্য এই ক্ষুদ্র দুই বিন্দু শোকাশ্রুমোচনে তাঁহার তর্পণের সাহায্য যত সামান্যই হউক্ না কেন, আমাদেরই শোকভারাক্রান্ত চিত্তের এতটুকু একটু সান্ত্বনা লাভ ইহাতে হইতে পারিবে, আমাদের লাভ এইটুকুই।

এস, আমরা আজ একান্ত নির্ভরে সেই সদ্য অপগত দেশবন্ধু—দেশবন্ধুর আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রাণের কামনা জানাইয়া বলি যে, এই দৈন্যপিষ্ট, দুঃখদুর্দ্দশাক্রান্ত তোমার জাতির মধ্যে আবার আসিও। দেহিরূপে অথবা বিদেহিরূপে এ জগতে আসিয়া অথবা জগদতীত থাকিয়া—ইহার মুক্তি-যজ্ঞের হোতৃত্ব, হে যাজ্ঞিক! কোন দিনই তুমি ত্যাগ করিও না।

শ্রীমতী অপর্ণাদেবীর পুত্র ও কন্যাদ্বয়

মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে নবীন জীবন,
আরো উচ্চ লক্ষ্য ধ্যান তরে,
প্রদানিতে বিরাম পঙ্কজ-আঁখিযুগে।
হে সৌম্য! তোমার তরে, হের
প্রতীক্ষার আছে সর্ব্বজন;
তব মৃত্যু নাহি কদাচন!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

দেশাত্মবোধে চিত্তরঞ্জন
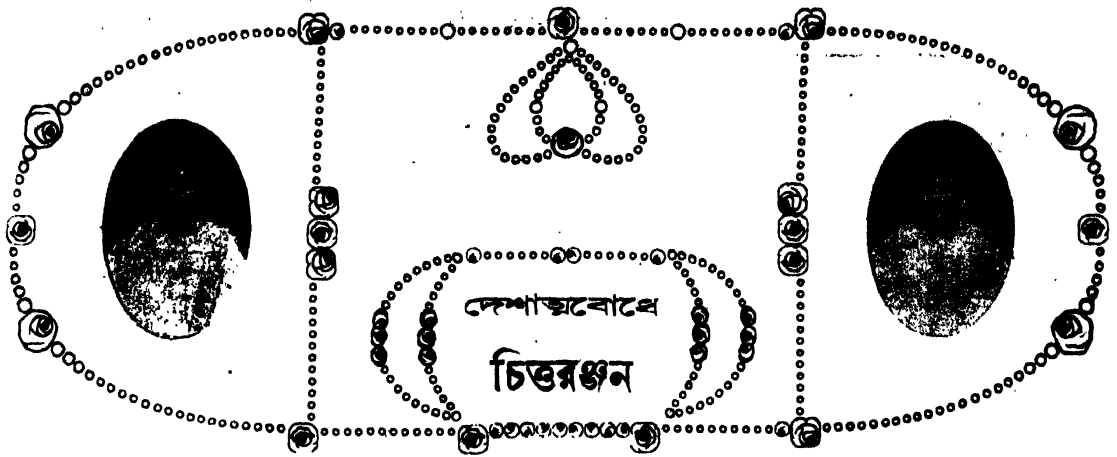
খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল, সে সময়ে ভারতবাসী জনসাধারণ নিরন্তর যুদ্ধবিপ্লবে কাতর ছিল। এক সঙ্কট অতিক্রম হইতে না হইতে আর এক নূতন রাষ্ট্রীয় সঙ্কট উপস্থিত হইত। প্রজাগণ নিজ উন্নতি বা হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইত না। শাসনতন্ত্রে রাজশক্তি ভিন্ন প্রজাশক্তি বলিয়া যে একটা বলপ্রয়োগ হইতে পারে, এ দেশের লোক তাহা শিখিবার অবসর পায় নাই।

ইংরাজ প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে কতক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় শান্তি স্থাপিত হয়। তাহার কিছু কাল পরে দেশের এক দল লোক পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করেন ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েন। দুই এক জন প্রতিভাবান্ ব্যক্তির মনে দেশের সম্বন্ধে নূতন চিন্তা অঙ্কুরিত হয়। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, দেশের উন্নতি ও দেশের শাসন সম্বন্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য আছে। সকল কার্য্য সম্পূর্ণরূপে রাজার উপর ন্যস্ত করিয়া উদাসীন থাকা উচিত নহে। দেশের উন্নতিকল্পে নিজ বিচারমত উপায় উদ্ভাবন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা উচিত।

ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের পূর্ব্বে এ দেশে প্রজাশক্তি কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে নাই। সময়ে সময়ে যে সব যুগপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবাসীর মনে ধর্ম্মভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাষ্ট্রচালন ও জাতিগঠন ব্যাপারে প্রজার যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহা জাগাইবার চেষ্টা হয় নাই।

ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহুযুগব্যাপী অসাড়তা ক্রমশঃ দূর হইতে আরম্ভ হইল। দেশবাসীর মনে সব জিনিষ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে একটা বিচার, স্বাবলম্বন ও আত্মোন্নতির ভাব উপস্থিত হইল। যেখানে ভাগ্যের উপর ও উপরওয়ালার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা অভ্যাস ছিল, সেখানে তাহার পরিবর্ত্তে একটা উদ্যমের ভাব লক্ষিত হইল। রামমোহন রায় দীর্ঘকাল-প্রচলিত লোকাচার অমান্য করিয়া সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া নির্ভীকভাবে নিজ মত প্রচার ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যে শিক্ষা দ্বারা উন্নত হইয়াছে, সেই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হয়েন। দেশের রাজনীতিক উন্নতি-বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। ইংলণ্ডপ্রবাসের সময় পার্লিয়ামেণ্টের কমিটীর সম্মুখে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দূরদর্শিতা বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেশের লোকের উপর অত্যাচার হইলে, চুপ করিয়া সহ্য না করিয়া লোক প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির লেখনীর বলে দেশবাসীর মনে একটা আশা, উৎসাহ ও উদ্যম আসিল।

এইরূপে ধীরে ধীরে জাতিগঠন কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এই কার্য্যে সহায়কদের মধ্যে কয় জন ইংরাজের নাম স্মরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে মিষ্টার হিউম কংগ্রেসের জন্মদাতা। কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বে মিষ্টার হিউম "বৃদ্ধের আশা" নামে এক পুস্তিকা

শ্রীমতী বাসন্তীদেবী

লিখেন। তাহাতে একটি কবিতা ছিল। নিম্নলিখিত স্তবকটি সেই কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইল :—

"Sons of Ind why sit ye idle
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing ;
By themselves are nations made."

আত্মনির্ভরতা ও অক্লান্ত চেষ্টার যে মন্ত্র মিষ্টার হিউম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন, সেই মন্ত্রের প্রসার অতি ধীরে হইতেছিল।

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্ব্বে জাতিগঠন সম্বন্ধে লোক অনেকটা দেশশাসকদের উপর নির্ভর করিত। সাধারণের কি প্রয়োজন ও সেই সম্বন্ধে শাসকদের দৃষ্টি-আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন ভিন্ন জনসাধারণের পক্ষে জাতিগঠনার্থ বিশেষ কিছু কার্য্য হয় নাই। দেশের লোক শাসকদের উপেক্ষাসত্ত্বেও দেশ গড়িয়া তুলিতে পারে, এ ভাব অল্পে অল্পে দেশবাসীর মনে উদিত হইতে লাগিল। বঙ্গচ্ছেদে আপত্তিজ্ঞাপনসংকল্পে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ধুয়া উঠিল। দেশের লোকের মনে একটা আত্মশক্তির আভাস আসিল। বঙ্গচ্ছেদ রদ হইল। কিন্তু দেশের মনে যে সাড়া আসিয়াছিল, তাহা স্থির হইবার নহে। বর্ষে বর্ষে আত্মশক্তি-বোধ বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্মশানে শুষ্ক অস্থিতে কে যেন জীবনসঞ্চারের সাড়া আনিল।

জনসাধারণের অস্ফুট মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা ও তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা দুরূহ। ইহা বুঝা যায় যে, দেশবাসীর মনে একটা আবেগ ও একটা আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়াছে। দেশবাসী নিজের দেশ নিজ মনের মত করিয়া নিজ হাতে গড়িতে চায়।

চিত্তরঞ্জন দাশ এই আত্মশক্তিবোধবিস্তারের এক শ্রেষ্ঠ যুগাবতার। আমরা হীন, আমরা ক্ষুণ্ণ, আমরা দুর্ব্বল ; কিন্তু আমরা মানুষ। আমাদের মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হইবার অন্তর্নিহিত শক্তি আমাদের মধ্যেও আছে ও আমাদের নিজ চেষ্টায় সেই শক্তির বিকাশ

শ্রীমান্ চিররঞ্জন

হইবে। সেই সত্য আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, চিন্তায় ও কার্য্যে আমরা যেন সর্ব্বদা সেই শক্তির উৎকর্ষের চেষ্টা করি, ইহাই চিত্তরঞ্জনের জীবনের সাধনা ছিল। সেই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া তিনি অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ ও একনিষ্ঠ সাধনা চিরকালের জন্য একটি জলন্ত উদাহরণ-স্বরূপ থাকিবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।
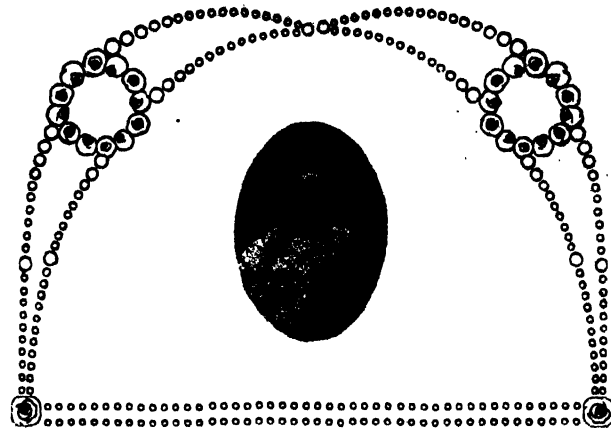
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরোপকার, স্বদেশপ্রেম, বদান্যতার জন্য তাহা বহুকাল পরিচিত। তাঁহার পিতা এবং বিশেষতঃ ভুবনমোহন দাশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ নানা হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু উত্তরাধিকার-সূত্রে এই সমস্ত গুণ লাভ করেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন, আমি তখন অধ্যাপক ছিলাম এবং সেই সময় হইতেই তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতাম। সেই সময়কার কথা তাঁহার সহাধ্যায়িগণ নানা সংবাদপত্রে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দেশবন্ধুর কংগ্রেসে যোগদান অতি অল্পদিনের বলিলেও চলে। উমেশচন্দ্র, আনন্দমোহন, কালীচরণ, রমেশচন্দ্র, মনোমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নেতৃগণ বহুকাল হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের এক এক জনকে এই ক্ষেত্রে ধুরন্ধরও বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৎসর মাস দিয়া দেশবন্ধুর কার্য্যের বিচার করিলে ভুল করা হইবে। চিত্তরঞ্জনের কংগ্রেস-জীবন বয়সে নবীন হইলেও কর্ম্মে প্রবীণ ছিল এবং অতি অল্পসময়ের ভিতরেই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে আমি বোম্বাই হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বিলাতযাত্রা করি। আমার প্রিয় বন্ধু পরলোকগত মহামতি গোখলে সহযাত্রী ছিলেন—কাযেই অনেক সময় দেশের বিষয় আলোচনা হইত। আমার স্মরণ আছে, এক দিন ক্রীড়াচ্ছলে এক টুক্‌রা কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। কবি বাইরণের (Byron) প্রসিদ্ধ কয়েক পংক্তি একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলাম,—

"Bhupeni politics is a thing apart,
T's Gokhale's whole existence,"

প্রকৃতপ্রস্তাবে বলিতে গেলে দাদাভাই নৌরোজি এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোখলে ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যাণার্থ এক প্রকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া আত্মোৎসর্গ করেন। উভয়েই অর্থনীতি-বিশারদ ছিলেন। ইংরাজ শাসনের শোষণ-নীতিপ্রসূত ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন কিরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা ইঁহারাই প্রথম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন ও পরে সুগভীর সুপ্তিমগ্ন দেশবাসীকে জাগাইয়া তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন—এক কথায় বলিতে গেলে উভয়েই উচ্চ দরের রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিশারদ ছিলেন এবং তাঁহাদের সেই শক্তি-সামর্থ্য ভারতের কল্যাণার্থ নিয়োজিত করেন।

গোখলের নিকট আমি অনেক খাতাপত্র দেখিয়াছি। বৎসরের পর বৎসর ভারতের সামরিক ব্যয় কি ভাবে রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর দুরন্ত রোগের ন্যায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে এবং সর্ব্ববিধ গঠনমূলক কার্য্যকে বাধা দিয়া দেশকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইতেছে, তাহা আমি তখন সর্ব্বপ্রথম ভাল করিয়া উপলব্ধি করি। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যখন বাৎসরিক বাজেট-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হইত, তখন একমাত্র গোখলের ভয়েই অর্থ-সচিবের হৃৎকম্প হইত।

চিত্তরঞ্জন কিন্তু এই সব তথ্য, পথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের বিবরণের ততটা ধার ধারিতেন না। বাদাম্বুবাদ, তর্কবিতর্কেও গোখলের ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল। তবে কি রহস্তবলে চিত্তরঞ্জন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন—কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ কোথায়? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ সব বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের মৌনতা বা ঔদাসীন্ত থাকিলেও কেন যে কেবল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান, তাহা নহে—বঙ্গবাসীর, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই আজ দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ—তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বরাজলাভ না হইলে ভারতের নিস্তার নাই এবং অর্থনীতিক মুক্তিও হইবে না। দেশশাসন-পদ্ধতির কূটনীতিরূপী রাক্ষস ভারতের বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার অর্থরক্ত অহর্নিশ প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছে। লোকের মেধা, প্রতিভা, আনন্দ, উত্তম, উল্লাস স্ফূর্ত্ত হইবার আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। আরও কিছু দিন এই ভাব স্থায়ী হইয়া থাকিলে, বাকী মনুষ্যত্বটুকুও একেবারে লোপ পাইবে। স্বরাজলাভরূপ মহাস্বস্ত্যয়নের দ্বারা এই অভিশাপ দূর করিতেই হইবে। এই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলেন, তখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াই তাহা করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিব ও অবসরমত দেশোদ্ধার করিব, তাহা আর চলিবে না—সে দিন গিয়াছে। ভারত ত্যাগের দেশ। একমাত্র ত্যাগের অরুণরাগেই ভারতের জনগণের মন আকর্ষণ করা যায়। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা ঐহিক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া রিক্ত হইয়াই ঝুলি পূর্ণ করিয়া ভরিয়া পাইয়াছিলেন, আর তাহারই মহিমা—তাহারই প্রীতি আজিও মানবের মনকে আকৃষ্ট, মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষায়' সত্যই বলিয়াছেন—

"ভিক্ষু কহে দেখ মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া করে বৃষ্টিধার
সর্ব্বধর্ম্ম মাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার ভূতলে।"

ইহা ভারতে চিরন্তন সত্য। ইহাই ভারতের প্রাণের গোড়ার কথা ও বেদমন্ত্রস্বরূপ।

দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা পৌত্রী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাদাভাই নৌরোজী ও গোখলেও এক প্রকার অনন্য কর্ম্মা হইয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের এই দুই বিশ্ববিশ্রুত উজ্জ্বলমণি ও বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জনের মধ্যে একটি প্রভেদ ছিল। দেশবন্ধু একেবারে তথ্যানুসঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি। আদর্শবাদ ও ভাবুকতার দ্বারাই তিনি বাঙ্গালার তরুণ-মনকে জয় করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যিনিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হউন না কেন, তাঁহাকেই এই সব গুণের অধিকারী হইতে হইবে। দেশবন্ধুর এক দিকে যেমন স্বদেশ-প্রেম প্রবল ছিল, অপর দিকে তেমনই উদ্দীপনা-শক্তিও ছিল। লোকের মনকে কিরূপে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি এত সহজেই দেশের হৃদয়ের উপর তাঁহার আসন পাতিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার অসামান্য ত্যাগে দেশ মুগ্ধ হইল। এই সব কারণে আমার বোধ হয়, তিনি যখন মুক্তি যজ্ঞে যুবকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন ও স্বয়ং সুভাষপ্রমুখ স্বদেশ-প্রেমোন্মত্ত যুবকগণের সঙ্গে হাসিমুখে কারাবরণ করিলেন, তখন সহস্র সহস্র যুবক তাঁহার অনুগামী হইলেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

অশ্রু ধারা
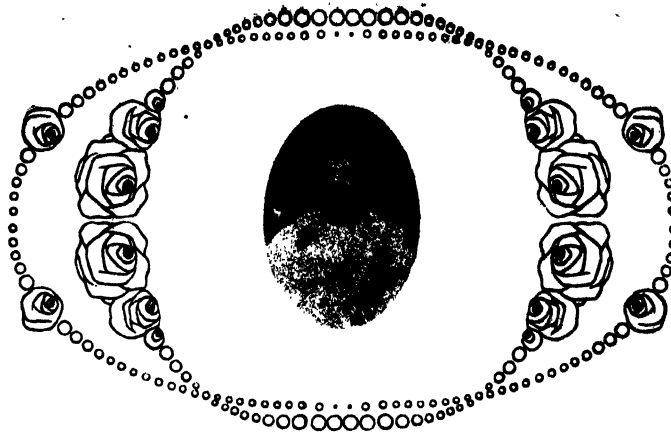
আমরা সকলেই প্রায় "দু'কুড়ি সাতের খেলা" খেলিতে আসি। কেহ কেহ বা কোনমতে হাতের পাঁচটা বজায় রাখেন। কিন্তু একেবারে ছক্কা, পাঞ্জা, ব্যোম এ অনেকের অদৃষ্টেও কুলায় না - শক্তিতেও কুলায় না। "মারি ত গণ্ডার—লুটি ত ভাণ্ডার" এমন বুকের পাটা কয় জনের থাকে? বিশেষ যেটা আবার—"কত রবি জ্বলে কেবা আঁখি মেলের" দেশ—সেখানে ক্ষণজন্মা লোক বড় একটা ত দেখাই যায় না, যেমন-তেমন দুধ-ভাত,বার আনা লোকেরই এর বেশী বড় একটা মন উঠে না, যাঁহারাও বা কেষ্ট-বিষ্ণু হন, তাঁহাদের দৃষ্টিও হয় জমীদারীতে, নয় কোম্পানীর কাগজে। এমন দেশে একটা চিত্তরঞ্জন দাশ আবির্ভূত হইলে সে যে কাশীতে ভূমিকম্প হওয়ার মত একটা আজগুবি ব্যাপার মনে হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমরা তালপুকুরের দোহাই দিয়া থাই, আমাদের স্থান ছিল—ত্যান ছিল, রাম ছিল, কৃষ্ণ ছিল, কুরুক্ষেত্র ছিল, অযোধ্যা ছিল ব্যাস ছিল, বাল্মীকি ছিল,একালেও শিবাজী ছিল, প্রতাপ ছিল। গীত গাহিতে হইলেই সেই সেকালের সব কাসুন্দি! বৎসরের পর বৎসর যায়, কিন্তু হালখাতা করিবার মত অবস্থা আর আইসে না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দুস্থানের হাওয়াটা একটু বদলাইয়া গেল, তখন হইতে যেন কতকটা হাতের, মুখের, প্রাণের আড় ভাঙ্গিয়াছে। এই যে মারো আর ধরো পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো, এ ভাবটা প্রায় দেড়শ দু'শ বৎসর দেশটাকে আফিমের নেশায় বুঁদ করিয়া রাখিয়াছে, হঠাৎ সেটা একটু একটু ফিকে হইয়া আসিতে লাগিল। এই কাদার ভিতর ফুটিল অরবিন্দ। তিনিই রাজনীতিতে সন্ন্যাস আনিলেন। ঠুংরী-টপ্পার মধ্যে একেবারে বাগেশ্রী ভাঁজিতে লাগিলেন। বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" তামাম হিন্দুস্থান তোলপাড় করিয়া দিল। মহারাষ্ট্রের সিংহ, পঞ্জাবের সিংহ, মধ্যপ্রদেশের সিংহ সব একেবারে কান খাড়া করিয়া সে সত্যকার স্বাধীনতার সুর শুনিয়া মসগুল হইয়া গেলেন। সেকালে লোক সেই অরবিন্দকেই জানিত আর চিনিত, কিন্তু আগ-দোয়ার ছিল উপাধ্যায়—আর পাছ-দোয়ার ছিল এই চিত্তরঞ্জন—যে আজ গোটা হিন্দুস্থানের চিত্তটার উপর আসন গাড়িয়া বসিয়া এক অজানা অচেনা রাজগিরি ফলাইয়াছে। বাহিরে শুনা যাইত, বিপিনের বিষাণ, অরবিন্দ ও উপাধ্যায়ের কাটাকাটা বোল, কিন্তু টাকা টাকা করিয়া প্রাণ যাইত সুবোধের, রজতের আর এই চিত্তরঞ্জনের। সুবোধেরও ধন গেল, প্রাণ গেল, রজতেরও তথৈব চ, কেবল চিত্তরঞ্জন আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ভেল্কিটা ভাল করিয়া লাগাইয়া গিয়াছে। তখন লোক এদের পুরোপুরি ওজন বুঝিতে পারে নাই,কেবল বলিত "কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ, কেবল সবার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ" কিন্তু ভাগ্যধর চিত্তরঞ্জন প্রাণ দিয়া, ধন দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, মান দিয়া সব দলটাকে ভাল করিয়া চিনাইয়া গেল। আজ চিত্তরঞ্জনের চন্দ্রিকায় দেশ আলো, কিন্তু যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের চোখে আশপাশের তারাগুলায়ও ঝকমকানি ত বড় কম ঠেকে না। এ সবগুলাই যেন বিনা সূতায় গাঁথা ছিল; সুবোধ মারা গেল, দেশে যেন কেহ টেরই পাইল না! অলক্ষ্যে যে কত বড় উল্কার পতন হইয়া গেল, এটা কেহ দেখিল না, কিন্তু অনেক দিন পরে

শিশুসহ চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন কোন সেকেলে অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইলেই আর সব কাযের কথা ফেলিয়া, একেবারে পাঁজরভাঙ্গা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সুবোধটি কি এমনই ক'রে পালাল?"

আজ কত কথাই মনে উঠে, কিন্তু সে ভাব চাপা রাখিতে ইচ্ছা করে, বুক ফাটে ত মুখ ফুটাতে চাহি না। চিত্তরঞ্জন তুষের আগুনের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া শেষকালে আগ্নেয়গিরির মত ফাটিয়া উঠিয়া দেশটাকে কাঁপাইয়া গেলেন। কেহ কেহ ভাবিল, এটা একটা বিদ্রবিন্যাসের উৎপাত, কিন্তু বুকের ভিতর কি জ্বালা লইয়া তিনি ঘর করিতেন, তাহা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই আবার সেটাকে বেড়া দিয়া ঘিরিবার চেষ্টাতে আরও জ্বলিয়া মরিতেন! আগুন পুড়িয়াও মারে, আবার আগুনেই মানুষ ভাত রাঁধে—সন্ধ্যা জ্বালে, অন্তিমে সদ্‌গতি করে, আগুনেই খাদ কাটে — ময়লা ছোটায়। চিত্তরঞ্জন এই আগুনে কত রকমে পুড়িলেন। বাপের দেউলে হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত কত জ্বালাতেই জ্বলিয়া মরিলেন, কিন্তু সেই যে সেকেলে সাবেক সোনার রং,তাহা আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত এক রকমই রহিয়া গেল। তাই তুলসীদাস বলিয়াছেন, —

"সোহি সুবর্ণ সাঁচ আঁচ
সোহি যো রং রাখে।"

কে যে তাঁহাকে কানের ভিতর দিয়া দেশের নামটি মরমে পশাইয়া দিয়াছিল, সেই দেশ—দেশ করিয়াই তিনি গেলেন। দেশই ছিল তাঁহার অন্ন —দেশই ছিল তাঁহার জল - দেশই ছিল তাঁহার বায়ু। যে পঞ্চ মহাভূতে বিধাতা তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন, সেই কয়টাই ছিল এ দেশের রূপান্তর ও নামান্তর। আজ সেই পাঁচটা ভূত দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেখি,বাট কোটি ভুজে বল আসিয়া দেশমাতৃকার উদ্ধারসাধন হয় কি না। চিত্তরঞ্জন লীলাবাদী ছিলেন, তিনি বোধ হয়, এইরূপ একটা লীলাই করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন দেশবন্ধু আখ্যাযুক্ত ছিলেন না, যখন তিনি কলিকাতায় এক জন বড় ব্যারিষ্টার, তখন আমি সামান্য পল্লীগ্রামবাসী; সুতরাং দেশবন্ধুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। স্বাধীনতাকামী দেশবন্ধু যখন বিলাসিতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজের প্রকৃত মূর্ত্তিতে কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন আমি সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে এক জন সামান্য সৈনিক। কিন্তু বাঙ্গালী আমি, বাঙ্গালার নেতাকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই। নাগপুরের কংগ্রেসে মৃত বাঙ্গালী প্রতিনিধির শবের পার্শ্বে ধূলিপূর্ণ পথে দেশবন্ধুকে সজলনয়নে ৬।৭ মাইল হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, বিলাসী চিত্তরঞ্জন আজ দেশপ্রেমিক, দেশবন্ধু, সন্ন্যাসী হইলেন। সেই দিন তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া হৃদয়ে নেতা বলিয়া গ্রহণ করি। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই নেতার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি; তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি; অন্ধের ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়াছি। কোনও দিন মনে দ্বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। লোক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছে। অনেকে শেষে 'বোকা' 'ভালমানুষ' আখ্যাও দিয়াছে। বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ বাঙ্গালী দেশবন্ধুর আদেশ অন্যায় ও অহিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার আদেশ যুদ্ধের সেনাপতির আদেশের ন্যায় প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বজনস্বীকৃত অদ্বিতীয় নেতা মহাত্মা গন্ধীর সহিত দেশবন্ধুর মতের অনৈক্য হইয়াছে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাতে বিচলিত না হইয়া বাঙ্গালার নেতা দেশবন্ধুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছে। আজ সমস্ত জগৎ একবাক্যে দেশবন্ধুর নেতৃত্বের প্রশংসা করিতেছে দেখিয়া মনে হয়, আমার হৃদয় অবিশ্বাসী নহে।

আমার বলিয়া নহে, দেশবন্ধু অধিকাংশ বাঙ্গালীর হৃদয় এইরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সমস্ত পৃথিবী আজ তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার, তাঁহার অভূতপূর্ব্ব দৃঢ়সঙ্কল্পের, তাঁহার অভাবনীয় দেশভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী-হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল, দেশবন্ধুর বাঙ্গালীত্বে। দেশবন্ধু কায়মনোবাক্যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি ভাবিতেন—বাঙ্গালীর মত, কায করিতেন—বাঙ্গালীর মত। তাঁহার আহার, উপবেশন, শয়ন সবই ছিল বাঙ্গালীর। তাই বাঙ্গালীর হৃদয়ের দারুণ বেদনা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। আর সেই জন্যই আপামর সাধারণ বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তাঁহার অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আজ তাই তাহাদের হৃদয়ের মণি হারাইয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ পাগলপ্রায় হইয়াছে। দেশবন্ধু পৃথিবীর মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে পারেন, তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে এক জন প্রধান যোদ্ধা হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব। বাঙ্গালা আজ সেই সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে।

দেশবন্ধু যখন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; তখন তাঁহার বহু দানের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু দেশবন্ধু যখন নিঃস্ব, তখন কর্ম্মীদের অভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কিরূপ কাঁদিত, তাহা দেখিয়াছি। নিজের সংসার পরদিন

কি করিয়া চলিবে, তাহার চিন্তা না করিয়া অভাবগ্রস্ত কর্ম্মীকে নিজের সামান্ত যাহা কিছু ছিল, তাহা নিঃশেষে দিয়া দিতে দেখিয়াছি। প্রার্থীর জন্ত হৃদয়ে তিনি কি বেদনা অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছি, আর দূর হইতে মনে মনে শত নমস্কার করিয়া বলিয়াছি, "নায়ক, সাধে কি তুমি আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছ ?"

দেশবন্ধু সর্ব্বদাই বলিতেন, সৎকার্য্যে টাকার অভাব হয় না। গত ৫ বৎসর তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া তাহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশবন্ধু গত ৫ বৎসরে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ভগবান্ কখনও তাঁহার অর্থের অভাব হইতে দেন নাই। যখন তিনি প্রথম স্বরাজ্য দল গঠন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার হাতে একটা পয়সাও ছিল না। কংগ্রেসের নামে টাকা তুলিয়া স্বরাজ্য দল গঠনে খরচ করা যায় না। সেই জন্ত তখন দেশবন্ধু নিজের নামে টাকা তুলিতে আরম্ভ করেন। কোথা হইতে রাশি রাশি অর্থ আসিল, তাহা ভগবান্ বলিতে পারেন। কিন্তু এক এক মাসে ১২।১৪ হাজার টাকা খরচ করিতেও দেশবন্ধু সমর্থ হইয়াছেন, টাকার অভাব হয় নাই।

গত ৫ বৎসরে দেশবন্ধুর জীবনে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি কখনও আইনের দাস ছিলেন না। কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি নিজের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কখনও তিনি নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন না। যত দিন কোনও আইন বা নিয়ম তাঁহার নিকট ন্যায় ও কার্য্যের উপযোগী বলিয়া মনে হইত, তত দিন তিনি তাহা মানিয়া চলিতেন ; কিন্তু যে দিন বুঝিতেন, তাহা অন্যায় করিতেছে বা প্রকৃত কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিতেছে, তিনি নিয়ম বা আইন সেই দিন পরিবর্ত্তনে প্রচেষ্ট হইতেন এবং না পারিলে তাহা অমান্ত করিতেন। তিনি বলিতেন, নিয়ম বা আইন মানুষের সুবিধার জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ নিয়ম বা আইনের সুবিধার জন্ত সৃষ্ট হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের আইন, কংগ্রেসের আইন প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই তিনি একই ভাবে চলিয়াছিলেন। সরকার যখন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনী বলেন, তখন তিনি সে আইন মানেন নাই। তাই ৬ মাস কারাগৃহে কাটাইয়াছেন। কংগ্রেসে যখন দেখিয়াছেন, single transferal নির্ব্বাচনক্ষেত্রে কার্য্যকরী নহে, তখন তাহা বদলাইয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে যখন কায-কর্ম্ম থাকিত না, তিনি সময়ে নাওয়া-খাওয়া করিতেন ; কিন্তু যখন কায পড়িত, তখন

কারামুক্তির পর চিত্তরঞ্জন

তিনি স্বাস্থ্যের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, ইহা কাহারও অগোচর নাই। এমন কি, তাঁহার অতিশয় ভগ্নস্বাস্থ্যের সময়ও অনেক সময় জোর করিয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে বিরত করাইয়া খাওয়াইতে হইয়াছে। এই বিষয়েও তাঁহার বাঙ্গালীর বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

দেশবন্ধু তাঁহার কর্ম্মিগণকে নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের যেমন গতিবিধি ছিল, তাঁহার কর্ম্মিগণেরও তদ্রূপ ছিল। নিজের কার্য্যে ও ব্যবহারে এরূপ পরকে আপন করা হৃদয় আমি আর কখনও দেখি নাই। গত ৫ বৎসর ধরিয়া এই দেবতার সংসর্গে আসিয়া তাঁহার জীবনের কত ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। এই ৫ বৎসর যে স্বর্গে বাস করিয়াছি, ভগবান্ আজ তাহা আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। আমাদের খেদ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই। আমাদের চক্ষুতে অশ্রু নাই। আমরা কেবল আমাদের বাঙ্গালা-দেশবাসী বাঙ্গালীর নিকট এই নিবেদন করিতেছি, "আইস ভাই, আজ আমরা আমাদের নেতা, আমাদের দেবতা, আমাদের সর্ব্বস্বের স্মৃতি লইয়া, দেশের নামে এই প্রতিজ্ঞা করি, যেন আমাদের আপন বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহাই পণ করিয়া দেশবন্ধুর জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, যেন সেই সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া বাঙ্গালায় স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারি।"

শ্রীসাতকড়িপতি রায়।

চিত্তহারা

সহসা কালের ভেরী ভেদিল গগন—
বিনামেঘে বজ্রাঘাত, ইন্দ্রপাত অকস্মাৎ,
অস্তমিত মধ্যাহ্ন তপন,
আচম্বিতে ভেঙ্গে গেল সোনার স্বপন!

প্রেমাশ্রয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী মানব-প্রধান!
কর্ম্মক্লান্ত কলেবর, ঢালিয়াছ ধরা 'পর—
বাড়াইলে শমনের মান,
তোমার নিধনে মৃত্যু মহিমা-নিধান!

কে কবে দেখেছে হেন মরণ-উৎসব!
জীবন করিতে ধন্য, রাজপথ জনারণ্য,
সিক্ত আঁখি, মুখে জয় রব,
নহিল, নহিবে হেন মৃত্যুর গৌরব!

ত্যজিয়ে বৈভব, সাধ—কৌপীন কম্বল,
একাধারে ত্যাগী ভোগী,
কোথা হেন কার্য্য-যোগী.
প্রেমমাত্র জীবন-সম্বল,
নির্ভীক, নিরভিমান, মুক্তহস্ত মহাপ্রাণ—
সুখে দুঃখে সম অবিচল,
ধীর, কর্ম্মবীর, নেতা—ভুবনে বিরল।

মহাব্রতে প্রাণাহুতি হবে কি নিষ্ফল?
কে জানে, মা বঙ্গভূমি,
চির-অভাগিনী তুমি,
একে একে গেছে ত সকল!
শুধু এ শ্মশান-ভূমে, ঘন ধূমে নভ চুমে,
ধূ—ধূ ধূ—ধূ গর্জ্জে চিতানল,
অনির্ব্বাণ—অশ্রুজলে দ্বিগুণ প্রবল!

অকালে ঢাকিল নিশা উষার আকাশ,
দিশাহারা দেশবাসী,
হতাশ-হুতাশে ভাসি,'
কহে কোথা প্রীতি-সিন্ধু দেশবন্ধু দাশ,
"কোথায়! কোথায়!" কহে নিষ্ঠুর নৈরাশ!

বয়ে যা'বে—বয় যথা সময়ের ধার,
গ্রহ, তারা, শশী, রবি,
ফলে-ফুলে রম্য ছবি
বসুন্ধরা ধরিবে আবার,
চিত্তহারা 'চিত্ত' ফিরে পাবে নাকো আর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
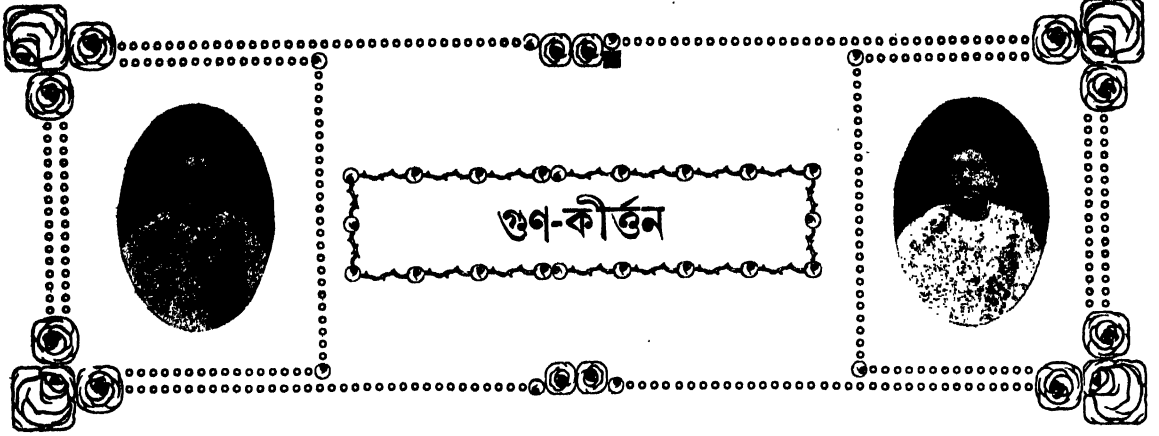
১। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিয়োগে বঙ্গদেশ আজ শোকসাগরে নিমগ্ন। চিত্তরঞ্জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন, তাই শুধু বঙ্গ নহে—সমগ্র ভারত আজ শোকাশ্রুবর্ষণে মলিন। দেশবন্ধুর এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণ আজ ভারতের বুকে সহসা বজ্রাঘাতের মতই বাজিয়াছে। ভারতাকাশ হইতে আজ এক সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্খলিত হইয়াছে। বাঙ্গালার আদর্শ গৌরবরবি আজ চিরতরে অস্তমিত হইলেন। কিন্তু দিনকর অস্তমিত হইলে যেমন নভোমণ্ডলে তাহার রক্তিম আভা সহসা বিলুপ্ত হয় না, তেমনই বাঙ্গালার এ গৌরবরবির প্রতিভাদীপ্তিও সহজে মলিন হইবার নহে। এ দীপ্তি কিছুকাল ধরিয়া বঙ্গদেশকে আলোকিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু বঙ্গমাতা আজ তাঁহার এই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর তনয়কে হারাইয়া সত্য সত্যই অভাগিনী হইলেন। পুত্রহীনা মাতার শোকের সান্ত্বনা নাই—তাঁহার হাহাকার মর্ম্মভেদী। তাঁহার অশ্রুধারা অনন্ত, অশ্রান্ত, অফুরন্ত। দেশবাসীও আজ মর্ম্মান্তিক শোকার্ত্ত।

২। চিত্তরঞ্জন প্রকৃতই জাতির মহাগুরু হইয়াছিলেন। গুরু যেমন ভক্তের মুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। হায়! ভগবান্ তাঁহার সাধনায় বুঝি অতি অল্পকালের মধ্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন!

৩। আমার বোধ হয়, তাঁহার সেই সাধনায়, সেই দেশপ্রেমসাধনায়—শুধু দেশপ্রেম কেন, তাঁহার সেই সার্ব্বজনীন প্রেম-সাধনায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন, এমন লোক বাঙ্গালায় অতি বিরল বা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি বেশ উপলব্ধি করিতেছি যে, দেশবন্ধুর বিয়োগে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমি নিজেই হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছি, কাযেই উপযুক্ত ভাষায় আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা বা মতামত প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। তবে এই কথা আমিও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, বাঙ্গালার কিংবা ভারতের নিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক তাঁহাকে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিবেন। তিনি যে বর্ত্তমান ভারতের এক জন অতি শ্রেষ্ঠ যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ, এ কথা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেও অন্যায় হইবে না।

৪। দেশবন্ধুর সম্বন্ধে এ সময়ে আমার আলোচনা কেবলমাত্র ইতঃপূর্ব্বে সুধীগণরচিত তাঁহার মহিমাকাহিনীর পুনরুক্তি মাত্র এবং কোন ভাব ও ভাষার পুনরুক্তি যে একটি দোষ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বলিবার প্রয়াস এই যে, মহাপুরুষের জীবনকাহিনী ও তৎসম্বন্ধে আলোচনায় অন্যের ভাব ও ভাষার পুনরুক্তি দোষ নহে। ইহা সেই মহাপুরুষের গুণগরিমা-কীর্ত্তন।

৫। আমার সহিত তাঁহার মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে দুইবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই দুইবারই তাঁহার সহিত কথোপকথনে আমি তাঁহার অভাবনীয় মনীষা, প্রতিভা, উন্নত হৃদয় এবং মহত্ত্বের বিশেষ পরিচয় পাই। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অকাতরে অতুলনীয় দানের কথা ভাগলপুরে অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই। তথায় তিনি কোন মামলায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সমগ্র

উপার্জ্জন তিনি সেই স্থানেই কেবলমাত্র নিঃস্বার্থদানেই নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তিনি যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখনই আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে তিনি এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ হইবেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমি আন্তরিক সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলাম।

৬। ইহজীবনে সে সকল গুণ থাকিলে মানব কৃতী ও যশস্বী হইতে পারে এবং পরলোকে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিতে পারে, চিত্তরঞ্জনে সে সকল গুণই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" তাই বলি, "চিত্তরঞ্জন অমর। তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়। তাঁহার গুণের সীমা ছিল না—কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দেশপ্রেম ও দেশসেবা, এই দুইটি গুণ ক্রমে ক্রমে সকল গুণকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছিল।" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই নীতিই তিনি শেষজীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। দেশের জন্য বা জন্মভূমির জন্য তিনি অকাতরে জীবনের সকল সুখভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই বলি, তিনি স্বনামধন্য মহাপুরুষ ছিলেন। আমার বোধ হয়, তাঁহাকে গৌতমবুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভোগের তাঁহার সকলই ছিল—বিপুল ঐশ্বর্য্য, সুরম্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, অসংখ্য দাস-দাসী, গুণবতী ভার্য্যা, স্নেহের পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী; কিন্তু সকলকেই তিনি ত্যাগ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাগ্রকাম্য করিয়াছিলেন—দেশসেবা, দান, সার্ব্বজনীন উপকার এবং ভগবদ্ভক্তি। তাঁহার উদারতা, মনস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, পরোপকার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা, দানশীলতা এবং ত্যাগ জগতে আদর্শ। ত্যাগই তাঁহার ধর্ম্ম, ত্যাগই তাঁহার কাম, ত্যাগই তাঁহার অর্থ এবং ত্যাগই তাঁহার মোক্ষ ছিল। অর্থলালসা, ভোগ, কাম এবং ধর্ম্ম এ সকলেরই পরিতৃপ্তি পাইয়াছিলেন তিনি ত্যাগে। তাই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে দেশসেবা বা সর্ব্বসাধারণের সেবায় একাগ্রচিত্তে ব্রতী হইতে পারিয়াছিলেন। ষড়রিপুকে তিনি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাই তিনি বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী, কর্ণের ন্যায় দাতা এবং চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবী

৭। জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবানে ভক্তি, ইহলোকে ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর কিছু নাই। তাই চিত্তরঞ্জন আজ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৌরবমহিমামণ্ডিত।

৮। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, তাঁহার এ গৌরব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, এই গৌরবই যেন সকলের আদর্শ হয়। চিত্তরঞ্জন এই গৌরবের আদর্শ হইয়া যেন ভারতবাসী ও বঙ্গবাসীর চিত্তে চিরকাল বিরাজমান থাকেন। ইহা অপেক্ষা বলিবার আমার আর কি থাকিতে পারে?

৯। আমি তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল এবং ঐকান্তিক মুক্তি কামনা করি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

দেশবন্ধুর কথা

১

যখন দেশবন্ধু বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ও ব্যবসায়ে অতুল প্রতিপত্তি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া পথে দাঁড়াইলেন, তখন লোক বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল—"কি ত্যাগ!" বাস্তবিক বর্ত্তমানকালে এতখানি টাকার মায়া এ দেশে বা অন্য দেশে এত সহজে কেহ ছাড়িতে পারিয়াছেন কি না, জানি না—অন্ততঃ মনে ত পড়ে না। কিন্তু তবু আমি এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, ঠিক ত্যাগ বলিলে দেশবন্ধুর মহত্ত্বের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিব না। যাহা কাম্য, ঈপ্সিত, বাঞ্ছনীয়, যাহা বাসনা ও সাধনার সামগ্রী, তাহার ত্যাগই ত্যাগ এবং সাধারণতঃ আমরা এমনই টাকার কাঙ্গাল যে, সেই জন্য টাকার ত্যাগই একমাত্র ত্যাগ বলিয়া মনে করি। ইহা কেবল আমাদের হৃদয়ের দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। আর কিছুই নহে। কিন্তু এই স্থানেই ছিল দেশবন্ধুর বৈশিষ্ট্য। তিনি টাকার দিকে কখন দৃক্‌পাত পর্য্যন্তও করেন নাই। অজস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন সত্য—কিন্তু সে টাকাকে কখনও ধূলিমুষ্টির অপেক্ষা মূল্যবান্ জ্ঞান করেন নাই—টাকার উপর তাঁহার কোনও দিন একটা দরদ বসে নাই। ইহা সকলের পক্ষেই গৌরবের কথা—দেশবন্ধুর পক্ষে আরও গৌরবের কথা। কারণ, সচরাচর দেখা যায় যে, যাঁহারা দারিদ্র্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া ঐশ্বর্য্যে উপনীত হইয়াছেন, টাকাটা তাঁহাদের কাছে বেশী বড় হইয়া দাঁড়ায়। দেশবন্ধু দরিদ্রের সন্তান বা দারিদ্র্যে পালিত, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে ঘোর অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। নন্‌-কো-অপারেশনের প্রথমাবস্থায় তিনি এক দিন আমাদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ের প্রথম প্রথম হাইকোর্টের পর তিনি হাঁটিয়া ভবানীপুরের বাসা পর্য্যন্ত যাইতেন—ব্যায়ামের জন্য নহে, ট্রামের ছয় পয়সা ভাড়া বাঁচাইবার জন্য। এমন ভীষণ দারিদ্র্যের অবস্থা কাটাইয়া যিনি মাসে ৫০ হাজার টাকা রোজগার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে টাকার মায়া করা স্বাভাবিক—কিন্তু দেশবন্ধুর কোন দিন তাহা হয় নাই।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, দেশবন্ধু সহজে টাকা স্পর্শ করিতে চাহিতেন না। খুলনায় মামলা করিতে গিয়াছেন—একসঙ্গে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হইল। কিন্তু এত টাকার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। বেণী খানসামা টাকা গণিয়া লইল, তাহার কাছেই টাকা এবং টাকার বাক্সের চাবি রহিল—দেশবন্ধু তাহার খোঁজও করিলেন না। একবার দুইবার নহে, বহুবার এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তাই বলিতেছিলাম, যে লোকের নিকট টাকা এতটা তুচ্ছ ও অসার বলিয়া পরিগণিত হইত, তাঁহার পক্ষে টাকার ত্যাগটাই বড় ত্যাগ বলিয়া মনে করিলে মানুষটাকে ভুল বুঝা হইবে—তাঁহার মহত্ত্বের অবমাননা করা হইবে। বহুদিনের অভ্যস্ত মদ ও তামাক নন্‌-কো-অপারেশনের পর তিনি যে এক মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দিলেন, আর জীবনে এক দিনের তরেও স্পর্শ করিলেন না—আমার মনে হয়, টাকার অপেক্ষা ইহাই দেশবন্ধুর পক্ষে বড় ত্যাগ; আর দেশবন্ধুও সেইরূপ অনুভব করিতেন। ব্যারিষ্টারী সম্বন্ধেও সেই কথা। ব্যবসায়ের এত বড় আয় ছাড়িয়া দিয়াছি, এ কথা কখনও তাঁহার মনে আসিত কি না, জানি না; কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার যে অতুল যশ, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব ছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহাকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করা বাস্তবিকই তাঁহার পক্ষে টাকার অপেক্ষা বড় ত্যাগের ব্যাপার। এক দিনের কথা বেশ মনে পড়িতেছে। রাজদ্রোহের জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকার' বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট মামলা করিয়াছেন। জ্যাকসন, নর্টন, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টার 'অমৃতবাজারের' পক্ষ হইয়া লড়িলেন, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। চীফ জাষ্টিসের ঘর বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণিতে পরিপূর্ণ, তিলধারণের স্থান নাই। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া

শুনিতেছেন—সকলেই ভাবিতেছেন, জজদের মনে কোনও impression হয় নাই (দাগ বসে নাই) বরং উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। মিষ্টার জ্যাকসন রাগ করিয়া চীফ জাষ্টিস্‌কে দুই একটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলেই মনে করিলেন, মোকর্দ্দমার দফা শেষ হইল। অবশেষে চিত্তরঞ্জন উঠিলেন; লোক চিত্রার্পিত, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল; অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তিনি সরকারপক্ষের মামলা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; মোকর্দ্দমার চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল; একটা গভীর ধন্যবাদে লোকের অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুইটার সময় জজরা উঠিয়া গেলেন, চিত্তরঞ্জন বাহিরে আসিলেন। চীফ জাষ্টিসের কাছারীঘর হইতে বার্ লাইব্রেরী পর্য্যন্ত সমস্ত বারান্দায় লোকের ভিড় লাগিয়া রহিয়াছে। লোক সসম্ভ্রমে দুই দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া মধ্যে পথ করিয়া দিল, বিজয়ী বীরের মত তিনি চলিয়া আসিলেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশবন্ধু প্রভুত্ব ভালবাসিতেন; প্রভুত্ব করিতে জানিতেন ও পারিতেন বলিয়াই ভালবাসিতেন; masterful manএর ইহাই লক্ষণ; এটা দোষগুণের কথা নহে, যাহা বাস্তবিক খুব প্রকৃত, তাহার কথা। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্যারিষ্টারী জীবনের এই যে বিজয়োল্লাসের গর্ব্ব, এই যে প্রচুর ও প্রভূত সম্মান ও গৌরব, ইহা ছাড়িয়া আসিতে বাস্তবিকই কিছু ক্লেশ হইয়া থাকিতে পারে—টাকা ছাড়িতে কিছুমাত্র হয় নাই।

স্বীকার করি যে, এই সম্মান ও গৌরবের লক্ষ গুণ প্রতিদান তিনি পরে দেশবাসীর নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু পাইব বলিয়া ত ছাড়েন নাই—ছাড়িয়াছিলেন নিজের চিত্তের একটা অসাধারণ প্রাচুর্য্য ও বিশালতা ছিল বলিয়া। কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া করিতে দেশবন্ধু জানিতেন না—নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করিয়া দেওয়া ছিল তাঁহার স্বভাবের ধর্ম্ম। নিজের জন্য কিছু পুঁজি রাখিয়া তিনি কোন কাযে লাগিতে পারিতেন না—একেবারে পুঁজি শেষ করিয়া লাগিয়া যাইতেন। কংগ্রেস হউক, কাউন্সিল হউক, মোকর্দ্দমা হউক, কোন কাযেই ২ আনা হাতে রাখিয়া ১৪ আনা কাযে লাগাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। ১৬ আনা ছাড়াইয়া ১৮ আনা না দিতে পারিলে, তাঁহার চিত্তের বিশালতা যেন ভরিয়া উঠিত না—অন্তরে যেন অপূর্ণতা থাকিয়া যাইত। এই যে নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ—সমগ্র আত্মা ও মনের অকুণ্ঠিত ও অবারিত দান—ইহাই ছিল চিত্ত-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। টাকার দানটা ইহারই একটা অকিঞ্চিৎকর প্রকারভেদমাত্র।

২

অনেকে মনে করেন যে, নন্-কো-অপারেশন বা বড় জোর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বেসাণ্ট আন্দোলনের সময়েই দেশবন্ধু বুঝি প্রথম পলিটিক্‌সে নামিলেন। কথাটা ভুল। তাহার বহু পূর্ব্বে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও কিছু পূর্ব্ব হইতেই দাশ মহাশয় পলিটিক্‌সে কায করিতেছিলেন। তবে তখন প্রচ্ছন্নভাবে ভিতরে থাকিয়া এই কায করিতেন—বাহিরে বড় আসিতেন না। কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন কাযের মূল্য বড় কম ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একমাত্র স্থায়ী কীর্ত্তি বোধ হয় National Council of Education—সমগ্র ভারতের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের ভাব ও চেষ্টার এইখানেই ভিত্তিস্থাপন। এই National Council of Educationএর মূলে সুবোধ মল্লিকের ১ লক্ষ টাকা দান—আর সেই দানের মূলে দাশের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উত্তম। Risley circular জারি হওয়ার পরই সুবোধ মল্লিক বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠার ইহাই উপযুক্ত অবসর এবং তাহার জন্য ১ লক্ষ টাকা দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা, এই প্রতিজ্ঞা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য সুযোগ এবং সুবিধা অন্বেষণ করা—ইহাই, বোধ হয়, দেশবন্ধুর প্রাণগত চেষ্টার ফল।

Politicsএ নব-ভাবের প্রচার ও নবযুগের প্রবর্ত্তন তখনকার 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা যেমন করিয়াছিল, এমন আর বোধ হয় কিছুতেই করে নাই এবং এই 'বন্দে মাতরম্' প্রতিষ্ঠার মূলেও দেশবন্ধু। মাত্র ১ হাজার ৮ শত কি ২ হাজার টাকা পুঁজি লইয়া 'বন্দে মাতরম্' সুরু করিয়া দেওয়া হয়; এবং এই ১ হাজার ৮ শত বা

২ হাজার টাকা ৩ জন হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া কর্জ্জ করেন—রজত রায়, সুবোধ মল্লিক ও দেশবন্ধু।

তাহার পর সে যুগের মামলার কথা। রাজনীতিতে নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিতে—কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্সের বাঁধা-বুলি ছাড়িয়া স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে উদ্রেক করিতে এই মামলাগুলি যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, এমন আর কিছুই নহে। 'বন্দে মাতরম্'এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা, শ্রীযুত বিপিন পালের বিরুদ্ধে সাক্ষী না দিবার জন্য অবমাননার মামলা, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মামলা এবং সর্ব্বোপরি অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের বোমার মামলা—এই চারিটি প্রধান এবং এই চারিটিই দেশবন্ধুর বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহার মধ্যে উপাধ্যায়জীর মামলা—যাহা লোক প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে—সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য। "জন্মভূমির পক্ষে স্বাধীনতার দাবী করার জন্য বিদেশী শাসনকর্ত্তা বা বিচারপতির নিকট জবাবদিহি করিতে আমি বাধ্য নহি" এই কথা বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের মধ্যে উপাধ্যায়জী সর্ব্বপ্রথম তাঁহার লিখিত বর্ণনাপত্রে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন; এবং আমার বিশ্বাস যে, উপাধ্যায়জীর এই জবাব আমাদের স্বাধীনতার প্রথম দলিল। অন্য কোন দলিল বা সনন্দকে আমরা সে আখ্যা দিতে পারি বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সে সব সে জাতীয় নহে। এই জবাব উপাধ্যায়জী স্বয়ং মুসাবিদা করিয়া Bar Libraryতে আসিয়া চিত্তরঞ্জনের হাতে দেন—এবং ইহা পাইয়া দেশবন্ধুর কি উল্লাস! তিনি বার বার যাচাইয়া লইলেন—"দেখুন, আপনি ঠিক্ থাকিতে পারিবেন ত—আপনি ঠিক থাকিলে আমিও আছি।" কিন্তু উপাধ্যায়জীও তেমনই অটল ও নির্ভীক—সেই জবাবই বাহাল রহিল। Bar Library র বিজ্ঞ বৃদ্ধরা—এমন কি, মিষ্টার জ্যাকসন পর্য্যন্ত বলিলেন যে, কোনও Barristerয়র পক্ষে এরূপ জবাব লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু দেশবন্ধু এই সকল বিজ্ঞতার যুক্তি গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি এই জবাব লইয়াই আদালতে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য, এরূপ জবাবের পর শাস্তি অনিবার্য্য। কিন্তু উপাধ্যায়জী মহাপুরুষ—তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া, সকল শাস্তির হাত এড়াইয়া, ডঙ্কা বাজাইয়া হাস্যমুখে পরলোকে চলিয়া গেলেন।

৩

কিন্তু পূর্ব্বে যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই দেশবন্ধু ধীরে ধীরে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগদান করিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, দেশবন্ধু তাহার সভাপতি মনোনীত হইলেন, এবং এই সভাপতিরূপে তাঁহার যে অভিভাষণ, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান উক্তি। এই বক্তৃতার সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল বলিয়া ইহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া যাইব। কথা ছিল যে, দেশবন্ধু বাঙ্গালায় বক্তৃতা লিখিবেন, আমি তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিব। কিন্তু সে সময় দেশবন্ধুর অবসর বড় কম। অনেক দিন ফেলিয়া রাখিয়া অধিবেশনের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া দিলেন। ছাপাখানা ফর্ম্মা ফর্ম্মা ছাপিয়া দিতে লাগিল, আমি তাহার অনুবাদ করিয়া যাইতে লাগিলাম এবং তাহাও সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হইতে লাগিল। এইরূপে দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া—ছাপাখানার কার্য্যাধ্যক্ষের বিশেষ উদ্যোগে ও কর্ম্মকুশলতায়—ঠিক অধিবেশনের দিন ১২টার সময় দুই বক্তৃতাই ছাপা শেষ হইল। কিন্তু ইতোমধ্যে একটি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অধিবেশনের পূর্ব্বের দিন বেলা ২টার সময়—যখন আমি অনুবাদের কাযে খুব ব্যস্ত, তখন C.I. Dর এক কর্ম্মচারী পুলিস কমিশনারের তরফ হইতে ডাক লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন আটকের যুগ। আমি ভাবিলাম, আমার জন্য তলব আসিয়াছে। যাহা হউক, আমি লিখিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কাযে বড় ব্যস্ত, পরদিন সকাল নহিলে যাইতে পারিব না। মুখে C. I. D. মহাশয়কে বলিয়া দিলাম যে, ওয়ারেণ্ট লইয়া আসেন ত যাইব,না হইলে পরদিন ৮টার আগে কিছুতেই যাইব না। C. I. D. সাত পাঁচ ভাবিয়া চলিয়া গেলেন। বন্ধুবর শর্ম্মা তখন আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বার্ লাইব্রেরীতে এই খবর লইয়া গেলেন এবং

ব্যারিষ্টার হইয়া নবপ্রত্যাগত চিত্তরঞ্জন

কমিশনারের কাছে ছাড়া পাইলেই সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া যাই। তাহাই হইল। পুলিস কমিশনার গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আমাকে এক warning (সাবধানবাণী) শুনাইয়া দিলেন, আমি কীড ষ্ট্রীট হইতে ভবানীপুর চলিয়া গেলাম। সেখানে পৌছিতেই বেণী, ললিত বাবু প্রভৃতি বলিলেন, "গত রাত্রিতে 'সাহেবে'র ঘুম হয় নাই, আপনি এখনই তাঁহার কাছে যান।" চিত্তরঞ্জন তেল মাখিতেছিলেন, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার মহা আনন্দ। একসঙ্গে খাইয়া সভামণ্ডপে গেলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কিছুতেই বক্তৃতা করিতে দিলেন না। বলিলেন, "একটা কিছু বক্তৃতা করিলেই আপনাকে ধরিবে; এবং মিথ্যা একটা বক্তৃতা করিয়া জেলে যাইবার এমন কিছু প্রয়োজন নাই।"

১৯১৭,১৮,১৯ খৃষ্টাব্দের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত চিত্তরঞ্জনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কত বাধা ও অসুবিধার মধ্যে এই কয় বৎসরের আন্দোলন চালাইতে হইয়াছে, তাহা সকলে জানেন না। এখন যেমন রাজনীতি বলিলেই লোক সাড়া দেয়, তখন তাহা ছিল না; ধীরে ধীরে লোকের মনে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল; আর মডারেটগণ তখন আসর জুড়িয়া বসিয়া ছিলেন এবং

দেশবন্ধু শর্ম্মার সহিতই আমার বাসায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার কি ব্যগ্রতা ও সমবেদনা! আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, আমার অপেক্ষাও তাঁহার যেন চিন্তা বেশী। সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া থাকিলেন, তাঁহার সম্মুখেই অনুবাদ শেষ হইল, তাঁহার সম্মুখেই C. I. D. আসিয়া খবর দিল যে, কাল বেলা সাড়ে ৮টা দেখা করিবার জন্ত সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেলেন, যেন পুলিস

আমাদের খুব বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। বাহির হইতে টাকা-কড়ির সাহায্য মোটেই হইত না। যাহা কিছু খরচের প্রয়োজন,তাহার ১২ আনা চিত্তরঞ্জনকেই করিতে হইত এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি তাহা করিতেন।

গোড়ায় গোড়ায় কংগ্রেসের বক্তৃতা প্রভৃতিতে তিনি তেমন যোগ দিতেন না—কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের দিল্লী কংগ্রেস হইতেই তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা হইয়া পড়িলেন। সে বারের কংগ্রেসের এক দিনের কথা বেশ মনে আছে। দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতি বসিয়াছে। বাগ্‌বিতণ্ডায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। বিষয় সেই একই—শাসন-সংস্কার সমর্থন করিতে হইবে, না—তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে হইবে? আমরা সকলেই বিরুদ্ধবাদী, দেশবন্ধু আমাদের নেতা; অপর পক্ষে অনেক নামজাদা লোক—মিসেস্ বেসাণ্ট, শাস্ত্রী, স্বয়ং সভাপতি মালব্য। ১২টার পর দাশ উঠিলেন, অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সহিত বিপক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার জয় হইল। সভাভঙ্গের পর বাহির হইয়া আসিতেছি। ত্রিবাঙ্কুরের বৃদ্ধ দেওয়ান ভি, পি, মাধব রাও দিল্লীর দুরন্ত শীতেও সেই দর্শ্মার ঘরের এক কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে ধরিয়া বসাইলেন; বলিলেন, "How beautifully Das fired up—I never saw anything like it." "দাশ কেমন আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, আমি এমনটি আর দেখি নাই।" বাস্তবিক এই আগুন হইবার ক্ষমতা—মত ও বিশ্বাসের এই গভীর আন্তরিকতা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন জয়ের একমাত্র হেতু।

৪

তাহার পর নন্‌-কো-অপারেশনের যুগ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে অসহযোগনীতি গৃহীত হইল, তখন দেশবন্ধু কিছুতেই বাগ মানিলেন না। তিনি যে অসহযোগের ঠিক বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, দেশ এখনও প্রস্তুত নহে, এখনও ৫ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আরও ৩ মাস তিনি বাহিরে থাকিলেন—শুধু বাহিরে থাকিলেন, তাহা নহে, দলবল লইয়া নাগপুরে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলেন। কিন্তু নাগপুরেই তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন হইয়া গেল। নন্‌-কো-অপারেশনের বিরুদ্ধাচারী হওয়া দূরে থাকুক, তিনিই নন্‌-কো-অপারেশনের প্রধান কর্ম্মী ও নায়ক হইলেন। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতায় দেশ মাতিয়া উঠিল। যে নন্‌-কো-অপারেশনের ক্ষীণ দীপশিখা এত দিন মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাঁহার বিরাট উৎসাহের দীপ্তি পাইয়া তাহা ভাস্বর জ্যোতিতে আকাশ ছাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর গত ৪ বৎসরের কথা কে না জানে? দেশবন্ধুর জেল, জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, স্বরাজ্যদলের সৃষ্টি, ব্যবস্থাপক সভা লইয়া আন্দোলনের প্রবর্ত্তন ও তাহাতে দেশবন্ধুর অপূর্ব্ব সাফল্য—ইহা ত বালকেরও বিদিত। কিন্তু ইহার বিষয় বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই।

৫

পূর্ব্বে দেশবন্ধুর চিত্তের বিশালতার কথা বলিয়াছি—কিন্তু আর একটি কথা না বলিলে তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও প্রভাবের ঠিক কারণ ধরিতে পারা যাইবে না। সাদা কথায় বলিতে গেলে সেটি তাঁহার স্বভাব-সুলভ জিদ্ বা রোক। যে বিষয় ধরিয়াছি, তাহাতে সাফল্যলাভ করিতেই হইবে, তাহাতে জিতিতেই হইবে, এই তাঁহার একটা অসাধারণ গোঁ ছিল এবং এই ঝোঁকের মুখে তিনি বাধা-বিপত্তি, নিজের সম্বল বা সহায়তার অভাব কিছুরই দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া Council নির্ব্বাচন ব্যাপারে তিনি যখন পূর্ণোদ্যমে নামিলেন, তখন নিজের উপর বিপুল ভরসা ছাড়া অন্য সম্বল তাঁহার অতি অল্পই ছিল। এত বড় নির্ব্বাচন ব্যাপার যখন তিনি হাতে লইয়াছেন, তখন ব্যাঙ্কে তাঁহার মাত্র ২ শত টাকা পুঁজি। কিন্তু এই নানাবিধ বিপত্তির সম্মুখে যেন দেশবন্ধুর সাহস ও কর্ম্মশক্তি দশগুণ বাড়িয়া উঠিল। পুরাতন ঋণের উপর নিজের দায়িত্বে আরও ৩০ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি নির্ব্বাচনের খরচ চালাইতে লাগিলেন এবং ভূতাবিষ্টের ন্যায় দারুণ পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বাচনযুদ্ধে অপূর্ব্ব

সাফল্যলাভ করিলেন। সাফল্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময়ে প্রথম তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। হকিম আজমল খাঁয়ের চিকিৎসায় বহুমূত্র সারিল, কিন্তু দেশবন্ধু আর পুরাতন স্বাস্থ্য কথনও ফিরিয়া পাইলেন না।

৬

একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িলে যেমন সেই দিকটা ফাঁকা বলিয়া মনে হয়, দেশবন্ধুর প্রস্থানে তেমনই চারিদিক্ ফাঁকা বলিয়া বোধ হইতেছে। এ যেন কেবল একটা মানুষ মরিয়া যায় নাই—যেন কোন বিপুল ভূমিকম্পে দেশের একটা দিক্ ধসিয়া পড়িয়াছে। দেশবন্ধুর চরিত্র ও মনীষার আলোচনা বা বিশ্লেষণ এখন ঠিক কেহ করিতে পারিবেন না। কারণ, এখনও আমরা তাঁহার বড় কাছে দাঁড়াইয়া আছি,এখনও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। কে বড়, কে ছোট, এরূপ তুলনা করার সময়ও হয় নাই,প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখিতে পারি। রামমোহন, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন—একই ছাঁচে গড়া—প্রত্যেকেই বিরাট মনুষ্যত্বের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সার্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে যে দেশের আকাশে এমন ৩টি জলন্ত মনুষ্যত্বের স্ফুলিঙ্গ ভাসিয়া উঠিতে পারে, জগতের দরবারে, মানবত্বের গৌরবে সে দেশ কিছুতেই হীন বলা যায় না।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধক-প্রয়াণম্

১

আচ্ছাদ্য দ্যুতিকৌমুদীধবলিতে দিঙ্মণ্ডলে সর্ব্বতঃ,
উদ্গচ্ছন্মধুবিন্দুচূতমুকুলাসক্তালিপুঞ্জক্রমে।
কূজৎকোকিলকাকলীধ্বনিভৃতে কালে মধৌ হা কথং,
পূর্ণেন্দুশ্চিরমাবৃতোঽবভ্রপটলেনান্ধং জগৎ কুর্ব্বতা ॥

২

চিত্তং নিত্যমশেষসাধুচরিতৈরাবাল্যতো রঞ্জয়ন্,
বিত্তং সত্যমুপাশ্রিতঃ প্রণয়িনে দাতার্থিকল্পদ্রুমঃ।
ইত্থং বীক্ষ্য সুতস্য জন্মচরিতং ধ্যানৈকগম্যং পিতা,
“বিশ্বরঞ্জন” “চিত্তরঞ্জন” ইদং নাম ব্যধাদন্বিতম্ ॥

৩

লব্ধা জন্ম পরার্থমেব বিমলে বংশেঽত্র মানোন্নতং,
আবাল্যং পরিভুজ্য ভোগনিচয়ং রাজানুরূপং তথা।
বিত্তাঞ্চার্থমুপার্জ্জয়ন্ ত্রিজগতীচিত্তং সদা রঞ্জয়ন্,
চক্রে যো নিজনাম সার্থকপদং বাগ্মী মহীমণ্ডনম্ ॥

৪

ভূত্বা ভারতবেদনাবিধুরহৃৎ সন্মাতৃমন্ত্রব্রতী,
হিত্বা প্রাজ্যবসূনি হর্ম্ম্যমতুলং শ্রীভূষণং বাহনম্।
আনন্দোজ্জ্বলমূর্ত্তিরুন্নতমনা যো দেশবন্ধুঃ স্বয়ম্
শ্রদ্ধাপূতসমস্ত-লোকহৃদয়াক্রাক্রম্য তস্থৌ চিরম্ ॥

৫

যস্যাঙ্কেঽচ্ছসুশীতনির্ঝরঝরৈর্ভাগীরথী প্রাবহৎ,
তস্মিন্ দুর্জ্জয়লিঙ্গতুঙ্গশিখরে শান্তে চ সিদ্ধাশ্রমে।
প্রাণায়ামপরায়ণোত্তমগতির্যোগীব যুঞ্জন্ মনঃ,
স্বারাজ্যং বিরজঃপদং স সমগাদ্ যদ্‌যোগিনামীপ্সিতম্ ॥

৬

হা বাণীবরপুত্র! রাজনয়বিৎ! স্মেরাস্যচন্দ্রোজ্জ্বল!
হা ধর্ম্মাধিগৃহোত্তমাঙ্গ! বদতামগ্রেসর! গ্রামণীঃ!
পূতাত্মন্! পরদুঃখমোচনবিধাবুৎসৃষ্টসজ্জীবন!
হা হা ভারতভূবরেণ্যতনয়! ত্বং সাম্প্রতং কাসি ভোঃ ॥

৭

মন্দারদ্রুমবীথিকাপরিসরে মন্দাকিনীশীতলে,
শ্রী-বাণীকরপদ্মলালিততনুঃ স্রগ্‌গন্ধভূষোজ্জ্বলঃ।
তেজস্বী নরসিংহ এষ বিবুধৈরভ্যর্থিতশ্চাসকৃৎ,
স্বর্গে দেবসভাসুদুর্ল্লভপদং নো লিপ্সতে প্রাঞ্জলিঃ ॥

৮

নানন্দং লভতে চ নন্দনবনে কর্ম্মী স বীতস্পৃহঃ,
লাবণ্যং সুরযোষিতামহিবিষং সম্মন্যতে সর্ব্বদা।
শশ্বদ্‌ভারতভূমিচিন্তনরতো দান্তশ্চ বাচংযমো
ভূয়ো জন্মপরিগ্রহং বরয়তে নত্বা বিধাতুঃ পদে ॥

শ্রীহরিপদ-কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থশর্ম্মণাম্।

দেশবন্ধুর তিরোভাবে

বাণীর সেবক, দেশাত্মবোধের প্রচারক, ত্যাগের ঋষি চিত্তরঞ্জন আর নাই!

কে নাম রাখিয়াছিল চিত্তরঞ্জন? বাঙ্গালার ও ভারতের চিত্তরঞ্জন বলিয়াই কি চিত্তরঞ্জন নাম? বাণীর সেবা, দেশের শুশ্রূষা, জন্মভূমির দাস্য করিতে হইবে বলিয়াই কি দাশ পদবী? সারা বাঙ্গালায় সর্ব্বসম্মত আধিপত্য চালাইতে হইবে—তাই কি পূর্ব্ববঙ্গ পিতৃভূমি; পশ্চিমবঙ্গ বাসস্থলী? সর্ব্বমতাবলম্বীর শ্রদ্ধার দেবতারূপে বসিতে হইবে—সেই কারণেই কি ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দু, বিলাতপ্রত্যাগত হইয়া বৈষ্ণব, কমলার বরপুত্র হইয়া বাগ্‌দেবীর উপাসক?

চিত্তরঞ্জন কি ছিলেন? উচ্চতায় হিমাদ্রি, গভীরতায় বারিধি, ধৈর্য্যে ভূমণ্ডল, বিস্তারে মহাকাশ। কোমল অথচ দৃঢ়, ভাবুক অথচ বীর, ত্যাগী অথচ কর্ম্মী, সরল অথচ চতুর, তিনি কি না ছিলেন? কবি, বক্তা, আইনজ্ঞ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী—তাঁহার তুলনা তিনিই ছিলেন। তাঁহার মুখে শিশুর হাসি, নেত্রে প্রতিভার দীপ্তি, চিত্তে সাহসের বল, আর ভ্রূভঙ্গীতে সিংহের বিক্রম বিরাজিত ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে—কংগ্রেস ও স্বরাজপ্রতিষ্ঠানে, বাণী-মন্দিরে—বঙ্গীয় ও বঙ্কিম-সম্মিলনে তাঁহার নেতৃত্ব, বাঙ্গালার তথা ভারতের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, কাউন্সিলে, কর্পোরেশনে সকল স্থানেই তাঁহার প্রভুত্ব। অসময়ে—মধ্যাহ্নেই এই সূর্য্যগ্রাস, অকস্মাৎ নির্ম্মেঘ আকাশে এই বজ্রপাত আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছি।

যিনি আদর্শ ত্যাগী বুদ্ধের মত ত্যাগের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি শঙ্করের মত দিগ্বিজয়ের জ্ঞানশঙ্খ বাজাইয়াছেন, অপূর্ব্ব প্রেমিক চৈতন্যের মত প্রেম ও ভাবধারায় সারা দেশকে প্লাবিত করিয়াছেন—সেই ত্যাগ, জ্ঞান ও প্রেমের সজীব অবতার মহাপুরুষের প্রতি যেমন আমরা এক দিন শ্রদ্ধায় নত, বীরত্বে মুগ্ধ, সর্ব্ববিজয়ী ব্যক্তিত্বে বিস্মিত হইয়াছি, তেমনই আজ তাঁহার এই অতর্কিত অন্তর্দ্ধানে বিষাদে ম্রিয়মাণ, নৈরাশ্যে মুহ্যমান, শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি।

দেশপ্রেমের তিনি অমৃতসিন্ধু, দীন-দুঃখী দরিদ্রের তিনি প্রাণের বন্ধু, সর্ব্বস্বদানের তিনি কল্পতরু। প্রথম জীবনেই তাঁহার এই ত্যাগের, এই বন্ধুতার, এই দানের বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সিবিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি যে শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা কেবল এই ভারতের, এই দেশবাসী আমাদেরই জন্য। ইংলণ্ডে বহু সভায় অগ্নিময়ী বক্তৃতা দেওয়ার ফলেই তাঁহার শাসনকর্ত্তার ফলের অলাভ; আর তাই আজ এই মুকুটহীন সম্রাটের গৌরব ও সম্মানের অধিকার। তিনি যে দেশহিতের জন্য রাজার অধিক ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগশীল ভিখারী সাজিয়াছিলেন—তাহারও উল্লেখ আইনানুসারে অদেয় বহু দিনের পিতৃঋণ পরিশোধেই পরিস্ফুট।

সে আজ কত বৎসরের কথা—আমরা ক্ষুদ্র বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনীর জন্য 'নারায়ণ' পত্র চাহিয়া হাই-কোর্টের ঠিকানায় চিত্তরঞ্জনকে এক পত্র দিই, তাহারই ফলে কয় বৎসরের পত্র আমরা বিনা মূল্যেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। গত বৎসরে সম্মিলনের সভাপতিত্বের জন্য যখন তাঁহার নিকট যাই, তখন সহস্র কার্য্যের মধ্যে যে মধুর নম্র ব্যবহার আমরা লাভ করি, চাহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রণীত সমস্ত পুস্তকগুলি পাইয়া চরিতার্থ হই—তাহা কখনও ভুলিব না। গত বৎসর বঙ্কিম-সম্মিলনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এক দিকে আষাঢ়ের প্রবল বর্ষা, অপর দিকে বিবাদের বিষম কোলাহল! তথাপি তিনি কি স্থির, শান্ত, হাস্যময়, কি আত্মপ্রতিষ্ঠ, নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত। তর্করত্ন মহাশয়ের আশীর্ব্বাদের প্রত্যুত্তররূপে তাঁহার সেই পদধূলিগ্রহণ দৃশ্য এখনও যেন চক্ষুর উপর ভাসমান। বুঝিলাম, তিনি বীর হইয়াও নিরভিমান, উন্নত হইয়াও নম্র, রাজা হইয়াও দাশ। সম্মিলনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার কি আকুল আগ্রহ; অর্থ-প্রার্থনায়ই বা কি সুন্দর কৌশল! আমাদের এই সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইতে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন—কিন্তু হায়, সম্মিলন আর

দেশহিতে সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

তাঁহাকে পাইবে না। দেশের দুর্ভাগ্য, সম্মিলনের দুর্ভাগ্য!

দেশের বন্ধু দেশের এই দুর্দ্দিনে পরলোকে থাকিয়াও দেশেরই কথা না ভাবিয়া কখন থাকিতে পারিবেন না। পার্থিব দেহে যাহা তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, চিন্ময়দেহে সেই অসমাপ্ত কার্য্যই সমাধা করিয়া যাইবেন—এ আশা আমরা করিতে পারি। এই দেশের মধ্যে যে শক্তির প্রকাশের জন্য ও যে জাতীয় একতার বিকাশের জন্য তিনি আমরণ সাধনা করিয়া গেলেন, এই জাতির মধ্যে যে ভাবধারা ফুটাইবার জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ আহুতিদান করিলেন—ভগবৎসাযুজ্যলাভ করিয়া অলৌকিক তেজোবলে সেই শক্তি, সেই ভাব এই দেশের মধ্যেই—এই জাতির মধ্যেই এক দিন তিনি ফুটাইয়া তুলিবেন—ইহাই আমাদের আশ্বাস, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

গুরু-বরণ

মহাত্মা গন্ধীর উদ্দেশে

[কবিবর চিত্তরঞ্জনের কবিতার খাতা হইতে]

আমি নিয়েছি, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধর গো হাল,
ওগো কর্ণধার!

আমার মরণ বাঁচন, ঢেউয়ের নাচন,
(ওগো) ভাবনা কিবা তার,
তোমারে করি নমস্কার।

আমি সহায় খুঁজে পরের দ্বারে,
ফিরবো না আর বারে বারে,
ওগো কর্ণধার—

কেবল তুমিই আছ, আমিই আছি,
এই জেনেছি সার,
তোমারে করি নমস্কার।

চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের কথা

১

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে কিংবা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষ সপ্তাহে চিত্তরঞ্জনকে আমি প্রথম দেখি। চিত্তরঞ্জন তখন ১২ বৎসর পূর্ণ করিয়া ১৩ বৎসরে সবে পা দিয়াছেন। সে আজ ৪২ বৎসরের কথা।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ। ভুবনবাবুরা তিন ভাই—কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন। দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহারা আমাকে জানিতেন। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে আমি ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূজার ছুটীতে দুর্গামোহন বাবু তাঁহার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী অবলাকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করাইবার জন্য মাদ্রাজ যায়েন; মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরে গমন করেন। এক দিন প্রাতঃকালে আমি বাড়ীতে বসিয়া আছি, সামান্য অসুখ বলিয়া কাযে যাই নাই, (ব্যাঙ্গালোরে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলে আমি তখন প্রধান শিক্ষকের কায করিতাম) এমন সময় দুর্গামোহন বাবু আমার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। তিনি একটা হোটেলে উঠিয়াছেন শুনিয়া আমি একটু অনুযোগ করিয়া কহিলাম, আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকিতে তিনি আমার আতিথ্য অগ্রাহ্য করিয়া হোটেলে গেলেন কেন? তখন আমার বিবাহ হইয়াছে, সপরিবারে ব্যাঙ্গালোরে বাস করিতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বে ব্যাঙ্গালোর কখনও বাঙ্গালী মহিলা দেখে নাই। তখনও আমরা দুই জনমাত্র বাঙ্গালী, কেবল ব্যাঙ্গালোরে নহে, কিন্তু সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে প্রবাসী ছিলাম। আমার অনুযোগে দুর্গামোহন বাবু লজ্জিত হইয়া পরদিবস আসিয়া আমার সামান্য কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সূত্রে আমাদের পূর্ব্বপরিচয় কেবল যে ঘনিষ্ঠতর হয়, তাহা নহে, পরন্তু একটা নূতন স্নেহসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া পড়ে। দুর্গামোহন বাবু তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের শিক্ষার ভার আমার উপরে অর্পণ করিতে চাহেন। বিদেশে, বন্ধুহীন প্রবাসে আমার সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া পড়ে। দেশে ফিরিবার জন্য আমিও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দুর্গামোহন বাবুর এই প্রস্তাব কৃতজ্ঞতাভরে মাথায় লইয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। দুর্গামোহন বহুদিন পূর্ব্বেই বিপত্নীক হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর উপরেই মাতৃহীন বালকবালিকাদিগের প্রতিপালনের ভার পড়িয়াছিল। দুই ভাইয়ে তখন বর্ত্তমান এল্‌গিন্ রোডে—পুরাতন নাম পিপলপটী রোড—একত্র বাস করিতেন। এই সূত্রে উভয় পরিবারের সঙ্গে ক্রমশঃ আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময়েই বালক চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

২

পরিচয় হয় বটে, কিন্তু কোন প্রকারের ঘনিষ্ঠতা জন্মে না। চিত্তরঞ্জন আমাকে দূর হইতেই দেখিত, আমিও তাহাকে দূর হইতেই দেখিতাম। ইহার বহু দিন পরে চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলে তাঁহার সঙ্গে আমার বর্ত্তমান স্নেহের ও সাহচর্য্যের সূত্রপাত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমি বিলাত ও আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসি। ভবানীপুরের বন্ধুরা সাউথ সুবারবান স্কুলে আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। যতদূর মনে পড়ে, বিলাতী ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা, বোধ হয়, এই বক্তৃতার বিষয়স্থল। এই সভায়, বোধ হয়, চিত্তরঞ্জন সভাপতি হইয়াছিলেন, আর কাহারও কথা মনে পড়ে না। চিত্তরঞ্জন সভাপতিত্ব করুন আর না করুন, আমার বক্তৃতার পরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক মনে আছে। এই উপলক্ষেই আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা চিন্তা ও ভাবের যোগ স্থাপিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমি বিলাতে যাই। ইংলণ্ডের বৃটিশ এবং ফরেইন ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশন (British and foregin Unitarian Association) আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিবার

জন্ত প্রচারক বা প্রচারার্থীরা যাহাতে অক্সফোর্ডে যাইয়া সেখানকার ইউনিটেরিয়ান কলেজে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া একটা বৃত্তি স্থাপন করেন। এই বৃত্তি লইয়া আমি বিলাতে যাই। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমি নানা স্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলাম। বিলাত ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই কাযই করিতে থাকি; তবে ব্রাহ্মসমাজের শাসন-জালে বাঁধা পড়ি নাই, স্বাধীনভাবেই এ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলাম। আমার এই স্বাধীনতাই চিত্তরঞ্জনকে বিশেষভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে। চিত্তরঞ্জনের পিতা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও চিত্তরঞ্জন কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক বন্ধনে বাঁধা পড়িতে রাজী হয়েন নাই। ব্রাহ্মসমাজের সকল মত-বাদের সঙ্গেও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল না। তিনি সে সময়ে অনেকটা হারবার্ট স্পেন্সা-রের অজ্ঞেয়তাবাদের বা Agnosticismএর অনু-বর্ত্তন করিতেছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্বে তাঁহার আস্থা তখনও জন্মায় নাই। ঈশ্বর বলিতেই আমরা এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝি। আমরা যাহাকে ঈশ্বর বলি, য়ুরোপীয় চিন্তা তাহাকেই Personal God বলে। চিত্তরঞ্জন তখন এই Personal Godএ কিংবা ঈশ্বর-তত্ত্বে আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার নিকটে তখনও পরম-তত্ত্ব unknown and unknowable—আছেন এইমাত্র বলা যায়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান মানুষের বুদ্ধির অতীত। ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের সঙ্গে এই স্থানেই চিত্তরঞ্জনের একটা বিশেষ বিরোধ ছিল। তবে ব্রাহ্মের পুত্র বলিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের উপরে একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে চিত্ত-রঞ্জন কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্তও ছিলেন বটে। ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার আদর্শই তাঁহাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথম যৌবনে আমাকেও এই স্বাধীনতা এবং এই মানবতা বা বিশ্বমানবতাই ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে টানিয়া-ছিল। আর কালবশে ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রাচীন হিন্দুসমাজের ৩ হাজার বৎসরের বদ্ধ সংস্কারকে বর্জ্জন করিয়া ৩০ বৎসরের সংস্কারকে জমাইয়া তাহার উপর কার্য্যতঃ একটা নূতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন আমার সঙ্গেও ব্রাহ্মসমাজের আমলাতন্ত্রের মত ব্যবহার সংঘর্ষ হয়। এই স্থানেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম যোগ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে চিত্ত-রঞ্জনের একটা বিরোধ আমি বিলাত যাইবার পূর্ব্ব হইতে বাধিয়া উঠিয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই চিত্তরঞ্জন আপনার কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়া "মালঞ্চ" নামে একখানি কবিতাপুস্তক প্রচার করেন। এই পুস্তকে কতকগুলি কবিতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত মতবাদের এবং রুচির উপরে খুব আঘাত করে। অজ্ঞেয় ঈশ্বরবাদ "মালঞ্চে"র ধর্ম্মমতের মূল সূত্র ছিল। আর আদিরসঘটিত দুইচারিটি কবি-তায় মানুষের রক্ত-মাংসের প্রেরণাকে অনাবৃত করিয়া কামলীলাকে মোহিনী সাজে লোকচক্ষুতে ধরিয়াছিল।
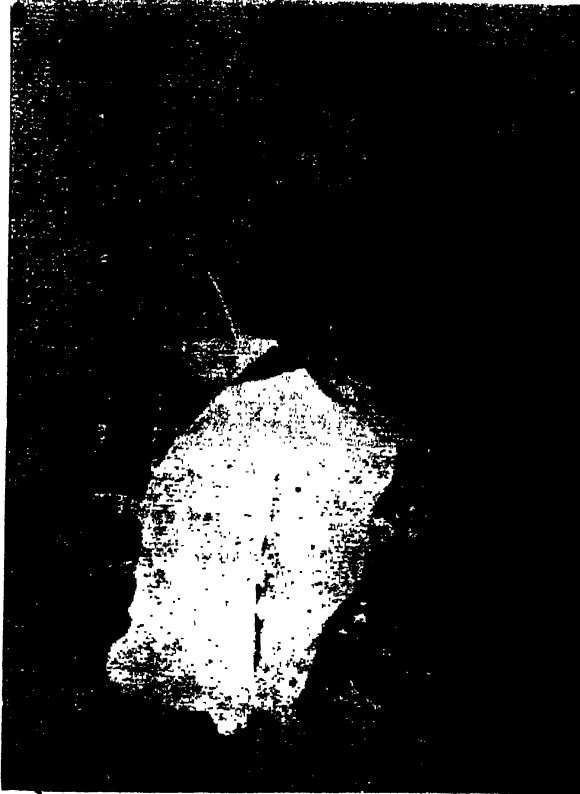
বিলাত যাইবার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন

এই দুই দিক দিয়া 'মালঞ্চ' ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মবুদ্ধিতে এবং রুচিবাদে বিশেষ আঘাত করে। ব্রাহ্মসমাজের আমলাতন্ত্র এই অপরাধে চিত্তরঞ্জনকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জনের বিবাহে পৌরোহিত্য করিবার জন্য ব্রাহ্ম আচার্য্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনের বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়া সমাজের নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে চিত্তরঞ্জনের মনে প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজের মতি-গতির প্রতি একটা বিরাগ ও রোষভাব জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আমি বাঁধা পড়িলাম না দেখিয়া চিত্তরঞ্জন আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা দেখিয়া আমিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। এই ভাবে আমাদের মধ্যে একটা স্নেহের এবং সাহচর্য্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

৩

বিলাতে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র বাবুর সংসর্গে আসিয়া আমি একটা নূতন-সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করি। এই সময়েই আমি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করি। এক দিকে ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিক সংসর্গ, অন্য দিকে গোস্বামী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক প্রেরণা, এই দুই শক্তি আমার ভিতরকার জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল। গোঁসাই সর্ব্বদা ভাগবতী লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। মানুষ সরলভাবে যাহাই ভাবুক বা করুক না কেন, তাহাতেই তাহাকে ঋজু কুটিলপথে পরমার্থের দিকে লইয়া যায়। গোস্বামী মহাশয় দিব্যচক্ষুতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া নাস্তিক্য-আস্তিক্য সমুদায় সিদ্ধান্তকেই উদারচক্ষুতে দেখিতেন। সত্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। অতীন্দ্রিয় সত্য বা সত্তা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। যতক্ষণ না জীবের সর্ব্বপ্রকারের বহিরিন্দ্রিয়ের এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া সে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, ততক্ষণ সে যাহাকে সত্য বলিয়া ভাবে এবং যাহাকে অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করে, তাহা উভয়েই তাহার মানসসৃষ্টিমাত্র—কল্পিত, সত্যবস্তু নহে। সুতরাং মানসরাজ্যের এই কল্পনা-প্রসূত সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব-কোলাহলে মানুষের চিত্তের স্থৈর্য্যই কেবল নষ্ট হয়, তাহাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে না। বেদান্তের পরিভাষায় মানসসৃষ্ট সত্য এবং অসত্য উভয়ই অবিদ্যাবৎ বিযোনি। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা এই জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদকে সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রেরণায় এই কথাটা বুঝিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রনাথের মানসসংসর্গে অন্য দিক্ দিয়া এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছিলাম। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের মতবাদ আমার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দেয় নাই। আর কোন দিনই আমি নিতান্ত রুচিবাদী ছিলাম না। প্রথম যৌবনে—অক্ষয়কুমারের 'নবজীবন' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচারে'র যুগে আমাদের একখানা ছোট মাসিক ছিল, 'আলোচনা'—তাহাতে 'রাধিকার প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া রুচিবাদী ব্রাহ্ম-বন্ধুদের নৈতিক স্নায়ুমণ্ডলে খুব আঘাত দিয়াছিলাম। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের "বারবিলাসিনী" শীর্ষক কবিতা আমার প্রচলিতরুচিবোধবিহীন চিত্তকে বিচলিত করে নাই। এই কবিতা এবং সমজাতীয় অন্যান্য কবিতায় কবির রক্ত-মাংসের ভিতরেও যে একটা রক্ত-মাংসের রসের অনুভূতি দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই ইহার আপাত কুরুচির সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমি সে সময়ে উপনিষৎ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মতত্ত্বেরই যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন করিতেছিলাম। এই বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের একটা দিক্ বাস্তবিক আধুনিক অজ্ঞেয়তাবাদের সমর্থন করিয়াছে। রাজা রামমোহন পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে ধরা যায় না, মনের দ্বারা যাঁহার মনন অসম্ভব, বাক্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহার ধ্যানের সূত্র "নেতি" "নেতি", তাঁহাকে unknown এবং unknowable না বলিয়া আর কি বলিব ?

উপনিষদ্ এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, যাহা জ্ঞাত, ব্রহ্ম তাহা হইতে ভিন্ন ; যাহা অজ্ঞাত, তাহার উপরে। আমরা ব্রহ্মকে জানি না। কি করিয়া ব্রহ্মের উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। প্রাচীন আচার্য্যরা এই কথাই কহিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্রহ্ম আছেন, কেবল এই কথাই বলা যায়, তাঁহার উপলব্ধি কি করিয়া হইবে ? "অস্তীতি ব্রুবতি কথং

তদুপলভ্যাতে”—উপনিষদের ব্রহ্ম—সত্তামাত্র জ্ঞেয়। হার্বার্ট স্পেন্সারও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন। রাজা রামমোহন যে ব্রহ্ম-উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার মূল সূত্র—“কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা মান।” বেদান্তও অধিকারিভেদে, নিম্ন অধিকারীর জন্য এই ব্যবস্থাই করিয়াছেন। বৈদান্তিক উপাসনা নিম্ন অধিকারে দুই অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, এক ব্যতিরেকী উপাসনা এবং অপর অন্বয়ী উপাসনা। ব্যতিরেকী উপাসনার সূত্র, ইহা নহে, ইহা নহে—নেতি নেতি নেতি। ব্রহ্ম চক্ষু নহেন, চক্ষুগ্রাহ্য রূপও নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয় নহেন, শ্রুতিগ্রাহ্য শব্দও নহেন—মন নহেন, মনের মন্তব্যও নহেন। এইরূপেই ব্যতিরেকী উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা বৈদান্তিক ব্রহ্ম-উপাসনার আধখানা। এ পথে উপাসকের চিত্ত বিরাট নির্ব্বিশেষ শূন্যেও যাইয়া উপস্থিত হয়। অন্বয়ী উপাসনার ক্রম এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের প্রকাশ ধ্যান করা। ব্রহ্ম রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ কিছুই নহেন। কিন্তু আবার ব্রহ্ম যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে রূপের দর্শন, শব্দের শ্রবণ, রসের আস্বাদন আমাদের কোন কার্য্যই সম্ভব হইত না। ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে—ও সকলের আলম্বন ও প্রতিষ্ঠারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই ভাবেই অন্বয়ী উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু যেমন ব্যতিরেকী উপাসনা, সেইরূপ এই অন্বয়ী উপাসনাও ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান দেয় না, দিতে পারে না। যন্ত্রকে দেখিয়া যন্ত্রীর যতটুকু জ্ঞানলাভ সম্ভব, ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়া ব্রহ্মের কেবল ততটুকু জ্ঞানই সম্ভব হয়। ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান-লাভ সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান সমাধিতেই কেবল লাভ হয়। সমাধিতে আমাদের সমুদায় ইন্দ্রিয়-চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি হয়। আত্মা তখন আপনার নিত্য-সিদ্ধ শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করেন। এ অবস্থা অল্প লোকেরই লাভ হইয়া থাকে। এ অবস্থা যাঁহাদের লাভ হয় নাই, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মন-গড়া ইষ্টদেবতারই উপাসনা করেন। এ উপাসনাও ব্যর্থ হয় না। কারণ, ইহাতেই ক্রমশঃ শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধনকে ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। সুতরাং এই যে মানস উপাসনা, ইহাকে তুচ্ছ করা যায় না। তবে যাঁহারা এই কল্পিত ঈশ্বর-তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নাস্তিক্যবাদে বা অজ্ঞেয়তাবাদে যাইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। তাঁহারা যদি নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে পারেন, তাহা হইলে এই পথেই ক্রমে পরমতত্ত্বের সন্ধান এবং ভাগ্যবলের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। মূল কথা, এখানে নিজের কাছে খাঁটি থাকা। “যাহা না দেখ আপন নয়নে, বিশ্বাস না কর কভু গুরুর বচনে।” না দেখিয়া বিশ্বাস করিলে মিথ্যাচার হয়। যাহা মানুষ দেখে না, তাহাতে অবিশ্বাসী হইলে সে সত্য-ভ্রষ্ট হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের কাছে এ সকল তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম। তিনি মানুষের মত দেখিতেন না, মন দেখিতেন। সুতরাং আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রভৃতি কোনও মতবাদই তাঁহাকে বিচলিত করিত না। গোস্বামী মহাশয়ের কৃপায় চিত্তরঞ্জনের মতবাদ আমাকে কখনও বিচলিত করে নাই। তাঁহার প্রথম যৌবনে অজ্ঞেয়তা-বাদ আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত দেয় নাই। তাঁহার কবি কল্পনাও “বারবিলাসিনী”র মধ্যে যে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাতেও আমার রুচিতে আঘাত করে নাই। কখনই আমি নিজে লোকমতের অনুবর্ত্তন করিতে পারি নাই। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মসমাজের লোকমতের অনুবর্ত্তন করেন নাই বলিয়া আমার কাছে অপাংক্তেয় হওয়া ত দূরের কথা, নিন্দনীয়ও হয়েন নাই।

৪

আমার সঙ্গে পরিচিত হইবার পর হইতে বয়োবৃদ্ধি সহকারে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচলিত মতবাদকে স্বল্পবিস্তর সংশোধিত করিয়া এবং ফুটাইয়া তুলিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়েন। ক্রমে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি পরিতৃপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভক্তিপন্থার দিকে তিনি ঝুঁকিয়া পড়েন। এই দুই কারণে তাঁহার সঙ্গে আমার মনের এবং ভাবের যোগ ক্রমশঃ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

যেমন ধর্ম্মে, সেইরূপ কর্ম্মেও আমাদের মধ্যে একটা অতি নিকটসম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আমি যখন প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইংরাজী সাপ্তাহিক

'New India' সম্পাদনে নিযুক্ত হই, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনেও একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। 'New India' যে নূতন স্বদেশিকতার বীজ বপন করে, 'বন্দে মাতরমে' তাহাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জনের দেশচর্য্যায় দীক্ষা হয়। তখন চিত্তরঞ্জন নানা কারণে আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, এ কথা গোপন থাকে নাই। সেই সময় হইতে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার সাহচর্য্য আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমি একরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ও দেশের কায করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। দেশচর্য্যায় আমি তাঁহার ভার বহন করিতাম, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে তিনি আমার ভার বহন করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ বৎসর কাল আমার সাংসারিক দায়-অদায় কেবল প্রসন্নচিত্তে নহে, পরন্তু অনাবিল শ্রদ্ধা সহকারে চিত্তরঞ্জন বহন করিয়াছিলেন। একবার মনে পড়ে, কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে আমি চিত্তরঞ্জনের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখি। সে পত্রের অন্য কথা মনে নাই, কেবল একটা কথা মনে আছে। চিত্তরঞ্জন তখন আপনার ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। আমি লিখিয়াছিলাম :—

"তোমাদের নিরতিশয় দুর্ভাগ্য যে, তোমার এত টাকা হইতেছে। আমারও দুর্ভাগ্য যে, আমার আদৌ টাকা নাই। না হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার যে স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ, তাহা কোন প্রকারে ব্যাঘাত পাইত না।"

এই চিঠিখানাতে চিত্তরঞ্জনের প্রাণে খুবই লাগিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আমাদের আত্মীয়তার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

৩

চিত্তরঞ্জনের মাতৃবিয়োগের পর হইতে তাঁহার ভিতরে একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। পূজার ছুটী উপলক্ষে সে বারে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন—ফিরিয়া আসিয়া আর মাতাকে দেখিতে পায়েন নাই। তিনি দেশে ফিরিবার ৫।৭ দিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন চিত্তরঞ্জন সর্ব্বদাই মাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতার মত এমন উদারমতি, স্বজনবৎসল, স্বামি-পুত্র-পরিবারের সেবানিষ্ঠ স্ত্রী-চরিত্র আধুনিক হিন্দু সমাজেও বিরল। জননী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "জন্মে জন্মে যেন এই স্বামী এবং চিত্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হই।" তাঁহার "চতুর্থী" উপলক্ষে আমি পুরুলিয়ায় যাই। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভুবন বাবু ব্যবসায় হইতে অবসর লইয়া একরূপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পুরুলিয়ায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই স্থানেই চিত্তরঞ্জনের জননীর সংসারলীলা সাঙ্গ হয়। তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার অন্তিমকালে পুরুলিয়াতে যাইয়াই একত্র হইয়াছিলেন। পুরুলিয়াতেই তাঁহারা মায়ের "চতুর্থী" করেন। ইহার পরদিনই চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরিয়া আইসেন। আর আমাকেই তাঁহার সতীর্থ এবং স্বগোত্র পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আসানসোলে যাইয়া তাঁহাকে মাতার পরলোকগমনসংবাদ দিতে হয়। এই সময় হইতে আমাদের উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বকার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জনের জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ের কোনটাই পরিতৃপ্তি লাভ করিত না। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহার সঙ্গে অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্রহ্মোপাসনার বড় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মৃত ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। ইহাতে অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইত না। শ্রাদ্ধ এবং স্মৃতিসভা প্রায় এক হইয়া যাইত। এই জন্য চিত্তরঞ্জন তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ যাহাতে একটা সত্য অনুষ্ঠান হয়, এইরূপ একটা পদ্ধতি রচনা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি প্রাচীন বৈদিক এবং পরবর্ত্তী পৌরাণিক গয়াশ্রাদ্ধের শ্লোকাদি যতটা আমাদের আধুনিক মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারা যায়, ততটা মিলাইয়া একটা নূতন শ্রাদ্ধপদ্ধতি রচনা করি। এই পদ্ধতিটি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রকৃতি এবং স্বাদেশিকতা উভয়কেই পরিতৃপ্ত

করিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু অনুষ্ঠানে এক দিকে যেমন অতিপ্রাকৃত মন্ত্রশক্তির উপরে আস্থা জন্মাইত, সেইরূপ আবার তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তিকেও অন্য দিক দিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। মন্ত্রের অতিপ্রাকৃত শক্তিতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, এই সকল অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য এবং কাব্যরস তাঁহাদিগকেও মুগ্ধ করিয়া থাকে। এই দিক দিয়াই তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের এই নূতন পদ্ধতি চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রকৃতিকে আকর্ষণ করে। পরে চিত্তরঞ্জন যে একেবারে ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়া গিয়া হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি করিতে আরম্ভ করেন, এই স্থানেই, মনে হয়, তাহার বীজ বপন হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন কোন কাযই আধখানা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইবার শক্তি এবং সাধনা তাঁহার ছিল না। এ শক্তি জগতের কবিদিগের মধ্যে প্রায় দেখাও যায় না। আর এই জন্যই তাঁহার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতির এই সংস্কার-চেষ্টার এই পরিণাম দাঁড়াইয়াছিল।

৬

চিত্তরঞ্জনের পিতা ব্রাহ্ম হইলেও তাঁহার জননী কোনও দিন আমাদিগের আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার সংসারে একই সঙ্গে নৈষ্ঠিক হিন্দু আচার এবং অন্য দিকে বিদেশী রীতি-নীতি দেখিতে পাওয়া যাইত। স্বামী এবং পুত্ররা বিলাতী ধরণে টেবলে আহারাদি করিতেন। কিন্তু তিনি নিজে যতদূর মনে পড়ে, কোন দিন ইঁহাদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতেন না। তাঁহাকে টেবলে বসিয়া ইঁহাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনও দিন একসঙ্গে খাইতে দেখি নাই। তাঁহার পরিবারে এক দিকে বাবুর্চ্চি এবং অন্য দিকে অন্যত্র ব্রাহ্মণ পাচক ছিল। ভুবনমোহন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই নিতান্তই স্বজনবৎসল ছিলেন। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ জ্ঞাতি-কুটুম্বের সংসারভার বহনে ইঁহারা কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না, এবং হিন্দু-সমাজভুক্ত আত্মীয়স্বজনের জন্য ভুবন বাবুর বাড়ীতে সর্ব্বদাই একটা শুদ্ধ হিন্দু পাকশালা ছিল। ইহা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন পিতৃপরিবারে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের রীতি-নীতি এবং আবহাওয়ার মধ্যেই বাড়িয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যে স্বদেশের সাধনা ও সভ্যতার প্রতি একটা গভীর অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগের প্রেরণা অনেকটা রাষ্ট্রীয় বা Political ছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই স্বভাবসিদ্ধ স্বজাতি-পক্ষপাতিত্বই ক্রমে তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যে সামান্য যোগ ছিল, শেষ জীবনে তাহা একেবারে ছিন্ন করিয়া প্রচলিত গতানুগতিক হিন্দু সমাজের দিকে টানিয়া লইয়াছিল। তাঁহার হিন্দুত্ব এবং স্বরাজ-সাধনা, দুই ই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চাবী দিয়াই তাঁহার শেষ জীবনের হিন্দুত্বের ও দেশ-চর্য্যার নিগূঢ় তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করিতে হয়। কিন্তু সে সকল কথার যথাযথ বিচারের সময় এখনও যে আইসে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অর্ঘ্য

হায়, চির-ভোলা হিমালয় হ'তে
অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া।

কেন এত ভালবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি,
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে,
স্বর্গে লইল তুলি।

ধরা আর তোমা ধরিতে পারে না,
আজ তুমি দেবতার,
নিয়া যাও দেব মরু-ভূগলীর
অর্ঘ্য নয়নাসার।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।
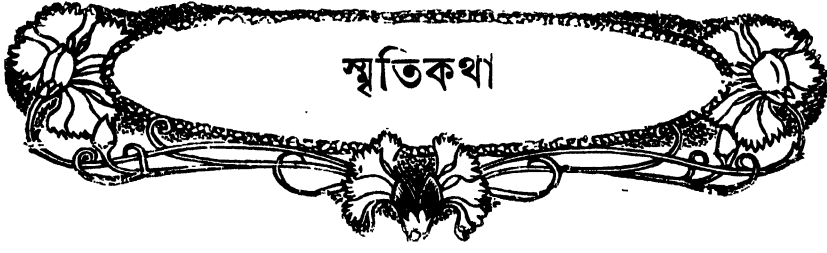
স্মৃতিকথা

মনে হয়, পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যে দিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এত বড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন।

সে দিন পাটনায় যাইবার পূর্ব্বে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার ফাইন্যাল শরৎ বাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।

তিনি যখন জেলে, তখন জন কয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার যো নাই, আমরা তাই জেলের পাঁচীলে তাঁকে প্রণাম করিতেছি। এ কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? দুই চোখ তাঁহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। মিনিট ২০ পরে ডাক্তার দাশ গুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেছেন, শরৎ বাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলিল না।

লোক বলিতেছে, এত বড় দাতা, এত বড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মধ্যেও এত বড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্য্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধনসম্পদের মূল্য যে কোন মতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকা-কড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোক ভাবে, আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছল করিয়াই ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নহে, তখন এই আমার ভাল।

কিন্তু এই বিরাট ত্যাগের নিভৃত অন্তরালে আর এক জন আছেন—তিনি বাসন্তী দেবী। এক দিন উর্ম্মিলা দেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, দাদার এত বড় কাযের মধ্যে আর এক জনের হাত নিঃশব্দে কায করে; সে আমাদের বৌ। নইলে দাদা কতখানি কি করতে পারতেন, আমার ভারি সন্দেহ হয়। বাস্তবিক, নন্-কো-অপারেশনের প্রথম হইতে ত অনেকই দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত কিছুর অগোচরে এমন আড়ম্বরহীন শান্ত দৃঢ়তা, এমন ধৈর্য্য, এমন সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আর আমার চোখে পড়ে নাই। একান্ত পীড়িত স্বামীকে সে দিন শেষবারের মত কাউন্সিল ঘরে তিনিই পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, গাড়ী হউক, ষ্ট্রেচার

হউক, যা হউক একটা তোমরা বন্দোবস্ত করিয়া দাও। উনি যখন মনস্থির করিয়াছেন, তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি নাই ওঁকে আটকায়। হাঁটিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তার ফলে তোমরা রাস্তার মাঝখানেই ওঁকে হারাইবে।

অথচ নিজে সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, পথের দিকে চাহিয়া সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে বলে সিন্ ক্রিয়েট করা, এই ছিল তাঁহার সব চেয়ে বড় ভয়। সর্ব্বলোকের চক্ষু তাঁহাতে আকৃষ্ট হওয়ার কল্পনামাত্রই তিনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন। আজ এইটিই হইতেছে ভারতের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। গৃহে গৃহে যত দিন না এমনই সাধ্বী, এমনই লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিবে, ততদিন দেশের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

সস্ত্রীক চিত্তরঞ্জন

আজ চিত্তরঞ্জনের দীপ্তিতে বাঙ্গালার আকাশ ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দীপের যে অংশটা শিখা হইয়া লোকের চোখে পড়ে, তাহার জ্বলার ব্যাপারে কেবল সেইটুকুই তাহার সমস্ত ইতিহাস নহে। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনকে রিক্ত করিয়া লইতেও ভগবান্ যেমন দ্বিধা করেন নাই, যখন দিয়াছিলেন, তখন কৃপণতাও তেমনই করেন নাই।

অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং উপলক্ষে কোথাও দূর পাল্লায় যাইবার প্রয়োজন হইলেই আমার কেমন দুর্ভাগ্য, ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমার কিছু-না-কিছু একটা মস্ত অসুখ করিত। সেবার দিল্লী যাইবার আগের দিন দেশবন্ধু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, কাল আপনার সঙ্গে উর্ম্মিলা যাবেন।

আমি বলিলাম, যে আজ্ঞা, তাই হবে।

দেশবন্ধু কহিলেন, হবে ত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে গাড়ী, কাল বিকাল নাগাদ আপনার অসুখ করবে ব'লে মনে হচ্ছে না ত?

আমি বলিলাম, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষীয়রা আপনার কাছে আমার দুর্নাম রটনা করেছে।

তিনি কহিলেন, তা করেছে বটে, কিন্তু আপনি বিছানায় শোন, এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণও ত কই নেই।

আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল। সে বেচারা বি. এ পর্য্যন্ত পড়িয়াও চাকুরী পায় নাই। বড়বাবুর কাছে আবেদন করায় তিনি রাগিয়া বলিয়াছিলেন, যাকে চাকরী দিয়েছি, তার ক্যোয়ালিফিকেশন বেশী, সে বি. এ ফেল্।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, আজ্ঞে, একজামিন দিলে কি আমি তার মত ফেল্ করতেও পারতাম না!

আমিও দেশবন্ধুকে বলিলাম, আমার যোগ্যতা অল্প, তারা আমার নিন্দা করে জানি, কিন্তু আমার শুয়ে থাকবার যোগ্যতাও নেই, এ অপবাদ আমি কিছুতেই নিঃশব্দে মেনে নিতে পারব না।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, না, আপনি রাগ করবেন না, আপনার সে যোগ্যতা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক্ আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী, বাঙ্গালা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি, তাহার আর তুলনা নাই। এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশ জ্বল্‌ছে, সে ত এক মুহূর্ত্তে আমাকে ভস্মসাৎ ক'রে দেবে।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন ৯টাই হইবে কি ১০টা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে উঠে ত তবে থাক্।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয়, শরৎ বাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কায করতে পারিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। এক দিন যখন সে বুঝ্‌বে, তার যথাসর্ব্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে! এই সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গালাদেশ ও এই বাঙ্গালাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন! কিছুতেই ত্রুটি দেখিতে পাইতেন না।

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, সত্যকার এতখানি ভাল না বাসিলে এই অপরিসীম শক্তিই বা তিনি পাইতেন কোথায়? লোক কাঁদিতেছে। মহতের জন্য দেশের লোক ইতঃপূর্ব্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়। একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কায করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কায। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কায করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার যায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে! যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ-প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার যো ছিল না।

সে দিন বরিশালের পথে, ষ্টীমারে ঘরের মধ্যে আলো নিবানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎ বাবু, ঘুমিয়েছেন?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসি গে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করার চেয়ে সে ঢের সুসহ। চলুন।

দুই জনে ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে, তাহার দূর-প্রসারী সার্চ্চলাইটের আলো কখনও বা তীরে বাঁধা ক্ষুদ্র নৌকার ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটীরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা

বলিয়া উঠিলেন, শরৎ বাবু, নদী-মাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই ই চাই।

এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। উত্তরের প্রয়োজন ছিল না; কারণ, সে সকল প্রশ্ন নহে, একটা ভাব। তাঁহার কবি-চিত্ত কি হেতু জানি না, উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না?

বোধ হয়, অনেক দিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ৩০ কোটি লোকের ৫ কোটিও যদি সুতো কাটে ত ৬০ কোটি টাকার সুতো হ'তে পারে।

বলিলাম, পারে। ১০ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ী তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হ'তে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই ১০ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু, তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছে হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাযেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন; বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

দেশবন্ধু বলিলেন, আপনার মুসলমানপ্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।

ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার যো নাই, খ্যাতি এত বড় কানে আসিয়াও পৌছিয়াছে। কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে চিরদিনই আমার লজ্জা করে, তাই সবিনয়ে বদন নত করিলাম।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে, বল্‌তে পারেন? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় ৫০ লক্ষ বেড়ে গেছে, আর ১০ বছর পরে কি হবে, বলুন ত?

বলিলাম, এটা যদিও ঠিক মুসলমানপ্রীতির নিদর্শন নয়, অন্ততঃ আপনার পরম বন্ধু আলী-ভ্রাতাদের মুখ এ সম্ভাবনায় ও-রকম ফ্যাকাশে হয়ে উঠ্‌বে না, কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিষ নয়। তা হ'লে ৪ কোটি ইংরাজ দেড়শ কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে দশের মধ্যে এদের একটা মর্য্যাদার স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে এদের মানুষ ক'রে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চ'লে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন, ও দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না।

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে না কি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধুর আর একটা অর্থ চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনাদোষে এই অসম্মানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া ক'রে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার ক'রে দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকি গে। আমি ঢের কায করতে পারবো। এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই একটা একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, বেচারাদের ধোপা-নাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না, অথচ এরাই মুসলমান, খৃষ্টান হয়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কায করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বল্‌ছে,

হিন্দুর চেয়ে মুসলমান, খৃষ্টানই বড়। এ রকম সেন্সলেস্ সমাজ মর্‌বে না ত মর্‌বে কে! এই বলিয়া বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত?

বলিলাম, না। অহিংস, সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দেখ্‌ছি, কোথাও লেশমাত্র মতভেদ নেই।

আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, এক দিন কিন্তু যথার্থই লেশমাত্র মতভেদ থাক্‌বে না, আমি এই আশাতেই আছি। ইতোমধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কায ক'রে দিই। আর শুধু মত নিয়েই বা হবে কি, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা ত দেশের বড় কর্ম্মী; কিন্তু ইংরাজের প্রতি বসন্তর বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষুর অহিংস দৃষ্টিপাত এবং শ্রীশের প্রেমসিক্ত বিদ্বেষবিহীন মেঘগর্জ্জন,— এই দুটি বস্তু দেখ্‌লে এবং শুন্‌লে আপনারও সন্দেহ থাক্‌বে না যে, মহাত্মাজীর পরে অহিংস অসহযোগ যদি কোথাও স্থিতি লাভ ক'রে থাকে ত এই দু'টি বন্ধুর চিত্তে। অথচ এত বেশী কাযই বা কয় জনে করেছে? অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা ত গণসাধারণ, অর্থাৎ mass-এর জন্য? কিন্তু এই mass পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। এক দিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা ক'রে ফেল্‌তেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সে বার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন-নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কোন দিন কেউ যদি দেশ স্বাধীন কর্‌তে পারে ত শুধু এরাই পারবে।

এইখানে দেশবন্ধুর বোধ করি, একটা গোপন ব্যথা ছিল, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু জেলের কথায় তাঁহার আর একটা প্রকাণ্ড ক্ষোভের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, এ দুরাশা আমার কোন দিন নেই যে, দেশ একেবারে এক লাফে পূরো স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই স্বরাজের একটা সত্যকার ভিত্তি স্থাপন করতে। আমি তখন জেলের মধ্যে, বাইরে বড়লাট প্রভৃতি এঁরা, ওদিকে সাবরমতি আশ্রমে মহাত্মাজী,— তাঁর কিছুতেই মত হ'ল না, অত বড় সুযোগ আমাদের নষ্ট হয়ে গেল। আমি বাইরে থাক্‌লে কোনমতেই এত বড় ভুল করতে দিতাম না। অদৃষ্ট! তাঁর লীলা!

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শুতে যাবেন না? চলুন?

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউশনারিদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কায দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ ২৫ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠ্‌বে, সামান্য মতভেদে একেবারে সিভিল ওয়ার বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎ বাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।

বহুদিন পরে আর এক দিন রাত্রিতে তাঁহার মুখ হইতে এমনই অকপট সত্য উক্তি বাহির হইতে আমি শুনিয়াছি। তখন রাত্রি বোধ হয় ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, আচার্য্য রায় মহাশয়কে গাড়ীতে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দেশবন্ধু সিঁড়ির উপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলাম, একটা কথা বোল্‌ব, রাগ কর্‌বেন না?

তিনি কহিলেন, না।

আমি বলিলাম, বাঙ্গালা দেশে আপনারা এই যে কয়জন সত্যকার বড়লোক আছেন, তা' পরস্পরের

সন্দর্শনমাত্রই আপনারা পুলকে যে রকম রোমাঞ্চিত-কলেবর হয়ে ওঠেন—

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বেরালের মত?

বলিলাম, পাপমুখে ও আর আমি ব্যক্ত কোরব কি ক'রে। কিন্তু কিছু একটা না হ'লে—

দেশবন্ধুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কত যে ক্ষতি হয়, সে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? কেউ যদি এর পথ ক'রে দিতে পারে ত আমি সকলের নীচে, সকলের তাঁবে কায করতে রাজী আছি। কিন্তু ফাঁকি চল্‌বে না, শরৎ বাবু।

সে দিন তাঁহার মুখের উপর অকৃত্রিম উদ্বেগের যে লেখা পড়িয়াছিলাম, সে আর ভুলিবার নহে। বাহির হইতে যাহারা তাঁহাকে যশের কাঙাল বলিয়া প্রচার করে, তাহারা না জানিয়া কত বড় অপরাধই না করে! আর ফাঁকি? বাস্তবিক যে লোক তাহার সর্ব্বস্ব দিয়াছে, বিনিময়ে সে ফাঁকি সহিবে কি করিয়া?

আর একটা কথা বলিবার আছে। কথাটা অপ্রীতিকর। সতর্কতা ও অতিবিজ্ঞতার দিক দিয়া একবার ভাবিয়াছিলাম বলিয়া কায নাই, কিন্তু পরে মনে হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা ও সত্যের জন্য বলাই ভাল। এ বার ফরিদপুরে কন্‌ফারেন্সে আমি যাই নাই, তথাকার সমস্ত খুঁটিনাটি আমি জানি না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া অনেকে আমার কাছে এমন সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে,—যাহা প্রিয় নহে, সাধুও নহে। অধিকাংশই ক্ষোভের ব্যাপার, এবং দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তাহা একেবারেই অসত্য।

'মাসিক বসুমতী' পাঠনিরতা দেশবন্ধুর কন্যা অপর্ণাদেবী

দেশের মধ্যে রেভোলিউশনারি ও গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাহারা বলিস্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত এখন সুপ্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে এক দিন বাঙ্গালায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থচিত্তে কায করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার "যদি" কথাটায় তিনি ঘোর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "'যদি'তে কায নেই। ২১ বৎসর ধ'রে assuming but not admitting ক'রে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, "যদি" বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার

স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমি রাজি হইতে পারি নাই, এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাকে বলিয়াছিলেন, এ সকল যারা করে, তারা জেনে শুনেই করে, কিন্তু যারা করে না কিছুই, গর্ভমেণ্টের হাতে তারাই বেশি ক'রে দুঃখ পায়। সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন প্রভৃতির জন্য তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। সুভাষকে করপোরেশনে কায দিবার পরে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, I have sacrificed my best man for this Corporation, এবং তাহাদেরই যখন পুলিস ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়া অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার হাত-পা কাটিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে।

দেশবন্ধুর ভগিনী—শ্রীমতী উর্ম্মিলাদেবী

তাঁহার ফরিদপুর অভিভাষণের পরে মডারেট দলের লোক উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, আর ত কোন প্রভেদ নাই, আইস, এখন কোলাকুলি করিয়া মিলিয়া যাই। ইংরাজী খবর-ওয়ালার দল তাঁহার "জেস্চারের" অর্থ এবং অনর্থ করিয়া গালি দিল কি সুখ্যাতি করিল, ঠিক বুঝাই গেল না। তাঁহার নিজের দলের বহু লোক মুখ ভারি করিয়াই রহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে।

অসাধারণ কর্ম্মীদের এই একটা বড় দোষ যে, তাঁহারা নিজেদের ভিন্ন অপরের কর্ম্মশক্তির প্রতি আস্থা রাখিতে পারেন না। এবার পীড়ায় যখন শয্যাগত, পরলোকের ডাক বোধ হয় যখন তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎ বাবু, Compromise করতে যে শিখলে না, বোধ হয়, এ জীবনে সে কিছুই শিখলে না। Tory Government is the cruellest Government in the world এরা না পারে, পৃথিবীতে এমন অত্যাচারই নেই। আবার মিটমাট ক'রে নেবার পক্ষেও, বোধ করি, এমন বন্ধু আর নেই। কিন্তু ভয় হয়, আমি তখন আর থাকব না। জালিয়ান ওয়ালা বাগের স্মৃতি মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

একবার একটা সভার পরে গাড়ীর মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনেকে আমাকে আবার প্র্যাক্‌টিস ক'রে দেশের জন্যে টাকা রোজগার ক'রে দিতে পরামর্শ দেন। আপনি কি বলেন?

আমি বলিয়াছিলাম, না। টাকার কাযের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক্। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়।

দেশবন্ধু জবাব দিলেন না, হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই হাসি এবং এই স্তব্ধতার মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আর নাই।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেশবন্ধুর কোষ্ঠী-বিচার

পাশ্চাত্যমতে স্ফুট গণনা চক্রাদি

৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ তারিখে গণনা।

জন্ম শকাব্দা ১৭৯২।৬।১৯।১।৪০ শনিবার দ্বাদশী-বেলা ৬।৪৮ মিঃ

ষড়বর্গ সাধনার ফল			পঞ্চবর্গী বলফল	
র	৫।৯।৪৬	বলী	৭।৪৭।	অল্পবলী
চং	৬।০৫।২৩	পূর্ণবলী	৭।৪২৫	„
ম	৫।৫৩।১০	„	১১।১৮॥	মধ্যবলী
বু	৮।৫৭।২৬	„	১২।৪৩।	„
বৃ	৮।২২।৫৭	„	১৬।১	পূর্ণবলী
শু	৬।৫৬।৪২	„	১১।৪১৫	মধ্যবলী
শ	৫।৪০।৩৪	„	৯।২৭।	মধ্যবলী

ভাবচক্র

রা বৃ চং
ম কে
বু শু র শ
লং ২৯

ভাবফল	চয়	ক্ষয়
র	২৪	০
চং	০	৫।৪৯
ম	০	২২।৫২
বু	০	১৬।০
বৃ	০	৪৪।৪২
শু	০	৬।৩৯
শ	০	৫২।১৫

পাশ্চাত্য চং স্ফুট সাধ্য উভয় দশা সূক্ষ্ম গণনা

পাশ্চাত্য মতে—২।৮।১৩

দেশীয় গণনায় জন্মদশায় বিংশোত্তরীতে শনির দশা ভোগ্য বর্ষাদি ৩।১০।১২

দ্বাদশ বর্গ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু	লগ্ন
ক্ষেত্র	শু	বৃ	র	শু	বু	শু	বৃ	বু	বৃ	শু
হোরা	চং	চং	র	র	র	র	র	চং	চং	চং
দ্রেক্কাণ	বু	চং	বৃ	শু	বু	শ	বৃ	শ	র	বু
তূর্য্যাংশ	র	বু	ম	শ	বু	শ	বৃ	বৃ	বু	চং
পঞ্চাংশ	বৃ	বৃ	বৃ	শ	মং	বৃ	ম	বু	বু	শু
ষষ্ঠাংশ	র	বৃ	বৃ	শু	ম	বু	ম	র	র	বু
সপ্তাংশ	শ	বৃ	শু	বৃ	বু	বৃ	বৃ	শু	ম	ম
অষ্টাংশ	বু	মং	বৃ	বু	বু	চং	বু	শ	শ	বৃ
নবাংশ	ম	ম	চং	বৃ	ম	শ	শু	ম	শু	ব
দশাংশ	ম	বৃ	বৃ	শ	চং	শ	শ	শ	চং	চং
একাদশাংশ	শু	শু	ম	শ	বৃ	শ	বু	বৃ	বৃ	র
দ্বাদশাংশ	বু	র	বৃ	শ	চং	শ	শ	শ	র	বু
শুভবর্গ	৭	৯	৮	৬	৮	৫	৭	৬	৭	১০
অশুভবর্গ	৪	৩	২	৬	৪	৭	৩	৬	৫	২
স্ববর্গ	১	২	২	১	১	১	২	০	০	২
বর্গভেদ সংজ্ঞা		পারিজাত	পারিজাত				পারিজাত			পারিজাত

১৩২৪ সালের মাঘ হইতে ১৩২৫ সালের বৈশাখের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝায়।

দেশীয় মতে অষ্টোত্তরীতে শুক্রদশা ভোগ্য বর্ষাদি ১৩।৩।২১ পাশ্চাত্য মতে শুক্র দশা ভোগ্য বর্ষাদি ১৩।৬।২৭

ধনেশে চ গতে লাভে ধনবান্ উদ্যমী পটুঃ।
বাল্যে রোগী সুখী পশ্চাদ্ যাবদায়ুঃ সমাপ্যতে॥

বরাহমতে ইঁহার কোষ্ঠীতে ২১ পৃষ্ঠায় সমস্ত গ্রহের রাশি শীল কথনে সর্ব্বগ্রহেরই শুভফল বর্ণিত আছে।

বুধের দশায় ফকিরী যোগ—এবেষ্টা যোগ নির্ব্বাসন যোগ দৃষ্ট হয়। ভাগ্যরাজ্য ভঙ্গ হইয়া অচিন্তনীয় ঘটনাচক্রের অদ্ভুত আবর্ত্তনে পড়িবেন।

ফেব্রুয়ারি ১০।১২।১৪।২৩।২৫।২৭

মং শ বিপত্তারায় আছেন
বৃ বধতারায় „
কে ক্ষেমতারায় „
বু শু মিত্রতারায় „
র রা পরম মিত্রতারায় „
চং জন্মতারায় „

বিপত্তারা ১।১০।১৯
প্রত্যরি ৩।১২।২১
বধ ৫।১৪।২৩

সন ১৩২৭ সালের শ্রাবণের শেষ হইতে ১৩২৮ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত র বুধ দশান্তরে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবে।

পাশ্চাত্যমতে দশা

অষ্টোত্তরী—

বু—বৃ পর্য্যন্তং বয়ঃ ৪৮।২ ফল আদৌ বহুধনমানাদি শেষাংশে মন্দফলং।

বিংশোত্তরী মতে রবি রাহু পর্য্যন্তং বয়ঃ ৪৮।৮।৪০

ইঁহার জায়ার ৩৮।৩৯ বৎসর বয়সে জন্মস্থ শনিতে এবং শ—মং এবং শ—বু দশান্তরে পারিবারিক আর্থিক বৈষয়িক কোনরূপ বিভ্রাট মানসিক দুঃখযোগ (অন্যান্য কারণেও) প্রবল দৃষ্ট হয়। পতি পুত্র কন্যা জামাতা সম্পর্কীয় দুর্যোগ দুশ্চিন্তা ঘটিবে। কোন্ দিন কোন্ মাসে তাহা সূক্ষ্ম গণনায় বিচারসাধ্য। আমি নিজে রুগ্নশয্যায় থাকায় সূক্ষ্ম গণনায় অক্ষম হইয়াছি।

জাতক স্বর্গাগত যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ স্বয়ং দৈবরক্ষিত এই ভরসা, সর্ব্বাপদ দূরে থাকিয়া কাটিতে পারে। অদ্ভুত ভাগ্যবল আছে, তথাপি সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

চিত্তরঞ্জনদাশস্য ভার্য্যায়াঃ

জন্মশকাব্দয়ঃ ১৮০১।১১।৮।৫৭।৫৬ রবিবার শুক্লা একাদশী চান্দ্র ফাল্গুন রাত্রি শেষে ইং ৫।১৩।৪৮ সেঃ সময়ে জন্ম
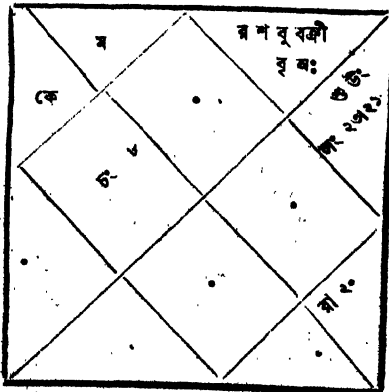
পাশ্চাত্য গণনা
র ১১।৯।৪৭
চং ৩।১২।৪৩
ম ১।২৬।৩৭
বু ১১।২১।১২
বৃ ১১।৫।১২
শু ১০।১০।১৫
শ ১১।২৪।৩৮
রা ৮।১৯।৪৪

লং ১০।২২।৩৯(কুম্ভ)
বৃ—অস্ত
বু—বক্রী
শু—উদিত

পাশ্চাত্য চন্দ্রস্ফুটসাধ্য দশা গণনা

অষ্টোত্তরী	বিংশোত্তরী
শ—ম পর্য্যন্তং	শু—রা পর্য্যন্তং
বয়ঃ ৩৮।১।২৩	বয়ঃ ৩৯।১।০
শ—বু ১।৬।২৬	শু—বৃ ২।৮
Bad time	৪১।৯
৩৯।৮।১৯	

বুধান্তরে পতি-পুত্রাদির মৃত্যুভয় বা অমঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুলতা, আর্থিক বৈষয়িক দুর্ঘটনা, অংশাংশ কার্য্যে অংশাদি লইয়া অংশীদার সহ বিবাদ-বিচ্ছেদ, দূরাগত কুসংবাদ, ভয়, উদ্বেগ, অশান্তি, আত্মগ্লানি, তিরস্কার, ভৎর্সনা, নিজ রোগপীড়া, মানসিক দুঃখ ইত্যাদিরূপ ও অন্যরূপ কুফল ভোগ সম্ভাবনা ৩৮।৩৯ বয়সে বুধান্তর্দশা ভোগ হইবে।

বুধ বক্রী পাপযুক্ত নীচস্থ ও অষ্টম পতি বলিয়া বিরুদ্ধ শনির দশায় শেষ এক বৎসর মন্দ সময় যাইবে।

ঐরূপ গ্রহদোষ দৃষ্টে অনেক পূর্ব্ব হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া হয়গ্রীব দেবসন্নিধানে আবেদন জানাইয়া কালযাপন করিতেছি।

অষ্টোত্তরী বৃ দশায় ইঁহার সংসার ছিন্নভিন্ন হইবে; ধন-সম্পদ ধ্বংস হইবে। ৪১।৪২ বয়সে ভীষণ দুর্য্যোগ।

তাং ৪।৪।২৭।

অদ্য ২৫শে মাঘ, ১৩২৪ সাল।

শকাব্দা	১৮৩৯।৯।২৪
„	১৮০১।১১।৯
সৌর বয়ঃ	৩৭।১০।১৯
বৃদ্ধি	৬।২০
সাবন বয়ঃ	৩৮।৫।৫
	১৮৩৯,৯।২৫
	১৭৯২।৬।১৯
সৌর বয়ঃ	৪৭।৩।৬
	৮।৭
সাবন বয়ঃ	৪৭।১১।১৩

চিত্তরঞ্জনস্য রবৌ গুরুদৃষ্টিফলং (চক্রে পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়)

বংশানুমানান্বপতিপ্রধান সত্যব্রতুবাক্রবিণাবিত্তো বা তীক্ষ্ণ্যঃ গুরুগৃহং প্রপন্নে দৃষ্টে রবৌ দেবপুরোহিতেন।

শিক্ষার্থ বিলাত যাইবার পূর্ব্বে পরিজন মধ্যে চিত্তরঞ্জন

দণ্ডায়মান—(১) চিত্তরঞ্জন (২) তরলা দেবী বড় ভগিনী (৩) প্রমীলা দেবী (৩য়া ভগিনী) (৪) পিতা ভুবনমোহন দাশ (৫) প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (মধ্যম ভ্রাতা)

উপবিষ্ট—(১) দেশবন্ধুর মাতা (ক্রোড়ে ছোট ভগিনী মুরলা দেবী) (২) অমলা দেবী (২য়া ভগিনী) (৩,৪) তরলা দেবীর কন্যাদ্বয় (৫) দেশবন্ধুর পিতামহী

সম্মুখের শ্রেণী—(১) উর্ম্মিলা দেবী (৪র্থা ভগিনী) (২) দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার

[শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর সৌজন্যে।

বুধে গুরুদৃষ্টিফলং

দেশোত্তমং গ্রামপুরাধিরাজং প্রাজ্ঞং গুণজ্ঞং গুণিনং সুশীলম্।
কুর্য্যান্নরং চন্দ্রসুতে সিতাহে সংস্থে সুরাচার্য্যনিরীক্ষ্যমাণে॥

গুরৌ শনিদৃষ্টিফলং

নরেন্দ্রসদগৌরবসংপ্রযুক্তং নিত্যোৎসবং পূর্ণগুণাভিবাসম্।
নরং পুরগ্রামপতিং করোতি গুরুর্জ্জগেহে শনিনা প্রদৃষ্টঃ॥

শুক্রে গুরোর্দৃষ্টিফলং

সম্বাহনানাং সুনয়ানাং সুমিত্রপুত্রদ্রবিণাদিকানাম্।
করোতি লব্ধিং নিজবেশ্মযাতঃ সিতঃ সুরাচার্য্য
নিরীক্ষতেশ্চেৎ॥

শনৌ গুরোর্দৃষ্টিফলং

নৃপপ্রধানঃ পুতনাপতির্বা সর্ব্বাধিশালী বলবান্ সুশীলঃ।
ছায়ানবো ভানুসুতে প্রসূতৌ জীবেক্ষিতে জীবগৃহং
প্রয়াতে॥

সম্রাটযোগবৎ ফল।

মিথুনে ৪র্থ অংশে বৃহস্পতি, ধনুতে ৪র্থ অংশে শনি উভয়ে পরস্পর (৬০ কলা) পূর্ণদৃষ্ট জন্য বহু লক্ষ ভাগ্যবান্‌কেও অতিক্রম পূর্ব্বক ব্যারিষ্টারী রাজ্যের সম্রাট্ যোগ ও তদ্রূপ মানসম্ভ্রমপদস্থ হইবার যোগ হইয়াছে।

প্রমাণং যথা—

যদা চ সৌরিঃ সুররাজমন্ত্রী পরস্পরং পশ্যতি পূর্ণদৃষ্ট্যা।
তদা সমগ্রাং বসুধামুপৈতি কিংবা ধনেনাস্তগুণেন কিংবা॥

চিত্তরঞ্জনস্য যোনীমণ্ডলং

(বু) ফল
ভাগ্যেংশে চ
গতে লগ্নে,
গুণবান্ লোক-
পূজিতঃ
শু
ক্রিয়া লগ্নং
লগ্নে চ সংযুক্তং
র
লাভেশে লগ্নে
গতে শূরো দাতা
জনপ্রিয়ঃ সুভগঃ

৪০০ পৃষ্ঠা তৃতীয় কাণ্ড হোরাবিজ্ঞান ২য় সংস্করণ দেখ—ব্যয়পতি লগ্নের ফলে নির্ভয় বাক্যদোষে রাজদ্বারে দোষাপরাধী হইবেন।

অত্র প্রমাণং যথা—

ব্যয়নাথে লগ্নগতে বিদেশগতঃ সুবচনঃ সুরূপশ্চ।
অপশব্দবাদদোষী ভবতি মানবোঽথবা খঞ্জঃ॥
পরাশরমতেন—জায়াসৌখ্যং ভবেন্নহি

অষ্টোত্তরী বু—বৃ দশান্তরে
প্রবাসগমনে বিপদের সম্ভাবনা।

এবং স্বদেশ-হিতৈষিতায় নির্ভয় বাক্যকথন দোষে অপরাধের সোপানসৃষ্টি, ৪৭।৪৮ বৎসর বয়সে ১৩২৫ সালের বৈশাখ মধ্যে হইতে পারে। *

শ্রীনারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ।

* স্বর্গীয় জ্যোতিষী নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের পুরাতন ছিন্ন জ্যোতিষ ডায়েরী হইতে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক বহু যত্নে সংগৃহীত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোভাব

কোন্ অসীমের কোন্ স্বরগে
পেতে আসনখানি!—
(ওহে বাঙ্গালার মণি)
ছুটছ তুমি আপন মনে—
কি ভাবে কি জানি!!
জালিয়ে দিয়ে জাতির প্রাণে
সজীব আশার বাতি;—
দমকা বায়ে নিবিয়ে দিলে—
শেষ না হ'তে রাতি,—
মরমমাঝে তোমার বাঁশীর
করুণ উদার ধ্বনি,
জানিয়েছিল জন্মভূমির আকুল প্রাণের বাণী!—
মহান্ তুমি কর্ম্মী তুমি, ত্যাগী মহীয়ান্!—
"দেশবন্ধু" দেশমাতৃকার ভক্ত সুসন্তান,—
ভারতবাসীর হৃদয় জোড়া
তোমার আসনখানি,
কোন্ পরাণে ফেল্‌লে ঠেলে
কোন্ পাথারে টানি!—
'নারায়ণের' ভাবুক সেবক ভক্ত মহাজ্ঞানী—
আশিষ কুসুম ঢালুক শিরে বঙ্গজননী
(ওহে বাঙ্গালার মণি)

শ্রীঅপরেশ মুখোপাধ্যায়।
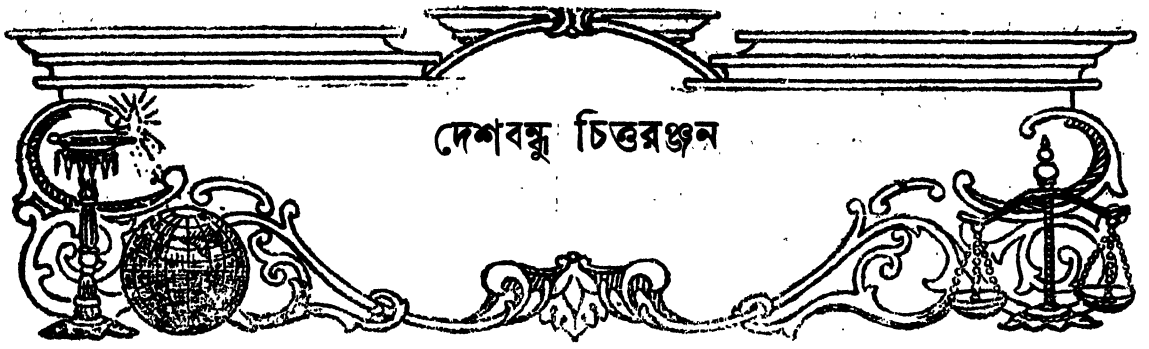
আমার জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, স্বরাজ-সাধনাকার্য্যে অন্যতম ক্ষুদ্র কর্ম্মী হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়া, তাঁহার অন্তরের যে পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আজ শোকের দিনে তাহা যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। হৃদয়বান্, কর্ম্মযোগী, পুরুষসিংহ চিত্তরঞ্জন স্বীয় পিতৃতুল্য স্নেহ ও মমতার দ্বারা কি ভাবে কর্ম্মিগণের চিত্ত জয় করিয়াছেন, তাহা ভাবিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। দেশের জনসাধারণও তাঁহার এই হৃদয়বত্তার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাই আজ চিত্তরঞ্জন শুধু দেশের নেতামাত্র নহেন, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের "দেশবন্ধু।"

দেশবন্ধুর সহিত কর্ম্মী হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া, তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক সাধনার যাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই গুটিকতক কথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বলিব।

দেশবন্ধুর পূর্ব্বে আমাদের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সমগ্র প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বক্তৃতায়, প্রস্তাবগ্রহণে, কন্ফারেন্স প্রভৃতির অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদানে পর্য্যবসিত ছিল। দেশবাসীকে কোন নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট পথিপ্রদর্শন বা কোন আদর্শ-সংস্থাপন তাঁহাদের দ্বারা হয় নাই। এই সব নেতা যে শক্তিতে হীন বা অযোগ্য ছিলেন, এমন নহে। প্রকৃত কথা এই যে, রাজনীতিতে তাঁহারা কেহ সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের মত প্রাণ-মন দিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। রাজনীতি অনেকাংশে তাঁহাদের সখের আলোচনা বা অবকাশরঞ্জনের উপায়মাত্র ছিল।

আমাদের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহার বিরাট ত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত, ব্যাকুল প্রাণের আবেগে পরিপূর্ণ। এই ব্যাকুলতাই চিত্তরঞ্জনের জীবনের সমগ্র প্রচেষ্টা, সমগ্র সাধনার ভিতরে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কবি চিত্তরঞ্জন গাহিয়াছিলেন—

"আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই
এত দিন ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত
ধরণীর চির-মর্ম্মভার।"

"মর্ম্মাহত ধরণীর" এই "চির-মর্ম্মভার" তাঁহাকে এমন ব্যাকুল করিয়াছিল যে, তাঁহার স্বরাজ-সাধনা কেবলমাত্র স্বদেশের মুক্তিলাভের স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই—বস্তুতঃ, চিত্তরঞ্জনের হৃদয় সমগ্র এসিয়ার সম্মিলন, মানবজাতির সম্মিলন প্রভৃতির কামনায় চঞ্চল ছিল। আমার মনে হয়, ইহাই চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ-সাধনার মূলমন্ত্র।

"সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে। এস ভাই খৃষ্টীয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই মুসলমান, আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছে! এস, এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা! বল নারায়ণ! বল বন্দে মাতরম্!" এই বিশ্বাসই চিত্তরঞ্জনের স্বরাজসাধনায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। মানুষ নিজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, এরূপ বিশ্বাসে ভর করিয়া সে অপরকে কোন

কার্য্যে আহ্বান করিতে পারে না। চিত্তরঞ্জনের আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি দেশবাসীর মনে বিশ্বাসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বরাবরই সম্মানের সহিত সহযোগিতা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নিজে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বৃটিশ আমলাতন্ত্র আমাদের দেশাত্মার প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনে বীতরাগ, তখনই তিনি নিজের ব্যবসায়, নিজের স্বার্থানুসন্ধিৎসা সবই বিসর্জ্জন দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে আপনাকে নিমজ্জিত করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনস্রোত নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু কালক্রমে আমলাতন্ত্রের প্রতিকূলাচরণে দেশের রাজনীতিক প্রচেষ্টার বেগ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিল—মহাত্মা গন্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন স্বয়ং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মুক্তিলাভের পর চিত্তরঞ্জন আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন ভাবের বন্যা আনয়নে বদ্ধপরিকর হইলেন। "আমলাতন্ত্রের শাসনকার্য্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অসম্ভবপর হইয়া উঠে, তন্নিমিত্ত দেশব্যাপী একটি প্রতিরোধমূলক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" এই সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া চিত্তরঞ্জন যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন, তাহারই মূর্ত্তস্বরূপ দেশে স্বরাজ্যদলের অভ্যুত্থান হইল। দেশের তদানীন্তন অবস্থায় আইন অমান্য করা সম্ভবপর নহে, এ কথা বুঝিতে চিত্তরঞ্জনের বিলম্ব হইল না। তাই তিনি প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয় আইন সভাগুলিতে সদলে বলে প্রবেশলাভ করিয়া সংস্কারমূলক শাসনপদ্ধতির দোষ ও অভাবাত্মক দিক্‌গুলি দেশবাসীর চক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া সংস্কার-শাসননীতির আমূল পরিবর্ত্তন—অন্যথা মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।
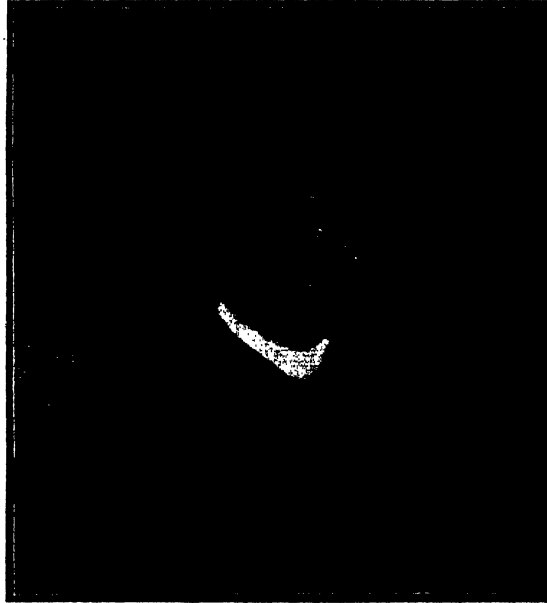
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায় যাহা সাধিত হইয়াছে, দেশবাসী সকলেই তাহা জানেন। দ্বিধাবিভক্ত শাসননীতির বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জনের এই ধর্ম্মাভিযান ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিবে,—এ সম্বন্ধে আর দ্বিমত নাই।

অক্সফোর্ডে পাঠকালে চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের শেষ বাণী ফরিদপুর প্রাদেশিক সভায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ হইতেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকের নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে শেষ চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "I have said my last word, and the onus is now on the Government."

আমাদের এই স্বরাজ-সংগ্রামের লক্ষ্য—আমাদের স্বকীয় আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ অর্জ্জন করা। যাহাতে আমরা বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিয়া, আমাদের জাতীয় সাধনার মূল ধারাটি বজায় রাখিয়া, জাতীয় আত্মার উদ্বোধন করিতে সমর্থ হইতে পারি, ইহাই আমাদের কাম্য। ইহার জন্য ইংরাজরাজের সহিত যদি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। যে যে সর্ত্তে তিনি গভর্ণমেণ্টের

সহিত এইরূপ আপোষ করিয়া সহযোগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি মোটামুটি এইগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(১) গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমননীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ রাজনীতিক বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

(২) বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজলাভ করিতে পারি, তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার কোন নড়চড় হইতে পারিবে না।

(৩) পূর্ণ স্বরাজলাভের পূর্ব্বে—ইতোমধ্যে এখন-ই আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজলাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্তরঞ্জনের এই শেষ বাণীর প্রতি আমার দেশবাসী জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। যোগী, ত্যাগের বিগ্রহ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবক চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন ও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রদর্শিত সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এ কথা আজ আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। চিত্তরঞ্জনের শেষ বাণী যেন আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে,—

"জাতীয়তাই শেষ কথা নয়। * * * * জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতিমুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এই জন্য প্রয়োজন যে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে।"

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার।

দেশবন্ধুর মৃন্ময়মূর্ত্তি

ভাস্কর—ভি, কর্ম্মকার।

বাঙ্গালায় চন্দ্রগ্রহণ

বাঙ্গালী, গত চন্দ্রগ্রহণে কলিকাতার দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলে কি? গঙ্গাবক্ষে ঐরূপ আলোকশোভা আর কখনও দেখিয়াছ কি? সে দিন প্রাণে স্বরাজ-লাভজনিত আনন্দ-স্পন্দন অনুভব কর নাই কি? সে দিন চিরপুরাতনের ভিতর যে নূতনের আভাস প্রাণে প্রাণে উপভোগ করিয়াছিলে, তাহা ভুলিতে পারিবে কি? সে দিন সকল যাত্রীর মনে কাহার ত্যাগের পূত ছবি পুনঃ পুনঃ আনাগোনা করিতেছিল? সে চিত্তচন্দ্র প্রকৃতই আজ রাহুগ্রস্ত, বাঙ্গালা-গগনের চিত্তচন্দ্র চিরতরে আজ রাহুগ্রস্ত।

চিত্তরঞ্জন আমার বিক্রমপুরের একমাত্র মুকুটবিহীন রাজা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বিক্রমপুরবাসী বলিয়া আজ নিজেকে আমি ধন্য মনে করিতেছি, ত্যাগের অবতার বীর চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাসী বলিয়া বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি। তদীয় শোকমগ্ন পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা ও শক্তি আমার নাই, তাঁহার সঙ্কল্পিত অসম্পন্ন কার্য্যাবলীই তাঁহার পরিবারবর্গকে শোকসংবরণে ও কর্ম্ম-প্রেরণা-সঞ্চারণে সাহায্য করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীহলধর রায়।

দেশবন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ

I must not ^any longer^ write an appreciation of Deshabandhu. A brother does not sing the praises of his father's son. If he bears true love to him, he does what he knows to be his wishes. So must it be with me and all those who loved Deshabandhu as brother, father or guru. There is no mistaking his wishes. He has left what has now turned out to be his last testament regarding one of his many activities. He bequeathed his mansion for charitable and educational purposes. The amelioration of the condition of women was a dear object with him. And so Bengal has decided to perpetuate his memory by freeing the mansion from debts and by using it ~~for~~ as a hospital for women and as an institution for training nurses. Careful inquiry shows that both these are a crying need. In order to make an unpretentious beginning <u>at least</u> Rs 1000000 are required. An appeal for that amount signed by leading men of all parties is now before the public. It is then the first duty of every Bengali whether living in Bengal or residing

elsewhere to ensure the success of the appeal by himself or herself contributing the maximum amount possible and inducing friends to do likewise. There should be no procrastination in the matter. It is a true saying that he gives twice who gives promptly. I hope that the Editor of Basumati will invite its readers to send him their quota and that the readers will overwhelm the office with their donations.

For many of us, I hope, the giving of a subscription must mean not the end of our contribution to the perpetuation of the memory of our deceased countryman but merely the beginning of it. We must follow out his wishes in other things in so far as it is possible for us. He had been placing of late more and more emphasis on village work. He has left a testament regarding this also. Of this later. But everyone must realise in thinking of villages the necessity of the use of Khadar. The public should know that after his adoption of Khadar Deshabandhu never gave up the use of Khadar. He used often to say that he preferred it to the fine stuff he wore before. Will the readers of Basumati as a permanent token of their love towards this friend of the country resolve henceforth to wear Khadar and nothing but Khadar.

28.6.25

M K Gandhi
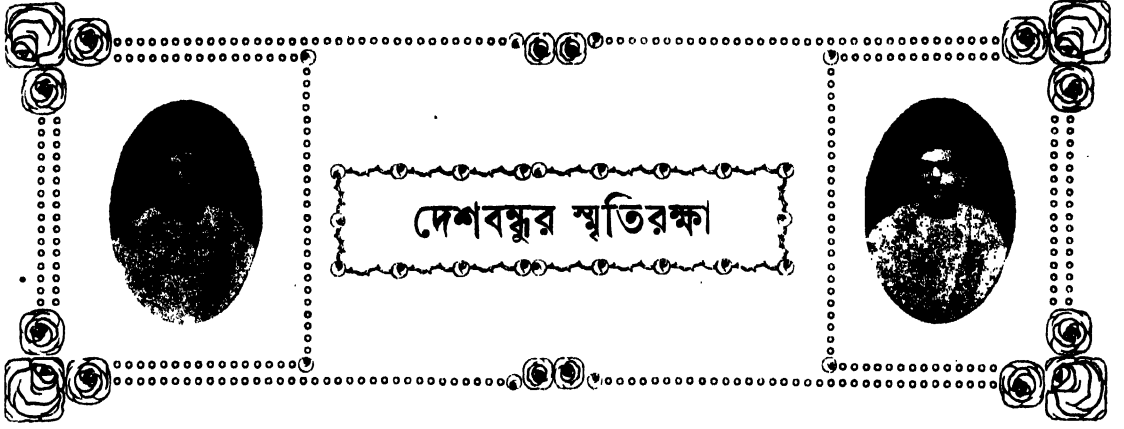
আমি দেশবন্ধুর গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া আর কিছু লিখিব না। ভ্রাতা তাহার ভ্রাতার গুণকীর্ত্তন করে না। যদি সে যথার্থই তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসে, তাহা হইলে তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেন, সেই ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। আমি ও আমার মত যাহারা দেশবন্ধুকে ভ্রাতা, পিতা অথবা গুরুর মত ভালবাসি বা বাসে, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহার জীবনের কি ইচ্ছা ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার কার্য্যবহুল জীবনের এক ভাগের সম্বন্ধে তিনি শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার রসা রোডের আবাসভবন শিক্ষোন্নতি-সাধনের ও দাতব্য কার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। নারীর অবস্থার উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের পরমপ্রিয় বিষয় ছিল। এই হেতু বাঙ্গালার লোক তাঁহার আবাসভবনটিকে ঋণমুক্ত ও উহাকে নারীহাঁসপাতালে পরিণত করিয়া এবং ঐ স্থানে সেবাধর্ম্ম-শিক্ষার্থিনী নারীদিগকে সেবাধর্ম্মে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই দুইটি অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য আড়ম্বরহীন কার্য্যারম্ভ করিতে অন্যূন ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এজন্য সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র সাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রচারিত হইয়াছে। এই হেতু বাঙ্গালার ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক, যেখানে বাঙ্গালী আছেন, সেখানেই তাঁহাদের এই অর্থের জন্য আবেদন সাফল্যমণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা স্বয়ং এবং বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের সকলের যত্নে এই ধনভাণ্ডারে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করুন। এ বিষয়ে অনর্থক কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। কথায় বলে, যিনি শীঘ্র দান করেন, তাঁহার দান দুইবার দানের তুল্যমূল্য। আশা করি, 'বসুমতীর' সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহার পাঠকবর্গকে এই ব্যাপারে সাহায্যদান করিতে আহ্বান করিবেন এবং পাঠকরা সাহায্যদান করিয়া বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির পূর্ণ করিয়া ফেলিবেন।

আশা করি, আমাদের অনেকের পক্ষে এই চাঁদা-দানেই পরলোকগত দেশবন্ধুর স্মৃতিতর্পণ সাঙ্গ হইবে না, পরন্তু উহা হইতে স্মৃতিতর্পণ আরম্ভ হইবে। আমাদিগকে যথাসম্ভব তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী পথে চলিতে হইবে। শেষজীবনে তিনি পল্লীসংস্কার কার্য্যে অধিক পরিমাণে মন দিয়াছিলেন। এ বিষয়েও তাঁহার দেশবাসীর প্রতি শেষ নিবেদন আছে। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু যাঁহারা পল্লীগঠন কার্য্যে মনোযোগ দিবেন, তাঁহাদের ঐ সঙ্গে খদ্দর ব্যবহারের উপকারিতার কথাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দেশবাসীর জানা উচিত যে, দেশবন্ধু একবার খদ্দর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া জীবনে আর উহা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তিনি পূর্ব্বে যে মিহি কাপড় ব্যবহার করিতেন, তাহার অপেক্ষা তিনি খদ্দরই অধিক পছন্দ করেন। 'বসুমতীর' পাঠকগণ দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মানের চিরস্থায়ী নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এখন হইতে খদ্দর ব্যতীত আর কোন কাপড় পরিধান করিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইবেন না কি?

(স্বাক্ষর) এম, কে, গন্ধী।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এক জন ব্যক্তি নহে—যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম-গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comteএর Positivism থাকিতে পারে, Europeএর দুর্দ্ধর্ষ Nation-idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাচিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপকাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় অপরিহার্য্য ত্রুটি থাকিতে পারে—পারে কি, হয় ত আছে; কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে - যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শের, এমন কি, ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europeএর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম-সাহিত্য—আত্মস্থ, সমাহিত, তেজঃপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্রবিশেষ।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে বড়ই পার্থক্য থাকুক, বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই য়ুরোপের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গালার—এমন কি, জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই, যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক-নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটকরচয়িতৃগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে, তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা লইতেছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপ্রয়োগ হউক—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে—যাহা ফরাসীদেশে Volaire, Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গালায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ আপনাদের মধ্যে কেহই শীঘ্র লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন না, আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালার Voltaire ও Rousseau.
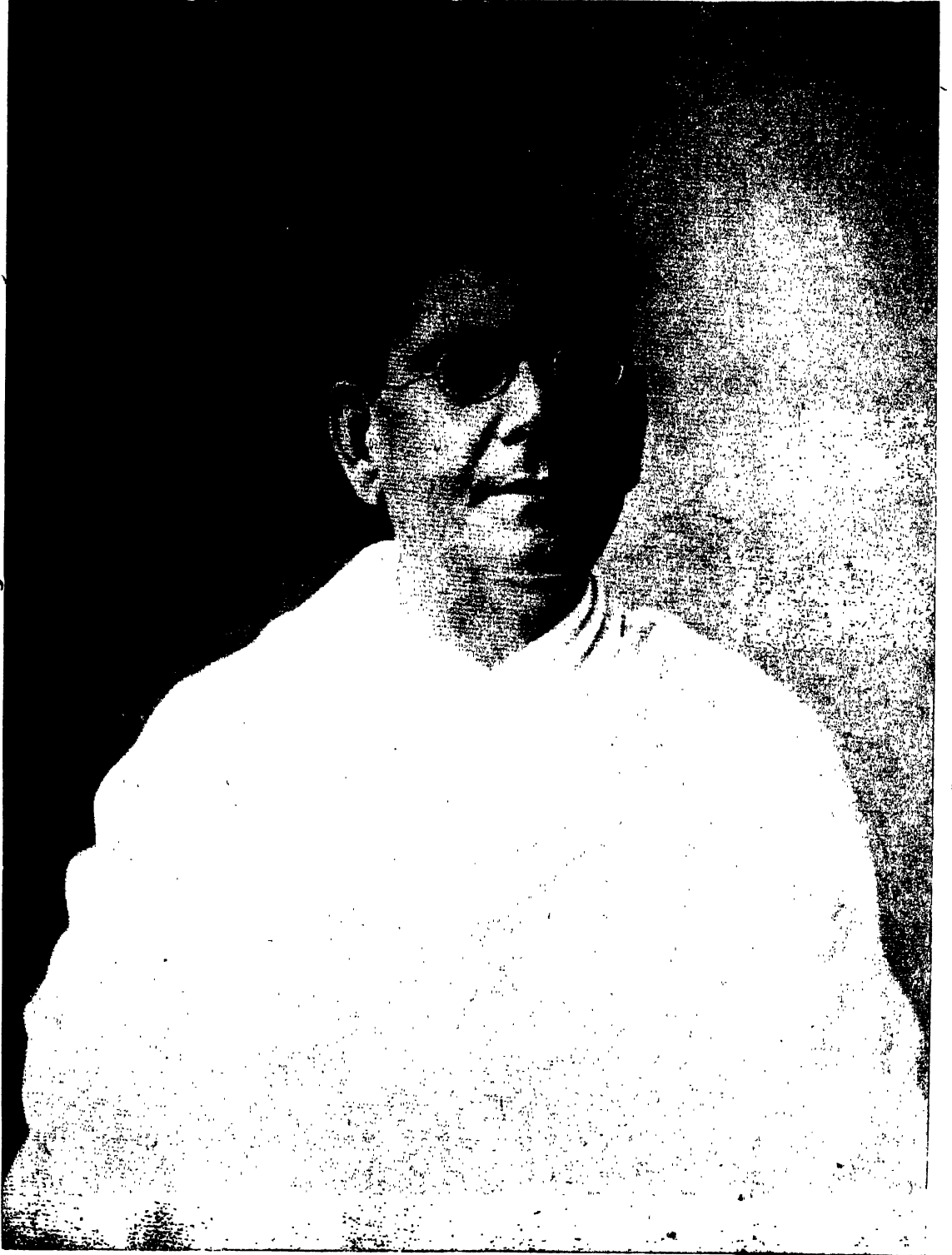
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

কলিকাতার প্রথম মেয়র চিত্তরঞ্জন

আকাঙ্ক্ষা

(কবিবর চিত্তরঞ্জনের অ-প্রকাশিত কবিতা)

আমি চাহি না শিষ্ট, চাহি না শান্ত
চাহি না নিরীহ মেষ।
আমি চাহি যে রুদ্র, চাহি যে চণ্ড,
চাহি বীরেন্দ্র-বেশ।
আমি চাহি না রুগ্ন, চাহি না জীর্ণ,
চাহি না বিদ্বান্ বোদ্ধা ;
আমি চাহি যে হৃষ্ট, বিশিষ্ট পুষ্ট,
চাহি যে সাহসী যোদ্ধা।
আমি চাহি না মিনতি, কৃপা ও বিনতি,
চাহি না অশ্রু-জল ;
আমি চাহি শুধু দম্ভ, গর্ব্ব,
চাহি হৃদয়ের বল !
আমি চাহি না যে বাবু (সে যে নেহাত কাবু)
চাহি না যে আমি খাসা ;
আমি চাহি শুধু তেজস্বী সরল
মুটিয়া, মজুর, চাষা !
আমি চাহি না সভ্যতা, (ভণ্ডামীর কথা)
চাহি না সুন্দর বেশ ;
আমি চাহি শুধু, এই অধিকার,
ভারত আমার দেশ,
আমি চাহি না দর্শন, চাহি না কাব্য.
চাহি শুধু আমি এই,
ভারতবর্ষ—ভারতবাসীর ;
পর-অধিকার নেই।

চিত্তরঞ্জন দাশ।

বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন

শুনিয়াছি, কোন প্রতিপক্ষ সিনিয়র কৌন্সলি ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া এক সময়ে চিত্তরঞ্জনকে উপহাস করিলে, তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "We do'nt only read histories, we make histories." আমরা ইতিহাস কেবল পড়ি না, গঠনও করিয়া থাকি। কথাটা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে, সভ্য জগতে বাঙ্গালার ইতিহাস তৈরী হইয়াছে। একা চিত্তরঞ্জন আজ বাঙ্গালার গৌরব উন্নত গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাস গঠন করিয়া অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, সপ্তকোটি নরনারীর দাসত্ব-শৃঙ্খল একা মুক্ত করিতে গিয়া নিজে দেহপাত করিয়াছেন। আমরা চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়াছি বটে, কিন্তু বাঙ্গালী আজ সগর্ব্বে আত্মপরিচয় দিয়া বলিতে পারিবে, "আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালা আমার জন্মভূমি।" অতীত কাহিনী গাহিয়া বাঙ্গালীকে আজ আর অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর চক্ষুতে অশ্রু শুষ্ক হইবে না—এই অভূতপূর্ব্ব পুরুষের অকাল মহাপ্রয়াণে।

সমগ্র ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনকে নেতৃস্বরূপে সসম্মান সংবর্দ্ধনা করিয়াছে, কিন্তু আমি জানি - যাহারা চিত্তরঞ্জনকে জানিয়াছে সকলেই জানে—তিনি বাঙ্গালী থাকিতেই ভালবাসিতেন, বাঙ্গালার সুখ-দুঃখ লইয়াই বাঁচিতে মরিতে চাহিতেন, এবং বাঙ্গালা হইতেই ভারতের গতি নির্দ্দেশ করিতে ভালবাসিতেন। তখনও তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন নাই, মোকর্দ্দমার নথিপত্রে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, বিলাসব্যসন তখনও তাহার বিরাট প্রাণতার চতুর্দ্দিক অধিকার করিয়া ছিল; কিন্তু তখনই প্রথমে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর উচ্চ মঞ্চ হইতে আমাদিগকে তাঁহার বাঙ্গালার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন—"আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে, আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী-মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।" প্রথম হইতেই বাঙ্গালাকে এত প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বদা বলিতেন—"আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না।"

বাস্তবিক সাধকের কাছে যেমন তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি অতি জাগ্রত, অতি পবিত্র, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম, চিত্তরঞ্জনও বাঙ্গালার সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই পূজা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের ধারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি সবই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নালোকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া চিত্তরঞ্জনের চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িত। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিত। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিত। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে থাকিত। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে তিনি মজিলেন। বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥

সেই মা'কে দেখিলেন—চিনিলেন। বঙ্কিমের গান তাঁহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" তখন "বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন, কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্ক-রাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক,মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জানিলাম, মা আমার আপনগৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।"

ভবানীপুরে এই মূর্ত্তিকল্পনায় অনেকে হাসিয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তকোটি নরনারীর জন্ত বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন একাই বঙ্কিমের সাধনা সার্থক করিয়াছেন। একাই সপ্তকোটি দেহের পরিবর্ত্তে দেহপাত করিয়াছেন, দ্বাদশ কোটি চক্ষুর জন্ত একা কাঁদিয়াছেন; একাই অধর্ম্ম, আলস্ত, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া, ভ্রাতৃবৎসল হইয়া, পরের মঙ্গলসাধন করিয়া, মায়ের পূজার অধিকারী হইয়াছেন এবং একাই সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল অনন্ত কাল-সমুদ্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিমজ্জিত মাতৃমূর্ত্তির উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। গত বর্ষের কাঁঠালপাড়া সাহিত্য-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতেই এই মূর্ত্তির বোধন করিতে করিতে চিত্তরঞ্জন কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই বঙ্কিম-সেবিত তীর্থভূমিতে বঙ্কিমের আত্মা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি একাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু নষ্ট করেন নাই, বাঙ্গালার মাটীতে আরও কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, আরও ধ্যাননিষ্ঠ তাপস আসিয়াছে। মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধকপ্রবর বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া গদ্‌গদভাবে সাক্ষাৎ দেখাইয়া গেলেন —বঙ্কিম-সেবিত সেই মাতৃমূর্ত্তি জননী জন্মভূমি সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা—দিগ্‌ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী; দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানশালিনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ।

কোথায় পাইলেন চিত্তরঞ্জন এই বিরাট শতযূথের বল, অপূর্ব্ব সাধনা, মাতৃভূমির বন্ধনমোচনে সহস্র সিংহের বিক্রম? সেই বঙ্কিম-নির্দ্দেশিত একমাত্র পথ অকপট ঐকান্তিক অবিমিশ্রিত স্বদেশভক্তি! 'আনন্দমঠে' পড়িয়াছি—জনশূন্য, পথশূন্য, বিরাট, অন্ধতমোময় অরণ্যে, নিস্তব্ধ রজনীতে সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?" সমস্ত নিস্তব্ধ। আবার প্রশ্ন হইল, আবার নিস্তব্ধতা আসিল। এইরূপে তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইলে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?" প্রত্যুত্তর বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।" প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে?" "আর কি দিব?" তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।" দেশসেবায় চিত্তরঞ্জন এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিতেই মায়ের পূজা করিয়া গিয়াছেন। এই ভক্তিতেই এক মুহূর্ত্তে ধূলিমুষ্টির ন্যায় রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছেন, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সামান্য ভেলার সহায়তায় ভীষণ কীর্ত্তিনাশা পার হইয়াছিলেন; স্ত্রী-পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া স্বয়ং কারাগৃহ বরণ করেন; স্বরাজ-সাধনায় যাহা কিছু ছিল, সমস্ত উৎসর্গ করিয়া ফকীর হয়েন, দ্বৈতশাসন অচল করেন এবং মরিবার সময়েও বাঙ্গালার উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে শেষ উদ্বোধনমন্ত্র পাঠ করাইয়া সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন—

আসিবে—তখন সংযত, শান্ত পদক্ষেপে সেই শান্তিময় মিলন-মন্দিরে—সমুন্নত শিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে। তখন তোমরা সর্ব্ব-প্রকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিবে। জয়ী যে, সে দম্ভ করে না; বীর যে, সে জয়ের পরে অবনত হয়।"

অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, কেন চিত্তরঞ্জন কিছু সঞ্চয় করিয়া আসিলেন না, কেন দুই একটা বড় বড় মোকর্দ্দমা করিয়া অর্থাভাব পূর্ণ করিলেন না? কিন্তু হায়, তাঁহারা জানেন না, ঝড় যখন উঠে, তেঁতুলগাছ, চারাগাছ এক হইয়া যায়। চিত্তরঞ্জনও বলিতেন, "প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না; মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না; না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ এক দিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে।"

শ্রীমান্ চিররঞ্জন—শ্রীমতী অপর্ণা ও কল্যাণী

"তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে—এ যুগে বহু স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছ বহু কষ্ট পাইয়াছ—তোমাদের উপরেই রাজরোষ সংহারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আইসে নাই, যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামলাভ করিতে পার। যুদ্ধক্ষেত্র এখনও তোমাদের অপেক্ষায় কলকোলাহলে মুখরিত। যাও, বীর, যুদ্ধ কর। ইতিহাসের একটা মহা গৌরবান্বিত যুদ্ধের সৈনিক তোমরা—তাহা কদাপি ভুলিও না। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া আসিবে—নিশ্চয়ই

আট বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণ বিলাসব্যসনের মধ্যেও তাঁহার মুখে যে কয়টি প্রাণের কথা বাহির হইয়াছিল, তাঁহার নিজ জীবনেই তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। আপনাকে সম্যক্ না চিনিলে কি কেহ এই কথা বলিতে পারে? ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসেই তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "দশ বৎসর পরে ব্যবসা ত্যাগ করিব।" দশ বৎসরের পূর্ব্বেই স্বদেশব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন এবং যে সময়ে তাহা করেন, তখন এক মিউনিশন বোর্ডের মোকর্দ্দমারই মাসে ৫০ হাজার টাকা পাইতেন।

বাঙ্গালার কথায় তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার ভালবাসা সাধকের অনুরাগ, ঐ ত্যাগ সাধকের ত্যাগ, একনিষ্ঠতা সাধকের প্রেম। বাঙ্গালার লজ্জা ও মানরক্ষার জন্য তিনি দেশবাসীকে সর্ব্বদা মিনতি করিতেন,উদ্বোধিত করিতেন, বাঙ্গালার পরাজয়ে ব্যথিত হইতেন। কোকনদ কংগ্রেসে কি অদ্ভুত তেজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, "You may delete the Bengal Pact, but you cannot delete Bengal from the history of the world"

এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন "দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই।" কিন্তু হইবার কি করিবার অধিকারের অপেক্ষা নায়কত্ব রাখে না। নায়ক যে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নায়ক হইয়া জন্মায়, গড়িয়া পিটিয়া নায়ক তৈয়ারী হয় না। আজ সমস্ত বাঙ্গালার হৃদয় অধিকার করিয়া চিত্তরঞ্জন আদর্শ নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছেন। এ নায়ক আপনার বিরাট হৃদয় লইয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন। যন্ত্রচালিতের ন্যায় রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ভিখারী, মুচি, মেথর তাঁহার কথায় উঠিতেন, বসিতেন এবং সমস্ত যুক্তিতর্ক বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের বলে তাঁহার মত গ্রহণ করিতেন। মাতৃভক্ত বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন তাঁহার মাতৃদত্ত দানের সার্থকতা করিয়াছেন। যখন বাধাবিঘ্নে উত্যক্ত হইতেন, ব্যথা-বেদনায় জর্জ্জরিত হইতেন, আমি তাঁহাকে বলিতাম,"আপনি গিরিশ ঘোষের 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মিরকাশিম' পড়িয়াছেন,আমি কেবল দেখি,আপনাকে লইয়াই যেন ঐ দুইখানি নাটক রচিত হইয়াছিল, তাঁহার কল্পিত নায়ক তিনি 'মিরকাশিমে' দেখাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে আপনাকে দেখিয়া সার্থক হইতেন।" বই কয়খানি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রাঙ্কন বন্ধ বলিয়া আমি দেখাইতে পারি নাই। তিনি উত্তর দিতেন, "ওঁরা (কবি) সমগ্র ভাবের অগ্রদূত কি না, ওঁরা বুঝবেন না, বুঝবে কে? তবে বাধাবিঘ্ন ব্যতীত কোন কার্য্যই জাগ্রত হইয়া উঠে না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর এত অযথা আক্রমণে মাঝে মাঝে মনটা বড় দমিয়া যায়, দেশ ত আমার নিজের নয়।"

শ্রীমতী সুনীতিদেবী

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "বাঙ্গালার দুঃখমোচন কর, সন্তানের কার্য্য কর—অগ্রসর হও, সমবেত চেষ্টায়, সকলের উদ্যমে বাঙ্গালীর স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থে আহুতি দিয়া, শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে জীবনযজ্ঞ আরম্ভ কর।" আজ চিত্তরঞ্জনের নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার বিরাট নেতৃত্ব অনুভব করিতেছি, এখনও দেখিতেছি, তিনি আছেন, তিনি অমর, স্বর্গ হইতে তিনিই আমাদের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তবে এস ভাই বাঙ্গালী, তুমি ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টান্ হও, এস একবার, সকলে মিলিয়া মাতৃশৃঙ্খল উন্মোচন করি। ঐ যে মা ডাকিতেছেন, এস, আলস্য ত্যাগ করিয়া এস, বিসংবাদ বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া এস। জাগ্রত সিংহবিক্রমে এস। সাত কোটি আমরা, ভয় কি, আর ভয় নাই, মৃত্যু আমাদিগকে অভিভূত করিবে না, ঐ যে—ঐ যে অমর চিত্তরঞ্জন স্বর্গ হইতে আলোকহস্তে পথ দেখাইবার জন্য সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া অগ্রসর হও, চল, পশ্চাৎ হটিও না; চিত্তরঞ্জনের আত্মার তৃপ্তি উহাতেই সাধিত হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্ত।
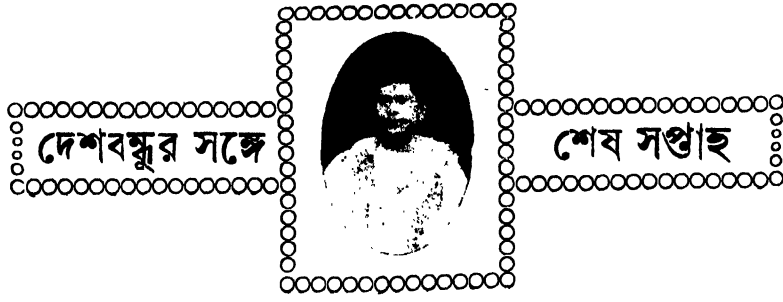
বুধবার ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন—

দার্জ্জিলিংএ এসেই শোনা গেল যে, দেশবন্ধু শ্রীযুত নৃপেন্দ্র সরকারের বাড়ীতে আছেন। ৯ই জুন বিকাল-বেলায় বাহির হইয়া প্রথমেই কাব্যরসিক শ্রীযুত বীরবলের স্যাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দার্জ্জিলিংএর চৌরাস্তায় পা দিতে না দিতে দেখলুম যে,দেশবন্ধু আস্তে আস্তে সাবেক লেবং রোড ধ'রে উঠে আসছেন। সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বল্লেন, "তুমি যে আসছ এবং অনেক দিন ধ'রে আসছ, এ কথাটা অনেক দিন ধ'রে শুনে আসছি।" আমি ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, তা দেখে তিনি বল্লেন; "তুমি ভাবছ, আমাকে কে বলেছে? এখন তোমার চেলা নেড়া গোঁসাই আমার ডান হাত হয়ে উঠেছে।" দেখলুম যে, কিছুদিন দার্জ্জিলিংএ থেকে দেশবন্ধুর চেহারাটা অনেকটা ভাল হয়েছে; কিন্তু পোষাক বদ্‌লে ফেলে একটু বদ্‌লে গিয়েছেন। দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংএ এসে শীতের জন্য গৈরিক রঙ্গের কাশ্মীরী পট্টুর একটা আলখাল্লা আর কাশ্মীরী পশমের টুপী পরতে আরম্ভ করেছেন; তাতে তাঁকে প্রথমে দেখলে পঞ্জাবের সনাতন শিখ সম্প্রদায়ের মহান্ত ব'লে ভুল হয়। মুখে দুরন্ত রোগের চিহ্ন তখনও স্পষ্ট বিদ্যমান; কিন্তু তিনি দার্জ্জিলিংএ আসবার দিন কতক পূর্ব্বে যে রকম চেহারা দেখেছিলুম, তার তুলনায় অনেকটা শুধরেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ঠাণ্ডায় এসে ঘুম হচ্ছে কি?" দেশবন্ধু বল্লেন, "সমস্ত উপসর্গই গেছে, কেবল সোমবারের দিন জর হয়। গেল সোমবারের দিন জরটা একটু কম হয়েছিল, আসছে সোমবার যদি জর না হয়, তা হলেই বুঝবো যে, আরাম হয়ে গেলুম।"

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে লোক দেশবন্ধুকে ঘিরে দাঁড়াল। বীরবল ব'সে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কত দিন থাকা হবে?" দেশবন্ধু বল্লেন, "যদি থাকতে দেয়, তা' হ'লে নবেম্বর পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংএই কাটাব মনে করছি।" বীরবল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "থাকতে দিচ্ছে না কে?" "যারা চিরদিন দেয় না। কর্ত্তারা যদি কাউন্সিল ডাকেন, তা' হ'লে হয় ত একবার নেমে যেতে হবে।"

বাঙ্গালার কর্ত্তাদের মধ্যে আমার ধর্ম্মসম্পর্কে এক খুড়া মহাশয় সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন, দেশবন্ধু তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলেন মহাশয়, দার্জ্জিলিংএ কি বেশী দিন থাকতে পাব?" খুড়া মহাশয় বললেন, "বোধ হচ্ছে যেন পাবেন। শুনছি যে, কাউন্সিল আর হালে ডাকা হবে না।"

"সে কথা ত অনেক দিন ধরেই শুনে আসছি; কিন্তু ছাপার অক্ষরে না দেখলে আর বিশ্বাস হচ্ছে না।"

চৌরাস্তা ছেড়ে দেশবন্ধু Observatory Hillএর বাঁ দিকের রাস্তাটা ধ'রে চলতে আরম্ভ করলেন। চৌরাস্তা ছাড়িয়েই দেশবন্ধু বল্লেন, "রাখাল, হেমেন্দ্র আসছে যে?" আমি বল্লুম, "বেশ ত।" "আমার এখানেই এসে উঠবে। দেখ, দু'এক জন বন্ধু বলছেন যে তোমার—— লেখাটায় উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে না। ইংরাজী অনেকটা শুধরেছে বটে, শুধরেছে কেন, একরকম বদ্‌লেই গেছে; কিন্তু বিলাতী কাগজে dramatic criticismএ যে terminology ব্যবহার করা হয়, তুমি তা ব্যবহার কর না কেন?" আমি বল্লুম, "আজ্ঞে, সকলে বোঝে না ব'লে, যেখানে Deus ex machina ব্যবহার করলে সম্পাদক পাদটীকায় তার মানে লিখে দিতে বলেন, সেখানে বিলাতী terminology ব্যবহার করলে লোক পড়বে না।"

"দেখ, আমি যখন পাটনায় ছিলুম, তখন——কাগজের ঐ পাতাটা একেবারেই পড়তুম না। এখানে এসে দুই এক দিন পড়ি। এখানে এসেছি বটে, কিন্তু সকল

শেষ শয়ন

[দার্জ্জিলিংএ গৃহীত ফটো হইতে।

রকম কথাই কানে আসে। শুনলুম, তুমি না কি—থিয়েটারের সঙ্গে—কাগজের বিবাদ বাধিয়ে তুলেছ? যাঁরা তোমার নামে এ কথাটা লাগিয়েছেন, তাঁদের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে সমস্ত লেখাগুলিই পড়লুম। আমি ত কিছু তোমার অন্যায় বুঝলুম না।"

"আমি কলকাতায় শুনে এলুম যে, আপনি বলেছেন, আমার থিয়েটারের সমালোচনা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে? কোন্‌খানটায় অন্যায় হয়েছে ব'লে মনে হ'ল, একটু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"দেখ, আমাকে যে রকম ভাবে এসে বলা হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল যে, তুমি——থিয়েটারের উপর রাগ আছে ব'লে অত্যন্ত অন্যায়রূপে তাদের আক্রমণ করেছ; কিন্তু প'ড়ে দেখলুম যে, তোমার সমালোচনা অনেকটা tame বিলাতে বিশেষতঃ ফরাসী দেশে থিয়েটারের সমালোচনা এর চেয়ে ঢের বেশী তীব্র হয়ে থাকে।"

এই সময় বীরবল বল্লেন, "দেখ, সমালোচনা জিনিষ বাঙ্গালীর এখনও বরদাস্ত হয় নি। আমাদের দেশে সমালোচনা করলেই বুঝতে হবে যে, এক জন আর এক জনকে গাল দিচ্ছে।"

দেশবন্ধু একটু হাসলেন। কারণ, বীরবলের কথার মধ্যে অনেক দিনের অনেক স্মৃতি জড়িত ছিল। তিনি অন্য কথা পেড়ে বল্লেন, "দেখ রাখাল, কলকাতায় যে কটা বাঙ্গালীর থিয়েটার আছে, তার মধ্যে একটাও থাকা উচিত নয়, সমস্ত বাড়ীগুলিই পুরান, বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী ক'রে কেউ একটা নূতন থিয়েটার করতে

দার্জ্জিলিংএ শবানুগমন

[ম্যাল—দার্জ্জিলিং।

দেশবন্ধু বল্লেন, "দেখ, private enterpriseএ আমাদের দেশে ভাল থিয়েটার হ'ল না। আমার ইচ্ছা আছে যে, কর্পোরেশনকে দিয়ে Continental Eruropeএর National Theatreএর মত একটা বাড়ী তৈরী করিয়ে——এর মত এক জন যোগ্য অভিনেতার হাতে দিই।"

বীরবল বল্লেন, "এমনই ত ঝগড়ার চোটে বাঙ্গালীর থিয়েটার অস্থির, তার উপর যদি এ রকম পক্ষপাত করা হয়, তা হ'লে এক দল লোক ক্ষেপে উঠবে।"

"ক্ষেপে ওঠ্বার কথা নয়। ——দের দিয়ে আর বিশেষ উন্নতি হবে ব'লে বোধ হচ্ছে না। যদি হয়, তা হ'লে——কে দিয়েই হবে, না হয় ত হবে না।"

Northern Bengal Mounted Riflesএর head-quartersএর উপরে যে বড় বসবার ঘরটা আছে, সকলে সেখানে ব'সে পড়া গেল। দেশবন্ধু বল্লেন, "বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই, মনে হচ্ছে যেন শরৎকাল।" সত্য সত্যই দেশবন্ধুর জীবনের শেষ সাত দিন দার্জ্জিলিং জুন মাসের মাঝখানেও যেন শরতের মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল, সমস্ত দিন ফুট ফুট রদ্দুর, কাঞ্চনজঙ্ঘা শুভ্রমূর্ত্তি, সমস্ত দিনই দেখা যায়। সে যেন বর্ষাকালই নয়। রাত্রি অনেক হয়েছিল, ফিরবার উদ্যোগ করা গেল।

পাল্লে না। এই শিশির ভাদুড়ী যে বাড়ীতে থিয়েটার কচ্ছে, সেটা কি ভয়ানক পুরান অন্ধকার বাড়ী!"

আমি বল্লুম, "আপনি ত তবু ভেতরটা দেখেন নি, একটা বসবার ঘর নেই, শিশির পাশের একটা বাড়ীতে নীচের তলায় কতকগুলো dressing room করতে বাধ্য হয়েছে। মনোমোহন থিয়েটারে একটিমাত্র ভাল বসবার ঘর আছে, শুনতে পাওয়া যায় যে, বাড়ীর মালিক শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে সেটি নিজের দখলে রেখেছেন।"

বৃহস্পতিবার, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন—

সকালবেলায় আর বেরুন হ'ল না। বিকেলবেলায়

দার্জ্জিলিঙ্গে রোগশয্যায় দেশবন্ধু ও পার্শ্বে কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী

[দেহাবসানের তিন দিবস পূর্ব্বে গৃহীত ফটো হইতে] [শ্রীমান্ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

নাগপুরে কংগ্রেসকর্ম্মী বাঙ্গালী যুবকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে দেশবন্ধু। ['ফরওয়ার্ড' হইতে।

চৌরাস্তায় উপস্থিত হয়েই দেখলুম যে, দেশবন্ধু এক-খানা বেঞ্চিতে ব'সে আছেন, তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কি রকম আছ ?" আমি বল্লুম, "বেশ ভালই আছি, দার্জ্জিলি'এ জুন মাসে এ রকম অবস্থা ২৫ বৎসরের মধ্যে দেখিনি। আপনি কেমন আছেন ?" দেশবন্ধু বল্লেন. "গেল হপ্তার চাইতে একটু ভালই বোধ হচ্ছে। এ সোমবারে যদি জ্বরটা না আসে, তা হ'লে বোধ হয় সেরে গেলুম। একটু একটু ক্ষুধাও হচ্ছে, ঘুমও হচ্ছে. ক্রমশঃ আবার কায করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

নানা কথার পরে দেশবন্ধু——কাগজের কথা তুল্লেন। তিনি বল্লেন, "দেখ, অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে যে, কাগজখানা রোজ ১২ পাতা না ক'রে ১৬ পাতা করি, আর রবিবারের দিন ২৪ পাতার বদলে ৩২ পাতা করি। রবিবারের দিন যে সমস্ত লেখা বেরোয়, তার ধরণ একেবারে বদ্‌লে না ফেল্‌তে পারলে কাগজখানা স্থায়ী হবে না। তুমি——এর ভার নিতে পার ?"

আমি বল্লুম, "আপনার হুকুমে একটা ভার ত নিয়েছি এবং তার জন্ত অনর্থক গালাগালি যথেষ্টই খাচ্ছি, আবার যে ভারটার কথা বলছেন, সেটা নিলে আর এক জনের অন্ন যাবে, সে গালাগাল দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদের সমালোচনা করব, তারা দল বেঁধে গাল দিতে আরম্ভ করবে।"

দেশবন্ধু বল্লেন, "দেখ, সকল দেশেই একটা ভাল কায আরম্ভ করলে, দেশের লোক প্রথমে গালাগাল দিতে আরম্ভ করে। যে যুগে কাযটা আরম্ভ হয়, সে যুগে লোক কেবল গালাগালই দেয়, কিন্তু তার appreciation হয় পরের যুগে।" ঠিক এই সময়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুত——দেশবন্ধুর নিকটে এলেন। দু'একটা কথার পর দেশবন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন বই কি লিখছেন ?" অধ্যাপক——বল্লেন, "——খানা শেষ হয়ে গেছে, এইবার পরের যুগের ইতিহাস আরম্ভ করব মনে কচ্ছি।" আমি বল্লুম, "দেখুন অধ্যাপক মহাশয়, ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলো যদি সাধারণ পাঠকের উপযোগী ক'রে——কাগজে মাসে দু'একবার ছাপানো হয় ত ভাল হয়। আমাদের দেশে যে সমস্ত বড় বড় ঘরের লোক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁদের পুরান কাগজপত্র ঘেঁটেই ঐ ঐতিহাসিক এই বিরাট ইতিহাস লিখেছেন। ইতিহাসের মাল মশলা কেমন ক'রে সংগ্রহ হয়,তা যদি দেশের লোকের জানা থাকে, তা হ'লে আর আওরঙ্গজেবের মহিষী উদীপুরী বেগমের ঘরে জয়-পুরের রাজা রামসিংহকে হয় ত দেখতে পাওয়া যাবে না। অধ্যাপক শ্রীযুত——যখন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী-সাহিত্য অধ্যাপনা করতেন, তখন থেকেই তাঁকে দেখলে মনে এমন একটা বিরাট ভয়ের উদয় হতো যে, এখনও তাঁকে দেখলে জড়সড় হয়ে যাই, কিন্তু সে দিন ম্যাল রোডের ধারে এই দুরন্ত অধ্যাপকটির ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। গৈরিক পরা দুর্ব্বল দুরন্ত রোগাক্রান্ত এই ক্ষুদ্রাকার লোকটির সম্মুখে এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাশালী অধ্যাপকটিকে গুরুমহাশয়ের সম্মুখে দুষ্ট বালকের মত মনে হ'তে লাগলো। দেশ-বন্ধুর অদৃশ্য প্রতিভা তখন যেন তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। প্রস্তাবটা আমি যখন করেছিলুম, তখন আমা-দের অধ্যাপক মহাশয় যে কায করতে সম্মত হবেন, এ আশা আমার মনে একবার ভুলেও উদয় হয়নি। বাদ-শাহ মহম্মদ শাহের কোকীজীউ এবং পারস্যদেশীয় মন্ত্রী নজর খাঁ দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চর্চ্চা ছেড়ে তিনি যে অন্ততঃ মুখেও——কাগজে ভারতবর্ষীয় পাঠকের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য সরস করতে প্রতিশ্রুত হবেন, তা আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু দেশবন্ধু অনুরোধ করা মাত্র অধ্যাপক মহাশয় বিনীতভাবে তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে সম্মত হলেন। তিনি বল্লেন, "আপনি যখন বলছেন, তখন করতেই হবে।" তখন আমার মনে হলো যে, ছোট বেঁটে লোকটির পিছন দিকে তাঁরই একটা অদৃশ্য বিরাট আকার আছে—যা আমাদের এই দুরন্ত শিক্ষকটিকে অভিভূত ক'রে ফেল্লে।

শুক্রবার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন—

সকালবেলায় আজও বেরুন হয়নি। বিকালবেলায় অধ্যাপক——র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল এবং সেখানে অনেকগুলি জ্ঞানপিপাসু ভদ্রমহিলাকে সিন্ধুদেশের

সোনা শুকনো উটের মাংসের সরস কাহিনী শোনান হচ্ছিল, এমন সময় দেশবন্ধু এসে উপস্থিত। তাঁর যে এখানে আসবার কথা ছিল, তা আমি জানতুম না। তিনি আসতেই আমার বক্তৃতাটা থেমে এলো। আমিও বাঁচলুম; কারণ, এক অপরিচিতা মহিলা কোনও যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে একটি সুন্দর গান গাইতে আরম্ভ করলেন, অধ্যাপক——র গৃহে অনেকক্ষণ কাটিয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল, তখন প্রায় ৮টা বেজেছে। দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে আমি এবং অধ্যাপক——ও বেরিয়েছিলুম। সরকারী রাস্তায় এসে আমরা দু'জনই তাঁকে রিকশায় চড়তে অনুরোধ করলুম; কিন্তু তিনি বল্লেন, "গানটা এখনও কানে বাজছে, চল, একটু হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে যাই। এমন সুন্দর weather দার্জ্জিলিংএ প্রায় পাওয়া যায় না। দরবারী কানাড়া কি সুন্দর গাইলে!" দেশবন্ধু তখন চলতে আরম্ভ করেছেন, আমি আর একবার রিকশায় চড়তে অনুরোধ করতেই তিনি বল্লেন, "দেখ, এ যে হেঁটে যাচ্ছি, আমার মনে হচ্ছে, আমি সুস্থ মানুষ, গানের সুরটা এখনও কানে লেগে আছে, কিন্তু রিকশায় চড়লেই মনে হবে, যেন আমি কত দিনের রোগী, আমার যেন আর বাঁচবার আশা নেই।" নামতে নামতে দরবারী কানাড়ার ১৮ রকম কথা কইতে কইতে আমরা যখন Auckland Roadএ এসে উপস্থিত হলুম, তখন অধ্যাপক——দেশবন্ধুকে তাঁর বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে অনুমতি চাইলেন। দেশবন্ধু বল্লেন, "আসুন না, বেড়ান হয়নি, আজ শরীরটা ভাল আছে, একটু পায়ে হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে কচ্ছে।" পথে যেতে যেতে দেশবন্ধু সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করলেন, অধ্যাপক——এবং তাঁর ছাত্র হিসাবে আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ, সুতরাং আমরা উভয়ে চুপ ক'রে রইলুম। দেশবন্ধু বল্লেন, "এই দরবারী কানাড়া গাইতে পারতো——রাখাল, তোমার তাকে মনে আছে?" সে লোকটিকে আমার বিলক্ষণ মনে ছিল, কারণ,আমার বোম্বাইএর বন্ধু বিষ্ণু ও ভালচন্দ্র সুখঠঙ্করের পরমাত্মীয় পূজনীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে লোকটির কথা আমাকে অনেকবার বলেছিলেন। দেশবন্ধুর জীবনে সাহিত্যচর্চ্চার যুগে তাঁর বাড়ীতে অবশ্য প্রতিপাল্য এবং অপ্রতিপাল্য যতগুলি লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, পুনায় ৮।১০ বৎসর থেকে তাদের সকলেরই নাম ভুলে এসেছিলুম, সুতরাং ভাতখণ্ডে রাও সাহেব——র কথা না বল্লে তার কথা নিশ্চয় মনে থাকতো না। ক্রমে গানের কথার মধ্যে কীর্ত্তনের কথা উঠলো। দেশবন্ধু বল্লেন, "দেখ, গঙ্গাযাত্রা করবার সময় অথবা মড়া নিয়ে যাবার সময় কীর্ত্তন গাইতে গাইতে নিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের কি সুন্দর প্রথা! যত রকম গান আছে, তার মধ্যে রোগ, শোক, দুঃখ ভুলিয়ে দেবার শক্তি কীর্ত্তনের যত আছে, এত বোধ হয় আর কিছুরই নেই। আমার এক আত্মীয়কে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় এক বুড়ো বৈষ্ণব অনেককাল আগে গেয়েছিল;—

যাদবায় মাধবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

তার পর কত কীর্ত্তন শুনেছি, রাখাল, তুমি আমার বাড়ীর কীর্ত্তনের মজলিস দেখেছ তো? আমার মনে হয়, সেই বুড়োর গানের মত প্রাণ মাতান ধ্বনি আর কোন দিন আমার কানে পৌঁছয়নি।"

দেখতে দেখতে চৌরাস্তায় এসে পড়া গেল। অধ্যাপক——আশা করেছিলেন যে, দেশবন্ধু সটান Step Asideএ নেমে যাবেন; কিন্তু চৌরাস্তায় এসেই দেশবন্ধু বল্লেন, "রাখাল, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ত? পা ধ'রে গিয়ে থাকে ত আর একটু ব'স।" আমি তখন আর কোন্ লজ্জায় বলি যে, আমার পা ধ'রে গিয়েছে? কাযে কাযেই বল্লুম, "না, আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হইনি। চলুন, আপনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।" দেশবন্ধু কি সহজে ছাড়বার পাত্র! তিনি বল্লেন,"তা হ'লে চল,Observatory Hillটা ঘুরে আসি।" পথে যেতে যেতে আমি খোঁড়াচ্ছি দেখে দেশবন্ধু বল্লেন, "রাখালচন্দ্র, দিব্যি খোঁড়াচ্ছ যে। তবে চল, একটু বসা যাক্।" Northern Bengal Mounted Riflesএর head quartersএর উপরে ব'সে তবে বাঁচলুম। দেশবন্ধু তখন অধ্যাপক——সঙ্গে কথা কইছেন,——কাগজ নিয়েই কথা হচ্ছে, কাগজের Manager শ্রীযুক্ত বী——ভয়ানক কড়া লোক,

বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁর টাকার কড়া তাগাদায় ব্যস্ত হয়ে দেশবন্ধুকে চারিদিক থেকে চিঠি লিখছে। কাগজের সম্পাদকবর্গ স্বরাজ্যদলের সকল লোকের কথা কানে তোলেন না; সুতরাং তাঁরাও চারিদিক থেকে ব্যথা জানিয়ে দেশবন্ধুকে অস্থির ক'রে তুলছেন। মোটের উপরে বায়ু পরিবর্তন করতে দার্জ্জিলিংএ এসেও তিনি যে অভিযোগ, অনুযোগ আর পত্রের চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, এ কথাটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। সে রাত্রিতে নেড়া ভাই ওরফে শ্রীমান্ অনুপলাল গোস্বামী আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি এই সুযোগে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "নেড়া, তোদের——কাগজ এসেছে?" নেড়া বল্লে, "হাঁ।" আমাদের এই কথাটাও দেশবন্ধুর কান এড়ায় নি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলাবলি কচ্ছ হে?" আমি বল্লুম, "এই কালকের কাগজের কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম। আপনি এবারকার লেখাটা পড়েছেন কি?" দেশবন্ধু বল্লেন, "না।" "তবে খেয়ে উঠে যখন তামাক খাবেন, তখন নেড়া আপনাকে প'ড়ে শোনাবে।"

দেশবন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তার পর আস্তে আস্তে বল্লেন, "তামাক——তামাক ত অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি, রাখাল!" আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ১০ বৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধুর জীবনে সাহিত্য-চর্চ্চার যুগে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে তামাকই তাঁর অবসররঞ্জনের একমাত্র উপাদান ছিল, সমস্তই ত তিনি ছেড়েছেন; তার সঙ্গে তামাকও। আমার মনের ভাব বুঝেই যেন তিনি বল্লেন, "তামাক ছাড়তে কষ্ট হয়েছিল,রাখাল, এত কষ্ট বোধ হয় আর কোন জিনিষ ছাড়তে হয়নি। মনে কর দেখি, তামাক যদি ছাড়তে না পারতুম, তা হ'লে জেলে গিয়ে আমার কি ভীষণ অবস্থা হতো! আমি দেশের লোককে বিলাসের সমস্ত উপাদান ছাড়তে বলছি, আর আমি নিজে তামাক খাব!" আমি আস্তে আস্তে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বল্লুম, "আর ত জেলে যাচ্ছেন না; সুতরাং এখন তামাক ধরলে ক্ষতি কি?" প্রস্তাবটা যে অত্যন্ত বেয়াকুবের মত হয়েছিল, তা উত্তর শুনেই বুঝতে পারলুম। দেশবন্ধু বল্লেন, "জেলে যাচ্ছি না, তোমায় কে বল্লে? এখনও কতবার জেলে যেতে হবে, কে জানে? হয় ত এক——কে খালাস করবার জন্য অন্ততঃ ৫।৭ বার জেলে যেতে হবে।" এই সময়ে অধ্যাপক——আমাকে রক্ষা করলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আপনার মতের একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে?" সে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলুম, দেশবন্ধুর চোখ দুটো একবার দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো, তিনি বল্লেন, "যারা বলছে, তারা আমায় ভাল রকম চেনেনি, আর শত্রুপক্ষ এই নিয়ে খুব হাসা-হাসি কচ্ছে বটে। যে উদ্দেশ্যে করেছি, তা যদি কখনও সিদ্ধ হয়, তা হ'লে উদ্দেশ্য আর বিধেয় সকল কথাই দেশের লোককে জানিয়ে যাব।" দেশবন্ধু চ'লে গিয়েছেন। সে বিধেয় আর সে উদ্দেশ্যের কথা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়নি, সুতরাং সে কথা বলবার সময় এখনও আসেনি।

সাড়ে ৮টা বেজে গেল, দেশবন্ধুর খাবার সময় অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গিয়েছে দেখে অধ্যাপক—তাঁকে বার বার বাড়ী ফিরে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন। সকলেই উঠলুম, চৌরাস্তায় এসে দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে বিদায় চাইলুম। কারণ, ৫ মাইল হেঁটে আমার বাঁ পা-খানির অবস্থা তখন এ রকম হয়েছে যে, আমি বাড়ী পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে পারি কি না সন্দেহ। নেড়া তাঁর সঙ্গে Step Aside পর্য্যন্ত গেল, আবার তখনই ফিরে এসে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল।

রবিবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই জুন—

—কাগজের কথা কইবার জন্য দেশবন্ধু একবার শনি-বারের দিন দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু শুক্রবারের দিন ঘুরে পায়ের অবস্থা এ রকম হয়েছিল যে, শনিবার বেরুতে ভরসা হয়নি; তার উপর আমার দার্জ্জিলিংএর সহযাত্রী বৈবাহিক মহাশয়ের অবসরের অভাবে কাপড় পরা হয়নি ব'লে সমস্ত শনিবারের দিনটা রাজনীতিক বন্দীদের মত সেনিটারিয়ামেই কাটাতে হয়েছে। রবি-বারের দিন সকালে কফি কিনবার অছিলায় একা বেরিয়ে পড়া গেল। খটখটে রদ্দুর, রাস্তাঘাট সব শুকনো, দিব্য আরামে হাঁটতে হাঁটতে চৌরাস্তায় গিয়ে দেখি যে, দেশবন্ধু তখন Observatory Hillএর ডান দিকের রাস্তা ধ'রে চলেছেন। এক ঘণ্টা ধ'রে অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে তাঁর কাছ থেকে শরৎ ভায়াকে পত্র

লিখবার হুকুম নিয়ে যখন নেমে আসছি, তখন দেশবন্ধু বল্লেন, "দেখ রাখাল, কল্‌কাতার খবর না পেলে—— কাগজের আকার বাড়াবার কথা ঠিক ক'রে বল্‌তে পাচ্ছিনে, এখনও অনেক কথা রইল, তুমি মঙ্গলবারের দিন বিকেলবেলায় অধ্যাপক— কে নিয়ে আমার ওখানে চা খেতে এস।"

বাসায় ফিরে শরৎকে একখানা লম্বা চিঠি লিখে ফেল্লুম। সে কথাগুলো সমস্তই বাকী রয়ে গিয়েছে।

সোমবার ১লা আষাঢ়, ১৫ই জুন—

শিশির দা'র মুখে শোনা গেল যে, কাল রাত্রিতে দু'টার পরে দেশবন্ধুর খুব জ্বর এসেছিল। মনে মনে স্থির করলুম যে,এইবার তাঁকে কবিরাজী অষুধ খাওয়াতে হবে; কারণ, কথায় কথায় তিনি এক দিন বলেছিলেন, "বদ্যির ছেলে, কবিরাজী অষুধে বিশ্বাস আছে বৈ কি?" পরে শুন্‌তে পাওয়া গেল যে, সমস্ত দিন তিনি পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আর রাত্রিতে তাঁর রক্ত-পরীক্ষা করা হবে। সমস্ত দিন যে খবর পাওয়া গেল, তাতে এমন কিছুই বুঝতে পারা যায়নি যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্তিমকাল নিকট।

মঙ্গলবার ২রা আষাঢ়, ১৬ই জুন—

সকালবেলায় যে খবর পাওয়া গেল, তাতে বুঝতে পারা গেল যে, দেশবন্ধু একটু ভালই আছেন,অথচ তাঁর মৃত্যুর পর শুন্‌তে পেলুম যে,বেলা ৮টা সাড়ে ৮টার সময়ে দেশবন্ধুর চিকিৎসক এবং আত্মীয় ডাক্তার——শ্বাসের লক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। বেলা সাড়ে ৪টার সময় Step Asideএ যাবার জন্য কাপড় পরছি, এমন সময় অধ্যাপক——তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন, "রাখাল, শুনেছ? আশ্চর্য্য ঘটনা——এ রকম আকস্মিক মৃত্যু দেখা যায় না।" আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কার মৃত্যু হয়েছে?" অধ্যাপক মহাশয় বল্লেন, "আর কার, দেশবন্ধু পৌনে ৫টার সময় মারা গেছেন।"

আমি যখন Step Asideএ পৌছলুম, তখন সরু লেবং রোডটা সকল জাতির লোকে ভ'রে গিয়েছে, Step Aside ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। যে ঘরে দেশবন্ধুর দেহ ছিল, সে ঘরের কাছে যাওয়াও আমার মত লোকের অসাধ্য। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর দিয়ে উপরে গিয়ে দেখলুম যে, দেশবন্ধুর দেহ একখানি লোহার খাটে শোয়ান আছে। দু'তিন জন ভদ্রমহিলা তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার বাহন শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র সরকারও দেখলুম দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেল্‌ছে। পাশের ঘরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও অনেকগুলি মহিলাকে দেখলুম। নীচে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুত শশিভূষণ দত্তের সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলুম যে, বাসন্তী দেবীর ইচ্ছা যে, দেশবন্ধুর দেহ দার্জ্জিলিংয়েই সৎকার করা হয়। খাটের যোগাড় করতে লোক গিয়েছে, রাশি রাশি ফুল আস্‌ছে। বাঙ্গালাদেশ ছাড়া অথচ ইংরাজের বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত এই পাহাড়ে দেশটিতে আমাদের বাঙ্গালী দেশবন্ধুকে রেখে যাব, এটা কোনমতেই পছন্দ হলো না। অনেক বাদানুবাদের পরে এবং কলকাতা থেকে দেশবন্ধুর প্রিয়বন্ধু ও ভক্তদের টেলিগ্রাম এসে পৌছনর পরে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুর দেহ কলকাতায় নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন। স্থির হলো যে, সকালবেলার ডাকগাড়ীতে দেশবন্ধুর নির্ব্বাক্ দেহ তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শিশির দা' দেশবন্ধুর দেহের একখানা ছবি তোলবার ব্যবস্থা করতে দার্জ্জিলিংয়ের ফটোগ্রাফার মণি সেনকে ডাকৃতে গেলেন। ক্ষান্তি দেশবন্ধুর দেহে যে সমস্ত অষুধ-পত্র প্রয়োগ করতে হবে, তা আন্‌তে গেল। দলে দলে লোক তখনও আস্‌ছে, ভুটিয়ানানীদের কান্নায় পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ১২টার সময় এক দল লোক রঙ্গীত থেকে দীর্ঘ বন্ধুর পাহাড়ে রাস্তা ভেঙ্গে দেশবন্ধুর দেহ দেখতে এলো। যখন ফিরে এলুম, তখন অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা জমাটবাঁধা নিস্তব্ধতা হিমালয়ের কোলের সেই দেশটিকে অধিকার ক'রে বসেছে; মাঝে মাঝে তা ভেঙ্গে দিয়ে পাহাড়ী রমণীদের ক্রন্দনের করুণ ধ্বনি যেন আকাশ ভেদ ক'রে উঠছে, তারা কেন কাঁদে, তারা দেশবন্ধুকে কতটা চেনে, তা তারাই জানে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যে দেশবন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাভিভূত। সকলেরই অন্তরে গভীর বেদনা এবং মুখে মর্ম্ম-উথলিত ভাষা—"সর্ব্বনাশ হইল!" দেশের নরনারী তাঁহার প্রতি কিরূপ নির্ভরপরায়ণ ছিল, অকৃত্রিম হিতকামী বন্ধু-বিশ্বাসে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর আবালবৃদ্ধবনিতার শোকাঞ্জলিদান হইতে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর ভক্ত হইয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেন, কিন্তু ভক্তির এমনই প্রভাব যে, দেশবন্ধুর চিতাহুতির দিন মহাত্মা স্বয়ং তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল গ্রহণের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

সত্য কখনও মরে না। তাহার প্রভাব চিরস্থায়ী। দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার কার্য্যপ্রভাব চিরঞ্জিরূপে ভারতে চির-বিরাজমান রহিল। মৃত্যুতে তিনি আমাদের নবজীবন লাভের শক্তি দান করিয়া গেলেন। আমরা যদি এই শক্তি গ্রহণ করিতে পারি, তবেই সে দানের সার্থকতা। শোক করিবার দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন যদি তাঁহার অমুদ্‌যাপিত দেশ-মঙ্গলব্রত উদ্‌যাপনে আমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্পণ করি, তবেই তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দান করা হইবে। তাঁহার সম্মানরক্ষার অর্থই আত্মসম্মানরক্ষা। শয়নে স্বপনে যে চিন্তা পলে পলে তাঁহাকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের স্বার্থচিন্তা নহে। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থ জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র দেশের মঙ্গলই তিনি আত্মমঙ্গল বলিয়া জানিয়াছিলেন। কেবল জানেন নাই—প্রাণ, মন দেহ দিয়া সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

ভগবান্ আমাদের প্রয়োজনমত যুগে যুগে নেতা প্রেরণ করেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন, ভগবান্-প্রেরিত শক্তিমান্ দেশপ্রেমিক, ভারতবর্ষের স্বরাজ-নেতা। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন,—দেশবন্ধু স্বরাজের জন্যই বাঁচিয়া ছিলেন এবং স্বরাজের জন্যই দেহপাত করিয়াছেন। অতএব এমন যদি কোন দিন আসে—যে দিন আমরা পৃথিবীস্থ অন্যান্য স্বাধীন দেশের নরনারীর সঙ্গে সমকক্ষ-ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব, সেই দিনই আমাদের দেশবন্ধুর অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং একমাত্র ইহাতেই তাঁহার স্বর্গগত আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

চিত্তরঞ্জন যে দেশের কি ছিলেন, কি গুণে যে তিনি সমগ্র দেশের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া গিয়াছেন—কত বড় বড় লোক ইহার ব্যাখ্যা-নিরত হইয়া ভাষার দৈন্য অনুভব করিতেছেন, এমনই বিরাট অপূর্ব্ব ছিল তাঁহার দেশপ্রেম, মাহাত্ম্যময় ছিল তাঁহার আত্মত্যাগ এবং কর্ম্মশক্তি। তবে আমি আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা কি লিখিব? আমি শুধু বলিতে পারি, তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা। সাহিত্যের দিক হইতে তাঁহাকে যেন ভাল করিয়া আমাদের এখনও দেখা হয় নাই। আশা করি, অতঃপর সাহিত্য-মন্দিরেও তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

তিনি যে বেশী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; ক্ষুদ্রায়তন চারি পাঁচখানি পুস্তকের মধ্যে তাহার কবিতার সমষ্টিসংখ্যা এক শতের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এক চন্দ্রও তমোহরণ করেন; একটি বিদ্যুৎ-কণিকার মধ্যেও বজ্রতেজ নিহিত। সংখ্যাবহুলদানে তিনি সাহিত্যভাণ্ডার সাজাইতে না পারিলেও ভাব-সম্পদে তিনি তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতাই তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের যেন সাধনা—তাঁহার জীবনেরই যেন রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী,—যে মহাপ্রেম তাঁহার জীবনকে চিরদিন আচ্ছন্ন, অভিভূত, ব্যথিত-আকুল করিয়া রাখিয়াছিল—তাহারই যেন মূর্ত্তিমন্ত বহির্বিকাশ। তাঁহার এই ছন্দোময়ী ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরতম মানুষটিকে আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই বলিয়াই এ কবিতাগুলি এত মূল্যবান্। তাঁহার অন্তরব্যাপী আদর্শ মহাপ্রেমকে ধরিবার জন্য তাঁহার যে আকুলতা, মালাগ্রন্থের "প্রেম ও প্রদীপে" তাহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত।—সে কবিতা এইরূপ—

১

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য-মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ, ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

২

অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে!
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি?

৩

তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্তস্বর—অন্তর-মাঝারে!
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর-আঁধারে।
জ্বাল গো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার!

৪

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার!
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার!
হে মোর নিঠুরা! কি যে বেদনা-বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে!
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে!
প্রজ্বলিত হৃদিমাঝে, শূন্য সব ঠাঁই!
হে প্রেমনিঠুরা! আমি যে তোমারে চাই।

—প্রেম ও প্রদীপ।

মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় তাঁহার প্রেম-সাধনার মধ্যে একটি গভীর নিরাশা দেখা যায়। অতীতের একটি শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার দেবী তাহার হৃদয়ে যে প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন, পরমুহূর্ত্তে যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আকাঙ্ক্ষাময় ও অতৃপ্তিময় মহাশূন্যের মধ্যে তাঁহাকে ভাসাইয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেছেন,—

জীবন, জীবন কোথা?—যেন নিরবধি,
মরণ নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।
জীবন, জীবন কোথা?—ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান ক'রে শুধু ভুলে থাকা!
এ কি হাসি! এ কি কান্না! শুধু ব'সে ব'সে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা!
মহান্ মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল!
কোথা তুমি কোথা আমি, গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয়-সম্বল।
সে ব্যথা বাজিছে আজো; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয়!
যত হাসি যত অশ্রু যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

—মহাশূন্য।

কিন্তু মহাজন ও মহাপ্রেমিক চিরদিন কল্পিত শূন্যতা লইয়া থাকিতে পারেন না। কার্য্যশক্তির দ্বারা তাহাকে তাঁহারা পরাজয় করিতে চাহেন। তাই কবিকে যখন মহাশূন্য ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
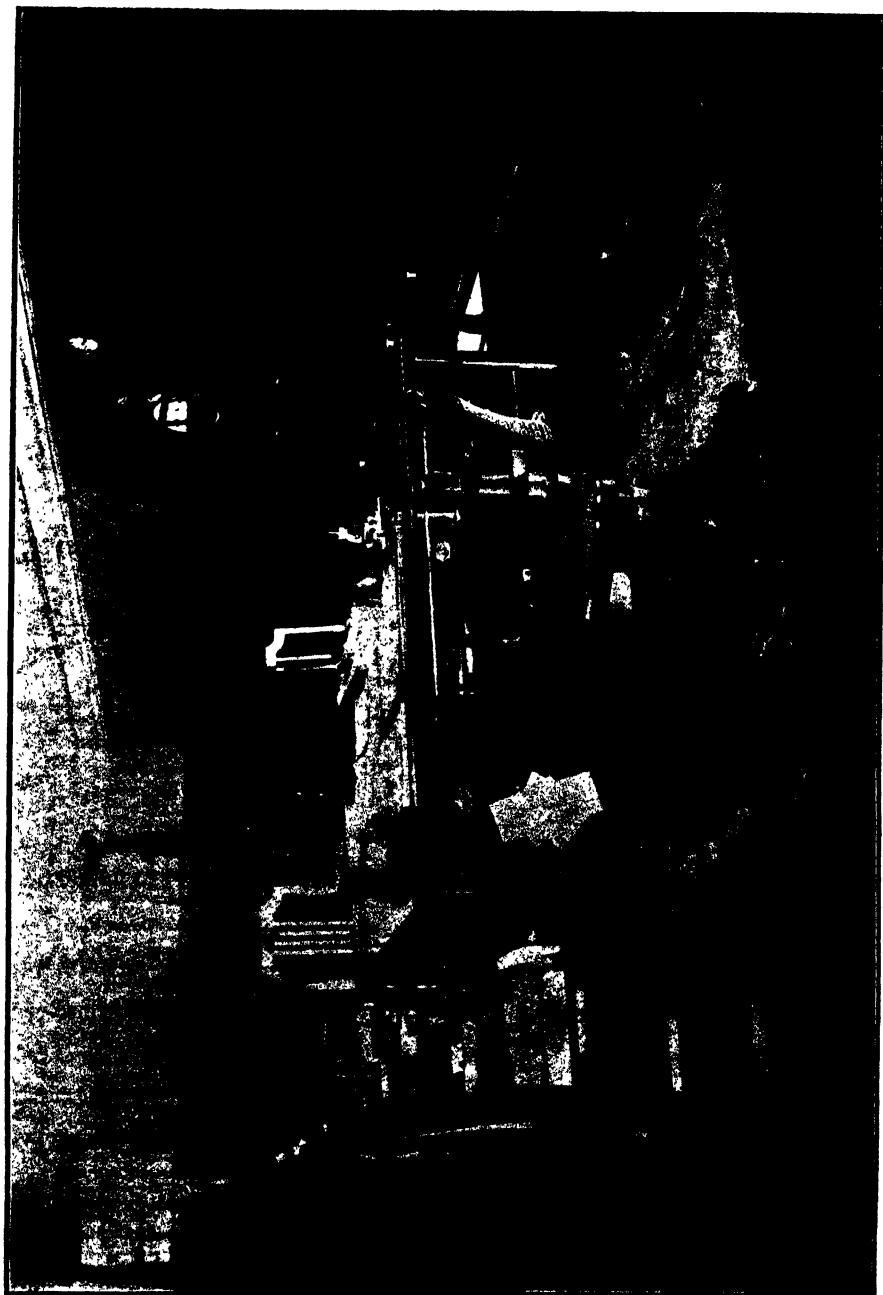
কলিকাতা করপোরেশনে মেয়রের কার্য্য কক্ষ

মিউনিসিপাল গেজেট হইতে

রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জলিছে জলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার সুর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে,—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

—মালা।

তিনি আঁখি মুছিয়া কার্য্যে নামিলেন, কিন্তু কার্য্যে নামিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। কবি যেমন শতছন্দ গাঁথিয়াও মনে করেন, তাঁহার অনেক ভাবই প্রকাশ করা হইল না,—সেইরূপ যিনি মহাকর্ম্মী, তিনি শত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও মনে করেন, তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাই কবির কর্ম্মহৃদয় বিফলতা-নিপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিল,—

ওরে রে পাগল!
জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কি গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা ?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন্ পূজা লাগি তব আকুল অন্তর ?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
নিবিড় নয়ন হ'তে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি-পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন-যৌবন-ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান ;
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেমপূর্ণ হিয়া!
আর কি করিব দান, কি আছে আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে রে পাগল আমার।
সন্ধ্যাশেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভ'রে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু ; হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দু'হাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর ?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

—মালা।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের নিরাশ মুহূর্ত্তে তিনি ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আবার বল লাভ করিতেছেন।

এ পথেই যাব বঁধু! যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব।
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেকো!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেকো!

—অন্তর্য্যামী।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত কবিতাই একটি মহাপ্রেমের ভাব-প্রেরণা। এই ভাবে তিনি কখন হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। সেই প্রেমকে কখনও কর্ম্মরূপে, কখনও ধর্ম্মরূপে, কখনও বা প্রিয়ারূপে পাইতেছেন, কখনও বা হারাইয়াও ফেলিতে-ছেন। যেমন তাঁহার কার্য্যের মধ্যে, তেমনই তাঁহার কবিতার মধ্যেও ভাব ও ভক্তি, জ্ঞান ও শক্তি, চিন্তা ও

মিষ্টান্নভোজনে চিত্তরঞ্জন

হে মোর লুকান ধন !
হে রহস্যময়ি !
আজি জীবনের শেষ
আজো তুমি জয়ী !
তোমারে খুঁজেছি আমি
আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ;
মরণ-মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে
সর্ব্ব-সাধনায় !
আজি শ্রান্ত জীবনের
ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন !
আজো তুমি জয়ী !
আজো খুঁজিতেছি তোরে
হে রহস্যময়ি !
একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার !
আমাদের দু'জনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার !
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার,
আছ তুমি, আর কেহ নাই·
আছে শুধু সাঁজের আঁধার !
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার ?
—প্রেম ও প্রদীপ।

কল্পনা—এ সকলের একটি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই।

মৃত্যুর বহুপূর্ব্বে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী ইপ্সিত রূপিণীর দর্শন-লাভে আনন্দের উচ্ছ্বাসভরে বলিতেছেন :—

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো অন্ধকারে ;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব-বেদনায় !
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো-অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে !

ইচ্ছা করিতেছে, তাঁহার সব কয়খানি গ্রন্থ হইতেই দুই চারিটি করিয়া কবিতা এখানে তুলিয়া দিই। কিন্তু স্থানের স্বল্পতা বশতঃ তাহা পারিলাম না। যদি সুবিধা ও সুযোগ হয়, তবে ভবিষ্যতে বিশদ ভাবে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল। এই স্থানে আর একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই, এতদিন তিনি কর্ম্মের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া যে পথটি সন্ধান করিয়া

বেড়াইতে ছিলেন- হঠাৎ যেন তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

সব তার ছিঁড়ে গেছে! একখানি তার
প্রাণমাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়!
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার!
সবকর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী!

ইহাই কি স্বরাজের পথ? ধন্য তুমি দেশবন্ধু! তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাতে ধন্য! আর তোমার দেশবাসী আমরাও—তোমাকে বন্ধুরূপে পাইয়া ধন্য!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

পরলোকে দেশবন্ধু

বঙ্গের পরম বিত্ত—হে চিত্তরঞ্জন,
সর্ব্ব মহতের মাঝে তুমি মহীয়ান্।
দেশধর্ম্মে সিদ্ধকর্ম্মী ভক্তিপূতপ্রাণ,
কোথায় লুকালে প্রেমপ্রসন্ন আনন?

নগাধিরাজের কোলে—নিভৃত ভবনে,
গৌরীশঙ্করের দিব্য পদচ্ছায়াতলে,
গঙ্গার আনন্দগীতি যেথানে উছলে
ছিলে দেশধ্যানে মৌন, কীর্ত্তিক্লান্তমনে।

এ বঙ্গের ছায়া-ব্যাপ্ত—উদয়-অচলে
তুমি দিয়েছিলে দেখা অম্লান কিরণে,—
অকস্মাৎ অস্তমিত,—প্রভাত-গগনে
সমুদিত মহারাত্রি—হেরি প্রাণ গলে।

কোটি ভক্ত স্তব্ধ শোকে—কুটীরে কুটীরে
শত বক্ষ হ'তে উঠে তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস,—
ওহে ধরাধন্য বীর—এই শোকোচ্ছ্বাস,
সহিতেছে সারা বঙ্গ তিতি অশ্রুনীরে!

তোমার অকৃত কর্ম্ম, ত্যাগ, অভ্যুদয়,—
কে লইবে শিরে তুলি কোথা হেন বীর?
তুমি যে অতল সিন্ধু আমরা শিশির,
ধরে না তপনবিম্ব এ ক্ষুদ্র হৃদয়!

কর্ম্মসিদ্ধি স্বর্গ কোথা—কোন ইন্দ্রালয়ে,—
কে গড়িছে কত রত্নে বিজয়-কিরীট,—
সাজাইছে শ্বেতপদ্মে তব পাদপীঠ —
ত্যাগপূত কোন ভক্ত—প্রসন্ন হৃদয়ে?

সে নহে নন্দনবন—মন্দার-মোদিত,—
উর্ব্বশী-উরসে যথা জ্বলে রত্নমালা,—
রতি গাঁথে কামপুষ্পে কমনীয় মালা,
কামনা-সঙ্গীত যথা নিত্য উদীরিত!

স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি—নিশীথ-শয়নে,—
পুষ্পময় রত্নরথ চলে উর্দ্ধলোকে,—
ছায়াপথ অবকীর্ণ চম্পকে অশোকে
সিদ্ধ সামগান গায়—সুপ্রসন্ন মনে,—

তপোলোকে মুক্তদ্বার—বিপুল তোরণ,—
পল্লবিত পূর্ণ কুম্ভ শোভে দুই পাশে,—
কিন্নরীরা গায় গান আনন্দ-উচ্ছ্বাসে,—
দ্বারশীর্ষে শোভে দীর্ঘ ত্রিশূল শোভন।

স্বর্গ-অভিষেক-কুম্ভ ধরি কক্ষ 'পরে,
দাঁড়াইয়া ত্রিনয়না জগৎজননী
জটামুকুটিত-শিরে সূর্য্যকান্তমণি
নয়নে প্রসাদ-দীপ্তি—আনন্দ অধরে।

পথপ্রান্তে ক্লান্ত রথ পুণ্যতপোলোকে
উঠিল বিমানে জয় জয় জয় ধ্বনি,—
নম্রনেত্রে নতশিরে বীরকুলমণি—
নামিল স্যন্দন হ'তে অশ্রুপূর্ণ চোখে।

নতজানু পদতলে—কৃতাঞ্জলিপুটে,
বসিলেন দেশবন্ধু তোরণ-সম্মুখে,
অভিষেকধারাস্নাত শুভ হাসিমুখে,
উজ্জ্বল ললাট দিব্য রতন-মুকুটে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সংবাদপত্রে শোকোচ্ছ্বাস

দৈনিক বসুমতী

১

আজ বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ ঘনমসীলিপ্ত হইল। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া শ্লাঘা করিবার যাহা কিছু—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গর্ব্ব,মান,অহঙ্কার—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। যে বিরাট পুরুষ বাঙ্গালার রাজনীতির শ্মশানে কত বর্ষ ব্যাপিয়া যোগাসনে শবসাধনে বসিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, নির্ম্মম কালের অমোঘ দণ্ড বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁহার উপর নিপতিত হইল। অভ্রভেদী হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ দুর্ভাগ্যবশে সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইল। বাঙ্গালী! মঙ্গলবার তোমার পক্ষে যে অমঙ্গল আনয়ন করিল, তাহার বহুদূরপ্রসারী প্রভাব হইতে তুমি কত দিনে মুক্ত হইবে, তাহা তোমার ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গালার ও ভারতের রাজনীতিক গগনের মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডসম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে অস্তমিত হইল, এ কথা—এ দারুণ কথা মনে করিতেও মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে—এ দুঃসংবাদ সত্য বলিয়া মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর কি ছিলেন? যে বৈরাগ্য, ত্যাগ বা সন্ন্যাসের মধ্য দিয়া ভারতের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য গোমুখীর পুণ্যপূত স্নিগ্ধধারার মত শত রাগে উছলিয়া উঠে, যে ভাব ও চিন্তার ধারা ভারতীয়ের অস্থিমজ্জায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে,—চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়া সেই বৈরাগ্য ও সেই ভাবধারা শত সৌরকরোজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চারি শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীঘাটে শ্রীচৈতন্য যেমন মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনির সহিত মধুর হরিনামের বন্যা আনয়ন করিয়া অজয়ের তটপ্রান্ত হইতে মণিপুরের বনান্তরাল পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তেমনই বাঙ্গালার রাজনীতির "মরা গাঙ্গে" দেশপ্রেমের বন্যায় চিত্তরঞ্জন সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের স্বরূপ দেখিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-সম্ভ্রমভরে নতমস্তকে ত্যাগী প্রেমিক চিত্তরঞ্জনকে অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিল।

জাতির বহু ভাগ্যফলে এমন জননায়ক মিলিয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনের সহিত রাজনীতিক অভিমত লইয়া দেশের কাহারও যে মতবিরোধ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তুচ্ছ সে বিরোধ—জাতির ঘোর দুর্দ্দিনে চিত্তরঞ্জন বিরাট ত্যাগের যে অনন্ত বর্ত্তিকালোক লইয়া জাতিকে পথিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাইব কোথায়? দেশনায়ক মহাত্মা গন্ধীর সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা, চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের রাজনীতিক্ষেত্রে পথিপ্রদর্শকরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এ শক্তি সামান্য শক্তি নহে।

বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর ভরসা, বাঙ্গালীর বুদ্ধিবল, বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালার বিরাট পুরুষ আজ কোথায় কোন্ অজ্ঞাতরাজ্যে চলিয়া গেলেন! যে পুরুষসিংহ কম্বুনাদে বলিয়াছিলেন, "আমার নিজের ঘরেই যদি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে না পারি, নিজের দেশেই যদি পশুর মত হইয়া থাকিতে হয়, তবে আমার মান, আমার ধর্ম্ম থাকিল কোথায়?"—বাঙ্গালী! আজ তাঁহার অভাব কে পূর্ণ করিবে? সেই শক্তিধরের নেতৃত্বে বঞ্চিত হইয়া আজ তুমি কাহাকে তাঁহার আসনে বরণ করিবে? সমগ্র দেশ ও জাতিকে কাঁদাইয়া কোথায় কোন্ দেশে সে শক্তিধর মহাপ্রস্থান করিলেন!

বাঙ্গালী! সম্মুখে তোমার কাঁদিবার দিন আসিয়াছে। এস বাঙ্গালী, প্রাণ ভরিয়া কাঁদ—যাহা হারাইয়াছ, তাহা সহজে পাইবার নহে!

২

"জন্মিলে মরিতে হ'বে।
অমর কে কোথা কবে?
চির-স্থির—কবে নীর,
হায় রে জীবন-নদে?"

জীবের জীবন অনিত্য—দেহীকে এক দিন এ দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু যিনি তাঁহার কার্য্যের মধ্যে সহসা অন্তর্হিত হয়েন এবং তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার লোক আর পাওয়া যায় না, তাঁহার জন্য মানুষের শোকোচ্ছ্বাস স্বাভাবিক। প্রতিদিন শত শত মানুষ লোকান্তরিত হয়—তাহাদের জন্য কেহ রোদন করে না। কিন্তু এক এক দিন এমন লোকের তিরোভাব হয় যে, তাঁহার জন্য সমগ্র জাতি ক্রন্দন করে—সেই শোকাশ্রুপাতে তাহারা সেই দিক্‌পালের স্মৃতি-তর্পণ করে।

আজ বাঙ্গালা—আজ ভারত তেমনই ভাবে চিত্তরঞ্জনের জন্য শোকাশ্রুপাত করিতেছে। জীবনে যাহারা তাঁহার কাযের নিন্দা করিয়াছে, আজ সেই সব নিন্দকের রসনাও তাঁহার গুণগান করিতেছে। মৃত্যুতে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহার বহু দিনের সাধনার ফল হইলেও—ভারতের রাজনীতিক গগনে তাহার আবির্ভাব একান্তই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত। চিত্তরঞ্জন কবি, চিত্তরঞ্জন ব্যবহারাজীব, চিত্তরঞ্জন উদারহৃদয় বন্ধু, চিত্তরঞ্জন বহুজনের আশ্রয়। সে চিত্তরঞ্জন যে সহসা রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া অতি স্বাভাবিক নিয়মে ভারতের নেতৃত্বের রাজদণ্ড হস্তগত করিবেন, তাহা তাঁহার বন্ধুরাও ৫ বৎসর পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহা কল্পনাতীত ছিল, তাহাই সত্য। চিত্তরঞ্জনের সাধনা যেমন ছিল, সিদ্ধিও তেমনই হইয়াছিল। তিনি ত্যাগীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দেশে সন্ন্যাসীর চরণতলে নৃপতির মুকুটমণ্ডিত মস্তক শ্রদ্ধাভক্তিতে লুণ্ঠিত হয়, যে দেশে গৌতম বুদ্ধ রাজৈশ্বর্য্য "ধরার ধূলার চেয়ে হীন" জ্ঞান করিয়া মানবের মুক্তির জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—সেই দেশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম। তিনি সমাজে, সাহিত্যে, শাসনে সর্ব্বত্র বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন—সে বৈশিষ্ট্য চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের আধারে

—মানমঞ্জুষার মণিখণ্ডের মত আশ্রয় পাইয়াছিল—তিনি তাহা দেখাইয়া দেশবাসীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যে লীলা তিনি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন—তাঁহাতেও দেশমাতৃকার সেই অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিপ্লব-বিহ্বল অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন তেমনই তাঁহার দেশবাসীকে মা'র অভয়রূপ দেখাইয়াছিলেন। যে অভয়ার সন্তান—যাহার জননী শক্তিরূপিণী, কিসে তাহার ভয়? যে জাতি পরপদদলিত হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছিল—জাড্য যাহার শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তিনি সেই জাতিকে মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়াছিলেন—তাহাকে তাহার জাড্য দূর করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন —তিনি জাতির এই ব্যাধির প্রতীকারের জন্য কেবল আপনার লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি তাঁহার পুত্রকে ও পত্নীকে কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন—পরে স্বয়ং কারাগারে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা বুঝিবেন, কি মানসিক বলে বলী হইয়া তিনি সে কায করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পঞ্জাবের হাঙ্গামা তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন, তখন শত শত লোক সেই প্রবাসে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং কয় মাসে তিনি স্বয়ং ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহার পর বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে চিত্তরঞ্জন স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়া দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। সে ত্যাগের বিরাটত্ব মনে করিলে হৃদয় শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়ে। যাঁহার গৃহে যাইয়া প্রার্থী কখন শূন্য হাতে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই—শেষে তিনিই পরাবসথী হইয়াছিলেন—এ ত্যাগবীরের তুলনা কোথায়? এই ভারত যখন মহাভারত ছিল, তখন ইহাতে ত্যাগবীর ভীষ্মের আবির্ভাব। আর নব-ভারতে যুগল ত্যাগী নেতা—মহাত্মা গন্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি রাজনীতি-নদীর কূলে দাঁড়াইয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং তাহাতে যাহারা বিপন্ন হইতেছিল তাহাদিগের উদ্ধারসাধন করিতেছিলেন। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—আপনার সর্ব্বস্ব কূলে ত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কবি চিত্তরঞ্জন হৃদয়ে মা'র আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন—ভারতের চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন—কাহাকেও ভয় করেন নাই। যখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা—রাজরোষের প্রলয়ান্ধকারে—চণ্ডনীতির বজ্রাগ্নি জ্বলিতেছে—নিবিতেছে, তখন চিত্তরঞ্জনের কম্বু কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল—"মা ভৈঃ।" তিনি দেশবাসীর অগ্রণী হইয়া অনাবৃত বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন—অনাচার কত শক্তি ধরে যে, সে বক্ষে আঘাত করিতে পারে? তিনি স্বয়ং ত্রিশূলীর মত শূলক্ষেপ করিয়া শাসন-সংস্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কেবল গড়িবার জন্য।

এই বিয়োগবেদনার মধ্যে যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—চিত্তরঞ্জন নাই। যিনি মৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহার কি তিরোভাব হয়? তিনি যে ভাবের মূর্ত্ত বিকাশ, সে ভাব কি কখন বিলুপ্ত হইতে পারে? সে ভাব যে দিন বিলুপ্ত হইবে, সে দিন এই জাতির আর কি থাকিবে? তিনি ছিলেন—আদর্শ। সে আদর্শ লুপ্ত হইবে না, পরন্তু যত দিন যাইবে, তত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আজই তাহার সূচনা লক্ষিত হইতেছে। আজই ভারতের সকল প্রদেশের সকল নেতা বলিতেছেন—চিত্তরঞ্জনের দলকে সাহায্য করিতে হইবে; দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে—ব্যুরোক্রেসীর সহিত সংগ্রাম করিবার মত শক্তি আর কোন দলের নাই; স্বরাজ্য দলই দেশে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ—শৃঙ্খলা-নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক দল। চিত্তরঞ্জন এই বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়া জয়যাত্রা করিয়াছিলেন।

যে মহামন্ত্রে চিত্তরঞ্জন দীক্ষিত হইয়াছিলেন—সে মন্ত্রের এমনই অসাধারণ শক্তি যে, তাহা অসম্ভবকে সম্ভব করে।

আজ চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে—সমগ্র জাতির অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সেই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে ;—

"বন্দে মাতরম্।"

আনন্দবাজার

এক রাজনীতিক সঙ্কটের দিনে আমরা লোকমান্য তিলককে হারাইয়াছিলাম; আজ আর এক সঙ্কটের দিনে—হে দেশবন্ধু, তোমাকে হারাইয়া আমরা দিশাহারা হইয়াছি! তোমাকে লইয়া গিয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদিগকে এক মহাপরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন। মহাত্মা গন্ধী, তাঁহার গৌরবময় দক্ষিণ বাহু হারাইয়া নিজেকে বলহীন মনে করিতেছেন। কে আজ বল দিবে? আশার বাণী শুনাইবে?

অসহযোগের ভাবগঙ্গা যে দিন প্রলয়-প্লাবনধারায় গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, সে দিন বাঙ্গালাদেশে তুমি একক ধূর্জ্জটীর মত সমুন্নত শিরে তাহা ধারণ করিয়াছিলে। সেই ভাব-গঙ্গাকে তুমি দেশের মাটীর উপর বহাইয়া দিয়াছিলে। তোমার আহ্বানে সহসা জাতি শতাব্দীর সুপ্তশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছিল! পরাধীনতার বেদনার জ্বালায় তোমার সেই দুঃসহ জাগরণ সমগ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল! কিন্তু কি করিবে তুমি! বহু শতাব্দীর শৃঙ্খলভারে জর্জ্জরিত আমরা গতিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি! তথাপি রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত কর্ম্মসন্ন্যাসী তুমি—জীবন-দীপে সহস্র নরকঙ্কালের জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে—আর সেই নবগঠিত মুষ্টিমেয় সৈন্যদল লইয়া স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গেলে! সমগ্র জাতি সুদীর্ঘকালের মোহঘুমঘোরে আচ্ছন্ন চক্ষু কোনমতে মেলিয়া তোমার সে জীবন-মরণ-তুচ্ছকারী যুদ্ধ দেখিল,—কিন্তু অসাধ্যসাধনের প্রাণপণ প্রয়াসে সেই তিলে তিলে আত্মবিসর্জ্জনের নিগূঢ় ভাব-সম্পদ্ কর্ম্ম-গৌরবের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল কি?

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তুমি ধূলিমুষ্টির মত দু'হাতে বিলাইয়া গিয়াছ—অর্থ তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তিলমাত্র প্রশমিত করিতে পারে নাই। তুমি তদপেক্ষাও বড় জিনিষ জাতির নিকট চাহিয়াছিলে। অর্থ নহে—জীবন; দেশের কার্য্যে জীবনদান—ইহাই তুমি চাহিয়াছিলে। তাই কেমন করিয়া জীবনদান করিতে হয়, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যুগযুগান্তর ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গেলে!

প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি, জীবনে যে যাহা ভালবাসিত, তার উদ্দেশে সেই প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করিতে হয়। তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলে তাহার আত্মা তৃপ্ত হয়।

তোমার যাহা প্রিয় বস্তু, তোমার যাহা প্রিয় কার্য্য—সে যে সমগ্র জীবনের প্রাণপাত সাধনায় অর্জ্জন করিবার এক অতি দুর্লভ বস্তু! আজ তোমার শ্রাদ্ধ-দিনে বাঙ্গালী যদি বিশ্বকে শুনাইতে পারে যে, সেই বস্তুই সে কর্ম্মসমুদ্র মথিয়া তুলিয়া আনিবে এবং তাহাই তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে, তবে হয় ত তোমার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি হইতে পারে!

একটা জাতির শবের উপর বসিয়া সাধনা করিবার জন্য, হে মহাভৈরব, তুমি আসিয়াছিলে! ভবিষ্যতের উপর অনন্ত আশা লইয়া বর্ত্তমানের নৈরাশ্যান্ধকারাহত জাতির মধ্যে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছিলে ;—হে বাঙ্গালার প্রাণধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ! বাঙ্গালীকে আবার বাঙ্গালী করিবার জন্য,—এক নূতন সুর ও রূপে বাঙ্গালাদেশ ভরিয়া দিয়া গিয়াছ। এত নূতন কথা, নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব তুমি অজস্র ধারায় বর্ষণ করিয়া গিয়াছ, যাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা আত্মস্থ করিতে পারি নাই। হে মহিমান্বিত সাধক, তোমার সাধনা জাতির জীবনে এক দিন সিদ্ধি লাভ করিবেই।

নায়ক

দলে দলে সহস্র সহস্র লোক নগ্ন পদে শোকপূর্ণ উদ্বিগ্ন মনে দেশবন্ধুর বাসভবনে সমবেত হইয়া সেই মহাপুরুষের মুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহা ইতিহাসে প্রথম। দেশবন্ধু পার্থিব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ হইতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপদবিক্ষেপে জাতি দেশবন্ধুর প্রদর্শিত পথে চলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্ত্যবনত চিত্তে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিবে! জাতীয় জীবনের প্রতি নিভৃত অংশ পর্য্যন্ত যে মহাপুরুষের প্রভায় প্রভান্বিত, তাঁহাকে ভুলিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। দেশবন্ধু মরণের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জাতির নিকট অমৃতের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। এমন ভাবে মরিয়া বাঁচিয়া থাকার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। দেশবন্ধু পার্থিব দেহ নষ্ট করিয়া সহস্রভাবে সহস্র মূর্ত্তিতে জাতির ভিতরে বাহিরে সকল স্থানে সকল কর্ম্মের ভিতরে স্বীয় প্রভাব ও শক্তি সঞ্চার করিয়া চির-অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে নিশ্চিত বুঝিয়াছি, দেশবন্ধু চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন বটে, কিন্তু জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁহার মহান্ শক্তি আমাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করিবে। মৃত দেশবন্ধু আজ জগদ্বন্ধু-রূপে সমগ্র জগতের মুক্তিপথপ্রদর্শক।

স্বরাজ

চিত্তরঞ্জন যে পথে দেশের হিত হইবে মনে করিতেন, সেই পথে চলিতে কোন কারণেই পিছাইতেন না। নিজ বিশ্বাসানুযায়ী কর্ম্মপন্থায় প্রশংসনীয় সাহসিকতা সহকারেই অগ্রসর হইতেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সকল শক্তিসামর্থ্য লইয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি নিজে বুঝিলেন যে, ঐ অসহযোগের পথে কিছু হইবে না, তখন প্রতিপত্তি-লাঘবের ভয়ে বা আর কোন কারণেই মহাত্মার অসহযোগ বা বর্জ্জন-নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলেন না, মহাত্মার মতানুযায়ী না হইলেও কাউন্সিল প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই উদ্দেশ্যে স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন। তার পর, কাউন্সিল-প্রবেশ—কাউন্সিল ধ্বংসচেষ্টা চলিল। সেই প্রচেষ্টার পরিণতি যাহা হইবার হইল। যে ভাবেই হউক, বাঙ্গলার দ্বৈতশাসন তিনি নষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁহার কাউন্সিল-ধ্বংসের চেষ্টার ফলেও যে দেশের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা দূর হয় নাই, বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে—ইংরেজ সাধারণের মধ্যেও অবিশ্বাস, আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াই সমাধানের উপায়-নির্দ্দেশে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে পাটনার পত্র, ফরিদপুরের অভিভাষণ। এইখানেই নিজ বিশ্বাসানুযায়ী পথে চলিবার সেই সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুরে আপোষের কথা, সম্মানকর সহযোগিতা প্রভৃতির কথা বলিতে যে কতখানি মনের জোরের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার ফরিদপুরের উক্তির ফলে যে তাঁহার অনেক তরুণ অনুগামী নারাজ হইবেন, তাহা তিনিও জানিতেন। কিন্তু যে আন্তরিকতার জোরে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী পথে চলিতে গিয়া তিনি মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনকে ছাড়িয়া নূতন দল গঠনের সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন, ফরিদপুরের অভিভাষণেও নিজ বিশ্বাসানুযায়ী পথে চলিবার সেই সাহসিকতাই তিনি দেখাইলেন। ইংরেজের মনে যে অবিশ্বাস ও আশঙ্কার ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা দূর করা দরকার, এই কথা বুঝিয়াই তিনি ইংরাজকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অবিশ্বাস ও বিরোধ দূর করিতে তিনি সর্ত্তমূলক সহযোগিতাকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

নিজেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন না হইলে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে, তাহা নিশ্চিত জানিয়াই তিনি ঐক্যস্থাপনের জন্য মহাত্মা গন্ধীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান

দাশের শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের এই অবসরে বিধাতার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলে, জানিতে পারিলে কি, তোমার শক্তির কেন্দ্র কোথায়? শক্তি আছে, এ দেশের শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তির উদ্বোধকেরই অভাব। সেই শক্তির উদ্বোধন হয় ভালবাসায়; সেই শক্তি জাগিয়া উঠে প্রেমে। দেশবন্ধু দাশ এই শক্তি-রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই শক্তির বীজের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন; এই শক্তির সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি শক্তিধর হইয়াছিলেন।

দাশের শক্তি কোথায়, আজও তাহা বুঝিতে পার নাই কি? স্বরাজ্যদলের নেতা তিনি, তাই তিনি শক্তিধর, ইহা নহে। তাঁহার টাকা-পয়সা এক সময়ে ছিল, তাই তিনি শক্তিশালী, ইহা সত্য নহে; আজ যে শক্তির খেলা দেখিলে, টাকা-পয়সা এ খেলা খেলাইতে পারে না। দাশের শক্তি ছিল তাঁহার অন্তরভরা ভালবাসায়। দাশ দেশকে—দেশের লোককে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা জানিতেন। তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, দেশবাসীকে আপনার করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এই শক্তি, তাই তিনি শক্তিধর হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সঙ্কল্পের কাছে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র-কেও নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। এই শক্তি ভালবাসারই শক্তি, শক্তি তাঁহার আত্মীয়তার; দেশবাসীকে প্রাণ খুলিয়া তিনি কোল দিতে পারিয়াছিলেন। মদ-মাৎসর্য্য, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত কিছুরই বাধা কোল দিবার বেলা তাঁহার ছিল না। ঐশ্বর্য্য-অভিমানের ঘন-সার হার প্রেমের পরশ-রস-আশে তিনি ছিঁড়িয়াই ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ভরা সত্যই ছিল অকৈতব প্রেম।

এ দেশের মানুষকে চিনিয়াছ? সোনার মানুষ এ দেশের, চায় একটু ভালবাসা, খাঁটি ভালবাসা। দাশ সেই খাঁটি ভালবাসাই দেশের লোককে দিতে পারিয়াছিলেন, সহরে রাজনীতির সংস্পর্শে তিনি ছিলেন বটে, সহরের ভেজাল তাঁহার এই ভালবাসার মধ্যে ছিল না। সে ভালবাসা ছিল 'অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম।' এমন কৃষ্ণপ্রেম, কালাকে এমন ভালবাসা আর কোন রাজনীতিক এই বাঙ্গালায় বাসিতে পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না; তবে আমরা এটুকু জানি যে, দাশের যে শক্তি ছিল, তাহা এই ভালবাসাতেই। আজ সেই ভালবাসার শক্তিরই বিকাশ-বিলাস দেখিতে পাইলে। তোমরা সমালোচকের দল যে যত যাহাই বল না কেন, অজ্ঞ তোমরা, তাই দাশের অন্য দিকটা লইয়া তর্কাতর্কি করিয়াছ, তাঁহার শক্তির মূল কোথায়, ধরিতে পার নাই।

দাশের যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—কর্ম্মের তোড়ের মুখে তাঁহার অহমিকার যে রৌদ্রদীপ্ত মূর্ত্তি তোমরা দেখিয়াছ, মনে করিও না, শুধু ব্যক্তি-অহঙ্কারের উপরে তাহার প্রতিষ্ঠা। সেখানে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল না, পিছনে ছিল ঐ ভালবাসারই শক্তি, প্রেমেরই শক্তি। এ শক্তি না থাকিলে শুধু অহমিকার উপর ভিত্তি করিয়া কেহ দাঁড়াইতে পারে না, প্রথম আঘাতেই পড়িয়া যায়।

দাশ জীবন বলি দিয়াছেন। কেন দিয়াছেন, বলিতে পার? তাঁহার অর্থ ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন; ভোগ-বিলাসের অলস আবেশে অঙ্গ এলাইয়া দিতে তিনি পারিতেন, ফকীর তাঁহাকে করিয়াছিল কিসে, কোন্ শক্তির সে আকর্ষণ? এই ভালবাসারই শক্তি, প্রেমেরই সে আকর্ষণ। সে প্রেমের শক্তি অদ্ভুত; তা ঠাহরই করিতে পারিবে না। প্রেমের সাধকের মুখে সে প্রেমের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় শোন—

'বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত,
সেই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন'

দাশ এই প্রেমের আস্বাদনে পড়িয়াছিলেন, বাহিরে তাঁহাকে বিষজ্বালাই সহ্য করিতে হইত; কিন্তু অন্তরে যে আনন্দ, তাহারই দায়ে তিনি বাহিরের কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দেশপ্রেম তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

সাপ্তাহিক বসুমতী

মৃত্যুর অকালজলদোদয়ে বাঙ্গালার স্বরাজ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে! সহসা বাঙ্গালার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, সহস্র অশনিসম্পাতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের মুক্তি-সাধনার সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই—দেশসেবাব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছেন! যিনি ত্যাগে মহাত্মা গন্ধীর প্রকৃত মন্ত্রশিষ্য—যিনি তেজে শতসূর্য্যসম সমুজ্জ্বল—যিনি দেশসেবার মহাযজ্ঞে হোতা, সেই চিত্তরঞ্জন নাই! কাঁদ বাঙ্গালী—ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নায়কের রাজদণ্ড তোমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; কাঁদ বাঙ্গালী, তোমার স্বরাজসাধনার সিদ্ধি দূরবর্ত্তিনী হইয়া গেল; কাঁদ ভারতমাতা, তোমার ভক্ত সন্তান অকালে তোমার অঙ্কচ্যুত হইলেন! যিনি মুক্তির সংগ্রামে অগ্রণী হইয়া উদার বক্ষে বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর লাঞ্ছনার একাগ্নী বাণ লইয়াছিলেন—তবুও ভীতিবিহ্বল হয়েন নাই; মুক্তির সংগ্রামে যিনি শঙ্কা জয় করিয়াছিলেন; যাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লক্ষ ভারতবাসী তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাদের জয়নাদ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের গর্জ্জনের মত বোধ হইয়াছিল; যাঁহার সঞ্জীবনী শক্তি পরাজিত জাতির শবে জীবনসঞ্চার করিয়াছিল, তিনি আর নাই! ভারতের গগনে আজ কেবল ক্রন্দনধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। ভারতের মুখ আজ অন্ধকার!

আজ জননীর মন্দিরে, বেদীমূলে, পুরোহিতের মৃত্যুস্তম্ভিত হস্ত হইতে আরতির পঞ্চপ্রদীপ ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োল্লাসে অগ্রসর সেনাদলের নায়কের হস্ত হইতে তাঁহার মুখমারুতপ্রপূরিত তূর্য্য পড়িয়া গিয়াছে। আজি সব নীরব।

যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহাই কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা অসম্ভব বলিয়া ভারতবাসী নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাই সম্ভব হইয়াছে—এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য!

চিত্তরঞ্জন গিয়াছেন। তাঁহার গৌরবরবি যখন মধ্যগগনে উপনীত হইয়া কিরণজাল বিস্তারিত করিতেছিল, যখন দেশে বিদেশে তাঁহার প্রভাব অনুভূত, যখন বাঙ্গালার, ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার নাম জপমালা করিয়াছিল, তখন তিনি আপনার অপরিম্লান ক্ষমতারশ্মি সংহরণ করিয়া অকালে অস্তমিত হইলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব যেমন আপনার জটাজালে জাহ্নবীর চঞ্চল ধারা ধারণ করিয়া তাহা শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন তেমনই আপনার ক্ষমতায় বাঙ্গালার চঞ্চল রাজনীতিক প্রবাহ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন—তাহাকে সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলামুক্ত করিয়াছিলেন। বিদেশী ব্যুরোক্রেশী যখন চণ্ডনীতির প্রচণ্ড দণ্ডের আঘাতে ভারতের জাতীয় জীবন চূর্ণ করিতে সমুদ্যত—তখন তিনি অহিংসার বর্ম্মে আবৃত হইয়া, অসহযোগের অজেয় অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়াছেন, আঘাতোদ্যত বাহু নিশ্চল হইয়াছে।

দেশের যখন বড় দুর্দ্দশা—দেশবাসীর যখন বড় বেদনা, সেই সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব। এমনই অবস্থায় যুগে যুগে সকল দেশে নেতার আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা শ্মশানে শবসাধনা করিয়া জাতির ভাগ্য পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা বজ্রকণ্ঠে ডাকিয়া ভীরুকে সাহসী করিয়াছেন, অলসকে কর্ম্মী করিয়াছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। ম্যাজিনী, গ্যারিবল্ডী, কাভুর, ওয়াসিংটন—জাতির যুগসন্ধিকালে ইঁহাদের আবির্ভাব। চিত্তরঞ্জনে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতের দুর্দ্দশার অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারতবাসী যখন নিরাশায় অবসন্ন, তখন তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার অকালতিরোভাবে সেই অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

হিতবাদী

বঙ্গে আজ বিজয়া। বাঙ্গালী আজ তাহাদের হৃদয়ের দেবতার সোণার প্রতিমা বৈশ্বানর-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছে। কলিকাতার কেওড়াতলার শ্মশান আজ ধন্য! বঙ্গের—কেবল বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের হৃদয়-রঞ্জন চিত্তরঞ্জনের অপার্থিব পার্থিব-দেহ বুকে লইয়া এই শ্মশান আজ পবিত্র হইল।

চিত্তরঞ্জন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দীনসমাজে দানবীর, জ্ঞানিসমাজে জ্ঞানবীর এবং কর্ম্মি-সমাজে কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহের অবসানে শাশ্বত-দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভৌতিক শরীর ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু যশঃশরীর কখনও ধ্বংস হইবে না।

চিত্তরঞ্জনের দানের কথা লিখিতে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে! তিনি সংসারী হইয়াও দানের সময় সন্ন্যাসী হইতেন; পুত্র-কন্যা ও সহধর্ম্মিণীর কথা ভুলিয়া যাইতেন।

চিত্তরঞ্জনের জ্ঞান-বীরত্বের পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। বিজাতীয় শিক্ষায় যে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এ জ্ঞান অকুতোভয়ে চিত্তরঞ্জন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"—বলিয়া প্রেমগীতি গাহিয়া কোন ফল নাই, এ জ্ঞানও তিনিই নির্ভয়ে বিতরণ করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন, কর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়।

দ্বৈত-শাসন উঠাইয়া দিবেন বলিয়া তিনি ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—অসীম ক্ষমতাশালী গভর্ণমেণ্টকেও দ্বৈত-শাসন উঠাইয়া দিতে বাধ্য করিয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

দেশের কার্য্যে এই মহাপুরুষ নিজের শরীর পাত করিয়াছেন। এই শরীরপাত আলঙ্কারিক নহে, ধ্রুব সত্য। স্বদেশের দৈন্য, দারিদ্র্য ও পরাধীনতা দূর করিবার জন্য নিয়ন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে যিনি নিজের ব্যাধি-ক্লিষ্ট দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনি অলৌকিক কর্ম্মবীর।

দেশবন্ধুর কার্য্যে ভারতবাসীর অবিচলিত বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি জনসাধারণের অটল অনুরাগ না থাকিলে মহাত্মা গন্ধীর মতের বিরুদ্ধে এত বড় একটা স্বরাজ্য দল গঠন করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

চিত্তরঞ্জন প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রখর জ্যোতিঃ অনেক গুরুতর বিষয়ে সন্দেহান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইত। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই থাকে, বিশেষতঃ সঙ্কটসময়ে। অতি বড় ঘোর সঙ্কটের সময়েও তিনি বিচলিত হইতেন না,—অলৌকিক প্রতিভা-বলে সঙ্কটোদ্ধারের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেন। বিপদের সময় ভয়বিহ্বলতা বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা কাপুরুষের লক্ষণ। কাপুরুষতা তাঁহার চরিত্র কখনও কলঙ্কিত করিতে পারে নাই।

চিত্তরঞ্জন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। মিছিলের জনতার মধ্যে শতকরা ৭৫ জন হয় ত জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে দেখেও নাই। তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যের বিষয় লোকমুখে শুনিয়া বা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। ভারত-সম্রাটের বংশধর, আমাদের ভাবী সম্রাট—প্রিন্স অব ওয়েলসেরও কলিকাতায় যে সম্মান দুর্লভ হইয়াছিল, কলিকাতার সর্ব্বজাতীয় অধিবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশবন্ধুর প্রতি আজ সে সম্মান দান করিলেন! ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, আমাদের সম্রাট, ভারতের মৃৎ-প্রস্তরের উপর আধিপত্য করিতেছেন,—চিত্তরঞ্জন দেশের লোকের হৃদয়ের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন? এরূপই বা হইল কেন? উত্তর সোজা,—দেশের লোক "স্বরাজ" চায়। সম্রাট লোকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে কৃপণতা করিতেছেন, চিত্তরঞ্জন নিজের দেহ-প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। উদ্বুদ্ধ দেশবাসী তাহা বুঝিয়াছিল, তাই কৃতজ্ঞতার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্যের সম্রাট করিয়াছিল।

—

বঙ্গবাসী

বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন—আর নাই। চিত্তরঞ্জন বলিতে বাঙ্গালায় এক জনকে বুঝাইয়া থাকে,—সে অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান্, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, অক্লান্তকর্ম্মা স্বদেশ-সেবক, অদ্বিতীয় ত্যাগী, অসামান্য তেজস্বী জননায়ক—চিত্তরঞ্জন দাশ। নির্মেঘ আকাশের অশনি-সম্পাতের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়। দুর্ঘটনা এতটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—চিত্তরঞ্জন নাই। যাহা গেল—যেমনটি গেল, তেমনটি আর মিলিবে কি না, বাঙ্গালার ও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের স্থান পূর্ণ হইবে কি না, তাহা আমরা জানি না। চিত্তরঞ্জনের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, তাঁহার সকল কার্য্যের সমর্থন করিতে পারি নাই, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের শক্তি, মনীষা, ঐকান্তিকতা, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। চিত্তরঞ্জন ভাগ্যবান্, কারণ, তিনি ভাগ্যের ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন; অনেক রাজনীতিক নেতার এ সৌভাগ্য ঘটে নাই। বীরের ঈপ্সিত,—রণস্থলে সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ; চিত্তরঞ্জন যে মনোবৃত্তি ও মূলনীতি লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজ্য-দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, সেই আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তিনি তনুত্যাগ করিয়াছেন। বিজয়ের গৌরব তাঁহার ভাগ্যে না ঘটুক, পরাজয়ের অগৌরব বা আত্মসমর্পণের অপযশ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ভারতে রাজনৈতিক নেতার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের নিদর্শন আর কিছু আছে কি না, জানি না। ভারতের রাজনৈতিক গগনে চিত্তরঞ্জন পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী থাকিয়াও কিরণ বিকিরণ করিতে করিতে তিনি কক্ষচ্যুত হইলেন। চিত্তরঞ্জন আজ স্তুতি-নিন্দার অতীত, তাঁহার কার্য্যাবলী সমালোচনার আজ দিন নহে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ভারতের রাজনৈতিক গগনে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহা নির্ণীত হইবে। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা মুহ্যমান।

—

সঞ্জীবনী

আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসের সুদীর্ঘ বেলা অবসান হইয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের শেষ রশ্মি পশ্চিম সাগরের বারিরাশি রক্তপ্রভায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। হিমাচলবক্ষে বাঙ্গালার গৌরব-সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি নিবিয়া গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

দেশের জন্য চিত্তরঞ্জন আত্মবলিদান করিলেন। দেশভক্তির পবিত্র হোমানলে তিনি তাঁহার দেহসমিধ্ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণের দ্বারা তাহার পূর্ণাহুতি হইল।

বঙ্গদেশের রাজনীতিক আকাশ বিরোধ-বিবাদের ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন; কলহ-কলরবে নিত্য মুখরিত; বিদ্বেষ-বহ্নির ধূমজালে বিমলিন। কিন্তু আজ সকল ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের মহিমা; অপূর্ব্ব দেশাত্মবোধের প্রেরণা;—অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির দ্যোতনা। ইহাই চিত্তরঞ্জনের অনন্ত জীবন।

উদার ও স্বাধীন ধর্ম্মমতের আবেষ্টনে চিত্তরঞ্জনের হৃদয় গঠিত হইয়াছিল। তাহার সুফল হইতে তিনি কখনও বঞ্চিত হন নাই। বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের শক্তি ছিল অসাধারণ। শত বন্ধনে জড়িত হইয়াও তিনি প্রয়োজনের সময় সকল বন্ধন সহজে কাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দুরবস্থার পীড়নে ও অর্থাভাবে নিষ্পেষিত হইয়াও তিনি অসমর্থ পিতার লক্ষাধিক টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী আজ সে কথা স্মরণ করিয়া সাধুতা শিক্ষা করুক। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার যে অতুলনীয় ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে, ব্যবহারশাস্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্রে তাহার গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন অল্প কয়দিনের জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার যে অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার ও সংগঠনক্ষমতা দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেশের সকল আশাভরসা তাঁহারই দিকে ফিরিয়াছিল।

ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশভক্তির একটা অগ্নিময়ী জ্বালা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোথাও-কিছু-নাই'র মধ্যে তিনি এক শক্তিশালী দল সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা স্বীকার করি যে, এমন আর কেহ পারে নাই। আজ চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের নেতা বলিয়াই বিশেষরূপে পরিচিত।

তিনি যখন ব্যারিষ্টারী করিতেন, তখন রাজার মত তাঁর চাল চলন ছিল। কিন্তু চক্ষুর পলকে তিনি সমস্ত বিলাস-বৈভব পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের বেশ ধারণ করিলেন। এমন হৃদয়ের বল আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। আমাদের আশঙ্কা হয়, এই দারিদ্র্যব্রতই তাঁহার অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যুর কারণ।

যেরূপ কৌশলে তিনি কাউন্সিলে মন্ত্রিত্ব ধ্বংস-ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মধ্যে যে শক্তি ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা তিনি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন।

চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গন্ধীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অভাবে আজ মহাত্মা গন্ধী শক্তিহীন হইলেন।

কর্মক্ষেত্রের অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে বিপুল বিজয়-গৌরবমণ্ডিত হইয়া চিত্তরঞ্জন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। কোন্ শক্তিমান্ পুরুষসিংহ তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবে? বাঙ্গালার নিরাভরণা পল্লীশ্রী চিত্তরঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া ছিল। জাতীয় শিক্ষার মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানসমূহ রুগ্ন চিত্তরঞ্জনের বিশীর্ণ বাহুর আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অমর আত্মা আজ সকল পার্থিবতার অতীতে। ভারতে স্বরাজ দর্শন বাসনায় সেই আত্মা তৃষিত ও ক্ষুধিত। যত দিন স্বরাজ লাভ না হয়, তত দিন কিরূপে তাঁহার স্বর্গগত আত্মার তৃপ্তি সাধন হইবে?

—

মোহাম্মদী

দেশবন্ধু যে এমন অকস্মাৎ তাঁর দেশবাসীকে পরিত্যাগ করিবেন, এ কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। বড়-ছোট, ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে তিনি সমস্ত দেশবাসীর সারা প্রাণ জুড়িয়া এমন করিয়াই তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর কথা দেশবাসী ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু দেশবাসীর প্রতি সর্ব্বশক্তিমান খোদার চরমদণ্ড বলিয়াই আমরা তেমন কঠোর দণ্ডের কল্পনাও করিতে সাহস করি নাই এবং করি নাই বলিয়াই সে দণ্ড আজ সহস্রগুণ হইয়া আমাদিগকে আঘাত করিয়াছে। তাই আমরা আজ শোকে এতই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি যে, ভারতের প্রাণ-পুত্তলি দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আমাদের ঠিক কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তৌলাইয়া দেখিবার ও পদ-বিন্যাস করিয়া বলিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তাঁহার সদ্য-নির্ব্বাপিত চিতার দিকে চাহিয়া আমাদের আজ কেবলই এই একটা কথা মনে পড়িতেছে যে, ভারত একটা মানুষের মত মানুষ হারাইল।

কি ছাত্র-জীবনের তেজস্বিতা, কি কর্ম্ম-জীবনের সততা, কি রাষ্ট্রনৈতিক-জীবনের গরিমা, সর্ব্বত্রই তাঁহার সেই একই মহান্ আদর্শবাদিতা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত ছিল। আমরা 'নারায়ণে' যে আদর্শবাদী চিত্তরঞ্জনের দেখা পাইয়াছিলাম, ময়মনসিংহের বক্তৃতায়, ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণে, 'বাঙ্গালার কথায়', আহমদাবাদ ও গয়াতে, এমন কি, তাঁহার শেষকথা ফরিদপুর অধিবেশনের অভিভাষণে, কোথাও আমরা সেই বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য-বাদী চিত্তরঞ্জনকে হারাই নাই।

কিন্তু তিনি বাক্-সর্ব্বস্ব আদর্শবাদী ছিলেন না। পরন্তু কর্ম্ম-কুণ্ঠ জীবনের অসার 'উচ্চাঙ্গের কথা'কে তিনি বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতই করিতেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, ইহা শুদ্ধমাত্র একটা কথার কথা নহে। জমীদার-উৎপীড়িত, গৃহ-তাড়িত ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসকে তাঁহার বিপদে কোল দিয়াছিলেন এই চিত্তরঞ্জন; বিনা পারিশ্রমিকে নিরুপায় রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিজের গাড়ী-ঘোড়া বন্ধক রাখিয়াছিলেন এই চিত্তরঞ্জন। এমনি করিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র দিক্ দিয়া তিনি তাঁহার বড় আদরের 'নরনারায়ণে'র পায়ে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছিলেন। বিপুল রৌপ্য-স্তূপের চাপেও যে তাঁহার বিরাট আত্মা নিষ্পেষিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল সেই দিন, যে দিন গুজরাটের বৈরাগী বাণিয়ার আহ্বানে বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৈরাগী চিত্তরঞ্জন টাকার বস্তায় পদাঘাত করিয়া স্বীয় আদর্শের সন্ধানে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বীয় আদর্শের জন্য কেমন করিয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীদিগকে কবি-দার্শনিক চিত্তরঞ্জন সে কথা এমনি করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ত্যাগপূত মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন যে দিন হিন্দু-মোছলেম-চুক্তিপত্রে হিন্দুর অনেকখানি ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইলেন, সে দিন এক দিকে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু যেমন রোষে ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল, অন্য দিকে বিস্ময়-বিমূঢ় মোছলমান দাঁতে আঙ্গুল কাটিতে লাগিল। বিষয়-বুদ্ধিতে অন্ধ হিন্দু-মোছলমান বুঝিতে পারিল না যে, যে চিত্তরঞ্জন স্বীয় আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছেন, সেই ত্যাগ-বীর চিত্তরঞ্জন তাঁহার কল্পিত সম্মিলিত বাঙ্গালার আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে সরকারী চাকুরীর মত নগণ্য স্বার্থকে নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। স্বীয় আদর্শের জন্য এমনই ছিল তাঁর উন্মাদনা, সে আদর্শের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন তিনি এমনি হাসিতে হাসিতে। এই চুক্তিপত্রকে কেহ মোছলমানকে ঘুষ দেওয়া বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে, কেহ হিন্দুর প্রতি অবিচার বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছে। কিন্তু ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিবার সময়ও যেমন তিনি ভাবেন নাই, তাঁহার সুখপালিত পোষ্য ও আশ্রিতের দশা কি হইবে, মোছলমানদের ন্যায্য পাওনা স্বীকার করিতেও তিনি ভাবেন নাই, তাঁহার স্বধর্ম্মী হিন্দুদের কি হইবে। তাঁহার আদর্শের বেদীতে যেমন করিয়া নিজের সুখ-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্য-আশ্রিতদের সুখ-সম্পদ বলি দিয়াছিলেন, তেমনি স্বধর্ম্মীদের সুখ-সম্পদও বলি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

অন্য প্রদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে লোক বিস্মিত হয়, যাহা সাধারণ-বুদ্ধি মানব কল্পনাও করিতে পারে না, যাহা করিতে অন্য মানুষের বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠে, অসাধারণ ত্যাগ-বীর চিত্তরঞ্জন সেই শ্রেণীর কাযই করিয়া গিয়াছেন বেশীর ভাগ; ইহাই চিত্তরঞ্জনের জীবনের বিশেষত্ব। ফলতঃ যাহাকে তিনি তাঁহার আদর্শ বলিয়া একবার মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহার জন্য অত্যাজ্য চিত্তরঞ্জনের কিছুই ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর মাথা চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় নুইয়া পড়িবে এবং তাহাদের জাতীয় গর্ব্ব-অহঙ্কার তাঁহাদের এই ত্যাগ-বীর পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিবে।

—

স্বদেশ মিত্রম্

মান্দ্রাজ

মৃত্যুর কঠোর হস্ত আমাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত, নেতাদের নেতা, যিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরচিত্তাকর্ষক প্রভাবে, অদমনীয় ইচ্ছাশক্তিতে

শোকমগ্না বাসন্তী দেবী

বসুমতী প্রেস]

[পি, বসুর ফটো-চিত্র হইতে
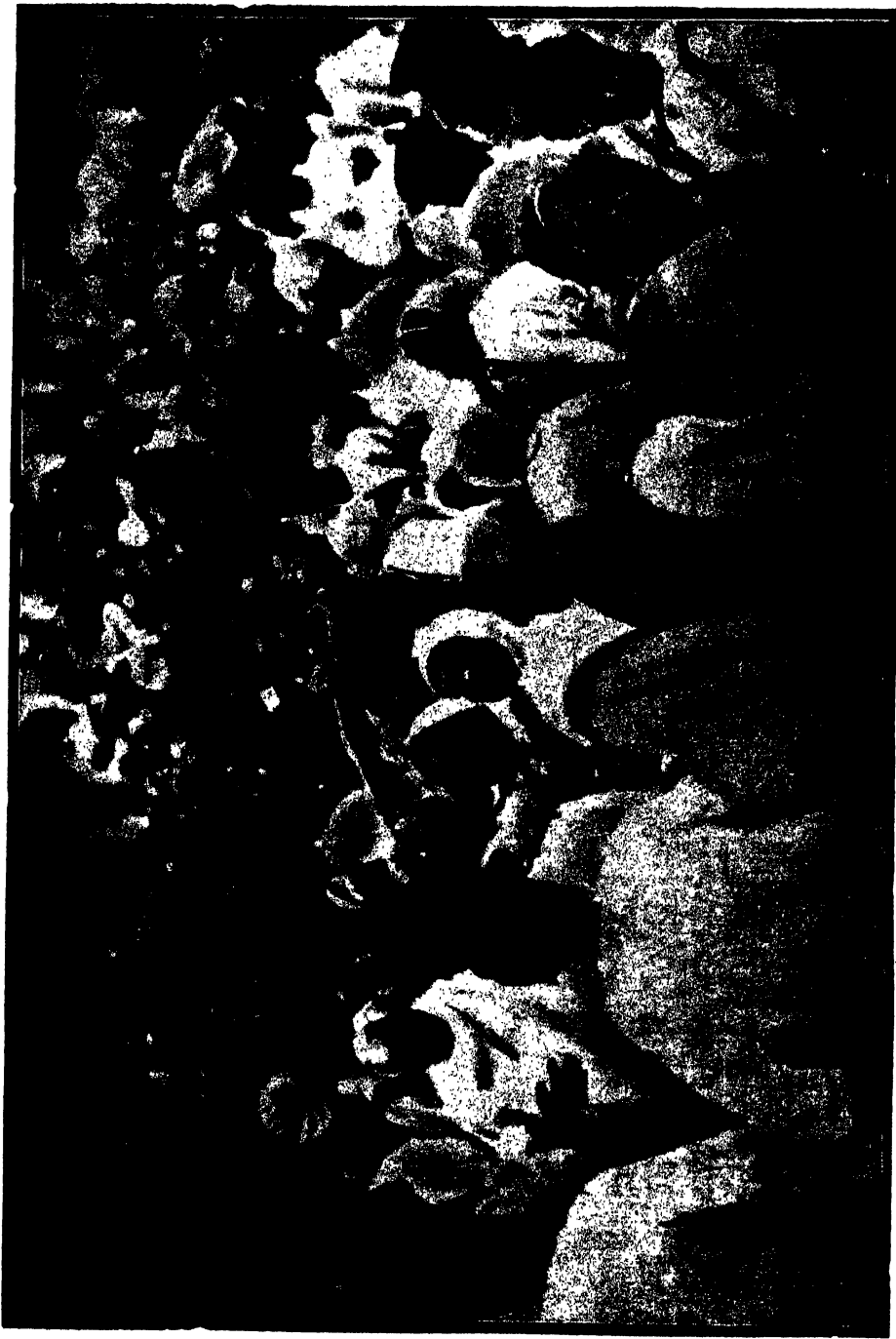
মতের দৃঢ়তায় ও চরম আত্মত্যাগে তাঁহার নাম এই বিরাট দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাকে সরাইয়া লইল। তাঁহার অভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করা কঠিন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার রাজনীতিক কার্য্যপদ্ধতি ঠিক কি-না। বাঙ্গালার কর্ত্তব্য—তাঁহার নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা।

মাদ্রাজ মেল

সি, আর, দাশের মৃত্যুতে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে এক জন মহা শক্তিশালী পুরুষের তিরোভাব ঘটল। তিনি প্রধান ব্যবহারাজীব থাকায় অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার আদালতবর্জ্জনে দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সে নীতির দৃঢ় সমর্থনের ফলে তিনি চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে আসন লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালায় তাঁহার দলের বাধা-দাননীতির সাফল্যলাভ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহার লেখা ও বক্তৃতায় বুঝা যাইত, কেবল বাধা-দাননীতির অনুসরণ করিলে যে ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে কোন শুভ ফল পাওয়া যাইবে না—এ কথাটা আজকাল তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। দাশ যদি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দলের নীতির পরিবর্ত্তন করিতেন বলিয়া মনে হয়। তিনি তাঁহার মতের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহার দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে যুঝিতেন।

হিন্দু

মাদ্রাজ

ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের ইহা একটা প্রধান দুঃখ যে, দেশমাতৃকার এক এক জন একনিষ্ঠ সেবকের অমূল্য জীবন মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর কঠোর হস্তে হঠাৎ অন্তর্হিত হইতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-সংবাদে জনসাধারণ প্রাণে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বর্ত্তমানে রাজনীতিক আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, এই একটিমাত্র লোকের অভাবে তাহা আবার রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে পারে। তিনি থাকিলে দৃঢ় হস্তে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া ও নানা শক্তির সমন্বয় ঘটাইয়া দেশবাসীর উদ্দেশ্য বোধ হয় সিদ্ধ করিতে পারিতেন। যে সময় ব্যুরোক্রেশীর সহিত সংগ্রাম চরমে উঠিয়াছে, সেই সময় মিঃ দাশের মত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন নেতার অভাব ভারতের পক্ষে নিতান্তই অসহ,—বাঙ্গালার কথা না বলিলেও বোধ হয় চলে। রাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষতার গুণে মিঃ দাশ বাঙ্গালায় তাঁহার দলটিকে বেশ সুসংবদ্ধ ও কার্য্যক্ষম করিয়া লইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত রেষারিষি সত্ত্বেও তিনি অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাঁহাকে কাষ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দলের সকলে দ্বিরুক্তি না করিয়াই একান্তভাবে তাঁহার বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হইত; প্রতিদানে, দলের কেহ কখনও কোন ভুল করিলে তিনি তাহা নিজেই বীরের মত মাথা পাতিয়া লইতেন। অসহযোগের অবশিষ্ট কার্য্যপদ্ধতিতে যখন বাঙ্গালার তরুণ সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না, সেই সময় মিঃ দাশ তাঁহাদের জন্য নূতন পন্থার আবিষ্কার করেন। যে ব্যক্তি এই ভাবে রাজদ্রোহের স্থানে নূতন কর্ম্মপদ্ধতির সৃষ্টি করিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকেই রাজদ্রোহের গোপন সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ করা হইল। বাঙ্গালায়—যেখানে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের উপরও মাঝে মাঝে ইট-পাথর পড়ে, সেখানে যখন তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক নেতা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার বাহিরে—সমগ্র ভারতে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা কিছু ভাল—আত্মত্যাগের, দেশসেবার অসীম ক্ষমতা তাঁহাতে পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল, তখন তিনি কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়াই বিলাস-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেশবাসীর জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন বলিলেও চলে। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন এবং অসমসাহসের সহিত উৎপীড়িত দেশবাসীর হৃদয়-ক্ষত আরাম করিবার জন্য প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতির ভালমন্দের বিচার ইতিহাস করিবে। আমরা সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার চরিত্রের উদারতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে পারি। মিঃ দাশের পূর্ব্বে অনেকেই সাহস, শিক্ষা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগের শক্তি প্রভৃতিতে বড় হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু মিঃ দাশে সে সকল গুণেরই বিশেষ সামঞ্জস্যের সহিত সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার জীবন তাঁহার সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশা ও উৎসাহ আনিয়া দিবে। মিঃ দাশ দেশের কাযেই তাঁহার জীবনপাত করিলেন। তাঁহার গর্ব্বে গর্ব্বিত, দুঃখিত দেশবাসী তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভের উপর লিখিয়া রাখিতে পারেন—ইঁহার অপেক্ষা অধিক স্বদেশপ্রেম আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

স্বরাজ্য

মাদ্রাজ

দেশভক্ত, কবি ও জাতীয়তার ব্যাখ্যাতা চিত্তরঞ্জন অপেক্ষা আর কেহ দেশবাসীর নিকট অধিক প্রিয় নহে। ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে যেটুকু ভাল, তাঁহাতে তাহাই প্রকাশ পাইত। দেশভক্তি তাঁহার প্রধান ব্যসন ছিল। তিনি তাঁহার দেশবাসীর সেবার জন্য তাঁহার ধন, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি ও কার্য্যশক্তি এবং শেষে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগ ও দেশসেবার বিরাটত্ব নিমিত্ত দেশের জনসাধারণের নিকট তাঁহার নামের একটা মোহিনী শক্তি ছিল। দেশবাসীর উপর প্রভাববিস্তারে, তাহাদের উন্মাদনা আনয়নে তিনি মহাত্মা গন্ধীর নিম্নেই ছিলেন। তাঁহার দেশসেবার বিষয় সকলেই অবগত আছে, এরূপ সঙ্গীন সময়ে যে এরূপ লোকের নেতৃত্ব পাওয়া গিয়াছিল, সে জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ, সকলেই শ্লাঘা অনুভব করিত। কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেশবন্ধু বুঝিলেন, আমাদিগকে চিরস্থায়ী দাসত্বের মধ্যে রাখিবার জন্য ব্যুরোক্রেশী যে কপট শাসনপ্রথা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে না পারিলে দেশে গঠনকার্য্যের পথ প্রস্তুত হইবে না। তিনি যাহা ঠিক পথ মনে করিলেন, তাহার জন্য তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরলতা ও অধ্যবসায়ের সহিত যুঝিতে লাগিলেন, প্রতিপক্ষের পর্ব্বতপ্রমাণ উপেক্ষা-উপহাসে তিনি বিচলিত হইলেন না। ২ বৎসরের পরীক্ষার পরই আমরা দেখিতেছি, তাঁহার অবলম্বিত পথই—তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ঠিক। কাউন্সিল-গৃহ হইতে ব্যুরোক্রেশীর উপর তিনি যে সকল আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি সমগ্র সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আজ বৃটিশ জগৎ তাঁহার আন্দোলনের ফলে বুঝিতেছে, ভারতবর্ষ এইবার ঠিক কাযের কথা পাড়িয়াছে এবং তাহার ন্যায্য অধিকার পাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। দুইটি প্রদেশে দেশবন্ধুর কার্য্যপদ্ধতি সাফল্য লাভ করিয়াছে, সেখানে দ্বৈতশাসন ইতোমধ্যে

পক্ষ লাভ করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশেও যে এরূপ হয় নাই, তাহার জন্য নিশ্চয়ই তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহার অভিপ্রায়-মত যদি কংগ্রেস গত কাউন্সিল-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই স্বরাজীদিগকে কাউন্সিল-গমনের অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে সকল কাউন্সিলেই কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ঘটিত। এখন আমাদের উচিত, দেশবন্ধুর আদর্শের অনুসরণ করা। যে সময় তাঁহার সাহায্য দেশের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, সে সময় মৃত্যুর কঠোর হস্ত তাঁহাকে অপসারিত করিল, ইহা আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু অদৃষ্টের সহিত ঝগড়া করিবার উপায় নাই। দেশবন্ধুর মত আত্মত্যাগী ও কৃতী পুরুষ সচরাচর মিলে না, কিন্তু সকলেই সাহস ও সততার সহিত তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে।

জাষ্টিস্

মাদ্রাজ

মিঃ সি, আর দাশের মৃত্যু-সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি ভগবানের কার্য্যপদ্ধতি রহস্যময়। সেই জন্য আজ আমাদিগকে দেশমাতৃকার এক জন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, অন্যতম প্রধান দেশ-কর্ম্মীর তিরোভাব-দুঃখ সহ্য করিতে হইল। বাঙ্গালার এই স্বরাজী নেতার রাজনীতিক মতামত ও আদর্শের সহিত আমাদের প্রায়ই মিল হইত না বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর জন্য তিনি ভারতের সাধারণ রাজনীতিকদের অপেক্ষা যে অনেক উচ্চে অবস্থিত ছিলেন, এ জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে কোন দিন পশ্চাৎপদ ছিলাম না। পক্ষান্তরে, আমরা তাঁহার অক্লান্ত দেশপ্রেম—দেশবাসীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সারা-জীবনব্যাপী অদম্য অপূর্ব্ব উৎসাহ—এ সবের প্রশংসাই করিয়া আসিয়াছি। দেশের কাযে জীবনপাত করা দেশবন্ধুর জীবনে সর্ব্বপ্রধান ব্যসনরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি তাঁহার সেই ব্যসনের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এ সুখ্যাতি তাঁহার চিরকাল বজায় থাকিবে। অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সময় মহাত্মা গন্ধী যখন তাঁহাকে কংগ্রেস ও দেশমাতৃকার নামে আহ্বান করিলেন, তখন দেশবন্ধু তাঁহার বিপুল অর্থাগমের ব্যবসা, রাজোচিত জীবন-যাপনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী লইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করেন নাই। সে কায করিয়া তিনি ভাল করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ত্যাগের অন্তরালে যে একান্ত অকপট ও তীব্র স্বদেশপ্রেম বর্ত্তমান ছিল, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। আত্মত্যাগের এরূপ জ্বলন্ত আদর্শ সচরাচর মানুষের চোখে পড়ে না, আর সকলেই তাহা প্রদর্শন করিতেও পারে না। ইতিহাসে মিঃ দাশ দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী রাজনীতিকরূপে পরিগণিত হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিঃ দাশ সে বিষয়ে দূরদর্শীও ছিলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীর ক্ষমতা ও মনের অবস্থা তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির ফলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সংগঠনশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন তিনি কোন বিষয়ে ঝুঁকিয়া পড়িতেন, তখন কোন বাধাই তিনি দুর্লঙ্ঘ্য মনে করিতেন না। এই নির্ব্বন্ধাতিশয্য তাঁহার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অনেকটা পরিমাণে ইহার জন্যই তিনি বাঙ্গালার গণনীয় হইবার মত প্রকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ডেলি এক্সপ্রেস

মাদ্রাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত মিঃ সি, আর, দাশের মৃত্যু-সংবাদ জানাইতেছি। তিনি বাঙ্গালার জাতীয় দলের বিখ্যাত নেতা ও দেশ-জননীর অন্যতম কৃতী সন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হঠাৎ ঘটিল, লোকে ধারণা করিতে পারিতেছে না—সেই বিশাল শক্তির অসামান্য প্রতিভা—সেই মহান্ হৃদয় সত্যই কি চিরতরে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল? অদৃষ্ট দুর্লঙ্ঘনীয়। তাই সমগ্র ভারত আজ ভারতমাতার একটি উদারহৃদয় ও প্রিয়তম পুত্রের জন্য শোকে মুহ্যমান। মানবজাতির উদ্ধারকল্পে আধ্যাত্মিকতাই ভারতের উল্লেখযোগ্য দান; তাঁহাতে তাহার অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব স্বাভাবিক শক্তি তাঁহাকে অল্পবয়সেই অনন্যসাধারণ সাফল্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সাফল্য তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার পিতার বিরাট ঋণভার তিনি মাথা পাতিয়া লইয়া যে মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহার পুণ্যস্মৃতি বাঙ্গালা চিরদিন যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। মিঃ দাশ স্বভাবতঃ কবি ছিলেন এবং কবি-জনোচিত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাই তাঁহাকে প্রথম বয়সে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিয়াছিল। আমাদের সামাজিক জীবনের কপটতা ও কঠোরতা অবলম্বন করিতে তখন তাঁহার অকপট বৈষ্ণব ধর্ম্মবিশ্বাস বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তিনি জাতি ও ধর্ম্মের নিকট হইতে যে দুইটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই ত্যাগ ও ভক্তি এবং তাঁহার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিল, যখন দেশের পক্ষে তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল এবং মিঃ গন্ধীর আহ্বান আসিল, দেশের সম্ভ্রান্ত, উচ্চবংশীয়দের সহিত সাধারণ ও নিকৃষ্টদের মধ্যেও বিরাট যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহার আহ্বান যখন মিঃ গন্ধীর মারফতে মিঃ দাশের মত সুন্দরভাবে গঠিত চরিত্রে যাইয়া আঘাত করিল, তখন তাহা বোধ হয়, তাঁহার নিকট দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকিবে। মিঃ দাশের রাজনীতিক মতামতের কথা আলোচনা করিবার সময় ইহা নহে; যখন এই সময়কার ইতিহাস লিখিবার সময় আসিবে, তখন দেখা যাইবে, জাতির জীবন-গঠনের পক্ষে মিঃ গন্ধীর নীচেই তাঁহার প্রভাব অধিক কায করিয়াছে। মিঃ মণ্টেগু জনসাধারণের সন্তোষের কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি আর দেখা না যায়, যদি সমগ্র দেশ অধিকতর স্বাধীন ও পূর্ণভাবে জীবন যাপন করিবার সুবিধা চাহে, তাহা হইলে অধুনা লোকান্তরিত এই মহান্ স্বরাজী নেতাই প্রধানতঃ তাহার কারণ বলিতে হইবে। তিনি তাঁহার দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং দেশের জন্য অসমসাহসিক কার্য্যেও অগ্রসর হইতেন, কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র মানবজাতির প্রতিও তাঁহার ভালবাসা কিছু কম ছিল না; তাঁহার ফরিদপুরের বিখ্যাত অভিভাষণ তাঁহার বুদ্ধি-শক্তির ও মহৎ হৃদয়ের জাজ্বল্যমান স্মৃতি-স্তম্ভস্বরূপ। এখন পথ অন্ধকারময়, চিত্ত সন্দেহ ও নিরাশায় আকুল; তাঁহার নেতৃত্ব এ সময় বিশেষ মূল্যবান্ হইত। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন। তবে তাঁহার জীবনের অগ্নিময় আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা যেন তাহার অনুসরণ করিতে পারি। তাঁহার আদর্শ তাঁহারই কথায়—"দেশভক্তির কবি, জাতীয়তার ব্যাখ্যাতা ও মানবজাতির সেবক।"

নিউ ইণ্ডিয়া

মাদ্রাজ

মিসেস আনি বেশান্ত নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন, মিঃ

দাশের মত এক জন উচ্চ দরের লোক হারাইয়া ভারত আজ গরীব। হঠাৎ তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। তিনি দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছিলেন; তাঁহার হঠাৎ তিরোভাবে সে কর্ম্মক্ষেত্রের আবশ্যক ব্যবস্থাদি করিতে অনেক সময় লাগিবে।

ইয়াং ইণ্ডিয়ায়

মহাত্মা গন্ধী

১

যখন অন্তরে গভীর ক্ষত থাকে, তখন কলম চলিতে চায় না। আমি এত বড় শোকের মাঝে 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'র পাঠকপাঠিকাদের জন্য বিশেষ কিছু লিখিতে পারিতেছি না। দার্জ্জিলিংএ মহান্ দেশপ্রেমিকের সহিত পাঁচ দিনের মেলা-মেশা আমাকে আরও ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। আমি বলিয়াছি, তিনি শুধু মহান্ নহেন, অতি উদার এবং অতি সৎ। ভারত মহারত্ন হারাইয়াছে, কিন্তু আমরা স্বরাজ্যলাভ করিয়া ইহার ক্ষতিপূরণ করিব।

২

পুরুষ-সিংহের পতন হইয়াছে। বাঙ্গালা আজ অনাথ। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশবন্ধুর এক জন সমালোচক আমার নিকট বলিয়াছিলেন—"এ কথা সত্য যে, আমি তাঁহার নিন্দা করি, কিন্তু আমি এ কথাও স্বীকার করি যে, তাঁহার স্থান লইবার উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে নাই।" দেশবন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া খুলনার জনসভায় আমি ঐ কথা বিবৃত করি। তিনি শত যুদ্ধের বীর ছিলেন। অপরাধ করিলেও তিনি দয়া করিতেন। ব্যারিষ্টারীতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও তিনি নিজে কখনও ধনী হয়েন নাই। নিজের গৃহ পর্য্যন্ত তিনি দান করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্জাবে কংগ্রেস তদন্ত-কমিটী-সম্পর্কে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। হাণ্টার কমিটীতে যে সকল প্রধান প্রধান সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল, সেগুলি বিবেচনা করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। আমি তথায় তাঁহার আইন সম্বন্ধীয় অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পাই। তিনি জেরা দ্বারা সাক্ষ্যগুলির মর্ম্ম উল্টাইয়া দিয়া সামরিক শাসনের দুষ্টামিগুলি প্রকাশ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি অন্য কিছু করিবার মতলব করিয়াছিলাম। আমি বাদানুবাদ করিলাম। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় তিনি আমার সকল আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়া আমাকে শান্ত করিয়া দিলেন। তিনি সকল বিষয়ে বিবেচক ছিলেন এবং আমি যাহা বলিলাম, বেশ ভাল করিয়া শুনিলেন। আজ কৃতজ্ঞতা ও শ্লাঘার সহিত জানাইতেছি—চিত্তরঞ্জন দাশের মত অনুরক্ত কর্ম্মী আমি আর একটিও পাই নাই।

অমৃতসর কংগ্রেসের সময় আমি আর শৃঙ্খলারক্ষার দাবী করি নাই। তখন সকলেই যোদ্ধা—প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেকমত দেশের মঙ্গলসাধনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম। সকলেই বিনয়ী, কিন্তু নিজ মত রক্ষায় ব্যগ্র। মালব্যজী মিটমাটের জন্য উৎসুক, একবার এ দল—একবার ও দল—করিয়া বেড়াইতেছেন। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলালজী ভাবিলেন—সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি লোকমান্য ও দেশবন্ধুর মধ্যে পড়িয়াছিলাম, শাসন-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে তাঁহারা উভয়ে একমত হইয়াছিলেন। এক দল অপর দলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু কেহ অপরের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। অনেকে ভাবিলেন—এইবার বন্ধুবিচ্ছেদ বা সর্ব্বনাশ হইবে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি পূর্ব্ব হইতে জানিতাম ও ভালবাসিতাম—কিন্তু এখনকার মত চিনিতাম না। তাঁহারা দুই জনে দেশবন্ধুর পক্ষসমর্থন করিবার জন্য আমাকে বুঝাইলেন। মহম্মদ আলী বিনীতভাবে জানাইলেন—"তদন্তের সময় তিনি যে বিরাট কায করিয়াছেন, তাহা যেন ব্যর্থ করিবেন না।" কিন্তু তাহাতে আমার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিন্ধুদেশবাসী সরলহৃদয় জয়রামদাস আমাকে রক্ষা করিলেন। তিনি এক টুকরা কাগজে মিটমাটের জন্য অনুরোধ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। প্রস্তাব ভাল বলিয়া মনে হইল। তাহা দেশবন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। উত্তর আসিল—"আচ্ছা, যদি আমার দল উহাতে সম্মত হয়।" দলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দলকে রক্ষা করিবার জন্য এই আগ্রহই আজ তাঁহাকে জনগণের এত প্রিয় করিতে পারিয়াছিল। লোকমান্য দূর হইতে ঐ ব্যাপার দেখিতেছিলেন। মালব্যজী তখন বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। লোকমান্য বলিলেন, "যদি দাশ মহাশয় সম্মত হন, তাহা হইলে আমিও সম্মত হইব।" মালব্যজী সে কথা শুনিয়া আমার হাত হইতে কাগজখানি কাড়িয়া লইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, মিটমাট হইয়া গিয়াছে। আমি এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া দেশবন্ধুর কতকগুলি গুণের পরিচয় প্রদান করিলাম। তাঁহার মহত্ত্ব, অবিসংবাদী নেতৃত্ব, কার্য্যে দৃঢ়সঙ্কল্প, বিচারে সমদর্শিতা ও দলের প্রতি অনুরাগ এই সকল গুণই এই ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি আরও কিছু বলিব। জুহু, আমেদাবাদ, দিল্লী ও দার্জ্জিলিংএ আমরা মিলিত হইয়াছিলাম। তিনি ও মতিলালজী আমার মত পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য জুহুতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা দুই জনে যমজের মত হইয়াছেন। আমার মত অন্যরূপ ছিল, কিন্তু তাঁহারা আমার সহিত মতভেদ হওয়া সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। যাহা তাঁহারা দেশের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, তাহার জন্য তাঁহারা প্রিয়তম বন্ধুর নিকটও নত হইতেন না। আমাদের মধ্যে মিটমাট হইল না। আমরা অসন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু হতাশ হই নাই। তাহার পর একে অপরকে পরাজিত করিবার জন্য বাহির হইলাম। আবার আমেদাবাদে সাক্ষাৎ হইল। দেশবন্ধু তখন প্রকৃতিস্থ, তিনি সকল বিষয় দেখিতেছেন ও মতলব স্থির করিতেছেন। তিনি আমাকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার মত বন্ধুর হাতে আর আমাকে পরাজিত হইতে হইবে না! তিনি আর নাই! কেহ যেন না মনে করেন যে, "গোপীনাথ সাহা" প্রস্তাবের জন্য আমরা পরস্পরের শত্রু হইয়াছিলাম। আমরা প্রত্যেকে অপরকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু উহা প্রেমিকের বিবাদ; স্বামি-স্ত্রীতে বিবাদের সময় যেমন ভবিষ্যতের মিলনকে মধুরতর করিবার জন্য প্রত্যেকে অপরকে অধিক চটাইবার চেষ্টা করেন—ইহাও সেই প্রকারের, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। আমরা দিল্লীতে আবার মিলিত হইলাম। দাশ, পণ্ডিতজী উভয়েই উপস্থিত। প্যাক্টের খসড়া প্রস্তুত হইল ও সকলে তাহাতে সম্মত হইলাম। এক জন মৃত্যুর দ্বারা যে বন্ধন দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কখনও ছিন্ন হইবে না।

এখন আমি দার্জ্জিলিংএর কথা বলিব। তিনি প্রায় আধ্যাত্মিক ব্যাপারের কথা বলিতেন এবং বলিতেন যে, উভয়েই আমরা এক-ধর্ম্মাবলম্বী। দার্জ্জিলিংএ ৫ দিন অবস্থান কালে তিনি দেখাইয়াছেন যে, তিনি শুধু মহৎ ছিলেন না—তিনি সৎ ছিলেন এবং তাঁহার সততা দিন দিন বাড়িতেছিল। লোকমান্যের মৃত্যুতে আমি নিঃসহায় হইয়াছিলাম। আজ দেশবন্ধু-বিয়োগে আমি অধিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি। লোকমান্যের মৃত্যুকালে দেশের লোকের সম্মুখে আশার

আলোক ছিল। তখন যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত। হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। আর এখন ?

বোম্বে ক্রণিকেল

দেশবন্ধুর এই অপ্রতর্কিত অন্তর্দ্ধান গভীর শোকের কারণ। দেশের কাযে তাঁহার এত অধিক প্রভাব ছিল যে, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই, এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারা যাইতেছে না। তিনি বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালা নয়, সমস্ত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিলকের মৃত্যুর পর দেশের এমন বিপৎপাত আর হয় নাই।

কয়েক মাস, হয় ত কয়েক বৎসর পরে আমরা বুঝিতে পারিব, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম হইতে কি এক প্রেরণাশক্তি, পরিচালনক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশের মুক্তির জন্য তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, দেশের কায লইয়াই তিনি ছিলেন এবং দেশের কাযেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, দেশের কাযে সুদীর্ঘ সময় প্রাণপাত পরিশ্রমেই তাঁহাকে এত শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। মহাত্মা গন্ধী ছাড়া যদি আর কেহ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া জাতির রাজনীতিক্ষেত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দেশবন্ধু। ইহা অতিরঞ্জন নহে। গত ২ বৎসর কাল ব্যুরোক্রেসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার কঠোর ভার দেশবন্ধু প্রকৃতপক্ষে মহাত্মার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু যে ভাবে যুদ্ধপরিচালন করিতেছিলেন, তাহা শুধু যে তিনি ঠিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নয়, যাঁহারা জগতে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে আসেন, সেই মহাপুরুষদেরই উপযুক্ত অটল বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে ছিল। তাঁহার পথি-নির্দ্দেশ ঠিক হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় এখন নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, দেশবন্ধু যাহার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের জন্য তিনি আর সব সরাইয়া দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই বিশেষত্ব, এই দৃঢ়তা এবং তাঁহার জলন্ত দেশপ্রেম তাঁহাকে দেশের কাযে—জাতীয় সংগ্রামের পরিচালন-ব্যাপারে বিশিষ্ট আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইল যে, ব্যুরোক্রেসীর সকল বাধা—তাঁহাদের সমর্থনকারীরা—সংবাদপত্র প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইল।

"আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমি আমার স্বাধীনতা ভালবাসি। আমার কায নিজে চালাইয়া লইবার অধিকার—আমার জন্মগত অধিকার আমি লইব-ই। যদি তাহা অপরাধ হয়, আমি বরং তাহার জন্য ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইব, তথাপি যাহা আমি বর্ত্তমান সময়ে সকল ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহা পরিত্যাগ করিব না।" এই জলন্ত কথা কয়টিতেই তিনি তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন. আর, ইহার জন্যই দেশের লোকের উপর তাঁহার এইরূপ প্রভাব ছিল। এই সোজা, সরল পথে চলিবার দৃঢ় ইচ্ছা—এক হাতে নিজের জীবন ও অপর হাতে যশের ভাণ্ড লইয়া—উভয় হাতই সম্পূর্ণ খুলিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইবার প্রবল সঙ্কল্প তাঁহাকে অদ্ভুত শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছিল। লোকমান্য এই শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং মহাত্মা অনেক অধিক পরিমাণে ইহা পাইয়াছেন। লোকমান্য ও মহাত্মার ন্যায়ই তাঁহাকে মহৎ হওয়ার দুর্ভাগ্য ভুগিতে হইয়াছে। তাঁহার দেশের লোক অনেকে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে, দেশের স্বাধীনতার শত্রু যাহারা, তাহারা তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে।

দেশের কায করিতে করিতেই দেশবন্ধু মারা যাইলেন। এমনটিই তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে সকলেই নিজ অঙ্গচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করিতেছে। যে সময় তাঁহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, সেই সময় তিনি অপসারিত হইলেন। যে সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ, শত্রুপক্ষ বলবান্, যে সময় তাঁহার পরিচালন—অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা, অদমনীয় ইচ্ছা এবং সর্ব্বোপরি অনুপম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব-বিস্তারের ক্ষমতা—এ সবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখনই তিনি চলিয়া যাইলেন।

কিন্তু তিনি ত মরেন নাই। মানস জগতে তিনি এখনও জীবিত। তিনি আমাদের কতকগুলি অমর বস্তু দিয়া গিয়াছেন—দেশের জন্য প্রাণ-ঢালা ভালবাসা, দেশের কাযে প্রাণ দেওয়া, আত্মত্যাগের মহামন্ত্র এবং সেই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি, যেখানে মানবের মুক্তিতে সম্প্রদায় ও দেশগত গভীর কোন বাধা থাকে না। দেশবন্ধুর জীবন ভগবানের বিশিষ্ট দান। আমরা যেন সে দানের প্রতিদান দিতে পারি, দেশবন্ধুর আদর্শ গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।

ইভনিং নিউজ

বোম্বাই

মিঃ দাশ বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তির অভাব ঘটিল। দেশবন্ধু সুবক্তা ছিলেন, বক্তৃতাশক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি তাঁহার আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে—সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজনীতিক কৌশলে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিয়াছিলেন এবং যেরূপ সাহসের সহিত তাহার অনুসরণ করিতেন, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

টাইম্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া

বোম্বাই

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অপসৃত হইলেন। বামনদের মধ্যে তিনি দৈত্যস্বরূপ ছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট তিনি হয় ত তত বড় বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, কেন না, যাঁহারা বড় বড় কায করিয়া যায়েন, তাঁহারাই পরে মহৎ ও উন্নত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সেরূপ বিবেচিত হন না। বড় ব্যবহারাজীব হইতে নিরপেক্ষ ও সঙ্কীর্ণ রাজনীতিকে পরিণত হইয়া তিনি হয় ত ভুল করিয়াছিলেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি সেরূপ হইয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। আর সে কথা স্বীকার করিলেই বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার দেশসেবার শক্তিতে যে বিশ্বাস ছিল, তাহারও কিছু প্রভাব তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের উপর পড়িয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল

বোম্বাই

বাঙ্গালার শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ায় মিঃ দাশের আর কোন

রাজনীতিক কার্য্যপদ্ধতি ছিল না। কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মিঃ গান্ধীকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই। মিঃ দাশের দেশভক্তিতে কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু দেশভক্তির সহিত রাজনীতিজ্ঞান না থাকিলে সুফল লাভ করা যায় না।

—

মারাঠা

বোম্বাই

দেশবন্ধু সি, আর, দাশের মৃত্যু-সংবাদে লক্ষ লক্ষ সন্তানের চক্ষু দিয়া ভারত-মাতা নিশ্চয়ই রক্ত অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। যে সময় দেশবাসী আশান্বিত ও দৃঢ় অধ্যবসায় লইয়া মুক্তি-সংগ্রামে পথিপ্রদর্শনের জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, সেই সময় এই নিদারুণ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কথা ছিল—যদি আমাকে বাঁচিতে হয়, স্বরাজের জন্য বাঁচিব; মরিতে হয়, স্বরাজেরই জন্য মরিব।

এই মুক্তি-সংগ্রামের বীরের মহান্ আত্মার মহত্ত্বের কারণ, মুক্তির জন্য তাঁহার একান্ত ব্যাকুলতা। অল্পবয়স হইতেই তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে তাঁহার দেশের মুক্তির আদর্শ পোষণ করিতেন। যে বংশে চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন, তাহা উদারতার জন্য প্রসিদ্ধ, কবিত্ব-প্রতিভা, চরিত্রের বিশুদ্ধিতা, স্বাধীনতা-প্রীতি সে বংশের বিশিষ্টতা। চিত্তরঞ্জন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন পিতৃঋণ পরিশোধ করেন, তখনই আত্মত্যাগ ও উচ্চ আদর্শের সুখ্যাতি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্বদেশী আমলের মামলাগুলিতে বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষসমর্থনে তাঁহাদের সংস্পর্শে তিনি দেখিতে পান, যুবকগণ দেশপ্রেমে পাগল, অন্তর সততায় পূর্ণ। ইহাতে তাঁহার অন্তরের অর্দ্ধসুপ্ত দেশপ্রেম পরিপূর্ণভাবে জাগিয়া উঠে। এই জন্য তিনি বরাবর স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট বাঙ্গালী যুবকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এমন কি, তিনি তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ সমর্থন করিতেন, প্রয়োজনমত তাহাদের ভুলভ্রান্তির সংশোধন করিয়া দিতেন এবং তাহাদিগকে দুই হাতে অর্থসাহায্য করিতেন। তাই তিনি বাঙ্গালার যুবকমণ্ডলীর এত প্রিয় হইয়াছিলেন, ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালার নেতৃত্ব পাইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থায় তিনি যে নেতাদের শীর্ষস্থানীয় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? নেতৃত্বের গুরু কর্ত্তব্যে সাফল্যলাভের পক্ষে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে সকলই তাঁহার ছিল। নেতার সম্মুখে সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ এবং সে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার মত সুব্যবস্থিত কার্য্যপদ্ধতি থাকা আবশ্যক, তাঁহার কার্য্যপরম্পরার পশ্চাতে চিন্তাধারার ও কার্য্যপদ্ধতির ব্যাখ্যা; তাঁহার জীবন মহৎ করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসারে চলিবার সাহস থাকা দরকার। মিঃ দাশের এ সকল গুণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। ১৯১৩ অব্দে তিনি লোকমান্য তিলকের সংস্পর্শে আইসেন এবং তাঁহাকে তিনি তাঁহার রাজনীতিক গুরু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার নিকট হইতেই রাজনীতিক্ষেত্রের কার্য্যবিজ্ঞান শিক্ষা করেন।

অসহযোগের মূল কথাগুলি তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিলেও তিনি কাউন্সিল-বয়কট ও বাধাপ্রদানের বিরতির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি দ্বৈত-শাসনকে ধ্বংস করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সাফল্যলাভ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গৌরবের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

—

হিন্দুস্থান টাইম্‌স্

দিল্লী

দেশবন্ধু দাশের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছি। সমগ্র ভারত আজ শোকে মুহ্যমান। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের এক জন অতুলনীয় যোদ্ধাকে আমাদের অবর্ণনীয় ক্ষতি করিয়া এত শীঘ্র কাড়িয়া লওয়া হইবে, সেরূপ আশঙ্কা কেহই করে নাই। ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রের এই বীরের প্রতি যে সময় সকলের উৎসুক দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, যে সময় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য দেশবন্ধুর রাজনীতিক শক্তি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় মৃত্যুর কঠোর হস্ত তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকা ফেলিয়া দিল। এরূপ দুর্জ্জয় সাহসী, অক্লান্ত দেশপ্রেমিক ও পরোপকারপরায়ণ ব্যক্তি যে কোন দেশে জন্মিলে তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তাঁহার জ্বলন্ত ইচ্ছার সম্মুখে প্রতিপক্ষের বাধা-প্রদান ব্যর্থ হইত, তাঁহার সমগ্র জীবন আত্মত্যাগের অনুপম ইতিহাস। এরূপ ত্যাগ ও দেশসেবার নিদর্শন পৃথিবীতে বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পিতৃঋণ নিজ স্কন্ধে লইয়া দেশবন্ধু প্রথম জীবনেই যে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া যে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি কবি ছিলেন, কিন্তু কৃপণের মত কাব্যরস আস্বাদনেই রত ছিলেন না। তিনি বড় ব্যবহারাজীব ছিলেন, কিন্তু দেশের মুখ চাহিয়া সে কুবেরের আয়ও তিনি পরিত্যাগ করেন। অদৃষ্ট-দেবতার প্রিয় পুত্র হইলেও দেশের কাযের জন্য তিনি নিজের সুখ নষ্ট করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর সাধনা—বিরাট যুদ্ধে সাফল্য-লাভের সঙ্কল্প। কলিকাতার স্পেশ্যাল কংগ্রেসে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে যাইয়া তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই নাগপুরে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার দেশসেবা বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার আত্মত্যাগের ও নেতৃত্বের শক্তি তাঁহার প্রদেশকে এরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, গবর্মেণ্ট তাঁহার আত্মাকে কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহাকে তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। ফরিদপুরে তিনি যে নির্ভীক অভিভাষণে এক দিকে বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা, কিন্তু অন্য দিকে তাহাদের অনাচারের নিন্দা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহার দেশপ্রেম, একমাত্র দেশপ্রেমই তাঁহার সমগ্র মনোরাজ্য জুড়িয়া ছিল।

—

ট্রিবিউন

লাহোর

মিঃ দাশের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে বাঙ্গালার এক জন শক্তিশালী পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। মিঃ দাশ বর্ত্তমান সময়ে দেশের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক সম্প্রদায়ের তিনি বিশ্বাসভাজন নেতা ছিলেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রধানতঃ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ছিল। তিনি তাঁহার যোগ্য ও তাঁহারই মত বিখ্যাত সহযোগীদের সাহায্যে ভারতের জাতীয়

আন্দোলনকে মহাত্মার সহিত একযোগে নিরাপদে স্বরাজ স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিবেন বলিয়া সকলেই আশা করিত।

মোসলেম আউট-লুক

লাহোর

মিঃ দাশের মৃত্যুতে আমাদের সময়ের এক জন নেতার অভাব ঘটিল। তিনি অকৃত্রিম দেশভক্ত, হিন্দু-মুসলমান একতার অকপট সমর্থক ছিলেন। ভারতের রাজনীতিতে তাঁহার যেরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ছিল, সেরূপ আর কোন হিন্দু নেতার নাই। তিনি যে ভাবে মহাত্মা গন্ধীর কাউন্সিল বয়কট নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে দেশের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা অনুসারে স্বরাজ্য দলের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে রাজনীতিক্ষেত্রে এক জন বিশেষ কাযের লোক এবং এক জন প্রতিভাশালী নেতা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি সিরাজগঞ্জের ভুল স্বীকার করিয়া প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার-নীতির নিন্দা করিয়া তিনি যে সততা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের নেতাদের মধ্যে দুর্লভ। বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদে দেশে দলাদলি ঘটিতেছে, তাহার মীমাংসায় তাঁহার মত সিদ্ধহস্ত কেহ ছিলেন না। বাঙ্গালার প্যার্টি তাঁহার দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও মহত্ত্বের স্মৃতি-স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করিবে।

সিভিল মিলিটারী গেজেট

লাহোর

মিঃ দাশ রাজনীতিক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। কাউন্সিলে তিনি গবর্ণমেণ্টকে পরাজিত করিবার জন্যই সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের প্রদেশে সংস্কার ব্যবস্থা পণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন। যদি ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা বেশ ভাল রকম করিয়াই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জমীন্দার

লাহোর

হিন্দু-মুসলমান একতার প্রধান সমর্থকরূপে মিঃ দাশ মহাত্মা গন্ধীর নীচেই ছিলেন। ভারতে একতা আনয়নের জন্য যে কয় জন দেশভক্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে কায করিতেছেন, মিঃ দাশের বিশিষ্ট প্রভাবে তাঁহারা শক্তিশালী ছিলেন। হিন্দুদের মতই মুসলমানরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে।

এডভোকেট অব ইণ্ডিয়া

লক্ষ্ণৌ

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ জীবনের মধ্যাহ্নে মৃত্যুর কঠোর হস্তে অপহৃত হইলেন। যে সব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেশবন্ধু সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, আমরা যেন তাহা না ভুলি এবং তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিরজাগরূক রাখি। যে সময় দেশে তাঁহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময় হঠাৎ আমাদের পথপ্রদর্শক নেতা, উপদেষ্টা বন্ধু—আমাদের মধ্য হইতে অপসৃত হইলেন। এই শোকের বেগ অধিক তীব্র ও মর্ম্মন্তুদ হইয়াছে। ভারতে বৃটিশের ইচ্ছাতেই যে এখনও সেই চিরপুরাতন কপটতা বিদ্যমান, তাহা প্রদর্শনের জন্য দেশবন্ধু নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, শেষ সময়ে তিনি তাহার পুরস্কার পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালায় তাঁহার চেষ্টার সাফল্য দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের স্বরাজ-সংগ্রামে তাঁহার জীবন-কথায় উৎসাহ আনিয়া দিবে।

ইণ্ডিয়ান ডেলী টেলিগ্রাফ

লক্ষ্ণৌ

মিঃ সি আর দাশের মৃত্যু-সংবাদে দেশবাসী বিশেষ বিচলিত হইয়াছে। মিঃ গন্ধী ছাড়া আর কোন ভারতবাসী তাঁহার মত সাধারণের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। দেশের জন্য তিনি যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা জগতে সকল জাতির ইতিহাসেই অশ্রুতপূর্ব্ব। তাঁহার বিয়োগে আজ দেশে কেবল এক জন মানুষের অভাব ঘটিল না—রাজনীতিক শক্তি নষ্ট হইল। তিনি দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে চারিদিক্ হইতে যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, তাহার প্রথম সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যাইলেন।

পায়োনিয়র

এলাহাবাদ

মিঃ সি, আর দাশ ব্যবহারাজীবদের মধ্যে বিশেষ কৃতিমান্, বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ। ভারতের উন্নতিবিধানের পক্ষে মিঃ দাশ এক জন প্রধান সাহায্যকারী, কিন্তু তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা তিনি ধ্বংস করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সমসময়েই বাঙ্গালাদেশ হইতে সেই শাসনপ্রথা অস্থায়িভাবে অন্তর্হিত হইবার ঘোষণা জারী হইয়াছে। সে হিসাবে তাঁহার রাজনীতিক জীবনে স্পষ্ট সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে। কাউন্সিল বয়কট করিবার গন্ধীপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার মৌলিক অসারতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার প্রশংসা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি রাবস্থাপক সভার বড় দলের গ্রহণীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই—দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এ পথে ততদূর অগ্রসর হয়েন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের আসনলাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে, কিন্তু ইদানীং তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য-হানির জন্য সে কার্য্যে অধিক মনোযোগ দিতে পারিতেন না।

লীডার

এলাহাবাদ

মিঃ দাশের মৃত্যু-সংবাদে দেশের সর্ব্বত্র গভীর শোকের ছায়া পড়িবে, দেশবাসী বিশেষ বিচলিত হইবে। মিঃ দাশ প্রতিভাশালী, অক্লান্ত কর্ম্মী, সাহসী, ধৈর্য্যশীল ও দাতা ছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। সে জন্য সকল কায করিতে, যে কোন প্রকার মূল্যে সে মুক্তি ক্রয় করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। যে সময়

তাঁহার রাজনীতিক মত সুন্দরভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় তাঁহার মৃত্যু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য।

—

বিহার হেরাল্ড

পাটনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল-মৃত্যুতে ভারত তাহার এক জন বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন নেতা, বাঙ্গালা তাহার প্রাণপ্রিয় দেবতাকে হারাইল। হঠাৎ এই দুঃসংবাদে সকলেই বিচলিত হইয়াছে। আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার অনাবিল অকপটতা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশপ্রেম, অসামান্য স্বার্থত্যাগ, এ সবের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার শক্তি এখন আমাদের নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবন বেশী দিনের না হইলেও, তাহা সাহস ও গৌরবের প্রভায় সমুজ্জ্বল। দেশের লোকের ভাবপ্রবণতার ও চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার, নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সেই অনুসারে কায করিবার ব্যবস্থা, মতামতের বৈশিষ্ট্য, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা ও উচ্চ আদর্শ—যাহার সাহায্যে নূতন নূতন লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়—দলপুষ্টি সম্ভব হয়, সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধিবিধান, সমাজ-দেহের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা-সম্পাদন—ইহাই যদি নেতৃত্বের কষ্টিপাতর হয়, তাহা হইলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, বলা যায়। সহস্রের মধ্যে সেরূপ এক জন নেতা মিলে। যতই বেশী লোক তাঁহাকে জানিতেছিল, ততই তাহারা শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলে বুঝিতেছিল, তিনি অসামান্য শক্তিশালী ছিলেন। পরের দুঃখ-কষ্ট বা নির্য্যাতনভোগ দেখিলে তিনি বিশেষ কাতর হইতেন, সকলের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ছিল। প্রাণে প্রাণে তিনি বিশেষভাবেই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু অন্য দিকে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার মত দুর্দ্ধর্ষ খুব কম লোকই ছিলেন, প্রতিপক্ষের ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের সহিত তিনি অসীম তেজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। তিনি ধীরচিত্ত অথচ অপরাজেয় ছিলেন। দেশবাসীর যে ভালবাসা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাদের উপর যে কর্তৃত্ব তিনি করিতেন, সেরূপ বাঙ্গালায় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার কোন বিশেষ গুণ তাহার কারণ নহে, তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

—

এক্সপ্রেস

পাটনা

মিঃ সি, আর, দাশ স্বভাবসিদ্ধ নেতা। ব্যবহারাজীব হইয়া অবধি তিনি সে ক্ষেত্রে বিশেষ বিচক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি আসামীপক্ষ সমর্থনের পর তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহার দানের সীমা ছিল না বলিলেও চলে। ব্যবহারাজীবের কাযে তিনি আশাতীত অর্থ উপার্জন করিলেও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য প্রায় কিছুই রাখিয়া যায়েন নাই। তিনি দেশের সেবার জন্য যে দিন আদালত বর্জ্জন করেন, সেই বিরাট আয় যাহা এ দেশবাসী লোকের ভাগ্যেই খুব কম ঘটিয়া থাকে, তাহা হঠাৎ ছাড়িয়া দিলেন, সেই দিন হইতে তিনি দেশবাসীর বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। ভারতীয় অনেক নেতারই সহিত তাঁহার রাজনীতিক মতের মিল ছিল না, কিন্তু মতভেদ প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার ছিল এবং পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় কোন মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তিনি তাহাতে ভীত হইতেন না।

রেঙ্গুন গেজেট

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ভারতের স্বরাজী সৈন্যরা এক জন নেতা হারাইলেন। মিঃ দাশ তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে আপনাকে সর্ব্বতোভাবেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি অন্য কাযে তাঁহার এই আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আরও অধিক প্রশংসা পাইতেন। বাঙ্গালার এক জন বড় ব্যবহারাজীব হইয়াও তিনি দ্বিধাশূন্য চিত্তে মিঃ গন্ধীর অনুসরণ করেন। মিঃ গন্ধী নিজের নামের জোরে জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, মিঃ দাশ তাঁহার বিশিষ্ট নীতির—রাজনীতিক মতের উপর নির্ভর করিতেন।

—

রেঙ্গুন টাইম্‌স্

মিঃ দাশ মিঃ গন্ধীর মত আদর্শবাদী ছিলেন। অধীরতার জন্য মিঃ দাশের দেশভক্তিতে সময় সময় বাধা পড়িত, এমন কি, তাঁহার বিচারশক্তিও প্রভাবিত হইত। রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরার্থে কায করিতেন। তিনি যদি আর কিছু দিন দেশের কায করিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিতেন। মিঃ দাশ যে এক জন মহান্ ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা শত্রুপক্ষও অস্বীকার করিতে পারেন না।

—

রেঙ্গুন ডেলী নিউজ

বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হইল। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনীতিক সম্প্রদায় নেতাশূন্য হইল। মিঃ দাশের বিয়োগে আজ সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন। বাঙ্গালা শোক করিতেছে, বর্ম্মাও শোক করিতেছে। মিঃ দাশের মত লোক জগতের এক স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার নিকট ভারতমাতা সকল জাতির সম্মিলনে একীভূত জগন্মাতার প্রতীকরূপে বিবেচিত হইতেন।

—

ফরওয়ার্ড

[মহাত্মা গন্ধী]

বাঙ্গালা দেশের উপর, শুধু বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতের উপর দেশবন্ধুর কি প্রভাব ছিল, কলিকাতা তাহা দেখাইয়াছে। বোম্বাইয়ের মত কলিকাতাতেও পৃথিবীর সকল জাতির লোকরা বাস করে। ভারতের সকল দেশের লোক এখানে থাকে। শবানুগমনের মিছিলে ইহারা সকলেই বাঙ্গালীর মত সমান আন্তরিকতা লইয়াই যোগদান করিয়াছিল। ভারতের সকল অংশ হইতে যে সব রাশি রাশি টেলিগ্রাম পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেই সমগ্র ভারতে লোকপ্রিয়তা তাঁহার কতটা ছিল, সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

কৃতজ্ঞতার জন্য যে জাতি বিখ্যাত, তাহাদের দেশের এমনটি ছাড়া অন্য কিছু ঘটিতে পারে না। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যোগ্য সম্মানই পাইয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ ছিল অসামান্য। উদারতা ছিল তাঁহার অসীম। তাঁহার প্রেমময় বাহু সকলকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই প্রসারিত ছিল। এ বিষয়ে তিনি বিচার-বিবেচনাশূন্য ছিলেন। এই সে দিন আমি ধীরভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার একটু বিচার-বিবেচনা করা উচিত ছিল। অমনই তাঁহার জবাব

শুনিলাম—আমার মনে হয় না যে, আমি বিচার-বিবেচনা হারাইয়াছি। রাজা এবং ফকির সকলকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। বিপন্ন যাহারা, তাহাদের প্রত্যেকের সাহায্যের জন্যই তাঁহার অন্তর-আকুল হইত। বাঙ্গালায় এমন যুবক কে আছে, যে কোন না কোন ভাবে দাশের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ নহে? আইনজ্ঞতায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন ছিলেন। তাঁহার সেই শক্তি দরিদ্রের সেবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। আমি জানি, বাঙ্গালার যাঁহারা রাজনীতিক বন্দী, তাঁহাদের সকলের না হইলেও অনেকেরই তিনি আদালতে পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন—এক পয়সাও না লইয়া। পঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য তিনি পঞ্জাবে গিয়াছিলেন, নিজের খরচ নিজেই দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে তিনি রাজার হালে সংসারে থাকিতেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, যত দিন তিনি পঞ্জাবে ছিলেন, সেখানে তাঁহার ৫০ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল। যাহারাই তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছে, তাহারাই উহা পাইয়াছে। এই যে মহাপ্রাণতা, ইহাই তাঁহাকে হাজার হাজার যুবকের অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

যেমন তিনি উদার ছিলেন, তেমনই ছিলেন নির্ভীক। তিনি অমৃতসরে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে আমার মনে শঙ্কা হইয়াছিল। তিনি তখনই তাঁহার দেশের মুক্তি চাহিয়াছিলেন। একটি বিশেষণের সামান্য পরিবর্তনও তিনি করিতে চাহিতেন না—তিনি অবুঝ ছিলেন বলিয়া নহে, দেশকে তিনি বড় ভালবাসিতেন বলিয়া। দেশের জন্য তিনি জীবন দিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তিকে তিনি সংযত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের প্রভাবে তিনি তাঁহার দলকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচণ্ড কর্ম্মোদ্যমেই তাঁহাকে জীবন দিতে হইল। এ যে স্বেচ্ছামৃত্যু—মহৎ—অপূর্ব্ব!

ফরিদপুর তাঁহার বৈজয়ন্তী তুলিয়াছে। ফরিদপুরে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব মৌলিকতা এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ফরিদপুরেই তিনি অহিংসার নীতিকে ভারতের রাজনীতি বলিয়া মুক্তকণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মহারাষ্ট্রের সুশিক্ষিত বীর যোদ্ধাদের সাহায্যে স্বরাজ্য দল গড়িয়া তুলিয়া তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় সঙ্কল্পশক্তি, যৌক্তিকতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কোন উপাদানই ছিল না ঐরূপ দল গড়িবার, কিন্তু দল তিনি গড়িয়াছিলেন। একবার তিনি যখন একটা জিনিষ কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, ফলাফলের কোন বিবেচনা না করিয়াই তাহা করিতেন। ফলের দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। আজ স্বরাজ্য দল একটি সঙ্ঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান। কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে আমার যে মতদ্বৈধ, তাহা মূলগত, কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে উত্যক্ত করিবার দিক্ হইতে কাউন্সিল-প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি কোন দিন সন্দেহ করি নাই। স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে গিয়া যে কায করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ জন্য প্রশংসা প্রধানতঃ দেশবন্ধুরই প্রাপ্য। আমি বুঝিয়া-সুঝিয়াই, বিবেচনা করিয়াই তাঁহার সহিত আপোষ করিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে ঐ দলকে সাহায্য করিবার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এখন স্বরাজ্য দলের নেতা চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুতে ঐ দলকে সাহায্য করিবার কর্ত্তব্যভার আমার আরও বাড়িল। আমি যেখানে ঐ দলকে সাহায্য করিতে পারিব না, সেখানে ঐ দলের পথে বাধা যাহাতে ঘটিতে পারে, এমন কিছুই আমি করিব না।

ফরিদপুরের বক্তৃতা সম্বন্ধেই আমাকে কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নিকট অস্থায়ী বড় লাট লিটন শোকসূচক বাণী প্রেরণ করিয়া যে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জন্য দেশ তাঁহার সুখ্যাতি করিবে। দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তৎসমুদায় স্মরণ করিতেছি। ফরিদপুরের অভিভাষণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে আন্তরিকতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অধিকাংশ ইংরাজের মনের উপরই যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু সৌজন্যই দেখিতে পাইব না, আমি ইহা আশা করি। ফরিদপুরের অভিভাষণের পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। মহান্ সেই স্বদেশ-প্রেমিক নিজের অবস্থা সুস্পষ্ট করুন, শান্তির প্রথম চেষ্টা তিনি করুন—তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণ ইহাই চাহিতেন, ফরিদপুরের অভিভাষণ তাঁহাদের ইচ্ছার ফলে হইয়াছিল। তিনি আপোষের জন্য হস্ত বাড়াইলেন। আজ মৃত্যুর নিষ্ঠুর নির্ম্মম হস্ত, তাঁহাকে আমাদের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধুর আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন ইংরাজের মনে এখনও যদি কোন সন্দেহ থাকে, আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি, দার্জ্জিলিংএ আমি যত দিন ছিলাম, তত দিন তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উক্তিতে অসাধারণ আন্তরিকতাই আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার সুমহান্ মৃত্যু কি অবিশ্বাস, সন্দেহ,—এ সব দূর করিতে পারিবে না?

আমি একটি প্রস্তাব করিতেছি মাত্র। বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দীরা এখনও জেলে আছেন। দেশবন্ধু দাশ বলিয়াছেন, তাঁহারা নির্দ্দোষ। আজ তাঁহাদের পক্ষসমর্থনের জন্য দেশবন্ধু দাশ আর নাই, গবর্ণমেণ্ট কি চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতির প্রতি সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবেন? তাঁহারা নির্দ্দোষ, এই যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া আমি এখন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি না। তাঁহারা যে অপরাধী, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হাতে বড় প্রমাণ থাকিতে পারে। পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনস্বরূপেই আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি। ভারতবাসীদের মত তাঁহাদের অনুকূল করিতে গবর্ণমেণ্ট যদি চাহেন, তাহা হইলে, তৎপক্ষে ইহার অপেক্ষা উপযুক্ত সুবিধা আর হইতে পারে না। এই সব বন্দীদিগের মুক্তি দিবার পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া এখনকার মত আর হইতে পারে না। বলিতে গেলে আমি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছি। কেবল স্বরাজ্য দলই নহে, সমগ্র জনসাধারণের মত ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে। যে আগুন দেশবন্ধুর নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহকে ভস্মীভূত করে, সেই আগুন কি এই নশ্বর সন্দেহ-সংশয় এবং ভয়কে ভস্ম করিবে না? ভারতবাসীদের দাবীর পরিপূরণ কি ভাবে হইতে পারে,—সে দাবী যাহাই হউক, উহার উপায় নির্দ্ধারণ দরকার, গবর্ণমেণ্ট যদি উহা মনে করেন, তাহা হইলে ইহার পর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটি বৈঠক আহ্বান করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য যদি করাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দিক্ হইতে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদিগকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, আমরা কায করিতে পারি, কেবল সঙের মত নই। গত যুদ্ধের সময় মিঃ উইনষ্টন চার্চিল যে কথা বলিয়াছিলেন, আমরাও যেন সেই কথাই বলিতে পারি—"কায যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে থাকিবে।" স্বরাজ্য দলকে অবিলম্বে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। বিনামেঘে এই বজ্রাঘাতে পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমানরা পর্য্যন্ত আজ যেন নিজেদের বিচ্ছেদ-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায় কি আজ ঐক্যবদ্ধ হইবেন, নিজেদের দুর্ব্বলতা ছাড়িবেন? দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। দেশবন্ধুর চিতায় আগুন কি আমাদের বিভেদের

পুণায় দেশবন্ধু

['ফরওয়ার্ড' হইতে ।

দার্জ্জিলিঙের "ষ্টেপ-এসাইড" ভবনে বিশ্রাম-রত দেশবন্ধু, বাসন্তী দেবী ও উর্ম্মিলা দেবী

[শ্রীনাথ তারক মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ।

অনৈক্যকে আজ দগ্ধ করিতে পারিবে না? ইহার পূর্ব্বে সকল দলকে মিলন-ভূমিতে দাঁড়াইতে হইবে। দেশবন্ধু এ জন্য ব্যগ্র ছিলেন। বিরোধীদের সম্বন্ধে তাঁহার ভাষায় হয় ত তীব্রতা অনুভব হইত, কিন্তু আমি যত দিন দার্জ্জিলিংএ ছিলাম, তত দিন তাঁহার মুখ হইতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটা কড়া কথা বাহির হইতেও আমি শুনি নাই। সমস্ত দলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে আমার যথাশক্তি চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন।

আমরা শিক্ষিত ভারতবাসী, আমাদের কর্ত্তব্য হইল, দেশবন্ধু দাশের সেই স্বপ্নকে সার্থক করিতে চেষ্টা করা—আমরা যদি আজ স্বরাজের সৌধচূড়ায় উঠিতে না পারি, অন্ততঃ কয়েকটি সিঁড়ি উঠিয়াও দেশবন্ধুর যাহা একমাত্র সাধনা ছিল, জীবনের একমাত্র আকাজ্ঞা ছিল, সে পক্ষে সাধনা করাই হইল আমাদের কর্ত্তব্য, তখনই আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিতে পারিব—দেশবন্ধু মরেন নাই, দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হউন।

—

সারভ্যাণ্ট

দেশবন্ধু দাশ আর নাই! বাঙ্গালী, যদি পার, কাঁদ। দৈবের এ নিদারুণ আঘাতে সকলের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। আত্মত্যাগ ও দেশ-প্রেমের আধার দেশবন্ধু আজ দেশের জন্য—দেশকে শক্তিশালী করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। মুক্তিকামনার উদ্দীপনা-অগ্নিতে ইন্ধনের মত তাঁহার দেহ আজ নষ্ট হইল। এ মৃত্যু মর-জগতে প্রার্থনীয়। তাঁহার সকল কথার মাঝে এই কথাই বুঝা যাইত যে, দেশের দুরবস্থায় তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। আজ তাঁহার অপ্রতর্কিত মৃত্যু দেখিয়া সকলেই এই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। দার্জ্জিলিংএর জলবায়ুও তাঁহার জ্বর আরাম করিতে পারিল না। সেই জ্বরের কারণ দৈহিক নহে। রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও তিনি তাঁহার দেশবাসীর জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা কপটতা ও মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেন, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাই তিনিও আজ মহাপ্রস্থান করিলেন। এইরূপ গৌরবের মাঝে মৃত্যু অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ মৃত্যুর মাঝেই আমরা আমাদের বীরদের চিনিব।

—

অমৃতবাজার পত্রিকা

মিঃ দাশ দেশমাতৃকার সেবায় তাঁহার সকল শক্তি ও সকল সময় নিয়োগ করিবার জন্য লাভজনক ব্যবহারাজীবের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মা গন্ধীর প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার জন্য অসহযোগ আন্দোলন যে কতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। চিত্তরঞ্জন কারাগারে যাইলে দেশ অলস হইয়া পড়ে; তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অসীম শক্তির বলে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। সেই অবধি তিনি বীরের মত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তির সম্মুখ হইতে পর্ব্বতও সরিয়া গিয়াছে, সকল লোক অবাক হইয়া এই অসাধারণ কর্ম্মীর দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে। তিনি যেন অমানুষী শক্তি লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি অচিরে ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে, সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁহার স্বরাজ-সংগ্রামের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল।

অত অল্পসময়ের মধ্যে সেরূপ সাফল্য, তিনি কিরূপে লাভ করিতেন, তাহা ভাবিয়া লোক আশ্চর্য্য হইত। তাঁহার জ্বলন্ত দেশ-প্রেমই তাহার কারণ। তাঁহার কবিসুলভ ভাবপ্রবণ প্রাণে এই দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় যে কর্ম্মশক্তি আনিত, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার দেহ সবল না হইলেও এই অত্যুৎকট দেশপ্রেম তাহাতে ঐরাবত-শক্তির আবির্ভাব ঘটাইত। তিনি নিজের দেহের প্রতি মায়া-মমতা না করিয়া দিন-রাত্রি দেশের জন্য পরিশ্রম করিতেন। যাহারা বরাবর তাঁহার নিকটে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহারাই লক্ষ্য করিয়াছে—তিনি দেশ-মাতৃকার সেবায় প্রতি মুহূর্ত্তে কি ভাবে তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিলেন। দেশবন্ধু তাঁহার রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকট হইতেও প্রশংসা লাভ করিতেন।

এক জন অকপট ও শক্তিশালী বন্ধুর বিয়োগে আমরা শোকাভিভূত। দেশবন্ধু যেমন অসামান্য প্রতিভার জন্য সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনই দরিদ্র ও বিপন্নদের বন্ধুরূপে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি সকলকে অর্থসাহায্য করিয়া গিয়াছেন, এমন কি, তাঁহার চরম নিন্দকরাও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। যেমন অল্প লোকই দেশপ্রেমে তাঁহার সমকক্ষ ছিল, তেমনই মানুষোচিত গুণগ্রামে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য ছিলেন।

দেশকে স্বাধীনরূপে দেখিবার বাসনায় তিনি অহরহঃ জ্বলিতেন; তাঁহার মনস্কামনার সিদ্ধি তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। মৃত্যুর পরপার হইতে তিনি তাঁহার দেশবাসীকে কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন,—চেষ্টা কর, স্বাধীন হও।

—

বেঙ্গলী

মিঃ সি, আর, দাশের মৃত্যু-সংবাদ আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি। এ দুঃসংবাদে আমরা দারুণ আঘাত পাইয়াছি। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আমাদের মৌলিক ও বিশিষ্ট রকমের মতভেদ ছিল। কিন্তু সে সকল এখন ভুলিয়া যাইতে—অতল সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যে সমালোচকের তাঁহার সহিত যতই মতভেদ থাকুক, সকলেরই এখন এইরূপ মনোভাব। তাঁহার তীব্র দেশপ্রেম, অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ, সংঘগঠনের মহান্ শক্তি—এ সবের প্রশংসা, তাঁহার মহত্ত্বকে স্বীকার করা এখন সকল সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য। দেশের বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে তাঁহার গুণগ্রাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। সকলের এখন একযোগে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। একটি শক্তিশালী বীরের আত্মার আজ তিরোভাব ঘটিল।

—

নিউ এম্পায়ার

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক নেতা আজ পরপারের আহ্বানে নিতান্ত অপ্রতর্কিত ভাবে চলিয়া যাইলেন। এ সংবাদে সমগ্র দেশ শোকমগ্ন হইবে—বাঙ্গালার পক্ষে ইহা নিতান্তই নিদারুণ। মিঃ সি, আর, দাশের চিরশত্রুরাও তাঁহার মহত্ত্ব ও সততায় অন্ধ থাকিতে পারে নাই। তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্রের সাম্প্রদায়িকতার ও দুর্জ্জয় শক্তির পশ্চাতে এমন একটি হৃদয় ছিল, যাহা যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই অনুভব করিয়াছে। তিনি তাঁহার জ্ঞান-বিশ্বাস মত প্রকৃষ্ট উপায়েই দেশের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেরূপে

দেশের মুক্তি হইবে বলিয়া তিনি অকপটে বিশ্বাস করিতেন, সেই-ভাবেই তিনি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন। দেশের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগই তাঁহার নিকট অধিক এবং কোন পরিশ্রমই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাঁহার জীবন-কথা সামান্যমাত্রও যাহারা জানে, তাহারা তাঁহার বিশ্বাসের অকপটতা ও তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিরাট স্বার্থত্যাগের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিমোহিত হইয়াছে।

মুসলমান

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে সমগ্র জাতি শোকাভিভূত। তিনি যে পথ ভাল বিবেচনা করিতেন, সেই পথে সমগ্র শক্তি দিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহ্যগুণ অসীম ছিল, কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনের উপর যে চাপ পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহার সেই সহ্য শক্তিকেও পরাস্ত করিল। সকল সম্প্রদায়ের ও সকল মতাবলম্বী লোক তাঁহার দেশসেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবন দীর্ঘ না হইলেও অনন্যসাধারণ। তিনি দেশনেতৃরূপে ভারতের সকল প্রদেশেই শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন। মুক্তির অগ্রদূতরূপে তাঁহার খ্যাতি জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিলাসের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও তিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিয়াছিলেন এবং নিজে ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। পিতৃ-ঋণ পরিশোধে মানুষের গড়া আইনের আশ্রয় না লওয়া, তাঁহার মুক্ত হস্তে দান, স্বরাজ্য দল গঠনে অসামান্য অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ সাধনা—এ সকল আজ একে একে স্মৃতিপথে উদয় হইতেছে।

নাগপুর কংগ্রেসে তিনি মহাত্মা গন্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে এক জন শক্তিশালী পুরুষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাকেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। সেই জন্য আজ বাঙ্গালা তাঁহার শোকে অধিক মুহ্যমান। বাঙ্গালা তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু তিনি দেশ-সেবায় যে অদম্য আগ্রহ, যে বিরাট স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা চির-কাল বাঙ্গালীর স্মৃতি সমুজ্জল রাখিবে।

চিত্তরঞ্জন অকপট দেশপ্রেমিক, হিন্দু-মুসলমান একতার অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি কখনও হিন্দু-ভারতের কথা মনেও স্থান দেন নাই, তাঁহার ভারত, ভারতবাসীর ভারত। তিনি যখন জাতীয়তার প্রচার করিতেন,তখন সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাহাতে থাকিত না। তাই তাঁহার অকালমৃত্যুতে দেশের জাতীয়তার পক্ষে মহা ক্ষতি হইল।

চিত্তরঞ্জন যখন ছয় মাস কারাভোগের পর আলিপুরের সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পায়েন, তখন সকল অসহযোগী কয়েদীরা (বর্ত্তমান পত্রের সম্পাদক তন্মধ্যে অন্যতম) মনে করিয়াছিলেন, পুলিস বুঝি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইল। জেলে যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে যাইত, সেই তাঁহার ব্যবহারে, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার ত্যাগ ও কারাবরণে তিনি তথাকার সকলেরই—এমন কি, জেল-কর্তৃপক্ষেরও সম্মান-শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

ষ্টেটস্‌ম্যান্

মিঃ দাশের সহিত প্রায় প্রতিপদেই আমাদের মতভেদ ঘটিত। গত কয় বৎসরের অনেক বাদ-বিতণ্ডায় তিনি উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ও তাঁহার অকপটতায় ও উচ্চ উদ্দেশ্যে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

শোকের বেগ যতই প্রবল, যতই তীব্র হউক, তাহা সময়ে কমিয়া যাইবে। এই জাতীয় শোকোচ্ছ্বাস যেন প্রথমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং পরে ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের মধ্যে আপোষ ঘটাইতে পারে। মিঃ সি আর দাশের শেষ বাণী—সম্মানজনক সর্ত্তে সহযোগ। তিনি সেই সঙ্গে অনাচারের নিন্দাও করিয়া গিয়াছেন। দুঃখ এই যে, যে ব্যক্তি এই সকল কথা বলিলেন, তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আর কিছুদিন বাঁচিলেন না।

মৃত্যু নিতান্ত অপ্রতর্কিতভাবে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে আজ সরাইয়া লইল। শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে সকলেই মিঃ দাশের এই অকালমৃত্যুতে নিদারুণ আঘাত অনুভব করিবে। দিবাবসানের পূর্ব্বেই তাঁহার জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইল। তাঁহার শক্তি ও প্রভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতিকোচিত বুদ্ধি-শক্তি ও দূর-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। অতীতের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি প্রবল রাজনীতিক স্রোতের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। একাধিকবার তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দূরে নীত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য রাজনীতিক ক্ষেত্রের স্বভাব।

শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁহার অসামান্য প্রভাবে প্রভাবিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষা, শিষ্ট ব্যবহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এ সকলের প্রভাব বড় কম ছিল না। তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর নিকট তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা, স্বার্থত্যাগের প্রভাব বিশেষ প্রবল ছিল। দেশবন্ধুকে বাঙ্গালীরা যে সম্মান দিত, তাহার অধিক আর কখনও কোন বীরপূজায় তাহারা দেয় নাই। তিনি যে এক জন যোগ্য নেতা ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইংলিশম্যান

মিঃ দাশ তাঁহার পরিচালিত স্বরাজ্য দলের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে আমরা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও স্বরাজ্য দলকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। সকল ইংরাজই, তাঁহারা রাজনীতিক বাদ-প্রতিবাদে মিঃ দাশকে যতই বাধা দিয়া থাকুন না কেন, আমাদের সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন বলিয়া মনে করি। মিঃ দাশের মৃত্যুতে তাঁহারা—সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

যে সব জিনিষ পাইলে লোকের জীবন উপভোগ্য হয়, সে সব পাইয়াও তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। আমাদিগকে অনেক সময় তাঁহার দলের ও মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ও পরাজিত হইতে হইয়াছে। সে জন্য আমরা দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমাদের সরলতা জাহির করি, এরূপ দাবী মিঃ দাশ কখনই করিতেন না, তিনি তত ছোট ছিলেন না।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল গেজেট

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ ও মহান্ সন্তান ছিলেন। তিনি স্বরাজ-সংগ্রামের নেতা, মানুষের মত মানুষ ছিলেন। বয়সে তিনি যেমন যুবামাত্র ছিলেন, তেমনই কর্ম্মক্ষেত্রেও তাঁহার এখনও অনেক কর্ত্তব্যই অসমাপ্ত ছিল। দেশের কাযে গুরু পরিশ্রমে তাঁহার

স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অপ্রতর্কিত মৃত্যু-সংবাদে দেশবাসী চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। তাঁহার তিরোধানে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যে আসন শূন্য হইল, তাহা শীঘ্র ও সহজে পূর্ণ হইবে না।

ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুসংবদ্ধ রাজনীতিক দলের নেতৃরূপে তিনি ব্যুরোক্রেশীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু যিনি দেশসেবার জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তিনি নিশ্চয়ই কেবল তাঁহার দলের জন্যই কায করিতেছিলেন না। তিনি জাতীয় নেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার দেশকে এত বেশী ও আগ্রহের সহিত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার নিকট কোন কার্য্যই কঠিন, কোন কষ্টই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। যে যুদ্ধে তাঁহার দেশ মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন—বিশ্বাস করিতেন, সে যুদ্ধে তিনি তাঁহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিতেছিলেন; তিনি যেন তাঁহার দেহ তাহাতে ব্যয় করিবার জন্য উৎসর্গই করিয়াছিলেন। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে যে. তাঁহার অপেক্ষা বড় দেশপ্রেমিক, অধিক সাহসী যোদ্ধা, বড় বীর আর দেখা যায় নাই। হয় ত তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি এক জন পুরা মানুষ ছিলেন।

মিঃ সি, আর, দাশ ব্যবহারাজীব ও কবি—উভয় হিসাবেই বড় ছিলেন। তাঁহার চিন্তাশক্তির গভীরতা, শিক্ষা-দীক্ষার উৎকর্ষতা ছিল। কিন্তু সে সব গুণ তাঁহার দেশপ্রেমের নিকট সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দেশ তাঁহার জন্য গৌরব অনুভব করিত। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন এবং দেশের লোকও তাঁহাকে ভালবাসিত। কৃতজ্ঞ দেশবাসী প্রশংসমান চিত্তে তাঁহাকে দেশবন্ধু বলিয়া ডাকিত—তিনি নিশ্চিতই দেশবন্ধু ছিলেন। তাঁহার মত অধিক লোক কোন দেশেই জন্মায় না। আমরা এক জন পাইয়াছিলাম, তাঁহাকে হারাইয়াছি। লোকে বলে—রাজার অভাবে রাজ্য অচল হয় না। কিন্তু যে মহাপুরুষ আজ চলিয়া যাইলেন, তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা—শুধু বাঙ্গালা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে।

ক্যালক্যাটা উইক্‌লি নোটস্

প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। দেশের কাযে যেমন, ব্যবহারাজীবমণ্ডলেও তেমনই তিনি দ্রুত সাফল্যলাভ করেন। ব্যবহারাজীবরূপে তাঁহার সাফল্যের কারণ এই যে, যখন কোন ফৌজদারী মামলায় তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন, তখন তাহা ভাল-মন্দ—যাহাই হউক না কেন, সেটিকে নিজের করিয়া লইয়া জিতিবার জন্য প্রাণপণ করিতেন। সাফল্যের জন্য এই দৃঢ়সঙ্কল্পই রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহাকে সফলতা প্রদান করিয়াছিল।

মুরারিপুকুর বোমার মামলায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। সে মামলায় মিঃ নর্টন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ঢাকা ষড়্‌যন্ত্র মামলায় পরলোকগত সার উইলিয়ামগার্থ তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন। সার লরেন্স জেঙ্কিন্স আপীলের শুনানীর সময় মিঃ দাশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সময় হইতে তিনি খুব মামলা পাইতে থাকেন।

প্রথম জীবনে মিঃ দাশ ললিত কলার অনুরাগী ও সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনীতি তখনও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই। তখন তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। স্বদেশী আমলের আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাইতেন, কিন্তু সে দিকে তত আকৃষ্ট হন নাই। ক্রমশঃ তাঁহার মন অরবিন্দ বাবুর রাজনীতিক মতামতের দিকে আকৃষ্ট হয়। শেষে মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া লয়। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার আত্মনির্ভরতার আদর্শের সন্ধান পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। মহাত্মার ত্রি বর্জ্জনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী না হইলেও একবার তিনি মহাত্মার অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন,—অমৃতসরে তিনি শাসন-সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিতে বলেন, মহাত্মা তখনও সংস্কার ব্যবস্থা অনুসারে কায করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। নাগপুর হইতে ফিরিয়া তিনি আদালত বর্জ্জন করেন এবং ছাত্রদিগকে স্কুল-কলেজ বয়কট করিতে বলেন। তখন তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দুঃখ করিলেও তিনি যে সেই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর সে অনুসারে কায করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আদালত বর্জ্জন করিয়া তিনি দারিদ্র্য বরণ করেন। ইহাই তাঁহাকে তাঁহার দেশবাসীর নিকট উচ্চ আসন প্রদান করে। মিঃ দাশ আত্মত্যাগের পথ গ্রহণ করিলেও কিন্তু তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা একেবারে বিসর্জ্জন করেন নাই—এমন কি, মহাত্মার নিকটও নহে। তথাপি তিনি মহাত্মার আদেশ অনুসারে যুবরাজের ভারত পরিদর্শন বয়কট করিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবক দল আহ্বান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। সে মামলায় তিনি যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইত না বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গয়া কংগ্রেসে তিনি যে কাউন্সিলে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ে প্রতিভা ও নেতৃত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এইরূপ আপনাকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শক্তিশালী রাজনীতিক দলের নেতৃরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার উৎসাহ, সাহস, উদ্দেশ্যের একাগ্রতা, সঙ্ঘগঠনের ক্ষমতা, সাফল্যলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—এ সকলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পরাজয়ে ভীত না হইয়া আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস ও দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি বর্ত্তমান কালের এক জন শ্রেষ্ঠ নেতা—বিরাট আদর্শবাদীর হস্ত হইতে নেতৃত্ব-ভার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধীও উদারতার সহিত তাঁহাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, মিঃ দাশকে তাঁহার রাজনীতিক কার্য্যপদ্ধতি অবাধে চালাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।

মিঃ দাশের দেশপ্রেম—জগতের সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে তাঁহার দেশ ও দেশবাসীকে সম্মানজনক স্থান দিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ সত্যই অকৃত্রিম ও অসীম ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন নেতাই যে ব্যুরোক্রেশীর বিরুদ্ধে এরূপ সাহস ও শক্তির সহিত যুদ্ধ করেন নাই, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। তিনি চির-অভ্যস্ত বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আত্মত্যাগের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। সে সাধনা তাঁহার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরাজয়ে তিনি নিরুৎসাহ হইতেন না, পক্ষান্তরে, অধিক তেজে কার্য্য করিতে উৎসাহিত হইতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তিনি পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন উপায় অবলম্বন করিতেন। মিঃ দাশ যখন সাফল্যমণ্ডিত হইতেছিলেন, সেই সময় অপ্রতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হওয়ায় বিশেষ শোকের কারণ ঘটিয়াছে।

ক্যালক্যাটা মিউনিসিপ্যালিটী গেজেট

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে দেশের কি ক্ষতি হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, চিন্তার অতীত। সমগ্র জাতির আন্তরিক দুঃখ ও স্বেচ্ছাকৃত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদনে বুঝা যায়, জাতীয় জীবনের কতটা যায়গা তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ স্বজন-বিয়োগে শোকাভিভূত। যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারের খবরাখবর রাখেন, এবং যাঁহারা মিঃ দাশের পরামর্শ ও ভাবধারা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন, কলিকাতার করদাতারা তাঁহাকে মেয়ররূপে পাইয়া কতটা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী উচ্চ ভাবই হৃদয়ে পোষণ করিতেন। মিঃ দাশ তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারদিগকে কর্পোরেশনের কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে তিনি সমগ্র সহরবাসীর স্বার্থের প্রতিকূল না হইলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা করিতে, "দরিদ্র-নারায়ণ" সেবার—দরিদ্রের গৃহ-নির্ম্মাণ, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা করিতে বলেন। মিঃ দাশ তাঁহার এই উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার বিরলপ্রাপ্ত সকল অবসরই নিয়োগ করিতেন। আদর্শবাদ ও কার্য্যকুশলতা—দুইটিই তাঁহাতে সমভাবে বিরাজিত ছিল। তাঁহার অভাবে কর্পোরেশন যে কিরূপে আবার সুব্যবস্থা করিয়া লইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারা যায় নাই। মিঃ দাশের তীব্র বিয়োগ-ব্যথার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তিনি তাঁহার দেশবাসীর জন্য আদর্শ ও ভাবধারা রাখিয়া গিয়াছেন। দেশবাসী এখন তাহার অনুসরণ করুক।

অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলার হইতে কর্পোরেশনের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সদয় ও শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা শুধু যে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেন, তাহা নহে, তাঁহার সমক্ষে সকলেই মনে করিতেন যে, কর্পোরেশনের সাধু সঙ্কল্পগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। তাঁহার পরামর্শে সকলের জটিল সমস্যার সমাধান হইত, নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইত, উৎসাহীর প্রাণে দৃঢ়সঙ্কল্প আনিত।

বিশ্বমিত্র

দেশবন্ধু দাশের মৃত্যু ভারতবর্ষের মস্তকে ভীষণ বজ্রপাতের মত। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি দীপ্তিশালী সূর্য্য ছিলেন। তাঁহার অস্তগমনে চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার হইয়া যাইল। দেশবাসী দেশবন্ধুর বিয়োগে কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, সে দিনকার কলিকাতার দৃশ্যে, এবং নেতাদের ও বিভিন্ন সভাসমিতির শোকপ্রকাশক টেলিগ্রামে জানা গিয়াছে। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে মুক্তিমণ্ডপের স্তম্ভ চূর্ণ হইল। কে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবে? তাঁহার এমন শক্তি আছে যে, সে এরূপ গুরুভার বহন করিবে? এই বিষয়ে শুদ্ধ আমরা নহি, সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আজ তাঁহার অদম্য উৎসাহ, বীরত্ব, তেজঃপূর্ণ বাণী—অনেক কথাই একে একে মনে পড়িতেছে। এরূপ বীর আর সাহসী পুরুষ-সিংহ আমাদের মধ্যে নাই। এখন দেশের যুবক সম্প্রদায়ের প্রাণে কে আর উৎসাহ আনিয়া দিবে? কে আর ব্যুরোক্রেশীর বিরুদ্ধে তেমন ভাবে যুদ্ধ চালাইবে? কে তাহাদের সম্মুখে বিবেকের দণ্ড উত্থাপন করিবে? যখন কোন সরকার আমাদের অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করিবে, তখনই দেশবন্ধুর কথা স্মরণ হইবে।

স্বতন্ত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহা অনুমান করা কঠিন। মিঃ দাশ শুধু একটি সংগঠিত রাজনীতিক দলের নেতা ছিলেন না, বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। যে সময় চারিদিক নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সে সময় তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে নূতন আশার আলোক ধরিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের সাড়ে ৩ বৎসরের ইতিহাস দেশবন্ধু দাশের স্বার্থত্যাগ, সংঘটনশক্তি ও যোগ্য নেতৃত্বের ইতিহাস। স্বরাজ্য দল গঠনের কল্পনা দাশ সাহেবের, আর তাহার নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতাও তাঁহাতেই ছিল। দেশবন্ধু বলিতেন, যত দিন অন্ততঃ কয়েক জন নেতা সব ছাড়িয়া দেশোদ্ধারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিবেন, তত দিন স্বরাজ্য স্থাপিত হইবে না। তাই মহাত্মা ১ বৎসরের জন্য আদালত বর্জ্জন করিতে বলিলেও তিনি বাৎসরিক লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে অন্যান্যদের অর্থকষ্টে তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হয়েন নাই। দেশবন্ধু দাশের উদারতা ও দানশীলতা প্রসিদ্ধ। তিনি বহু বাঙ্গালী ছাত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন। বাঙ্গালার রাজনীতিক ষড়যন্ত্রকারীদের উপর এই জন্যই তাঁহার প্রভাব ছিল। প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের উভয়ের (দেশবন্ধুর ও এই পত্রের সম্পাদকের) কক্ষ পাশাপাশি ছিল। তাহাতে জানি, তিনি পূর্ণভাবেই অহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিলাতী সংবাদপত্র

ডেলী নিউস

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গুরু আঘাত লাগিল। তিনি শান্তি-স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করা গবর্মেণ্টের পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। মিঃ দাশের স্থান পূর্ণ করিবার লোকের অত্যন্ত অভাব। ইদানীং তিনি যে আভাস দিয়াছিলেন, তাহা আশাজনক। তাঁহার জীবনের কার্য্য এরূপ সঙ্কটকালে অসময়ে হঠাৎ শেষ হইল, ইহা যার-পর-নাই শোচনীয়।

ডেলী হেরাল্ড

দাশ মহাশয়কে বিখ্যাত আইরিশ নেতা মিঃ পার্ণেলের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিরোধ নীতির কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, যে সময় বাঙ্গালায় পুরাতন জবরদস্ত শাসন-প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন হইল ও তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন্ করিবার মূল্যবান্ যন্ত্র তাঁহার হস্তে পতিত হইল, ঠিক সেই সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে জাতীয় বীরের সম্মান প্রদান-পূর্ব্বক সকলে তাঁহার বিয়োগে শোক প্রকাশ করিবে।

ডেলী গ্রাফিক

বিরক্তিজনক রাজনীতিক সংগ্রাম প্রশমিত করিলে ও শান্তিস্থাপকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলে মিঃ দাশ ভারতের আর্থার গ্রিফিথ (আয়ার-ল্যাণ্ডের প্রথম প্রেসিডেণ্ট) হইতেন। তিনি ইদানীং যে জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা যদি তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু যে বিষম ক্ষতিজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবজার্ভার

ভারত গবর্মেণ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতভেদের কথা ছাড়িয়া আমরা এই শোক-প্রকাশের অনুষ্ঠানটি সহানুভূতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিব।

টাইম্‌স্

মিঃ দাশের মৃত্যুতে ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয় অসহযোগের শক্তি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। ইহা দুঃখের বিষয়।

রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদে জার্ম্মাণ সুধী গেটের একটি কথা মনে পড়িল। এক দিন তিনি একারম্যানের সহিত কবি বায়রণের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। বায়রণ জীবনের শেষভাগে নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য গ্রীসে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই কথায় গেটে বলেন—

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা জীবনের প্রথম ভাগে ভাগ্যদেবীর কাছে বরাভয় লাভ করিয়াছিল এবং সকল অনুষ্ঠানেই সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহারা যৌবন অতিক্রম করিবার পরই দুরদৃষ্ট-দাবানলদগ্ধ হয়। ইহার কারণ কি? মানুষকে পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। প্রত্যেক অসাধারণ মানুষই কোন না কোন বিশেষ কার্য্য-সাধন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন—সে কায সম্পন্ন হইয়া গেলে সে দেহে তাঁহার আর অবস্থিতি করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন বিধাতা তাঁহাকে অন্য কাযের জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু এই মরধামে সব ব্যাপারই স্বাভাবিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয়; তাই বিধাতা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পাতিত করেন এবং শেষে তাঁহার মৃত্যু হয়। নেপোলিয়ন প্রভৃতির এইরূপই হইয়াছিল। মোজার্ট ও র‍্যাফেল উভয়েই প্রায় ৩৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। বায়রণ আরও কিছু দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ নিয়তিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছিলেন। কার্য্যশেষে তাঁহাদের তিরোভাব হইয়াছিল।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালাদেশে—কেবল বাঙ্গালায় নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতে নূতন ভাব প্রবাহিত করিয়াছিলেন, দ্বৈতশাসন চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে দিন তাঁহার সেই সাফল্যসংবাদ সরকারী ইস্তাহারে প্রচারিত হয়, সেই দিনই তিনি শয্যা গ্রহণ করেন—সেই শয্যাই তাঁহার অন্তিম শয্যা, তাহার পর ২ দিন অতীত না হইতেই তাঁহার জীর্ণ দেহ প্রাণহীন শবে পরিণত হইয়াছিল। দেশবাসী তাঁহার জন্য যখন শোকে কাতর, তখন তাহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—তাঁহার আদর্শ। তিনি মাত্র ৪ বৎসর ৬ মাস কালের মধ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি অসাধ্য-সাধন না হয়, তবে অসাধ্য-সাধন আর কাহাকে বলে?

দামোদরের বন্যা যেমন ভাবে আসিয়া নদীগর্ভে বহু দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহাকে নির্ম্মল জলে পূর্ণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয় কূলে ভূমিতে উর্ব্বরতা সঞ্চার করে—চিত্তরঞ্জনের আন্দোলন তেমনই বন্যারই মত আসিয়া দেশের রাজনীতিক প্রবাহিণী আবর্জ্জনামুক্ত করিয়া তাহাতে প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন যখন প্রথম রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তখনও রাজনীতিচর্চ্চা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন উকীল, এটর্ণী, জমীদার প্রভৃতির অবসরবিনোদনের ও যশ অর্জ্জনের উপায় ছিল এবং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকা দূরে থাকুক, সম্পদলাভের সম্ভাবনাই ছিল। তখনও গোপালকৃষ্ণ গোখলে সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া রাজনীতিচর্চ্চাতেই অখণ্ড মনোযোগ দেন নাই এবং তখনও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক নির্ভীকভাবে বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর পতনোন্মত বজ্র সম্মুখে দেখিয়া বজ্রকণ্ঠে বলেন নাই—"আমি যদি দেশবাসীর আস্থা হারাই, তবে আমার পক্ষে মহারাষ্ট্রে বাসে আর আন্দামানে নির্ব্বাসনে কোন প্রভেদই থাকিবে না। বিপদের

সময় দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া লোককে হতাশ করা নেতার পক্ষে অসঙ্গত।" কংগ্রেস যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার হিউম বিদেশী; তিনি ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার-বিস্তারের পক্ষপাতী হইলেও ভারতের মুক্তির কল্পনা করেন নাই। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যবিবৃতিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করেন :—

মিষ্টার হিউম

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কায করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন;

(২) পরিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টিসাধন;

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতনির্দ্ধারণ;

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকগণের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ।

সেই অধিবেশনে ৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

বালগঙ্গাধর তিলক

(১) এ দেশে ও বিলাতে ভারত-শাসনবিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করা হউক্। সে কমিশনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হউক্ এবং কমিশন যাহাতে ভারতে ও বিলাতে সাক্ষ্যগ্রহণ করেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক্।

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদের উচ্ছেদসাধন করা হউক্।

(৩) নির্ব্বাচিত সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার করা হউক্।

(৪) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয় অনাবশ্যক এবং রাজস্বের তুলনায় অতিমাত্রায় অধিক।

(৫) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা না যায়, তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস্ শুল্ক ও লাইসেন্স করের দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক্।

(৬) কংগ্রেসের মতে ইংরাজের পক্ষে আপার ব্রহ্ম অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহা অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত উপনিবেশে পরিণত করাই সঙ্গত।

(৭) কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভাসমিতিসমূহের গোচর করা হউক্।

(৮) আগামী কংগ্রেস ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় হইবে।

কিছুকাল ধরিয়া কংগ্রেসের কায এই সুরেই বাঁধা ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"শুধু কথার বাঁধুনী
কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই·
কারো নীর;
নিবেদন আর
আবেদন-থালা
বহে বহে নত শির।"

সে সময় যে সব ভারতীয় ছাত্র বিলাতে শিক্ষালাভার্থ যাইতেন, তাঁহারা তথায় স্বাধীন দেশের পরিবেষ্টনের মধ্যে নূতন ভাবের অনুভূতি লাভ করিতেন এবং সে দেশে অবস্থান করিবার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। তবে বিদেশে ছাত্রদিগের সে সব আন্দোলনের মূল্য যে অতি সামান্য, তাহা বলাই বাহুল্য। সেরূপ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনও যোগ দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি·এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। তখন দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে। লালমোহন ঘোষ তাহার পূর্ব্বে পার্লামেন্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। তাহার পর দাদাভাই সে চেষ্টা করেন ও তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়। লর্ড সল্‌সবেরী তাঁহাকে "কালা আদমী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই কালা আদমীর নির্ব্বাচনে যে বিলাত-প্রবাসী সব কালা আদমী বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। চিত্তরঞ্জনে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।
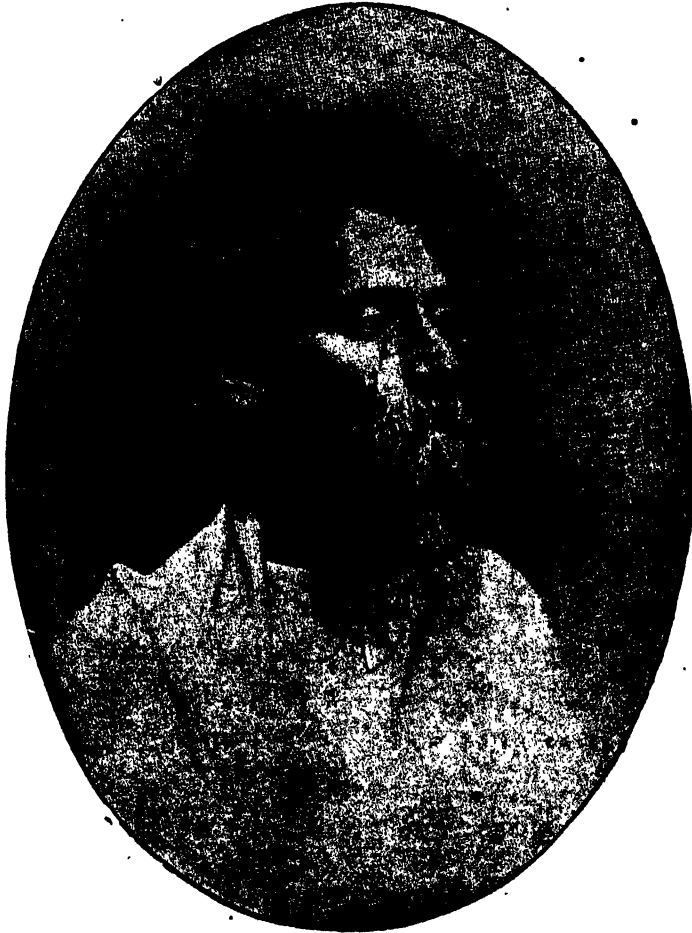
বিলাতে অবস্থানকালেই চিত্তরঞ্জন তাঁহার অসাধারণ একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জন ম্যাকলীন নামক পার্লামেন্টের কোন সদস্য হিন্দু-মুসলমানকে অশিষ্টভাবে আক্রমণ করিলে চিত্তরঞ্জন তাহার প্রতিবাদকল্পে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি তখন শিক্ষার্থী যুবক, তাঁহার প্রচুর অর্থ নাই—সমাজেও প্রতিষ্ঠা নাই, সম্বল কেবল আত্মসম্মানে আঘাতজনিত দারুণ ক্রোধ আর যুবজন-সুলভ উৎসাহ; সহকর্ম্মী সেই প্রবাসে মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছাত্র। কিন্তু বীরবর নেপোলিয়নের এক জন সেনাপতি যেমন একক শত্রুর আক্রমণ প্রহত করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন তেমনই সেই সামান্য সম্বল লইয়া ভারতবাসীর মান রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে যে আন্দোলন আরব্ধ হয়, তাহার ফলে জন ম্যাকলীন ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মনের

এই বল, সঙ্কল্পের এই দৃঢ়তা, উৎসাহের এই অসীমতা ৩০ বৎসর পরে অসহযোগ আন্দোলনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিলাতে চিত্তরঞ্জন মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোনের সভাপতিত্বে ভারত-সমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের এই সব রাজনীতিক কাযের জন্যই তিনি সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হইবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, এই সব কাযই তাঁহার সার্ভিসে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিপন্ন করিতে হয়, তাহার উপর চিত্তরঞ্জন দারিদ্র্যের দংশনে পীড়িত। তাঁহার পিতা তখন ঋণভারগ্রস্ত। মুক্তহস্ত পরিবারে—বিলাসের পরিবেষ্টনে যাঁহারা বসবাস করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে অর্থাভাব কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এইরূপে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। চিত্তরঞ্জন ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলেন—তাহাতেও প্রয়োজনানুরূপ অর্থাগম হইতে লাগিল না।

এইস্থলে বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী কালে চিত্তরঞ্জনের বন্ধু অরবিন্দ ঘোষও সার্ভিসে প্রবেশচেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার হইয়া চিত্তরঞ্জন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে কংগ্রেসই তখন একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—তাহা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাহাতে যোগ দিলেন না। সে প্রবৃত্তির অভাবে অর্থাৎ কংগ্রেসের আদর্শ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই বলিয়া, কি অবসরের অভাবে—তাহা বলা যায় না। কারণ, তখন তাঁহার অবসরের অভাবও যথেষ্ট ছিল। একে ত নবীন ব্যবহারাজীবকে প্রথম ব্যবসায়ে প্রবেশ করিলে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় যোগ্যতা

দাদাভাই নৌরজী
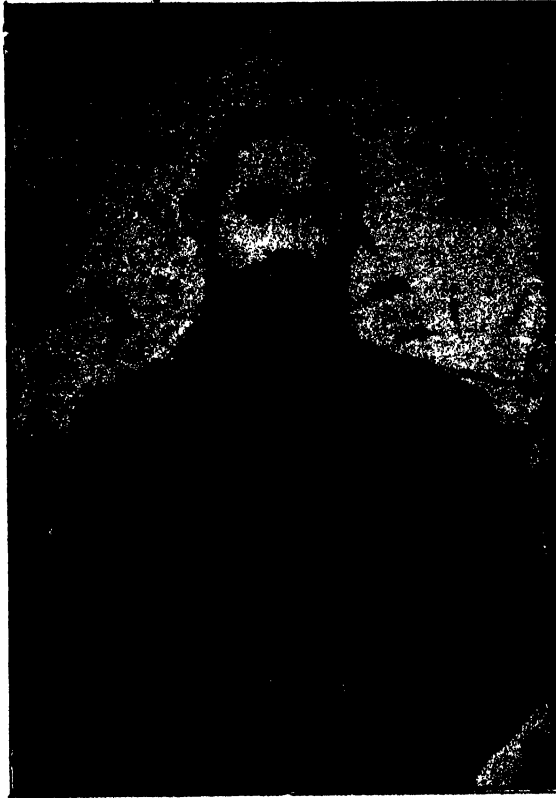
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় নবজীবন দেখা দিল। বাঙ্গালী আপনাকে যেন নূতন রূপে ও নূতন ভাবে দেখিল। সে রূপ দেখিয়া সে আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল। কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :—

"বাঙ্গালাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি,
ঐ অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী!"

ইংরাজ সরকার বাঙ্গালীর প্রতিবাদ পদদলিত করিয়া বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। কিন্তু ঐ যে বাঙ্গালীর প্রতিবাদ পদদলিত হইল, তাহাতেই বাঙ্গালার আহত আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত বিষধরের মত ফণা তুলিল।
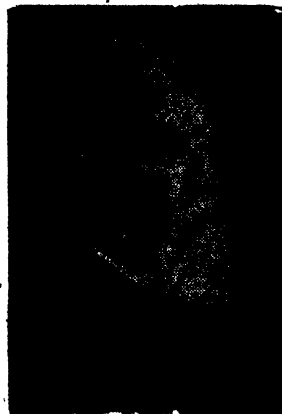
বাঙ্গালায় যে ভাব দিনে দিনে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা এই উপলক্ষে আত্ম-প্রকাশ করিল। বাঙ্গালায় এক তরুণ দলের উদ্ভব হইল এবং সেই তরুণ দল মহারাষ্ট্রের জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলকের নির্ভীক আদর্শ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের প্রভাব যে অতি অল্পকালমধ্যে অনুভূত হইল, তাহার কারণ, দেশ প্রস্তুত হইয়া ছিল, অভাব ছিল কেবল নেতার।

যিনি তরুণদলের জয়যাত্রায় সারথি হইলেন—তিনি বাঙ্গালায় অপরিচিত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অরবিন্দ ঘোষ বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালা জানিতেন না। তিনি অতি অল্পবয়সে শিক্ষার্থ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বরোদায় শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং তরুণ দলের মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হইলে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' গণতন্ত্রশাসিত ছিল। সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাহার জন্য প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন দিন প্রভুত্ব করেন নাই। অরবিন্দের সম্পাদকীয় কার্য্য একটি সঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত হইত। সে সঙ্ঘে ছিলেন—বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর ও বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক। এক দিকে 'বন্দে মাতরম্' ইংরাজীতে পরিচালিত; আর এক দিকে 'সন্ধ্যা' বাঙ্গালায় প্রকাশিত। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সন্ন্যাসী, অরবিন্দ ভবিষ্যতের ভাবনা না ভাবিয়া চাকরীত্যাগী। ত্যাগীদিগের দ্বারা তরুণ দলের কায চলিতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র যে কত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকে কল্পনা করিতে পারিবেন না। কোন পুলিস-কর্ম্মচারী একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "'বন্দে মাতরম্' পত্রের পরিচালকরা যে বিনা পারিশ্রমিকে কায করেন—এ কথাটা য়ুরোপীয়দিগকে বিশ্বাস করাইতে পারি না।" 'সন্ধ্যা' সরল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া লোকের ভয় ভাঙ্গাইতে লাগিল—'বন্দে মাতরম্' শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাব প্রচার করিতে লাগিল, তাহা অরবিন্দের 'নবভাব' (New Spirit) শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

লালমোহন ঘোষ

এই দলের কাম্য ছিল—মুক্তি; বিদেশের কর্ত্তৃত্বমুক্ত স্বায়ত্ত-শাসন। তাই আদালতে অভিযুক্ত হইয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আত্মপক্ষসমর্থনে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট স্বরাজের কার্য্যের জন্য তিনি বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর নিকট কৈফিয়তের দায়ী নহেন। তাই

অরবিন্দ ঘোষ

সুবোধচন্দ্র মল্লিক

'যুগান্তরের' ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরাজের আদালতে রাজ-দ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

এই ত্যাগীর দলে চিত্তরঞ্জন যোগ দিয়াছিলেন। তখন 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবে' ও সুবোধচন্দ্রের গৃহে পরামর্শ-সম্মিলনে চিত্তরঞ্জনকে প্রায়ই দেখা যাইত। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সম্পাদক নিয়োগের প্রস্তাবে -বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে তিনি বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও রাজনীতিচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। সে বার জাতীয় দল যে বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসে সভাপতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেও চিত্তরঞ্জনের সম্মতি ছিল। তিনিও অরবিন্দের মত বিশ্বাস করিতেন, দেশ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। সে বিষয়ে এক দিন অরবিন্দের সহিত আমাদের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা বলিতেছেন, দেশ এখনও অপ্রস্তুত, তাঁহারা দেশের কথা কতটুকু জানেন? তাঁহারা কি দেশের শক্তিকেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছেন? ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সে কয় জন লোক সত্য সত্যই মনে করিতে পারিয়াছিল, দেশ প্রস্তুত হইয়াছে?" চিত্তরঞ্জন তখন যে দলে যোগ দিয়াছিলেন, সে দলের এই অভিমত ছিল।

চিত্তরঞ্জন 'বন্দে মাতরমে'র জন্য ও চরমপন্থী নামে অভিহিত দলের জন্য অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার অর্থসাহায্য প্রদান করিবার বাসনা যত বলবতী, সাহায্যদানের ক্ষমতা সেরূপ নহে। তবে তখনই তাঁহার যে রাজনীতিক মত প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে বলিতে পারা যায়, তাঁহার পক্ষে দেশের মুক্তিসংগ্রামে নায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তখনও তাঁহার ক্ষমতার স্ফূর্ত্তি হয় নাই—তাহার স্ফূর্ত্তির জন্য যে বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল, তাহা তখনও দেখা দেয় নাই—তাহার কল্পনাও দেশের লোক তখনও করে নাই। কারণ, তখনও দেশের রাজনীতিক আন্দোলন—জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয় নাই। সে জন্য যে ত্যাগী নেতার আবির্ভাব প্রয়োজন—তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তখনও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েন নাই।

কলিকাতায় দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে যে কংগ্রেসে "স্বরাজ" ভারতবাসীর কাম্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়,

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব
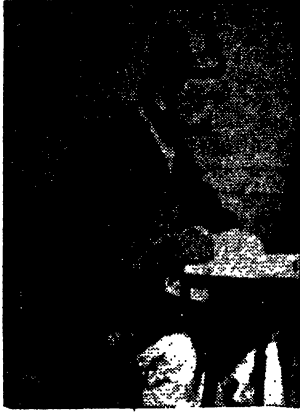
সার ফিরোজশা মেটা

সে কংগ্রেসে বিষয়নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন হইতে জাতীয় দলের অধিকাংশ সদস্য যখন সার ফিরোজশা মেটার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কথাতেও প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না, তখন তাঁহারা চিত্তরঞ্জনের গৃহে সমবেত হইয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই গৃহ চিত্তরঞ্জন শেষে জনসাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার অভিপ্রেত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর নাগপুরে অধিবেশন হইবার কথা ছিল। তাহা না হইয়া সুরাটে অধিবেশন হইল এবং সেই অধিবেশনেই কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। সুরাটের অধিবেশনে যে রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন হইতে সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত লালা লজপৎ রায়কে সভাপতি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতেও চিত্তরঞ্জন সাহায্য করিয়াছিলেন।

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পর মডারেটরা "ক্রীড" রচনা করিয়া কংগ্রেস আপনারা হস্তগত রাখিলেন এবং সরকারও এই সুযোগে চণ্ডনীতির পরিচালন আরম্ভ করিলেন।

ইহার পর মাণিকতলার বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল ও অরবিন্দ সেই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইলেন। অরবিন্দের বন্ধুবর্গের ইচ্ছা ছিল, চিত্তরঞ্জনই আদালতে অরবিন্দের পক্ষসমর্থন করেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। সে জন্য কিছু টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল ; সেই টাকায় মামলা চালাইবার ভার অরবিন্দের আত্মীয়রা লইলেন। কিন্তু অর্থের পরিমাণ অল্প ; কাযেই কয় দিন পরেই সে ভাবে আর মামলা চালান অসম্ভব হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া শ্যামসুন্দর বাবু ও বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক
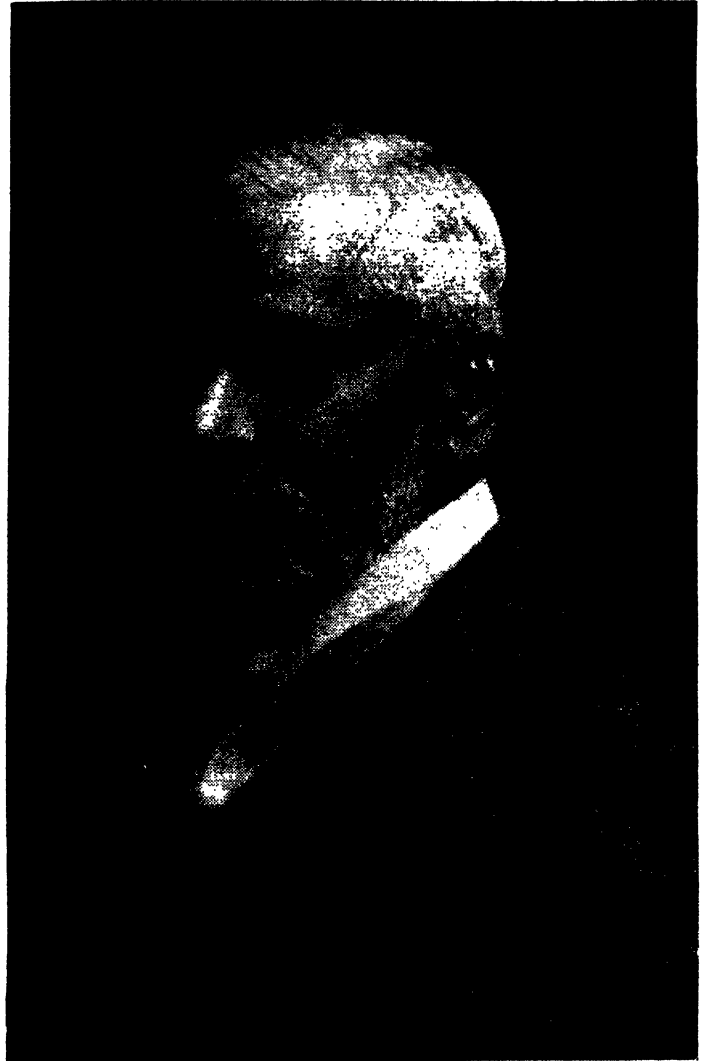
ভূপেন্দ্রনাথ বসু

চিত্তরঞ্জনকে সে ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা কুণ্ঠিতভাবে সে অনুরোধ করিলেন। তাহার কারণ—চিত্তরঞ্জন তখন দরিদ্র, আর ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদের প্রস্তাব সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনকে মামলার পরামর্শে রাখা হয় নাই। সে দিনের কথা আমাদের সুস্পষ্টরূপ মনে আছে। প্রস্তাব শুনিয়া চিত্তরঞ্জন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—"অরবিন্দ আপনাদেরই বন্ধু—আমার নহে?" দীর্ঘকাল এই মোকর্দ্দমা বিনা পারিশ্রমিকে চালাইতে চিত্তরঞ্জনকে কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন অবগত আছেন। সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাকে গাড়ী ও ঘোড়া বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে তিনি য়ুরোপীয়দিগের মত আহার্য্য আহার করিতেন—অর্থাভাবে তাঁহাকে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে ও পাচককে বিদায় দিতে হইয়াছিল। তখন যাঁহারা সর্ব্বদা চিত্তরঞ্জনের গৃহে যাইতেন, তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে, সংস্কারের অভাবে গৃহও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন কিরূপ দক্ষতাসহকারে এই মোকর্দ্দমা চালাইয়া অরবিন্দকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, সে কথা আজ আর বলিব না। সওয়াল-জবাবে তাঁহার বক্তৃতা যে শুনিয়াছিল, সে-ই মুগ্ধ হইয়াছিল। এই মোকর্দ্দমা পরিচালনকালে এক দিন তাঁহার সহিত বিচারক বীচক্রফটের যে কথা কাটাকাটি হয়, তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার কোন কথায় বিচারক বলেন, "অসার কথা।" চিত্তরঞ্জন উত্তর দেন, "কি বলিব—আপনি বিচারকের আসনে, আর আমি ব্যবহারাজীব। নহিলে—আদালতের বাহিরে হইলে আপনাকে ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিতাম।"

অরবিন্দের জন্য চিত্তরঞ্জন যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল না, পরন্তু তাহার পুরস্কার পাইতেও বিলম্ব হইল না। সেই মোকর্দ্দমার ব্যবহারাজীব হিসাবে তাঁহার যশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এটর্ণী বন্ধু ধনুলাল আগরওয়ালা ডুমরাওন রাজের একটি বড় মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কমলার কৃপা তদবধি শতধারে চিত্তরঞ্জনের ভাণ্ডারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারমণ্ডলীতে প্রধানদিগের মধ্যে

সার রাসবিহারী ঘোষ

স্থান অধিকার করিলেন। সে দিকে তাঁহার সাধনার সিদ্ধি দেখা গেল।

তাহার পর চিত্তরঞ্জন আর রাজনীতিক্ষেত্রে বড় দেখা দিলেন না। তবে রাজনীতিক অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কখন তাঁহার সাহায্যে ও উপদেশে বঞ্চিত হইতেন না। লক্ষ্ণৌ সহরে যে কংগ্রেসে আবার সকল দলের মিলন হইল, কংগ্রেসের সে অধিবেশনেও চিত্তরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে আবার কংগ্রেসে একটু মনোযোগ দিতে হইল। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। জাতীয় দল মিসেস্ বেসান্টকে সভানায়িকা করিতে চাহিলেন; মডারেটরা তাহাতে অসম্মত হইলেন। মডারেটরা রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত করিলেন, জাতীয় দলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সে পদ গ্রহণ করিলেন। শেষে মিটমাট হইয়া গেল—বৈকুণ্ঠনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মিসেস্ বেসান্ট সভানেত্রী হইলেন। সে অধিবেশনের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্যভাবে দলাদলিতে যোগ দেন নাই।

লালা লজপৎ রায়

তাহার পর মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। সেই রিপোর্টে ভারতে শাসন-পদ্ধতির যে পরিবর্ত্তন করা হইবে বলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইল, তাহারই আলোচনার জন্য বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন আহূত হইল। মিষ্টার হাসান ইমাম সে অধিবেশনের সভাপতি। আমরা শুনিয়াছি, চিত্তরঞ্জনই মিষ্টার হাসান ইমামকে সে অধিবেশনের সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনের অল্প দিন পূর্ব্বে রৌলট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে প্রস্তাব করেন;—

"এই কংগ্রেস রৌলট কমিটীর নির্দ্ধারণের নিন্দা করিতেছেন।—সে নির্দ্ধারণ অনুসারে কায হইলে ভারতবাসীর প্রাথমিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে এবং জনমতের বিকাশপথে বিঘ্ন স্থাপন করা হইবে।"

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় তিনি বলেন—

আজ যখন সমগ্র দেশ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য ও
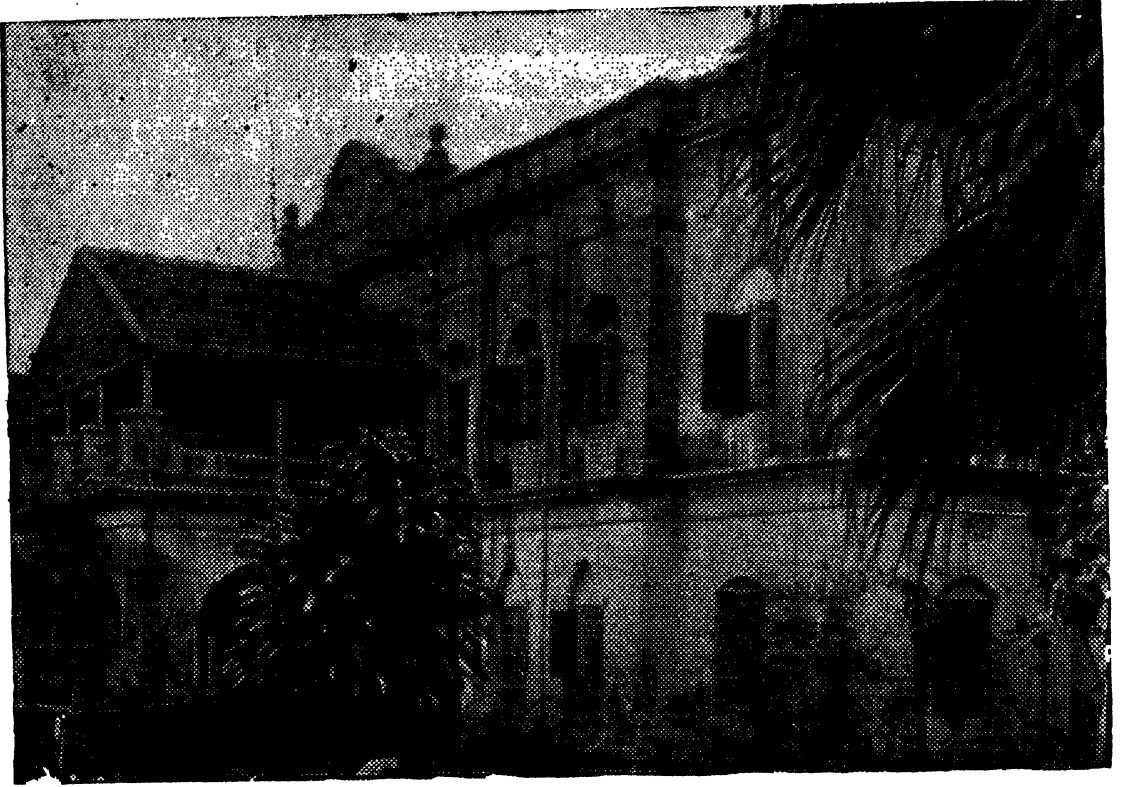
চিত্তরঞ্জনের গৃহ

আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছে—যখন সমগ্র দেশ আমাদের রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য রাজনীতিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় সরকার কেন যে লোককে পীড়িত করিবার জন্য ২টি নূতন অস্ত্র প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা শুনিয়াছি, সরকারের বিশ্বাস, এ দেশে বিপ্লবপন্থীর দল আছে। আমিও তাহাই মনে করি। কমিটীর নির্দ্ধারণের আশ্রয়ে সরকার সেই দলকে চূর্ণ করিবার জন্য এই অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু জগতের ইতিহাসে কুত্রাপি দেখা যায় নাই—চণ্ডনীতিদ্যোতক আইনের দ্বারা বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠান উন্মূলিত হইয়াছে। সরকার এ ব্যাপারে আবশ্যক মনোযোগ দান করেন নাই। সরকার এ দেশে এই দলের অবস্থিতির কারণ সন্ধান করেন নাই। ইহা যে অকল্যাণ, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। এই অকল্যাণ দূর করিতে হইবে, কিন্তু কমিটীর নির্দ্দিষ্ট উপায়ে তাহা দূর করা যাইবে না। লোককে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিতে হইবে। স্বায়ত্ত শাসনই এ ব্যাধির ভেষজ। সরকার যে এই দলের অস্তিত্বের কারণ সন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, তাহা এই কমিটী নিয়োগের প্রস্তাবেই সপ্রকাশ। সরকার বিপ্লবাত্মক অনুষ্ঠানসংশ্লিষ্ট ষড়্‌যন্ত্রের প্রকৃতি ও বিস্তার নির্দ্ধারণ, ষড়্‌যন্ত্রসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অসুবিধা নির্দ্দেশ ও সে জন্য কোন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হইলে সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার জন্য কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন। কমিটী সে সীমা অতিক্রম করিয়া কারণ সন্ধান করিয়াছেন। কমিটী যখন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, তখন সমগ্র দেশ সরকারের চণ্ডনীতিতে বিরক্ত। সেই সময় অনুসন্ধান করিয়া কমিটী এই লজ্জাজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ষড়্‌যন্ত্র এক দল লোকের রাজনীতিক কার্য্যের ফল। এই সম্পর্কে লোকমান্য তিলকের, বিপিনচন্দ্র পালের নামও কতকগুলি

সংবাদপত্রের রচনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব বক্তা ও লেখক কি জন্য সে ভাবে বক্তৃতা ও রচনা করিয়াছেন, কমিটী সে বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন না কেন? তোমরা গত ১শত ৫০ বৎসর কাল এ দেশের লোককে পীড়িত করিতেছ, কোন দিন কি সংস্কারের কথা কল্পনাও করিয়াছ? এ কথা কি সত্য নহে যে, যখনই সংস্কারের কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তখনই ব্যুরোক্রেশী তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন? তোমরা কি কখন লোকের রাজনীতিক অধিকার-বিষয়ে অবহিত হইয়াছ? তোমরা কি সামরিক প্রয়োজনের ছলে রচিত ভারত-রক্ষা আইনের বলে শত শত লোককে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ কর নাই? এই রৌলট কমিটী আরও কঠোর বিধি বিধিবদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সরকারের বিনা বিচারে লোককে আটক করার প্রতিবাদ করিয়াছি। বাঙ্গালায় আমরা এই ব্যাপারে জর্জ্জরিত। এই প্রস্তাবে আমাদের সেই প্রতিবাদ সমর্থিত হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন যে বলিয়াছেন, বঙ্গদেশে

বৈকুণ্ঠনাথ সেন

তিনি বিনা বিচারে লোককে আটক করিবার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিবার জন্য বহু সভাসমিতি হইয়াছিল এবং "জনসভা" সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই "জনসভা"র সহিত চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং আটকের প্রতিবাদে তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন।

এই সময় হইতেই তিনি বহু রাজনীতিক মোকর্দ্দমায় বিনা পারিশ্রমিকে আসামীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে এক মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত আর কেহই এরূপ ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। মনোমোহন পুলিসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন এবং তাঁহার চেষ্টায় বহু পুলিস-চালানী আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেক মোকর্দ্দমায় পুলিসের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনও বহু মোকর্দ্দমায় পুলিসের ও সরকারের অনাচার প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন

আরও একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সে-টি শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় সদস্ত নির্ব্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকারসম্পর্কিত—

"ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা, নির্ব্বাচনকেন্দ্র ও ব্যবস্থাপক সভার গঠন নির্দ্ধারণ বিষয়ে কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, সে সব ব্যাপার যেন কমিটীতে স্থির না হইয়া পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় এবং আইনের অন্তীভূত হয়।

অথবা

যদি সেই কার্য্যের জন্ত কমিটী গঠিত করা হয়, তবে কমিটীর ২ জন বে-সরকারী সদস্তের ১ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক ও ১ জন মসলেম লীগের কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে যে ১ জন সদস্ত অস্থায়িভাবে গ্রহণ করা হইবে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিবেন।"

এই প্রস্তাবের প্রথম ভাগে কমিটী অপেক্ষা পার্লামেণ্টের উপর অধিক আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছিল। কারণ, এ দেশের ব্যাপারে সরকার কিরূপ সদস্ত লইয়া কমিটী গঠিত করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চিত্তরঞ্জন তাঁহার বক্তৃতাতেও সে কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবের দ্বিতীয় ভাগে যাহা উক্ত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কংগ্রেসকে সরকার কোন দিন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হয়েন নাই, এমন কি, কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পর সার হেন্‌রী কটন যখন কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রদান করিবার জন্ত বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন বড় লাট উত্তর দিয়াছিলেন, সার হেন্‌রী সরকারের পুরাতন চাকুরিয়া। তিনি যদি সেই ভাবে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে বড় লাট সানন্দে তাঁহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন, কিন্তু তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে অনুমতি পাইবেন না। সত্য বটে, সুরাটের পর কংগ্রেস মডারেটদিগের অধিকৃত হইলে মাদ্রাজের অধিবেশনে মাদ্রাজের প্রাদেশিক গভর্ণর ও লক্ষ্ণৌএ প্রাদেশিক ছোট লাট কংগ্রেসে দর্শন দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি কংগ্রেস তাঁহাদের কাছে "অপাংক্তেয়ই" ছিল—বিশেষ কলিকাতায় মিসেস্ বেসাণ্টের নেতৃত্বে যে অধিবেশন হয়, তাহার পর হইতে সরকারের সেই মনোভাব আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—শেষে বোম্বাইয়ের এই অতিরিক্ত অধিবেশনে মডারেটরাও যোগ দেন নাই; কারণ, তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল, এই অধিবেশনে শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের ত্রুটি প্রদর্শিত হইবে এবং তাঁহারা সেই প্রস্তাবেই পরম পুলকিত হইয়াছিলেন।

হাসান ইমাম

সেই সময় চিত্তরঞ্জন অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেসই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাহাকে কমিটীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে। ইহা একরূপ যুদ্ধঘোষণা। এই প্রস্তাবে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। তিনি কমিটীতে সদস্ত নির্ব্বাচন বিষয়ে মসলেম লীগকে কংগ্রেসের সহিত তুল্য অধিকার দিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত যে নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের এই অতিরিক্ত অধিবেশনে তিনি তাহার সূচনা দেখাইয়াছিলেন। যে "প্যাক্ট" প্রবর্ত্তিত করায় তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু যাহা তিনি দেশের জন্ত প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূলে যে ভাব ছিল, সেই ভাব এই প্রস্তাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে এই অতিরিক্ত অধিবেশনের কায শেষ হইল। ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সাধারণ অধিবেশন হইল। সেই অধিবেশনে শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, তাহাতে বোম্বাইয়ে গৃহীত ৬ষ্ঠ প্রস্তাবে কিছু পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে বলা হয়। তাহাতে বলা হয়, অতিরিক্ত অধিবেশনের পর দেশের লোক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেস মনে করেন—প্রদেশসমূহে অবিলম্বে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য এবং ভারতের কোন অংশকেই শাসন-সংস্কার হইতে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত নহে।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবর্ত্তন পরিত্যাগ করিবার জন্ত সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তিনি আরও বলেন, বোম্বাইয়ে গৃহীত প্রস্তাবে যে শাসন-সংস্কার "হতাশার কারণ ও অনুপযুক্ত" বলা হইয়াছিল এবং ১৫ বৎসরের অনধিককালমধ্যে সমগ্র ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের দাবি করা হইয়াছিল—সেই ২টি অংশ বর্জ্জন করা হউক। তখন উভয় দলে যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে মিসেস্ বেসাণ্ট, নবাব সরফরাজ হুসেন খাঁ, পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর, মিষ্টার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, মিষ্টার বরদলই, মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, মিষ্টার (পরে সার) বীর নরসিংহেশ্বর শর্ম্মা, মিষ্টার যমুনাদাস দ্বারকাদাস, মিষ্টার গোবিন্দরাঘব আয়ার, মিষ্টার ফজলুল হক প্রভৃতি যোগ দেন। পরে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ৩টি বিষয় বিবৃত করেন। দেখা যায়, তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে তিনি শেষ পর্য্যন্ত সেই ৩টি বিষয়ে অবিচলিত ছিলেন ;—

(১) কত দিনে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ দেশের সিভিল সার্ভিসই আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানের বিশেষ বিরোধী। যদি কালনির্দ্দেশ

না থাকে, তবে সেই সিভিল সার্ভিসই আমাদের উপযোগিতা বিচার করিবেন। ব্যুরোক্রেশী আপনার ধ্বংসে সম্মতি দিবেন, এমন আশা কি কেহ করিতে পারে?

(২) শাসন-সংস্কার প্রস্তাব যে অসন্তোষজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৩) আমরা দ্বৈতশাসনে সম্মত নহি। আমরা প্রাদেশিক সরকারে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করিতেছি; তাহাই স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম সোপান। সমগ্র জাতির তাহাই অভিমত।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মিসেস্ বেসাণ্ট ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি প্রবর্ত্তনের জন্য যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, চিত্তরঞ্জন তাহার সমর্থন করেন।

তিনি এই অধিবেশনে আরও একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন; কিন্তু সেই প্রসঙ্গে কোন বক্তৃতা করেন না। সে প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, শান্তিপরিষদে ভারতের যে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, ভারত সরকার তাঁহাকে মনোনীত করিবেন না—পরন্তু তিনি কংগ্রেস কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং কংগ্রেস লোকমান্য তিলককেই সে জন্য নির্ব্বাচিত করিতেছেন।

এই প্রস্তাবে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এই অধিবেশনেই প্রস্তাব হয়, এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে যে সব দাবি করা হইয়াছে, সেই সকল উপস্থাপিত করিবার জন্য বিলাতে এক "ডেপুটেশন" প্রেরণ করা হউক। পণ্ডিত গোকর্ণনাথ মিশ্র "এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের" স্থানে "কংগ্রেসে" লিখিতে বলিলে চিত্তরঞ্জন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইবে, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়াই সঙ্গত।

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর ঘটনার গতি অতি দ্রুত হইল। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন যে রৌলট রিপোর্টের নিন্দাত্মক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই রিপোর্টে নির্ভর করিয়া ব্যুরোক্রেশী আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। সে আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে তীব্র প্রতিবাদ হইলেও সরকার তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। মহাত্মা গন্ধী তাহাতে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিলেন। তাহার পর পঞ্জাবে হাঙ্গামা হইল এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী জেনারল ডায়ারের নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন দেখা গেল।

পঞ্জাবের ব্যাপার অনুসন্ধান করিবার জন্য কংগ্রেস এক সমিতি নিযুক্ত করিলেন। তাহার সদস্য—

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু
মিষ্টার ফজলুল হক
চিত্তরঞ্জন দাশ
মিষ্টার আব্বাস তায়াবজী
শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী

মিষ্টার ফজলুল হক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিলে বোম্বাইয়ের মিষ্টার জয়াকর সেই স্থানে নিযুক্ত হয়েন।

চিত্তরঞ্জন কেবল যে দীর্ঘকাল ব্যবসা ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন, সেই সময় তিনি নিজ হইতে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

সে বার অমৃতসরেই কংগ্রেসের অধিবেশন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মডারেটদিগকেও সে অধিবেশনে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। সে অনুরোধ ব্যর্থ হইল। চিত্তরঞ্জন সে অধিবেশনে যোগ দিলেন। সেই বার তিনি ভারতের রাজনীতিক গগনে অমানিশার অন্ধকার দেখিয়া দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিলেন। এত দিন তিনি কূলে দাঁড়াইয়া স্রোতের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারসাধনে সাহায্য করিতেছিলেন। এবার তিনি আপনি সেই স্রোতে ঝাঁপ দিলেন। দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা চৌষট্টি কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, তেত্রিশ কোটি মাথায় বহিয়া মা'র প্রতিমা ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত

করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব! মাতৃহীনের জীবনে কায কি?"

অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থির হইল, শাসন-সংস্কার সন্তোষজনক ও ভারতবাসীর যোগ্যতার উপযুক্ত না হইলেও তাহা চালান হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সরকারের কার্য্যে বাধাপ্রদানও করা হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহা স্থির হইয়া গেলে—পরবর্ত্তী সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হইল। তাহার আলোচ্য বিষয়—

(১) পঞ্জাবী ব্যাপার

(২) খিলাফৎ সমস্যা

(৩) শাসনসংস্কারের নিয়ম

(৪) সহযোগিতা বর্জ্জন

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে ২ দিন আলোচনায় পর মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবিত সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"খিলাফৎ-ব্যাপারে ভারত ও বিলাত সরকার মুসলমান প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন; মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্মসম্পর্কিত দুর্দ্দিনে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের অনাচারের সময় পঞ্জাবের নির্দ্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারদ্বয় রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা করেন নাই; পরন্তু বর্ব্বরোচিত অনাচারের অনুষ্ঠানকারীদিগের দণ্ডবিধানের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা মূল দোষী সার মাইকেল ওডয়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। পার্লামেন্টের কমন্স ও লর্ডস্ সভায় পঞ্জাব সম্পর্কে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে, বিলাতের অধিকাংশ লোক এ দেশের লোকের ব্যথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত নহেন, বরং তাঁহারা পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত ঘোর অত্যাচার-অনাচারের সমর্থন করেন। বড় লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি পঞ্জাব বা খিলাফৎ ব্যাপারে অণুমাত্র অনুতপ্ত নহেন।

"এই সকল কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরি-উক্ত দুইটি অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শান্তি পাইবে না। অসন্তোষ দূর করিবার একমাত্র উপায় আছে। সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটী যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সহযোগিতা-বর্জ্জননীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা পঞ্জাব ও খিলাফৎ-সমস্যার সমাধান হইবে না।

"এই নীতি গ্রহণের প্রথম সোপান—

(১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরী ত্যাগ করা।

(২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগদান না করা।

(৩) সরকারের যে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ হইতে ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লওয়া এবং সেই স্থানে জাতীয় স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইনব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা বর্জ্জন করা এবং সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণিগণের এবং মজুরগণের মেসোপোটেমিয়ায় চাকরীগ্রহণ অস্বীকার করা।

(৬) সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন বর্জ্জন করা। কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাঁহাদিগকে ভোট দিবেন না।

"ইহাতে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। কিন্তু স্বার্থত্যাগ না করিলে কোন জাতিই উন্নত হয় না। সেই হেতু দেশের লোককে এই স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত করাইবার নিমিত্ত এই প্রথম পথ নির্দ্দেশ করা হইল। সুতরাং এই সঙ্গে 'স্বদেশী' গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য।"

তৎকালে চিত্তরঞ্জন সর্ব্বতোভাবে এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেসের বহুমত এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় তিনি বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

সেপ্টেম্বরের পর ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে যে অধিবেশন হয়, চিত্তরঞ্জন তাহাতে অসহযোগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তথায় কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবের কিছু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে;—

"যে হেতু এই মহাসভার মতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে এবং যে হেতু ভারতবাসী এখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম এবং বহুবিধ অন্যায় অবিচারের প্রতীকারকল্পে আমাদের অবলম্বিত উপায়সমূহ এতাবৎকাল ব্যর্থ হইয়াছে—বিশেষ পঞ্জাব ও খিলাফতের কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, সেই জন্ম এই কংগ্রেস অহিংসাত্মক সহযোগনীতিকে অঙ্গীকার ও গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অহিংসামূলক সহযোগবর্জ্জনব্যবস্থা সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সর্ব্বসংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্ম প্রথম প্রস্তাব হইতে শেষ প্রস্তাব রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কোন্‌টি কখন্ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা কংগ্রেস বা নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবামাত্র সকলকে একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব এই কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার জন্ম নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে :—

(ক) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত, পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে ষোড়শবর্ষের অন্যূনবয়স্ক ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত বালকের শিক্ষার জন্ম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অভিভাবক ও পিতামাতাদিগকে (ছাত্রগণকে নহে) আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) এতদ্দেশবাসিগণ যে শাসনতন্ত্রের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করেন, সেই শাসনতন্ত্র-পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত বা সাহায্যকৃত শিক্ষায়তনগুলি হইতে ষোড়শবর্ষীয় বা ততোধিক বয়সের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা উক্তরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ধর্ম্মবুদ্ধি-সঙ্গত নহে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যাহাতে ফলাফল চিন্তা না করিয়া সে সব বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে এবং ঐ ছাত্ররা যাহাতে অসহযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে।

(গ) বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিও জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিণতির জন্য, মিউনিসিপালিটী, জিলা বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কিত সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি (ন্যাসরক্ষক) কর্ত্তৃপক্ষ, শিক্ষকগণকে আহ্বান করিতে হইবে।

(ঘ) আইন-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের ব্যবসায় স্থগিত রাখিয়া সমব্যবসায়িগণকেও ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করাইতে এবং মামলাকারিগণকে আদালত বর্জ্জন করিয়া সালিশী-সভায় মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করাইতে এবং একাগ্রচিত্তে দেশসেবায় প্রবৃত্ত করাইতে অধিকতররূপে চেষ্টিত হইবেন।

(ঙ) ভারতবর্ষের আর্থিক স্বচ্ছলতাবিধান এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম যাহাতে ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে বৈদেশিক সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে পরিহার করেন, তজ্জন্ম তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে হইবে। চরকায় সূতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ বৈদেশিক পণ্যবর্জ্জন সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন।

(চ) অসহযোগ আন্দোলন সফল করিবার জন্ম যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, প্রত্যেক নরনারীকেই তাহা অনুষ্ঠান করিবার জন্ম নির্ব্বিচারে আহ্বান করিতে হইবে। এই জাতীয় আন্দোলন সফল করিবার জন্ম প্রত্যেককেই শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আত্মোৎসর্গের জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে।

(ছ) অসহযোগনীতি প্রচার করিবার জন্ম প্রত্যেক গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রাম লইয়া সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরগুলিতেও ঐরূপ এক একটি সমিতি থাকিবে এবং প্রত্যেক সমিতিই প্রাদেশিক সমিতির অধীনে থাকিবে।

(জ) 'জাতীয়-সেবক-সঙ্ঘ' নামে দেশসেবার জন্ম একটি জাতীয় সেবকদল গঠন করিতে হইবে।

(ঝ) জাতীয় সেবাকার্য্য পরিচালনের এবং অসহযোগ নীতি প্রচারের সহায়তার জন্ম নিখিলভারত তিলক-স্বরাজ ভাণ্ডার নামে একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"ভারতবাসী অসহযোগ নীতি পালনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা কংগ্রেস আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ ভোটদাতৃগণ যে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনির্ব্বাচনব্যাপার পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার মুখপাত্র নহে; অতএব কংগ্রেস আশা করেন যে, যে সমস্ত সভ্য সাধারণের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্বর পদত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহারা গণতন্ত্রের নিয়ম অবহেলা করিয়া ভোটদাতৃগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে নির্ব্বাচনকারিগণ তাঁহাদিগকে রাজনীতিক কোন কার্য্যে সহায়তা করিবেন না।

"পুলিস ও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত জনসাধারণের সম্প্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা এই সভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আশা করেন যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞা পালনের জন্য নিজের দেশ ও বিশ্বাস বিস্মৃত হইবেন না এবং শিষ্টাচার ও ধীরতার পরিচয় দিয়া তাঁহারা যে দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন, এই দুর্নাম প্রক্ষালিত করিবেন।

"এই সভা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন দেশের আহ্বানে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য দেশবাসীর সহিত উদার ও সাধু ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েন। ব্যক্তিগতভাবে দেশের কার্য্যে যোগদান না করিলেও তাঁহারা নির্ভীক এবং প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের সভায় যোগদান করুন এবং এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতায় জন্য অর্থ-সাহায্য করুন।

"এই সভা বিশেষভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি—অহিংসা। বাক্যে ও কর্ম্মে জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার আঘাত করিবেন না এবং গবর্ণমেণ্টেরও যে এই নীতি পালন করা উচিত, ইহা এই কংগ্রেস প্রত্যেক সভ্যকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এই কংগ্রেস বলিতেছেন যে, প্রতিহিংসামূলক শক্তি-প্রয়োগ গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বের বিরোধী এবং (প্রয়োজন হইলে) অসহযোগনীতি সর্ব্বাংশে প্রয়োগ করিবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

"পরিশেষে যাহাতে পঞ্জাব ও খিলাফৎ সমস্যা সুমীমাংসিত হয় এবং এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন। অপর দিকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পরকে সহায়তা করিবার ভাব বৃদ্ধি করিবার উপরেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যবিধান এবং হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতিসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য এই কংগ্রেস সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ হইতে ছুৎমার্গের কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইবে। পতিত জাতিসমূহকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মনায়কদিগকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।"

নাগপুরে চিত্তরঞ্জন অসহযোগসম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তিনি আরম্ভেই বলেন, নাগপুরে সকল সম্প্রদায়ের সম্মতি লইয়া প্রস্তাবে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহাতে প্রস্তাব দুর্ব্বল করা হয় নাই। তিনি বলেন, আমরা যে সব অনাচারপীড়িত, সে সকলের প্রতীকারজন্য স্বরাজপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত আমরা প্রতীকারের যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সে সব ব্যর্থ হইয়াছে; কাযেই আমাদিগের পক্ষে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমরা অসহযোগের কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্বরাজলাভে চেষ্টিত হইব। প্রয়োজন হইলে আমরা সরকারকে কর প্রদানেও বিরত হইব। সে জন্য দেশের সকল শ্রেণীর লোককে প্রস্তুত হইতে হইবে। এ দেশে যে আমলাতন্ত্র শাসন চলিতেছে, কে তাহা চালাইতেছে? এ দেশে লোকের সাহায্যে বিদেশী আমলারা তাহা চালাইতেছেন। সুতরাং কংগ্রেস বলিলে দেশের লোককে সেই শাসন-যন্ত্র পরিচালনে সাহায্যে বিরত হইতে হইবে। ছাত্ররা যাহাতে বুঝিয়া কায করে,

তাহাই আমাদের অভিপ্রেত। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন সম্বন্ধেও আমরা সাধারণভাবে কোন কথা না বলিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহি। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা আমাদের বিধাতৃদত্ত অধিকার সম্ভোগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব। ভগবান্ যেন এই জাতিকে এই প্রস্তাবে বিবৃত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আবশ্যক বল প্রদান করেন।

এ বার মহাত্মা গন্ধী এই উপস্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

নাগপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জন ব্যবহারাজীবের ব্যবসা ত্যাগ করেন এবং সর্ব্বতোভাবে রাজনীতিচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

পরবৎসর যুবরাজের ভারতে আসিবার ব্যবস্থা ছিল। নেতারা যুবরাজের আগমনে উৎসবাদিতে যোগ দিবেন না স্থির করেন। শেষে সরকার ৬ই ডিসেম্বর খদ্দর বিক্রয় করিতে যাইবার অপরাধে চিত্তরঞ্জনের পুত্রকে গ্রেপ্তার করিলে প্রতিবাদকল্পে খদ্দর বিক্রয় করিতে যাইয়া চিত্তরঞ্জনের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ভগিনী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী সুনীতি দেবী গ্রেপ্তার হয়েন। সরকার স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১০ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হয়েন।

১৭ই তারিখে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিয়া সরকারের সহিত নেতাদের মিটমাটের চেষ্টা করেন। স্বয়ং কলিকাতায় আসিবার সময় তিনি বোম্বাইয়ের যমুনাদাস দ্বারকাদাসকে ও যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে মহাত্মা গন্ধীর কাছে পাঠাইয়া আইসেন।

১৯শে তারিখেই পণ্ডিত মদনমোহন কারাগারে চিত্তরঞ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পণ্ডিতজী পরে বলিয়াছেন, যাহাতে সরকার অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দেন ও চণ্ডনীতিমূলক ইস্তাহারসমূহ প্রত্যাহার করেন এবং দেশের লোকের ও সরকারের মধ্যে বিরোধের কারণসমূহের আলোচনার জন্য সরকারের ও সকল দলের প্রতিনিধিদিগের এক সভা (Round Table Conference) হয়, সেই জন্য চেষ্টা করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যুবরাজের আগমনের প্রতিবাদে হরতাল বর্জ্জন না করিলে সরকার এরূপ কোন প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না জানিয়া তিনি মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে হরতাল বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি ১৬ই তারিখে মহাত্মা গন্ধীকে যে টেলিগ্রাম করেন, তাহাতে তিনি লিখেন—"বড় লাট যদি সভায় সম্মতি দেন এবং সরকার চণ্ডনীতি স্থগিদ রাখেন ও নেতৃগণকে মুক্তি দেন, তবে আপনি যুবরাজের অভ্যর্থনায় আপত্তি বর্জ্জন করিবেন ও সভা না হওয়া পর্য্যন্ত আইন অমান্য করা বন্ধ রাখিবেন—এই সর্ত্ত বড় লাটকে জানাইতে আপনার সম্মতি চাহি।"

যমুনাদাস দ্বারকাদাস ও পণ্ডিত হৃদয়নাথের সহিত আলোচনার পর উত্তরে মহাত্মা গন্ধী ১৯শে তারিখে তার করেন—"সরকারের দলননীতির জন্য ব্যস্ত হইবেন না। সরকার যদি সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হয়েন এবং পঞ্জাবের ব্যাপারের, খিলাফতের ও স্বরাজের সুমীমাংসা করিতে আগ্রহান্বিত না হয়েন, তবে সভা নিষ্ফল হইবে।"

কারাগার হইতে চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯শে তারিখেই মহাত্মা গন্ধীকে টেলিগ্রাফ করেন:—

"আমরা নিম্নলিখিত সর্ত্তে হরতাল বন্ধ করিতে বলি—(১) কংগ্রেস কর্ত্তৃক উত্থাপিত সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য সরকার শীঘ্রই সভা আহ্বান করিবেন, (২) সরকার সংপ্রতি প্রকাশিত সকল ইস্তাহার ও আদেশ প্রত্যাহার করিবেন, (৩) নূতন আইনে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তিদান করা হইবে। অবিলম্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে উত্তর দিবেন।"

উত্তরে মহাত্মা গন্ধী তার করেন—কাহাদিগকে সভায় ডাকা হইবে, তাহা যদি পূর্ব্বাহ্নে স্থির হয় এবং ফতোয়ার জন্য ও করাচীতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকেও মুক্তি দেওয়া হয়, তবে হরতাল বন্ধ করা যাইতে পারে।

চিত্তরঞ্জনের স্থানে তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালার নায়ক। ২০শে তারিখে তিনি মহাত্মাজীকে যে টেলিগ্রাফ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, বাঙ্গালার মতে সভায় আলোচনার সুবিধা গ্রহণ করা সঙ্গত।

মহাত্মা গন্ধী কিন্তু ইহাতে প্রলুব্ধ হয়েন না।—শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলেন—সভার ফল সন্তোষজনক না হওয়া পর্য্যন্ত অসহযোগ বন্ধ করা যায় না।

বড় লাট ইহাতে সম্মত হয়েন না।

এ বার আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের সভাপতি হইবার কথা ছিল। কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অভিভাষণের খশড়া মহাত্মা গন্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের অভাবে নির্ব্বাচিত সভাপতি হাকিম আজমল খাঁর অভিভাষণের পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য পাঠ করেন :—

"আমাদের পক্ষে অসহযোগ ব্যতীত যুদ্ধের অন্য কোন উপায় নাই এবং কংগ্রেসের ২টি অধিবেশনে আমরা অসহযোগই উপায়স্থানে অবলম্বন করিয়াছি। আমরা অসহযোগী; সুতরাং আপনাদের কাছে ইহার স্বরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই। মিষ্টার ষ্টোকস বলেন—'প্রতিবেধসাধ্য অন্যায়ে সম্মত হইতে অস্বীকার করাই অসহযোগ। অবিচার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা, প্রতীকারসাধ্য অনাচারে অসম্মত হওয়া, যাহা ন্যায়ের বিরোধী, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং যাহারা অনাচার করে, তাহাদের সঙ্গে কায করিতে অস্বীকার করা—ইহাই অসহযোগ'।"

চিত্তরঞ্জন বলেন, অসহযোগ হতাশার নহে—ইহার ফলে আমরা জয়ী হইব। তিনি ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তাহারাই ত্যাগী—তাহারাই জয়ী হইবে—জাতীয় জীবনের অন্ধকারে তাহারাই আলোকের বর্ত্তিকা বহন করিয়া যাইতেছে—তাহারা মুক্তির পুণ্যতীর্থযাত্রী।

চিত্তরঞ্জন যে তাঁহার অভিভাষণের খশড়া পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মা গন্ধীর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আরম্ভে তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতার সরকারের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে—লোককে ভয় দেখাইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগদানে বাধ্য করিতে সরকার রাজনীতিক জীবনের শ্বাসরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। "আমি অপরিসীম উৎসাহ লইয়া আসিয়াছি—এই সংগ্রাম শেষ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছি।"

তিনি "মুক্তির" ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—স্বাধীনতা বা মুক্তি সর্ব্ববিধ সংযমের অভাব নহে; পরন্তু যে অবস্থায় জাতি তাহার স্বতন্ত্র স্বরাজ লাভ করিতে ও স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, সেই অবস্থাই স্বাধীনতা বা মুক্তি। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, বহু জাতি তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছে। ফিনল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে, আয়ার্লণ্ডে, মিশরে ও ভারতবর্ষে এই চেষ্টা প্রকট। প্রথমে জাতি তাহার শিক্ষাব্যবস্থাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অর্থাৎ বিদেশী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে; তাহার পর লোক জাতীয় শিক্ষা চাহে—শেষে বিদেশীর প্রভাবমুক্ত হইয়া আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বলবতী বাসনা আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা যখন আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য লাভ করিব, তখন আমরা প্রয়োজন বুঝিয়া অন্যান্য দেশের ভাব গ্রহণ করিব, তাহার পূর্ব্বে নহে। গৃহ না থাকিলে কেহ কি অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে পারে? রাজনীতিক পরাভবের ফলে আমাদের শিক্ষাদীক্ষাগত পরাভব ঘটিয়াছে। তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নহিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। আমরা দাসের জাতিতে পরিণত হইতেছি। ভারতের প্রাণ পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গ্রামবাসীরা শ্রমশীল ও নির্ভীক, কিন্তু তাহাদের ললাটে পরাধীনতাজনিত দুর্দ্দশা অনপনেয়ভাবে অঙ্কিত। বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে কোটি কোটি টাকা বিদেশে যায়, আমরা তাহার বিনিময়ে যৎসামান্যই লাভ করি। আমরা বিজেতাদের ভাষা ব্যবহার করি, তাহাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করি, আমরা আমাদের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান অবহেলা করিয়া তাহাদের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে ব্যগ্র হই।

ব্যুরোক্রেশীর সহিত সমরে আমরা ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারি :—

(১) সশস্ত্র প্রতিরোধ।

(২) ভারত শাসন আইনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভাদিতে ব্যুরোক্রেশীর সহিত সহযোগ।

(৩) অহিংস অসহযোগ।

প্রথম উপায় অবলম্বন করিবার কল্পনাও আমরা করি না। দ্বিতীয় উপায় কিরূপে অবলম্বিত হইতে পারে? ভারত শাসন আইনের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই দেখা যায় :—

(১) স্বায়ত্ত-শাসনলাভে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যে অন্যান্য জাতির সহিত তুল্যাসনলাভে যে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার আছে, সে কথা পার্লামেণ্ট স্বীকার করেন নাই।

(২) ভারতবাসীর সেই তুল্যাধিকার স্বীকার করিতে পার্লামেণ্ট বাধ্য নহেন।

(৩) কত কালে এবং কি ভাবে ভারতবাসীর অধিকার-বিস্তার করা হইবে, এ দেশের অবস্থাব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ বৃটিশ পার্লামেণ্ট তাহা স্থির করিবেন।

(৪) আমরা নাবালক—বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের অভিভাবক।

ইংরাজ যদি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করেন, তবেই ইংরাজের সহিত সহযোগ করিতে সম্মত হইব—নহিলে নহে। যে জাতি আমাদের দেশাত্মবোধের পথ বিঘ্নবহুল করে, সে জাতি আমাদের মিত্র নহে। আমরা ব্যবস্থাদির সামান্য ব্যাপারে ইংরাজের সহিত আপোষ্-নিষ্পত্তি করিতে পারি, কিন্তু মূল ব্যাপারে তাহা হইতে পারে না। আমরা মুক্তি চাহি—মুক্তিলাভই আমাদের কাম্য। আমরা সেই জন্য চেষ্টা করিব—যদি পরাভূত হই, তবুও আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে না।

এখন দ্রষ্টব্য—শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের আরম্ভ হইয়াছে কি না এবং ব্যবস্থাপক সভার ব্যয়ের উপর কোন কর্তৃত্ব আছে কি না? আইনের নির্দ্ধারণ—গভর্ণর শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সহিত একযোগে সংরক্ষিত বিভাগসমূহের ও মন্ত্রীদিগের সহিত একযোগে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কায করেন। কর, ঋণ ও রাজস্বব্যয়ের প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে সকলে একযোগে পরামর্শ করিবার ব্যবস্থা নাই। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য সংরক্ষিত বিভাগসমূহের প্রয়োজন অত্যধিক—সে বিভাগ সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। সরকারের সহিত জনগণের যে সংগ্রাম চলিতেছে, মন্ত্রীরা নীরবে তাহা দেখিবেন মাত্র। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে দেশে চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তিত হইবে কি না, সে বিষয়ে বিচারকালে তাঁহারা সরকারের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবেন না; মহাত্মা গন্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইবে কি না, সে বিষয়ে সরকার তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবেন না। গভর্ণর ও শাসন পরিষদের সদস্যরা একমত হইলে সংরক্ষিত বিভাগে শাসন পরিষদের দেশীয় সদস্যরাও কিছু করিতে পারেন না।

কোন "বিষয়ের" ভার যে মন্ত্রীদিগের উপর প্রদত্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না; কেবল কয়টি "বিভাগ" হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু শতবর্ষব্যাপী ব্যুরোক্রেটিক শাসনে যে সব দায়িত্ব সৃষ্ট হইয়াছে—সে সবই রহিয়া গিয়াছে; মন্ত্রীরা সেই সব লইয়া বিব্রত হইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিভাগের কথা ধরা যাউক। এই ২ বিভাগের সম্পূর্ণ ভার পাইলে মন্ত্রী অনেক কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভার তিনি পায়েন না; কারণ, তিনি সেই সব বিভাগে কর্ম্মচারী বাছিয়া লইতে বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন না। ভারতে ব্যুরোক্রেটিক শাসনের বৈশিষ্ট্য—যখনই ভারতবাসী তাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু চাহিয়াছে, তখনই সরকার তাহার পরিবর্ত্তে ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা, ব্যয়সাধ্য গৃহ প্রভৃতি দিয়াছেন। মন্ত্রী বলিতে পারেন না,—তিনি বিভাগটির আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস তুলিয়া দিয়া দেশীয় লোকের দ্বারা কায চালাইবেন। তিনি যদি কোন সঙ্কটে অধিক-সংখ্যক ডাক্তার চাহেন, অমনই বলা হয়—"ডাক্তার নাই।" কোথাও ব্যাধি-বিস্তারহেতু তিনি চিকিৎসক পাঠাইলে মেডিক্যাল বিভাগ বলিতে পারেন—"আমরা ইহাদের বেতন দিব না।" এক জন মন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছেন, তাঁহার অর্থ নাই—কাযেই তিনি সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেন না।

ব্যবস্থাপক সভারও খরচের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই। কোন মন্ত্রীই বলিয়াছেন—এ দেশে মন্ত্রীরা বিলাতের মন্ত্রীর মত ক্ষমতাশালী বলিয়াই লোক মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা শাসনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দত্ত অর্থমাত্র লইয়া কায করেন।

আইনে আছে, শাসন পরিষদের সদস্যরা ও মন্ত্রীরা একযোগে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগের খরচ মঞ্জুর করিবেন—তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইলে গভর্ণর যাহা স্থির করিয়া দিবেন, তাহাই হইবে। কোন্ বাবদে কত
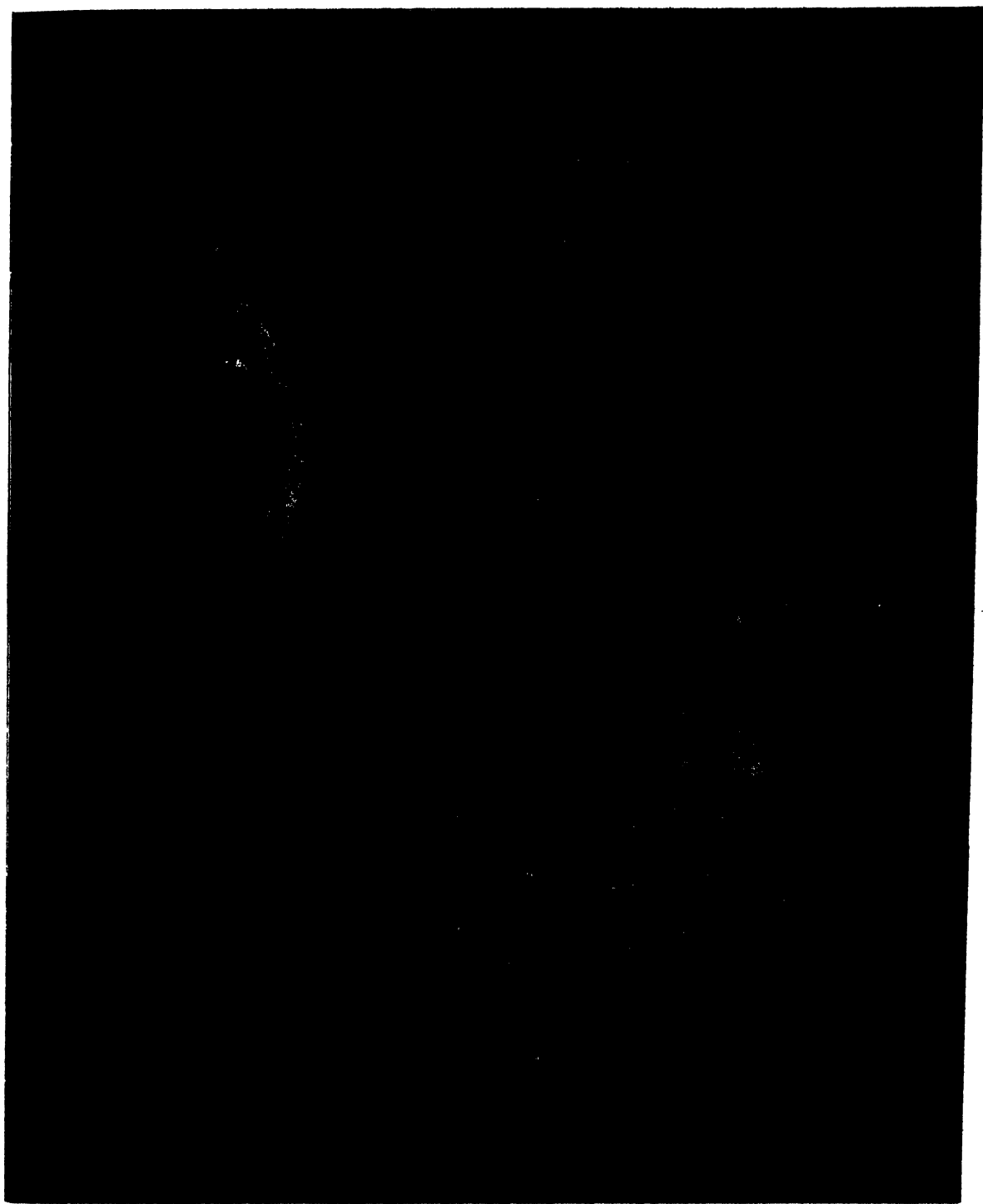
মহাপ্রস্থান

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

খরচ করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভার নাই।

আইনখানি আলোচনা করিলে দেখা যায়ঃ—

(১) সভ্য সরকারের অধীনে প্রজা যে সব প্রাথমিক অধিকার সম্ভোগ করে, এ আইনে আমাদের সে সব অধিকারও স্বীকৃত হয় নাই।

(২) দেশের লোকের মত না লইয়াই সরকার চণ্ডনীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

(৩) দেশের লোক চণ্ডনীতিদ্যোতক আইন নাকচ করিতে পারে না।

(৪) শাসন-সংস্কারের ফলে পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনাচারের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয় নাই।

এ সব বিষয়েই আমাদের অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

মন্ত্রীদিগকে এইরূপ ব্যবস্থায় কায চালাইতে হয়; আর মডারেটরা বলেন, এই ব্যবস্থায় এ দেশে স্বরাজের সূচনা হইয়াছে! ভারত-শাসন আইন সরকারের সহিত সহযোগের ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ভারতবাসী অসম্মানজনক শান্তি চাহে না—যতক্ষণ ভারত-শাসন আইনের মুখবন্ধ বিদ্যমান থাকিবে এবং আমাদের আত্মকার্য্য-নিয়ন্ত্রণের, আত্মবিকাশের ও আত্মবোধের অধিকার অস্বীকৃত রহিবে, তত দিন মিটমাটের কথা উঠিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের পক্ষে যুদ্ধের একমাত্র উপায়—অসহযোগ। অসহযোগে বিচ্ছেদ বুঝায় না। ইংরাজ ইংরাজ বলিয়াই আমরা তাহার সহিত অসহযোগ করিব না। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে লিখিত আছে—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান এবং বৈচিত্র্য অনন্তের লীলামাত্র। জগতে সকল জাতিকে স্ব স্ব বৈচিত্র্যের স্ফূর্ত্তির দ্বারা ঐক্যসাধন করিতে হইবে; তবেই মনুষ্যজাতির উন্নতি সাধিত হইবে। ভারতবাসী ইংরাজ বলিয়াই ইংরাজের সহিত অসহযোগে প্রবৃত্ত হইবে না; কিন্তু যে কোন জাতি বা প্রতিষ্ঠান তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিকাশের বিরোধী হইবে, সে তাহারই সহিত অসহযোগ করিবে। জাতীয় শিক্ষা বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নহে। তাহার উদ্দেশ্য অতীতের সহিত সংযোগ-সংরক্ষণ ও আমাদের জ্ঞানকে আমাদের মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা দেশবাসীকে বলি—"প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বালিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর। তাহার পর নির্ভীকভাবে জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার, তাহা গ্রহণ কর।" মিষ্টার ষ্টোকস্ বুঝাইয়াছেন,—প্রতিরোধসাধ্য অন্যায়ে সাহায্য না করার নাম অসহযোগ। যাহারা সুযোগের নামে অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত একযোগে কায করিতে অস্বীকার করাও অসহযোগের অঙ্গ।

আমরা যে ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সে কেবল গঠনের উদ্দেশ্যে। আজ যাঁহারা দেশসেবার জন্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। মৌলানা সৌকৎ আলী ও মৌলানা মহম্মদ আলী যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। বীরবর লালা লজপত রায় যে ব্যুরোক্রেসীর আদেশ অমান্য করিয়া কারাগারে গমন করিয়াছেন, সে তেজ ব্যর্থ হইবার নহে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যে ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া যে আদেশ তাঁহাকে দাসত্বে লইবে, তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন—সে ত্যাগ কি ব্যর্থ হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের জয়যাত্রায় পথিপ্রদর্শক—তাঁহাদের আদর্শের বর্ত্তিকালোক আমাদিগকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

আমরা উপযুক্তরূপে সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে এবং আমাদের অনুষ্ঠানের স্বরূপ লোক না বুঝিলে আমাদের সাফল্য-সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমাদের মতপ্রচারকালে বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা হইয়াছে। আমরা তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিব এবং স্বীকার করিব, সেই পরিমাণে আমাদের সাফল্যলাভ ঘটে নাই। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কোথায়? জনগণের কাছে আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে। জগতে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানেই চাঞ্চল্য ও রক্তপাত হইয়াছে—খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সেই জন্য কি কখন মত-প্রচারে বিরত হওয়া সঙ্গত? হয় ত কেহ কেহ বলিবেন, বোম্বাইয়ে যখন হাঙ্গামা হইয়াছে, তখন আমাদের কার্য্য-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু সমগ্র

ভারতের একটিমাত্র স্থানে হাঙ্গামায় সে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয় না। নানা স্থানে নেতৃগণের অবরোধে যে জনগণ বিচলিত হয় নাই—শান্তিভঙ্গ হয় নাই, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—লোক অহিংস অসহযোগের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। দেশবাসী সাহসের, ধৈর্য্যের ও সংযমের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—আমাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।

৫ বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন

ব্যুরোক্রেশী যে আমাদের অনুষ্ঠানের সাফল্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চণ্ডনীতিপ্রবর্ত্তনেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কংগ্রেস অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কংগ্রেস যুবরাজের এ দেশে আগমনের উৎসবাদি বর্জ্জন করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকে আইনভঙ্গ বলা যায় না। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদিগের সাহায্য ব্যতীত এই কায সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্যুরোক্রেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইরূপে ব্যুরোক্রেশী কংগ্রেসকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় দেশবাসী যদি সরকারের নির্দ্ধারণ স্বীকার না করিয়া কারাবরণ করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথায়? প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যুরোক্রেশীই আইন ভঙ্গ করিয়াছেন। যতক্ষণ লোক বক্তৃতায় বা কাযে সাধারণ আইনের বিরোধী কায না করে, ততক্ষণ তাহাকে সেরূপ কার্য্যের অধিকারে বঞ্চিত করাই আইন ভঙ্গ করা। সভা যতক্ষণ বে-আইনী না হয়, ততক্ষণ তাহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করাই বে-আইনী কায।

দাশ মহাশয়ের এই অভিভাষণে শাসন-সংস্কারে প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতির পূর্ণ আলোচনা ছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শোকে আশীর্ব্বাদ

(শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর প্রতি)

ওগো পতিপ্রাণা, আজ চাও মুখ তুলি
আজ যাও ক্ষণিকের বিচ্ছেদেরে ভুলি।
এ নহে গো তিরোধান। এ যে অধিষ্ঠান
লক্ষ বক্ষে, লভি নব নবতর প্রাণ।
তোমার বিজয়ী বীরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
দেখ গো, সমগ্র দেশ লইছে বরিয়া;
সে নহে তোমারি শুধু। তারে ভালবাসি
লয়েছে আপন করি তব দেশবাসী;
তোমারেও করিয়াছে তাই আপনার,
বাঁটিয়া লইছে তব বেদনার ভার।
তাহাদের দুঃখ-দৈন্য লও বুকে তুলে
আজ হ'তে, মৃত্যুশোক যাও তুমি ভুলে।
কার মৃত্যু? লক্ষ বক্ষে যে পেয়েছে ঠাঁই
সে কি মরে দেহনাশে? মৃত্যু তার নাই।
তুমি যার ছিলে জায়া সখী ও সচিব
বঙ্গের হৃদয়-গেহে সে যে চিরঞ্জীব।
অয়ি পতিভাগ্যবতি, অয়ি অবিধবে,
পালিত আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিয়া তবে
ধন্য হোক জন্ম তব। কর তুমি বাস
ইহ পর দুই লোকে। হোক পরকাশ,
সেথাকার প্রেমালোক হেথা অন্ধকারে
এ আশীষ হে কল্যাণি, করি বারে বারে।

শ্রীমতী কামিনী রায়।

কবিকুঞ্জের বেদনা-গীতি
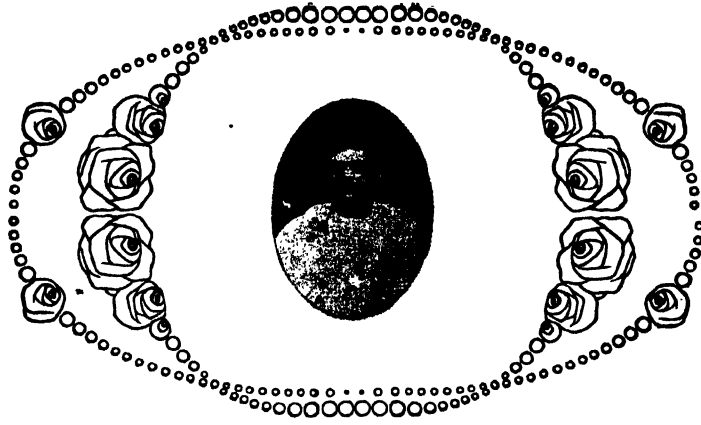
চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রস্থানে

বঙ্গের গৌরব-রবি অস্তমিত এবে,
কি করিলি অকস্মাৎ নিষ্ঠুর মরণ?
নিদারুণ শোক-শেল জননীর বুকে—
বিঁধিলি?—কাড়িয়া নিলি ক্রোড়ের রতন!

বঙ্গের 'চিত্তরঞ্জন' ইহলোকে নাই,
নেতৃহীন এ ভারত কে দিবে স্বরাজ?
আশার স্বপন বুঝি হলো না সফল,
নিরাশা-আঁধার ঘন ঘরে ঘরে আজ!

দেশের দুর্ভাগ্য তাই দেশবন্ধু নাই;
কে করিবে পূর্ণ আজ তাঁর শূন্য স্থান;
হেন মহাপ্রাণ বঙ্গে খুঁজিয়ে না পাই
দেশপ্রেমে আত্মহারা—উদার মহান্।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নবযুগ-প্রবর্ত্তক,
তেজস্বী পুরুষ বীর সাহসী নির্ভীক;
রণক্ষেত্রে কভু নাহি মানে পরাজয়,
হটে নাই এক পদ এদিক ওদিক।

দেশহিতে স্বার্থত্যাগ ভারতে অতুল,
স্বদেশ-প্রেমিক কেবা তাঁহার মতন?
অকাতরে করি দান সর্ব্বস্ব নিজের
অন্তর্হিত ভারতের অমূল্য রতন!
দেশের কল্যাণে দিয়া আত্মবিসর্জ্জন
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি দেশবন্ধু দাশ,
প্রাতঃস্মরণীয় তিনি বিশাল ভারতে
স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য দিবে ভাবী ইতিহাস।

উৎসাহে মাতিয়া যত ভাবী বংশধর
তাঁর প্রদর্শিত পথে হ'লে অগ্রসর,
ঘুচিবে দেশের এই দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন
ভারতে হাসিবে পুনঃ পূর্ণ শশধর!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস, (কৃষ্ণনগর)।

শোকোচ্ছ্বাস

কোথা গেল বল আজি সেই প্রিয় ফুল,
যাঁহার সুবাসে মুগ্ধ বঙ্গবাসিকুল।
চিত্তের রঞ্জন আহা সে চিত্তরঞ্জন!
আঁধারিয়া চিত্ত-ভূমি কোথায় এখন?
কে হেন নিঠুর চোর হরিল সে নিধি,
হায় রে মোদের প্রতি বাম বড় বিধি।
হে আষাঢ়! তুমিও যে ফেল নেত্র-জল,
যাঁর লাগি মোরা কাঁদি হইয়া বিহ্বল।
এ জগতে প্রিয়সনে ক্ষণ দরশন,
নীহারের শোভা নাহি রহে সর্ব্বক্ষণ।
হে দেশবান্ধব, তুমি দেশহিততরে,
জনমিলে অবতার এ বঙ্গ-ভিতরে।
কত আশা করেছিল এ বঙ্গ-জননী,
রবে নাক চিরদাসী চির-কাঙ্গালিনী।
জননী জনমভূমি কে বুঝিবে আর,
সর্ব্বস্ব করিবে ত্যাগ, চরণে তাঁহার?
অদম্য উৎসাহভরা প্রফুল্ল অন্তর,
নবীন যুবক সম কার্য্যেতে তৎপর।
কি ছার সাম্রাজ্য-পতি লভে সে কি মান,
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি রবে দীপ্তিমান্।
হে রাজর্ষি! বঙ্গহৃদে তুমি অধীশ্বর,
বল্কল বসন তব স্বদেশী খদ্দর।
বঙ্গের পবিত্র ধূলি বিভূতি সমান,
দেশবাসী প্রতি তব ভ্রাতৃ সম জ্ঞান।
স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্র করেছ সাধন,
স্বদেশ-মঙ্গলে ত্যজি নশ্বর জীবন,
দিয়াছ সুনীতিপূর্ণ দৃঢ় অস্থি তব,
যাহাতে গঠিত বঙ্গ হবে অভিনব।

শ্রীপদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য কবিশেখর, (নারিট)।

দেশবন্ধু-বিয়োগে

ফেলিও না অশ্রুজল, কাতরতা দেখায়ো না
বুক বাঁধো, দৃঢ় হও,—স্থির,
মরণে হয়েছে জয়ী বীর !
বীরত্বের কর পূজা, ধৈর্য্য তব হারায়ো না
স্বার্থ ভেবে হয়ো না অধীর।
তোমার অশেষ ক্ষতি, কোটি বজ্রাঘাত মাথে
মানি, তবু আজ তাহা সহ।
চেয়ে দেখ চারি পাশে, বীরত্বের এ পূজাতে
ক্ষুদ্র তুমি কিছুই ত নহ।
পৃথিবীর ইতিহাসে হয়নি এমন আর ;
সমগ্র জাতির কাছে ভক্তি-অর্ঘ্য উপহার ;
দিগ্বিজয়ী বীর কিংবা জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধ কেহ
পায়নি সমগ্র দেশে প্রাণঢালা এত স্নেহ ;
কারও তরে ঝরে নাই এত চোখে অশ্রুজল,
এ মরণ জয় তাঁর,—এ কীর্ত্তি অমলোজ্জ্বল !
* * * *
ধীরে ধীরে চ'লে এস, দাঁড়াও একটি ধারে ;
স্থির হয়ে চেয়ে দেখ দেখিতে পাইবে তাঁরে।
মূর্ত্ত বিয়োগের মাঝে দীপ্ত ঐ দেহখানি
স্পর্শিতে বহিতে ব্যগ্র অযুত অযুত প্রাণী।
চেয়ে দেখ অচঞ্চল,
মুছে ফেল অশ্রুজল,
কাঁদিবার অবসর ঢের পাবে এর পর।
এখন চাহিয়া দেখ—এ কীর্ত্তি অবিনশ্বর !
দিগ্বিজয়ী বীর নয়, মুকুট ছিল না মাথে,
সাম্রাজ্য ভূমির'পরে ক্ষমতা ছিল না হাতে ;
পদানত এই দেশে পরাধীন জন্ম লয়ে
মরণে চলিয়া গেছে কত কীর্ত্তিমান্ হয়ে !
ত্যাগ, দেশ-প্রেম আর মধুময় ব্যবহারে
রঞ্জন করিত চিত্ত, তাই আজ দেশ তারে
দিল যোগ্য সমাদর। ওহে বঙ্গাকাশ-রবি !
এ শুধু তোমারই প্রাপ্য, হে চিত্তরঞ্জন কবি !
* * * *
আর এই দীন ভক্ত কত দিন কত বার
মনে করিয়াছে পদে করে শত নমস্কার ;
মনের সে আশা তুচ্ছ সরম-সঙ্কোচে প'ড়ে
মনেই রহিয়া গেছে আজ তুমি দূরে স'রে
চ'লে গেছ ; এ অতৃপ্ত হৃদয়ের অর্ঘ্য তবু
আজ এই বেলাশেষে বহিয়া এনেছি, প্রভু !
তুমি—তাই এত আশা, এতই ভরসা তার
দেশবন্ধু ! এ দাসের লহ ভক্তি নমস্কার।

শ্রীবঙ্কিমবিহারী সেন, (জামালপুর)।

দেশবন্ধু

অয়ি ! জ্যোৎস্নে, উঠ ত্বরা করি,—
জয়মাল্য লয়ে হাতে
বরণের ডালা মাথে,
সঙ্গে লয়ে অমর-কুমারী—
দাঁড়াও প্রবেশদ্বারে,
বিজয়-বিষাণ করে,
বিজয়-মুকুট ধীরে ধরি।

ধীরে দেবি ! ধীর লঘু পদে,—
ধরি রাজসিক সাজ,
ছড়াও মঙ্গল-লাজ,
ঐ দেখ, আসিছে রাজন,
কি শান্ত, কি সমাহিত
বদনে ভাতিছে পূত
স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দিব্য দরশন।

প্রেমময়, প্রেমের পূজারী,—
দেশপ্রেমে মাতোয়ারা,
হইয়া আপন-হারা
ত্যাগ করি বিভব-বিলাস
দিতে নব জাগরণ
সর্ব্বস্ব জীবন পণ
লয়ে দীক্ষা প্রেমের সন্ন্যাস।

মাতৃযজ্ঞ স্বরাজ-মন্দিরে
সাহসে সূচনা করি
আত্ম-স্বার্থ পরিহরি
রুদ্রতেজে জ্বালায়ে অনল
কি আদর্শ মহীয়ান্
আহুতি আপন প্রাণ
দিল দেব, পুণ্য বেদিতল।

বীরবর মহিমা মণ্ডিত,
ভারতের সর্ব্বদেশে
জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে
শ্রদ্ধা-অশ্রু করি আকর্ষণ
আপন গৌরব-রথে
আসিছেন ঐ পথে
ভারতের হৃদয়-রঞ্জন।

শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী, (বালেশ্বর)।

——

দেশবন্ধুর তিরোধানে

বৎসর গত হয় নি আজিও
এই মেদিনীর বুকে,
বিরোধ মিটাতে এসেছিলে তুমি
ডাক পেয়ে উৎসুকে।
বন্ধু, তোমার থাকিল না কথা,
চ'লে গেলে পেয়ে ব্যথা,
আজ মনে হয় এক এক ক'রে
সেই সে দিনের কথা।

তুমি এসেছিলে, লিখেছিনু আমি
"স্বাগত এহি" ব'লে,
আজ যদি পুনঃ সেইমত ডাকি
আসিবে কি হেথা চ'লে ?
ওই মরণের কুহেলি তিমির
দুস্তর ব্যবধান,
সরায়ে আসিবে সে দিনের মত
আর কি হে দেশ-প্রাণ ?

চীৎকার করি আজ যদি ডাকি
"স্বাগত এহি" বীর—
সে শুধু কেবল বাতাসে কাঁপিয়া
কাঁপিয়া হইবে থির।
সুখ-বিলাসের লালিত দুলাল
নবনী-কোমল দেহ,
অন্তরে তব মা'র তরে ছিল
লুকানো এতটা স্নেহ !

কুসুম-পেলব সুরভি-শীতল
বসন-ভবন তব
ছিল কত শত শতদল সম
সম্মুখে নব নব।

এক দিনে সব একবারে সব
নিমেষে করিলে দূর,
পশিল যে দিন শ্রবণে মায়ের
ঘন ক্রন্দন-সুর।

দেখিলে সে দিন পড়ি পদতলে
দীন ভিক্ষুক শত,
অন্তরে আর বাহিরে সাজিলে
তুমিও তাদেরই মত।

স্নিগ্ধ ছায়ায় বর্দ্ধিত ছিলে,
রৌদ্রে আনিল কে সে ?
ম্লান হয়ে ধীরে পুড়ে গেল তরু
আতপের তাপে শেষে।
মনে পড়ে আজ রাজা হরিশের
অতীত কাহিনী যত—
বিশ্বামিত্রে রাজস্বদান—
মাতা সে পুণ্যব্রত।

অতুল তাহার বিপুল কীর্ত্তি
আজো সব আছে বেঁচে,
দক্ষিণা দিল দাস হয়ে নিজে
পত্নী, তারেও বেচে।

হে দেশবন্ধু, তুমি যা দিয়াছ
ভোগাসক্তির কালে,
চির-অমলিন উজ্জ্বল চির
রবে তা কালের ভালে।

সুখ-বিলাসের চির-অভ্যাস
ত্যজিলে স্বদেশ-তরে,
কুবেরের মত ধন-দৌলত
সব নিঃশেষ ক'রে।

দক্ষিণাটুকু বাকি ছিল তার
আজ তা' করিলে দান,
মুক্ত-যজ্ঞে মায়ের চরণে
তব অমূল্য প্রাণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, (মেদিনীপুর)।

দেশবন্ধু

চিনিবে কি দেশ-বন্ধু তোমা বঙ্গজনে ?
ছিলে কি মহার্হ রত্ন তুমি এ ভারতে !
এ কোন্ অমৃত-ফল কল্পের কাননে,
কোন্ সাধনার মহাশক্তি এ জগতে !
আচরিলে কোন্ ব্রত কোন্ জন্মান্তরে,
এ মর্ত্ত্যে করিলে যার মহা উদ্যাপন ;
যার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ যুগ-যুগান্তরে,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে নিরখে ভুবন।
কে ছিল তোমার সম বিপুল-মহান্
দরিদ্র-দেশের বন্ধু ! বিশ্বে কি অতুল,
দেশ-হিতে সর্ব্বত্যাগ—মহা-আত্মদান,
দারুণ দুর্দ্দিনে চির অকূলের কূল !
সমগ্র দেশের দীপ্তি গিয়াছে নিবিয়া,
বহে কি শোকের বন্যা ধরণী প্লাবিয়া !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, কবিশেখর।

শ্রদ্ধেয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু উপলক্ষে

কোন্ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া কাহারে
দূর-দুরান্তরে
দরিদ্র দেশের বন্ধু! যেতেছ চলিয়া
ব'লে যাও ক্ষণেক থামিয়া।
মানবের উচ্চ কণ্ঠস্বর
রথের সে ভীষণ ঘর্ঘরে,—
আজি কি হতেছে লুপ্ত? পশিছে না তাই
অসহায়-আর্ত্তনাদ শ্রবণ-কুহরে?
সংবর্দ্ধনা করিতে তোমায়,
সমগ্র স্বদেশবাসী তব প্রতীক্ষায়,
হেথা ছুটে এসেছে যাহারা ;—
অশরীরী মুক্ত আত্মা! বল মোরে আজ
মৃত্যু-হিম দেহ চেয়ে কি চাহে তাহারা?
উরধে উদ্যত বজ্র নিয়ে পারাবার
করিতেছে ভীষণ গর্জ্জন,
চৌদিকে অনল-শিখা তারি মাঝখানে
কাহারে স্বরাজ-দল করিলে অর্পণ?
অনলের লেলিহান শিখা নিরখিয়া
সমুদ্রের ভীম আস্ফালনে,
যার চিত্ত বিচলিত, কখন না হয়
অশনিনিপাতে যেবা তুচ্ছ গণে মনে,
মণিবন্ধে আছে যার অসীম শকতি
উচ্চ সুরে বাঁধা আছে মন,
তোমার অবর্ত্তমানে, তোমারি স্থানেতে
কর্ত্তব্যে, স্বদেশপ্রেমে তোমারি মতন?
আছে কি এ হেন কেহ
দিব্য দৃষ্টি লভি আজ কর নিরীক্ষণ।
শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতি-রাজ্যে শূন্য যে আসন আজ
বল সে শূন্যতা কেবা করিবে পূরণ?
আজি এ ঘনায়মান আঁধার-মাঝারে
ভীষণ তুফানে,
তোমার সাধের তরী কূলের নিকটে আনি
শিথিল ও মুষ্টি তব বল কি কারণে?
দুর্য্যোগে রক্ষিতে তরী পারে অবহেলে ;—
দৃঢ়-শক্তিমান্ কর্ণধার—
কে আছে এ ধরাপরে আজি বল দয়া ক'রে
পরিত্যক্ত এ আসনে
কার অধিকার?

শ্রীহিমাংশু বসু, (কলিকাতা)।

দেশ-বন্ধু-স্মরণে

১

দেশ-বন্ধু দীন-বন্ধু, হে চিত্ত-রঞ্জন!
এত ত্বরা কর্ম্ম তব হ'ল সমাপন!
যে মহান্ দেশ-হিত-ব্রতে
ভোগ ছাড়ি বৈরাগ্যের পথে
আসিয়া দাঁড়ালে দৃপ্ত বীরের মতন,
সেই ব্রত আজি কি হে হ'ল উদ্যাপন।

২

মৃত্যু কি আনিবে ধ্বংস সে মহা কর্ম্মের!
কোথা মৃত্যু? মৃত্যুঞ্জয় তুমি যে মর্ত্ত্যের!
মৃত্যু? মৃত্যু এরে কহে কেবা?
এ যে মা'র গরীয়সী সেবা—
এ যে নব প্রাণ-দান মৃত স্বদেশের!
মৃত্যু নহে স্থচনা এ নব জীবনের!

৩

আজন্ম-সঞ্চিত তব সর্ব্বস্ব আহরি
ডালি দিয়া জননীর শ্রীচরণোপরি
পারিলে না অশ্রু মুছাইতে—
পারিলে না ব্যথা ঘুচাইতে ;
তাই কি দধীচি সম অস্থি দান করি
অকালে চলিয়া গেলে মর্ত্ত্য পরিহরি!

৪

জন্মে জন্মে আসি এই মাতৃ-অঙ্ক'পরে
হে বীর-সাধক-শ্রেষ্ঠ! একাগ্র অন্তরে
মত্ত হবে নব প্রতিভায়
তব পূত সাধনা-লীলায় ;
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে
উঠে নর সাধনার উচ্চতর স্তরে!

৫

ত্যাগের আদর্শ তব উজ্জ্বল প্রভায়
ঝলকিবে সারা বিশ্বে চির গরিমায়!
বয়সে কি নরের গৌরব?
কীর্ত্তি তার অক্ষয় সৌরভ।
যাও তবে, কর্ম্ম-বীর! স্মরিয়া তোমায়
আবার মাতিবে বঙ্গ নব প্রেরণায়!

শ্রীপ্রসাদকুমার রায়, (কলিকাতা)।

শোকোচ্ছ্বাস

কৃতান্তের সহচর দুরন্ত আষাঢ়ে,
ঘোর কৃষ্ণ মেঘজালে ছাইল গগন,
ভারতের ভাগ্য-রবি হায়! চিরতরে
দুর্ভেদ্য তমসা-জালে হইল মগন।

যাঁহার করুণা-রশ্মি তপনের মত,
যাঁহার বিমল-দৃষ্টি চাঁদের মতন,
জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে হায়! কত শত
দরিদ্রের দরিদ্রতা করেছে মোচন।

আসমুদ্র হিমাচলে কীর্ত্তিগাথা যাঁর,
সমাদরে গৃহে গৃহে হতেছে কীর্ত্তন,
অভাগিনী কাঙ্গালিনী ভারত-জননী
সে "চিত্তরঞ্জনে" আজ দেছে বিসর্জ্জন।

ভারতের দীর্ণ জীর্ণ কুটীরের মাঝে,
জ্বলেছিল যেই দীপ ঘোর অন্ধকারে,
না বিলাতে পূর্ণ আলো হায় রে অদিনে
নিবে গেল ভারতের অদৃষ্ট-ফুৎকারে।

আর কি হইবে আলো আঁধার ভারত!
আর কি আশার গান গাবে নরনারী?
আর কি রে শিরা বেয়ে ছুটিবে উল্লাস
আর কি রে সুপ্ত প্রাণ উঠিবে ফুকারি?

আর কি রে সভামঞ্চ উঠিবে নিনাদি,
আর কি রে উত্তেজিত হবে কর্ম্মিদল,
"অনিল" "সুভাষ" কি রে পাবে সে উৎসাহ
পা'বেন মহাত্মা গন্ধী হৃদয়ের বল?

ভেঙ্গে গেছে ভারতের গৌরব-শিখর,
ভেঙ্গে গেছে ভারতের ভগন পরাণ,
ভেঙ্গে গেছে মহাত্মার হৃদয়-পঞ্জর
থেমে গেল ভারতের উৎসাহের গান।
অভাগিনী পরাধীনা ভারত-জননি!
প্রাণ ভ'রে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ আজীবন,
তোমার এ বিড়ম্বনা ধাতার বিধান
অসম্ভব তোমার, মা, দুর্ভাগ্য-মোচন।
কাঁদ কাঁদ কাঙ্গালিনি! লুটায়ে ধূলায়,
উচ্চৈঃস্বরে দশদিক করি মুখরিত,
অশ্রু-জলে ধুয়ে যাক্ দৌর্ব্বল্য বিপদ
যদি বা সৌভাগ্য-রবি হয় সমুদিত।
আরাধ্যা বাসন্তী দেবি! জননি আমার,
ভাষা নাহি পাই তোমা করিতে সান্ত্বনা,

তোমার মুখের পানে চাহি যতবার
চোখ ফেটে বহে ধারা নাহি মানে মানা।

আমাদের মুখ চেয়ে মুছ আঁখি-জল,
নিরাশ্রয় পুত্রগণ করিছে মিনতি,
নারীত্বে মাতৃত্বে আজি জাগায়ে জননি!
পতির পদাঙ্ক তুমি অনুসর, সতি!

হে কলির হরিশ্চন্দ্র! ত্যাগী! দানবীর!
কাঙ্গালিনী জননীর হৃদয়-রঞ্জন!
তুমিই যথার্থ ছিলে মায়ের সেবক,
সমগ্র দেশবাসীর নয়ন-অঞ্জন।

সহসা তোমার আজ হেন তিরোধানে,
যে বাজ পড়িল আজি ভারতের শিরে,
শতধা ভেঙ্গেছে হায়! শির, বক্ষ তার,
আর কি চৈতন্য তার আসিবে রে ফিরে?

যাও ওহে দেশবন্ধো! শাপভ্রষ্ট দেব!
স্বরগে গৌরবাসন কর আলোকিত,
পুণ্য-কীর্ত্তি-গাথা তব গাক্ মন্দাকিনী,
শত যশঃ-পারিজাত হোক বিকসিত।

আশীর্ব্বাদ ক'র দেব! স্বর্গধাম হ'তে,
শোকাকুল নিরাশ্রয় ভ্রাতৃগণশিরে,
অসমাপ্ত কার্য্য তব সমাপ্ত করিতে
পারে যেন প্রাণপণ ক'রে ধীরে ধীরে।

স্বরাজের ভিত্তি তুমি করেছ নির্ম্মাণ,
শক্তি দিও, আশা দিও, ওহে শক্তিময়,
স্বরাজ-মন্দির যেন পারি গো নির্ম্মিতে
সাময়িক ঝঞ্ঝাবাতে নাহি হয় ভয়।
পুণ্য-স্রোতা কল্লোলিনি! জননী জাহ্নবি!
গেয়ে যাও কলস্বরে চিত্ত-কীর্ত্তিগান,
গাও ওগো প্রতিধ্বনি! হুঙ্কারি গম্ভীরে
কাঁপুক জগৎ-কণ্ঠে সুদূর বিমান।
আষাঢ় ঢালিছে অশ্রু ঝর ঝর ধারে,
ছুটে এস ভ্রাতা আর ভগিনীর দল,
শ্মশান-ধূলায় পড়ি দেও গড়াগড়ি—
প্রাণ ভ'রে ঢালি আজি নয়নের জল।
চিতাভস্ম মাখি এস সগৌরবে গায়,
নয়ন-সলিলে এস ধোয়াই শ্মশান,
পুষ্পবৃষ্টি কর, ওগো যত কুলবালা,
অন্তিমে চরম শান্তি তিনি যেন পান।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (কালীঘাট)।

ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন

অসমাপ্ত করমের পথে
শৈলশিরে লভিতে বিশ্রাম,
শ্রান্ত বীর বসেছিলে তুমি
পার্শ্বে রাখি বিজয়-নিশান ;
অবসাদে অঙ্গখানি পড়েছিল ঢলি,
পাষাণের বক্ষে যেন ছিন্ন পুষ্পকলি !

মন্দারের মালা লয়ে করে
দেববালা স্বর্গলোক হ'তে,
এসেছিল যোগ্য যাত্রী জনে
তুলে নিতে মহাপুণ্য রথে ;
তোমারে হেরিয়া তারা করিল বন্দন,
দিয়ে নানা পুষ্পমাল্য অগুরু চন্দন।
করে ধরি বসাইয়া রথে
বাজাইল দিব্য শঙ্খ বীণ,
সান্ধ্য রবি দাঁড়াইয়া পথে
দেখেছিল মুগ্ধ আঁখি ক্ষীণ।
রহিল পতাকা পড়ি, পবন-পরশে
পৎ পৎ আর নাহি উড়িছে রভসে।

অনুরাগী নিত্য সহচর
যারা তব আশাপথ চেয়ে,
দাঁড়াইয়া ছিল অনুক্ষণ,
হতাশ্বাস তোমারে না পেয়ে ;
ব্যগ্র সবে ডাকে বন্ধু এত ত্বরা যাই,
মহাকাশে ওঠে ধ্বনি—নাই বন্ধু নাই !

ভারতের বক্ষে লুটি লুটি
কেঁদে কহে পাগল পবন,
ওরে অভিশপ্ত দেশবাসী,
কোথা তোর ভারত-রঞ্জন ?
চোখে চোখে অশ্রু, মুখে হাহাকার রব,
হায় হায় এত দিনে ফুরাইল সব !
ত্যাগে তেজে দীপ্ত মনীষায়
দেশ-প্রেমে মত্ত অনিবার,
মিলিবে না পুত্র তব সম
অভাগিনী ভারত-মাতার।
কেবা আছে তুলে নিতে তোমার নিশান,
বজ্রঘোষে বাজাইতে তোমার বিষাণ ?

রুদ্র তুমি স্নিগ্ধ তুমি ধীর,
মানবের মিত্র গরীয়ান্,
চিরদিন জীবনযাপনে
কি আদর্শ ছিলে মহীয়ান্
অসময়ে আজি তব নীরব বিদায়,
বজ্রসম বাজে, বন্ধু, সবারি হিয়ায় !
ত্রিদিবের জয়টীকা ভালে
উজলিয়া মধ্য-ব্যোমপথ,
মহোল্লাসে ধরি নব গান
নব দেহে এস মহারথ।
কোটি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আনন্দের ধ্বনি
শুনি পুনঃ ভারতের হে কৌস্তুভ মণি,—

কর্ম্মক্ষেত্রে হও আগুয়ান,
সাধনায় মুক্ত কর দেশ ;
বুক-ভরা ভরসার আজি
তপ্তশ্বাসে হবে কি গো শেষ ?
অরি মিত্র রহিবে না ভেদ,
মুক্ত কণ্ঠে গা'বে সবে গান।
তার আগে যেতে নাহি দিব,
না মানিব তব অবসান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্মশানে চিত্তরঞ্জন

শ্মশানের এই মুক্ত আকাশতলে,
তাহারে বিদায় দিয়েছি নয়ন-জলে ;
লিখিয়া দিয়েছি চিতাভস্মেতে তার :—
এক ছেলে হেথা ঘুমায়ে বঙ্গমা'র ;
জীবনার্জ্জিত সকল বিভবরাশি
বিলাইয়া সে যে হ'ল তরুতলবাসী।
মনে পড়ে তারে দেখেছি যেন গো প্রাতে,
হারায়ে যেন গো ফেলেছি গভীর রাতে ;
করুণা-মাখান শান্ত স্নিগ্ধ মুখে,
লিখিতে লিখিতে ঘুমায়ে পড়েছে সুখে।
তাহারি তরেতে বসিয়া কাটিল বেলা,
কভু কি তাহার ফুরাবে না ঘুম-খেলা ?
জাগিবে না কি সে দেশভরা কলরবে ?—
জানি না জননী আবার জাগাবে কবে ?
কখন যদি গো না ভাঙ্গে তাহার ঘুম,
জননী তাহারে দিও গো স্নেহের চুম !
আমরা তাহারে কিবা দিব আর বল,
দিব গো তাহারে কেবল অশ্রুজল !

শ্রীবিকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, (কালীঘাট)।

অবসান

মহাপ্রস্থান

১

হে দেশবন্ধু সাধক-প্রবর,
হে চিত্তরঞ্জন!
বরিলে মৃত্যু না হইতে, দেব,
তব পূজা সমাপন;
ভারত-মাতার দুখের রজনী
না হইতে সবে ভোর;
চ'লে গেলে তুমি অসময়ে আজি
কেটে তাঁ'র মায়া-ডোর।

২

ভারতের আজি প্রতি ঘরে ঘরে
তোমা লাগি হাহাকার;
ঝরিছে দুখিনী জনমভূমির
নয়নে অশ্রুধার;
তুমি নাই, দেব, এ কথা আমরা
কিছুতে ভাবিতে নারি,
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সাগর তুমি যে
নিপুণ নাবিক তারি!

৩

সে দিন বিপুল পুলকে সহসা
দেখিল ভারতবাসী;
সকল তেয়াগি যেই দিন তুমি
বাহিরে দাঁড়ালে আসি;
কোটি নরনারী পূজিল তোমারে
আবেগ-পুলকময়,
দিকে দিকে দিকে উঠিল ধ্বনিয়া
জয় বীর তব জয়!

৪

বুদ্ধের মত তেয়াগিলে তুমি
নিজ সম্পদভার;
দধীচির মত তেয়াগিলে তনু
স্বদেশের তরে আর;
মৃত্যু কি কভু সম্ভবে তব?
অমর তুমি যে ভবে,
দেশের লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
সন্ন্যাসী হ'লে যবে।

৫

তুমি নাই, দেব, দুর্ব্বল মোরা
দাঁড়াব কাহার ছায়,
কে আর বহিবে দেশের পতাকা
হে বীর, তোমার প্রায়?
আসিবে যে দিন দুর্দ্দিন ঘোর
ভীষণ অন্ধকার;
তখন কেবা সে বর্ত্তিকা হাতে
দেখাইবে পথ আর?

৬

বৈরি-বজ্র বক্ষ পাতিয়া
হাসিমুখে কেবা ল'বে;
লক্ষ বিপদ মাঝারে কেবা সে
অচল অটল রবে;
স্তব্ধ করিবে ক্ষুব্ধ বারিধি
শান্তিমন্ত্র বলি?
না হইতে, দেব, পূজা সমাপন
আগে কেন গেলে চলি!

৭

সাগরের গান বুঝেছিলে তুমি
লিখেছিলে তুমি তাই,
এমন মহান্ বিশাল হৃদয়
কোথায় খুঁজিয়া পাই?
তোমার হৃদয় সাগরের মত.
অসীমে মিশিতে ধায়,
ক্ষুদ্র মানব আমরা তোমারে
কেমনে রাখিব হায়!

৮

স্বাধীনতা আশে, হে দেশপ্রেমিক,
প্রেম-হোমানল জ্বালি,
সে অনলে তুমি উজ্জ্বল হয়ে
নিজ প্রাণ দিলে ডালি;
দেবতারা তোমা বরণ করিয়া
লইলা স্বরগধামে,
ধন্য হইল ভারতবর্ষ
তব পবিত্র নামে।

৯

নাই নাই নাই সে প্রেমিক নাই
সে গিয়াছে আজি চলি,
প্রাণ দিয়া যেবা বেসেছিল ভাল
এই ভারতের ধূলি;
তাই দশদিকে আকাশে বাতাসে
উঠে শুধু হাহাকার;
শুধু হায় হায় যে গিয়াছে চ'লে
সে কভু ফিরে কি আর?

১০

যাও যাও, দেব, যেথায় কখন
নাই অধীনতা-ক্লেশ
নাহিক ক্লান্তি, নাহিক শ্রান্তি
নাহিক ভাবনা-লেশ,
যখন আসিবে বিপদ বিষম
তোমারে স্মরিব সবে,
তুমি দিবে বল স্বরগে থাকিয়া
মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে !

শ্রীসুশীলকুমার সেন গুপ্ত, (কলিকাতা)।

স্মৃতি-তর্পণ

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণোপলক্ষে)

এই ভারতের সোনার কিরণ
দূর জগতের বক্ষে মিশে ;
মুক্তি-বেদীতে মুক্ত হিয়ার
হৈম প্রদীপ জ্বালাল কি সে ?
হিমগিরি আজ মৌন ব্যথায়
হিম হয়ে গেছে হৃদয় তার,—
স্তব্ধ অচল, চির-চঞ্চল
শৈল-নিঝর প্রবাহধার।
বায়ু বহে আজ ধীর মন্থর,
এ কি দুরন্ত বেদনাঘাত—
আশ্রয়হারা নিঃস্বের শিরে
কেন নিদারুণ অশনিপাত !
গৌরব-রবি পড়িল অকালে
নিঠুর মরণ-রাহুর গ্রাসে,
কণ্টকভরা আঁধারের পথে
কে দেখাবে আলো বিষম ত্রাসে !

নীলকণ্ঠের মত বিষ পিয়ে
বিতরিবে কেবা অমৃত আর,
বেদনা-কাতর স্নেহ-ভিখারীর
কে মুছাবে বল অশ্রুভার !
কোথা সে দেশের দরদী বন্ধু,
বিগলিত দয়া, উদার প্রাণ,
কল্যাণব্রতী কোথা সে দধীচি,
কোথা সে সেবায় আত্মদান !
কোথায় ত্যাগের শাক্যসিংহ,
কোথা প্রতিভার বৃহস্পতি,
কোথা বাংলার সে দাতাকর্ণ,
বিত্তবিরাগী কোথা সে যতি !
একাগ্রতার মূর্ত্ত বিকাশ,
কর্ম্মকুশল নায়ক কোথা,
মুক্তিপথের সন্ধানী কই,
মাতৃপূজায় কোথা সে হোতা !

ভীতি-বিহ্বল কুণ্ঠিতচিতে
কে করিবে আর মন্ত্র দান,
নাহি দুর্জ্জয় নির্ভীক বীর
নাহি সে অমিত শক্তিমান্।
দেশ-বরেণ্য, চির-প্রশান্ত,
বিরাট পুরুষ, মমতাধার,
সারা ভারতের পূজিত কর্ম্মী
লহ এ দীনের অর্ঘ্যভার।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

দেশবন্ধুর তিরোভাবে

দেশমাতৃকার মুকুতার হার
কে আজি ছিনিয়া নিল,
স্বাধীনতা আশা সকল ভরসা
কোন্ শূন্যে মিলাইল !
কে হানিল বজ্র দেশের বুকে,
কে ফুটাল ব্যথা মায়ের মুখে,
বাঙ্গালার বল সাধনার ফল
গর্ব্ব মোদের ছিল,
সবি গেল চলি, আঁধার সকলি,
দশ দিক্ নীরবিল !

দেশের বন্ধু ত্যাগের সিন্ধু
হে চিত্তরঞ্জন তুমি,
আজি তব তরে হাহাকার করে
জননী ভারতভূমি।
ব্রত-উদ্‌যাপন এখনো হয়নি,
স্বরাজসাধনা এখনো পূরেনি,
দেশবাসিগণ মুদিয়া নয়ন
রয়েছে অঘোরে ঘুমি',
এরি মাঝে গেলে সব কায ফেলে,
ছাড়িয়া মর্ত্তভূমি !

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, (কাঁঠালপাড়া)।

অশ্রু-উৎসব

ভারত-মাতার মুক্তি-পিয়াসী,
কে আছ কোথায় ভক্তদল!
বাঙ্গালার শিরে বাজ পড়িয়াছে,
ফেল ফেল আজি অশ্রুজল!
মেঘ-অঞ্চলে, হে গগন, তুমি,
ঢেকে ফেল তব মুক্ত মুখ,
আঁখি-জল-ধারে ভাসাও আজিকে,
ভাসাও নিখিল বিশ্ব-বুক!
চন্দ্র-সূর্য্য, থেমে যাও আজি,
ভারতের পথে এস না আজ,
ঘন-তমসায় ছেয়ে দাও দেশ,
পরাও সবারে শোকের সাজ!
চাহি নাকো হাসি,চাহি নাকো আলো,
চাহি নাকো আজি গন্ধ রূপ,
সারা বাংলায় ঘিরে নিক্ আজি,
হাহাকারভরা অন্ধকূপ!
কে কোথায় আছ জননী ভগিনী,
দিও নাকো মুখে অন্ন জল,
'কারবালা' আজি ফিরে আসিয়াছে
দীর্ণ কর গো বক্ষতল!
মিলিত জাতির 'মহরম' আজি,
মারা গেছে নব 'হোসেন' বীর,
হাহাকার কর, হাহাকার কর -
ফেল ফেল আজি অশ্রু-নীর!

* * * * * *

চেয়ে দেখ আজি নয়ন মেলিয়া,
হে আমার চির-অভাগা দেশ!
তোমার লাগিয়া কে মহাপুরুষ,
নিজের জীবন করেছে শেষ!
সুখ সম্পদ বিলায়ে দিয়াছে,
দিয়াছে অর্থ, দিয়াছে মান,
বাকী যাহা ছিল, তা'ও দিল আজি,
দিল সে আনিয়া আপন প্রাণ!

আকাশ হইতে এসেছিল বুঝি,
নীরব নিশীথে খোদার ডাক—
"হে দেশবন্ধু, অনেক দিয়াছ,
কায নাই আর—ও সব থাক্,
দিতে যদি পার দাও তব প্রাণ,
চাহি নাকো কিছু অন্য দান;
দেশের বন্ধু, দেশের ভক্ত,
এ কথার আজি দাও প্রমাণ!"
ভক্ত সে কি গো খাটো হয় কভু?
জীবন থাকিতে কথনো নয়,
অকাতরে তাই শহীদ হইল,
মহা পরীক্ষা করিল জয়!
দেশের লাগিয়া দিল যে জীবন,
তার তরে আজি কাঁদ গো দেশ!
ভক্তের হ'ল শেষ পরীক্ষা,
তোমাদের আজো হয় নি শেষ!
দেশ-জননীরে বেসেছ যে ভাল,
এ কথার আজি দাও প্রমাণ!
অশ্রু-সলিলে বীর-পূজা কর,
রাখ স্বদেশের বীরের মান!
হৃদয়-গলানো তীব্র তপ্ত
অশ্রু চাই গো অশ্রু চাই,
বেদনার গানে ভ'রে যা'ক্ আজি,
আকাশ-বাতাস সকল ঠাঁই!
অশ্রু হইতে বাষ্প উঠ্‌ক,
জড় হ'ক তারা আকাশ-গায়,
মেঘ হয়ে তারা ঢালুক বক্ষে,
মুক্তি-সলিল এ বাংলায়!
কাঁদ কাঁদ আজি জননী ভগিনী,
কাঁদ কাঁদ আজি তরুণ দল!
অশ্রু-জলের উৎসব আজি—
চাই শুধু আজি অশ্রু জল!

গোলাম মোস্তাফা।

হারাধন-অন্বেষণ

(কীর্ত্তন)

ও মা কই মা, কই মা,
বঙ্গ-গগনের শশী !
ও মা সে ত' নহে রাহুগ্রস্ত,
নহে পূর্ণিমাতে অস্ত,
কেন না আসিতে দশমীর নিশি,
পড়িল মা খসি।
ও মা পদে পদে পদে,
সম্পদে-বিপদে,
প্রমোদে-প্রমাদে ছিলে সঙ্গিনী,
সাধে আধ-অঙ্গিনী,
রণে রণ-রঙ্গিণী,
ছিলে বাণী বচনে, লিখনী লিখনে
অরি-বারণে অসি।

রাখনি মা চাবি দিয়ে তারে,
নিজ হৃদয়-মন্দিরে,
ও মা দেশ পূজা-তরে, হাতে তুলে ধ'রে
দিয়েছিলে স'পে গম্ভীরে,
পড়িতে পড়িতে তন্ত্র,
সন্ধি-পূজা মন্ত্র,
ঘেরিল ঘোর তামসী।
দেখ, কোটি কোটি লোকে,
জল-ভরা চোখে
ডাকে, মা মা ব'লে তোকে ;
বাসন্তী মা, তারা সন্তান বলিয়া
এসেছে সান্ত্বনা দিতে ;
—পদ-প্রান্তে বসি।

আঁখি-অঞ্জন চিত্তরঞ্জন—
হারা তারা, ধারা ধরিয়ে
রাখিতে নারে নয়নে, ঝরে ঝর ঝর
ঝর দিবা-নিশি।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাগর-সঙ্গীতের প্রথম কবিতা (দেশবন্ধুর হস্তাক্ষরে)

স্বরাজ্যদলপতি চিত্তরঞ্জন

[বসুমতী প্রেস।

৪র্থ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩২ [৪র্থ সংখ্যা

বাঙ্গালা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন

কবি বলিয়াছেন —

"এ জগতে হেন জন মিলে উঠা ভার।
মন মুখ কায সব একরূপ যার॥"

হাজারের মধ্যেও এক জন পাওয়া যায় না, লাখের মধ্যেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পুরাণে পড়া যায়, লোক ব্যগ্র হইয়া নারায়ণের বা শিবের নিকট এইরূপ একটি ভাল লোক অন্বেষণে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বলিতেন, ভদ্র লোকের মধ্যে পাইবে না, যাও অমুক ব্যাধের কাছে, বা অমুক চণ্ডালের কাছে। হয় ত ছোট লোকের মধ্যে এরূপ মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু বড় লোকের মধ্যে মেলা একেবারে দুষ্কর। বিশেষ যাঁহারা পরহিতব্রত লইয়া দেশ উদ্ধারে লাগিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। পরহিতব্রত, দেশোদ্ধার, দেশের কায একটা পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা সহজে অর্থ ও সম্মান লাভ করার পথ হইয়াছে। অনেক সময় দেখিয়াছি, পরহিতব্রত লইয়া লোক গুরুতর আত্মহিত করিয়া বসিয়াছেন অর্থাৎ চাঁদার বাড়ীটির পাট্টাখানি নিজের অথবা নিজের স্ত্রীর নামে লিখাইয়া লইয়াছেন। এখন সে দিন গিয়াছে, ততদূর আর কেহ হইতে দেয় না, লোক সেয়ানা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—

"এ জগতে হেন জন মিলে উঠা ভার।
মন মুখ কায সব একরূপ যার॥"

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ কিন্তু খাঁটি এইরূপ এক জন লোক ছিলেন। তাঁহার মন, মুখ, কায সব একরূপই ছিল। নাইকুণ্ডল থেকে আরম্ভ করিয়া ঠোঁটের আগা পর্য্যন্ত তাঁহার এক ছিল। ইংরাজীতে যাহাকে সিনসেরিটি বলে, তিনি তাহার মূর্ত্তিমান্ আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত পুরুষ হয় না।

পরের দুঃখে তাঁহার মন যেমন কাঁদিত, এমন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কত লোক যে তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইত, বলা যায় না। দাতা বলিয়া নাম লইতে তাঁহার একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। আমি একটি দৃষ্টান্ত জানি। সে অনেক দিনের কথা—১০।১২ বৎসর হইবে। এক জন পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নানা কারণে দেশত্যাগ করিয়া একটি মিউনিসিপ্যাল টাউনে

আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সেখানে ২।১ বৎসর বাস করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরিবারে ৩।৪টি লোক মহা দুরবস্থায় পড়ে। তাহারা কাহার পরামর্শে জানি না, মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যানের এক পত্র লইয়া চিত্তরঞ্জন বাবুর সাহায্য চায়। তিনি বরাবর তাহাদের দশটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন। যিনি সাহায্য পাইতেন, তিনি বলিয়াছেন মাসের পহেলা তারিখে ঘড়ীর কাঁটার মত টাকাটি মণি অর্ডারে তাঁহার নিকট পৌঁছিত। এরূপ দান চিত্তরঞ্জনের অনেক ছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে কাহারও এমন কিছু বলিতে যাওয়া এখন বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, তিনি ত এক জন প্রকাণ্ড লোক ছিলেন, আর এই কুড়ি বৎসর ধরিয়া সব লোকই তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ জানেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন, আদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। সর্ব্বসাধারণের এত প্রীতি আর কেহ এত পরিমাণে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। আমি তাঁহার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। লোকের মুখে তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতাম মাত্র।

শুনিতাম, তাঁহার পিতা দেউলিয়া হইয়া যে সকল লোকের টাকা দিতে পারেন নাই, তিনি নিজের রোজগারের টাকা হইতে তাহা সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

শুনিতাম, তিনি পরের দুঃখে কাতর। শুনিতাম, দুঃখী দরিদ্র লোক পুলিসাদি দ্বারা উৎপীড়িত হইলে তিনি অযাচিতভাবেও তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দয়ায় সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

প্রথম বোমার কেসে তিনি যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিপন্ন অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে রক্ষা করবার জন্য কোর্টে উপস্থিত হয়েন ও তাঁহার ওকালতা গ্রহণ করেন, তখনকার কথা সকলেই জানেন। কিরূপে তিনি মোকর্দ্দমাটি আয়ত্ত করেন, কিরূপে তিনি সাক্ষীদিগকে জেরায় নাস্তানাবুদ করেন, সে সব কথা এখনও লোকের বেশ মনে আছে। তাঁহাকে কোর্টে আসিতে দেখিয়া পরমভক্ত অরবিন্দ বাবু বলিয়াছিলেন, 'আমার রক্ষার জন্ত স্বয়ং নারায়ণ উপস্থিত হইয়াছেন।' সে কথাটা যে কেহ পড়িয়াছিল, সকলেরই মনে খুব লাগিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের ত লাগারই কথা। কারণ, চিত্তরঞ্জন এক জন খুব ভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহার কবিতা পুস্তকগুলিতে ভক্তির যে একটা আকুলতা দেখা যায়, সেটা প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। বৈষ্ণবরা তাঁহাদের ভক্তির পাত্রকে চিনিতেন, তাই তাঁহাদের আকুলতা এক রকমের, আর চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে চিনিতেন না, তাই তাঁহার আকুলতা আর এক রকমের। বৈষ্ণবের আকুলতা সে কালের লোকের ভাল লাগিত, আর চিত্তরঞ্জনের আকুলতা একালের লোকের ভাল লাগে। আমি ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ভক্তিপ্রাণ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে "নারায়ণ"ভাবে দেখায় একটা ফল ফলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যখন কয়েক বৎসর পরে একখানি বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "নারায়ণ।" তাঁহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার তলদেশে বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, "নারায়ণ" দেশ রক্ষা করিবেন। হইয়াছেও তাই। একটা মহলে বাঙ্গালার বড় একটা আদর ছিল না, সেটা ব্যারিষ্টার ও বিলাত ফেরত মহল। নারায়ণ সে মহলে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। এমন সকল লোক আমার কাছে নারায়ণের কথা কহিতেন, যাঁহারা কখন যে বাঙ্গালা পড়েন, আমি বিশ্বাস করিতেও পারিতাম না। তাঁহাদের অনেকে ছেলেদের বাঙ্গালা কথা শিখিতেই দেন না। ছেলে আধ আধ কথা কহিতে শিখিলেই তাঁহারা চোখ দেখাইয়া বলেন, ইটি কি? ছেলে বলে, "আই।" ইটি কি? ছেলে বলে, "নোজ।" ইটি কি? "ইয়ার।"

যাঁহারা ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই পাছে বাঙ্গালা কথা শিখিয়া বাঙ্গালী হইয়া যায়, সেই জন্ত গোড়া থেকে ছেলেদিগকে 'সাহেব' করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারাও 'নারায়ণ' পড়িতেন। নারায়ণ একটি বড় কায করিয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা পণ্ডিতী সাধু ভাষার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহার বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। 'নারায়ণ' পারিয়া উঠিয়াছিল। নারায়ণের সময় হইতেই সাধুভাষা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন

"নির্ম্মিমিৎসা, চিকীর্ষা, জিগমিষা" "নদ নদী পর্ব্বতকন্দর" প্রভৃতি শব্দ আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; নারায়ণ বাঙ্গালা ভাষাকে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা করিয়া দিয়া গিয়াছে। নারায়ণে ছোট ছোট গল্পগুলি খুব ভাল ছিল। মাঝে মাঝে দুই একটা গল্প পড়িয়া রুচিবাগীশরা নাক সিঁটকাইলেও গল্পগুলি ভাল যে,তাহাতে সন্দেহ নাই। দাশ মহাশয়ের নিজের পদ্যগুলি বেশ মিষ্ট লাগিত। তিনি যেন কি একটা প্রেম ভক্তি ভালবাসার জিনিস খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, পাইবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, উধাও হইয়া বেড়াইতেছেন।

নারায়ণে সমালোচনার অভাব ছিল না। সমালোচনা কোন দিকে ঢলিয়া পড়িত না,বিশেষ করিয়া চারিদিক দেখিয়া লেখা হইত। অনেক লোকের উপাস্য দেবতাকে অসার বলিয়া উল্লেখ করিতে নারায়ণ ভয় পাইত না। অনেক ঋষি-তপস্বী ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনেক অজানা লেখককে নারায়ণ জানাইয়া দিয়াছে। দাশ মহাশয় আমায় বাঙ্গালা কবিগণের সমালোচনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, আমি স্বীকার করি নাই। কাহারও বইকে তাহার মনের মত সুখ্যাতি না করিলে সে জন্মের মত শত্রু হইয়া থাকিবে আর পথে ঘাটে যা তা বলিয়া গালি দিয়া বেড়াইবে। বাস্তবিক এখনও বাঙ্গালা লেখকদের সমালোচনার সময় হয় নাই। তাই আমি কালিদাসের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

জননীর ক্রোড়ে চিত্তরঞ্জন

[মিসেস্ পি, কে রায়ের সৌজন্যে।

আমার সমালোচনা দাশ সাহেব খুব পছন্দ করিয়াছিলেন এবং দুই একবার আমায় তাহা বলিয়াও পাঠাইয়াছিলেন,কালিদাসের ক'নে দেখান তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল। তিনি লেখকদিগকে বড় একটা ফরমাস করিতেন না। আমায় কেবল দুইবার দুর্গোৎসবের সময় দুর্গোৎসব সম্বন্ধে লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমি প্রথমবার দুর্গোৎসব worship of the spirit of vegitation লিখিয়াছিলাম,বর্ষার পর প্রকৃতির সতেজ ও সহাস্য ভাবের পূজা বলিয়াছিলাম। ইহাতে অনেক ভক্ত আমার উপর চটিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে ভক্তমণ্ডলী অনেকে আমায় খুব আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি আমায় আর একবার ফরমাস করিয়াছিলেন বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য। সেটার জন্যও তিনি খুব খুসী হইয়াছিলেন। আমি যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখি, তখন তরুণ ইতিহাসবাগীশগণ, তাঁহার কাছে শুনিয়াছি নালিশ করে যে, উনি ফুট নোট দেন না, উনি অথরিটি দেন না, উঁহার কথায় বিশ্বাস কি? দাশ সাহেব তাঁহাদের কথায় বড় একটা কান দেন নাই। কিন্তু কর্ত্তারাই আমার কাছে কথাটা পাড়িয়াছিলেন। আমি বলিলাম, বাপু হে, তোমাদের বয়স কম, ৫ বছর কি ৭ বছর কলেজ ছাড়িয়াছ, তোমাদের সব মনে আছে আর তোমরা

কথানাই বা বই পড়িয়াছ,আর পড়িয়াছ ত এক ইংরাজীতে না হয় বাঙ্গালায়। আমার প্রায় ৫০ বৎসর ঐ চর্চা। আমার সব অথরিটি মনে ত থাকে না, তবে ও সকল প্রবন্ধ লেখার সময় আমার মটো "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে" মল্লিনাথেরও যে মটো, আমারও তাই। আমায় কত কি যে ঘাঁটিতে হইয়াছে, তাহা কি এত কাল মনে থাকে? কত সংস্কৃত বই ও পুথি,কত পালি পুথি, কত হিন্দী, কত ভাষার কত পুথি, সে সব মনে থাকে না। সে পুথিও আমার কাছে থাকে না, হয় ত কাশীর কোন পণ্ডিতের বাড়ী, রাজপুতানার কোন চারণের বাড়ী। একখানা পুথিতে একটা কথা পাইয়াছি, মনে গাঁথিয়া গিয়াছে, লিখিয়া দিয়াছি, তোমাদের সন্দেহ হইলে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি এই সব ইতিহাসবাগীশদের হাঙ্গামায় শেষে অথরিটি দিতে লাগিলাম সব বৌদ্ধপুথি, তাহার নামও বাগীশমহাশয়দের জানা নাই। আমার নোটবুকে আছে। কর্ত্তারা কতক থামিলেন। সবাই থামেন নাই। এখনও মাঝে মাঝে ঐ কথা তোলেন, কাগজে তোলেন, পত্রে তোলেন, বলেন, ও সব পুথিই নাই। আমি নাচার। 'নারায়ণ' এই সব ইতিহাসবাগীশদের হাত হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কালে শুনিতাম, "লিখনং পঠনং বিবাহেরই কারণম্।" ইতিহাসবাগীশদেরও লিখনং পঠনং চাকরীর কারণম্। চাকরী যদি মনের মত হইলং; লিখনং পঠনং সবং ফুরাইলম্। কিন্তু যত দিন মনের মত অর্থাৎ পেটভরামত চাকরী না হয়, তত দিন আমার মত লোক তাঁদের জ্বালায় অস্থির। একবার আমি লিখিয়াছিলাম, সংস্কৃতে যাহাদের মগ বল, তাহারা পারস্যদেশের মগিয়াই। এ কথা ইংরাজ লেখকমাত্রই জানেন, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা এখনও আপনাদের মগ ব্রাহ্মণ বলেন, বোম্বাই অঞ্চলের পার্সীরা অগ্নি-উপাসক মগদের বংশধর, তাহাদের পরস্পর আপনাদের মেগুপেত অর্থাৎ মগপতি বলে। যেখানে সংস্কৃত "মগ" শব্দ আছে, ইংরাজী তর্জ্জমাকাররা সেখানে Magii লিখিয়াছেন। তথাপি এক জন ইতিহাসবাগীশ চীৎকার করিয়া আমায় বলিয়া উঠিলেন, "প্রমাণ?" আমি ভাবিলাম, ইঁহারা এই বিদ্যায় "বাগীশ" হইয়াছেন। দাশ সাহেব কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন 'নারায়ণ' বাহির করেন, তখনও তিনি এক জন দেশমান্য লোক ছিলেন। তথাপি তিনি আমার কুটীরে উপস্থিত হইয়া আমার লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, মহাশয়, লিখিতে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে কি না, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, অনেক দিন লিখিতেছি, অনেক দিন লেখার জন্য নবীশী করিয়াছি, ভাল ভাল লোকের সঙ্গে লিখিয়াছি। কিন্তু এখনকার ছেলেছোকরা এডিটাররা আমার লেখায় দস্ত আন্দাজ করে। তাই আমি কাগজে লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনার কে এডিটার হইবে, তাহা ত জানি না। তিনি বলিলেন, সে বিষয়ে আপনার কোনও ভয় নাই। আমিই এডিটার থাকিব। আমি আপনার লেখার দস্ত আন্দাজ করিব না। আপনার বাড়ীর কাছেই ছাপাখানা—আপনার কাছ হইতে উহারাই কাগজ লইয়া যাইবে। আপনিই শেষ প্রুফ দেখিয়া দিবেন। তাঁহার মন, মুখ, কায সবই একরূপ। তিনি ঠিক এইরূপই বরাবর করিয়াছিলেন। সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন বাধিত থাকিব। তিনি বেশ সোজা লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত কায-কর্ম্ম করিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে বড়ই ভাল লাগিত। তাঁহার কাছে গেলে বা তিনি কাছে আসিলে মনে হইত, যেন তাঁহার একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। সে আকর্ষণে বাঙ্গালায় অনেকেই পড়িয়াছেন, আমিও পড়িয়াছিলাম।

দাশ সাহেব অল্পদিন হইল পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন, এখনও তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধে কার্য্যকলাপ সমালোচনার সময় হয় নাই এবং লোকের ভালও না লাগিতে পারে। এখন তাঁহার সম্বন্ধে এমন দু'চারিটি গল্প করা উচিত, যাহাতে তাঁহার চরিত্র ফুটিয়া উঠে ও তাঁহার উপর লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। খবরের কাগজে দেখিলাম, দাশ সাহেব মহাত্মা গন্ধীর চেলা হইয়াছেন এবং উকীলরা পরগাছা, আসল গাছের রস চুষিয়া বড় হয়, মহাত্মার এই কথা মানিয়া লইয়া ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহাকে কিরূপ খাটিতে হয়, তাহা আমায় গিয়া একটু দেখিয়াছিলাম এবং কিরূপ টাকা পাইতেন,তাহাও জানিতাম। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া

অক্সফোর্ডে চিত্তরঞ্জন
১৮৯২ সালে অক্সফোর্ডে গৃহীত ফটো চিত্র হইতে
[শ্রীরাখালচন্দ্র দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে ।

অন্ততঃ চালটা বজায় থাকিবে। তাহার পর শুনিলাম, তিনি সর্ব্বস্ব সাধারণের উপকারার্থ দান করিয়াছেন, এমন কি, ভিটা বাড়ীটি পর্য্যন্ত। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই সময়ে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত মহাশয় তারাপ্রসন্ন কাব্যকণ্ঠ আমায় আসিয়া বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়, দাশ সাহেব ত যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক বাঙ্গালা পুথি আছে। সেগুলির জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন এবং ২।৩ বৎসর পণ্ডিত রাখিয়া সেগুলি গুছাইয়াছেন, আপনি গিয়া চাহিলে বোধ হয়, সাহিত্য-পরিষদের জন্য পাইতে পারেন। কথাটা আমার পছন্দ হইল না। লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সৌখীন লোক সখের জিনিষ ত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক, গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, আপনি এখানে? আমি বলিলাম, আমি সাহিত্য-পরিষদের দূত হইয়া আসিয়াছি। "আমার ত এখন দিবার কিছু নাই যে, সাহিত্য-পরিষদের কোনও উপকার করিব।" আমি বলিলাম, "আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি যে অনেক যত্ন করিয়া বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার

গেলাম। দুই একবারমাত্র তাঁহার বাড়ী গেলেও, তাঁহার অসীম দানের কথা আমার বেশ জানা থাকিলেও, আমি জানিতাম, তাঁহার চালচলন খুব উঁচু অঙ্গের। চালের জন্যও তাঁহাকে অনেক খরচ করিতে হয়। সে চাল চলিবে কিরূপে? বোধ হয় কিছু করিয়াছেন, তাহাতে

কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তা বটে, সেগুলোর ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, আমিও আর ৫।৭।১০ বৎসর তাহার কোন ব্যবহারই করিতে পারিব না। আপনারা সেগুলি চান? আমি হাঁ বলিলে, তিনি ডাকিলেন—"সরকার!" সে আসিলে বলিলেন. "পুথির আলমারীর চাবি লইয়া আইস।" চাবি আনিলে চাবিটি আমার হাতে দিলেন। আমি ত স্তম্ভিত, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনিও তাঁহার অন্য কাযে মন দিলেন, আমিও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম। সাহিত্য-পরিষদের মিটিংয়ে এই সব কথা শুনিয়া তাঁহারাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দাশ সাহেবের পুথিগুলি স্বতন্ত্র করিয়া একটি আলমারীতে রাখার ব্যবস্থা হইল। উহার নাম হইল 'দেশবন্ধুর দান।'

দাশ সাহেবকে যাঁহারা দেশবন্ধু উপাধি দিয়াছেন, তাঁহারা দাশ সাহেবকে সত্য সত্যই ভালবাসিতেন, আর বন্ধু শব্দটি ভালবাসারই চিহ্ন। দেশও তিনি ভালবাসিতেন, দেশও ভালবাসিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শোকাষ্টক

["যখন সঘন গগন গরজে"—সুর]

১

হিমগিরি হ'তে কুমারী অবধি উথলিছে শোক-সিন্ধু,
ঘরে ঘরে সবে হাহাকার রবে কাঁদে 'কোথা দেশবন্ধু!'
লক্ষ শোক-দীর্ণ বক্ষে বহিছে অশ্রুধারা,
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

২

স্বদেশের লাগি সর্ব্ব তেয়াগি সাজিলে কাঙ্গাল সাজে,
রাজপুরী সম গৃহ পরিহরি দাঁড়ালে পথেরি মাঝে!
মত্ত পরাণে মায়ের আহ্বানে ছুটিলে পাগলপারা;
কোথায় ভারত কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৩

অবহেলে সব সম্বল তব মায়ের চরণে ঢালি,
দিলে অবশেষে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আত্মজীবন ডালি!
স্তব্ধ নেহারি মুগ্ধ বিশ্ব চন্দ্র-তপন-তারা!
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৪

দেবব্রত সম অটল-চিত্ত, কর্ণ তুল্য দানে,
প্রেমে ঢল ঢল পরম ভক্ত, দেবগুরু সম জ্ঞানে;
দীন দুঃখী তরে কার হেন আর বহিবে চক্ষে ধারা!
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৫

কঠোর কর্ম্মী, পুরুষসিংহ, হুঙ্কারে ধরা কাঁপে,
নিখিল গর্ব্ব মস্তক নত শঙ্কিত তব দাপে।
তেজে প্রচণ্ড ভাস্কর সম, অন্তরে মধু-ধারা।
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৬

নিরাশা-আঁধারে লুপ্ত-চেতন সুপ্ত ভারতবাসী,
চকিতে চাহিয়া উঠিল জাগিয়া শুনিয়া তোমার বাঁশী।
জড়তা-মুক্ত অযুত ভক্ত ধাইল আপন-হারা।
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৭

ধনি-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, কাঁদিছে পুরুষ নারী,
কোথায় চিত্তরঞ্জন আজি, নিখিল-চিত্ত-হারী।
তোমা বিনে আজ আঁধার ভারত, মস্তক-মণি-হারা!
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

৮

আর কে শুনাবে জীমূতমন্দ্রে অগ্নিময়ী সে বাণী?
আর না হেরিব এ নয়নে তব দীপ্ত মূরতিখানি!
আসিবে কি পুন ভারত-বক্ষে ঢালিতে শান্তি ধারা?
কোথায় ভারত-কাণ্ডারী আজি, ভারতের ধ্রুবতারা!

শ্রীতারকনাথ গুপ্ত।

বিয়োগ-ব্যথা

চিত্তরঞ্জন নাই, তাঁহার সৌম্য স্নিগ্ধ সহাস্য বদন আর দেখিতে পাইব না, তাঁহার সুমধুর হাসিমাখা মুখের অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী আর শুনিতে পাইব না, এ কথা আজিও বিশ্বাস হয় না। আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যার পরে যখন আমরা দিনান্তের আহার করিতে বসিয়াছি, তখন "ফোন্"-যোগে সংবাদ পাইলাম, সেই দিন অপরাহ্ণ পাটায় চিত্ত ইহধাম ত্যাগ করিয়া, সমগ্র বাঙ্গালা এবং ভারতকে কাঁদাইয়া শ্রেষ্ঠতম স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, ভারতের ত্রিশ কোটিরও অধিক নরনারীকে তাহার জন্য কাঁদিতে রাখিয়া গিয়াছে। ক্রন্দন আমাদের নিত্যকৃত্য, কাঁদিতে আমাদের জন্ম, কাঁদিয়াই জীবন যাইবে, তাহা জানি; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর জন্য এমন অসময়ে অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত তুল্য বিষম আঘাতে সমগ্র দেশকে কাঁদিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও কোন দিন ভাবি

কালীমোহন দাশ

কালীমোহন দাশের পত্নী

নাই। যাহা ভাবি নাই, তাহাই হইল—'যচ্চেতসা ন গণিতং' তাহাই ঘটিয়া গেল। হায় রে দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশ! বাঙ্গালার "চিত্ত" ভারতের চিত্তহরণ করিয়াছিল, তাহা জানি, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা অল্পকালে অতুলনীয় হইয়াছিল, তাহাও শুনিয়াছি; কিন্তু সে জন্য কাঁদিবার লোক অনেক আছে, থাকিবে এবং পরে হইবে। আমার হৃদয়ের শোণিতধারা যে অশ্রুরূপে নয়নদ্বারে আসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কণ্ঠ রোধ করিয়া দিতেছে, তাহার কারণ, আমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর হারাইয়াছি। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন চিত্ত বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল, সেই সময়ে আমি তাহাকে দেখি, তদবধি তাহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমি তাহার অগ্রজপ্রতিম, সে আমার কনিষ্ঠ; সেই সম্বন্ধ এক দিনের জন্যও অন্যরূপ ধারণ করে নাই—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যৌবনের প্রারম্ভে আমরা যাহা ছিলাম, আজিও তাহাই রহিয়াছি—স্বর্গে এবং মর্ত্তে যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে

আমাদের সে সম্বন্ধ এখনও আছে এবং আমার মৃত্যুর পরেও যে থাকিবে, সে কথা বলা বাহুল্য।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত যে ব্যক্তি এইরূপ ছুশ্ছেদ্য নহে, — অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে চিত্তের সম্বন্ধে কোনরূপ লিখা, আজ এই তাহার দেহান্তরের অল্পদিন পরে যে কত দূর সহজ-সাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর হেমেন্দ্রপ্রসাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এই কয় পংক্তি লিখিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ প্রয়াস, নয়নজলে কাগজ সিক্ত হইলে লিখা কি সম্ভব ?

দেশবন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ শঙ্কর

ঊর্ম্মিলা দেবীর পুত্র জিতেন ও পি, আর, দাশের কন্যা

শ্রীমতী তরলা শ্রীমতী অবলা বসু শ্রীমতী শৈলবালা

আমি চিত্তের মত দানবীর আর দেখি নাই যখন হাতে কপর্দ্দকমাত্র নাই, তখন ঋণ করিয়া অপরকে সাহায্য করে, এমন লোক যদি ধরাধামে থাকে, তবে অতি অল্পই আছে এবং সে ছিল চিত্তরঞ্জন; যে ঋণ পরিশোধ না করিলে আইন কিছু করিতে পারে না, লোকনিন্দার ভয়ও নাই, পিতৃভক্ত সন্তান পিতার তৃপ্তির জন্ত তাঁহার জীবমানে একান্ত কষ্ট করিয়া প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা ঋণ শোধ করে, এমন লোক পৃথিবীতে থাকিলে অল্পই আছে — আমি দেখিয়াছি এক চিত্তরঞ্জনকে। জীবন তাহার আরম্ভ হইয়াছিল সংগ্রামের মধ্যে —বহু পরিবার, অর্থ সংস্থান নাই, নিত্য অর্জ্জন, নিত্য ব্যয়, তাহা না হইলে পরিবারের মুখে অন্ন যাইবার উপায় নাই; সেই চিত্তরঞ্জন ঐশ্বর্য্যের সু-উচ্চ শিখরে যখন সমাসীন, তখন এক মুহূর্ত্তে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, নিষ্ঠীবনের ন্যায় সে রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী, সন্ন্যাসী হইল; এ দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কি না, আমি জানি না; যদি থাকে, তবে অতি অল্পই আছে—"কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী" এই কথার সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্তই হয় ত আছে বা হইবে।

দেশবন্ধুর ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মায়া দেবী ও তাঁহার স্বামী—অজিত বসু

যে ভিখারীর, যে সন্ন্যাসীর কণ্ঠোচ্চারিত একটিমাত্র বাণী শুনিবার জন্য সমস্ত জগৎ উৎকর্ণ হইয়া থাকে, যাহার বাণীর একার্থের পরিবর্ত্তে নানার্থ করিয়া সভ্যজগৎ ক্ষণে ক্ষণে উচ্চকিত হইয়া উঠে, সে পুরুষপ্রবরের কথা আমার কি সাধ্য যে, আমি অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারি? বন্ধুবর হেমেন্দ্রের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারি নাই, তাই এই কয় পংক্তি কষ্টে লিখিলাম, নতুবা চিত্তের কথা বলিতে গেলে অশ্রুবেগে কণ্ঠরোধ হয়, লিখিতে গেলে লেখনী অচল হইয়া যায়।

পরের কল্যাণে আত্মত্যাগ করিয়া দধীচির

দেশবন্ধুর কনিষ্ঠা ভগিনী মুরলা (পুত্রকন্যাসহ)

দৃষ্টান্ত লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিবার জন্য সে আসিয়াছিল, সে কার্য্য করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে; রাখিয়া গিয়াছে আমাদের জন্য অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস এবং জীবনব্যাপী হাহাকার। হে বাঙ্গালার পুরুষপ্রবর, তোমার সাধনোচিত শ্রেষ্ঠ স্বর্গপুরে গমন কর; কিন্তু সুরসৌভাগ্যে হতভাগা দেশকে ভুলিয়া থাকিও না, সেখান হইতে কৃপাদৃষ্টিপাতে অন্ধতমসাবৃত রসাতল হইতে তোমার দেশ এবং দেশবাসী যাহাতে উঠিতে পারে, তাহার বিধান করিও। আবার নব-কলেবরে নবীনতেজে উদ্ভাসিত শ্রী হইয়া পুনরায় আসিবার প্রয়োজন হইলে তোমাকে আসিতে হইবে, এ কথা বিস্মৃত হইও না।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

প্রথম আষাঢ়ের নবীন নীরদমালায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে রামগিরি-নির্ব্বাসিত বিরহী যক্ষ যেমন তাহার সুখ-শান্তি ও আনন্দের আগার অমরবাঞ্ছিত অলকার চির-আকাঙ্ক্ষিত বাসভবনের দিকে চাহিয়া নিদারুণ অন্তর্বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল এবং ব্যাকুল-হৃদয়ে বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসনদণ্ডের অবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেইরূপ বঙ্গজননীর কর্ম্মী ও সাধক সন্তান—দেশমাতৃকার আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তুষারকিরীট হিমাচলের মেঘমণ্ডিত উপত্যকায় রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া, প্রথম আষাঢ়ের সজল সন্ধ্যায়—তাঁহার গৌরবপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, তাঁহার সাধনার তপোবন, শস্যশ্যামলা, নদীমেখলা, বনরাজিকুন্তলা, বিবিধ বিহঙ্গের বিচিত্র কলগীতি-মুখরিত, সরস বর্ষার স্নেহধারায় উচ্ছ্বসিত বঙ্গজননীর নিবিড় স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় প্রত্যাগমনের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী জানেন—যিনি সকলের অলক্ষ্য থাকিয়া নিখিলের সকল নরনারীর প্রত্যেক হৃদয়-ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন। চিত্তরঞ্জনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ, তাঁহার কর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মজীবনের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী—সাধ্বী পত্নী, তাঁহার স্নেহময়ী কল্যাণীয়া দুহিতা—যাঁহারা তাঁহার রোগশয্যাপ্রান্তে বসিয়া রোগক্লান্ত, কর্ম্মশ্রান্ত কর্ম্মবীরের পরিচর্য্যায় রত ছিলেন—তাঁহারা অদূর-সমাগত আকস্মিক মৃত্যুর ছায়াসম্পাতে ক্ষীণপ্রভ নেত্রের অবসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার সেই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন; কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রথম আষাঢ়ের সেই মেঘান্ধকারসমাচ্ছন্ন সিক্ত সন্ধ্যায় বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই—পরদিন দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্ত তাঁহার রোগখিন্ন জীর্ণ দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণবিহঙ্গ অপহরণ করিয়া, সমগ্র দেশের অভিশপ্ত মস্তকে এমন বজ্রাঘাত করিবে—যাহার ফলে তাঁহার চির-আরাধ্যা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কোটি কোটি নরনারী নির্ব্বাক্, অসাড়, স্তম্ভিত হইবে; তাহার পর ক্ষুব্ধ, বিহ্বল, হতাশ নেত্রের আকুল দৃষ্টি উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া ভগ্ন স্বরে বলিবে, "ভগবান্, এ কি করিলে!"

বস্তুতঃ, চিত্তরঞ্জনের এই শোচনীয় অকালমৃত্যুতে কেবল বঙ্গদেশ নহে, আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত শোকবিহ্বল। যাহার হৃদয়ে দেশাত্মবোধের কণিকামাত্র বর্ত্তমান,—চিত্তরঞ্জনের অনুপম স্বদেশ-প্রেমের ও বিরাট ত্যাগের অপূর্ব্ব মহিমা মুহূর্ত্তের জন্যও যে অনুভব করিয়াছে, সে, পুরুষ হউক বা নারী হউক, চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে প্রিয়জনবিয়োগবেদনা অনুভব করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। ত্যাগের আদর্শ-স্বরূপ এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে চিরজীবনের মত শেষ দেখা দেখিয়া জীবন সার্থক ও ধন্য করিবার জন্য দার্জ্জিলিংয়ের উপলসঙ্কুল বন্ধুর গিরিবর্ত্ম হইতে পুণ্যতীর্থ কালীঘাটের শ্মশানক্ষেত্র পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী তীর্থযাত্রীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহার শবের অনুসরণ করিয়াছিল। এরূপ মহান্ দৃশ্য বাঙ্গালায় অপূর্ব্ব, আধুনিক ভারতের ইতিহাসেও তাহার তুলনা নাই। নবজাগ্রত তরুণ ভারতের দেশাত্মবোধের ইহা মূর্ত্ত বিকাশ!

উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা, সর্ব্বসুখসৌভাগ্যবঞ্চিতা দেশ-মাতৃকার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যিনি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া

অবশেষে স্বরাজ-সাধনার হোমানলে জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিলেন—তাঁহার পবিত্র দেহ যে শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়াছে—তাহা মুক্তিকামী সমগ্র ভারতবাসীর—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসী—ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী সন্তানের মহাতীর্থ; তাঁহার চিতাভস্ম ত্যাগ ও মহত্ত্বের গৌরবে পরিপূত; এই অধঃপতিত, ধূলিধূসরিত, অভিশপ্ত জাতির জাতীয় জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মহামূল্য স্মৃতি-চিহ্ন। বাঙ্গালী তাহা সাগ্রহে সঞ্চয় করিয়া ধন্য হইয়াছে। বিজয়া-দশমীর মধ্যাহ্নে বাঙ্গালী তাহাদের শক্তির আধার দেবপ্রতিমা ভাগী-রথীতীরে বিসর্জ্জন করিয়া, শোকের ধ্বজা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে গৃহে ফিরিয়াছে, এবং নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বাঙ্গালীর অকালবোধন শেষ হইল; জানি না, কত দিনে আদ্যা-শক্তি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিবেন; কিন্তু মনে হয়, সিদ্ধি এখনও বহুদূর!—চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের ধ্বজা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া বঙ্গের বহু ভক্ত সাধককে জাতীয় কল্যাণ-যজ্ঞের হোমানলে জীবনের সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে হইবে; কায়মনোবাক্যে তাঁহার মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীকে সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে; ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, সমগ্র ভারতের দুর্ভাগ্য! কি বিরাট পুরুষকেই আমরা অকালে হারাইলাম! স্বদেশহিতে এরূপ ত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দুর্লভ!

বড় এস, আর দাস (সত্যরঞ্জন দাস সস্ত্রীক)

স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক ও হিতৈষী বান্ধব চিত্তরঞ্জনের 'দেশবন্ধু' অভিধা সুপ্রযুক্ত ও সার্থক হইয়াছিল। দেশের লোক তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' নামে অভিহিত করায় কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'দেশবন্ধু' পদবী গৌরব বা সম্মানের নিদর্শন নহে। শ্মশানে যাহারা মৃতদেহের সৎকারে সাহায্য করে, (ডোম কি মুদ্দফরাস!) তাহারাই 'দেশবন্ধু' নামে অভিহিত। কিন্তু মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন এই পদবী গৌরবের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বঙ্গের মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির সৎকারের সহায়তাকল্পে তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ শক্তিসামর্থ্যের বিনিয়োগ করেন নাই, তিনি বাঙ্গালার বিশাল শ্মশানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়া, এই অসাড়, নিস্পন্দ, নির্জ্জীব জাতির দেহে নবজীবন-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; অবশেষে এই চেষ্টায় তাঁহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগ ভিন্ন কেহ দেশনায়কের উচ্চ আদর্শ দেশের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারে না। ইহা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাহা কেবল জানিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের স্বদেশানুরাগে কৃত্রিমতা ছিল না। কোন কোন ঝুনো, বকেয়া, বাক্-সর্ব্বস্ব, সৌখীন স্বদেশ-প্রেমিকের মত তিনি ঝুটা স্বদেশ-প্রেমের মুখোস পরিয়া স্বার্থকেই উপাস্য দেবতা মনে করিলে এবং অর্থসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলে, আজ চিত্তরঞ্জনের বিয়োগ-শোকে কোটি কণ্ঠ

হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইত না। তাঁহার আন্ত-রিকতা তাঁহার মহত্ত্বেরই অনুরূপ ছিল। রাষ্ট্রনায়ক লোকমান্য তিলক, যুগাবতার মহাত্মা গন্ধীর ন্যায় তিনিও অকুণ্ঠিতচিত্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহা-দের পদরেণুস্পর্শে অপবিত্র কারাপ্রকোষ্ঠ পবিত্র হইয়া-ছিল; কারাকক্ষের পাপ-কলুষিত বায়ুস্তর নির্ম্মল হইয়া-ছিল। মুক্তিমন্ত্রের এই সকল উপাসক সমগ্র দেশের নরনারীবর্গের হৃদয়ে কারাবরোধের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন; ভারতের জাতীয় জীবনের মুক্তির ইতিহাসে কারাগার তীর্থে পরিণত হইয়াছে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রাণা-ধিক পুত্রকে কারাবরণে উৎসাহিত করিয়া দেশ-বাসীর সম্মুখে পিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। তিনি জানি-তেন, দেশে এরূপ নেতার অভাব নাই, যাঁহারা নিজের ছেলে-টিকে নিরাপদ গৃহের অন্তরালে রাখিয়া পরের ছেলেগুলিকে কারা-প্রবেশে উৎসাহিত করিতে লজ্জা বোধ করেন না!

বর্ত্তমান ভারতে এই বাগ্‌বিভূতির যুগে চিত্তরঞ্জন ত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যে আদর্শ তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব; পৃথি-বীর অন্য কোন দেশে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না, জানি না। চিত্তরঞ্জনের স্বদেশবাসী তাঁহার আত্মদানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার বিয়োগশোকে মুহ্যমান হইয়াছেন; এমন কি, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতবিরোধ ছিল, স্বরাজের প্রতিষ্ঠাসঙ্কল্পে তিনি যাহাদের 'ভৈরবীচক্র' শক্তিহীন ও ব্যর্থ করিবার জন্য সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্ত ধ্বংস ও অন্য হস্ত গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহা-রাও তাঁহার অকালমৃত্যুতে ক্ষোভ এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কেবল যে চিত্তরঞ্জনের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া-ছেন, এরূপ নহে, তাঁহা-রাও যে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হয়েন নাই—ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দুর্গামোহন দাশের ২য়া পত্নী (হেমন্তকুমারী)

চিত্তরঞ্জন অসাধারণ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবহারাজীব-রূপে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করি-তেন; তাঁহার ব্যারিষ্টা-রীর আয় বাঙ্গালার অনেক মহারাজার জমী-দারীর আয় অপেক্ষা অধিক ছিল; তিনি অন্য দশ জনের মত 'বৈষয়িক-বুদ্ধি'-সম্পন্ন ও সঞ্চয়ী হইলে ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা ধরিত না! কিন্তু অর্থের প্রতি কোন দিনও তাঁহার মমতা ছিল না। তিনি যে অবস্থায় বিপুল পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর। অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনে তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না; প্রার্থী কখন বিফল-মনোরথ হইয়া তাঁহার অবারিত দ্বার হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইত না। ভোগে ও বিলাসে তিনি যখন বহু অর্থ ব্যয় করিতেন—তখনও ত্যাগের জন্য তাঁহার অনাসক্ত হৃদয় কিরূপ

ব্যাকুল থাকিত—তাহা তাঁহার বাহ্য ভোগ-বিলাস দেখিয়া কেহ কি ধারণা করিতে পারিত ?. যে সম্মানজনক ব্যবসায়ে তিনি অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন—সেই বিপুল অর্থকর ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক মমতা বা শ্রদ্ধা থাকিলে তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তচিত্তে কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করিতে পারিতেন ?—প্রেমই ত্যাগের মূল। ভগবৎপ্রেমই হউক, আর স্বদেশপ্রেমই হউক, হৃদয়ে প্রেমের বল না থাকিলে কেহই আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত করিয়া, ত্যাগের গৈরিক উত্তরীয়মাত্র সম্বল করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিশ্বের মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সঙ্কীর্ণচিত্ত, স্বার্থসর্ব্বস্ব, সংসারী লোক চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিত না। কমলার স্নেহের দুলাল সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া ঋণগ্রস্ত, তথাপি তিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গের মুখের দিকে না চাহিয়া মাথা রাখিবার আশ্রয়, অন্তিমের শেষ অবলম্বন—লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের প্রাসাদোপম সুবিস্তীর্ণ বাসভবনখানি পর্য্যন্ত স্বদেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানের জন্য দান করিয়াছেন শুনিয়া অনেকেই বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, "আহা, অত বড় লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গেল! পাগল না হইলে কি এমন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হয় ?"

হাঁ, এক হিসাবে তিনি পাগল বই কি!—কপিলাবস্তুর সর্ব্বত্যাগী রাজকুমার সিদ্ধার্থ, প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ ও সনাতন, আধুনিক যুগে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব, কর্ম্মযোগী প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ, যোগনিরত তপস্বী শ্রীঅরবিন্দ, যুগাবতার মহাত্মা গন্ধী, এমন কি, খদ্দরপ্রচারব্রতে উৎসর্গীকৃত-জীবন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—ইঁহারা সকলেই পাগল,—ঘোর উন্মাদগ্রস্ত!

দেশবন্ধুর ভাগিনেয়ী মালতীবালা

কিন্তু আমরা যতই প্রকৃতিস্থ ও বুদ্ধিমান্ হই না, ভোগের ভিতর দিয়াই যে ত্যাগের পথ প্রসারিত—ইহা আমাদের অনেকেরই বুদ্ধির অগম্য!—এই জন্য আমাদের যথাসর্ব্বস্ব সম্বল কৌপীনখানির ভোগাধিকারে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আমরা দুই হাতে তাহা আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই পৌরাণিক কাহিনীটির উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শুকদেব গোস্বামী মহাযোগী ও মুক্ত পুরুষ ছিলেন; তথাপি তাঁহাকে ত্যাগের আদর্শ খুঁজিতে হইয়াছিল! কিন্তু সংসারে তিনি প্রকৃত ত্যাগীর সন্ধান না পাইয়া অগত্যা নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ তাঁহাকে রাজর্ষি জনকের নিকট ত্যাগ শিক্ষা করিতে পাঠাইলেন। নারায়ণের আদেশে গোস্বামিপ্রবর বিস্মিত হইলেন; এ কথায় তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা হইল না। তাঁহার ন্যায় মহাত্যাগী মুক্তপুরুষ এক জন ভোগী ও বিলাসী নরপতির নিকট ত্যাগের শিক্ষালাভ করিবেন!—ইহা বিড়ম্বনার

মিঃ পি, আর, দাশের কন্যাদ্বয় গৌরী, উমা এবং অপর্ণার পুত্র

বিষয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু তিনি নারায়ণের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, সন্দিগ্ধচিত্তে রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—জনক রাজা ঘোর সংসারী, কামিনী-কাঞ্চনের মোহে আচ্ছন্ন, ভোগ-বিলাসে ডুবিয়া আছেন; ত্যাগের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান নাই—গোস্বামী ক্ষুণ্নমনে নারায়ণের নিকট ফিরিয়া গিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী তাঁহার বিরাগের কারণ বুঝিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জনকপুরে প্রেরণ করিলেন।—গোস্বামী সে বারও সেখানে গিয়া রাজর্ষিকে বিলাসপঙ্কে নিমজ্জিত দেখিলেন। কোথায় বৈরাগ্য, কোথায় ত্যাগ? গোস্বামী প্রভু নিরাশ-হৃদয়ে নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আপনার এই পরিহাসে মর্ম্মাহত হইয়াছি। জনকের নিকট কি উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ আমাকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে পাঠাইতেছেন? তাঁহার ন্যায় ভোগলালসামুগ্ধ বিলাসী কি কখন ত্যাগের আদর্শ হইতে পারে?" নারায়ণও নাছোড়বান্দা! তি- গোস্বামীকে পুনর্ব্বার রাজর্ষির প্রাসাদে প্রের- করিলেন।

রাজর্ষি জনক শুকদেব গোস্বামীকে একাধিকবার তাঁহার প্রাসাদে আসিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছেন; তৃতীয় বার তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অগত্যা গোস্বামীকে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিতে হইল। রাজর্ষি সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার পাদস্পর্শে আমার পুরী পবিত্র হইয়াছে, প্রভু, অগ্রে প্রাসাদসন্নিহিত সরোবরে স্নান করিয়া আসুন; আপনি অতিথি, অতিথিসৎকার করিয়া পরে আপনার সঙ্গে সকল কথার আলোচনা করিব।"

গোস্বামী প্রভু প্রাসাদসংলগ্ন সরোবরে স্নান করিতে চলিলেন। কৌপীনমাত্র গোস্বামীর সম্বল, তিনি সরোবরকূলে কৌপীনখানি খুলিয়া রাখিয়া সরোবরের জলে অবগাহন করিতেছেন—হঠাৎ দেখিলেন, অগ্নিতে রাজপ্রাসাদ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। অতি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! সেই অগ্নিতে সমুন্নত সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সুবিস্তীর্ণ রাজপুরী অতি অল্প সময়ে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া অগ্নির লোলজিহ্বা সেই সরোবরের তীরেও প্রসারিত হইল, অবশেষে তাহা গোস্বামীর অদ্বিতীয় সম্বল কৌপীনখানিও গ্রাস করে আর কি! গোস্বামী প্রভু কৌপীনখানি বহ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কূলে উঠিয়া ব্যগ্রভাবে উভয় বাহু প্রসারিত করিলেন।—সেই সময় রাজর্ষি জনক সম্পূর্ণ অবিচলচিত্তে সরোবরকূলে উপস্থিত হইয়া, কৌপীনের প্রতি গোস্বামীর আসক্তি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারে ত আপনার ঐ কৌপীনমাত্র সম্বল, তাহাই হারাইবার আশঙ্কায় আপনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন; আর ঐ দেখুন, আমার বিশাল পুরী, আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য আপনার চক্ষুর উপর বিধ্বস্ত—ভস্মীভূত হইল; এই সর্ব্বনাশেও আমি ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হই নাই। আমার মত আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাহা এই

ভাবে নষ্ট হইলে আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইত ?”

যাহাদের সম্বল কৌপীনমাত্র, বড় জোর লোটা আর কম্বল, ত্যাগের সামর্থ্য তাহারা কিরূপে লাভ করিবে ? কিন্তু যাহাদের যথেষ্ট আছে, এবং যাহারা চিরজীবন ভোগ-বিলাসে ডুবিয়া আছে, তাহারা ত একটিমাত্র কথায় বা কোন মহদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া লালাবাবুর মত ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, চিত্তরঞ্জনের মত স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব দান করা ত দূরের কথা! এইখানেই অন্য সকলের সহিত চিত্তরঞ্জনের পার্থক্য। এই জন্যই চিত্তরঞ্জন মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন; স্বদেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহার বিয়োগ-বেদনায় ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুদক্ষ কর্ণধার যাত্রিপূর্ণ তরণী লইয়া উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল কর্ম্মসাগরে ভাসিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল; মসীলেখা-সমাচ্ছন্ন তীর বহুদূর। অপরাহ্নের রবিকর-প্রতিবিম্বিত সুবিশাল লবণাম্বুরাশির দিকে চাহিয়া কর্ণধার শঙ্কিত, হতাশ বা নিরুৎসাহ হয়েন নাই; তাঁহার আশা ছিল, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বেই তাঁহার তরণী সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সিদ্ধির কনক-মন্দিরের দ্বার তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবে। কিন্তু নির্ম্মল আকাশে সহসা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সঞ্চার হইল, ভীষণ বজ্রনাদে চরাচর বিকম্পিত হইল; প্রচণ্ড ঝটিকার আবর্ত্তে পড়িয়া কর্ণধার কালসিন্ধুর অতলস্পর্শ গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলেন! অকূল সমুদ্রে কাণ্ডারিহীন তরণীর আরোহিগণের মর্ম্মভেদী হাহাকারে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে!

সশস্ত্র সংগ্রাম অপেক্ষা অহিংস প্রতিরোধে অনেক অধিক শক্তি ও বিপুল মনোবলের প্রয়োজন। অহিংস-প্রতিরোধে যিনি সমগ্র দেশবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহার যে সকল অনন্যসাধারণ গুণ ও মানসিক শক্তির আবশ্যক, ভগবান্ তাহা চিত্তরঞ্জনকে যথেষ্ট পরিমাণেই দান করিয়াছেন। *চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতা, দূরদৃষ্টি, রাজ*নীতিতে অভিজ্ঞতা এবং জনসাধারণের হৃদয়ের উপর প্রভাববিস্তারের শক্তি অসাধারণ ছিল; অন্যের চিত্তরঞ্জনের সামর্থ্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বহু বিভিন্ন মতাবলম্বী, একতা-বিরহিত, দরিদ্র, পরাধীন জাতির নেতার সর্ব্বপ্রধান সঙ্কট অর্থাভাব। অর্থাভাবে চিত্তরঞ্জন স্বদেশের কল্যাণকর কোন স্থায়ী অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার যে গঠনমূলক কার্য্যের পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। এই অর্থাভাব নিবন্ধন চিত্তরঞ্জন যে মানসিক শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, মহাত্মা গন্ধীকেও তাহা ক্ষোভের সহিত স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল কারাবাসের নানা অনিয়ম ও অশান্তিতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার পর যদিও তিনি সুস্থ ও সবল হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালের কঠোর পরিশ্রম ও নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রহিল না। তিনি বিশ্রামের আশায় পাটনায় গিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামসুখ লিখেন নাই। তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ খট্টায় তুলিয়া ব্যবস্থাপক পরিষদ সভায় কি ভাবে নীত হইয়াছিল, এবং সেই রুগ্ন বীরের অপূর্ব্ব ব্যক্তিগত প্রভাবে প্রবলপ্রতাপ্রাক্রান্ত গবর্মেণ্টকে কি দারুণ পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল—চিত্তরঞ্জনের জীবনের তাহা স্মরণীয় ঘটনা; আমলাতন্ত্রের সহিত প্রজার মতবিরোধে প্রজার এই বিজয়কাহিনী দেশবন্ধুর সাধনসংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্য।

যাহা হউক, রোগজীর্ণ অবসন্ন দেহ ও চিন্তাভারক্লান্ত মস্তিষ্ককে যথাযোগ্য বিশ্রামের অবসর না দিয়া স্বদেশের জন্য নবোদ্যমে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রমে রত থাকায় চিত্তরঞ্জনের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল; দিনের পর দিন তাঁহার জীবনীশক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি বায়ুপরিবর্ত্তন ও স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের আশায় দারজিলিং যাত্রা করিলেন। কিন্তু দেহের বিশ্রামই কি প্রকৃত বিশ্রাম? তাঁহার মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তিকে দূর

করিবে? মৃত্যু যখন নিঃশব্দে তাঁহার শিয়রপ্রান্তে সমাগত হইয়া তাঁহার সংজ্ঞা হরণ করিল, তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মন শান্তি বা বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারে নাই; যতক্ষণ তাঁহার জ্ঞান ছিল—স্বদেশের কল্যাণ ও মুক্তির চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই; মহাপ্রস্থানের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু মহাশয়কে স্বহস্তে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিছত্র স্বদেশপ্রেমের সুবর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত; কিন্তু তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, জীবনের মহাব্রত অপূর্ণ রাখিয়া অকালে তাঁহাকে জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইল।

চিত্তরঞ্জন বঙ্গসাহিত্যের কৃতী সেবক ছিলেন; তিনি সুকবি, ভাবুক, ভক্ত, দার্শনিক ও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসমালোচক ছিলেন। অন্য দিকে সুদক্ষ রাজনীতিক, অসাধারণ আইনজ্ঞ, অপূর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বাগ্মী, সুতার্কিক এবং গভীর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কর্ম্মকুশল সুযোগ্য নগরাধ্যক্ষ (মেয়র) ছিলেন। একাধারে এত গুণ, এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও দেবদুর্লভ হৃদয়ের সমাবেশ মানবসমাজে একান্ত বিরল। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ভক্তিরসাশ্রিত পদাবলীর তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সুমধুর কাব্যরস তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত অশান্তিবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে যে শান্তি ও তৃপ্তির উৎস প্রবাহিত করিত—তাহাই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য মনে করিতেন। যে দিন মৃত্যুর করাল ছায়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার পূর্ব্বদিনও সরস সাহিত্যালোচনায় রোগযন্ত্রণা প্রশমিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী তখনও জানিতেন না যে, তাহাই তাঁহার সাহিত্যালোচনার শেষ দিন, সেই আবৃত্তিই তাঁহার মধুর কণ্ঠের শেষ উচ্ছ্বাস!

আমরা হিন্দু, পরলোকে আমরা আস্থাবান্, কর্ম্মফলে আমরা বিশ্বাস করি। মনস্বিনী শ্রীমতী আনি বাসন্তী চিত্তরঞ্জনের অকালবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া লিখিয়াছেন —দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনের ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও তাঁহার অমর আত্মা ইহজীবনের আরব্ধ অসমাপ্ত ব্রতের উদ্‌যাপন করিবে। তাঁহার অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, তাঁহার বিরাট ত্যাগ, তাঁহার মানবদুর্লভ মনুষ্যত্ব ও কঠোর সাধনা, স্বরাজপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার বিপুল চেষ্টা, প্রাণপণ যত্ন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম কি মহাকালের ফুৎকারে অকালে জীবনদীপনির্ব্বাণের সঙ্গেই ব্যর্থ বিফল হইয়া যাইবে? চিত্তরঞ্জনের যে সকল ভক্ত, যে সকল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী তাঁহার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই পতাকা বহন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকে আজ বিচ্ছিন্নভাবে কারাপ্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ, তাঁহাদের বিশ্বাস—চিত্তরঞ্জন আবার আসিবেন, জন্মান্তরে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবেন; তাঁহার অসমাপ্ত ব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন।

তাহাই হউক। কাল অনন্ত, কর্ম্মস্রোতের বিরাম নাই। চিত্তরঞ্জন যে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জন্মজন্মান্তরের সাধনাসাপেক্ষ। তাঁহার দুষ্কর সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা জন্মান্তরে সফল হইতে পারে। তাহা দেখিবার জন্য আমরা জীবিত থাকিব না, আবার তিনি ফিরিয়া আসুন। স্বদেশকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন; স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। এ প্রেম ব্যর্থ হইবার নহে।

চিত্তরঞ্জনের চিতানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগীর চিতাভস্মের প্রতি পরমাণুতে যে জীবনীশক্তি ক্ষুদ্রমানবের জ্ঞানবুদ্ধির ধারণাতীতভাবে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা বাঙ্গালীকে তাঁহার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন এবং গৌরবময় মৃত্যু কদাচ ব্যর্থ হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রাচী চিরদিন ত্যাগের আদর্শের পূজা করিয়া আসিয়াছে; প্রতীচীর ভোগের আদর্শ গ্রহণ করে নাই। য়ুরোপ প্রাচ্যের খৃষ্টের ত্যাগের আদর্শ পদদলিত করিয়া ভোগকেই ইহজীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য ভোগপরায়ণ ইহসর্ব্বস্ব য়ুরোপ, প্রাচ্যভূমণ্ডলের তপোবন, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই; ভারতে রাজসম্মান লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে আমরা 'জাহাজী গৌরাঙ্গী কিবা ভেকধারী সম্রাট বলিয়া

দেশবন্ধুর ভ্রাতা মনোরঞ্জন দাশ

ভারতের সর্ব্বত্র পূজিত, বিশাল ভারতের নেতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত; বাহুবলে তাঁহার সেই গৌরব বিলুপ্ত বা নিষ্প্রভ হইবার নহে। কর্ম্মবীর মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন মহাত্মার ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বঙ্গের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাসের স্থায় তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আজ চিত্তরঞ্জন নাই, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিবে? বাঙ্গালীর হৃদয়-সিংহাসন শূন্য করিয়া, ত্যাগের দেবতা দেশবন্ধু স্বরাজ-সাধন যজ্ঞে অকালে জীবন আহুতি দিয়া জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের নবযুগের ইতিহাসে
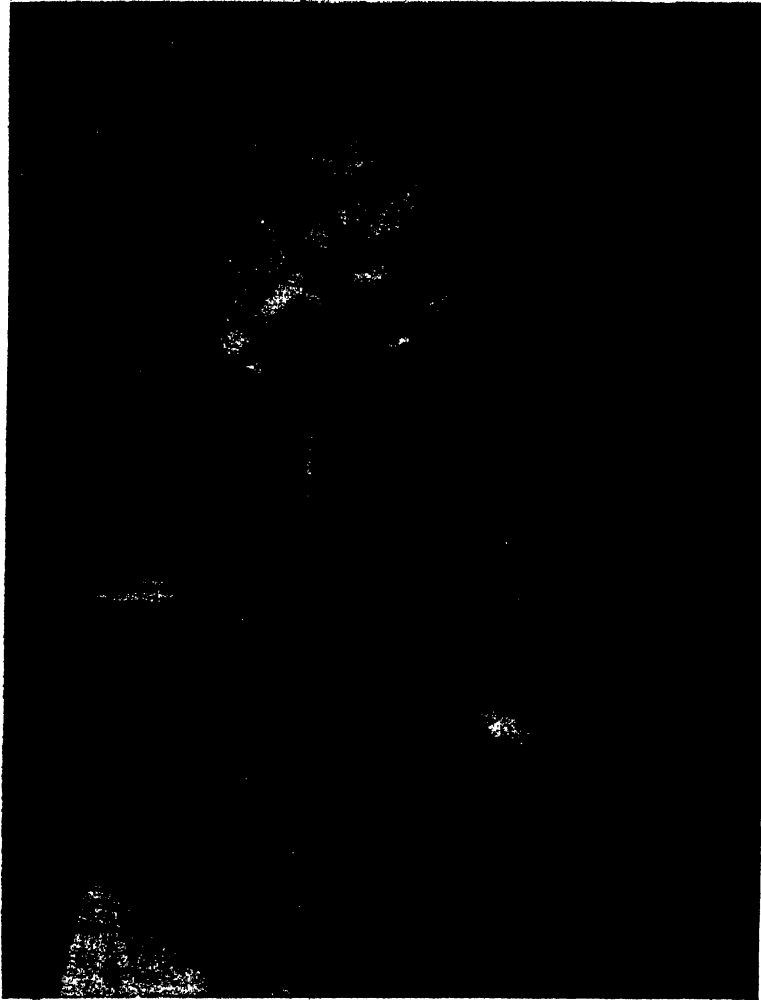
পূজি সকলে!' কিন্তু নেতার আসন সে অধিকার করিতে পারে নাই। ত্যাগী ও যোগী ভিন্ন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, অসীম বাহুবলদৃপ্ত, ভোগাভিলাষী কোনও বিলাসী সম্রাট ভারতের হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। এ সেই দেশ, যে দেশে সহস্র রাজরাজেন্দ্রবন্দিত রাজাধিরাজ সম্রাটের মণিমুক্তাহীরকখচিত উষ্ণীষ সর্ব্বত্যাগী কৌপীনধারী যোগী ও সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হয়। অহিংসা, ত্যাগ ও প্রেমের মহামন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মা গন্ধী এই জন্যই আজ যুগাবতার বলিয়া আসমুদ্র হিমাচল

চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব্ব অবদানকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার দেবদুর্ল্লভ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে বিরাজিত থাকিয়া তরুণ ভারতকে জাতীয় জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল মহৎ কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিবে, এই আশায় বঙ্গসাহিত্যের এই অধম সেবক জননী ভারতী ও ভারতের মহাপ্রাণ সন্তান চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার সুপবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিল। বন্দে মাতরম্।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

ভারতের এক জন মহান্ সেবককে আজ মৃত্যু আমাদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে শুধু এক জন রাজনীতিক নেতা বলিলে তাঁহার ঠিক ঠিক পরিচয় হয় না। তিনি এক জন ভক্ত প্রেমিক, কবি, দার্শনিক, এবং রাজনীতিক নেতা ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে সত্য সত্যই বড় ভালবাসিতেন। তাই তিনি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশবাসী তাঁহাকে "দেশবন্ধু" উপাধি প্রদান করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য অতি সুন্দররূপে পালন করিয়াছে। কারণ, তিনি ঐ উপাধির বা নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান অর্থকরী ও জড়বাদী সভ্যতার যুগে অধিকাংশ রাজনীতিক নেতা যে সময় নাম, যশ এবং স্বার্থ প্রভৃতির জন্য লালায়িত, "দেশবন্ধু" সেই সময়ে মহাত্মা গন্ধীর সহকর্ম্মিরূপে পৃথিবীর সম্মুখে নিঃস্বার্থ ত্যাগের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর ন্যায় আদর্শ দেশপ্রেমিক অতি বিরল।

দেশবন্ধুর ভগিনী অমলা দাশ

জগতে আবার যেন যুবরাজ সিদ্ধার্থের ন্যায় চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল প্রকার ভোগ, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি দেশ-মাতৃকার আহ্বানে সে সকল অনায়াসেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি গৃহস্থ জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তঃকরণ বা হৃদয় প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু শ্রেয়, আমি দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজের কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কায করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে—এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিব, আবার চলিয়া যাইব, আবার আসিব, এইরূপে যত দিন না আমার মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে, আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, তত দিন এই ভাবেই এখানে কায করিতে আসিব।" (১৯১৮, ১২ই জুনের বক্তৃতা) ইহা হইতেই বুঝা যায় যে তিনি স্বদেশকে কত ভালবাসিতেন।

বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে এই 'স্বাধীনতা' বা 'মোক্ষলাভে'র আদর্শ বিরাজমান রহিয়াছে। অবশ্য, স্বাধীনতা অর্থে আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা বুঝায়। চিত্তরঞ্জন ইহারই এক জন উপাসক ছিলেন।

ভারতবর্ষ আজ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমার মতে দেশবন্ধু আজ মৃত নহেন। তাঁহার আত্মা এই নশ্বরদেহ হইতে মুক্ত হইয়া দেশের ত্রিশ কোটি নরনারীর প্রাণে আশা এবং শক্তির সঞ্চার করিবে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি নূতন এবং বৃহত্তর জীবন লাভ করিয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অভেদানন্দ স্বামী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিতে বলা হইয়াছে। দেশবন্ধু—দেশবন্ধু। সমস্ত দেশ প্রাণে প্রাণে আজ তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছে। প্রতি কার্য্যে প্রতি-পদবিক্ষেপে জাতি বুঝিতে পারিতেছে, তাহাদের আশা, আনন্দ, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি সমস্তই তাহারা হারাইয়াছে। জাতির প্রাণ—বাঙ্গালার গর্ব্ব—ভারতের ভরসা—পৃথিবীর আদর্শ মহাপুরুষ তাঁহার গরিমার অত্যুচ্চ শিখর হইতে অস্ত গিয়াছেন! পৃথিবীতে এমন গৌরবময় তিরোধানের ইতিহাস আর নাই। আমি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র সেবক তাঁহার সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম—তাঁহার অনুমতি অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার সাহায্য লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। জগতের চক্ষু হইতে আজ তিনি তিরোহিত হইলেও আমি প্রতি কার্য্যে তাঁহার শক্তি ও সত্তা অনুভব করি—তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা-পূর্ণ আশার বাণী প্রতিনিয়ত আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়। কর্ম্মক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত প্রাণে নিরাশার অন্ধকারে যখন অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াই, তাঁহারই প্রতিকৃতি মূর্ত্তিমান হইয়া আবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে। দেশবন্ধু আমার গুরু, আমার শিক্ষাদাতা, পথিপ্রদর্শক। জীবনে ও মরণে সর্ব্বদাই আমি তাঁহার সেবক ও শিষ্য—সমানভাবে আদেশপালনকারী। আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু দেশবন্ধুর ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি আমার ধ্যানের দেবতা, পূজার বিগ্রহ, বিপৎকালের বন্ধু। তিনি দেশের কি ছিলেন, এ কথার উত্তরে কি ছিলেন না, প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। জাতীয় জীবনের প্রতি নিভৃত কক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভায় প্রভান্বিত। জাতীয় জীবন সংগঠনের তিনিই একমাত্র আদর্শ। নবযুগের তিনি হরিশ্চন্দ্র—স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগী বৈরাগী বুদ্ধ। তিনিই জাতীয় সাধনার প্রতীক,—তাঁহার উপদেশ জাতির মুক্তি-মন্ত্র—তাঁহার প্রদর্শিত পথে অনুগমনই জাতির একমাত্র সাধনা। সসীম দেশবন্ধু আজ অসীম শক্তিতে জাতিকে তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজের পথে পরিচালনা করিতেছেন। সমগ্র জাতি দেশবন্ধুর হস্তাঙ্কিত স্বরাজ-পতাকা সগর্ব্বে উত্তোলন করিয়া সেই মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথে চলিয়া তাঁহার আরব্ধ অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করত স্বরাজ লাভ করিলে তবে তাঁহার স্বরাজ আকাঙ্ক্ষার বুভুক্ষিত আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে। তাঁহার মধুময় স্মৃতি বক্ষে লইয়া শ্রদ্ধার তর্পণ সার্থক হইবে।

দার্জ্জিলিংএ পথভ্রমণে দেশবন্ধু—মহাত্মা গান্ধীসহ

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায়।

পুনরাগমন

চিত্তরঞ্জন!—পিতামাতা যখন শিশুর নামকরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হয় ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে এই শিশু, তাঁহাদেরই নন্দদুলাল, সমগ্র বাঙ্গালার, এমন কি, সমুদ্র-মেখলা বিরাট ভারতভূমির জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে। নামের সার্থকতা কদাচিৎ কোন ক্ষণজন্মার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। দেহত্যাগের পর চিত্তরঞ্জনের আত্মা সেই দুর্লভ বস্তু লাভ করিয়াছেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যবহারাজীব হইয়া চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত একটি সামান্ত ঘটনা উপলক্ষে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন আমি কৈশোর অতিক্রম করি নাই—স্কুলে পড়ি। একই পল্লীতে উভয়ের বাস ছিল—বকুলবাগানের মোড়ের উপর চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক বাসভবন। এক দিন—সম্ভবতঃ আষাঢ়ের সন্ধ্যা—গাড়ীবারান্দার উপরের ঘরে গান চলিতেছিল। পরলোকগত অমলা দাশ—চিত্তরঞ্জনের অন্ততমা সহোদরা—গানের জন্ত তখনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্ত আমরা প্রায়ই রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। তিনি গাড়ীবারান্দার উপরের ঘরে বসিয়া সঙ্গীত-সাধনা করিতেন। সে দিনও আমরা কয়েক জন নীচে, পথে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। সঙ্গীতের মাধুর্য্যে আমরা এমনই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আকাশের বর্ষণোন্মুখ অবস্থা লক্ষ্য করি নাই। বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিতেই গাড়ীবারান্দার নীচে আশ্রয় লইতে হইল। এমনই সময় চিত্তরঞ্জন তথায় আসিলেন, আমাদিগকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি সমাদরে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। পরবর্ত্তী কালে, তাঁহার মিষ্ট, মধুর, সরস ব্যবহারে তাঁহার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিনও তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইয়াছিলাম।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "নির্ম্মাল্য" নামক একখানি মাসিক পত্র কালীঘাট হইতে প্রকাশিত হইত। উহার সম্পাদক ছিলেন কাব্যবিনোদ রাজেন্দ্রনারায়ণ। এখন তিনি জীবিত আছেন কি না, জানি না। মনোহরপুকুর রোডের মোড়ের উপর একটি ছোট বাড়ীতে "নির্ম্মাল্য" পত্রের কার্য্যালয় ছিল। চিত্তরঞ্জনের কবিতা "নির্ম্মাল্যে" প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধলেখক তখন উহার নিয়মিত সেবক ছিল। সেই সময়ে চিত্তরঞ্জনের সহিত লেখকের পরিচয়ের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও "নির্ম্মাল্য" পরিচালনে চিত্তরঞ্জন বন্ধুকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেন। "নির্ম্মাল্য" অনেক দিন সুপরিচালিত হইয়া চলিয়াছিল। সম্পাদক রাজেন্দ্রনারায়ণকে চিত্তরঞ্জন বিশেষ স্নেহ করিতেন। "নির্ম্মাল্য" উঠিয়া যাইবার পরেও তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে নানা ভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্ধুবাৎসল্য চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। একবার তিনি যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহাকে পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সাহায্য করিতেন, ভালবাসিতেন। তাহার কোনও দোষ, অপরাধ গ্রহণ করিতেন না। স্নেহ ও প্রেমের ডোরে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই বন্ধুবাৎসল্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে গেলে একখানি বড় গ্রন্থ রচনা করা যায়।

যাঁহারা মহৎ—পৃথিবীতে যাঁহারা বৃহত্তর, মহত্তর কার্য্যের দ্বারা জাতিকে—মানব-সমাজকে ধন্ত করেন, পবিত্র করেন—বিরাট আদর্শের স্বরূপ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের জীবনে মহদ্‌ভাবের পূর্ব্বাভাস থাকে। হয় ত সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা প্রথমতঃ ধরা পড়ে না—অথবা প্রথমজীবনে তাহা এমনই সঙ্গোপনে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হইতে থাকে যে, মানুষ তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় না। কবি চিত্তরঞ্জন, ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন, স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন, ভক্ত—বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জনের জীবনধারায় এই পরম সত্যের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

তরুণ যৌবনে সাহিত্যের তপোবনে চিত্তরঞ্জন সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে যুগের সে ইতিহাস তাঁহার

বন্ধুজনের অগোচর ছিল না। যাঁহারা পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত প্রথম যুগের "সাহিত্য" পড়িয়াছেন, তাঁহারা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সে সময়ে মাঝে মাঝে "সাহিত্যে"র অঙ্কে চিত্তরঞ্জনের কবিতা প্রকাশিত হইত। সাধক চিত্তরঞ্জন তখন কবিতার মধ্য দিয়া দেশ-জননীর উদ্দেশে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন। সে

চিত্তরঞ্জনের হৃদয় যে হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরের ন্যায় মহান্ এবং মহাসমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ ও সুগভীর, ইহা তাঁহার যৌবনের সহচরগণের অনেকেরই মনে বদ্ধ-মূল ছিল। কবি চিত্তরঞ্জনের সহিত যে সকল সাহিত্যিক বন্ধুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। পণ্ডিত সমাজপতি, সুকবি

দেশবন্ধুর ভ্রাতা মিঃ জে, আর, দাশ ও মিঃ এস, আর, দাশ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ

সকল কবিতার অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অন্ততঃ "মালঞ্চ-মালা"র সে অপূর্ব্ব কুসুমগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। দেশাত্মবোধ, স্বদেশ-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে সহসা উদ্দীপিত হইয়াছিল, এ কথা অন্ততঃ সেই কবিতাগুলি পড়িলে কেহই বলিতে পারিবেন না।

অক্ষয় বড়াল, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীভূষণ গুহ, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত চিত্তরঞ্জনকে অনেক সময় কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। সে সময় তাঁহার স্বাজাত্যাভিমান ও দেশাত্মবোধ তাঁহার বিনয়-নম্র মধুর ব্যবহারের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। তখনই মনে হইত—সুখভোগে

অত্যন্ত বিলাসী, আভিজাত্যাভিমান সম্বন্ধে জাগ্রতবুদ্ধি চিত্তরঞ্জনকে বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে ভ্রান্ত হইতে হইবে। তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয় যে কিরূপ গভীর, মহান্ এবং অকৃত্রিম সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার পরিচয় উত্তরকালে বাঙ্গালীজাতি পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে।

আশৈশব সহিত্যানুরাগী—কাব্য-সাহিত্যের অকৃত্রিম ভক্ত চিত্তরঞ্জন কর্ম্মসমুদ্রে অবগাহনকালে—ব্যবহারা-জীবের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার সময় কখনও কাব্য-সাহিত্যের সেবা ত্যাগ করেন নাই। এই কাব্য-প্রীতি, সাহিত্য-চর্চ্চা—রসবস্তুর সন্ধানে প্রাণ-মন দিয়া চেষ্টা তাঁহার কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের সকল প্রকার সাফল্যের যে মূল কারণ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক সময় তিনি তাহার উল্লেখও করিতেন। তাঁহার সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে "বঙ্কিম-সংখ্যা নারায়ণ" প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। "নারায়ণ"-পরিচালন সূত্রে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছিল। তখন ব্যবহারা-জীব হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে চিত্তরঞ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গৃহ সে সময়েও সর্ব্বদা দর্শনার্থীতে ভরিয়া থাকিত—নানা কার্য্যের উপ-লক্ষে নানা ভাবের লোক সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে আসি-তেন। কর্ম্মময় জীবনে অবকাশ নাই, তথাপি সাহিত্য সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, সকল কর্ম্ম ভুলিয়া, তিনি সমগ্র মন দিয়া তাহার আলোচনা করিতেন। তখনই বুঝা যাইত, সাহিত্য তাঁহার কাছে বিলা-সের বস্তু নহে—তিনি সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ সেবক, ভক্ত।

অনাসক্ত ভোগী চিত্তরঞ্জনকে ভোগ ও বিলাস কখনও মুগ্ধ, অভিভূত করিতে পারে নাই। ভোগ ও বিলাসের বন্যাপ্রবাহে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, কিন্তু প্রবল স্রোতোধারা কখনও তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। পদ্মপত্রের নীরের মত তিনি পাতার উপরে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নিখিলের ধ্রুব বাণী, দেশজননীর আহ্বান বায়ুপ্রবাহে তরঙ্গ করিয়া তাঁহাকে দোলা দিল, অমনই তিনি বিলাস-আধার হইতে আপনাকে সরাইয়া দিলেন।

এক দিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। দেশজননীর আহ্বানে তখনও তিনি সন্ন্যাসী সাজেন নাই। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাবে, সাহিত্য-রসের চর্চ্চায় তখন চিত্তরঞ্জনের মন ভরপুর। সম্ভবতঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস—এক দিন চিত্তরঞ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরদিন রবিবারে আমার কোনও বিশেষ কায আছে কি না। কায থাকিলেও আমি জানাইলাম যে, প্রয়োজন হইলে আমি আসিতে পারিব। প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন যে, দ্বিপ্রহরে নিরালায় তিনি তাঁহার রচিত কাব্য পড়িয়া আমাকে শুনাইবেন।

পরদিন যথাসময়ে আসিয়া দেখিলাম, তিনি বাহি-রের ঘরে একা বসিয়া আছেন। ধূমপান চিত্তরঞ্জনের একটা প্রধান বিলাস ছিল। ধূমপান শেষ হইলে তিনি "কিশোর-কিশোরী" ও "অন্তর্যামী" আনাইলেন। এই দুইখানি তাঁহার শেষের দিকের রচনা। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কক্ষমধ্যে মাত্র আমরা দুই জন। চিত্তরঞ্জন ভৃত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে কেহ কোন কার্য্যে আসিলে যেন অন্য ঘরে অপেক্ষা করেন।

কাব্যপাঠ চলিল। তাঁহার আবৃত্তির ভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দর—কণ্ঠস্বর সুমধুর। কবি আপনার রচনা পড়িতে পড়িতে যেন অন্যলোকে প্রয়াণ করিলেন; আমিও তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহার কাব্যগুলি পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সে দিন তাঁহার কণ্ঠে যে সুরের ঝঙ্কার ও ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া-ছিল, তাহা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। "কিশোর-কিশোরী" ও "অন্তর্যামী" পূর্ব্বে আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু সে দিন বোধ হইয়াছিল, ভক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের লেখনী হইতে এমন পীযূষধারা নির্গত হইতে পারে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বই দুই-খানি সমাপ্ত হইল। কবি চিত্তরঞ্জনের সৌম্য আননে, প্রতিভাদীপ্ত ললাট ও শান্ত নয়নে সে দিন যে পরিতৃপ্ত শান্তির আলো দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। ভাবের আতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠ ভারাক্রান্ত

হইয়া উঠিয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম, তিনি যে সত্যের সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন, তাহার শুধু সন্ধানই পান নাই, জীবনে তিনি সে সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন চণ্ডিদাসের মতই চির-ভাস্বর, নিত্য প্রেম ও আনন্দময় রাজ্যের প্রেমিক সম্রাটের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন।

ভৃত্য অভ্যাসমত মাঝে মাঝে কলিকা বদ্‌লাইয়া দিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু তাম্রকূটসেবনানুরাগী চিত্তরঞ্জনের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। প্রকৃত কবি, ভক্ত ও প্রেমিক না হইলে এমন বাহ্যচেতনাশূন্য হওয়া যায় না। তখন তাঁহার কাছে বোধ হয়, সংসারের আর সকল বিষয়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখনই যাহা করিতেন, এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া কায়মনঃপ্রাণে তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া, লাভ-লোকসান খতাইয়া সাধারণ মানুষের মত কোন কাযই তিনি করিতে পারিতেন না। এইখানেই তাঁহার বিরাট বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে সে দিন তাঁহার কণ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার সুরও অনুভব করিয়াছিলাম। কবি চিত্তরঞ্জন হিসাবে, বাঙ্গালী তাঁহার কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে সুবিচার করে নাই। কেহ কেহ সময়ে সময়ে তাঁহার কবিতা-পুস্তকগুলির যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই ভাসা ভাসা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচকের সুষ্ঠু, প্রেয় ও শ্রেয় ইঙ্গিতের অভাব ছিল। সে কথা সে দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার কাব্য-গ্রন্থগুলির একটা আলোচনা করিব, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদিত "নারায়ণে" তাঁহারই রচনা সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা সঙ্গত ও শোভন হইবে না। "পল্লীবাণী" নামক মাসিক পত্রিকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে উহাতে আমার বক্তব্য আলোচনা করিব ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু নানা কারণে উহার বিলোপ ঘটায় আমার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই। তাহার পর চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বাঙ্গালী বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তাঁহার দিকে আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কাব্য-জীবন কথার আলোচনার উৎসাহ এই বিস্ময়কর ঘটনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—এত দিন শিক্ষিত বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনের কাব্যের সম্যক্ সমাদর করে নাই। বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ যদি এখন তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা করেন, তাহা হইলে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ বাঙ্গালী যে তাহা মাথায় করিয়া লইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেকের মুখে শুনিয়াছি—ইদানীং যাঁহারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চিত্তরঞ্জনের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও ধারণা—কর্ম্মী গৃহীর জীবনধারা হইতে কবে তাঁহার ভগবানের প্রতি সুগভীর প্রেম ও দৃঢ়বিশ্বাসের স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কখনই বা তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আরম্ভ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। কথাটা সত্য ; কিন্তু ধীরভাবে তাঁহার সমগ্র জীবন-কাহিনীর আলোচনা করিলে, তাঁহার কাব্য-গুলি অভিনিবেশসহকারে পড়িলে, তাঁহার সকল কার্য্যের ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। কিছুই তখন আকস্মিক বলিয়া বোধ হইবে না। যে বিরাট ও মহান্ ত্যাগ তাঁহাকে বরণীয়, মহনীয় ও স্মরণীয় করিয়াছে, ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত। সকলের অগোচরে তাঁহার চিত্ত দীর্ঘকাল হইতেই এ জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াছিল। "মালার" গ্রথিত "মোছ আঁখি" কবিতায় বহুদিন পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—

> "অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে—
> হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
> জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
> বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।"

চিত্তরঞ্জন শুধু কল্পনার রাজ্যে স্বপ্ন চয়ন করেন নাই। বাস্তব জগতে—বাসনার স্তর ভাঙ্গিয়া, দেশবাসীর অশ্রু মুছাইবার জন্য জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। বিলাসভোগের প্রবল বাসনার জাল ছিন্ন করিয়া সাধক দেশপ্রেমিক সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন।

প্রতিভাবান্, ক্ষমতাশালী, কবি, সাহিত্যিক তীব্র অনুভূতি ও প্রেরণার সাহায্যে ভাব ও চিন্তার রাজ্যে বহু মহনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, নানা অভিনব তত্ত্ব, বিশ্বপ্লাবী রস-সৌন্দর্য্যেরও সৃষ্টি করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা ও কার্য্যের মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়? চিত্তরঞ্জন যাহা ভাবিয়াছেন, যাহা রচনা করিয়াছেন, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাকে মূর্ত্তি দিয়াছেন। শুধু ভাবের রাজ্যেই তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। "সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের" তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনা, কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার কল্পনা কি সার্থকতার গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই?

চিত্তরঞ্জনের ব্যবহারে ও কার্য্যে একটা রাজকীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করিত। সাধারণভাবে তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি যখন ধূমপান করিতেন, তখনও একটা আয়াসরুক্ত রাজৈশ্বর্য্যের ভঙ্গী প্রকাশ পাইত। তাঁহার বক্তৃতায় রাজকীয় নম্রতা, গাম্ভীর্য্য, তেজ ও মাধুর্য্যের বিকাশ দেখা যাইত। তিনি রাজার ন্যায় ভাবিতেন, রাজার মত কায করিতেন। তিনি অর্থোপার্জ্জন রাজারই ন্যায় করিয়াছেন, ব্যয়ও করিয়াছেন রাজার ন্যায়। আবার রাজার মতই অকুণ্ঠিত চিত্তে ভোগৈশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য মানবসমাজে সুদুর্ল্লভ। পুরাণে বর্ণিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এই ত্যাগপ্রবৃত্তির তুলনা করা চলিতে পারে।

চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালাকে ভালবাসিতেন, বাঙ্গালীকে ভালবাসিতেন, বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভাষাকে ভালবাসিতেন। অর্থাৎ বাঙ্গালার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তিনি তাহারই প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে আর কে রাখিবে?" চিত্তরঞ্জন এই সত্যটি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি 'বাঙ্গালার প্রাণে'র স্পন্দন শুধু অনুভব করেন নাই—প্রাণ-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভাবধারা, বাঙ্গালার চিন্তাধারা, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কথা চিত্তরঞ্জন যেমন ভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর কেহ তেমন ভাবে বুঝান নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে ভাবরাজ্যে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রধান, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু কর্ম্মজগতে বাঙ্গালী অন্যান্য জাতির তুলনায় পশ্চাতে ছিল। তাই তিনি রাষ্ট্রনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে বাঙ্গালীজাতিকে পথ দেখাইয়া অগ্রণী হইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি—রাষ্ট্রনীতিক জীবন অবলম্বন করিবার বহু পূর্ব্বে তিনি কতবার বলিয়াছিলেন, হিংসার পথ শ্রেয়ঃ নহে—অহিংসার পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষ হিংসার দেশ নহে, অহিংসাই তাহার মুক্তিমন্ত্র। তাই তিনি অহিংসা মন্ত্রের পুরোহিত, ঋষি—মহাত্মা গন্ধীকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে কোনও দিন হিংসার রেখাপাত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে শুধু ভালবাসার স্থান ছিল।

কিছুকাল পূর্ব্বে নির্ব্বাচন উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন একবার চেতলা পার্কে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর তখন অত্যন্ত অসুস্থ এবং কণ্ঠস্বর ভগ্ন। কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণা তাঁহাকে এক দিনও সুস্থ হইবার অবকাশ দিত না। তখন সমগ্র দেশে, হিন্দু-মুসলমান 'pact' লইয়া বিপুল আলোড়ন চলিতেছিল। তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। বক্তৃতা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনকে সে দিন তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের সম্বন্ধেও কোনও অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনি নাই। বরং তিনি তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে শত্রুভাবে জ্ঞান করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের মনের প্রান্তেও স্থান পাইত না। মতান্তর হইলেই বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণতঃ মনান্তর ঘটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন এ সকল তুচ্ছতা ও নীচতা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতাশেষে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল—রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণকালে তাঁহার অবসর এতই অল্প হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমাদের আর পূর্ব্ববৎ ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ করিবার সুযোগ বড় ঘটিত না। সে দিনও যত আলোচনার অবকাশে তাঁহার কণ্ঠে

একটা মৌন বেদনা ও ক্ষোভের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিয়াছিলাম। সে কথাগুলি এখনও কানে বাজিতেছে। "দেখুন ত, প্যাক্ট নিয়ে কি ঝড়ই উঠেছে! কিন্তু উদ্দেশ্যটা তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন না।" আমি বলিয়াছিলাম যে,তিনি পর্দ্দার সুর বাঁধিয়া গান ধরিয়াছেন, আমরা সাধারণ মানুষ, তত দূর পৌছিবার শক্তি আমাদের নাই, সুতরাং তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া সকলে চলিতে পারিবে কেন? চিত্তরঞ্জন তাহাতে হাসিয়াছিলেন—সেই চির-প্রসন্ন মৃদু হাস্য!

দেশবন্ধুর ভগিনী শ্রীমতী সরলা রায় সপরিবারে

পরিশ্রান্ত মন ও রোগশীর্ণ দেহ লইয়া হিমাদ্রি অঙ্কে—দুর্জ্জয় লিঙ্গের শৈলশিখরে তিনি বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এ যাত্রা, ভ্রাতৃবৃন্দসহ সব্যসাচী অর্জ্জুনের মহাযাত্রার কথা মনে করাইয়া দিতেছে! পাণ্ডব-গৌরব হিমাদ্রি-বক্ষে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গৌরব—বিংশ শতাব্দীর সব্যসাচীও সেই মহাপ্রস্থানের পথে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হাহাধ্বনি অনন্ত বায়ুমণ্ডলে শোক ও ব্যথার বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক বিয়োগ-বেদনায় মর্ম্মাহত। সকলেই বলিতেছে—"দেশবন্ধু নাই! চিত্তরঞ্জন নাই!"

কিন্তু সত্যই কি তিনি নাই? তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ 'ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমে' মিলাইয়া গিয়াছে—শ্মশানচুল্লীতে তাঁহার দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চিত্তরঞ্জন নাই, এ কথা মিথ্যা। যে দিন বাজারে আলু পটলবিক্রেত্রী বঙ্গপ্রবাসী পশ্চিমাঞ্চলের নারীর মুখে শুনিয়াছি, "বাবু, সি,আর, দাশ মারা গেছেন;" মুটিয়া হীরু কাহারকে বলিতে শুনিয়াছি, "সি, আর, দাশ মর গেই, বাবু"; ৯।১০ বৎসরের বালককে অনাহারে, নগ্নপদে সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত শবদেহের অনুগমন করিতে দেখিয়াছি, শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীদিগকে রাজপথের ধারে বারান্দায় ম্লানমুখে শবদেহ দেখিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়াছি;

তখনই মনে হইয়াছিল, চিত্তরঞ্জন মরিতে পারেন না— তিনি মরেন নাই! সারা বাঙ্গালার প্রাণের ভিতরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। রোগ তাঁহার দেহকে ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী কাল তাঁহার স্মৃতিকে অমরত্বের সিংহাসনে বসাইয়া জয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে তাঁহার আত্মা পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া কর্ম্মের উৎসাহ সঞ্চার করিবে।

চিত্তরঞ্জনের আত্মা কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম করিবার উদ্দেশে অমরলোকে প্রবাস-যাপন করিতেছে। তাঁহার কামনা ছিল, তাঁহার চিরগরীয়সী জন্মভূমিকে পৃথিবীর সকল দেশের সম্মুখে নব-মূর্ত্তিতে সাজাইয়া সকল জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতির বস্তু করিয়া তুলিবেন, যাবতীয় সভ্যদেশের সমকক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। তাঁহার সে সাধনা এখনও সিদ্ধি লাভ করে নাই, সুতরাং তাঁহাকে আবার নব-জীবন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতে হইবে। এ কথা তিনি স্বয়ং পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

অমরাবতীর তোরণ মুক্ত করিয়া বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, তিলক প্রভৃতি মাতৃভূমির ভক্তবৃন্দ চিত্তরঞ্জনের আত্মাকে বরমাল্য দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি এখন তাঁহার চিরারাধ্য অন্তর্যামীর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হইয়াছেন। কবির আকাঙ্ক্ষা, দেশজননীর ভক্তসন্তানের উদগ্র কামনা তাঁহাতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া পুনরাগমনের জন্য নবশক্তি সঞ্চয় করিয়া শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিবে। চিত্তরঞ্জনকে আবার আসিতে হইবে, আবার নবদেহ নবশক্তি লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে দেখা দিবে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নির্গত মহাবাণী ব্যর্থ হইবার নহে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই শাশ্বত বাণী সার্থক করিবার জন্য তাঁহাকে সুজলা সুফলা বাঙ্গালার বুকে আবার অবতীর্ণ হইতেই হইবে। তাঁহার কর্ম্ম এখনও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। যৌবনে তিনি যে গান গাহিয়াছিলেন—"মোছ আঁখি, কাঁদিবার নহে, এই বিশাল প্রাঙ্গণ"—সেই সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে তাহার উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করিয়া দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা দেশকে ভালবাসিয়াছেন, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সিদ্ধির মন্দিরে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাঁহাদের আত্মা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

দেশবন্ধুর মৃন্ময় মূর্ত্তি
[ভাস্কর—ভি, কর্ম্মকার।

চিত্তরঞ্জন, তুমি আবার আসিবে, আবার সেবাব্রত লইয়া মায়ের পূজার আয়োজন করিবে, সেই শুভ দিনে তোমার দেশবাসী আবার তোমাকে লাভ করিয়া ধন্য হইবে—পবিত্র হইবে। মহাদেবীর পূজাবসানে—বিসর্জ্জনের সময় যাজ্ঞিক পুরোহিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় -"পুনরাগমনায় চ।" দেশবাসীও আজ তোমার উদ্দেশ্যে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছে—তুমি আবার এস—পুনরাগমনায় চ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, পতিত মানব এবং পতিত জাতির সম্মুখে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহারা এ বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করেন যে "Reformers are born much ahead of their time," সুতরাং যুগাবতার বা সংস্কারকগণ যে তাঁহাদিগের সমসাময়িক জনগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কুত্রাপিও মতভেদ নাই। এই শ্রেষ্ঠ এবং বরেণ্যগণকে পূজা করা যদি কুসংস্কার হয়, তবে তেমন কুসংস্কার জগতে স্থায়ী হওয়া কোনরূপেই অবাঞ্ছনীয় নহে। হিন্দুদিগের পুরাণ ও ইতিহাসে বর্ণিত অবতারদিগের কার্য্যকলাপ অতিরঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, চক্ষুর সম্মুখে যে সমস্ত আদর্শ মানব বা Reformerদিগকে আমরা দেখিয়াছি বা দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগের মজ্জাগত এই প্রকৃতির প্ররোচনায় আমরা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার জ্ঞানে পূজা করিতেছি, মহাত্মা গন্ধীর দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতেছি এবং আজ চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। ইহা কুসংস্কার নহে, ইহার মধ্যে অসত্য কিছুই নাই এবং এরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাইয়া কোন কারণে কাহারও সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই।

হিন্দুদিগের অবতারগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিভিন্ন অবতার পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন অবতার বা Reformerকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পুরাণ ও ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই সমস্ত সংগ্রামে সমসাময়িক অনেকে যুগাবতারদিগের মহান্ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে এবং উত্তরকালে এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে ইতিহাসে মসীবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে। ইতিহাসলেখকগণ কিন্তু এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের একটা বিশেষ সুবিধার দিকে তেমন লক্ষ্য রাখেন নাই এবং তাহা এই যে, যুগাবতার বা Reformerএর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে যাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহাকে জানিবার যেমন সুযোগ পাইয়াছিল, একান্ত অনুরক্ত ভক্তের পক্ষেও তেমন সুযোগ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান যুগের অবতার বা Reformer চিত্তরঞ্জন যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা সফল করিবার জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মহারথ তাঁহার সাহায্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহারা নমস্য। যাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে এবং উত্তরকালে মসীবর্ণে চিত্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও একান্ত সত্যের অনুরোধেই বলিতে হইতেছে যে, এই অধম লেখক তাঁহাদের অন্যতম। যুগাবতার চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যের নিরর্থকতা এবং তাঁহার আদর্শের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গত ৪ বৎসর কাল আমি সংবাদপত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিয়াছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য গত অষ্টাদশ মাস কাল আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছি, সুতরাং সর্ব্বহিসাবেই আমি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। কাযেই তাঁহাকে জানিবার জন্য এবং তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য আমাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। এ জন্য জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে আমার সমব্যবসায়ীরা যে আমাকে কত ধিক্কার দিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সমস্ত ঘৃণা ও ধিক্কার মস্তকে ধারণ করিয়া আজ কিন্তু এই মনে করিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি যে, তাঁহাকে জানিবার এবং তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

বাহিরের অনেকের বিশ্বাস যে, আমি সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতাম এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার বিপক্ষে কার্য্য করিতাম বলিয়া চিত্তরঞ্জন আমাকে ঘৃণা করিতেন। এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা

চিত্তরঞ্জনের কোন সংবাদই রাখিতেন না এবং তাঁহাকে আদৌ চিনিতেন না। প্রতিপক্ষের সহিত সংগ্রামকালে চিত্তরঞ্জন বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিতই আবার ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। তিনি আমার সমবয়স্ক ছিলেন এবং বহুকাল যাবৎ তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় থাকিলেও, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে রাজনীতিক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে আমরা কেহই কাহাকেও ভালরূপে জানিতে পারি তিনি ক্রোধে দিশাহারা হইতেন, আবার কখনও দেখিতাম, দেশমাতৃকার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-কল্পনায় তাঁহার বদন-মণ্ডলে অপূর্ব্ব প্রসন্নতা বিরাজ করিত। তাঁহার কর্ম্মজীবনের চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা পোষণ করিতে শিখিয়াছি, তাহা আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে, এমন আশা করি। আমার সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং আমাকে তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তৎসম্বন্ধে দুই

সপরিবারে মিঃ এস, আর, দাশ ও মিঃ জে, আর, দাশ

নাই। আমি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিতাম, আর তিনি আমাকে জানিতে পারিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিতেন। এমন কত দিন গিয়াছে যে, কাউন্সিলে তিনি তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া এবং আমি তাঁহার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, কার্য্যসমাপনান্তে 'লরীতে' বসিয়া নিভৃতে দেশের কথা আলোচনা করিয়াছি। এরূপ আলোচনার সময় দেশের কথা বলিতে বলিতে কখনও তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইত, কখনও একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার এই তর্পণ শেষ করিব।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবার পর হইতেই দ্বৈত-শাসন শেষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। স্বরাজ্য এবং স্বতন্ত্র দল একত্র হইলেও majority হইল না দেখিয়া তিনি ব্যবস্থাপক সভার অপরাপর সভ্যদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা করেন। এই সময় এক দিন তাঁহার সহিত আমার এ বিষয়ে কিছু কথোপকথন

হয়। এই কথোপকথনের ফলে তিনি আমার Position ঠিক ভাবে বুঝিয়া লয়েন এবং পরে তিনি নিজে ত কখনই আমাকে তাঁহার মতসমর্থন করিতে কোনরূপ অনুরোধ করেন নাই, অধিকন্তু তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী কোন কর্ম্মী-কেও সেরূপ করিতে দেন নাই। ব্যবস্থাপক সভার একাধিক মনোনীত সভ্য আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বরাজ্য দল হইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ উপরোধ করা হই-য়াছে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সহিত কথোপকথনের পর আমাকে কেহ কখনও কোন অনুরোধ করেন নাই। চিত্তরঞ্জন নিজে ত্যাগী ছিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন, সকলের ত্যাগী হওয়া সম্ভব নহে, তিনি নিজে মহৎ ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি অপরকে জোর করিয়া মহৎ করিতে চাহিতেন না। দুর্ব্বলকে তিনি প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিতেন, কিন্তু কপটের প্রতি তাঁহার ভীষণ ঘৃণা ছিল। আমার বিশ্বাস যে, তিনি আমার সব কথা শুনিয়া বুঝিয়া-ছিলেন যে, আমি দুর্ব্বল এবং এই জন্যই বোধ হয়, আমাকে প্রসন্নচিত্তে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বার মন্ত্রীদিগের বেতন অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব স্বরাজ্য দলের যে সভ্য উপস্থিত করেন, তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পূর্ব্বেই আমি দেখিয়াছিলাম। এই বক্তৃতার একটা অংশে কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে ব্যক্তিগত-ভাবে তীব্রতার সহিত আক্রমণ করা হইয়াছিল। ঐ অংশটা আমার নিকট ভাল বোধ না হওয়ায়, আমি তাহা বাদ দিবার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করি। তখন তিনি বলেন যে, বক্তৃতাটি দলের অনেকেই দেখিয়াছেন এবং স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দেখিয়া দিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় বাদ দেওয়া অসম্ভব। সভা অধিবেশনের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এ ঘটনা হয়। বক্তা চলিয়া গেলেও আমি নিরাশ হইলাম না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে আমি ব্যবস্থাপক সভা-গৃহে পৌছিয়াই চিত্তরঞ্জনকে আমার নিবেদন জানাই-লাম। তিনি একটু হাসিয়া বক্তাকে ডাকাইয়া লিখিত বক্তৃ-তাটি হাতে লইলেন এবং পেন্সিল হাতে করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আমি স্থানটি দেখাইয়া দিলাম—তিনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে সমস্তটার উপর দিয়া পেন্সিল চালাইয়া দিলেন। আমার তখন স্বতঃই মনে হইল—"ভগবান্, এ মহ-ত্বের পরিমাণ করিবার শক্তিও আমাদিগকে দিলেন না!"

ঐ সময়ই আরও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, তৃতীয় বার মন্ত্রীদিগের বেতন অগ্রাহ্য করাই ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনের শেষ কায। এই কায সম্পন্ন করিতে যাইয়া তিনি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভিতরের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পূর্ব্ব দুই বার অপেক্ষা এ বারে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাহিরের লোক ত মনে করিয়া ছিলই, তিনি স্বয়ংও আমাকে একাধিকবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। বেতন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দ্বৈত-শাসন লোপ করা অসাধ্য হইবে মনে করিয়া তাঁহার দলস্থ কেহ কেহ স্বতন্ত্র দলের প্রস্তাবের উপর ঝোঁক দিতে চাহিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, স্বতন্ত্র দল দ্বৈতশাসন লোপ করি-বার পক্ষপাতী নহেন, এ জন্য তাঁহারা মন্ত্রীদিগের বেতন হইতে সামান্য কিছু কর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাজা মন্মথনাথ রায় ও নবাব নবাবালী চৌধুরী মন্ত্রী থাকিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু দ্বৈত-শাসন লোপ পাইত না। বলা বাহুল্য, ইহা স্বরাজ্য দলের নীতি নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কিছু বলিবার নাই। কাযেই স্বতন্ত্র দলের প্রস্তাব গৃহীত হইলে চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। মন্ত্রী-দিগের বেতন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া যথালাভ নীতির অনুসরণ করিতে কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময় চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। স্বতন্ত্র দলের প্রস্তাব যাহাতে গৃহীত হয়, তাহা করিবার জন্য তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, এমন কথা আমি কখনও শুনি নাই, তবে অগত্যা এই দিকে তিনি ঝুঁকিবেন, এমন আমাদের মনে হইয়াছিল। আমি স্বরাজ্য দলের প্রতিদ্বন্দী হইলেও, ঐ দলের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হয়, ইহা ভাল মনে করিতাম না, এ জন্য আমি চিত্ত-রঞ্জনকে বলি যে, মন্ত্রীদিগের বেতন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দ্বৈতশাসন লোপ করা অসম্ভব হইলেও, তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র দলের প্রস্তাব সমর্থন করা অন্যায় হইবে।

তিনি তখন কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু আমার নিবেদন যে, তাঁহাকে বিশেষভাবে চিন্তাকুল করিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার দলের এক জন অক্লান্ত কর্ম্মীকেও আমি এ কথা বলি এবং স্বরাজ্য দলের মূল নীতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা করিতে অনুরোধ করি। পরদিন ঐ কর্ম্মী আমাকে জানান যে, চিত্তরঞ্জন দৃঢ় হইয়াছেন এবং কিছুতেই মূলনীতির বিরুদ্ধে কায করিবেন না। কাউন্সিলে পৌঁছিলে চিত্তরঞ্জন আমাকে ডাকিয়া ঐ কথাই বলিলেন, তখন আর একবার আমার মনে হইল যে, তিনি কত মহৎ।

কাউন্সিলের কায এবং ফরওয়ার্ড পরিচালনা বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক সময় আমার অনেক কথা হইয়াছে এবং সকল সময়ই দেখিয়াছি যে, কোন সময়েই তিনি তাঁহার অনুকৃত মূলনীতি হইতে এক ইঞ্চি দূরে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কাউন্সিলে বাধাদান নীতি অবলম্বন করিয়া এবং বিশেষভাবে দ্বৈতশাসন লোপ করিয়া তিনি কি পাইতে আশা করেন, তাহা তাঁহার নিজ মুখ হইতে পরিষ্কাররূপে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আজ সে কথা বলিয়া কোন্দল সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি না। তাঁহার বাধাদান নীতি আমি কোন কালে সমর্থন করি নাই, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার প্রতি আমি কখনও বিশ্বাস হারাই নাই। কাউন্সিল বিতণ্ডায় অনেকে তাঁহার প্রতি অনেক বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা করি নাই।

দুর্গামোহন দাশের প্রথমা পত্নী ব্রহ্মময়ী

তৃতীয় বার মন্ত্রীদিগের বেতন অগ্রাহ্য হইলে বঙ্গদেশ হইতে দ্বৈতশাসন লোপ পাইবে, তাহা অনেকে বিশ্বাস না করিলেও আমি নিশ্চিত জানিতাম। ঐ জন্য একমাত্র ঐ সময়ই আমি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ঐ

বক্তৃতায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইতেই চিত্ত-রঞ্জনের প্রতি আমার মনের ভাব প্রকাশ পাইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার রিপোর্টের ১৭শ খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যার ২৩০ পৃষ্ঠায় আমার বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে, তাহার শেষাংশে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম,—

I know all about his courage and conviction. I know that his shoulders are broad enough to bear the responsibility that he is trying to undertake, yet I ask him to consider the question seriously once again. He must remember that he is taking upon himself the task of shaping the destiny of the nation in a way quite different from the one which had hitherto been advocated by the elders of the nation. We very plainly say that we have no faith in the destructive policy of Mr. Das and so I entirely dissociate myself with the views that have been put forward by those who want the salaries of the ministers to be refused. If Mr. Das carries the day, the responsibility of shaping the distiny of the nation will be entirely his and he will never be forgiven by the nation if he fails to give it what he is promising to give by the abolition of dyarchy.

তিনি যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আর দিয়া যাইতে পারিলেন না—তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াই তাঁহাকে যাইতে হইল—কে সে কার্য্য সমাপ্ত করিবে?

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ।

আদর্শ বলি

আদি ইস্‌লাম যুগের খাঁটি মোস্‌লেম হজরৎ ইব্রাহিম খলিল উল্লাহকে আদেশ হইয়াছিল, "তোমার প্রাণপ্রিয় জীব কোরবাণি (বলি) দাও।" উপর্য্যুপরি আদেশ পাইয়াও যখন খলিল আদেশের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, তখন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল বলিলেন, "তোমার প্রাণ-পুত্তলী ইস্মাইলকে মঙ্গলময়ের নামে কোরবাণি দাও।"

হর্ষ-পুলকিত ও বিষাদ-ম্লান চিত্তে অতি সন্তর্পণে খলিল, পুত্র ইস্মাইলকে ও ইস্মাইল-জননী দেবী হাজেরাকে আদেশ জ্ঞাত করিলেন। মাতাপুত্র করুণাময়ের অসীম করুণার ও মহান্ মঙ্গলেচ্ছার গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং শীঘ্র আদেশ পালন করিবার জন্ত খলিলকে উৎসাহিত করিলেন। ভক্তের স্ব-হস্ত-উৎপাটিত হৃৎপিণ্ড অর্ঘ্যে সন্তুষ্ট হইয়া করুণাময় ইস্মাইলকে দীর্ঘজীবন ও জবেউল্লাহ উপাধিদানে সম্মানিত করিলেন।

তদবধি মোসলেম জাতি উক্ত চান্দ্র মাসে কোরবাণির (বলির) অভিনয় করিয়া এবং দয়ালের প্রিয় পাত্ররা আত্মবলিদানে জাতির পাপকালিমা ক্ষালন করিয়া আসিতেছেন।

শত শতাব্দী পরে আবার বলির আদেশ আসিয়াছে। রত্নগর্ভা দেশমাতৃকা চণ্ডনীতির যূপকাষ্ঠে কর্ম্মী জাতির মুক্তিলাভাশায় মুক্তি-উপাসক অগণিত পুত্র-রত্ন বলি দিতেছেন! তাই আজ বঙ্গ গগনের মধ্যাহ্ন তপন, বীরপ্রসূ ভারতমাতার দানবীর, ত্যাগী পুত্র, দেশবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু চিত্তরঞ্জন জাতির মুক্তির কামনায় ত্যাগের ক্রুশ মঞ্চে আত্মবলি দিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়া গিয়াছেন।

শোকার্ত্ত দেশবাসী! তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, মাতৃপূজার আদর্শ পূজারীর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং সদিচ্ছা-সমার্জ্জনী দ্বারা দ্বেষ, হিংসা, দলাদলিরূপ জঞ্জাল পরিষ্কার ও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একতা-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কর। ইহাতেই তোমাদের নেতার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন, দেশমাতৃকার সেবা ও তোমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে এবং মঙ্গলময়ের বিরাট আশিস্‌রূপে জাতির মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা "স্বরাজ" আসিবে। (আমিন)

মিসেস্ এম্, রহমান।

দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই, সে সুকৃতি আমার ছিল না। আনুমানিক ৭ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার দুয়ারে এক দিন দাঁড়াইয়াছিলাম ভিক্ষাব্যপদেশে। তখনও দেশের লোক তাঁহাকে দেশবন্ধু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, কিন্তু সকলেই বেশ জানিত যে, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া ইঁহার নিকট হাত পাতিলে নিরাশ হইয়া ফিরিবার ভয় নাই। আমাদের গ্রামের এক ভদ্র লোক বহু দিন ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া হঠাৎ এক দিন মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। দিবারাত্র তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তন ত চলিতই, বিদেশ হইতে বহু ভক্তজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসবে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিগ্রহ স্থাপনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু টাকার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি গেলেন চিত্তরঞ্জনের নিকট টাকা চাহিতে, আর একা যাইতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ার জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, আমাকে ও আমার আর এক জন বন্ধুকেও যাইবার সময়ে ধরিয়া লইয়া গেলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য ও পিতামহ বরিশালে ওকালতী করিয়াছিলেন। দুর্গামোহন দাশের নিকট বরিশাল অনেক রকমে ঋণী। কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ চিহ্নস্বরূপ বরিশালবাসী বরিশালের 'পাবলিক লাইব্রেরী'-গৃহে দুর্গামোহন দাশের একখানি চিত্র টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমাদের একটা আইনসঙ্গত দাবী আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। জ্যেঠা মহাশয় যখন বরিশালের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তখন ভাইপো বরিশালের লোকদের সাধ মিটাইতে সাহায্য করিতে নিশ্চয়ই আইনতঃ বাধ্য। বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জনও ছিলেন মহাপ্রভুর পরম অনুরক্ত ভক্ত। যাহা হউক, তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে গেলাম, দেখা পাইতেও কোন বাধা হইল না। তিনি দ্বিপ্রহরে আপনার পাঠাগারে বিশ্রাম করিতেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া সুরভি তামাক টানিতেছিলেন। আমরা নমস্কার করিয়া তাঁহাকে আমাদের আর্জী জানাইলাম। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য তিনি ৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুসাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন দাশকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ঢাকায় একটি সাহিত্য-পরিষৎ আছে, এটি একটি স্বাধীন অনুষ্ঠান; কলিকাতার বড় পরিষদের শাখা নহে। চিত্তরঞ্জন এই পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বার্ষিক সভার সময় সকলের আগ্রহে তিনি ঢাকায় গেলেন; নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি সভাপতির কার্য্যও করিলেন। সেদিনকার সভায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছিল। আমরা খুব বড় একটা বক্তৃতা শুনিবার আশায় সভায় গিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন না, দিলেন পরিষদের ভাণ্ডারে ১ হাজার টাকা। কলিকাতার পরিষদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু ঢাকার গরীব পরিষদের পক্ষে ১ হাজার টাকা একটা কুবেরের ভাণ্ডার। তিনি দেশের সেবায় নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এই সকল ছোট দানে তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে মাত্র

ইহাতে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য আর কতটুকু বুঝা গিয়াছে ?

তৃতীয় বার যখন দেশবন্ধুকে দেখিলাম, তখন আর তিনি ব্যবহারাজীব নহেন, অঙ্গে তাঁহার সুচিক্কণ স্বচ্ছ বস্ত্রের চাদর পরিচ্ছদ নাই। আগের দিন বিকালবেলা এক দল অসহযোগী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও বাহির হইয়া আসিতে ডাকিয়াছিল, সে ডাকে কেহ সাড়া দেয় নাই। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় দস্তুরমত অবরুদ্ধ হইল। ভাইস চ্যান্সেলারেরও সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে কষ্ট হইয়াছিল। আমরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নীচে রাস্তায় সমবেত বিরাট জনতা দেখিতেছিলাম। আর দেখিতেছিলাম, মাঝে মাঝে চিত্তরঞ্জন তাহাদের কায দেখিয়া লইতেছিলেন; তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছিলেন। তাঁহার মৃদু বাক্য অত দূর হইতে শুনিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাঁহার মধুর হাস্য সেখান হইতেও স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী যখন বাঙ্গালার ছাত্রদিগকে বিদ্যালয় ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, তখন কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ডাকে তাহারা সুড় সুড় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, ভবিষ্যতের কথা ভাবিল না, লাভ-লোকসান হিসাব করিল না, অভিভাবকদিগের ভয়ে বিচলিত হইল না। চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগে তাহারা এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কিছু ভাবিবার অবসর আর সে দিন তাহাদের ছিল না। চিত্তরঞ্জন সে দিন বাঙ্গালার তরুণ হৃদয়ে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা সংক্রামিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সে দিনকার জয় এক হিসাবে স্থায়ী হয় নাই। যাহারা সে দিন স্কুল ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তাহারা আবার সুবোধ গোপালের মত স্কুলে ফিরিয়া গিয়াছে, কেহ হয় ত এক বৎসর দেরী করিয়াছে, কেহ হয় ত আরও বেশী। চিত্তরঞ্জনের অনুকরণে যাঁহারা আইনের ব্যবসায় ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের সঙ্কল্প বজায় রাখিতে পারেন নাই; আবার মামলার নথি বগলে করিয়া আদালতের নিষিদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সে দিনকার জয়ের গৌরব এতটুকুও ম্লান হয় নাই। যাহারা
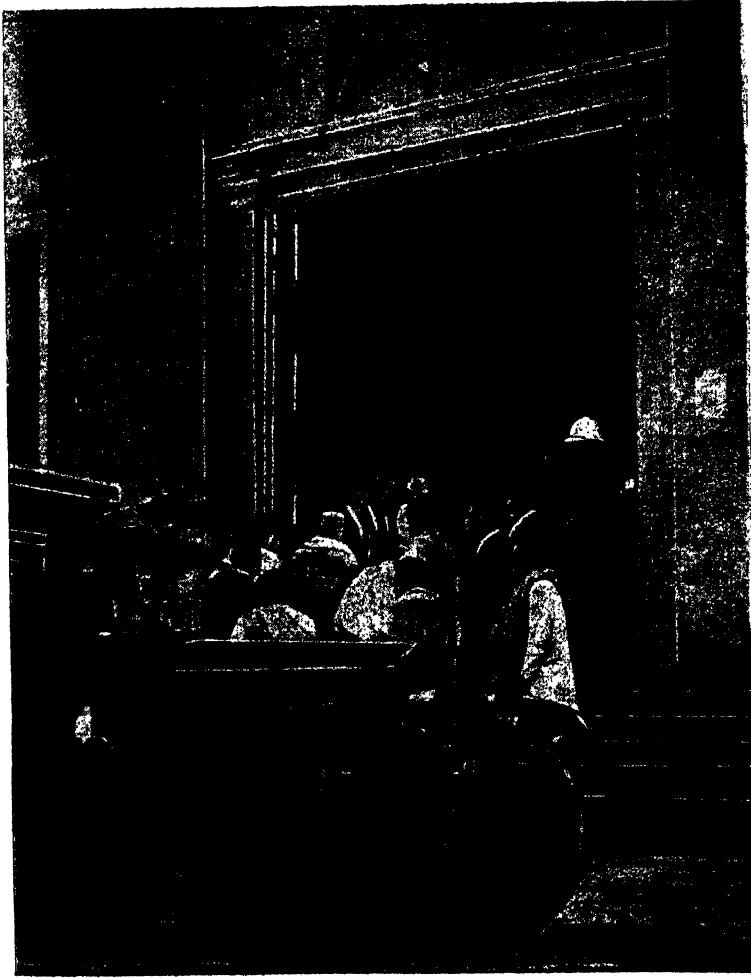
কাউন্সিলের জন্য ষ্ট্রেচারে বাহিত দেশবন্ধু

নিজেদের মন ভাল করিয়া জানিত না, সাময়িক উচ্ছ্বাসে যাহারা আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাহারা ধীরে ধীরে নিজেদের অভ্যস্ত নিরাপদ গণ্ডীতে আবার আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু যিনি এই মূকদিগকে বাচাল করিয়াছিলেন, যিনি এই পঙ্গুদিগকে গিরিলঙ্ঘনে উদ্যোগী করিয়াছিলেন, যাঁহার সাহসে, যাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার বালকরা ও যুবকরা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্যও একটা অহিংস সমরে ব্রতী হইয়াছিল, তাঁহার শক্তির, তাঁহার সাহসের, তাঁহার ত্যাগের পরিমাণ করিবে কে ?

চিত্তরঞ্জন যে প্রখর বুদ্ধিশক্তি ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে কথা বলিতে যাওয়াই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা যুক্তিবাদের লীলাভূমি বিলাতে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যুক্তি-তর্কের অবতরণ করাই ত তাঁহার ব্যবসায় ছিল। কিন্তু জীবনে ত তিনি কখনও যুক্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। আর তাহা করেন নাই বলিয়াই তিনি এত বড় হইয়াছিলেন। তিনি চলিতেন প্রাণের আবেগে, খেয়ালের ভরে, মুঠা মুঠা টাকা বিলাইতে তাঁহার এতটুকু দ্বিধা হয় নাই। তাই ব্যবসায়িক উন্নতির শিখরে পৌছিয়া চিরদিন সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াও তিনি দারিদ্র্য বরণ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। যখন দেশের কার্য্যে সম্পত্তি দিলেন, তখন নিজের জন্ম আর কিছুই রাখিলেন না। মনে পড়ে, চিত্তরঞ্জনের এই ত্যাগের স্তুতিতে যখন সমগ্র দেশ মুখর, তখন এক জন অতি হিসাবী সম্পাদক আক্ষেপ করিয়াছিলেন, যাহারা অনেক রোজগার করিয়া দান করে, তাহাদের সকলেই প্রশংসা করে, কিন্তু যাহারা অনেক রোজগার করিতে পারিত, কিন্তু করিল না, তাহাদের কথা কেহই মনে করে না। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ত্যাগমাত্রই সমান। কেন না, পরমহংস রামকৃষ্ণের ত্যাগের পরিমাণ সাংসারিক হিসাবে একটা পুরুতগিরি বা রাঁধুনীগিরিমাত্র—যাহার মূল্য টাকা-পয়সার হিসাবে ১৪ টাকা ২ আনা ৯ পাই হইতে পারে। গরীব রামকৃষ্ণকে কেন লোক ভক্তি করে, তাহা হয় ত হিসাবী সম্পাদক মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত ধনীর দুলালের ত্যাগ যে ভিক্ষুকের তথাকথিত ত্যাগের সঙ্গে লোকে সমান করিয়া দেখে না, ইহাই ত স্বাভাবিক। এই সহরের এক দল ভিখারী আছে—যাহাদের জন্ম রাস্তার ফুটপাথে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যাহারা নির্ব্বিকারচিত্তে ফুটপাথেই কাটাইয়া দেয়, তার পর এক দিন সেই ফুটপাথেই চক্ষু মুদিয়া এক বাস্তব, তাহাদের অভ্যস্ত সুখ-দুঃখের অতীত কোন এক লোকে চলিয়া যায়; রাখিয়া যায় ত একটা নেকড়ার পুঁটুলি, যাহার দিকে ভাল করিয়া নজর দিবার ইচ্ছা খেয়ালী কবি ব্যতীত কোন পথিকেরই হয় না। কিন্তু শুদ্ধোদনের সমৃদ্ধ প্রাসাদের বিলাসসম্ভার ত্যাগ করিয়া যদি কোন শাক্য দুলাল গভীর রজনীর গাঢ় অন্ধকারেও বিশ্বের হিতসাধনের চেষ্টার মহা অভিনিষ্ক্রমণ করেন, তবে তাহা প্রচারিত হইয়া যায় সমগ্র জগতে, দূর-দূরান্তর হইতে মুমুক্ষু নরনারী ছুটিয়া আসে সেই মহাত্যাগীর চরণপ্রান্তে নির্ব্বাণমন্ত্রের সন্ধানে। ইহাই বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম। যে হাত তুলিয়া বিদ্যার্থীকে কিছু দিল না, দরিদ্রের পাঠাগারে কিছু দিল না, সে হিসাবী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে, ব্যবসায়ে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে আরও বেশী রোজগার করিলে চিত্তরঞ্জনের মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবা করিতে পারিত কি না, সে হিসাব করিয়া কেহ সময়ের অপব্যয় করে না। চিত্তরঞ্জন ভাবের আবেগে চলিয়াছেন, আইনের ব্যবসায় যেমন মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রজনীকান্তের বাণী সেবার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই, তেমনই মক্কেলের কোলাহল চিত্তরঞ্জনের কবিচিত্তকেও পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ 'মালঞ্চ', 'সাগর-সঙ্গীত', 'কিশোর-কিশোরী' ও 'নারায়ণ।'

তাঁহার জীবনটাই কি একটা মহাকাব্য নহে ? এমন ভাবে দেশের সেবায় সর্ব্বস্ব বিলাইয়া হাসিতে হাসিতে লক্ষ নরনারীর বক্ষোমথিত ক্রন্দনের মধ্যে পরলোকে গমন, ইহার অপেক্ষা সুন্দর ও মহান্ কি আর কিছু আছে ? কোন্ মহাকাব্য ইহা অপেক্ষা মধুর ?

চিত্তরঞ্জনের জন্মভূমি বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দু

নরপতিগণের চরম আশ্রয় বিক্রমপুর। তিনি খাঁটি বাঙ্গাল। বাঙ্গালের দোষগুণগুলি চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে যেমন বিকসিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের আর কোন নেতার চরিত্রে তাহা তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। মানুষমাত্রের ত্রুটি আছে—দুর্ব্বলতা আছে। কেহ তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে, কেহ করে না। চিত্তরঞ্জন কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, যাহাতে লোকনিন্দা হইতে পারিত, তাহাও নহে। রাজরোষ উপেক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ, রাজার দেওয়া কঠোর শাস্তির জ্বালা প্রজার দেওয়া ফুলের মালায় শীতল হয়। কিন্তু জনসাধারণের নিন্দার বোঝা হেলায় যিনি মাথায় ধারণ করিতে পারেন, তিনিই ত খাঁটি সাহসী আসল বীর। রাজার ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি হত্যাকারী গোপীনাথের স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ্য প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দা ও রোষের ভয় উপেক্ষা করিয়া তিনি মুসলমানদিগের সহিত Pact করিয়াছিলেন, নিজের হিতের জন্য নহে—দেশের হিতের জন্য। এখানেও তিনি যুক্তি অপেক্ষা প্রাণের উদারতার দ্বারাই বেশী পরিচালিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম পিতার পুত্র, বিলাতপ্রত্যাগত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিত্তরঞ্জন আবার যে হিন্দুসমাজের কোলে ফিরিয়া আসিলেন, তাহাতে কি আমরা তাঁহার হৃদয়ের ভাবপ্রবণতার পরিচয় পাই না? এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে কে আর মহাপ্রভুর প্রেমের আহ্বানে সাড়া দেয়? চিত্তরঞ্জন দিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহার চিত্ত যুক্তি-তর্কের ধার ধারিত না, সরল বিশ্বাসের পথে তিনি সহজেই চলিতে পারিতেন। যুক্তিবাদের খোলস তিনি ছাড়িয়া আসিতেন, তাঁহার ব্যারিষ্টারীর গাউনের সহিত হাইকোর্টের কামরায়। আর এই তাঁহার জীবনের শেষ কয় দিন, এই যে ইজি-চেয়ারে শুইয়া আইন-মজলিসে গেলেন,—সরকারের স্বেচ্ছাচার নীতির প্রতিবাদ করিতে, এই যে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্র দেশের কাযে অসুস্থ শরীরে দুরূহ পরিশ্রম করিতেছিলেন, তিনি কি ইহার পরিণাম জানিতেন না? তিনি কি জানিতেন না যে, তাঁহার অদম্য আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শক্তি ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহে নাই? সবই জানিতেন, তিনি চলিয়া গেলে দেশের যে কি দুর্গতি হইবে, তাহাও জানিতেন। কিন্তু বাঙ্গাল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কায করিতে পারে না, প্রাণের আবেগে ছুটিয়া চলে। যত দিন দেহে একটুও শক্তি ছিল, চিত্তরঞ্জন দেশের জন্য খাটিয়া গেলেন, যে বিশ্রাম এখানে পান নাই, এখন তাঁহার উপাস্য ভগবানের কোলে তাহা মিলিয়াছে।

এক বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে এইরূপ অকস্মাৎ আত্মীয়স্বজনবিহীন পাটলিপুত্রনগরে বাঙ্গালার ব্যাঘ্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর চক্ষুজল শুকাইতে না শুকাইতে তেমনই অকস্মাৎ সার্থকনামা চিত্তরঞ্জনও বাঙ্গালার চিত্ত অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন! বাঙ্গালার গগন হইতে দুইটি মহা-জ্যোতিষ্ক অন্তর্হিত হইল, এখন তারকার স্তিমিত আলোকে রজনীর গভীর অন্ধকারে আমাদিগকে পথ চলিতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

মৃত্যুহীন

"মৃত্যু নিল তুচ্ছ দেহ,
শ্মশানের এক মুঠো ছাই.
চিত্ত বেঁচে চিত্ত-মাঝে
মৃত্যু তুমি নাই, নাই, নাই।

—কুমারী চপলা বিশ্বাস।

স্মৃতি-রক্ষা
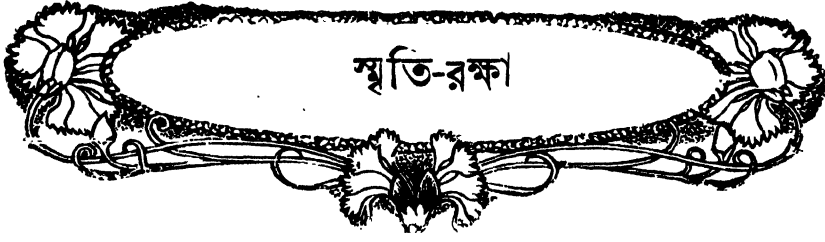
চিত্তরঞ্জন ও আমি বিদ্যালয়ে সতীর্থ ছিলাম। আমরা উভয়েই আইন ব্যবসায়ে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করি এবং জীবন-সংগ্রামে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। কিন্তু ঈর্ষ্যায় বা পরস্পরকে বুঝিবার ভুলে আমাদের বন্ধুত্ব এক দিনের জন্যও মলিন হয় নাই। ব্যবসায়-ক্ষেত্রের বাহিরে আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তাঁহার মৃত্যু অতর্কিত বলিয়া এমনই শোচনীয় যে, যিনি এত দিন আমাদের জাতীয় জীবনে এত দেদীপ্যমান ছিলেন, তিনি সত্য সত্যই চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমি যেন তাহা উপলব্ধি করিতেই পারিতেছি না। জাতীয় জীবনে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার শবানুগমনের দৃশ্য যে কোন নৃপতির পক্ষেও গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি জাতির কত প্রিয় ছিলেন।

আমি তাঁহার কয়টি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিব। আমি অল্পবয়সেই তাঁহার একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম—সে তাঁহার স্বভাবের আকুলতা; তাঁহার পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসায়। জীবনের আনন্দে ও উদ্দেশ্যসাধনে তাঁহার স্বভাবের এই আকুলতা প্রকাশ হইত। সেই অল্পবয়সেই আমি তাঁহার চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিয়াছিলাম—সে আরব্ধ কার্য্যসাধনে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পথ যতই কেন দীর্ঘ ও বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত হউক না—কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। দুর্ভাগ্যের রোষ বা সৌভাগ্যের কৃপাবর্ষণ কিছুতেই তাঁহার গতি মন্থর হইত না—তিনি দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া জয় লাভ করিতেন।

তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য—সঙ্কীর্ণতা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থানলাভ করিবেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে বড় বড় মোকর্দ্দমা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। যে কাযে তিনি একবার হাত দিতেন—তাহাতে আপনার অত্যন্ত মনোযোগ দিতে বিরত হইতেন না।

আর একটা কথা—যুদ্ধে তিনি কখন অনাচার অবলম্বন করিতেন না। তিনি প্রবলবেগে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেন; কিন্তু তিনি তরবার ব্যবহার করিতেন, গুপ্তঘাতুকের ঘৃণ্য ছুরিকা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বন্ধুত্বে ঘনিষ্ঠতাই দেখাইতেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যবহারে উদারতার পরিচয় দেখাইতেন।

অতিমাত্রায় উদার, মহত্ত্বের অনুসরণে আগ্রহশীল, আন্তরিকতায় ওতপ্রোত, মহৎ, দেশসেবায় উৎসৃষ্ট-জীবন—আমার প্রিয় বন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন তাঁহার প্রতাপ-সূর্য্য মধ্যাকাশে সমাসীন, সেই সময় দেশের উপর অক্ষয় জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া অকালে অস্তমিত হইয়াছেন। আজ আমরা সেই আগ্রহশীল, আন্তরিকতাপূর্ণ, বিরাট পুরুষের শোকে মুহ্যমান।

শ্রীবিনোদচন্দ্র মিত্র।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল-বিয়োগে দেশের মধ্যে একটা বিপুল ব্যথা ও বেদনা ঘনীভূত হইয়াছে। তাহারই প্রেরণায় দেশের সর্ব্বত্র বিরাট জনতা সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। বিনামেঘে এই বজ্রপাতের আঘাতে দেশবাসীর হৃদয়ে একটা নৈরাশ্য ও ব্যাকুলতার ভাব লক্ষিত হইতেছে। অনেকের মধ্যে আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, বুঝি বা দেশবন্ধুর জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হইবে না, বুঝি বা আমাদের এই ঐকান্তিক স্বরাজসাধনা ব্যর্থতায় অবসিত হইবে, বুঝি বা কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় আমাদের জাতীয় তরী বিপ্লুত হইবে। এই অবসাদ ও নিরাশার ঘনান্ধকারমধ্যে আমি আজ একটু আশার আলোকসম্পাত করিতে চাই।—এই উদ্দেশ্যে আমি পাঠককে একবার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে 'আনন্দমঠে' প্রবেশ করিতে বলি। চাহিয়া দেখুন, নিবিড় অরণ্য,—পথশূন্য, শব্দশূন্য, ছিদ্রশূন্য, বিরামশূন্য, বিরাট্ অরণ্য। এই নিবিড় নীরব নিস্পন্দ অরণ্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধে কেবল অন্ধকার, কেবল তমঃ; তমের অন্তরে বাহিরে তমঃ, যেমন সেই তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আনন্দমঠের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ একাকী গভীর ধ্যানমগ্ন। সহসা সেই স্তিমিত নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" সে ধ্বনির কোন প্রতিধ্বনি হইল না—সে প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। আবার সেই প্রশ্ন—সেই নিরুত্তর। তৃতীয় বার প্রশ্ন হইল—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' তেমনই উত্তর হইল—'তোমার পণ কি?' 'পণ? পণ আমার জীবন।' 'জীবন? জীবন অতি তুচ্ছ?' 'আর কি পণ? আর কি আছে? আর কি দিব?' তখন গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হইল, 'সর্ব্বস্ব।' দেশবন্ধু দেশের জন্য এই সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দেশের সেবা একটা অবসরের বিনোদন ছিল না; তাঁহার মন্ত্র ছিল,—'তোমায় নিশিদিন আমি ভালবাসিব।' এই জন্য তিনি সর্ব্বস্ব দেশকে নিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন,—এই অপূর্ব্ব ত্যাগের মহিমায় তাঁহার শেষ জীবন মণ্ডিত হইয়াছিল। এই জন্য আজ তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে সমাসীন হইয়াছেন। তাঁহার এ আসন মহার্ঘ আসন, তাঁহার এই ত্যাগ অতি বরণীয় ত্যাগ। এই ত্যাগ তাঁহাকে অমর করিয়াছে। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বম্ আনশুঃ।'

যদি কোন দিন এই ধিক্কৃত, নির্য্যাতিত, অধঃপতিত দেশে স্বরাজের উচ্চ সৌধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ভিত্তি-প্রস্তর হইবে এই ত্যাগ। এই বিপুল ত্যাগ কখনই ব্যর্থ যাইবে না। এই ত্যাগের বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ফলিত হইবেই। ঐ ত্যাগের মূল হইতে যে প্রকাণ্ড মহীরুহ উত্থিত হইবে, তাহার শীতল ছায়ায় আমাদের জাতি শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিবে। ঐ অটল ভিত্তির উপরে অচিরে স্বরাজমন্দির গঠিত হইবে, তাহার মধ্যে আমরা দেশমাতৃকার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিব এবং সেই সুজলা, সুফলা, কমলা, অমলা, অতুলা, বহুবলধারিণী, রিপুদলবারিণী, জনমনোহারিণী জননীকে বন্দনা করিয়া ত্রিশ কোটি মিলিত কণ্ঠে বলিব—'বন্দে মাতরম্!'

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

চিত্তরঞ্জন বিয়োগে

শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গজননীর অঞ্চল শূন্য করিয়া অকালে দেশবন্ধু চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি চিরদিন পৃথিবীতে জাগরূক থাকিবে। দেখিতে দেখিতে ২০ বৎসর কাটিয়া গেল, যখন 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রথম তাঁহার চরিতকথা এবং চিত্র বাহির হয়, সেই সময় স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় চিত্তরঞ্জনের ফটোর জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। এই সূত্রে প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হয়। মাণিকতলার বোমার মামলায় আসামীগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তিনি নিঃস্বার্থভাবে নির্ভীকচিত্তে যেরূপ মোকর্দ্দমা চালাইয়াছিলেন, তাহাতেই দেশবাসিগণের কাছে তাঁহার প্রথম পরিচয় ফুটিয়া উঠে। দেশমাতৃকার সুসন্তান চিত্তরঞ্জনের প্রতি সেই সময় হইতে কিরূপ একটা টান—কিরূপ একটা ভালবাসা আপনা হইতেই জন্মিয়া পড়ে। প্রিয়দর্শন চিত্তরঞ্জন নাই, এ কথা বলিলে যেন গালি দেওয়া হয়। তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে, হাইকোর্টের চেম্বারে বা অন্য যে কোন সভাসমিতিতে দেখা হইয়াছে, তাঁহার মিষ্ট বিনয়সম্ভাষণে হৃদয় আপনা হইতে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়ের সময় যখন অনেকেই গৃহহীন হইয়া গাছতলায় বসিয়াছিলেন, তখন চিত্তরঞ্জন অগ্রণী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের ব্যাপারে অনেকেই জানেন, কৃত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি সেই ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। হাটখোলা দত্তবাড়ীতে গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে একটি মহতী সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। সভায় বহু অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, দেশবন্ধু পরে সভায় আসেন, দেশবন্ধুর যুক্তি ও তর্কে অধ্যাপকগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। যখন তিনি মহাত্মার অসহযোগব্রত গ্রহণ করেন, তখন সকলেই তাঁহার অসামান্য ত্যাগে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। জগদ্বরেণ্য চিত্তরঞ্জন আজ কোন্ অজানিত অনন্ত ধামে অবস্থান করিতেছেন, জানি না, এখনও তাঁহার ব্রত উদ্যাপিত হয় নাই, আবার তাঁহাকে মর্ত্তধামে শীঘ্রই আসিতে হইবে। কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাঁহার মোকর্দ্দমা প্রত্যহই দেখিতে যাইতাম, তাঁহার সেই চির-হাস্যবদন—সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতাম।

দেশবন্ধুর এক জন পুরাতন কেরাণীর সহিত সাক্ষাতে তাঁহার গুপ্তদানের অনেক কথা শুনিয়াছি। একবার তিনি ময়মনসিংহে কোন মোকর্দ্দমায় গিয়াছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি পুত্রের উপনয়ন দিবার ক্ষমতা নাই, এই কথা বলায় দেশবন্ধু বলেন যে, উপনয়নে কত টাকা খরচ পড়িবে, সে ব্যক্তি বলেন, ৫ শত টাকা খরচ পড়িবে। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ উক্ত টাকার একখানি চেক দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার কোন ডাক্তারের কাছে শুনিয়াছি যে, চিত্তরঞ্জন তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া খামের মধ্যে তাঁহাকে বেশী টাকার একখানি চেক পুরিয়া দিয়া বলেন, এই পত্রখানি বাড়ীতে গিয়া খুলিবেন। তাঁহার নিকট প্রত্যাশী হইয়া কাহাকেও কখন রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয় নাই। তিনি গুপ্তভাবে দান করিতেন, তাঁহার দানে জয়ঢক্কা বাজিত না।

দীনের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, দরিদ্রের অবলম্বন চিত্তরঞ্জন আজ নাই! তাঁহার জন্য শুধু বাঙ্গালী নহে, কেবল ভারত নহে, সমগ্র পৃথিবী শোকাচ্ছন্ন, সকল স্থান হইতেই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।

দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী ও পুত্রের নিকট কত টেলিগ্রাম, কত পত্র যে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় বাঙ্গালার চির-দুর্দ্দিন। দেশমাতার সুসন্তান একনিষ্ঠ সাধক চিত্তরঞ্জন নশ্বর

দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য সকলের কি আগ্রহ, কি কষ্টস্বীকার! ৪ঠা আষাঢ় প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখ হইতে হারিসন রোড ধরিয়া কলেজ ষ্ট্রীট ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত সকল রাস্তায় কি জন-সমুদ্র, জীবনে এ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—আর দেখিতে পাইব না। দেশবন্ধুর প্রতি দেশের লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত গোঁড়া হিন্দুকে খালি পায়ে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়াছি।

চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইতে পারে না। দেশের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়া তিনি ভিখারী সাজিয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে দেশবন্ধু বক্তৃতায় এক স্থলে বলিয়াছেন—"আমার যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, আমি এই কার্য্যসাধনের জন্য তাহাই প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কায করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে—এই বাঙ্গালা দেশেই জন্মগ্রহণ করিব, আবার আমার দেশের জন্য কায করিব, আবার চলিয়া যাইব, আবার আসিব, এইরূপে যত দিন না আমার মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে, আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, তত দিন এই ভাবেই এখানে কায করিতে আসিব।"

তাঁহার হৃদয় বড়ই কোমল ছিল, পরের দুঃখ-কষ্টে গলিয়া যাইত। স্বদেশপ্রীতির মোহন মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন বীর সাধক ছিলেন, কোন বিঘ্ন-বাধা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। স্বরাজসাধনায় যখন তাঁহার ডাক পড়ে, তিনি জাতীয় যজ্ঞে মহাত্মার নির্দ্দেশে যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর" লোকের স্মৃতিপথে থাকিবে। দেশবাসী যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভগবানের দয়া না থাকিলে মৃত্যুতে এত জাঁকজমক হইত না। বোধ হয়, এই কারণেই দার্জ্জিলিং-শৈলে দেশবন্ধুর মৃত্যু, দুই দিন ধরিয়া লোকের আগ্রহ, উৎসাহ, লোকের ভীড়। যাও কর্ম্মবীর! অমরধামে চলিয়া যাও, সে স্থান জন্ম-মৃত্যু-জরার অতীত। ভারতের ইতিহাসে তোমার নাম চিরদেদীপ্যমান থাকিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী।

তিরোভাব

বাঙ্গালার গৌরব-রবি চির-অস্তমিত, বিনামেঘে বঙ্গভূমিতে বজ্রপাত হইয়াছে! সমগ্র জাতি আজ শোক-সাগরে মগ্ন। অবরোধবাসিনী বন্দিনী আমি, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক দেশবন্ধুকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, দেখিতে গিয়াছিলাম তাঁহার শ্মশান-যাত্রার হৃদয়ভেদী দৃশ্য।

সহস্র সহস্র দেশবাসীর নীরব-বিলাপে, তাহাদের বুককাটা দীর্ঘশ্বাসে ও ভারতমাতার রোদনোচ্ছ্বাসে আকাশ-বাতাস আলোড়িত দেখিয়া প্রকৃতিদেবী শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়াছিলেন! গগনে, পবনে মহাপ্রস্থানের মহাশূন্যতা; দ্বেষ, হিংসা, দলাদলির স্থলে বাঙ্গালীর প্রাণে মর্ম্মভেদী হাহাকার !!

এ সম্বন্ধে যে সকল মুসলমান ভ্রাতার সহিত আলোচনা হইয়াছে, তাঁহাদের কেহ বলিতেছেন, "আমি ভ্রাতৃহীন হইয়াছি," কেহ বলিতেছেন, "এত দিনে আমি পিতৃহীন হইলাম," "আমাদের ব্যথার ব্যথী ছাড়িয়া গিয়াছেন!" তবে না কি দেশবন্ধু মুসলমানদের ব্যথার ব্যথী ছিলেন না, তবে না কি মুসলমানদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তিনি পান নাই? এ নিন্দা সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলক।

করুণাময় এলাহি! বাঙ্গালীর কি পাপে তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধুকে, কোন্ সাধকের সাধনার ত্রুটিতে বঙ্গের সাধকশ্রেষ্ঠকে, কাহার অভিশাপে বঙ্গজননীর আদর্শ পুত্ররত্নকে অসময়ে ডাকিয়া লইলে? সাধকশ্রেষ্ঠ যে সাধনমার্গের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার বিপুল শক্তি ও সেই সাধনার সিদ্ধি লাভ করিবার মহান্ মন্ত্রে দীক্ষা দিবার মহদুদ্দেশেই বুঝি ডাকিয়া লইয়াছ?

দেশপূজ্য দেশবন্ধু! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ত্যাগমন্ত্রে দেশবাসী দীক্ষিত হউক, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহারা দ্বেষ-হিংসা-দলাদলি ভুলিয়া যাউক, তোমার পুনরাবির্ভাবের পথ, একতার্ঘ্য গড়িয়া তুলুক। তোমার সাধনার সিদ্ধিরূপে স্বরাজ-মহীরুহে মুক্তি-ফল ফলিয়া উঠুক। (আমিন)

মহমুদা খাতুন।
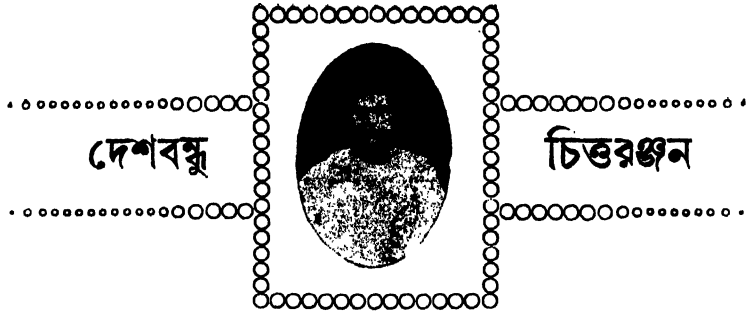
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতির মধ্যে সময় সময় এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহাদের জীবন-কথা দেশবাসী কর্তৃক আদর্শরূপে পরিগৃহীত হয়। এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনলীলা সাঙ্গ হইলেও তাঁহারা যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যায়েন, তাহার প্রভাব কথনই বিলুপ্ত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ জাতীয় জীবনে যুগান্তর আনিয়া থাকেন। স্বর্গগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের ছাত্রজীবনেই তদীয় অন্তর্নিহিত ওজস্বিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। প্রথম কর্ম্মজীবনে তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আইনতঃ বাধ্য না হইলেও তিনি পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

আলিপুর বোমার মামলায় তিনি শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষসমর্থন করেন। এই মোকর্দ্দমায় তিনি অসাধারণ আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন। ইহার পর হইতে তিনি ফৌজদারী মামলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হয়েন। পরে ডুমরাঁওএর রাজার মোকর্দ্দমায় তাঁহার দেওয়ানী মামলায় কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। ইহার পর হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হয়েন। এমন কি, গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ মোকর্দ্দমার পরিচালনভার দিয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের পর তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজনীতিক ক্ষেত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সময় তিনি ভবানীপুর কন্‌ফারেন্সে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্বনামধন্য মাননীয় জজ (সেই সময় উকীল) শ্রীযুত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই সময় চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করেন ও বিশেষ আয়কর আইনব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অতুল স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেন। এই সময় হইতে তিনি দেশবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশের জন্য কারাবরণ করেন। ঐ অব্দেই তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেসনের মেয়রের পদে আসীন ছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা প্রদর্শন করেন।

বাঙ্গালার কাউন্সিলে তিনি স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন। তাঁহার প্রভাবেই কাউন্সিলে সরকারকে অনেকবার পরাজিত হইতে হয়। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল। তিনি যে সময়ে কাউন্সিলে শেষ বক্তৃতা দেন, তখন উপস্থিত সদস্যগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

দৈন্যক্লিষ্ট বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা উন্নত করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি-বিধান অসম্ভব, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে সভাপতির আসন হইতে তিনি এই কথা বলেন। পরেও তিনি বারংবার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রের সেবা তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তিনি বলিতেন, নারায়ণ দীনবেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া থাকেন। দীনের সেবাই তিনি ভগবৎসেবা বলিয়া জানিতেন। চিত্তরঞ্জনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে প্রাণমন ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার মনের জোর ছিল ততোধিক। তিনি যে কেবল বিচারালয়ে ও রাজনীতিক্ষেত্রে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে। চিত্তরঞ্জন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে ব্যবহারাজীব, রাজনীতিবিদ্, কবি ও সমালোচক ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপেও তিনি অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছিলেন। দল সংগঠনে ও সংরক্ষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি স্বদলভুক্ত লোকদিগকে যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেন। অনেকে তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অদ্বিতীয় দেশভক্ত ও দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজক ছিলেন, তাহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। দেশের জন্যই তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। দেশের ভাবনায় ও দেশের কাযে দেশবন্ধু অকালে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

স্বর্গারোহণ

১

আস্‌মানে আজ বাংলাদেশের নিভ্‌ল উজল একটি তারা,
বইল হা-হুতাশের বাতাস, রইল কেবল অশ্রুধারা।
কাঁদ্‌ল শ্মশান-সৈকতে হায় বঙ্গবাসী বন্ধুহারা,
নাম্‌ল ধরায় 'পুষ্পক রথ' চৌদিকে তার অপ্সরীরা।

২

তুল্‌ল বীরে সেই রথে হায় 'উর্ব্বশী' আর 'রম্ভা' আসি,
আপনা হতেই নিভ্‌ল তখন চিতার বিলোল বহ্নিরাশি।
ঘর্ঘরিয়ে চল্‌ল সে রথ মিশল যখন মেঘের সাথে,
'পুষ্কর' 'দ্রোণ' ধর্‌ল তখন স্বর্ণ-মুকুট তোমার মাথে।

৩

কৃতান্ত ঘোর বিস্ময়ে আজ নন্দনেরই মধ্য হ'তে
বাঁশীর মদির মন্ত্র হঠাৎ শুন্‌তে পেল শ্রবণপথে,
দেখল নভের থির নীরবে ঝিলিকরাজে 'মাণিক' 'হীরা,'
'গুলাব'-ভরা পিচ্‌কারী দেয় স্বর্গ হ'তে হুর পরীরা।

৪

'ভোলানাথে'র শির হ'তে তাই শুন্‌তে পেয়ে রথের ধ্বনি,
ছড়িয়ে দিলেন সেই পথে আজ জাহ্নবী নীলকান্তমণি।
'পিঙ্গল' তাঁর বুক থেকে হায় নিঙড়ে পূত পীযুষরাশি,
ছড়িয়ে দিলেন সেই পথে আজ সকল অশিব রিষ্টি নাশি।

৫

তার পরে যেই সুবর্ণ রথ থাম্‌ল কনক-তোরণ-দ্বারে,
দুলালে তার কবুল বরণ শচী পারিজাতের হারে।
উল্লাসে তার দেবেন্দ্র আজ নিলেন বুক-বক্ষে তুলি,
দিলেন পোড়া ভারত-শিরে বিদা দেবেই বজ্র ফেলি।

কাজী কাদের নওয়াজ।
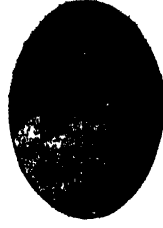
সাহিত্যসাধনায় চিত্তরঞ্জন

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ এক জন উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন। কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি একান্তভাবে সাহিত্য-সাধনা করিতে না পারিলেও তিনি যে স্বভাবসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখনও তিনি কবিতা লিখিতেন। সে কবিতা যেন তাঁহার অন্তরের ভাবধারা হইতে উৎসারিত হইত বলিয়া মনে হয়। ভাবুকতাই কবিতার প্রাণ। তাঁহার অন্তরে সেই ভাবুকতার অভাব ছিল না। তাই তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতির কবিতা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। আমার যেন মনে হয়, টেনিসনের কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। পঠদ্দশায় বা তাহার অল্পদিন পরে তিনি Browningএর কবিতার উপর একবার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোড়ায় তাঁহার গূঢ়তত্ত্ববাদের (mysticism) দিকে একটু বেশ ঝোঁক ছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাহা বেশ প্রকাশ পাইত। তবে পঠদ্দশায় তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা না থাকায়, আমি তাঁহার সেই সময়ের মনোভাবের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে পারি নাই। বিশেষ তিনি স্বতন্ত্র কলেজে ও স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পড়িতেন, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা বা আলাপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে তাঁহার এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম এবং আমার সম্মুখে তাঁহার সহিত উক্ত বন্ধুর যে দুই একবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। একবার সে কালের এলবার্ট হলে এক সভা হয়, সেই সভা ভাঙ্গিবার পর তাঁহার সহিত আমার একটু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কবি বড় কি দার্শনিক বড়, ইহা লইয়া কথা হয়। দাশ মহাশয় বলেন "কবি বড়,"—আমি বলি "দার্শনিক বড়।" সেই সময় তাঁহার সহিত আমার সামান্য একটু তর্ক হয়। তাহা অত্যন্ত অল্পস্থায়ী। ছাত্র-জীবনে আর কখনও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎভাবে আলাপ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমি সেই সময় জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ভাবময়। সেই জন্য আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি হয় ত এক জন বড় কবি হইবেন। আমার সে অনুমান সার্থক হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ খেলিত, তাহা প্রথমে কবিতাতেই আত্মপ্রকাশ করে। 'মালঞ্চই' তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ। ইহাতে যে কবিতাগুলি আছে, তাহা অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক না হইলেও ভাষার কোমলতায় ও ভাবের তরঙ্গে উহার ভিতর একটু অসাধারণত্ব ছিল। তাঁহার জীবনের ভিতর যে একটি প্রেরণা বা দৈব প্রত্যাদেশ ছিল, তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। সম্ভবতঃ তিনিও তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই ভাবে ও ভাষায় তাঁহার কবিতাগুলিতে কতকটা বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহাতে তাঁহার সেই দৈব প্রত্যাদেশ মুখরিত হয় নাই। উহাতে তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মকথা প্রতিধ্বনিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব ছিল, তাহা যেন ফুটি ফুটি করিয়া ফুটে নাই। তিনি যেন সেই ভাব-সম্পদ লইয়া এই সংসারের মরুস্থলীতে মরীচিকাভ্রান্ত পান্থের ন্যায় দিশাহারা হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ফলে তখন তিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রকৃত পথের সন্ধান পায়েন নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার হৃদয় দরিদ্রের ক্রন্দনে, দুঃখীর দুঃখে, ব্যথিতের মর্ম্মবেদনায় কাতর হইত; তাহাদের সেই ক্রন্দনের, সেই দুঃখের, সেই মর্ম্মবেদনার মধ্যে তাঁহার কি যেন একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন

"না পাওয়ার জন্ত যে ক্রন্দন, তাহাতে একটা অপূর্ব্ব সুর থাকে, সেই সুর গানে পরিণত হয়। সাহিত্যেই তাহা বিকাশ লাভ করে। সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।" তাঁহার জীবনের সেই বিশিষ্ট অনুভূতির প্রথম পরিচয় পাই তাঁহার প্রণীত 'মালঞ্চে'। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এত দিন
ক্রন্দন ধরার
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার।"

অতি দূর হইতে শ্রুত, কোকিলকাকলীর ন্যায় অস্পষ্ট ও মধুর সুরে ঐ দৈব প্রত্যাদেশের মৃদু বাণী যেন তাঁহার হৃদয়কুঞ্জে ঝঙ্কার দিত, তিনি তাহার ভাষা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর ক্রমশ: সেই ধ্বনি, সেই সুর স্পষ্ট হইতে লাগিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যেন একটা কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিতেছে। কিন্তু তখনও সে কর্ত্তব্য যে কি, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তাই 'অন্তর্যামী'তে তিনি ভক্তি-ভরে প্রকৃত সাধকের মত কাতরভাবে গাহিয়াছেন :—

"ভাবনা ছাড়িনু তবে এই দাঁড়াইনু আমি!—
যে পথে লইতে চাও লয়ে যাও অন্তর্যামী;"

তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন, যেন তাঁহার প্রাণের ভিতর দিয়া একটা কি প্রেরণা আসিতেছে। তাই তিনি গাহিয়াছেন :—

"যে পথেই লয়ে যাও যে পথেই যাই;
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই।
* * * * * *
* * * * * *
* * —অলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের প্রান্তে!
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা ত মনে নাই!
সবাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই!"—অন্তর্যামী।

ইহা যে কেবলমাত্র ভক্তের হৃদয়-তন্ত্রী হইতে ঝঙ্কৃত ভক্তির কথা, তাহা নহে, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী গোপিকা-গণের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্ত কাতরতার ন্যায় ভগবানকে পাইবার জন্ত ভক্তের ব্যাকুলতা, তাহা নহে,—ইহা তাঁহার জীবনের একটা বিশিষ্ট অনুভূতি। দৈবপ্রেরণায় তীব্র অনুভূতি হইতে ঝঙ্কৃত। বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুরাগী চিত্ত-রঞ্জন তখন সেই প্রত্যাদেশের—হৃদয়কন্দর হইতে উত্থিত সেই সুরের অর্থ সম্যগ্‌ভাবে বুঝিয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার সাহস আমার নাই, কিন্তু কান্তভাবে ভগবানকে সাধনা করিবার ভাষায় তিনি যে কবিতা লিখিয়া গিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী হইতে উত্থিত ক্রন্দনের অপূর্ব্ব সুর মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি এক দিকে যেমন বৈষ্ণব সাধক, অন্য দিকে তেমনই ভগবানের প্রত্যাদেশ লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ, ইহা তাঁহার লিখিত সাহিত্য হইতেই বুঝা যায়। সংসার-কান্তারে দিশাহারা পথিকের ন্যায় যখন তিনি কর্ত্তব্যের পথ পায়েন নাই, কেবল পথের সন্ধানেই ব্যস্ত ছিলেন, তখনও তাঁহার প্রাণের আবেগ এত ছিল যে, পথ পাইলেই তিনি সেই পথের যাত্রী হইবার জন্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাই তিনি 'অন্তর্যামী'তে বলিয়াছেন,—

"যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোরে।
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোরে।
পথখানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব,
পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়:—
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়!
কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথখানি,
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা জানি।"
—অন্তর্যামী, ১৬-১৭

চিত্তরঞ্জন যে কর্ত্তব্যের ভার লইয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্ত তাঁহার প্রাণের ভিতর যে একটা আকুলি-ব্যাকুলি ছিল, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই দেখা যায়। উহাতে যেমন ব্রজগোপিকার কান্তভাব আছে, বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত আছে, তেমনই তাঁহার প্রাণের সেই দিশা-হারা ভাবও মিশ্রিত হইয়া আছে। কারণ, তিনি তখনও পথ খুঁজিয়া পায়েন নাই। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় সরলভাবে যে কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসা-ধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু কবিতা লিখিবার জন্ত বিধাতা তাঁহাকে ধরাধামে প্রেরণ করেন

নাই। বিধাতা তাঁহাকে কর্ম্মী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যত দিন তিনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, তত দিন সেই আকুলতা ভগবদ্ভক্তির কবিতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। তখন তিনি দেখিতেছিলেন, "কঠিন পাষাণে যেন বদ্ধ চারি ধার, প্রবেশের পথ নাই।" তিনি যে পথে চলিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার নহে। তাই তাহাতে তাঁহার মন বসিতেছিল না, অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও মনের ভিতর একটা জ্বালা জন্মিতেছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন :—

"ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!
কোন্ পথে যেতে হবে?
কে বল আমায় কবে?
যেন হেরি মনে মনে বদ্ধ চারি ধার!
ওই ছায়া মন্দিরের কোথা রে দুয়ার!"

তাঁহার হৃদয়ে যে জ্বালা জন্মিতেছিল, তাহার পরিচয়ও তিনি তাঁহার কবিতায় দিয়া গিয়াছেন ;—

"পথের মাঝে এত কাঁটা? আগে নাহি জানি!
কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি!
কাঁটায় কাঁটায় ফালা ফালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে ক'রে গেছে পথখানি!
কাঁটার ঘায় জ্ব'লে জ্ব'লে চলছি পথ বাহি!
বেড়া আগুনের মত
জ্বলছে প্রাণে অবিরত।—
সে জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে এত পথ বাহি!
তোমার গাওয়া প্রাণের গান, সে গান গাহি!"

ইহা কি তাঁহার প্রকৃত পথের পূর্ব্ব আভাস বা পূর্ব্বানুভূতি? তখন ভিতর হইতে তাঁহার কর্ম্মের পথখানি তিনি কি দূর হইতে লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায় কখন দেখিতেছিলেন, কখন দেখিতে পাইতেছিলেন না? তবে পথ ধরিবার বহু পূর্ব্বে তিনি যে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহার সেই দিশাহারা ভাব তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীতে'ও প্রতিবিম্বিত। এইখানে দেখি, তিনি ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছেন :—

"তোমারি এ গীত প্রাণে সারাদিনমান
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—বাজাও আমারে
দিবস-যামিনী ভরি আলোক আঁধারে
বাজাও নির্জ্জন তীরে বিজন আকাশে,
সকল তিমির-ঘেরা আকুল বাতাসে
মায়ালোকে ছায়ালোকে তরুণ উষায়
বাজাও বাসনাহীন উদাসী সন্ধ্যায়
ওগো যন্ত্রী আমি যন্ত্র বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে।"

এই আত্মসমর্পণের ফলেই তিনি সম্মুখে যে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ পড়িয়া আছে, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই পূর্ব্বপথ যে তাঁহার পথ নহে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি 'সাগর-সঙ্গীতে' গাহিয়াছেন :—

"আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করেছে আকুল!
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু দিবস যামিনী!"

কর্ম্মী চিত্তরঞ্জনের হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্মপথে যাইবার জন্য যেরূপ পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিতেছিল, 'সাগর-সঙ্গীতে'র এই কয় ছত্রে তাহা সুপ্রকাশ। যিনি একটা মহৎ কর্ত্তব্যের ভার লইয়া সংসারে আইসেন, তাঁহারই হৃদয় কর্ম্মক্ষেত্রের ঘাত প্রতিঘাতে এইরূপে খুলিয়া যায়, প্রকৃত পথের সন্ধান পায়। বুদ্ধদেব, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির জীবনও ঠিক ঐরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইহা সত্য যে, এই সংসারে কতকগুলি লোক কর্ম্ম করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এমন হৃদয় লইয়াই আইসেন যে, তাহা পৃথিবীর ধূলি-কর্দ্দমের সহিত সংগ্রাম করিতেই দৃঢ়ভাবে গঠিত। তাঁহাদের সেই হৃদয়ে যে কেবলমাত্র অমিত বল ও অপ্রমেয় কর্ম্মশক্তি থাকে, তাহা নহে, উহাতে অফুরন্ত ভালবাসা ও অপ্রমেয় প্রেম থাকে। সে প্রেম স্বয়

ক্ষেত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহা সমস্ত দেশের জন্য প্রদত্ত, তাহা কি কখন সামান্য ও সঙ্কীর্ণ-পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে? এই জাতীয় কর্ম্মীরা কর্ম্মক্ষেত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যত দিন আপনাদের কর্ত্তব্যপথের সন্ধান না পায়েন, তত দিন তাঁহারা সামান্য পার্থিব ও মানবীয় প্রেম লইয়া নানা চিত্র আঁকিতে থাকেন। তাঁহারা মনে মনে মানসী প্রতিমা গড়িয়া তাহারই চরণপ্রান্তে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন। শেষে তাহাতেও পরিতৃপ্তি না পাইয়া মহান্ হইতে মহত্তর পদার্থে প্রেমের সন্ধান করিতে থাকেন। বিশ্বের যাহা কিছু মহান্, তাহাই তাঁহার প্রেমের বিষয় হয়, তাহাই তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করে। সেই জন্য লর্ড বাইরণ বলিয়াছেন :—

"There is a pleasure in the pathless wood
There is a rapture on the lonely shore
There is society where none intrudes,
By the deep sea and music in its roar
I love not man the less, but Nature more."

চিত্তরঞ্জন তাঁহার 'কিশোর-কিশোরী'তে মানবীয় প্রেমের যে মানসী প্রতিমা আঁকিয়াছিলেন, তাহাতেও যেমন তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার ভবিষ্য কর্ম্মজীবনের ছায়াপাত হইয়াছিল, তেমনই "যেখানে প্রলয়-বিষাণ বাজে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া" সেই 'সাগর-সঙ্গীতে' তাঁহার কর্ম্মজীবনের ভবিষ্য ছায়া পতিত হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার কর্ম্মপথের সন্নিহিত হইয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ দেশের ও দেশবাসীর আকুল ক্রন্দন তাঁহার কর্ণে পশিতেছিল। তাই তিনি 'সাগর-সঙ্গীতে' গাহিয়াছেন :—

"হে অনাদি! হে অনন্ত! তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দনধারা কেমনে বহিয়া যায়
কাঁদিতেছে এ কি ক্ষুধা, এ কি তৃষ্ণা অনিবার
কি ব্যথা গরজিছে, শ্রান্তিহীন দুর্নিবার
কত জন্মজন্মান্তর
কত যুগ-যুগান্তর
হে আমার অভিশপ্ত! হে বন্ধু আমার!
হে আমার শ্রান্তিহীন অশ্রু-পারাবার
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সর্ব্বস্বত্যাগী
আমি যে তোমার লাগি এসেছি আবার
কত যুগ-যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।" ইত্যাদি

ইহার পরই তিনি কর্ত্তব্যপথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে তিনি ঘোষণা করেন—"দেশকে সেবা করিলে, জাতিকে সেবা করিলে মানব-সমাজকে সেবা করা হয়। আবার মানব-সমাজের সেবাতে, মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।" ইহার পর তিনি যাহা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার রাজনীতিক কর্ম্মজীবনের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা তাঁহার রাজনীতিক মতের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বিশদভাবে বলিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথাই বলিব।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই ভারতে,—এই বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যাদেশের বাণী তাঁহার প্রাণ হইতে আধ্যাত্মিক ভাষায় সমীরিত হইলেও তাঁহার বুদ্ধি কিছুকাল মায়াঘোরে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রাণের সেই দৈববাণী বুঝিবার জন্য তাঁহার মনের ভিতর যে আকুলি-ব্যাকুলি হইত, তাহাই তাঁহার কবিত্বের প্রেরণা বা inspiration। তাই পার্থিব যে বিষয় লইয়া তাঁহার কবিতা আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, তাহাতে যেন কোন-না-কোন দিক দিয়া সেই দিশাহারা, লক্ষ্যহারা বা পথহারা ভাব প্রকাশ পাইত। বিধাতা তাঁহাকে যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধিত করিবার সম্বলও তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ও অফুরন্ত অনুরাগের আধার ছিল। তাঁহার মন প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য কেবল দুঃখীকে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন না,—অধিকন্তু মানসী প্রতিমা গড়িয়া তাহার চরিতার্থতা-সাধন

করিতে প্রয়াস পাইতেন। সুতরাং সেই সুরেই ঝঙ্কৃত হইয়া তাঁহার কবিতা আত্মপ্রকাশ করিত।

এরূপ কবিতা প্রায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে না,—উহা ভাবকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ উহা objective হয় না, subjective হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জন সেইরূপ ভাবমূলক কবি ছিলেন। তিনি যথাযথ বস্তু বর্ণনে প্রয়াস পায়েন নাই, কয়েকটি শব্দরূপ রেখা দ্বারা বস্তুর চিত্রমাত্র দিয়া ভাবের রাগেই তাহার সমস্তটা পূর্ণ করিয়া দিতেন। তাহাতে শব্দের ছটা, উপমার ঘটা কিছুই নাই,—আছে কেবল ভাব। একটা সহজ উদাহরণ দিব,—তাঁহার "আপনার মাঝে" কবিতাটিতে দুইটিমাত্র কথায় সন্ধ্যার কেমন সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে দেখুন—

"ওরে পাখি সন্ধ্যা হ'ল আয় রে কুলায়
সমস্ত গগন ভরি
আঁধার পড়িছে ঝরি
ওরে পাখি অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায়।"—মালা।

এখানে দুইটিমাত্র শব্দে সন্ধ্যার অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত কবিতাটি বুঝিতে হইলে, তাঁহার চিত্তের ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া চাই। নতুবা কবিতা বুঝা যাইবে না। উহাতে শব্দের আড়ম্বর নাই, উপমার প্রাচুর্য্য নাই, নাই কিছুই,—কিন্তু আছে কেবল ভাব। উহা তাঁহার প্রাণের কথা শুনিবার জন্য মনকে আহ্বান। সেই ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ঐ কবিতা যে কত উচ্চ অঙ্গের, তাহা বুঝা যাইবে না। লোক তাঁহার হৃদ্গতভাবের সহিত পরিচিত হইতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার কবিতা এত দিন জনসমাজে তাদৃশ আদর পায় নাই। সেই জন্য ভাবপ্রধান কবির আদর হয় প্রায় তাঁহার মৃত্যুর পর। নতুবা কবির শক্তিতে, ভাবসম্পদে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার কবিতাগুলি কোন কবির কবিতা অপেক্ষা হীন নহে। ভাষার সরলতায় ও ভাবের প্রাচুর্য্যে স্কটল্যাণ্ডের কবি রবার্ট বার্ণসের সহিত তাঁহার কতকটা তুলনা হইতে পারে। তবে চিত্তরঞ্জনের আত্মগত ভাবটা এবং কবিতার subjective দিকটা একটু গূঢ় রকমের। আমাদের আশা আছে, এইবার বাঙ্গালা তাঁহার কবিতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।

সমালোচক চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন কেবল এক জন উচ্চ অঙ্গের কবি ছিলেন না, —তিনি এক জন সমজদার সমালোচক ছিলেন। তাঁহার স্বীয় কবিতাতে যে বাঙ্গালার ধাতু-প্রকৃতি, বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালার সরলতা ও ভাবুকতা ছিল,—তিনি তাহারই অনুরাগী ছিলেন। তিনি জহরী ছিলেন, তাই জহর চিনিতেন। 'বাঙ্গালার গীতি-কবিতা'য় তিনি বলিয়াছেন,—"এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। প্রত্যেক পা ফেলা ও প্রত্যেক পা ফেলার দাগটি। মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষা স্বভাব, সৃষ্টিরক্ষার জন্য মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলেন, এ তৃষা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার, খেলা করিবার লীলার মাধুর্য্য। * * * * গভীর পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনী শতদল বিকসিত করিয়া মৃদুল বাতাসে দুলে, সে-ও তাঁহারই লীলা। এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁহারই, এ জীবসৃষ্টির সকল খেলাই তাঁহারই। ইহা মায়া নয়, মিথ্যা নয়, কৈতব নহে। ইহা পূর্ণ, রূপে রূপে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, বিলাস লীলার বিচিত্র ক্রীড়া। এই অনুভূতির জীবন্ত জলন্ত প্রকাশই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা,—সেই অনুভূতিই সাহিত্যের রস।"

তাহার পরই তিনি বলিয়াছেন, "কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য। সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না। কল্পকলার অন্তরঙ্গের আদর্শও দেশকাল অতীত। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নীতি ও ধর্ম্মের অতীত। কল্পকলা সেই দিব্যদৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কলাবিৎ তাহার ভিতরে দেখেন অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।" তিনি এই মত অনুসারে সাহিত্যের সৃষ্টি,পুষ্টি, প্রচার এবং আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমি আজ এখানে তাঁহার মতের আলোচনা করিব না,—ইহা তাঁহার মত এবং সমালোচনার মানদণ্ড, ইহা বুঝাইবার জন্য কথাটা তুলিলাম। ইহা জানিলে

তাহার সমালোচনায় ও সাহিত্যসাধনায় মর্ম্ম বুঝা যাইবে বলিয়া ইহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়া গিয়াছেন—"পরিষ্কার কাচ যেমন মানুষের দৃষ্টির অন্তরায় না হইয়া সাহায্য করে, কথাও তেমনি ভাবকে জমাইয়া তুলে, কাচ যদি অপরিষ্কার হয়, চোখে ঝাপসা ঠেকে। ভাষাও তেমনি। কোন সুন্দর ভাবই সুন্দর আকার না লইয়া ব্যক্ত হয় নাই। * * * * শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবও ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠে না, ভাষাও ভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তাহা সুডৌল, নিখুঁত, সুন্দর, সহজে তাহাকে গয়না পরাইতে হয় না। অলঙ্কার সৌন্দর্য্যকে বাড়াইবার জন্য, অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্যকে বাড়াইলে তাহাকে খর্ব্ব করা হয়, তাহার রূপের জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হয়।"

এই মতের মানদণ্ড লইয়া চিত্তরঞ্জন সাহিত্যের সমালোচনা করিতেন,—তাই বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে তিনি এত ভালবাসিতেন। বৈষ্ণব গীতি-কবিতাতেই বাঙ্গালাকবিত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। তিনি চণ্ডিদাসের পরম ভক্ত ছিলেন। যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর করেন,—তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডিদাসের ভক্ত নহেন, এমন কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। চণ্ডিদাসের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" ইহার তুলনা নাই। অনেকে উপরে উপরে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার রসাস্বাদন করে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাহা করিতেন না। তিনি বৈষ্ণব কবিদিগের মনের ও ভাবের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিয়া তবে উহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। বিদেশী ভাব দিয়া বা বিদেশের মাপকাঠী লইয়া খাঁটি দেশী বৈষ্ণব গীতি-কবিতার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করেন নাই। গান বা কবিতা বুঝিতে হইলে কবির ভাবের সহিত নিজের ভাবসাম্য করিতে হয়। তাহা হইলেই কবিতা ঠিক বুঝা যায়। নতুবা উহা বুঝা যায় না।

'মালঞ্চে'র কবি চিত্তরঞ্জন

এ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল.—"আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের,প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্য-জীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া বেড়াই।" সমালোচনাকালে তিনি কেবল কবিতার ভাব খুঁজিয়া বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না—খুঁজিতেন কবিতার প্রাণ—ভাবের উৎস বা জন্মস্থান। তাই তিনি সমালোচনায় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, খোসা লইয়া যাহা লেখা যায়, তাহা কবিতা নহে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উভয়েই

বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। কবীন্দ্র বলিয়াছিলেন, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি। দেশবন্ধু বলেন, যাহারা সুখ এবং দুঃখকে তলাইয়া বুঝেন নাই, ইহা তাঁহাদেরই কথা। তিনি বলেন, সুখেরই রূপান্তর দুঃখ, দুঃখের রূপান্তর সুখ। সে কথা তুলিয়া আমরা আর প্রবন্ধটি দীর্ঘ করিব না। ফলে চিত্তরঞ্জন সমালোচনাকালে ভাবের উৎস সন্ধানেই সচেষ্ট হয়েন। তাই সমালোচনায় তাঁহার সাফল্য সমধিক। তাঁহার কাব্যের কথা সাহিত্যামোদী লোকমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

গদ্য-সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন দাশ কেবল স্বভাব-কবি ও সমালোচক ছিলেন না; তিনি এক জন শক্তিশালী গদ্য-লেখক ছিলেন। তাঁহার গদ্যের ভাষা সরল হইলেও তরল নহে, আড়ম্বর-বহুল ও অলঙ্কার-বিড়ম্বিত না হইলেও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সহজ হইলেও শক্তিশালী। ইংরাজী ভাষায় তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত হইলেও তিনি যে বাঙ্গালা লিখিতেন, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা—ইংরাজীর ভিতর দিয়া চোঁয়াইয়া আনা বাঙ্গালা নহে। সেই ভাষা যে ভাবকে বহন করিত, সেই ভাবটিও ছিল খাঁটি বাঙ্গালার ভাব। তিনি কার্য্যের অনুরোধে 'সাহেব' সাজিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, মনে-প্রাণে একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী। তিনি বলিয়াছেন —"নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিষটা খেয়ালের ব্যাপার, এক দিন থাকে, তার পর থাকে না। কিন্তু হওয়া জিনিষটার সঙ্গে রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিষটার ভাব থাকা চাই।" চিত্তরঞ্জন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন,—কেবল ভাবে নয়, ভাষাতেও বটে। তিনি বাঙ্গালীকে যেমন দো-আঁসলা জাতিতে গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী ছিলেন না,—তেমনই বাঙ্গালা ভাষাকেও দো-আঁসলা ভাষায় পরিণত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্র প্রচার করিয়া তিনি সেই চেষ্টাকে সফল করিবার প্রয়াস পায়েন। ইহার জন্য তিনি অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার 'দেশের কথা' বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। তাঁহার 'বাঙ্গালার কথা', 'ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা', 'শিক্ষা-দীক্ষার কথা' প্রভৃতি মৌলিক চিন্তার অপূর্ব্ব নিদর্শন। গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার সাফল্য অনন্যসাধারণ।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যিক হিসাবে চিত্তরঞ্জনের আসন অতি উচ্চ। তাঁহার কোন কোন মতের সহিত কাহারও কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

অমর

অহিংসা বৈষ্ণব-মন্ত্রে একনিষ্ঠ স্থির,
স্বর্গে আজি বাঙ্গালার একমাত্র বীর।
মহাশোকে বঙ্গবাসী করে হাহাকার,
হরিল মরণ আজি সর্ব্বস্ব তাহার।
কিন্তু মৃত্যু কোথা তার? সে কি গো নশ্বর?
মৃত্যু তারে ছুঁয়ে শুধু করিল অমর।
বাহিরে যে ছিল, এল অন্তরের মাঝে,
আজি প্রতি চিত্তে চিত্তরঞ্জন বিরাজে!

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন আমার পরলোকগত সুহৃৎ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। মনে হয়, সেটা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। আমার প্রথম নাটক "ফুলশয্যা" তখন এমেরাল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। পরিচয় ঐ রঙ্গালয়েই হইয়াছিল, কিংবা সুরেশচন্দ্রের সাহিত্য প্রেসে হইয়াছিল, সেটা মনে না থাকিলেও প্রথম দর্শনেই তাঁহার কমনীয় মুখশ্রী আমাকে তৎপ্রতি যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এটা আমার বেশ মনে আছে।

ইহার পর অনেক দিন আমরা পরস্পরে মিলিত হইয়াছি। এই মিলন সাহিত্যের দিক দিয়াই হইত। তখন হইতেই তিনি এক জন উচ্চদরের কবি। তাঁহার অনেক কবিতার মাধুর্য্য সে সময় আমি উপভোগ করিয়াছি। শুধু তিনি প্রিয়দর্শন ছিলেন না, স্বভাবও তাঁহার এমনই মধুর ছিল যে, কিয়ৎক্ষণের আলাপে তৎপ্রতি কেহ আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। নিজে অমানী, কিন্তু ছিলেন তিনি প্রভূত মানদ। আমি তাঁহার অপেক্ষা বছর সাতেকের বড়। সুতরাং আমার সহিত তাঁহার সখ্য অনেক সময়ে তাঁহার শ্রদ্ধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত। তিনি আমার সে সময়ের অভিনীত নাটক সকলের নিয়মিত দ্রষ্টা ছিলেন—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক নাটকের। তাঁহার প্রদত্ত প্রশংসায় অনেক সময় আমি আত্মগৌরব অনুভব করিতাম। মনে হইত, সে প্রশংসা মৌখিক নহে, আন্তরিক। তাঁহার মন মুখ এক ছিল। সেই হেতুই বুঝি তিনি এমন সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা হইয়াছিলেন।

সে সময়ের এক দিনের একটা কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিজের দিক হইতে সেটা নিতান্ত অযৌক্তিক হইলেও চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে বলিয়াই বলিতেছি।

সে দিন ষ্টার রঙ্গালয়ে মদ্‌রচিত পদ্মিনীর অভিনয় হইতেছিল। চিত্তরঞ্জন সেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি কোনও কথা না বলিতেই আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি এ পর্য্যন্ত যত নাটক পড়িয়াছি, কোনটিতেই আপনার আলাউদ্দীনের মত চরিত্র দেখি নাই।"

যদিও অন্তরের অন্তরে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু কথাটা এমনই অসম্ভবের মত যে, সঙ্কোচের সহিত আমাকে উত্তর দিতে হইল, "আমার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসায় আপনি কিছু অধিক বলিয়া ফেলিয়াছেন।"

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখে বেশ একটু উষ্মার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "প্রতাপাদিত্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কি নিজে অনুভব না করিয়া? আপনি বাঙ্গালী। অন্য জাতির তুলনায় আপনি আপনাকে ছোট মনে করিবেন কেন?"

এই কয়টি কথার জন্যই আমি উক্ত কথার অবতারণা করিয়াছি। তাঁহার ভগিনীপতি অনন্তলাল সেন আমার এক জন সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিতাম। তিনিও আমাকে অগ্রজেরই মত শ্রদ্ধা দান করিতেন। এক দিন তাঁহার নিকট ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনের মন মুখ এক। লোকের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অযথা প্রশংসা করিবার পাত্র ছিলেন না।

চিত্তরঞ্জনের মুখে ঐ কথা শুনিবার পর হইতেই বুঝিয়াছিলাম, তিনি বাঙ্গালী। আর অনন্তলালের মুখে শুনিবার পর হইতে বুঝিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার বাঙ্গালীত্ব, শুধু মুখে নহে, মর্ম্মে মর্ম্মেই উপভোগ করিতেন।

দেশবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার ও মিসেস পি. আর. দাশ

হইবে। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবস্থা তখন চিত্তরঞ্জনের আইসে নাই। অবস্থা ও সুযোগ আসিয়াছে তাহার বহু বৎসর পরে।

স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে চিত্তরঞ্জনকে রাজনীতিক্ষেত্রের কোথাও দাঁড়াইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। সে সময়ের যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদিগের ভিতরে আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রধান ছিলেন—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। দেশের সেবায় তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে দেখিয়াছিলাম। অবশ্য, অল্প বিস্তর ত্যাগ অনেকেই করিয়াছিলেন, কিন্তু যে ত্যাগে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, লোককে মুগ্ধ করে, সে ত্যাগ একমাত্র দেখাইয়াছিলেন তিনি। সে ত্যাগের কথা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা জানেন না, এমন লোক অল্পই আছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যাহার নাম দিয়াছিলেন গোলামখানা, তাহা হইতে বঙ্গের যুবক-সম্প্রদায়কে মুক্ত করিবার জন্য সেই সময় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা

তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতি অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। বরং বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে পৃথিবীর অনেক স্বাধীন জাতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত কতকগুলা আবর্জ্জনা এ জাতির মহত্বকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে মাত্র। কোনও ক্রমে সেই আবর্জ্জনাগুলা সরাইতে পারিলেই বিশ্ববাসী ইহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পায়। সে রূপ আজিও পর্য্যন্ত কোনও জাতি দেখাইতে ত পারেই নাই, দেখেও নাই। সেই সকল আবর্জ্জনার মধ্য হইতে কোনও ক্রমে বাহির হইয়া, দুই একটি স্ফুলিঙ্গ তাহাদের চোখের উপর পড়িয়াছিল। তাহাদেরই তাহারা আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়াছে। আমার মনে হয়, তখন হইতেই চিত্তরঞ্জনের মনে সঙ্কল্প জাগিত, যে কোনও উপায়েই হউক, জাতিকে আবর্জ্জনামুক্ত করিতে

হইয়াছিল। বাঙ্গালার অনেক মনীষীই সেই সময় বুঝিয়াছিলেন, জাতিকে মোহমুক্ত করিতে হইলে জাতির নিজস্ব ভাব দিয়াই তাহাকে শিক্ষিত করিতে হইবে, যাহাতে কোনওমতে যুবকদিগের ভিতরে দাসভাব জাগিতে না পারে।

এই শিক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন অরবিন্দ। বহু কর্ম্মী এই শিক্ষামন্দিররক্ষায় নানা ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বহু ধনী অর্থ দিয়াছিলেন। জমীদার বহুমূল্যের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দুই এক জন মহাত্মার ত্যাগের ফলে বাঙ্গালী সে সময় ত্যাগের এক অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছিল। সে সময়েও সেই রঙ্গস্থলে চিত্তরঞ্জনকে দেখিতে পাই নাই।

ইহার কিছু দিন পরেই দেশমাতৃকার আহ্বানে চিত্তরঞ্জনকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। রণক্ষেত্রে

বঙ্গবাসী এক দিন সহসা বহু যুগের পুঞ্জীকৃত নিদ্রার ভার ঠেলিয়া দেখিল, দেশাত্মবোধের প্রবল উত্তেজনায় জাতিকে মোহমুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রতিভাশালী যুবক জীবন উৎসর্গ করিতে চলিয়াছে। অরবিন্দ ছিলেন তাহাদের অন্যতম সেনাপতি।

রাজদ্রোহিতার অপরাধে অরবিন্দ অনেক সহকর্ম্মীর সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলেন; চিত্তরঞ্জন তাঁহার রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় অরবিন্দের মুক্তিলাভ ঘটিল। এক দিনেই তাঁহার যশ দেশমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। কেন না, আবালবনিতাবৃদ্ধ অতি উৎকণ্ঠার সহিত অরবিন্দের বিচারফলের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইহার পরেও অনেক যুবক উক্ত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন তাহাদের ভিতরেও অনেকের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল কথার আলোচনার আর প্রয়োজন নাই! চিত্তরঞ্জনের এই নিঃস্বার্থ দেশসেবার কথা সর্ব্বজনবিদিত।

তাঁহার মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার আমি অভিমান রাখি না। যাহা আমি জানি, তাহা বালক পর্য্যন্তও জানিয়াছে। যাহা জানি না. তাহাও দেশের অনেকেরই গোচর হইয়াছে। সুতরাং আর দুই একটিমাত্র কথা তৎসম্বন্ধে বলিয়া আমি এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পথে চলিতে আমরা বহু দিন পরস্পর হইতে দূরে পড়িয়াছিলাম। ১২।১৪ বৎসর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

এই দীর্ঘযুগ পরে এক দিন তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাতের আমার সুযোগ ঘটিল। আমি পূর্ব্বোক্ত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের এক জন সদস্য ছিলাম এবং শ্রীযুত অরবিন্দ যত দিন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, উহাতে রসায়ন ও বাঙ্গালার অধ্যাপনা করিতাম। বর্ত্তমান 'বসুমতী' আফিসে উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সদস্যগণের ভিতরে মতভেদ হওয়ায় কলেজটি উঠিয়া গেল। শুদ্ধমাত্র শ্রমশিল্পের অংশ লইয়া যখন তাহা মাণিকতলার 'পঞ্চবটী ভিলায়' স্থানান্তরিত হইল,তখন আমি অধ্যাপনাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সে প্রায় ১২।১৩ বৎসরের কথা। নানা কারণে সেই সময় হইতে আমি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম।

নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে সময় চিত্তরঞ্জন ঘরে ফিরিলেন, সেই সময় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আমি তাঁহার গৃহে আহূত হইয়াছিলাম।

সে সময় সেখানে ছিলেন মহাত্মা গন্ধী. মহানুভব মহম্মদ আলী এবং পরিচিত অপরিচিত, বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশের অনেক কংগ্রেস-কর্ম্মী। আমার পূর্ব্ববন্ধু মৌলবী ওয়ায়েদ হোসেনকেও সেখানে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম।

এক যুগ পরে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হইল। এই ১২।১৩ বৎসরে তাঁহার শ্রীর বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছু দেখিলাম না। বয়োধর্ম্মে দেহশ্রীর যেরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব, তাহাই মাত্র হইয়াছে।

কিন্তু তাঁহার বেশের কি বিপুল পরিবর্ত্তন! বৎসরে ৫।৬ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনকারী দেশের এক শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব, মহাত্মা গন্ধীর ন্যায় দীনবেশ অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তবিকই মাতৃভূমির কল্যাণ-কল্পে এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি আমার সম্মুখে পড়িল।

মহাত্মার মূর্ত্তি দেখিলাম, চিত্তরঞ্জনের নূতন মূর্ত্তি দেখিলাম—সঙ্গে সঙ্গে অনেক ত্যাগী কর্ম্মীর পুণ্যমূর্ত্তিও আমার চোখে পড়িল। আমি তাঁহাদের দেখিয়া সত্য সত্যই চিত্তের এক অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিলাম।

আমি চিত্তরঞ্জনকে চিনিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। এ ১২।১৩ বৎসরে আমারও দেহে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাকে চিনাইয়া দিলেন আমার এক তরুণ বন্ধু—রামকৃষ্ণ মঠের ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ।

দুই একটি আলাপ-সম্ভাষণের পর চিত্তরঞ্জনেরই ইচ্ছায় আমি তাঁহার সহিত একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহমধ্যে বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ পরিষৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ভিতর তর্ক চলিতেছিল। আর অনেকেরই তর্ক চলিতেছিল মৌলবী সাহেবের সঙ্গে। পরিষৎ বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই

মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাদের জন্ম স্বতন্ত্র কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে, হওয়া যুক্তিসম্মত কি না ইত্যাদি বিষয় লইয়া, সমবেত ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইংরাজীতে যাহাকে hot discussion বলে, তাহাই চলিতেছিল।

মহাত্মাজী তখন পার্শ্বের ঘরে বোধ হয় আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আসিলে, তাঁহার একটিমাত্র কথায় সমস্ত যুক্তি-তর্কের মীমাংসা হইয়া গেল।

চিত্তরঞ্জনকে এ যুক্তিতর্কে যোগ দিতে দেখি নাই। তিনি যেন তখন কি এক ভাবে তন্ময়ের মত আপনাকে লইয়া বসিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, ইঁহাদের কথা তাঁহার যেন কানেই প্রবেশ করিতেছে না। মহাত্মাজীর উপদেশে তিনি প্রভূত উপার্জ্জনের ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছেন; সমস্ত বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া ঘরের রচা সূত্রের খদ্দর পরিয়া একরূপ সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। সারা বাঙ্গালার চিত্র কি তখন তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়াছিল? মুক্তিপথের সন্ধান দিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক নেতাদিগের ন্যায় তাঁহাকে কি বঙ্গবাসীকে রহস্য করিতে হইবে? অথবা প্রকৃতই একটি সুগম পথ তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইবে? কি ভাবিতেছিলেন তখন তিনি, কে জানে?

মহাত্মাজী স্বরাজের একটি সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি স্বরাজ চাও, কর সকলে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগ প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ গ্রামে যেমন কাহাকেও বশে আনিতে হইলে অথবা শাসনের প্রয়োজন হইলে, ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়া তাহাকে একঘরে করিয়া রাখে, সেইরূপ একঘরে করিয়া আমলাতন্ত্রকে শাসন কর। অস্ত্রে তাহাদের বশে আনিতে পারিবে না; যে হেতু, তোমরা এমন অস্ত্রশস্ত্র-শূন্য যে, একটা শৃগালের আক্রমণ হইতেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নও। আর তাহারা দেবতারও অজেয় অস্ত্রবলে বলীয়ান্। চীৎকারেও তাহারা বশে আসিবে না। পূর্ব্বেও তোমরা সময়ে অসময়ে চীৎকার করিয়াছ। ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়াছ মাত্র। এখন হইতে তোমরা নীরব হও, খদ্দর পর, বিদেশী শিক্ষা ও সমস্ত বিলাসিতা বর্জ্জন কর আর স্বরাজলাভের যে দুইটি প্রকৃষ্ট উপায়—হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ছুঁৎমার্গ-পরিহার—কায়মনোবাক্যে তাহা পালনের চেষ্টা কর। চেষ্টায় সফল হও, অদূরবর্ত্তী কালের মধ্যেই তোমাদের স্বরাজলাভ হইবে। কিন্তু সাবধান, এ সকল কায করিতে গিয়া কাহারও উপরে বিন্দুমাত্রও হিংসার পোষণ করিও না, করিলেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অসাধারণ বলে বলীয়ান্ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আয়ত্ত করিতে এ যুগের এই মহাস্ত্র—পুত্রের শাসননীতির মূলে পিতা ও মাতার যে প্রেম, এই অসহযোগ নীতির মূলেও তাহাই নূতন মন্ত্র। শুধুই নূতন নহে—নূতন, অদ্ভুত,

মিসেস পি, আর, দাশ

অচিন্তনীয়। মন্ত্রের স্মরণমাত্রেই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

এই মন্ত্রশক্তির পরীক্ষার জন্ম অন্তরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিত্তরঞ্জন ঘরে ফিরিয়াছেন। এই বারে এই মন্ত্রার্থ জাতির হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। বালকদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়াইতে হইবে, মোকর্দ্দমার বাদি-বিবাদীদের আদালত যাওয়া বন্ধ করাইতে হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে বিলাসিতা বর্জ্জন করাইয়া দীনতার ভিতরে যে মহত্ত্ব লুকানো আছে, তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

বুঝি ঐ সকল বিষয় লইয়া অপরিমেয় চিন্তার প্রবাহ চিত্তরঞ্জনের হৃদয়প্রদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। ইহার উপরেও বিশেষ চিন্তা—এ কার্য্য কে করিবে? চিত্তরঞ্জন একা, না কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অন্য পাঁচ জনের পরামর্শের সাহায্য তাঁহাকে লইতে হইবে?

ইহার পর যে কথা বলিব, তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের আভাস আপনারা অনেকটা পাইতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ইচ্ছায় আমরা একান্তে বসিয়া ছিলাম। সঙ্গে ছিলেন মাত্র ঐ ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। আমি মনে করিয়াছিলাম, শিক্ষাপরিষৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহা হইল না। কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কের ভাবে বসিয়া হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই না বলিয়াছিলেন, একা বাঙ্গালী মহাশক্তি?"

তাঁহার প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সে সময়ে আমি তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিয়াছি বহু দিন পরে—যখন এই পুরুষ-সিংহকে বাঙ্গালার জনারণ্যমধ্যে এক-স্বরূপ বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। নিজের বিবেকবুদ্ধিকে সহায় করিয়া দেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে চিত্তরঞ্জন সেই সময় হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের পঞ্চায়তী পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে কোনও স্থায়ী সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। যে যাঁহার নিজের মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অনেক সময়ে কার্য্যহানি করিয়াছেন, যে যাঁহার উদ্দেশ্য হইতে দূরে সরিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। যদি এ পথে চলিতে হয়, চলিতে হইবে একা। পথ অতি দুর্গম বটে, কিন্তু শত বাধাও তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালা স্বরাজের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমি বলিতে পারি না। কেবল এইটুকু বলিতে পারি, স্বরাজলাভ করিতে হইলে বাঙ্গালায় চিত্তরঞ্জনের ন্যায় এক জন মহাপুরুষের অস্তিত্বের প্রয়োজন। সেই চিত্তরঞ্জন অকালে চলিয়া গিয়াছেন। জানি না, বাঙ্গালার ভাগ্যে কি আছে!

ইহার পর আর একটিবারমাত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাক্ষাৎ হইয়াছিল গোয়ালন্দে। যে সময় চা-বাগানের অত্যাচারিত কুলীদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া ষ্টীমারের সমস্ত খালাসী ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। সময়ান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অশ্রু-কণা

ধর্ম্মে দৃঢ়, সত্যাশ্রয়ী, যথা "যুধিষ্ঠির",
অরাতির আক্রমণে "ভীম"-পরাক্রম,
লক্ষ্যভেদে একনিষ্ঠ "পার্থ"সম বীর,
তোমার তুলনা আর নাই, নরোত্তম!
ভোগেও দেবেন্দ্র ছিলে, ত্যাগে বুদ্ধ যথা,
প্রেমে বিগলিত প্রাণ, নিত্যানন্দ রায়,
গৌরাঙ্গী পত্নী-প্রেম মাতৃমন্ত্রে গাঁথা,—
সে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, বঙ্গবাসী প্রায়,
মাতালে ভারতবাসী, কি মোহন তানে।

চিত্ত বিত্ত শক্তি স্বাস্থ্য, মান-অপমান,
মাতৃযজ্ঞে সর্ব্বত্যাগী। মাতার কল্যাণে,
অবশেষে পূর্ণাহুতি দিয়ে নিজ প্রাণ,
দেখালে ভারতে, মাতৃপূজার বিধান,—
এক মূল-মন্ত্র, প্রেমে আত্মবলিদান।
বিত্তদানে ভারতের চিত্ত করি জয়,
চিত্তরাজ তুমি আজ, হে চিত্তরঞ্জন,
সে তুচ্ছ পার্থিব রাজ্য, হবে ধ্বংস লয়,
এ রাজ্যে তোমার, রাজা, অক্ষয় আসন।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি-অর্ঘ্য

আজ এই নব-জাগরণের দিনে যখন আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী একটা অপূর্ব্ব নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, যখন আশায়, উৎসাহে, আনন্দে আমরা একটা গোটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে ভগবান্ আমাদের নেতাকে আমাদের নিকট হইতে কেন টানিয়া লইলেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে আমাদের কি ছিলেন, এবং আমাদের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেটা ঠিক ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। মোটের উপর যাহার তাঁহাকে জানিবার ও তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়াছে, সে-ই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছে এবং ভক্তিভরে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে।

তাই আজ মনে পড়ে সেই দিন, যে দিন বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত চিত্তরঞ্জন কর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পূর্ব্বেই পুত্রের কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার অতিগুরু ঋণভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়া ছিলেন, আর সেই দিন হইতেই তাঁহার ভিতর একটা বিশাল হৃদয়, একটা মহৎ প্রাণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে দিন যে মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কালে তাহা একটা বিরাট বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভারতকে মুক্তির মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, আর সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল।

হে দেশবন্ধো! আজ মনে পড়ে সেই অরবিন্দের মোকর্দ্দমার কথা, যে দিন তোমার দেশবাসী তোমাকে এক জন কৃতবিদ্য ব্যবহারাজীব বলিয়া চিনিয়াছিল, সে দিন হইতে যশ, মান ও অর্থ তোমার শিরে অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল, সে দিন হইতে কত দীন-হীনের, কত অনাথ, আতুর ও বিপন্নের, কত ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও শরণাগতের এবং ছাত্রের তুমি পিতা, ত্রাণকর্ত্তা ও বন্ধু হইয়াছিলে, আর তাহারা তোমার দত্ত কৃপাকণায় নিত্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইত। "To live for others" এই মহৎ বাক্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তুমিই।

তাহার পর মনে পড়ে, যখন আমরা তোমাকে 'সাগর-সঙ্গীতের' কবি বলিয়া চিনিলাম। আর তুমি তোমার কর্ম্মময় জীবনের শত কায সত্ত্বেও বাণীর এক জন সেবক হইয়া উঠিলে।

তাহার পর মনে পড়ে সেই দিন—যে দিন তুমি দেশমাতৃকার আহ্বানে ধন, জন, গৌরব, ব্যারিষ্টারী, বিলাস, ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া ফকির হইলে—শুধু ফকির নয়, আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত তুমি কারাগারের ধূলিশয্যায় ত্যাগমন্ত্রের সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে -জগৎ তোমার এই অপূর্ব্ব মহান্ ত্যাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইল— আর তোমার দেশবাসী ভক্তিভরে তোমার নিকট মস্তক অবনত করিল। কত লোক তোমার সংস্পর্শে ধন্য হইল—পবিত্র হইল।

তাহার পর কত ঝড়, কত বিপদ্ তোমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল -আর তুমি দীপ্ত তেজে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া রহিলে— জগৎকে দেখাইলে—ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র।

তাহার পর মনে পড়ে সে দিনের কথা, যে দিন আমি এ জীবনে তোমাকে শেষ দেখা দেখিয়াছিলাম— যে দিন দার্জ্জিলিং যাইবার ঠিক ৩ দিন পূর্ব্বে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে আমাদের আলয় ও উত্তরপাড়া ধন্য হইয়াছিল, পবিত্র হইয়াছিল। সে দিন তোমার শ্রীমুখের বাণীগুলি এখনও আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে।

সব শেষ মনে পড়ে, সে দিন শিয়ালদহ ষ্টেশনের কথা। সে দিন তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ ভাবিয়া যেমন হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল, তেমনই আবার যখন দেখিলাম যে, তোমার পবিত্র আত্মার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তোমার প্রতি অসীম ভক্তিভরে সমবেত হইয়াছে, তখন মনে হইয়াছিল

দুর্গামোহন দাশ

ধীর অবিকম্পিত ব্যক্তিত্ব; তোমার সেই দেশমাতৃকার কল্যাণে উৎসৃষ্ট স্বার্থগন্ধশূন্য প্রবল আত্মত্যাগের ফল, তাই আজ তুমি শুধু বাঙ্গালার দেশ-বন্ধু নহ, ভারতের দেশবন্ধু—সমগ্র জগতের জগদ্বন্ধু—তাই আজ তোমার নাম পৃথিবীময় ধ্বনিত হইতেছে এবং তোমার ত্যাগ, তোমার অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেম জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে।

তাই আজ তোমার গুণের তুলনা নাই। তাই আজ তোমার তুলনা করিতে গেলে বলিতে হয়,—

"কাহার সনে করিব তুলনা,
তোমার তুলনা তুমিই গো।

আর তাই আজ তোমারই সমগ্র দেশবাসী পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিত্তরঞ্জনের,—বাণীর একনিষ্ঠ সেবক চিত্তরঞ্জ-নের—ভারতের রা জ নী তি-ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ বীর চিত্তরঞ্জনের এবং স্বদেশপ্রেমিক ও কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রস্থানে তাঁহার পুণ্যময় পবিত্র আত্মার প্রতি ভক্তিভরে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

যে, বুঝি এরূপ মৃত্যু দেবতারও বাঞ্ছনীয় এবং লোভনীয়।

সারা ভারতে তুমি একটা নূতন জীবন আনিয়া দিয়াছ, সারা ভারতময় তুমি উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াইয়া বিপুল বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও অপূর্ব্ব একতামন্ত্রে সমগ্র ভারতকে দীক্ষিত করিয়াছ।

আজ যে ভারত একটা নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে—মহাত্মা গন্ধীর অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে,—আজ সমগ্র জগৎ, ভারতের দিকে যে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে, ইহার মূলসূত্র তোমারই সেই অচল অটল

হে দেশবন্ধু!

দিতেছি বিদায় যাও চ'লে যাও
রোগ-শোক-ভরা ধরণী ত্যজি।
দেবতার মাঝে দেবতার সাজে
চিরবিরাজিত হও গে আজি॥
যাবার সময় আশিস্ তোমার
দেবতা গো শুধু এইটি চাই।
তোমার স্মৃতিটি জাগাইয়ে যেন
তোমার পথেতে চলিয়া যাই॥

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।
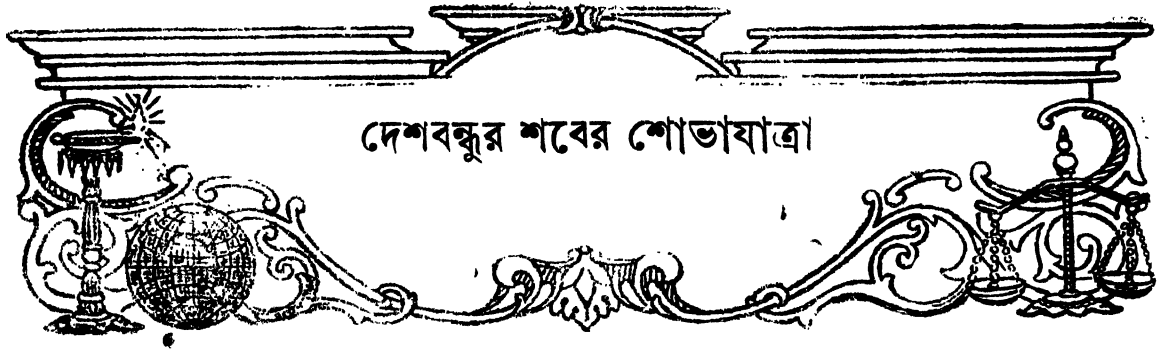
দেশবন্ধুর শবের শোভাযাত্রা

রোগশয্যা

ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে যাইয়াও প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে তাঁহার জ্বর হইত। সোমবারে সে জ্বর ছাড়িয়া যাইত। শারীরিক অসুস্থতা তিনি কোন দিনই গ্রাহ্য করিতেন না—কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ৬৩ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহান্ত ঘটিবে না। এই দৃঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি শারীরিক অসুস্থতা সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করিতেন। রবিবার প্রাতে তিনি তাঁহার বাসগৃহ "ষ্টেপ এসাইড" হইতে দিঘাপাতিয়ার রাজা শ্রীযুত প্রমোদানাথ রায়ের 'গিরিবিলাস' গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার জ্বর আসিল না দেখিয়া পরম আনন্দে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী বলিলেন, 'তুমি কেবল মনে কর জ্বর আসিবে—জ্বর আর হইবে না।' পত্নীর অনুরোধে দেশবন্ধু অন্য দিনেরই মত সান্ধ্য আহার গ্রহণ করিলেন। তখনও তিনি কোনরূপ অসুস্থতা অনুভব করেন নাই। আহারের পর তিনি কতকগুলি আবশ্যক কায শেষ করিয়া ৯টা বাজিলে পত্নী, কন্যা প্রভৃতিকে তাঁহার কতকগুলি নব-রচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

রবিবার রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আসিল। আহারের পর জ্বর, মাঝে মাঝে কম্প ও মাঝে মাঝে কম্পত্যাগ হইতে লাগিল। এইরূপে

ষ্টেপ এসাইড—দার্জ্জিলিং [ফটোগ্রাফার—নবীন গুপ্ত

দার্জ্জিলিংএ সংবাদ
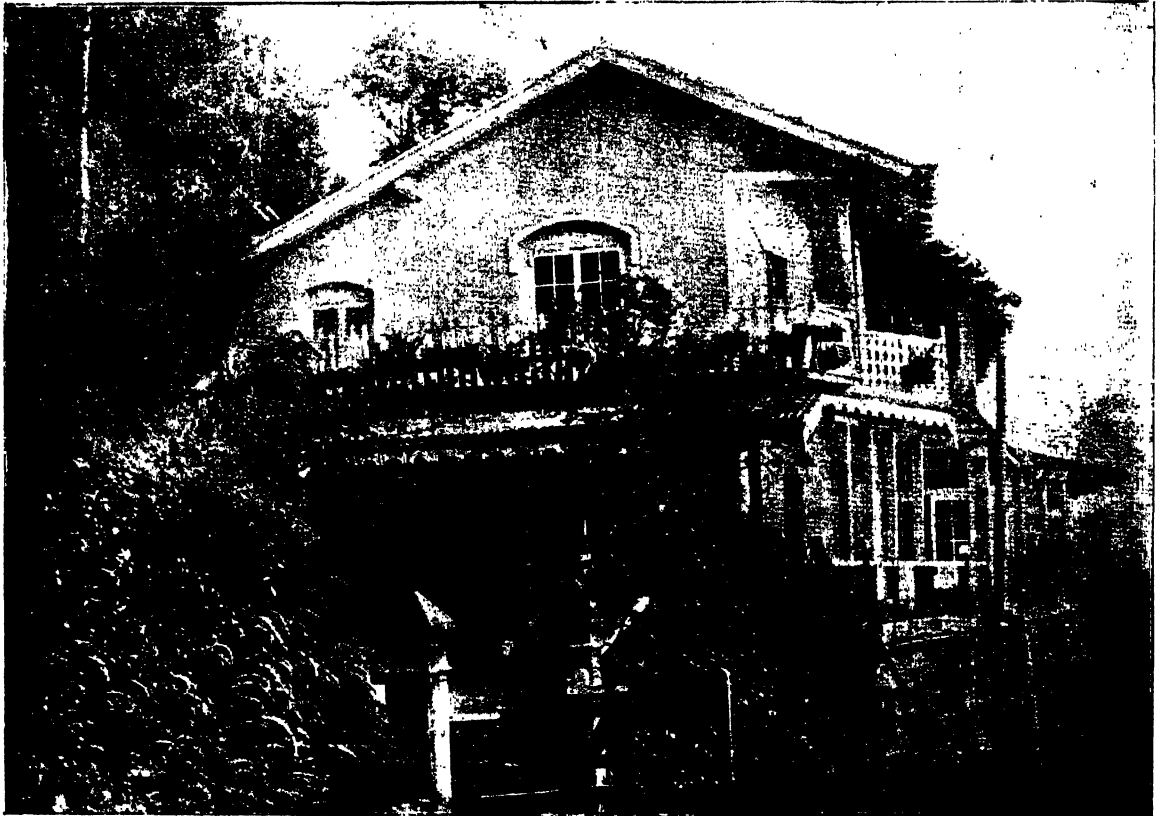
দেখিতে দেখিতে ঐ সংবাদ সহরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে "ষ্টেপ এসাইড" লোকে একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল। মহাপ্রাণ বীরাবতার প্রাণহীন চিত্তরঞ্জনকে শেষ দর্শন করিবার জন্য সহর ও সহরতলীর সমস্ত লোক ষ্টেপ এসাইডের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। সেই গভীর অন্ধকারময় রাত্রিতে লোক ৬।৭ মাইল পার্ব্বত্য পথ প্রাণের আকুলতায় অবহেলায় অতিক্রম করিয়া দলে দলে আসিয়াছিল। পাহাড়ীয়ারা পর্য্যন্ত দলে দলে ছুটিয়া আসতে লাগিল।

দার্জ্জিলিংএ পুষ্পশয্যা [ফটোগ্রাফার—শ্রীতারাকুমার সুর

সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাতে দেখা গেল, তাপ ১০৩ ডিগ্রী উঠিয়াছে। তখনও আশঙ্কার কোন কারণ কেহ মনে করেন নাই—কাজেই কাহাকেও কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। বেলা ১১টার সময় হইতেই দেহে বেদনা ও শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে ডাক্তার ডি, এন, রায় মহাশয়কে আনা হইল। তিনি রোগী দেখিয়াই বলিলেন—রোগ শিবের অসাধ্য। ক্রমেই রোগীর অবস্থা অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—মঙ্গলবার প্রভাতে দেখা গেল—পদের দুই স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে। বেলা ৩টার সময় অবস্থা খুব খারাপ হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া খুব মৃদু হইয়া আসিয়াছিল। ডাক্তারেরা অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অক্সিজেন প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই বেলা ৫টার সময় তিনি মারা যায়েন।

বাসন্তী দেবী

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাসন্তী দেবী প্রিয়তম স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিতা অবস্থায়

দার্জ্জিলিংএ শববাহন [ছায়াচিত্রকর—শ্রীতারাকুমার সুর

দার্জ্জিলিংএর শোকযাত্রা [ছায়াচিত্রকর—শ্রীতারাকুমার সুর

ব্যস্ত হইলেন। সার আবদার রহিম, সার হিউ ষ্টিফেনসন, মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি সকলে চেষ্টা করিয়াও সে রাত্রিতে শবপ্রেরণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। শব একটি শবাধারে রক্ষিত হইল। পাছে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, সে জন্য তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। দেশবন্ধুর সেই অন্তিম দিনে দার্জ্জিলিংবাসী সকলেই প্রায় সে রাত্রি ষ্টেপ এসাইডে কাটাইলেন

পড়িয়া ছিলেন, নয়নে তাঁহার অশ্রু ছিল না—যখন তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন চক্ষুতে এক বিরাট শূন্যতা ও তাহা হইতে বিপুল ব্যথার বেদনা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

তিনি দার্জ্জিলিংয়েই দেশবন্ধুর শব দাহ করিতে চাহেন, কারণ, দেশবন্ধুও শেষ মুহূর্ত্তে না কি সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এ দিকে শব কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে বহু টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু-ভগিনী লেডী অচলা বসু তখন বাসন্তী দেবীর পার্শ্বে। তাঁহারা দেশবাসীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বাসন্তী দেবীকে অনেক অনুরোধ করিয়া শব কলিকাতায় আনিতে দিতে সম্মত করাইলেন। দার্জ্জিলিংএ সে রাত্রিতে কেহ ঘুমায় নাই। গভর্ণর সার জন কার হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কে কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন, তাহার জন্য

দার্জ্জিলিংএ শোভাযাত্রা

বেলা ৯টার সময় মৃতদেহ রেলে তুলিবার কথা (ঐ সময়েই দার্জ্জিলিং মেল ছাড়ে), কিন্তু মৃতদেহ বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য রাত্রি প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেপ এসাইডের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। যথাসময়ে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া দেশবন্ধুর 'শব' কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। সেই

দার্জ্জিলিংএ শবানুগমন [ছায়াচিত্রশিল্পী—শ্রীতারাকুমার সুর

মহাত্মা ট্রেণ হইতে শিয়ালদহে শব নামাইতেছেন

সাড়ে ৯টার সময় মেল ষ্টেশন ত্যাগ করিল, অনেকে ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল, পরে ট্রেণ খুব জোরে ছুটিয়া চলিল। শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী দার্জ্জিলিংএ ছিলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে চলিয়া আসায় শেষ মুহূর্ত্তে ভ্রাতাকে দেখিতে পায়েন নাই।

গভর্ণর নিজে রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়াছিলেন—চিত্তরঞ্জনের স্বজনগণ যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলেন, তাঁহারা যেন সেইরূপ ব্যবস্থাই করেন। শবাধার একখানি ব্রেকভ্যানে তুলিয়া লওয়া হইল। বাসন্তী দেবী শবের পার্শ্বে

শোভাযাত্রায় সার জগদীশচন্দ্র বসু, দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমোদনাথ রায়, সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, নদীয়ার মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় প্রভৃতি সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশন

ষ্টেশনের দৃশ্য হৃদয়-বিদারক, বিরাট ও বিপুল জনতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের বীর নেতার দেহ শেষবার দেখিবার জন্য ব্যথাতার বুকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথায় এক জন বৃদ্ধা মহিলা এমন ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন যে, তাঁহাকে শান্ত করা বড়ই মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছিল।

প্লাটফরমে কুসুমাবৃত শয্যায় শবস্থাপন
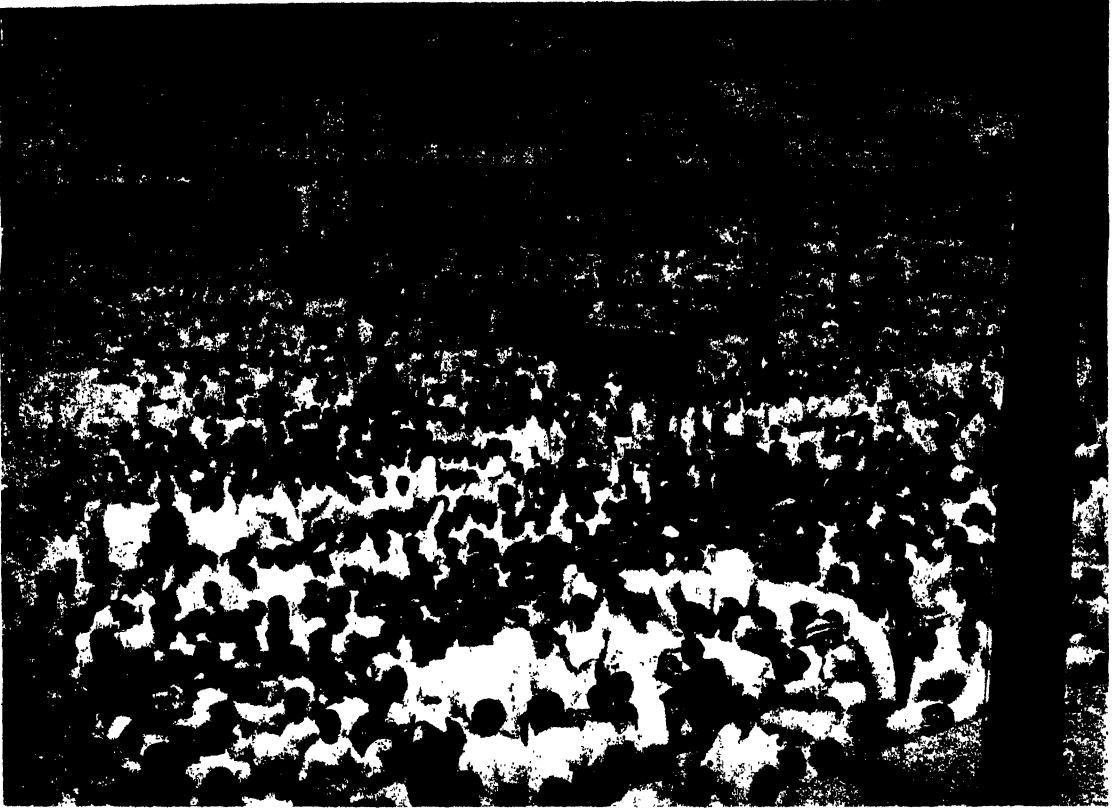
শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরের দৃশ্য

বসিয়া রহিলেন। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী-গুপ্তা, চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণী মায়া বসু ও চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা সেই সঙ্গে ছিলেন। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় দেশবন্ধুর নিকটই ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্বশুরের শোকে পাগলপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। বহু সান্ত্বনা সত্ত্বেও তাঁহাকে শান্ত করা যায় নাই। তিনি কেবল স্ত্রীলোকের মত রোদন করিয়াছিলেন। বোর্ড অফ রেভিনিউএর মেম্বর শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে-র পত্নী ঐ ট্রেণেই আসিতেছিলেন—তিনি বহুক্ষণ শোকার্ত্ত পরিবারের সঙ্গে ব্রেকভ্যানেই আগমন করিয়াছিলেন।

শিলিগুড়ী

ট্রেণ আসিয়া শিলিগুড়ীতে পৌছিল। কলিকাতা হইতে সস্ত্রীক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ হালদার ও ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত শিলিগুড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ভাগ্যহীন চিররঞ্জন পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি পাবনা হিমায়েৎপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে ছিলেন—তিনিও শিলিগুড়ীতে গিয়াছিলেন। শিলিগুড়ীর এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার মিষ্টার গ্রেটার তথায় যতদূর সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব, তাহা করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শিলিগুড়ী কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক তথায় সংকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ী হইতে শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেন প্রভৃতি কংগ্রেস-কর্ম্মীরাও শিলিগুড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হয়েন।

হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে শবাধার দার্জ্জিলিংএর গাড়ী হইতে নামাইয়া পার্ব্বতীপুরের গাড়ীর ব্রেকভ্যানে তোলা হইল। ট্রেণ যখন পার্ব্বতীপুরে আসিল, তখন দেখা গেল, ষ্টেশনে শোকাকুল জনগণ একান্তই স্থানাভাব ঘটাইয়াছে। রঙ্গপুর হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায়, মৌলবী বসির মহম্মদ, দিনাজপুরের মৌলবী কাদের বক্স প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। পার্ব্বতীপুরেও সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল।

কলিকাতার গাড়ীতে

পার্ব্বতীপুরে শবাধার কলিকাতার গাড়ীতে তোলা হইল। পথে হিলি ষ্টেশনে মৌলবী আফতাব-উদ্দীন চৌধুরী, সান্তাহারে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুত নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বগুড়ার নেতৃবৃন্দ ও প্রায় তিন সহস্র লোক দেশবন্ধুর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত জনগণ শবের উপর পুষ্পমাল্য ও তুলসীমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। ট্রেণ যখন নাটোরে পৌছিল, তখন দিঘাপাতিয়ার কুমার প্রতিভানাথ রায় আসিয়া পিতার নামে, নিজ নামে ও দিঘাপাতিয়ার জনগণের নামে দেশবন্ধুকে ৩ গাছি মাল্য নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত সুদর্শন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ রাজসাহীর বহু লোক
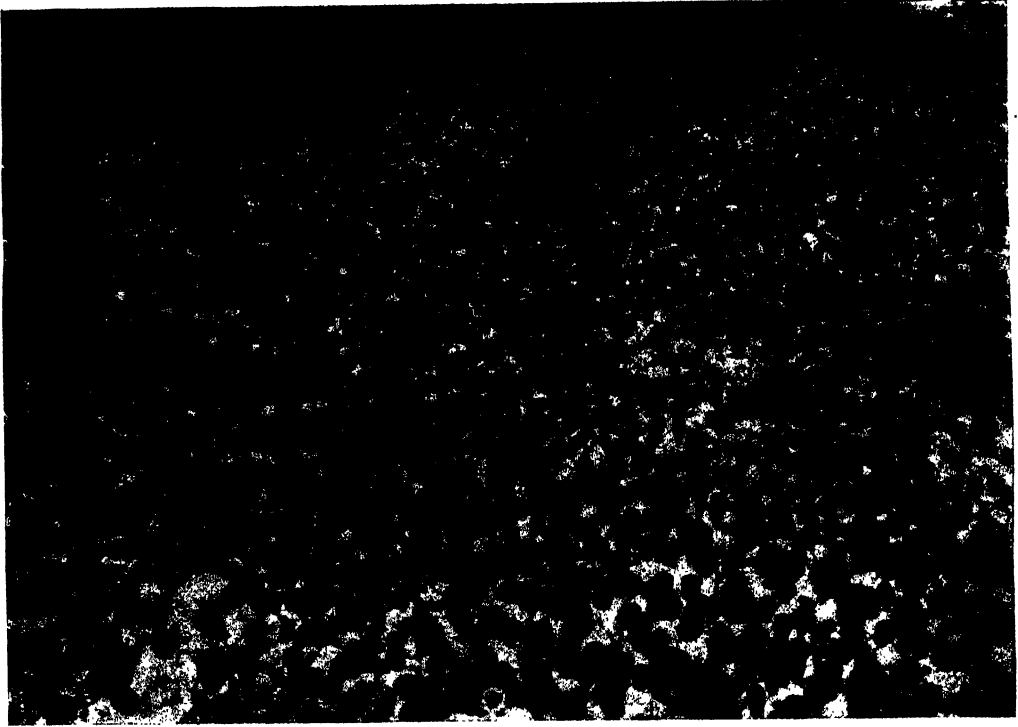
শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরের জনসমুদ্র [প্রিন্স কোং ফটোগ্রাফার

নাটোর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরদী ষ্টেশনে সিরাজগঞ্জ ও পাবনার বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঢাকা অঞ্চল হইতে বহু লোক পোড়াদহে সমবেত হইয়া ষ্টেশন-প্ল্যাটফরম পূর্ণ করিয়াছিলেন।

রাণাঘাট

ট্রেণ যখন রাণাঘাটে পৌঁছিল, তখন দেখা গেল, সমগ্র ষ্টেশন জন-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। তথায় বহরমপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে আগত প্রায় ৫ সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার, মৌলবী সামসুদ্দীন আহম্মদ প্রভৃতি বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী তথায় উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ নৈহাটী ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তার মাতা, হুগলীর শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম প্রভৃতি দেশবন্ধুর প্রতি শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে প্রতি ষ্টেশনে জনতার বাহুল্য হেতু ট্রেণকে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল

শোকযাত্রার অগ্রগামী তোরণ-দ্বার

বারাকপুর

কলিকাতা হইতে মহাত্মা গন্ধী, শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায়, শ্রীমতী অপর্ণা ও দেশবন্ধুর পুত্রবধূ বারাকপুরে গিয়াছিলেন। মেল বারাকপুরে আসিলে তাঁহারা সকলেই মেলে উঠিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত ভবশঙ্করও বারাকপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।
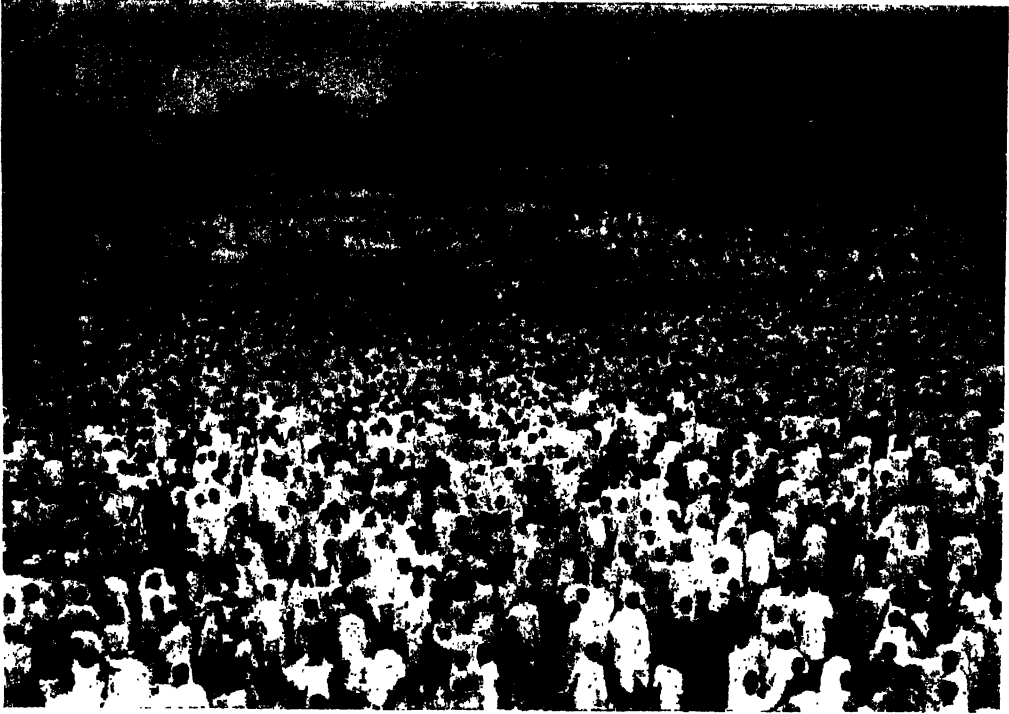
শিয়ালদহের জনস্রোত

শিয়ালদহ ষ্টেশন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শব দার্জ্জিলিং মেলে সকাল সাড়ে ৬টার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিবে জানিয়া রাত্রি ৪টা হইতেই লোক ষ্টেশন-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী, শিখ, মারাঠী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, তৈলঙ্গী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই দলে দলে আসিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে হাওড়ার পুল খুলিয়া দেওয়ায় হাওড়া হইতে বিরাট জনসংঘ যথাসময়ে শিয়ালদহে সমাগত হইতে পারেন নাই।

রাত্রি ৪টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকরা শিয়ালদহের উত্তরদিকের ষ্টেশন ও মধ্যের ষ্টেশনের মাঝ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার দুই ধারে কাতারে কাতারে দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে লোক জমিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায় আসিলেন। ষ্টেশনের প্রবেশপথে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। সাড়ে ৪টার সময় শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আসিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী আসিলেন। ৫টা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে এক জন গোরা সার্জ্জেন কয়েক জন লম্বা লম্বা লাঠিওয়ালা কনেষ্টবল লইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাছে আসিল। সম্মুখেই দড়ি ছিল। সে পকেট হইতে ধীরে ধীরে একখানা চাকু বাহির করিয়া দড়ি কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। প্রথমতঃ তাহার মতিগতি একটু বেয়াড়া মনে হইয়াছিল, পরে কিন্তু সে দড়ি কাটে নাই। স্বেচ্ছাসেবকদিগের দলে দাঁড়াইয়াই পুলিস শান্তিরক্ষা করিতেছিল। সর্ব্বপ্রথমেই খিলাফৎ কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ দণ্ডায়মান ছিলেন।

৫টার সময় হইতে ক্রমেই ভিড় বাড়িতে লাগিল। কাতারে কাতারে লোক ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম যাহাদিগকে আসিতে দেখা গেল, তাহাদের মধ্যে যুবক ও বালকই বেশী পরে সকল শ্রেণীর লোকই ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল। সাড়ে ৫টার সময় কয়েক জন সহিস কতকগুলি পদ্ম লইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

সাড়ে ৬টার সময় দেখা গেল, শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত অগণিত নরমুণ্ড। এরূপ জনতা ইতঃপূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর এক দুর্দ্দিনে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন এমনই অতর্কিতভাবে পাটলীপুত্রে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শব পরদিন কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল, বোধ হয়, কেবল তখনই এই জনতার অনুরূপ জনতা সমবেত হইয়াছিল।

মহাত্মার নিবেদন

ভিড়ের মধ্যে মহাত্মা গন্ধীর নিম্নলিখিত নিবেদনপত্র বিলি করা হইয়াছিল :—

"আজ সমগ্র জাতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আমরা কেন শোক করিব ? কারণ, দেশবন্ধু পরলোকে গমন করিলেও আমাদের ভিতরেই তিনি জীবিত থাকিবেন। মৃতের প্রতি যে সম্মান দান করা উচিত, আমাদের শিক্ষা তাহা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের স্নেহমমতা যেন আমাদিগকে অন্ধ না করে, আমরা যেন তাহাতে বুদ্ধি-বিবেচনা না হারাই।
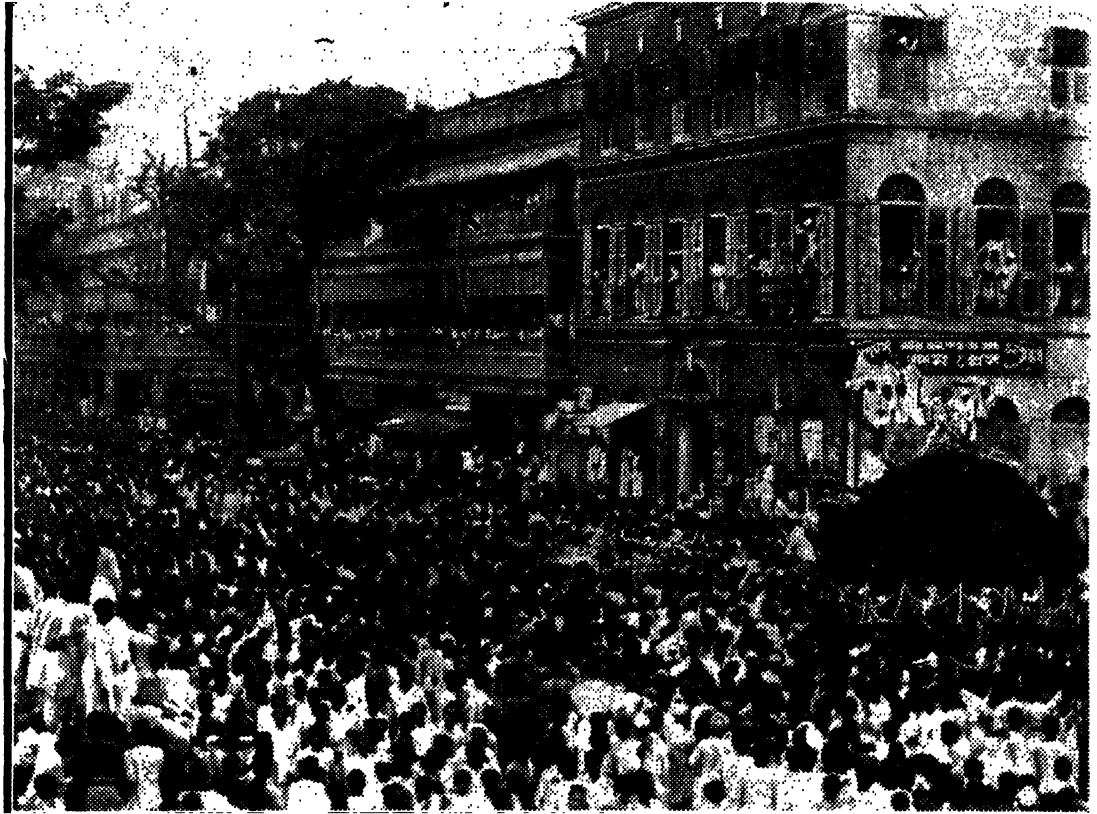
শোকযাত্রার দৃশ্য—হ্যারিসন রোডের মোড়ে [এ, এন. দাস, ফটোগ্রাফার

দেশবন্ধুর মৃতদেহ যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিবে, তখন খুবই ভিড় হওয়ার কথা। প্রত্যেক লোক যাহাতে· পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদশন করিতে পারে, তাহাদের ঐ ইচ্ছা যদি আমরা পূর্ণ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে :—(১) কেহ চীৎকার করিবেন না। (২) গাড়ীর দিকে যাইবার জন্য কেহ ছুটিবেন না। লোক যে যেখানে, সে সেই-খানে দাঁড়াইবে, যেন ভিড় ঠেলিয়া কেহ সামনে আগাইয়া যাইতে চেষ্টা না করে। (৩) শববাহকদিগকে যাইবার ·পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই. সামনে ভিড় না হয়। (৪) কীর্ত্তনের দল ছাড়া শববাহকদিগের সম্মুখে অপর কেহ যেন না থাকে ; যাঁহারা মিছিলে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পিছনে থাকিবেন, লাইন যেন ভাঙ্গা না হয়। শ্মশানঘাটে চিতার দিকে কেহ যেন হুড়াহুড়ি করিয়া না যায়। তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, কাযেই ভয় হয়, শব হয় ত বিকৃত হইয়াছে, কাযেই উহা উন্মুক্ত করিয়া দেখান সম্ভবপর হইবে না। (৫) অনুগ্রহ পূর্ব্বক·মনে রাখিবেন, বাহ্য সাময়িক সম্মান দেখাইলেই পরলোকগত স্বদেশপ্রেমিকের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হয় না, দেশবন্ধু যে ব্রত আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপনে অন্তরের ভক্তিপ্রদর্শনেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শিত হইতে পারে। ইতি—এম, কে, গন্ধী।"

তাহার পর হগমার্কেট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্পদামে গ্রথিত "একতাই বল" এবং "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" লিখিত সুদৃশ্য তোরণ এবং অমলধবল শ্বেতপদ্মে শোভিত খট্টা আসিয়া পৌঁছিল।

আগমন

দার্জ্জিলিং মেল আসিতে পথে বিলম্ব হইয়াছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনের ডিষ্টাণ্ট সিগনালের নিকট মেল থামাইয়া তাহা হইতে শবাধারবাহী ব্রেকভ্যান ও সঙ্গের বগীখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইল। মেলের অবশিষ্ট গাড়ীখানি·যথানিয়মে ৮নং প্ল্যাটফরমে যাইয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন গাড়ী দুইখানিকে একখানি এঞ্জিন টানিয়া ৪নং প্ল্যাট-ফরমে আনয়ন করিল। সেই জন্য সাড়ে ৭টার পূর্ব্বে ট্রেণ কলি-কাতায় পৌঁছে নাই। ততক্ষণে ষ্টেশনের ছাদে, আলিসায়, টিনের চালে, গাড়ীর উপর, এমন কি, প্লাটফরমের কড়ির উপরেও লোক উঠিয়া ·বসিয়া ছিল। বহু লোক ষ্টেশন-প্লাটফরমে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—রেভারেণ্ড বিমলানন্দ নাগ, ডাক্তার বি, এল, চৌধুরী, রায় বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর কনীন্দ্রলাল দে, সত্যানন্দ বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
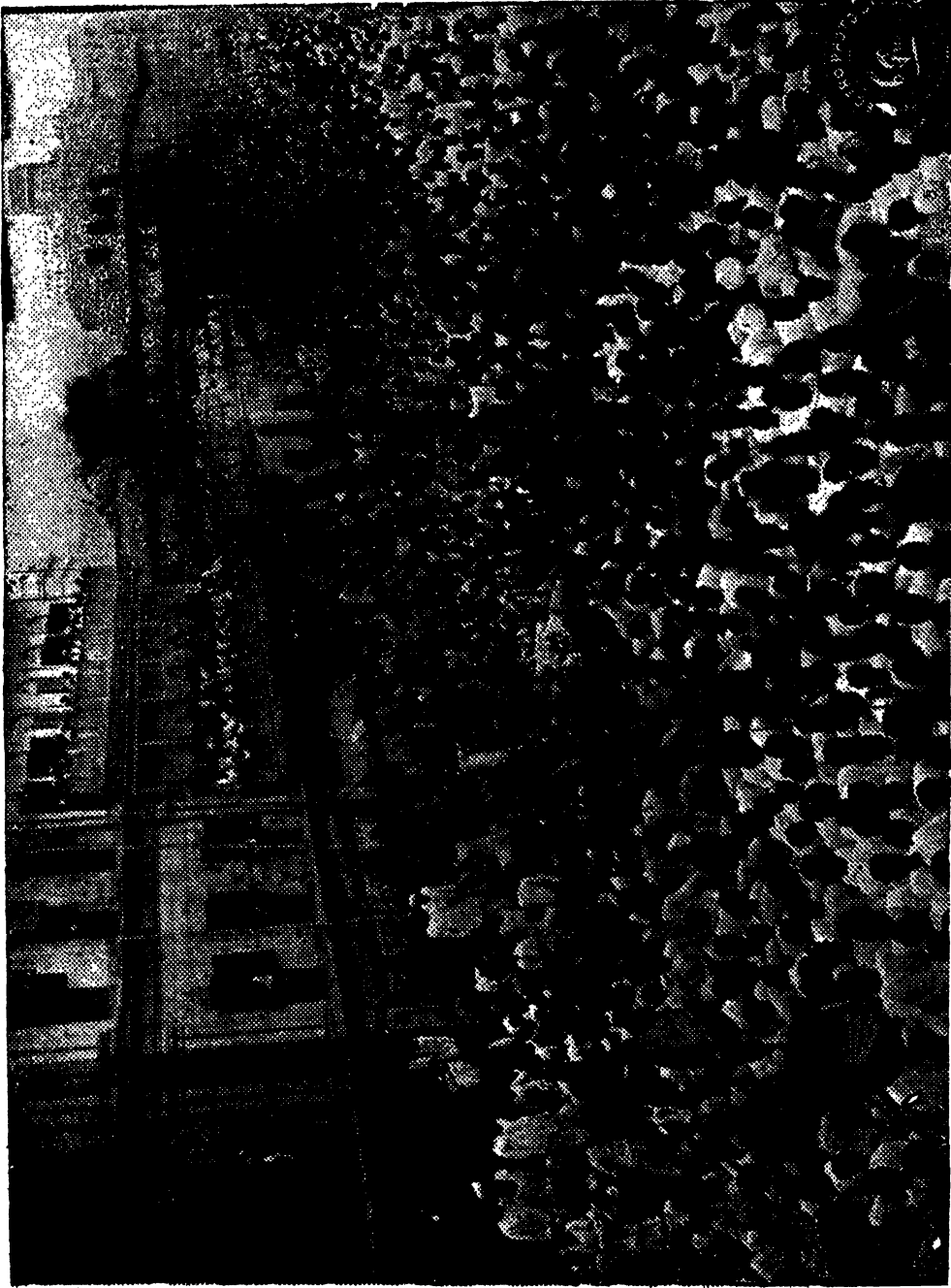
হ্যারিসন রোডের দৃশ্য

শোভাযাত্রা বড়বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী

ভবেন্দ্রনাথ রায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, প্রবোধচন্দ্র গুহ, প্রিয়নাথ গুহ, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্যামাদাস বাচস্পতি, খগেন্দ্রনাথ সেন, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নিবারণচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মল্লিক, পুলিসের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার নলিনী সেন, এ এচ, গজনভী, বি, কে, গজনভী, মহম্মদ আলি মামুজী, বিপিনচন্দ্র পাল, দোস্ত মহম্মদ, মহম্মদ রফিক, মহাদেব দেশাই, কৃষ্ণদাস, রামা সুব্বা আয়ার, হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায়, খাঁ বাহাদুর আবদুল মমিন, বসন্তকুমার লাহিড়ী, সার নীলরতন সরকার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, সাহিদ সারওয়ার্দ্দী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডি, এন, ইউলকার, রেভারেণ্ড এণ্ডারসন, খাজে সাদারুদ্দী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লেপ্টেনাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় প্রভৃতি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু কর্ম্মচারী ও কাউন্সিলার, ব্যবস্থাপকসভার সদস্য, কংগ্রেসকর্ম্মী প্রভৃতি সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা বাহুল্যমাত্র।

শবস্থাপন

ট্রেণ আসিতে বিলম্ব হওয়ায় জনসঙ্ঘ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, কোন ট্রেণের শব্দ শুনিলেই তাহারা চকিত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে হয় যে, ট্রেণ আইসে নাই। সকলেরই মুখে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা—অন্তরের বিষাদ কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। ট্রেণ উপস্থিত হইলে জনসঙ্ঘ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া উঠিলে মহাত্মা সকলকে শান্ত হইতে উপদেশ দেন। তখন সেই বিরাট জনসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরব। সকলের চক্ষুতে জল, হৃদয়ে দারুণ দুঃখ, কিন্তু বাহ্য কোন চাঞ্চল্য নাই, মুখে কোন কথা নাই।

ট্রেণ স্থির হইবামাত্র মহাত্মা গন্ধী কামরার দ্বার খুলিয়া দেহ বহন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাহার পর মহাত্মা গন্ধী, ভ্রাতা সতীশরঞ্জন, পুত্র চিররঞ্জন, জামাতা সুধীরচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী শবাধার হইতে শব আনিয়া পালঙ্কে স্থাপিত করিলেন। পালঙ্কখানি কুসুমে মণ্ডিত ছিল। শব বিশদ বস্ত্রে আবৃত, তাহার উপর শত শত ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য কুসুমদাম। এই অপরূপ সজ্জায় কলিকাতাবাসী চিত্তরঞ্জনকে শেষ দেখা দেখিল। মহাত্মা গন্ধী ও চিররঞ্জন প্রমুখ বহু আত্মীয় শব স্কন্ধে লইয়া ষ্টেশন হইতে নির্গত হইলেন। তাহার পর অপূর্ব্ব দৃশ্য—বিরাট জনসঙ্ঘ নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে শোকাকুল চিত্তে বাষ্পাকুল লোচনে বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব—ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা চিত্তরঞ্জনের পার্থিব দেহের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিল। কাহারও মুখে কথা নাই, কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসঞ্চালন নাই—যেন কিসের করুণ স্পর্শে জড় পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধা শেষবার নিবেদন করিতেছে। এমন দৃশ্য কুত্রাপি কোন দিন দেখা যায় নাই।
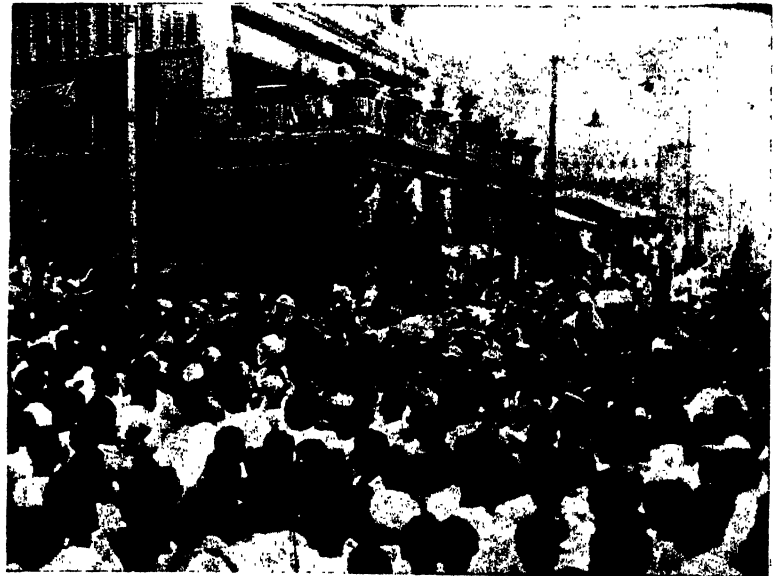
সেন্‌ট্রাল এভিনিউতে শোকযাত্রা

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের শোকযাত্রা

 [ফটোগ্রাফিক ষ্টোরস

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের জনস্রোত [ফটোগ্রাফিক ষ্টোরস

নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের দৃশ্য

ছিল। রথে, দোলে অথবা মহরমে যেমন গাড়ী বোঝাই হইয়া নরনারী দর্শকবৃন্দ পথের পার্শ্বে অপেক্ষা করে, তেমনই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অসংখ্য গাড়ী, মোটর, ল্যাণ্ডো মানুষের ভার বহন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর ভিতর যেমন ন স্থানং তিলধারণে হইয়াছিল, তেমনই ছাদে, পাদানীতে ও পশ্চাতে কত লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না, আর পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদসম অট্টালিকা সমূহ অসংখ্য নরনারী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বারান্দা, গবাক্ষ, ছাদ কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রায় অধিকাংশ গৃহের পুরনারীরা

শেষ দেখা

সকলেই একবার শেষ দেখা করিতে চায়—একবার শেষ স্পর্শ লাভ করিতে চায়—এই তাহাদের কামনা। তাহাদের এই কামনা পূর্ণও হইয়াছিল—সকলেই শেষ দেখা দেখিয়াছে—একবার শেষ স্পর্শ পাইয়াছে। ঐ সময় চিত্তরঞ্জনের শববাহী ছাড়া আত্মীয় বা বন্ধুরা কেহ সঙ্গে ছিলেন না। জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন জনসাধারণের নিকটে ঐ অবস্থায় থাকিয়া হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত বাহিত হয়েন। পশ্চাতে মহাত্মা গন্ধী ২ জন স্বেচ্ছাসেবকের স্কন্ধে বাহিত হইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তিনি এই দৃশ্যে আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, অবসন্ন হইয়া পড়েন। তখন ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল মহাত্মাকে নিজ মোটরে তুলিয়া লয়েন।

হ্যারিসন রোড

হ্যারিসন রোডে ট্রাম যাতায়াত ভোর হইতেই বন্ধ ছিল। পথের উত্তর পার্শ্বে দলে দলে লোক দাঁড়াইয়াছিল। দোকান-পাট সমস্তই বন্ধ—কিন্তু দোকানের অলিন্দে, দরজার সম্মুখে যে যেখানে সামান্যমাত্র স্থান পাইয়াছিল, সেইখানেই কোনরূপে অতি কষ্টে দণ্ডায়মান

পিকচার প্যালেসের সম্মুখের দৃশ্য

দেশবন্ধুর শব কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্মুখে

পুষ্প, লাজ ও শঙ্খ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, আর পুরুষরা স্তূপাকারে হাতপাখা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোনও কোনও গৃহস্বামী শীতল পানীয়ের বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন।

সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, যে দিকে চাও, অসংখ্য অগণিত নরমুণ্ড—সে যেন নরমুণ্ডের সমুদ্র বলিয়া মনে হইতেছিল। যেন বাঙ্গালী, হিন্দু মুসলমান, মাড়োয়ারী, গুজরাটী সকল জাতিই এক-যোগে একপ্রাণে বিরাট পুরুষ দেশনায়ক চিত্তরঞ্জনকে একবার শেষ দেখা দেখিতে সকল দলাদলি, সকল মতবিরোধ বিস্মৃত হইয়া পথে সমবেত হইয়াছিলেন। সে কি মহান্ দৃশ্য! এমন ভাগ্যধর কে আছে যে, মৃত্যুতে মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বদেশ ও স্বরাজের নিকট এমন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে? সার্থক এমন জন্ম—সার্থক এমন মৃত্যু। বাঙ্গালীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মৃত্যুর পর জাতির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু এমন সার্ব্বজনীন শোকোচ্ছ্বাস এবং বিরাট লোকসমাগম কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

তপনদেব দিন বুঝিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন—বুঝি তিনিও জাতির শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘান্তরালে মুখ লুক্কায়িত করিয়া গোপনে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃতি অকরুণ—কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃতিও যেন দয়ার্দ্র হইয়া জনসঙ্ঘকে আতপতাপ ও ঝঞ্ঝাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হ্যারিসন রোডের প্রথম হইতে শোভাযাত্রা আরম্ভ হইল। প্রথমে জাতীয় পতাকাবাহী দল। বজরং পরিষদ একখানি লরীতে পানীয় জল বিতরণ করিতে করিতে গিয়াছিলেন। একে একে নানা সংকীর্ত্তনের দল অগ্রসর হইল। ইহার মধ্যে এক দলের নেতা ছিলেন শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়। কর্পোরেশনের জলের গাড়ী রাস্তায় জলসেচন করিতে করিতে যাইতেছিল। একখানি গাড়ীতে একটি বৃহৎ জাতীয় পতাকা। তাহার পশ্চাতে গাড়ীতে এক দল লোক খৈ ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছে। পশ্চাতে বয় স্কাউটস্। আবার দলে দলে হরিসংকীর্ত্তন। পশ্চাতে এক আকালী দল। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ পতাকায় ও পাগড়ীতে যেন শোকের শোভাযাত্রার গাম্ভীর্য্য সঞ্চার করিতেছিল। তাহার পর পুষ্পপল্লবে রচিত একটি বিস্তৃত তোরণ। তাহা হগ মার্কেট ট্রেডস এসোসিয়েসনের দান। তাহাতে কুসুমের অক্ষরে নব-ভারতের যুগ-বাণী লিখিত ছিল, "একতাই পথ।" তাহার পর ঐরূপ পত্রপুষ্পে রচিত দুইটি পতাকা—এক দিকে জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণের শোভা, অপর দিকে মাতৃমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্।' তাহার পর আর একটি তোরণ—ভারতের সুসন্তান লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক যেমন ছত্রপতি শিবাজীর সমাধি-তোরণে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন—'বন্দে মাতরম্', তেমনই এই তোরণে উৎকীর্ণ রাম-চন্দ্রের সেই অমর বাণী,—

শোকযাত্রা চৌরঙ্গীর পথে
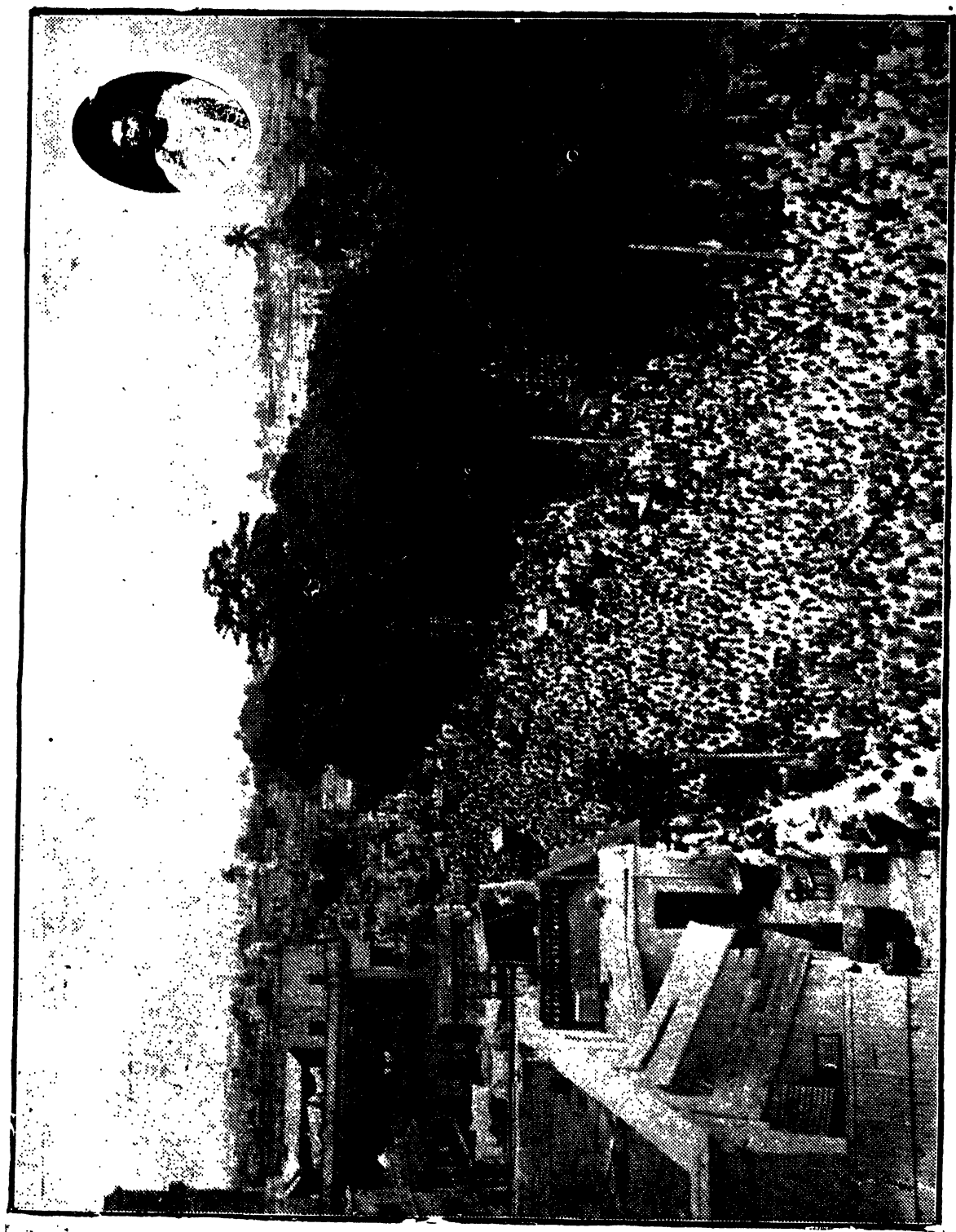
দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহার সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায় ম্যান্সন হইতে চিত্তরঞ্জনের শবের উপর পুষ্প-মালা অর্পণ করেন। ঐ সময় তথায় ঠাকুর পরিবারের বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতাবাসীরা দেশবন্ধুকে তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক মেয়র পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মেয়রের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কর্পোরেশন অফিসের সম্মুখে সমুদয় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলার এবং মহিলা কাউন্সিলার মিস লয়েড উপস্থিত ছিলেন। য়ুরোপীয়গণ টুপী খুলিয়া চিত্তরঞ্জনের

পিপাসিত জনগণকে জল দান

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

তাহার পর শববাহীরা শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। হ্যারিসন রোডে মহিলারা বাড়ীর উপর হইতে খৈ ফেলিতেছিলেন এবং শঙ্খবাদন করিতেছিলেন। মিছিল হ্যারিসন রোড দিয়া চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত গমন করে। পথে বড়বাজারের (১) শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মনের বাড়ীর সম্মুখে (২) মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের সম্মুখে (৩) শ্রীযুত জাজদিয়ার বাড়ীর সম্মুখে (৪) ১৮০ নং হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ী হইতে মহিলারা পুষ্প, খৈ ও গোলাপজল বর্ষণ করে। শোভাযাত্রা দক্ষিণে ফিরিয়া চিৎপুর রোড দিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে এবং পরে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মিছিল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। বাড়ীর মেয়েরা মিছিলের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেন। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে মিছিল ওয়েলেস্লী দিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে ও পশ্চিমাভিমুখী হয়, যে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর সহিত চিত্তরঞ্জনের

দেশবন্ধুভবনে দর্শনলোলুপ আত্মীয়গণের প্রতীক্ষা—শোকবিহ্বলা বাসন্তী দেবী

দেশবন্ধুর ভবনে জজ শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ ও মিঃ এস, আর, দাস

[পি, বসু ফটোগ্রাফার

চিত্তরঞ্জন দেশবাসীকে তাঁহার গৃহ দান করিবার পর পাটনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর সে গৃহে গমন করেন নাই। সেই জন্য শব আর সে গৃহে লওয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অভিপ্রেত ছিল না। ঐ স্থানে মিছিল যখন উপস্থিত হইল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। বাড়ীর ছাদে বহু মহিলা দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। শব গৃহের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাঁহার আপনার জনগণ একবার শেষ দর্শনপ্রয়াসী হইয়াছিলেন। জনতার বাহুল্যে তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। কাযেই শব হাজরা রোড হইয়া কেওড়াতলার শ্মশানে নীত হয়।

শ্মশান-ঘাটে

সেখানে বেলা ১২টার পর হইতে লোক-সমাগম হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যে ক্ষুদ্র স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। বহু মহিলা শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের আত্মীয়-স্বজনগণ সকলেই ঘাটে আসিয়াছিলেন। ঐ শ্মশানেই

পার্থিব দেহের উপর পুষ্পমাল্য রক্ষা করেন। তৎপরে কর্পোরেশনের উচ্চ-নীচ সমুদয় কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাদের প্রিয় মেয়রের প্রতি নীরবে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঐ সময় বহু কর্ম্মচারী এবং কয়েক জন কাউন্সিলারও চোখের জল সংবরণ করিতে পারেন নাই; অনেকে শোকাবেগে কাঁদিতেছিলেন। গ্র্যাণ্ড হোটেল ও এম্পায়ার থিয়েটারের ছাদ ও বারান্দার উপর হইতে বহু শ্বেতাঙ্গ নরনারী ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। মিছিল কর্পোরেশন প্লেস দিয়া চৌরঙ্গী রোডে উপস্থিত হয়। ঐ স্থান হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে কেবল লোক। দোকান, অফিস সব বন্ধ, কেবল বাড়ীতে, রাস্তায় সর্ব্বত্র মানুষ। ছাদের উপর হইতে শ্বেতাঙ্গ মহিলারা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন। ঐ রাস্তায় ভিড় যেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। প্রায় সকলের চক্ষুতেই জল দেখা গিয়াছিল। আর্ম্মি ও নেভী স্টোর্সের উপরিস্থিত পতাকা অর্দ্ধ-উত্তোলিত অবস্থায় রাখা হয়। শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বা মোটরে থাকিয়া শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছিলেন।

১৪৮ রসারোডের দ্বারপ্রান্তে শোকমগ্না শ্রীমতী বাসন্তী দেবী উপবিষ্টা

তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। অসহ্য গরম অনুভূত হওয়ায় উপর হইতে জনতার উপর জলবর্ষণও করা হইয়াছিল।

মিছিল পোড়াবাজারে পৌছিলে লক্ষ্মী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ খই ও পুষ্পের সহিত ৫০ টাকার পয়সা পথে ছড়াইয়াছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে অল্পদিনের ব্যবধানে বাঙ্গালার দুই জন সুসন্তানের নশ্বর দেহ চিতানলে দগ্ধ হইয়াছিল;—স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মবীর সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ শ্মশানে চিতাশয়নে শায়িত হইয়াছিলেন।
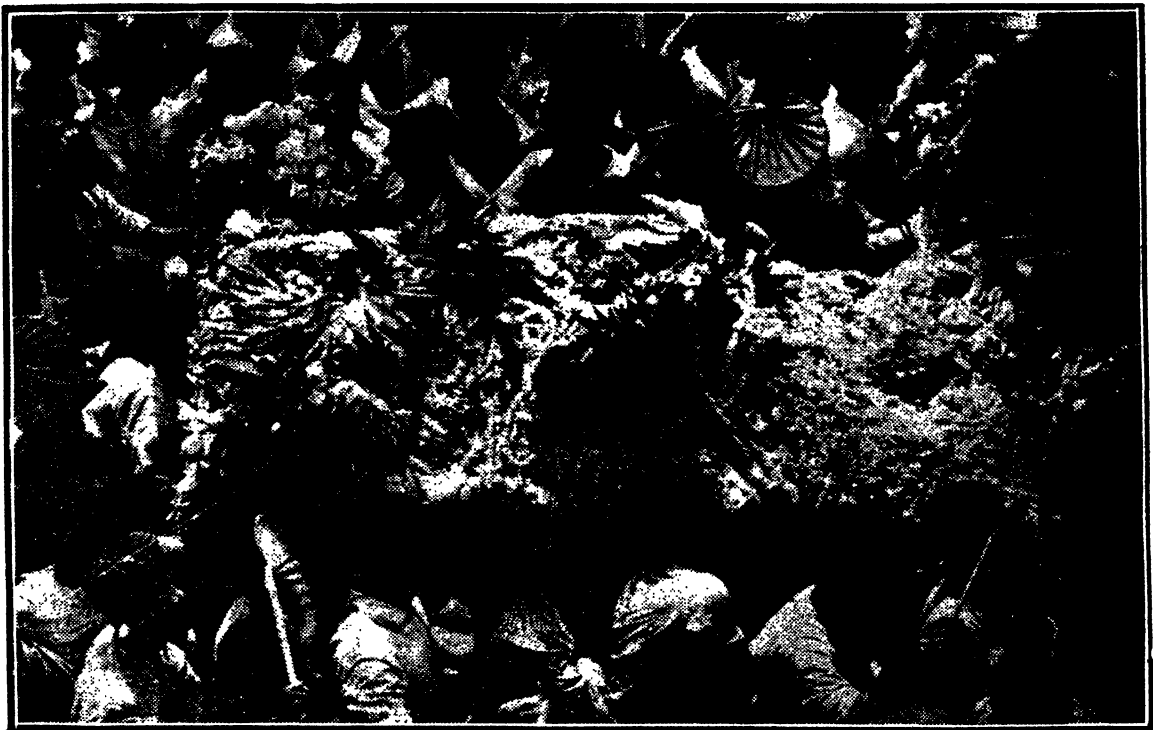
কেওড়াতলা শ্মশানে দেশবন্ধুর শব

শ্মশানে দেশবন্ধুর চিতাশয্যার পার্শ্বে মহাত্মা

শ্মশানে চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি-প্রবন্ধ-রচনায় মহাত্মা

শ্মশানে প্রবন্ধ-রচনার অবকাশে যোগেশ্বর পাল মহাত্মার মৃন্ময়-মূর্তি প্রস্তুত করিয়াছেন

চিতানল—ওপারের দৃশ্য [শ্রীহরেন ঘোষ ফটোগ্রাফার
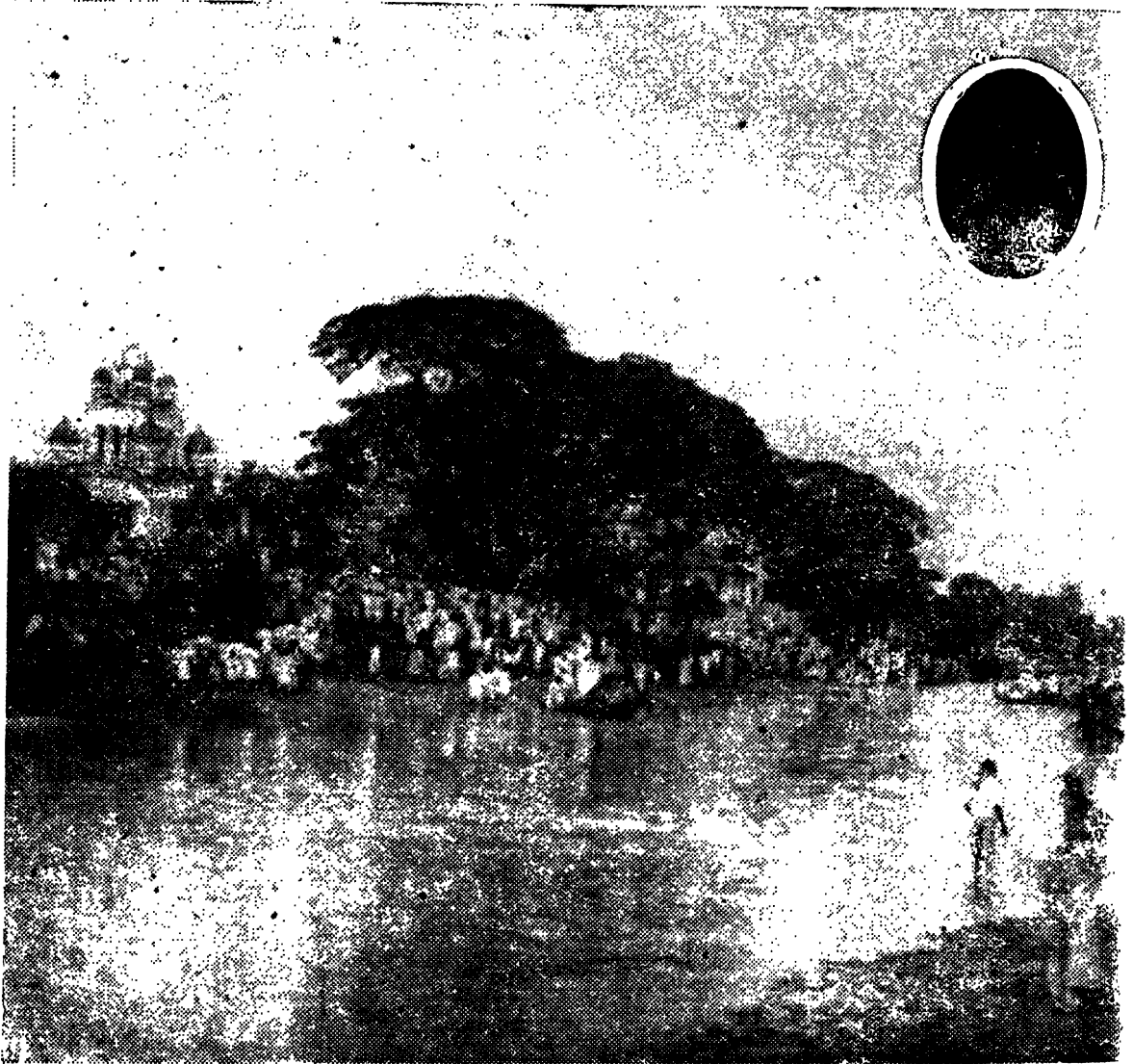
চিত্তরঞ্জনের শব তাঁহাদেরই চিতাস্থানের পার্শ্বে স্থানলাভ করিয়াছিল।

মিছিল যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন রাজবন্দী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলখানার ছাদ হইতে সোৎসুক দৃষ্টিতে শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলেন।

শোভাযাত্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। দর্শকদিগকে ধরিলে প্রায় ৪ লক্ষ লোক দলে ছিলেন। কেওড়াতলার ঘাটে প্রায় ২ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। কালীঘাটে কালী-মন্দির হইতে কেওড়াতলা ঘাট পর্য্যন্ত পথে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, সেরূপ জনতা মহাষ্টমীর দিনও দেখা যায় না। শোভাযাত্রা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৭টা ৪০ মিনিটে যাত্রা করিয়া ২টা ১৫ মিনিটের সময় ঘাটে পৌঁছিয়াছিল।

দেশবন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্ম প্রায় দশ মণ চন্দনকাষ্ঠ ও এক মণ ঘৃত আনা হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী সে দিন বহুক্ষণ শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্মশানে বসিয়াই 'ফরওয়ার্ডের' জন্ম একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময় সামান্ত সামান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রীযুত দেশাই মহাত্মার পার্শ্বে ছাতি ধরিয়া বসিয়া ছিলেন।

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীযুত গোপেশ্বর পাল সেখানে বসিয়া মহাত্মাজীর একটি মৃন্ময় মডেল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে চিতায় অগ্নিসংযোগ হইল। চিতাধূমে গগনমণ্ডল চিত্তরঞ্জন-বিয়োগে ভারতের অদৃষ্টাকাশের মতই মসিমলীন হইয়া গেল।

শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

চতুর্থী শ্রাদ্ধবাসর

গত ১লা জুলাই শ্রীমান্‌ চিররঞ্জন দাশ কর্তৃক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শ্রাদ্ধ যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর বন্ধু ছিলেন, কাযেই চিররঞ্জন এই শ্রাদ্ধে সকল দেশবাসীকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দেশসেবায় উৎসৃষ্ট ১৪৮ রসা রোড ভবনেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

বাড়ীর দুইটি প্রবেশদ্বারই পত্র-পুষ্পে সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল এবং দুই দিককার ফটকের মাথাতেই পুষ্প দ্বারা 'স্বরাজ' কথাটি লিখিত হইয়াছিল। ট্রাম চলিবার পূর্ব্ব হইতেই দেশবন্ধু-ভবনে লোকসমাগম হইতে থাকে এবং প্রধান প্রবেশপথে দুই দলে প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক শুদ্ধ খদ্দর বেশে ভূষিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নগ্নপদে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা অতি প্রত্যুষে আসিয়া বাড়ীটির সকল স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বদিনেই বাগানের ঘাস ও গাছগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া মনোরম করিয়া গিয়াছিলেন।

সভামণ্ডপ

বাড়ীর পূর্ব্বদিকের সবুজ ভূখণ্ডের উপর ত্রিপল খাটাইয়া এক সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা আগাগোড়া সতরঞ্চি দ্বারা মণ্ডিত। একদিকে মহিলাদিগের বসিবার ব্যবস্থা ছিল, চতুর্দ্দিকে কতকগুলি চেয়ারও

শ্রাদ্ধদিবসে দ্বারপ্রান্তে জনসমাগম

শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে—দেশবন্ধুভবনে [ফটোগ্রাফার হরেন ঘোষ

নাবিক সমিতির শোভাযাত্রা [ফটোগ্রাফার হরেন ঘোষ

শ্রাদ্ধ দিবসে রসারোডে জনগণের শোভাযাত্রা

সাজান ছিল। বাড়ীর প্রাচীরের বাহিরে বেলতলা রোডের মোড়ে ঐ রকমের আর একটি বৃহৎ মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। দুইটি মণ্ডপেই কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং দেশবাসী সকলে তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদের মধ্যেও বড় বড় দুইখানি ঘরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের জন্ত তথায় বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ

গৃহদেবতা নারায়ণের মন্দিরের অতি নিকটে পত্র-পুষ্প সজ্জিত শ্রাদ্ধমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। চতুষ্কোণ শ্রাদ্ধমণ্ডপের অভ্যন্তরে গাঢ় লোহিত-বর্ণের এক চন্দ্রাতপ খাটান ছিল। তাহার নীচে এক ধারে দেশবন্ধুর সুবৃহৎ ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত তৈলচিত্রখানি নয়ন-মনোমুগ্ধ-কর করিয়া শ্বেতপদ্ম ও পত্রপল্লবে সাজান ছিল। তাহার সম্মুখভাগে ছয়টি ঘৃত-দীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই ধারে ছয়টি পিতলের কলসী শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সাজান

শ্রাদ্ধবেদী

শ্রাদ্ধ মণ্ডপ [ফটোগ্রাফার হরেন ঘোষ

ব্যবসায়ী সমিতির শোভাযাত্রা

কীর্ত্তন মণ্ডপ [ফটোগ্রাফার হরেন ঘোষ

দেশবন্ধুর মৃন্ময় মূর্ত্তি [ভাস্কর গোপেশ্বর পাল

ছিল, প্রত্যেক কলসীর উপর একটি করিয়া সশীষ ডাব। নিকটেই নূতন থালায় ভারে ভারে দ্রব্য-সম্ভার সাজান। পার্শ্বে দুই প্রস্থে খাট ও তদুপরি শুদ্ধ খদ্দরে আবৃত গাদি ও শয্যাদ্রব্যাদি সাজান। একখানি সুসজ্জিত পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি দেশবন্ধুর পরিবারবর্গের একখানি ছবি বসান ছিল।

তাহার পার্শ্বে লোহিত বেদীর উপর পালঙ্কের কোমল শয্যার

শ্রাদ্ধমণ্ডপে আত্মীয়গণ

উপর দেশবন্ধুর একটি মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। ঐ মূর্ত্তিটি কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুত গোপেশ্বর পাল প্রস্তুত করিয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে উপহার দিয়াছিলেন। মূর্ত্তির গলদেশে পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। নিকটেই বেদীবক্ষে নানা দ্রব্য সাজান। রৌপ্যনির্ম্মিত কলসী, থালা, ঘটী, বাটি, গেলাস, দীপাধার প্রভৃতি সকলই সাজান, ঐ স্থানেই দানক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল।

একটি বেদীর উপর মুণ্ডিতমস্তক পিতৃ-শোক-বিহ্বল চিররঞ্জন বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিল। পার্শ্ব হইতে দুইজন পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে কুসুমদাম সুসজ্জিত দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি

জন-সমাগম

বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ভিড়ও ততই অধিক হইতে লাগিল। বেলা আন্দাজ ৯টার মধ্যে সুবৃহৎ বাড়ী, উঠান ও বাড়ীর পার্শ্বস্থ পথগুলি একেবারে জনাকীর্ণ হইয়া গেল। বহু সম্ভ্রান্ত মহিলাও আসিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারে থাকিয়া সমাগতগণের সুবিধাবিধান করিতেছিলেন। একটি দ্বার পুরুষদিগের জন্য ও আর একটি দ্বার মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

শোক-দর্শকগণ
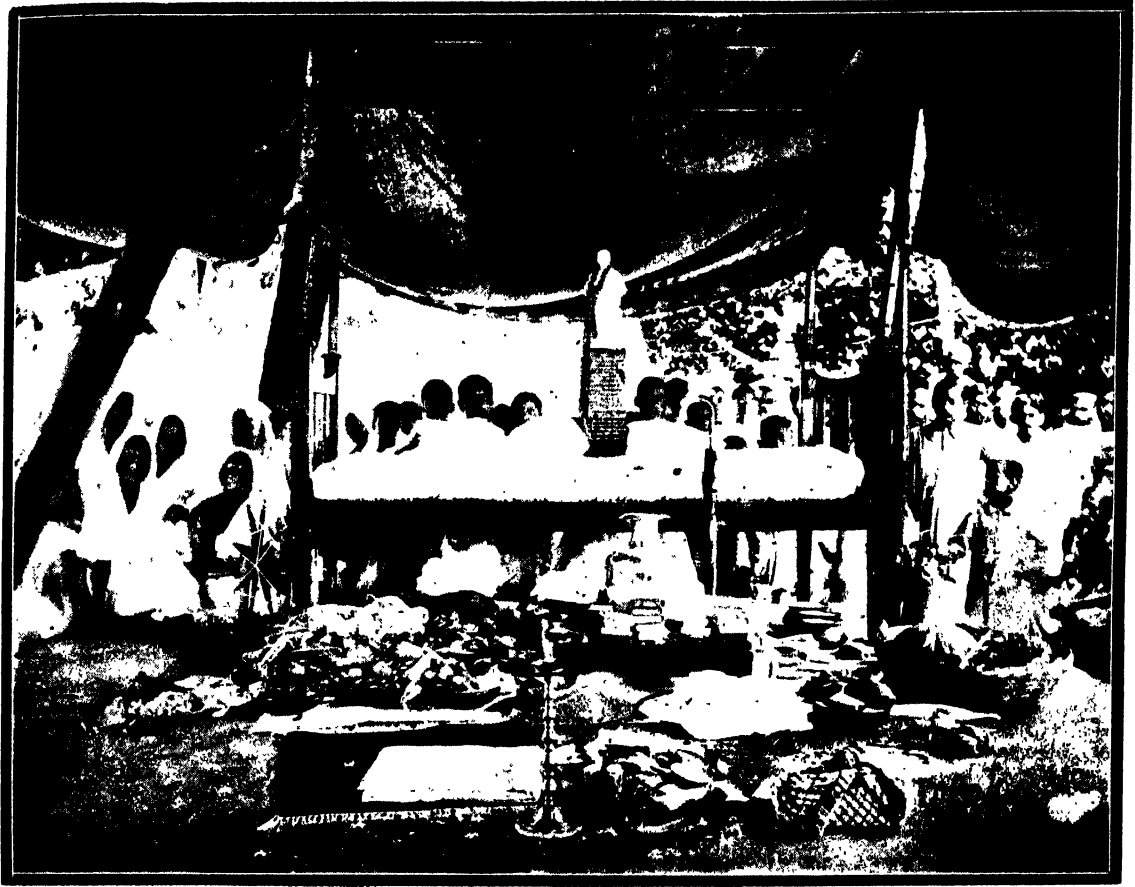
দানউৎসর্গ

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন রৌদ্রে দ্বারে দাঁড়াইয়া সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জামাতৃদ্বয় ভিতরে থাকিয়া সকলকে আপ্যায়নাদি করিতেছিলেন। বাড়ীর বাহিরে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তার ফুটপাথে অসংখ্য ভিক্ষুক ও সাধু-সন্ন্যাসী ভিড় করিয়াছিল।

বিরাট শোভাযাত্রা

বেলা ১০টার পর এক বিরাট শোভাযাত্রা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশবন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল। প্রথমে খড়্গপুর শ্রমিক সংঘের কাল চিহ্ন-পরিহিত দল, তাহার পর জাতীয় পতাকা হস্তে বি, এন, রেল কর্ম্মী সংঘের দল, পশ্চাতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, তাহার পর নীল পোষাক-পরিহিত নাবিক সমিতির দল, তৎপরে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রকাণ্ড দল, তৎপরে মুসলমানগণের দল, সকলেই মৌনভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীর মন্থর গমনে দাশভবনে প্রবেশ করিলেন।

দাশ-বংশাবলী
১। পাচু
২। নীলকণ্ঠ
৩। নৃসিংহ
৪। নর
৫। রাঘব
৬। ভীম
৭। শ্রীকৃষ্ণ
৮। শ্রীহর্ষ
৯। সদাশিব
১০। শ্রীকান্ত
১১। গোবিন্দ
১২। সুরয়ানন্দ
১৩। যদুনন্দন
১৪। শিবরাম
১৫। রামজীবন
১৬। কৃষ্ণরাম
১৭। শ্যামরাম
১৮। রমানাথ
১৯। রতনকৃষ্ণ
১৯। চন্দ্রনাথ (ইঁহার বংশাবলী পরপৃষ্ঠায় দেখুন)
২০। জগবন্ধু
গোপীমোহন
কেদারেশ্বর
বৈকুণ্ঠেশ্বর
২১। ভুবনমোহন (পোষ্যপুত্র)
রাখালচন্দ্র
তড়িৎমোহন
ললিতমোহন
অবনীমোহন
সুরেন্দ্রমোহন
২২। তরলা
চিত্তরঞ্জন
অমলা
প্রফুল্ল
প্রমীলা
ঊর্মিলা
বসন্ত
মুরলা
সুধী
নিশীথ
প্রাণনাথ
সুধীর
সুবোধ
কৃষ্ণ
নলিনী
আশু
সুনীল
সুকুমার
নীহার
প্রভাস
২৩। চিররঞ্জন
শঙ্কররঞ্জন
শশীরঞ্জন

(দেশবন্ধুর খুল্লতাত শ্রীযুত রাখালচন্দ্র দাশ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত
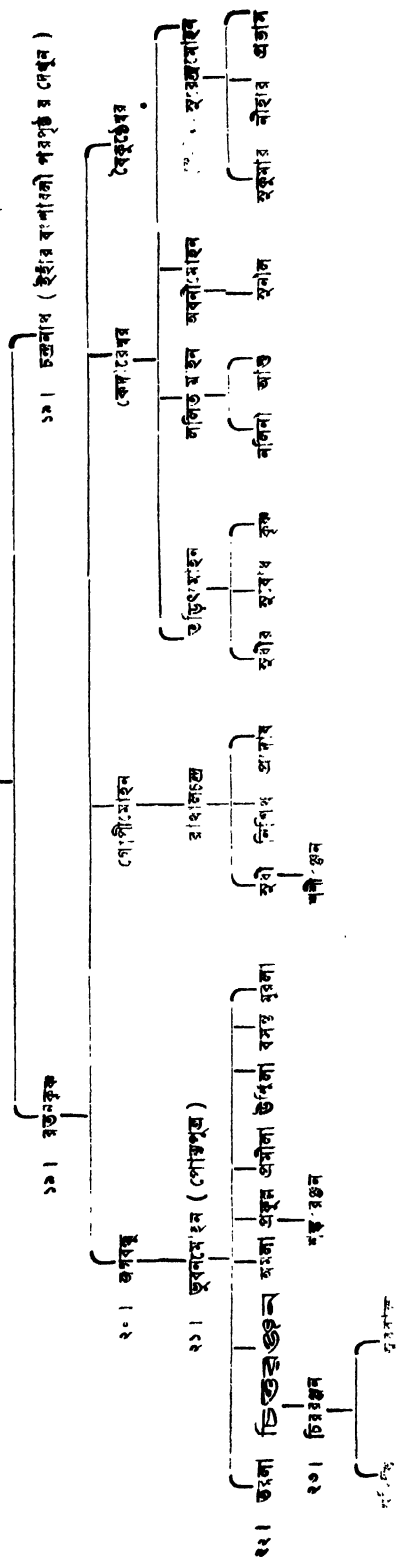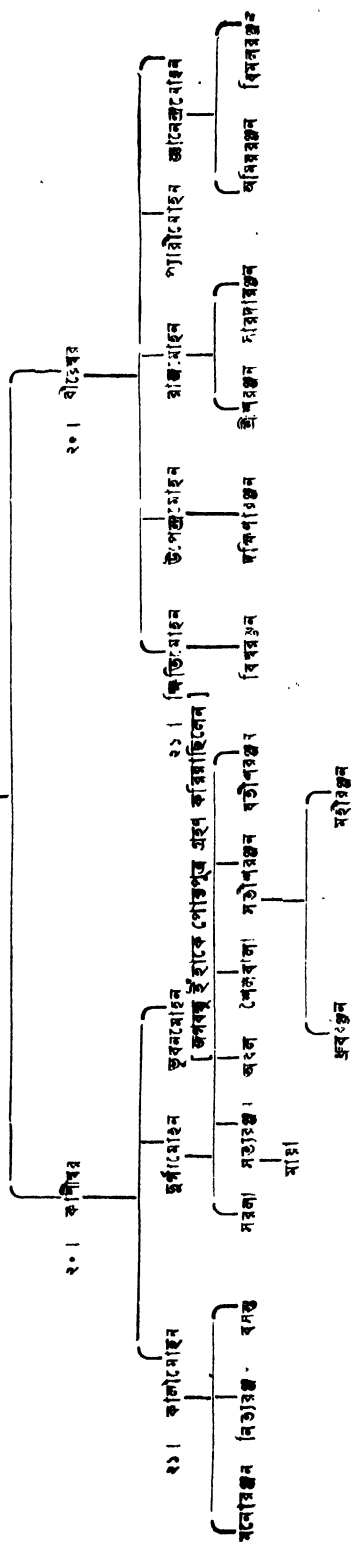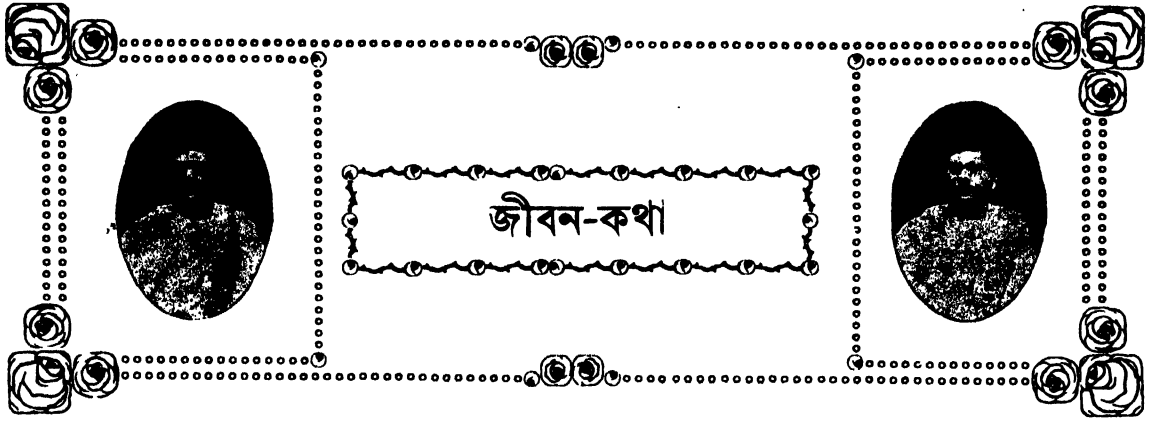
মুখবন্ধ

মার্কিণ দার্শনিক এমার্শন তাঁহার 'Representative Men' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, The first men ate the earth and knew it was sweet. লেখক এই স্থলে first men অর্থাৎ প্রধান মানুষ অর্থে যুগমানবকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে সকল বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ যুগে যুগে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের ভাবধারা দ্বারা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন এবং জগদ্বাসী কোন এক জনসাধারণকে সেই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন, তাঁহারাই যুগ-মানব, এমার্শনের ভাষায় Representative men অথবা First Men। এমার্শন বলিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীকে উপভোগ করেন এবং তাহাতেই আনন্দ লাভ করেন (ate the earth and knew it was sweet), অর্থাৎ তাঁহারা যখন দেখেন, তাঁহাদের যুগ-বাণী জগদ্বাসী গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহাদের আবির্ভাব সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া জীবনে এবং মৃত্যুতে শান্তি লাভ করেন।

সম্প্রতি বাঙ্গালী জাতি যাঁহাকে হারাইয়াছে, বর্ত্তমানে যিনি বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, অধিকন্তু যিনি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার গর্ব্ব, মান অহঙ্কারের লক্ষ্যস্থল ছিলেন,—সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এমার্শনের first men অথবা প্রধান মানবগণের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অতি অল্প দিন মাত্র তিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সে দিন কয়টি একটা জাতির জীবনে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ এই সামান্য কয়টি দিনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁহার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মনুষ্যত্বের বিকাশ যে ভাবে করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই। তিনি যে যুগ-বাণী লইয়া এ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা সম্পন্ন হইয়াছে—দেশবাসী জনসাধারণ সে বাণী গ্রহণ করিয়াছে। জীবনে ও মরণে দেশবন্ধু তাহা জানিয়া শান্তিতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

দেশবন্ধু এ যুগে যে বাণী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র—দেশপ্রেমের উন্মাদনা। দেশবন্ধু স্বয়ং দেশপ্রেমে পাগল ছিলেন! তাঁহার নিকট দেশপ্রেম কেবল কথার কথা ছিল না—তাঁহার শিরায় শিরায়, অস্থি-মজ্জায় তিনি উহার তীব্র মাদকতা অনুভব করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দেশের সেবা আমি আমার ধর্ম্মের অংশ বলিয়া মনে করি। দেশসেবা আমার জীবনের স্বপ্ন—আমার জীবনের অঙ্গ। দেশ বলিয়া আমি ভগবান্‌কেও বুঝি।"

এমন করিয়া দেশকে ভালবাসিতে এ যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত আর কেহ পারিয়াছেন কি না, জানি না। তাঁহার দেশবাসীকে তাঁহার প্রাণের এই কথা বুঝাইতে তাঁহার কি আকুল আগ্রহ ছিল, তাহা তাঁহার নানা রচনা ও বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) যার অন্তরে স্বরাজের বেদনা জাগে নাই, যার অন্তর স্বরাজের ভাবে ভিজে নাই, সে কি স্বরাজ চাইতে পারে? স্বরাজ পাওয়া কি যেমন তেমন? স্বরাজ বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায় গাছের ফলের মত পড়ে না,

(২) স্বরাজ যে আসবেই, স্বরাজকে যে আসতেই হবে, এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগাও। তার আগে ধ্যান-ধারণা কর—তার আগে মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝ যে, যত দিন স্বার্থত্যাগ করতে না পার, তত দিন বিধাতার কৃপা অবতরণ করবে না। যে স্বার্থপর, তাকে বিধাতা কৃপা বর্ষণ করেন না--যে নিজেকে নিবেদন না করে, যে নিজেকে উৎসর্গ না করে, যে জাতির উদ্ধারের জন্য সকল কষ্ট সহ্য না করে—মৃত্যু পর্য্যন্ত হাসিমুখে বরণ না করে, সে জাতির স্বরাজ উদ্ধার বিড়ম্বনামাত্র,

(৩) যে দিন স্বরাজের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারত জেগে উঠবে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে স্বরাজ, স্বাধীনতা তার হাতের মধ্যে এসে পড়বে। তবে সে যোগ্যতা চাই, সে গভীর আকাঙ্ক্ষা চাই। মুখের কথায় নয়, কাগজপত্রে লিখে নয়, সে আকুল যাতনা প্রাণে অনুভব করা চাই। সে তৃষ্ণার প্রমাণ কি ? তার প্রমাণ ত্যাগ ; দুঃখ-সহন,

(৪) স্বার্থ বলিদান চাই—যে নিজকে নিবেদন করবে, স্বরাজের জন্য মরতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হবে, তাহার চাওয়ার উপরই স্বরাজ আসবে,

(৫) আমাদের এই আন্দোলন প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায়—আত্মনিবেদন—সকল শাস্তি, সকল আপদ-বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন।

দেশের মুক্তিসাধনের জন্য এই যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, —ইহারই ভাবে তিনি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই যুগ-বাণীতে দেশের তরুণসম্প্রদায়ের ত কথাই নাই, কর্ম্মনিরত বয়স্ক ধনী ব্যবসায়ী মহাজনও নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। তিনি দেশ-প্রেমের শঙ্খনাদে দেশের শুষ্ক খাতে জাহ্নবীর পবিত্র বারিধারা বহাইয়াছিলেন।

তাঁহার দেশপ্রেমে অভিনবত্ব ছিল, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার দেশপ্রেম বিলাতের আমদানী Patriotism নহে, ইহা তাহা হইতে বিভিন্ন। চিত্তরঞ্জনের একটি রচনা হইতেই এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছি,—

"স্বরাজ মানে কি ? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়, স্বরাজের এমন অর্থ হয় না যে, পার্লামেণ্ট থেকে একখানা অ্যাক্ট তৈয়ারী ক'রে আমাদের উপহার দেবে। স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা।"

আর এক স্থলে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন,—

"যাঁরা মনে করেন, স্বরাজ একটা শাসনপ্রণালী, তাঁরা এই তত্ত্ব বোঝেন না। তাঁরা জানেন না যে, স্বরাজ হ'লে তবে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা হবে। স্বরাজ আগে, শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা পরে। স্বরাজের অর্থ কি ? হিন্দু মুসলমান মিলে যে নবীন জাতি গ'ড়ে উঠছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-প্রণালী।"

কেহ কেহ এ জন্য দেশবন্ধুকে Idealist ও dreamer আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু যিনি যুগ-মানবরূপে যুগবাণী আনয়ন করেন, তিনি সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে অল্পবিস্তর dreamer বা পাগল হইয়া থাকেন। এ হিসাবে যেমন ধর্ম্ম-জগতে বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পাগল, তেমনই ঐহিক সাধনার জগতে রাণা প্রতাপ বা চাঁদবিবি পাগল, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডী পাগল, হ্যামডেন, ওয়াশিংটন পাগল, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য পাগল,—পাগল অনেকে। কিন্তু এই সব Idealist বা পাগলই জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের লোক নবজীবন লাভ করিয়াছে—নবশক্তিতে শক্তিমান হইয়াছে।

দেহান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশবন্ধু শাসক জাতিকে সহযোগের gesture বা ইঙ্গিত দেখাইয়াছিলেন, কেহ কেহ এই কথা তুলিয়া বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, তাঁহার পূর্ব্বাপর অভিমতের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য ছিল। তিনি জানিতেন, স্বরাজ অন্তরের, বাহিরের নহে, স্বরাজ ও শাসনপ্রণালী একই জিনিষ নহে। তিনি শাসক জাতির নিকটে শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন কামনা করিয়াছিলেন। তিনি শ্বেত ব্যুরোক্রেশীর পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ব্যুরোক্রেশী প্রার্থনা করেন

নাই। ব্যুরোক্রেশীর পরিবর্ত্তে জনমতানুযায়ী শাসন-প্রথার ভিত্তিপত্তন হইলে পরে তাহার উপর স্বরাজ-সৌধ গড়িয়া তুলিবার কামনা করিয়াছিলেন, তাই তিনি শাসক জাতিকে শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তনের ফলে সহযোগ প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অভিমতের অসামঞ্জস্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। কথাটা দেশবন্ধুর নিজের রচনা হইতেই আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে,—

"ইংরেজ বল্‌তে পারে, গোলমালে কায কি, তোমরা স্বায়ত্তশাসন নাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জ্জন নয়, সাধনার ফল। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে? স্বরাজ তোমাকে অর্জ্জন কর্‌তে হবে। তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতি, সেই সত্য প্রকৃতির সন্ধান করে, তাকে বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ।"

সুতরাং বুঝিতে হইবে, দেশবন্ধু শাসক জাতির প্রতি 'ইঙ্গিত' করিয়া যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ নহে, স্বরাজ-সৌধ নির্ম্মাণ করিবার ভিত্তিমাত্র। সে স্বরাজ-সৌধ গড়িয়া তুলিবার মূল উপাদান ত্যাগ ও দুঃখবরণ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে স্বরাজের অর্থ হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত জীবন-প্রণালী, ইহা চিত্তরঞ্জনের রচনা হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের উপায় কি? চিত্তরঞ্জন নিজেই উত্তর দিয়াছেন,—"বাসনা প্রগাঢ় করা, ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করা, আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করা।" তাহাতে কি চাই? চিত্তরঞ্জনের কথা,—"তাহাতে স্বার্থ বলিদান চাই, কষ্ট বরণ করিবার শক্তি সঞ্চয় করা চাই।" কিন্তু তাহা কি সম্ভব?

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন,—"বিশ্বাস জাগাও, আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় কর—তা হ'লেই যা এত দিন অসম্ভব মনে করছ—তা অবিলম্বে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে।"

ইহাই এ যুগে যুগমানব চিত্তরঞ্জনের যুগবাণী। যুগমানব নিজের জীবনে যুগবাণীর সার্থকতা ফুটাইয়া তুলিয়া থাকেন—চিত্তরঞ্জনেও তাহার অসদ্ভাব হয় নাই। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার দুঃখবরণ অসাধারণ। তিনি যেমন বিরাট পুরুষ, তাঁহার ত্যাগ ও দুঃখবরণও তেমনই বিরাট। যে বৈরাগ্য, ত্যাগ বা সন্ন্যাসের মধ্য দিয়া ভারতের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য গোমুখীর পুণ্যপূত স্নিগ্ধ ধারার মত শতরাগে উছলিয়া উঠে—যে ভাব ও চিন্তার ধারা ভারতীয়ের অস্থি-মজ্জায় যুগ যুগ ব্যাপিয়া ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া আছে,—চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়া সেই বৈরাগ্য ও ভাবধারা শত সৌরকরোজ্জ্বলপ্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জাতির বহু ভাগ্যফলে এমন জন-নায়ক যুগমানব মিলিয়া থাকে। দেশের যখন ঘোর দুর্দ্দশা—দেশবাসীর যখন বড় বেদনা, সেই সময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দেশবন্ধুর আবির্ভাব। সকল দেশেই যুগে যুগে এমনই অবস্থায় যুগমানবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনও ভারতের দুর্দ্দশার অমানিশার ঘনান্ধকারে ভারতবাসীর ঘোর অবসাদের দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই গাঢ় স্তব্ধ স্পর্শাসুমের অন্ধকারে তিনি যুগমানবরূপে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত বর্ত্তিকালোক হস্তে লইয়া পথিভ্রষ্ট লক্ষ্যচ্যুত দেশবাসীকে পথিপ্রদর্শন করিয়াছেন—দেশের রাজনীতির 'মরা গাঙ্গে' দেশপ্রেমের বন্যা বহাইয়াছেন।

সেই দেশপ্রেমের উৎস কোথায়, তাহাও যুগমানব চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধুরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনার কায ও আমাদের কায শেষ করিয়া দিবাবসানে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী, মাথা নত কর; ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক; প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে?" ইহাও দেশবন্ধুর যুগবাণী। দেশের জনসাধারণ দেশের অস্থি-মজ্জা—তাহারাই দেশের রক্ত-মাংস। তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের স্বরাজসাধনা কোনও যুগে সিদ্ধ হইবে না। দেশবন্ধু প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করিতেন,

তাই দরিদ্র নিরক্ষর দেশবাসীর জন্য সর্ব্বদা তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। চাঁদপুরে শ্রমিক বিভ্রাটের সময়ে দরিদ্র উৎপীড়িত শ্রমিকের দুঃখে তাঁহার প্রাণের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল—দেশবন্ধু দরিদ্রবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তরঙ্গভঙ্গভীষণা পদ্মায় সামান্য ভেলায় পাড়ি দিয়াছিলেন। এই ত্যাগ ও এই সাধনার বাণী তিনি দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন।

কা'ল যাঁহার মুখে ছিল 'তপো তপো' রব, আজ তিনি নীরব। যে বিরাট পুরুষ যুগমানবরূপে বাঙ্গালার রাজনীতির শ্মশানে কয় বর্ষ ব্যাপিয়া যোগাসনে শব-সাধনায় বসিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, নির্ম্মম কালের অমোঘ দণ্ড বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁহার উপর নিপতিত হইল, অভ্রভেদী হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশে অকালে সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইল। তাঁহার তিরোধানে দেশ ও জাতি যে অভাব অনুভব করিতেছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। মঙ্গলবার যে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে, তাহার বহু দূর-প্রসারী প্রভাব হইতে জাতি কত দিনে মুক্ত হইবে, তাহা জাতির ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন।

তবে দুঃখে সান্ত্বনা, যুগমানব মৃত্যুতে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা অযাচিতভাবে অকপটে তাঁহার শেষযাত্রায় যে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতি-সম্মানের অঞ্জলি প্রদান করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সার্থক হইয়াছে। দেশ তাঁহাকে চিনিয়াছে, তাঁহার যুগবাণীর মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না কি? তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে, এখনও তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীতে বিস-র্পিত রহিয়াছে। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিধর হইয়া দেশ-বাসী তাঁহারই প্রদর্শিত ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে অগ্র-সর হউক, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাহাদের উপরে নিশ্চিতই বর্ষিত হইবে।

প্রথম পর্ব্ব—বাল্য ও যৌবন

ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হইলে উদ্ভিদ্-জগতে সুফল উৎপন্ন হয়। মানুষের জীবনেও মানুষ কেন বড় হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে মানুষেরও ক্ষেত্র, বীজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয়। চিত্তরঞ্জন জাতির জীবন-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে তাঁহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের নিকষ-রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য কিরূপে সম্ভবপর হইল? এ কথার উত্তর দিতে গেলে তাঁহার চরিত্র-গঠনের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ক্ষেত্র

প্রথমেই ক্ষেত্রের কথা বলা যাউক্। ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক (১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর) কলিকাতা পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের এক বাসাবাটীতে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়; কিন্তু তাহা হইলেও পদ্মার পারে বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রামই পরোক্ষে তাঁহার জন্মভূমি। প্রাচীন গৌড়ের নদীমেখলা শস্যশ্যামলা এই প্রাচীন পরগণা তাঁহার পিতৃপিতামহের জন্মস্থান—জীবনের লীলাভূমি। চিত্তরঞ্জন যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা বাঙ্গা-লার অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশ। কথিত আছে, এই বৈদ্য-বংশের অনেকে প্রাচীন বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদারতায়, মনস্বিতায়, জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চ্চায় এবং স্বাধীনতা প্রিয়তায় এই বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর 'আড়িয়াল বিলে'র পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র তেলিরবাগ গ্রাম আজ রসারোডস্থ আবাসবাটীর মত বাঙ্গালীর তীর্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। এই মাটীতে, এই বাতাসে যে দাশ-পরিবারের অস্থি-মজ্জা গড়িয়া উঠিয়াছিল, চিত্তরঞ্জনে সেই দাশ-পরিবারের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভাবধারা, ভাবনা-চিন্তা, গতিপ্রকৃতি—সকলই বিশেষরূপে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিক্রমপুর বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যে বিশেষ খ্যাত। বৌদ্ধযুগের জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল শীলভদ্র, দীপঙ্কর ও বীরদেব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নামাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সেই জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়াছিল স্বাধীন চিন্তার অব্যাহত গতিপ্রবাহে। তাহার পরিচয় বিক্রমপুরে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধত্বের বিকাশে, ব্রাহ্ম-সংস্কারের যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের বন্যাপ্রবাহে, স্বদেশী ও বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে শাসন-বন্ধনের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলনে এবং মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যুগে চিত্ত-রঞ্জনের উদ্ভবে।

বীজ

বিক্রমপুরের সুখসমৃদ্ধির সময়ে যদুনন্দন বৈদ্যবংশের রতনকৃষ্ণ দাশ স্বনামখ্যাত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্বন্ধু (তিনি কাশীশ্বরের পুত্র ভুবনমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন) চিত্তরঞ্জনের পিতামহ। কাশীশ্বর মোক্তারী করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেম। তিমি ও তাঁহার পিতা রতনকৃষ্ণ অতিথিপরায়ণতা ও দানশৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সঞ্চয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। কাশীশ্বরের উপার্জ্জনের অধিকাংশই দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণে এবং অতিথি-সেবায় ব্যয়িত হইত। কাশীশ্বর অতীব করুণপ্রকৃতির লোকও ছিলেন। একবার তিনি স্বয়ং পাল্কী ছাড়িয়া এক জন ক্লান্ত পথিশ্রান্ত ব্রাহ্মণকে চড়িতে দিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন, ধর্ম্মেও তাঁহার মতি ছিল। তাঁহার বাঙ্গালা কবিতা 'নারায়ণ-সেবা' ও 'হরিলুঠের পুথি'র বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও আদর আছে। উহা সরল ও শ্রুতিমধুর ভাষায় লিখিত।

কাশীশ্বরের তিন পুত্র ;—দুর্গামোহন, কালীমোহন ও ভুবনমোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র ;—পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুনের জজ জ্যোতিষরঞ্জন এবং বাঙ্গালার বর্ত্তমান এডভোকেট জেনারল সতীশরঞ্জন। কালীমোহন অপুত্রক ছিলেন, তাই ভুবনমোহনের অন্যতম পুত্র বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহনের তিন পুত্র ;—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। প্রফুল্লরঞ্জন পাটনা হাইকোর্টের জজ। বস্তুতঃ এমন শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি সম্ভ্রান্ত বংশ বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। দুর্গামোহন ও কালীমোহন উকীল ছিলেন। তিন ভ্রাতাই যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ স্বাধীন চিত্ত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি কুসংস্কারকে ধর্ম্মমত বলিয়া মানিতে চাহে নাই। ইহা তাঁহাদের বংশের ধারা। কালীমোহন পরে হিন্দু হইয়াছিলেন। রসারোডের গৃহ কালীমোহনের আবাসবাটী ছিল।

ভুবনমোহন নির্ভীক, তেজস্বী, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তিনি অতীব দক্ষতার সহিত 'ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ান' এবং 'বেঙ্গল পাবলিক অপিনিয়ান' নামক দুইখানি সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবনে দরিদ্র আত্মীয় বান্ধবগণের সহিত ব্যবহারে তাঁহার স্নেহপ্রবণ সরল অন্তঃকরণেরও পরিচয় পরিস্ফুট। এটর্ণী হইয়া সঞ্চয় ত দূরের কথা, শেষজীবনে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হইয়াছিল। স্বজনপ্রতিপালনস্পৃহা, দরিদ্র, বিপন্ন ও দুঃস্থের প্রতি করুণা, দানশৌণ্ডতা ও অতিথিপরায়ণতা ভুবনমোহনের দেউলিয়া হইবার মূল কারণ।

এই যে পরের জন্য ত্যাগের স্পৃহা, এই যে অন্যায় বন্ধন হইতে মুক্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা, এই যে বিদ্যানুরাগিতা,—এ সকল চিত্তরঞ্জন পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষপতি বিলাসী চিত্তরঞ্জন এক দিনে বাৎসরিক ৩।৪ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবসায় এক দিনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার উৎস খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে বিক্রমপুরকে বুঝিতে হইবে, দাশপরিবারকে বুঝিতে হইবে, কাশীশ্বর-ভুবনমোহনকে বুঝিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জনের মুক্তির আকুল আগ্রহও পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পিতৃপিতামহের মত অন্যায় বন্ধনের (তাঁহার হিসাবে) ও কুসংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহেন নাই।

বিদ্যানুরাগিতাও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। চিত্তরঞ্জনের কবিত্বশক্তি তাঁহার 'সাগর-সঙ্গীত', 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কাব্যের প্রাণস্পর্শী ভাব ও ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশানুরক্তি, স্বজনপ্রীতিও তাঁহার বংশের অস্থিমজ্জাগত। তাই চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার হইয়া 'দাশ সাহেব'রূপে হাজার হাজার টাকা উপায় করিবার সময়েও মোটর-ল্যাণ্ডোর ক্লাবে, মজলিসে যাইবার সময়ে বাঙ্গালার প্রাণের গান ভুলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার দরিদ্র শ্রমিক কৃষক, মুদী, মোদক, চাষের ক্ষেত ও খামার-মরাই, বাঙ্গালার সবুজ মাঠ চিত্তরঞ্জনের সাহেবী পোষাকের মধ্য দিয়া অন্তর ফুটিয়া দেখা দিত। তাঁহার

হৃদিতন্ত্রী যে সুরে বাজিয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সুর – খাঁটি বাঙ্গালী কবির সুর। সে সুর কোঠা-বালাখানায় বাজে না, বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায়, গোছা গোছা সবুজ ধানের মাঠে, গোচারণের ধূলিময় গ্রাম্যপথে. রাঙ্গা উষার রক্ত আভায় রঙ্গিলা কূলে কূলে ভরা বাঙ্গালার নদীর চিকণ জলে সেই সুর বাজে। সে সুর চণ্ডিদাস-গোবিন্দদাসের সুর।

চিত্তরঞ্জনের মধ্যে বৈষ্ণবের বৈরাগ্য ও কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ আগ্রহ, আকুলতা ও তন্ময়তা তিনি পূর্ব্বপুরুষ হইতেই পাইয়াছিলেন। ভুবনমোহন যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা কাহার মুখ না চাহিয়া, সমাজ-স্বজনের স্তুতিনিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া, আগ্রহ ও উৎসাহভরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন পিতারই মত যাহা নিজের মনে ন্যায় ও সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা লোকের স্তুতিনিন্দার ভয় না করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

ক্ষেত্র ও বীজের পর চিত্তরঞ্জনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দেখা যাউক্। আশেপাশে মুক্ত আকাশ, বিশুদ্ধ বায়ু পাইলে গাছপালা যেমন সতেজ, সবল ও সুস্থ অবস্থায় বাড়িয়া উঠে, চিত্তরঞ্জনের চারি পাশে এমন কতকগুলি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনিও বড় হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

প্রথমেই সংসারযাত্রায় যিনি তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়াছিলেন—সেই দেবী বাসন্তী সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এমন পত্নীলাভ তাঁহার জীবন-গঠনে যে অনেক সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাসন্তীদেবী আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের আদর্শ গৃহিণী। হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূর মত তিনি স্বভাবতঃ সুনম্রা, সুমার্জ্জিতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, কর্ত্তব্যবুদ্ধিপরায়ণা, গভীর ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না, ধীরা, শান্তা, মৃদুভাষিণী, আত্মীয়স্বজনপ্রতিপালিনী, সংসার-সেবিকা, অতিথিসেবাপরায়ণা, দরিদ্র আতুরে করুণাপরায়ণা। সর্ব্বোপরি তিনি পতিগতপ্রাণা পতির সুখে দুঃখে একান্ত অনুগামিনী অংশভাগিনী। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে নিখিল ভারতীয় মহিলাসম্মিলনে সভানেত্রীরূপে বাসন্তীদেবী যে একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়,—"মনে রাখিবেন, আমাদের আদর্শ—সতী, সাবিত্রী, সীতা।"

বাসন্তীদেবী স্বামীর জ্ঞানার্জ্জনে ও সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহদাত্রী, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সংসারপ্রতিপালনে পরম সহায়িকা সেবিকা, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এবং স্বজাতি ও স্বদেশসেবায় শক্তিস্বরূপিণী। যে দিন দেশবন্ধু রসা রোডের গৃহে সরকারের আদেশে ধৃত হয়েন, সে দিন বাসন্তীদেবী পুরনারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সহিত হাসিমুখে স্বামীকে জেলে বিদায় দিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পুত্র চিররঞ্জন যখন সরকারের বে-আইনী আইন অমান্য করিয়া ভলাণ্টিয়ার দলের সহিত পুলিসের হস্তে ধরা দিয়া জেলে গিয়াছিল, তখনও বাসন্তীদেবী হাহুতাশ করেন নাই—স্বয়ং সঙ্গিনীগণ সঙ্গে ভলাণ্টিয়ার হইয়া রাজপথে খদ্দর বিক্রয় করিতে নির্গত হইয়াছিলেন এবং ধরা দিয়া পুলিসে নীত হইয়াছিলেন। যাহা হইতে নারীর প্রিয় কিছু নাই—সেই স্বামিপুত্রকে সত্যের মর্য্যাদা—দেশের মর্য্যাদা রক্ষার্থ বাসন্তীদেবী হাসিমুখে কষ্ট ও বিপদের মুখে প্রেরণ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, স্বয়ং নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ গৃহস্থের কুলবধূ হইয়াও প্রকাশ্য রাজপথে পুলিসের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কাতেও বিচলিত হয়েন নাই। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের জীবনে মহীয়সী সহধর্ম্মিণীর প্রভাব বড় সামান্য বিস্তার লাভ করে নাই।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির প্রভাবেও চিত্তরঞ্জনের জীবন প্রভাবিত হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালার মাটীর, বাঙ্গালার জলের বক্ষঃপঞ্জর হইতে বৈষ্ণব কবির প্রেমের গানের—ত্যাগ ও বৈরাগ্যের গানের উৎস উৎসারিত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন উহাতে 'প্রাণের সাড়া' পাইয়াছিলেন। এই প্রাণের সাড়া তাঁহার বিরাট ত্যাগে মূর্ত্ত হইয়াছিল। প্রেমের ও ত্যাগের কবি চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন,—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥

চিত্তরঞ্জনে এই প্রেম-তন্ময়তা জাগিয়াছিল বলিয়া তিনি দেশ-প্রেমের জন্য পত্নী, পুত্র, ধন-জন—সমস্তই দেশ-প্রেমের বেদীতে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে চিত্তরঞ্জনের জীবনে যুগাবতার মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। নব-ভারতের মুক্তিমন্ত্রের গুরু মহাত্মা গন্ধী যে যুগবাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ হৃদয় তাহার মর্ম্ম শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াছিল। ধনী, বিলাসী, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-কেশরী চিত্তরঞ্জন এক দিনে দেশপ্রেমে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন—ইহাতেই তাঁহার জীবনের উপর ত্যাগী সন্ন্যাসী গন্ধীর প্রভাব সহজে বুঝিতে পারা যায়। ধন্য গুরু, সার্থক শিষ্য!

শিক্ষা

এই সকল প্রভাবের মধ্য দিয়া চিত্তরঞ্জন ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃপিতামহের প্রভাব—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি বিক্রমপুরের প্রভাব। যৌবনে জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর প্রভাব, বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাব। প্রৌঢ়কালে মহাত্মা গন্ধীর প্রভাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক কলিকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাসাবাটীতে চিত্তরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভুবনমোহন ভবানীপুরে উঠিয়া যায়েন। সেই স্থানেই চিত্তরঞ্জনের বাল্যশিক্ষা। লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তথা হইতে যথাক্রমে এফ এ, ও (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) বিএ পাশ করেন। কলেজে তাঁহার সতীর্থগণ সাহিত্যে ও বাগ্মিতায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিলাতে শিক্ষা

ইহার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। তখনকার দিনে উহাই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থসন্তানের অর্থকরী বিদ্যার কাশীমক্কা ছিল। গোলামীর মোহ তখন এমনই বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল যে, ভুবনমোহন পুত্রকে এই উদ্দেশ্যেই বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের সৌভাগ্য যে, চিত্তরঞ্জন 'সিবিলিয়ান' হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই,স্বাধীন-বৃত্তিজীবী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে বিধাতার মঙ্গলহস্তস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

তখন চিত্তরঞ্জনের বয়স ২১ বৎসর। তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বভাবজাত অসাধারণ বাগ্মিতা-শক্তিরও পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁহার প্রাণও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ইহাতেই তাঁহার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার পর চিত্তরঞ্জন বিলাতের বহু রাজনীতিক সভায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। সেই সময়ে ভারতের স্বরাজ মন্ত্রের আদিগুরু দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মাতৃযজ্ঞে আহুতি দিবার এমন সুযোগ জন্মভূমির একান্ত সেবক চিত্তরঞ্জন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া বিলাতের নানা স্থানে নানা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নবীন বাঙ্গালী যুবকের সেই প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতায় বহু ইংরাজ সংবাদপত্রসেবক মুগ্ধ হইয়া শতমুখে প্রশংসাবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নদীর এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল ভরে। চিত্তরঞ্জন সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন না বলিয়া যেমন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন দুঃখিত ও আশাহত হইলেন, তেমনই দেশবাসীর পক্ষে উহা সুখকর হইল, কেন না, ইহাতে তাহারা তাঁহাকে তাহাদের মধ্যেই ফিরিয়া পাইল। শুনিতে পাওয়া যায়, কোন সভায় ভারতীয়
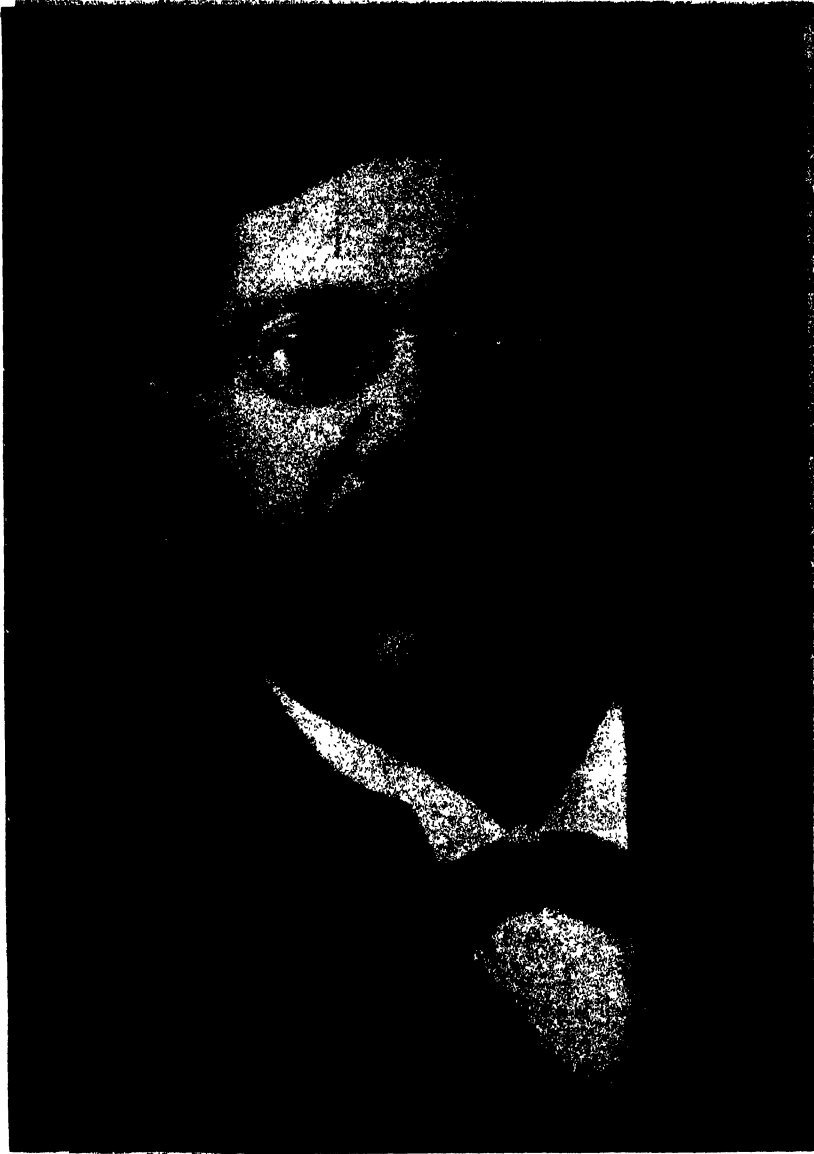
বোমা-মামলায় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন

বসুমতী প্রেস]

অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল বলিয়া তিনি পরীক্ষায় পাশ হইলেও ঐ বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবীশদিগের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় (মিঃ গ্লাডষ্টোন ঐ সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন)। যাহাই হউক, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায়, তাঁহাকে সরকারী গোলামগিরি করিতে হয় নাই, ইহাতে বিধাতার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। এই সময়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন চিত্তরঞ্জন বিলাতে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময়ে এমন এক ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহা হইতে চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। জেমস্ ম্যাক্‌লীন নামক পার্লামেন্টের সদস্য বক্তৃতার মুখে ভারতবাসীকে অযথা অভদ্রোচিত আক্রমণ করিয়া গালি দেন, বলেন,—ভারতীয়রা ক্রীতদাসের জাতি, মুসলমানরা দাস এবং হিন্দুরা চুক্তিবদ্ধ দাস; মুসলমানরা গোলাম, হিন্দুরা গোলামের গোলাম। দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন এই অপমান—জন্মভূমির অপমান—নিজের অপমান বলিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এ অপমানের জ্বালা তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তাই লিখাপড়া ভুলিয়া, জগৎ-সংসার ভুলিয়া, প্রবাসী ভারতীয়ের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করিয়া, লণ্ডনের এক্সটারহলে এক সভার অধিবেশন করাইলেন। সভায় উদ্ধত অশিষ্ট ম্যাক্‌লীনের কথার তীব্র প্রতিবাদ হইল। সে সভায় চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী বক্তৃতা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে।

ফল বড় সহজ হইল না। বিলাতের শক্তিশালী সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বক্তৃতা উদ্ধৃত হইল এবং উহার তুমুল সমালোচনা চলিল। ফলে ইংলণ্ডে এ বিষয়ে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। লিবারলদল মহামতি গ্লাডষ্টোনের নেতৃত্বে ওল্ডহামে এক সভার আহ্বান করিলেন; চিত্তরঞ্জন সেই সভায় বক্তৃতা করিতে আহূত হইলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতার ফলে ভারতের নিন্দুক মিথ্যাবাদী ম্যাক্‌লীনকে জগতের সমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইল, তাহার পার্লামেন্টের সদস্যপদও ঘুচিল। ইহা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

ইহার পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জীবনের প্রথম প্রভাতে—সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন বিদেশে যে নবস্ফুরিত স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, উহাই কালে ফলে-ফুলে শোভিত হইয়া মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কর্ম্ম-জীবন—মনুষ্যত্বের বিকাশ

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর চিত্তরঞ্জন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। তাঁহার পিতার সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, তাহার উপর পিতা ঋণজালে জড়িত। এ অবস্থায় তাঁহাকে উপার্জ্জনশীল সিবিলিয়ান হইয়া আসিতে দেখিলে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন নিশ্চিতই সন্তোষলাভ করিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। চিত্তরঞ্জনের মনুষ্যত্ববিকাশের অবসর দিবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা তাঁহার পিতাকে ঋণজালে জড়িত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য আয়াস ও সুখের চাকুরীর পথ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রতিভাবিকাশের রঙ্গস্থল অনিশ্চিত-পরিণাম ব্যারিষ্টারী পেশা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন প্রথমে ভাগ্যোন্নতিসাধন করা বিশেষ কষ্টকর বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিপদ বা কষ্টের সম্মুখে পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। আইনে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য তিনি প্রথম শিক্ষার্থীর মত আইন-অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কষ্ট ঘুচাইবার নিমিত্ত তিনি সে সময়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাও বহু শিক্ষার্থীর অনুকরণীয়।

তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার অচিরে হস্তগত হইল। তাঁহার প্রতিভাবিকাশেরও এক সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালায় তখন এক মহা যুগ উপস্থিত—সে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশীর যুগ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের বিখ্যাত বোমার মামলা উপস্থিত হইল। অন্যান্য দেশকর্ম্মীর সহিত শ্রীঅরবিন্দ, স্বদেশী মামলার বেড়াজালে ঘেরা পড়িলেন—সরকার তাঁহার নামে রাজনীতিক ষড়্‌যন্ত্রের মামলা আনয়ন করিলেন। দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের

পক্ষে ইহা মহা সুযোগ। প্রায় ৬ মাস কাল মামলা চলিল। মামলা চালাইবার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা কয়দিনে ব্যারিষ্টারের পারিশ্রমিকে নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে দিয়া আর মামলা চালান অসম্ভব হয়। চিত্তরঞ্জন ইহা 'স্বদেশী মামলা' বলিয়া যৎসামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এই মামলা চালাইতে লাগিলেন। সরকারপক্ষে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টনের বিপক্ষে চিত্তরঞ্জন ফৌজদারী আইনে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে তখন হইতেই তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে 'first criminal lawyer' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। দীর্ঘ ৮ মাস কাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি এই মামলা চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই স্বার্থত্যাগের ফল– অরবিন্দের মুক্তি। চিত্তরঞ্জন বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া, মুক্ত অরবিন্দের হস্তধারণ করিয়া, আদালত-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সমগ্র দেশে তাঁহার জয় জয় রব পড়িয়া গেল। বিপ্লববাদী যুবকগণের স্বপক্ষে চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা শ্রবণে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি উডরফ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। আদালতে উপস্থিত ব্যারিষ্টার, উকীল বা শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার সেই বক্তৃতাশ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন।

এক হিসাবে যেমন তিনি এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তেমনই লাভবান্‌ও হইয়াছিলেন। বিধাতা তাঁহার ত্যাগের পুরস্কার দিয়াছিলেন। অরবিন্দের মুক্তির পর হইতে তাঁহার মামলা আসিতে লাগিল এবং দৈনিক পারিশ্রমিকের হার ১ হাজার টাকার উপরেও উঠিল। অরবিন্দের মামলার পর তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এই মামলায় এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি স্বদেশী বয়কট মামলায় আসামীদের পক্ষসমর্থন করিয়া চিত্রঞ্জন যুগপৎ আইনজ্ঞান ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ সকল স্বদেশী মামলাতেও তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। ডুমরাঁও রাজ মামলায়, নাগপুরের হোমরুল লীগের সেক্রেটারী মিঃ বৈদ্যের মামলায়, ব্রহ্মদেশে ভারতরক্ষা আইনের অজুহতে ধৃত মিঃ মেটার মামলায়, চট্টগ্রামে কুতবদিয়ার আটক আসামীদের মামলায় চিত্তরঞ্জন সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিয়া যখন তিনি সহস্র সহস্র মুদ্রা আয়ের ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দেন, ঠিক তাহার পূর্ব্বে সরকার তাঁহাকে মিউনিশান বোর্ডের মামলার ভার দিয়াছিলেন।

পিতৃঋণ পরিশোধ

মামলার পর মামলায় চিত্তরঞ্জন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, চিত্তরঞ্জনের আইনজ্ঞান ও বক্তৃতাশক্তি অজেয়।

এ অর্থের তিনি কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধে পাওয়া যায়। তিনি পিতার সহিত ইতঃপূর্ব্বে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন। ইচ্ছা থাকিলে তিনি এ ঋণের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আইনের ফাঁকিতে নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান বা বিবেকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার মানুষ ছিলেন না। যতই অর্থোপার্জ্জন করুন, যতই সুখে—বিলাসে থাকুন, পিতৃঋণ তিনি কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তাই যখন বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন, তখন তিনি নিজের রোজগারে পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন। এমন আদর্শ পুত্র কয় জন ভাগ্যবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে? এইখানেই চিত্তরঞ্জনের মনুষ্যত্ব, এইখানেই তাঁহার চিত্তরঞ্জনত্ব। সে মহত্ত্ব দেখিয়া বিস্ময় পুলকে অধীর হইয়া হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস ফ্লেচার বলিয়াছিলেন, "দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়া কেহ আবার পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করে, এমন দৃষ্টান্ত আমি কখনও দেখি নাই। ইহাই প্রথম।"

বিবাহ ও সংসার

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। বাসন্তী দেবী বিজনী ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বরদাপ্রসাদ হালদারের কন্যা। তিনি আদর্শচরিত্রা মহৎকুলোদ্ভবা নারী। মানুষ সুখে, সম্পদে, ভোগে, বিলাসে মগ্ন থাকিলে, তাহার ভিতরের দেবতার অংশ ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ হয় না। তাই যখন দেবী বাসন্তীর স্বামী দেশসেবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়া কষ্টবিপদের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহারও দেবীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেশবাসী তাঁহার দেবীত্ব দর্শন করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়াছিল। স্বামী যখন কারাগারে রাজদণ্ড ভোগ করিতেছেন, সে সময়ে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সম্মিলনীর নেত্রীর পদে বরণ করিয়া তাহাদের প্রীতিশ্রদ্ধার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিল। তিনি স্বামীর সকল সৎকার্য্যে উৎসাহদাত্রী ছিলেন বলিয়া চিত্তরঞ্জনের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধ করা সহজসাধ্য হইয়াছিল, পরে বিরাট ত্যাগও সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে এমন স্বার্থত্যাগী পতি-পত্নী যুগে যুগে অবতীর্ণ হউন, ইহাই কামনা।

সামাজিক জীবন

পারিবারিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে চিত্তরঞ্জন তাঁহার মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি পিতৃভক্ত মাতৃ-অনুরক্ত পুত্র, গুণময় স্বামী, স্নেহশীল পিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ ভ্রাতা ও গৃহস্বামী। ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়-কুটুম্ব পালনে চিত্তরঞ্জন যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে কোনও একান্নবর্ত্তী পরিবারে অধুনা আদর্শযোগ্য।

সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্জনের অমায়িকতা, সৌজন্য ও বদান্যতা উদাহরণযোগ্য। সমাজের সকল স্তরের লোকেরই তাঁহার নিকট অবারিতদ্বার ছিল। চিত্তরঞ্জন যথার্থ দরিদ্র, দীন ও আর্ত্তের বন্ধু ছিলেন। দীন, আতুর ও প্রার্থীর সেবায় তাঁহার দান অফুরন্ত ছিল। তাঁহার সঞ্চয় ছিল 'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাম্'। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যাদি লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহার দান সামান্য ছিল না। বর্ত্তমান জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের নূতন গৃহনির্ম্মাণকল্পে, বেলগাছিয়ার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনকল্পে তিনি প্রতি বৎসর মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। পুরুলিয়ার এবং ভবানীপুরের অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় চিত্তরঞ্জনের দানের কথা সর্ব্বজন-বিদিত। দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর সাহায্যকল্পে চিত্তরঞ্জন অনেক সময়ে অযাচিতভাবে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্রের বেদবিদ্যার প্রচারকল্পের মূলে চিত্তরঞ্জনের দান না থাকিলে উহা প্রচারিত হইত কি না সন্দেহ। পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঋণের দায়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্র বন্ধ করিতে উদ্যত হইলে চিত্তরঞ্জন সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস যখন দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়াছিলেন, তখন চিত্তরঞ্জনই তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

স্বগ্রামে বিদ্যালয় ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা এবং স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানে চিত্তরঞ্জনের চেষ্টার ক্রটি ছিল না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে চিত্তরঞ্জন ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। চাঁদপুরের শ্রমিক বিভ্রাটে শ্রমিকের দুঃখ-মোচনে চিত্তরঞ্জন যথাসাধ্য সাহায্যদান করিয়াছিলেন। এত বড় উদার, উন্মুক্ত বিরাট প্রাণ বর্ত্তমানে আর কোন বাঙ্গালীর ছিল বলিয়া আমি জানি না।

তৃতীয় পর্ব্ব

রাজনীতিক জীবন

চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবন বহুদিনব্যাপী নহে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হইতে এই জীবনের আরম্ভ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে চিত্তরঞ্জন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিত্ববিকাশের অবসর পাইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মনস্বী হিউমের চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে রাজনীতিক বক্তৃতা একটা সখের জিনিষ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা ভারতীয় শিক্ষিত-সমাজের অবসরবিনোদনের ক্ষেত্র ছিল—উহার সহিত দেশের যাহারা অস্থি-মজ্জা, সেই জনসাধারণের কোনও সম্পর্ক ছিল না, উহাতে জাতির জীবন-মরণের কথা উঠিত না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হয়। উহার ফলে দেশে যে স্বদেশী ও বয়কটের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, উহাতে দেশের রাজনীতি ধর্ম্মনীতিতে পরিণত হইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ভারত-গৌরব

দাদাভাই নৌরোজী প্রথমে ভারতীয়ের পক্ষ হইতে স্বরাজের দাবী করিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হয় এবং উহাতে ষ্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটী ও অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন সম্পর্কে প্রাচীন ও নবীন দলে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রাচীন দলের; আর উদীয়মান নবীন দলের মুখপাত্র চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, হেমেন্দ্র-প্রসাদ প্রভৃতি। সে শক্তিপরীক্ষায় তরুণরা জয়লাভ করেন। তখন হইতেই গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। চিত্তরঞ্জন সে যজ্ঞে প্রধান হোতা হইলেন। তাহার পর সুরাট কংগ্রেসে নবীন গণতন্ত্রবাদীরা প্রাচীনপন্থীদিগের একাধিপত্যের অবসান করেন।

তাহার পর হইতে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দেশের ও জাতির চিত্তরঞ্জনে পরিণত হইলেন। তিনি যাহা একবার মঙ্গলকর বলিয়া ধারণা করিতেন, তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে আধাখিচুড়ী Half-measure কায সম্ভব ছিল না। চিত্তরঞ্জনের উদার বিশ্বপ্রেমিক ভাবুক মন চিরদিনই মুষ্টিমেয়ের একাধিপত্যের বিরোধী, তাই তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালার প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন; —

"রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও প্রয়োজনীয়।"

পুরাতনপন্থীরা জনসাধারণকে জাতীয় আন্দোলন হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। তাই চিত্তরঞ্জন উক্ত অভিভাষণে জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন,— "আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, সেই আমরা— দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সহিত আমাদের যোগ কোথায়? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাযে তাহাদের ডাকি?"

চিত্তরঞ্জনের ইহাই মাতৃমন্ত্র—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর জাতীয় সঙ্গীতে যে 'সপ্তকোটি কণ্ঠের' উল্লেখ করিয়াছেন, চিত্তরঞ্জন উহার মধ্য হইতে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য প্রাণপণ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। 'সাগর-সঙ্গীত', 'মালঞ্চ', 'কিশোর-কিশোরী' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া চিত্তরঞ্জন ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'নারায়ণ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি একবার বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্যের আলোচনাকালে চিত্তরঞ্জনের মনে রাজনীতির আলোচনা প্রভৃতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা তাঁহার বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের প্রধান সোপান।

বাঙ্গালার অধিবাসী তখন হইতেই চিত্তরঞ্জনের উপর বাঙ্গালার রাজনীতির নেতৃত্ব অর্পণ করিল—তাঁহার উপর রাজনীতিক্ষেত্রের সকল আশা-ভরসা স্থাপন করিল। নেতার গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বরিশাল কনফারেন্সে নবীন দলের পক্ষ হইতে স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন:—

"ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্ত-শাসন হইবে না, মুসলমানদিগের স্বায়ত্ত-শাসন হইবে না, জমীদারদের স্বায়ত্ত-শাসন হইবে না,—ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালার স্বায়ত্ত-শাসন, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে।"

ইহা হইতেই চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট জাতীয়তার মূলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের চেষ্টা ছিল না। তিনি দেশকে এক অপার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেন। ময়মনসিংহে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"দেশের কায আমার ধর্ম্মের অঙ্গ। উহা আমার জীবনের অঙ্গ—জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেশ ও জাতির সেবা—মানুষের সেবা। মানুষের সেবাই ভগবানের আরাধনা।"

এত বড় উচ্চাঙ্গের দেশ-প্রেম-তন্ময়তা কয়জনে সম্ভব হইয়াছে? তাই বলিতেছি, চিত্তরঞ্জন যখন একবার দেশসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে কায়মন সকলই ঢালিয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের সনাতন ভাব-ধারার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আন্তরিক ছিল। তিনি অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গের মত রাজনীতিক দেশসেবাকে 'পোষাকী' করিয়া রাখিতে জানিতেন না। তাই ময়মনসিংহের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে অবদানস্বরূপ একটি মহতী সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এক আধ্যাত্মিকতার রক্ষক হইয়া আছি। সেই আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করিতে হইবে। আমরা সেই অগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত করিব—যাহা সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে জীবন্ত ও উজ্জ্বল করিব।" ভারতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি এই আন্তরিক আকর্ষণ ও উহা পুনরুজ্জীবিত করিবার আকুল আকাজ্ক্ষা আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

চিত্তরঞ্জন এইরূপে কতকটা ধর্ম্মভাব লইয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, আপনার ভাবধারার মধ্য দিয়া আপনার শক্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনার দেশের মুক্তি সাধন করিবার পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। এ জন্য তিনি ইংরাজ-শাসনের পক্ষপাতী হইলেও আবেদন-নিবেদন দ্বারা মুক্তি-সাধনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সে বিরোধ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শতমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে কলিকাতা কংগ্রেসে কাহাকে সভাপতি করা হইবে, এই বিষয় লইয়া প্রাচীন ও নবীন জাতীয় দলের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন নবীন দলের নেতা। প্রাচীনপন্থী মডারেটরা মামুদাবাদের রাজা সাহেবকে এবং চিত্তরঞ্জনের নবীনপন্থী দল মিসেস্ বেসাণ্টকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। শেষে নবীন দলেরই জয় হয়, বেসাণ্ট প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তখন হইতে মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট দল একবারে পৃথক্ হইয়া গেল, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরের রাজনীতিক্ষেত্রে এক্সট্রিমিষ্ট দলের অবিসংবাদিত নেতৃপদে সমাসীন হইলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কারসম্পর্কিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। চিত্তরঞ্জন উহার সম্পর্কে অগাধ অর্থোপার্জ্জনের মায়া কাটাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে তাঁহার আত্মনির্ভরতার মহাবাণী প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ঢাকার এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,—"স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কতটুকু অধিকার প্রদান করিবেন এবং কতটুকু দিবেন না, এ সমস্ত ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের যতটুকু অধিকার প্রয়োজন, আমাদিগকে ততটুকু দাবী করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট দিবেন কি দিবেন না, তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। আপনারা ভীত হইয়া কোন কায করিবেন না, দেশের মঙ্গলের জন্য যেরূপ শাসনবিধি প্রয়োজন মনে করেন, তাহাই গবর্ণমেণ্টের নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত করিতে হইবে।"

স্বায়ত্ত-শাসন কেন চাই, তাহাও ঐ বক্তৃতাতে চিত্তরঞ্জন বুঝাইয়াছিলেন,—"আমাদের ধর্ম্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনই একমাত্র উপায়।" পাঠক দেখিবেন, ভারতের স্বার্থের বিরোধীরা এই সকল অন্তরায়কেই কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চতুর্থ পর্ব্ব

অসহযোগে চিত্তরঞ্জন

এ যাবৎ চিত্তরঞ্জন ইংরাজ-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় যত্নবান্ হইলেও কখনও এক দিনের জন্য ইংরাজ-শাসন হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিবার কল্পনা মনে স্থান দেন নাই। কলিকাতার কোনও সভায় মিঃ আর্ডেন উড বলিয়াছিলেন, "ভারতীয়কে ক্রমাগত অধিকার বাড়াইয়া দিলে এমন সময় আসিবে, যখন আবার আমাদিগকে তরবারির দ্বারা পুনরায় ভারত জয় করিতে হইবে।" চিত্তরঞ্জন এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মিঃ আর্ডেন উডের যেন স্মরণ থাকে, ভারত কখনও অস্ত্রের দ্বারা জয় করা হয় নাই,

কেবল প্রীতির দ্বারা এবং ভারতকে সুশাসনে রাখিব, এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা ইংরাজ ভারতকে লাভ করিয়াছে।"

চিত্তরঞ্জন এইরূপে ইংরাজকে কখনও শ্রেষ্ঠের আসন প্রদান করেন নাই। তবে কখনও বর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমার শিক্ষাদীক্ষার জন্ম আমি য়ুরোপের নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাহা হইলেও আমি ভুলিতে পারি না যে, য়ুরোপীয় রাজনীতির ধার করা জিনিষ লইয়া আমাদের জাতীয়তা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।"

চিত্তরঞ্জন এক্সট্রিমিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইতেন; কিন্তু তিনি কি চাহিয়াছিলেন? তাঁহার কথা:—"আমরা আমলাতন্ত্র চাহি না, আমরা চাই স্বায়ত্ত-শাসন।" অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "যখন আমি স্বায়ত্ত-শাসন চাই, তখন মনে করিবেন না যে, আমি বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র-শাসনের পরিবর্ত্তে আর একটা নূতন আমলাতন্ত্র-শাসন চাহিতেছি। আমার মতে আমলা-তন্ত্র-শাসন সবই সমান—তা সে ইংরাজেরই হউক বা ফিরিঙ্গীরই হউক অথবা ভারতীয়েরই হউক।" পুনশ্চ —"যদি প্রবাসী ইংরাজরা ভারতকে আপনার আবাস-ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে চান, তবে সানন্দে বলিব, আসুন, আমরা একযোগে ভারতের মঙ্গলের জন্য কায করি।"

এই সকল কথা হইতেই বুঝা যায়, চিত্তরঞ্জন এ যাবৎ ইংরাজের সম্পর্ক বর্জ্জনের কল্পনা এক দিনও করেন নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের মনের কথা জানাইবার চেষ্টা করা হয়। তখন কলিকাতায় এক সভায় চিত্তরঞ্জন বলিয়া-ছিলেন,—"গত ৩০ বৎসরের মধ্যে যে কোনও শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই এই আমলাতন্ত্র বাধা জন্মাইয়াছে ও সংস্কারের পথ রুদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং আমলাতন্ত্রের নিকট কোনরূপ রাজনৈতিক অধিকার পাইবার আশা বৃথা। আমা-দিগকে আমলাতন্ত্রের পরিচালকদের নিকট যাইতে হইবে। বৃটিশ জনসাধারণের নিকট আমাদের ন্যায্য দাবী উপস্থিত করিতে হইবে।"

এ দাবীর মধ্যে চিত্তরঞ্জনের ইংরাজ-বর্জ্জনের আকা-ঙ্ক্ষার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় কি? মহাত্মা গন্ধীও পূর্ব্বা-পর ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রি-কায় নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও বুয়র-যুদ্ধকালে তিনি ডুলীবাহক দল সৃষ্টি করিয়া ইংরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং জার্ম্মাণযুদ্ধকালে এ দেশ হইতে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের যুদ্ধজয়ের ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। অথচ এই দুই নেতাই পরে ইংরাজ শাসনের সহিত সম্পর্কবর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মনোভাব পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আছে। উহার মূল শাসন-সংস্কার আইন, রাউলট আইন, জালিয়ানওয়ালা ও খিলাফৎ।

মহাত্মার সত্যাগ্রহ

চেমসফোর্ড-মণ্টেগুর শাসন-সংস্কার আইন যে মূর্ত্তিতে দেখা দিল, তাহাতে উহা চিত্তরঞ্জন-পরিচালিত নবীন জাতীয় দলের যে মনঃপূত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। বোম্বাই সহরে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিশেষ অধি-বেশন হইল; পরন্তু উহার পর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক অধিবেশন হইল। উভয় ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জনের দল সংস্কার-আইনকে ভারতীয়ের ন্যায্য দাবীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। বিপক্ষে রহিলেন মিসেস্ বেসাণ্ট। কিন্তু চিত্তরঞ্জন জয়ী হইলেন। তাঁহার দলের প্রস্তাবিত পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মন্তব্য উভয় ক্ষেত্রেই গৃহীত হইল। অর্থাৎ নবীন দল প্রতিপন্ন করিলেন যে, দেশের মুক্তি-কামীরা স্বায়ত্তশাসনের ছায়া চাহে না, প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন চাহে। এ বিষয়ে দেশের মত প্রকাশের জন্য চিত্ত-রঞ্জনের নিকট দেশবাসী কৃতজ্ঞ। এ দিকে এই ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের মন ইংরাজ শাসনের আকর্ষণের মোহ হইতে কথঞ্চিৎ দূরে অপসারিত হইল।

তাহার পর রাউলট আইন। সরকার ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাউলট কমিটী নিযুক্ত করেন। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধকালে প্রবর্ত্তিত ভারতরক্ষা আইন রদ করিতে হইবে, অথচ উহা বিলুপ্ত হইলে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত আসামী-দিগকে আটক রাখা অসম্ভব হইবে, এই আশঙ্কায় সমগ্র

জাতির তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাউলট কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে দুইখানি কঠোর আইন প্রবর্ত্তিত করা স্থির হইল। আইনের বলে ভারতের বড় লাট ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে বৃটিশ ভারতের যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ের জন্য ভারতরক্ষা আইনের ক্ষমতার প্রায় অনুরূপ ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণরের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন—ফলে যে কোনও ব্যক্তিকে সরকার ইচ্ছা করিলে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতা হস্তগত করিবেন। ইহা প্রথম আইন। অপরটির দ্বারা ভারতীয় ফৌজদারী আইনের বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার উপায়বিধান করা হইল।

বলা বাহুল্য, ইহাতে ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে কে না ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়? জার্ম্মাণ যুদ্ধে সাহায্য করার ইহাই পুরস্কার! কিন্তু সরকার অচল অটল। তাঁহারা আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ মাদ্রাজের বি, এন, শর্ম্মা পদত্যাগ করিলেন, কিন্তু পরদিন বড় লাটের গৃহে ভোজে গিয়া লাটের অনুরোধে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ জিনা, মিঃ মজরুল হক ও শ্রীযুক্ত বিষণ দত্ত শুকুল পদত্যাগ করিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের যে ফেব্রুয়ারী মাসে এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইল, ঐ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে মহাত্মা গন্ধী রাউলট আইনের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ' বা Passive Resistance প্রবর্ত্তন করিলেন। ইহাকে বাঙ্গালায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বলা হয়। এই অস্ত্রের দ্বারা মহাত্মা গন্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়ের ন্যায্য অধিকারের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। ১লা মার্চ্চ মহাত্মার সত্যাগ্রহ-ঘোষণা প্রচারিত হইল। ১৩২৭ সালে ২৩শে চৈত্র কলিকাতার গড়ের মাঠে বিরাট সত্যাগ্রহ সম্মিলন হইল। চিত্তরঞ্জন উহাতে প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতা করিলেন, "প্রেমের বলের দ্বারা আমরা আত্মাকে জয় করিব—স্বার্থপরতা, হিংসাদ্বেষ বর্জ্জন করিব। ইহাই মহাত্মার বাণী, ইহাই ভারতের সনাতন বাণী। রাউলট আইনের দ্বারা আমাদের নবজাগ্রত জাতিকে নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে বাধা দেওয়া হইতেছে। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে দ্বেষহিংসা বর্জ্জন করিয়া দেশপ্রেমকে জাগাইতে হইবে।"

এইরূপে মহাত্মার প্রভাব চিত্তরঞ্জনের উপর বিসর্পিত হইল, চিত্তরঞ্জন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ সফল হইতে না হইতেই ৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে রক্তপাত হইল। মহাত্মা গন্ধী রক্তপাতের সংবাদ পাইয়া দিল্লীযাত্রা করিলেন। পথে পুলিস তাঁহাকে আটক করে ও পরে সরকার তাঁহাকে বোম্বাই বিভাগের সীমানার মধ্যে থাকিবার আদেশ করেন।

ইহার ফলে পঞ্জাবে আগুন জলিয়া উঠিল। সে সময়ের পঞ্জাব-হাঙ্গামা ও সরকারের অনাচারের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জালিয়ানওয়ালায় ডায়ারের নৃশংসতা, জনসন ওব্রায়েন, বসওয়ার্থ স্মিথ প্রভৃতির অমানুষিক অনাচার, ওডয়ায়ের সামরিক শাসন, হাণ্টার কমিটীর নিয়োগ প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পঞ্জাব অনাচারের তদন্ত জন্য কংগ্রেস যে বে-সরকারী কমিটী নিযুক্ত করেন, তাহাতে অন্যতম সদস্যরূপে চিত্তরঞ্জন পঞ্জাবে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাত্মাজীর কথায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, চিত্তরঞ্জন ইহাতে স্বয়ং পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন, অধিকন্তু ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়েরও ক্ষতিস্বীকার করিয়াছিলেন। এমনই দেশের জন্য চিত্তরঞ্জনের ত্যাগস্বীকার! পঞ্জাববাসী দেশবন্ধুর সে বন্ধুত্ব—সে ত্যাগ—সে দেশপ্রেমের জন্য আত্মনিয়োগের কথা কখনও বিস্মৃত হয় নাই। কমিটীর সদস্যরূপে চিত্তরঞ্জন যখন স্বকর্ণে নির্যাতিতগণের করুণ কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে যে দাগ লাগিয়াছিল, তাহা ইহজন্মে শুকায় নাই, উহা তাঁহার অহিংস অসহযোগ গ্রহণের ভিত্তি বলা যাইলেও যাইতেও পারে। রাউলট আইনের দ্বারা যে জমী চিত্তরঞ্জনের মনে প্রস্তুত হইয়াছিল, পঞ্জাব অনাচারে সেই জমীতে বীজ উপ্ত হইল।

অসহযোগ গ্রহণ

চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শিরোধার্য্য করিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে কংগ্রেসের

অধিবেশন হইল, উহাতেও চিত্তরঞ্জন সংস্কার আইন সফল করিবার জন্য সরকারের সহিত সহযোগ করিবার নীতির বিপক্ষে প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন। কংগ্রেসে ...স্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। সে সময়ে ...ত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী বক্তৃতার কথায় মহাত্মা গন্ধী ...লিয়াছিলেন, সে নির্ভীক জ্বলন্ত বক্তৃতা শুনিয়া অনেকের ভীতি উৎপাদিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানিতেন না। যাহা ন্যায় বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তাহা জগতের সমক্ষে বলিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। এ জন্য অনেক সময়ে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ তাঁহাকে বিপ্লববাদী (Revolutionary) আখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদের ফলে কংগ্রেসে একটা রফা হইল। কংগ্রেস যে মন্তব্য গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বলা হইল যে, সংস্কার আইন অপ্রচুর, অসন্তোষজনক এবং নিরাশাব্যঞ্জক হইয়াছে বটে, তবে উহার কার্য্য এমন ভাবে করিয়া যাওয়া হইবে, যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে মহাত্মা গন্ধী তাঁহার যুগবাণী লইয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। পঞ্জাব হাঙ্গামা সম্বন্ধে হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট পঞ্জাব অনাচারের প্রতীকারপন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। সেভারেস সন্ধিতে তুর্কীর ও খিলাফতের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। মহাত্মা গন্ধী প্রচার করিলেন, পঞ্জাব অনাচার ও খিলাফৎ অবিচারের প্রতীকার করিতে হইলে স্বরাজলাভই একমাত্র উপায়। আশু সেই স্বরাজলাভ করিতে হইলে নিরস্ত্র দুর্ব্বল পরাধীন জাতির একমাত্র অস্ত্র "অহিংস অসহযোগ।" মহাত্মা নির্দ্দেশ করেন, পঞ্চবিধ অসহযোগ দ্বারা বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, যথা—

(১) সরকারের সম্পর্কিত স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জ্জন,

(২) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী বর্জ্জন,

(৩) সরকারী লেভি ও দরবার আদির সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্কবর্জ্জন,

(৪) সরকারী আইন-আদালত ইত্যাদি বর্জ্জন,

(৫) কাউন্সিল এসেমব্লি আদি বর্জ্জন।

এতদ্ব্যতীত মহাত্মা গন্ধী আরও কয়টি প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—

(ক) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নীতিতে ও অসহযোগ মন্ত্রে দেশবাসীকে সম্যক্ শিক্ষিত করিয়া তোলা।

(খ) জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

(গ) সালিসী বিচারালয় বা পঞ্চায়েৎ সমূহের প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া এক বিরাট ট্রেড য়ুনিয়নে কেন্দ্রীভূত করা।

(ঙ) ক্রমশঃ অবস্থা বুঝিয়া বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা হইতে দেশীয় মূলধন ও শ্রমিকগণকে ছাড়াইয়া লওয়া।

(চ) ভারতের বাহিরে সৈনিক, লেখক ও শ্রমিক হিসাবে কোনও ভারতীয় কায না করে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(ছ) স্বদেশী সাধন করা।

(জ) এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতাসাধনের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহার্থ একটি স্বরাজ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা।

খদ্দর ও চরকা প্রচলন, হিন্দুমুসলমানে মিলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ইহার পরের কার্য্য-তালিকার প্রথম ও প্রধান উপাদান হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের পরিবর্ত্তন

চিত্তরঞ্জন মহাত্মার সত্যাগ্রহ আন্দোলন মানিয়া লইলেও এবং সংস্কার আইনে সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিলেও প্রথমে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন মানিয়া লইতে সম্মত হয়েন নাই। পঞ্জাবী ব্যাপারে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও তিনি ইংরাজের ন্যায়-বিচারে আস্থা হারান নাই—সহযোগিতার উপকারিতায়ও বিশ্বাস হারান নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। মহাত্মা গন্ধী ঐ কংগ্রেসে পঞ্জাব অনাচার ও খিলাফতের অবিচারের প্রতীকার মানসে তাঁহার বিখ্যাত অহিংস অসহযোগ

প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সভাপতি পঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায় ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, মিসেস বেসাণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গও মহাত্মার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই, বরং ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর নিকট ভারতের কথা বলিবার নিমিত্ত এক ডেপুটেশন প্রেরণের কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু শেষে ভোটাধিক্যে মহাত্মার জয় হয়। সে সময়ে এই প্রবন্ধের লেখক বিশেষ কংগ্রেসে মহাত্মার যে প্রভাব দেখিয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। মহাত্মার এক একটি কথায় সেই বিরাট সভায় যে উত্তেজনা ও হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতে মহাত্মার অবিসংবাদী নেতৃত্ব অনুসূচিত হইয়াছিল। সে উত্তেজনা-স্রোতের মুখে চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য নেতার বাধা জাহ্নবী-স্রোতে মত্তমাতঙ্গের মত ভাসিয়া গেল। যুক্তপ্রদেশের ধনী বিলাসী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মহাত্মাজীর অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ওকালতী ত্যাগ করিলেন; তাঁহার নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সে সময়ে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস ও দেশবাসীর বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার বক্তৃতা আগ্রহান্বিতচিত্তে শুনেন নাই, পরন্তু তিনি "মিঃ গন্ধী" বলিয়া মহাত্মাজীকে আখ্যা দিলে সহস্র সহস্র শ্রোতা সমস্বরে বলিয়া উঠেন, "বল, মহাত্মা গন্ধী।" সে গর্জ্জন সাগরগর্জ্জনের মত অনুমিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন লোকরঞ্জন ছিলেন, এ কথা সত্য, কিন্তু লোকপ্রিয়তার খাতিরে সত্য ধারণাকে বিসর্জ্জন দেন নাই। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। যতক্ষণ তিনি আপন বিবেককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, ততক্ষণ মহাত্মা গন্ধীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইলেও চিত্তরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কল্পচ্যুত হয়েন নাই, বিবেককেও বলিদান দেন নাই। তিনি সরকারী স্কুল-কালেজ বর্জ্জন ও আদালত-বর্জ্জনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

তাহার পর ঐ বৎসরের (১৯২০ খৃষ্টাব্দের) ডিসেম্বর মাসেই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কংগ্রেসে বাঙ্গালা মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভোট দিবে বলিয়া কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, জনরব রটিল, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা হইতে ২ শত 'গুণ্ডা' ডেলিগেট ভাড়া করিয়া অসহযোগ প্রস্তাবের মুণ্ডপাত করিতে যাইতেছেন। নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি মান্দ্রাজের নেতা শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়া মহাত্মাজীর প্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। বাঙ্গালার ডেলিগেট ক্যাম্পে এই প্রস্তাব লইয়া ভাটিয়া গুজরাটীদের সহিত হাতাহাতিও হইয়া গেল। কিন্তু যাহাই হউক, মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবই গৃহীত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি প্রধান বিরুদ্ধবাদী, সেই চিত্তরঞ্জন সহযোগনীতি পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগনীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের প্রকৃতি যাঁহারা বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। মহাত্মা গন্ধীর সহিত বিরলে তাঁহার বহুক্ষণ অসহযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার ফলে যখন তিনি বুঝিলেন যে, অসহযোগ ব্যতীত এ দেশের অবস্থা প্রতীকারের অন্য উপায় নাই, তখন তিনি সম্পূর্ণ অসহযোগী হইলেন—তাঁহার নিকট Half measure বা আধা খিচুড়ী কাযের আদর ছিল না। একে পঞ্জাবের ব্যাপারে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়াছিল, তাহার উপর মহাত্মাজীর যুক্তিতর্ক,—এই দুই ঘটনাস্রোত তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্প ভাসাইয়া দিল। তিনি স্বয়ং নাগপুর কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ মন্তব্য উপস্থাপিত করিলেন। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা এক মহাত্মাজীতেই সম্ভব হয়, আর চিত্তরঞ্জনেই বিকাশ হয়।

অসহযোগ গ্রহণ—বিরাট ত্যাগ

একবার ব্রতগ্রহণ করিবার পর চিত্তরঞ্জন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবার মানুষ নহেন। তিনি বুঝিলেন, বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ না করিলে ব্রত সফল হইবে না, পরন্তু নিজ জীবনে ব্রতের জন্য ত্যাগমাহাত্ম্য দেখাইতে না পারিলে দেশ কেবল তাঁহার মুখের কথা লইবে না। তাই নাগপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই চিত্তরঞ্জন এক দিনে সন্ন্যাসী হইলেন, একটা রাজার রাজ্যের আয়ের পেশা ছাড়িয়া দিলেন। আমীরের ভোগবিলাস তুচ্ছ জ্ঞান

করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। দেশের জন্য এ বিরাট ত্যাগ—ত্যাগ সামান্য নহে, বাৎসরিক ৩।৪ লক্ষ টাকা—এ বিরাট ত্যাগ দেখিয়া দেশবাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার বিরাট ত্যাগের মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল, ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-সম্ভ্রমভরে তাহাদের মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসিল। এ ত্যাগস্বীকারে বিরাট পুরুষের আর কোনও কষ্ট হইল না, কষ্ট হইল কেবল এই ভাবনায় যে, অতঃপর ইচ্ছামত আর প্রার্থী দরিদ্র আর্ত্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবেন না। দধীচি-শিবির দেহদানের মত, দাতাকর্ণ-হরিশ্চন্দ্রের মত এ বিরাট দান!—দেশবাসী আনন্দাশ্রুপ্লুত-নয়নে শ্রদ্ধাগদ্গদকণ্ঠে তাঁহাকে "দেশবন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তৃপ্তি পাইল। এ বিরাট ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া য়ুনিভার্সিটি কমিশনের সভাপতি সার মাইকেল স্যাডলার বলিয়াছিলেন, "চিত্তরঞ্জনের অদ্ভুত ত্যাগ জগতে অতুলনীয়। কোনও দেশে কোনও সময়ে কেহ এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশের কাযে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভারতবাসী তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিলে ধন্য হইবে।"

অসহযোগ প্রচার—বরিশাল কন্‌ফারেন্স

ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া, চিত্তরঞ্জন সামান্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সামান্যভাবে থাকিয়া, দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগ ও অসহযোগমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যেরই মত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার এ প্রেমের গান! সে ভগবদ্‌প্রেমের গান, এ দেশপ্রেমের গান। দেশপ্রেমে সন্ন্যাসী সর্ব্বস্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন সে গান গাহিয়া দেশবাসীর প্রাণের সাড়া পাইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই তাঁহার বিরাট সংবর্দ্ধনা—রাজারাজড়ার ভাগ্যে এমন সংবর্দ্ধনা জুটে কি না সন্দেহ। নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকায় তাঁহার ডাকে জাতীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইল। বাঙ্গালার পল্লীমফঃস্বলে উকীল, মোক্তার পেশা ছাড়িতে লাগিলেন, ছেলেরা স্কুল-কালেজ ছাড়িতে লাগিল। সে এক কি উত্তেজনার দিনই গিয়াছে!

তাহার পর যখন ময়মনসিংহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহর-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন, তখন সমগ্র বাঙ্গালা হুহুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল—চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়া বাঙ্গালার মুকুটহীন রাজা হইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কঠোর আদেশের ফলে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল না, উকীল-মোক্তাররা ৭ দিন আদালত বর্জ্জন করিলেন। শেষে উপরওয়ালার ইঙ্গিতে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

ময়মনসিংহ হইতে টাঙ্গাইল—সেখানে প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পেশা ছাড়িয়া দেশের কাযে যোগদান করিলেন। চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিয়া পুলিসের রিপোর্টারও অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। টাঙ্গাইল হইতে করটিয়ায়—সেখানে প্রসিদ্ধ জমীদার দেশপ্রেমিক ওয়াজেদ আলী খাঁ পনি সাহেব ওরফে চাঁদ মিঞার বিশাল ভবনের প্রাঙ্গণে সভা হয়। সে সভায় চিত্তরঞ্জনের মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা দরিদ্র নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকেও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

তাহার পর চিত্তরঞ্জন একে একে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি নানা স্থানে বক্তৃতা দ্বারা ভাবের বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া বরিশাল কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ যেমন স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর পূতধারা মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়া মৃত সগরবংশকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তেমনই চিত্তরঞ্জন তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালার প্রাণশূন্য অকর্ম্মণ্য দেহে নবজীবনীশক্তির সঞ্চার করিলেন। চিত্তরঞ্জনের প্রতি এ ঋণ বাঙ্গালী কিসে পরিশোধ করিবে?

বরিশালের সেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতি শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বরিশালের স্বনামধন্য জন-নায়ক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাঙ্গালা অসহযোগ গ্রহণ করিবে কি বর্জ্জন করিবে, ইহাই কন্‌ফারেন্সে মীমাংসিত হইবে বলিয়া ইহার বিশেষত্ব ছিল। এ জন্য বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে দলে দলে বরিশালের পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। এত বড় বিরাট প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালায় কখনও হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক সেই কন্‌ফারেন্সের মহাযজ্ঞে 'বসুমতীর'

প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিল, পরন্তু সভাপতি বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় 'বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য রক্ষার' ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার ব্যথায় ব্যথা অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহার 'বৈশিষ্ট্য' চাহে নাই, বিপিনচন্দ্রের অপরূপ স্বরাজের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করে নাই, বরং মহাত্মা গন্ধীর অসহযোগব্রতের পক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে সাড়া দিয়াছিল। দ্বাদশ সহস্র বাঙ্গালী নর-নারীর মধ্যে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন যখন মহাত্মার বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন—অহিংস অসহযোগ মন্ত্রগ্রহণের জন্য বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন সমগ্র সভা সমস্বরে তাহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিল। বাঙ্গালায় তখন চিত্তরঞ্জনের এমনই প্রভাব।

খুলনা ষ্টীমারে রাত্রিকালে দেশবন্ধুর সহিত লেখকের সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সে সময়ে দেশবন্ধু বিনিদ্র থাকিয়া সামান্যবেশে ডেলিগেট উকীল বাবুদের নিকট গিয়া প্রত্যেককে অনুনয়-বিনয় করিয়া দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন—ত্যাগের মহিমা বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত যুক্তি-শক্তি, অসাধারণ দেশপ্রেম প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের বিশালতাও প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। কত উকীল বাবু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেন, কত জন কঠোর কথা শুনাইয়া দিলেন, কিন্তু দেশপ্রেমিক দেশবন্ধুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না—তিনি যে দেশের কায করিতেছিলেন! এ তন্ময়তা আর কাহাতেও খুঁজিয়া পাই না। শুনিয়াছি, তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্য চিত্তরঞ্জন সামান্য লোকেরও হাতে-পায়ে ধরিয়াছেন! যখন ভাবিয়া দেখি, সমাজে তাঁহার কোথায় স্থান ছিল, আর দেশের জন্য তিনি কোথায় অবতরণ করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়াছিলেন, তখন স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতিতে অন্তর ভরিয়া যায়। দেশের এমন সুসন্তান কত যুগযুগান্তরে জন্মগ্রহণ করিবে, কে বলিতে পারে!

আইন অমান্য ও গ্রেপ্তার

দেশ অহিংস অসহযোগনীতি অবলম্বন করিলে পর সরকারের সহিত জনমতের সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এক দিকে প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ আমলাতন্ত্র সরকার, অপর দিকে নিরস্ত্র, আত্মার বলে বলী অসহযোগী—সে যুদ্ধে মহাত্মাজীর বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া সে সময়ে দেশের ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, ফকীর, নবাব, আপামর জনসাধারণ যে অদ্ভুত আত্মত্যাগ ও কষ্টবরণের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা জাতির মুক্তির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। তবে সে যুদ্ধের একটা প্রধান ঘটনা যুবরাজের আগমনে হরতাল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারত পরিদর্শনে আসিয়া বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। ঐ দিন সারা ভারতবর্ষে প্রজাপক্ষ হইতে হরতাল ঘোষিত হয়। অসহযোগীরা পঞ্জাব অনাচার ও খিলাফতের অবিচারের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত উৎসবে যোগদান করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিল। হরতালের দিন বোম্বাই সহরে দাঙ্গা ও রক্তপাত হয় এবং মহাত্মা গন্ধী প্রায়োপবেশন করেন। কলিকাতায় হরতালে যদিও দাঙ্গা হয় নাই, তথাপি অসহযোগী জাতীয় দলের হরতালের আশ্চর্য্য বন্দোবস্তে য়ুরোপীয় সমাজ ও তথা শাসক-সম্প্রদায় বিস্মিত, বিচলিত, ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। কলিকাতা সে দিন শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয়ান সমাজ সে দিন আহার্য্য, যানবাহন বা ভৃত্যের সেবায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা 'গেল রাজ্য, গেল মান' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন এবং সরকারকে বলেন, হয় তাঁহারা রাজ্য-শাসন করুন, না হয় খিলাফতী ও অসহযোগীদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিন।

বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে আর নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ব্যবস্থাপক সভায় শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর তারিখে তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর এক ঘোষণার দ্বারা বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবক দল-গুলিকে বে-আইনী বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহার পর কলিকাতার পুলিস কমিশনার এক ইস্তাহারে সাধারণ সভা-সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। বড় লাট লর্ড রেডিং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণরের এই নীতি পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

এ দিকে ২৭শে নভেম্বর রবিবার ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সরকারের এই আদেশ বে-আইনী ও অন্যায়, এই হেতু কংগ্রেসের কার্য্য যথাপূর্ব্ব চালাইতে হইবে। ২৮শে নভেম্বর বঙ্গীয় খিলাফৎ কমিটীও কংগ্রেস কমিটীর এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া নিজেরাও খিলাফতের কার্য্য যথাপূর্ব্ব চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দেশবন্ধু নিয়ামক (ডিক্‌টেটার)

এইরূপে নানা ঘটনার পর বাঙ্গালার প্রধান হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশবন্ধুকে দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে দেশের রাজনীতিক কার্য্য চালাইবার জন্য নিয়ামক বা একমাত্র পরিচালক বলিয়া স্বীকার করিলেন। এমন ভাবে দেশবাসীর বিশ্বাস, আশা-ভরসা ও শ্রদ্ধার গৌরব-মুকুট বোধ হয় এ যাবৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই—অন্ততঃ বাঙ্গালায় নহে। ডিক্‌টেটারের পদে সমাসীন হইবার পর দেশবন্ধু দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটি আহ্বান-বাণী ঘোষণা করেন। উহাতে তিনি সেই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে দেশকর্ম্মীদের কর্ত্তব্যের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বাঙ্গালা সরকারও চিত্তরঞ্জনের এই কর্ম্মী (ভলাণ্টিয়ার) আহ্বান কার্য্যকে এবং নিজে ভলাণ্টিয়ার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাকে উপেক্ষা করিলেন না। তাঁহারা এই সকল ঘোষণা বে-আইনী বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ডিক্‌টেটাররূপে দেশবন্ধু যে ১০ লক্ষ ভলাণ্টিয়ার আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও বে-আইনী বলিয়া স্থির করিলেন।

সরকারী কমিউনিকেই প্রকাশ পাইল, "৬ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জনের আদেশে বড়বাজারে ভলাণ্টিয়ার প্রেরিত হয়। প্রথম দলে তাঁহার পুত্র চিররঞ্জন অন্যান্য ভলাণ্টিয়ারের সহিত গ্রেপ্তার হয়। ইহার পরদিন পুরুষ ভলাণ্টিয়ারদের সহিত মিঃ দাশের পত্নী, ভগিনী ও অন্য একটি পুরমহিলা ভলাণ্টিয়ার হইয়া পথে বাহির হয়েন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হয় ও পরে সেই রাত্রিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার শক্তিকে সমরে আহ্বান করিতেছেন। মহিলা ও কোমলমতি বালকগণকে যাঁহারা আইনভঙ্গ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, অতঃপর তাঁহাদের সম্পর্কেও সরকার আইন চালাইতে বাধ্য হইবেন।"

দেশবন্ধুর কারাদণ্ড

বলা বাহুল্য, এ ঘোষণা দেশবন্ধুকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হইলেন। ঐ দিনই শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আকরাম খাঁ, পদ্মরাজ জৈন, মৌলবী আহম্মদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও ধরা পড়িলেন। দেশবন্ধু বেলা ৩টার সময়েই সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া হাসিমুখে বলিয়াছিলেন, আমি সে জন্য প্রস্তুত। ডেপুটী কমিশনার মিঃ কিড যখন তাঁহাকে পুলিসে লইয়া যান, সে সময়ে বাসন্তী দেবী অন্যান্য পুরনারীর সহিত শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু দেশবাসীকে এই বিদায়বাণী দিয়া যায়েন যে, তাঁহারা যেন সাহস ও ধৈর্য্য ধরিয়া এই সঙ্কটের সম্মুখীন এবং উত্তেজনার কারণ থাকিলেও অহিংসভাবাপন্ন থাকেন, তাহা হইলেই জয় অবশ্যম্ভাবী। স্বরাজ যেন তাঁহাদের চরম লক্ষ্য থাকে।

২১শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী দেশবন্ধুর বিচার হইল। সে বিচারের ইতিহাস অপূর্ব্ব। হাইকোর্টের উকীল-ব্যারিষ্টাররা দল বাঁধিয়া এই মামলা দেখিতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দেশবন্ধু কাঠগড়ায় নীত হইলে সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিচারের কালে কোর্টের সান্নিধ্যে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বিচারক দেশবন্ধুকে ৬ মাস কারাদণ্ড প্রদান করেন। দেশের কাযে কর্ম্মবীর দেশবন্ধু কষ্টবিপদের কণ্টকমুকুট বরণ করিলেন। বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার রাজত্ব দৃঢ়মূল হইল। পত্নী, পুত্র, ভগিনী,—সকলই তিনি দেশের

কার্য্যে নিয়োগ করিলেন, শেষে স্বয়ং কারাবরণ করিলেন। কমলার বরপুত্র মায়ের ডাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কর্ম্মবীরের কর্ম্ম-পিপাসা, দেশসেবার আকুল আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই। শেষে দেশবাসীকে দেশসেবার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার নিমিত্তই যেন তিনি হাসিমুখে কারাদণ্ড মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। এমন না হইলে দেশ-নেতা?

পঞ্চম পর্ব্ব

কাউন্সিলে কর্পোরেশনে

গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে দেশবন্ধু আমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগের মহিমা দেশবাসীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগণ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাঁহাকে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির গৌরবময় পদে বরণ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে দেশবন্ধু হাজতে, সেই সময়ে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। প্রথমে কথা উঠিল, তাঁহার সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসিয়া সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু তিনি স্বামীর কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া বাঙ্গালা ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। সুতরাং দিল্লীর বিখ্যাত জননায়ক হাকিম আজমল খাঁ দেশবন্ধুর প্রতিভূরূপে সভাপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিলেন এবং দেশ-প্রেমিকা সরোজিনী নাইডু তাঁহার অপঠিত অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করেন। দেশবন্ধু সেই মহাযজ্ঞে সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও দেশবাসী তাঁহার আত্মাকে তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী পরে তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে সমস্ত অভিভাষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অভিভাষণে দেশবন্ধু কেন অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন। আইনের কূটতর্ক দ্বারা প্রতিভাবান্ ব্যবহারাজীব চিত্তরঞ্জন দেখাইয়াছিলেন যে, শাসন-সংস্কার আইনের দ্বারা আমাদের স্বরাজলাভ সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং যত দিন আমরা স্বরাজ না পাই, তত দিন আমাদিগকে অসহযোগ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেই।

জেলের পর

দেশবন্ধু যখন জেলে, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কলিকাতায় আসিয়া সরকারের সহিত দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে মীমাংসা-বৈঠক বসাইবার চেষ্টা করেন। তিনি কারাগারে এ বিষয়ে দেশবন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গন্ধী তারে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। ইহাতেই মীমাংসা-বৈঠকের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়।

জেল হইতে মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধু দেশবাসীর নিকট যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন মির্জ্জাপুর পার্কের অভিনন্দন। সে অভিনন্দনপত্র এইরূপ:—

"শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের

শ্রীকরকমলেষু—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

এক দিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সে দিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু, আর এক দিন এই বাঙ্গালাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সে দিনও সে ভুল করে নাই। সে দিন এই বাঙ্গালার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি

উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয় ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌছায় নাই, হয় ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে এক দিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌছিল। যে দিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সে দিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমায় কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই, বাঙ্গালা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত, আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পঞ্জাবী, মারহাট্টা, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনই করিয়াই মানব-জীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনিই করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

এক দিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যত দিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, তত দিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে-বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ্, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড় গর্ব্ব—বাঙ্গালী তুমি; তাই ত, সমস্ত বাঙ্গালার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ,—তুমি চিরজীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণমুগ্ধ—স্বদেশবাসিগণ।"

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী একবাক্যে দেশবন্ধুকে তাহাদের অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালী নহে, সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ তাঁহাকে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করিল।

ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেসের উপর্য্যুপরি তিনটি অধিবেশনে কাউন্সিলবর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া কাউন্সিল প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বেই ইহার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে যখন

বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন, তখন দেশবন্ধু কারাগারে। তাঁহার পত্নী বাসন্তী দেবীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা তাঁহাকে উক্ত কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পদে বরণ করে। বাসন্তী দেবীর অভিভাষণে কাউন্সিল প্রবেশের আভাস ছিল। লোক উহাতে দেশবন্ধুর ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন আশা ত্যাগ করেন নাই। তিনি 'ভিতর হইতে অসহযোগ' মন্ত্রের সার্থকতা যেইমাত্র অনুভব করিলেন, সেইমাত্র তাহার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার স্বভাবই এইরূপ। যাহা ন্যায় বলিয়া তিনি একবার বুঝিতেন, শত বাধা তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। তাই গুরু গন্ধীর অভিমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও তিনি কাউন্সিল প্রবেশে উদ্যোগী হইলেন। ইহাতে কংগ্রেসের অসহযোগীদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল, এক দল পরিবর্ত্তনবিরোধী, অন্য দল পরিবর্ত্তনকামী। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, অসহযোগী ও মডারেটে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এই দুই দলের মনোমালিন্য তাহা হইতেও বড় হইয়া দাঁড়াইল। অনেকের তখন আশঙ্কা হইল, বুঝি এই দলাদলির ফলে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়, এ বিরোধে রফা না করিলে কংগ্রেসেরই অস্তিত্ব থাকিবে না। সেই সময়ে দেশবন্ধু এক নূতন দল গঠন করিলেন। প্রথমে তাহার নাম হইল কংগ্রেস স্বরাজ-খিলাফৎ কমিটী, পরে স্বরাজ্য দল। এই দলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরা যোগদান করিলেন। দেশের অধিকাংশ লোক দেশবন্ধুর মতাবলম্বী হইলেন। যদি দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ দেশনায়ক কংগ্রেস ছাড়িয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই সকল ভাবিয়া একটা রফার চেষ্টা হইল। ফলে দেশবন্ধুর চেষ্টায় দিল্লীর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এ সময়েও জনরব রটিয়াছিল, দেশবন্ধু কাশী, এলাহাবাদ হইতে ভাড়া করিয়া ডেলিগেট লইয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে কোকনদ কংগ্রেসেও কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী ঘোষণা করেন যে, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে এ বিষয়ে মহাত্মার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মাজী তখন জেলে। মহাত্মাজীর প্রভাবের বিরুদ্ধে এত বড় একটা শক্তিশালী দল গঠন করা দেশবন্ধুর অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক।

তাহার পর স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। দেশবন্ধুর চেষ্টায় বাঙ্গালায় নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ স্বরাজ্য দলের হস্তগত হয়। সার সুরেন্দ্রনাথ, মিঃ এস, আর, দাশ প্রমুখ বিখ্যাত লিবারলরা ভোটে স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিদের নিকট পরাজিত হয়েন। বলা বাহুল্য, এ সকলের মূল দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব। তিনি যে ভোটারের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, সে অবনত-মস্তকে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়াছে। ইহা সাধারণ ক্ষমতা নহে।

বাঙ্গালায় স্বরাজ্য দলের প্রভাব দেখিয়া গভর্ণর লর্ড লিটন দেশবন্ধুকে মন্ত্রি-সভা গঠনের ভার প্রদান করেন। সরকারের বিপক্ষদলকে ডাকিয়া এমন ভাবে গুরুভার প্রদান করাতে বুঝা যায়, দেশবন্ধু স্বরাজ্য দলের কি প্রভাব আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি যে সকল সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সরকার তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। দেশবন্ধু ভুয়া মন্ত্রিত্ব চাহেন নাই, যাহাতে মন্ত্রিগণের হস্তে হস্তান্তরিত বিভাগের প্রকৃত শাসনভার প্রদত্ত হইতে পারে, তাহাই চাহিয়াছিলেন। তিনি সরকারের হাতে ছায়াবাজীর পুতুলের খেলা খেলিতে সম্মত হয়েন নাই।

কাষেই সরকারের সহিত মন্ত্রি-গঠন ও মন্ত্রি-বেতন লইয়া স্বরাজ্য দলের বিরোধের সূত্রপাত হইল। দেশবন্ধু 'ভিতর' হইতে, অর্থাৎ কাউন্সিলের মধ্য হইতে 'অসহযোগ' করিয়া ভুয়া কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিবেন বলিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এতদর্থে এখন হইতে তিনি কাউন্সিল ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বগুণে বিরোধী দলের বহু প্রতিনিধিও তাঁহার পক্ষে ভোট দিতে লাগিলেন। ফলে বার বার সরকারের পরাজয় হইতে লাগিল।

তাঁহার শেষ বিরোধই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বার দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কাউন্সিলে মন্ত্রি-বেতন না-মঞ্জুর হইল। তাহার পর দেশবন্ধু পাটনায় চলিয়া যায়েন। সেই সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গভর্ণর লর্ড লিটন ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের তদ্বির ও চেষ্টার ফলে কাউন্সিলে মন্ত্রিনিয়োগ নীতি গৃহীত হইল, অনেকেই মনে করিলেন, চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসন দৃঢ়মূল হইয়া বসিল। সরকার বেতন মঞ্জুর করাইয়া লইবার জন্য সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ এবং নবাব নবাব আলী চৌধুরীকে মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। বাঙ্গালায় জনগণের মধ্যে একটা হতাশার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কিন্তু লর্ড লিটন তথনও দেশবন্ধুর অসাধারণ প্রভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনে যখন তিনি পুনরায় মন্ত্রি-বেতন মঞ্জুরী প্রার্থনা করিলেন, তখন এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। তাঁহার উপস্থিতি বাজীকরের যাদুমন্ত্রের মত কায করিল। যাঁহারা সরকারের কখনও বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন না বলিয়া জানা গিয়াছিল, তাঁহারাও ভোটের সময় জনমতের পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন! উভয় পক্ষেই খুব 'যোগাড়ের' চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে দেখা গেল, সরকারের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর প্রভাব বড় হইল। মৌলভী ফজলুল হক ও নবাব নবাব আলী চৌধুরীর মত সদস্যরা—যাঁহারা এককালে মন্ত্রিত্ব উপভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও জনমতের পক্ষে ভোট দিয়া লোককে ও সরকারকে বিস্মিত করিলেন। দেশবন্ধুর জয় জয় রবে দেশ ভরিয়া গেল। স্বরাজ্য দলের প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশবন্ধুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ সমবায় ম্যানসন গৃহে এক সান্ধ্য প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিলেন। লেখক ঐ ভোজে সকল রাজনীতিক দলের সমবায় দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিল। এক দিকে সরকারপক্ষে কৃষ্ণনগরের মহারাজা, অপর দিকে মৌলভী ফজলুল হক ও নবাব নবাব আলী এবং তাঁহাদের সঙ্গে স্বরাজ্য দলের শ্রীশচন্দ্র—সকলে একবাক্যে দেশবন্ধুর গুণগানে যোগদান করিয়াছিলেন। এমন যোগা-যোগ কেবল দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

যাহা হউক, মন্ত্রি-বেতন না-মঞ্জুর হওয়ায় বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসনের অবসান হইল। গভর্ণর হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহও স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কাউন্সিল-কামী অসহ-যোগী যে উদ্দেশ্যে কাউন্সিল প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সাধিত হইল। দেশবন্ধু নিজশক্তিতে প্রবলপ্রতাপ সরকারকেও জনমতের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য করিলেন।

বাঙ্গালার বে-আইনী আইন

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালা-সরকার ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাঙ্গালা অর্ডিনান্স আইন জারী করেন। সরকার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তা সুভাষচন্দ্র বসু এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী অনিলবরণ রায় ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বহু বাঙ্গালী যুবককে ধরিয়া বিনা বিচারে আটক করিলেন। উহার বিপক্ষে টাউনহলের বিরাট সভায় দেশবন্ধু যে জালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যে কোন দেশের জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবার যোগ্য। যখন দেশবন্ধু অসংখ্য জনতার সম্মুখে জলদগম্ভীরনাদে বলিয়াছিলেন, "কথা উঠেছে, আমাকেও ওরা ধরবে। বেশ ত, ধর আমাকে। আমি ত বলছি, চীৎকার ক'রে বল্‌ছি, আমায় ধর, আমায় ধর!" তখন সমস্ত জনমণ্ডলীর শিরায় শিরায় যে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধুর বক্তৃতার কি মোহিনী শক্তি, তাহা ঐ সভাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ইহার পর ৭ই জানুয়ারী এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন করা হয়। ঐ সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চেয়ারে বাহিত হইয়া কাউন্সিল-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। লোক সহস্র কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাটনায় ভ্রাতা জষ্টিস্ প্রফুল্লরঞ্জনের গৃহে স্বাস্থ্যোন্নতিকামনায় অবস্থান করিতেছিলেন। জেল-বাসের সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য, প্রথমে কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, সকলে ইহাই স্থির জানিয়াছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাহা হইলে কি জন্য 'দেশবন্ধু' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন? দেশের কায উপস্থিত, সে সময়ে চিত্তরঞ্জন কি দূরে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? যিনি দেশের কাযের জন্য—স্বরাজের জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তিনি যে মৃত্যুশয্যাতেও দেশের কায, স্বরাজের কায ভুলিতে পারেন না, তাহা এক চিত্তরঞ্জনেই সম্ভব হইয়াছিল। ফলে ঐ আইন ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয় নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই সার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় (তখন তিনি মন্ত্রী) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট কার্য্যকর হয়। প্রথম নির্ব্বাচনকালে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বহু প্রার্থী সদস্য (কাউন্সিলার) পদের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বলা বাহুল্য, এই উদ্যোগের প্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি যে গৃহে বা যে ওয়ার্ডে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে গৃহের বা ওয়ার্ডের অধিকাংশ ভোট কংগ্রেসের মনোনীত পদপ্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে দেশবন্ধুর আশ্চর্য্য প্রভাবে কংগ্রেসের স্বরাজ্য দল দ্বারা কর্পোরেশন অধিকৃত হয়। দেশবন্ধু প্রথম মেয়র নিযুক্ত হয়েন। মেয়রের পদে বসিয়া তিনি যে প্রথম বক্তৃতা দেন, তাহাতে সহরের দরিদ্রের ব্যথা হরণের এবং জনগণের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের কথা ছিল। দেশবন্ধু যেরূপ যোগ্যতার সহিত মেয়রের কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শত্রু-মিত্র একবাক্যে ঘোষণা করিতেছেন—এমন কি, তাঁহার অভাবে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার লোক পাওয়া দুর্ঘট বলিয়াও অনুমিত হইয়াছিল। স্বরাজ্য দলের সুভাষচন্দ্রকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধেও শত্রু-মিত্রের মধ্যে মতবিরোধ নাই। বলা বাহুল্য, কর্ম্মকর্ত্তা মেয়রের পরামর্শ লইয়া কায করিতেন, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতেন। মেয়রের লোকান্তরে ডেপুটী মেয়র মিঃ হাসান সুরাবার্দ্দীর শোকপ্রকাশ যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি শোকাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ কর্পোরেশন তাঁহাকে হারাইয়া যেন যথার্থই পিতৃহীন হইয়াছিল। ইহা দেশবন্ধুর কৃতিত্বের সামান্য পরিচায়ক নহে।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে গোপীনাথ সাহা মন্তব্য গৃহীত হয়। ইহাতে যুরোপীয় সমাজ, সরকার এবং দেশের এক শ্রেণীর লোক অতীব বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। যুরোপীয়রা স্পষ্টই বলেন, ঐ মন্তব্যের দ্বারা রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং বাঙ্গালার যুবকগণকে উহাতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, দেশবন্ধু প্রথমাবধি এই মন্তব্যের বিরোধী ছিলেন। তবে তাঁহার অধিকাংশ দেশবাসী ডেলিগেট যখন মন্তব্য ভিন্নাকারে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন, তখন তিনি উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ফল কথা, মন্তব্যের কথাগুলি যে ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রকৃত মন্তব্যে কিন্তু সে ভাবের কথা ছিল না বলিয়া প্রকাশ। দেশবন্ধু স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যিনি স্বরাজের জন্য জীবন উৎসর্গ দিতেও কাতর ছিলেন না, তিনি এই সামান্য ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ দেশবন্ধুর আর এক স্মরণীয় কার্য্য। ইহাতে আর কিছু প্রতিপন্ন না হউক, লোক বুঝিয়াছিল, দেশের তরুণসম্প্রদায়ের উপর দেশবন্ধুর কি অপূর্ব্ব প্রভাব ছিল। ১৩৩০ সালের ফাল্গুনমাসের শেষাশেষি স্বামী সচ্চিদানন্দ 'বসুমতী' কার্য্যালয়ে আগমন করিয়া কালীঘাটে অনাচার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছিলেন। সে সময়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক স্বামীজীকে বলেন, "তারকেশ্বরে যে অনাচার অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শুনা যায়, তাহার তুলনায় কালীঘাটের অনাচার কিছুই নহে, তারকেশ্বরের অনাচার দূর করিতে পারেন?" স্বামী সচ্চিদানন্দ ইহার পর হইতে তারকেশ্বরের অনাচারনিবারণে আত্মনিয়োগ করেন। চৈত্রমাসে মোহান্তকে

অপসারণ করিবার আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলনে সমগ্র বাঙ্গালা কাঁপিয়া উঠিল। ৩০শে চৈত্র (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল মাস) দেশবন্ধু দাশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অনাচার সম্বন্ধে তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করেন। তদন্তের পর তিনি ১৩৩১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আহ্বানে কিরূপে দলে দলে বাঙ্গালার তরুণসম্প্রদায় সে আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ ও কষ্ট-বিপদ সহ্য করিয়াছিল, তাহা আজিও বোধ হয় সকলের মনে আছে। সে সময়ে এই আন্দোলন চালাইবার জন্য দেশবাসী কিরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিল, তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেশবন্ধুর নামের এমনই প্রভাব! তাহার পর ১৩৩১ সালের আশ্বিনমাসে মোহান্তপক্ষের সহিত দেশবন্ধুর যে চুক্তি হয়, তাহা অনেকের মনঃপূত হয় নাই, এ কথা সত্য, অন্ততঃ দেশ যে ঐ চুক্তিতে সন্তোষ লাভ করে নাই, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতেই জানা যায়। কিন্তু সে যাহা হউক, এই ব্যাপারে অনাচারনিবারণে দেশবন্ধুর আন্তরিক চেষ্টা এবং তরুণগণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাবের পরিচয় যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফরিদপুর

গত মে মাসে ফরিদপুরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। দেশবন্ধু উহার সভাপতিপদে বরিত হইয়াছিলেন। ফরিদপুরে যাইবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু সংবাদপত্রে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। সিরাজগঞ্জের গোপীনাথ সাহা মন্তব্য গৃহীত হইবার পর বহু য়ুরোপীয় ও কোন কোন ভারতীয়ের ধারণা হইয়াছিল যে, দেশবন্ধু বুঝি বিপ্লববাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। দেশবন্ধু এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার নিমিত্ত ঘোষণা করেন যে, "আমি আমার মূলনীতি অনুসারে কোন প্রকার রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড বা অনাচারের পক্ষপাতী নহি। ইহা আমার ও আমার দলস্থ লোকের নিকট অতীব ঘৃণার্হ। আমি ইহাকে আমাদের রাজনীতিক উন্নতির পরম অন্তরায় বলিয়া মনে করি।" দেশবন্ধুর এই উক্তির পর য়ুরোপীয় মহলে একটা হর্ষের সাড়া পড়িয়া গেল, সকলে তাঁহার এই "পরিবর্ত্তনে" আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে 'পরিবর্ত্তন' কিছুই ছিল না। যাঁহারা দেশবন্ধুকে জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, তিনি প্রথমাবধিই অনাচার ও বিপ্লববাদের বিরোধী—অহিংসায় তিনি মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য। যাহা হউক, ভারত-সচিব লর্ড বার্কেণহেড দেশবন্ধুর এই 'ইঙ্গিত' (Gesture) পাইয়া লর্ড-সভায় বক্তৃতাকালে দেশবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বিপ্লব ও অনাচারনিবারণে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন দেশবন্ধু পীড়িত হইয়া পাটনায় ভ্রাতা জষ্টিস্ প্রফুল্লরঞ্জনের গৃহে আছেন। তিনি সেখান হইতে সংবাদপত্রের মারফতে জবাব দিলেন, "যদি আমি বুঝিতাম, বাঙ্গালার অর্ডিনান্স বিপ্লব-বিষ সমূলে উৎপাটন করিতে পারিব, তাহা হইলে আমি দ্বিধা না করিয়া সরকারকে সাহায্য করিতাম। কিন্তু আমি সেরূপ বুঝি নাই।"

ফরিদপুরের কন্‌ফারেন্সেও দেশবন্ধু এই ভাবের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি সরকারের সহিত সম্মানজনক সহযোগের কথাও তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আমি বুঝিতাম, বর্ত্তমান সংস্কার-আইন দেশের জনসাধারণকে কোনওরূপ শাসন-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, যদি বুঝিতাম, ইহাতে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মোন্নতি করিবার সুযোগ আছে, তাহা হইলে আমি কোন দ্বিধা না করিয়া সরকারের সহিত সহযোগ করিতাম এবং ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে গঠনকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতাম। কিন্তু আমি প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন না পাইয়া কেবল উহার ছায়ার জন্য সহযোগ করিতে পারি না।" দেশবন্ধু আরও বলেন, "যদি যথার্থই উভয় জাতির মধ্যে সহযোগ আনয়ন করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শাসক-জাতির মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পূর্ণ স্বরাজ আমাদিগকে দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া চাই।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দেশবন্ধু বৃটিশ-শাসনের বিরোধী ছিলেন না, তবে স্বৈরাচার-শাসনের বিরোধী ছিলেন। তিনি অহিংসার পথে ভারতের মুক্তিকামনা করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমান অংশীদাররূপে গৃহীত হইয়া ভারতবাসী আপনাদের ভাবধারার মধ্য দিয়া

আপনাদের স্বরাজ গড়িয়া তুলে, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইহার সহিত বিপ্লববাদের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

চরকা ও খদ্দর—গঠনকার্য্য

দেশবন্ধু মহাত্মা গন্ধীর মন্ত্রশিষ্য, অথচ তিনি মহাত্মাজীর নির্দ্দেশমত কাউন্সিল বর্জ্জন করিয়া আবার কাউন্সিল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে তাঁহার অসহযোগ-নীতির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। দেশবন্ধু কারামুক্ত হইবার পর কোথাও কোথাও বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—কেবল চরকায় স্বরাজ আসিবে না। ইহাতেও পরিবর্ত্তনবিরোধী অসহযোগীরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অবশ্য যাঁহারা মহাত্মাজীর নির্দ্দেশমত কর্ম্মপথে চলিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কারণ যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু দেশবন্ধু চরকা ও গঠনকার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। গঠনকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলের মধ্য দিয়া সরকারের কার্য্যে বাধা প্রদান করিলে কার্য্য সত্বর অগ্রসর হইবে, এইরূপই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

চিত্তরঞ্জনের রচনা হইতেই তাঁহার মনের ভাবের পরিচয় দিতেছি। তাঁহার 'বাঙ্গালার কথা' প্রথম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যায় আছে ;—"অনেকে বলেন, কৈ, স্বরাজ ত হ'ল না? এই রকম মনের অবস্থা থেকে তর্ক অনেক আসবে। তর্কের ঢের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু যে জেগে ঘুমায়, তাকে কি ক'রে জাগাই? কোটি টাকা, কোটি লোক ও ২০ লক্ষ চরকা হলেই কি স্বরাজ হ'ল? কেহ বলে, নাই স্বরাজ হবে—স্বরাজের সিঁড়ি তৈয়ারী হবে। ধাপে ধাপে আমাদিগকে উঠতে হবে। প্রথম ধাপে উঠেই যদি কেউ বলেন, কৈ, দোতলায় ত এলাম না? সেটা তার দোষ, না দোতলার দোষ? আমাদের সব সিঁড়ি উঠতে হবে, তবে ত স্বরাজ। স্বরাজ পাওয়া কি ছেলেখেলা?" সুতরাং চরকাও যে স্বরাজের সোপান, তাহা দেশবন্ধু স্বীকার করিতেন ; তবে হয় ত শুধু চরকা লইয়া থাকিলে স্বরাজ পাওয়া যাইবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে।" সুতরাং খদ্দরের প্রচারের জন্য দেশবন্ধুর যে কম আগ্রহ ছিল, এমন কথা বলা যায় না।

দেশবন্ধু কেবল ভাঙ্গনের পক্ষপাতী ছিলেন, এ কথা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী স্বার্থসন্ধ কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও য়ুরোপীয়ান বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি গঠনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মেলনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন :—

"জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বৎসরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচ জন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামের সমস্ত কার্য্য—সমস্ত শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা গ্রামে পূর্ব্বেকার যাত্রা, গান ইত্যাদি চালাইবার চেষ্টা করিবেন। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিবেন। চাষীকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আবশ্যকমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যক পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষীরা যাহাতে বারো মাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য শিল্প-পণ্য উৎপন্ন করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী-সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষীমাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল কিছু কিছু করিয়া দিবে। পল্লী-সমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা

করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন পল্লী-সমাজ চাষীদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধান্য দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

"এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিভিসন ও জিলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে।

"এইরূপে প্রত্যেক জিলার জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লী-সমাজ থাকিবে। এই প্রত্যেক পল্লী-সমাজে ৫ জন পঞ্চায়েত ব্যতীত জিলা-সমাজের জনসংখ্যা অনুসারে ৫ হইতে ২৫জন পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লী-সমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জিলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী-সমাজ এই জিলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জিলা-সমাজ—

(১) সেই জিলাভুক্ত সকল পল্লী-সমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লী-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জিলার যে রাজধানী, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লী-সমাজের অধীন সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লী সমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জিলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জিলাসমিতির অধীন থাকিবে।

(৫) জিলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোটখাট ব্যবসা চালাইতে হইবে।

(৬) এই জিলা-সমাজ এক জন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জিলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(৭) জিলার কৃষিকার্য্য, কুটীর-শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লী-সমাজেই এক একটি করিয়া থাকিবে। চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জিলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) জিলা ও পল্লী-সমাজের কোনও কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না।

(৯) জিলা সমাজ ও পল্লী-সমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক বসাইয়া প্রয়োজনীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জিলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১০) পল্লী-সমাজ ও জিলা-সমাজের এই সমস্ত কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যক আইন করিতে হইবে।"

এমন স্পষ্টভাবে দেশ ও জাতিগঠনের কার্য্য আর কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না জানি না।

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট

দেশবন্ধুর আর এক জীবনের ব্রত ছিল,—হিন্দু-মুসলমানে মিলনসংঘটন করা। তাঁহার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানে কোনও প্রভেদ ছিল না। সম্ভবতঃ মহাত্মা গন্ধীর পর এমন ভাবে হিন্দু-মুসলমানকে একই জাতি বলিয়া মনে করিতে এবং একই জাতিতে পরিণত করিতে দেশবন্ধুর মত অন্য কোনও নেতাকে দেখা যায় না। তাঁহার মুসলমান-সমাজের উপর এত প্রভাব ছিল যে, তাঁহার পরলোকগমনের পর পঞ্জাব ও দিল্লীর বিবদমান হিন্দু-মুসলমান পরস্পর শত্রুতা ও বিরোধিতা ভুলিয়া তাঁহার আত্মার প্রতি একযোগে সম্মান-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা সামান্য প্রভাব নহে।

অবশ্য, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালায় যে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট সংঘটনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহাতে অনেক হিন্দু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না, তাঁহারা যোগ্যতার বিনিময়ে সংখ্যাধিক্য দেশের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে স্থান দিতে চাহেন নাই। কিন্তু দেশবন্ধু বুঝিয়াছিলেন যে, সরকারী চাকুরীতে এবং কাউন্সিলে, মিউনিসিপ্যালিটীতে সংখ্যায় অধিক বাঙ্গালার মুসলমানকে তাঁহাদের সংখ্যায় অনুরূপ অধিকার না দিলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কালে সদ্ভাব স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ বর্ত্তমানের অবস্থা বুঝিয়া এই ব্যবস্থা করাই উচিত। তাহার পর যখন মুসলমানদের মধ্যেও সমানরূপে শিক্ষাবিস্তার হইবে, তখন তাঁহারাও চাকুরীর মোহে আকৃষ্ট হইবেন না—নির্ব্বাচনক্ষেত্রেও আপনাদের যোগ্যতার জোরে প্রতিনিধির পদ অধিকার করিবেন। ইহাতেও দেশবন্ধুর জাতীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষ কথা

নানা দিকে নানা কার্য্যে অবিশ্রান্ত দেহ ও মন নিয়োগ করিয়া দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। প্রায় ৬ মাসের উপর হইল, তাঁহার জ্বর হইতে আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার বহুমূত্র রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার উপর জ্বর; কাযেই শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকরা স্থান ও বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেন। দেশবন্ধু কিছু দিন পাটনায় ভ্রাতা জষ্টিস প্রফুল্লরঞ্জনের গৃহে গিয়া রহিলেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও কিরূপে তিনি দেশের কাযে জীবনাহুতি দিতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। বস্তুতঃ জীবনের শেষ ভাগে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে দেশবন্ধু তাঁহার শোণিতবিন্দু দেশের কাযে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালার কোনও হৃদয়বান্ কবি অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে লিখিয়াছেন :—

'তুমি বড় ছিলে তা ত জানি,
কিন্তু এত বড় এতখানি!—
আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ,
হে সাধক, হে মহান্, হে মহীয়ান্!'

শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে চিকিৎসকরা দার্জ্জিলিংয়ে বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইতে বলিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া প্রথমে তাঁহার কতকটা উপকার হইয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে জ্বর যে হইত না, এমন নহে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে দিন তাঁহার পালামত জ্বর হইবার কথা, কয় দিন হইতে সে জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কাল জ্বর আবার দেখা দিল। তাহাতেই সব শেষ হইল।

দেশবন্ধুর অভাবে আজ দেশ ও জাতি অবসন্ন, শোকে মুহ্যমান। নেতা অনেক হয়, কিন্তু এমন নেতা কয় জন জন্মগ্রহণ করেন? এমন বিরাট হৃদয় লইয়া জগতের রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও দেশে কোনও নেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। কবিত্বক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মহামস্তিষ্কশালী কবি হইতে না পারেন, কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয়ের যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই তাঁহাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া-দেবতা বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করে। 'মালঞ্চে' কবি চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছেন :—

'তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ
ওগো কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর
জীবনে তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক;
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক।'

মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনে এই 'প্রাণপুষ্প' কিরূপে ফুটিয়াছিল, তাহা প্রার্থী সাহিত্যসেবী, রাজনীতিক, দুঃস্থ, দুঃখী, আর্ত্তপীড়িত এবং শিক্ষার্থী দরিদ্র বাঙ্গালী যুবক বলিয়া দিতে পারে। তাঁহার এই 'প্রাণপুষ্প' তাঁহার জীবনের সকল দেশহিতকর কার্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার দেশপ্রেমেও এই হৃদয়ের বিরাটত্ব দেখা দিয়াছিল। তিনি দেশকে যেমন আর পাঁচ জনে ভালবাসে, তেমন ভালবাসিতেন না—সমস্ত হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দেশকে ভালবাসিতেন। সমস্ত কায করিয়া, সমস্ত স্বার্থ রক্ষা করিয়া, তাহার পর অবসর ও সুযোগমত দেশকে

ভালবাসিব,—ইহা চিত্তরঞ্জনে সম্ভব ছিল না। তাই মহাত্মা বলিয়াছেন,—

"দেশবন্ধু জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। গত ৬ বৎসর কাল তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। মাত্র কয় দিন পূর্ব্বে আমি যখন তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দার্জ্জিলিং হইতে চলিয়া আসি, তখন আমি কোনও বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, আমি যতই তাঁহাকে অধিক জানিবার সুযোগ পাইয়াছি, ততই অধিক ভালবাসিয়াছি। দার্জ্জিলিংয়ে অবস্থানকালে আমি দেখিয়াছি, তাঁহার সকল চিন্তাই ভারতের মঙ্গলবিধানের সহিত জড়িত ছিল। তিনি ভারতের মুক্তির কথা অহরহঃ চিন্তা করিতেন, উহার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেন।" এমন নেতা যে জগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ, তাহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। দানে যিনি এ যুগের দাতাকর্ণ ছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে দেশপ্রেমেও বিরাট আকার ধারণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

এতদ্ব্যতীত সাহস ও নির্ভীকতায়, সহনক্ষমতায়, সংঘবদ্ধতাসাধনে, প্রচারকার্য্যে, অনুচরবর্গের হৃদয়জয়ে, অফুরন্ত বিশ্বাসে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় তাঁহার বিরাটত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কত যুগযুগান্তরে আবার বাঙ্গালায় এমন বিরাট কর্ম্মশক্তি লইয়া জন-নায়কের আবির্ভাব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন

গরবে গৌরবে, ভৈরব আরাবে,
বিজয়-বিষাণ বাজে।
কৈলাসে উল্লাসে, যশস্বি-আবাসে,
ঈশান-নিশান সাজে।
দশমীর রাত্রি, বিজয়ার যাত্রী,
জগদ্ধাত্রী-পদতলে।
পশুরাজ অঙ্গে, হেলাইয়া রঙ্গে,
বসে শুদ্ধ পদ্মদলে॥
দেখ চেয়ে চক্ষে, ওই ঊর্দ্ধ লক্ষ্যে,
অক্ষ মালা শোভে বক্ষ।
দেহ-লীলা রঙ্গে, কর্ম্ম-যোগ ভঙ্গে,
শিব শিবা সঙ্গে সখা॥
হিমগিরি-শিরে, লয়ে যেতে বীরে,
যবে এলো মহাকাল।
সমাধি-মন্দিরে, দেখিল নন্দীরে,
দেখে ঘন জটাজাল॥
সর্ব্বশুভঙ্কর, সম্মুখে শঙ্কর,
যম ভয়ঙ্করে—লজ্জা।
মৃত্যু যেন ভৃত্য, পালে নিজ কৃত্য,
পাতি ফুলদল-শয্যা॥
ঈশানী সঙ্গিনী, যোগিনী রঙ্গিণী,
তাণ্ডব তরঙ্গে নাচে।
মৃত্যু থিয়া থিয়া, তাথিয়া তাথিয়া,
মুক্ত ভূত-পঞ্চ পাছে॥
মরণের জাঁক্, দেখিয়া অবাক্,
মেদিনী মোদিনী তায়।
পুত্র পুণ্যে সতী, ভাবে ভাগ্যবতী,—
'আরতি আমারি পায়॥'

ও কি! ও মা বঙ্গ, কেন কাঁপে অঙ্গ,
অশ্রুর তরঙ্গ চোখে।
যম জয় ক'রে, ছেলে চলে ঘরে,
কাঁদিয়ে হাসাবে লোকে॥
কেঁদ না কেঁদ না, সহিতে বেদনা,
শেখ, দেখে বলিদান।
বিনা রক্তপাত, অরির নিপাত,
করি, পুত্র দেছে প্রাণ॥
এই রণজয়, পশু সাধ্য নয়,
অমর সমর এই!
প্রেমের কামান, সম্মোহন বাণ,
কুসুম সমান সেই॥
এ ভারতবর্ষে, সহযোগে হর্ষে,
ক'রে গেছে আকর্ষণ।
সে কি যে সে ছেলে, ছেড়ে চ'লে গেলে,
চিতা তিতায়ে বর্ষণ॥
ওঠো বাঁধ কটি, পর খাটো ধটী,
মাটী কাটি খোঁজ ভক্ষ্য।
পায়স অশন, চিকণ বসন,
নহে, মা—মা এক লক্ষ্য॥
ছিল মহাভোগী, হোলো কর্ম্মযোগী,
দেখাতে ত্যাগের পথ।
চক্র-চিহ্ন ধর, হও অগ্রসর,
ঐ যায়—ঐ যায় রথ॥
আমাদের চিত্ত, হয়ে যেন নিত্য,
বঙ্গের রঞ্জন রহে।
জুড়ে অন্তস্থল, মৃত্যু দিক্ বল,
চক্ষে জল কেন বহে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ

এও কি বলিবার কথা?—লিখিবার কথা? বাঙ্গালার কি সর্ব্বনাশ—ভারতের কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল! দেশবন্ধু দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জন অকালে চলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নের পূর্ণোজ্জ্বল সূর্য্য অকালে চির-অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালার কি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিবার শক্তি আছে? তাহার এ চোখের জল আর কি শুকাইবে? এ ভগ্ন মেরুদণ্ড সোজা করিয়া আর কি সে দাঁড়াইতে পারিবে?

এই দুর্ব্বল দেশ আর ততোধিক দুর্ব্বল দেশের মানুষ—ইহাদের কান্না ভিন্ন যে কোনই সম্বল নাই, কোনও উপায় নাই! এমনই মহামানব দেশনায়ক জন্মিয়াই দেশের এ দুর্দ্দশা দূর করেন! দুঃস্থ দেশের ত মাঝে মাঝে এ সৌভাগ্যলাভ হইয়াই থাকে! অভাগ্য আমরা, অকালমৃত্যু আমাদের আশার সূর্য্যকেও নিভাইয়া দিতেছে! গত বৎসর আশুতোষ গেলেন, আবার এ বৎসরে এ যে একেবারে সর্ব্বনাশ! এত বড় হতভাগ্য দেশ আর কি আছে?

একটি বটবৃক্ষের ফলে অসংখ্য বটবৃক্ষের সৃষ্টি হয়। দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনকে চিত্তের মধ্যে লইয়া এই অগণ্য নগণ্য কীটেরা মানুষ হইয়া উঠুক, প্রাণ লাভ করিতে শিখুক, ইহাই কি বিধাতার ইঙ্গিত? পাইয়া ত ইহারা সম্পূর্ণ লাভ করিতে আজও পারিল না—তাই হারাইয়া প্রকৃত লাভ করুক, ইহাই কি বিধাতার কামনা?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়া এখন ভাবিতে হইবে, হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য আমরা—অভাগা আমাদের দেশ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু আমাদের মধ্যেই ত মহাত্মা গন্ধী, লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লোকাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মিয়াছেন? এ দেশেরও ত এমন ভাগ্য হইয়াছে। তবে কেন মনে করিতেছি, এইবার সব শেষ? অত বড় মহান্ বৃক্ষের ফলে কি শত শত মহাপ্রাণ আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে না?

আমাদের এ কিসের শোক, কিসের অজস্র অশ্রুপাত, কিসের এ মর্ম্মচ্ছেদী হাহাকার? আমরা কি চিরজীবনের চিন্তায় কর্ম্মে-মর্ম্মে দেহে-প্রাণে দেশবন্ধুকে চিরজীবিত করিয়া রাখিব না? বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জনকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া যাইতে দিব? আমরা তাঁহাকে না ছাড়িলে তিনি কি আমাদের ছাড়িতে পারিবেন? তিনি আবার আসিবেন, তাঁহাকে যে আসিতেই হইবে। তাঁহার এ অসমাপ্ত সাধনা সমাপ্ত না করিয়া তিনি কোথায় যাইবেন? মৃত্যুসময়েও কি স্বরাজ-সাধনার চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল? "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" তিনি এখনও যে দেশের ভাবনাই ভাবিতেছেন, স্বরাজসাধনাই করিতেছেন! আমাদের বাহির হইতে তিনি এখন অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করিবেন। বাহিরে হারাইলাম, তাই বাহিরের এই হাহাকার, কিন্তু অন্তরে যেন না হারাই! প্রকাণ্ড সৌধ আগুনে পুড়িয়া গেল সত্য, কিন্তু গৃহহীন হইলে ত চলিবে না, ঐ সর্ব্বনাশের চিতা হইতেই ইট-কাঠ যা পার সংগ্রহ করিয়া নূতন করিয়া কুটীর বাঁধ। উদ্যম হারাইও না। চিত্তরঞ্জনের কার্য্য দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠুক, তাঁহার স্মৃতি দিন দিন উজ্জ্বলতর করিয়া তাঁহাকে দিন দিন অমরত্ব দান কর—দেখিও, যেন দেশবন্ধু তাঁহার দেশ হইতে এক তিলের জন্যও না চলিয়া যায়েন।

দেশ যে দেশবন্ধুর কাছে কতখানি আশা করিয়াছিল, কতখানি পাইয়াছিল, দেশের বিরাট শোকেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জন আমাদের যাহা দিয়াছেন, তাহা যে দেশ ইহার পূর্ব্বে কখনও পায় নাই। তিনি ত্যাগী, তিনি দানী, তিনি উদারহৃদয় ছিলেন। তিনি ত্যাগের মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাত্মা গন্ধীর যথার্থ অনুকরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশাত্মবোধের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। আদর্শকে তিনি মাত্র মনের ইচ্ছা ও মুখের কথায় পর্য্যবসিত না করিয়া জীবনে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাঁহার এ ত্যাগ গীতার "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে

নিরাহারস্য দেহিনঃ। "রসবর্জ্জং"—মাত্র নয়. অক্ষমের অপ্রাপ্ত মনস্কামের অগত্যাত্যাগ নয় "ভুক্তভোগাদৃষ্টদোষা পরিত্যক্তা। রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" দেশকে "পরতত্ত্বের" মতই দেখিয়া দেশবন্ধুর অন্য সকল তৃষ্ণাই একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছিল, তবু আমরা কি কেবল তাঁহার সেই ত্যাগের মহিমায়ই আজ তাঁহার শোকে কাতর হইয়াছি? না, কেবলমাত্র ইহাই নহে। তাঁহার এ দেবত্বের জন্যই আজ আমাদের এ শোক নয়! দেবতা বুঝি মানুষকে এতখানি কাঁদাইতে পারেন না! দেবতাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, চরণে মাথা লুটাইয়া দেয়, কিন্তু এত কাঁদে মানুষ কেবল মানুষের জন্যই! তাঁহার অমরত্বের জন্য নহে বোধ হয়, কেবল মরত্বেরই জন্য! মানুষ আমরা, তাই আমাদের মহামানব দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের জন্য কাঁদিতেছি। দেশস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিবার প্রধান যে বস্তু, সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিগ্রহকে হারাইয়া কাঁদিতেছি। যাঁহার অপূর্ব্ব রাজনীতিক বুদ্ধিতে এই মৃত বাঙ্গালা জীবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, নবজীবনের আশা করিয়াছিল, স্বরাজসূর্য্যোদয়ের অগ্রদূতরূপী সেই দেশবন্ধুকে হারাইয়া বাঙ্গালা আজ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছে!

দেশবন্ধু বলিয়া গিয়াছেন, "আমি আবার এই বাঙ্গালাদেশেই জন্মগ্রহণ করিব, আবার আমার দেশের জন্য কায করিব,—যত দিন না আমার মনের কামনা সম্পূর্ণ হইবে, আমার আদর্শের পূর্ণ পরিণতি ঘটিবে, তত দিন এই ভাবেই এখানে কায করিতে আসিব।" গীতার সেই মহাবাক্য স্মরণ করি, "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি—সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" তাঁহার এই রক্ত-মাংস- অস্থি- মজ্জায় মিশানো ভাব—"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" তিনি তাহাই হইয়াছেন। আমাদের চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে অন্তরের অন্তরে স্বদেশ-সেবা স্বরূপে স্বরাজ-সাধনার ভাবে প্রস্ফুট হইয়া উঠিবেন!

দেশবন্ধুর ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী

বাহিরে তাঁহাকে হারাইয়াছি, অন্তরে যেন না হারাই—আদর্শে না হারাই—কর্ম্মে না হারাই—সাধনায় না হারাই! তিনি যে সমস্ত সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছেন, দেহে, মনে, প্রাণে, কর্ম্মে আমরা যেন তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি। তাঁহার সাধের স্বরাজ্য দল দেশবন্ধুর প্রভাব নিজ নিজ আত্মায় অনুভব করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে চলুন, আর আমরা আপনাদের গঠন করিতে, গ্রাম্যসংস্কার সাধন করিতে, কুটীরশিল্প পুনর্জীবিত করিতে মহাত্মা গন্ধীপ্রদর্শিত এবং প্রফুল্লচন্দ্র-পরিচালিত পথে চরকার দিকে মনোনিবেশ করিতে আর বিলম্ব না করি! এখনও যদি এ কথা আবার ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে বুঝিব, আমাদের এ শোকও মিথ্যা, জীবনের সবই মিথ্যা!

এসো, আজ আমরা দেশবন্ধুর এই স্মৃতি-শ্রাদ্ধ-যজ্ঞে

যজমান, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক প্রত্যেকেই হই! দেশের এই বিরাট শ্রাদ্ধক্ষেত্রে সেই বিরাট পুরুষের তৃপ্তিকামনায় পূতচিত্তে বিরাট পাঠ করি,—তাহার ধারক, পাঠক, শ্রোতা হই। তাঁহার গুণগানে ভাট হই। তিনি দেশকে যাহা দান করিয়া গেলেন, তাহার অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রদানী হই। এ শ্রাদ্ধ ত এক দিনে ফুরাইবে না—দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে, কালে কালে বঙ্গবাসীকে তাঁহার উদ্দেশে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইবে। তিনি ত মরেন নাই, তিনি ত মরিবার নহেন। তিনি যে মরণে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত দেশের ও জাতির সম্বন্ধ ত কোন যুগে ছিন্ন হইবার নহে। তাঁহার শ্রাদ্ধশেষে মন্ত্র গাহিতে হইবে, "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।" "হে সোমদৈবত পিতৃগণ, দেবমার্গ অবলম্বন করিয়া এই কুশের নিকটে আগমন করুন। আসিয়া আমাদের পৈতৃক ধনে কল্যাণ সম্পাদন করুন এবং যে সকল পৈতৃকক্রমাগত ধন আমরা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সেই সকল সর্ব্ববীরপুরুষলভ্য ধনকেও আমাদের প্রদান করুন।" দেশাত্মবোধের পিতা দেশবন্ধুর নিকটে এমনই করিয়া আমাদের পিতৃধনে অধিকার চাহিতে হইবে। নিঃস্ব আমাদের এই তিলোদকের শ্রাদ্ধ আজ দেশবন্ধু দেশাত্মবোধের জনক চিত্তরঞ্জনের মহান্ আত্মাকে অর্পণ করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ চাহিতে হইবে, "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্। ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। * * যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন।" "আমাদের দাতৃগণ জ্ঞান এবং সন্ততিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, আমাদের শ্রদ্ধা যেন নষ্ট না হয়। আমাদের নিকটে অনেকে যাচ্ঞা করুক —কিন্তু আমরা যেন কাহারও নিকটে যাচ্ঞা না করি।" বঙ্গের এ মহাশোক মধুময় ফল প্রসব করুক। এসো, আমরা পাঠ করি, "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্ম্মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

সত্যরঞ্জন দাশের কন্যা মায়াদেবী পুত্রসহ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

আমার পূজা

বিদ্যে! তুমি একটু স'রে দাঁড়াও, বুদ্ধি-বিচার তর্ক-সমালোচনা প্রভৃতি বৈষয়িক হিসাবের খাতাপত্র নিয়ে একটু স'রে দাঁড়াও ;—যাও, দপ্তরখানায় গিয়ে ব'স।

আমি একটু পূজায় বসিব। বাটীর একান্তে এই ক্ষুদ্র কুঠরীটির মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া ধূপের ধূমে গৃহ-মধ্যস্থ বাতাসে পবিত্রতা আনিয়া পূজায় বসিব। অষ্ট প্রহরের সহচর বুদ্ধি, তোমার পরামর্শ না লইয়া আমি কোন কার্য্যই করি না। আমার অভিমানের পরিচ্ছদ তোমারই দান, অহঙ্কারের অলঙ্কারে তুমি-ই আমায় সাজাইয়া দিয়াছ, তোমার-ই প্রদত্ত দর্পণে দম্ভভরে আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখি। তুমি যে মায়া-স্ফটিক-নির্ম্মিত উপনেত্র আমাকে দিয়াছ—তাহা যদি চক্ষুতে না লাগাইয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আমার কি অবস্থা-ই না হইত! আমার দেহে যে এত সৌন্দর্য্য, আমার স্বভাবে যে এত মাধুর্য্য, আমার চরিত্রে যে এত পবিত্রতা, আমার জ্ঞানের যে পৃথ্বী-জয়ী পরিধি—তাহা আমি কিছু ই দেখিতে পাইতাম না। আর দেখিতে পাইতাম না—এ জগতে যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পূজিত, তাহারা কত ভণ্ড, পরোপকারীরা কি পাষণ্ড, সাহিত্য-রথীদের কত অধোগতি হইতেছে। দেশ-হিতব্রতে যাহারা রত, তাহাদের মধ্যে কত স্বার্থ,—এক কথায় নিজের কত গুণ—পরের কত দোষ, তোমার চশমার সুষমাতে-ই তাহা আমি দেখিতে পাই।

কিন্তু, পূজার সময় তুমি একটু স'রে থাক, আপনাকে ঢাকো। আমার কথা রাখো, একবার বাল্যের সারল্যে, কৈশোরের আত্ম-বিস্মৃতিতে, যৌবনের উদ্দাম আবেগে উপাস্যকে ভালবাসিতে—পূজা করিতে দাও।

আমার স্বদেশবাসিগণ যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বন্দনা করিয়া 'দেশবন্ধু" নামে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, দীনের ন্যায় আমাকে তাঁহার পূজা করিতে দাও। তুমি আর এখন আমায় স্মরণ করাইয়া দিও না যে—তাঁহার নাম চিত্তরঞ্জন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-গ্রস্ত হইয়াছিল, অক্সফোর্ড-এ শিক্ষালাভ করিয়াছিল, ব্যারিষ্টার-শ্রেষ্ঠ হইয়া বিবাদীর অর্থসামর্থ্যকে আপন আজ্ঞাধীন করিয়াছিল! স্মরণ করাইয়া দিও না যে—ধন-লিপ্সা, শক্তিতে আসক্তি, ভোগাকাঙ্ক্ষা, বিলাস-আলস্য, প্রভুত্ব-পিপাসা প্রভৃতি সাধারণ পুরুষোচিত বৃত্তি সকল তাহাতে এক দিন বর্ত্তমান ছিল। সে যে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া ঋণী হইয়া অকাতরে দান করিয়াছে, এ কথাও আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও না।

তবে আমি কেন পূজা করিতেছি? কিসের পূজা দিতেছি? কিসের জন্য পূজা করিতেছি? আমি পূজা করিতেছি আমার ভাবের। সকল লোক-ই ভাবের পূজা করে, বস্তুর পূজা কেহ-ই করে না। আমার অন্তরের মধ্যে যে একটি দেশবন্ধু-ভাব আছে—সেই ভাব আমি আধারবিশেষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাত্র পূজায় বসিয়াছি। এ আধার আমায় কে দেখাইয়া দিল? দেখাইয়া দিল আমার দেশের লোক। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষবাসী কোটি কোটি লোক কার্য্যে, বাক্যে, ব্যবহারে, ইঙ্গিতে আমায় দেখাইয়া দিয়াছে যে—ঐ আধার এখন তোমার পূজ্য। গঙ্গা-গর্ভ হইতে এক জন একটি শিলাখণ্ড কুড়াইয়া আনিয়া পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলে তাহাকে স্থাপন করিল। ক্রমে দুই জন দশ জন শত শতাধিক জন ঐ শিলাসমীপে পূজা করে,

দেশবন্ধুর ভ্রাতা যতীশরঞ্জন ও সতীশরঞ্জন

দশভুজা দুর্গাকে বিসর্জন দিয়া বিংশতি হস্তবিশিষ্ট দশানন রাবণের পূজা করিত। সংখ্যাতীত নরনারী কুমার-কুমারী যাহার ব্যক্তিগত নাম বিস্মৃত হইয়া তাহাকে 'দেশবন্ধু' 'দেশবন্ধু' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে—ভাবের আবেশে মনের মন্দিরে যাহার নব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে—সে সকলের পূজ্য, সকলের আরাধ্য, সকলের প্রণম্য!

হে আমার অর্চ্চিত, হে আমার পূজিত! হে আমার অমর, অবিনশ্বর, চির-ভাস্বর দেশবন্ধু! আমার জন্মভূমি হইতে চিরদাস্যের ঔদাস্য দূর কর, ঋষির আবাস এই প্রাচীন মৃত্তিকাস্তরের উপর কর্ম্মযোগের হিমালয় উন্নত কর, ক্ষাত্রনেত্রপাতে পবিত্র ক্ষেত্রে দেশ-প্রীতির জাহ্নবী প্রবাহিত কর, সর্ব্বস্বত্যাগের মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া ভারতবাসীকে মানবসমাজে রাজরাজেশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত কর।

দিন যায়, সে পথ দিয়া যে-ই যায়, সে-ই ঐ শিলায় অন্ততঃ একটু সলিল সিঞ্চন করিয়া যায়। অন্যধর্ম্মাবলম্বী পথিক সেই পথে চলিবার সময় পুষ্প-জল না দিলে-ও, কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম না করিলে ও পূজার স্থান বলিয়া একটু মস্তক অবনত করিয়া চলে; উপাসকের ভক্তি-প্রণোদিত মন্ত্রতেজে শিলাখণ্ড, দারুদণ্ড, মৃৎপিণ্ড-ও দেবতেজে দীপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোক ভাবের পূজা করে। পূজ্য পদার্থের বস্তুগত গুণের অস্তিত্বের প্রতি কেহ-ই লক্ষ্য করে না। তাহা যদি করিত, তবে লোক পঞ্চানন মহাদেবকে দূরে রাখিয়া,

পূজান্তে মূর্ত্তির বিসর্জ্জন। বিজয়ার পর মনোমণ্ডপে ভক্তি-সলিল-পূর্ণ হৃদয়-ঘট স্থাপন এবং শত্রু-মিত্র পরিচিত অপরিচিত সকলকে প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর।

বাকি এখন দক্ষিণা। হা পূজারী প্রাণ! তুমি আমার শক্তিতে দরিদ্র করিয়াছ, এ পূজার দক্ষিণা আত্মত্যাগ পারিলাম না। মাতর্ব্বঙ্গভূমি! তোমার তরুণ সন্তানগণের মধ্যে অন্ততঃ জনকয়েককে বল মা, তাহারা মিলিয়া কিছু কিছু দিয়া এ প্রাচীনকে দক্ষিণাদায় হইতে মুক্ত করুক, নহিলে আমার পূজা সম্পূর্ণ হইবে না:

শ্রীঅমৃতলাল বসু।
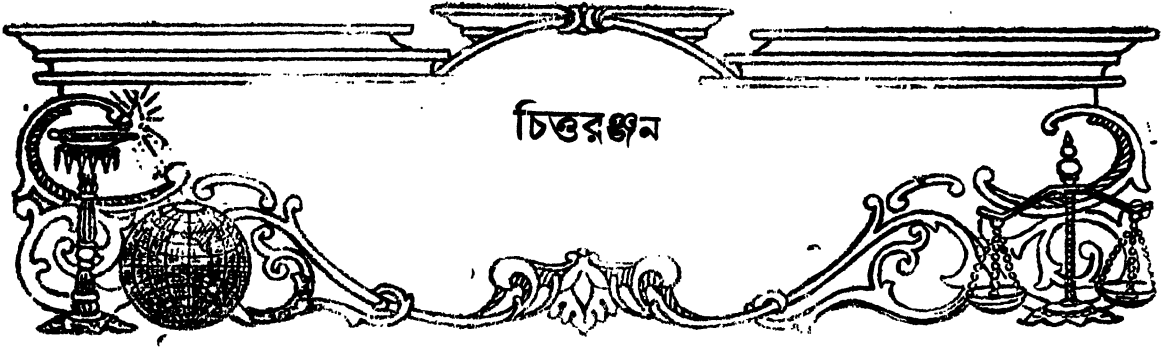
চিত্তরঞ্জন

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের প্রাসাদের বিস্তৃত বাগানে এক বিপুল জনসঙ্ঘ মিলিত হইয়াছিল। এমন সভা আমি খুব কম দেখিয়াছি। এই পবিত্র দিনে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, হৃদয়ের ভাবের আদান-প্রদান হয়।

তাহার পর ধর্ষণের পালা। ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু ব্রহ্মবান্ধব ক্যাম্বেলে শরীরত্যাগ করিলেন। কালীঘাটে চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। স্মিতভাষী চিত্তরঞ্জন শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি চিত্তরঞ্জন—পূর্ব্বভাষী হইয়া সকলের হৃদয়রঞ্জন করিয়াছিলেন।

যখন হিন্দু-মুসলমানের প্যাক্ট হয়, তখন লেখককে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। প্রতিবাদটাও একটু তীব্র হইয়াছিল। তাহার পর ভবানীপুরে হরিশ পার্কে প্যাক্টের বিরুদ্ধে আর এক সভা হয়। এ সভায় লেখককে সভাপতি করা হইয়াছিল। লেখককে ৩—৩॥০ ঘণ্টা চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বে বসিতে হইয়াছিল। অন্য লোকে অসংযত হইলেও চিত্তরঞ্জন সংযত ছিলেন, অন্য লোকে উত্তপ্ত হইলেও চিত্তরঞ্জন তাঁহার স্বভাবগত স্নিগ্ধতা পরিত্যাগ করেন নাই।

এইবার সিরাজগঞ্জের তুমুল সংগ্রামের কথা। এ যুদ্ধে আমার স্নেহশীল যুবক স্বরাজী বন্ধুরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন—আমিও নিতান্ত কম ছিলাম না—যাঁহারা ইহা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অনেক দিন স্মরণ থাকিবে।

যুদ্ধবিরতির পর মহাভারত-যুদ্ধের বীরেরা মিলিত হইতেন, কৌতুক করিতেন। সভাভঙ্গের পর চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার সহৃদয় আলাপ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল—কোনরূপে বুঝিতে পারিলাম না যে, তাঁহার সহিত আমার কোনরূপ মতভেদ হইয়াছে। যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, বেলগাঁও হউক, কলিকাতায় হউক, যথার্থ হিন্দুর ন্যায় তিনি সম্মান-প্রদর্শন করিয়া আমাকে জয় করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, তিনি যথার্থই দেশবন্ধু ছিলেন।

আজ চিত্তরঞ্জন পরলোকে—যে লোকে শূর-বীর, যোগী, সন্ন্যাসী, তাপস গৌরবের সহিত অবস্থান করেন, সেই দেবেন্দ্রদুর্ল্লভ স্থানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া পরিশোভিত হইতেছেন।

স্বরাজ যুদ্ধঘোষণার প্রারম্ভেই জন-নায়ক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব যুদ্ধে আমাদের কখন প্রতিকূল, কখন বা অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইবে। স্বরাজ সুধা সম্পূর্ণরূপে যে পর্য্যন্ত না আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, সে পর্য্যন্ত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অকাতরে প্রাণপাত করিতে হইবে। কবি বলিয়াছেন—

"রত্নৈর্মহার্হৈস্তুতুষুর্ন দেবা
ন ভেজিরে ভীমবিষেণ ভীতিম্।
সুধাং বিনা ন প্রযযুর্বিরামম্
ন নিশ্চিতার্থাদ্বিরমন্তি বীরাঃ॥"

দেবতারা স্বরাজ-সুধা যে পর্য্যন্ত না পাইয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত অমূল্য রত্ন বা ভীষণ বিষ পাইয়া তাঁহারা তুষ্ট বা বিভীষিকাগ্রস্ত হয়েন নাই। নিশ্চিতার্থ প্রাপ্ত না হইয়া বীর কখন বিরামলাভ করেন না।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
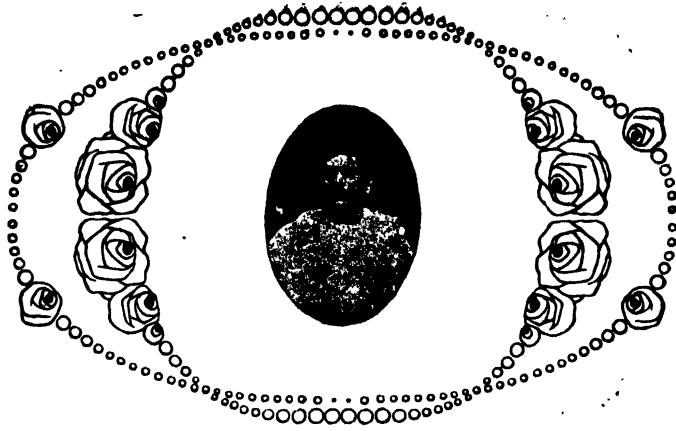
বসুমতীর কর্ম্মকর্ত্তাদের অনুরোধে তাঁহাদের মাসিকে 'দেশবন্ধু' সংখ্যায় আমাকে কিছু লিখিতেই হইবে। আমি আজ মাসাবধি রুগ্ন শয্যায় একেবারে শয্যাশায়ী আছি, বিশেষতঃ আমার মত এক জন অশিক্ষিতা মহিলার পক্ষে বিশেষ কিছু লিখা বাস্তবিকই অসম্ভব। তাঁহার মহৎ চরিত্র আমাদের গুণকীর্ত্তনের অনেক উপরে। তাঁহার কার্য্যক্ষমতা ও প্রাণের উদারতা লেখনী অথবা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার স্বদেশপ্রেম আজ প্রত্যেক নর-নারী তাঁহাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছেন এবং আমার মনে হয়, তাঁহাদের সমস্ত আকুলতা ও ব্যাকুলতা লইয়াও তাঁহারা উপযুক্ত ভাষায় কেহই সে ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। দেশবন্ধুর শত্রু হউক, মিত্র হউক, আজ সকলেই তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে কি যেন একটা হারাইয়াছেন। তিনি এই বিরাট জাতির প্রাণ কি ভাবে দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এই মনোভাব হইতেই বেশ বুঝা যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার জীবিত অবস্থায় তাঁহার এই মহান্ ত্যাগ, একনিষ্ঠা, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যদি পারিতেন, আমার মনে হয়, তবে এই লাঞ্ছিত দেশবাসীকে লইয়া তিনি আরও অনেক অগ্রসর হইতে পারিতেন। শাপভ্রষ্ট দেবতা জাতির মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলেন, কর্ম্ম শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ সকল ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ—কর্ম্ম ফুরাইয়া গেলে আর থাকিতে পারেন না। এখন আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম—তাঁহার প্রদর্শিত পথকে আঁকড়াইয়া ধরা। যাহাতে জাতি মায়ের উদ্ধারকল্পে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বরাজের পথে অগ্রসর হয়, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা ও করণীয় কার্য্য। যুবক, বৃদ্ধ, নারী সকলকেই সঙ্কল্প করিতে হইবে, চাই—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।"

দেশবন্ধুর জন্য কাঁদিয়া বা লিখিয়া কোন ফল হইবে না। তিনি যে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, যে কার্য্য দেশবাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করাই দেশবন্ধুর প্রতি উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন। মা মঙ্গলময়ীর কোন্ শুভ ইচ্ছায় জাতি আজ দেশবন্ধুকে তাঁহাদের নিকট হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় যে, আমাদের কর্ম্মশিথিলতাতেই এই মহাপুরুষকে আমাদের নিকট হইতে হারাইয়াছি। এখনও যদি আমরা বদ্ধপরিকর না হই, আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য ভুলিয়া না যাই—তবে এই অধঃপতিত জাতির পক্ষে স্বরাজলাভের আশা সুদূরপরাহত।

শ্রীহেমপ্রভা মজুমদার।
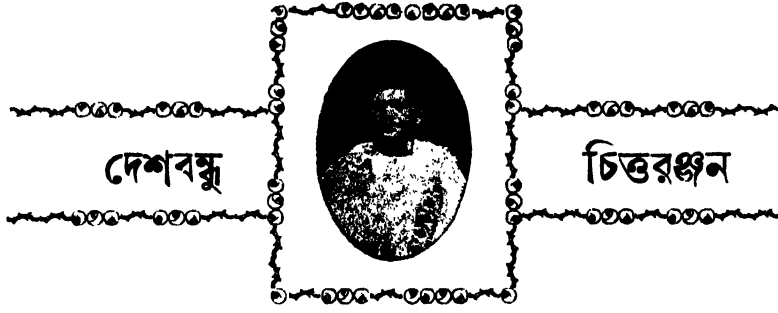
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে নূতন কথা বলা বা পুরাতন কাহিনী লিপিকৌশলে নববেশে সজ্জিত করা, উভয়ই আমার সামর্থ্যের বহির্ভূত। কেবল অনুরোধরক্ষার্থ সময়োপযোগী কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন, "যখন সকল প্রজা এক হইয়া, আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোনও রাজশক্তি নাই, যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে।"

এই একতার মূলমন্ত্র বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উদ্যম, প্রয়াস ও স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দেশবন্ধু আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। সমবেত চেষ্টার অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রবল চেষ্টাতেই তাঁহার শরীরপতন হইয়াছে।

তাঁহার কার্য্যের সমালোচকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার তথাকথিত পরিবর্ত্তনশীলতার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে চিত্তরঞ্জন এক সময় মহাত্মার অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, সেই চিত্তরঞ্জনই স্বীয় বলে স্বহস্তে তাহা ধ্বংস করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই সমালোচনা সঙ্গত বা সমীচীন নহে, পরন্তু সমালোচকের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

দেশকালপাত্রভেদে মুক্তিলাভের পন্থাপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যে নেতা সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই একই অস্ত্র-ব্যবহার প্রয়োজন মনে করেন, তিনি পরিবর্ত্তনবিরোধী বলিয়া খ্যাতি পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। যাঁহারা রাজনীতিক ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে নিজ সিদ্ধান্তপরিবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। গ্লাডষ্টোন এক সময়ে রক্ষণশীল ও অন্য সময়ে উদারনীতিক ছিলেন। আধুনিক ইটালীতে সিনর মুসোলিনী প্রথমে রাজবিসর্জ্জন-পথ অবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজার নামের সাহায্যে, রাজার ঠাট বজায় রাখিয়া দেশের কার্য্য সিদ্ধ করিতে সফলকাম হইয়াছেন।

অকালমৃত্যুতে কার্য্যনিবৃত্তি না হইলে দেশবন্ধু ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতেন, সে বিষয়ে অনেকেই তাঁহাদের ধারণা প্রচার করিয়াছেন। আমার নিজের ধারণার মূল্য এত স্বল্প যে, তাহা জনসাধারণে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না।

দেশবাসিগণ, দেশবন্ধুর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনিবার্য্য। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা এখনও "বাবু" নামে পরিচিত আছি।

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই 'বাবু'।

"যাঁহার বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ, পৃষ্ঠে শত গুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই 'বাবু'।"

যদি দেশবন্ধুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কেবলমাত্র মৌখিক না হয়, তবে লিখন, কথন, ক্রন্দন ও কলহ হ্রাস করিয়া নিশ্চেষ্ট অকর্ম্মণ্যতা-বর্জ্জন এবং আত্মবিশ্বাস ও তীব্র দীক্ষা-গ্রহণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার একমাত্র উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আমরা অবশ্যই বুঝিব।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার।
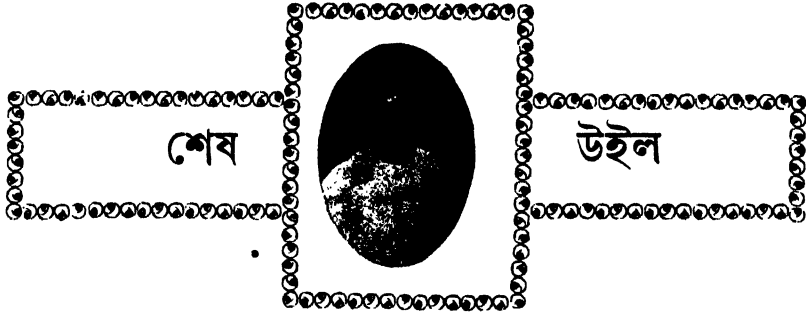
দেশবন্ধুর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ চিঠি হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল সত্যই বলিয়াছেন, দেশবাসীর কাছে উহাই দেশবন্ধু দাশের শেষ উইল। যেগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, যদি কেবল সেইগুলি বাদ দিয়া পণ্ডিত মতিলাল চিঠির অন্য সব অংশটা উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলেই আমরা অধিক সুখী হইতাম, এমন কি, ব্যক্তিগত বিষয় যেগুলি, তাহাতেও হয় ত দেশবন্ধু দাশের দেশসেবাসম্পর্কিত কর্ম্মতৎপরতার উপর অনেকটা আলোক-সম্পাত হইত। জননায়ক যিনি, ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিতে গেলে তাঁহার পক্ষে খুব সামান্যই থাকে। জনসাধারণের অবারিত দৃষ্টির কাছে তাঁহার সবই উন্মুক্ত; লুকোছাপা কিছু নাই। জনমতের জ্যোতিরালোকিত পথেই তাঁহার গতি; সেই জনমতের উজ্জ্বল আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়াই তিনি নিজকে নিয়ন্ত্রিত করেন, চালিত করেন, নিজের নীতি গড়িয়া তুলেন। দেশবন্ধু ঐ চিঠিতে যাহা বলিয়াছেন এবং বাস্তবিক পক্ষে স্বীকারও করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, স্বরাজ্য দল খুব সামান্য কাযই করিয়াছেন—এত সামান্য যে, তাঁহারা কিছু কাযই করেন নাই, এ কথা বলিলেও ভুল হয় না। তিনি লিখিতেছেন,—"আমাদের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটকাল ঘনাইয়া আসিতেছে। এই বৎসরের শেষভাগে এবং আগামী বৎসরের প্রথম দিকটাতে অফুরন্ত কায আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের সমস্ত শক্তি উহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। অবস্থা ত ইহাই, অথচ আমরা উভয়ে এই সময়ই পীড়িত। ভগবান্ জানেন কি ঘটিবে।"

ব্যক্তি এবং দলের বিচার হয়, কার্য্যের দ্বারা। ম্যাডাম ডি-ষ্টেল এক দিন এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লইয়া গেলে বীরকেশরী নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ইনি কায কি করিয়াছেন?' সকল যোগ্যতার একমাত্র কষ্টিপাথর হইল ঐ কায। আমরা যাহা বলি, দিন রাত যাহা আওড়াই, তাহাতে আমার বিচার হইবে না, আমাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার পরখ হইবে, আমরা কে, বাস্তবিক কি কায করিয়াছি, তাহারই বিচার করিয়া। এই কাযের দিক হইতে স্বরাজ্য দল বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, সত্যই অনেক কাযই তাঁহাদের বাকী রহিয়াছে।

দেশের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দাশ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় কোন্ পথে, কোন্ নীতি ধরিয়া চলিতে হইবে, দাশ তাঁহার উইলে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে কর্ম্মতালিকা লইয়া তিনি কায আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার আমূল পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হইয়াছে; এমন পরিবর্ত্তন দোষের নহে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহাই সমীচীন। দেশবন্ধু দাশ দেশবাসীকে যে বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য, সেই অভীষ্টের সাধনাতেই আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে; সর্ব্বপ্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বর্জ্জন করিতে হইবে; কাযেই অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে বিধিসঙ্গত উপায়ই হইবে আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। যে লক্ষ্য দেশবন্ধু দাশের আদর্শ ছিল, দাশের যাহা অভীষ্ট ছিল, সেই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত

সম্মানজনক সহযোগি- তাঁর নীতিরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইল দাশের উইল। তাঁহার ফরিদপুরের অভিভাষণের সার কথাও হইল ইহাই। ভারতের সকল দলই উহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দাশের এই উইল অনুসারে যদি আন্তরিকতার সহিত কায হয়, তাহা হইলে উহা নব মিলনের সূত্রস্বরূপ হইতে পারে, উহাকে ভিত্তি করিয়া যেখানে দেশের সকল দলই এক হইয়া মায়ের পূজা করিতে পারেন, এমন মিলনমন্দির বিনির্ম্মিত হইতে পারে।

সতীশরঞ্জন দাশ

আমরা, উদারনীতিক দল আমরা সর্ব্বদা এই কর্ম্ম তালিকা অনুসারেই কার্য্য করিতেছি। আমাদের দলের নীতির মূলমন্ত্র অনেক দিন হইতেই উহাই এবং ভবিষ্যতেও আমরা ঐ মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়াই চলিব। প্রাচীন সভ্যতার লীলানিকেতন এই ভারতভূমিতে পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই মহান্ উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে দাশের উইলকে সসম্মানে স্বীকার করিয়া লইয়া আজ স্বরাজ্য দল এবং অন্যান্য রাজনীতিক দল ঐক্যবদ্ধ হউন, সংহতির সূত্রে আবদ্ধ হউন, অতীতের সকল মতদ্বৈধ তাঁহারা বিস্মৃত হউন, বিগত বিতর্কের বিভেদ-বিদ্বেষ আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আমরা সকলে যদি একই সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হই, তাহা হইলে অচিরেই যে আমরা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব, স্বরাজ লাভ করিতে আমাদের যত দিন আবশ্যক হইবে বলিয়া আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেছেন, তাহার অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যেই যে স্বরাজ আমাদের করায়ত্ত হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বরাজ্য দলের কাছে সেই জন্যই আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহাদের বরেণ্য নেতার যাহা শ্রেয় উইল—দেশবাসীর প্রতি, বিশেষভাবে স্বরাজ্য দলের প্রতি তাঁহার যাহা শেষ বাণী, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন এবং তদ্দ্বারা দেশের স্বরাজলাভের পথই প্রশস্ত করুন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-সূর্য্যাস্ত

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ মজুমদার
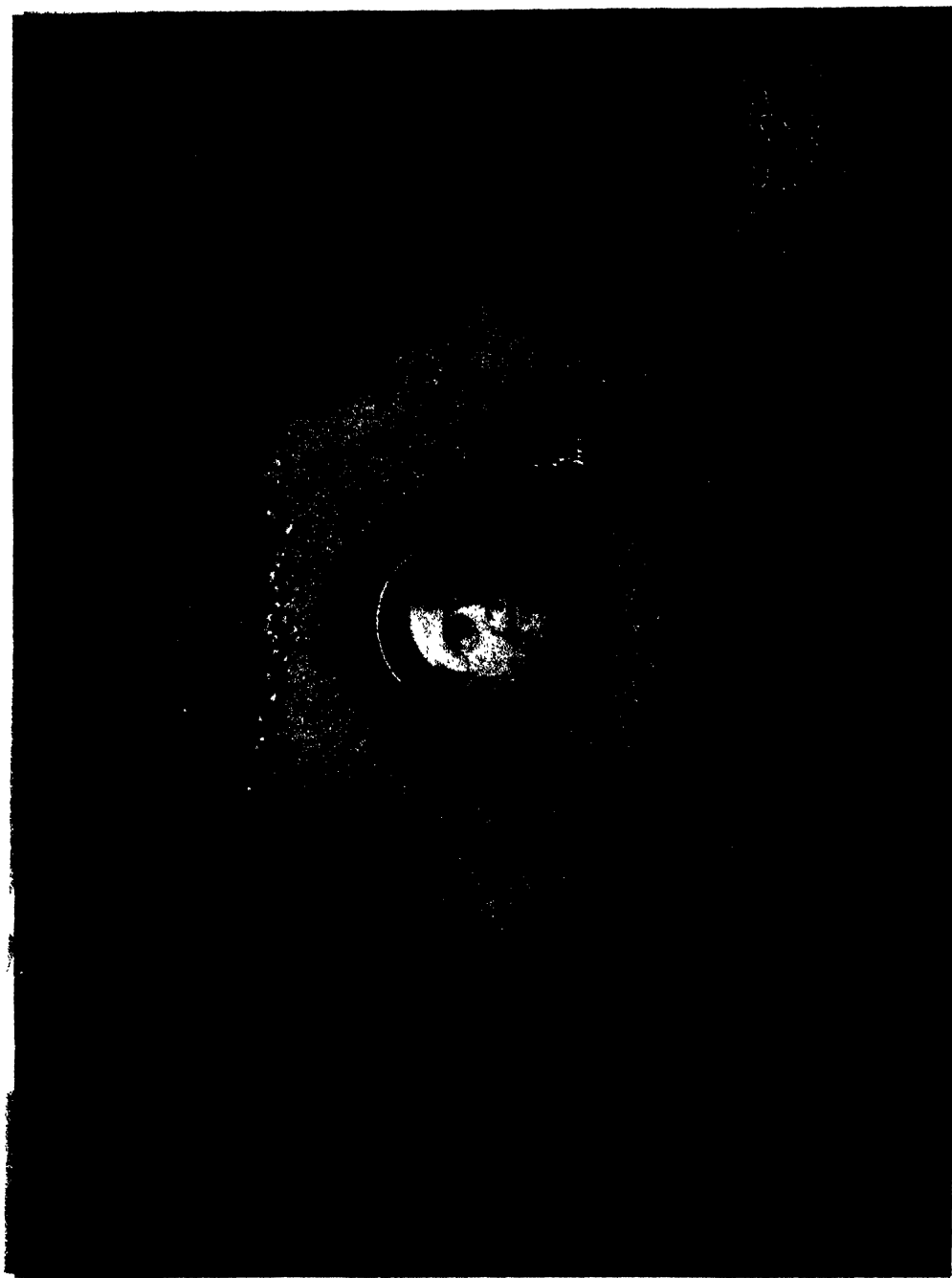
স্মরণে

তখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ পূরা দমে চলিতেছে, দলে দলে বাঙ্গালার যুবকগণ জেলে যাইতেছে। এই সময় এক দিন শ্রাবণমাসের মাঝামাঝি দেশবন্ধুর সঙ্গে সত্যাগ্রহ কমিটীর মিটিংয়ে তারকেশ্বর যাই। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম, সঙ্গে ডাক্তার দাশ-গুপ্ত ছিলেন। আমি বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কথা পাড়িলাম। বলিলাম, টাস্কেণ্ডে বলশেভিকরা যেরূপ আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশে আসিতে তাহাদের আর বড় দেরী হইবে না। তিনি বলিলেন, টাস্কেণ্ড থেকে বলশেভিকদের আসা নিয়ে আমি মোটেই ভাবিনে, আমি দেখছি, আমার সাম্‌নেই বলশেভিক ব'সে আছে। আমি বলিলাম, আপনি ঠাট্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা না হইয়া আর উপায় কি? এই বলিয়া বলশেভিকদের স্বপক্ষে বই-পড়া যত মামুলি মত—বণিকের অত্যাচার, মূলধনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা, শ্রমিক-শোষণ, ধর্ম্মের নামে লোক ঠকান, আভিজাত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলাম। তিনি একটু হাসিলেন, তাহার পর একটু বাদে বলিলেন, য়ুরোপের এই বলশেভিকবাদ ভারতবর্ষে টিক্‌বে না, কারণ, তোমরা ভারতের সমাজের যে কি প্রাণ, তা জান না, বাহির থেকে যা আমদানী করতে চাইছ, তা এ দেশের মাটীতে ভাল ফলবে না, বরং আগাছা হয়ে জঞ্জাল আরও বেশী বাড়িয়ে তুলবে। সমাজতন্ত্রই ভারতের প্রাণ, ভারত কোন দিন তার ভাইদের খেতে না দিয়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করেনি। সকলকার মধ্যে সমানভাবে তার ধন-বিভাগ চিরদিন ক'রে আস্‌ছে। ধনীর অর্থ চিরদিন দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অতিথি কখনও বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। গ্রাম্যসমবায়ে সাধারণ পুষ্করিণী, দেবালয়, মন্দির, মস্‌জিদ, পাঠশালা, টোল, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গ্রামের সকলকার অর্থেই পুষ্ট হইত, গ্রামের জমীদার এ সব অর্থ-সংগ্রহ ক'রে যার যা প্রাপ্য, দিতেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতেই গ্রামের বিবাদ মিটত। কথকতা, চণ্ডী, জারি, কীর্ত্তন গানে লোকশিক্ষার প্রভূত সাহায্য হ'ত, আজ যদি তোমরা সে সব কাযের ভার খবরের কাগজের হাতে তুলে দাও এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার ভেঙ্গে ফেলে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার গণ্ডীকেই শ্রেয়ঃ ব'লে মনে কর, তা হ'লে ভারতবর্ষের গলা টিপে মেরে ফেলা হবে। আমার স্বরাজের আদর্শ এই যে, সেখানে প্রত্যেকেই খেতে পাবে, কেউ না খেয়ে থাক্‌বে না, কারুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে কিছুমাত্র বাধা থাক্‌বে না। স্বাধীন অথচ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে সৌভ্রাত্রে ভারতের সমাজ আবার গ'ড়ে উঠবে, সমগ্র দেশ সাধারণের ভূসম্পত্তি হবে। আর তুমি যে বল্লে, অর্থের কেন্দ্রীভূত অবস্থাটাই যত বিরোধের কারণ, আজ পর্য্যন্ত তাই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু আসলে এ দেশে অর্থ কোন দিনই কেন্দ্রীভূত হ'ত না, কারণ, ধন-বিভাগের ব্যবস্থা এত স্পষ্ট ছিল যে, বাপ ম'রে গেলে তাঁর সঞ্চিত অর্থ সকল ছেলের মধ্যেই সমান অংশে ভাগ হয়ে যেত। এই ক্রম-বিভাগের দ্বারাই সামঞ্জস্য রক্ষিত হ'ত, বণিকের প্রাধান্য কোন দিনই হবার সুযোগ পেত না।

* * * *

কথা শুনিতে শুনিতে অনেকটা দূর আসিয়া পড়িলাম। পথে যত যায়গায় গাড়ী থামিতেছিল, স্কুলের ছেলেরা ছুটী পাইয়া দলে দলে ফুলের মালা, স্তবক ইত্যাদি লইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য আসিতেছিল। ক্রমেই ভিড় বাড়িয়া চলিল, এই সময় একটা ষ্টেশন হইতে স্বামী সচ্চিদানন্দ উঠিলেন, তখন আমাদের কথা চাপা পড়িয়া গেল। তারকেশ্বর সম্বন্ধেই কথা চলিল।

আমরা যথাসময়ে তারকেশ্বরে পৌছিলাম। নরনারীর মুখে একটা সশ্রদ্ধভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অধর্ম্মের হাত হইতে ধর্ম্ম-মন্দিরের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। এই কারণে দেশবন্ধুর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তির আর সীমা ছিল না। ষ্টেশন হইতে মন্দিরে পৌছিতে আমাদের আধঘণ্টা লাগিয়া গেল—এতই লোকের ভিড়। সকলেই তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে

চায়। সেখানে পৌঁছিয়া কমিটীর মিটিং শেষ করিয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন ও যথাযথ উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার ট্রেণে আমরা কলিকাতা ফিরিলাম।

ভম্বল (চিররঞ্জন) তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে কারাবরণ করিয়াছে। যখনই ভম্বল জেলে কেমন আছে, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই জবাব দিয়াছেন—"বেশ ভাল আছে" অথচ জেলে ভম্বলের আমাশয় হইয়াছিল ও খুব কষ্টে ছিল, তাহা তিনি জানিতেন। এক দিনের জন্যও নিজ পুত্রের জন্য তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখি নাই, বরং সত্যাগ্রহে ছেলে কারাবরণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার মুখে আমরা পরম আত্মপ্রসাদের চিহ্নই দেখিয়াছি।

কালীমোহন দাসের পুত্র নিত্যরঞ্জন

গত বৎসর ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, সে দিন জন্মাষ্টমীর দিন আমি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। শরৎ বাবু তাঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকিলেন, আমি বাহিরেই বসিলাম। শরৎ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল—একবার তিনি বাহিরে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া ব'লিলেন—তুমি বাইরে ব'সে কেন? কতক্ষণ এসেছ—ভিতরে এসো। ভিতরে গিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন—শৈলেশকে বাইরে বসিয়ে রেখেছেন কেন? ঘরে আর কেউ নাই—আমরা ৩ জন। বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। তিন আইনের বন্দীদের মধ্যে অনেকেরই নাম করিয়া তাঁহাদের মতামতের কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন,—হিংসার পথে আমাদের কিছু হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি অহিংসভাব policy হিসাবে মানেন, না প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, অহিংসার দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে? তিনি বলিলেন—তোমাদের বয়সে আমিও অহিংসা মানিতাম না—আমি সত্যই এখন বিশ্বাস করি যে, অহিংসা ছাড়া আমাদের অন্য পথ নাই। যাঁহারা তিন আইনের বন্দী, তাঁহাদের নাম করিয়া বলিলেন, এঁরা প্রত্যেকেই কত বড় কর্ম্মী, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য কত দুঃখ সহিয়াছেন। আজ যদি তাঁরা

হিংসা পথ ত্যাগ ক'রে এই পথে আইসেন, তবে আমাদের কাযে কত জোর হয়, আমাদের বল দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

এই সময় টেলিফোনে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমি গিয়া টেলিফোন ধরিলাম—সাংঘাতিক খবর। নায়ক অফিস হইতে টেলিফোন করিয়াছে, আজ সন্ধ্যায় তারকেশ্বরে গুলী চলিয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া সেই খবর বলিলাম, তিনি ও শরৎ বাবু ত্রস্তে বাহিরে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না—টেলিফোনে সব কথা ভাল ক'রে জান—আমি ফোনে শুনতে পাই না—তুমি স্থির হয়ে ফোন কর।

দেশবন্ধুর সহোদর প্রফুল্লরঞ্জন সপরিবারে

আবার ফোন করিলাম—সেই একই জবাব। কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলিতে পারিল না—তাহা শুনিয়া তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ (আজ তিনি রাজবন্দী) দুই জন কংগ্রেসকর্ম্মী সহ আসিলেন। তাঁহারা ঐ খবর দিতেই আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে সব শুনিয়া তিনি খুব বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন—বলিলেন, নিরীহ ছেলেরা গুলী খাইল,—ধর্ম্মের স্থানে রক্তপাত হইল, আর বাকী কি? তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে সে দিনকার মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, এত বড় সত্যাগ্রহ আমার ঘাড়ে, আমরা হেরে গেলে বাঙ্গালীর মুখ থাকবে না, তার উপর আজ এই সংবাদ—আমার বিশ্রাম কোথায়? রাত ১টা পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া তিনি যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া তবে আমাদের বিদায় দিলেন। শরৎ বাবুও তাঁহার সঙ্গে আছেন—তিনিও তখন বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বে একটি অতিশয় মনোহর কালো পাতরের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ছিল। শরৎ বাবুকে ঐ মূর্ত্তি সংগ্রহের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন—ঐ মূর্ত্তিটি উড়িষ্যা হইতে তিনি সংগ্রহ করেন,—বলিলেন, মূর্ত্তিটি ৫ শত বৎসরের কম নহে, বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা—এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন ও একটি মন্দির তৈয়ারী করিবেন। পরে শরৎ বাবুকে বলিলেন, আরও একজোড়া রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, আপনাকে দিতেছি। এই বলিয়া আবার উপরে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি শরৎ বাবুকে দিয়া বলিলেন, আজ জন্মাষ্টমী, তাতে তারকেশ্বরে গুলী চলেছে—ঠাকুর স্বয়ং আজ আপনার ঘরে যাচ্ছেন—নন্দের বাড়ী ছেড়ে আজ গোকুলে যাচ্ছেন। পরে হাসিয়া বলিলেন—"তোমারে বধিবে যেই, গোকুলে বাড়িছে সেই।"

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধুর জন্ম-কুণ্ডলী

চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয়স্য জন্ম শাকাব্দাঃ ১৭৯২।৬।১৯।১।৩৪।৩০

শনিবার ইংরাজী ১৮৭০ সাল ৫ই নবেম্বর

মৃত্যু বাঙ্গালা ১৩৩২ সাল ২রা আষাঢ় বেলা ৫টা দার্জ্জিলিং

বক্রী বৃ ৫ রা ৭		চ ২৬ নেঃ
হাঃ		
মঃ ১০	বুশু ১৫ র ১৬ লং	শ ১৯ কে২০

তাৎকালিক গ্রহস্ফুট নিরয়ন		নবাংশ রাশি	ভাবস্ফুট
রবি	৬।২০।৩৮।১০	মেষ	লগ্ন ৬।২৯।৩৮
চন্দ্র	১১।১৪।৪৬।০	বিছা	ধন ৭।২৯ ০
ভৌম	৪।১২। ৪। ০	কর্কট	সহজ ৮।২৯।০
বুধ	৬।১০। ০।৪১	মকর	বন্ধু ১০।২।০
গুরু	২।৩।৫৫।০ বক্রী	বিছা	পুত্র ১১।৩।০
শুক্র	৬।১২।২২।৩৩	মকর	রিপু ০।৩।৩০
শনি	৮।৩।৪৯।০	বৃষ	————
রাহু	১।২৬।১৫।০	মেষ	হোরা লং ৭।৮।৩২
কেতু	৮।২৬।১৫।০	তুলা	নিধন স্ফুট ২।২৬।১৮
হার্শেল	৩।২।৫৪।বক্রী	সিংহ	
নেপচুণ	১১।২৮।৭ বক্রী	মীন	

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-চক্র

হাঃ ২৬° কে ২২°	ম ৬°	নে ৯°
		বু ৬° শু ১০°
চ ১৩° শ ১৪°	বৃ ৪°	রা ২২° র ২৯° লং ২৭°

১৭৮৪।৮।২৮।৫৭।৩৫

"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গালার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে।"

"বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মধ্যে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে।"

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশদ্বর্ষ গত হইল, বাঙ্গালার মাটীতে বাঙ্গালার হাওয়ায়, বাঙ্গালার রবিকিরণে বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন দেশমাতৃকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে বাঙ্গালার, তথা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য জলদগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র ধরামধ্যে যে অভিনব এবং অতীব গভীর শোকোচ্ছ্বাস তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যে দিন বাঙ্গালী প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে পারিবে, সেই দিন পরিপূর্ণভাবে ঋষি-তুল্য মহাপুরুষ চিত্তরঞ্জনের উক্ত অমোঘ বাণীর যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিবে। দেশবন্ধুর চরিত-কথামৃত লিখিবার ও শুনাইবার যোগ্য লোকের অভাব হইবে না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার সে সাধ্য আছে বলিয়া আমার ধারণা নাই। আমি সে চেষ্টা না করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিব। ত্রুটী পদে পদে আশঙ্কা করিলেও সুধীগণের নিজগুণে অপূর্ণতা দূর হইবে, এইটুকু আমার ভরসা।

জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে চরিত্র অঙ্কন করিতে বসিয়া শবব্যবচ্ছেদ-প্রণালী অবলম্বন করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, গ্রহ-সমাবেশের দ্বারা এই মহাপ্রাণের (super man) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, তাহাই সাধারণের নিকট সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা। সুতরাং এক হিসাবে ইহাতে technical defect থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন দোষের বিচার করা উচিত নহে বলিয়া আমি ইহা সাময়িকী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি।

বাঙ্গালায় মুক্তিমন্ত্রের যে কয় জন সাধকাগ্রণী (High priest) আসিয়াছিলেন, বোধ হয়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই মহাপুরুষের জন্মকুণ্ডলী অনুশীলন করিলে দেখিতে পাই যে, সায়ন মতে জন্মকালে মকরের ১৯ অংশ উদিত ছিল। La Volasfera উক্ত রাশ্যংশের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

মকরের ১৯ অংশের স্বরূপ,—

"A rocky eminence in the mid t of a turbulent sea. This denotes a character of great self-reliance, firmness, stability and originality; one who is capable of standing alone and com bating with the steady resistance of enduring strength all the assaults of adverse fortune or popular displeasure. Alone, undaunted and impassive, he will stand amid the angry tumult of contending forces. He will show real strength and the firmness that is born of conviction and direct perception of the truth. He cannot hope to be popular, but he cannot fail to be great and singular. The waves sweep on and dash themselves in futile wrath upon his moveless body. They are driven back and expend themselves in seething comment and hissing impotence: he remains."

স্বামী বিবেকানন্দের চক্রে ধর্ম্মস্থানপতি পূর্ণ সত্ত্বগুণী রবি লগ্নে; ভক্তিস্থানে (৫ম) স্বগৃহগত অতি বলশালী ভৌম, লগ্নপতি ও চতুর্থপতি দেবাচার্য্য বৃহস্পতিসহ সম্বন্ধ করিয়া অবস্থিত।

মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর কুণ্ডলীতেও (প্রব্রজ্যাকারক) দশমপতি রবি লগ্নগত এবং লগ্নপতি স্বয়ং ভৌম দশমে তুঙ্গী গ্রহের ন্যায় ফলদাতা। অর্থাৎ উভয় কুণ্ডলীতেই রবি এবং ভৌম বিশেষ বলশালী এবং বিশিষ্ট ফলপ্রদ। স্বামীজীর কোষ্ঠীতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যোগ অতি প্রবল, দেশবন্ধুর কুণ্ডলীতে রাজনীতিক্ষেত্রে (political sphere) উক্ত গ্রহদ্বয় ফলপ্রদ।

মঙ্গল দশমগত হওয়ায় কিরূপ ফলপ্রদ হইতে পারেন, তাহা Max Heindel নিজ গ্রন্থমধ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

"Mars in the tenth house and well aspected is one of the best signs of success in life, for it gives an ambitious, enthusiastic nature with an inexhaustible fund of energy, so that no matter what obstacles are placed in his way, the person is bound to rise to the top. It gives a masterful nature and good executive ability: when wellaspected, it gives a strong constitution and a positive independent and selfreliant nature. People who have Mars prominent in their horoscope, are eminently practical and play an important part in the world's work."

ধর্ম্ম-সাধন-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া "eminently practical" হওয়া যায় কি না, বিবেকানন্দ-জন্ম-কুণ্ডলীস্থিত বলবান্ ভৌম গ্রহ তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে উভয় কুণ্ডলীতে রবি-গ্রহ লইয়া যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। উভয় কুণ্ডলীতে রবিই আত্মকারক গ্রহ। রবি সত্ত্বগুণী এবং রাজা

(অর্থাৎ independent leader)। বিবেকানন্দ-কুণ্ডলীতে রবি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ও বৃহস্পতির নবাংশে থাকায় সত্ত্বগুণের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং ধর্ম্মস্থান-পতি হওয়ায় ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া উৎকর্ষতা প্রদান করিয়াছে। দেশবন্ধু-কোষ্ঠীতেও দেখিতে পাই, রবি আত্মকারক হইয়া মেষে ভৌম-নবাংশে থাকিয়া উচ্চস্থ হইয়াছে এবং অতিশয় বলশালী হইয়াছে। অপিচ, জন্মকুণ্ডলীতে বিছা লগ্নের অধিপতি মঙ্গল অগ্নিরাশিস্থ হইয়া রবির ক্ষেত্রে স্থিত হওয়ায় দেশবন্ধু অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রই তাঁহার প্রকৃত সাধনক্ষেত্র হইয়াছিল। উভয়েই মহাবিক্রমী ছিলেন এবং উভয়েই উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করা এবং উভয়েই অক্লান্তকর্ম্মা হইয়া মুক্তির পথে ধাবিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর জন্মকুণ্ডলীতে লগ্ন ভাবগত বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় মকর রাশিতে ছিল। দেশবন্ধুর জন্মকালেও বুধ শুক্র লগ্নের নিকটবর্ত্তী (ভাবে যদি চ ব্যয়স্থানগত) হইয়া তুলা রাশিতে ছিল। তুলার প্রকৃতি অনুসারে balancing অর্থাৎ সমন্বয় করিবার শক্তি বা স্পৃহা প্রবল হয়। মকর রাশির প্রকৃতি political methods বা diplomacy দ্বারা কার্য্য উদ্ধারের প্রচেষ্টা বেশী দেখা যায়। বুধ ও শুক্র-যোগফলে মানুষ সুবক্তা হয়, বহু গুণান্বিত হয়, নীতিমান্ হয় এবং নানা কলাশাস্ত্রবেত্তা হয় এবং তাহার প্রকৃতিও লোকের চিত্ত হরণ করে।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে,—

"অতিশয়ধনো নয়জ্ঞো বহুশিল্পবেদবিৎ সুবাক্যঃ স্যাৎ।
গীতিজ্ঞো হাস্যরতির্ব্বুধসিতয়োর্গন্ধমাল্যরুচিঃ ॥"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—

"The mind is merry and cheerful, fond of music, singing, poetry and all elegant arts and sciences, requiring finish, touch and culture: it gives the power of speaking, writing and also manual dexterity: it brings fascination of manners and amiability."

মহাত্মা গন্ধীর কোষ্ঠীতেও উক্ত গ্রহদ্বয়ের যোগ আছে এবং লগ্নগত বুধ ও শুক্র।

দেশবন্ধু-কোষ্ঠীতে উক্ত বুধ ও শুক্র ব্যয়ভাবগত হইয়া তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছে। যে অনন্যসাধারণ ত্যাগের মহিমায় আজ তাঁহার দেশবাসী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, সেই ত্যাগের অন্যতম কারণ আমার মনে হয়—উক্ত গ্রহদ্বয়ের ব্যয়ভাবে থাকার ফল। তুলা লগ্ন ধরিলে বুধ ভাগ্যপতি এবং শুক্র লগ্নপতি ; সুতরাং জাতকের ভাগ্যার্জ্জিত এবং নিজোপার্জ্জিত সমুদয় ফল ব্যয়স্থানে অর্পিত হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যয়ভাবে "philanthropic institutions, self doing, prisons, hospitals" ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া একটি শাস্ত্রের বচন পাওয়া যায়,—

"পঞ্চমে দানভাবেশে কর্ম্মেশে কেন্দ্রমাশ্রিতে।
ব্যয়েশে গুরুসংদৃষ্টে মহাদানকরো ভবেৎ ॥"

এখানে যদি বিছা লগ্ন গ্রহণ করা যায়, নবমপতি চন্দ্র ভাবে পঞ্চমে এবং দশমপতি রবি লগ্ন কেন্দ্রগত, ব্যয়-পতি শুক্র গুরু কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হওয়া উক্ত যোগ সিদ্ধ হয়।

শুক্র কারক হওয়ায় স্ত্রীজনের জন্য তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হওয়ায় বিস্মিত হইবার কারণ দেখি না। শুধু এই অনুপম ত্যাগের জন্যই দেশবন্ধু অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ !

বিবেকানন্দ-কুণ্ডলীতে পঞ্চম ভাবে মঙ্গল ছিলেন। দেশবন্ধুর চক্রে নবমপতি চন্দ্র পঞ্চম ভাবগত। এক জন বীর সাধক ও তান্ত্রিক এবং যোগী। অপর বৈষ্ণব-মতাবলম্বী এবং মৃদু সাধক। তাঁহার কাব্যে ও গানে এই জন্যই বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ন্যায় মধুর রসের আধিক্য। এই জন্যই দেশমাতৃকা তাঁহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণের স্পন্দন দেশবাসী নরনারীর সুখ-দুঃখের সমবেদনায় প্রকট হইয়া উঠিত। পাশ্চাত্য মতে রবি যেমন রাজা, চন্দ্র তেমনই "the masses" বা জনশক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উভয় কোষ্ঠীতে মঙ্গল প্রবল ছিল। সেই জন্য উভয় পুরুষ-সিংহ যেমন বজ্রাদপি কঠিন

ছিলেন, তেমনই আবার বুধ শুক্র প্রভৃতির সমাবেশ-ফলে কুসুম অপেক্ষাও মৃদুপ্রকৃতি ছিলেন। উভয়েই সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির ও সুকুমার কলার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং দেশবন্ধু যে আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হইয়া সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ শাস্ত্র যাহা বলেন, তাহা দেখাইতেছি, -

(১) "প্রমদাপুত্রগৃহাণাং ভাগিনমথ যানবাহনানাঞ্চ স্বর্ক্ষে।
গুরুসংদৃষ্টঃ কুরুতে ভৃগুরিষ্ট-চেষ্টানাম্॥"

(২) "প্রাজ্ঞঃ গৃহীতবাক্যং দেশপুরশ্রেণিনায়কং খ্যাতম্।
ত্রিদশ-গুরুদৃষ্ট-মূর্ত্তিং জনয়তি সৌম্যঃ সিতগৃহস্থঃ॥

(৩) "যদি পশ্যতি দানবার্চ্চিতং বচসামধিপস্তদা ভবেৎ।
নৃপতির্বহুনায়কো নরো ভুজগেন্দ্র ইব প্রতাপবান্॥

(৪) "যদেন্দ্রমন্ত্রী বিধুজং প্রপশ্যেদ্ গুণজ্ঞবিজ্ঞং নৃপতিং করোতি।

(৫) "ভাগ্যেশো মূর্ত্তিবর্ত্তী
সুরপতিগুরুণালোকিতো ভূপতিবন্দ্যঃ।"

(৬) "গুরুণা সংযুতে ভাগ্যে তদীশে কেন্দ্ররাশিগে।
বিংশাব্দাৎ পরঞ্চৈব বহুভাগ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥"

সারাবলী গ্রন্থের মতে তুলারাশিগত বুধ-শুক্র জাতককে সর্ব্বদা শিল্পকর্ম্ম ও বিবাদে (debate) অভিরত, বাক্‌চাতুর্য্যসম্পন্ন, ব্যয়শীল, বিদ্যাচার্য্য গুরু, অতিথি-ভক্ত, সম্মানিত, শ্রমলব্ধ বিত্তসম্পন্ন, শূর, সুদুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত, (যথা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা) রক্ষণশীল (conservative), আঢ্য, মনোহর, সৎকার্য্যে রত ও লব্ধকীর্ত্তি-সম্পন্ন এবং পণ্ডিত করিয়া থাকে। গুরুর পূর্ণ দৃষ্টির ফলে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে তাহা দ্রষ্টব্য।

স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধু কেন এত স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে তাহার একটু পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

সায়নমতে দেশবন্ধুর জন্মলগ্ন বিছার একবিংশ অংশ (অর্থাৎ ২০ অংশ—৪৫ কলা)। La Volasfera তাহার স্বরূপ বর্ণনা এই করিয়াছেন,—

"It is the symbol of a bold, independent and forceful nature, that knows neither restraint nor law, and that will suffer great privations in order to maintain the semblance of freedom. It is a degree of independence."

দেশবন্ধুর কোষ্ঠীতে বুধ (mental ruler) সায়নমতে বিছার দ্বিতীয় অংশে ছিল। তাহার স্বরূপ বর্ণনা এইরূপ,—

"A great headland over which the sun is rising. It overhangs the sea. It indicates one who is great and magnificent, imbued with feelings of magnanimity and reposeful strength. His opinions are lofty and elevated, his views wide as the seas, and his stability of purpose in all respects equal to his strength of mind. He looks forward to the future with confidence, and his hopes will not be frustrated. It is a degree of magnitude."

এক্ষণে এই জাতকের অসামান্য খ্যাতিকীর্ত্তি, মানসম্ভ্রম এবং জনসাধারণের উপর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যে সকল যোগাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা লিখিতেছি,—

(১) "কেন্দ্রে বিলগ্ননাথঃ শ্রেষ্ঠবলো মানবাধিপং কুরুতে।
গোপালকুলেঽপি নরং কিং পুনরবনীশ্বরাণাং হি॥"

(২) "জন্মলগ্নেশ্বরঃ খেটো দশমে দশমেশ্বরঃ।
লগ্নে বিখ্যাতকীর্ত্তিশ্চ বিজয়ী চ ধরাধিপঃ॥"
(এখানে বিছা লগ্ন ধরিয়া বিচার্য্য।)

(৩) "যদা রাজ্যস্বামী নবমসুতে কেন্দ্রেঽর্থভবনে।
বলাক্রান্তো যস্য প্রভবতি স বীরো নরবরঃ॥
সদা কাব্যালাপী নবমণিকলাপী বহুবলী।
তুরঙ্গালীদন্তাবলকলভগন্তা ধনপতিঃ॥"

উক্ত বচনপ্রমাণের দ্বারা তাঁহার immense popularity, oratorial powers ও অর্থবলশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত যোগে তুরঙ্গ প্রভৃতি যানে গমনশীল বলা হইয়াছে। অবশ্য তুরঙ্গ মানে swift conveyance অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের motor cars বুঝায়।

সর্ব্বশেষে মহামুনি পরাশর-রচিত কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রাজযোগ এই কোষ্ঠীতে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, তাঁহার greatness কতকটা posthumous.

(বিষ্টা লগ্ন ধরিয়া গণনীয়)

৯ ১০ ২
(১) "ভাগ্যেশ-রাজ্যেশ-ধনেশ্বরাণামেকোঽপি চন্দ্রাৎ যদি
কেন্দ্রবর্ত্তী।

২ ৫ ১১
স্বপুত্রলাভাধিপতিগুরুশ্চেদখণ্ডসাম্রাজ্য-
পতিত্বমেতি॥"

১১ ৪ ২
(২) "লাভেশ-বিত্তেশ-ধনেশ্বরাণামেকোঽপি চন্দ্রাৎ যদি
কেন্দ্রবর্ত্তী।

২ ৫ ১১
স্বপুত্রলাভাধিপতি গুরুশ্চেদখণ্ডসাম্রাজ্য-
পতিত্বমেতি॥"

(৪র্থ পতি শনি চন্দ্রাপেক্ষা ১০ম স্থানগত এবং ২।৫ পতি বৃহস্পতি)

(৩) "যদা চ সৌরিঃ সুররাজমন্ত্রী পরস্পরং পশ্যতি
পূর্ণদৃষ্ট্যা।

তদা সমগ্রাং বসুধামুপৈতি কিংবা ধনেনাঙ্গগুণেন
কিংবা॥"

(এখানে শনি ও বৃহস্পতি সপ্তম দৃষ্টিতে পরস্পরকে পূর্ণভাবে দেখিতেছেন। ধনুরাশিগত শনি বিশেষ ফলপ্রদ)

(৪) "ভবতি চন্দ্রমসো দশমাধিপো
জনুষি কেন্দ্রনবদ্বিসুতোপগঃ।

অতিবিচিত্রমণিবজ্রমণ্ডিতো
বসুমতৌ বসুভূষণসংযুতঃ॥"

(এখানে চন্দ্রাপেক্ষা দশমপতি গুরু ৪র্থগত হইয়াছে)

(৫) "সর্ব্বগ্রহৈঃ সুরগুরুর্যদি দৃষ্টমূর্ত্তির্ভৃগ্বত্রিগর্গকথিতো
নৃপযোগ এবঃ।

দৈবাৎ পুনঃ স যদি পশ্যতি তান্ গ্রহেন্দ্রান্ ভূয়াত্তদা
নরপতিঃ প্রথিতঃ শতায়ুঃ॥"

(এখানে প্রথম-চরণ লিখিত যোগ পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চরণ অনুসারে সম্পূর্ণ যোগ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ পাশ্চাত্য মতে sextile dexter দৃষ্টি স্বীকার না করিলে গুরুপ্রতি মঙ্গলের দৃষ্টি সিদ্ধ হয় না।)

পরিশেষে প্রবন্ধশেষের পূর্ব্বে বক্তব্য এই যে, দেশবন্ধুর লোকান্তরগমন উপলক্ষে রাজপথে যে শোভাযাত্রা অবলোকন করিয়াছি, তাহাতে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, যদি দেশবন্ধু কোন সাম্রাজ্যের অধিপতিও হইতেন, তাহা হইলেও এবংবিধ দেবতাবাঞ্ছিত সম্মান লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই অপরূপ ত্যাগী প্রতিভা-সম্পন্ন মহাপ্রাণ কর্ম্মী শুধু যে "দেশনায়ক" হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি "জনবল্লভ" হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য মরণকে অতিক্রম করিয়া "সাম্রাজ্যপতিত্বের" ফল লাভ করিয়াছিলেন। অথবা স্বয়ং মরণের দেবতা তাঁহার ত্যাগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে সাম্রাজ্যপতির মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। মহামুনি পরাশর উক্ত অখণ্ড সাম্রাজ্যপতিত্বের যোগ বৃথা লিখিয়া যান নাই—ইহাই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। Posthumous greatnessর আর একটি কারণ বিচার-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, যোগকারক যে দুইটি গ্রহ (অর্থাৎ শনি ও গুরু) ভাবস্ফুট অনুসারে নিধন স্থানে অথবা নিধনদর্শী হইয়াছিল। আরও দেখিতে পাই যে, নিধন স্থানে সমস্ত গ্রহের যোগ ছিল এবং আরও বিশিষ্ট যোগ এই যে, চন্দ্রাপেক্ষা নিধন স্থানেও সমস্ত গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি আছে। বৃদ্ধ যবনজাতকে লিখিত আছে :—

৮ ৮
"যদি বহুগ্রহযুক্তে রন্ধ্রেশো রন্ধ্রভেঽত্র সংযুক্তে।
বহুজনমরণকালে নিধনং জাতস্য নিশ্চয়ং ব্রূয়াৎ॥"

এ ক্ষেত্রে বহুব্যক্তির মৃত্যুকালে নিধন এইরূপ ভাবার্থ না গ্রহণ করিয়া বিকল্পে (alternative নিধনকালে অথবা ক্ষেত্রে "বহুজনসমাগম" এইরূপ বিচার করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। গত শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশনায়ক পুরুষগণের কোষ্ঠীতে নিধনস্থানঘটিত উক্ত প্রকার যোগ অল্পবিস্তর লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু দেশবন্ধুতে উক্ত যোগ যে বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছে, অন্য কাহারও কুণ্ডলীতে তাহা লক্ষ্য করি নাই। যোগকারক গ্রহদ্বয় দেশবন্ধুর পার্থিব সৌভাগ্য সৃষ্টি যত দূর করুক আর নাই করুক, স্বয়ং মৃত্যুরাজ জাতককে যে অমরবাঞ্ছিত অখণ্ড অমরত্বে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রিপণ)।

দেশবন্ধুর সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে দিনকয়েক

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকে পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া দেশবন্ধু নেপোলিয়নের মত একটার পর একটা দুর্গ ক্রমাগত জয় করিয়া চলিলেন। তাঁহার বিরাট ত্যাগ—দেশের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল—সেই সম্মোহিত মনকে লইয়া তিনি যেরূপ ইচ্ছা খেলাইতেছিলেন। অর্দ্ধ-লক্ষ যুবকের ত কথাই নাই—বৃদ্ধ, প্রবীণ, মানবের সাধুতায় অবিশ্বাসী, বিচারবুদ্ধি-কঠিন আইনজ্ঞের দলও সে ধাক্কায় অনেকে পাতিত হইলেন। দেশবন্ধু প্রথম আসিয়াছিলেন নারায়ণগঞ্জে—আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা দল বাঁধিয়া খোল-করতালের সঙ্গে গান করিয়া অনেক টাকা ও গহনা পাঠাইয়াছিলাম। দেশবন্ধু আসাতে সকলের উৎসাহ বাড়িয়া গেল - অনেকে নগদ টাকা দিলেন, গহনা দিলেন, আবার অনেকে বহু অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতি করিলেন। এক জন সাহা মহাজন সেই সময়ে তাঁহার ভাইয়ের বিবাহে ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। তিনি বেশ কিছু দিবেন মনে করা হইয়াছিল। পরে দিয়াছিলেন কি না, জানি না। নারায়ণগঞ্জের উকীল-মোক্তার সকলেই ব্যবসা ত্যাগ না করিতে পারিলেও কয়েক জন করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট প্রায় সকলেই কংগ্রেসের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। কেবল এক ভদ্রলোক ছেলে সরকারী স্কুলে যাইতে চাহে নাই বলিয়া তাহাকে না কি বন্দুক দিয়া গুলী করিতে গিয়াছিলেন!

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা আসিয়া দেশবন্ধু ছাত্রগণের নিকট খুব সাড়া পাইলেন। দলে দলে ছাত্রগণ বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসিল। অনেকে মাথায় করিয়া কেরোসিন তেল বিক্রয় করিয়া ও নানা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া পেটের ভাত জুটাইত। আমাদের মত অযোগ্য চালকের হাতে না পড়িলে তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক কাষ হইত। আজ তাহাদের অনেকে চাকরী-বাকরীতে ফিরিয়াছে, অথবা বাড়ী বসিয়া বেকারভাবে স্বরাজ আন্দোলনকে ধিক্কার দিতেছে—কিন্তু সেই দিন তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া দেশের জন্য পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়াতে কত বড় সাহসের পরিচয়ই না দিয়াছিল! দেশবন্ধু এই সমস্ত দেশপ্রাণ ছাত্রের দুঃখের কথা শুনিলে চোখের জলে ভাসিতেন।

ঢাকার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ও পরে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু তখন ছেলেদের অনেকেরই উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উকীলদের মধ্যে দেশবন্ধুর কুটুম্ব ঢাকার বিখ্যাত ফৌজদারী উকীল প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়কে এক প্রকার জোর করিয়া ৩ মাসের জন্য প্র্যাকটিস্ ছাড়ানো হইল। আরও দুই এক জন উকীল অবস্থা খারাপ হইলেও কিছু দিনের জন্য ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এক জন জেলেও গিয়াছিলেন—ইনি শ্রীযুত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত গোড়া হইতেই দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে শ্রীশ বাবুই একমাত্র হিন্দু, যিনি খিলাফৎ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারূপে জেল খাটিয়াছিলেন। ঢাকার নবাববাড়ীর খাজে আবদুল করিম এম-এল-এ ও খাজে সোলেমন কাদের প্রভৃতিও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, জেলে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন!

ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ গিয়া দেশবন্ধুকে প্রথম ১৪৪ ধারার হাতে পড়িতে হয়। ষ্টেশনে সে কি বিশাল বিক্ষুব্ধ জনতা! দেশবন্ধু আদেশ অমান্য করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের আদেশ স্মরণ করিয়া দেওয়ায় ও স্থানীয় নেতৃগণের অনুরোধে তাহা করেন নাই। টাউনহলের সম্মুখে মিটিং হয়, আমরাই সে মিটিংএ

মিসেস্ পি, আর, দাশ—পুত্রকন্যাসহ

পেণ্ডুলামের মত একবার রাস্তার এধার, একবার ওধার করিতে করিতে যাইতেন!

টাঙ্গাইল হইতে দেশবন্ধু চাঁদ মিঞার বাড়ী করোটিয়া যায়েন। আটিয়ার চাঁদ কত বড় বিলাসী বাবু ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন—তিনিও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনে পড়িয়া কারাবরণ করেন। চারি লক্ষ টাকা জমীদারীর আয় ও রাজ-ঐশ্বর্য্য থাকিতে তিনি কেন কারাগারে গিয়াছিলেন—কে বুঝিবে?

টাঙ্গাইল হইতে ফিরিয়া আসাম প্রাদেশিক খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে বরিত হইয়া চাঁদপুর দিয়া যাইবার জন্য দেশবন্ধু ষ্টীমারে উঠেন। রেলের ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারীরা দেশবন্ধুর জন্য কত না করিতেন! ঘাট হইতে ছাড়িয়া ষ্টীমার যখন এক মাইল গিয়াছে, তখন দেশবন্ধুর জন্য ইলিশ মাছ লওয়া হয় নাই বলিয়া সারেং ষ্টীমার বাঁধিয়া মাছ লইয়া তবে চলিয়াছে।

বক্তৃতা করি। শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী, সূর্য্যকুমার সোম প্রভৃতি আগেই প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়াছিলেন এবং তখন বাঙ্গালার মধ্যে মৈমনসিং জাতীয় আন্দোলনে সকলের প্রথমে চলিতেছিল।

টাঙ্গাইলে যাইয়া দেশবন্ধু শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অতিথি হয়েন। অমরদা এখন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, একবারে সাধু হইয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি যে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার পূর্ব্বে তাঁহার জ্বালায় টাঙ্গাইলের রাস্তায় ঘাস জন্মাইতে পারিত না—ঘড়ির

চাঁদপুর হইতে আসাম যাইবার পথে ষ্টেশনে কি ভীষণ জনতাই হইত। পথে একটা ষ্টেশনে রাত্রি ৪টার সময় জনতার মধ্য হইতে এক জন বিশালকায় পাঞ্জাবী শিখ আসিয়া আমাদের গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিল, "দেশবন্ধু কোথায়?" শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সেই গাড়ীতে ছিলেন। আমাদের ত ভয় হইয়া গেল। দেশবন্ধু লোকের উঁকিতে অস্থির হইয়া উপরের গদিতে ঘুমাইতেছিলেন। পাঞ্জাবী-বীর বলিল, "আমরা সাত দিনের পথ আসিয়াছি, দেশবন্ধুকে দেখিব বলিয়া আর দুই দিন চিঁড়া খাইয়া ষ্টেশনে বসিয়া আছি—আমরা দেশবন্ধুকে দেখিতে চাই।" আমি

যথাসাধ্য তর্ক করিলাম—কিন্তু কথা শুনে কে? বারের উপর হইতে দেশবন্ধুকে টানিয়া হাতের উপর তুলিয়া লইয়া সে বাহিরের সকলকে দেখাইতে লাগিল। দেশবন্ধু হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ভাবিলেন, বুঝি ট্রেণ উল্টাইয়াছে, না কি একটা বিপদ ঘটিয়াছে। যাই হউক, আমরা বলিলাম, "ভয়ের কারণ নাই।" ভালবাসার এই অত্যাচারেই তাঁহার পরাণ-বাতি ধীরে ধীরে নিবিয়াছে—কিন্তু ইহাই বোধ হয় বড় হওয়ার শাস্তি!

শ্রীহট্টের নানা স্থান ঘুরিয়া দেশবন্ধু কুমিল্লা আসিলেন। কুমিল্লার বারের প্রায় সকলেই প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়া দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! টাকাও বিস্তর উঠিতে লাগিল। শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় ওখানকার এক জন বিখ্যাত উকীল। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যবসা ছাড়িলেন ত তিনি রাজি হইলেন না। দেশবন্ধু যখন ট্রেণে উঠিতেছেন—তখন কামিনী বাবু আসিয়া বলিয়া গেলেন, তিনিও প্রস্তুত হইয়াছেন। সর্ব্বত্র এক আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল।

কুমিল্লা হইতে দেশবন্ধুর চট্টগ্রাম যাইবার কথা ছিল—কুমিল্লার কায খুব ভাল হওয়ায়, তাঁহার চট্টগ্রাম যাইতে দুই দিন দেরী হয়। ইতোমধ্যে দেশবন্ধুকে বাসস্থান দিয়া উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্ত চট্টগ্রামের লোক মিঃ জে, এম, সেন-গুপ্তকে কলিকাতা হইতে আসিবার জন্ত তার করেন। মিঃ সেন-গুপ্ত যথারীতি সাহেবী ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়া যে দিন দেশবন্ধু চট্টগ্রাম প্রথম যাইবার কথা, সেই দিনকার গাড়ীতে আইসেন।

দেশবন্ধু তখন কুমিল্লায় আট্‌কাইয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধুকে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার অভাবে ষ্টেশনে হতাশ জনতা মিঃ সেন-গুপ্তের গলে জয়মাল্য দান করেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মিঃ সেন-গুপ্তের মনে প্রথম ঘুণ ধরে। তিনি দেখিলেন, ত্যাগের চরণে এ দেশের লোক কি ভাবে মাথা নোয়ায় এবং অসহযোগ আন্দোলন দেশের হৃদয় কি ভাবে স্পর্শ করিয়াছে!

চট্টগ্রামে গিয়া আমরা সেন-গুপ্তের বাড়ী উঠিলাম। একটা ঘরে দরজা দিয়া দেশবন্ধু সেন-গুপ্তকে জপাইলেন—শ্রীযুতা বাসন্তী দেবী ও আমিও সেই ঘরে ছিলাম। সেন-গুপ্ত অনেক না-হাঁ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত রাজি হইলেন, ৩ মাস প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়া কংগ্রেসের কয়েক হাজার মেম্বর ও কয়েক হাজার টাকা তুলিয়া দিবেন এই প্রতিশ্রুতিতে। দেশবন্ধু সভায় সেই বার্ত্তা ঘোষণা করিতেই চট্টগ্রামে এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল!

দেশবন্ধুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সেন গুপ্ত ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, আজ সারা বাঙ্গালা ও কলিকাতার লোক তাহার জবাব দিয়াছে!

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

পূর্ব্ব-স্মৃতি

আমার ভ্রাতা খুল্লতাতপুত্র—চিত্তরঞ্জন, আমি এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতা, সকলেই একসঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছিলাম। আমার যখন ৪ বৎসর বয়স, আমার কনিষ্ঠ সহোদর যখন শিশু, সেই সময় আমাদের মাতৃবিয়োগ ঘটে। আমার খুড়ীমা, চিত্তরঞ্জনের জননী, আমাদের মাতার স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কে লালিত-পালিত হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমি অধ্যয়নের জন্ত ইংলণ্ড যাত্রা করি। আমাদের বাল্যকালেও চিত্তরঞ্জন আমাদের দলের সর্দ্দার ছিলেন এবং প্রায়ই বক্তৃতা করিয়া শুনাইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, তখন আবার আমরা একসঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্ত অধ্যয়নের অবকাশকালেও তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন যখনই যে কার্য্য করিতেন, সমগ্র মনপ্রাণ তাহাতে অর্পণ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের জন্ত কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজনীতিক মতের সহিত সকল সময় আমার মতের সামঞ্জস্য হইত না; পরবর্ত্তী কালে আমাদের পরস্পরের মতকে সমর্থন করিবার জন্ত—আমরা উভয়েই কঠোর সংগ্রাম করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত আত্মীয়তা, ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধন শিথিল হয় নাই।

শ্রীসতীশরঞ্জন দাশ।

একনিষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক, অদ্বিতীয় দেশসেবক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দেশকে দুঃখার্ণবে ডুবাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার ক্রীড়া-সঙ্গী ছিলাম, বয়সে তিনি আমার অপেক্ষা ২ বৎসরের বড় ছিলেন। বাল্যকালে একসঙ্গে পড়িয়াছি, খেলা করিয়াছি, পরবর্ত্তী জীবনে একসঙ্গে কাযও করিয়াছি। অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে পরস্পর পরস্পরের বিরোধিতা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য একই ছিল।

বাল্যকাল হইতেই চিত্তরঞ্জন সরল ও নির্ভীক ছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তিতর্ক অমোঘ ছিল, কেহ তাঁহাকে তর্কে পরাভূত করিতে পারিত না। দেশের জন্য তিনি যে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই দেখিতে পাওয়া যাইত। হৃদয়ের ঔদার্য্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পিতৃদেব ভুবনমোহনের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি বাল্যকাল হইতেই প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

১৬ বৎসর ধরিয়া চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য ভীষণ পরিশ্রম ও কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন প্রভাতে আমি চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে টাকা পাইয়াছিলাম। তাঁহার পিতা আমার পিতার নিকট হইতে এই টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। উভয়েই তখন পরলোকে। পিতৃঋণ পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন আমাকে একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। এই পত্র পাইয়া আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তখন আমার এই কথা মনে হইয়াছিল, "একসঙ্গে মানুষ হলুম; চিত্তরঞ্জন দেবতা হয়ে গেল, আমি মানুষও হ'তে পারলুম না।"

এই কথাগুলি সর্ব্বক্ষণই আমার মানসপটে সমুদিত ছিল। তাহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কারামুক্তির পর যখন দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য দিবার জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় সভাপতি হিসাবে আমি উল্লিখিত কথাগুলিই বলিয়াছিলাম।

চিত্তরঞ্জন যখন কারাগারে, সেই সময় আমি প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। সেই সময় আমি তাঁহাকে কাউন্সিল বর্জ্জনের নিরর্থকতা সম্বন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। তিনি তখন বলিতেন যে, যদি তিনি কখনও কাউন্সিল প্রবেশ করেন, তবে উহা ধ্বংসের জন্যই করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কত কথাই আজ আমার মনে পড়িতেছে!

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। তখন হইতেই রাজনীতিক অনেক ব্যাপারে আমার দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বাত্যায় সমস্ত দেশ যখন উদ্বেলিত হইতেছিল,—নাগপুরে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা বর্জ্জন করিয়া যখন চিত্তরঞ্জন সন্ন্যাসী সাজিয়া বাঙ্গালার স্বরাজ-পতাকাদণ্ড নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন, তখনও স্বরাজ-সাধন কার্য্যে তাঁহার এক জন শিষ্য হিসাবে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

এই অসহযোগ আন্দোলনের দিনে পুরুষসিংহ চিত্তরঞ্জনের অনেকগুলি কায আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহারই দুই একটি কথা বলিব।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে একটা জিনিষ আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; তিনি অপরকে যাহা করিতে বলিতেন, নিজেই প্রথমে তাহা করিয়া সকলকে দেখাইতেন।

সে আজ অধিক দিনের কথা নহে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী বে-আইনী সঙ্ঘ বলিয়া সরকার ঘোষণা করিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সমস্ত বাঙ্গালা ইহার প্রতিবাদ করিল। এই বে-আইনী আদেশ অমান্য করিয়া সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিলেন। দেশবন্ধু তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জনকেও তাঁহাদের সঙ্গে হাসিমুখে কারাগারে পাঠাইলেন। শুধু ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। পরন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও ভগিনী শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীকে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকের ন্যায় বড়বাজারে প্রকাশ্যভাবে খদ্দর বিক্রয় করিতে পাঠাইলেন। অল্পক্ষণ পরেই চিত্তরঞ্জনের নিকট সংবাদ আসিল,—শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সংবাদে চিত্তরঞ্জন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পরন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহাদিগকে আবার মুক্তিদান করা হইয়াছে, তখন তিনি মনঃকষ্ট অনুভব করিলেন; যিনি সে জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। সহস্র সহস্র দেশবাসী যে সময়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন স্বীয় স্ত্রী ও ভগিনীর মুক্তিবার্ত্তা কিছুতেই চিত্তরঞ্জনের মনে আনন্দদান করিতে পারিল না।

নেতা চিত্তরঞ্জনের কারাজীবনের একটা কথা বলি।

তখন সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা মিটমাটের কথা চলিতেছিল। লর্ড রেডিংএর ইচ্ছানুক্রমে বাঙ্গালা সরকারের কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী সহ আলিপুর জেলে আসিয়া এক দিন উপস্থিত হইলেন। জেলের মধ্যেই এক বৈঠক বসিল। দেশবন্ধু ও অন্যান্য যে সকল নেতা তখন জেলে ছিলেন, তাঁহারা সেই বৈঠকে আসিলেন। বাহির হইতেও বড় বড় নেতারা বৈঠকে যোগদান করিলেন।

স্বরাজের জন্য আন্দোলন, খিলাফতের প্রতি অবিচার ও পঞ্জাবে অত্যাচার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সরকারের সঙ্গে এই তিন বিষয়ে কি কি সর্ত্তে আমাদের মিটমাট হইতে পারে, তাহা লইয়া কথা চলিতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন তাঁহার সর্ত্ত বৈঠকে উপস্থিত করিলেন। বৈঠকে উহা গৃহীতও হইল। অতঃপর পণ্ডিত মালব্যজী সেই সর্ত্তে দস্তখত করিবার জন্য দেশবন্ধুকে অনুরোধ করিলেন। দেশবন্ধু কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি এখন কারাগারে, নেতা হিসাবে এই সর্ত্তে আমি এখন দস্তখত করিতে পারি না। আর এই আন্দোলনের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক, তাঁহার দ্বারা এই সর্ত্ত অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা কিছুতেই হইতে পারে না।" মালব্যজী দেশবন্ধুকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি দস্তখত না করিলে সরকার কখনও এই সর্ত্ত গ্রহণ করিবেন না। অবশেষে মালব্যজীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দেশবন্ধু সর্ত্তে

দার্জ্জিলিংএ বিশ্রামমগ্ন চিত্তরঞ্জন

[শিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু] [মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএ গৃহীত ফটো হইতে

গ্রহি করিলেন বটে, কিন্তু মহাত্মা গন্ধী উহার অনুমোদন না করিলে তাঁহার নিকটও সর্ত্ত অগ্রাহ্য হইবে, এই কথা সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া দিলেন। শৃঙ্খলা কেমন করিয়া মানিয়া চলিতে হয়, এই ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাহা দেশকে শিখাইলেন।

দেশবন্ধুর জীবনের আর একটা ঘটনা এই আমি তখন চাঁদপুরে। তথায় তখন প্রবল আন্দোলন ও চাঞ্চল্য। ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছে। চা-বাগানের কুলীদের উপর অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার ন্যায্য বিচার করিতে হইবে। নতুবা কর্ম্মচারীরা কাযে ফিরিয়া যাইবেন না। এই সংবাদ দেশবন্ধুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। চা-বাগানের কুলীদের বেদনার করুণ কাহিনী দেশবন্ধুর মনকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আসিবেন বলিয়া জানাইলেন। আমরা কিন্তু এই সংবাদে চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তখন ঘোর বর্ষা। পদ্মাবক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। সচরাচর যে ষ্টীমারগুলি গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর যাতায়াত করে, সেগুলি এমন দিনে অনেক সময় বিপদে পড়ে শুনা গিয়াছিল। তাহার উপরে এই ধর্ম্মঘটের দিনে ষ্টীমারের অভাবে দেশীয় ক্ষুদ্র নৌকায় আসা যে কত দূর বিপজ্জনক,—জীবনকে কত তুচ্ছ ভাবিলে যে এইরূপ বিপদকে আলিঙ্গন করা যায়, বর্ষায় পদ্মার রুদ্র মূর্ত্তি যে দর্শন করিয়াছে, সে-ই তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু কোন বিপদ, কোন ভয় দেশবন্ধুকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—"দুই এক দিন অপেক্ষা করুন।" বন্ধুবান্ধবের শত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, জীবনের সমস্ত ভয়-ভাবনা ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু সামান্য একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া চাঁদপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা সকলে উদ্বিগ্নচিত্তে চাঁদপুরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি যে দিন ক্লান্তদেহে চাঁদপুরে আসিয়া উঠিলেন, সে দিন সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য তাঁহার এতটা উৎসাহ, এতটা একাগ্রতা দেখিয়া শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সে দিন তাঁহার চরণে হৃদয় লুটাইয়া দিয়াছিলাম।

দরিদ্রের প্রিয়তম বন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাঙ্গালার স্বরাজ-সূর্য্য চিত্তরঞ্জন, ভারতের মুক্তিসাধনার মহান্ সাধক চিত্তরঞ্জন আজ আর নাই, বাঙ্গালীর তাই আজ বড় দুঃখ, বড় ব্যথা। বাঙ্গালী তাই আজ বড় নিঃসহায়। কেবল আশা আছে, বিশ্বাস আছে, চিত্তরঞ্জনের অমর আত্মা বাঙ্গালীর সহায় হইয়া বাঙ্গালীকে স্বরাজ-সংগ্রামে চালিত করিবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত।

ক্ষত্রিয় চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু সম্বন্ধে কিছু লিখা আজ আমাদের পক্ষে কঠিন, কারণ, ঘটনার স্রোতের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার ইতিহাস লিখা অসম্ভব। আমরা আমাদিগকে দেশবন্ধুর শিষ্য বলিয়া ধন্য মনে করি। আমাদের পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেকেই বলিতেছেন যে, দেশবন্ধু মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন—অর্থাৎ দেশবন্ধুর শেষ-জীবনে যে ত্যাগ আমরা দেখিতে পাই, উহা যেন মহাত্মাজীর চরিত্রের সংস্পর্শেই সম্ভব হইয়াছিল। দেশবন্ধুকে যাঁহারা কিছুমাত্র জানিতেন, তাঁহারাই এ কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার ভোগের মধ্যেও ত্যাগের বাঁশী বাজিত। মহাত্মার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু মহাত্মা তাঁহার গুরু ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিল। আজ সে তুলনার হয় ত সময় আইসে নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যায় যে, মহাত্মাজী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ এবং দেশবন্ধু ক্ষত্রিয়। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সাধনাযোগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিত, কিন্তু হায় রে ভারতবর্ষ! সে শুভযোগ ভারতের অদৃষ্টে বেশী দিন রহিল না।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

ব্যথিতের বন্ধু চিত্তরঞ্জন

মহামতি এফ, সি, এণ্ড্রুজ মাদ্রাজের "স্বরাজ্য" পত্রে পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে। সেই সময়ে পঞ্জাব অনাচারের তদন্ত হইতেছিল। অমৃতসর, গুজরাণওয়ালা, লাহোর ও অন্যান্য স্থানে এ দেশবাসীরা পুলিস ও ফৌজের দ্বারা অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। ঐ সকল অনাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক এক বে-সরকারী কমিটী বসান হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টাররূপে সেই সময়ে দেশবন্ধু কতকগুলি মামলা পাইয়াছিলেন। সে সকল মামলায় তাঁহার প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনের কথা। কিন্তু দেশবন্ধু সে অর্থলোভ ছাড়িয়া দিয়া পঞ্জাব তদন্ত কমিটীর সদস্য হইয়া আসিলেন। যখন তিনি আমাদের সহিত একযোগে তদন্তে নিযুক্ত, সেই সময়েও তাঁহাকে দৈনিক হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়া মামলায় ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য অনেক তারের আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি একবার দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিলেন, তখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই কাযে লাগিয়া গেলেন।

পঞ্জাব তদন্ত

পঞ্জাব তদন্ত দেশবন্ধুর জীবনে এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তিনি তদন্তকালে যখন দেশবাসীর অপমান ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে লাগিলেন, তখন পরাধীনতার অপমান তাঁহার হৃদয়ে তপ্ত লৌহের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অন্ধকারে বিদ্যুদ্‌-বিকাশের মত তদন্ত হইতে পরাধীনতার মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের যুদ্ধে কি অপমান সহ্য করিতে হয়, যে জাতি চিরদিন অপরের দ্বারা শাসিত হয়, তাহার ভাগ্য কিরূপ মলিন,—তাহা তিনি পঞ্জাব তদন্তকালে বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। তদন্তকালে যখন তিনি পর পর এক একটি ঘটনার কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন বাহিরে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভূত না হইলেও, তাঁহার চক্ষু হইতে যখন অগ্নি নির্গত হইত, তখন বুঝা যাইত, তিনি কি মর্ম্মান্তিক যাতনা সহ্য করিতেছেন। এই সকল ঘটনার প্রমাণ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে আন্তরিক স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার দেশহিতার্থ সর্ব্বস্বত্যাগের প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে নাই। পঞ্জাব তদন্তের পর তিনি সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত হইলেন।

চাঁদপুরে শ্রমিক-চাঞ্চল্য

তাহার পর যে ঘটনায় তাঁহাকে আমি চিনিবার সৌভাগ্য লাভ করি, সে ঘটনা চাঁদপুরে ঘটিয়াছিল। তখন আসামের চা-বাগিচায় কুলী-ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, কুলীরা চাঁদপুরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছিল। যখন কুলীরা চা-বাগিচা ছাড়িতে থাকে, তখন তিনি বিশেষ কার্য্যে আটক পড়িয়াছিলেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পর তখন ষ্টীমার-ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, কাযেই তিনি চাঁদপুরে যাইবার ষ্টীমার পাইলেন না। তখন পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি, খুবই জল-ঝড় হইতেছে। তখন অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে এমন ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা ছিল যে, দেশীয় নৌকার মাঝিরা পদ্মায় পাড়ি দিতে সাহস করিত না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রথমেই যে নৌকা পাইলেন, তাহাতেই চাঁদপুর রওনা হইলেন। আমরা
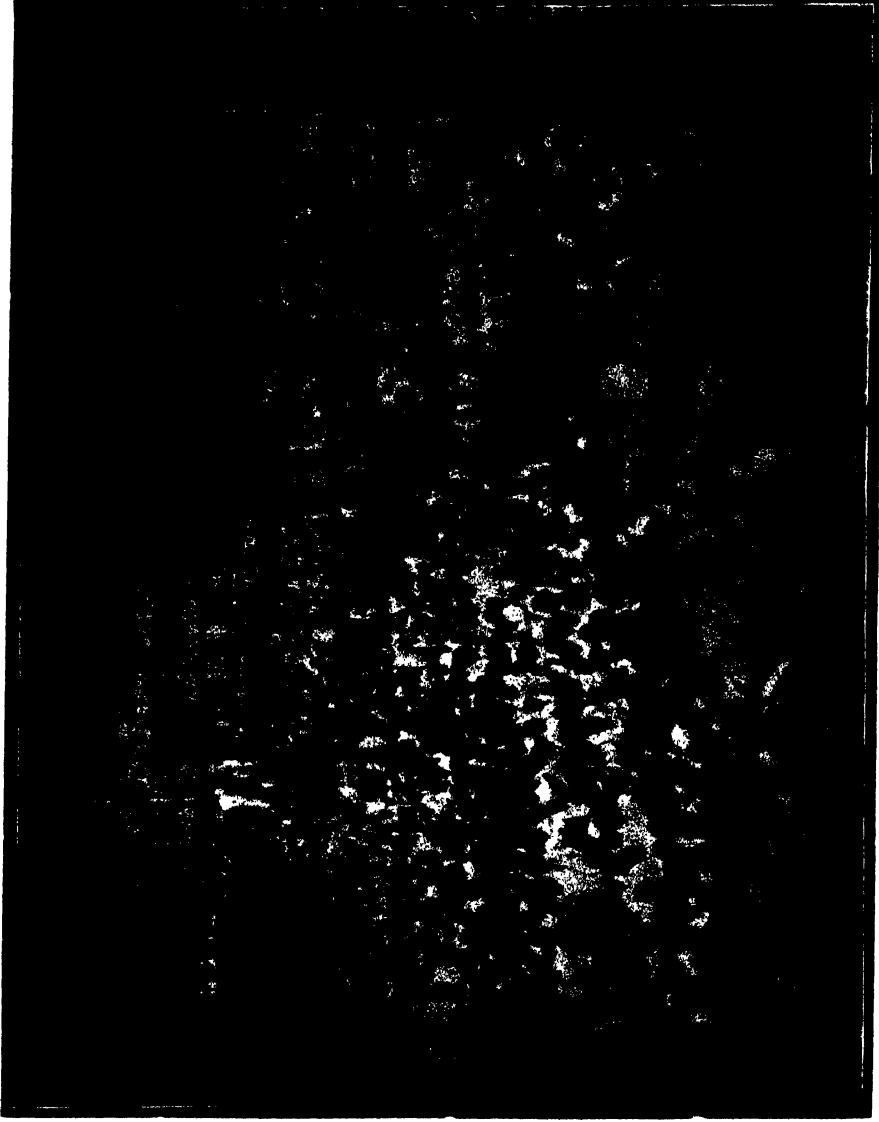
শিয়ালদহ ষ্টেসন সম্মুখের জন-সমুদ্র

[বসুমতী প্রেস।

যখন মনে করিতেছি, তিনি গোয়ালন্দে রহিয়াছেন, তখন এক দিন প্রাতে তিনি চাঁদপুরে হরদয়াল বাবুর বাটীতে উপস্থিত। আমি তৎপূর্ব্ব-রাত্রিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সকাল সকাল শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রাতে উঠিয়া বিস্মিত হইয়া দেখি, দেশবন্ধু বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমরা যখন তাঁহাকে পদ্মায় পাড়ি দেওয়ার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম, তখন তিনি আমাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

জামসেদপুরে শ্রমিক সাহায্যে

ইহার পর বহু দিন আমি তাঁহাকে দেখি নাই। যে সময়ে তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত জামসেদপুরে শ্রমিকদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিকদের বিবাদ চলিতেছিল। তিনি এই ব্যাপারের শালিসি-বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময়েই প্রথমে আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি কিরূপ ঘোর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। কেন আমার এই ধারণা হইয়াছিল, তাহা বুঝান কঠিন। সারা রাত্রি রেলের ভ্রমণের পর মোটরে সুবৃহৎ কারখানা পরিদর্শন, দেশবন্ধু ইহাতে কাতর হইয়া পড়েন। আমি তাঁহার সহিত মোটরে ছিলাম। তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বলিতে-ছিলেন, এই পরিদর্শনের কষ্ট অনর্থক ভোগ করা হই-তেছে। তথাপি তিনি শেষ পর্য্যন্ত সকল কষ্ট দৃঢ়চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে সন্ধ্যার সময় তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শ্রমিকদিগের যে প্রকাণ্ড সভার আয়োজন হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সেই সভায় বক্তৃতা করা স্থগিত রাখিতে হইল। ইহার পরেই তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। আমি তখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বুঝিলাম, দেশের কাযে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার এইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।

শেষ কথা

ইহার পর আমি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। আমি ভাবিতাম, তাঁহার কি অদম্য মানসিক শক্তি! দেশের জন্য যে কাযে তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন, অতীব প্রবল জ্বর বা অন্য কোনও রোগ তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। আমার বিশ্বাস, গত দুই বৎসর তাঁহাকে দেশের জন্য অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক দিনের জন্যও তাঁহাকে এই হেতু বিষণ্ণ দেখি নাই, জন্মভূমির জন্য হাসিমুখে তিনি এই কষ্ট সহিয়াছিলেন। সত্যই দেশের লোক তাঁহাকে "দেশবন্ধু" আখ্যা দিয়াছিল, কেন না, তাঁহার বিরাট দেশপ্রেমই তাঁহাকে দেশের জন্য এমন সহনক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল।

দিল্লীতে যখন মহাত্মা গন্ধী ২১ দিন প্রায়োপবেশন করেন, তখন দেশবন্ধু একটু সুস্থ হইলেই কলিকাতা হইতে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তখনও তিনি এমন অসুস্থ যে, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, তিনি মহাত্মারই মত শয্যাগত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তিনি সাধারণকে নিজের শরীরের অবস্থা জানিতে দিতেন না। বুঝিলাম, শরীরের উপর এই অমানুষিক মনোবলের প্রয়োগে তিনি তিলে তিলে ক্ষয় হইতেছেন। তাঁহার পত্নী বাসন্তী দেবীর মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত, তিনি স্বামীর জন্য কি উৎকণ্ঠায় ও দুর্ভাবনায় কালহরণ করিতেছেন।

তাঁহার চরিত্রে আমি দুইটি জিনিষ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি,—তাঁহার অসীম দয়াদাক্ষিণ্য এবং দেশসেবায় অসীম সাহস।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু সম্বন্ধে লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অনুরোধ স্বীকার করিয়াছি। লিখনপটু সাহিত্যিকরা যেখানে গুছাইয়া লিখিতে পারেন নাই, ভাবের আবেগে অসংবদ্ধ যা হয় কিছু লিখিয়াছেন, আমি যে সেখানে কিছু লিখিতে পারিব, এরূপ আশা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তথাপি শিষ্য—সহকর্ম্মী—অনুগত ও অনুচররূপে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এত মিশিয়াছিলাম যে, বসুমতী-সম্পাদক আমাকে রেহাই দিতে যদি না চাহেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। শুধু তাঁহার জানা উচিত ছিল, হৃদয়ের আবেগ ও তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার শক্তি ঠিক এক বস্তু নহে। অতএব দেশবন্ধু সম্বন্ধে আবেগের উপর দুই চারি ছত্র যাহা লিখিব, তাহাতে অসংখ্য ত্রুটি থাকিবারই কথা।

চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে যখন আমি ঘনিষ্ঠভাবে আসি, তখন তাঁহাকে ভিখারিরূপেই দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত দেশবাসিগণের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থ তাঁহার সহিত কয়েক যায়গায় ঘুরিয়াছিলাম। কোথাও তিনি চাঁদা পাইয়াছিলেন, কোথাও মাত্র গালাগালি খাইয়া ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিনের চিত্তরঞ্জন ভিখারী সাজিয়াছিলেন—পরদুঃখকাতর হৃদয়ের দ্বারে পরের দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া অর্থ সাহায্য চাহিয়া ফিরিয়াছিলেন। পরে তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডারের জন্য তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। এই বারে ছিল সত্যকার ভিখারীর রূপ। ইহাতে আত্মপর-ভেদবুদ্ধি আর ছিল না। এই ভিক্ষায় দৈন্য ছিল না, জোর ছিল।

আর দেশবন্ধু শেষবার ভিক্ষা করিয়াছিলেন পল্লী-সংস্কারের জন্য। এই বার মনে হইয়াছিল, স্বয়ং মহাদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু কুবেরের ভাণ্ডার যিনি ইচ্ছা করিলে করতলগত করিতে পারিতেন, চঞ্চলা লক্ষ্মীকে যিনি চাহিবামাত্রই ঘরে আনিতে পারিতেন, তিনি যখন আশানুরূপ ভিক্ষা পাইলেন না, ৩ লক্ষ দূরের কথা, তুলসী গোস্বামী মহাশয় না থাকিলে বহু কষ্টে তাহার এক-তৃতীয়াংশও নাগরিকগণের নিকট হইতে আদায় হইত না, তখন ভাবিয়াছিলাম, হায় রে বাঙ্গালী, দেবতা ভিখারী মানব-দুয়ারে, আর তাহাকে চিনিলে না, প্রত্যাখ্যান করিলে! তখনই আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি বা এইবার দেবতা বিমুখ হইলেন। দেবতার ডাক শুন নাই, বলি সংগ্রহ করিয়া আন নাই, তাই আজ ফরিদপুরে শেষ ভিক্ষা করিয়া দেবতা নীরব হইয়া গেলেন। ফরিদপুরে তিনি কাতর চিত্তে তোমার কাছে তোমার অহঙ্কার ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন—দিবে কি? যদি দাও, ভাই, পরিবর্ত্তে কি পাইবে জান? প্রেম ও সংযম—যাহা তোমার বাঙ্গালার সনাতন বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন ভিক্ষা করিতেন কেবল বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালার নিকট। ফরিদপুরের অভিভাষণের কদর্থ করিয়া যাঁহারা বলেন, বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট তিনি ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে চিনেন নাই। চিত্তরঞ্জন সুরেন্দ্রনাথের নিকট, প্রভাসচন্দ্রের নিকট, ফজলুল হকের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে পারিতেন, কিন্তু বিদেশী আমলাতন্ত্র ত দূরের কথা, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকটও তিনি বাঙ্গালার সাহায্যের জন্য হাত পাতিতে চাহেন নাই। চিত্তরঞ্জন আসন্নমৃত্যু বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার জন্য সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সে সন্ধির সর্ত্তে দৈন্য নাই, ভিক্ষা নাই, হীনতা নাই। তাহাতে আছে সত্য, তাহাতে আছে সাহস, তাহাতে আছে যুক্তি। বহু যুগসঞ্চিত পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া স্বাধীনতার, স্বরাজের উপযুক্ত হইবার জন্য মাত্র যতটুকু সময় অপেক্ষা করিতে হইবে, সেইটুকু সময়ের জন্য তিনি যুদ্ধে বিরত হইতে সম্মত। ইহা ছাড়া তাহাতে বিদেশীকে বলিবার আর কিছুই ছিল না। দেশবাসীকে সংযম ও প্রেমের শিক্ষা দিতে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন, এই সংযম ও প্রেমের সাধনায় প্রাণপণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছেন। পথহারান ছেলেদের ঘরের পথে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু নিজে পথ ভুলিয়া যায়েন নাই।

আর বিপথে তিনি যাইতে পারিতেন না; কারণ,

দেশবন্ধুর খুল্লতাত শ্রীযুত রাখালচন্দ্র দাশের পরিবারবর্গ

জন্মগত সংস্কারবশেই চিত্তরঞ্জন জননায়ক ছিলেন। একবার দেশের লোক তাঁহার নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, এই অহিংসরণে মহাত্মা তন্ত্রধারক ছিলেন, কিন্তু পৌরোহিত্যের ভার ছিল দেশবন্ধুর উপর। বিদেশী আমলাতন্ত্রকে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত করিবার শক্তি ছিল মাত্র তাঁহাতেই। কারণ, আজন্ম যুদ্ধই তিনি করিয়াছেন এবং যুদ্ধে তাঁহার কখন ক্লান্তি আইসে নাই। বার বার সদসৎ নানা উপায়ে তাঁহার পরাজয়ের কত চেষ্টাই না বিদেশী আমলাতন্ত্র করিয়াছে। মুসলমানকে সন্দিগ্ধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে হীন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে কুৎসা রটনার জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে; সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রতিদিন কত মিথ্যা কথা তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের নামে প্রচার করা হইয়াছে; তাঁহার কর্ম্মকুশল শিষ্যদের বিনা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু কোন বাধাই তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে বীর দেখিয়া মরিয়াছেন যে, বাঙ্গালার দ্বৈত-শাসনের দুর্গ ভূমিতে বিলীন হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন গিয়াছেন। বিদেশী আবার নূতন কেল্লা বানাইবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে—সেই কেল্লা ভাঙ্গিবার ভার এখন তাঁহার দেশবাসীর উপর—বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানের উপর; বাঙ্গালার প্রবাসী অপর ভারতীয়ের উপর। যে সংযম ও প্রেমের বলে, যে আত্মত্যাগে নির্ভর করিয়া চিত্তরঞ্জন এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, আমাদের সমবেত সংযম ও প্রেমের মধ্য দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বলিদানেও কি ভগবান্ আমাদের এমন একটা শক্তি দিবেন না, যাহাতে স্বরাজের পথে আমাদের পিছু ফিরিতে না হয়?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র।
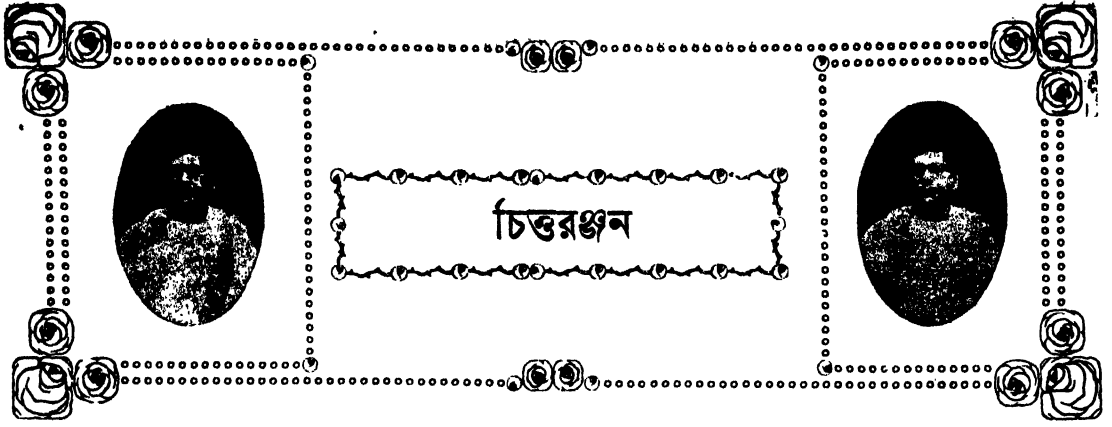
চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার প্রভাব কিরূপে আমার হৃদয়, মন ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার ভগিনীর সহিত তাঁহার পরিণয়ের পর হইতেই তিনি আমার উপদেষ্টা, ভ্রাতা, সঙ্গী—এমন কি, আমার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি সম্বন্ধে কোনও কিছু লিখিবার অধিকার আমার নাই। আমার দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে, মানুষ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিব মাত্র। আমার ভগিনীর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রকৃতপক্ষে ভাবে ও কাযে চিত্তরঞ্জনের সংসারের এক জন হইয়া পড়িয়াছিলাম। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই চিত্তরঞ্জন ফৌজদারী-বিভাগে সুদক্ষ ব্যবহারাজীবের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে খাঁটি মানুষটি ছিলেন, তিনি আইনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন নাই। কাব্যের উৎস তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। আইন-চর্চ্চার অবকাশে 'মালঞ্চের' জন্ম হয়। তাহাতে প্রকৃত কবি-হৃদয়ের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকে দুইটি সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁহার ভবিষ্যজীবনে সেই দুই রাগিণীর মূর্ত্ত প্রকাশ ঘটিয়াছিল। প্রথম, মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা—বিশ্বনিয়ন্তা সম্বন্ধে যুক্তি ও চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত; দ্বিতীয়, নরনারীর দুঃখ-কষ্টে প্রবল করুণা, সমবেদনার অনুভূতি। চিত্তরঞ্জন তখনও ৩০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক—এই বয়সে মানুষ বিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তিরই ভক্ত হইয়া থাকে। চিত্তরঞ্জনের চিত্ত তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিহান; কিন্তু তাঁহার বিরাট হৃদয় তখন হইতেই অভাবপীড়িত, দুঃস্থ, নির্যাতিতের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত—তখন হইতেই তিনি অভাবপীড়িতের দুর্দ্দশামোচনে মুক্ত-হস্ত। নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া, ভবিষ্যতে কি হইবে, না ভাবিয়াই তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য কল্পতরু। তাঁহার নিকট আসিয়া কোনও প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমি বিলাতে গিয়াছিলাম। ১৯০৫ অব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জনের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিলাম। আমি তাঁহার ব্যবহারাজীব ব্যবসায় সম্বন্ধে উচ্চ সাফল্যের কথা বলিতেছি না। তাঁহার অন্তরে যে গভীরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যুক্তির জাল তখন খসিয়া পড়িয়াছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল, তাহা সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তিনি দিন দিন অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে উপহাস করিতাম, উত্তরে তিনি মৃদু হাসিয়া আমাকে নিরুত্তর করিয়া দিতেন। সে হাস্য যে কি মধুর, কি অজেয়, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গগণ ভালই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার দানের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছিল। এই সময়ে দেশে জাতীয়তার ভাব, স্বদেশ-প্রাণতার ভৈরব সঙ্গীত দেশবাসীর হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। ভক্ত চিত্তরঞ্জন সেই দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। তখন শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁহার অখণ্ড সংস্রব। জাতীয় দলের প্রতি চিত্তরঞ্জনের অবিচলিত নিষ্ঠার প্রভাবেই সে সময় শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতায় ও "নিউইণ্ডিয়ার" মধ্য দিয়া দেশাত্মবোধসূচক ভাবপ্রবাহের বন্যার ধারা বহাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন নিজে তখন দেশের কার্য্যে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সমগ্র চিত্ত দেশের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন ব্যবহারাজীবদিগের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রিয়জনদিগের বিয়োগে তাঁহার হৃদয় মহত্তর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। প্রিয়জনদিগের বিয়োগব্যথার অশ্রু তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়া দিয়াছিল—তিনি তাঁহার রচয়িতার উদ্দেশ পাইয়াছিলেন। বাহিরের লোক দেখিত, তিনি অতুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। দুই হাতে তাহা বিলাইয়া দিতেছেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিত, তাহার সন্ধান কয় জন রাখিত? যোগ্য অযোগ্য নির্ব্বিচারে তিনি দান করিতেন, সাংসারিক বুদ্ধিমান্ মানুষ তাঁহার এই নির্ব্বিচার দানকে সমর্থন করিত না; কিন্তু যাহারা তাঁহার স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহারা জানিত, চিত্তরঞ্জন পাত্রা-পাত্রনির্ব্বিচারে যে দান করিতেছেন, তাহাতে তিনি বিশ্বনিয়ন্তারই সেবা করিতেছেন। যোগ্য ও অযোগ্যের রূপ ধরিয়া সেই পরম পুরুষই তাঁহার সেবাগ্রহণ করিতেছেন।

তাহার পর গন্ধীজীর সহিত চিত্তরঞ্জনের মিলন। এই মিলনের সমগ্র ফল সাধারণের জ্ঞানের অগোচর। আমরা কেহই তাহার সম্যক্ বিবয় জানি না—লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়া-ফল হয় ত পরিপুষ্ট হইতেছে। যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরিচয় চিত্তরঞ্জনের শবানুগমনে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর এই ভাব-প্রবাহকে, হিমালয়ের তুষারজটাশীর্ষ হইতে উদ্ভূত জাহ্নবী-প্রবাহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাসন্তী দেবীর প্রতি সরোজিনী নাইডুর পত্র

বাসন্তী, আমার বাল্যকালের খেলার সাথী, আমার প্রিয়সখী, তোমার নিকট আমি বহুবার পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু পারি নাই। আমি এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই, যাহা দ্বারা তোমাকে দারুণ শোকে·সান্ত্বনা·দেওয়া যাইতে পারে।

তুমি আজ যে কি শোক পাইয়াছ, তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে ত সাধারণ বিধবার মত একাকী অন্ধকার গৃহকোণে বসিয়া শোক করিতে হইতেছে না। আজ ভারতবাসিমাত্রেই তোমার পতির মৃত্যুতে শোকার্ত্ত। তুমি রাণী—দেশবাসীর ·শোক তোমার মুকুটস্বরূপ হইবে। দেশবাসী যে তাঁহাদের রাজার মৃত্যুতে শোকাবনত—দেশবন্ধুর কথা মনে হইলে, আমার ঐ এক কথাই মনে পড়ে। ইতঃপূর্ব্বে আমি দেশনেতা স্বাধীনতার যুদ্ধের সেনাপতি দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু আজ আমি ভক্তি জানাইতে আসি নাই। আমি আমার শৈশবের চিত্তদাদার প্রতি আমার ভালবাসা জানাইতে চাই। তিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে যাহাই হউন না কেন, আমি তাঁহাকে চিরকালই আমার চিত্ত-দাদা বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি জানি, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কি মহান্ ছিলেন। ইতিহাস পাঠে সকলেই জানিতে পারিবে, তিনি স্বরাজের জন্য কিরূপ নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না, সাংসারিক জীবনে তিনি কি মহান্, কি উদার ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রসবোধ, অসীম প্রেম, প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধির অসীম শক্তি, পৃথিবীর লোকে জানিতে পারিবে না। তাঁহার হৃদয়ে মহান্ কবি সুপ্ত ছিল, তাই সংসারের ক্ষুদ্র দুঃখ-কষ্ট তাঁহার হৃদয়ে ভাবের বন্যা তুলিত, তাই তিনি বৈষ্ণবকবিদের ন্যায় শেষ জীবনে ঈশ্বরপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমি মনে-প্রাণে তাঁহার হৃদয়ের এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাই আজ আমি শোকে এতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ এই যে, বসুমতী আজ এমন একটি রত্ন হারাইলেন। দেশবন্ধু মনে প্রাণে কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলে মনে হয়, এক জন কবিকে পৃথিবীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে কবিজনোচিত একটা কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইত।

বাসন্তী, চিত্তদাদার সহধর্ম্মিণী, তোমার সৌভাগ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তুমিই ছিলে তাঁহার মহান্ হৃদয়ের আবাসস্থল। তোমাকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা যে কি সৌভাগ্য, তাহা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? বহু শরৎ, বর্ষা ও বসন্ত তোমাদের জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু তুমি ছিলে তাঁহার প্রেম-রাজ্যের চিরবসন্ত। তুমি আদর্শ হিন্দু স্ত্রী ছিলে, তুমি তোমার নাম সার্থক করিয়াছ, তাই আজ দেশবাসী তোমায় ভক্তি করে—পূজা করে।

মহাত্মাজী তোমার নিকটে আছেন, এই সংবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি এবং তোমার স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি আরও আনন্দিত হইয়াছি। আমি জানি, মহাত্মাজী স্ত্রীলোকের ন্যায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। তাঁহার মধ্যে মাতৃত্বের অংশ আছে, তাই আমি তিনি তোমার নিকট আছেন শুনিয়া স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি।

আমার শরীর অসুস্থ। যত সত্বর সম্ভব তোমার সহিত মিলিত হইব। আমরা সকলেই দেশবন্ধুর আদর্শে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি জানি, তুমি শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না,—তোমার স্বামী—দেশের রাজা আজ পরলোকে; তুমি রাণী, তোমাকেই তাঁহার স্থান অধিকার করিতে হইবে।

মহাত্মা গন্ধী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রাদ্ধদিবসে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দেশের সর্ব্বত্র অপরাহ্ণ ৫টার সময় শোক-সভার অধিবেশন হইবে। কলিকাতায় তিনটি স্থানে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—(১) টাউন-হল—সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য, (২) গড়ের মাঠ—জনসাধারণের জন্য, (৩) য়ুনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট হল—মহিলাদিগের জন্য।

টাউন হল

টাউন হলে প্রবেশের জন্য টিকিট করা হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দ ছাড়া অপর কেহ প্রবেশাধিকার পায়েন নাই। কাযেই অন্যান্য সময়ে টাউন হলে সভায় যেরূপ অধিক লোকসমাগম হয়, সেরূপ হয় নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, য়ুরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান, মাড়োয়ারী শিখ, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মডারেট, জাতীয় দল, স্বরাজী প্রভৃতি সকলে মতভেদ ও দলাদলি বিস্মৃত হইয়া পরলোকগত দেশকর্ম্মীর গুণগান করিতে আসিয়াছিলেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সভায় পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ও হাজি এ. কে গজনভী যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও সভাপতি মহাশয় সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজের বক্তৃতা

সভাপতি মহাশয় বলেন, আজ আমরা এক জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আমরা আজ রাজনীতিক দল ও মতের কথা ভুলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির জন্য তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিব।

তাঁহার বন্ধুপ্রীতির জন্য সকলে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। এই হলে সমবেত হিন্দুগণ সকলেই জানেন যে, শব্দ ব্রহ্ম ও শক্তি—মায়া! তাহা অমর, কাযেই দেশবন্ধুর স্মৃতিও অমর। তিনি আজ পার্থিব দেহে জীবিত না থাকিলেও অশরীরী হইয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আজ যেন আমরা তাঁহার রাজনীতিক মতের কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সদ্গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করি। আসুন, আজ আমরা সেই নেতার আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তাঁহার অনুরোধে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, দাশ মহাশয় কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করার পর তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। তাঁহাকে প্রথম জীবনে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং পরে নিজের শক্তির দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার আদর্শ পিতৃভক্তি ও অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেমের কথা সকলের নিকট সুবিদিত।

তিনি কাহারও দারিদ্র্য বা অভাব দেখিতে পারিতেন না। দেশের সেবার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুখ ছিল, তাই তিনি বিপুল আয়ের ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া দারিদ্র্য বরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু-স্মৃতি-সভায় গৃহীত প্রস্তাব

বিভিন্ন দল, বিভিন্ন সমিতি এবং বিভিন্ন জাতির পক্ষ হইতে সমবেত কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দের এই সভা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অকালমৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং শ্রদ্ধাসমন্বিত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার মহান্ গুণাবলী, আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ, অপরিসীম দয়া, বিপদ ও সমস্যার সম্মুখে অদম্য সাহস, বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি ন্যায়োচিত ব্যবহার, জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং দীন-দুঃখীর বেদনায় সমবেদনা ও দুঃখানুভবের কথা স্মরণ করিতেছে।

এই সভা পরলোকগত দেশপ্রেমিকের বিধবা পত্নী এবং পরিবারবর্গের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ শোক জ্ঞাপন করিতেছে।

মিষ্টার থর্ণ

বর্ত্তমান সমগ্র জাতি এক বিরাট শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাই অদ্য আমরা এখানে দলাদলিনির্ব্বিশেষে পরলোকগত মিঃ সি, আর, দাশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। এক জন ব্যারিষ্টার হিসাবে, ইংরাজ জনসাধারণের একটি দলের প্রতিনিধি হিসাবে এবং ইংরাজ শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আমি এক জন উদারহৃদয় বন্ধু, এক জন রাজভক্ত প্রজা এবং সর্ব্বোপরি এক জন অদম্য দেশপ্রেমিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিবার জন্য ঊর্দ্ধলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং উহা চিরশান্তি লাভ করিবে। আমরা এই জগতে রহিয়াছি। আমাদের পক্ষে তাঁহার বাক্য এবং কার্য্য হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত আশাকে কার্য্যে

পরিণত করা কর্ত্তব্য। তাঁহার চিতাভস্ম হইতে "সম্মানজনক সহযোগিতার" সৌধ উত্থিত হউক। তাহা হইলে আমরা ভারতের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য একযোগে কার্য্য করিতে পারিব। মহাত্মাজী যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি,—দেশবন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে, দেশবন্ধু চিরঞ্জীব হউন। আমি আশা করি, তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতের শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার জন্য তাহার একতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে, যাঁহার মৃত্যুতে তাঁহারা শোকপ্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাঁহার সহিত তাঁহারা অনেকেই একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার সহিত সমানভাবে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অনেকে পথের মাঝখানে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দাশ মহাশয়ের মৃত্যুতে যে শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে, তাহার স্রোতে বর্ত্তমানে সকল মতবিরোধ, সকল বিবাদ-বিসংবাদের অবসান হইয়াছে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে ২০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে তাঁহার সহিত মিলামিশা করিতেন। রাজনীতি বড়ই নির্দ্দয়। রাজনীতিই ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে, বন্ধু ও বন্ধুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। গত ৫ বৎসর যাবৎ তাঁহারা সাধারণ কার্য্যে পরস্পরের বিরোধী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসার বন্ধন অটুট ছিল। জীবনের শেষের দিকে দাশ মহাশয়ের ব্যবহারে এক অদ্ভুত মধুরত্ব দেখা দিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য সকলপ্রকার মতাবলম্বীদিগকে লইয়া একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছিল, জাতিধর্ম্ম এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি তাহাদের সহিত একতাবদ্ধ হইয়া একযোগে কার্য্য করিবার মানস করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা

টাউনহলে শোকসভা—দ্বারদেশে জনতা

তাঁহাদিগকে সেই বাণীই শুনাইতেছেন। মতের বৈষম্য ঘটিতে পারে, কিন্তু দেশের জন্য ভালবাসা বদলাইতে পারে না।

দাশ মহাশয় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি সমগ্র বাঙ্গালা দেশে, শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে নাই। তিনি কখনও কোন কার্য্য অর্দ্ধেক প্রাণ দিয়া করিতেন না, তিনি সখের রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেন না; তিনি জীবিতকালে দেশের এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জাতি তাঁহার জন্য যে শোক-ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহাতেই এই উক্তির সত্য উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রস্তাবটির সমর্থন করিয়া বলেন যে, দাশ মহাশয় সর্ব্বদা দেশের জনসাধারণের মনের গতি উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তিনি জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি দেশের জন্য প্রাণে প্রাণে দুঃখ অনুভব করিতেন। সেই জন্যই তিনি বহু বৃহৎ কার্য্য করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

আজ আমরা যে দুর্দ্দৈবের মধ্যে সমবেত হইয়াছি, তাহা অবর্ণনীয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আমাদের দুঃখে সুখের আকর এবং লজ্জায় গর্ব্বের উৎস ছিলেন। সহস্র সহস্র লোকের ন্যায় আমার নিকট তিনি কেবলমাত্র রাজনীতিক নেতা ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত উদারহৃদয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। আমার স্মরণ আছে, ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসি, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমাকে জানান যে, আমার বিষয় চিন্তা করিয়া দেশবন্ধু বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, আমাদের উদ্দেশ্য অব্যাহত রাখিয়া সসম্মানে কি উপায়ে আমাকে কারামুক্ত করিয়া আনা যায়, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আমার ন্যায় তাঁহার আরও লক্ষ লক্ষ অনুচর আজ আমারই ন্যায় দারুণ সমস্যায় পতিত হইয়াছে। তিনি আমাদের সকলের জন্যই কষ্টভোগ করিয়াছেন। অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে আমি আর কিছু ব'লব না। তাঁহার শবের শোক-যাত্রার দিন যে অসংখ্য লোক যোগদান করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? তাঁহার সহিত যাঁহাদের মতবিরোধ, তাঁহাদিগের সহিত অন্য সকলে যে দলনির্ব্বিশেষে অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, ইহার কারণ কি? এই স্থানের অনতিদূরে যে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতেছে এই যে, তিনি মানুষ এবং মানুষের মধ্যে, দল এবং দলের মধ্যে, শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখিতেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত কোন গরীব হিন্দু, ব্যবসায়ে নষ্টসর্ব্বস্ব ব্যবসাদার, গরীব অক্ষম ছাত্র, কোন দেশহিতকামী কর্ম্মী, কিংবা কোন নষ্টসর্ব্বস্ব রাজনীতিক বিরুদ্ধবাদী যে কেহই তাঁহার নিকট যাইত, সকলকেই তিনি সমান চক্ষুতে দেখিতেন, তাঁহার নিকট কোন ভেদাভেদ ছিল না। এই প্রকারের প্রার্থীদিগকে তিনি অর্থ দান করিতেন। দেশের জন্য তাঁহার আজন্ম সঞ্চিত ভালবাসা, তাঁহার আত্মত্যাগের মহান্ দৃষ্ট, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার অদম্য যুদ্ধ—এই সকল কার্য্যের জন্যই তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে দেবতার আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের মধ্যে দেবতা ছিলেন। দেশবন্ধু মারা যান নাই; আমাদের জাতীয়তার স্মৃতির সহিত তিনি চিরদিনের জন্য অমর হইয়া থাকিবেন। আজ আমাদের গভীরতম শোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। পরলোকগত কর্ম্মবীরের আত্মা আমাদিগের সকলকে একতাবদ্ধ হইতে বলিতেছে।

সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

টাউনহলের সভা বক্তৃতা করিবার জন্যই বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করার অভ্যাস এখনও আমাদের দেশ হইতে যায় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় নেতৃবৃন্দকে সেই জন্য বলিয়াছিলেন—"তোমরা অন্ততঃ এক জন করিয়া প্রত্যেক প্রস্তাব সম্পর্কে বাঙ্গালায় বক্তৃতা কর। নচেৎ তোমাদের কথা দেশের জনগণ বুঝিতে পারিবে না। সরকার যত দিন না দেখিবে যে, তোমাদের পশ্চাতে দেশের জনগণ আছে, তত দিন তোমাদিগকে কিছুই দিবে না।" ঘোষ মহাশয়ের কথানুযায়ী বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ হইলেও অনেকে এখনও ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেই ভালবাসেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ইংরাজীতে বক্তৃতা না করিলে তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না।

তাই টাউনহলে বহু বক্তার ইংরাজী বক্তৃতার পর সার প্রভাসকে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে শুনিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই।

সার প্রভাস বলেন, চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে এখন এখানে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা একান্ত অনাবশ্যক। তাই আমি শুধু একটি কথাই বলিব। তাহা তাঁহার স্বদেশপ্রেম। তাহার সহিত আর কিছুরই তুলনা করা যায় না। দেশের প্রতি দেশবন্ধুর ভালবাসা—ওজন করা ভালবাসা নয়। তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন—শুধু তাঁহার দেশপ্রেমের জন্য। মাতা তাঁহার মৃতপ্রায় পুত্রের জন্য যেরূপ কাতর হয়েন, দেশবন্ধু তাঁহার পরাধীন দেশের জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক কাতর হইয়াছিলেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহার জন্য যত্ন ও চেষ্টার কখনও ত্রুটী করিতেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ঈপ্সিত সাধনের জন্য জীবন পর্য্যন্তও দান করিয়া গিয়াছেন। আজ আমার সম্মুখে বহু হিন্দুসন্তান উপস্থিত আছেন—আমার বিশ্বাস, হিন্দুসন্তান সকলেই কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেই কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া আজ আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি—দেশবন্ধু দেশের মঙ্গলের জন্য যে মহাত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ফল দেশ অবশ্যই পাইবে।

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ঝঙ্কারপূর্ণ বাঙ্গালা ভাষাতে বক্তৃতা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি অপূর্ব্ব রহিয়াছে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের উপক্রমণিকাটি আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

হীরেন্দ্র বাবু বলেন—দেশবন্ধুর অকাল-বিয়োগে দেশের মধ্যে আজ যে বিপুল ব্যথা ও বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহারই প্রেরণা আজ এই বিপুল জনতারূপে প্রকট হইয়াছে, তাহাই আজ ভারতের নানা স্থানে নরনারীবৃন্দকে সমবেত করিয়াছে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের আঘাতে দেশবাসীর হৃদয়ে আজ নৈরাশ্য, আশঙ্কা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। হয় ত কর্ণধারবিহীন তরণীর মত আমাদের জাতীয় জীবনতরী দেশবন্ধুর অভাবে আজ বিপন্ন হইবে, আমাদের এত আদরের—এত সাধনার স্বরাজসাধনা অবসিত হইবে। আজ আমি এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে কিছু আশার আলোকসঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা আজ আমি আপনাদিগকে শুনাইব—

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল—কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য—এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার—মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট—ভয়ানক—তাহার ভিতরে কখনও মনুষ্য যায় না! পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর স্বর ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না। একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অনন্ত শূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল—

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না!" শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ; তখন কে বলিবে যে, এই অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল ; আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল—

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল :—

"তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল—"পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল—"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে—আর কি দিব?"

তখন আকাশবাণী হইল—"সর্ব্বস্ব"।

দেশবন্ধু এই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সর্ব্বস্ব-ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিলেন—ত্যাগের ভিত্তি ভিন্ন ভারতে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

এখন আর সে দিন নাই। এখন আর দেশকে "অবসরমত তোমায় ভালবাসিব" বলা চলে না। তাঁহার ত্যাগের জন্যই তিনি জাতির হৃদয়ে বিপুল সম্মান ও সমাদরের আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসাধারণ ত্যাগ কখনও ব্যর্থ হইবে না—তাহা কখনও বিফল হইবার নহে। এই পরাধীন, পরপদদলিত, ধিক্কৃত দেশে যদি কোন দিন স্বরাজের ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা এ ত্যাগের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি যে ত্যাগের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক দিন ফলিত হইবে—তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে। তাহারই ছায়াতলে এই প্রাচীন জাতি স্বস্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিবে। তাহার ভিত্তির উপর, তাহাতেই দেশমাতৃকার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা ধন্য হইব।

আমাদের সেই সুজলা, সুফলা, অমলা, কমলা, সুস্মিতা, ভূষিতা মাতার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আমরাও বলিব—"বন্দে মাতরম্"।

মিষ্টার মরণো

তাহার পর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিষ্টার এচ, ডবলিউ, বি, মরেণো বক্তৃতা করেন। তিনি দেশবন্ধু ও মহাত্মার সহিত তাঁহার পরিচয় ও আলাপের কথা বিবৃত করিয়া বলেন—"আমি দেশবন্ধুর শেষ বাণী শুনিয়াছি। আশা করি, স্বরাজ-সংগ্রামের যোদ্ধা নিহত হইলেও এই সংগ্রাম অকালে শেষ হইবে না।"

মুজিবর রহমন

তাহার পর মুসলমান-সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমন বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি বলেন—"আমার আর কিছু বলিবার নাই। শ্যামসুন্দর বাবু প্রভৃতি দেশবন্ধুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।"

লেফ্টেন্যাণ্ট বিজয়প্রসাদ

সিংহ রায়ও ইংরাজীতে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর—

কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়

মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন—দেশবন্ধু দাশ মহাশয় জমীদার সম্প্রদায়ের যেরূপ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, দেশের অপর কোন নেতা তাঁহাদের সেরূপ শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন নাই।

রায় সাহেব জয়লাল

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি দেশবন্ধুর নানা গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এম, কে, আচারিয়া

কলিকাতাবাসী অবাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর—

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

বলেন, আমি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের কার্য্যকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা, বন্ধুপ্রীতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণের অনেক পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে সব গুণের কথা লোক ভুলিয়া যাইবে, থাকিবে শুধু তাঁহার ত্যাগ। দধীচির তনুত্যাগ, সিদ্ধার্থের রাজ্যত্যাগ প্রভৃতির কথা ভারতের কন্দরে, পর্ব্বতে এখনও বর্ত্তমান আছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কালে আবার নূতন ত্যাগী সন্ন্যাসীর উদয় হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? দেশে এত লোক থাকিতেও সকলে তবে দেশবন্ধুর জন্য আজ এত শোকপ্রকাশ করিতেছেন কেন? কিন্তু অতীতের ত্যাগের সহিত এ যুগের ত্যাগের অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। অতীতযুগের ত্যাগ পরলোকমুখী ছিল। কিন্তু এই নূতন যুগের ত্যাগী সেরূপ না হইয়া ইহলোকের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান সময়টিকে স্বর্গের শোভায় শোভিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, ত্যাগের এই নূতন ধারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য ভগবান্ এই দেশবন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, দাশ মহাশয়ের এই ত্যাগের ফলে অধীন ভারত আবার স্বাধীনতার মুখ দেখিবে। অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—দেশবন্ধু অসময়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক হিসাবে কথাটা সত্য বটে, কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। যীশুখৃষ্ট ৩০ বৎসর বয়সে ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাতে লোক বলিল, মহা অনিষ্ট হইয়াছে। এখন কিন্তু পাশ্চাত্যের অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, তাঁহার মৃত্যুতে ভালই হইয়াছে—তিনি বেশী দিন বাঁচিলেও আর কিছুই হইত না।

দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধেও আমি সেই কথাই বলি। তিনি অধিক দিন বাঁচিলে হয় ত স্বরাজ্য দলের শিষ্যদের সুবিধা হইত—কিন্তু তাঁহার মৃত্যু দেশের মঙ্গল আনয়ন করিবে, তাই আজ দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতে চাই—তোমরা যদি কিছু করিতে চাও—তাহা হইলে ত্যাগ স্বীকার কর—ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ কর।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন

বলেন—যদিও আজ শোকে আমার মন আচ্ছন্ন তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি—"নীরবতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা।" দেশবন্ধু দাশকে রাজনৈতিক গুরু বলিয়া মানিতাম। গত ৫ বৎসর আমি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়াছি। একটি জিনিষ আমাকে বিশেষভাবে বিমোহিত করিয়াছে, তাহা তাঁহার পার্থিব লিপ্সাত্যাগ। আমি তাঁহার মধ্যে সুফী, সন্ন্যাসী ও রাজনৈতিক নেতার অনেক বিশিষ্ট গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। মহাত্মা গন্ধী যেমন ভারতের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত—দাশ মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ ছিলেন—বোধ হয়, ভারতের আর কোন নেতা এরূপ নহেন। আমাকে আমার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন—তোমাদের স্বরাজ্য দল ও দলের নেতা দেশবন্ধু দাশ এত অস্থির কেন? আমি বন্ধুর কথামত দাশ মহাশয়কে চাঞ্চল্য ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তরে দেশবন্ধু আমাকে জানাইয়াছিলেন—জীবন অনস্থায়ী।

তাহার পর সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চন্দ মহতাব প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে পাঠ করেন।

প্রস্তাব পাঠের পর সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।

তাহার পর শ্রীযুত রোস্তমজী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভাপতি মহাশয় সমবেত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ হয়।

—

য়ুনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে মহিলা-সভা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বুধবার ৫টার সময় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার য়ুনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউটে এক বিরাট মহিলা-সভা হইয়াছিল। স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভারম্ভে কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি সঙ্গীত গীত হইলে পর সভানেত্রী মহোদয়া এক বক্তৃতা করেন।

সভানেত্রী মহোদয়া নিজেই প্রস্তাবটি পাঠ করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তৎপরে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত কামিনী রায়ের "শ্রদ্ধা নিবেদন" সম্বন্ধে এক কবিতা পঠিত হইল, তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ডাক্তার হেলেন বিশ্বাস, মহিলা হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুতা রামা দেবী (হিন্দীতে), শ্রীমতী মোহিনী দেবী ও পর্দ্দানসীন মহিলাদিগের পক্ষ হইতে শ্রীমতী বিদ্যাধিনী রায় চৌধুরী বক্তৃতা করেন। তখন শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী একটি গান গাহেন।

সর্ব্বশেষে মহাত্মা গন্ধী উপস্থিত হইয়া হিন্দী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন ও কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী তাহা বাঙ্গালায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

গড়ের মাঠে

গড়ের মাঠে কলিকাতা ফুটবল ক্লাবের গ্রাউণ্ড ও রেড রোডের মধ্যস্থিত স্থানে বিরাট জনসভা হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা গন্ধী শ্রীযুত ললিতমোহন দাশকে দেশবন্ধু দাশের অকালমৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া সভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করেন। ললিত বাবু বঙ্গভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। মানুষের নশ্বর দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর অমর, তাহা মরিতে পারে না। দেশবন্ধু চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা রহিয়াছে। সেই আত্মা হইতেই আমাদের কাযের প্রেরণা আসিবে, আমাদিগকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতেই হইবে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

উর্দ্দু ভাষায় ললিত বাবুর উপস্থাপিত প্রস্তাবটি অনুবাদ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অদ্যকার এই শোকপ্রকাশের সভাতে দেশবন্ধু সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না। কেন না, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া আজ আমাদের সকলের হৃদয়ই বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার অসাধারণ নিষ্কলঙ্ক 'কোরবাণী' (বলিদান), প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, তাঁহার আদর্শ বদান্যতা তাঁহাকে চিরকাল মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে। পনর দিন পূর্ব্বে যে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহাতে ভারতের যে মহৎ ক্ষতিসাধন হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তব্য শেষ হইলে শ্রীযুত পুরুষোত্তম রায় হিন্দীভাষায় ও অক্সফোর্ড মিশনের

ফাদার হোম্‌স

ইংরাজী ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর কংগ্রেসকর্ম্মী মাদারীপুরের শ্রীযুত

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথার অবতারণা করেন। তিনি বলেন, আজ যদিও আমরা সকলে এই স্থানে শোকপ্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, কিন্তু তবুও এই শোকের মধ্যে আমার এইটুকু আনন্দ যে, এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে আমাকেও অনুরোধ করা হইয়াছে। আমি

চিররঞ্জনকে

বলিতে চাহি, ভাই চিররঞ্জন, তুমিই শুধু পিতৃহীন হও নাই, আমরা সকলেই পিতৃহীন হইয়াছি। মা বাসন্তী দেবি, তুমিই শুধু স্বামিহীনা হও নাই—সকলেই স্বামী হারাইয়াছে। দেশবাসীদিগের নিকট আমার বক্তব্য, দেশবন্ধুর পরলোকগমনে তোমরা এক জন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছ। দেশবন্ধু দেশের এক জন বন্ধুর মত বন্ধু ছিলেন। তিনি দেশের ও দশের কাযে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রের মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহেন নাই। দেশের কাযে তিনি স্ত্রী-পুত্র, বাড়ী-ঘর, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিরাট দান আর কে কখন্ করিয়াছেন? তুমি হয় ত বলিবে, রাজা হরিশ্চন্দ্রও এই প্রকার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু তিনিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া

১লা জুলাইয়ের ময়দান—সভায় মঞ্চের উপর মহাত্মা গন্ধী, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ

এই প্রকার দান করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে কিন্তু কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দান করিতে হয় নাই। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই এই বিরাট দান করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিরাটত্ব, এই প্রকার মাহাত্ম্য শুধু ভগবানেই সম্ভব। ভগবান্ নরদেহের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়েন। এক দিন স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, দেশের মুক্তিবার্ত্তা ভারতবাসীর মুখ হইতেই বাহির হইবে। ভারতবাসীই এই ভাবধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবেন। আজ যিনি আপনাদিগের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি অহিংসার মধ্য দিয়া ভাবধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। দেশবন্ধু এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুগোবিন্দ সিং তারস্বরে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে কে প্রাণ বলি দিতে পার—অগ্রসর হইয়া আইস; তাঁহার আহ্বানে যেমন এক জন সাড়া দিয়াছিলেন, সেই প্রকার দেশবন্ধুও দেশের আহ্বানে দেশের কাযে জীবন দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আর কয়েকটি কথা বলিয়া বলেন, তাঁহাকে যদি সঞ্জীবিত রাখিতে হয়—তাঁহার স্মৃতি যদি চিরজাগরূক রাখিতে হয়, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার পদানুসরণ করিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে

মহাত্মা গন্ধী

হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন—ভাই সকল! ভগবান্ দেশবন্ধুর আত্মাকে যাহাতে সুখে ও শান্তিতে রাখেন, সে জন্য আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অদ্যকার প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং ১ মিনিট কাল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন।

মহাত্মাজীর আদেশমত সভাস্থ সকলেই ১ মিনিটকাল দণ্ডায়মান হইয়া দেশবন্ধুর আত্মার কল্যাণকামনা করেন এবং মহাত্মাজীর আদেশেই সকলে পুনর্ব্বার উপবেশন করেন।

ইহার পর মহাত্মাজী মঞ্চোপরি আসনে উপবিষ্ট হইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন—ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আমাদের এই সভার কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। আমি জানি, আপনারা চাহেন যে, আমি এ সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলি। আপনারা যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত এই সভার কায সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। সে জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

দেশবন্ধুর স্তুতি নিরর্থক। দেশবন্ধুর জন্য আমার প্রাণে যে প্রেম ও প্রীতি আছে, তাহা আর কি বলিব। দেশবন্ধুর সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষ হইতে আমি যে সব সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে আমার সন্তোষ ও অভিমান বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এমন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য কেবল ভারতবর্ষ নহে, পরন্তু সমস্ত পৃথিবী শোকার্ত্ত।

আমি রোদন করিয়া দেশবন্ধুর আত্মার অকল্যাণ করিতে চাহি না। আপনারা জানেন, দেশবন্ধুর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত আমরা একটি হাসপাতাল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। দেশবন্ধু

১লা জুলাইয়ের ময়দানসভায় সমবেত জনমণ্ডলী

তাঁহার বিরাট ভবন জনসাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ট্রাষ্টীদিগকে ঐ বাড়ী হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। হাঁসপাতাল ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, শিখ, জৈন প্রভৃতি যে যে সম্প্রদায়ের লোক বাঙ্গালায় থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে ঐ ১০ লক্ষ টাকা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। যদি ঐ চাঁদা আদায় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ঐ টাকা আদায় করিবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ জন্য সকলকে আরও উৎসাহের সহিত কায করিতে হইবে। যাহাতে জুলাই মাসের মধ্যে ঐ টাকা আদায় হয়, সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সে সব চাঁদা আসিতেছে, ৩।৪ জন লোক সারা দিন ধরিয়া গণনা করিতেছে। দেশবন্ধু স্বরাজের জন্য জীবিত ছিলেন এবং স্বরাজের জন্যই তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন. আমি স্বরাজ চাহি। আপনারাও স্বরাজ চাহেন। ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ ভিক্ষা করিলে চলিবে না। যে দিন হিন্দুস্থানের কোন লোকও কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করিবে না, যে দিন কেহ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাইবে না, যে দিন হিন্দু হিন্দুর সহিত ঝগড়া করিবে না এবং যে দিন হিন্দুগণ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবে, সে দিন হিন্দুস্থানে প্রকৃত স্বরাজলাভ হইবে।

বীর চিত্তরঞ্জন যে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। তাঁহার জন্য রোদন করিলে চলিবে না। পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে, শোক করা পাপ। রাজপুত জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইত, তখন অন্য যোদ্ধা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ চালাইত। তাহারা কেহই রোদন করিত না। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন রবার্টসের পুত্র নিহত হয়েন, তখন তিনিও এ জন্য কোন প্রকার শোক না করিয়া সোৎসাহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমাদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহে কায করিতে হইবে।

এক জন পানওয়ালা দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমার নিকট ১ টাকা ৪ আনা পাঠাইয়া দিয়াছে। আমি উহা লক্ষ টাকা বলিয়া মনে করি। যদি ধনী, দরিদ্র, সকলেই এইরূপ ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দেন, তাহা হইলে ১০ লক্ষ টাকা তুলিতে দেরী হইবে না। এই টাকা তুলিবার জন্য অনুনয়-বিনয় না করাই কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, সকলেই আপনা হইতে ঐ টাকা দিবেন।

হিন্দুস্থানের অধিবাসিবৃন্দ হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করিতে চাহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যত দিন এইরূপ ভাবে বিবাদ চলিতে থাকিবে, তত দিন হিন্দুস্থান স্বাধীন হইবে না।

আগামী কল্য বকরীদ উপলক্ষে দিল্লীতে যে কি হইবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। উহা ভাবিয়া মৌলানা সাহেবের বুক কাঁপিতেছে।

মাদ্রাজ ত্রিপলিকেন বিচ তিলকঘাটে দেশবন্ধুর শোকসভা। রেভারেণ্ড বিটম্যান বক্তৃতা করিতেছেন

সর্ব্বপ্রথমে সভার সকলে কিছুক্ষণ উপাসনা করেন—তৎপরে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। মিষ্টার ইয়াকুব হাসান, শ্রীযুত প্রকাশম, রাও বাহাদুর কাও স্বামী চেট্টিয়ার, শ্রীযুত গোপাল মেনন প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কংগ্রেস সভার উদ্যোগে 'ভজন' দল সহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। সকলকে সভায় যাইবার সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বাজার ও দোকান-পাট সমুদয় বিকাল ৩টায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মোগল বাদশাহদিগের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত দিল্লীতে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কেন যে পরস্পরের মধ্যে এরূপ বিবাদ করেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভারতের ৩৩ কোটি লোক শান্তিতে বাস করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

এখন পল্লী সংগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। তাহাদিগকে কায করিতে হইবে—কাযের জন্য, নামের জন্য নহে। এইরূপ স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মহাত্মাজী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবার পর সকলকে শান্তিতে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন।

মহাত্মার আদেশানুসারে সকলেই ধীরে ধীরে শান্তভাবে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন।

মাদ্রাজ

১লা জুলাই অপরাহ্ণে মাদ্রাজ ত্রিপলিকেন বীচ তিলক ঘাটে সকল রাজনীতিক দলের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দেশমত দেশবন্ধু দাশের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার স্বর্গগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বরাজ্য দলের নেতা শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বোম্বাই টাউনহলে

১লা জুলাই দেশবন্ধু দাশের শ্রাদ্ধবাসরে বোম্বাইয়ের সেরিফের আহ্বানে টাউনহলে এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল। বেসেন্ট সায়

বোম্বাই পাড়েলে এক ওয়ার্ডের অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে আহুত দেশবন্ধু শোকসভা—সভাপতি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য মিঃ ব্রি. দাস

মিসেস পেটিট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত ফেরোজ সেঠনা শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত এস, পি, মোদি, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস, শ্রীযুক্ত জোসেফ ব্যাপটিষ্টা, শ্রীযুক্ত জে, কে, মেটা ও মিঃ, কে, এফ, নরিম্যান সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পার্শী-সভা

২৮ জুন রবিবার অপরাহ্নে বোম্বাইয়ের পার্শীগণ [illegible] এক সভায় সমবেত হইয়া দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] বক্তা ও সভাপতির [illegible] কুমারী মিথন, এ, টাটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন

ভারতের দেশবন্ধু বাঙ্গালার হে চিত্তরঞ্জন
এ কি হ'ল আজ,
সহসা হিমাদ্রি মূলে বেজে ওঠে কালের বিষাণ
বিনা মেঘে বাজ!
তুমি যে এমনি ক'রে অকস্মাৎ কালের আহ্বানে
চ'লে যেতে পার,
হতভাগ্য মোরা তাহা স্বপনেও পারিনি ভাবিতে
কভু এক বার।
কাল প্রহরীও যদি অসতর্ক তন্দ্রার আলসে
হয়ে থাকে কভু
তোমার জাগ্রত আঁখি নিশিদিনে বর্ষান্তে পলক
ফেলেনি যে তবু।
আর যে যেথায় যাক স্বার্থ কিবা মরণের টানে
তুমি রবে স্থির
কালের পরশাতীত মর্ম্মে মর্ম্মে ছিল যে মোদের
বিশ্বাস গভীর!
প্রাণপুঞ্জ ওই তব জীবনের দীপ্ত প্রতিভায়
ঝলস চেতন,
বুঝি নাই ভাবি নাই স্বপনেও জানি নাই কভু
ঘটিবে এমন!
চাহিয়া তোমার পথ প'ড়ে আছে দুর্ভাগা দেশের
শত শত বীর,
হে নেতা, হে দেশবন্ধু—ভারতের হে চিত্তরঞ্জন
কোথা তুমি আজ

জীবনে প্রথম আজ কার ছেড়ে কোথা আছ তুমি
কর্ম্মযোগী হয়ে
সাফল্যের মুখে তোমা ক্রুর কাল আসি অকস্মাৎ
কোথা গেল লয়ে!
ভাবিতে পারি না আজো – সেই তব প্রশান্ত মুরতি
হেরিব না আর
উদার গম্ভীর সেই আননের অব্যর্থ দীপনা
কর্ম্ম-প্রেরণার—
তেজঃপুঞ্জ নয়নের অন্তরালে প্রেমবেদনার
অশ্রু টলটল
বীরের কবচে ঢাকা 'জননীর হিয়া'খানি যেন
কুসুম কোমল।
ধূর্জ্জটির জটা হ'তে ভৈরব গম্ভীর-নিনাদিনী
জাহ্নবী-ধারায়
নবজীবনের উৎস তোমা হ'তে এসেছিল নামি
মৃত বাঙ্গালায়,
কি ত গিয়াছ চলি বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য-রথের
হে মহাসারথি!
স্তূপীকৃত অন্ধকার আজি শুধু উঠিছে মোদের
মর্ম্মতল মথি,
দুর্ব্বার সান্ত্বনাহীন শোকতুঃ গাঢ় কালিমার
ঘন যবনিকা
সহসা ফেলিয়াছে ঢাকি বাঙ্গালার জাগ্রত প্রাণের
হোমানল-শিখা!

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার রায়।

চিত্তরঞ্জন

বিরাট পুরুষ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিবার মত শক্তি আমার নাই—ভাষা এখানে মূক হইয়া যায়। তাঁহার অকাল-তিরোধানে মনে হইতেছে, আমার নিজেরই নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে। অতি অল্পদিনের জন্য দার্জ্জিলিং শৈলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রীতিপ্রদ ব্যবহারে মন পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত, হৃদয়ে একটা অনবদ্য ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

নেতা হিসাবে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার বঙ্গদেশমধ্যে আর কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তাঁহার শূন্য সিংহাসন বর্ত্তমান যুগে কে অধিকার করিবে? তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনে [illegible] যে উদ্বেল-ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার তুল্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস এই ঘটনা বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে।

জনসাধারণের এই প্রীতি—তাহাদের শ্রেষ্ঠ নেতার প্রতি এই শ্রদ্ধা যদি অকৃত্রিম ও গভীর হয়, তবে তাহারা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সারাজীবনের সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে বিস্মৃত হইবে না। পরলোক হইতে তাঁহার আত্মা দেশবাসীর কার্য্যকলাপের উপর নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখিবে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়।

অমর

সাজে না যে আর বলা "নাই নাই"
নিয়ত যখন দরশ মেলে
নয় অবশেষ অঙ্গার ছাই
চিতার আগুনে যা' এলে ফেলে!

গঙ্গার সাথে বঙ্গেরে ঘেরি'
করুণা-ধারায় বহিয়া যান
নর্ম্মদা, ইরা, সিন্ধু, কাবেরী
তমসা বিঘোষে বিজয়-গান!

হিমগিরি সাথে মেঘভেদী আশে
ভারতের বুকে ফেরেন তিনি
মন্দাকিনীর পীযূষ নিশাসে
'সাগর-গীতিতে' সে গান চিনি!

রক্তের সাথে ধমনী শিরায়
তরুণ হৃদয়ে আসন রয়,
শৌর্য্যে সাহসে হিয়ায় হিয়ায়
উঠেছেন আজ মৃত্যুঞ্জয়!

বৃন্দাবনের মুরলী-মায়ায়
বেজে বেজে তিনি ওঠেন কানে
কানের অতীত যে কান সেথায়
সবার চিত্তে—সবার প্রাণে!

শ্রীলীলা দেবী।

শ্রাদ্ধ-বাসরে

প্রাণ দিলে প্রাণ পায়
মরণে দিয়েছ, তুমি তার পরিচয়;—
দেশ ছিল প্রাণ হ'তে প্রিয়তম যাঁর,
দেশের উন্নতি ছিল আত্মার আহার,
দধীচির প্রাণ লয়ে জনম যাঁহার,—
দানে সিন্ধু দেশবন্ধু দেশমাতৃকার!

শ্রীললিতমোহন সেন।

চিত্ত-শোকে

ভেঙ্গে গেছে হৃদি-বীণা, আর কি তুলিবে তান
চারিদিকে ব্যাকুলতা ভারত-গগন ম্লান।
স্বর্গসুখ পরিহরি মরতে মুরতি ধরি—
ভারত-চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীজাতির মান।
দেশসেবা-তরুমূলে, ধন-মান সমর্পিলে,
ভিখারী সাজিয়ে পরে ত্যজিলে আপন প্রাণ।
অপূর্ব্ব ত্যাগেরি ধারা বুঝিতে নারিনু মোরা
(সেই) অভিমানে বিষ্ণু-পদে লভিলে চরম স্থান।

শ্রীঅতুলানন্দ বক্সী।

স্মৃতিরক্ষায় আহ্বান

দেশবন্ধুর অকালে পরলোক-প্রয়াণের পর মহাত্মা গন্ধী বাঙ্গালার লোককে তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় উদ্যোগী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এ আহ্বানে বাঙ্গালা অচিরে অন্যূন ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিবে, মহাত্মা এ আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ আশা অমূলক নহে। যে বিরাট পুরুষ দেশের ও দশের মঙ্গলে সর্ব্বত্যাগী হইয়া শেষে আপনার অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়াছেন—যাঁহার সেই বিরাট ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া দেশবাসী দলে দলে কাতারে কাতারে তাঁহার শবের অনুগমন করিয়াছিল—আজিও যাঁহার অভাবের দারুণ জ্বালা দেশবাসী হৃদয়ের পরতে পরতে অনুক্ষণ অনুভব করিতেছে,—সেই কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক কলিকাতা সহরেই এক দিনে ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় ছিল না, সমগ্র বাঙ্গালা ত দূরের কথা!

দেশবন্ধু তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার আবাসভবন জনসাধারণের জন্য ট্রাষ্টীদের হস্তে দিয়া ঐ ভবনে মাতৃজাতির সেবায় এবং নারীর সেবা ও পরিচর্য্যা বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। উহার জন্য অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু মহাত্মাজী ও অন্যান্য নেতার আহ্বান সত্ত্বেও আমরা আজিও এক মাসকালমধ্যেও ৫ লক্ষের কিঞ্চিদধিক ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা নহে?

দেশবন্ধুর শবানুগমনে দেশবাসী আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যহ কত কবিতা, কত প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীজাতির শ্লাঘার বিষয় ছিলেন—বাঙ্গালী যে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া গর্ব্ব—অহঙ্কার করিত তাহা বাঙ্গালী আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করি। অথচ তাঁহার জীবিতকালের মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে সমর্থ হইব না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? কেহ কেহ নারী-হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সম্মত নহেন, তাঁহাদের মতে চরকার স্কুল করাই ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে দেশবন্ধুর নিজের ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করাই কি যুক্তিসঙ্গত নহে?

মহাত্মাজী নানা কার্য্যের ক্ষতি করিয়া কেবলমাত্র দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষায় অর্থসংগ্রহের জন্য এখনও বাঙ্গালা দেশে অবস্থান করিতেছেন। বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই যুগ-মানবকে আমরা আর কত দিন বাঙ্গালায় আটক করিয়া রাখিব?

তাই বাঙ্গালার ধনী নির্ধন আপামর জনসাধারণকে অনুরোধ,—তাঁহারা বাঙ্গালার মুখরক্ষা করুন—বাঙ্গালার বিরাট পুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য জগদ্বরেণ্য যুগাবতার মহাত্মা গন্ধীর আহ্বানে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য দান করুন। যিনি একবার দিয়াছেন, তিনি আবার দিউন—দ্বিগুণ দিউন। যিনি দেন নাই, তিনি সামর্থ্যানুসারে অবিলম্বে দিউন। সংগ্রহকার্য্যে নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া হয় নাই বলিয়া অনেকে অর্থসাহায্য দিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। এ জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে পল্লীতে পল্লীতে দেশের তরুণসম্প্রদায় অর্থসংগ্রহের জন্য অগ্রণী হউন।

বাঙ্গালার হৃদয় আছে—একবার সেখানে বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে সাড়া পাওয়া যায়। উত্তর বাঙ্গালার বন্যায় বাঙ্গালী যে সাড়া দিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। দেশবন্ধুর স্মৃতি-তর্পণের জন্য বাঙ্গালী তদধিক সাড়া দিবে, এমন আশা কি করা যায় না?

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারাও এই আহ্বানে সাড়া দিউন। আর সময় নাই। এই শ্রাবণমাসের মধ্যেই বাঙ্গালী যে যেখানে

আছেন, দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডারের ১০ লক্ষ টাকা ছাপাইয়া দিবেন, বাঙ্গালীজাতির কাছে এই আশার প্রতীক্ষা করা অন্যায় হইবে না।

অর্থসাহায্য 'বসুমতী' সাহিত্য-মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেই হইবে। বলা বাহুল্য, সংগৃহীত অর্থ নিয়মিত রূপে মহাত্মাজীর নিকট প্রেরিত হইবে।

বাঙ্গালী চিফ জষ্টিস্

সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ল্যান্সলট স্যাণ্ডার্সন অবকাশ গ্রহণ করিবার পর মাননীয় বিচারপতি সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এ নিয়োগে বাঙ্গালার জনসাধারণ সন্তোষলাভ করিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। নলিনীরঞ্জন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিচারকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ওকালতী করিবার কালে দেশের লোক তাঁহার গভীর আইনজ্ঞানের, বহু পরিশ্রম করিয়া মোকর্দ্দমা পরিচালনের এবং সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি সার রাসবিহারী ঘোষের নিকট ওকালতীর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। সুতরাং বিচারপতিরূপে তিনি যে নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। সামাজিক জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু, সংযত ও আড়ম্বরহীন গৃহস্থ। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও মধুর স্বভাবের গুণে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সুবিচারে জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস আছে। প্রধান বিচারপতির পদ তাঁহারই প্রাপ্য, এ কথা সত্য। তথাপি তাঁহাকে এই পদে উন্নীত করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাঁহার স্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

হিরন্ময়ী দেবী

গত ১৩ই জুলাই সোমবার হিরন্ময়ী দেবী পরলোক প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধা স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন নিজেরা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তেমনই ভাবে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ফলে শ্রীমতী সরলা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী ও শ্রীযুত জ্যোৎস্না-ঘোষাল বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। হিরন্ময়ী দেবী তাঁহার ভগিনী সুপ্রসিদ্ধা সরলা দেবীর সহিত একযোগে বহু দিন 'ভারতী' পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় হিরন্ময়ী দেবীর রচনা-শক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। সিথ-সমিতিতে এবং উহার সংশ্লিষ্ট নারী-শিক্ষা বিভাগে তিনি অনেক কায করিয়া গিয়াছেন। হিরন্ময়ী অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী ছিলেন। তাঁহার অভাবে এই পরিণত বয়সে শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী যে বিষম বিয়োগ-ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১

অন্তররূপিণী আমারি হৃদয়-অংশে,
আপনারে কেমনে করিব পূজা।
যদি স্বর্গ হ'তে আসিতে নামিয়া
পেতে সব অন্তরের উপাসনা,
এস কাছে এস, যেও না চলিয়া
আমার জীবন মন অপূর্ণ করিয়া।

* * *

২

বুঝেছি যৌবন তব
হেলেছে পশ্চিমপানে।
আমার আসিবে দিন—
স্বর্ণপাত্রে তপ্ত সুরা,
কামিনীর কলকণ্ঠ,
তত দিন দেখে লই জীবন কেমন।

* * *

৩

কেমনে দেখিব ভাল?
তুমি যে আমারি
আপন অন্তর-ছায়া
ছিলে মর্ম্মতলে
পূর্ণ করি এ প্রাণের।

ব্যারিষ্টাররূপে চিত্তরঞ্জন

৪

হে সুন্দরি! হে সুন্দরি!
কি চাহিছ আর!
এ প্রাণের প্রেম দিছি
কি দিব আবার?
আমার অন্তর-কূলে
তোমারে রেখেছি তুলে,
চিররাত্র চিরদিন সুন্দরি আমার,
অন্তরের প্রেম দিছি
কি দিব আবার।

* * *

৫

হে ঈশ্বর! অপার ঐশ্বর্য্য তোমার।
সর্ব্বপ্রেমধন—মানব-হৃদয়
কত সাধ কত আশা
করিয়াছে চিরদিন।

* * *

৬

কারে দিব পূজা—মানব-হৃদয়!
শিশু যুবা প্রৌঢ় প্রেম ভালবাসা
কোথায় ঈশ্বর?

---

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় রচিত অ-প্রকাশিত কবিতাবলী। পুত্র শ্রীমান্ চিররঞ্জনের সৌজন্যে তাঁহার পুরাতন নোট-বহি হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। (১৮৮৯।৯২ খৃষ্টাব্দে রচিত) কবিতাগুলি অসম্পূর্ণ।

অবসান

নারায়ণে ভক্তিমান্ ত্যাগী কর্ম্মবীর
হে মহাপুরুষবর, ইন্দ্রালয়ে আজি
চলিলে করিয়া সাঙ্গ কর্ম্ম পৃথিবীর—
দুন্দুভি জানায় বার্ত্তা সুরপুরে বাজি'।

একদা প্রভূত শক্তি করি' কেন্দ্রীভূত
সৃজিলা তোমারে ধাতা—অভিনব দান—
মরণে সে শক্তি হ'য়ে বিসর্পিত দ্রুত
প্রতি বঙ্গবাসি-হৃদে লভিলেক স্থান।

একতায় সে বিচ্ছিন্ন শক্তিরাশি যবে
একীভূত হ'বে—হ'বে মঙ্গল মহান্,
উদিবে স্বরাজ-সূর্য্য, কিরণ-বৈভবে
অদ্ভুত বিদ্যুত-দীপ্তি করি' পরিম্লান।
কোটি কণ্ঠে নর-নারী গাহিবেক তবে
তব জয়—মহাত্মার অতুল গৌরবে।

শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য।

ভ্রমসংশোধন—শ্রীযুত চিররঞ্জন দাশ জানাইয়াছেন, আষাঢ়ের 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত "আকাঙ্ক্ষা" ও "গুরুবরণ" কবিতা দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের রচিত নহে। আমাদের সংগ্রাহকের ভ্রমে এরূপ ভুল হইয়াছে।

আষাঢ়ে প্রকাশিত দেশবন্ধু দাশ, মতিলাল নেহরু, আচার্য্য রায় প্রভৃতির সমবেত ফটো চিত্র ও অক্সফোর্ডে চিত্তরঞ্জন—ফটো আর্টিলিয়ারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যাসহ সুরেন্দ্রনাথ

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান

সুরেন্দ্রনাথ যখন সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, প্রায় সেই সময়েই স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম র‍্যাঙ্গলার (Wrangler) স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও উভয়ে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজনীতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। আমার বয়স তখন সবে ১৩।১৪ বৎসর। কিন্তু সেই সময়েই যেখানে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন পাশাপাশি বক্তৃতার জন্য উপস্থিত হইতেন, আমরা পাগলের মত সেইখানেই ছুটিয়া যাইতাম। ইহার কিছু দিন পরেই ভারত-সভা (Indian Association) স্থাপিত হয় এবং ইহার উন্নতিকল্পে উভয়েই যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও প্রকারের রাজনীতি বা অন্যান্য আন্দোলনে বীতরাগ (cynic) হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন ও এই অনুষ্ঠানে যোগদানে অসম্মত হয়েন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিবার নিমিত্ত যাহাতে ভারতের যুবকবৃন্দ বিলাতে না যাইয়া এই দেশেই পরীক্ষা দিবার সুযোগ পায়, সে জন্য তিনিই ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র উত্তর-ভারত, আর্য্যাবর্ত্ত ও গৌড় অভিযানে বাহির হয়েন ও তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও বাক্‌কৌশলে সকলকে আলোড়িত, অনুপ্রাণিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেন। সে আজ কত কালের কথা।

ইহার পর আমি প্রায় ৪ বৎসর কাল মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে অধ্যয়ন করি। অধুনা সুকিয়া ষ্ট্রীটের যে স্থানে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য ভবন অবস্থিত, তখন সেখানেই উক্ত বিদ্যালয় ছিল। সেখানে আমি এফ-এ ও বি-এ ক্লাসে সুরেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলাম। তাঁহার নিকট Macaulay's Essay on Clive & Warren Hastings এবং Burke's Reflections

on the French Revolution প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করি। তিনি যে ভাবে মূল সাহিত্য অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। মনে হয়, এখনও যেন সেই ধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিলেন না।

রাজনীতি সম্বন্ধে আমার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা এই গুরুরই পাদপ্রান্তে লাভ করিয়াছিলাম। তখনকার বাঙ্গালার যুবকদের প্রাণে তিনিই নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। সেই বোধনের পুরোহিতের আজ তিরোধান হইয়াছে শুনিয়া প্রাণ গত যৌবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

নব্য ইটালীর সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট পুরুষ ম্যাটসিনির কথা সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন এবং তাঁহার সুমহান্ আদর্শে যুবকদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেন। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র আজ যে জাতীয় স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি, তাহার আদি কেন্দ্র ও মূলীভূত কারণ সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালী আজ অনেকখানি নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সেই যুগেই ছাত্র-সভা (Student Association) স্থাপিত হয় ও তিনি তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

ভুলে যায় পাছে

১

বঙ্গের সুরেন্দ্র নাই, ভারতের সুরেন্দ্র যে নাই!
তার লাগি ঘটা ক'রে আজ কেহ কাঁদিয়ো না ভাই।
তাহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিবার কর আয়োজন,
বর্ষ দশ পূর্ব্বে হলে হয় ত হ'ত না প্রয়োজন।
আজ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার একান্তই দরকার আছে
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

২

যে বুঝালে জাতীয়তা, বাণী যার জগৎ মাতায়,
ডাকিতে শিখায়ে দিল মা ব'লে যে ভারত-মাতায়।
প্রাচ্য প্রতীচ্যের মাঝে যে কান্তিল ভাবের যোজক,
অন্ধ বাউলের দেশে যে প্রথম শক্তির পূজক।
তার মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার একান্তই দরকার আছে,
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

৩

কপিলের মহাশক্তি সুপ্ত যার বক্তৃতার মাঝে
বাণীর নূপুরে যার চিরদিন বৈশ্বানর রাজে।
কপোত-কূজনে যার গরুড়ের শক্তি আচ্ছাদিত,
যে পুরুষসিংহে হেরি বৃটিশ সিংহও ভয় পেত।
তারি মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার একান্তই দরকার আছে,
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

৪

বঙ্গের বশিষ্ঠ গুরু, তেজস্বী নবীন ভৃগুমুনি,
ত্রিপাদ ভূমির ভিক্ষু বলি কাঁপে আবেদন শুনি'।
নব জাগরণ-ভেরী দীপকের ভয়াল গমক
দেবতার দৈববাণী কংসের যা লাগায় চমক,
তার মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার একান্তই দরকার আছে,
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

৫

শান্তির সে সেনাপতি যুদ্ধে প্রাণ দেয় নাই বটে,
তরুণ ভারত-প্রাণ চিরঋণী তাহার নিকটে।
বাঙ্গালীর হিমালয় শুভ্র শির আছে উচ্চ করি'
সম্ভ্রমে নোয়াক মাথা বিশ্ব তার গুণগ্রাম স্মরি'।
স্থাপ ভগীরথ-মূর্ত্তি দেশভক্ত গোমুখীর কাছে,
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

৬

ভারতের ভাবী সৈন্য নমি সেই বেদিকার তলে
তবে যেন দিগ্‌বিদিকে আলোকের অভিযানে চলে.
দেশনেতা যেন হেথা উষ্ণীষ নামায়ে রাখি তার
আশিস মাগিয়া, লয় দীনভাবে গুরু কর্ম্মভার।
বরবধূ সূতা খোলে যেন আসি এ মূর্ত্তির কাছে,
ভুলেছি যেমন মোরা, ছেলেরাও ভুলে যায় পাছে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সম্রাট সুরেন্দ্রনাথ

ভারত-সম্রাট স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক দিন বাঙ্গালার মুকুটহীন সম্রাট (uncrowned king of Bengal) ছিলেন। সেই বঙ্গভঙ্গজনিত তুমুল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সত্য সত্যই শ্যামবাজারের কোন প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে এক প্রকাণ্ড সভায় তাঁহার মস্তকে ফুলের মুকুট পরান হইয়াছিল, এবং এই ঘটনা উপলক্ষে ইংরাজদের পরিচালিত খবরের কাগজ সমূহ, এমন কি, বিলাতের Times (টাইম্‌স্) পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া শাসাইয়াছিল। এই সময়কার একটি দিনের ঘটনা আমি বিবৃত করিব।

সে বোধ হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, আমি তখন পুরুলিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। মিঃ এ, ডবলিউ, ওয়াটসন (Mr. A. W. Watson) সেখানে ডেপুটী কমিশনার ছিলেন। তাঁহার ন্যায় জবরদস্ত সিবিলিয়ান আমি খুব কমই দেখিয়াছি। কিন্তু আমার প্রতি তিনি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন ছিলেন। তিনি মাসের মধ্যে ২৫ দিন মফঃস্বলে থাকিতেন, তাঁহার অধিকাংশ কায আমাকে করিতে হইত। এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে তাঁহার কুঠীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি সেখানে গিয়া শুনিলাম, 'সাহেব' অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ভয়ানক বিপদ উপস্থিত।" তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে হইল—বোধ হয় "Empire in danger"—অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্ব বুঝি যায় যায় হইয়াছে! পরে তিনি দম ছাড়িয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি এখানে আসিতেছেন, তিনি রাঁচি গিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিবার সময় এখানে নামিবেন এবং এক দিন এখানে আসিয়া সভা করিবেন।" বেশ ত, তাহাতে ভয়ের কারণ কি? ভয়ের কারণ আছে বৈ কি? তিনি বাঙ্গালা দেশময় আগুন জ্বালিয়াছেন, এখন বাকী আছে ছোটনাগপুর; এখানে যদি অসভ্য সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডদের স্বদেশী হুজুগে ক্ষেপাইয়া তুলেন, তবেই সর্ব্বনাশ হইবে। 'সাহেব' আমাকে স্পষ্টাক্ষরে এই ভয়ের কারণ না বলিলেও আমি তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম। তখন সুরেন্দ্রনাথ পুরুলিয়াতে আসিলে তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ (receive) করা উচিত, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আমাকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখিয়া ইতোমধ্যে নানা স্থানে যে সকল টেলিগ্রাম করিবেন, তাহা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম, "সাহেব, আপনার কোন ভয় নাই, অতিরিক্ত পুলিস আনিবারও প্রয়োজন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়াই এ দেশের লোক হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই।" 'সাহেব' বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাঁহাকে recieve করা এবং তাঁহার সঙ্গে সভায় উপস্থিত থাকা ইত্যাদি কার্য্যের ভার তোমাকে দিতেছি, সাবধান, যেন কোন গোলযোগ না হয়।"

ওয়াটসন্ সাহেবের মত এক জন দুর্দ্ধর্ষ সিবিলিয়ানও সুরেন্দ্রনাথের নামে এতটা ভড়কিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই আমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইহাতে সেই বঙ্গের মুকুটহীন সম্রাটের এক সময়ে কতদূর আধিপত্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

যাহা হউক, আমার শাপে বর হইল। আমি এক জন গোঁড়া স্বদেশী, সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার এই সুযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি রাঁচি হইতে বেলা ১০টার সময় পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। সহরের সমস্ত লোক ষ্টেশনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল. লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় স্বদেশী নেতৃবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে শরৎচন্দ্র সেন উকীলের বাসায় তাঁহার থাকিবার যায়গা হইয়াছিল। এই দেড় মাইল পথ একটা টমটম গাড়ীতে তাঁহাকে চড়াইয়া এক দল স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে টানিয়া নিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা ও স্বদেশী-সঙ্গীত। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিলেই শরৎ বাবু আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেবের' প্রতিনিধি বলিয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। আমি তাঁহার গাড়ীর আগে আগে সেই শোভাযাত্রার সহিত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া শরৎ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমি পদব্রজে যাইতেছি দেখিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে তাঁহার পাশে গাড়ীতে বসিতে বলিয়াছিলেন; আমি অবশ্যই সে প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম। শরৎ বাবুর বাসায় যখন তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন, তখন কত লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। আমিও কিঞ্চিৎ আড়ালে এই কার্য্যটি করিলাম, কারণ, আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেবের' প্রতিনিধি। সুরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমার ছাত্র?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে না, আমি আপনার কাছে পড়ি নাই; তবে আপনি আমাদের সকলেরই গুরুস্থানীয়।" এই কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া সাধারণ লোকদিগকে বলাবলি করিতে শুনিলাম—"বাপ রে! ইনি কি এক জন সাধারণ লোক! কত হাকিম, উকীল, দারোগা ইঁহার পায়ের ধূলা লইতেছে!"
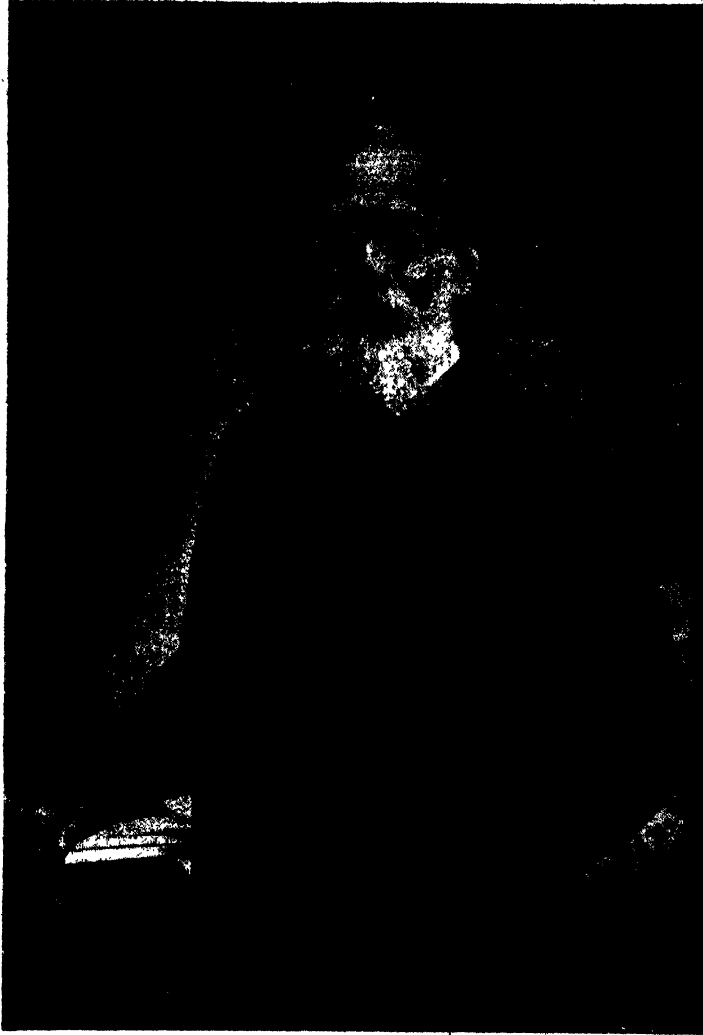
মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
[শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে।

সেই দিন বৈকালে ৩টার সময় ষ্টেশনের মাঠে সামিয়ানার নীচে এক বিরাট সভা হইল। পুরুলিয়া সহরের অধিকাংশ লোক সেই সভায় উপস্থিত হইল, মফস্বল হইতেও অনেক লোক আসিয়াছিল। কিন্তু সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা বড় কেহ আইসে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট

'সাহেবের' নির্দ্দেশমতে অল্প কয়েক জন পুলিশ প্রহরী এবং চারি পাঁচ জন পুলিস কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল। আমিও প্রেসিডেন্টের পার্শ্বে বসিবার আসন পাইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া প্রথমতঃ বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। পরে দুই এক জন নেতার অনুরোধে আবার ইংরাজীতেও বক্তৃতা করেন। বোধ হয়, তাঁহারা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা কখনও শুনেন নাই। তাঁহার বক্তৃতার সেই সমুদ্র নির্ঘোষবৎ ধ্বনি এখনও আমার কানে বাজিতেছে। সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি আবার ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। গাড়ী ছাড়িবার সময় মুহুর্মুহুঃ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি হইতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ যেন তাহাতে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সুরেন্দ্রনাথের পুরুলিয়া আগমনে ব্রিটিশ রাজ্যধ্বংসের কোন সম্ভাবনা হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব' আমার রিপোর্টে জানিতে পারিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।

এই ঘটনার ১২ বৎসর পরে আমার আর একবার সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সে বোধ হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। তখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বঙ্গের মুকুটহীন সম্রাট, "The people's Tribune," "Surrender-not"—তখন Sir Surendranath Banerjea Kt, গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, Hon'ble minister, আমি তখন নদীয়ার একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট। নদীয়ার মহারাজা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি জিলার জলকষ্ট নিবারণ ও অন্যান্য হিতকর কার্য্যের সম্বন্ধে একটি Conference আহ্বান করেন, আর সার সুরেন্দ্রনাথকে কলিকাতা হইতে সেই সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে আমরা কয়জন গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বর ছাড়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য কেহই যায় নাই। নদীয়ার মহারাজার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানেও মাত্র আমরা ২।৪ জন লোক দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণনগর কলেজ হলে সভা হইয়াছিল, সেখানে মহারাজার নিমন্ত্রিত অনেকগুলি মফস্বলের পঞ্চায়েত, কৃষ্ণনগরের অনেকগুলি উকীল, মোক্তার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের মেম্বর এইরূপ প্রায় ২।৩ শত লোক মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সম্পাদক—সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত আর্‌ক্‌কুমার চৌধুরীর গৃহীত ফটো হইতে]

সভায় সুরেন্দ্রনাথ একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন, এবং অনেকগুলি Resolution পাশ করা হইল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কি উপায়ে টাকা কর্জ্জ করিয়া পুকুর কাটাইবার সাহায্য দিতে পারেন, এই সব কথার আলোচনা হইল। এই সভার অবসানে সুরেন্দ্রনাথকে বিদায় দেওয়ার সময় আমার মনে হইল "Look at this picture and that"—"তে হি নো দিবসা গতাঃ"। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

স্মরণে
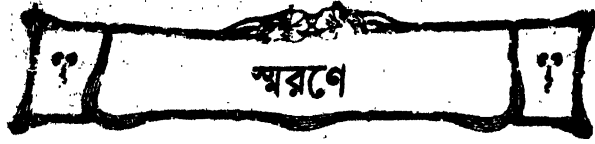
"Bear this in mind that in the great work of political regeneration of our country upon which we are all engaged, the foundations must be based broad and deep upon the eternal principles of morality. We ask you to incur self-sacrifice--we ask you to give up your personal interests—we ask you to abandon your comforts and personal conveniences at the altar of your country's political deliverance. The key-note of politics is self-sacrifice and the abandonment of personal interests, personal considerations and motives of personal convenience for the promotion of the public good" (Madras speech—1894)

যে শক্তিধর মহাপুরুষ উচ্চকণ্ঠে একত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুবিধৌত মাদ্রাজে বসিয়া তদ্দেশীয় ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া উপরের উদ্ধৃত সারগর্ভ ও মহামূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যে বীজমন্ত্রের নিরন্তর সাধনা ব্যতীত পতিত জাতির উদ্ধারের উপায় নাই, যে বীর সাধক অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া রাজনীতিক আলোড়নে স্বদেশবাসী জনসাধারণকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে তপস্বী Mackenzie Actর পরিণামফলে এই বিশাল সৌন্দর্য্যময়ী মহানগরীতে স্বায়ত্তশাসনের অধোগতি অনিবার্য্য উপলব্ধি করিয়া মহাবিক্রমে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং দ্বাবিংশ বর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২২এ নভেম্বর তারিখে Bengal Legislative Councilএ The New Calcutta Municipal Act পাশ করাইয়া তাঁহার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীতে সম্পূর্ণ "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁহার সারা জীবনের স্বপ্ন দেশের গণতন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত শাসনযন্ত্রের অধিনায়কত্ব (ministry) নিজ জীবনের সায়াহ্নে সফলতায় পরিণত হইয়াছিল, যাঁহার রাজনীতিক শবসাধনার ফলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Lord Curzonএর বঙ্গভঙ্গরূপ (Partition of Bengal) বিষবৃক্ষ এবং Lord Morleyর "settled fact"ও সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল – বিগত ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবা দেড় ঘটিকার সময় সেই মহা মানব (Super man) স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় লইয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে দেহ রক্ষা করিয়া অনন্ত ধামের যাত্রী হইয়াছেন।

অন্যান্য বারে তাঁহার পীড়া যেরূপ গুরুতর ও আশঙ্কাজনক হইয়াছিল, এবার সেরূপ ভীতিপ্রদ উপসর্গ কিছুই প্রকাশ না হওয়ায়, তাঁহার আকস্মিক তিরোধানের জন্ত দেশবাসী প্রস্তুত ছিল না। তাঁহার মনের জোর এত বেশী ছিল যে, শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত দেশের রাজনীতিক অবস্থার বিষয় লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে কোন্ পথ শ্রেয়ঃ, তাহার সম্যক্ অনুশীলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না, সুতরাং অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে যে সকল ব্যক্তিগত বিষয়ের অনুশীলন হইতেছিল, তজ্জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে তাঁহার উপর মরণ-দেবতার ধীরে ধীরে আধিপত্য কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

অধিক কি, ৪।৫ দিন পূর্ব্বে রিপণ কলেজ হইতে যখন কতিপয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি এত উৎসাহের সহিত রিপণ কলেজ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও একবারও এমন ধারণা হয় নাই যে, এত শীঘ্র মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িতে হইবে।

রিপণ কলেজ কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তৎসংক্রান্ত কয়েকটি গূঢ় রহস্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে সময়ান্তরে বলিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তাহা বলিবার অবসর ইহজীবনে আর ঘটিবে না। রিপণ কলেজ তাঁহার বড় আদরের বড় প্রিয় বস্তু ছিল। এই কলেজে যখন তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন,
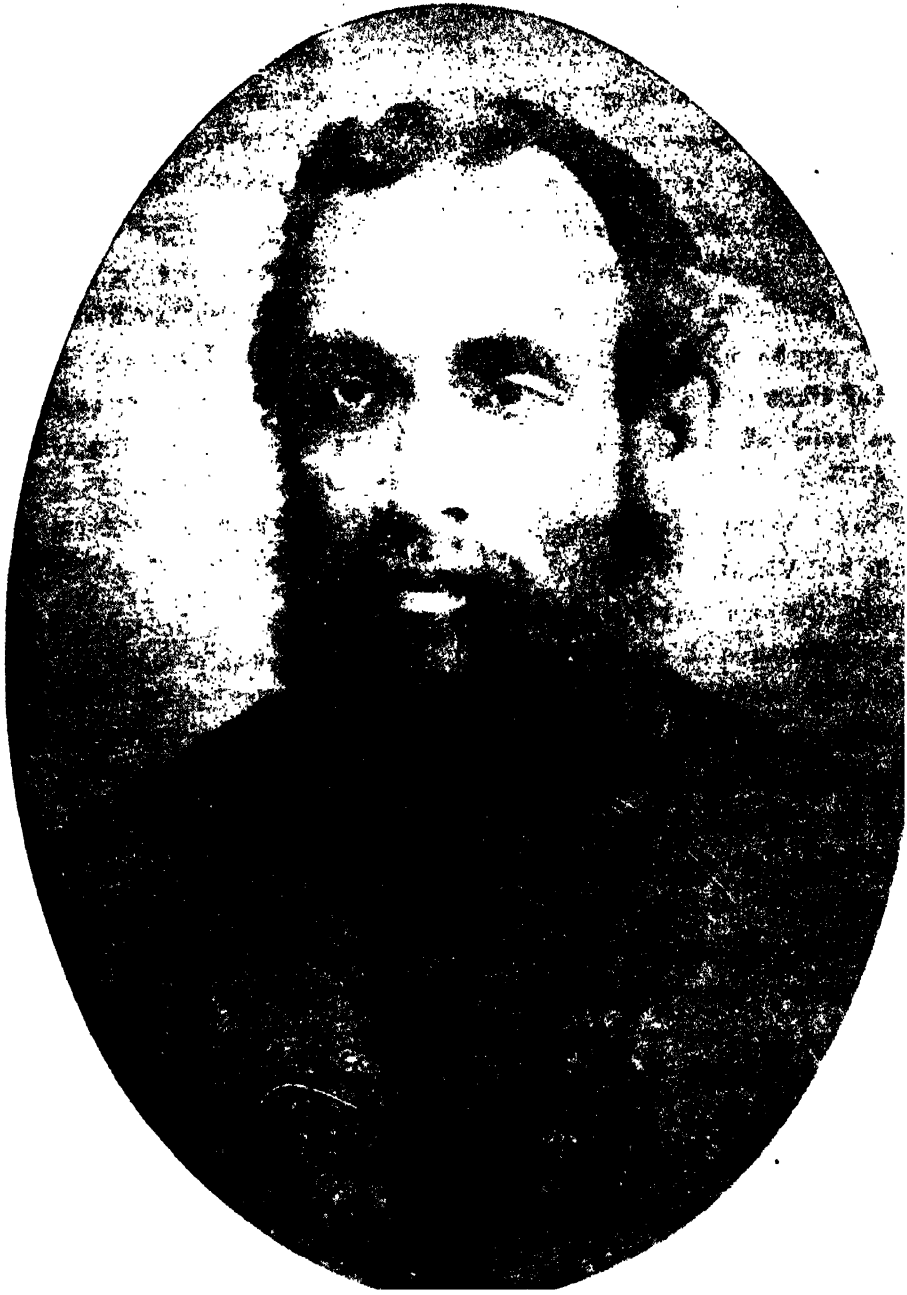
সিভিলসার্ব্বিস আইনের আন্দোলনকালে সুরেন্দ্রনাথ [করাচীতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

তখন প্রতিবর্ষে শত শত ছাত্রবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার উদ্দীপনাপরিপূর্ণ অধ্যাপনা শুনিয়া চরিতার্থ হইত। অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াও মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণের (১৯২১) পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে এই কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই কাউন্সিলের সভাপতি-পদে সমাসীন থাকিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। এতাবৎকাল আমাদের কলেজে যত প্রকার সদনুষ্ঠান ও উন্নতি

হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই তাঁহার কর্তৃত্ব চিহ্ন-সংবলিত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সুরেন্দ্রবিহীন রিপণ কলেজ যেন সমুদ্রবক্ষে কর্ণধারশূন্য ক্ষুদ্র তরণিখানি। যদিও এই কলেজ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে, তাহার বিধিব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার কর্মভার ও কর্তৃত্ব সর্ব্বকর্মদক্ষ প্রিন্সিপাল এবং সুযোগ্য সেক্রেটারী মহাশয়ের এবং সর্ব্বোপরি Governing Councilর উপর ন্যস্ত আছে, তথাপি কলেজের সকল বিষয়ের সহিত সার সুরেন্দ্রনাথ এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন যে, তাঁহার অভাব বহুদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে সন্দেহ নাই।

কুক্ষণে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে Secretary of State এবং Viceroy এর Joint Report on Constitutional Reforms প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি দেশমধ্যে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ "Surrender-Not" ছিলেন। তখনও সুরেন্দ্রনাথের নামে সমগ্র দেশবাসী গৌরবে পুলকিত হইয়া উঠিত। তখনও তাঁহার বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষা প্রাবৃটের প্রাক্কালে মেঘমন্দ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিত। তখনও দেশের ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিত এবং যে সভায় সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতেন, সে সভায় অপরের বক্তৃতা করা অসম্ভব হইত, যে সভায় তিনি বক্তৃতা না করিতেন, সে সভা তেমন জমিত না। আজিও স্মৃতিপথে সেই দিনের কথা স্পষ্ট জাগে, যে দিন টাউন হলে মহামহিমান্বিতা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তিরোধান উপলক্ষে বাগ্মিপ্রবর লর্ড কার্জ্জনের সভাপতিত্বে যে শোক-সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভায় বীচি-বিক্ষুব্ধ অনন্ত জলধির ন্যায় বিরাট ও বিপুল জনতার বিষম চাঞ্চল্য নিমেষে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল যেই সুরেন্দ্র বাবু সভাপতির আহ্বানে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ফারিত বক্ষে জলদ-নির্ঘোষে তাঁহার অনুপম বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজিও স্মরণে গৌরবে বুক ভরিয়া উঠে। গণ্যমান্য, শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য বহু সহস্র লোক এবং রাজন্যবর্গের দ্বারা অলঙ্কৃত সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথের শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে পাশ্চাত্য রমণীকুল-শিরোমণি ঐন্দ্রিলা তুল্যা Lady Curzon কি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ও পুলকিত চিত্তে ঘন ঘন করতালি দিয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গালীর ভুলিবার কথা নহে, যখন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের সভাপতিত্বে সুরেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন ইংলণ্ডে কি অভিনব ব্যাপার হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে অনেক ইংরেজ দর্শক সংবাদপত্রে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

"His speech on the occa·ion was mag i-ficent and electrified his learned hearers by its close reasoning, by the appropriate langu·ge in which he clothed his ide·s, and by the spirit which breathed in his utterances. Experienced speakers in and out of Parlia·ment, found in the Babu a g·od deal which recalled the sonorous thunders of a William Pitt, the dialectic l skill of a Fox, the rich freshness of illustration of a Burke and the keen wit of a Sheridan."

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে যখন সুরেন্দ্র বাবু ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইয়া সফলতামণ্ডিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হয়েন, তখন বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁহাকে কিরূপে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল, তাহা কি বাঙ্গালী এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে? এক দিন যাঁহার গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া লইয়া তাঁহার দেশবাসী জনসাধারণ আহ্লাদে তাঁহার রথ টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তাঁহার অমানুষিক অবদানপরম্পরা আজিকার দিনে বাঙ্গালী কি স্মরণের অতীত মনে করিবে?

নিরন্তর লেখনীচালনে ও বক্তৃতার প্রভাবে সুরেন্দ্র বাবু Jury Notification ও Vernacular Press Act প্রত্যাহার করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্পর্কিত আইন পাশ করাইয়াছিলেন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুনা কংগ্রেসের

সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আজিও তাহা অনেকের মতে "Regular Vade Mecum of the politics of India। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়া তদানীন্তন দেশের কথা যেরূপ অসাধারণ স্পষ্টবাদিতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সরকারী রিপোর্টে চিরদিন স্থায়ী রহিবে। উক্ত সময়ে প্রথম বার যে তিলকসংক্রান্ত মোকর্দ্দমা উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং নাটুভ্রাতৃদ্বয়কে সহসা নির্ব্বাসন করার সঙ্গে দেশব্যাপী যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎকালে তিনি দেশের সেবায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল কথা আজ তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে আলোচনা করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার দেশবাসী জনসাধারণ উপলব্ধি করিবে, কেন সুরেন্দ্রনাথ সেই গৌরবময় যুগের মুকুটহীন রাজার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

যে দিন (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে শনিবার) হাইকোর্টের মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হইয়া সুরেন্দ্র বাবুর উপর দুই মাস কারাদণ্ড ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, বাঙ্গালী কি ভুলিয়া গিয়াছে, সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই দিন এই তীব্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধ কি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই বিচারের প্রতিফলস্বরূপ সমগ্র দেশবাসীর চক্ষুতে সুরেন্দ্রনাথ Hero and Martyr হইয়াছিলেন? আজিও মনে পড়ে Indian Empire (May 20, 1883) যে কথাগুলি লিখিয়াছিল:–

"It is no exaggeration to say that there is scarcely any remarkable town in India that has not echoed the sound of sorrow, sympathy and indignations and we are strictly within the limits of truth when we say that there is scarcely an educated community in India that has not contributed its mite to swell the universal chorus nay the masses proverbially inert and indifferent as to the outside world, have spoken and made signs."

'Nay our ladies have not been slow in signifying their heartfelt sympathy with the wife of the illustrious husband in her hours of grief and sorrow. The rich and the poor, the young and the old, the high and the low —all of one mind and of one voice."

অধিক কি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতার উড়িয়া সমাজের দুই সহস্র লোক কম্বুলিয়াটোলায় সভা করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি তাহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, দেশাত্মবোধক বীজমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু, ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত ব্যাকুল, উগ্রতপস্বী এবং ভারতের বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকগণের একত্রীকরণে সর্ব্বপ্রধান নায়ক সুরেন্দ্রনাথ কিরূপে সফলকাম হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা জনৈক চিন্তাশীল সমালোচক নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন:—

'The exertions of Babu Surendra Nath Banerjee have always been in the direction of getting up a strong, *watchful and intelligent public opinion*, competent *either to successfully* cope with interested and *influential* opposition to the advancement of Indian interests or to substantially and powerfully lend strength to those who have taken into their head to promote those interests."

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের রাজনীতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে বোম্বাই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সেইখানেই "মডরেট" দলের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গন্ধী জাতীয় তরীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তদবধি সুরেন্দ্র বাবুর কর্ম্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া উঠিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বড় দিনের সময় নাগপুরে কংগ্রেস এবং সুরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঐ দিন হইতে বাঙ্গালায় মহাত্মা গন্ধীর শিষ্যরূপে দেশবন্ধু কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন। সেই দিন হইতে সহস্র যুদ্ধে বিজয়ী প্রবীণ ভীষ্মদেবকে অজেয় অর্জ্জুনের নিকট পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইল। কোন্ পথে শীঘ্র শীঘ্র এই পতিত জাতি স্বীয় কাম্য "স্বরাজ" লাভ করিতে পারিবে, তাহা বিচার করিবার ধৃষ্টতা এই ক্ষুদ্র লেখকের নাই। ভীষ্মদেবের অথবা অর্জ্জুনের নির্দ্দিষ্ট পথই ভূ-খণ্ডের উপর, স্তব্ধ, অচঞ্চল, বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবপরিবৃত হইয়া—এই গম্ভীর—উদার মহামানবের প্রাচীন ও শীর্ণ দেহখানির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেই চিরাভ্যস্ত কর্ম্মক্লান্ত দেশপূজ্য মুকুটহীন অধিনায়কের চিরশান্তির পক্ষে যে অতিশয় উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন।

অলৌকিক বিধাতৃবিধানে চিতার শেষ ধূম

সুরেন্দ্রনাথের জামাতা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সপরিবারে

শ্রেয়স্কর কি না, একমাত্র ভবিষ্যৎ তাহার উত্তর দিতে সমর্থ।

সে যাহাই হউক, মহানগরী কলিকাতার চিরক্ষুব্ধ জনকল্লোলের অনতিদূরে স্নিগ্ধ, শ্যামায়মানা, বনরাজিনীলা, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে, কূলে কূলে প্লাবিতা গঙ্গাবারিবিধৌতা, পবিত্র নবীন তৃণশয্যার উপরে, চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত, শ্রাবণের ঘনঘটাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গগনের নিম্নে, বহু যত্নে রচিত বাগানবাটিকার পশ্চিম ভাগে, আপন নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে মেঘমালা অবিশ্রান্ত বারিধারা বর্ষণ করিয়া তাঁহার পূত আত্মার শীতলতা সম্পাদন করিয়াছিল এবং গঙ্গাপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার চিতাভস্ম সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করিয়া ভাগীরথীর উভয় কূলে নবীন শক্তির বীজ বপন করিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে সাগর-সঙ্গমে ধাবিত হইয়াছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম, এ)
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।

স্মৃতি-সংবর্দ্ধনা

বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল ভারত-সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে, এক হিসাবে তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য। কারণ, যে আকস্মিক উৎকর্ষ, ত্যাগের যে আদর্শ—উজ্জ্বল দীপের মত যুগে যুগে দেশমাতার মুখ উদ্ভাসিত রাখিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসীর যে অবিচ্ছিন্ন ধারা ধর্ম্ম-জগতে এ দেশকে সমুন্নত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ভারতের সেই সনাতন গৌরব, সেই মহাপুরুষের উদাত্ত জীবনী চাক্ষুষ করিবার পুণ্যে তাহারা বঞ্চিত; কিন্তু অন্য হিসাবে এ যুগের ভারত সন্তানগণ অপূর্ব্ব ভাগ্যসম্পদে ধন্য। জপ, তপ এবং দেব-আরাধনা এ যুগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ভারতেতিহাসে বিশ্রুত হইবে না সত্য। দেশের চিন্তাস্রোত অন্য খাতে প্রবাহিত হইতেছে, এ যুগের জনগণের শক্তিসামর্থ্য অন্য প্রকার প্রচেষ্টায় প্রযুক্ত হইতেছে। দেশসেবাই এ যুগের ধর্ম্ম জাতীয় মুক্তিই ইহার জলন্ত মন্ত্র—স্বরাজসাধনা ইহার ব্রত এবং তপস্যা। হিমাচল-কিরীটিনী, বিন্ধ্যমেখলা, শস্যশ্যামলাঞ্চলা, জাহ্নবী-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-পঞ্চনদ-কাবেরী গোদাবরীস্রুত স্নেহধারা, সাগর-ধৌতচরণা ভারতমাতা এ যুগের প্রত্যক্ষ দেবতা। আত্ম-সমাহিত, অদৃষ্টনির্ভর, বিষয়বিরক্ত, পরলোকোন্মুখ ভারতবাসীকে এই নূতন সাধনায় দীক্ষিত করিয়া—দেশে নূতন চেতনা সঞ্চারিত করিয়া যে সকল মহাসত্ত্ব পুরুষ ধন্য হইয়াছেন এবং দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—সার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অগ্রণী এবং শীর্ষস্থানীয়।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি তুচ্ছ অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমার যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন—এ দেশের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক মেকলে লিখিয়াছেন,—"The feeling of the Hindus was infinitely stronger. They were indeed, not a people to strike one blow for their countrymen, but his sentence filled them with sorrow and dismay."

তৎকালে বৃটিশের প্রবলপরাক্রমে অভিভূত, দুঃখ-ক্লেশ-অত্যাচারে স্পন্দহীন, নানা বিরোধে বিচ্ছিন্ন, নির্ব্বাক্, অগণিত মানবের আবাস এই প্রাচীন ভূভাগ—"আনন্দমঠ"বর্ণিত সেই "অতি বিস্তৃত অরণ্য—গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক-প্রবেশের পথমাত্র শূন্য, এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! * * * পশু-পক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সেই অরণ্য-মধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।"

এই বিপুল লোকারণ্যের অশক্ত, কাতর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একসঙ্গে ভাষা ও সঙ্গীত ছুটিল। এই নীরবতা মথিত করিয়া ভবানন্দের কণ্ঠ দিয়া দেশাত্ম-বোধের মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র অমর ভাষায় সঙ্গীত ধরিলেন—'বন্দে মাতরম্।' ঠিক এমনই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসকসম্প্রদায় হইতে পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন সুরেন্দ্রনাথ যখন আদালত অবমাননার অভিযোগে দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, তখন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল, তাহা ঠিক ইংরাজ ঐতিহাসিকের অবজ্ঞোপহত নন্দ-কুমারের শাস্তিবিবরণের পুনরাবৃত্তির মত বোধ হইল না। মূর্চ্ছিত দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইল—নির্ব্বাক্ দেশের মুখ ফুটিল। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভ হইতে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া যে সকল কথা জাতির হৃদয়ে আকুলি-বিকুলি করিতেছিল—এখন হইতে তাহা জ্বালা-ময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে সকল শক্তি-শালী বাগ্মী নবোদ্বোধিত জাতীয় চেতনার প্রতিধ্বনি দ্বারা দেশকে মুখর করিয়া তুলিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অগ্রণী ও শীর্ষস্থানীয় সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার বক্তৃতার হুঙ্কার ব্রিটিশসিংহকে চমকিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া

সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী চণ্ডী দেবী [শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে

তুলিল। ভারতীয় সমাজদেহে হৃদয়স্থল যদি বঙ্কিমচন্দ্র হয়েন, সুরেন্দ্রনাথ তাহার বজ্রনির্ঘোষী কণ্ঠ।

দৈববিড়ম্বিত এ দেশে পৌরুষের জলন্ত আদর্শ—সুরেন্দ্রনাথ। ঐকান্তিক সাধনা ও হৃদয়ের বল দ্বারা রাষ্ট্রজগতে এক জন মাত্র ব্যক্তি কি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন, সুরেন্দ্রনাথের জীবনী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অখণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ সরকারকে তিনি পদে পদে আপন নীতি পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি ব্যবহারে ইংরাজকে বহুবার 'খুড়ি' বলিতে হইয়াছে। যে মুখে সরকার "চ্যাং মুড়ি কাণী" বলিয়াছেন, সেই

মুখেই আবার "জয় বিষহরী" বলিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথকে ইংরাজ সরকার "স্বর্গোদ্ভূত শাসকসম্প্রদায়" (heaven born service) হইতে বিদায় দেন। ৫০ বৎসর পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সাগ্রহে ও সসম্মানে তাঁহাকে পুনরায় মন্ত্রীর আসনে—সেই সম্প্রদায়েরই অন্যতম প্রভুরূপে বরণ করিয়া লয়েন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে আদালত অবমাননার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বরিশাল হাঙ্গামায় তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা দেন; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করিয়া পরম তৃপ্তি ও আশ্বাস বোধ করেন। লর্ড লিটনের আমলে প্রেস আইন প্রচলনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ শতমুখে প্রতিবাদ করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই গ্লাডষ্টোনের অধীনে উদারনৈতিক দলের মন্ত্রিত্বকালে উহা নাকচ হইয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'সাবাস আটাশের' অগ্রণীরূপে সদর্পে কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পুরাতন মিউনিসিপ্যাল আইনের আমূল সংশোধন করিয়া পুরাতন আইনের ত্রুটি ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার তাঁহার বহুবৎসরপোষিত সঙ্কল্প সাধিত করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্বই তাঁহার জীবনের গৌরমময় উচ্চ শিখর। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ লর্ড কার্জ্জন যাহার প্রবর্ত্তয়িতা—লর্ড মর্লির মত উদারনীতিক মন্ত্রী ভারতীয় লোকমত উপেক্ষা করিয়া যাহা পার্লামেন্টে অপরিবর্ত্তনীয় (settled fact) বলিয়া ঘোষণা করেন, সুরেন্দ্রনাথ-চালিত আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে মহামান্য ভারত-সম্রাটের নিজ বাণী দ্বারা সেই বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া যায়। এই আন্দোলনই রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও তেজস্বিতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। এই সময়ে জনগণ-মন-অধিনায়ক দীপ্ত ভাস্বররূপে তিনি মধ্যগগনে অধিরূঢ়। এই ব্যাপারে তাঁহার অটুট প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার অনিবার্য্য সঙ্কল্পপালনের কথা - ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা নন্দকুলধূমকেতু চাণক্যের কার্য্যাবলী স্মরণে আনিয়া দেয়।

আধুনিক ভারতে রাজনীতিক সমাজে কাষের লোক হিসাবে তাঁহার তুলনা নাই। অবাস্তব কল্পনা বা আবেশময় সাময়িক উত্তেজনা তাঁহার রাজনীতিক উদ্যমকে কখনও চালিত করে নাই। সুস্পষ্ট আকারে উদ্দেশ্যটি মানসনেত্রে উদ্ভাসিত রাখিয়া, স্থিরবুদ্ধিতে উপায় নির্ণয় করিয়া, তিনি কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। অর্দ্ধ-শতাব্দী ব্যাপ্ত সেবার দ্বারা তিনি যে দেশের অবস্থা অসম্ভাবিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার রহস্য ও মূল এইখানে। বর্ত্তমান সময়ে স্বরাজের মর্ম্ম লইয়া অশেষবিধ বাদ-বিসংবাদ চলিতেছে। কিন্তু ভারতে জাতীয় উদ্বোধনের স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথের ধারণা এ বিষয়ে বরাবরই অতি সুস্পষ্ট ছিল। রুগ্ন ও শীর্ণ দেহে মাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা স্বরাজ আয়ত্ত হইতে পারে, ইহা তিনি কখনও বিশ্বাস করিতেন না। সুস্থ ও সবলকায়, দৃঢ়চেতা, সুশিক্ষিত জনগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কৌশল সকল আয়ত্ত করিয়া, সকল বিষয়ে আধুনিক সভ্য-জগতের সমকক্ষ হইয়া আপন অধিকার বুঝিয়া লইবে এবং দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবে—স্বরাজের এই কল্পনাই তিনি আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যসাধন বিপ্লববাদীর দ্বারা সম্ভব নহে। নিরস্ত্র জাতি বলপ্রয়োগে বা গোপনে সংগৃহীত অস্ত্রসাহায্যে ইহা আয়ত্ত করিবে, ইহা তিনি ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া মনে করিতেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে শিক্ষার প্রসার – রাজনীতিক স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে জ্ঞানবিস্তার —তিনি সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপায় প্রয়োগ করিবার উপযোগী সামগ্রী বিধাতা অকুণ্ঠিতহস্তে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। Indian Association এবং Indian National Congress প্রতিষ্ঠা এই উদ্দেশ্যেরই অঙ্গমাত্র। 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদকরূপে এবং রিপণ কলেজের স্থাপয়িতৃরূপে দেশের রাজনীতিক সংজ্ঞা তিনি বহুল পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করেন। আগ্নেয় স্রাবের মত জলন্ত ভাষায় সরকারের কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ করিয়া বহু বৎসর ধরিয়া "বেঙ্গলী" ভারতের রাজনীতিক আকাশ উদ্দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হইতে এ যাবৎ ইংরাজী ভাষায় বক্তা-রূপে কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইয়াছে কি না

মণ্টেগু অভ্যর্থনায় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভবনে সুরেন্দ্রনাথ

[শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে।
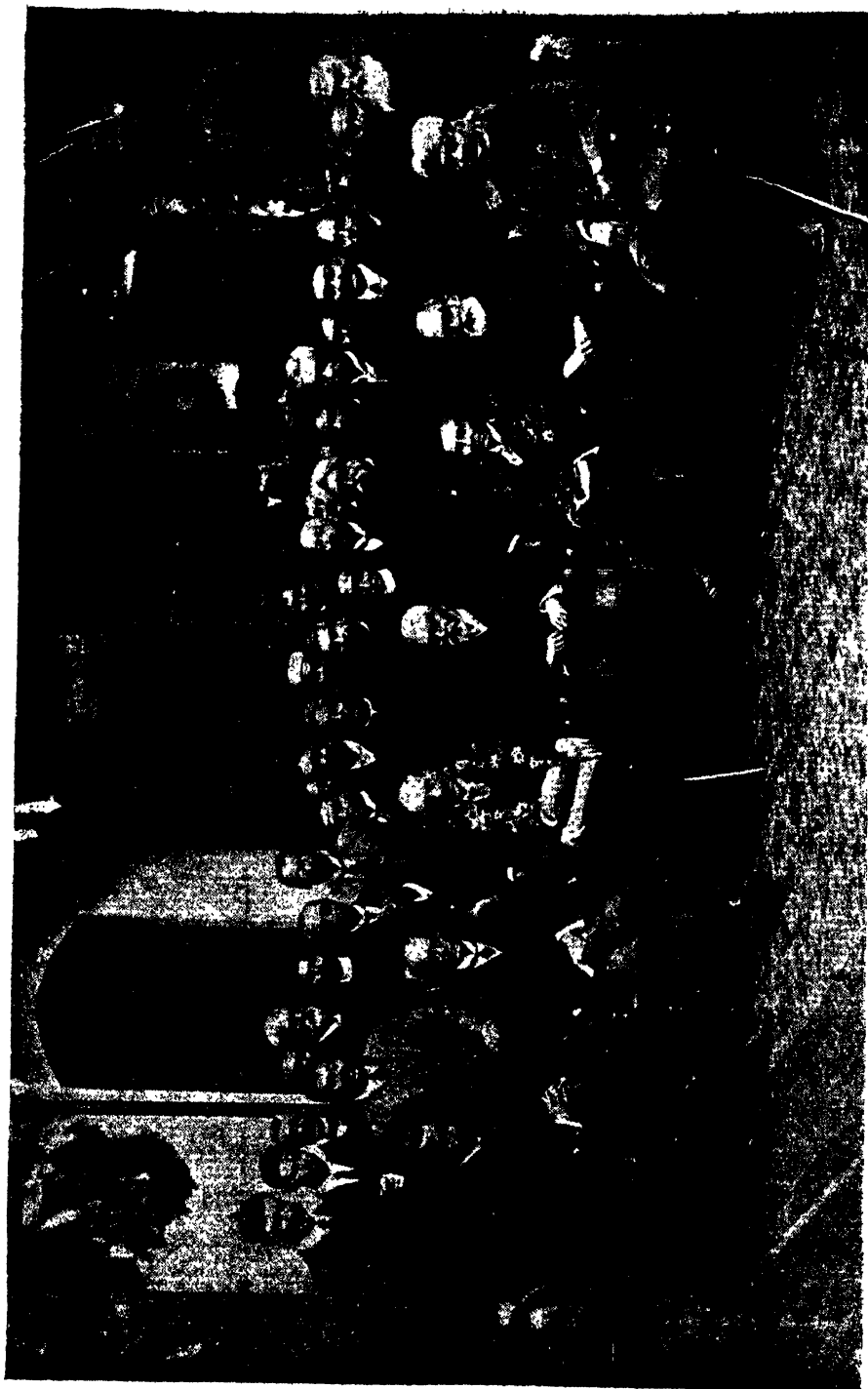
সন্দেহ। বাগ্মিতায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত। যে ভাষায় Burke, Pitt, Fox, Sheridan, Disraeli প্রভৃতি প্রথিতনামা—সেই ভাষার প্রয়োগে বিদেশী হইয়া—পরাজিত জাতির প্রতিনিধি হইয়া চিরস্মরণীয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপকের আসনে তিনি যখন অধিষ্ঠিত, তখন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হইতে ছাত্রগণ দলে দলে এখানে যে সমাগত হইত, তাহাও শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোপযোগী শিক্ষালাভের জন্ত নহে। রিপণ কলেজ দেশাত্মবোধে জাতীয় প্রেরণার উৎস ছিল। দেশের যুবকবৃন্দ আসিত সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ শুনিতে—Burkeএর গ্রন্থ-ব্যাখ্যান উপলক্ষ মাত্র ছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাহাদিগের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিত। উত্তরকালে এই সকল ছাত্রই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। যে বীজ তাহারা তাঁহার নিকট লাভ করে, জিলায় জিলায় সহরে সহরে উপ্ত হইয়া তাহা আজ সমুচ্চ মহাতরুতে পরিণত হইয়াছে। যে অগ্নিমন্ত্রে তিনি এই অগণিত ছাত্রবৃন্দকে দীক্ষিত করেন, দেশের সর্ব্বত্র আজ তাহারই সাধনা প্রকটিত।

স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথ বহুবার আপনাকে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণপ্রবর বলিয়া খ্যাপন করিতেন। মনীষা ও তেজস্বিতায় সত্যই তিনি ব্রাহ্মণকুলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যে কয়জন পুরুষ-শার্দ্দূল হিন্দুস্থানকে এ যুগে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জগৎব্যাপ্ত খ্যাতি ভারত-মাতার মলিন মুখ এ দুর্দ্দিনেও সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের স্থান তাঁহাদিগের পুরোভাগে। সুদূর অতীত যুগে ব্রাহ্মণের মুখে স্ফুরিত হইয়াছিল সেই প্রথম ঋক্—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।" নানা অনুষ্ঠানাড়ম্বরের মাঝে ভারতে অগ্নিস্থাপনা হইল—যজ্ঞের প্রবর্ত্তন হইল। আর্য্যগণের গৃহ-প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া, প্রাচীন সভ্যতার প্রসার ঘটাইয়া—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দাক্ষিণাগ্নি যজ্ঞশালার বেদীতে বিরাজ করিতে লাগিল। এই ত্রিবিধ শ্রৌত অগ্নিতে আহুতি দিয়া আর্য্যসন্তান পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ পরিশোধ করিয়া যুগের পর যুগ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন।"যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" কালক্রমে অবস্থার বিপর্য্যয়ে বুঝি বা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের যথাযথ পালনের অভাবে—বিশ্বব্যাপারের সহিত নূতন ধরণের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলে নূতন করিয়া আবার অগ্নিস্থাপনার প্রয়োজন হইল। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার মহিমায় অনুপ্রাণিত দেশের বরেণ্য সন্তানগণ এখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অগ্নির ক্রমশঃ বর্দ্ধমান প্রভায় পৃথিবী প্রভান্বিত হইতেছে। এই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দৈন্ত ও গ্লানি নির্ম্মুক্ত হইয়া ভারতবাসীকে স্বরাট্ হইতে হইবে। বেদপন্থী সমাজের পঞ্চ মহাযজ্ঞের অতিরিক্ত এক ষষ্ঠ মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। ইহার নাম মাতৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞ সাঙ্গ করিলে স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশমাতৃকার ঋণশোধ সম্ভব। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ এই যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও পুরোহিত—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও সদস্যরূপে সমাগত হইতেছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ এই বিশ্ববিশ্রুত যজ্ঞের কাহিনী লিখিতে গিয়া গৌরবের সহিত যখন বিভিন্ন দেশের উল্লেখ করিবেন, তখন স্পর্দ্ধায় স্ফীতবক্ষ হইয়া ২৪ পরগণার অধিবাসিবৃন্দ শুনিবে—এ যজ্ঞের সামগায়ক উদ্গাতা ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র এবং আহ্বানকর্ত্তা হোতা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ।

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রনাথ

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

[শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত।

সার সুরেন্দ্রনাথ

সার সুরেন্দ্রনাথ আর নাই ; কিন্তু তাঁহার জীবনের সঞ্জীবনী শক্তি সহসা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার ওজস্বিনী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, তাঁহার স্বদেশপ্রেম, সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে আজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিবে। তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যদ্বংশধরদিগকে তাঁহাদের জন্মভূমির প্রতি এবং জনগণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনের পথে পরিচালিত করিতে থাকিবে। রামমোহন রায়ের এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় তিনি বর্ত্তমান ভারতের সংগঠনকর্ত্তা। এই তিন ক্ষণজন্মা পুরুষ বর্ত্তমান সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে জ্ঞান, সভ্যতা এবং প্রেরণা লইয়া আমাদের সভ্যতায় যাহা ভাল ছিল, তাহার সহিত তাহার সম্মিলন সাধনপূর্ব্বক প্রাচীনকালে আমাদের জন্মভূমি যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই উচ্চস্থানে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথের জীবন এতই ঘটনাবহুল যে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও এরূপ অল্প স্থানে দেওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁহার জীবনের যে স্মৃতিপুস্তক সম্প্রতি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকাশকগণ নাম দিয়াছেন—"A Nation in Making" উহাতে তিনি তাঁহার নিজের কথা অতি অল্পই বলিয়াছেন। স্বজাতির রাজনৈতিক মুক্তিসাধন যাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, সেই জাতিসংগঠনকারীর জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে হইলে বহু খণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য কঠোরভাবে যেরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া যেরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া এবং যেরূপ অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তদনুরূপ ভাবে কার্য্য করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই। যে রূপার ঘড়িটির সাহায্যে তিনি তাঁহার জীবনের সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বেই পড়িয়া ছিল। এই ঘড়িটি তাঁহার জীবনের নিয়ত সঙ্গী ছিল। তিনি কখন সময়ের অপব্যয় করিতেন না। তিনি এমন সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিতেন যে, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী এ দেশে কেন, বিদেশেও বিরল। সাধারণের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ম্যাজিনীর ন্যায় তিনি যুবকদের মধ্যেই স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সমগ্র ভারতকে এক মহান্ জাতীয়তা-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এবং শাসনযন্ত্রের গঠনপদ্ধতিতে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি বিপ্লবের পথ অপেক্ষা সংস্কারের পথকে অধিক পছন্দ করিতেন। তাঁহার ইহাই ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, যদি সমস্ত ভারতবাসী সম্মিলিত হইয়া 'স্বতন্ত্রী' উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্বশাসন লাভের দাবী করেন, তাহা হইলে ইংরাজ কোনমতেই সেই দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। সমস্ত ভারতকে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য ভারতব্যাপী আন্দোলনই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাহার তিনি জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই কংগ্রেসে তাঁহার জীবনের সেই আদর্শকে সাফল্যে পরিণত করিবার জন্য আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গকালে বাঙ্গালীজাতি ও বঙ্গভূমিকে অক্ষুন্ন রাখিবার তাঁহার সঙ্কল্প ও আন্দোলনের অত্যন্ত কঠোর কাল গিয়াছে, সুদীর্ঘ সাত বৎসরের অধিককালস্থায়ী এই অগ্নিপরীক্ষায় তাঁহার নেতৃত্বের সাফল্য সূচিত হইয়াছে। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসরকাল তিনি বঙ্গদেশকে এমন একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভারতের এবং বিলাতের রাজপুরুষরা যে বঙ্গভঙ্গকে কোন মতেই রহিত হইবার নহে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তাহাও রহিত করাইয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার তাঁহারই জীবনব্যাপী আন্দোলন ও পরিশ্রমের ফল। তিনি উহাকে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়াই মনে করিতেন এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মতভেদ সত্ত্বেও যে দিন আমরা

আমাদের মধ্যে আত্মমন স্থগিদ রাখিয়া স্বায়ত্ত শাসনলাভে বদ্ধপরিকর হইতে পারিব, সেই দিনই আমরা আপনাদের কর্ত্তৃত্বভার আপনারাই লইতে পারিব।

তিনি মন্ত্রিত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু বহু চেষ্টার পর তিনি যে অল্পকালস্থায়ী ব্যবস্থাস্বরূপ শাসনসংস্কার পাইয়াছিলেন, তাহা সফল করিবার চেষ্টা করিবার জন্য তিনি সত্যপাশে বদ্ধ ছিলেন। মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি বাঙ্গালার জিলাবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠনটি জনতন্ত্রবাদমূলক করিয়া গিয়াছেন, তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন উঠাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগের প্রবল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়াই তিনি প্রথমে এক জন ভারতবাসীকেই কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ দিয়াছিলেন। যে সকল পদে পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লোকরাই নিযুক্ত হইতেন, রাজপুরুষদিগের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া তিনি ভারতীয় যোগ্য চিকিৎসককে ঐরূপ কতকগুলি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার মন্ত্রিত্বকালীন কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে চাকুরী দিয়াছেন, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। চাঁদপুরে আসাম হইতে কুলী পলায়নের সময়ে উহা তাঁহার বিভাগীয় কার্য্যের অন্তর্গত না হইলেও তিনি বিপন্ন ও পীড়াক্রান্ত কুলীদিগকে ঔষধপথ্যদানে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্লাবনের সময় তিনি যে সকল স্থানে লোক অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য সরকার হইতে কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, জানিবার জন্য প্রখর রৌদ্রে অনাহারে ও অসুস্থ শরীরে সেই সকল স্থানে ট্রলিতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ কায তাঁহার বিভাগের কাযও ছিল না। তথা হইতে তিনি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া
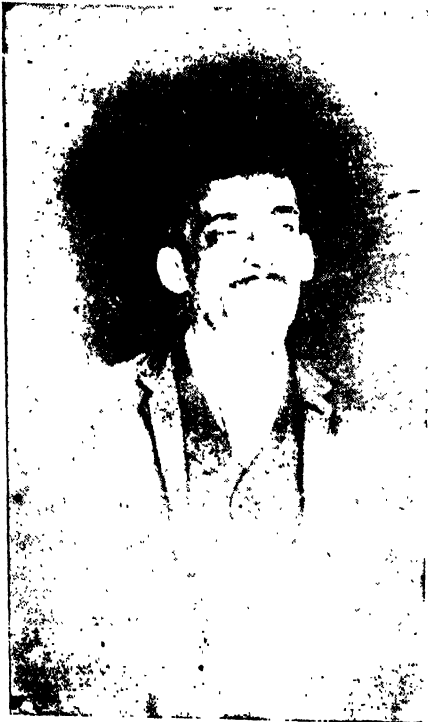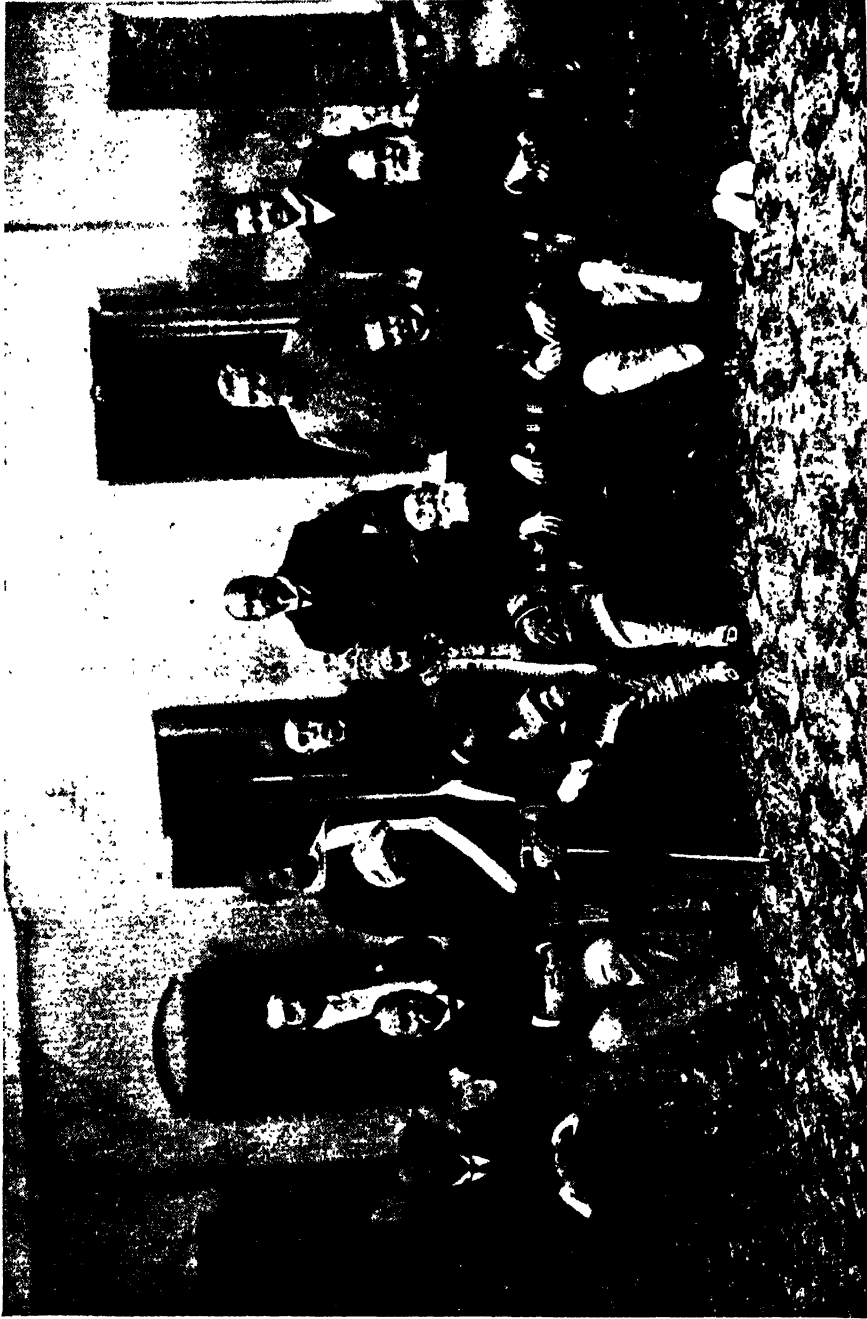
সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ সপরিবারে

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ

কংগ্রেসের কার্য্যকারী সভায় সুরেন্দ্রনাথ

[১৯০৬ সালে কংগ্রেসের সময় দ্বারবঙ্গের মহারাজার ভবনে গৃহীত

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে]

সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্কর ও পুত্রবধূ মায়াদেবী

দার্জ্জিলিংএ ফিরিয়া যান ও ট্রেণ হইতে নামিয়াই তিনি ঐরূপ অবস্থায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটীর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি শয্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে না জানিয়া অযথা দোষারোপ করিয়াছিল। কিন্তু সে জন্ত তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই। কায ও কর্ত্তব্যপালনই তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের স্থায় পবিত্র ছিল; তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি বলিতেন, উহা অপেক্ষা পবিত্রতর ধর্ম্ম তিনি আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যখন তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মানসিক বল, প্রফুল্লতা, দেশসেবার স্পৃহা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তিও সুতীক্ষ্ণ ছিল। যদিও তাঁহার দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহার মনের তেজ ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, তিনি আর ১০ বৎসর জীবিত থাকিতে চাহেন, তাঁহার জীবনের প্রান্ত মমতাবশতঃ তিনি সে কথা বলিতেন না, পরন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যের সাফল্য দর্শন করিয়া তিনি যাইতে চাহেন ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে চাহেন, ইহাই তাঁহার এই ইচ্ছার মূলে ছিল। তাঁহাকে যাঁহারা দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকেই তিনি বলিতেন যে, যদি আমরা সকলে সম্মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে কোন শক্তিই আমাদের সেই দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। তিনি আরও বলিতেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এবং বিলাতের ও ভারতের মধ্যে বিদ্বেষভাবের উদ্ভব করিয়া যে কি লাভ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যাহা হউক, ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে—ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে আমাদের মধ্যে যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা ক্ষণিক উপসর্গ মাত্র। আমাদের দেশের লোক শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের পতন এবং সম্মিলিত হইলে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয় ও অভীষ্টসিদ্ধি সহজেই হইবে।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার অল্পদিন পরই তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গিনী এবং একান্ত অনুরক্ত সহায়স্বরূপিণী সহধর্ম্মিণী

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সরোজিনী

সুরেন্দ্রনাথের জননী জগদম্বা দেবী

[ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

তাঁহাকে চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি আদর্শ হিন্দু-পত্নী ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ঘোর সঙ্কটকালে যখন তিনি ভারত সরকারের ও ভারতসচিবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আপীল করিতে যাইয়া নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি পর্য্যন্তও দেওয়া হয় নাই, যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন আশাহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, যে সময়ে তাঁহার বন্ধু, আত্মীয়-কুটুম্ব ও কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সামাজিক হিসাবে সর্ব্বস্বান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই মহীয়সী মহিলা তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য আপনার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেশের রাজনীতিক মুক্তিসাধনে তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেমভক্তি, উৎসাহ, বল ও সহায়তা দান করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মিষ্ঠা মহিলা যে কেবল এই সঙ্কটকালে সুরেন্দ্রনাথের গৃহিণী, সচিব ও সখী ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র রাজনীতিক জীবনে ইনি ইঁহার অসাধারণ স্বাভাবিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভা এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সুরেন্দ্রনাথকে রাজনীতিক্ষেত্রে বিপদের ও বাধার সম্মুখীন হইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ যে দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ভারতের সর্ব্বত্রই জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথের নাম রাখিয়াছিল, Surrender not (নাছোড়বান্দা)। সুরেন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যু তাঁহার জীবনের একটি ঘোর দুর্ব্বিপত্তি; উহা তাঁহার জীবনের যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাহা পূরণ হইবার নহে, ইহার ফলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের সহিত পরবর্ত্তী জীবনের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছিল।

তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় যখন লিখিত হইবে, তখন তাঁহার যাহা কিছু মহান্ ও সুন্দর ছিল, তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইবে। তিনি যেরূপ সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার-বর্জ্জিত, যেরূপ জনতন্ত্রবাদী এবং লোকের প্রতি সার্ব্বভৌম সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ভারতের জননায়কদিগের মধ্যে সেরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁহার জীবনের সকল সময়েই তিনি সাধারণের এক জন ছিলেন। বেঙ্গলী অফিসে বা তাঁহার গৃহেই হউক, অথবা মন্ত্রীর কক্ষেই হউক, সুসময়েই হউক আর দুঃসময়েই হউক, উচ্চ-নীচ ধনি-দরিদ্র সকলেই তাঁহার নিকট সমান সমাদর পাইতেন। যাহার কোন অভিযোগ ছিল বা দেশের জন্য যে ব্যক্তি নির্য্যাতিত বা দণ্ডিত হইয়াছে, এমন লোককে কখনই তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। উদাহরণস্বরূপ লিয়াকৎ হোসেনের কথা বলা যাইতে পারে। এই বিহারী মুসলমান ইংরাজীও জানে না, বাঙ্গালাও জানে না, গত বিশ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় এই স্বদেশী-প্রচারক কেবল ছেলেদের মিছিল বাহির করিয়া আসিতেছে, আর উর্দ্দু ভাষাতে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে,—ছেলেরা উহা ভাল রকম বুঝুক বা না বুঝুক। এই লোকটি রাজনীতিক অপরাধে ৬।৭বার কারারুদ্ধ বা মুচলেকা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। এই লোকটিকে সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ ভালবাসিতেন এবং তাঁহার স্মৃতিপুস্তকে তাহাকে সম্মানজনক স্থান দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের একটি ভৃত্য তাঁহার পরিচ্ছদ লইয়া উপহাস করিত, এই ব্যক্তির শোভনতা ও অশোভনতা সম্বন্ধে ধারণা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত হাসিতেন। যখন কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি মনটা প্রফুল্ল করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি তাহাকে লইয়া পরিহাস ও বিদ্রূপ করিতেন। এই লোকটি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্ত ভৃত্যের শোক ভুলিতে পারেন নাই। রঙ্গরস ও কৌতুক করিতে ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু যখন কায করিতেন, তখন তাঁহার অতি নিকট ও প্রিয় আত্মীয়ও তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। কিন্তু যখন তিনি ক্লান্তি অপনোদন করিতে চাহিতেন, তখন বালকের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তিনি খুব রঙ্গরস বুঝিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। তিনি কাহারও উপর কখনও কোন বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করিতেন না।

দেশসেবার যোগ্যতা দান করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে যে বাগ্‌বিভূতি, ভাষাজ্ঞান, মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা এবং মনের ও হৃদয়ের অনন্যসাধারণ গুণ

জীবন-স্মৃতি-রচনা নিরত সুরেন্দ্রনাথ

করিবার পর তিনি মনের সর্ব্ববিধ আবেগ, বাসনা এবং আত্মাভিমান পরিহার করিয়া কেবল শক্তিতে যত দূর কুলায়, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার আদর্শ সফল করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন বর্ত্তমান ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তির পথিপ্রদর্শক ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথও সেইরূপ রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের নবজীবনলাভের পথপ্রদর্শক, তিনিই ভারতবাসীকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আদর্শ লাভের এবং ভারতকে উন্নতিশীল জাতি হইবার পথে দাঁড় করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত-সম্প্রদায় রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের চিন্তার, ধারণার ও জ্ঞানচর্চ্চার উপর রামমোহন রায়ের প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই হিসাবে সুরেন্দ্রনাথও বর্ত্তমান ভারতের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁহার শান্তিপূর্ণ জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি তাঁহার মাতৃভূমির জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া লৌকিক বা ব্যবহারিক কোনও অভিনয় হয়, এরূপ বাসনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তিনি ভগবান্ ও মানুষের নিকট তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন এবং কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ ও জাতি মুক্তি লাভ করে, এই বিশ্বাসেই তাঁহার মনে শান্তি ছিল। কর্ম্মই তাঁহার জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি যে গঙ্গাতীরে বাস করিতেন, সেই গঙ্গাই তাঁহার দেহভস্ম বহন করিয়া লইয়া যাইবে ও তাঁহার চিতাভস্ম তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিতে সম্মিলিত হইয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিবে এবং তাঁহার আত্মা তাঁহার

দিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই তিনি দেশসেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই জন্য লোকপ্রিয়তা ও খ্যাতি তাঁহার নিকট অযাচিতভাবেই উপস্থিত হইয়াছিল। সাধুতা এবং সত্যনিষ্ঠাই তাঁহার রাজনীতিক জীবনের নিয়ামক ছিল। তিনি বলিতেন যে তিনি জানিয়া শুনিয়া লোককে কখনই কুপথে বা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবেন না। লোকের পক্ষে যাহা হিতকর বলিয়া মনে হইত, তাহা লোকের অপ্রিয় হইবার শঙ্কা থাকিলেও তিনি তাহা করিতেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

সুরেন্দ্রনাথের জনক ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বজাতির মানসক্ষেত্রে অনুকূল স্থান লাভ করিবে। এই-রূপেই মানব-চেতনায় বিষয়ীভূত হইয়া ভগবান্ মানব-মণ্ডলীর নিকট তাঁহার সত্তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৬ই আগষ্ট অপরাহ্ণে যে দিন স্বদেশী আন্দোলনের বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হয়, যখন পশ্চিমগগন অস্তমিত সূর্য্যের লোহিত আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহার চিতানল উপরিস্থিত আকাশ এবং তাঁহার বাসভবনের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর উদ্বেল বারিরাশিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। তাহার পর গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ তাঁহার চিতাভস্ম ধৌত করিয়া লইয়া গেল এবং আকাশ হইতে আসারসম্পাতে তাঁহার প্রধূমিত চিতা নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

সুরেন্দ্রনাথ

১

কলঙ্ক-মোচন

সুরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তখন আমি শ্রীহট্ট জিলা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট। বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই তিনি এই পদে নিযুক্ত হয়েন। সুরেন্দ্রনাথ আমাদের স্কুল দেখিতে আইসেন। সেই উপলক্ষেই আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করি।

আজকাল ভারত আর বিলাত এ-ঘর ও-ঘর হইয়াছে। হামেশাই এ দেশ হইতে শিক্ষা বা সখের জন্য বহু লোক বিলাত যাইতেছেন। এখনকার বিলাতফেরতারা প্রায়ই সাহেবীয়ানার ভাণ করেন না। তাঁহারা দেশে আসিয়া অধিকাংশ স্থলেই ধুতি-চাদর পরিয়া বেড়ান। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাত-ফেরতাদের এ রীতি ছিল না। বিশেষতঃ যাঁহারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করিয়া দেশের আমলাতন্ত্রভুক্ত হইতেন, হ্যাটকোট না পরিলে তাঁহাদের জাতি থাকিত না। এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সাহেবী পোষাক পরিয়া থাকিতেন। সুরেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হইলেও পুরাদস্তর সাহেবী পোষাক পরিয়া আমাদের স্কুলে আইসেন নাই। হ্যাট বা গলাবন্ধ বা বুক খোলা কোট পরেন নাই, প্যান্টুলেনের উপরে আমরা এখন যাহাকে পার্শী কোট বলি, তাঁহার পরিধানে তাহাই ছিল। মাথায় হ্যাট ছিল না, একটা বিভারের টুপী ছিল। সিভিলিয়ান হইয়াও সেই কালে সুরেন্দ্রনাথ যে একেবারে সাহেব সাজেন নাই, ইহা নিতান্ত সামান্য কথা ছিল না। এই ব্যাপারেই এখন মনে হয়, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের স্বাজাত্যাভিমান এবং দেশসেবার পূর্ব্বাভাস দেখা গিয়াছিল।

নিজে যদিও সুরেন্দ্রনাথ পুরাদস্তর সাহেবী পোষাক পরিয়া বেড়াইতেন না, শ্রীহট্টের ইংরাজ সিভিলিয়ানরা তাঁহাকে ইংরাজ সাজাইতে কম চেষ্টা করেন নাই। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সাদারল্যাণ্ড। সাদারল্যাণ্ডের অতিকায় দেহ এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। এমন মোটা মানুষ জন্মে দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম যে, সাদারল্যাণ্ড যখন প্রথমে শ্রীহট্টে যান, তখন নূতন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের এবং আপিসের কেদারা তৈয়ারী করাইতে হইয়াছিল। সহরে রাষ্ট্র ছিল যে, একটা আস্ত বিলাতী কুমড়া না হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ডিনার অপূর্ণ থাকিত। সাদারল্যাণ্ড সাহেব প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ স্নেহ দেখাইয়াছিলেন। এরূপ গুজব যে, সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে গেলে পরে তিনি এস্তাহার জারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সকলে সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিবে। এ দিকে সুরেন্দ্রনাথ নিজে পুরাদস্তর সাহেব না সাজিলেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেমদিগের পোষাক পরিয়া সহরের সদর রাস্তায় স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন। সহরের মেমসাহেবদের এটা বড় সহ্য হয় নাই। এই সূত্রেই সুরেন্দ্রনাথের শ্রীহট্টের কর্ম্মজীবনের অকাল অবসানের সূচনা হয়।

এরূপ গুজব যে, ঘোড়দৌড়ের মেলায় সাহেব-বিবিরা যে মঞ্চে বসিয়া ঘোড়দৌড় দেখিতেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী সেই মঞ্চে আপনার স্বামীর পদের উপযোগী আসন দাবী করিয়াছিলেন। বিবিদের ইহাতে গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তদবধি সহরের সাহেবরা সুরেন্দ্রনাথকে দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথই বা তাহা সহিবেন কেন? তিনিও আপনার যথাপ্রাপ্য সম্মান আদায় করিতে ছাড়েন নাই। কাযেই তিনি শ্রীহট্টের বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। কথাটা বাজারেও রাষ্ট হইয়া পড়ে। কাছারীর কেরাণীদিগের মধ্যেও এই উপলক্ষে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী সর্ব্বদাই বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। বিশেষতঃ চাকুরীয়া মহলে এই অসূয়াটা অত্যন্ত প্রবল। সেকালে বাঙ্গালী কেবল ইংরাজের অধীনতা নহে, পরন্তু ইংরাজের হাতে অযথা অপমান পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে সহিয়া যাইত; কিন্তু নিজেদের দেশের কোন লোক ইংরাজের সমকক্ষ আসন পাইলে তাহার পদের

রিপণ কলেজের ছাত্রগণসহ সুরেন্দ্রনাথ

উপযোগী সম্মান দিতে হইলে যেন অধস্তন বাঙ্গালী-কর্ম্মচারীদের কলিজা ফাটিয়া যাইত। সুরেন্দ্রনাথের অধীনস্থ স্বদেশী আমলার দল প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি স্বল্পবিস্তর বিরূপ ছিলেন। ক্রমে যখন রাষ্ট হইল যে, সুরেন্দ্রনাথ উপরওয়ালা য়ুরোপীয়দিগের বিরাগভাজন হইয়াছেন, তখন এ সকল বাঙ্গালী কেরাণীর মধ্যে কেহ কেহ গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটও ইঁহাদিগের নিকট হইতে সুরেন্দ্রনাথের দপ্তরের সকল খবরাখবর লইতে লাগিলেন। ইহার ফলে য়ুরোপীয়দের জ্ঞানতঃই হউক, আর অজ্ঞানতঃই হউক, সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা ছোটখাট ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিল। এই ষড়যন্ত্রই ক্রমে পাকিয়া উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ানির সর্ব্বনাশ করিল।

ব্যাপারটা অতি সামান্যই ছিল। সুরেন্দ্রনাথের এজলাসে একটা নৌকাচুরির মামলা দায়ের হয়। যুধিষ্ঠির নামে এক জন এই মামলায় প্রথম আসামী ছিল। যত দূর মনে পড়ে, যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়াতে আর এক ব্যক্তি এই চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার যথাযোগ্য শাস্তিও হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নাম একেবারে এই মামলার নথী হইতে উঠিয়া যায় নাই। নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইবার পরেও যুধিষ্ঠিরের নাম এই মোকর্দ্দমার নথীতে আসামী হইয়া রহে। ইহার ফলে যুধিষ্ঠিরের উপরে ওয়ারেণ্ট জারি হয়, আর ফলতঃ এই মামলা শেষ হইয়া গেলেও সালতামামীর হিসাবে ইহাকে মুলতুবী রহিয়াছে বলিয়া লিখা হয়। এই সকল নথীপত্রে অবশ্য হাকিমের সহি ছিল। সুতরাং মিথ্যা return এবং নির্দ্দোষকে আসামীভুক্ত করিয়া রাখা এবং আদালতে হাজির থাকিলেও ফেরার বলিয়া তাহার নাম নথীভুক্ত করা—সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ উপস্থিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জজের নিকটে লিখেন। জজসাহেব সকল কাগজপত্র দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের অমার্জ্জনীয় অসাবধানতা হইয়াছে, ইহা সাব্যস্ত করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনা অনুযায়ী হাইকোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। জজ কহেন যে, এই নৌকাচুরির মামলাতে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত আসামীকে ফেরার বলিয়া নথীভুক্ত করাতে অত্যন্ত অসাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহার হাতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আর থাকা বিধেয় নহে। অর্থাৎ, তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য নিম্নতর শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকারে রাখিলেই এই অনবধানতার যথাযোগ্য শাস্তি হইত। কিন্তু হাইকোর্ট অথবা বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্রনাথকে এরূপ লঘুদণ্ড দিতে রাজি হয়েন নাই। তাঁহার বিচারের জন্য একটা কমিশন বসিল। আর এই কমিশনের অভিমতে সুরেন্দ্রনাথকে সিভিল সার্ভিস হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল।

গত ৫০ বৎসর ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথের শত্রুরা তাঁহার এই পদচ্যুতিকে একটা বিরাট অপরাধের আকারে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোকের মনে এমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, সুরেন্দ্রনাথ না জানি কি গুরু অপরাধ করিয়া রাজ-কর্ম্ম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কিন্তু এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের কোনই অপরাধ ছিল না, সন্দেহের কথা। হাকিমরা কখনও কোন নথাপত্র সহি করিবার সময় সেই নথীভুক্ত সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া দেখেন না, দেখিতে পারেনও না। পেসকারের উপরে এ সকল ব্যাপারে তাঁহাদিগকে একান্তভাবে নির্ভর করিয়া চলিতে হয়; ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আরও বেশী চলিতে হইত। এ অবস্থায় মিথ্যা কথা নথীভুক্ত করার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অপরাধী ছিলেন, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। এরূপ মিথ্যা দলিল রচনা করিবার কোন হেতু তাঁহার পক্ষে ছিল না। তিনি যে কোন প্রকার স্বার্থের সন্ধানে ইহা করিয়াছিলেন, এ কথা কেহ ইঙ্গিত করিতেও সাহস পায় নাই। অনবধানতা ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের আর কোনই অপরাধ হয় নাই। অনবধানতা কোথাও গুরু অধর্ম্ম বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অথচ এই অর্দ্ধশতাব্দীকাল সুরেন্দ্রনাথের নামে এই একটা অন্যায় অপযশ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আজ অন্ততঃ যাঁহারা এ বিষয়ে ভিতরকার কথা জানিতেন, তাঁহাদের সকল কথা প্রকাশ করিয়া এই মিথ্যা কালন

করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই এই সামান্ত ঘটনা লইয়া এত কথা লিখিতে হইল।

২

দেশ-সেবার প্রারম্ভ

সিভিলিয়ানী শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে কায করিতেন। সেকালে মোটর গাড়ীর আবিষ্কার হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাইয়া একরূপ নিঃসম্বল হইয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। তালতলায় নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেনে পৈতৃক ভদ্রাসনবাড়ীতে বাস করিতেন। সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটা বড় ময়দানে, যত দূর মনে পড়ে, তুইটা বড় টিনের ঘরে তখন মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাসা ছিল। সেই যায়গায় এখন রাজা জয়গোবিন্দ লাহার প্রাসাদ উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ পাল্কীতে তালতলা হইতে আপনার কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিতেন। এই বৎসরেই কলিকাতা Student's Association-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন উভয়ে মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হয়েন। এই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়েই সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্ত বাগ্‌বিভূতি প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার রাষ্ট্রীয় নায়কত্ব গড়িয়া উঠে।

সুরেন্দ্রনাথ যখন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দেশসেবাব্রত গ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে স্বাদেশিকতার প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রথম নায়ক রাজা রামমোহন। কিন্তু রাজা রামমোহনের সময়ে ইংরাজ রাজশক্তির সঙ্গে আমাদের নবজাগ্রত স্বদেশহিতৈষণার কোন প্রকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। ইংরাজ প্রথমে জনসাধারণের হিতৈষিরূপেই বিদেশী ব্যবসায়ীর তৌলদণ্ড ছাড়িয়া মোগলের অসাড় হস্তচ্যুত রাজদণ্ড তুলিয়া লয়েন। বাঙ্গালাদেশে নবাবের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশাতে হিন্দু এবং মুসলমান আমীর-ওমরাহরা ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজকে ডাকিয়া আনেন। এই সময়ে এবং ইহার কিছুকাল পরে দেশে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ-মঠে ইহার উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ-মঠে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের গুরুর মুখে সেই বিদ্রোহের অবসানে যে সকল কথা ফুটাইয়াছেন, ইংরাজ-শাসন সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের মনোভাব তাহাতে অতি বিশদরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা এবং সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের জন্ম আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীক্ষা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের হাতে দেশের লোক এই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। অন্ত দিকে মোগল-শাসনের অন্তিমকালে দেশব্যাপী অরাজকতা ও উপদ্রব হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে উদ্ধার করিয়া ইংরাজ দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই কারণে রাজা রামমোহন স্বদেশের স্বাধীনতালাভে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইলেও ইংরাজ-বিদ্বেষী ছিলেন না। রাজার ধারণা ছিল যে, ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যেই এ দেশে ইংরাজের কায ফুরাইয়া যাইবে এবং তখন ভারতবর্ষও আধুনিক জগতের অপরাপর দেশের মত নিজের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং রামমোহন দেশের স্বাধীনতার জন্ম সচেষ্ট হইয়াও ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শত্রুভাব নিজেও পোষণ করেন নাই, দেশের লোকের মনেও জাগাইতে চাহেন নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন সংসার-লীলা সংবরণ করেন; আর যে ৪০ বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংরাজের শাসনের অবসান হইবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন, সেই ৪০ বৎসরের মধ্যেই তিলে তিলে একটা নূতন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাহাদিগের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইংরাজ-শাসনের প্রতিকূলে একটা প্রবল ভাবস্রোতের সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজা রামমোহনের পরলোকের ঠিক

৩২ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ দেশচর্য্যাব্রত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। সুরেন্দ্রনাথ যে যুগে এই নূতন সাধনা অবলম্বন করেন, বাঙ্গালাদেশে তাহা একটা অভিনব স্বাধীনতার যুগ ছিল। রামমোহন স্বদেশবাসীদিগকে প্রাচীন গতানুগতিক ধর্ম্মবিশ্বাসের এবং লোকাচারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। বেদান্ত এবং উপনিষদ প্রচার করিয়া তিনি হিন্দু জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মসাধনকে আত্মজ্ঞানের এবং সহানুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যগণ এই নূতন সাধনাকে আরও ফুটাইয়া তুলেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ (rationalism) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপরে ইঁহারা দেশের লোকচরিত্র এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সকলকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে রাজা এবং সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে কালের ব্যবধান ছিল, সেই ৪০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উচ্চ ও উদার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় ইঁহারা ধর্ম্মের সংস্কার এবং সমাজের শাসন উভয়ই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংসারের ক্ষতিলাভ-বিবেচনা-বিরহিত হইয়া এক দল লোক উন্মত্তের মত এই নূতন আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়াছিল। স্বাধীনতা এক এবং অবিভক্ত বস্তু। মানুষ যেমন একটা সমগ্র বস্তু, মানুষের মন যেমন একটা সমগ্র বস্তু, এ সকলের মধ্যে যেমন ভাগ-বাটোয়ারা চলে না, সত্য স্বাধীনতার আদর্শেও সেইরূপ কোন ভাগ-বাটোয়ারা সম্ভব হয় না। ধর্ম্মে ও সমাজে যাহারা সকল শৃঙ্খল কাটিয়া-ছাঁটিয়া আপনার বিচার-বুদ্ধির উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া সত্যের সন্ধানে এবং মোক্ষলাভের আশায় ছুটিয়াছিল, তাহারা কখনও রাষ্ট্র সম্বন্ধে পরাধীনতা স্বীকার করিতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগতে ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালার স্বাধীনতার ইতিহাসেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের অনুসরণে নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটা অভিনব স্বাজাত্যাভিমান এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর এই নূতন সাধনা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেই রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এবং প্রতিষ্ঠানে গাড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প লইয়া সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কলিকাতার ছাত্রসমাজ

রাজকর্ম্ম হইতে তাড়িত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত কলিকাতার সমাজে অপাংক্তেয় হইয়া ছিলেন। সামাজিক হিসাবে বিলাত-ফেরতা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ অপাংক্তেয় ত ছিলেনই; ইহার উপরে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেও অস্পৃশ্য হইয়া রহেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় অগ্রণী ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার প্রধান সভ্য ছিলেন। কোন বিষয়ে দেশের লোকের মতামত জানিতে হইলে, ইংরাজ রাজ-সরকার ইঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেন। ইঁহারাও ইংরাজ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যথাসম্ভব মিলিয়া-মিশিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে চাহিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের হিতসাধনেরও চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে সুরেন্দ্রনাথকে কলঙ্কের দাগ দিয়া রাজকর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়রা যে সর্ব্বপ্রকারের দেশহিতকর্ম্মে সেই সুরেন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাঁহারা দেশপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতিকূলে জনমণ্ডলীর স্বত্ব-স্বাধীনতার নামে সংগ্রাম ঘোষণা করেন, সকল দেশেই সেই রাজশক্তির লোকনায়করা তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আবার সকল দেশেই এই সকল স্বাধীনতার পুরোহিতরা সমাজের নগণ্য জনমণ্ডলীর সংহত শক্তির আশ্রয়ে আপনাদিগের শক্তিকে গড়িয়া তুলেন। অনেক স্থলে ইঁহারা দেশের শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীকে

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃজায়া নিকুঞ্জকামিনী

লইয়া নূতন স্বাধীনতার সাধনমণ্ডলী গড়িয়া তুলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে এই কর্ম্মেই আপনার সমুদয় শক্তিকে নিয়োগ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের চেষ্টায় বাঙ্গালা-সাহিত্য এবং নূতন নাট্যকলা ও রঙ্গালয়ের আশ্রয়ে দেশে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সাধনের কোন প্রতিষ্ঠান বা মণ্ডলী গড়িয়া উঠে নাই। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহনই প্রথমে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া একটা নূতন স্বাধীনতার সাধকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন। আনন্দমোহন বিলাত হইতে ফিরিবার সময় বোম্বাই হইয়া আইসেন। সেখানে তখন একটা নূতন ছাত্রসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সমাজের সভ্যরা বোম্বাই সহরে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ছাত্রসমাজের তত্ত্বাবধানে বোধ হয় দুই একটা বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া আনন্দমোহন আমাদের এখানে বোম্বাইয়ের মত একটা ছাত্রসমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহনের সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতার ছাত্রসমাজের বা Student's Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দকৃষ্ণ বসু তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। বোধ হয় এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নন্দকৃষ্ণ তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নন্দকৃষ্ণই এই নূতন ছাত্রসমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। নন্দকৃষ্ণ পরে Statutory সিভিলিয়ান হইয়া প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ক্রমে জিলার জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বোধ হয় নন্দকৃষ্ণ বসুর পরে এই ছাত্রসমাজের সম্পাদক হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই আনন্দমোহন এই সমাজের সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই ছাত্রসমাজের আশ্রয়েই সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনের এবং লোকনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

কলিকাতার Student's Associationএর নিজের কোন বাড়ী ছিল না। হিন্দু-স্কুলের থিয়েটারেই 'ছাত্রসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হইত। বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমাংশে এই হিন্দু-স্কুল থিয়েটার ছিল। ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে এখানেই আমাদের যত বড় বড় সভার অধিবেশন হইত। এখানেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "এ-কাল ও সে-কাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আর মনে হয়, এখানেই বোধ হয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা-সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রথম প্রস্তাব পঠিত হইয়াছিল। এইখানেই সুরেন্দ্রনাথ এই কলিকাতা ছাত্রসমাজের নিকটে প্রথম বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল—শিখশক্তির অভ্যুত্থান। এমন বক্তৃতা বাঙ্গালী আর কখনও ইতঃপূর্ব্বে শুনে নাই। যেমন বিষয়, তেমনই সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী ভাষা। সে দিন সন্ধ্যার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে গোলদিঘীর চারিদিকে যেন একটা প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। কিরূপে গুরুগোবিন্দ একটা মুষ্টিমেয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া একটা দুর্জ্জয় রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিরূপে অভিনব স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য সামান্য কতকগুলি কৃষক প্রবলপরাক্রান্ত মোগল প্রভুশক্তিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, কিরূপে এই শিখ গণতন্ত্র বা খালসা আপনার অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবে গুজরাট এবং চিলিনওয়ালা যুদ্ধে অসাধারণ সমরকুশল ইংরাজ প্রভুশক্তিকে পর্য্যন্ত একান্ত পরাভূত করিতে

না পারিলেও নিতান্তই কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্য বাগ্‌বিভূতির আশ্রয়ে এ সকল কথা অভিব্যক্ত হইয়া কলিকাতার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলীর অন্তরে এক অদ্ভুত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বদেশ-প্রীতি জাগাইয়াছিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র বাঙ্গালার স্বাধীনতার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা ও পুরোহিত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মের নামে, যুক্তিবাদের নামে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে পরমার্থের অন্বেষণে প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে একটা নূতন স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছিল। সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের একরূপ অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু চিন্তায় এবং ভাবে, সিদ্ধান্তে এবং আদর্শে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ মানিয়া লইলেও অতি অল্পলোকই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এই অভিনব স্বাধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিতেন। হিন্দু-সমাজের শাসন তখন অত্যন্ত কঠোর ছিল। পাউরুটী-বিস্কুট খাইলেও লোক সমাজচ্যুত হইত। সুতরাং সকলের পক্ষে এই কঠোর শাসনকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াও অতি অল্প লোক এই জন্য ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে পারিতেন। ক্রমে যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক দিকে এবং সমাজশাসন অন্য দিকে,এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়িয়া নিজেদের ভিতরকার দুর্ব্বলতার জন্য ভাবে ও কাযে এক করিতে না পারিয়া মনে মনে আপনার কাছে আপনি খাটো হইয়া পড়িতে ছিলেন, তাঁহারা এই আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটিদুর্ব্বলতা অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন; এবং পরিণামে নানা অজুহতে ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী হইয়া উঠেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন এই অবস্থাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দুন্দুভি বাজাইলেন, তখন ইঁহারা নিজেদের অন্তরের বলবতী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির লোভে এই নূতন এবং অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এ সংগ্রামে সমাজশাসনের ভয় ছিল না। পরিবার-পরিজনের স্নেহবন্ধন ছেদন করিতে হইত না। নিজেদের স্বাভাবিক দায়াধিকার

সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ সপরিবারে

হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না। ঘরবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড়াইতে হইত না। সুতরাং এই নূতন স্বাধীনতার আন্দোলন সহজেই দেশ ছাইয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল—শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সংস্কারকর্ম্ম। ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন স্কুলে সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দেন। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের কিংবা মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী ভক্তিতত্ত্বের বিবৃতি ছিল না। ছিল কেবল তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কথা। তান্ত্রিক-প্রধান বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে কি করিয়া মহাপ্রভু ব্রাহ্মণচণ্ডালনির্ব্বিশেষে হরিনাম বিলাইয়া জানিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পলোকই মহাপ্রভুর জীবনের ও শিক্ষার সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বৈষ্ণবগণও কেবল গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করিতেন। আমরা মহাপ্রভুকে তখন এক জন ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপেই জানিতাম। সুরেন্দ্রনাথও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে এক জন অলোক-প্রতিভা ও শক্তিসম্পন্ন ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপেই আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিখিয়া আমরা যে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

শিমুলতলায় বিশ্রামনিরত সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে [শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন জাতি-বর্ণের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা নূতন সমাজ-বিধানের প্রতিষ্ঠা করেন, সুরেন্দ্রনাথ সে সকল কথাই বলিয়াছিলেন। সে কালে মহাপ্রভু-প্রচারিত নূতন ঈশ্বর-সিদ্ধান্ত এবং ভক্তিপন্থার প্রামাণ্য গ্রন্থাদি শিক্ষিত-সমাজে একান্তই অপরিচিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয় নাই। আজিকালি আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ও মহাপ্রভুর ভক্তিপন্থার একটু একটু যাহা জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীর ত কথাই নাই, বাঙ্গালার নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব-সমাজেও সে সকল কথা অতি অল্পলোকের জানা ছিল, এবং যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, শ্রীচৈতন্যকে সেই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা ও পুরোহিতরূপেই গ্রহণ করিলাম। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ আমাদের নিজেদের দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের সাহায্যে আমাদিগের মধ্যে একটা নূতন স্বাজাত্যাভিমান এবং জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলেন। আর ধর্ম্মের প্রেরণা দ্বারাই যে এই নূতন আদর্শের সফলতালাভের চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের বুদ্ধি এবং বিবেকের শুদ্ধতা এবং স্বাধীনতার উপরেই যে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই সুরেন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা ছিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিনবিহারী পাল।

বাঙ্গালায় প্রথম জাতীয় স্পন্দন-প্রবাহ

আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম স্পন্দনের স্মৃতি সুরেন্দ্র বাবুর কারাগমনের সঙ্গে জড়িত। তখন আমি বছর নয় দশের বালিকা। বেথুন স্কুলে পড়ি। সে বয়সে নিজের কোন নিজত্ব দানা বাঁধেনি। বড়দের চালনায় চলতুম। কোথা থেকে কোন্ হাওয়া যে কে বইয়ে দিত, তার খবর রাখতুম না, শুধু একটা কোন বিশেষ দিকে বিশেষভাবে হঠাৎ চলতে আরম্ভ করেছি, এই দেখতে পেতুম। সে কালে আমাদের স্কুলে প্রথম ধাপের নেত্রী ছিলেন কলেজবিভাগের শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী অবলা বসু, শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগীর ও শ্রীমতী কামিনী রায়। তার পরের ধাপে স্কুলবিভাগে ছিলেন আমার দিদি শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী। ধাপে ধাপে হাওয়া ও হুকুম নেমে আমাদের গায়ে পৌঁছত। তার ফলে এক দিন ফ্রকের উপর চওড়া কালো ফিতের 'বো' বেঁধে গেল। কেন? সুরেন্দ্র বাবু ব'লে দেশের কে এক জন বড়লোক না কি জেলে গেছেন, তাই দেশের মেয়েদের না কি এই রকম ক'রে শোক দেখাতে হয়। অনেক মেয়েই ফিতে প'রে এল, কেউ কেউ পরলে না; তাদের মায়েরা ফিতে কিনে দেয়নি, বলেছে—"এ আবার কি ঢঙ্?"

যা হোক্, আমরা কালো ফিতে-পরা মেয়েরা মনের মধ্যে একটা গুরুত্ব অনুভব করতে লাগলুম। যারা পরেনি, যারা ঠাট্টা করে, তাদের সামনে একটু লজ্জাও করে, অথচ একটা যেন যথাকর্ত্তব্য করার আত্মসম্মান-বোধে একটু পায়া ভারিও হয়।

তার উপর একটা চমৎকার রসে মন ভ'রে গেল। গাড়ী ক'রে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরবার সময় সে দিন দেখি, হেদোর ধার দিয়ে যে সব বালক-ছাত্ররা যাতায়াত করছে, তাদের মধ্যেও কারও কারও বুকে কালো ফিতের ফুল লাগান। একটা সহৃদয়তার সমানধর্ম্মিতার বৈদ্যুতী মনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল,—ঐ যে পায়ে-হাঁটা ছেলেরা আর এই যে আমরা গাড়ী-চড়া মেয়েরা, আমরা একই। Esprit-de-corps জিনিষটা সে দিন শব্দতে না জানলেও বস্তুতে অনুভব করলুম—সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসে শোকচিহ্ন ধারণের দ্বারা জাতীয় একতাবোধের হাতে খড়ি আমার হ'ল।

তার পর যে অদেখা সুরেন বাবুর জন্য কালো ফিতে পরেছিলুম, তাঁকে চোখে দেখলুম—লর্ড রিপণের অভ্যর্থনায় ফুলবালা সেজে। স্বদেশীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও তখন হ'ল। অভ্যর্থনাকমিটীর দেওয়া স্বদেশী রেশমের তৈরী সাড়ী ও জামায় ভূষিত হয়ে কমিটী-নির্ব্বাচিত আর বিশ ত্রিশটি মেয়ের সঙ্গে—তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেনের মেয়েও ছিলেন একটি—লাইন বেঁধে ফুলের ঝারি হাতে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলুম। লর্ড রিপণ যেমন গাড়ী থেকে নেমে লাল কাপড়-মোড়া প্লাটফরমে চলতে আরম্ভ করলেন, আমরা সার-বাঁধা পুষ্পবালিকারা তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলুম। সেই বাল্যের আটহাতী প্রথম স্বদেশী ও ঐতিহাসিক সাড়ীখানি আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে আছে। তার ভাঁজে ভাঁজে বাঙ্গালী জাতির একটা জাগরণের ইতিহাস সঞ্চিত আছে। সে দিনকার অনুষ্ঠানের কর্ত্তা ছিলেন সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রধানতঃ গিরিজাশঙ্কর সেন, অল্পদিন পরেই যাঁর অকাল-মৃত্যুতে দেশ সে সময় শোকতপ্ত হয়েছিল। গিরিজা বাবুর বোন্ আমার সহপাঠিকা ছিলেন।

তার পর বড় হয়ে সুরেন্দ্র বাবুকে অনেক যায়গায় অনেকবার দেখেছি ও শুনেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় শিমুলতলায়। সে বছর তিনি কংগ্রেসের জন্য দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হয়েছেন। তাঁর বড় দুটি মেয়ের তখন বিবাহ হয়ে গেছে। ছোট তিনটি তখনও কুমারী, এই তিনটি বোন্ ও তাদের মা আমায় হৃদ্যতায় বেঁধে ফেল্লেন। যেন আজন্মের আলাপ ও ভালবাসা। রোজ যেতে হবে তাদের বাড়ী, বিকেলে এক-সঙ্গে চা খেয়ে কালাপাহাড় পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসতে হবে। বেড়াতে বেরিয়ে কাপড়ে একমাঠ চোরকাঁটা ভ'রে আসা যেত। ফিরতি বেলা আবার তাদের বাড়ী বসতে হবে, তারা তিনটি বোনে মিলে একটি একটি ক'রে আমার কাপড় থেকে সমস্ত চোরকাঁটাগুলি তুলে ফেলে

সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্রদ্বয়—গৌতম ও সঞ্জীব

তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সঙ্গে অপূর্ব্ব মেধার সেই প্রথম পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্য হলুম।

সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সেই যে কন্যোপম সম্পর্ক পাতা হয়ে গেল, সে সম্পর্কের উপযোগী স্নেহ-ব্যবহার তার পর থেকে বরাবরই পেয়ে এসেছি। যখনই আমার কোন কোন বাতিকের পুষ্টির জন্যে তাঁর সহায়তা চেয়েছি, অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্যদান করেছেন। আমার লাঠি খেলানর যুগে ভিতরে ভিতরে যাই তাঁর মনোভাব হোক, বেঙ্গলীর স্তম্ভ আমার মতপ্রচারের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। যখন আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় খোলার জন্য আন্দোলন করেছি, সন্তোষের রাজা মন্মথনাথের সঙ্গে তিনিও প্রত্যেক প্রাইভেট মিটিংয়ে যোগদান ক'রে আমার বিচার ও বক্তব্য সমর্থন করেছেন এবং রমেশ মিত্র বালিকা-বিদ্যালয়কে আমার মতে চালানর জন্য আমার হাতে সমর্পণে উদ্যোগী হয়েছেন। এ ত গেল সাধারণের কাযে সাহায্য দান। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর স্নেহ তখন থেকে আমার প্রতি স্বতঃ উৎসারিত দেখেছি। তিনি শিমূলে থেকে দেবে, আরও কত রকমে সেবা-শুশ্রূষা করবে, তার পরে আমি তাদের গান শোনাব, তবে ছুটী পাব। কিন্তু তাদের কাছে ছুটী পেলেও তখনই বাড়ী ফিরে আসা হ'ত না। তার পর সুরেন্দ্র বাবুর টেবলের ধারে ডাক পড়ত। ততক্ষণে তিনি তাঁর সান্ধ্যভ্রমণ সেরে এসেছেন। এত বড় দেশনায়ক, বাড়ীতে তাঁর মেয়ে কটির হাতে কি রকম করতলগত নবনীর মত মোলায়েম হয়ে থাকতেন, বাপের উপর তাদের স্নেহের কি কড়া শাসন চলত, তা দেখে হৃদয় প্রীতিপ্রফুল্ল হ'ত। মেয়েরা তখন সরলা-দিদিগতপ্রাণ, তাই তাঁরও আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচয় হ'ল। তাঁর কংগ্রেসের অভিভাষণ লেখা শেষ হয়েছে, আমাকে তার প্রথম শ্রোতা করবেন। সে সময়টা মেয়েরা বাপের কাছ থেকে পলাতকা। তাঁর সামনে তাকের পর তাক লেখা কাগজ প'ড়ে রয়েছে। তারই এক একখানা ক'রে আমার তুলতে বললেন আর তিনি না দেখে তাই কণ্ঠস্থ ব'লে যান।

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী মৃণালিনী

সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ

নামছেন, আমি লাহোর থেকে আসছি, পথে অম্বালা ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে দেখা। অমনি ব্যস্ত হয়ে খোঁজ নিলেন আমার বার্থ ঠিক আছে কি না, সঙ্গে ক'রে নিজে গিয়ে উঠিয়ে দিলেন, শঙ্করকে ডেকে হুকুম দিলেন—"রিফ্রেসমেণ্টরুম থেকে এঁর জন্যে খাবার নিয়ে এসো।"

লাহোর কংগ্রেসে ভূপেন বাবু, পৃথ্বীশ বাবু আর সমস্ত বাঙ্গালী ডেলিগেটদের সঙ্গে সুরেন বাবুকে আমার গৃহে অতিথিরূপে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম। বৃদ্ধের শীতাতপসহিষ্ণুতা ও সাদাসিদেভাব বয়োন্যূনদের ধিক্কার দিত। সেবার দক্ষিণ-আফ্রিকায় চাঁদা পাঠানর জন্য তিনি কংগ্রেসে আপীল করেন, তাঁর আপীলে সাড়া পড়তে বিলম্ব হ'তে লাগল। মহাসভা নীরব, কেউ উঠল না, কেউ বল্লে না কিছু দিতে চায়। আমার মনে ধাক্কা লাগ্‌ল। দক্ষিণ-আফ্রিকার জন্যে নয়, সুরেন বাবুর মান রাখার জন্যে। সঙ্গে কিছুই টাকা ছিল না। হঠাৎ একটা উপায় মাথায় এল। হাতের একগাছা বালা একটু কষ্ট ক'রে খুলে তাঁর সামনে রাখলুম। আমার এই কন্তোচিত কাযে বৃদ্ধ গদ্‌গদ হলেন। সভার নীরবতার বাঁধ ভাঙ্গল, হাজার হাজার টাকার প্রতিশ্রুতির স্রোত বইল, আমার বালাগাছির মূল্য সে সবের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আমার সে ক্ষুদ্র উৎসর্গটি কোন দিন বিস্মৃত হননি, একটা Psychological momentএ মানুষের স্তব্ধ মনের গতিকে চালনা দেওয়ার মুহূর্ত্তের দান ব'লে তাকে মাথায় তুল্লেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দিনকতক শ্রীযুক্ত বিপিন পালের সঙ্গে সুরেন বাবুর বিলক্ষণ বাদবিসংবাদ ও অপ্রীতি চলেছিল। বিপিন বাবু তখন ঘোর গরমপন্থী হয়ে নরমপন্থী সুরেন বাবুর উপর তাঁর তৎকালীন কাগজে গোলাবর্ষণ করছেন। বেঙ্গলীতে তার জবাব চলছে। এমন সময় হঠাৎ শুনা গেল, বিপিন বাবুকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বেরিয়েছে। খবরটা যেখানে এল, সেখানে সুরেন বাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলুম, এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা না ক'রে সুরেন বাবু তাঁর দলবলকে ডেকে বল্লেন—"বিপিনের ডিফেন্সের সব বন্দোবস্ত তৈরী রাখ, জামিনে খালাসের আয়োজন ঠিক থাকুক, কোন্ ব্যারিষ্টার দেওয়া হবে, কত টাকা তুলতে হবে হিসেব কর।"

ব্যক্তিগত অনৈক্য ভুলে জাতীয় ঐক্যকে প্রাধান্য দেওয়া জিনিষটি কি, দেশের নেতা হওয়ার রহস্যটি কি, তা সে দিন উপলব্ধি করলুম।

রাজমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পর আমার সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাস আমি হারাইনি। আজ বাঙ্গালার কেশরী শ্মশানে শায়িত; তাঁর সিংহ-গর্জ্জনে আর টাউনহল ও জাতির জাতীয়তা নড়ে উঠবে না। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি এখনও বহুকাল বহমান ও কার্য্যকরী থাকবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

সুরেন্দ্রনাথের পুরাতন কথা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম দেখি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। পিতৃদেবের যে সকল বন্ধু ও "রোগী" ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের সহিত মিশিবার ও সময়ে সময়ে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।

এইরূপে যে সকল মহাজনের দর্শন পাইয়াছি, তাহার মধ্যে বেশী মনে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (খিদিরপুর), বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

সুরেন্দ্র বাবুর পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার পিতা সহকর্ম্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সিভিল সার্ভিস ত্যাগের পর সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ তাঁহাদের তালতলার বাড়ীতে বাস করিতেন। জিতেন্দ্রনাথের কুস্তীর আখড়াতে আমরা কুস্তী, জিমন্যাষ্টিক করিতাম, সুরেন্দ্র বাবুর কথা শুনিতাম। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ডাক্তার সত্যপ্রসাদ ও জিতেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে সহপাঠী ছিলেন। আমি তাঁহাদের অনেক নীচের ক্লাসে পড়িতাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহাধ্যায়ী জিতেন্দ্রনাথের বাহুবল ও সাহস আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করাইয়াছিল। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এখনও পর্য্যন্ত সে বন্ধুত্ব তেমনই রহিয়া গিয়াছে।

একবার পুলিসের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের দাঙ্গা হয়, আর একবার নবগোপাল মিত্র মহাশয়-স্থাপিত জাতীয় মেলায় পুলিস ও ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়। উভয় দাঙ্গাতেই ছাত্রপক্ষের নেতা বীর জিতেন্দ্রনাথ। তখন ইউন্যান নামে এক জন দুর্দ্ধর্ষ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; ডাক্তার ইউন্যান ও ফাদার ইউন্যান তাঁহার পুত্র। তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল, জিতেন্দ্রনাথের বিপুল ঘুসী সেই চক্ষুতে রণস্থলে ক্ষণিক আশ্রয় লাভ করে। সংস্কৃত কলেজের এক জন রঙ্গপ্রিয় অধ্যাপক রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা হা, কাণা চোখটাতেই কেন ঘুসী মার্‌লে।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউন্যানের নামই ছিল, "কাণা সার্জ্জন।" ছাত্রসমাজে সুরেন্দ্রনাথের আধিপত্য-স্থাপনের পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলবীর্য্যে, সৌজন্যে ও বন্ধুবাৎসল্যে বাঙ্গালার ছাত্রহৃদয় অধিকার করিয়া জ্যেষ্ঠের কার্য্যপথ কতকটা সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। প্রভূত চেষ্টায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ভলান্টিয়ার শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, উত্তরকালে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হইয়া, স্তাওহার্ষ্ট-কমিটীর মেম্বার হইয়া, দেশের সামরিক শিক্ষায় সহায়তা করিয়া দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা আমাদের ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাড়ীতে পিতৃদেবের নিকট আসিতে হইত, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাংঘাতিক পীড়িত। পিতৃদেব দুইবার তিনবার তালতলার বাড়ীতে চিকিৎসার্থ যাইতেন, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, পরামর্শ দিতেন, উৎসাহ দিতেন। সুরেন্দ্র বাবুকে অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে পিতৃদেবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। তখন আমি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইতাম। তিনি তাড়াতাড়িতে কোন কোন দিন পাল্কীভাড়া আনিতে ভুলিয়া যাইতেন। মা'র নিকট হইতে পয়সা লইয়া উড়িয়া বেহারার গোল থামাইতাম, তাঁহার জলযোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতাম। তাহাতে বড় উৎসাহ—বড় আনন্দ হইত। একে জিতেন বাড়ুয্যের দাদা, তাহাতে সেইমাত্র সিভিল সার্ভিস হইতে বহিষ্কৃত

—অতএব সকলেরই তিনি বড়ই অনুরাগের পাত্র। 'ইংলিশম্যান', 'হিন্দুপ্রেট্রিয়ট', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার নিজের মুখে বাকী অনেক কথা শুনিলাম।

শুধু এই উপলক্ষেই ৫০ বৎসরের কথা এত করিয়া মনে থাকিবার কথা নয়। সুরেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রক্ষা পাইল না। যে দিন ছেলেটি মারা গেল, সেই দিনই বৈকালে পুরাতন এলবার্টহল গৃহে সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভার স্থাপন ও প্রথম অধিবেশনের দিন ধার্য্য ছিল। দারুণ পুত্রশোকে অভিভূত হইয়াও, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নির্দ্ধারিত সময়েই সভা স্থাপন ও অধিবেশনে কৃতসংকল্প হইলেন। পিতৃদেব ও সুরেন্দ্র বাবুর তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী শোক দমন করিয়া তাঁহার এ কার্য্যের অনুমোদন ও সহায়তা করেন। সেই কারণে ঘটনাটা মনে রহিয়া গেল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসভা স্থাপিত হইল। সুরেন্দ্র বাবু আজীবন সম্পাদক অথবা সভাপতিরূপে সভার সেবা করিয়া দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের অবতারণা করেন। দেশে প্রদেশে, নগরে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মত যেরূপ ভাবে গঠিত করেন এবং তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ফল ফলিয়াছে, সে কথার আলোচনার স্থান ও সময় ইহা নয়। সে কথা বাঙ্গালার ইতিহাসের কথা—ভারতের ইতিহাসের কথা। ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, বাঙ্গালার তথা ভারতের জাতীয় ভাবের সুদৃঢ় ভিত্তি সুরেন্দ্রনাথ স্বহস্তে স্থাপিত করিয়াছেন। আজ বম্বে, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, আসাম, বেহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ দেশ-মাতৃকার সত্তা অনুভব করিতে শিখিয়াছে, আত্মমর্য্যাদা শিখিয়াছে, দেশসেবায় কৃতসংকল্প হইয়াছে। বাঙ্গালার ইহাই গরীয়সী কীর্ত্তি যে, বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, প্রতাপ, লালমোহন, আনন্দমোহন, কালীচরণ প্রভৃতি পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশসেবার, দেশপ্রেমের, দেশভক্তির মূল মন্ত্র দিয়াছেন।

প্রসাদপুর সর্ব্বাধিকারিভবনে সান্ধ্য-সম্মিলনে সুরেন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে] [শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর সৌজন্যে

আজ তাই ভারত ধন্য। কিন্তু সে কথা আমি এখানে বলিব না—এখন বলিব না। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সে কথা তাঁহার জীবনীগ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বাকী অনেক। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালার পক্ষ হইতে যে কার্য্যের অবতারণা করেন, বাঙ্গালার এই সব সুসন্তান সে কায বহু পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দেন।

কলেজ ষ্ট্রীটে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ড্রাগিষ্ট হলের পাশে ভারতসভা কিছু দিন ছিল ও পশ্চিম ফুট-পাথে অপর একটা বাড়ীতেও কিছু দিন ছিল। এই বাড়ীর ঘর ও সাজ-সজ্জা উপলক্ষ করিয়াই ব্যঙ্গরস-রসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গাহিয়াছিলেন—

"দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে।"

পুত্রশোকে আকুল না হইয়া বীরের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ পুত্রের মৃত্যুর দিন বৈকালেই তাঁহার পরিকল্পিত সভা স্থাপন করিলেন। ইহাতে মন বিস্ময়, ভক্তি ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভারতসভা প্রবীণ দলের জন্য স্থাপিত হইল। কিন্তু ছাত্রজীবন গঠন করিয়া ভবিষ্যৎ দেশসেবক দল প্রস্তুত না করিতে পারিলে যথার্থ কার্য্য অগ্রসর হইবে না, সুরেন্দ্রনাথ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েসন্ স্থাপিত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস, নন্দকৃষ্ণ বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর গুহ প্রভৃতি অনেকে সে কার্য্যের সহিত পূর্ণপ্রাণে যোগদান করিলেন। সভাস্থাপনাবধি আমি সহকারী সম্পাদক পদে ব্রতী ছিলাম, পরে সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিও বুঝি হইয়াছিলাম। স্বহস্তে হ্যাণ্ডবিল লিখিয়া ও বিতরণ করিয়া, বাজার হইতে মাটীর কল্‌কে ও বাতী খরিদ করিয়া সভা আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া, চেয়ার, বেঞ্চ সংগ্রহ, সাজান, ঝাড়া-পোঁছা পর্য্যন্ত করিয়া তখন সভার কায চালাইতে হইত; বক্তা-সংগ্রহ, শ্রোতা-সংগ্রহ সবই করিতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ও সাঁতার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত। নিকটস্থ গ্রাম বা নগরে দেশের অবস্থা, নীতি-রীতি আলোচনার জন্য কখন কখন ছাত্রদলকে লইয়া যাওয়া হইত। ম্যাটসিনির গ্রন্থাবলীর আলোচনা হইত, কৌসথ (Kossuth) গ্যারিবল্ডীর জীবন-চরিত, এমেট ওডনেনের বক্তৃতা কণ্ঠস্থ করা হইত। সকল কার্য্যেই সুরেন্দ্র বাবুর সহায়তা, উপদেশ, সাহচর্য্য লাভ হইত। দপ্তরীপাড়ায় নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াইতাম, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিতাম। ছোট-বড় সকল কাযই সুরেন্দ্রনাথকে অগ্রণী করিয়া হইত। লিখাপড়া, পরীক্ষা দেওয়া ও পাশ করা প্রভৃতি কিছুরই হানি তখন হইত না—অথচ কায হইত অনেক। আশুতোষ বিশ্বাস সুরেন্দ্র বাবুর অনুকরণেই বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। দেখা-দেখি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়ও সেই অনুকরণের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে ওজস্বিনী বক্তৃতার আদর্শ সে সময় খুব উচ্চ হইয়া উঠিল। অথচ শিক্ষাবিভাগ কিংবা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আপত্তি কিছু করা হইত না। হিন্দু স্কুলের থিয়েটার হলে আমাদের সভা হইত, পুরাতন এ্যালবার্ট হলেও হইত। কিন্তু এ্যালবার্ট হলে গ্যাসের দাম দিয়া উঠা দায় হইত বলিয়া হিন্দু-স্কুল থিয়েটার হলে কল্‌কে ও বাতীর সাহায্যে সভার কায চলিত। সেই অর্দ্ধান্ধকার সভায় দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র বাবু গলা কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "Who shall be our Matsinis and Garibaldis"? আর ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে সমস্বরে উত্তর হইত, "All, All।" তদপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে গ্যালারীর সর্ব্বোচ্চ বেঞ্চের উপর হইতে জিতেন বাঁড়ুয্যের অব্যর্থ সন্ধানে কাঁইবীচি সেই সব ভাবী ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর মস্তকে অজস্র বর্ষিত হইত। জিতেন্দ্রনাথ কায বুঝিতেন, কথা বুঝিতেন না। বুঝি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ এই কাঁইবীচি বর্ষণ হইত! তাহাতে কোন পক্ষের বিরক্তি উৎপাদন হইত না।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রবর্ত্তিত 'আর্য্যদর্শন' মাসিক পত্রিকায় ম্যাটসিনির জীবন-চরিতের অনুবাদ এই সময় বাহির হয় এবং আমরা সকলেই ম্যাটসিনির জীবন-চরিত ও গ্রন্থাবলী কিনি। বন্ধুবান্ধবের বিবাহে সেই সকল গ্রন্থ উপঢৌকন দেওয়া তখন খুব প্রচলিত হইল। এই সময় বুকের রক্ত দিয়া কেহ কেহ দেশসেবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বাড়ীর "দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে" ঘরের অন্ধকারের

মধ্যে এ সকল প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের সময় অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কিন্তু পুলিসপেয়াদা পশ্চাতে লাগে নাই। ভারত-সভার প্রতি ও ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েসনের প্রতি কোন কোন পদস্থপুঙ্গবের খরদৃষ্টি থাকিলেও সরকারপক্ষ হইতে তাহাদের উপর রাজনৈতিক বর্ণ আরোপের চেষ্টা হয় নাই।

এই সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজ ও প্রথার প্রতি অমর্য্যাদা না দেখাইয়া যথাসম্ভব সমাজ-সংস্কারের আয়োজন করেন এবং ছাত্রগণকে সে ব্রতে ব্রতী করান। কন্যার বিবাহকাল সম্বন্ধে সহসা হস্তক্ষেপ না করিয়া বালকদিগের বিবাহের বয়স লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। "২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না"—এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞাপত্রে অনেক ছাত্র স্বাক্ষর করে। কেহ কেহ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল;—যদিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে কাহাকেও কাহাকেও নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল।

জাতীয় জীবন একদর্শী হইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে না, এবং প্রকৃষ্টরূপে ও ব্যাপকরূপে দেশে শিক্ষা-বিস্তার না হইলে উপায় নাই—ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও শিক্ষাকার্য্যে তিনি নিজেকে ঢালিয়া দিলেন। তিনি নিজে ডভটন্ কলেজের ছাত্র, ইংরাজী লিখার ও বলার যথেষ্ট শক্তি ছিল। ছাত্রশিক্ষায় সে শক্তি বাড়িয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষাকার্য্যের ভিতর দিয়া ছাত্রজীবনের সহিত অন্তভাবে গাঢ়তররূপে সংশ্লিষ্ট হইতেছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও আমার পিতৃদেব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃদেব ও পিতৃব্যগণ এক"বাসায়" থাকিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজী পড়াইতেন; ও তাঁহার নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয়ও সে পাঠনায় সাহায্য করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরাণীগিরি করিতেন, পরে সেই কলেজে পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ক্রমশঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুল ইনস্পেক্টর প্রভৃতি পদে উন্নীত হয়েন। যখন সুরেন্দ্র বাবুর কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল ও পুত্রশোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহার প্রেসিডেন্সী স্কুল নামক বিদ্যালয়ে সুবিধা হইল না, তখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ও পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন—এখন যাহার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ—সুরেন্দ্রনাথের জন্য কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের বন্ধু ও "রোগী" কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সহিত সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম লর্ড লীটন দিল্লী দরবার করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী আখ্যা ঘোষণা করেন, সুরেন্দ্র বাবু হিন্দু-পেট্রিয়টের পক্ষ হইতে দিল্লীর সংবাদদাতা হইয়া যায়েন এবং তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের রাজনৈতিক মত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষানৈতিক মতের সহিত তাঁহার ক্রমশঃ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "বেঙ্গলী" পত্রের স্বত্ব তিনি ক্রয় করিলেন এবং ক্রমশঃ রিপণ স্কুল ও রিপণ কলেজের স্থাপন হইল।

বেঙ্গলী কাগজ প্রথম সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়, ক্রমশঃ দৈনিক আকার ধারণ করে। তালতলায় বাড়ীতেই বেঙ্গলী ছাপাখানা ছিল। প্রতি শনিবার ছাপা হইত। শুক্রবার রাত্রি জাগিয়া বেঙ্গলী লেখা ও ছাপার সহায়তা করিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে "সময়" ও "ভারতবাসী" পত্রিকায় লিখিবার সময় এত অবকাশ পাইতাম না। Indian Worldএ লিখিবার কালেও বিশেষ অবকাশ থাকিত না। বেঙ্গলীর সহিত সম্পর্কে উত্তরকালে হিন্দু-পেট্রিয়ট-সম্পাদনে সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্র বাবু খাইতে, ঘুমাইতে ও ব্যায়াম করিতে বিশেষ মজবুৎ ছিলেন। তাহা বেঙ্গলীর কায করিবার সময় দেখিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম।

তাঁহার অনুরোধে রিপণ কলেজের কার্য্যকরী সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলাম, প্রয়োজনমত তাঁহার

নবপ্রতিষ্ঠিত ল-কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাযও করিয়াছি এবং আমি ভাইসচ্যান্সেলার থাকার সময় গবর্ণমেণ্ট ও ইউনিভারসিটির সাহায্যে রিপণ কলেজের যে হোষ্টেল স্থাপিত হয়, তাহার নির্ম্মাণকার্য্যের জন্ম ভারার উপর উঠিয়া অনেক দিন কায তদারক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

একবার পিতৃদেবের সময়ে, একবার আমার ও একবার আমার ভ্রাতা স্বরেশপ্রসাদের সময়ে রিপণ কলেজের উপর ইউনিভারসিটির প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়। পিতৃদেব, পিতৃব্য রায় বাহাদুর রাজকুমার, ভ্রাতা স্বরেশপ্রসাদ ও আমাকে সে সময়ে রিপণ কলেজ রক্ষার জন্ম অনেক ক্লেশ, গ্লানি ও অসুবিধা সহিতে হইয়াছিল।

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সুরেন্দ্র বাবু ও আমি একত্র অনেক সময় কায করিয়াছি। আমার যেবারে ভারত ব্যবস্থাপক সভায় যাইবার কথা হয়, শেষ মুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় হইল যে, তিনি নিজেই সে সভায় যাইবেন। অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, আমিও সরিয়া দাঁড়াইলাম। ভূপেন বাবুর এইরূপ অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিতীয়বারও সরিয়া দাঁড়াইলাম। তৃতীয় বারে যখন ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে যাইলাম, তাহার পরই নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। সুরেন্দ্র বাবুর ও আমার পুরাতন সভার সভ্যত্বলোপ এক সময়েই হইল। আমি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনের জন্ম দাঁড়াইলাম। সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ অনুরোধ করিলেন যে, আমার বাঙ্গালা সভার জন্ম দাঁড়ান হইবে না, ভারত ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হইবে। তাঁহাদের অনুরোধ ও অনুমতি শিরোধার্য্য করিলাম। পাঁচ বৎসরকাল তাঁহারই অনুরোধ ও উপদেশ অনুসারে বাঙ্গালার বাহির হইতে তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শের অনুযায়ী দেশসেবার চেষ্টা করিতেছি।

স্থানীয় ও সিমলা ব্যবস্থাপক সভায়, ভারতসভায়, কলিকাতা কর্পোরেশনে ও অন্যান্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা সভাসমিতিতে বহুকাল একত্র কাষ করিয়াছি। তাঁহার নির্যাতন ও গৌরব দেখিয়াছি। দশচক্রে ভগবান্ যেমন ভূত হয়েন, সেইরূপ চক্রে তাঁহার গৌরবচ্যুতি দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছি; কিন্তু এমন মানুষ ত আর দেখি নাই। সহস্র বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তিতে নিরুদ্যম হওয়া তাঁহার কোষ্ঠীতে লিখে নাই। শেষবয়সে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে এবং ঘোরতর বিঘ্ন-বিপত্তি সত্ত্বেও পুনরায় বিনা পারিশ্রমিকে বেঙ্গলী পরিচালনের গুরুভার গ্রহণ করিয়া যে সাহস, কৃতিত্ব ও উদ্যমের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা এ দেশে বিরল। প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিমত দেশসেবা তাঁহার অক্ষুণ্ণ ছিল।

যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবমত আলোচনা লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বন্ধ করিলেন, তখন আমি সে কাউন্সিলের সভ্য। আমরা বড় লাটের এই কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ স্থির করিলাম যে, যাহার নামে যে প্রস্তাব সে দিনকার সভার কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ সে সকল প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করিবেন না—বরং প্রত্যাহার করিবেন। আমার নামেও একটা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ ছিল। সুরেন্দ্র বাবু উহা প্রত্যাহারের অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য সভ্যগণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এই সময় হইতে সুরেন্দ্র বাবু সাধারণ মত হইতে অল্পে অল্পে মতান্তর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখন্ কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কায করিতে হয় এবং দেশের যথার্থ হিত কোন্ পথে সাধিত হইবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে মতান্তরের যথেষ্ট স্থান আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। স্বরাজ্যদলের প্রধান নেতৃগণের মধ্যেও অল্পবিস্তর গুরুতর বিষয়ে এরূপ মতান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মতান্তর গ্রহণ উপলক্ষ করিয়া কোন নেতার অমর্য্যাদা বা নির্যাতন করা যথার্থ দেশসেবার পথ নয় ও হইতে পারে না। যে কার্য্যের ভিত্তি অকৃত্রিম দেশভক্তি, তাহার দোষাদোষ বিচার অন্য মানদণ্ড সাহায্যে করিতে হয়। সুরেন্দ্র বাবুর দেশপ্রেম ও দেশসেবা কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অক্ষুণ্ণভাবে ৫০ বৎসর দেশসেবা কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? আজ বাঙ্গালার রাজনৈতিক

প্রাণ বলিতে যাহা বুঝায়, সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা যে একপ্রকার সুরেন্দ্রনাথই করিয়াছেন—এ কথা বলিলে অত্যুক্তি বা মিথ্যা বলা হয় না।

জেলে যাওয়া আজকাল অনেকের ঘটিয়াছে, উহা সম্মানের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জজ নরিসকে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ শালগ্রামশিলা আদালতে তলব করার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আদালতের মানহানি অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে জেলে যাইতে হয়। সেই দিন বর্ত্তমান লেখকের বিবাহ-বাসর। অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠানগুলিমাত্র কোনও প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছিল। উৎসব, আমোদ, ভূরিভোজন সমস্তই বন্ধ করা হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালার ছাত্র, তথা যুবক-সমাজে সুরেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যুবকবৃন্দ দুঃখসূচক কালো ফিতা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কারামুক্তির পর এবং তাহার পর তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া সকলে মিলিয়া সেই গাড়ী টানার কথা অনেকেরই মনে থাকিতে পারে। আমরা খাদ্য ও পুষ্প-সম্ভার লইয়া প্রত্যহ জেলের আতিথ্য স্বীকার করিতাম, সরকার উহাতে আপত্তি করেন নাই। তাঁহার বীর হৃদয়ের যে বিকাশ তখন দেখিয়াছি, তাহা ভুলিব না। ভুলিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার অকপট দেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধে কখন সন্দিহান হইতে পারিব না। আজ সুরেন্দ্রনাথের Moderate, Liberal, Conservative, Re-actionary প্রভৃতি আখ্যায় গৌরবচ্যুতির যত চেষ্টাই হউক না কেন, সরকার তাঁহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত Extremist of Extremists বলিয়া জানিতেন ও সেইমত ব্যবহার করিতেন। সময়ে সময়ে যে সকল দেশসেবককে রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথেরও তাঁহাদের সহ অতিথি হইবার কথা ছিল। গুপ্তরহস্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ কথা বিশেষভাবেই জানেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র—যাহা লিবারেল সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র Oppose Government when necessary but support it when possible, সরকার যে দিন এই মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিলেন, সেই দিন হইতেই সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ক্রূর ও খর দৃষ্টি প্রত্যাহার করিলেন—তাহার পূর্ব্বে নহে।

এই মন্ত্রে দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দল একমত হউন, সকলে দলাদলি মতদ্বৈধ ভুলিয়া একপ্রাণে দেশ-সেবায় নিযুক্ত হউন, শেষ নিশ্বাসের সহিত তিনি এই মহা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ করুন, তাঁহার নিবেদন সার্থক হউক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

সুরেন্দ্র-বন্দনা

দেশ-জাগরণ-যজ্ঞের তুমি ছিলে দেব যজমান,
জাতির জীবন—মন্ত্রসাধনা—সাধক তুমি মহান্।
ভারতসভার হে মূলাধার,
স্বদেশী যুগের হে অবতার,
রাজনীতি-প্রাতে প্রথম তপন, একতার মূলপ্রাণ;
তুমিই জাগালে তরুণের দল,
তোমার স্মৃতির পূজা করি, লহ হৃদয়ের ফুলদান।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথ

ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে তাঁহার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উভয়কে অভিন্নহৃদয় করিয়াছিল। ৫০ বৎসর তাঁহাকে দেখিয়াছি, কখনও কখনও ২।৩ মাস দিবারাত্র একত্র বাস করিয়াছি. কখনও তাঁহাকে অসত্য কথা কহিতে, পরনিন্দা বা আত্মশ্লাঘা করিতে শুনি নাই। পরিচিত বা অপরিচিত সমস্ত লোকের নিকটই তিনি আপনাকে খুলিয়া দিতেন। মনে কিছু পোষণ করিয়া মুখে মিষ্ট কথা বলিতেন না। তিনি অকপট ও উদারপ্রাণ ছিলেন। যাহারা তাঁহার নিন্দা করিত, তিনি তাহাদিগেরও উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের স্বরূপ।

'বেঙ্গলী'র সম্পাদকরূপে তাঁহাকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত। মন্ত্রিরূপে তাঁহাকে গুরু রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইত। তবু দ্বারবানের অনুমতি বা কার্ড পাঠাইয়া কাহারও তাঁহার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইত না। তাঁহার কর্ম্মস্থান সকলের নিকটই উন্মুক্ত ছিল। এমন কি, সি. আই. ডি পুলিস ও গুপ্তচর অবলীলাক্রমে তাঁহার মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিত। তিনি তাহা জানিতেন, তবু তাহাদের প্রবেশে বাধা দিতেন না। কেন না, তাঁহার গোপন করিবার কিছু ছিল না।

নিয়মানুগত্য তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারিবার আহার করিতেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম ও ভ্রমণ করিতেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাত্রি ৯টায় নিদ্রা যাইতেন, কেহই এই নিয়মের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না। বড়লাট তাঁহাকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ হইবার ভয়ে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

আহারে তাঁহার বিশেষ সংযম ছিল। কখনও অতিরিক্ত আহার করিতেন না। দুষ্পাচ্য দ্রব্য কখনও ভক্ষণ করিতেন না। মদ দূরে থাকুক, চুরুট পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই।

তিনি পরিচ্ছদে ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। যখন সিভিলিয়ান ছিলেন, তখনও ইংরাজী পোষাক পরেন নাই। যখন মন্ত্রী হইয়াছিলেন, তখনও চোগা, চাপকান ও পায়জামা তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল।

বঙ্গ-বিচ্ছেদের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, স্বদেশী বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিবেন না, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বদেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীদের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়াছিলেন। লোক তাঁহাকে জাতীয়তার গুরু বলিত। তিনি কখনও আপনাকে গুরু মনে করিতেন না। তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকেও কখনও কোন কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেন না, বরং তিনিই অনুবর্ত্তীদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। এই গুণেই তিনি প্রকৃত জননায়ক হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া কলিকাতা আগমন করেন। সেই সময়েই আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। সেকালে ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির কোন চর্চ্চা হইত না। স্বদেশপ্রেম তাহাদের জ্ঞানের অগোচর ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বিদেশ হইতে এই অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছিলেন, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে জন্মভূমির কোন প্রকার বন্ধন ছিন্ন হইবে না। তাঁহাদের পরামর্শে ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, চৈতন্য, শিখজাতি ও শিখধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রাণ-উন্মাদিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই দিন বাঙ্গালার ছাত্রদের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই এখন ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

সে কালে রাজনীতিচর্চ্চা ছিল—শিক্ষিত কতিপয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণের উত্থান ব্যতীত রাজনীতিচর্চ্চা

বৃথা। সেই জন্য উভয়ে মিলিত হইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারত-সভা স্থাপন করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এই কার্য্যে তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিলেন। ভারত-সভা প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রজাশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য নদীয়া, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা জিলায় বিরাট সভা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সভায় ৪।৫ সহস্র হইতে ২৫।৩০ হাজার লোক উপস্থিত থাকিত।

খোলাভাঁটী নিবারণ, লবণের মাশুল হ্রাস, জুরীর বিচার প্রবর্ত্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপন, উচ্চ রাজকর্ম্মে ভারতবাসীর নিয়োগ, আদালতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিচারবৈষম্য নিবারণ প্রভৃতি কত প্রকার আন্দোলনে ভারত-সভা প্রবৃত্ত হইয়াছেন,তাহার প্রত্যেক বিষয় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য মফঃস্বলেই প্রবল আন্দোলন করিয়াছেন। জনশক্তি জাগাইবার চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণই প্রথম করিয়াছেন।

ভারত-সভা সংস্থাপনের পর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কালীশঙ্কর সুকুল ও আমাকে লইয়া রাজনীতিক আন্দোলনের জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে লাহোর প্রভৃতি সমস্ত বড় সহরে সুরেন্দ্রনাথ যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া বহুকালের নিদ্রার পর শিক্ষিত-মণ্ডলী স্বদেশপরায়ণ হয়েন।

সমুদয় ভারতবর্ষকে এক মহা জাতিতে পরিণত করিয়া জন্মভূমির বন্ধনমোচন করা সুরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মহামেলা দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশের অনেক প্রধান ব্যক্তি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তদানীন্তনকালের এলবার্ট হলে এক সভা করেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির নানা স্থানের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে মহাপ্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকদিগকে একত্র করিয়া রাজনীতিচর্চ্চা করা হয় নাই। ইহার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ন্যাশন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের উপনিবেশ কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় শাসন-প্রণালী সংস্থাপন করা সুরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। ঐ লক্ষ্যসাধনের জন্য তিনি ভারতবাসীকে ভারতে সমস্ত উচ্চ রাজকর্ম্মে নিয়োগ করা, ভারতবাসীর দ্বারা ভারতের আইন প্রণয়ন করা ও ভারতবাসীর দ্বারা ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি জানিতেন, এক দিন বা এক বৎসরের আন্দোলনে এই চেষ্টা সফল হইবে না। সমস্ত জীবনব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে।

কংগ্রেস ও তাঁহার আন্দোলনে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে এখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হইতেছে। ইংলণ্ডে না যাইয়াও বহু ভারতবাসী ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছেন। আই, সি, এস না হইয়াও অনেকে আই, সি, এসের পদ পাইতেছেন। এমন কি, এক জন বাঙ্গালী বেহারের গবর্ণর হইয়াছিলেন। কি গবর্ণর জেনারল, কি গবর্ণর সকলের শাসন-পরিষদেই ভারতবাসিগণ, সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ব্যবস্থাপক সভায় ১৪ জন সভ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ছিলেন। এইরূপে ৩০ বৎসর কাটিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের চেষ্টায় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা ২০ জন করা হয়। তন্মধ্যে ৭ জন জিলাবোর্ড প্রভৃতির অনুরোধক্রমে মনোনীত হইতেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা ৫০ জন করা হয়। তন্মধ্যে ২৬ জন নির্ব্বাচিত হয়েন। নির্ব্বাচন-প্রথা এই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়।

তাহার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যসংখ্যা ১শত ৩৯ জন করা হয়। তন্মধ্যে ১শত ২৩ জনই জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। এই সময়েই বাঙ্গালার শাসন-বিভাগ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক খণ্ড পরিচালনের ভার মন্ত্রীদের উপর অর্পিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আশা ক্রমে পূর্ণ হইতেছিল। সুতরাং তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন শীঘ্র লাভ করিবেন, এই আশায় দ্বৈতশাসন সং-

করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, দ্বৈতশাসনকালে বাঙ্গালী আপনার কৃতিত্ব-বলে আপনার দেশে স্বরাজ স্থাপন করিতে পারিবে।

তিনি মন্ত্রী হইয়া বঙ্গদেশকে স্বরাজের যোগ্য করিতে-ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভাপতির পদে সিভিলি-য়ান ভিন্ন আর কেহ নিযুক্ত হইতে পারিত না। সিভিলিয়ানদের সমুদয় আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে সভাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তাহার পর ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করেন। তিনি এমন এক আইন রচনা করেন, যদ্দারা কলিকাতায় প্রকৃত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বলাভের পূর্ব্বে বাঙ্গালার জিলা-বোর্ডের দুই চারিটি সভাপতির পদে বেসরকারী ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হইয়া সমস্ত জিলাবোর্ডের সভাপতির পদে বেসরকারী লোক নির্ব্বা-চন করিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিপদ গ্রহণের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অনেক-গুলি মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতির পদে বেসরকারী ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, বেসরকারী ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না।

সুরেন্দ্রনাথ জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে স্বরাজ স্থাপনের অভিপ্রায়ে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আইনে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ হইতে অপসৃত হয়েন।

বঙ্গদেশে ৪০ জন আই, এম, এস, ছিলেন। সুরেন্দ্র-নাথ সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার ১৬টি পদে আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তার-দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

মেডিকেল কলেজে আই, এম, এস ব্যতীত আর কেহ অধ্যাপক হইতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ আই, এম, এস-দের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আই, এম, এস নহেন, এমন দুই জন বাঙ্গালী ডাক্তারকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তির পথ সুগম করিবার জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি স্থানে স্থানে মেডিকেল স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুল তাঁহারই চেষ্টার ফল। বাঙ্গা-লার প্রত্যেক জিলায় ইউনিয়ন সমূহে ডাক্তারখানা স্থাপন করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কতিপয় স্থানে ডাক্তার-খানা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নদী সকল মজিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালায় রোগ ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ নদী-সংস্কারের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত না হওয়াতে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ দুর্ব্বল ও অত্যাচারিতের বন্ধু ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতিকে তিনিই আণ্ডামান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। আণ্ডামানে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে অত্যাচার হইত, তিনিই তাহা নিবারণ করাইয়াছিলেন।

কামাগাটুমারুর ৫৭ জন শিখকে রাজদ্রোহের অপ-রাধে ফাঁসীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথই লর্ড হার্ডিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই রক্ষা করিয়াছিলেন।

সৎকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ও অসৎকার্য্যে কেবল অসহযোগ নয়, প্রবল প্রতিবন্ধকতাচরণ, ইহাই সুরেন্দ্র-নাথের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল নীতি ছিল। এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি জয়লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। এই নীতির অনুসরণ করিয়া নানা বিষয়ে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদব্যবস্থা ঐ উপায়েই তিনি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ নীতির অনুসরণ করিয়াই তিনি জন্মভূমিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

সুরেন্দ্রনাথ

সুদীর্ঘ জীবন-যুদ্ধের পর দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ আজ স্বর্গ-মন্দাকিনীর তীরে বিশ্রামলাভ করিতেছেন। কবি আর এক জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—After Life's fitful fever he sleeps well। এ বর্ণনা সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কারণ, তাঁহার জীবন Fitful fever ছিল না—সে জীবনে অনিয়ত জরের অস্বস্তি ছিল না। তাঁহার কর্মময় জীবন ব্রতধারীর ন্যায় অক্লান্ত অশ্রান্ত ছিল। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—Life is real, Life is earnest। সে জীবনে 'অবসাদ পরমাদ' ছিল না—নৈরাশ্যের নিরুদ্যম ছিল না—নিষ্ফলতার হতাশ্বাস ছিল না। সেই জন্য মনে হয়—'He sleeps well' এ কথা তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য নহে। 'ছিনু ঘুমঘোরে দেখিনু স্বপন'—ইহা তাঁহার অবস্থা নহে। তিনি আজ সজাগ সতৃষ্ণ উদগ্র দৃষ্টিতে এই কর্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া আছেন এবং আমার আশা হয়, অচিরেই ভারত-মাতার সেবার জন্য অবতীর্ণ হইবেন।

আমি সম্প্রতি তাঁহার A Nation in making পাঠ করিতেছিলাম। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ যিনিই অবহিত হইয়া পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন, সুরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান ঘটনা—তাঁহার Civil Service হইতে অপসারণ।

আমার মনে হয়, বিধাতার ভৌগোলিক ভ্রমেই তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া Civil Service পাশ করিয়া 'ভদ্র ভৃত্য' হয়েন। কিন্তু বিধাতা অল্পদিনেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং একটা তুচ্ছ অছিলায় তাঁহাকে নিষ্কাশিত করেন। তাঁহার সহকর্ম্মী, সে যুগের Civilianরা তখন স্বস্তি শ্বাস ছাড়িয়া বলিয়াছিল—'আঃ বাঁচলাম, উঃ, কি আরাম।' হংসমধ্যে বকই ত বিড়ম্বনা! কিন্তু তাহাদের চক্ষুতে এ যে হংসমধ্যে বায়স!—শ্বেত শতদল-দলের মধ্যে একটা ঘন কৃষ্ণ আতস ফুল। কিন্তু বিধাতা—যিনি সকল ঘটনার ঘটক—যাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ করকলিত কুবলয়বৎ—তিনি এ কথা শুনিয়া বোধ হয় একটুখানি ক্রূর হাসি হাসিয়াছিলেন. যদি আমাদের দিব্যদৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে তখন দেখিতে পাইতাম, সুরেন্দ্রনাথের এই নিষ্কাশনে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, দেববালারা হুলুধ্বনি দিয়াছিল!

বাস্তবিক এই অবধিই ভারতে সংঘবদ্ধ জাতীয়তার আরম্ভ। সেই যে জাতীয় যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বলিত হইল—সুরেন্দ্রনাথ ঋত্বিক্‌রূপে তাহাতে আহুতির পর আহুতি ঢালিতে লাগিলেন। অবশ্য এ জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন নিপীড়ন ভোগ করিতে হইয়াছিল—এমন কি, অর্দ্ধাশনে অনশনে অনেক দিনাতিপাত করিতে হইয়াছিল—বাঙ্গালীর যাহা শেষ সম্বল, সাধ্বী-স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছিল—কিন্তু ইহাতেও এই পুরুষসিংহ দমিত হয়েন নাই। পুঞ্জীভূত বাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়া তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইয়াছিল। শেষে এমন এক দিন আসিল—যখন যে আমলাতন্ত্র তাঁহাকে অপমান করিয়া বিদূরিত করিয়াছিল, তাহারাই সাধ্য-সাধনা করিয়া বরণ করিয়া লইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহাকেই বলে নিয়তির প্রতিশোধ!

তাঁহার এ মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ আমাদের অনেকেরই মনঃপূত ছিল না। সে জন্য আমরা তাঁহাকে অনেক ধিক্কার দিয়াছি—অনেক কটু-কাটব্য বলিয়াছি। কিন্তু আজ আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, দেশের বহুজনের ভ্রূকুটীভঙ্গী সত্ত্বেও তিনি যাহা দেশের হিতকর ভাবিয়াছিলেন, তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। এখানেও তাঁহার সেই অদম্য সাহস, সেই নির্ভীক তেজস্বিতা, সেই অনমনীয় দৃঢ়তা। আর ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার অবলম্বিত এই পথ এবং লোকমান্য তিলকের অনুমোদিত Responsive Co-operation ও দেশবন্ধু দাশের অধুনা-প্রবর্ত্তিত Honourable Co-operationএ বিশেষ তফাৎ আছে কি?

সুরেন্দ্রনাথের ভৈরব শিঙ্গা আর নিনাদিত হইবে না—তাঁহার সিংহধ্বনি আজ স্তম্ভিত, নীরব—কিন্তু তাহার প্রতিধ্বনি যেন চিরদিন আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হয়। তাঁহার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যেন তাঁহার হস্তচ্যুত বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত করিতে পারি। যদি পারি,—তবে যে দিন—'নহে বহুদিন আর'—যে দিন আমাদের

স্বরাজসাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে, যে দিন আমাদের স্বরাজ-সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবে -যে দিন আমাদের জাতীয় জীবনতরী 'গম্যস্থান সুখধাম, স্বরাজ যাহার নাম'—সেই অভীষ্ট স্বরাজ-বন্দরে উপনীত হইবে, সেই গৌরব-গরিমার দিনে আমরা বিজয়-তিলকে মণ্ডিত হইয়া আমাদের এই বরেণ্য বীরকে বন্দনা করিয়া ঋষিদিগের উদগ্র গম্ভীর স্বরে বলিব,—

"রথীনাং ত্বে রথীতমং জেতারমপরাজিতম্।".
হে রথিগণের রথীতম! হে অপরাজেয় জেতা!
তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
চলিয়া তোমারি পথে,
চীর্ণ আজি ব্রত পূর্ণ মনোরথ
চড়িলাম জয়রথে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
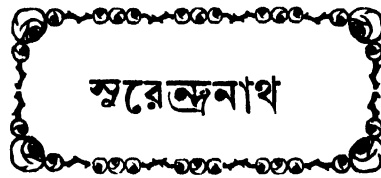
সুরেন্দ্রনাথ

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন সমগ্র ভারত নিদ্রিত, যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয় জ্ঞান জাগে নাই, তখন কে ভারতের মহানিদ্রা ভাঙ্গাইয়াছিল, কে বাঙ্গালীর প্রাণে প্রথম স্বদেশ প্রেম জাগাইয়াছিল, কে বাঙ্গালার—ভারতের—জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল? — সে বাঙ্গালার চির আদরের ধন — ভারতের চিরগৌরবমণি — সুরেন্দ্রনাথ। যে কয়েকটী উজ্জ্বল নক্ষত্র বঙ্গের অদৃষ্ট-আকাশে দীপ্তি প্রকাশ করিতেছিল একএকটী করিয়া অনেকগুলিই খসিয়া পড়িয়াছে — যেটী উজ্জ্বলতম ও যাহা গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ভারতের রাজনৈতিক আকাশে জ্বলিয়াছে এখন তাহাও নিবিয়া গেল।

যে সুরেন্দ্রনাথ ভাষার নির্ঝরে, অতুলনীয় বাক্‌শক্তিতে বাঙ্গালীর প্রাণে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন — সমগ্র ভারতবাসীকে জাগরিত, বিমোহিত, ও একত্রিত করিয়াছিলেন, সে সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে। তিনি জাতীয়তার যে ভিত্তি-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন স্বরাজ্য যে প্রণালীতেই গঠিত হউক্ তাহারই উপর স্থাপিত হইবে। সুরেন্দ্রনাথের কাছে বঙ্গদেশ — ভারতবর্ষ চিরঋণী। বাঙ্গালী একথা কখনও ভুলিবে না, তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বিধাতার ইচ্ছায়ই হউক বা দেশের পুণ্যবলেই হউক্ সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াও অল্পদিনের মধ্যে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পদত্যাগ করিয়া তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া নির্ভয়ে, অনন্ত আশায় অসাধারণ কর্ম্মবীর কর্ম্ম করিতে করিতেই জীবন শেষ করিলেন। রমেশ চন্দ্র দত্ত ও বেহারীলাল গুপ্তর সহিত সুরেন্দ্রনাথ একই বৎসরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সার্ভিসে থাকিলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই মত খ্যাতি পাইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর লইতেন। কিন্তু মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, জাতীয় জীবন গঠন করিয়া, স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া থাকে?

মৃত্যুর আন্দাজ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই তখনও আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি আরও দশবৎসর বাঁচিবার আশা রাখেন — আরও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও মন তাঁর যুবারই ন্যায় সতেজ আছে। তখনও তাঁহার প্রাণে কি আশা যে দেশের ভিন্ন ভিন্ন দলগুলিকে মিলিত করিয়া একটী মহা জাতীয় দল গঠন করিতে পারিবেন!

তাঁহার বিশ্রামের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সত্য, কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, আমরা সেই বিধাতার বরপুত্রকে হারাইয়া আজ শোকে অভিভূত।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
৭ নং হ্যারিংটন স্ট্রীট।

Sir Surendranath will be best remembered for his stubborn fight against the partition. It is evident that the country today wants fighters. It cannot be otherwise so long as our country is under a domination that is grinding the masses to powder. The rank and file, if they would fight like Sir Surendranath, cannot do better than make the commencement with the spinning wheel and Khaddar.

2/8/'25

M.K. Gandhi

যোদ্ধা সুরেন্দ্রনাথ

বঙ্গ-ভঙ্গের বিপক্ষে অদম্য যুদ্ধের জন্য সার সুরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এখন বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে দেশে যোদ্ধারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-প্রয়োজন। যে বৈদেশিক প্রভুত্ব দেশের জনশক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে, যত দিন আমাদের দেশ সেই প্রভুত্বের অধীন থাকিবে, তত দিন ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের জনসাধারণ যদি সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চরকা ও খদ্দরের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিন; ইহা অপেক্ষা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আর নাই।

মোহনচাঁদ করমচাঁদ গন্ধী।

মহাপ্রয়াণে

সে কি পুণ্য দিন ! যবে বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়
সহসা করিল ছিন্ন কেশরীর স্বেচ্ছার বন্ধন,
নব মহাভারতের সংগঠন পরিকল্পনায়
তেজোদৃপ্ত মুক্ত চিত্তে জাগাইল বিরাট স্পন্দন !
পঞ্জাব-সীমান্ত হ'তে চট্টলার চারু-শ্যাম তীর
যুগান্তের সুপ্তি-ভঙ্গে সে কম্পনে উঠিল নড়িয়া,
বজ্র-কণ্ঠ-উদ্গারিত অগ্নি-মন্ত্রে, হে বাগ্মী, হে বীর,
চেতায়ে দেশাত্মবোধ এক জাতি তুলিলে গড়িয়া।
উৎসাহের জ্বলদর্চ্চিঃ চিরদীপ্ত তোমার অন্তরে,
ঝটিকা-ঝাপটে কভু ক্ষণতরে হয়নি নির্ব্বাণ---
সদ্যোমৃত প্রাণ-পুত্রে বিসর্জ্জিয়া চিতার উপরে
ছুটিয়া গিয়াছ যেথা কর্ত্তব্যের—দেশের আহ্বান !
দীর্ণ-বক্ষ বাঙ্গালার দুঃখ-দিগ্ধ দারুণ দুর্দ্দিনে,
অশনি-সম্পাত সহি' অবিচল হিমাদ্রির মত,
'স্বদেশীর' সাম-রবে মিলাইলে নবীনে-প্রবীণে,
যোড়াইলে খণ্ড বঙ্গ জনশক্তি করিয়া জাগ্রত।
ব্যর্থতার মনস্তাপে, যত্ন-পুষ্ট আশার বিনাশে
টলে নাই কোনো দিন, হে স্থিরধী, তব ভার কেন্দ্র,
প্রভুত্বের রোষদৃষ্টি, নিয়তির ক্রূর পরিহাসে
সম নির্ব্বিকার তুমি, আত্মজয়ী হে শূর সুরেন্দ্র !
কারাগার, মন্ত্রিসভা, হাতে-গড়া জাতি-প্রতিষ্ঠান
কি বরণ, কি বর্জ্জন শুধু দেশহিত সাধিবারে ;
বিবেক নির্দ্দিষ্ট পথে দ্বিধাহীন সদা আগুয়ান
প্রশংসা কি লোক নিন্দা লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি তোমারে।
সফল সঙ্কল্প তব, সিদ্ধ আজি সাধনা তোমার—
লভিয়া তোমার দীক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ সমুদ্ধ ভারত ;
শত বরষের জাড্য, ক্ষুদ্র স্বার্থ করি' পরিহার
সমুৎসুক রচিবারে সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষৎ।
অন্তিম শয়নে কর্ম্মী কর্ম্ম অন্তে শান্তিতে শয়ান,
অস্তমিত চিরতরে বাঙ্গালার গৌরবের রবি !
শোকমগ্ন দেশবাসী নিরখিয়া এ মহাপ্রয়াণ—
উদ্দেশে প্রণমে দেব ! দূর হ'তে দেশান্তের কবি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্।

আশ্বিন সংখ্যায় গল্প উপন্যাস সাজির সঙ্গে সার সুরেন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনী ও কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধও প্রকাশিত হইবে।—সম্পাদক
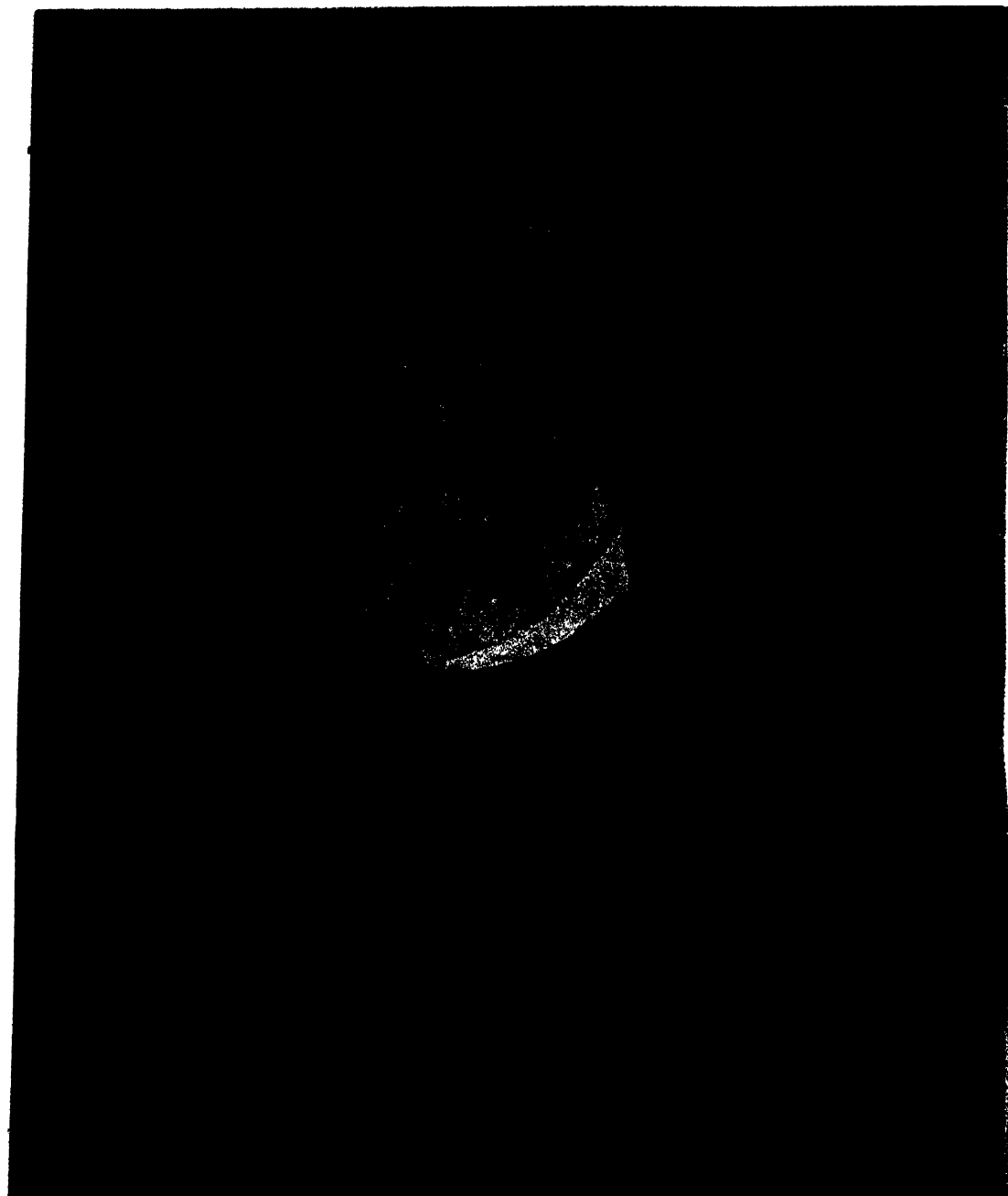
শেষজীবনে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ

বসুমতী প্রেস] [মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জীর সৌজন্যে

৪র্থ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩২ [৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (শ্রীম)

বেলঘরে গ্রামে শ্রীযুত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরে শ্রীযুত গোবিন্দ মুখুয্যের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। আজ রবিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, মাঘ শুক্লা দ্বাদশী, পুষ্যানক্ষত্র। নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তরা আসিয়াছেন, প্রতিবেশিগণ আসিয়াছেন। ঠাকুর ৭।৮ টার সময় প্রথমেই নরেন্দ্রাদি সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন।

বেলঘরেবাসীকে উপদেশ। কেন প্রণাম। কেন ভক্তিযোগ।

কীর্ত্তনান্তে সকলেই উপবেশন করিলেন। অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, ঈশ্বরকে প্রণাম কর। আবার বলিতেছেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, তবে এক এক যায়গায় বেশী প্রকাশ; যেমন সাধুতে। যদি বল, দুষ্ট লোক ত আছে, বাঘ-সিংহও আছে, তা বাঘ নারায়ণকে আলিঙ্গন কর্‌বার দরকার নাই, দূর থেকে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতে হয়। আবার দেখ জল; কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে পূজা করা যায়, কোন জলে নাওয়া যায়। আবার কোন জলে কেবল আচান-শোচান হয়।

প্রতিবেশী। আজ্ঞা, বেদান্তমত কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদীরা বলে 'সোঽহং।' ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আমিও মিথ্যা। কেবল সেই পরব্রহ্মই আছেন।

"কিন্তু আমি ত যায় না; তাই আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত, এ অভিমান খুব ভাল।

"কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। বিষয়বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধি থাকতে 'সোঽহং' হয় না।" *

"ত্যাগীদের বিষয়বুদ্ধি কম, সংসারীরা সর্ব্বদাই বিষয় চিন্তা নিয়ে থাকে, তাই সংসারীর পক্ষে 'দাসোঽহম্'।"

* অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।—গীতা।

বেলঘরেবাসী ও পাপবাদ

প্রতিবেশী। আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর নাম-গুণ কীর্ত্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহ-বৃক্ষে পাপ পাখী; তাঁর নাম-কীর্ত্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে বৃক্ষের উপরের পাখী সব পালায়, তেমনি নাম-গুণ-কীর্ত্তনে সব পাপ যায়। *

"আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্য্যের তাপে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নাম-গুণ-কীর্ত্তনে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা আপনি শুকিয়ে যায়।

"রোজ অভ্যাস করতে হয়। Circus এ দেখে এলাম, ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে, তার উপর বিবি এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ঐটি হয়েছে!

"আর তাঁকে দেখবার জন্ত অন্ততঃ একবার ক'রে কাঁদ।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

"এই দুটি উপায়, অভ্যাস আর অনুরাগ অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্ত ব্যাকুলতা।

বেলঘরে-বাসীর ষট্‌চক্রের গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি

বৈঠকখানা-বাড়ীর দোতালা ঘরের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রসাদ পাইতেছেন; বেলা ১টা হইয়াছে। সেবা সমাপ্ত হইতে না হইতে নীচের প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন;—

গান

জাগ জাগ জননি!
মূলাধারে নিদ্রাগত কত দিন,
গত হ'ল কুলকুণ্ডলিনি!

ঠাকুর উপরে গান শুনিয়া সমাধিস্থ। শরীর সমস্ত স্থির, হাতটি প্রসাদপাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। খাওয়া আর হইল না। অনেকক্ষণ পরে ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন, "আমি নীচে যাব, আমি নীচে যাব।"

---

* মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।—গীতা।

এক জন ভক্ত তাঁকে অতি সন্তর্পণে নীচে লইয়া যাইতেছেন।

প্রাঙ্গণেই সকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ও প্রেমানন্দে ঠাকুরের নৃত্য হইয়াছিল। এখনও সতরঞ্চ ও আসন পাতা রহিয়াছে। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট; গায়কের কাছে আসিয়া বসিলেন। গায়ক এতক্ষণে গান থামাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিতেছেন, "বাবু, আর একবার মায়ের নাম শুনব!"

গায়ক আবার গান গাহিতেছেন :—

জাগ জাগ জননি!
মূলাধারে নিদ্রাগত
কত দিন গত হ'ল
কুলকুণ্ডলিনি!
স্বকার্য্যসাধনে
চল মা শিরোমধ্যে,
পরম শিব যথা
সহস্রদলপদ্মে,
করি ষট্‌চক্র ভেদ (মা গো)
ঘুচাও মনের খেদ
চৈতন্যরূপিণি!

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় ভক্ত সঙ্গে রাখালের প্রতি গোপালভাব

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি দুই একটি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার ৯ই মার্চ্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, মাঘের অমাবস্যা, সকাল, বেলা ৮টা ৯টা হইবে।

অমাবস্যার দিন ঠাকুরের সর্ব্বদাই জগন্মাতার উদ্দীপন হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। মা তাঁর মহামায়ায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। মানুষের ভিতরে দেখ, বদ্ধ জীবই বেশী। এত কষ্ট-দুঃখ পায়, তবু সেই 'কামিনী-কাঞ্চনে' আসক্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দর দর ক'রে রক্ত পড়ে, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময়, মেয়েরা বলে, ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না; আবার ভুলে যায়।

"দেখ, তাঁকে কেউ খোঁজে না। আনারস গাছের ফল ছেড়ে লোকে তার পাতা খায়!"

ভক্ত। আজ্ঞা, সংসারে তিনি কেন রেখে দেন?

স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র)

সংসার কেন? নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম্ম করো আর এই সব কর্ম্ম কোরো না। আবার তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেন। কর্ম্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায়। ভাল ডাক্তারের হাতে পড়লে ঔষধ খেতে খেতে যেমন রোগ সেরে যায়। *

"কেন তিনি সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে, তবে ছাড়বেন। কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চ'লে যাবে, তখন ছাড়বে। হাঁসপাতালে নাম লেখালে পালিয়ে আসবার যো নাই, রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছাড়বে না।"

ঠাকুর আজকাল যশোদার ন্যায় বাৎসল্যরসে সর্ব্বদা আপ্লুত হইয়া থাকেন, তাই রাখালকে কাছে

* "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"—গীতা।

সঙ্গে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে রাখালের গোপাল-ভাব। যেমন মা'র কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের কোলের উপর ভর দিয়া বসিতেন। যেন মাই খাচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সঙ্গে গঙ্গায় বানদর্শন

ঠাকুর এই ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক জন আসিয়া সংবাদ দিল যে, বান আসিতেছে। ঠাকুর, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সকলে বান দেখিবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলেন। পঞ্চবটীমূলে আসিয়া সকলে বান দেখিতেছেন। বেলা প্রায় ১০॥ টা হইবে। একখানা নৌকার অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ দেখ ঐ নৌকাখানার অবস্থা বা কি হয়!"

এইবার ঠাকুর পঞ্চবটী রাস্তার উপরে মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতির সহিত বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, বান কি রকম ক'রে হয়?

মাষ্টার মাটীতে আঁক কাটিয়া পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, ভাটা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, গ্রহণ ইত্যাদি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ)

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে ও পাঠশালায়

[The *yogi* is beyond all finite relations of number, quantity, cause, effect.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ঐ যা! বুঝতে পারছি না; মাথা ঘুরে আসছে! টন্ টন্ করছে! আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন ক'রে জানলে?

"দেখ, আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম; কিন্তু শুভঙ্করী আঁক ধাঁধাঁ লাগতো। গণনা অঙ্ক পারলাম না।"

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙ্গান যশোদার ছবি দেখিয়া বলিতেছেন, "ছবি ভাল হয় নাই; ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে।"

শ্রীঅধর সেনের প্রথম দর্শন ও বলির কথা

মধ্যাহ্ন-সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও অন্যান্য ভক্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। অধর সেন এই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। অধরের বাড়ী কলিকাতা বেণেটোলায়। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বয়স ২৯।৩০।

অধর (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বলিদান করা কি ভাল? এতে ত জীবহিংসা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে, বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।

"কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না। আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মা'র প্রসাদ মাংস, এ অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙ্গুলে ক'রে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।

"আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখি সর্ব্বভূতে ঈশ্বর, পিঁপড়েতেও তিনি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মলে এই সান্ত্বনা হয় যে, তার দেহমাত্র বিনাশ হ'ল, আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই।" *

অধরকে উপদেশ—বেশী বিচার করো না

"বেশী বিচার করা ভাল নয়। মা'র পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হ'ল। বেশী বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে

* "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"—গীতা।

যায়। এ দেশে পুকুরের জল উপর উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। ধ্রুবর ভক্তি সকাম। রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহ্লাদের কিন্তু নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি।"

ভক্ত। ঈশ্বরকে কিরূপে লাভ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ ভক্তির দ্বারা। তবে তাঁর কাছে জোর করতে হয়। দেখা দিবিনি, গলায় ছুরি দেবো, এর নাম ভক্তির তম।

ভক্ত। ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার সাকার দুই দেখা যায়? সাকার চিন্ময়-রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

আগামী ৮ই এপ্রেল রবিবারে শ্রীযুক্ত অধর, ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করিতে আসিবেন। (দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ডে)।

অধরলাল সেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। রাখাল, মাষ্টার, রাম, হাজরা প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। হাজরা মহাশয় বাহিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আজ রবিবার ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, ভাদ্র, কৃষ্ণা সপ্তমী।

নিত্যগোপাল, তারক প্রভৃতি ভক্তগণ রামের বাড়ীতে থাকেন। তিনি তাহাদের যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

রাখাল মাঝে মাঝে শ্রীযুত অধর সেনের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। নিত্যগোপাল সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর।

তারকেরও অবস্থা অন্তর্মুখ। তিনি লোকের সঙ্গে আজকাল বেশী কথা কন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রর জন্য ভাবনা

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রর কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (এক জন ভক্তের প্রতি)। নরেন্দ্র তোমাকেও like করে না। (মাষ্টারের প্রতি) কই, অধরের বাড়ী নরেন্দ্র এল না কেন?

"একাধারে নরেন্দ্রর কত গুণ! গাইতে, বাজাতে, লেখা-পড়ায়। সে দিন কাপ্তেনের গাড়ীতে এখান থেকে যাচ্ছিল; কাপ্তেন অনেক ক'রে বল্লে, তার কাছে বসতে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল; Captainএর দিকে ফিরে চেয়েও দেখলে না।"

শাক্ত গৌরী পণ্ডিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ

"শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? সাধন-ভজন চাই। ইঁদেশের গৌরী,—পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শাক্ত-সাধক; মা'র ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত। মাঝে মাঝে

বলত, 'হারে রে নিরালম্ব লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্?' তখন পণ্ডিতরা কেঁচো হয়ে যেত। আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার খাওয়া দেখে বোলত, তুমি ভৈরবী নিয়ে সাধন করেছ।

"এক জন কর্ত্তাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করলে। নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার; গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল।

"প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শাক্ত ছিল; তুলসীপাতা দুটো কাঠি ক'রে তুল্‌ত—ছুঁত না (সকলের হাস্য) তার পর বাড়ী গেল; বাড়ী থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই।

"আমি একটি তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুখে

পুতেছিলাম ; ম'রে গেল। পাঁটা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না।"

"গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। 'এ ঐ' ব্যাখ্যা করত, এ শিষ্য! ঐ তোমার ইষ্ট। আবার রাবণের দশ মুণ্ড বোলত, দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।"

রাম, তারক ও নিত্যগোপাল

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, তারক (শিবানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা মেঝেতে বসিলেন। মাষ্টারও মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাম বলিতেছেন, "আমরা খোল বাজনা শিখিতেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)। নিত্যগোপাল বাজাতে শিখছে ?

রাম। না, সে অমনি একটু সামান্য বাজাতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তারক ?

রাম। সে অনেকটা পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'লে আর অত মুখ নীচু ক'রে থাকবে না ; একটা দিকে খুব মন দিলে ঈশ্বরের দিকে তত থাকে না।

রাম। আমি মনে করি, আমি যে শিখছি, কেবল সংকীর্ত্তনের জন্য।

নিত্যগোপাল মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি না কি গান শিখেছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে না ; অমনি উঁ আঁ করি।

আমার ঠিক ভাব—'কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে, দে মা পাগল ক'রে'

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ওটা অভ্যাস আছে ? থাকে ত বল না।

আর কায নাই বিচারে, দে মা পাগল ক'রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ, ঐটে আমার ঠিক ভাব।

হাজরাকে উপদেশ—সর্ব্বভূতে ভালবাসা। ঘৃণা ও নিন্দা ত্যাগ কর

হাজরা মহাশয় কারু কারু সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। "ও দেশে একজনদের বাড়ী প্রায় সর্ব্বদাই গিয়ে থাকতাম। তারা সমবয়সী, তারা সে দিন এসেছিল ; এখানে দু'তিন দিন ছিল। তাদের মা ঐরূপ সকলকে ঘৃণা করত। শেষে সেই মা'র পায়ের খিল কি রকম ক'রে খুলে গেল। আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হ'ল যে, লোকে ঢুকতে পারত না।

হাজরাকে তাই ঐ কথা বলি ; আর বলি, কারুকে নিন্দা কোরো না।"

বেলা প্রায় ৪টা হইল, ঠাকুর ক্রমেই মুখপ্রক্ষালনাদি করিবার জন্য ঝাউতলায় গেলেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব বারান্দায় সতরঞ্চ পাতা হইল। সেখানে ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন। রাম প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। শ্রীযুত অধর সেন সুবর্ণবণিক, তাঁর বাড়ীতে রাখাল অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাম বাবু কি বলিয়াছিলেন। অধর পরম ভক্ত। সেই সব কথা হইতেছে।

এক জন ভক্ত সুবর্ণবণিকদের মধ্যে কারু কারু স্বভাব রহস্যভাবে বর্ণনা করিতেছেন। আর ঠাকুর হাসিতেছেন। তাঁহারা রুটী, ঘণ্ট ভালবাসেন, ব্যঞ্জন হউক আর না হউক, তাঁরা খুব সরেস চাল খান,
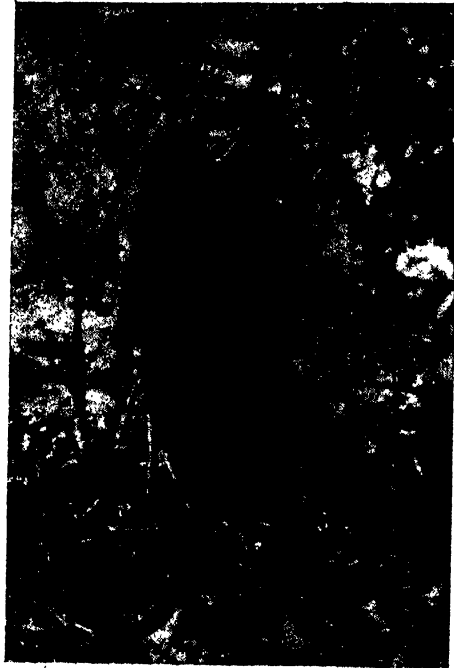
স্বামী শিবানন্দ (তারক মহারাজ)

আর জলযোগের মধ্যে ফল একটু খাওয়া চাই। তাঁরা বিলাতী আমড়া ভালবাসেন ইত্যাদি। যদি বাড়ীতে তত্ত্ব আসে, ইলিশ-মাছ, সন্দেশ, সেই তত্ত্ব আবার ওদের কুটুম্ব-বাড়ীতে যাবে। সে কুটুম্ব আবার সেই তত্ত্ব তাদের কুটুম্ব-বাড়ীতে পাঠাবে। কাযে কাযেই একটা ইলিশ-মাছ ১৫।২০ ঘরে ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সব কায করে, তবে রান্নাটি উড়ে বামুনে রাঁধে, কারু বাড়ী ১ ঘণ্টা, কারু বাড়ী ২ ঘণ্টা এই রকম। একটি উড়ে বামুন কখনও কখনও ৪।৫ যায়গায় রাঁধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন, নিজে কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না।

ঠাকুর সমাধিস্থ, জগন্মাতার সহিত কথা

সন্ধ্যা হইল। উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও সমাধিস্থ।

অনেকক্ষণ পরে বাহ্যজগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য্য অবস্থা! আজকাল প্রায়ই সমাধিস্থ হন। সামান্ত উদ্দীপনে বাহ্যশূন্য হন, ভক্তরা যখন আসেন, তখন একটু কথা বার্ত্তা কন; নচেৎ সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ। পূজা-জপাদি কর্ম্ম আর করিতে পারেন না।

'যস্ত্বাত্মরতিঃ স্যাৎ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' —গীতা।]

শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ম্মত্যাগের অবস্থা।

সমাধি-ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "মা, পূজা গেল, জপ গেল; দেখো মা, যেন জড় করো না! সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা! যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম কর্‌তে পারি; আর তোমার নাম-গুণ-কীর্ত্তন করবো, গান করবো, মা। আর শরীরে একটু বল দাও, মা, যেন আপনি একটু চল্‌তে পারি; যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব যায়গায় যেন যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালীঘরে গিয়া জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তিনি আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, মা, আজ সকালে তোমার

চরণে দুটো ফুল দিলাম; ভাবলাম, বেশ হোল, আবার (বাহ্য) পূজার দিকে মন যাচ্ছে। তবে মা, আবার এমন হোল কেন? আবার জড়ের মতন কেন ক'রে ফেল্‌ছ।"

ভাদ্র কৃষ্ণা সপ্তমী। এখনও চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবাবিষ্ট; সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ভিতর ছোট খাটটিতে বসিলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঈশানকে শিক্ষা—'কলিতে বেদমত চলে না' 'মাতৃভাবে সাধন কর'

এই বার বুঝি ভক্তদের বিষয় মা'কে কি বলিতেছেন। ঈশান মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছেন। ঈশান বলিয়াছিলেন, আমি ভাটপাড়ায় গিয়া গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলিয়াছিলেন যে, কলিকালে বেদমত চলে না। জীবের অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, দেহবুদ্ধি, বিষয়-বুদ্ধি একেবারে যায় না। তাই ঈশানকে মাতৃভাবে তন্ত্রমতে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "আবার গায়ত্রীর পুরশ্চরণ! এ চাল থেকে ও চালে লাফ।......কে ওকে ও কথা ব'লে দিলে? আপনার মনে করছে। আচ্ছা, একটু পুরশ্চরণ করবে।" আর ঈশানকে বলেছিলেন, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই মা, তিনিই আদ্যাশক্তি।

(মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, আমার এ সব কি বাইরে না ভাবে?

মাষ্টার অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে এইরূপ কথা কহিতেছেন। তিনি অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন, ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে। অতি নিকটে না হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কচ্ছেন? *

* তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে

আজি এসেছি তোমার চরণপ্রান্তে
দীনের ঠাকুর জগত-নাথ?
চাও করুণ-নয়নে অগতির গতি
করুণার তরে পেতেছি হাত—
ভবে সুখ-দুঃখ আর হাসি খেলা লয়ে,
দিনগুলি মোর কেমনে যায়,
আমি ক্ষণেকের তরে ভাবি না তোমারে
সঁপি না এ মন ও রাঙ্গাপায়?
করি কত অভিনয়, ওহে দয়াময়,
সংসার-মাঝে কি মোহে মাতি,
কভু ভাবি না বারেক ঘনায়ে আসিছে
জীবনের সাঁঝে আঁধার রাতি।
এস মণিকোঠা-রাজ রত্নবেদীর অধীশ্বর
এই হিয়ার মাঝে,
তুমি নিজ গুণে আজ, হও প্রতিভাত,
তাপিত হৃদয়ে মোহন সাজে।
কর কামনার শেষ, পুরায়ে কামনা,
অদেয় তোমার কি আছে দীনে,
তুমি নিজ গুণে দেছ কত অভাজনে
সুযোগ তোমারে লইতে কিনে।

ওহে "অমূল্য ধন!" মূল্যও তব
তোমার দয়ায় কিছুই নাই,
এই দুঃখময় ধরা তাই সুখে ভরা
স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, নিয়ত পাই।
দেছ স্নেহময় পিতা তার বাড়া মাতা
"স্বামীর প্রেমের তুলনা নাই,"
ওগো তবু আশা আর মেটে না আমার
চেয়েছি কত না এখনও চাই।
দেছ স্বজন সবার স্নেহ শতধার
কহিব তা কত মমতা-মাখা,
তবু এখনও প্রাণের মেটেনি বাসনা,
ও মূরতি হৃদে নাই ত আঁকা।
করি সহনাতীত সে শত আব্দার
অভিমান কত ও রাঙা পায়,
আজি অপার কৃপায় ও চন্দ্রমুখ
দেখারও ভাগ্য দিলে আমায়?
আমি করি প্রণিপাত, "হে জগন্নাথ,"
"বলরাম" আর "ভদ্রা" সহ,
প্রভু আকুল আবেগে ডাকি সকাতরে
অকৃতী প্রাণের অর্ঘ্য লহ।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

প্রলয়ের আলো

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিস্ময়কর আবিষ্কার

জোসেফ্ কুরেট্ আনা স্মিটের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। সে বুঝিতে পারিল, কর্ত্রী তাহার ঔদ্ধত্যে তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে; কর্ত্রী কোন কর্ম্মচারীর প্রতি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না—ইহাও জোসেফের অজ্ঞাত ছিল না। জোসেফ কর্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাহার চাকরী থাকিবে কি না, তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ ছিল।

যাহা হউক, জোসেফ্ আনা স্মিটের খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া চলিল। সুইট্জার্ল্যাণ্ডের অধিকাংশ অট্টালিকার ন্যায় এই অট্টালিকাটির বাহিরের দিকে রঙ্গীন কাচের পর্দ্দা ছিল। বারান্দা হইতে যে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নীচে নামিতে হইত, তাহা যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি ফুলগাছের টব দ্বারা সুসজ্জিত। শ্রেণীবদ্ধ টবগুলি বাগান পর্য্যন্ত প্রসারিত, মধ্যে ইষ্টকবদ্ধ সমতল পরিচ্ছন্ন পথ।

জোসেফ্ বারান্দা দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই দেখিল, বার্থা বারান্দার এক পাশে বসিয়া পশমের সূচিকার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছে। সে জোসেফকে নতমস্তকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; কিন্তু অন্য কাহাকেও কোন দিকে দেখিতে পাইল না। তখন সে জোসেফকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "মা কোথায়?"

জোসেফ ঘাড় গুঁজিয়া বলিল, "তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া আছেন।"

বার্থা বলিল, "তিনি তোমাকে কি বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন? কথাটা বুঝি খুব গোপনীয়?"

জোসেফ বলিল, "তিনি আমার বিবাহ দিতে চাহেন, তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন।"

বার্থা সবিস্ময়ে বলিল, "তিনি তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন? কেবল প্রস্তাব নয়—তোমাকে সম্মত করিবার জন্য পীড়াপীড়িও করিতেছিলেন! কাহার সঙ্গে তিনি তোমার বিবাহ দিতে চাহেন?"

জোসেফ বলিল, "তোমাদের পরিচারিকা সারা ষ্ট্রভোল্জের সঙ্গে।"

বার্থা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "সারার সঙ্গে? মরণ আর কি! তা তুমি কি করিয়া মায়ের অনুরোধ এড়াইলে?"

জোসেফ বলিল, "আমি তাঁহাকে সোজা জবাব দিয়াছি; বলিয়াছি, আমি আর এক জনকে ভালবাসি, সারাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

বার্থা বলিল, "করিয়াছ কি? একদম্ কবুল জবাব? কি ভয়ানক! তোমার কথা শুনিয়া মা কি বলিলেন?"

জোসেফ বলিল, "তিনি বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন, তা ছাড়া অত্যন্ত অসন্তুষ্টও হইয়াছেন।"

বার্থা বলিল, "বোধ হয়, খুব রাগও করিয়াছেন?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, তিনি রাগিয়া আগুন হইয়াছেন। আমাকে যে দুই এক ঘা খাইতে হয় নাই, ইহাই আমার সৌভাগ্য।"

বার্থা উৎকণ্ঠিতভাবে দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল, "দেখ জোসেফ, মা'কে চটাইলে তোমার মঙ্গল নাই। তুমি খুব সতর্ক থাকিবে।"

জোসেফ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তিনি রাগ করিলে আর আমার উপায় কি? সতর্ক থাকিয়াই বা কি ফল হইবে?—এখন আমি কি করিব, বলিয়া দিতে পার?"

বার্থা বলিল, "কঠোর পরীক্ষা বটে! কিন্তু যাহাকে তুমি ভালবাস, সঙ্কটে পড়িয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না, তাহাকে ভুলিয়া যাইও না।"

জোসেফ বলিল, "সে বিষয়ে আমি কৃতসঙ্কল্প; প্রাণ থাকিতে তাহাকে ভুলিতে পারিব না, তাহার আশাও ত্যাগ করিব না। তাহাকে পাইবার জন্য মৃত্যুকেও বরণ করিতে প্রস্তুত আছি, বার্থা!"

বার্থা বলিল, "তা যাহাই কর, মা'কে চটাইও না; যেরূপে পার, তাঁহাকে খুসী করিবার চেষ্টা করিবে।"

জোসেফ বলিল, "কিন্তু তাঁহার অবাধ্য হইয়া কিরূপে তাঁহাকে খুসী করিব? তাঁহার অসঙ্গত আবদার রক্ষা না করিলে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন—এরূপ আশা করা পাগ্‌লামী মাত্র।"

বার্থা হাসিয়া বলিল, "মায়েদের আবদারমাত্রই অসঙ্গত; অন্ততঃ মায়ের ছেলে-মেয়েরা এইরূপই মনে করে। কিন্তু যেরূপেই হউক, তাঁর একটু তোয়াজ করিয়া চলিও। তিনি তোমাকে সত্যই বড় স্নেহ করেন, তোমার প্রকৃত হিতৈষিণী, তাহাও তুমি জান, তাঁহার সঙ্গে তোমার বচসা করা সঙ্গত হইবে না।"

জোসেফ ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "পরমেশ্বর জানেন, তাঁহার সঙ্গে বচসা করিবার ইচ্ছা আদৌ আমার নাই। কিন্তু যে কায আমার অসাধ্য, সেই কায করিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিলে আমি যে নিরুপায়।"

এই সময়ে অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া জোসেফ ব্যগ্রভাবে বার্থার হাতখানি টানিয়া তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল; পরমুহূর্তেই সে বার্থার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল। সেই সময় আনা স্মিট সেই বারান্দায় প্রবেশ করিল। যদিও বার্থা সভয়ে তাড়াতাড়ি জোসেফের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহার মায়ের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। জোসেফকে বার্থার করাগ্র চুম্বন করিতে দেখিয়া আনা স্মিট স্তম্ভিত-ভাবে মুহূর্ত্তকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "বার্থা! এ কি কাণ্ড? ইহা কি কখন সম্ভব?"

মায়ের কথা শুনিয়া বার্থার মুখ কর্মচার মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে অবনতমুখে জড়িত স্বরে বলিল, "কি সম্ভব মা?"

বার্থার ন্যাকামীতে আনা স্মিট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি সম্ভব? আমার কথা বুঝিতে পারিয়াও ন্যাকামী করিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিস্? তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমি একেবারেই চোখের মাথা খাইয়াছি, তোর বাঁদরামী দেখিতে পাই নাই?"

বার্থা অপরাধ অস্বীকার করিতে পারিল না; সে মায়ের সম্মুখে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

কন্যাকে নীরব দেখিয়া আনা স্মিটের রাগ আরও বাড়িয়া গেল, সে কর্কশ স্বরে বলিল, "কালামুখী! জোসেফের মুখের কাছে তুই হাত তুলিয়া দিলে সে তাহা চুম্বন করে নাই? তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমি তাহা দেখিতে পাই নাই?"

বার্থা অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ মা, তুমি তাহা দেখিয়াছ!"—সে একখান চেয়ারে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

আনা স্মিট ঘৃণায় মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "আমার চোখের উপর বড়ই বাহাদুরীর কায করিয়াছিস্! যে সামান্য একটা চাষার ছেলে, আমার নগণ্য একটা চাকর—ইহাই যাহার পরিচয়, আমাদের আদেশ ভিন্ন যে আমার সম্মুখে বসিতে সাহস করে না, ভদ্র সমাজে যাহার স্থান নাই,—সেই জোসেফকে সমকক্ষের মত হাত চুমিতে দিতে তোর একটু সঙ্কোচ—এক বিন্দু ঘৃণা হইল না? আমি জুরিচের সম্ভ্রান্ত সমাজের নেত্রী, আর আমার মেয়ের এমন হীন প্রবৃত্তি! কণামাত্র আত্মসম্মান নাই? ধিক্!"

বার্থা কোন কথা বলিতে পারিল না, অপরাধীর মত নতমস্তকে বসিয়া রহিল। মায়ের তীব্র তিরস্কারে সে

মনে এরূপ কঠোর আঘাত পাইল যে, তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল; তাহার নয়নসমক্ষে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

আনা স্মিটের মনে একটা নূতন সন্দেহের ছায়াপাত হইল, সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "শোন্, মুখ তুলিয়া আমার কথার জবাব দে! জোসেফ কুরেটের সঙ্গে গোপনে তোর কোন রকম প্রেমের খেলা চলিতেছে কি না বল্। আমি সত্য কথা শুনিতে চাই।"

বার্থা কোন কথা বলিল না, সে রুমালে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আনা স্মিট আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না; সে হাত বাড়াইয়া বার্থার হাত হইতে রুমালখানি কাড়িয়া লইল, এবং তাহা পদপ্রান্তে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া পদদলিত করিল। অনন্তর সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার কথার জবাব দিতেছিস্ না কেন? তুই কি বোবা হইয়াছিস্, না এই কেলেঙ্কারীর কথা স্বীকার করিতে তোর লজ্জা হইতেছে?"

মায়ের কঠোর ব্যবহারে বার্থার কোমল হৃদয় হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সে সবেগে মাথা তুলিয়া তেজের সহিত বলিল, "মা, তোমার লজ্জাজনক ব্যবহার দেখিয়া মনে হইতেছে, আমি যেন কতই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি! মেয়ে যদি সত্যই কোন গুরুতর অপরাধ করে, তাহা হইলেও কোন মা সেই মেয়ের প্রতি এ রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

আনা স্মিট বলিল, "যদি তুই সেই ইতর ভিখারীটাকে গোপনে প্রেম বিলাইয়া থাকিস্, তাহা হইলে তোর সেই অপরাধ যে কত গুরু, তাহা তোর ধারণা করিবার শক্তি থাকিলে তোর মাথা ঘৃণায় লজ্জায় এতক্ষণ মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইত; চোখে রুমাল দিয়া সখের কান্না কাঁদিতে প্রবৃত্তি হইত না। আমি চাষার বাচ্চাটার সঙ্গে সান্নার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলাম, বিবাহের পর তাহাদের সংসার অচল না হয়, এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু সেই অকৃতজ্ঞ, দাম্ভিক, ইতর বর্ব্বরটা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবজ্ঞা-ভরে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল; আমার অপমান করিতে তাহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা হইল না! তাহার পর দশ মিনিট না যাইতেই সে আমারই ঘরে দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে আমার কন্যার হাত চুম্বন করিল, আমার অপমানের চূড়ান্ত করিয়া চলিয়া গেল! সেই শূয়ারের বাচ্চার এত সাহস কোথা হইতে হইল? বার্থা, তোর কাছে প্রশ্রয় পাইয়াই এই ভাবে আমার অপমান করিতে তাহার সাহস হইয়াছে; তাহার স্পর্দ্ধা এত বাড়িয়া গিয়াছে! জুতার নীচে যাহার স্থান, তোর উৎসাহেই সে মাথায় চড়িতে উদ্যত হইয়াছে! তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোর গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছে; সে কিরূপ ষড়যন্ত্র—আমি যেরূপে পারি, তাহা আবিষ্কার করিব। যদি প্রমাণ পাই—তুই তাহাকে ভালবাসিয়াছিস্, তাহা হইলে তুই আমার মেয়ে হইলেও তোর সেই অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিব না; তোকে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব, আর কখন তোর মুখ দেখিব না; তুই ক্ষুধার জ্বালায় লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেও তোকে সাহায্য করিব না।—তোর বাবা মৃত্যুকালে কিছু সম্পত্তি তোকে দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার 'উইলে' তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—আমি ইচ্ছা করিলে তোর ছাব্বিশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি আমার দখলে রাখিতে পারিব। তুই আমার সঙ্গে কপটতা করিলে তোকে সেই সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া নিশ্চয়ই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব। তোর ব্যবহারের উপর আমাদের বংশের সুনাম ও সম্মান নির্ভর করিতেছে; শেষে কি তুই কুলগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া একটা ভিখারীকে প্রেম বিলাইবি? তুই আমার বংশগৌরব নষ্ট করিলে আমি কখন তোর সে অপরাধ মার্জ্জনা করিব না। এখন সত্য বল্, তুই জোসেফের ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়াছিস্ কি না?"

বার্থা আর কখন তাহার মায়ের এ রকম ভয়ঙ্কর রাগ দেখে নাই, এরূপ কঠোর তিরস্কারও তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া তাহার মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "মা, তুমি রাগ করিও না; আমি তোমার কাছে কোন কথাই

লুকাইব না। জোসেফ সত্যই আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।”

আনা স্মিট মুখ ভেঙচাইয়া বলিল, “প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে! তার ভালবাসার মুখে আগুন! সে ভালবাসে বলিয়া তুইও কি তাহাকে ভালবাসিয়াছিস্? তার ভালবাসায় উৎসাহ দিয়াছিস্?”

বার্থা নিরুত্তর।

আনা স্মিট বলিল, “চুপ করিয়া রহিলি যে? শীঘ্র আমার কথার জবাব দে।”

বার্থা অস্ফুট স্বরে বলিল, “হাঁ, আমি—আমি তাহাকে ভালবাসি।”

আনা স্মিট গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তুইও তাহাকে ভালবাসিয়াছিস্? হা পরমেশ্বর, এ কালামুখী বলে কি? তুই কোন্ আক্কেলে সেই কুকুরটাকে ভালবাসিলি? আমার মেয়ের এমন প্রবৃত্তি! হারামজাদী, তোর কি এক বিন্দু আত্মসম্মান, বংশমর্য্যাদাজ্ঞান নাই? অত বড় ধাড়ী মাগী একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত?”

আনা স্মিটের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া তাহার বড় ছেলে ফ্রিজ, ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া তাহার মা বলিল, “ফ্রিজ, আমার মরণ হইলেই বাঁচিতাম, বাবা! তাহা হইলে বংশের কলঙ্কের কথা আমাকে শুনিতে হইত না।”

ফ্রিজ সভয়ে বলিল, “কি হইয়াছে, মা! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, সকল কথা খুলিয়া বল।”

আনা স্মিট হতাশভাবে বলিল, “আমার মাথা কাটা গিয়াছে, আর কি হইবে? বার্থা আমার সকল আশায় ছাই দিয়াছে। ও বলিতেছে, আমাদের অন্নে প্রতিপালিত চাষার ছেলে জোসেফ কুরেট উহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে; আর এই কালামুখী তাহার ভালবাসায় মজিয়া গিয়াছে!”

মায়ের কথা শুনিয়া ফ্রিজের চোখ-মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে বার্থার মুখের দিকে রক্তনেত্রে চাহিয়া সরোষে বলিল, “বেহায়া ছুঁড়ী! তোদের এই প্রেমের খেলা কত দিন চলিতেছে, বল্।”

বার্থা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “তিন বৎসর হইতে আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছি।”

বার্থার কথা শুনিয়া ফ্রিজ ও তাহার মা স্তম্ভিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কথাটা বিশ্বাস করিতে যেন তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। বিস্ময়ের আবেগ হ্রাস হইলে আনা স্মিট বার্থাকে বলিল, “জোসেফ কি তোকে চিঠিপত্র লিখিত?”

বার্থা বলিল, “হাঁ।”

আনা স্মিট বলিল, “কোথায় সেই সকল চিঠি?”

বার্থা বলিল, “পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।”

ফ্রিজ বলিল, “ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিস্, না বাণ্ডিল বাঁধিয়া লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছিস্?”

বার্থা এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ করিল। সে ফ্রিজের মুখের উপর এমন অবজ্ঞাপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, সেই দৃষ্টিতে ফ্রিজ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, সে জানিত, বার্থা কখন মিথ্যা কথা বলিত না।

আনা স্মিট বলিল, “সে যে সকল পত্র লিখিত, তুই সেগুলির উত্তর দিতিস্ ত?”

বার্থা অস্ফুট স্বরে বলিল, “হাঁ, দিতাম।”

আনা স্মিট বলিল, “চিঠিপত্রে ত তোদের গুপ্ত প্রেমের তরঙ্গ বহিত; কিন্তু তোর এই বেহায়াপনার শেষ ফল কি, তাহা কোন দিন ভাবিয়াছিলি? তোর সঙ্কল্পটা কি ছিল, শুনি!”

বার্থা বলিল, “আমি তাহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।”

মেয়ের কথা শুনিয়া আনা স্মিট দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সক্রোধে হুঙ্কার দিল; ফ্রিজ ঘৃণাভরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন অসম্ভব কথা যেন তাহারা কখন শুনে নাই।

আনা স্মিট চেয়ারে মাথা রাখিয়া আড়ষ্টপ্রায় হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, “বাবা ফ্রিজ! শীঘ্র আমার শুঁকিবার শিশিটা আনিয়া দাও, বোধ হয়, আমার মূর্চ্ছা হইবে। আর পোষাকের টেবলে হাত-পাখা আছে, সেখানা আনিয়া আমার মাথায় একটু বাতাস দাও; আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে!”

মায়ের আদেশ শুনিয়া মাতৃভক্ত পুত্র তাড়াতাড়ি শিশি ও পাখা আনিতে ছুটিল। আনা স্মিট যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্ম-সংবরণ করিয়া বার্থাকে বলিল, “যা এখন

মীরাবাই

বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী— শ্রীভবতারণ দে

তোর ঘরে। তুই যে ঢলাঢলি করিয়াছিস্, তা সাম্‌লাই-বার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কেলেঙ্কারীর কথা যদি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে লোকের কাছে আমার মুখ দেখান ভার হইবে; লজ্জায় আমি মরিয়া যাইব। আমাকে জুরিচ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। আমার মেয়ের এমন হীন প্রবৃত্তি? হা ভগবান্! কোন্ পাপে তুমি আমার মাথায় এমন বজ্রা-ঘাত করিলে? আমার উঁচু মাথা একেবারে ধূলার সঙ্গে মিশাইয়া দিলে? এমন সর্ব্বনাশীকেও গর্ভে স্থান দিয়া-ছিলাম! হারামজাদী শেষে আমার বংশের সম্মান নষ্ট করিল!"

বার্থা উঠিয়া কম্পিতপদে তাহার শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। সে বুঝিল, তাহার প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল সে যে আশা অতি সংগোপনে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ তাহা শূন্যে বিলীন হইল! সে জানিত, তাহার মা তাহাকে জোসেফের হস্তে সম্প্রদান করিতে কখন সম্মত হইবে না, এমন অসঙ্গত প্রস্তাব মায়ের নিকট উত্থাপন করিতেও তাহার সাহস হইবে না, জোসেফের সহিত মিলনের পথে যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে, তাহা অতিক্রম করাও তাহার অসাধ্য; তথাপি সে জোসেফকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। তিন বৎসরকাল জোসেফই তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া, আরাধ্য দেবতার ন্যায় দিবানিশি তাহার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতেছিল। বার্থা তাহার হৃদয়ভরা প্রেম এ পর্য্যন্ত কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, তাহার মনের ভাব কেহ কোন দিন বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু সহসা আজ এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! বার্থা শয্যায় পড়িয়া বাণবিদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিল।

কয়েক মিনিট পরে ফ্রিজ পাখা ও শিশি লইয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইল; সে শিশিটা মায়ের হাতে দিয়া স্বয়ং তাহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। আনা স্মিট্ কতকটা সুস্থ হইয়া ফ্রিজকে বলিল, "বাবা ফ্রিজ! এ যে বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম! জোসেফটা এ রকম সয়-তান, তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম? রাস্কেলটার কি সাহস, কি স্পর্দ্ধা! চাকর হইয়া প্রভুকন্যার সঙ্গে প্রেম করিতে আইসে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়! আমার অনুগ্রহের কি এই প্রতিদান?"

ফ্রিজ আস্তীন গুটাইয়া ঘুসি তুলিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "আমি সেই সয়তানের মাথা ঘুসাইয়া গুঁড়া করিয়া দিব। তাহার প্রেমের বাতিক ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।"

আনা স্মিট্ ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না, ফ্রিজ! তুমি ও রকম কিছু করিও না; ও ভাবে তাহাকে শাস্তি দিলে কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইবে, এই কেলেঙ্কারীর কথা সকলেই শুনিতে পাইবে; আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না। একেই ত আমি বার্থার ব্যবহারে মরমে মরিয়া গিয়াছি। তাহার বিবাহের জন্য য়ুরো-পের বড় বড় কুলীনের ঘরে পাত্র খুঁজিতেছি, আর সে কি না একটা চাষার প্রেমে মজিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! কি লজ্জা, কি বিড়ম্ব-নার কথা! ইহার উপর যদি এই কেলেঙ্কারীর কথা লইয়া হাটে বাজারে আন্দোলন উপস্থিত হয়—তাহা হইলে 'হার্টফেল' করিয়া হঠাৎ আমার মৃত্যু হইতে পারে। ওঃ! কি ভীষণ, কি শোচনীয় অবস্থা!"

ফ্রিজ বলিল, "তাহা হইলে তুমি কি করিতে বল, মা; এখন প্রতীকারের উপায় কি?"

আনা স্মিট মুখ ভার করিয়া বলিল, "হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না, ফ্রিজ! বার্থা যে সত্যই সেই কুকুরটাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, ইহা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, মেয়েরা প্রথম-যৌবনে অবিবাহিত লম্পট যুবকদের তোষামোদের লোভে তাহাদের সঙ্গে যে ভাবে নাটুকে প্রেমের অভিনয় করে, বার্থাও তাহাই করিয়াছিল। এ আগাগোড়া ছেলেখেলা! কিন্তু ছেলেখেলা হইলেও সে কি করিয়া তাহার উচ্চবংশের সম্মান, সম্ভ্রান্তসমাজে আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্মৃত হইয়া হীনবংশীয় ইতর একটা কুলীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করিল? তাহার প্রবৃত্তি কি এতই হীন?"

ফ্রিজ গম্ভীর স্বরে বলিল, "বার্থার পক্ষে উহা ছেলে-খেলা হইতে পারে, কিন্তু সেই সয়তানটা উহাকে

ভুলাইয়া বিবাহ করিয়া দাঁও মারিবার চেষ্টায় ছিল, এ বিষয়ে এক বিন্দু সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে তুমি তাহার ষড়যন্ত্রটা যখন ঠিক সময়েই ধরিয়া ফেলিয়াছ—তখন আর দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই। বার্থার সম্পত্তিটুকুর লোভেই সে উহাকে ক্রমাগত ফুস্‌লাইতেছিল, তাহার ভালবাসা-টাসা সবই মিথ্যা। বেটা যেন বর্ণচোরা আম, বাহির দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই!"

আনা স্মিট মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, বাবা! বার্থার সম্পত্তিটুকুর লোভেই সে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। একটা চাষার ছেলে আমার মেয়ের স্বামী হইলে আমাদের বংশগৌরব একেবারেই নষ্ট হইত। উঃ, কি লোমহর্ষণ ব্যাপার!"

ফ্রিজ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমাদের মত সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ে চাষার ঘরের বৌ! ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, বার্থার হৃদয় হইতে এই উৎকট প্রেমের অঙ্কুর উপড়াইয়া ফেলিবার একটা ব্যবস্থা শীঘ্রই করা চাই, মা!"

আনা স্মিট বলিল, "হাঁ, সে ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতে হইবে। আমার খুড়তুতো ভাই পিটার ফ্রিবর্গে আছে, বার্থাকে তাহারই কাছে পাঠাইব; আর জোসেফ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে হয়—তাহা আমিই করিব, তুমি তাহাকে কিছু বলিও না। কা'লই আমি তাহাকে এখানে ডাকাইয়া এই লজ্জাজনক ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মেঘের সঞ্চার

আনা স্মিট রাশভারী স্ত্রীলোক ছিল, তাহার ছেলেমেয়েরা তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং তাহার অবাধ্য হইতে সাহস করিত না। সে যাহা সঙ্কল্প করিত, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিত; কোন কারণে তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হইত না। জিদ বজায় রাখিবার জন্ত সে অর্থব্যয়েও কখন কুণ্ঠিত হইত না। বার্থা জোসেফকে যতই ভালবাসুক, মায়ের কঠোর তিরস্কারে ভয় পাইয়া সে তাহার প্রণয়-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছিল; কোন কথা গোপন করে নাই। সে জোসেফের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইত, পাঠের পর সেগুলি বাক্সের ভিতর লুকাইয়া রাখিবার জন্ত তাহার বড়ই আগ্রহ হইত; কিন্তু পাছে কেহ দেখিতে পায় এবং তাহাদের গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় নিতান্ত অনিচ্ছায় সহিত পত্রগুলি নষ্ট করিত। এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল!

বার্থা যখন বাড়ী থাকিত, তখন জোসেফের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাহার দেখা হইত বটে, কিন্তু তাহারা এতই সতর্কভাবে আলাপ করিত যে, তাহারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত, এ সন্দেহ কোন দিন কাহারও মনে স্থান পায় নাই। সে সময়েও তাহারা গোপনে পত্র লিখিয়া পরস্পরের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিত। তিন বৎসর পূর্ব্বে আনা স্মিট কার্য্যোপলক্ষে কিছু দিনের জন্ত স্থানান্তরে গিয়াছিল; বার্থা তখন বাড়ীতেই ছিল এবং জোসেফও সে সময় সর্ব্বদা তাহার মনিব-বাড়ী আসিত। সেই সময় তাহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই আকর্ষণ ক্রমে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল। তাহার পর বার্থা বিদ্যার্জ্জনের জন্য বার্ণিতে প্রেরিত হইলেও তাহাদের প্রণয় ক্ষুন্ন হয় নাই, বরং সুদীর্ঘ বিরহে তাহার গভীরতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আনা স্মিট তাহার পরিচারিকা সারার সহিত জোসেফের বিবাহ দেওয়ার জন্ত তেমন ব্যস্ত হইয়া না উঠিলে, বার্থার গুপ্ত প্রেমের সংবাদ তত শীঘ্র জানিতে পারিত না; অতঃপর কোন একটা সুযোগ পাইলেই জোসেফ বার্থাকে সহরতলীর কোন ভজনালয়ে লইয়া গিয়া গোপনে বিবাহ করিত। অন্ততঃ এইরূপই তাহাদের সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

আনা স্মিট তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা দুই ধরিয়া চিন্তা করিল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে বার্থার বিবাহের জন্ত য়ুরোপের কোন রাজপুত্র—অভাবপক্ষে ডিউক-নন্দনের অনুসন্ধান করিতেছিল, আর বার্থা একটা চাষার ছেলেকে—তাহারই কারখানার একটা চাকরকে প্রেম বিলাইতেছিল,

তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল! বার্থাকে কাটিয়া ফেলিলেও বোধ হয় আনা স্মিটের গায়ের জ্বালা দূর হইত না। কিন্তু কলঙ্কপ্রচারেরও ভয় ছিল; এই জন্য সে উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া, তাহার খাস-কামরা হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বার্থার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

বার্থা তখন তাহার শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখ বিবর্ণ, কেশ-বেশ বিশৃঙ্খল, তাহার হৃদয়ে তখন তুফান বহিতেছিল। সে তাহার মাতাকে হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল না; সে বুঝিল, এবার আর এক দফা গালাগালি আরম্ভ হইবে! এজন্য সে প্রস্তুত ছিল। যাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে—তিরস্কারে তাহার আর ভয় কি? সে বিতৃষ্ণাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, কোন কথা বলিল না।

আনা স্মিট একখানি চেয়ারে বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বার্থার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু এবার আর পূর্ব্ববৎ তিরস্কার বা কটূক্তি না করিয়া, কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মোলায়েম করিয়া বলিল, "বার্থা, তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি মনের ভুলে যে ভয়ানক অন্যায় ও কলঙ্কজনক কায করিয়া ফেলিয়াছ, সে জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছ। তোমার মানসিক দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া তুমি যে লজ্জিত হইয়াছ, এবং কি কুকর্ম্মই করিয়াছি ভাবিয়া মনের দুঃখে কাঁদিয়াছ—ইহাতে আমি ভারী খুসী হইয়াছি।"

মায়ের কথা শুনিয়া বার্থার চক্ষু পুনর্ব্বার অশ্রুপূর্ণ হইল, সে কোন কথা না বলিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া আনা স্মিট বলিতে লাগিল, "তোমার চোখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছ। কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছ, কিন্তু যতই কাঁদ, তুমি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছ, চোখের জলে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই; তবে এ পথে তুমি আর পা না দেও, তোমার এই কলঙ্কের কথা কেহ শুনিতে না পায়—তাহাই এখন কর্ত্তব্য। লোক তোমার কুচরিত্রের কথা লইয়া আলোচনা করিলে, আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। আমার মাথা কাটা যাইবে। হাঁ; তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই 'হার্টফেল্' করিয়া মরিব। আমার মৃত্যুর জন্য তোমাকেই দায়ী হইতে হইবে। তুমি বংশের সম্মান কি ভাবে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ, পরলোকে থাকিয়া তোমার পিতাও কি তাহা জানিতে পারিতেছেন না? তোমার এই লজ্জাজনক হীনতার পরিচয় পাইয়া সমাধি-গহ্বরের ভিতর তাঁহার অস্থিগুলি পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই!"

আনা স্মিট এই সকল অতিরঞ্জিত কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিল না; কিন্তু সে জানিত, কর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে কিঞ্চিৎ ধনবান্ হইলেও তাহাতে তাহার বংশগৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই, উচ্চকুলেও সে জন্মগ্রহণ করে নাই; জানিত, তাহার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষরা দরিদ্র কৃষক,—ইহা ভিন্ন তাহাদের অন্য পরিচয় ছিল না।—আনা স্মিটের স্বামী এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে, এবং বার্থা জোসেফকে ভালবাসিয়াছে শুনিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, "বেশ ত! জোসেফকে বিবাহ করিয়া বার্থা যদি সুখী হয়—তাহাতে আপত্তি কি? জোসেফও ত আমারই মত কৃষকের ছেলে, ভাগ্য প্রসন্ন হইলে উহারও উন্নতি হইবে।"—কিন্তু কর্ম্মকার-নন্দিনী কাঞ্চন-কৌলীন্যের গর্ব্বে তাহার স্বামীর রুচি, প্রবৃত্তি, এমন কি, লোহা ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাতে কড়া পড়ার কথাও বিস্মৃত হইয়াছিল!

জননীর তীব্র ধিক্কারে অধীর হইয়া বার্থা বলিয়া উঠিল, "এত বাক্যযন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছে না। আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মরিলে আমার হাড় জুড়ায়।"

মেয়ের কথা শুনিয়া আনা স্মিট উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বার্থা! তোমার মুখে এ কি কথা শুনিতেছি! এ রকম জঘন্য কথা কি করিয়া তোমার মুখ হইতে বাহির হইল? তুমি কি জান না, আত্মহত্যা কত বড় গুরু অপরাধ? ছি, ছি, এই কি তোমার শিক্ষার ফল? কোথায় তুমি আমার সম্মান, আমার গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবে,—না, আমার মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারিলেই তোমার হাড় জুড়ায়?"

বার্থা মুখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "তুমি বলিতেছ কি? তোমার মান-সম্ভ্রম, তোমার গর্ব্ব কি আমি ধুইয়া খাইব? চিরজীবন যদি মনের কষ্টেই কাটাইতে হইল—তাহা হইলে ফাঁকা মান-সম্ভ্রমেই বা কি লাভ হইবে, আর তোমার ঐ গর্ব্ব বুকে পুষিয়াই বা কি সুখ পাইব আমি?"

আনা স্মিট হাত তুলিয়া বাধা দিয়া নীরস স্বরে বলিল, "বার্থা, তুমি একেবারেই অধঃপাতে গিয়াছ? তোমার কথাগুলা ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত কথা নয়! আমার মেয়ে হইয়া যে মান-সম্ভ্রমে, আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া একটা চাষার ছেলেকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে, তাহাকে আমার সন্তান বলিয়া মনে করিতে পারি না। পুনর্ব্বার তোমার মুখে ঐ রকম কথা বাহির হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিব। এ গৃহে তোমার আর স্থান হইবে না। তোমার যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমার সাক্ষাতে এত দূর বেয়াদবি?"

মায়ের কথায় ভয় পাইয়া বার্থা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তখন আনা স্মিট বলিল, "তুমি যথেষ্ট পাগ্‌লামী করিয়াছ, আর নয়। এখন যাহা বলি, শোন। এখনই তুমি জোসেফকে একখানি পত্র লিখ; কি লিখিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি, আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না। শীঘ্র উঠিয়া কাগজ-কলম লও।"

বার্থা তাহার মাতার আদেশানুযায়ী পত্র লিখিতে প্রথমে অসম্মত হইল; কিন্তু তাহার মা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া টেবলের কাছে বসাইয়া দিল। তাহার পীড়াপীড়িতে বার্থা নিরুপায় হইয়া, একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল :—

"গত তিন বৎসর ধরিয়া আমি যে অন্যায় কায করিয়া আসিয়াছি, এত দিনে তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপনে প্রেমপত্র লিখা আমার মত সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারীর পক্ষে কতদূর গর্হিত, কিরূপ মূঢ়তার কায হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি। প্রেমের মোহে আমি বোধ হয় উন্মত্ত হইয়াছিলাম, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি হারাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই মোহ কাটিয়া গিয়াছে। যদি তুমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করিয়া থাক, ভবিষ্যতে আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে আজ তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছি, তোমার সেই দুরাশা পূর্ণ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতেই পারে না। এমন কি, আমাকে প্রণয়-জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখা তোমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। তুমি কে, সমাজের কোন্ স্তরের লোক, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে, আর আমার সামাজিক মর্য্যাদা কিরূপ, তাহাও তুমি জান; আমাদের উভয়ের এই ব্যবধান বিলুপ্ত হইবার নহে। তোমার ও আমার জীবনের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আমাদের কার্য্যক্ষেত্রও বিভিন্ন। এ জন্য তোমাকে জানাইতেছি—ভবিষ্যতে তুমি আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিবে না এবং যদি কখন কোন কার্য্যোপলক্ষে তোমাকে আমার সম্মুখে আসিতে হয়—তাহা হইলে স্মরণ রাখিবে, তুমি আমাদের কারখানার অসংখ্য চাকরের মধ্যে এক জন সামান্য পরিচারকমাত্র; তুমি ভৃত্য, আর আমি তোমার প্রভুকন্যা।"

বার্থা তাহার মাতার নির্দ্দেশক্রমে এই পত্রখানি লিখিতে যে কষ্ট অনুভব করিল, তত কষ্ট সে জীবনে পায় নাই। বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। পত্রখানি লিখিতে লিখিতে দুই একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—কলম ফেলিয়া দিয়া অসম্পূর্ণ পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে; কিন্তু মায়ের ভয়ে সেই ইচ্ছা সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না, পত্রখানি শেষ করিতে হইল। একখানি লেফাপায় জোসেফের নাম লিখিয়া বার্থা পত্র ও লেফাপা মায়ের হাতে দিল, আনা স্মিট অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত পত্রখানি পাঠ করিয়া লেফাপায় পুরিল। আনা স্মিট লেফাপা বন্ধ করিলে বার্থা সঙ্কল্প করিল—সে জোসেফকে গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইবে, তাহার মাতার পীড়াপীড়িতে ও নির্য্যাতনের ভয়ে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছে; পত্রে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা তাহার অন্তরের কথা নহে। জোসেফের প্রতি তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই,

হইতে পারেও না। সে তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে, অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক -সুযোগ পাইলেই গোপনে তাহাকে বিবাহ করিবে।

পত্রখানি পকেটে পুরিয়া আনা স্মিট বলিল, "তোমাদের প্রেমের খেলা বন্ধ করিবার জন্য প্রথমে এই পন্থাই অবলম্বন করিলাম; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, প্রণয়ান্ধ যুবক-যুবতীর বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। তোমাকে এখানে রাখা আমি সঙ্গত মনে করিতেছি না। কা'ল প্রথম ট্রেণেই তোমাকে ফ্রিবর্গে তোমার কাকা পিটারের কাছে পাঠাইব। ফ্রিজ তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিবে; কি জন্য তোমাকে সেখানে পাঠাইতেছি—তাহাও সে পিটারকে বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিবে। পিটার তোমার গুণের কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইবে বটে, কিন্তু এ সকল কথা সে গোপন রাখিবে সন্দেহ নাই। সেখানে থাকিয়া ক্রমে তোমার চরিত্র-সংশোধিত হইবে; পরে তুমি বুঝিতে পারিবে, আমার উদ্দেশ্য মন্দ নহে, তোমার হিতের জন্যই আমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। এখন তুমি পোষাক পরিয়া মজ্‌লীসে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হও. পরে বেড়াইতে যাইবার জন্য আমি গাড়ী জুতিতে বলিব।"

আনা স্মিট কন্যার কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে বার্থা হতাশভাবে রোদন করিতে লাগিল। সে তাহার মায়ের সকল তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দিয়া এই পত্রখানি লিখান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুরতা বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। কয়েক মিনিট পরে সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল, এবং জোসেফকে আর একখানি পত্র লিখিয়া জানাইতে চাহিল—তাহার মা যে পত্র পাঠাইয়াছে, সেই পত্র তাহাকে দিয়া জোর করিয়া লিখাইয়াছে; সেই পত্রের কোন কথা জোসেফ যেন সত্য বলিয়া মনে না করে—ইত্যাদি।

পত্রখানি লিখিয়া বার্থার মন একটু সুস্থির হইল; সে তাহা জোসেফের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইবার সুযোগের প্রতীক্ষায় লুকাইয়া রাখিয়া, তাহাদের পারিবারিক মজ্‌লীসে যোগদানের জন্য সাজ-পোষাক করিতে লাগিল।

আনা স্মিট তাহার খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রিজকে ডাকাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল, সে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র পিটারকেও পরামর্শের জন্য ডাকিত; কিন্তু পিটার তখন বাড়ী ছিল না, কয়েক দিন পূর্ব্বে কলোনে বেড়াইতে গিয়াছিল।

সে দিন রবিবার। প্রতি রবিবারে আনা স্মিটের গৃহে মজ্‌লীস বসিত, সে দিনও অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ভদ্র লোক তাহার বৈঠকখানায় সমবেত হইল। আনা স্মিট সেই ঘরে প্রবেশ করিবার কয়েক মিনিট পরে বার্থা মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল; তখন সে অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। আগন্তুক যুবকগণ বার্থাকে ঘিরিয়া বসিয়া মধুলুব্ধ মধুকরের ন্যায় গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করিল। বার্থা মনের কষ্ট গোপন করিয়া তাহাদের গল্পে যোগদান করিল। তাহার পর তাহাদের জলযোগ আরম্ভ হইল। আহারান্তে আনা স্মিট একটি বান্ধবীকে ও বার্থাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল।

আনা স্মিটের শকটখানি অত্যন্ত মূল্যবান্, শ্বেতবর্ণ অশ্বযুগলও যেন উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর। কোচম্যানের পোষাকের ঘটা দেখিলে রাজবাড়ীর কোচম্যান বলিয়াই মনে হইত। চোপদার তাহার পার্শ্বে সুবর্ণ-খচিত দণ্ড হাতে লইয়া আনা স্মিটের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে আনা স্মিট কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল—ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে, আর কোন ভয় নাই!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মচকায়—ভাঙ্গে না

বার্থা যে পত্রখানি লিখিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই রবিবারে তাহা জোসেফের নিকট পাঠাইবার সুযোগ পাইল না, এমন কি, ডাকে দেওয়ারও ব্যবস্থা করিতে পারিল না। সোমবার প্রত্যুষের ট্রেণে তাহাকে ফ্রিজের সঙ্গে ফ্রিবর্গে যাত্রা করিতে হইল। সে স্থির করিল, ফ্রিবর্গে পৌঁছিয়াই পত্রখানি কোন একটা ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিবে।

বার্থা ক্রিবর্গে যাহার নিকট প্রেরিত হইল, সে আনা স্মিটের পিতৃব্যপুত্র; তাহার নাম পিটার গটসক। পিটার ক্রিবর্গে হোটেল খুলিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। আনা স্মিটের স্থায় সে-ও অত্যন্ত দাম্ভিক ছিল; যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় হইলে তাহার ধারণা হইল—হোটেলের ব্যবসায় তাহার স্থায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না! ইহাতে তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে হোটেল বন্ধ করিয়া এক ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসিয়াছিল। 'কুঠিয়াল' হইয়া তাহার কৌলীন্স-গর্ব্ব গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণের সঙ্গে সে বড় একটা মিশিত না, তাহাদিগকে "ছোট লোক" মনে করিয়া কৃপার চক্ষুতে দেখিত। এ বিষয়ে আনা স্মিটের সহিত তাহার চরিত্রের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। জুরিচ-বাসিনী ভাগ্যবতী ভগিনীর সে বড়ই গৌরব করিত; এবং সে কিরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া আনা স্মিটের সামাজিক মানসম্ভ্রম ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গে আলোচনার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না।

বার্থাকে ফ্রিজের সঙ্গে ঘরের গাড়ীতে ষ্টেশনে পাঠাইয়া আনা স্মিট অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। যে কোচম্যান বার্থাকে ও ফ্রিজকে তাহার গাড়ীতে ষ্টেশনে লইয়া গেল, আনা স্মিট তাহাকে আদেশ করিল, 'ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় কারখানা হইতে জোসেফ কুরেটকে ঐ গাড়ীতে এখানে লইয়া আসিস্।"

জোসেফ তখন স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানায় কায করিতেছিল। কোচম্যান ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া কারখানার সম্মুখে গাড়ী রাখিয়া জোসেফকে কর্ত্রীর আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেল। আনা স্মিটের আদেশ শুনিয়া, সে তাড়াতাড়ি কারখানার বাহিরে আসিয়া দেখিল, কর্ত্রী তাহার জন্ম নিজের গাড়ী পাঠাইয়াছে! ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং মিস্ত্রীখানার ময়লা পোষাকে সেই পালিশকরা ও মখমলাবৃত স্প্রিংএর গদী আঁটা মূল্যবান্ ব্রুহামে চড়িয়া মনিব-বাড়ী যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিল।

তাহাকে কুণ্ঠিত দেখিয়া কোচম্যান বলিল, "তা গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যাইতে তোমার সাহস না হয় ত কোচবাক্সে উঠিয়া আমার পাশে বসিয়া চল; কর্ত্রীর হুকুম, তোমাকে এই গাড়ীতে যাইতেই হইবে।"

যাহা হউক, জোসেফ কোচবাক্সে না বসিয়া গাড়ীর ভিতরের আসনেই উঠিয়া বসিল, দুই দিন পরে বার্থাকে গোপনে বিবাহ করিয়া কর্ত্রীর জামাই হইবে, বার্থার পিতৃদত্ত সম্পত্তি তাহার হাতে আসিবে, তখন সে নিজেই এই রকম গাড়ী-ঘোড়া রাখিতে পারিবে; তবে সে কোচবাক্সে কোচম্যানের পাশে বসিয়া যাইবে কেন? এই কথাই তখন তাহার মনে হইতেছিল; কিন্তু অসময়ে কর্ত্রী তাহাকে হঠাৎ ডাকিয়া পাঠাইল কেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আনা স্মিট দুইটি উদ্দেশ্যে জোসেফকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। প্রথম উদ্দেশ্য, বার্থার সহিত তাহার গুপ্ত প্রেমের কথা সে জানিতে পারিয়াছে—ইহা তাহার গোচর করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, সারাকে বিবাহ করিলে ভবিষ্যতে তাহার কত সুবিধা হইবে, তাহা তাহাকে আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।—আনা স্মিট মনে করিয়াছিল, সারার সহিত জোসেফের বিবাহটা দিয়া ফেলিতে পারিলে বার্থা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; বার্থা তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিবে না, তাহার প্রেমব্যাধি সারিয়া যাইবে। আনা স্মিটের তখনও বিশ্বাস ছিল—লোভেই হউক আর ভয়েই হউক, জোসেফ তাহার আদেশ পালন করিবে, ইচ্ছা না থাকিলেও সারাকে সে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে।

জোসেফ 'বো সেজোরে' উপস্থিত হইলে এক জন ভৃত্য তাহাকে জানাইল, কর্ত্রী তাহাকে তাঁহার কামরায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া জোসেফের একটু ভয় হইল, কিন্তু সে মনে মনে বলিল, "সারাকে আমার ঘাড়ে চাপাইবার জন্ম কর্ত্রী বোধ হয় আর একবার চেষ্টা করিবেন, এই জন্মই খাস-কামরায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম হইয়াছে। কিন্তু তিনি এখনও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। আমি কি জন্ম সারাকে বিবাহ করিতে অসম্মত, তাহা জানিয়াও তিনি কেন আমাকে এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন? সারাকে বিবাহ করিবার লোকের ত অভাব নাই।"

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে সে কর্ত্রীর খাস-কামরায় প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে কর্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া সে একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রায় ৫ মিনিট পরে আনা স্মিট সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। জোসেফ তাহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু আনা স্মিট তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিল না, এমন কি, তাহাকে বসিতেও বলিল না! জোসেফের সহিত কর্ত্রীর এরূপ ব্যবহার এই প্রথম!

আনা স্মিট জোসেফের মুখের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমাকে হঠাৎ কেন ডাকিয়াছি, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পার নাই, এই পত্রখানি পড়িয়া দেখ, তাহা হইলে তোমাকে ডাকাইবার কারণ বুঝিতে পারিবে।"

আনা স্মিট বার্থার পত্রখানি জোসেফের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। জোসেফ কম্পিত হস্তে লেফাপা খুলিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। আনা স্মিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে জোসেফের মুখভাবের যে পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহাই সে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

জোসেফ পত্রখানি পাঠ করিয়া সকলই বুঝিতে পারিল। তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল, তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল, তাহার দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়া যেন তরল অনলের স্রোত বহিতে লাগিল! যেন হঠাৎ কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড ঝড় আসিয়া তাহার সুখের প্রাসাদ এক মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!

পত্রখানি শেষ করিয়া জোসেফ বিবর্ণ মুখে আনা স্মিটের মুখের দিকে চাহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না।

আনা স্মিট ঘৃণার হাসি হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, সাধু পুরুষ! তোমার ভণ্ডামী ও বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে কি? বার্থা নিতান্ত ছেলেমানুষ, এই জন্য নানা ছলে তাহাকে ভুলাইতে পারিয়াছিলে, কিন্তু তাহার ভ্রম দূর হইয়াছে। ঘৃণা ও লজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়া সে তোমাকে এই পত্র লিখিয়াছে, ইহার প্রতি ছত্রে তোমার প্রতি তাহার আন্তরিক অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তোমার ভাগ্যফল তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ কোন দিন আশা করিয়া থাক, তুমি বার্থাকে বিবাহ করিতে পারিবে, তাহা হইলে আশা করি, এই পত্র পড়িয়া তোমার সেই ভ্রম দূর হইয়াছে, তুমি যে কিরূপ নির্ব্বোধ, তাহাও বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারিয়াছ। তোমার মত সামান্য লোকের আমার মেয়েকে বিবাহ করিবার সাধ? এ রকম দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিতে তোমার লজ্জা হয় নাই ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তোমার এ রকম পাগ্‌লামীর কথা শুনিয়া কেহ কি না হাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু লোকের কাছে তোমাকে অপদস্থ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমার অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা করিতেও প্রস্তুত আছি, কারণ, আমি জানি, তোমার মত বয়সে মোহান্ধ হইয়া ঐ রকম অপরাধ করা অস্বাভাবিক নহে। বার্থাকে তুমি কোন কৌশলে পুনর্ব্বার ভুলাইয়া কুপথগামিনী করিতে না পার, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছি, তাহার সহিত আর তোমার দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলেও অতঃপর তোমাকে চাকরীতে রাখিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই, তবে আমার দয়ার শরীর, তোমাকে আমার কারখানা হইতে তাড়াইয়া দিলে তোমাকে অনাহারে থাকিতে হইবে ভাবিয়া, এক সর্ত্তে তোমাকে রাখিতে প্রস্তুত আছি। সেই সর্ত্ত এই যে, তুমি তিন মাসের মধ্যে বিবাহ করিবে।"

জোসেফ অবনত মস্তকে আনা স্মিটের অবজ্ঞা ও কটূক্তি সহ্য করিতেছিল, তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করে নাই। তাহার মনের ভিতর ঝড় বহিতেছিল, আঘাতের পর আঘাতে তাহার বেদনাপ্লুত হৃদয় যেন অসাড় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আনা স্মিটের এই শেষ কথা শুনিয়া সে জ্বলিয়া উঠিল, মাথা তুলিয়া কর্ত্রীর

মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "কর্ত্রি, আমাকে নির্ব্বোধ মনে করা আপনার একান্ত ভুল! মনুষ্য-চরিত্রে আপনার এক বিন্দু অভিজ্ঞতা থাকিলে আপনার এ রকম ভুল হইত না। আপনি মনিব, আমি চাকর; এই জন্যই আপনি মনে করিয়াছেন, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই অসঙ্কোচে আমাকে বলিবার অধিকার আছে এবং আমি আপনার সকল আদেশ পালন করিতে বাধ্য। ইহাও আপনার ভুল ধারণা, আপনি যদি সারাকে তাহার বিবাহ উপলক্ষে ২ লক্ষ ফ্রাঙ্ক যৌতুক দানের অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলেও আমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন, আমি দরিদ্র, পবিত্র প্রেমের অধিকারী নহি, আমি দরিদ্র, অতএব অর্থলোভে আমি আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য—তাহা হইলে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে, আপনাকে বুদ্ধিমতী মনে করিয়া আমি বড়ই ভুল করিয়াছি।"

চাকরটা বলে কি? মনিবের মুখের উপর এ রকম স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে, এরূপ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতে তাহার সাহস হইল!—আনা স্মিট গভীর বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিয়া জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর ক্রোধে ও বিরাগে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া জোসেফকে তাড়াইয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া আনা স্মিট কষ্টে উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিল; অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "জোসেফ, তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ—তাহা ভুলিয়া যাইতেছ। মনিবের সম্মুখে ভৃত্যের এরূপ ধৃষ্টতার মার্জ্জনা নাই।"

জোসেফ সতেজে বলিল, "কিন্তু মানুষের কাছে সরলভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার অধিকার মানুষ-মাত্রেরই আছে। শুনুন কর্ত্রি, আমার সকল কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমি আপনার কন্যাকে ভালবাসি; ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতাকে যেমন ভালবাসে—সেই-রূপ ভালবাসি। যদি তাহাকে লাভ করিবার আশা আমার পক্ষে বামনের চাঁদ ধরিবার আশার ন্যায় অসঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমি এইমাত্র বলিতে পারি—এ রকম অসঙ্গত আশা যে আর কেহ কখন করে নাই, এরূপ নহে এবং অনেকেরই তাহা সফল হইয়াছে। আপনার কন্যার যে পত্র আপনি আমাকে দিলেন, ইহা পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, আপনার কন্যা আমার প্রেমের প্রতিদানে অসম্মত; আর যদি সে সত্যই আমাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার ভয়ে তাহা গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার মনের ভাব যাহাই হউক, এই পত্রপাঠে বুঝিতে পারিলাম, আমার সুখস্বপ্নের অবসান হইয়াছে! আপনি আমার মনে অতি কঠোর আঘাত করিয়াছেন। কাহারও মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেওয়া যে কিরূপ নিষ্ঠুরের কায, নারী হইয়াও আপনার তাহা বুঝিবার শক্তি নাই, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়! এইরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া আপনার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছে! আপনি কি রমণী?"

আনা স্মিট বিরক্তিভরে বলিল, "পাগলের মত কি আবোল-তাবোল বকিতেছ? তোমার যে আশা পূর্ণ হইবার কোন দিন সম্ভাবনা ছিল না, সেই দুরাকাঙ্ক্ষা আমি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি, তোমার ভ্রম-প্রদর্শন করিয়াছি, ইহাতে যদি তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকে, সে দোষ কি আমার? তোমার হৃদয় এরূপ অসার—এ কথা প্রকাশ করিতে তোমার লজ্জা হইল না? আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও, এত দূর তোমার সাহস, এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা! তোমার এই প্রস্তাব আমার পক্ষে কতখানি অপমানজনক, তাহা তোমার বুঝিবারও শক্তি নাই! সাধে কি বলিতেছি, তুমি পাগল? তোমার কথা উন্মত্তের প্রলাপ-মাত্র?"

জোসেফ বলিল, "আমার প্রস্তাব আপনার পক্ষে অপমানজনক কেন? আমার কার্য্যে কি অসাধুতার কোন পরিচয় পাইয়াছেন?"

আনা স্মিট বলিল, "আমার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া তুমি কোন দিন অসাধুতার পরিচয় দিয়াছ, এরূপ কথা বলি নাই।"

জোসেফ বলিল, "তবে আমার প্রস্তাব আপনার পক্ষে অপমানজনক, এরূপ মনে করিবার কারণ কি?"

আনা স্মিট বলিল, "কারণ? কারণ কি তুমি বুঝিতে পার নাই? এতই তুমি নির্ব্বোধ? তুমি দরিদ্র কৃষকের পুত্র, হীনবংশে তোমার জন্ম, আর আমি কে—তাহাও তুমি জান।"

জোসেফ সতেজে বলিল, "হাঁ কর্ত্রি, আমি তাহা জানি; কিন্তু আমি জানিলেও আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, আপনি কামারের মেয়ে এবং আপনার স্বামী আমারই ন্যায় কৃষকের পুত্র ছিলেন।"

আনা স্মিটের দম্ভে এ অতি কঠোর আঘাত! তাহার ভৃত্য মুখের উপর তাহার কুলের উল্লেখ করিয়া খোঁটা দিল! এ অপমান অসহ্য। আনা স্মিট সরোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার মুখ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল; তাহার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। যে কথা সে ভুলিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছে, সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিতেছে, ডিউক, মার্ক্‌ইস্ বা ব্যারণের ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়া আভিজাত্যলাভের চেষ্টা করিতেছে—একটা সামান্য চাকর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্টস্বরে সেই কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল? অসঙ্কোচে বলিল, 'তুমি কামারের মেয়ে এবং সামান্য কৃষকের পুত্রবধূ?'—জোসেফের এই ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। আনা স্মিট বিকৃতস্বরে বলিল, "ওরে সয়তান, তোর ছোট মুখে এত বড় কথা? তোর মঙ্গলের জন্যই আমি তোকে সদুপদেশ দিতেছিলাম; ভবিষ্যতে তুই সুখী হইতে পারিস্, তাহারই চেষ্টা করিতেছিলাম। আমার সেই চেষ্টার এই ফল? শেষে আমাকে যা তা বলিয়া গালাগালি! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা! আমি তোকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিলাম।"

জোসেফ অবজ্ঞাভরে বলিল, "কর্ম্মকার-নন্দিনী বলায় আপনাকে গালি দেওয়া হইল? আপনি কি কামারের মেয়ে, কৃষকের পুত্রবধূ নহেন? ইহা স্বীকার করিলে সম্মানের লাঘব হয়—এরূপ আমার ধারণা ছিল না। আমার কথা শুনিয়া আপনি অত ক্ষাপ্পা হইবেন না। আপনার মুরুব্বীয়ানা, আপনার নেকনজর আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ছেঁড়া জুতার মত তাহা পরিত্যাগ করিতে আমি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত ছিলাম। আপনি আমাকে বরখাস্ত করিলেন শুনিয়া আমি ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় কাহিল হইব না। কর্ম্মকারের ব্যবসায়ে আপনার যথেষ্ট টাকা হইয়াছে, তাহা আমার জানা আছে, কিন্তু দরিদ্রের বংশে আপনার জন্ম—ইহাও আপনার অজ্ঞাত নহে। তথাপি আপনি দারিদ্র্যকে পাপ মনে করিতেছেন, উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনার বিষয়। আপনার এই ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব এক দিন চূর্ণ হইতে পারে, এ কথা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? যদি আমি জীবিত থাকি—তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াও জীবিকার সংস্থান করিতে পারিব—ইহা আপনার অগোচর রহিবে না। আপনার মত অব্যবস্থিতচিত্ত দাম্ভিকা নারীর সেবায় জীবনপাত করা শক্তির অপব্যয় মাত্র। আপনি আমাকে বেতন দিয়াছেন, আমিও প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি। আমার উপর আপনার কৃতজ্ঞতার দাবী এক বিন্দুও নাই।"

আনা স্মিট গর্জ্জন করিয়া বলিল, "অকৃতজ্ঞ! নিমকহারাম!"

জোসেফ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "জিহ্বা সংযত করুন, কর্ত্রি! আমি ঐ দুইয়ের একটাও নহি। আপনার সঙ্গে আর আমার কথা-কাটাকাটি করিবার আগ্রহ নাই, তাহার প্রয়োজনও দেখি না; কিন্তু আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে বলিয়া যাইতেছি, এই আমার শেষ বিদায় নহে। আপনি জানিয়া রাখুন, আপনার কন্যা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে আমি বিবাহ করিব না। আপনি তাহাকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পাঠাইলেও আমার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিবেন না। আপনার সহিতও পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

জোসেফ আনা স্মিটকে অভিবাদন না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। আনা স্মিট হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিল। সে মনে করিয়াছিল—তাহার দুই একটা তাড়া খাইয়াই জোসেফ ঘাবড়াইয়া যাইবে; কিন্তু এ কি হইল? সে তাহাকেই চাবুক মারিয়া বিজয়ী বীরের মত সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া চলিয়া গেল! বরখাস্ত হইয়াও তাহার তেজ কমিল না? চাষার ছেলের এত তেজ, এত গর্ব্ব, এ রকম জিদ কোথা হইতে আসিল? অতি ভয়ঙ্কর লোক!

আনা স্মিট মনে মনে বলিল, "ভাগ্যে মেয়েটাকে এখান হইতে সরাইয়া দিয়াছি! কিন্তু দূরে পাঠাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না; তাহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতেও যদি ভয়ের কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আরও বেশী দূরে—দেশান্তরে পাঠাইব। ছোঁড়া যাহাতে মেয়েটার কোন সন্ধান না পায়, তাহা করিতেই হইবে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর জিদ! কি দম্ভ! আমাকে বলিয়া গেল—কামারের মেয়ে, চাষার পুত্রবধূ? এত অপমান! দেখি উহাকে অন্য উপায়ে জব্দ করিতে পারি কি না!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দেশবন্ধুর তিরোভাবে

কি কাল প্রভাত উদিল গগনে
কি দারুণ কথা শুনিনু আজ;
সহসা পড়িল বাঙ্গালার শিরে
এ কি নিষ্ঠুর কালের বাজ।
আজি ভারতের রাজনীতি ভূমে
উঠেছে যে ঘোর বিসংবাদ,
ওগো বীর! তুমি অগ্রণী হয়ে
করেছিলে তায় তূর্য্যনাদ;
সহস্র সেনা সজ্জিত এবে
তব ইঙ্গিতে সমর-সাজে,
সহসা কেন এ অকাল-নিদ্রা
আসিল তোমার নয়ন-মাঝে?
বিশ্রাম-কাল এ নহে তোমার
সাজে কি এখন এ নীরবতা!
নায়ক-শূন্য কর্ম্মীর দল
বল কোন্ পথে যাইবে কোথা?
কার হাতে তুমি অর্পিয়া গেলে
ওগো তেজস্বী কর্ণধার!
সাধের তোমার "স্বরাজ্য"-তরী
"ব্যবস্থাপকের" বিপুল ভার।

মহান্ ত্যাগের আদর্শ হ'য়ে
করি আলোকিত অযুত প্রাণ,
মধ্যগগনে গেলে কি অস্ত
ভারতের রবি জ্যোতিষ্মান্!
দেশের সেবায় হয়েছিলে "দাস"
দেশের সেবায় স'পিয়া প্রাণ,
জ্ঞান গরিমায় তবু হে সুভাষি!
লভেছিলে তুমি রাজার মান।
জাগো জাগো দেব এখনও তোমার
সে সকল আশার হয়নি শেষ,
বঙ্গের প্রাণ হে দেশবন্ধু!
বান্ধব-হারা করো না দেশ।
শূন্য দেউল ফেলি পুরোহিত
কোন্ লোকে তুমি গেলে গো আজি,
কোন্ সুললিত আহ্বান-ভেরী
শ্রবণে তোমার উঠিল বাজি'?
সে দেশ কি তব সাধের স্বদেশ—
স্বজন-ভারত-জগৎ-পার?
তাই শোকাহত মানবের প্রতি
ফিরিয়া না চাহি দেখিলে আর।

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

সপ্তগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম মহানগরীর শেষ নিদর্শন একটি বহু পুরাতন মস্জিদের ভগ্নাবশেষ, তৎসংলগ্ন সমাধি, কয়েকখানি শিলালিপি, প্রাচীন দুর্গের উচ্চভূমি ও তথায় ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড ভিন্ন আর উল্লেখযোগ্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে দিকে নয়ন ফিরাইবেন, সেই দিকেই দেখিবেন, বনের পর বন গভীর হইতে গভীরতম। এখন আমি ২৪ বৎসর পূর্ব্বে মস্জিদটি দেখিতে যাই। মিঃ ব্লকম্যানের পর বোধ হয় আর কেহ এই মস্জিদের খোঁজখবর লয়েন নাই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মস্জিদের চতুর্দ্দিক্ এরূপ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল যে, তথায় মনুষ্য ত দূরের কথা, শ্বাপদগণেরও প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে মস্জিদটি কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে কঠিন
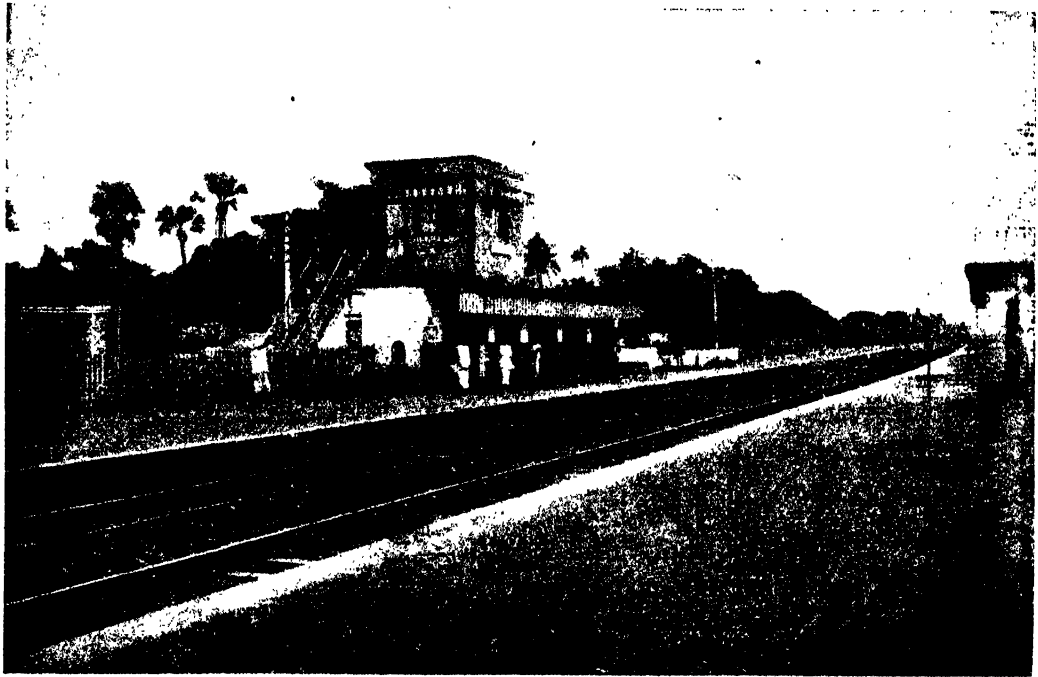
ত্রিশবিঘা ষ্টেশন

সপ্তগ্রাম বলিতে পূর্ব্বোক্ত ৭টি গ্রামকে বুঝায় না। বাঁশবেড়িয়ার স্বর্গীয় রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয়ের বদান্যতায় ও দায়িত্বে স্থাপিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে ক্ষীণকায়া সরস্বতী-তীরে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান এখন সপ্তগ্রাম বলিয়া পরিচিত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ব্লকম্যান উপরি-উক্ত মস্জিদটি দেখিয়া যায়েন। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে বহু কষ্টে স্থান নির্ণয় করিয়া জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করি—তাহার পর মস্জিদটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। সেই দিন আমার বন্ধু মেজর উইগল্‌কে (Major G. E. Weigall, R. A.) সঙ্গে লইয়াছিলাম। বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা লোকজনসহ সশস্ত্রই গিয়াছিলাম, আর তাঁহার সহিত একটি ক্যামেরা ছিল। সে দিন তিনি যে কয়খানি ফটো লইয়াছিলেন, তাহা এই

প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল। মস্‌জিদটির ছাদ বহুকাল পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়াছিল, দেওয়ালগুলিও পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের চতুর্দ্দিকে কয়েক বিঘা লাখরাজ জমী মস্‌জিদ সংস্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও এই জনহীন অরণ্যে কে তাহার ব্যবস্থা করিবে? প্রতীকারকল্পে আমি এ বিষয়ে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁহার আদেশানুযায়ী কয়েক বৎসর পরে পূর্ত্তবিভাগ দ্বারা পতনোন্মুখ দেওয়ালগুলি খাড়া রাখিবার-ব্যবস্থা হয়।

মেজর জি, ই, উইগল্, আর, এ

মস্‌জিদটি সৈয়দ ফকীরুদ্দীনের পুত্র জালালুদ্দীন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন এক খণ্ড ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ ফকীরুদ্দীন কাস্পিয়ান হ্রদ-তীরস্থ আমুল নগর হইতে আসিয়া এখানে অবস্থান করেন। মস্‌জিদের দেওয়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডে রচিত। প্রাচীরগাত্রে নয়ন-তৃপ্তিকর লতাগুল্ম-পত্রাদি আরব চিত্রকর কর্ত্তৃক সুন্দররূপে চিত্রিত। মধ্যস্থলের প্রাচীরগাত্রে ক্ষোদিত কুলঙ্গিটি অতিশয় সুদৃশ্য, কিন্তু পশ্চিমদিকের দেওয়াল-স্থিত উপরের অংশ ভগ্ন হওয়ায় প্রস্তর এবং ভগ্নস্তূপ ভেদ করিয়া সমগ্র কুলঙ্গিটি নয়নগোচর হয় না। খিলান এবং গম্বুজগুলি আধুনিক পাঠান ধরণের। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রত্যেক দ্বারের উপর তুর্কীদিগের জাতীয় পতাকার অনুকরণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অঙ্কিত। এই মস্‌জিদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে তিনটি সমাধি আছে। তাহার নিম্নে সৈয়দ ফকিরুদ্দিন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও খোজা চিরনিদ্রায় শয়ান আছেন। এই প্রাচীরের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উত্তরদিকের প্রাচীরের ভিতরদিকে দুইখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বক্রভাবে রক্ষিত হইয়াছে। একখানি চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ফলক প্রাচীরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থল ভগ্ন হইয়াছে। এই প্রস্তর-ফলকগুলি কি প্রকারে মস্‌জিদের অভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। যখন সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর সাধারণ অট্টালিকাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়ে কোনও ধার্ম্মিক লোক ক্ষোদিত লিপিগুলি উদ্ধার করিয়া ফকীরুদ্দীনের মস্‌জিদ এবং জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধিস্থলের ন্যায় পবিত্র স্থানে রক্ষা করিয়া থাকিবেন এবং মস্‌জিদ সংস্কারকালে কতকগুলি প্রস্তর-ফলক প্রাচীরগাত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন। ফকীরুদ্দীনের সমাধির উপর প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ যে লিপি আছে,
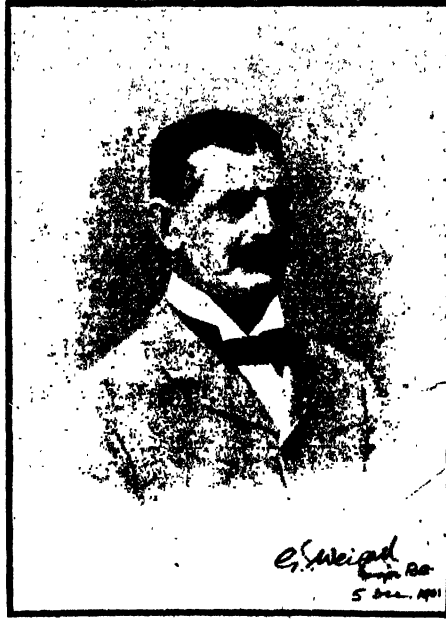
ফকীরুদ্দীনের মস্‌জিদ (লেখক কর্ত্তৃক আবিষ্কারকালে গৃহীত ফটো হইতে)

তাহা এত অস্পষ্ট যে, তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। চারিখানি প্রস্তরলিপিমধ্যে দুইখানি সপ্তগ্রামের পূর্ব্বোক্ত মস্‌জিদ-সম্বন্ধীয়। দুইখানিই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ, তন্মধ্যে একখানি বেশী লম্বা—সেখানি ফকীরুদ্দীনের সমাধির দেওয়ালে বক্রভাবে রক্ষিত। লিপিখানি আরবী ভাষায় লিখিত। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল—
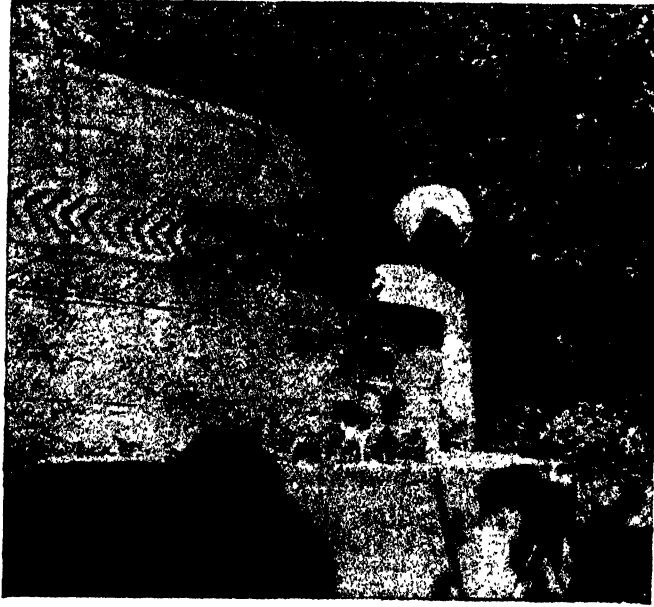
ফকীরুদ্দীনের সমাধি

১

“পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে শুক্রবারে উপাসনা-শব্দ শুনিবামাত্র ত্বরিতপদে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া উপাসনায় যোগদান করিতে যাইবে। যদি তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হইবে। দেবোত্তর দ্রব্য অপহরণ করিও না। মহাপুরুষ (ভগবৎকৃপা তাঁহার উপর অক্ষুণ্ণ থাকুক) বলিয়াছেন—

ফকীরুদ্দীনের মস্‌জিদ

যখন তুমি বাটী হইতে বহির্গত হও, সে দিন যদি শুক্রবার হয়, তাহা হইলে তুমি এক জন মুহাজির (মহম্মদের প্রস্থানের সঙ্গী), আর যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তুমি উচ্চতম স্বর্গে গমন করিবে। মহাপুরুষ আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক মসজিদ এবং দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করে, সে স্বীয় দুহিতা,

বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণু বা বাসুদেব মন্দির—৬৭৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

বাঁশবেড়িয়ার ডাক্তার ডাকের স্কুলবাটী—বর্ত্তমান "শ্রীবাস"

মাতা এবং ভগ্নী-গমনের পাপে পতিত হয়। মসজিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি।

* * *

* * *

(অস্পষ্ট)—তাঁহার মুখজ্যোতি পুনরুত্থানের দিবস পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

প্রতিভাত হইবে। (পারস্য ভাষায়) হাসানের বংশধর হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান্ এবং আদর্শ সুলতান মোজাফার সুলতান নাস্রা সাহর রাজত্বকালে এই জুম্মা মস্জিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ববিধান করুন। ৯৩৬ হিজরী রামজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ) আমুল নগরনিবাসী সৈয়দ ফকীরুদ্দীনের পুত্র, সৈয়দদিগের আশ্রয়স্বরূপ সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন এই মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন। মোল্লা এবং জমীদাররা দেবোত্তর অপহরণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করেন। সে জন্য যাহাতে এরূপ না ঘটে, শাসনকর্ত্তা এবং কাজীদিগের সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পুনরুত্থানের দিবস তাঁহারা এই কুকর্ম্মের সহায়তার জন্য দণ্ডিত হইবেন না।"

বাশবেড়িয়া হংসেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

অপর প্রস্তর-ফলকখানিতে এইরূপ লিখিত আছে—

২

"পরমেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে এবং অন্তিম দিবসকে বিশ্বাস করে, দৈনিক উপাসনা করে এবং ধর্ম্মানুমোদিত দান-ধ্যান করে, এবং পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, সেই ব্যক্তি ভগবদুদ্দেশে মস্জিদ নির্ম্মাণ করিবার অধিকারী। যাহারা ভগবৎকৃপায় চালিত—কেবল তাহারাই এই সকল কার্য্য করিতে পারে। মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভগবানের জন্য ইহজগতে একটি মস্জিদ নির্ম্মাণ করে, ভগবান্ তাহার জন্য স্বর্গে ৭০টি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। হাসেনের বংশধর সুলতান হাসেন সার পুত্র ন্যায়বান্ নৃপতি আবুল মোজাফার নাস্রা সাহ সুলতানের রাজত্বকালে টাহাবংশের গৌরব, সৈয়দদিগের আশ্রয়স্বরূপ, আমুল নগরনিবাসী সৈয়দ ফকীরুদ্দীনের উপযুক্ত পুত্র সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেন কর্ত্তৃক ৯৩৬ হিজরী শুভ রামজান মাসে (মে, ১৫২৯ খৃঃ) এই জুম্মা মস্জিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।"

অপর দুইখানি প্রস্তরলিপির মধ্যে একখানিতে ৮৬১ হিজরী (১৪৫৭ খৃঃ) মামুদ সাহর রাজত্বকালে তরবিয়ৎ খাঁ কর্ত্তৃক এবং আর একখানিতে ৪ঠা মহরম ৮৯২ হিজরী (১৪৮৭ খৃঃ) ফাত সাহর রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান সেনাপতি ও উজীর উলুগ্ মজিলিস নুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মসজিদ দুইটি কোন্ স্থানে ছিল, তাহার উল্লেখ প্রস্তর-ফলকে নাই এবং কি প্রকারে এগুলি ফকীরুদ্দীনের সমাধির নিকট স্থান পাইল, তাহাও জানিবার উপায় নাই। এইগুলি ভিন্ন সপ্তগ্রামের প্রাচীন নিদর্শন আর কিছু দেখা যায় না।

সপ্তগ্রাম এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ, ডি ব্যারোর (De Barro) ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে গৃহীত

করেন, স্বর্গে ভগবান্ তাঁহার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। (এই স্থানে দুইটি ছত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এত অস্পষ্ট হইয়াছে যে পাঠ করা দুষ্কর)।

যিনি প্রমান্ এবং সাক্ষ্যের দ্বারা বলীয়ান, ইসলামধর্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আশ্রয়স্বরূপ, সুলতান নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার সাহ, ভগবান্ তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁহার পদগৌরব এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন। এই মসজিদ সেই মহামহিম মহিমান্বিত তরবিয়ৎ খাঁ উপাধিধারী খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার অপার করুণা দ্বারা তাঁহাকে অন্তিম কালের ক্লেশ হইতে রক্ষা করুন।"৮৬১ হিজরী বর্ষে (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) উপরিউক্ত লিপি আরবী ভাষায় একখানি পাতলা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত এবং ফকীরুদ্দীনের সমাধিস্তম্ভের উপরের দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট আছে।

অপর প্রস্তরফলক দুইখানির মর্ম্মানুবাদ—

৩

"মহম্মদ বলিয়াছেন, যে তাঁহাকে বিশ্বাস করে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসস্থাপন করে, দৈনন্দিন উপাসনায় যোগদান করে এবং ধর্ম্মানুযায়ী দান করে এবং ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করে না, কেবল সেই ব্যক্তিই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাহারা ভগবানের করুণালাভের অধিকারী, তাহারাই এই মহৎ কার্য্য আরব্ধ করিতে সমর্থ। যিনি নিজের গৌরবেই গৌরবান্বিত এবং যাঁহার পরহিতৈষিণা বিশ্বব্যাপী, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, মসজিদ সকল ভগবানের সম্পত্তি। ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিও না। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন, যিনি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্ম্মাণ

৪

"মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, যাহারা ভগবানে এবং অন্তিমকালে বিশ্বাসী, দৈনন্দিন প্রার্থনা করে এবং দানধর্ম্ম প্রতিপালন করে, এবং ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও ভয়ে ভীত হয় না—কেবল সেই ভক্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে মসজিদ উৎসর্গ করিবার অধিকারী। ঈশ্বরের কৃপাভাজনগণই এই সকল সৎকার্য্য করিতে পারে। মহাপুরুষ (তাঁহার নামে শান্তি বর্ষিত হউক) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহজগতে ভগবানের উদ্দেশে মসজিদ নির্ম্মাণ করে, স্বর্গে ভগবান্ তাহার জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। সুলতান মামুদের পুত্র ন্যায়বান্ এবং সদাশয় নৃপতি জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ সুলতানের

রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ভগবান্ তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব বিধান করুন।

হাদিগড় জিল ও মহলেরা (পরগণা?) শাসনকর্ত্তা এবং লাওবলা ও মিরবক থানার অধ্যক্ষ, সার্জিলা মানকবাদ এবং সিমলাবাদ নামক সহরের শাসনকর্ত্তা এবং উজীর, অসি এবং লেখনীর অধিপতি উলুগ মজিলিস্নুর এই সুবৃহৎ মসজিদের নির্ম্মাণকর্ত্তা। ভগবান্ তাঁহাকে ইহলোকে এবং পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ৪ঠা মহরম ৮৯২ সাল (১লা জানুয়ারী ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ।)

দাসানুদাস আখন্দ মালিক কর্ত্তৃক লিখিত।"

আর্শা পরগণার দক্ষিণ মহম্মদ আমিনপুর ও তদন্তর্গত য়ুরোপীয় উপনিবেশ—রেনেলের [Rennel) মানচিত্র হইতে গৃহীত

একখানি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে আরবীভাষায় এই লিপি অঙ্কিত। ইহাও ফকীরুদ্দীনের সমাধিস্থানের উত্তরের দেওয়ালের নিম্নে রক্ষিত।

এখন আমরা এই সংক্রান্ত দুই একটি কথার আলোচনা করিব।

১। জিলা সার্জিলা মানকবাদ, ২। জিলা হাদিগড়, ৩। থানা লাওবলা ও মিরবক, ৪। সহর সিমলাবাদ। এই কয়েকটি স্থান নির্ণয় করা দুরূহ। থানা লাওবলা সম্ভবতঃ লাওপল্লা। ত্রিবেণীর ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে ভাগীরথীর অপর পারে যমুনার নিকট লাওপল্লা নামক একটি স্থান আছে। লাওপল্লা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান।

প্রস্তরলিপিগুলিতে যে তিন নরপতির নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বাঙ্গালার ইতিহাসে কোনও উল্লেখ আছে কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

১। নসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সা (৮৬১ হিজরী।)

২। মামুদের পুত্র জালালুদ্দীন আবুল মোজাফার ফাত সাহ (৮৯২ হিজরী।)

৩। আলাউদ্দীন হাসেন সার পুত্র নাস্‌রা সাহ (৯৩৬ হিজরী।)

হংসেশ্বরী-মন্দির

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তৃতীয় মুসলমান নরপতি নাসির সাহের উল্লেখ আছে। তিনি ৮৩০ হইতে ৮৬২ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার হাসেন সাহ ইতিহাসে নাসির সাহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নামের শেষে পদবী ধরিয়াই নৃপতিগণের নামকরণ হওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। ইতিহাসে নাসির সাহের নাম প্রথম হাসেন সাহ দেওয়া

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী ও বিষ্ণু বা বাসুদেব-মন্দির

উচিত ছিল। ইতিহাসে নাসরা সাহের পিতা আলাউদ্দীন বলিয়া উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাঁহার নাম দ্বিতীয় হাসেন সাহ দিলে এত গোল হইত না।

বঙ্গদেশের পঞ্চম মুসলমান নরপতি ফাত সাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মার্সডেন এবং লেডলী বলেন, ফাত সাহ মামুদের পুত্র, সুতরাং বারবাক্‌ সাহের ভ্রাতা। মার্সডেন ৮৭৩ হিজরী বারবাক্‌ সাহের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বারবাক্‌ সাহ ৮৬২ হইতে ৮৭৯ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সামসুদ্দীন আবুল মোজাফার যুসুফ সাহ রাজত্ব করেন। গৌড়ের ক্ষোদিত লিপিতে ৮৮০ হইতে ৮৮৫ যুসুফ সাহর রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। যুসুফের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় রাজবংশের সিকন্দর সাহ নামক এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন। যুসুফ সাহের খুল্লতাত ফাত সাহ সিকন্দরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

লেডলী গৌড়ের ক্ষোদিত লিপি এবং যে দুইটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে একই সময়ে দুই জন মুসলমান নরপতি রাজত্ব করিতেন ;—নাসরা সাহ এবং তাঁহার ভ্রাতা গায়েসুদ্দীন আবুল মোজাফার মামুদ সাহ। ডাক্তার ওল্‌ড্‌হাম্‌ আজিমগড় জিলায় সিকন্দরপুর নামক গ্রামে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে টোগরা অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, তত্রত্য একটি মসজিদ ২৭শে রাজব ৯৩৩ হিজরীতে নাসরা সাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। গৌড়ীয় লিপিতে ৯৩৬ হিজরীতে নাসরা সাহর উল্লেখ আছে এবং গৌড়ীয় মুদ্রায় ৯৩৩ হিজরীতে নাসরা সাহের ভ্রাতা গায়েসুদ্দীন আবুল মোজাফার মামুদ সাহের নাম অঙ্কিত আছে। এই সকল ব্যাপার স্পষ্টতঃই একই সময়ে দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতির রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতেছে।

কথিত আছে, সপ্তগ্রামে ৭ শত খিলিপানের দোকান ছিল। ইহা হইতে সপ্তগ্রাম কিরূপ জনবহুল স্থান ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। রামুশিও (Ramusio) লিখিয়াছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও অর্থাৎ সপ্তগ্রাম হইতে বন্দরাদি স্থানান্তরিত হইবার পরেও সপ্তগ্রামে ১০ সহস্র বাসগৃহ বিদ্যমান ছিল।" পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে বহু স্বুবর্ণবণিকের বাস ছিল, হুগলীতে বন্দর স্থাপিত হইলে তাঁহারা হুগলীতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাণিজ্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। পাদরী লঙ্ সাহেব লিখিয়াছেন, সপ্তগ্রামের অবনতির পরেও হুগলীর ওলন্দাজদিগের মধ্যে অনেকেই সপ্তগ্রামে বাগান-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্নে পদব্রজে সেখানে গমন করিয়া সান্ধ্যভোজনের পর তাঁহারা হুগলীতে প্রত্যাগমন করিতেন—এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সে কালে সপ্তগ্রামের লোকরা রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের সহিত রসিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায়ই জয়লাভ করিত। সপ্তগ্রাম হীনশ্রী হওয়ার পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের রেশমী বস্ত্রের লেপ ও বালাপোষের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী-মন্দির (হংস সরোবরে প্রতিবিম্বিত)

বহুকাল হইতে সপ্তগ্রামে কাগজ প্রস্তুত হইত। সপ্তগ্রাম নগণ্য হওয়ার পরেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও সপ্তগ্রামে কাগজ প্রস্তুতের জন্য বহু কারখানা ছিল। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই সেই কাগজ ব্যবহৃত হইত। গবর্ণমেণ্ট জেলখানা সমূহে কয়েদীদের দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় এবং বিদেশ হইতে সস্তা কাগজের আমদানী হওয়ায় সপ্তগ্রামের কাগজের কারখানাগুলি ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। আমরাও বাল্যকালে সপ্তগ্রামের কাগজ ব্যবহার করিতাম। শ্বেত, হরিদ্রা ও নীল রঙের কাগজ প্রস্তুত হইত। শেষোক্ত কাগজে সহজে উই বা পোকা লাগিত না, এখনও সেই কাগজের অনেক খাতাপত্র আমাদের দপ্তরখানায় আছে।

যে সাতটি গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম—সেই গ্রামগুলির মধ্যে অধিকাংশের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত—প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে। গ্রামগুলির মধ্যে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া এখনও পূর্ব্বোক্ত

রাজা রঘুদেবের পৌত্র রাজা নৃসিংহ-দেবের পত্নী সুপ্রসিদ্ধা রাণীশঙ্করী নির্ম্মিত গড়বাটীস্থ হংসেশ্বরী-মন্দির জন্য প্রসিদ্ধ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত বাঁশবেড়িয়া নীল-কুঠীর ভগ্ন অট্টালিকা ও সিন্ধু প্রদেশের লুঠের টাকায় নির্ম্মিত ডাফ্ সাহেবের স্কুল-বাটী বর্ত্তমান "শ্রীবাস"ও উল্লেখ-যোগ্য। ত্রিবেণী এখনও হিন্দুর পরম তীর্থস্থান—উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দ-দেবের ঘাট ও হিন্দু-দেবালয় ভাঙ্গিয়া তদুপরি জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধি 'গাজীদরাফ' এখনও ত্রিবেণীর পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। শিবপুরে সপ্তগ্রাম বন্দরের মাঝি-মাল্লারা বাস করিত, এখনও তাহাদের বংশধররা তথায় বাস করে ও ডিঙ্গী-নৌকায় চড়িয়া মৎস্য ধরিয়া জীবিকার্জ্জন করে। সপ্তগ্রামে যাহারা বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যতরী চালাইত—তাহাদের বাস ছিল বাসু-দেবপুরে। তাহাদের বংশীয় 'নিকারীরা' এখনও কয়েক ঘর মাত্র আছে, তাহারা জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দুদের ন্যায় জীবনযাপন করে। শঙ্খনগরে পূর্ব্বে বহু ছুলেবেহারা বাস করিত—এখনও কয়েক ঘর আছে, তখন পাল্কী প্রভৃতি নরযান বিশিষ্টলোকের যাতায়াত জন্য ব্যবহৃত হইত—এই ছুলেবেহারা সপ্তগ্রাম নগরীর

বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠীর ভগ্নবাটী

পাল্কীবহনের কার্য্য করিত। দেবানন্দ-পুরের মধ্যে মুন্সী-বংশ প্রসিদ্ধ। 'অন্নদা-মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর, প্রভৃতির রচয়িতা সুবিখ্যাত ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে থাকিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। কৃষ্ণপুরে সরস্বতীতীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট ও মদনমোহন-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ত্রিশবিঘার নিকট সপ্তগ্রামে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে গৌরনিতাই ও ষড়ভুজা মূর্ত্তির শ্রীমন্দির ও প্রভু নিত্যানন্দের রোপিত মাধবীলতা বৃক্ষ আছে। এই ষড়ভুজা মূর্ত্তিতে এক দিন প্রভু নিত্যানন্দ অম্বিকানগরে তাঁহার ভাবী শ্বশুর সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিলা।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি ষড়ভুজ হৈলা॥
উর্দ্ধে ধনু বাণ মধ্যে শ্রী হল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে, দণ্ড কমুণ্ডল॥
মস্তকে কিরীট শোভে, শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব-অঙ্গে মণি-ভূষা করে ঝলমল॥
দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করেন স্তুতি করযোড় হইয়া॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ।

বাঁশবেড়িয়া বিষ্ণুমন্দিরের ক্ষোদিত ইষ্টকের উপর কারুকার্য্য

এই মূর্ত্তিদর্শনে পণ্ডিত-প্রবর সূর্য্যদাসের মনের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গেল—উপবীতত্যাগী বৈশ্য-অন্নভোজী সংসারত্যাগী নিত্যানন্দের করে জাহ্নবী দেবী ও বসুধা দেবী নাম্নী কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করিতে তিনি আর দ্বিধাবোধ করিলেন না, বরং নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় চলিয়া আসিতেছে—ভাঙ্গাগড়া প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। সপ্তগ্রাম ভাঙ্গিল, হুগলী গড়িয়া উঠিল, আবার হুগলীর অবনতি হইল—নগণ্য কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়া অতুলনীয় শ্রীসম্পন্ন হইল। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। কালে সবই লয় হয়, পরম সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগরী কালে বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যরাজী, সুবিশাল প্রাসাদসমূহ, অগণ্য পণ্যবীথিকা সকল বিদ্যমান ছিল, আজ তাহা কালের কঠোর নিষ্পেষণে হিংস্রজন্তুসমাকুল দুষ্প্রবেশ্য ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। যে বিপুলকায়া স্রোতস্বতী সরস্বতী নদীর উপর নানা দেশের পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যপোত সকল

ত্রিবেণী গাজী দরাফ

বিরাজ করিত—আজ কালবশে সেই বেগবতী সরস্বতী ক্ষীণকায়া, সূক্ষ্ম রজত-রেখার ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবহমানা। যে স্থানে এক দিন অগণিত জনকল্লোল উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইত—আজ সে স্থান জনকোলাহলশূন্য, নিস্তব্ধ, কালের অনন্ত ক্রোড়ে সুষুপ্ত! কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন! কিন্তু পরিবর্ত্তন যতই হউক, স্মৃতি যাইবার নহে। যত দিন বাঙ্গালার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন সপ্তগ্রামের স্মৃতি মুছিয়া যাইবার নহে। ইহাই সান্ত্বনা।

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়।

বঙ্গসাহিত্যে নূতন পঞ্জিকা-কলশ্রুতি *

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ

হরপার্ব্বতী-সংবাদ।

হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি ॥
বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কোন্ কল্প হয়।
কোন্ কোন্ যুগ গত কাহার উদয় ॥
কোন্ যুগে কেবা রাজা কোন্ অবতার।
পাপ-পুণ্য-ভাগ কিবা যুগধর্ম্ম আর ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ

অথ শ্বেতবরাহকল্পাব্দাঃ ১২২৪ বৎসর গত। তত্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং উইলকিন্স্ সাহেব বঙ্গাক্ষরের মুদ্রারম্ভ প্রস্তুত করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফরষ্টার সাহেব প্রথম বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন। এই সময়ে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরি, মার্স্‌ম্যান প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের চেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্যরচনা আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসাহিত্যের

সত্যযুগোৎপত্তি

এই যুগের পরিমাণ ৬০ বৎসর। এই যুগের অবতার রাজা রামমোহন রায়। তিনি মীনরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজল হইতে বেদের উদ্ধার করিয়া বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

এই যুগের সম্রাট্—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; সামন্ত-নৃপতিগণ—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়-কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যুগারম্ভে বাঙ্গালা গদ্য দেবভাষার সদৃশ ছিল, যথা—"শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন, বিসঙ্কট বদনব্যাদান, বিকট দংষ্ট্রাকড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট্‌চট্ শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত"—ইত্যাদি।

ইহার রচয়িতার নাম এই ভাষার অনুরূপ অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি সিভিলিয়ানদের বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য এইরূপ ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের পদ্যের নমুনা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

কামিনীর সজ্জা

"স্মর অলসে মৃদু-হসনা।
তনু উলসে মদ ললনা ॥
জঘন-তটে ধৃত-রশনা।
অধরপুটে স্মিতদশনা ॥
জিত বরটা গজগমনা।
অরুণঘটা সম বরণা ॥
কনকছটা জিনি বরণা।
চমরসটা কচ-রচনা ॥
ভণতি যথাগতমতিনা।
কবি মদন দ্রুতগতিনা ॥"

এই মদনমোহন তর্কালঙ্কারই যে আবার সরল সুমিষ্ট খাঁটি বাঙ্গালায় "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"—কবিতাটি রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন, তাহা ঐ বাসব-দত্তা পড়িয়া কে অনুমান করিবে?

যে ঈশ্বর গুপ্ত পরমেশ্বরের মহিমবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—

"রে মন! পরম পুরুষের প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে রে—একবার নে রে,—শোন্ রে

* মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ষোড়শ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

শোন্ রে; ভূতনাথকে একবার দেখ রে—একবার দেখ্—রে; মন রে—মন রে—শোন্ রে—শোন্ রে; ও মন, ব্রহ্মরসে গল্ রে—গল্-রে—গল্—রে।" ইত্যাদি। তিনিই আবার কেমন সুললিত ছন্দে এই শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, দেখুন—

"কে রে বামা বারিদবরণী; তরুণী ভালে ধরেছে তরণী,
কাহার ঘরণী আসিয়া ধরণী করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ! কি অপরূপ, অপরূপ নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ চরণ শরণ লয়॥
বামা - হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা—টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে চলিছে
গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥"
ইত্যাদি।

এই প্রকার বিবিধ লেখকের বিভিন্নাকৃতির ভাষা কাল-ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাবে সুমার্জ্জিত ও সমতা প্রাপ্ত হইল। তিনি বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বহুকাল যাবৎ বঙ্গসন্তানদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ভাষা অবশ্যই পণ্ডিতী ভাষা ছিল, কিন্তু তাহা প্রাঞ্জল, সুবোধ্য ও সুমার্জ্জিত ছিল, যথা—

"যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র দশাননের বংশ ধ্বংসকরণাভিপ্রায়ে মহাকায় মহাবল কপিবল-সাহায্যে শত যোজন বিস্তীর্ণ অর্ণবোপরি কীর্ত্তি হেতু সেতু-সংঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভ-প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক ভূরুহ উত্থিত হইল, তদুপরি এক সকললোকললামভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চার্ব্বঙ্গী বীণাবাদন পূর্ব্বক গান করিতেছে।"

এই পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র দণ্ডায়-মান হইয়া তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিলেন। তাহার ভাষার নমুনা এই,—

"ছাদের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে ম'রে রই—টক্ টক্ পটাস্ পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গরু চল্‌তে পারে না ব'লে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।"

আবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত যুগসন্ধিসময়ে যে মহাকাব্য রচনা করেন, তাহাতে আভিধানিক ভাষা চরমে উঠিয়াছিল। তাঁহার সেই ভাষাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ঢাকা জিলার মানকুণ্ডনিবাসী জগবন্ধু ভদ্র যে ছুছুন্দরী কাব্য রচনা করেন, তাহার নমুনা এই,—

"দ্রুহিণবাহন সাধু অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে,
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত দুর্জ্জয়
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে।"

কিন্তু এই মধুসূদনই আবার তাঁহার ব্রজাঙ্গনা ও অন্যান্য কাব্যে যে সরল সুমিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

এই যুগের সাহিত্যে সৃষ্ট নরনারীর সংখ্যা অতীব বিরল, কারণ, অধিকাংশ গ্রন্থই অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ছাত্রদিগের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক। তখন সেই আদিযুগের মানব-মানবী পশ্চিমদেশীয় জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে নাই। দেশের বৈষ্ণব কবি-বর্ণিত বৃন্দাবনের প্রেম তখনও দেবতার লীলা, সুতরাং মানব-সমাজে অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য হইত। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরকীয় প্রীতি "পীরিত" বলিয়া ঘৃণার বস্তু ছিল, সৎসাহিত্যে মাথা তুলিতে পারিত না। তখনও সাহিত্য ও সুনীতির মধ্যে ব্যবধান কল্পিত হয় নাই।

অতএব সেই সত্যযুগের সাহিত্যে—"পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি।"

অথ ত্রেতাযুগোৎপত্তি

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশিত হইয়া

বঙ্গসাহিত্যের এক একটি দিক্ আলোকিত করে। সুতরাং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি। তাহার স্থিতিকাল ৩০ বৎসর।

এই যুগের অবতার একাধারে রামকৃষ্ণ। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে স্বীয় আচরণ ও উপদেশের দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছিলেন।

এই যুগের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তাঁহার সামন্ত-নৃপতিগণ—দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার আলালী ভাষার দ্বারা পণ্ডিতী ভাষার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় প্রকার ভাষার মধ্যে একটি Golden mean অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা করেন। তিনি "লুপ্ত-রত্নাকরে"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে লোকে জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" কিন্তু সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,— "দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক্‌প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষায় 'লম্ফ প্রদান' 'নিদ্রাগমন' প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। পরে অনেক বিচার-বিতর্কের পর বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে 'গরু ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন।"

ক্রমশঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই আদর্শ গদ্যের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইল। তবে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সংস্কৃতশব্দ-বহুল গদ্যেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রগাঢ় ভাবসম্পন্ন প্রবন্ধাবলীতে এই ভাষা মানাইতও ভাল।

এই যুগে পাশ্চাত্য নভেলের অনুকরণে বিস্তর উপন্যাস রচিত হইয়া তৎসঙ্গে অনেক নরনারীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই খাঁটি বাঙ্গালী, তাহারা প্রায়ই বিলাতী ধরণে প্রেম করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন চরিত্রে কতকটা বিলাতী ভাবের ছায়া পড়িয়াছে। তিনি গভীর ট্রাজেডি সৃষ্টির অভিলাষে আয়েষা, কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী গড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর্ট অধিকাংশ স্থানেই স্বভাব ও বাস্তবের অনুগামী হইয়া স্বচ্ছন্দগতিতে চলিয়াছে, সুনীতির সহিত দ্বন্দ্ব করে নাই। এই যুগের সাহিত্যে পাপচিত্র যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবির আর্ট কখনও পাপকে চিত্তাকর্ষক করিয়া চিত্রিত করে নাই, অথবা তাহাকে পুণ্যের মর্য্যাদা প্রদান করে নাই, বরং যথোচিত দণ্ড দিয়াছে। সুতরাং এই ত্রেতাযুগে,—

"পুণ্যং ত্রিপাদং পাপমেকপাদম্।"

অথ দ্বাপরযুগোৎপত্তি

যে দিন ওষধিপতি বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চিমাকাশে অস্তগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাকাশে অরুণ-রাগ বিকিরণ করিতে করিতে তরুণ রবি উদিত হইলেন, সেই দিনই বঙ্গসাহিত্যে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস সীতারাম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসী বাহির হইয়াছে, তখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। সুতরাং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে দ্বাপরযুগোৎপত্তি। পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী কবিযশঃ অর্জ্জন করেন, তখন তিনি বঙ্গসাহিত্যগগনের মধ্যাহ্নভাস্কর। সুতরাং এই দ্বাপরযুগের স্থিতি অনুমান ৩০ বৎসর।

এই যুগের অবতার রামকৃষ্ণশিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী। তিনি হিন্দু-জাতিকে পাশ্চাত্য মোহাবরণ-নির্ম্মুক্ত করিয়া আত্মবোধে জাগ্রত করিয়াছেন, এবং বুদ্ধদেবের ন্যায় দরিদ্রের দুঃখে কাতর হইয়া সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

এই যুগের সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁহার সামন্ত নৃপতিগণ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। আমি জীবিত সাহিত্যরথীদিগের নাম করিলাম না।

ত্রেতাযুগে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া যে সরল গদ্যের ভাষা প্রচলন করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা কাহারও কাহারও মতে অচল হইয়া পড়িল। তাঁহারা কলিকাতার কথোপকথনের ভাষাকে "চল্‌তি-ভাষা" নাম দিয়া সাহিত্যরচনার জন্য সাধু ভাষার বিরুদ্ধে খাড়া করিলেন। ইহা লইয়া "চল্‌তি ভাষা বনাম সাধুভাষা" নামক একটি মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হইল। পরে ১৩২৩ সনের চৈত্রমাসের 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত "ভাষার কথা" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে রায় প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা এই মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। সেই রায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমি ছোট বেলা হইতে সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। * * * যে ভাষা পুথিতে পড়িয়াছি, সেই ভাষাতেই চিরদিন পুথি লিখিয়া হাত পাকাইয়াছি। * * * * ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকরূপে প্রাকৃত বাঙ্গালা ও প্রাকৃত বাঙ্গালার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ক্ষণিকায় আমি কোন পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন কোনটার উপরেই দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। * * * এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ, সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র নিত্যের ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে, সাজাইতে ও বাজাইতে হয়। এই জন্যই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। * * * * তবে প্রতিদিনের যে ভাষার খাতে আমাদের জীবন-স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূরে পড়ে, ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে তাহাকে এক দিকে সাধারণ ও আর এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সম্রাট এখানে মথুরার রাজ-ভাষাতেই তাঁহার রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে রাখালী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সম্রাটের এই রায় প্রকাশ হওয়ার পরে চল্‌তি ভাষা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই।

এই যুগে কবিতা, নাটক, উপন্যাস বর্ষার বারিধারার ন্যায় প্রবলবেগে বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র গল্প যে কত বাহির হইয়াছে, তাহার লেখাজোখা নাই। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনে দাম্পত্যপ্রেম, সখ্য ও বাৎসল্য রস যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কেবল এইগুলি লইয়া কাব্য-রচনা করিতে গেলে তাহা বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হইয়া পড়ে। সে জন্য অনেক গ্রন্থকার বিলাতী প্রেমের আম দানী করিয়া তদবলম্বনে গল্প ও উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অনেক স্থলে দেশপ্রচলিত সামাজিক আদর্শ ও ধর্ম্মনীতি ক্ষুণ্ণ হইল। তখন "art for art's sake" এই আইন প্রচারিত হইল এবং মোরালিটীর সহিত আর্টের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। কিন্তু উভয়েই তুল্য বল থাকায়, দ্বাপরযুগের সাহিত্যে—

"পুণ্যমর্দ্দং পাপমর্দ্দম্।"

অথ কলিযুগোৎপত্তি

দ্বাপরযুগের সাহিত্য-সম্রাট আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখনও পশ্চিমাকাশে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতেছেন, কিন্তু বিগত ১০।১৫ বৎসর হইতে বঙ্গসাহিত্যে কলির হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যৎ যুগবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

সম্রাট রবীন্দ্রনাথ এখন মথুরার রাজভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কাব্য-উপন্যাসাদিতে নহে, প্রগাঢ় ভাবসম্পন্ন রচনাতেও বৃন্দাবনের রাখালী ভাষা

ব্যবহার করিতেছেন। তদনুসারে অনেক লেখক কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই তিনটা জিলার মৌখিক ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি,—

"সত্যি আমি বড্ড ভালবেসেছিলুম তাকে; অত ভাল বোধ হয় তখন আর কাউকে বাসিনি। সে আমার কুমারীর প্রাণে কি মায়াবলে হঠাৎ অতখানি ভালবাসার সঞ্চার ক'রে ফেলেছিল, তা এখনও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু বুঝেছি, আমাদের সেই ভালবাসার ভেতর আবিলতার লেশমাত্রও ছিল না; শুধু ছিল একটা মিষ্টি মধুর মাদকতা—একটা তন্ময় ভাব। আমরা দু'জনে দু'জনকে কাছে পেলেই যথেষ্ট সুখী হোতুম; অন্য কেউ এসে বাধা জন্মালে আর বিরক্তির অবধি থাকতো না। না—না, তার বাড়ী কোথায় ছিল, আমায় জিজ্ঞেস কোর্ব্বেন না; আমি বোল্‌তে পারবো না। তার নাম? তা'ও জানতুম না; তবে—হ্যাঁ, আমি আদর ক'রে তার নাম রেখেছিলুম 'দুলাল'।"

গল্প, উপন্যাস লিখিতে এই মৌখিক ভাষা মানায় ভাল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়—যে সকল ভাব আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে এ ভাষা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। আবার এই ভাষার সঙ্গে যে অঞ্চলের লোকের প্রতিদিনের জীবনস্রোত বহিতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অঞ্চলের বাহিরের লোকের পক্ষে ইহা কৃত্রিম। যে দুই একটি পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই কলিকাতার মৌখিক ভাষায় গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা হয় ত গভীর বিষয় চিন্তা করিয়া পড়িতে দিন দিন অশক্ত হইতেছেন। তাঁহারা তরল সাহিত্য তরল ভাষায় পড়িতে অভ্যস্ত হইতেছেন। আমার বোধ হয়, সেই জন্য এই ভাষা অধিক প্রসার লাভ করিতেছে এবং গল্প ও উপন্যাস এ যুগের সাহিত্যক্ষেত্র দখল করিয়া বসিয়াছে।

সেই সকল গল্প ও উপন্যাসে প্রেমের কাহিনী সমাজে প্রচলিত সোজা পথে না চলিয়া বৈচিত্র্যের অনুরোধে নানা প্রকার উৎকট ও বীভৎস আকার ধারণ করিতেছে। কবির আর্ট এখন মোরালিটীর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া মাথায় লাল পাগড়ী ও হাতে রেগুলেসন লাঠী লইয়া সে বেচারীকে "চোখ রাঙ্গাইয়া" বলিতেছে, "হট যাও!" সুতরাং এই কলিযুগের সাহিত্যে—

"পুণ্যমেকপাদং পাপং ত্রিপাদম্।"

এবং সেই সাহিত্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত কলির লক্ষণসকল স্পষ্টরূপে প্রকট হইতেছে, তদ্‌যথা,—

"যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা সদা ধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"

এখন কবে কোন্ মহাপুরুষ অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া এই কলির পাপপুণ্যের সামঞ্জস্যবিধান পূর্ব্বক সাহিত্য ও সমাজের মঙ্গল-সাধন করিবেন?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ব্যর্থতা

সে দিন নূতন সাজে সাজিয়া
এসেছিনু তোমারি দুয়ারে,
চপল উতল ছন্দে বাঁধিয়া
এনেছিনু এ মোর হিয়ারে।

ডাকিনু তোমারে বার বার বার
সাড়া নাহি তুমি দিলে ওগো আর,
দয়া যে তোমার নাহি উপজিল
দেখিয়া এ দুখী পিয়ারে।

শ্রীসত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
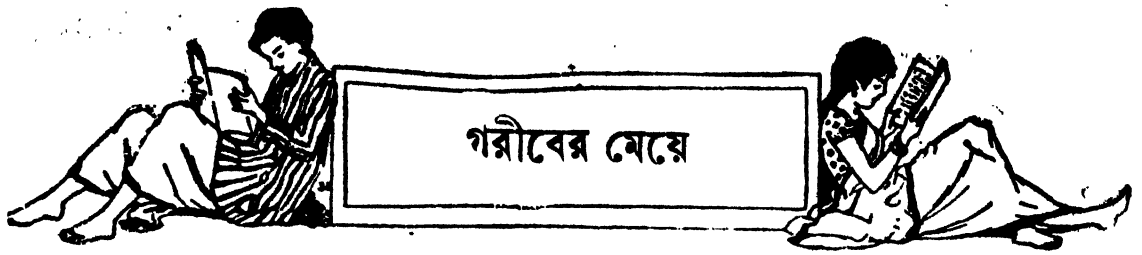
গরীবের মেয়ে

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সুশীল চলিয়া গেলে কি অসহ্য শোকাহত শরীর-মন লইয়াই যে নীলিমা তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তাহা শুধু সেই জানে, আর যদি কেহ তাহার চিরদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধির শুভ মুহূর্ত্তে তাহার ইষ্ট-দেবতাকে এমনই বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে সেই শুধু একমাত্র তাহার এ ক্ষতির পরিমাণ বোধ করিতে পারিবে। শয্যাহীন তক্তপোষের উপর সে অসহ্য যন্ত্রণায় অব্যক্ত রব করিয়া লুটাইয়া পড়িল এবং তাহার পর সে কি কান্না! তখন নিখিলের সমুদয় বেদনা যেন এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়া তাহার দুই নেত্রপথে অজস্র ধারাকারে প্রবাহিত হইতে থাকিল, আর সে কান্না যেন তাহার অফুরন্ত, তাহার যেন আর কোনখানেই শেষ নাই! তাহার করতলগত অমূল্যনিধি, তাহার সাধনার সিদ্ধি, সে আজ নিজের হাতে অতল জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, চির জন্ম-জন্মান্তরের মতই তাহার যথাসর্ব্বস্ব সে বিসর্জ্জন দিয়া দিয়াছে, তাহার এ ছার ও বৃথা জীবনেই বা আর এখন প্রয়োজন কিসের? কি লইয়াই বা এই দীর্ঘ—দীর্ঘতর, সুখহীন, শান্তিহীন, নির্ব্বান্ধব, নির্জ্জন জীবনভারকে সে বহন করিয়া বেড়াইবে?

নীলিমার মনে পড়িল, এক দিন সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, পূর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও মরণের দ্বার ঠেলিয়া আবার সেই জীবন্ত জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার মনে হইল, এমনই কঠিন প্রাণ তাহার যে, মরণও তাহাকে ছুঁই ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারে না। যে মৃত্যুর ভয়ে উচ্চ নীচ সমুদয় জীবজগৎ সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাকেই সে সমাদরের সহিত বরণ করিয়া লইতে উদ্যত, অথচ সে তাহাকে আলিঙ্গন-দানে ঘোরতর অসম্মত। এ রহস্য বড় মন্দ নহে! অথবা যে অনাবশ্যক, মৃত্যুর রাজ্যেও বোধ করি, তাহার মূল্য নাই।

এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে মিস্ রীচের আহ্বান পাইয়া নীলিমা তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিল, শুধু তিনিই নহেন, তাঁহার সঙ্গে সে ঘরে আজ * * * * এর পুরোহিত মহাশয়ও উপস্থিত রহিয়াছেন। ইঁহার উপস্থিতিতে নীলিমা মনে মনে কিছু সঙ্কোচ বোধ করিল। যেহেতু, মিস্ রীচ যে তাহাকে আদর করিতে ডাকান নাই, সেটুকু ত জানা কথাই; অথচ এক জন অপর লোকের সান্নিধ্যে অনর্থক অপমানিত হওয়া কে-ই বা পছন্দ করিতে পারে? এই দুই জনের প্রতিই তাই নীলিমার জ্বালাভরা, অসহিষ্ণু চিত্ত সমানভাবেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং সে একটা আসন্ন সংগ্রামের জন্যই নিজেকে কতকটা তৈরী করিয়া লইয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল। কারণ, নিজের ভিতরকার অবস্থা হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, আজ যদি মিস্ রীচ তাহার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতে যান, তাহাকেও সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সমর-ঘোষণা করিতে হইবে; শরীর-মনের এত বড় মন্দ অবস্থায় আর কোন কিছুই তাহার সহ্য হইবে না।

মিস্ রীচ তাঁহার স্বতঃই গম্ভীর ও কঠিন কণ্ঠে কথা কহিলেন; বলিলেন, "মিস্ চক্রবর্ত্তী! তোমার বিষয়েই এঁর সঙ্গে আমার এতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তোমার যেমন চরিত্র, তাহাতে বিবাহই তোমার পক্ষে একমাত্র প্রতিষেধক। তাই আমরা তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমার বিবাহ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি; অতএব তুমি প্রস্তুত হও, এই সপ্তাহেই মিঃ চিনিবাস পল রাস্কিন্স্এর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে।"

নীলিমার বিদ্রোহ-বিষে বিদগ্ধ চিত্ত ঘোরতর বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সে এ দিক দিয়া আক্রমণের ভয় আদৌ করে নাই। নিশ্চিন্তই সে ভাবিল,—

"এই খৃষ্টধর্ম্ম! উদার ও মহৎ বলিয়া এরই এত বড় নাম, এতেই এদের এত গর্ব্ব? সে যে এ কথা বিশ্বাস করিতেই পারে না। না না, হয় ত তাহার বুঝিবার ভুল, মিস্ রীচ যতই যা হউন, নিশ্চয়ই এমন কথাটা তাহাকে বলেন নাই।" সে প্রায় নিরুদ্ধশ্বাসে মিস্ রীচের বাহ্য-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিল,—না, কই, না, কিছুই বুঝা যায় না; মুখ সেই যথাপূর্ব্ব পাথরের মতই কঠিন ও নির্লিপ্ত। তখন সাহসভরে সে প্রশ্ন করিল, "বিবাহের কথা আপনি কি বলিতেছেন? আপনি জানেন, আমি জর্জ্জ ওকবর্ণকেই যখন বিবাহ করি নাই—"

"ওঃ, তোমার ত বড়ই স্পর্দ্ধা দেখিতে পাই! নেটিব নিগার হইয়া উচ্চবংশীয় আইরিশম্যানকে তুমি বিবাহ করিতে চাও না কি! বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার জন্য উদ্বাহু হওয়া আর কি! শোন নীলিমা! তোমার কু-চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমি আমার মিশনের মেয়েকে ত আর নষ্ট হ'তে দিতে পারি না, কাযেই তোমায় এক জন শক্ত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া এই মিশনবাড়ীর বাহিরে পাঠাইতেই হইবে। এমনই মায়াবিনী তুমি যে, তোমার হাতে আইরিশ যুবক, বাঙ্গালী যুবক কাহারও কোথাও রক্ষা নাই! কি লজ্জা! যাও, এখন নিজের স্থানে যাও, বিবাহের পোষাকের জন্য কাপড় আনাইয়া দিব, ভাল করিয়া শেলাই করিয়া লইও।"

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্তে ক্রোধের অগ্নি বাড়বাগ্নির মতই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার অমতে আপনারা আমার বিয়ে দিতে চান জোর ক'রে? যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে আমি কখন দেখিও নি, সে-ও আমার নয়। হিন্দু-সমাজ এর চেয়ে বেশী আর কি ক'রে থাকে? তবু ত তারা আত্মীয়, আর তোমরা সম্পূর্ণ পর। যাহাই হউক, বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না।"

মিস্ রীচের ভূগোলশাস্ত্রের প্রদর্শিত ভূ-গোলের মতই সুবৃহৎ এবং সুগোল মুখমণ্ডল কঠোরতর হইয়া উঠিল, গম্ভীরতর স্বরে তিনি সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন, "তা করবে কেন? তা হ'লে যে প্রজাপতির পাখা খসিয়া যাইবে। কিন্তু আমিও বলিতেছি যে, বিবাহ তোমায় করিতেই হইবে। বর তোমায় দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে, আর তোমার পছন্দের জন্য কিছুই আসিয়া যায় না। পল তোমায় ঠিক জব্দ রাখিতে পারিবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে আখমাড়ার চিনির কুঠীতে কুলী খাটায়, আর তোমার মত একটা মেয়েমানুষকে সোজা করিতে পারিবে না? তা ভিন্ন সে মরিসসেও অনেক দিন কুলী খাটাইয়া খুব পাকা হইয়া আসিয়াছে। জানেন রেভারেণ্ড মশাই! মিঃ চিনিবাস পল সে দিন তার অনেকগুলি আপনার জাতের বাগ্দীকে খৃষ্টান করেছে, ভারী ভাল লোক সে।"

নীলিমা সাপের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাগ্দীর সঙ্গে আপনারা আমার বিয়ে দিতে চান?"

মিস্ রীচ প্রচ্ছন্ন আননে প্রতিহিংসার হাসি হাসিয়া, পরিতুষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমরা ত জাতিভেদ মানি না। ব্রাহ্মণ বা বাগ্দী আমাদের কাছে প্রভেদ কি?"

এ যুক্তি শুনিয়া আর নীলিমার মাথার ঠিক রহিল না, সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! জাতিভেদ আপনারা খুবই মানেন। আইরিশম্যানের বিবাহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে হওয়ায় আপনার এবং আপনাদের অধিকাংশেরই ঘোরতর আপত্তি আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ বাগ্দীর সঙ্গে হওয়ায় আপনার আপত্তি নাই। কেন? আমরা কি আপনাদের সঙ্গে তুলনায় তাদেরও অধম? কিসে শুনি? রংয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে তফাৎ, আমাদের সঙ্গে বাগ্দীদেরও প্রায় তাই। আপনারাও এ দেশে থেকে খুব বেশী পূর্ব্বের রং বজায় রাখতে পারেন না, তাও ত স্বচক্ষে সর্ব্বদা দেখেছেন। তবু তা বজায় রাখতে কত চেষ্টা, কত না অসাধারণ যত্ন! পাহাড়ে যোয়া, মধ্যে মধ্যে 'বাড়ী' ঘুরে আসা। আর শিক্ষা, সংযম, চরিত্র কোন বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যত প্রভেদ, আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশের অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের তার চেয়ে কি কম প্রভেদ? আমরা অর্দ্ধোলঙ্গবেশে নর-নারীতে মিলে—তাও পরপুরুষ ও পরনারী—মদ খেয়ে অর্দ্ধ প্রমত্তভাবে উদ্দাম নৃত্য করতে পারি না, পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা এখানেও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হলেও, নারীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমাদের সমাজ, সমাজধর্ম্মের অধিকন্তু

বিরোধী বোধ করে, সন্তানকে সতী-গর্ভজাত রাখতে চায়, এরই জন্য আমরা আপনাদের কাছে অর্দ্ধশিক্ষিত ব'লে যদি গণ্য হই, তবে ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ত এখনও গণে শেষ করতে পারা যায় না। আমি অবশ্য আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধে মিশ্রিত হ'তে বলিনে, কিন্তু আমাদেরও আপনারা সেই দয়াটুকু দেখালেই ত চুকে যায়। এই রঙ্গিন খোলস, এই কথার মালায় আমাদের দেশের যে সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে। ছাড়ুন এ সব অভিভাবকত্বের ভাণ, এই ভুল পথের ভুল শিক্ষা ছালা ভ'রে এনে ছোট ছোট মাথায় ইন্‌জেক্ট ক'রে দেবেন, আর—" উত্তেজনায় নীলিমার কণ্ঠরোধ হইল; সে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল।

রেভারেণ্ড গিলবার্ট অটোম্যান এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন। পুরোহিতোচিত ধীর-গম্ভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠেই তিনি নীলিমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! ধৈর্য্যহারা হইও না, তুমি নিশ্চয়ই সেণ্ট ম্যাথিউএর সেই মূল্যবান্ কথাগুলি স্মরণ করিবে যে * * * and gathered the good into vessels, but cast the bad away And shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailling and gnashing of teeth—, অতএব সুস্থিরচিত্তে সকল কথা ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ। দেখ,— ভুল করা মানবধর্ম্মের বাহিরের বস্তু নহে। To Err is human এটি একটি বিশেষ প্রমাণ। আর যীসাস্ ক্রাইষ্ট এই ভুলাক্রান্ত পাপীদের জন্যই অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কাঁটার মুকুট পরিয়া নিদারুণ যন্ত্রণাজনক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণদান করিলেন, তাহা কেবলমাত্র জগতের পাপিকুলের মুক্তির জন্যই। অতএব তুমি নিজের জীবনের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হও, এবং সম্পূর্ণভাবে যিনি তোমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তোমার জন্য বিহিত তোমার এই একমাত্র উদ্ধারের পথকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ কর। হিন্দুর জাতিভেদে ও খৃষ্টানের জাতিভেদে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। হিন্দুতার সহিত সমানধর্ম্মী, সমবর্ণ ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যেও আহার পর্য্যন্ত করে না, আর আমরা নিগ্রো, বাগ্দী বা তোমাদের সবার হাতেই নির্ব্বিকারভাবে খাই; ও সব সঙ্কীর্ণতা, মিথ্যাভেদবুদ্ধি মন হইতে পরিত্যাগ কর। পলকে আমিও চিনি, সে তাহার কুলীদের খুব খাটায় ও তাহাদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করে; এতে তাদের খুব ভাল হয়। উপার্জ্জনও সে কম করে না। আমার বিশ্বাস, এ বিবাহে তোমার আত্মারও কল্যাণ হইবে এবং সুখীও যে হইবে না, তা নয়। আর তুমি কি আশা করিতে পার? নেটিবের মেয়ে হইয়া এর বেশী কি পাইবে?"

এরই নাম উদারতা! আর এই সমুন্নত য়ুরোপীয় সমাজ! এতটুকুমাত্র সঞ্চয় লইয়াই ইঁহারা পরধর্ম্মের প্রতি, অপরের সমাজধর্ম্মের প্রতি পদে পদে আক্রমণ পূর্ব্বক পরের শান্তিপূর্ণ সমাজধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছেন? য়ুরোপীয়ের জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপেই বর্ণভেদ, এক জন ইংরাজ এক জন ইটালিয়ানকে বিবাহ করিলে তাহার জাত যায় না, কিন্তু এক জন ভারতবর্ষীয়কে করিলে যায়। আর অবস্থাভেদও এই জাতিভেদের একটা প্রধান অঙ্গ। লর্ডের ছেলের গরীবের মেয়ে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী য়ুরোপের মিশ্রজাতির আমেরিকানের ঘরে বিবাহে কিছুমাত্র দোষ হয় না। তাহার পর বিবাহে স্বাধীন নির্ব্বাচনটাও যতদূর হইতে পারে, তাহাও এই জর্জ্জের ব্যাপারেই ত স্পষ্ট জানা গিয়াছে। নিজ সমাজমধ্যেও গণ্ডী ছাড়াইবার পথ ইঁহাদের কাহারও নাই। রাজার ছেলের বিবাহ রাজবংশে হওয়া চাই, সকল ক'নেই বরের ধনৈশ্বর্য্যের মূল্যে আত্ম-বিক্রয় করিতে নিজেকে পণ্যের মতই বিবাহ-বিপণির দ্বারে নিয়মমত সাজাইয়া আনে। পিতার ঐশ্বর্য্য মূল্যে বিক্রয় সহজ হয়। এ সমাজও সেই ত একই সঙ্কীর্ণ বিত্তের সমাজ? সমাজ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই কি তবে এক নহে? মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অনুদারতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, এ কি সর্ব্বত্র একই ভাবে বর্ত্তমান নাই? বরং ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু উদার, অপর ধর্ম্মে সেটুকুরও অভাব!

বিরক্তিপরুষ মুখে পুরোহিত মহাশয়ের দিকে মুখ তুলিয়া নীলিমা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল,

"আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তবে আপনারা যে নিজেদের বিজয়গর্ব্বে বিজিত জাতির বিষয়ে কখনও এবং কোন বিষয়েই সুবিচার করিতে সমর্থ নহেন, এ কথা এখন এ দেশে সবাই জানে। এ দেশের মেয়েরা স্বজাতির বাহিরে ত দূরের কথা, স্বশ্রেণীর বহির্ভাগেই সাধ্যপক্ষে বিবাহ করিতে ঘৃণা বোধ করে, এমন কি, যাহারা মুখে জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও মনের এ সংস্কার সহজে দূর হয় না। যাহা হউক, আমি আপনাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি; তাহা অপেক্ষা বরং আপনারা আমায় বিদায় দিন, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি, তাহা হইলে আমার কু-দৃষ্টান্তে অন্য মেয়েরা ত আর মন্দ হইতে পারিবে না।"

এই বলিয়া নীলিমা সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই মিস্ রীচও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে পদাঘাত পূর্ব্বক সরোষকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "বিদায় তোমাকে নিশ্চয়ই দিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার বিষদাঁত তুলিয়া লইয়া তবেই তোমায় ছাড়িব। তোমার মত কুহকিনীকে বাহিরে পাঠাইলে অল্পবয়স্ক যুবকবৃন্দের সর্ব্বনাশসাধন করা হইবে, সে কার্য্য জানিয়া শুনিয়া আমি করিতে পারিব না। পরের হাতে তোমায় বাঁধিয়া দিয়া তাহার শাসনে রাখিতে পারিলে তোমায় কতকটা ঠাণ্ডা করিতে পারিব আশা হয়। যাও, আর কোন কথা বলিও না; বিবাহের পোষাক তুমি তৈরী না করিয়া বড্ড সুখী করিয়া দিলে। তুমি এখান হইতে দূর হইয়া যাও!"

নীলিমা একবার কি বলিবার জন্য মুখ তুলিতে গিয়াই আত্মসংবরণ পূর্ব্বক আর কোন কথা না বলিয়াই নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সঘন শ্বাসে তাহার বুক তখন জোয়ার-লাগা নদীতরঙ্গের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, গরলে ভরা সর্প-শ্বাসের মতই প্রবল বেগে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছিল; দুই চোখ তাহার আগুনের ভাঁটার মত দীপ্ত হইয়া জলিতেছিল; পাছে মিস্ রীচের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার টুঁটি টিপিয়া ধরে, পাছে এই প্রবল উত্তেজনার বশে তাঁহার জিহ্বাটা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বসে, তাই কোনমতে প্রাণপণে সে নিজেকে জোর করিয়া ঠেলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নিজেকে রাখিতে তাহার ভরসামাত্র হইল না।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলিমা চোরের মত সন্তর্পণে নিজের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি একটি ছোট পুঁটুলীতে বাঁধিয়া লইয়া নিঃশব্দপদে দ্বার খুলিল এবং এদিক ওদিক দেখিয়া ধীর-সতর্কপদে পিছনের বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, এ দিকের ছোট দরজাটা খুলিলেই সে মুক্তি পাইবে, কিন্তু কাছে আসিয়া তাহার সে ভুলটা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল, সেই ক্ষুদ্র দ্বারে একটা বড় রকমের পিতলের তালা লাগানো রহিয়াছে। তখন হতাশায় তাহার সমস্ত মনপ্রাণ যেন মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, শরীরের সবটুকু শক্তি যেন তাহার কোথায় নিঃশেষ হইয়া চলিয়া গেল, সে সেই কপাটের কাছেই দুই হাঁটু ভাঙ্গিয়া একেবারে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং আর্ত্তনাদের মত করিয়া মর্ম্মান্তিক বিলাপস্বরে কহিয়া উঠিল, "হে ঠাকুর! তোমায় ছেড়েছি ব'লে তুমিও কি আমায় ছাড়লে? শেষে কি সুশীলকে ছেড়ে বাগ্চীর গলাতেই আমায় মালা দিতে হবে? আমার বড় স্বার্থত্যাগের কি এই ছোট পুরস্কার!"

পিছনে কাহার যেন মৃদু পদশব্দ হইল, অমনি নীলিমা সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা হইতে মাথা অবধি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ধরা পড়িলেই ত তাহার সকল আশারই আজ সমাধি ঘটিবে, এ কথা সে ভালমতেই বুঝিয়াছিল। মিস্ রীচের যে প্রকৃতি, অতঃপর তিনি যে তাহাকে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

"নীলিমা! ভয় পেয়েছ? আমি চন্দ্রমুখী, তুমি কি এখান থেকে পালাতে চাও? আচ্ছা, এসো, এ পথে ত যেতে পারবে না। মেয়েদের বাথ-রুমের দোর দিয়ে তোমায় বার ক'রে আমি দিতে পারি; কিন্তু তার পর?"

নীলিমার সর্ব্বশরীরের সে প্রবল কম্পন তখন পর্য্যন্তও থামে নাই, সংশয় তাহার মনকে তখনও পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আছে, তথাপি অন্তের পরিবর্ত্তে চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া এবং তাহার মুখের আশ্বাসবাণীতে কথঞ্চিন্মাত্র আশ্বস্ত হইয়া সে উত্তেজনারুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সাগ্রহে উত্তর করিল, "তার পর যা হয়, আমার হবে, আমায় তুমি দয়া ক'রে এই নরক থেকে উদ্ধার ক'রে দাও দিদি! আমি আর কোন উপায় না দেখি, এবার না হয় ম'রে গিয়েও বেঁচে যাব। বিয়ে করতে আমি পারবো না, স্বর্গের দেবতাকেও না, তা ঐ বাগ্দী খৃষ্টানকে।"

চন্দ্রমুখীর অধরে ঈষৎ সহানুভূতিপূর্ণ দুঃখের হাসি ফুটিয়া তখনই আবার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, সে শুধু কহিল, "এসো।"

বাহিরের মুক্ত বাতাসে রুদ্ধশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলিমা চন্দ্রমুখীকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল; কহিল, "দিদি! তুমি আমার মা'র বাড়া হ'লে, নিশ্চয়ই তুমি আমার জন্মান্তরে মা ছিলে, নয় ত বোন্ ছিলে ভাই! উঃ, কি দুর্ভাগ্য থেকেই আমায় তুমি আজ বাঁচালে বল দেখি?"

চন্দ্রমুখীর দুই চোখ ছলছল করিতেছিল, সে নীলিমার ভয়পাণ্ডুর ও শীতল গণ্ড দুই হাতে ধরিয়া তাহার ভয়, উত্তেজনা ও সংশয়ে শবশুভ্র ললাটে সস্নেহ চুম্বন করিয়া সজল গাঢ়স্বরে কহিল, "নিজে ম'রে যে মরণের বিভীষিকাকে চিনেছি রে ভাই! ঐ থেকে কেউ যদি বাঁচতে পারে, মনে হয়, তাতে বুঝি একটুখানি শান্তি পাব। যাও ভাই, দেরী করো না, কিন্তু একটা কায কর মা হয়, হিন্দুস্থানীর মত ক'রে শাড়ীটা প'রে নাও, আর একটা শাড়ী ছিঁড়ে ওড়না ক'রে মাথায় ঢাকা দাও, আর এই দাইএর হুঁকা-কলকেটা এনেছি, হাতে ক'রে নাও দেখি। ভুলে যেও না, হিন্দীতে কথা কয়ো, বাঙ্গালীর মেয়েকে একা এত রাত্রে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে বেশী। আচ্ছা, মন্দ হয়নি, হ্যাঁ,—যদি কখন নিরাপদ হ'তে পার, তখন আমার একটু খবর দিও, এখন যেন দিও না।"

দুই জনে দুই দিকে পথ ধরিল।

কোন্ দিকে ষ্টেশন, জানা নাই; মিস্ ওকবর্ণের জীবিতকালে কয়েকদিন গাড়ী করিয়া বাহির হইয়া সে সহর কোন্ দিকে, তাহা দেখিয়াছিল, পোষ্ট আফিসেও এক দিন তাহাদের গাড়ী থামে, আন্দাজ করিল, ষ্টেশন সেই দিকেই হইবে। উত্তরের পথকে সে সভয়ে বর্জ্জন করিল, সেই পথ দিয়াই সে এমনই অসহায় অবস্থায় আর এক দিন এ দেশে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সেই কথা আজ আবার ভাল করিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ট্রেণের থার্ড ক্লাস টিকিটই সে কিনিয়াছিল; কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল,—যাহাতে সে গাড়ীতে তাহার উঠা ঘটিল না। সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটি বঙ্গনারীর অনাবৃত মুখ বাহিরের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়া ছিল, তাহার ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি হইতেই নীলিমার মাথা হইতে তাহার অনভ্যাস ওড়নাখানা বাতাসের ঝাপটায় খসিয়া পড়িল, এ দিকে সে তাহা শশব্যস্তে কুড়াইয়া লইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই সেই বাতায়নমধ্যবর্ত্তিনী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর অথচ সুস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন, "নীলিমা!" এই অতর্কিত সম্বোধনে নীলিমা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের সেই গার্লস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুলোচনা দিদি।

সুলোচনা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর, অথচ শান্তকণ্ঠে আদেশের স্বরে কহিলেন, "এখানে এসো।"

নীলিমা একবার মনে করিল যে, সে ইঁহার সম্মুখ হইতে না হয় খুব ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু তাহার সে ভরসা হইল না। তাই অনিচ্ছুক ও বিপন্নভাবেই তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার কামরাতেই প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। মনটা অতিরিক্ত বিপন্নতায় ভরা।

সুলোচনা নীলিমার আপাদমস্তক বার দুই চোখ বুলাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কথা কহিলেন; বলিলেন, "তবে যে শুনেছিলুম, তুমি ম'রে গেছ?"

নীলিমা চিরদিনের অভ্যাসমত এই গম্ভীরপ্রকৃতি শিক্ষয়িত্রীকে ভীতিদৃষ্টি প্রেরণ করিল, মুখে তাহার কথা সরিতেছিল না; স্কুলে থাকিতেও সে কখনও ইঁহার সহিত

বেশী কথা কহে নাই। এমন কি, পাওনা টাকার তাগিদের ভয়ে বরং তাঁহাকে দেখিলেই তাহার হৃৎকম্প হইত।

সুলোচনা পুনশ্চ বলিলেন, "দোষ তোমার বাবারই, কিন্তু তার ফলে তুমি আর যা হোক করলেই পারতে, এটা ভাল হয় নি।"

এতক্ষণে নীলিমা তাঁহার তিরস্কারের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল, এবং তাহা পারিয়া তাহার মনের সমস্ত সঙ্কোচকে কাটিয়া দিয়া তাহার অন্তরের সতীতেজ তাহাকে দীপ্ত করিয়া তুলিল, সে তখন একটু যেন সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল ও অকুণ্ঠস্বরে সহজভাবে তাঁহাকে বলিল, "কোন্‌টা ভাল হয়নি, সুলোচনাদি'? মা ম'রে যাওয়াতে বাপের কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না জেনে শ্মশান থেকেই আমি নদীর ধারে ধারে চ'লে চ'লে ক'দিন পরে আধমরা অবস্থায় * * এর মিশন কুটীর-কাছে পৌঁছে সেইখানে মাঠের মধ্যে প'ড়ে ছিলেম। তারা নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে আমায় খৃষ্টান করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আমি মোটে টেঁকতে পারছিনে, তাই আমি আজ সেথান থেকে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতুম বলুন?"

সুলোচনা আবার চশমার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, "তুমি খৃষ্টান?"

"হ্যাঁ, হয়েছিলুম, এই দেখুন না" বলিয়া সে তাহার পুঁটলী খুলিয়া একটা কাল রং-করা কাঠের ছোট্ট ক্রশ ও একখানা বাইবেল বাহির করিয়া তাঁহাকে সেই দুইটি জিনিষ দেখাইল।

সুলোচনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখ পেলে না?"

নীলিমা ম্লানমুখে মাথা নাড়িল, "না।"

"কোথায় যাচ্চো? বাপের কাছে কি?"

নীলিমা এই প্রশ্নে শিহরিয়া উঠিল। বাপের কাছে? হাঁ, সেটা তাহার যাইবার মত স্থানই বটে! যমের দুয়ারেও তাহা হইলে পৌঁছানটা সহজ হয়। কিন্তু প্রাণের উপরকার মমতাটাও যে সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না, সেখানে নয়। কলকাতার টিকিট নিয়েছি।"

"সেখানে কি কেউ আছেন?"

নীলিমার মুখ শুকাইয়া ছোট্ট হইয়া গেল, বিপন্নভাবে সে নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ছাড়া ছাড়া ভাবে উত্তরে কহিল, "কেউ না, শুধু কোথায়ই বা যাব, তাই জন্যেই নিলুম। শুনেছি, সেখানে না কি অনেক উপায় আছে। স্কুল আছে, বোর্ডিং আছে, কিছু না কিছু উপায় হয় ত হয়ে যেতে পাবে।"

সুলোচনা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর একটা ছোট্ট রকম শ্বাস মোচন পূর্ব্বক স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "তোমার বাবা যে দিন তোমায় আমাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন, আমার মনে তোমার জন্য কষ্ট হয়েছিল। যা হোক, তুমি আসতে চাও ত আমার কাছে আসতে পার। ইচ্ছা হ'লে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করতে পার, আর সেই সঙ্গে ইনফ্যাণ্টক্লাসটায়ও পড়াতে পার। আর কিছু পড়াশুনা করেছিলে কি?"

এই অপ্রত্যাশিত বন্ধুলাভে নীলিমার দলিত হৃদয় যেন সকৃতজ্ঞ হর্ষোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার চোখের কোণ ছাপাইয়া পড়া জলের ধারাকে রোধ করিতে চাহিয়া জোর করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আমি ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, এমন কি, একটু একটু ল্যাটিন পর্য্যন্ত শিখেছি। আমায় আপনি স্থান দেন ত আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনার কাছে,—কিন্তু আমার বাবা যদি আমায় সেখান থেকে ধ'রে আনেন, আর আপনাকেও যদি আমার জন্য অপমান ক'রে বসেন—"

সুলোচনা তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন, বলিলেন, "তুমি হয় ত জান না, তোমার বাবা এখন মৃত্যুশয্যায়, ঝড়-বৃষ্টিতে পুরান বাড়ীর একটা দিক ভেঙ্গে পড়ছিল, তারই মধ্য থেকে লোহার সিন্দুক টেনে আনতে গিয়ে একটা মোটা কড়িকাঠ ভেঙ্গে প'ড়ে তাঁহার মাথা ফেটে গেছে। তিনি এখন হাঁসপাতালে, পরশু আমি এসেছি, সে দিনও তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।"

নীলিমা এই সংবাদে অল্পকাল স্থির স্তব্ধ হইয়া রহিল, সে যে এ খবরে খুসী হইল অথবা দুঃখিত হইল, সে কথাটাও সে যেন কয়েক মুহূর্ত্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া

উঠিতে পারিল না। তাহার পর তাহার মনের মধ্যে কিসের যেন একটা দুরন্ত তৃষ্ণা দেখা দিয়াছে বলিয়াই সে সহসা অনুভব করিল। সেটা যেন সেই চির-অত্যাচারী, নির্ম্মমপ্রকৃতি পিতার প্রতি সমবেদনা, ও তাঁহাকে একবার শেষ দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বলিয়াই তাহার আর বুঝিতেও বাকী থাকিল না। আর এই অভিনব আবিষ্কারে যেন বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া রহিল এবং তাহার পরই কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা অশ্রুগাঢ় সজল স্বরে কহিয়া উঠিল, "যাই হউক, যাই করুন, তবুও ত তিনি আমার বাপ, আমি আগে একবার তাঁরই কাছে যাব সুলোচনাদি! তার পর যদি যায়গা দেন, তবে আপনার পায়ের তলায় সেই আপনার মত পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেবো। আমার এ জন্মটায় আর ত আমার কিছুই করবারও নেই। কিন্তু একটি কথা সুলোচনাদি'! আমি যে খৃষ্টান হয়েছিলুম, এ কথা যদি সম্ভব হয়, তবে আমি তা ভুলতে চাই, আপনিও দয়া ক'রে আমায় তাতে একটুখানি সাহায্য করুন। আপনি এ কথা কারও কাছে বলবেন না, আমিও বলব না। আমি ত আর গৃহস্থ সংসারে ঢুকতে যাচ্চিনে যে এতে আমার পাপ হবে? সমাজের ও সংসারের বাইরে থেকেই ত আমি আমার এ জীবনটা কাটাতে চাই। এতে আর কার ক্ষতি হবে? আমি হিন্দু; কায়মনে আচার-নিষ্ঠায় আমি হিন্দু হয়েই থাকব, আপনি সে সুযোগ আমায় দিতে পারবেন না কি? বলুন, তবেই আমি যাব।"

সুলোচনা কথায় ইহার জবাব না দিয়া শুধু নীলিমার মাথার উপর নিজের দক্ষিণ হস্তখানি রক্ষা করিলেন।

তখন সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্তা ও আশান্বিতা হইয়া উঠিয়া নীলিমা তাহার সেই কালো রংএর ক্রশ ও কাল চামড়া-বাঁধা বাইবেলখানা তুলিয়া লইয়া জানালার মধ্য দিয়া তৃণাস্তৃত মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিল। গাড়ী তখন রীতিমত ছুটিয়া চলিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

নিবেদন

সরোবর যদি কর মোরে কভু—
কমল হইয়া আসিও,
বক্ষে আমার ফুটিও গো সখা,
চির-শূন্যতা নাশিও।
জলধর যদি কর মোরে কভু,
এস গো সাজিয়া বিজলী,
গভীর বিষাদ হাস্য হইবে
আঁধার আস্য উজলি।
বীণা যদি কভু কর মোরে, সখা!
এস রাগিণীর সাজে,
(যেন) অঙ্গ শিহরি প্রতি তারে তারে
তব প্রিয় নাম বাজে।
শ্যামল কুঞ্জ কর যদি কভু,
পিকবর সাজি আসিও,
কুহু কু কূজনে তুলিয়া লহরী
চিত্ত হরষে ভরিও।

তৃণের জীবন দাও যদি কভু—
প্রভাতে শিশির সাজিও,
উজল কিরীট রতন হইয়া
মাথে মম তুমি রাজিও।
(যদি) তৃষাতুর মোরে চাতক কর গো,
আসিও সাজিয়া বারি,
প্রেম-বারি দিয়া মিটায়ো গো তৃষা
প্রেমময় তৃষাহারী।
মরু প্রান্তর কর যদি মোরে,
সাজিও নদীর সাজে,
লক্ষ বাহুর বন্ধনে দিও
সরসতা মম মাঝে।
(যদি) সাগর-জীবন দাও কভু সখা!
এস তরঙ্গ হয়ে,
আমার মাঝারে তোমার প্রকাশ
যায় যেন চির রয়ে।

শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী।

কৃত্রিম রেশম

বাজারে যখন কোন জিনিষের মূল্য অথবা চাহিদা অধিক হয়, তখনই উক্ত দ্রব্যের অনুকরণ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। অনেক সময় নকল ঠিক আসলের মত হয় না, সেই জন্য আসলের কাটতি কমিয়া গেলেও উহার একবারে উচ্ছেদ সাধিত হয় না। কিন্তু যে স্থানে নকল ও আসল দ্বারা প্রায় সমান কার্য্য হয়, সেরূপ স্থলে অধিক মূল্যবান্ আসলের স্থান সুলভ নকল সহজেই অধিকার করিয়া লয়। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতির সহিত এমন অনেক সংগঠনমূলক দ্রব্য (Synthetic products) প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বভাবজ দ্রব্য ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। নীল ও অন্যান্য রং, চিনি, গন্ধদ্রব্য, রবার, কর্পূর, চামড়া ইত্যাদি ইহার উদাহরণস্থল। সম্প্রতি এই শ্রেণীর আর একটি শিল্পের দ্রুতগতি পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে—উহা কৃত্রিম রেশম। ভারত জগতের মধ্যে বহুকাল হইতেই রেশম উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং কৃত্রিম রেশমের বাজারে প্রবর্ত্তনের ফলাফল ভারতের রেশম-ব্যবসায়ের উপরে যে সত্বরে অথবা বিলম্বে প্রতিভাত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

আবিষ্কারের সূত্রপাত

আজকাল কৃত্রিম রেশম বাণিজ্য-জগতের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর পরিচিত হইলেও ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কল্পনা বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ফ্রান্সই এই রেশমের জন্মভূমি। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক Reaumar তাঁহার কীটসম্বন্ধীয় পুস্তকে মত প্রকাশ করেন যে, কৃত্রিম উপায়ে রেশম প্রস্তুত করা সম্ভবপর; এমন কি, বর্ত্তমান সময়ে যে প্রথায় কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতেছে, তাহারও কতকটা পূর্ব্বাভাস তিনি সে সময়ে দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পর বার্থেলো (Berthelot) প্রমুখ কতিপয় মনীষী পরীক্ষাগারে নকল রেশম তৈয়ারী করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে Chardonnet নামক ফরাসী শিল্পীই এই কার্য্যে বাস্তবিক সফলতা লাভ করেন। প্রথম কৃত্রিম রেশম-বস্ত্র, ব্যবসায়িক হিসাবে তাঁহার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। নূতন প্রচারের অবস্থায় লোক ইহাকে কৌতূহলের দৃষ্টিতেই দেখিত এবং ইহার ভবিষ্যতের উপর আস্থাবান্ ছিল না। কিন্তু কতকটা স্বকীয় উৎকর্ষতায় এবং কতকটা অনুকূল অবস্থার সহায়তায় কৃত্রিম রেশম অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিস্ময়কর ব্যাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কৃত্রিম রেশম-ব্যবসায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে কিয়ৎপরিমাণে কৃত্রিম রেশম উৎপাদিত হইতেছিল। তৎপরে অন্যান্য দেশেও ইহার কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ইহার দ্রুত উন্নতি চলিতেছে। ১০ বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর রেশম উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত জগতে উৎপাদিত কৃত্রিম রেশম সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত অঙ্কাদি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে:—

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মোট উৎপাদিত কৃত্রিম রেশম ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড
১৯২৪ „ „ „ „ „ ১২ কোটি „
১৯২৫ „ „ „ „ অনুমিত ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ „

বিগত কয়েক বৎসরে স্বভাবজ রেশম উৎপাদনের মাত্রা যদি হ্রাস না পাইত এবং অপরাপর দ্রব্যের ন্যায় রেশমের মূল্যও যদি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া না যাইত, তাহা হইলে কৃত্রিম রেশম-ব্যবসায়ের পরিসরবৃদ্ধির বোধ হয় এতটা সুবিধা হইত না। সে যাহা হউক, আপাততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্যপ্রধান দেশেই কৃত্রিম রেশম

প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে ; এই প্রকার দেশের মধ্যে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইজরলণ্ড, ইতালী, জর্ম্মণী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই অন্যতম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফ্রান্সেই কৃত্রিম রেশমের প্রথম সৃষ্টি। এক্ষণে ফ্রান্সে অন্যূন ৫০টি কৃত্রিম রেশমের কল হইয়াছে ; Lyons সহরই এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র, কিন্তু সমস্ত প্রধান কারখানার কার্য্যালয় রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত। ফ্রান্সে কৃত্রিম রেশমজাত সৌখীন ও অন্যান্য প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের মাত্রা এত অধিক যে, দেশে প্রস্তুত রেশম অতি সামান্য পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হয় ; বরং বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণ রেশম প্রতি বৎসর আমদানী করা হয়। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইদানীন্তন ফ্রান্সে স্বভাবজ রেশম অপেক্ষাও কৃত্রিম রেশম অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। বেলজিয়মের রেশম-কারখানাসমূহের ফ্রান্সের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অনেক স্থলে তত্ত্বাবধানের প্রধান আফিস ফ্রান্সে অবস্থিত। সুইজরলণ্ডে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন বিশেষ পুরাতন না হইলেও এ স্থলে উৎপাদিত রেশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এই শ্রেণীর রেশম প্রস্তুত করার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত দেশে মজুরী অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। ইতালীতে কৃত্রিম রেশমের কায অল্পসময়ের মধ্যে সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেশে ছোট বড় ১২টি রেশমের কারখানা আছে এবং তৎসমুদয়ে প্রত্যহ প্রায় ২৫ টন রেশম প্রস্তুত হয়। কারখানাগুলি নানা স্থানে স্থাপিত হইলেও ব্যবসায়ের কেন্দ্র টুরিস্ সহরে। কৃত্রিম রেশম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত কোম্পানী সমূহ যেরূপ ভাবে কলকারখানাদি বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, ইতালী শীঘ্রই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এই শিল্পে ছাড়াইয়া উঠিবে।

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগতে উৎপাদিত কৃত্রিম রেশমের প্রায় একপঞ্চমাংশ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইত ; এখন উক্তরূপ অনুপাত কমিয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ডকে দেশীয় বস্ত্রশিল্পাদির জন্য ইতালী হইতে অনেক পরিমাণে রেশম আমদানী করিতে হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কৃত্রিম রেশম উৎপাদিত হইত না ; কিন্তু উক্ত বৎসরে কারখানা স্থাপিত হইয়া ৭ শত টন রেশম উৎপাদিত হয় ; ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ হাজার ৫ শত টনে দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মণীর কৃত্রিম রেশম-ব্যবসায় খুবই উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে। তথায় উৎপাদনের মাত্রা ইতালী অপেক্ষাও অধিক। ইতালী কারখানার স্বল্পতার জন্য যে সমুদয় চাহিদা সরবরাহ করিতে পারিতেছে না, তৎসমুদয় জর্ম্মণীর হস্তগত হইতেছে। এই কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশ ব্যতীত প্রতীচ্যে আরও দুই একটি স্থানে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্যে এই শিল্পপ্রবর্ত্তনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

কৃত্রিম রেশমের সুবিধা

স্বভাবজ রেশম পূর্ব্বে কেবলমাত্র ধনবান্ ব্যক্তিগণেরই ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য ছিল। কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠায় অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক কালে রেশমজাত বস্ত্রাদির মূল্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ হওয়ায় মধ্যবিত্ত লোকরাও তাঁহাদের সখ চরিতার্থ করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে ছোট বড় সকলেই সুদৃশ্য চাক্‌চিক্যশালী বস্ত্রাদি পরিধান করিতে চায়, অথচ অর্থসঙ্কট যথেষ্ট। এরূপ অবস্থায় কৃত্রিম রেশমের ন্যায় সুলভ ও চিত্তবিনোদক দ্রব্যের যে সমধিক আদর হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আপাতঃ-দৃষ্টিতে কৃত্রিম রেশম কোন অংশে স্বভাবজ রেশম অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয় না,—যদিও আসল রেশমের স্থিতিস্থাপকতা, দীর্ঘস্থায়িতা এবং টান-সহিষ্ণুতা ইহাতে নাই। অধিকন্তু আসল রেশম দ্বারা সকল প্রকারের বস্ত্র বয়ন করা যায় না ; কিন্তু নকল রেশম দ্বারা অমিশ্র অথবা মিশ্রভাবে সামান্য ফিতা হইতে আরম্ভ করিয়া জামা, গেঞ্জি, মোজা ও গাউনের কাপড়, সাটিন প্রভৃতি সকল রকম বস্ত্রই প্রস্তুত করা চলে। যে কোন প্রকার তন্তুর সহিত ইহাকে 'খাপ' খাওয়াইতে পারা যায়। সেই জন্যই বস্ত্র-কলওয়ালাগণ ইহাকে এতটা পছন্দ করেন। অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য সমস্ত তন্তুর দাম যে পরিমাণ বাড়িয়াছে, কৃত্রিম রেশমের তদ্রূপ বাড়ে নাই। কৃত্রিম রেশমজাত বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবসায়িগণের সেই

কারণে অধিক লাভ আছে। এতদ্ভিন্ন বিলাতী বিলাসিনী-গণের কৃত্রিম রেশমের উপর অনুরাগের হেতু এই যে, তাঁহাদের দেশে 'ফ্যাসন্' অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বদলাইয়া যায়; প্রত্যেকবার নূতন ফ্যাসনের কাপড়-চোপড় আসল রেশম দিয়া প্রস্তুত করাইতে অনেক খরচ পড়ে; কিন্তু কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করিলে সেরূপ খরচ কতক পরিমাণে কমিয়া যায়।

উৎপাদন-প্রণালী

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত প্রণালীতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদিত হয়, তন্মধ্যে চারিটি প্রধান; প্রযুক্ত উপাদানের নামের হিসাবে উহাদিগকে (১) Cellulose acetate, (২) Copper ammoniate, (৩) Nitro-cellulose এবং (৪) Viscose process বলা হয়। বিভিন্ন প্রণালীর বিশেষত্ববর্ণনার পূর্ব্বে একটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়। তাহা এই যে, যে কোন প্রণালীতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হউক না কেন, উহার আদি উপাদান Cellulose। এই সেলুলোজই আবার সর্ব্বপ্রকার তন্তুর ভিত্তি। ইহা তূলা, শণ, পাট, ঘাস, বিচালী ও কাষ্ঠপিণ্ড ইত্যাদি হইতে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য গৃহীত হয়, কিন্তু উদ্ভিদ্‌কোষের ইহা কঙ্কাল-স্বরূপ। রেশম উৎপাদনের জন্য সেলুলোজকে কোন প্রকার দ্রাবণে গলাইয়া লওয়া হয়। এই সময় দেখা দরকার যে, গলিত সেলুলোজের সহিত কোন প্রকার ময়লা অথবা অদ্রবীভূত পদার্থ না থাকে। দ্রব সেলুলোজ অল্পবিস্তর চট্‌চটে। অতঃপর দ্রব ও সুপরিষ্কৃত সেলুলোজকে একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের মধ্যে রাখিয়া বায়ুর চাপ দেওয়া হয়, তখন পিচকারীর নল-নিঃসৃত ধারার ন্যায় সেলুলোজ বাহির হইতে থাকে। অবশ্য, ছিদ্রের ব্যাসের হিসাবে ধারা (সূত্র) সরু বা মোটা হইয়া থাকে। প্রযুক্ত প্রণালী অনুসারে এই ধারা কোন বিশেষ প্রকারের তরল পদার্থের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয় এবং উক্ত তরল পদার্থের সংযোগে আসিলে ধারা সূত্র হইয়া জমিয়া যায়। তখন ২.৩টি সূক্ষ্ম সূত্র একত্র করিয়া প্রয়োজনমত মোটা সূত্র পাকাইয়া লওয়া হয়। পরে এই প্রকার পাকান সূত্র পরিষ্কৃত জল অথবা কোন রাসায়নিক পদার্থের দ্রাবণে ধুইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ধুইবার পর সূত্রকে কাচের অথবা রবারের নলের উপর এরূপ ভাবে গুটান হয় যে, সূতার উপর পুরা টান থাকে। যখন সূতা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায়, তখন উহার সহিত স্বভাবজ রেশম-সূত্রের পার্থক্য সহজে ধরা যায় না। সকল প্রণালীতেই সূত্র প্রস্তুতের নিয়ম একরূপ, কিন্তু সেলুলোজ দ্রব করিবার ও জমাইবার প্রথা বিভিন্ন।

সেলুলোজ এসিটেট্ প্রণালী :—ইহা একটি নবাবিষ্কৃত প্রথা; ইহাতে Acetic acid, Acetic anhydride ও Sulphuric এর মিশ্রণে সেলুলোজ দ্রব করা হয়; জল মিশাইয়া দিলেই Cellulose acetate চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত হয়। এই চূর্ণ উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া পুনরায় Ethyl acetate, acetone ইত্যাদিতে দ্রব করিয়া সূত্রকাটা যন্ত্রের (spinarette) ভিতর দিয়া সুরাসারের মধ্যে চালাইয়া সূত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। এসেটিক এসিডের পরিবর্ত্তে ফরমিক্ এসিড ব্যবহার করিলে খরচ কিছু কম হয় বটে, কিন্তু উভয় উপাদানই সুলভ নহে। এই প্রথায় উৎপাদিত সূত্রের গুণ এই যে, ইহা অল্পবিস্তর মাত্রায় অদাহ্য। অধিকন্তু এসেটিক এসিডে সেলুলোজ শীঘ্র গলিয়া যায় বলিয়া সূত্র প্রস্তুতের সময় অনেক সংক্ষেপ হয়। তাহা হইলেও ব্যয়-বাহুল্যের জন্য এই প্রণালীর চলন খুব বেশী নহে।

তাম্র-এমোনিয়েট প্রণালী :—মূল দ্রাবণ তৈয়ারী করিবার জন্য একটি মুখবদ্ধ পাত্রে তামার পাতের টুক্‌রা ও এমোনিয়া একত্র করিয়া ফুটান হয়। মধ্যে মধ্যে পাম্প করিয়া ইহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিলে, তামা একবারে গলিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ন্যায় এই প্রণালীর প্রয়োগও সীমাবদ্ধ।

নাইট্রো-সেলুলোজ প্রণালী :—কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের ইহা একটি পুরাতন প্রথা, ইহাতে কলোডিয়ম নামক নাইট্রিক এসিডে তূলার দ্রাবণকে সূতাকাটা যন্ত্রের মধ্যে পুরিয়া, চাপ দিয়া, শীতল জলের মধ্যে চালাইয়া, সূতা জমাইয়া লওয়া হয়। ইহা কিন্তু সহজ-দাহ্য, সেই জন্য ক্ষারক্রিয়াযুক্ত hydro-sulphides এর দ্রাবণের মধ্যে সূতা জমাইয়া ইহার দহনশক্তি হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে

কয়েকটি প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের কতিপয় কারখানায় নাইট্রো সেলুলোজ প্রথা প্রচলিত আছে।

ডিস্কোজ্ প্রণালী:—এই প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সাধারণ। ইহাতে প্রথমে সেলুলোজকে কষ্টিক সোডার সহিত মিশ্রিত ও চূর্ণ করিয়া লওয়ার পর একটি ঘূর্ণ্যমান ষট্‌কোণযুক্ত পাত্রে কার্ব্বন ডাইসল্‌ফাইডের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ রাখা হয়। তৎপরে কার্ব্বন ডাইসল্‌ফাইড বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আবার কষ্টিক সোডা দ্রাবণ প্রয়োগ করিলে সেলুলোজ এক প্রকার ঘন আঠাবৎ পদার্থে পরিণত হয়। এই আঠাবৎ দ্রব্য হইতেই সূত্র তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। যে দ্রাবণে সূত্র জমান হয়, তাহা ক্ষার অথবা অম্ল ক্রিয়াযুক্ত হইতে পারে। সূত্র প্রস্তুতের পর বিশেষ প্রকার দ্রাবণে ধৌত করিয়া যথাসম্ভব সল্‌ফাইডসমূহ অপসৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রণালী যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সহিত প্রয়োগ করিতে না পারিলে সূত্র বাহির করিবার পূর্ব্বেই উপাদান জমিয়া কঠিন হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তখন উহা ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয়বার কষ্টিক সোডা দিয়া সেলুলোজকে তরল ও ঘন করিবার সময় ৪১. ডিগ্রী ফারেনহিটের উপর তাপ হওয়া উচিত নহে। এই স্থানে অনবধানতা হইলে উক্তরূপে জমিয়া যাওয়ার ভয় আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা কারখানায় ডিস্কোজ প্রণালী অবলম্বিত হইলেও জমাইবার ও ধোয়ার দ্রাবণ প্রস্তুতে প্রত্যেক কারখানারই কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে।

কৃত্রিম রেশমের ভবিষ্যৎ

যদিও প্রতীচ্যের কোন কোন ব্যবসায়ী এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন যে, কৃত্রিম রেশম হইতে স্বভাবজ রেশমের কোন ভয় নাই এবং যদি থাকে, তাহা হইলে তসর, এণ্ডি, মুগা, পশম প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেশমেরই আছে; তুঁত রেশমের সহিত কৃত্রিম রেশম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, তথাপি এরূপ আশ্বাসের উপর কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। তুঁত রেশম উৎপাদনে যথেষ্ট পরিশ্রম আছে; তুঁতপোকারও রোগ অনেক এবং শুধু তুঁতচাষের উপর নির্ভর করিয়া কৃষক থাকিতে পারে না। এই সমুদয় কারণে ভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা যে রেশম উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে রেশমের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের দর যে বিশেষ কমিবে, তাহা বোধ হয় না। সুতরাং মূল্যাধিক্যই আসল রেশমের ব্যবহারবৃদ্ধির পথে বাধা প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম রেশমের ব্যবসায়ে এখন যাঁহারা কোটি কোটি টাকা নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তাঁহারাও বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে ধারাবাহিক গবেষণা চালাইতেছেন এবং যাহাতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত-প্রণালী আরও সরল এবং সুলভ হয়, তজ্জন্য কোন চেষ্টারই ক্রটি করিতেছেন না। খুবই সম্ভব যে, ভবিষ্যতে নকল রেশম আরও সস্তা হইবে। তখন সহজপ্রাপ্য ও অতি-সুলভ, চাকচিক্যময় নকল রেশমী বস্ত্র ফেলিয়া লোক অধিক দাম দিয়া আসল রেশমী বস্ত্র ক্রয় করিতে যাইবে না। প্রাচ্যে যে সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন এবং তাহারা দ্রব্যের উৎকর্ষ অপেক্ষা সুলভতার উপর অধিক নজর দেয়, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদেশী বণিক বিলক্ষণ জানেন। তাঁহাদের কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের মাত্রা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা উক্ত শ্রেণীর মাল পারস্য, ভারত, চীন, মালয় প্রভৃতি প্রাচ্য বাজারে কাটাইতে পারিবেন, তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছা না থাকিলেও কৃত্রিম রেশমের অবাধ আমদানীতে এই ফল হইবে যে, ভারতের ন্যায় যে সমস্ত দেশে রেশম-শিল্প আধুনিক ব্যবসায়িক প্রথায় গঠিত নহে, সে সমস্ত দেশে স্বভাবজ রেশম উৎপাদন ক্রমশঃ লোপ পাইবে। ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশে রেশম-শিল্প সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সহজে উহার ক্ষতি হওয়া সম্ভব নহে; অন্যান্য দেশের রেশম-শিল্প নষ্ট হইলে উক্ত কয়েকটি দেশই স্বভাবজ রেশম-শিল্পের যাহা কিছু সুবিধা ও লাভ থাকিবে, তাহা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় কোন সংগঠনমূলক দ্রব্য বিশেষ হানিকর বলিয়া

বোধ হয় না। উহার স্বরূপ কালক্রমে প্রকাশ পায়। যখন কৃত্রিম রং প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, তখন এমন কি, য়ুরোপেরও মঞ্জিষ্ঠা-চাষিগণ ত্রস্ত হইবার কোন কারণ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্সের ও অন্যান্য দেশের বিশাল মঞ্জিষ্ঠা-ক্ষেত্রসমূহ পরিত্যক্ত হইল এবং যে ভারত এক সময়ে পৃথিবীর রঞ্জক পদার্থ সরবরাহের অন্যতম আকর ছিল, সেই ভারতও লক্ষ টাকার আয় হইতে বঞ্চিত হইল। এখন এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমকক্ষতায় ভারতের রেশম-শিল্প রক্ষা করিতে হইলে উক্ত শিল্পে অধিক মূলধন নিয়োগ ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু ইহা ব্যতীত কৃত্রিম রেশম-শিল্পেরও এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। কারণ, অনতিকালের মধ্যেই ভারতের বাজারে প্রভূত পরিমাণে নকল রেশম আমদানী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রক্ষা-শুল্ক দ্বারা কিংবা অন্য উপায়ে তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে। সেরূপ অবস্থায় দেশমধ্যেই যাহাতে এই শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে সময়ে সচেষ্ট না হইলে বিলাতী নকল রেশম-ব্যবসায়িগণকে ভারতের অর্থশোষণ করিবার অবাধ অবসর প্রদান করা হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মিঃ জি, পি, রায়

ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতীয়দের মধ্যে এই পদে এ যাবৎ কেহ উন্নীত হয়েন নাই।

কৃত্রিম সুবর্ণ-প্রস্তুত-প্রণালী

আজকালকার জৈব রসায়নের যুগে (Age of Organic Chemistry) কত যে কৃত্রিম জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নীলের চাষের বিলোপ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নীল রঙটা (Indigo) যে কত রকমে মানুষের কত কাযে লাগে, তাহা বলা যায় না। রঞ্জন বস্তুরূপেই ইহার প্রচলন বেশী, তদ্ব্যতীত বস্ত্র পরিষ্কৃত করিতেও ইহার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিদেশীয় বণিক্‌গণের চক্ষুতে যে নীলের চাষ একদা লোলুপদৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আজ তাহা একটি পরিত্যক্ত ব্যবসায়রূপে পরিণত। ইহার কারণ কি, খুঁজিতে যাইলে বিজ্ঞানের জৈব রসায়নের (Organic Chemistry) দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। জৈব রসায়নের এই প্রবল যুগে রাসায়নিকের বীক্ষণাগারের ছোট এক টেবলের উপর ছোট কয়েকটি টেষ্ট-টিউবে (Test Tube) যে অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার নব নব আবিষ্কার স্থান পাইতেছে, তাহাই আবার ব্যবসায়ের সুবৃহৎ ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়া অনেক বড় বড় কল্-কারখানার বড় বড় ডাইনামো-বয়লারকে উল্টাইয়া দেয়! এই ক্ষেত্রে জৈব রাসায়নিককে আমরা যাদুকর বলিতে বাধ্য হই। বৈজ্ঞানিকরা যখন বীক্ষণাগারে বসিয়া কৃত্রিম উপায়ে নীলরঙের সৃষ্টি করিলেন এবং বস্তাবন্দী করিয়া সস্তাদরে বাজারে ছাড়িতে লাগিলেন, তখন বাজারে ইহাই বেশী চলতি হইয়া পড়িল। আর তখন নীলকুঠী হইতে যে নীল রঙ বস্তাবন্দী করিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হইত, তাহার দাম বৈজ্ঞানিকের নীলের দামের চারিগুণ পাঁচগুণ বেশী হইয়া ক্রেতার চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িল। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরই জয় হইল। এইরূপে বৈজ্ঞানিকরা নীলচাষের মূলে এমন নির্ম্মমভাবে কুঠারাঘাত করিলেন যে, তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনেক ভগ্নজীর্ণ নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষে আজও ছড়াইয়া আছে। এই ত গেল শুধু এক নীল রঙের কথা—নীল ছাড়াও আজকাল বৈজ্ঞানিকরা যে কত রকম রঙ কেরোসিনের (Petrolium) প্রস্তুত পদ্ধতির সময় ঘটনাক্রমে লাভ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর কৃত্রিম বা নকল রঙকে বৈজ্ঞানিকরা 'এনিলীন ডাই' (Anilyne dye) বা এনিলীন নামক জৈব পদার্থের অন্তর্গত বর্ণশ্রেণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আজকাল এই এনিলীনডাই এত রকম এবং এত নিখুঁত হইয়াছে যে, বাজারে ইহার প্রচলন অপর সকল রঙকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

শুধু বর্ণাবলী নহে, নিত্য ব্যবহার্য্য রসায়নের কত রসায়নদ্রব্য যে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার হিসাব নাই। এই সব জিনিষের অধিকাংশই একটি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রস্তুতপদ্ধতির মাঝ রাস্তায় পাওয়া যায়, অপরাপরগুলিকে বৈজ্ঞানিকরা ইচ্ছা করিয়াই তৈয়ারী করিয়া থাকেন। অন্য জিনিষের প্রস্তুত-পদ্ধতির মাঝ রাস্তায় যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাদের বৈজ্ঞানিকরা By product বা "প্রকারান্তরে প্রাপ্ত দ্রব্য" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রকারান্তরে প্রাপ্ত দ্রব্যের তালিকা রসায়নশাস্ত্রে বড় কম নাই। শুধু রসায়নশাস্ত্র নহে, বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে এইরূপ প্রকারান্তরে আবিষ্কার ব্যাপারের উদাহরণও ছড়াইয়া আছে। কোন এক বৈজ্ঞানিক একটি বিশেষ আবিষ্কারের মাঝ রাস্তায় ঘটনাক্রমে সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, এমন উদাহরণও বিজ্ঞানের পুথি উল্টাইলে পাওয়া যায়। এটা হইল কতকটা 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা'র মত ঘটনা;—একটা আবিষ্কার ত হইলই, পরন্তু মধ্যপথে আর একটা নূতন আবিষ্কারও হইয়া গেল।

বহু বৎসর আগে অর্থাৎ প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রে আল্‌কেমিষ্টদের (Alchemist.) নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিতেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় মূলপদার্থ পারদ, লবণ ও গন্ধক এই তিন মূলপদার্থ হইতে উৎপন্ন। সমস্ত পদার্থ যখন এই ত্রিবিধ পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগে সংগঠিত, তখন তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এক-দিন-না-এক-দিন তাঁহারা রসায়নের জড়ত্ব ঘুচাইয়া বীক্ষণাগারে লৌহ, পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি ইতর ধাতুকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি উত্তম ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা তখন ত ফলবতী হয়ই নাই, আজ পর্য্যন্তও সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, তাহা বলা চলে না। তবে কতকটা যে সফল হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। রসায়নের সেই আদিম যুগে রাসায়নিকরা যে দুই একটা অতি প্রচলিত রসায়ন-পরীক্ষা জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা "যাদুকর" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, আর আজ যখন রসায়নের বড় বড় পরীক্ষা ও বড় বড় আবিষ্কার বিশ্বজগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতেছে, তখন আমরা রসায়নবিদ্‌গণকে যে কি বলিয়া অভিহিত করিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। "যাদুকর" বলিলে ত নেহাৎ অল্প বলা হইল। যাদুকরের উপরেও যদি কোন আখ্যা থাকে, আমরা আজ তাহাই রসায়নবিদ্‌গণকে উপহার দিব। গত চারি শতাব্দী ধরিয়া রসায়নবিদ্‌গণ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। আজ রসায়নবিদ্‌গণ পারদ (Mercury)কে সুবর্ণে পরিণত করিয়া যে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

রসায়নবিদ্‌গণ সমস্ত ধাতব পদার্থকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যখন তাহাদের ক্ষুদ্রতম কণায় (Atomic) বিভক্ত করিলেন, সেই সময়টাই হইতেছে পরমাণুবাদ বা Atomic Theoryর প্রথম গোড়াপত্তন। পরমাণু (Atom) বলিতে আমরা ধাতব পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই পরমাণুর খেলাই হইতেছে সমগ্র রসায়নের মূল কথা। এক ধাতুর পরমাণু আর এক ধাতুর পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া যে সকল যৌগিক (Compound) পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাদের বিশ্লেষণ এখন খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

এক পরমাণুর সহিত আর এক পরমাণুর আকর্ষণ, অন্য এক পরমাণুর সহিত পৃথক্, আর একটি পরমাণুর বিপ্রকর্ষণ লইয়াই সমস্ত যৌগিকের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় নির্ভর করিতেছে। এই পরমাণুতে পরমাণুতে যে আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায়, তাহাতেই পরমাণুগণ অনবরত ছুটাছুটি করিয়া রসায়নের সৃষ্টি বজায় রাখে। তাই ক্লোরিন্ (Chlorine) নামক ধাতু-পদার্থকে জলে গুলিয়া খানিকক্ষণ সূর্য্যালোকে রাখিলে, ক্লোরিনের সমস্ত পরমাণুগুলি জলের হাইড্রোজেন্ গ্যাসের সমস্ত পরমাণুর প্রবল আকর্ষণে মিলিত হইয়া চারি পরমাণু হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড (4Hcl.) নামক একটা অম্ল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ফেলে। তখন বাকি যে দুই পরমাণু অক্সিজেন্ বাষ্প ছাড়া পায়, তাহারা বুদ্বুদ্ আকারে জল হইতে উপরে উঠিয়া হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া যায়। তখন যদি কোন বুদ্ধিমান্ এই অক্সিজেন বাষ্পকে সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে ত কথাই নাই। সুতরাং ক্লোরিন্ এবং জল হইতে আমরা হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড নামক অম্লপদার্থ ও অক্সিজেন্ নামক একটি গ্যাসকে একত্র এবং একই সময়ে লাভ করিতে পারি। ইহা পরমাণুর সহিত পরমাণুর প্রবল আকর্ষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ কত আকর্ষণের উদাহরণ যে ধাতু ও গ্যাসের পরমাণুর জীবনীতে ছড়াইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রসায়নের যে কোন একটি পাঠ্যপুস্তক খুলিলে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা দেখিতে পাইবেন।

কি উপায়ে পারদ হইতে স্বর্ণ পাওয়া যায়, জানিতে হইলে পরমাণুতত্ত্ববাদের আধুনিক সিদ্ধান্তগুলি জানা একান্ত আবশ্যক। আধুনিক সিদ্ধান্ত বলিতে আমি ইলেকট্রন্ সিদ্ধান্তের (Electron Theory)' কথাই বলিতেছি। এই সিদ্ধান্তে আমরা মূলপদার্থমাত্রেরই যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি চরম অবস্থা দেখিতে পাই, তাহাকেই রসায়নতত্ত্ববিদরা ইলেকট্রন্ (Electrons) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ইলেকট্রন্‌বাদের পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল, তাহাকে পরমাণুবাদ (Atomic Theory) বলা হইয়াছিল। এই পরমাণুবাদ এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রাচীন পরমাণুবাদ মানিয়া চলিলে ধাতুপদার্থমাত্রেরই পরমাণু বা Atom-কেই তাহার চরম গতি বলিতে ও মানিতে আমরা বাধ্য। এই চরম দশাপ্রাপ্ত মূলপদার্থের পরমাণু, মৌলিকের (Element) প্রকারভেদে বিভিন্ন ধরণের হইয়া পড়ে। হাইড্রোজেন্ নামক মৌলিক বাষ্প পদার্থের পরমাণু, অক্সিজেন্ নামক মৌলিকের পরমাণু হইতে কেবল যে ওজনে (Weight) তফাৎ, তাহা নহে, প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহারেও তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্নতা রক্ষা করিয়া চলে। সুতরাং প্রত্যেক মৌলিক, তাহার প্রকৃতিগত ও আচারগত স্বাতন্ত্র্য লইয়া অজৈব রসায়নের (Inorganic chemistry) এক এক খোপ অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত পাশের মৌলিকটির একটুও মিল থাকে না। বিভিন্ন প্রকারের গৃহপালিত পারাবতদলের ন্যায় তাহারা পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিতে অবিরত গুঞ্জন করিতে থাকে। এই মৌলিক পারাবতদলকে যখন বৈজ্ঞানিকরা একত্র এবং একই সময়ে ছাড়িয়া তাহাদের ঐক্যতান শ্রবণের দুরাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির প্রয়াস পান, তখন তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়েন তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহাদের মধ্যে ঐক্যকেই দেখা যায় না, তাহাদের লইয়া ঐক্যের তান শ্রবণ করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটা ভুল আকাঙ্ক্ষাই বলিতে হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রকারের মৌলিকদলের মধ্যে যে সামান্য ঐক্য দেখা যায়, তাহা তাহাদের পরমাণুর ওজনগত সামঞ্জস্য লইয়া। পরমাণুর ওজনের বৃদ্ধির ক্রম বা পর্য্যায় দেখিয়া বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, প্রত্যেক অষ্টম মৌলিক গুণ ও ধর্ম্মে কতকটা একতা রক্ষা করিয়া চলে। এই অষ্টম মৌলিকের ঐক্য ব্যতীত অজৈব রসায়নের মৌলিক পদার্থদলের ভিতর আর কোন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া দায়।

আধুনিক ইলেকট্রন্ সিদ্ধান্তটা হইতেছে, এই বিভিন্ন খোপে পোরা মৌলিক-পারাবতদলের মধ্যে একেবারে অমূল্য ঐক্যতানবাদ্যের সমারোহপূর্ণ পরিপাটী আয়োজন! এই ইলেকট্রনের সিদ্ধান্ত মানিলে প্রত্যেক মৌলিকপারাবতকে তাহার পাশের মৌলিকের সহিত আর পৃথক্ করিয়া রাখা যায় না। তখন সবগুলিকে একত্র এবং একই সময়ে ছাড়িয়া দিয়া যে চমৎকার এবং সুসম্পূর্ণ ঐক্যতানটি শ্রবণ করা যায়, তাহাই হইতেছে এই বিংশ শতাব্দীর রসায়নের চরমোৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। পাঠকপাঠিকাগণ! একবার এই রসায়নের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতটিকে শ্রবণ করিবেন কি? দেখিবেন কি, ঐ ইলেকট্রনের ঘূর্ণ্যচক্রের আবর্ত্তন? দেখিবেন কি, ভৈরবীর ভৈরবচক্রের ন্যায় রসায়নের এই নবতর সিদ্ধান্তের ঐক্যতানমন্ত্রে সমগ্র মৌলিকের একতা? শুনিবেন কি এই বিংশ শতাব্দীর রসায়নের নবতর সাফল্যের কথা?

এই ঐক্যতানের মূলমন্ত্র হইতেছে এই যে, মৌলিক পদার্থগুলি একটি হইতে অপরটি যতই কেন গুণ ও ধর্ম্মে বিভিন্ন হউক, তাহারা মূলে একই প্রকারের ইলেকট্রন্ নামক পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চূর্ণ হইতে সমুৎপন্ন। ঐ দেখুন, বৈজ্ঞানিকরা ওজন করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, এই ইলেকট্রনের এক একটি কণার ওজন হাইড্রোজেন্ নামক মৌলিকপদার্থের একটি পরমাণুর ওজন হইতে হাজার গুণ কম। এক পরমাণু-পরিমাণ হাইড্রোজেন এক দিকে বসাও ও এক হাজার ইলেকট্রন্ অপর দিকে চাপাও, তবেই তুলাদণ্ডের ভারদণ্ডই সোজা হইয়া থাকিবে। সুতরাং এক একটি হাইড্রোজেন্ বাষ্পের পরমাণু এক একটি ইলেকট্রন্ হইতে এক হাজার গুণ ভারী। 'ভারী' বলিতে আমি বস্তুভারকেই বুঝাইতেছি। কিন্তু এই বস্তুভার যে কত ছোট, তাহা কল্পনারও অগোচর;—হাওয়ায় ভাসা ছাড়া হাওয়ায় ইহারা উড়িয়া চলে! সুতরাং ইহাদের আটকানোও বিপদ!

ঐ দেখুন, প্রত্যেক মৌলিকের পরমাণুর মধ্যস্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া দুই প্রকারের ইলেকট্রন্ অনবরত তীব্রবেগে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এই আবর্ত্তবেগ বুঝি বা ভৈরবীর ভৈরবচক্র হইতেও অধিক। ইহাদের ঘূর্ণাবেগ আলোকের গতির বেগের সমান। আলোকের গতির বেগ (The Velocity of Light.) সেকেণ্ডে ১২ শত ফিট্। ১২ শত ফিট্ প্রায় ১ মাইলের কাছাকাছি। সুতরাং ইহাদের ঘূর্ণাবেগ ১ মাইলের কিছু কম হইবে।

এই প্রবল গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন্‌গুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের ডাক নাম ও ইহাদের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধনাত্মক বা Positive ইলেকট্রন্ যাহাদের নাম, তাহারা ঋণাত্মক বা Negative বিদ্যুৎ বহন করে এবং তদ্রূপ ঋণাত্মক বা Negative আখ্যাধারী ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক বা Positive বিদ্যুৎ বহন করিয়া থাকে। সুতরাং নামে ও গুণে এই দুই প্রকার ইলেকট্রনগুলি ঠিক উল্টা।

ইলেকট্রন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যে সকল ইলেকট্রনের ডাকনাম ঋণাত্মক বা Negative ইলেকট্রন তাহাদেরই বুঝিয়া থাকি। যে সকল ইলেকট্রনের ডাক নাম ধনাত্মক বা Positive ইলেকট্রন, তাহারা প্রোটোন্স (Protons) নামে অভিহিত হয়। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যস্থান বা Nucleus-এর চারিদিকে এই দুই প্রকার ইলেকট্রন্ অনবরত প্রবলবেগে ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছে। এই দুই প্রকার ইলেকট্রন্ মৌলিকমাত্রেরই পরমাণুতে কখনও সমসংখ্যক অবস্থায় থাকে না। সাধারণতঃ ধনাত্মক বা Positive ইলেকট্রনের সংখ্যাই ঋণাত্মক বা Negative ইলেকট্রনের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায়। মৌলিকের এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেকট্রনের

সংখ্যাই তাহার পরমাণুর (Atom) গুরুত্বের সমান হয়। এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার সমসংখ্যক আর এক জাতীয় ইলেক্‌ট্রন পরমাণুর চারিদিকে অনবরত ঘুরপাক খাইয়া পরমাণুটির ভার সমান করিয়া দেয়। যেমন এক জাতীয় ইলেক্‌ট্রন পরমাণুর অস্তিত্বের মধ্যে দেখা যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত ইলেক্‌ট্রনের নাম হইতেছে প্লানেটরি ইলেক্‌ট্রন্ (Planetary Electrons) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে সকল গ্রহ আছে, ইংরাজীতে তাহাদের প্লানেট (Planet) বা "গ্রহ" কহে। পরমাণুর মধ্যস্থান বা Neucleusএর চতুর্দ্দিকে এই অতিরিক্ত ইলেক্‌ট্রনরা ঠিক গ্রহগণের ন্যায় কক্ষপথ অবলম্বনে অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা ইহাদের নাম দিয়াছেন, গ্রহময় ইলেক্‌ট্রন্ বা Planetary Electrons. এক্ষণে ইলেক্‌ট্রনবাদের রহস্য হইতেছে এই যে, যদি আমরা কোনক্রমে একটি পরমাণুর ওজন (weight) কমাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ঐ পরমাণুকে অপর আর এক শ্রেণীর পরমাণুতে পরিণত করা সম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, সব ইলেক্‌ট্রনই যখন সমান, তখন বিভিন্ন মৌলিকের পরমাণুর বিভিন্নতা, একমাত্র তাহাদের ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার কম-বেশীর উপর নির্ভর করে। কারণ, পরমাণুর গুরুত্ব মৌলিকের অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হাইড্রোজেনের পরমাণুর গুরুত্ব যখন ১ বলি, তখন আমরা ঐ অতিরিক্ত একটিমাত্র ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রন্‌কেই নির্দ্দেশ করিয়া দিই।

ইলেক্‌ট্রন্‌তত্ত্ব মানিয়া চলিলে দেখা যায় যে, পারদের এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা মাত্র ৮০। সুবর্ণের এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা তদ্রূপ ৭৯। এই স্থানে জানা আবশ্যক যে, এই অতিরিক্ত ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রনের হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদেরই সমসংখ্যক গ্রহময় বা Planetary Electron অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে। এখন যদি কোনক্রমে আমরা একটি পরমাণু হইতে এই গ্রহময় ইলেক্‌ট্রন্ কমাইয়া দিতে পারি, তবে এক মৌলিকের পরমাণু আর এক মৌলিকের পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। পারদের এই ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ৮০ এবং সুবর্ণের এইরূপ ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ৭৯; সুতরাং পারদের পরমাণু হইতে যদি একটিমাত্র প্লানেটরি ইলেক্‌ট্রন্‌কে কোনক্রমে সরাইয়া লইতে পারি, তবেই তাহা সুবর্ণের একটি পরমাণুতে পরিণত হইয়া পড়িবে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্‌ট্রনের এই বিয়োগপদ্ধতিতেই পারদ হইতে সুবর্ণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যাপারটা হঠাৎ শুনিতে খুবই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইলেক্‌ট্রনবাদের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা খুবই সোজা ব্যাপার। ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা লইলে, বাকিটা যে ৫ টাকার একখানি নোটের সহিত সমান হয়, ইহা যেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, পারদের ৮০ সংখ্যক প্লানেটরি ইলেক্‌ট্রন্ হইতে একটি ইলেক্‌ট্রন্ কাড়িয়া লইলে তাহার সুবর্ণপ্রাপ্তির কথাটাও তেমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। তবে কথা হইতেছে যে, রসায়নবিদ্‌গণ যে জটিল উপায়ে ইলেক্‌ট্রনের এই বিয়োগপদ্ধতি পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাহা এত শ্রম ও অর্থসাপেক্ষ যে, তাহাতে বীক্ষণাগারে সুবর্ণ প্রস্তুত করা অপেক্ষা আফ্রিকার সোনার খনিতে সুবর্ণখনন ব্যাপার আর্থিক হিসাবে শতগুণে শ্রেয়ঃ ও লাভজনক। জৈব রসায়ন বা Organic chemistryতে কৃত্রিম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রসায়নবিদ্‌গণ আর সব ব্যবসায়েরই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু এই সুবর্ণের ক্ষেত্রে তাহা আজ পর্য্যন্ত সুবিধা বা লাভজনক হইয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে ইহা যে একটি পরম লাভজনক ব্যবসায় হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কি উপায়ে এক মৌলিকের পরমাণু হইতে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা কমাইয়া তাহাই আবার অপর মৌলিকের পরমাণুতে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বিশদভাবে পরে প্রবন্ধে আলোচনা করিব। পাঠকপাঠিকাগণ জানিয়া রাখুন যে, কোয়ার্টজ (Quartz) নামক একপ্রকার স্বচ্ছ এবং ভঙ্গুর কাচজাতীয় পদার্থের পাত্রের ভিতর প্রথমে পারদকে বাষ্পাবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহার পর এই পারদ-বাষ্পাবদ্ধ পাত্রের দুই প্রান্তে বিদ্যুৎবহনকারী তারের দুই প্রান্ত রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে ঐ স্বচ্ছ পাত্রের গায়ে সুবর্ণ চূর্ণাকারে জমিতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, ইহা পারদের বাষ্প হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পদ্ধতি-অনুসরণেই আজকাল রাসায়নিকেরা পারদ বা পারা (Mercury) হইতে সোনা (Gold) প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যাপারটি শুনিতে খুবই সোজা, কিন্তু রসায়নের ক্ষেত্রে এমন দুরূহ ও অর্থসাপেক্ষ রসায়নক্রিয়া কচিৎ দৃষ্ট হয়। পদ্ধতিটি স্বল্প শ্রমসাপেক্ষ ও স্বল্প অর্থসাপেক্ষ হইলে আজ পৃথিবী তোলপাড় হইয়া যাইত। নীলকুঠীর মালিকদের ন্যায় সোনার খনির মালিকদেরও আজ চাঞ্চল্য দেখা যাইত। কিন্তু পদ্ধতিটি বড়ই অর্থ-সাপেক্ষ ও পরিশ্রমলব্ধ। তাই আজ কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিয়া রসায়নবিদ্‌গণ সমগ্র বিশ্বজগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সুবর্ণ-ব্যবসায়ীদের আজও চমৎকৃত করিতে পারেন নাই।

ধন্য এই ২০ শতাব্দী—যে সময় কৃত্রিম সোনাও বীক্ষণাগারে সৃষ্ট হইয়া উঠিল। ধন্য এই ইলেক্‌ট্রনের ঘূর্ণাচক্রের আবর্ত্তন—ভৈরবীর ভৈরবচক্রের ন্যায় এই আবর্ত্তনের চক্রে পড়িয়া পারদের ন্যায় ইতর ধাতুও সুবর্ণের ন্যায় দ্বিজোত্তম ধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল! ধন্য এই রসায়নের জয়মন্ত্র—যে মন্ত্রে আজ গত চারি-শতাব্দী উদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে রসায়নবিদ্‌গণকে লোক "যাদুকর" নামে আখ্যা দিত, আজ সত্য সত্যই সেই রসায়নবিদ্‌গণ যাদুকর ব্যতীত আর কিছুই নহেন। আল্‌কেমিষ্ট্ বা যাদুকরগণ আজ ইলেক্‌ট্রনের ভেল্কি-বাজিতে পারাকে সুবর্ণে পরিণত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা—এই ২০ শতাব্দীর মানুষেরা পরবর্ত্তী শতাব্দীর মানুষের উদ্যম ও চেষ্টার পূর্ণ সাফল্য কামনা ব্যতীত আর কি করিতে পারি? রসায়নের এই দ্রুত উন্নতির দিনে আজ সেই বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ—রাসায়নিক ও ইলেক্‌ট্রনবাদের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, সেই অমানুষিক ধীমান্, সাধক ও শ্রেষ্ঠ মানব রাদারফোর্ড (Rutherford)কে স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস্ সি।

সৃষ্টিতত্ত্ব

২

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি, পৃথিবী যখন তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইল, তখন 'নারিকেলফলাম্বুবীজং বাহ্যদেশৈরিব" পৃথিবীর উপরিভাগে একটি কঠিন আবরণ (crust) গঠিত হইল। এই কঠিন আবরণই পৃথিবীর প্রথম মৃত্তিকা-স্তর। ক্রমে পৃথিবী যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই নূতন নূতন স্তরের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এইরূপে কোটি কোটি বৎসরে ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইয়া প্রাণিগণের বাসের উপযোগী হইয়াছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এখন সমগ্র সৌরজগতের কথা কিছু বলা আবশ্যক। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাপ্‌লাস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড এককালে

সমগ্র সৌরজগতের স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। সেই বাষ্পপিণ্ড নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করিত। কালক্রমে তাপ-বিকিরণ হেতু ঐ বাষ্পপিণ্ড শীতল হইয়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন উহার আবর্ত্তনের বেগ বৃদ্ধি হওয়ায় কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির (Centrifugal force) প্রভাবে কোমল বাষ্পপিণ্ড হইতে কতকাংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া নেপচুন গ্রহে পরিণত হইল। তৎপরে এইরূপে যথাক্রমে ইউরেনাস্, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আদি বাষ্পপিণ্ডের যে অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহাই সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহাই লাপলাসের 'নীহারিকাবাদ' (Nebula theory) নামে জ্যোতিষশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন যে, একটি জ্বলন্ত বাষ্প হইতেই সূর্য্য ও সৌরজগতের গ্রহাদি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে প্রণালীতে গ্রহাদির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লাপলাস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, একই সময়ে একটি নীহারিকা বা বাষ্পরাশি হইতে সূর্য্য ও গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। একটি নীহারিকার বিভিন্ন অংশ জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি এক একটি জ্যোতিষ্কে পরিণত হইয়াছে। উহারা লাপলাসের মতানুযায়ী মূল নীহারিকা হইতে একটির পর আর একটি উৎক্ষিপ্ত হয় নাই।

বৃহস্পতি ঋষি সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে আভাস প্রদান করিয়াছেন :—

"অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বসপরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ॥" ১০।৭২।৮ ঋক্।

অদিতির দেহ হইতে আটটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ৭টি পুত্র (গ্রহ) দেবলোকে গেলেন। মার্ত্তণ্ড নামক পুত্র দূরে স্থাপিত হইলেন।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া মনে হয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে 'নীহারিকা' (Nebula) বলিয়াছেন, ঋষিরা তাহাকেই 'অদিতি' বলিয়াছেন। সেই 'অদিতি' বা আদি নীহারিকার উপাদান হইতে একই সময়ে সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, মঙ্গল, পৃথিব্যাদি ৭টি গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই অদিতির 'অষ্ট পুত্র।' এই আট পুত্রের মধ্যে ৭টি গ্রহ আকাশের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িল, আর গ্রহরাজ সূর্য্যের জন্য দূরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

বিরাট সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। সূর্য্যের আকর্ষণ-বলে ধৃত হইয়া গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্যের আলোকেই গ্রহ ও উপগ্রহ সকল আলোকিত হয়। সূর্য্যের তাপ না পাইলে পৃথিবীর উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু জীবন ধারণ করিতে পারিত না। তাই দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,—

"অয়ং দেবা নামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশংভুবা।
বি যো মমে রজসী সুক্রতুয়য়াজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে॥"
১।১৬০।৪ ঋক্।

"তিনি দেবতাগণের মধ্যে দেবতম, কর্ম্মকারগণের মধ্যে কর্ম্মতম। তিনি সর্ব্বসুখপ্রদা দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং প্রাণিগণের সুখের জন্য দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তর শঙ্কু (খোঁটা) দ্বারা ইহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।"
—রমেশবাবু

প্রাণিগণের সুখের জন্য পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল সূর্য্যের তীব্র উত্তাপ হইতে দূরে থাকিলেও গ্রহ সকল যদৃচ্ছা দূরে চলিয়া যাইতে পারে না। সূর্য্য মাধ্যাকর্ষণবলে খোঁটায় আবদ্ধ জীবের ন্যায় গ্রহদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এই সকল শ্লোক হইতে অনুমান হয় যে, প্রাচীন ঋষিগণ সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎ-উপাদান সকল প্রথমে বাষ্পাকারে অতি সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল। সেই সূক্ষ্ম উপাদান সকল ক্রমবিকাশের ফলে নৈসর্গিক নিয়মাধীনে আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কে পরিণত হইয়াছে। এক 'অদিতি' বা আদি নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবী যে উপাদানে গঠিত, সূর্য্য ও অপরাপর জ্যোতিষ্ক সকলও সেই উপাদানেই গঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চক্ষুর অগোচর দূরবর্ত্তী পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করা যায়। গেলিলিও যখন প্রথম দূরবীক্ষণ দ্বারা আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তখন অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সৌরকলঙ্ক (sunspot) চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি ও গহ্বর সকল, বৃহস্পতির চন্দ্র, শনির বলয় (ring), বুধ ও শুক্র গ্রহের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি তথ্য তিনিই আবিষ্কার করেন। গেলিলিওর পর আরও অনেক উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণ আবিষ্কার হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে বহু অভিনব তথ্য সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। লোকের জ্ঞানস্পৃহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। জ্যোতিষ্ক সকল কেবল প্রত্যক্ষ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তৃপ্তি লাভ করিলেন না। আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক কি উপাদানে গঠিত, উহারা কঠিন না তরল, না বাষ্পীয়, এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তাঁহাদের অদম্য কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু দূরবীক্ষণ সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রের (spectroscope) আবিষ্কারের পর সেই অভাব দূর হইল। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ এখন ঘরে বসিয়া কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের উপাদান সকল বলিয়া দিতে পারেন। বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জ্বলন্ত পদার্থের বর্ণচ্ছটা (spectrum) বিভিন্ন রকমের। বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কোন পদার্থের বর্ণচ্ছটা পরীক্ষা করিলে উহা কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়।

বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদিগের প্রথমেই সৌরজগতের রাজা সূর্য্যের উপাদান জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। সূর্য্যের অচিন্তনীয় উত্তাপে উহার উপাদান সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের চারিদিকে বাষ্পাকারে অবস্থিত রহিয়াছে। বহু যত্ন ও চেষ্টার পর সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যে লৌহ, সীসা, 'নিকেল্', 'কোবাল্ট', ম্যেগ্নেসিয়াম্, ক্যেল্সিয়াম্, সোডিয়াম, বেরিয়াম, হেলিয়াম, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি উপাদান বর্ত্তমান আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে নাই, এমন কোন পদার্থের অস্তিত্ব সূর্য্যমণ্ডলে পাওয়া যায় নাই। সূর্য্যের তীব্র উত্তাপের জন্য উহার অনেক উপাদান ধরা পড়িতেছে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানও সূর্য্যে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং পৃথিবী ও সূর্য্য যে একই উপাদানে গঠিত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকল যে একই উপাদানে গঠিত, এই কথা এখন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় সৌরজগৎ অতি ক্ষুদ্র। মহাসাগরের বারিরাশির তুলনায় একটি শিশির-বিন্দু যত ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ ততোধিক ক্ষুদ্র। সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক সকল একই উপাদানে গঠিত

নির্দ্ধারিত হইলেও অনন্ত আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্তই সত্য ধরিয়া লওয়া সমীচীন হইবে না। তাই জ্যোতির্বিদ্‌গণ এক একটি করিয়া আকাশের নক্ষত্রগুলি বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নক্ষত্র তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সকলও সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পাবস্থায় অবস্থিত এবং উহাদের উপাদানও নক্ষত্রের উপাদানের অনুরূপ। তখন বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত জ্যোতিষ্ক সকল একই উপাদানে গঠিত।

আকাশের জ্যোতিষ্ক সকলের যদি একই উপাদান হইয়া থাকে, তবে উহাদের ক্রমবিকাশের ধারাও একরূপই হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের পৃথিবী যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, অপরাপর জ্যোতিষ্ক সকলও সেই সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই অবস্থায় উপনীত হইবে। সুতরাং পৃথিবীর জীবন-ইতিহাস অনুসরণ করিলে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সকলেরও চরম পরিণতি বোধগম্য হইবে। পৃথিবী এককালে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পময় অবস্থায় ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর তাপ বিকিরণ করিয়া এখন উহা শীতল হইয়া গিয়াছে, এখনও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অতিশয় উত্তপ্ত রহিয়াছে। কালে এই তাপও বিলুপ্ত হইবে। চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি-গুলিও নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১৩ লক্ষ গুণ বড়; সুতরাং সূর্য্যদেহ শীতল হইতে বহু কোটি বৎসর লাগিবে। যাহার ব্যয় আছে, কিন্তু আয় নাই, তাহার 'তহবিল' যতই বড় হউক না কেন, তাহা এককালে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় তাপ বিকিরণ করিতে করিতে একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। আকাশে কোটি কোটি নির্ব্বাপিত 'মৃত' সূর্য্য লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচরণ করিতেছে। মৃত্যুই জগতের চরম পরিণতি।

আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক যে পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন পৃথিবীর কথা আর একটু আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবী শীতল হইলে উহার কঠিন আবরণ লইয়া ভূপঞ্জর (crust) গঠিত হইল এই ভূপঞ্জর ক্রমে ক্রমে গঠিত হইয়াছে এবং উহা বহু স্তরে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা এই তথ্য অবগত ছিলেন। ভূপঞ্জরের গুণানুসারে তাঁহারা ৭টি স্তর বা 'তলে' বিভক্ত করিয়াছেন।

> কৃষ্ণভৌমঞ্চ প্রথমং ভূমিভাগঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
> পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্॥ ১৪
> পীতভৌমঞ্চতুর্থন্ত পঞ্চমং শর্করাময়ম্।
> ষষ্ঠং শিলাময়ঞ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্॥ ১৫
>
> —ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অঃ।

পৃথিবীর প্রথম স্তর কৃষ্ণবর্ণ ভূভাগময়, দ্বিতীয় পাণ্ডুবর্ণ ভূমি, তৃতীয় রক্তমৃত্তিকাময়, চতুর্থ পীতভূমিবিশিষ্ট, পঞ্চম শর্করাময়, ষষ্ঠ শিলাময় এবং সপ্তম স্তর সুবর্ণময়।

পুরাণে উক্ত এই 'সপ্তপাতাল' যে ৭টি ভূ-স্তর, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। স্তরগুলি পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত। এই সকল স্তরের গুণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের বর্ণিত স্তরবিভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্তরের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। কৃষ্ণভূমিস্তর কর্দ্দম-(clay) নির্ম্মিত মনে হয়। কর্দ্দম অত্যধিক চাপে শ্লেট-পাথরে (slate) পরিণত হয়। পাণ্ডুভূমি খড়িমাটী (chalk) হওয়াই সম্ভব। অন্যত্র স্তরের বর্ণনায়—"কৃষ্ণা শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনী" উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শুক্ল স্তর খড়িমাটী ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। রক্ত মৃত্তিকা (Red sand stone) পীত স্তর উহাদেরই মাঝামাঝি এক রকম মৃত্তিকা হইবে। শর্করা যে বালি, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ষষ্ঠ স্তর একপ্রকার কঠিন প্রস্তরময় মৃত্তিকা এবং সপ্তম স্তরের বর্ণ সোনার বর্ণের ন্যায়। ভূগর্ভস্থ ভীষণ উত্তাপে সর্ব্বনিম্ন স্তর দগ্ধ হইয়া সোনার ন্যায় বর্ণ ধারণ করাই সম্ভব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন, ভূ-স্তর মাত্র ৫০ মাইল স্থূল। ইহার পর আর কোন কঠিন পদার্থ নাই। ৫০ মাইল নিম্নে ধাতু ও প্রস্তরাদি ভূগর্ভের ভীষণ তাপে গলিয়া তরল অবস্থায় আছে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮ হাজার মাইল। আর উহার ভূ-স্তরের পরিমাণ মাত্র ৫০ মাইল। অর্থাৎ ভূ-স্তর পৃথিবীর ব্যাসের ১৬০।১ ভাগ মাত্র। একটি নারিকেলের আয়তনের তুলনায় উহার খোসাটি যত পুরু, পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় উহার স্তরের সমষ্টি তাহার অপেক্ষাও ত কম পুরু হইবে। সুতরাং আর্য্য ঋষিরা যে পৃথিবীকে নারিকেলফলের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে ঠিক হইয়াছে।

পৃথিবীতে জীবোৎপত্তি ও জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাও আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করিতেছে। জলেই প্রথম জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করিতেছেন। তাহার পর পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিভিন্ন ভূ-স্তরের প্রাপ্ত জীবকঙ্কাল পর্য্যালোচনা করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে মৎস্যাদির আবির্ভাব হয় (Age of fishes), তৎপরে সরীসৃপযুগ (Age of Reptiles), তৎপর স্তন্যপায়ী জীবের যুগ (Age of mammels), সর্ব্বশেষ মানব-যুগ (Age of man)। হিন্দু ঋষিরা আরও একটি সূক্ষ্মতর বিভাগ করিয়াছেন। ভগবান্ জীব সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই হিন্দুরা বলেন, ভগবান্‌ই জীবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জীবের আবির্ভাবকেই ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে। প্রথমে মৎস্য অবতার, তৎপর কূর্ম্ম, তাহার পর স্তন্যপায়ী বরাহ অবতার। তাহার পর অর্দ্ধ-মানব ও অর্দ্ধ-পশুরূপী জীব নৃসিংহ বা নরসিংহ। তাহার পর খর্ব্বাকৃতি পূর্ণমানব বামন। তাহার পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতর মানবের আবির্ভাব হইল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দিক্

সবে বলে দশ দিক্, আমি বলি দুই;
দুটি ছাড়া বেশী দিক্ খুঁজে পাই কই?
জন্ম মৃত্যু জীবনের এই দিক্ দুটি;
তাড়াতাড়ি কায সার হ'ল বুঝি ছুটী।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সরকার

নীরব ভেরীর রব

"আহা আহা হায় হায়", কানে নাহি শোনা যায়,
বঙ্গের যুবক-বুকে কম্পন কোথায়।
কচি আম ক'ড়ে ক'ড়ে, বাজারে বিকায় ফ'ড়ে,
তালগাছ পড়ে ঝড়ে শুনিতে কে চায়॥

আশ্বিনে আনন্দ-রোল, তখন বেজেছে ঢোল,
ফেঁসে গেল ভাঙ্গা ঢোল পণ্ড গণ্ডগোল।
চড়কে গাজন চোস্তে, বাণ-ফোঁড়া সুরু হোত্তে,
ঝাঁকেতে ঢাকেতে সাড়া পাড়া ডামা-ডোল॥

জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি মিষ্টতর, কার্ত্তিকে বাড়ায় জ্বর,
অকালে বাদলে বল কে করে আদর।
পোষের পোষাক শাল, গ্রীষ্মে বস্তাবন্দি মাল,
বৈশাখে সৌখীন সাজ ঢাকাই চাদর॥

পুরাণো জামাই খাবে, মেয়েরা বালাই ভাবে,
বরণের তরে ব্যস্ত যবে নব বরে।
মরেছে সুরেন বন্দ্যো, বাসি ফুল হীন গন্ধ,
ভালমন্দ কিছু নাই প'ড়ে গেলে ঝ'রে॥

কিন্তু এ প্রাচীন স্মৃতি, জাগায় আগের প্রীতি,
যখন নবীন ব্রতী তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে।
কর্ম্মচ্যুত'কর্ম্মসূত্রে, বক্তার ডাক্তার-পুত্রে,
প্রথমে দেখিল বঙ্গ যবে মুগ্ধনেত্রে॥

বাগ্মীতা তখন গীতা, সর্ব্বশাস্ত্র সুমথিতা,
স্বদেশ হিতৈষিমিতা কণ্ঠের ঝঙ্কার।
রণরঙ্গে ভেরীনাদ, জাগায় উন্মাদ সাধ,
সেনাগণ পরে সাজ অসি অলঙ্কার॥

মুক্তি-যুক্তি প্রার্থী পাত্র, বঙ্গের যতেক ছাত্র,
তন্দ্রা ত্যজি তোলে গাত্র সুরেন্দ্রের স্বরে।
সেই ভীম হুহুঙ্কার, "জাতি জাতি" অহঙ্কার,
ধনুক-টঙ্কার যেন রাক্ষস-সমরে॥

ভারত ভারত রব, কণ্ঠে কণ্ঠে কলরব,
মাতৃভূমি ব'লে স্তব ফোটে রসনায়।
বনার্জি নরোজি এসে, কংগ্রেস বসায় দেশে,
সে কেন্দ্রে সুরেন্দ্র ব'সে মেদিনী মাতায়॥

বেতের বগীতে চড়া, পোষাকে ঘাটের মড়া,
রাস্তাবন্দি সা'ব যবে জুজু অবতার।
উন্নত করিয়া শির, সুরেন বাঁড়ুয্যে বীর,
সাহসে সাহেবে বলে চাই অধিকার॥

বক্তৃতা বক্তৃতা খালি, চড়াচ্চড় করতালি,
সুরেন্দ্র-লেক্‌চার খ্যাতি বিলাতে প্রচার।
ইংরাজ সমাজে বুঝে, 'বেঙ্গলী' জাগিয়া যুঝে,
পেটার্ণ্যাল্ গবর্মেণ্ট চলা ভা.. ার॥

টু বিজি এজিটেসন, ঘন ঘন পিটিসন,
সেসনে সেসনে বাড়ে নেশনের তেজ।
আস্না হয়েছে ফেটাব্, চল্‌তি পদ্ধতি বেটার্,
ঘৃণ্য ব'লে গণ্য দোজ্ ডেডলেটার.ডেজ্॥

জাতিয়ে মাতি হরিষে, ভুলে গেছি সে নরিশে,
ভুলে গেছি সুরেনের কারাগার-বাস।
বুকে বেঁধে কালো ফিতে, নয়ন জলেতে তিতে,
আরাধ্যে আবদ্ধ দেখি কি সে হা হুতাশ॥

দেখি বীরে কারামুক্ত, যুদ্ধে যেন জয়যুক্ত,
ঘোড়া খুলি গাড়ী টানে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত।
তারা সব ভাল ছেলে, কেউ "এমে" কেউ "এলে",
বিকারে আক্রান্ত নয়, নয় মতিভ্রান্ত॥

স্মরণ কি আছে বঙ্গ, কর্জ্জন-গর্জ্জনে ভঙ্গ,
তোমার সোনার অঙ্গ হয়েছিল যবে।
ফুলায়ে বুকের ছাতি, "একভাষা একজাতি",
বলিয়া সুরেন যবে নামিল আহবে॥

হব না হব না ভিন্ন, দেখি কেবা করে ছিন্ন,
মুছিব কলঙ্ক-চিহ্ন যায় যাবে প্রাণ।
যশের সুরভি গন্ধ, করেছিল বঙ্গে অন্ধ,
সে "বন্দে মাতরং" সনে মাথা তার ঘ্রাণ॥

স'রে গেল, শুভগ্রহ, অন্তর্হিত সে আগ্রহ,
প্রাচীন চরণ আর না চায় চলিতে।
রাজনীতি পথে পান্থ, তার যে নাহি সীমান্ত,
রাবণ ম'লে-ও থাকে চিতাটি জ্বলিতে॥

শ্রান্ত হ'য়ে পরিশ্রমে, অথবা চিত্তের ভ্রমে,
কেন হে সুরেন্দ্রনাথ হ'লে বিস্মরণ।
কোটি মুকুটের মূল্য, নহে লোক-প্রেম তুল্য,
ভারত হৃদয় ছিল তব সিংহাসন॥

তুচ্ছ চৌকি মন্ত্রিত্বের, রুদ্ধদ্বারে কর্ত্তৃত্বের,
নেতৃত্বের পিতৃত্বের অধিকার হ'তে।
আজ তুমি বেঁচে নাই, মুখে তুলে অন্ন খাই,
গড়াগড়ি দিই নাই প'ড়ে রাজপথে॥

তথাপি তথাপি বঙ্গ, বহুকাল ছিল সঙ্গ,
বহুকাল-অন্তরঙ্গ লয়েছে বিদায়।
ধুয়ে দিতে চিতানল, ছুটো ফোঁটা লোণাজল,
চাবে না সে করতালি আসি পুনরায়॥

ফুরায়েছে দেখা শোনা, দোষ-গুণ বেছে গোণা,
বিবেচনা চলে না নাড়া-হাতে দাঁড়ায়ে।
শত্রু-মিত্র আত্মপর, বাসের শেষের ঘর,
গলাগলি শ্মশানে দলাদলি ছাড়ায়ে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মৌলিক গবেষণা *

বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার স্থান অতি উচ্চে। প্রথমতঃ, মৌলিক গবেষণা দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিত্য নূতন নূতন রত্ন সঞ্চিত হইয়া উহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার সাহায্যে অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর উদ্ঘাটন এবং তাহাদিগের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ মানবজাতির সেবায় নিত্য নিয়োজিত হয়। তৃতীয়তঃ, মৌলিক গবেষণার ফল ব্যবহারিক বিজ্ঞানে আরোপ করিয়া মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথ সুগম এবং সুখস্বচ্ছন্দতার মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। চতুর্থতঃ, ইহার ফলে নিত্য বিবিধ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া জগতের দ্রব্যসম্পদের সংখ্যার বৃদ্ধি সাধিত হয়। সর্ব্বশেষে মৌলিক গবেষণা-চর্চ্চায় যে বিশুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চায় মৌলিক গবেষণা কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে এই অভিভাষণের আলোচ্য বিষয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার আলোচনা এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভূত নহে; তবে প্রয়োজনানুসারে আনুষঙ্গিক ভাবে দুই এক স্থানে তাহারও উল্লেখ করা যাইবে।

এ দেশে জড়-বিজ্ঞানচর্চ্চা দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহা বড়ই আশাপ্রদ, কেন না, ভারতবর্ষ যে অপরিমেয় অসংস্কৃত খনিজ ও কৃষিজ সম্পত্তির অধিকারী, ভারতবাসী বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগের সংস্কারসাধন করত দেশের কাজে লাগাইতে না পারিলে কেবল যে দেশের লোকের দৈন্য কখন ঘুচিবে না, তাহা নহে, চিরদিন তাহাদিগকে নিত্য-ব্যবহার্য্য অতি সামান্য পদার্থের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। এখন অর্থ ও সামর্থ্যে বলীয়ান্ অধ্যবসায়সম্পন্ন বৈদেশিকগণ বৈজ্ঞানিক কৌশল সাহায্যে ভারতবর্ষের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পত্তির উদ্ধারসাধন করিয়া ক্রোরপতি হইতেছে এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা স্ব স্ব দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে,—আর আমরা উপযুক্ত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হইয়া হতাশভাবে অদৃষ্টের লিপি অখণ্ডনীয় মনে করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্যের পীড়ন নীরবে সহ্য করিতেছি এবং বিদেশী বণিকগণকে দীর্ঘ-নিশ্বাসতপ্ত নিষ্ফল অভিশাপ প্রদান করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছি। সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ে দেশের শিক্ষাপরিষদে বিজ্ঞান যে তাহার প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়া ন্যায্য দাবীদাওয়া বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে অনেক শিক্ষিত লোকেরও এই ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে জড়বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে মোটেই অগ্রসর হইতে পারে নাই। য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানের ফলে এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। যখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই অতি প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষে আত্মবিজ্ঞান,

* কাঁঠালপাড়ায় বিগত বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিকিৎসা-জগতে ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ দান। ঔষধপ্রয়োগ ব্যপদেশে ধাতুবিশুদ্ধি-প্রক্রিয়া জ্ঞান ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় "হিন্দুদিগের রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস" (History of Hindu Chemistry) নামক তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কতিপয় ধাতুর বিশুদ্ধিসাধন করা হইত, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া-সমূহের সহিত মূলতঃ তাহাদিগের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। প্রাচীন ভারতবাসীর লৌহবিশুদ্ধিকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দিল্লীর কুতব মিনারের নিকট অবস্থিত বিশুদ্ধ ঢালাই লৌহের স্তম্ভ ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে চিরদিন ভারতবর্ষের যশ ঘোষণা করিবে।

যাহা হউক, এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিয়া অধিক

নীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত জ্যোতিষ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, গণিত, রসায়নী বিদ্যা প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞানিক বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বীজ-গণিত ও সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষ পৃথিবীর গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আরবগণ ভারত হইতে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মধ্যযুগে য়ুরোপে ইহার প্রচার করিয়াছিল, সুতরাং য়ুরোপ ভারতের নিকট এই বিদ্যার জন্য ঋণী। অতি প্রাচীন যুগের আর্য্য ঋষি কণাদের পরমাণু-বাদ বৈজ্ঞানিক জগতে সামান্য আদরের বস্তু নহে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অতি প্রাচীন কালে এ দেশে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের ভেষজতত্ত্ব

সময় ক্ষেপণ করিতে চাহি না। যাহা আমরা নিজের দোষে হারাইয়াছি, তাহার জন্য বৃথা অনুশোচনা এবং বিলাপ-পরিতাপ না করিয়া অথবা অভিমান-দৃপ্ত হইয়া কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরবস্মৃতির পূজায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া, যাহাতে আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চায় য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশবাসী কর্ম্মকুশল জাতি-সমূহের সমকক্ষ হইয়া ভারতের জ্ঞান, গৌরব ও অর্থসামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করাই প্রকৃত দেশহিতৈষী ভারতবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য।

মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে এ দেশ যে য়ুরোপ ও

আমেরিকা হইতে বহু পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে, প্রধানতঃ তিনটি কারণ তাহার মূলে অবস্থিত:—

(১) শিক্ষার অব্যবস্থা।
(২) অনুরাগের অভাব।
(৩) সুবিধার অভাব।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার মোটেই সুব্যবস্থা ছিল না। কলিকাতার যে দুই একটি কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষার সামান্যমাত্র ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলিকাতা মেডি-

ক্যাল কলেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেও কেবলমাত্র দুই একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করা হইত। শারীর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্ ও জীবতত্ত্ব, এমন কি, রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণকে মেডি-ক্যাল কলেজে যাইয়া এই সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইত। তখন এই বিজ্ঞান-শিক্ষার সহিত মৌলিক গবেষণার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। তখনকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কেবলমাত্র অধ্যাপকের বক্তৃতায় আবদ্ধ থাকিত। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই লেবরেটারিতে "হাতে কলমে" (Practical) শিক্ষালাভ করিবার অবসর ঘটিত। বক্তৃতা শুনিয়া ও পুস্তক পাঠ করিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, তাহার অধিক তখন কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কুতব-মিনার ও লৌহস্তম্ভ
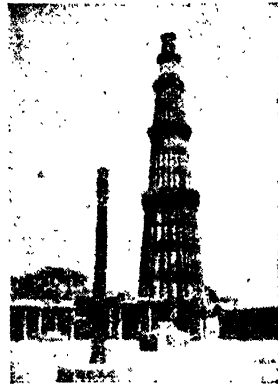
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানমন্দির" (Indian Association for the Cultivation of Science) স্থাপন করিয়া ভারতবাসীর বিজ্ঞানচর্চ্চা ও মৌলিক গবেষণার পথ সুগম করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি যে মহদুদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে এখন তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাহার সুফল ভোগ করিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কলিকাতার কলেজসমূহে বিজ্ঞানশিক্ষার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। যখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নী-বিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন হইতেই তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য একটা উৎসাহ ও চেষ্টা লক্ষিত হইল। এই দুই জন মনস্বী অধ্যাপকই এ দেশে বিজ্ঞানে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণার পথিপ্রদর্শক। এই সময় হইতে কলিকাতার অন্যান্য কয়েকটি বে-সরকারী কলেজে কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

হইল এবং "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান মন্দিরে" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাঁফো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের ধারাবাহিক বক্তৃতা বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ জন্মাইয়া দিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে বি, এস্, সি পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা বিষয়ে আমূল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় একটি ইউনিভার্সিটী কমিশন গঠিত হয় এবং ঐ কমিশনের অনুসন্ধানের ফল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যে আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই ফলে এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান-শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং "হাতে কলমে" বিজ্ঞানশিক্ষা এই সময় হইতেই দেশে সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান আর্টস্ (Arts) শিক্ষার পুচ্ছস্বরূপ ছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নূতন আইনের সর্ত্তানুসারে আর্টস্ ও সায়েন্সের (Science) স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে তাহার পদোচিত আসন ও সম্মান দেওয়া হইয়াছে। এখন ছাত্রগণ আর্টস বা সায়েন্স, যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও

লর্ড কার্জ্জন

সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইণ্টার্মিডিয়েট্ পরীক্ষা (Intermediate Examination) হইতেই তাহারা বিজ্ঞানে বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমাদের ছাত্রগণ সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কলেজের আর্টস্ ক্লাসে অধিক ছাত্রের সমাগম হইত, এখন বিজ্ঞানের ক্লাসে প্রবেশ করিবার

জন্য ছাত্রদিগের মধ্যে অত্যধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে; এমন কি, অনেক কলেজে তাহারা বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য স্থান পাইতেছে না।

এই নূতন বিজ্ঞান-শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান প্রবর্ত্তক দেশমান্য বরেণ্য স্বর্গগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আমরা পরে দেখাইব যে, সার আশুতোষের প্রাণপাত পরিশ্রম, ঐকান্তিক চেষ্টা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং কালে ইহার সম্পূর্ণ পরিণতিলাভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
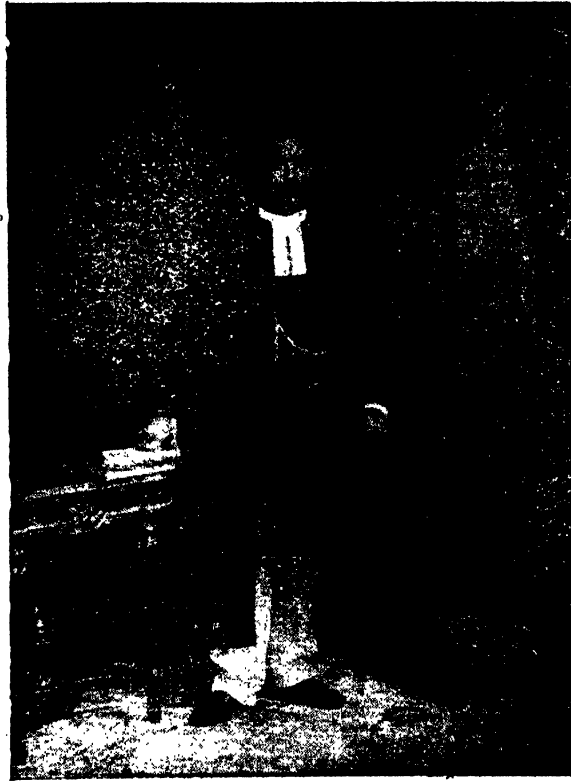
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র ছাত্র-দিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও তাহাদিগকে উপাধি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। নূতন আইন পাশ হইবার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ও উপাধি বিতরণ ব্যতীত আর্টস্ ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় শিক্ষা দিবার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সার আশুতোষের চেষ্টায় দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলনের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালা দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রসারের এক মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালার কৃতী সুসন্তান সার তারকনাথ পালিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ও সার রাসবিহারী ঘোষ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি তাঁহাদিগের স্বদেশবাসীর বিজ্ঞান শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া সার আশুতোষের হস্তে প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার ইতিহাসে এই মহাদানের জন্য সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে ও সার আশুতোষের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও মনীষাবলে য়ুনিভারসিটী সায়েন্স কলেজ (University Science College) প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কলেজের ভারতীয় অধ্যাপক ও ভারতীয় ছাত্রগণের কৃতিত্বে বিজ্ঞানের নানা শাখা মৌলিক গবেষণার ফলপুষ্পে সবিশেষ পরিশোভিত হইয়াছে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা ও কার্য্য-কুশলতা এবং সার তারকনাথ ও সার রাসবিহারীর অসামান্য বদান্যতা, এতদুভয়ের রাজযোটকে বঙ্গদেশে এই মহাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত ভারতবাসিগণ বিদেশে যাইয়া বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যও সার রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরে শিক্ষানুরাগী বদান্য খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের অর্থানুকূল্যে সায়েন্স কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষা আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাবিভাগ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অপূর্ব্ব ও অমর কীর্ত্তি। এই বিভাগ আর্টস্ ও সায়েন্স এই দুই ভাগে

বিভক্ত। বি, এ, বা বি, এস্, সি, উপাধি পাইবার পর ছাত্রগণকে আর্টস্ বা সায়েন্স বিভাগে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা (Post Graduate Teaching)। যখন সার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষাকার্য্যের সহিত শিক্ষা ভার গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইলেন, তখন হইতেই তিনি ইহাকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানসম্পদের কেন্দ্রস্বরূপে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তাঁহার সে উচ্চাশা সম্পূর্ণভাবে ফলবতী না হইলেও, এই বিভাগের সৃষ্টি হওয়া অবধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আর্টস্ ও সায়েন্স, এতদুভয় ক্ষেত্রেই মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাবিভাগে যথারীতি শিক্ষা ও গবেষণা কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর্টস্ ও সায়েন্স শাখায় এই ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্বের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি সেরূপ সুফল কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই গবেষণাকার্য্য পৃথিবীর পণ্ডিত-সমাজে সম্যক্ সমাদৃত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্য রাজসরকার হইতে এত দিনে যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, আর্থিক সুব্যবস্থা হইলে মৌলিক গবেষণা দিন দিন অধিকতর প্রসার লাভ করিবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কালে পৃথিবীর মধ্যে একটি উচ্চশ্রেণীর মৌলিক গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হইবে। বহু ভারতীয় ছাত্র এক্ষণে উপযুক্ত অধ্যাপকগণের অধ্যাপনায় ও তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞান দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আরোপ করিয়া ভারতের স্বভাবজ অসংস্কৃত খনিজ ও কৃষিজাত সম্পত্তির উদ্ধার এবং দেশে অর্থাগমের সৌকর্য্য-সাধনের জন্য এপ্লায়েড কেমিষ্ট্রী (Applied Chemistry) এবং এপ্লায়েড ফিজিক্স (Applied Physics) নামক দুইটি স্বতন্ত্র ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিভাগ য়ুনিভারসিটী সায়েন্স কলেজে স্থাপিত হইয়াছে। অনেকানেক ছাত্র উপযুক্ত অধ্যাপকদিগের অধীনে শিল্প ও ব্যবসা কার্য্যের উপযোগী "হাতে-কলমে" শিক্ষা এই দুই বিভাগে আয়ত্ত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা-বিভাগে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান (Botany), প্রাণিতত্ত্ব (Zoology), ভূতত্ত্ব (Geology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), গণিত (Mathematics), পরীক্ষাসহ কৃত মনস্তত্ত্ব (Experimantal Psycology) প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অল্পবিস্তর শিক্ষা ও গবেষণাকার্য্য চলিতেছে।

ভারতবাসী এত দিন জড়বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও আত্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিল। বহু যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া এইরূপ শিক্ষার পরিচর্য্যায় ভারতবাসীর মনের ভাব, গতি ও আসক্তি ঐ দিকেই প্রকৃষ্টভাবে ধাবমান হইয়াছে। সামাজিক জীবন অন্য ধারায় পরিচালিত হইবার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞান-চর্চ্চায় তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা আসক্তি দেখা যায় নাই। এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ক্রমে তাহার ধারণা হইয়াছে যে, জড়-বিজ্ঞানচর্চ্চা না করিলে সে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং জড়বিজ্ঞান যে তাহার অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়, এখন ভারতবাসী তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে এবং বিজ্ঞানশিক্ষায় তাহার আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যাইতেছে। য়ুরোপে অনেক দিন পূর্ব্বে এই জ্ঞানের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং য়ুরোপ যে ভারত-বর্ষ অপেক্ষা মৌলিক গবেষণা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে সম-ধিক অগ্রসর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, দার্শনিক মনের ধারা বৈজ্ঞানিক মনের ধারায় পরিণত করা সময়সাপেক্ষমাত্র; ভারতবাসীর এ কার্য্যে সাফল্যলাভ সম্বন্ধে সন্দেহ করি-বার কোন কারণ নাই। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকিলে সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিতে পারা যায়।

বিজ্ঞানক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রতিবন্ধক ব্যতীত ভারতবাসীর পক্ষে আর একটি বিশেষ বাধা থাকিতে দেখা যায়। সেটি যথোচিত সুবিধার অভাব। যাঁহারা এ দেশে যাবতীয় বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চপদ অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহাদেরই মৌলিক গবেষণা করিবার অবসর ও সুবিধা থাকিতে দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে যাবতীয় সরকারী বৈজ্ঞানিক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব এবং গভর্ণমেণ্ট কলেজ সমূহের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ বিদেশীয়দিগের একচেটিয়া ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সরকারী যাবতীয় বিজ্ঞান-বিভাগের উর্দ্ধতম কর্ম্মচারী সকলেই বিদেশী, ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত কেবল সহকারিরূপে তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। লেবরেটারি, লেবরেটারির যাবতীয় যন্ত্র, পুস্তক, অর্থ, লোকজন সকলই কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে; তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে সহকারী ভারতবাসীর এমন সুবিধা নাই যে, নূতন কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে সহজে প্রবৃত্ত হয়। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, যখনই সহকারীর কার্য্যে কিছু বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখনই তাহা কর্ত্তৃপক্ষের দপ্তরে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে ভারতবাসীর কোন মৌলিক গবেষণা করিবার সুবিধা বা অবসর কোথায়? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত সুযোগ্য অধ্যাপক সে দিন পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল্ সার্ভিসে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই, "অন্য পরে কা কথা।" দুই এক স্থল ব্যতীত সহকারী ভারতবাসীর মৌলিক গবেষণাকার্য্য তাঁহার উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ কখনই সুনজরে দেখেন নাই। তবে কতিপয় ভারতবাসী যে মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে যশোলাভ করিয়াছেন, সে কেবল তাঁহাদের অসামান্য প্রতিভা ও প্রশংসনীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ের গুণে। আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ব্যবহার করিবার সুবিধা এবং কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে কোন ব্যক্তি মৌলিক গবেষণায় সহজে সাফল্যলাভ করিতে পারে না। অধুনা এ বিষয়ে কতক পরিমাণে ভারতবাসীর সুবিধা হইয়াছে। এখন সরকারী শিক্ষাবিভাগে ভারতবাসী ক্রমশঃ উচ্চপদ অধিকার করিতেছে এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কিঞ্চিৎ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত য়ুনিভার্সিটী সায়েন্স কলেজে অনুষ্ঠাতৃগণের সর্ত্ত অনুসারে ভারতবাসিগণ সর্ব্বোচ্চ অধ্যাপকের পদ অধিকার করিয়া মৌলিক গবেষণা কার্য্য স্বাধীনভাবে পরিচালন করিবার ক্ষমতা ও সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন গবেষণার পরিচয় দেশীয় ও বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানকালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানমন্দিরে পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics) মৌলিক গবেষণা স্বাধীনভাবে ভারতবাসীদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি তদুপরি সম্যক্ আকৃষ্ট হইয়াছে। সরকারী অনেকানেক বৈজ্ঞানিক বিভাগের কর্ত্তৃপদ এখনও ভারতবাসীর দুরধিগম্য। উপযুক্ত ভারতবাসিগণ এই সকল পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা মৌলিক গবেষণা কার্য্যে যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিবে, ইউনিভার্সিটী সায়েন্স কলেজ ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানমন্দিরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। ডাক্তার ওসাগ্‌নেসী (Dr. O'Shaugnessy) এ বিষয়ের প্রথম পথিপ্রদর্শক। তিনি মেডিক্যাল কলেজে রসায়নী বিদ্যা (Chemistry) ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের (Pharmacology) অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি এ দেশীয় ঔষধাদি সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটারি (Bengal Dispensatory) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় দেশীয় কতিপয় ঔষধ পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রথমে স্থান লাভ করিয়াছিল।

মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন শিক্ষা-বিভাগে মৌলিক গবেষণার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং বহু দিন পর্য্যন্ত এই বিভাগে ভারতবর্ষীয় উদ্ভিজ্জাত ঔষধাবলীর উপাদান নিরূপণ এবং জীবদেহের উপর তাহাদিগের ক্রিয়া সম্বন্ধে

অল্পবিস্তর গবেষণা হইয়াছিল। যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কানাইলাল দে, মুদীন সরীফ, উড্, ওয়ার্ডেন্, ওয়াডেল্, সার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার্, সার ডেভিড প্রেণ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার কানাইলাল দে প্রথমে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের এবং পরে কিছু দিন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেশী ঔষধ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় অহিফেনের একটি নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করেন।

উড, ওয়ার্ডেন্ ও ওয়াডেল্ মেডিক্যাল কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন। উড সাহেব অল্প খরচে কেরোসিন তৈলের সাহায্যে কুইনিন্ পরিষ্কার করিবার এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। ডাক্তার ওয়ার্ডেন্ দেশী গাছগাছড়া সম্বন্ধে বিস্তর মৌলিক গবেষণা করেন এবং ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের ডেভিড হুপার ও বোম্বাই প্রদেশের ডাক্তার ডিমকের সহিত একযোগে এ সম্বন্ধে তিন খণ্ডে বিভক্ত ফার্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা (Pharmacographia Indica) নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ভারতবর্ষীয় উদ্ভিজ্জ ঔষধাবলী সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ওয়ার্ডেন্ ও ওয়াডেল্ লালকুঁচ (Abrus Precatorius) সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়া উহার বিষাক্ত উপাদানের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করেন। লালকুঁচ গো-মহিষাদি হত্যা করিয়া তাহাদের চর্ম্ম সংগ্রহ করিবার জন্য দেশীয় চর্ম্মকারেরা বিষরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াডেল্ সর্পবিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উহার মধ্যে যে পদার্থ বিষের কার্য্য করে, তাহার রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় করেন এবং এখন যে এণ্টিভিনিন্ (Antivenin) নামক সর্পবিষয় ঔষধ লেবরেটরিতে প্রস্তুত হইয়া সর্পবিষ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সার ডেভিড প্রেণ গাঁজার উপাদান ও জীবদেহে উহার ক্রিয়া সম্বন্ধে মেডিক্যাল কলেজের লেবরেটরিতে বিস্তর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত ডাক্তার ওয়ার্ডেনের সহকারী ছিলেন। তিনি কুর্চ্চির ছাল হইতে কুর্চ্চিসিন্ (Kurchisine) নামক একটি উদ্ভিজ্জ উপক্ষারের (Alkaloid) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক যখন ডাক্তার ওয়ার্ডেনের সহকারী ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মৌলিক গবেষণা কার্য্যে অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন এবং পরে যখন অন্যতম গভর্ণমেণ্ট রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তখন করবী (Nerium Odorum) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া উহার মধ্যে "করবিন্" (Karabin) নামক একটি নূতন বিষাক্ত পদার্থের আবিষ্কার করেন এবং এই মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিজ্ঞান বিভাগে ডাক্তার ম্যাকে ও তাঁহার সহকারী ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং রায় বাহাদুর ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর শোণিত সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেডিক্যাল কলেজের পাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার সার লেনার্ড রজার্স্ এবং তাঁহার সহকারী রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কতিপয় গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশজ ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন।

ভৈষজ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা বহুদিন ব্যাপিয়া চলিলেও রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণা প্রেসিডেন্সি কলেজেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার প্রবর্ত্তক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিজ্ঞান জগতে মৌলিক গবেষণা দ্বারা ইঁহাদিগের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইঁহারা দুই জনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত একযোগে ভারতের পূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতকে জগতের চক্ষুতে বরেণ্য করিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক গবেষণা-ঘটিত প্রথম প্রবন্ধ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রয়াল সোসাইটীতে পঠিত হয় এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই মৌলিক গবেষণাকার্য্যে তিনি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া

আসিতেছেন। তিনি বোধ হয় এ পর্য্যন্ত এক শতটি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ স্বয়ং লিখিয়াছেন এবং আরও অনেক প্রবন্ধ তাঁহার ছাত্রদিগের সহযোগে প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিক্যাল সোসাইটীর জর্ণালে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পত্রে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞানে বঙ্গবাসীর মৌলিক গবেষণার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মৌলিক গবেষণা ব্যতীত অপর একটি কার্য্য দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে মৌলিক গবেষণাকার্য্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি মেধাবী ছাত্র লইয়া একটি ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিষ্ট্রী (Indian School of Chemistry) স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যাপীঠে অনেকানেক বিশিষ্ট ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের নানা স্থানে মৌলিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রদিগের মধ্যে নীলরতন ধর, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বিমানবিহারী দে, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রমোহন বসু, যতীন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্রকুমার সেন, পঞ্চানন নিয়োগী, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, স্নেহময় দত্ত প্রভৃতি কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপযুক্ত ছাত্র হইয়া ভারতের নানা স্থানে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, ইঁহারা তাহার সাফল্যসাধনে সবিশেষ সহায়তা করিতেছেন। এই ইণ্ডিয়ান্ স্কুল অফ কেমিষ্ট্রীর ছাত্রগণ গত কয়েক বৎসরে অন্যূন দুই শত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের গুরুদেবের আশা পূর্ণ এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

জগন্মান্য বরেণ্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার মৌলিক গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া প্রাচীন ভারতের আচার্য্যগণের ন্যায় জগদীশচন্দ্র নীরবে তাঁহার নবোদ্ভাবিত কৌশলময় যন্ত্রাদি-সাহায্যে জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের রহস্যভেদ-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ তড়িৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে অনেকানেক নূতন রত্ন আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বহুকাল পূর্ব্বে তড়িৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া মার্কনির বিনা তারে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের সম্ভাবনার সূচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভিজ্জীবন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বহু আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজ উদ্ভাবিত অপূর্ব্বকৌশলসম্পন্ন যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রাণ-স্পন্দনের পরিচয় প্রদান করিয়া এক বহু পুরাতন জটিল প্রশ্নের সমস্যাসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মৌলিক গবেষণার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তিনি বিশিষ্ট সম্মানের আস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাঁহার গবেষণা-মন্দির (Bose Research Institute) স্থাপন ও তাহার কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গবেষণাকার্য্য-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত বিবিধ পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার মৌলিক গবেষণাকার্য্যের ইতিহাস, বিস্তৃতি ও সাফল্য বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তিনি রয়াল্ সোসাইটীর ফেলোসিপরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ডাক্তার ওয়াটসন্ এক সময়ে ঢাকা কলেজে রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অর্গানিক কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধগুলি নানা বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় তিনিও ঢাকায় অনেক কৃতী ছাত্রকে মৌলিক গবেষণাকার্য্যে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহার জন্য বঙ্গদেশ ডাক্তার ওয়াটসনের নিকট ঋণী।

ডাক্তার ওয়াটসনের ছাত্রদিগের মধ্যে অনুকূলচন্দ্র

সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শিখিভূষণ দত্ত প্রভৃতি কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক্ষণে এ দেশে মৌলিক গবেষণার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এবং যাঁহারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের কয়েক জনের নাম এবং কি কি বিষয় তাঁহাদের গবেষণার অন্তর্ভূত, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই অভিভাষণের উপসংহার করিব।

বঙ্গদেশে য়ুনিভারসিটী সায়েন্স কলেজ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির (Bose Research Institute), ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-মন্দির, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্, মেডিক্যাল্ কলেজ, কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল্ মেডিসিন্, শিবপুর বটানিক্যাল্ গার্ডেন, এসিয়াটিক্ সোসাইটী অফ বেঙ্গল, ঢাকা য়ুনিভারসিটী প্রভৃতি স্থানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মৌলিক গবেষণা চলিতেছে। বঙ্গদেশের বাহিরে বেণারস হিন্দু য়ুনিভারসিটী, এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটী, পঞ্জাব য়ুনিভারসিটী, বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, পুষা এগ্রিকলচারাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট, বম্বে পারেল্ লেবরেটারি, কাসৌলি পাষ্টুর্ ইন্‌ষ্টিটিউট এবং কোডাইকানেল্ অব্‌জার্ভেটারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহে নানা বিষয়ে অল্পবিস্তর মৌলিক গবেষণাকার্য্য চলিতেছে।

য়ুনিভারসিটী সায়েন্স কলেজে রসায়ন-বিজ্ঞান বিভাগে আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার সেন, প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রমুখ তাঁহার কতিপয় কৃতী ছাত্র উচ্চ রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপনা এবং ইনর্গানিক, অর্গানিক ও ফিজিক্যাল্ কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহাদিগের রচিত বিস্তর মৌলিক প্রবন্ধ নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিলাতের কোন বিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ইঁহাদিগের কৃত মৌলিক গবেষণার উপর অযথা কটাক্ষপাত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ভারতবাসীর কোন বিদ্যায় বা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বদাবী বিলাতের একশ্রেণীর লোকের নিকট চিরদিন অসহ্য ও অমার্জ্জনীয় হইয়া আসিয়াছে এবং আজিও ঐ দেশে সেই গতানুগতিক চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাইট্রাইট্ (Nitrites) নামক যৌগিক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা বিজ্ঞানজগতে একটি শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কৃতী ছাত্রদিগের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঢাকায়, বিমানবিহারী দে মাদ্রাজে, নীলরতন ধর ও মেঘনাথ সাহা এলাহাবাদে, যতীন্দ্রনাথ সেন পুষায়, রসিকলাল দত্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডষ্ট্রী বিভাগে, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিভাগে এবং বি, এম্, দাস চর্ম্মবিভাগে (Tannery) সবিশেষ প্রশংসার সহিত নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

য়ুনিভারসিটী সায়েন্স কলেজে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল্ সোসাইটী নামক মৌলিক গবেষণাকার্য্যের আলোচনার জন্য একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সভা হইতে একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন, আর্সনিক্ কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এই কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের মৌলিক গবেষণাকার্য্য সবিশেষ প্রশংসনীয়। অধ্যাপক রমন্ এ বিষয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া বিজ্ঞানজগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ন্যায় তিনিও অনেকানেক ছাত্রকে গবেষণাকার্য্যে দীক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-মন্দিরে পদার্থ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যদেশ প্রভৃতি ভারতের নানা দেশবাসী ছাত্র কলিকাতায় আসিয়া মৌলিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইঁহাদের গবেষণামূলক বিস্তর প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক রমন্ সম্প্রতি মৌলিক গবেষণায় তাঁহার কৃতিত্বের জন্য বিলাতের রয়াল্ সোসাইটীর ফেলোসিপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সঙ্গীত-যন্ত্র-বিজ্ঞান

(Properties of Musical Instruments) এবং আলোকরশ্মির আণবিক বিক্ষেপ (Scattering of Light by Molecules) সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

য়ুনিভার্সিটী সায়েন্স কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার মিত্র, দেবেন্দ্রমোহন বসু, স্নেহময় দত্ত প্রভৃতি অধ্যাপকগণের মৌলিক গবেষণাকার্য্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরে (Bose Research Institute) তাঁহার উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণা-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এখানে আসিয়া আচার্য্য বসুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার যে উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় দ্বারা "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-মন্দির" স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ফল এত দিনে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবাসী যাহাতে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানের নানা শাখায় মৌলিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিসাধন করিতে পারে, তাহাই ডাক্তার সরকারের এই বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে এই বিজ্ঞান-মন্দির অধ্যাপক রমনের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে মৌলিক গবেষণায় কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

অধ্যাপক রমন্

প্রাণিতত্ত্বে (Zoology) স্বর্গত ডাক্তার এনাণ্ডেলের (Dr Annadale) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বহুদিন অবধি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে জীবতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর মৌলিক গবেষণা করিয়া রয়াল সোসাইটীর ফেলোসিপ সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লাহোরের কর্ণেল ষ্টিফেনসন্, লক্ষ্ণৌয়ের অধ্যাপক ডাঃ করম্ নারায়ণ বাল এবং কলিকাতা জুওলজিক্যাল্ সর্ভে বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাক্তার বেণীপ্রসাদের নাম জীবতত্ত্বের গবেষণাক্ষেত্রে সুপরিচিত। মেডিক্যাল কলেজের প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপক ডাক্তার একেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই বিভাগে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

গণিতবিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণাকার্য্যে মাদ্রাজবাসী স্বর্গত রামানুজ সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। অতি অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়া জগতের গণিত-বিজ্ঞান-বিভাগে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তাঁহার যশ ভারতের বাহিরে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রয়াল সোসাইটীর ফেলোসিপ সম্মান অর্জ্জন করেন। এই বিভাগে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ

বিজ্ঞান-কলেজ
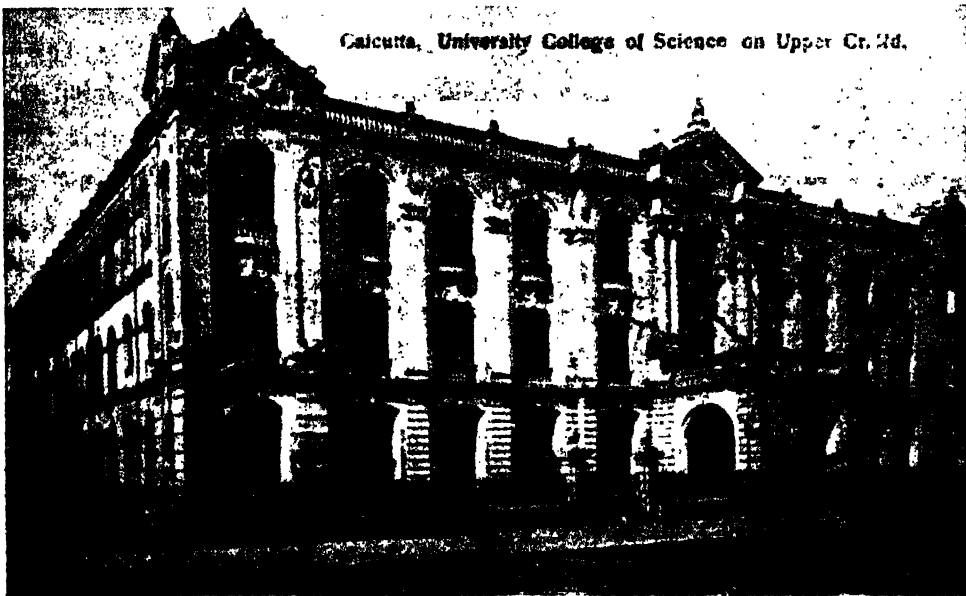
কালিস্, ডাক্তার ডি, এন, মল্লিক, ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার গণেশপ্রসাদ এবং শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গণিত সম্বন্ধে ইঁহাদের মৌলিক প্রবন্ধ অনেকানেক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব (Geology) বিভাগে ভারতবাসীকে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব পদ এ পর্য্যন্ত প্রদান করা হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে পি, এন, বসু ও পি, এন, দত্ত কৃতিত্বের সহিত এই বিভাগে অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ভূতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান সবিশেষ প্রশংসনীয়। লক্ষ্ণৌ য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপক বীরবল সানি অতি দক্ষতার সহিত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্বিজ্ঞান (Fossil Botany) সম্বন্ধে গবেষণার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। এই বিভাগে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাস গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবহাওয়া বিভাগে (Metereology) ডাক্তার সিম্‌সন্ এবং সার গিলবার্ট ওয়াকার ইতঃপূর্ব্বে গবেষণা-কার্য্যে সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ডাক্তার সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এক্ষণে বম্বের কোলাবা অবজার্ভেটারিতে প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে য়ুনিভার্সিটী সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং মৌলিক গবেষণাকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহালানবিশ আলিপুর অবজার্ভেটারিতে প্রশংসার সহিত এই বিভাগে কার্য্য করিতেছেন।

উদ্ভিদ্বিজ্ঞান বিভাগে বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপক আর, এস্, ইনামদার উদ্ভিদের জীবনীক্রিয়া (Plant Physiology) সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ের অধ্যাপক বীরবল সানির নাম উল্লেখ করিয়াছি। উদ্ভিদ্বিজ্ঞান বিভাগে তাঁহার কার্য্যও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের অধ্যাপক সহায়রাম বসু "বাংয়ের ছাতা" (Fungus) সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার কতিপয় মৌলিক প্রবন্ধ বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপক ডাক্তার ব্রুলও এই বিভাগে অল্পবিস্তর গবেষণার কার্য্য করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সার জর্জ্জ ওয়াট্, শিবপুর বটানিকাল্ গার্ডেনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সার জর্জ্জ কিং এবং সার ডেভিড প্রেণ এবং বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কর্ণেল গেজ ভারতবর্ষীয় বৃক্ষলতাদির সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। সার ডেভিড প্রেণ প্রণীত "বেঙ্গল প্লাণ্টস্" (Bengal Plants) নামক বহুতথ্যপূর্ণ উদ্ভিদ্বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এম, এস্, সি পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়। গাঁজার উপাদান নিরূপণ ও জীবদেহে উহার ক্রিয়া সম্বন্ধে সার ডেভিড প্রেণের কার্য্য ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

নৃ-তত্ত্ব বিদ্যা (Anthorpology) অল্পদিন হইল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে পাঠ্য বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাঁচিনিবাসী রায় শরচ্চন্দ্র রায় বাহাদুর নৃ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞান সমাজে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে। তিনি নৃতত্ত্ব বিদ্যাবিষয়ক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর অধ্যাপক রাও বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ার এই বিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

কলিকাতায় স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপিত হইয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের প্রকৃষ্ট অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার সার লেনার্ড রজার্স এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবয়িতা ও স্থাপয়িতা। মৌলিক গবেষণার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান চিরদিন তাঁহার নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার গবেষণার ফলে কুষ্ঠব্যাধি, কলেরা, রক্ত-আমাশয়, কালাজ্বর প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা-সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিশেষ বিশেষ ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান ও তাহাদের

বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে চিকিৎসা উদ্ভাবন এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। এই প্রতিষ্ঠানে কালাজ্বরে ডাক্তার নেপিয়ার, কুষ্ঠব্যাধিতে ডাক্তার মিউর, হুক্-ওয়ার্ম রোগে ডাক্তার চ্যাণ্ডলার, বহুমূত্র রোগে ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ম্যালেরিয়া ও পরপুষ্ট জীবতত্ত্বে ডাক্তার নোল্‌স্, বীজাণুতত্ত্ব ও চর্ম্মরোগে ডাক্তার এক্‌টন্, কীটতত্ত্বে ডাক্তার স্ট্রীক্‌লাণ্ড, বেরিবেরি রোগে কর্ণেল মেগ, রক্ত আমাশয় রোগে কাপ্তেন মৈত্র, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মেজর ষ্টুয়ার্ট এবং ভৈষজ্য-বিজ্ঞানে মেজর চোপরা ও ডাক্তার সুধাময় ঘোষ প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তিগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় যাবতীয় শাখায় মৌলিক গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সম্প্রতি পাষ্টুর ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যও এই স্থানে আরম্ভ হইয়াছে এবং ডাক্তার ক্ষিপ্ত কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দংশনের চিকিৎসা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এরূপ সুন্দরভাবে পরিচালিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নাই। এই গবেষণা-মন্দির বাঙ্গালাদেশের একটি বিশেষ গৌরবের সামগ্রী।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোক বিস্তৃতভাবে পাতিত করিতে হইলে, বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহনের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। যত দিন না বাঙ্গালা ভাষা বঙ্গদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহনরূপে নিয়োজিত হইবে, তত দিন দেশের জনসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হইবে না এবং বিজ্ঞানের সহজ তত্ত্বগুলি জীবনযাত্রার নানা কার্য্যে আরোপ করিয়া তাহার সুফল ভোগ করিতে তাহারা সমর্থ হইবে না। এই জ্ঞানের অভাবই দেশের যাবতীয় কুসংস্কার ও অনর্থের মূল। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মূল নিয়মগুলি জানা না থাকাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য দিন দিন যে কিরূপভাবে হীন হইয়া যাইতেছে এবং প্রতিষেধ্য রোগজনিত কত অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে এ বিষয়ে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই অমঙ্গল প্রতিবিধানের জন্য একটি সংহত চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিজ্ঞান এখন বাঙ্গালা পোষাক পরিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্য আরম্ভ না হইলে বিজ্ঞানের নানা শাখায় অধিকসংখ্যক পুস্তক রচিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা না হইলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ সহজে হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং কয়েক জন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার পরিভাষা কতক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিবেন, তাঁহারা এই সঙ্কলিত পরিভাষা হইতে অল্পবিস্তর সাহায্য পাইবেন। সহজ বাঙ্গালায় সরলভাবে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, দেশে কতক পরিমাণে এ কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে; আশা করি, ক্রমশঃ ইহা প্রসার লাভ করিবে। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা এখন যেমন ইংরাজীতে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ তাহাদিগের বাঙ্গালা ভাষায়ও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয়। যাঁহারা মৌলিক গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মনোযোগ এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ফলবতী হউক। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, দেশের ভাষা দেশের শিক্ষাকার্য্যে অবাধে নিয়োজিত না হইলে কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দূরসাপেক্ষ।

আপনাদের সময় ও ধৈর্য্যের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিলাম, বিষয়ের গুরুত্ববোধে আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীচুণিলাল বসু।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসার ফল

সে দিন বৈকালবেলা ভ্রমণে বাহির হইয়া সন্ধ্যার অল্প আগে সকলে গৃহে ফিরিতেছিলেন। ডেরাডুনের নদীতে জল প্রায়ই থাকে না। আবার সময়ে সময়ে এত পরিমাণ জল আইসে যে, তখন পার হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। কারণ, নদীর স্রোত অত্যন্ত বেশী। নদী-গর্ভে নানা বর্ণের পাতর দেখা যায়। অনেকেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনে। সকলে একটু আগে গিয়াছেন। বাসন্তী পশ্চাতে থাকিয়া সকলের অলক্ষিতে পাতর কুড়াইতে কুড়াইতে একটু পিছনে পড়িয়াছিল। সে নদীগর্ভে নামিয়া পাতর কুড়াইয়া যেমন দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনই পায়ের তলায় সে যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। অতর্কিতে তাহার মুখ হইতে যন্ত্রণাব্যঞ্জক "উঃ,—মা গো" শব্দ নির্গত হইয়া পড়িল। সে অসহ্য যন্ত্রণায় আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া আর্দ্র নদী-সৈকতে বসিয়া পড়িল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "হা রে শিউলী, বড়বৌমা কোথায়? তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না। তোদের আক্কেল কি? বৌটার খোঁজ নেই।" এই বলিয়া তিনি নদীর ধার দিয়া পুনরায় বাসন্তীর অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন।

সন্তোষ তখন তাড়াতাড়ি কহিল, "পিসীমা, আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি দেখছি।" এই বলিয়া সে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিল, বাসন্তী বসিয়া আছে, সে প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া নিকটস্থ হইয়া কহিল, "এ কি! এখানে ব'সে যে? পায়ে লাগ্‌লো না কি।" এই বলিয়া সে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দেখিল, বাসন্তীর পা হইতে প্রবল রক্তস্রোত বহিয়া যাইতেছে, সে পা ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছে। সন্তোষ তখন ক্ষিপ্রহস্তে নিজের কোটটা ভূমিতে রাখিয়া বাসন্তীর পায়ের নিকট হাত লইয়া যাইতেই সে ভীষণ আপত্তি করিতে লাগিল, অবশেষে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আপনি হাত দেবেন না। থাক—আমি যাচ্ছি।"

সন্তোষ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, "আমায় দেখতে দাও, এ সময়ও কি ভুল বুঝতে হয়? আমি ডাক্তার, তা ত তুমি জান।"

সন্তোষ আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহার পদতল নিজের হাতের উপর রাখিয়া অপর হস্ত দিয়া দেখিল যে, একটা বোতলের গলাভাঙ্গা বাসন্তীর পায়ে ফুটিয়া রহিয়াছে। সে তখন ধীরে ধীরে কাচখণ্ড বাহির করিয়া দিয়া নিজের পকেটস্থ রুমালখানা ছিঁড়িয়া অল্প জলে ভিজাইয়া লইয়া অতি সত্বর ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। কিন্তু রক্ত তখনও বাহির হইতেছিল। বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই পুনরায় বসিয়া পড়িল।

সন্তোষ তখন নিরুপায় হইয়া কহিল, "তুমি কি আমার সাহায্য নেবে? না—অপর কাউকে ডাকবো?"

জড়িত কণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "আপনি পারবেন না।"

সন্তোষ রহস্যচ্ছলে কহিল, "যাদের ডাকবো, তারা বুঝি আমার চাইতে বীর?" এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উচ্চকণ্ঠে শেফালীকে আহ্বান করিল।

ক্ষণেক পরে শেফালিকা আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, দাদা? এ কি! বৌদি ব'সে কেন?"

সন্তোষ গম্ভীরভাবে বলিল, "কাচে পা কেটে গেছে। তোর বৌদির বিশ্বাস, তুই এক জন মস্ত বীর। এখন বাড়ী নিয়ে চল্ দেখি। কিন্তু খুব সাবধান, রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি।"

গৃহে ফিরিয়া শেফালী এক কেট্‌লী জল গরম করিয়া সন্তোষকে ডাকিয়া আনিল। সে কতকগুলি ঔষধপত্র হাতে করিয়া পিসীমার গৃহে গিয়া বসিল। বাসন্তীর পায়ের রুমাল খুলিয়া দেখা গেল, ক্ষতমুখ গভীর এবং তখনও অল্প অল্প রক্ত বাহির হইতেছে। পিসীমা আসিয়া তাহার পায়ের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং ও সব দেখিতে পারেন না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পিসীমা চলিয়া যাইবার পরে বাসন্তীকে নিজের হাতে রুমাল খুলিয়া ফেলিতে দেখিয়া সন্তোষ কহিল, "রুমালখানা ত নিজেই খুলে ফেল্লে, ডাক্তারীটাও নিজে করবে না কি?"

বর্ষাকালের পুঞ্জীভূত মেঘের মত প্রচুর বিরক্তিতে বাসন্তীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সন্তোষের এই বিদ্রূপের বাণটুকু তাহার বুকে বিদ্ধ হইলেও সে নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "একটুখানি রেড়ির তেল দিলেই সেরে যাবে, কিছু করতে হবে না।"

সন্তোষ বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "এত মুষ্টিযোগ আবার কবে থেকে শেখা হয়েছে? ডাক্তারীও করা হয় না কি?"

সন্তোষের ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বেদনানুভব করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "সময় সময় দরকার হয় বৈ কি।"

সন্তোষ আর কথা না বাড়াইয়া বাসন্তীর নিকট অগ্রসর হইতেই সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, "থাক থাক, আমি সব—"

সন্তোষ মনে মনে অসহিষ্ণু হইলেও মনের মেঘ মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়া সে ধীরগম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "বাসন্তী—আমি কিছু করতে গেলেই তুমি অমন কর কেন বল দেখি?—কর্ত্তব্য কি কেবল তোমারই আছে—তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও শেষ হয় নাই? আমি জানি, আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তবু—তবু আমার মনে হয়, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ—আবেগে তাহার কণ্ঠ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে যথাসম্ভব বাসন্তীর ক্ষতের অভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়া, ক্ষত ধৌত করিয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই দ্বারপ্রান্তে সহাস্যবদনে শিশির আসিয়া কহিল, "যা হউক বৌদি, দাদাকে দিয়ে পদসেবাটা খুব করিয়ে নিলেন, তবুও আবার আমাদের মন্দ বলেন।"

সন্তোষ কহিল, "স্বয়ং ভগবান্‌ই যখন এর হাত থেকে নিস্তার পাননি, তখন আমরা ত মানুষ।" এই বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল, শিশিরও তাহার সহিত বাহিরে গেল।

নিদাঘের তপ্ত দাবদাহে এ শীতলতাকে কে আনিয়া দিল রে? দীর্ঘ ৭ বৎসর পরে স্বামীর মুখে আজ নিজের নাম প্রথম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বাসন্তী প্রথমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, ধরিত্রী যেন তাহার চরণতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল। আজ নিজের এই ক্ষুদ্র নামটাও যেন তাহার কাছে কতই না সার্থক বোধ হইতেছিল। এ নামে ত অনেকেই তাহাকে ডাকিয়া থাকে; কিন্তু আজ এই মধুর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকারে স্বামীর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত এই প্রিয় সম্বোধনটির মত সে নাম ত তাহার জীবনের শুষ্ক মরুভূমি কোনও দিন বারিপাতে স্নিগ্ধ করে নাই। আজ বাসন্তীর নিকট স্বামীর বাক্যগুলি মিথ্যা ছলনা-বিদ্রূপের মত লাগিলেও তাহার মন সন্তোষের দোষ ধরিতে চাহিতেছিল না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মীমাংসা

গভীর রাত্রে ঈষৎ ঠাণ্ডা অনুভব করিয়া হঠাৎ সন্তোষের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল; গলার মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়া সে বাতি জ্বালিয়া ফ্লানেলের মাফলারটা গলায় জড়াইয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিল।

শয়ন করিল বটে, কিন্তু নিদ্রাদেবী তাহাকে একেবারেই ত্যাগ করিয়া গেলেন। জাগ্রত সন্তোষকুমারের মনের উপর তখন আর এক জন আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। সে চিন্তা! সেই সঙ্গে আজ পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা পত্নীর সেই অস্পষ্ট অথচ মধুর বাণী, "অন্ধ জাগো, কিবা রাত্র কিবা দিন" কেবলই তাহার স্মৃতি-সাগরের তলদেশ মথিত করিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে সে যেন কি একটা

অভাবের বেদনা অনুভব করিতেছিল। এত দিনের পর এই শূন্য শয্যাটাও যেন তাহার মনকে নিপীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। কোন অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি আসিয়া তাহাকে যেন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছিল। তাহার দেহের সমস্ত শিরাগুলি হইতে যেন তীব্র স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। অঙ্গের সকল অংশ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এত দিনের দমিত চিত্তবৃত্তিগুলা যেন শিথিল হইয়া বাসন্তীর অন্বেষণে ছুটিয়া যাইতেছিল। এ যে তাহার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত,এই ত আরম্ভ, ইহারও শেষ আছে—তাহা বহু দূর—কত দূর, কে জানে? ইহার জন্য সে বাসন্তীকে দোষী করিতে চাহে কেন? এ মহাচীনের বিশাল প্রাচীর সে ত নিজের হাতেই গাঁথিয়া তুলিয়াছে। তাহার চোখ হইতে ঘুম ছুটিয়া গেল, ক্রমে তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এই দুর্ব্বলা নারী, কিন্তু কি অসীম তাহার অন্তরের শক্তি!—যাহার কাছে পুরুষের কঠোর হৃদয়ের দৃঢ়সঙ্কল্পও অবলীলাক্রমে খাটো হইয়া যায়। সন্তোষ মনের চাঞ্চল্যে ক্রমেই ভীত হইয়া উঠিতেছিল। মনের আবেগ তাহাকে এমন করিয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে কেন? এত কাল ধরিয়া যে বিকারের ঘোর তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ কি সে ঘোর কাটিয়া যাইতেছে? তাহার মনের—দেহের এ দুর্ব্বলতা কোথা হইতে আসিল? সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে?

দিনের পাখী তখনও নীড় পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ণিমার চন্দ্র তখনও একেবারে লুকাইয়া পড়ে নাই। প্রভাতের আলোক তখনও ধরণীর বক্ষে বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এমনই সময়ে জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারের মধ্যে সন্তোষ দুইবার চিন্তার হাত এড়াইবার জন্য গৃহ হইতে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া পদচারণা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল—ওঃ, এমন পরাজয় কি পুরুষের হয়! গাছের পাতা, আকাশের চন্দ্র, এমন কি, নিজের হৃদয় পর্য্যন্ত আজ সকলেই তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে!

সে দিন কোথায় গেল—যে দিন অতিশয় গর্ব্বে দৃঢ়চিত্তে সে সুষমাকে বলিয়াছিল, বাসন্তীকে সে ভালবাসিতে পারিবে না—মূর্চ্ছিতা সংজ্ঞাহীনা পত্নীকে পদতলে পতিত দেখিয়াও যে সে বিচলিত হয় নাই, বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া অবধি ঘৃণা ও অপব্যবহারের বোঝা যাহার মাথায় তুলিয়া দিতে সে হৃদয়ে ব্যথা বোধ করে নাই। অসহায়া উপেক্ষিতা পত্নীর সাগ্রহ আহ্বানও যাহাকে সঙ্কল্প হইতে টলাইতে পারে নাই, আজ তাহারই নিষ্ঠুরতা ও তাচ্ছীল্য দেখিয়া তাহার মন এত গভীর ব্যথায় ভরিয়া উঠে কেন?

দীর্ঘ সাধনায় এত কাল ধরিয়া সে যে ধৈর্য্যের বাঁধ বাঁধিয়া তুলিতেছিল, আজ সে তাহাকে এমন ভাবে অবজ্ঞা করিয়া গেল কেন? এ পরাজয়ের টীকা ললাটে অঙ্কিত করিয়া সে লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না, এখান হইতে তাহাকে পলাইতেই হইবে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মনের এ ভাবটাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার আর নিরাপদ নহে। বাসন্তীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে শুভ। যদিও এখন এ বিদায় গ্রহণ করিতে তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি এই দণ্ডই তাহার উপযুক্ত।

সহসা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বিনয় ডাকিল, "দাদা!"

চমকিত হইয়া সন্তোষ পিছন ফিরিয়া দেখিল, বিনয় দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "কি বল্‌ছিস্ বিনু, আমায় কিছু বল্লি?"

বিনয় দেখিল যে, সন্তোষের সদাপ্রফুল্ল মুখখানা আজ শুষ্ক, বিষাদের ঘন ঘোর যেন তাহার সমস্ত মুখমণ্ডলের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সে এক রাত্রিতে দাদার এতখানি পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল। সন্তোষের অন্তরের ব্যথা নিজের অন্তরে অনুভব করিয়া তাহার অন্তর যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি সে তখন সেটাকে চাপা দিয়া সহজ সরল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি অসুখ করেছে?"

নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সন্তোষ কহিল, "কই—না। কেন বল্ দেখি?"

সন্তোষের শুষ্ক বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিনয় কহিল, "হঠাৎ আপনার চেহারাটা এ রকম হয়ে গেল কেন?"

মৃদু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ কহিল, "কি রকম বল্ দেখি? কা'ল রাত্রে ঘুম হয় নি—বোধ হয়, সেই জন্যে, আর—"

"তবে আর গিয়ে কায নেই।"

সাগ্রহকণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "কোথায়?"

সে কহিল, "ইলকেশ্বর।"

সন্তোষ কহিল, "আমি ত ভাই আজ যেতে পারব না। কা'ল রাত্রে মাইক্রশকোপে ভাল দেখতে পাইনি। আজ একবার সকালে ভাল ক'রে তোর বৌদির পায়ের পুঁজ দেখতে হবে। আজ বোধ হয় আমার যাওয়া হবে না।" এই বলিয়া সে যেমন বসিতে যাইবে, অমনই শেফালী আসিয়া বলিল, "দাদা, আসুন, সব ঠিক ক'রে এসেছি।" সন্তোষ চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ একা বসিয়া বিনয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। সে বারান্দা হইতে রাস্তায় নামিবার উপক্রম করিতেই ফটকের পথে একখানি গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া সে সেই দিকে অগ্রসর হইল। সে গাড়ীর নিকট গিয়া দেখিল, ভিতরে তাহার পিতা, চামেলী, জ্যেঠাইমা এবং সুষমা রহিয়াছেন।

গাড়ী হইতে রমাকান্ত বাবু নামিতেই বিনয় কহিল, "বাবা, আপনি? খবর দেননি কেন? ষ্টেশনে যেতুম, আপনার বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছে?"

পুত্রের স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়া রমাকান্ত বাবু কহিলেন, "না বাবা, কোন কষ্ট হয়নি। ছুটীর দুদিন আগেই চ'লে এলুম।"

তাঁহারা সকলে অন্দরের পথে অগ্রসর হইলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

জন্মাষ্টমী

গভীর দুর্য্যোগময়ী প্রলয়ের ঘোরা নিশীথিনী,
জলদ-মেদুর নভে ঘন ঘন চমকে দামিনী
ভেদি অন্ধকার,—
শন্ শন্ বহে ঘোর নিশীথের সজল বাতাস
গভীর, দাঁড়ায়ে স্থির সে দুর্য্যোগে ভেদিয়া আকাশ
কংস-কারাগার!
মুহুর্মুহু ঘোরনাদে কাঁপাইয়া অম্বর ধরণী,
গরজি' উঠিছে শুধু গুরু গুরু প্রলয়-অশনি
থাকিয়া থাকিয়া,—
গভীর সে প্রতিধ্বনি বাজে গিয়া আঁধারে গভীর
গুম্ গুম্ কারাগার সে গর্জ্জনে গুমরে অধীর
কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
দেবকীর সনে আজি কংসের সে আঁধার কারায়
যাপে নিশি বসুদেব শৃঙ্খলয়ে মুক্তির আশায়
দিন গণি' গণি';—
বাহিরে প্রকৃতি তাই মাতিয়াছে উন্মত্ত-উৎসবে,
মুক্তির বারতা তাই দিকে দিকে ফিরি' ঘোর রবে
ঘোষিছে অশনি!

মুক্তির সঙ্গীত তাই ভেদি গাঢ় অন্ধকাররাশি
আকাশে বাতাসে আজ দিকে দিকে উঠিয়াছে ভাসি
দুর্য্যোগ নিশায়,—
শত ভগ্নপ্রাণ তাই সমুৎসুক রয়েছে চাহিয়া,
কখন্ সে আর্ত্তত্রাতা জ্যোতিঃ পথে আসিবে নামিয়া
লাঞ্ছিত ধরায়!
অশনি গর্জ্জুক ঘোর, বৃষ্টিধারা ঝরুক গভীর,—
জ্যোতিঃ শিশু! তুমি এসে এ নিশায় ক্রোড়ে জননীর
চাহিবে হাসিয়া,—
ঝন্ ঝন্ খুলি' যাবে দৃঢ়বদ্ধ কারার দুয়ার,
হে মুক্তির অগ্রদূত! তুমি হেসে উজলি আঁধার
দাঁড়াবে আসিয়া!
দুর্য্যোগ আঁধার-মাঝে এস তবে আলোক পূর্ণিমা,
মুক্তির আলোক করে, শিরে ধরি বিপুল গরিমা
তুমি নারায়ণ!
দাসত্বের এ কারার দৃঢ়বদ্ধ কঠিন শৃঙ্খল
মহাশঙ্খে ছিন্ন করি, অত্যাচারী এ পাপ প্রবল
কর নিবারণ!

শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল।

মহাযুদ্ধের নায়ক-নায়িকা
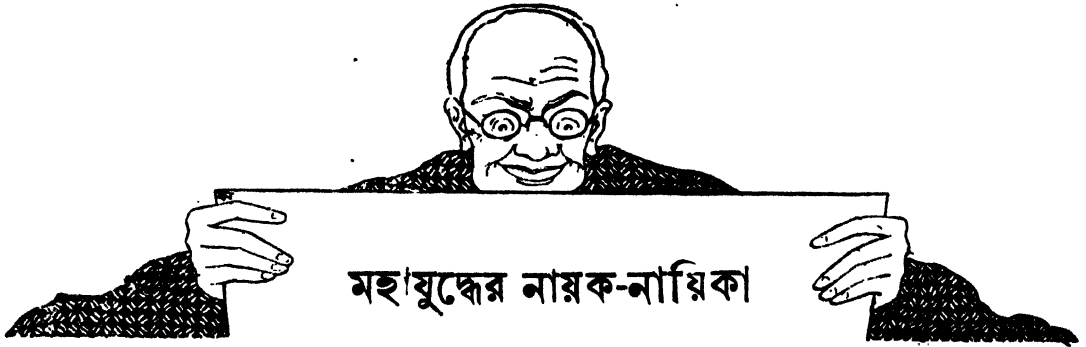
জর্ম্মণীর সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম (উইলিয়াম) বিশ্বযুদ্ধের প্রধান নায়ক, এইরূপই খ্যাতি। তাঁহাকে মিত্রপক্ষ নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কখনও তিনি War lord কখনও হন সর্দ্দার, কখনও পিশাচ নরহন্তা, কখনও নর-রাক্ষস। তাঁহারই অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেপোলিয়ানের মত সর্ব্বগ্রাসিনী—উহা লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জর্ম্মণী কেবল জগতে একটু হাত-পা মেলাইবার স্থান চাহে—a place under the sun, এই ছুতা করিয়া তিনি জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ বিস্তারের জন্য—কেবল উপনিবেশ নহে, বাণিজ্য-বিস্তারেরও জন্য এই বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি টিউটন জাতীয়, রাসিয়া স্লাভ জাতীয়; এই স্লাভ-টিউটনের পরস্পর বিদ্বেষ-বহ্নিতে তিনিই ইন্ধন যোগাইয়া যত অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার স্লাভের সহিত ভাগ্যপরীক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর্ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ডের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া তিনি য়ুরোপে কালানল জ্বালাইয়াছিলেন। প্রুসিয়ার প্রাধান্য জগতে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইংরাজ তাঁহার প্রধান অন্তরায়। ইংরাজের রণতরী ও পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য এই হেতু তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। এই হেতু কোন অছিলায় ইংরাজের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া তিনি একবার শক্তিপরীক্ষার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। আগাডির বন্দরে জর্ম্মণ রণতরী প্যান্থারের লীলাভিনয় এই উদ্দেশ্যেই সংসাধিত হইয়াছিল। সে সময়ে ফরাসী ও ইংরাজ নরম হইয়া না গেলে হয় ত তখনই বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইত।

কাইজার উইলিয়ামের বিপক্ষে যেমন এক দিকে এমন গ্লানি রটিত হইয়াছে, অন্যদিকে তাঁহাকে অবস্থার দাস মাত্র বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোনও যুদ্ধ-সমালোচক বলেন, য়ুরোপের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মহাযুদ্ধ সংঘটিত না হইয়া পারে না—কাইজার নিমিত্ত মাত্র।

এখন আবার আর এক শ্রেণীর লেখক দেখা দিতেছেন। তাঁহারা মিত্রপক্ষীয় হইলেও কাইজারবিদ্বেষী নহেন। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধের সময়ে প্রচারকার্য্যের জন্য কাইজারের বিপক্ষে যতই মিথ্যাপবাদ রটান হউক না কেন, মহাযুদ্ধের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কাইজার এ যুদ্ধসংঘটনের মূল নহেন। তাঁহাদের মতে ফরাসীর আতঙ্ক ও বিদ্বেষই এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। তাহার সীমানায় জর্ম্মণী দিন দিন জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শৌর্য্যেবীর্য্যে যেরূপ মহীয়ান্ জাতিতে পরিণত হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার ভয়ের কারণ বিদ্যমান ছিল। এক দিকে ফরাসীর এই আতঙ্ক, অন্যদিকে প্রবল রুসিয়ার টিউটন বিদ্বেষ,—এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া জর্ম্মণীকে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কেহ কেহ এমনও বলেন, জর্ম্মণীর বাণিজ্যজগতে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান প্রাধান্যে আতঙ্কিত হইয়া বণিক ইংরাজও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল। এই সকল কারণে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রকৃত কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। হয় ত ভবিষ্যতে এক দিন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সে তথ্য নির্ণয় করিবেন। বর্ত্তমানে যে পুরুষ এক দিন এক দিকে শৌর্য্যে-বীর্য্যে, বুদ্ধিমত্তায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় প্রদানে এবং অন্য দিকে নিষ্ঠুরতায় ও বর্ব্বরতায় জগৎকে স্তম্ভিত চকিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় নিশ্চিতই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য।

কাইজার উইলিয়াম হোহেনজোলারণ রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। এই বংশ অষ্ট্রিয়ার হাপসবার্গ অথবা রুসিয়ার রোমানফ রাজবংশের মত প্রাচীন নহে। কাইজারের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর ছিলেন; আধুনিক বার্লিন সহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের নাম ব্রাণ্ডেনবার্গ। তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত ফ্রেডারিক দি গ্রেট। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি প্রুসিয়ান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রুসিয়ার পক্ষে থাকিয়া অষ্ট্রিয়ার রাণী মেরায়া টেরেসার বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রাকালে ফ্রেডারিক বলিয়াছিলেন,—"Ambition, interest, the desire of making the people talk about me carried the day, and I declared for war." এ হেন ফ্রেডারিকের প্রপৌত্র কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। সুতরাং তাঁহাতেও যে পিতামহের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কতক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

ফ্রেডারিকের পুত্র প্রথম উইলিয়াম। ফ্রেডারিক প্রুসিয়ার আকৃতি-প্রকৃতি গঠিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র প্রথম উইলিয়ামের রাজত্বকালে বিসমার্ক তাহার উপর কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়া যায়েন। বিসমার্ক আধুনিক জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের বিশ্বকর্ম্মা। যখন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান জর্ম্মণরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বিসমার্ক তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার Reminiscences গ্রন্থে কথাটা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন,—"I did not doubt that a Franco-Prussian war must take place before the construction of a united Germany could be realised." চন্দ্রগুপ্তের চাণক্যের মত প্রথম উইলিয়াম বা উইলিয়াম দি গ্রেটের মন্ত্রী বিসমার্ক জর্ম্মণসাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়া যায়েন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম প্রথম জর্ম্মণসম্রাট প্রথম উইলিয়ামের পৌত্র। তাঁহাকে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সহিত তুলনা করিয়া বহু ঐতিহাসিক তাঁহাকে ফ্রেডারিকের ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষাময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, উইলিয়ামও ফ্রেডারিকের ন্যায় পরিশ্রমে অকাতর; তিনিও তাঁহার ন্যায় পরের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না, পরন্তু জর্ম্মণজাতি ও সাম্রাজ্যকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিতে তাঁহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল।

মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই ঘোষণাপত্র প্রচার করেন,—"আজ ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর জর্ম্মণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। তদবধি এ যাবৎকাল আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শান্তি সহকারে যাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের বিপক্ষপক্ষ সে চেষ্টার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম,—সর্ব্বত্রই, এমন কি, সুদূর সমুদ্রপারেও ভিতরে ভিতরে সমস্ত য়ুরোপীয় জাতির অন্তরে একটা দারুণ জর্ম্মণ-বিদ্বেষ-বহ্নি ধিকি ধিকি জলিতেছে। চতুর্দ্দিকে যখন পূর্ণ শান্তি বিরাজিত, তখন অতর্কিত অবস্থায় আমরা আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। অতএব আর শান্তির সুখ চাহিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, এখন সকলকেই অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজ তাহার বিষম সঙ্কটকাল উপস্থিত। এখন জর্ম্মণীকে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন করিতে হইবে। যত দিন এক জন জর্ম্মণ জীবিত থাকিবে, যত দিন জর্ম্মণীর একটিমাত্র রণ-হয় বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব না। এ যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবী যদি একা জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি জর্ম্মণী পশ্চাৎপদ হইবে না। সম্মিলিত জর্ম্মণী কখনও পরাজিত হয় নাই, কখনও বিজিত হইবে না, হইতে পারে না। পরমেশ্বরের নাম লইয়া, তাঁহার কৃপামাত্র ভরসা করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তিনি সহায় ছিলেন, এখনও তিনি আমাদিগের সহায় হইবেন।"

ইহা হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে, কাইজার কতটা অপরাধী ছিলেন। মিত্রপক্ষ বলিবেন, কাইজারের এই বক্তৃতা কপটতার আবরণে মণ্ডিত। যাহাই হউক, এইরূপ মনোভাব লইয়া কাইজার বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা এক হিসাবে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সমগ্র জগৎকে শত্রুরূপে পাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহাই পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সদম্ভ উক্তি "সম্মিলিত জর্ম্মণী কখনও বিজিত হইতে পারে না" সফল হয় নাই। আজ তাই তিনি হলণ্ডের ডুর্ণ পল্লীতে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি আজ রাজাহারা—তাঁহার সাধের জর্ম্মণ সাম্রাজ্য আজ য়ুরোপের মিত্রশক্তিগণের কৃপাপ্রার্থী!

কাইজার উইলহেলেম

হার ভন জেগো

ডাঃ ভন বেটম্যান হলওয়েগ

রাজকুমার ফ্রেডারিক উইলহেলম্।—ক্রাউন প্রিন্স, অথবা জর্ম্মণীর যুবরাজ। ইঁহাকেও মিত্রপক্ষ মহাযুদ্ধের এক প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি যেন পিতার শনি সদৃশ, ইঁহাকে এই জন্য ব্যঙ্গ করিয়া Little W llie বলা হইত। জর্ম্মণযুদ্ধকালে ইনি জর্ম্মণীর পশ্চিম-বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন এবং ভনক্লাক ও হেসলারের সহিত একযোগে পশ্চিম-রণক্ষেত্রে জর্ম্মণ আক্রমণের প্রচণ্ডতা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইঁহার লাক্সেমবার্গ অধিকারকালে নানা লোক রটাইয়াছিল যে, ইনি বলপূর্ব্বক লাক্সেমবার্গের সুন্দরী যুবতী গ্রাণ্ড ডাচেসের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথার কোনও ভিত্তি ছিল না। সিভেন হেডিন (Sven Hedin) নামক বিখ্যাত সুইডেনদেশীয় পর্য্যটক যুবরাজের সৈন্যের সহিত পশ্চিম-রণ-ক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি With the German Army in the V est নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সে গ্রন্থ পাঠ করিলে জর্ম্মণ যুবরাজকে অতি উচ্চমনা শূরবীর বলিয়াই বোধ হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের জন্ম হয়। জর্ম্মণ যুবরাজ দেখিতে দীর্ঘ, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ। তিনি নেপোলিয়ানের উপাসক। তিনিও রণে পরাজয়ের পর পিতার ন্যায় হলাণ্ডে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি জর্ম্মণীতে পলাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে জর্ম্মণীতে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে।

ডাক্তার ভন বেটমান হলওয়েগ।—ইনি যুদ্ধকালে জর্ম্মণ চান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকেও এই যুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু তিনি যুদ্ধের প্রাক্কালে যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ,—

"আমরা লাক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য আপত্তি অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি স্পষ্টই বলিতেছি যে, ইহাতে আমরা বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গের উপর অন্যায় আচরণ করিতেছি। যে মুহূর্ত্তে আমাদের সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা ঐ দুই গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতেছে। আমাদের মত যদি কেহ এইরূপে শত্রু কর্ত্তৃক ভয়প্রদর্শন দ্বারা ব্যাকুল হইত অথবা সর্ব্বস্ব-নাশের আশঙ্কায় চিন্তাগ্রস্ত হইত, তাহা হইলে সেও আমাদের মত কিরূপে শত্রুব্যূহ ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে, সেই চিন্তায় বিভোর হইত।" ইহা হইতে বিচার করা যাইতে পারে, হলওয়েগ পৃথিবীধ্বংসকারী কালানল জ্বালাইবার পক্ষপাতী ছিলেন কি না।

আর এক কার্য্যে ভন বেটম্যান হলওয়েগের মনোভাব অবগত হওয়া যায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে হলওয়েগ অষ্ট্রিয়ার জর্ম্মণ দূতকে তার করেন, "সার্বিয়ার সহিত যখন অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়াছে, তখন আর যে উভয়ের মধ্যে আপোষ কথাবার্ত্তা হইবে, এমন আশা নাই। তবে রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়া যদি আপোষ-কথা না কহেন, তাহা হইলে বড়ই অন্যায় হইবে। আমরা নিশ্চিতই বন্ধুর কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া অষ্ট্রিয়া আমাদের পরামর্শ না শুনিয়া যদি রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমরা সেই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে বিজড়িত হইব না। আপনি এই

ক্রাউনপ্রিন্স

ভন মল্টকি

ভন ফকেনহেন

ভন টিরপিজ

ভন ইনগেনোল

কথা ভাল করিয়া কাউণ্ট বার্কটোল্ডকে বুঝাইয়া বলিবেন।" ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

হার ভন জেগো।—ইনি যুদ্ধারম্ভকালে জর্ম্মণীর বৈদেশিক সচিব ছিলেন। জর্ম্মণী যে সময়ে বেলজিয়ামে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে,

ভন হিণ্ডেনবার্গ

ভন সিয়ার

ভন জিমারম্যান

ভন ম্যাকেনসেন

সেই সময়ে জর্ম্মণীর বৃটিশ দূত সার এডোয়ার্ড গসেনের সহিত হার ভন জেগোর যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে বুঝা যায়, জেগো চ্যান্সেলার হলওয়েগের আদেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নতুবা তিনি স্বয়ং যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। সার এডোয়ার্ড যখন শেষ চ্যান্সেলার হলওয়েগকে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে নিষেধ করেন, তখন হলওয়েগ যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রথিত হইয়া গিয়াছে;—Just for a word— neutrality, a word which in war time had often been disregarded—just for a scrap of paper Great Britain was going to make war upon a kindred nation who desired nothing better than to be friends with her.

এ কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েগ বলিয়াছিলেন, "যখন এক জন লোক দুইটা শত্রুর দ্বারা দুই পার্শ্বে আক্রান্ত হয় এবং সে যখন

ভন হেসলার

ভন লুডেনডর্ফ

ভন বিসিং

ভন মুলার

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এসকিথ

সার এডোয়ার্ড গ্রে
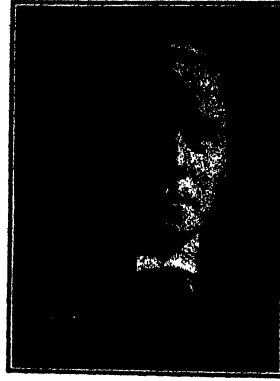
প্রাণপণে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিতে থাকে, তখন যদি তাহার বন্ধু তাহার পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সে দৃশ্য যেমন বিসদৃশ হয়, তেমনই আপনাদের এই আচরণ বিসদৃশ হইতেছে।"

বুঝাইয়াছিলেন, "জর্ম্মণী হইতে ফ্রান্সে যাইবার সহজ এবং অল্প সময়ের পথ হইতেছে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া। যত শীঘ্র সম্ভব, ফ্রান্সকে এক ভাগ্যনির্ণয়ক যুদ্ধে পরাজিত করিবার নিমিত্ত এবং শত্রুর পূর্ব্বেই সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত জর্ম্মণ

লয়েড জর্জ্জ

আরল্ কিচনার

সার জন ফ্রেঞ্চ

গবর্ণমেণ্ট বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহার উপর জর্ম্মণীর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।" জেগোর মুখে হলওয়েগের কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। ফল কথা, এইটুকু মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে যে, সে সময়ে যথার্থই জর্ম্মণী ফরাসী ও রুসিয়ার যোগাযোগে আপন অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা
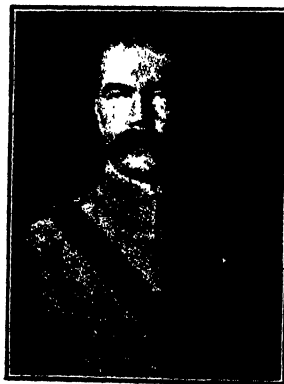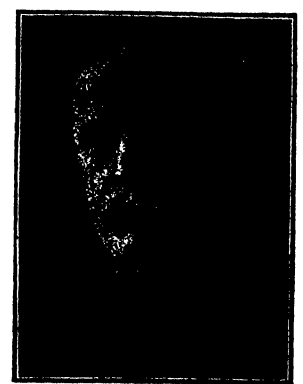
অর্থাৎ জর্ম্মণীর বরাবর বিশ্বাস ছিল যে, রুসিয়া ও ফ্রান্স এক-যোগে তাহাকে দুই দিক হইতে চাপিয়া মারিবে। তাই সে ফ্রান্সকে প্রস্তুত হইতে দিবার পূর্ব্বেই বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া ফ্রান্স আক্রমণে অগ্রসর হইতেছিল—ইহার জন্য সে ইংরাজের বন্ধুত্ববিচ্ছেদেও ভয় করে নাই। হার ভন জেগো এই কথাই সার এডোয়ার্ড গসেনকে

সার জন জেলিকো

সার ডগলাস হেগ

সার হেন্‌রী জ্যাকসন

কাপ্তেন গ্লোসোপ

মিস এডিথ ক্যাভেল

করিয়াছিল। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এ সকল জর্ম্মণীর ছল মাত্র।

ফিল্ড মার্শাল ভন মোলটকে।—ইনি যুদ্ধের প্রারম্ভে জর্ম্মণ সেনার জেনারল ষ্টাফের চীফ অর্থাৎ সকল বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ইনি বিখ্যাত সেডান যুদ্ধজয়ী ভন মোলটকের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার স্থান পরে জেনারল ভন ফকেনহেন অধিকার করিয়াছিলেন।
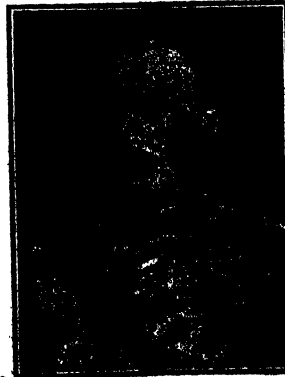
জেনারল ভন ফকেনহেন।—প্রসিয়ার সমর-সচিব, পরে জেনারল ষ্টাফের চিফ হইয়াছিলেন। ইঁহার রণকুশলতা ও কূট রণনীতির প্রশংসার কথা শুনা যায়। কথিত আছে, ইঁহারই প্লান অনুসারে জর্ম্মণ বাহিনী সকল রণপ্রান্তে পরিচালিত হইত।

ভন টিরপিটজ্।—গ্রাণ্ড এডমিরাল; ইনি জর্ম্মণ নৌবাহিনী বিভাগের প্রধান মন্ত্রী (Secretary)। ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিণ যদি কোনও জর্ম্মণের উপর এখনও বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ভন টিরপিটজের নামই উল্লেখ করা যায়। কেন না, ইনিই সমুদ্রে ভীষণ সাব-মেরিণ বা ডুবো জাহাজের দ্বারা বাণিজ্যপোত, হাঁসপাতাল জাহাজ ইত্যাদি অসহায় অস্ত্রহীন জাহাজ আক্রমণ করিবার নীতি আবিষ্কার ও সমর্থন করেন। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও ইনি সেই নীতি পরিহার করেন নাই। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—ইহাই টিরপিটজের নীতি ছিল। তিনি বলিতেন,—"আমরা নৌবলে ইংরাজের অপেক্ষা বহুগুণে দুর্ব্বল। ইংরাজ আমাদিগকে বালটিক সাগরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে রুসিয়া ও ফ্রান্সও আমাদের পথ আটক করিয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য যেরূপে হউক, একটা পথ পরিষ্কার করিতেই হইবে। তাই আমরা সাব-মেরিণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি।"

সার ডেভিড বিয়াটী

এডমিরাল ভন ইনগেনোল।—জর্ম্মণ নৌবাহিনীর সেনাপতি। ইনি বালটিকেই আবদ্ধ ছিলেন। জাটলাণ্ডের জলযুদ্ধে ইনি জর্ম্মণ পক্ষে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন

মার্শাল ভন হিনডেনবার্গ।—ইঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এই স্থানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইনি টানেনবার্গ যুদ্ধের বিজেতা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যখন জর্ম্মণীকে বিরাট রুসিয়া পূর্ব্ব প্রান্তে বিষম চাপিয়া ধরিয়াছিল, এমন কি, প্রতিমুহূর্ত্তে রুশীয় সেনার বার্লিণ আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা ছিল, জর্ম্মণীর সেই সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে হিণ্ডেনবার্গ টানেনবার্গের যুদ্ধে রুসিয়ার শক্তি একেবারে ধ্বংস করিয়া দেন। এই হেতু তাঁহাকে Saviour of the Fatherland অথবা জন্মভূমির ত্রাণ কর্ত্তা আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এই হেতু তিনি আজও জার্ম্মাণ জাতির হৃদয়ের রাজা।

এডমিরাল ভন সিয়ার।—উত্তর-সমুদ্রে জর্ম্মণ নৌবাহিনীর সেনাপতি।

হার ভন জিমারম্যান।—হার ভন জেগোর পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর বৈদেশিক সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফিল্ড মার্শাল ভন ম্যাকেনসেন।—ইঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত; কেন না, ইঁহার ন্যায় রণকুশল শূরবীর সেনাপতি জর্ম্মণ-যুদ্ধকালে আর কেহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। রুমানিয়া আক্রমণে, রুসিয়ার বেসারেবিয়ায় হানা দিতে, অষ্ট্রিয়া-রুসিয়াপ্রান্তে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্যদানে, ইটালীপ্রান্তে,—যেখানে এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই জর্ম্মণ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ অপর পক্ষের অসহ্য হইয়াছিল। এই হেতু Mackensen's drive বা ম্যাকেনসেনের হানা কথাটা যুদ্ধকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, তাঁহাকে Mackensen the Hammerer অথবা হাতুড়ির ঘা দেওয়া ম্যাকেনসেন আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে অপর পক্ষও এত মোহিত হইয়াছিল যে স্কচরা তাঁহাকে আপনার স্বজাতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। তাঁহার জননী স্কচ-মহিলা ছিলেন।

ফিল্ড মার্শাল ভন হেজলার।—এই অশীতিপর জর্ম্মণ সেনাপতি ভার্দ্দুন আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে মিত্রপক্ষ Devil of Verdun আখ্যা দিয়াছিলেন, কেন না, তাঁহার ভীষণ গোলাবর্ষণে ভার্দ্দুন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

জেনারল ভন লুডেনডর্ফ।—জেনারল হিণ্ডেনবার্গের চিফ অফ ষ্টাফ বা সমর-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী। লোক বলে, ইঁহারই পরামর্শে হিণ্ডেনবার্গ পরিচালিত হইতেন। ইনি অতীব কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। পরে ইনি এক সময়ে জর্ম্মণ বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে জর্ম্মণীর দুর্ভাগ্যের দশা। লুডেনডর্ফ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বরং অনেকে বলেন, তাঁহারই

এডলফ ম্যাক্স

কিং এলবার্ট

বুদ্ধির দোষে জর্ম্মণ জাতির শেষ পরাজয় ঘটিয়াছিল।
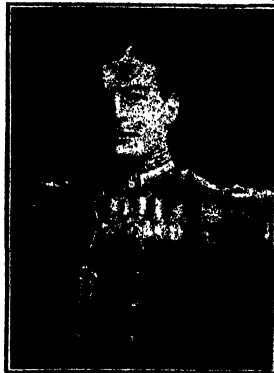
জেনারল ব্যারণ ভন বিসিং।—জর্ম্মণ অধিকৃত বেলজিয়ামের শাসনকর্ত্তা। ইনি বেলজিয়ামে বহু অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। আঁভোয়ার্প, লুভেন ইত্যাদি ধ্বংসকার্য্যে ইঁহার হাত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরন্তু নিরস্ত্র বেলজিয়াম গৃহস্থের গৃহদাহ, লুণ্ঠন, অনাচার অত্যাচার ইত্যাদি আচরণেও ইঁহার অনুমতি ছিল, এমনও প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি নাকি আদেশপ্রদানকালে বলিতেন, "যাহারা আদেশ অমান্য করে, তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দেওয়া চাই, (fright ulness) যাহাতে অপরাপর বেলজিয়ানরা জর্ম্মণ সেনার বিপক্ষে কোনওরূপ ষড়যন্ত্র করিতে না পারে।"

কাপ্তেন কারল ভন মুলার।—এমডেন নামক জর্ম্মণ রণতরীর অধ্যক্ষ। ইনি চীন সমুদ্র হইতে পলায়ন করিয়া ভারতসমুদ্রে উপস্থিত হয়েন। ইঁহার গোলাবর্ষণে মাদ্রাজ এক দিন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর, কলম্বো প্রভৃতি স্থানেও তিনি বিষম ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ইনি শীকারী বাজের মত ওৎ পাতিয়া লুকাইয়া থাকিতেন; কোন শীকারের যোগ্য জাহাজ সম্মুখে পড়িলেই তাহার উপর ছোঁ মারিয়া পড়িতেন। তবে তাঁহার মহানুভবতা ও সদাশয়তাও যথেষ্ট ছিল। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক নরহত্যা করিতেন না, বন্দীদিগকে সুবিধা পাইলেই মুক্তিদান করিতেন এবং যতক্ষণ তাঁহারা বন্দী থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহাদিগের সহিত সদয় বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য ইংরাজের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে সিডনি' নামক ইংরাজ রণতরীর অধ্যক্ষ দক্ষিণ সমুদ্রে এমডেনের সন্ধান পাইয়া ধ্বংস করেন। মুলার বন্দী হইয়া ইংলণ্ডে নীত হয়েন। সেখানে তাঁহাকে সমাদরে রক্ষা করা হইয়াছিল। একবার বন্দী-বিনিময়কালে কাপ্তেন মুলার স্বদেশ-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।—জর্ম্মণীর প্রধান আততায়িরূপে ইংরাজ এই বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইংরাজের সাহায্যের ভরসা না পাইলে ফরাসীর পক্ষে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ। এই ইংরাজপক্ষে সকলের প্রধান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ। তাঁহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তবে এই বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশ্বযুদ্ধকালে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার রাজপরিবারের কেহ কোনও স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ না করিয়া নির্লিপ্তের মত দূর হইতে যুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। রাজা তাঁহার রাজসংসারের অনেক ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া দেশের মঙ্গলে দান করিয়াছিলেন, বহু স্থানে উপস্থিত থাকিয়া দেশবাসী প্রজাপুঞ্জকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, যুদ্ধাভিযানে গমনোদ্যত সৈন্যমণ্ডলীকে আশার কথা, ভরসার কথা শুনাইয়া জন্মভূমির সেবায় আত্মদান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, যুদ্ধের হাঁসপাতাল ও আতুর-আশ্রম সকলের প্রতিষ্ঠা ও পোষণের বাবদে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—স্বয়ং রণস্থলের সান্নিধ্যে গমন করিয়া সৈন্যমণ্ডলীর অবস্থা প্রতীক্ষা করিয়াছেন এবং তথায় অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই যুদ্ধ সম্পর্কে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ সৈন্যের মত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহার পত্নী মহারাণী মেরী ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী মেরী পীড়িত ও আহত সৈন্যগণের সেবাকার্য্যে নানারূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রাজকুমারী মেরী নার্সের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

ব্যারণ বিসেলিস

জেনারল জেফার

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এই বিশ্বযুদ্ধকে ন্যায় ও ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—এ যুদ্ধ যে দরিদ্র দুর্ব্বল জাতির রক্ষার জন্য এবং জগতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার জন্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি তাঁহার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এইরূপ,—

"যে অমঙ্গলকর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। আমি এ যাবৎ শান্তির জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আমার মন্ত্রিগণও আমার সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কবর্জ্জিত এই বিবাদের মূল কারণ দূর করিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছেন। যখন বেলজিয়াম আক্রান্ত হইল এবং বেলজিয়ামের নগর সমূহ ধ্বংস হইতে লাগিল, যখন ফরাসীজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইল,—তখন যদি আমি আমার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান থাকিতাম, তাহা হইলে আমার সম্মান বিসর্জ্জন দিতে হইত এবং আমার সাম্রাজ্য ও সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতার বিলোপসাধন অবলোকন করিতে হইত।"

ইহা হইতেই রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মনের ভাব বুঝা যায়। তিনি যে শান্তি কামনা করিতেন, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, ইহা তাঁহারই মুখের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এসকিথ।—এখন ইনি আরল অব অক্সফোর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ এসকিথ বিলাতের লিবারল বা উদারনীতিক দলের কর্ত্তা। রক্ষণশীলরা যতটা সাম্রাজ্যবাদী, লিবারলরা ততটা নহে। সুতরাং তাঁহাদের মন্ত্রিত্বকালে হঠাৎ
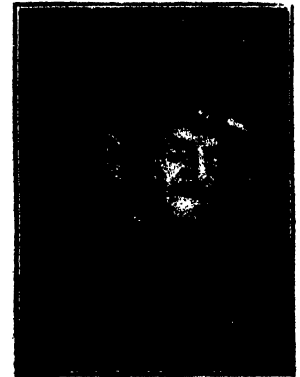
জেনারেল পারসিং

যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, মিঃ এসকিথ জর্ম্মণীর বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথাতেই প্রকাশ। তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে উপর্য্যুপরি সাতটি বক্তৃতা করেন। তাহার সকলগুলির মর্ম্ম একই,—ইংলণ্ড শান্তিপ্রিয়, জর্ম্মণী একাধিপত্যপ্রয়াসী, তাই এই যুদ্ধ ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে না নামিলে দুই পাপে পতিত হইত,—(১) বেলজিয়ামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, (২) জগতে যথেচ্ছারিতার প্রশ্রয়প্রদান। ইংরাজ স্বাধীনতাপ্রিয়, সুতরাং বেলজিয়াম ক্ষুদ্র হইলেও তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা ইংরাজের কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ সন্ধিসূত্রে ইংরাজ যখন তাহা করিতে প্রতিশ্রুত। এক পক্ষে ইংরাজের সত্যপালনপ্রবৃত্তি, অপর পক্ষে জর্ম্মণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি;—সুতরাং ধর্ম্ম ইংরাজের পক্ষে। এই ধর্ম্মযুদ্ধে ইংরাজের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ এসকিথকে পরে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধের নীতি বিলাতে গৃহীত হয় নাই। তাঁহার নীতিকে wait and see নামে সেই সময়ে অভিহিত করা হইয়াছিল।

পররাষ্ট্র-সচিব সার এডোয়ার্ড গ্রে।—কূট-রাজনীতিক বলিয়া ইনি যুদ্ধের প্রথম মুখে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধের আভাস তাঁহার মুখেই পাওয়া যায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তিনি ইংলণ্ডস্থ জর্ম্মণ দূত প্রিন্স লিচনাউস্কিকে বলেন, "রুসিয়ার বৈদেশিক সচিব মুঁসিয়ে সাজোনফ তাঁহাকে রুসিয়ার পক্ষ হইতে অষ্ট্রীয়ার সহিত আপোষ-কথা কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কেন না, ইতঃপূর্ব্বে ২৮শে জুলাই তারিখে অষ্ট্রীয়া সার্বিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া এখন আর সরাসরি রুসিয়া-অষ্ট্রীয়ায় কথা চলিতে পারে না। এই হেতু সাজোনফ আমাকে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

প্রথম হইতে সার এডোয়ার্ড মধ্যস্থতার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কথার ভাবে বুঝা যায়। ইহার পর ৩রা আগষ্ট তারিখে কমন্স সভায় সার এডোয়ার্ড তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, তিনি শান্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহাযুদ্ধের কয়েক পর্ব্ব অতীত হইবার পর সার এডোয়ার্ডকেও বিলাতের জনসাধারণের অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ।—ইনি যুদ্ধের মধ্যপর্ব্বে ইংলণ্ডের একরূপ Dictator বা ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে লিবারল-দলীয় ছিলেন, কিন্তু পরে লিবারল ও কনজারভেটিব—দুই দলের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া Coalition Government প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধকালে তিনি ইংলণ্ডে নানারূপ কঠোর ব্যবস্থা করেন, লোক তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইলেও যুদ্ধ হেতু তাঁহার ব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধ 'জয় করিয়াছিলেন,' এই হেতু তাঁহার জনপ্রিয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহারই কূটবুদ্ধির ফলে লর্ড রেডিং ও অন্যান্য প্রচারকের অক্লান্ত চেষ্টায় মার্কিণ বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু তাঁহার এই জনপ্রিয়তা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। যুদ্ধান্তে শান্তির সময়ে তাঁহার Dictatorship ইংলণ্ডের লোক সহ্য করে নাই। তাহারা দুই দিন পূর্ব্বের 'পূজার দেবতাকে' টানিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিল। এখন লয়েড জর্জ্জ বিবদন্তহীন রাজনীতিকরূপে কালাতিপাত করিতেছেন।

আরল কিচনার।—ইংলণ্ডের War Lord বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি সমরসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ভারতে, মিশরে ও দক্ষিণ-আফ্রিকায়—সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদ সংরক্ষণে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি সমরবিভাগে লর্ড রবার্টসের যোগ্য শিষ্য ছিলেন। যুদ্ধের প্রথম মুখে তিনি সাম্রাজ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহের নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে Lord Kitchener's Army প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই সেনা জর্ম্মণ আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহা না হইলে ইংলণ্ড যেরূপ অপ্রস্তুত ছিল, তাহাতে জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে হয় ত ইংরাজ সেনা সত্য সত্যই Contemptible little army প্রতিপন্ন হইত।

লর্ড কিচনার এক সামরিক উদ্দেশ্যসাধনার্থ গোপনে জলপথে রুসিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কটলণ্ডের উত্তরে জলনিমগ্ন মাইনে ঠেকিয়া তাঁহার জাহাজ বানচাল হইয়া যায়, লর্ড কিচনার উহাতে প্রাণত্যাগ করেন।

ফিল্ড মার্শাল সার জন ফ্রেঞ্চ।—(পরে লর্ড ফ্রেঞ্চ) ইনি অন্যতম বৃটিশ সেনাপতি। বিশ্বযুদ্ধকালের প্রারম্ভে ইনি ফরাসীদেশে ইংরাজসেনার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। ইনি জাতিতে আইরিশ হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক জন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ইনি বুয়র-যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়কত্ব করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে জেনারল জোফ্রের সহিত যোগাযোগে ইনি প্রথম জর্ম্মণ আক্রমণের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এডমিরাল সার জন জেলিকো।—ইনি বৃটিশ ঘরের (Home অর্থাৎ ইংলণ্ডের কাছাকাছি, বাহির সমুদ্রের নহে) নৌ-বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন এবং উত্তর-সমুদ্রে জর্ম্মণ নৌ-বাহিনীকে জব্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় জর্ম্মণ বাল্‌টিক বা কায়েল খালের নৌ বাহিনীর বাহির সমুদ্রে আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়াছিল।

ফিল্ড মার্শাল সার ডাগলাস হেগ।—(পরে লর্ড হেগ) ইনি সার জন ফ্রেঞ্চের পরে ফরাসীদেশে বৃটিশ সেনার অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণদের বিপক্ষে যুদ্ধে ইনি রণকুশলতা দেখাইয়াছিলেন। যখন ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ফোস পশ্চিম-প্রান্তে সম্মিলিত মিত্রসেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সার ডাগলাস তাঁহার সহিত অতি সুন্দরভাবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

এডমিরাল সার হেনরী জ্যাকসন।—ইনি ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। যখন শত্রুপক্ষের 'গোয়েবেন' ও 'সার্ণহার্ষ্ট' নামক দুইখানি রণতরী বাহিরসমুদ্রে উৎপাত করিয়া বেড়াইয়াছিল, তখন ইনি উহাদিগকে তাড়া করিয়া শক্তিহীন করিয়া দিয়াছিলেন। দার্দ্দেনেলিস প্রণালী অবরোধকালে ইঁহার নৌবাহিনী বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিল।

ভাইস-এডমিরাল সার ডেভিড বিয়াটি।—বৃটিশ ব্যাটল ক্রুইজার নৌবাহিনীর নায়ক। ইনি জাটলাণ্ডের নৌযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে ইনি সার জন জেলিকোর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রধান নৌসেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন জন গ্লসপ।—ইনি সিডনি নামক সমরপোতের অধ্যক্ষরূপে এমডেনের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন।

কুমারী এডিথ ক্যাভেল।—বেলজিয়ামে যে সকল ইংরাজ নার্স রেড ক্রস সমিতির পক্ষ হইতে আহত ও পীড়িত সেনাগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কর্ত্রী ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণরা তাঁহাকে গুপ্তচররূপে অভিযুক্ত করিয়া নিষ্ঠুরের মত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। কুমারী ক্যাভেলের স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সমগ্র ইংরাজজাতি ইঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

রাজা এলবার্ট।—বেলজিয়ামের বীর রাজা। যখন জর্ম্মণীর মত বিরাট শক্তি তাঁহার রাজ্য দিয়া সৈন্যচালনা করিবার দাবী করিয়াছিল তখন তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষ হইতে ধ্বংসের ভয় না করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম গ্রীক লিওনিডাস অথবা সুইস উইলিয়াম টেলের মত জগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। যুরোপের সকল রাজা অপেক্ষা ইনি দীর্ঘায়তন।

ব্যারণ বেয়েন্স।—বেলজিয়ামের বৈদেশিক সচিব। ইনিও ইঁহাদের দেশের রাজার মত আসন্ন বিপদের মুখে পরম নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

জেনারল লেমান।—লিজের দুর্গরক্ষক। লিজ সহর ও দুর্গ অবরোধকালে ইনি অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ জন্য শত্রুমিত্র সকলেই ইঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ 'লিজন অফ অনার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ বিজেতাও রণজয়ের পর তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মুসিয়ে এডলফ ম্যাক্স।—বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলের শূরবীর বার্গোমাষ্টার। জর্ম্মণরা যে সময়ে ব্রাসেল অধিকার করে, সেই বিষম বিপদের সময়ে ইনি যেরূপে মস্তিষ্ক শীতল রাখিয়া শৃঙ্খলার সহিত নগর সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ডাক্তার উড্রো উইলসন।—বিশ্বযুদ্ধকালে ইনি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি ভাবুক এবং বিশ্বময় শান্তি ও সৌহার্দ্দকামী। মিত্রপক্ষকে রণজয়ে সাহায্য করিয়া রণজয়ের পর ইনি শান্তির দিনে জগতে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং জর্ম্মণীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৪ পয়েণ্ট এ জন্য বিখ্যাত। ইনি ১৪টি সর্ত্তে জগতে শান্তি আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়মদগর্ব্বিত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব শক্তিপুঞ্জ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। প্রেসিডেণ্ট উইলসন এ জন্য ভগ্নহৃদয় হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ আঘাত তিনি অধিককাল সহ্য করিতে পারেন নাই।

জেনারল জন. জে, পার্শিং।—মার্কিণ যুক্তরাজ্য হইতে যে বাহিনী মিত্রপক্ষের সাহায্যার্থ ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছিল, ইনি তাহার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সসৈন্যে আগমন মিত্রপক্ষের পক্ষে সে সময়ে যেন মরুভূমির মাঝে শীতল প্রস্রবণের মত কায করিয়াছিল। ওয়েলিংটন যেমন ওয়াটারলুর যুদ্ধে Come Blucher or night বলিয়া হতাশ চীৎকার করিয়া ব্লুকারকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইয়াছিলেন, মিত্ররাও সেইরূপ মার্কিণ ভ্রাতাকে পাইয়া স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিলুপ্ত চিতা

আজি শুষ্ক নদীবুকে প্রভাত-বেলায়
গিয়ে দেখি হায়,
নাহি চিতা, নাহি কালো দগ্ধ রেখা তার!
বালুকা-বালারা শুধু ঘিরে ঘিরে তারে
যেন ওগো অতি সকাতরে
মর্ম্মন্তুদ বেদনার ভরে
করিতেছে বুকভাঙা শোকে হাহাকার!

প্রিয়তমে! এইখানে তুমি;
শুয়ে আছ লইয়া শিয়রে
নিয়ে মোর জীবনের স্মৃতিময় বালুকার ভূমি;
মনে পড়ে আশ্বিনের রাতে,
শরতের ব্যথাহত শিশিরের সাথে
খ'সে তুমি পড়েছিলে শিউলীর প্রায়;
মোর কুঞ্জবন হ'তে হায়!
এ "সুবর্ণরেখা" তীরে আনি,
দগ্ধ অঙ্গারের সাথে আমি নিজ হাতে
মিশায়ে দিয়াছি তব হেম অঙ্গখানি।

সে দিন সুবর্ণ-তীরে,
জলেছিল যেই অগ্নি ওই বুক চিরে,
লোকে বলে সেই চিতা
মুছে গেছে বরষার নীরে;

লোকে বলে,—নাই চিতা,
কিন্তু হায় আমি জানি
এই তপ্ত বালুকার রামায়ণখানি;—
শোক-দগ্ধ প্রতি ছত্রে তার
রহিয়াছ তুমি মোর অভিশপ্ত জীবনের সীতা!

হায় প্রিয়তমে!
জানি আমি মরমে মরমে
ছাড়ি তুমি এই মিথ্যা ধরণীর দেশ,
এই বালু পাতালের কোলে করেছ প্রবেশ!
লোকে বলে—নাই, নাই, সেই চিতা নাই!
ঢাকিয়াছে না কি তারে একেবারে
কেবল কঙ্কর, ধূলি, ছাই;
আমি তো দেখিতে পাই
তুমি প্রতি বালু সাথে
প্রতি স্তরে স্তরে,
আছ এই নিখিলের প্রতি রেণু ভ'রে!
অন্যে কি বুঝিবে হায়,
যেই চিতা রেখেছ হেথায়
শত শত বরষার অজস্র ধারায়
অজস্র প্লাবন-বেগ বুকের উপরে
জলিবে সে চিতাখানি যুগ যুগ ধ'রে!

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কেরাণীর স্ত্রী

[গি দে মোপাসাঁর অনুকরণে]

(১)

রাণীর রূপের খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। রূপের হিসাবে সে রাজরাণী হওয়ারই যোগ্য। কিন্তু রূপের সঙ্গে রূপেয়ার স্তূপ না হইলে মনের মত বর জোটে কার! রাণীরও মনের আশা মনেই রহিল—রাজার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার সম্ভাবনা না থাকায় সে তাঁর নামেরই গৌরব লইয়া রহিল—এক কেরাণীর স্ত্রী!

কেরাণীর স্ত্রী হওয়াই কি একটা অপরাধের কথা?...জগতের মাঝে রাণীই কি একা কেরাণীর স্ত্রী?—না, কেরাণীদের ঘরণীর আশা রাখা নিতান্তই চাঁদ ধরিবার বাতুলতা? আসল কথা এই—যে রূপেয়ার অভাবে রূপেরও আদর নাই, সেই রূপেয়াই ঘরে থাকিলে কেরাণীও হইয়া উঠে মাথার মণি। রাণীর স্বামী একে কেরাণী তার উপর বেতন তার পঁয়ত্রিশটি টাকা মোটে! কাযেই শৈশবাবধি স্বামি-গৃহের যে সুখের কল্পনা লইয়া নবযৌবনে সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল, আহারে বিহারে কোথায়ও তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় না পাইয়া মন তাহার বিষাদের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার উপর স্বামীর সঙ্গে সহরে আসিয়াও যখন সে আশ্রয় পাইল ধনী গৃহস্থের ত্রিতল এক হর্ম্ম্যের কোণে, ক্ষুদ্র একতল অন্ধকার এক কুঠরীর মাঝে, তখন প্রতিবেশীর সমৃদ্ধির তুলনায় নিজেদের দৈন্য অধিকতর প্রকাশ পাইয়া মনে তাহার কেবলই অভিমানের খোঁচা লাগিতে লাগিল—'এই ত আমরা! আমরাও আবার মানুষ!'

স্বামী অতুলের আপিসে যেমন খাটুনি, গৃহের খাটুনিও তাহার অপেক্ষা বড় কম নহে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে পাছে স্ত্রীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নিজেই ভোরে উঠিয়া উনুন ধরাইয়া ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দেয়। ঠিকা ঝি বাসন মাজিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া, মসলা পিষিয়া চলিয়া যায়; স্বামী রান্না-ঘর আগলাইয়া থাকে—স্ত্রী সাবানের জলে গা মাজিয়া, স্নান করিয়া, ভিজা চুলে পাতা কাটিয়া, যতক্ষণ না অন্নপূর্ণার ভার বুঝিয়া লইবার অবসর পায়। বেচারা এত করিয়াও কিন্তু স্ত্রীর মুখে সোহাগের হাসি ফুটাইতে পারে না। খাওয়া-পরায় মাসের মাহিয়ানায় মাস কুলায় না, তবু সময়ে-সময়ে তাহার উদ্দেশেই স্ত্রীর ঝঙ্কার চলে—'যকের গোলাম কিপ্‌টে!'—কেন না, তাহার সোনার অঙ্গে এত দিনেও একখানি বই দুইখানি সোনা উঠিল না।

ত্রিতল বাড়ীর প্রতিবেশিনীরা সাজিয়া গুজিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের শিঞ্জন তুলিয়া কুটুম্ববাড়ী বেড়াইতে যায়; সপ্তাহে সপ্তাহে বায়স্কোপ দেখে, থিয়েটার দেখে; ফিরিবার বেলা হাস্য-কৌতুকে পাড়া জাগাইয়া তুলে; সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ জ্বলিয়া উঠে; খালি ঘরেও হু হু শব্দে পাখার হাওয়া খেলিয়া যায়; গ্রীষ্মের ছলে সৌখীন যুবতীরা চুল এলাইয়া, হাত-পা ছড়াইয়া, শ্বেত পাতরের মেঝেয় গড়া-গড়ি দিতে থাকে!—এই সব দেখিয়া শুনিয়া রাণীর অন্তরে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলিয়া উঠে। গরাদের গায়ে হাত চাপিয়া গুম্ হইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে, আর এক এক সময়ে মনে ভাবে—'এ জন্মটা বৃথাই গেল!

২

পৃথক্ হইলেও এ বাড়ীটি ত্রিতল-বাটীরই সীমানার মধ্যে,—হয় ত ঐ বাড়ীরই পুরাতন কোন মুহুরী-আমলার জন্য এক সময়ে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। বড়বাড়ীর খিড়কির সোজাসুজি এ বাড়ীরও একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে; তাহা ছাড়া এক তলের ছাদখানিও ও-বাড়ীর দোতালার বারান্দা-সংলগ্ন; বারান্দার রেলিংএর মাঝে এক কাটা দরজা, ছাদের উপর দিয়া বাড়ীর ভিতর যাওয়ার পথ মুক্ত রাখিয়াছে। অতুল, বাবুদের নিতান্ত অপরিচিত নহে বলিয়া, পথ আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে।

রাণী ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়াছে; সে শুনিল—দোতালার সামনের ঘরে মেজো বাবুর মেয়ে বীণা ছোট বাবুর মেয়ে মহারাণীকে বলিতেছে—'এঃ! রাণী হবারই যুগ্যি নয়, তুই আবার মহারাণী? আচ্ছা, মহারাণী ত দূরের কথা, বল্ দিকিন্, রাণী ক'রকম?'

মহারাণীর জবাব শোনা গেল—'তা আর আমি জানিনে! তুই জানিস্!...শুন্‌বি? রাণী হচ্ছে তিন রকম—রাজরাণী, চাকরাণী আর মেথরাণী। আমি ত মহারাণী অর্থাৎ রাজরাণীই আছি, চাকরাণী আর মেথরাণী হলি তুই।'

'আর?—আর যেটা রয়ে গেল?—কেরাণী? সে বুঝি তোর বর?'

ইহার পরই শুনা গেল হাসির খিল্ খিল্ ধ্বনি, আর দুই জনের ছুটাছুটির দুপ্ দাপ্ শব্দ।

দারিদ্র্য ছাড়া, কেরাণীর স্ত্রী হওয়াও যে একটা লজ্জার ব্যাপার, এত দিন তাহা রাণীর ধারণাই ছিল না। আজ বীণার উপহাস তাহাই যেন তাহাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিল। তাহার মনে হইল—এই বিদ্রূপের বাণ যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইয়াছে। সে এক হাত-আড়ায় কাপড়টাকে কোন রকমে মেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

সারা বিকাল তাহার মনে ফিরিয়া ঘুরিয়া এই একই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কেরাণীর স্ত্রী কি সত্য সত্যই উপহাসের পাত্রী? স্বামীর প্রতি যে শ্রদ্ধা দৈন্যের ভারে দিন দিন চাপা পড়িতেছিল,—আগ্নেয়-গিরি যেমন ভিতরের চাপে ভূগর্ভের চাপা পাতরও বাহিরে ছিটাইয়া ফেলে,—তেমনই সকলের কল্পিত উপহাসের চাপে তাহার অন্তরে চাপা শ্রদ্ধাটুকুও যেন ছিট্‌কাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যতই এড়াইয়া চলুক না, একের মনের অশান্তি অন্যের কাছে গোপন রাখা সহজ নহে। রাণী যতই দূরে দূরে থাকে, অতুলের মন ততই ব্যাকুল হইয়া যত্ন-আদরের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে কাছে আনিতে চায়। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সে ধরা না দিলে ত তাহাকে বাঁধিবে কার সাধ্য!

৩

আশ্বিনমাসের শেষাশেষি এক দিন ত্রিতল-বাড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল—মেজবাবুর ছোট খোকার ভাত। পাড়া-পড়শী সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, রাণীদেরও বাদ পড়িল না।

সহরে কেরাণীর স্ত্রীর নিমন্ত্রণ ত সহজে জুটে না। অতুল হাস্য-মুখে স্ত্রীর খোঁপা নাড়িয়া বলিল—'এবার দেখব পাতাকাটা চুলের বাহার কত! যত রূপসীই নেমন্তন্নে আসুন না, সবার উপর কিন্তু টেক্কা দিয়ে মহারাণী হয়ে আসা চাই—এই রাণুর!'

রাণী মাথা-নাড়া দিয়া এক পাশে সরিয়া গেল। কাঁধের আঁচল খোঁপার উপর তুলিয়া দিয়া জবাব দিল—'অ্যাঃ!...কে যাচ্ছে তোমার নেমন্তন্নে!'

অতুল অবাক্ হইয়া বলিল—'সে কি!...বল্‌তে গেলে এক বাড়ীরই কায,—নেমন্তন্নে যাবে না কেন?'

রাণী দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া বামদিকের কপাট ঘেঁসিয়া রহিল,—মুখে কিছুই বলিল না। অতুল স্ত্রীর হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল—'ব্যাপার কি, বল দেখি?…সত্যিই একটা কাণ্ড কোরো না যেন শেষে!…কি হয়েছে, বলই না?'

রাণী মুখ ভার করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল; ভ্রুকুটি করিয়া, বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল—'আমি কি দাসী বাঁদীর মত ভাত ভিক্ষে করতে বড়লোকের বাড়ী যাব না কি?…আমার কাপড় কই?'

'কেন, সেই যে টিয়েপাখী-রঙের সাড়ীখানি পুজোর আগে দিয়েছিলুম!…তাতে ত তোমায় দিব্যি মানায়।'

"ওঃ! সে আবার একটা কাপড়!—ছ'টাকা ন'সিকায় ফেরিওয়ালারা যা বেচে! আর, আজকাল ও রকম সাড়ী ভদ্দর লোকের মেয়েরা পরে না কি? পার ত, জরি-পেড়ে মাদ্রাজী সাড়ী একখান আমায় দাও—নইলে দাসী-বাঁদীর মত আমি বেরুতে পারব না।"

'আচ্ছা দেখি'—বলিয়া অতুল বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আপিসের কেসিয়ারকে অনেক বলিয়া কহিয়া আগামী মাসের বেতনের অর্দ্ধেক টাকা ধার করিয়া অতুল স্ত্রীর জন্য মাদ্রাজী সাড়ী কিনিয়া আনিল। সাড়ীর ভাঁজ খুলিয়া পরা-কাপড়ের উপরই তার আঁচল জড়াইয়া রাণী আলোর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ধার শোধের উপায় কি?'—এ কথা মনে আসিলেও, স্ত্রীর তখনকার হাস্য-দীপ্ত মুখখানি দেখিয়া অতুল সে দুর্ভাবনাকে আমলই দিল না।

৪

নিমন্ত্রণের দিন প্রাতে ঘুম হইতে চোখ মেলিয়াই রাণী বলিয়া উঠিল—"নাঃ! নেমন্তন্নে যাওয়া হইবে না।"

অতুল বলিল—"আবার কি হ'লো?…সাড়ী কি পছন্দ হ'লো না?"

"সা—ড়ী?…তা—এক রকম মন্দের ভাল হয়েছে। কিন্তু…অত লোকজনের মাঝে বড় লোকের বাড়ী নেড়া গলায় আমি যেতে পারব না।"

"এ আবার কি বায়না তুল্'লে? আমার হার দেওয়ার শক্তি থাকলে কবেই তোমায় দিতুম। আর শক্তি থাক্‌লেই বা এক্ষুনি হার জোটাই কোথা হ'তে?…এ তোমার অন্যায়, রাণু।…কে আর বল তোমার গলা দেখ্‌ছে। শেষ সময় তুমি দেখ্‌ছ মান-ইজ্জৎও রাখ্‌বে না—"

কথা শেষ না হইতেই রাণী ঝঙ্কারে দিয়া উঠিল—"আমি ত সেই মান-ইজ্জতের কথাই বলি গো!…আমি কি চাক্‌রাণী না মেথরাণী যে, খালি গলায় ভদ্দর সমাজে যাব?"

চাক্‌রাণী-মেথরাণীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করিবার সময় হয় ত কেরাণীর স্ত্রী কথাটিও রাণীর মুখে আসিতেছিল, কিন্তু সে কথা আর খুলিয়া বলিল না।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অতুল বলিল—"আচ্ছা, তোমার গঙ্গাজল সুশীলা না এখানে মাসীর বাড়ী আছে? তার কাছে দেখ্‌লে হয় না, এক ছড়া হার মিলে কি না?"

উৎসাহে রাণী লাফাইয়া উঠিল—"তাই ত! সুশীলা ত এখানেই!…চল…চল,—গাড়ী নিয়ে এস,—তার কাছে হার মিলবেই।"

হারের কথা বলিতেই সুশীলা রাণীর সম্মুখে গহনার বাক্স খুলিয়া ধরিল—"তোর যা খুসি, নে না।"

সুশীলা বড় ঘরের বধূ। গহনার বাক্স ভরা চুড়, চুড়ি, রুলি, জসম, বালা, ব্রেসলেট, ইয়ারীং ইত্যাদি হরেক রকম অলঙ্কার; আর হাতীর দাঁতের ছোট ছোট কৌটায় তিন চার ছড়া হার। রাণী বাছিয়া বাছিয়া হাতে লইল—এক ছড়া মুক্তার হার। হারটি দিব্যি দেখিতে, রাণীর গলায় মানায়ও বেশ। গঙ্গাজলের কাছে এই মুক্তার মালা চাহিয়া লইয়া সে গৃহে ফিরিল।

৫

গল্পগুজব করিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেই প্রায় অর্দ্ধেক দিন কাটিয়া গেল। দিনের আলোকে টিয়ারংএর সাড়ীখানি পরিয়া রাণীর রূপের যে বাহার খুলিয়াছিল, তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল, ফুটনোন্মুখ মাধুরিমার আবেশে যখন সে রাত্রির কৃত্রিম আলোকে প্রতিমার মত দেখা দিল, নূতন মাদ্রাজী সাড়ীখানিতে অঙ্গ ঢাকিয়া, আর গোলাপী কণ্ঠমূলে শুভ্র মুক্তামালা দোলাইয়া,—যেন দিবসের রৌদ্রমুক্ত একখানি মেঘের স্বচ্ছপাখা সন্ধ্যার রঙ্গীন আলোকের রামধনুতে চিত্রিত হইয়া প্রকাশ পাইল! এ রূপের প্রশংসা কে না করিয়া থাকিতে পারে?—যাহারা কাছে আসিয়া চোখ মেলিয়া তাহার মুখখানি দেখিতে লাগিল, তাহারা হার ছড়াও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—'বেশ ত জিনিস।'

বাসায় ফিরিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গেল। বড় গিন্নী ছাদের পথে আগাইয়া ছিলেন; রাণী ধীরপদে ঘরে ঢুকিল। অতুল বারোটা পর্য্যন্ত জাগিয়াই বসিয়া ছিল, ঢুলিতে ঢুলিতে সবে মাত্র পাশ-বালিসটার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেওয়ালের দর্পণে হারিকেনের আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল। রাণী ঘরে ঢুকিয়া আবার দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়ীর দিকে ফিরিয়া তাকাইল। তাহার পর, আলোটা একটু উস্কাইয়া দিয়া দর্পণের কাছে সরাইয়া লইল। অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া আত্মগরিমায় আজ হৃদয় যে তাহার নাচিয়া উঠিয়াছে;—শুধু পরের মুখেই এ প্রশংসার ভাগ লইয়া কি তৃপ্তি হয়! নিজের চোখে দেখিয়া মন যদি তাহার এ প্রশংসায় যোগ না দেয়, তবে তাহার আনন্দের আর মূল্য কি? রাণী হাস্যমুখে দর্পণের ভিতর নিজের রূপ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মুখ হইতে বুকে দৃষ্টি নামিতেই সে চমকাইয়া উঠিল—'এ কি! মুক্তার হার কোথায়?…এই ত একটু আগেও কে এক জন হারছড়া খুলিয়া লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিলেন না?…হাঁ হাঁ, তিনি ত তখনই হার ফিরাইয়া দিয়াছেন।'…রাণী নিজের কাপড়-চোপড় খুলিয়া ঝাড়িয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। আলো লইয়া সিঁড়ি, ছাদ ও বাড়ীর বারান্দার পথ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল।—কোথায়ও হার নাই।…এখন কি হইবে?…হারও যে পরের!

হতবুদ্ধির ন্যায় তখন সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীকে ঠেলিয়া তুলিল। অতুল ঘুম হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া প্রথমে কিছুই স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই; পরে যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া স্ত্রীর খোঁজা-পথ নিজেও বার বার খুঁজিতে লাগিল।…'এর মধ্যে তুমি অন্য কোন ঘরে যাওনি?…কলতলায়?…তাও না।…হোক না, একবার দেখায় দোষ কি!'…এই বলিয়া সে বাড়ীময় খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্থানেই হার নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়া খোঁজাখুঁজি—সে ত মুস্কিল! তবু রাণী বড় গিন্নীকে কি বলার ছলে উকিঝুঁকি দিয়া যতটা পারে দেখিয়া আসিল। বামা-ঝি এক হাঁড়ি সন্দেশ লুকাইয়া গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টায় ছিল—রাণী তাহার কাঁধে হাত দিয়া, বকশিসের লোভ দেখাইয়া, হারের সন্ধান লইতে বার বার অনুরোধ করিল। সকলেই খুঁজিল বটে, আর খোঁজাও হইল অনেক স্থান; কিন্তু কোথাও হার নাই—উপায়—এখন উপায়?

তবু মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা উঁকি দিতেছিল—ভোরে বড় বাবুকে বলিয়া যদি সন্ধান ঘটে!

পরদিন বড় বাবুও বাড়ীর ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন—কিছুই ফল হইল না।

রাণী বলিল—"সুশীলাকে জানালে হয় না?"

অতুল বলিল—"ছিঃ!" তার হয় ত মনে হইল—টাকার জন্য কি রাণীর মুখ হেঁট করা যায়!

অতুল আপিস কামাই করিয়া পরদিন এ দোকান সে দোকান ঘুরিতে লাগিল—ঐ হারেরই অনুরূপ হার মিলে কি না। হার এক দোকানে মিলিল বটে, কিন্তু তার মূল্যের সংস্থান কই?

ছয় শত টাকা ত কম কথা নয়!—তাহার হাতে এখন যে ছয় টাকাও নাই। স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া, বাসন-কোসন সামান্য যাহা আসবাবপত্র ছিল সব বেচিয়া-খুয়াইয়া, কাবুলীর দুয়ারে ধন্না দিয়া, আড়াই শত টাকার জোগাড় হইল; কিন্তু বাকী টাকা কই? অতুল বৈকালের ট্রেণেই দেশে গিয়া ভদ্রাসনখানি বন্ধক দিয়া বাকী টাকা সংগ্রহ করিল।

নিজের যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে মুক্তার মালা লইয়া অতুল যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাণীর ইচ্ছা হইতেছিল একবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া লয়। লজ্জায় সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না—স্বামীর কত দিনের কত আদরের কথা, কোন সময়ের কোন ত্যাগের স্মৃতি—একটার পর একটা জমা হইয়া তাহার বুক ভরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া এই একটা কথারই করুণ ধ্বনি গুঞ্জন করিতেছিল—'এই আমার কেরাণী স্বামী! এই স্বামীর স্ত্রী হওয়া যদি লজ্জাকর ব্যাপার হয়, তবে এ লজ্জা আমার নারীত্বের লজ্জারই মত দেহ-মন ব্যাপিয়া থাক্!'

৬

ঋণের দায় ত কম নহে। অতুল আহারের বাহুল্য বর্জ্জন করিল; রাণী ঠিকা ঝিকে বিদায় দিল; দুই জনে যুক্তি করিয়া পাকা কোঠা ছাড়িয়া দেড় টাকায় ভাড়া লইল এক খোলার ঘর।

রাণী নিজেই এখন রাঁধে-বাড়ে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর নিকায়। রান্নার হলুদে কাপড় ছোপাইয়া যায়—স্নানের সময় শুধু জল দিয়া রগড়াইয়া ধোয়; কয়লার কালিতে হাত ভরিয়া উঠে—উনুনের ছাই দিয়া ঘষিতে থাকে। অতুল এক এক দিন আগেরই মত আদর করিয়া বলিতে চায়—পাতাকাটা চুলেই তাহাকে মানায় বেশ, সে কেন আর পাতা কাটে না? স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়াই যেন রাণী তাহার বুকের মাঝে মুখ লুকায়—সারা মাথার এলো চুলে স্বামীর বুক ঢাকিয়া পড়ে। বিস্ময়-পুলকে অতুলের তখন মনে পড়ে—

'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্।'

স্বামী এক দিনও হারের কথা তোলে না; তাহার এ উদাসীনতা কিন্তু রাণীকে হুলের মত দিনরাত বিদ্ধ করে। সময়ে সময়ে সেই একটা দিনের দিগ্বিজয়ের গর্ব্বে তাহার অন্তরমাঝে বিদ্যুতের মত আত্মপ্রসাদের চমক খেলিয়া যায়, কিন্তু তখনই আবার হারের কথা স্মরণ হইয়া হৃদয়ে বজ্র-শলাকার আঘাত লাগে। তাহারই একটা দিনের খেয়ালে স্বামীর আজ এই দশা!

পাঁচ বৎসরে মানুষের কত আর পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু খাটুনির সঙ্গে দুশ্চিন্তা যাহাদের জীবন-সঙ্গী, তাহাদের পাঁচ বৎসর যে পঁচিশ বৎসরের আয়ু কাড়িয়া লয়! রাণীরও তাহাই হইল—শ্রমের অবসাদে শ্রী এখন তাহার লাবণ্যহীন, দুর্ভাবনায় ভ্রমরকৃষ্ণ মাথার কেশে শুভ্ররেখার রাজত্ব। রূপের হাটে তাহার মূল্য আজ কাণাকড়িও নহে।

৭

মহালয়ার দিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া রাণীর ঘাটে সাক্ষাৎ হইল তাহার গঙ্গাজল সুশীলার সঙ্গে। সুশীলা স্নান সারিয়া ভিজা কাপড়ে রাণীর গা ঘেঁসিয়াই যাইতেছিল, রাণী আঁচল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"সুশীলা?"

সুশীলা মুখ ফিরাইয়া রাণীর মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া রহিল; তাহার পর অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিল—"রাণী!…, রাণী, তোর এ কি হয়েছে? তোকে যে চেনা যায় না।…এত দিন কোথায় ছিলি? বল্, বল্ দিকিন্ তোর এ দুর্দ্দশা কেন?"

রাণী বলিল—"সুশীলা, দুর্দ্দশা নয়, আমার পাপের পেরাচিত্তি বল্।…তুই ত কিছুই জানিস্ না, আজ তোকে বল্‌ছি—তোর মুক্তার মালা নিয়েই আমাদের এ দুর্দ্দশা।"

মুক্তার মালা!…পাঁচ বৎসরের আগেকার কথা—সুশীলার, কই, কিছুই ত মনে পড়ে না। সুশীলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সখীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। রাণী সুশীলার নিকট একে একে হারের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিল।

সুশীলা বলিল—"তবে…সে হার ছড়া তোরা সতি সত্যিই ছ'শো টাকায় কিনেছিলি? আর,… তারই দায়ে, স্বামী তোর তার বাপের ভিটাও খুইয়েছে?"

রাণী বলিল—"হাঁ।"

সুশীলার চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল; ভিজা আঁচলে চোখ মুছিয়া সে আবেগভরে রাণীর দুই হাত আপন হাতে চাপিয়া ধরিল; বলিল—"কিন্তু, রাণি, এ কথাটা আগে কেন আমায় জানাস্‌নি? তোরা যে এত দিন মিছামিছি ভুলেরই পেরাচিত্তি করেছিস্!…আমার সে হারে যে আসল মুক্তা একটাও ছিল না, সবই ঝুটো. আর—তার দামও ছিল—বড় জোর পঞ্চাশ টাকা।"

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

আতুর-তর্পণ

সেথায়—হয় না আসর দূর পরিসর রচিয়া তোরণ-দ্বার,
হয় নাই রাখা পত্র পতাকা খচিয়া চমৎকার;
পাতি মখমল মণি ঝলমল মর্ম্মর বেদী'পরে,
মোহি অগণন দর্শক-মন বিপুল আড়ম্বরে;
হয় নাই তব পূজা আয়োজন, হে নর বৃহস্পতি!
কোথায় অর্ঘ্য তব সে যোগ্য? ভক্ত যে দীন অতি।
রুদ্ধ তাহার কুটীর-দুয়ার করে করি করলগ্ন,
তুলি' বনফুল বসেছে বাতুল তোমারি ধেয়ান-মগ্ন;
তুচ্ছ তাহার পূজা-উপচার সকলি অঙ্গহীন,
আছে সম্বল শুধু আঁখিজল, ঝরিছে রজনী-দিন।
হোথা উৎসব-শেষে যবে সব কলরব হ'ল বন্ধ,
নীরব কুটীরে উঠে তবু ধীরে ধূপদানে তার গন্ধ।
ও মহাসভার নিতে উপহার এস যদি মহাপ্রাণ,
ফিরিবার পথে দীনের কুটীরে দিও প্রভু দেখা দান।

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ।

দাম্পত্য-প্রণয়

৪

মাণিকপুর গ্রাম হইতে আগত বেণী বসু, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি একত্র বাসা করিয়াছেন। যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়া খুব আনন্দেই তাঁহারা সময় কাটাইতেছিলেন। বিশেষতঃ বেণী বসু থিয়েটার দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এই দলটি কলিকাতার কোনও একটি "অবৈতনিক" সম্প্রদায়। পুরুষমানুষই গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজে। এক দিন শকুন্তলা, এক দিন নব-নাটক এবং এক দিন নীলদর্পণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই আর এক দিন নীলদর্পণ অভিনীত হইবে। থিয়েটারের দল যেখানে বাসা করিয়াছে, বেণী বসু তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই দলের কয়েক জন লোকের সহিত বেশ আলাপও জমাইয়া তুলিয়াছেন। সীতানাথ ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিয়াছেন, গ্রামে ফিরিয়া তথায় একটি থিয়েটারের দল খুলিতে হইবে। এই অবৈতনিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা শিবনাথ সান্ন্যাল এ বিষয়ে ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শিবুর বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর, কথাবার্ত্তায় খুব চৌকস; কিন্তু একটু ইংরাজী বুকনি মিশানো তার অভ্যাস। অভিনয় কার্য্যে সে ওস্তাদ।

পাকাপাকি পরামর্শ করিবার জন্য বেণী বসু আজ শিবনাথকে নিজেদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া তিনি থিয়েটারী বাসায় গিয়াছিলেন; সন্ধ্যার পর শিবনাথকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় আসিতেছিলেন। পথে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, তুমিও যে এসেছ দেখছি!"

নরহরি বলিল, "না এসে আর করি কি বল, বেণীদা! গিন্নী যে ছাড়লেন না!"

"গিন্নীকেও এনেছ না কি?"

"এনেছি বৈ কি। তা ছাড়া মিত্তির বাড়ীর ঠান্‌দিদি, মুখুয্যেদের খুড়ীমা, জ্যেঠাইমাও এসেছেন। তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, আমি তাঁদের আন্‌তে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, তা বেশ বেশ। এলেই যদি, দু'দিন আগে আস্‌তে হয়; নীলদর্পণ দেখতে পেতে। আচ্ছা, তাতে ক্ষতি নেই, কা'ল রাত্রে আবার নীলদর্পণ হবে। দেখতে যেও নিশ্চয়! সে যে কি চমৎকার—দেখলে আর জীবনে ভুল্‌তে পারবে না। চল হে শিবু, রাত হয়ে যাচ্ছে।"

পথে শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে লোকটি?"

বেণী বসু নরহরির পরিচয় দিল; তাহার অসাধারণ পত্নীভক্তির বিষয়ও সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। শুনিয়া শিবু হাসিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিয়া বেণী বসু দেখিলেন, সীতানাথ হুঁকা হাতে বসিয়া পাকা রুই মাছের পোলাও রন্ধন তদারক করিতেছেন। বলিলেন, "শিবুকে ধ'রে নিয়ে এলাম, ঠাকুর্দ্দা। আর একটা খবর শুনেছেন? নরহরি এসেছে। এইমাত্র পথে আসতে আস্‌তে তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

সীতানাথ বলিলেন, "কে? আমাদের গ্রামের নরহরি? সত্যি না কি? বউকে ফেলে? দেখি দেখি, সূর্য্যি আজ কোন্ দিকে উঠেছিলেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতানাথ বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।

বেণী বসু বলিলেন, "বউকে ফেলে আস্‌বে, তাও কি সম্ভব, ঠাকুর্দ্দা? সঙ্গেই এনেছে।"

সীতানাথ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "বউটাকে এই ভিড়ে, গলায় বেঁধে নিয়ে এসেছে? কেলেঙ্কারী!"

বেণী বসু ইতোমধ্যে মাদুর বিছাইয়া, শিবনাথকে লইয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সীতানাথ দুই জনকে দুই ভাঁড় সিদ্ধি দিয়া, নিজে এক পাত্র লইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, "কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে? এক পাড়ায় বাস, আমাদের গিন্নীরাও ত সবই শুনেছেন, দেখেছেন; বাড়ী ফিরে গেলে আমাদের দশাটা কি হবে বল দেখি দাদা!"

বেণী বসু বলিলেন, "জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মার্‌লে! ইচ্ছে করে, আচ্ছা ক'রে নোরোটাকে জব্দ ক'রে দিই।"

"তা, দাও না—একটু শিক্ষা হোক্। কিন্তু কি উপায়ে জব্দ কর্‌বে, সেইটে বল দেখি?"

বেণী বসু সিদ্ধির খালি ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "কত রকম উপায় হ'তে পারে। এই ধরুন, গ্রামে কারু নামে এখান থেকে যদি একটা উড়ো চিঠি লেখা যায় যে, নরহরির স্ত্রীকে সুন্দরী দেখে, মোহান্ত মহারাজ—"

ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়া কহিলেন, "না না—তা কি কর্‌তে আছে? ছিছি, তা করো না। হাজার হোক্ সতীলক্ষ্মী! এমন কোনও উপায় বের কর, যাতে দু'জনের খুব চুলোচুলি বেধে যায়। দিন কতক একটু মজা দেখে নিয়ে, তার পর সব ভেঙ্গে দিলেই হবে এখন। কি বল শিবু ভায়া?"

শিবু বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই ভাল। ওর ওয়াইফ কি খুব সুন্দরী না কি?"

বেণী বসু বলিলেন, "এমন যে কিছু ডানাকাটা পরী, তা নয়, তবে রংটা ফর্সা আছে, মুখ-চোখও ভাল।"

"নাম কি?"

"কুসুমকুমারী।"

"এজুকেটেড? চিঠি লিখতে পারে?"

বেণী বসু বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! এ কি কল্‌কাতার মেয়ে যে লেখাপড়া জান্‌বে? কেন, জান্‌লে কি কর্‌তে? তার নামে কোনও জাল প্রেমপত্র-টত্র—"

শিবু বলিল, "না, এম্‌নিই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম।"

এই সময় আর দুই জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন। এ প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সীতানাথ উঠিয়া পাকের স্থানে গিয়া, পোলাও রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

৫

পরদিন সন্ধ্যায় আবার নীলদর্পণের অভিনয় হইল। নরহরি স্ত্রী ও ঠান্‌দিদি প্রভৃতিকে লইয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিল।

তাহার পরদিন থিয়েটারের দল কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যাত্রার দল, বাই, খেমটা প্রভৃতি এখনও আসর গরম রাখিয়াছে, এমন সময় মেলায় আর একটা নূতন "আকর্ষণ" উপস্থিত হইল। এক জন না কি অসাধারণ সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি লোকের হাত দেখিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ত তুচ্ছ কথা, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন তবে, তাঁহার দক্ষিণাটা কিছু বেশী—নগদ ষোল আনা। তিনি না কি কেদার-বদরীর পথে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫।৬ হাজার টাকা লাগিবে, তাই বাবাজী এই উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন মাত্র—নচেৎ তাঁহার আহার দৈনিক আড়াই সের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফলমূল মাত্র।

বেণী বসু এক দিন গিয়া হাত দেখাইয়া আসিলেন। পরিচিত অপরিচিত যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিতে লাগিলেন, "বাবাজীর ক্ষমতা একবারে অদ্ভুত! অত্যাশ্চর্য্য! আমার জীবনের পূর্ব্বকথা যা যা বল্লেন, শুনে ত মশাই আমি 'থ' হয়ে গেছি।" আবার কেহ কেহ এমনও বলিতেছে, "বেটা বুজরুক্! আন্দাজি ঢিল মারে, এক একটা লেগেও যায়। টাকা উপায়ের

একটা ফন্দি করেছে।”—কিন্তু তথাপি হাত গণাইবার লোকের অভাব হইতেছে না। বাবাজী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, বেলা ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পুরুষগণের হাত দেখিবেন। একটি কাগজে নাম-ধাম ও জন্ম-নক্ষত্র লিখিয়া, সেই কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া, চেলার দ্বারা ভিতরে বাবাজীকে পাঠাইয়া দিতে হয়; যথাসময়ে ডাক পড়ে।

সে দিন সন্ধ্যার পর রন্ধন করিতে করিতে খুড়ীমা নরহরির স্ত্রী কুসুমকে বলিলেন, “আচ্ছা বউমা, তুমি একবার গিয়ে হাত দেখাও না কেন! তোমার ছেলেপিলে হ'ল না কেন, কি ব্রত-ট্রত মানত টানত কর্‌লে হ'তে পারে, সেটা জেনে এলে হয়।”

জ্যেঠাইমা ও ঠান্‌দিও এ প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। কুসুম গিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল; নরহরি আপত্তি করিল না।

পরদিন প্রাতে কুসুমকে লইয়া ইঁহারা বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নিয়ম অনুসারে নাম ও জন্মনক্ষত্র লেখা কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া চেলা বাবাজীর দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া, বাহিরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ডাক হইতে লাগিল। ক্রমে শেষ যিনি গিয়াছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, চেলা ডাকিল, “কুসুমকুমারী দাসী—কুসুমকুমারী দাসী কার নাম? শীগ্‌গির এস।”

কুসুম উঠিল। ভিতরে যাইতে তাহার পা কাঁপিল। প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ জটাজূটধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাবাজীকে দেখিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন, “জিতা রও বেটী! তুমি কি জান্‌তে চাও, বল।”

কুসুম সভয় কণ্ঠে বলিল, “আজ ১৫ বচ্ছর হ'ল আমার বিয়ে হয়েছে—আজ পর্য্যন্ত একটি সন্তানের মুখ দেখতে পেলাম না, তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষে বড়ই মনের দুঃখে আছি, বাবা! কি পাপে এ রকম হ'ল, কি কর্‌লে সে পাপ খণ্ডাতে পারে, সেইটি যদি বাবা দয়া ক'রে আমায় ব'লে দেন!”

বাবাজী বলিলেন, “হুঁ! তোমার একটি সন্তান দরকার? তার জন্যে চিন্তা কি? কি সন্তান চাও? পুত্তুর সন্তান, না কন্যে সন্তান?”

কুসুম সলজ্জভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, “একটি পুত্তুর সন্তান হলেই আমার শ্বশুর-বংশের জলপিণ্ডি বজায় থাকৃত, বাবা!”

বাবাজী বলিলেন, “হুঁঃ—পুত্তুর সন্তান চাই? এ আর বিচিত্র কথা কি?—এস, স'রে এস, বাঁ-হাতখানি তোমার দেখি!”

কুসুম সভয়ে অগ্রসর হইয়া, নিজ বামহাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। বাবাজী হাতখানি ধরিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “না, তোমার পুত্তুর সন্তান হবে না—কোন সন্তানই হবে না।”

কুসুম কাতরভাবে বলিল, “কেন, বাবা? কি পাপের জন্যে—”

বাবাজী বাধা দিয়া বলিলেন, “বিশেষ কোনও পাপের জন্যে নয়, মা—কোনও একটা গূঢ় কারণের জন্যেই তোমার সন্তানভাগ্য নষ্ট হয়ে গেছে।”

কুসুম হাতযোড় করিয়া বলিল, “কেন, বাবা, কি গূঢ় কারণ?”

বাবাজী বলিলেন, “সে গূঢ় কারণটি পূর্ব্বজন্মঘটিত। শুনতে চাও?”

কুসুমের কৌতূহল অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, “হ্যাঁ বাবা, দয়া ক'রে বলুন—জান্‌বার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।”

বাবাজী বলিলেন, “কিন্তু সে যে অতি গুহ্য কথা, মা! অন্য কিছু ত নয়—পূর্ব্বজন্মের কথা,—নরলোকে তা প্রকাশ করাই নিষেধ। তবে আমি তোমায় বল্‌তে পারি, যদি তুমি আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌তে পার যে, সে কথা এ জীবনে কাউকে, এমন কি, তোমার স্বামীকেও বল্‌বে না। যদি এ নিষেধ অমান্য কর, তবে এক মাসমধ্যেই তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে দেখ।”

কুসুম কোনও ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই বলিল, “না বাবা, আমি কারুথকে বলবো না। আপনার পা ছুঁয়ে

দিব্যি করছি—” বলিয়া সভয় কম্পিতহস্তে বাবাজীর পদস্পর্শ করিল।

বাবাজী তখন মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া, অনুচ্চ স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

“পূর্ব্বজন্মেও তুমি কায়স্থকুলেই জন্মেছিলে—তুমি এক জন লক্ষ্মীমন্ত লোকের স্ত্রী ছিলে। মুকসুদাবাদ সহরে, তোমার স্বামীর মস্ত একটা নুণের গোলা ছিল, প্রায় লাখো টাকার কারবার। নৌকো নৌকো বোঝাই নুণ আস্‌তো,—২০।২৫ জন দুলে, বাগ্দী—এই রকম সব ছোট জাত—তোমাদের মাইনে করা চাকর ছিল, তারা সব, নুণের বস্তা নৌকো থেকে নামিয়ে, পিঠে ক’রে বয়ে বয়ে, গোলায় নিয়ে গিয়ে তুল্‌তো। আবার, নুণ কোথাও চালান দিতে হ’লে, গোলা থেকে বের ক’রে পিঠে ক’রে নিয়ে গিয়ে নৌকোতে বোঝাই দিত। এই ছিল তাদের কাষ। এ জন্মে যে লোক তোমার স্বামী হয়েছে, সেও ছিল তোমাদের এক জন মাইনে করা মুটিয়া,—জেতে বাগ্দী ছিল।”

কুসুম বলিয়া উঠিল, “অ্যাঁ! বাগ্দী!”—ঘৃণায় তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

“হ্যাঁ—বাগ্দী ছিল। নামটি যদি জান্‌তে চাও, তাও ব’লে দিতে পারি। কেষ্টা বাগ্দী। গতজন্মে তুমি বড়ই রাগী ছিলে মা, কিন্তু বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলে। স্বামীর মৃত্যুর পর কারবারটি তুমি নিজেই চালাতে লাগলে। ঐ কেষ্টা বাগ্দী ছিল বিষম চোর। তোমার নুণের গোলা থেকে গঙ্গার ঘাট প্রায় পোয়াটেক পথ। কেষ্টা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই পথে দুই এক বস্তা নুণ, আধাকড়িতে কাউকে বেচে ফেল্‌তো। এক দিন ধরা প’ড়ে যায়। তোমার কাছে খবর হ’ল। সেই শুনে তুমি রেগে কাঁই! সরকারকে হুকুম দিলে, ‘হারামজাদা বেটাকে দশ জুতো মেরে, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও।’—কেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি কর্‌লে, সরকারের পায়ে ধ’রে কেঁদে বল্লে, ‘দোহাই সরকার মোশাই, এবার আমায় মাফ কর্‌তে আজ্ঞে হয়—আর কক্ষনো এমন কাষ কর্‌বো না।’—সরকার বল্লে, ‘কর্ত্রাঠাকুরুণ নিজে হুকুম দিয়েছেন, আমি মাফ কর্‌বার কে রে বেটা!’—হুকুম তামিল হ’ল; কেষ্টার পিঠে দশ ঘা জুতো মেরে, তাকে দূর ক’রে তাড়িয়ে দেওয়া হ’ল। কেষ্টা দুঃখে, অভিমানে সেই দিন গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা কর্‌বে স্থির কর্‌লে। গঙ্গার ধারে গিয়ে, ‘হে মা গঙ্গে, হে মা পতিতপাবনি! এই অধম সন্তানকে তোমার কোলে ঠাঁই দাও মা!—তোমার অভাগা সন্তানের এইমাত্র ভিক্ষা, মা, আর জন্মে আমি ঐ হারামজাদী কর্ত্রীঠাকুরুণকে যেন উঠতে-বসতে জুতোপেটা কর্‌তে পারি।’—এই বল্‌তে বল্‌তে কেষ্টা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল।”

কুসুম বলিল, “সে আমাকে জুতো মার্‌তেই চেয়েছিল। তবে আমার স্বামী হয়ে জন্মালো কেন?”

বাবাজী বলিলেন, এইটে আর বুঝতে পার্‌লে না, মা? নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককে কি জুতো মারা চলে? শাস্ত্রের নিষেধ যে!”

কথাগুলি শুনিয়া কুসুমের তখন বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, “কিন্তু বাবা, কৈ, সে ত আমার সঙ্গে কোনও দিন কোনও দুর্ব্ব্যবহার করেনি! বরঞ্চ—”

গণৎকার বলিল, “দাঁড়াও মা, এখনই কি তাই সে করবে?—এখনও যে তুমি, কি বলে হুঁ হুঁ—ছেলেমানুষ কি না! আর বছর কতক যাক্, তোমার চুল ২।১ গাছি পাকুক, তখন দেখো, তোমার সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে। অত কথায় কায কি, তোমায় একটা পরীক্ষা আমি ব’লে দিচ্ছি; তা হ’লেই তুমি বুঝতে পার্‌বে, আর জন্মে ও কেষ্টা বাগ্দী ছিল কি না।”

কুসুম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “কি পরীক্ষা, বাবা?”

বাবা বলিলেন, “ও যখন ঘুমুবে, তুমি ওর পিঠ চেটে দেখো।—আর জন্মে পিঠে নুণ ব’য়ে ব’য়ে পিঠ এমন নোন্‌তা হয়ে গেছে যে, এখন ২।৩ জন্ম লাগবে ওর সেই নুণ কাট্‌তে।—আচ্ছা, এখন ঘরে যাও মা, অনেক লোক এখনও অপেক্ষা কর্‌ছে।”

কুসুম তখন গণৎকার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ম্লানমুখে সজল-নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিলে, সুযোগমত নরহরি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হাত দেখে বাবাজী কি বল্লেন?”

কুসুম সংক্ষেপে উত্তর করিল, “ছেলে হবে না বল্লেন!”—বলিয়া ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

৬

নরহরি সেই দিনই আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্ণকালে আবার তারকেশ্বর দর্শনে চলিল। তথায় গ্রামস্থ বন্ধুগণের আড্ডায় পৌছিয়া দেখিল, সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থানে গিয়া দুই এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আর সকলে কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "তারা হাত গোণাতে গেছে।" গণৎকার ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অনেক প্রশংসাবাদ করিল। বলিল, "আমরাও যাচ্ছি—যাবে তুমি?"

নরহরি ভাবিল, কুসুম ত হাত দেখাইয়া গিয়াছে, গণৎকার ঠাকুর তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, সন্তান হইবার কোনও আশা নাই। যাই না, আমিও হাত দেখাই, আমাকেই বা কি বলেন, শুনা যাক। আমিই যে কুসুমের স্বামী, তাহা ত আর ঠাকুর জানেন না! তাঁহার যথার্থ গণনাশক্তি আছে অথবা বুজরুকি মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার এই সুযোগ। বলিল, "বেশ, চল, আমিও হাত দেখাব।"

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নাম-ধাম ও জন্ম-নক্ষত্র-লিখিত কাগজে একটি টাকা জড়াইয়া, চেলার দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া নরহরি অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার ডাক হইল।

নরহরি ভিতরে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি তোমার মনস্কামনা, বল, বাবা!"

নরহরি বলিল, "মনস্কামনা এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার হাতটা একবার দেখুন; আমার আয়ুস্থান, ধনস্থান, পুত্রস্থান,—এইগুলো সব কেমন, সেইটে জান্‌বার অভিলাষ।"

"আচ্ছা, স'রে এস—দাও, হাত দাও, দেখি।"

নরহরি, বাবাজীর নিকট বসিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া, বাবাজীর পরিচ্ছদটি দেখিতে লাগিল। এত টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু—ওঃ—কি বৈরাগ্য! আলখাল্লাটি ছেঁড়া এবং তালি দেওয়া, তাও রং মিলে নাই। অথচ ইচ্ছা করিলে ইনি রোজ একটা নূতন রেশমী আলখাল্লা কিনিয়া পরিতে পারেন।

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ নরহরির হস্ত নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার আয়ুস্থান ত তেমন সুবিধে নয়, বাবা! ৫২ বছর মাত্র তোমার পরমায়ু, ঐ সময় তোমার অপঘাতমৃত্যু। বিষপ্রয়োগে তোমার মৃত্যু—তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"

শুনিয়া নরহরি শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ঠাকুর!"

ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি বল্‌ছি? বল্‌ছে তোমার অদৃষ্টলিপি। ধনস্থান—বড় মন্দও নয়; ৪০ বৎসর বয়স হ'লে হঠাৎ এমন একটা উপায়ে তোমার বিপুল ধনাগম হবে, যা তুমি কখনও স্বপ্নেও ভাবনি। তার পর যশস্থান, সেটাও ঐ ৪০ বছর বয়সের পরে। যশ জিনিষটে ধনেরই অনুগামী কি না! তার পর পুত্রস্থান—কৈ, না, এখানে ত কিছুই নেই, একেবারে শূন্য যে! তোমার কি কোনও ছেলেপিলে হয়েছে?"

নরহরি হতাশভাবে বলিল, "না।"

বাবাজী বিষণ্ণভাবে মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন, "একদম শূন্য।"

"কেন বাবা, পুত্রস্থান আমার শূন্য হ'ল কেন? এটা খণ্ডাবার কি কোনই উপায় নেই? কোনও রকম ব্রত-ট্রত কি যাগ-যজ্ঞ কর্‌লে দোষটি খণ্ডাতে পারে না?"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কয় স্ত্রী?"

"একটিমাত্র।"

বাবাজী ঠোঁট গুটাইয়া বলিলেন, "হুঁ! সে আমি তোমার হাত দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ স্ত্রীর গর্ভে তোমার সন্তান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি অন্য বিবাহ কর, তা হ'লে সন্তান আপনিই হবে, তার জন্যে যাগ-যজ্ঞ কিছুই কর্‌তে হবে না। কিন্তু এ স্ত্রী হ'তে হবে না। শুধু তাই নয়, বাবা, এ স্ত্রীকে তুমি বেশী 'নাই' দিও না।"

"কেন, বাবা? 'নাই' দিলেই বা কি অশুভ হবে, না দিলেই বা তার শুভফল কি?"

বাবাজী বলিলেন, "'নাই' দিলে মাথায় উঠবে। আসল কথা শুন্‌তে চাও? সে কিন্তু গত জন্মের কথা।"

"বেশ ত, বলুন না।"

"'বেশ ত বলুন না' বল্লেই হলো না, বাবা! পূর্ব্ব-জন্মের কথা—এ সকল গুহ্যাতিগুহ্য বিষয়। যাকে তাকে অমনি বল্লেই হ'ল! তুমি যদি আমার পা ছুঁয়ে দিব্য কর্‌তে পার যে, আজ আমি তোমায় যা শোনাব, তা তুমি নরলোকে কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে না, তবেই তোমায় বল্‌তে পারি। কথাটি যদি তুমি প্রকাশ ক'রে ফেল, তবে তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে।"

নরহরি কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার পর বাবাজীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

বাবাজী তখন বলিতে লাগিলেন, "আর জন্মে তুমি মুখসুদাবাদে নবাব সরকারে চাকরী কর্‌তে। অবস্থা তোমার বেশ ভালই ছিল। বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলে। এ স্ত্রী ভারী সুন্দরী ছিল। যেমন হয়ে থাকে, তুমি তার অত্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়েছিলে; যাকে ঘোর স্ত্রৈণ বলে, তাই আর কি! তোমার একটি কুকুর ছিল ঠিক কুকুর নয়—কুকুরী—তোমার আগেকার স্ত্রী সেই কুকুরটিকে বড়ই ভালবাসতেন। তোমার এই দ্বিতীয় পক্ষটি, সেই জন্যে, কুকুরটিকে মোটেই দেখতে পারতেন না। তাকে মারতেন, ভাল ক'রে খেতে দিতেন না। এক দিন তিনি কুকুরটিকে এক লাথি মেরেছিলেন, কুকুর রাগ না সাম্‌লাতে পেরে খ্যাঁক ক'রে তাঁর পায়ে কামড়ে দেয়। এই আর যায় কোথায়! তিনি ত কেঁদেকেটে অনর্থ। তুমি বাড়ী এসে, তাই দেখে, রাগের বশে কুকুরের মাথায় এক লাঠি মেরেছিলে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মর্‌বার সময় সে মনে মনে বলেছিল, কার দোষ, বাবু তার কিছুই অনুসন্ধান কর্‌লেন না, স্ত্রীর কথা শুনে আমার প্রাণবধ কর্‌লেন!—এই ভাবতে ভাবতে সে প্রাণত্যাগ কর্‌লে। তার পরেই তার আত্মা, কাশীতে বাবা কাল-ভৈরবের দরবারে উপস্থিত। কালভৈরবই হলেন কুকুর-দের দেবতা কি না। কুকুরটি হাতযোড় ক'রে বাবাকে বল্লে, 'হে বাবা কালভৈরব, এই বর আমাকে দাও, আর জন্মে যেন ওকে আমি এর প্রতিফল দিতে পারি। আর জন্মে আমি যেন কামড়ে ওকে মেরে ফেল্‌তে পারি।' বাবা বল্লেন, 'পাগলা কুকুর না হ'লে ত তার কামড়ে মানুষ মরে না। তা ছাড়া তোর পাপ শেষ হয়েছে, তুই এবার মানুষ হয়ে জন্মাবি। তার চেয়ে বরঞ্চ তুই ওর স্ত্রী হয়ে জন্মাস্, বিষ খাইয়ে ওকে মেরে ফেলিস্।' সেই জন্যেই সেই কুকুর—বা কুকুরী—তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মেছে—তোমায় বিষ খাইয়ে মারবে, তবে ছাড়বে!"

নরহরি বলিল, "কি বলেন আপনি! আমার স্ত্রী আর জন্মে কুকুরী ছিল—আমিই তাকে মেরে ফেলে-ছিলাম, এ কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি?"

বাবাজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। প্রকৃত ঘটনা যা, তাই আমি তোমায় বল্লাম। তুমি পীড়াপীড়ি কর্‌লে ব'লেই বল্লাম, নৈলে কারু পূর্ব্বজন্মের কথা সহসা আমি প্রকাশ করিনে।"

নরহরি সবিনয়ে বলিল, "বাবা, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, তাই আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ ও কথাটা বেরিয়ে পড়েছিল; আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, বাবা! কেবল একটা বিষয়ে খট্‌কা ঠেক্‌ছে। আমাকে বিষপ্রয়োগেই যদিও মার্‌বে, তা হ'লে স্ত্রী হয়ে জন্মাবার কি দরকার ছিল? অন্য যে কেউ ত—"

বাবাজী বলিলেন, "এ ত সে কুকুর বলেনি, বলেছেন বাবা কালভৈরব; দেবতার লীলা কি সহজে বোধ-গম্য হয়? বোধ হয়, এর মীমাংসা এই,—ও সব কাযে স্ত্রীর যেমন সুযোগ হবে, তেমন আর কার?"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে!"

বাবাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ের প্রমাণ যদি পাও, তা হ'লে বিশ্বাস হবে ত?"

নরহরি বলিল, "আপনার দয়া।"

বাবাজী তাহাকে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর নামটি এতে লেখ।"

বাবাজী কাগজখানি ফেরত লইয়া কুসুমকুমারী নামের ২য়, ৩য় ও ৫ম অক্ষর কাটিয়া, সেটি নরহরির হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

নরহরি পড়িল—"কুকুরী।" তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন, "আরও প্রমাণ আছে। রোজ রাত্রে, তুমি ঘুমুলে, কুকুরের যা স্বধর্ম—তোমার স্ত্রী

তোমার পিঠ চাটে—কোনও দিন জান্‌তে পারনি কি ?"

"আজ্ঞে না। আমার ঘুমটা খুব গভীর হয়।"

"আচ্ছা, এক দিন ঘুমের ভাণ ক'রে পিছু ফিরে শুয়ে থেক। তা হ'লেই দেখতে পাবে।"

নরহরি বিদায় গ্রহণ করিল। মেলার কোনও তামাসা দেখা আর তাহার ভাল লাগিল না। তারকেশ্বরে থাকিতেই আর ভাল লাগিল না।

পরদিন ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমার বিস্তর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলকে লইয়া নরহরি বাড়ী ফিরিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর সীতানাথ দত্তের তারকেশ্বরের বাসায় শিবনাথ তাস খেলিতে আসিল। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল হে, শিবু ?"

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, "পরামর্শ যেমন যেমন হয়েছিল, ঠিক সেই রকমই বলেছি। কিন্তু দাদা, যাই বল, ছুঁড়ীটেকে যখন বল্লাম, তোমার স্বামী আর জন্মে বাগ্দী ছিল, তখন তার মুখখানি এমন হয়ে গেল যে, দেখে আমার ভারী দুঃখ হ'তে লাগলো। ভাবলাম, দূর হোক্ গে, কথাটা পাল্টে নিই ;—অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লেছিলাম।"

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মিন্‌ষেটা ?"

"মিন্‌ষেটার প্রাণে বড় ভয় হয়েছে। স্ত্রী বিষ খাওয়াবে, সোজা কথা ?"

বেণী বসু বলিলেন, "কিন্তু বুদ্ধিটে খুব বের করেছিলে ভায়া। হাঃ হাঃ—এক জন ছিল কুকুরী, এক জন নূণ বওয়া মুটে! বাস্তবিক তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।"

সীতানাথ বলিলেন, "ওরা হ'ল কলকাতার ছেলে! ওদের হাড়ে ভেল্কী খেলে!"

সকলে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সীতানাথ বলিলেন, "সাজগোজটিও তোমার চমৎকার হচ্ছে। আচ্ছা, ঐ দিনে কত টাকা রোজগার হ'ল ?"

শিবু বলিল, "ও দিকে রোজ ২৫।৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত হচ্ছিল। এখন ক্রমেই কিন্তু কমছে। মেলা ত প্রায় ভেঙ্গে এল কি না। লোক আর তেমন কৈ ?"

তাহার পর তাসখেলা আরম্ভ হইল।

৭

সে দিন নরহরির বাড়ী পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—কুসুম তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া আসিয়া আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল।

আহারের সময় নরহরির মনে হইতে লাগিল, যেন সে কুকুরের ছোঁয়া ভাত খাইতেছে। খাইয়া তৃপ্তি হইল না ; পুরা খাইতেও পারিল না ; অর্দ্ধেক ভাত পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আচমন করিয়া, পাণ মুখে দিয়া নরহরি বিছানায় শয়ন করিল। কুসুম আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নরহরি বলিল, "যাও, আর দেরী কোর না—খেয়ে এসে শুয়ে পড়, সারাদিন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে শরীর একবারে এলিয়ে গেছে—আমি ত ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে।"

কুসুম রান্নাঘরে চলিয়া গেল। স্বামীর থালার নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করবো ? পাতে আর খাব কি ? কায়েতের মেয়ে হয়ে শেষে বাগ্দীর এঁটো খাব ?"—আবার ভাবিল, "আর জন্মেই বাগ্দী ছিল, এ জন্মে ত কায়েত। আর, হাজার হোক্, স্বামী ত বটে!—খাই না হয়!"

হেঁসেল হইতে আর কিঞ্চিৎ ভাত-তরকারী আনিয়া পাতে ঢালিয়া লইয়া কুসুম খাইতে বসিল। কিন্তু, বাগ্দীর এঁটো খাইতেছি মনে করিয়া তাহার গা-টা কেমন "ঘিন্ ঘিন্" করিতে লাগিল।

কোনমতে আহার শেষ করিয়া কুসুম উঠিল। কাযকর্ম্ম সারিয়া শয়নঘরে গিয়া দেখিল, স্বামী বিছানার অপর প্রান্তে পাশ-বালিস আঁকড়াইয়া, পিছু ফিরিয়া নিদ্রিত। তাঁহার নিশ্বাস বেশ গভীরভাবে পড়িতেছে।

কুসুম পাণ খাওয়া শেষ করিয়া, বাহিরে গিয়া কুলকুচু করিয়া, মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া লইল। তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঘুমুলে ?"

কোনও উত্তর নাই। কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুলে না কি ?"

উত্তর নাই। কুসুম তখন স্বামীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন বুঝিয়া জিহ্বা দ্বারা ধীরে ধীরে, তাহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে লাগিল। হাঁ, নোনৃতা ত বটেই! পিঠে নুণের বন্যা না বহিলে কি কারও পিঠ এত লবণাক্ত হইতে পারে? বাবাজীর কথায় কুসুমের মনে একটু যাহা সন্দেহ ছিল, এতক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার পর খাট হইতে নামিল। প্রদীপ জ্বালিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। নরহরি মাথা তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল, স্ত্রীর শাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ-মাত্র দেখিতে পাইল। ভাবিল, "এত রাত্রে আর চল্লেন কোথায়? হাড়-টাড় চিবুতে না কি?"—বারান্দায় জলের শব্দ শুনিল, কুসুম কুলকুচু করিতেছে। নরহরি আবার উপাধানে মস্তক দিয়া নিদ্রার ভাণ করিল।

কুসুম ঘরে আসিয়া একটি পাণ খাইয়া শয্যার প্রান্ত-দেশে সঙ্কুচিতভাবে শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণমধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নরহরি তখন উঠিয়া বাহিরে গিয়া জল-হাতে পিঠের চাটা অংশটুকু বেশ করিয়া ধুইয়া আসিয়া শয়ন করিল।

৭

স্বামি-স্ত্রীর সে অখণ্ড স্নেহপ্রেম কোথায় উড়িয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কোনও দিন যাহা হয় নাই—তাহাও হইতে লাগিল—মাঝে মাঝে কলহ-কিচিকিচিও হইতে লাগিল। ক্রমে কুসুম শুনিল, তাহার সন্তান হয় না বলিয়া স্বামী নাকি আবার বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে কুসুমের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

প্রস্তাবিত সখের থিয়েটারের দল খুলিয়াছে। সীতা-নাথ হইয়াছেন অধ্যক্ষ। শিবনাথ কলিকাতায় গিয়াই একখানি শকুন্তলা নাটক পাঠাইয়া দিয়াছিল। নীলদর্পণ শক্ত, তাই শকুন্তলারই অভিনয় প্রথমে হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বেণী বসুর বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হইয়া মহলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নরহরি এক দিন এই আড্ডায় আসিয়া বলিল, "আমিও সাজবো—আমাকেও একটা কিছু পার্ট দাও।"

সীতানাথ বলিলেন, "আমাদের কিন্তু রিহার্শাল ভাঙ্গতে কোনও দিন রাত ১০টা, কোনও দিন রাত ১১টাও বেজে যায়। অত রাত অবধি পারবে তুমি থাকতে?"—বলিয়া ব্যঙ্গভরে চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

নরহরি বলিল, "তা খুব পারবো।" বাস্তবিক কিছুক্ষণ গোলেমালে থাকিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হওয়াই নরহরির উদ্দেশ্য। নরহরিকে রাজমন্ত্রীর পার্ট দেওয়া হইল। বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে অভিনয় শিক্ষা করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরেই কলিকাতা হইতে শিবনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নিজে কণ্বমুণি সাজিবে এবং অভিনয়কাল অবধি এইখানে থাকিবে। সে কলি-কাতায় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে, টাকা পাঠাইলেই ড্রেস, সীন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিবে। খুব উৎসাহের সহিত মহলা চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে পোষাক প্রভৃতি আসিল। আগামী কল্য রথযাত্রার দিন প্রথম অভিনয় হইবে। অদ্য ড্রেস রিহার্শাল। কিন্তু নরহরি সহসা অনুপস্থিত।

নরহরিকে ডাকিতে তার বাড়ীতে লোক ছুটিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তার বড় বিপদ, তার স্ত্রী ঝগড়াঝাটি করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতেছে। কল্য ভোরে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পৌঁছাইতে যাইবে—সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ড্রেস রিহার্শালে না হয় সে নাই নামিল। কিন্তু কল্য রাত্রে অভিনয়! নরহরির শ্বশুরালয় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভোরবেলা রওয়ানা হইয়া সেই দিনই আবার কি সে ফিরিয়া আসিয়া প্লে করিতে পারিবে? অসম্ভব! সুতরাং তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বয়ং তিনি নরহরির গৃহে যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "যাই, ব'লে কয়ে দুটো দিন যদি দেরী করাতে পারি।"

শিবু বলিল, "তার চেয়ে চলুন, আমিও যাই—গিয়ে ব্যাপারটা ভেঙ্গেই দিয়ে আসি। ২।৩ মাস হয়ে

গেল—আর কেন? ফরনথিং আর তাঁ'দিকে কষ্ট দেওয়া কেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তবে তাই কর—রহস্যটা ভেঙ্গেই দাও। তা হ'লে একলাই তুমি যাও। আমাদের সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না।" শিবু বলিল, "না, না—আপনি অন্ততঃ চলুন সঙ্গে, ঠাকুর্দ্দা!"

সীতানাথ বলিলেন, "আচ্ছা চল।"

এক হস্তে গেলাস-বাতিযুক্ত একটি দেশী লণ্ঠন, অপর হস্তে বাঁশের লাঠী ঠক্ ঠক করিতে করিতে শিবনাথ ও সীতানাথ রওয়ানা হইয়া গেলেন।

নরহরির বাসায় পৌঁছিয়া ঠাকুর্দ্দা তাহার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নরহরি আসিয়া, দরজা খুলিয়া, ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইলেন।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "হ্যাঁ হে ভায়া, তোমাদের হয়েছে কি বল দেখি!"

নরহরি মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "হবে আবার কি? ঝগড়া হয়েছে!"

"ঝগড়া হয়েছে? আমরা ত জানি, আমাদের ঘরেই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে। তোমরা হ'লে এ গ্রামের আদর্শ দম্পতি, তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি কি রকম? এ যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁঃ—আদর্শ দম্পতি ত কেমন। আমাদের বাতাস যেন আর কোনও দম্পতির গায়ে না লাগে।"

"বটে! এমন ব্যাপার? কবে থেকে এ রকমটা তোমাদের হয়েছে?"

"মাস দুই হবে। সেই তারকেশ্বরে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা দেখে ফিরে আসা অবধি।"

"কি নিয়ে তোমাদের গণ্ডগোল বল দেখি?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। কা'ল রাত্রে রিহার্শাল থেকে ফিরে এসে দেখি—গিন্নী নিজের আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চেন, আমার ভাতের থালা মেঝের উপর রাখা। একটা ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল,—ঘরে কুকুর ঢুকে ঝুড়ি ঠেলে সব খেয়ে গেছে—ভাতগুলো ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে রেখেছে। দেখে ভারি রাগ হ'ল, বিশেষ ক্ষিধের সময়—রাগ সামলাতে পারলাম না, চুল ধ'রে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে পিঠে এক কিল মেরে কেবল বলেছিলাম—'ত্যাখ দেখি হারামজাদি! কি হয়েছে! তোর ভাইকে দিয়ে এ সব যে খাইয়ে দিলি, এই রাত্তিরে আমি কি খাই?'—এ নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল।"

সীতানাথ বুঝাইতে লাগিলেন, "স্বামি-স্ত্রীতে বিবাদ কোন্ সংসারে আর নেই—তাই বলে' স্ত্রীকে বাপের বাড়ী চলে যেতে দেওয়া, এই বা কেমন কথা! দিন দুই সবুর কর। না, থিয়েটারটা হয়ে যাক, তার পরেই না হয়—"

নরহরি বলিল, "গিন্নীর রাগ যা হয়েছে—সে রাগ ভাঙ্গানো শিবের অসাধ্য!"

সীতানাথ বলিলেন, "বল কি ভায়া? শিব ত এখানে উপস্থিতই রয়েছেন—যদি বল ত ইনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন।"

সীতানাথ ও শিবচন্দ্রকে নরহরি অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। শিবনাথ গিয়াই কপট ভক্তিভরে একটি প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বউঠাকরুণ, কা'ল ভোরে ত আপনার কোনও মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। ইম্‌পসিবল্। আমরা সকলে এত ট্রবল্ নিয়ে থিয়েটার করছি, আপনি না দেখেই চ'লে যাবেন? তা হ'লে আমাদের মনে যে বড়ই আপশোষ হবে, বউ ঠাকরুণ!"

কুসুম ঘোমটা দিয়া অবনতমুখে বসিয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না।

শিবনাথ বলিল, "আপনি অর্ডার দেন, নরদাদাকে রিহার্শালে নিয়ে যাই। কা'ল তখন থিয়েটার দেখে, পরশু হয়, তার পর দিন হয়, বাপের বাড়ী যাবেন এখন।"

কুসুম তাহার সেই ঘোমটায় আবৃত মস্তক প্রবলভাবে চালনা করিয়া নিজ অসম্মতি জানাইল।

শিবনাথ বলিতে লাগিল, "দেখুন বউঠাকরুণ, নরদাদার কাছে সব হিষ্ট্রীই শুনলাম। উনি অবশ্য আপনার সঙ্গে যা করেছেন, খুবই অন্যায় কায করেছেন। কিন্তু সেটা কি আপনার মাইণ্ড করা উচিত? আপনি ত জানেন, উনি আর জন্মে ছিলেন বাগ্দী—পুণ্যবলে এবার কায়স্থের ঘরে জন্মেছেন। এখনও সেই বাগ্দী স্বভাবই ত আছে—এক জন্ম কায়েত হ'লেই বাগ্দী কি আর জেণ্টলম্যান হয়!"

শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইল এবং ঘোমটা কমাইয়া, বক্তার মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর করিল ?

নরহরি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ তুমি শিবু! আর জন্মে আমি বাগ্দী ছিলাম।"

শিবনাথ বলিল, "ছিলে না? আবার ভণ্ডামী! বাগ্দী ছিলে, সল্ট গোডাউনে মুটেগিরি কর্‌তে, সে কথা কি বউঠাকরুণ জানেন না ভেবেছ? তোমার পিঠের নুণ আজও কাটেনি—বউঠাকরুণ তা চেটে দেখেছেন। হয় কি না হয়, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি এ সব কথা কি ক'রে জান্‌লেন ?"

নরহরি বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছ তোমরা সব ? আমি আর জন্মে বাগ্দী ছিলাম, নুণের বস্তা পিঠে বইতাম, এই সব কথা আমার স্ত্রীকে কেউ বলেছে না কি ?"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো! তুমিই কি তারকেশ্বরে সেই গণৎকার সন্ন্যাসী সেজেছিলে ?"

শিবু বলিল, "রাম বল! তবে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছেই আমি সব কথা শুনেছি বটে।"

নরহরি বলিল, "সে সন্ন্যাসী কি তোমার চেনা লোক ?"

শিবু বলিল, "খুব চেনা! ওল্ড ফ্রেণ্ড! তাঁর কাছেই ত আমার গাঁজা খেতে শেখা!—বউ ঠাকরুণকে তিনি কি বলেছিলেন, তোমায় কি বলেছিলেন, সবই তাঁর নিজ মুখে আমি শুনেছি। এখানে আস্‌বার আগের দিন, কল্‌কাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা, বাগবাজারের এক আড্ডায় ব'সে বাবাজী গুলী টানছিলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন। আমি এখানে আস্‌বো শুনে তিনি বল্লেন, 'ওহে, সেই গ্রামের নরহরিকে আর তার স্ত্রীকে কতকগুলো তামাসার কথা ব'লে এসেছিলাম—কিন্তু তার পরে ভেবে দেখলাম, কাযটা অন্যায় হয়েছে। করনথিং বেচারীদের একটা মনোমালিন্য হবে। তুমি সেখানে যাচ্ছ, নরহরি আর তার স্ত্রীকে বোলো, সে সব বিলকুল মিছে কথা, শুধু রঙ্গ করাবার জন্যে বলা, আর তাদের এই টাকা দুটি ফিরে দিও।"—বলিয়া শিবু ট্যাঁক হইতে কাগজের পুঁটুলি দুইটি বাহির করিয়া নরহরির হাতে দিল।

নরহরি খুলিয়া দেখিল, একটিতে তার স্বহস্ত লিখিত নিজ নাম-ধাম ও জন্ম-নক্ষত্র; অপরটিতে কোনও অপরিচিত বালক-হস্তাক্ষরে কুসুমের নামাদি লেখা।

নরহরি বলিল, "তবে তুমিই সেই গণৎকার!"

শিবু বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি!"—বলিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মৌখিক কথাটা প্রতিবাদস্বরূপ গণ্য হওয়া কঠিন।

সব গোলমালই মুহূর্ত্তমধ্যে মিটিয়া গেল। ড্রেস রিহার্শালের সময় নরহরি দেখিল, গণৎকার ঠাকুরের অঙ্গে যে পোষাকটি দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই পোষাক পরিয়াই শিবু কণ্বমুণি সাজিয়াছে। সেই স্থানে সেই তালিটি এ পোষাকেও বিদ্যমান। রিহার্শাল অন্তে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে সে এই কথা বলিল এবং দুই জনে খুব হাসিতে লাগিল। নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিতও হইল। কিন্তু,সব গোলমালই সুন্দর ভাবে মিটিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পরশ

প্রভাতের রবি, লাল ছটা তার
গৃহে মোর না পাঠালে,
কভু ত জাগি না, তবে আজি মোরে
অভ্যুদয়ে কে জাগালে।
কাহার পরশ আকুল করিল
বুঝি বা মলয় বায়,
নিশানা তাহার, না পাই দেখিতে,
প্রতীতি না হয় তায়।

পৃষ্ঠদেশে হয় হেন কালে পুনঃ
অনুভব সমীরণ,
শয্যা-পাশে হেরি লজ্জাবতী লতা
ঘুম-ঘোরে অচেতন।
সর্ব্ব অঙ্গে তার উষার মাধুরী,
নিশ্বাসও পড়ে গায়,
আমি ভাবি বুঝি, ঘুম ভাঙে মোর
প্রভাত মলয় বায়।

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সরকার।
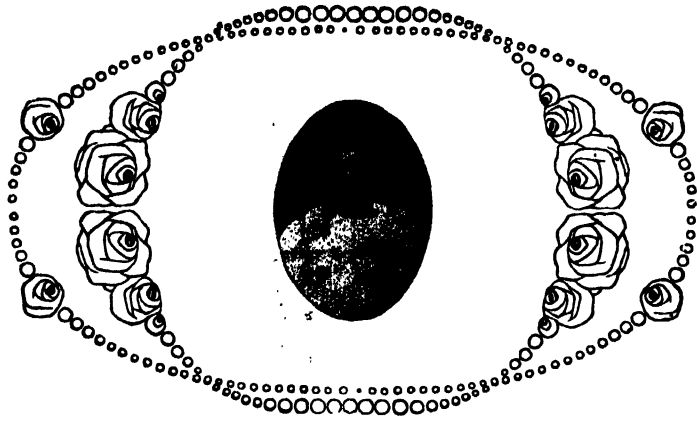
রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন

২

কারামুক্ত হইয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জন পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সে বার কংগ্রেসের অধিবেশন গয়ায়। চিত্তরঞ্জন যখন কারাগারে, তখন চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সভানেত্রী ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে অসহযোগ কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তনে আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাই চিত্তরঞ্জন কি উপদেশ দেন, জানিবার জন্য দেশ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধী তখন কারাগারে। দেশে যেন অবসাদ আসিয়াছে—রাজনীতিক কায অগ্রসর হইতেছে না। পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচনে দেশের লোক আগ্রহ প্রকাশ না করায় এবং জাতীয় দলের নেতারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করায় যাঁহারা সে সময় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরকারের শাসন-নীতির প্রতিবাদকল্পে প্রতিরোধ অবলম্বন করেন নাই। কাযেই ব্যুরোক্রেশীর কায পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে। তাই কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া প্রতিরোধনীতি অবলম্বন দ্বারা দ্বৈত-শাসন চূর্ণ করিবার চেষ্টা করাই বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ব্রজকিশোর প্রসাদ সে মতের প্রতিবাদ করেন।

তাহার পর চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ পঠিত হয়। এই অভিভাষণে আমেদাবাদের অভিভাষণের ভাবাবেগ ছিল না—আইনের তর্ক তাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। অভিভাষণের আরম্ভে তিনি মহাত্মা গন্ধীকে যীশুখৃষ্টের সহিত তুলিত করেন। তিনি বলেন, যে দেশে সরকার স্বৈরাচারী এবং প্রজার প্রাথমিক অধিকার অস্বীকৃত, সে দেশে আইন ও শৃঙ্খলার কথা বলা বৃথা। তাহার পর ইংলণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া, তিনি প্রজার স্বাভাবিক অধিকারের স্বরূপ বুঝাইয়া, দেশবাসীকে জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করিতে বলেন। স্বরাজ বলিলে কোন বিশেষ শাসন-পদ্ধতি বুঝায় না। তাহা জাতির হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। হিংসার দ্বারা স্বরাজ লাভ করা যায় না। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, ইটালীতে ও রুসিয়ায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে এক সঙ্ঘ গঠনের কল্পনা প্রকাশ করিয়া এ দেশে শাসন-পদ্ধতির আরম্ভ কিরূপ হইবে, তাহা বলেন :—

(১) সে কালের গ্রাম্য সমিতির আদর্শে বা অনুকরণে স্থানীয় কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(২) এই সব প্রতিষ্ঠান হইতে সম্মিলিত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৩) এই সব প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবে।

(৪) কেন্দ্রিক সরকারের কায প্রধানতঃ পরামর্শ-দানে পর্য্যবসিত হইবে।

তাহার পর ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের কথা। তিনি বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার ত্রুটি দেখাইয়া বলেন, এই সভা বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর সৃষ্ট এবং ভারতের উপযোগী নহে। ইহা হয় সংস্কৃত করিতে হইবে, নহে ত নষ্ট করিয়া

দিতে হইবে। ইহা ব্যুরোক্রেশীর ছদ্মবেশ—সেই ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া ইহার স্বরূপ দেখাইতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া—ভিতর হইতে সে কায করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগের মূলনীতি পরিত্যাগ করা হয় না। গত ২ বৎসরে ব্যবস্থাপক সভায় যে ভাবে কায চলিয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, অসহযোগীদিগের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা ব্যুরোক্রেশীর শক্তিক্ষয় না হইয়া শক্তিবৃদ্ধিই হইয়াছে। করের মাত্রা কেবলই বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের লোক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া—যাহাতে এই সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা ব্যুরোক্রেশীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে না পারে, তাহাই করুন।

বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জনের এই উক্তিতে তখন চারিদিক হইতে প্রতিবাদ আরম্ভ হয় এবং অনেকেই বলেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগনীতি ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

এই অধিবেশনে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন :-

"যেহেতু, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনকালে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ বর্জ্জনের বাঙ্গালার সরকার যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আপনার ক্ষমতা দৃঢ় করিতে ও দায়িত্বহীন শাসন পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক শক্তি নষ্ট হইয়াছে।

"এবং যেহেতু অহিংস অসহযোগের অত্যাবশ্যক কার্য্যপদ্ধতি হিসাবে দেশবাসীর পক্ষে আগামী নির্ব্বাচনও বর্জ্জন করা প্রয়োজন।

"সেই জন্য কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন, কোন ভোটার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইবেন না এবং কেহ এই উপদেশ অমান্য করিয়া পদপ্রার্থী হইলে কেহ তাঁহাকে ভোট দিবেন না, এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যে ভাবে এই বর্জ্জন ব্যক্ত করিতে বলিবেন, ভোটাররা সেই ভাবেই তাহা ব্যক্ত করিবেন।"

শ্রীযুক্ত এস, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন—

"যেহেতু, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে অধিকাংশ ভোটার নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিলেও বহু ভারতীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং নাগপুরে কংগ্রেস কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও পদত্যাগ করেন নাই—ফলে নূতন ব্যবস্থাপক সভাসমূহ লোকমতের প্রতিনিধি না হইলেও সরকার সেগুলির দ্বারা আপনার শক্তি দৃঢ় করিয়া লইতেছেন, সেই জন্য এই কংগ্রেস ব্যবস্থাপকসভা বর্জ্জন অধিকতর ফলোপধায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—ভোটাররা কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকেই ভোট দিবেন এবং সেই সকল কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবেন না।"

এই প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাব লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবিতর্ক হয়। শেষে ১ হাজার ৭ শত ৫০ জন প্রতিনিধি আয়াঙ্গার মহাশয়ের সংশোধক প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ৮ শত ৯০ জন পক্ষে ভোট দেওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হয়।

গয়ার এই অধিবেশনে পরাভূত হইয়া চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের মধ্যেই নূতন দল গঠিত করিলেন। তিনি নূতন দল গঠিত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন না।

স্বরাজ্য দলের চরম উদ্দেশ্য—স্বরাজলাভ। কিন্তু আপাততঃ সে দল ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে প্রতিনিধিদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই দলের উদ্দেশ্যবিবৃতি-পত্রের তৃতীয় প্যারায় ছিল :—

স্বরাজ্য দল আগামী নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত সর্ত্তে দেশের সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপরিষদে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সদস্য হইবার জন্য জাতীয় দলস্থ প্রার্থী উপস্থিত করিবেন।—

(ক) নির্ব্বাচিত হইবার পরই সদস্যরা দল কর্তৃক স্থিরীকৃত দাবি জাতির পক্ষ হইতে উপস্থাপিত করিয়া সরকারকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহা পূর্ণ করিতে বলিবেন।

(খ) যদি সরকার সন্তোষজনকরূপে সে সব দাবি পূর্ণ না করেন, তবে সদস্যদিগের পক্ষে সমভাবে ক্রমাগত সরকারের কাযের প্রতিরোধের সময় উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সদস্যরা

প্রয়োজন মনে করিলে—আপনাদের শক্তি প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে—এ বিষয়ে দেশের লোকের মত গ্রহণ করিবেন। প্রতিরোধের উদ্দেশ্য—ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালন অসম্ভব করিয়া তুলা।

(গ) দলের কোন সদস্য সরকারী চাকরী গ্রহণ করিবেন না।

ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদে স্থির হয়—

(১) কংগ্রেসের উভয় দলই ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় কোনরূপ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন না; অর্থাৎ স্বরাজ্য দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে ও অপর দল বিপক্ষে আন্দোলন চালাইবেন না।

(২) ইতোমধ্যে উভয় দল স্ব স্ব কার্য্যপদ্ধতির গঠনাত্মক অংশে কায করিবেন—পরস্পর তাহাতে বাধা দিবেন না।

(৩) ৩০শে এপ্রিলের পর যে যাহার ইচ্ছামত কায করিতে পারিবেন।

২৫শে মে তারিখে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর অধিবেশন হয় এবং তাহাতে মিটমাটের হিসাবে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন যে প্রস্তাব করেন, আপাততঃ ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন বিষয়ে কোনরূপ আন্দোলন করা হইবে না, তাহাই গৃহীত হয়।

দেশের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে এবং শেষে ৯ই জুলাই তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশন হয়, তাহাতেই স্থির হয়—অবস্থা বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হউক। তদনুসারে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন হয়। বলা বাহুল্য, স্বরাজ্য দল দেশে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে যে ভাবে লোক-মত গঠিত করিতেছিলেন, তাহাতেই কংগ্রেসে দলাদলি নিবারণের উদ্দেশ্যে, এই অধিবেশন হইয়াছিল।

ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে প্রতিনিধিরা এক সভায় সমবেত হইয়া আলোচনা করেন এবং সেই আলোচনা-স্থলে মৌলানা মহম্মদ আলী একটা মিটমাটের প্রস্তাব করেন। শেষে তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব করেন:—

"কংগ্রেস যে অহিংস অসহযোগ নীতিতে অবিচলিত, সেই কথা পুনরায় বলিয়া এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন যে, যে সকল কংগ্রেস-কর্ম্মীর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে ধর্ম্মগত বা বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা আগামী সদস্যনির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা সদস্যপদপ্রার্থী হইতে পারেন। সুতরাং কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিদ রাখিতেছেন।

"কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকর্ম্মীমাত্রকেই যথাসম্ভব শীঘ্র স্বরাজ লাভের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে লোক-নায়ক মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছেন।"

তিনি বলেন, কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের পক্ষে দলাদলি পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার মত যাঁহারা কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, সাজান বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। যে ২ বৎসর তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, তাহার মধ্যে কার্য্যপদ্ধতিতে খদ্দর প্রচার, বা আদালত বর্জ্জন বা অন্যান্য কায অগ্রসর হয় নাই। তিনি বলেন, মহাত্মা গন্ধী তাঁহাকে জানাইয়াছেন—"আপনারা আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতিতেই অবিচলিত থাকুন, এমন কথা আমি বলি না। আমি সেই কার্য্য-পদ্ধতিরই সমর্থক। কিন্তু দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা যদি মনে করেন, পদ্ধতির দুই একটি অংশ ত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়, তবে আমি আপনাদিগকে সে সব অংশ পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি।"

নানা জন নানা মত প্রকাশ করার পর চিত্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিতে উঠেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি এই মিটমাটের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে তিনি বুঝিবেন—স্বরাজ অদূরবর্ত্তী, সকলের পক্ষে মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজলাভের জন্য একযোগে কায করা কর্ত্তব্য। মিটমাটের জন্য যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, যুক্তির দিক হইতে দেখিলে তাহাতে ত্রুটি থাকিয়া যায়; কারণ, যুক্তিতে অবিচলিত থাকিলে মিটমাট হয় না। কিন্তু মনে রাখিবেন—যুক্তি অপেক্ষা জীবন বড়। যাহার উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই কংগ্রেসের—ভারতীয় জাতির সেই জীবন আনিতে বলি। আমাদের মধ্যে মত-ভেদ আছে জানিয়াও আমরা যে এই প্রস্তাব গ্রহণ

করিতে চাহিতেছি, তাহার কারণ—আমরা একযোগে কায করিতে চাহি। মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ঘৃণ্য। আমার বিবেচনায় কিন্তু তাহা নহে। তাহার কারণ, এই প্রস্তাবেই আমরা বলিতেছি, আমরা অহিংস অসহযোগ নীতিতে অবিচলিত থাকিব। অনেকে বলিয়াছেন, স্বরাজ্য দল অসহযোগ নীতি বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃই বলিয়াছি, স্বরাজই আমাদের কাম্য, আর অসহযোগই তাহা লাভের উপায়। এই প্রস্তাবে বলা হইতেছে, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যেন অহিংস অসহযোগে অবিচলিত থাকেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাহা পরিত্যাগ না করেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাহা অসম্ভব। আমি তাঁহাদের সহিত একমত নহি। ব্যবস্থাপক সভার মধ্য হইতে অহিংস অসহযোগ-নীতি অনুসারে কায করিলেই অহিংস অসহযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে। অসহযোগের অর্থ কি? ইহার অর্থ—যাহা তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ,স্বরাজ যে জাতীয় আত্মার বিকাশ, যাহা সেই স্বরাজের বিরোধী—তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাযেই যে ভুল ভিত্তির উপর আজ জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা যদি অসহযোগ না হয়, তবে আমি অসহযোগের বিরোধী। আমাদের ব্যবস্থাপক সভাসমূহ অসত্য। সেগুলি ধ্বংস করিতে হইবে। এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে, সেগুলি আজ দেশের জাতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং আমাদিগকে পীড়িত করিয়া কুফল প্রসব করিতেছে? মহাত্মা গন্ধী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আমাদের জাতীয় জীবনের সংহারক এই শাসনসংস্কার নষ্ট করিতে চাহি। উদ্দেশ্য—আত্মবোধ লাভ করিব। এই সব ব্যবস্থাপক সভা অট্টালিকামাত্র নহে। ইহারা আমাদের রক্ত শোষণ করিতেছে। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সরকারের দেশশাসন অসম্ভব করিয়া দিতে হইবে। আমি আবার বলিতেছি, আমি অহিংস অসহযোগে অবিচলিত। যাহারা ক্ষুদ্র লাভের আশায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে, তাহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া শাসনসংস্কার-রাক্ষসকে সংহার করিতে পারি, তবেই তথায় যাইব; নহিলে নহে। সুতরাং এই প্রস্তাবে অহিংস অসহযোগের কথা পুনরুক্ত হওয়ায় আমি আনন্দিত।

চিত্তরঞ্জন বলেন, ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশে যাঁহাদের ধর্ম্ম বা বিবেকগত বাধা আছে, তাঁহারা তথায় যাইবেন না। কংগ্রেসে বিবিধ মতাবলম্বী আছেন বলিয়া আমরা কি কংগ্রেসকে বিভক্ত করিব? মুসলমানরা কি হিন্দুদিগকে বলিবেন—তোমরা যখন কোরাণ মান না, তখন হয় তোমরা কংগ্রেস ত্যাগ কর, নহে ত আমরা যাই?

চিত্তরঞ্জন বলেন—প্রস্তাবে গঠন-কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা গঠন-কার্য্যে মনোযোগ দিতে চাহেন না। এ কথা ভিত্তিহীন। পরন্তু গঠনকার্য্যের পথে যে সব বিঘ্ন রহিয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া সে সব দূর করিবার চেষ্টাই করা হইবে।

উপসংহারে তিনি বলেন—

"আপনারা মনে রাখিবেন, আপনার যে ভ্রাতা অসহযোগের পক্ষপাতী, যিনি স্বরাজকামী, যিনি প্রয়োজন হইলে স্বরাজলাভের জন্য প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত—তাঁহার সান্নিধ্য সহ্য করায় আপনি আপনার কার্য্যের ধ্বংসকর কিছুই সহ্য করিতেছেন না। যদি আপনারা আদেশ করেন, আমি যে কোন ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইব। আমার অনুরোধ—পরস্পরের বিরোধী হইবেন না।"

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দিল্লীতে এই জয়ের পর চিত্তরঞ্জন আর কখন রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। দিল্লীতে এই জয়ের জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ২টি নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন;—

(১) "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।"

(২) "মারি অরি পারি যে কৌশলে।"

এই সময় তিনি দল গঠিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কি উদ্যম, কি পরিশ্রম, কি অর্থ যে এই জয়ের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়াছেন। এইরূপ কাযই চিত্তরঞ্জনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, যাহাতে তিনি হাত দিতেন, তাহাতে কখন দোলাচলচিত্ত হইয়া হাত দিতেন না—সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সে কাযে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই জন্যই সাফল্য তাঁহার করতলগত হইত।

এই জয়ের জন্য তাঁহাকে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এক দিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া—আর এক দিকে ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনের পক্ষপাতী অসহযোগী দল এই উভয়ের আক্রমণ হইতে তিনি যে কৌশলে আপনার দলকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ভারতের নানা স্থানে যাইয়া স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। আমাদের বিশ্বাস, সেই সময় অতি-শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; কিন্তু তিনি আপনার দিকে ফিরিয়া চাহিবার সময় পায়েন নাই—সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। আপনার জন্য চিন্তা করা তাঁহার ধাতুতে সহিত না। তাই তিনি অনায়াসে নিঃসম্বল হইয়াও ব্যবহারাজীবের ব্যবসা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

দিল্লীর জয়ই যে জয় নহে—লোকমত যে তখনও তাঁহার পক্ষে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, তাহা তিনি বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি লোকমত তাঁহার সহগামী করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবল বাত্যা যেমন সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই উড়াইয়া লইয়া যায়, প্রবল বন্যা যেমন সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়—চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ উদ্যম ও উৎসাহ তেমনই সব বাধা ঘুচাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ফলে কেবল যে লোকমত তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া,তিনি কি কায করিতে পারেন দেখাইবার সুযোগ-দানে সম্মত হইল, তাহাই নহে, পরন্তু দিল্লীর অধিবেশনে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিয়মের ও অনাচারের কথা আলোচিত হইতেছিল, সে সব অদৃশ্য হইয়া গেল—সে সকলের দিকে আর কাহারও দৃষ্টি রহিল না।

এ দিকে সেই সময় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ও ব্যবস্থাপরিষদে নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের সময় সমাগত হইল। চিত্তরঞ্জন সে জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাই স্বীয় কর্ম্মকেন্দ্র করিবেন।

দিল্লীর পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কোকনদে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে দিল্লীর মিটমাটের পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"কলিকাতায়, নাগপুরে, গয়ায় ও দিল্লীতে গৃহীত অসহযোগসম্বন্ধীয় প্রস্তাব এই কংগ্রেস গ্রহণ করিতেছেন।

"দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে, হয় ত বা ত্রিবিধ বর্জ্জন বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই জন্য এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন, সে বিষয়ে কংগ্রেসের নীতি অবিচলিত আছে।

"কংগ্রেস আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, সেই নীতিই গঠন-কার্য্যের ভিত্তি এবং দেশবাসীকে বারদোলীতে গৃহীত গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে ও আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। কংগ্রেস শীঘ্র আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছেন।"

ইহার পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপক সভাসমূহের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গালায় স্বরাজ্য দলের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া লর্ড লিটন চিত্তরঞ্জনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। সে আহ্বানের উত্তর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার গবর্ণরকে লিখিয়াছেন:—

"আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি আমার দলের গোচর করিয়াছি এবং দলের সদস্যরা আপনার কথায় সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দলের সদস্যদিগের সঙ্কল্প এই যে, তাঁহারা শাসন-সংস্কারে লব্ধ সর্ব্ববিধ অধিকার দ্বৈতশাসন চূর্ণ করিবার জন্য ব্যবহার করিবেন। মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহারা আর এ কায করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জানেন, মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াও ভিতর হইতে বাধা প্রদান করা

বন্ধু
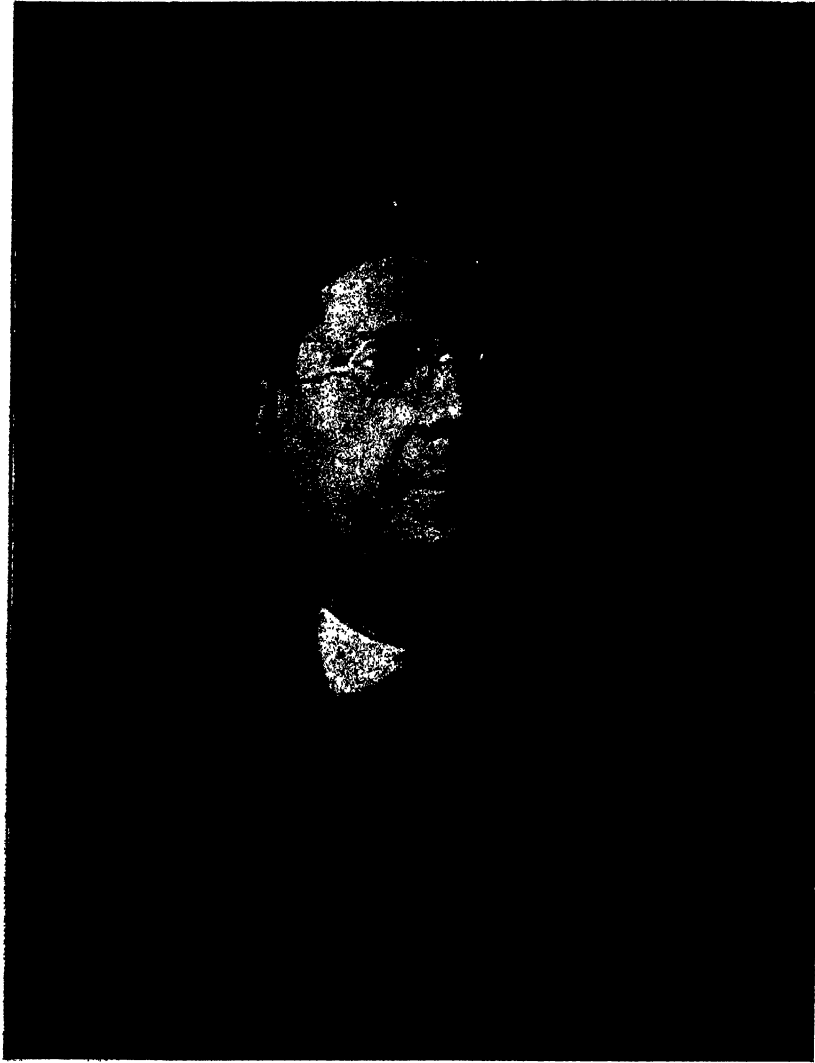
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে]

[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্ভব, কিন্তু আপনার নিকট হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া পরে তাহা বাধা প্রদানের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা, তাঁহারা শিষ্টাচারসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। দেশের লোকের উদ্রিক্ত দেশাত্মবোধ বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন চাহিতেছে এবং যত দিন সে পরিবর্ত্তন না হয় বা সাধারণ অবস্থায় সরকারের মনোভাব পরিবর্ত্তনব্যঞ্জক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, তত দিন দেশবাসীর পক্ষে স্বেচ্ছায় সরকারের সহিত সহযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। এই অবস্থায় আমি হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু আমরা আপনার যে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি, আপনি যে নিয়মানুগ হইয়া আমাদিগকে সে আহ্বান প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমার দল আপনার কার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।"

ইতঃপূর্ব্বেই মুসলমানদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপনের আশায় স্বরাজ্যদল তাঁহাদিগের সহিত চুক্তিতে বদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হইলে বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানে অধিকার কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করেন;—

(১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সাম্প্রদায়িক লোক-সংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হইবে এবং স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচন হইবে। নিখিল ভারত হিন্দু-মুসলমানে চুক্তি এবং কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটীর নির্দ্ধারণে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সদস্যনির্ব্বাচনে জিলায় যে সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাধিক্য, সে সম্প্রদায় হইতে ৬০ জন ও অপর সম্প্রদায় হইতে ৪০ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৩) সরকারী চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানরা পাইবেন। তাহার ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হইবে;—যত দিন পর্য্যন্ত চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত না হয়, তত দিন যোগ্যতায় সর্ব্বনিম্ন আদর্শানুরূপ হইলেই মুসলমানরা চাকরী পাইবেন এবং তত দিন হিন্দুরা শতকরা ২০টি চাকরী পাইবেন।

(৪) (ক) যে সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব বা আইন হইবে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদিগের শতকরা ৭৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সেরূপ প্রস্তাব বা আইন গৃহীত হইতে পারিবে না।

(খ) মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য হইবে না।

(গ) ধর্ম্মগত ব্যাপারে গোবধে আপত্তি করা হইবে না।

(ঘ) ব্যবস্থাপকসভায় আহারের জন্য গো-বধবিষয়ে কোন আইন করা হইবে না। তবে ব্যবস্থাপকসভার বাহিরে উভয় সম্প্রদায়ে এ বিষয়ে একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা করা হইবে।

(ঙ) গোহত্যা এমনভাবে সংসাধিত হইবে যে, তাহাতে যেন হিন্দুদিগের মনে ব্যথা না লাগে।

(চ) হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত হইবে। তাহার সদস্য অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমান হইবেন।—সমিতি আপনার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন।

কংগ্রেসে এই চুক্তির কথা উঠিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে এই চুক্তি লইয়া বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। লালা লজপৎ রায় এইরূপ চুক্তির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন এবং বাঙ্গালায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করেন। বলা বাহুল্য, মুসলমানদিগকে স্বদলে আনিয়া একযোগে কায করিবার সুযোগ পাইবার আশায়ই চিত্তরঞ্জন এই চুক্তি করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপকসভায় আপনাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার স্থূল কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(১) রাজনীতিক অপরাধে বন্দী সকলেরই মুক্তির জন্য চেষ্টা করা হইবে।

(২) চণ্ডনীতিদ্যোতক আইনগুলির প্রত্যাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) চণ্ডনীতিদ্যোতক আইনের প্রত্যাহার করিতে ব্যবস্থা পরিষদকে অনুরোধ করা হইবে।

(৪) প্রাদেশিক জাতীয় দাবি স্থির করিতে হইবে—তাহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপায় হইবে।

সুভাষচন্দ্র বসু

(৯) দল একযোগে কায করিবেন এবং অধিকাংশের মত সকলে গ্রহণ করিবেন।

(১০) বিশেষ কারণ বা অসুস্থতা ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভার সকল সদস্য অধিবেশনে যোগ দিবেন।

(১১) জাতীয় দাবিপূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন স্বরাজ্যদলভুক্ত লোক চাকরী লইবেন না।

এই সব উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়া চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য-দলের কার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মন্ত্রী অবস্থায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিয়া নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৫) প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদিগের বেতন না-মঞ্জুর করিতে হইবে।

(৭) জাতীয় দাবি স্বীকৃত ও প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারের সকল প্রস্তাব স্থগিদ বা পরিত্যাগ করা হইবে।

(৮) দাবিপূরণের পূর্ব্বে যদি বাজেট উপস্থাপিত করা হয় এবং সরকারের পক্ষে সেরূপ দাবি পূর্ণ করিবার আগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া না যায়, তবে বাজেট না-মঞ্জুর করা হইবে। সেরূপ আগ্রহের পরিচয় পাইলে স্বরাজ্যদল পুনরায় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

নূতন আইনে নির্ব্বাচনাধিকার বহু পরিমাণে গণতান্ত্রিক মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। নূতন নির্ব্বাচনের সময় চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় অধিকাংশ সদস্যই স্বরাজ্য-দলের লোক হইলেন। এইরূপে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বরাজ্যদলশাসিত হইল। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করিলেন এবং সদস্যরা তাঁহাকেই মেয়র নির্ব্বাচিত করিলেন।

সুভাষের পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব? তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু চাকরী স্বীকার করেন নাই—দেশে আসিয়া ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে

যোগ দেন। তিনি চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্যই—তাঁহার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উপর কর্পোরেশনের গুরুভার অর্পণ করেন।

ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নির্ব্বাচন কালে চিত্তরঞ্জন যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা যে দেখিয়াছিল, সে-ই বিস্মিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই চেষ্টার ফলেই স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলভুক্তগণ প্রায় সকলেই পরাভূত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে দল গঠিত করিলেন, তাহার প্রথম কায—স্বতন্ত্রদলের সহিত একযোগে কায করিবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা না হইলে স্বরাজ্যদলেরপক্ষে ভোটে সরকার পক্ষকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না।

শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এই স্বতন্ত্রদলের নেতা। সে দলের কর্ম্মী—ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার শ্রীযুত শিবশেখরেশ্বর রায়, শ্রীমান্ রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি।

চুক্তির ফলে মুসলমানরা অনেকে স্বরাজ্যদলের সহিত একযোগে কায করিতে সম্মত হইলেন।

স্বরাজ্যদলের কয়জন যুবক কর্ম্মী উৎসাহে অগ্রযুক্ত হইল। শ্রীমান্ অনিলবরণ রায় বাঁকুড়ার অসহযোগ আন্দোলনের গঠন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তিনি তথা হইতে এবং শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নোয়াখালি হইতে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুর হইতে ব্যবস্থাপক সভায় আসিলেন। শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় সে দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিলেন। মৈমনসিংহ হইতে শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন সরকার স্বরাজ্যদলের সাহায্য পাইয়া আসিলেন এবং স্বতন্ত্রদলভুক্ত হইয়াও স্বরাজ্যদলের সহিত কায করিতে লাগিলেন। যুবকদিগের মধ্যে ইনিই পুরাতন কর্ম্মী—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। ইনি 'সন্ধ্যা' 'বন্দে মাতরমের' পাঠশালার পড়ুয়া, উপাধ্যায়, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর ও বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে কায করিয়াছিলেন। সেই সময় ইনি 'বন্দনা' নামক জাতীয় গীতসংগ্রহ প্রকাশ করিয়া সরকারের রোষভাজনও হইয়াছিলেন। পরে ইনি চিত্তরঞ্জনের স্নেহভাজন হয়েন এবং চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন।

ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

এই সব কর্ম্মীর কার্য্যফলে স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় পদে পদে জয়লাভ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দলের মুখপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ইংরাজীতে

পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা হইল—চিত্তরঞ্জনই তাহার সম্পাদক। এই পত্র প্রবর্ত্তনে শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

এই সঙ্গে শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায়ের ও শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল দল হইতে প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, সে সকল দলের মধ্যে সংখ্যায় স্বরাজ্যদলই প্রবল বলিয়া বাঙ্গালার গভর্ণর সেই দলের নায়ক চিত্তরঞ্জনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে দ্বৈতশাসন উন্মূলিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। গভর্ণর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিষ্টার গাজনভি ও মিষ্টার ফজলুল হক এই ৩ জনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। স্বরাজ্যদলের চেষ্টায় মল্লিক মহাশয়ের সদস্যনির্ব্বাচন নাকচ হওয়ায়, তিনি মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট ২ জন কাষ চালাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় বাজেটে মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদিগের বেতন না-মঞ্জুর হইয়া গেল। গভর্ণর কিন্তু তখনও তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিলেন না, পরন্তু তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবস্থাপক সভার আস্থার অভাবব্যঞ্জক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বলিয়া বেতন দিবার প্রস্তাব পুনরায় উপস্থাপিত করিলেন। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল এবং মন্ত্রিদ্বয় পদত্যাগ করিলেন। দেশে ও ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের পরিচয় প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে গভর্ণর পুনরায় মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে বার নবাব নবাব আলী চৌধুরী ও রাজা শ্রীযুত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মন্ত্রী মনোনীত হইয়াছিলেন। সে বারও চিত্তরঞ্জনের দলের চেষ্টায় মন্ত্রীর বেতনবিষয়ক প্রস্তাব না-মঞ্জুর হয় এবং শেষে সরকার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ সংরক্ষিত করিতে বাধ্য হয়েন। চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জনের আর একটি জয়ের কথার উল্লেখ না করিলে এ বিবরণ একান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। সে জয় অর্ডিনান্স আইন সম্পর্কে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর প্রাতে বঙ্গবাসী জাগিয়া দেখিল, বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে অর্ডিনান্সের বলে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ, সত্যেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বহু কংগ্রেসকর্ম্মীকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সমগ্র দেশ এই স্বৈরাচারদ্যোতক কার্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ৩১শে তারিখে কলিকাতাবাসীরা সার নীলরতন সরকারের সভাপতিত্বে টাউনহলে সভায় সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিল। বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন সফরে বাহির হইয়া নানা স্থানে নানা বক্তৃতায় তাঁহার কাষের সমর্থন চেষ্টা করিলেন। শেষে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় অর্ডিনান্স পাকা করিবার জন্য আইন পেশ হইল। চিত্তরঞ্জন তখন অসুস্থ। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিলেন—তিনি ব্যবস্থাপক সভায় না যাইলেই ভাল হয়। তিনি কর্ত্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী পীড়িত পতির সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সার ইভান কটন তাঁহাকে তথায় গমনের অধিকার দিতে অসম্মত হইলেন। সভাধিবেশনের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মোটরে শায়িত অবস্থায় চিত্তরঞ্জনকে সভাগৃহে আনা হইল। তাঁহাকে রোগীর আসনে বসাইয়া সভাস্থলে লইতে হইল। গভর্ণর স্বয়ং সভায় আসিয়া অর্ডিনান্স আইনের সমর্থন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন এবং

সরকারের পক্ষে সার হিউ ষ্টিফেনসন আইন সমর্থন করিলেন। তাহার পর ভোট গৃহীত হইল—৬৬ জন সদস্য আইনের বিরুদ্ধে ও ৫৭ জন পক্ষে ভোট দিলেন। জনতার জয়ধ্বনি চিত্তরঞ্জনের জয়ঘোষণা করিল। আসনে বাহিত হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি হাসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এইবার আমার অসুখ সারিয়া যাইবে!"

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য সার আবদর রহিম প্রস্তাব করিলেন—পরবর্ত্তী বাজেটে মন্ত্রীদিগের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হউক। সে প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং তাহার পর মন্ত্রীদিগের বেতন-বিষয়ক প্রস্তাব চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের চেষ্টায় পুনরায় নাকচ হইয়া গেল।

কিন্তু বাঙ্গালায় দ্বৈত-শাসন ধ্বংস করাই চিত্তরঞ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা তাঁহার পরোক্ষ উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি, তাহা তিনি তাঁহার এক ঘোষণায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

ততঃ কিম্?

সর্ব্বত্রই প্রশ্ন হইতেছে, ইহার পর কি হইবে? এই প্রশ্নের এক ব্যতীত দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে না—জাতীয় আত্মসম্মান ও স্বরাজ। আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্পে ও বিশ্রাম-বিহীন ভাবে পরিচালিত জাতীয় সংগ্রামে যতক্ষণ আমরা জয়ী না হইতে পারিব, ততক্ষণ পরের কোন কথা উঠিতে পারে না। অমঙ্গলের সহিত সংগ্রাম করিতে অস্বীকার করা—মৃত্যু। যাহা আমাদের উন্নতির অন্তরায়, তাহা নষ্ট করিতে অস্বীকার করা—অপমান। আমরা কি আমাদের মনুষ্যত্ব, ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমাদিগকে দমিত করিয়া রাখিতে দিব? আমাদের অক্ষমতায় উপহাস করিতে ও দায়িত্বহীন স্বাধিকারপ্রমত্ত আমলাতন্ত্র-শাসনের জীবনের গর্ব্ব করিবার জন্য কি ব্যবস্থাপক সভাসমূহ অবস্থিত রহিবে? ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ধ্বংস-সাধনই জাতীয় জীবনের পক্ষে প্রয়োজন, দেশপ্রেম তাহাই চাহিতেছে। ব্যুরোক্রেশী যাহা গঠন করে, সে কেবল আমাদের জাতীয় জীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য। আমরা কি আমাদের দৌর্ব্বল্যের উপর ব্যুরোক্রেশীর প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমৃদ্ধ হইতে দিব? যুক্তভারত কি মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি করতলগত করিয়া জাতীয় জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবে না? আমাদিগকে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক থানায়, প্রত্যেক সহরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের যুদ্ধের কায পরিচালিত করিবার ও লব্ধ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যুরোক্রেশী আমাদিগকে শাসন করিবার জন্য ভেদনীতির প্রয়োগ করে। আমরা কি ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না? আমাদের সকলকে—যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র—সকলকে ভারতের সম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য কংগ্রেসের

শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী

বৈজয়ন্তীতলে সমবেত হইতে হইবে। আমাদের দলাদলিই ব্যুরোক্রেশীর অবস্থিতির কারণ। জাতীয় জীবনে ঐক্যই এ ব্যাধির ভেষজ।

চিত্তরঞ্জন এই ঘোষণায় তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য অকাতরে অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং শেষে গঠন কার্য্যের জন্য পল্লী সংস্কার কার্য্যে সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে আবশ্যক অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অবশ্যই পল্লীপ্রাণ বাঙ্গালার লোককে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তিনি সেই কার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আশা করি, সেই সমিতি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবেন। সে কাযে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

দেশে স্বরাজ্য দল দিন দিন যেরূপ সমর্থন লাভ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বেলগাঁওয়ে মহাত্মা গন্ধীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে দলাদলি পূর্ণমাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিবে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ স্বরাজ্য দলের নেতৃগণের আন্তরিক দেশপ্রেম তাঁহাদিগকে এইরূপে দেশের কায পণ্ড করিতে বিরত করিয়াছিল এবং তাঁহারা মহাত্মা গন্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া যায় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

চিত্তরঞ্জনের বিশ্বাস ছিল, দেশে বিপ্লবপন্থীদিগের একটি দল আছে। সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতেন, অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও চিত্তরঞ্জনের মনে তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতির অভাব নাই। বিশেষ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনের পর হইতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া সেই বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে অধিবেশনের পূর্ব্বে গোপীনাথ সাহা নামক এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতার পুলিস কমিশনার ভ্রমে মিষ্টার ডে নামক এক জন য়ুরোপীয়কে হত্যা করিয়াছিল। সম্মিলনে তাহার অনাচারের নিন্দা করিয়াও তাহার দেশপ্রেমের প্রশংসা করা হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস, সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে চিত্তরঞ্জন নিম্নলিখিত ভাবে এক বিবরণ প্রচার করেন :—

"সম্প্রতি য়ুরোপীয় বন্ধুদিগের সহিত কথাবার্ত্তার ফলে
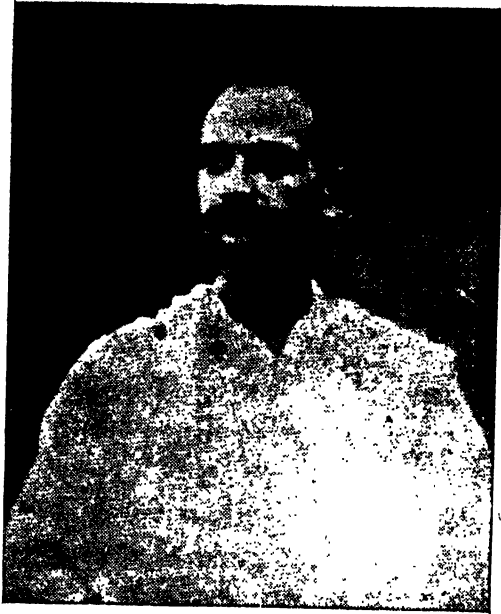
শ্রীঅনিলবরণ রায়

আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কোন কারণে এ দেশে ও বিলাতে য়ুরোপীয়দিগের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, স্বরাজ্য দল রাজনীতিক কারণে হত্যা ও ভীতিপ্রদর্শনের সমর্থন করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আমার কাছে বিশেষ বিস্ময়াবহ। গত ৬ বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গন্ধী যে অহিংসা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমি ও স্বরাজ্য দলের অন্যান্য নেতা সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করাতেও যে এই মত লোকের মনে স্থান লাভ করিতেছে, ইহা আরও বিস্ময়ের বিষয়।

"আমি ও স্বরাজ্য দলের অন্য নেতারা আমাদিগের বক্তৃতায় সর্ব্বতোভাবে হিংসার নিন্দা করিলেও যে ভারতে ও বিলাতে য়ুরোপীয়দিগের মনে এই ভ্রান্ত মত স্থান পাইতেছে, ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারি না। কিন্তু এ ধারণা যতই কেন ভ্রান্ত হউক না, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং আমি এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে চাহি।

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—আমি রাজনীতিক কারণে হত্যার ও যে কোনরূপ ভীতিপ্রদর্শনের বিরোধী। তাহা আমার ও আমার দলের লোকের কাছে ঘৃণাজনক। আমার মতে তাহা আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাহা আমাদের ধর্ম্ম-মতের বিরোধী।

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, আমি সরকারের পক্ষে যে কোনরূপ দমন-কার্য্যেরও সমভাবে বিরোধী। চণ্ডনীতির দ্বারা রাজনীতিক হত্যা নিবারিত হইবে না। চণ্ডনীতিতে কেবল তাহা উৎসাহিত হইবে। ইতিহাসে দেখা যায়, চণ্ডনীতি আপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে এবং যাহা বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্দিষ্ট, তাহাই পুষ্ট করে।

"আমরা স্বরাজ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে সম্মানিত অংশিরূপে তুল্যাধিকার লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প। সে জন্য যুদ্ধ হয় ত দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে—হয় ত কঠোর হইবে, কিন্তু আমাদের সঙ্কল্প, আমরা শেষ পর্য্যন্ত কোন অসদুপায় অবলম্বন না করিয়া যুদ্ধ করিব। তরুণ বাঙ্গালীদিগকে আমি বলি—'স্বরাজের জন্য যুদ্ধ কর, কিন্তু যুদ্ধে কোনরূপ কলঙ্কজনক কায করিও না। তোমাদের কাযে যেন কলঙ্কস্পর্শ না হয়। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কর—অগ্রসর হও—বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া স্বরাজ লাভ কর।'

কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায়

য়ুরোপীয়দিগকে আমি বলি—'আমাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা মনে পোষণ করিও না। অকারণ সন্দেহ ত্যাগ কর। সরকারকে দমনের কার্য্যে সহায়তা করিয়া আমাদের রাজনীতিক জীবনে হিংসাকে স্থায়ী আসন দান করিও না।"

চিত্তরঞ্জনের এই ঘোষণা লইয়া দেশে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ইহার আলোচনা করিয়া বলেন—যাহারা তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কায করে, তাহাদের উপর তাঁহার এই উক্তির প্রভাব কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই। লর্ড বার্কেনহেড আরও বলেন—হিংসার সহিত সংস্রব অস্বীকার করিলেই চিত্তরঞ্জনের কর্ত্তব্যের অবসান হইবে না—তিনি যে হিংসার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা দমিত করিতে সরকারের সহিত সহযোগ করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

বলা বাহুল্য, লর্ড বার্কেনহেডের আহ্বান স্বরাজ্য দলের অসহযোগ নীতির বিরোধী।

চিত্তরঞ্জনের শত্রুদল এই ব্যাপার লইয়া বলিতে আরম্ভ করেন—তিনি শঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছেন বলিয়াই এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ সহসা তাঁহার পক্ষে শঙ্কানুভব করিবার কোনই কারণ লক্ষিত হয় নাই।

ইহার পর ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার মত আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমি বরাবর বলিয়াছি যে, গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে, স্বাধীনতালাভ করিবার পথে, কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান, খুব বেশী সময় নয়। অবশ্য, সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজলাভের ভিত্তি যদি এখনই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের ও গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। আমি জানি, আপনারা বলিবেন—'মন পরিবর্ত্তন' একটা সুন্দর কথা মাত্র—উহার কোন অর্থ নাই—প্রকৃত কাযে উহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা চাই। ইহা খুব সত্য এবং আমি ইহা স্বীকার করি। কিন্তু মুখের কথা কাযে পরিচয় দিবার জন্ত রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে পারে, যদি রাজা ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্স দূর করিয়া একটা মিটমাট বা আপোষের প্রস্তাব হয়। উভয় দলের মধ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস উভয় দলই অতি সহজে অনুভব করিতে পারে। ধীর ও শান্তভাবে সত্য যদি কোন আপোষের প্রস্তাব হয়, তবে তাহার সার্থকতার জন্ত আমি মনে করি, সেই আপোষের সর্ত্ত (Terms) গুলি অপেক্ষা ঐ সমস্ত সর্ত্তের (Terms) পশ্চাতে যে মন আছে, সেই মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। উভয় পক্ষের মন যদি সরল হয়, সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে।

অন্যথা সফলতার কোন সদুপায় আমি ত দেখি না। বর্ত্তমান অবস্থায়—এখনই—আপোষের জন্য নিশ্চিতরূপে কোন সর্ত্ত (Terms) উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সত্যই কর্ত্তৃপক্ষের মন যদি সরল হইয়া আইসে, পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া—শান্তভাবে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—তবে আপোষের সর্ত্তগুলিকে স্থিরনিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অধিককাল বিলম্ব হইবে না।

"বাঙ্গালা দেশের মনের ভাব আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি—তাহাতে আভাসে কতকগুলি সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"প্রথমতঃ—গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ দমন-নীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ—রাজনীতিক বন্দীদের সর্ব্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

"দ্বিতীয়তঃ—বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি—তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন—যে কথার নড়চড় হইতে পারিবে না।

"তৃতীয়তঃ—পূর্ণ স্বরাজলাভের পূর্ব্বে—ইতোমধ্যে এখনই—আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজ-লাভের একটা স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

"এখন পূর্ণ স্বরাজলাভের পথে কি ভাবে এই বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে কোন্ দিকে কতটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা মিট্‌মাট-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তার উপর নির্ভর করে এবং এই কথাবার্ত্তা কেবল যে গবর্ণমেণ্ট ও সমগ্র প্রজা-শক্তির প্রতিনিধিদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। দেশের সকল বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও পরামর্শ করিতে হইবে। দেশের য়ুরোপীয় Anglo-Indian সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকেও আহ্বান করা হইবে। আমার গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি।

"আমি এ কথা আপনাদিগকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে বলিতেছি যে, আমরাও গবর্ণমেণ্টের সহিত এমন একটি সর্ত্তে আবদ্ধ হইব যে, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি হাবভাবে আমরা রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনে উৎসাহ দিব না—অবশ্য এখনও দিই না—এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আত্মঘাতী আন্দোলন দেশ হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিব। এইরূপ একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে, তাহা নয়—কেন না, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন,—কোন দিনই রাজদ্রোহমূলক কোন প্রকার আন্দোলনকে উৎসাহ দেয় নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইলে—তাহার ফলে স্বতঃই রাজদ্রোহীদের মনেও একটা পরিবর্ত্তনের ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে এবং আমি যে ভাবের একটা আপোষের আভাস এইমাত্র দিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে রাজদ্রোহের আন্দোলন একটা অতীতের বস্তু হইবে মাত্র—বর্ত্তমানে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না এবং যে শক্তি ও সামর্থ্য ভ্রান্তপথে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োগ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে, তাহা দেশের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবে।

"তার পরের কথা, যদি আমাদের আপোষের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। আমরা গত ২ বৎসর কাল যে ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছি—সেই পথে—সেই ভাবেই কার্য্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাপ্রযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন—স্বাভাবিক নিয়মে—শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন না। যেমন এখন পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা যুক্তিও দেন। বাজেটের প্রস্তাবে বাধা দিবার না কি আমাদের নৈতিক অধিকার নাই। কেন না, তৎপূর্ব্বে আমাদের না কি প্রজাদের নিকট যাইয়া ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

"এই কথার উত্তরে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, সমগ্র ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট অহিংসামূলক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আবহাওয়া' সৃষ্টি করা স্বাধীনতা-প্রয়াসী পর্য্যন্ত আমরা

—আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্ব্বপ্রথমেই পাশুপত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই—কোন বীরই তাহা করেন না,—আমরাও তেমনই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না। কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে,—শেষ যখন আমাদের সম্মুখে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না—ভীত হইব না। কেন না, আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশু-বলের বিরুদ্ধে মানবের যে আত্মার বল—তাঁহারই যুদ্ধ। ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই—কিছু আইসে যায় না। এ বিশ্বাস আমাদের আছে যে, পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের আজিকার যুদ্ধের মত—কোন একটা যুদ্ধও দেখাইতে পারে না। এক দিকে বর্ত্তমান যুগের নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান সহায়ে সুসজ্জিত দৃঢ়বদ্ধ কাতারে কাতারে সশস্ত্র সেনা-সমাবেশ—অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ অগণন ৩০ কোটি নর-কঙ্কাল। কটিমাত্র বস্ত্রের আবরণে দেশব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জীবন্ত বিগ্রহ—ভারতের প্রধান সেনাপতি, আজ মাত্র আত্মার বলকে হস্তামলক-বৎ ধারণ করিয়া আমাদিগকে এই সমরাঙ্গনে আহ্বান করিয়াছেন।"

রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই রাজনীতিকে চিত্তরঞ্জনের শেষ উক্তি, দেশবাসীকে ইহাই তাঁহার শেষ উপদেশ। আজ তিনি লোকান্তরে—কিন্তু মৃত্যুর পরপার হইতে তাঁহার এই উপদেশ দেশবাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, যাহাদের জন্য তিনি সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন—দেশবাসী তাঁহার এই উপদেশ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কায করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

চিত্তরঞ্জনের নৈতিক চরিত্র

যে বিরাট ত্যাগী,—মহাপুরুষের আজ অন্তর্দ্ধান হইল—তাহার তুলনা নাই। তিনি দানে শিবির মত ছিলেন,—ত্যাগে হরিশ্চন্দ্র ছিলেন। বিদ্যা ও প্রতিভায় তাঁহার সমকক্ষ বর্ত্তমান যুগে একান্ত বিরল।

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ বহবঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"

দেশের দুর্ভাগ্য যে, আজ তাঁহার তিরোভাব হইল। দেশের পক্ষে ইহা ইন্দ্রপাতের মত অকল্যাণকর।

চিত্তরঞ্জন দেশের বর্ত্তমান নৈতিক অবস্থায় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। দেশে যখন নীতিশিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই, তখন সাক্ষাৎ নীতি যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্রের একাংশও যদি দেশবাসী নিজ নিজ চরিত্রে বিকাশিত করিতে পারেন, তাহা হইলেও দেশ—এই বর্ত্তমান নৈতিক দুরবস্থার দিনে মহিমামণ্ডিত হইতে পারে।

তাঁহার নৈতিক চরিত্রের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার 'অর্থ-শুচিতা' প্রকটিত হইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহার পিতার ৬৪ হাজার টাকা ঋণ। কিন্তু উত্তমর্ণের পক্ষে আইনানুসারে এই টাকা আদায় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কিন্তু সাধু-চরিত্র মহামনা চিত্তরঞ্জন ভাবিলেন যে, ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি পিতার ঋণের জন্য অবশ্য দায়ী। তিনি আইন অনুসারে ঐ টাকা না দিলেই পারিতেন, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ ঋণ তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার যে হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে এ মর্ত্ত্যলোকে নাই। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজের আইনের গণ্ডীর বাহিরে আমরা আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব।" এক্ষণে তাঁহার এই বাক্য এবং কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তারকেশ্বরে যখন তাঁহার নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ব্যাপারের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইতেছিল, তখন নীচমনা তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার নামে মোহান্তের নিকট হইতে টাকা লওয়ার কুৎসা রটাইতেও বিরত হয় নাই। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নামে সংবাদপত্রে নানা কুৎসা প্রচারিত হইতেছে, অনেকে বলিতেছেন, আমি মোহান্তের নিকট হইতে ঘুস লইয়াছি, কিন্তু আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি অহঙ্কারী হইতে পারি, অভিমানী হইতে পারি, কিন্তু আপনারা ঠিক জানিবেন, টাকার থলির উপর দিয়া আমার চরণই চালিত হইতে পারে—হস্ত আমার কখনই ঐ ঘৃণিত টাকার থলি স্পর্শ করিবে না।" বস্তুতঃই নিন্দক দলের এই কুৎসা-প্রচার সম্পূর্ণ বিফলই হইয়াছিল। তিনি অজস্র অর্থ স্বয়ং অর্জ্জন করিয়া প্রার্থিগণের প্রার্থনা পূরণার্থ মুক্তহস্তে জলের মত নির্ম্মমভাবে দান করিতেন, তিনি স্বদেশজননীর সেবার আহ্বানে সমুদয় ঐশ্বর্য্য সিদ্ধার্থের মত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তাই বিরোধী দলের ঐরূপ নিন্দা—দেশবাসী উপেক্ষায় হাসির সহিত উড়াইয়া দিয়াছিল।

"সর্ব্বেষামপি শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থশুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥"

(মনু, ৫ অঃ, ১০৬ শ্লোঃ।

যিনি অর্থ বিষয়ে শুচি—তিনিই প্রকৃত শুচি। অর্থশুচি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিলে শুচি হয় না,—মহর্ষি মনুর এই বাক্যটি স্বর্গীয় দাশ মহাশয়ের চরিত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এই এক অর্থশুচি মাত্র গুণটিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবার যোগ্য।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন—(সভা পঃ ৫ম অঃ ১১২ শ্লোঃ)—"দত্তভুক্তফলং ধনম্।" অর্থাৎ দান ও ভোগেই ধনের সার্থকতা। চিত্তরঞ্জনও অজস্র দান ও রাজার মত ভোগ করিয়া স্বোপার্জিত ধনের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের দৃঢ়তা ও সৎসাহস প্রকাশ পায়—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসময়ে—যখন তিনি নারায়ণ-শিলা গৃহে আনয়ন করিয়া হিন্দুমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই পুরুষ ব্রাহ্ম ছিলেন, তথাপি তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মপদ্ধতি উল্টাইয়া যে হিন্দুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, ইহা কম হৃদয়বলের পরিচায়ক নহে। ইহাতে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার উপর বিষম চটিয়াছিল, কিন্তু নারায়ণভক্ত—দৃঢ়চিত্ত চিত্তরঞ্জন ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিখ্যাত "নারায়ণ" পত্রিকাও তাঁহার অচলা নারায়ণ-ভক্তির পরিচায়ক।

গত বর্ষে তিনি যখন আমাদের ভাটপাড়ায় ২৪ পরগণা জিলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে আশীর্ব্বাদসূচক অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তাহার উত্তরে তিনি যে ভক্তিগদ্‌গদভাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের প্রতিনিধি মহোদয়কে প্রণাম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণভক্তি বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমসম্মিলনীর সভাপতিরূপে আসিয়াও ব্রাহ্মণপদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি ধন্য হইলেন বলিয়া—ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আজ-কালকার নবাশিক্ষিত দলের মধ্যে কয় জন এইরূপ ব্রাহ্মণভক্তি দেখাইতে পারেন? বিশেষতঃ তিনি দেশের নেতৃরূপে বরেণ্য। ইহা তাঁহার বিনয়নম্র ভাবেরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ধীরোদাত্ত নায়কের মত তাঁহার চরিত্র এক দিকে যেমন বীরত্বগরিমামণ্ডিত ছিল, অপর দিকে তিনি তেমনই মধুরিমার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কটুভাষী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও তিনি কখন অবিনীত বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

ভাটপাড়ার কন্‌ফারেন্সে তিনি একটি মহামূল্য বাক্য কহিয়াছিলেন,—"ধর্ম্ম প্রথম, কি রাজনীতি প্রথম, ইহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। দিনের পর রাত্রি, কি রাত্রির পর দিন, ইহাও যেমন তর্কের স্থল, সেইরূপ ধর্ম্ম ও রাজনীতিক প্রাধান্য লইয়াও তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু আমার মতে দেশ রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য না পাইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে কিরূপে? পরাধীন—অর্থহীন জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানবাঞ্ছা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনপ্রয়াসের মত ব্যর্থ।"

গোঁড়ার দল—চিত্তরঞ্জনের এই বাক্যের নানারূপ অযথা সমালোচনা করিয়াছিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে চিত্তরঞ্জনের কথার সত্যতা উপলব্ধি না করিয়া থাকা যায় না। পরাধীন জাতি যে ক্রমশঃ নৈতিক হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে ক্রমশই অসমর্থ হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রভু শাসক জাতির মনস্তুষ্টির জন্য অযথা মিথ্যা তোষামোদে এবং সঙ্গে সঙ্গে তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ইত্যাদি নৈতিকগুণের বিসর্জ্জন—অবশ্যম্ভাবী। দেখুন, গুপ্তরাজগণের আমলেও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুর স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে কয়টা যজ্ঞের খবর পাইয়া থাকেন? এই পরাধীনতার ফলেই না আমাদের বেদ, স্মৃতি, সামাজিক আচার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। আর আজ যে চাতুর্ব্বর্ণ্য লোপ পাইতে চলিল, ইহার কারণও কি পরাধীনতা নহে? আমাদের নিজের রাজা যদি সমাজের রক্ষক হইতেন, তাহা হইলে কি বর্ণাশ্রম সমাজের এমন বিড়ম্বনা হইত? দেখুন, রাজর্ষি জনকের সময়ে তাঁহার রাজ্যে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কেহ স্বধর্ম্মচ্যুত ছিল না। (বন পঃ ২০৬ অঃ ২৮ শ্লোঃ)

> "জনকস্যেহ রাজর্ষে বিকর্ম্মস্থো ন বিদ্যতে।
> স্বকর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি দ্বিজোত্তম॥"

জনক রাজার রাজ্যে কেহ বিকর্ম্মস্থ নাই, চতুর্ব্বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত। তবেই দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের ক্রমশই অধোগতি হইতেছে।

ইহা ব্যতীত, আমাদের শাস্ত্রে গৃহীর পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রতি তুল্য সেবার উপদেশ আছে। কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অর্থ, কাম বর্জ্জন করিতে শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করিতেছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রের একটি বচন দেখুন। (মহাভারত বন পঃ ৩৩ অঃ ২৯ শ্লোঃ)

> "সর্ব্বথা ধর্ম্মমূলোঽর্থো ধর্ম্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ।
> ইতরেতরয়োর্নীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা॥"

যেরূপ মেঘের কারণ সমুদ্র, আবার সমুদ্রের কারণ মেঘ, তেমনই ধর্ম্মের কারণ অর্থ এবং অর্থের কারণ ধর্ম্ম, এই দুইটি পরস্পরাশ্রিত জানিবেন।

এইক্ষণে দেশবন্ধুর বাক্যের সহিত শাস্ত্রের বাক্য মিলাইয়া দেখুন। উভয় বাক্যের যথেষ্ট সাম্য বিদ্যমান।

চিত্তরঞ্জনের আর একটি মহাগুণ—তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা, এই নির্ভরতা ছিল বলিয়াই তিনি রাজার মত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া—প্রাণপ্রিয় পুত্র ও পত্নীকে নিঃস্ব করিয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং শেষে স্বদেশ-সেবা যজ্ঞে নিজজীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক অভিভাষণের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—"যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সকল মানবের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে কিরূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন, শুধু তিনিই জানেন।" সর্ব্ববস্তুর মধ্যে শ্রীভগবদুপলব্ধির পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে?

তাঁহার অনেক কবিতাতেও শ্রীভগবানে অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি দেখিতে পাই।

> "আমি জানি না, চিনি না, বুঝি না তোমারে
> তখনি তোমারে চাই,
> যে পথে ল'য়ে যাও সেই পথে যাই
> আমি তোমারেই শুধু চাই।
>
> * * *
>
> সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই,
> তুমি জান দুঃখমাঝে করেছি সন্ধান—
> তোমারে তোমারে শুধু, পাই বা না পাই।
>
> * * * * *
>
> যদি প্রাণে ব্যথা লাগে চোখে আসে জল
> ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
>
> * * *
>
> দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক,
> যদি ভয় পাই বঁধু মাঝে মাঝে ডেক।"

এই কবিতা তাঁহার কেবল কবি-কল্পনাপ্রসূত নহে, পরন্তু ইহা তাঁহার মর্ম্মগাথার একটি মূর্চ্ছনা। ইহাতেই দেখুন শ্রীভগবানে তাঁহার কি দৃঢ়া ভক্তি ছিল। এই ভগবদ্ভক্তির ফলেই তিনি মরিয়াও অমর হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতি।" ইহার সার্থকতা দেশবন্ধুতে পরিস্ফুট। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" আজ তাঁহার কীর্ত্তি ধরিত্রীর ভিত্তিগাত্রে প্রতি প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

চিত্তের কথা

শৈশবে চিত্তরঞ্জন, সতীশরঞ্জন ও যতীশরঞ্জন, সমবয়স্ক এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারে লালিত ও পালিত হয়। তাহাদের শৈশবেই সতীশ ও যতীশের মাতা দেহরক্ষা করেন। চিত্তরঞ্জনের মাতা তিন জনকেই মানুষ করেন। খেলিবার কালে চিত্তের সঙ্গে কেহ ঝগড়া করিত না। "চিত্তদাদা" বলিতে সকলেই অজ্ঞান ছিল। এক স্কুলে সকলেই বাল্যকালে পড়িত। চিত্তের মাতা চিত্ত অপেক্ষা সতীশ ও যতীশকে বেশী যত্ন করিতেন। তিনি হয় ত চিত্তকে না দিয়া সতীশ ও যতীশকে খাবার দিতেন। জিজ্ঞাসায় বলিতেন যে, উহাদের নালিশ করিবার বা জানাইবার স্থান নাই, এই জন্য উহাদের অগ্রে দিয়াছি। মাঝে মাঝে খেলনা লইয়া সতীশ ও যতীশে ঝগড়া করিয়া চিত্তের মা'র কাছে নালিশ করিলে তিনি চিত্তকে মারিতেন, এরূপ অবিচারও দেখিয়াছি। চিত্তকে বলিতেন, ভুলে যাস উহাদের 'মা' নাই। চিত্ত বন্ধুদের না খাওয়াইয়া নিজে কখনও খাইতেন না। ১০।১২ বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জনের নিজ মতামতে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইত। একবার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন বাবু চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বড় হইলে তোমরা কি করিবে? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, উকীলরা সব জুয়াচোর হয়, আমি কিছুতেই উকীল হইব না। তাহাতে দুর্গামোহন বলেন যে, তবে আমরা (অর্থাৎ আমি ও তোমার পিতা) কি জুয়াচোর? তাহাতে চিত্তরঞ্জন উত্তর দেন যে, তোমরা কি কর, তাহা জান না, কিন্তু উকীলী ব্যবসায়ে উচ্চতা লাভ করিতে হইলে জুয়াচুরি ছাড়া উপায় নাই। এ কথায় সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহাকে জ্যেঠা ছেলে মনে করিল। চিত্তরঞ্জন কাহারও মতের উপর নিজের মত দিতেন না, সর্ব্বদা তিনি নিজের মতে কার্য্য করিতেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষ সর্ব্বদা হৃদয়ে বিরাজ করিত। মাতৃভক্তি চিত্তের হৃদয়ে বেশী ছিল।

দারজিলিংএর শেষ শয্যা [শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

বিলাতে চিত্তসহ

চিত্তরঞ্জন যখন শিক্ষার্থ লণ্ডনে ছিলেন, আমিও সে সময় সেখানে ছিলাম! পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে আঁটা-আঁটি ছিল না এবং পোষাক-পরিচ্ছদে বাবুয়ানা ছিল না। কেবল নূতন পুস্তক দেখিলেই ক্রয় করিতেন। কবিতার পুস্তক লইয়া সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন। একবার আমি কথাপ্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি যে এত কবিতা ভালবাস, যদি তোমার জীবনে কবিত্বময়ী স্ত্রী না জুটিয়া উঠে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তখন তিনি ব্রাউনিংএর একটি কবিতা দেখাইয়া বলিলেন যে, যদি স্ত্রীকে ভালবাসা দিয়া সুখী করিতে না পারি, তাহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া সুখী করিব। এ কথা আজও আমার কানে বাজিতেছে। নূতন পুস্তক ও নূতন লেখকের সমালোচনা যখনই করিতেন, তখনই তাঁহার স্থির দৃষ্টির নমুনা পাইতাম। পিতামাতার দুঃখমোচনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই চিত্তের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। থিয়েটার ও মিউজিক হলে প্রায়ই যাইতেন ও তাঁহার সঙ্গীদের খরচও নিজে বহন করিতেন। দেশের কবিতা কিংবা নাট্য-কলার উন্নতি হওয়া উচিত, এই সব বিষয় সর্ব্বদাই চর্চ্চা করিতেন। নিজের পাঠ্য ব্যতীত বাহিরের পুস্তক বেশী অধ্যয়ন করিতেন এবং সেই পড়িবার স্পৃহা বেশী দেখা যাইত। বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্য ভাল রকমই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিঙে শেষ তিন সপ্তাহ

দার্জিলিংএ আমি যাইবার পরদিনই চিত্ত আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা

করিল এবং রাজনীতিক বিষয় লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চিত্ত বলিলেন, বড় দিদি, অনেক দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই। আমি বলিলাম, ইচ্ছা করিয়া আমি দেখা করি নাই, তোমরা দুই ভাই যে (সতীশবাবু ও চিত্তরঞ্জন) যেরূপ কবির লড়াই করিতেছ, তাহাতে ভাই মনে বড়ই দুঃখ হয়,তাই আমি এখানে থাকি। চিত্ত উত্তর দিলেন,দিদি, ও বাহিরের ঝগড়া, আমরা পরস্পরকে গালি দিলেও তাহাতে মনের ভিতর ঠিক সদ্ভাবই আছে। আমি যাহা করিতেছি, দেশের ও দশের জন্যই করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাব যাইবার নয়, তাহা অন্তরে ঠিকই আছে। একটি আশ্রমের কথা চিত্ত সর্ব্বদাই বলিতেন। প্রাইমারী শিক্ষা ও গ্রামাসংস্কার লইয়াই আমার সহিত অনেক কথা হইয়াছিল। চিত্ত বলিতেন যে, "আমার শরীর সুস্থ হইলে শীতকালে গ্রাম্য-সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিব।" ডাক্তাররা দেখিয়া সমুদ্র-পথে যাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি সেই কথা বলাতে উত্তর দেন যে আমার বিলাত যাবার সহজ কথা নয়, অনেক পয়সা চাই, এখন তাহা কোথা পাইব? আমি বলিলাম, তোমার প্রাণ আগে না পয়সা আগে? দার্জিলিঙ্গে এক দণ্ডও আমার কাছছাড়া থাকিতেন না। সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত মৃত্যুর পূর্ব্বে রবিবারে নিজে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। চিত্তের একটা মহদ্গুণ আগাগোড়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার কাছে যেই আসুক-না কেন, আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাতে আকর্ষণী শক্তি প্রবল ছিল।

শ্রীসরলা রায় (দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী)।

দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দধীচি, ভীষ্ম কি ভরতকে দেখি নাই, মস্তক কিন্তু তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধায় অবনত না হইয়া পারে না। স্বর্গীয় দাশ মহাশয়ের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য কোন দিন ঘটে নাই, তথাপি প্রাণ আজ হায় হায় করিয়া উঠিতেছে, তাঁহার উদ্দেশে বার বার নত হইয়া দীনভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "square man." আমাদের মধ্যেও "চৌকোস লোক" কথাটা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তার কোনটাই উচ্চাদর্শবাচক নহে; কথাটা বরং বিষয়ী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের একটা বিশেষণ বলিয়াই গৃহীত হয়,—তাহা শ্রদ্ধাকর্ষণ করে না।

দাশ মহাশয় "চৌকোস লোক" ছিলেন না। তিনি ছিলেন—আদর্শপুরুষ,—যাহা বহুভাগ্যে কোন দেশ লাভ করিয়া থাকে।

তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁহার আইনজ্ঞান, তাঁহার কবিপ্রতিভা, তাঁহার বিপন্নবাৎসল্য, তাঁহার দেশপ্রীতি, তাঁহার সঙ্ঘগঠনদক্ষতা, তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার তুলনারহিত ত্যাগ প্রভৃতি সর্ব্বজনবিদিত কথা ছাড়া,—সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন—ধর্ম্মপ্রাণ পরম বৈষ্ণব, তাঁহার অন্তরটা ছিল—অকৃত্রিম অনুরাগী ভক্তের; হৃদয়টি ছিল অত্যধিক কোমল।

কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি মহাত্মা গন্ধীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। নাগপুর কংগ্রেসেই তিনি মেজরিটির, তথা মহাত্মার মতের অনুকূলে নিজের প্রাণের পূর্ণ অনুমোদন পায়েন নাই। ফিরিবার পথে তিনি কাশী হইয়া যান। কাশীতে কেহ কেহ তাঁহার অভিমত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ব্যথিত অন্তরে, উদাসভাবে বলেন—"আমি এখনও Non-co-operationএর ভাল-মন্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া, আমাকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। সহসা কিছু করিতে আর প্রাণ চাহে না। এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি—আমার প্রাণাধিক প্রিয় বালক ও যুবকরা আমাদের ইচ্ছা ও আদেশ মাথায় করিয়া চলিয়া—সকল রকমের নির্যাতন ও পীড়া সহিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এমন কি, তাহাদের অধিকাংশেরই ইহজীবন ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। বাপ-মা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংসার নষ্ট হইয়াছে। তাহারাই দেশের প্রাণের সবল উৎস,—তাহারাই আশাভরসা। তাহাদের উপর অন্যায় নির্যাতনের উপযুক্ত প্রতীকার করিতে পারি নাই। তাহাদের অসীম ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা সর্ব্বক্ষণ আমাকে ব্যথাই দিতেছে;—বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কই—আমাদের ত কোন ক্ষতি হয় নাই, সকল ঐশ্বর্য্যই পূর্ব্ববৎ ভোগ করিতেছি! ভাল খাওয়া-পরা, উৎকৃষ্ট যানবাহন—শোভা-সম্মান,—সবই ত বর্ত্তমান,—কিছুই ত ঘোচে নাই! এ আর আমি সহিতে পারিতেছি না। যাহা হয় করিতেই হইবে,—দেশের সাড়া লইয়া দেখি।" তাঁহার সে কি দ্বিধান্দোলিত, কাতর, চিত্তব্যাকুলতা! ইহাই ভক্ত-সাধকের সত্য পরিচয়। ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্যটা সর্ব্বদাই তাঁহার সজাগ থাকিত। প্রত্যেক কর্ম্মেই তিনি ধর্ম্মের অনুমোদন খুঁজিতেন।

বেণারস হইতে দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরে,—বোধ করি, মাসাধিকও অতীত হয় নাই,—দেখি, দাশ মহাশয় দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র দেশসেবাকেই জীবনের ব্রতরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং বঙ্গদেশও এই পুরুষসিংহকে "দেশবন্ধু" ও নেতৃপ্রধান বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

সেই দিন সেই মাসাধিক পূর্ব্বের তাঁহার সেই কাতর ভাব ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা কেবলই স্মরণ হইতে লাগিল। ভাবিলাম—সেই বেদনাবিধুর মহাপ্রাণ বুঝি দেশের জন্য স্বেচ্ছায় ফকির হইয়া ও কৃচ্ছ্র সাধনা গ্রহণ করিয়া, তবে আজ শান্তি লাভ করিলেন! বুকটা গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল;—প্রাণ—ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল, মস্তক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধাভক্তিতে বার বার তাঁহার উদ্দেশে নত হইল। আমি বাঙ্গালী, চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালাদেশের লোক —এই ভাবিয়া আমিই যেন ধন্য হইয়া গেলাম!

তাহার পর তিনি বাঙ্গালাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই চিত্ত জয় করিয়া, এমন কি, বিরুদ্ধ মতাশ্রয়ী পক্ষেরও হৃদয়াকর্ষণ করিয়া, তাঁহার যাহা-যাহা অভীপ্সিত ছিল, একে একে তাহা লাভ করিয়া অসীম শ্রমে ও অদম্যগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ ভক্তের মুখ রক্ষা করিলেন; তিনি দেখিয়া গেলেন—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, বঙ্গের মন্ত্রী ও মন্ত্রণা-পরিষদ তাঁহার অঙ্গীকারানুরূপ গতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন হইল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের শোক-সভায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মাত্র তাঁহারই শক্তিসাধনার যোগ্য ছিল। সে অগ্নিগর্ভ বাণীর প্রতি অক্ষর শক্তিদীপ্ত; বঙ্গবাসী চিরদিনই তাহা শ্রদ্ধায় স্মরণ করিবে। বীরের সে আত্মসমর্পণ, সে বিপুল বেদনাভরা প্রকাশ—বুঝি স্বাধীন দেশের শক্তিশালী ভাষাতেও দুর্লভ।

তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি—

"মুক্তবেণী গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদবঙ্গে।"

* * * *

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া—আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি!"
"চরণতলে সপ্তকোটি সন্তান তোর যাগে রে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো,—
জাগিয়ে দে তোর নাগেরে।"

উদাত্ত আবেগে আবৃত্তি করিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে মহাকবির আসন দিয়া বলেন—"যদি কেহ আমার সঙ্গী না হয়, আবশুক হইলে একাই আমি সেই বাঘের মধ্যে প্রবেশ করিব ও তাহাদের জাগাইব !"

দেশের জন্য তাঁহার ছিল অনন্যসাধারণ আন্তরিকতা। দেশের দুঃখ তিনি আর সহিতে পারিতেছিলেন না। "Subject nation" এই কথাটি তাঁহাকে তীব্রভাবে অহরহ দংশন করিতেছিল। ইহাই ছিল তাঁহার দুঃসহ পীড়া,—সত্যের পীড়া। সেই পীড়াই এত সত্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেল !

তাই বলিয়া—চিত্তরঞ্জন মরেন নাই, মরিবেনও না। তিনি অনন্যোপায় দেখিয়া ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিবার জন্য আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, প্রত্যেক বাঙ্গালী যাহাতে তাঁহার আন্তরিকতা, তাঁহার শক্তি-অংশ লাভ করে, তিনি তাহারই জন্য নিজেকে সবার মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী এখন তাঁহাকে "স্বাগত" বলিয়া সগৌরবে শ্রদ্ধায় বরণ করিয়া লইয়া—নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই তাঁহার দেহত্যাগ সার্থক হইবে।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণের মানুষ *

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন !" এমনই প্রাণান্ত পণে আপন জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে মরণকে অম্লান মুখে সাধিয়া বরণ করিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর আজ এই অগণ্য আমাদের মধ্যে আপনাকে দিব্য সঞ্জীবনী শক্তিরূপে ব্যাপ্ত ও সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার পুণ্য স্মৃতি-তর্পণের দিনে এই শুভ শ্রাদ্ধাহে আজ বারংবার কেবল একটা কথাই আমার মনে হইতেছে। কথা হইতেছে যে, এই যে অদ্ভুতকর্ম্মা, বিরাট পুরুষকে আমি আবাল্য দেখিয়া শুনিয়া আসিলাম, ইঁহার 'স্বভাব-চরিত্রে' বা জীবনে এমন কি অনন্যসাধারণ ও অলৌকিক বিশেষত্ব বা অপূর্ব্ব লৌকিকত্ব দেখিলাম, এমন কি অনুপম মহিমা বা আশ্চর্য্য রহস্যের সন্ধান তাঁহাতে পাইলাম, যাহার ফলে তিনি দলাদলি ও মতানৈক্যে ছিন্নভিন্ন, হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত, নির্জীব ও অবসন্নপ্রায় এই ৩০ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যে এমন করিয়াই আপন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং অবিচল ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ অর্জ্জন করিয়া লইতে অনায়াসেই সমর্থ হইলেন ? অমর দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত, প্রাণহীন ও অসার শবের দর্শন, সংবর্দ্ধন ও অনুগমন উপলক্ষে মহানগরীতে এই যে সে দিন লক্ষ লক্ষ লোক চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় অন্তরের অনিবার্য্য আকর্ষণের আবেগে সমবেত হইয়াছিল, এরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী, অদ্ভুত সম্মোহিনী শক্তি তাঁহার কি ছিল, যাহাতে এমন একটা বিশ্ব-বিস্ময়কর, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভাবিত ব্যাপার বাস্তবিকই সম্ভব হইতে পারিল ? কি সে অমোঘ আকর্ষণ—যাহার বলে এমন কল্পনাতীত, আশ্চর্য্য ঘটনা এই হতভাগ্য, পরাধীন দেশেও আজ প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল ? বস্তুতঃ সে দিন কলিকাতায় এই যে অপূর্ব্ব দৃশ্য চাক্ষুষ হইয়াছে, তাহা এ পৃথিবীতে ইদানীং আর কোথাও কোন ঘটনা উপলক্ষে দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়াছে কি না, কে বলিবে ?

দেশবন্ধু অজাতশত্রু ছিলেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে নানা কারণে ও অনেক ব্যাপারে তিনি এ দেশের কল্যাণকল্পে নিজে যাহা ভাল, সঙ্গত ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা করিতে যাইয়া, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, এ দেশে সর্ব্বথাই বহু বিরুদ্ধবাদী, প্রতিকূলকর্ম্মী ও নিন্দকের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এ কি অদ্ভুত রহস্য যে, সহসা যে মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁহাকে এই দুর্ভাগ্য দেশের বক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ছিনাইয়া লইয়া গেল, ঠিক তখনই এ দেশে স্বদেশী ও বিদেশী,—তাঁহার যেখানে যত শত্রু, নিন্দক বা প্রতিকূলকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অভাবে একান্ত তন্ময়ভাবেই শোকার্ত্ত হইয়া উঠিলেন ; এবং তাঁহার অসহ্য বিয়োগশোকে দিশাশূন্য, অস্থির, আত্মহারা ও ব্যাকুল হইয়া, হিন্দু, মুসলমান, স্বদেশী ও বিদেশী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিচারে এ দেশের সকলেই তাঁহার ঐ নিঃসাড় শবের পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধন, পূজা ও অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেন ; এ হেন মোহিনী শক্তি তিনি কোথায় পাইলেন ? কি করিয়া এমন একটা অভাবিত, অদ্ভুত কাণ্ড এ দেশেও সম্ভব হইল ?

আমার মনে হয়, ইহার কারণ—এ দেশের অন্তর্নিহিত যে যথার্থ স্বরূপ, বাঙ্গালার অন্তরের অন্তরতম মণিকোটায় প্রকৃত তাহার যে প্রাণ-শক্তি, দেশবন্ধু সেই স্বরূপ-প্রকৃতি বা প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাইয়া, নিজেকে সেই আত্ম-স্বরূপেই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন ; এবং বাঙ্গালার এই মূল 'ধাত'টি অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়া, স্বভাব বা স্বধর্ম্মের সাহায্যেই তিনি এ দেশের উদ্ধারসাধনার্থ দেশমাতৃকার পাদপীঠতলে আপনার ইহসর্ব্বস্ব, আপন তনুমনঃ-প্রাণ নিঃশেষেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই যে সত্যযুগসম্ভব, অভাবিত আত্মোৎসর্গ, এই যে অপূর্ব্ব, অপরিমেয়, বিরাট্ ত্যাগ,—এ কালে ইহার কি আর কোথাও তুলনা আছে ? এমন করিয়া দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্ম-হারা, পাগল হইতে ইদানীং আর এ দেশে কবে, কোথায় কে পারিয়াছে ? কিন্তু শুধুই কি এ দেশ ? এই বিপুল পৃথিবীতে এত বড় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত এ যুগে আর কোথায় আছে ? দূর হইতে, বাহির হইতে তাঁহাকে না জানিয়া, আজও বোধ হয়, অনেকেই তাঁহার এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মহিমা তেমন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কিন্তু, যাঁহাদের তাঁহাকে পূর্ব্বাপর দেখিবার বা জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহারা জানেন যে, তিনি কি ছিলেন এবং পরে এই দানের ঝোঁকে ঠিক যেন পাগলেরই মত, আপনাকে কিরূপ নির্ব্বিচারে ও সর্ব্বতোভাবেই একেবারে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া, এমন কি, শেষে আপন প্রাণটকে পর্য্যন্ত তিলে তিলে কি ভাবে কেমন করিয়া আমাদের জন্য, এ দেশের কল্যাণকল্পে অনায়াসেই হাসিতে হাসিতে পরম আগ্রহের সঙ্গে বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন !

> শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।
> ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।
>
> —কৈবল্য-উপনিষৎ।

এই অভ্রান্ত ঋষিবাক্য যে কতদূর সত্য, তাহা প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেশবন্ধুর জীবনের এই অতুল আদর্শ দেখিয়া, অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। একমাত্র এই ত্যাগ, এই নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের দ্বারাই তিনি অমরত্ব—অমৃতত্ব, স্বীয় একাগ্র ঐকান্তিক তপস্যার সেই অবিনশ্বর স্বরাজলাভে তিনি যে সত্য সত্যই কৃতকার্য্য বা সফলকাম হইয়া গিয়াছেন, তৎপক্ষে কি আর কোন সন্দেহ আছে ? ধন্য, ধন্য, তিনিই ধন্য ! আর আমরাও ধন্য যে, এ 'দেশবন্ধু' আমাদেরই এই দেশের বন্ধু, তিনি আমাদেরই সমশোণিতজীবী সহোদর ভাই, আমাদের এই মায়ের বুকে,—একই জন্মভূমি জননীর স্নিগ্ধ শ্যামল কোলে তিনিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনে তিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বথা শুধু আমাদেরই ছিলেন। অবশ্য মরণে আজ তিনি বিশ্ববিজয়ী অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তবু তিনি আমাদের,—একান্তই আমাদের, আর আমরাও তাঁহার জীবনে-মরণে ইহ-পরকালে

---

* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধাহে বরিশাল সহরে যে বিরাট্ স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

আমাদের এই ঐকান্তিক বন্ধন, এই আধ্যাত্মিক সত্তা সম্বন্ধ কখনও বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। বাস্তবিক আমাদের এই সৌভাগ্য, এ গৌরব, এই যে অধিকার গর্ব্ব. জাতীয় জীবনে আজ এত বড় ভরসা আমাদের আর কি আছে?

এই সারাটা দেশকে, মোক্ষভূমি এই বিশাল ভারতবর্ষকে, —বিশেষভাবে আমাদের এই সোনার বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালীজাতি, অর্থাৎ এই অযোগ্য ও অভাগ্য আমাদিগকে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু এই যে এমন করিয়া আত্মহারা, তন্ময় ও উন্মাদ হইয়া আপনাকে একেবারেই নিঃশেষে বিলুপ্ত বা উজাড় করিয়া দিয়া, অনন্যমনে ভালবাসিয়া গেলেন,—বাস্তবিক যে মহান্ প্রেমযজ্ঞে তিনি তাঁহার তনুমনঃপ্রাণ, এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব সমস্তই আন্তরিক অদম্য আগ্রহে আহুতি দান করিয়াছেন,—এ হেন সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বনাশা প্রেমের এ সংসারে প্রকৃতই আর তুলনা মিলে না সত্য; কিন্তু এই দিব্যোন্মাদ, প্রেমময় মহাপুরুষ এই ভাবে কেবল আপনার জীবনাহুতি দিয়াই কি এ যজ্ঞের অবসান করিলেন? এ যজ্ঞের ফলভাগিরূপে আমাদের জন্য আর কি কোন কিছুই অবশেষ রাখিয়া যান নাই? এত বড় আত্মমেধযজ্ঞ বাঞ্ছাকল্পতরু যজ্ঞেশ্বরের রাজ্যে কি কখনও বিফল বা অসার্থক হইতে পারে? তবে এ যজ্ঞের ফলস্বরূপ আমরা আজ কি পাইলাম?

অক্সফোর্ডে চিত্তরঞ্জন

[মিঃ পি, সি, রায়ের সৌজন্যে

কি যে পাইলাম, তাহা ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হই। কারণ, তাহা এমন কিছু,—এ জাতির পক্ষে, এ দেশের পক্ষে যাহা হইতে বড় লাভ আমি ত অন্ততঃ আর কিছু মনেই করিতে পারি না। এই দেশবন্ধুর সর্ব্বশেষ চরম দান এই যে, তথাকথিত দুর্ব্বল, অক্ষম এই ভাবপ্রবণ "ভেতো" বাঙ্গালীর এই স্বল্পায়ু, অবজ্ঞাত জীবনেরও যে Immense possibilities প্রভূত সাফল্য সম্ভাবনা থাকিতে পারে, (শুধু "থাকিতে পারে" নহে,—আছে।)—এই সুনিশ্চিত ভরসায়, এই প্রাণপ্রদ আশার উদ্দীপনায় তিনি আজ আমাদের এই সাত কোটি বাঙ্গালী জীবনের অন্তর্নিহিত, সুপ্তপ্রায় জীবনী বা প্রাণশক্তিকে আপন ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্তসাহায্যে অব্যর্থরূপেই উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, সঞ্জীবিত করিয়া দিয়া গেলেন। আত্মশক্তির উপরে এই যে অচল অসীম আস্থা, দ্বিধাশূন্য নিঃসংশয় বিশ্বাস,—বস্তুতঃ ব্যক্তিগতভাবে কিংবা জাতীয়তার দিক দিয়া, আমাদের পক্ষে এত বড় লাভ আর কিছু আছে কি না, আমি জানি না। দেশবন্ধুর সমগ্র জীবন—তাঁহার পূর্ব্বাপর আদ্যন্ত জীবনের এই যে বিচিত্র প্রকৃতি, গতি ও আশ্চর্য্য পরিণতি—তাহা কি ভাবে ও কেমন করিয়াই যে এই অপরিসীম ভরসা, সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়িনী, মৃতসঞ্জীবনী, ঐশী শক্তি, বিশ্ববিজয়িনী অব্যর্থ, দিব্য চেতনা এই অবসন্ন, ক্ষীণজীবী আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত বা অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিল,—তাঁহার জগদ্বরেণ্য, ধন্য জীবনের সেই রহস্য-সূত্র বা গোপন সংবাদটির সন্ধান লইয়াই আমি এ কথা শেষ করিব। বড় লোক এই বাঙ্গালা দেশেও ত আরও অনেক জন্মিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সকলের জীবনের দ্বারা আমরা লাভবান্ ও শক্তিমান্ও নানা প্রকারে যথেষ্টই হইয়াছি; কিন্তু তথাপি আমাদের এই প্রাণের মানুষ, নিতান্তই এক 'ধাতের' আপন জন, মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধেই যে আমি কেন এই লাভের কথাটা এত বিশেষভাবে বলিতেছি,—এখন সেই কৈফিয়ৎটা দেওয়া হইলেই আমার এ প্রসঙ্গটা শেষ হইয়া যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালের যাঁহারা তাদৃশ কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, অন্ততঃ সে সকল সময়ে সাধারণতঃ তাঁহার চরিত্রে বিশেষ কোন অসাধারণত্ব বা অপূর্ব্বত্ব লক্ষিত হয় নাই। অবশ্য স্বভাবতঃই তিনি সুদৃঢ়সঙ্কল্প, আত্মনির্ভরশীল, তেজস্বী, স্বদেশহিতকাম, সরল, পরম হৃদয়বান্ ও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। কিন্তু এ সকল স্বাভাবিক সদ্গুণ সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রে এমন কতকগুলি বহুজনবিদিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষদুর্ব্বলতাও ছিল—যে জন্য মোটের উপর তৎকালে কেহই তাঁহাকে এত বড় এক জন অসামান্য শক্তিধর, সর্ব্বস্বত্যাগী জাতীয় নেতৃরূপে কেহ কল্পনাও করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। চিত্তরঞ্জন এক দিকে যেমন মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্, অতিশয় হৃদয়বান্ ও অসাধারণ উপার্জ্জনশীল ব্যারিষ্টার ছিলেন, অপর দিকে তেমনই তিনি খুবই অপরিণামদর্শী ও সুখপ্রিয় বিলাসী লোক ছিলেন। নিজের বা স্বজন-পরিবারবর্গের ভবিষ্যচ্চিন্তা ত তিনি কখনও করেন নাই, পরন্তু অত্যন্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় আপন প্রাণের স্বাভাবিক সরল আকর্ষণের টানে অনেক সময়েই তিনি আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র হৃদয়ের আবেগেই জীবনযাপন করিয়াছেন,—নিন্দা-লাঞ্ছনা, লজ্জা-অপমান বা যুক্তি-বিচারের সাধারণতঃ তিনি বড় একটা ধারই ধারেন নাই। ভাল বলিয়া যাহা তিনি বুঝিতেন, শত বাধাবিপত্তি

সত্বেও, তাহাই তিনি করিতেন, এবং প্রাণ যাহা চাহিত, তাহারই দিকে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িতেন; স্বভাবতঃ তাহাই পাইতে ও সেই ভাবেই চলিতে তিনি বাধ্য হইতেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান্, সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী চিত্তরঞ্জন যুক্তিতর্ক যে করিতেন না বা করিতে পারিতেন না, তাহা মোটেই নহে; বরং সে পক্ষে তাঁহার প্রচুর দক্ষতা ও নৈপুণ্য ছিল, এবং প্রাচ্য ও বিশেষভাবে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার রীতিমতই অধিকার ছিল। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবী দার্শনিকতা কিংবা বিরসলক্ষণ, শুষ্ক যুক্তিতর্ককে পরবর্ত্তী কালে বড়ই তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিতেন এবং ইহাকে "মায়ার ছলনা" বলিয়া ইদানীং প্রায়ই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ আমার আজ একটা কথা এখন মনে পড়িতেছে, সে আজ অনেক দিন পূর্ব্বেকার কথা। বন্ধুবরের আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এক দিন আমার সঙ্গে কথায় কথায় তাঁহার কিঞ্চিৎ বচসা হইয়াছিল। সে দিন তিনি হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া, আমার কথাস্রোতে বাধা দিয়া আমাকে নিজের সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন,—এ প্রসঙ্গে আমি আজ তাহাই আপনাদের গোচর করিতে ইচ্ছা করি। সুহৃদ্বরের এই কথা কয়টি একটু ধীরভাবে তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে আপনারা সহজেই তাঁহার চরিত্রের ভিতরকার আসল কথা,—তজ্জীবনের মূল স্বরূপসূত্রটির সন্ধান পাইতে পারিবেন। প্রাণের আকস্মিক আকর্ষণে হৃদয়ের দুর্দ্দম আবেগে বিচার-বিবেচনাশূন্য হইয়া অনেক সময়েই শুধু ঝোঁকের মাথায় তিনি যা'-তা' করেন জানিয়া,—সকল কার্য্যে বিচার করিয়া চলাই যে মনুষ্যত্ব, সোজা কথাটা নজীর উপলক্ষে যুক্তি ও বিচারের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁহার কাছে একটা বক্তৃতা করিতে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সে দিন আমি যা' শুনিয়াছিলাম, তাহারই সারাংশ বা মর্ম্মার্থ মোটামুটি এই।—চিত্তরঞ্জন বলিলেন,—"ঢের হইয়াছে! এখন আসল কথা যা, তাহাই শোন। আমিও ভাই, এ জীবনে এক সময়ে Logic ও Philosophy'র (যুক্তি ও দর্শনের) মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া খুবই তার্কিক ও "অজ্ঞেয়বাদী" (Agnostic) হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু জানি না, কি শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে সেই আমি কলিকলুষনাশন, পতিতপাবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরিতাবলী শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া এবং বিশেষভাবে পরম পূজনীয়, সদ্গুরু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অমূল্য আশ্বাস ও উপদেশ-বাণী শুনিয়া হঠাৎ যেন পুনর্জ্জন্মই লাভ করিলাম। সেই হইতে এই যে আমার পরম প্রিয়, প্রাণের মাতৃভূমি—আমার এই যে সোনার বঙ্গদেশ, ইহার প্রকৃত স্বরূপ-মূর্ত্তি, ইহার প্রাণ-শক্তির আমি প্রত্যক্ষরূপেই দর্শন পাইলাম। বিশ্বাস কর! আমি সত্য সত্যই সেই হারামণির সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ ত তাই আমি অমর!" এ কথা সে দিন যখন শুনিয়াছিলাম, তখন ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝি নাই; কিন্তু আজ বোধ হয় যেন এ কথার মর্ম্ম কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কি বুঝিলাম, সেই কথাটাই এখন আপনাদিগকে বলিব।

আসল কথা, দেশবন্ধু চিরকাল তাঁহার হৃদয়-ধর্ম্মের অনুশীলনেই জীবনপাত করিয়াছেন এবং সরলভাবে একমাত্র তিনি তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তিরই একনিষ্ঠ উপাসক ও পূজক ছিলেন। এই জন্য সচরাচর তিনি লৌকিক ভালমন্দ বা সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি কোন দিনই বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত বা আস্থাবান্ ছিলেন না, আর এই জন্যই বোধ হয়, যখন তখন একটু সুযোগ পাইলেই তিনি Copy book morality—কেতাবী নীতিকথা হিতোপদেশের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ-বাণ বর্ষণ ক'রতে ছাড়িতেন না। হৃদয়বান্ দেশবন্ধু স্বীয় সহজাত স্বভাবের নির্দ্দেশ অনুসারে আপন হৃদয়-ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম পালনেই অকুণ্ঠিতভাবে সারাটা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমার মনে হয়, প্রত্যুত তাহারই ফলে পরিণামে তাঁহার জীবনে অমন অনুপম সঙ্গতি, সৌন্দর্য্য, সার্থকতা ও বিশ্ববিমোহন আশ্চর্য্য মহিমার স্ফুরণ সম্ভবপর হইয়াছিল। সাধারণজনমান্য বা মানবসুলভ নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলন-পতন দৌর্ব্বল্য সত্বেও এই যে আমাদের প্রাণের মানুষ চিত্তরঞ্জন আমাদেরই মত একই ধাতের মানুষ হইয়াও এমন সহজে স্বীয় স্বধর্ম্মবলে, শুধু নিজের ঐ হৃদয়-ধর্ম্ম, প্রাণশক্তিরই স্ফুরণবশে অবশেষে এত বড় বিরাট আদর্শ রাখিয়া অচ্যুত অমৃতত্ব,—অমরত্বের অধিকারী হইয়া গেলেন,—এই ভরসা, এই আশা, আত্মশক্তিতে আমাদের এই নিঃসংশয় আস্থা বা বিশ্বাসই বাস্তবিক এই জাতিকে বা এই দেশকে আমাদের ধর্ম্মবন্ধু, প্রাণবন্ধু, দেশবন্ধুর সর্ব্বশেষ চরম ও পরম দান। ফলে আর যদি কিছু না-ও হয়, তবু আমি বিশ্বাস করি, এই অমোঘ আশা ও ভরসাবলেই এ দেশে অচিরেই আমাদের দেশবন্ধুর অভীপ্সিত স্বরাজ্য অর্জ্জনে আমরা নিশ্চিতরূপেই সিদ্ধকাম ও সমর্থ হইব।

শাস্ত্রে আছে,—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।" এই যে 'গুহা' শব্দ এ স্থানে উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক এ গুহা মুনি ঋষিসেবিত হিমালয় প্রমুখ পর্ব্বতগুহা নহে, এ গুহার অর্থ, এই মানবেরই দেহমন্দিরের স্বয়ং হৃষীকেশ-অধিষ্ঠিত, এই পরম পুণ্য হৃদয়-গুহা! এই সার সত্য অনুসারে দেশবন্ধু আজীবন যে ধর্ম্মানুশীলন করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সহজ হৃদয়-ধর্ম্মের অনুশীলনের ফলেই যে তাঁহার জীবন বিলাস-ব্যসনের নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া অকস্মাৎ ভুবনমোহন দিব্য দ্যুতিতে দীপ্যমান ও মহিমোজ্জ্বল হইয়া অক্ষয় অমরত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, তৎপক্ষে আজ অণুমাত্রও সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। এই হৃদয়-ধর্ম্মের সেবক ছিলেন বলিয়াই সরল প্রাণশক্তির স্বাভাবিক আকর্ষণে তিনি অমন সহজে ইহসংসারের সর্ব্ববিধ বিষয়বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত জনকল্যাণকল্পে এই মহাপ্রেম-মন্দাকিনীপ্রবাহে এমন প্রমত্ত আগ্রহে দিগ্বিদিক্জ্ঞানহারা হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন, আর ঠিক এই কারণে এ ভাবপ্রবণ ভারতের, বিশেষভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সিদ্ধার্থের জগৎপূজ্য লীলানিকেতন, আমাদের এই নয়নমনোমোহন, সোনার বাঙ্গালা দেশে স্বাভাবিক যা বৈশিষ্ট্য, সেই স্বরূপ, স্বভাব বা ধাতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক নিজ জীবনে এ জাতির প্রাণশক্তির সেই যে স্বধর্ম্ম—হৃদয়ধর্ম্ম, তাহা অক্ষুণ্ণভাবেই পালন করিয়া আপন সর্ব্বস্ব তনুমনঃপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও তিনি অপ্রতিরোধ বীরদর্পে আপন লক্ষ্যলাভার্থ সাধনাপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই এই হৃদয়ধর্ম্মী ভাবপ্রবণ বাঙ্গালা দেশের, তথা সমগ্র-ভারত-ভূখণ্ডের এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণ্য প্রাণ তাঁহার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে আজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সমুপস্থিত অদম্য শোকাবেগে এই এমন ভাবেই বিরহবিধুর অবসন্ন ও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে।

সর্ব্বস্বত্যাগের অল্প কিছুকাল পরে বন্ধুবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রাণের আবেগে আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি তাহাতে একটু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন,—"ও কি! পাগল হ'লে না কি?" আমি বলিলাম, "পাগল হই নাই বটে, তবে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি তোমার ভিতর যে এত ছিল, তাহা কে জানিত!" দেশবন্ধু আমার এ কথায় আত্মপ্রসাদবশে সরলভাবেই খুব খুসী হইয়া আমাকে দু' হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে একটু যেন গর্ব্বোল্লাসভরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কেমন? যুক্তি, বিচার বা বিবেচনা করিয়া আমার মত সামান্য ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এ রকমটা করা কখনও কি সম্ভব হইত?" আমি এ কথার কোন জবাব না করিয়া আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের

একটি উক্তি "শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ" নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে তখনই পড়িতে দিলাম। তাহাতে ঠাকুর ব্রহ্মচারীজীর প্রশ্নোত্তরে বলিতেছেন, "ভগবানের দিকে লক্ষ্যটি স্থির রেখে প্রাণের সরল আকর্ষণ অনুসারে জীবনযাপন ক'রে গেলে কখনও ঠকিতে হয় না।" এইটি পড়িবামাত্র দেশবন্ধু অকস্মাৎ ঠিক যেন তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, এবং আমাকে সবেগে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই রে, তবে ত ভুল করি নাই, এ তুচ্ছ জীবন তবে ত বৃথায় যায় নাই? এই যে আমার ধর্ম্ম!—সারা জীবনটা আমি যে আগাগোড়া এই ভাবেই কাটিয়ে এসেছি!" আহা! তাঁহার সেই যে অপূর্ব্ব অকৃত্রিম ব্যাকুলতা, ঐকান্তিক ধর্ম্মোচ্ছ্বাস দেখিয়াছি, তাহা চিরদিনের জনাই আমার এই দগ্ধ জীবনের একটা জুলন্ত সাক্ষাৎ ও অক্ষয় সঞ্চয় হইয়া আছে!

যাহা গেল, তেমনটি কি আর হইবে? তুমিই জান ঠাকুর, তাহা তুমিই জান। এ যে তোমার কি লীলা, তাহা তুমিই জান! দিলেও তুমি, আবার নিলেও তুমি,—এ ত তোমার চিরকালের খেলা। কিন্তু, প্রাণ দিলেও যাঁহার ঋণ পরিশোধিত হইবার নহে,—তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণের অধিকারও কি আমাদিগকে দিবে না?

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

চিতায় চিত্তরঞ্জন

মরম-বীণা টুটে, ধুলার 'পরে লুটে,
ফুটে না বুকে তার প্রাণের কোন গান,
এ শুধু শোক নয়, দারুণ জ্বালাময়,
রাবণ-চিতা এ যে সতত লেলিহান,
প্রাণের যত আশা, সাধ যা' ছিল মনে
সকলই দিনু ডালি ও পূত হুতাশনে,
আজি কি শোভা পায়, শ্মশানমাঝে হায়,
ছন্দে মালা গাঁথা রুধিয়া আঁখিজল,
উৎস-মুখে এ কি! অশ্রুধারা দেখি,
বাষ্পে পরিণত এমনি শোকানল!
ব্যথার নিশ্বাসে, কথা যে কোথা ভাসে,
মরমে উচ্ছ্বাসে চরম হাহাকার,
হারায়ে ধ্রুববাণী, হৃদয়-বীণাখানি,
গুমরি মরে বুকে বহিয়া গুরুভার,
নিভিল গৃহে আলো, জ্বলিল চিতালোক,
শ্মশানই আজি তবে সবারই গৃহ হো'ক্,
অভাগা মোর দেশ, আজি কি সব শেষ,
ঘুচে কি গেল হায়, সকল আশা তোর,
অরুণ-আলোমাখা, ঊষা কি গেল ঢাকা,
অশনি হানিল কি আষাঢ় ঘন-ঘোর!
বিধাতা ভুল ক'রে, কাঙাল দীন-ঘরে,
পরশমণিটিরে পাঠায়েছিল, হায়,
যেমনি জ্যোতি ফুটে, অমনি ভ্রম টুটে,
ধুলির রাশি হ'তে তুলিয়া নিল তায়,
কাহারও সনে এবে তুলনা করিও না,
প্রেমের পরশে এ লোহাকে করে সোনা,
মণিরে ভেবে ঢেলা, করেছি কত হেলা,
করেছি কত খেলা না জেনে পরিচয়,
আজিকে তাহা স্মরি' কেবল হা হা করি,
মরম তুষানলে করম করি ক্ষয়।

বিপদ নাহি মানি' স্বরাজ-তরীখানি,
ভাসায়ে রেখেছিলে ভীষণ ঝটিকায়,
ধরিয়াছিলে হাল, সাহসে ভরা পাল,
তরণী ছুটেছিল সমুখে কি আশায়!
তোমারে গুরু জানি, দেশ যে দিল ভার,
অকূল পারাবার করিয়া দিতে পার,
সকল বাধা নাশি' ঘাটের কাছে আসি'
সোনার তরী বুঝি সহসা ডুবে যায়,
উছলি' উঠে বারি, কোথা হে কাণ্ডারি!
তরণী টলমল, যাত্রী নিরুপায়।
শাক্য মুনি সম, জিনিয়া মোহতম,
রাজার সম্পদ হেলায় করি' দান,
স্বদেশ-জননীর, মুছাতে আঁখিনীর,
মলিন দীন-চীর করিলে পরিধান,
হৃদয়-রাজা তুমি চিত্তরঞ্জন,
মিলন-লীলাভূমি, বিবাদ-ভঞ্জন,
অসাড় দেহ-মাঝে, চেতনা আজি রাজে,
বেদনা বুকে বাজে, মায়ের অপমান,
তোমারই মন্ত্রে যে' হৃদয়-যন্ত্রেতে,
হিন্দু-মোস্লেম তুলিছে একতান।
যেটুকু ছিল বাকী, পুরালে আজি তা' কি,
মরিয়া ভায়ে-ভায়ে পরালে রাখী-ডোর,
তোমার শব-দেহ, মিটাল সন্দেহ,
পাষাণে দিয়ে স্নেহ ঝরালে আঁখিলোর,
জীবনে ছিলে তুমি বৃহৎ গরীয়ান্,
মরণে হ'লে তুমি মহৎ মহীয়ান্,
তোমার সনে চলে, শ্মশানে দলে দলে,
ভক্ত লাখে লাখে কাতরে কাঁদি' কয়,
"দাও হে ভগবান্, ফিরায়ে ওই প্রাণ,
একের সনে কর লাখের বিনিময়।"
হায় রে বৃথা কাঁদা, বিধিরে বৃথা সাধা,
দুখের সু'রে বাঁধা সকল সুখ-গান,
মরণ-স্রোতোজলে, জীবন পোত চলে
কালের পারাবারে অকালে পড়ে টান,
দারুণ শোক পেয়ে হয়ো না ম্রিয়মাণ,
জানিও মান চেয়ে কভু না প্রিয় প্রাণ,
কে আছ ত্যাগবীর, মুছিয়া আঁখিনীর,
নিশান তুলে লও হৃদয়ে বাঁধি বল,
বাতাস ঘুরে যাবে, জোয়ারও নাহি পাবে,
সাধের তরী তবে যাবে যে রসাতল।
চরণ স্মরি' তাঁর— তাঁহারই দেওয়া ভার—
স্কন্ধে লহ তুলি' বন্দি' ভগবান্,
রত্নাকর জিনি, রত্ন-প্রসবিনী—
বাঙ্গালা মা'র ছেলে হবে না হতমান,
পাদুকা রাখি' তাঁর আসনোপরি তবে
সঁপিও মন-প্রাণ তাঁহারই ব্রতে সবে,
বিবাদে সে সাধের, সাধনা আমাদের,
মুখের পানে চেয়ে ডাকিছে "আয়, আয়",
"ঐ যে বাজে ভেরী, আর কি সাজে দেরী,
জননী পুজিবার বেলা যে ব'য়ে যায়।"

শ্মশান-অভিযান, জনতা অবিরাম,
গঙ্গাধারা যেন প্লাবিল রাজপথ,
স্থাবর-জঙ্গমে, নমিল সম্ভ্রমে,
সাগর-সঙ্গমে চলে কি ভগীরথ !
মুক্তিপথযাত্রী মরণে কিবা ক্ষোভ,
এমন মৃত্যু যে অমরও করে লোভ,
কুসুমে ঢাক দেহ, সুরভি ঢাল কেহ,
কাঁপায়ে অম্বর দাও গো "হরিবোল,"
সে ধ্বনি সংঘাতে, সূর্য্য-সোম সাথে,
অসীম ব্যোমপথে উঠুক কলরোল।
সাজাও চিতা সবে, ভাবিয়া কিবা হবে,
দেখিবে, দেখ তবে ও মুখ শেষবার,
জ্বালাও ইন্ধন, সঘৃত চন্দন,
পুড়িয়া হ'ক্ ছাই ও তনু সুকুমার,
যজ্ঞাহুত দেশবন্ধু-চিতানল—
জ্বালায়ে রেখ চিত্তে লভিবে সব বল,
তোমারে পেয়ে আজ, হে ঋষি মহারাজ,
পুণ্যতর হ'ল পুণ্য এ শ্মশান,
আশিস কর তুমি, এ তব চিতাভূমি,
সূতিকা-গৃহ হয়ে জাগাক্ নব-প্রাণ।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা *

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

ওঁ য আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ।
যস্ত ছায়ামৃতং যস্ত মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বের শক্তি, যিনি বিশ্বের একমাত্র উপাস্য, দেবতারাও যাঁহার প্রশিষ্য, অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই সর্ব্বলোকমহেশ্বরের চরণে আজিকার এই মহাক্ষণের ভারতব্যাপী যে মহাদুঃখপূত একটি মাত্র প্রার্থনার গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—আমারও সেই মহাধ্বনির সহিত আমাদের প্রাণের প্রার্থনাকে সংযোজিত করিবার অধিকার চাহিতেছি। হে অমৃত, যিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতের প্রাণস্বরূপ—শক্তিস্বরূপ হইয়া এত দিন আমাদেরই মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি আজ ষোড়শ দিন হইল, তোমারই অমৃত-সাগরের মধ্যে শয়ন লাভ করিয়াছেন—আমাদের প্রার্থনা, তাঁহার সেই স্থান অক্ষয় হউক। হে বিশ্বব্যাপী ! তুমি আমাদের মধ্যেও আছ—আমরা হতভাগ্য—আমরা চিরনির্জ্জিত, চিরলাঞ্ছিত, তবু জানি, হে দীননাথ, তুমি আমাদের মধ্যেও অন্তর্যামিরূপে চিৎরূপে চিত্ত-মন-প্রাণ সব হইয়াই আছ। সেই বিশ্বাসে, সেই সাহসেই আজ আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে ভারত-চিত্তরঞ্জনের চিরন্তন স্থান সেইখানেই হউক, যে পরম স্থান আমাদের মত অধমের মধ্যে গুহাহিত হইয়া নিত্যকালের জন্য আছে। হে লোকবন্ধু, আমাদের দেশবন্ধুর স্থান সেইখানেই হউক, যেখানে তিনি নিত্যকালের জন্য বন্ধুরূপে—ভ্রাতৃরূপে—পিতৃরূপে থাকিয়া আমাদের আত্মাকে প্রবুদ্ধ, চিত্তকে জাগ্রত, প্রাণকে ভয়লেশহীন করিবেন। যে স্থান হইতে তিনি আমাদিগকে ভয় হইতে অভয়ের দিকে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বের দিকে, পররাজ্য হইতে স্বরাজ্যের দিকে অবাধে পরিচালিত করিতে পারিবেন। বাহিরের সকল বাধার শেষ হইয়াছে, এখন তাহার সকল কার্য্য অবাধ হউক।

আজ আমরা সর্ব্বশক্তি মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন পূর্ণ বিশ্বাসে বলিতে পারি, হে মৃত্যু, তুমি নাই—নাই—নাই। হে ভয়াল, তোমার করাল মূর্ত্তির পশ্চাতে ঐ যাঁহার দক্ষিণ মুখ সুপ্রকাশ রহিয়াছে, তাঁহার নয়নে নয়ন সঙ্গত করিয়া আমরা আজ বলিতে চাই—হে মৃত্যু, তোমাকেও অতিক্রম করিয়া আমাদের চিত্তাধিপতি চিত্তরঞ্জন রহিয়াছেন। যাঁহার এক পাদমাত্র এই জন্মমৃত্যুময় জগতে প্রকাশিত, যাঁহার অমৃতময় অন্য পদত্রয় গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ আমাদের সেই অন্তর-গুহায় চিরন্তন স্থান লাভ করিয়াছেন। হে সুনিশ্চিত, হে অনিবার্য্য, হে দুর্দ্দম, হে পরম নিষ্ঠুর কাল, তোমার অনিবার্য্যত্ব এইখানেই নিবারিত হইয়াছে,—এইখানেই তুমি পরাজিত হইয়াছ। এইখানেই তোমাকে তোমার করালাস্যের পশ্চাতে রুদ্রের চিরহাস্যময় দক্ষিণ মুখ দেখাইতে হইয়াছে। ভারতব্যাপী এই শ্রাদ্ধক্ষণের যিনি শ্রদ্ধেয়, তিনি তাঁহার ঐ অমৃতময় ক্রোড় হইতে আমাদের দিকে ঐ তাঁহার করুণকোমল নয়ন মেলিয়া চাহিয়াছেন।

হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর, এই চিরলাঞ্ছিত—চিরনির্জ্জিত চিরনিরাশায় অন্ধকারমগ্ন হতভাগ্য দেশের উপর তোমার করুণ নয়নের রশ্মিপাত অক্ষয় হউক। তোমার মহান্ আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিবার অহঙ্কার আমরা রাখি না, কিন্তু আজ তোমার শ্রাদ্ধবাসরে আমাদের ৩০ কোটি ভারতবাসীর মিলিত অন্তরের প্রার্থনার সহিত এই প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করিতেছি যে, আমরা যেন চিরদিন তোমাকে আমাদের মধ্যে আহ্বান করিবার মত শক্তি লাভ করি। যেন সর্ব্ববিপদে, সর্ব্বভয়ে, সর্ব্বকালে, সকল কার্য্যে তোমাকে বলিতে পারি,—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।

হে লোকনায়ক, গণপতি, তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমাদের মুক্তিলাভে তুমি চিরনায়ক হও। হে ভারতচিত্ত-জলধির শ্রেষ্ঠ নিধি, তোমাকে যেন আমরা কোনও কার্য্যে না হারাই। হে আমাদের চিরপ্রিয়তম, তোমার যাহা প্রিয়, তাহাই যেন আমাদের প্রিয় হয়।

সর্ব্বশেষে এই ঘনায়মান নিরাশান্ধকারের মধ্যে শত ভয় শত আশঙ্কার বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন পূর্ণ শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসে কালরূপী ভগবান্‌কে বলিতে পারি,—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো মামৃতং গময়
আবিরাবীর্ম্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণমুখং
তেন মাম্ পাহি হ্ব নিত্যম্।

শ্রীভববিভূতি তর্কভূষণ।

* বহরমপুর শোকসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি-সঞ্জীবিকা

যাবে যাও অমরায় তোমার কি আসে যায়
তুমি নিধি অমরার—ভারতের প্রবাসী,
মোরা চির দীনহীন, হাসি-কাঁদি অনুদিন—
হাসি আর রবে নাক—হব চির-উদাসী!

তবু ফুলে-ফলে তার রবে তব স্মৃতিভার
মরণের দেবতারে মরতের সাধনা—
বেদনায় হিয়া যার কেঁদেছিল অনিবার—
পদানত বাঙ্গালার মরমের বাতনা!—
তুমি জয়ী জয়ে তার— মরণের অধিকার
শুধু তার, শুধু তার, প্রাণে যার সততা,—
তোল ধ্বজা দুর্ব্বার প্রলয়েরি হুঙ্কার—
বিনা রণে চ'লে যাবে প্রাণে যার মমতা!
যাবে যাও অমরায় তোমার কি আসে যায়—
তুমি নিধি অমরার—ভারতের প্রবাসী,
ভারতের মাঝে আজ প'ড়ে গেছে রণসাজ,
জীবনের মহারণে মরণের প্রবাসী!
সুরাসুর চারিধার এসো, দেখো হাহাকার
বাঙ্গালার সব যায় আজিকার দহনে,
শুধু পিছে মনীষার স্মৃতিটুকু অবিকার—
দুর্জ্জয় ভরসায়—দহনে কি দলনে!
ও কি চিতা? ও কি তোর— তোরো ছিল আঁখি-লোর?—
তোরো কান্না থর্ থর্ কাঁপে ঘোর জ্বলনে!
বাঙ্গালীর ব্যথা নাই— ব্যথা নাই—ব্যথা নাই—
চিতা যদি শোকাতুর—ঢাল জল প্লাবনে।
চোখে চোখে দেখা আর হবে কি হে শেষবার—
ধূমে—ধূমে—চারিধার,—অই অই শিবিকা।
অই ধ্বজা বাঙ্গালার উড়ে ঘন দুর্ব্বার,
বাঙ্গালার জয়গান ভ'রে নভো বীথিকা!
মরণের এ কি যাগ, এত প্রীতি অনুরাগ,
উতরোল্ খোল রোল্ 'হরি হরি' নিনাদে,—
ধর তান্ ধর তান্ বাঙ্গালার জয়গান
মা ভৈঃ—মা ভৈঃ গান হরিবে কি বিষাদে!
বাঙ্গালার জনে জনে, জ্বাল্ চিতা মনে মনে,
যে গেছে যে যায় আজ—কাজ নাই শোচনা—
যত দিন অধীনতা— তত দিন রবে চিতা—
তাই হোক্ বাঙ্গালার স্বাধীনতা-সাধনা।

শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রস্থানে

[দেশবন্ধু-ভবনে শ্রাদ্ধসভায় গীত]

বিশ্ব-চিত্ত আঁধার করি
চিত্তরঞ্জন গেছে ছাড়ি
শুধু কি নয়ন-বারি ও ঋণ শোধিতে তার
হৃদয়-শোণিত ঢেলে দিলেও শোধিবে না ধার।
কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরই শোকের গান॥

মরণের দেবতা হয়ে এ মরতে জন্ম লয়ে,
বিশ্ববাসীরে দেখাইলে মানুষ কারে কয়;
মানুষ যে দেবত্ব লভে ত্যাগের সাধনায়।
কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরই শোকের গান॥

গীতার বচন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তা হ'তে শ্রেষ্ঠ ধ্যানী;
ধ্যানী হ'তে শ্রেষ্ঠ যে জন কর্ম্মফলত্যাগী,
চিত্তরঞ্জন সেই না ত্যাগের পূর্ণতম যোগী

কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরই শোকের গান॥

অনন্ত গুণের আধার, কি গুণ বর্ণিব তাঁর
বর্ণিতে বর্ণ না মিলে, সে যে গুণের খনি,
অফুরন্ত গুণ বর্ণিতে বিবর্ণ হয় বাণী
কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরই শোকের গান॥

কোথা গেলে দেশের বন্ধু, দেশের সামনে
দুঃখ-সিন্ধু, নাবিক তুমি চ'লে গেলে
কে রাখে এ তরী! ভাগ্যাকাশে ঘোর কালিমা
আঁধার এল ঘেরি।
কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরই শোকের গান॥

যাওনি তুমি, যাওনি ছেড়ে, দেশ যে তোমার
হৃদয় জুড়ে, তুমি ছাড়লেও দেশ না ছাড়বে
কার কাছে দাঁড়াবে, দুঃখীর দুঃখে তাপীর তাপে
কে শান্তি ঢালিবে।
দ্বিজ রামকমল বলে আসবে ফিরে তুমি
বিশ্রাম লভিতে, কোলে নিলেন জননী।
কোটি প্রাণের বিনিময়ে মিলবে কি সে প্রাণ।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে আজ তাঁরি শোকের গান॥

শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ, কীর্ত্তন-বিশারদ।

মেয়র চিত্তরঞ্জন

কাউন্সিলার শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতার প্রথম মেয়র চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যাল গেজেটে লিখিয়াছেন:—

যাঁহারা কর্পোরেশনের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সহরের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তি ও বিস্ময়ের সহিত তাঁহার বিরাট নেতৃত্ব অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নেতৃত্বের বিরাটত্বের প্রভাব অনুক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য,—তাঁহার নিরপেক্ষতা, তাঁহার দয়া, তাঁহার কার্য্যের সুষ্ঠুতা।

ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত আকর্ষণ তাঁহাকে সহরের শাসনকার্য্যে সকল সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সম্মানরক্ষার্থ সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রাখিয়াছিল।

কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তা সুভাষচন্দ্র যখন ধৃত ও আটক হয়েন, তখন মেয়ররূপে দেশবন্ধু নাগরিকগণের জন্মগত অধিকার সমর্থনে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা যে কোনও দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবার যোগ্য। এ সম্বন্ধে কর্পোরেশনে যে বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল, ইংরাজ-ব্যবসায়ীর মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে সে সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—"লোক মিঃ সি, আর, দাশের রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুন না, এই বিচার-বিতর্কে যে কেহ তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়াছে, সে তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতাশক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিবে না। তাঁহার যুক্তি-তর্ক অদ্ভুত, তাঁহার বলিবার শক্তি অতীব সুন্দর। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোক বুঝিয়াছিল, যিনি বক্তৃতা করিতেছেন, তাঁহার শক্তি অসাধারণ।

ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না, কেমন করিয়া তিনি তাঁহার দেশের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।”

মেয়র দেশের নানা কাযে ব্যাপৃত থাকিলেও মেয়রের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন নাই। মেয়রের পদে সমাসীন হইয়াই তিনি কর্পোরেশনকে এই কয়টি কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

(১) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, (২) দরিদ্রদিগের জন্য অবৈতনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, (৩) বিশুদ্ধ খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা, (৪) বিশুদ্ধ পানীয় ও গঙ্গার জলের সু-সরবরাহের ব্যবস্থা, (৫) বস্তি ও ঘনবসতিপূর্ণ স্থানের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা, (৬) দরিদ্রদিগের বসবাসের ব্যবস্থা, (৭) সহরতলীর উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা, (৮) যাতায়াতের ও যানবাহনের সুব্যবস্থা, (৯) অল্প খরচে সহরশাসনের সুব্যবস্থা।

এ সম্বন্ধে তিনি যে উদ্বোধন-বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, “ভারতবাসীর মহান্ আদর্শ,—দরিদ্রনারায়ণের সেবা। ভারতবাসীর নিকট ভগবান্ দরিদ্ররূপে দেখা দিয়া থাকেন, এ জন্য দরিদ্রের সেবাই ভারতীয়ের নিকট ভগবানের সেবা বলিয়া বিবেচিত হয়। এই হেতু আমি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কর্পোরেশনকে আত্মনিয়োগ করিতে বলি। কর্পোরেশন যদি এই মহৎ কার্য্যে সাফল্যলাভ করে, তাহা হইলেই তাহার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে।”

যে কয়দিন ভগবান্ তাঁহাকে কর্পোরেশনের কার্য্য করিতে দিয়াছিলেন, সেই কয়দিন তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধনার্থ সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে কর্ম্মকর্ত্তারূপে কার্য্য বিভাগের শীর্ষস্থানে বসাইয়া কর্পোরেশন মেয়রের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। মেয়র সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন যে, তিনি এই কার্য্যে যথেষ্ট মনোযোগ ও সময় দিতে পারিতেছেন না। তিনি সর্ব্বদা কর্পোরেশনের নানা বিভাগের কমিটীর নিকট খবর লইতেন যে, নানা বিভাগে কার্য্য কিরূপ চলিতেছে।

সকলেই জানেন যে, কর্পোরেশনের ধন-ভাণ্ডার আশানুরূপ নহে। সহরের জলসরবরাহ, জলনিকাশ, আলোক প্রদান, জঞ্জাল সাফ ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয় করিয়া তহবিলে আর বড় কিছু থাকিত না। সুতরাং উহা হইতে নূতন নূতন সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ পুরাতন কর্পোরেশন যে সালতামামি হিসাব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার অদল-বদল করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এ সকল বাধা সত্ত্বেও নূতন কর্পোরেশন মেয়রের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও সামান্য নহে। হাতে টাকা না থাকিলে সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব মনে করিয়া কর্পোরেশন মেয়রের উপদেশ অনুসারে কর্পোরেশনকে ঢালিয়া সাজিবার জন্য এবং ব্যয়সঙ্কোচসাধন করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। উক্ত কর্ম্মচারী নূতন আয়ের পথ আবিষ্কার করিবেন, এরূপও স্থির হইয়াছিল।

এইরূপে মেয়রের প্রদর্শিত এক একটি সংস্কার-কার্য্য গ্রহণ করা হইল। প্রথমেই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা যাউক। এ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য এক জন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটকে নিযুক্ত করা হইল। তিনি এক কমিটীর অধীনে কায করিতে লাগিলেন। সহরের বিশেষজ্ঞ শিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া স্পেশাল কমিটী গঠিত হইল, তাঁহারা এ বিষয়ে কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় নানা সম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুযায়ী নানা অবৈতনিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

দরিদ্রগণের অবৈতনিক চিকিৎসার জন্য সহরের কয়েকটি কেন্দ্রে কালাজ্বর, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। এমন কি, অত্যন্ত দরিদ্রদিগকে বিনা মূল্যে পথ্যাদি দিবারও ব্যবস্থা করা হইল। কর্পোরেশন সুবিধার দরে জমী ও বাড়ীর লিজ দিয়া সাধারণ লোকের উদ্যোগে প্রথম শ্রেণীর এক হাঁসপাতাল সমেত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিল। এই ভাবে সহরে এক প্রথম শ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া মেয়র সহরের রোগ-চিকিৎসার সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সেই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। আশা করা যায়, সহরের বড় বড় কবিরাজ ও আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীরা দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

সহরের কোন কোন কেন্দ্রে দরিদ্রদিগের সন্তানসন্ততির জন্য সাধারণ পরিচ্ছন্নতাগার (স্নানাগার ইত্যাদি) এবং দুগ্ধ সরবরাহাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে দরিদ্র শিশুগণের জননীরা সন্তান-সন্ততিদিগকে স্বাস্থ্যকর স্নানাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া যাইবার এবং দুগ্ধপান করাইয়া লইয়া যাইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে দরিদ্রদিগের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বিশুদ্ধ খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহের জন্য মেয়র সমস্ত বাজারে খরদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহাতে সস্তায় মৎস্য পাওয়া যায়, তাহারও চেষ্টা করা হইতেছিল। কিন্তু এ সকল সমস্যা সহজসাধ্য নহে। এ বৎসরের মিউনিসিপ্যাল বাজেট সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা না হইলে কিছু করিয়া উঠা যায় না। তথাপি মেয়রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাজেট কমিটী সহরের দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়-মঞ্জুরের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়সঙ্কোচ না দেখিয়া ঋণদান করিবেন না বলায় ১ লক্ষ স্থলে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়-মঞ্জুরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। যৌথকারবার দ্বারা দুগ্ধ সরবরাহের সঙ্কল্পও কার্য্যে পরিণত হইবার বিলম্ব নাই। ইতোমধ্যেই এক Cooperative Milk Societies Union প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্পোরেশন এই সমিতিকে জমী দিয়া সাহায্য করিয়াছে, শীঘ্রই ইহাকে অর্থসাহায্য করিবার সঙ্কল্পও আছে। সমিতি ইতোমধ্যেই সস্তায় বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ব্যাপারেও কর্পোরেশন উদাসীন নহে। মেয়রের উপদেশ অনুসারে এবং কর্ম্মকর্ত্তা সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে সহরে ৭০ লক্ষ গ্যালন অধিক জল প্রত্যহ সরবরাহ করিবার কথা হইয়াছে। এই ৭০ লক্ষ গ্যালনের কতকাংশ গত এক মাস সরবরাহ করা হইয়াছে ; পরন্তু প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ১ ঘণ্টা অধিককাল জল দেওয়া হইতেছে। তাহার পর যখন মেসার্স মুর ও বেট্‌ম্যানের প্রস্তাবমত জলসরবরাহ করা সম্ভব হইবে, তখন সহরবাসী আরও অধিক জল পাইবে।

পথ, গৃহ ও বস্তী, কমিটী এবং স্বাস্থ্য কমিটী একযোগে বস্তীর উন্নতি-সাধনে মনোযোগ দিয়াছেন। বড় বড় বস্তীতে ইতোমধ্যেই কার্য্যারম্ভ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রনিবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার আলোচনা চলিতেছে।

সহরতলীর উন্নতি-সাধনে কর্পোরেশন অমনোযোগী নহে। তবে সরকারের নিকট ঋণগ্রহণের অনুমতি পাইলেই এ বিষয়ে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে।

সহরের মধ্যে ও সহরতলীতে যাতায়াতের সুব্যবস্থা সম্বন্ধেও কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। সরকারও এ বিষয়ে একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটীর রিপোর্ট দেখিয়া কর্পোরেশন কমিটী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

এইরূপে মাত্র ১ বৎসরের মধ্যে মেয়র তাঁহার প্রেরণা দ্বারা কর্পোরেশনে নবজীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছেন। সকল দিকেই তাঁহার মঙ্গল হস্তস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

—

দাতা চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চলিয়া গিয়াছেন। অসীম শোকের প্রথম বেগ কথঞ্চিৎমাত্র প্রশমিত হইয়াছে। দেশবাসী পূত পবিত্র মনে নিজ নিজ সামর্থ্যমত যথাবিহিত তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন। এখনও তাঁহার অমূর্ত্ত মূর্ত্তি ধ্যানে বাঙ্গালার কত নরনারী মগ্ন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবেন ? লোকচক্ষুর সমক্ষে যাহাতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হয়, সে জন্ত এক্ষণে দেশবাসী উদ্যোগী হইয়াছেন।

দেশবন্ধু ত্যাগী, পণ্ডিত, উৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবী, কবি, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক। অপরের স্বার্থসম্পর্কশূন্ত একের যে ত্যাগ, তাহা যত বড়ই হউক, সাক্ষাৎসম্পর্কে তাহার জন্ত যদি সাধারণের বড় বেশী কৃতজ্ঞ হইবার কথা কিছু না থাকে, তবে সে ত্যাগ জগতের উপকারে লাগে না। তাঁহার উক্ত অসামান্ত গুণরাশিও তাঁহাকে যত অলঙ্কৃত করুক, তাহাতে দেশের কি আসিয়া যায় ? তবে আজ আপামর সাধারণে তাঁহার উদ্দেশ্যে এ শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্ত এত উদ্‌গ্রীব কেন ? কিসের প্রতিদানে, এমন অন্ধ আবেগে আজ বাঙ্গালীর মরা কর্ত্তব্যে বান ডাকিয়াছে ? মুখে যাহাই বলি, জাতির এ পূজা সত্যই কোন না কোন কিছুর প্রতিদান, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কিছু আর কি হইতে পারে—দান, তাঁহার দান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই মহাপুরুষ, তাঁহার জাতিকে এমন কোন্ দানে আজি বাঁধিয়াছেন, তাহাই ভাবিবার ও ধরিবার বিষয়।

তিনি আইনের গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়াও পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, এ অবশ্য কর্ত্তব্যের হিসাবে বেশী না হইলেও, এ যুগের বড় কথা সন্দেহ নাই। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ সমস্তই অর্থী, প্রার্থী, দুঃস্থ, দরিদ্রকে অকাতরে দান করিয়াছেন। রাজদ্বারে বিপন্ন বন্ধুকে, এক জন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের পক্ষে যে দান সম্ভব, তাহা করিয়াছেন। উচ্চপ্রাণ অর্থ-সামর্থ্যহীন দেশসেবককে—অর্থাভাবে দেশসেবায় ব্যাঘাত না ঘটে—সে জন্ত সুযোগ করিয়া দিয়াছেন,—ও স্বেচ্ছায় দীর্ঘকালব্যাপী মাসিক অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি মাসিক ৩০।৪০ হাজার টাকা আয়ের সম্মানজনক ব্যবসা—দেশের কাযে আত্মনিয়োগ জন্ত, স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। শেষে তাঁহার দেশ—তাঁহার জাতির জন্ত জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। এত বড় দান সত্যই জগতের ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। দধীচি ও হরিশ্চন্দ্রের দানও বুঝি ইহার তুলনায় নিষ্প্রভ। কিন্তু ইহাই কি দেশবন্ধুর মহত্ত্বের চরম পরিচায়ক ? এই জন্তই কি ত্যাগিশ্রেষ্ঠকে আজ সমগ্র জাতি পূজা করিতেছে ? দধীচির অস্থিদান এবং হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান বিশ্ববিশ্রুত হইয়া আছে। কিন্তু সে দানের অংশ দেশের জন্ত প্রত্যক্ষভাবে ছিল না। সে সব দিনের কথা ছাড়িয়া দিই। আধুনিক কার্ণেগী, রকফেলার প্রভৃতির বিরাট দান দেশের জন্ত, মনুষ্যসমাজের জন্ত, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বিরাট পুরুষ দেশবন্ধুর দান—কি সমস্ত অর্থ-সম্পদ, কি তাঁহার রসারোডের বাসভবন—সে সবই তুলনায় সামান্ত। এ সবের উল্লেখ দ্বারা তাঁহার দানের পরিচয় দিতে, তাঁহার অতি বড় দানকে ম্লান করাই হয়।

চিত্তরঞ্জন তাঁহার 'মৃত্যুহীন প্রাণ' দান করিয়া আমাদের যে সামগ্রী দিয়াছেন, এমন দান কেহ কখনও করে নাই, করিতে পারে নাই। আমাদের চিত্তরঞ্জনকে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন, বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন—আমাদের আলোককে আবার তিনিই লইয়াছেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে এই দীন বাঙ্গালীকে, তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা দিলেন, তাহার মূল্য কি ? জগতের কোন্ দানের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে ?

আমরা শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের জাতীয়তা বলিয়া কিছু নাই বা এখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু অমাবস্যার নিশা অন্তে, উষার আলোকের ন্যায় দেশবন্ধুর তিরোভাবের সঙ্গে আমরা কি পাইলাম ? নিজের নিজের মধ্যে অনুভবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪ঠা আষাঢ় কলিকাতার সেই শোক-বিহ্বল, মুহ্যমান, শূন্যহৃদয়, উদ্বেলিত জন-সমুদ্রকে যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার কি মনে হইয়াছিল ? আর আজ সেই শোক বুকে ধরিয়াও কি একটা যেন নূতনের সন্ধান পাইয়া বা নব ভাবের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়া দেশবাসী অমঙ্গলের মধ্য হইতেও একটা অপ্রত্যাশিত মঙ্গলের সূচনায় আশান্বিত। দেশের সে দিন রসারোডের পুণ্যতীর্থে দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ-বাসরে, যাঁহাদের যাইবার বা ময়দানের বিপুল জনাকীর্ণ শোক-সভায় যোগদানের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা সেই শান্ত শোকমথিত বাক্য—হীন জনসঙ্ঘের মুখে অলক্ষ্যে একটা অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষার রেখা ফুটিয়া উঠিতে কি দেখেন নাই ? তাঁহারা কি দেখেন নাই, তাঁহার দেশের ছেলেরা তাঁহার নিতান্ত আপনার জনের অপেক্ষাও অধিক করিয়া রসারোডের ভবনের সে দিনের অপূর্ব্ব জনতায় শৃঙ্খলা রক্ষা ও সর্ব্ববিধ সুবিধা রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণপণ করিয়াছিলেন ? এ অর্দ্ধোদয় যোগ নয়, তারকেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা বা অন্য কোন জাতীয় পর্ব্ব-উৎসব নয়। বঙ্গমাতার একটি সন্তানের আদ্যশ্রাদ্ধ মাত্র। এই এক জনের শ্রাদ্ধে, নগরপদে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবকগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহ আহূত অনাহূত জনের সেবা দেখিয়া জাতীয়তাহীন বাঙ্গালীর হৃদয় কি ভাবে বিভোর হইয়াছিল, নয়নপ্রান্তে কিসের অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী হৃদয়বান্ ভিন্ন কে অনুভব করিবে ? সে দৃশ্য হইতে কি মনে হয় নাই যে, চিত্তরঞ্জন কোন বংশবিশেষের সন্তান, ব্যক্তিবিশেষের সন্তান, ব্যক্তিবিশেষের আপন জন, কোন দলবিশেষের নেতা মাত্র ছিলেন না ? তিনি সমগ্র জাতির বিশিষ্ট সন্তান, আত্মীয় ও নেতা ছিলেন।

সত্যই আমরা আজ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, আজ আমরা বন্ধুহীন, কিন্তু তাঁহার প্রেরণা, তাঁহার প্রচারিত সত্য কি আজ আমাদের হৃদয়ে এক অমূল্য শক্তি সঞ্চারিত করিতেছে না !

তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার মুক্তিসাধনার অমোঘ মন্ত্র আজ শনৈঃ শনৈঃ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, আজ আমরা তাঁহাকে সম্যক্ চিনিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহাকে মূর্ত্তরূপে পাইয়া আমরা যে তাঁহাকে ঠিকমত চিনিতে পারি নাই, সেই পাপের ইহা প্রায়শ্চিত্ত।

মহাপুরুষের জীবন শেষ হইয়াছে, তাঁহার জীবনকালে তাঁহার নিকট হইতে কি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, জানি না। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শিখিলাম,—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান যতক্ষণ না দেশের জন্য, পরের জন্য নিয়োজিত হয়, ততক্ষণ তাহা বৃথা। পরার্থে যাঁহার প্রাণ উৎসৃষ্ট, দেশ-সেবা যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার জীবনই ধন্ত।

শ্রীহরিহর শেঠ।

—

চিত্তরঞ্জনের "মা"

চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মবহুল জীবনের সূত্র ধরিবার চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার "মা" কি নিবিড় ভাবে আপনার প্রভাব এই জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। দেশমাতৃকা তাঁহার নিকট

একটা উপাধি (abstraction) মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়েন নাই। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে নিরতিশয় স্নেহের সহিত তাঁহার রক্তমাংসের শরীর অবলোকন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, এই "মা"য়ের জন্ত,তাঁহার বিষাদ-মলিন মুখে একটু হাসি ফুটাইতে তিনি না করিতে পারিতেন, এমন কোনও কার্য্যই ছিল না। আমরা তাঁহার বিরাট ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মহিমায় স্তম্ভিত হইয়া যাই। ভাষা এইখানে একেবারে মূক। এই মহান্ ব্যাপার সম্পর্কে যথাযথ ভাষা প্রয়োগ করিবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহার মধ্যে অভাবনীয় বা অচিন্তনীয় কিছুই ছিল না, ইহা ঠিকই তাঁহার স্বভাবানুমোদিত, যেমনটি মায়ের ছেলে মায়ের জন্ত করিতে পারে, ইহা তাহা ছাড়া আর ত কিছুই নহে। যে মাকে প্রাণ ভরে ডাকিয়া কত ভক্ত সাধক আপনাদের জীবন পবিত্র ও মহিমোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জন কি তাঁহার জন্ত আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিবেন না?

চিত্তরঞ্জনের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা—বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র অমোঘ বাণী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, মায়ের সেবার জন্ত জীবন তুচ্ছ, সকলই ত্যাগ করিতে হয়। এই দীক্ষা একটা খোস-খেয়ালের ব্যাপার নহে, ইহার পণ জীবনসর্ব্বস্ব। বঙ্কিমের অঙ্গুলিসঙ্কেত চিত্তরঞ্জনের জীবনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিল। শুধু সর্ব্বস্ব দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আজ প্রাণ দিয়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া, তিনি সেই দীক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। আজ অমরপুরে না জানি কি আনন্দের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র ত্যাগী চিত্তরঞ্জনকে স্নেহালিঙ্গন দান করিতেছেন! এ যে যেমনটি তিনি করিয়াছিলেন, ঠিক তাই।

এক দিন বঙ্কিমচন্দ্র তারস্বরে তাঁহার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের হৃদয়ের ভাষাকে মূর্ত্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "উঠ মা হিরন্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব—উঠ মা দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।" বঙ্কিম বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, "মা উঠিলেন না—উঠিবেন কি?" কেন মা উঠিবেন না, আজ যে তাঁহার দেউলে ঝলমল বিভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহারই সুসন্তান তাঁহার জন্ত রিক্ত ও নিঃসম্বল হইয়া যে সাধনা করিয়াছেন, তাহা ত নিষ্ফল হইবার নহে। মাতৃসাধক ঘনান্ধকারে ফেনিল কালস্রোতের মধ্য হইতে সুবর্ণময়ী মায়ের প্রতিমা উত্তোলন করিয়া আজ বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে দেখিয়াই মজিয়াছিলেন—আজ তাঁহার ন্যায় চক্ষুষ্মান্ হইয়া কে দেখিবে?

আজ মনে পড়ে ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনে চিত্তরঞ্জনের সেই আকুলতা-ভরা আহ্বান:—"হে সাত্ত্বিক! আসুন, তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন, মা'র ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি আসুন। মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগীরথী-পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব, আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে—প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবি দান করিব। আর গললগ্নীকৃতবাসে বলিব—জননি জাগৃহি!" আট বৎসর পূর্ব্বে বুকভরা ব্যাকুলতা লইয়া যখন এই আহ্বান দেশবাসীর কর্ণে তিনি সমুচ্চারিত করিয়াছিলেন, তখন কে ভাবিত যে, দেশমাতৃকার রক্ত-চরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবি উৎসর্গ করিয়া তিনি দেশাত্মবোধের আদর্শস্থানীয় হইবেন! এ ভাবের মধ্যে আমরা প্রাণের স্পর্শ পাই, এ যে বৈদিক ঋষির ভাষ্য হৃদয়ের কোন নিভৃত কন্দর হইতে আলাময়ী ভাষায় উৎসারিত হইয়াছে!

"আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি"—চিত্তরঞ্জন আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে এই কথা বার বার বলিতেন। এ যে তাঁহার জীবনের একটা মহান্ সত্য। "যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত, জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।" সারা জীবন ব্যাপিয়া মায়ের পুণ্যপ্রভাব তাঁহার মধ্যে অভিনব শক্তি স্ফুরিত করিয়াছিল। তাই চিত্তরঞ্জন মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে হইয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইয়াছিলেন। এই অপরিসীম প্রেমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন—আত্মবিসর্জ্জন। চিত্তরঞ্জন কতবার বলিয়াছেন—"সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। কিন্তু আমাদের ওজনকরা প্রেম সে পথ খুঁজিয়া পায় নাই। যে প্রেম স্বার্থ-গন্ধদুষ্ট, তাহা কি প্রকারে কল্যাণের নিয়ামক হইবে, যে ব্যক্তি কেবল অবসরমত দেশকে ভালবাসিবার ভাণ করে, মায়ের কল্যাণময়ী মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য তাহার নাই। শুদ্ধমনে সংযতচিত্তে প্রেমের বলে বলীয়ান্ হইয়া জননীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে ডাকিলে মা কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন?"

চিত্তরঞ্জন মাকে চিনিয়াছিলেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা মাতৃমূর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু "মহেন্দ্র" বাঙ্গালীর প্রতিনিধিরূপী হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তাই বঙ্কিম বলিলেন, "সময়ে চিনিবে, বল বন্দে মাতরম্, এখন চল।" জানি না, সত্যের সাক্ষাদ্দর্শী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট বাঙ্গালী মাকে যথার্থরূপে চিনিবার সৌভাগ্য কত দিনে লাভ করিবে? কিন্তু ইহার মধ্যে এক জন যে মাকে যথার্থরূপে চিনিয়া সেই অপরূপ রূপকে আজন্ম করিয়া চলিয়া গেলেন, সে কথা কি আমরা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? চিত্তরঞ্জনের প্রেমব্যাকুল দৃষ্টিতে মা ধরা দিয়াছিলেন কারণ, ইহাকে ত কোনও মতে ঠেকাইয়া রাখা চলে না মা'র সন্তান তাঁহার মত যখন মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে, সেই দিন দেবী নিশ্চয়ই সুপ্রসন্না হইবেন, চিত্তরঞ্জনের শবসাধনা সার্থক হইবে। কিন্তু এখন বাঙ্গালার শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া আমরা যে ব্যর্থ অভিনয় করিতেছি, কত দিনে সেই ভ্রমের খেলা ফুরাইবে, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। চিত্তরঞ্জন স্বর্গ হইতে পথ দেখাইয়া দিন, সমস্ত বাঙ্গালা অশ্রুসজল নয়নে ও নিরুদ্ধশ্বাসে তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতের জন্ত অপেক্ষা করিবে। হে লোকোত্তরবাসী, সুরপুর হইতে শুভ আশীর্ব্বাদ দ্বারা তোমার ভাবধারায় স্নাত ও পূত বাঙ্গালীকে সেই শুভ দিনের সমীপবর্ত্তী কর, যখন বাঙ্গালী তোমার মত মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়া মাকে চিনিতে শিখিবে এবং চিনিয়া আপনার সকল চেষ্টা ও সাধনা তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জনকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, তখন তিনি তরুণ যুবক। অল্পদিন পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, তখন সুকবি বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তখনকার

দিয়ে বিলাতফেরতামাত্রেই ঘরে বাহিরে সাহেব—হ্যাট কোট নেকটাইধারী, কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর মত ধুতি পিরাণ উড়ানী পরিধান করিয়া সাধারণ্যে বাহির হইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এটা তখনকার দিনের পক্ষে কম মনের বল নহে। তার পর ব্যারিষ্টারীতে যখন তাঁহার নাম-যশ বাড়িয়া গেল, তখন তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতার কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। যে পিতৃঋণ পরিশোধে আইনানুসারে তিনি বাধ্য ছিলেন না, তাহা অযাচিতভাবে মহাজনদিগকে ডাকিয়া দেওয়ায় তাঁহার যশঃসৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক দেশবন্ধুর পিতাকে কয়েক সহস্র টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। অতর্কিতভাবে এক দিন প্রাতে মল্লিক মহাশয় দেশবন্ধুর নিকট হইতে এক পত্র সহ সেই টাকার চেক পাইয়া বিস্মিত হয়েন। বিস্মিত ত হইবারই কথা, এরূপভাবে ঋণ পরিশোধের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি ?

তাঁহার সহৃদয়তার আর একটি ঘটনার কথা বলি। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনও আত্মীয়ার একটি মোকর্দ্দমায় তাঁহাকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করি, তখন তাঁহার খুব পশার। আমার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠে এবং তাঁহার পারিশ্রমিক ফি দিতে উদ্যত হইলে, তিনি বলিলেন, "এখন থাক, ব্রীফ রাখিয়া যান—কল্য হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা উঠিলে আমায় ডাকিয়া লইয়া যাইবেন।" ডাকিতে গিয়া দেখিলাম, আমার প্রদত্ত ব্রীফে নোট লিখিতেছেন, অন্যান্য ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে লোক ডাকাডাকি করিতেছে, তিনি কেবল সময় লইতে বলিতেছেন। তার পর এমন সুন্দরভাবে caseটি জজদের বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রতিপক্ষদের কোনও যুক্তিতর্কই তাহাতে টিকিল না—তিনি জয়যুক্ত হইলেন। খরচার কথা উঠিলে তিনি জজদিগকে জানাইলেন যে, তিনি ঘটনা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া caseটি লইয়াছিলেন, কাউনসিলের ফি হিসাবে এক কপর্দ্দকও লইবেন না। দুঃখের কাহিনীতে তাঁহার মন কিরূপ বিচলিত হইত, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

সে দিন এক শোকসভায় শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় বলিতেছিলেন, দেশবন্ধু শেষ দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে সাতকড়ি বাবুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া বলেন, "স্বরাজ ফণ্ডে বুঝি টাকার অভাব ঘটিয়াছে, তাই ভাবছো ? আমার ত কিছু নাই, আমার স্ত্রীর হাতে এখনও দুই হাজার টাকা আছে, তাহা হইতে এক হাজার টাকা লইয়া যাও।" এরূপ কথা কয় জন বলিতে পারে ? স্ত্রীর শেষ দুই হাজার টাকা হইতে এক হাজার টাকা দান ! কি মহাপ্রাণতা !

আমাদের দেশে প্রায় শুনা যায়, পরলোকগত আত্মীয়রা মরণোন্মুখ আত্মীয়কে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া থাকেন। দেশবন্ধুর এক ভ্রাতার দার্জ্জিলিংএ মৃত্যু হইয়াছিল। মহাপ্রস্থানের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে দেশবন্ধু মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "ভোলা আমাকে ডাকাডাকি করিতেছে, এবার আমায় যেতে হবে।" তখন খেয়াল বলিয়া সে কথা কেহ মনে স্থান দেন নাই, কিন্তু শেষ সেই ভোলার ডাকই তাঁহাকে পরলোকে বিশ্বেশ্বর ভোলানাথের শ্রীচরণে লইয়া গেল। বাঙ্গলার কপাল ভাঙ্গিল !

শ্রীসুধীন্দ্রদেব রায়।

মৃত্যু-প্রভাতে

স্বর্গের নন্দন-কানন, মন্দাকিনী নদীর তীরে একটি ছোট্ট মেয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিল, তার খেলার সাথী ছিল ফুল, পাখী, আর নদীর সেই ছোট ছোট ঢেউগুলি।

তোমরা বোধ হয় শুনে হাস্‌ছ ? কিন্তু স্বর্গের মেয়েদের খেলার সাথী এইরূপ অপূর্ব্বই হয়ে থাকে। সে যখন পাখীর গানের সুরে সুর মিলিয়ে, নদীর ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে, ফুলের গাছগুলিতে দোলা দিয়ে বেড়াচ্ছিল—তখন এমন কেউই ছিল না—যে তাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে।

তখন সকালবেলা। সূর্য্যদেব মুখটি ধুয়ে সবেমাত্র উঁকি মেরে দেখছেন যে, তাঁর বেরোবার সময় হ'ল কি না ? দুরন্ত ছেলে বাতাস ত ঘুম থেকে উঠে অবধি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, ফুলবালারা ঘুমভাঙ্গা চোখ মেলে অলসভাবে চেয়ে দেখলে -ছোট্ট মেয়েটি তাদের দোলা দিয়ে দিয়ে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে--"ওরে ওঠ ওঠ !"

মেয়েটির নাম উষা, সকলের ঘুম ভাঙ্গানোই ছিল তার কায; সকলের আগে সেই চোখ মেলে উঠে বস্‌ত,—তার পর—কেউ বা তার হাসির আলোয়, কেউ বা তার আঁচলের বাতাসে, আবার কেউ বা তার কচি হাতের ঠেলায় জেগে উঠত।

সে দিন তার মনটা ছিল আনন্দভরা, বোধ হয়, সে এমন কিছু সুস্বপ্ন দেখেছে—যাতে তার কচি মুখখানি ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে ভ'রে উঠছিল। সে চুপি চুপি সাথীদের ডেকে ডেকে বল্‌লে—"শোন্ শোন্ সু খবর !"

সকলেই বিস্ময়ে চোখ তুলে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—"কি ?"

"আজ আমাদের সুপ্রভাত !"

"কেন ? কেন ?"

"তিনি আস্‌ছেন ! এত দিন ধ'রে আমরা যাঁর প্রতীক্ষা কর্‌ছি, সেই মায়ের সুসন্তান, স্বদেশপ্রেমিক বন্ধু আজ আমাদের দুয়ারে !"

দিকে দিকে তখনই এ কথা প্রচারিত হয়ে গেল, বাতাস দুরন্তপনা ভুলে আনন্দে ছুটে ছুটে ব'লে বেড়াতে লাগল—"তিনি আস্‌ছেন !"

ফুলেরা দুলে দুলে বল্‌তে লাগল,—"তিনি আস্‌ছেন !"

পাখীরা মধুর সুরে গাইতে লাগল,—"তিনি আস্‌ছেন !"

মন্দাকিনীর জল কুল-কুল স্বরে গেয়ে চল্‌ল—"তিনি আস্‌ছেন!"

সারা অমরাবতী জুড়ে সাড়া প'ড়ে গেল—কি আনন্দ! কি আনন্দ!

সেই মহান্ অতিথির অভ্যর্থনার জন্ম ত্রিদিব ফলে, ফুলে, আলোয়, বাতাসে সুরভিত হয়ে উঠল, তপনের আর ধরণীতে আলো যোগাইবার সময় হ'ল না।

সে দিন পৃথিবীতে আলোর দরকারও ছিল না, কারণ, তাদের অদৃষ্ট বিপরীত। নিদারুণ কাল দুঃখিনী মায়ের আঁচলের নিধিটি হ'রে নিতে বসেছে, সমস্ত দেশ আজ অসহ্য শোকে কাতর!

স্বর্গের সোনার ফটক খুলে গেল; সমস্ত দেবতা হাসিমুখে তাঁদের দেশপূজ্য অতিথিকে এগিয়ে নিতে এলেন, অপ্সরারা ভৃঙ্গারে জল আর ফুল ও চন্দন নিয়ে এসে পাদ্য অর্ঘ্য দিলে।

কি, এ কি! পৃথিবীতে এমনও কি কেউ আছে?—যে ত্রিভুবন-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে আস্‌তে অনিচ্ছুক! দেবতারা অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলেন,—অতিথির চোখে জল! মুখে বিদায়ের ব্যথা!

তাঁরা বিস্ময়ে পৃথিবীর পানে চাইলেন,—ধরণী অন্ধকার—গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, অভাগিনী ভারতমাতা বুকের রত্ন হারিয়ে অচেতন হয়ে প'ড়ে আছেন, আশেপাশে অভাগ্য দেশবাসীরা হেঁটমুখে ধূলায় ব'সে আছে, তারা যে আজ সর্ব্বস্বহারা!

সেই অন্ধকারের মাঝে একটিমাত্র আলোক জল্‌ছিল, এক জন মাত্র মহাপুরুষ চোখের জল মুছে হাত বাড়িয়ে শোকাকুলদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন,—প্রিয়তমের বিয়োগে বুক ভেঙ্গে পড়লেও বাহিরে তিনি আজ শান্ত, স্থির!

দেবতারা এতক্ষণে অতিথির চোখের জলের মর্ম্ম বুঝলেন; বুঝলেন যে, অসমাপ্ত কায ফেলে, কতখানি ত্যাগস্বীকার ক'রে—তাঁকে কালের হুকুম মেনে চ'লে আস্‌তে হয়েছে।

তাঁদের কোমল মন ব্যথায় ভ'রে উঠল,—

সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার চোখের জল ঝরঝর ধারায় রূপে ঝ'রে পড়তে লাগল,—ঝর্, ঝর্, ঝর্।

শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু।

পথের আলো

ওরে—নিভে গে'ছে পথের আলো
চল্‌বি কেমন ক'রে!
(তাই) র'বি কি তুই অন্ধ হ'য়ে
অন্ধকার ঘরে॥

ক্ষণিক সুখের রঙীন্ নেশায়
বদ্ধ হয়ে মত্ত কারায়;
থাক্‌বি কি রে সারাজীবন্
বিফলতা ধ'রে।
ওরে—নিভে গেছে পথের আলো
চল্‌বি কেমন ক'রে॥

ও যে—বিজলী নয় ব্যঙ্গ হাসি,
মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে হাসি,
বৃষ্টি কোথা? আকাশ থেকে
করকা যে ঝরে,
ওরে—নিভে গেছে পথের আলো
চল্‌বি কেমন ক'রে॥

কপট রাহুর বিকট গ্রাসে
চিত্ত-রবির শূন্য ভাসে
ফুটবে "অরবিন্দ" কি আজ
দেশের সরোবরে।
ওরে—নিভে গেছে পথের আলো
চল্‌বি কেমন ক'রে॥

আবার আলো জ্বলে যদি,
যতন ক'রে নিরবধি
অটুট বাঁধন দিয়ে তারে
রাখিস্ সদা ঘিরে।
দম্‌কা বায়ুর চমক লেগে
যায় না যেন ছিঁড়ে॥

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

১৭ই বৈশাখ—

মরক্কোয় রিফজাতি কর্ত্তৃক ফরাসী এলাকায় উপদ্রব। বিলাতে উইণ্টারটনের কথা, ৩ নং রেগুলেশন প্রত্যাহারে আপত্তি। কমন্স সভায় তর্ক-যুদ্ধ—মন্ত্রীদিগের উপর শ্রমিকদিগের আক্রমণ, সভা হইতে মিষ্টার চার্চ্চিলের প্রস্থান। কেপটাউনে যুবরাজ গমনে উৎসব।

১৮ই বৈশাখ—

মহাত্মা গন্ধীর কলিকাতা আগমন, হাওড়া ষ্টেশনে বিরাট অভ্যর্থনা। রসারোডে দেশবন্ধু-ভবনে বাসের ব্যবস্থা। অপরাহ্নে মির্জ্জাপুর পার্কে বিরাট জনসভা—রাত্রি ১০টায় ট্রেণে ফরিদপুর যাত্রা। ব্রহ্মদেশে ওকপোতে অগ্নিকাণ্ড, ৯টি ধানের গুদাম ভস্মীভূত। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক উৎসব—দশ সহস্র লোকের শোভাযাত্রা।

১৯শে বৈশাখ—

ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী—সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অভ্যর্থনা সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী—সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অভ্যর্থনা সভাপতি ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাদেশিক ছাত্রসম্মিলনী—সভাপতি সাহিদ সুরাওয়ার্দ্দী, অভ্যর্থনা সভাপতি—অতুলচন্দ্র সেন। ফরিদপুরে মৌলবী ফজলল হকের সভাপতিত্বে আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া সম্মিলন। বিলাতে সম্রাটের সহিত লর্ড রেডিংএর সাক্ষাৎ। প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীতে মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা। ফরিদপুরে বঙ্গীয় যুবকসম্মিলনী—সভাপতি যতীন্দ্রমোহন রায় ও অভ্যর্থনা সভাপতি—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

২০শে বৈশাখ—

প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন, মহাত্মা গন্ধীর উপস্থিতি ও বক্তৃতা। রাত্রিতে বিষয়নির্ব্বাচন কমিটীর সভা। দেশবন্ধু হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত। মাদ্রাজ রাজমহেন্দ্রীতে নোট জালে নানা স্থানে খানাতল্লাস ও বহু লোক গ্রেপ্তার। রুসিয়ায় শাসনপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব। কেপটাউনে গরুর গাড়ী আরোহণে যুবরাজের শোভাযাত্রা। ফরিদপুরে বঙ্গীয় অস্পৃশ্যতানিবারণী সম্মিলন—সভাপতি শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, অভ্যর্থনা সভাপতি—মোহিনীমোহন দাস, মহাত্মাজীর বক্তৃতা।

২১শে বৈশাখ—

মহাত্মা গন্ধী, আচার্য্য রায় প্রভৃতির কলিকাতায় প্রত্যাগমন। প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন—দাশ মহাশয় পীড়িত থাকায় শ্রীযুত ললিতমোহন দাস সভাপতি; আগামী বৎসরে কৃষ্ণনগরে অধিবেশনব্যবস্থা। রেঙ্গুনে জোড়া খুন, কূপের মধ্যে মৃতদেহ। ফরিদপুরে মুসলমান বৈঠকে মহাত্মাজীর বক্তৃতা।

২২শে বৈশাখ—

প্যারিসে বিরাট শ্রমিক ধর্ম্মঘট, বিলাতে কমন্স সভায় রাজনীতিক বন্দী সম্বন্ধে আলোচনা। পোলাণ্ডে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা। মহাত্মা গন্ধীর চন্দননগরে প্রবর্ত্তক আশ্রম পরিদর্শন।

২৩শে বৈশাখ—

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে মহাত্মা গন্ধী—ভিত্তিস্থাপন উৎসবে বক্তৃতা। বাগবাজার মদনমোহন মন্দিরে পর্দ্দানসীন মহিলা সভায় মহাত্মাজীর বক্তৃতা। সন্ধ্যায় মির্জ্জাপুর পার্কে চরকা উৎসব—মহাত্মাজী ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের যোগদান। অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ সম্পর্কে কলিকাতায় ৩০ জন গ্রেপ্তার। লালবাজার হাজত-ঘরে পুলিস হাবিলদারের আত্মহত্যা। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসী সম্পর্কে গোল টেবিল বৈঠকের কথা। মরক্কোয় ফরাসীর সম্ভ্রমহানির আশঙ্কা।

২৪শে বৈশাখ—

কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটীতে মহাত্মা গন্ধী—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান। কলিকাতা কর্পোরেশনে পীর সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা—মৃতদেহ উত্তোলন বন্ধ। বোম্বায়ে বাওলা হত্যার মামলা, ইন্দোরের ডাক্তার ও মোটর-চালকের সাক্ষ্যপ্রদান। আসামীর নিকট উৎকোচ গ্রহণে জঙ্গীপুরে দারোগার কারাদণ্ড। মহাত্মা গন্ধীর বাঙ্গালাভ্রমণে যাত্রা।

২৫শে বৈশাখ—

মহাত্মা গন্ধীর মালিকান্দা অভয় আশ্রম পরিদর্শন। নাভা জেলে অনাচারে ভারত-সরকারের প্রতিবাদ। উত্তর-পশ্চিম রেল-ধর্ম্মঘটে এজেণ্টের ইস্তাহার। মঁসিয়ে ট্রট্‌স্কির মস্কোয়ে প্রত্যাবর্ত্তন। বেলা ১টায় ভাগ্যকুলে মহাত্মা, বেলা আড়াইটায় লৌহজঙ্গ—বিকালে জনসভা—সাড়ে ৭ হাজার টাকা-পূর্ণ থলি প্রদান। চাঁদপুরে ভ্রাতৃহত্যার মামলা। ভাগলপুরে ২ শত নাগা সন্ন্যাসী—পুলিস কর্ত্তৃক আটক। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারতসচিব ও বড় লাটের গোপন পরামর্শ।

২৬শে বৈশাখ—

মহাত্মাজীর বিক্রমপুরস্থ বানরী গমন। দিঘীরপাড়ে মহাত্মা গন্ধী—যুনিয়ন বোর্ডের অভিনন্দন প্রদান। ১১টায় তালতলা গমন—মালখানগর, সুরসাইল প্রভৃতি পরিদর্শন। সম্রাট কর্ত্তৃক বিলাতে ওয়েম্বলী প্রদর্শনীর উদ্বোধন। রাত্রি ৮টায় মহাত্মার চাঁদপুর গমন।

২৭শে বৈশাখ—

কিশোরগঞ্জে হত্যাকাণ্ড, ময়দানে নমঃশূদ্র বালকের মৃতদেহ। পাটনায় কমিশনারের অপমান—শ্বেতাঙ্গের ক্ষমাপ্রার্থনা। ঢাকা রায়ের বাজারে ডাকাইতি। কলিকাতায় অম্বিকাচরণ লাহার মৃত্যু। মান্দালয় জেলে রাজবন্দী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের স্বাস্থ্যহানি। চাঁদপুরে মহাত্মা গন্ধী—সভায় অভিনন্দন দান—খাদি কেন্দ্র ও জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন। পুরানবাজারে সভায় যোগদান।

২৮শে বৈশাখ—

চাঁদপুরে মহাত্মার অভিনন্দন। মিঃ এমার্সন বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের নূতন সদস্য নিযুক্ত। জোড়াবাগানে মারামারির মামলায় বাদিরা অভিযুক্ত। ভারকেশ্বরে রিসিভার নিয়োগের আদেশ—হুগলী জেলা জজের রায়। মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সূতাকাটা প্রস্তাব পরিবর্তনের সঙ্কল্প। সাংহাইয়ে চীনা কামানের জাহাজ হইতে ইংরাজের উপর গুলী। ক্ষতিপূরণ বাবদে প্রথম বৎসরে জার্মাণীর ৩১ কোটি স্বর্ণ মার্ক প্রদান। সোফিয়ার হত্যাকাণ্ডে ৯ জনের ফাঁসি। মহাসমারোহে হিণ্ডেনবার্গের বার্লিনপ্রবেশ। মাদ্রাজ-নেতা সত্যমূর্ত্তির বিলাতযাত্রা।

২৯শে বৈশাখ—

আলীপুর ফৌজদারী আদালত-প্রাঙ্গণে খুন। সন্ধ্যা ৬টায় মহাত্মা গন্ধীর চট্টগ্রাম গমন—সেনগুপ্তের বাড়ীতে অবস্থান। সন্ধ্যায় মোসলেম হলে বিরাট জনসভা। চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ—মানুষের মাংস ভক্ষণ ও পুত্র-কন্যা বিক্রয়। ধূমে মহাত্মা গন্ধী—মহাজনহাট খাদিকেন্দ্র পরিদর্শন। কলিকাতায় ইটালীয় বিমান-বীর।

৩০শে বৈশাখ—

সেকেন্দ্রাবাদে অগ্নিকাণ্ড, ২ শত গৃহ ভস্মীভূত। ত্রিচিনাপল্লীতে নৌকাডুবী—৪ জন জলমগ্ন। এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্যামলাল নেহরুর অর্দ্ধদণ্ড। চট্টগ্রামে মহাত্মা গন্ধী—প্রাতে বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ, দ্বিপ্রহরে মহিলা সভা, বে-সরকারী ক্লাব পরিদর্শন—স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রবৃন্দের সভা। মহাত্মার চট্টগ্রাম হইতে নোয়াখালি যাত্রা। লণ্ডনে লর্ড মিলনারের মৃত্যু। লণ্ডনে বলশেভিক আড্ডায় খানাতল্লাসী।

৩১শে বৈশাখ—

কাথিয়াবাড় রাজ্য হইতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে ১৯ হাজার টাকা দান। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের বেঙ্গলীর সম্পাদক পদ ত্যাগ। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঙ্গলীর সম্পাদনভার গ্রহণ। নোয়াখালিতে মহাত্মা গন্ধী—শোভাযাত্রা, মহিলা-সভা, চরকা উৎসব, জনসভা। মরক্কোয় ভীষণ যুদ্ধ—ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ।

১লা জ্যৈষ্ঠ—

রাত্রিতে মহাত্মাজীর কুমিল্লা অভয় আশ্রমে গমন। কটক ছাত্র-কনফারেন্স—সভাপতি সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। লর্ড এলেনবীর স্থানে সার জর্জ লয়াড মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিজাম রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

২রা জ্যৈষ্ঠ—

অভয় আশ্রমে মহাত্মাজী—অভিনন্দন প্রদান, হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন। যুদ্ধে আহত ও হতগণের পরিজনবর্গকে সরকার হইতে সাহায্য প্রদান ব্যবস্থা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা। চরমনাইর মানহানি মামলা—সরকার পক্ষ হইতে প্রত্যাহৃত। রাত্রিকালে মহাত্মার অভয় আশ্রম ত্যাগ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ—

মহাত্মাজীর চাঁদপুর হইয়া নারায়ণগঞ্জ গমন। ঢাকা যাইবার পথে তারপুরে জাতীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন। রেঙ্গুনে ইটালীয় বিমান-বীর। মাদ্রাজে ভীষণ ঝড়, বহু লোক হতাহত। মাসপোতে ভারতীয় আক্রান্ত—এক জনের মৃত্যু।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ—

কানপুরে লালা লজপৎ রায়—অভিনন্দন প্রদান। পুণায় বড় ডাকঘরে চুরী—যুরোপীয় পোষ্টমাষ্টার গ্রেপ্তার। চুঁচুড়া আদালত-প্রাঙ্গণে বালিকা লইয়া গণ্ডগোলে ১২ জন গ্রেপ্তার। ঢাকায় মহাত্মা গন্ধী। আলোয়ার রাজ্যে গ্রামবাসীদের উপর সৈন্য-দলের গুলীবর্ষণ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ—

বোম্বায়ে বিরাট সভায় শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বরাজ খসড়ার আলোচনা। সার আশুতোষ চৌধুরীর লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান। ৯ শত মুসলমানের হজযাত্রা। রিষড়া পাটকলে গণ্ডগোল, শ্বেতাঙ্গ সহকারী আহত। নাগপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রহৃত। মেদিনীপুর জেল হইতে ৩ জন কয়েদীর পলায়ন। মৈমনসিংহে মহাত্মা গন্ধী—জাতীয় বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, মহিলা সভা প্রভৃতি পরিদর্শন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—

পারস্য মজলিসে ১২ জন মার্কিণ অর্থনীতিক নিযুক্ত। বোম্বায়ে বাওলা হত্যা মামলায় এডভোকেট জেনারেল। মৈমনসিংহে মহাত্মা গন্ধী—অভিনন্দনাদি প্রদান। এলাহাবাদে ৬ জন ডাকাইত গ্রেপ্তার। মহাত্মা গন্ধীর মৈমনসিংহ ত্যাগ। চট্টগ্রামে ঝড়ে নৌকাডুবীতে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি। মরক্কোয় ফরাসীর লোকক্ষয় ও রিফদিগের পরাজয়।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—

হেতমপুর কলেজে ধর্ম্মদাস সমস্যা। মহাত্মা গন্ধীর দিনাজপুর গমন। প্যারিসে ভারতীয়ের দোকানে চুরি।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—

হায়দ্রাবাদে ভীষণ ডাকাইতি—একখানি গ্রাম লুঠ। সীমান্তে হুলুস্থুল—ট্যাক্স আদায়কারীর বিপদ। আগ্রায় ট্রেণ ডাকাইতি—রেল কোম্পানীর ৩ হাজার টাকা উধাও। মহাত্মা গন্ধীর বগুড়া গমন—গণমঙ্গল আশ্রম পরিদর্শন। সার জন ফ্রেঞ্চ—লর্ড ইপ্রের মৃত্যু। ভালোয়ায় মহাত্মা গন্ধী—অপরাহ্নে বিরাট জনসভা।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—

বাওলা হত্যার মামলার বিচার শেষ, ৪ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ৩ জনের প্রাণদণ্ড ও ২ জন খালাস। লাহোরে ডাক কর্ম্মচারী কনফারেন্স। কুমিল্লায় নৌকাডুবীতে ৫ জনের মৃত্যু। লেডী লিটনের ভারতে প্রত্যাগমন। বহরমপুরে মুসলমান সম্মিলন—মৌলবী ফজলল হকের বক্তৃতা। পাবনায় মহাত্মা গন্ধী—সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শন। কলিকাতায় ফুটবল খেলায় মারামারি—শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড়দিগের ঔদ্ধত্য। জাপানে আবার ভূমিকম্প—২ শত গৃহ ধ্বংস, ওসাকা সহরে অগ্নিকাণ্ড। মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ—

দিল্লীতে বিরাট চরকা-প্রদর্শনী। ডেরা ইস্মাইলখাঁতে হিন্দুদিগকে আবার ভীতি প্রদর্শন। জাপানে ভূমিকম্পে ১৫ শত লোকের মৃত্যু

৬৭ শত লক্ষ ইয়েন ক্ষতি। মাদ্রাজে অগ্নিকাণ্ডে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি। তুরস্কে বিমান পল্টন গঠনের উদ্যোগ। মধ্যপ্রদেশে অব্রাহ্মণ কনফারেন্সে লাঠালাঠি—কংগ্রেসকর্ম্মী আহত। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলন—সভাপতি তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ—

মহীশূর রাজ্যে স্বরাজ্য দল গঠন। চাঁদপুরে নূতন খাদি প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা গন্ধীর বর্দ্ধমান যাত্রা। লালা লজপৎ রায় পঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত। কলিকাতায় পারসিক কন্সাল মির্জ্জা মহম্মদ ইস্পানীর মৃত্যু।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—

নিখিল ভারত হিন্দু সভার অফিস কাশী হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত। ওয়েলেস্‌লী পুষ্করিণীতে সন্তরণে বালকের মৃত্যু। মহাত্মা গন্ধীর বর্দ্ধমান ও হুগলী গমন। লণ্ডনে বাৎসরিক আসাম ভোজে লর্ড বার্কেণহেডের উক্তি। ত্রিবাঙ্কুরে পশুবলি নিবারণ ব্যবস্থা। ফ্রান্সে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে দাঙ্গা।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—

সার হাওয়ার্ড গ্রীগ কেনিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত। আলোয়ার রাজ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরভিনয়। বরিশালে জনসভা, গভর্ণরের অভিনন্দনে আপত্তি। সার নরসিংহ শর্ম্মার কার্য্যকাল বৃদ্ধি। বোম্বায়ে বাঙলার মোটর চালকের অব্যাহতি লাভ। সিন্ধু-নেতা জয়রাম দাস দৌলতরাম দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌" পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত। চুঁচড়া হইতে শ্রীরামপুর হইয়া মহাত্মা গন্ধীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। লণ্ডনের ডার্ব্বি খেলার ফল প্রকাশ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ—

রাজসাহীতে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু-প্রতিমা ভঙ্গ। ১৪ জন যুবকের পদব্রজে দিনাজপুর হইতে দার্জ্জিলিং গমন। পুণায় গণেশ শেঠের মন্দিরে বিগ্রহ ভঙ্গ। অম্বালা জেলে আকালী নির্য্যাতন। মধ্যপ্রদেশে গভর্ণরের কীর্ত্তি—সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের প্রতি কড়া হুকুম। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে' মহাত্মা গন্ধীর পদার্পণ। চট্টগ্রামে লবণ প্রস্তুত করায় ২ জন ভিক্ষুকের কারাদণ্ড। ইংলণ্ডে বিদেশীয় কম্যুনিষ্টদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ। হাতরাসে দুইটি হিন্দু যুবক খুন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ—

মহাত্মা গন্ধীর সহিত ডাক্তার মরেণোর পুনরায় সাক্ষাৎ। আলিগড়ে হিন্দু রমণীর নিগ্রহ। শিক্ষক সম্মিলনের প্রতিনিধিদ্বয়ের মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ। লেডী লিটনের বোম্বায়ে অবতরণ। ঢাকার নবাবের বিরুদ্ধে মামলা—সাক্ষীর কাঠগড়ায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ফজলল হক। বড়বাজারে ১৬ হাজার টিন ঘৃত ভেজাল বলিয়া আটক। মহাত্মা গন্ধীর সহিত পণ্ডিত জহরলাল, শ্রীযুত আনে ও ডাক্তার নাইডুর কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা। কাবুলে খোস্ত বিদ্রোহীদের মধ্যে ৪৪ জনকে গুলী করিয়া হত্যা। সোফিয়ায় ৪০ হাজার লোকের সম্মুখে ৩ জন বিপ্লববাদীর ফাঁসি।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ—

বোলপুরে মহাত্মা গন্ধী—প্রাতে বড়দাদার সহিত সাক্ষাৎ—পরে রবীন্দ্রনাথের সহিত ৩ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা। চীনে পুলিসের গুলীতে বহু ছাত্র নিহত। ডেরা ইস্মাইলখাঁতে হিন্দুদিগের জীবনসঙ্কট। কংগ্রেসকর্ম্মী সূর্য্যনারায়ণ সেনগুপ্তের মৃত্যু। মার্কিণের সহিত সোভিয়েটের মৈত্রীর বাসনা। ভৈরবে ভীষণ নৌকাডুবী—বহু লোক জলমগ্ন। উত্তর-পশ্চিম রেল ধর্ম্মঘট সম্পর্কে [illegible] ইস্তাহার।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—

শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গন্ধী—প্রাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা। সন্ধ্যায় সভা ও বড়দাদার সহিত সাক্ষাৎ। কলিকাতায় মুসলমান সম্মিলন। হালিসহর শান্তিমঠে উৎসব। বর্দ্ধমানে পণ্ডিত জোহরলাল নেহরু। সার শঙ্করণ নায়ারের রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হইবার চেষ্টা। অমৃতসরে হিন্দু কনফারেন্স—হিন্দু সংগঠনে লালাজীর বক্তৃতা। জেনেভা শ্রমিক সম্মিলনীতে শ্রীযুত যোশী ও চমনলালের বক্তৃতা। কাইরোতে কম্যুনিষ্ট ভীতি, সন্দেহে ১৭ জন গ্রেপ্তার।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ—

ব্যারিষ্টার প্রশান্তকুমার সেন পাটনা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত। শ্রীযুত লালুভাই শ্যামলদাস বোম্বাই সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত। বোম্বায়ে হত্যাকাণ্ড—এক রাত্রিতে ৫ জন খুন। গ্লাসগোতে কম্যুনিষ্ট সম্মিলনী, সরকারী আদেশ অমান্য। সাংহাইএ ছাত্রদিগের উপর পুলিসের গুলীবর্ষণ। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধিতালিকা প্রকাশ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—

বোম্বাইয়ে অতি বর্ষণ, সহর জলপ্লাবিত। রেঙ্গুনে 'সান' সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। নিজাম রাজ্যে 'মারাঠী' পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মাদ্রাজের গণ্টুরে নূতন মেডিকেল স্কুল। কালীঘাটে অন্নপূর্ণার মন্দিরে পণ্ডিত-সম্মিলন। দক্ষিণ-কলিকাতায় চরকা উৎসব, মহাত্মা গন্ধীর বক্তৃতা। রাজসাহী ধাসবাসীর নারীহরণ মামলার রায়, আসামীদের প্রত্যেকের ১০ বৎসর কারাদণ্ড। সাইকেলে ৯ দিনে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং গমন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ—

এলাহাবাদে 'মজদুর' সম্পাদক শ্রীযুত কিরণচন্দ্র মিত্রের কারাদণ্ড। গোপালপুরে ভীষণ ডাকাইতি। বোম্বাইয়ে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল' পত্রের সম্পাদকের পদত্যাগ। যুবরাজের মেটালে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন। শ্রীহট্টের রাজঘাট চা-বাগানে য়ুরোপীয়ের হাতে বাঙ্গালীর লাঞ্ছনা। নোয়াখালিতে মৌলবী ফজলল হকের বক্তৃতা—আগে মুসলমান, পরে ভারতবাসী। আলোয়ারে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি। হাওড়ায় ইউনিয়ন জুট ও গার্ডেনরীচ কারখানায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট। লাহেরিয়া সরাই লাখো চকে ভীষণ হাঙ্গামা। বুলগেরিয়ায় ১০ হাজার লোক কর্ম্মচ্যুত—৬ শত কম্যুনিষ্ট গ্রেপ্তার। সাংহাইএ বিদেশীদিগের বিরুদ্ধে চীনাদিগের বিদ্রোহ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ডালহৌসীতে পীড়াবৃদ্ধি। মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রী সমস্যায় গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব। সিন্ধুদেশে লোমহর্ষণ নারীনিগ্রহ। মজঃফরপুরের মৌলবী সফির মক্কাযাত্রা। শ্রীহট্টে মঙ্গ ও আসামের ডাক বিভাগীয় কর্ম্মচারী বৈঠক। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলীর মৃত্যু। বরিশালে সাড়ে ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ডিঙ্গী গমন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ—

কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা। প্রায় আড়াই হাজার হজ যাত্রীর তীর্থযাত্রা। বহরমপুর জেলে

রাজনীতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন। জার্ম্মাণীর উপর মিত্রশক্তির দাবী, ১ লক্ষ ২০ হাজার পুলিস সৈন্য হ্রাস ব্যবস্থা। সাংহাইএ সাড়ে ৪ শত লোক গ্রেপ্তার, ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলীবর্ষণ।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ—

ঢাকা সহরে ভীষণ পুলিস জুলুম, স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার। রেঙ্গুনে অগ্নিকাণ্ডে মিউনিসিপ্যাল অফিস ভস্মীভূত। প্যারিসে গোয়ালিয়রের মহারাজার মৃত্যু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ বিল্ডিং' প্রতিষ্ঠা। সজ্জন সাহিদী জাঠের জৈঠো যাত্রা। শ্রীহট্টে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—

কাশীঘাটে ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা। চীনা দাঙ্গাকারীদের কার্য্যে বলশেভিকদের উৎসাহ প্রদান। ক্যাণ্টনে যুদ্ধ, উভয় পক্ষের অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ। ইরাকে ইংরাজ কর্ম্মচারী হত্যা। হাওড়ায় মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে টাউনহলে জনসভা। বাওলা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ইন্দোরের বহু সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত। বেলুচিস্থানে বিদ্রোহের আশঙ্কা।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ—

আন্দামান দ্বীপে বিদ্রোহ, ৩ জন বিদ্রোহী হত। শ্রীযুত পাঠিককে ৫ বৎসর কমালগড় কেল্লায় আটক। বাঁকুড়ায় মিউনিসিপ্যালিটীতে স্বরাজ্য দলের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত। নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস—ধর্ম্মঘট ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। ইন্দোর রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা। মিশরে বলশেভিক ষড়্‌যন্ত্র। তুরস্কে ষড়্‌যন্ত্র সম্পর্কে ১১ জন বিশিষ্ট লোক গ্রেপ্তার।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ—

তারকেশ্বর তরবারি মামলার রায়, আসামীদিগের মুক্তি। কলিকাতায় কবিরাজ বামনদাস গ্রেপ্তার। আবার ডেরা ইস্‌মাইল খাঁতে হিন্দুদিগের গৃহে অগ্নি সংযোগ। পাঞ্জাবে বোমায় ৩ জন লোক গ্রেপ্তার। রেল ধর্ম্মঘট সম্পর্কে মিঃ এণ্ড্রুজের সিমলা যাত্রা।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—

সুহাসিনী হরণের মামলায় আসামীদ্বয়ের অব্যাহতি। ময়মনসিংহ শিল্পকুটীরে খানাতল্লাসী। বোম্বায়ে বাওলার সোফারের অব্যাহতি। পাটনায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। জলপাইগুড়ীতে মহাত্মা গন্ধী, ৯খানি অভিনন্দনপত্র প্রদান। পাবনায় মদের দোকান তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব। চীনা শ্রমিকদিগের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিকদলের সহানুভূতি। আবার মরক্কো অবরোধ। লণ্ডনে নরহত্যার জন্য বালক অভিযুক্ত। সার বেসিল ব্লাকেটের ভারতাগমন। মরক্কো সমস্যা লইয়া ফ্রান্স ও স্পেনের পরামর্শ। চীনের বিপদে রুসিয়ার সহানুভূতি। নীলফামারীতে মহাত্মার সংবর্দ্ধনা।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—

নবাবগঞ্জে (ঢাকা) মহাত্মা গন্ধী। আলোয়ার দুর্ঘটনায় সরকারী বিবরণ। ভারতের আর্থিক অবস্থা তদন্ত সমিতির কার্য্য শেষ। শ্রীরামপুর কারখানায় হাঙ্গামা—ম্যানেজার ও ১০ জন গ্রেপ্তার। জেনেভায় অস্ত্র বৈঠক।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ—

হিতবাদী মানহানি মামলায় দরখাস্ত না মঞ্জুর। মহাত্মা গন্ধীর নামে করাচী পশুশালার নামকরণ। তুরস্কে ভারতীয় মুসলমানের উপর গুলী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের প্রথম স্থান অধিকার। মুলশী সত্যাগ্রহের জের, শ্রীযুত বাপাতের ৭ বৎসর কারাদণ্ড। কলিকাতায় বৈদ্যুতিক রেলের জরীপ আরম্ভ। মাদারীপুরে মহাত্মা গন্ধী। কলিকাতা ভারতসভার বার্ষিক অধিবেশন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ—

উত্তর-পশ্চিম রেল ধর্ম্মঘট—মিটমাটের চেষ্টা। বাঙ্গালায় নূতন শাসন ব্যবস্থা—হস্তান্তরিত বিভাগ সরকারের হাতে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ২৪খানি নূতন বাস আমদানী। ফরিদপুর শিক্ষামঠে মহাত্মা গন্ধী।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ—

লায়ালপুরে লালা লজপৎ রায়। আলিগড়ে অন্ধদিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বরিশালে মহাত্মা গন্ধী। চীনে বৃটিশ দূতাবাসে অগ্নি সংযোগ। চীনে ২৫ হাজার ছাত্রের সভায় দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণার ব্যবস্থা। কাবুলে ইতালীয় ইঞ্জিনিয়ারের ফাঁসীতে মুসোলিনীর প্রতিবাদপত্র।

১লা আষাঢ়—

কলিকাতা বার লাইব্রেরীর শতবার্ষিক উৎসব। বরিশালে মহাত্মা গন্ধী—মৌন দিবস। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বিরোধশঙ্কা—ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৪৪ জারি—কসাইখানা ব্যতীত অন্যত্র গো-হত্যা নিষিদ্ধ। গোয়ালন্দে বঙ্গীয় ধীবর কনফারেন্স, সভাপতি শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকারকে ৫ শত টাকার তোড়া প্রদান।

২রা আষাঢ়—

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় দার্জ্জিলিংএ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু—৬টায় কলিকাতায় সংবাদ প্রচার—কলিকাতায় শব প্রেরণের ব্যবস্থা। ঢাকা রায়েরবাজার ডাকাইতি সম্পর্কে ১৫ জন গ্রেপ্তার। বাঙ্গালায় শাসন পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ ব্যবস্থা। ভোনাল্ড কমিটীর নির্দ্ধারণ প্রকাশ।

৩রা আষাঢ়—

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে মহাত্মাজী—খুলনার সভায় শোকপ্রকাশ—রাত্রিকালে মহাত্মার কলিকাতায় প্রত্যাগমন। কলিকাতা হাইকোর্ট ও বিভিন্ন আদালত সমূহে শোকপ্রকাশ। ভারতের নানা স্থান হইতে শোকপ্রকাশ। বিচারপতি পি, আর, দাশের পাটনা হইতে কলিকাতা যাত্রা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উপর ১৪৪—জাগলপুর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৪ঠা আষাঢ়—

ভারত-সরকার কর্ত্তৃক নেপালকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা উপহার প্রদান। কলিকাতায় দেশবন্ধুর শব—অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভাযাত্রা। হাওড়া তুলার কলে অগ্নিকাণ্ড, ৮০ হাজার টাকা ক্ষতি। ভাইকমে সত্যাগ্রহের জয়—সকলের জন্য মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
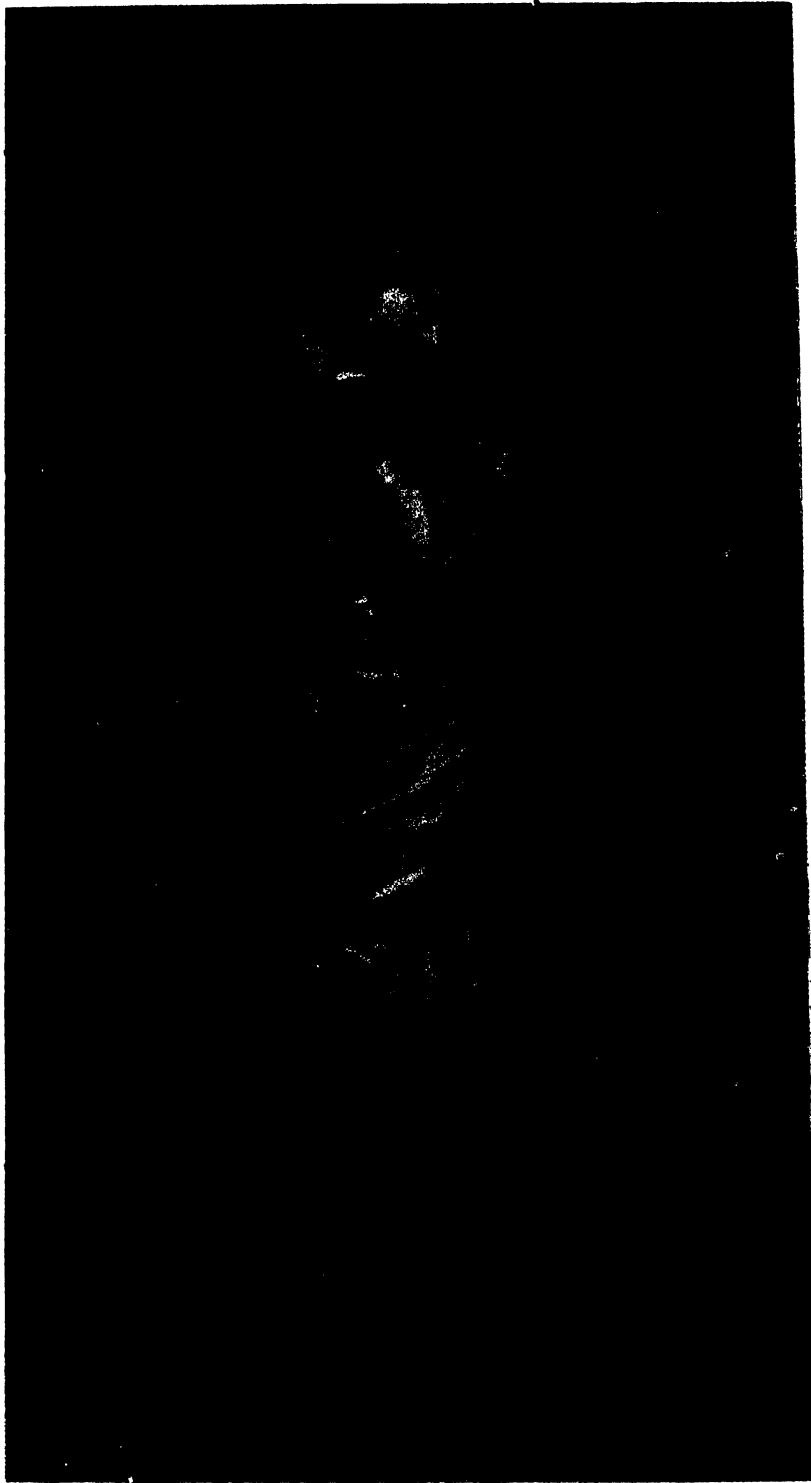
শিল্পী

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্রশালা] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

মাসিক বসুমতী

৪র্থ বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩৩২　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন-আবাহন

রঙ্গহাসি-বঙ্গবাসী ফুটাও অধরে।
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা সাজো ঘরে ঘরে ॥
আনন্দ-দায়িনী দুর্গা এলে মহীতলে।
প্রীতিতে প্রকৃতি-সতী সহাস উজলে ॥
বসুমতী ফুল্লমতি ক'রে বর্ষা-স্নান।
শ্যামল বসনখানি করে পরিধান ॥
চিকুরে ঠিকরে মণি বিচিত্রবরণ।
সরোজলে শতদল সাজায় চরণ ॥
সদ্য-ফোটা স্থলপদ্ম শেফালীর শোভা।
ধরিত্রী-পবিত্র-অঙ্গ করে মনোলোভা ॥
শরত-চন্দ্রিকা মেখে' ভরি' ফুলগন্ধে,
নন্দন-নন্দিনী সনে মাতিতে আনন্দে,—
বলেন মোহিনী মাতা প্রফুল্ল বদনে,
সাজিতে সুখের সাজে সাধের সদনে ॥

*　　*　　*

মুক্তকেশী রণবেশী বসি' সিংহোপরে।
দশবিধ প্রহরণ রাজে দশ করে ॥

তথাপি প্রকাশ্য আস্যে হাস্যের তরঙ্গ।
শক্তিসনে সিক্ত অঙ্গে আনন্দের রঙ্গ ॥
বিষাদের অবসাদে মূর্চ্ছাপন্ন মন।
সে মনে কি কর্ম্ম-শক্তি করে জাগরণ ॥
নির্ব্বাণ করিতে জ্বালা পার্ব্বণের সৃষ্টি।
উৎসবের কলরবে হৃদে সুধা-বৃষ্টি ॥
ধূমধাম বিনা কোথা উদ্যম উদ্ভব।
বিরক্তির সনে শক্তি কভু না সম্ভব ॥
আশ্বিনে কস্মিন্‌কালে হ'য়ে হাস্যহীন।
থেকো না হে বঙ্গবাসী কি ধনী কি দীন ॥
রঙিলা বাঙ্গালী ছিল স্বল্পেতে সন্তোষ।
ভেঙ্গে দেছে মন তার দুরাশার দোষ ॥
ঘরে ঘরে গ্রামে আর নাড়ে নাকো তাড়্।
গড়িতে গুড়ের মুড়্‌কি নারিকেল-নাড়্ ॥
ছুতোরের মেয়ে খেয়ে গতরের মাথা।
ভোরে উঠা চিঁড়ে কোটা ছেড়ে কাটে "পাতা" ॥
টাকার ওজনে মজা, ভোজনেতে নয়।
জাঁকেতে জানানে হবে এতো টাকা ব্যয় ॥
ফাঁসির হুকুম তাই হয়েছে হাসির।
বারাণসী নীচে মন ওঠে না দাসীর ॥
বর্ব্বর গর্ব্বের তুষ্টি খর্ব্ব দেখে পরে।
পর্ব্বের আনন্দবৃদ্ধি সর্ব্বে সুখী করে ॥
বরদা শারদা মাতা মরতে উদয়।
আনন্দ-সুগন্ধে যেন পূরে দিক্‌চয় ॥
ধোয়া-পোঁছা চাঁদখানি আকাশেতে ভাসে।
ঘাসে ভরা মাঠে তটে কাশফুল হাসে ॥
ভাসায় হাসির ধারা সারা বসুমতী।
বালক-বালিকা হাস যুবক-যুবতী ॥
আমি এক মন্ত্র জানি ফোটাইতে হাসি।
দেখ দেখি ফলে কি না দীন-দুঃখ নাশি ॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ
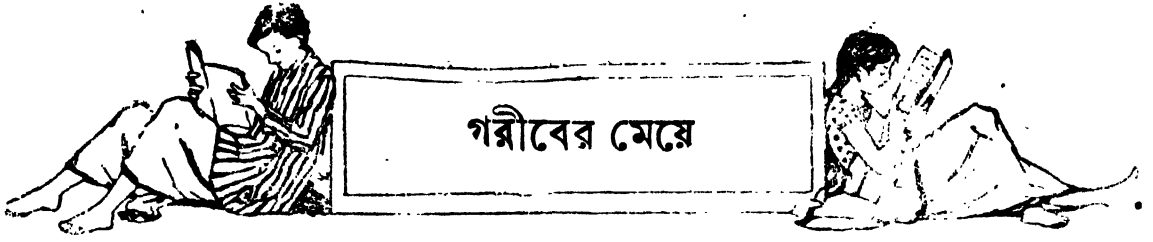
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ভুবন বাবুর ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল না। বাহিরে ভৃত্যবর্গ অতি সন্তর্পণে চলা-ফেরা করিতে থাকিলেও কোন এক জনও এ ঘরে প্রবেশ করিতে ভরসা করে নাই। কলিকাতার রাজপথ ব্যতীত আর সমস্ত প্রকৃতিই যেন আজ একটা আকস্মিক বিরাট শোকভারে অভিভূত, স্তব্ধ ও ভয়ার্ত্ত। আকাশ ঘোলাটে, বাতাস গুমোট, গাছপালা নিঝুম হইয়া আছে। গৃহ-বাসী ততোধিক স্তব্ধ ও স্থির।

ভুবন বাবু যে সোফায় সচরাচর দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রাবেশ হইলে কখন কখন শয়ন করেন, তাহাতেই অর্দ্ধ-চেতনবৎ বহুক্ষণাবধিই পড়িয়া আছেন। আহার তাঁহার আজ কয় দিন ধরিয়াই প্রায় ছিল না, আজ আর তাহা একেবারেই হয় নাই, আহারের কথা বলিতে আসিবার প্রবৃত্তি অথবা ভরসাও এ বাড়ীর কাহারও মনে ছিল না। এই চিরসহিষ্ণু সহৃদয় কোমলপ্রবৃত্তি মনিবের উপর আজ কত বড় বিপদের বজ্রই যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেক পরিজন আজ কেবলমাত্র গোপনে অশ্রুতে অভিষিক্ত হইতেছিল। আর সুশীল? সে-ও যে এ বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই বড় প্রিয় ছিল। সকলেরই মনের মধ্যে অস্ফুট অবিশ্বাসে সুশীলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে পূর্ণ সন্দেহই যে আজও তেমনই জাগ্রত রহিয়াছে। দুই এক জন স্পষ্টই তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদও করিতে-ছিল। কিন্তু তাহাদের সেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদে বাহিরের কোন পরিবর্ত্তনই ত ঘটাইতে পারে নাই। কা'ল সুশীলের বিচারের দিন,' এ সংবাদ তাহার জন্য নিযুক্ত উকীল-ব্যারিষ্টারের কাছেই সরকার জানিয়া আসিয়াছে।

একখানা ভাড়াটে থার্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া থামিলে গাড়ীর মধ্য হইতে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ক্লিষ্টভাবে নামিয়া আসিল বিনতা। বিনতার সেই সগর্ব্ব সন্নত চলনের ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুপুষ্ট উন্নত দেহ অনেকখানিই নমিত হইয়া গিয়াছে, পায়ে তাহার জুতা নাই, কেশ রুক্ষ, অসংবৃত মুখ তাহার অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ, চক্ষু অসাধারণ উজ্জ্বল। এই ভয়াবহ নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে বাড়ীর সকলেই যেন সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সম্ভাষণের কোন একটি ভাষাও সে দিন কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইল না—কেহ কেহ একটু বিদ্বিষ্টভাবেই মুখ সরাইল। বিনতাও কোন দিকে দৃকৃপাতমাত্র না করিয়া সোজা তাহার বাপের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার দৃঢ় পাদক্ষেপ ও কাঠিন্য-কঠোর মুখভাবে তাহাকে যে দেখিল, সেই মনে মনে আসন্ন আর একটা বিপৎপাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিল, গর্জ্জনোন্মুখ বজ্র যেন সেই মেঘব্যাপ্ত মুখখানায় ক্ষণে ক্ষণে চকিত চপলার মধ্য দিয়া উদ্যত হইয়া রহিয়াছিল। সেটা ভাইয়ের জন্য শোক নহে, পিতার প্রতি সহানুভূতিও নহে, এ সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্কৃত অপর আরও কোন নূতন জিনিষ, তাহা যে কোন দর্শকই বুঝিতে পারিল।

বিনতা ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই এক বার এবং দ্বারে পা দিয়াই আবার এক বার তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিল, "বাবা!"

ভুবন বাবুর অসাড় আচ্ছন্নবৎ মনের ভিতরে সে ধ্বনি একটুখানি যেন স্পন্দন মাত্র তুলিল। এই 'বাবা' ডাক যেন কোথা হইতে কোন্ সুদূর হইতে আজ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এ যেন তাঁহার বহু বহু দিন অশ্রুত! এমনই হৃদয়-মনে চমকিত—উচ্চকিত হইয়া তিনি সহসা লোভাকুল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া দ্বারের দিকে চোখ ফিরাইয়া চাহিতেই সেই অনুজ্জ্বল সন্ধ্যালোকে একটি অস্পষ্টপ্রায় নারী মূর্ত্তি তাঁহার সেই উদ্বেগ-ব্যাকুল চক্ষুতে পড়িল। অমনই গভীর হতাশার হাহাকারে সমস্ত মনপ্রাণ যেন কোন্ পাথারে তলাইয়া যাইবার উপক্রম

করিল। কৈ, কোথায় রে! কে কোথায়! কাহার অলীক প্রত্যাশা করিয়া এ স্বপ্ন দেখা! সে কোথায়? আজ সে কোথায়?

আবার সুস্পষ্ট পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান আসিল—"বাবা!"

"কে?" বলিয়া ভুবন বাবু বিস্মিত স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর মূর্ত্তির প্রতি স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন। মাথার ভিতরটা যেন কি এক রকম গোলমাল হইয়া গিয়াছিল, তাই এ যে তাঁহার কোন দিনের পরিচিত, কিছুতেই যেন এই কথাটাকে তিনি স্মরণে আনিতে পারিলেন না। বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?"

অভিমানিনী বিনতার বুকের ভিতর বারেকের জন্য অভিমানেরই উৎস উথলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বারেক-মাত্র. তাহার পরই সে শান্ত দৃঢ়পদে পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আলোটার সুইচ টিপিয়া ঘরটাকে আলোকিত করিল, এবং হঠাৎ এই তীব্র আলোকরশ্মি প্রতিহত হইয়া পিতাকে সচমকে চোখ ঢাকিতে দেখিয়াও সে জন্য একটুকুও ব্যস্ত না হইয়া কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্থির স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, "চেয়ে দেখ, বাবা! এই সইটা কি তোমার নিজের হাতের?"

ভুবন বাবুকে কে যেন বুকের উপর বোমা ছুড়িয়া মারিয়াছে, তিনি তেমনই ভয়ার্ত্ত বিবর্ণ মুখে প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে সবেগে উচ্চারণ করিলেন, "আবার!—আবার এ কি খেলা! আবার আমাকে কেন এমন ক'রে মারতে এলে তুমি? এর মানে কি?"

বিনতা বাপের চোখের সাম্‌নে একখানা বড় ফুলস্কেপ কাগজ অকম্পিত হস্তে প্রসারিত রাখিয়া, তাহার প্রথম সইটার উপর তেমনই অকম্পিত অঙ্গুলী রাখিয়া বাপকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিল। সেই ভাবই বজায় রাখিয়া অস্বাভাবিক স্থির ও ধীর কণ্ঠে সে বাপের ঐ কাতর আবেদনের জবাবে উত্তর করিল, "মানে আমি তোমায় এখনই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি, বাবা, বেশী সময় তাতে লাগবে না, আগে তুমি শুধু ঠিক ক'রে দেখে বল দেখি, এ সই করা তোমার নিজের হাতের কি না? কৈ, তোমার চশমা কৈ? এই যে—পড় ত, বেশ ক'রে দেখ।"

ভুবন বাবু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মতই তাঁহার এই চির-স্বল্পভাষিণী ও দৃঢ়প্রকৃতি মেয়ের অলঙ্ঘ্য আদেশ নিঃশব্দেই প্রতিপালন করিলেন, তাহার পর অনেকক্ষণ পরে কাগজের লেখা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া প্রায় অস্ফুট ও একান্ত ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "না, আমার নয়।"

বিনতার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে এতটুকু একটু সঙ্কল্প-কঠোর তীক্ষ্ণ হাস্য উদ্‌ভাসিত হইয়াই পর-মুহূর্ত্তে তাহা তাহার ঘন মেঘাচ্ছন্নবৎ গম্ভীর মুখের মধ্যেই নিঃশেষে আবার লয় হইয়া গেল। সেই হাসিটুকু দেখিয়া মনে হইল, যেন একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝলকিয়া উঠিয়াছিল মাত্র। দ্বিতীয় সইটার উপর পুনশ্চ নিজের আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া সে আবার কহিল, "এটা?"

বারেকমাত্র বিস্মিত নেত্রের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ করিয়াই এবার ভুবন বাবু মাথা নাড়িলেন, তাঁহাকে যেন এইটুকু শ্রম করিতে হওয়াতেই একান্ত অবসন্ন দেখাইল। বিনতা তবুও নিবৃত্ত হইল না, সে ইহার পর পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটা ঐরূপ সইএর উপর আঙ্গুল বুলাইয়া বাপকে ক্রমাগত ঐ একই প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল—"এইটে? এইটে!"

নাম সব কয়টাতেই ভুবন বাবুরই সই বটে, কিন্তু লিখার ছাঁদ ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে সব শেষ লিখাটা একেবারেই অন্য ছাঁদের। তাহার সহিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে মিলিয়া যায়—এমনই আর একটা হাতের নাম-সই ইহার ঠিক পাশাপাশি কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই লিখাটার উপর চোখের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া আসিতেই ভুবন বাবু তড়িৎস্পৃষ্টের মতই চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন—সে সইটা তাঁহার ছোট জামাই শুভেন্দুর। নামও তাহার, লিখাও তাহার। এই লেখকের লিখার ছাঁদ যে ক্রমে ক্রমেই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নসহকারে লুপ্ত হইতে হইতে সর্ব্বশেষ লিখাটায় প্রায় ভুবন বাবুর লিখার ছাঁদে মিলাইয়া আসিয়াছে, তাহা সব কয়টা সই পর পর দেখিয়া গেলেই বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

ভুবন বাবুর সহসা বোধ হইল, তাঁহার বুকের উপর

হইতে যেন বিশ মণ ওজনের সুদুঃসহ ভারী একখানা পাথরের ভার কে নামাইয়া লইয়াছে। বহুকালের শ্বাস-কৃচ্ছ্রকর, অসহনীয় রোগযন্ত্রণা অকস্মাৎ কোন দৈবী শক্তিতে যেন একটি মুহূর্ত্তেই নিঃশেষ হইয়া গেল। কিছু-ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অপরিসীম বিস্ময়ের আবেগে একটিও শব্দোচ্চারণ করিতেই পারিলেন না, অথবা ভাল করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসও টানিয়া লইতে বা ফেলিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

বিনতা স্থির কটাক্ষে বাপের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণভেদ্য অপলক দৃষ্টি তেমনই করিয়াই সেইখানে মেলিয়া রাখিয়া অকম্পিত স্থির স্বরে ডাকিল—"বাবা!"

ভুবন বাবুর সর্ব্ববিস্মৃত স্বপ্নবিভোর চিত্ত যথার্থ সত্যের মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার একবার প্রবল শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার সুশীল নিরপরাধ, তাহা সত্য বটে; ইহার অপেক্ষা বড় কথা আর কিছু নাই। কিন্তু তাহার সে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা এখনও তাঁহার পক্ষে যে প্রায় সমানই কঠিন রহিয়া গিয়াছে! প্রকৃত অপরা-ধীকে দণ্ডিত করিতে হইলে, সে দণ্ড তাঁহার পক্ষে যতই যাহা হউক, কিন্তু এই নির্দ্দোষী বালিকার তাহাতে কি দশা হইবে? উঃ, তবে কি, তবে কি, যাহা হারাইয়াছে, তাহা আর ফিরানো যাইবে না? তাহার পর তিনি বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি মহৎ, কত উচ্চ, কতই অসাধারণ চিত্ত তাঁহার সুশীলের! পরের জন্য কত বড় ত্যাগ তাহার, আর সে এ জগতে চিরকলঙ্কিত নাম লইয়াই, অসহনীয় লাঞ্ছিত জীবন বহন করিয়াই কি সব শেষ করিবে? এ কি অপ্রতিবিধেয় অবস্থা দাঁড়াইল! ইহার কি কোন উপায় নাই? এ কি নিজের প্রাণবিনি-ময়েও আর কোনমতে ফিরানো যায় না?

বিনতা বাপের মনের লিখা তাহার কালো চোখের আলো দিয়া সুস্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিতেছিল, সে তাঁহাকে বাক্যবিমুখ ও চিন্তাবিমনা দেখিয়া তাঁহার মানসিক চিন্তার প্রকৃতি অনুভবও করিয়াছিল; হাতের কাগজখানা ভাঁজ করিতে করিতে অকুণ্ঠিত মুখে মুখ তুলিয়া সহজ কণ্ঠেই কহিল—"দাদার উকীলকে ডেকে পাঠাতে বলবো, না আমিই শীল ক'রে কাগজখানা তাঁ'কে পাঠিয়ে দেব?"

এই নির্জ্জন ঘরের একাকিত্বের মধ্যে নিজের মেয়ের মুখের এই কয়েকটি কথায় অত বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোকটা এমনই বিস্ময়াতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন যে, মনে হইল, ঐ কথাগুলা যেন তাঁহার মেয়ের মুখের নহে—তাহার রূপ ধরিয়া যেন কোন ছদ্মবেশী রাক্ষসী আসিয়া এই প্রলোভনের জাল তাঁহার মনের উপর পাতিতে বসিয়াছে। তাঁহার যন্ত্রণাভারাতুর চিত্ত এ সব সহিতে পারিতেছিল না, তাই দারুণ অসহিষ্ণুতার বির-ক্তিতে তাঁহার মন যেন অকস্মাৎ একান্তই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন সেই আকস্মিক উথলিত অস-হায় ক্রোধে তাঁহার মনের মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া গেল—সেই গভীর উত্তেজনা তাঁহার দুর্ব্বল দেহে বল আনিয়া দিল। তিনি উঠিয়া সহজভাবে সোজা হইয়া বসিয়া উচ্চ তীব্র কণ্ঠে কঠোর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তুই কি বল্‌ছিস্, বুঝতে পারছিস্? তোর ভাইকে বাঁচাতে গেলে তোকে যে স্বামিঘাতিনী হ'তে হ'বে, তা কি ভেবে দেখেছিস্, রাক্ষসি? তুই না হিন্দুর মেয়ে—তুই না সতীর মেয়ে? তোর গর্ভে না তোর স্বামীর সন্তান?"

যে পিতা জীবনে কোন দিন কখন একটি রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, যে পিতা সন্তানের সকল আব্দার অন্যায় জানিয়াও সহিয়া গিয়াছেন, বিবাহের অত বড় মতভেদেও যাঁহাকে একটিবারের জন্য রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই, তাঁহার মুখ দিয়াই আজ এমন তিরস্কার বাহির হইল! বিনতা তিরস্কৃত হইয়া এক বারের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, ইহার গম্ভীর অনুযোগে সহসা মাথা হেঁট করিল। দারুণ বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া গেল। এই পিতৃস্নেহকেও সে কতবার সন্দিগ্ধ চক্ষুতে দেখি-য়াছে! এই পিতৃবক্ষেও সে কি লজ্জার আঘাত প্রদান করিয়াছে, আর আজ এই সর্ব্বনাশের চিতা সেই-ই ত তাঁহার বুকে সাজাইয়া দিয়াছে—তবু সেই তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার এত বড় ত্যাগ! উঃ, বাপ রে! না না, সে উহা সহিতে পারিবে না। এত বড় ত্যাগ, এত বড় সহিষ্ণুতা, এত বড় নির্ম্মম কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার মধ্যে নাই। অসম্ভব!—অসম্ভব! সুলেখার পত্র সে দেখি-য়াছে, তাহার শ্বশুর তাহার দাদাকে যূথভ্রষ্ট করার মতই

ভ্রষ্টশ্রী ও লাঞ্ছনা-কশাহত যত দূর যাহা করিবার, তাহা করিয়াছিল—আবার কি না, তাহার বাকীটুকু তাহারই স্বামী শোধ করিয়া দিল! না না, তাহাকে এত বড় আত্মবিসর্জ্জন, এমন ভাবে আত্মহত্যা কখনই সে করিতে দিবে না। বাপের মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া সে প্রতিজ্ঞাদৃঢ় কণ্ঠে তাঁহার তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া জবাব দিল -"হ্যাঁ, আমি হিন্দুরই মেয়ে—আমি সতী কন্যা ও সতী স্ত্রী, সেই জন্যেই ত আমার স্বামীকে তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাই। আর ইহাতে শুধু আমারই অধিকার আছে। তুমি না পারো, পেরো না, আমিই সমস্ত পারবো।"

সেই ভাঁজকরা কাগজখানা আঁচলে বাঁধিয়া দৃঢ়পদে সে ঘর হইতে সে তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যতা হইয়া ফিরিতে গেল। কি নির্ম্মম, কি দার্ঢ্যতাপূর্ণ তাহার কণ্ঠ, তাহার পদবিন্যাস!

"বিনা!"

"বাবা!"

"এ কি করছিস্, মা? সে যে তোরই জন্য এত বড় কলঙ্ক নিজে মাথায় তুলে নিয়েছিল, আর আমি তোর বাপ হয়ে —"

বিনতা ফিরিয়া আসিয়া বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া শান্ত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিল,, "হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার বাপ ব'লেই ত আমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মে আমায় তুমি সহায়তা করবে। সে ছেলেমানুষ, তাই কোন্‌টা বড়, তা দেখতে পায়নি, কিন্তু তুমি ত সবই জানো? তুমি কেমন ক'রে নির্দ্দোষকে মরতে দেবে? মনে কর, সে তোমার ছেলে নয়, কিন্তু একটা মানুষ।"

বিনতা আর তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়াই ক্ষিপ্র-চরণে ঘর হইতে বাহির হইয়া সোজা চলিয়া গেল।

কাছের বাদামগাছে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ অশুভ কণ্ঠে শব্দ করিয়া উঠিল, তাহার পরই শ্যামল গভীর পত্রান্তরের মধ্য হইতে বিকট স্বরে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতে লাগিল, আকাশের গায়ে গম্ভীরভাবে ছিটানো, কোথাও এলোমেলো ভাবে ঢালিয়া রাখা, কোথাও সুশৃঙ্খলভাবে, সুসজ্জিত আলোর বিন্দুগুলা নিজেদের অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির মধ্যে মানব-ভাগ্যলিপির অজ্ঞেয়ত্ব দর্শন করিয়াই যেন তাহাদের সান্ত্বনা দিতে স্ফুলিঙ্গরূপে কয়েকবার অধোমুখে ঝরিয়া পড়িল। সেই নির্জ্জন কক্ষের গাঢ় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ভগ্নচিত্ত পিতার সেই ক্ষোভদুর্ব্বল কণ্ঠের সমুদয় ব্যগ্রতা পরিহার পূর্ব্বক বারেকমাত্র ভাসিয়া উঠিল—"চারুশশী! এ আমার যা-ই হোক্, তোমার সন্তানদের মহত্ত্বে আমি আজ ধন্য হয়েছি, তুমিও তাদের গর্ভে ধারণ করায় সার্থকজন্মা হ'লে! সুশীল! বিনা! আমার সকল সন্দেহকে তোরা ক্ষমা করিস্! ভগবান্! তুমিও ক'রো।"

স্তব্ধ নিশীথিনীর অব্যাহত শান্তিধারার মধ্যে আর কোন শব্দমাত্র শুনা গেল না, সব শান্ত, সব স্তব্ধ, সব স্থির!!

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর শেষ আলোক-রশ্মিটুকুকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া দিতে পারে নাই, তখনও পশ্চিম-গগনের আধমুক্ত দ্বারপথে ঈষৎ একটু রক্তিমচ্ছটা পৃথিবীর দিকে উঁকি দিয়া চাহিতেছিল। পাখীগুলা রাত্রির মত নীরব হইবার পূর্ব্বক্ষণে এক বার তাহাদের শেষ তান ধরিয়া আসন্ন সুপ্তির পূর্ব্বে সান্ধ্য প্রকৃতিকে এক বার শব্দময়ী করিয়া তুলিতেছিল। রাজপথের জনতরঙ্গে কিন্তু তখনও কিছুমাত্র ভাঁটার টান ধরে নাই, বরং কর্ম্ম-ক্লান্ত জনসমূহের গৃহাভিমুখী চিত্তগুলি তাহাদের সকল শ্রান্তি বিস্মৃত করাইয়া শ্লথগতিকে আগ্রহচপল করিয়া তুলিতেছিল। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মোটরকারের ভোঁ ভোঁ, বাইকের টুং টাং, ট্রামের ঘর্ঘর এবং তাহাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া রিক্স গাড়ীর টুং টুং—এই সকল মিলিয়া একটা ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে দিনের আলো থাকিতেই বিদ্যুতের তীব্র আলো অনাগত রজনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নাশ হেতু তখনই জ্বলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই ছায়ারহস্যময় কান্তিবিজড়িত অপরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া সুশীল তাহার সুগভীর চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া

গিয়াছিল। বহু বহু দিন পরে আজ আবার সুনিবিড় মৃত্যু অন্ধকারময় গভীর যবনিকা তাহার জীবনের উপর হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া আবার তাহার পরপার হইতে অস্ফুট স্নিগ্ধ গোলাপী আলোকের ক্ষীণ রেখাটুকু দেখা দিয়াছে। মাথার উপর যে নিকষ কালো মেঘের স্তর জমাট বাঁধিয়া চাপিয়া বসিয়াছিল, একটুখানি ঐ দমকা হাওয়ার বেগে তাহারই মধ্য দিয়া আবার নির্ম্মল নীল আকাশের একটা প্রান্ত দেখা দিয়াছে। তাহার অঙ্গে সমুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারাও দুই একটা বুঝি ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সুশীলের অপরিতৃপ্ত কিশোর-জীবনের অকাল-বিরাগে বৈরাগী চিত্ত এতটুকু-কেই অবলম্বন করিয়া লইয়া যেন আবার একটুখানি আশার বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। সুলেখার চিত্ত হইতে তাহার প্রতি সন্দেহ অপসারিত হইয়াছে—সে তাহার এত বড় বিপদের মধ্যেও দেখা দিতে আসিয়াছিল, দেখিতে আসিয়াছিল; ক্ষমা করিয়া এবং ক্ষমা লইয়া গিয়াছে। আঃ! এত বড় দুর্দ্দশার ভিতরে আজ এই কি কম ঐশ্বর্য্য! রিক্ত নিঃস্ব ভিখারীর এ যে অমূল্য মণিলাভ!

সুশীলের বক্ষোভার বহুলাংশে লঘুতর করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উত্থিত ও বহির্গত হইয়া গেল। সুলেখার ক্ষমা, ইহা ত সে এত দিন ধরিয়া একান্তভাবে চাহিতেছিল, সে পাওয়া তাহার হইয়া গিয়াছে—আর কিছু—আর কিছু, তা' সে পাইল—বা না-ই পাইল! আর যদি কেহ তাহাকে ক্ষমা না-ই করেন, সে জন্য আর তাহার দুঃখ করিবার কি আছে? করেন নাই, হয় ত সে ভালই হইয়াছে; করিলে হয় ত তাহার বাঁচিবার, ফিরিবার, নিজের সুনাম সুযশ অকলঙ্কিত রাখিবার লোভ তীব্র হইয়াই হয় ত বা দেখা দিত। হয় ত বা—হয় ত বা—এমন করিয়া অন্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করা তখন প্রায় বলা যায় না, হয় ত বা সম্ভবও হইত না। আর তাহার ফলে? তাহার ফলে সেই একই কলঙ্কে তাহার পিতৃগৃহ কলঙ্কে, অপমানে, বিষাদে ভরিয়াই উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মরিতে হইত অভাগিনী বিনতাকে। এ শুধু অপরাধী চরিত্রহীন সুশীলই না হয় মরার সব কলঙ্ক একত্র করিয়া লইয়া একাই মরিল! অনেক দিনই ত তাঁহাদের চোখে তাহার মরণ ঘটিয়াছে! তবে আর তাহার এ মরণে সেখানে বেশী কি ক্ষতি করিবে? যাহা অনাগত, তাহাই এ জগতে অসহনীয়, যাহা আসিয়া গিয়াছে, তাহা গৃহীতও হইয়াছে।

সুশীলের লঘু বক্ষ আবার একটা অরুন্তুদ মর্ম্মচ্ছেদী অভিমানের ব্যথায় ভারাক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া উঠিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া গৃহভিত্তির উপর মস্তক রক্ষাপূর্ব্বক কতক্ষণই সে স্তব্ধ,স্থির ও মূর্চ্ছিতবৎ হইয়াই পড়িয়া রহিল। এই অভিমানের হাত ছাড়াইবার জন্যই সে যে নিজেকে নিঃশেষে শেষ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ইহার ত আর শেষ নাই। এ যে হৃদয়ের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুটিকে পর্য্যন্ত তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিষের বাতি দিয়া অহরহঃ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, ইহার আর নিমেষ-মাত্র সমাপ্তি নাই। রাবণের চিতার মতই এই অনির্ব্বাণ অভিমানাগ্নি তাহার বুকের ভিতরটাকে ছারখার করিয়া দিল, তথাপি ইহার এতটুকু তেজ ত' কই কমিল না!—অথবা ইন্ধন পাইলে অগ্নির তেজ ত বর্দ্ধিতই হয়, কমিবেই বা কেন?

কারাদ্বারের অর্গলমোচন-শব্দ শ্রুত হইল, হয় ত কেহ দেখা করিতে আসিতেছে। সুশীল মুখ হইতে করাবরণ মোচন করিল না। মনে মনে সে যথেষ্ট অসন্তোষ বোধ করিল। হয় ত আবার সেই সুলেখাই। সে কি তাহার সুনামকে ডরায় না? তাহার বাপ-মা নিশ্চয়ই এ কথা জানেন না! নতুবা জানিয়া শুনিয়া কে কাহার বয়স্থা অনূঢ়া কন্যাকে জেলখানার ভিতর ভীষণ অপরাধে অভি-যুক্ত অপরাধীর সাহচর্য্যে পাঠাইতে পারে? বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরের পর্দ্দানশীন মেয়েকে। ইহা কিন্তু সুলেখার অন্যায়; অত্যন্ত অন্যায়! মরণের উপকূলে দাঁড়াইয়াও কি উহারা তাহাকে এতটুকু একটুখানি শান্তির মুখ দেখিয়া মরিতে দিবে না? কা'ল তাহার বিচার, বিচার-ফলে যাহা ঘটিবে, সে ত সবাই জানে; চিরকলঙ্কে দেশ, ভূমি, বংশ, নাম সব ডুবাইয়া দিয়া বৎসরের পর বৎসরের জন্য পৃথিবীর আলোক হইতে অপসরণ! তাহার পর—তাহার পর আর কি? এই আনন্দময়ী,উৎসবময়ী পৃথিবীর মধ্যে তাহার সেই অনপনেয় কলঙ্কের কালিমালিপ্ত মুখ সে দেখাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই না। তবে আবার এ চিরবিদায়ের দিনে শুধু আর একটি নারীর সুনামকে

সে কলঙ্কিত করিয়া যাইতে বাধ্য হয় কেন? সুশীলের মনে হইল, এই জন্যই সংসারাভিজ্ঞ যতিগণ নারীকে এড়াইয়া চলিতে আদেশ দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন। সুশীলের জীবনে এই নারীর দৃষ্টিই শুধু শনির দৃষ্টির মত তাহার সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য, সমুদয় আনন্দ-গৌরব ভবিষ্যৎ ও আশাকে গণেশের মুণ্ডের ন্যায় নিঃশেষে শেষ করিয়া দিল। আজ এ পৃথিবীর সকল বন্ধনই যখন কাটিয়া আসিয়াছে, এখনও আবার সেই দুর্গ্রহরূপিণী নারী তাহাকে অনুসরণ করিতে ছাড়িল না!

যে আসিয়াছিল, সে ভিতর হইতে কক্ষদ্বার অর্গলা-বদ্ধ করিয়া দিল এবং অগ্রসর হইয়া আসিয়া একেবারে সুশীলের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণামচ্ছলে তাহার পায়ের তলায় নিজেকে লুটাইয়া দিল। তখন বদ্ধনেত্র সুশীল সবিস্ময়ে অনুভব করিল, সে নিশ্চয়ই সুলেখা নহে, আর কেহ এবং সেই বিস্ময়ের তাড়নায় মুখ হইতে হাত সরাইয়া সে সেই দিকে চাহিতেই চিনিতে পারিল, এই যে একরাশি চম্পকফুলের অঞ্জলির মত তাহার পায়ের উপর নত হইয়াছে, সে সুলেখা নহে, নীলিমা!

দেখিয়া সুশীলের চিত্তে এক দিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি, তাহারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই আর একটা দিক ঠেলিয়া একটা গোপন উল্লাস তাহার অবসাদখিন্ন চিত্তকে একটুখানি পুলকিত করিয়া তুলিল। এইক্ষণেই সর্ব্বপ্রথমবার যেন সে অনুভব করিল, এই নীলিমাকে সে দূরে ফেলিয়া আসিলেও, এই নীলিমা তাহাকে সুদূর প্রত্যাখ্যান দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিলেও, বিধাতার বা ভাগ্যের কাহার অমোঘ বিধানে জানি না, তাহারা পরস্পরকে আর বাস্তবিকই একান্তভাবে আপনাদের জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। কর্ত্তব্য ইত্যাদি যেখানে যতই বাধা দিক, হৃদয় তাহার নিভৃত কোণে গোপনে কোন্ সময় যে এই নৈকট্য স্বীকার করিয়া বসিয়া আছে এবং সেইখানে তাহাকে অতি সঙ্গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া বুঝি আর একবার কামনা করিতেছিল, সেই যেন এই সন্দর্শনের ফলে তৃপ্ত হইল। সুশীল ইহাতে বিস্মিত হইলেও আজ আর ব্যথিত হইল না, বরং তাহার মনে হইল, তাহার পক্ষে এই বুঝি সঙ্গত! সুলেখা তাহার জীবনে চির-আদর্শ থাকিবে, কিন্তু এ অপরাধের কালি গায়ে থাকিতে সে তাহার কামনার ধন আর থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ধরিতে গেলে নীলিমাই যখন তাহার স্ত্রী।

দুই হাতে নীলিমার পদলুণ্ঠিত মস্তক ধরিয়া সুশীল তাহাকে উঠাইল; বিস্ময়লেশহীন স্নেহস্বরে বলিল—"আর একবার দেখে যাবার সাধ ছিল, তাহাও বাকী থাক্‌ল না দেখছি। ভাল আছ, নীল?"

নীলিমা সুশীলের কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নিজের কথাই কহিল; বলিল,—"তুমি সে দিন আমায় যা দিতে চেয়েছিলে, আজ আমি তাই আদায় কর্‌তে এসেছি, যেখানেই যাও, আমার প্রাপ্য না দিয়ে ত যেতে পাবে না"—এই বলিয়া সে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা সিন্দূর-কৌটা বাহির করিয়া মৃদু-মন্দ-হাস্যস্মিত মুখে অথচ প্রায় যেন আদেশের স্বরেই কহিল, "এই থেকে একটু সিন্দূর নিয়ে আমার সীঁথেয় তুমি নিজে হাতে পরিয়ে দাও—আর এই লোহাটা এই আমার বাঁ-হাতে—"

"নীলিমা! এ ত ছেলেখেলা! এর কিছু দরকার আছে কি?"

নীলিমা তেমনই প্রফুল্ল স্মিতমুখে সুশীলের মুখের উপর উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমার না থাক্, আমার আছে যে! আমি নিজের পথ স্থির ক'রে নিয়েছি। তুমি জানো না বোধ হয়, ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়ী ভেঙ্গে চাপা প'ড়ে আমার বাপের মৃত্যু হয়েছে। মরবার সময় খবর পেয়ে আমি হাঁসপাতালে দেখা করি, তাঁ'র অনেক কষ্টে জমান প্রায় হাজার সাতেক টাকা তিনি আমায় দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে আমি একটা স্কুল খুলবো, বাড়ী-ঘরের কোন আড়ম্বর থাকবে না, শুধু কায। হিন্দুর মেয়েদের হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেবার জন্য আমি প্রাণপাত করবো, যা'রা আমার মত অজ্ঞতার দোষে বা প্রলোভনাদি অন্য কারণে দু'দিনের ভুলে দূরে স'রে যা'বে, তাদের ফিরবার পথ দেবার জন্য একটা স্থান যাতে হয়, তা'র উপায় করবো, এর জন্য ধনি-দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে ফিরে অর্থ, সামর্থ্য ও সহায়তার

চেষ্টায় নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে চাই, অবশ্য নিজেকেও তা'র আগে উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়াতে হ'বে। কিন্তু এ সবের আগে আমার নিজেকে একটু সুরক্ষিত ক'রে নেওয়ার দরকার। তাই তোমার কাছে এসেছি—"

সুশীল মন্ত্রমুগ্ধের মত নীলিমার কথাগুলি শুনিতেছিল। মনে মনে তাহার প্রতি অজস্র প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ঈষৎ বিস্ময়ে সে উচ্চারণ করিল—"আমার কাছে! কি পা'বে নীলিমা! আমার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্চো! আমি—"

নীলিমা অকুণ্ঠিত মুখে মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার যা' কাম্য, সে দেবার সামর্থ্য তোমার আছে, না হ'লে তাই বা আমি চাইবো কেন? আমি যে কায নিচ্চি, তা'তে আমায় লোকসঙ্গ করতে হ'বে, এতে নিজের কুমারী পরিচয়ে বিপদ্ বেশী, আর কিছু বল্লে সে আমি পারবো না—তা'তে তোমার অকল্যাণ হ'বে, তাই আমি লোকের কাছে নিজের সধবা পরিচয়টাই প্রচার রাখতে চাই, অবশ্য তা'তে স্বামীর পরিচয় কেউই জানবে না। তাই সে দিনের সেই অসমাপ্ত কাযটা যদি আজ সেরে দাও, তা হ'লে আমার পক্ষে বড়ই উপকার করা হয়।"

সুশীলের বক্ষ এ প্রস্তাবে সঘনে আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠটা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল—গলা ঝাড়িয়া গাঢ় স্বরে সে উত্তর করিল, "আমি ত তা তোমায় দিতে চেয়েছিলুম, নীলিমা! তখন নিলে না, এখন সেটুকু দেবার শক্তিই বা আমার কই? আমি ত আর স্বাধীন নই দেখতে পাচ্চো।"

সিন্দূর-কৌটার ঢাকনি খুলিয়া নীলিমা তাহার সামনে ধরিয়া হাসিমুখে কহিল, "যথাশাস্ত্র পাণিগ্রহণ, সে ত আমি তোমার কাছে চাইনি, শুধু এই সিন্দূর পরার, সধবা বলার অধিকারটুকুই মাত্র চেয়েছি, এটুকু তুমি অনায়াসেই ত দিতে পারো। আমার বাপ আমায় সে দিন তোমায় দিয়েছিলেন, কাযেই সম্প্রদান এক রকম আমার হয়ে গেছে, এখন এই সিন্দূর দিয়ে আজ আমায় তোমার স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রে যাও, তা হ'লেই আমি জানবো, আমি তোমারই, এ জীবনে সামাজিক বা ব্যবহারিক জগতে আমি তোমার আর হ'তে পারি না—সে আমি জানি। কারণ, আমি দু'দিনের জন্যও নিজের ধর্ম্মসমাজকে ত্যাগ ক'রে বিধর্ম্মী হয়েছিলুম, সে ত আমার ভোলবার নয়। সেই জন্য যথাশাস্ত্র বিবাহ আমায় তুমি আর করতেও পারো না—আমিও তা তোমার কাছে দাবী করি না। এই শাস্ত্রবিধিটাই সেই জন্য আমাদের মিলন-পথের ব্যবধান হয়ে থেকে এ জন্মের মত আমাদের দু'জনকে দূরে সরিয়ে রাখুক। কিন্তু আমি জানবো, আমি হিন্দু, আমি হিন্দুর স্ত্রী, আমি তোমার এবং জন্মান্তরে তোমায় পা'বার তপস্যা ক'রে মরতে ত আমি পারবো? এ জন্মের জন্য আমার একমাত্র কর্ত্তব্য শুধু ঐ, হিন্দুকন্যাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা প্রচার করা, আর পথিভ্রষ্টাদের পথের সীমানায় ফিরিয়ে আনা।"

সুশীল ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিল, এক বার চোখ তুলিয়া নীলিমার সমুৎসুকতায় ঈষদুত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর ঈষৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে মোচনপূর্ব্বক সিন্দূর-কৌটা হইতে অঙ্গুলীতে সিন্দূর লইয়া নীলিমার তরঙ্গায়িত সুপ্রচুর কেশরাশির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম সরল রেখাবৎ শুভ্র সীমন্ততটে তাহার অরুণাভ দীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, তাহার প্রভাত-গগনের মতই সমুজ্জ্বল ললাটে বালার্কবৎ বিন্দু অঙ্কিত করিয়া দিল।

তাহার পর নীলিমা নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইতেই সে সহসা আবেগমথিত বক্ষে দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া, তাহার সিন্দূর চর্চ্চিত ক্ষুদ্র ললাটে গভীর স্নেহে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া গভীর স্বরে কহিল, "তোমার ব্রত সফল হোক্! তোমার মহৎ জীবন আমার মত ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতর কার্য্যের জন্যই সৃষ্ট হয়নি, তাই আমাদের মিলনে বিধাতার অভিসম্পাত রয়েই গেল, কিন্তু এর পর থেকে তোমার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি যে চিরদিন অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে, তাতে তুমি কোন মুহূর্ত্তেও সংশয়মাত্র করো না। বাহিরে আর যদি কখন আমাদের দেখাও না হয়, তবু তুমি জেনে রেখ, আমি তোমায় আমার স্ত্রী ব'লে—শুধু তাই নয়—

দেবী ব'লে মনে মনে চিরদিন ধ'রে পূজা ক'রে যাবো। যদি কখন আবার আমার সামর্থ্য হয়, তোমার আরব্ধ কর্ম্মে তোমার সহায়তাও প্রাণপণে আমি করতে কুণ্ঠিত হব না, ইহাও তুমি বিশ্বাস করো।"

নীলিমার নবসাজে সুশোভিত আরক্ত সুন্দর মুখ তাহার আভ্যন্তরিক হর্ষোচ্ছ্বাসে সমুজ্জলতর ও লোহিতাভ হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে গভীর বলে সংযত করিয়া সে সুশীলের পায়ের উপর হাত রাখিয়া মৃদু গুঞ্জনে পুলকোস্পষ্ট, অথচ সঙ্কল্পদৃঢ় স্বরে ইহার প্রত্যুত্তরে উত্তর করিল, "তাই করো—কিন্তু আমার এই মিনতি রইল যে, শুধু আমায় আর কখন দেখা দিও না। অথবা যদি দেখা-ও দাও, তবে আমার এত কাছে এসো না, আমায় তোমার বেশী কাছে যেতে দিও না, দু'জনকে দূরে দূরে সরিয়ে রেখ—আর এই যে সম্বন্ধটুকু আজ তুমি আমার দিলে—এ দান আমার পক্ষে এ জন্মের মতই যেন তোমার শেষ দান হয়—এ না হ'লে হয় ত আমার সকল সঙ্কল্প কোথায় ভেসে চ'লে যাবে—মানুষ যে বড় দুর্ব্বল, বড় ক্ষুদ্র! শুধু তাই নয়—তাতে সুলেখার কাছে তুমি, আর সমাজের এবং ধর্ম্মের কাছে আমি চির-অপরাধী হয়ে পড়বো। এইবার তবে বিদায় নিই! মনে রেখ, আমি তোমারই স্ত্রী, কায়মনপ্রাণে আমি হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম পালন ক'রে কাটিয়ে যাব, কিন্তু এ জন্মে তোমার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই থাকবে না, পরস্পরের কাছে আমরা এখন থেকে চির-অপরিচিত হয়ে গেলেম।—বিদায়!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

ইন্দ্র

আজিও মরেনি বৃত্র, মাঝে মাঝে বজে উঠে জেগে,
তব স্বর্গ-সিংহাসনে, হে বৃত্রারি, আছ অনুদ্বেগে
বজ্রে বারিয়াছ তার উপদ্রব তোমার দ্যুলোকে,
আশ্রয় নিয়েছে সে যে স্বর্গ ছাড়ি' মোদের ভূলোকে;
'অনাবৃষ্টি'রূপে হেথা অনাসৃষ্টি করে সংঘটন
তোমার যজ্ঞের হবি, সোমরস করিছে শোষণ।
দুর্ভিক্ষ মড়ক আদি সুরারিরা তার আজ্ঞাবহ
রক্ষা কর, আখণ্ডল, দুঃসহ যে তাহার নিগ্রহ।

তোমার নন্দনবনে সন্তানক সুরভি মন্দার
নির্ভয়ে ফুটিছে বটে, বিশ্বলোকে চাহ একবার,
মোদের এ শ্যামকুঞ্জ ধ্বস্ত দগ্ধ তার নির্যাতনে
জেলে দেছে দাব-বহ্নি আমাদের নন্দন-কাননে।
উৎপাটিয়া সোমলতা, দগ্ধ করি' দর্ভাঙ্কুরগুলি
প্রচণ্ড তাণ্ডবাঘাতে উড়াইয়া অন্ধকার ধূলি
শাদ্বলে পাষাণ করি', লোকালয়ে করিয়া শ্মশান
বাপী-কাসারের বক্ষ বিদারিয়া করি রক্ত পান
এ দেশ করিছে মরু, তরুগুলি হের দারুসার
পুষ্প-পত্রহারা হয়ে যূপরূপে বহে বলিভার।
নাচে তার তরবারি ঝকমকি' মৃগ-তৃষ্ণাজালে,
রক্ত ত্রিপুণ্ড্রক তার জাগে রক্ত সায়াহ্নের ভালে,
মেদিনীর গিরি-স্তনে করি শুষ্ক প্রবাহস্তন্তন
ধেনুর আপীনে পশি স্নেহ-রস করিয়া শোষণ,
নারিকেলগর্ভে পশি শস্য-জল শুষ্ক করি' তার,
জীবন অঙ্কুরগুলি ধূলিস্তোমে করিয়া সংহার,
তব 'ইন্দ্রজালে' আজি জিনিয়াছে তার 'বৃত্র-জাল',
তব সৃষ্টি ধ্বংস করে আজি তার কুহক করাল।
চাতকের কণ্ঠপুটে লাঞ্ছিতের আর্ত্ত নিবেদন,
মুহুর্মুহুঃ প্রেরি মোরা, মেল' দেব, তন্দ্রালু লোচন
সুধাপান-মোহ টুটে', শতমন্যু উঠ উঠ জাগি'
থামুক অপ্সরোনৃত্য সভাতলে ক্ষণেকের লাগি।
এ কি অঘটন হেরি, রাজা যার সহস্রলোচন,
অনীক্ষিত র'বে তার দুঃখভার হবে না মোচন?
ডাক' ডাক', পুরন্দর, তূর্য্যনাদে যত অনুচরে;
ডাক' কাল-প্রভঞ্জনে ঐরাবতে পূর্জ্জন্য পুষ্করে,
হানো বজ্র বৃত্রশিরে, হে বাসব প্রকৃতি-সুহৃদ,
সার্থক বৃত্রহা নাম বর্ষে বর্ষে করো, গোত্রভিদ্।

শ্রীকালিদাস রায়।

বুদ্ধ-গয়া

নিরঞ্জনা-তীরে ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুক-ভোজন

ইতিহাস

গৌতম সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভের পরে এই বনের মধ্যে কে প্রথমে মন্দির গড়িয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহা স্থির যে, যীশুখৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের সম্রাট্ অশোক এই স্থানে একটি নূতন ধরণের মন্দির তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। মন্দিরটা নূতন ধরণের বলিতেছি এই জন্য যে, আমরা যে সমস্ত পুরাতন মন্দির এখন দেখিতে পাই, তাহার কোনটির সহিতই এই মন্দির মিলে না। খৃষ্টের মৃত্যুর ৬ শত ৪০ বৎসর পরে চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ইউআন-চোআং বুদ্ধ-গয়া দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দেবানাম্পিয় পিয়দশি অশোক এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের ১ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভরহুত গ্রামের স্তূপের চারিদিকে যে পাতরের রেলিং আছে, তাহার একটি থামে মহাবোধির এই মন্দিরের চিত্র খুদিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সার আলেক্‌জাণ্ডার কনিংহাম ভরহুত গ্রামের স্তূপের এই রেলিংএর অনেকগুলি টুকরা কলিকাতার মিউজিয়মে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন এবং যে থামে মহাবোধি মন্দিরের চিত্র আছে, তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রটির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেই জন্য ইহাকে মহাবোধি মন্দিরের চিত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রথম লক্ষণ শিলালিপি, ভরহুত গ্রামের স্তূপের রেলিংএ অনেকগুলি ছোট বড় শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রত্যেক থামে, প্রত্যেক চিত্রে অন্ততঃ একটি করিয়া শিলালিপি আছে। এই শিলালিপিগুলি অনেক স্থানে চিত্রের বিবরণ। যে থামে মহাবোধি মন্দিরের চিত্র আছে, তাহাতে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে বোধিবৃক্ষ ও তাহার চারিদিকে গোলাকার দোতলা মন্দির। এই মন্দিরের দোতলায় সেকালের ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে,—"ভগবতো সকমুনিনো বোধো" অর্থাৎ ভগবান্ শাক্য মুনির বোধি বা বোধিবৃক্ষ। দ্বিতীয় ভাগে মহাবোধি মন্দিরের উঠানের বাগানে হস্তীর মূর্ত্তিযুক্ত একটি পাতরের থাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় পাতরের থাম মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সারনাথে এই রকম একটি থামের মাথায় চারিটি সিংহ-মূর্ত্তি আছে, সঙ্কাশ্যে যে থামটি ছিল, তাহার মাথায় একটি হস্তীর মূর্ত্তি ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউআন চোআংও মহাবোধিতে অশোকস্তম্ভের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইটি প্রমাণ হইতেই স্পষ্ট

বুঝিতে পারা যায় যে, ভরহুত গ্রামের রেলিংএর থামে যে মন্দিরের চিত্রটি আছে, তাহা মহাবোধি মন্দিরের।

ভরহুত গ্রামের থামের চিত্রটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—

(১) বোধিবৃক্ষের নিম্নে বজ্রাসন ও তাহার চারি দিকে দ্বিতল মন্দির। (২) মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে অশোক-স্তম্ভ ও তাহার চারি দিকে উদ্যান। (৩) প্রাঙ্গণের বাহিরে খোলা জমী।

চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খোলা জমীর এক ধারে একটি ভদ্রমহিলা বসিয়া আছেন এবং তাঁহার কোলের কাছে তাঁহার দিকে ফিরিয়া এক জন পুরুষ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। এই মহিলাটির পাশে পাঁচটি স্ত্রীলোক বাজাইতেছে ;—দুই জন বীণা, এক জন মৃদঙ্গ, এক জন খঞ্জনী আর এক জন বাঁশী বাজাইতেছে। চারি জন নর্ত্তকী ও একটি বালক ইহাদের সম্মুখে নাচিতেছে। ইহা থামের নীচের ভাগের চিত্র। থামের মাঝখানের অথবা দ্বিতীয় ভাগের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্দিরের উঠানের বাগানে দুই সারিতে অনেকগুলি পুরুষ হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছবির উপরের দক্ষিণদিকের কোণে একটি লোক মাথায় পসরা বহিয়া লইয়া যাইতেছে আর নীচের বাম দিকের কোণে আর একটি লোক গাছতলায় একখানি বড় পাতরের উপর বসিয়া আছে। উঠানের চারি দিকে ছোট-বড় গাছ থাকায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এখনকার মত সেকালেও মহাবোধি মন্দিরের উঠানে বাগান ছিল।

ভরহুত গ্রামের রেলিং

ভরহুত গ্রামের থামের উপরের চিত্রে মহাবোধি মন্দির ও বোধিবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। বড় বড় থামের উপরে সম্ভবতঃ কাঠের একটি গোলাকার বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছিল। এই বাড়ীটি বোধিবৃক্ষের চারি দিক ঘিরিয়াছিল। ইহা যে বাড়ী এবং থামের উপরে কাঠের কড়ি লাগান নহে, তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, থামের উপরে যে সকল ঘর আছে, তাহার জানালায় লোক দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল ঘরের মধ্যে সম্মুখের ঘরটি বড় এবং ইহাতে দুইটা বড় বড় জানালা আছে, তাহার ভিতর দিয়া এক একটি বড় ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়।
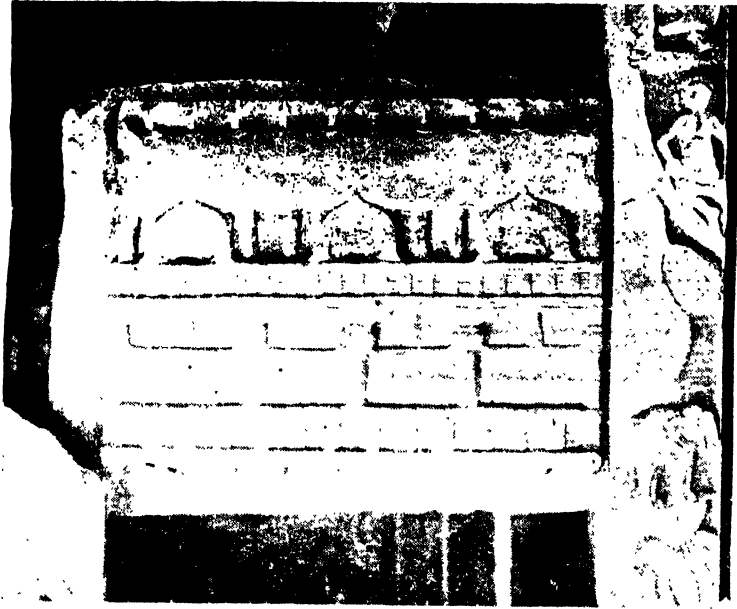
এই গোলবাড়ীর মাঝখানে একটি বড় অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটিই বোধিবৃক্ষ। অশ্বত্থের মূলে একটি বড় পাতরের বেদী আছে এবং বেদীর উপরে গাছের গুঁড়ির দুই পাশে একটি "ত্রিরত্ন" আছে। বেদীর উপরে অনেকগুলি ফুল ছড়ান আছে এবং প্রত্যেক পাশে এক এক জন উপাসক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া প্রণাম করিতেছে। ইহা ছাড়া বেদীর বামদিকে একটি স্ত্রীলোক ও দক্ষিণদিকে একটি পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। আকাশে বোধিবৃক্ষের প্রত্যেক দিকে এক জন

শাক্যমুনির অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নের দৃশ্য
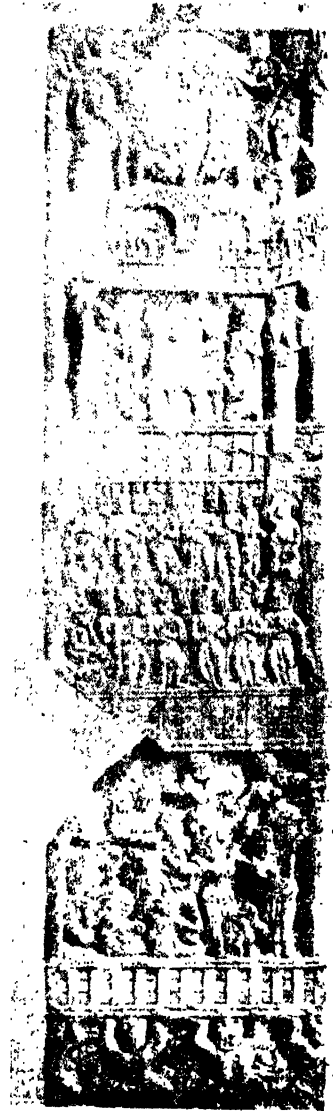
শাক্যমুনির অশ্বত্থবৃক্ষের উপরের দৃশ্য

দেবতা ও একটি কিন্নর (অর্দ্ধেক মানুষ ও অর্দ্ধেক পাখী) উড়িতেছেন। বোধিবৃক্ষের ডালে অনেকগুলি মালা ঝুলিতেছে এবং পাতার একটি ডবল ছাতা বা দুইটি ছোট ছোট ছাতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ভরহুত গ্রামের রেলিংএর থামে মহাবোধি-মন্দিরের এই রকম ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। যে ছবি ছাপা হইল, তাহাতে প্রথম তিনখানিতে থামের তিনটি ভাগের তিনটি ছবি আলাদা দেখান হইয়াছে। ৪নং ছবিখানিতে সমস্ত থামে তিনখানি ছবি একসঙ্গে কেমন সাজান আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই থামটি ছাড়া ভরহুত গ্রামের স্তূপের রেলিংএ আর এক যায়গায় প্রাচীন মহাবোধি-মন্দিরের এক অংশের একখানি ছবি ক্ষোদা আছে। এহ পাতরখানি দুইটি থামের মাঝখানের আড়া। ভরহুত গ্রামের স্তূপের রেলিংএ প্রত্যেক দুইটি

থামের মধ্যে তিনটি করিয়া আড়া ও একটি মাথাল থাকিত। এই আড়ার সংস্কৃত নাম সূচী, ইংরাজী স্থপতি-বিদ্যায় ইহার পারিভাষিক শব্দ cross-bar। মাথালের সংস্কৃত নাম 'আলম্বন ও ইংরাজী নাম Architrane। এই সূচীটিতে মহা-বোধি-মন্দিরের মত বড় বড় থামের উপরে একটি লম্বা দোতলা বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাড়ীর একতলা চারিদিকে খোলা, কিন্তু দোতলায় জানালা-দেওয়া ঘর আছে। একতলায় ঘরের সমান লম্বা একটি বড় উচ্চ বেদী আছে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, এই বেদী বুদ্ধের সংক্রমণস্থান। সত্য সত্যই এখনকার মহাবোধি-মন্দিরের উত্তর দিকে এই রকম একটা লম্বা বড় বেদী আছে। এই বেদীর দুই দিকে এক এক সারি পাতরের থাম ছিল, তাহার দুই একটা এখনও দাঁড়াইয়া আছে। এই বেদীটি মহাবোধি-মন্দির অপেক্ষা পুরাতন, কারণ, ইহার ধার মহাবোধি-মন্দির হইতে সমান্তরাল নহে। প্রত্যেক থামের নীচে একটি ছোট পাতরের বেদী আছে, এই বেদীর ইংরাজী নাম Pillar base এবং প্রত্যেক বেদীতে অশোকের আমলের এক একটি অক্ষর আছে। এই অক্ষরের মধ্যে স্বর্গগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম "ঙ" অক্ষরটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে খৃষ্টের জন্মের ৩ শত বৎসর পূর্ব্বের বর্ণমালার "ঙ" অক্ষরটি অশোকের শিলালেখে বা অপর কোন প্রাচীন লিপিতে পাওয়া যায় নাই। এই সূচীর চিত্রটি যে সত্য সত্যই গৌতম বুদ্ধের সংক্রমণের চিত্র, তাহার অপর কোন প্রমাণ নাই। এই সূচীতে একটি শিলালিপি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছবির বিবরণ নাই, সূচীটির খরচ কে দিয়াছিল, তাহারই নাম আছে।

ভরহুত গ্রামের সূচী—বুদ্ধের সংক্রমণস্থান

বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের চারি দিকে যে পাতরের রেলিং আছে, তাহা বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই রেলিংএর থামগুলির গায়ে যে সমস্ত লেখ আছে, তাহার অক্ষরগুলি অনেকটা অশোকের আমলের অক্ষরের মত। এই জন্ম অনেককাল পূর্ব্বে পণ্ডিতরা মনে করিতেন যে, এই পাতরের রেলিং অশোকের সময়ে তৈয়ারী। এই রেলিংএর সমস্ত থাম বা স্তম্ভগুলি এখন আর নাই। খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতকের কোন সময়ে শৈব
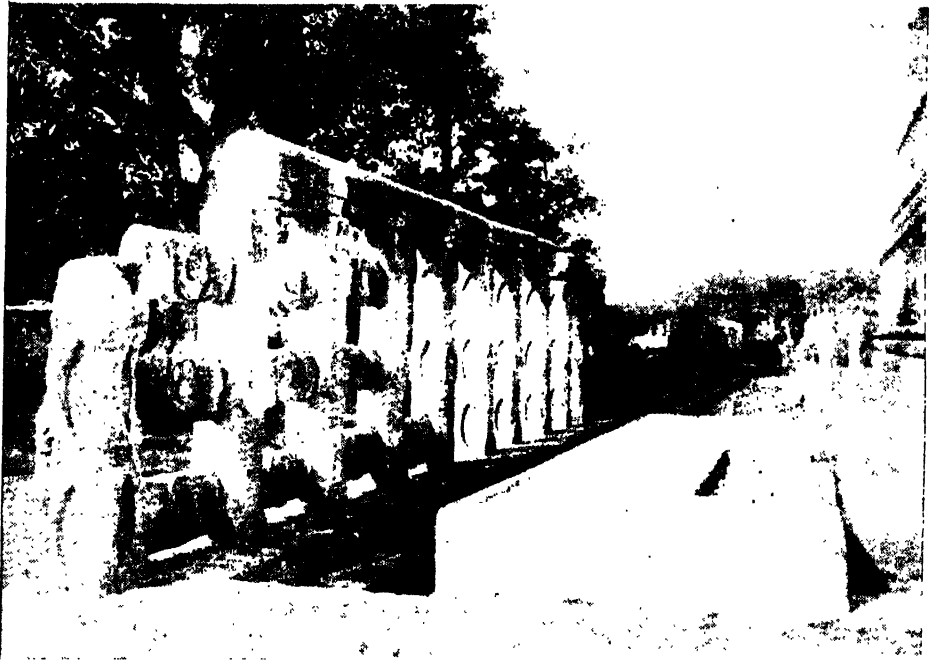
বুদ্ধ-গয়া মন্দিরের চারিপার্শ্বের রেলিং

মহান্তরা যখন বুদ্ধগয়ায় আসিয়া বাস করেন, তখন মঠ ও মন্দির তৈয়ারী করিবার জন্ত তাঁহারা মহা-বোধি-মন্দিরের মাল-মসলা অন্তত্র লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই পাতরের থাম ও কতকগুলি সূচী মঠ তৈয়ারী করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীযুত কৃষ্ণদয়াল গিরি ইংরাজ সরকারের অনুরোধে সেগুলি ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং সেগুলি যথাসম্ভব আবার যথাস্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এই রেলিং-এর দুই স্থানে দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় শিলালেখ আছে। প্রথমটি একটি আলম্বন বা মাথালের শিলালেখ। ইহা এখন কলিকাতার মিউজিয়মে আছে। ইহাতে লেখা আছে—

"ইংদাগিমিত্রাস পজাবতিয়ে জীবকুত্রায়ে কুরংগিয়ে দানং রাজাপাসাদ চেতিকাস।"

ইহার অর্থ—"ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের স্বপুত্রকা স্ত্রী কুরঙ্গীর দত্ত রাজপ্রাসাদ ও চৈত্য।" অন্তান্ত থামেও এই কুরঙ্গীর নাম পাওয়া গিয়াছে, সে সকল থামে লেখা আছে;—

"আয়ায়ে কুরংগিয়ে দানং"

"আর্য্যা কুরঙ্গীর দান।"

মহান্তর বাড়ী হইতে যে সমস্ত থাম বাহির হইয়াছে, তাহার একটিতে লেখা আছে:—

"রাঞো ব্রহ্মমিত্রস পাজাবাতিয়ে নাগদেবায়ে দানং"

"রাজা ব্রহ্মমিত্রের পত্নী নাগদেবার দান।"

অগ্নিমিত্র শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা সেনাপতি পুষ্পমিত্রের পুত্রের নাম। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মমিত্র এবং অগ্নিমিত্রের নামের অতি পুরাতন তামার পয়সা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা যীশু-খৃষ্ট জন্মিবার ১ শত হইতে ১ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যা-বর্ত্ত বা হিন্দুস্থানের রাজা ছিলেন। এই দুইটি শিলালিপি আবিষ্কার হইবার পরে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের চারি পাশের পাতরের রেলিং অশোকের আমলের জিনিষ নহে; অশোকের মৃত্যুর ১ শত হইতে ১ শত ৫০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় শুঙ্গবংশীয় রাজা-দের রাজত্বকালে তৈয়ারী হইয়াছিল।

শুঙ্গবংশের রাজাদের অধঃপতনের অনেক কাল পরে যখন শকরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া ফেলিল, তখন বুদ্ধ-গয়ার অনেক উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এখনকার বোধি-বৃক্ষের তলায় যে বড় পাতরের আসনখানি পড়িয়া আছে, তাহার চারি পাশে একটি অস্পষ্ট লেখ আছে। এই লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এককালে ইহার উপর একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং ইহার অক্ষরগুলি কনিষ্ক অথবা হুবিষ্কের রাজত্বকালের। এই পাতরের আসনের নাম বজ্রাসন এবং ইহার ঠিক নীচে কুষাণ বংশের সম্রাট্ হুবিষ্কের একটি মোহরের ছাঁচ পাওয়া গিয়াছিল। আসল মোহরটি অনেক কাল পূর্ব্বে চুরি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কনিংহাম বজ্রাসনের তলা খুঁড়িবার সময় এই মোহরের ছাঁচটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধ-গয়ার আশে পাশে শকবংশের রাজাদের আমলের অনেক জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে পোড়া মাটীর তৈয়ারী সপ্তবুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির একটি টুক্‌রা উল্লেখযোগ্য। ইহাতে এখন কেবল গৌতম বুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহামের সহকারী জে, ভি, এম বেগলার বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের চারি পাশ খুঁড়িবার সময় ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে এই টুক্‌রাটি তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে কলিকাতা মিউ-জিয়মের জন্য খরিদ করা হইয়াছে (Indian Museum No. 6271 ।)

সপ্তবুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব সিদ্ধভাষায় শিলালিপি সমেত

বুদ্ধ-গয়ায় অনেকগুলি চীনদেশের ভাষায় লেখা শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন কলিকাতা মিউজিয়মে যে কয়খানি চৈনিক ভাষায় লেখা লেখ আছে, তাহার মধ্যে দুইখানি মাত্র পড়া হইয়াছে। সপ্ত-বুদ্ধের ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি পাতরের মূর্ত্তির তলায় চৈনিক অক্ষরে তিন ছত্র লেখা আছে। তাহা পড়িয়া চৈনিকভাষাবিৎ পণ্ডিত বিল (S. E. Beal) লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার অক্ষরগুলি চীনদেশের দ্বিতীয় হান রাজবংশের অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের অক্ষর (I. M. No. B. G. 133)। কলিকাতা মিউজিয়মের চৈনিকভাষায় লেখা দ্বিতীয় লেখটি ১০২২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চীনদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু হো-য়ুন এই বৎসরে বুদ্ধ-গয়ায় আসিয়া বোধিবৃক্ষের উত্তর দিকে একটি পাতরের চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে এই শিলালেখখানি রাখিয়া গিয়াছিলেন (I.M. No. B. G. 122)। এই দুইখানি ছাড়া কলিকাতা মিউজিয়মে চৈনিক ভাষায় লেখা আরও দুইখানি শিলালেখ আছে, কিন্তু তাহা এখনও পড়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

খৃষ্টাব্দের ৪র্থ ও ৫ম শতকে আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তবংশের সম্রাটের অধীনে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়ে বুদ্ধ-গয়ায় কোনও ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু দেশ-বিদেশ হইতে অনেক তীর্থযাত্রী বুদ্ধ-গয়ায় আসিতেন। গুপ্ত সম্রাট্‌দের যুগে বোধ হয়, ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের অবস্থা ভাল ছিল না, কারণ, এই সময়ে সিংহল দেশের লোক আসিয়া মহা-বোধি মন্দির মেরামত করিয়া গিয়াছিল। সিংহলদেশের রাজবংশজাত প্রখ্যাতকীর্ত্তি নামক এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতকে মহাবোধিতে আসিয়া একটি মন্দির
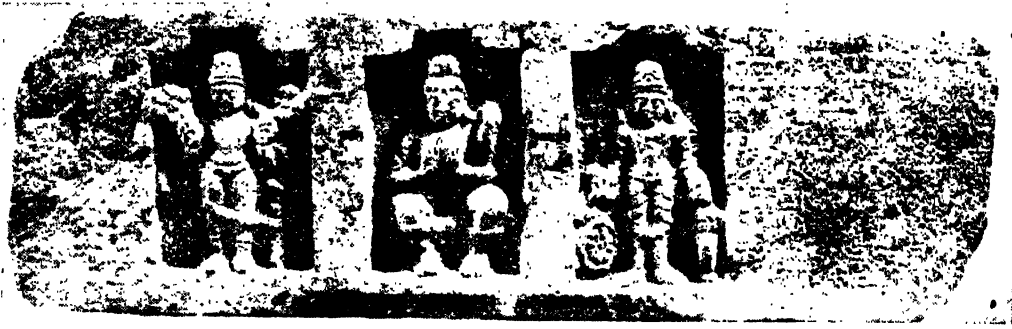
সম্রাট ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের শিলালিপি

প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের ৯ম শতকে বাঙ্গালার পালবংশের রাজাদের অভ্যুদয়ের পরে বুদ্ধ-গয়ার খুব উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় হইতে বুদ্ধ-গয়ায় ও আশেপাশে যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, তাহাই বেশীর ভাগ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের ৯ম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ৪ শত বৎসর ধরিয়া এই বুদ্ধ-গয়ায় হাজার হাজার ছোট, মাঝারি, বড় চৈত্য বা স্তূপ এবং লক্ষ লক্ষ ছোট, বড় পাতরের মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে হাজার হাজার মূর্ত্তি ও চৈত্য এখনও মহাবোধি উরেল, হাথিয়ার প্রভৃতি চারিপার্শ্বের গ্রামে পড়িয়া আছে, হাজার হাজার চৈত্য ও মূর্ত্তি ভারতবর্ষের ও বিলাতের ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়মে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও মাটী খুঁড়িলে দুই হাত জমীর নীচে দুই দশটা মূর্ত্তি বাহির হয়।

বাঙ্গালার পালরাজবংশের ২য় রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে বুদ্ধ-গয়ায় একটি হিন্দু-মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল। কেশব নামক এক জন হিন্দু ভাস্কর ধর্ম্মপালের রাজ্যের ২৬ অঙ্কে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতকের শেষভাগে একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব বুদ্ধ-গয়ায় প্রতিষ্ঠা করিয়া ৩ হাজার রূপার টাকা খরচ করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। পালরাজবংশের ৭ম রাজা ২য় গোপালদেবের রাজত্বকালে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধ-গয়ায় একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই মূর্ত্তিটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু শিলালেখযুক্ত পাদপীঠটা পাওয়া গিয়াছে। পালরাজবংশের অধঃপতনের সময়েও মহাবোধি বা বুদ্ধ-গয়া তাঁহাদের অধিকারে ছিল। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাংশের অর্থাৎ ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি গয়ায় বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেন গয়া ও বুদ্ধ-গয়া জয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার পালরাজবংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ বুদ্ধ-গয়ায় আবিষ্কৃত ব্রহ্মদেশের ভাষায় লিখিত একখানি শিলালেখ হইতেই পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে লেখা আছে যে, গৌতম-বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে সুজাতার নিকট মধুর পায়স লইয়া যে স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে বুদ্ধের মৃত্যুর ২ শত ৯৮ বৎসর পরে রাজা অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই স্তূপ জীর্ণ হইলে মহাথের পিন্থাগুস্যি (সংস্কৃত ভাষায় পাংশুকুলিক) তাহা মেরামত করাইয়াছিলেন। চীনজাতীয় পণ্ডিত ট-সেন-কোর মতে এই মহাথের ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। স্তূপটি পুনর্ব্বার জীর্ণ হইলে রাজা থাদমিন তাহা মেরামত করিয়াছিলেন। ইহা তৃতীয়বার জীর্ণ হইলে শ্বেত হস্তীর অধিপতি, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের রাজা ধর্ম্মরাজ (তাঁহার প্রকৃত নাম মেঙ্গ-দি) শ্রীধর্ম্মরাজগুরু নামক ভিক্ষুকে পাঠাইয়া ইহা মেরামত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীধর্ম্মরাজগুরুর শিষ্য সিরিকস্সপ অর্থ থাকিলেও

মহাবোধিমন্দিরের শেষ শিলালিপি

পবাধিকারকালের মৃন্ময় মূর্ত্তি গৌতম বুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব
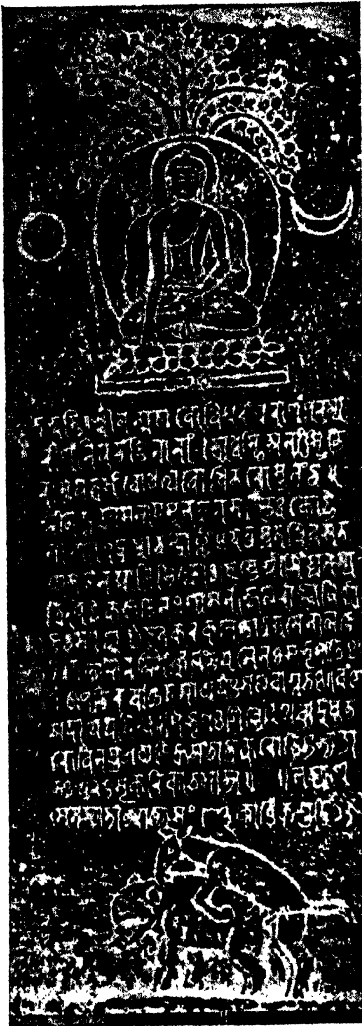
মেরামত আরম্ভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে রাজা প্যু-তা-থিন-মিন নামক রাজার সাহায্যে এই মেরামতের কায ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শেষ হইয়াছিল। এই শিলালেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টাব্দের ১২শ শতকের শেষ ভাগে মগধের বা দক্ষিণ-বিহারের বৌদ্ধদের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তীর্থ বুদ্ধ-গয়ায় ব্রহ্মদেশের অনার্য্য বৌদ্ধরা আসিয়া প্রধান মন্দিরগুলি মেরামত করিত।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদবিন-বখতিয়ার খলজী উদ্দণ্ড-পুর বিহার এবং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানরা অনেক দিন বুদ্ধ-গয়া আক্রমণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার রাজা লক্ষ্মণসেনের অভিষেকের সময় হইতে যে অব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই অব্দের নাম 'লক্ষ্মণ সংবৎসর।' এই লক্ষ্মণ সংবৎসরের ৮৩ বৎসরে অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দে বিহারপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেন নামক এক জন স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং তিনি এই বৎসরে সিংহল দেশের ভিক্ষুদের জন্য একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মুসলমানরা কোন্ সময়ে বুদ্ধ-গয়া জয় করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না এবং কিরূপে গয়ার সেনবংশের রাজ্য শেষ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বুদ্ধ-গয়ায় আবিষ্কৃত ব্রহ্মদেশের ভাষায় লিখিত শিলালেখ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে,

১২৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরগুলি একেবারে ধ্বংস হয় নাই এবং তখনও ব্রহ্মদেশ হইতে বৌদ্ধরা তীর্থযাত্রায় বুদ্ধ-গয়ায় আসিতেন। মহাবোধি মন্দিরের মধ্যে মন্দিরের মেঝের পাতরে দুই তিনখানি লেখ আছে। এখন তাহা অস্পষ্ট হইয়া গেলেও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহা স্পষ্ট ছিল এবং কনিংহাম এই সময়ে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। এই দুইখানি শিলালেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিক্রম সংবৎসরের ১৩৮৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে করণ-জাতীয় এক জন ঠাকুর, তাঁহার স্ত্রী জাজো আর দুইটি আত্মীয়ার সহিত তীর্থযাত্রায় বুদ্ধ-গয়ায় আসিয়াছিলেন। ১৩৮৮ বিক্রম সংবৎসরে অর্থাৎ ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে আরও তিন জন বৌদ্ধ পুরুষ ও একটি মহিলা তীর্থযাত্রায় এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ-বিন-তোগলক শাহ দিল্লীর রাজা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যকালে অথবা তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ফিরোজ তোগলকের রাজত্বকালে মুসলমানগণ গয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গয়ার শাসনকর্ত্তা ঠাকুর কুলচন্দ্র ফিরোজ তোগলকের আধিপত্য স্বীকার করিতেন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের পরে বুদ্ধ-গয়ায় বৌদ্ধের উপাসনার নিদর্শন আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই তারিখের প্রায় ৩ শত বৎসর পরে হিন্দু, শৈব, দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী সন্ন্যাসিগণ বুদ্ধ-গয়ায় আসিয়া বাস করিয়া শৈব-মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ শ্রীযুত কৃষ্ণদয়াল গিরি বুদ্ধ-গয়া মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বা মহান্ত। ইংরাজরাজ্যে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশের বৌদ্ধ তীর্থ-যাত্রী বুদ্ধ-গয়ায় আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায় একটি ধর্ম্মশালা তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধ-গয়ার শৈব-মঠে সকল দেশের সকল জাতির অবারিত দ্বার। দরিদ্র হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী মহান্ত কৃষ্ণদয়াল গিরির আদেশে সমানভাবে অতিথি-সৎকার পাইয়া থাকে। বৌদ্ধের প্রতি অত্যাচার বা উপাসনার ব্যাঘাত আমি গত ২০ বৎসরের মধ্যে কখনও শুনি নাই, কেবল অনাগারিক ধর্ম্মপালের ন্যায় অধিকার-লোলুপ বৌদ্ধ-ভিক্ষুরাই মহান্তের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া এই শান্তিময় প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে মহান্তের নিকট কিছু জমী লইয়া বিদেশীয় বৌদ্ধরা একটি নূতন মন্দির তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং এই মন্দিরে কতকগুলি বিদেশীয় বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে সর্ত্তে জমী লওয়া হইয়াছিল, সেই সর্ত্ত অনুসারে মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় মহান্ত এই জমী পুনরায় দখল করিয়াছেন. সুতরাং বৌদ্ধরা বিদেশীয় মূর্ত্তিগুলি কলিকাতায় লইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনাগারিক ধর্ম্মপাল প্রমুখ যে সমস্ত বৌদ্ধরা দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধের প্রধান তীর্থ বুদ্ধ-গয়ায় বৌদ্ধ উপাসকের অধিকার নাই বলিয়া আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা কেবল সত্যের অপলাপ করিতেছেন মাত্র।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতি

(শেলী হইতে)

অমিয় ছড়ায়ে থেমে যায় গান
সুধাময় সুর গগন ভ'রে—
মধুময় বাস বহে যায় বায়
কাননে যখন কুসুম ঝরে';
গোলাপ ফুটিয়া লুটিয়া গেলে,
কোমল তাহার দলে,

তরুণ প্রেমিক বিছায় তাহার
প্রিয়ার মেঝের তলে—
তেমতি, হে প্রিয়! তোমারি বিহনে
তব ওই স্মৃতিটুক্
আলোকে আঁধারে নিশিদিন রবে
ভরিয়া এ পোড়া বুক্।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদে গুপ্তচর
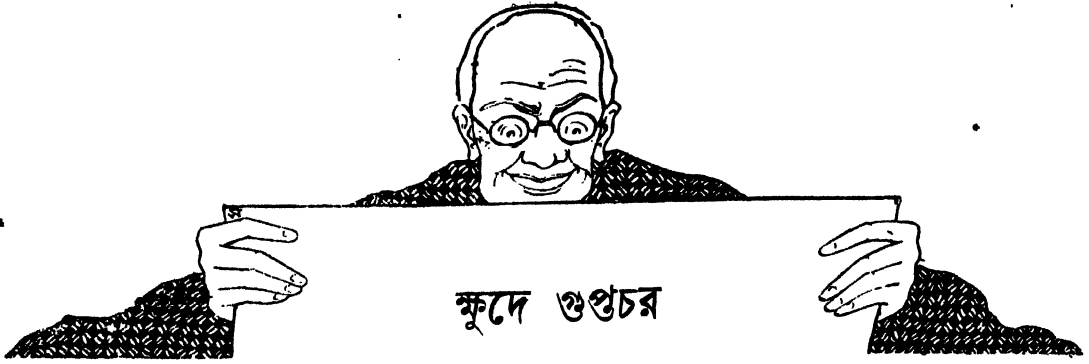
তাহার নাম ষ্টিন্; সকলে তাহাকে ক্ষুদে ষ্টিন্ বলিয়া ডাকিত।

সকল রকমেই তাহাকে খাঁটি প্যারীবাসী বলা যাইতে পারে; শীর্ণকায়, বিবর্ণ মুখ, বয়স প্রায় দশ বৎসর—অথবা পনেরও হইতে পারে—এই প্রকার বালকদিগের যথার্থ বয়স অনুমান করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে মাতৃহীন; তাহার পিতা পূর্ব্বে নৌ-বিভাগে কার্য্য করিত, বর্ত্তমানে অবসর লইয়া নগরের কোনও প্রমোদোদ্যানের দ্বাররক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্যারীর যাবতীয় শিশু, ধাত্রী, দরিদ্রা জননী—প্রমোদোদ্যানে বায়ু সেবন করিতে আসিত, সকলেই বৃদ্ধ ষ্টিন্‌কে চিনিত—সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। জনসাধারণ জানিত যে, তাহার প্রকাণ্ড ও কণ্টকারণ্যবৎ গুম্ফযুগল কুকুর ও পথচারীর ভীতিপ্রদ হইলেও, তাহার অন্তরালে কোমল, মৃদু, মাতার ন্যায় স্নিগ্ধ হাস্য প্রচ্ছন্ন আছে। এই হাস্য দেখিবার জন্য আগ্রহ হইলেই লোক প্রশ্ন করিত, "তোমার ছেলে কেমন আছে গো?"

বৃদ্ধ ষ্টিন্ তাহার পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালক অপরাহ্নকালে যখন তাহাকে ডাকিয়া লইবার জন্য আসিত, সেই সময় তাহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। পিতা ও পুত্র তখন উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসনে উপবিষ্ট, প্রাত্যহিক বিশ্রাম-সুখপ্রয়াসী নরনারীদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে নগর আক্রান্ত হইবার পর হইতে এ সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রমোদোদ্যানের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল; সেখানে তখন পেট্রোলিয়ামের গুদাম—বেচারা ষ্টিন্ অনুক্ষণ প্রহরায় নিযুক্ত। সেখানে কেহ আর বেড়াইতে আসিতে পারিত না; জনশূন্য, শত্রুর আক্রমণে আংশিক বিধ্বস্ত প্রদেশে বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে তাহাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইতেছিল। সেখানে ধূমপান করিবারও আদেশ ছিল না। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে এমনই ভাবে দিনযাপন করিতে হইত; তাহার পর পুত্র আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। প্রুসিয়ান্‌দিগের কথা উঠিলে তোমরা একবার তাহার গুম্ফের অবস্থা দেখিয়া খুসী হইতে!

ক্ষুদ্র ষ্টিন্ কিন্তু এই নবজীবনের আবির্ভাবে, অবস্থা-পরিবর্ত্তনে দুঃখিত হয় নাই। অবরুদ্ধ নগর পথচারী বালকদিগের পক্ষে কৌতুকোদ্দীপক। স্কুলে যাইবার প্রয়োজন নাই; পড়া-শুনার বালাই নাই; সকল সময়েই ছুটী। রাজপথে ত সকল সময়েই বাজার-হাটের সমাবেশ। বালক ষ্টিন্ সারাদিন পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। ঐ অঞ্চলের সেনাদল যখন পালাক্রমে দুর্গ-প্রাকার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইত, বালকও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইত; বিশেষতঃ যে দলে ভাল বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ ছিল। বালক ষ্টিন্ এ বিষয়ের ভাল সমালোচক। সে বলিয়া দিতে পারিত, ৯৬ সংখ্যক দলের বাদ্য মোটেই ভাল নয়, কিন্তু ৫৫ সংখ্যক পদাতিক দলের বাজনা উত্তম। কোন কোন সময় সে দেখিত, নবনিযুক্ত সৈনিকগণ কুচকাওয়াজ অভ্যাস করিতেছে। এই সময় সে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিত।

শীতের প্রত্যূষে—উষার মৃদু আলোকে মাংসবিক্রেতা কসাই ও রুটীওয়ালাদিগের দোকানের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান নরনারীদিগের মধ্যে বালকও তাহার পাত্রটি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নিরূপিত আহার্য্য

বিতরণের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নগরবাসীরা পরস্পরের সহিত আলাপ জমাইয়া লইত এবং রাজনীতিক চর্চা করিত; বালক মসিঁয়ে ষ্টিনের পুত্র বলিয়া সকলে তাহারও মতামত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক, 'গ্যালোশ্' খেলায় জনসাধারণের আসক্তি ছিল, নগরাবরোধকালে ব্রেটন সৈনিকগণ এই ক্রীড়ার প্রচলন করিয়াছিল। বালক ষ্টিন্ যখন দুর্গপ্রাকার-সন্নিহিত স্থানে অথবা আহার্য্য-বিতরণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত না, তখন তাহাকে 'প্লেস্ স্তাপ্ল্ ডি' মূ'তে দেখিতে পাওয়া যাইত। সে নিজে 'গ্যালোশ্' খেলায় যোগ দিত না, কারণ, তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইত। সে শুধু সমগ্র দৃষ্টিশক্তি নয়নে কেন্দ্রীভূত করিয়া খেলা দেখিত।

নীল কোর্ত্তা-পরা এক জন দীর্ঘাকার কিশোর বালক ষ্টিনের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। এই ছোকরা কখনও পাঁচ ফ্রাঙ্কের বেশী বাজি খেলিত না। সে যখন চলাফেরা করিত, অমনই তাহার পকেট হইতে মুদ্রার মৃদু রিণরিণী ধ্বনি উত্থিত হইত।

এক দিন একটি মুদ্রা গড়াইয়া আমাদের গল্পের নায়কের পদতলে আসিয়া পড়িল। উহা কুড়াইয়া লইবার সময় দীর্ঘাকার ছোকরা তাহাকে বলিল, "তোমার জিভে জল ঝরছে বোধ হয়? যদি পাবার ইচ্ছা থাকে, কি ক'রে এবং কোথায় পাওয়া যায়, আমি ব'লে দিতে পারি।"

ক্রীড়াশেষে ছোকরা, বালক ষ্টিন্‌কে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিল যে, জর্ম্মাণদিগকে খবরের কাগজ বেচিতে পারিলে, এক একবারেই ত্রিশ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ ষ্টিন্ এই প্রস্তাব সক্রোধে প্রত্যাখ্যান করিল। তিন দিন সে আর সেই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে গেলই না—সে তিন দিন তাহার পক্ষে যে কি যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল, তাহা সে-ই জানে! সে ভাল করিয়া খাইতেও পারে নাই, নয়নে নিদ্রা ত ছিলই না। রাত্রিকালে সে স্বপ্ন দেখিত যে, তাহার শয্যাপার্শ্বে—পায়ের দিকে স্তূপাকার 'গ্যালোশ' রহিয়াছে; আর ৫ ফ্রাঙ্কের মুদ্রাগুলি উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চারিদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে। এ প্রলোভন বড়ই উদগ্র—দুর্দ্দমনীয়। চতুর্থ দিবসে সে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল, দীর্ঘাকার ছোকরাটির সহিত দেখা করিয়া সে তাহার প্রস্তাবমত কায করিতে সম্মত হইল।

একদা প্রত্যূষে—তখন তুষারপাত হইতেছিল—উভয়ে এক একটা থলি লইয়া বাহির হইল। তাহাদের জামার অন্তরালে অনেকগুলি সংবাদপত্র ছিল। ফ্লাণ্ডার্স তোরণের সন্নিহিত হইতেই দিবার আলোক দেখা দিল। দীর্ঘাকার ছোকরা বালক ষ্টিনের হাত ধরিয়া তোরণের প্রহরীর সন্নিহিত হইল। প্রহরীটি সৈনিক হইলেও ভদ্রজাতীয়; ছোকরা বিনাইয়া বিনাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমাদের পথ ছেড়ে দিন; মা জ্বরে ভুগছেন, বাবা মারা গেছেন। আমার ছোট ভাই ও আমি মাঠ থেকে কিছু আলু তুলে আন্‌ব—দয়া ক'রে ছেড়ে দিন!"

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। লজ্জানত শিরে বালক ষ্টিন্ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রহরী মুহূর্ত্তমাত্র উভয়ের দিকে তাকাইয়া, তুষারাচ্ছন্ন, জনহীন রাজপথের দিকে চাহিল।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে বলিল, "যাও, শীঘ্র যাও!" উভয়ে 'অবারভিলিয়ার্স' রাস্তায় উপনীত হইল। বড় ছোকরাটি তখন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ছোট ষ্টিন্ যেন স্বপ্নের ঘোরে চলিতেছিল, তাহার নয়নে সবই যেন ঝাপ্সা, এলোমেলো দেখাইতেছিল। কারখানাগুলি ইদানীং সেনানিবাসে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেনাদল যেখানে অস্থায়ী দুর্গ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, সেগুলি আপাততঃ পরিত্যক্ত—আর্দ্র বস্ত্রগুলি সেখানে পড়িয়া আছে; বড় বড় চিম্‌নীগুলি অধুনা ধুম-রহিত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়—ধূমচ্ছায়াচ্ছন্ন আকাশপথে তাহাদের উন্নত শীর্ষগুলি অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় দেখা যাইতেছিল। নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান পরে এক এক জন প্রহরী—সামরিক কর্ম্মচারীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি প্রেরণ করিতে ব্যস্ত; স্থানে স্থানে শিবির—গলিত তুষারে আর্দ্র; পার্শ্বে স্তিমিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ড। বয়োজ্যেষ্ঠ ছোকরাটি পথ-ঘাট ভালরূপেই চিনিত; ঘাঁটি এড়াইয়া সে মাঠের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল।

এইরূপে চলিতে চলিতে তাহারা এক দল রক্ষি-সৈনিকের শিবিরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ইহাদিগের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া চলিবার কোনও উপায়ই ছিল না। 'সৈসন' রেলপথের ধারে ধারে যে পরিখা খনিত হইয়াছিল, সলিলপূর্ণ সেই খাতের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কুটীরমধ্যে রক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘকায় ছোকরার গল্প শুনিয়া তাহারা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল না। ছোকরার বিলাপে জনৈক বৃদ্ধ সেনানী বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার কেশরাজি শুভ্র, ললাট ও আনন রেখাঙ্কিত। তাঁহার আকৃতি অনেকটা বৃদ্ধ ষ্টিনের অনুরূপ।

তিনি বলিলেন, "ছোকরারা, আর কেঁদ না! আচ্ছা, তোমরা আলু তুলে নিয়ে এস, আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে ভিতরে এসে একটু আগুন পোহায়ে নেও। ঐ বাচ্চা ত জ'মে যাবার মত হয়েছে দেখ্‌ছি!"

হায়! বালক ষ্টিন্‌ শীতে কাঁপিতেছিল না; আতঙ্ক ও লজ্জায় তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিতেছিল!

রক্ষিভবনে ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে কতকগুলি সৈনিক ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া সঙ্গীনের তীক্ষ্ণাগ্রভাগে বিস্কুট বিঁধিয়া টোষ্ট প্রস্তুত করিতেছিল। লোকগুলি বালক দুইটির জন্য স্থান করিয়া দিল—এক এক পেয়ালা কফিও তাহাদের ভাগ্যে জুটিল। সকলে যখন কফিপানে রত, সেই সময় জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী আসিয়া রক্ষিসেনার অধ্যক্ষকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি কি বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অধ্যক্ষ সহকারীদিগকে সম্বোধন করিয়া স্ফুরিতাধরে বলিলেন, "ভাই সব, আজ রাতে 'তাম্রকূট' হবে। প্রুসিয়ান্‌দের সাঙ্কেতিক শব্দ জানা গেছে; আজ রাত্রিতেই 'বোর্গে' আমরা দখল করব।"

সকলেই উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল; হাস্যধ্বনিতে শিবির মুখরিত হইতে লাগিল। সকলে উঠিয়া নাচিয়া, গাহিয়া, বন্দুক ও তরবারি লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। সেই অবকাশে বালক-যুগল সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

খাত অতিক্রম করিবার পর সম্মুখে সমতলক্ষেত্র—সীমাশেষে এক দীর্ঘ প্রাচীর। প্রাচীরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর—গহ্বরপথে আগ্নেয়াস্ত্র সংরক্ষিত। উভয়ে সেই প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা আলু কুড়াইবার অভিনয় করিতেছিল।

ক্ষুদ্র ষ্টিন্‌ মাঝে মাঝে বলিতেছিল, "চল, ফিরে যাই; ওখানে গিয়ে কায নেই।" কিন্তু তাহার সঙ্গী সে কথা কানে না তুলিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা বন্দুকের ঘোড়া তুলিবার শব্দ তাহাদের কানে গেল।

বড় ছোকরাটি অবিলম্বে মাটীতে শুইয়া পড়িয়া বালককে বলিল, "শুয়ে পড়!"

মাটীতে উপুড় হইয়া শুইয়াই সে শিস্‌ দিতে আরম্ভ করিল। অপর দিক হইতে শিস্‌ দিয়া কেহ উত্তর দিল। হামাগুড়ি দিয়া উভয়ে অগ্রসর হইল। প্রাচীরের সম্মুখে, পীতবর্ণের একজোড়া গুম্ফশোভিত মনুষ্য-মুণ্ড আবির্ভূত হইল—শিরোদেশে মলিন টুপী। বড় ছোকরাটি লম্ফ দিয়া খাতের মধ্যে নামিয়া প্রুসিয়ানের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সঙ্গীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, "ও আমার ভাই।"

ষ্টিন্‌ এমনই ক্ষুদ্রাকার যে, প্রুসিয়ান্‌ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বালককে টানিয়া তুলিয়া নামাইল।

প্রাচীরের অপর প্রান্তে মাটীর স্তূপ, কর্ত্তিত বৃক্ষের রাশি—তুষার-স্তূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছোট ছোট গহ্বর, প্রত্যেক গহ্বরের কাছে একজোড়া পীত গুম্ফ ও মলিন টুপী। বালকরা যখন তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, গুম্ফ ও টুপীর মালিকরা যেন ঘৃণায় দাঁতে দাঁত ঘষিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

এক প্রান্তে মালীর কুটীর—চারিদিকে বৃক্ষের বেষ্টনী। নিম্নতলে সৈনিকের দল তাসখেলা অথবা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ঝোল তৈয়ার করিতে ব্যস্ত। বাঁধা কপি ও মাংসের গন্ধ কি লোভনীয়! ফরাসী-শিবিরের ভোজ ও প্রুসিয়ান্‌-শিবিরের আহার্য্যের কি প্রভেদ! উপরের তলায় সেনানীদিগের থাকিবার স্থান। কেহ তখন পিয়ানো বাজাইতেছিল, মাঝে মাঝে স্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলিবার শব্দও শুনা যাইতেছিল।

প্যারীর বালক-যুগল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আনন্দ অভিনন্দনের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা খবরের কাগজগুলি বিলি করিয়া দিল, কিছু আহার্য্য ও পানীয় পাইল। সামরিক কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের নিকট হইতে কথা বাহির করিয়া লইতে লাগিলেন। সেনানীরা তাহাদের সহিত গর্ব্বোদ্ধতভাবে বিদ্রূপভরে কথা বলিতেছিলেন; কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ছোকরাটি সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাম্যভাষায় ও কদর্য্য রসিকতায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। ষ্টিন্ কথা কহিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিত যে, সে-ও নির্ব্বোধ নহে; কিন্তু তাহার মুখ ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিল না। সে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল। তাহার সম্মুখেই এক জন বৃদ্ধ সামরিক কর্ম্মচারী বসিয়া ছিলেন, অন্য সকলের তুলনায় তিনি অত্যধিক গম্ভীর। সামরিক কর্ম্মচারী কি পড়িতেছিলেন, অথবা পাঠের অভিনয় করিতেছিলেন। বৃদ্ধ স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ষ্টিনের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার সুদৃঢ় আননে কোমলতার মাধুর্য্য ও তিরস্কার যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল। হয় ত গৃহে—দেশে, ষ্টিনের তুল্য বয়সী পুত্র আছে—হয় ত তিনি স্বগত বলিতেছিলেন, "আমার পুত্রকে এরূপ নীচ কার্য্যে রত দেখিবার পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু ঘটে!"

সেই মুহূর্ত্ত হইতে ষ্টিন্ অনুভব করিল, কে যেন তাহার বক্ষের উপর গুরুভার চাপিয়া ধরিয়াছে, বক্ষের স্পন্দন যেন অনুভূত হয় না—তাহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এই ভীষণ অনুভূতি হইতে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় বালক পানে মনোনিবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার বোধ হইল, যেন গৃহ ও তাহার অধিবাসীরা তাহার চারিদিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার সঙ্গী তখন কি গল্প করিতেছিল, তাহা তাহার কানে সুস্পষ্ট প্রবেশ করিতেছিল না। তবে, ভাবে সে বুঝিয়াছিল যে, নিজেদের জাতীয় রক্ষী সেনাদল সম্বন্ধে—তাহাদের সমরাভিনয়-কৌশল সম্বন্ধে সে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা করিতেছিল, আর প্রুসীয় সেনানীরা তাহা শুনিয়া উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিতেছিল। সহসা ছোকরা কণ্ঠস্বর নামাইয়া লইল, সেনানীরা তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন—তাঁহাদের মুখমণ্ডল গম্ভীর। ফরাসী সেনাদল অতর্কিতভাবে প্রুসিয়ানগণকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, সেই গোপন কথাটা বলিবার জন্য হতভাগা উদ্যত হইল।

বালক ষ্টিন্ সক্রোধে লাফাইয়া উঠিল, তাহার বিমূঢ়ভাব তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও সব নয়, থাম, থাম!" কিন্তু ছোকরা থামিল না, হাসিতে হাসিতে সে সব কথা বলিয়া ফেলিল। কথা সমাপ্ত হইবামাত্রই সামরিক-কর্ম্মচারীরা লাফাইয়া উঠিলেন। এক জন দ্বার মুক্ত করিয়া বলিলেন, 'চ'লে যাও—চ'লে যাও!"

সেনানীরা জার্ম্মাণ ভাষায় কি আলোচনা করিতে লাগিলেন। বড় ছোকরা সগর্ব্বে মুদ্রাগুলি বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল। নতশিরে ষ্টিন্ তাহার অনুবর্ত্তী হইল। বৃদ্ধ সেনানীর পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় সে শুনিল, তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় বলিতেছেন, "ভারী অন্যায়—বড় খারাপ!"

ষ্টিনের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আবার তাহারা প্রান্তরে—মাঠে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিকাল-মধ্যে দৌড়াইয়া দীর্ঘপথ পার হইল। তাহাদের থলি তখন আলুতে পরিপূর্ণ, প্রুসীয়ানগণ সেগুলি তাহাদিগকে দিয়াছিল। এই আলুর থলি দেখাইয়া তাহারা ফরাসী রক্ষীদিগের সন্তুষ্টিবিধান করিল। তখন ফরাসী সেনাদল নৈশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দলে দলে সৈনিক আসিয়া নিঃশব্দে প্রাচীরপার্শ্বে সমবেত হইতেছিল। বৃদ্ধ ফরাসী সেনাধ্যক্ষ তাহাদিগকে মনোমত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। বালকদিগকে দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া তিনি সহাস্যে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন।

সেই সময়, মধুর হাস্য ষ্টিন্কে আহত করিল। সে ডাক ছাড়িয়া বলিতে চাহিল, "আজ অগ্রসর হইবেন না। আমরা আপনাদের মতলব ফাঁক ক'রে এসেছি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছি!"

বড় ছোকরাটি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে যদি কোন কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়কেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। জীবনের আশঙ্কা তাহাকে মূক করিয়া রাখিল।

লাকুর্ণেস্তের কাছে আসিয়া এক জনহীন বাড়ীতে উভয়ে প্রবেশ করিল। অর্জ্জিত অর্থ উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইল। সত্যের অনুরোধে আমি প্রকাশ করিতে বাধ্য যে, ভাগে কোনও ইতরবিশেষ হয় নাই। বালক ষ্টিন্ যখন মুদ্রার মধুর ধ্বনি শুনিল, তখন নিজের অপরাধের বোঝা ততটা গুরু বলিয়া মনে করিল না। তখন 'গ্যালোশ' ক্রীড়ার সম্ভাবিত আশায় সে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল!

কিন্তু যখন সে একা পড়িল—বড় ছোকরাটি যখন তাহাকে ফটক পার করিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার পকেটের ভার যেন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। আবার তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনোমোহিনী প্যারীর মূর্ত্তি আর তাহার দৃষ্টিতে তেমন রমণীয় বোধ হইল না। তাহার বোধ হইল, পথচারীরা যেন কঠোর দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—সকলেই যেন তাহার অভিসারের কথা জানে! তাহার কানে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল—গুপ্তচর, গোয়েন্দা! গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দকে জয় করিয়াও সে ধ্বনি যেন তাহার কর্ণ-পটহকে আঘাত করিতে লাগিল।

অবশেষে সে গৃহে পৌঁছিল। পিতা তখনও ফিরিয়া আসেন নাই দেখিয়া সে একটু স্বস্তি অনুভব করিল। সে দ্রুতগতি উপরের তলে গিয়া মুদ্রাগুলিকে লুকাইয়া রাখিল—রজত-মুদ্রাগুলি তাহার কাছে যেন বোঝার মত দুর্ব্বহ বোধ হইতেছিল।

সে দিন বৃদ্ধ ষ্টিন্ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিল। এমন প্রফুল্লতা, এমন উৎসাহ সে কখনও অনুভব করে নাই। নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছিল যে, অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে। নৈশ ভোজকালে বৃদ্ধ সৈনিক প্রাচীর-বিলম্বিত নিজের বন্দুকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "খোকা, আজ যদি তুই বড় হতিস্, প্রুসিয়ান্‌দের সঙ্গে কি ব্যবহার কর্‌তিস্?"

প্রায় রাত্রি ৮টার সময় কামানের শব্দ শ্রুত হইল।

"অবারভিলিয়ার্স থেকে ঐ কামানের শব্দ হচ্ছে!"

বৃদ্ধ সকল স্থানের দুর্গ সম্বন্ধে সংবাদ রাখিত। ক্ষুদ্র ষ্টিনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বড় ক্লান্ত হইয়াছে, এই কথা জানাইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কামানের ভীম গর্জ্জন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বালক কল্পনানেত্রে দেখিল যে, রজনীর অন্ধকারে ফরাসী সৈন্য প্রুসিয়ান্‌দিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু তাহারা জানে না যে, শত্রুপক্ষ সংবাদ পাইয়া উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্লেই প্রস্তুত হইয়া আছে। সে মানস নয়নে দেখিল, সকালে যে বৃদ্ধ ফরাসী সৈনিক তাহাকে সমাদরে আগুন পোহাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, মিষ্টস্বরে তাহার সহিত মধুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণহীন দেহ তুষারশয়নে শায়িত! ফরাসী বীরগণ আশে-পাশে মরিয়া পড়িয়া আছে। আর ইহাদের রক্তের বিনিময়মূল্য তাহারই উপাধানতলে রহিয়াছে। সে বৃদ্ধ সৈনিক ষ্টিনের বংশধর! সেই এই কার্য্য করিয়াছে। সে এ কি করিল? অশ্রুধারা তাহার কণ্ঠরোধ করিল। পার্শ্বস্থ কক্ষে তাহার পিতা তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহার পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। বাতায়ন উন্মুক্ত করিবার শব্দও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অদূরে রণদামামা বাজিতেছিল, নাগরিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া সমবেত হইতেছিল। কৃত্রিম যুদ্ধ নহে—সত্যই এইবার প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার জন্য নাগরিকগণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। হতভাগ্য বালক আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুত্রের শয়নকক্ষে আসিয়া বৃদ্ধ ষ্টিন্ বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে?"

বালক আর সহ্য করিতে পারিল না; সে লম্ফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া পিতার চরণতলে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিতে গেল; সঙ্গে সঙ্গে উপাধাননিম্নস্থ রৌপ্যমুদ্রাগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, "এ সব কি? তুই কি কাহারও টাকা চুরি করেছিস্ না কি?"

বালক প্রুসিয়ান্ সীমায় গিয়া যাহা যাহা করিয়াছিল, সকল কথা পিতার নিকট বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার হৃদয়ের গুরুভার যেন লঘু হইয়া আসিল —আত্মাপরাধ স্বীকার করিয়া সে যেন স্বস্তি অনুভব

করিল। বৃদ্ধ ষ্টিন্ সকল কথা শুনিল; তখন তাহার মুখের ভাব অত্যন্ত ভীষণ। বালকের কথা শেষ হইলে বৃদ্ধ বাহুযুগলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"বাবা! বাবা!—"

বালক আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু পিতা তাহাকে সরাইয়া দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে রৌপ্য-মুদ্রাগুলি কুড়াইয়া লইল।

"সব টাকা এই ত?"

বালক মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। বৃদ্ধ সৈনিক প্রাচীর-সংলগ্ন বন্দুক নামাইয়া লইল, গুলীর বাক্স কোমরে বাঁধিল। তাহার পর টাকাগুলি পকেটে রাখিয়া প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, "বেশ, এগুলি আমি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি!"

তাহার পর আর কোনও কথা না বলিয়া, মুখ ফিরাইয়া, সে নীচে নামিয়া গেল। অন্ধকারে সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—সে তাহাদের দলে মিশিয়া গেল।

আর কেহ তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই! *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* আলফোঁস্ ডোডে রচিত কোন ফরাসী গল্প হইতে অনুদিত।

অনাদৃত

হাসিত একদা স্বদেশ আমার, বক্ষে ধরিয়া পদ্মাধার,
গ্রহগীতি সম, সঙ্গীত তা'র, রণিয়া উঠিত বারংবার,
যে গীতি গাহিত মলয় বায়,
যেরূপ ফুটিত জলদ-গায়,
মুকুর সমান সকলি তায়,
দিত সে ধরিয়া স্নেহোপহার।

ডম্বরুনাদী ঘন অম্বর, গাহিত যখন প্রাবৃট্ গান,
চঞ্চলা নদি! নিমেষে তখন রুদ্রবীণায় তুলিতে তান।
ফুলিয়া উঠিত সলিলভার,
কুপিত ভুজগ বাঁধিয়া সার,
বরজে যেন রে গরলাধার,
তৃপ্তি লভিত নয়ন প্রাণ।

রচিয়া তোমার অঙ্গভূষণ, সারি সারি সারি চলিত তরী,
গ্রাম্য মাঝির সরল কণ্ঠে, আকাশ বাতাস উঠিত ভরি,
ঊর্ম্মি-শিশুর চপল ঘায়,
হেলিয়া দুলিয়া দখিণে বায়,
কেমনে তরণী চলিয়া যায়,
দেখেছি কত না সে কথা স্মরি'।

শত হুঙ্কারে মত্ত মরুৎ ধ্বনিত যখন প্রলয়-রাব,
দেখেছি তোমার আননে পদ্মা, অতি অপরূপ বিরূপভাব।
পাড়িতে যেন রে নগর-গ্রাম,
ফুলিত ফেনিল অলকদাম,
ভীষণে যে আছে মনোভিরাম,
সাক্ষ্য দিয়াছে তব প্রভাব।

স্মরি' উপকার, তটিনি, তোমার ফুটাতে তৃপ্তি চিত্তে তব,
হরিৎ শস্য ধরিত বক্ষে, স্বদেশ আমার, নিত্য নব;
যখন আসিত শারদবালা,
হরিতে পরা'ত কনক-মালা,
মায়ায় ভুবন করিত আলা,
মধুর স্মিরিতি, কত বা ক'ব?

ছেড়ে গেছ আজ, শপ্ত নগরী, অজ্ঞাত কোন পাপের তরে,
ম্লান মুখ আজ, তপ্ত নগরী, দীপ্তি নাহিক' নয়ন পরে;
ক্ষতের আসন আঁকিয়া গায়,
অনল যেমন চলিয়া যায়,
স্বদেশ আমার তেমনি হায়,
বলিতে সে কথা কথা না সরে।

শিশুকাল হ'তে পালিয়াছ যারে,
নিঃশেষে ঢালি' বুকের স্নেহ,
ভেঙ্গে দেছ তার, বুকের পাঁজর,
রেখে গেছ শুধু অসাড় দেহ;
অনিল পারে না প্রবোধ দিতে,
শুধু ব'য়ে যায় ব্যথিত চিতে,
শূন্য সে হিয়া পুনঃ পূর্ণিতে
পারে না পারে না পারে না কেহ।

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (বি, এ)।
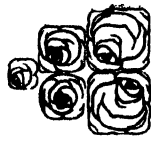
চীনের জাগরণ

পিকিংয়ে বিদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে চীনাছাত্রদের শোভাযাত্রা

জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় হইতে জগতের প্রায় সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে। যাহারা অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল জাতি,—তাহাদেরও প্রাণে একটা নবীন আশার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে প্রবল শক্তিনিচয়ের মুখে আত্মনিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র প্রবর্ত্তন ইত্যাদি অনেক আশাপ্রদ কথা শুনা গিয়াছিল। সুতরাং এই আবহাওয়ায় চীনের মত বিরাট জাতিরও প্রাণে যে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

চীন এক প্রকাণ্ড দেশ, ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৪০।৪২ কোটি হইবে। চীনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। এক সময়ে চীন অতি প্রবল শক্তি ছিল। ক্রমে অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য জাতির মত চীনজাতির মধ্যে অবসাদ ও আলস্য দেখা দিয়াছে, দিন দিন চীনের অবনতি ঘটিয়াছে। চীনের বিরাট সাম্রাজ্যের প্রান্তস্থিত রাজ্যসমূহ একে একে চীনের অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। চীনের যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল, চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ে তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। রুসিয়া সুযোগ বুঝিয়া চীনের কতকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। কোরিয়া রাজ্য জাপান গ্রাস করে। বক্সার যুদ্ধকালে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীনের স্থানে স্থানে আপনাদের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লয়। ফলে Treaty ports ও য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চীনের customs বিভাগে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, চীন একরূপ পরাধীনভাবেই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় হইতে চীনের দেশপ্রেমিকরা এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। চীনের ছাত্ররা বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশের মুক্তির জন্য বিরাট ছাত্রান্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। এই আন্দোলনে মহিলা ছাত্রীদেরও বিলক্ষণ সংস্রব আছে। 'চীন চীনজাতির জন্য'—এই বাণী চীনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। বিদেশী প্রভুত্বের বিপক্ষে অসন্তোষানল ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

সম্প্রতি সেই আগুন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাংহাই সহরে ইহার সূত্রপাত। ক্রমে সেই আগুন রাজধানী পিকিন হইতে ক্যাণ্টন, এময় প্রভৃতি দূরবর্ত্তী সহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জ বলিতেছেন, চীনারা অসন্তুষ্ট নহে, বল-শেভিকরা তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে, তাহাদের আন্দোলন নিবিয়া আসিয়াছে, যৎসামান্য এময় সহরে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাও অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে। এইরূপে জগতের লোককে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, চীনের এই অশান্তি সাময়িক, ইহার জন্য কোনও আশঙ্কার কারণ নাই।

সাংহাই হাঙ্গামা

কিন্তু কথাটা ঠিক তাহাই নহে। এই অশান্তি ও হাঙ্গামার মূল বহুদূরবিসারী। কিরূপে কোথা হইতে এই হাঙ্গামা ঘটিল, তাহার ইতিহাস বিশেষ জানা না গেলেও যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, সঙ্কলন

হংকঙে উত্তেজিত জনসাধারণ কর্তৃক লুঠ

করিয়া দিতেছি। পাঠক ইহা হইতেই বুঝিবেন, এই অশান্তি ও হাঙ্গামা আকস্মিক বা সাময়িক নহে।

সাংহাই সহরে বিদেশীদের অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ কোন এক জাপানী কাপড়ের কলে দুই মাসের মধ্যে তিনটি শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয়। গত জুন মাসের শেষে ও জুলাই মাসের প্রারম্ভে ধর্ম্মঘট প্রবল আকার ধারণ করে। জাপানী কলে ধর্ম্মঘটীদের সহিত কলের কর্তৃপক্ষের এক বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে দুইটি চীনা শ্রমিককে গুলী করিয়া মারা হয়। আরও সাত জন চীনা শ্রমিক আহত হয়। শান্তিপ্রিয় চীনারা এত দিন অনেক সহ্য করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সহনশক্তিরও একটা সীমা আছে। এই ঘটনায় চীনা ছাত্ররা শ্রমিকদিগের সহিত যোগদান করিয়া এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া ক্যাকিং রোড দিয়া গমন করে। ঐ স্থানে বৃটিশ অধিকার (concession) অবস্থিত। বৃটিশ পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে, ফলে নয় জন চীনা নিহত হয়। দ্বিতীয় দিন আরও ৩ জন চীনা নিহত হয় এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৩ শত চীনা আহত হয়। বৃটিশ পক্ষে একটি লোকও হত বা আহত হয় নাই। চীনারা বলে, শোভাযাত্রার লোক যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তখনও তাহাদিগকে গুলী করা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তাহারা দেখাইতেছে যে, হতাহতের মধ্যে অনেকের পৃষ্ঠদেশে বন্দুকের গুলীর চিহ্ন আছে।

প্রথমে জাপানী কলে ও পরে বৃটিশ 'অধিকারের' মধ্যে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের জন্য সমগ্র চীনজাতি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর চীনের নানা স্থানে ধর্ম্মঘট ও প্রতিবাদসভা হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক ব্রেলসফোর্ড এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,—"এক শতাব্দী যাবৎ আমরা চীনকে মানুষের জীবনের মূল্যের কথা শিখাইয়া আসিতেছি। চীনের উত্তেজিত জনতা এক জন জার্ম্মাণ খৃষ্টান পাদরীকে হত্যা করিল, অমনই জার্ম্মাণ কৈশর চীনদেশের একটা প্রদেশ দখল করিয়া লইলেন। এক জন চীনা দস্যু এক য়ুরোপীয় পরিব্রাজক বণিককে হত্যা করিল, আমরা অমনি ১০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চাহিলাম। চীনও এইরূপে মানুষের জীবনের মূল্য বুঝিতে শিখিয়াছে। এখন তাই তাহারা তাহাদের নিজের দেশে বিদেশীদের দ্বারা চীনার হত্যা হেতু অপরাধী বিদেশীদের দণ্ড দান করিতে চাহিতেছে।"

কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার। পিপীলিকাও পদদলিত হইলে ফিরিয়া দংশন করে। এত দিন প্রবল বিদেশী শক্তিপুঞ্জ চীনকে ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহাদের দেশে আপনাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। এখন চীনের চক্ষু ফুটিয়াছে। চীন বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে 'নিজ বাসভূমে পরবাসীর' মতই হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে যদি চীনজাতির মধ্যে অসন্তোষানল জ্বলিয়া থাকে, তাহা হইলে চীনকে কি বিশেষ দোষ দেওয়া যায়?

য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জরা বলেন, রুসিয়ার বলশেভিক কমিউনিষ্টরা যত অনর্থের মূল। তাহারা গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া চীনজাতিকে 'বিদ্রোহী' করিয়া তুলিতেছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের 'বিদ্রোহী' কথাটা ব্যবহার করাই ভুল। চীন নিজের দেশে কাহার বিপক্ষে বিদ্রোহ করিবে? দ্বিতীয় কথা, যদিই বা বলশেভিকরা চীনাদিগকে ক্ষেপাইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষেপিবার কোন হেতু না থাকিলে চীনারা কেবল তাহাদের কথায় ক্ষেপিবে কেন? বিলাতের 'টাইমস্' পত্রই এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া জগতের লোককে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, বৈদেশিকরা চীনে কোন অপরাধে অপরাধী নহে, চীনারা রুসিয়ার বলশেভিকদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইতেছে। লর্ড বার্কেণহেড তাঁহার লাকবরোর বক্তৃতায় এই ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং মিঃ চেম্বারলেন তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন। সে দিন রুসিয়ার বৈদেশিক সচিব মুঁসিয়ে চিচেরিণ ইহার জবাব দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, বলশেভিক কমিউনিষ্টদের চীনের প্রতি খুবই সহানুভূতি আছে বটে, কিন্তু চীনকে উত্তেজিত করিবার প্রবৃত্তি নাই। বৈদেশিক ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের

সাংহাই বৃটিশ পুলিস কর্ত্তৃক চীনা ছাত্র হত্যার স্থান
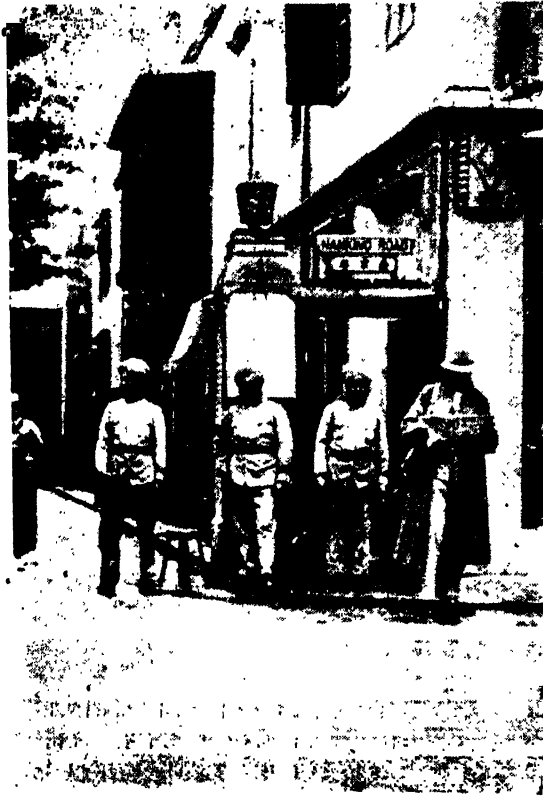
স্বার্থসাধনের চেষ্টা এবং তাহাদিগকে তাহাদের সরকারসমূহের সাহায্যদানের আগ্রহ চীনকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে, বলশেভিকরা ক্ষেপায় নাই।

চীনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড চীনের বিপক্ষে 'অহিফেন যুদ্ধ' (opium war) ঘোষণা করেন। উহার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যোগান দেওয়া অহিফেন লইতে চীনকে চিরদিনের জন্য বাধ্য হইতে হয়, হংকং অধিকৃত হয় এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই সময়ে ৫টি Treaty ports পুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করা হয়, ঐ সকল স্থানে ইংরাজ ব্যবসাদাররা আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কলাও করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চীনকে ভয়-প্রদর্শন করিয়া চীনের ৫২টি সহর য়ুরোপীয় ব্যবসাদারের পক্ষে উন্মুক্ত করা হয়। এই সকল সহর এখন Treaty portsএর মধ্যে পরি-গণিত। ন্যূনাধিক ১৬টি বিদেশী শক্তি এই সকল স্থানে বিশেষ অধি-কার উপভোগ করিয়া থাকে। ব্যাপার বুঝুন! দেশ চীন-জাতির, অথচ চীন দুর্ব্বল বলিয়া তাহারই বুকের উপর প্রবল বিদেশীরা আপনাদের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে—'যার ধন তার ধন নহে,' অপরে তাহা উপভোগ করে। আজ যদি চীন প্রবল হইয়া য়ুরোপে বা মার্কিণ দেশে এইরূপ বিশেষ অধিকারের দাবী করিত, তাহা হইলে এতক্ষণ জার্ম্মাণদের মত তাহারা পৃথিবীকে পীড়ন করিতেছে বলিয়া সমস্বরে চীৎকার উঠিত সন্দেহ নাই।

এই যে চীনদেশের মধ্যে বিদেশীরা স্ব স্ব স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহাতে চীনের কি ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার ফলে নিজ রাজ্যে চীন শাসকদিগের কর্ত্তৃত্বক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, পরন্তু চীন আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থনীতি হিসাবেও চীন এই জন্য পরের অধীন হইয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বন্দরসমূহের কাষ্টম, তার, ডাক প্রভৃতি সমস্তই বিদেশীর হস্তগত। তাহাদের স্বদেশীয়ের বিচারের ভার তাহাদেরই হস্তে,—চীন কর্ত্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতা নাই। চীনদেশের Treaty portগুলি ক্রমে বিদেশীদের ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং উহার ফলে চীনাদের কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিদেশীরা আপনাদের আমদানী কাঁচা মাল ও বনজাত পণ্যের উপর মাত্র শত-করা ৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারণ করিল। ইহাতে চীনের নিজস্ব শিল্প-শিল্প-বাণিজ্য শুকাইয়া যাইতে লাগিল। পরন্তু বিদেশী ধনী ব্যবসায়ীরা চীনের সস্তার শ্রমকে ক্রীতদাসে পরিণত করিল। ৫।৬ বৎসরের চীনা শিশুদিগকেও কলে সপ্তাহ ভোর অহোরাত্র কায করিতে হয়। কাযের সময় ১২ ঘণ্টা হইতে ১৬ ঘণ্টা। ইহার মধ্যে ১ ঘণ্টা খাইবার ছুটী। বালকবালিকাগণকে সকল সময় দাঁড়াইয়া কায করিতে হয়। পিতামাতাকে মাসিক ২ ডলার মুদ্রা দিয়া মফঃস্বল হইতে এই সকল বালকবালিকাকে কলে কায করিতে আনয়ন করা হয়। এই ভাবের সাংহাই সহরেই ৫টি বৃটিশ ও ২০টি জাপানী কাপড়ের কল আছে।

ক্যাণ্টনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক ব্যাপারের কমিশনার মহাত্মা গন্ধীকে সম্প্রতি তার করিয়া যাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে এই সকল কথা বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—

চীন এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে জাপান, রুসিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন নহে। এমন কি, ভারতবর্ষ কিংবা কোরিয়ার ন্যায় কোন শক্তিবিশেষের পরিচালিত দেশ নহে। ডাঃ সান-ইয়াটসেন যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, চীন বহু শক্তির অধীনে বহুধা বিভক্ত উপনিবেশ মাত্র। বন্দুর সন্ধির দ্বারা যে সকল শক্তি চীনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে চীনের রক্ত শোষণ করিতেছে। অহিফেনের বিরুদ্ধে চীন যখন যুদ্ধ-ঘোষণা করে,

বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক হংকংয়ের প্রবেশদ্বার রক্ষা

চীনের সাংহাই সহরের রাজপথ

তাহার পর হইতে একের পর একটি করিয়া স্বাধীনতাহরণকারী সন্ধি চীনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বৈদেশিকগণ তাহার সমস্ত দ্বারের চাবি-কাঠি হস্ত লইয়া বসিয়া আছে। কাষ্টমস নীতি দ্বারা চীনের অন্তর্বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ শিল্পের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে।

বৈদেশিক শক্তিসমূহ চীনের অধিবাসীদিগকেই প্রকারান্তরে তাহাদের শোষণ ও ধর্ষণনীতির পরিপোষক করিয়া লইয়াছে। যে সকল বন্দর হইতে সমগ্র জগতের সহিত বাণিজ্য পরিচালনা করা যায়, সেই সকল বন্দর সন্ধির দ্বারা বৈদেশিকগণ অধিকার করিয়া বসিয়া চীনের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

এই সকল স্থানে বৈদেশিকগণ তাহাদের অভিরুচি অনুসারে বিচার করে। সামান্য অজুহাতে তাহারা চীনের অধিবাসীদিগকে তাহাদেরই স্বদেশভূমিতে গুলী করিয়া হত্যা করিতেছে। চীনের অর্থনীতিক চাবিকাঠি বৈদেশিকদের হস্তে থাকায় কৃষিজীবী অধিবাসীদিগকে স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বৈদেশিক শোষকদিগের সহযোগীর কার্য্য করিতে হইতেছে। সামান্যমাত্র প্রতিবাদ করিলে তাহাদিগকে গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইতেছে।

বিকৃত শিক্ষায় যুবকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহারা তাহাদের শোষণনীতির পথ প্রস্তুত করিতেছে, ফলে স্বদেশের লোক বৈদেশিকদের অত্যাচারের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

বৈদেশিকদিগের প্ররোচনায় চীনে বিভিন্ন সামরিক দলের অভ্যুত্থান হইতেছে। এই সকল সামরিক শক্তি বৈদেশিকদিগেরই সহায়তা করিতেছে। বক্সার সন্ধির পর চীনের মাঞ্চু রাজবংশ বিদেশীয়দিগের কবলিত হইয়া পড়ে। এই জন্য দেশে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে। এই বিদ্রোহী শক্তির দ্বারা মাঞ্চু রাজবংশের ধ্বংস হইয়া যায়। তখন অনেকগুলি সামরিক শক্তি জাগিয়া উঠে। কিন্তু ইহাদের সকলেই বৈদেশিকদিগের দ্বারা প্ররোচিত। এই সকল ব্যাপার উপলব্ধি করিয়া চীনের জাতীয় দল এই সব সামরিক শক্তির বিলোপ-সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা উপেই-ফু, চ্যাংসোলিন প্রভৃতি বিভিন্ন সামরিক নেতার শক্তির অবসান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

যত দিন এই সকল শক্তির ধ্বংসসাধন না হয়, তত দিন চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। এই সকল বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্য এবং অত্যাচার রহিত করিয়া চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই জাতীয় দলের উদ্দেশ্য। নতুবা যদি বর্ত্তমান অবস্থা চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক মহাযুদ্ধের উদ্ভব হইবে। চীনের অধিবাসিগণ কোন প্রকার বিদ্রোহের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ নহে। তাহারা নির্ম্মম শোষকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চায়।

কমিশনার অবশেষে জানাইয়াছেন যে, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে চীনের ন্যায়যুদ্ধে জগতের সকল দেশের অধিবাসিগণই তাহার সহায়তা করিবে।

অবস্থাটা আরও বিশদরূপে বুঝিতে হইলে Consortium কথাটি বুঝা চাই। বিদেশীরা চীনদেশে এক আন্তর্জ্জাতিক ধনি-সম্মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহারই নাম Consortium. ইহার মধ্যে

ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিণ, জাপানী ব্যাঙ্কসমূহ আছে। ইহারা টাকা কর্জ্জ দেওয়া একচেটিয়া ক'রয়া লইয়াছে। ইহারা চীনদেশকে বেড়াজালে ঘিরিয়াছে, পরন্তু ইহাদেরই ইঙ্গিতে শক্তিপুঞ্জ ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকেন। মার্কিণের ওয়াশিংটন সহরে যে সুদূর প্রাচ্য বৈঠক বসিয়াছিল, উহাতে স্থির হইয়াছিল যে, চীনকে তাহার নিজের কাষ্টম শুল্ক নির্দ্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। আরও স্থির হইয়াছিল যে, একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন বসান হইবে; সেই কমিশন চীনে বৈদেশিকদিগের বিশেষ বিচারের অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। কিন্তু উক্ত ধনি-সম্মিলনের চেষ্টায় ফল কিছুই হয় নাই। মিঃ চেম্বার্লেন বৃটিশ জাতির পক্ষ হইতে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত শেষে মানিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহার মূলে ধনি-সম্মিলনের হাত ছিল।

ধনি-সম্মিলনের প্রভাব চীনের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে বলিয়া আজ চীনের অধিবাসী ঘোর অসন্তুষ্ট। এ প্রভাব দূর না হইলে শক্তিপুঞ্জ চীনের প্রতি কখনও সুবিচার করিতে পারিবেন না। আর তাহা হইলে চীনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষানল এক দিন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিবে।

জেনারল ফেঙ্গ-য়ুসিয়াঙ্গ এখনই যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে চীনের প্রধান শত্রুরূপে ইংরাজকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। এমন কি, তিনি প্রকাশ্যে ইংরাজকে যুদ্ধে আহ্বানও করিয়াছেন। তিনি দম্ভভরে বলিয়াছেন, ইংরাজ জলে প্রবল হইলেও, স্থলে নগণ্য শক্তি। বুয়ার যুদ্ধকালে—অথবা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অহিফেন-যুদ্ধকালে চীনের এরূপ সদম্ভ উক্তি শুনিলে ইংরাজ নীরব থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এখন ইংরাজ নীরব। তাই মনে হইতেছে, পাশা উল্টাইয়াছে. চীনের জাগরণে শক্তিপুঞ্জ শঙ্কিত হইয়াছেন।

এ দিকে রুসিয়া চীনে বিশেষ আধিপত্য ও অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া মহাযুদ্ধের ফলে স্বাধিকার হইতে স্বতঃই বঞ্চিত হইয়াছেন। মার্কিণ বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে শীঘ্র পুনর্বিচার ও আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; বাকী ইংরাজ ও জাপান। ইঁহারা উভয়ে স্বাধীন চীনের প্রকৃত স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া থাকিবেন কি? ধনি-সম্মিলনের প্রভাব কি এতই অধিক?

সিরাজের বাগে

আলী নয়নের জ্যোতিভরা তারা খসিয়াছে এইখানে—
আজও স্মৃতি তার এই বাগিচায় বাজে সমাধির গানে।
সিরাজের বাগে সিরাজ শায়িত দাদুর নয়নমণি—
মরণের বাণী স্মরণ করিলে হিয়া উঠে রণরণি।
কিরীটেশ্বরে হীরাঝিল যার আজও দাঁড়ায়ে আছে
ধ্বংসেটি শোকের গভীর বার্ত্তা আজও এখানে বাজে।
লুৎফার চির-সাধনার ধন সিরাজ—সিরাজ—কই?
বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব ঐ যে ঘুমায়—ওই!

মোহনের সখা শান্তিশয়ান শুইয়াছে অকাতরে
মাটী দিয়ে গড়া বহু পুরাতন এই কবরের পরে।
শত শত বাতি উজ্জ্বল করেছে যাহার প্রমোদ-গেহ
আজিকে তাহার হৃদয় আঁধার দেখেও দেখে না কেহ।
বন্দিশালার শতেক বন্দী বিফল হলো বা আজ
বঙ্গের বীর বরিয়াছে মাটী ফেলিয়া যশের তাজ।
লুৎফার চির-সাধনার ধন সিরাজ—সিরাজ—কই?
বঙ্গের শেষ নরশার্দ্দূল ঐ যে ঘুমায়—ওই।

কোথায় মীরণ, মীরজাফরের কাপুরুষ সন্তান,
কোথায় সিরাজ লুকায়েছে আজি কেবা দিবে সন্ধান?
শত বরষের পলাশীর মাঠ উন্মেষ করি স্মৃতি,
সিরাজের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রাণে আজ জাগে নিতি
অবাক নয়ানে চেয়ে থাকি হায় উদাস গগনতলে,
দোষী হ'তে বেশী দুর্ভাগা সে যে জগতেতিহাসে বলে।
লুৎফার বহু সাধনার ধন সিরাজ—সিরাজ—কই?
বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব ঘুমায় ঐ যে ওই।

দিল ভরা যার খুশ ছিল হায়, আঁখিতে কোরা স্বপন,
কোথা সে বালক সিরাজদ্দৌলা বঙ্গ-নর রাজন্
সুমসাম্ আজ দিশদিক কেউ কথাটিও নাহি কয়,
কত দিন হ'তে বক্ষে তাদের রয়েছে কিসের ভয়।
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে এ ভয় চলিয়া যাবে
কোন্ মহাধ্বনি যুগান্তে সহসা বাজিবে গভীরারাবে।
লুৎফার সেই প্রাণের দেবতা ঘুমায় আজিকে ওই,
যশোগৌরব গিয়াছে চলিয়া কবরের স্মৃতি বই!

অভ্রংলিহ প্রাসাদের পরে হাজার হাজার বাতি
এক লহমার দিল হেতু যার উজল করেছে বাতি—
সেই সিরাজের কবরের পরে জ্বলে যে মাটীর দীপ,
বহু পুরাতন মরণের ভালে দেখায় নিমেষ টিপ।
ষোল পয়সার তেল জ্বলে আজ সারা মাস ধরি হায়,
কত গৌরব কত মহিমা, বিরাজিত ছিল যায়।
লুৎফার সেই সাধনার ধন সিরাজ—সিরাজ কই?
বঙ্গের শেষ নবাবজাদা ঘুমায় ওই যে ওই!

এ সিরাজ বাগ পুণ্যতীর্থ এ মহামিলন মাঝে
এস হে হিন্দু এস অহিন্দু দুঃখমলিন সাজে,
ভাই ভাই আজ করি গলাগলি এস এ ভায়ের নীড়ে,
এস হে পান্থ, চির অশান্ত এস হেথা ধী—রে, ধী—রে।
এস দ্রুতপদে নত করি শির—দেখে যাও অনিমিখে,
মহামরণের শান্তির বাণী সিরাজ গিয়াছে লিখে,
সতীর সাধনা—আজও এখানে জ্বলিতেছে সদা ওই,
নাহি কোথা আর এ হেন তীর্থ এ সিরাজ বাগে বই!!

শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী।

প্রলয়ের আলো

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

আনা স্মিটের সহিত কলহ করিয়া জোসেফ চিন্তাকুল-চিত্তে অবনতমস্তকে 'বো-সিজোর' পরিত্যাগ করিল। তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা অন্যের অসাধ্য। এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। এত দিন তাহার বিশ্বাস ছিল—বার্থাকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এই আশায় নির্ভর করিয়া সে ধীরভাবে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছিল, নানা প্রতিকূল ঘটনাস্রোতে পড়িয়াও নিরুৎসাহ হয় নাই; বার্থার প্রগাঢ় প্রেম দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় তাহার হৃদয়কে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আজ তাহার সকল আশার অবসান হইল! সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মন স্থির করিতে পারিল না। স্মিট এণ্ড সন্সের কারখানার দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ হইলেও, অন্য কোন কারখানায় সে আর একটা চাকরী জুটাইয়া লইতে পারিত; কিন্তু ঐরূপ হীন চাকরী করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিজের যোগ্যতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল; তাহার ধারণা ছিল—লোহার কারখানায় লোহা ঠেঙ্গাইয়া জীবন ব্যর্থ করিবার জন্য সে সংসারে আইসে নাই। সে ভাবিল, "আমার বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, উচ্চাভিলাষ আছে; অন্য লোকের মত আমিই বা ধনবান্ হইতে পারিব না কেন? জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টায় প্রাণবিসর্জ্জনও গৌরবের বিষয়। এই দীনতা ও হীনতা অসহ্য; এই অপমান ও উপেক্ষা ক্ষমার অযোগ্য।"

জোসেফ তাহার বাকী বেতন আদায় করিবার জন্য কারখানায় না গিয়া প্রথমে জুরিচের একটি 'কাফে' বা ভোজনাগারে প্রবেশ করিল; তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল,—প্রফুল্লতালাভের আশায় সে সেখানে আকণ্ঠ মদ্যপান করিল। ইহাতে তাহার অবসাদ দূর হইল বটে, কিন্তু তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে চোখ-মুখ লাল করিয়া টলিতে টলিতে কারখানায় উপস্থিত হইল এবং ম্যানেজারের নিকট তাহার প্রাপ্যের অতিরিক্ত মজুরীর দাবী করিল, কারণ, তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ পদচ্যুত করা হইয়াছিল। ম্যানেজার তাহার দাবী অগ্রাহ্য করায়, সে তাহার সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিল। তখন ম্যানেজারের আদেশে কারখানার দরোয়ানেরা ঘাড় ধরিয়া তাহাকে কারখানার বাহিরে তাড়াইয়া দিল। জোসেফ নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত 'কাফে'তে ফিরিয়া আসিল এবং তাহার পকেটে যে কিছু টাকা ছিল, তাহা দিয়া পুনর্ব্বার মদ খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর সামান্য কারণে এক জন লোককে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। ভোজনাগারের মালিক তখন পুলিস ডাকিয়া আনিল। পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল এবং সমস্ত রাত্রি তাহাকে হাজতে কয়েদ করিয়া রাখিল।

পরদিন প্রভাতে তাহার মত্ততা দূর হইলে, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিল; নেশার ঝোঁকে সে কিরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল—তাহা স্মরণ হওয়ায় অনুশোচনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল; লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারিল না। মাতাল হইয়া সে যে কুকর্ম্ম করিয়াছিল—সে জন্য আপনাকে শতবার ধিক্কার দিল।

যাহা হউক, পরদিন জোসেফ সহজেই হাজত হইতে

মুক্তি লাভ করিল। এবার সে অন্য কোথাও না গিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেখানে সে শুনিতে পাইল—পূর্ব্বদিন সে কারখানা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন না করায়, তাহার পিতা-মাতা অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল এবং তাহার সন্ধানে কারখানায় গিয়া, কারখানার অধ্যক্ষের নিকট তাহার দুর্ম্মতি ও পদচ্যুতির কথা শুনিয়া আসিয়াছিল। জোসেফকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তাহার পিতা-মাতা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

কিন্তু জোসেফ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে তাহার পিতামাতাকে বলিল, "আমি বড়ই বোকামী করিয়াছি; তোমরা আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। জীবনে এই প্রথম আমি পশুবৎ আচরণ করিয়াছি, এ জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত; এই অনুতাপই আমার যথেষ্ট শাস্তি। তোমরা আমার কুকর্ম্মের জন্য আমাকে তিরস্কার করিও না; এমন কি, আমি যাহা করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে চাহিও না,—সে সকল কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতেও আমার ইচ্ছা নাই। আমার সকল আশা নষ্ট হইয়াছে; নিরাশ জীবন আমার দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনের কষ্ট শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে; কিন্তু এখনই আমি সে সকল কথা তোমাদের বলিতে পারিতেছি না। আমার মন এখন অত্যন্ত ব্যাকুল, আমি শুইতে চলিলাম।"

জোসেফের পিতামাতা—কুরেট-দম্পতি জোসেফকে তিরস্কার করিল না; এমন কি, জোসেফের অপরাধ গুরু বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তাহারা নিতান্ত নিরীহ লোক এবং সৎলোক বলিয়া পল্লীবাসীরা সকলেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত। তাহারা দরিদ্র এবং কুটীরবাসী হইলেও তাহাদের কুটীর অনেকের কুটীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সকল বিষয়েই তাহারা প্রতিবেশীদের আদর্শ ছিল। জোসেফকে তাহারা বড়ই ভালবাসিত এবং তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতিও তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেই পল্লীর অধিবাসিগণের ধারণা ছিল—কৃষিকার্য্যে কুরেট-পরিবারের যে আয় হইত, তাহার অতিরিক্ত অন্য আয়ও ছিল; কিন্তু সে টাকা কোথা হইতে আসিত এবং কেন আসিত—তাহা কেহই জানিত না; তবে তাহারা দেখিত, জোসেফের মাতা মিসেস্ কুরেট অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গিয়া সূচি-কর্ম্ম করিত এবং সে জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইত।

জোসেফ কিছুকাল বিশ্রামের পর উঠিয়া গিয়া আহার করিল; আহারান্তে সে পুনর্ব্বার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা সূচি-কর্ম্ম করিবার জন্য বাহিরে গেল। কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর জোসেফের শরীর সুস্থ হইল বটে, কিন্তু তাহার মন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে তাহার পিতার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিয়াছিল। সেই সময় বৃদ্ধ কৃষক জোসেফের ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কথাই জানিতে পারে নাই। জোসেফ তাহার পিতামাতার নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিলেও দীর্ঘকাল চিন্তার পর জুরিচত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইল। যেখানে বাস করিয়া বার্থাকে লাভ করিবার আশা নাই, সেখানে বাস করিবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ রহিল না; কিন্তু সে কোথায় যাইবে এবং ভবিষ্যতে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

সেই রাত্রে একটি ক্ষুদ্র পোর্টম্যাণ্টে জোসেফ তাহার কাপড়-চোপড় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিষ গুছাইয়া লইল। সে চাকরী করিয়া কয়েক শত ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাও একটি থলিতে পুরিয়া লইয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল :—

"মা! বাবা! হঠাৎ আমার মনে কি কঠিন আঘাত পাইয়াছি, সেই বেদনা কিরূপ দুঃসহ, তাহা অন্য কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। গত তিন বৎসর ধরিয়া আমি বার্থা স্মিটকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। তাহাকে লাভ করিবার আশা আমার পক্ষে দুরাশা হইলেও আমার বিশ্বাস ছিল—ভবিষ্যতে কোন না কোন দিন সেই আশা পূর্ণ হইবে, বার্থাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিব। আমার এই [illegible] কথা শুনিলে, বোধ হয়, সকলেই আমাকে পাগল [illegible], আমার বুদ্ধির [illegible]তার সন্দেহ করিত; [illegible] আমি দরিদ্র কৃষকের সন্তান এবং সামান্য শ্রমজীবী[illegible]—বার্থার

মায়ের কারখানার একটা নগণ্য ভৃত্য; আর বার্থা বিপুল সম্পদের অধিকারিণীর কন্যা এবং প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী! বামন চাঁদ ধরিবার জন্য উর্দ্ধে হাত বাড়াইলে তাহা দেখিয়া কেহ কি না হাসিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু সত্যই কি বার্থা আকাশের চাঁদ, আর আমি ধরাতলবাসী বামন? নিশ্চয়ই তাহা নহে। আমার ন্যায় বংশমর্য্যাদাহীন দরিদ্র শ্রমজীবী বংশগৌরবাভিমানিনী লক্ষপতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছে—জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে।

"যাহা হউক, আমার সেই সুখের অবসান হইয়াছে। কা'ল সকাল পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, বার্থাও আমাকে ভালবাসিত; আমার এইরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। বার্থা এই তিন বৎসরে আমাকে শতাধিক পত্র লিখিয়াছিল,—সেই সকল পত্রের প্রতিছত্র তাহার হৃদয়নিঃসৃত গভীর প্রেমে অনুরঞ্জিত। কোন দিন তাহার আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পাই নাই। আমাদের প্রেমের কথা এতই গোপনে ছিল যে, কেহ কোন দিন কোন সূত্রে তাহা জানিতে পারে নাই; কিন্তু সেই গুপ্ত-কথা কিরূপে হঠাৎ প্রকাশিত হইল, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমি জানিতাম, বার্থার জননী কাঞ্চন-কৌলীন্যের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া বার্থাকে মহা-সম্ভ্রান্তবংশের বংশধরের হস্তে সম্প্রদান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যে দুইটি তরুণ-হৃদয় সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে—তাহাদের সেই বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে কি ধনগর্ব্বই যথেষ্ট? তাহাদের প্রেমের কি কোন সার্থকতা নাই?—আমি বার্থাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম—সে সুযোগ পাইলেই যেন গোপনে আমাকে বিবাহ করিয়া তাহার জননীর সঙ্কল্প ব্যর্থ করে।

"দরিদ্রের গৃহে, অখ্যাতবংশে আমার জন্ম—তাহা আমার অজ্ঞাত নহে, আমি জানি, দুইখানি সবল হস্তের শ্রম ভিন্ন আমার অন্য কোন মূলধন নাই; কিন্তু বার্থার মাতা আনা স্মিট কি আমারই ন্যায় দরিদ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই? আর তাহার স্বামী? তাহার বংশ যে আমার অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর! তাহার পিতার কি কোন পরিচয় ছিল? সৌভাগ্যক্রমে তাহারা ধনবান্ হইয়াছে! এখন আনা স্মিটের প্রকাণ্ড কারখানা, বিস্তর টাকা; কিন্তু টাকায় কি বংশের হীনতা ঢাকা পড়ে? ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেই কি ইতর বংশের লোক সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না; এই জন্যই আমি বংশমর্য্যাদায় তাহাদের সমকক্ষ—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি। আমি পরিশ্রমী, আমার উচ্চাভিলাষ আছে; দৈব সহায় হইলে আমিও কালে আনা স্মিটের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারি।—কিন্তু আনা স্মিট ধনগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে—কুকুরের প্রতিও কেহ সেরূপ ব্যবহার করে না! আমার সকল আশা, আমার সুখের স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যতের সঙ্কল্প সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে,—কারণ, সে ঐশ্বর্য্যবতী, আর আমি দরিদ্র শ্রমজীবী মাত্র! যদি আমি কোন খেতাবধারী ধনাঢ্য ব্যক্তির দুশ্চরিত্র, মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য পুত্র হইতাম, তাহা হইলে আমার দোষ সত্ত্বেও আনা স্মিটের কন্যার যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতাম! কিন্তু আমি দরিদ্রের সন্তান, দৈহিক পরিশ্রমে সাধুভাবে আমি জীবিকার সংস্থান করি—এই অপরাধে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া কুকুরের মত বিতাড়িত হইলাম! যদি আনা স্মিট আমার প্রতি এই প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে সে অপমান আমার অসহ্য মনে হইত না; কিন্তু বার্থাকেও সে বশীভূত করিয়াছে এবং তাহাকে দিয়া পত্র লিখাইয়া আমাকে জানাইয়াছে—তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, আমি তাহার প্রেমের অযোগ্য, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে; আমি দরিদ্র ও হীনবংশের লোক, অতএব যেন তাহার আশা ত্যাগ করি!

"উত্তম, তাহাই হউক। আমি আমার ভাগ্যফল ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বিনা যুদ্ধে, নিশ্চেষ্টভাবে ভাগ্যের বশীভূত হইব না। আমার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; জানি না, এই স্রোত আমাকে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, সঙ্কটসঙ্কুল, উদ্বেলিত মহাসিন্ধুর অতলগর্ভে টানিয়া লইয়া যাইবে। সে জন্য আমি ভীত নহি। সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এখানে নিত্য উপেক্ষিত নগণ্য শ্রমজীবীর বৈচিত্র্যহীন, অবজ্ঞাত

জীবন বহন করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। হাঁ, আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব।—ঘৃণিত দাসত্ব অপেক্ষা হ্রদের জলে ডুবিয়া, মৃত্যুকে বরণ করা শতগুণ অধিক স্পৃহণীয়। কিন্তু তোমরা ভয় পাইও না; জীবনের সার্থক্যলাভের জন্ম বীরের মত চেষ্টা না করিয়া নিরুপায়, অলস, মূঢ়ের মত হতাশভাবে আত্মহত্যা করিব, আমি সেরূপ কাপুরুষ নহি। জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। কোথায় যাইব, কি করিব—তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। চেষ্টা দেখিব—কোন দিন কমলার কনক-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি কি না। বসুন্ধরা বিপুল, আমার উদ্যম ও উচ্চাভিলাষ অসীম; আমার প্রাণপণ চেষ্টা সফল হইতেও পারে, অনেকেরই ত হইয়াছে।

"আমার এই সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। আমি যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইয়া যাইব—সেই কঠোর পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমাকে তোমরা অকৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত বা পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন মনে করিও না। আমি যাহা ভাল মনে করিয়াছি—তাহাই করিতেছি; আমি ভ্রান্ত হইতে পারি, কিন্তু আমার আন্তরিকতার অভাব নাই। আমি জানি, তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা চিরদিন আমার সুখ-শান্তি-বিধানের জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু তোমাদের সুখের আদর্শ ও আমার সুখের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিরুদ্বেগে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইবে—এই আশায় আজীবন দাসত্ব করা আমি অসহ্য বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে করি। যাহারা এত অল্পে সন্তুষ্ট, তাহারা সত্যই কৃপার পাত্র। তাহাদের জীবন মৃত্যুর নামান্তরমাত্র।

"তোমরা আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাকুল হইও না, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হইলে, আমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়া যাইতাম। বিশেষতঃ, স্মিট এণ্ড সন্সের চাকরী হইতে বিতাড়িত হইয়াও এই অপমান সহ্য করিয়া এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। বার্থার প্রত্যাখ্যান আমার জীবনের কঠোর অভিশাপ, ইহা আমি এখানে মুহূর্ত্তের জন্ম ভুলিতে পারিতাম না।

"আশা করি, এক দিন তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিব; সুযোগ ও অবসর পাইলেই তোমাদিগকে পত্র লিখিব। যেখানেই থাকি, পরমেশ্বরের নিকট তোমাদের কুশল প্রার্থনা করিব।

"তোমাদের অযোগ্য সন্তান এখন তোমাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিল। তোমরা প্রসন্নমনে তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। তোমাদের মনে কষ্ট দিতেছে বলিয়া যেন পিতামাতার গভীর স্নেহে ও করুণায় বঞ্চিত না হয়—

তোমাদের স্নেহাকাঙ্ক্ষী
হতভাগ্য সন্তান—জোসেফ।"

পত্রখানি লিখিবার সময় পুনঃ পুনঃ তাহার লেখনী কম্পিত হইতেছিল; উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশিতে কয়েকবার তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দুই তিন বার সে তাহার এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতেও উদ্যত হইয়াছিল। অবশেষে তাহার ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হৃদয়ের অন্ধ আবেগেরই জয় হইল।

পিতামাতার সহিত নৈশভোজন শেষ করিয়া সে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল—তখন তাহার হৃদয় আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় এতই বিচলিত ও ব্যথিত হইয়াছিল যে, সে মুখ তুলিয়া তাহাদিগকে কোন কথা বলিতে পারিল না। জোসেফ রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত তাহার বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল; তাহার পর উঠিয়া পত্রখানি টেবলের উপর চাপা দিয়া রাখিল এবং শয়নকক্ষের দ্বার খুলিয়া চারিদিক একবার দেখিয়া আসিল।

হঠাৎ কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে ভাবিয়া সে আর অধিক বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করিল না। সে তাহার টাকার থলিটা বাঁধিয়া লইয়া, পোর্টম্যাণ্টোটা ঘাড়ে তুলিয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল।

তখন গগনমণ্ডল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-স্তরে সমাচ্ছন্ন। শুক্লপক্ষের রাত্রি। খণ্ড খণ্ড মেঘ-স্তরের ব্যবধানে পূর্ণপ্রায় চন্দ্রের আভা এক একবার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, আবার মুহূর্ত্ত পরেই তাহা মেঘান্তরালে অদৃশ্য হইতেছিল। নৈশ সমীরণ শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া, বিশালকায় বৃক্ষগুলির শাখাপল্লব আলোড়িত করিয়া

আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিতেছিল। দুর্যোগ-ময়ী নৈশপ্রকৃতির এই বিষাদভরা হাহাকার জোসেফের হৃদয়ে কি একটা অব্যক্ত বেদনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—মেঘমণ্ডিত ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব তাহারই সঙ্কটসঙ্কুল অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভীষিকাপূর্ণ ভবিষ্যতের আভাস জ্ঞাপন করিতেছে।

জোসেফ বহির্দ্বারে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল; একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে অসীম গগনব্যাপী মেঘের দিকে, একবার সম্মুখের বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের দিকে চাহিল, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার জীবনের সকল সুখ-শান্তি ও আনন্দ এইখানে রাখিয়া, একাকী সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম।" পরমুহূর্ত্তেই সে অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন রাজ-পথ দিয়া কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খেতাবধারী অতিথি

জোসেফ কুরেট প্রত্যহ প্রত্যুষে ছয়টার সময় স্মিট এণ্ড সন্সের লোহার কারখানায় কায করিতে যাইত; এই জন্য তাহার মা মিসেস্ কুরেট সাড়ে পাঁচটার সময় এক পেয়ালা কাফি ও রুটী-মাখন লইয়া পুত্রের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইত। জোসেফ যে রাত্রে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিল, তাহার পরদিন প্রত্যুষে মিসেস্ কুরেট কাফি ও রুটী-মাখন লইয়া যথানিয়মে পুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া জোসেফকে দেখিতে পাইল না। সে জোসেফের শয্যা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল, জোসেফ রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করে নাই। দুশ্চি-ন্তায় তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে ডেস্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই জোসেফের পত্রখানি দেখিতে পাইল। সে কম্পিত হস্তে পত্রখানি তুলিয়া, রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিতে লাগিল এবং পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। সে যে কি করিবে—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাহার স্বামীর নিকটে গিয়া পত্রখানি তাহার হাতে দিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

জোসেফের পিতা সেই সুদীর্ঘ পত্রের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল; ব্যাকুল স্বরে বলিল, "এ যে বড়ই সর্ব্বনাশের কথা!—এখন করা যায় কি?"

মিসেস্ কুরেট বলিল, "আমি ত কোনও উপায় দেখিতেছি না! আমরা কোথায় তাহার দেখা পাইব? কিরূপেই বা তাহাকে ফিরাইয়া আনিব? সে কি অল্প দুঃখে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে?—সেই কামার মাগী তাহার যে অপমান করিয়াছে—তাহা কি সে সহ্য করিতে পারে? উঃ, মাগীর কি অহঙ্কার! যে বেটী আমার জোসেফের জুতা সাফ করিবারও যোগ্য নয়, সে কি না টাকার গরমে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না! পরমেশ্বর জোসেফকে চিরজীবন লোহা ঠেঙ্গাইবার জন্য সংসারে পাঠান নাই, ইহা কি আমি জানিতাম না? জোসেফ মনের ঘৃণায় দেশত্যাগী হইল; সেই বজ্জাত মাগীই এই সর্ব্বনাশের মূল! পরমেশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। জোসেফ যেখানেই যাক, নিজের চেষ্টায় মানুষ হইবে। আমাদের ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার প্রতীক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। সুযোগ পাইলেই সে আমাদিগকে পত্র লিখিবে। বাছা আমার নির্ব্বোধ নয়; আমি তাহাকে বেশ চিনি, সে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।"

জোসেফের সাহস ও আত্মনির্ভরতার শক্তিতে তাহা-দের উভয়েরই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; এ জন্য তাহারা দীর্ঘকাল হাহুতাশ না করিয়া নিজের কাযে মনঃসংযোগ করিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে আনা স্মিট জোসেফের গৃহ-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল। জোসেফকে পদচ্যুত করিয়াও সে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; জোসেফ জুরিচ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। আনা স্মিট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপদটা জুরিচ হইতে চলিয়া গিয়াছে, বাঁচা গেল। সারাকে তাহার ঘাড়ে গছাইবার

চেষ্টা করিয়াছিলাম; আমার সে চেষ্টা সফল হইল না বটে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। টাকার লোভে কত বেটা ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমার কাছে উমেদারী আরম্ভ করিবে। তাহার ভাল বরের অভাব হইবে না; তবে সারা ছুঁড়ী সেই সয়তানটাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তাহার বিরহে ছুঁড়ী বুক ফাটিয়া মরিবে না—তা আমার জানা আছে। যুবক-যুবতীর প্রণয় ছেলেখেলা ভিন্ন আর কি?"

পরদিন ফ্রিজ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার মা'কে জানাইল, তাহার পিতার মামা বার্থার গুণের কথা শুনিয়া তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে; বার্থার জন্য আর কোন চিন্তা নাই। ফ্রিজের কথা শুনিয়া আনা স্মিট নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু 'পিটার মামা' বার্থাকে চোখে চোখে রাখিলেও, বার্থা জোসেফকে পাঠাইবার জন্য যে প্রণয়পত্রখানি লিখিয়া গিয়াছিল, তাহা সে ডাকে দেওয়ার সুযোগ পাইল। সেই পত্রের প্রতি ছত্রে জোসেফের প্রতি বার্থার গভীর প্রেম পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই পত্রখানি যে দিন জোসেফের পিতামাতার হস্তগত হইল, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে জোসেফ গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল; সুতরাং সে বার্থার মনের কথা জানিতে পারিল না। পত্রখানি তাহার হস্তগত হইলে তাহার সঙ্কল্প বোধ হয় পরিবর্ত্তিত হইত; কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়!

আনা স্মিট নিশ্চিন্ত হইয়া সারার জন্য আর একটি সুপাত্র খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু জোসেফের গৃহত্যাগের সংবাদে সারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে জোসেফকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল; জোসেফ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অন্য কোন যুবকের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিবার জন্য আনা স্মিটেরও জিদ্ বাড়িয়া গেল। সে বোধ হয়, তাড়াতাড়ি সারার বিবাহের আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিত; কিন্তু আট দশ দিনের মধ্যেই আনা স্মিট তাহার ছোট ছেলে পিটারের পত্রে একটি অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব শুভসংবাদ পাইয়া এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল যে, সারার বিবাহের সকল উদ্যোগ-আয়োজন চাপা পড়িয়া গেল।

পিটার দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে যখন বিদেশে যাত্রা করে, সেই সময় তাহার মা, কোন খেতাবধারীর বা আভিজাত্য-গৌরবের অধিকারীর বংশধরকে জামাতৃপদে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহাকে সেইরূপ পাত্রের সন্ধান করিতে বলিয়াছিল। মায়ের সেই অনুরোধ বা আদেশ পিটারের স্মরণ ছিল।

আনা স্মিট পিটারের পত্রখানি খুলিয়া জানিতে পারিল, পিটার সেই পত্র কবলেন্স নগরের 'হোটেল-ডু জিয়াণ্ট' হইতে লিখিয়াছিল। সুবিখ্যাত রাইন নদী যে স্থানে 'ব্লু মোসেল' নদীর সহিত মিশিয়াছে, সেই উভয় নদীর সংযোগস্থলের অদূরে কবলেন্স নগর অবস্থিত। জার্ম্মাণীর সমর-বিভাগের একটি প্রধান আড্ডা বলিয়া এই নগরটির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই নগরের সেনাবারিকে বহু সৈন্য বাস করিত। এই নগরের অদূরে নদীর পারে ইরেন্ ব্রেটষ্টিনের পার্ব্বত্য দুর্গ অবস্থিত এবং এই দুর্গ 'রাইনের জিব্রাল-টার' নামে অভিহিত। পিটার কলোন হইতে কব্লেন্সে বেড়াইতে আসিয়া 'হোটেল-ডু-জিয়াণ্টে' বাসা লইয়াছিল। সেখান হইতে তাহার মাতাকে লিখিয়াছিল;—

"মাই ডিয়ার মা, এই সুদৃশ্য প্রাচীন নগরে বেড়াইতে আসিয়া আমার দিনগুলি কি আনন্দে কাটিতেছে ও আমার কি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব? আমার এই আনন্দের সংবাদ ছাড়াও আজ তোমাকে একটা সুখবর দিব—তাহা শুনিয়া তুমি নিশ্চয়ই ভারী সুখী হইবে। তুমি বোধ হয় জান, আমি 'বিলিয়ার্ড' খেলায় ভারী ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছি। পাকা খেলোয়াড় বলিয়া আমার এতই নাম জাহির হইয়াছে যে, অনেক বড় বড় খেলোয়াড় আমার সঙ্গে খেলা করিবার জন্য আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। পরশু রাত্রিতে আমি সমর-বিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে বাজি রাখিয়া খেলা করিয়াছিলাম, আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই রাত্রিতে আমি যাঁহার সঙ্গে খেলা করিয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে আমার ভারী বন্ধুত্ব হইয়াছে। কা'ল

রাত্রিতে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, দুই জনে একত্র বসিয়া কাফি পান করিয়াছি এবং চুরুট টানিতে টানিতে কত গল্প করিয়াছি।—আমার সেই ইয়ারটি বড় যে সে লোক নহেন, তিনি জার্ম্মাণী দেশের একটি 'কাউণ্ট!' তাঁহার নাম কাউণ্ট ভন্ আরেনবার্গ। এখানে যে সেনা-নিবাস আছে, সেই সেনানিবাসের একটা রেজিমেণ্টের তিনি অধিনায়ক। ভয়ঙ্কর বনিয়াদী ঘরের ছেলে, জার্ম্মাণ সম্রাট কৈশরের সহিত ইঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ, কৈশরের খুড়তুতো ভাইএর মামী—ইঁহার খুড়োর শাশুড়ীর পিসতুতো ভগিনী! আমি জুরিচ হইতে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি শুনিয়া কাউণ্ট ভারী খুসী। তিনি বলিলেন, বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার এক মাসীর কাছে জুরিচে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় জুরিচ তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল, সেখানে আর একবার যাইবার জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে আমাদের গৃহে অতিথি হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। মা, তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, জানি না, তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, আমাকে এ আশ্বাসও দিয়াছেন যে, যদি আমি এখানে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করি, তাহা হইলে তিনি মাস দেড়েকের 'ফার্লো' লইয়া আমার সঙ্গেই জুরিচে যাইতে পারেন। আমি তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইয়াছি, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই বাড়ী ফিরিব। অতএব জানিয়া রাখ—এত দিন পরে এক জন সত্যিকার তাজা কাউণ্ট তোমার অতিথি হইতে যাইতেছেন—এত বড় উঁচু দরের 'কাউণ্ট' যে, কৈশর তাঁহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। আনন্দ কর মা, আনন্দ কর! কিন্তু আনন্দের চোটে তোমার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঘর-বাড়ী সাজাইয়া রীতিমত প্রস্তুত হইয়া থাকিও। কাউণ্ট বড়ই সজ্জন, লোকটিকে আমার খুবই পছন্দ হইয়াছে। তোমার কৌতূহল সজাগ রাখিবার জন্যই তাঁহার চেহারা কেমন, তাহা লিখিলাম না। আর এ কথাও বলি যে, আমার এই পত্র পড়িয়া তুমি আশমানে কেল্লা বানাইও না, এবং স্মরণ রাখিও, এই কাউণ্টটির স্ত্রী এবং কতকগুলা ছেলেমেয়ে থাকিতে পারে—আর যুবক না হইয়া তিনি পক্ককেশ বৃদ্ধ হইতেও পারেন, অতএব তুমি উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিবে। এখানে আমাদের ৯।১০ দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দে ও উৎসাহে আনা স্মিটের 'হার্টফেল' করিবার উপক্রম হইল! 'সত্যিকার তাজা কাউণ্ট' তাহার অতিথি হইতে আসিতেছে? কি সৌভাগ্য! কর্ম্মকার-নন্দিনীর জীবনে এত বড় স্মরণীয় ঘটনা আর কখন ঘটে নাই! কোনও 'কাউণ্ট' তাহার গৃহে পদার্পণ করিবে—ইহা যে তাহার স্বপ্নেরও অগোচর!

পত্রখানি পাঠ করিয়া পিটারের উপর একটু রাগও হইল। সে ভাবিল, "ছেলেটা কি গাধা! পত্রে সে এত কথা লিখিতে পারিল, আর কাউণ্টের বয়স কত, চেহারা কেমন, বার্থার সঙ্গে মানাইবে কি না, এ সকল কথার কোন উল্লেখ করিল না! আমি যাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল—তাহা সে আমাকে জানাইল না? কি নিষ্ঠুর! মন, স্থির হও, কাউণ্ট নিশ্চয়ই অবিবাহিত যুবক।"

পত্রখানি আনা স্মিটের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রিজ কারখানায় চলিয়া গিয়াছিল। ফ্রিজকে এই সুসংবাদ জানাইবার জন্য সে ছটফট্ করিতে লাগিল এবং ফ্রিজের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আনা স্মিট কোচম্যানকে ডাকাইয়া 'ল্যাণ্ডোতে' অবিলম্বে ঘোড়া জুড়িতে আদেশ করিল এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কারখানায় উপস্থিত হইয়া ফ্রিজকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। এ সংবাদে ফ্রিজও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু পিটার কাউণ্টের বয়স, চেহারা, স্ত্রী আছে কি না প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য সংবাদ না লিখায় সে তাহার মায়ের মত পিটারের উপর রাগ করিয়া তাহার উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর সে এই মহা-সম্ভ্রান্ত অতিথির সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানের সুব্যবস্থা করিবার জন্য মায়ের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিল। স্থির হইল, কাউণ্টের অভ্যর্থনার জন্য তাহাদের বাসভবন

জেনিভা নগরে যাইবে, সেখানে দুই এক দিন থাকিয়া প্যারিসে যাত্রা করিবে। এই সময় জোসেফের একটি বন্ধু জেনিভায় বাস করিত; তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য জোসেফের অত্যন্ত আগ্রহ হইল।

এই যুবকটির নাম মাইকেল চানস্কি। তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। দুই তিন বৎসর সে জুরিচে স্মিট এবং সন্‌সের লোহার কারখানায় ওভারসিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু চাকরীতে বীতস্পৃহ হইয়া, কিছু দিন পূর্ব্বে সে চাকরী ছাড়িয়া জেনিভায় চলিয়া গিয়াছিল। চানস্কি পোলাণ্ডের অধিবাসী; এই জন্য সে রুস ভাষায় কথা কহিত। জোসেফের পিতা-মাতা রুস ভাষা জানিত, জোসেফ তাহাদের নিকট রুস ভাষা শিখিয়াছিল, এই সূত্রে চানস্কির সহিত জোসেফের বন্ধুত্ব অল্পদিনেই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

মাইকেল চানস্কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সে কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিল, তাহার মত বিদেশীর জুরিচে আসিয়া চাকরী লইবার উদ্দেশ্য কি, সেখানে তাহার কোন আত্মীয়স্বজন ছিল কি না, তাহার বাল্যজীবন কোথায় কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, এ সকল কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না; তাহার মনের কথাও কেহ জানিতে পারিত না। জুরিচে চাকরী করিবার সময় সে একটি 'কাফে'তে দুই বেলা আহার করিত, এক দরিদ্র পল্লীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে একাকী নির্ব্বাসিতের ন্যায় বাস করিত। হঠাৎ এক দিন সে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল; কিন্তু চাকরী ছাড়িবার কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। তাহার কার্য্যদক্ষতায় স্মিট এণ্ড সন্‌স এতই সন্তুষ্ট ছিল যে, সে ইস্তফানামা দাখিল করিলেও তাহারা তাহাকে রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, বেতনবৃদ্ধিরও লোভ দেখাইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার গোঁ ছাড়িল না, চাকরী ছাড়িয়া দিল।

চানস্কি জুরিচ ত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে জোসেফের নিকট বিদায় লইবার সময় তাহার জেনিভার ঠিকানা লিখিয়া দিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, জোসেফ যদি কখন জেনিভায় যায়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে যেন দেখা করে। চানস্কি জেনিভায় গিয়া জোসেফকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত; জোসেফও সেই সকল পত্রের উত্তর দিয়া বন্ধুর মনোরঞ্জন করিত। জুরিচের বাহিরে চানস্কি ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত জোসেফের পরিচয় ছিল না।

জেনিভা জোসেফের সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান হইলেও সেখানে আসিয়া চানস্কির বাসা খুঁজিয়া লইতে তাহার অসুবিধা হইল না। একটি পাহাড়ের ধারে জঞ্জালপূর্ণ দুর্গন্ধময় পথের পাশেই চানস্কির বাসা। এই পথটির নাম 'রুদে এন্‌কার।' সেই পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী ইতর ও অসাধু-প্রকৃতি; গর্হিত উপায়ে তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। পল্লীতে বদমায়েসের আড্ডাও অনেকগুলি ছিল।

জোসেফ দেখিল, তাহার বন্ধুর বাসায় তিনখানি ঘর;—একটি শয়নকক্ষ, একটি বৈঠকখানা, আর একখানি ঘর তাহার কারখানা। এই শেষোক্ত কক্ষে একখানি বৃহৎ টেবল সংস্থাপিত। এই টেবলের উপর, এমন কি, এই কক্ষের মেঝেতেও নানাপ্রকার নক্সা প্রসারিত ছিল। সেই সকল নক্সা কিসের ও কি উদ্দেশ্যে সেগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া না দিলে কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। চানস্কি জোসেফকে হঠাৎ জেনিভায় আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল; কিন্তু বিস্ময় গোপন করিয়া পরম সমাদরে বৈঠকখানায় বসাইল। চানস্কি সুপুরুষ, তাহার দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দু'টিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট। সে য়ুরোপের ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিত। বাহুবলে বা বাক্যকৌশলে কেহ তাহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিত না।

চানস্কি জোসেফকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিল, "এ আনন্দ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব; দিন কতক ছুটী লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছ বোধ হয়? কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, তোমার মনে একটুও সুখ নাই!"

জোসেফ বিমর্ষভাবে বলিল, "দিন কতকের ছুটী নয়, একেবারেই সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া আসিয়াছি! দেখি যদি বিশাল পৃথিবীর কোন অংশে বিস্মৃতি খুঁজিয়া পাই। হয় ত এ জীবনে শান্তি ফিরিয়া

পাইব না, তবে চেষ্টা করিলে উত্তেজনার কোন একটা উপলক্ষ পাইতেও পারি।"

চানস্কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তোমার ও হেঁয়ালী বুঝিতে পারিলাম না। প্রণয়িনীর প্রত্যাখ্যান, না তাহা অপেক্ষাও গুরুতর আর কিছু ?"

জোসেফ বলিল, "হাঁ, কতকটা তাই বটে, কিন্তু সে অনেক কথা, ব্যর্থ জীবনের নিরাশার কাহিনী। সে সকল কথা ক্রমে ক্রমে শুনিতে পাইবে। আপাততঃ একটা সিগারেট বাহির কর, ভাই! তাহার পর একটা 'কাফে'তে লইয়া যাইও, কিছু না খাইলে আর চলিতেছে না।"

চানস্কি সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া জোসেফের সম্মুখে রাখিল, তাহার পর সার্টের উপর কোটটি পরিধান করিয়া, দেওয়ালস্থিত আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া মাথায় বুরুষ বুলাইয়া লইল, এবং টুপী মাথায় দিয়া, একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি প্রস্তুত, চল যাই।"

সুদীর্ঘ, জীর্ণ, সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া তাহারা পথে আসিল। কিছু দূরে হ্রদের তীরে একটি 'কাফে' ছিল। তাহারা সেই 'কাফে'র ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানি টেবল দখল করিয়া বসিল। কাফের একটা চাকর সেই টেবলের উপর একখানি চাদর বিছাইয়া প্রথমেই লোহিত মদ্যপূর্ণ একটি বোতল ও একটা গ্লাস রাখিয়া গেল। জোসেফ সাগ্রহে পিপাসাশান্তি করিল। অনন্তর তাহার আদেশে সুপ এবং মাখনে ভাজা ডিম দেওয়া হইল। দুই বন্ধু তাহা উদরগহ্বরে প্রেরণ করিলে, কয়েকখান রুটী, খানিক তরকারী ও সুমিষ্ট ওমলেট পরিবেশন করা হইল। সকলের শেষে কালো কাফি ও সিগারেট আসিল। নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া জোসেফ প্রকৃতিস্থ হইল।

তখন দিবা অবসানপ্রায়। অস্তোন্মুখ তপনের লোহিত কিরণ হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। আকাশ নির্ম্মল, মেঘসংস্পর্শহীন ; বহু দূরে হ্রদের পার্ব্বত্য তটভূমি শ্যামল তরুরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। নানা বৃক্ষের অন্তরালে সুদৃশ্য উদ্যানভবনগুলির কোন কোন অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহাও ছবির মত সুন্দর। আরও দূরে গিরপাদমূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। অপরাহ্ণের ছায়া ও আলোক সেই সকল পল্লীর শুভ্র অট্টালিকাগুলিকে কি এক বিচিত্র রহস্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। জোসেফ আহারান্তে ধূমপান করিতে করিতে সেই দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিল, "দেখ, কি সুন্দর দৃশ্য!"

চানস্কি বলিল, "তুমি নূতন দেখিতেছ, তোমার ত সুন্দর লাগিবেই। জেনিভার মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য য়ুরোপে বিরল।—সে কথা থাক, এখন তোমার দুঃখের কাহিনীটা বল শুনি। তুমি জুরিচ হইতে চলিয়া আসিলে কেন ?"

সে সময় সে কক্ষে অন্য লোক ছিল না। জোসেফ তাহার দুঃখকাহিনী ধীরে ধীরে চানস্কিকে বলিতে লাগিল। চানস্কি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার সকল কথা শুনিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ চিরপুরাতন কাহিনী আজ নূতন করিয়া তোমার মুখে শুনিলাম। একমাত্র দারিদ্র্য দোষ সকল গুণ নষ্ট করে ; তোমার যতই গুণ থাক, তুমি দরিদ্র ; অতএব ঘৃণা ও উপেক্ষার পাত্র। তোমার বুদ্ধিমত্তা, সাধুতা, ন্যায়পরতা ও মহত্ত্ব সমস্তই অগ্রাহ্য। অর্থই জগতে একমাত্র সার পদার্থ। তুমি কপট হও, প্রবঞ্চক হও, সয়তান হও—তোমার টাকা থাকিলে সে সকল দোষই ঢাকা পড়িবে ; সকলে তোমার পায়ের ধূলা চাটিবে ও তোমায় পূজা করিবে। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি এত অপদার্থ নও যে, এই যুবতীটি তোমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়া বুক ফাটিয়া মরিবে।"

জোসেফ বলিল, "না, আমি বুক ফাটিয়া মরিব না বটে, কিন্তু তুমি বোধ হয় জান—পৃথিবীতে এরূপ পুরুষ কেহই নাই, যে তাহার প্রিয়তমার উপেক্ষায় সম্পূর্ণ অচঞ্চল থাকিতে পারে। তাহার জীবনের পথ নিরাশার যে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়, সেই অন্ধকার অপসারিত করা তাহার অসাধ্য। দরিদ্র বলিয়াই কি আমি ঘৃণার পাত্র ? যাহারা এই অপরাধে আমাকে ঘৃণাভরে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহারাও ত এক দিন আমারই মত দরিদ্র ছিল !"

চানস্কি বলিল, "দেখ জোসেফ, তোমার বয়স এখনও অল্প, মানব-চরিত্রে তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার নাই; এই বহু প্রাচীন বিশ্বের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় নাই, তাহা সৃষ্টির প্রথম দিনের মতই সুন্দর ও মহান্, কিন্তু মানবসমাজের পুনর্গঠন আবশ্যক।"

জোসেফ উৎসাহভরে বলিল, "হ্যাঁ, তাহা অপরিহার্য্য।"

উৎসাহে ও মানসিক উত্তেজনায় জোসেফের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া চানস্কি বলিল, "অত উত্তেজিত হইও না, ভাই! ধৈর্য্যই কঠোর সঙ্কল্পের সুদৃঢ় বর্ম্ম।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারের ছায়া পড়িয়া হ্রদের জল কালো হইয়া উঠিল; নগরের রাজপথে, ধনীর অট্টালিকায়, দরিদ্রের কুটীরে দীপ জ্বলিল; বিভিন্ন অট্টালিকা নরনারীকণ্ঠের গুঞ্জনে, মধুর হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কোন কোন আলোক-সমুজ্জ্বল কক্ষ হইতে গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হইয়া সন্ধ্যার বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চানস্কি সান্ধ্য প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য না করিয়া জোসেফকে আর একটি সিগারেট দিল, এবং নিজেও একটি ধরাইয়া লইল, তাহার পর জোসেফের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "তুমি প্যারিসে যাইবে বলিলে না?"

জোসেফ বলিল, "হ্যাঁ, এখান হইতে প্যারিসেই যাইব।"

চানস্কি। কেন?

জোসেফ। জানি না।

চানস্কি। সেখানকার খরচপত্র চালাইবার মত টাকা আছে ত?

জোসেফ। কয়েকশত ফ্রাঙ্ক মাত্র সম্বল লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।

চানস্কি। কয়েকশত ফ্রাঙ্ক তোমার সম্বল?—যদি কাযকর্ম্ম জুটাইতে না পার, তাহা হইলে এ টাকায় কয় দিন চলিবে? টাকা ফুরাইলে কি করিবে?

জোসেফ। সে কথা ভাবিয়া দেখি নাই; হয় ত অনাহারে মরিতে হইবে। যে সকল কুকুরের মালিক নাই, সেগুলা অনাহারে যে ভাবে পথের ধারে পড়িয়া মরিয়া থাকে, হয় ত আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে; তাহার পর কোন নামহীন কবরে সমাহিত হইব; সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম পৃথিবী হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া যাইবে।"

চানস্কি আবেগভরে বলিল, "পাগল আর কি! যাহারা অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের মত নির্ব্বোধ নও। পথের কুকুরের মত অপদার্থও নও।"

জোসেফ বলিল, "তাহাতে কি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে?"

চানস্কি বলিল, "অন্যের ক্ষতিবৃদ্ধি না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার আছে। প্রণয়িনীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়াছ বলিয়া জীবনটা বিফল মনে করিও না; তোমার পার্থিব স্বার্থে উদাসীন হইও না।"

জোসেফ বলিল, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে, কিন্তু আমি কি, কতটুকু করিতে পারি? যত দিন পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকিবে, তত দিন প্রাণপণে পরের দাসত্ব করিতে পারিব, ইহা আমার জানা আছে। আমার যে কিঞ্চিৎ শক্তি ও বুদ্ধি আছে, তাহার সাহায্যে অন্যের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিব, তাহার বিনিময়ে দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইব; শীতনিবারণের জন্য ছেঁড়া কম্বলও মিলিতে পারে। আমার কঠোর পরিশ্রমের ফল অন্যে ভোগ করিবে আর আমাকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া দেহপাত করিতে হইবে; ইহাকেই কি তুমি বাঁচিয়া থাকা বল? এই লোভেই কি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে বল।"—আবেগ ও উত্তেজনায় জোসেফের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

চানস্কি জোসেফের আরও নিকটে সরিয়া গিয়া, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য খাটো করিয়া বলিল, "তুমি যে কথা বলিতেছ, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিরন্ন নরনারীর উহাই প্রাণের কথা; দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই তাহাদের পক্ষে বিলাসিতার চরম! আমার অভিশপ্তা মাতৃভূমি পোলাণ্ডে, এমন কি, রুসিয়াখণ্ডেও দেখিয়াছি, কোটি কোটি দরিদ্র দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবন কাটাইতেছে, আর মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করিতেছে। ইহার কারণ কি? রুসিয়া পোলাণ্ডের বুকে বসিয়া, লৌহদণ্ডে তাহার গলা চাপিয়া

ধরিয়া, তাহার বুকের রক্ত শোষণ করিতেছে ; তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবারও অধিকার নাই ! রুসিয়ার স্বার্থপর শাসক সম্প্রদায়ের কঠোর বিধান নাগপাশের ন্যায় তাহার হাত-পা শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ অনতিক্রম্য ; শীঘ্রই এমন দিন আসিবে—যে দিন এই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। ইতর জনসাধারণ—সমাজের যাহারা মেরুদণ্ড—আর দীর্ঘকাল জড়ের মত ধূলায় মাথা লুটাইয়া পড়িয়া থাকিবে না ; সমাজের উচ্চ নীচ সকল স্তর সমভূমি করিয়া তাহার উপর সাম্যের বিজয়-নিশান প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে সকল স্বার্থসর্ব্বস্ব ধনী কাঞ্চনকৌলীন্যের গর্ব্বে অধীর হইয়া দরিদ্রের পরিশ্রমের ফল অর্থবলে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহারা ধরাতল হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে এবং অধঃপতিত অভিশপ্ত নিরন্ন মূকের দল বিধাতার অমোঘ বিধানে, তিমিরাবৃত যামিনীর অবসানে প্রাতঃসূর্য্যের নবীন আলোক দেখিতে পাইবে। কারণ, রাত্রির পর দিন—বিধাতার নিয়ম ; তিনি সকলকেই সূর্য্যালোক উপভোগের সমান অধিকার দিয়াছেন। হাঁ, নবযুগের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিয়াছে। যথেচ্ছাচারী শাসক সম্প্রদায় বাহুবলে দীর্ঘকাল তাহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু সেই লৌহদণ্ড তাহাদের হাত হইতে স্খলিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। ক্রীতদাসেরা শীঘ্রই তাহাদের বন্ধন-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া তাহাদের উৎপীড়কগণের লালসা-পূর্ণ লুব্ধ হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। আমি অদূরে নবজাগ্রত বিরাট জন-সমুদ্রের ভৈরব হুঙ্কার স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি।”

আনন্দে উৎসাহে জোসেফের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে স্পন্দিত বক্ষে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “তোমার কথা শুনিয়া আমার মন আশায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, ভাই ! আমিও কত দিন তোমার ঐ সকল কথাই ভাবিয়াছি। তুমি যে নবযুগের কথা বলিতেছ, সেই যুগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য যদি কোন কর্ম্মীর দল গঠিত হইয়া থাকে, আমি সেই দলে যোগদান করিয়া এই মহৎ সঙ্কল্পসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।”

চানস্কি আবেগকম্পিত হস্তে জোসেফের হাত ধরিয়া বলিল, “তোমার সঙ্কল্প প্রশংসনীয়, তোমার কর্ম্মানুরাগ আন্তরিক, চল, আমরা যাই।”—চানস্কি উঠিয়া দাঁড়াইল।

জোসেফ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিঃশব্দে চানস্কির অনুসরণ করিল। ‘কাফে’র বাহিরে আসিয়া, তাহারা পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে চানস্কি নিম্ন স্বরে বলিল, “দেখ, ভাই, আমাদের একটু সতর্ক হইয়া কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু উৎসাহে এতই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম যে, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। আমরা যেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তাহার কিছু দূরে অন্য কুঠরীতে কেহ কেহ বসিয়া ছিল, তাহারা কান পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল ; এক এক বার আড়চোখে আমাদিগকে দেখিতেছিল। আমাদের মনের কথা অন্যে শুনিতে পাইলে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে, এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে।”

তাহারা উভয়ে হ্রদের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। আকাশ নির্ম্মল, মেঘসংস্পর্শহীন ; ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তারকার শুভ্র জ্যোতি হ্রদের নিস্তরঙ্গ বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। গান-বাজনার বিভিন্ন আড্ডায় তখনও গান-বাজনা চলিতেছিল। উভয় বন্ধু নিঃশব্দে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিল, তাহার পর চানস্কি হঠাৎ থামিয়া জোসেফকে বলিল, “কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে জীবন বিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছ ?”

জোসেফ বলিল, “নিশ্চয়ই, এ জীবন কোন সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারিলে সার্থক মনে করিব।”

চানস্কি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে পূর্ণ দৃষ্টিতে জোসেফের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে তোমার সাহস হইবে কি ? এই সম্প্রদায়ে যোগদানের পূর্ব্বে শপথ করিয়া এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে যে, তুমি লক্ষ লক্ষ মানবের দুঃসহ দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য, যুগ যুগ ব্যাপী অধীনতার দুশ্চেদ্য পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির আনন্দ দানের নিমিত্ত, অবিচার, অত্যাচার, হীনতা ও দুর্গতির নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের অভিশপ্ত লাঞ্ছিত জীবন সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, এবং

প্রয়োজন হইলে সেই চেষ্টায় অম্লানবদনে জীবন উৎসর্গ করিবে; সত্য ও ন্যায়ের সম্মানরক্ষার জন্য কোন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে তোমার সাহস হইবে কি?"

জোসেফ বলিল, "সাহস? আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি যে কোন দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য কাপুরুষের ন্যায় সঙ্কল্পে ভ্রষ্ট হইব—আমাকে সেরূপ অপদার্থ মনে করিও না। উত্তেজনাপূর্ণ যে কোন কায পাইব, তাহাতেই আমি প্রবৃত্ত হইব। যে কার্য্যের লক্ষ্য উচ্চ, যাহার ফল আশা ও আনন্দপূর্ণ, অধঃপতিত, অভিশপ্ত, জড়তাগ্রস্ত মানবাত্মার মুক্তি যাহার চরম সার্থকতা, সেই মহদ্‌ব্রতের উদ্‌যাপনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমি মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইব না।"

চানস্কি সাগ্রহে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই, তোমার হৃদয় অতি উচ্চ, তোমার মত লোকরাই মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা সফল করিতে পারে। ধন্য তুমি!"

জোসেফ বলিল, "আমি তোমার তোষামোদ শুনিতে চাহি না।"

চানস্কি বলিল, "আমি সত্য কথা বলিয়াছি, তোষামোদ করি নাই; গুণের প্রশংসা তোষামোদ নহে। এখন বল, কি উদ্দেশ্যে তুমি প্যারিসে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ?"

জোসেফ বলিল, "আমার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই। দেশভ্রমণের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে;—প্যারিস হইতে বার্লিন, ভিয়েনা, লণ্ডনেও যাইতে পারি। এক স্থানে অধিক দিন থাকিতে পারিব না। যদি অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনে আর কখন দাসের মত দিন-মজুরী করিব না।"

চানস্কি জোসেফের কানে কানে বলিল, "আমি তোমাকে এরূপ কায দিতে পারি, যাহাতে তুমি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অথচ একটি মহৎ ও গৌরবজনক কার্য্যে তোমার শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হইবে।"

জোসেফ বলিল, "সত্য না কি? কাযটা কি, শুনি।"

চানস্কি বলিল, "সে কথা এখন তোমাকে বলিতে পারিতেছি না। সে কথা তুমি পরে জানিতে পারিবে। আজ রাত্রিতে তুমি কি করিবে?"

জোসেফ বলিল, "এখন পর্য্যন্ত তাহা স্থির করি নাই।"

চানস্কি বলিল, "রাত্রিতে আমার বাসায় থাকিতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

জোসেফ বলিল, "না, কোন আপত্তি নাই; এখানে আমি আর কাহাকেই বা চিনি?"

চানস্কি বলিল, "আমার ঘরে কোচের উপর তোমার শয়নের ব্যবস্থা করিব; তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আমি যে সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছি, সেই সম্প্রদায়স্থ কোন কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইব। তুমিও আমার সঙ্গে চল। সেখানে যাহা কিছু দেখিবে ও শুনিবে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিও না; কেহ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সতর্কভাবে সংযত ভাষায় তাহার উত্তর দিবে।"

জোসেফ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে চানস্কি তাহাকে সঙ্গে লইয়া অন্যপথে নগরের ভিতর প্রবেশ করিল। একটা গির্জ্জার ঘড়ীতে ঠং ঠং শব্দে দশটা বাজিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নিশি-শেষে

এখনো হয়নি ভোর, ফেলিয়া যাওয়া কি ভালো?
উষার ও আলো নহে, ও তব আঁখির আলো।

সুখ-নিশি ভাঙে নাই, ভেঙেছে যে বুক মোর,
বিদায় কি দিতে হ'বে, ছিঁড়িবে কি বাহু-ডোর?

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী
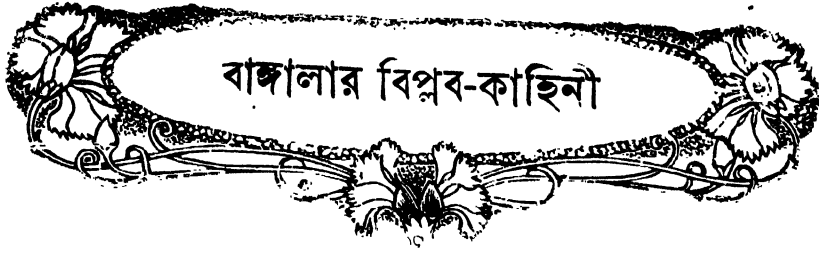
দশম পরিচ্ছেদ

লাট-বধের দ্বিতীয় চেষ্টা

রংপুর থেকে বেরিয়ে পরদিন সকালে গোয়ালন্দে পৌঁছিবার একটা কি দুটো ষ্টেশন আগে গাড়ী দাঁড়ালো। স্যাঙ্কো শুনিল, ভীষণ বন্যার জন্য গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গাড়ী যা'বে না। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে তখন না কি এক বাঁশ জল। যে ষ্টেশনে গাড়ী আটকাল, সেখানেও স্যাঙ্কো দেখিল, রেল লাইন জলে ডুবে আছে। অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে পড়ল। অধিকাংশই বকা-ঝকা ক'রে গাড়ীতে ব'সে রইল। স্যাঙ্কো তখন নেমে গিয়ে, অনেক চেষ্টায় জেনেছিল, হঠাৎ বন্যার জন্য উক্ত লাট-অভিনন্দন স্থগিত হয়েছে; তাই লাট স্পেশ্যাল ট্রেণে কলিকাতা যাচ্ছেন।

তা'রা কল্‌কাতার টিকেট কিনে ফেল্‌লে। সে গাড়ীটা তখুনি পেছন হেঁটে চল্‌ল। মাঝখানে একটা ষ্টেশনে বোধ হয় গাড়ী বদল ক'রে সেই দিন সন্ধ্যে-বেলায়, প্রায় ৬টার সময় তা'রা নৈহাটী ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলে, লাল পাগড়ীতে প্ল্যাটফর্ম্ম ভ'রে গেছে। অনেক পুলিস অফিসারও ঘোরাফেরা করছে। অনুসন্ধানে জেনেছিল, লাটের গাড়ী সেখানে তখনই এসে দাঁড়াবে।

তা'রা কিন্তু মৎলব এঁটেছিল, লাটের আগে কলকাতায় পৌঁছিতে পারবে এবং শিয়ালদা ষ্টেশনে লাট নামবার সময়, সুযোগ দেখে রিভল্‌বার চালাবে। কিন্তু ঐ সুযোগের ধারণা স্যাঙ্কো খুঁটিনাটি মিলিয়ে মিলিয়ে করতে পারছিল না। বোধ হয়, তাই তা'র মনে একটা কিন্তু ছিল। তা'র পর হঠাৎ নৈহাটীতে লাটের গাড়ী দাঁড়াবে ব'লে যাই শুনতে পেল, আর সেখানেই যখন পুলিসের এত ঘটা, তখন কলকাতাতে যে, তা' আরও বেশী হ'বে, এ চিন্তা মুহূর্ত্তমধ্যে তা'র মনে যাই এল, অমনি সেখানেই চেষ্টা করা উচিত মনে ক'রে প্রফুল্ল ও সে নেমে পড়ল।

তখন পুলিস অন্য সব লোকজনকে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। কয়েকটি স্কুলের ছেলে বেড়ার বাইরে ছিল; তবু পুলিস তা'দের কাপড় জামা টিপে তালাসী করলে। স্যাঙ্কো দেখলে, ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন; এবং প্ল্যাট-ফর্‌মের উপর থেকে কোন চেষ্টা একেবারে অসম্ভব।—তাই আবার তড়িঘড়ি একটা মতলব এঁটে ফেললে; যেন পুলিসের ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, প্রবেশদ্বার দিয়ে না বেরিয়ে, বরাবর প্ল্যাটফর্ম্মের দক্ষিণ দিকে লাইনের পাশে পাশে একটুখানি গিয়ে হাঁপ ছেড়ে ব'সে পড়ল। মনে করেছিল, তা'দেরই সামনের লাইন দিয়ে লাটের গাড়ী কলকাতা যা'বে। তাদের সামনে যখন গাড়ী আস্‌বে, তখন নিশ্চয় গাড়ীর বেগ খুব জোরের হ'বে না। কাযেই তারা কোন গতিকে গাড়ীতে উঠে প'ড়ে, দু'জনেই লাটের প্রতি পটাপট গুলী চালাতে পারবে। ব্যাগের ভিতর থেকে দুজনে দু'টী রিভল্‌বার বে'র ক'রে নিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরে লাটের গাড়ী এসে দাঁড়াল; তখনও খুব অন্ধকার হয় নি। লাটের কাম্‌রাতে আলো জ্ব'লে উঠল। গাড়ী কেটে রেখে এন্‌জিন্‌খানা, তা'দের সাম্‌নে দিয়ে লাইন বদলে, আবার ফিরে ষ্টেশনের অন্য দিকে গেল। এ ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করবার মত মনের অবস্থা তখন তা'দের ছিল না। একটুও এদিক ওদিক না ক'রে, কি ক'রে—একটি লাফে একেবারে লাটের কামরাতে উঠে পড়বে, আর কি ক'রে একটুও কোন রকম অভিভূত না হয়ে গুলী চালাতে থাকবে, সাম্‌নের গাড়ীখানার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে

থেকে, আগাগোড়া সেই ব্যাপারটাই মনে মনে বার বার মক্‌স কচ্ছিল। তা'দের উপর পুলিসের নজর না পড়ার বোধ হয় একমাত্র কারণ ছিল—তখনকার পুলিসের এ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। বরং তা'দের চেহারা দেখে পুলিস বোধ হয় ভেবেছিল, তা'রা নেহাৎ হাবাগোবা গেঁয়ো বেকুব। তা'দের দু'দিন নাওয়া হয়নি, খাওয়াও এক রকম না হওয়ার মধ্যে, জুতো ছিল না পায়, জামা কাপড় বিশ্রী ময়লা, বহুদিন যাবৎ দাড়ী কামান বা চুল ছাঁটা আঁচড়ান হয়নি; বিশেষতঃ দু'জনেরই স্বাভাবিক চেহারাই ছিল বদ্‌খত্‌ রকমের। তা'র উপর ভীষণ উদ্বেগ আর বিকট চিন্তায় তা'দের মুখের ভাব এমনই বেয়াড়া হয়েছিল যে, তা'দের দ্বারা যে লাটের কোন রকমে অকল্যাণ সংঘটিত হ'তে পারে, এ কথা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেউ তখন মনে স্থান দিতে পারত না। সদ্য হত্যাকারীর চেহারার বিশেষত্ব সম্বন্ধে তখনকার সাধারণ পুলিস বোধ হয় ওয়াকিবহাল ছিল না। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর পরে, সব ইন্সপেক্টার নন্দলাল কিন্তু এই প্রফুল্লকেই চেহারার বিকৃতি দেখেই ঠিক ধ'রে ফেলেছিল।

খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি শারীরিক শক্তি-সংরক্ষক ও স্ফূর্ত্তিবিধায়ক কাযগুলার অভাবে শরীর বিকৃত হ'লে যে সেই সঙ্গে মনও বিকৃত বা দুর্ব্বল হ'তে পারে, এ কথাটা বিপ্লবীদেরও জানা ছিল না।

যাই হোক, ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে রিভলবার বাগিয়ে ধরতে গিয়ে তারা বুঝেছিল—যেন চালিত যন্ত্রবৎ কায ক'রে যাচ্ছে। গাড়ীখানার কোন্‌ দিকে এঞ্জিন ছিল, তা' দেখ্‌তেই পায় নি। অবশেষে ভোঁ দিয়ে গাড়ীখানা তখন যে দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে চ'লে গেল। তা'রা ত একেবারে হতভম্ব! অবাক হয়ে অনেকক্ষণ থাক্‌বার পরে দেখলে, ষ্টেশনে একটিও পুলিস নাই, সব নিস্তব্ধ; অগত্যা তা'রা ষ্টেশনের দিকে ফি'রে চল্‌ল। তখন তা'দের শরীর ও মনের উপর প্রচণ্ড উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। একটা দুর্দ্দমনীয় অবসাদ ক্রমে তা'দের আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে। কোন গতিকে ষ্টেশনে এসে জিজ্ঞাসা ক'রে, যাই জেনেছিল, লাট হুগলী পুল পেরিয়ে ই, আই, রেলওয়ে ধ'রে সোজা বম্বে রওয়ানা হয়েছেন, প্রফুল্ল অমনই ব'সে পড়ল। তা'র চোখ-মুখের অবস্থা দে'খে স্যাঙ্কো বুঝলে, তা'র অবস্থা কাহিল। তা'র নিজেরও প্রায় সেই দশা। নিকটেই ছিল ফেরিওয়ালা, স্যাঙ্কো একটা সোডা নিয়ে তা'কে খানিকটা খাইয়ে দিয়েছিল, আর বাকীটা চোখে মুখে দিতে প্রফুল্ল একটু সুস্থ হ'ল। মিনিট কয়েক পরেই কল্‌কাতার গাড়ী এসে পড়ল। কোন রকমে টিকিট ক'রে সেই গাড়ীতে কল্‌কাতা পৌছেই ক-বাবুর কাছে গেল। তিনি নির্ব্বিকারভাবে সমস্ত শুনে তা'দের শুধু বাড়ী যেতে বল্‌লেন।

আন্দাজ রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরে, আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে তা'রা স্তম্ভিত হয়ে গেল। সদ্য হত্যাকারীর চুল যে খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, চোখ কোটরে প্রবেশ করে, আর দৃষ্টি কি রকম ভীষণ হয়, নিজেদের চেহারা দেখে সে দিন তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিল।

যাই হোক, এখন থেকে পরবর্ত্তী প্রায় দুই বৎসর যাবৎ এই ধরণের action অর্থাৎ লাট-হত্যার, আর "বিধবার ঘটি চুরির" বিস্তর honest attempt হয়েছিল। কিন্তু একটাও সফল হয়নি। কেন?

দেশকালপাত্রের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কল্যাণ অকল্যাণ-জ্ঞান অর্থাৎ লোকমতেরও পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তা' আমরা ভাবতে পারি না। বরং অনিবার্য্য কারণে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে, যা' কিছু পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে, তা' হাজার বা শত বছর আগে যেমনটি ছিল, ভাল মন্দ নির্ব্বিচারে ঠিক সেই রকমটি ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রায় সমস্ত শক্তির অপব্যয় করছি। এই যে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার," ইহাই বিপ্লববাদের বা যে কোন জাতীয় উন্নতির অনতিক্রমণীয় অন্তরায়।

যে ধরণের যুদ্ধে মানুষ মানুষকে হত্যা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে রকম জিনিষটা এ দেশে বহুকাল যাবৎ একেবারে নাই বললে প্রায় অত্যুক্তি হ'বে না। তা'র উপর আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও কেহ কখনও যুদ্ধে একটাও মানুষ বধ করেছে,

অথবা খালি যুদ্ধ করেছে, এ কথা আমরা কেউ কখনও শুন্‌তে অভ্যস্ত নই। এমন কি, তা'র কোন রকম ধারণা করবার চেষ্টাও 'আমরা কখনও করিনি, অথবা তা'র কল্পনা করবার প্রবৃত্তিও আমাদের কখনও হয়নি। বিশেষ ক'রে হিন্দুদের মধ্যে।

তা' ছাড়া নারীর নিকট সম্মান বা আদর লাভের বাসনা পুরুষ-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা সকল জাতির মধ্যে স্মরণাতীত কাল হ'তে এ যাবৎ পুরুষদিগকে যুদ্ধ-প্রিয় করবার প্রধানতম উপাদান। পরন্তু সৈন্য বা যোদ্ধা যে প্রকারান্তরে পেশাদার নরঘাতক, এ কথা অতি সত্য হ'লেও কোন দেশের লোক, এমন কি, স্ত্রীলোক-রাও, এহেন ছোট বড় যোদ্ধামাত্রকেই যখন বীরের পূজা বা শ্রদ্ধা জানায়, তখন তা'রা যে নরহন্তা, সুতরাং বীভৎস ও পাপী, তা' কিছুতেই মনে আনতে পারে না। অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, পুরুষদের মনেও খালি যুদ্ধের নামেই নরহত্যার বিভীষিকা জেগে উঠে,--যেহেতু, আমরা আধ্যাত্মিক জীব। অবশ্য এ কথা দুনিয়ার অন্য লোক বিশ্বাস না করলেও নিত্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, ভারতবাসী ভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় আধ্যাত্মিকতার খাঁটি মাল-মসলায় গঠিত। সেই হেতু আমাদের সঙ্গে অন্য দেশের অনাধ্যাত্মিক মানুষের তুলনাই হ'তে পারে না। কাযেই মানুষ মারা যুদ্ধ কখনও আমাদের আধ্যাত্মিকতা-সম্মত ব'লে বিবেচিত হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইহাও সকলে স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের অথবা অন্য যে কোন দেশের পৌরাণিক যুগের এবং ঐতিহাসিক যুগের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন সংগ্রামে, যে যত বেশী নরহত্যা করতে পেরেছে, সে তত বড় যোদ্ধা, সেই হেতু সে তত বড় বীর, তত অধিক পূজ্য, তত পূর্ণ মানব-রূপী ভগবান্ বা অবতার, দেবতা, ঋষি, মহাপুরুষ, ধার্ম্মিক ইত্যাদি।

তা' হলেও এ কেউ নেহাৎ মিথ্যা বল্‌তে পারবেন না যে, কয়েক শতাব্দী ধ'রে অহিংসাবাদ এমনই আমাদের অস্থিমজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে (কচিৎ পাঁঠা ছাড়া আর বিশেষ ক'রে বাঙ্গালা দেশে মাছ ছাড়া) কোন খাদ্য প্রাণি-হত্যা করতে দেখে, এমন কি, শুনেও আতঙ্কে শিউরে উঠা হিন্দুদের ধার্ম্মিকতার একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ বিনা উত্তেজনায় জীবন্ত মানুষ, এই রকম অহিংস-আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে হত্যা করা, বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে যে কি রকম বিষম ব্যাপার, তা' থেকে তা' সহজে অনুমেয়।

অবশ্য, আমরা এ কথা বলছি না যে, বাঙ্গালী আজ-কাল কোন রকম নরহত্যা করে না। আমরা জানি, নরহত্যার অপরাধে দণ্ডিত হয়ে প্রতি বছর বিস্তর নরহন্তা ফাঁসিতে ঝুলে, জেলে ও দ্বীপান্তরে যায়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশ থেকে যা'রা উক্ত অপরাধে দণ্ডিত হয়, তা'দের মধ্যে অধি-কাংশই "অভাগিনীর বক্ষে ছুরী হানে" অর্থাৎ নারী-হন্তা। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের দণ্ডিতদের মধ্যে অনুপাতে এত নারীহন্তা দেখা যায় না। যাই হোক, ব্যক্তিগত স্বার্থ, আক্রোশ বা শত্রুতাজনিত সদ্য উদ্দীপ্ত প্রচণ্ড উত্তেজনাবশে নরহত্যা পৃথক্ কথা। আর বৈপ্লবিক নরহত্যা যে বাঙ্গালা দেশে হয়নি, তাও নয়। কিন্তু যতগুলা নরহত্যা বা ডাকাতির honest attempt করা হয়েছিল, তা'র অকৃতকার্য্যতার তুলনায় যে কটা সংঘটিত হয়েছে, তার সংখ্যা নেহাত কম। তাও হয়েছিল বহুকাল যাবৎ বার বার প্রাণপণ চেষ্টার ফলে, আর বেচারি নেটিভদের বেলায়। কিন্তু অনেকে অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য কি রকম ধেড়িয়েছিল, তা' সাধারণের অজানিত।

ফল কথা, পৃথিবীতে যত উল্লেখযোগ্য জাতি আছে, তা'র মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে মানবহিতের অথবা দেশ-হিতের জন্য অনিবার্য্য নরহত্যা করবার মত যোদ্ধৃ-সুলভ মনোভাবের অভাব সব চেয়ে বেশী। এই মনোভাব বৈপ্ল-বিক হত্যাকালীন পূর্ব্বোক্ত অবসাদ বা দুর্ব্বলতা অর্থাৎ আত্মসংযমের অভাবে অত্যধিক স্নায়বিক চাঞ্চল্যে অভি-ভূত হয়ে পড়ার প্রধানতম কারণ। আর এই দুর্ব্বলতাই পরবর্ত্তী লাটবধের চেষ্টায় ভুল-ভ্রান্তিরও কারণ।

কেউ বলতে পারেন, আমাদের স্যাঙ্কো আর প্রফুল্ল, মাত্র এই দু'জনের অবস্থা থেকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়! তা'

না-ও হ'তে পারে। কিন্তু এই গত বিশ কি বাইশ বছরের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁ'দের মন, এ দেশের কারুর থেকে বেশী দুর্ব্বল ছিল না। আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর মত জাতির পক্ষে এ রকম দুর্ব্বলতার হাত এড়াতে হ'লে ভিন্ন রকমের আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তা'র মধ্যে জেগে থেকে, দুদশ বছর নয়, বহু যুগব্যাপী এ বিষয়ের শিক্ষা ও দারুণ অভ্যাস আবশ্যক। তখনই এ দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি সার্থক হ'তে পারে।

দেড় শত বছরের যে ইংরাজ আমাদিগকে স্বরাজ-ভোগের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেনি ব'লে আমরা এত অনুযোগ করি, সেই ইংরাজ সরকারই জাতিকে এই অতিবড় অভিসম্পাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য তবু অনেক চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠনের চেষ্টা কিছু দিন আগে বিশেষ ক'রে হয়েছিল; তা'র পর অনেক বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সে চেষ্টা এখনও চলেছে কেবল ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। যাই হোক, বাঙ্গালার কর্ত্তাদের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নাই। কারণ, জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হ'লে মানুষমাত্রেই দেশ বা আত্মরক্ষার জন্য যে সামর্থ্য অবশ্য থাকা চাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী জাতি তা' অতি তুচ্ছ মনে করে। তা'র বদলে অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিকশক্তির (Soul force) দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য-সাধন ক'রে মানব জাতিকে শক্তির এক অভূতপূর্ব্ব পন্থা দেখানই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে! কাযেই কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হ'বে, এখন আমাদিগকে তারই প্রতীক্ষা করবার সামর্থ্য লাভের জন্যই সাধনায় রত থাকতে হ'বে—অন্ততঃ শত যুগ।

যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় কিন্তু আমাদের মধ্যে এই অতি মহৎ লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই কুবুদ্ধির প্ররোচনায় মনে ক'রে ফেলেছিলাম যে, যে কোন জাতির ইতিহাসে, পুরাণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বা রূপ-কথায় অন্যায়ের প্রতীকার বা অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশ বা স্বার্থরক্ষা করবার যে একটামাত্র সনাতন শেষ উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তা' হচ্ছে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ আমাদিগকে অগত্যা করতেই হ'বে ব'লে তা'র প্রথম আয়োজন যা' চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী অতি গোপনে অনুষ্ঠেয়—আজকালকার ভাষায় যা'কে বলে গুপ্ত সমিতি —তা' কোন প্রকারে গ'ড়ে তুলতেই হ'বে। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উক্ত সমিতির কায চল্‌লে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। এর জন্য বিদেশে গিয়ে বিপ্লববাদের কোন কিছু শিখার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, সে ধারণা আমাদের ত ছিল-ই না, কর্ত্তাদেরও ছিল না। যুদ্ধের অস্ত্র খালি হাতিয়ার গোপনে সরবরাহ করা, আর বোমা, গোলা, গুলী আদি তয়ের করতে বিদেশ থেকে শিখে আসা যে আবশ্যক, সেই কথাই আমাদের বোঝান হয়েছিল।

কিন্তু ঐ সময়ের প্রায় দু'বছর আগে থেকে একটা প্রবল দুরাশা আমার ঘাড়ে চেপেছিল যে, আমেরিকায় গিয়ে ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবলদীর মত অথবা তথাকথিত সুরেশ বিশ্বাসের মত যুদ্ধবিদ্যাটা রীতিমত শিখে, ভারত স্বাধীন করবার বিলকুল তোড়জোড় অস্ত্রশস্ত্র সমেত, এক দিন শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে, কেন্দ্রে বৃহস্পতিকে চড়িয়ে, দেশে ফিরে এসে একদম রক্তগঙ্গা ছুটিয়ে দোব। অর্থাৎ কিনা আমার দুরাশার দৌড়টা ছিল, প্রবাসী ভারতবাসী দ্বারা গঠিত Indian Legion আর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রণসম্ভারপূর্ণ এক বহর রণতরীতে ভারতীয়া মহিলাদের দ্বারা কারুকার্য্যখচিত স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে, অতর্কিতভাবে ঘোড়ামারা দ্বীপটা দখল ক'রেই দমাদ্দম তোপের উপর তোপ দেগে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই ফন্দিটা অবশ্য মনে মনেই ছিল। তখন কিন্তু ভারতের গ্যারিবল্দী হওয়ার সাধটা আমাদের মধ্যে অনেকেই মুখ ফুটে প্রকাশ ক'রেও বেশ তৃপ্তি লাভ করত।

কিন্তু ক্রমেই গুপ্ত সমিতির কার্য্যকলাপের মধ্যে থাকতে থাকতে নেতাদের স্বরূপ যতই হৃদয়ঙ্গম হ'তে লাগল, ততই তাঁ'দের ভারত স্বাধীন করবার মুরোদ সম্বন্ধে চোখ ফুটতে লাগল; আর সেই সঙ্গে আমারও বড় সাধের জাঁদরেলীর আশা ঘুরে আস্‌ছিল। অবশেষে, এমন কি, গুপ্ত সমিতি গঠনেরও সামর্থ্য, ক'বাবুর কিংবা অন্য কোন নেতার ছিল কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ জন্মেছিল। তখন বেশ বুঝেছিলাম, এর জন্য

বহুকাল যাবৎ দস্তুরমত হাতে কাযে শিক্ষা চাই। এ দেশে সে শিক্ষার সুযোগ মোটা অসম্ভব। এর বছর-খানেক আগে অবধিও বিশ্বাস ছিল, মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে খুব পাকা রকমের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কায চল্‌ছে। কিন্তু সে সব যে কেবল চালিয়াতি, তা' তখন বুঝে ফেলেছিলাম।

শুনা ছিল, রাসিয়াতে গুপ্ত সমিতির অতি প্রকাণ্ড কারবার চলছে। আর তাদের শাখা-সমিতি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশেও আছে। কোন দেশের ভাষা নতুন ক'রে শি'খে, সে দেশে এই রকম সমিতি খুঁজে নিয়ে, তা'র সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। তা'র পর ইংলণ্ডে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা হ'বে মনে ক'রে, আমেরিকা যাও-য়াই স্থির করেছিলাম। আর পূর্ব্ব হতেই আমেরিকার দিকে একটা টান ছিল।

এক জন জুড়ীদার জুটেছিলেন। তিনি নেতাদের অভিপ্রায়মত হাতিয়ার সংগ্রহ আর বোমা, বারুদ আদি প্রস্তত করা শিখবার জন্য নাকি আমেরিকা যাচ্ছিলেন। দু'মাস আগে একসঙ্গেই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অনেকগুলি সাধারণ শিল্পশিক্ষার্থীর সঙ্গে যাচ্ছি-লেন ব'লে এবং হঠাৎ আমি সমিতির কোন বিশেষ কাযে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় তাঁ'র সঙ্গে যেতে পারিনি।

দুই এক জন আত্মীয়বন্ধু স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে অর্থ-সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁ'রা জানতেন না যে, আমি কি রকম ভীষণ মৎলবে যাচ্ছি। তাঁ'দের কেবল জানিয়েছিলাম, আমি কোন একটা শিল্প শিখতে যাচ্ছি! তাই তাঁ'রা ক্ষুন্ন হ'লেও তাঁ'দের স্নেহের দান দুটি কারণে, সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রথমতঃ আমি এক দিন পুলিসের হাতে বাঁধা পড়ব, আর সেই সঙ্গে আমার সম্ভ্রান্ত সাহায্যকারীরাও যে সমানে লাঞ্ছিত হবেন, তা' বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। পরে কাযেও তাই হয়েছিল অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও কোন নির্লিপ্ত ভদ্র লোককে অকারণ যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

হয় ত ঐ সময় দেশের কাযের নাম ক'রে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চাঁদা সংগ্রহের বিস্তর ফণ্ড বা তহবিলের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সকল ফণ্ডের নাম ক'রে যে সে যেখানে সেখানে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা খুলেছিল। প্রথমে আমরাও খুব আগ্রহের সহিত দেশের প্রভূত মঙ্গলের আশা ক'রে সাধ্যমত চাঁদা আদায়ও করেছি, দিয়েওছি। কিন্তু কিছু দিন পরে অনেক স্থলে সেই সংগৃহীত অর্থের অত্যন্ত অপব্যয় প্রত্যক্ষ ক'রে স্থির করেছিলাম, অর্থের সদ্ব্যয় সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় না হয়ে কখনও স্বদেশী কাযের নামে কাউকে টাকা দো'বও না, আর কারুর কাছ থেকে নোবও না। অধিকন্তু এও স্থির করেছিলাম যে, নিজের সম্পত্তি যা কিছু, আর তার পর সাধ্যমত চেষ্টার দ্বারা নিজের রোজগারের যা কিছু, তা আগে দিয়েও যদি দেশের কোন কাযে আরও টাকার অভাব দেখি এবং কারও প্রদত্ত টাকা, সে অভাবপূরণে নিশ্চিত ব্যয় হ'বে, আর দাতাকে সে জন্য বিপন্ন হ'তে হ'বে না, এ বিষয়ে যদি নিশ্চিত হ'তে পারি, তবেই অন্যের প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য নোব, নচেৎ নয়।

যাই হোক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ফ্রান্সের মার্শাল বন্দর পর্য্যন্ত টিকিট কিনে ফেল্‌লাম। কলম্বো থেকে জাহাজে য়ুরোপ হয়ে আমে-রিকা যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল। তখন পাশপোর্টের হাঙ্গামা ছিল না।

সেই সময় ইংলণ্ডের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক্ ফেডা-রেসনের বিখ্যাত নেতা এবং ম্যাজিনীর বন্ধু মিঃ এচ, এম, হাইণ্ডম্যানের সম্পাদিত "জাস্টীস্" নামক পত্রিকা, স্বনামখ্যাত বিপ্লবপন্থী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাজী কৃষ্ণ-বর্ম্মা মহাশয়ের "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী" এবং আমেরি-কার "গেলিক আমেরিকা" নামক পত্রিকার সহিত আমাদের "যুগান্তরের" আদান-প্রদান চলত! "যুগা-ন্তরের" আদর্শের প্রতি ঐ পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদকগণের না কি প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল। এ-ও তখন শুনেছিলাম, উক্ত পণ্ডিতজী ছাড়া অন্য দু'জন মহাপুরুষের না কি ভারতকে একেবারে স্বাধীন ক'রে দেওয়ার সাধু ইচ্ছাও ছিল। এর এক বছর পরে কিন্তু মিঃ হাইণ্ডম্যানকে বল্‌তে নিজ কানে শুনেছি যে, ইংলণ্ডের অধীনে ভারত শুধু স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়ারই আশা করতে পারে।

যাই হোক, আশা করেছিলাম, 'যুগান্তরের' নাম ক'রে

গেলে এঁদের আন্তরিক সাহায্য নিশ্চয় পাব, আর তা হ'লেই ভারত-উদ্ধারের সমস্ত তদ্বির ক'রে ফেলতে পারব। তাই এঁদের নামে তিনখানি পরিচয়-পত্র পেয়ে বড়ই ধন্য হয়ে গেছলাম।

তা ছাড়া—কলম্বো যাওয়ার পথে কটক, মাদ্রাজ, কইম্বাটুর ও তুতিকোরিনে না কি এক একটা বিপ্লব-কেন্দ্র ছিল ব'লে কর্ত্তারা জাঁক করতেন। ঐ সকল কেন্দ্রের নেতাদের নামে এবং আরও জনকয়েকের নামে পরিচয়-পত্র সংগ্রহ ক'রে তুতিকোরিন পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকেট কিনে ফেললাম।

বিলাতে যাচ্ছি ব'লে আমার গুণগ্রাহী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আদর কাড়াবার তীব্র বাসনাকে অতি কষ্টে জলাঞ্জলি দিয়ে, কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুর সমিতির দু' এক জন বিশেষ সভ্যের নিকট বিদায় নিয়ে মামার বাড়ীতে দু'দিন ছিলাম। হঠাৎ বিলাত যাওয়ার একটা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে মনে মনে স্ত্রীপুত্র-কন্যা আদি স্বজনের নিকট একরকম চিরবিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কটকে দু'দিন যাবৎ অনেক চেষ্টা ক'রে গুপ্ত সমিতির কিছুই খুঁজে পেলাম না। সেখানে যাঁর নামে পরিচয়পত্র ছিল, তাঁ'র সঙ্গে পরিচয়ে জেনেছিলাম, তখনকার চরমপন্থী বলতে যা বুঝায়, তিনি তাই ছিলেন। তাঁ'র মতাবলম্বী কয়েকটি ছাত্র ও অন্য ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁ'দের মধ্যে কয়েকজন 'যুগান্তরে'র গ্রাহক ছিলেন, আর আগ্রহ সহকারে তা পড়তেন। সেখানকার কলেজের জনকত উদারপ্রকৃতি ছাত্রের আতিথেয়তাতে বিশেষ বাধিত হয়েছিলাম। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠন করবার উপদেশ আর স্বদেশপ্রীতির বচন দিয়ে আতিথ্যের ঋণ শোধ দিয়েছিলাম।

তা'র পরে মাদ্রাজে আর তুতিকোরিনে এক এক দিন ছিলাম। উল্লিখিত পরিচয়-পত্রের ঠিকানা অনুযায়ী কোন লোকের সন্ধান পেলাম না। তুতিকোরিন হ'তে জাহাজে ক'রে কলম্বো পৌঁছে চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করবার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় ১৩ই আগষ্ট য়ুরোপে রওয়ানা হয়েছিলাম।

য়ুরোপে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, তার অনেক বিষয়, মনে হয়—আপাততঃ অপ্রকাশ থাকাই সমীচীন। অতঃপর সেখানকার ব্যাপার সংক্ষেপে সারবার চেষ্টা করব। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

গোলাপ

গোলাপ, ও তুই কোন্ রূপসীর প্রলাপ লো!
সুন্দরীদের দর্পভাঙা
পাপ্‌ড়ি যে তোর কোমল, রাঙা,
পরূত তোরে পরীর রাণী, জড়িয়ে জরীর কলাপ লো!
কোন্ রূপসীর মনের আশা, প্রলাপ ভাষা গোলাপ লো!

শিল্প-শালায় স্বর্গে হ'লে কল্পিত;
শিল্পী, তোমায় তিলে তিলে
তিলোত্তমা সাজিয়ে দিলে;
সুন্দ, উপসুন্দ অসুর তোমার দ্বারাই লাঞ্ছিত!
সুন্দরীদের বন্দনা যে গন্ধে তোমার উদ্গীত!

তরুণ রূপ—দক্ষ মনের আনন্দে
তরুণীদের সরম-সুখে
রাঙলো তোমার নরম বুকে,
কনক স্বপন ধরিয়ে দিয়ে ভরিয়ে দিল সুগন্ধে!
কবির মানস-কমল-কলি, ফুটলে কোটি সুছন্দে!

ধূলায় ভরা ধরায় সুধা সঞ্চারো!
তরুণ মনের মণি-কোঠায়
চুম যে তোমার কুসুম ফোটায়,
ঘুম-ভরা ঐ নীরব রূপের নিঝুম বীণা ঝঙ্কারো!
পরশ যে তার সরস ক'রে ঊষর হিয়া ঝঙ্কারো!

উর্ব্বশীদের গর্ব্ব ছিলে স্বর্লোকে—
উরস-দোলা তাদের হারে
দুলতে স্বপন-লোকের পারে,
মানব-লোকের সঙ্গে কখন মিলন হ'ল চার-চোখে?
মূর্ত্তি নিয়ে মর্ত্ত্যে এলি, ম'রতে হ'বে হায় তোকে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

দেবস্থান দর্শনে যাবার সময় যে স্ফূর্ত্তি ছিল, এখন যে ঠিক তা'র reaction (প্রতিক্রিয়া) দেখা দিয়েছে। কারুর মুখে কথাবার্ত্তা বা হাসি-খুসীর আভাসমাত্র নেই, সকলের মুখেই ভয়-ভাবনার ভাব। মাতঙ্গিনী মস্ত একটা সন্দেহে প'ড়ে গেছেন।

আচার্য্য ঠাওরালেন—এ ভাব ত ভাল নয়, এরা কল্‌কেতার লোক,—কেবল কেতার ওপর স্থিতি। এরা মোলেও 'গোড়ে' গলায় দিয়ে নিমতলায় যায়, এরা রঙ্গ-মঞ্চের বীর—চালের উপর পাল তুলে বেড়ায়,—সব কাযে কায়দা আর ফায়দা চাই। কথাটা বেশ মধুর ভাষায় কয়,—মনে জানে, কথা ত কেবল কইবার তরে,—রাখবার তরে নয়।

আধ গ্যালন চা নিঃশব্দে চ'লে গেল। আচার্য্য বুঝলেন, গতিক সুবিধের নয়,—ভাল্লুকই ভড়্‌কে দিলে দেখছি। তিনি নিজেই তখন আরম্ভ করলেন,—"জগতে লোক চেনা বড়ই কঠিন,—ক'দিন বাজিয়ে নিয়ে বুঝেছি, পূজারীটি একটি মস্ত বড় সাধক, সম্প্রতি নাগ-পাশ-সিদ্ধি অভ্যাস করছেন। শিবার প্রথম ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই আসনে বসতে হয়—তাই সকলকে সরিয়ে দিলেন,—ভাল্লুক-টাল্লুক কথার কথা মাত্র। ওরা ত ওঁর কাছে যোড়হাত। আমার কাছে দিগ্‌বন্ধন বীজটি আদায় করবার চেষ্টায় আছেন, বলেছি, মহাষ্টমীই প্রশস্ত দিন,—আমাদের কাযটি হয়ে গেলেই ব'লে দেব। এখন বাছাধন আমার মুঠোর ভেতর।"

মাতঙ্গিনী নিরুল্লাস মুখেই বল্লেন,—"ওতে কি হয়?"

আচার্য্য উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন, "ওই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যতদূর ঘুরে গণ্ডী দেওয়া হয়, তা'র মধ্যে একটি মাছি-মশাও ঢুকতে পারে না,—ভাল্লুকের বাবা জাম্বুবানেরও সাধ্য নেই সে বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে,—সে যেন আগুনের বেড়া—ঘেঁসেছে কি মেড়া-পোড়া। এ জানা না থাকলে কি সাঁচ্চা সাধুরা পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করতে পারতেন।"

কিন্তু এতেতেও মজ্‌লিস মোশমুক্ত হ'ল না,—স্বচ্ছন্দ্য দেখা দিলে না। কারণ, প্রকৃত মোশটি ছিল ভাদুড়ী-মশায়ের শরীরে, আর তা'র জানটি ছিল মাতঙ্গিনীর মনে,—সেটা ভাল্লুক নয়।

সকলেই ভাদুড়ীমশায়ের মুখ চেয়ে ছিলেন; শেষে তিনি বললেন, "সব ত বুঝলুম,—সস্তাও বটে,—কিন্তু সুবিধে কই? ভাল্লুকের ভাবনা মিটলেই ত মানুষের সব ভাবনা মেটে না। ওই যে বললেন—'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত,' তা'র ম্যাও ধরবে কে? তা'র মানে ত মাটীতে প'ড়ে চৌচাপটে চ্যাপ্‌টা প্রণাম! আমি ত কাগজে আঁকা পট নই যে, চেপ্টে দেবে! মূল্য ধ'রে দিলে হয় ত বল,—তারিণী আছে।"

মাতঙ্গিনী এই ভয়টিই করছিলেন,—তাই নীরব ছিলেন।

আচার্য্য বলতে যাচ্ছিলেন—"হ'বে না কেন, অসমর্থ পক্ষে সকল ব্যবস্থাই আছে।" কিন্তু মাতঙ্গিনী মাথা নেড়ে বললেন, "সে চেষ্টা কি আমি পাইনি? পূজারী বললেন—'সে সব ছোট-খাট মানতে চলে। এত বড় অভীষ্ট লাভ করতে হ'লে এ কষ্টটুকু স্বীকার ওঁকে করতেই হবে;—আমি ফাঁকির পয়সা নিয়ে দেবতার বদ্‌নাম কিনতে পারব না,—তা'তে তোমাদের কায হ'বে না'।"

অত বড় ভাল্লুকের ভণিতা ভেসে যাওয়ায় আচার্য্য মুশ্‌ড়ে গিছলেন, এবার পূজারীর মুখ খুমিতে একদম্‌ হতাশ হয়ে ভাবলেন—"সাঁওতালী যুধিষ্ঠির বেটা মাঝ-দরিয়ায় ডোবালে দেখছি! এ জাহাজী যজমান বানচাল্‌ না হয়!"

মাতঙ্গিনী কাতরভাবে স্বামীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সুরু করলেন,—"কষ্ট ত হবেই বুঝছি, তা' একবারটি—"

ভাদুড়ীমশাই মুখে একটু ম্লান হাসি এনে মাতঙ্গিনীকে বললেন,—"একবারটি কি,—ওই সাষ্টাঙ্গ? ওতে ত

একবারই আড়ষ্টাঙ্গ আর সাঙ্গ,—দুবারটির তরে আর 'পাচ্ছ কা'কে ?"

মাতঙ্গিনী রোষভরে বললেন,—"তোমাকে ও সব অলুক্ষুণে কথা মুখে আনতে হ'বে না ত,—তোমার কিছু ক'রে কায নেই।"

ভাদুড়ী বলিলেন, "তুমি রাগ কচ্ছ কেন গো, পারলে আমার কি অসাধ ? ওইখানেই ত শেষ নয়, আবার তিন "গড়ান্" ফাউ দিতে হবে !"

নবনী ভাবছিল, তা'র একটা কিছু বলা উচিত, তা-না তো দিদিই বা কি মনে করবেন, কিন্তু পাছে সে হেসে ফেলে, তাই চুপ ক'রে ছিল। এবার কিছু না ভেবে চিন্তেই চট্ ক'রে ব'লে বস্‌ল, "ওটা আর শক্ত কি ?"

সঙ্গে সঙ্গেই ভাদুড়ীমশাই ব'লে উঠলেন, "হ্যাঁ রে শা,—পাটের গাঁঠ পেয়েছ কি না—গড়ালেই হ'ল !—এ তোমার জ্যামিতির মেনে নেওয়া "দত্ত গোলাকার" (given circle) নয় !"

তাঁ'র স্বরে আর সুরে রোষ বা বিরক্তিভাব ছিল না, বরং তা'তে একটু রহস্যের রেশই ছিল। তাই তাঁ'র কথাটাকে উপলক্ষ ক'রে সকলে হেসে বাঁচলো। এতক্ষণ নিরোধ পীড়াটা সকলেই ভোগ করছিলেন।

বিষয়টা বস্তুতঃ খুবই করুণরসাত্মক ছিল, লোক কিন্তু পাত্র ও অবস্থাবিশেষে সেটাকে হাস্যরসপ্রধান ক'রে নিতেই ভালবাসে, কারণ, মানুষের স্বভাব আনন্দ-টাই চায়। মুখ টিপে গম্ভীর থাকবার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেল, মাতঙ্গিনীর চক্ষুতে সলজ্জ হাস্য-রেখা সুস্পষ্ট !

ভাদুড়ীমশায়ের মেজাজটা মোলায়েম পেয়ে নবনীর উৎসাহ বেড়ে গেল, সে বল্‌লে, "পাঁচ বছর ত ঘাস কেটে আসিনি, পাহাড়ে পর্ব্বতে তোপ তোলবার পথ বানিয়ে এলুম—আর সাষ্টাঙ্গে প্রণামের সহজ উপায় ক'রে দিতে পারব না ? ও ভার আমার রইল। পাতালে কয়লার খনিতে বয়লার ফিট্ করে—এই ইঞ্জিনীয়াররাই। পাঁচ মাইল লম্বা লোহার পোল একটিমাত্র থামের উপর বসালে কে !"

এই শুনে মাতঙ্গিনী যেন শতহস্তীর বল পেয়ে ব'লে উঠলেন, "ও মা ! তাই ত, ও যে ইঞ্জীনীয়ার—তবে আবার ভাবনা কি !"

ভাদুড়ীমশাই বললেন,—"ও ইঞ্জিনীয়ার বটে, কিন্তু আমি ত লোহাও নই, পথ-ও নই যে, যেখানটা বাদ দেবার দিলে, বেদরদ্ হাতুড়ি পিট্‌লে, শেষ কুপিয়ে চেঁচে ছুলে টেনে হিঁচড়ে পেড়ে ফেল্‌লে ;—বাহবা প'ড়ে গেল। এ যে জ্যান্ত জিনিষ,—এতে কান্না প'ড়ে যাবে।"

মাতঙ্গিনী বললেন,—"তোমার কেবল ওই সব কথা, ইচ্ছে নেই, তাই বল। তা' ব'লে এত সুবিধে—এমন যোগাযোগ কারুর হয় না।"

ভাদুড়ীমশাই অগত্যা বললেন, "তবে হোক্,—ওহে নবনী, আগে একটা নক্‌শা বানিয়ে আমায় দেখিও।"

নবনী বলিল, "কা'ল সকালেই পাবেন।"

এতক্ষণে আচার্য্যের একটু আশার সঞ্চার হ'ল, তিনি বললেন, "তা' দেখাবেন বই কি, উনি ত শুধু ইঞ্জিনীয়ার নন—আপনার পরম আত্মীয়। ওঁর ত আর কায সারা নয়—আপনার মঙ্গলটা আগে দেখা। এত বড় কায উপায় থাকতে অবহেলায় ছাড়তে নেই। ওদিকে শাস্ত্রও বলছেন—পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্—তা' হ'লে পুৎনামক নরক সম্বন্ধে একেবারে খোলসা—আহা—সে কি কম ভাগ্যের কথা !"

ভাদুড়ীমশাই মিঠে সুরেই বল্‌লেন, "আজকাল সে আশা আর কই, ঠাকুর, তবে বাড়ীঘর স্থাড়া স্থাড়া দেখায়, তাই একটা উপলক্ষ খোঁজা। ছেলেদের সব দেখেছেন ত,—এখন ছেলে মানে—একজোড়া জুতো আর এক মাথা চুল,—বাকীটা পাঞ্জাবী মোড়া পিপীলি-ভুক ! সে ছেলে আর আমার কোন্ কাযে আসবে। ভীম এসে ত জন্মাবেন না যে, এ জিনিষটিকে নরক থেকে টেনে তুলতে পারবেন। এ ত ওই নবনীবাবুর শরীর নয়—এ যে অবনীর আধখানা !"

এই রকম কথাবার্ত্তায় ভাদুড়ীমশাই-ই নিবন্ত আসর-টাকে জীবন্ত ক'রে তুললেন। তিনি মাতঙ্গিনীকে হতাশ হ'তে দেখেই এই ভাব অবলম্বন করেছিলেন।

* * * * *

ভাদুড়ীমশাই বড় ক্লান্ত হয়েছিলেন, সে রাত্রিতে আর

পোষা পাখী

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু

কিছু খেলেন না। মধুপুরের ঘোষের দুধের আড়াই সের আন্দাজ এক ইঞ্চি পুরু সর মিছরির গুঁড়ো সংযোগে ভোগ' লাগিয়ে, আধ কুঁজো জল টেনে শুয়ে পড়লেন।

আচার্য্য আর নবনী একই কামরায় শুতেন; শয্যা গ্রহণানন্তর আচার্য্য বললেন,—"বুঝলে বাবাজী, সাষ্টাঙ্গের সুবিধাটি তোমায় ক'রে দিতেই হ'বে। ভাল্লুকের ভার আমার রইল।"

নবনী বল্লে—"ছাঁচের আঁচ এর মধ্যেই আমার মাথায় এসে গেছে।"

আচার্য্য। আসবে বই কি, বাবা, বিদ্যে শিখেছ!

নবনী। কেবল সকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটা measuring tape (মাপবার ফিতে) কিনে আনা চাই! আনাড়ীর মত কায করতে পারব না ত; খোঁচ খাঁচ সব ঠিক করা চাই।"

আচার্য্য। চাই বই কি, বাবা, বিদ্যে রয়েছে যে,—তুমি কি তা পারো! বক্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমারে দেখেছি পাঁচ সাতশো মোণ লোহার কল্ গায়ে গায়ে উঠছে নাম্‌ছে, ঘুরছে ফিরছে, যেন মাখমের জিনিষ; কোথাও একটি আঁচড় লাগে না। সে-ও ত ওই বিদ্যের জোরেই। নাও—এখন শুয়ে পড়, বাবাজী,—কোন চিন্তা নেই,—আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি কচু বানিয়ে ফেল্‌বে।

মিনিট তিনেক পরে আচার্য্য ব'লে উঠলেন,—"খেলে কলা-পোড়া, নদী-নালা নেই, খাল-বিল নেই, শুক্‌নো ড্যাঙায় এত কোলা ব্যাঙ ডাকে কোথায়?"

নবনী হেসে বললে, "বোধ হয়, ভাদুড়ীমশায়ের নাক ডাকছে।"

আচার্য্য একটুও অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে ঝাঁ ক'রে বললেন,"ও আর কার না ডাকে, বাবাজী,—নাক থাকলেই ডাকে! আমাদেরই কি কম ডাকে! নিজেরটা শুনতে পাই না, তাই। এই শুনুন না—সহরের সুপ্রভাত বাবুর বাড়ী এক রাত্তির ব'সে কাটাই, তাঁ'র গড়নও একটু ভারি ছিল, মেয়েরা যা'কে গতর বলে গো। বলব কি' বাবাজী,' রাত এগারটার পর এমন গোঙানী সুরু হ'ল, ভাবলুম, এখনই ত কাঁধ দিতে হ'বে,—আর পোঁয়া কেন? সেই খাসটান সারারাত সমান চল্‌লো; কান্নাও উঠলো না, কারুর সাড়া-শব্দও পেলুম না। ছটা বাজতে গোঙানী থামল,—বাবুও নীচে এলেন। ভাবলুম, বাড়ীতে কাঁদবার লোক নেই, কেবল বাঁধবার লোক চাই। উদ্বেগের স্বরে প্রশ্ন করলুম—'কার অসুখ, মশাই?' তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—'কারুর ত নয়, এ প্রশ্ন করলেন যে?' বললুম—'যাক্, বাঁচলুম, সারারাত্রি তবে গোঙাচ্ছিল কে? পাশের বাড়ীতে বুঝি!' বাবু হেসে বল্‌লেন, 'ওটা অনেককেই বলতে শুনি, আমি নিজে কিন্তু টের পাই না,—যেমন বন্দুকে কি বজ্রাঘাতে যে মরে, তা'কে আওয়াজটা আর শুনতে হয় না, এও সেই কেলাশের জিনিষ,—আগে ঘুম, তা'র পর শব্দকল্পদ্রুম!' শুনলে, বাবাজী! নাক শাঁক ও সব বাজবার জন্যেই; নাক্ ডাকবে না ত কি হাত-পা ডাকবে! আবার তাও বলি বাবাজী, পাহাড়ী পর্ব্বই আলাদা। ল্যাপচানীদের নাক যেন অধিত্যকার ছাঁচ।—কিন্তু হ'লে কি হয়, ডাকেতে পুষিয়ে নিয়েছে,—গর্জ্জায় যেন' পাহাড়ী পাকোয়াজ! হঠযোগ সাধতে গিয়ে হটে আসতে হ'ল। বুঝলে বাবাজী—"

নবনীর তখন অর্দ্ধেক রাত। আচার্য্য মাড়ওয়ারী দারোয়ানের ঘোঁটা ভাঙ্ একটি লোটা টেনে বক্তার হয়েছিলেন। নবনী ঘুমিয়ে পড়েছে জেনে—"কোনও বেটা আপনার নয় রে" ব'লে, মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

৬

হলঘরের টেবলের উপর একটুকরো কাগজ ও একটা পেন্সিল। নবনী measnring tape (ফিতে) হাতে ভাদুড়ীমশায়ের দেহ জরীপ্ করছিল আর ওই কাগজে টুকছিল। এইবার সে শক্ত যায়গায় এসে পড়েছে; নাভি থেকে নাকের ডগায় ফিতে ধ'রে ভাবছিল, সতের ইঞ্চি না ঝুঁকলে নাভির সমরেখায় নাক গিয়ে ঠেকে না; সুতরাং নাক থেকে নাভি পর্য্যন্ত গোড়েনভাবে ভারটা রাখা চাই,—এক সুতো ঝোঁকা-ঝুঁকি চলবে না। তা'র ইচ্ছা, বেডৌল জিনিষের এমন একটি সুডৌল ছাঁচ বানানো—যা'তে সে বাহবা পায়;

কেউ না "গোরঠাওরায়। কিন্তু নানা angleএর খোঁচ-খাঁচের জঙ্গল সাফ করতে higher mathematicsএও কুলুচ্ছিল না, সুবিধামত ভারকেন্দ্রও পাওয়া যাচ্ছিল না।

নবনীর বয়স কম, তায় সে রহস্যপ্রিয়। হঠাৎ তা'র মনে হ'ল—একেই বোধ হয় "অ্যাংগল্ অব্ ভীষণ" বলে! সে নিজে নিজেই চাপা গলায় হেসে উঠল।

মাতঙ্গিনী ঘরে ঢুকে টেবলের উপর কাগজের টুকরোটা দেখছিলেন আর চটছিলেন। নাভি থেকে নাভি—পরিধি ১৫ ইঞ্চি, ইত্যাদি। এই সময় নবনী হাসায় সহসা জ্ব'লে উঠে "তোর কাযের নিকুচি করেছে" বলতে বলতে তিনি ফিতেটা ধ'রে টেনে ছুড়ে ফেলে দিলেন। "এ কি তামাসা পেয়েছিস! কোমরের ঘের ১৫ ইঞ্চি!"

নবনী বলিল, "কম হ'ল কি দিদি?"

মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ভাদুড়ীমশাই সহাস্যে বললেন—"ওর অপরাধটা কি, আমি ত কাঁচপোকাটি নই?"

"তুমি আমাকে ন্যাকা বুঝিও না, এমন একটা জীবের নাম কর ত দেখি, যা'র কোমর বুকের চেয়ে সরু নয়!"

ভাদুড়ী ধীরে ধীরে বললেন,—'তা' আছে বই কি। এই দেখ না, শ্রীহরি সখ করেই কূর্ম্ম অবতারে কোমর বাদ দিয়ে একসা হয়েছিলেন। প্রাণিতত্ত্ববিদরাই বলতে পারেন,আরপোকার কোমর কতটা সরু। শুশুক সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে, মাতু।"

মাতঙ্গিনী রোষভরে দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন, বললেন, "তুমি থাম থাম, তোমাদের কারুর কিছু ক'রে কায নেই,—শুশুক সম্বন্ধে ওঁর সন্দেহ হয়! তবে ত আমি কেতাথ হলুম। সব তামাসা দেখা!"

নবনী বুঝেছিল, প্রধানতঃ তা'র হাসিই এই অনর্থ বাধিয়েছে। সে তাই অপরাধীর মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। কথা কইলে ব্যাপারটা আরও ঘনীভূত হয়ে পড়বে, তাই সে চুপচাপ ছিল, হাসিটাও তা'র পেটের মধ্যে তখনও প্রবল, একটু ফাঁক পেলে ফ্যালাও হয়ে পড়বার ষোল আনা সম্ভাবনা।

এতক্ষণে সে একটু সামলে নিয়ে বললে,"মাইরি বলছি, 'দিদি, একটা অন্য কথা মনে পড়ায় হেসেছিলুম, এ সবের সঙ্গে তার—"

মাতঙ্গিনী ফোঁস্ ক'রে বললেন,"দেখ, মিছে কথা কোস্ নি বলছি! আচ্ছা, বল্ ত শুনি কি এমন কথাটা?"

নবনী কিন্তু সাধুটির মত সহজভাবে আরম্ভ ক'রে দিলে, "শুনেছি, পূজোর সময় স'বাজারের রাজাদের বাড়ী বড় বড় ইংরেজদের নিমন্ত্রণ হ'ত। এক বার কম্যান্ডারান্ চীফ এসে পড়েছিলেন। যার যা ব্যবসা,—তাঁ'র নজর পড়ল মা দুর্গার দশ হাতের দশখানি অস্ত্রের ওপর।—তিনি পছন্দ করলেন খাঁড়াখানি। তখন সত্যিকার একখানি মোষকাটা খাঁড়া এনে তাঁ'কে দেখান হ'ল। ডিরোজিও সাহেব আমাদের চণ্ডীখানা ইংরাজীতে সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে খাঁড়ার প্রচণ্ড শক্তি শুনিয়ে দিলেন, —শেষ বললেন—'এর আশ্চর্য্য প্রভাব এই যে, এ দিয়ে বড় বড় মোষ থেকে ছোট ছোট মাষকড়াই পর্য্যন্ত এক কোপে সমান সাবাড় হয়,—আবার নরবলিও চলে।' আর যায় কোথা, জঙ্গীলাটের মাথায় ঢুকল—এ-দেশী অস্ত্র এ-দেশের লোকরা যেমন চিনবে আর চালাবে, এমন আর কোন অস্ত্রই নয়; পল্টনে একে চালাতেই হ'বে। পল্টনের ওপর তাঁ'র প্রবল প্রভাব—পটাপট তলোয়ার ভেঙ্গে খাঁড়া তয়ের হয়ে গেল। এইবার "খাপ" চাই। মিলিটারি ইঞ্জি-নীয়ার মাপ নিয়ে খাপের নক্সা করেছিলেন। সভ্য-জাতের নিয়ম এই—সব সুডৌল্ হওয়া চাই - এক সুতো এদিক্ ওদিক্ হ'বে না—সব টাইট্ ফিট্। তা' করতে গিয়ে খাঁড়ার ওপর চামড়া মুড়ে খাপ সেলাই করতে হ'ল—সে একদম্ "অমরকোষ" দাঁড়িয়ে গেল! তা'র পর কি একটা যুদ্ধে গিয়ে খাঁড়া আর খাপ থেকে বেরুল না,—সব দাঁড়িয়ে সাফ! হুলস্থূল প'ড়ে গেল, রয়েল-ইঞ্জিনীয়ারের কৈফিয়ৎ তলব হ'ল। তিনি লিখে দিলেন—"এমন কোনও আর্টিষ্ট নেই যে, আমার নক্সার নিন্দে করতে পারে, কিন্তু এ বেখাপ-দেশে সুডৌল কোন কিছুই ফিট্ করবে না;—ইংলণ্ড হ'লে—"

ভাদুড়ীমশাই ব'লে উঠলেন,—"তুমি ত রয়েল্

নও—খাঁটি বশুরে, আমার দেহটাও মানুষের দেহ—চাপ পড়লে চ্যাপ্টায়. সেটা ত জান। তুমি ভায়া মাথা, পেট আর নাকের resting point ছাড়' ঃব দিকে ফুট্‌খানেক ক'রে ঢিলে রেখো, ঢোল-শুদ্ধ করবার দরকার নেই, আমি অভয় দিচ্ছি।"

মাতঙ্গিনী কল্পিত রোষে নবনীকে বললেন, "হ্যাঁ রে অ হতভাগা, ওই কথায় তোমার অত হাসি এসেছিল! যা-ইচ্ছে কর গে যা।" বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু স্পষ্টই দেখা গেল, তাঁ'র চোখে মুখে হাসি মাখান। মানুষ মানুষই—তা' সে যতই ঢেকে ঢুকে চলুক।

নবনী মাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আচার্য্য মুকিয়েই ছিলেন—সঙ্গ নিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগমনী

ল'য়ে দশ প্রহরণ দশ হাতে জননী
এস মা গো দশভূজে হে দানব দলনি,
দলেছিলে কতবার দানবের-সৈন্য—
দল' দেখি বাঙ্গালার দুখ-তাপ দৈন্য!
নাশ দেখি অনশন অনাটন অসুরে
আধি ব্যাধি অনাচার ব্যভিচার পশুরে--
হুঙ্কার করি যারা ফিরিতেছে নিত্য
বাঙ্গালার চারি ধারে কাঁপাইয়া চিত্ত।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আন' মা গো শান্তি,
ভায়ে ভায়ে স্নেহ-প্রীতি—যাক্ ভুল ভ্রান্তি!
আন' স্বাস্থ্যের সুখ, বুক ভরা তৃপ্তি,
বাঙ্গালীর চোখে-মুখে আনন্দ-দীপ্তি!
দাও পুনঃ আমাদের সে চরম দীক্ষা—
"ত্যাগই ভোগ"—ও চরণে এই শুধু ভিক্ষা!
পল্লীর মৃতপ্রাণে ফিরে আন চেতনা,
পুনঃ তারে জাগাবে না দিয়া নব প্রেরণা?

কর্ম্মঠ সন্তানে ভর' তার অঙ্ক,
সন্ধ্যা সকালে সেথা বাজুক মা শঙ্খ!
কল-গীতে নন্দিত কর তার চিত্ত,
বাঁধ তার অঞ্চলে ফল ফুল বিত্ত।
আন' তার মাঠে মাঠে কমলার হাস্য,
গোঠে গোঠে কামধেনু—দূরে যাক্ দাস্য!
দূরে যাক্ আঁখি-নীর, এই চীর কন্থা—
ব'লে দে মা আমাদের কল্যাণ-পন্থা!

পেটে আজ ভাত নাই, মনে নাই স্ফূর্ত্তি,
ভ্রমিতেছি হেথা হোথা কঙ্কাল মূর্ত্তি।
পরণে বসন নাই, দাঁড়াবার ঠাঁই গো,
গৃহ-বিচ্ছেদে প্রাণ সদা আই-ঢাই গো।
তবু মা পূজিব তোরে ভক্তির অর্ঘ্যে—
তিনটি দিনের তরে—রহিব ভূস্বর্গে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শিবানন্দের দুর্গোৎসব

১

সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখনও বাঙ্গালার এমন দীন-হীন নির্জ্জীব দশা হয় নাই, তখনও বাঙ্গালার মোটা ধান ও মোটা কাপড় এমন অগ্নিমূল্য হয় নাই, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর প্রভাব এমন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠে নাই। তখন বাঙ্গালী মনের সাধ মিটাইয়া বর্ষান্তে জগজ্জননীর বার্ষিক পূজা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিত। তখন ধনীও দুর্গোৎসব করিত, দরিদ্রও নিজের শক্তি অনুসারে মৃন্ময়ী জগজ্জননীর চরণাম্বুজে গঙ্গাজল ও বিল্বদল উপহার দিয়া ধন্য হইত। এখন দরিদ্রের ত কথাই নাই, ধনীদিগের মধ্যেও শতকরা নিরানব্বই জন দুর্গোৎসবের কয়টা দিন রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর চরণে রজতরাশি ঢালিয়া দিয়া নিছক হাওয়া খাওয়াকেই পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া থাকে। সুতরাং এহেন সময়ে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের কথা শুনাইতে যাওয়াও যা, আর অরণ্যে বসিয়া রোদন করাও তা' বলিলে বড় একটা অত্যুক্তি হয় না, তাহা যে না বুঝি, তাহা নহে, তবুও কিন্তু সেই কথা শুনাইবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি, কেন যে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা এখন বলিব না। আমার কথাটি ফুরাইলে যদি আবশ্যক বোধ করি, তবে বলিব, নচেৎ বিজ্ঞ পাঠক নিজেই কৈফিয়ৎ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দিয়া লইবেন।

২

শিবানন্দ শর্ম্মার হঠাৎ বিশ বৎসর পরে জন্মাষ্টমীর দিনে খুব ভোরে নিজগ্রাম মহেশপুরে আবির্ভাব হইল। বিশ বৎসরের নিরুদ্দেশ শিবানন্দ সরাসরি পৈতৃক চির-পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণটা যেন ধড়ফড়িয়া উঠিল। বাহির-বাটীর প্রাঙ্গণে আগাছার জঙ্গল, চণ্ডীমণ্ডপের চালে একগাছিও খড় নাই—দ্বার, জানালা ও কপাট জীর্ণ ও পতিত, তাহার উপর অধিকাংশই অপহৃত, তাহার শৈশবের বড় সাধের বাস্তুভিটার সকলই যেন বীভৎস আকার ধারণ করিয়া বিশ বৎসরের পূর্ব্বের সেই স্বানুভববেদ্য পবিত্র ও মধুর স্মৃতির প্রতি অবজ্ঞার উপহাস করিতেছে। স্বর্গত পিতৃদেবের বড় সাধের চণ্ডীমণ্ডপের এই দীন-হীন দশা দেখিয়া শিবানন্দের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। তাহার ন্যায় কুপুত্র না হইলে আজিও হয় ত সেই সব তেমনই বজায় থাকিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাবসিক্ত হইল, প্রাণের ভিতরটা যেন কি ভীষণ অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল—সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ক্ষিপ্রপাদবিক্ষেপে দ্রুত-গতিতে 'পিসীমা পিসীমা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কবাটবিরহিত দ্বার অতিক্রম করিয়া সেই জীর্ণ বাটীর জীর্ণ অন্দরে ঢুকিয়া পড়িল।

৩

জীর্ণা, শীর্ণা, মলিনবসনা পিসীমাতার চরণযুগলে টিপ্ করিয়া একটি প্রণাম ঠুকিয়া শিবানন্দ বলিল, "পিসীমা! বাস্তু-ভিটার এমন অবস্থা কে করিল?" পিসীমা সে কথার কি উত্তর দিবেন? তিনি আজ বিশ বৎসর ধরিয়া যাহার জন্য কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছেন, বড় স্নেহের সেই শিবানন্দকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তিনি আনন্দে আত্ম-হারা হইয়াছিলেন, অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কাটাইয়া আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে তিনি বলিলেন, "শিবু রে, আবার যে তো'কে এ জীবনে দেখিব, তা' ত মনেও ভাবিতে পারিনি, বাবা! সে সব কথা পরে শোনবার হয়, শুনিস্, এখন যা' বাবা, স্নান ক'রে আয়, আমি দুটো ভাত চড়িয়ে দিই।" পিসীমা'র কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে শিবানন্দ বলিল,—"সে হ'বে না, পিসীমা, আমি এখনই কুমারের বাটী চল্লুম, আজ যে জন্মাষ্টমী, আগে দুর্গাপ্রতিমা গড়িবার ব্যবস্থা ক'রে আসি, তাহার পর স্নানাহারের যাহা হয় দেখা যাইবে।"

শিবানন্দের কথা শুনিয়া পিসীমা ত অবাক্। বিশ বৎসর পরে সে বাটী ফিরিয়াছে, এত দিন সে কোথায় ছিল, গ্রামের কেহই তাহা জানিত না; কেহ কেহ বা কানা-ঘুষো করিত যে, শিবানন্দ আর ইহলোকে নাই, কেহ বা বলিত, সে সাধু-সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছে; এহেন শিবানন্দ হঠাৎ জন্মাষ্টমীর দিন বাটী আসিয়াছে, প্রতিমা গড়িবার ব্যবস্থার জন্য কুমারের

বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল, তাহার শরীর শীর্ণ, শুষ্ক কেশ, মলিন বসন, হাতে যে তাহার একটিও পয়সা থাকিতে পারে, তাহার কোন চিহ্নও পিসীমাতার কল্পনায় স্থান পাইতেছে না। হায় রে কপাল, এত কাল পরে শিবু কি শেষে পাগল হইয়া বাটী ফিরিল? ক্ষণকালের মধ্যে পিসীমাতার আনন্দাশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হইল। পিসীমাতার এ সকল ভাববিপর্য্যয়ের দিকে কিন্তু দৃক্‌পাতও না করিয়া শিবানন্দ প্রতিমা গড়িবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ত্বরিতপদে কুমারের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৪

শিবানন্দ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কুমারের বাটীর পথ ধরিয়া একমনে চলিতেছিল আর মনে মনে ভাবিতেছিল, —কুমারের বাটীতে যাইব, কিন্তু সে যদি বলে, ঠাকুর, কিছু বায়না না পেলে ঠাকুর গড়িব না, তখন কি করিব? কথাটা ত ঠিকই বটে। জগদম্বা স্বপ্নাবেশে দেখা দিয়া পূজা করিবার জন্য তা'কে দেশে আনিয়া শেষে কি তাহাকে পাগল করিয়া উপহাসাস্পদ করিবেন! এই দুর্ভাবনায় তাহার মাথাটা গরম হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সে দেখিল, তাহার বাল্যবন্ধু অভয়চরণ সেই দিকে তাহাকেই যেন লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। দূর হইতেই শিবানন্দ তাহাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'অভয়! ভাল ত?' বলিয়া অভিনন্দিত করিল। বহুকাল পরে দুইটি প্রাণের বন্ধুর এমন অতর্কিতভাবে সাক্ষাতে যে পরস্পরের কি আনন্দ হইল, তাহা আর কি বলিব? পথে দাঁড়াইয়া তাহাদের অনেক কথাই হইল, শেষে স্থির হইল যে, গ্রামের সকল লোককে কিছু জানিতে দেওয়া হইবে না, শিবানন্দের পুরাতন বয়স্যগণ এখন অনেকেই স্বচ্ছলভাবে দিন কাটাইতেছে, তাহাদের মধ্য হইতেই চাঁদা করিয়া শিবানন্দের দুর্গোৎসবের টাকাটা তোলা যাইবে। তাহার যখন দুর্গোৎসব করিবার জন্য এত আগ্রহ এবং তাহার ন্যায় প্রিয় বন্ধুকে তাহারা যখন আবার জগদম্বার দয়ায় ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া যেমন করিয়াই হউক, তাহার দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিবেই করিবে; আপাততঃ অভয়ের হাতে একটি টাকা যাহা আছে, তাহা দ্বারা কুমারকে প্রতিমার বায়না দেওয়া যাইবে। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা দুই জনে কুমারের বাটী গিয়া প্রতিমা গড়িবার বায়না দিয়া আসিল।

৫

অভয়চরণ প্রভৃতি শিবানন্দের প্রাচীন বন্ধুবর্গ হঠাৎ নবপ্রত্যাগত নিরুদ্দেশ বন্ধু শিবানন্দের প্রতি এমন সদয় হইয়া বহুব্যয়সাধ্য তাহার দুর্গোৎসবের ভার আনন্দসহকারে কেন বহন করিতে উদ্যত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে শিবানন্দের পূর্ব্ব-ইতিহাসের একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মহেশপুরে শিবানন্দের পিতা এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সের একমাত্র পুত্র শিবানন্দর বারো বছর বয়স পার হইতে না হইতেই তিনি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিয়া কোন এক অজানা দেশে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন; পতিপ্রাণা সাধ্বী শিবানন্দজননীও এক মাস যাইতে না যাইতেই প্রিয়তম পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। সংসারে আর কেহ না থাকায় একমাত্র বিধবা পিসীমাতাই শিবানন্দের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া স্বামিগৃহ হইতে আসিয়া মৃত ভ্রাতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিবানন্দের পিতা এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহার ছোট একটু তালুক ছিল, তাহা হইতে যাহা আয় হইত, তাহাতে তাঁহার সেই ক্ষুদ্র সংসারের প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া, যাহা উদ্‌বৃত্ত হইত, তাহা দ্বারা দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি আবশ্যক উৎসবময় ধর্ম্মকার্য্যগুলিও বেশ স্বচ্ছলভাবে হইয়া যাইত। পিতার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তিরক্ষার ভার পড়িল এক দূর-সম্পর্কের মাতুলের উপর। এরূপ ব্যবস্থায় যাহা অবশ্যম্ভাবী, বর্ত্তমানকালোচিত পরিণাম শিবানন্দের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে না কেন? ফলে এই হইল যে, পরমাত্মীয় মাতুলের নিঃস্বার্থ সুব্যবস্থার প্রভাবে পিতার স্বর্গারোহণের ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই শিবানন্দের দুই বেলা পেট পূরিয়া আহার করিবার সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইয়া উঠিল।

৬

এ দিকে শিবানন্দও ক্রমেই দুর্দ্দান্ত বালকবৃন্দের সর্দ্দারী করাকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছিল; স্কুলে যাওয়া বা লিখাপড়া শেখা তাহার মোটেই

ভাল লাগিত না। কোথায় কোন্ গ্রামবাসীর বাগানে রাশি রাশি কলার কাঁদি হইয়াছে, শিবানন্দের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তাহার সুশিক্ষিত বালক সেনাদলের প্রভাবে এক রাত্রিতে সব গাছের কাঁদি কোথায় উড়িয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহাদের দ্বারা এই অসমসাহসের কার্য্য ঘটিল, তাহাদের মধ্যে কেহই একটি কলাও লইল না, যে সকল দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহে অন্নমাত্র আছে, তন্নিতরকারীর সংস্থান নাই, তাহাদের রান্নাঘরে রাত্রির মধ্যে ঐ সকল কলা হাজির! এইরূপভাবে শিবানন্দের ও তাহার দলের কল্যাণে দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহে প্রায়ই কলা, মুলা, বেগুণ, কুষ্মাণ্ডাদি ও তাহার সঙ্গে তেল, নুণ প্রভৃতিও প্রায়ই জুটিত। আবার অন্য দিকে গ্রামে যখন কলেরা বা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিত, তখন অসহায় রুগ্ন নরনারীর শয্যার পার্শ্বে শিবানন্দের সহচরবর্গ একে একে পালা করিয়া সেবায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদের নিঃস্বার্থপর সেবা দেখিয়া গ্রামের লোক সকল বিস্ময় ও গর্ব্ব অনুভব করিত। শিবানন্দের বালকসেনার দৌরাত্ম্যে গ্রামে দুষ্ট লোকের পক্ষে চুরি, প্রতারণা, মামলা-মোকর্দ্দমা, ব্যভিচার প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান ক্রমে অসম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে গ্রামের লোক শিবানন্দ ও তাহার বালকসেনাদিগকে ভয়ও করিত, ভালও বাসিত। সুতরাং পিতৃমরণের পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এইভাবে পরমানন্দে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া শিবানন্দ মহেশপুরে একপ্রকার একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছিল।

৭

এমন সময় যে দিন সে শুনিল, তাহার পৈতৃক বিষয় সময়ে মালগুজারী না দিতে পারায় নীলামে চড়িয়া পরহস্তগত হইয়াছে, তখন কিন্তু শিবানন্দের চক্ষুস্থির হইল। অকস্মাৎ নিজের দল সে ইচ্ছা করিয়াই ভাঙ্গিয়া দিল, কয়েক দিন পরে শুনা গেল, পিতৃহীন নিরাশ্রয় শিবানন্দ কাহাকে কিছু না বলিয়া হতাশমনে চিরদিনের জন্য গ্রাম ত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই শিবানন্দ কুড়ি বৎসর পরে আজ হঠাৎ গ্রামে আসিয়াছে, তাহার প্রিয় বয়স্যগণের মধ্যে আজ অনেকেই গণ্যমান্য, গ্রামের মাথাধরা মানুষ হইয়া সুখে দিন কাটাইতেছে, ইহারা যখন শিবানন্দের মুখে শুনিল যে, সে তাহার পৈতৃক ভিটাতে দুর্গোৎসব করিয়া চিরজীবনের একমাত্র সাধ মিটাইবার জন্য তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী, তখন তাহারা সকলেই আনন্দসহকারে সে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহারা স্থির করিল যে, তাহারা যে শিবানন্দের দুর্গোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিতেছে, এ কথা কিন্তু আর কাহাকেও জানান হইবে না। কারণ, তাহা গ্রামের সকলে জানিলে তাহাদের প্রিয়বন্ধুর প্রতি লোকের তেমন আস্থা থাকিবে না, হয় ত তাহা দেখিয়া শিবানন্দেরও এ পূজার আনন্দ উপভোগে আসিবে না। এই কারণে গ্রামের মধ্যে অন্য লোক সকলেই শিবানন্দের দুর্গোৎসবব্যাপার লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিঃসম্বল শিবানন্দের প্রতি জগদম্বার বিশেষ করুণা হইয়াছে। উপযুক্ত সিদ্ধ গুরু পাইয়া, তাঁহার কৃপায় অল্পদিনের সাধনাতেই শিবানন্দের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, নহিলে এমন অঘটন-ঘটন হইবে কি প্রকারে ইত্যাদি কল্পনায় ও জল্পনায় মহেশপুর গ্রাম ক্রমেই ভরপূর হইয়া উঠিল ও দুর্গোৎসবের আয়োজনও পূর্ণভাবে চলিতে লাগিল।

৮

অভয়চরণ, রামসহায়, গোবিন্দ, গুরুপ্রসন্ন প্রভৃতি শিবানন্দের প্রাচীন বয়স্যগণ একযোগে সাময়িক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার দুর্গোৎসব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়, তাহারই জন্য লাগিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃত হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিল। এ দুর্গোৎসবে মায়ের প্রসাদার্থী হইয়া আগত কোন ব্যক্তিও যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়, ইহাই ছিল শিবানন্দের ঐকান্তিক বাসনা। বয়স্যগণ তদনুসারে পূর্ব্ব হইতে উপযুক্ত সামগ্রীসম্ভারের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রাচীন সুবিজ্ঞ পুরোহিতের দ্বারা যাবতীয় পূজোপকরণের ফর্দ্দ করাইয়া লওয়া হইল। শিবানন্দের অভিপ্রায়, পূজা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবেই হইবে। শিবানন্দের স্বর্গীয় পিতা দুর্গোৎসবে প্রচুর ব্যয় করিতেন, এ কথা গ্রামের সকল লোকই জানিত। এ পূজায় বলিদান হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে শিবানন্দ বলিল, "বলিদান হইবে কি না—ইহা আবার জিজ্ঞাসা কেন?

এই পূজার প্রধান কার্য্য হইবে বলিদান, সুতরাং তোমরা ভাই এমনভাবে পূজার আয়োজন করিবে, যেন বলিদানটি ভাল করিয়াই হয়।" শিবানন্দের এই আদেশ পাইয়া তাহারা একজোড়া মহিষ ও পাঁচটি ছাগের যোগাড় করিয়া রাখিল। দেখিতে দেখিতে পিতৃপক্ষ শেষ হইয়া আসিল, দেবীপক্ষের আরম্ভে প্রতিপদের দিনই জগন্মাতার মৃন্ময়ী প্রতিমা শিবানন্দের পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপ রূপের প্রভায় আলোকিত করিয়া গ্রামবাসিগণের নয়নরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এ দিকে শিবানন্দ কিন্তু নিশ্চিন্ত পুরুষ; সে কেবলই হাসিতেছে, কোন কার্য্যই সে নিজে করিতেছে না, প্রসন্নবদনে চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বে ছোট কুঠারীতে একখানি কুশাসনের উপর সে প্রায়ই বসিয়া থাকে, সর্ব্বদাই নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া স্থিরভাবে সে কিসের ধ্যানে মগ্ন থাকে; গ্রামের বৃদ্ধ বা সম্ভ্রান্ত লোক দেখা করিতে আসিলে বড় একটা জমকাল আলাপ করে না, করিতে জানে বলিয়াও বোধ হয় না; কিন্তু হাসিমুখে দুই একটিমাত্র সাদাসিধা কথা বলিয়াই সে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া থাকে। তাহার অকপট প্রশান্তভাবদ্যোতক স্নিগ্ধজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় যেন সর্ব্বদাই হাসিতেছে, অভাবের তাড়নার বা বিষাদের কোন চিহ্নই সে নয়নদ্বয়ে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না; সে চির-আনন্দময়; চিদানন্দময়ীর ধ্যানানন্দের স্বর্গীয় সুধাপানে সে যেন সর্ব্বদাই বিভোর। তাহার এই সকল মহাপুরুষোচিত ভাব দেখিয়া গ্রামের লোকসমূহ ক্রমেই তাহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিল, সকলেই উৎসাহসহকারে তাহার দুর্গোৎসবের সাহায্য করিতে সামর্থ্যানুসারে লাগিয়া গেল, ফলে শিবানন্দের সেই আকস্মিক দুর্গোৎসব যেন গ্রামবাসীর সকলেরই আপনার দুর্গোৎসব হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাবে পঞ্চমী কাটিয়া গেল, ষষ্ঠীর সায়ংকালে দেবীর বোধন ও অধিবাসও নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

৯

প্রাচীন পুরোহিত চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য বড়ই সাত্ত্বিক ও আস্তিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবানন্দের শ্রদ্ধা ও পূজার পবিত্র সামগ্রীসম্ভার দেখিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পুরোহিতের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সপ্তমীর প্রাতঃকালে কল্পারম্ভের সংকল্প করিতে যাইয়া তিনি শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার নামে সংকল্প করা হইবে? শিবানন্দ বলিল, গ্রামবাসী সকল লোকেরই ভগবতীপ্রীতিকামনা করিয়া আপনি নিজের নামেই সংকল্প করিলে ক্ষতি কি? পুরোহিত মহাশয় কিন্তু তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "গ্রামবাসী বলিলে পতিত চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চজাতীয় সকল লোককেই বুঝি, আমি কখনও ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জাতির প্রতিনিধি হইয়া কোন দৈব কার্য্য করি নাই, সুতরাং এরূপ সংকল্পবাক্য হইলে আমার দ্বারা এ পূজা হইবে না, আমি তোমার বা তোমার স্বর্গত পিতার দুর্গাপ্রীতিকামনা করিয়া সংকল্পপূর্ব্বক পূজা করিতে পারি, গ্রামবাসী সকলের পৌরোহিত্য আমার কার্য্য নহে।" পুরোহিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া শিবানন্দ যেন বিস্মিত হইল, কিন্তু তাঁহার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না, অতি ধীরভাবে বিনয়ের সহিত বলিল, "তাহা হইলে গ্রামবাসী সকলের প্রতিনিধি হইয়া আমিই মায়ের পূজা করিব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই অধমের দ্বারা মায়ের পূজা সম্পন্ন হয়, কোন বাধা না হয়।"

পুরোহিত মহাশয় আর কি কর্ত্তব্য, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না, অগত্যা শিবানন্দের অভিপ্রায়ানুসারে তিনি তন্ত্রধারকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বড়ই আনন্দের সহিত শিবানন্দ পূজার আসনে বসিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কল্পারম্ভের সংকল্প করিয়া মহাপূজা করিতে আরম্ভ করিল। এত দিন সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, শিবানন্দ বাল্যকালে যেমন অশিক্ষিত ছিল, এখনও তাহাই আছে। পুরোহিতমহাশয় ভাবিয়াছিলেন, তাহার মুখে হয় ত মন্ত্র উচ্চারণই হওয়া কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের সকল ধারণাই উল্টাইয়া গেল, শিবানন্দের মুখে সংস্কৃত মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধ ও মধুর স্বরসমন্বিত গম্ভীর উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল; পুরোহিতমহাশয় পাছে ধরা পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় বড়ই সাবধানতার সহিত তন্ত্রধারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। 'গ্রামের সকল লোকের প্রতিনিধি হইয়া

স্বয়ং প্রবৃত্ত শিবানন্দ তাহাদের সকলের প্রতি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রীতি-কামনায় নিজে পূজা করিতেছে, এ সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসীর আনন্দ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, শিবানন্দের প্রতি তাহাদের বড়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইল, তাহারা এখন হইতে শিবানন্দের দুর্গোৎসবকে সত্য সত্যই নিজেদের দুর্গোৎসব ভাবিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দিয়া সমগ্র গ্রামে একটা আনন্দময় মহোৎসবের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। শিবানন্দের পূজা দেখিবার জন্য দূর দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে নরনারীগণ দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। যত লোকই আসুক না কেন, জগন্মাতার অনুগ্রহে শিবানন্দের ভাণ্ডার যেন অক্ষয় হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে দীয়তাং, ভুজ্যতাং ;—খিচুড়ী, লুচি, কচুরী, মিঠাই, পায়স, পান্তুয়া কোন জিনিষেরই অভাব নাই, পাত পাতিয়া আকণ্ঠ ভরিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করার পর আবার হাঁড়ি ভরিয়া লোক ঐ সকল প্রসাদ গৃহস্থিত পরিজনবর্গের জন্য যে যত পারিতেছে, লইয়া যাইতেছে। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমীপূজা অতি সমারোহের সহিত শেষ হইল ; এই দুই দিনই কিন্তু শিবানন্দের অভিপ্রায়ানুসারে কোন বলিদান হইল না, শিবানন্দের ইচ্ছা, মহানবমীর দিনেই বলিদান হইবে। অগত্যা শিবানন্দের বয়স্যগণের ইচ্ছা না থাকিলেও মহানবমীর দিনেই বলিদান হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাই পরিগৃহীত হইল।

১০

মহানবমীর পূজা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন। অনেকগুলি ছাগ, বড় বড় দুইটি মহিষ বলি হইবে, দেখিবার জন্য পূজাপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে শঙ্খ, ঘণ্টা, মার্দ্দল, ঢাক, শানাইএর মিলিত উচ্চ শব্দে দর্শকবৃন্দের শ্রবণযুগল প্রায় বধিরীকৃত। আজ যেন শিবানন্দের মুখে হাসি ধরিতেছে না। মায়ের পূজা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল, এইবার বলিদান হইবে, তাহারই জন্য সকলে উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। পুরোহিত মহাশয় কেবল বলিতেছেন যে, আর নবমী বেশীক্ষণ নাই, শিবানন্দ! তুমি তাড়াতাড়ি তোমার স্তুতিপাঠ শেষ করিয়া লও, নহিলে নবমীর মধ্যে আর বলি হইয়া উঠিবে না। এ দিকে যুপকাষ্ঠে পশু বাঁধা হইয়াছে, আর বিলম্ব উচিত নহে। শিবানন্দ যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে, সে না আসিলে যেন তাহার বলি উৎসর্গ করিতে মন সরিতেছে না, ঠিক এই সময়ে এক জন সন্ন্যাসী দ্রুতপদক্ষেপে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা দূর হইতে শিবানন্দ দেখিতে পাইল ; দেখিবামাত্র সে আসন হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, যেখানে বলির জন্য পশুকয়টি বাঁধা ছিল, সেইখানে যাইয়া নিজহস্তে তাহাদের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল। তাহার এই অশাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া ত সকলেই অবাক্, কেহ বা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল, সকলেই বলিয়া উঠিল, চিরদিনকার পাগল শিবানন্দ, তাহার আবার দুর্গোৎসব ! এ সবই পাগলামী, বলি না হইলে গ্রামশুদ্ধ লোকের অমঙ্গল হইবে, গ্রামে মড়ক হইবে, দেখ দেখি, বদ্ধ পাগলের পাগলামী। এই প্রকার উত্তেজিত জনতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া শিবানন্দ তাড়াতাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ হইতে দুইখানি কুশাসন আনিল ; দেবীর দিকে সম্মুখ করিয়া সেই বলির জন্য কল্পিত স্থানে নিজে একখানি আসনে উপবেশন করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময় সেই তেজঃপুঞ্জ-বিমণ্ডিত-শরীর গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সেইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শিবানন্দ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিল, আনন্দের অশ্রুধারা নয়ন হইতে বহিয়া তাহার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছিল, ভক্তিজড়িত কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল—'গুরুদেব ! এত দয়া না হ'লে এ দীনের উদ্ধার হইবে কেন ? আমার শঙ্কা হইতেছিল, বুঝি এই মাহেন্দ্রক্ষণে চরণ-দর্শন আর ঘটিয়া উঠিল না।' সহাস্যবদনে সন্ন্যাসী শিবানন্দের মস্তকে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন—"বৎস শিবানন্দ ! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, তোমার ন্যায় শিষ্যকে পাইয়া আমার জীবনও সার্থক হইয়াছে ; আর বিলম্ব কেন ? শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তুমি প্রস্তুত হও।" অকস্মাৎ সমাগত সেই জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীর সহিত শিবানন্দের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য কাহারও মুখে একটিও কথা শুনা গেল না। সকলেরই দৃষ্টি সেই অপূর্ব্বপ্রকৃতির গুরু ও শিষ্যের

দিকে নিবিষ্ট হইল, জগদম্বার দেদীপ্যমান প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া শিবানন্দ সেই আসনে পদ্মাসন করিয়া উপবেশন করিল, সম্মুখে সেই সন্ন্যাসীও উপবেশন করিলেন। শিবানন্দ যথাবিধি আচমন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করিল এবং বলিল, "গুরুদেব! আপনারই কৃপায় আমার এই সৌভাগ্য, আপনারই শিক্ষার প্রভাবে আজ আমার এই আত্মবলিদান সম্পূর্ণ হইবে; গ্রামের লোকের বড় ইচ্ছা যে, এই অকিঞ্চন শিবানন্দের পূজা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হউক, বলিই হইল এই পূজার প্রধান অঙ্গ, যজমান আত্মবলি দিতে অক্ষম হয় বলিয়াই তাহার প্রতিনিধিরূপে পশুবলি হইয়া থাকে। গুরুদেব! আজ্ঞা করুন, আমি আত্মবলি দিয়া শ্রীজগন্মাতার সন্তোষসাধন করিতে পারি।"

১১

শিবানন্দের কথা শুনিয়া সকলেই ভয় পাইল, না জানি, শেষে কি একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটিবে, এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে মহাপুরুষ সন্ন্যাসী স্বীয় কমণ্ডলু হইতে শিবানন্দের মস্তকে জলসেচন করিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ! আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি শ্রীজগন্মাতার চরণে আত্মবলি দিয়া জগতের মঙ্গলসাধন কর।"

তখন আবার গুরুদেবের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া শিবানন্দ প্রণাম করিল এবং দুই হস্তে অঞ্জলি বাঁধিয়া সেই চিদানন্দময়ী জগন্মাতার মৃন্ময়ী প্রতিমার দিকে চাহিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে অবিচলিতভাবে বলিল—

"ন কাময়ে দেবি মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং,
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

দেবি! আমি মহেন্দ্রপদ চাহি না, যোগসিদ্ধি বা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যেও আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণও চাহি না, দাও মা, সেই শক্তি—যে শক্তির প্রভাবে আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের সকল ক্লেশ অঙ্গীকার করিতে সমর্থ হই এবং সেই সঙ্গে তাহাদের সকলের সকল দুঃখও যেন চিরদিনের জন্য উপশান্ত হয়।

"শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

এই বলিয়া আবার ভক্তিভরে জগদম্বার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শিবানন্দ সমাধিমগ্ন হইল। অল্পক্ষণ পরে সকলে দেখিল, শিবানন্দের শিবনেত্র হইয়াছে, তাহার মুখে স্বর্গীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তাহার সুষুম্নাবাহী প্রাণ জ্যোতীরূপে নির্গত হইয়া সেই চিন্ময়ী জগজ্জননীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পাদপদ্মে মিশিয়া গিয়াছে, আর সেই সন্ন্যাসীও সেই সময়ে সকলের অতর্কিতভাবে কেমন করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

১২

এইভাবে শিবানন্দের আত্মবলিদানে তাহার দুর্গোৎসব পূর্ণ হইল দেখিয়া শিবানন্দের সহচরবর্গ কেমন একটা বিষাদমাখা বিস্ময়ে ভরা আনন্দের মাত্রা অনুভব করিতে লাগিল। তাহাদের বাল্যসহচর উদ্ধতপ্রকৃতি অশিক্ষিত শিবানন্দের প্রতি জগজ্জননীর এমন অসাধারণ কৃপার কথা ভাবিয়া তাহারা আপনাদিগকেও ধন্য বলিয়া বোধ করিল। পুরোহিতের দ্বারা অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিয়া তাহারা নবমীর সংকল্পিত ব্রাহ্মণাদি ভোজন যথাবিধি করাইল। দশমীর দিনে শূন্যহৃদয়ে শিবানন্দের সাধের প্রতিমাকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া তাহারা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাদের গ্রামে দুর্গাপূজার সময় আর কাহারও বাটীতে পশুবলি হইবে না; শিবানন্দের আত্মবলিতে সেই গ্রামের সকলপ্রকার হিংসা নিবৃত্ত হউক, তাহারা যেন শিবানন্দের বয়স্য বলিয়া জগতে আত্ম পরিচয় দিতে সমর্থ হয়, সংসারের জনসাধারণের দুঃখনিবৃত্তির জন্য তাহারাও যেন শিবানন্দের ন্যায় আত্মবলি দিয়া জগজ্জননীর পূজা করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ সংকল্প করিয়া শিবানন্দের বয়স্যগণ বিজয়ার বিসর্জ্জন করিয়া গ্রামে ফিরিল। এখনও মহেশপুর গ্রামের বৃদ্ধ অধিবাসিগণ এই বিচিত্র দুর্গোৎসবের কথা দুর্গোৎসবের সময় সমাগত নূতন লোককে গল্প করিয়া শুনাইয়া থাকেন।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

আত্মার তৃষা

১

অশোক কলেজের পোষাক না ছাড়িয়াই দুই বার পড়া পত্রখানি লইয়া আর এক বার পড়িল।

পত্রখানিতে লিখা ছিল :—

শ্যামনিবাস

১৮ই ভাদ্র। ১৩—

বন্ধুবরেষু—

তোমার হইয়াছে কি ?

এতগুলা বৎসর মাঝখানে চলিয়া গিয়াছে—অথচ একটিবারও দেখা দাও নাই! পত্র লিখার পাট ত প্রায় তুলিয়াই দিয়াছ। পাঁচখানি পত্র লিখিলে একখানির উত্তর দাও। তাও বড় দু'ছত্রের বেশী হয় না ;—কেমন আছ ? চ'লে যাচ্ছে এক রকম। বাস্!

কিন্তু তখন ? তখন যে তোমার চিঠি কলেজে একটা দর্শনীয় দ্রব্য ছিল। তুমি বলিবে—যে গিয়াছে, তাহার জন্য ক্ষোভ বৃথা। যত দিন সে স্বাভাবিকভাবে ছিল, তত দিনই তাহার প্রাণ ছিল। তাহাকে আর টানিয়া আনিবার চেষ্টা মৃতদেহ বহিয়া বেড়ানোর মতই পীড়াদায়ক।

কিন্তু আমি ত কোন দিনই দার্শনিক ছিলাম না—আর এ অবেলায় হবার আশাও নাই। তাই পুরানো সুখস্মৃতিগুলিকে দুর্ল্লভ রত্নের চেয়ে কম মনে করিতে পারি না।

দূরে থাকিয়াও তুমি নিকটে—অথচ তোমাকে দেখিতে পাই না, এই দুঃখ।

বড় বড় সব মাসিক পত্রগুলিই তোমার লিখা বুকে করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। তোমার বই যখনই প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা পাঠাইয়া দাও—অথচ তুমি আইস না! মালতী সব মাসিক পত্রগুলি লওয়া আরম্ভ করিয়াছে—বুঝি ভাবে, যদি দৈবাৎ তোমার একটা লিখাও এড়াইয়া যায়!

Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing
A voice, a mystry ;

তুমি যে ক্রমশঃ পিকরাজ হইয়া উঠিলে। তোমার গানে চারিদিক ভরিয়া যায়, অথচ তোমাকে দেখিতে পাই না—এ কেমন ?

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না যে, মালতী আমার চেয়ে তোমার বেশী ভক্ত। জান ত, বি, এ, ক্লাশ হইতে এম্, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত তোমার কবিতা বা গল্প নকল করিবার একমাত্র অধিকার আমারই ছিল। আর তোমার লিখা নির্ভুলভাবে নকল করিতে পারিতাম বলিয়া একটা গর্ব্বও আমার ছিল—যে গর্ব্বকে অন্যায়ও বলা যাইত না ; কারণ, তোমার লিখা পড়া বড় একটা যে সে লোকের কায ছিল না এবং যে নির্ভুলভাবে সে কাযটি করিতে পারিত—সে আমি।

তবে এ কথা সত্য যে, আগের মত আজকাল আর সাহিত্য বা ললিতকলার চর্চ্চা করিতে পারি না। শুধু খুন, মারপিট আর চুরির বিচার করিয়া করিয়া জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই কলের মত কায করিয়া যাইতেছি। তবু মালতী মাসিক পত্র হইতে গল্প ও কবিতা বাছিয়া বাছিয়া শুনাইয়া, সেই পুরাতন দিনের মত গান গাহিয়া ভিতরটাকে কতকটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নহিলে হয় ত এত দিন ঠিক কয়েদীর অবস্থা হইত।

কা'ল সন্ধ্যাকালে তোমারই রচিত সেই গানটি মালতী গাহিতেছিল—

প্রদোষে আজিকে মনে পড়ি গেল
প্রভাতের সেই গান!

ঠিক মনে হইতেছিল, আমারও বুঝি আজ প্রদোষে প্রভাতের গান মনে পড়িতেছে। সে গান গাহিতে কা'ল. কি জানি কেন, মালতীর চোখে জল আসিয়াছিল। আর মালতীর চোখের জল এবং তোমার গানের সুর আমাকেও বড় বিচলিত করিয়াছিল। এই কথাটিই আমার কেবলই মনে হইতেছিল—প্রভাতে তুমি আমাদের কত কাছে ছিলে,—আজ তুমি কত দূরে!

এইবার একটি কাযের কথা। সাম্‌নেই পূজার ছুটী। খোকার অন্নপ্রাশন হইবে পূজার অষ্টমীর দিনে। সে দিন তোমাকে আসিতে হইবে। বাপের ত মুখে ভাত দিতে নাই—কাযেই কাকাকে আসিয়া মুখে ভাত দেওয়া চাই।

মালতী সে দিনের জন্য প্রোগ্রাম তৈয়ার করিয়াছে। তোমার লিখা কয়েকটি গান মালতী কি সুন্দর করিয়া গাহিতে পারে, শুনিও। আর একটি অভিনব ব্যাপার ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে—সেটি তুমি আসিয়া জানিবে। আগে বলা মালতীর নিষেধ—সে জন্য বলা হইল না।

কিন্তু আসিও।

আশা করি, ভাল আছ।

তোমার 'ললিত।'

পত্রখানির নীচে মালতীর হাতের লিখা কয়েকটি ছত্র ছিল—

অভিনব ব্যাপারটি আপনাকে না বলিয়া পারিলাম না। সাবিত্রীকে আপনার গান শিখাইয়াছি। সে কেমন সুন্দর গাহিতে শিখিয়াছে, একবার শুনিবেন। আমার গান ত আপনাকে আর আকর্ষণ করিতে পারে না, যদি সাবিত্রীর গান পারে, তাই এই ব্যবস্থা করিয়াছি। দাদাকেও আসিতে লিখিয়াছি। দু'জনেরই আসা চাই। নহিলে বুঝিব, দু'জনের কেহই আর আমাকে ভাল-বাসেন না।

প্রণতা—'মালতী।'

২

চিঠিখানি টেবলের উপর রাখিয়া, অশোক কলেজের পোষাক ছাড়িয়া, একখানি ধুতি ও একটি কামিজ পরিয়া লইল। তাহার পর হাত-মুখ না ধুইয়াই চিঠিখানি পুনরায় হাতে লইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া অশোক নিজের জীবনটা এক বার আগাগোড়া ভাবিতে লাগিল :—

আকাশে সে দিন মেঘের ঘটা ছিল। এক পসলা বৃষ্টি সবেমাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় আমি পড়িবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলাম। ছোট ভাইটি, ছোট বোনটি ও মায়ের জন্য বড়ই মন কেমন করিতে-ছিল। কিন্তু পড়িতে হইবে, ছোট ভাইটিকে মানুষ করিতে হইবে, ছোট বোনটির ভাল বিবাহ দিতে হইবে, মায়ের দুঃখ যেটুকু সম্ভব দূর করিতে হইবে, এই সব ভাবিয়া মনে বল আনিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম। বেশী পড়িবার ত আশা ছিল না; বৃত্তি পাইয়াছিলাম—আর কিছু চেষ্টা করিলে গৃহশিক্ষকতাও মিলিতে পারে, এই ভরসাতেই আসিয়াছিলাম।

তাহার পর রিপণ কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। বৃত্তির টাকা কয়টা বাঁচিয়া গেল। তাহাতেই একটা মেসে থাকিয়া কষ্টে-সৃষ্টে চালাইতে লাগিলাম।

ললিত ও বসন্তের সঙ্গে বি, এ, ক্লাশেই প্রথম দেখা। দুই জনের সঙ্গেই ধীরে ধীরে পরিচয় হইয়া গেল। বসন্তরা "আর্য্যাবর্ত্ত" লইত; আমার নাম শুনিয়া বলিল, "আর্য্যাবর্ত্তে প্রায়ই লিখেন আপনিই না?" স্বীকার করিলাম। তাহার পর হইতে তাহারা দুই জনেই আমার মেসে আসা সুরু করিয়া দিল। অতি শীঘ্রই আমাকে আন্তরিক প্রশংসা দিয়া, উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, আমার গল্প ও কবিতা নকল করিয়া যথাস্থানে তাহা পাঠাইয়া আমাকে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

বসন্ত বড়লোকের ছেলে; তাই উহাদের বাড়ী আমি প্রথমটা যাইতাম না।

আমার যে একটা দারিদ্র্যের গর্ব্ব ছিল, তাহা বসন্ত বুঝিত। তাহা ছাড়া রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ছেলেকে দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া পড়াইতে যাইতাম। বেড়াইতে গেলে সেখানে দেরী হইয়া যাইবে, কিংবা হয় ত কোন দিন যাওয়াই ঘটিবে না—এই সব জন্য বসন্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিত না। কিন্তু একটা রবিবারে বসন্ত যখন আসিয়া বলিল—'মা বলেছেন, আজ তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে', তখন আর 'না' বলিতে পারিলাম না। বসন্তর মা'কে না দেখিলেও তাঁহার হাতের তৈয়ারী জিনিষ অনেক খাইয়াছি।

বসন্তর জামার এক একটা পকেট এক একটা ছোটখাটো ঘরবিশেষ ছিল। সেই রকম ৩।৪টি ঘর তাহার-আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকিত এবং কলেজে

আসিবার সময় সেই ঘরগুলি নানাবিধ আহার্য্যে পূর্ণ করিয়া লইত। ঘরের তৈয়ারী নানাবিধ জলখাবার ক্লাশের অনেক ছেলেকেই সে খাওয়াইত। এমন ভাবে সে সকলের সঙ্গে মিশিত, ভাব করিত ও চাহিয়া খাইত যে, তাহার দেওয়া জিনিষ খাইতে আমি আপত্তি করিতে পারি নাই। এক দিন টিফিনের সময় বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময় বৃষ্টি আসিল। বসন্ত আসিয়া আমাকে বলিল, 'বৃষ্টির দিন গরম মুড়ি খাওয়াও না, ভাই!' পাশেই মুড়ির দোকান। আমার কাছ হইতে পয়সা লইয়া মুড়ি কিনিয়া আমাকে ২।১ মুঠা দিয়া বাকি সবগুলি মুড়ি প্রসন্নমুখে নিজে খাইয়া ফেলিল। এই বসন্ত যখন মায়ের নামে ডাকিতে আসিল, তখন না গিয়া পারিলাম না।

মালতীকে সেই দিন প্রথম দেখিলাম। তেমন সুন্দর মুখ আমি জীবনে আর কাহারও দেখি নাই। সব চেয়ে সুন্দর তাহার চক্ষুদুটি। চক্ষুই যেন তাহার সৌন্দর্য্যের উৎস। সে চোখের দিকে একবার চাহিলে মানুষ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। মনে হইত যেন সেই চক্ষুদুটি হইতে লাবণ্য ঝরিয়া তাহার সারা দেহ সর্ব্বক্ষণ স্নিগ্ধ ও সুন্দর করিয়া রাখিত।

প্রথম দিন মালতী আমার সহিত কোন কথা কহে নাই। আমার পরিচয় শুনিয়া শুধু একবার আমার পানে মধুরভাবে চাহিয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছিল। বসন্ত বলিয়াছিল—"মালতী আমাদের মধ্যে তোমার লিখার সব চেয়ে বড় ভক্ত। তোমার লিখা এমন কোন গান, কবিতা বা গল্প নাই--যাহা মালতী পড়ে নাই।"

মালতী লজ্জারক্ত মুখে আমার দিকে একবারমাত্র চাহিয়া মাথা নীচু করিয়াছিল। কিন্তু কি শান্ত মধুর দৃষ্টি! সে দৃষ্টি আমি জীবনে কখন ভুলিব না।

ক্রমশঃ মালতীদের বাড়ী যাওয়াটা অভ্যাস ছাড়াইয়া নেশার মধ্যে দাঁড়াইল। মালতী তখন এনট্রান্স ক্লাশে পড়িত। প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়া গেলে মালতী আমার সঙ্গে বেশ মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। আমার কোন কবিতা তাহার কোন্ সহাধ্যায়িনীর খুব ভাল লাগিয়াছে, কোন্ শিক্ষয়িত্রী আমার লিখার কোন্ যায়গাটির প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই সব লইয়া সে আলোচনা করিত। আমার কবিতা সে কি সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিত! তাহার মুখের আবৃত্তি শুনিয়া গর্ব্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিত। মনে মনে আমার কবিতার ইহার চেয়ে বেশী সৌভাগ্য আর কিছু কল্পনা করিতে পারিতাম না।

আমরা যে বার বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ, পড়িতে লাগিলাম, সেই বার মালতী এনট্রান্স পাশ করিল। এই সময়ে আমি প্রথম মালতীর গান শুনি। মালতী বসন্তর অনুরোধে আমারই লিখা একটি গান যে দিন গাহিল, সে দিনের কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমার গান যে এত সুন্দর ও মধুরভাবে গাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি কোন দিন ভাবিতে পারি নাই। সে দিন সকলের অজ্ঞাতসারে মালতীকে বলিয়াছিলাম, 'তোমার কণ্ঠে যে আমার গান স্থান পেয়েছে, এ আমার অসীম সৌভাগ্য।' তাহার মুখে কি সুন্দর লজ্জার আভা ফুটিয়াছিল। কি মধুর হাসি হাসিয়া সে বলিয়াছিল, 'আমি আপনার সব গানই গাহিতে জানি।'

মেসে ফিরিয়া সেই রাত্রিতে অনুভব করিলাম, মালতীকে না পাইলে জীবনই বৃথা! মালতী যদি আমার হয়, জীবনে তাহা হইলে আর কোন সৌভাগ্যই বাকী থাকিবে না। আমি গান রচনা করিব, মালতী সেই গান মধুর সুরে মধুর কণ্ঠে গাহিয়া আমাকে শুনাইবে। আমি যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিব, সে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। কি সুন্দর আদর্শে মধুর সুখস্বপ্নে জীবন বহিয়া যাইবে।

কিন্তু মালতীর পিতা অত্যন্ত ধনী আর আমি দরিদ্র। মালতীকে লাভ করিবার বাসনা আমি মনে মনেই রাখিলাম, কাহাকেও প্রকাশ করিলাম না। বাহিরে এমন কোন ভাবই দেখাইলাম না, যাহাতে কেহ সে সন্দেহ করিতে পারে। মনে মনে সংকল্প করিলাম, এম্, এ'তে প্রথম হইতে হইবে; তাহা হইলে বড় চাকরী হয় ত একটা মিলিতে পারে। প্রাণপণ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। সিদ্ধিলাভও হইল। ইংরাজীতে ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হইলাম। প্রথম হইতে পারিলে য়ুনিভার্সিটীর নির্ব্বাচনে ডেপুটিগিরি পাইব, এ ভরসা পাইয়াছিলাম। আমরা তিন জনেই—বসন্ত, ললিত ও আমি

পাশ করিয়াছিলাম। যে দিন পাশের খবর পাইলাম, সেই দিন অপরাহ্নে মেস হইতে বাহির হইলাম। ভাবিলাম, আজ আমার এত দিনকার সঙ্কল্প প্রকাশ করিব, সব আগে ললিতকে কথাটা বলিব, তা'র পর বসন্ত ও বসন্তের পিতাকে—সব শেষে মালতীকে।

ললিতের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, সে একেবারে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র দুই হাতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "আজ আমার জীবন ধন্য হইয়াছে, ভাই। এত দিনকার বাসনা আজ আমার সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে।"

মনটায় একটা ধাক্কা লাগিল। তাহা দমন করিয়া বলিলাম, "এত আনন্দ কেন, বলিবে না, ভাই?"

ললিত আমাকে কাছে বসাইয়া বলিল, "তোমাকে বলিব বলিয়াই আমি বাহির হইতেছিলাম, এমন সময়ে তুমি আসিলে। ভাই, মালতীকে আমি লাভ করিতে পারিব। মালতীর বাপ-মা আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়াছেন। মালতীও কোন আপত্তি করে নাই।"

উঃ, সে দিনটা কি ভয়ানক দিনই গিয়াছে আমার! ভাগ্যে ললিত আপনার ভাবে বিভোর ছিল, তাই আমার অবস্থাটা সে ধরিতে পারে নাই।

ইহার পর যে কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, সে কথা আর মুখে আসিল না। বলিলাম, "ইহার চেয়ে আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে?"

যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহার দুঃখের কারণ কি করিয়া হইব?

তাহার পর মালতীর বিবাহ হইল। বিবাহের রাত্রিতে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

মনের উচ্চাশা সব চলিয়া গেল। ডেপুটির পদ পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিলাম। সেই হইতে প্রফেসরি লইলাম। বাসা করিয়া মা'কে ও ভগ্নীকে আনিলাম। ভাই.ত আগে হইতেই আসিয়াছিল।

বাসায় আসিয়াই মা বিবাহের জন্য ধরিয়া বসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম,—"মা, আমাকে ক্ষমা করিও। আর একটা বছর পরেই জয়ন্তের বিবাহ দিয়া বৌ ঘরে আনিও, আমি বিবাহ করিতে পারিব না, করিলে আমার দুঃখের শেষ থাকিবে না।"

বুঝি কথা বলিতে আমার মুখে একটা কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বুঝি বা চোখে এক ফোঁটা অশ্রুও আসিয়াছিল। তাই দ্বিতীয় বার মা আর আমাকে বিবাহের কথা বলেন নাই।

ইহার কয়েক মাস পরেই মা মারা যায়েন। এক এক বার ভাবি, হয় ত মায়ের মনে ব্যথা দিয়া তাঁহার মৃত্যুকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম।

মায়ের মৃত্যুতে জীবনে আর কোন বন্ধনই রহিল না।

কেন বিবাহ করিলাম না, কেন ডেপুটিগিরি লইলাম না, তাহার প্রকৃত কারণ কেবল এক জনকে বলিয়াছিলাম; সে বসন্ত। বসন্তও কিছু সন্দেহ করিয়াছিল। এক দিন সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা অশোক, তুমি কেন বিবাহ করিলে না? এমন অনাসক্ত হইয়াই বা রহিলে কেন, বলিবে না?"

এমন করিয়া বসন্ত কথাগুলি বলিয়াছিল যে, অশ্রু-ধারায় গলিয়া তাহাকে সব কথাগুলি বলিয়াছিলাম।

সদাপ্রফুল্ল বসন্তর চোখেও সে দিন অশ্রু আসিয়াছিল। একটা অপরিসীম মনস্তাপের সহিত সে বলিয়াছিল, ললিতকে সে কথা বলিতে যাইবার আগে আমাকে একবার আভাসেও সে কথা বলনি কেন? আমার মনে এ কথাটা অনেক দিন ধরিয়া ছিল; কিন্তু তোমার নিস্তব্ধতার জন্য আমি ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই নিজে ও কথা তোমার কাছে প্রস্তাব করিতে পারি নাই। তোমার উপর মালতীর সত্যকার আকর্ষণ ছিল।

আকর্ষণ ছিল! কথাটায় কম আঘাত পাই নাই। কিন্তু সে কথায় তখন আর কাষ কি?

এম্, এতে ললিত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই আমি ডেপুটির পদ না লওয়ায় ললিত তাহা পাইয়াছিল। বিবাহের পর এফ. এ, পাশ করা পর্য্যন্ত মালতী কলিকাতায় ছিল। তাহার পর ললিত তাহাকে কার্য্যস্থানে লইয়া যায়।

তাহাদের সন্তান হইয়াছে। সুখে আছে। আমার প্রতি মালতীর যে ভাব ছিল, তাহা অন্য আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই জনেই আমাকে মনে রাখিয়াছে। বসন্ত

হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছে। সে-ও আমাকে তেমনই সস্নেহে মনে রাখিয়াছে। আমার মনের বেদনার ছাপ তাহার মনেও একটু লাগিয়া আছে।

এখনও মাঝে মাঝে ললিত ও মালতী আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। কিন্তু যাইতে পারি না। মনের মধ্যে মালতী আমার ঠিক সেই ভাবেই জাগিয়া আছে। গোপন সৌরভের মত সে আমার হৃদয় মন সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণ করিয়া আছে। তাহার কথা না ভাবিয়া পারি না এবং তাহার কথা ভাবিতেই এক দুঃখভরা আনন্দে আমার চিত্ত ভরিয়া যায়। তাই ভাবি, এখনও আমি মালতীর কাছে—ললিতের কাছে যাইবার উপযুক্ত হই নাই। শুধু চিঠি লিখি—এক দিন যাইব, কবে ঠিক নাই। ছুটী পাইলেই তাড়াতাড়ি দূরে পলাইয়া যাই, পাছে ললিত আসিয়া পড়ে বা ধরিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু এবার? মালতী গান গাহিবে—আমার লিখা নূতন নূতন বেদনার গান। তাহার মেয়ের মুখেও আমার গান শুনিব। এবারকার প্রলোভন কি করিয়া জয় করিব?

না, এবার আর জয় করিয়া কায নাই। জয়ের চেষ্টায় হৃদয়-মন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এবার পরাজয়ই মানিয়া লইব। বসন্তকে সঙ্গে লইব। এত দিনের পর আর এখন কি ধরা পড়িব?

অশোক ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তাহার ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র ঘরের দুয়ার হইতে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল—"জ্যেঠামহাশয়, উঠুন, মা বল্লেন, ভিতরে আসুন, আজ এখনও যে খাবার খাননি।"

অশোক চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—সন্ধ্যা হয় হয়! সূর্য্যের শেষ রশ্মি সম্মুখের গাছগুলির শিরে ও বড় বড় বাড়ীর মাথায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া কখন্ মিলাইয়া গিয়াছে। রাজপথে ও গৃহে গৃহে কখন্ আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

নিশ্বাস ফেলিয়া অশোক শয্যাত্যাগ করিল ও বালককে বুকে তুলিয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিল।

৩

পরদিন কলেজের ফেরত অশোক বসন্তদের বাড়ী গিয়া বসন্তর সহিত দেখা করিল। বসন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি রকম, তুমি সশরীরে যে!"

অশোক হাসিয়া বলিল 'কি করি, শরীরটাকে আর কোথায় রেখে আসি বল!"

"আচ্ছা, এখানে আসা একেবারে ছেড়ে দিলে কেন বল ত? আমি যাই, তাই না দেখা হয়?"—বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল।

"কেন, এই ত এসেছি!"

"কমাস পরে বল ত? তোমার অত কষ্ট ক'রে মনে করতে হবে না। আমিই ব'লে দিচ্ছি। এসেছিলে সেই এক দিন গ্রীষ্মের ছুটীর প্রথমের দিকে—বৈশাখমাসে। আর এটা ভাদ্রের শেষ। ক'মাস হ'ল?"

লজ্জিত হইয়া অশোক বলিল—"কি করি, ভাই, যেন বেরুতে ইচ্ছে করে না। তুমি যাও দয়া ক'রে, তাই দেখা হয়। আর—"

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল,—"দয়া করাটরা, ও সব কথাগুলো বাদ দাও, ভাই। আমি যাই আর তুমি আস না, এর জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু তোমারও ত একটু আধটু বেরুনো দরকার। তুমি যে শুধু লিখাপড়া আর চিন্তা নিয়ে শরীরটাকে মাটী ক'রে ফেলছ।"

অশোক ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "মাটী হ'তে এখনও ঢের দেরী আছে, ভাই, সে ভয় নেই।"

তাহার পর পকেট হইতে ললিতের চিঠিখানা বাহির করিয়া বসন্তকে পড়িতে দিল।

বসন্ত পত্রখানি শেষ করিয়া অশোককে জিজ্ঞাসা করিল—"কি করবে, ভাবছ?"

"যাব।"

"যাবে—সত্যি?" বসন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি যে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলে!"

"তা' হ'ব না? ওরা কবছর থেকে বিদেশে আছে, তুমি ত যাও নি! কতবার মালতী নিজে চিঠি লিখেছে, আমি বলেছি—গিয়েছ?"

বসন্তর কথার স্বরে দুঃখ ও অভিমান ফুটিয়া উঠিল।

বসন্তর কাঁধে হাত রাখিয়া অশোক বলিল—"বসন্ত, তুমি ত জান সব!"

বসন্ত আঘাত ভুলিয়া বলিল—"এখন যে যাওয়া ঠিক করলে?"

"পড়লে ত, মালতীর গানের লোভ দেখান আছে; তা'র পর ছোট্ট সাবিত্রী গাইবে।—আবার আমার লিখা গান! আমি মানুষ ত বসন্ত।"

শেষের দিকটায় অশোকের গলাটা কাঁপিয়া আসিল।

বসন্ত মনে মনে বলিল—"তুমি যে মানুষ, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষে অতখানি পারে না!" মুখে বলিল—"বেশ, দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যা'বে।"

কবে হইতে ছুটী, কবে কোন্ ট্রেণে যাওয়া হইবে, সে সব কথাবার্ত্তা কহিয়া অশোক উঠিল। বসন্ত অশোককে বাসা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া তাহার বাসায় খানিক বসিয়া ফিরিয়া গেল। ঠিক রহিল, সপ্তমী-পূজার দিন রওনা হইতে হইবে। অষ্টমীর প্রভাতে সেখানে পৌছান যাইবে। অশোক সেইমত চিঠি ললিত ও মালতীকে লিখিয়া দিল।

৪

জয়ন্ত সপ্তমীর প্রভাতে বসন্তকে ডাকিতে আসিল—"কা'ল থেকে দাদার হঠাৎ জ্বর হয়েছে। আপনি আসুন, নইলে তাঁ'কে ওষুধ খাওয়ানো দায়।"

বসন্ত ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জয়ন্তের সঙ্গেই বাহির হইল। আসিয়া দেখিল, অশোকের খুব জ্বর। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল।

বসন্তকে দেখিবামাত্র অশোক বলিয়া উঠিল, "কা'ল যেতে হ'বে, মনে আছে ত? আমি ত তৈরি; যাওয়া চাই-ই।"

ইহার পূর্ব্বেই এক বার ডাক্তার আসিয়াছিলেন। বসন্ত ভয় পাইয়া আবার ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। তখনই ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। ডাক্তার বলিলেন, "আরও বাড়িবার আশঙ্কা। আইসব্যাগ সর্ব্বক্ষণ মাথায় রাখা চাই।"

সে দিনটা একরকমে কাটিয়া গেল।

পরদিন রোগ আরও বাড়িল। অপরাহ্ণে পূর্ণ প্রলাপ দেখা দিল।

"বসন্ত, তা' হ'লে চল, আবার ট্রেণটা না ছেড়ে দেয়। মালতী এত ক'রে যেতে বলেছে, যেতেই হ'বে।"

"তুমি যেন সে কথা কাউকে বোলো না। দু'জনে সুখে আছে, সে কথা শুনলে কষ্ট পা'বে।"

"তাই ভেবেই ত আমি বলিনি। নইলে ত বলতেই এসেছিলাম। আর একটু হ'লে ব'লেই ত ফেলেছিলাম।"

"উঃ, তা হ'লে ললিতের অবস্থাটা ঠিক আমার মত হ'ত। সে কি আর আমার মত দুঃখ পেলে বাঁচত! ভাগ্যে বলিনি। নইলে লোক বলত বন্ধুদ্রোহী!"

হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখেছ, বসন্ত, কেমন চুপটি ক'রে ছিলাম? একটা কথা বলিছি? কাউকে জানতে দিয়েছি?

"কেবল তুমি জান। তা, হোক্ গে। তুমি ত বন্ধু, মালতীর ভাই। তোমাকে বলতে কোন দোষ নেই।"

তাহার পর হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—"জয়ন্ত, ফরসা একটা কামিজ বা'র ক'রে দে ত, ভাই! আর নতুন যে বইখানা বা'র করেছি, সেই বই ওখানা দিস্;—শুধু হাতে ত যা'ব না!"

বসন্ত জোর করিয়া অশোককে শোয়াইয়া দিয়া মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া অশোক আবার আরম্ভ করিল। একবার বলে, খানিকটা চুপ করে; আবার আরম্ভ করে।

"এত বছর পরে যদি একবার যাই, তা'তে কি দোষ হ'বে—পাপ হ'বে? কি বল, বসন্ত—তা'তে ললিতের প্রতি অবিশ্বাসী হ'ব না ত?

"তা' হ'লে চল, অনেক দিন তাদের দেখিনি।

"মালতীর চোখ দুটি দেখেছ—কি সুন্দর! অমন চোখ আমি কখনও দেখিনি।

"তুমি না কি আবার দেখনি! তুমি ভাই, জন্ম থেকে দেখছ!

"কিন্তু আমার মত ক'রে দেখতে পাওনি—আমি যেমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে দেখেছি!

"আমার লিখা তোমরা সুন্দর বল, করুণ বল, আর আমি হাসি! সুন্দর হ'বে না, করুণ হবে না? মালতীর সুন্দর চোখ ছল-ছল করা একবার দেখলে আর ও-কথা বলতে না!"

"মালতী, সেই গানটি গাও ত, সেই যে—

আকাশে আজিকে ঝরিছে যে বারি

আমারি নয়ন-জল ;

ঐ যে ও পারে জলভরা মেঘ

তারই আঁখি ছলছল!

"বাঃ, কি মধুর! আমার গান যে এত মধুর, তা' তোমার মুখে শোন্‌বার আগে কখন জানি নি। * * *"

বসন্ত চোখ মুছিয়া ডাক্তারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাত কাটবে?"

ডাক্তার বিমর্ষ মুখে বলিল, "সন্দেহ।" জয়ন্ত কাঁদিয়া উঠিল।

৫

শ্যামনিবাসে এক সুন্দর সুসজ্জিত বাংলোর সম্মুখে অষ্টমীর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ললিত ও মালতী দুইখানি ইজিচেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া ছিল। সম্মুখের মাঠে একটি পাঁচ বছরের মেয়ে ও একটি তিন বছরের ছেলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। মেয়েটি খেলা ফেলিয়া এক বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কাকা-বাবু তা হ'লে আসবেন না?"

মালতী বিষণ্ণমুখে বলিল, "কই আর এলেন!"

মেয়েটি আবার খেলিতে গেল। ললিত বলিল,"আচ্ছা বসন্তও ত কোন খবর দিলে না! অশোক লিখলে নিশ্চয়ই যাব। এই বুঝি তার নিশ্চয়?"

মালতী বলিল,—"আমার মনটা আজ সকাল থেকে কেবল কু গাইছে। বোধ হয়, তাঁ'র কোন অসুখ-বিসুখ করেছে।"

ললিত ভরসা দিয়া কহিল, "অসুখ হ'বে কেন, কেউ হয় ত বলেছে, চল মাদ্রাজ বা সিংহল, তাই হয় ত বেরিয়ে পড়েছে।"

মালতী বলিল, "আমার কিন্তু তা' মনে হয় না।"

মালতীর বিষণ্ণতা কিছুতেই গেল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ললিত বলিল, চল, "ভেতরে যাই। যেমন আমাদের কথা আছে, অশোক না এলেও তা'র প্রিয় দুই একটা গান গাইতে হ'বে।"

ঘরে আসিয়া হারমনিয়মের কাছে বসিয়া মালতী বলিল, "কোন্‌টা গাইব?"

ললিত বলিল, "যে গানটা অশোক সব চেয়ে ভাল-বাসে, সেইটে গাও।"

মালতী একটু ভাবিয়া গাহিল—

"আকাশে আজিকে ঝরিছে যে বারি

আমারি নয়ন-জল ;

ঐ যে ও পারে জলভরা মেঘ

তারি আঁখি ছলছল!

মেঘের ডাক কি তারে বল সবে?—

আমারি রোদন-ধ্বনি ;

গুমরি গুমরি উঠিছে হৃদয়,

তাই না—প্রতিধ্বনি?

গগনে আগুন কিসের লেগেছে,

তাহে আকুলতা হেন?

সুখ-আশা মোর জ্বলিয়া গিয়াছে,

তাহারি এ শিখা যেন।"

গান শেষ হইবে, এমন সময় মালতী আনন্দে বলিয়া উঠিল—"এই যে অশোকবাবু এসেছেন! একেবারে রাত্রি ক'রে আস্‌তে হয়?"

ললিতও চাহিয়া দেখিল—দুয়ারের কাছে অশোক দাঁড়াইয়া—মুখে তাহার হাসি, চোখে অশ্রু!

তৎক্ষণাৎ দুই জনে উঠিয়া দুয়ারের দিকে ছুটিল। সেখানে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, সে স্থান শূন্য—কোথাও কেহ নাই!

ললিত তাড়াতাড়ি দুই হাতে মালতীকে ধরিয়া ফেলিল, নহিলে সে পড়িয়া যাইত।

বাহিরের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, কেহ আইসে নাই, বাহির হইয়াও যায় নাই।

মালতীকে ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ললিত বলিল, "আমাদেরই চোখের ভুল।"

মালতীর চোখ দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি ৯।১০টার সময় একখানা টেলিগ্রাম আসিল, খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ললিত পড়িল—"যাওয়া ঘটিল না। অশোক আর নাই। আজ সন্ধ্যায় তাহাকে হারাইয়াছি। বসন্ত।"

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

উনশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তৃপ্তি

শেফালীর সহিত বাসন্তীর কক্ষে আসিয়া সন্তোষ দেখিল, সে ছটফট্ করিতেছে। বাসন্তীর যন্ত্রণাকাতর মুখখানির দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি ?"

বাসন্তী কহিল, "এমন কিছু নয়।"

সন্তোষ সার্টের হাতাটা কনুয়ের উপর গুটাইয়া রাখিয়া সাবান-জলে হাত ধুইল, অপর পাত্রস্থিত গরম জলে অস্ত্রগুলি ফেলিয়া দিয়া বাসন্তীর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এখনও যে এর ভেতর কাচ রয়েছে, সেই জন্যে এত যন্ত্রণা হচ্ছে। শিউলী, দেখবি ? ডাক্তারীটা শিখে নে না।"

সহাস্যমুখে শেফালী কহিল, "তোমার ডাক্তারী তোমারই থাক, দাদা, আমার দরকার নেই। তুমি যদি ঘা-টাগুলো কাট, তা' হ'লে বল, আমি চ'লে যাই।"

স্নেহপূর্ণ কটাক্ষে ভগিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সন্তোষ কহিল, "তা' একটু কাটতে হ'বে বৈ কি, কাচ-গুলো ত বা'র করতে হ'বে। এই বুঝি তোর বীরত্ব ? তোর বৌদি যে বলেন, তুই মস্ত বীর।"

"তবে রইলো, দাদা, আমি চল্লুম।"

সন্তোষ তখন পলায়নপর শেফালীকে উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "অনিলকে তবে ডেকে দে।"

বাসন্তী তখন নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া, অভিমান, অত্যাচার, অবিচার, অপমান সমস্ত দূরে ঠেলিয়া দিয়া, লজ্জা অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানশূন্যভাবে সন্তোষের হাত দুটি নিজের শীতল হস্তমধ্যে লইয়া অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি কাটতে পারব না—আর — ঠাকুরপোকে ডাকবেন না—যদি—চেঁচিয়ে উঠি।"

বাহ্যজ্ঞানশূন্যা পত্নীর দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া সন্তোষ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ভয় নেই, লাগবে না, দেখ, কি রকম আস্তে আস্তে বার ক'রে দিই। তুমি হয় ত জানতেই পারবে না।"

বাসন্তীর হস্তস্পর্শে সন্তোষের শরীরমধ্যে যেন কি একটা হইয়া গেল। দীর্ঘকালের রোগীর মত তাহার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি বাসন্তীর হস্ত সরাইয়া দিতে আজ আর তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। সে ত এই স্পর্শের কাঙাল, এ যে তাহার আশার অতীত !

এমন সময়ে দ্বারপথে সুষমা ও চামেলীকে দেখিয়া বাসন্তী বিস্মিতভাবে কহিল, "এ কি ?—দিদি—" সন্তোষের হাত হইতে নিজের হাতটা তুলিয়া লইতে সে তখনও ভুলিয়া গেল।

নিজের ধৃত হস্তখানা তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইয়া সন্তোষ দ্বারের দিকে চাহিতেই চামেলীকে দেখিয়া বলিল, "চামেলী যে, কখন্ এলি ?" পরক্ষণেই গৈরিক-ধারিণী সুষমাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিয়া উঠিল, "এ কি ! সুষমা—তুমি ?" বাসন্তী কর্ত্তৃক সন্তোষের ধৃত হস্তখানা চামেলী বা সুষমার দৃষ্টি এড়াইল না।

স্থির কণ্ঠে সুষমা কহিল, "হাঁ সন্তোষদা। আপনি ভাল আছেন ?" এই বলিয়া সে বাসন্তীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বাসন্তী চামেলীকে কহিল, "সুষমা দিদিকে কি ক'রে পাকড়াও কল্লে ?"

চামেলী কহিল, "বাবা অনেক ক'রে তবে ধ'রে এনেছেন, চুনীচাঁদবাবুর একটা মোকর্দ্দমার তদ্বির করতে বাবা কলকাতা গিছলেন, ফেরবার সময় সুবীদি'কে দেখে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। বাবা বল্লেন, দিদি কিছুতেই

আসছিলেন না। অনেক ব'লে ক'য়ে কিছু দিনের জন্য এখানে এসেছেন। কি রকম চেহারা হয়েছে, দেখ না! এই দেখেই বাবা ওঁকে জোর ক'রে সঙ্গে এনেছেন। তোর আবার কি হ'লো? পাতর কুড়োবার আর বুঝি সময় পেলিনি? চিরকালই তুই এমনই থাকবি। জ্যেঠাইমাও এসেছেন যে।"

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া সন্তোষ কম্পিত কণ্ঠে সুষমাকে কহিল, "বাবা কোথায়?"

শান্ত কণ্ঠে সুষমা কহিল, "মা যাবার পরই ত বাবা দাদার কাছে চ'লে গিয়েছেন।"

মায়ের কথা বলিতেই সুষমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

সন্তোষও কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আর দেরী করা যায় না। পা'খানা এবার দেখতে হয়।"

বাসন্তী ত্রস্তা হইয়া সুষমার স্কন্ধে মুখ লুকাইল, চামেলী নিকটস্থ হইয়া বাসন্তীর কম্পিত পা দু'খানি চাপিয়া ধরিল। অভ্যস্ত হস্তে সন্তোষ খুব ধীরে ধীরে কাচের কুচিগুলি বাহির করিয়া লইল। তাহার পর আর একবার পরীক্ষা করিয়া ধৌত করিয়া দিয়া ঔষধপত্র দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল।

যন্ত্রণার উপশম হওয়াতে এবং পায়ে কিছুমাত্র না লাগায় স্বামীর দয়ায় বাসন্তী নিজেকে সন্তোষের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিল।

সন্তোষ বাহির হইয়া যাইতেই সুজাতা আসিয়া সুষমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। চামেলী বাসন্তীর নিকট গিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহাস্য মুখে কহিল, "কি গো, রাধারাণীর দরজায় মদনমোহন ক'দিন থেকে কোটালী কচ্ছেন?"

বাসন্তী লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, "কই, আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

চামেলী তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "ঐ অবোঝার মধ্য দিয়েই জয়দেবের লেখার কাযটা দাদা সেরে নেবেন। এখন কি আর জ্ঞান থাকে?"

তাহার কথায় বাধা দিয়া বাসন্তী কহিল, "যান—আপনি ভারী ফাজিল।"

"এখন ত ফাজিল হবই। আর সে দিনকার সে সব কথাগুলো বুঝি মনে নেই? এ যে ঘোর কলি! আমি মরি ওঁর জন্যে, আর উনি এ সুখবরটুকু দিতেও নারাজ। তাদের দোষ ত কেউ দেখবে না, একটু ত্রুটি হোক দেখি, অমনই ননদিনী রায়বাঘিনী আখ্যা পেয়ে যা'ব।"

"আপনার সঙ্গে কথায় ত পারব না, যা খুসী বলুন। ঘাট মেনে নিচ্ছি। আচ্ছা, সুষমাদিদির কি চেহারা হয়ে গেছে, দিদি? পিসেমশাই এনে খুব ভাল কায করেছেন।"

চামেলী একটা ছোট রকম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আহা,—মেয়েটাকে দেখে বড় কষ্ট হয়। তাই কি দু'দিন থাকবে, আট দিন ব'লে বাবার সঙ্গে এসেছে। বাবা চেহারা দেখে বলছেন, ও বেশী দিন বাঁচবে না। এলাহাবাদে বাবা মন্মথ বাবুকে দেখালেন। তিনি বল্লেন, অতিরিক্ত কিছু আঘাত লাগায় হার্ট খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেখছিস্ না, কি রকম ফ্যাঁকাসে চেহারা হয়ে গেছে, গায়ে যেন রক্ত নেই। মা গিয়েই দিদি যেন বেশী কাতর হয়ে পড়েছেন।"

এমন সময় স্মিতমুখী সুষমা আসিয়া কহিল, "বাসী কাঁদ্‌ছে কেন?"

চামেলী কহিল, "মন্মথ বাবুর কথা সব বলেছিলুম, তাই—"

চামেলীর দিকে চাহিয়া সুষমা কহিল, "এতগুলো ভাত হজম করেন, আর কথাটা বুঝি হজম হ'লো না?"

তাহার পর বাসন্তীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,"এমন পাগল ত দেখিনি, ডাক্তারে ও রকম বলে, তা' ব'লে কি এক্ষুনি মচ্ছি। এখনও ঢের দিন বেঁচে থেকে তোদের জ্বালাবো পোড়াবো। দাঁড়া, আগে আমার সাধনা সিদ্ধি হোক। অন্নপূর্ণার দুয়ারে ভাঙড় পশুপতিকে ভিক্ষেপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে দেখি। তবে ত তোর দিদি মরণে শান্তি পা'বে।"

বাসন্তী ও চামেলী গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা দেখিল, বহুদিনের পর যেন সুষমার মুখে একটা তৃপ্তির ভাব বিরাজ করিতেছে। চামেলী মনে মনে ভাবিল, সুষমাদিদির হৃদয়খানা কত বড়। ওঁর মত ধনীও কেহ নয়, আবার অত

দীনও কেউ নেই। যে জগতের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে, সুখ-দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, অনাথ অসহায়ের দুঃখ যে নিজের দুঃখের মতই গ্রহণ করিতেছে, তাহার মনে যত অভাবই থাক, তবু ব্যথায় তাহার মনকে পীড়িত করিতে পারে না।

গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাসন্তী চামেলীকে কহিল, "দিদি, শনির দশা কি আমার কাটবে?"

বাসন্তীর বেদনামিশ্রিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে চামেলী কহিল, "তুই যে রাণী হবি, বাসন্তী, এখন তোর বৃহস্পতির দশা পড়েছে।" এই বলিয়া তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন করিল। এমন সময় জ্যেঠাইমা আসিয়া কহিলেন, "তুই কি চিরদিনই এমনই এলো-পাতাড়ী থাকবি, দেখ দেখি, এখন কত কষ্ট পাচ্ছিস্। যাই হোক, মা'র পাশে আজ বাবাকে দেখে আমার বুকখানা—কিন্তু ঠাকুরপো যে দেখতে পেলেন না—" তিনি আর বলিতে পারিলেন না। প্রবল অশ্রুধারায় তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। সুষমা তখন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "বাসন্তী যে পরশপাতর, জ্যেঠাইমা, ওর কাছে যে আস্‌বে, সেই সোনা হয়ে যা'বে।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গমনে বাধা

আট দশ দিন কাটিয়া গেল। বাসন্তী একটু সারিয়াছে। তবে তাহার ঘা এখনও খোলা হয় নাই এবং সে এখনও ভাল করিয়া চলিতে পারে না। সুষমা কা'ল চলিয়া যাইবে, সেই জন্যে বাসন্তীর একান্ত আগ্রহে পিসীমা তাহাকে লইয়া ডেরাডুনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে গিয়াছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সন্তোষ বাসন্তীর ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে চামেলী আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, "দাদা, বৌদিকে অযুধ খাওয়া-বেন, বৌদি নিজে কিন্তু খাবেন না।" সে ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, নয়ান সিংহের মা অর্দ্ধেক মৃত্তিকা দখল করিয়া বিকট নাসিকাগর্জ্জনসহকারে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছে। হঠাৎ কি একটা বিশ্রী গন্ধ তাহার নাসিকায় আসিয়া প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে এক-খানি ইউকলিপটস্-মাখান রুমাল বাহির করিয়া নাসি-কায় ঢাকা দিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে সন্তোষ কহিল, "বাবা! এ গন্ধে কি মানুষ তিষ্ঠুতে পারে? কি ক'রে শুয়ে আছ? বোবা ত অনেক দিন থেকেই হয়েছ, দেখ্‌ছি, নাকটাও সেই সঙ্গে বুজে গেছে না কি?"

বাসন্তীর ইচ্ছা হইতেছিল, সে একবার জিজ্ঞাসা করে যে, এই বোবা হওয়াটা কি তাহার ইচ্ছাকৃত? আর মসী-মলিন তৈলনিষিক্ত দুর্গন্ধভরা বিছানাগুলির সঙ্গেই সে বিশেষ সুপরিচিত, জন্মাবধি বিশ্বপিতা তাহার অদৃষ্টসূত্রে ইহাই গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন, ইহা হইতে তাহার পরি-ত্রাণ কোথায়? কিন্তু সে কোন কথা বলিল না। অগত্যা সন্তোষ ঝিকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিল।

ঝি চলিয়া গেল। সন্তোষ টেবলের উপর হইতে শিশি উঠাইয়া গেলাসে ঢালিয়া বাসন্তীর নিকট যাইতেই দেখিল, বাসন্তী খাটিয়া হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তোষ তখন বাসন্তীকে কহিল, "এখন অত নড়াচড়া করো না, আমিই ত দিচ্ছি, তুমি অমন কচ্ছ কেন?"

লজ্জিত কণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "আপনার ও সব অভ্যেস নেই। দিন, আমিই কচ্ছি।"

পত্নীর শুষ্ক অথচ লজ্জারুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া গভীর বেদনামিশ্রিত কণ্ঠে সন্তোষ কহিল, "বাসন্তী—এখনও কি—প্রায়শ্চিত্ত—শেষ—হয়নি—আর কেন কষ্ট দিচ্ছ? আজ আমি তোমার সঙ্গে একটা শে—শেষ বোঝা-পড়া করতে এসেছি—শোন—বাসন্তী, তোমায় বিয়ে ক'রে আমি তোমার জীবনটাকে যে মাটী করেছি—আজ তার জন্যে—"

বাসন্তীর ইচ্ছা হইল, একবার জিজ্ঞাসা করে, আজ কি তবে চৌদ্দ পাকে সেটা ফিরিয়ে নিতে এসেছেন? কিন্তু কথার উপর কথা বলিয়া তর্ক করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ, সুতরাং সে কথার জবাব দিল না।

সন্তোষ কিছুক্ষণ পত্নীর অবিচলিত মৌন মুখের পানে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বাসন্তী, অনেক দিন ধ'রে এমনি একটা অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তুমি

বোধ হয় এটা পাগলের প্রলাপের মতই উড়িয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু তবুও বল্‌ছি, আমি আর যা-ই হই, তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, এ কথা তুমি ইচ্ছে কল্লে বিশ্বাস করতে পার।” উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

তখনও বাসন্তী কোন উত্তর দিল না দেখিয়া সন্তোষ পুনরায় কহিল, “অনেক দিনের অনেক কথা বুকের ভিতর জ'মে রয়েছে, আজ আর তারা বাধা মানছে না, বাসন্তী। যদি নির্দ্দয় হৃদয়হীন স্বামীকে ক্ষমা ক'রে থাক— তবে শোন, তোমায় গোটাকতক কথা ব'লে যাই—”

সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বাসন্তী কহিল, “আপনি কোথায় যাবেন?”

“কোথায় যে যা'ব, তা' এখনও বল্‌তে পারি না। তবে যা'ব—তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, সে জন্যে আমায় ক্ষমা করো। মনে ভেবেছিলুম, তোমায় কখনও ভালবাসতে পারব না, কিন্তু—কিন্তু আজ ক'মাস থেকে আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তোমাকে আমি—তুমি বোধ হয় জান, কলেজে পড়বার সময় আমি এক জনকে ভালবেসেছিলুম—সে—সুষমা—সে ভালবাসার প্রধান অন্তরায় ছিলেন বাবা। বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমি যে তোমার উপর অন্যায় অত্যাচার করেছি, তা' আমি অস্বীকার করবো না।”

বাসন্তীর প্রতি শিরায় শোণিতের স্রোত তখন যেন তালে তালে নৃত্য করিতেছিল। অপূর্ব্ব সুখের অজ্ঞাত পুলকস্পর্শে তাহার দেহ যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। যে পবিত্র ভালবাসার নির্ঝরধারায় নিজের তৃষাদগ্ধ অন্তরটাকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, যে অসহনীয় জীবন-সংগ্রামে সে নিজেকে পরাস্ত বোধ করিতেছিল, আজ এত দিনের অত্যাচার, অবহেলা, অবিচার সমস্তই স্বামীর মনের আকুল ভাব দেখিয়া ঝড়ের মুখে ধুলিরাশির ন্যায় কোন্ মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; চিরদিনের কাঙ্ক্ষিত এই বাণীটুকু এক অজ্ঞাত পুলকের সুধাধারায় তাহার দেহ-মন সিঞ্চিত করিয়া দিল, তাহা সে অনুভব করিতে পারিল না। হতাশভরা জীবনের রাত্রিশেষে, সত্যই কি এ আশার উষা? আজ কি যথার্থই তাহার নব জাগরণের শুভমুহূর্ত্ত? সত্যই কি ইন্দ্রেশ্বর হৃতসম্পদ লইয়া চির উপেক্ষিতার দ্বারে উপস্থিত? এ কি মরুমরীচিকা! ব্যর্থ নারীজীবনের তীব্র হাহাকার সত্য সত্যই কি তোমার চরণতল স্পর্শ করিয়াছে? এ কি আশাতীত করুণা তোমার, দেব!

যে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাসন্তীর মন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর কথায় যখন মনের মেঘ কাটিয়া গেল, তখন তাহার মনে হইল, এ শুধু বিসর্জ্জনের বাজনা নহে, এর সঙ্গে আগমনীও আছে।

পত্নীকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্তোষের মন যেন বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে পুনরায় কহিল, “তোমার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি, নিজেও সে জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছি। যে কথা এত দিন লজ্জায় বল্‌তে পারিনি, আজ তোমাকে সে কথা ব'লে বুকের ব্যথা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। এখন বোধ হয়, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার যে, আমি তোমায় ভালবাসি— আর—আর—তুমিই—আমার—স—” বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্তোষ বাসন্তীর কম্পিত হস্তদ্বয় নিজের শীতল হস্তের মধ্যে লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, “তোমার অনুমতি না নিয়ে তোমায় স্পর্শ করেছি, সে জন্য আমায় ক্ষমা করো। আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার এ ধৃষ্টতা—ক্ষমা করো। আর হয় ত দেখা হ'বে না—আজ আর আমায় লজ্জা করো না, বাসন্তী—শুধু—এক—একবার তোমার মুখে শুনে যেতে চাই যে, তুমি আমায়—ঘৃণা—কর না—আর বল, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ! এমন ক'রে ভুলের মধ্যে আমায় ঢেকে রেখ না—”

বাসন্তী তখন শান্ত অচঞ্চল জলভরা চক্ষু দুটি স্বামীর বেদনামিশ্রিত মুখখানির দিকে তুলিয়া ধরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, “আপনি দিদির কাছে অপরাধ—তাঁ'র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর—আর—”

বাসন্তী সন্তোষের ধৃত হাতখানির দ্রুত কম্পনেই তাহার মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল। যে যাহা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না। একমুখ হাসি লইয়া সুষমা গৃহমধ্যে আসিয়া ডাকিল, “বাসন্তী—

এ কি! সন্তোষদা—" সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সন্তোষ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "চমকে উঠলে কেন, সুষমা? যেও না, তোমার সঙ্গে আমাদের—আমার কিছু কথা আছে।"

ধীর, শান্ত কণ্ঠে সুষমা কহিল, "আমাকে—"

সন্তোষ কহিল, "হাঁ, তোমাকে। সুষমা, আজ এত বৎসর পরে তোমার কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি; বাবার আশীর্ব্বাদ তোমার ভবিষ্যৎবাণী—আর বাসন্তীর ব্যাকুলতা সত্যই আমাকে সত্যের পথে এনেছে। আমায়—ক্ষমা—করো সুষমা।"

ভূমিতলে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া সংযতকণ্ঠে সুষমা কহিল, "ও কথা ব'লে আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না, সন্তোষদা, অপরাধী ত আপনি নন, সে অনুপাতে আপনার কাছে আমিই বরং বেশী অপরাধী—আপনি আমার দীক্ষাদাতা—গুরু।"

বাসন্তীর নিকট হইতে দুই পদ পিছাইয়া আসিয়া সন্তোষ কহিল, "গুরু? কি বল্লে—আমি—তোমার—"

"হাঁ সন্তোষদা, আপনিই আমার গুরু। আপনি যদি বাসন্তীকে এ ভাবে না রাখতেন, তা' হ'লে আমি বোধ হয়, আপনাদের এতখানি চিনতে পারতুম না। তাই বলছি, আমার মুক্তিপথের দর্শয়িতাই আপনি; নারী-মাত্রেই দুর্ব্বল, চিরদিন পরাধীন—বিশেষতঃ হিন্দুর ঘরে। কেন না, যা'র কাছে তা'কে আজীবনের বন্ধন স্বীকার ক'রে নিতে হয়, যা'র সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত ক'রে রাখতে হয়, সেই অজ্ঞাত সাগরে ঝাঁপ দিয়ে হিন্দুর মেয়ে যে অচল অটল অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে আসে, অন্য জাতের মত তারা ত ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গীকে দেখবার বা চেনবার অবসর পায় না। এই সরল গভীর বিশ্বাস—প্রথম জীবনের ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, যাদের চরণে আমরা উৎসর্গ ক'রে দিই, তা'রা যদি স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে তা' পায়ে ঠেলে দেয়, তা' হ'লে আমরা কোথায় যাই? ওপরের আবরণটাকেই লোক দেখে, ভিতরের খবর কয়জনে রাখে বলুন? বাসন্তীর দুর্ভাগ্যই আমাকে সংসারে দৃঢ় ক'রে রেখেছে, আর এই দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ আপনি—তাই বলছি, আপনিই আমায় নারীর প্রকৃত পথের সন্ধান দেখিয়ে দিয়েছেন।"

গৃহমধ্যস্থ আলোকে সুষমার পবিত্র গৌরবমণ্ডিত তপস্বিনী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সন্তোষ অনুতাপমিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, "তোমায় চিনতে পারিনি, তোমার দান অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়ে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি। দাও, সুষমা, আজ তোমার দান আমি সাদরে গ্রহণ কচ্ছি।"

সুষমা তখন অগ্রসর হইয়া বাসন্তীর তুষারশীতল হস্ত দুইখানি সন্তোষের কম্পিত হস্তদ্বয়ের উপর রাখিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আজ তবে আমার বোনটিকে গ্রহণ করুন, সন্তোষদা। আমার সাধনার সিদ্ধিটুকু আপনাকে দিয়ে যাই; বাসন্তীকে আপনার কাছে দিয়ে আমি এখন নিশ্চিন্তে আমার আশ্রমে ফিরে যাই। আপনি এত মহৎ বলেই আপনার কাছে সে দিন বাসন্তীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। যাক—আর সে কথায় দরকার নেই—আপনি জানেন না—আপনার ভালবাসা পাওয়া—যে কোন নারীর সাধনা—" এই বলিয়া সে গৃহের বাহির হইয়া গেল। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা যেমন করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাটীর তলদেশ অবধি ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন, সন্তোষের ইচ্ছা হইল, ঐ পাষাণী অথচ ধরিত্রীরূপিণী সুষমার অন্তরের তলদেশটা সে যদি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিত! কিন্তু কি ভাবিয়া সে তাহার অবাধ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রবলভাবে শাসিত করিয়া রাখিল। মনে মনে বলিল, "সেই স্থান তোমার অক্ষয় হোক, সুষমা।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্তোষ ফিরিয়া দেখিল, বাসন্তীর দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ, চোখের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে, সে যেন স্বপ্নাভিভূতা, আত্মবিস্মৃতা।

সন্তোষ ধীরে ধীরে বাসন্তীর স্কন্ধে শ্লথ হস্তখানি স্থাপন করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "কিছু ত বল্লে না; তবে বিদায় দাও, বাসন্তী। আর তোমার চোখের সুমুখে থেকে যন্ত্রণা বাড়াব না—আমিই তোমার দুর্দ্দশার হেতু—তাই দূরে যেতে চাই—আর এই নিষ্ঠুর জীবনের সন্ধ্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথের শেষ পাথেয়স্বরূপ তোমার অকৃতজ্ঞ স্বামীকে এমন কিছু দাও, যাতে একা পথে চলতে গিয়ে অভাবের ব্যথায় আমার মনকে পীড়িত করতে না পারে। মাঝে মাঝে এক একবার মনে করিয়ে দেয় যে, শেষ দিনে তুমি ক্ষমা করেছিলে। এক দিন

এমনই অশুভ সন্ধ্যায় তোমার প্রাণের আকুল আহ্বান উপেক্ষা ক'রে অন্যপথে গিয়েছিলুম,আজ আবার তেমনই সন্ধ্যায় তোমার বিনাহ্বানে আবার তোমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে—ক্ষমা চাইতে এসেছি। যদি ক্ষমা ক'রে থাক,' তা' হ'লে তা'র চিহ্নের মত এমন কিছু আমাকে দাও, যা আমাকে এই চোখের শেষ পলক পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ক'রে তোমার অবিকৃত স্মৃতিটাই উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মত স্থির রাখে। আমাকে যেন শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে। বল, সময় নে—"

স্বল্পভাষিণী লজ্জিতা বাসন্তী কি করিয়া জানাইবে যে, দীর্ঘ সাত বৎসর সে কি ব্যাকুলতার সহিত যাপন করিয়াছে, কত বিনিদ্র নিশীথে একাকিনী শূন্য শয্যায় শয়ন করিয়া সেই দেবাদিদেবের চরণে নিজের কাতর প্রার্থনা জানাইয়া উপাধান সিক্ত করিয়াছে। হায়! সর্ব্বহারা রিক্তা বাসন্তী আজ নূতন করিয়া তাহাকে আবার কি দিবে? তাহার সুখশিথিল দেহলতা যেন এলাইয়া পড়িতেছিল, বক্ষের স্পন্দন স্থির হইয়া যাইতেছিল, কণ্ঠ ভাষা হারাইয়া ফেলিতেছিল, প্রবল অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, সে শ্লথ গতিতে কম্পিতপদে সন্তোষের নিকট আসিয়া তাহার পায়ের উপর মস্তক রাখিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি কোথায় যাবেন, আমায় আর ত্যাগ কর—"

উত্তীর্ণ সাহারার উপকণ্ঠে যে শীতল নির্ঝরবারি সন্তোষের পিপাসিত কণ্ঠ আর্দ্র করিতে সাগ্রহে উছলিয়া উঠিতেছিল, আজ আর সে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

সমাপ্ত

আনন্দময়ী

—ওগো আমার সোহাগিনী প্রিয়া,
চিত্তভরা চিত্ত তোমার—স্নিগ্ধ-মধুর হিয়া।
মূর্ত্তিমতী স্ফূর্ত্তি তুমি,
আনন্দ যায় চরণ চুমি',
তোমায় আমি চিনিনিক আঁখির আলো দিয়া।

সাধন-পথের পথিক আমি চল্‌ছি পথ চেয়ে
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক-ধারায় নেয়ে,
ক্ষুদ্র আমার হৃদয়-পুটে
প্রীতির নিযুত লহর ছুটে,
পুলক লাগে লক্ষ কবির চরণ-পরশ পেয়ে।

ভেবেছিলাম প্রাণের দোসর তোমার মাঝে নাই,
আমার লাগি আমার মতই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান-গরিমা নাইক যেথা
আনন্দ কি মিল্‌বে সেথা!
জঙ্গলী মেয়ের জঙ্গলী বুলি—মূল্য তাহার ছাই!

আজকে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সে-যে বিল্‌কুল্,—
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল;
তোমার মুখের কথার মাঝে
বীণাপাণির আলাপ বাজে,
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশগুল্!

তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত
সৃষ্টি করে আমার মাঝে অপূর্ব্ব সওগাত,
একটু হাসি, একটু কথা,
দুষ্টামি ও প্রগল্‌ভতা,
নিবিড়-নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিন-রাত!

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভাল লাগে,
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে!
কোথায় কবির কাব্য সুতার,
ভাল লাগে তাদের কি আর!
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব মাধুরী জাগে।

গোলাম মোস্তফা।

রমেশকে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে হইতেছে এবং তাহার বন্ধু-বান্ধব হইতে অন্তর্যামী সকলেই জানেন যে, রমেশ এই প্রস্তাবে কিরূপ মর্ম্মাহত। কিন্তু উপায় নাই; রমেশ একান্তই নিরুপায়।

রমেশের স্ত্রী মন্দা আজ ন্যূনাধিক চারি বৎসর রোগশয্যায় শায়িতা, উঠিবার আশা অতি অল্প; জীবনের আশঙ্কা যদিচ এখনও সুস্পষ্ট নহে, তবে সে যে কোনকালেই আর স্বাস্থ্য-সম্পদ্-সম্পন্না হইয়া সংসারের এক জন হইতে পারিবে, সে আশা সুদূরপরাহত। সংসারে রমেশের মা—বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেহই নাই। একমাত্র ভগিনী, সে স্বামি-পুত্র-কলত্র লইয়া সুখে তাহার স্বামীর ঘর করিতেছে। রমেশের স্ত্রী মন্দার অসুখের প্রথম বৎসরের কয়েকটা মাস রমেশের ভগিনী মোহিনী দাদার অচল সংসারে মাতার সহকারিণীরূপে কিছু দিন আসিয়া বাস করিয়াছিল; দ্বিতীয় বৎসরেও এক মাস আসিয়া ছিল, কিন্তু তৃতীয় বৎসর হইতে আর আসিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পাওয়ায় সে নিজেই কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও বটে, আর চিররুগ্না ভ্রাতৃজায়ার সেবা করিবার কিঞ্চিন্মাত্র আগ্রহও তাহার নাই, না আসিবার ইহাই অপর একটি কারণ।

রমেশের বৃদ্ধা জননী যত দিন পারিয়াছিলেন, সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহার শক্তিও নাই সামর্থ্যও নাই, ইচ্ছাও বোধ আর করি নাই। তবে তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। একাদিক্রমে ৪ বৎসরে অর্থের শ্রাদ্ধ ত করা হইয়াছেই; রুগ্না পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া রমেশের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়াছে, অথচ সারিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। রোগ না বাড়ে, না কমে, এক রকম খবু-থবু অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাতে মানুষ যদি সহিষ্ণুতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে দোষ দিতে পারা যায় কি?

ইদানীং রমেশের মা পুত্রবধূর তথ্য লওয়া একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে রুগ্নার কক্ষে পা দিতেও তাঁহার পা উঠে না। প্রকৃতপক্ষে রমেশের স্বাস্থ্যহীন দেহ, পাণ্ডুর আনন, ক্লিষ্ট ভাব দেখিয়া জননীর হৃদয় যে পরিমাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, পুত্রবধূর প্রতি ততোধিক বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না বটে, তবে মনের ভাব ত গোপন করিবার নয় কি না, চাকর-দাসী হইতে পুত্র রমেশ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার রেখাঙ্কিত মুখেই সে ভাবাটি নির্ব্বিঘ্নে পাঠ করিয়া লইয়া থাকে। তাহার ভাবার্থ এইরূপ:—অভাগী ধনে-প্রাণে মারিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইবে। অর্থাৎ থাক, টীকা ভাষ্য করিবার আর প্রয়োজনই নাই।

রমেশকে বাহির হইতে যতদূর দেখা যাইত, তাহাতে তাহার জননী যে কিছুমাত্র ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা নয়, সে দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার দৃষ্টি অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে। তবে বাহির হইতে যে স্থানটি দেখা যায় না, চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিও যেখানে পৌঁছিতে অক্ষম, সেই স্থানে রমেশ পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, অফুরন্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত একাগ্রতা লইয়া মন্দার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিল। চারি বৎসর পূর্ব্বের রমেশ হইতে আজিকার রমেশের এতটুকু পার্থক্যও সেখানে ছিল না।

রমেশ একটা সওদাগরী আফিসে মোটা মাহিনার চাকরী করিত। ১০টায় আফিসে যায়, ৫টায় আইসে। এই ৭ ঘণ্টা ছাড়া মন্দার শয্যাপার্শ্বে কেহ আধ ঘণ্টার অধিক কাল তাহাকে অনুপস্থিত দেখিতে পায় নাই। চারি বৎসরে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কত উলট-পালট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রমেশের স্রষ্টা রমেশকে এমন এক ধাতুতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার এক বিন্দু পরিবর্ত্তনও হয় নাই। আফিসের লোক হয় ত তাহাকে একটু উন্মনা—একটু গম্ভীর দেখিতে পায়, গৃহে—আহারে তাহার একটু আধটু অরুচি, বেশভূষার প্রতি সামান্য ঔদাসীন্য, সংসারের শুভাশুভের প্রতি তাহার দৃষ্টির ঈষৎ অল্পতা তাহার জননীর চোখেও পড়িতেছে সত্য, কিন্তু মন্দা এতটুকু ব্যতিক্রমও তাহার দেখিতে পায় নাই। বিবাহ হওয়া অবধি যে অবাধ স্বামি-প্রেম মন্দাকে একরূপ ডুবাইয়া তলাইয়া আপনাহারা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, আজ এই রুগ্ন, অস্থিসার দেহেও মন্দা সে তলহীন, অন্তহীন প্রেম-পারাবারের কূল দেখিতে পাইতেছে না। আজও রমেশ সেই স্নেহে, সেই প্রেমে, সেই স্বপ্নে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। রোগে ভুগিতে ভুগিতে প্রথম প্রথম কিছুদিন মন্দা আপনার মৃত্যু-কামনা করিত। নিয়ত তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট রমেশকে মুক্তি দিতেই সে কায়মনে আপনার মৃত্যু-কামনা করিত, কিন্তু এখন রোগ সারিবার নয়, জানিয়াও অভাগিনী ভগবানের কাছে সকাতরে পরমায়ু ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। যে ভগবান্ তাহাকে সংসারে সুদুর্লভ স্বামিভাগ্যে ভাগ্যবতী করিয়াছেন, তাঁহারই কাছে সে এই বলিয়া মাথা খুঁড়িতেছে যে, এমন স্বামীকে সে সুখী করিতে পারিল না, সে তাহার মন্দ ভাগ্য; কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া পরলোকে গিয়াও সে সুখী হইতে পারিবে না। রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তাহার স্নেহ ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে নিরন্তর এই প্রার্থনা জানায় যে, হে ভগবান্, আমি বড় স্বার্থপর, তা আমি জানি; কিন্তু হে আমার অন্তর্যামী, তুমিই আমাকে স্বার্থপর করিয়াছ। এমন স্বামী যদি তুমি আমাকে না দিতে, যদি তিনি একটি দিনের, একটি মুহূর্ত্তের তরেও অযত্ন করিতেন, মুখ ভার করিতেন, বিষণ্ণ হইতেন, আমি মরিতেই চাহিতাম, কিন্তু এ ত তা' নয়! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এ কি দেখিতেছি! মুখে হাসিটি যে লাগিয়াই আছে, কর্ম্ম-ক্লান্ত হাত দু'খানিতে যে নিরন্তর সেবা ঝরিয়া পড়িতেছে; এত কথা, এত গল্প, বিবাহের প্রথম ৫ বছরে যত না পাইয়াছি, এই ৪ বছরে যে তাহার শতগুণ পাইয়াই আমাকে স্বার্থপর করিয়া তুলিতেছে। হে ভগবান্, এমন স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ যে ভাবিতেও আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়!

মন্দা আগে মরণকে ভয় করিত না, এখন সে চিন্তাতেও সে শিহরিয়া উঠে। আগে আগে স্বচ্ছন্দে স্বামীর সঙ্গেই তাহার মৃত্যুর কথা আলোচনা করিত। রমেশের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না পাইলেও আলোচনার বিরাম ছিল না, তাহার মৃত্যুর পর স্বামী যেন তাহার সমস্ত বসনাদি তাহার চিতায় সাজাইয়া দেন; তাহার অলঙ্কারাদি রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে অথবা তদ্রূপ কোন সেবানুষ্ঠানে দান করেন; কেবল তাহাদের যুগল চিত্রখানি স্বামীর শয্যাগৃহে যেমন আছে, তেমনই টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, এ সকল উপদেশ দিতেও তাহার বাধিত না। স্বামী যদি বিবাহ করেন, তবে সেই রমণীর সঙ্গে যেন মন্দার কথা আলোচনা না করেন, এই অনুরোধও করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু আজ ভুলিয়াও সে এ সকল কথা মুখে আনে না।

এখন, যখন সেই প্রসঙ্গটা তাহার কাছে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে, তখন আজ সেই প্রসঙ্গটা লইয়াই গম্ভীরভাবে আলোচনা

করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রমেশের মা এত দিনে মনের ভিতর হইতে কথাটাকে টানিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রমেশের বন্ধু বল, অভিভাবক বল, সহোদর বল,—জগতে মাত্র একটি লোক ছিল, রমেশ ও তাহার জননী উভয়েই যাহাকে ভালবাসিত, স্নেহ করিত, আপদে-বিপদে আহ্বান করিয়া যুক্তি লইত। রমেশের ছেলেবেলাকার বন্ধু সে, নরেন তাহার নাম। স্মল-কজেস কোর্টের উকীল-তালিকায় তাহার নাম ছাপা আছে।

রমেশের মা নরেনকে ডাকিলেন। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন আদালত যাইবার কু-গ্রহ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ও তাহারই অব্যবহিত ফলস্বরূপ কয়েক গণ্ডা পয়সাও বাঁচিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে. নরেন দেরী করিল না। রমেশের মা সাশ্রুনয়নে স্বাস্থ্যহীন, রমেশের কথা বলিতে বলিতে নরেনের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে একমাত্র তুমিই আমাদের পার। তাই তোমাকেই ডেকে পাঠিয়েছি। রমেশ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, খায় না, রাত্রিতে ঘুম নেই, এমন করলে ওই বা আর ক'দিন বাঁচবে? আমি নিজের কথা ধরিনে, সংসারের ভাবনাও ভাবিনে. কিন্তু রমেশের মুখ দেখলে আমার হাত-পা যে পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। আর বৌয়ের যদি সারবার কোন আশা থাকত, এ কথা আমি মুখেও আনতাম না।"

কথাটা যে কি এবং তিনি সত্যিকারের মুখে না আনিলেও, নরেন তাহা বুঝিল। এই প্রস্তাবটা যে অনেক দিন হইতেই ধূমায়িত হইতেছিল, নরেন তাহা জানিত এবং পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সকলেই এই রায় দিয়াছিলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইহা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

নরেন বলিল, "মা, রমেশ কি বলে?"

রমেশের জননী আর্তকণ্ঠে কহিলেন, তা'র কথা আর বলো না, বাবা সে যেন কি হয়ে গেছে। সে দিন তা'কে বললুম, বাবা রমেশ, আমি বুড়ো হয়েছি, সংসার টানতে যে আর পারিনে। তা'র পরদিনই কোত্থেকে একটা ঝি, আর একটা চাকর এনে ভর্ত্তি ক'রে দিলে। এই ত দু'টি লোকের সংসার, নরেন, শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে, তিনটে চাকর দু'টো ঝি রমেশ পুষছে। এই বাজারে কতগুলো ক'রে টাকা মিছে বেরিয়ে যাচ্ছে, বল দিকি বাবা!"

নরেন বৃদ্ধার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধা কহিলেন, "এক দিন বল্লুম, বাবা রমেশ, বুড়ো বয়সে যে রোজ গঙ্গাচান ক'রে ঠাকুর-দেবতা দেখে পরকালের একটু কায করব, তোর সংসারে আবদ্ধ হয়ে তা' আর হ'ল না, বাবা! বাবা নরেন, বলবো কি তোমাকে, তা'র পরদিনই রমেশ ঐ কম্পাশ গাড়ী কিনে বসল; বল্লে, মা, তোমার গঙ্গাস্নানের জন্যে গাড়ী কিনলুম। মা-ছেলের রান্না, তুমি ত জানই নরেন, আমিই রান্নাবান্নাটা করতুম, সেই দিনই খেতে ব'সে উঠে যায়, ভাল ক'রে কিছু খায় না, চায় না, নেয় না, এক দিন বলতে গেলুম, বাবা রমেশ-আমরা সেকেলে মনিষ্যি, তা'র ওপর বুড়ো হইছি, কি ছাই পাঁস যে রাঁধি, তা জানিনে, তোর ত দেখি খাওয়াই হয় না। কত সাধ ক'রে বৌ আনলুম, আমার এমনই পোড়া বরাত যে, স্বামী পুত্তুরকে রেঁধে খাওয়াতে আর হ'ল না!—এই শুনেই, চ'লে গেল। আর খোর-পোষ কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে ঐ ঠাকুরটিকে এনে বসল। চারশ' টাকা মাইনে পায়, সে চারশ' ঐ শুনতেই, মাসের শেষে বাছা চারটে টাকাও হাত রাখতে পারে না। আর পারবেই বা কোত্থেকে বল, ঐ রোগের খরচটা ত বড় কম নয়। মাস ছয় হ'ল, কবরেজী চিকিচ্ছে হচ্ছে, হপ্তার হপ্তায় নাকি কুড়ি টাকার ওষুধই লাগে, তা'ছাড়া—"

নরেন উচ্ছ্বসিত বন্ধু-প্রেমে বিগলিত-হৃদয় হইয়া বলিল, "মা, তুমি যা' বলছ—রমেশ রাজী হবে না।"

"ও বাবা নরেন, অমন কথা বলো না, বাবা। রাজী তা'কে করতেই হ'বে! নইলে রমেশ আমার বাঁচবে না। আমি কি এই বয়সে তা'কে হারাব নরেন!"—বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এখনও নাইতে নামেনি, তুমি বাবা. একবার 'স্বচক্ষে' গিয়ে দেখে এস, সেই হাড় কখানাকে আগলে বাছা আমার চুপটি ক'রে ব'সে আছে। আমি ঐ দেখতে হ'বে ব'লে সে ঘরেই ঢুকতে পারি নে, বাছা। শেষে কি একটা উৎকট রোগে প'ড়ে এই মরণকালে পুত্রশোক সইতে হবে নরেন?"

নরেন নীরব। সে শ্রদ্ধানত চিত্তে, তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর কথাই ভাবিতেছিল। মনে প্রাণে রমেশ চিরকাল বড়; তাহাকে জানিবার সৌভাগ্য নরেনের ঘটিয়াছিল। আজ তাহার মাতার মুখের এক একটি কথা শুনিতেছিল আর বন্ধুগর্ব্বে তাহার বুক দশ হাত হইয়া উঠিতেছিল।

রমেশের মাতা কিন্তু ঠিক সেই সময়েই মাটীতে প্রোথিত হইয়া যাইতেছিলেন, মজ্জমান ব্যক্তির মত শূন্যে হাত ছুড়িতেছিলেন। বলিলেন, "ও বাবা নরেন, আমি কি বুড়ো বয়সে শেল বুকে নিতেই ওকে গর্ভে ধরেছিলুম রে! তুমি যে রমেশের প্রাণের বন্ধু, নরেন, তুমিই কি বাবা সুখী হ'তে পারবে!"—নরেনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধা হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

নরেন আর্দ্র হৃদয়ে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মা, আপনি চুপ করুন, আমি রমেশের সঙ্গে কথা কয়ে আপনাকে জানাব!"

বৃদ্ধা পুত্রসম নরেনের দুইখানি হাত ধরিয়া সানুনয়ে কহিলেন, "জানাব নয়, নরেন, এটি তোমাকে করতেই হবে, বাবা। রমেশ তোমার বন্ধু, ছেলেবেলাকার বন্ধু, দুজনে হরিহর আত্মা ভাব, তা'কে তোমার রাজী করতেই হবে, বাবা।"

যত বড় বন্ধুই হোক, রমেশকে আপন সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা যে তাহার সাধ্যাতীত, নরেন তাহা জানিত; তাই কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমেশের বৃদ্ধা জননী তাহাকে নীরব দেখিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "আর বাবা, তুমিও যদি রমেশের মত পাগল হও, তবে দু'বন্ধুতে পরামর্শ ক'রে আমাকে এ বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দাও। এ দৃশ্য আর আমি চোখে দেখতে পারি নে। যেখানে দু'চক্ষু যায়, চ'লে যাই, চোখের ওপর একটিমাত্র ছেলেকে আমি হারাতে"……ভীষণ কল্পনা তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

নরেনের দুর্ব্বল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়াই নরেন এই বলিয়া আশ্বাস দিল যে, 'মা' আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি রমেশকে রাজী করাচ্ছি।"

বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া নরেনের মাথায় কম্পিত হস্তখানি রাখিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন।

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণ শপথ করিতে দ্বিধা করে না, তাহা রক্ষা করিবার সময় আসিলেই তাহারা মুসড়াইয়া পড়ে। যে সব কথা হইল, তাহার পর এই হীন প্রস্তাব লইয়া রমেশের সম্মুখীন হওয়া যে কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াই নরেন চলচ্ছক্তি হারাইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু মৌখিক আশীর্ব্বাদই নরেনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সর্ব্বান্তঃকরণে, তাহার মস্তকে আশিষধারা বর্ষণ করিতে করিতে রমেশের মা তাহার পিছনেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নরেন রমেশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

নরেন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। সে দিন আফিস যাইতে

রমেশের এক ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল এবং মামলাহীন উকীল নরেন্দ্রের কর্ম্মঠ মুহুরী সেই দিনই নরেনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, আজ গোড়ার দিকেই সে একটা কেস্ সংগ্রহ করিয়াছিল, বিলম্বে তাহা পর-হস্তে চলিয়া গিয়াছে। নরেন ইহাতে দুঃখিত হইল না। কারণ, ইতঃপূর্ব্বেই তাহার ঠিক অনুপস্থিতির দিনই তাহার মুহুরী বহুসংখ্যক মামলা আনিয়া হতাশ হইয়াছে, ইহা সে তদীয় প্রমুখাৎই অবগত হইয়াছিল। তাহার দুঃখিত না হইবার আরও একটা কারণ ছিল, রমেশের মা'কে সত্যই সে ভাবী পুত্রশোকের দুশ্চিন্তা হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে।

রমেশ বলিয়াছে, সে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিবে।

২

রমেশ যথাসময়ে আফিস হইতে ফিরিয়া মন্দার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, মন্দার শীর্ণ হাত দুইখানি হাতের মধ্যে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছ,মন্দা ?"

মন্দা বলিল "ভাল আছি।"

বাস্তবিক ইহা সত্য নহে; আজ তাহার অসুখটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

"কিন্তু গা গরম কেন, মন্দা ?" রমেশ উৎকণ্ঠিত মুখে কথাটা বলিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিল। কাচের বুককেস্‌টা খুলিয়া, থার্‌মোমিটার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ জ্বর বেশী বলে মনে হচ্ছে, দেখি একবার!"

মন্দা বলিল "না, বেশী নয়!" বলিতে বলিতে মন্দার ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর হইয়া আসিল এবং চক্ষুপল্লবাসিক্ত হইবার উপক্রম করিল। কক্ষে তখন আলোক জ্বলে নাই; দিবসের আলোও ম্লান হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেই অল্প আলো অল্প আঁধারেই রমেশ সবখানি দেখিতে ও বুঝিতে পারিল। সে ত মন্দাকে কেবল চোখের দৃষ্টিতেই দেখিত না, তাহার অন্তর্দৃষ্টি যে আঁধারে আলোকে সমানভাবেই প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইত।

কথা না বলিয়া, রমেশ থার্ম্মোমিটারটি মন্দার বগলে দিয়া মন্দার চর্ম্মসার কপালটির উপর কপোল রক্ষা করিয়া শুইয়া পড়িল।

মন্দার দুই চক্ষু ভেদ করিয়া, এইবার প্রবলধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল; অশ্রু গোপন করিতে মন্দা পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, রমেশ বাধা দিয়া বলিল—"আর এক মিনিট, থার্ম্মোমিটার খুলে নিই। কিন্তু কাঁদছ কেন, মন্দা আমার? ওহ, বুঝেছি!—তুমি বুঝি নরেনের সঙ্গে আমার পরামর্শ শুনেছ ?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

"মা'র কাছে শুনেছ ?"

মন্দা ঘাড় নাড়িল—"না।"

রমেশ সবিস্ময়ে বলিল, "শোননি কিছু?"

এবার আর মন্দা ঘাড় নাড়িল না। সে শুনিয়াছিল। রমণী, হিন্দুঘরের রমণী মিথ্যা বলিতে আজও শিখে নাই।

রমেশ পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল, "শুনেছ ?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শুনিয়াছে।

রমেশ থার্ম্মোমিটারটি টানিয়া লইয়া, পরীক্ষা করিয়া বলিল, "যা বলিছি, তাই, আজ জ্বর একটু বেড়েছে।"

অন্যদিন জ্বর কত, মন্দা তাহা জানিতে চাহিত, আজ প্রশ্ন করিল না।

রমেশ যন্ত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া, বসিয়া বলিল, "তোমার বিশ্বাস হয় ও কথা?"

মন্দা সিক্ত আঁখি তুলিয়া চাহিল।

"বল, মন্দা, বিশ্বাস হয় তোমার ?"

মন্দা কথা কহিল না। তবে তাহার জীর্ণ দেহখানি যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা রমেশের অজ্ঞাত রহিল না।

রমেশ বলিল, "না বল্‌লে আমি ছাড়্‌ব না, মন্দা আমার! বল্‌তেই হ'বে।"

মন্দা বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, "কি ?"

রমেশ বলিল, "তুমি, আমার মন্দা, বিছানায় প'ড়ে আছ, রোগ ভুগছ, আর আমি টোপর মাথায় দিয়ে বর সেজে বিয়ে ক'রে আস্‌ছি, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয় ?"

মন্দার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে চাহিল,—"না গো না, বিশ্বাস হয় না, চোখে দেখিলেও না!" মন্দার জিহ্বা সজোরে সে কথা জানাইতে চাহিল, কিন্তু অশ্রু পথরোধ করিল, মন্দার বলা হইল না।

রমেশ বলিল, "বল, মন্দা আমার? বিশ্বাস হয় তোমার? চুপ ক'রে আছ কেন, মন্দা? আমি যা করব, তা কর্‌বই। তোমার মনের কথাটিও আমায় জান্‌তে দেবে না, মন্দা ?"

স্বামীর কণ্ঠে ব্যথা অনুভব করিয়া মন্দা প্রাণপণ শক্তিতে জিহ্বায় বলসঞ্চার করিয়া বলিল,"কত কাল আর মড়ার বিছানা আগলে..."

রমেশ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ! ও কথা আমি শুন্‌তে চাইনি, মন্দা!"

মন্দা কাঁদিল। কাঁদিয়া ভগবানের চরণে এই নিবেদন করিল যে, এমন স্বামী যদি দিলে প্রভু, তবে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য দিলে না কেন?

রমেশ বলিল, "আমার কথার ত উত্তর দিলে না, মন্দা ?"

মন্দা পাংশুনেত্রে চাহিল মাত্র।

রমেশ নত হইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল, মন্দা ?"

মন্দা বলিল না।

রমেশ রাগ করিয়া বলিল, "বলবে না ?"

মন্দা বলিল। চক্ষু মুদিয়া, অতি কষ্টে বলিল, "মা'র কত কষ্ট হচ্ছে, তোমার কষ্টের ত......"আবার অশ্রু-স্রোত কণ্ঠে উথলিয়া উঠিল; মন্দা কথা শেষ করিতে পারিল না।

রমেশ মন্দার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া, অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিল।

মন্দা ধীরে, কষ্টে দক্ষিণ হস্তখানি রমেশের কোলের উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, "রাগ কর্‌লে ?"

রমেশ কথা কহিল না।

"রাগ করো না। তুমি রাগ করেছ, এ যে আমি ভাবতেও পারি না। কথা কও, কথা কও, আমার মিনতি রাখ, কথা কও।"

রমেশ মুখ ফিরাইয়া নীরবে কাঁদিতেছিল, সাড়া দিল না।

মন্দা বলিল, "বল্‌ছি, ফেরো, আমার দিকে চাও।"

রমেশ বাম হস্তে চক্ষু মুছিয়া ফিরিয়া চাহিল।

মন্দা বলিল, "বল্‌ছি।"

রমেশ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মন্দা ধীর কণ্ঠে কহিল, "আগে বিশ্বাস হ'ত না; এখন"......সে থামিল।

রমেশ বলিল, "এখন বিশ্বাস হয় ?"

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "হয়।"—বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। এবারের অশ্রু শুধু চোখের নয়, বুকেরও। বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

রমেশ কথা কহিল না। তবে ভগবান্ জানেন, মন্দার কথায়

তাহার বুকের পাড় যেন বর্ষার পদ্মার কূলের মত ভাঙ্গিয়া ধসিয়া পড়িতেছিল।

মন্দা বলিল, "তুমি আরশীতে মুখ দেখ না, যদি দেখতে, তা' হ'লে মড়া আগলে প'ড়ে থেকে তোমার যে 'কি দশা হয়েছে, তা' দেখতে পেতে।"

রমেশ নীরব।

"তুমি খেতে পার না, সারা রাত জেগে কাটাও, এ রকম করলে তোমার শরীরই বা ক'দিন বইবে। আর মা-ই বা তা কত দিন সহ্য করবেন? মা'র প্রাণ ত, ছেলেকে—একমাত্র ছেলেকে না গৃহী, না সংসারী দেখে কোন্ মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?"

কথাগুলা রমেশ শুনিতেছিল কি না, কে জানে, সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

"তবে—তুমি যে নিজের ইচ্ছেয় করছ না, তা আমি জানি।" মন্দা কাঁদিয়া ফেলিল, আবার বলিল, "না করেই বা উপায় কি বল? রুগীর বিছানায় ব'সে ত আর মানুষ সারা জীবন কাটাতে পারে না। তুমি সুখী হও" ..শেষের কথাগুলা জড়িত স্বরে বলিয়া ফেলিয়া মন্দা চাদরখানাকে টানিয়া মুখে ঢাকা দিল।

"ভগবান্ আমায় মেরেছেন, তোমার দোষ কি? তিনি আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেননি, তবু তোমার হাতে পড়েছিলুম বলেই এত কাল সুখী হ'তে পেরেছি।"—এই সত্য কথাগুলা এতই সত্য, এতই মরম ভাঙ্গা যে, প্রত্যেকটা অক্ষর যেন তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুতে ধারা নামিল; কণ্ঠ শক্তিহীন হইল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা, একটা কথা বলবে?"

মন্দা ভয়ে ভয়ে আবৃত মুখেই বলিল, "কি?"

"বলবে?"

"কি?"

"আমার সে সুখ তুমি দেখতে পারবে?"

মন্দা সাড়া দিল না।

রমেশ বলিল, "তা হ'লে পারবে না?"

মন্দা নিরুত্তর।

রমেশ ক্ষণকাল থামিয়া বলিল, "তা' হ'লে ত আর তোমার এখানে থাকা হয় না, মন্দা!"

মন্দা দুই হাতে প্রাণপণ শক্তিতে বিছানাটা চাপিয়া ধরিল।

রমেশ বলিল, "আমি ঠিক করেছি, কা'লই তোমাকে মোটরে ক'রে কোন্নগরে রেখে আসব। আফিসের সাহেবের মোটরখানাও চেয়ে এসেছি, কা'ল রবিবার, ছুটী আছে, আর···"

এতদূর অগ্রসর! মন্দা শ্বেতবর্ণের মুখখানি অনাবৃত করিয়া ঐ 'আর'এর শেষটা শুনিতে চাহিল।

রমেশ বলিল, "আর, আসছে রবিবারেই দিন হয়েছে কি না!"

মন্দা দৃঢ় মুষ্টিতে শয্যা চাপিয়া ধরিল।

রমেশ বলিল, "নরেন রাত্রিতেই আসবে'খন; তা'র মুখেই শুনতে পাবে, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।"

মন্দা ভাবিতে লাগিল, আজই কথা উঠিল, আর আজই ঠিক হইয়া গেল! একটা দিন একটা রাত্রি—স্বামী তাহার ভাবিবার সময়ও লইতে পারিলেন না। এক দিনেই সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেল! এত শীঘ্র! ওগো আমার স্বামী, অন্যায় তুমি কিছুই করিতেছ না জানি; এ মৃতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তোমার জীবন বিনষ্ট করাও উচিত হইতেছে না জানি, কিন্তু তবু, তবু একটা সময় দিন তুমি কেন ভাবিতেও লইলে না! একটা দিন কি এতই দীর্ঘ! ৪ বছর পারিলে, আর একটা দিন পারিলে না, প্রভু? আর এখনও ত ন'দিন বাকী রহিয়াছে, কালই আমায় বিদায় না করিলে কি চলিতেছে না? আমার দশ বছরের ঘর, দশ বছরের—দশ জন্মের স্বামী তুমি, কালই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে? চিরদিনের মত, এ জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতে হইবে!

মন্দা কি যেন বলিতেই চাদরখানা সরাইয়া দেখিল, রমেশ সেখানে নাই, কখন্ উঠিয়া গিয়াছে।

ভৃত্য ঘরে আলো দিতে আসিয়াছিল, মন্দা হাত নাড়িয়া বলিল, "আলো বাইরে রেখে দাও, শরণ!"

শরণ প্রভুপত্নীর আদেশ পালন করিয়া চলিয়া গেল।

সেই অন্ধকারেই মন্দার ধূমায়মান দৃষ্টির সমক্ষে যে অত্যুজ্জ্বল সংসার-চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ অপলকনেত্রে চাহিয়া চাহিয়াও সে তাহার মধ্যে আপনাকেই শুধু দেখিতে পাইল না। তাহার স্বামীকে দেখিল, শ্বশ্রূকে দেখিল, দাসদাসীদের দেখিল, আর এক জন অ-দেখা, অ-চেনা, অ-জানা লোককেও দেখিল; কেবল দশ বছরের একান্ত পরিচিত আপনাকেই দেখিতে পাইল না। সেই অ-দেখা, অ-চেনা, অ-জানা স্ত্রীলোকটিকেই সে স্বামীর পার্শ্বে, মধুর আনন, মধুর হাস্য, মধুময় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল!

মন্দার ঘরের দ্বার-জানালা কোন দিনই বন্ধ হইত না, আজও হয় নাই। আপনা-লুপ্ত দৃশ্যটা হইতে চক্ষু ফিরাইতেই সে একটা জানালার পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। শীত-শেষের ফাল্গুনী রাত্রির জ্যোৎস্নায় জানালা ভরিয়া গিয়াছে, ঘরের মেঝেয় ঘুমন্ত অপ্সরীর মত জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মন্দা ভাবিল, আজ এত জ্যোৎস্না না উঠিলেই ভাল হইত।

৩

মন্দা শুনিতে পাইল, নরেন্দ্র বলিতেছেন, "আমাকে কিন্তু তোমার এই বিয়ের পরই দেশ ত্যাগ করতে হ'বে। অবশ্য তা'র জন্যে আমার একটুও দুঃখু নেই। কলকাতার খরচ চালান অসাধ্য হয়ে পড়েছে! অনেক দিন থেকেই ভাবছিলুম, শ্বশুরমশায়ের বাড়ী গিয়ে উঠি, তিনিও ডাকাডাকি করছিলেন, এত দিন হয়ে ওঠেনি। তোমার এই বিয়ের পর বাস্তবিক আমি কলকাতা ছাড়ব।"

নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর যে অত্যন্ত বিষণ্ণ, দুঃখপূর্ণ, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কক্ষান্তরে থাকিলেও, মন্দারও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

মন্দার স্বামী উত্তর দিলেন কি না, মন্দা শুনিতে পাইল না। সে ভাবিতে লাগিল, নরেন্দ্রই তাহার দুঃখের দুঃখী। তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া আর এক জনকে এই সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে সুখী নহে, তাই দেশত্যাগ করিবার সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

স্বামী যে কিছু বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রর কথাতেই তাহা বুঝা গেল। নরেন্দ্র বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ, রমেশ। এর পরে থাকা যায়! অসম্ভব!"

মন্দা এবার স্বামীর কথা শুনিতে পাইল। স্বামী বলিলেন, "আমি বলছি, তুমি দেখে নিও, রমেশ, এর ফল শুভ হ'বেই। এর জন্যে কা'কেও অনুতাপ করতে হবে না।"

মন্দার যদি দেহে অনুমাত্র শক্তিও থাকিত, তাহাই ক্ষয় করিয়া সে ঐ দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া এই কথোপকথন শুনিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু সে যে আজকাল উঠিয়া বসিতেও পারে না!

নরেন্দ্র বলিলেন, However, I wish you happiness every happiness—with all my heart and soul রমেশ। তোমার এই বিয়ের পরদিনই আমি লাক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসে সীতাপুর যাব—it is almost settled. তা'র পর এ দিকে তোমাদের সব মিলন-টিলন হয়ে গেছে যদি জানাও, আবার ফিরতেও পারি, তা'র আগে নয়।"

তাহার স্বামী উত্তরে কহিলেন,"আমার মনে হচ্ছে, যাওয়া-আসার খরচটা তুমি নেহাৎ মিছে-মিছে করবে, নরেন। এখানে থেকেই মিলনটা সম্পূর্ণ তুমি দেখতে পারতে! অতি শোকে, অতি আনন্দে মানুষের মনের ওপর, দেহের ওপর যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তা' বোধ হয় তুমি কখনও শোনওনি, তাই বুঝতে পারছ না। আমি বল্‌ছি তোমাকে, নরেন, তোমার কোথাও যেতে হ'বে না, আমি তোমাকে miracle (যাদু, ভোজবাজী) দেখাব।"

"না, ভাই, অত সাহস আমার নেই।" নরেন্দ্রের কণ্ঠে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

তাহার পর সব নীরব।

মন্দা স্বামীকে দোষ দিল না, শ্বশ্রূকেও দোষী করিল না। তাহার দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

রমেশ যখন ঘরে ঢুকিল, মন্দা জাগিয়াই ছিল, কিন্তু তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার মত ভাবা আজ আর তাহার ছিল না. নীরবে শুইয়া রহিল।

রমেশ ঘড়ীতে সময় দেখিয়া, ঔষধের শিশি, কাচের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া শয্যায় আসিয়া বসিয়া মন্দার ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "মন্দা !"

প্রেমাস্পদের প্রেমপূর্ণ আহ্বান মন্দা নিঃশব্দে ফিরাইয়া দিতে পারিল না, বলিল, "কেন ?"

"ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।"

ঔষধ খাইবার এতটুকু ইচ্ছাও মন্দার ছিল না, কিন্তু সে কথা বলিলে, স্বামী যদি মনঃক্ষুণ্ণ হন, মন্দা বলিতে পারিল না।

রমেশ ঔষধ ঢালিয়া তাহার গালে ঢালিয়া দিল, পান-পাত্রের জল ধীরে ধীরে তাহার গালে ঢালিয়া দিয়া, পিকদানিটা গণ্ডের পার্শ্বে ধরিল।

ইহা নিত্যকার কর্ম্ম। অন্য দিন মন্দা ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই লক্ষ্য করিত না, আজ করিল। কি অপরিমেয় স্নেহপূর্ণ হৃদয়-তাহার স্বামীর! কি ঐকান্তিক যত্ন! কিন্তু হায়, আজই আমার শেষ! কা'ল আর ঐ সেবাহস্তের সেবা সে পাইবে না, ও হৃদয়ের স্নেহ আর সে ভোগ করিতে পাইবে না, আজিই সবের শেষ! আর একটি সপ্তাহ পরে তিনি আর তাহার থাকিবেন না। মাত্র দশটি বছরের পাওনা, সে ত দশ দিনেই ফুরাইয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে তাহার স্বামী,—অন্যের! যিনি আজ তাহার পার্শ্বে বসিয়া স্নেহে, যত্নে আদরে, সোহাগে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন, মন্দার মুখের উপর যাঁহার নিশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে, যাঁহার বুকের স্পন্দন মন্দার বুকে ধ্বনিত হইতেছে, সেই স্বামীর উপর তাহার কোন অধিকার থাকিবে না, তিনি অন্যের হইবেন!

সেই 'অন্য'টি কেমন, তাহার রূপ, তাহার স্বাস্থ্য, তাহার কথা কেমন, মরমে মরিয়া মন্দা তাহাই ভাবিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। আশু বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহার সারা অঙ্গে সূচের মত ফুটিতেছিল, মন্দা অতি কষ্টে তাহা গোপন করিতেছিল।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে, স্বামীর উপর তাহার এক বিন্দু ক্রোধ নাই। তাঁহাকে ছাড়িবার দুঃখের পরিমাণ করিবার শক্তি তাহার নাই-সত্য, তাই বলিয়া তাঁহাকে সে কোন মতেই অপরাধী ভাবিতে পারিতেছে না। তবে ইহাও সত্য কথা, তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়া মানিয়া স্বীকার করিয়াও কষ্টের লাঘব একটুও হইল না।

ভোর হইতেই রমেশ বলিল, "বেলা করা হ'বে না। রৌদ্র জোর হ'লে মোটরেও তোমার কষ্ট হবে, মন্দা। ৭টাতেই গাড়ী আসতে ব'লে দিয়েছি।"

স্বামী কোন প্রশ্ন করেন নাই, উত্তর দিবারও কিছু ছিল না, মন্দা নীরব।

রমেশ হাত মুখ ধুইয়া চা পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। সদর দরজায় মোটরও থামিল।

শ্বশ্রূ অশ্রু-সিক্ত লোচনে বধূকে দেখিতে আসিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। কাঁদিয়াই আকুল হইলেন; বধূও কাঁদিল। রমেশ ঘরেই রহিল, কেবল তাহার চক্ষুতেই জল আসিল না; মন্দা তাহা দেখিল, দেখিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিয়া বসিল! আর বিলম্ব করা তাহারও ইচ্ছা নয়।

শরণ তাহার নিজস্ব তোরঙ্গটি, গহনার বাক্সটি মোটরে তুলিয়া দিয়া আসিল। রমেশ আলমারী খুলিয়া আরও কতকগুলি কি বাহির করিয়া একটা চামড়ার ব্যাগে ভরিয়া দিল, শরণ তাহাও মোটরে রাখিয়া আসিল।

বধূ শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া শ্বশ্রূর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, কত অপরাধ করিয়াছি, অবোধ কন্যা ব'লে ক্ষমা করবেন, মা।"

শ্বশ্রূ কাঁদিয়া ফেলিলেন; বধূ তাহাতেই বুঝিল, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্বশ্রূ ও সুন্দরী ঝি উভয়ে দুই বাহু ধরিয়া মন্দাকে মোটরে বসাইয়া দিলেন। রমেশ নিঃশব্দে আসিয়া পার্শ্বে বসিল।

শ্বশ্রূ বলিলেন, "ওষুধ-পত্তর, চিকিচ্ছে আদি যেমন চলছে, তেমনই চলবে, বৌ-মা! আজ বড় তাড়াতাড়ি হ'ল, রমেশ বোধ হয় কোন ব্যবস্থাই ক'রে উঠতে পারেনি, দু'চারদিন বাদেই সে গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসবে। ভায়েদের সংসারে তোমাকে ভায়েদের হাত তোলায় থাকতে হ'বে না, মা! তা'র পর সেরে ওঠ......"

মোটর চলিল। সারিয়া উঠার পর তাহার কর্ত্তব্য কি, আর সে শুনিতে পাইল না, শুনিতে ইচ্ছাও নাই, কারণ, সে মরিবে, কৃতনিশ্চয়।

কোন্নগর মিত্রপাড়ায় মন্দার পিত্রালয়ের সম্মুখে মোটর থামিতেই, একটা মস্ত সাড়া পড়িয়া গেল। মন্দার ভায়েরা ছুটিয়া আসিয়া ভগিনীকে নামাইয়া লইয়া, ভগিনীপতিকে নামিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিশেষ জরুরী কায আছে বলিয়া, রমেশ নামিল না। শীঘ্রই এক দিন আসিবে বলিয়া, রমেশ মোটর চালাইয়া দিল।

তিনি যে শীঘ্রই এক দিন কেন আসিবেন, শাশুড়ীর শেষ কথাগুলা মনে ছিল বলিয়াই, বুঝিতে মন্দার বিলম্ব হইল না। হায় গো! এ কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য! স্বামীর স্নেহহীন, স্পর্শহীন অর্থগুলা কি লইতেই হইবে? তাঁহাকে হারাইয়া, তাঁহার কণামাত্র দয়া, অনুকম্পায় প্রাণ ধরিতে হইবে? এ ছার প্রাণের এত দাম!

মন্দা আপন মনেই সঙ্কল্প করিল, না, তাহার প্রাণের মূল্য এত নয়; যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে, তবে তাঁহার দয়া গ্রহণ না করিয়াও এ প্রাণ সে ত্যাগ করিতে পারিবে।

মন্দার মা থাকিলে, জামাই অমনই অমনই চলিয়া গেলেন কেন, ইহা লইয়া অবশ্যই যথেষ্ট আলোচনা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু মন্দার বিবাহের দেড় বৎসর পরেই বিধবা স্বামি-দত্ত শেষ ভারটি সসম্মানে নমিত করিয়া মহামিলনের আশায় চলিয়া গিয়াছিলেন। মন্দার ভ্রাতৃজায়ারা সংসারে তেমন অভিজ্ঞ নহেন, সুতরাং মন্দার বর্ত্তমান ও জীবনের কথাটা কেহ জানিতেও চাহিল না, মন্দাও কাহাকেও বলিল না। নিত্য নিয়মিত জ্বর ও রোগ ভোগ করিতে লাগিল।

৪

সুখের বা আনন্দের বিবাহ ত নয়, সুতরাং কোনরূপ বাহুল্যই ছিল না। রমেশ একমাত্র বন্ধু নরেনকে লইয়া, মায়ের জন্য দাসী আনিতে

চলিয়া গেল। পুত্রকে সেই কার্য্যে পাঠাইয়া, তাহার মাতা সেই যে আসিয়া শয্যায় শুইলেন, সারা বিকাল সারা রাত কোথা দিয়া কাটিয়া গেল জানিতে পারিলেন না। সংসারধর্ম্ম করিতে বসিয়া, বাধ্য হইয়া যে অন্যায়টি তিনি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের সুখ-শান্তি একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু কি করিবেন? রমেশ ছেলেমানুষ, তাহার জীবনের সাধ-আহ্লাদ, সুখ-শান্তি, আরাম-বিরাম সব যে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল; মা হইয়া তাই বা তিনি দেখেন কোন্ প্রাণ লইয়া? অভাগীকে তিনিই কি কম ভালবাসিতেন? বধূ ত নয় সে যে তাঁহার মেয়ে মোহিনীর স্থানটাই অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আজ তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া তিনিই কি সুখী হইয়াছেন?

না, না, না—আদৌ না। ঐ সিক্ত উপাধান দেখ; সে বলিবে, না। ঐ বিবর্ণ মুখের পানে লক্ষ্য কর; সে সতেজে কহিয়া দিবে, না। তাঁহার কণ্ঠস্বর কান পাতিয়া শোন; সে তোমার মর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে, না, না, না। তাঁহার প্রাণের কোণে সুখের লেশমাত্র চিহ্নও নাই। কেবল ব্যথা, কেবল বেদনা, কেবল অশ্রু, আর কেবল হাহাকার।

দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া দুই তিনটি রমণীকে না আনিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না বলিয়াই রমেশের মা তাঁহাদের আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রশংসাও করিল; কেহ বা কিছু না বলিয়াই কাযকর্ম্মে যোগ দিল; কেহ কাযটা সমীচীন হয় নাই বলিয়া একটু দুঃখ প্রকাশও করিল। রমেশের মা নীরবেই সব শুনিলেন। বিচারকর্ত্রিগণ যদি জানিতেন যে, অপরাধী তখন তুষের আগুন জ্বালিয়া নিজেই পুড়িয়া ছাই হইতেছে, তবে তাঁহাদেরও প্রিয় অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধিয়া যাইত।

সকালে তাঁহারাই রমেশের মা'র ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিলেন। গত কল্য যাত্রাকালে রমেশ বলিয়া গিয়াছিল, সাতটা আটটার ভেতর আমরা ফিরে আসব—৭টার ত আর বিলম্ব নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যৎসামান্য হইলেও করিতে ত হইবে। রমেশের মা'কে উঠাইয়া আনিয়া, তাঁহারা পিঁড়িতে আলিপনা দিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি আর যত কর্ম্ম ছিল, করিলেন। রমেশের মা জড়ের মত বসিয়া রহিলেন।

৮টা বাজিয়া গেল, ৯টাও বাজে, বর-ক'নের দেখা নাই। সকলেই অল্পবিস্তর উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পাশের বাড়ীর একটি বাবু হাওড়া রেলে কর্ম্ম করিতেন, তিনি টাইম-টেবল পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন, প্রথম গাড়ী ৭টায় আসিয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাড়ী পৌনে আটটা হইতে সওয়া আটটার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। এখন কিছুক্ষণ আর গাড়ী নাই, আবার সাড়ে নটা হইতে পনোরো কুড়ি মিনিট অন্তর গাড়ী আছে। কিন্তু সে সকল গাড়ীই লোকাল ট্রেণ, আজ তা'তে সোমবার, আফিসের বাবু বোঝাই হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বর-ক'নে আসা বড়ই কষ্টকর, সম্ভবতঃ রমেশ বাবু সে সব গাড়ীতে আসিবেন না।

তাই ত! রমেশের মা'র প্রাণে যে ঢেঁকিতে পাড় পড়িতে লাগিল। নরেন সঙ্গে আছে সত্য, বিপদ-আপদে প্রাণ দিয়াও সে রমেশকে রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিলম্বের কারণ কি? রমেশ যে অত্যন্ত অনিচ্ছায় বিবাহে সম্মত হইয়াছে, বৃদ্ধা মাতার চেয়ে সে সংবাদটা বেশী কেহই জানিত না, যদিও এক দিন মা'কে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা-তেই সে যখন তখন হাসিয়াছে ও ছেলেমানুষের মত বায়না আবদার করিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু সন্তানের গর্ভধারিণীর কাছে ইহা ত অজ্ঞাত নাই যে, অন্তরের কষ্টটাকেই তাঁহার সন্তান এই ভাবে গোপন করিতে চাহিয়াছে।

বিগত রাত্রির নিজের অভিজ্ঞতা স্মরণ হইতেই ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি যদি শশ্রু হইয়া সারা রাত কাঁদিয়া বিছানা ভাসাইয়া থাকেন, সেই মন্দভাগিনী মন্দার স্বামী যে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিতে পার নাই, ইহা কল্পনা করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিপজ্জনক ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃদ্ধা একেবারে বাত্যাহত তরুটির মত আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

একটিমাত্র পুত্র, অল্পবয়সেই তাহার বিবাহ দিয়া পৌত্র-মুখ সন্দর্শনের আশায় তিনি যখনই রমেশের কাছে কথাটা পাড়িতেন, রমেশ তখনই বলিত, 'মা যদি লেখা-পড়ার সময় অমন ধারা জ্বালাতন কর, যে দিকে হয়, পালিয়ে যাব, সন্নিসি হ'ব।'

ছেলে বি, এ, পাশ করিলে মা আবার কথাটা তুলিলেন, ছেলে হিমালয়যাত্রার ভয় দেখাইল।

এম্, এ, পাশ করিবার পরও সে এক দিন গেরুয়া ধারণ করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। তাহার পর চাকরী হইল, মা অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কথাটা পাড়িলেন, রমেশ মৌন থাকিয়া সম্মতি দিল।

দশ বছর সুখে ও দুঃখে কাটিয়াছিল। দশ বৎর পরে আজ বৃদ্ধার মনে সেই কথাগুলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল আর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অশ্রু ঝরিয়া চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে, রমেশের মা ভাঁড়ার ঘরের মেঝেয় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছেন।

তাঁহার সেই প্রায়ান্ধ দৃষ্টির সামনে তিনি দেখিতেছেন, রমেশ কা'ল রাত্রিতে বিবাহ-সভা হইতে সকলের অলক্ষ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নরেন্দ্র অনেক সন্ধান করিয়াও তাহার সন্ধান না পাইয়া কলিকাতায় আর ফেরে নাই, কোন্ দূরদেশে গিয়া লুকাইয়া আছে।

অশ্রু আরও জমাট হইয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ছেলে রমেশ গেরুয়া পরিয়া, হাতে একটা কমণ্ডলু লইয়া, পথে পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। তাহার মাথায় সোনালি রঙ্গের জটা ধরিয়াছে, মুখ-চোখের সে শ্রী নাই দাড়ী-গোঁফে মুখ ঢাকা; গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা; পা ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে; আজ ভিক্ষায় সে কিছু পায় নাই, নদীতে নামিয়া এক গণ্ডুষ জল পান করিয়া ঐ যে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছে। তিনি ডাকিলেন, "ও বাবা রমেশ! রমেশ!" সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু থামিল না! বোধ হয়, তাঁহার মুখ আর দেখিবে না বলিয়াই জোরে জোরে চলিতে লাগিল। যে তাহার সুখের সংসার নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাকে গৃহহীন করিয়াছে, পাছে তাহাকেই মা বলিয়া ডাকিতে হয়, সন্ন্যাসী তাই দৌড়িতেছে! তিনিও ছাড়িবেন না, ছুটিবেন তাহাকে ধরিবেনই! এই ত ধরিয়া ফেলিয়াছি—ঐ যা, সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! রমেশের মা রমেশের নামোচ্চারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একটি আত্মীয় বিধবা সে আকুল কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ঘরে আসিয়া মুখে-চোখে জলের ছিটা দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

এই সময়ে দ্বারে মোটর থামিল। শরণা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল, "বাবুজী সাদি করিয়া আসিয়াছেন।"

"আমার রমেশ এসেছে?" বলিয়া তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বিধবার মাঙ্গলিক কর্ম্মে যোগদান নিষিদ্ধ, একটিমাত্র সধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনিই বর-বধূকে বরণ করিয়া লইলেন। রমেশের মা, রমেশ আসিয়াছে, এইটুকু সংবাদেই সন্তুষ্ট ছিলেন, দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া অশ্রু গোপন করিতে লাগিলেন।

বরণ হইয়া গেলে বর-বধূ দ্বিতলে উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই

একটা কলরব উত্থিত হইল। রমেশের মা একাই নীচে বসিয়া ছিলেন, আতঙ্কে কাঁপিলেও কি যে হইয়াছে, তাহা জানিবার কোন চেষ্টা করিতেই তাঁহার সাহস হইল না।

জনৈক বিধবা রমণী ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ডাকিলেন, "ও দিদি, শীগ্‌গির এস! তোমার রমেশ…"

"আমার রমেশ!"—বৎসহারা গাভীর মত বৃদ্ধা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

মাঙ্গলিক কর্ম্মে নিযুক্তা সধবা স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, হাসিমুখে কহিলেন, "এস, দিদিমা, তোমরা বৌ দেখবে এস!"

বৃদ্ধা সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রাণটাই যে উড়িয়া গিয়াছিল। না জানি, রমেশের তাঁহার কি হইল! তবে ভয়ের কিছু নাই। আঃ!

"কি, দিদিমা, বসলে যে অমন ক'রে! তোমার রমেশের বৌ দেখবে না?"

তোমার রমেশের! কথাটায় যাদু ছিল, জননীর লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া আসিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বালা জোড়াটা ভাঁড়ার ঘরে প'ড়ে আছে, নিয়ে আসি, বাছা" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে বালা লইয়া ফিরিয়া পুত্রের কক্ষে ঢুকিলেন।

কাছে আসিতেই রমেশ উঠিয়া মা'কে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া, শয্যায় ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মা, বৌ দেখবে?"

রমেশকে সুস্থ স্বরে কথা কহিতে দেখিয়া মায়ের কান, বুক সব ভরিয়া গেল। মা কালীকে শত সহস্র প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, "দেখব বৈ কি, বাবা! আমার ঘরের লক্ষ্মী এসেছেন, দেখব না?"

"এই দেখ" বলিয়া রমেশ বধূর মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিল।

সামনে বাজ পড়িলেও বৃদ্ধা এত বিস্মিত হইতেন না। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও, এটা বাজ নয়! বলিলেন, "মন্দা!"

মন্দা শাশুড়ীর পা ছুঁইয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা, তোমার দাসী!"

* * * * *

বছর দুই পরে পৌত্রমুখ দেখিয়া রমেশের বৃদ্ধা মাতা মনের আনন্দে কাশীবাস করিতে গেলেন। এই সময়ে নরেনও শ্বশুরালয় সীতাপুরের প্রতি বীতরাগ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আর একবার স্মল-কজেজ কোর্টের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া অন্ন পরিপাক করিতে মনস্থ করিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

বৃন্দাবনে

ময়ূরগুলি নাচছে সদাই
কুঞ্জ ঘিরে ঘিরে,
হরিণ খেলে যমুনার ঐ
শ্যামল তীরে তীরে;
নীল যমুনার স্বচ্ছ জলে
মনের সুখে মরাল চলে,
পক্ষী ঢালে গানের সুধা
তমাল-তালের শিরে।

মুঞ্জরিত পুষ্প সদা
'কুঞ্জ' 'নিধুবনে',
মুক্তা-ফলের শুভ্র শোভায়
হর্ষ জাগে মনে;
হাল্কা হাওয়া চল্‌ছে ছুটে,
কমলকলি শিউরে উঠে,
পিয়াল বনে কোকিল-দোয়েল
ডাক্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

দূরে বেতস-বনের মাঝে
বাতাস করে খেলা,
ব্রজের বালক চরায় ধেনু
সন্ধ্যা-সকালবেলা;
দিক্ কাঁপায়ে সকাল-সাঁঝে
মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে,
পূজার দেউল-প্রাঙ্গণেতে
ব্রজাঙ্গনার মেলা।

অতীত যুগের পুণ্যভূমি
এই ত বৃন্দাবন;
এই মোদের কেলেসোনার
লীলার নিকেতন;
তৃণে লতায় গাছে গাছে
স্মৃতিটি তা'র জড়িয়ে আছে;
ব্রজের ধূলা মাখ্‌তে আমার
পরাণ উচাটন।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

দস্যি মেয়ে

নিস্তারিণী বিধবা—দুঃখী। সংসারের বিজয়যাত্রাটা কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে পরিসমাপ্তি করিয়া দিয়া স্বামী সরিয়া পড়িলেন, রাখিয়া গেলেন একটি শিশু-পুত্র ও একটি মেয়ে। নিস্তারিণী আইবড় মেয়েটিকে লইয়া বিপদ গণিলেন। পাড়ার লোক বলিত,—"মা গো! মেয়ে নয় ত—দস্যি! পার করুতে চাস্ ত পায়ে শেকল দে—শেকল দে!"

এরূপ বলিবার হেতু ছিল। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার বুকের স্পন্দনটা যে দ্রুততালে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, সে দিকে মেয়েটির লক্ষ্য ছিল না। সে কোমরে দুই-তিন ফেরা কাপড় জড়াইয়া লোকের বাগানে বাগানে আম, জাম, নীচু, জামরুল এই সকল সংগ্রহ করিয়া কোঁচড় ভর্ত্তি করিতে আনন্দ পাইত। গাছের কোন ডালটি মাটীতে দাঁড়াইয়া নাগাল ধরিতে পারিলে সে তাহার উপর চড়িয়াও ঝুলিত। পাড়ার লোক এই কারণেই যে তাহার মাতাকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিতেন, সে কথা সে গ্রাহ্য করিত না। মাতা বকিতেন—বুঝাইতেন—ফল হইত না। তলার আমটি কে না কুড়াইয়া লয়? পাকা কুল দেখিলে কে না গাছটায় একবার খোঁচা দেয়? ইহাতে যে বিবাহ বন্ধ হইতে পারে, বিরুদ্ধ দলের এরূপ মীমাংসা তাহার নিকট অত্যন্ত জটিল ঠেকিত। যাহা হউক, নিস্তারিণী দুঃখী বলিয়াই হউক অথবা প্রতিবাসীরা 'গেছো মেয়ে' 'দস্যি মেয়ে' ব'লে যে ডাকনাম দিয়াছিলেন, সেই কারণেই হউক, সম্বন্ধ কিন্তু আর আসিত না। নিস্তারিণীর মতই গরীব-দুঃখী দুই একটি লোক সম্বন্ধ লইয়া অগ্রসর হইলে তাঁহার বাড়ীর অঙ্গনে পা না দিতেই পাড়ার লোক মেয়েটির গুণের ব্যাখ্যা করিয়া সেইখানেই তাহাদের পা দু'খানা থামাইয়া দিতেন। আর নিস্তারিণীকে আসিয়া বলিতেন, "কি করুবি, ভাই, বিধাতা মেয়েটির বিবাহের ঘরে অঙ্কপাত করেন নি, তুই এই বেলা দিন থাকৃতে ওকে সঙ্গে নিয়ে কাশী অথবা কামিখ্যেয় স'রে পড়্।" যিনি অঙ্কপাত করেন নি, তিনি বোধ করি, অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিতেন। নিস্তারিণী কিন্তু এই সকল তীব্র মন্তব্য শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেন আর ভাবিতেন, "সত্যই কি মেয়ের আমার কোন গুণই নাই? আমার মত দুঃখী অনাথাকে জীর্ণ করবার জন্ত পাড়ার লোক কেন এমন উৎসাহী যত্ন হইয়া উঠিল?" এইরূপে উদ্বেগে ও আশঙ্কায় অনাথার দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল।

সে দিন ঝাঁ ঝাঁ দু'পুরবেলাটায় শৈলেনদের ঘাটে একখানি নৌকা আসিয়া নোঙ্গর করিল। নৌকার আরোহী ছিল রমেশ। সে ধনীর সন্তান। এইবার এম্, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। শৈলেন তাহার বন্ধু। তাহাদের বাড়ীতে একবার আসিবার জন্ত সে রমেশকে প্রায়শঃ অনুরোধ করিত। রমেশের মন এ সময় ভাল ছিল না। পরীক্ষা দেওয়ার পর হইতে সে বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির না হইতেই তাহার পিতা রামলোচন বসু চারিদিকে ঘটক ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন,—"আজকালকার ছেলে, রংটা ফর্সা দেখ—চোখ দু'টো বিড়ালের চোখের মত ক্যাট্‌কেটে না

হয়—আর চুলগুলো পাছা বেয়ে পড়ে, এই হ'লেই হ'ল। গড়নপেটন তা'রা বড় বোঝে না। আর আমার দিক্‌কার কথা এই যে,—স্বাস্থ্যটা ভাল দেখ্‌বে, বদ্দির কড়ি আমি যোগাতে পারব না। বয়ের যৌতুক আর ক'নের গহনা দেখে লোক নিন্দা না করে; নগদে হাজার পাঁচেক টাকা হ'লে আমি চালিয়ে নিতে পার্‌ব।" তাহাকে লইয়া নিত্য নূতন নূতন ভদ্রলোকের সহিত পিতা এই যে দর-কষাকষি করিতেছেন, ইহাতে রমেশ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এক দিন সে তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"নগদ পাঁচ হাজার আর গহনা, বরসজ্জা—এই দশ পনর হাজার টাকা একটা সাধারণ লোক জীবনে উপায় কর্‌তে পারে? এ সকল অনাচার যদি কর ত আমি বাড়ী ছেড়ে পালাব, তা' কিন্তু ব'লে দিচ্ছি।"

জননী হরিমতি হাসিলেন। বলিলেন, "এ ত বাপু, নূতন কথা কিছু নয়—এ ত চলনই রয়েছে।"

রমেশ রাগিয়া কহিল, "চলন কে করেছে? মানুষে—না দেবতায়? মানুষে যদি ক'রে থাকে ত মানুষে তা' রদও কর্‌তে পারে।"

হরিমতি পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! আমি ব'লে দেখব।"

তাহার পর হরিমতি এক সময় রামলোচনকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। রামলোচন বলিলেন, "হুঁ।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এ সকল পাগ্‌লামী মতলব কর্‌তে তা'কে বারণ ক'রে দিও। তা'র কোন কথার মধ্যে থাকার প্রয়োজন নেই।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া হরিমতি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পাওনা-থোওনার আশা তিনিও যে করিতেছিলেন।

যাহা হউক, এইরূপ তিত-বিরক্ত হইয়া রমেশ কিছু দিন বাহিরে বেড়াইয়া আসিবার জন্য এক দিন নৌকাযোগে শৈলেনদের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল। নৌকাখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া চাপিলে সে তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি হাতে লইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িল। পথে ঘাটে তখন জনমানবের সম্পর্ক ছিল না। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মি-রাগে প্রকৃতির ধ্যান-মৌন মূর্ত্তিটা তা'র অন্তহীন বৈচিত্র্যকে যেন ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল। একটা মস্ত তেপান্তর মাঠ পার হইয়া যখন বাঁশ, খেজুর, আম, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষবহুল একটি নিবিড় পথে আসিয়া সে দাঁড়াইল, তখন দেখিল, অদূরে ঘেরার মধ্যে একটি এগার বারো বছরের মেয়ে জামরুল পাড়িতেছে। তাহাকে হাঁক দিয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "খুকী—ও খুকী!"

মেয়েটি একবারমাত্র ফিরিয়া চাহিয়া আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রমেশ পুনর্ব্বার ডাকিতে এই শ্রান্ত পথিকটির প্রতি যেন একটা তুচ্ছ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বালিকাটি বলিল, "খুকী কে?—আমি মুক্ত।"

কিন্তু তখনই সে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

রমেশ বলিলেন, "আচ্ছা! মুক্ত, তুমি সরকার-পাড়া জান?"

মুক্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঞ্চির লগিটা গাছের ডালে আটকাইতে তৎপর হইল।

রমেশ বলিলেন, "যদি ব'লে দিতে—আমি বড় ব্যস্ত।"

মুক্ত লগিটার আগায় দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "আমিও ব্যস্ত। বামাপিসী টের পায় ত হাঁ ক'রে গিলে ফেলে দেবে।"

বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মেয়েটি অসদুপায়েই এই লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃতা আছে। রমেশ ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, মেয়েটি অমনি ডাকিয়া বলিল, "চল্‌লেন না কি আপনি?"

"কি কর্‌ব, তুমি ত ব'লে দিলে না।"

"দাঁড়ান না একটু—আমার ত হয়ে গেছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়।"

রমেশ ঘেরাটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুক্ত ভূলুণ্ঠিত জামরুলগুলি কোঁচড়ে কুড়াইয়া লইয়া একটু ব্যস্তভাবেই রমেশের নিকটে আসিল। বলিল, "মা গো! আপনি যে ব্যস্ত মানুষ! এই দেখুন না, বেড়ে ঢুক্‌তে কাপড়খানা কি হয়েছে! যে তাড়া-হুড়ো লাগিয়েছেন আপনি—আর একটা ফালি দিতে পার্‌লে পিঠের আর চামড়া থাক্‌বে না। হাতখানা

ধরুন না—এইখান থেকেই পার হই। পথ ধ'রে আস্‌তে গেলে বামাপিসী হয় ত দেখে ফেল্‌বে।"

রমেশও মনে করিলেন,—"বাবা! এ দেখি দস্যি মেয়ে।"

তিনি কোনক্রমে হাসিটা চাপিয়া ফেলিলেন এবং মেয়েটির মসৃণ বাহু দু'টি দু'ই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বেড়ার বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু বেড়ার সর্ব্বোচ্চ ধাপ হইতে লাফাইয়া পড়িবার সময় তাহার চল-চঞ্চল গতিটা যখন রমেশের কাছে আসিয়া স্থির হইল, তখন সেই ধাক্কায় মেয়েটির সযত্ন সঞ্চিত জামরুলগুলি ভূমিতলে ছিটকাইয়া পড়িল। সে চক্ষু দু'টি জ্বলন্ত করিয়া রমেশের দিকে এক ভীষণ মুখভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধমক দিয়া বলিল, "দেখুন ত কি কর্‌লেন?"

রমেশের বোধ হয় দোষ এই যে, নিপুণতার সহিত তিনি মেয়েটিকে নামাইয়া লইতে পারেন নাই। তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমার বুঝি দোষ?"

মুক্ত এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "না, আমারই দোষ! আমি দু'টি হাত আপনাকে ধর্‌তে বলেছিলুম—না? একটি হাত ধর্‌লেই ত আর এক হাতে জামরুলগুলি চেপে ধর্‌তে পারতুম।"

রমেশ কুণ্ঠিত হইয়া তাহার আঁচলে জামরুলগুলি কুড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু এমনই কুগ্রহ যে, কাপড়ের খুঁটটা একটু টানিয়া ধরিতেই মেয়েটি ইতঃপূর্ব্বে রমেশকে কাপড়ের ফালিটা দেখাইয়া যে তাহার শিষ্টতার পরিচয় দিয়াছিল, সেই ছিন্নস্থল দিয়া জামরুলগুলি আবার মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। মুক্ত তাহার প্রাণের নিবিড় সঞ্চারে চোখ দু'টি ঝক্‌ঝকে করিয়া লইয়া রমেশের দিকে তাকাইল এবং নিম্নের রক্তিম ওষ্ঠের প্রান্তভাগটা ক্ষণকাল দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া মুখাবয়বকে যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার পর সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "চশমা প'রে চারটে চোখ করেছেন—তবুও চোখ নেই?"

এ কথার আর উত্তর কি! রমেশ নীরবে মুক্তর কাপড়খানি টানিয়া লইলেন এবং এবার চারিটি চক্ষুতেই তাকাইয়া অতি সাবধানে তাহাতে জামরুলগুলি তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিশোধ লইবার বাসনায় একটা অন্তঃসলিলা ছন্দগতি যেন তাঁহার মনের মধ্যে ঠেলা মারিয়া উঠিতে লাগিল। জামরুলগুলি বান্ধিয়া দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'খানা কাপড় লাগে বছরে তোমার?"

মুক্ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে লাগিল। রমেশও তাহার ঠিক ব্যথায় আঘাত করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া কিছু তৃপ্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু মুক্ত তাঁহার এই অন্ধ আবেগময় আনন্দকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া সহজভাবেই বলিয়া উঠিল, "কুল পাকা থেকে আম পর্য্যন্ত কিছু বাঁধাধরা নেই, দেখছেন না, এই একটা দিনের কাণ্ড!" এই বলিয়া সে তাহার কাপড়ের ছিন্নস্থলটি আর এক বার রমেশের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। বলিল, "তাহার পর চারখানা হ'লে চ'লে যায়।"

এই মেয়েটি এত সরল যে, তাহার মনে একখানা, মুখে একখানা ছিল না। কিন্তু মুক্ত যদি সঙ্কুচিতই না হইল, এত সহজভাবেই যদি সে তাহার দোষ, ক্রটিগুলি স্বীকার করিয়া গেল, তবে তাহাকে পরাজিত করিতে পারা যাইবে কেন? নিষ্ঠুরের মত অকাট্য আঘাত দিয়াই রমেশ এবার বলিয়া বসিলেন, "আমও বুঝি এই রকমে লোকের বাগান থেকে সংগ্রহ কর?"

বাত্যাতাড়িত মৃণালের মত চোখে-মুখে একটা কম্প তুলিয়া মুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, "চুরি করি?"

মুক্তর এই নৃত্যোন্মত্ত দেহের গতিভঙ্গিমায় তাহার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে রূপে ও আকারে এমন ফুটাইয়া তুলিল যে, রমেশ আর তাহার দিকে চক্ষু রাখিতে পারিলেন না; মাথা নীচু করিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গটি শেষ করিবার জন্য মুক্ত বোধ করি পুনর্ব্বার কথা পাড়িল যে, "চাইলে দেয় বুঝি? দেখুন না, বাদুড়ে কতটা খায়—মানুষের বেলায় ঝাঁটা নিয়ে তাড়িয়ে আসে। চুরি বুঝি? শেয়াল-কুকুরের জিনিষ না?"

মুক্তর এই খোলাখুলি ও দ্বিধাবিহীন মনোধর্ম্মের অভিব্যঞ্জনার নিকটে লুটাইয়া পড়িতে রমেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি লেশমাত্র অপেক্ষা রাখিল না।

তাহার পর মুক্ত চলিতে সুরু করিল। রমেশও তাহার পাশাপাশি চলিতে লাগিলেন। একটা গাছতলায় আসিয়া মুক্ত হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। কাপড়ের খুঁট খুলিয়া গুটিকতক জামরুল সে রমেশের হাতে দিয়া বলিল, "এই যায়গাটায় বেশ ছায়া আছে। খান—ঘেমে দেখি নেয়ে উঠেছেন।"

রমেশ বলিলেন, "কষ্ট ক'রে পেড়েছ—থাক, তুমি খাবে।"

আবার অপ্রত্যাশিত বিদ্রোহ আসিয়া পড়িল। রমেশ দেখিলেন, মুক্তর স্বচ্ছ মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এবার সে আর জলন্ত চক্ষু লইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল না। মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি নিজে খাই—না? আমার জিবটা এত বড় ভেবেছেন আপনি?"

আর কি বলা যায়? কিন্তু যে যায়গায় কথাটা সে দাঁড় করাইয়া দিল, সে যায়গায় মৌন থাকিয়া তাহাকে নীচু করা যায় না। রমেশ বলিলেন, "একলা খাও, সে কথা বলিনি, কা'কে দাও?"

"কেন, ভাইকে দিই—সঙ্গীসাথীদের দিই—যে চায়, তাকেই দিই।"

রমেশ বলিলেন, "আমার কিন্তু দু'চারটায় কুলোবে না। তোমাদের এই মাঠটাই পার হ'তে বুকের ছাতি ফেটে গেছে।"

মুক্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিল। কোঁচড়টি আলগাইয়া ধরিয়া কহিল, "সবই খান না—সে ত ভাল। খাননি বুঝি এখনও?" রমেশের চুলের দিকে চাহিয়া বলিল, "চানও করেননি দেখছি।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "না। আজ দু'দিন পথে পথেই রয়েছি। কা'ল রাত্রে নৌকাতেই ভাতে ভাত ক'রে খেয়েছিলুম।"

বিদ্রোহটা যেন মিলনের মাধুর্য্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। এবার মুক্ত অনুযোগের স্বরে বলিল, "তবে মিছেমিছি কেন বকাচ্ছেন আমাকে? এতক্ষণ যে আমাদের বাড়ী যেয়ে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হ'তে পারতেন।"

রমেশ বলিলেন, "আমাকে ত শৈলেনদের বাড়ীতেই যেতে হ'বে। শৈলেন সরকার—জান? সেই পথটাই তোমার কাছে জিজ্ঞেস কচ্ছিলুম।"

শুভ্র অভিমানে বালিকার মুখখানি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে পরিষ্কার গলায় বলিয়া উঠিল, "আপনি পাগল হয়েছেন দেখছি। সে কি এখানে? সে ও-পাড়ায়। এত বেলায় খাননি আপনি—ছেড়ে দিলে মা বকবে।"

রমেশ বলিলেন, "এই ত জামরুল খাওয়ালে।"

মুক্ত একগাল হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর চলিতে চলিতে তাহাদের বাড়ীর কাছের চৌমাথার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে সে বলিল, "ঐ ত আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, চলুন না?"

রমেশ আপত্তি করিলেন।

মুক্ত মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "মা যদি শোনে, আপনি না খেয়ে এত বেলায় আমাদের বাড়ীর পথ দিয়ে চ'লে গেছেন—বড় রাগবে।"

রমেশ বলিলেন, "তাঁ'কে না শুনালেও ত পার?"

মুক্ত অবশেষে তাহার রক্তনেত্র দুটি উপরে তুলিয়া বলিল, "যাবেন না আপনি?"

রমেশের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি সে যেন চূরমার করিয়া দিতে পারিল। রমেশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের ত খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। তুমি ছেলেমানুষ, বোঝ না, এত বেলায় গেলে তোমার মা কষ্টের মধ্যে প'ড়ে যাবেন।"

মুক্ত ঈষৎ ঘাড় উঁচু করিয়া রমেশের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চশমা দু'খানা—কি মুখখানা, ঠিক ধরিতে পারা গেল না। সে বলিল, "মা ত বলে, অসময়ে কাকেও শুকনো মুখে ফিরিয়ে দিতে নেই।"

মুক্তর এই সাগ্রহ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবার স্পর্দ্ধা যেন রমেশের ক্রমে ক্রমে লুকাইয়া যাইতেছিল। তথাপি তিনি উত্তর করিলেন, "এতে আর দোষ কি? আমি ত আর কারও বাড়ী যাইনি। পথের মানুষ, পথেই রয়েছি।"

মুক্ত যেন মনের মধ্যে আঁতিপাতি খোঁজাখুঁজি করিয়া লইয়া বলিল, "আর আমি জানতে পারিনি যে, আপনি কিছু খাননি?"

রমেশ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, 'সে পথে-ঘাটে অত-শত জান্‌তে-শুন্‌তে গেলে চলে ?"

"আমি বুঝি পথের মানুষ ? ঐ ত আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে।" একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহকারে সে প্রশ্ন করিল, "আপনি বুঝি কলকাতায় পড়েন ?"

"পড়তাম—সে এক রকম শেষ ক'রে দিয়েছি।"

"আমিও শেষ করেছি। মা গো! পণ্ডিতটে যে ঠেঙায়! এক দিন জলখাবার নাম ক'রে বাগানে ব'সে কুল পেড়ে খেয়েছিলুম—আর যায় কোথায় ? আপনি আমাদের পণ্ডিতকে দেখেননি ? হাত দু'খানা যেন শক্ত লোহা। তাই দিয়ে কান দুটো এমন টেনে ধরল— এই দেখুন, মাকড়ী ছিঁড়ে দাগ হয়ে রয়েছে। সেই পর্য্যন্ত খতম।"

মুক্ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ছাড়লেন কেন ?"

হাসিটা কষ্টে দমন করিয়া লইয়া রমেশ উত্তর করিলেন, "আমার গায়ে কোন দাগ হয়নি। এম্‌-এ অবধি সার্টিফিকেট পেয়েছি।"

মুক্ত পরীক্ষার দৃষ্টিতে রমেশকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাস হ'ল না বুঝি ?"

মুক্ত কহিল, "তা' না। বোঝেন না যে কিছু। ঐ বাড়ী আমার—ঐ বাগান আমার—এ রাস্তা আমার— আমি বুঝি পথের মানুষ ? হ'ল—এখন চলুন।"

বেলা বোধ হয় তখন আড়াইটে। এই অসময়ে একটি পরিবারের মধ্যে উপদ্রবের মত যাইয়া পড়িবার একটা কুণ্ঠিত চিন্তা মুক্তর অনুরোধ উপরোধ এড়াইয়া রমেশের মনে যেন ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন ?"

"কেন, আমার মা আছেন—ভাই আছে—আর—" মুক্ত নিজের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

আরও একটু বেশী জানিবার আগ্রহে রমেশ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, চাকরী বাকরী নিয়ে কেহ বিদেশে থাকেন না ?

মুক্ত মুখ অন্ধকার করিয়া কহিল, "কে আর থাক্‌বেন ? মনু হবার দু'মাস বাদে বাবা মারা যান। মা ত বলেন, আমাদের আর কেউ নেই।"

রমেশের নাসিকার শ্বাসটি এবার গভীরভাবেই বাহির হইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি ত রাঁধতে বাড়তে শেখনি, তোমার মা'কে এই অ-বেলায় যেয়ে কি কষ্ট দেওয়া উচিত ?"

ক্রুদ্ধা সিংহীর মত মুক্ত তাহার চোখ দুটি রমেশের দিকে পাকাইয়া ধরিল। তাহার পর তিক্ত স্বরে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সে তাহাদের বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। "এই জন্তে বুঝি সাতগোষ্ঠীর পরিচয় নিলেন ? বড় কুতর্কের মানুষ ত আপনি ? যান— যান, আপনার আস্‌তে হবে না।" আরও স্বর উচ্চ করিয়া মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া সে বলিল, "যান— যান।"

রমেশ তাহাকে ফিরাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে কর্ণপাতও করিল না। পাষাণপ্রতিমার মত নিশ্চল দেহে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

একটু পরেই তিনি দেখিলেন, মুক্ত ফিরিয়া আসিতেছে। তাঁহার আহ্বানটা সে তা' হ'লে উপেক্ষা করে নাই। মুক্ত কিন্তু হাত পাঁচেক দূরে থাকিয়াই বলিল, "হাঁ, শৈলেন বাবুদের বাড়ীটা—এই পথে বরাবর সোজা অনেকটা পথ যেতে হ'বে আপনাকে। একটা পুকুর পেলেই বাঁহাতের রাস্তায় চ'লে যাবেন। সেই পথটাই তাঁদের বাড়ী যেয়ে শেষ হয়েছে।"

মুক্ত ইতঃপূর্ব্বে যে বাড়ীটা তাহাদের বলিয়া হস্তসঙ্কেতে রমেশকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল, সেই দিকে যাইতে যাইতে রমেশ বলিলেন, "এই বাড়ীতেই আগে যা'ব, তাহার পর শৈলেন-টৈলেন কে কোথায় আছে, দেখা যা'বে।"

মুক্ত শুধু হাসিয়া বলিল, "এতও জানেন আপনি ?" তাহার পর সে রমেশের কাছাকাছি আসিয়া বলিল, "চলুন, আর বেলা নেই।"

রমেশ ক্রীড়া-পুত্তলির মত মুক্তর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন।

২

মুক্তদের অন্দর বাহির পৃথক্ ছিল না। তিন পোতায় তিনখানা ঘর, তাহার মধ্যে একখানায় রান্নার কার্য্য হইত। যে ঘরে তাহারা বাস করিত, সে ঘরখানিতে বাঁশের বেড়ার দ্বারা তিনটি কামরা ছিল। তাহারই একটি কামরায় একখানি তক্তাপোষের উপর রমেশকে বসাইয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার মায়ের সহিত এই নবাগত অতিথিটিকে যে কি ভাবে পরিচিত করিল, রমেশ তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তখনই তখনই তিনি দেখিতে পাইলেন, রান্নাঘরের মটকা ফুঁড়িয়া ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর একটি বর্ষীয়সী বিধবা নারী রন্ধনব্যাপারে ব্যাপৃতা হইয়া ঘর-বাহির করিতেছেন। অনুমানে বুঝিলেন, ইনিই মুক্তর মা।

কে—মুক্ত না? মুক্তই ত! ঐ রকমের রাঙা পেড়ে কাপড়খানাই ত সে পরিয়া ছিল। রান্নাঘরের আর একটি খোপে মুক্ত যেন কি কার্য্যে ব্রতী ছিল। একটু পরেই এক হাতে একখানা পাখা ও অপর হাতে একটি ছোট বালকের হাত ধরিয়া লইয়া রমেশের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া সে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল এবং তাহার ভাইকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল, "এই আমার ভাই মন্থু।"

রমেশ তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইলেন। মুক্তর হাত হইতে পাখাখানি টানিয়া বলিলেন, "আমাকে দাও, আমি বাতাস করি।"

"তাই করুন, আমার কায আছে।" এই বলিয়া মুক্ত বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিতেই তাহার মাতা নিস্তারিণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রলোককে বাড়ী আন্লি—একটু জল-টল খেতে দে। কখন্ রান্না হ'বে, সেই পর্য্যন্ত বাসী মুখে থাক্‌বেন?"

মুক্ত বলিল, "পেঁপে কেটে রেখেছি, দু'খানা বাতাসা না হ'লে কি ক'রে দেওয়া যায়?"

মুক্তর মা তাহার হাতে পয়সা দিলে সে এমন দ্রুত ছুটিয়া চলিয়া গেল যে, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া থামাইতে পারিলেন না।

অল্পক্ষণ পরে এই চঞ্চল বাক্‌পটু মেয়েটি একখানা রেকাবীতে পরিষ্কার করিয়া জলখাবার সাজাইয়া লইয়া রমেশের নিকটে উপস্থিত হইল। রমেশ অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার জলযোগ হইলে সে চলিয়া গেল।

আর ত মুক্তর সাড়া-শব্দ নাই। এই নির্জ্জন পুরীতে তাহাকে যে রমেশের খুবই প্রয়োজন। সে-ই রমেশের পরিচিত, রমেশ যে তাহারই আমন্ত্রিত। রমেশ তাহার প্রতীক্ষায় চক্ষু দু'টি ইতস্ততঃ ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন, কিন্তু সে যখন তাহার পদশব্দটাও শুনান দরকার মনে করিল না, তখন রমেশ হতাশভাবে বিছানার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মুক্তর মা একটি কাচের বাটিতে তৈল লইয়া রমেশের ঘরের দ্বারে রাখিয়া দিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে বলিলেন, "বাবা, এই বাগের ভিতর পুকুর আছে—চান ক'রে এস। মুক্ত বোধ হয় ঘাটে আছে।"

তেল মাখিয়া বাগানের ভিতর কিছু দূর যাইয়া রমেশ দেখিতে পাইলেন, মুক্ত পুকুরের জলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের কাপড় কোমরে জড়ান এবং অঙ্গের নিম্ন-বস্ত্র হাঁটু পর্য্যন্ত তুলিয়া সে কটিদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কর্দ্দমাক্ত একখানি গামছা লইয়া সে তাহার ভাইকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। সে বেচারী জলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আর করপুচ্ছ দ্বারা একটি চক্ষু ক্রমাগত রগড়াইতেছে। রমেশ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মুক্ত? মন্থুকে বকেছ?"

হঠাৎ চাহিয়া দেখিয়াই মুক্ত ত্রাসিত ও লজ্জিত হইয়া তাহার অঙ্গের বস্ত্রখানির চারিদিককার খুঁটগুলি খুলিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া দিল, আর কোমরের পেঁচটাও খুলিয়া বক্ষোদেশ আবৃত করিল। রমেশের কথার জবাব না দিয়া কেমন অস্বচ্ছন্দভরেই সে বলিয়া উঠিল, "আপনি কেন এলেন এখানে?"

রমেশ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "বাড়ীতে পুকুর কাটতে পারিনি, তাই।"

মুক্ত বোধ করি এই অল্পপরিচিত লোকটির দৃষ্টিটার

আঘাত করিবার জন্যই চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডী আঁটিবার উদ্দেশ্যে সেই হাঁটু জলেই গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ফেলিল। রমেশ কেমন অপ্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন, এই ছোট মেয়েটি প্রতিনিয়তই আমাকে অপ্রস্তুত করিতেছে। না—না, এমন ক'রে একটি বালিকার কাছে আমি নত হ'তে চাই না। এই বেলাটার জন্যই তা'র সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক। খেয়ে দেয়ে বাহির হইয়া পড়িতে পারিলে হয়।

মনুর তখন কান্না থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে একটি চোখ তখনও রগড়াইতেছিল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি ভারি দুষ্টু, তোমাকে মেরেছে বুঝি ?"

রমেশের সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া ফুলিতে ফুলিতে মনু কহিল, "মাছ ধর্‌তে পারিনি, তাই।"

রমেশ তখন বুঝিতে পারিলেন, তাহারা দু'টিতে মৎস্যশীকারে ব্রতী ছিল।

মুক্তর রং ফর্সা। গড়ন-পেটন মন্দ নয়—গোলগাল ; দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়াছিল। রমেশ জলে নামিয়া মুক্তর হাত হইতে কর্দ্দমাক্ত গামছাখানির এক প্রান্ত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মনু ছেলেমানুষ, পার্‌বে কেন ? দেখি, আমি তোমার সাহায্য করি।"

মুক্ত হাসিয়া কহিল, "আপনি পার্‌বেন না—বইর বিদ্যেয় কুলোবে না।"

মুক্ত ক্রমাগতই রমেশকে লেখাপড়ার খোঁটাটাই দিতে লাগিল। এক জন এম্, এ উপাধিধারীকে নাড়িয়া-চাড়িয়া গোল্লায় দিবার চেষ্টা করা একটা বালিকার পক্ষে কত বড় দুঃসাহস, আর কত বড় অপরাধ, তাহা সে গ্রাহ্যই না করিয়া সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে নীচু করিয়া দিতে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এ উন্মাদ আনন্দটা কি তাহার বড় মনের চিহ্ন ? যাই হোক্, তাহার এই উদ্দাম বাসনাকে অপ্রস্তুত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রমেশ যত্ন সহকারে গামছাখানার এক প্রান্ত ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "ধর না একবার—দেখা যাক্ কা'র কত বিদ্যে।"

মুক্ত ভয়ে ভয়ে তাহার দিকটা জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া ঘুরিয়া যখন ডাঙ্গা পর্য্যন্ত গেল, রমেশের তখন অর্দ্ধেক পথও যাওয়া হয় নাই।

মুক্ত বলিল, "বেশ বিদ্যে আপনার! দেখুন ত আপনার দিক দিয়ে সব বের হয়ে গেল! দুই দিক সমানভাবে ডাঙ্গায় গুটিয়ে না নিলে কি মাছ রাখা যায় ?"

দুই জনে গামছাখানা উঁচু করিয়া ধরিতে জল ঝরিয়া গেলে রমেশ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ একটি মাছও কাপড়ের উপর লম্ফ-ঝম্প দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে না।

পরের বার মুক্ত দোষ ধরিল যে, এবার ডাঙ্গা পর্য্যন্ত গুটাইয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু মাটী ঘেঁসিয়া চলা হয় নাই। তৃতীয় বারে মুক্ত যখন কাপড়ের খুঁট টানিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, মৎস্যগুলিকে সবংশে বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুরিবার ব্যাকুল বাসনায় রমেশ নাকি তখনও কাপড়খানা জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহাদের বাহির হইবার পথই করিয়া দিয়াছেন।

পর পর তিন বার পরাজিত হইবার পর মুক্ত আর রমেশকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে কেন ? "মনু, তুই ধর" বলিয়াই সে রমেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "দেখেছেন, মনুকে নিয়েই কতটা মাছ ধরেছি ?"

রমেশ ডাঙ্গায় উঠিয়া যাইয়া নারিকেলের মালাটি তুলিয়া ধরিতেই দেখিতে পাইলেন, বড় বড় সরল-পুঁটিতে ঘটিটা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

ইতোমধ্যে মুক্তর মা ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। রমেশ বলিলেন, "অনেক হয়েছে, আর রোদ লাগিয়ে কায নেই, এখন যাও।"

মনুর কিন্তু মান ভাঙ্গিল না। সে গুম্ হইয়া জলেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দিদি অনুনয়ের স্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাইটি, চল, মা বক্‌ছেন, রান্না হ'লে তবে ত এঁর খাওয়া হ'বে, কখন্ রাঁধবেন বল ত ?" এই বলিয়া সে তাহার বুকের মধ্যে মনুকে টানিয়া লইতেই—তাহার অভিমান যেন মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। তাহারা ভাই-বোনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিল। রমেশ কোমরজলে দাঁড়াইয়া তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মুক্ত কথায় কথায় রমেশের হৃৎপিণ্ডটার উপর যে আঘাত করিতেছে, তাহার চিহ্নটা অন্তরের মাঝে যেন

স্মৃতি হইয়াই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই খপ করিয়া জলিয়া উঠিবার মধ্য দিয়া এক অতি সূক্ষ্ম সরল পথে সে যেন রমেশকে তাহার হৃদয়ের পুষ্পিত তোরণটি দেখাইয়া দিয়া অগস্ত্যের তৃষ্ণা বাড়াইয়া তুলিতেছে! বিদ্রোহের সুরে সে তাহার অন্তরের চিরন্তন সত্যকে রমেশের কাছে এমন এক করুণ রাগিণীর ঝঙ্কারে ফুটাইয়া তুলিতেছে যে, তাহাকে প্রাণের দরদ দিয়া গ্রহণ না করিয়া পারা যায় না। এমন অন্তর-বাহির একাকার স্বচ্ছন্দ—অবাধ তাহার মনটি। রমেশের এক বার বোধ হয় মনে উঠিয়াছিল,—আমি এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, বাবার পয়সা যথেষ্ট, আমি কি সামান্য ঘরের এক সাধারণ পল্লীবালাকে ভালবাসিতে পারি? কিন্তু সে চিন্তা তিনি অধিকক্ষণ মনের মধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই।

স্নান সারিয়া ফিরিয়া আসিতেই রমেশ দেখিলেন, মুক্ত ব্যস্তভাবে তাঁহার ঘরে আসিয়া হাজির। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড়?"

"না। সে আমার ব্যাগেই আছে।"

"চাবিটা দিন না, বের করি।"

রমেশ জামার পকেট হইতে চাবিটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। মুক্ত কিন্তু খুলিতে পারিল না। অনর্থক চাবিটায় এমন জোর দিতে লাগিল, বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যায়। রমেশ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কর কি—ভেঙ্গে গেল যে!"

মুক্তর মুখে কালী মাড়িয়া দিল। সে চাবির গোছাটা রমেশের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। রমেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চোখে-মুখে এখন একটা তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার ফলে বিরক্তিতে মুক্তর মুখখানা এমন বিষাইয়া তুলিয়াছে। মুক্ত সেই রকম বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেই রমেশ তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। রমেশের হাতের শিকলটা তাহার জলন্ত চক্ষুর শিখায় যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "ছাড়ুন আমাকে—এত দরদ ঐ ছাই ব্যাগটায়?"

সে এক টানে হাত মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইল। রমেশ অনেকক্ষণ সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ব্যাগ খুলিয়া কাপড় পরিলেন।

মুক্তর মা রমেশকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন। রমেশের মন-প্রাণ চুম্বকশলাকার মত অনুক্ষণ যে ভৎর্সিত বালিকার দিকে টানিয়া হাহাকার করিতেছিল, যাইয়া দেখিলেন, অন্নের থালার অদূরে ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সে মাটীতে হিজিবিজি আঁক পাড়িতেছে। রমেশও চুপচাপ খাইতে বসিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে তিন চারি ভাগে তরকারীপত্র রান্না করা হইয়াছিল। শেষের দিকটায় মুক্তর মা বলিলেন, "যে তাড়াতাড়ি ক'রে রান্না—খেতে বোধ হয় খুবই কষ্ট হ'ল?"

রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "কষ্ট? বলেন কি? একে মুক্তর শীকার—তা'তে সস্নেহ হস্তের সংযোগ, একেবারে অমৃত হয়ে গেছে।"

মুক্তর মা হাসিলেন। মুক্ত বাঁকা চোখে এক বার রমেশের দিকে তাকাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। কি জানি, এই অভিমানিনী তা'র মায়ের সম্মুখে বুঝি বা রমেশের গর্ব্বিত মস্তকটি হেঁট করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় রমেশ তথায় আর তাহার মানভঞ্জনের চেষ্টা না করিয়া খাইয়া উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন।

রমেশ অলসভাবে বিছানার উপর গড়াগড়ি দিতেছেন, দেখিলেন, মুক্ত। সে পানের ডিব্যাটি খাটের উপর রাখিয়া দিয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে। রমেশ তাহার পরিহিত বস্ত্রের একাংশ চাপিয়া ধরিতেই তাহার উন্মত্ত বিপরীত গতিটায় আর এক কাণ্ড ঘটাইয়া বসিল। দুর্গ্রহ যেন রমেশের পিছু পিছু বন্ধুর মতই ফিরিতেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবেন—যো কি? মুক্তর কাপড়ের অনেকখানি ফাঁস হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। রমেশ ত অপ্রস্তুতের একশেষ! মুক্ত তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বাঃ, দেখি! কথায় কথায় মুখ কালি! ছিঁড়েছে—ছিড়েছে, হয়েছে কি? আমি ত প্রায়ই ছিঁড়ি।"

রমেশ এবার এক লম্ফে খাট হইতে নামিয়া যাইয়া মুক্তকে বাহুবেষ্টনে নিকটস্থ করিয়া লইলেন। কিন্তু সে তাঁহার অঙ্কবেষ্টনের মধ্যে ছটফট্ করিতে করিতে বলিল, "না—না, ছেড়ে দিন আমাকে। মা গো! আপনার যে কাল্য মুখ!"

তা বটে! কিন্তু রমেশ বুদ্ধি খাটাইয়া বলিলেন, "কাপড় ছিঁড়েছি—তাই রাগ করেছ—তাই চ'লে যাচ্ছ!"

মুক্ত এবার সহজ ও শান্তভাবে রমেশের খাটের উপর যাইয়া উঠিয়া বসিল। সে যে লজ্জা দিল, তাহার প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে রমেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত গল্প করিয়া তাহাকে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহাদের অনেক খবরই তিনি বাহির করিয়া লইলেন। মুক্তদের যে জমী-জমা ও বাগ-বাগিচা আছে, তাহাতে তাহাদের মত ক্ষুদ্র সংসারের মোটা ভাত মোটা কাপড় স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। সঞ্চয় হয় না—নাইও।

কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পর শৈলেনদের বাড়ী যাইবার জন্য রমেশ নিস্তারিণীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নিস্তারিণী আপত্তি তুলিলেন। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট গিয়াছে, রাত্রিটা সেখানে কাটাইয়া শৈলেনদের বাড়ীতে যেন যান—এইরূপই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, শৈলেনদের বাড়ী হইয়া এখানে আসিয়াই আহার করিবেন। মুক্ত তাঁহার ব্যাগ আটকাইয়া রাখিল।

শৈলেন তখন তাহাদের বাহিরের ঘরের বারান্দায় পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছিল। দূরে যেন একখানি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইয়া সত্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য সে তাহার চক্ষু দু'টি পাকাইয়া তুলিল। রমেশ আর একটু কাছে আসিতেই সে উঠানে লাফাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কে রে—তুই? দেবতারাও যে এ ধারণা করতে পারে না। তোর পাশের খবর পেয়েছি। কিন্তু এ গরীবের ঘরে তুই যে—"

শৈলেনের দেহটায় একটা ঝাঁকা দিয়া রমেশ কহিলেন, "থাক্—থাক্, আর বাচালতা করতে হ'বে না। অমন করবি যদি ত যে পায় এসেছি, সেই পায়ে—"

শৈলেন হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা' করিস্‌নে যেন, পায়ে দরদ নেই বুঝি! সত্যি বল্ না—এত কাল পরে কেন এমন মনে পড়ল?"

"সেটা ত মনকে জিজ্ঞাসা করলেই পা'রিস্।"

"তা' পারি। তবে তোকেই বেশী হাতের কাছে পেয়েছি কি না। তোর মুখে কিছু খবর পেলে একটা আন্দাজ ক'রে নিতে পারি।"

রমেশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুই ত ও পথ মাড়াসনে। তাই একবার মনে হ'ল যে, দেখে আসি, আমাদের শৈলেন আমাদেরই আছে, কি আর জনের হয়ে গেছে। তা' ছাড়া একটু তিত-বিরক্তও হয়ে পড়েছি। সেটা গোপন করলে মিথ্যা বলা হ'বে।"

শৈলেন কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিত-বিরক্ত?" তা'র পর বলিল, "নে, এখন আয়! হাতে মুখে জল দে, তা'র পর শোনা যাবে।"

শৈলেন মহাসমাদরে তাহাকে আনিয়া বসাইল। হাত-মুখ ধুইয়া সুস্থ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিত-বিরক্ত বল্‌ছিলি—হেতু?"

"হেতুটা বুঝলিনে। গরুর দাঁত উঠলেই দর-দস্তুরের সাড়া প'ড়ে যায়। বাড়ীতে পা না দিতেই রাজ্যিশুদ্ধ মাছিগুলা একত্র হয়ে যেন আমাদের বাড়ীতে মৌচাক বেঁধে বসেছে। কে কতখানি মধু এনে চাকে ঢেলে দিতে পারবে, বাবা তাই নিয়েই যাচাই করতে ব'সে গেছেন। এতে কি আর বাড়ী-ঘরে টেঁকা যায়!"

শৈলেন বিশুষ্ক মুখে বলিল, "তোকে ত বরাবরই এ সকলের বিরোধী ব'লে জানি। সংসারের এ কসাই বৃত্তিটে আমাদের দোষে—কি অভিভাবকদের দোষে থেকে যাচ্ছে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে। অবশ্য, এ কালটায় আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু অপরিপক্ক থাকে না। কিন্তু স্বাধীন মতটার উপরেই যে জোর দিতে পারিনে। এ দুর্ব্বলতা আমাদের যত দিন না যাবে, তত দিন সংসারে এ পাপ থাকবে!"

দুই বন্ধুতে মিলিয়া অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। শৈলেন সে রাত্রে আর রমেশকে ছাড়িয়া দিল না।

৩

পরদিন রমেশ যখন মুক্তদের বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিস্তারিণী বলিলেন, "কা'ল বাবা, তোমার মুখ চেয়ে সমস্ত রাতই ব'সে কাটিয়েছি। ছেলেমেয়েরা পুকুর থেকে কইমাছ মারলে—রান্নাবান্না করলুম—আসবে আসবে ক'রে তা'রাও তা' মুখে দেয়নি।"

রমেশ মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বন্ধুদের আদরযত্নের পাশ কাটাইয়া আসিতে পারেন নাই বুঝাইয়া বলিলে নিস্তারিণী বুঝিলেন, কিন্তু মুক্ত বড় গোল বাধাইল, সে আর রমেশের কাছ দিয়াও ঘেঁসে না। দেখা-সাক্ষাতের সূত্রপাত হইলেই সরিয়া যায়। এক সময় পার্শ্বের ঘরে তাহার অবস্থিতি উপলব্ধি করিয়া মনুকে দিয়া রমেশ তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মুক্ত যেন রুখিয়া উত্তর করিল, "কে—সেই বাবুটি? তা' ডাকুক যেয়ে। তুই যা, কি দরকার থাকে, দিয়ে আসবি, আমি যেতে পারব না সেখানে।"

তার পর সব চুপচাপ।

রমেশ কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। হোক্ না ছোট মেয়েটি, মুক্তর মা'কে ছাড়িয়া দিলে সে গৃহে সে-ই যে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। একটা শুষ্কভাব লইয়া তাহার সঙ্গে কি দিনপাত করা চলে? এবার রমেশ গলা ছাড়িয়া ডাকিলেন, "মুক্ত!"

উত্তর পাইলেন না।

মুক্তদের বাড়ীতে কোন স্থানে যাইতে বাধার কিছু ছিল না। রমেশ পাশের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সে চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাগ করেছ?"

প্রথম বারের প্রশ্ন ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিতে মুখখানা বিশুষ্ক করিয়া মুক্ত বলিল, "করবই ত।"

সে মাথা নীচু করিয়া ফেলিল। রমেশ তাহার কাছে বসিয়া বিনয়ের স্বরে বলিলেন, "বোঝ না, নূতন এসেছি এখানে, তা'দের আদর-যত্নের উপর জবরদস্তি করতে পারিনি।"

মুক্ত ঘাড় বাঁকাইয়া এক নজর রমেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর আমাদের উপর করতে পেরেছেন?"

"কেন, তোমাদের উপর কি জবরদস্তি করলাম?"

"করেননি? করেননি আপনি? মা আপনাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন না যে, সন্ধ্যায় আসবেন? সে শপথের উপর জোর খাটাননি? সে আমি বুঝতে পেরেছি—আমরা গরীব—তাই।"

রমেশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "এবারটা দোষ ক'রে ফেলেছি। এখন আমাকে না তাড়ালে আর যাচ্ছি না।"

মুক্ত ঢুটি চোখ পাকাইয়া বলিল, "মানুষ বাড়ী এলে তাড়ায় বুঝি? কি বুদ্ধি!"

"তুমি মুখ আঁধার ক'রে থাক্‌লে চ'লে যেতে হবে বৈ কি!"

মুক্ত হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "মুখ আঁধার বুঝি চিরদিন থাকবে? নেন—এখন কি বলছেন আমাকে? হাস্‌তে?" সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘনিষ্ঠতা আবার অবাধ হইয়া উঠিল।

বিকালে সবে ঘুম থেকে উঠিতেই রমেশ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার চেতনার অপেক্ষায় মুক্ত যেন দ্বারগোড়ায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। সে হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত আগ্রহভরে খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার কুসুম-পেলব হস্তখানি রমেশের দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "জাম খাবেন? দেখুন, কেমন পাকা—মিষ্টি—মাইরি খুব মিষ্টি জাম।"

হাতের জাম ক'টি সে রমেশকে দিতে উপক্রম করিলে রমেশের অসংযত মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, "এ আবার কা'র বাগান থেকে এনেছ?"

মুক্তর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "পরের বাগানে চুরি করতেই আমি জন্মেছি—না? ক'টা জামগাছ চান আপনি? আসুন আমাদের বাগানে—দেখে যান।" এই বলিয়া সে হাতের জাম কয়টি জানালা দিয়া বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এই মেয়েটির সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হওয়া এত সহজ যে, রমেশের নির্ব্বাক্ থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। রমেশ কহিলেন, "খেতে দিয়ে মুখের জিনিষ ফেলে দিলে?"

মুক্ত লজ্জা পাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিয়া সে চলিয়া গেল। পরক্ষণে একটি চুপড়ি আনিয়া রমেশের সম্মুখে হাজির করিয়া সে বলিল, "খান—এ সবই আপনার। মুখের জিনিষ ফেল্‌তে পারবেন না কিন্তু।"

৪

রমেশ সে যাত্রায় কিছু দিন শৈলেনদের বাড়ীতেই থাকিল। কিন্তু অন্নের সদ্ব্যবহার দুই পরিবারে যেন পালা করিয়া চলিতে লাগিল।

শৈলেন এক জন সমজদার মনস্তত্ত্ববিদ্। একটি

অনাথার গৃহে তাঁহার দুঃখের অন্নের অংশীদার হইতে রমেশের এমন ব্যাকুল বাসনা কেন ? শৈলেন চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথম দিন অ-বেলায় গ্রামে পা দিয়া অতিথির মত একখানি ভগ্ন কুটীরের অন্ন গ্রহণ করায় কি এতটা আত্মীয়তা হওয়া সম্ভব ? যাহা হউক, শৈলেনের এ সম্বন্ধে অধিক ভাবিতে হইল না। সে ক্রমে দেখিতে পাইল যে, মুক্তর প্রশংসায় রমেশ যেন দিন দিন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছে। এক দিন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে সে বলিয়া বসিল, "আমি ভেবে পাইনে যে, কেন তুই মুক্তর এত প্রশংসা করিস্। গ্রামের লোক ত তাকে গেছো মেয়ে বলে।"

রমেশ বলিলেন, "সে ত তোদের গ্রামে পা দিতেই মেয়েটি আমার চোখের সামনে প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ একটা দিক্ দেখলে মুক্তর সব দিক্ দেখা হয় না। বালককালের সঙ্গে সঙ্গে যেটা চ'লে যাবে, সেটা খুব আসল জিনিষ নয়।"

শৈলেন কহিল, "তা' ঠিক। কিন্তু ঐ বালককালের স্বভাবটা পরিণত বয়সে ভিন্ন রূপ ধ'রে দেখা দিতে পারে। ঠিক উল্টো নয়—ঐ রকম দোষের একটা কিছু।"

রমেশ বলিলেন, "অনেকের তা' দেখা যায়। কিন্তু তা'দের এতগুলো গুণ থাকে না। যা'রা সরল, তা'রা গর্হিত পথে পা মাড়ায় না। মাড়ালেও সে বেশী সময় না।"

শৈলেন হাসিল।

রমেশ বলিলেন, "হাসার কথা নয়। দস্যি মেয়েটিকে না বুঝে দেখে গ্রামশুদ্ধ লোক তা'র উপর যে অত্যাচার করতে বসেছিস্, অজ্ঞলোকের পক্ষে তা' সম্ভব, কিন্তু আশ্চর্য্য যে, তোরাও সেই দলে ভিড়ে গেছিস্।"

শৈলেন এবারও হাসিল। বলিল, "যাক্, এত দিন পরে মুক্তর এক জন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটে গেছে। এইবার যদি তা'র গালিটা ঘুচে যায়।"

রমেশ বিরক্ত হইলেন, কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন।

সম্পর্কে শৈলেনের সঙ্গে মুক্তদের কিছু বাধিত। সুতরাং মুক্তকে জানিবার অবকাশ তাঁহারও কম ছিল না। মুক্তর সম্বন্ধে রমেশের এইরূপ উদারতা দেখিয়া শৈলেন অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইতেছিল।

ইহার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া যখন তখন পরামর্শ চলিত। শৈলেনও রমেশের সঙ্গে যাইয়া নিস্তারিণীর কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল।

এক দিন শৈলেন গল্পচ্ছলে রমেশকে শুনাইয়া দিল যে, মুক্তর এক সঙ্গিনী না কি তাহাকে বলিয়াছে, "তোর যে বর এসেছে।"

"কে বর ?"

"রমেশবাবু।"

"দূর—তা'র সঙ্গে যে পথে দেখা।"

"পথের লোক বুঝি বর হয় না ?"

মুক্ত অবিশ্বাসের বাক্যে বলিল, "বর বুঝি এম্‌নি ক'রে আসে ?"

গল্প শেষ করিয়া শৈলেন বলিল, "বরের কিন্তু বরের মতই যেতে হ'বে, নইলে সে মনে দুঃখ পাবে।"

তাহার পর এক দিন গোধূলিতে মুক্ত রমেশকে সাতটি পাক দিয়া শুভদৃষ্টি করিল। দস্যি মেয়ের বরাতের জোর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

শুভদৃষ্টির মাহাত্ম্য কিছু আছে কি না, জানি না। মুক্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেল। সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়া থাকে। কোন কথাটি বলে না। এক দিন অনেক সাধ্যসাধনার পর বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া সে বলিল, "সেই জামরুল পাড়া—মাছ ধরা—কত কি! মা গো, কি দুষ্টুই তুমি!"

রমেশ তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "লজ্জা কেন, তুমিই জয়ী হয়েছ।"

যে দিন রমেশ তাঁহার এই জীবন-সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে রওনা হইলেন, সে দিন তাঁহার শাশুড়ী কাঁদিয়া কাটিয়া লুটি-পুটি খাইলেন। বালক মন্টু ফোঁপাইতে লাগিল। মুক্তর চক্ষু দুটি হইতে শ্রাবণের অজস্র ধারা বহিয়া গণ্ড ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

বাটে আসিলে রমেশ মা'কে সংবাদ পাঠাইলেন। লিখিলেন, "মা, আপনার দাসী এনেছি। বাবাকে বল্‌বেন, টাকাকড়ি পাইনি—পেয়েছি মুক্ত।"

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

"মালা দিব কা'র গলে ?"

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা
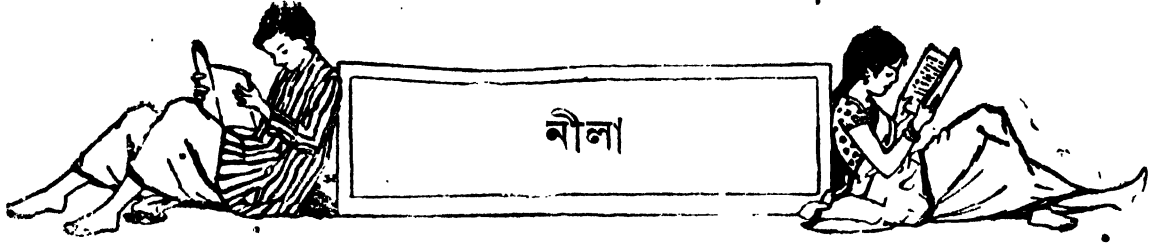
নীলা তাহার প্রথম ও শেষ দান।

তাহার শীর্ণ, পাণ্ডুর ঠোঁট দুটির উপর শেষ স্পন্দন থামিবার পূর্ব্বে সে আমার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল, 'ওগো, আমার নীলাকে দেখো, সে যেন কাঁদে না, সে যেন অযত্নে না থাকে, তা হ'লে আমি স্থির থাকতে পারব না।" তার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, "আর দেখো, আমার জন্যে যেন তুমি কেঁদ না, তা হ'লে নীলা বড় কাঁদবে, সে বড় অভিমানী মেয়ে, আমাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে শেখেনি। প্রথম প্রথম তা'র বড় কষ্ট হবে, তা'র পর তোমার কাছে থাকতে থাকতে ক্রমে ক্রমে সব ভুলে যা'বে। আজ আমি চ'লে যাচ্ছি ব'লে আমার কিছুমাত্র কষ্ট নেই। শুধু এইটুকু কষ্ট যে, তোমাকে আর দেখতে পা'ব না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে গিয়ে তোমাকে আবার ফিরে পাই, জানি, তুমি আর বিয়ে করবে না,—"

আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। আমার চক্ষু হইতে জগতের সমস্ত আলো যেন একসঙ্গে নিবিয়া গেল, বিকটাকার দৈত্যের মত অন্ধকার ক্রমে যেন বাড়ী-ঘর, গাছপালা, জীবজন্তু সমস্ত সৃষ্টি একসঙ্গে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করিতে গেলাম, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। স্বজনহীন, আশ্রয়হীন, নিরুপায় আমি সেই সীমাহীন অতলস্পর্শ অন্ধকারের কোন্ অতল তলে তলাইয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলাম, বাহিরে কাতারে কাতারে মেয়ে, পুরুষ অনেকগুলি লোক তাহার মাথার কাছে। মায়ের বক্ষে করাঘাত আর বিপুল ক্রন্দন আর তাহার মমতাহীন অসাড় পাষাণ বুকের উপর লুণ্ঠিত নীলা। তাহার মর্ম্মভেদী চীৎকারে ঘরের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছিল!

হৃদয়ের পেয়ালাটি যখন যৌবনরসে কানায় কানায় পূর্ণ, মোহিনী প্রকৃতির বুকের মদির গন্ধ যখন সপ্তবর্ণের ছায়া ওড়নার ফাঁকে মাতালের মত বাতাসে ভাসিয়া আসিয়াছিল, ষড়ঋতুর পূর্ণসম্ভারে বরণডালা সাজাইয়া সদ্য প্রস্ফুটিত তারাফুলের মালা লইয়া দিগ্বধূরা যখন একে একে আমাকে বরণ করিতে নামিয়া আসিল, তখন সেই সুখের দিনে দুঃস্বপ্নের মত চুপে চুপে কোন্ অচেনা পথের অদেখা ইঙ্গিত আমার সাজান ঘরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-টুকু হরণ করিয়া নিমিষে সুখস্বপ্নের মাঝে এক প্রবল ঝাঁকানি দিয়া আমায় সচকিত করিয়া দিল। জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষণে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বসন্ত-কোকিলের যে গান ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার আকুলকরা তান অসময়ে কালবৈশাখীর গর্জ্জনে মাঝ-পথে মূর্চ্ছিত হইয়া থামিয়া গেল।

বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, তখন নিরুপায় গৃহস্থ যেমন তাহার শেষ আশ্রয় কুটীরখানি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, তেমনই নীলাও আমাকে গভীর আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। তাহার ছল ছল কালো চোখে তাহারই অভিমানভরা চোখের দৃষ্টিটুকু যেন আঁকা ছিল। তাহার ছোট কোমল হাত দু'টিতে তাহারই প্রেমের অফুরন্ত দান যেন আজ লুকাইয়াছিল। তাহার কচি কচি পা দু'খানিতে তাহারই চলার মৃদুমন্দ ভঙ্গী দেখিতাম আর তাহার সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরিয়া যেন জলহারা মেঘের কোলে বিদ্যুতের হাসি খেলা করিয়া বেড়াইত।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা দুইটি শিশুতে খেলায়, গানে, গল্পে ভরপুর থাকিতাম। সারাদিন তাহার অর্থহারা অবিশ্রান্ত উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমার ভিতরে পরিতৃপ্তির যে সুধা সঞ্চিত হইয়া উঠিত, যে আনন্দ লাভ করিতাম, তেমন তৃপ্তি—তেমন আনন্দ আমি কখনও কোথাও কোন সভাসমিতিতে, কোন বাবুমহলে, কোন সাহিত্যে, কোন ইতিহাসে, কোন কাব্যে কখনও পাই নাই।

তাহার ছোট ছোট রঙিন হাঁড়িগুলিতে নানা রকম খাদ্য অখাদ্য তরকারির সঙ্গে ধূলোর ভাত, তাহার ছেলে-মেয়ের অন্নপ্রাশন হইতে বিবাহ উৎসব, তাহার মেনী বিড়ালটিকে সাবানের জলে গা ধুয়াইয়া দিয়া পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি নানা রকম কাযে অকাযে আমাকে বিষজর্জ্জরিত সংসারের সমস্ত আকর্ষণ হইতে তাহার দিকে টানিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এক এক সময় সে আমাকে ভয়ানক অস্থির করিয়া তুলিত। স্বল্প অন্ধকারাচ্ছন্ন বিজন সন্ধ্যায় সে যখন আপন মনে বসিয়া কাঁদিত, রাত্রিতে তাহার ক্ষুদ্র বিছানাটিতে শুইয়া যখন তাহার শিশু-হৃদয় আর একটি মমতাময় স্নেহ-কোমল বুকের তপ্ত স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিত, গভীর রাত্রিতে চমকিয়া উঠিয়া সে যখন ডাকিত, "মা—মা—মা", তখন আমি দিশাহারা হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতাম। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা, ভুলাইবার জিনিষ যে নাই,—কিছু নাই,—কিছু নাই, এ দুঃখের—এ ব্যথার সান্ত্বনা বুঝি কিছু নাই, আমার দুই চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিত।

দুই মাস যাইতে না যাইতে মা'র তাড়া আসিল, "অতীন, বে' কর, বাবা, যা হবার, তা ত হয়ে গেছে, সে ত আর ভেবে লাভ নেই, আর একটা বিয়ে কর—দেখে-শুনে আর একটা বৌ নিয়ে আয়।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "এত কি তাড়াতাড়ি, মা? যাক না আরও দু'দিন।" একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, যে প্রশ্নটা আমার মনে সকলের আগেই আসা উচিত ছিল, সেটাকে আমি এত দিন এক বার ভাবিবারও অবকাশ পাই নাই! এই বিরাট বিশাল পণ্যশালায় আমাদের সাজান কারবার যখন উন্নতির সোপানে উঠিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ ভরাডুবি হয়। কিস্তি যদি মারা যায়, লোকসানের দিক ভারী হইয়া উঠে, তখন বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যতক্ষণ মূলধন আছে, নূতন পথে ব্যবসায়কে গড়িয়া লইতে হইবে। আমরা যে চাই শুধু লাভ! তাই হৃদয়ের মিলন যতই গাঢ়, যতই প্রাণস্পর্শী হউক না কেন, তাহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে ত হইবে না। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সংসারকে বজায় করিতে আর একটা বিবাহ করিতে হইবে। 'আমার সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। এখনও যে তাহার নিশ্বাসের পরিমল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; দেয়ালে টাঙ্গান তাহার শেষের দিনের তৈলচিত্রে তাহার চোখের দৃষ্টি, তাহার মুখের হাসিটি তেমনই করিয়াই ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার হাতের সহস্র কাযের সহস্র আভাস তাহার পাতা বিছানাটি, আন্‌লায় সাজান তাহার হাতের কোঁচান কাপড়গুলি, টেবলে সাজান বইগুলি, তাহার গোছান আলমারী, হাতে টাঙ্গান ছবিগুলি যে আজও তেমনই রহিয়াছে। আমার অমৃতময়ী সঙ্গিনী আজও অশরীরী সহস্র কমলমূর্ত্তিতে, তাহার অভিমানাহত আঁখির সজল চাহনিটুকু লইয়া তেমনই করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। সে যে অশ্রুসাগর-মন্থিত স্মৃতির নিস্তম মর্ম্মর তাজমহল।

* * * * *

তাগাদায় তাগাদায় মা আমাকে বেজায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। রাগ করিয়া, অভিমান করিয়া, কোন প্রকারে তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না।

অবশেষে বুঝাইলাম যে, দ্বিতীয় বার বিবাহ করা শুধু ভুল নহে—পাপ।

তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মা শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, পাপ, জগতের সমস্ত লোকগুলোই এত দিন ধ'রে শুধু পাপ ক'রে আসছে, তুই এইবার পুণ্যি কর্‌বি।"

সে দিন মেঘলা দিনের মাঝে আলোছায়ার লুকাচুরি খেলা দেখিতেছিলাম। আকাশ-সমুদ্রের বুকের উপর ছোট বড় অসংখ্য মেঘের পান্‌সী পাল তুলিয়া হাওয়ার তালে তালে এ দিক ও দিক ছুটাছুটি করিতেছিল। ভাবিতেছিলাম, মানুষের জীবন কি রহস্যাবৃত, কি একটানা ধারায় ইহা ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কোথায়—কোথায় ইহার শেষ! কল্পনাসৃষ্ট স্বপ্নময় কল্পলোক-পরকাল কোথায়? বিরহীদের সঘন গোপন শ্বাস যাহার রুদ্ধ দুয়ারের পাশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে, কোথায় সেই কল্পলোক? কতক্ষণ যে এমনই ভাবে আত্মহারা হইয়া বসিয়া ছিলাম, মনে নাই। মনে হইল যেন, আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, জীবজন্তু বাস্তব কল্পনা সব মিশিয়া গিয়াছে, আমি যেন আর একটি নূতন

জগতের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার পরিচিত সকলের মাঝে দেখিলাম, তেমনই করিয়া নীলা তাহার মায়ের কোল হইতে আমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, নীলার মুখে হাসি—তাহার মুখে হাসি—আমার মুখে হাসি, চিরন্তন সুন্দরের খেলার সমুদ্রে যেন একটা হাসির তরঙ্গ!

আমার কল্পনার জালকে ছিন্ন করিয়া দিয়া ব্যস্ততার সঙ্গে মা আসিয়া বলিলেন, "একবার উঠে আয় না, বাবা!" তাঁহার মুখে-চোখে যেন একটা আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মা'র সঙ্গে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়া ছাড়া উপায় নাই। একটি চৌদ্দ পনের বৎসরের সুন্দরী কিশোরী আর তাহার কোলে নীলা! নীলা আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মা। কেমন সুন্দর মা—রাঙ্গা মা!!"

আমি মা'র দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলাম, "কি মা?" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুই ত আর কিছু দেখবিনে, শুনবিনে, কাযেই আমাকে দেখে-শুনে একটি বৌ যোগাড় ক'রে নিতে হ'ল—এখন তুই শুধু পছন্দ কর।"

মা'র হাসির সম্যক্ অর্থ বুঝিতে এখন আর আমার একটুও দেরী হইল না। আমাদের মায়ে বেটায় এত দিন ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহারই জয়ের পূর্ব্বাভাস আজ মাতার মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! আজ আমি সম্পূর্ণ পরাজিত, নীলাও মা'র দিকে।

'নীলা!'

নীলা আসিল না। সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি যাব না, আমি নূতন মা'র কাছে থাকব।"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি রে, পছন্দ হ'ল?"

বলিলাম, "তুমি কি আমার পছন্দর অপেক্ষায় ব'সে আছ, মা? না হ'লে নীলা এত বড় সম্বন্ধ পাতাতে সাহস পায়?"

নীলা আব্দারের স্বরে বলিল, "বাবা, নূতন মা কেমন সুন্দর—না?"

রেখা তাহার হাসিভরা সলজ্জ মুখখানি ফিরাইয়া লইল। মা'র পায়ের ধূলা লইলাম। তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া আনন্দের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া আমার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন। আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চলা পথের মাঝখান হইতে ফিরিতে হইল। আর একবার নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইবে!

* * * *

বধূরূপে রেখা আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে সব চেয়ে আনন্দ বেশী হইল নীলার। তাহার পিপাসা-কাতর শুষ্ক বুক রেখার স্নেহ-আবেষ্টনে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। মা-হারা শিশু এত দিন পরে তাহার হারা মা পাইয়া সব ভুলিয়া গেল।

আমরাও দিনকতক আরামের নিশ্বাস ফেলিলাম, যেন এইটুকু পাইবার প্রত্যাশায় আমরা উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহাকে ধরিবার কৌশল না জানিয়া অন্ধকারে হাতড়ানই সার হইয়াছিল।

অনেক দিন হইতে বাহিরের জগৎ ও তাহার কর্ম্ম-কোলাহল হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত রাখিয়াছিলাম। এই সুযোগে একবার সেখানে ফিরিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু যে সুখের পরিকল্পনা করিয়া আমি আকাশে প্রাসাদ রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, নিমিষের ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল।

নীলা যেন বুঝিতে পারিল, এ তাহার মা নহে। তাহার মায়ের চিরদিনকার পাতা সিংহাসন এক মায়াময়ী ছদ্মবেশিনী আসিয়া অধিকার করিয়াছে। তাহার মায়ের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার জন্য ছদ্ম-স্নেহের আবরণে এ তাহার বিমাতা! সে আর রেখার কাছে যাইতে চাহিত না, এবং যতদূর সম্ভব, তাহার কাছ হইতে পলাইয়া থাকিত, কেমন করিয়া যে এই বিমাতৃবিদ্বেষ তাহার শিশু-হৃদয়ে জাগিল, তাহা আমি আজও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। তাহার ফলে দিন দিন সে শীর্ণ হইতে লাগিল। একটা ক্ষুদ্র ব্যথার রেখা তাহার কচি মনের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের কোণে নিরাশার আকুল দৃষ্টি দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিতেছিল।

রেখার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যেন এক ভীষণ অপরাধ করিয়াছে এবং তাহারই গুরুভার আমাদের সকলকে একসঙ্গে ম্রিয়মাণ করিয়াছিল। সে অপরাধীর মত আমাদিগকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু তাহার অপরাধটা যে কি, কোথায়, কোন্‌খানে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইত। তাহার ভালবাসায় যে কার্পণ্য ছিল না, সে যে ব্যাকুল আগ্রহে জ্যোৎস্নার শুভ্র কিরণের মত তাহার হৃদয়ের অনাবিল স্নেহরাশি দুই হাত দিয়া বিলাইয়া দিতে চাহে, আমরা তাহা একবারও বিচার করি নাই। পরন্তু সে সময় সর্ব্বপ্রথম যাহা মনে আইসে, আমি তাহাকে সেই নিষ্ঠুরা বিমাতার আসনে বসাইয়াই অভিনন্দিত করিয়াছি। নীলার এমনই ভাবে দিন দিন শীর্ণ হইবার একমাত্র কারণই যে রেখা, ইহা ভাবিয়া আমি তাহাকে তাহার কাছে যাইতে দিতাম না এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে নিজের কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তবু—তবু তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। সে আকাশের পাখী আকাশে উড়িয়া গেল, আমার সংসার-উদ্যানের অপরিম্লান স্বর্ণকুসুম চিরদিনের জন্য ঝরিয়া পড়িল।

মানুষ যে পাগল হয় কেন, আমি সর্ব্বপ্রথম সেই দিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এমনও দিন গিয়াছে, যখন বন্ধুমহলে তুমুল তর্ক করিয়াছি, সংসার অসার, বাপ মা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজন কেহ কাহারও নহে, শুধু মায়ার ঘোরে দুই দিনের জন্য 'আমার আমার' করিয়া মরে। কিন্তু সেই দিন সেই বিচার-বুদ্ধি—সেই জ্ঞানের একটি সূক্ষ্ম ক্ষীণ রেখাও মনের গায়ে দাগ কাটিতে পারিল না। মনে হইল, সব হারাইলাম—আমি সব হারাইলাম। আমি উন্মত্তের মত বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম,—"নীলা—নীলা, ফিরে আয় মা—ফিরে আয়—নীলা—নীলা!" শুধু বিদ্যাধরীর পরপার হইতে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর দিল, 'নীলা—নীলা—নীলা!'

কোথায় নীলা? নীলা নাই! সে আকাশের ঐ অনন্ত নীলিমায়—সমুদ্রের নীলজলে,—বৃক্ষলতার সজীব নীলবর্ণে মিশাইয়া গিয়াছে। . . .

সে দিন রাত্রিতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম, আকাশের কোলে একখানা শুভ্র মেঘের উপর পা রাখিয়া এক দেবী বসিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া স্বর্গীয় কিরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মুখে হাসি, সে হাসি যেন মানুষের হাসি নয়—সে যেন চাঁদনী রাতে উদাসী বালুবেলায় ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মায়াহাসি। দেবী আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কি নীলার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, কোথায় নীলা?" দেবী বলিলেন, "এই যে।" দেখিলাম, নীলা তাঁহার কোলের উপর বসিয়া। তাহারও মুখে হাসি। আমাকে দেখিয়া সে তাহার ছোট ছোট হাত দুইখানা বাড়াইয়া দিল। আমি ডাকিলাম, "নীলা, আয়।" নীলা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি যাব না।" আমি কাতরস্বরে অনুনয়-বিনয় করিয়া দেবীকে বলিলাম, "নীলাকে ফিরিয়ে দাও।" দেবী বলিলেন, "না, ও বিমাতার কাছে থাকতে পারবে না।" দেবীর মুখখানা যেন কাল হয়ে গেল, বলিলেন, "আমায় চিনতে পার?" আমি বলিলাম, "কৈ না।" "আচ্ছা দাঁড়াও" বলিয়া দেবী সেই মেঘের উপর হইতে আস্তে আস্তে আমার অনেক কাছে নামিয়া আসিলেন। আমি চিনিতে পারিলাম; হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তুমি, তুমিই নীলাকে নিয়েছ, তা হ'লে আমার আর ভাবনা নেই।" দেবী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমিও আমাদের কাছে এস না।" আমি, "আচ্ছা যাচ্ছি দাঁড়াও।" আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু কোথায় দেবী, কোথায় মেঘ—কোথায় নীলা!

* * * * *

তাহার পর এক এক করিয়া অনেকগুলি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নীলার স্মৃতি বুকে লইয়া কক্ষহারা গ্রহের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছি—এখান হইতে সেখান, এ দেশ হইতে সে দেশ। নিশির ডাকে যেমন নিদ্রিত মানুষ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, তেমনই যেন কি একটা আমাকে সারা দেশ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল। ব্যর্থ জীবনটা শুধু এক অনাসৃষ্টি খেয়ালের বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা। কিন্তু কোথাও শান্তি পাই নাই। ভিতরে

যাহার আগুনের জ্বালা, বাহিরে জল ঢালিলে সে জ্বালা কেমন করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে?

মনে করিয়াছিলাম, পঞ্চধারার সেই প্রাণস্পর্শা জলধারার সঙ্গে জীবনধারা মিশাইয়া দিব, সেই 'উতল বিভল' ভঙ্গিমায় ঝিলমের স্রোতোধারায় সঙ্গীতনিস্তব্ধ নিশায় কোন ব্যথাতুরা পথিকবালিকার কণ্ঠোত্থিত বিরহ-রাগিণীর মত, মায়ের অর্থহারা ঘুমপাড়ানিয়া গানের মত আমার ক্লান্ত মনের উপর হাত বুলাইয়া বুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। তাহার স্নেহ-শীতল ছায়াতলে বসিয়া জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইয়া দিব।

সে দিন লাহোরে একটা আতুরাশ্রমে উৎসব ছিল। এক জন লাহোরী বন্ধুর সঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখিতে সেখানে গিয়াছিলাম। পিতৃমাতৃহীন পথের কাঙ্গাল অসংখ্য বালকের এই আশ্রয়প্রতিষ্ঠানটি সে দিন আমার কাছে বড়ই সুন্দর বোধ হইয়াছিল। অন্ধের চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিবার মত যে সব মহাত্মা এই অগণ্য নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, কর্ম্মকুশলতা দিয়েছে, সফলতার সীমায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠাতাদিগকে আমি হৃদয়ের অজস্র ধন্তবাদ দিয়াছি। আমার সেই দিন মনে হইল,—না, আর নয়, এই সৃষ্টিছাড়া জীবনের এইখানেই শেষ। এবার দেশে ফিরিয়া যাইব। দেশে গিয়া এখনই একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব, এমনই করিয়া পিতৃমাতৃহীনদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া অনাথ আপনহারাদের আপন হইব, আমার স্নেহের অশ্রুধারায় দুঃখী সন্তানদের বুকের গভীর ক্ষত ধুইয়া দিব।

আট বৎসর পরে ঘরে ফিরিলাম। ঘর আছে, কিন্তু সেখানে মা নাই—নীলা নাই। আছে শুধু এক জন—আমার পরিত্যক্ত শ্মশানের উপর সন্ধ্যার ক্ষীণ দেউটীর মত আছে শুধু রেখা।

সন্ধ্যার অন্ধকার তেমনই গাঢ় ছায়ার অঞ্চল বিছাইয়া নামিয়া আসিয়াছিল। বিদ্যাধরীর পরপারে পশ্চিম-গগনের শেষ আবীরের রেখা তখন সবেমাত্র মিলাইয়া গিয়াছে। কুললক্ষ্মীদের মৌনগান শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম্য-দেবতার পদমূলে লুটাইয়া পড়িতেছে। আমি নিজের বাড়ীতে চোরের মত প্রবেশ করিলাম। রেখা ঘর হইতে বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়া সে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "তুমি এসেছ—এসো—এসো।" ব'লেই তখনই আবার সে ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেল। তাহার পর একটি ফুটফুটে ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে করিয়া আনিল। মনে হইল যেন, নীলা হারায় নাই, সে যেন আরও ছোট্টটি হইয়া তাহার মায়ের কোলের উপর ঘুমাইয়া আছে। রেখা মেয়েটিকে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেখা, একে তুমি কোথায় পেলে, এ কি সেই নীলা?" রেখা কিছু বলিল না; শুধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, হাঁ। কিন্তু সে যেন স্থির হইতে পারিতেছিল না, ক্রমাগত টলিতে লাগিল। আমি তাহাকে ধরিলাম; বলিলাম, "রেখা, তোমার পা টল্‌ছে—তোমার কি কোন অসুখ কচ্ছে?" সে শুধু বলিল, 'না।' আমি তাহাকে ঘরে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। আলোতে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই কি সেই রেখা—সেই সুন্দরী কিশোরী—সেই যৌবনের নিটোল জ্যোতিঃ—সৌন্দর্য্যের ভরা ডালি—অভিমানিনী—অনাদৃতা—প্রস্ফুটিত কুসুম—না এ তাহার কঙ্কাল প্রতীক!

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন আচ্ছন্নের মত বকিতে লাগিল। "যাই—আর না—তুমি এসেছ—বেশ হয়েছে—আমার বিষ-নিশ্বাসে তোমার নীলা শুকিয়ে গেল—আমি কি করব বল—নিশ্বাসের বিষ সে কি সোজা কথা—তুমিও সুখী হ'লে না—আমিও সুখী হ'তে পাল্লুম না—ঠাকুরবাড়ীর পথে এই মেয়েটিকে কে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আহা, এমন পদ্মের কলির মত মেয়ে, তাকেও মানুষ ফেলে যায়—আমি তাকে বুকে ক'রে নিলুম—মনে কল্লুম—তোমার বুকটা জ্বল্‌ছে—একে বুকে নিলে যদি কিছু শান্তি পাও—কত দিন থেকে ডাক এসেছে—যেতে পাচ্ছি না—ভাবতুম, তুমি আজ আসবে—কা'ল আস্‌বে—কিন্তু তুমি যে দেরী কল্লে—বড্ড দেরী—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—"

আমি তাহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "কোথায় যাবে—কোথায় যাবে, রেখা? আমায় একা ফেলে কোথায় যাবে? আমি তোমায় যেতে

দেব না। আমার ভুল সারতে দেও—এত দিন শুধু তোমার বাহির দেখে আস্‌ছি—তোমার ভিতরের এই দেবীমূর্ত্তিটি দেখবার অবকাশ পাইনি। একবার তা'কে দেখতে দাও।—আর একবার ফিরে এস, রেখা, আর একবার—"

কত বড় বড় ডাক্তার দেখাইলাম—তাহাদের পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি দিতে চাহিলাম। তবু তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। দুর্জ্জয় অভিমানে সে আর মুখ তুলিয়া চাহিল না।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, রজনীর গভীর অন্ধকারে সে চিরদিনের জন্য মিলাইয়া গেল।

আর একবার ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিলাম। সে রেখার দান! তাহার সমস্ত দেহে রেখার বুকের স্নেহের স্পর্শ মাখান ছিল। নীলাকে হারিয়ে আমি ঘরের বাহির হইয়াছিলাম; ঘরে আসিয়া দেখি, সেই নীলা নূতন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত।

শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এক জন লোক চড়িবার উপযুক্ত একখানি ক্যাম্বিসে প্রস্তুত নৌকায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহার পূর্ব্ব-ভ্রমণের বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে আমরা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি তিনি আবার মুর্শিদাবাদ হইতে ঐ নৌকায় করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

লাটসাহেবের মা

প্রথম

নারাণ-গাঁ হইতে যে কয়টি ছেলে মাধবপুরের ইংরাজী স্কুলে পড়িতে যাইত. তাহারা বেলা ন'টার সময় আহারাদি করিয়া, প্রথমে গ্রামের প্রান্তভাগস্থ নদীর সাঁকোর গোড়ার প্রকাণ্ড বট-গাছটার তলায় আসিয়া একে একে জমা হইত। তাহার পর সেখান হইতে সকলে মিলিয়া একসঙ্গে নানারূপ কথাবার্তা ও গল্পগুজব করিতে করিতে, নদীর ধার দিয়া, মাঠ পার হইয়া, বেগুন-ক্ষেত ও পাট ক্ষেতের পাশ দিয়া, দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ধূলধূসরিত পদে মাধবপুরের স্কুলে আসিয়া পৌঁছিত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, এই রকম করিয়া এই ছাত্র কয়টি প্রত্যহ চারি ক্রোশ পথ হাঁটাহাঁটি করিয়া যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য এতটা করিয়া পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিল, তাহা যে তাহাদের কতটা পরিমাণে উপার্জ্জিত হইতেছিল, তাহার হিসাব করিতে তাহারা নিজেরা ত পারিতই না, তাহাদের গুরুরাও বোধ করি তাহা পারিয়া উঠিতেন না।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে কেহ এক বৎসর, কেহ দুই বৎসর, কেহ বা চারি বৎসর ধরিয়া হাঁটাহাঁটির পর যখন ম্যালেরিয়ার সঙ্গে বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে, বিদ্যা-উপার্জ্জনের অঙ্কের নীচে কষি টানিয়া দিয়া, সমস্ত হিসাবের শেষ করিয়া স্কুলের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিল, তখনও কিন্তু গয়লাপাড়ার ভূতনাথ দলছাড়া হইয়া একাকীই প্রত্যহ এই চারি ক্রোশ পথ হাঁটাহাঁটি করিতে ছাড়িল না। অন্যান্য ছেলেরা ভূতনাথকে তখন ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল—"ভূতো জজ না হয়ে আর ছাড়বে না।" ভূতনাথের কিন্তু ভবিষ্যতে জজীয়তী পাইবার কোন আশা থাকুক বা না-ই থাকুক, কয়েক বৎসর পরে যখন সমস্ত গ্রামের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সে 'ম্যাট্রিকুলেশন্' পরীক্ষা পাশ করিয়া বৃত্তি লাভ করিল, তখন মনিব মাধব চাটুয্যে মহাশয় ভূতোর মা'কে বলিলেন,—"ভূতোর মা, কা'ল 'বিশালাক্ষীর' আগে ভাল ক'রে পুজো দিয়ে আয়, তা'র পর তোকে যা বোলবো, তাই শুনিস্।"

ছয় মাসের ছেলে ভূতোকে রাখিয়া যখন হৃদয় ঘোষ ইহ-জগতের দেনা-পাওনা শোধ করিয়া চলিয়া যায়, তখন নগদ ছাপ্পান্নটি টাকা, একটি গাই গরু আর কচি শিশু ভূতোকে লইয়াই ভূতোর মা তাহার ভাঙ্গা কুঁড়েখানিতে বুক দিয়া পড়িয়া ছিল। তাহার পর মাধব চাটুয্যে মহাশয়ের বাটীতে দাসীবৃত্ত করিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, দুধের যোগান দিয়া, সেই ছয় মাসের ভূতোকে সে আজ যোল বছরেরটি করিয়া তুলিয়াছিল।

বছর সাতেক আগে এই চাটুয্যে মহাশয়েরই পরামর্শে যখন ভূতোর মা ভূতোকে গ্রামের নারা'ণ মশায়ের পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া লইয়া মাধবপুরের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল, তখন গয়লাপাড়ার সকলেই হা-হা করিয়া উঠিয়া তাহাকে এমন কাষ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল,—"কচ্চিস্ কি ভূতোর মা! ছেলেকে গাই দুইতে শেখা, ছানা কাটাতে শেখা,—ইঞ্জিরি পড়িয়ে কি ছেলেকে ম্যাচেস্টার করবি?" তখন ভূতোর মা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহার মনিবেরই কথামত কায করিয়াছিল। আজও ভূতোর সম্বন্ধে তিনি তাহাকে যাহা পরামর্শ দিলেন, তাহাতেও সে 'না' বলিতে পারিল না।

মাসখানেক পরে এক দিন সকালবেলা, বিশালাক্ষীর নিত্যপূজারী হরিপদ গাঙ্গুলী আসিয়া দেখিল, ভূতোর মা মন্দিরের রোয়াকের একটি ধারে বসিয়া আছে। গাঙ্গুলীকে দেখিয়া ভূতোর মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"এই এত বেলা ক'রে তুমি পুজো কত্তে এস বামুন ঠাকুর! আমি কখন্ যে এসে তোমার জন্যে ব'সে আছি!" দরজার চাবি খুলিতে খুলিতে গাঙ্গুলী বলিল,—"কেন রে, ভূতোর মা, কিছু দরকার আছে কি?"

"দরকার আর কি বামুন ঠাকুর,—ঐ ভূতোকে চাটুয্যে দাদা কোলকাতায় পাঠাচ্ছেন কি না,—তাই ঐ অশ-তলা থেকে একটু মাটী নিয়ে এলুম আর মায়ের পুজোর একটা ফুল নিতে এসেছি, কাপড়ে বেঁধে দোবো।"

"ভূতোকে চাটুয্যেমশাই কোন কাযকর্ম্মে লাগিয়ে দিলেন না কি রে?"

"না বামুনঠাকুর। তেঁনার ইচ্ছে, ও আরও পড়ুক। তিনি বলেন—'এখন কাযে ঢুকলে কতই আর ওর মাইনে হ'বে, আরও একটা পাশ করুক, তখন যেখানেই ঢুকবে, পঞ্চাশটে টাকা ওর বাঁধা।'—তা' হ্যাঁ বামুনঠাকুর, পঞ্চাশ টাকা ক'রে যদি আমার ভূতোর মাইনে হয়, ত সে ক' গণ্ডা টাকা হ'বে?"

মন্দিরের ভিতর ঝাঁট দিতে দিতে গাঙ্গুলী বলিল—"সাড়ে বারো গণ্ডা হ'বে আর কি।"

"বল কি বামুনঠাকুর! সে যে অনেক টাকা! ভূতো আমার মাস গেলে সাড়ে বারো গণ্ডা ক'রে টাকা উপায় করবে!"

"তা আর করবে না? পয়সা খরচ ক'রে লিখাপড়া শেখাচ্ছিস্, উপায় করবে না?"

"আমি এত পয়সা কোথা পাব বামুনঠাকুর যে, ভূতোকে এত লিখাপড়া শেখাবো। ঐ চাটুয্যে দাদা ভূতোকে আমার বড্ডই ভালবাসে কি না, তাই তেনাই সব বাবস্থাপত্তর ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমার কিন্তু, বামুনঠাকুর, এক তিলও ভূতোকে পাঠাতে মন নেই। কি জানি, বামুনঠাকুর, ভূতো হয় ত যেমী 'ইনজিরি' শিখে শেষকালে না 'খিরিস্টেন্'ই হয়ে যায়! আমার যে বড্ডই পোড়া অদেষ্ট, বামুনঠাকুর!"

মায়ের পায়ের তলা থেকে পূর্ব্বদিনের একটি জবাফুল তুলিয়া লইয়া, ভূতোর মা'র হাতে আলগোছে ফেলিয়া দিয়া গাঙ্গুলী বলিল,—"কিছু তোর ভাবনা নেই, ভূতোর মা। চাটুয্যেমশাই যা বলেন, তাই কর গে,—ছেলেটা তোর মানুষ হয়ে যাবে। এমন ছিল্লে তুই কিন্তু কিছুতেই ছাড়িস্ নি যেন।" তাহার পর মুহূর্ত্তকাল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভূতোর মা'র কাছে সরিয়া আসিয়া, চাপা গলায় গাঙ্গুলী বলিল,—"তবে খুলেই বলি তোকে, কাউকে যেন এ কথা বলিস্ নি। সে দিন মা বিশালাক্ষী আমায় পষ্ট স্বপন দিয়ে বল্লেন,—ওঃ—গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে রে! বল্লেন কি জানিস্? একটু একটু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—'হরিপদ! ঐ হৃদয় ঘোষের ছেলে ভূতো—ও লাটসাহেব হবে।' তা দেখিস্—ভূতোর তোর ভালই হ'বে। ওরে, একটা কথা যেন ভুলে যাস নি। ভূতোর ভাল চাকরী-বাকরী হ'লে বেশ ভাল ক'রে মায়ের পুজো দিতে যেন ভুলিস নি।"

"আহা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বামুনঠাকুর। মা যেন আমার তাই করেন! আমার বড় দুঃখের ভূতো, সে যেন লাট-সাহেবই হয়। এই দেবতার থানে ব'লে যাচ্ছি, বামুনঠাকুর, আর একটা পাশ হ'লে পরেই আমি খুব ভাল ক'রে আবার মায়ের পুজো দিয়ে যাবো।"

ফুলটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে যাইবার সময় ভূতোর মা বলিল—"ফেরবার সময় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যেও, বামুনঠাকুর, একটু দুধ দোবো সেবা কোরো।"

সেই দিন দ্বিপ্রহরে যখন চাটুয্যেমহাশয় ভূতোকে লইয়া দশ-ঘরার ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতা যাইবার গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন, তখন ভূতোর মা গাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া তেত্রিশকোটি দেবতার কাছে ছাপ্পান্নকোটি প্রার্থনা জানাইয়া, বাহির হইতে ভূতোর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঘণ্টা দিয়া যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে গাড়ীখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল,—"হে মা বিশালাক্ষী, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, হে বাবা মাঠের পীর, ভূতোর আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সব থেকো।" তাহার পরও মিনিট পাঁচ-সাত নিশ্চল হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে অনেকেরই সঙ্গে তাহার দেখা হইল এবং অনেকেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই ঠিক-দুপুর-বেলায় সে কোথায় গিয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোনও কথার জবাব না দিয়া সে তাহার ভগ্ন গৃহের আগড় বন্ধ করিয়া দাওয়ার একধারে ধুলার উপরেই শুইয়া পড়িল।

দ্বিতীয়

চাটুয্যেমহাশয়ের জামাতা কলিকাতায় থাকিয়া চাকুরী করিতেন। ভূতনাথকে তিনি সেইখানেই রাখিয়া তাহার পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দুটি তিনটি দৌহিত্র স্কুলে পড়িত, ভূতনাথ তাহাদের পড়া বলিয়া দিত আর নিজেও পড়িত। আর তাহার বৃত্তির টাকা হইতেই তাহার কলেজের বেতনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

ইতঃপূর্ব্বে গ্রাম ছাড়িয়া, জননীকে ছাড়িয়া, ভূতনাথকে কখনও কোথায় একটি দিনও থাকিতে হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, জননীকে ছাড়িয়া থাকাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপায়ও ত কোন আর ছিল না। তবে সপ্তাহের ছয় দিন কলিকাতায় কাটাইয়া শনিবার বৈকালের গাড়ীতে সে গ্রামে আসিয়া হাঁপাইয়া পড়িত এবং রবিবার থাকিয়া সোমবার ভোরের গাড়ীতে আবার সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইত।

এই ভাবে কয় বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া ভূতনাথ যথাক্রমে আই এ, ও বি-এ, পাশ করিল এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই বৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু বি, এ, পাশ করিবার পরই ভূতনাথের পক্ষে এমন একটি সুযোগ আসিয়া পড়িল, যাহাতে চাটুয্যেমহাশয় ভূতনাথের এম, এ পড়ার সঙ্কল্প বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমত তদ্বির আদির দ্বারা তাহাকে বরিশাল জিলার কোন এক মহকুমাতে সব-ডেপুটীর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন।

গ্রামে ফিরিয়া চাটুয্যেমহাশয় ভূতোর মা'কে বলিলেন,—"মাগী, বরাত্‌টা করেছিলি ভালো, ছেলে তোর হাকিম হয়ে গেল। এখন থেকে তুই হাকিমের মা হলি।"

সে দিন ভূতোর মা কোন কাযকর্ম্মেই আর মন লাগাইতে পারিল না। কেমন যেন একরকম হতভম্ব হইয়াই সে তাহার গৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িল ও আকাশ-পাতাল যাহা সে ভাবিতে লাগিল, তাহার কোন আদিও ছিল না, কোন অন্তও ছিল না, আর পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগও ছিল না।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপভাবে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে ভূতোর মা হঠাৎ উঠিয়া বসিল এবং আগড়ে তালা লাগাইয়া বরাবর চাটুয্যেমশায়ের বাটীতে ঢুকিয়া, অন্দরবাটীর উঠান হইতে ডাকিল,—"দাদাঠাকুর, শুয়েছ না কি গা?"

চাটুয্যেমহাশয় তখন আহারান্তে তামাক খাইতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত রাত্রে কেন রে ভূতোর মা?"

"আচ্ছা, দা'ঠাকুর, হাকিম বড় না লাটসাহেব বড়?"

চাটুয্যেমহাশয় ভূতোর মা'র কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"এই কথাট জিজ্ঞেস্ কত্তে এত রাত্তিরে এসেছিস! তা—ও হাকিমও যা, লাটসাহেবও তা।"

পরদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূতোর মা'র আর অবসর রহিল না। সারাদিন ধরিয়া সে গ্রামের প্রায় সকল বাড়ীতেই যাইয়া শুনাইয়া দিল যে, তাহার ভূতো হাকিম হইয়াছে। আর ইহাও জানাইল যে, তাহার চাটুয্যে দাদা বলিয়াছে যে—হাকিমও যা, লাটসাহেবও তা।

এইভাবে কয়দিন কাটিবার পর ভূতোর মা'র চিন্তার ধারা অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। তাহার আনন্দের মধ্যে একটা বিপরীত ভাব আসিয়া দেখা দিল। ভূতনাথ যত দিন কলিকাতায় ছিল, তত দিন সে প্রায় প্রতি শনিবারই বাড়ী আসিত, কিন্তু এখন ত আর সে তেমনই করিয়া শনিবার বাড়ী আসিতে পারিবে না। এখন তাহার চাটুয্যে দাদা তাহাকে কোথায় দিয়া আসিল! সে কত দূর, কত দিনের রাস্তা? সে যে কোন্ দেশ কোন্ মুলুক,—সে কিছুই জানে না। সে ত এ বাঙ্গালাদেশ নয়। বাঙ্গালাদেশের ত অনেক বড় বড় যায়গার নামই সে শুনিয়াছে, ত্রিবেণী, মগ্‌রা, হুগলী, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, চুঁচড়ো, চন্দননগর,—কিন্তু বরিশাল! সে কোন্ সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে! সে কি এই ইংরেজদেরই দেশ, না আর কোন রাজার দেশ! সেখান থেকে চিঠি আস্‌তেই বা কদ্দিন লাগে! কই,—এত দিন সে গেছে, তার ত কোন চিঠিপত্তর এখনও এল না! তখন সে আর ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিল না; উঠিল। বরাবর ডাকঘরে আসিয়া ভগীরথ পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ভূতোর কোন চিঠি এসেছে কি না। ভগীরথ গ্রামেরই ছেলে। চিঠির উপর ছাপ মারিতে মারিতে সে বলিল,—"কৈ, না গয়লাখুড়ী, কোন চিঠিপত্তর ত আসে নি।" ভূতোর মা তবুও তাহাকে বলিল,—"একবার ভাল ক'রে দেখ না, বাবা বোধ হয় এসে থাক্‌বে। হাকিমের চিঠি ত, সে আসতে দেরীও হবে না, মারাও যাবে না।" ভগীরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোক-দেখান হিসাবে চিঠির তাড়াটি লইয়া, একবার চোখ বুলাইয়া বলিল,—"না গয়লা-খুড়ী, আসে নি; চিঠির কি আর ভুল হবার যো আছে।"

অসন্তুষ্টচিত্তে ভূতোর মা ডাকঘর হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং আঁচলে করিয়া এক পালি চাউল, একটা সুপারি ও একটা পান লইয়া দৈবজ্ঞপাড়ায় আশু আচায্যির বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া চাউল কয়টি ও পানসুপারি ঢালিয়া দিয়া আশুকে বলিল,—"আচাযািমশাই, একবার একটু গুণে দেখ দেখি, ভূতোর আমার কোন অসুখ বিসুখ হোল কি না, আর তার চিঠিপত্তরই বা আসচে না কেন?"

আশু আচার্য্য পাঁজিপুঁথি ও খড়ি লইয়া আসিয়া, সে যে এক জন কত বড় জ্যোতিষী, তাহার নিদর্শনস্বরূপ মেঝের উপর নানারূপ আঁকজোঁক কাটিয়া, মন্ত্র আওড়াইয়া, মাথা নাড়িয়া ভূতোর মা'কে বলিল,—"ভাবনা করবার কিছুই নাই, ছেলে তোর ভালই আছে। তবে শনিতে বুধেতে একটু মেশামিশি হয়েছিল ব'লে দিন দুই একটু

পেটের অসুখ হয়েছিল, তাই পত্তর-টত্তর কিছু দিতে পারে নি।" তার পর খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর বলিল,—"চিঠি পাবি, দু'এক দিনের মধ্যেই বোধ হয় পাবি। কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্দি হয়ে থাক গে যা।"

সে দিন ছিল শনিবার। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভূতোর মা দাওয়ার উপর শুইয়া শুনিতে পাইল, তাহারই ঘরের কানাচের পথ দিয়া গ্রামের পাঁচ সাত জন লোক সোরগোল করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহারা সকলেই কলিকাতায় চাকুরী করে ও শনিবার শনিবার যে যাহার বাটী আইসে। আগে ইহাদের সঙ্গে তাহার ভূতোও আসিত। শনিবার এমন সময় কি তাহার আর অবসর থাকিত! রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত মায়ে পোয়ে কত রকমের কত কথাবার্ত্তাই হইত! তাহার এই নিঃশব্দ ভাঙ্গা কুঁড়ে সেই দুই দিন যেন সজাগ হইয়া উঠিত। আজ সকলেই যে যাহার বাটী আসিল, কেবল তাহার ভূতোই আসিল না! কবে যে আবার আসিবে, তারও কোন ঠিক নাই। আহা, বাছা যে কোথায় আছে! হয় ত কত কষ্টই না সে পাচ্চে! কেন তাকে লেখাপড়া শেখাতে গেলাম; কোলকাতাতেই বা কেন পাঠাতে দিলুম! শাক-ভাত খেয়ে, গয়লার ছেলে হয়ে, সে যদি আজ আমার কাছেই থাকতো! —এই রকম সহস্র রকমের চিন্তা আসিয়া ভূতোর মা'কে অস্থির করিয়া ফেলিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে একটিবারের জন্যও চক্ষু বুজিতে পারিল না।

তৃতীয়

অপরাহ্নকালে চাটুয্যে-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের উপর একধারে বসিয়া ভূতোর মা খড় কাটিয়া গাদা করিতেছিল। ইদানীং এই সব কায করিতে চাটুয্যেমহাশয় যদিও তাহাকে বার বার নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে তাঁহার নিষেধ কিছুতেই শুনিত না।

চাটুয্যেমহাশয় বাহির হইতে বাড়ী ঢুকিয়া ভূতোর মা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মাগী, ভেবে মরছিলি,—এই তোর ভূতোর চিঠি এসেছে।" চমকিয়া উঠিয়া ভূতোর মা জিজ্ঞাসা করিল,—"এসেছে! কি লিখছে, দাদাঠাকুর? ভাল আছে ত?"

"হাঁ—হাঁ, ভাল থাকবে না ত কি হবে! নতুন যায়গায় গেছে, তায় ছেলেমানুষ, যোগাড়পত্তর ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে খুব ব্যস্ত ছিল, তাই চিঠি দিতে পারে নি আর কি! যা'ক, এইবার বাঁচলি ত?" বলিয়া চিঠিখানা আদ্যোপান্ত সবটা পড়িয়া তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। ভূতোর মা'র আর খড় কাটা হইল না। বঁটীখানি কাত করিয়া রাখিয়া, চিঠিখানি আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া সে চাটুয্যে-বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পথে আসিতে আসিতে যাহার সঙ্গেই তাহার দেখা হইল, তাহাকে দিয়াই সে চিঠিখানি একবার পড়াইয়া লইল। এইরূপে দশ বারো জনকে দিয়া চিঠিখানি পড়াইয়া সন্ধ্যার সময় আপনার গৃহে আসিল এবং একখানি ন্যাকড়ায় চিঠিখানি বেশ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া তোরঙ্গের মধ্যে তাহা রাখিয়া দিল।

মাসখানেক পরে ভূতনাথ যে দিন রেজেষ্ট্রী ডাকে চাটুয্যেমহাশয়ের নামে দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া জানাইল যে, ইহা তাহার প্রথম মাহিনা, সুতরাং মায়ের চরণে ইহা তাহার প্রণামী, সে দিন ভূতোর মা'র আনন্দের ধারা শত মুখে ছাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আনন্দের আতিশয্যে সে তিন চারি দিন ধরিয়া আহার-নিদ্রা একরূপ ভুলিয়া গিয়া গ্রামময় এই শুভবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল এবং যে কেহ তাহার এই আনন্দে সহানুভূতি দেখাইয়া, তাহার নিকট হইতে কোন কিছুর প্রত্যাশা করিয়া, আকারে ইঙ্গিতে তাহাকে তাহা জ্ঞাপন করিল, তাহাকেই সে তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া আসিল।

ভাদ্রমাসে ভূতনাথের পত্র আসিল যে, আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার ছুটীতে সে বাটী আসিতেছে। এই সময় হইতে ভূতোর মা'র একটা প্রধান কায হইল, দিনের মধ্যে দশবার করিয়া গণিয়া দেখা যে, পূজার আর কত দিন বাকী রহিল।

প্রথম আশ্বিনেই পূজা ছিল। কিন্তু দিন যে আর কাটিতেছে না! প্রবল উৎকণ্ঠাতে ভূতোর মা'র শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই তাহার ভয় হইতে লাগিল, আসিবার মুখে যদি ভূতোর কোন অসুখ-বিসুখই হয়; তা হ'লে ত সে আর আসিতে পারিবে না। হে মা মঙ্গলচণ্ডী! হে মা বিশালাক্ষ্মী! শরীরটা তার ভাল রেখো, মা, আমি জোড়া বলি দিয়ে তোমার পুজো দেবো! হে নারায়ণ! হে হরি! ঘরের ছেলে আমার ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও, ঠাকুর! আমি আর কখনও তাকে চোখের আড়াল করবো না!

ইতোমধ্যে আশু আচার্য্যির কাছে সে দশ দিন গিয়া গণাইয়া আসিয়াছে যে, শরীরটা ভূতো'র ভাল আছে কি না, আর ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার শনিতে বুধেতে মেশামিশি না হয়, সে জন্য আশুর ব্যবস্থামত কার্য্য করিতেও সে কোথাও একরত্তি ত্রুটি করে নাই।

ক্রমে পুজার দিন নিকটতর হইয়া আসিতে লাগিল। মধ্যে আর কয়টা দিন মাত্র বাকী। এইবার কবে এক দিন ভূতো তাহার আসিয়া পড়ে। ভূতোর মা এখন হইতে আর বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইত না, কি জানি, কখন্ ভূতো আসিয়া পড়ে। পুজোর আর দশটি দিন মাত্র বাকী, কিন্তু দিনগুলো আর ফুরাইতে চায় না। আর আট দিন,—আর পাঁচ দিন—আর তিন দিন। সে উৎকর্ণ হইয়া দিনরাত কেবল দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে ষষ্ঠী আসিয়া পড়িল; কিন্তু ভূতো ত আসিল না! যেখানে ভাবনা, বুঝি ভয়ও বা সেইখানে! সপ্তমী, অষ্টমীও চলিয়া গেল। পাগলের মত হইয়া ভূতোর মা তখন একবার চাটুয্যেমশায়ের বাড়ী, একবার ডাকঘর, একবার আশু আচার্য্যির কাছে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তার পর বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে আর সে উঠিতে পারিল না; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ভারে সে পিষিয়া গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন চাটুয্যেমহাশয় ভূতনাথের যে পত্র পাইলেন, তাহাতে জানিতে পারিলেন যে, সরকারী বিশেষ কোন জরুরী কাযের জন্য তাহাকে আটকাইয়া থাকিতে হইয়াছে; কার্ত্তিক মাসের গোড়াতেই সে ইহার পরিবর্ত্তে এক মাসের ছুটী পাইবে এবং সে সময় সে নিশ্চয়ই বাটী আসিবে।

চিঠিখানি হাতে করিয়া তিনি ভূতোর মা'র গৃহে আসিয়া দেখিলেন, প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া সে শয্যার উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে আর অবিরাম প্রলাপ বকিতেছে,—"এঃ,—এসেছে গো এসেছে! কে আবার,—ভূতো—ভূতো—ভূতো। ঐ যা! ভুল হোয়ে গেল। ভূতো নয়—ভূতো নয়—ভূতো নয়! লাটসাহেব—লাটসাহেব—লাটসাহেব!!"

চতুর্থ

চাটুয্যেমহাশয়ের বহির্ব্বাটীর এক প্রান্তে দুইখানি প্রশস্ত ঘর ছিল। ভূতনাথ আসিলে তাহার থাকিবার জন্য তিনি সেই দুইখানি ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভূতোর মা'কে সেইখানে আনাইয়া নিজের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং তাহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, ভূতনাথকে ছুটী পাইবামাত্র বাটী আসিবার জন্য বিশেষভাবে লিখিয়া দিলেন।

দিন পনেরো পরে ভূতোর মা আরোগ্য হইল বটে; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক কথঞ্চিৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইল। প্রবল জ্বরের সময় সে যে সমস্ত

প্রলাপ বকিত, সুস্থ হইয়াও সময় সময় সে ঐরূপ অসংবদ্ধ বাক্য সকল বকিয়া যাইত। নানাপ্রকার চিকিৎসাতেও এই দোষটুকু তাহার আর সারিল না। প্রত্যহ দিব্য আহারাদি করিতেছে, বেড়াইতেছে, গল্পগুজব করিতেছে, কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই যে, তাহার মস্তিষ্কের বিন্দুমাত্রও দোষ আছে; কিন্তু সেই সময় হঠাৎ ভূতনাথের সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলেই সে অমনই হয় ত বলিয়া উঠিত,—"আহা! কি ক'রিস গা তোরা! লাট-বেলাটের কথা একটু চুপি চুপি বল্‌তে পারিস্ নি?" তার পরই অনর্গল বকিয়া যাইতে থাকিত,—"হ্যাঁ,—আমি কিন্তু তখন ঠেকাতে পারব না,বাবা। আমি মা হ'লে কি হবে, কত কথাই আর সে আমার শুনবে বল? সে একটা লাটসাহেব ত বটে!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভূতোর মাকে দেখিলেই বলিত —"ওই রে, লাটসাহেবের মা আসচে।" 'লাট সাহেবের মা' বলিয়া যে কোন ছেলেমেয়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহাকেই সে আদর করিয়া, কোলে লইয়া, দোকান হইতে খাবার কিনিয়া দিত আর বলিত,—"দু'দিন বাবা একটু সবুর কর তোরা, এই লাটসাহেব এসে পড়লো ব'লে। সে আমার এলেই তোদের সব পেট ভ'রে রসগোল্লা খাওয়াব।"

সে দিন চাটুয্যেমহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ ভূতোর মা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিল,—"হাঁ গা, দাদাঠাকুর, হাঃ-হাঃ-হাঃ—আসল কাযেই ভুল ক'রে ব'সে আছ?" চম্‌কাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া চাটুয্যেমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্ দেখি রে?"

"কিচ্ছুটি তোমার মনে নেই তা হ'লে! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি ভোলা মন গো তোমার! আসল কাযেই একেবারে ভুল! ওগো, লাটসাহেব যে আসবে, তা ইষ্টিসনে নেবে আসবে কিসে ক'রে? চারঘোড়ার গাড়ী একখানা ঠিক ক'রে রাখ নি! হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ—একেবারেই ভুলে ব'সে আছ দাদাঠাকুর!"

চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়া গিয়াছিল যে, সে বিকৃত মস্তিষ্কে যাহাই কেন বলুক না, সকলেই যেন তাহার কথায় সায় দিয়া যায়, তাহার কোন কথার কেহ যেন কোনরূপ প্রতিবাদ না করে। চাটুয্যেমহাশয় বলিলেন,—"ইস্, তাই ত রে, বড্ডই ত ভুলে গিছলুম বটে!"

"তুমি তামাক খাও, দাদাঠাকুর আমি এখনই চারঘোড়ার একখানা গাড়ী ঠিক ক'রে আসচি" বলিয়া ভূতোর মা ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। সে দিন আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে বাড়ী ফিরিল না। সমস্ত দিন অস্নাত ও অনাহারে থাকিয়া, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে লাগিল এবং যাহার সহিতই তাহার দেখা হইল, তাহাকেই বলিল,—"লাটসাহেব আসবে—একখানা চার ঘোড়ার গাড়ী চাই যে!"

পরদিন,—সেই দিন দুপুরের গাড়ীতে ভূতনাথ আসিবে—রাত থাকিতে ভূতোর মা উঠিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। আজ তাহার মনের মধ্যে যেন কোন বিকার কোন চাঞ্চল্য নাই—আজ সে স্থির ধীর গম্ভীর। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিল। ঘণ্টাখানেক পরে যখন চারিদিক একটু ফর্সা হইল, কাকপক্ষী ডাকিয়া উঠিল, তখন সে উঠিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিল এবং ধীরে ধীরে নদীর সাঁকোর গোড়ায় সেই প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় আসিয়া বসিয়া আপনমনে অস্ফুটস্বরে একবারটি বলিল,—"এইখান দিয়েই ত সে যাবে।"

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। দু'এক জন করিয়া পথিক পথে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। তখনও মাঠে মাঠে আউস ধান কাটা সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই; চাষীরা কাস্তে হাতে লইয়া আউস ধান কাটিবার জন্য দলে দলে মাঠের দিকে যাইতে লাগিল।

এই বটগাছের তলাতেই বহুকাল আগে ভূতনাথ প্রত্যহ তাহার স্কুলের বহিগুলি হাতে লইয়া আসিয়া বসিত। এইখানে বসিয়াই সহযাত্রীদের জন্য সে অপেক্ষা করিত। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কত শলা-পরামর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এইখানে বসিয়াই তাহারা করিত। বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত ভূতোর মা ভূতনাথের আসার অপেক্ষায় সেই বটগাছের তলায় বসিয়া রহিল। তার পর সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সে মাঠের উপর দিয়া ষ্টেশনের পথে চলিয়া গেল।

* * * * *

দশঘরার ষ্টেশনমাষ্টার তাহার টিকিটের হিসাব মিলাইতেছিল। সহসা একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ গা, তুমিই মাস্টর বুঝি? তা লাটসাহেবের আসতে আর দেরী কত গা?" ষ্টেশনমাষ্টার যতই তাহাকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিতে লাগিল, সেও ততই দৃঢ়ভাবে চেয়ারখানির উপর বসিয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি বুঝি জান না, আমি লাটসাহেবের মা!"

খানিক পরে যখন বাঁশীর শব্দ দিয়া কলিকাতার গাড়ী ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন বাধ্য হইয়া মাষ্টারকে তাড়াতাড়ি টুপীটা হাতে করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটি চেয়ার ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং প্ল্যাটফরমের জনতা ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া, চাটুয্যেমহাশয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভূতনাথকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা রে আমার—এসেছিস্ বাপ্! আর আমি তোকে ছাড়বো না।"

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-ভক্তি

(সাদী হইতে)

প্রতাপান্বিত মোগল বাদশা
কহেন সাধুরে ডাকি,
"কর না কি মোরে স্মরণ কখনও
অন্তর-মাঝে রাখি?"

উত্তরে তাঁর সাধু মহাজন
জলদ-গভীর স্বরে,
কহিল, "বিভুরে ভুলি আমি যবে
রাখি তোমা স্মৃতিপরে।"

শ্রীতরুণ ঘোষাল।

আগমনী

১

বন্ধনহীন স্বাধীনতার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করা হেমবাবুর অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে একখানি ছোট বাড়ীতে তিনি বিশ্বস্ত ভৃত্য ও পাচক শম্ভুকে লইয়া গত ৭ বৎসর নিরুদ্বেগে বাস করিতেছেন। শম্ভুর সযত্ন সেবায় আহারাদি সম্পর্কে তাঁহার কোন উদ্বেগ ছিল না। উদ্দেশ্যহীন জীবনটা একরকমে কাটাইয়া দিবার জন্য তিনি সাহিত্য-চর্চাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে একখানি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রে ক্রমে তিনি উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের নানা বিচিত্র রসধারা যে একটা জীবনের সমস্ত শূন্যতার ফাঁক ভরিয়া রাখিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিতেন।

অতীত-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তাঁহার স্মৃতিতে চির-জাগরূক ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক পল্লী-বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলেন, এমন কি, তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—সে কথা চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতেন। জীবনের সেই ক্ষণিক চাঞ্চল্য তাঁহার নিকট চিরন্তন বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। তাঁহার অবিবাহিত জীবনটাকে তিনি সেই ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে ভাবিতেন, সেই প্রথম-প্রণয়ের মর্য্যাদারক্ষার জন্যই তিনি আর বিবাহ করিতেছেন না। আসলে ৮ বৎসর পূর্ব্বের সেই প্রণয়-স্মৃতি তাঁহার চিত্তে ইদানীং কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি করিত না। ২৪ বৎসর বয়সের সে তীব্র অনুভূতি সে পুলক-চাঞ্চল্যের এক কণাও ৩২ বৎসর বয়সের শুষ্ক প্রাণে অবশিষ্ট ছিল না—এক শিথিল শীতল ঔদাসীন্য তাঁহাকে অসম্ভব রকমে গম্ভীর করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবনটা তাঁহার নিকট অর্থহীন প্রহেলিকার মত মনে হইত।

এ হেন হাস্যলেশহীন গম্ভীর হেমবাবু,' সম্পাদক মহাশয়ের কন্যা মনীষাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনীষা সুন্দরী, শিক্ষিতা—অথচ কেন যে তিনি এই নগণ্য সহকারী সম্পাদকটির অনুরক্ত হইলেন, হেমবাবু অনেক চিন্তা করিয়াও প্রথমে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইল, ইহা জ্ঞানস্পৃহা—কিন্তু পরে বুঝিলেন, শুধু তত্ত্বকথা আলোচনা নহে. মনীষা তাঁহার সঙ্গ আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাইতে চাহে। বিশেষ সম্পাদক-গেহিনী যখন তাঁহাকে জল 'খাইবার ও চা খাইবার জন্য মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন হেমবাবুর চৈতন্য হইল। সমস্ত ব্যাপারটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তিনি এ সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে লাগিলেন। হেমবাবু যতই সরিয়া থাকেন, কৌতুকময়ী মনীষা ততই নানা ভাবে তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তোলেন, অথচ এই সুশিক্ষিতা তরুণীর সমস্ত আচরণের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক সংযম ও শীলতা ছিল, যাহাতে রূঢ় ব্যবহারের কথা চিন্তা করাও অসম্ভব।

প্রতপ্ত চৈত্র-মধ্যাহ্ন। হেমবাবু প্রেরিত প্রবন্ধগুলি হইতে প্রকাশযোগ্য লিখা বাছাই করিতেছিলেন। সাহিত্যের হাটের অনাবশ্যক আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার শ্রান্ত মনের বিরক্তি মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—এমন সময় মনীষা আসিয়া তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং ছোট রুমালখানি দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কি গরম পড়েছে, কি বলেন হেমবাবু!" হেমবাবু কিছুই বলিলেন না—একবার চকিতে চাহিয়া পুনরায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। মনীষা কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন, "আজ বৈকালে এক বার গঙ্গার ধারে মাঠের

ওদিক্‌টায় বেড়াতে গেলে হয় না? আমার দুইটি বন্ধুও থাক্‌বেন। আপনি সঙ্গে গেলে আমরা সকলেই আনন্দিত হ'ব।"

"মাপ করবেন, আমার সময় নেই!"

"সময় নেই, না ইচ্ছে নেই?"—মনীষা হাসিয়া উঠিলেন। মুখ না তুলিয়াই হেমবাবু বলিলেন,—"আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝবার স্বাধীনতা আছে।"

গত এক সপ্তাহের নানা প্রকার ঘটনায় হেমবাবু যথেষ্ট বিরক্তই হইয়াছিলেন। তাঁহার অবিবাহিত জীবনটা যে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এটা যে মা কিংবা মেয়ে কেহই বুঝিতেছেন না, ইহাতে হেমবাবু অতিশয় ক্ষুব্ধ। তাঁহার ন্যায় এক জন গম্ভীর, স্বল্পভাষী পণ্ডিত ব্যক্তিকে ভাবী স্বামী বা জামাতা মনে করাই যে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রগল্‌ভতা মাত্র—এটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য হেমবাবু প্রস্তুত হইয়াছেন। যে সমস্ত তরলমতি যুবক মহিলাদের সান্নিধ্যে আনন্দিত হয়, সুন্দরী, শিক্ষিতা কুমারীদের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে আত্মহারা হয়, ইঁহারা যে তাঁহাকে সেই শ্রেণীর মনে করিতেছেন, ইহাতে চিরকুমার হেমবাবুর আত্মমর্য্যাদা আহত হইয়াছে। তাই মনীষা যখন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি বিকেলে একবার বেড়াতেও যান না?" তখন হেমবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না, বাসায় থাকাই আমার অভ্যাস!"

"সেখানে আর কে আছেন?"

"আমি একাই থাকি।"

'আপনি ভারী অসামাজিক।" মনীষা হাসিয়া উঠিয়া গেলেন।

২

আট বৎসর পূর্ব্বের সেই ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনাজড়িত কাহিনী সময় সময় হেমবাবুর মনে পড়িত। ছাদের উপর চেয়ার পাতিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে শুভ্র তারকাগুলির প্রতি চাহিয়া হেমবাবু অভিভূতের মত সেই কিশোরীর কথা ভাবিয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন।

সে দিন অপরাহ্ণে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াও হেমবাবু নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিলেন না। মনীষার সহিত রূঢ় ব্যবহারের কথা বারে বারে তাঁহার মনে হইতে লাগিল। অন্তরের অস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিবার জন্য তিনি ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। ঝির-ঝির করিয়া দক্ষিণা হাওয়া আসিতেছিল—চন্দ্রহীন আকাশে অগণিত তারকা—একটি অপেক্ষাকৃত বড় শুভ্র তারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি নির্ম্মলার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

আট বৎসর পূর্ব্বের একটি শ্রাবণ-সন্ধ্যা তাঁহার স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র নদীর ঘাটের পথে সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; এমন সময় দু'জনায় দেখা। নিরাভরণা শুভ্রবাস-পরিহিতা বিধবা কিশোরী কলসী-কক্ষে ধীরপদে আসিতেছে—হেমচন্দ্রের দৃষ্টি অপলক! নির্ম্মলা সুন্দরী—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য হেমচন্দ্রের দৃষ্টিপথে পড়িল না। শ্মশানের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা স্মরণ করিয়া মানুষ যেমন সম্ভ্রমে স্তব্ধ হইয়া থাকে, হেমচন্দ্র তেমনই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কাছাকাছি আসিলে নির্ম্মলা একবার মুখ তুলিয়া চকিতে চাহিল, পরক্ষণেই মাথা নত করিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মলার শ্বেত বসনের শুভ্রতার ছাপ হেমচন্দ্রের মনে চিরদিনের মত বসিয়া গেল। শুভ্রতাকে বাদ দিয়া তিনি নির্ম্মলাকে ভাবিতে পারিতেন না। শুভ্র কিছু দেখিলেই তাঁহার নির্ম্মলাকে মনে পড়িত। এমন কি, নির্ম্মলা নামটাও তাঁহার নিকট শুভ্রতারই প্রতীক হইয়া পড়িয়াছিল!

হঠাৎ হরিশ দত্তের গৃহ তাঁহার নিকট তীর্থ হইয়া পড়িল। নির্ম্মলার মনের ভাব জানিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য হেমচন্দ্র অধীর হইলেন। কিন্তু কথা কহিবার কোন সুযোগই নির্ম্মলা তাঁহাকে দিল না—একটা বেদনাজড়িত ভীতি তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিত, সে দূরে সরিয়া সরিয়া থাকিত।

কেন এই ভীতি! অনেক সময় তাহার স্নিগ্ধ চক্ষু হেমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, লজ্জার অরুণ আভায় তাহার পাংশুমুখখানিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে! এ কি সংস্কারজনিত সঙ্কোচ!

নির্জ্জন পল্লীপথে পুনরায় দেখা। হেমচন্দ্র প্রগাঢ় স্নেহভরে বলিলেন, "নির্ম্মলা, আমার দুটো কথা শুনিবে?"

নির্ম্মলা নতনেত্রে দাঁড়াইল, মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল। হেমচন্দ্র সমস্ত সাজানো গুছানোর কথা ভুলিয়া গেলেন। গভীর সহানুভূতি ও আবেগের মধ্য দিয়া হেমচন্দ্র অসংলগ্নভাবে যে সব কথা বলিলেন, নির্ম্মলার কানে তাহা কঠিন-কঠোর হইয়া বাজিল। বিবর্ণ মুখখানি তুলিয়া সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল—তাহার সারা-দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, অতি কষ্টে কেবল বলিল,—"কা'ল বলিব।"

নির্ম্মলা ধীরপদে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে নদী-তীর ধরিয়া মুক্ত প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা কি বলিবে? নির্ম্মলা যদি সম্মতি দেয়—তথাপি সমাজ কি এই বিবাহ স্বীকার করিবে? নির্ম্মলার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন?—বিষয়গুলি হেমচন্দ্র ভাল করিয়া ভাবিতে পারিলেন না। চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক—রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। প্রভাতে স্নান করিয়া তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন এবং ধীরে ধীরে দত্তবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নির্ম্মলার দেখা পাইলেন না। সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া অপরাহ্নে নদী-তীরে গিয়া বসিলেন, নির্ম্মলা আসিল না!

নির্ম্মলা অসুস্থ জ্বরে শয্যাগত। পরে শুনিলেন, তাহার নিউমোনিয়া হইয়াছে। গোপন-প্রণয়ের লজ্জায় একবার নির্ম্মলার রোগশয্যার পার্শ্বেও তাঁহার যাইবার সাহস হইল না। দুই সপ্তাহের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল—দত্তবাড়ীতে রোদনের রোল শুনিয়া হেমচন্দ্র সে দিন প্রভাতে স্তব্ধ হইয়া গৃহাভ্যন্তরেই বসিয়া রহিলেন; শ্মশানে যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু নির্ম্মলার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ কোন আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি কি ভালবাসিয়াছিলেন? অথবা ইহা বাল-বৈধব্যের প্রতি অনুকম্পা? কিংবা মুগ্ধতা-বিকার-ক্ষিপ্ত হৃদয়ের অসুস্থ উত্তেজনা? চিন্তার তীব্রতা ক্রমে কমিয়া গেল। কেবল এক এক দিন সন্ধ্যায় সেই নদী-তীরের রহস্যময় মিলনের অসমাপ্ত কাহিনী মনে পড়িত মাত্র। এক দিন নদী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পরপারের বালুচরে শুভ্র কাশ-কুসুম-শোভা দেখিয়া, শুভ্রবসনা নির্ম্মলার কথা মনে পড়িল। না, ক্ষণিকের মোহ নহে—তিনি সত্যই নির্ম্মলাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এক এক দিন স্বপ্নে দেখিতেন—নির্ম্মলা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছে, সেই রক্তহীন পাংশু মুখখানি কত করুণ হইয়া দেখা দিত—আর সেই মৌন-মিনতিমাখা কাতর দৃষ্টি -কি যেন বেদনা নিবেদন করিতে চায়!

নির্ম্মলার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনীষার কথা তাঁহার মনে হইল। সুশিক্ষিতা মার্জ্জিত-বুদ্ধি মনীষাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাইবার জন্য প্রত্যাশী দীন ভিক্ষুকের মত কত সম্ভ্রান্ত পদমর্য্যাদাশালী যুবককে তিনি দেখিয়াছেন, অথচ তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার মত খ্যাতিহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতি এ অনুরাগ কেন? ইহা প্রেম না নিছক কৌতুক? যাহাই হউক,—বিবাহ তাঁহার জীবনের সমস্যা নহে। ভালবাসা? না, নির্ম্মলার স্মৃতিকে অপমান করিতে পারিব না! এই দয়াহীন সংসারের পিচ্ছিল পঙ্কিল পথে ইতর-সাধারণের সহিত আড়াআড়ি করিয়া সুখ-দুঃখের কাড়াকাড়ি করিয়া হাসি-কান্নার করুণ অভিনয় করিবার মত হীনতা তাঁহার নাই!

* * * *

না, মনীষা তাঁহাকে নিরুদ্বেগে থাকিতে দিবে না। শিক্ষিতা হইলে কি হয়—রমণীমাত্রেই প্রগল্‌ভা! ২৩ বৎসরের এক জন বঙ্গ-কুমারীর মধ্যে বালিকা-সুলভ চপলতা হেমবাবু কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি নিষ্কৃতির এক উপায় স্থির করিলেন। চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেই, মনীষা তাঁহাকে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইবেন, ইহা মনে করিয়া এক দিন তিনি সম্পাদক মহাশয়কে বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার একবার দেশে যাওয়ার প্রয়োজন। সম্পাদক মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

পরদিন মনীষা আসিয়া বলিল, "হেম বাবু, আপনি না কি—আজ রাত্রির মেলে দেশে যাবেন?"

"হাঁ -সেই রকমই অভিপ্রায়।"

"সেখানে আর কে কে আছেন?"

কেহ নাই শুনিয়া মনীষা বলিলেন, "আপনার খাওয়া-দাওয়ার খুবই কষ্ট হবে ত দেখছি!"

এমন ভাবে গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি প্রকাশ হেমবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইল। তিনি শুষ্কস্বরে বলিলেন,—"শম্ভু সঙ্গে যাবে; আপনার দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক।"

কৌতুকহাস্য অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া মনীষা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল, 'আপনার শুভ-কামনা করার অধিকারও আমাদের দেবেন না?'

এ কথার উত্তর দিতে না পারিয়া হেমবাবু নিরুত্তরে রহিলেন। মনীষা কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল। পল্লীর কথা আলোচনায় হেমবাবুর কুণ্ঠিত ভাবটা কাটিয়া গেল—এই নগরবাসিনী বিদুষী মহিলার পল্লী-জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পল্লী-জীবনের বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের উপায় সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি শুনিয়া হেমবাবু অবাক্ হইলেন। কথা প্রসঙ্গে হেমবাবু সহসা বলিলেন, "আপনার এত গভীর জ্ঞান, অথচ বালিকার মত চপলতা প্রকাশ করেন কেন?"

মনীষা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলার অভ্যাস, কি করি বলুন!"

৩

অনেক দিন পরে হেম বাবু দেশে ফিরিয়া আসিলেন। নির্ম্মলার স্মৃতিটা একটু ঝালাইয়া লইবার জন্য নদীতীরে, দত্তবাড়ীর আশেপাশে কয়েক দিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। নূতনত্বের মোহ কাটিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, জীবনটা আর 'রোমাণ্টিক' করিয়া তুলিবার উপায় নাই। সুদীর্ঘ অবসর নিভৃত চিন্তায় বা সাহিত্যালোচনায় কাটাইয়া দিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। তাঁহার পাশের বাড়ীর কোপন-স্বভাবা গৃহিণী কারণে অকারণে দিনের মধ্যে তিন চারবার, রাত্রিতেও দুই একবার ছেলেটাকে ধরিয়া এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন যে, বালকের কাতর ক্রন্দনে হেমবাবুর গৃহে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। বালক মাতৃহীন, বিমাতার চক্ষুর বিষ। তাহার উপর স্ত্রৈণপ্রকৃতি পিতা অসহায় শিশুর নিপীড়নের কোন প্রতীকার করিতে পারিতেন না। "বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও" বলিয়া আর্ত্তরোলে হতভাগ্য বালক যখন গগন বিদীর্ণ করিত, তখন বিমাতা প্রহারের মাত্রা বাড়াইয়া দিতেন; কাপুরুষ পিতা অভিভূতের মত বসিয়া থাকিত।

অসহ্য—হেম বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। রাত্রিতেই শম্ভুকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া রাখিলেন, কা'ল সকালবেলায় ছেলেটিকে যেন সে ডাকিয়া আনে।

সকালবেলায় ৯।১০ বৎসরের একটি শীর্ণকায় বালক শম্ভুর সহিত আসিয়া হেমবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—হেমবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—ঠিক যে নির্ম্মলার মুখের মত। বিশেষ সেই দৃষ্টি—মর্ম্মভেদী অথচ মিনতিমাখা! আদর করিয়া হেম বাবু তাহাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন, "তোমার নাম কি, খোকা?"

"অমিয়কুমার"—

হেম বাবু খুটিনাটি অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। প্রায় অধিকাংশ রাত্রিতেই তাহাকে অভুক্ত থাকিতে হয়। প্রহারের ভয়ে মাঝে মাঝে সে অন্য বাড়ীতে গিয়া লুকাইয়া থাকিয়াছে। মায়ের কথা, বাবার কথা কিছুই হেম বাবুর অজানা রহিল না।

ক্ষুধিত বালককে হেম বাবু ভাল করিয়া খাওয়াইলেন;—খাইতে খাইতে বালক বলিয়া উঠিল,—"আমার আগের মা কিন্তু কত আদর করতো, খেতে দিতো! এ মা খালি মারে আর মরুতে বলে!"

অমিয়কে একখানা ছবির বই দিয়া, তিনি অমিয়ের বাবাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হেম বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "দেখুন, বৌদিদিকে বলবেন, অন্ততঃ আমি যে কয়দিন গ্রামে আছি, ছেলেটিকে যেন এমন ক'রে না মারেন।"

অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া ঘোষ মহাশয় আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "দেখুন, সৎমা,—পেটে ত আর ধরেনি, ছেলের মমতা কি বুঝবে?"

হেম বাবু বলিলেন, "ও এই তিন বছর বেঁচে আছে, এতেই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

ঘোষ মহাশয় নিজের অসহায় দুরবস্থা এবং দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতাপ সবিস্তারে বর্ণন করিয়া সমস্ত দোষ সৃষ্টিকর্ত্তার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিলেন। এই নিরেট নরপশুর সহিত তর্ক করা নিষ্ফল—হেম বাবু

তাহাকে বিদায় দিয়া স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ভীত বালক অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,"আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে বাবাকে, মা পাঠিয়েছিল বুঝি ?"

"না গো—না, তোমায় আর যেতে হ'বে না—আজ তোমার নেমন্তন্ন এখানে।"

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে—অমিয় বসিয়া বসিয়া তাহার পূর্ব্ব-মাতার গল্প করিতে লাগিল; হেম বাবু সহসা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "অমিয়, আমার সঙ্গে যদি কল্‌কাতায় যাও, তা হ'লে তোমাকে তেমনি মা দিতে পারি।"

পরক্ষণেই হেম বাবু লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন; তাঁহার মনের এ কোন্ অজ্ঞাত-বাসনার প্রতিধ্বনি! অমিয় সানন্দে বলিল, "আমায় নিয়ে যাবেন, আমি সেই মা'র কাছে যাব, এ মা বড় মন্দ, খালি মারে।" হেম বাবু একখানা পুস্তক খুলিয়া বসিলেন, বালক ঘুমাইয়া পড়িল।

বই বন্ধ করিয়া হেম বাবু অমিয়ের মুখখানার প্রতি চাহিলেন, সেই মুখ—অবিকল নির্ম্মলার মত।

সন্ধ্যার পর অমিয়কে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া হেম বাবু ভাবিতে বসিলেন;—ঐ হিংস্র নারীর কবল হইতে মাতৃ-হীন বালককে রক্ষা করিতেই হইবে। সে দিন রাত্রির স্বপ্ন সকল সমস্যার মীমাংসা করিল। যেন নির্ম্মলা আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছে। নির্ম্মলার মুখখানি ঠিক যেন অমিয়র মত—দেখিয়া হেম বাবু আশ্চর্য্য হই-লেন। কি স্থিরদৃষ্টি—নির্ম্মলা কি যেন চাহে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। হেমবাবু কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও ?' মৃদু হাসিয়া সে চলিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া হেম বাবু বিষাদিতচিত্তে ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু অর্থহীন নহে।

হেম বাবু, ঘোষ মহাশয়ের নিকট অমিয়কে কলি-কাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিবামাত্র যে তিনি রাজী হইবেন, ইহা হেম বাবু ভাবিতে পারেন নাই। কেন না, গত রাত্রে কর্ত্তা ও গিন্নীতে যে গোপন কথোপ-কথন হইয়াছিল এবং আপদটা দূর করিবার উৎকণ্ঠায় ঘোষ-গৃহিণী যে প্রকার ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তাহাতে হেম বাবুর বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তিনি অমিয়কে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

৪

পাঁচ সাত দিনমধ্যেই হেম বাবুর জীবনযাত্রার সমস্ত প্রণালী বদলাইয়া গেল। বিশেষ শত্রুর শিক্ষামত অমিয় যখন তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, তখন আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। স্কুলে না দিয়া অমিয়কে নিজেই পড়াইতে লাগিলেন। অমিয় তাহার সবখানি হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। অমিয় শিষ্ট শান্ত না হইলেও, দুষ্ট নহে। কাযেই তাহাকে লইয়া হেম বাবুকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইত না। কেবল মাঝে মাঝে অমিয় জিজ্ঞাসা করিত, "মা কোথায়, মা কি আসবে না ?" একটি মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া শত মিথ্যা কথার অবতারণা করিতে হয়। বালকের মাতৃদর্শন-কৌতূহল যখন অতিশয় বাড়িয়া উঠিত, তখন হেম বাবু তাহাকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলা-ইয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিতেন না।

"বাবা, তুমি যে বলেছিলে, কলকাতায় আমার মা আছে; এত দিন হ'ল এসেছি, মা ত এক দিনও এলেন না।" হেম বাবু ক্লিষ্ট হইয়া বলিতেন, "তিনি বাপের বাড়ী গেছেন, চিঠি দিয়েছি, শীগ্‌গীরই আসবেন।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আর মনীষার সহিত হেম বাবুর দেখা হয় নাই। তাঁহারা দারজিলিংএ বেড়া-ইতে গিয়াছিলেন। হেম বাবুর ফিরিবার মাসখানেক পরে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন—হেম বাবুও প্রমাদ গণিলেন। সত্যই এক দিন ডাক আসিল, মনীষার মাতা তাঁহাকে খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন; হেম বাবু কোন অছিলাতেই নিষ্কৃতি পাইলেন না, পরদিন যথাসময়ে সম্পাদক-গৃহে দেখা দিলেন। সম্পাদক-গৃহিণী মায়ের মত আদর-যত্ন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন; দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আহারান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া হেম বাবু দেখেন, মনীষা যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছে; অগত্যা একটা নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, ভাল আছেন ত ?"

মনীষা হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়, কিন্তু আপনি দেশ থেকে রোগা হয়ে এসেছেন। যদি আমাদের সঙ্গে দারজিলিং যেতেন, তা' হ'লে শরীরটা শুধরে আনতে পারতেন!"

দারজিলিংএর কথা উঠিল। প্রসঙ্গতঃ মনীষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা হেম বাবু, আপনার ছেলে আছে, এ কথা ত কোন দিন বলেন নাই।"

হেম বাবুর মুখের রক্ত সহসা সরিয়া গেল, বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—"আমার ছেলে? বলেন কি?"

কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া মনীষা বলিলেন,—"লোকে এইরূপই বলে। সে দিন আফিসের পিয়ন, কাগজ দিতে গিয়ে দেখে এসেছে, আর জেনেও এসেছে!"

হেম বাবু নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। একটু রুক্ষ হইয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে এত খুটিনাটি সংবাদ আপনি রাখেন, এ আমি ইচ্ছা করি না।"

মনীষা গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আপনার মনে দুঃখ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়, এটুকু বিশ্বাস করলে আপনার কোন হানি হ'বে না।"

মনীষা তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসিয়াছে, অতএব সত্য কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে করিয়া হেম বাবু অমিয়ের সমস্ত ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। বলিবার সময় হেমবাবু সহসা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মনীষার চক্ষুতে অশ্রু! এ অশ্রু মহৎ—এই গভীর সমবেদনার অশ্রুসরোবরেই মনুষ্যত্বের আদর্শ—সদশ্রদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়াছে। মানুষের সভ্যতার ন্যায় নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ এই পবিত্র অশ্রুতে অভিষিক্ত! কল্পনা-প্রবণ হেম বাবুর সমস্ত কাঠিন্য গলিয়া গেল!

মনীষা কহিলেন, "হেম বাবু, কর্ত্তব্য ছাড়াও আর একটা জিনিষ আছে, যা কর্ত্তব্যের চেয়েও উঁচু, সে হচ্ছে স্নেহ। আপনি নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরে নয়, স্নেহবশেই অমিয়কে তুলে নিয়েছেন!"

"অপনি কেমন ক'রে বুঝলেন?"

"আমরা নারী—এটা আপনাদের চেয়ে ভাল বুঝি!"

সে দিন অপরাহ্ণে আফিস হইতে বাসায় আসিয়া হেম বাবু দেখেন, মনীষার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমিয় গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। হেম বাবু বিস্মিত সঙ্কোচে কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র অমিয় বলিয়া উঠিল, "বাবা, এই দেখ, মা এসেছেন!"

মনীষা লজ্জায় রক্তিম হইয়া মাথা নীচু করিলেন, হেমবাবু বিবর্ণমুখে স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। কিয়ৎকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া অপরাধীর মত মনীষার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "দেশে এক দিন হঠাৎ অমিয়কে বলেছিলুম, কল্‌কাতায় তোমার ভাল মা আছেন! এখানে আসার পর থেকে রোজই একবার মা'র কথা জিজ্ঞাসা করে; তাই ব'লে আপনাকে—"

মনীষা সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন,—"ছেলে-পিলের কথায় কি কান দিতে আছে? আপনি কাপড় বদলে আসুন। আমরা একটু বেড়াতে যাব।"

হেম বাবু অপ্রতিবাদে মনীষার আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

৫

অমিয়ের মায়ের কথা মনীষার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। মনীষার অমিয়ের প্রতি ভালবাসা, হেম বাবুর মনের মধ্যেও বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সে যে তাঁহার সম্মুখেই মনীষাকে মা বলিয়া ডাকে, এ লজ্জা ও সঙ্কোচ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। কেন না, মনীষার সহিত তাঁহার পরিণয় অসম্ভব। দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কোন দিনই মনীষাকে সেরূপভাবে দেখেন নাই। অথচ উভয়ের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতার পরিণাম কি, ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। সাধারণ লঘুচিত্তা তরুণীদের সহিত মনীষার অনেক পার্থক্য ছিল।—বিশেষ এই ব্যবহারে মনীষা যে ভাবে তাঁহার আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, তাহাতে যে কি পরিমাণ মানসিক বলের আবশ্যক, তাহা হেম বাবু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া এক দিন হেম বাবু মনীষাকে কহিলেন, "আপনি বিদুষী ও উচ্চহৃদয়া মহিলা, আমি সর্ব্বাংশেই আপনার অযোগ্য। আপনার বন্ধুত্ব দুর্লভ হইলেও দুর্ব্বহ। নিজের ভবিষ্যৎ লইয়া ছেলে-খেলা করিবেন না।" মনীষা সহজভাবে উত্তর দিলেন, "যাহারা সত্যই বিদুষী, তাহারা জীবন লইয়া ছেলেখেলা করে না, হেম বাবু! আর যোগ্য অযোগ্যও তাহাদের বোধ আছে।"

হেম বাবু নিরুত্তর হইয়া দীনভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন। কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। এ অপরূপ সম্বন্ধের অনিশ্চয়তার সংশয় হেম বাবুকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিতে লাগিল। বিশেষ ইতোমধ্যে এক দিন অমিয় যখন মনীষার সম্মুখেই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে, 'মা তাহাদের বাড়ীতে থাকেন না কেন?' তখন মনীষা যেরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটা প্রত্যাশা ছিল—তাহা নিঃসন্দেহ; এবং তিনি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মনীষা অমিয়কে কোলে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, "দুষ্টু ছেলে, মায়ের কথা ছাড়া কি আর কথা নাই?"—তাহার পর হইতে কয়েক দিন মনীষা আর অমিয়কে দেখিতে আসে নাই। অমিয়র কড়া তাগাদা সত্ত্বেও হেম বাবুও মনীষার সহিত দেখা করেন নাই।

'পূজা সংখ্যা' বাহির হইয়া যাওয়ার পর কার্য্যালয়ে ছুটী হইয়াছে। হেম বাবুও আর আফিসে যান নাই। পূজার ছুটীতে অমিয়কে লইয়া পশ্চিমে কোন সহরে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার অন্ধের যষ্টি শম্ভু পীড়িত হইয়া পড়ায় যাত্রা কিছু দিনের মত স্থগিদ রাখিতে হইল।

সে দিন সন্ধ্যার পর হেম বাবু নিবিষ্ট মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় অমিয় আসিয়া ডাকিল, "বাবা, মা এসেছেন।"

তিনি মুখ তুলিয়া দেখেন, অমিয়কে কোলে করিয়া মনীষা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন; ঠিক যেন গণেশ-জননী! নূতন বসন-ভূষণে সজ্জিত অমিয়কে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

হেম বাবুর চক্ষু অজ্ঞাতে অশ্রুসিক্ত হইল,—মনীষা ধীরে ধীরে আসিয়া হেম বাবুর পার্শ্বে বসিলেন; অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি বড় ছেলেমানুষ!"

"না, আমি ছেলেমানুষ নহি! ওরে অমিয়, তোর মা'কে ধ'রে রাখ,—আজ তোর মায়ের আগমনী!"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিরহিণী

সখি;—কি কব দুঃখের কথা,—
শ্যামবারি বিনা অকালে শুকা'ল—
এ মোর যৌবন-লতা।
আশার কুসুম ঝরিয়া পড়িল
বিরহ-নিদাঘ-তাপে,
হৃদয়-কানন মরুভূমি হ'ল—
কোন্ বিধাতার শাপে,
এত আঁখি-জল হ'ল গো বিফল
জীবনে কি ফল আর;
চল চল সখি যমুনার জলে,
স'পিব এ তনু ছার।

সান্ত্বনা আর কি দিবে সজনি
বুঝাবে কি আর বল,
আসিবে আসিবে শুনিতে শুনিতে
যুগযুগান্ত গেল।

আসিবার হ'লে আসিত সে চ'লে—
আসিবে না কভু আর,
বুঝিয়াছি সার বিরহ-আঁধার
ঘুচিবে না রাধিকার।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

জুজুর ভয়

'কি রান্না হচ্ছে, চিফ সেফ সাহেবের?—মোচার কাটলেট না থোড়ের চপ?'—মাথায় ম্যাকাসার অয়েলের গন্ধ ছড়াইয়া সাবান, তোয়ালে, মাজন, বুরুষ হাতে লইয়া রজতনাথ একেবারে রসুই-ঘরের দ্বারে উপস্থিত। তাহার প্রফুল্ল মুখখানা হাস্তের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তরকারিতে খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে রাঙ্গা ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, "তা কি করি বল, দাদা, এই কালাকিস্কিন্দে আদমীর দেশে ত কুকুর-বেরালের চপ-কাটলেট হয় না, হলে কি থোড়-মোচায় আমার সাহেব ভাইটির খানা তৈরী করতুম?"

বুরুষে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে রজতনাথ বলিল, "যা বল, ঠানদি, আমাদের এই থোড়-মোচাই ভাল। যে দিন বাড়ী এসে তেল মেখে নেয়ে টেয়ে তোমার হাতের সুক্তো-ডালনা খেলুম, সে দিন মনে হ'ল যেন অমৃত খাচ্ছি। বাঙ্গালীর কি ও সব কপিসেদ্ধ আলুসেদ্ধয় পেট ভরে?"

ঠানদি তরকারিটা নামাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ভারি ত রান্না! না আছে মাছ, না আছে মাংস, না আছে পেঁয়াজ, না আছে রসুন—এ ছাই-পাঁশ কি বিলেতফেরত সাহেব ভায়ার পছন্দ হ'বে?"

রজতনাথ কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "কি? এই পোষ্টাই রান্নার কাছে বিলিতী খানা? বাবা! অড়র-ডালে পোয়াটাক গাওয়া ঘি, মোচার ঘণ্টোয় পোয়াটাক গাওয়া ঘি, দু'সের খাঁটি দুধ মেরে আধসের ক্ষীর, সেরটাক তিলকুটো চন্দ্রপুলী—"

ঠানদি অন্তরে চটিয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরে কাঠহাসি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম ছুঁচো! পোষ্টাই, পোষ্টাই! বিধবার ছাই-পাঁশ খাবারেও কেবল পোষ্টাই দেখে! বলে—"

কথাটা শেষ হইল না, একটি সুন্দরী যুবতী রান্না-ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কে পোষ্টাই দেখছে, ঠানদি? ঠাকুরপো বুঝি?"

ঠানদি তরকারি সাঁতলাইতে সাঁতলাইতে বলিলেন, "নয় ত আর কে ভাই? হাড়-জ্বালানে!"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "ভাইটি আমার বড় দুষ্টু ত। বিলেত থেকে এক জাহাজ বিদ্যে নিয়ে দেশে এলেন, তা ঘরের কোণে যুদ্ধ করতেই মজবুত, বাইরে ঢুঁঢুঁ। দাঁড়াও না, ঠানদি, মরদকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি।"

রজত কৃত্রিম ভয়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "দোহাই, বৌদি, কি করবে বল দিকি? ঝোলে এক থাবা নুণ দিয়ে রাখবে, না পানে আরশুলোর নাদি দেবে? দোহাই, বউদি, সবে আজ এসেছো, এরই মধ্যে ফাঁসির ব্যবস্থা করো না।"

"দাঁড়াও না, ঠাট্টা বা'র করছি। আসছি তোমার জুজু নিয়ে,"—কথাটা বলিয়াই মনোরমা হাসিতে হাসিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রজতনাথ এইবার বস্তুতঃই ভীত হইয়া বলিল, "না, বউদি, ঘাট হয়েছে, আর ঠান্‌দিকে জ্বালাব না, তোমার পায় পড়ি—"

কথা শেষ না করিয়াই সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

তাহার 'বৌদি' হাসিয়া খুন! ঠান্‌দি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবাক্! ছেলে যে এখনও সেই আগেকার খোকাটিই আছে। ও কি এখনও খোকা দেখলে আঁৎকে ওঠে?"

মনোরমা বলিলেন, "দেখলে আঁৎকাবে কেন, ধর্‌তে হ'লেই সর্ব্বনাশ। এত বড়টি হয়েছে, কিন্তু এখনও খোকাকে কোলে দাও দিকি, একবারে জুজুটি হয়ে থাক্‌বে।"

ঠান্‌দি বলিলেন, "বিলেত যাবার আগে ত দেখেছি তাই। আচ্ছা, এক দিন সুন্থকে ছুতোয়-নতায় কোলে দিয়েই দেখ না।"

মনোরমা বলিলেন, "না বাবু, আবার কি অনর্থ ক'রে বস্‌বে।"

ঠান্‌দি ডালনায় গুড় দিয়া বলিলেন, "হাঁ, তুমিও যেমন! আসুক না নেয়ে। খেতে বস্‌লেই খোকাকে কোলে বসিয়ে দোবো'খন। সরলাকে কবে আন্‌ছ, বৌমা?"

মনোরমা খোকা কাঁদিতেছে শুনিয়া রান্নাঘরের বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই যে সাম্‌নে মাসের দোসরা দিন দেখান হয়েছে।"

২

রজতনাথের বয়স কম নহে, বিলাতে ৫ বৎসর শিক্ষার্থ থাকিবার পর ২৩ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়াছে, অথচ সে এখনও যদি জগতে যমের মত কাহাকেও ভয় করে, তবে ছোট ছেলেপুলেকে। তাহার দাদার ছেলেপুলে ছিল, কিন্তু কেহ বলিতে পারে না যে, সে কখনও এক দিন এক মুহূর্ত্তেরও জন্ত কাহাকেও কোলে-পিঠে করিয়াছে। কোলে-পিঠে করা ত দূরে থাকুক, সে কখনও এক দিনের জন্তও কোন ছেলে-মেয়েকে স্পর্শ করে নাই। দেশে পাঠ্যাবস্থায় ছেলেপুলের চেঁচামেচির ভয়ে সে পাড়ার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া লেখাপড়া করিত। তাহার সদাশিব দাদা শিবনাথ এ বিষয়ে কখনও এক দিনের জন্তও মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই, বরং অপরে কোনও কথা বলিলে বলিতেন, "আচ্ছা, এখন ওর বয়েস কি? বড় হ'লে, ওর আবার ছেলেপুলে হ'লে ও রোগ সেরে যাবে।"

'বড় হ'লে ছেলেপুলে হলে'র কথা এক দিন রজতনাথ ও তাহার বৌদিদি মনোরমার মধ্যে হইয়াছিল। রজতনাথ একখানা পত্র লিখিতেছিল, এমন সময়ে তাহার বৌদি কোলের ছেলে সুন্থকে লইয়া তথায় উপস্থিত। সুন্থ মায়ের কোলে চড়িয়া পরম আনন্দে চিলের মত চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল এবং মায়ের গলার হারটা ছিনাইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল। রজতনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ, নে যাও ওটাকে, বৌদি। রাস্কেলটা চেঁচাচ্ছে দেখ না!"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "অত দূর-ছাই কোরো না বল্‌ছি। আজ বাদে কা'ল যখন ওর কাকীমার কোলে সোনার খোকা হ'বে, তখন কি কর্‌বে?"

রজতনাথ চিঠি হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কে, আমি? ওঃ, দেখে নিও বৌদি, আমার ও সব আপদ-বালাই হ'বে না।"

"বা রসকে! আপদ-বালাই বুঝি ইচ্ছেমত আনা যায়? ইস্! ফুস মন্তর আর কি?"

"তা নয় ত কি? আমরা পুরুষমানুষ—আমাদের একটা উইলফোর্স নেই?"

"দেখে নোব, কত ফোঁস্। ঈশেমূল আসছে শীগ্‌গির, পুরুষ-মদ্দোর জারিজুরি তখন দেখবু।"

"ওঃ, তা পাঁচশবার দেখে নিও। এখন যাও দিকি, তোমার পায় পড়ি, চিঠিখানা শেষ কর্‌তে দাও।"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু ব'লে রাখছি, আসছে মাসে সরুকে আন্‌ছি, পুরুষ-মদ্দো যেন হুঁসিয়ার হয়ে থাকে।"

কথাটা বলিয়া হাসিতে হাসিতে মনোরমা চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই যেন কি একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার বলিলেন, "হাঁ, ঠাকুরপো, আমার ছোট বোন্ যে সোমবার ছেলেপুলে নিয়ে দিনকতকের জন্ত এখানে আস্‌ছে—"

রজতনাথ চমকিত হইয়া বলিল, "কবে আস্‌ছে, সোমবার? সে ত পরশু? ওঃ, তার আগেই ত আমায় পালাতে হবে।"

মনোরমা মুখখানি যতদূর সম্ভব বিমর্ষ করিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ঠাকুরপো! এত লেখাপড়া শিখে এমন অসভ্যর মত কাষ কর্‌বে কি ক'রে বল দিকি?

তোমার বাড়ীতে তারা অতিথ আস্‌ছে, বিশেষ ক'রে সে আরও তোমায় দেখবে ব'লেই আস্‌ছে। বিলেত-মিলেত গেলে না কি তোমাদের সব লেজ বেরোয় না কি হয়, তাই তা'র ভারি ইচ্ছে, দিশী সাহেব কেমন, দেখে যাবে। তুমি কি ব'লে বাড়ী ছেড়ে পালাবে? তা কি হয়?"

রজতনাথ পত্র লিখা স্থগিত রাখিয়া গভীর চিন্তামগ্ন-ভাবে ক্ষণপরে বলিল, "হুঁ, তা ক'টা ছেলেপুলে বল্‌লে, কদ্দিন থাকবে?"

মনোরমা বলিলেন, "ছেলেপুলে? এই ধর না কেন, শামু, রামু, নন্ত, মন্ত" —

"আঃ সর্ব্বনাশ!" লাফাইয়া উঠিয়া রজতনাথ বলিল, "থাম, থাম, বৌদি, যথেষ্ট হয়েছে" কথাটা শেষ করিয়াই রজতনাথ একখানা হাওড়া রেলের টাইমটেবল খুলিয়া বসিল।

মনোরমা অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ও কি হচ্ছে, গাড়ীর সময় দেখা হচ্ছে না কি?"

"না ত করি কি? দেখছি, কাশীর গাড়ী ক'টায় ছাড়ে।"

"কেন, জুজুর ভয়ে কাশীবাসী হ'বে না কি? না, ভাই, সত্যি বল্‌ছি, কুমুর বেটের কোলে মাত্র একটি ছেলে। তা খুব শান্ত, কোনও ভয় নেই। আর থাক্‌বেও না সে বেশী দিন এই সাতটা দিন। কি বল?"

"সাতটা দিন? তা, তা, দেখা যাবে। কিন্তু বৌদি, যদি তোমার কুমুর ছেলে সাম্‌নে পড়ে বা আমার কাছে দিয়ে-টিয়ে যাও, তা হ'লে ব'লে রাখছি, আমি অতিথির মান রাখতে পা'রবো না। অবশ্য তোমার কুমুই হোক আর যেই হোক, তিনি এলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হ'বে না। কিন্তু ছেলেপুলে? উঃ!"

"আচ্ছা গো, বীরপুরুষ, তাই হ'বে, তোমায় ছেলের হাঙ্গামা পোয়াতে হ'বে না।"

এই সময়ে ঠান্‌দি আসিয়া বলিলেন, "কি গো, কি উদ্যুগ কর্‌ছ—কুটুম-সাক্ষেত আস্‌ছে—বিলেত-ফেরতা বাবু-সাহেব মুরগী টুরগীর যোগাড় কর্‌ছ ত?"

রজতনাথ একগাল হাসিয়া বলিল, "সত্যি বল্‌ছি, ঠান্‌দি, তোমায় ভালে যখন হিঙ ফোড়ন দাও, ঠিক যেন মুরগীর কোর্ম্মার খোসবাই ছাড়ে!"

ঠান্‌দিদি মহা ক্রুদ্ধ হইবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "ও মা, কোথায় যাব গো—মিন্‌ষে কি বলে গো! হিঁদুর ঘরের বিধবা, অমন ধারা কথা বলিস্‌'ত সত্যি সত্যি সরিকে এনে তাকে দিয়ে তোর ঘাড়ে ছেলে বওয়াব।"

রজতনাথ বলিল, "ইস্! আচ্ছা, এস বাজী,—এক সের কেষ্টনগরের সরভাজা! কেমন?"

ঠান্‌দি ও বৌদি সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তাই, তাই।"

ঠান্‌দি পরে বলিলেন, "কিন্তু তখন যেন পেছিয়ো না, ভাই, তা হ'লে এই কান ছুটো —"

রজতনাথ "আঃ উঃ" করিয়া কান ছাড়াইয়া লইয়া দ্বারসান্নিধ্যে উপস্থিত হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "উঃ, কান ছুটো ছিঁড়ে গেছে একবারে; আচ্ছা ঠান্‌দি, তুমি কেন জার্ম্মাণ ওয়ারে গেলে না?"

ঠান্‌দি হাসিয়া বলিলেন, "কেন বল ত?"

রজতনাথ বলিল, "তা হ'লে ইংরেজের লড়াই ফতে হ'তে এদ্দিন লাগতো না।"

"তবে রে ছুঁচো", বলিয়া ঠান্‌দি তাড়া করিয়া গেলে রজতনাথ হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

৩

রজতনাথ বালিগঞ্জে এক সতীর্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বেলা ১০টার সময় বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, বাড়ী খাঁ খাঁ, কেহ কোথাও নাই। তাহার সদাপ্রফুল্লাননা স্নেহময়ী বৌদিদি না থাকিলে তাহার যেন বাড়ী অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, ঠান্‌দির মুখখানি একবার না দেখিলে, তাহার কিছুই ভাল লাগে না। এত আদর—এত যত্ন তাহাকে কে করিবে?

ভৃত্যদের নিকট রজতনাথ শুনিল, আজ রাধাষ্টমীর ব্রত বলিয়া তাঁহারা এই কতক্ষণ হইল গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। আজ প্রাতে ৮টার গাড়ীতে বৌদির ভগিনীর এখানে আসিবার কথা ছিল, তাহার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্যরা বলিল, ৮টার পর গাড়ী করিয়া কাহারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলে ঠান্‌দিদের সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন; কেবল মা'ঠাকুরুণের (বৌদিদির) ছোট বোন্ যায়েন নাই, তাঁহার খোকার শরীর ভাল না।

রজতনাথ অন্দরে প্রবেশ করিতেই শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনিতে পাইল, তাহার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে একবার মনে করিল, রণে ভঙ্গ দিয়া অন্যত্র পলায়ন করে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে বৌদিদির নিকট প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়িল। বিশেষতঃ নিজেও মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, চলিয়া গেলে অতিথিসেবা না করিয়া পাপ হইবে। আবার ভাবিল, "আমি ত চুপি চুপি আমার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিব, বৌদিদির ভগিনী ছেলেমানুষ, তিনি ত আর একাকী আমার নিকট আসিবেন না। কাযেই ছেলেটাও আসিবে না। তবে আর কি?"

কথাটা তোলাপাড়া করিবার পর রজতনাথ সাহসে ভর করিয়া নিজের ঘরে গিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এই অবস্থায় ছিল, জানে না, হঠাৎ মধুর কোমল কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চা-হালুয়া কি এইখানেই আনব?"

রজতনাথ তড়াক করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া বিস্মিত-নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, একটি সুন্দরী যুবতী অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া দ্বারসান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সে অনুমান করিয়া লইল, ইনিই বৌদিদির ভগিনী 'কুমু।' সে তাড়াতাড়ি বলিল,"না, না, ও সব কষ্ট আপনাকে করতে হ'বে না, আমি বালিগঞ্জেই ও সব সেরে এসেছি—বিশেষ আপনি আজ সবে এখানে এয়েছেন—"

"তা হোক, দিদি ব'লে গেছেন। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এলুম ব'লে।" তরুণী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রজতনাথ তখন নানারূপ দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। একবার ভাবিল, বিপদের সম্ভাবনা হইতে দূরে পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আবার ভাবিল, না, তরুণী কষ্ট স্বীকার করিয়া চা-হালুয়ার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, এ আহ্বান উপেক্ষা করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। আর একটা কথা রজতনাথ মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। এ দেশের উন্নতি কোনও কালে হইবে না। এই তরুণী 'কুমু'—তরুণী কেন, ইহাকে বালিকা বলিলেও বিশেষ অপরাধ করা হয় না,—এই তরুণী বিবাহিতা, ইহার এক পুত্রসন্তান, এ ভাবে বাল্যবিবাহের ফল ফলিলে দেশ উৎসন্ন যাইবে না ত কি হইবে? এই কোমল বয়সে পুত্রবতী হইলে নারীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে না ত কি হইবে? রজতনাথ নিজের অবস্থার কথাটাও ঐ সঙ্গে ভাবিয়া লইল। তাহারও এক বিবাহিতা পত্নী আছে। তাহার যখন মাত্র ১৮ বৎসর বয়স, তখন তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া এক চেলীর পুঁটুলীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে সে জানে না, চেনে না, বিবাহের পরেই সে বিলাত চলিয়া গিয়াছিল। সে এ যাবৎ বিদ্যার ধ্যানেই তন্ময় ছিল এবং তাহাকে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সহায়তা করিবার জন্য আত্মীয়-স্বজন কোন পক্ষ হইতেই কুশল-সংবাদ গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন বাধা প্রদান করা হয় নাই। এ জন্য এ যাবৎ তাহার পত্নীর সহিতও পত্রবিনিময় হয় নাই। সে এমনই বিদ্যা-পাগল ছিল যে, সে বিলাতেও নারীজাতির প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবসরও পাইত না। এখন সেই পত্নীরই সহিত তাহাকে ঘর করিতে হইবে। এ কিরূপ ব্যবস্থা? নাঃ, ভারত উদ্ধারের আর কোনও আশাই নাই।

হঠাৎ এই সময়ে তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। এক বিকট চীৎকারে তাহার দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। রজতনাথ দেখিল, তরুণী একখানি রেকাবে চা, হালুয়া লইয়া উপস্থিত; এবার কিন্তু তিনি একক নহেন, তাঁহার ক্রোড়ে এক শিশু। সেই শিশুর চীৎকারেই রজতনাথের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল। শিশু বিকট বদন ব্যাদান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতেছিল,—শিশুকে রজতনাথের ভীষণ দৈত্যদানা বলিয়াই মনে হইতেছিল। সে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু তরুণীর বিপদ দেখিয়া তাহার পলাইতে মন সরিল না। দুর্দ্দান্ত শিশু দুই হাতে রেকাব ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, তরুণী তাহাকে সামলাইতে গিয়া মহা ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, শিশুর সহিত ধস্তাধস্তিতে বিস্রস্ত-বসনা কাতরা তরুণী একান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে শিশুর টানাটানিতে রেকাব হইতে চায়ের পেয়ালা মেঝের উপর সশব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

কি জানি কেন, হঠাৎ সেই সময়ে রজতনাথের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "খোকাকে আমার কাছে দিন, আপনাকে বড় জ্বালাতন করছে।"

রজতনাথ এই কথা বলিয়া হস্ত-প্রসারণ করিল। কে যেন যন্ত্রচালিতবৎ তাহাকে লইয়া চলিল। তরুণী সঙ্কোচ ও লজ্জার মাঝেও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া খোকাকে তাহার বাহুদ্বয়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "যদি একে একটু ধরেন, তা হ'লে আমি গিয়ে চা-টা আবার নিয়ে আসি।"

তরুণী চা আনিতে গিয়াছেন, রজতনাথ খোকাকে কোলে লইয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। ঠিক কোলে লওয়া বলে না, যেমন করিয়া লোক সাপের ছানা, বাঘের ছানা ধরে, ঠিক সেইভাবেই রজতনাথ এই দুরন্ত ছেলেটাকে ধরিয়াছে। যখন তরুণী আবার চায়ের পেয়ালা সহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন খোকা ওয়াটার্লুর রণজয়ী বীরের স্থায় 'হুররে হুররে' করিয়া গর্জ্জিতেছে। সে খেজুরগাছে উঠার মত রজতনাথের অঙ্গ বাহিয়া উঠিয়া তাহার কাঁধের উপর বসিয়াছে এবং ক্ষণপূর্ব্বে রজতনাথ তাহাকে ভুলাইবার জন্ত টেবলের উপর হইতে যে কাগজ চাপা দিবার পাথরের গণেশটা দিয়াছিল, সেইটা হাতে বাগাইয়া ধরিয়া রজতনাথের মাথায় সজোরে দমাদম প্রহার করিতেছে আর মহোল্লাসে গর্জ্জন করিয়া হা-হা হাসিতেছে। রজতনাথের সে সময়ের মুখ-চোখের ভীষণ অবস্থা দেখিয়া তরুণী হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার চাপা হাসিতে রজতনাথের বিভীষিকার সহিত লজ্জা ও অপৌরুষেয়ত্ব শতরাগে মুখে চোখে ফুটিয়া বাহির হইল।

বিপদের উপর বিপদ, ঠিক ঐ সময়ে পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি রজতনাথের কক্ষে দেখা দিল। তাহাদেরও উচ্চ হাস্তরোলে কক্ষ ভরিয়া গেল, তরুণী তাহাদিগকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া কক্ষ হইতে মুহূর্ত্তে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

একটি মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া রজতনাথের কানটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"নিয়ে আয় শালা, কেষ্টনগরের সরভাজা—শালা, ছেলে ছুঁবি নি না কি?" ঠানদির মিষ্টমধুর কানমলা ও বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বেচারা রজতনাথ ভেবাচাকা খাইয়া-ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেই সম্মুখে তাহার সদা-হাস্তময়ী চিরপ্রফুল্লাননা বৌদিকে দেখিতে পাইল। তাঁহার দিকে কাতরে কৃপাভিক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই বৌ-দিদি বলিলেন,—"এ যে ভাই গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এখনও সরুর কোলে ছেলে হয় নি, শুধু ঢল ঢল কাঁচা মুখখানারই এত জোর? তা যাক গে, নিজের ধন নিজে চিনে নিতে পারলে না, ভাই?"

ঠানদি ঠেস দিয়া বলিলেন, "হাঁ, ও শালার আর কিছু চিনে নেবার ক্ষমতা আছে কি? দু'টো ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দেখে যে মুণ্ডু ঘুরে গেছে। আচ্ছা শালা, তোকে ত বলিনি যে, সরিকে এনেছি; তবে পরের ধন কুমুর কাঁচা মুখখানা দেখেই একবারে কামরূপের ভেড়া ব'নে গেলি? ছিঃ ছিঃ, তোদের জাতটাই এই রকম?"

রজতের এতক্ষণে কথা ফুটিল, সে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া এতক্ষণ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল। এইবার বলিল, "কামরূপের ভেড়াই বটে, ঠানদি! তোমরা সব করতে পার। আচ্ছা, বৌদি, ভাল বুঝলুম না, কি ধাঁধা লাগালে। খোকার মা কে, যিনি এয়েছেন, তিনি না?"

ঠানদি আবার রজতের কানদুটা ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"না গো, না, বুদ্ধির ঢেঁকি, খোকার মা তোমার সামনে এই দাঁড়িয়ে—এই তোমার বৌদি। আর যিনি এসেছেন, তিনি—তিনি—তোমার দেহি পদপল্লব—"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—"না ঠানদি, আর বেচারীকে জ্বালিও না, ও সরু। ওকেই এনেছি, আজ কুমু আসে নি, কেন না, কুমু ব'লে কেউ নেই।"

রজত সবিস্ময়ে বলিল,"কি আশ্চর্য্য,মনে করেছিলুম—"

ঠানদি কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন,—"যাক চালাক-রাম—আর মনে কিছু ক'রে কায নেই। নতুন পোষাকে বৌদির খোকাকে চিনতে পারলে না?"

রজতনাথ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"এঁ্যা, বৌদির খোকা? না, না। তা হতেও পারে। দেখেছো, এই খোকাগুলোর মুখ সবারই একরকম!"

অপরাধীর শাস্তি

হঠাৎ মণিকার স্বামীর নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইয়া তাহার পিতার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গরীব জগবন্ধু বোসের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটিকে দেখিয়া জীবন মিত্র বিনাপণে সাগ্রহে মণিকার সহিত নিজ পুত্র হিরণের বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহিণীশূন্য গৃহে কন্যা-সদৃশী পুত্রবধূ আনিয়া তিনি তৃপ্তি পাইয়াছিলেন। তিনি নিজ হাতে মণিকাকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। মণিকার কণ্ঠ বড় মধুর ছিল, সেই জন্য তিনি তাহাকে সেতার ও এস্রাজ বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন এবং তাহাকে কখনও অবগুণ্ঠন দিতে দিতেন না। ইহাতে গ্রামবাসী ও প্রতিবেশীরা অনেকেই অনেক কথা বলিত। কিন্তু দুহিতাহীন বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জরে ফল্গুর ধারার ন্যায় যে অন্তর্নিরুদ্ধ বেগ লুক্কায়িত ছিল, তাহা মণিকাকে পাইয়া পূর্ণ-জোয়ারের বিপুল আবেগে অফুরন্ত ধারায় অন্তরে বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্গত হইল, তখন লোকাপবাদ, নিন্দা, গ্লানি, আত্মীয়-স্বজনের শ্লেষ সমস্তই সেই প্রবল বন্যার মুখে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না।

হিরণ ছেলেটি মন্দ ছিল না, কিন্তু তাহার প্রধান দোষ ছিল যে, সে অত্যন্ত অভিমানী ও খেয়ালী। মাতৃহীন পুত্রকে পিতা অত্যধিক যত্নে ও আদরে লালন-পালন করিয়াছিলেন। তিনি কখনও তাহার কোন আব্দারে বাধা দেন নাই, সেই কারণেই সকলে বলিত, তাঁহার দোষে হিরণ ঐ রকম হইয়াছে। তিনিও সময় সময় হিরণের জন্য যে কষ্ট পাইতেন না, তাহা নহে, তথাপি হিরণকে তিনি কিছু বলিতে পারিতেন না।

কিন্তু এত সুখ বোধ হয় মণিকার ভাগ্যে সহিল না। বিবাহের দুই বৎসর পরে নিষ্ঠুর কালের আহ্বানে তাহার শ্বশুর কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেলেন, তাহা সে বালিকা-হৃদয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

স্বামীর আদর-যত্নে, বিপুল সোহাগে মণিকার বিয়োগ-ব্যথা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া যখন স্বামীর প্রেমে অন্তর-বাহির অপরিসীম তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইতেছিল, তখন সামান্য একটা ঘটনায় কখন্ যে তাহার ভাগ্যসূত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

এক দিন হিরণ তাহাকে তাহার বন্ধুদের নিকট গান গাহিতে বলিয়াছিল; কিন্তু লজ্জায় সে তাহা পারে নাই। এই জন্য স্বামিস্ত্রীতে তিন দিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা ছিল না। চার দিনের দিন সকালবেলা মণিকাকে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া হিরণ যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। সে পত্রে লিখিয়াছিল—

"মণিকা,

নিশীথের সম্মুখে তুমি আমাকে বড় অপমানিত করিয়াছ এবং প্রায়ই তুমি আমার অবাধ্য হও। বাবা অত্যধিক আদর দিয়া তোমার মাথা খাইয়া গেছেন, সুতরাং তোমার সহিত আর আমার দেখা হওয়া অসম্ভব।

হিরণ।"

জীবন মিত্রের বেশী কিছু সম্বল ছিল না। তিনি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেন, এবং যাহা কিছু নগদ ছিল, তাহা কোথায় ছিল, মণিকা জানিত না। সুতরাং হিরণ চলিয়া যাইবার পরেই বাড়ীওয়ালা মণিকাকে ভাড়ার টাকার তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিল। জগবন্ধু বাবু জামাইয়ের নিরুদ্দেশ সংবাদ পাইয়া হাওড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাড়ীওয়ালার নিকট জানিতে পারিলেন যে, ছয় মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে, হিরণ নিরুদ্দেশ, কোন রসিদপত্র নাই এবং বহু অন্বেষণেও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার কথামত কন্যার গহনা বিক্রয় করিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া তিনি রোদনরতা কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন।

মণিকা বিবাহের দুই বৎসরমধ্যে মাত্র আট দিন পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিল, তাহাও অনেক কাঁদাকাটি করিয়া ও পিতার নিতান্ত অনুনয়ের পর। আর—আজ, আজ সে কোথায় চলিয়াছে? নির্ব্বাসিতা সীতার ন্যায়

পিতৃগৃহের বিনা আহ্বানে নিতান্ত উপযাচিকা হইয়া সেই দেশেই কি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে? এই কথাটাই সে দিন তাহার অন্তরে প্রতিনিয়ত উদিত হইতেছিল। তাহার চিররুদ্ধ অশ্রুরাশি আজ আর বাধা মানিল না। মনে পড়িতেছিল, এক দিন বাপের বাড়ী যাইবার জন্য সে হিরণকে কত অনুনয় করিয়াছিল, তাহাতে হিরণ বলিয়াছিল, "বিয়ের পর বাপের বাড়ী যাওয়া আমাদের বংশে কেহ পছন্দ করে না, বিশেষতঃ আমি ওটাকে একেবারেই ঘৃণা করি।" মণিকা ভাবিতেছিল, সামান্য অপরাধে বংশগত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ঘৃণার দেশেই তাহাকে কেন চিরনির্ব্বাসন দিয়া গেলে? এত বড় অবিচার, এত অধিক শাস্তি দিতে কি একটুকুও কষ্ট হয় নাই? চিরকালই তোমাদের বিধান জয়ী হইবে? আগে যদি একটুকুও জানিতে পারিতাম যে, সত্য সত্যই তুমি চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া একবার সেই স্নিগ্ধ মনোরম মূর্ত্তিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইতাম। কিন্তু সে যে চিরকালই লজ্জা করিয়া আসিয়াছে। জাগ্রত মূর্ত্তিখানি যে সে কোন দিনই লজ্জা অতিক্রম করিয়া দেখিতে পারে নাই, স্বামীর শত অনুরোধেও সে যে কোন দিন নয়ন হইতে হস্ত অপসারিত করিতে পারিত না। শয্যায় সংলগ্ন তন্দ্রামগ্ন অতুল রূপরাশি সে যে চুরি করিয়াই দেখিত। মনে হইল, এক দিন হিরণ কপট নিদ্রায় শয্যায় শায়িত ছিল, আর সে যেমন হাত দুইখানি সরাইয়া চাহিতে যাইবে, অমনই গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া হিরণ বলিয়াছিল, "কেমন জব্দ, এইবার, চোর অনেকেই হয়, এমন হাতে হাতে ধরা কেউ পড়ে না।" সে স্বর কি মধুর, আলিঙ্গনে কি অসীম তৃপ্তি, নীলেন্দীবর নয়নযুগলে কি স্নিগ্ধ কটাক্ষ! সে দিন কি আর ফিরিবে না? এত ভালবাসায় এক দিনের ত্রুটিতে কি করিয়া তত বড় বিচ্ছেদ আনিয়া দিল? সেই সূর্য্যকিরণ সদৃশ স্বচ্ছ হৃদয়মধ্যে কেমন করিয়া এত অহিবিষ পূর্ণ ছিল, সে ত তাহা ধারণায় আনিতে পারে না।

জগবন্ধু বাবুর দুইটি পুত্র ও ঐ কন্যা। পুত্র দুইটিরও বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের পুত্র-কন্যাও হইয়াছে। ক্রন্দনরতা কন্যাকে লইয়া তিনি গৃহে ফিরিতেই মণিকার মাতা কন্যাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া মাতাপুত্রী রোদন করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাতা কহিলেন, "মনু, কি হলো, মা? হিরণ যে সোনার ছেলে, সে কেন এমন কল্লে?"

কন্যা মাতাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলে মণিকার মাতা পুনরায় কহিলেন, "বড় অন্যায় করেছিস্, মা, সে কেমন অভিমানী খেয়ালী, তা ত তুই জানিস, বেহাই মহাশয়ই তাকে কত ভয় করতো। তুই অবাধ্য হয়ে ভাল করিস নি। তুই ত অবোধ নস।"

রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে মণিকা কহিল, "এমন যে হ'বে—" আর বলিতে পারিল না, মাতার বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

জগবন্ধু বাবুর অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। সংসারে অনেকগুলি পরিবার; তাহার উপর একমাত্র কন্যার দুরদৃষ্ট ভাবিয়া এবং এক বৎসর ধরিয়া জামাতার বহু অন্বেষণেও কোন উদ্দেশ না পাইয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি হঠাৎ কালের আহ্বানে সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। এত দিনে মণিকার সমস্তই গেল।

জগবন্ধু বাবুর দুইটি ছেলেই চাকরী করে। বড় সুধীরচন্দ্র কাষ্টম হাউসে বড় বাবু। তাহার বেশ উপরি পাওনা আছে, তাহা ছাড়া মাহিনাও মোটা। ছোট সুশীল ৬০ টাকা বেতনে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কেরাণীগিরি করে।

পিতার মৃত্যুর পরেই বধূদ্বয়ের নিকট শাশুড়ী ও ননদ আপদ-বালাই হইয়া পড়িল। সংসারে দুই বধূই এখন গৃহিণী, ছোট বড় যায়ের মন যোগাইয়া চলেন, কারণ, তাঁহার স্বামীর তেমন রোজগার নাই। আর বড় বধূ অত্যন্ত মুখরা। শ্বশুরের মৃত্যুর পর শরীর খারাপের ওজর দিয়া পিতৃগৃহ হইতে নিজের মানুষ-করা ঝি আনাইয়া তাহাকে সংসারের কর্ত্রী করিলেন এবং মাঝে মাঝে পিতৃগৃহ হইতে ভাই, মা, ভাজ আসিয়া যে না থাকিত, এমন নহে। জামাই মোটা চাকরী করে, তাহার উপর কন্যার অত্যন্ত বশীভূত, সুতরাং তাহারাও যে দুঃখিনী মণিকাকে নির্য্যাতন না করিত, এমন নহে। বড় বধূর গৃহে কাহারও পা দিবার ক্ষমতা ছিল না, বিশেষতঃ

মণিকার। কারণ, স্বামিত্যক্তা পত্নীর পাদস্পর্শে যদি তাহার ভাগ্যসূত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু পিতৃ-লোকেদের নিকট তাহার দ্বার অবারিত। মণিকাও অত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিল, সে ভুলিয়াও কখন বড় বধূর গৃহে প্রবেশ করিত না।

মণিকাকেই সংসারের সমস্ত কায করিয়া দিতে হইত। এমন কি, একাদশীর দিন রান্নার শেষে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ঘিয়ের লুচী, তরকারী তৈয়ারী করিয়া বড়বধূর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি বারোটা অবধি যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। বড়বধূর বিনা দোষে বর্ষিত অজস্র বাক্যবাণে তাহার মন ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অসাধারণ সহিষ্ণুতার ফলে সে কিছু প্রকাশ করিত না। কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার অসহ্য দহনে তাহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

এক দিন বেলা হইয়া গিয়াছে, সুধীর ও সুশীল না খাইয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছেন। বড়বধূ তখন ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, উনানে আগুন পড়ে নাই, চতুর্দ্দিকে জঞ্জাল, এঁটো বাসনগুলি তখনও পড়িয়া আছে। ছোটবধূ সবে মাত্র উঠিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। ননদ ঠাকরুণ আজ কোথায়? তিনি শাশুড়ীর দুয়ারে গিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "কি গো, আজ আর রাজরাণীর ঘুম ভাঙ্গছে না নাকি?"

ক্ষীণ কণ্ঠে মণিকা ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল," কা'ল রাত্রে জ্বর হয়েছে, মাথাটায় খুব কষ্ট হচ্ছে, আজ আর উঠতে পাচ্ছি না, বৌদি।"

"কবে যে শরীর ভাল থাকে, তা ত জানি না। ভাতারের শোকে মেয়ে যেন একেবারে গ'লে গ'লে পড়ছেন।"

দুয়ার খুলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহিণী কহিলেন, "ষাট্—ষাট্, ও কি কথা, বৌমা, এতে যে হিরণের অকল্যাণ হয়। তুমি বাছা বড্ড যা' তা' বলো।"

বারুদ স্তূপে অগ্নি প্রদান করিলে যেমন অগ্নিরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, বড়বধূও তদ্রূপ ক্রুদ্ধ হইয়া সগর্জ্জনে কহিলেন, "কি আর যা' তা' বলছি যে, সকালবেলায় ঝগড়া বাধাচ্ছ? আহ্লাদে মেয়ে আদরেতে চব্বিশঘণ্টা শুয়ে আছেন, তা লোকে একে শোক বলবে না ত কি বলবে? অত আদর শ্বশুরবাড়ী চলে, আমি এ অসইরণ সইতে পারি না।"

গৃহিণী কহিলেন, "শুয়েই যদি থাকে, তবে কাযগুলো কি ক'লে হয়? আর ননদকে এত আদর কয়েই বা ডাকতে এসেছ কেন?"

"গেরো, গেরো—এত বেলায় দুটো লোক না খেয়ে চ'লে গেল, তা' কেউ দেখলে না। আর যা'র বাড়ীতে থাকে, তা'র খোঁজটাও ত নিতে হয়।"

"না মা, এমন খোঁজ তুমি আর নিও না। আর ছেলেরা ওকে দেখে গেছে, ওরাই বারণ করেছে।"

"ওঃ, ভাই-সোহাগী, ভায়ের আদর আর ধরে না, আমার বাড়ী সব থাকে কেন? ঐ গুণের জন্যই ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, মেয়েটি যে অসাধারণ।"

ক্রমশঃ গুরুতর ঝগড়া বাধিবার উপক্রম দেখিয়া মণিকা মাতাকে শান্ত করিয়া কহিল, "আমি যাচ্ছি, বৌদি"—এই বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিতেই মাতা কহিলেন, "তুই যদি আজ উঠিস্, মনু, তবে তুই বাপের বেটী নোস। এত মন রাখা কিসের? এই গতর অন্য যায়গায় খাটালে মায়ে ঝিয়ের দিন খুব কেটে যাবে। ঝি এনেছেন, সে খাটুক না, তা নয়, তার শুদ্ধু কাঁড়ি যোগাতে যোগাতে মেয়েটা ম'রে গেল।"

বড়বধূ তীব্র গর্জ্জনে গৃহ কম্পিত করিয়া সচীৎকারে কহিলেন, "করতে হবে, যারা ঝিএর সেবা না করতে পারবে, তারা যেন না থাকে। ও কি ঝি? ও মা'র চেয়ে বেশী। ঝি ঝি করা কেন? ও কি কারও খায় পরে?"

আরও একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ছোটবধূ আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপা দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। ঝি তাড়াতাড়ি একখানা পাখা ও জলের ঘটী লইয়া আসিয়া মুখে চোখে জল দিতে দিতে বলিয়া উঠিল, "বাবা, কি ঘরেই বিয়ে দিছনু মেয়েটাকে, সবাই মিলে মেরে ফেল্লে গা।" সে দিন সকালে আর হাঁড়ি চাপিল না।

বৈকালবেলা ছোটবৌ রান্না চাপাইল। ঝিকে কায করিতে দেখিয়া সেই ক্রোধের ভরে সমস্ত দিন বড়বৌ বাড়ীতে কাক-চিল বসিতে দিলেন না।

সে দিন রাত্রির অন্ধকারে শয্যায় শয়ন করিয়া মণিকার অন্তর আজ পুরাতন স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কত দিন—কত দিন এই পরিচিত গৃহে সেই অনিন্দ্যসুন্দর, কান্তিপূর্ণ দেহ লইয়া সে ঐ অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ সে—কোথায়? ধরণীর কোন্ স্থানে লুকাইয়া আছে? সে দুর্ভেদ্য দুর্গে কি এতটুকুও ছিদ্র নাই, যাহাতে দুঃখিনী মণিকার বক্ষোভেদী ব্যাকুল আহ্বান তাহার প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে? প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া আর কত দিন—কত রাত্রি সেই অজানিত দেশে লুকাইয়া থাকিবে? সামান্য দিনের অদর্শন-ব্যাকুল ব্যথার ভয়ে সে যাহাকে পিতৃগৃহে আসিতে দিত না, আজ সেই গৃহে, সেই স্থানে, তাহাকে চিরনির্ব্বাসনদণ্ড দিতে মনে কি তোমার এতটুকুও ব্যথা লাগে নাই?

কত দিনই ত এমনই ঘটনা ঘটিয়াছে। সে দিন কেন এমন করিলেন? কলের কঠিন চাপে নিষ্পেষিত করিয়া ইক্ষুর রস বাহির করিয়া লইয়া পরে আবর্জ্জনা-বোধে ছালগুলিকে মানুষ পথের ধূলায় ফেলিয়া দেয়, তেমনই সর্ব্বস্বহীন করিয়া তোমার মণিকাকে এই নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিতৃগৃহে কি করিয়া আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া গেলে?

মণিকার অন্তরে বাহিরে যেমন বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল, তেমনই অবসর বুঝিয়া প্রকৃতিও তখন বাহিরে ভীষণ প্রলয়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু বাহিরের অবস্থা তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তাহার আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, ভয়শূন্য, সর্ব্বহারা মন আজ কোন্ অজানা দূর-দূরান্তরে কোন্ অসীমের পথে কাহার অন্বেষণে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঘটনার পরদিনই গৃহিণী নিজের হাতের রুলী দুইগাছি বিক্রয় করিয়া মণিকাকে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। বড়বধূর অসহ্য অত্যাচার আর বৃদ্ধবয়সে সহ্য করিতে পারিলেন না।

কাশী আসিয়া রুলী বিক্রয়ের টাকা কয়টিতে কিছু দিন কাটিয়া গেল। ক্রমেই টাকা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, মণিকা একটি রাঁধুনীর চাকরী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ মায়ে-ঝিয়ের আহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। গহনাও আর কিছু ছিল না যে, বিক্রয় করিবে। বাড়ীওয়ালী ঘন ঘন ভাড়ার তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিল। মণিকা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, কিন্তু কিছুই উপায় নাই। ভগবান্ যাহার'উপর বিরূপ হন, সে আশাতীতভাবে সমস্ত পাইলেও তাহার আশা পূর্ণ হয় কি? মণিকার অদৃষ্টেও তাহা হইয়াছিল, সুতরাং ভাবিবার তাহার কিছুই ছিল না। অদৃষ্ট-চক্রের কঠিন পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া ভাগ্যসূত্রের ঘোর পরিবর্ত্তনে সে আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এই ঝঞ্চা যে কবে কোন্‌খানে গিয়া নিবৃত্ত হইবে, তাহা কে জানে? এই নির্ব্বান্ধব শূন্য জীবনটাকে যে আরও কত দিন টানিয়া লইয়া বেড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

তিন দিন অনাহারের পর বাড়ীওয়ালীর নিশিদিন তাগাদার যন্ত্রণায় উপায়হীনা মণিকা গৃহে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে শিবমন্দিরে বসিয়া ছিল। এমন সময় একটি বিধবা মহিলা শিবের মাথায় জল দিতে আসিয়া একপার্শ্বে রোদনরতা মণিকাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা বাছা, তুমি অমন ক'রে একলাটি ব'সে কাঁদছ কেন, মা?"

মণিকা কিছু বলিতে পারিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে মহিলাটি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া একে একে তাহার সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া এবং সে ভদ্র কায়স্থের মেয়ে শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আমায় রেঁধে দেবে, মা? আমরা একখানা ঘর দেব, সেইখানে মায়ে ঝিয়ে থেকো।"

তিন দিনের পর বিশ্বনাথের কৃপায় তাহার জন্য ব্যথিতা এই করুণাময়ী বিধবার অযাচিত করুণায় মণিকা যেন কি হইয়া গেল। তাহার মুখ হইতে একটা কৃতজ্ঞতার বাণীও বাহির হইল না, সে কেবল মন্দিরতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে মণিকা অঞ্চল হইতে একটি সুদৃশ্য আংটী বাহির করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মা—এ যে আমার কি জিনিষ, তা আপনাকে বলতে পারবো না, এত দুর্দ্দশার মধ্যেও এটিকে আমি প্রাণ ধ'রে বিক্রী

করতে পারিনি। আজ আপনি এটি নিয়ে কিছু টাকা ধার দিন, পরে মাইনে থেকে কেটে নেবেন। টাকা না পেলে বাড়ীউলী ছাড়বে না, মা।"

বিধবা কহিলেন, "আচ্ছা মা, তুমি তবে সব গুছিয়ে রাখ, আমি গোপাল চাকরকে টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা তার সঙ্গে এখুনি কিন্তু যেও।"

বিধবা বাড়ী গিয়া অঙ্গুরীটি ভাসুরপুত্রকে দিয়া কিছু টাকা লইয়া চাকর দিয়া তাহাদের আনিতে পাঠাইলেন। যাঁহার বাড়ীতে মণিকা আশ্রয় লইল, তাঁহার নাম রণু বাবু, তিনি মস্ত কারবারী। গোধোলিয়ার নিকটে তাঁহার প্রাসাদসম বাটী। লোকজন কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই। দূর-সম্পর্কীয় এক খুড়ীমাকে আনিয়া তিনি সংসারে গৃহিণী করিয়া রাখিয়াছেন। রণু বাবু কাযকর্ম্মে এমনই বিব্রত যে, অধিকাংশ সময়ই তিনি বাহিরে কাটাইয়া থাকেন।

মণিকা ও তাহার মাতা প্রায় মাসাবধিকাল ইঁহাদের বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছে এবং মণিকা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে গৃহস্বামীর সংস্রব হইতে দূরে রাখে। সে বিধবার সেবা লইয়া সময় অতিবাহিত করে। বৃদ্ধা মাতা বাত-রোগে আক্রান্ত, অবসরসময়টুকু তাঁহার সেবায় কাটাইয়া দেয়। এমনই করিয়া তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

শ্রাবণের অপরাহ্ণে খুব বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, ঝুলন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোক ঘন মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া গিয়া ধরাবক্ষে ঘন মেঘের অন্ধকার আরও বাড়াইয়া তুলিল। খুড়ীমা'র অপরাহ্ণে খুব জ্বর আসিয়াছে, মাতা বাতে শয্যাগত, মণিকা আজ একাকিনী খুড়ীমা'র শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কতই ভাবিতেছিল। চাকরেরা সব ঝুলনের মহোৎসবের জন্য বাবুর নিকট ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এত বড় বাড়ীতে আজ সেই কেবল একা পাহারা দিতেছে। বাবু তখনও বাড়ী ফিরেন নাই। মণিকা ভাবিতেছিল, খুড়ীমা'র অসুখ, সে আজ কি করিয়া সকল জিনিষ বাবুকে গুছাইয়া দিবে? সে কোনও দিন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। পরপুরুষের সম্মুখে সে কেমন করিয়া আহার্য্যের থালা সাজাইয়া উপস্থিত হইবে? তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খুড়ীমা ভাল থাকিতে তাহাকে কোনও দিন বাবুর সান্নিধ্যেও আসিতে হয় নাই; কিন্তু আজ—? সে যখন নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া একাগ্রচিত্তে বিশ্বনাথকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেছিল, তখন বহির্দ্দেশে দ্বারের শব্দ শুনিয়া সে চমকিত হইয়া কম্পিত পদে বাহিরে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

অন্দরের পথে পা দিয়া রণু বাবু বলিলেন, "আ—প—তুমি যে?" পুরুষকণ্ঠে ভদ্র নারীকে অভদ্র ভাষায় তুমি উচ্চারণে মণিকা অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনই মনের অন্তরালে ধ্বনিত হইল—সে যে—দাসী—ইহার অপেক্ষা তাহার আর কিছু প্রাপ্য সম্বোধনের দাবী আছে কি? নিমকভোজীর অত অহঙ্কার কে সহ্য করিবে? দয়া-শ্রদ্ধায় সে যে, ইহাদের নিকট অসীম ঋণবদ্ধা, আর সে হেয় ঘৃণিত নামধেয় পরিচারিকা মাত্র।—কিন্তু তবু—তবু—তাহার হৃদয়াভ্যন্তর হইতে শুধু উচ্চারিত হইল, "দয়াময়"—

বাবু উপরে চলিয়া গেলে সে দ্বার বন্ধ করিয়া খাবারগুলি থালে গুছাইয়া রাখিল। লুচি করিয়া মণিকা ভয়চকিত ত্রস্তপদে কম্পিতবক্ষে গৃহস্বামীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আহারাদি সারিয়া গৃহস্বামী কহিলেন, "খুড়ীমা কোথায়?—ওঃ, তুমি আবার কথা বলবে না, চাকরগুলো ত আজ নেই। আমি শুয়ে পড়েছি, বড্ড ঝাঁট আসছে, খড়খড়ীগুলো বন্ধ ক'রে দাও।"

মণিকার অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল। গৃহস্বামীর এইরূপ ব্যবহার তাহার মনে অস্বাচ্ছন্দ্যের ছায়া ঘনাইয়া তুলিল। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যপালনের জন্য সে দৃঢ়পদে খড়খড়ীগুলি বন্ধ করিয়া দিতে গেল। কায সারিয়া যেমন বাহির হইতে যাইবে, অমনই বাতির আলোক নির্ব্বাপিত হইল, গৃহ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, মণিকা আর্ত্তনাদ করিয়া যেমন দ্বারপথে ছুটিয়া যাইবে, অমনই দুইখানি বলিষ্ঠ বাহু দিয়া গৃহস্বামী তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে

কহিল, "অপরাধ করেছি, মনু, আমায় ক্ষমা করো। তোমার আংটীই আমায় সব ফিরিয়ে দিয়েছে। খুড়ীমাকে ব'লেই আমি এই অভিনয়ের আয়োজন করেছি। তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমায় মাপ করো—তোমার উপর রাগ ক'রে দেশত্যাগী হইনি, এ কথা বিশ্বাস কর—তবে আমি কি রকম অভিমানী, জানতে ত? বড় দুঃখ হয়েছিল তোমার অবাধ্যতায়। আর—বাবা অনেক দেনা ক'রে গেছলেন, পাওনাদারের জ্বালায় নাম গোপন ক'রে আমি বিদেশে এসে পয়সা পেয়েছি, বাবাকে ঋণমুক্ত করেছি। কিন্তু দেশে গিয়ে যখন শুনলুম, তুমি নাই—তখন—মণিকা—মনু—আমি"—বেদনায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মণিকার সংশয়পূর্ণ বক্ষঃপঞ্জর তখনও দুরু দুরু কম্পিত হইতেছিল, চক্ষুর স্পন্দন স্থির হইয়া যাইতেছিল, রসনা জড়তায় অবশ হইতেছিল, পদদ্বয় ধরণীতে স্থির হইতেছিল না, সে যেন আত্মবিস্মৃতা; এমন সময় হিরণ পুনরায় বাতি জ্বালিয়া দিল, ক্ষণিকের জন্য বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে মণিকা নয়ন তুলিতেই তাহার তুষার-শীতল অবশ দেহ হিরণের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

সাগর সঙ্গীত

অভাগিনী! নিশেষে চল
[illegible]
[illegible]
নিশেষে চল।
[illegible]
অভাগিনী! নিশেষে চল

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
অভাগিনী অভাগিনী! নিশেষে চল।

চিত্তরঞ্জন দাশ

গোঁসাইদাস

গোঁসাইদাস নিজেকে যত ভালবাসিত, এত আর কিছুই ভালবাসিত না। তাহার নিজের মনে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে বড়ই প্রেমিক। প্রেমের জন্য তাহাকে অনেকবার অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত প্রেমিকের মত সে কখনই অযাচিতভাবে প্রেম-বিতরণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহার প্রেম উদারনৈতিক বিশ্বপ্রেম বলিলেও চলে, কারণ, ভাল সন্দেশ, বড় মাছ, উত্তম দধি হইতে সুন্দরী নারী পর্য্যন্ত তাহার প্রেমকণা বিতরণে কেহই বাদ পড়িত না। নিমন্ত্রণের সময় গোঁসাইদাস বসিলে অপর সকলে ভীষণ আপত্তি করিত, কারণ, তাহাদের ধারণা যে, গোঁসাই একাই সমস্ত খাইবে। শান্তিপুরের রাসের মেলা দেখিতে তাহার সঙ্গে কেহ যাইতে চাহিত না, কারণ, গোঁসাইদাস একাই আসর জমাইয়া থাকে, আর "কেহ" তাহাদিগের দিকে চাহে না। সম্প্রতি গোঁসাইদাসের মনের বিকার জন্মিয়াছে এবং সে নিমন্ত্রণ, সখের যাত্রা বা থিয়েটার এবং মেলাদর্শন পরিত্যাগ করিয়াছে।

বৈশাখ মাস। কাঠফাটা রৌদ্র, সমস্ত দিন ভীষণ গরম গিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা গোঁসাইদাসের সদরের পুষ্করিণীতে একসঙ্গে তিনখানা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। দুরন্ত আলস্যের বশীভূত হইয়া গোঁসাইদাস তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিতেছিল না। এমন সময় পথ দিয়া একটি নর ও একটি নারীর আবির্ভাব হওয়ায় আকস্মিক প্রেমের উত্তেজনায় গোঁসাইদাস সহসা উঠিয়া বসিল। নরটি বৈদ্যপাড়ার হেমেন্দ্র রায়। সে কলিকাতার বাবু বলিয়া গোঁসাইদাস তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ অনেক; প্রথম গোঁসাইদাস জামকালো, হেমেন্দ্র ফর্সা, দ্বিতীয় গোঁসাইদাসের মাথায় টাক, হেমেন্দ্রর চুল কোঁকড়া, তৃতীয় গোঁসাইদাস মাইনার স্কুলের ৩য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং হেমেন্দ্র কলেজে পড়ে। অবশিষ্ট কারণগুলা প্রকাশ করা চলিবে না। এ হেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে গোঁসাইদাস ডাকিল, কেবল তাহার সঙ্গিনীর খাতিরে।

হেমেন্দ্রর সঙ্গিনী বিধবা, কাপড়খানা ধপ্‌ধপে সাদা, সুতরাং সম্ভবতঃ পল্লীবাসিনী নহেন, গায়ের রংটা খুবই ফর্সা, সুতরাং গোঁসাইদাসের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের ঘন আন্দোলনে জীবনের পিচ্ছিল পথে তাহার পদস্খলন হইল। গোঁসাইদাস হাঁকিল, "হেমেন যে? কবে এলে?" হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে যাইতেই বলিল, "এই-মাত্র আস্‌ছি।"

"দাঁড়াও না হে, অনেক কথা আছে।"

হেমেন্দ্র অগত্যা দাঁড়াইল, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গিনীকেও দাঁড়াইতে হইল। গোঁসাইদাস চরিতার্থ হইয়া গেল, কারণ, সে তাহাই চাহিতেছিল। গোঁসাইদাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভিতরে এস না, রদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ঠাকুরুণের যে কষ্ট হচ্ছে।" অভ্যাসবশতঃ গোঁসাইদাস মহিলাটিকে 'মাঠাকুরুণ' বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বহু-কষ্টে সাম্‌লাইয়া লইল। হেমেন্দ্র চটিল, কিন্তু উপায় না পাইয়া গোঁসাইদাসের ঘরের ভিতরে আসিল। গোঁসাইদাস হেমেন্দ্রকে বসাইয়া তাহার সঙ্গিনীর জন্য একখানা আসন আনিয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ না করিয়া দূরে মাটীর উপরই বসিয়া পড়িলেন। অন্য কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া গোঁসাইদাস পল্লীগ্রামের সাধারণ প্রশ্নগুলি আরম্ভ করিয়া ফেলিল, যথা—কোন্ থিয়েটারে কোন্ নাটকের অভিনয় হইতেছে, নাচ-গান কোথায় জমে ভাল এবং দানিবাবু বৃদ্ধবয়সে পূর্ব্বের মত ভাল অভিনয় করিতে পারেন কি না? পাঁচ সাত মিনিট গোঁসাইদাসের এই ভীষণ শিষ্টাচারে বিষম পরিতুষ্ট হইয়া হেমেন্দ্র বলিল, "গোঁসাইদা, তবে আসি?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। গোঁসাইদাস বুঝিল যে, মস্ত একটা চালের ভুল হইয়া গেল। সে তখন একটা নূতন কলিকায় আগুন দিয়া নূতন চাল স্থির করিতে বসিল।

সন্ধ্যাবেলা হইতে গোঁসাইদাস এমন ছায়ার মত হেমেন্দ্রর পিছনে লাগিয়া গেল যে, সে বেচারা অস্থির হইয়া উঠিল। গোঁসাই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শেষ

রাত্রিতে হুঁকাটি হাতে করিয়া হেমেন্দ্রর বাড়ীর দুয়ারে গিয়া বসিত, কোন দিন হেমেন্দ্রর মা'কে "আজ চারটি পেসাদ পাব, মা!" বলিয়া চরিতার্থ করিয়া দিত এবং কোন দিন বা ভীত শৃগালের মত ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়া দুটি অন্ন নাকে মুখে গুঁজিয়া যাইত। গোঁসাইদাসকে যাহারা ভাল রকম চিনিত, তাহারা গোঁসাইদাসের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য না হইয়া বলিল, "গুঁসো বেটা কোন ফেরেব্বাজির মতলবে আছে।" কিন্তু তাহাদের নির্দ্ধারণটা ভুল হইয়াছিল, কারণ, শ্রীযুত গোস্বামিচরণ নিষ্কাম-প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়াই হেমেন্দ্রর সঙ্গিনীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে হেমেন্দ্রর সেবা করিয়াও গোঁসাইদাস যখন তাহার সঙ্গিনীর সহিত কথা কহিতে পাইল না, তখন সে একটু দমিয়া গেল। ইত্যবসরে নবদ্বীপচন্দ্র তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, কারণ, সে শুনিল যে, হেমেন্দ্র কলিকাতায় যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন স্পন্দনে গোঁসাইদাসের প্রেমপ্রবণ হৃদয় সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সে আনন্দে এক কলসী ঘামিয়া উঠিল। হেমেন্দ্রর সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইল, তখন সে তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "হিমু ভাই, আমি তোর সঙ্গে কলকাতা যাব!" সুসংবাদ শুনিয়া হেমেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল।

গোঁসাইদাসের সঙ্গে কলিকাতা যাওয়া তাহার প্রতিবাসীদের পক্ষে জীবনের বন্ধুর পথে একটি ভীষণ পরীক্ষা হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ,—প্রথম দফা, গোঁসাইদাস ময়রার দোকান দেখিলেই খাইতে চাহিত, খাবার খাইয়া পথে দাঁড়াইয়া দামের জন্ম প্রত্যেকবারে দশ পনের মিনিট তর্ক করিত। দ্বিতীয় দফা, মণিহারী অথবা বড় কাপড়ের দোকান দেখিলেই সে দশ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জিনিষ দেখিত এবং অবশেষে কিছু খরিদ না করিয়াই চলিয়া যাইত। হেমেন্দ্র একবার তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক বিলাতী দোকানে বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। মন খুব কঠিন করিয়াও গোঁসাইদাস সাদা 'সাহেবের' মিনতি ও উপরোধ এড়াইতে পারে নাই, সুতরাং তাহাকে পনের টাকা মূল্যের একটি হ্যাট্, মেমসাহেবদের একটি ছাতা ও মুখে মাখিবার রং এক কৌটা কিনিব বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হেমেন্দ্রর আপত্তি সত্ত্বেও গোঁসাই গৌরাঙ্গ দোকানদারের অর্দ্ধগৌরাঙ্গী সহকারিণীর উপরোধ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। অর্দ্ধগৌরাঙ্গী যখন জিনিষের ফর্দ্দ লইয়া আসিল, তখন হেমেন্দ্র দেখিয়াছিল যে, গোঁসাইদাস সরিয়া পড়িয়াছে। অগত্যা হেমেন্দ্রকে নিজের পয়সা খরচ করিয়া এই অনাবশ্যক জিনিষগুলা খরিদ করিতে হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়াও সে জিনিষগুলা গোঁসাইদাসের ঘাড়ে চাপাইতে পারে নাই, কারণ, গোঁসাইদাস হিসাব করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ট্রামের পয়সা ও রিটার্ণ টিকিট ছাড়া তাহার নিকটে মোট সওয়া সাত আনা পয়সা আছে। তৃতীয় দফা, কলিকাতায় পথ চলিতে চলিতে গোঁসাইদাস সাধারণতঃ তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন দুইটি দ্বিতল ও ত্রিতলের বাতায়নপথে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, সুতরাং ট্রামের ও টেলিগ্রামের পোষ্ট, নর ও গোজাতীয় ষণ্ড ইত্যাদি বহু বাহু প্রসারণ করিয়া তাহাকে সদাই আলিঙ্গন করিতে আসিত; সুতরাং তাহার সঙ্গের লোককে বিপদে পড়িতে হইত। সহসা দ্বিতল বা ত্রিতলের বাতায়নপথে কোন অবরোধবর্ত্তিনী মহিলার আবির্ভাব হইলে গোঁসাইদাস সেই বাড়ীটির সম্মুখে উর্দ্ধনেত্রে বিরূপাক্ষের কৃষ্ণমর্ম্মরের প্রতিমার মত এমন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত যে, তাহার সঙ্গীকে বাড়ীর এবং পাড়ার লোকের তীব্র শ্লেষের চোটে ও দৈনিক প্রেমালাপের ভয়ে গোঁসাইদাসের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে "যঃ পলায়তি স জীবতি" পন্থার অনুসরণ করিতে হইত।

এ হেন গোঁসাইদাস যখন হেমেন্দ্রর সহিত আবার কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল, তখন সে বেচারার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। গোঁসাইদাস কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল, "হিমু ভাই, এবার আমি কোন অন্যায় কায করবো না, একেবারে পাকা কল্‌কাতার বাবু হয়ে যাব। দেখবি যে, গোঁসাইদার মত হালফ্যাসানের লোক খুব কমই আছে।" গোঁসাইদাস যাহা বলিল, তাহাই করিল। সে সেই দিন হইতেই ভোল ফিরাইয়া ফেলিল। জ্যৈষ্ঠের কাঁঠালপাকা গরমেও সে গামছার পরিবর্ত্তে কোঁচান কাপড় এবং সঙ্গে সঙ্গে গেঞ্জি ও জামা পরিতে আরম্ভ করিল। ঘামাচিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল এবং নিত্য জামা বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে

তাহার পুঁজি ফুরাইয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া হেমেন্দ্র বলিল, "গোঁসাইদা, এগুলো এখন থেকে আরম্ভ করলে কেন?" গোঁসাইদাস হাসিয়া বলিল, "সইয়ে নিচ্ছি ভাই, কোন কালে জামা গায়ে দেওয়া অভ্যাস নেই ত।"

ক্রমে শুভদিন আসিল, হেমেন্দ্র তাহার সঙ্গিনী ও গোঁসাইদাসকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। টিনের প্যাঁট্‌রা ও কাপড়ের বোঁচকা পরিত্যাগ করিয়া গোঁসাই-দাস যখন বিলাতী চামড়ার সুট কেশ হাতে করিয়া এবং ফিট বাবু সাজিয়া পথে বাহির হইল, তখন তাহার দুই চারি জন প্রতিবেশী ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে আরম্ভ করিল। ষ্টেশনের কাছে আসিয়া একটা পুরাতন কথা স্মরণ হওয়ায় হেমেন্দ্রর মুখ আবার শুকাইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "গোঁসাইদা, তোমায় আর টিকিট কিন্‌তে হবে না।" বহুদর্শনের ফলস্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া গোঁসাইদাস বলিল, "হিমু, ভয় পাচ্ছিস বুঝি? এবার আর সস্তায় রিটার্ণ টিকিট কিনব না।" পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবার সময় গোঁসাইদাস রেলের টিকিট-কলেক্টর ও ফ্লাইং চেকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দশ আনার পরিবর্ত্তে চারি আনায় কলিকাতা যাইত, কেবল ফিরিবার সময় ম্লানমুখে নগদ দশ আনা বাহির করিত। এতক্ষণ গোঁসাইদাস হেমেন্দ্রর সঙ্গিনীর পিছনে পিছনে আসিতেছিল। ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া সে দ্রুতপদে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে টিকিটঘরে ছুটিয়া গিয়া একসঙ্গে তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কিনিয়া ফেলিল, হেমেন্দ্র তাহা দেখিয়া ভীষণ ভয়ে ও দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নিকটের একখানা বেঞ্চির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল।

গাড়ী ছাড়িলে গোঁসাইদাসের ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে দেখিয়া, হেমেন্দ্র তাহার সঙ্গিনীকে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি, আমি তোমাকে তোমাদের বাড়ীর দুয়ারে নামিয়ে দিয়ে গোঁসাইদাকে নিয়ে একটা মেসে চ'লে যাব।" দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? তোর সঙ্গে যাচ্ছে, আমাদের বাড়ীতেই থাকবে।" হেমেন্দ্র লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "ও এক রকমের মানুষ, দিদি, কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, তখন লজ্জায় তোমাদের বাড়ী থেকে পালাতে পথ পাব না।" দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নেই, ভাই; আমি তোমার গোঁসাইদাকে টিট ক'রে রাখবো।"

কলিকাতায় আসিয়া, ট্রেণ হইতে নামিয়াই গোঁসাইদাস একখানা ট্যাক্সি লইয়া আসিল এবং হেমেন্দ্রর সহিত তাহার দিদির বাড়ীতে গিয়া উঠিল। দিদি গোঁসাইদাসকে তাহার মামার বাড়ীর লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া যখন একেবারে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন, তখন সে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার শুভ্র দশনপংক্তি আবৃত রাখিতে পারিল না। এইবার গোঁসাইদাসের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বিকালবেলা একখানা বড় 'মোটর বাস' আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল, গোঁসাইদাস পূর্ব্বের অভ্যাসমত ছুটিয়া দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু হেমেন্দ্রর দিকে একবার চাহিয়া নিজের চিত্তচাঞ্চল্য সংবরণ করিল। 'বাস' হইতে তিনটি যুবতী ও কিশোরী যখন নামিয়া উপরে উঠিল, তখন গোঁসাইদাসের চোখ দুইটি তাহার অন্তরের অসংখ্য কশাঘাত সহ্য করিয়াও তাহাদিগের দিক্ হইতে ফিরিতে চাহিল না। মেয়েগুলি যখন হেমেন্দ্রর দিদিকে "কাকীমা কাকীমা" বলিয়া জড়াইয়া ধরিল, তখন গোঁসাইদাসের মনে একটু ভয় হইল। সে মনে করিল, "ব্রাহ্ম-বাড়ী না কি? দক্ষিণপাড়ার পাঁচু চাটুর্য্যে জানতে পারলে একঘরে করবে না ত? হেমেন্দ্র আছে বটে, কিন্তু গ্রামে প্রচার যে, সে মুরগী খায়, সেই জন্য গাঙ্গুলীবাড়ীর লোক পূজার সময়ে তা'কে দালানে উঠতে দেয় না।" এই সময়ে হেমেন্দ্রর দিদি মাথার কাপড় খুলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "গোঁসাই, চা খাবে এস!" মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিতে উঠিতে গোঁসাইদাস ভাবিল, রাবণ যে স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিল, তাহার আর বিশেষ আবশ্যক নাই। চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়া বেচারা গোঁসাইদাস অবাক্ হইয়া গেল। বড় একটা ঘরের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড গোল টেবল, তাহার চারিপার্শ্বে চৌদ্দ পনেরখানা চেয়ার। বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলেই সেখানে উপস্থিত এবং চায়ের সঙ্গে খাবারেরও কিছু অভাব ছিল না।

তখন হইতেই গোঁসাইদাস কিন্তু বিপদে পড়িল।

বড় রসগোল্লার রস মুখ হইতে জামার উপর গড়াইয়া পড়ায় সে একটু জল চাহিল। বেহারা একটা চীনা-মাটীর রেকাবের উপরে কাচের বাটিতে জল আনিয়া দিল। গোঁসাইদাস বহুকষ্টে পাঞ্জাবী জামার সেই অংশটি সেই বাটিতে ধুইল এবং ন্যাপকিন উপেক্ষা করিয়া কোঁচার খুঁটে হাত মুছিল। সেই সময়ে হেমেন্দ্র তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য আস্তে একটা চিম্‌টী কাটিল, গোঁসাই তাহার মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এই চায়ের সময় হইতে গোঁসাই একটা ধাঁধায় পড়িয়া গেল। যে সংসারে সে আসিয়াছিল, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেশে হেমেন্দ্ররা হিন্দু, তাহাদিগের বাড়ীতে দশকর্ম্মের অনুষ্ঠান আছে; কিন্তু কলিকাতায় তাহার ভগিনীর বাড়ী ব্রাহ্ম অথবা খৃষ্টানী-ভাবে পরিপূর্ণ। হেমেন্দ্রর দিদি বিধবা, থান পরেন, পূজা করেন, নিজের হাতে রাঁধিয়া খান অথচ জামা পরেন, মুসলমানের তৈয়ারী পাঁউরুটী স্পর্শ করেন এবং দেবর ও ছেলে-মেয়েদের খাইবার সময় পরিবেশন করেন। অনেক গভীর গবেষণার পরে গোঁসাই স্থির করিল যে, এই দিদি মাগীটা গভীর জলের মাছ। সে কেবল হেমেনের জাতি বাঁচাইবার জন্য লোক দেখাইয়া ঘণ্টা বাজায়। আর একটা ঘোরতর ধাঁধা গোঁসাইদাসকে অস্থির করিয়া তুলিল; বাড়ীর সকল মেয়েই তাহার সম্মুখে বাহির হয়. সকলেই তাহাকে পরম আত্মীয় বিবেচনা করে এবং পল্লীগ্রামে ভদ্রমহিলারা যে পরিমাণ সঙ্কোচ দেখান, ইহারা তাহার কিছুই দেখায় না। গোঁসাইদাস এই ভাবেরও অর্থ কিছু বুঝিতে পারিল না। গ্রাম হইতে ব্রাহ্মসমাজের ও হালফ্যাসানের আলোকপ্রাপ্ত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে বিবরণ সে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত এই সংসারের মেয়েদের কিছুই মিলিল না। দুই নম্বর ধাঁধায় গোঁসাইদাসের অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল। অনেক কাপড়-জামা কিনিতে হইল। কারণ, কলিকাতার ধোপা সচরাচর পনের কুড়ি দিনের কমে কাপড় দেয় না। কলিকাতার দ্রষ্টব্য পদার্থ যাহা—যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান, পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি স্থান বহুবার দেখা সত্ত্বেও গোঁসাই দিদির সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ করিতে আরম্ভ করিল। হেমেন্দ্র ক্রমশঃ গোঁসাইদাসের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু দিদির ভয়ে সে কিছু বলিতে পারিত না। দুই চারি দিন এড়াইয়া দিদি এক দিন এক এক স্থানে যাইতে রাজি হইতেন। সেই দিন গোঁসাই-দাসের পনের কুড়ি টাকা খরচ হইয়া যাইত। কারণ, দিদি সমস্ত মেয়েগুলি এবং হেমেন্দ্রকে লইয়া যাইতেন, দুইখানা গাড়ীর কমে সকল লোক ধরিত না এবং পথে চা, জলখাবার, সোডা, লেমনেড বাবদে কিছু ব্যয় হইত। গোঁসাইদাস যখন এক একটি টাকা বাহির করিত, তখন তাহার মনে হইত যে,সে তাহার হৃৎপিণ্ডের এক একটি টুক্‌রা কাটিয়া দিতেছে। টাকাটি দিয়াই সে যখন হেমেন্দ্র ও তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিত, তখনই সে বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে একটা গভীর অর্থ লুকাইয়া আছে।

দশ পনের দিন কাটিয়া গেলেও গোঁসাইদাস যখন দেশে ফিরিবার নাম করিল না, তখন হেমেন্দ্র বিপদে পড়িল। দিদি এবং তাঁহার দেবর হেমেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে দিতেন না। বাড়ীর মেয়ে কয়টি গোঁসাই-দাসের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার জন্য গোঁসাইদাস মাঝে মাঝে একটু জয়গর্ব্ব অনুভব করিত। মেয়েরা তাহাকে মাঝে মাঝে ক্ষেপাইত; কিন্তু তাহাতে গোঁসাইদাস চটিত না। কেবল মাঝে মাঝে সে যখন একা বসিয়া টাকার হিসাব করিত, তখনই তাহার গোল, কামান মুখখানা লম্বা হইয়া যাইত।

গোঁসাইয়ের অনেকগুলি মুদ্রা-দোষ জন্মিয়া গিয়াছিল। প্রথম দফা গামছা; পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিয়া, কাঁধে কোঁচান চাদর ফেলিয়া গোঁসাইদাস তাহার লাল রঙ্গের ভিজা গামছাখানি লইতে ভুলিত না। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "গামছার মত আরামের জিনিষ বাঙ্গালাদেশে আর নাই।" মেয়েরা অমৃতলাল বাবুর 'কৃপণের ধন' হইতে তাহাকে শুনাইয়া দিত, "কাছাকে কাছা, কাছা দু'গুণে গামছা, গামছা দু'গুণে উড়ুনী আর উড়ুনী দেড়ে ধুতি।" দ্বিতীয় দফা কুলকুচা, চায়ের পরে হাত ধুইবার কাচের বাটি চাহিয়া সে তাহাতেই কুলকুচা করিয়া ফেলিত, চিলিমচি আনিয়া দিলেও তাহা ব্যবহার

তন্ময়

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ

করিত না। হেমেন্দ্র তাহাকে চিমটী কাটিয়া কাটিয়া অবশেষে হার মানিয়াছিল। শেষে গোঁসাই দেখিল, সে একটা কাচের বাটি নিত্য তাহার সম্মুখে আনে; তথাপি সে তাহার মুদ্রাদোষ ছাড়িতে পারিল না। তৃতীয় দফা, পানের পিক; গোঁসাইদাস অনেক পান খাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে দোক্তা, জর্দ্দা বা সুর্ত্তী একটা না হইলে তাহার চলিত না। দোক্তা মুখে দিয়াই সে জানালা দিয়া পানের পিক ফেলিত এবং এক দিন তাহা পথের এক ভদ্রলোকের গায়ে পড়ায় সে বিষম বিপদে পড়িয়াছিল। তাহার জন্য একটা বড় পিকদানী বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহা প্রায়ই ব্যবহার করিতে ভুলিয়া যাইত।

এক বিষয়ে দিদি ও তাঁহার দেবর গোঁসাইদাসের অনুরোধ শুনিতেন না। সেটা থিয়েটার দেখা। তাঁহারা গোঁসাইকে একা থিয়েটারে যাইতে বলিতেন; কিন্তু একা যাওয়াটা গোঁসাইদাসের মনঃপূত হইত না। কারণ, সে বহুবার একা কলিকাতা আসিয়াছে এবং প্রত্যেকবারে দুই চারি দিন করিয়া থিয়েটার দেখিয়াছে। দিদিকে কোন প্রকারে থিয়েটারে লইয়া যাইতে না পারিয়া গোঁসাইদাস এক নূতন মতলব আঁটিল। বাড়ীর লোক ব্রাহ্ম কি না, তাহা স্থির করিয়া জানিবার জন্য গোঁসাইদাস এক দিন দিদির নিকটে ব্রাহ্মসমাজে যাইবার প্রস্তাব করিল। দিদি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে কি করব, ভাই? তুমি হেমকে নিয়ে যাও।"

ইদানীং গোঁসাইদার সঙ্গে কোথাও যাইতে হইলে হেমেন্দ্রর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আসছে সোমবার আমার একজামিন, দিদি, আমি কোথাও যেতে পারবো না।" কিন্তু হেমেন্দ্রর ভাগিনেয়ীরা আসিয়া গোঁসাইদাসের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারা বলিল যে, তাহাদের সহপাঠিনীরা অনেকেই সমাজে যায় এবং সেখানে অতি সুন্দর গান হয়। তাহাদের অনুরোধে পড়িয়া দিদি অগত্যা রবিবারের দিন ব্রাহ্মসমাজে যাইতে রাজী হইলেন। গোঁসাইদাস কোনমতেই মনের আনন্দ গোপন করিতে পারিল না। কারণ, তাহার হৃদয় তখন কলিকাতার সমতল ভূমি হইতে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত লম্ফপ্রদান করিতেছিল।

রবিবারের দিন যথাসময়ে গাড়ী আসিল, মেয়েদের লইয়া গোঁসাইদাস ব্রাহ্মসমাজে চলিল। হেমেন্দ্র কোনমতেই তাহাদের সঙ্গে গেল না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াই গোঁসাইএর মুখ শুকাইয়া গেল। কারণ, সে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, মেয়েদের সঙ্গে এক যায়গায় বসিবে। মেয়েরা যখন উপরে চলিয়া গেলেন, তখন সে হতভম্ব হইয়া সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর গান হইতেছিল, তাহা গোঁসাইয়ের ভাল লাগিল না। তখন গাড়ীভাড়ায় নগদ আড়াই টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে এবং ফিরিবার সময় আরও তিন টাকা লাগিবে। গোঁসাই পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত চারিদিকে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা তাহার পক্ষাঘাত জন্মিল, সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া—গোঁসাইদাস সে দিন সাদা পাঞ্জাবীর ভিতরে লাল রঙ্গের রেশমের গেঞ্জিটা পরিয়া আসে নাই বলিয়া মনে মনে মাথা কুটিতে লাগিল। পকেট হইতে ফিরোজা রঙ্গের রুমালখানা বাহির করিয়া স্থানাভাবে তাহা পাঞ্জাবীর বুকে ঘড়ীর পকেটে গুঁজিল। তাহার পাশে এক দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিলেন, গোঁসাই দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "মশাই—মশাই, ঐ যে দেখছেন—ঐ যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে—" হেমেন্দ্রর নিষেধ সত্ত্বেও আসিবার সময় গোঁসাই তাহার নূতন রঙ্গিন রেশমী রুমালখানায় প্রচুর পরিমাণে বিলাতী সুগন্ধ লাগাইয়া আসিয়াছিল এবং তাহার তীব্র গন্ধ অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধকে ত্যক্ত করিতেছিল। তিনি গোঁসাইদাসের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?" গোঁসাইদাস তখন জ্ঞানশূন্য, সে হিতাহিতবিবেচনা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "মশাই, ঐ মেয়েটির ঠিকানা জানেন?"

বৃদ্ধ একবার গোঁসাইদাসের তৈলনিষিক্ত সুচিক্কণ টাক হইতে তাহার পদযুগলের নব-নাগরা পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি হে? তুমি এখানে কি করতে এসেছ?"

"গোঁসাইদাস বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টিতে জড়সড় হইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম গোঁসাইদাস হাজরা, নিবাস সাতবেড়ে,. দিদির সঙ্গে সমাজে গান শুনতে এসেছি।"

উপাসনা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, বৃদ্ধের আদেশে দুই তিন জন ছোকরা গোঁসাইদাসকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্রর দিদি নীচে নামিয়া গোঁসাইদাসকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার দেবরপুত্রীরা তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গে গোঁসাই মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া তাহার অবস্থার কথা জানিতে পারিল এবং কোনমতে তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া চলিল।

গভীর রাত্রিতে গোঁসাইদাস জমা-খরচ বাহির করিয়া দেখিল যে, তখনও পর্য্যন্ত ৩৭১৷৷৵১৭৷৷ খরচ হইয়াছে। সে দিদিকে ঘোষপাড়ার মেলায় লইয়া যাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া অতি প্রত্যুষে সকলে উঠিবার পূর্ব্বে কলিকাতা পরিত্যাগ করিল।

তদবধি গোঁসাইদাসের ঘোরতর চিত্তবিকার উপস্থিত।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরতে

বারিধারা মাঝে মাঝে রোদ্ হাসে আজ।
বিহগ কুহরি ওঠে কাননের মাঝ।
পূরবে সোনার থাল,
ভোরের আকাশ লাল;
ফুলে ফুলে বন-রাণী ধরে নব সাজ!

শেফালিকা-সুরভিত—সুশীতল বায়—
মনের দুয়ারে আজ ডাক দিয়া যায়;
মধুকর-গুঞ্জনে—
লতিকার শিহরণে,
নিথর হিয়ারে মোর পুলকে কাঁপায়।

ঘন বনে মাতোয়ারা শ্যামা দধিয়াল,
আকাশ কাঁপায়ে চলে সুর সুরসাল।
সবুজ মাঠের পরে—
সে সুর-নির্ঝর ঝরে,
ধান্যের মর্ম্মররব দেয় তা'তে তাল।

সবুজ দূর্ব্বার দলে হইয়াছে ঢাকা—
গ্রামে যাইবার সেই মেঠো পথ বাঁকা,
শত সরসীর জল—
আলো করে শতদল,
পবন বহিছে অঙ্গে ফুল-গন্ধ-মাখা।

রামধনু-রঙ ফোটে আকাশের গায়,—
ধরণী নবীন রাগে আগমনী গায়।
আইল শরৎ রাণী—
চড়ি মেঘ-রথখানি,
প্রকৃতি আসন তাঁর যতনে সাজায়।

কুটীরে কুটীরে বেজে ওঠে শুভ শাঁক।
গগনের কোলে কোলে ফিরে তার ডাক।
ফুটে ওঠে শত কলি—
ছুটে বনে যত অলি,
হিয়ার কাননে ফুল ফোটে লাখ লাখ!

অন্তর আমার দুটি গীতি-কলিকায়—
মালাগাছি গেঁথে রাঙা-পায়ে দিতে চায়,
ভাঙা বাঁশী ছিল পড়ি—
ওঠে আজ সুরে ভরি—
গদগদ আবাহন-গীতি-নাদ তায়!

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
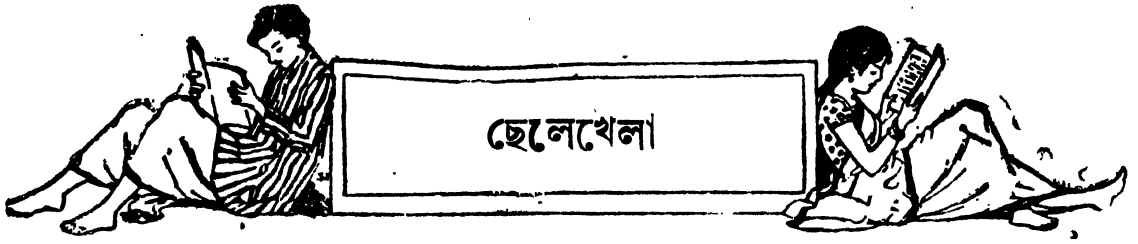
১

"ঠাকুর গড়তে মিস্ত্রী কবে আসবে, বাবা?"

সে বৎসর আশ্বিনের প্রথমেই পূজা, সুতরাং আশ্বিন-মাস পড়িতে না পড়িতেই চারিদিকে পূজার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামে জমীদার বিশ্বাস বাবুদের বাড়ীতে নবমীর বোধন বসিয়াছিল। সেখান হইতে সকালে সন্ধ্যায় নহবতের মধুর আলাপ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে আনন্দময়ীর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। পাওনাদাররা পূজার কিস্তির দোহাই দিয়া সকাল সকাল পাওনা আদায় করিতে পারিবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, আর দেনদাররা এত শীঘ্র আনন্দময়ীর আগমনে অন্তরে অন্তরে নিরানন্দ ও দুশ্চিন্তার যাতনা ভোগ করিতেছিল। রাঘব হাজরার বাড়ীতে প্রতিমার গায়ে রঙ মাখান দেখিবার জন্য গ্রামের যত ছেলেমেয়ে হর্ষকোলাহলে পথ মুখরিত করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল, এবং যাইতে যাইতে হরিশ মিত্তিরের বাড়ীতে কাঠামোর গায়ে মাটী দিতে মিস্ত্রী আসিয়াছে কি না, উঁকি দিয়া তাহাই দেখিয়া যাইতেছিল। হরিশ মিত্তির কিন্তু মিস্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষা না করিয়া, শূন্য চণ্ডীমণ্ডপের দাবায় বসিয়া মুদীর দোকানের তিন মাসের পাওনা, এবং রাঘব হাজরার নিকট কিস্তিবন্দীর টাকা কি উপায়ে মিটাইবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভিখারী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল,—

"গা তোলো, গা তোলো বাঁধ মা কুন্তলো
ওই এলো পাষাণী তোর ঈশানী।"

হরিশ পশ্চাতে ফিরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে রক্ষিত জীর্ণ কাঠামোখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

দুই দশ বৎসরের পূজা নয়, তিন পুরুষের পূজা। হরিশের পিতামহ মথুর মিত্তির নায়েবী চাকরী করিয়া জমায় ও লাখেরাজে যখন প্রায় দুই শত বিঘা ভূ-সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন হইতেই তিনি এই পূজার পত্তন করিয়া যান। হরিশের পিতার আমলেও মামলা-মোকর্দ্দমা ও দান-খয়রাতে সম্পত্তি অনেক নষ্ট হইলেও পূজা বন্ধ যায় নাই। হরিশও এ পর্য্যন্ত পৈতৃক পূজা কখনও ধূমধামের সঙ্গে, কখনও বা বিনা আড়ম্বরে চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি তিনটি মেয়ের বিবাহ দিয়া হরিশ যখন রাঘব হাজরার নিকট আড়াই হাজার টাকার বন্ধকী তমঃসুক লিখিয়া দিতে বাধ্য হইলেন, তখন অনেকেই ভাবিল, এবার মিত্তির-দের পূজো বন্ধ হবেই হ'বে। হরিশ কিন্তু পূজা বন্ধ করিলেন না, রাঘব হাজরার নিকট হইতে দুই পয়সা সুদে টাকা লইয়াও কোনরূপে মায়ের পায়ে ফুল-বিল্ব-পত্র দিয়া আসিতে লাগিলেন।

কিন্তু যে বৎসর দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেই বৎসর হরিশের সর্ব্বনাশ হইল। তিনি টাকা ধার করিয়া ধানের চালানী কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বন্যার প্রকোপে ঘর-বাড়ীর সঙ্গে ধানের গোলা ভাসাইয়া লইয়া গেল। কারবারে হরিশ প্রায় দুই হাজার টাকার দাগী হইয়া পড়িলেন।

সে বৎসরও হরিশ কষ্টে-সৃষ্টে মায়ের পায়ে ফুল-জল দিলেন, কিন্তু পূজার পরই রাঘব হাজরা ঋণ শোধের জন্য ধরিয়া বসিল। তখন ঋণের পরিমাণ সুদে-আসলে ৭ হাজারের উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্পত্তি বিক্রয় করা ছাড়া ঋণ শোধের অন্য উপায় ছিল না। যে সকল ভাল জমী ছিল, হরিশ রাঘব হাজরাকে লিখিয়া দিয়া সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দেনা শোধ করিলেন। বাকী দেড় হাজার টাকার জন্য বৎসরে দেড় শত টাকা হিসাবে কিস্তিবন্দী হইল। কিস্তিবন্দীর টাকা দুই কিস্তিতে—পূজার কিস্তিতে অর্দ্ধেক এবং চৈত্রের আখেরী কিস্তিতে অর্দ্ধেক দিতে হইবে।

ঋণ শোধ করিয়া যে কয় বিঘা জমী অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে ফসলের আশা ছিল না। বন্যার জলে তাহা বর্ষার কয় মাস ডুবিয়া থাকিত। দুই এক বিঘা জমীতে যে ধান হইত, তাহাতে দুইটা মাসও চলিত না।

হরিশ যে বৎসর ঋণ শোধ করিলেন, সে বৎসর পূজার আর উপায় রহিল না। সম্পত্তি আর নাই দেখিয়া রাঘব হাজরা ধার দিতে সম্মত হইল না। কিন্তু এত কালের পৈতৃক পূজা হরিশ একেবারে বন্ধ করিতে পারিলেন না; শুধু ঘট পাতিয়া কোনরূপে নিয়ম রক্ষা করিলেন।

ছেলে নরেন ইহাতে বড়ই গোল বাধাইল। সে কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া বলিতে লাগিল, "এ আবার কি পূজো? ঠাকুর কোথায়?"

নয় দশ বৎসরের বালক, সে ত পিতার অবস্থা বুঝে না। কাযেই প্রতিমাবিহীন পূজা দেখিয়া সে কান্নাকাটি করিতে লাগিল। হরিশবাবু বহুকষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "মিস্ত্রীর অসুখ, তাই সে ঠাকুর গড়তে পারলে না। আসছে বছরে ঠাকুর হ'বে।"

নরেন অগত্যা আগামী বৎসরের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া শান্ত হইল; কিন্তু পূজার আনন্দ তাহার হৃদয়কে আদৌ স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহার উপর পাড়ার ছেলেরা যখন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিল, "ভারী ত তোদের পূজো! ঠাকুর নেই, ঢাক-ঢোল নেই, শুধু দু'টো ঘট। একে বুঝি পূজো বলে।" তখন নরেনকে লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইল। তবে সে পিতার আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল, "আচ্ছা, দেখিস, আস্‌চে বছরে পূজোও হ'বে, ঢাক-ঢোলও বাজবে।"

কিন্তু বর্ষার অবসানে হাজরাদের প্রতিমার গায়ে মাটী পড়িলেও যখন মিস্ত্রী আসিয়া তাহাদের ঠাকুর গড়িতে আরম্ভ করিল না, তখন নরেন যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ রে নরেন, তোদের যে ঠাকুর হ'বে?"

নরেন উত্তর দিল, "হাঁ, হবেই ত।"

কিন্তু ঠাকুর হইবার কোন লক্ষণই না দেখিয়া নরেন তাগাদায় তাগাদায় পিতাকে অস্থির করিয়া তুলিল, "কৈ, মিস্ত্রী এলো না, বাবা? ঠাকুরের গায়ে মাটী পড়বে কবে?"

হায় অবোধ শিশু, মিস্ত্রী এ বাড়ীতে আর আসিবে কি? ঠাকুরের গায়ে আর কি মাটী পড়িবে? শুধু ফুল-জল লইতে মা কি এ দীনের ভবনে আর আসিবেন, পাগল! মা যে আনন্দময়ী; অভাবের তাড়নায় নিত্য যেখানে নিরানন্দের হাহাকার উত্থিত হইতেছে, আনন্দময়ী সেখানে কি আসিতে পারেন? যে অভাগা, মায়ের পাদপদ্মে বিল্বপত্র দিবার সৌভাগ্য সে কোথায় পাইবে?

ছেলের জিজ্ঞাসায় বাপের বুক ফাটিয়া যাইত, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। ছেলে কিন্তু এত কথা বুঝিত না, বাপও তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন না। অন্তরের করুণ হাহাকার অন্তরে চাপিয়া পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন, আশ্বিন-মাসে পূজো। আশ্বিনমাস আসুক আগে, তখন ত ঠাকুর গড়তে মিস্ত্রী আসবে।"

২

সকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাবায় বসিয়া হরিশ ভাবিতেছিলেন, গত বৎসরে ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইয়াছে, এ বৎসর তাহাও বুঝি ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবে কোথা হইতে? মুদী ত তাগাদায় তাগাদায় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার তিন মাসের পাওনা ৩২ টাকা কড়া-গণ্ডায় মিটাইয়া দিতেই হইবে। রাঘব হাজরাও লোক দিয়া দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। এই দেখা করার অর্থ, পূজার মধ্যেই কিস্তিবন্দীর টাকাটা দিতে হইবে। কিন্তু হাতে ত একটি পয়সাও নাই। মনসাতলার জমী তিন বিঘা কিনু ঘোষ মাটীর দরে দেড় শত টাকায় লইবে বলিয়াছে, কিন্তু আশ্বিনের শেষাশেষি না হইলে সে টাকা দিতে পারিবে না। পূজাটা যদি এ বৎসর শেষ মাসে পিছাইয়া যাইত! ওঃ, এই পূজা কবে আসে, কবে আসে বলিয়া আষাঢ়মাস হইতেই প্রতীক্ষা করিতাম; কিন্তু আজ ভাবিতে হইতেছে, পূজাটা যদি আরও কিছু দিন পিছাইয়া যাইত! অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা!

ভাবিতে ভাবিতে হরিশের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। এমন সময় নরেন ছুটিয়া আসিয়া নিতান্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর গড়তে মিস্ত্রী কবে আর আসবে, বাবা?"

পুত্রের প্রশ্নে হরিশ যেন চমকিয়া উঠিলেন; তিনি উদাস দৃষ্টিতে পুত্রের আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "মিস্ত্রী—মিস্ত্রী আস্‌বে বৈ কি।"

জোরে ঘাড় দোলাইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে নরেন বলিল, "হাঁ, আস্‌বে! তুমি ত বলেছিলে, আশ্বিনমাস আসুক। তা আশ্বিনমাস ত এসেছে, আজ মাসের তিন দিন, আর সাত দিন পরেই পূজো। আর কবে মিস্ত্রী আসবে? কবে ঠাকুর গড়বে?"

ছেলের কথায় হরিশের মুখখানা যেন সাদা হইয়া আসিল। পুত্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া অনুযোগের স্বরে নরেন বলিল, "হাজরাদের ঠাকুরের গায়ে রঙ মাখাচ্ছে, আমাদের কাঠামোর গায়ে এখনও মাটী পড়লো না। সব্বাই বল্লে, হাঁ, তোদের ত ঠাকুর হ'লো! হাঁ বাবা, এ বছরও কি আমাদের ঠাকুর হ'বে না?"

গভীর দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের ব্যথাটাকে যেন অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া দিয়া বেদনা-গম্ভীর-কণ্ঠে হরিশ বলিলেন, "তা মিস্ত্রী যখন এলো না, তখন কি ক'রে ঠাকুর হ'বে, নরেন?"

ঠাকুর হইবে না? নরেনের চোখ দুইটা যেন ছল ছল করিতে লাগিল। বলিল, "তা অন্য মিস্ত্রী ডাকলে না কেন? আমি হাজরাদের বাড়ীর মিস্ত্রীকে ডেকে আনব?"

একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া হরিশ বলিলেন, "পাগল! ওরা আমাদের ঠাকুর গড়বে কেন?"

"যদি গড়ে?"

"ওরা অনেক টাকা চেয়ে বসবে। এত টাকা পাব কোথায়?"

"তা হ'লে ঠাকুর গড়বে কে?"

"কে আর গড়বে? ঠাকুর এ বছর হ'বে না।"

"ঠাকুর হ'বে না? না হ'লে ছেলেগুলো যে—"

ছেলেদের নিকট হইতে লজ্জা পাইবার আশঙ্কায় নরেন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হরিশ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নরেনও নৈরাশ্যক্ষুব্ধচিত্তে পিতার নিকট হইতে সরিয়া আসিল।

হতাশ হইলেও নরেন কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হাজরাদের বাড়ীতে ঠাকুর হইতেছে, কিন্তু তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুর নাই। হাজরাদের গুপে ছেলেদের সমক্ষে কেমন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া কত টাকার ডাকের সাজ দিয়া তাহাদের ঠাকুর সাজান হইবে, কয়টা ঢাক, কয়টা ঢোল আসিবে, ইহা সাহঙ্কারে প্রকাশ করিতেছে, আর নরেনকে তাহার মাঝে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে। ছেলেদের মধ্যে কেহ তাহাকে টিটকারী দিয়া বলিতেছে, "তোদের কত টাকার সাজ আস্‌বে রে?" কেহ বলিতেছে, "কয়টা ঢাক, কয়টা ঢোল বাজবে রে নরেন?" তাহাদের প্রশ্নে নরেনের যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। কিন্তু হায়, তাহাদের ত ঠাকুর হইবে না! মিস্ত্রীকে টাকা দিবার ক্ষমতা তাহার পিতার ত নাই।

আচ্ছা, মিস্ত্রীরা ছাড়া আর কেহ কি ঠাকুর গড়িতে পারে না? ঐ ত সিংহের উপর দুর্গা, দুর্গার দশটা হাত। ডান দিকে লক্ষ্মী, বাঁ দিকে সরস্বতী, এক পাশে কার্ত্তিক, অপর পাশে গণেশ। কাযটা কি এমন শক্ত? গত বৎসরে সরস্বতীপূজার সময় ঘোষেদের মাণিকের সঙ্গে মিলিয়া সে যে সরস্বতী ঠাকুর গড়িয়াছিল। তবে মুখগুলা গড়াই একটু শক্ত। তা চেষ্টা করিলে কি হয় না? অত বড় প্রতিমা না হোক্, ছোটখাট প্রতিমা ত খুব হইতে পারে।

মনে মনে সঙ্কল্প আঁটিয়া নরেন পুকুরধার হইতে খানিকটা কাদা সংগ্রহ করিল, এবং সেই কাদা লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের গায়ে যে একটি ছোট পূজার ভাঁড়ার ঘর ছিল, সেই ঘরে বসিয়া ঠাকুর গড়িতে আরম্ভ করিল।

বৈকালে পাড়ার ছেলেরা খেলিবার জন্য নরেনকে খুঁজিতে লাগিল, এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাকে পূজার ভাঁড়ার ঘরে ঠাকুর গড়িতে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "এ কি হচ্ছে, রে নরেন, ঠাকুর গড়ছিস?

আহা, কি ঠাকুরই হ'বে তোর! দূর দূর, তুই আবার ঠাকুর গড়বি?"

ছেলেদের উপহাসে নরেন লজ্জিত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘোষেদের মাণিক তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "না, না, মন্দই বা হচ্ছে কি? তবে দুর্গার বাঁ পা টা আর একটু মুড়ে দিতে—নীচের হাত দুটো আর একটু বড় কত্তে হবে। সরস্বতীর ঘাড়টা একটু হেলিয়ে দেওয়া দরকার।"

তখন মাণিকও নরেনের সঙ্গে মিলিয়া প্রতিমাগঠন-কার্য্যে উদ্যোগী হইল।

মাটীর ঠাকুর, মাটীর গহনা। মাটী শুকাইল, চূণ মাখাইয়া খড়ির কায সারা হইল। তার পর রঙ—রঙের মধ্যে হলুদ, সিন্দূর এবং কালি মাত্র পুঁজি। এই তিন রঙেই সকলকে রঞ্জিত করা হইল। কিন্তু চোরার রঙ? মাণিক বলিল, "ও একটা অসুর ত, কালি মাখিয়ে দিলেই চলবে।" যেখানে অন্য রঙের নিতান্ত প্রয়োজন হইল, মাণিক হাজরাদের বাড়ীর মিস্ত্রীর রঙের মালা চুরি করিয়া আনিয়া সেখানকার অভাব পূর্ণ করিল।

পঞ্চমীর দিনে রঙের কায শেষ হইল। ছেলেরা ঠাকুর দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "না, নেহাৎ মন্দ হয়নি, তবে চালচিত্তিরটা হ'লেই বেশ মানানসই হ'ত।"

মাণিক বলিল, "ওটা আস্‌ছে বছরে মানিয়ে দেব।"

৩

সারা বৎসরের আশা ও আনন্দের সার্থকতা লইয়া ষষ্ঠীর প্রভাত যখন পৃথিবীর বুকে সোনার আলো ছড়াইয়া দিতেছিল, হাজরাদের বাড়ীর ঢাক-ঢোলের শব্দে গ্রামখানি আনন্দ ও উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে হরিশ মিস্তিরের দুঃখ-দৈন্যমথিত অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইতেছিল, তখন নরেন ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "দেখবে এস, বাবা, ঠাকুর গড়েছি আমি।"

হরিশ সবিস্ময়ে পুত্রের হর্ষপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিলেন। নরেন তখন পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং চণ্ডীমণ্ডপে পূজার চৌকিতে স্বহস্তগঠিত প্রতিমা যেখানে আনিয়া বসাইয়াছিল, তথায় উপস্থিত করিল। ঠাকুর দেখিয়া হরিশ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এ দেবী-প্রতিমা কে গড়িল? নরেন? অসম্ভব। এ যে সেই মূর্ত্তি। শিল্পীর নৈপুণ্য নাই, সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই, তথাপি যে সেই জটাজূটসমাযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা জগদম্বার মূর্ত্তি! প্রতিমা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়াই যে জগজ্জননীর বিরাট রূপ বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। সেই দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী, বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী,—সেই দানবদলনী ভক্ত-মনোহরা মূরতি! কে এই প্রতিমা গড়িল রে! হরিশ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে নিমেষশূন্য নেত্রে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভিখারী দরজায় দাঁড়াইয়া গান ধরিল,—

"দেখ না চেয়ে ফিরি, গৌরী আমার সেজে এলো।
এত দিনের পরে আমার পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলো।"

মা, মা, সত্যই কি তুই আসিয়াছিস্, মা! তিন পুরুষের সেবা ভুলিতে পারিস্ নাই, তাই এই ছেলে-খেলার ভিতর দিয়া দীনের দুঃখসমাচ্ছন্ন কুটীর আলো করিতে আসিলি কি, জননি? হরিশের দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রুধারা দর দর গড়াইয়া পড়িল।

নরেন বলিল, "ঠাকুর হয়েছে, এবার ত পূজো কত্তে হবে, বাবা?"

সত্যই ত, মা যখন আসিয়াছেন, তখন যথাসাধ্য মায়ের চরণে ফুল-জল ত দিতেই হইবে। হরিশ ছুটিয়া পুরোহিতের কাছে গেলেন। পুরোহিত কিন্তু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "দুর্গোৎসব ত ছেলেখেলার কথা নয়, বাপু, এর উদ্যোগ-আয়োজন চাই।"

হরিশ বলিলেন, "উদ্যোগ-আয়োজন আমার ত কিছুই নাই, তবে মা যখন দয়া ক'রে এসেছেন, তখন কোন রকমে মায়ের পায়ে ফুল-জল দিতেই হ'বে।"

পুরোহিত বলিলেন, "পার, নিজেই ফুল-জল দাও, আমার দ্বারায় ত হ'বে না। আমি হাজরাদের বাড়ীর পূজোর ব্রতী আছি।"

বিস্মিতভাবে হরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে উপায়?"

পুরোহিত বলিলেন, "আমি উপায় কি করবো? আজ ষষ্ঠী, আজ বামুন কোথায় পাবে?"

শঙ্কিত স্বরে হরিশ বলিলেন, "তা হ'লে মায়ের পূজো কি হ'বে না?"

পুরোহিত বলিলেন, "হ'বে না কেন, যদি বেশী দক্ষিণা দিতে পার, তা হ'লে বামুন যোগাড় ক'রে দিতে পারি। তোমার সে সাবেক দশ টাকা দক্ষিণায় বামুন পাওয়া যাবে না।"

সদুঃখে হরিশ বলিলেন, "দশ টাকা দক্ষিণা দেবার সঙ্গতিও আমার নাই, পুরুতকাকা!"

ক্রোধসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া পুরোহিত বলিলেন, "তবে আমার কাছে ছেলেখেলা কত্তে এসেছ না কি? দক্ষিণা দেবার সঙ্গতি নাই, তবু দুর্গোৎসব কত্তে হ'বে?"

হরিশ বলিলেন, "দুর্গোৎসব করবার ক্ষমতা আর আমার নাই, পুরুতকাকা। তবে মা যখন নিজে এসেছেন—"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে পুরোহিত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, মা নিজে এসেছেন! মায়ের ত যাবার আর যায়গা নাই? ও সকল চালাকী আমি বুঝি হে বাপু বুঝি, এটা শুধু তোমার বামুনকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব। কিন্তু দস্তুর-মত পূজার আয়োজন না হ'লে, দস্তুরমত দক্ষিণা না দিলে বামুন পাবে না, এই আমি স্পষ্ট ব'লে দিলাম।"

পুরোহিতের স্পষ্টোক্তিতে হতাশ হইয়া হরিশ ঘরে ফিরিলেন এবং ব্রাহ্মণ না পাইলে কিরূপে মায়ের পায়ে ফুল-জল দিবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। গৃহিণী তাঁহার সঙ্কল্প শুনিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হ'লে না কি? আজ বোধন, কিন্তু তোমার ঘরে এমন এক মুঠো চাল নাই যে, হাঁড়িতে দেবে। তুমি পূজো করবে?"

দুঃখগাঢ় কণ্ঠে হরিশ বলিলেন, "পূজো করবার ক্ষমতা নাই ব'লে আমি ত মা'কে আন্তে চাই নাই, বড়-বৌ! কিন্তু মা যখন নিজে এসে পড়েছেন, তখন কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি?"

গৃহিণী কিন্তু চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত বলিয়া উপদেশ দিলেন। ছেলেরা খেলাচ্ছলে ঠাকুর গড়িয়াছে, তাহারাই যা হয় করুক। হরিশ কিন্তু গৃহিণীর উপদেশে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, পূজক ব্রাহ্মণের চেষ্টায় গ্রামের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু উপযুক্ত দক্ষিণা ও পূজার উপযুক্ত চাউল, কাপড় ইত্যাদি না পাইলে কোন ব্রাহ্মণই পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। হরিশ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার কাতরতা দেখিয়া গদাই ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তোমার যে রকম পূজো, হরিশ খুড়ো, তাতে টীকি, নামাবলীওয়ালা বামুন তুমি পাবে না। তবে আমাকে যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে আমি রাজি আছি।"

হরিশ যেন অকূলে কূল পাইলেন। কিন্তু গদাই ঠাকুরের মূর্খতা স্মরণ করিয়া একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন, "তুমি পারবে ত, গদাই ঠাকুর?"

ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়িয়া গদাই ঠাকুর বলিলেন, "পারাপারি আর কি, মন্তর-তন্তর কিছু আমি জানি না, তবে 'নাও মা, খাও মা' ব'লে দু' আঁচলা ফুল ফেলে দিতে পারবো। টাকা-কড়ি কিছু চাই না, ভরি দুই গাঁজা আমাকে দিও।"

অগত্যা হরিশ এই গাঁজাখোর মূর্খ ব্রাহ্মণকেই পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। হইলই বা মূর্খ, ব্রাহ্মণসন্তান বটে ত, গলায় ত যজ্ঞসূত্র আছে।

লোক শুনিয়া বলিতে লাগিল, "হরিশ মিস্ত্রিরের যেমন পূজো, তেমনই বামুন। এমন ছেলেখেলা কি না করলেই নয়?"

৪

কিন্তু যেমনই পূজা হউক, কিছু টাকা চাই ত। যে কয় টাকারই দরকার হউক, ধার করা ছাড়া উপায় নাই। টাকা ধার করিবার জন্য হরিশ রাঘব হাজরার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাঘব হাজরা তাঁহাকে দেখিয়াই শ্লেষতীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৎসর না কি পূজো এনেছ আবার?"

সঙ্কুচিতভাবে হরিশ উত্তর করিলেন, "পূজো আন্‌বার ক্ষমতা আমার নাই, হাজরা মশায়! তবে ছেলেটা এক ছেলেখেলা আরম্ভ করেছে—"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে হাজরা মহাশয় বলিলেন, "তাই বুড়ো মানুষ হয়েও তুমি সেই ছেলেখেলায় যোগ দিয়েছ।"

হাজরা মহাশয়ের কথায় ভীতি অনুভব করিয়া হরিশ নিরুত্তরে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। হাজরা মহাশয় তখন রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এই দু'দিন আগে কাঁদুনি গাইতে এসেছিলে। টাকার যোগাড় কত্তে পাচ্ছি না, একটা মাস সময় দিতে হবে। কিন্তু দু'দিন পরেই ছেলের নাম দিয়ে দুর্গোৎসব ফেঁদে বসেছ। তুমি যে মহাজনকে ফাঁকি দিবার মতলবে আছ, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, বন্ধের পর আদালত খোলা হোক, তখন কিস্তিখেলাপের নালিশ ক'রে যদি তোমার ঘর ভিটে বেচে না নিই, তবে আমার নাম রাঘব হাজরাই নয়।"

হাজরা মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে হরিশ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি শপথ পূর্ব্বক অনুনয়-বিনয় সহকারে হাজরা মহাশয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বাস্তবিক ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত দুর্গোৎসব নহে, ছেলেখেলা মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিয়া মা'কে আনেন নাই। ছেলেখেলাকে উপলক্ষ করিয়া মা নিজে আসিয়াছেন। মা যখন আসিয়াছেন, তখন কোনরূপে তাঁহার পায়ে ফুলজল ত দিতেই হইবে। গড়া ঠাকুর ত তিনি ফেলিয়া দিতে পারেন না।

হাজরা মহাশয় কিন্তু তাঁহার শপথে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মহাজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "ছেলে তোমার অগোচরে ঠাকুর গড়েছে, এ কথায় আমি বিশ্বাস কত্তে পারি না। ভাল, যখন সত্যিকার ঠাকুর নয়, ছেলেখেলা, তখন এ ঠাকুরকে তুমি ফেলে দিলেই ত পার।"

হরিশ শিহরিয়া উঠিলেন, "হিন্দুর ছেলে হয়ে তৈরী ঠাকুর আমি ফেলে দিতে পারবো না, হাজরা মশায়।"

রোষকুঞ্চিত মুখে হাজরা মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে তোমার মতলব আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। উত্তম, আমার হকের টাকা জলেও ডুববে না, আগুনেও পুড়বে না। পুজোটা শেষ হোক, তার পর কত বড় ফন্দীবাজ তুমি, তা আমি দেখে নেব।"

হাজরা মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস বিচলিত করা দুঃসাধ্য বোধে হরিশ বিষণ্ন চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। টাকা ত চাহিতেই পারিলেন না, অধিকন্তু সর্ব্বনাশ আসন্ন বুঝিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

ঘরে ফিরিতেই দেখিলেন, গোকুল মুদী তাগাদায় আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই গোকুল সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা জোচ্চোর ত তুমি, মিত্তির মশায়, এ দিকে দুগ্‌গোচ্ছোব কচ্ছো, কিন্তু দোকানে ধার খেয়েছ, তার টাকা দিতে পাচ্ছো না। ভদ্দর লোক যে এত জোচ্চোর হয়, তা ত আমি জানতাম না।"

ওহো হো, লাঞ্ছনার আর বাকী কি? গোকুল মুদী —সে-ও তাঁহাকে জোচ্চোর নামে অভিহিত করিল! হায় অবোধ ছেলে, ছেলেখেলা করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলি তুই? হরিশ নিজের মাথাটাকে যেন মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোকুল বলিল, "আজকার মত যাচ্ছি আমি। রাত্তিরের মধ্যে টাকার যোগাড় ক'রে রাখ। কা'ল এসে টাকা যদি না পাই, তা হ'লে তোমার পূজো নিয়ে আসা বুঝিয়ে দেব। গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় ক'রে নেব।"

পরদিন টাকা দিবার জন্য কঠোর তাগাদা দিয়া গোকুল চলিয়া গেল। হরিশ অপমানজর্জ্জরিত, ক্ষুব্ধ চিত্তে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কর্ত্তব্য কি? না, এই ছেলেখেলার ঠাকুরই যত অপমানের—যত লাঞ্ছনার মূল। কি হইবে এমন ঠাকুরের পূজা করিয়া? পূজা হইবেই বা কোথা হইতে? টাকা ধার করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিতে হইল। ঘরে এমন পয়সা নাই, যাহাতে পূজার জন্য এক পোয়া চাউলও কিনিয়া আনা যায়। তবে এমন বিড়ম্বনে ফল কি? দূর হউক, এমন ছেলেখেলায় কায নাই, এই ছেলেখেলার ঠাকুরকে জলে ফেলিয়া দিয়া আপাততঃ পাওনাদারের লাঞ্ছনার হাত হইতে আত্মরক্ষা করি।

হরিশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্থির চিত্তে গিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

এ কি, প্রতিমার মুখে সে মৃদুমধুর হাস্যরেখা কৈ? এ যে তীব্র বিদ্রূপের কঠোর হাসি! মা, মা, আমার লাঞ্ছনা দেখিয়া অট্টহাসি হাসিতেছ কি? অথবা দুঃখে দৈন্যে মানুষ কেমন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহাই দেখিয়া তোমার মুখে এই বিদ্রূপের হাসির উদয় হইয়াছে? ওঃ, বড় দুঃখ—বড় কষ্ট মা; সব চেয়ে দুঃখ,—বিপদে অধীর হইয়া, তোমাকে ছেলেখেলার পুতুল ভাবিয়া আজ আমি কি ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিতে আসিয়াছি, নিজে নিরাপদ হইবার জন্য তোমাকে তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডের মত জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি শুধু ভাগ্যহীন নই, মহাপাপী আমি; মা,মা, আমার বাতুলতা মার্জ্জনা কর।

কাঁদিতে কাঁদিতে হরিশ সেই ক্ষুদ্র প্রতিমার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া অনুতাপের অশ্রুধারায় কক্ষতল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

৫

সপ্তমীর প্রভাতে হাজরাদের বাড়ীর ঢাক-ঢোলের শব্দে গ্রামখানা যখন কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তখন গদাই ঠাকুর আসিয়া বলিল, "কৈ গো, মিত্তির মশায়, পূজো কর্ত্তে হবে যে?"

হরিশ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন; গদাই ঠাকুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, "পূজো ত কত্তে হ'বে, কিন্তু কি দিয়ে পূজো হ'বে, গদাই ঠাকুর? এক মুঠো চাল পর্য্যন্ত নাই।"

উপেক্ষার হাসি হাসিয়া গদাই বলিল, "রেখে দাও তোমার চালকলা, মিত্তির মশায়। আমিও যেমন বামুন, তোমারও তেমনই পূজো। ফুল বিল্বপত্র আছে ত?"

হরিশ বলিলেন, "তা ঢের আছে। নরেন রাত থাকতে একঝোড়া ফুল তুলে রেখেছে।"

গদাই বলিল, "তবে আর পূজোর ভাবনা কি? তা হ'লে আগে ঘটটা ডুবিয়ে আনি।"

গদাই নিকটবর্ত্তী নদীতে ঘট ডুবাইতে চলিল। নরেন ও পাড়ার জন কয়েক ছেলে কাঁসর-ঘণ্টা লইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

পথে বৃদ্ধ রতন ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রতন ঘোষ গদাইকে সম্বোধন করিয়া পরিহাসের সহিত বলিল, "কি গদাই ঠাকুর, গাঁজার কল্কে ছেড়ে পূজোর ঘণ্টা ধরলে যে?"

গদাই হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি কি ধর্ত্তে চাই, ঘোষজামশাই, মা জোর ক'রে ধরিয়ে দিলে যে। বেটী বললে, হতভাগা বামুন, চিরকাল গাঁজা টিপেই মরবি, আমার পায়ে ফুল এক মুঠো দিবি না?"

রতন বলিল, "মা তা হ'লে বেছে বেছেই তোমাকে ধরেছেন। কেন না, তুমি এ পূজোর উপযুক্ত বলি বটে।"

মাথা নাড়িয়া গদাই বলিল, "ভুল বললে, ঘোষজা-মশাই, কোন হিন্দুর ঠাকুরের কাছে আমার বলি হ'তে পারে না।"

রতন ঈষৎ হাস্য দ্বারা আপনার ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, "ঠিক কথা, তুমি যে বামুনের ঘরের গরু।"

হাসিতে হাসিতে গদাই বলিল, "তাই বল, ঘোষজা মশাই! কায়েতের ঘরের পাঁটা হলেও বা হয় হতো।"

রতন ক্রোধসূচক ভ্রূভঙ্গী করিলেন। গদাই হাসিতে হাসিতে ঘট ডুবাইয়া চলিয়া গেল।

ঘট কিরূপে বসাইতে হয়, কেমন করিয়া তাহাতে পল্লব-সিন্দূর ইত্যাদি দিতে হয়, তাহা গদাইএর জানা ছিল না। সে যেমন তেমন করিয়া ঘট বসাইয়া তাহাতে খানিকটা সিন্দূর মাখাইয়া দিয়া পূজায় বসিল।

পূজার উপকরণের মধ্যে একরাশ বিল্বপত্র, আর শিউলী, জবা, অপরাজিতা প্রভৃতি কতকগুলা ফুল। গদাই সেগুলাকে চন্দনে ডুবাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঘটের মাথায়, প্রতিমার পায়ে দিতে লাগিল। মা গো, মন্ত্র জানি না, তন্ত্র জানি না, ভোগ নাই, নৈবেদ্য নাই, আবাহন নাই, বিসর্জ্জন নাই, আছে শুধু তোমার পায়ে ফুল দিবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার বশে বিনা মন্ত্রে বিনা আবাহনেই তোমার চরণোদ্দেশে ফুল ঢালিয়া দিতেছি, সে ফুল তুমি কি গ্রহণ করিবে না? তুমি জলে আছ, স্থলে আছ, স্থাবরে আছ, জঙ্গমে আছ, অন্তরে আছ, বাহিরে আছ; ইহা

গচ্ছ বলিয়া আবাহন করিয়া মন্ত্রপূত ফুল না দিলে কি সে ফুল তোমার পায়ে পড়িবে না, জননি? মূর্খ, নেশাখোর, সন্ধ্যা-গায়ত্রী-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ আমি—আমার পূজা তুমি গ্রহণ করিতে না পার, কিন্তু তোমার দরিদ্র ভক্তের আড়ম্বরহীন পূজা তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে যে মা!

অঞ্জলি ভরিয়া ফুল দিতে দিতে গদাই ঠাকুরের চক্ষুর্দ্বয় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে সেই মুদিত নেত্রপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া অঞ্জলি-ধৃত পুষ্পরাশি সিক্ত করিতে থাকিল।

হরিশ স্থিরভাবে বসিয়া গদাই ঠাকুরের পূজা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল, এ পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে উদাত্ত স্বরে বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের সহিত পূজা করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্রহীন এমন নীরব পূজা কখনও দেখেন নাই। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত সুসজ্জিত প্রতিমা দেখিয়া অনেকবার মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু বালকের নৈপুণ্যবিহীন হস্তে গঠিত সাজসজ্জাবিহীন এই ক্ষুদ্র প্রতিমার অধরোষ্ঠ হইতে যেমন প্রসন্ন হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, এমন হাসি দেবতার মুখে কখন দেখিতে পান নাই। মা, মা, নিতান্ত নিঃস্ব—নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় এই ছেলেখেলার পূজায় তুমি কি প্রসন্ন হইয়াছ, জননি? তাহা হইলে আমার দারিদ্র্য সার্থক—আমার ছেলেখেলা সার্থক! ইহার পর যদি আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে—ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, মা, তাহাতেও আমার আর দুঃখ নাই মা!

হরিশ ভক্তি-বিহ্বল নেত্রে সেই ক্ষুদ্র প্রতিমার মধ্যে আনন্দময়ীর আবির্ভাব দর্শনে আপনার দৈন্যটাকে সার্থক জ্ঞান করিয়া লইলেন। অব্যক্ত আনন্দে অন্তরের দুঃখ, দৈন্য, লাঞ্ছনা সব বিধৌত হইয়া গেল।

কৌতূহলবশে পাড়ার অনেকেই ছেলেখেলার পূজা দেখিতে আসিল। কিন্তু ঠাকুর দেখিয়া কেহই ইহাকে ছেলেখেলার ঠাকুর বলিয়া মনে করিতে পারিল না। ফিরিবার সময় অনেককেই বলিতে হইল, "না, হরিশ মিত্তিরের ওপর মায়ের দয়া আছে।"

গোকুল মুদী তাগাদায় আসিয়া ঠাকুর দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সে দিন টাকার কথা না তুলিয়াই হরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "পূজো যখন কচ্ছো, মিত্তির মশাই, তখন অনিয়ম কচ্ছো কেন? চা'ল-টাল যা দরকার, আমার দোকান থেকে নিয়ে এসো। দাম না হয় দু'মাস পরেই দেবে।"

গোকুলের কথায় বিস্ময় অনুভব করিয়া হরিশ বলিলেন, "চালের কি দরকার, গোকুল, এ ত আমার সত্যিকার পূজো নয়—ছেলেখেলা।"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া গোকুল উত্তর করিল, "তুমি ছেলেখেলা কত্তে পার, মিত্তির মশায়, কিন্তু মা ত ছেলেখেলার জিনিষ নয়। আচ্ছা, আমি আজই মণখানেক চাল পাঠিয়ে দেব।"

অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে চাহিয়া হরিশ মনে মনে বলিলেন, "মা গো, এ তোর দয়া, না ছলনা?"

৬

সন্ধিক্ষণের পূজা শেষ করিয়া গদাই ঠাকুর গাঁজা টিপিতেছিল, এমন সময় রাঘব হাজরা তথায় উপস্থিত হইলেন। হরিশ ভয়ে ভয়ে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। হাজরা মহাশয় কিন্তু আসন গ্রহণ না করিয়াই বলিলেন, "কৈ হে মিত্তির, তোমার ঠাকুর কোথায়? গাঁ শুদ্ধ লোক ত পাগল, মা স্বয়ং তোমার ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। হরি হরি, এই তোমার ঠাকুর, আর গাঁয়ের বোকা লোকগুলো এতেই মায়ের আবির্ভাব দেখে পাগল হয়ে উঠেছে?"

গভীর অবজ্ঞায় হাজরা মহাশয়ের বিশাল ললাট কুঞ্চিত হইল। কুণ্ঠিতভাবে হরিশ বলিলেন, "আমার ঘরে মায়ের আবির্ভাব! আমি বলেছি ত হাজরা মশায়, আমার এ পূজো নয়—ছেলেখেলা।"

অবজ্ঞার উচ্চ হাসি হাসিয়া হাজরা মহাশয় বলিলেন, "ছেলেখেলাই বটে, মিত্তির, ছেলেখেলাই বটে। যেমন ঠাকুর, তেমনই পূজার আয়োজন, বামুনটিও জুটেছে তেমনই। আমার এই পূজোটায় হাজারের ওপর খরচ। কলকাতা থেকে ডাকের সাজ আসে, তারই দাম এক শো টাকা। এই সন্ধিপূজায় এক মণ চা'লের প্রধান

নৈবেদ্য, চেলীর কাপড়, সোনার নথ। রামনগরের বিদ্যানিধি মশায় পুথি ধরেন আর চণ্ডীপাঠ করেন, তাঁকেই ৭০ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। এত খরচ করেও মায়ের আবির্ভাব ত দেখলাম না, মিত্তির! আর তোমার এই এক পোয়া চালের নৈবেদ্য খাবার লোভে, গদাই ঠাকুরের গাঁজার ধোঁয়ার চোটে, এই পেত্নী দানা প্রতিমায় মায়ের আবির্ভাব হয়েছে! লোকগুলোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে দেখছি।";

হরিশ নতমস্তকে নীরব রহিলেন। হাজরা মহাশয় হাতের রূপা-বাঁধান ছড়ির আগাটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন, "যাক্, আমার কিস্তিবন্দীর টাকা মিটিয়ে না দিয়ে তুমি পূজো কচ্ছো শুনে আমার খুবই রাগ হয়েছিল। কিন্তু কে জানে তখন যে, সত্যিই তুমি ছেলেখেলা কচ্ছো। তা মাসের শেষ নাগাদ টাকাটা দিও। এ বছর পূজোটায় বোধ হয় দেড় হাজারের ওপর খরচ হয়ে যাবে। চল্লুম এখন, বস্‌বার যো নাই। কা'ল সাত আট শো লোক খাবে, তা'র আয়োজন আছে ত। যদিও লোকজন মোতায়েন আছে, তবু নিজে না দেখলে চলে কি? তারা, তারা, ব্রহ্মময়ী মা!"

ব্রহ্মময়ীকে ডাকিতে ডাকিতে হাজরা মহাশয় সদর্প পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ক্রোধের উপশম হইয়াছে দেখিয়া হরিশ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং আনন্দময়ীর কৃপাই যে এই ক্রোধশান্তির মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়া ভক্তি-পুলকিত কণ্ঠে বলিলেন, "মা, মা, দীনের উপর তোমার এত কৃপা! কিন্তু এত কাল তোমার পূজা করিয়া আসিতেছি, এমন কৃপার পরিচয় ত কখনই পাই নাই? তবে এই ছেলেখেলার পূজাতেই কি তোমার এত সন্তোষ – এত তৃপ্তি মা!"

মায়ের নিকট হইতে হরিশ এ প্রশ্নের কোনই উত্তর পাইলেন না। গদাই ঠাকুর গাঁজায় দম দিয়া গান ধরিল,—

'জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে;
তুমি লুকিয়ে মা'কে কর্‌বে পূজা
জান্‌বে না রে জগজ্জনে।'

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পারের পথিক

কে ওই পথিক, কোথায় যাবে
কেন গো কার সন্ধানে?
ব'সে কেন সাঁঝের বেলা
নদীর কূলে ঐখানে?

পারের তরী পারে গেছে;
নাইকো তরী পার-ঘাটে,
সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল
রাখাল-বালক নাই মাঠে।

আকাশ-কোলে মেঘ করেছে
আস্‌ছে সমীর স্বন্‌স্বনি,
এমন সময় সাহস কা'হার
খুলতে তরীর বন্ধনী?

তবু পথিক ব'সেই আছে·
আশায় বেঁধে নিজের বুক;
কুয়াসায় ঘিরেছে নদী
তবু চেয়ে সমুৎসুক!

পারের তরী পারে গেছে,
আস্‌বে কি না কে জানে—
সাঁঝের তুফান ঘনিয়ে এল,
রইবে পথিক কোন্‌খানে!

আকছায়রুদ্দীন আহম্মদ।

উৎসর্গ

১

ধনিসন্তান শিশির যখন রাত্রি দেড়টার সময় টলিতে টলিতে থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার বাহ্য-জ্ঞান যথেষ্ট কমিয়া আসিয়াছে। সে একই রকম ভাবে যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন কিছুতে একটা ধাক্কা খাইয়া 'উঃ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।—তাহার পর তাহার আর কিছু মনে পড়ে না। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে রোগীর খাটে শুইয়া আছে।

চক্ষু মেলিতেই সহানুভূতিপূর্ণ একটি করুণ স্বর তাহার কর্ণে বাজিল, "একটু ভাল বোধ করছেন কি ?" শিশির কিছুক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না; পরে বলিল, "আমি কোথায় ?" তেমনই স্বরে উত্তর আসিল, "কিছু ভাববেন না, আপাততঃ আপনি হাঁসপাতালে। আপনার মা এখুনি আসবেন।"—তাহার পর শিশির আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

* * * * *

আজ শিশির বেশ সুস্থ বোধ করিতেছে—একটু চলিতেও পারিতেছে। তাহার মা আজ তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। এত দিনের পর আবার বাড়ী যাইবার চিন্তায় সে একটু শান্তি পাইতেছে বটে, কিন্তু তবুও তাহার মনে বিদায়ের ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশ্য, রোগীদের হাঁসপাতালে কিছু চির-বাঞ্ছিতের প্রাপ্তি ঘটে না, কিন্তু শিশিরের এই উচ্ছৃঙ্খল যৌবন যেন হাঁসপাতালেই রুদ্ধগতি নদীর মত আসিয়া থামিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'কিছুক্ষণ······আর কিছুক্ষণ······ঐ বোধ হয়, মোটরের শব্দ'—এমনই করিয়া খাটের উপর বসিয়া বসিয়া শিশির ভাবিতেছিল, এমন সময় ম্লান মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটাইয়া একটি নারী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই দীর্ঘ দুই মাস শিশিরের রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে—কেবল উৎকণ্ঠায় জাগিয়া আর ভাবিয়া। আবার ছুটিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াই হয় ত ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ধুইয়া দিতে হইয়াছে—ডাক্তার ওষুধ দিয়া গিয়াছেন। বিরামহীন সেবায় শিশিরের রোগক্লিষ্ট সুন্দর মুখ এখন আবার পূর্ব্ব-সৌম্যভাব ধারণ করিয়াছে—দুটি চোখ অনিমেষ আনন্দে তাহার এই শেষের এক মাসের উন্নতিশীল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আজ সেই সেবাময়ী নারী শিশিরের সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

বিদায় বড় নিষ্ঠুর। সমস্ত কারুণ্য, সমস্ত বেদনাকে বিদ্রূপ করিয়া বিদায় আইসে।—শিশির কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না। দুই জনেরই অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকা চলে না, তাই শেষে শিশির বলিল, "অরুণা, তোমার স্নিগ্ধ ছবিটি চিরদিন আমার মনে জেগে থাক্‌বে—কিন্তু আজ আমি চ'লে গেলে হয় ত তুমি আমায় কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যাবে।"

অরুণা কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চোখই যেন কথা কহিতেছিল, বলিতেছিল, "ওগো, তোমরা এমনই মনে কর।" তাহার পর দুই চারিটা কথার পর তেমনই করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই অরুণা চলিয়া গেল। শিশির তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "আমি তা হ'লে শনিবারে তোমার সঙ্গে দেখা করব, অরুণা,—"একটা মোটরের শব্দে আর কিছু শোনা গেল না। শিশিরের বৃদ্ধা মাতা তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

২

পিতার সামান্য কয়েকখানা আস্‌বাব আর অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া যে কয়টি টাকা পাইল, অরুণা তাহাতেই লিখাপড়া শেষ করিয়া মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে নার্সের কাযে ঢুকিয়াছিল। সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না। সে অল্পবয়স হইতেই আত্মনির্ভরশীলা। সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত কর্ম্মজীবনের নিতান্ত সঙ্গিহীন দিনগুলি এক রকম করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। সে ঠিক করিয়াছিল, আজীবন কুমারী থাকিয়া পরের সেবাতেই কাল কাটাইবে। এমন সময় আহত শিশির আসিল তাহার ওয়ার্ডে—এই ধনিসন্তানের রোগ-ম্লান

সৌম্য মুখে এমন কিছু ছিল—যেটি অরুণার বড় ভাল লাগিল।

*　*　*　*　*

সারিয়া উঠিয়াই প্রত্যেক দিন শিশির অরুণার বাড়ী আসিয়া তাহার অবসরসময়টুকু গল্পগুজবে কাটাইয়া দিত। এমনই করিয়া দিনের পর দিন চলিল; অরুণা ক্রমে ক্রমে সব কাযেই শিশিরের অনুগামিনী হইয়া পড়িল।

*　*　*　*　*

শেষে এক দিন হঠাৎ শিশিরের জ্ঞান হইল। এ কি করিতেছে সে? এক বার মনে পড়িল তাহার মা'কে, তাহার পর মনে পড়িল তাহার প্রতিজ্ঞা। সমস্ত সুসঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—আত্মগ্লানিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। তাহার জীবনের লক্ষ্য সে কোথায় কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিয়াছে; এত দিন অন্ধ অজ্ঞান শিশুর মত বিলাসের কু-অভ্যাসের দিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়াছে—আজ হঠাৎ তাহার সম্মুখে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

শিশির আজ দুই দিন হইল আইসে নাই। শেষদিন যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে, "অরুণা, আমার বোধ হয় আসিতে এক দিন দেরী হ'বে।" ক্রমে ক্রমে দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন হইয়া গেল, তবু শিশিরের দেখা নাই। অরুণা নানা রকম ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল, হয় ত অরুণার সঙ্গে তাহার দরকার চুকিয়া গিয়াছে—সে অরুণাকে ভুলিয়া যাইতে চাহে। আবার মনে হইল, হয় ত এক বৎসর পূর্ব্বে যেমন অবস্থায় প্রথম শিশিরের সঙ্গে দেখা হয়, তেমনই করিয়া আবার হাত-পা ভাঙ্গিয়া সে কোনও হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। একবার অজ্ঞাতসারেই অরুণার মুখ দিয়া বাহির হইল, "প্রভু, তাঁর যেন কোন বিপদ না হয়।"

যদিও শিশির অরুণাকে সংযমের—সাধুতার পথ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি সে শিশির ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানে না। এ জীবনে সে আর কাহারও কথা ভাবিতে পারে না। যদিও সে আজ শিশিরের পরিণীতা স্ত্রী নহে, শুধু তাহার আমোদের সাথী, তথাপি সে তাহারই মধ্যে যতটুকু ধর্ম্ম আছে, সেটুকু অক্ষুন্ন অটুট রাখিবে। যখন সে বুঝিয়াছে, সে ও শিশির এত দিন অন্যায় করিয়া আসিয়াছে, তখন আজ হইতেই তাহার প্রতীকার করিতে আরম্ভ করিবে। আর যখন সে শিশিরকে ভালবাসিয়াছে, আমরণ তাহাকেই ভালবাসিবে। সে অমিতাচারী হইয়াছিল বটে, কিন্তু অসতী হয় নাই। তাহার এই পাপের জীবনে সে পুণ্যের প্রভাত আবার ফিরাইয়া আনিবে—আজ হইতে ইহাই তাহার লক্ষ্য।

অরুণা একে একে সমস্ত বিলাসের সামগ্রী ও সুরার সরঞ্জাম ত্যাগ করিল। আর কখন্ শিশির আইসে, সেই অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই পবিত্র জাগরণের সোনার কাঠি শিশিরের প্রাণে স্পর্শ করাইয়া দিতে পারিলেই তাহার সমস্ত সাধনা সফল হইবে।

দিন চলিয়া গেল……অরুণা অক্লান্ত উদ্যমে শুদ্ধ পবিত্র পথে চলিতে লাগিল; কিন্তু শিশির আসিল না।

৩

যে দিন শেষবার শিশির অরুণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী গেল, সে দিন তাহার মা তাহাকে বলিলেন —"বাবা, কবে আছি কবে নাই, তুমি এবার বিয়ে কর। বৌমাকে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিয়ে আমি অবসর নেবো। তিনি ত আমার তীর্থ করবার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছেন—একবার ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে আসবো মনে কচ্ছি।"

শিশির বৃদ্ধার সকরুণ কথাগুলি ঠেলিতে পারিল না। বিলাস আর নিজের খামখেয়ালীতে তাহার প্রকৃতিও একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; মায়ের কথায় সায় দিয়া বলিল, "তোমার যা খুসী কর।"

৪

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শিশিরের মা বিশ্বেশ্বরের ক্লান্তিহরণ শান্তিময় চরণে শরণ লইয়াছেন। শিশির এখন কলিকাতার সেই মস্ত বাড়ীর একমাত্র মালিক। কিন্তু সে স্বভাবের একটুও সংশোধন করিতে পারে নাই—তেমনই দুশ্চরিত্র মাতাল। সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়,—সহ্য-শক্তির প্রতিমা তাহার বালিকা বধূ 'অমলা'কে।

এক দিন হঠাৎ শিশির বলিল, "অমলা, আমার শরীর আজকাল বড় খারাপ হয়েছে; ডাক্তাররা সব বলছে—সমুদ্রের হাওয়া লাগলে যদি আবার স্বাস্থ্য ফেরে—তা মনে করছি, একবার পুরী যাবো মাস কতকের জন্যে। তোমার দরকারমত খরচের টাকা দিতে নায়েবকে ব'লে চল্লুম—বুঝলে?"

উত্তরে অমলা বলিল, "আমারও বড় সমুদ্র দেখবার ইচ্ছে যায়। সেই ছোটবেলায় অনেক দিন হ'ল কখন্ একবার দেখেছিলুম, মনে পড়ে না, আর একবার দেখতে বড় সাধ করে। আর তোমারও ত শরীর বড় খারাপ, কে দেখবে শুনবে, আমায়ও নিয়ে চল না?"

"হ্যাঃ, তোমার-ও যেমন! আমি যাচ্ছি কোথায় একটু সেরে আসব, একটু নির্জ্জনে থাক্‌বো, না অমনই কচি খুকীর মত 'সঙ্গে নিয়ে চল না।' আমার হুকুম, তোমায় কলকাতায় থাক্‌তে হ'বে। আমি একলা যেতে চাই। ভাল কথায় বল্লে সব হয় না—না?"

অমলা মুখ ফিরাইয়া লইল। শিশিরের অলক্ষ্যে এক ফোঁটা চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিল। শিশির বুঝিল না, ছোট বুকে কতখানি আঘাত লাগিল। সে গট্ গট্ করিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে যাইতে হুকুম করিল, "মুনিয়া, আমার সুটকেশ-গুলো গুছিয়ে রাখ।"

৫

কলিকাতার সেই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না বলিয়াই শিশির প্রথমে মনে করিয়াছিল, পুরী গেলেই বোধ হয় খুব একচোট আমোদ হইবে। কিন্তু কোথায় বা কি, প্রথম সপ্তাহটা যাইতে না যাইতেই সে অ-তিষ্ঠ হইয়া পড়িল। সঙ্গিহীন আমোদ-প্রমোদহীন দিন কি আর শিশিরের ভাল লাগে? সে ভাবিল, ঢের হইয়াছে, এবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

এক দিন সন্ধ্যায় রঙিন সুরাদেবীর নিয়মিত আরাধনা করিয়া শিশির সমুদ্রের তটে পাদচারণা করিতেছে,—এমন সময় দেখিল, কিছু দূরে একটি নারী সমুদ্রের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না। শিশির একটু অগ্রসর হইতেই স্ত্রীলোকটি তাহার দিকে চাহিলেন। শিশির কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "অরুণা! তুমি?" বলিয়া তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল। অরুণা দৃঢ়স্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, আমিই। শিশির, থামো, তুমি না বিয়ে করেছ, তোমার স্ত্রী কোথায়?" শিশির প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত হইল। ঠিক প্রশ্ন শুনিয়া নহে, অরুণার স্বরের দৃঢ়তায় আর তাহার ভাবভঙ্গীর গাম্ভীর্য্যে। সে বেশ বুঝিল, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের আর আজিকার অরুণার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আসিয়াছে।

শিশিরকে নীরব দেখিয়া অরুণা বলিল,—"ছি, শিশির, তুমি এখনও মদ খাওয়া ছাড়তে পারনি? তোমার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে যে?"

"আর তুমি ছেড়ে দিয়েছ বুঝি?" একটু তীব্রভাবে এই কথাটা বলিয়া শিশির অরুণার মুখের দিকে চাহিল।

"হ্যাঁ শিশির, সে অনেক কথা। এস, আমার ঘরে এস, সমস্ত শুনবে।"

দুই জনে রাঙা পথটি ধরিয়া চলিল। কিছু দূরেই একটি ছোট দেয়াল দিয়া ঘেরা একখানি 'বাংলো।' প্রবেশ-পথের উপর লেখা আছে, "অনাথ-আশ্রম।" ভিতরে কতকগুলি খাট পাতা, আর তাহার উপর রোগীরা শুইয়া আছে। দূরে একটি ছোট টালির ঘর। অরুণা সেইটিকে দেখাইয়া বলিল, 'এস এই দিকে।' ঘরে চেয়ার পাতা ছিল—একটিতে শিশির বসিল।

অরুণা তখন বলিতে লাগিল:—"সে অনেক কথা, তোমায় সংক্ষেপে বলি। যে দিন তুমি চ'লে গেলে, আর এলে না, তার পর থেকে একটু একটু ক'রে বুঝলুম, কি গভীর পাপের পঙ্কে নামছিলুম আমি। আশ্চর্য্য হয়ো না, আমি সত্যিই শেষে বুঝলুম, আমার জীবনের গতি বিপথে চল্‌ছিল। আমি সেই দিন থেকে তাকে সুপথে আন্‌বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। এমন কি, ঈশ্বরের কৃপায় সফলও হয়ে এসেছি। পাপের পথে চলেছিলাম বটে, কিন্তু দেবত্বের আধার এই নারী-শরীর কলুষিত করিনি আজও। শিশির, হয় ত সেই দিন তোমায় ভালবেসেছিলুম—ঠিক সেই জন্যেই আজ আমি যে তোমার সুমুখে চেষ্টার সাফল্যে মণ্ডিত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, তাতে কত আনন্দ হচ্ছে। 'আমি যে তোমায়

ভালবেসেছি এক দিন, তার ঋণ কিসে শোধ হ'বে জান? তোমায় সৎপথে এনে।

"দেখ শিশির,' যে পথে চলেছ, তা'তে কখনও সুখ পাবে না; শেষে তার আছে অশেষ জ্বালা আর অসীম দুর্গতি। এখনও তা বুঝতে পারনি, কেউ বুঝিয়ে দেয়নি ব'লে। তুমি একটি বালিকাকে বিয়ে করেছ, সে কত কষ্ট পাচ্ছে তোমার জন্যে! তা'র প্রতি কি তোমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই? শুধু সে তোমার খেয়ালের জিনিষ? ছি ছি, এই মনের ভাব নিয়ে তা'র কাছ থেকে দেবতার আরাধনা পেতে চাও? তুমি তা'র প্রতি বাঁদী-চাকরাণীর মত ব্যবহার করবে, আর সে কি ক'রে তোমায় দেবতা ভাবে বল দেখি?

"তাকে ভালবাস কি? বোধ হয় বলবে, ভাল-বাসা আবার কি? জীবনটাকে এমন ভাবে চালিয়ে এনেছ যে, অনাবিল পুণ্যে, দেবত্বের মাধুর্য্যে মণ্ডিত প্রকৃত ভালবাসা যে কি, তা' বোঝবার সুযোগ এক দিনও পাও নাই। যে দিন তুমি সেই ভালবাসার আস্বাদ পাবে, দেখবে, তা'তে কি বিপুল সুখ, কি পরম শান্তি। দেবত্বে তোমার প্রাণ ভ'রে যাবে, তখন তুমি তোমার পরিণীতা স্ত্রীর কাছে দেবতার মতই পূজা পাবে। সে দেবত্বে কিছু স্পর্দ্ধা নাই, কিছু অন্যায় নাই। দেবতার মত যদি নিজেকে তৈয়ারী করতে পার, নারী তোমায় দেবতার পূজা সহজভাবেই দেবে। তখন তোমার সমস্ত তৃষ্ণা মিটবে। এখন যা'কে তৃপ্তির, চরিতার্থতার পথ ঠাউরেছ, সে কেবল অ-তৃপ্তিতে অ-চরিতার্থতায় ভরা। মরীচিকার পেছনে ছুটেছ—তৃষ্ণাকে চিনতে পারনি। সুধার স্বাদ পাওনি, আর এ রকমে কখনও পাবেও না।

"মদ খাওয়া ছাড়। জীবনের উচ্ছৃঙ্খল গতিতে শৃঙ্খলা আন, সংযত হও, আর স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও। সে বালিকাকে আর কষ্ট দিও না। সে-ই তোমার সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে আজীবন সহায় হ'বে; আর কেউ-ই কেউ নয়। তা হতেই অশেষ আনন্দ—অসীম শান্তি পাবে। ফিরে যাও তা'র কাছে, দেখবে, সে তা'র শ্রেষ্ঠ আনন্দের অঞ্জলি নিয়ে উন্মুখ-আশায় ব'সে আছে। কিন্তু এ সাধনা বড় কঠিন, শিশির! ঈশ্বরের কাছে আমি নিশিদিন প্রার্থনা করব, তুমি সফল হও।"

অরুণার কথা শেষ হইল। শিশির তখন জানালার কাছে সরিয়া গিয়াছে। দূরে—দূরে—ছোট লাল পথটি ঘুরিয়া যেখানে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিয়াছে, সেখানে কয়েকটা খেজুরগাছের মাথায় ফাঁকে একটি বিস্তৃত নীলিমার আঁচল ছোট ছোট তরঙ্গ-ভঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। শিশির সেই দিকে চাহিল। তাহার বুকের মধ্যে অরুণার স্বপ্ন-মাধুরী-ভরা অনুযোগের বাণী রিণ্ রিণ্ ধ্বনি করিতেছিল। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য তাহাকে ডাকিতেছিল—এস। মনের মধ্যে কোনখানে ফুলের মত সুরভি, রঙের মত সুষমা, তাহাকে ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিতেছিল। পবিত্রতার ছবি অমলা অলক্ষিতে যেন একটি শুভ্র কুসুম করপুটে লইয়া তাহাকে নিবেদন করিতেছিল—হঠাৎ তাহার সেই দিকে চোখ পড়িল!

* * * *

৬

পুরীর সে ঘটনার পর আরও পাঁচটি বছর চলিয়া গিয়াছে। শিশির আর এখন আগের মত নাই। অরুণার সেই অরুণ-বাণী তাহার হৃদয়ে পুণ্যের ছটা ছড়াইয়া দিয়াছে—সে সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কঠিন—বড় কঠিন। কিন্তু সমস্ত কাঠিন্য পরাজিত করিয়া সে আজ বিজয়ী বীরের আত্মপ্রসাদে ধন্য। সম্ভ্রান্ত জমীদার-পরিবারে লুপ্ত লক্ষ্মীশ্রী আবার সে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

* * * *

উপসংহার

অমলা এক দিন হঠাৎ শিশিরকে প্রশ্ন করিল, কিরূপে তাহার পরিবর্ত্তন হইল? হাসিতে হাসিতে শিশির বলিল, "শুনবে, অমু?"

সে দিন সে অরুণার কথা সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিরূপে তাহারা প্রথম পরিচিত হইয়াছিল, তাহাদের দুই জনের অবনতির পর অরুণার প্রাণপণ সাধনা, কি করিয়া সে নিজেকে উন্নত করিয়া তুলিয়া শেষে

শিশিরের হাত ধরিয়া তাহাকেও উপরে টানিয়া তুলিয়াছিল, সমস্ত কথাগুলি সুরের মত অমলার প্রাণটি ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

শিশির যখন অরুণার নিকট হইতে পুরীতে বিদায় গ্রহণ করার কথা বলা শেষ করিল, তখন অমলা আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, "চল না, একবার পুরী গিয়ে তাঁ'কে দেখে আসি।"

পুরীতে যখন তাহারা উপস্থিত হইল, অরুণা তখন 'অনাথ-আশ্রমের' সমস্ত ভার এক বিধবার হাতে দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

শ্রেষ্ঠ দান

রাজা চান মনোমত রাণী
যেবা আত্ম ভুলে,
তনু-মন দিতে পারে ঢালি
পতি-পদ-মূলে।
ছাড়ি রাজ-ভূষা, একা তাই
ভিখারীর বেশে,
রাণী অন্বেষণে নরপতি
যান দেশে দেশে।
ধনীর প্রাসাদে আসি রাজা
দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
বাতায়নে দেখি ধনিসুতা,
ডেকে কন তা'রে—
"হে কুমারি! দাও ভিক্ষা মোরে,
তব শ্রেষ্ঠ দান।"
মণি-মুকুতায় গর্ব্বময়ী
দিলো নাকো কান।
চলিলেন রাজা একে একে
কত দ্বারে দ্বারে,
চাহিলেন "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" কত
কুমারীর করে।
কেহ দেয় আনি ফল-মূল,
কেহ বা বসন,
আতপ-তণ্ডুল, কেহ আনে
রতন-ভূষণ।
ভিখারী বলিল, "চাহি নাকো
ধনরত্ন মান,
আমি চাহি শুধু জগতের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

আসিল ভিখারী শেষে এক
দরিদ্র-কুটীরে,
"কোথায় কুমারী, দাও ভিক্ষা,"
বলে ধীরে ধীরে।
গরীবের বালা ছিন্ন বেশে
আসিয়া বাহিরে,
দেখে এক অপূর্ব্ব ভিক্ষুক
দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
রূপসী কুমারী বলে "আমি
দরিদ্রের সুতা,
কায়ক্লেশে কাটে দিন, হায়!
ভিক্ষা পাব কোথা?"
ভিখারী গেল না তবু, পুনঃ
"ভিক্ষা দাও" বলে,
"কিবা ভিক্ষা দিব" ভাবি বালা,
ভাসে আঁখি-জলে।
"আমার বলিতে শুধু মোর—
আছে তনু-মন,
এই তুচ্ছ ভিক্ষাটুকু তুমি
কর গো গ্রহণ।"
বলিতে বলিতে বামা পড়ে
ভিখারী-চরণে,
বুকে তুলে লন রাজা তা'রে
সাদরে যতনে।
মুকুতার মত অশ্রু মুছি,
চুম্বি মুখখানি,
কন "রাজা আমি, আজ হ'তে
তুমি মোর রাণী।"

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পূজার তত্ত্ব

১

ভাদ্রের দ্বিপ্রহর। আশা জানালায় দাঁড়াইয়া উদাস-নয়নে চাহিয়া ছিল। পাশের বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খঞ্জনী বাজাইয়া এক জন ভিখারী গান ধরিয়াছিল,—

"গোষ্ঠে যাবে নীলমণি
সাজিয়ে দাও রাণী।"

পাশের বাড়ীর জানালায় একখানি তরুণ হাসিমুখ দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল—"কি ভাই, আজ এত দেরী যে?"

আশা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া বলিল, "আজ আমার এক খুড়-শাশুড়ী দেশ থেকে এসেছেন, তাই খাওয়া-দাওয়া মিটতেই বেলা গেল, এই বাসন মেজে রেখে আসছি, আজ আবার ঝিও আসেনি।"

পাশের বাড়ীর বধূটির নাম কমলা। কমলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি হ'ল ভাই তোমার যাওয়ার?"

আশা ম্লান, বিবর্ণ মুখে বলিল, "শাশুড়ী বলছেন, পূজার তত্ত্ব না দেখে পাঠাবেন না, আজ আমার ছোট বোনের চিঠি পেয়েছি। লিখেছে যে, মায়ের অবস্থা ভাল নয়।"

তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কমলা সহানুভূতির সহিত বলিল, "তোমার শাশুড়ীর মত এমন চামার, ভাই, আমি জন্ম ভোর—"

আশা শিহরিয়া ওষ্ঠে আঙ্গুল দিল। পাশের ঘরে কাহার পদ-শব্দ পাওয়া যাইতেছিল।

কথা ঘুরাইবার জন্য আশা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার যাওয়া কবে হ'বে?"

কমলার সুন্দর মুখখানি হাসির আভায় আরও সুন্দর হইয়া উঠিল, বলিল, "বাবা ত ২রা কি ৩রা আশ্বিন আসবেন। এবার পূজায় আর আমোদ হ'বে না, যাবার ত দিন চার পরেই পূজা।"

"আসবে কবে?"

"এবার আর শীগ্‌গির আসছি না, সেই অগ্রাণ মাস।"

আশা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সুশীলবাবু থাকতে দিলে ত?"

কমলা কৃত্রিম রোষে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভারী সাধ্যি, সে বরং তোমায় বলা যায়। এসে পর্য্যন্ত ত আর যেতে পাওনি।"

আশার এই জায়গাটিতেই একটা গোপন ব্যথা ছিল। দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সে বলিল, "যাই, ভাই, বিছানা ক'রে আবার উনানে আগুন দিতে হ'বে।" সে চলিয়া গেল।

২

আশার বিবাহ দেড় বৎসর হইল হইয়াছে। তাহার পিতা হরিপ্রসাদ বাবু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে থাকিতেন, সামান্য জমী-জমার আয়ে সংসার চালাইয়া তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ফলে ঋণগ্রস্ত হইয়া জমী কতক বেচিয়া আরও নিঃস্ব হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। আশা তাঁহার তৃতীয় কন্যা, এখনও একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা পিতা-মাতার বুকের রক্ত জল করিয়া ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহে বাড়িতেছিল অথচ হরিপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নী দিন দিন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইতেছিলেন।

আশার বিবাহের সময় দেনা-পাওনা লইয়া বরপক্ষের সহিত মনান্তর হইয়াছিল, তাহার পরই জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব গৃহিণীর মনোমত না হওয়ায় আশাকে আর পিত্রালয়ে যাইতে হয় নাই। আশার স্বামী যামিনীনাথ একটা না একটা অছিলা করিয়া আশাকে সর্ব্বদাই শুনাইত, তাহার শ্বশুর তাহাকে কি রকম ঠকাইয়াছেন, সে হেন স্বামী, তাই আশাকে লইয়া ঘর করে। অন্য লোক হইলে এমন কালপেঁচা লইয়া দুই দণ্ডও কেহ ঘর করিত না।

আশা শ্যামাঙ্গী। তাহার পিতা পাত্রপক্ষকে রূপের বদলে উপযুক্ত রৌপ্য-মূল্যও দিতে পারেন নাই। আশাকে এজন্য স্বামী, শাশুড়ী, ননদ, এমন কি, বাড়ীর ঝিয়ের নিকটও লাঞ্ছনা সহিতে হইত। বাঙ্গালার হতভাগিনী মেয়ের চোখের জল ছাড়া আর কোনও সম্বল নাই। আশার ভাগ্যেও বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। পিতা-মাতার যদিও অজানা ছিল না, তবু সে নিজ হইতে পিতা-মাতাকে কিছুই জানাইত না। জানিলেই বা তাঁহারা কি করিবেন? ঋণগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত পিতা-মাতা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কোনওরূপে দিনযাপন করিতেছিলেন, তাহার উপর আবার একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে গলায়। মা চোখের জল চাপিয়া বুকভরা ব্যথা লইয়া এবার যে শয্যাশায়ী হইয়াছেন, আর তাহা হইতে উঠিবার আশা নাই। আশার একমাত্র ব্যথার ব্যথী পাশের বাড়ীর বধূ কমলা তাহাকে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিত, আর এই হতভাগিনী বধূর প্রতি অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া সমবেদনার ব্যথায় তাহার মন ভরিয়া উঠিত। তাহারা পরস্পর জানালা দিয়াই কথা কহিত, কারণ, কমলার শ্বশুররা মস্ত ধনী, তাঁহাদের বাড়ীর বধূর পাশের বাড়ীর দরিদ্র গৃহে যাইবার অধিকার ছিল না। আশার শাশুড়ী সর্ব্বদাই কমলার শাশুড়ীর নিকট যাইতেন, অবশ্য বধূকে যাইতে দিতেন না। এই সম-বয়স্কা তরুণী দুইটি দ্বিপ্রহরের অবকাশসময়টিতে অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যও পরস্পরকে দেখিয়া দুইটা কথা বলিয়া যাইত। আশার অবশ্য অবসর একান্তই কম ছিল; সংসারে মাত্র একটি ঠিকা ঝি, সে-ও আবার মাসে পাঁচ সাতদিন কামাই করিত। কাযেই আশার অবকাশ কম, তবে এই সময়টিতে গৃহিণী ও আশার বিধবা ননদ দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেন, তাই রক্ষা। গৃহিণী বধূর সর্ব্বপ্রকারে লাঞ্ছনা করিলেও কমলার সহিত কথা কহিতে বারণ করিতেন না, কারণ, তিনি অনেক রকমে কমলার শাশুড়ীর অনুগ্রহপ্রার্থিনী ছিলেন। আর কমলাও শাশুড়ীর কন্যাধিকা ছিল। তাই তিনি উভয়ের ক্ষণিক বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিতে সাহস করিতেন না।

৩

আশা কলতলায় বসিয়া মাছ কুটিতেছিল। "কই গো, দিদিমণি কোথায়" বলিয়া তাহার বাপের বাড়ীর মালতী গোয়ালিনী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। আশা চকিত-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া মালতীর নিকট আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন, মালতী দিদি?"

মালতী মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া রকে রাখিয়া একটা ক্লান্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর মা, তার শরীলে আর কিছু আছে? কা'ল তার দাঁত দিয়ে নাকি আধসের রক্ত পড়েছে শুনে এয়েলাম, উত্তরপাড়া থেকে হরেন ডাক্তারকে তোমার বাবা কা'ল নিয়ে গেছ্‌ল,'ত সে বলেছে নাকি যে, ম্যালেরি আর নয়-সেই

চা-বাগানের কি জ্বর বলে, তাই। মাগী বিছানায় ধুকছে, তবু আমার আসবার সময় শতেক বার বল্লে, 'আমার আশা কেমন আছে, দেখে আসিস্. আর হাত জোড় ক'রে তার শাশুড়ীকে বলিস্, আমাদের যা কিছু দোষ, ক্ষমা ক'রে যেন আশাকে দু'টি দিনের জন্যও পাঠান'।"

তপ্ত অশ্রুধারা আঁচলে মুছিয়া আশা বলিল, "মায়ের দেখা-শুনা কে কচ্ছে? নীহার কি পারে?"

"ও-মা, সে এখন মস্ত গিন্নী হয়েছে, দিদি, সেই ত সব করে, তা তোমার শাশুড়ী ননদ সব কোথা গো?"

আর বলিতে হইল না, ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়াই শাশুড়ী দেখিলেন, বউ বাপের বাড়ীর লোকের সহিত কথা কহিতেছে, এ দিকে কোটা মাছ বিড়ালে খাইতেছে। ক্রোধে তাঁহার মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বলি কি গো বড় মানুষের মেয়ে, বাপের বাড়ীর ঝিএর সঙ্গে ত খুব গল্প হচ্ছে, এ দিকে যে বেড়াল মাছগুলো খেয়ে গেল; বলি সেগুলো কি তোমার বাপের বাড়ী থেকে এসেছে?"

যামিনীনাথ কোনও সওদাগরী আপিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার কেরাণী, তিনি স্নানার্থ কলতলায় আসিতেছিলেন। মাতার মুখে উপরি-উক্ত মন্তব্য শুনিয়া তিনিও বক্রকটাক্ষে একটা কটূক্তি করিয়া চলিয়া গেলেন। আশা অপরাধিনীর ন্যায় শুষ্কমুখে মাছগুলার নিকট বসিয়া পড়িল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, প্রাণপণে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে মালতীর সম্মুখে প্রবাহিত অশ্রুবেগ সংবরণ করিল।

মালতী বেচারী অবাক্ হইয়া বসিয়া ছিল, গৃহিণী গম্ভীর হইয়া নিকটে আসিয়া শ্লেষ-চাপা তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "কই, কি তত্ত্ব পাঠিয়েছেন রাজা বেহাই, বা'র কর না, গেল বছরের মতই বোধ হয় এসেছে।"

মালতী ঝুড়ি হইতে যাহা বাহির করিল, তাহা নিকৃষ্টই বটে। তুলনায় গত বৎসরের তত্ত্ব ভালই ছিল। গৃহিণী ক্রোধে জ্বলিয়া বলিলেন, "ফিরিয়ে নিয়ে যাও গো তোমাদের তত্ত্ব, যামিনী আমার বেঁচে থাক, অমন ঢের তত্ত্ব পাব।"

মালতী দুই হাত যোড় করিয়া বলিল. "মা-ঠাকরুণ, এই পাঠাতেই তাদের জিভ বেরিয়েছে, মা মাগী মরছে, তা ঔষধ-পথ্য জুটছে না, এ যদি ফেরত দেন ত মা ঠাকরুণ আর বাঁচবে না।"

গৃহিণী তেমনই ভাবেই বলিলেন, "মেয়ে-জামাইকে দেবার বেলাই মা মাগী মরে। যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হ'ত, তা হলে কি এই দু'খানা হেটো কাপড় আর একথালা চিড়ের না খইয়ের মোয়া দিয়ে পাঠাতে পারত? যাও যাও, মায়া-কান্না না কেঁদে বেরিয়ে যাও। মা গো, এমন চামার ত কখনও দেখিনি, আমার একটা ছেলে, তা তার বিয়ে দিয়ে আমি সাধ মিটিয়ে আমোদ আহ্লাদ কিছু করতে পেলাম না।"

মালতী আরও বহুক্ষণ অনুনয় করিল, গৃহিণীর রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে চলিল এবং তাঁহার বিধবা কন্যাও আসিয়া যোগ দেওয়াতে মালতী ঝুড়ি উঠাইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া আশাকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল। কি করিয়া যে সেই দরিদ্র দম্পতিকে এই কাহিনী বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

৪

যামিনীনাথ আহারে বসিতেই মাতা শত রকমে ব্যাখ্যা করিয়া চামার বৈবাহিকের কাহিনী পুত্রের কর্ণগোচর করিলেন। যামিনী সবই শুনিয়াছিল এবং মায়ের উপর একটু অসন্তুষ্টও হইয়াছিল, কারণ, পূজায় নিজ হইতে কাপড় কেনা তাহার অসাধ্য। শ্বশুর চামারই হউক বা মুচিই হউক, তাহার তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। কাপড় জামা যে বাড়ী আসিয়াও হস্তগত হইল না, ইহাই আক্ষেপ।

শ্বশুর যে আবার কাপড় পাঠাইবেন, ইহাতে যামিনীর গভীর সন্দেহ ছিল। কারণ, আশার সব চিঠিই তাহার অগোচরে সে পড়িত, প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই তাঁহাদের দুরবস্থার কথা থাকিত। তাই মায়ের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া যামিনী বলিল, "তোমার জ্বালায় আমি আর লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারব না, চারিদিকে ধার, নতুন কাপড় জামা কেনবার পয়সা নেই। ও সব ফেরত দিতে গেলে কি জন্যে?"

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "তোর শ্বশুরের উপর যদি অতই দরদ ত এসে রেখে দিলেই পারতিস।"

যামিনী আরও বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি শ্বশুরের উপর দরদের জন্যই বল্‌ছি বটে, মেয়েমানুষের কথা যে শোনে, সে মানুষই নয়!"

গৃহিণীর মেজাজ একেই উগ্র হইয়া ছিল, পুত্রের কথায় আরও উগ্র হইয়া উঠিল। ফলে কয়েকটা কটু-কাটব্য শুনিয়া যামিনী ভাত ফেলিয়া চলিয়া গেল। গৃহিণী গলা সপ্তমে চড়াইয়া ছোটলোক বেহাই ও তাহার কন্যাকে প্রাণ ভরিয়া গালি-গালাজ করিয়া শান্ত হইলেন। আশার কানে আজ আর কোনও শব্দই পৌঁছিতেছিল না, তাহার প্রাণ আকুল হইয়া সেই অনতিদূর গ্রামের একখানি ভগ্ন কুটীরের পাশে ঘুরিতেছিল। সেখানে তাহার মা মৃত্যুপথ চাহিয়া পড়িয়া আছে! সংসারের কায না করিলে নয়, তাই প্রাণের অশান্ত ব্যথা চাপিয়া সে কায করিতেছিল।

বৈকালে কমলা ডাকিয়া বলিল, "ভাই, আমি আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছি, গিয়ে চিঠি দেব, উত্তর দিও কিন্তু।"

আশা ম্লানমুখে বলিল, "তুমিও চল্‌লে?"

কমলা আজিকার ঘটনা সবই জানিত। তাই সমবেদনায় তাহার কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দ বাহির হইল না। কি সান্ত্বনা সে দিবে? নিজে সর্ব্ব সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী হইয়া দুর্ভাগিনী সখীকে কোনও উপদেশ দিতে ইচ্ছা তাহার হইল না। বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

৫

বিজয়া-দশমী। বাঙ্গালা দেশের প্রধান উৎসব এ বৎসরের মত শেষ হইয়া গেল। সকলেই বিসর্জ্জন দেখিয়া বাড়ী বাড়ী প্রণাম করিয়া ফিরিতেছে। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, যামিনীনাথের প্রতীক্ষায় আশা নিজের ঘরে জানালায় বসিয়া ছিল। শাশুড়ী ও ননদিনী পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন।

আজ নীহার কাঁদিয়া চিঠি লিখিয়াছে, "মায়ের ফিট হচ্ছে, তোমাদের দেওয়া জিনিষ সবই ধারে কেনা হয়েছিল। দোকানী নিয়ে গেছে, বাবার আর কোনও সাধ্য নেই যে, আর কিছু দেন। জামাইবাবুর হাতে পায়ে ধ'রে একবার মা'কে দেখা দিয়ে যাও।"

আশা চিঠিখানি লইয়া বসিয়া ছিল। আজ স্বামীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিবে। সেই দিন হইতে যামিনী আর তাহার সহিত কথা কহে নাই।

নীচে দরজায় আওয়াজ পাইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। যামিনী টলিতে টলিতে উপরে উঠিয়া কাপড়-চোপড় না ছাড়িয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। খুব সিদ্ধি এবং বোধ হয়, আরও কিছু খাইয়াছিল।

আশা মৃদু স্বরে বলিল, "ভাত খেলে না?"

যামিনী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "খাব না," আজ তাহার আশার উপর মর্ম্মান্তিক রাগ হইয়াছিল।

বন্ধুরা সকলেই নূতন কাপড়-জামায় সজ্জিত হইয়া আমোদ করিয়াছে। আর তাহার শ্বশুর কাপড় ফেরত পাইয়া, না টাকা না কাপড় পুনরায় কিছুই পাঠাইল না। অনুপস্থিত শ্বশুরের উপর উদ্যত রাগটা উপস্থিত শ্বশুর-কন্যার উপরই নিপতিত হওয়া সঙ্গত !

আশা নিকটে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া স্বামীকে প্রণাম করিতে গেল। যামিনী চমকিত হইয়া বলিল, "থাক্ থাক্, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ; যেমন চোর তোমার বাপ তেমনই তুমি।"

আশা কাঁদিয়া তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "ওগো, আমায় যা বলো বল, আমার বাপকেও কি তুমি এমন ক'রে বল্‌বে ? এই চিঠি দেখ, তাদের কি অবস্থা।"

যামিনী সজোরে পা ছাড়াইয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "অবস্থা আমারই বড় ভাল, যার অবস্থা ভাল নেই, তার আবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া কেন ?" একটা অশ্রাব্য কটু কথা বলিয়া সে শুইয়া পড়িল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইল। স্বামী পা ছাড়াইতে যাওয়ায় আশার মাথায় খুব জোরে একটা জুতার ঠোক্কর লাগিয়াছিল। ব্যথিত হৃদয়ে কপাল চাপিয়া জানালায় গিয়া সে বসিয়া পড়িল, অবিরল অশ্রু-ধারায় তাহার বক্ষ ভাসিতেছিল। রাস্তায় তখন কে গাহিয়া যাইতেছিল,—

"এ নহে গো তৃণদল
ভেসে আসা ফুল-ফল
এ যে ব্যথা-ভরা প্রাণ মনে রাখিও।"

শ্রীমতী মণিমালা দেবী।

আবাহন

আজি মা জননী বিশ্বমাঝারে রচিতে উচ্চ আসন তোর
অযুত পরাণ মিলেছে আসিয়া ত্যজিয়া তা'দের ঘুমের ঘোর
সন্তান আজ চিনেছে তোমারে, জেনেছে তোমার দুঃখ ক্লেশ
শতেক কণ্ঠে ডাকিছে তোমারে না করি পরাণে ভয়ের লেশ
এসেছে আবার সে দিন আজি রে শত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

২

তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি সবে ছুটিব নিখিল বিশ্ব'পরে
ঘোষিব সঘনে তোমার মহিমা গর্ব্বেতে শির উচ্চ কোরে
ঘুচা মা মোদের ভোগের লালসা ত্যাগের মন্ত্র কর মা দান
শিখা মা অবোধ সন্তানে তোর পরের লাগিয়া ত্যজিতে প্রাণ
এসেচে আবার সে দিন আজি রে শত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

৩

সন্তান তোর করে না'ক ভয় ত্যজিতে তাদের তুচ্ছ প্রাণ
যদি মা জননী ও চরণরেণু দয়া কোরে শিরে করিস্ দান
আদেশ কর মা সন্তানে তোর মুছাতে মা ওই নয়ন নীর
ছুটুক পলকে বিশ্বের মাঝে মাতৃভক্ত অযুত বীর
এসেছি আবার সে দিন আজি রে শত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

৪

একদা তোমার আসন গড়িতে ত্যজেছে পরাণ প্রতাপ-বীর
ধন্য করেছে স্বদেশ তাহার ধন্য করেছে কমলমীর
ঘোষিতে জগতে মায়ের মহিমা বালক-বাদল দিয়েছে প্রাণ
পৃথ্বী ত্যজেছে জীবন তাহার রাখিতে তোমার অটুট মান
এসেছে আবার সে দিন আজি রে কত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

বল্ মা জননী কি করিলে তোর মুছাতে পারি মা অশ্রু-নীর
দুঃখ তাহার আছে কি জননী সন্তান যার অযুত বীর
ইঙ্গিত কর সন্তানে তোর মথিতে অরাতি ভীষণ বেগে
দেখি সে দৃশ্য কাঁপুক বিশ্ব, রুদ্রেরও প্রাণ উঠুক কেঁপে
এসেছে আবার সে দিন আজি রে কত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

[illegible]

বঙ্কিম কবি সত্যেন রবি রচিল তোমার মহিমা-গান
তিলক জাপিল তোমার মন্ত্র তুচ্ছ করিয়া নিজের প্রাণ
তা'দের জননী তুই ন: গো মা, তুই না মা সেই তীর্থভূমি
অযুত কণ্ঠে বন্দি তোমারে কোটি যোড়করে চরণে নমি
এসেছে আবার সে দিন আজি রে কত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

৭

আয় সব ছুটে ভক্ত পরাণ অর্ঘ্য তোদের লইয়া করে
ঢাল্ রে সকলে অর্ঘ্য যতনে পূজ্যা মায়ের চরণ'পরে
মিটে যাক্ আজ রেষারেষি সব ভুলে যা রে আজ হিংসা-দ্বেষ
ছুটে আয় ওরে যতেক ভক্ত ঘুচাতে মায়ের দুঃখ-ক্লেশ
এসেছে আবার সে দিন আজি রে কত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

৮

ঘুচাতে মা তোর দুঃখ-দৈন্য রাখিতে মা তোর লজ্জা-মান
শ্রীচরণতলে মিলেছে আজিকে শতেক তরুণ ভক্ত-প্রাণ
বারেকের তরে দেখ মা চাহিয়ে আশীস্ কর মা পরাণ ভ'রে
যেন এ নিখিল বিশ্বমাঝারে শ্রেষ্ঠা করিতে পারি মা তোরে
এসেছে আবার সে দিন আজি রে কত কোটি যুগ যুগের পরে
ধন্য হইবে সন্তান যত পূজিয়া আবার জননী তোরে।

শ্রীগুরুদাস রায়।

১

"বাবা!"

যোগেন্দ্রনারায়ণ স্তব্ধভাবে একখানি বিবর্ণ, হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, কন্যার আহ্বান প্রথমটা শুনিতে পাইলেন না।

নীলিমা চায়ের পেয়ালাটা পিতার সম্মুখস্থ একটা ছোট, বিগতশ্রী টিপয়ের উপর রাখিয়া এক বাটি গরম মুড়ি আগাইয়া দিল।

উদ্গতপ্রায় অশ্রুকে কোনও মতে ফিরাইয়া দিয়া সে শান্ত কণ্ঠে বলিল, "বাবা, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

প্রত্যহই চা অথবা অন্য আহার্য্য পিতাকে পরিবেষণ করিবার সময় নীলিমাকে এমনই ভাবে আত্মসংবরণ করিতে হইত। যাঁহার বাড়ীতে নিত্য উৎসব—প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল, বিবিধ উপাদেয় ভোজ্য যাঁহার পাতে প্রতিদিন নষ্ট হইত—যাঁহার দাসদাসীরাও রাজভোগে বঞ্চিত ছিল না, আজ তাঁহাকে চায়ের সঙ্গে মুড়ি চিবাইতে হয়, অতি সামান্য উপকরণযোগে দুই বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়, ইহা নীলিমার পক্ষে কত মর্ম্মান্তিক, তাহা সে ছাড়া অন্যে বুঝিবে কিরূপে?

চায়ের পেয়ালা ও মুড়ি লইয়া প্রৌঢ় প্রসন্ন মনে প্রাভাতিক জলযোগে অবহিত হইলেন। কন্যার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মা নীলু, তুমি চা খেয়েছ?"

নত দৃষ্টিতে মৃদু হাসিয়া নীলিমা বলিল, "চা ত আমি আর খাইনে, বাবা। অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।"

"বটে!—কেন খাও না, মা?"

ইদানীং সংসার প্রতিপালনের চেষ্টায় যোগেন্দ্রনারায়ণকে এমনই পরিশ্রম করিতে হইত যে, সংসারের একমাত্র বন্ধন কন্যার সম্বন্ধে সংবাদ রাখিবারও তাঁহার অবকাশ ছিল না। বিশেষতঃ অবস্থাবিপর্য্যয়ের পর মনের সঙ্গে তাঁহাকে এমন কঠোর সংগ্রাম করিতে হইতেছিল যে, অভ্যস্ত নিত্যকর্ম্মগুলি সম্পাদনেও তাঁহার অনেক সময় ভ্রম হইত।

নীলিমা অত্যন্ত সহজভাবে, মৃদু স্বরে বলিল, "চা ত ঢের খেয়েছি, বাবা, এখন দিনকতক না খেয়ে দেখছি, থাকা যায় কি না। চা ছেড়ে দিয়ে আমি বেশ আছি, বাবা।"

পিতা চুপ করিয়া গেলেন। গৃহিণী যখন সংসারের সকল প্রকার সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে হঠাৎ এক দিন অজ্ঞাত রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিলেন, সেই সময় হইতেই যোগেন্দ্রনারায়ণ গৃহিণীর প্রতিচ্ছবি এই নীলিমাকে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাছছাড়া করিতেন না। অতুল ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে ধ্রুবতারার মত এই কন্যা তাঁহাকে পথ দেখাইত। কন্যার হৃদয়ের প্রত্যেক কথাটি তিনি তাহার মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। নীলিমা সকল রকমে তাহার মাতার মত হইয়াছিল, অধিকন্তু সে অপ্সরোনিন্দিত অতুলনীয় মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী ছিল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ সুদূর পল্লী-অঞ্চলের লোক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষার চাপরাশ পাইয়াও তিনি গোলামখানায় গোলামী করিতে যায়েন নাই। নিজের চেষ্টায় প্রথমতঃ দালালী করিয়া পরে কয়লার খনির মালিক হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ে তিনি নাম, যশ ও অর্থ সবই লাভ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন যোগেন্দ্রনারায়ণের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ যে যুগের মানুষ এবং যেরূপ শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাতে রূপ ও রৌপ্যের মোহ তাঁহার জীবনকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাই বাহিরের

রূপের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তিনি শ্যামাঙ্গী কৃষ্ণভাবিনীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

সংসার বেশ' সুখেই চলিতেছিল. কলিকাতার মধ্যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, গ্যারেজে 'রোল্‌স্ রয়েস্' মোটর, ল্যাণ্ডো; বাড়ী-ভরা দাসদাসী, আত্মীয়-পরিজন; প্রায় প্রত্যহই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-পরিজন লইয়া আনন্দোৎসব, ভোজ। কুমারী নীলিমা প্রিয়-দর্শনা—গৌরাঙ্গী না হইলেও তাহার অমরা-লাঞ্ছিত কণ্ঠ-স্বরে আকৃষ্ট হইয়া উপাসক যুবকদলের নিত্য সমাগম ঘটিত। যোগেন্দ্রনারায়ণ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ রাখিয়া কন্যাকে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতে দক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। খেয়াল, কীর্ত্তন গান তাহার কণ্ঠ হইতে যেন অমৃত বর্ষণ করিত। প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিবাহসভায় অথবা উৎসবক্ষেত্রে নীলিমার নিমন্ত্রণ হইত। তাহার গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পিতামাতা মনে করিতেন, রূপ না থাকিলেও কন্যার কণ্ঠস্বর এবং ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের জোরে নীলিমার জন্য সুপাত্রের অভাব হইবে না। কার্য্যতঃ ঘটিয়াছিলও তাহাই। যোগেন্দ্রনারায়ণের অর্থ, প্রতিষ্ঠা এবং নীলিমার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া হাইকোর্টে নাম-লিখান অনেক নবীন ব্যারিষ্টার শুধু তাহাদের যৌবন ও রূপের মূলধন লইয়া সর্ব্বদাই যোগেন্দ্র-ভবনে গতায়াত করিত, মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় গুন্ গুন্ রবে নীলিমার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। দলের মধ্যে রমেশই ছিল অগ্রণী। দুই বেলা সে নিয়মিতভাবে নীলিমার কাছে হাজিরা দিত—জল-ঝড়, ভূমিকম্প কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে নাই।

কোনও পক্ষ হইতে পাকাপাকি কোন কথা না হইলেও বাহিরের সকলেই মনে করিয়াছিল, ভাগ্যবান্ রমেশই যোগেন্দ্রনারায়ণের জামাতার পদ পূর্ণ করিবে।

অকস্মাৎ এক দিন কৃষ্ণভাবিনী সকলকে কাঁদাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। শোকমুহ্যমান যোগেন্দ্র-নারায়ণ কায-কর্ম্ম দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। বৎসর-খানেক পরে কয়লার খনির মালিকান স্বত্ব লইয়া অকারণ এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণ শোক বিস্মৃত হইয়া নিজের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিল। দুই বৎসর ধরিয়া মোকর্দ্দমার পর হাইকোর্টে যোগেন্দ্রনারায়ণ হারিয়া গেলেন।

সঞ্চিত অর্থ পূর্ব্বেই উড়িয়া গিয়াছিল। মোকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঋণও হইয়াছিল। সর্ব্বস্বান্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ বসতবাটী, বাগানবাড়ী প্রভৃতি বেচিয়া ঋণমুক্ত হইলেন। প্রিভিকাউন্সিলে চরমফল কি হয়, দেখিবার জন্য আপীলও হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বরিক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণের তখন মাথা গুঁজিবারও স্থান পর্য্যন্ত নাই।

কবির ভাষায় তখন —"বন্ধুগণ যত স্বপ্নের মত, বাসা ছাড়ি দিল ভঙ্গ!"

নীলিমার সুকণ্ঠ—অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠের অমৃতস্রাবী সঙ্গীত শুনিবার শ্রোতারও ক্রমে অভাব ঘটিল।

নীলিমার অনুরক্ত ভক্ত রমেশচন্দ্র যে কোনও দিন কোনও অজুহতেই যোগেন্দ্রনারায়ণের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণে উৎসাহহীনতা প্রকাশ করে নাই, তাঁহার ঘোর দুর্দ্দশার সঠিক সংবাদ লইতে আসিয়া সে-ও নীলিমার সেই দিনের চায়ের নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কোনও জরুরী কার্য্যের প্রয়োজনে তখনই তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে—সুতরাং সংক্ষেপে মৌখিক ধন্যবাদ জানাইয়া সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

সহরের নির্জ্জনতম অংশে, একটি ছোট একতল বাড়ী ভাড়া লইয়া পিতাপুত্রী সমাজের সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রথম যৌবনের অবলম্বিত দালালী করিয়া প্রৌঢ় যোগেন্দ্রনারায়ণ দুইটি প্রাণীর জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন। কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিখাইয়া কিছু অর্থোপার্জ্জন করা যায়, নীলিমা পিতার নিকট সে প্রস্তাবও করিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বরকমে রিক্ত, দরিদ্র হইলেও যোগেন্দ্রনারায়ণ আভিজাত্যের মর্য্যাদাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই কন্যার এই প্রস্তাব সঙ্গত হইলেও তিনি তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই।

চা-পানরত যোগেন্দ্রনারায়ণের মনে গত জীবনের ঘটনাগুলির স্মৃতি বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্যপটের মত জাগিয়া উঠিল। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসকে তিনি চাপিয়া

চাপিয়া বাহির হইতে দিলেন। পাছে নীলিমা তাঁহার গোপন ব্যথাটি বুঝিতে পারে!

২

শ্রান্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ আজ একটু আগেই শয্যায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। মেঘ-মেদুর আকাশপথে সন্ধ্যা হইতেই বর্ষার ধারা নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাতাসের বেগও ছিল। সারা রাত্রির মধ্যে দুর্য্যোগের অবসান হইবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁহার ক্লান্ত দেহ নিদ্রার কোমল আলিঙ্গনে সহজেই আত্মসমর্পণ করিল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলেন, স্মরণ নাই, হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আকাশে ঘন ঘন বজ্রনাদ হইতেছিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, বাতাসের শব্দেই কি তাঁহার গাঢ় নিদ্রা অন্তর্হিত হইয়াছিল? তিনি ত বিপ্লবের মাঝখানেই সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন! তবে?—

পাশের ঘরে ও কিসের শব্দ? প্রকৃতির এই সংহারিণী অট্টহাসিকে উপেক্ষা করিয়া কাহার অঙ্গুলির আঘাতে এস্রাজের বক্ষ মথিত করিয়া বৈরাগ্যের উদাস রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে? নীলিমা, তাঁহারই আদরিণী, জীবনাধিকা কন্যা এত রাত্রিতে যন্ত্রযোগে কাহার ধ্যান-মূর্ত্তি সঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিতেছে?

কন্যার কণ্ঠে যোগেন্দ্রনারায়ণ নানা রাগরাগিণীর বিচিত্র আলাপ শুনিয়াছেন। তাহার কোমল অঙ্গুলির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ চেতনাহীন, জড়বৎ যন্ত্রের ভিতর হইতে কত অপূর্ব্ব মোহন সুরের লীলাতরঙ্গ তুলিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়াছে; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আজিকার এই গভীর বাদল-নিশীথে রাগিণীর ধ্যানে আত্মহারা কন্যার এমন উদাস করা সুর তিনি ত আর কখনও তাঁহার কর্ণে শুনেন নাই! সুপ্ত আত্মা যেন নিত্য চৈতন্যের অনুভূতিলাভে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহারই বন্দনাগানে আপনাকে ধন্য করিতেছে!

পিতা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে কন্যার ঘরের মুক্তদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোক জ্বলিতেছে। ভূমিতলে বসিয়া নীলিমা নিমীলিত নয়নে এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছে। সাধনরতা ভৈরবীর ন্যায় সে সমাসীনা। তাহার আত্মা ও মন তখন কোন মাধুর্য্য ও তৃপ্তিভরা কল্পলোকে বিচরণ করিতেছিল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া জীবনাধিকা স্নেহপাত্রী কন্যার ঐন্দ্রজালিক যন্ত্রালাপ শুনিতে লাগিলেন, পাছে দ্রুত নিশ্বাসের শব্দে তাহার ধ্যানভঙ্গ হয়! কিন্তু তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই গভীরহৃদয়া, সেবাপরায়ণা, স্নেহ-মমতা করুণার আদর্শরূপিণী কন্যা, নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াও, শুধু দৈহিক রূপের অভাবের জন্য আজ মনুষ্যসমাজে উপেক্ষিতা! পুরুষ আজ চাহে শুধু বাহিরের রূপ?—অন্তরের কোনও মূল্য নাই? আর কি চাহে?—অর্থ!

প্রৌঢ় যোগেন্দ্রনারায়ণের হৃদয় ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিল। আজ কি অসমর্থ পিতা তিনি! তাঁহার এখন এমন সামর্থ্য নাই যে, কন্যাকে কোনও সুপাত্রে অর্পণ করেন।

নীলিমা দিন দিন যেন অন্তরে অন্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। শেষে কি কন্যা সন্ন্যাসিনী সাজিবে? ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি পূর্ব্বে তাহার ত এমন নিষ্ঠা ছিল না! যে সামাজিক জীবনের আবেষ্টনে সে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে ধর্ম্মমতকে এত দিন মানিয়া চলিয়াছিল, এখন তাহাকে সে অবজ্ঞা করে না সত্য; কিন্তু তাহা ছাড়াও আরও কিছু জানিবার স্পৃহা যোগেন্দ্রনারায়ণ নীলিমার মধ্যে জাগ্রত হইবার প্রমাণ পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু কন্যার মধ্যে নিস্পৃহতা, সকল বিষয়ে ঔদাসীন্য, পরিচিত জীবনযাত্রার প্রতি উপেক্ষা, বিশেষতঃ এই বয়সেই এমন ভাবের বৈরাগ্য—না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। প্রৌঢ়ের হৃদয় যেন কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার আর কেহ নাই, কন্যাকে তিনি সংসারী দেখিয়া সুখী হইতে চাহেন।

পিতা অবসন্নহৃদয়ে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। দরদর ধারে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু গলিয়া পড়িতে লাগিল। যখন অর্থ-বিভব ছিল, সেই সময় কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেই ভাল হইত; নীলিমার মতামত না শুনিলেই চলিত। পিতাকে একা রাখিয়া এখনই সে

সংসারী হইতে চাহে না ; এই আপত্তিতে তখন তিনি কর্ণপাত না করিলেই পারিতেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ শয্যার উপর উপুড় হইয়া মথিত-হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

৩

ঋষি বলিয়াছেন, পুরুষের ভাগ্য দেবতারও জ্ঞানের অগোচর। বর্ত্তমান দেখিয়া কোনও মানুষের সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাস দেওয়া মনুষ্যশক্তির অতীত। কথাটা সকলের পক্ষে সকল সময়ে প্রযোজ্য কি না, জানি না ; কিন্তু ঋষি-বচন যোগেন্দ্রনারায়ণের সম্বন্ধে অব্যর্থ হইয়াছিল। প্রৌঢ়বয়সে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে তিনি দারিদ্র্যের যে স্তরে নীত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি যে আর কখনও প্রাচুর্য্য ও সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইবেন, তাঁহার আত্মীয় ও পরিচিত কেহই তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এক দিন সকলে জানিতে পারিলেন যে, ভাগ্য-বিড়ম্বিত যোগেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে মোকর্দ্দমা জিতিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট হইতে মোকর্দ্দমার বিপুল ব্যয়ের সমস্ত টাকা ডিক্রীর সাহায্যে আদায় করিয়া লইয়াছেন। এই কয়েক বৎসর যাহারা তাঁহার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল, এই আকস্মিক সৌভাগ্যলাভের সংবাদে তাহাদের মধ্যে নবোদ্যমে পূর্ব্বপ্রীতি জাগিয়া উঠিল। অযাচিতভাবে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার সংবাদ লইতে বিস্মৃত হইল না।

যোগেন্দ্রনারায়ণ নূতন উদ্যমে ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অটুট ছিল। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিবার যে সকল গুণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। অল্পদিনের চেষ্টায় তিনি পুনরায় ব্যবসায়িসমাজে আপনার স্থান করিয়া লইলেন।

সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রনারায়ণ আবার নূতন বাড়ী তৈয়ার করাইলেন। পূর্ব্বগৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবার তিনি কায়মনোবাক্যে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার স্বর্ণ-ঝাঁপি খুলিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণের শিরে আবার আশীর্ব্বাদের ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার সবই ফিরিয়া আসিল, শুধু কয়েক বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল। অভিজ্ঞতার চশমা দিয়া তিনি জগৎটাকে সাবধানে দেখিতে লাগিলেন।

কিন্নরী-কণ্ঠী নীলিমার আদর আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। নানা সভাসমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠানে তাহাকে গান গাহিবার জন্য চারিদিক হইতে অনুরোধ উপরোধ আসিতে লাগিল ; কিন্তু নীলিমা তাহাতে টলিল না। মিষ্ট কথায় একটা না একটা অজুহত দেখাইয়া সে সকল প্রকার অনুষ্ঠান হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া রাখিল। গৃহে একা অবসর-কালে সে অনেক সময়ই সঙ্গীতচর্চ্চায় মগ্ন থাকিত, কিন্তু কেহ গান শুনিতে চাহিলে সে এমনই ভাবে কোন একটা কায লইয়া পড়িত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রোতার কর্ণপরিতৃপ্তির সুযোগ ঘটিত না।

যে সকল যুবক পূর্ব্বে অনুরাগ ও উপাসনার অভিনয়-কলার নৈপুণ্য দেখাইয়া নীলিমার ও তাহার পিতা-মাতার মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বদা গতায়াত করিত, তাহা-দের মধ্যে কেহ কেহ অন্যত্র দাম্পত্য-বন্ধনের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিল। যাহাদের সে সুযোগ এই কয় বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই, তাহারা আবার আত্মীয়তা জানাইবার জন্য যোগেন্দ্রনারায়ণের গৃহে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র তাহাদের অগ্রণী। সে হাইকোর্টে তখনও পূর্ব্ববৎ অধিকাংশ সময় বার লাইব্রেরীতে বসিয়া তাহারই মত পসারওয়ালা নবীন ব্যবহারাজীবদিগের সঙ্গে গল্প-গুজব করিয়া কাটাইত। জীবনসঙ্গিনী নির্ব্বাচনেও প্রজাপতি তখনও তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন নাই। সুতরাং উপাসকদিগের মধ্যে রমেশই সর্ব্বাগ্রে রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদা পিতাপুত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ কলাকৌশলের অভিনয় করিতে বিরত হইত না।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কন্যাকে এইবার সুপাত্রে অর্পণ করিবেন। তাঁহার আদরিণী দুলালীকে আর এমনভাবে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে দেওয়া হইবে না। সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে নিজের কাছেই

রাখিবেন। তাহা হইলে, পিতাকে ছাড়িয়া যাইবার আশঙ্কাবশতঃ নীলিমা যে আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহার কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না। জামাতা অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্য বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া যদি তাঁহার কারবারের অংশী হয়, তাহা হইলে পরানুগ্রহের আপত্তিও উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

যোগেন্দ্রনারায়ণের মনোগত অভিপ্রায়ের আভাস রমেশও জানিয়া লইয়াছিল। সুতরাং আসর জমকাইয়া লইবার জন্য এবার সে নীলিমার স্তুতিবাদে সকলকে হঠাইয়া দিল। যোগেন্দ্রনারায়ণকে সে এমনভাবে আঁকড়িয়া ধরিল যে,তাহাকে ঠেলিয়া ফেলাও সহজসাধ্য নহে।

৪

যোগেন্দ্রনারায়ণের সৌভাগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মূল্যবান্ বেশভূষার প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে সকল সময়েই অতি সাধারণভাবে, অতি সামান্য ও স্বল্প বসনের সাহায্যে প্রসাধন করিত। পিতা তাহার মনোরঞ্জনের জন্য বহুমূল্য অলঙ্কার ও নানাপ্রকারের বসনাদি প্রায়ই কিনিয়া আনিতেন, কিন্তু এই স্বল্পভাষিণী যুবতী সেগুলির কদাচিৎ ব্যবহার করিত। অন্ততঃ পুরুষ স্তাবকদিগের সম্মুখে সে কখনও সাড়ম্বরে বাহির হইত না। পিতার সন্তোষবিধানের জন্য মাঝে মাঝে শুধু তাঁহারই সম্মুখে সে পিতৃদত্ত অলঙ্কারাদি অঙ্গে ধারণ করিত মাত্র।

নীলিমার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় দিন দিন এমনই একটা দৃঢ় ও মৌন গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, রমেশের মত বেপরোয়া যুবকও সসম্ভ্রমে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত।

কন্যার এই ভাবান্তর পিতার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি কন্যাকে ভাল করিয়া জানিতেন। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাঁহার নিকট হইতেই নীলিমা যে উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করিয়াছে।

সে দিন সন্ধ্যার পর কয়েক জন আত্মীয়-পরিবেষ্টিত হইয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ বিশ্রামসুখভোগ করিতেছিলেন। আজ ছোটখাট একটা উৎসব; ভোজের আয়োজনও হইয়াছিল। পূর্ণিমার চন্দ্র নীল সাগরে হাসির প্লাবন বহাইয়া দিয়াছিল। রমেশচন্দ্র নানাবিধ সরস গল্পে সকলকে তুষ্ট করিতেছিল। মনোরঞ্জনের ক্ষমতা এই প্রিয়দর্শন যুবকের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।

নীলিমা তখনও সে আসরে যোগ দেয় নাই। অতিথিদিগের পরিচর্য্যার জন্য সে তখন পাচক ও দাসদাসীদিগের সাহায্যে বিবিধ প্রকার আহার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

এক জন আত্মীয় মহিলা প্রস্তাব করিলেন, পূর্ণিমার রাত্রি, নীলিমার মধুর কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত না হইলে মানাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সে প্রস্তাবে সায় দিল। রমেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "অনেক দিন তাঁ'র গান শুন্বার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। বাস্তবিক, মিসেস্ মুখার্জ্জি চমৎকার প্রস্তাব করেছেন।"

যোগেন্দ্রনারায়ণের মন আজ সমধিক প্রসন্ন ছিল। সোদপুরে একটা প্রকাণ্ড বাগান কেনা হইয়াছিল, এই বিস্তীর্ণ বাগানটার প্রতি অনেক দিন হইতেই তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। তাহা ছাড়া ব্যবসায় হইতে প্রচুর লাভের সংবাদ আজ তিনি পাইয়াছিলেন। উল্লসিতভাবে তিনি কন্যাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাস্তবিক নীলিমা শুধু আহার্য্যের তদ্বিরেই ব্যস্ত থাকিবে? সকলের সঙ্গে মিলামিশা, আমোদপ্রমোদ করিবে না?

গল্প-গুজব পূর্ণোৎসাহে চলিতেছে, এমন সময় আলোকিত বারান্দায় নীলিমা ধীর পদে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে—তৃণাস্তৃত শ্যামল প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্নার ধারা যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। রজনীগন্ধার ঝাড়গুলি মৃদু পবনে আন্দোলিত হইতেছিল।

সুবেশা, সুকেশী, আভরণসমুজ্জ্বলা নারী এবং সৌখীন, বেশবিলাসী তরুণদিগের মধ্যে স্বল্পাভরণা নীলিমা যখন নম্র পদে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার বেশের বৈচিত্র্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল একখানি সাধারণ চওড়া লাল পাড় শাড়ী অতি সাধারণভাবে তাহার অঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ছিল। গায় একটা সাদা ব্লাউজ ছিল বটে, কিন্তু তাহার ছাঁটকাটের বিশিষ্টতা দেখা গেল না। চরণযুগল অন্য মহিলাদের ন্যায় পাদুকামণ্ডিত নহে। কিন্তু সেই বেশে তাহাকে এমন চমৎকার মানাইয়াছিল যে,যোগেন্দ্রনারায়ণ ক্ষণকাল

আদরিণী কন্যার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ সংস্কারমুগ্ধ হৃদয় কন্যার বিলাসবিমুখতায় ঈষৎ আহত হইলেও তাঁহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "এই ভাল! এই ভাল!"

আজ পরলোকগতা পত্নীকে যোগেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়িল। এই নারী প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও কখনও বিলাস-ব্যসনের মোহে আকৃষ্টা হয়েন নাই। নীলিমা আজ যেন সেই মায়ের রূপ ধরিয়াই আসিয়াছে!

প্রগল্‌ভ, বাকপটু রমেশচন্দ্র নীলিমার এমন বেশভূষা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেও তাহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না। এই তরুণীর সংযত ব্যবহার এবং সর্ব্ববিষয়ে উপেক্ষার ভাব তাহার সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সে ইদানীং নীলিমার মন অধিকার করিবার জন্য যথাসাধ্য বুদ্ধি, কৌশল এবং উদ্যম প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই যেন এই নারীর মনের 'নাগাল' পাইতেছিল না। নীলিমা অন্যান্য স্তাবকদিগের ন্যায় তাহাকেও এড়াইয়া চলিতেছিল, ইহা সে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে হাল ছাড়ে নাই। পুরুষ নারীকে বশ করিতে পারে না? অন্ততঃ রমেশচন্দ্র এরূপ পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বলিয়া উঠিলেন, "নীলিমা, তুমি আজ এমন বেশে? খালি পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে না, মা?"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে নীলিমা বলিল, "ঘরের মধ্যে, খালি পায় ঠাণ্ডা লাগে কি, জ্যাঠাইমা? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোজ সকালে খালি পায় বেড়ান শুনেছি। তিনি ত মস্ত বৈজ্ঞানিক।"

এ যুক্তিকে ত খণ্ডন করা চলে না। কথাটা কাযেই চাপা পড়িয়া গেল।

অণিমা বলিল, "নীলাদি, আমরা সবাই তোমার গান শুন্‌বার জন্য ব'সে আছি। এস্রাজটা নিয়ে এস।"

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, "হ্যাঁ মা নীলু, নিয়ে এস ত মা। অনেক দিন তোমার গান আমরা শুনিনি।"

চারিদিক হইতে এই প্রস্তাবের পক্ষে অনুকূল মন্তব্যের প্রতিধ্বনি উঠিল। রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মিস্ রায়ের কণ্ঠস্বরের আমরা বিশেষ ভক্ত। আচ্ছা, আপনার যেতে হ'বে না, এস্রাজটা আমিই নিয়ে আস্‌ছি।"

নীলিমার নয়ন সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। একটা বিচিত্র আলোক যেন তাহার দৃষ্টি-পথে বাহির হইয়া রমেশকে দগ্ধ করিতে চাহিল, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তেও একটা মর্ম্মান্তিক হাস্যরেখা দেখা গেল; কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র।

দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে নীলিমা রমেশচন্দ্রকে নিশ্চল করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ ও মৃদু স্বরে বলিল, "মাপ কর্‌বেন, রমেশবাবু। আপনাকে কষ্ট কর্‌তে হ'বে না।"

তাহার পর সকলের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্যে সে বলিল, "আপনারা আজ এখানে অতিথি। আজ মা থাক্‌লে সবই তিনি কর্‌তেন। রান্নাঘরে এখন এত কায যে, আমি এক মুহূর্ত্ত না থাক্‌লে সব মাটী হয়ে যাবে। আপনারা অণিমার গান শুনুন। ও চমৎকার গান গায়। আমি ততক্ষণ কাযগুলো সেরে আস্‌ছি।"

বৃদ্ধ দাদামহাশয় দিল্লী হইতে দীর্ঘকাল পরে, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সম্পর্কে তিনি নীলিমার মাতার খুল্লতাত। যোগেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার কন্যা নীলিমাকে বৃদ্ধ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন, "তা বেশ ত! সত্যি, এ বাড়ীর গিন্নী এখন ও-ই ত। এখানে ওকে আটকে রাখলে চল্‌বে কেন?"

উপস্থিত সকলে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও প্রকাশ্যে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। যোগেন্দ্রনারায়ণ নীরবে প্রস্থানবর্ত্তিনী কন্যার লঘু গতির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেশচন্দ্রের উৎসাহও যেন সহসা ম্লান হইয়া গেল।

৫

শরতের প্রসন্ন আকাশ স্বপ্ন-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। যোগেন্দ্রনারায়ণ উষা-ভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মনটা সম্পূর্ণরূপে উদ্বেগশূন্য না হইলেও

আজিকার প্রভাতের শান্ত, অনবদ্য শ্রী তাঁহার চিত্তে যেন একটা আশার আলোক-রেখা টানিয়া দিয়াছিল।

দৈনিক সংবাদপত্রখানা টানিয়া লইয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় নীলিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চা ও রুটীর টোষ্ট তাঁহার সম্মুখে রাখিল।

পিতার পরিচর্য্যার ভার নীলিমা আপনার হাতেই রাখিয়াছিল। অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

যোগেন্দ্রনারায়ণ সংবাদপত্র হইতে মুখ তুলিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিলেন। নীলিমা বুঝিল, পিতা তাহাকে কিছু বলিতে চাহেন। সে ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পিতার কেশ-রাজির মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া পাকা চুলের সন্ধান করিতে লাগিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া, ধীরে ধীরে তাহা টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "মা, অনেক দিন ধ'রে একটা কথা ভাব্‌ছি। রমেশ ত রাজীই আছে। আগামী অগ্রাণ মাসে শুভ-কাযটা হ'লে মন্দ হয় না। কা'ল রাত্রিতে সে খোলা-খুলিভাবে আমার কাছে প্রস্তাবও করেছে। আমি তা'কে ব'লে দিয়েছি, তোমার মত না নিয়ে আমি কিছু স্থির কর্‌ব না। যদিও আমি জানি, আমার মা তার ছেলের কোন ব্যবস্থারই কোন দিন প্রতিবাদ কর্‌বে না।"

নীলিমার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই নে!"

যোগেন্দ্রনারায়ণের কর্ণে কন্যার ব্যথাতুর কথা প্রবেশ করিল বটে; কিন্তু তিনি তাহার মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। আশ্বাসবাক্যে তিনি বলিলেন, "আমাকে ছেড়ে তোমাকে কোথাও যেতে হ'বে না, মা! তোমরা এখানে এই বাড়ীতেই থাকবে। রমেশ তা'তে খুব রাজী আছে। ছেলেটি বড় ভাল, সবরকমেই উপযুক্ত।"

মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে নীলিমা বলিল, "না, বাবা, তোমার ও আমার মাঝখানে কাকেও দরকার নেই। সে আমি সহ্য কর্‌তে পারব না।"

পিতা এবার মুখ ফিরাইয়া দুলালী কন্যার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, নীলিমার ওষ্ঠাধরযুগল যেন রক্তলেশশূন্য, নয়নে একটা দীপ্ত আলোক।

তবে, তবে কি নীলিমা রমেশকে পছন্দ করে না? এই রূপবান্, গুণবান্, উচ্চশিক্ষিত, কর্ম্মঠ যুবকের প্রতি তাহার কোনও আসক্তি নাই? তিনি কি সত্যই তবে এত দিন ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছিলেন?

কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু মা, এমন ক'রে ত চল্‌বে না! তোমার একটা ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি আর ক'দিন, তা'র পর? না, মা নীলু, তোমার বিয়ে আমাকে দিয়ে ফেল্‌তেই হ'বে। নিঃসঙ্গ জীবন—না, সে হতেই পারে না!"

"বাবা!"

কন্যার এই দুই অক্ষরবিশিষ্ট সম্বোধনে যোগেন্দ্র-নারায়ণ চমকিয়া উঠিলেন। এক একটা শব্দ এক এক সময়ে কাহারও কাহারও কাছে প্রকাণ্ড অভিধানের মত অর্থ-পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার মনে হইল, এই শব্দে কত অলিখিত কাব্য, ইতিহাস—কত ব্যথা-পূর্ণ কাহিনী, আদি-অন্তহীন মানব-জীবনের ব্যর্থতার করুণ সুর যেন লুকাইয়া আছে। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

"মা, মা, আমার এই দগ্ধজীবনের তুই একমাত্র শান্তির আধার। বল্, তোর কিসের দুঃখ? মনের কথা আমাকে খুলে বল্।"

প্রাচীরগাত্রে জননীর তৈলচিত্রখানি দুলিতেছিল। সেই দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া তরুণী বলিল, "বাবা, তোমার সোদপুরের বাগানবাড়ী মেরামত করা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ মা, চারিদিকে পাঁচীল দিয়ে ঘিরে ফেলেছি। তুমি যেমন যেমন বলেছিলে, সেই রকম ক'রে বাগান, পুকুর সব তৈরী হয়েছে। চল, এক দিন তোমাকে দেখিয়ে আনি।"

দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে বাম হস্তের অঙ্গুলির নখ খুঁটিতে খুঁটিতে নীলিমা বলিল, "ঐ বাগানটা আমায় দেবে, বাবা?"

যোগেন্দ্রনারায়ণ বিস্মিত হইলেন। সহাস্যে বলিলেন, "আমার যা কিছু, সবই ত তোমারই মা। আমার আর কে আছে?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে নীলিমা বলিল, "বাবা, চল, আমরা ঐ বাগানবাড়ীতে গিয়ে থাকি। তুমি সেখান থেকে রোজ মোটরে আপিসে আসবে। এ বাড়ী ভাড়া দিলেই হ'বে।"

পিতার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তিনি ইদানীং কন্যার মনের গতির সহিত তাল রাখিয়া সত্যই চলিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমেই সে যেন একটা হেঁয়ালী হইয়া উঠিতেছিল।

"তা বেশ, তাই হ'বে। কিন্তু সেখানে, আশেপাশে কোন লোকজন নেই. আত্মীয়-স্বজনের মুখ সর্ব্বদা দেখতে পাবে না। এখানে রোজ কত লোকজন আসেন। সেখানে কিন্তু নির্ব্বাসনের মত কষ্টকর জীবন হ'বে, মা।"

নীলিমা দৃঢ় স্বরে বলিল,"সে আমি খুব পারব, বাবা। মানুষের সঙ্গ এখন আমার মোটেই ভাল লাগে না। খালি স্বার্থ, নীচ স্বার্থ!"

বলিতে বলিতে তরুণীর আননে অসন্তোষের গাঢ় ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

যোগেন্দ্রনারায়ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, তুই কি তবে চির-কুমারী থাকতে চাস্?"

নীলিমা কোন উত্তর করিল না। যোগেন্দ্রনারায়ণ বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর আপনা-আপনি বলিলেন, "কঠিন সমস্যা!—সে কি সম্ভবপর? পিচ্ছিল পথ। দুরন্ত পৃথিবীর দুর্দ্দান্ত মানুষ!—না মা, তুই ছেলেমানুষ, এ পথ তোর নয়! আমি না হয় অন্য পাত্র দেখ্‌ছি।"

শান্ত কণ্ঠে তরুণী বলিল,"বাবা, তোমার ও মা'র রক্তে আমার জন্ম হয়েছে, সে কথাটা ভুলে যেও না। কিছু দিন আগের কথা তুমি কি ভুলে যেতে পার, বাবা? মানুষের পরিচয় কি ভাল ক'রে পাওনি? যে সংসারে মানুষ শুধু টাকা ও রূপের আদর করে, তা'র মাঝখানে তোমার মেয়েকে বিসর্জ্জন দিও না, বাবা!"

অতি সত্য কথা। হাঁ, যাহার আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞান আছে, সে কিছুতেই এই অভিজ্ঞতা, এই নির্ম্মম শিক্ষার পর আর ভুল করিবে না। মানুষের হৃদয়ের কোন মূল্য নাই। গুণের কোনও আকর্ষণ নাই? শুধু বাহিরের শোভাময় খোলস ও চক্রাকার মুদ্রার মধুর শব্দের আকর্ষণই বেশী?

না, কন্যার নারীত্বের মর্য্যাদাকে তিনি ক্ষুন্ন হইতে দিতে পারেন না। তাঁহার ঈপ্সিত, কাম্য ফললাভ না ঘটুক, তাঁহার সাধ নাই বা মিটিল।

নীলিমা বলিল, "বাবা, তুমি আমাকে আপাততঃ কয়েকটা গরু ভাল দেখে কিনে দিও। আমি তা'দের সেবা করব। ক্রমে সংখ্যা বাড়বে। সেই কায নিয়ে আমি বেশ থাকব। আর আমাদের কাছাকাছি যে সব গরীব ভদ্রলোকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুধের অভাবে দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়ছে. তা'দের খাঁটি দুধ বিলিয়ে দেব। মা'র সঙ্গে এই বিষয়ে আমার অনেক পরামর্শ হ'ত, বাবা। তিনি হঠাৎ চ'লে গেলেন!"

সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ পত্নীর তৈলচিত্রের নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন; নিমীলিতনেত্রে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর কন্যার দিকে ফিরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোর ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক্।"

* * * * *

"শুনুন মিস্ রায়, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।"

অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্রে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

নীলিমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমেশচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। ঘরের মধ্যে তখন আর কেহ ছিল না।

"বলুন।"

একটু সরিয়া আসিয়া রমেশচন্দ্র অভিনয়ের ভঙ্গী সহকারে বলিল, "সে দিন আপনার বাবার কাছে বলেছি। তিনি আমাকে আপনার কাছে প্রস্তাব করতে বলেছিলেন। নীলিমা, তুমি কবে আমাকে ভাগ্যবান্ করতে চাও? আস্‌ছে—"

তর্জ্জনী তুলিয়া, কঠোর দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া নীলিমা বলিল, "রমেশবাবু, আমি জানতুম, আপনি

ভদ্র সন্তান। ভদ্র মহিলার প্রতি শিষ্ট ব্যবহার ও সম্ভাষণও যে আপনার জানা নেই, তা জান্‌তাম না। আপনি অনাত্মীয়া মহিলার সঙ্গে কথা বল্‌বার প্রণালীও কি শেখেন নি?"

সদা সপ্রতিভ রমেশচন্দ্র নীলিমার এই আকস্মিক উত্তেজনায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে দমিবার পাত্র নহে। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "আত্মীয়তার বন্ধনে আপনাকে বাঁধবার জন্যই ত আমি প্রস্তুত। সেই কথাই বল্‌ছিলাম। আপনি কবে আমার সহধর্ম্মিণীর সিংহাসন অলঙ্কৃত কর্‌বেন, সেই আশার কথাটা আমাকে দয়া ক'রে বলুন।"

নির্ম্মমভাবে হাসিয়া নীলিমা বলিল, "সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে নেই, রমেশবাবু! আপনি এই বাঙ্গালা দেশে অনেক রূপবতী, গুণবতী রমণী পাবেন. তাদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে স্বামিরূপে পেয়ে ধন্য হ'তে পারেন। আমাকে মাপ কর্‌বেন, মানুষের সঙ্গ আমার আর ভাল লাগে না।"

নীলিমা ফিরিয়া দাঁড়াইল। রমেশের মনে হিংস্র পশুবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠিল সে বলিল, "মিসেস্ মুখার্জ্জির কাছে এইমাত্র শুনে এলুম্, মানুষ ছেড়ে আপনার নাকি আজকাল পশুপ্রীতি জেগে উঠেছে!"

কঠোর কণ্ঠে নীলিমা বলিল, "সে কথা ঠিক। মানুষের চেয়ে পশুরা ঢের ভাল, ঢের সরল। তা'রা মানুষের ভালবাসার কদর্ বোঝে। রূপের খোলস্ বা টাকার গন্ধে লুব্ধ হয়ে তা'রা মানুষের খোসামোদ ক'রে বেড়ায় না।"

রমেশচন্দ্র স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলিমা যাইতে যাইতে বলিল, 'রমেশবাবু, আপনি যাবেন না। বাবা এখনই নীচে নামবেন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা খেলা করিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

করুণা ও প্রেম

আজ এ দেহ হঠাৎ যদি জীর্ণ হয়ে যায়,
নাহি থাকে এ লালিত্য চিক্কণতা তায়,
রোগে বিকলাঙ্গ বিরূপ পাণ্ডু ম্রিয়মাণ
বজ্রাহত তরুর মত কষ্টে ধরি' প্রাণ,
তবু যদি বলো "তোমায় তেমনি ভালবাসি"
আত্ম-প্রবঞ্চনায় তোমার আমার পাবে হাসি।
বলবে বলো প্রেম তাহারে সে ত মুখের ভাষা,
তোমার সে ত নেহাৎ কৃপা নয়কো ভালবাসা।
আজকে যদি মনটি আমার বিকার লভে সখি
উন্মাদের হার ঘোরে যদি প্রলাপ শুধু বকি।
শক্তি যদি নাহি থাকে প্রেম নিতে প্রেম দিতে
বিস্মরণের ব্যথা জাগে কাতর চাহনিতে,
তবু যদি বলো "তোমায় তেমনি ভালবাসি"
তখন তোমার দক্ষিণতায় ক্ষ্যাপার পাবে হাসি।
বলবে বলো ভালবাসা, সে ত মুখের ভাষা,
তোমার সে ত অপার কৃপা, নয়কো ভালবাসা।
দেহ মনের মিলেই ভালবাসায় গ'ড়ে তোলে
তারুণ্যের অভাবে সে প্রেম কারুণ্যে যায় গলে'।
যৌবনে সই জন্ম যাহার রুচিরতার ধাম
অসুন্দরের পরশে সে রয় না অভিরাম।
ভালবাসা ভাব-সুষমার মধুর মিলন ফল
মিলন মধু গেলে শুধু রয় গো লোণা জল।
যদি একের বিকারে রয় করুণাময় প্রীতি,
ভালবাসা নয় কভু তা' প্রেত প্রেমের স্মৃতি।

শ্রীকালিদাস রায়

আমোদ-কর

উড্ডীয়মান কবি

It is, Sir, Puja time this. ডিস্‌মিস্‌ Ten minute late অমনি ডিস্‌মিস্‌।
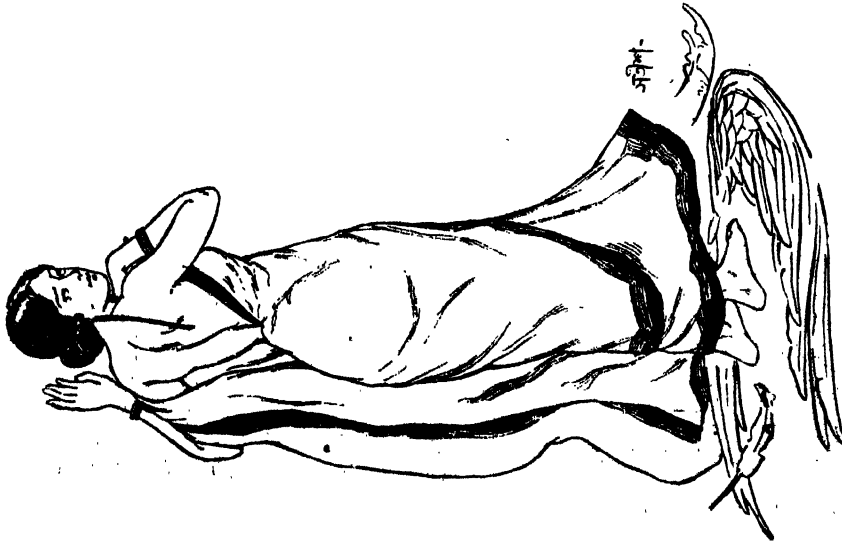
ডানাকাটা পরী

বুকের মাঝে ওড়ন-কল নাই ক' পিঠে ডানা।
উড়তে চাইলে উড়চেন এঁরা কবৃবে কেবা মানা॥
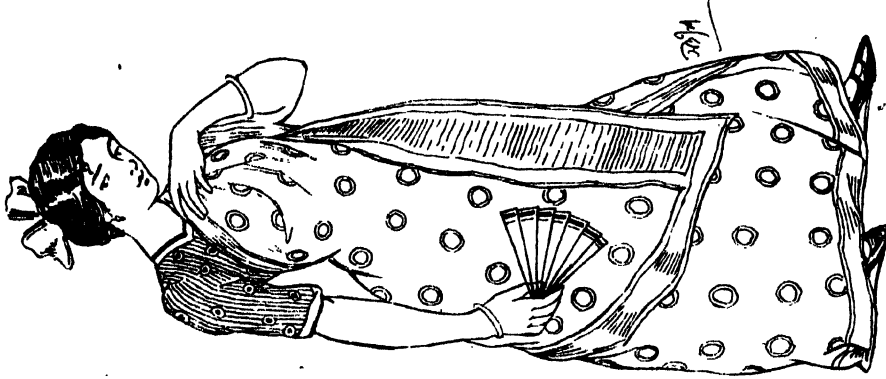
পটের বিবি

কোচ কেদারা আরশীর মতন ইনি ড্যালের ছবি।
পটের বিবি বলেন এঁকে কোন কোন কবি॥

ননীর পুতুল

আল্‌তো আল্‌তো ছুঁয়ো যেন তাত লাগে না অঙ্গে।
ননীর পুতুল গ'লে পড়েন কত এমন রঙ্গে॥

ভাবের অভিব্যক্তি
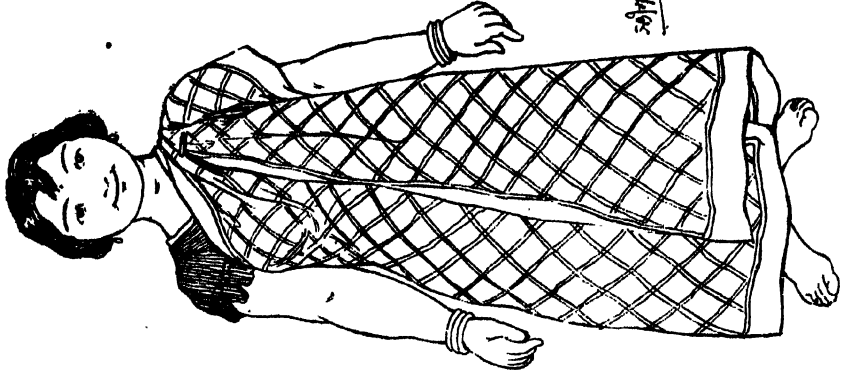
তিনটি ভূমিকায়
একক
তারকনাথ
বাকচী

আমারই যে সর্ব্বনাশ, * বাঘের ঘরে ঘোঘের বাস !

চুপি চুপি আনাগোনা ? দিবা অভিসার। * নাগরা বেজায় কড়া যোগ্য পুরস্কার ॥

এ যে দেখছি মন্দ নয়—ঘুমের অভিনয়! * যেমন কুকুর, তেমনই মুগুর, দিচ্ছি পরিচয়।
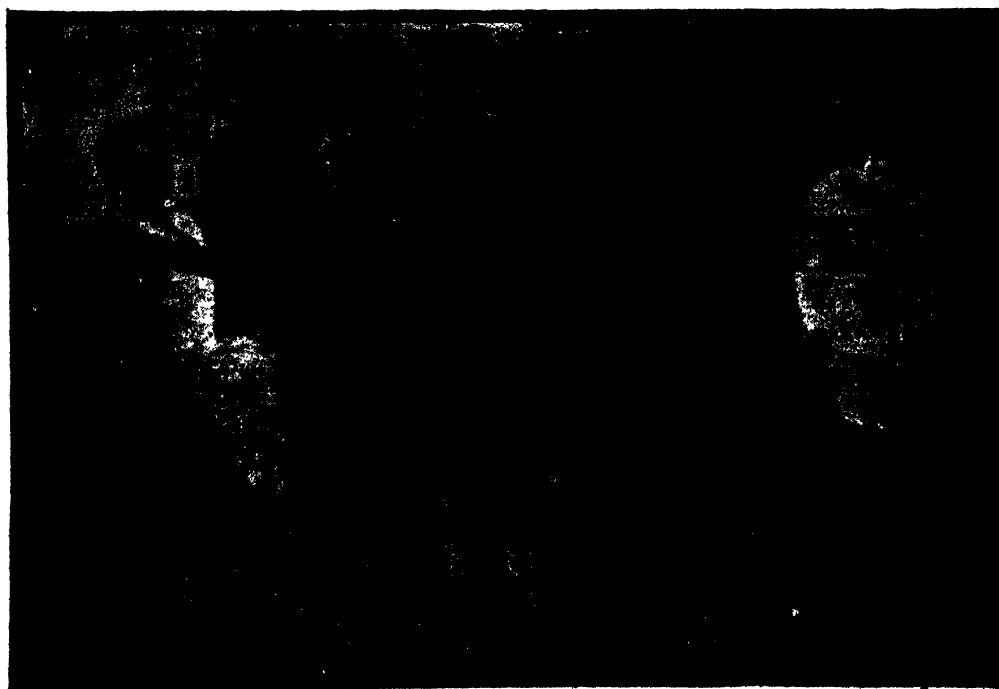
বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী—আপনার পর। * লহ মুণ্ড, দেহ দণ্ড, যেবা ইচ্ছা হয়।

মুক্তি

১

পশ্চাতে ও দুই ধারে উদ্যান-তরুশ্রেণী ; সম্মুখে বর্ষার জলে-ভরা জাহ্নবীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সুপরিপাটী ময়দান ; সুগোল সুঠাম স্তম্ভসারি, উপরে সুদৃশ্য অলিন্দ-পরিশোভিত সুধা-ধবল ত্রিতল অট্টালিকাখানির দিকে নৌকা-যাত্রীরা সকলেই চাহিয়া থাকিত, চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইত—যেমন সুন্দর, শোভন, তেমনই রুচির ঐশ্বর্য্যের মহিমাব্যঞ্জক. যেন স্বর্গ হইতে দেবরাজের অভিবাঞ্ছিত একখানি পুরী কেহ এই পৃথিবীতে আনিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে,—অমর কোনও শিল্পীর হাতে আঁকা ছবিখানির মত নদীতীরে তাহা হাসিতেছে! আহা, কে সে ভাগ্যবান্—মৃদুতরঙ্গা-য়িত-গঙ্গাসলিলস্পৃষ্ট সুশীতল সমীর-সেবিত এই পুরীতে যিনি বাস করেন? এই পৃথিবীর কোনও দুঃখই কি প্রশান্ত আনন্দময় তাঁহার এই জীবনকে স্পর্শও কখনও করিতে পারে?

পুরীখানির নাম বিরামকুঞ্জ। ভাগ্যবান্ অধিকারী কুমার মহীভূষণ রায় চৌধুরী, এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী জমীদার। বড় বড় রাজকর্মচারীরাও যাঁহার কুঞ্জে মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যাঁহাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন।

গঙ্গার ওপারে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরশ্মিজাল নদীর উপর দিয়া আকাশ ভরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, যেন কোন্ স্বপ্নলোকের মোহন ও মাদক একটি মধুরিমা পুরীখানির উপরে কে ঢালিয়া দিয়াছে!

কুমার মহীভূষণ কূলে কূলে জলেভরা গঙ্গাতীরে সেই ময়দানের প্রান্তে পাদচারণ করিতেছিলেন। একটু যেন ক্লান্ত হইয়া কাছেই একখানি মর্ম্মর-আসনে হেলিয়া বসিলেন। নদীর দিকে চাহিলেন, চাহিয়া চাহিয়া গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িলেন।

কে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া কুমার বাহাদুর চাহিয়া দেখিলেন, দীর্ঘায়তন দেহ, অতি বলিষ্ঠ-গঠন, তেজোদীপ্ত বদন, যেন সাক্ষাৎ পুরুষশ্রী এক যুবক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! কে এ? কোথাও কি কখনও দেখিয়াছেন? কই, মনে ত পড়ে না! কোথা হইতে সহসা আসিল? যুবক নীরব, উজ্জ্বল দুটি নয়নের অতি তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। ভয় কি সম্ভ্রমের লেশমাত্র তাহার ঐ ভঙ্গীতে কি দৃষ্টিতে নাই। কই, কেহ ত এমন নির্ভীক নিঃসঙ্কোচভাবে এত কাছে আসিয়া এরূপ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে কখনও পারে না!

"কে—কে তুমি?"

"হরি সিং।"

"হ—রি—সিং! ফেরারী ডাকাত?"

"হাঁ! আর রামপ্রসাদ!"

"রামপ্রসাদ! গুণ্ডা রামপ্রসাদ!"

"রহিম বক্স!"

"রহিম বক্স ও তুমি? পুলিসকে—"

"হাঁ, ধরেছিল বড়বাজারে। দু'জনের বুকে পিস্তলের গুলী মেরে পালিয়েছিলাম, এক মাসও হয়নি!"

মুখখানি একেবারে সাদা কাগজের মত! ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে কুমার বাহাদুর কহিলেন, "তা—তা এখানে এ সময়ে—"

কুমার বাহাদুর একবার পিছনের দিকে ফিরিলেন—লোকজন যদি কেহ ডাকের মাথায় থাকে—

"সাবধান! লোক কেউ এদ্দূর এসে পৌঁছবার আগে আপনার রক্তাক্ত দেহ এই গঙ্গার জলে ভাসবে। ছুরী আর পিস্তল সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকে।"

কুমার বাহাদুর কহিলেন, "কি চাও তুমি? কত—"

"না, সে সব কিছু চাইনে। আপনার ধনরত্ন কিছু লুটে নেব ব'লে আসিনি।"

"তবে?"

"একটা সংবাদ কেবল জানতে চাই।"

"সংবাদ? কি?"

"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হ'ল, একটা ঘটনা ঘটেছিল। স্মরণ করতে পারবেন কি?"

"ত্রিশ বৎসর আগে! তোমার বয়স—"

"আমার বয়সও এই ত্রিশ প্রায় হ'ল।"

"তা হ'লে—সে রকম কিছু ঘটনা—"

"ঠিক জানা বলতে পারিনে. তবে শোনা এমন অসম্ভব কিছু নয়।"

"ঘটনাটা কি?"

"আপনাদের বড় একটা কাছারী ছিল রামপুরে?"

"হাঁ।"

"তা'র কাছেই ছিল বাবলাগাছি ব'লে একটা গ্রাম?"

"হাঁ—ছিল। কেন?"

"বিধবা এক কুলকন্যাকে সেই গ্রাম থেকে আপনি তখন ভুলিয়ে নিয়ে যান?"

শুষ্ক আড়ষ্টপ্রায় কণ্ঠেও একটু সুর বাড়াইয়া কুমার বাহাদুর কহিলেন, "যুবক! এ সব কি তুমি বলছ? কি ভেবেছ? ত্রিশ বৎসর আগে—"

"হ'ক্ ত্রিশ বৎসর আগে! কিন্তু ঘটনা সত্য কি না?"

"ত্রিশ বৎসর আগে—উদ্দাম যৌবনে কোথায় আমি কি করেছি না করেছি, তার একটা হিসাব-নিকাশ মনে ক'রে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার কোনও জবাব আজ কাউকে দিতেও আমি বাধ্য নই।"

যুবক উত্তর করিল, "স্মরণ আপনার আছে, জবাবও দিতে হ'বে। আমি জানতে চাই, সেই নারী জীবিত আছে কি না, আর থাকলে কোথায় আছে?"

জমীদার ভ্রূকুটী করিলেন। কহিলেন, "এমন কোনও নারী যদি স্বেচ্ছায় তখন আমার সঙ্গে কুলত্যাগ ক'রে গিয়েই থাকে, আজও তার সংবাদ আমি রাখব, বাতুল বই কেউ তা ভাবতে পারে না। তার সংবাদ যদি জানতেই চাও, সেই সব যায়গায় গিয়ে খোঁজ, যেখানে সে শেষে স্থান গ্রহণ করে!"

"সাবধান!"

ধমকে জমীদার কাঁপিয়া উঠিলেন। যুবকের রক্তচক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্ত দেখিয়া শরীরের সব রক্ত যেন তাঁহার জল হইয়া গেল। মুখের দিকে চাহিলেন। ধীরে ধীরে শেষে কহিলেন, "তুমি তা'র কে যে, আজ ত্রিশ বৎসর পরে সংবাদ নিতে এসেছ?"

"আমি তা'র পুত্র!"

"পুত্র! পুত্র! তা—তা—র পু—ত্র। তুমি! হরি সিং! রা—রা—ম প্রসাদ—"

"আর রহিম বক্স!"

"পুত্র ব'লে—দা'বী করছ! কিন্তু—প্রমাণ—"

হরি সিং উত্তর করিল, "আদালতে তা উপস্থিত ক'রে আপনার সম্পত্তি দাবী করতে আসিনি। সম্ভব হ'লেও তা করতাম না। জানবেন, আমার পুত্রত্বের পরিচয়ে আপনি যত লজ্জিত হ'তে পারেন, আপনার পিতৃত্বের পরিচয়ে আমি তা'র চেয়ে অনেক বেশী লজ্জিত! এখনও আপনার সন্দেহ কিছু আছে?"

"তবু—"

"আমার জন্মের পর আমার মাতাকে আপনি ত্যাগ করেন না?"

"ক'রেই যদি থাকি—"

"না, আপনার পক্ষে সেটা এমন আশ্চর্য্য কিছু হয়নি। কিছু খোরাকীর বরাদ্দ তাঁর ক'রে দেন, কিন্তু তা তিনি গ্রহণ করেন নাই।"

"হ'তে পারে।"

"হ'তে পারে নয়। আপনি জানেন, তাই-ই হয়েছিল।"

"ভাল, স্বীকারই করলাম। তার পর?"

"কিছু অর্থসহ অন্য এক নারীর হাতে শিশুকে দিয়ে দেন?"

"তা—"

"এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেন, ঠিক হাতে ধ'রে যেন তাকে না মারে, তবে তার অবহেলায় যদি সে—"

"এ সব কি বলছ তুমি?"

"কিন্তু সেই নারীর প্রাণে একটা মমতা অসহায় শিশুর প্রতি জেগে উঠল,—যত্নে সে তাকে পালন ক'রে তুলল। আপনিও কোনও সংবাদ নেননি, সে-ও ভয়ে কোনও সংবাদ আপনাকে দেয়নি। পাছে আপনি কিছু জানতে পারেন, তাই, সে শিশুকে নিয়ে দূরে কোথাও চ'লে যায়।"

জমীদার নীরব, কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরি সিং কহিল, "পৃথিবীতে এনে আবার আপনের মত যাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় ক'রে দিতে চেয়েছিলেন, সেই আমি আজ এই পূর্ণবয়সে আপনার সম্মুখে উপস্থিত! প্রীতিকর আপনার যে হচ্ছে না, হ'তে পারে না, তাও বেশ বুঝতে পারছি।"

ধীরে ধীরে জমীদার কহিলেন, "কি প্রয়োজনে তবে এসেছ? কোনও সাহায্য—"

"সাহায্য! হাঃ হাঃ হাঃ! সাহায্য! আপনার কাছে! যে পথেই গিয়ে থাকি, অর্থের অভাব কখনও হয়নি। অর্থ বাহুবলে বুদ্ধিবলে কেড়ে নিয়েছি—ভিক্ষা কখনও করিনি। দুঃখীকে ভিক্ষা বরং অনেক দিয়েছি, প্রজার অর্থশোষণ ক'রে যা আপনারাও কেউ কখনও দুঃখীকে বড় দেন না, দিতে চান না। ভোগপুষ্ট ঐ অসার দেহের ভোগেই আপনাদের কুলোয় না।"

"তবে—কি প্রয়োজনে—"

"আগেই বলেছি। আমার মা'র সন্ধান চাই। আপনি কি জানেন না?"

"না।"

"ঠিক জানেন না?"

"না। জানলে অস্বীকার করবার কোনও কারণ ছিল না।"

"হুঁ!"

যুবক দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল। জমীদার কহিলেন, "কিন্তু—একটি কথা আমি বুঝ্‌তে পারছি না। এত দিন পরে তুমি—"

"এত দিন পরে কেন? এত দিন পরেই সম্প্রতি জানতে পেরেছি আমার মা'র দুর্ভাগ্যের কথা, আর আমার—আমার জন্মদাতার পৈশাচিক আচরণের কথা।"

"সেই নারী—"

"কখনও আমায় কিছু বলেনি। এইমাত্র জানতাম, সে আমার মা নয়,—আরও জানতাম, আমার মাতা কুলভ্রষ্টা কোনও নারী। কিন্তু সে কে, কে তাকে কুলভ্রষ্টা করেছিল, এ সব জানবার ইচ্ছাও কখনও হয়নি, মনে কখনও উঠলেও চেপে দিইছি। কারও পক্ষেই এ সব চিন্তা সুখের নয়।"

"তা এখন—"

"এখন? শীঘ্রই পুলিসের হাতে আমাকে ধরা দিতে হ'বে—"

"ধরা দিতে হ'বে? পুলিসের হাতে—"

"হাঁ। আর সামলাতে পারছিনি। হরি সিং, রামপ্রসাদ আর রহিম বক্স—তিন জনই যে আমি একা, তা তারা জানতে পেরেছে। আটঘাট সব প্রায় বেঁধে ফেলেছে! দলগুলি এক রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আমার দুই জন অতি বিশ্বস্ত সঙ্গী পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। অমানুষিক পীড়ন তাদের ওপর হচ্ছে। এড়াতে এখনও হয় ত নিজে আমি পারি। কিন্তু আমার সেই সঙ্গী দু'টিকে অসহনীয় এই ক্লেশ থেকে বাঁচাতে হ'বে। ধরা দেওয়া ছাড়া তা'র আর উপায় কিছু নাই।"

"কিন্তু ধরা দিলে কি দণ্ড তোমার হ'বে জান?"

"জানি! ফাঁসী। যে ডাকাত, যে গুণ্ডা, তাকে খুনও করতে হয়। আগের খুনগুলো প্রমাণ না হ'লেও, পুলিস দুটোর বুকে যে গুলী মেরেছিলাম, তা'র একটা ম'রে গেছে। ফাঁসী হাতে হাতেই যেতে হ'বে! কি, কি ভাবছেন? সন্তান ব'লে কিছু মমতা হচ্ছে আজ? না ভয় পাচ্ছেন, পরিচয়ে পাছে লোক-সমাজে কি রাজদরবারে আপনাকে অপদস্থ হ'তে হয়? ভয় নাই, সে পরিচয় আমি কিছু দেব না। কেন দেব? পরিচয়ে আমার গৌরব কিছু নেই। আপনাকে অপদস্থ ক'রে প্রতিশোধ নেবারও ইচ্ছে নেই!"

"তবে—"

"ধরা দিতে হ'বে, এই সঙ্কল্প যখন স্থির করলাম, কেন জানি না, মনে হ'ল, আমার মাতা যদি জীবিত থাকেন, শেষ একবার দেখা ক'রে বিদায় তাঁ'র কাছ থেকে নিই। এই রকম একটা ধারণা আমার ছিল, পিতা যত বড়ই পাষণ্ড হ'ন, মা আমার প্রতারিতা, অতি দুর্ভাগা। যদি জীবিত থাকেন, যে অবস্থায়ই থাকুন, দেখা যদি হয়—"

হরি সিংএর চক্ষুতে জল আসিল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "সেই নারীর কাছে তখন জিজ্ঞাসা করি, সব সে জানত। তার কাছেই আপনার আর আমার অভাগী মা'র পরিচয় আমি পাই।"

আবার হরি সিংএর কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসিল। আত্ম-সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কোনও সংবাদ তাঁ'র আপনি সত্যই জানেন না?"

"না বাবা! জান্‌লে—"

"আচ্ছা, আসি তবে।"

বলিয়াই হরি সিং চলিয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কুমার বাহাদুর বসিয়া রহিলেন।

২

তিন চার দিন চলিয়া গিয়াছে। কুমার বাহাদুর উচ্চ কোনও রাজপুরুষের সঙ্গে কি প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।—বৈকালে এখন নিজের মোটর-যানে গৃহে ফিরিতেছেন। কলিকাতা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়াছেন, লোক-জনের ভীড় কিছু ছিল না, বিদ্যুদ্বেগে গাড়ীখানি ছুটিয়াছে। অতি শীর্ণদেহে ব্যাধি-ক্লিষ্টা এক ভিখারিণী লাঠি ভর করিয়া পাশের এক পথ দিয়া অতর্কিতভাবে সহসা মোটরখানির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আতঙ্কে ভিখারিণী চীৎকার করিয়া উঠিল, সামলাইতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল, মোটরখানি একেবারে তাহার উপরে আসিয়া পড়ে আর কি! সাইকেল চড়িয়া একটি যুবক পাশের আর এক পথ দিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবস্থা দেখিয়াই লাফ দিয়া পড়িল; কিন্তু ভিখারিণীকে ঠেলিয়া দিতে দিতেই মোটরখানি তাহার নিজের হাঁটুর উপর দিয়া চলিয়া গেল, হাঁটু কাটিয়া দুই ভাগ হইল! প্রাণপণ চেষ্টাতেও চালক সামলাইতে পারিল না।"

"আহা হা! কে তুমি, বাবা! কে তুমি—কার বাছা গো! অভাগীর জন্যে এম্‌নি ক'রে প্রাণটি দিলে! আহা হা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! এ যে রাজার ঘরের দুলাল গো!"

আর্ত্ত স্বরে কাঁদিয়া ভিখারিণী আহত যুবকের রক্তাক্ত ভূপতিত দেহের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

ক্ষীণ ও ক্লিষ্ট স্বরে যুবক কহিল, "কেঁদো না, মা! তোমার লাগেনি ত! উঃ! কোনও দুঃখু নেই! মা! তুমি কে?"

"আমি! কেউ নই—বাবা, কেউ নই! অভাগী এক পথের ভিখারিণী! বাবা! বাবা! কি হ'চ্চে গো! আহা হা! পাখানি যে একেবারে দু' ভাগ হয়ে গেছে গো! ওগো! কে কোথায় আছ গো!"

"চুপ! কেউ নেই! ডাক্তারখানা অনেক দূরে! দরকার নেই! দেখ—তোমারই মত—এক জন ভিখারিণীকে খুঁজছিলাম। আহা! সে যদি—আজ—তুমি হ'তে—আঃ—জল!"

"জল! আহা হা! তেষ্টায় ত বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে! কোথায় জল—যাই—যাই—দেখি?"

যুবক ভিখারিণীর হাত চাপিয়া ধরিল।

"না—যেও না! জল—কোথায়! যেও না। হাতখানি আমার বুকে রাখ!—মা! আমার মা! আঃ—যদি তুমি—এই পথের ভিখারিণী তুমি—সত্যি যদি আমার মা হ'তে"

কত দূর গিয়াই মোটরখানি থামিয়াছিল। ঘুরিয়া তখন কাছে আসিল, কুমার ও সোফার তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন।

"কে—কে—হরি সিং! তুমি! তুমি আমার মোটরে আজ—"

ভিখারিণীর পাশেই কুমার বাহাদুর বসিয়া পড়িলেন।

হরি সিং চাহিয়া একবার দেখিল। মুখে মৃদু একটু হাসিও যেন ফুটিল। কহিল, "কে, আপনি? আপনার গাড়ী? বাঃ! বেশ হয়েছে! এ পাপ দেহ থেকে আজ মুক্তি পেলাম—আপনা থেকে! বাঃ—বেশ হয়েছে! ধন্য আমি! কিন্তু—আমার মা—"

সোফারের দিকে চাহিয়া কুমার বাহাদুর কহিলেন, "ধর—ধর, রামশরণ! তোল—গাড়ীতে তোল। সময় আছে! এক্ষুণি ছুটে চল কল্‌কেতায়!"

"না—না! যাব না! ধরো না—তুলো না! যাব না! এই রাস্তায়—এখানে—এই আঘাতেই—"

ভিখারিণী সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তুমি! তুমি! তুমি সেই কুমার বাহাদুর! কে এই হরি সিং! কে এ তোমার!"

কুমার বাহাদুর চাহিয়া দেখিলেন, কে এ ভিখারিণী।

"চিন্‌তে পারছ না? না, পারবে না, সেই আমি—

আর আজ এই আমি! তবু—দেখ—দেখ! নাই যদি চেন, বল্‌ছি, সেই আমিই আজ। এই আমি! চল—চল—কে এই হরি সিং? আমার সেই বাছা—"

"হাঁ, সেই বটে, বিন্দু।"

"বাবা! আমার হারাধন! আজ এই ত্রিশ বচ্ছর পরে তোকে পেলুম—এই ভাবে হারাতে! ওহো হো! এত বড় অভাগী এ জগতে আর কোথাও কেউ আছে গো!"

শিথিল দৃষ্টিতে হরি সিং একবার চাহিল। ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "কে—মা! সতী তুমি মা!—আঃ! ধন্য—ধন্য—আমি! মুক্তি—মা'র কোলে—মা—মা—মা—"

"বাবা! বাবা! বাবা আমার! ওহো হো! ওগো—দেখ—দেখ—সব বুঝি শেষ হয়ে গেল গো! ওহো হো! বাবা—বাবা আমার!"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস-গুপ্ত।

কুমার শিবশেখরেশ্বর

গত ১২ই আগষ্ট বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগষ্ট বৈঠকের উদ্বোধনের দিনে স্বতন্ত্র দলের কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় সার ইভান কটনের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনব্যাপারে খুবই একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে ৬ জন পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন:—কুমার শিবশেখরেশ্বর, খাঁ বাহাদুর আবদাস সালাম, ডাক্তার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী, শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং মৌলভী ফজলুল হক। শেষোক্ত ৩ জন তাঁহাদের পদপ্রার্থনা প্রত্যাহার করেন। তখন প্রথমোক্ত ৩ জনের মধ্যে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব চলে। উহাতে ডাক্তার সুরাবর্দ্দী ৫৯ ভোট, কুমার শিবশেখরেশ্বর ৬১ ভোট এবং খাঁ বাহাদুর আবদাস সালাম ৮টি ভোট প্রাপ্ত হয়েন। ইহার পর দুই জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়—সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামান্য নহে। এক পক্ষে স্বরাজ্য-দলীয় ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী, অপর পক্ষে স্বতন্ত্র-দলীয় কুমার শিবশেখরেশ্বর। কুমারের দিকে সরকারপক্ষ এবং বে-সরকারী য়ুরোপীয় পক্ষ যোগদান করেন। ফলে কুমার ৬৭ ভোট এবং ডাক্তার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী ৬১ ভোট প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে অনেকে স্বরাজ্য দলের পরাজয়ের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ইহার প্রভাব ব্যবস্থাপরিষদে পর্য্যন্ত অনুভূত হইবে। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইয়াছে। স্বরাজ্য-দলীয় শ্রীযুক্ত পেটেল ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কুমার শিবশেখরেশ্বর তাহিরপুরের ব্রাহ্মণ রাজা শশি-শেখরেশ্বরের পুত্র। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি সামান্য নহে।

কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায়

যোদ্-দা

অনেক কাল পরে আজ যোদ্‌দা'র কথা মনে পড়ছে। বহু পুরান কথা এমন মাঝে মাঝে মনে আসে। কর্ম্মের উত্তেজনা, চোখের নেশা যখন মনকে মাতাল ক'রে রাখে, তখন আসে না, কিন্তু অবসাদের সময় সার ভাঁটায় অনেক হারানো ডিঙ্গি, ভাঙ্গা তক্তা, বাঁশ, দড়ি, কখনও কখনও ট্যাঁক-ব্যাঁক ঘুরে মোহনার মুখে এসে পড়ে। সাঙ্ঘাতিক পীড়ার আরোগ্যমুখে, নৈরাশ্যের গুমোটের উৎসবের অবসানে বহুদিন বিস্মৃত দু'চারিটি মুখ কোথা থেকে যেন এসে একবার উঁকি মেরে দেখা দিয়ে যায়।

পাড়ার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সবারই যোদ্‌দা'। বয়ঃকনিষ্ঠরা ত বলে-ই, সমবয়স্করাও বলে, বয়োজ্যেষ্ঠরাও চাটুয্যেকে যোদ্-দা' ব'লে ডাকে। এমন কত দিন হয়েছে, যোদ্-দা'কে ডাকতে তার বাড়ীতে লোক পাঠান গেছে, তাঁর বড় ছেলে এসে ব'লে গেল, "যোদ্-দা' ব'লে গেছেন, তাঁর ফিরতে আজ দেরী হ'বে।" ছেলেটির বোধ হয় মনে হয়েছিল যে, সে 'বাবা" বললে আমরা ঠিক বুঝতে পারব না; ছেলেটির মা-ও ছেলের বাপকে যোদ্-দা' বল্‌তেন কি না, এ কথাটা এক দিনও জিজ্ঞাসা করা হয় নি; এখন আর উপায় নেই। কোথায় বা সেই যোদ্-দা', কোথা-ই বা আমি আর কোথা-ই বা তখনকার সেই ইয়ার বন্ধু!

বাল্যে খেলার সাথীদের নাম থাকে "ভাই", ছেলেরা-ও "ভাই", মেয়েরা-ও "ভাই"। প্রথম যৌবনে তারা হয় "ইয়ার বন্ধু"; সে "বন্ধু" শব্দের অর্থ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না; তবে ভাবের আদান-প্রদানে কতক বুঝে নেওয়া যায়। তার পর সারাজীবন কেবল "মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড"; এই বচনটি বিলিতি ব্র্যাণ্ড, কাজেই সস্তা, সৌখীন ও অসার। প্রায় প্রত্যেকের-ই জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সে দিন কতকের জন্ত এই ইয়ার-বন্ধু-সঙ্ঘের মেম্বরগিরি ক'রে নেয়। লেখাপড়া যা' হবার, তা' হয়ে গেছে, অথচ সংসারের মোট মাথায় তোলবার তেমন প্রয়োজন হয় নি, ঘুরে ফিরে বাড়ী এসে "ভাত বাড়" বললেই একখানা পিঁড়ে-ও পড়ে, সামনের থালার উপর ছটি অন্ন-ও দেখা দেয়; নূতন কাপড় জুতো পরবার জন্তে পুরাতনগুলি অব্যবহার্য্য হবার মাত্র অপেক্ষা, এই সময়ে তরুণ যুবকরা হিসাব-কিতাব খতিয়ানের খাতা-বিহীন একটা বিশ্রম্ভালাপের যৌথকারবার খুলে বসে।

আমাদের-ও এক সময়ে এই রকম একটি কারবার ছিল; ডিপো পাড়াতেই এক আলাপী ছোকরার বাড়ী; বাড়ীর কর্ত্তা—শিবুর মামা—বেলা ন'টা বাজতেই আপনার কাযে বেরিয়ে যান, ঐ সময়টুকু আমরা একটু আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কই; তার পর বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বি ফ্ল্যাট থেকে এফ সার্প পর্য্যন্ত সমস্ত পর্দ্দাই আমাদের গলায় খুলে যায়; আবার খাওয়া-দাওয়া ও একটু বিশ্রামের পর বেলা ৩টা থেকে জম্‌তে আরম্ভ ক'রে প্রায় রাত্তির ১০টা পর্য্যন্ত আড্ডা চলে, মামাবাবু-ও প্রায় সেই সময় তাঁর সুরকির কল থেকে বাড়ী ফেরেন।

মাছধরার গল্প থেকে ফ্র্যাঙ্কো প্রাশিয়ান ওয়ার পর্য্যন্ত; তিনকড়ি বাবুর পাঁচালির দল থেকে গ্যারিকের একটিংএর সমালোচনা পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ই আমরা আলোচনা ক'রে থাকি। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না, কেশব সেনের লেকচার শুনে সাহেবরাও চমকে যায়, মুরগীর মত গেরস্ত-পোষা পদার্থটিকে খেতে নিষেধ ক'রে বামুনরা কি মূর্খতাই না প্রকাশ করেছে; ক্যাম্বেল সাহেবের যতই প্রশংসা কর, নবগোপাল মিত্তির না থাকলে এ দেশে জিমন্যাষ্টিক করা সুরুই হ'ত না; এই রকম সব কথার তর্কবিতর্ক আলাপ-ঝগড়া চলতেই থাকতো। সৌহার্দ্দ্য-বর্দ্ধনের প্রধান উপাদান হচ্চে পরস্পরের গুণবাদ অর্থাৎ Mutual Admiration Society. যদি লোকের সঙ্গে ভাব রাখতে চাও ত তার গুণের প্রশংসা কর; গুণ তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়; যাকে খুব খারাপ মনে কর, একটু গঙ্গাজলে চোখ ধুয়ে তার পানে চাইলে অনেক গুণ দেখতে পাবে; নিন্দে ক'রে কেউ কখনও কাউকে শোধরাতে পারে না। 'কিচুর যুগ্যিতা নেই, এ হ'তে একটা উপকার হবার জো নেই—কেবল কোঁচো নবাবী আর বাঁকা সীঁতে' শুনে শুনে যে ছেলে বাড়ীতে এক দণ্ড ব'সতে চায় না, সে পাড়ার জ্যেঠাইমার 'তুই বাবা, একটু কষ্ট ক'রে মাছটি না এনে দিলে ছিরুর আজ খাওয়া হবে

না' শুনে থ'লে গামছা নিয়ে সে পরের বাজার ক'রে এনে দেয়। আমায় এক জন বললে, "তুমি না জোগাড় করলে এবার 'বন্দমাতার' দল ব'সত-ই না।" আবার আমি তাকে বললুম, "তোমরা দলশুদ্ধ মিলে লাটুর মাসীকে গঙ্গাযাত্রা ক'রে তিন দিন ঘাটে না রাত কাটালে সে কি আমাদের দলে ছড়া কাটাতে রাজি হ'ত।" আর এক জন বললে, "ছড়ার কথায় মনে প'ড়ে গেল, হেমের 'ভারত বিলাপ' কবিতাটা শুনেচ—কাছে আছে রে হেম, পড় না ভাই একবার তেমনি ক'রে জোর দিয়ে।" এক দিন এই রকম পরস্পরের প্রশংসা চলছে, মনে খুব স্ফূর্তি এয়েছে, এমন সময় ঝর ঝর—ঝর ঝর ক'রে এক পশলা বৃষ্টি নামলো; 'কার কাছে কি আছে বের ক'রে ফেল ভাই' বলতেই দু'পয়সা চার পয়সা, আর শিবু-ও দিলে দু' আনা। ব্যস্ জমা পুরোপুরি চার আনা, আর আমাদের পায় কে! গরম গরম মুড়ি, তেলে ভাজা ফুলুরী আর ঝুনো নারকেল!—ওহে গাড়ী চড়া বাবু, উইলসন্ হোটেলে ত কারি কাটলেট খেতে যাচ্ছ, কিন্তু এ মুড়ির মজা পাবে না বাবা, পাবে না। ঐ বিল দেখিয়ে জাঁকই যা, প্রাণের আমোদ এই শিবুর তক্তাপোষের উপর ছেঁড়া মাদুরে।

ভবিষ্যৎজীবনযাত্রা—গুরু সমস্যার আলোচনা যে হ'ত না, এমন নয়। 'ভারত উদ্ধার' মার্কাদেওয়া স্বাধীনতা স্যাম্পেনের প্রথম গ্লাস তখন আমরা পান করেছি, সুতরাং 'দাসত্বশৃঙ্খল আর কে পরিতে চায় রে, কে পরিতে চায়'; চাকরী তে কখনই করা হবে না। দেশের মঙ্গল এবং আপনার উন্নতির জন্যে নানান রকম নূতন ব্যবসায়ের কল্পনা মাথায় আসে। এক জন প্রস্তাব করলে—গ্যাস কোম্পানী কোক্ কয়লা বেচতে আরম্ভ করেছে, সেখান থেকে পাইকিরী দরে গাড়ী কিনে এনে পাড়ায় একটা কয়লার দোকান করলে হয় না। কয়লার ভেতর বীররসের অগ্নি লুকানো থাকলেও প্রেমরসের একেবারে অভাব। সেই জন্য প্রস্তাবককে আমরা সেই দিন থেকে 'গদ্য জগা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলুম। কলের চরকা, কলের ঢেঁকি (ধানভানা কল তখনও দেখা দেয় নি), কলের কুলো, তেল, ময়দা প্রভৃতির হাতকল, এ রকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলের মতলব-ও বিস্তর মাথায় উঠতো। একবার তিন চার জনে পরামর্শ করা গেল, জাহাজের সেলার হয়ে আমেরিকায় গিয়ে গোটাকতক নতুন ব্যবসা শিখে আসতে হবে।

* * * * *

যোদ্-দা আমাদের চেয়ে বয়সে ৮।১০ বছরের বড় হ'লেও আমাদের সঙ্গে মিশতেন ও আমাদের আড্ডায় বসতেন-ও। তবে আমাদের বসা দাঁড়ান ছিল সৌখীন, আর যোদ্-দা ওয়াজ ওবলাইজড টু। বেচারীর চীনে-বাজারে একখানি কাগজের দোকান ছিল, প্রাণটিও যেমন সাদা, দোকানের খাতাপত্রের পাতাগুলিও তেমনই সাদা; প্রাণেও একটু কালির আঁচড়-ও পড়েনি, খাতাতে-ও একটু কালির আঁচড় পড়েনি। হেসে কথা কইলে যোদ্-দা নিজের প্রাণটি ধার দিতেন, আর খদ্দের এসে হেসে চাইলেই চেনা অচেনা সকলকেই কাগজ-ও ধার দিতেন। বুঝতেই পারছেন তা হ'লে কারবারের কি গতিক দাঁড়াল? পরিবারের গায়ে যা কিছু সোনা-রূপার গয়না ছিল, সেগুলি বেচে কার-বারের দেনাগুলি সব শোধ ক'রে দোকানের চাবিটি বাড়ীওয়ালার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যোদ্-দা নিজ বাড়ীতে এসে বসল। অভাবের সংসারে সদ্ভাবেরও অভাব। সেখানে উনুন ছাড়া আর সকল যায়গাতেই দিন-রাত আগুন জলতে থাকে।

গৃহিণীর কলেক্টরীতে এমিউজমেন্ট ট্যাক্স জমা না দিলে কর্ত্তার হাসবার হুকুম নেই—তাই যোদ্-দা বলেন, "তোদের কাছে ব'সে এই খানিকটা জিরিয়ে যাই ভাই।"

যোদ্-দার দোকানে যখন বিক্রী-সিক্রী বেশ চল্‌তো—(যোদ্-দা জানতো ধারে), তখন রাধাবাজারের চীনেবাজারের অনেক দোকানদার ইসেরা-ইঙ্গিতে যোদ্-দাকে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়েছে—কেউ কেউ বা শুষ্ক বখরাদারীতেও নিতে চেয়েছে—কেন না, যোদ্-দা ছিল বড় মিষ্টি মানুষ—সুন্দর চেহারা, মুখখানি হাসি হাসি, কথাগুলি মিষ্টি মিষ্টি। আর আপনার পুঁজিই যে সাম্‌লাতে জান্‌তো না, সে পরের চুরি করবে বা পরকে ঠকাবে কি? কিন্তু তা'রা চেয়েছিল চাকরী দিতে যোদ্-দার সৌভাগ্যকে; দুর্ভাগ্যকে কেউ ডেকে বাড়ী ঢোকায় না।

যোদ্-দা'র একটা মস্ত গুণ ছিল, নিজের দুঃখের ধুচুনীর ভিতর থেকে পেঁয়াজ, রশুন, লঙ্কা, হীং, নালতে, চুণ, বোলতা, ভিমরুল, আরশুলা সব বা'র ক'রে ফুলের গন্ধ-ভরা সাজান মজলিস মাটী করতো না। আমাদের মধ্যে কেউ তা'র বেকার অবস্থা বা সাংসারিক কষ্টের কথা তুললে যোদ্-দা' তখনি তা'কে থামিয়ে দিত; বলত, "আর বেশী নয় হে brother, বেশী নয়, বড় জোর আর গোটা তিন চার বছর, তখন মাল বোঝাই ভড়ের দাঁড় টানতে টানতে পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাবে; এখন-ও আগ-জোয়ারে পানুসী ভাসছে, যে ক'টা দিন পার, সুখের বাচ-খেলা খেলে নাও; আমার মুখ পানে চেয়ে নিজেদের সুখের ক্ষীর তেতো ক'রে ফেল না।

যোদ্-দা'র ঠোঁটের হাসি যে কিন্তু ক্রমে অভিনয়ের একসান মাত্রে বিলীন হয়ে আসছে, তা' আমরা বেশ বুঝতে পারতুম। সান্ত্বনা দিবার উপযুক্ত সঙ্গতি তখন আমাদের কিছু ছিল না, বিনামূল্যে পরামর্শ দিবার পর্য্যন্ত বয়স তখন-ও হয়নি। আমাদের আমোদ-প্রমোদের খরচার পালায় যোদ্-দা' যে এ পর্য্যন্ত এক দিন ভাগে-ও ঠাকুর-সেবার ভার নিতে পারেনি, তা'র জন্যে দাদা কিছু লজ্জা পেতেন, তা' আমরা বুঝতে পারতুম; আর কোনমতে পয়সার কথার সঙ্গে যা'তে যোদ্-দা'র নাম না উল্লেখ ক'রে ফেলি, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতুম। মুড়ি-কড়াই মাখা হ'লে প্রথম একখানি ছোট প্লেট যোদ্-দা'র জন্যে আলাদা; প্রথম গ্রাসটি যোদ্-দা না খেলে আমাদের মধ্যে কেউ তা' ছোঁবে না; খিচুড়ী রান্না হ'লে প্রথমে যোদ্-দা'কে ডেকে পাতে বসিয়ে তবে আমরা বসব, ইলিশ মাছ ভাজা তাঁ'র পাতে দু'তিনখানা—মায় ডিম।

* * * *

শ্রাবণ মাস। মধ্যে তিন না চার দিন যোদ্-দা'র একেবারে দেখা নেই। সোমবার কি মঙ্গলবার এই রকম হবে ঠিক মনে নেই, আমি ভোরে উঠে-ই শিবুদের বাড়ী গেছি। আর কেউ তখন-ও এসে জমেনি, শিবু তখন-ও বাইরের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমুচ্ছে। দালানে একখানা হেলান দেওয়া বেতের চেয়ার প'ড়ে ছিল, আমি তার ওপর গিয়ে বসেছি, গোরা এক ছিলিম তামাক দিয়ে গেছে, এমন সময়ে দেখি যোদ্-দা উঠানের মাঝখানে এসে-ই আমায় দেখে থমকে দাঁড়ালেন; আমি বল্লুম, "আরে কোথায় ছিলে এতদিন হে যোদ্-দা, —এস এস।" "আসছি brother এখনি আসছি", ব'লে যোদ্-দা বেরিয়ে গেল। "ব্যাপার কি?—দিন চারেক বাদে ত দেখা দিলে, তামাক-টামাক না খেয়ে-ই যে চ'লে গেল?—হাঁ গোরা—।" "ওই যে যোদ্-দা'-বাবু ফিরেছেন" ব'লে গোরা উঠানের দিকে একটা আঙ্গুল বাড়ালে। হাতে একখানা ফুলিস্কেপ কাগজ, কলম, দোয়াত একটি; এসে আমার হাতের হুঁকাটি নিয়ে বেঞ্চিখানার ওপর ব'সে পড়ল।

আমি। আজ যে তিন চার দিন টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা নেই; কোথায় ছিলে যোদ্-দা?

যোদ্-দা। Brother, তোদের নরম প্রাণে খোঁচা দেবার ভয়ে কিছু প্রকাশ করি নি, কিন্তু আর চলে না।

আমি। তাই ত!

যোদ্-দা। আলু-পটল মাথায় ক'রে ফিরি করতে পারি;—তবে কলকেতার ভেতরে—

আমি। কি বল যোদ্-দা—ছেলেবেলার সেই "Try again"; চেষ্টা করতে করতে-ই একটা চাকরী জুটবেই—জুটবে।

যোদ্-দা। জুটবি ই ত—আলবাৎ জুটবে,—চাই কি আজ ই, তাই তোমার কাছে এসেছি।

আমি। আমার কাছে—

যোদ্-দা। আমার brother একটা উপকার করতে হবে; এই দোত, কলম, কাগজ সব এনেছি, এই বেলা বেশ একলা আছ, ভাল ক'রে আমার একখানি দরখাস্ত লিখে দাও।

আমি। চাকরীর দরখাস্ত?

যোদ্-দা। হ্যাঁ। ইংরাজীটে খুব জবরদস্তি হওয়া চাই। খুব বড় ক'রে একটা অনার্ড স্যার—না মাই লর্ড লিখবে? মাই লর্ড-টাই ভাল, কি বল? তার পর-ই "ইওর কাইণ্ডনিস্" এটা তিন চারবার; "ইওর ম্যাক না চার্টা অফ দি হার্টটাও" দেবে, সেখানে "বেনেভাওলেন্সটা" দেবে আর শেষটায় খুব ভাল ক'রে

ইওর সার্ভেন্ট-সার্ভেন্ট গ্রাটি চিউটলি ওবলাইজ ইউ ফর ফোরটিন মেল জেনারেসান আপওয়ার্ড এণ্ড ডাউনওয়ার্ড, কেমন,—কি বল ?

আমি। (ঈষৎ হাস্তে) তা যা হয় দোবো গুছিয়ে।

যোদ্-দা। পারবে হে পারবে, তা আমি জানি; খামকা পড়াশুনো বন্ধ করলে, তা না হ'লে তুমি এক জন বড় ইংরেজী-ওলা হ'তে পারতে।

আমি। দরখাস্ত দিচ্ছ কোন্ আফিসে ?

যোদ্-দা। যে আফিসে হয়;—আপাতত: মিন্‌সিপ্যাল আফিসের বড় সাহেবের নামে দাও।

আমি। মিউনিসিপ্যালিটীর কোন্ ডিপার্টমেন্টে চাকরী খালি আছে ?

যোদ্-দা'। ডিপার্টমেন্ট টিপার্টমেন্ট জানি নি; চেয়ারম্যান কি সেক্রেটারী যার নামেই হোক, এই কথা লেখ যে, আমার অবস্থা ভয়ানক কষ্টের, সপরিবারে উপবাসে দাঁড়িয়েছে; উপবাস, কষ্ট, এ সব কথাগুলো ইংরিজীতে বেশী জোর হয়;—এই দেখ না, বাঙ্গালায় খালি উপোস নয় উপবাস, কিন্তু ইংরিজীতে একেবারে লম্বা 'এষ্টারভেকেসন" আর তুমি সব জান, বেশী কি বলব। লেখ যে, হয় আমায় এখুনি একটা চাকরী দিক, নয় চুরি করবার লাইসেন্স দিক।

বুকটা ফেটে গেল যোদ-দা'র মুখপানে চেয়ে! তখনও কাঁচা বুক একেবারে দলদলে কাদা, রৌদ্রের তাতে একটুও আঁট বাঁধেনি, তবু মনে হ'ল যেন ফেটে গেল। এ ঠাট্টা তামাসা নয়—মজলিসের মজার কথা নয়।

অভাব উপবাস ঋণের নিদারুণ বেদনা যাতনাযুক্ত ক্লেশের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে চৌর্য্যদ্বারা আহার্য্য অর্জ্জনের জন্ম রাজদ্বারে অনুমতি ভিক্ষা করছে।

"এ দরখাস্ত একটু ভেবে লিখতে হবে, যোদ্-দা, কাল পাবে" এই ব'লে তখন তাঁকে একটু ভুলিয়ে দিলুম। যোদ্-দা বললে "সন্ধ্যের পরে দিতে পারবে না ?" আমি বল্লুম "চেষ্টা করব।"

সে দিন সকালের মজলিসটে ভাল জমল না; যোদ-দা'র দরখাস্তের কথা তখনও কারুকে বলিনি, তবু এই শ্রাবণের সকালটা ফাঁকা ফাঁকা গেল। সন্ধ্যার পর আড্ডা বেশ জমেছে, শরীরটা একটু গরম ক'রে নেওয়া গেছে; যোদ্-দা'র দরখাস্তের গল্প আমার কাছে সবাই শুনেছে; প্রথম একটা হাসির হর্‌রা উঠে গিয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বেই তার প্রতিক্রিয়া; বলাবলি চলতে লাগল, "এ ত হাসির কথা নয়, এ রকম হতাশের বাতাসে মানুষ সব করতে পারে; পাগল হওয়া বা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।" আমি বল্লুম, "সন্ধ্যাবেলায় দরখাস্ত নেবে ব'লে আমায় তাগাদা দিয়ে গেছে, এখনও এল না কেন; রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।" আরও কোয়াটার খানেক বাদে ঠোঁটে মুখে নাকে চোখে ভুরুতে হাতে পায় গলায় বুকে হাসির গোলাপজল মেখে—"Brother, Brother, গুড বেটার বেষ্ট নিউস, চাকরী জুটেছে জুটেছে" বলতে বলতে যোদ্-দা' ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। গন্ত জগা যেন পদ্যে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব'লে উঠল, "দু'ঘণ্টা পরে এসে যদি অমনি ক'রে দেখা দিতে যোদ্-দা, তা হ'লে দু'টো টাকা আজ বেঁচে যেত।"

যোদ্-দা ব'লে উঠল, "হিয়ার ইজ দি টু রুপিস—ডু ইনকোর।" বলেই যোদ্-দা দুটো টাকা ফেলে দিলে। দু'জনে এনকোর বললেই আর দু'জনকে নোমোর বলতে-ই হয়, থিয়েটারের এ আর্টটা তখন আমরা শিখেছিলুম; সুতরাং সবাই বলে উঠলুম—"নো মোর নোমোর, আজ যোদ্-দা তোমার চোখ দুটিতে শ্যাম্পেনের ফ্রথ ফুটে উঠেছে, এর ওপর আর কোন নেশা জমবে না!"

দরখাস্ত লেখার ভার আমায় দিয়ে যোদ্-দা খালি পেটেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন; বেলা ৪টা নাগাদ রাধাবাজারে আগেকার চেনা একটি গ্লাসওয়ারী দোকানে ব'সে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় নিবারণ সুর সেখানে এসে উপস্থিত। নিবারণ যোদ্-দার বহুকালের আলাপী; ছেলেবেলায় স্কুলে, পরে যোদ্-দার যখন কাগজের দোকান, তখন নিবারণ দে কোম্পানীর কাটা কাপড়ের দোকানে চাকরী করে, মধ্যে অনেক দিন কোন খোঁজ খবর ছিল না, আজ হঠাৎ দেখা।

যোদ্-দার সঙ্গে দেখা-শুনো বন্ধের পর নিবারণ ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে ক'রে নানান যায়গায় ঘুরে শেষ

সম্প্রতি রাণীগঞ্জে একটা ছোট খাট দোকান খুলে বসেছে। রাণীগঞ্জ জায়গা ভাল, এখনও ভাল ক'রে চালাতে পারলে সেখানে মাঝারি রকম দোকান বেশ চলে। সুর মহাশয়ের রাণীগঞ্জের দোকানে টিকে, তামাক, দেশালাই, কেরোসিন থেকে আরম্ভ ক'রে কাগজ, কলম, নিব, উডপেনসিল, শ্লেট, শ্লেট-পেনশিল, মারবেল, লাটিম, ব্যাটবল, লজেঞ্জুস, দোয়াত, কালি, গালাবাতী, জুতোর কালি, ছুচ, সুতো, আলপিন, চুলের ফিতে, চিরুণী—কৌটা, আরশি, রুমাল, তোয়ালে, ঝাড়ন, নারিকেল তেল, হাত ল্যাণ্ঠান, হরিকেন ল্যাম্প, সোডা, লেমনেড এই রকম সকল রকমই জিনিষ কিছু কিছু মজুদ থাকে, ছাতাও দু'পাঁচটা রাখা হয়। নিবারণের পুঁজিপাটা বেশী নয়, তার জন্য সে তত ভাবিত-ও নয়; কলকেতার মুরগীহাটা, কলুটোলা, চীনে-বাজার, চাঁদনী প্রভৃতির অনেক দোকানদার নিবারণকে চেনে, বিশ্বাসী বলেও জানে, অল্প স্বল্প মালটাল ধারেও ছেড়ে দেয়। নিবারণের মুস্কিল হয়েছে একলা হয়ে; গস্তে বেরুলে দোকান প্রায় বন্ধ বললেই হয়, আর গস্তে না বেরুলে দোকান চলেই বা কি ক'রে? একটা লোক ঢুকেছে বটে, বোধ হয় বিশ্বাসী, কিন্তু একেবারে নিরেট বোকা—তাই বিশ্বাসী। সে না জানে খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইতে, না জানে বেচা-কেনা করতে; তিন পয়সার জিনিষে পাঁচ পয়সা দাম চেয়ে বসে, আবার পাঁচ আনার চিরুণীখানা তিন আনায় বেচে ফেলে; বোদ্দা যখন বসেই আছেন, তবে নিবারণের সঙ্গে মিশে এ কাযে লেগে যেতে আপত্তি কি? কলকেতা ছেড়ে যেতে বোদ্-দার বিশেষ আপত্তি নেই; বোদ্দি মজবুত লোক, ছেলেপুলে সামলাতে পারবেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে কলকেতাও যা, রাণীগঞ্জও তা, আর কাশী বারাণসীও তা। তবে ব্রাদার, একেবারে অন্ত ভক্ষ্য—বুঝেছ কি না; দিন রুথ মাত্র—সোপ ওয়াস; এ অবস্থায় যাই-ই বা কোথায় – করি-ই বা কি?

বোদ্দা আমাদের ব'লে যেতে লাগলেন; নিবারণ গুড ম্যান, বুজুম ফ্রেণ্ড; বললে, নেভার মাইন; বললে, আপাতত: বাড়ীতে এই টয়েনটি রূপি দিয়ে যাও, আর টেন রূপি তোমার কাপড় জামা লাকটার। সেখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া থাকা, আপাতত: মন্থে মন্থে বাড়ীতে ১৫ টাকা মনিঅর্ডার; দোকান জ'মে গেলে দু আনা বখরা।

আমি বললুম, "বোদ্-দা, আমার আর দরখাস্ত লিখতে হ'ল না। তোমার বুকের পিটিসান করুণাময়ের আসন টলিয়েছে। দুর্গা ব'লে যাত্রা কর।"

বোদ্-দা বললে, "ইয়েস, শুক্রবারে; কিন্তু ব্রাদার, তোদের ছেড়ে যেতে মনটা বড় কাঁদছে, এক একবার মনে হচ্ছে, টাকা ক'টা নিবারণকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি, যা আছে বরাতে হবে।"

শিবু একটু গোঁয়ার গোছের লোক, ব'লে উঠল, "ও রকম কর যদি বোদ্-দা', তা হ'লে একটা হাতাহাতি হয়ে যেতে পারে ব'লে দিচ্ছি। আমরা মরব না, মাস-ছয়েক ঘুরে একবার বাড়ী এস, আবার দু'দিন এই রকম আমোদ করা যাবে।"

* * * *

ছ'নাম চুয়ায় মাস কেটে গেছে; আমাদের আড্ডা একটু পাতলা হয়ে এসেছে; দু' এক জন চাকরীতে ঢুকেছে, (এরা আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে স্বাধীন ছিল), এক জন এলাহাবাদ গেছে, সেখানে তা'র মামা বড় উকীল। নিমাই শুধরে গেছে, নিজের পরিবার ছাড়া অন্য পুরুষের মুখ দেখে না। আর দু' পাঁচ জন যে কেন আসে, তা বলতে পারি না। যে ক'জন আমরা আড্ডায় এসে জমি, তা'দেরও বাড়ীতে আজকাল ভাতটা বেড়ে দেয় একটু মুখটা ভার ক'রে; ছুটীর পর যা হোক একটা করতেই হবে, মনে এই রকম একটা ভাব মাঝে মাঝে আসে, তবু বন্যায় জল ম'রে নব-যৌবনের আনন্দের স্রোতে এখন-ও একেবারে ভাঁটা পড়েনি।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। এখনও বাড়ী থেকে নতুন কাপড়-জুতো পাওয়া বন্ধ হয়নি; দেনা ব'লে দানাটার সঙ্গে এখনও চেনা-পরিচয় নেই; এখনও বাড়ীতে ছেলে ব'লে পরিচয়, নেবার সম্বন্ধ—দেবার নয়। পূজোর চারটে দিন কি রকম ক'রে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে, মিলে-জুলে ব'সে আমোদ-প্রমোদে কাটান যাবে, তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা যাচ্ছে হুঁকার টান, আর মাঝে মাঝে পাণ, এমন সময়—ও কে ও! বোদ্-দা না! বাঃ বাঃ!

একেবারে ছেলেমেয়ে সঙ্গে ক'রে যে! কবে এলে? কখন্ এলে?

যে'দ্-দা'। তিন বছর নয় রে ভাই, তিন বছর নয়? বছরখানেক অনেকটা রগড়ারগড়ি কর্‌তে হয়েছিল, তার পর থেকে যোদ্দা দোকান বেশ জাঁকিয়ে চল্‌ছে; শুধু দোকান নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাণীগঞ্জ থেকে পোড়া কয়লাও দু' দশ ওয়াগন চালান দিয়ে থ'কি। আরে ভাই, এখন আমি শুধু যোদ্-দা' নয়; এণ্ড কোং—এণ্ড কোং, সুর চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং। কা'ল সকালে এসে পৌছেচি, তোদের সঙ্গে দেখা করিনি, ছেলেগুলোকে নতুন কাপড়-জুতো কিনে পরিয়ে আনব মনে করেছিলুম, তাই দেখা কর্‌তে দেরী হয়ে গেল। ব্রাদার, সে-ই তিন বছর আগে আমার দু'টো টাকা ফিরিয়ে দিছলি, কিন্তু আজ যদি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ফোর ডোজের ফোর, দ্বিগুণে এইট রুপি না নিস্, তা হ'লে কা'ল সকালে রাণীগঞ্জে ফিরে যাব। এই ফোর 'বিগাইব' আমার, বিজয়া 'ম্যানেজ' করিস ইউ অল্; ফেয়ার ডিলিং—কেমন? আজকাল যে রাণীগঞ্জে সাহেবদের সঙ্গে কথা কই রে আমি, তাঁ'রা ভারি খুসী, হেসে লুটোপুটি।

* * * *

৫০ বছরের উপর চ'লে গেছে। ৫০ বার মা দুর্গা বঙ্গদেশে এসেছেন—চ'লে গেছেন। আজ কোথায় বা সেই শিবু, কোথায় সেই গন্ধ-জগা, কোথায় বা নিমাই, আর কোথায়-ই বা সে যোদ্-দা! হা রে, প্রথম যৌবন! চেষ্ট, বেষ্ট, এণ্ড মোষ্ট মিষ্টি! আবার ষষ্ঠী এসেছে, কিন্তু আজ একটু হাসতেও যেন কষ্ট হচ্ছে!

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মী

মুখ-পদ্ম হাতে পদ্ম পদ্ম হৃদি-সরে।
পদ্মাসনা হেন লক্ষ্মী গৃহ আলো করে॥

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ রায়

গত ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল-সভার সভাপতি মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার ভবানীপুরের বাটীতে ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ রায় হাওড়া জিলার তাজপুরের গিরিজাচরণ রায়ের পুত্র। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্কুল ও কলেজে নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। এফ, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ঈশান, বৰ্দ্ধমান ও ভিজিয়ানাগ্রাম বৃত্তি লাভ করেন। পরবৎসর তিনি গণিতে এম, এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ হইতে বি, এল পাশ করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের উকীল হয়েন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ পর্য্যন্ত তিনি সিটি কলেজে গণিত ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ রায়

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় মহেন্দ্র বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হয়েন। তাহার পর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৯১০ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত তিনি সিণ্ডিকেটেরও সদস্য ছিলেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের 'ডীন' নির্ব্বাচিত হয়েন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাই ছিলেন। ওকালতী করিয়াও তিনি অবসরসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা এবং গণিতশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। তাঁহার প্রণীত বীজগণিত ছাত্রসমাজে আদৃত হইয়া থাকে।

উকীল হইয়া প্রথম রায় মহাশয়কে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রথম ১৫ বৎসর তাঁহার তেমন অর্থাগম হইত না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি 'ইণ্ডিয়ান রিপোর্ট' কলিকাতা সিরিজের রিপোর্টার ছিলেন। সে সময় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইলে রায় মহাশয়ের ওকালতীতে অনেক সুবিধা হয়। ওকালতীতে তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তিও অল্প ছিল না। কালেজে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানকালে যেমন তাঁহার সুনাম হইয়াছিল, ওকালতীতেও তাহা হইতে কম হয় নাই।

রায় মহাশয় নিজ জিলার উন্নতিসাধনের জন্য খুব পরিশ্রম করিতেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত হাওড়া জিলাবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

গত এক বৎসরকাল মহেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এ জন্য তিনি নানা স্থানে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাস করিয়াছিলেন। যে ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার

তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বে পাঁচ, সপ্তাহকাল তাঁহার জর হইতেছিল। উহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জ্ঞান ও মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন প্রাতেই তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয় এবং বেলা ৮ ঘটিকার সময় সব শেষ হয়।

তাঁহার বিধবা পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ সর্ব্বজনবিদিত; তিনি হাইকোর্টের এডভোকেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

মহেন্দ্রনাথ কেবল উকীল হিসাবে নহেন, বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হিসাবেও এ দেশের এক জন উচ্চাঙ্গের মানুষ ছিলেন। তাঁহার অভাব বাঙ্গালার পক্ষে বড় সামান্য নহে।

কবি মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত ১৫ই ভাদ্র সোমবার অপরাহ্নকালে সুকবি মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার বাসগ্রাম টাকী—খুবায় অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। পল্লীমায়ের ভক্ত দুলাল তাঁহার চিরপ্রিয় পল্লীর শ্যামাঞ্চল-ছায়ায় নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছেন—জুড়াইয়াছেন। কবি মুনীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল "হিতবাদীর" সম্পাদকীয় বিভাগে কায করিয়া কিছু কাল সম্পাদকের দায়িত্বও পাইয়াছিলেন; কিন্তু কাল ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে "হিতবাদীর" সংস্রব ত্যাগ করিতে হয়। কবি গাহিয়াছেন—"যে জন সেবিবে তোমার চরণ, সেই সে দরিদ্র হবে।" কবি মুনীন্দ্রনাথের জীবনে কবির এই আক্ষেপোক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। জন্মকবি মুনীন্দ্রনাথ সারাজীবন নিষ্ঠাভরে দেবী ভারতীর পূজা করিয়াছিলেন—অপূর্ব্ব সুরে বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া বিবিধ রাগে নানা গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য কবিতা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠে রহিয়া গিয়াছে। "সাহিত্য", "ভারতবর্ষ" "নির্ম্মাল্য", "পল্লীবাণী, "মাসিক বসুমতী", "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু "হিতবাদীর" সংস্রব বিচ্যুত হইবার পর হইতে তাঁহাকে কঠোর ব্যাধি ও দারিদ্র্যের প্রকোপে পিষ্ট হইতে হইয়াছিল। দেবী ভারতীর কৃপালাভে বঞ্চিত না হইলেও ইন্দিরার প্রসন্নদৃষ্টি কোনও দিন ভাগ্যবিড়ম্বিত কবির দিকে নিক্ষিপ্ত হয় নাই প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল নিদারুণ অভাবের মধ্যে তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এত দিন পরে, ৫৬ বৎসর বয়সে, প্রতিভাশালী কবি জ্বালাময় সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়া সত্যই জুড়াইয়াছেন। সংগ্রামে অবসন্ন কবি প্রায়ই বলিতেন, "আর পারি না।" চিরারাধ্যা জননীকে নিবেদন করিতেন, যেন শীঘ্রই তাঁহার জীবনের অবসান হয়। কবি মুনীন্দ্রনাথের কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। অর্থাভাবে গ্রন্থকারের পর্য্যায়ে তিনি উপনীত হইতে পারেন নাই। সাহিত্য-পরিষদ কি এই দুঃস্থ কবির রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিতে পারেন না? মুনীন্দ্র বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

শ্রীমতী গুপ্তা

বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মিঃ এস, এন, গুপ্তের পত্নী। গত ২৫শে জুন তারিখে লেডী বার্কেনহেড তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে রাজদম্পতির সহিত পরিচিত করিয়া দেন।

আব্দুল্ করিম

এই মূর-নেতা সম্প্রতি প্রবল ফরাসী ও স্পেনীয় জাতির সম্মিলিত বাহিনীর বিপক্ষে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছেন। বহুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ মরক্কো বা মূর-দেশ স্বাধীন ছিল। মূররা এককালে শৌর্য্যে-বীর্য্যে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও জ্ঞানগরিমায় জগতে শ্রেষ্ঠ জাতিত্বের দাবী করিয়াছিল। তাহারা বাহুবলে স্পেনদেশ অধিকার করিয়া তথায় আপনাদের সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। অদ্যাপি স্পেন দেশের গ্রানাডায় মূর স্থাপত্যের চরম নিদর্শন আলহাম্‌ব্রা প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। কালে মূরদিগের পতন হয়। স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা বহুকাল যুদ্ধ করিয়া মূরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহার পর ভাগ্যনেমির আবর্ত্তনে স্পেনীয়রা মূরদেশের কতকাংশ অধিকার করে; ফরাসীও ঐ দেশের দক্ষিণাংশে প্রভাব বিস্তার করে। মূর সুলতান মুলী হাফিদ বিজেতাদিগের হস্তে বন্দী হয়েন। এখন এক জন নামমাত্র সুলতান আছেন, তিনি ফরাসীদের কৃপাপ্রার্থী। উত্তরে স্পেনীয়, দক্ষিণে ফরাসী, এতদুভয়ের মধ্যে রিফ নামক পার্ব্বত্য অঞ্চল কতক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। আবদুল করিম পূর্ব্বে স্পেনীয় সিবিল সার্ভিসে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তিনি পরে স্বয়ং রিফের মূরদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া উপরি-উক্ত প্রবল প্রতীচ্য শক্তিদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। প্রথমে যুদ্ধে তিনি স্পেনীয়দিগকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রোপকূলে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে ফরাসীরা তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। আবদুল করিম জগতের সকল নিরপেক্ষ জাতিকে জানাইয়াছেন যে, তিনি দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার মূর-সেনা কষ্টসহিষ্ণু, ধর্ম্মপ্রাণ; তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না, ভাগ্য বিরূপ হইলে তাহারা তাহাদের নারীদিগকে হত্যা করিয়া শত্রুর তরবারিতে প্রাণ দিবে। ফরাসী বলিতেছেন, তাঁহারা আবদুল করিমকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, করিম তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু করিম বলিতেছেন, তিনি সন্ধির প্রস্তাব প্রাপ্ত হয়েন নাই; পাইলে সম্মানজনক সন্ধি করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এখনও তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

আবদুল করিম

স্যর উইলিয়াম বার্ডউড

সার উইলিয়াম বার্ডউড

লর্ড রলিনসনের পরে ইনি ভারতের জঙ্গীলাট বা প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন। সে দিন ব্যবস্থা-পরিষদে, জনতার উপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ইনি ইঁহার প্রথম বক্তৃতায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার উদারনীতি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ইনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, জনতার উপর কতটা বল-প্রকাশ করা এবং কোন্ মুহূর্ত্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা সেনানীরাই ভাল বিচার করিতে পারেন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত